1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(প্রথম খন্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

প্রকাশক

মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

১ম খন্ড

ইমাম গাযযালী (রাহঃ)

প্রকাশক

মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে

মোস্তাফা মঈনউদ্দীন খান

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

১ম প্রকাশ

রমযান ঃ ১৪০৭ হিঃ

২য় সংস্করণ ঃ

রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১০

আশ্বিন ঃ ১৩৯৬

অক্টোবর ঃ ১৯৮৯

৩য় সংস্করণ ঃ

আষাঢ় ঃ ১৪০৫

জুলাই ১৯৯৮ইং

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মদীনা প্রিণ্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

হাদিয়া ঃ ১৪০.০০ টাকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের আরজ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল্-গায্যালী রচিত 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' বিগত আট শতাধিক বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তাঁর এ অমর গ্রন্থ যেমন এক সময় পথভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসলিম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গাযযালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য আমীর-ওমারাহ্গণের মতই তাঁরও জীবনযাত্রা ছিল বর্ণাঢ্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের ব্যাপক স্খলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতো। ইহুদী-নাসারাদের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন কোন সময় এ চিন্তা তাঁকে আত্মহারা করে ফেলতো। ভাবনা-চিন্তারই এক পর্যায়ে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে মৃতকল্প মুসলিম জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করে তোলা একমাত্র দ্বীনের স্বচ্ছ আবে হায়াত পরিবেশনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর তা বিলাসপূর্ণ জীবনের অর্গলে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে হাতে পাওয়া সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি তাড়িত হয়েই ইমাম সাহেব একদিন পরিবার-পরিজন এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যাঁর সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আব্রু ঢেকে দিনের পর দিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জীবনে ইমাম সাহেব পবিত্র মক্কা, মদীনা, বাইতুল মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দামেশকের জামে মসজিদের মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন।

ইমাম সাহেবের এ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল এহইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা। এ গ্রন্থে ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোআন-সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ তাঁকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

এ মহাগ্রন্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান- যাঁদের নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গাযযালীর ভাবশিষ্য, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ভক্ত পাঠক।

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে চাই, এ মহাগ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই আমরা এ কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা করছি, যদিও তাঁর অপার মহিমা ও প্রতিপত্তির সামনে সকল প্রশংসাকারীর যাবতীয় প্রশংসাই নিতান্ত তুচ্ছ। দ্বিতীয়তঃ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক উপাধিতে ভূষিত রসূল শ্রেষ্ঠ (সাঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তৃতীয়তঃ এলমে দ্বীনকে জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে একখানা গ্রন্থ রচনার যে ইচ্ছা আমার অন্তরে উদিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য তৌফীক কামনা করছি। চতুর্থতঃ হে নিন্দুক ও গাফেল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অন্যতম, অধিকতর অস্বীকৃতি ও নিন্দা জ্ঞাপনকারী! তোমার আত্মম্ভরিতার অবসান কামনা করি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আমার জবান থেকে নীরবতার গিঁঠ তুলে নিয়েছেন এবং আমার গলায় কথা ও যুক্তির মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে সে কথা বলতে হল যাতে তুমি নিরত। অর্থাৎ, ন্যায় ও সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে অন্যায়ের সহায়তা ও মূর্খতার প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করছ। যদি কোন লোক সৃষ্টির নিয়ম নীতি থেকে সামান্যও সরে আসতে চায়, কিংবা নীতির অনুবর্তিতা পরিহার করে জ্ঞানানুসারে কাজ করতে আগ্রহী হয় এমন আশায় যে, নফসের পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাকে আল্লাহ যে এবাদত বলে গণ্য করেছেন, তা হাসিল করতে পারবে এবং সারাটা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার প্রতিকারে যত্নবান হবে। যেসব আলেম সে বিষয়ের প্রতি উদাসীন তাদের সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তক হযরতে ফখরুল মুরসালীন (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه -

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন সে আলেমই সর্বাধিক কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেমের কোন উপকারিতা দান করেননি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দাও, অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অস্বীকৃতিতে বাড়াবাড়ির কারণ তোমার এ রোগ ছাড়া আর কিছু নয় যা অধিকাংশ লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে; বরং বলা যায়, সারা বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করে চলেছে। অর্থাৎ, আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য অবলোকনে মানুষ দিন দিন অপারগ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতেই পারছে না বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও অভিযান বিরাট। আখেরাত ক্রমাগত এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু নিকটবর্তী এবং যাত্রা দীর্ঘ। পাথেয় অল্প অথচ প্রয়োজন বিপুল। পথও বন্ধ। আর যে জ্ঞান ও কর্ম আল্লাহর অস্তিত্বের বাইরে, তা পর্যালোচক বুদ্ধির সামনে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। বহুবিধ ধ্বংসাত্মক বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আখেরাতের পথচলা কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এ পথের পথপ্রদর্শক সেসব আলেমই হতে পারেন যাঁরা নবী-রসূলগণের যথার্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। অথচ দুনিয়া এসব লোক থেকে শূন্য হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রথাগত লোকই রয়ে গেছে। আবার এদেরও বেশীর ভাগের উপরই শয়তান প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ঔদ্ধত্য তাদেরকে পথহারা করে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের সাময়িক লাভের পেছনে পড়ে আছে। এ কারণেই তারা অধিকাংশ ভাল বিষয়কে মন্দ ও মন্দ বিষয়কে ভাল বিবেচনা করে। এমনকি দ্বীনী এলেম পুরানো হয়ে গেছে, হেদায়েতের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে। তারা মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এলেম হয় হবে রাষ্ট্রীয় ফতোয়া, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ ইতর-চন্ডালদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে গিয়ে সাহায্য গ্রহণ করে, আর না হয় হবে বাহাস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিদ্যা, যাতে করে দাম্ভিক অহংকারীরা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজেদেরকে বিজয়ী করার উপায় বানাবে। অথবা এলেম হবে সেসব ছন্দপূর্ণ মসৃণ সংলাপ, যেগুলো ওয়ায়েযরা সাধারণ মানুষকে পদস্খলিত করার অবলম্বন সাব্যস্ত করবে। কারণ, এই তিন প্রকার এলেম ছাড়া তারা হারাম এবং দুনিয়াদারদের মালামাল আয়ত্ত করার আর কোন ফাঁদ খুঁজে পায়নি। পূর্ববর্তী নেক ও সৎ মানুষেরা আখেরাতের যে পথে চলতেন, সে পথের জ্ঞান মানুষের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার নামগন্ধও আর নেই। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে জ্ঞানকেই তাঁর কিতাবে ফেকাহ, হেকমত, প্রজ্ঞা, আলো, জ্যোতি,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু এ অবস্থা দ্বীনের উপর একটা বিরাট আঘাত ও মহাবিপদ, কাজেই আলোচ্য এ গ্রন্থ প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছি, যাতে করে দ্বীনের জ্ঞানসমূহ পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, পরবর্তী পথপ্রদর্শকদের পথ সুগম হয় এবং নবী-রসূলগণ ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের কল্যাণকর জ্ঞান অবগত হওয়া যায়। এ গ্রন্থটি আমি চার খন্ডে রচনা করেছি। প্রথম খন্ডে রয়েছে এবাদত-উপাসনা, ২য় খন্ডে স্বভাব-প্রকৃতি ও শিষ্টাচার, তৃতীয় খন্ডে ক্ষতিকর বিষয়াদি, অর্থাৎ, যেসব বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং চতুর্থ খন্ডে রয়েছে ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি। অর্থাৎ যেসব বিষয় নফসের কারাগারে বন্দীকে মুক্তি দান করবে। সর্বাগ্রে আমি জ্ঞান অধ্যায় এজন্য রচনা করছি যে, সেটি অত্যন্ত জরুরী। তা ছাড়া এ অধ্যায়টি সর্বাগ্রে সংযোজনের আরেকটি কারণ হল, যাতে প্রতিটি লোকের সামনে সে জ্ঞান বিকশিত হয়ে যায়, যা অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলে মকবুল (সঃ)-এর মাধ্যমে এবাদত হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কল্যাণহীন জ্ঞান থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা এ অধ্যায়ে মানুষের সঠিক পথ পরিহার করে মরীচিকার চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়া এবং জ্ঞানের নির্যাস ফেলে তার ছাল-বাকলে পরিতৃপ্ত হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরব। এখন জানা প্রয়োজন, এ গ্রন্থের প্রতিটি খন্ড দশটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত। অর্থাৎ, এবাদত খন্ডের দশটি অধ্যায় ঃ জ্ঞান, আকীদা-বিশ্বাস, পবিত্রতার তাৎপর্য, নামাযের তাৎপর্য, যাকাতের তাৎপর্য, রোযার তাৎপর্য, হজ্জের তাৎপর্য, কোরআন তেলাওয়াতের আদব, যিকির ও দোয়া এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ওজিফাদির নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কিত। আচরণ খন্ডের দশটি অধ্যায় ঃ (১) পানাহারের আদব (২) বিয়ে-শাদীর আদব (৩) উপার্জন সংক্রান্ত বিধি-বিধান (৪) হালাল-হারাম (৫) জনগণের সাথে লেনদেনের প্রকারভেদ ও আদব (৬) নির্জনবাস (৭) সফর বা ভ্রমণের আদব (৮) সংগীত শ্রবণ ও আচ্ছন্নতা (৯) সদুপদেশ দান ও অসৎ বিষয় থেকে বারণ (১০) জীবনের শিষ্টাচার ও নবুয়তী স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কিত।

তৃতীয় খন্ড ধ্বংসাত্মক বিষয়সম্বলিত, যথা- (১) আত্মার বিস্ময় (২) আধ্যাত্মিক সাধনা (৩) ভোজন বিলাসিতা ও লজ্জাস্থানের বিপদাপদ (৪) জিহ্বার অনিষ্টকারিতা (৫) ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের অপকারিতা (৬) পৃথিবীর অনিষ্ট (৭) সম্পদ ও কার্পণ্যের নিন্দা (৮) ভুয়া মর্যাদা বোধ ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লোকদেখানোর নিন্দা (৯) অহংকার ও আত্মপ্রশস্তির নিন্দা (১০) ধন-সম্পদের লোভ-লালসার নিন্দা প্রভৃতি সংক্রান্ত দশটি অধ্যায় সংযোজিত। আর চতুর্থ মুক্তি বিষয়ক খন্ডটিও তেমনি– (১) তওবা (২) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা (৩) আশা ও ভয় (৪) দারিদ্র্য প্রীতি ও দুনিয়া পরিহার (৫) আল্লাহর একত্ব ও তাঁর উপর নির্ভরশীলতা (৬) প্রেম, আগ্রহ, সম্পর্ক ও সম্মতি (৭) নিয়ত, নিষ্ঠা ও সততা (৮) অনুধ্যান ও আত্মসমালোচনা অর্থাৎ, রিপুর প্রতি সতর্ক পর্যবেক্ষণ (৯) মনন ও (১০) মৃত্যুর স্মরণ সংক্রান্ত ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এবাদত খন্ডে আমরা এবাদতের অন্তর্নিহিত আদব ও তার সুন্নতসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি, সেগুলোর সেসব গোপন তাৎপর্যসমূহ তুলে ধরব যেগুলোর প্রতি এবাদতকারী ব্যাকুল হয়ে উঠে। সুতরাং যারা এসব বিষয় অবগত নয়, তারা আখেরাতের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুতঃ এ বিষয় প্রায়শই ফেকাহ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বর্জিত হয়েছে এবং কেউই এগুলো লিপিবদ্ধ করেননি।

আচরণ খন্ডে আমরা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত আচার-আচরণের তাৎপর্য তুলে ধরব। সাথে সাথে আমরা সেগুলোর পন্থাসমূহের সূক্ষ্মতা এবং ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করব। কারণ, এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি দ্বীনদারেরই রয়েছে। অতঃপর ধ্বংস খণ্ডে সেসব বিষয় চিহ্নিত করব যেগুলো পরিহার করা অপরিহার্য। আত্মা এবং হৃদয়কে এগুলো থেকে পবিত্র মুক্ত করার কথা কোরআনেও উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সেসব অভ্যাসের মধ্যে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বর্ণনা করব এবং অতঃপর সেসব বিষয় উল্লেখ করব যার কারণে মানুষের মধ্যে সে অভ্যাসগুলোর জন্ম হয়। প্রসঙ্গতঃ আমরা এসব অভ্যাসের ফলে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেগুলো তুলে ধরব। তারপর আমরা এসব অভ্যাসের লক্ষণাদি এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথাযথ প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে মানুষ তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

সবশেষে মুক্তি খণ্ডে সেসমস্ত কল্যাণ, আচরণ ও সৎস্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করব, যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যা নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্বভাব এবং আল্লাহ্ তাআলার নেকট্য লাভ করতে আগ্রহী বান্দারা যার মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা এসব স্বভাবের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সংজ্ঞা, তাৎপর্য, তা অর্জনের উপায়, এর ফলাফল ও লক্ষণাদি এবং এর সেসব ফযীলত মাহাত্ম্য শরীয়ত ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি সহকারে আলোচনা করব। অবশ্য এসব বিষয়ে লোকেরা পুস্তকাদিও লেখেছে। তবে আমার এ পুস্তক তাদের রচনা থেকে পাঁচটি ব্যাপারে স্বতন্ত্র ঃ (১) যে বিষয়টি তারা সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য ভেবে ছেড়ে দিয়েছে তা আমি সবিস্তার ব্যাখ্যাসহ লেখেছি। (২) যে বিষয়গুলো তারা বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্তভাবে লেখেছে, আমি সেগুলো ধারাবাহিক ও বিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছি। (৩) যে বিষয়গুলো তারা সুদীর্ঘ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছে, আমি সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করেছি। (৪) তারা যেসব বিষয় বারংবার উল্লেখ করেছেন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি আমি বর্জন করেছি; শুধু তার মূল উদ্দেশ্যটি রেখেছি। (৫) আমি সেসব বিষয়গুলোর বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করেছি, যেগুলো অনুধাবন করা (সাধারণ) জ্ঞানের পক্ষে কঠিন, অথচ এসবে এতদসংক্রান্ত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে সবাই প্রায় একই রকম লেখেছে। অথচ এমনও হতে পারে যে, এসব গোপন বিষয়ে একজন অবগত হবেন, কিন্তু তাঁর আরেক সতীর্থ অবগত হবেন না কিংবা এ সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি, কিন্তু পুস্তকে তা উল্লেখ করতে ভুলেই গেছেন। অথবা ভুলেনওনি, কিন্তু আসল তাৎপর্য লেখার ব্যাপারে তাঁর কোন অন্তরায় থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, আমাদের এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে সেই সমুদয় তাৎপর্যের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। আর আমরা যে একে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি, তারও দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ এই বিন্যাস, গবেষণা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটিই ছিল অপরিহার্য। কারণ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়, তা দুই প্রকার। একটি হল 'এলমে মোয়ামালা' তথা বৈষয়িক জ্ঞান আর দ্বিতীয়টি 'এলমে মোকাশাফা। 'এলমে মোকাশাফা' বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে জ্ঞান, যার কাছে জানা বিষয়টির বিকাশ দাবী করা যেতে পারে। আর এলমে মোয়ামালাহ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে এলেম, যার মাধ্যমে বিকশিত এলেমের উপর আমল করা যায়। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল এলমে মোয়ামালাহ, এলমে মোকাশাফা' নয়– যা কোন কিতাব বা গ্রন্থে লেখার অনুমতি নেই। বস্তুতঃ মা'রেফতান্বেষী ও সিদ্দীকগণের উচ্চতর মর্তবা-মর্যাদাই হল 'এলমে মোকাশাফা' অর্জন করতে পারা। পক্ষান্তরে এলমে মোয়ামালা' হল তা লাভের উপায় বা অবলম্বন। কিন্তু নবী রসূলগণ মানুষের সাথে শুধুমাত্র 'এলমে মোয়ামালা' সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন এবং এর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন– এলমে মোকাশাফার ব্যাপারে কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আলোচনা করেননি। তবে উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে শুধু এর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত-ইশারা দিয়েছেন এ কারণে যে, তাঁরা জানতেন, সৃষ্টির কোন বাস্তব রূপ নেই।

অতঃপর এলমে মোয়ামালা দু'রকম। এক বাহ্যিক এলেম। অর্থাৎ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা কাজকর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান। দুই- অন্তরের ক্রিয়াকর্মের জ্ঞান। যে এলেম বা জ্ঞান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিফলিত হয়, সেগুলো হয় হবে এবাদত-উপাসনা, না হয় হবে আচার-অভ্যাস। পক্ষান্তরে বাতেন বা গোপন- যা অন্তরের বা রিপুর অভ্যাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাও ভাল কিংবা মন্দ এই দু'ভাগে বিভক্ত। কাজেই মোট দাঁড়ালো চার ভাগে। এলমে মোয়ামালার কোন বিষয়ই এই বিভাগসমূহের বহির্ভূত নয়। আরেকটি কারণ, আমি শিক্ষার্থীদের সত্যিকার আগ্রহ সে ফেকাহর মধ্যেই দেখেছি, যা এমন লোকদের কাছে রক্ষিত, আল্লাহর প্রতি যাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং যা গর্ব-অহংকারের উপায় হতে পারে অথবা যার উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। আর সে ফেকাহ্ও চার প্রকার। যেহেতু প্রিয় বস্তু-সামগ্রীর প্রেক্ষিতে অন্যান্য বস্তু-সামগ্রীও প্রিয় বলে গণ্য হয়, সেহেতু আমিও এ ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করিনি। এ গ্রন্থটির আকৃতিও ফেকাহ গ্রন্থেরই অনুরূপ করেছি, যাতে করে মনের আকর্ষণ এদিকে বৃদ্ধি পায়। আর একই কারণে কোন কোন লোক, যারা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বিত্তবানদের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে আগ্রহী, তারা নিজেদের গ্রন্থকে নক্ষত্রের পঞ্জিকার আকারে ছক ও সংখ্যার ভিত্তিতে লেখেছেন এবং সেগুলোর নামকরণও করেছেন, 'স্বাস্থ্য-পঞ্জি' ধরনের। কারণ, বিত্তবানরা সাধারণতঃ এমনি ব্যাপারে বেশী আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এই রচনারীতিও তাদের মনোবৃত্তি সেসব পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট করবে। বলাই বাহুল্য, কারো মন সে এলেমের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এমন কলা-কৌশল অবলম্বন করা, যাতে চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ বিদ্যমান, সে কলা-কৌশলের তুলনায় অত্যন্ত জরুরী, যাতে শুধু দৈহিক চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কারণ, এলমে আখেরাতের ফল হল অন্তরাত্মার চিকিৎসা করা, যাতে করে একটা জীবন অনন্ত স্থায়িত্বে পৌছাতে পারে। পক্ষান্তরে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান সে পর্যন্ত কেমন করে পৌছাতে পারবে, যাতে শুধু দৈহিক রোগ-ব্যাধিরই প্রতিকার হয়। আর একথাও নিশ্চিত, সেটি সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই যাওয়া-আসা করে। এবার আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তৌফীক ও পথ প্রদর্শনের আবেদন করছি। কারণ, তিনিই মহান দাতা। অতঃপর এলেম অধ্যায় গ্রন্থের শুরুতেই লেখছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানের মাহাত্ম্য	১৩
জ্ঞান অন্বেষণের মাহাত্ম্য	২৩
জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব	২৬
যে জ্ঞান ফরযে আইন	৩৩
যে জ্ঞান ফরযে কেফায়া	৩৮
আখেরাত বিষয়ক এলেম	৪৬
যে জ্ঞান উত্তম গণ্য হয় কিন্তু বাস্তবে উত্তম নয়	৭০
শব্দ পরিবর্তিত এলেম	৭৫
কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে প্রশংসনীয় জ্ঞান	৯২
তর্কশাস্ত্রে মানুষের মনোযোগী হওয়ার কারণ	৯৮
মোনাযারা	১০০
মোনাযারা থেকে উদ্ভূত বিপদ	১০৬
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আদব	১১৫
শিক্ষকের আদব	১৩০
ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের আলামত	১৩৮
বিবেক ও তার মাহাত্ম্য	১৯৫
বিবেকের স্বরূপ ও প্রকার	১৯৯
বিবেক কম-বেশী হওয়া	২০৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	
আকায়েদ	২০৮
কলেমা তাইয়্যেবায় আহলে সুন্নতের আকীদা আকায়েদের বিবরণ	২১৫
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য	২৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	
পবিত্রতার তাৎপর্য	২৪০
ওযুর ফযীলত	২৫৫
গোসল	২৫৭
তায়াম্মুম	২৫৭
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	
নামাযের রহস্য	২৬৬
আযানের ফযীলত	২৬৬
নামাযের ফযীলত	২৬৮
নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম	২৮১
নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ	২৮৫
নামাযের ফরয ও সুন্নত	২৮৬
অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্ত	২৮৯
যেসব আভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা নামাযের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয়	২৯৩

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তরের উপস্থিতির সহায়ক ব্যবস্থা ২৯৮
নামাযের প্রত্যেক রোকন ও শর্তের জরুরী বিষয় ৩০২
ইমামের করণীয় ৩১৯
জুমআর ফযীলত ৩২৬
জুমআর শর্ত ৩২৮
জুমআর আদব ৩২৯
জুমআর দিনের অন্যান্য আদব ৩৩৭
নামাযের বিবিধ মাসআলা ৩৪২
নফল নামায ৩৪৬
গ্রহণের নামায ৩৬০

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা ৩৭২
যাকাতের প্রকার ও ওয়াজেব হওয়ার কারণ ৩৭৩
যাকাতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী ৩৭৭
যাকাতের আভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার ৩৮০
যাকাতের হকদার হওয়ার কারণ ৩৯৭
যাকাত গ্রহীতার আদব ৪০০
নফল দান-খয়রাত ও তার ফযীলত ৪০৪
সদকা গোপনে ও প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ৪০৮
সদকা গ্রহণ করা উত্তম, না যাকাত ৪১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযার তাৎপর্য ৪১৬
রোযার কাহ্যিক ওয়াজেবসমূহ ৪১৯
রোযার কাযা ও কাফফারা ৪২১
রোযার সুন্নতসমূহ ৪২১
রোযার আভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ ৪২২
নফল রোযা ৪২৯

সপ্তম অধ্যায়

হজ্জের তাৎপর্য ৪৩২
হজ্জের ফযীলত ৪৩২
বায়তুল্লাহ ও মক্কা মোয়াযযামার ফযীলত ৪৩৭
হজ্জের শর্তসমূহ ৪৪৪
সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বাহ্যিক কর্মসমূহ ৪৪৮
মীকাত থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত এহরামের আদব ৪৫৭
মক্কায় প্রবেশ করার আদব, ৪৫৯
তাওয়াফের আদব ৪৬৫
সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি ৪৬৭
আরাফাতে অবস্থান ৪৭৪
অবস্থানের পরবর্তী করণীয় বিষয় ৪৮০
ওমরা ও তার পরবর্তী করণীয় ৪৮১
বিদায়ী তওয়াফ ৪৮২
মদীনার যিয়ারত ও তার আদব ৪৮৮
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সুন্নত ৪৯৪
নিয়ত খাঁটি করা ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপায় ৪৯৭

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানের মাহাত্ম্য

কোরআন মজীদে জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এই ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ـ

ফেরেশতাকুল ও মধ্যপন্থী আলেমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম পর্যায়ে নিজের সত্তা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেরেশতাকুল এবং তৃতীয় পর্যায়ে জ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও মৌলিকতা বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ আরও বলেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

যারা বিশ্বাসী এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্তবা অনেক উঁচু করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন– সাধারণ মুমিনদের মর্তবা অপেক্ষা জ্ঞানী মুমিনদের মর্তবা সাতশ'স্তর বেশী হবে এবং প্রত্যেক দু'স্তরের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের সমান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন, তারা কি সমান হতে পারে?"

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ـ

"বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমরাই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে।"

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ـ

বলে দিন, আল্লাহ্ এবং কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানীরা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতারূপে যথেষ্ট।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ ـ

যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল : আমি তাকে এনে দিচ্ছি।

এতে ব্যক্ত করা হয়েছে সে লোকটি জ্ঞানের বলেই রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ

"যারা জ্ঞানী ছিল, তারা বলল : তোমাদের ধ্বংস হোক, আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণই বিশ্বাসী ও সৎকর্মীর জন্য উত্তম।"

এতে বলা হয়েছে, পরকালের মাহাত্ম্য শিক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ ـ

"আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি। এগুলো কেবল তারাই বুঝে, যারা জ্ঞানী।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ـ

"যদি তারা বিষয়টি রসূলের কাছে এবং গণ্যমান্যদের কাছে উপস্থাপন করত, তবে তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানান্বেষী, তারা জেনে নিতে পারত।"

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে তাঁর নিজের বিধান শিক্ষিতদের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্র বিধান জানার ব্যপারে তাদের মর্তবাকে পয়গম্বরগণের মর্তবার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে, আর নাযিল করেছি পশম এবং পরহেযগারীসুলভ পোশাক, এটা সর্বোত্তম।

এ আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে পোশাকের অর্থ শিক্ষা, পশমের অর্থ বিশ্বাস এবং পরহেযগারীসুলভ পোশাক বলে লজ্জা বুঝানো হয়েছে।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ ـ

"আমি তাদের কাছে কিতাব পৌঁছে দিয়েছি, যা জ্ঞান সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি।"

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ـ

"আমি সজ্ঞানে তাদের সকল অবস্থা বর্ণনা করব।"

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ـ

"বরং এগুলো কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের বক্ষে গচ্ছিত।"

خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।" এ বিষয়টি অনুগ্রহ প্রকাশের স্থলে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده -

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের প্রজ্ঞা দান করেন এবং তার অন্তরে সৎপথ ইলহাম করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ العلماء ورثة الانبياء "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী।"

বলাবাহুল্য, নবুওয়তের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। কাজেই এ মর্তবার উত্তরাধিকারী হওয়ার চেয়ে বড় আর কোন গৌরবও নেই। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে আকাশ ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু মাগফেরাত প্রার্থনা করে। সুতরাং এর চেয়ে বড় আর কি পদমর্যাদা হবে, যার কারণে আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাকুল মাগফেরাতের দোয়ায় মশগুল থাকবে? জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকে, আর ফেরেশতারা তার জন্যে মাগফেরাত প্রার্থনায় নিরত থাকেন। রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ "প্রজ্ঞা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে এবং গোলামের মর্যাদাও এত উঁচু করে যে, তাকে রাজা-বাদশাহদের আসনে বসিয়ে দেয়।" এ হাদীসে তিনি দুনিয়াতে জ্ঞানের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আখেরাত দুনিয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

خصلتان لايكونا فى منافق حسن سمت وفقه فى الدين -

"দুটি স্বভাব মোনাফেকের মধ্যে পাওয়া যায় না। -(১) সুন্দর পথ প্রদর্শন এবং (২) ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান।" কোন কোন সমসাময়িক ধর্ম জ্ঞানীর নেফাক (কপটতা) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়। কেননা, "ফেকাহ্" শব্দ বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই বুঝাননি, যা তোমরা মনে কর; বরং এ শব্দের অর্থ পরে বর্ণিত হবে। ফেকাহবিদের সর্বনিম্ন স্তর হল আখেরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাস ফেকাহ্বিদের মধ্যে সুষ্ঠু ও প্রবল হয়ে গেলে সে নেফাক ও নাম-যশের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন ঃ "মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ঈমানদার সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, যার কাছে মানুষ প্রয়োজন নিয়ে আগমন করলে সে তাদের উপকার করে এবং মানুষ তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করলে সে নিজেকে বিমুখ করে দেয়।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "ঈমান নিরাভরণ। তার পোশাক হচ্ছে তাকওয়া (খোদাভীতি), তার মজ্জা হচ্ছে লজ্জা এবং তার ফল হচ্ছে জ্ঞান।" এক হাদীসে আছে ঃ মানুষের মধ্যে নবুওয়তের মর্তবার নিকটতম হচ্ছে জ্ঞানী ও জেহাদকারী সম্প্রদায়। জ্ঞানী সম্প্রদায় এ কারণে যে, তারা মানুষকে রসূলুল্লাহ (সঃ) কতৃর্ক আনীত কথাবার্তা বলে এবং জেহাদকারীগণ এ কারণে যে, তারা পয়গম্বরগণের আনীত শরীয়তের জন্যে অশ্বের সাহায্যে জেহাদ করে। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "একটি গোষ্ঠীর মরে যাওয়া একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মরে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلنَّاسُ مَعْدِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

"মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত খনি বিশেষ। অতএব যারা জাহেলিয়াতের যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলাম যুগেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।" এক হাদীসে আছে ঃ "কেয়ামতের দিন জ্ঞানীদের লেখার কালি শহীদদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।" আরও আছে ঃ "আমার উম্মতের যেব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ মুখস্থ করবে, সে কিয়ামতের দিন ফেকাহবিদ ও জ্ঞানীরূপে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।" অন্যত্র আছে ঃ যেব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করবে, আল্লাহ্ তাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবেন এবং তাকে ধারণাতীত জায়গা থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবেন।" আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, "হে ইবরাহীম! আমি মহাজ্ঞানী এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে পছন্দ করি।" আরও আছে ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যারা ঠিক হয়ে গেলে সকল মানুষ ঠিক হযে যায় এবং যারা বিগড়ে গেলে সকল মানুষ বিগড়ে যায়। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে শাসক এবং অপর শ্রেণী ফেকাহ্‌বিদ অর্থাৎ, দ্বীনী এলমে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।" অন্য হাদীসে আছে ঃ "আল্লাহ্‌র নৈকট্যশালী করে এমন জ্ঞান বেশী পরিমাণে না থাকার দিন যদি আমার উপর আসে, তবে সেদিনের সূর্যোদয় যেন আমার ভাগ্যে না জুটে।"

এবাদত ও শাহাদতের উপর জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠত্বদান প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنٰى رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِيْ ـ

"জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর।"

লক্ষণীয়, এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এলেমকে কেমন করে নবুওয়তের স্তরে রেখেছেন এবং জ্ঞানহীন কর্মের মর্তবা কেমন করে হ্রাস করেছেন। অথচ এবাদতকারী সদাসর্বদা যে এবাদত করে, তার জ্ঞান সে অবশ্যই রাখে। এ জ্ঞান না হলে এবাদত হবে না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ـ

"আলেম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর তেমনি, যেমন চতুর্দশীর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তারকারাজির উপর হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

"কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে– পয়গম্বরগণ, অতঃপর জ্ঞানী লোকগণ, অতঃপর শহীদগণ।"

এ হাদীস দ্বারা জ্ঞানের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, এটা নবুওয়তের পরে এবং শাহাদতের অগ্রে। অথচ শাহাদতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কোন কিছুর মাধ্যমে ততটুকু সমৃদ্ধ হয় না, যতটুকু দ্বীনের জ্ঞানের মাধ্যমে হয়। একজন দ্বীনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্যে হাজার এবাদতকারী অপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফেকাহ্ (দ্বীনী জ্ঞান)।" আরও বলা হয়েছে ঃ "ঈমানদার আলেম ঈমানদার আবেদ অপেক্ষা সত্তর গুণ শ্রেষ্ঠ।" অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক এবং বক্তার সংখ্যা কম। ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প এবং দাতার সংখ্যা অধিক। এমন যুগে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা আমল করা উত্তম। অতি সত্বর এমন যুগ আসবে, যখন জ্ঞানীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং বক্তা হবে অধিক। দাতা কম হবে এবং ভিক্ষুক বেশী হবে। তখন জ্ঞান অর্জন হবে আমল অপেক্ষা উত্তম।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি ও এবাদতকারীর মধ্যে একশ' স্তরের ব্যবধান রয়েছে! প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে, যতটুকু একটি দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বছরে অতিক্রম করতে পারবে।" এক হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ্, কোন্ আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ আমরা উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। আবার বলা হল ঃ আমরা আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, আপনি এলেম সম্পর্কে বলছেন! তিনি বললেন ঃ এলেমের সমন্বয়ে অল্প আমল উপকারী হয় এবং মূর্খতার সমন্বয়ে অধিক আমলও নিষ্ফল হয়ে যায়।" এক হাদীসে আছে ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে উঠাবেন। অতঃপর আলেমদেরকে উঠাবেন এবং তাদেরকে বলবেন ঃ "হে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ! আমি তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান রেখেছিলাম, তা তোমাদেরকে কিছু জেনেই রেখেছিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান এজন্যে রাখিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেব। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম।" আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমরাও এমনি আনজাম কামনা করি।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) কোমায়লকে বললেন, "হে কোমায়ল! জ্ঞান ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। জ্ঞান তোমার হেফাযত করে, আর তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধন-সম্পদের হেফাযত কর। জ্ঞান শাসক আর ধন-সম্পদ শাসিত। ধন ব্যয় করলে হ্রাস পায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বেড়ে যায়।" তিনি আরও বলেন ঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি রোযাদার, এবাদতকারী ও জেহাদকারী অপেক্ষা উত্তম। আলেম ব্যক্তির মৃত্যু হলে ইসলামে এমন শূন্যতা দেখা দেয়, যা তার উত্তরসুরি ছাড়া কেউ পূরণ করতে পারে না।" তাঁর কথিত একটি আরবী কবিতার অনুবাদ এরূপ ঃ

"সকল মানুষ আকার-আকৃতিতে একরূপ। সকলের পিতা আদম এবং সকলের মা হওয়া। তারা যদি মূল উপাদান নিয়ে গর্ব করতে চায়, তবে পানি ও মৃত্তিকা ব্যতীত তাদের মূল উপাদান আর কি? হাঁ, যার দেহে আলেমদের গর্বের আলখেল্লা আঁটা রয়েছে। কেননা, সে নিজে যেমন পথপ্রাপ্ত, তেমনি অপরেরও পথ-প্রদর্শক। সৌন্দর্যের বস্তু তার অর্জিত রয়েছে। এটাই মানুষের মর্যাদা। মূর্খরা সদা জ্ঞানীদের সাথে শক্রতা পোষণ করে। তথাপি তুমি এমন জ্ঞান অর্জন কর, যদ্দ্বারা চিরঞ্জীব হতে পার। সকল মানুষ মৃত; কিন্তু জ্ঞানী চিরজীবী।

আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে বেশী ইযযতের কোন বিষয় নেই। বাদশাহ জনগণের শাসক হয়ে থাকে এবং জ্ঞানীরা বাদশাহদের শাসক হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-কে এলেম, ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তিনি এলেম পছন্দ করেছিলেন। ফলে তাঁকে এলেমের সাথে ধন এবং রাজত্বও দান করা হয়েছিল। হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ সংসারবিমুখ দরবেশ। প্রশ্ন হল ঃ নীচ কে? উত্তর হল ঃ "যারা নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে খায়।" মোট কথা, জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে তিনি মানুষ বলেননি। কেননা, যে বৈশিষ্ট্য মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে, তা হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ তখনই মানুষ বলে কথিত হবে যখন তার মধ্যে গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ দিব্যমান থাকবে। মানুষের মর্যাদা দৈহিক শক্তির কারণে নয়। কেননা, উট তার চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী। মানুষের মর্যাদা বিশাল বপু হওয়ার কারণেও নয়। কেননা, হাতীর বপু তার চেয়ে অনেক বিশাল। তেমনি বীরত্বের কারণেও নয়। কেননা, হিংস্র জন্তুর বীরত্ব মানুষের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চেয়ে বড়। বরং একমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই মানুষ সম্ভ্রান্ত। জ্ঞানের জন্যই মানুষ সৃষ্টি। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ কেউ আমাকে বলুক, যেব্যক্তি এলেম পায়নি, সে কি পেয়েছে এবং যেব্যক্তি এলেম পেয়েছে, তার পাওয়ার আর কি বাকী আছে?

ফাতাহ্ মুসেলী বলেন ঃ রোগীকে রোজ রোজ খাদ্য, পানীয় ও ওষুধপত্র কিছু না দিলে সে কি মরে যাবে না? লোকেরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে মরে যাবে। তিনি বললেন ঃ আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। আত্মাকে তিন দিন এলেম ও জ্ঞান থেকে উপোস রাখলে সে মরে যায়। তাঁর এ উক্তি যথার্থ। কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হচ্ছে আত্মার খোরাক; এগুলোর মাধ্যমেই তার জীবন; যেমন দেহের খোরাক খাদ্য। যার জ্ঞান নেই, তার অন্তর রুগ্ন। মৃত্যু তার জন্যে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার আত্মার রোগ ও মৃত্যুর খবর রাখে না। দুনিয়ার মহব্বত ও কাজ কারবারে লেগে থাকার কারণে তার চেতনা লোপ পায়। যেমন ভয় ও নেশার আতিশয্যে জখমের ব্যথা অনুভূত হয় না; যদিও বাস্তবে ব্যথা থাকে। কিন্তু মৃত্যু যখন দুনিয়ার বোঝা ও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তখন সে আত্মার মৃত্যুর কথা জানতে পারে এবং পরিতাপ করে। অবশ্য তখন পরিতাপে কোন উপকার হয় না। ভীত ব্যক্তির ভয় অথবা মাতালের নেশা দূর হয়ে গেলে ভয় ও নেশার অবস্থায় তার যেসব জখম লাগে, সেগুলো সে হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকে। সত্য উদঘাটিত হওয়ার সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, এখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। মৃত্যু হলে জাগ্রত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ "জ্ঞানী লোকদের লেখার কালি এবং শহীদদের রক্ত ওজন করা হলে কালির ওজন বেশী হবে।" হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ "হে লোকসকল! জ্ঞান অর্জন কর জ্ঞানকে তুলে নেয়ার পূর্বে। জ্ঞান তুলে নেয়ার অর্থ জ্ঞানী লোকদের মৃত্যুবরণ করা। আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ– যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তারা জ্ঞানী লোকদের মাহাত্ম্য দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জ্ঞানী অবস্থায় পুনরুত্থিত করলেই ভাল হত। কেউ জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাতের কিছু অংশে জ্ঞানচর্চা করা আমার মতে সারারাত জাগ্রত থেকে নফল এবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। এ বিষয়টিই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

"আয় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ইহকালে পুণ্য এবং পরকালে পুণ্য দান করুন।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার পুণ্য জ্ঞান ও আরাধনা। পরকালের পুণ্যের অর্থ জান্নাত।

জনৈক দার্শনিককে কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্ বস্তু সঞ্চয় করা দরকার? উত্তর হল ঃ এমন বস্তু সঞ্চয় করা উচিত, যা তোমার নৌকা ডুবে গেলে তোমার সাথে সাঁতার কাটতে থাকে। অর্থাৎ, জ্ঞানই হচ্ছে সঞ্চয়যোগ্য বস্তু। কারণ, দেহরূপী নৌকা মৃত্যুরূপী সলিলে সমাধিলাভ করলে পর এটাই সাথে থাকে।

অন্য একজন দার্শনিক বলেন ঃ "যেব্যক্তি প্রজ্ঞাকে নিজের লাগাম বানিয়ে নেয়, মানুষ তাকে ইমাম করে নেয়। যেব্যক্তি জ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করে, মানুষ তাকে ইযযত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ জ্ঞানের এক গৌরব এই যে, "একে কোন ব্যক্তির সাথে সামান্যতম ব্যাপারেও সম্পর্কযুক্ত করা হলে সে আনন্দিত হয়। উদাহরণতঃ যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে। পক্ষান্তরে সে এ বিষয়ের জ্ঞান রাখে না– একথা কাউকে বলা হলে সে দুঃখিত হয়।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ "হে লোকসকল! জ্ঞানব্রতী হও। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি মহব্বতের চাদর আছে। যেব্যক্তি কোন বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাআলা সে চাদর তাকে পরিয়ে দেন। এরপর সে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করলেও তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের তওফীক দান করা হয়। পুনরায় গোনাহ্ করলেও আল্লাহ্ তাকে এই তওফীক দান করেন। তৃতীয় বার গোনাহ্ করার পরও এরূপ করা হয়। এভাবে বার বার তওফীক দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার কাছ থেকে সে চাদরটি ছিনিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না নেয়া, যদিও তার গোনাহ্ বৃদ্ধি পেতে পেতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে।"

আহ্নাফ (রহঃ) বলেন, "মনে হয় জ্ঞানীগণ সমগ্র ইয্যতের মালিক হয়ে যাবে। যে ইয্যত জ্ঞানের দ্বারা সুদৃঢ় না হয়, তার পরিণতি হয় লাঞ্ছনা।"

সালেম ইবনে আবী জা'দ বলেন ঃ "আমি ক্রীতদাস ছিলাম। প্রভু আমাকে তিন'শ দেরহামের বিনিময়ে মুক্ত করে দিলে আমি কি কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করব সে সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে জ্ঞানকে পেশা করে নিলাম। এরপর এক বছর অতীত না হতেই শহরের শাসক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম; কাছে আসতে দিলাম না।"

যুহরা ইবনে আবু বকর বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে ইরাকে জ্ঞান ব্রতী হতে চিঠি লেখলেন। তিনি লেখলেন– যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও তবে জ্ঞান হবে তোমার ধন। আর যদি ধনাঢ্য হয়ে যাও, তবে জ্ঞান হবে অঙ্গসজ্জা।

হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিলেন ঃ হে বৎস! জ্ঞানীদের কাছে বস। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানের নূর দ্বারা অন্তরকে জীবিত করেন, যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা মাটিকে শস্যশ্যামল করেন। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্যে পানিতে মাছ এবং শূন্যে পাখীরা পর্যন্ত ক্রন্দন করে। বাহ্যতঃ তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত থাকে।

জ্ঞান অন্বেষণের মাহাত্ম্য

এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ -

"তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে?"

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"অতএব যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাদীস নিম্নরূপ ঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ.

"যেব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালাবেন।"

* ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্যে পাখা বিছিয়ে দেয়।

* একশ' রাকআত নফল নামায পড়া অপেক্ষা জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা উত্তম।

* জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা মানুষের জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।

* জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদিও তা চীনে থাকে; অর্থাৎ অনেক দূরে থাকে।

* জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

* জ্ঞান একটি ভাণ্ডার, যার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা । সুতরাং জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন কর। কেননা, এতে চার ব্যক্তি সওয়াব পায়– (১) প্রশ্নকারী (২) জ্ঞানী ব্যক্তি (৩) শ্রোতা এবং (৪) যে তাদের প্রতি মহব্বত রাখে।

* মূর্খ ব্যক্তি যেন তার মূর্খতা নিয়ে চুপ করে বসে না থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরও তার জ্ঞান নিয়ে চুপ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ, মূর্খতা দূর করার জন্যে প্রশ্ন করবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তার জওয়াব দিবে।

* হযরত আবু যরের (রাঃ) হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জ্ঞান সংক্রান্ত মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া, হাজার রোগীর খবর নিতে যাওয়া এবং হাজার জানাযায় যোগদান অপেক্ষা উত্তম। কেউ আরজ করল ঃ কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষাও কি উত্তম? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জ্ঞান ব্যতীত কোরআন কি উপকার করে?

* ইসলামকে জীবিত করার উদ্দেশে জ্ঞান অন্বেষণকালে যেব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, জান্নাতে তার এবং পয়গম্বরগণের স্তর হবে এক।

নিম্নে এ প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি বর্ণিত হল ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি যখন জ্ঞান অর্জন করছিলাম, তখন হীন ছিলাম। এখন আমার কাছে লোকজন জ্ঞান লাভ করতে শুরু করলে সম্মানের অধিকারী হয়ে গেছি।

* ইবনে আবী মুলায়কা বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সমতুল্য কাউকে দেখিনি। তাঁর মুখাকৃতি সর্বোত্তম, কথাবার্তা প্রাঞ্জল এবং ফতোয়া সর্বাধিক জ্ঞানবহ।

* ইবনে মোবারক বলেন ঃ আমার কাছে সেই ব্যক্তি আশ্চর্যজনক, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে না। কারণ, তার মন তাকে কোন মাহাত্ম্যের প্রতি আহ্বান করে না।

* জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ দু'ব্যক্তির প্রতি আমার মনে যে দয়ার উদ্রেক হয়, তা অন্য কারও প্রতি হয় না- এক, সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে; কিন্তু বুঝে না এবং দুই, সে ব্যক্তি, যে বুঝে; কিন্তু অন্বেষণ করে না।

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার মতে সারা রাত জেগে নফল পড়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী কল্যাণে অংশীদার। অন্য সকলেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী হও অথবা জ্ঞান অন্বেষণকারী হও অথবা শ্রোতা হও, চতুর্থ কোন কিছু হয়ো না, তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

* হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের একটি মজলিস ক্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হাজার রাত জাগরণকারী রোযাদার আবেদের মরে যাওয়া এমন জ্ঞানী ব্যক্তির তুলনায় কম, যে আল্লাহ্ তা'আলার হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অন্বেষণ করা নফলের চেয়ে উত্তম।

* ইবনে আবদুল হাকাম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের কাছে পাঠাভ্যাসে রত ছিলাম। এমন সময় যোহরের সময় হল। আমি নামাযের জন্যে কিতাব বন্ধ করলে তিনি বললেন ঃ ওহে, যার জন্যে তুমি উঠেছ, সেটা এর চেয়ে উত্তম নয়, যাতে তুমি ছিলে। তবে নিয়ত দুরস্ত হওয়া শর্ত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মনে করে, জ্ঞান অন্বেষণ করা জেহাদ নয়, সে বুদ্ধি বিবেচনায় অপক্ক।

জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব

এ সম্পর্কিত আয়াত এই ঃ

وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

"এবং যাতে সতর্ক করে তাদের সম্প্রদায়কে, যখন তাদের কাছে ফিরে আসে, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা সংযমী হয়।"

এ আয়াতে সতর্ক করার অর্থ জ্ঞানদান ও পথ প্রদর্শন।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ـ

"যখন আল্লাহ কিতাবের অধিকারীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন একে মানুষের জন্যে অবশ্যই বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।"

এতে বলা হয়েছে, জ্ঞানের শিক্ষাদান ওয়াজেব।

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

"এবং তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।"

এতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্ঞান গোপন করা হারাম। যেমন- সাক্ষ্য গোপন করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ـ

যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপিষ্ঠ।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ

"তার চেয়ে সুন্দর কথা কার, যে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে!"

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"তোমার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানদান করে তার কাছ থেকে সে অঙ্গীকারও নিয়েছেন, যা পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়েছেন; অর্থাৎ, তারা অবশ্যই তা বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় বললেন ঃ

لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

"যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি লোককেও পথ প্রদর্শন করেন, তবে এটা হবে তোমার জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।"

* যেব্যক্তি অন্যদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে জ্ঞানের একটি অধ্যায় শিক্ষা করবে, তাকে অবশ্যই পয়গম্বর ও সিদ্দীকের সওয়াব দান করা হবে।

* হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী আমল করে এবং মানুষকে তা শিক্ষাদান করে, সে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে মহান বলে বিবেচিত হয়।

* কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবাদতকারী ও জেহাদকারীদেরকে বলবেন ঃ জান্নাতে যাও। আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি বলবেন ঃ ইলাহী! তারা আমাদের জ্ঞানের বদৌলতে এবাদত ও জেহাদ করেছে; অর্থাৎ সম্মান পাওয়ার যোগ্য আমরা। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা আমার কাছে আমার কোন কোন ফেরেশতার সমতুল্য। তোমরা সুপারিশ কর। তোমাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর তারা সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ মর্তবা সে জ্ঞানের, যা শিক্ষাদানের মাধ্যমে অপরের কাছে পৌঁছায়। সে জ্ঞানের নয়, যা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত থাকে এবং অন্যের কাছে পৌঁছায় না।

* রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ اَنْ يُّؤْتِيَهُمْ اِيَّاهُ وَلٰكِنْ يَذْهَبُ بِذَهَابِ الْعُلَمَاءِ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلاَّ رُؤُسَاءُ جُهَّالاً اِنْ سُئِلُوْا اَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْنَ يُضِلُّوْنَ -

"আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দান করার পর তা ছিনিয়ে নিয়ে যান না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানও তুলে নেন। সেমতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার সাথে জ্ঞানও চলে যায়। অবশেষে মূর্খ নেতৃবর্গ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এই মূর্খদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা না জেনে না শুনে ফতোয়া দেয়। ফলে নিজেরাও বিপথগামী হয় এবং অপরকেও বিপথগামী করে।

مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ -

যেব্যক্তি কোন জ্ঞান অর্জন করে, অতঃপর তা গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

* উৎকৃষ্ট দান ও উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে জ্ঞানের কথা, যা তুমি শুনে স্মরণ রাখবে, এরপর মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে এবং তাকে শিক্ষা দেবে। এটা এক বছর এবাদতের সমান।

* বলা হয়েছে ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَمَا وَالاَهُ اَوْ مُعَلِّمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا -

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু তাতে রয়েছে, তাও অভিশপ্ত; কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং যা এর নিকটবর্তী হয় অথবা শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী, এগুলো অভিশপ্ত নয়।

اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَرْضِهِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ فِى الْبَحْرِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি পিপীলিকা তাদের গর্তে এবং মৎস্য সমুদ্রে সেই শিক্ষকের জন্যে রহমত কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়।

* এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দোয়ার চাইতে বড় কোন উপকার করতে পারে না।

* যদি ঈমানদার একটি উত্তম কথা শুনে তদনুযায়ী আমল করে, তবে তার জন্যে তা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

* একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে দু'টি মজলিস দেখলেন। এক মজলিসে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হচ্ছিল এবং মজলিসের লোকেরা দোয়ার প্রতিই উৎসুক ছিল। অপর মজলিসে শিক্ষাদান করা হচ্ছিল। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ প্রথম মজলিসের লোকেরা তো আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দেবেন এবং ইচ্ছা না করলে দেবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় মজলিসের লোকেরা শিক্ষাদানে রত আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও শিক্ষাদাতারূপেই প্রেরণ করেছেন। এই বলে তিনি দ্বিতীয় মজলিসের দিকে গেলেন এবং তাদের মধ্যে বসে পড়লেন।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا بُقْعَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا بُقْعَةٌ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَاً ـ

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কোন ভূখন্ডে পতিত প্রচুর বৃষ্টির মত। সে ভূখন্ডের কিছু অংশ এমন যে, সে পানি ধারণ করে এবং প্রচুর ঘাস উৎপন্ন করে। অপর অংশ এমন যে, সে পানি আটকে রাখে। আল্লাহ তা'আলা আটকে পড়া সে পানি দ্বারা মানুষকে উপকার পৌছান। তারা তা পান করে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্ষেতে সেচ করে। পক্ষান্তরে সে ভূখন্ডের কিছু অংশ এমন যে, সে পানি আটকায় না এবং ঘাস, লতাপাতাও উৎপন্ন করে না।"

এ হাদীসে ভূখন্ডের প্রথম অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা জ্ঞানের দ্বারা নিজেরা উপকৃত হয়। দ্বিতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা অপরকে উপকার পৌঁছায় এবং তৃতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা উভয় বিষয় থেকে বঞ্চিত।

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ وَصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَّوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ بِالْخَيْرِ ـ

মানুষ মারা গেলে তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি বিষয় অব্যাহত থাকে– (১) জ্ঞান- যা দ্বারা অপরের উপকার হয়, (২) সদকায়ে জারিয়া এবং (৩) সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্যে নেক দোয়া করে।

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ ـ

* সৎ কাজের প্রতি যে উৎসাহ দেয়, সে সৎকর্মীর অনুরূপ।

لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْخَيْرِ ـ

* দু'ব্যক্তির প্রতিই ঈর্ষা করা উচিত– (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন; অতঃপর সে তদনুযায়ী কাজ করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দিয়েছেন এবং তা দান-খয়রাতে ব্যয় করতে বাধ্য করেছেন।

* আমার নায়েবদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার নায়েব কারা? তিনি বললেন ঃ যারা আমার পথ বেছে নেয় এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।

শিক্ষাদানের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি ঃ

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, সে সেসব লোকের সমান সওয়াব পাবে, যারা সে কাজটি সম্পাদন করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা শেখায়, তার জন্যে সকল বস্তু, এমনকি সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত এস্তেগফার করে।

* জনৈক আলেম বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ।

* বর্ণিত আছে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) আসকালানে এসে কিছু দিন অবস্থান করেন। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তিনি বললেন ঃ আমার জন্যে সওয়ারী ঠিক করে দাও, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। এ শহরে জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটবে। এ কথা বলার কারণ, তিনি শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান অব্যাহত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন।

* আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি কাঁদছেন। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে কেউ জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করে না।

* জনৈক মনীষী বলেন ঃ জ্ঞানীরা কালের প্রদীপ। স্ব স্ব সময়ে প্রত্যেকেই উজ্জ্বল বাতি বিশেষ। সমসাময়িক লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে আলো আহরণ করে।

* হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেম সম্প্রদায় না থাকলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যেত। অর্থাৎ, জ্ঞানীরা জ্ঞানদানের মাধ্যমে মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে বের করে মানবতার স্তরে পৌঁছে দেয়।

* ইকরিমা বলেন ঃ এ জ্ঞানের কিছু মূল্য আছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তা কি? তিনি বললেন ঃ তা এই যে, তা এমন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবে, যে স্মরণ রাখে এবং বিনষ্ট না করে।

* ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আলেমগণ উম্মতের প্রতি পিতামাতার চেয়ে অধিক দয়াশীল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কেমন করে? তিনি বললেন ঃ পিতামাতা মানুষকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করে, আর আলেমগণ রক্ষা করেন আখেরাতের আগুন থেকে।

* জনৈক মনীষী বলেন ঃ জ্ঞানের সূচনা চুপ থাকা, অতঃপর শ্রবণ করা, অতঃপর মুখস্থ করা, অতঃপর আমল করা, অতঃপর মানুষের মধ্যে প্রচার করা।

* অন্য একজন বলেন ঃ নিজের জ্ঞান এমন ব্যক্তিকে দাও যে সে সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ কর, যে তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যা জান না তা জানে। এরূপ করলে তুমি যা জান না, তা জানতে পারবে এবং যা জানবে তা মনে থাকবে।

* হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ আমি এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত পেয়েছি যে, জ্ঞান অর্জন কর। কারণ, জ্ঞানার্জন করা খোদাভীতি, তার অন্বেষণ এবাদত, তার পাঠদান তসবীহ্ এবং তার আলোচনা জেহাদ। যেব্যক্তি জানে না, তাকে জ্ঞানদান করা খয়রাত। যোগ্য ব্যক্তির জন্যে তা ব্যয় করা নৈকট্য। জ্ঞান একাকীত্বে সহচর, সফরে সঙ্গী, একান্তে বাক্যালাপকারী, ধর্মের পথপ্রদর্শক, সচ্ছলতা ও নিঃস্বতা উভয় অবস্থায় পথপ্রদর্শক, বন্ধুদের সামনে প্রতিনিধিত্বকারী, অপরিচিতদের মধ্যে নৈকট্যকারী, শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার এবং জান্নাতের পথে আলোকবর্তিকা। এ জ্ঞানের বদৌলত আল্লাহ্ তা'আলা কিছু লোককে উচ্চ মর্তবা দান করেন। তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সর্দার, নেতা ও পথপ্রদর্শক করেন। তাদের দেখাদেখি অন্যরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। মানুষ তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি তাকিয়ে থাকে। ফেরেশতারা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করে এবং পাখা দ্বারা তাদেরকে মুছে পরিষ্কার করে। প্রাণী ও নিষ্প্রাণ সবাই তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি, সমুদ্রের মৎস্য, পোকমাকড়, স্থলের হিংস্র সরীসৃপ ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু এবং আকাশ ও তারকারাজি পর্যন্ত মাগফেরাতের দোয়া করে। কারণ, জ্ঞান আত্মার জন্য জীবনী শক্তি। এর কারণে মূর্খতা থাকে না। জ্ঞান একটি নূর। এটি যার মধ্যে থাকে তার সামনে থেকে অন্ধকার সরে যায়। জ্ঞানের দ্বারা দেহ শক্তি পায় এবং দুর্বলতা দূরীভূত হয়। এর সাহায্যে বান্দা সৎলোকদের মর্তবা ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা রোযা রাখার সমান এবং জ্ঞানদানে মশগুল থাকা রাত জেগে নফল এবাদত করার সমান। জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য, একত্বে বিশ্বাস ও এবাদত হয়। এর মাধ্যমেই পরহেযগারী, তাকওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং হালাল হারামের জ্ঞান অর্জিত হয়। জ্ঞান ইমাম এবং আমল তার অনুসারী। সৎলোকদের অন্তরেই এর জন্যে স্থান করা হয় এবং হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত থাকে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তওফীকপ্রার্থী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে জ্ঞান ফরযে আইন

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

* জ্ঞান অর্জন কর; যদিও তা চীন দেশে থাকে।

যে জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন, তা কি? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং এতে বিশটিরও বেশী মতের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা সবগুলোর বিবরণ দিচ্ছি না। তবে মতভেদের সারকথা প্রত্যেক পক্ষই সে জ্ঞানকে অত্যাবশ্যক বলেছেন, যাতে সে নিজে নিয়োজিত ছিল। উদাহরণতঃ কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বলেন, কালাম শাস্ত্রই ফরযে আইন। কারণ, তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ এর মাধ্যমেই জানা যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান এ শাস্ত্রের দ্বারাই অর্জিত হয়। ফেকাহ্বিদগণ বলেন, ফেকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা করা ফরযে আইন। কারণ, এর মাধ্যমে এবাদত, হালাল-হারাম এবং জায়েয না-জায়েয ও আদান-প্রদান সম্পর্কে জানা যায়। তফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণ বলেন ঃ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নত শিক্ষা করা ফরযে আইন। কেননা, এ দু'টি থেকেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি। সূফীগণ বলেন ঃ ফরযে আইন হচ্ছে আমাদের জ্ঞান। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, বান্দার নিজের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদার অবস্থা জানা ফরযে আইন। কেউ বলেন ঃ এখলাস, নফসের অপবাদ এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফেরেশতাদের এলহামের পার্থক্য জানা ফরযে আইন। আবার কেউ বলেন, ফরযে আইন হচ্ছে 'এলমে বাতেন', যা এ জ্ঞানের যোগ্য বিশেষ লোকদের উপর ওয়াজেব। তাঁরা শব্দের ব্যাপকতা পরিবর্তন করে একে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন।

আবু তালেব মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ ফরযে আইন হচ্ছে সে জ্ঞান, যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله الخ

পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ঃ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই----------।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেননা, এ পাঁচটি বিষয়ই ওয়াজেব। তাই এগুলো জানাও ওয়াজেব।

এখন শিক্ষার্থীর পক্ষে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা দরকার, তা আমরা উল্লেখ করছি। আমরা এ অধ্যায়ের ভূমিকায় বলে এসেছি যে, এলেম দুই প্রকার (১) এলমে মোয়ামালা ও (২) এলমে মোকাশাফা। হাদীসে যে এলেম প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বলে ব্যক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে এলমে মোয়ামালা তথা আদান-প্রদান সম্পর্কিত জ্ঞান। বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে তিন প্রকার বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়– (১) বিশ্বাস, (২) বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা ও (৩) না করা। এখন ধর, কোন ব্যক্তি সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে বালেগ হল। এখন তার উপর প্রথমতঃ ওয়াজেব হবে শাহাদতের উভয় কলেমা অর্থসহ শিক্ষা করা। অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" কলেমাটি শেখা ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ওয়াজেব হবে। এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে বিশ্বাস করা ওয়াজেব হবে না; বরং নিঃসন্দেহে ও দ্বিধাহীন চিত্তে কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এতটুকু জ্ঞান মাঝে মাঝে অনুসরণ ও শ্রবণের মাধ্যমেও অর্জিত হয়ে যায়– আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন হয় না। আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ ওয়াজেব না হওয়ার কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরবের লোকদের কাছ থেকে যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই কেবল সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন।

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়টুকু জেনে নিলেই তখনকার ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। তখন কলেমাদ্বয় শিক্ষা করা ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই তার জন্যে ফরযে আইন ছিল। এছাড়া অন্য কোন কিছু তার জন্যে জরুরী ছিল না। কারণ, সে যদি এই কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করার পর মারা যায়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দারূপেই মরবে, নাফরমানরূপে নয়।

কলেমার পর অন্য বিষয়সমূহ সাময়িক কারণাদির ভিত্তিতে তার উপর ওয়াজেব হয়। এগুলো প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য নয়। কেউ কেউ এগুলো থেকে আলাদাও থাকতে পারে। এসব সাময়িক কারণ কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে দেখা দেয়। প্রথমটির উদাহরণ এই– মনে কর, উপরোক্ত ব্যক্তি সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময় থেকে যোহর পর্যন্ত জীবিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রইল। যোহরের সময় এলে তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে ওযু ও নামাযের মাসআলা শিক্ষা করা। অতএব এ ব্যক্তি বালেগ হওয়ার সময় সুস্থ থাকলে যদি সে সূর্য ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত কিছু না শেখে এবং এ সময়ের পর শিখতে শুরু করলে ঠিক সময়ে সব শেখে আমল করতে না পারে, তবে বলা যায় যে, ব্যহ্যতঃ সে জীবিত থাকবে বিধায় সময়ের পূর্বেই শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব। এ কথাও বলা যায়, জানা আমল করার জন্যে শর্ত। আমল ওয়াজেব হওয়ার পর সে আমল সম্পর্কে জানা ওয়াজেব হয়। সুতরাং প্রথম সময় থেকে শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়। অন্যান্য নামাযের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য।

এর পর যদি এ ব্যক্তি রমযান পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে রমযানের কারণে রোযা শিক্ষা করা তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে। অর্থাৎ, জানতে হবে যে, সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার সময়। এ সময়ে রোযার নিয়ত করা এবং পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা জরুরী।

এখন যদি তার কাছে অর্থ-সম্পদ আসে অথবা বালেগ হওয়ার সময়ই অর্থ সম্পদ থাকে, তবে যাকাতের পরিমাণ জানা তার জন্যে অপরিহার্য হবে। কিন্তু তখনই অপরিহার্য হবে না; বরং বালেগ হওয়ার সময় থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর অপরিহার্য হবে। যদি তার কাছে উট ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে তবে কেবল উটের যাকাত জানাই জরুরী হবে। অন্যান্য মালের ক্ষেত্রে এরূপ বুঝা উচিত।

যদি তার উপর হজ্জের মাস আসে, তবে হজ্জের মাসআলা তখনই জানা জরুরী নয়। কেননা, হজ্জ সমগ্র জীবৎকালের মধ্যে মাত্র একবার আদায় করতে হয়। তবে আলেমগণের উচিত তার সামর্থ্য থাকলে বলে দেয়া যে, জীবনে একবার হজ্জ করা সে ব্যক্তির উপর ফরয, যে পাথেয় ও সওয়ারীর মালিক। এতে সম্ভবতঃ সে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী মনে করে দ্রুত হজ্জ আদায় করতে সচেষ্ট হবে। অতঃপর যখন সে হজ্জ করার ইচ্ছা করবে, তখন মাসআলা শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব হবে। তবে কেবল হজ্জের আরকান ও ওয়াজেব বিষয়সমূহ শিক্ষা করা জরুরী হবে– নফলসমূহ নয়। কারণ, যে কাজ করা নফল, তা শিক্ষা করাও নফল। মোট কথা, যেসব করণীয় কাজ ফরযে আইন, সেগুলো শিক্ষা করা ক্রমান্বয়ে এমনিভাবে ওয়াজেব হবে। বর্জনীয় কর্মের ক্ষেত্রেও যখন যেরূপ অবস্থা দেখা দেবে, সেভাবেই তা শিক্ষা করা ওয়াজেব। এ বিষয়টি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ। উদাহরণতঃ যেসব কথাবার্তা বলা হারাম, সেগুলো জানা বোবার জন্যে ওয়াজেব নয়; অথবা অবৈধ দৃষ্টির মাসআলা জানা অন্ধের জন্যে জরুরী নয় কিংবা যারা জঙ্গলে বাস করে, তাদের জন্যে কোন্ কোন্ গৃহে বসা হারাম, তা জানা আবশ্যক নয়। মোট কথা, যদি জানা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এসব বিষয়ের প্রয়োজন হবে না, তবে সেগুলো শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়; বরং যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত, সেগুলো সম্পর্কে বলে দেয়া জরুরী।

উদাহরণতঃ যদি মুসলমান হওয়ার সময় রেশমী বস্ত্র পরিহিত থাকে অথবা অবৈধভাবে দখল করা যমীনে বসে থাকে কিংবা বেগানা নারীর প্রতি তাকিয়ে থাকে, তবে তাকে এসব বিষয় বর্জন করার কথা বলে দেয়া জরুরী। যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত নয়; বরং অদূর ভবিষ্যতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন পানাহারের বস্তু, সেগুলো শিক্ষা দেয়া ওয়াজেব। উদাহরণতঃ যদি কোন শহরে মদ্যপান ও শূকরের মাংস খাওয়ার প্রচলন থাকে, তবে তাকে এগুলো বর্জন করার কথা বলা জরুরী। যেসব বিষয় শিক্ষা করা ওয়াজেব, সেগুলো শেখানোও ওয়াজেব। বিশ্বাস এবং অন্তরের কর্মসমূহ জানাও আশংকা অনুযায়ী ওয়াজেব। যেমন, তার অন্তরে কলেমাদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হলে তার এমন বিষয় শেখা উচিত, যদ্দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যদি সে সন্দেহ করে এবং মরে যায়; মৃত্যুর সময় সে বিশ্বাস করেনি যে, আল্লাহ্ তা'আলার কালামে পাক অনন্ত, আল্লাহর দীদার সম্ভবপর, তার মধ্যে পরিবর্তনের অবকাশ নেই এবং এছাড়া অন্যান্য বিশ্বাসও পোষণ করেনি, তবে এরূপ ব্যক্তি সকলের মতানুযায়ী ইসলামের উপরই মরেছে। কিন্তু যেসব কুমন্ত্রণা বিশ্বাসের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, সেগুলোর কতক স্বয়ং মানুষের মন থেকে উদগত হয় এবং কতক পরিস্থিতি-পরিবেশের প্রভাব মনে উৎপন্ন হয়। যদি সে এমন শহরে বসবাস করে, যেখানে বেদআতী কথাবার্তার প্রচলন রয়েছে, তবে তাকে বালেগ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সত্য বিষয় শিখিয়ে বেদআত থেকে রক্ষা করতে হবে, যাতে প্রথমেই মিথ্যা শিকড় গেড়ে না বসে। কেননা, মিথ্যা শ্রুতিগোচর হয়ে গেলে তা মন থেকে দূর করা ওয়াজেব হবে। অবশ্য কোন কোন সময় এটা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণতঃ নও-মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে এবং তার শহরে সুদের কারবার প্রচলিত থাকলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার মাসআলা শিক্ষা করা তার জন্যে ওয়াজেব হবে। অতএব ফরযে আইন শিক্ষা সম্পর্কে আমরা যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লিপিবদ্ধ করেছি, তাই সত্য। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আমলের অবস্থা জানা ফরযে আইন। সুতরাং যেব্যক্তি প্রয়োজনীয় আমল ও তার ওয়াজেব হওয়ার সময় জেনে নেবে, সে তার ফরযে আইন জ্ঞান অর্জন করে নেবে। সূফীগণ বলেছেন, ফরযে আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ফেরেশতাদের ইলহাম জানা। তাদের এ উক্তিও সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তির জন্যে, যে এতে লিপ্ত হয়। মানুষ যেহেতু প্রায়ই অনিষ্টের কারণাদি তথা রিয়া ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে না, তাই তিনটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্য থেকে যার প্রতি সে নিজেকে মুখাপেক্ষী দেখে, তা জানা তার জন্যে অপরিহার্য। এটা জানা অবশ্যই ওয়াজেব। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় মারাত্মক– (১) কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয়, (২) কুপ্রবৃত্তি, যা মেনে চলা হয় এবং (৩) আত্মম্ভরিতা। কোন মানুষ এগুলো থেকে মুক্ত নয়। পরে আমরা আড়ম্বর, আত্মপ্রীতি ইত্যাদি মনের যেসব অবস্থা উল্লেখ করব, সে এ তিনটি মারাত্মক বিষয়েরই অনুসারী, যা দূর করা ফরযে আইন। এই মারাত্মক বিষয়সমূহের সংজ্ঞা, কারণাদি, লক্ষণ ও প্রতিকার না জানা পর্যন্ত এগুলো দূর করা সম্ভব নয়। কেননা, অনিষ্ট সম্পর্কে না জানার কারণেই মানুষ অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকার হচ্ছে বিপরীত বিষয় দ্বারা তার মোকাবিলা করা। পরবর্তীতে বিনাশন পর্বে আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি, তার অধিকাংশই ফরযে আইন। সব মানুষ অনর্থক বিষয়াদিতে মশগুল হওয়ার দিক দিয়ে সেগুলো বর্জন করে রেখেছে।

নও-মুসলিম ব্যক্তিকে বেহেশত, দোযখ, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় দ্রুত শিক্ষা দিতে হবে– যাতে সে এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে। এ বিষয়টিও দুটি কলেমায়ে শাহাদতের পরিশিষ্ট। কারণ, রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাঁর আনীত বিষয়সমূহও বুঝা দরকার। তা এই যে, যেব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাত এবং যে তাঁদের নাফরমানী করে তার জন্য জাহান্নাম। সত্য মাযহাব এটাই এবং এ থেকে আরও জানা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির দিবারাত্রির চিন্তাধারার মধ্যে এবাদত ও আদান-প্রদানের কিছু নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে। এ কারণেই তার সামনে যে অভিনব ঘটনা ঘটে, তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী এবং যে ঘটনা সত্বর ঘটবে বলে আশা করা যায়, অবিলম্বে তার জ্ঞান লাভ করাও জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সুতরাং জানা গেল, طلب العلم فريضة على كل مسلم বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে আমলের এলেমই বুঝিয়েছেন, যার ওয়াজেব হওয়া সুস্পষ্ট, অন্য কোন এলেম বুঝাননি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, আমল ওয়াজেব হওয়ার সময় ক্রমান্বয়ে এলেম ওয়াজেব হতে থাকবে। والله اعلم

যে জ্ঞান ফরযে কেফায়া

প্রকাশ থাকে যে, শিক্ষার প্রকারসমূহ উল্লেখ না করা পর্যন্ত কোন্‌টি ফরয এবং কোন্‌টি ফরয নয়– এর পার্থক্য বুঝা যাবে না। ফরযে কেফায়ার দিক দিয়ে জ্ঞান দু'রকম– শরীয়তগত ও শরীয়ত বহির্ভূত। পয়গম্বরগণের কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয় এবং বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও শ্রবণ দ্বারা অর্জিত হয় না, তাকে আমরা শরীয়তগত জ্ঞান বলে থাকি। যেমন, অংক শাস্ত্র বুদ্ধি দ্বারা, চিকিৎসা শাস্ত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং অভিধান শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা অর্জিত হয়। যে জ্ঞান শরীয়তগত নয়, তা তিন প্রকার– ভাল, মন্দ, অনুমোদিত। যে জ্ঞানের সাথে পার্থিব বিষয়াদির উপযোগিতা জড়িত, তা ভাল জ্ঞান; যেমন চিকিৎসা ও অংক শাস্ত্র! এ শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে কতক ফরযে কেফায়া এবং কতক শুধু ভাল– ফরয নয়। পার্থিব বিষয়াদিতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা ফরযে কেফায়া। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র। দেহের সুস্থতার জন্যে এটা জরুরী। লেনদেন, ওসিয়ত, উত্তরাধিকার বন্টন ইত্যাদিতে অংক শাস্ত্র জরুরী। শহরে কোন ব্যক্তি এ জ্ঞানের অধিকারী না থাকলে শহরবাসীর অসুবিধার অন্ত থাকবে না। কিন্তু অংক শাস্ত্রে একজন জ্ঞানী হলেও যথেষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যরা এ ফরয থেকে অব্যাহতি পায়। আমরা চিকিৎসা ও অংক শাস্ত্রের জ্ঞান ফরয বলেছি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এদিক দিয়ে মৌলিক শিল্পগুলোও ফরযে কেফায়া। উদাহরণতঃ বস্ত্র বয়ন, কৃষিকাজ এবং রাজনীতি প্রভৃতিও ফরযে কেফায়া। বরং বদরক্ত চুষে বের করা এবং সেলাই কর্ম শিক্ষা করাও জরুরী। কোন শহরে বদরক্ত বের করার লোক না থাকলে শহরবাসীর জীবন বিপন্ন হবে। যে আল্লাহ রোগ প্রেরণ করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন এবং ব্যবহার পদ্ধতিও নির্দেশ করেছেন। এভাবে তিনি রোগমুক্তির উপকরণ ঠিক করে দিয়েছেন। সুতরাং এসব উপকরণ কাজে না লাগিয়ে বিনা চিকিৎসায় মরে যাওয়া বৈধ নয়। যে জ্ঞান ফরয নয়, কেবল ভাল, যেমন অংক ও চিকিৎসার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হয় না। শরীয়ত বহির্ভূত জ্ঞানের মধ্যে মন্দ শিক্ষা, যেমন জাদু ও তেলেসমাতের জ্ঞান, আর অনুমোদিত অর্থাৎ, বৈধ জ্ঞান যেমন, ক্ষতিকর নয় এমন কবিতা এবং ইতিহাসের জ্ঞান। এখানে শরীয়তগত জ্ঞান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ জ্ঞান সবই ভাল। কিন্তু বাস্তবে মন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা শরীয়তগত জ্ঞান জানায় ধোঁকা হয় বিধায় এ জ্ঞান দু'রকম– ভাল ও মন্দ। ভাল জ্ঞানের কিছু অংশ মৌলিক, কিছু অংশ শাখা, কিছু অংশ ভূমিকা এবং কিছু অংশ পরিশিষ্ট। অর্থাৎ, এ জ্ঞানের চারটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম মৌলিক । এ মৌলিক জ্ঞান চারটি–

(১) আল্লাহর কিতাব, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত, (৩) উম্মতের ইজমা এবং (৪) সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্য। ইজমা যেহেতু সুন্নতকে জানার সুযোগ করে দেয়, তাই এটা মৌলিক জ্ঞান। কিন্তু এর মর্যাদা সুন্নতের পর। সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্যও সুন্নত জ্ঞাপন করে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা এমন সব বিষয় দেখেছেন যা অন্যের দৃষ্টিতে অদৃশ্য। তাই আলেমগণ তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের ঐতিহ্যগুলোকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা যথার্থ মনে করেছেন।

শরীয়তগত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে শাখা, যা এই চারটি মৌলিক জ্ঞান থেকে বুঝা যায়, শব্দাবলী থেকে বুঝা যায় না; বরং অর্থ সম্ভার ও কারণাদির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উদাহরণতঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ لا يقضى القاضى وهو غضبان বিচারক ক্রুদ্ধ অবস্থায় কোন রায় দেবে না। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, যখন বিচারকের উপর প্রস্রাবের চাপ থাকে, অথবা সে ক্ষুধার্ত থাকে অথবা রোগ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, তখনও রায় দেবে না।

এই শাখা জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত– (১) পার্থিব কল্যাণ সংক্রান্ত জ্ঞান। কল্যাণের সাথে ফেকাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত। এর দায়িত্বে রয়েছেন ফেকাহ্‌বিদগণ। তাঁরা পার্থিব আলেম। (২) আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে মনের অবস্থা এবং তার ভাল ও মন্দ অভ্যাসের জ্ঞান। এসব অভ্যাসের মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় আর কোন্‌টি অপছন্দনীয়, তাও জানতে হয়। এ গ্রন্থের শেষার্ধে এ জ্ঞানের বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শরীয়তগত জ্ঞানের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ভূমিকা, যা শরীয়তগত জ্ঞানের হাতিয়ারস্বরূপ। যেমন, অভিধান ও ব্যাকরণ উভয়টিই কালামে পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার। অথচ অভিধান ও ব্যাকরণ শরীয়তগত জ্ঞান নয়। কিন্তু শরীয়ত জানার জন্যে এগুলো নিয়ে গবেষণা করা অপরিহার্য। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শরীয়ত আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক শরীয়তের অবস্থা তার ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। তাই আরবী অভিধানের জ্ঞানার্জন কালামে পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের জন্য হাতিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে। পুথিগত জ্ঞানও এ হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা জরুরী নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মী ছিলেন; পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। যদি ধরে নেয়া যায়, শ্রুত কথাবার্তা স্মরণ রাখা সম্ভবপর, তবে লেখা শেখার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু প্রায়শঃ মানুষ এরূপ হয় না বিধায় অক্ষর জ্ঞান জরুরী।

শরীয়তী জ্ঞানের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে পরিশিষ্ট। এটা কোরআন মজীদে রয়েছে। কারণ, এর কতক অংশ শব্দাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কেরাত ও অক্ষরের মাখরাজ তথা উচ্চারণস্থল প্রভৃতির জ্ঞানার্জন। আবার এর কয়েকটি অর্থের সাথে সম্পৃক্ত— যেমন, তফসীর। এ জ্ঞানও কোরআন হাদীসের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেবল অভিধানের জ্ঞান এর জন্যে যথেষ্ট নয়। আরও কতক অংশ কোরআনের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, নাসেখ, মনসুখ এবং আম ও খাস ইত্যাদির জ্ঞান। এ জ্ঞানকে 'উসূলে ফেকাহ্' তথা ফেকাহ্র মূলনীতি বলা হয়। হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস ও সাহাবীগণের বর্ণনায় রাবীদের নাম, বংশ পরিচয় ও অন্যান্য অবস্থা জানা, সাহাবীদের নাম ও গুণাবলী জানা, যাতে দুর্বল হাদীসকে শক্তিশালী হাদ্দীস থেকে পৃথক করা যায়। রাবীদের বয়সের অবস্থা জানা, যাতে মুরসাল হাদীস মুসনাদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এমনি ধরনের সকল বিষয় পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তগত জ্ঞানের উপরোক্ত প্রকার চতুষ্টয় কল্যাণকর এবং ফরযে কেফায়া। যদি প্রশ্ন হয়, উপরে ফেকাহ পার্থিব জ্ঞান এবং ফোকাহ্বিদগণকে পার্থিব আলেম বলা হল কেন? তবে জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করে পিতার ঔরস থেকে মাতার গর্ভে এবং সেখান থেকে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ করেছেন। এরপর দুনিয়া থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কবরে, কবর থেকে হিসাব-নিকাশের জন্যে হাশরে এবং সেখান থেকে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এগুলোই হচ্ছে মানুষের সূচনা এবং শেষ মনযিল ও শেষ পরিণতি। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে মানুষের জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র করেছেন, যাতে মানুষ উপার্জনযোগ্য বিষয়সমূহ এখানে উপার্জন করে নেয়। মানুষ যদি সুষ্ঠুভাবে ও ইনসাফ সহকারে দুনিয়াকে গ্রহণ করে, তবে সকল ঝগড়াই চুকে যায় এবং ফেকাহ্‌বিদগণের কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মানুষ তা করে না। সে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে দুনিয়াকে গ্রহণ করে। ফলে দুনিয়াতে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে রাজা-বাদশাহ তথা শাসনকর্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং আইন-কানুন রচনা করতে হয়েছে। ফেকাহ্‌বিদ শাসননীতি প্রণয়নে পারদর্শী এবং বিবাদ-বিসংবাদে মানুষের মধ্যে ইনসাফ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি শাসনকর্তাকে পথ প্রদর্শন করেন। হাঁ, দ্বীনের সাথেও ফেকাহ্‌র সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সরাসরি নয়– দুনিয়ার মধ্যস্থতায়। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র এবং দ্বীন দুনিয়া ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। রাজ্য শাসন ও দ্বীন উভয়েই যমজ অর্থাৎ এক সাথে থাকে। দ্বীন আসল এবং রাজ্য তার রক্ষক। বৃক্ষ যেমন শিকড় ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না, দ্বীনও তেমনি রক্ষক ব্যতীত কায়েম থাকে না। রাজ্য শাসন ও ব্যবস্থাপনা রাজা ব্যতীত পূর্ণ হয় না। ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা করার ব্যবস্থা ফেকাহ্‌র সাহায্যে হয়ে থাকে। সুতরাং রাজ্য শাসন যেমন প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়; বরং দ্বীনের পূর্ণতায় রাজ্য শাসন সহায়ক হয়ে থাকে, তেমনি রাজ্য শাসন পদ্ধতি অর্থাৎ ফেকাহ্‌র জ্ঞানলাভ করাও প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়। উদাহরণতঃ পথিমধ্যে বেদুইনদের কবল থেকে রক্ষা করে– এমন ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে হজ্জ পূর্ণ হয় না। কিন্তু হজ্জ এক বস্তু, হজ্জের পথে চলা দ্বিতীয় বস্তু, হজ্জ পূর্ণ হওয়ার জন্যে পথের নিরাপত্তা তৃতীয় বস্তু এবং এর পদ্ধতি, কৌশল ও আইন-কানুন জানা চতুর্থ বস্তু। রাজ্য শাসন ও হেফাযতের পদ্ধতি শিক্ষা করা ফেকাহ্‌র সারকথা। নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ ঃ

আমীর, মামুর ও মুতাকাল্লিফ– এ তিন শ্রেণী ব্যতীত যেন কেউ শাসনকার্য পরিচালনা না করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ হাদীসে 'আমীর' বলে ইমাম তথা শাসককে বুঝানো হয়েছে। প্রথম যুগে শাসকই ফতোয়া দিতেন। 'মামুর' অর্থ ইমামের নায়েব এবং 'মুতাকাল্লিফ' অর্থ যে আমীরও নয় এবং মামুরও নয়। সে সেই ব্যক্তি, যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসব পদ গ্রহণ করে। সাহাবায়ে কেরামের রীতি ছিল, তাঁরা ফতোয়া দেয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলতেন এবং একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। কিন্তু কেউ কোরআন ও আখেরাতের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বলে দিতেন। কতক রেওয়ায়েতে মুতাকাল্লিফ শব্দের স্থলে 'মুরায়ী' অর্থাৎ, রিয়াকার বর্ণিত আছে। কারণ, যেব্যক্তি ফতোয়া দানের পদ গ্রহণ করে, অথচ এ কাজের জন্যে একমাত্র সেই নির্দিষ্ট নয়, তার মতলব নাম যশ ও অর্থোপার্জন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বলা যেতে পারে, আপনার এ বক্তব্য হুদূদ ও কেসাসের বিধি-বিধানে এবং ক্ষতিপূরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিষয়বস্তু যেমন– নামায-রোযা ইত্যাদি এবাদত এবং হালাল হারাম কাজ-কারবারের বর্ণনা এ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে না। ফেকাহ্‌বিদগণ এসব বিষয়েও ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এর জওয়াব এই যে, ফেকাহ্‌বিদগণ আখেরাতের বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যেসব আমল বর্ণনা করেন, সেগুলো বেশীর চেয়ে বেশী তিন প্রকার হতে পারে– (১) ইসলাম, (২) নামায ও যাকাত এবং (৩) হালাল ও হারাম। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও ফেকাহ্‌বিদের চূড়ান্ত দৃষ্টি দুনিয়ার সীমা পার হয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয় না। এ তিন বিষয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অন্যান্য বিষয়ে তো দুনিয়ার মধ্যেই থাকবে। উদাহরণতঃ ইসলাম সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদ কিছু বললে একথাই বলবে যে, অমুকের ইসলাম সঠিক এবং অমুকের ইসলাম সঠিক নয়। মুসলমান হওয়ার শর্ত এগুলো কিন্তু এসব বর্ণনায় মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না। অন্তর তার রাজত্বের বাইরে। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাজা বাদশাহদেরকে অন্তরের রাজত্ব থেকে পদচ্যুত করে দিয়েছেন। সেমতে জনৈক সাহাবী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যে মুখে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছিল। হত্যাকারী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এই বলে ওযর পেশ করলেন যে, লোকটি তরবারির ভয়ে কলেমা উচ্চারণ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ هلا شققت قلبه অর্থাৎ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে, সে অন্তর দিয়ে বলছে কিনা? বরং ফেকাহবিদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া তরবারির ছায়াতলে দেয়। অথচ সে জানে, তরবারি দ্বারা তার সন্দেহ দূর হয়নি এবং অন্তরের উপর থেকে মূর্খতার পর্দা সরে যায়নি। যদি কোন ব্যক্তির ঘাড়ের উপর তরবারি উত্তোলিত থাকে এবং ধন-সম্পদের দিকে হাত প্রসারিত থাকে, এমতাবস্থায় সে কলেমা উচ্চারণ করলে ফেকাহ্‌বিদের ফতোয়া অনুযায়ী তার প্রাণ ও ধন-সম্পদ বেঁচে যাবে। কলেমার দৌলতে তার জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالواها فقد عصموا منى دماءهم واموالهم ـ

"কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" না বলা পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। যখন তারা এ কলেমা বলবে, তখন আমার কাছ থেকে তারা তাদের জান ও মাল বাঁচিয়ে নেবে।"

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবল জান ও মালের উপর এ মৌখিক কলেমার প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আখেরাতে মৌখিক কথাবার্তা উপকারী নয়; বরং অন্তরের নূর, রহস্য ও চরিত্র উপকারী। এসব বিষয় ফেকাহ শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। কোন ফেকাহ্‌বিদ এগুলো বর্ণনা করলে তা কালাম ও চিকিৎসা শাস্ত্র বর্ণনা করার মতই হবে। তার এ বর্ণনা ফেকাহ্ শাস্ত্র বহির্ভূত।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বাহ্যিক সব শর্ত পূরণ করে নামায আদায় করে এবং প্রথম তকবীর ছাড়া সমস্ত নামাযে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গাফেল থাকে; বরং বাজারের কাজকারবারের কথা চিন্তা করতে থাকে, তবে ফেকাহ্‌বিদ অবশ্যই ফতোয়া দেবেন যে, তার নামায সঠিক হয়েছে। অথচ এ নামায আখেরাতে তেমন উপকারী হবে না। যেমন, মুখে কেবল কলেমা উচ্চারণ করে নেয়া ইসলামের ব্যাপারে বিচার দিবসে উপকারী হবে না। কিন্তু ফেকাহ্‌বিদ এই অর্থে ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া দেবেন যে, সে যা করছে তাতে আল্লাহ্‌র আদেশসূচক বাক্য পালিত হয়ে গেছে এবং হত্যা ও শাস্তি তার উপর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে! নামাযে খুশু খুযু, নম্রতা ও অন্তর হাযির করা, যা আখেরাতের কাজ, তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ সচরাচর আলোচনা করেন না। করলেও তা ফেকাহ্ শাস্ত্র থেকে আলাদাই থাকবে।

যাকাতের ব্যাপারেও ফেকাহ্‌বিদের দৃষ্টি এতটুকুতেই নিবদ্ধ থাকে, যতটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে শাসনকর্তার দাবী পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ, এতটুকু হওয়া যে, যদি মালদার ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং শাসনকর্তা তাকে জবরদস্তি গ্রেফতার করে, তবে এ ফতোয়া যেন দেয়া যায় যে, তার যিম্মায় যাকাত নেই। বর্ণিত আছে, কাজী আবু ইউসুফ বছরের শেষ ভাগে নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীকে দান করে দিতেন এবং তার ধন-সম্পদ তাকে দিয়ে নিজের নামে দান করিয়ে নিতেন, যাতে যাকাত ওয়াজেব না হয়। এ বিষয়টি কেউ হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এটা তার ফেকাহর ফল। ইমাম আবু হানীফার এ উক্তি যথার্থ। কেননা, এ কৌশল কেবল দুনিয়াবী ফেকাহ্‌রই হতে পারে। পরকালে এর ক্ষতি যেকোন গোনাহ থেকে বড়।

হালাল ও হারামের অবস্থা এই যে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার স্থির নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার চারটি স্তর রয়েছে– (১) সেই স্তর, যা সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে শর্ত। আত্মরক্ষার এ ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ সাক্ষ্য দেয়ার, বিচারক হওয়ার এবং শাসক হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বাহ্যিক হারাম থেকে বেঁচে থাকাই কেবল এ ধরনের আত্মরক্ষা। (২) সৎকর্মপরায়ণ লোকদের আত্মরক্ষা; অর্থাৎ এমন সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যাতে হারাম ও হালাল হওয়ার উভয়বিধ সম্ভাবনাই বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ دع ما يريبك الى ما لايريبك "যা সন্দেহজনক নয়, তার বিনিময়ে যা সন্দেহজনক তা ত্যাগ কর।" তিনি আরও বলেন ঃ الاثم حواز القلوب অর্থাৎ, গোনাহ অন্তরে খটকা লাগায়। (৩) মুত্তাকী-পরহেযগারদের আত্মরক্ষা– তারা কিছু সংখ্যক হালালকেও এ কারণে পরিহার করে যে, এর দ্বারা হারাম পর্যন্ত পৌঁছার ভয় থাকে।

لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا باس به مخافة مما به باس -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

"মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না, যে পর্যন্ত এমন বিষয় পরিহার না করে, যাতে কোন ক্ষতি নেই 'ক্ষতি হতে পারে' এমন বিষয়ে জড়িত হওয়ার ভয়ে।" এর উদাহরণ– যেমন, কোন ব্যক্তি গীবত হওয়ার ভয়ে অন্যের অবস্থা বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকে। অথবা উল্লাস স্ফূর্তি বেড়ে গিয়ে অবাধ্যতা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। (৪) সিদ্দীকগণের আত্মরক্ষা। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত সবকিছু থেকে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যেন জীবনের এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত না হয়, যাতে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য থেকে সামান্য সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও তাতে হারাম পর্যন্ত না পৌঁছার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে।

সুতরাং প্রথম স্তর ব্যতীত সকল স্তরই ফেকাহ্‌বিদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। তার দৃষ্টি কেবল সাক্ষীদের ও বিচারকদের হারাম থেকে আত্মরক্ষার দিকে থাকে এবং সেসব বিষয়ের দিকে থাকে, যেগুলো আদেল হওয়ার পরিপন্থী। এরূপ আত্মরক্ষার উপর কায়েম থাকা আখেরাতে গোনাহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেন ঃ "তুমি তোমার অন্তরের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দেয়।"শেষ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। ফেকাহ্‌বিদ অন্তরের খটকার কথা বর্ণনা করে না এবং খটকা সহকারে আমলের অবস্থাও বলে না; বরং কেবল এমন বিষয় বর্ণনা করে, যদ্দ্বারা ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

যাবতীয় বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ফেকাহ্‌বিদের পূর্ণ দৃষ্টি সে জগতের সাথে জড়িত, যার দ্বারা আখেরাতের পথ নিষ্কণ্টক হয়। সে অন্তরের হাল হকিকত ও আখেরাতের বিধানাবলী বললে তা একান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। যেমন, তার কথায় মাঝে মাঝে চিকিৎসা, অংক, জ্যোতির্বিদ্যা ও কালাম শাস্ত্রের আলোচনাও এসে যায়। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন, ফেকাহ্ শাস্ত্রের অন্বেষণ আখেরাতের পাথেয় নয়। এ উক্তি যথার্থ। কেননা, সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, তদনুযায়ী আমল করা। এমতাবস্থায় সেই জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন কানুনের জ্ঞান কিরূপে হতে পারে? এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হবে, এ আশায় যে লোক এসব বিষয় শিক্ষা করে সে উন্মাদ। আল্লাহর আনুগত্যে অন্তর ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়ের দ্বারা আমল হয়ে থাকে। এ আমলের জ্ঞানই সর্বোত্তম। এখানে প্রশ্ন হয়, আপনি ফেকাহ্ ও চিকিৎসা শাস্ত্রকে বরাবর করে দিলেন কিরূপে? চিকিৎসা শাস্ত্র দুনিয়া তথা দেহের সুস্থতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর উপরও দ্বীনের সঠিকতা নির্ভরশীল। এরূপ জ্ঞানকে ফেকাহর বরাবর করা ইজমার পরিপন্থী। এর জওয়াব এই যে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ফেকাহ্ বরাবর হওয়া অপরিহার্য নয়; বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনটি কারণে ফেকাহ্ চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর শ্রেষ্ঠ। প্রথমত ফেকাহ্ শরীয়তী জ্ঞান অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অর্জিত। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র শরীয়তী জ্ঞান নয়। দ্বিতীয়তঃ যারা আখেরাতের পথিক, তাদের কেউ ফেকাহ্র প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। রুগ্ন ও সুস্থ উভয়েরই এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি কেবল রুগ্নরাই মুখাপেক্ষী। তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়তঃ ফেকাহ্ শাস্ত্র আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের সঙ্গী। কারণ, এর সারকথা হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের প্রতি লক্ষ্য করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অন্তরের অভ্যাস। ভাল আমল ভাল অভ্যাস থেকে প্রকাশ পায় এবং মন্দ আমল মন্দ অভ্যাস থেকে উদগত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অপর দিকে সুস্থতা ও অসুস্থতার উৎপত্তি হয় মেযাজ ও পিত্তের দোষ-গুণ থেকে, যা দেহের বিশেষণসমূহের অন্যতম– অন্তরের নয়। সুতরাং ফেকাহকে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে দেখলে ফেকাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাবে এবং একে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্রের সাথে তুলনা করলে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্র মনে হবে।

আখেরাত বিষয়ক এলেম

উল্লেখ্য, আখেরাত বিষয়ক এলেম দুই প্রকার– এলমে মুকাশাফা ও এলমে মুয়ামালা। এলমে মুকাশাফার অপর নাম এলমে বাতেন। এটা সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেমতে জনৈক সাধক বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তার সমাপ্তি অকল্যাণকর হবে বলে আমি আশংকা করি। এ শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বনিম্ন জ্ঞান এই যে, একে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং যোগ্য লোকদের এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কথা স্বীকার করবে। অন্য একজন বলেন ঃ যার মধ্যে বেদআত ও আত্মম্ভরিতা রয়েছে, সে অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেও এই শাস্ত্রের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন বিষয় অর্জন করতে পারবে না। এ শাস্ত্র অস্বীকারকারীর সর্বনিম্ন শাস্তি এই যে, এ শাস্ত্র থেকে সে কিছুই লাভ করতে পারে না। এটা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল বান্দাদের শাস্ত্র। এটা একটা নূর। অন্তর যখন তার মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন এই নূর অন্তরে প্রকাশ পায়। এ নূরের প্রভাবে মানুষের সামনে রহস্যের বহু দ্বারোদঘাটিত হয়ে যায়। পূর্বে যেসব বিষয়ের কেবল নাম শুনত এবং কিছু অস্পষ্ট অর্থ ধারণা করে নিত, এ নূরের বরকতে এখন সেসবগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। এমনকি, তখন আল্লাহ পাকের সত্তার প্রকৃত মারেফত অর্জিত হয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর, তাঁর কর্মের, দুনিয়া ও আখেরাতের সৃষ্টি রহস্যের এবং আখেরাতকে দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল করার বাস্তব মারেফত অর্জিত হয়ে যায়। নবুওয়ত, নবীর অর্থ, ওহী, ফেরেশতা ও শয়তানের অর্থ, মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার অবস্থা, নবীগণ কর্তৃক ফেরেশতাগণকে জানার স্বরূপ, তাঁদের কাছে ওহী পৌঁছার অবস্থা, আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা, অন্তরের মারেফত, তার মধ্যে ফেরেশতা ও শয়তানের বাহিনীর মোকাবিলার অবস্থা, ফেরেশতাগণের ইলহাম ও শয়তানদের কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়, আখেরাত, জান্নাত, দোযখ. কবরের আযাব, পুলসেরাত, মীযান ও হিসাবের পরিচয়, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তত্ত্ব–

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

"তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে যথেষ্ট।"

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

"আখেরাতের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।"

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ, তাঁকে দেখার অর্থ, তাঁর নৈকট্যশীল হওয়া ও প্রতিবেশী হওয়ার উদ্দেশ্য, উর্ধ্ব জগতের সঙ্গ এবং ফেরেশতাগণের নৈকট্য দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার মর্ম, জান্নাতীদের স্তরের মধ্যে এত পার্থক্য হওয়া যে, তারা একে অপরকে আকাশের উজ্জ্বল তারকার মত ঝলমল করতে দেখবে– ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় এ নূরের কারণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ নূরের পূর্বে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মে মানুষ মতভেদ করে। মূল বিষয়বস্তু সত্য বলে বিশ্বাস করে ঠিক, কিন্তু আপন স্বার্থের ব্যাপারে কিসের মধ্যে কি বলতে থাকে! কতক লোকের বিশ্বাস– এগুলো সব দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তার সৎ বান্দাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং কারও অন্তর কল্পনাও করেনি। মানুষের জন্যে জান্নাতে গুণাবলী ও নাম ছাড়া কিছু নেই। কারও বিশ্বাস– এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় দৃষ্টান্ত এবং কিছু বিষয় এমন, যার স্বরূপ শব্দ থেকে জানা যায়। কারও মতে, আল্লাহ তা'আলার মারেফতের পরিণতি ও পূর্ণতা, তাঁকে জানার ব্যাপারে অক্ষমতা স্বীকার করা। কিছু লোক আল্লাহ তা'আলার মারেফত সম্পর্কে বড় বড় দাবী করে। কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তা'আলার মারেফতের চূড়ান্ত স্তর সর্বসাধারণের বিশ্বাসের সীমা; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান, জ্ঞাত, ক্ষমতাশালী, শ্রোতা, দ্রষ্টা, বাক্যালাপকারী। এলমে মুকাশাফা বর্ণনা করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য এসব বিষয়ের উপর থেকে পর্দা সরে যাওয়া, সত্য বিষয় চোখে দেখে নেয়ার মত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এরপর কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকা। অন্তরের উপর পাপাচারের মরিচা থরে থরে পড়ে না থাকলে এটা মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

আখেরাতের এলেম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সেসব পাপাচার থেকে অন্তরের স্বচ্ছ হওয়ার অবস্থা জানা, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণ ও কর্মের স্বরূপ জানতে বাধা সৃষ্টি করে। অন্তর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং সর্বাবস্থায় পয়গম্বরগণের অনুসরণ করা। এ উপায় অবলম্বন করলে অন্তর পরিষ্কার হতে থাকবে, তাতে সত্যের অংশ প্রতিফলিত এবং সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হতে থাকবে। এ স্বচ্ছতার পথ রিয়াযত তথা সাধনা ও জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। সাধনার বিবরণ স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

এসব জ্ঞান কোন কিতাবে লিখিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা যাকে এ জ্ঞান সামান্য দান করেন, সে তা অন্যের কাছে সাধারণভাবে বর্ণনা করে না; কেবল যোগ্য সহচরের কাছেই বর্ণনা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসে এ গোপন জ্ঞানের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ কতক জ্ঞান লুক্কায়িত ধনভাণ্ডারের ন্যায়। সাধকবৃন্দ ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। তাঁরা এগুলো বললে কেবল সেসব লোকই এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যারা আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে আলেমকে এ জ্ঞানের কিছু অংশ দান করেন, তাঁকে হেয় মনে করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হেয় করেননি এবং এ জ্ঞান দান করেছেন।

এলমে মুয়ামালা হচ্ছে অন্তরের ভালমন্দ অবস্থা জানা। ভাল অবস্থা যেমন– সবর, শোকর, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সংসার বর্জন, খোদাভীতি, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্বীকার করা, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, সচ্চরিত্রতা, সৎভাবে জীবন যাপন করা, সততা, এগুলোর স্বরূপ জানা, এগুলো অর্জনের উপায় জানা, এগুলোর ফলাফল ও আলামত চেনা, এগুলোর মধ্যে কোনটি দুর্বল হয়ে গেলে তাকে শক্তিশালী করার উপায় জানা এবং কোনটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা সৃষ্টি করার পদ্ধতি আয়ত্ত করা আখেরাত বিষয়ক এলেমের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে অন্তরের মন্দ অবস্থা, যেমন দারিদ্র্যের ভয়, তকদীরের প্রতি অসন্তোষ, হিংসা-দ্বেষ পোষণ, বড়ত্ব অন্বেষণ, প্রশংসা কামনা, পার্থিব ভোগ-বিলাসের জন্যে দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ আস্ফালন, শত্রুতা, লোভ, কৃপণতা, লালসা, বিত্তবানদের সম্মান করা, ফকীরদেরকে হেয় করার প্রয়াস, কোন বিষয়ে একে অপরের উপর বড়াই করা, সত্য বিষয়ে অহমিকা করা, অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করা, বেশী কথা বলা পছন্দ করা, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সেজেগুজে থাকা, ধর্মের কাজে শৈথিল্য করা, নিজেকে বড় মনে করা, নফসের অনিষ্ট থেকে গাফেল হয়ে অন্যের দোষ অন্বেষণ করা, নিশ্চিন্ত হওয়া, আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত থাকা, অপমান বোধ করলে কঠোরভাবে তার প্রতিশোধ নেয়া, সত্য বিষয়ের প্রতিশোধে দুর্বল হওয়া, আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া, এবাদতের উপর ভরসা করা, চক্রান্ত, আত্মসাৎ ও প্রতারণা করা কঠোর প্রাণ হওয়া, রূঢ়ভাষী হওয়া, দুনিয়া নিয়ে খুশী থাকা, পার্থিব সাফল্য না পেয়ে কাতর হওয়া, জুলুম করা, লজ্জা শরম ও দয়া কম হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই মন্দ। অন্তরের এসব অভ্যাস সকল অনিষ্ট ও কুকর্মের মূল। এর বিপরীত তথা ভাল অভ্যাসসমূহ আনুগত্য ও পুণ্যের মূল। এগুলোর সংজ্ঞা, স্বরূপ, কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার জানার নাম আখেরাত শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের আলেমগণের ফতোয়া অনুযায়ী এটি ফরযে আইন। যেব্যক্তি এ থেকে বিমুখ থাকবে, সে আখেরাতে সত্যিকার মহাসম্রাটের ক্রোধে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন, বাহ্যিক আমলের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী দুনিয়ার শাসনকর্তার তরবারি দ্বারা এবং ফেকাহ্‌বিদগণের ফতোয়া অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সারকথা, ফেকাহ্‌বিদগণ দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ফরযে আইন বিষয়সমূহ দেখে থাকেন। আর আমরা যে জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করেছি, তা মানুষকে আখেরাতের কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। কোন ফেকাহবিদকে তাওয়াক্কুল অথবা এখলাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে অথবা রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে জওয়াবদানে বিরত থাকবে। অথচ এটা তার নিজের উপরও ফরযে আইন। এটা না জানলে তার পরকাল বিনষ্ট হবে। কিন্তু তাকে যদি লেয়ান, যেহার, ঘোড়দৌড় ও তীরন্দাজির মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সে এগুলোর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখার বিরাট দফতর বর্ণনা করে দেবে, যেগুলোর প্রয়োজন শত শত বছর পর্যন্তও কারও হবে না। প্রয়োজন হলেও সেগুলোর বর্ণনাকারীর অভাব হবে না। ফেকাহ্‌বিদ দিবারাত্র এগুলোর স্মরণ ও পাঠদান করার মধ্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু যে বিশেষ বিষয়টি তার জন্য জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রতি গাফেল থাকে। এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে সে বলে ঃ এটা দ্বীনী এলেম এবং ফরযে কেফায়া। তাই আমি এতে নিয়োজিত আছি। মানুষ এ ধোঁকায় পড়ে ফেকাহর জ্ঞনার্জন করে এবং অপরকে ধোঁকা দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই জানে, যদি ফরযে কেফায়ার হক আদায় করাই তার উদ্দেশ্য হত, তবে ফরযে কেফায়ার পূর্বে ফরযে আইন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করত। বস্তুতঃ ফরযে কেফায়া আরও অনেক রয়েছে। সেগুলো ফেকাহ্‌র পূর্বে অর্জন করত। কোন কোন শহরে কাফের যিম্মী ছাড়া মুসলমান চিকিৎসক নেই। ফেকাহর যেসকল বিধি-বিধান চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোতে কাফেরদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেকাহ্‌বিদ চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ফেকাহ্ শাস্ত্র বিশেষতঃ বিরোধপূর্ণ ও বিতর্কিত মাসআলাসমূহ শিক্ষা করার কাজে বাড়াবাড়ি করে। অথচ এ ধরনের ফতোয়াদান ও মোকদ্দমায় জওয়াব লেখার লোক শহরে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় যখন কিছু লোক এ ফরযে কেফায়া পালনে তৎপর রয়েছে, তখন ফেকাহ্‌বিদরা এটা শিক্ষা করার অনুমতি কিরূপে দেবে এবং যে চিকিৎসা শাস্ত্র কেউ জানে না, তা বর্জন করার আদেশ কিরূপে দেবে? এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জ্ঞানার্জনে ওয়াক্ফ ও ওসিয়তের মুতাওয়াল্লী হওয়া যায় না, এতীমদের ধনসম্পদের রক্ষক হওয়া যায় না, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগে চাকুরী লাভ করে সমকক্ষদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না এবং শত্রুদের উপর প্রবলও হওয়া যায় না।

পরিতাপের বিষয়, মন্দ আলেমদের ধোঁকায় দ্বীন মিটে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এমন বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন, যার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং শয়তান খুশী হয়। বাহ্যদর্শী আলেমগণের মধ্যে যারা পরহেযগার ছিলেন, তাঁরা বাতেনী আলেম ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শায়বান নামক এক আবেদ রাখালের সামনে এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসতেন ঃ যেমন মক্তবে বালকরা ওস্তাদের সামনে বসে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ অমুক অমুক ব্যাপারে আমি কি করব? লোকেরা ইমাম শাফেয়ীকে বলত ঃ আপনার মত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এই জংলী লোকটির নিকট কি শিখতে পারেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা যা শেখনি, তার তওফীক এ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) মারূফ কারখীর কাছে যাতায়াত করতেন। অথচ তিনি যাহেরী এলেমে এঁদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁরা উভয়ই তাঁকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা যদি কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই এবং কোরআন ও হাদীসে তার বিধান খুঁজে না পাই, তবে কি করব? তিনি বললেন ঃ সাধু পুরুষদের কাছে জিজ্ঞেস করো এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করো। এ কারণেই বলা হয়েছে, বাহ্যিক আলেমগণ পৃথিবী ও দেশের শোভা এবং বাতেনী আলেমগণ আকাশ ও ফেরেশতাজগতের সৌন্দর্য। জুনাইদ (রহঃ) বলেন ঃ একদিন আমাকে আমার মুর্শিদ সিররী (রহঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে উঠে কার কাছে গিয়ে বস? আমি বললাম ঃ মুহাসেবী (রহঃ)-এর কাছে। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা। তাঁর জ্ঞান ও আদব গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি যে কালাম শাস্ত্র ও মুসলিম দার্শনিকদের খণ্ডন করেন তা শেখো না। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে উঠার সময় একথা বলতে শুনলাম ঃ আল্লাহ্ তোমাকে এলেম ও হাদীসওয়ালা সূফী করুন– সূফী হাদীসওয়ালা না করুন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, যেব্যক্তি হাদীস ও এলেম শিখে সূফী হয়, সে সফলতা লাভ করে। আর যেব্যক্তি সূফী হয়ে হাদীস শিক্ষা করে, সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজেকে বিপন্ন করে।

আমরা জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে কালাম শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিনি এবং এগুলো ভাল কি মন্দ তাও বর্ণনা করিনি। এর কারণ, কালাম শাস্ত্রের যে সকল উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলোর সারমর্ম কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেসকল বিষয় কোরআন ও হাদীস বহির্ভূত, সেগুলো হয় বেদআতের অন্তর্ভুক্ত মন্দ বিবাদ বিসম্বাদ, না হয় বিভিন্ন ফেরকার বিরোধ সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তৃতা বিবৃতি। সুতরাং এগুলো সব বাতিল ও অর্থহীন বিষয়। সুস্থ হৃদয় এগুলো দূষণীয় মনে করে এবং সত্যপন্থী কান এগুলো শ্রবণ করতে সম্মত নয়। আর কিছু বিষয় রয়েছে যা দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। তখন এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বেদআত বলে গণ্য হত। কিন্তু এখন নীতি বদলে গেছে। কারণ, এ ধরনের বেদআত অনেক হয়ে গেছে, যা কোরআন ও হাদীসের দাবীর প্রতি বিমুখ করে। এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা বেদআতের সন্দেহকে মসৃণ করেছে এবং এ সম্পর্কে বক্তৃতা রচনা করেছে। ফলে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রথমে নিষিদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনের খাতিরে এখন জায়েয; বরং ফরযে কেফায়া হয়ে গেছে।

দর্শনশাস্ত্র কোন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং এর চারটি অংশ রয়েছে– (১) জ্যামিতি ও অংক। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এ উভয়টিই জায়েয। যার সম্পর্কে আশংকা হয় যে, এগুলো পাঠ করলে খারাপ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এগুলো পাঠ করতে নিষেধ করা যাবে না। যার সম্পর্কে আশংকা, তাকে নিষেধ করা দরকার। কারণ, এসব বিষয়ে অধিক পারদর্শী হলে মানুষ বেদআতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতএব যাদের ঈমান দুর্বল, তাদেরকে উভয় বিষয় পাঠ করা থেকে বাঁচানো উচিত। যেমন, ছোট শিশুকে নদীর কিনারে দাঁড়াতে দেয়া হয় না অথবা নও-মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করা থেকে দূরে রাখা হয়, যাতে তার উপর সংসর্গের প্রভাব না পড়ে। দ্বিতীয় অংশ ফালসাফা (দর্শন)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে প্রমাণের অবস্থা ও শর্ত এবং সংজ্ঞার কারণ ও শর্ত বর্ণিত হয়। উভয়টিই কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। (৩) এলমে ইলাহিয়াত– অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা। এটাও কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিকরা এক্ষেত্রে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান আবিষ্কার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেননি; বরং তাদের মাযহাব আলাদা। তন্মধ্যে কতক কুফর এবং কতক বেদআত। মুতাযেলী হয়ে যাওয়া যেমন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং কালাম শাস্ত্রীদেরই কতক লোক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করে বাতিল মাযহাব সৃষ্টি করে নিয়েছে, দার্শনিকদের অবস্থাও তেমনি। (৪) পদার্থবিদ্যা– এর কতক অংশ শরীয়ত বিরোধী। এটা মূলতঃ জ্ঞানই নয় যে, জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে বর্ণনা করা যাবে; বরং এটা মূর্খতা। আর কতক অংশে পদার্থের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এবং রূপান্তরণের বিষয় আলোচিত হয়। এর অবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্রের মত। পার্থক্য এই যে, চিকিৎসকের দৃষ্টি রোগ ও সুস্থতার দিক দিয়ে বিশেষভাবে মানব দেহের উপর নিবদ্ধ থাকে এবং পদার্থবিদদের দৃষ্টি পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন ও গতিশীলতার দিকে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থবিদ্যার তুলনায় উত্তম। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং পদার্থবিদ্যার তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

সারকথা, কালাম শাস্ত্র ফরযে কেফায়া জ্ঞানসমূহের অন্যতম। এর ফলে সর্বসাধারণের অন্তর বেদআতীদের চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পায়। বেদআত পয়দা হওয়ার কারণে এ শাস্ত্র ওয়াজেব হয়েছে। যেমন হজ্জের পথে বেদুঈনদের জুলুম ও রাহাজানির কারণে রক্ষীর আশ্রয় নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। যদি বেদুঈনরা তাদের অত্যাচার বন্ধ করে দেয়, তবে হজ্জের শর্তসমূহের মধ্যে সাহায্য গ্রহণ করার শর্ত বাদ পড়ে যাবে। অনুরূপ বেদআতীরা যদি তাদের বাজে বকা বন্ধ করে দেয়, তবে সাহাবায়ে কেরামের সময়ে যতটুকু ছিল, এর বেশী কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব কালাম শাস্ত্রীদের জানা উচিত, ধর্মে তাদের মর্তবা হজ্জের পথে রক্ষীদের মর্তবারই মত। যদি রক্ষী রক্ষা কাজ ছাড়া অন্য কিছু না করে, তবে সে হাজী হবে না। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করলেই কেবল হাজী হবে। এমনিভাবে যদি কালামশাস্ত্রী কেবল বিতর্ক ও বেদআত দমনেই মশগুল থাকে এবং আখেরাতের পথ অতিক্রম না করে, আত্মার উন্নতি ও সংশোধনে নিয়োজিত না হয়, তবে সে কখনও আলেমে দ্বীনগণের মধ্যে গণ্য হবে না। তার কাছে আকীদা অন্তর ও মুখের বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাঁ, সর্বসাধারণ থেকে তার তফাৎ এতটুকু হবে যে, সে বেদআতীদের সাথে লড়াই করতে পারে এবং সাধারণ লোকের হেফাযত করে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর সিফাত ও কর্ম এবং এলমে মুকাশাফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের পরিচয় কালাম শাস্ত্রের দ্বারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্জিত হয় না। বরং এ শাস্ত্র যে এগুলোর অন্তরায় তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। একমাত্র মুজাহাদা তথা সাধনার দ্বারাই এসব বিষয় অর্জন করা যায়। মুজাহাদাকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েতের মুখবন্ধ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"যারা আমার পথে সাধনা করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।"

এখন আমি কালামশাস্ত্রীর সংজ্ঞাও বর্ণনা করলাম যে, সে সর্বসাধারণের বিশ্বাসকে বেদআতীদের যুক্তিজট থেকে মুক্ত রাখে, যেমন রক্ষী হাজীদেরকে বেদুঈনদের লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করে। আমি ফেকাহবিদের সংজ্ঞা এই বর্ণনা করেছি যে, সে সেসব আইন জানে, যদ্দ্বারা বাদশাহ্ একে অপরের উপর সীমালংঘন দমন করতে পারে। ধর্ম শাস্ত্রের তুলনায় এই উভয় কাজ নিম্নস্তরের। অথচ গুণী আলেম বলে যাঁরা প্রসিদ্ধ, তাঁরা হলেন ফেকাহবিদ ও কালামশাস্ত্রী। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনি ধর্ম শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে এই আলেমগণকে নিম্নস্তরের বলেন কেন? তবে এর জওয়াব এই যে, যেব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ দেখে সত্যের পরিচয় লাভ করে, সে পথভ্রষ্টতার অরণ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে। প্রথমে সত্য জানা দরকার। এর পর মানুষ চেনা উচিত, যদি সে সত্য পথের পথিক হয়। আর যদি তুমি অনুসরণ করেই তুষ্ট থাক এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রসিদ্ধ স্তরের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, তবে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও উচ্চ মর্তবা থেকে গাফেল হয়ো না। যাদের কথা তুমি বল, তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বীনের ব্যাপারে কেউ তাঁদের মত চলতে পারে না, এমনকি তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। অথচ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কালাম ও ফেকাহ শাস্ত্রের কারণে ছিল না; বরং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র ও তার পথ অবলম্বনের কারণে ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর ছিল, তা বেশী রোযা রাখা, বেশী নামায পড়া এবং বহু হাদীস রেওয়ায়েতের কারণে ছিল না, ফতোয়া দান ও কালাম শাস্ত্রের দিক দিয়েও ছিল না; বরং সে বিষয়ের দিক দিয়ে ছিল, যা তাঁর বক্ষে প্রবিষ্ট ছিল। তোমার সে রহস্যের অনুসন্ধানে আগ্রহী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হওয়া উচিত। এটাই উৎকৃষ্ট ও গুপ্ত ভান্ডার বিশেষ। যাকে সাধারণ লোকজন বড় মনে করে এবং সম্মান করে, তাকে পরিত্যাগ কর। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) হাজারো সাহাবী দুনিয়াতে রেখে গেছেন। তাঁরা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের প্রশংসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে করেছেন। তাঁদের কেউ কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। দশ জনের কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছাড়া কেউ নিজেকে ফতোয়া দানের কাজে নিয়োজিত করেননি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রধান সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ "অমুক শাসনকর্তার কাছে যাও। সে এ কাজ নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছে। এ প্রশ্নটি তার কাছে রাখ।" এতে ইঙ্গিত ছিল, মোকদ্দমা ও বিধিবিধান সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন ঃ এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ তিরোহিত হয়ে গেছে। লোকেরা বলল ঃ আমাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনি একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উদ্দেশ্য ফতোয়া ও বিধানের এলেম নয়– আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত এলেম উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কি কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি বুঝিয়েছিলেন? যদি না বুঝিয়ে থাকেন, তবে তুমি সে এলেমের মারেফত হাসিল করতে আগ্রহ কর না কেন, যার দশ ভাগের নয় ভাগ হযরত ওমরের ওফাতের কারণে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল? অথচ হযরত ওমর (রাঃ) কালাম ও বিতর্কের দরজা বন্ধ করেন। কেউ তাঁর সামনে কোরআনের দু'আয়াতের পরস্পর বিরোধিতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি তাকে দোররা মারতেন এবং তার সাথে মেলামেশা করতে মানুষকে নিষেধ করে দিতেন।

আলেমদের মধ্যে ফেকাহবিদ কালামশাস্ত্রীরা সমধিক প্রসিদ্ধ– একথার জওয়াব এই যে, যে বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করা যায়, তা অন্য জিনিস। সেমতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল খেলাফতের দিক দিয়ে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই রহস্যের কারণে যা তাঁর অন্তরে রক্ষিত ছিল। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল রাজনীতির কারণে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সে এলেমের দিক দিয়ে, যার দশ ভাগের নয় ভাগ তাঁর মৃত্যুর ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর লক্ষ্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছিল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার ও স্নেহ মমতা। এদিক দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ছিল অনন্য । এ বিষয়টি তাঁর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল। তাঁর অন্যান্য বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম তো অন্য লোকদের দ্বারাও সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল, যারা জাঁকজমক, সুখ্যাতি ও নামযশ প্রত্যাশী। মোট কথা, প্রসিদ্ধি ক্ষতিকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আর শ্রেষ্ঠত্ব গোপন বিষয়ের আওতাভুক্ত, যা কেউ অবগত হতে পারে না। অতএব ফেকাহ ও কালামবিদ যথাক্রমে শাসক ও বিচারকের ন্যায়। তারা কয়েক ধরনের। তাদের কেউ আপন এলেম ও ফতোয়া দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তরীকাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়; নামযশ ও সুখ্যাতি তাদের কাম্য হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তারা এলেম অনুযায়ী আমল করে এবং ফতোয়া ও দলীল দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা, প্রত্যেক এলেমই আমল, কিন্তু প্রত্যেক আমল এলেম নয়। চিকিৎসকও তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম। সে তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্র জন্যে কাজ করে বিধায় সওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে যদি শাসনকর্তা জনগণের কাজকারবার আল্লাহর জন্যে করে, তবে সে আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ও সওয়াবের যোগ্য হবে– ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার দিক দিয়ে নয়; বরং এমন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে, যার লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা।

তিন প্রকার বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হতে পারে– (১) শুধু এলেম এবং তা হচ্ছে এলমে মুকাশাফা। (২) শুধু আমল; যেমন শাসনকর্তার ন্যায়বিচার করা এবং মানুষকে শৃংখলায় রাখা। (৩) এলেম ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত শাস্ত্রই হচ্ছে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র। এই শাস্ত্রজ্ঞ আলেম ও আমেল উভয়টি হয়ে থাকে। এখন তুমি নিজেই পছন্দ কর কেয়ামতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে, না আমেলদের, না উভয় দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? নিছক সুখ্যাতির অনুসরণ করার তুলনায় এ কাজটি তোমার জন্যে অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। জনৈক কবি বলেন ঃ যা দেখ এবং শুন, তা ত্যাগ কর। সূর্য সামনে থাকতে শনি গ্রহের কি প্রয়োজন?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখানে আমরা পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করছি। এতে জানা যাবে, যারা নিজেদেরকে তাঁদের মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে, তারা তাঁদের প্রতি জুলুম করে এবং কিয়ামতে তারাই হবে এই ফেকাহ্বিদগণের বড় দুশমন। কেননা, স্ব স্ব এলেম দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের অবস্থার মধ্যে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়েছে। সেমতে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাঁরা কেবল ফেকাহ্শাস্ত্রেই মশগুল ছিলেন না; বরং আধ্যাত্ম্য জ্ঞানেরও চর্চা করতেন। এটা ঠিক, এ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা কোন কিতাব লেখেননি এবং কাউকে এর সবকও দেননি। সাহাবায়ে কেরাম যে কারণে ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কে কোন কিতাব লেখেননি এবং দরস দেননি, সে একই কারণে ফেকাহ্বিদগণও তা করেননি। অথচ ফতোয়া শাস্ত্রে সব সাহাবীই এক একজন ফেকাহ্বিদ ছিলেন।

এখন আমরা ইসলামী ফেকাহর কিছু অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে জানা যাবে, আমরা যা কিছু লিখেছি তা পূর্ববর্তী ফেকাহ্বিদগণের প্রতি ভর্ৎসনা নয়; বরং তাদের প্রতি ভর্ৎসনা, যারা তাঁদের অনুসরণ দাবী করে এবং নিজেদেরকে তাঁদের মতাবলম্বী বলে প্রকাশ করে, অথচ আমলে তাঁদের বিপরীত।

যাঁরা ফকীহগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং যাঁদের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী, তাঁরা হলেন পাঁচ জন– ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী (রহঃ)। তাঁদের প্রত্যেকেই এবাদত, সংসারত্যাগ, আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রে পারদর্শিতা, মানব কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ফেকাহ্ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা– এই পঞ্চ গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই পঞ্চ গুণের মধ্য থেকে বর্তমান যুগের ফেকাহবিদগণ মাত্র একটি গুণে তাঁদের অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন মাসআলার শাখাগত বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জন ও তা নিয়ে নিমগ্ন থেকেছেন। অবশিষ্ট চারটি গুণ কেবল আখেরাতেরই যোগ্য। আর এই একটি গুণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যে হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্যে ঝুঁকে পড়েছে এবং এই একটিমাত্র গুণের কারণে তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের সাথে সামঞ্জস্য দাবী করে। জিজ্ঞাসা করি, কর্মকার কি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেরেশতাগণের অনুরূপ হতে পারে?

এখন আমরা উপরোক্ত ইমামগণের অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে জানা যাবে, চারটি গুণই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম গুণ অর্থাৎ, ফেকাহশাস্ত্রে দক্ষতা– এটা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে এবাদতকারী ছিলেন, একথা এই রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়– তিনি রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করতেন, একভাগ এলেমের জন্যে, দ্বিতীয় ভাগ নামাযের জন্যে এবং তৃতীয় ভাগ নিদ্রার জন্যে। রবী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমযান মাসে ষাট বার কোরআন খতম করতেন এবং তা নামাযেই খতম করতেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য বুয়ায়তী রমযানে প্রতিদিন এক খতম করতেন। হাসান কারাবেসী বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেয়ীর সাথে অনেকবার রাত্রি যাপন করেছি। তিনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। আমি দেখেছি, তিনি নামাযে পঞ্চাশ আয়াতের বেশী পড়তেন না। বেশী পড়লে একশ' আয়াত পড়তেন। রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিজের জন্যে, সকল মুসলমানের জন্যে এবং ঈমানদারদের জন্যে সে রহমতের দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে আযাবের আয়াত পাঠ করার সময় নিজেকে এবং মুসলমানদেরকে সে আযাব থেকে মুক্ত রাখার আবেদন করতেন। এভাবে আশা ও ভয় উভয়ই তাঁর মধ্যে একত্রিত থাকত। এ রেওয়ায়েত থেকে বুঝতে হবে, পঞ্চাশ আয়াতের বেশী না পড়া কোরআনী রহস্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যেরই জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি ষোল বছর যাবত পেট ভরে আহার করি না। কেননা, উদরপূর্তি দেহ ভারী করে, অন্তর কঠোর এবং বুদ্ধিমত্তা হরণ করে। অধিক নিদ্রা আনয়নের কারণে এতে মানুষের এবাদত হ্রাস পায়। এ উক্তিতে তিনি উদরপূর্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বাস্তব প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এবাদতে তিনি কতদূর সচেষ্ট ছিলেন, তা তাঁর উদরপূর্তি বর্জন করা থেকেই বুঝা যায়। বলাবাহুল্য, কম আহার এবাদতের মূল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি কখনও আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম তো দূরের কথা, সত্য কসমও খাইনি। এ উক্তির প্রেক্ষিতে চিন্তা কর, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহর প্রতাপ সম্পর্কে তাঁর কতটুকু জ্ঞান ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকটি বলল ঃ আপনার প্রতি আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রহমত হোক, আপনি জওয়াব দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ চুপ থাকার মধ্যে আমার কল্যাণ, নাকি জওয়াব দেয়ার মধ্যে— একথা না জানা পর্যন্ত আমি জওয়াব দেব না। এখন চিন্তা কর, তিনি জিহ্বার হেফাযত কতটুকু করতেন! অথচ ফেকাহবিদগণের সকল অঙ্গের চেয়ে জিহ্বাই অধিক নিয়ন্ত্রণহীন। এ থেকে আরও বুঝা যায়, তাঁর কথা বলা ও চুপ থাকা সওয়াব অর্জনের উদ্দেশে হত। আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াবীর বর্ণনা করেন ঃ একবার ইমাম শাফেয়ী লণ্ঠনের বাজার থেকে বের হলে আমরা তাঁর পেছনে চললাম। দেখি, এক ব্যক্তি জনৈক আলেমের সাথে বচসা করছে এবং তাকে মন্দ বলছে। ইমাম শাফেয়ী আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ অশ্লীল কথা শোনা থেকে কানকে রক্ষা কর, যেমন জিহ্বাকে বাজে বকাবকি থেকে রক্ষা করে থাক। কেননা, শ্রোতা বক্তার অশ্লীল বাক্য বিনিময়ে শরীক হয়ে থাকে। নির্বোধ ব্যক্তি তার মগজে যে সর্বাধিক খারাপ বিষয় জমিয়ে রাখে, তা তোমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চায়। যদি তার কথা তাকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ, শোনা না হয়, তবে এসব যে শুনবে না সে ভাগ্যবান হবে। পক্ষান্তরে যে বলে, সে হতভাগ্য হয়। তিনি বলেন ঃ জনৈক দার্শনিক অন্যের কাছে পত্র লেখল, তোমাকে আল্লাহ তাআলা এলেম দান করেছেন। এই এলেম পাপাচারের অন্ধকার দ্বারা মলিন করো না। নতুবা যেদিন আলেমরা তাদের এলেমের নূরে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে।

ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখতা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় ঃ

তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি দাবী করে যে, তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ও স্রষ্টার মহব্বত এক সাথে রয়েছে, সে মিথ্যাবাদী। হুমায়দী বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী একবার জনৈক শাসনকর্তার সাথে ইয়ামনে গমন করেন এবং সেখান থেকে দশ হাজার দেরহাম নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে মক্কার বাইরে এক গ্রামে তাঁবু স্থাপন করা হয়। জনগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে থাকে। তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বণ্টন না করা পর্যন্ত সেখানে অনড় হয়ে রইলেন। একদিন তিনি হাম্মাম (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে হাম্মামের মালিককে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিলেন। একবার তাঁর হাত থেকে বেত পড়ে গেলে জনৈক ব্যক্তি তা তুলে দিল। তিনি এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলেন। তাঁর দানশীলতা প্রসিদ্ধ। বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। যুহদ তথা সংসারবিমুখতার মূল হচ্ছে দানশীলতা। কারণ, যেব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত রাখে, সে তা আটকে রাখে এবং আলাদা করে না। ধন-সম্পদ সে-ই আলাদা করবে, যার দৃষ্টিতে সংসার নিকৃষ্ট হবে। যুহদের অর্থ তাই। ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখতা, অধিক খোদাভীতি এবং আখেরাতের কাজে নিজেকে মশগুল রাখার ব্যাপারে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতও সাক্ষ্য দান করে ঃ

একবার সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না তাঁর সামনে অন্তরের কোমলতা সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। লোকেরা সুফিয়ানকে বলল ঃ তিনি মারা গেছেন। সুফিয়ান বললেন ঃ মারা গেলে সমসাময়িক সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েই মারা গেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ বলখী বলেন ঃ একবার আমি ও ওমর ইবনে বানানা একত্রে বসে এবাদতকারী ও সংসারবিমুখদের কথা আলোচনা করেছিলাম। ওমর বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী অপেক্ষা অধিক পরহেযগার ও মিষ্টভাষী কাউকে দেখিনি। একবার আমি ইমাম শাফেয়ী ও হারেস ইবনে লবীদ সাফা পাহাড়ের দিকে গেলাম। হারেস ছিলেন সালেহ মুরারীর শিষ্য। তিনি সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু করলেন। যখন هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ পাঠ করলেন, তখন আমি ইমাম শাফেয়ীকে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখলাম। তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল এবং এবং তিনি কিছুক্ষণ ছটফট করে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ এলাহী, আমি আপনার কাছে মিথ্যুকদের জ্ঞান ও গাফেলদের বিমুখতা থেকে আশ্রয় চাই। এলাহী, আপনার জন্যেই সাধকদের অন্তর বিনম্র এবং ভক্তদের মাথা নত হয়। এলাহী, আপনার বদান্যতা থেকে আমাকে দান করুন এবং আমাকে কৃপার পর্দায় আবৃত্ত করুন। আপন সত্তার কৃপায় আমার ত্রুটি মার্জনা করুন। আবদুল্লাহ বলেন ঃ এর পর আমরা সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। আমি যখন বাগদাদ পৌঁছলাম, তখন ইমাম শাফেয়ী ইরাকে ছিলেন। একদিন আমি নদীর কিনারে বসে অযু করছিলাম। একব্যক্তি আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন বৎস, উত্তমরূপে অযু কর। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। আমি পেছন ফিরে দেখলাম,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পেছনে অনেক লোকজন রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি অযু করে তাদের পেছনে চললাম। বুযুর্গ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমার কোন কাজ আছে কি? আমি বললাম ঃ, হাঁ, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে এলেম দান করেছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, যে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে নিষ্কৃতি পায়। যে দ্বীনের ভয় রাখে, সে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। যে দুনিয়াতে সংসারবিমুখ থাকে সে যখন কেয়ামতে আল্লাহ্ প্রদত্ত সওয়াব দেখবে, তখন তার চোখ ঠাণ্ডা হবে। আরও কিছু বলব? আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিতে পারে। প্রথম, অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং প্রথমে নিজে তা মেনে চলবে। দ্বিতীয়, মন্দ কাজ থেকে অন্যকে নিষেধ করবে এবং প্রথমে নিজে বিরত থাকবে। তৃতীয়, আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমার খেয়াল রাখবে এবং তা অতিক্রম করবে না। আরও কিছু বলব? আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসারবিমুখ হয়ে থাকবে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হবে। সবকিছুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য জানবে, এতে তুমি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পর্যন্ত বলে তিনি চলে গেলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ইনিই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। এ রেওয়ায়েতে তাঁর বেহুঁশ হয়ে যাওয়া এবং উপদেশ দানের কথা চিন্তা কর। এতে তাঁর সংসারবিমুখতা ও প্রবল খোদাভীতি সম্পর্কে জানা যায়। এই ভীতি ও সংসারবিমুখতা আল্লাহ্র মারেফাত ব্যতীত অর্জিত হয় না। আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে তারাই ভয় করে, যারা আলেম তথা জ্ঞানী।

ইমাম শাফেয়ী এই ভয় ও সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা ফেকাহ্ শাস্ত্রের যেহার, লেয়ান, সলম, ইজারা ইত্যাদি থেকে অর্জন করেননি; বরং কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। কেননা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দর্শনে কোরআন হাদীস পরিপূর্ণ। তাঁর দার্শনিক কথাবার্তা থেকে জানা যাবে, তিনি অন্তরের রহস্য ও আখেরাত সম্পর্কে কতদূর ওয়াকিফহাল ছিলেন। একবার রিয়া কি, এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন ঃ রিয়া এক প্রকার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেতনা, যা বৈষয়িক কামনা-বাসনা অন্তরে উপস্থাপিত করেছে। মন মন্দ কাজে উৎসাহী বিধায় আলেমগণ এর প্রতি আগ্রহী হয়েছে। ফলে তাদের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমল করতে গিয়ে আত্মম্ভরিতার আশংকা কর, তখন ভেবে দেখো কার সন্তুষ্টির জন্যে তুমি আমল করছ। তুমি কোন্ সওয়াবের প্রতি আগ্রহ কর এবং কোন্ আযাবকে ভয় কর। তুমি কোন্ নিরাপত্তার জন্যে কৃতজ্ঞ এবং কোন্ বিপদকে স্মরণ কর। এসব বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তোমার আমল তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ গণ্য হবে এবং তুমি আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এ উক্তিতে রিয়ার স্বরূপ ও আত্মম্ভরিতার প্রতিকার লক্ষণীয়। এগুলো অন্তরের জন্য অনিষ্টকর বিষয়সমূহের অন্যতম।

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের নফসকে হেফাযতে না রাখে, তার এলেম উপকারী হয় না। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে, সে এলেমের রহস্য বুঝে। প্রত্যেক ব্যক্তির শত্রু মিত্র অবশ্যই থাকে। অতএব তুমি তাদের সাথেই থাক, যারা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল।

বর্ণিত আছে, আবদুল কাহের ইবনে আবদুল আজীজ একজন সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরহেযগারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ইমাম শাফেয়ীও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সবর, ইমতেহান (পরীক্ষা) ও তমকীন্ (প্রতিষ্ঠা) এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ তমকীন পয়গম্বরগণের মর্তবা। এটা পরীক্ষার পরে অর্জিত হয়। সুতরাং পরীক্ষা হলে সবর হয় এবং সবরের পর তমকীন ও প্রতিষ্ঠা হয়। লক্ষ্য কর, আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা নিয়েছেন এবং পরে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। তদ্রূপ হযরত মূসা ও হযরত আইউব (আঃ)-এর প্রথমে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, এরপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বেলায় তেমনি প্রথমে পরীক্ষা এবং পরে প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব দান করা হয়েছে। অতএব তমকীন তথা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْاَرْضِ

এমনিভাবে আমি ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠা দান করেছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আইউব (আঃ)-এর ভীষণ পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاٰتَيْنَا اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ ـ

"আমি তাঁকে তাঁর পত্নী ও তৎসহ আরও লোকদের দান করেছি। এটা আমার পক্ষ থেকে মেহেরবানী এবং এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ।"

ইমাম শাফেয়ীর এ জওয়াবে প্রতীয়মান হয়, কোরআনের রহস্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের 'মকামাত' সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব বিষয় আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কখন আলেম হয়? তিনি বললেন ঃ মানুষ যখন তার জানা জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে অন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং যে বিষয় অর্জিত হয়নি, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, তখন সে আলেম হয়। সেমতে জালিনূসকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি যে এক রোগের জন্যে অনেকগুলো যৌথ উপাদান সম্বলিত ওষুধ লেখেন এর কারণ কি? জালিনূস বললেন ঃ উদ্দেশ্য একই ওষুধ। এর তীব্র প্রভাব হ্রাস করার জন্য অন্য ওষুধ সাথে দেয়া হয়। কেননা, একক ওষুধ মারাত্মক হয়ে থাকে। এ ধরনের আরও অনেক উক্তি দ্বারা মারেফত জ্ঞানে ইমাম শাফেয়ীর উচ্চ মর্তবা বুঝা যায়।

ইমাম শাফেয়ী ফেকাহ্ শাস্ত্র ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের বাহাস দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করতেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতগুলো এর প্রমাণ।

তিনি বলেন ঃ আমি চাই মানুষ এই শাস্ত্র দ্বারা উপকৃত হোক এবং এর কোন কৃতিত্ব আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত না হোক। এতে জানা গেল, এলেমের অনিষ্ট ও সুখ্যাতি অর্জনের কুফল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়ত করতেন এবং খ্যাতির আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতেন।

তিনি বলেন ঃ আমি কখনও কারও সাথে তার ভ্রান্তি কামনা করে মুনাযারা তথা বিতর্ক করিনি। কারও সাথে আলোচনা করার সময় আমি কামনা করেছি যে, সে তওফীক, সততা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হোক এবং তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতি আল্লাহ তাআলার সমর্থন ও হেফাযত থাকুক। কারও সাথে কথা বলার সময় আমি এ বিষয়ের পরওয়া করিনি যে, সত্য আমার মুখ দিয়ে অথবা তার মুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করুক। সত্য বিষয় কারও সামনে পেশ করার পর যদি সে কবুল করে, তবে আমি তার ভক্ত হয়ে যাই। পক্ষান্তরে সত্য বিষয় নিয়ে কোন ব্যক্তি জোর-জবরদস্তিতে আমার প্রমাণ খণ্ডন করলে সে আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যায়। আমি তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ পরিহার করি। এসব আলামত দ্বারাই জানা যায়, ফেকাহ্ শাস্ত্র ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে বিতর্ক করার পেছনে ইমাম শাফেয়ীর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন।

এখন দেখ, বর্তমান যুগের লোকেরা পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে কিভাবে তার অনুসরণ করেছে! এই এক বিষয়েও তারা বিরোধ করে। এজন্যেই আবু সওর (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ীর মত কোন ব্যক্তি না আমি দেখেছি, না অন্য কেউ দেখেছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে আমি এমন কোন নামায পড়িনি,, যাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্যে দোয়া করিনি। এ রেওয়ায়েতে দোয়াকারীর ইনসাফ এবং যার জন্যে দায়া করা হয় তার মর্তবা লক্ষ্য কর এবং এর সাথে বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা মিলিয়ে দেখ, তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কতটুকু হিংসা-দ্বেষ রয়েছে। তারা পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনুসরণ করে বলে যে দাবী করে, তা ঠিক নয়। ইমাম আহমদকে বেশী দোয়া করতে দেখে তাঁর পুত্র একদিন বললেন ঃ ইমাম শাফেয়ী কে ছিলেন, যার জন্যে আপনি এত বেশী দোয়া করেন? তিনি বললেন ঃ বৎস! ইমাম শাফেয়ী পৃথিবীর জন্যে সূর্যের মত এবং মানুষের জন্যে সুস্বাস্থ্যের মত ছিলেন। এখন বল, এসব বিষয়ে কেউ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে কি?

ইমাম আহমদ আরও বলতেন ঃ যে কেউ দোয়াত স্পর্শ করে, সে ইমাম শাফেয়ীর কাছে ঋণী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (তুলা বিক্রেতা) বলেন ঃ আমি চল্লিশ বছর ধরে যত নামায পড়েছি, তাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্যে দোয়া করেছি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এলেম দান করেছেন এবং তিনি তার মাধ্যমে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর গুণাগুণ হিসাবের বাইরে বিধায় আমরা এতটুকু উল্লেখ করেই শেষ করছি। নসর ইবনে ইবরাহীম মাকদেসী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গুণাবলী সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, বর্ণিত অধিকাংশ বিষয় সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-ও বর্ণিত পাঁচটি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ হে মালেক! এলেম অন্বেষণ করার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ ভাল। বরং যেব্যক্তি (এলেমের জন্যে) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে না, তুমিও তার সঙ্গ ত্যাগ করো না। তিনি দ্বীনের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতেন। এমনকি যখন হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে ওযু করতেন, বিছানায় বসে দাড়িতে চিরুনি করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, অতঃপর গাম্ভীর্যের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের সম্মান করতে চাই। তিনি বলেন ঃ এলেম একটি নূর। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। অধিক রেওয়ায়েত দ্বারা তা অর্জিত হয় না। এলেমের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন একথাই প্রমাণ করে, তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র মহিমার মারেফত অত্যন্ত প্রবল ছিল।

এলেম দ্বারা ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এটা তাঁর এ উক্তি থেকে জানা যায়, দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক করা অর্থহীন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর এ উক্তিও এর প্রমাণ। তিনি বলেন, আমি যখন ইমাম মালেকের কাছে উপস্থিত হই তখন তাঁকে ৪৮টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি ৩২টি প্রশ্নের জওয়াবে বললেন ঃ আমি জানি না। যেব্যক্তির এলেম দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনও এমনভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করতে সম্মত হয় না। এ জন্যেই ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ আলেমদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে বলতে হয়, ইমাম মালেক তাঁদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা। ইমাম মালেকের চেয়ে বেশী আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ হয়নি। বর্ণিত আছে, আবু জাফর মনসুর ইমাম মালেককে জবরদস্তি তালাকের হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর এক ব্যক্তিকে এই প্রকার তালাকের মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি সকলের সামনে বলে দিলেন ঃ যেব্যক্তিকে জবরদস্তিমূলকভাবে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়, তার তালাক হয় না। এতে আবু জাফর তাঁকে বেত্রাঘাত করেন, কিন্তু তিনি হাদীসের বর্ণনা বর্জন করেননি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইমাম মালেক বলেন ঃ যেব্যক্তি কথায় পাকা– মিথ্যা বলে না, তার বুদ্ধি তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে তার বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা দেয় না। সংসারের প্রতি ইমাম মালেকের নির্লিপ্ততা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়–

আমিরুল মুমিনীন মাহদী ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু এ সম্পর্কে আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাতে চাই। আমি রবিয়া ইবনে আবী আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি– মানুষের পরিবার-পরিজনই তার গৃহ।

খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন– না। খলীফা তাঁকে একটি বাড়ী ক্রয় করার জন্যে তিন হাজার দীনার দিলেন। তিনি তা রেখে দিলেন, ব্যয় করলেন না। অতঃপর খলীফা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় ইমাম মালেককে বললেন ঃ আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি আপনার হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে চাই, যেমন হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। ইমাম মালেক জওয়াবে বললেন, মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে পৌছে গেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের কাছে হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ اختلاف امتى رحمة আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ। এখন রইল আপনার সাথে যাওয়ার বিষয়টি। এটাও হতে পারে না। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون যদি মদীনাবাসীরা বুঝে, তবে মদীনা তাদের জন্যে উত্তম। তিনি আরও বলেন–

المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكيد خبث الحديد ـ

"মদীনা তার ময়লা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কর্মকারের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রেত লোহার ময়লা দূর করে দেয়।" আপনার দীনার যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রাখা আছে। ইচ্ছা হলে নিয়ে যান, ইচ্ছা হলে রেখে যান। অর্থাৎ, আপনি আমাকে মদীনা ত্যাগ করাতে চান এই বলে যে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি দীনারকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনার উপর অগ্রাধিকার দেই না। এটা ছিল ইমাম মালেকের সংসারবিমুখতা।

যখন তাঁর এলেম ও শিষ্যদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সব দিক থেকে অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে আসতে থাকে, তখন তিনি সমুদয় অর্থ সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দিতেন। এই দানশীলতা থেকে দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনাসক্তি সম্পর্কে জানা যায়। মানুষের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকা সংসারবিমুখতা নয়; বরং অর্থ সম্পদের প্রতি অন্তরের বেপরওয়া ভাবকেই বলা হয় সংসারবিমুখতা। হযরত সোলায়মান (আঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

ইমাম মালেক দুনিয়াকে হেয় মনে করতেন– একথা ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়। তিনি বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের দরজায় খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চরের এমন উৎকৃষ্ট একটি পাল দেখলাম, যা আমি কোনদিন দেখিনি। আমি তাঁর খেদমতে আরজ করলাম, কি চমৎকার পাল! তিনি বললেন ঃ আবু আবদুল্লাহ! এ পাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপঢৌকন। আমি বললাম ঃ আপনি নিজে সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি রেখে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ করি, যে মাটিতে তাঁর পয়গম্বর (সাঃ) শায়িত আছেন, সে মাটি আমার ঘোড়া পদদলিত করবে? এ রেওয়ায়েতে ইমাম মালেকের দানশীলতা লক্ষণীয়। তিনি সকল ঘোড়া ও খচ্চর একযোগে দান করেছিলেন। এরপর মদীনা তাইয়্যেবার পবিত্র মাটির সম্মানের কথাও চিন্তা কর।

ইমাম মালেক বর্ণিত নিম্নোক্ত কাহিনী দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁর এলেমের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

তিনি বলেন ঃ আমি খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আসা যাওয়া করুন। যাতে আমার ছেলেরা আপনার কাছে মুয়াত্তার হাদীসসমূহ শুনতে পারে। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে উন্নতি দান করুন। এই এলেম আপনাদের নিকট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে বের হয়েছে। আপনারা এর সম্মান করলে সে সম্মানিত হবে। আর যদি আপনারা এর অবমাননা করেন তবে এ এলেম লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। মানুষ এলেমের কাছে যায়। এলেম মানুষের কাছে যায় না। খলীফা বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলছেন। অতঃপর খলীফা ছেলেদেরকে মসজিদে গিয়ে সকলের সাথে মুয়াত্তা শ্রবণ করার আদেশ দিলেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা কুফী (রহঃ)-ও আবেদ, যাহেদ, আরেফ বিল্লাহ, আল্লাহভীরু এবং এলেমের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী ছিলেন। ইবনে মোবারক বর্ণিত রেওয়ায়েতে তাঁর সাধারণ এবাদতের অবস্থা জানা যায়। তিনি শালীনতাসম্পন্ন ছিলেন এবং অত্যধিক নামায পড়তেন। আসাদ ইবনে আবী সোলায়মান বর্ণনা করেন– তিনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি প্রথমে অর্ধ রাত্রি এবাদত করতেন। এক দিন পথ চলার সময় এক ব্যক্তি তাঁর দিকে ইশারা করল এবং অন্য একজন বলল ঃ ইনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করেন। এই মন্তব্য শুনার পর থেকে ইমাম সাহেব সমস্ত রাত্রি এবাদত শুরু করে দেন এবং বলেন ঃ আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি এ জন্যে যে, আমি তাঁর যতটুকু এবাদত করি না, মানুষ ততটুকু বলাবলি করে।

নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ইমাম সাহেবের সংসারবিমুখতা প্রমাণিত হয়। রবী ইবনে আসেম বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রার নির্দেশক্রমে আমি ইমাম সাহেবকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি ইমাম সাহেবকে বায়তুল মালের প্রশাসক নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইমাম সাহেবকে বিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ দেন এবং তা পালিত হয়। লক্ষণীয়, তিনি বেত্রাঘাত সহ্য করলেন বটে, কিন্তু প্রশাসক হতে স্বীকৃত হলেন না। হাকাম ইবনে হেশাম সকফী বলেন ঃ সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তি ইমাম সাহেব সম্পর্কে আমার কাছে বর্ণনা করল, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ছিলেন। বাদশাহ্ সরকারী ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাইলেন এবং তা গ্রহণ না করলে তাঁকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিলেন এবং আল্লাহর আযাব ভোগ করার দুঃসাহস করলেন না।

ইবনে মোবারকের সামনে আবু হানীফার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা সে ব্যক্তির কথা কি বলছ, যাঁর সামনে দুনিয়া পেশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে শুজা ইমাম সাহেবের জনৈক শিষ্যের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, একবার ইমাম সাহেবকে কেউ বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুর আপনাকে দশ হাজার দেরহাম দিতে আদেশ করেছেন। ইমাম সাহেব সম্মত হলেন। যেদিন এই দেরহাম আসার কথা ছিল, সেদিন ইমাম সাহেব ফজরের নামায পড়ে মুখ ঢেকে নিলেন এবং কারও সাথে কোন কথা বললেন না। খলীফার দূত হাসান ইবনে কাহ্তাবা যখন সে অর্থ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল, তখনও তিনি কিছুই বললেন না। উপস্থিত এক ব্যক্তি দূতকে জানাল, তিনি আমাদের সাথেও কম কথাই বলেন; অর্থাৎ কথা না বলাই তাঁর অভ্যাস। আপনি এই অর্থ এই থলের মধ্যে ভরে গৃহের কোণে রেখে দিন (তাই করা হল)। অতঃপর দীর্ঘ দিন পরে ইমাম সাহেব যখন তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ওসিয়ত করেন, তখন পুত্রকে বললেন ঃ আমার মৃত্যু হলে দাফনের পর এ থলেটি হাসান ইবনে কাহ্তাবার কাছে নিয়ে যাবে এবং বলবে ঃ এটা আপনার আমানত, যা আপনি আবু হানীফার কাছে সোপর্দ করেছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র ওসিয়ত অনুযায়ী থলেটি পৌঁছে দিলে হাসান ইবনে কাহ্তাবা বললেন ঃ আপনার পিতার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। তিনি ধর্ম-কর্মের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন।

বর্ণিত আছে, ইমাম সাহেবকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ যদি আমি সত্যবাদী হই, তবে তো বাস্তবিকই এ পদের যোগ্য নই। পক্ষান্তরে যদি মিথ্যাবাদী হই তবে মিথ্যাবাদী কখনও বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্যে উপযুক্ত হতে পারে না।

ইমাম সাহেব যে আখেরাত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং আরেফ বিল্লাহ ছিলেন, তা এ থেকে জানা যায় যে, তিনি আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করতেন এবং সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। সেমতে ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ আমি অবগত হয়েছি, তোমাদের এই নো'মান ইবনে সাবেত কুফী আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত ভয় করেন। শুরাইক নখয়ী বলেন ঃ ইমাম আযম খুব চুপচাপ থাকতেন, চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মানুষের সাথে কম কথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলতেন। এসব বিষয় উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি এলমে বাতেন ও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল থাকতেন। কারণ, যে চুপচাপ থাকা ও সংসারবিমুখতা প্রাপ্ত হয়, সে জ্ঞানে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এ হচ্ছে ইমামত্রয়ের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুফিয়ান সওরীর অবস্থা এই যে, তাঁদের অনুসারী পূর্বোক্ত ইমামত্রয়ের অনুসারীদের তুলনায় কম, কিন্তু তাঁরা পরহেযগারী ও সংসারবিমুখতায় অধিক প্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁদের উভয়ের কর্ম ও উক্তিতে পরিপূর্ণ। তাই এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই।

এখন তুমি ইমামত্রয়ের সীরাত সম্পর্কে চিন্তা কর, এসব অবস্থা, কর্ম ও উক্তি কিসের ফল। তাঁরা যে সংসারবিমুখ ছিলেন এবং খাঁটিভাবে খোদাপ্রেমিক ছিলেন, এটা কি ফেকাহ্র শাখাগত মাসআলা তথা সলম, ইজারা, যেহার, ঈলা ও লেয়ান জানার ফল হতে পারে, না অন্য শাস্ত্র দ্বারা অর্জিত, যা ফেকাহ্ অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? আরও চিন্তা কর, যারা নিজেদেরকে তাঁদের অনুসারী বলে দাবী করে, তারা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে জ্ঞান উত্তম গণ্য হয় কিন্তু বাস্তবে উত্তম নয়
কোন কোন জ্ঞান মন্দ কেন

প্রশ্ন হতে পারে, যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমনি জানাকে বলা হয় এলেম। এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম সিফাত বা গুণ। এমতাবস্থায় এলেম মন্দ ও নিন্দনীয় কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, এলেম স্বয়ং মন্দ হয় না; বরং তিনটি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিতির কারণে এলেমকে মন্দ বলা হয়। তিনটি কারণ এই : (১) এমন এলেম, যা আলেমের জন্যে অথবা অন্যের জন্যে ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। যেমন, জাদুবিদ্যা ও তেলেসমাতি বিদ্যাকে মন্দ বলা হয়। অথচ জাদুবিদ্যা সত্য। কোরআন এর সাক্ষী। মানুষ জাদুকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজে ব্যবহার করে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর কেউ জাদু করেছিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফলে তিনি অসুস্থ হয় পড়েছিলেন। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) এসে সংবাদ দেন এবং একটি কূপের ভেতরে পাথরের নীচ থেকে সে জাদু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

জাদু এক প্রকার জ্ঞান, যা পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও তারকা উদয়ের মধ্যে গণনামত বিষয়সমূহ জানার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথমে পদার্থ দ্বারা সে ব্যক্তির একটি পুত্তলিকা তৈরী করা হয়, যার উপর জাদু করতে হবে। এরপর তারকা উদয়ের একটি বিশেষ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা হয়। যখন সেই সময় আসে তখন পুত্তলিকার উপর কতিপয় কুফরী কলেমা ও শরীয়ত বিরোধী অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে এগুলোর মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এসব তদবীরের ফলে আল্লাহ্র নিয়মানুযায়ী জাদুকৃত ব্যক্তির মধ্যে অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জ্ঞান হিসাবে এসব বিষয় জানা মন্দ নয়। কিন্তু মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া এবং অনিষ্টের ওসিলা হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর যোগ্যতা এসবের মধ্যে নেই বিধায় এ বিদ্যাকে নিন্দনীয় বলা হয়। যদি কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কোন ওলীকে হত্যা করতে মনস্থ করে এবং ওলী তার ভয়ে কোন সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করেন, তবে জানা সত্ত্বেও ওলীর ঠিকানা অত্যাচারীকে বলা উচিত নয়। এস্থলে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অথচ জিজ্ঞাসার জওয়াবে তার ঠিকানা বলা সত্য অবস্থা প্রকাশ করা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পরিণতি ক্ষতিকর বিধায় এটা মন্দ।

(২) যে এলেম প্রায়শঃ আলেমের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে থাকে– যেমন জ্যোতির্বিদ্যা। এটা সত্তার দিক দিয়ে মন্দ নয়। কেননা, এটা হিসাব সংক্রান্ত বিষয়। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ; وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ - অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের গতি হিসাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আরও বলা হয়েছে–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

অর্থাৎ, আমি চন্দ্রকে কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশেষে সে খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় সরু হয়ে যায়।

অথবা জ্যোতির্বিদ্যার সারমর্ম হচ্ছে কারণ দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা। এটা চিকিৎসকের নাড়ি দেখে ভাবী রোগের কথা বলে দেয়ার মতই। মোট কথা, জ্যোতির্বিদ্যা জানার মানে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নির্ধারিত নিয়মকে জানা। কিন্তু শরীয়ত একে মন্দ বলে আখ্যা দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তকদীরের আলোচনা হয় তখন নীরব হয়ে যাও। যখন জ্যোতির্বিদ্যার কথা বলা হয় তখন নীরব থাক এবং যখন আমার সাহাবীগণের প্রসঙ্গ উঠে তখন নীরব থাক। তিনি আরও বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয়ে ভয় করি– (ক) শাসকদের জুলুম করা, (খ) জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী হওয়া এবং (গ) তকদীর অস্বীকার করা।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জ্যোতির্বিদ্যা এ পরিমাণে অর্জন কর যাতে স্থলে ও পানিতে পথ প্রাপ্ত হতে পার। এতটুকু অর্জন করেই ক্ষান্ত হও।

তিন কারণে জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ অধিকাংশ মানুষের জন্যে এটা ক্ষতিকর। অর্থাৎ, যখন মনে একথা উদয় হয় যে, তারকার গতিবিধির দরুনই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হতে থাকে যে, তারকারাজিই প্রভাব বিস্তারকারী এবং সেগুলোই উপাস্য। সেগুলো উর্ধ্বাকাশে বিরাজমান থাকে বিধায় মনে সেগুলোর সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আন্তরিক মনোযোগ সেগুলোর দিকে নিবদ্ধ থাকে। কল্যাণের আশা এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষাপ্রাপ্তি তারকারাজির সাথেই সম্পৃক্ত বলে ধারণা হতে থাকে। এতে করে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ মন থেকে মুছে যায়। কেননা, দুর্বল বিশ্বাসীদের দৃষ্টি উপায় পর্যন্তই সীমিত থাকে। পাকা আলেম ব্যক্তি অবশ্যই জানেন, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সকলেই আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে মাত্র। দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তি সূর্যের কিরণ সূর্যোদয়ের কারণে দেখে। উদাহরণতঃ যদি পিপীলিকাকে বুদ্ধিমান ধরে নেয়া হয় এবং সে কাগজের উপর থেকে লক্ষ্য করে যে, কলমের কালি দ্বারা কাগজ কাল হয়ে যাচ্ছে, তবে সে এটাই বিশ্বাস করবে যে, লেখা কলমেরই কাজ। তার দৃষ্টি কলম থেকে আঙ্গুলের দিকে, আঙ্গুল থেকে হাতের দিকে, হাত থেকে ইচ্ছার দিকে, ইচ্ছা থেকে ইচ্ছাকারী লেখকের দিকে এবং লেখক থেকে তার শক্তি ও হাত সৃষ্টিকারীর দিকে উন্নতি করবে না। মোট কথা, মানুষের দৃষ্টি প্রায়ই নিকটের ও নিম্নের কারণসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ থেকে সকল কারণের মূল কারণের দিকে উন্নতি করা থেকে বিরত থাকে। তাই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণ, জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়াবলী নিছক অনুমানভিত্তিক। তাই এর মাধ্যমে কোন কিছু বলা মূর্খতার উপর ভিত্তি করে বলারই নামান্তর। এমতাবস্থায় এটা মূর্খতা হিসাবে মন্দ- বিদ্যা হিসাবে নয়। কেননা, এটা ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর মোজেযা, যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিদের কোন কথা ঘটনাচক্রেই সত্য হয়ে থাকে। কেননা, জ্যোতির্বিদ মাঝে মাঝে কোন কারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে থাকে। সেই কারণের পর অনেকগুলো শর্তের অনুপস্থিতির দরুন ঘটনা সংঘটিত হয় না। এ সব শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। সুতরাং যদি ঘটনাচক্রে আল্লাহ্ তাআলা অবশিষ্ট শর্তগুলোও উপস্থিত করে দেন, তখন জ্যোতির্বিদের কথা সত্য হয়ে যায়। অন্যথায় তার কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এটা এমন যেন কেউ দেখল, পাহাড়ের উপর থেকে মেঘমালা উঠে উঠে একত্রিত হচ্ছে এবং চলাফেরা করছে। এতে সে অনুমান করে বলে দিল, আজ বৃষ্টি হবে। অথচ প্রায়ই এমন মেঘমালার পরেও রৌদ্র উঠে পড়ে এবং মেঘ কেটে যায়। কখনও বৃষ্টি হলেও কেবল মেঘমালাই বৃষ্টিপাতের জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত অন্যান্য কারণগুলোর সমাবেশ না ঘটে।

অনুরূপভাবে মাঝির অনুমান করা যে, নৌকা সহীহ্ সালামত থাকবে। মাঝি বাতাসের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে এবং এর উপর ভরসা করেই একথা বলে। অথচ বাতাসের দিক পরিবর্তনের আরও গোপন কারণ রয়েছে। সেগুলো মাঝি জানে না। ফলে কখনও তার অনুমান সত্য এবং কখনও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। এ জন্যেই দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তিকেও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ, এই বিদ্যার দ্বারা কোন উপকারই হয় না। কেননা, এতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামানো হয়। মানুষের মূল্যবান জীবন অনুপকারী কাজে বিনষ্ট করা যে খুবই ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির চার পাশে অনেক লোককে জমায়েত দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকটি কে? লোকেরা বলল ঃ সে একজন বড় পণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কি বিষয়ে পণ্ডিত? উত্তর হল, কাব্যে ও আরবদের বংশ জ্ঞানে। তিনি বললেন ঃ এ বিদ্যা উপকারী নয়; বরং এটা এমন মূর্খতা যা ক্ষতিকরও বটে। তিনি আরও বললেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

انما العلم اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة.

অর্থাৎ, বিদ্যা তিনটি কোরআনের অকাট্য আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং কোরআন ও সুন্নতে বর্ণিত ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক জ্ঞান।

এতে প্রমাণিত হয়, জ্যোতির্বিদ্যার মত শাস্ত্রে মাথা ঘামানো বিপদাশংকায় পতিত হওয়া এবং মূর্খতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। কারণ, তকদীরে যা আছে তা হবেই। তা থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব। চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ নয়। এর প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ এর প্রমাণ দেখা যায়।

বিদ্যা যে কিছু লোকের জন্যে নিশ্চিত ক্ষতিকর, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, পাখীর গোশত দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে ক্ষতিকর। বরং কোন কোন লোকের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকাই উপকারী হয়ে থাকে। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে তার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ করলে চিকিৎসক স্ত্রীর নাড়ি পরীক্ষা করে বলল ঃ এখন সন্তান লাভের জন্যে চিকিৎসা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা নাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, সে চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা যাবে। একথা শুনে স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সে তার ধন-সম্পদ বন্টন ও ওসিয়ত করে পানাহার পরিহার করল এবং মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হল না। তার স্বামী চিকিৎসককে এ কথা জানালে চিকিৎসক বলল ঃ আমি জানতাম, সে মরবে না। এখন তার সাথে সহবাস কর। তার গর্ভে তোমার সন্তান হবে। স্বামী জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে বললেন? চিকিৎসক বললেন, অধিক মোটা হওয়ার কারণে মহিলার গর্ভাশয়ের মুখে চর্বির পরত পড়ে যাচ্ছিল। এটাই ছিল গর্ভ ধারণের অন্তরায়। আমি মনে করলাম, মৃত্যু ভয় ছাড়া সে ক্ষীণাঙ্গিনী হবে না। তাই তার মনে মৃত্যুর ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এখন তার গর্ভধারণের অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। এ গল্প থেকে জানা যায়, কতক বিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার মধ্যে বিপদাশংকা থাকে। এ থেকেই এ হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়– نعوذ بالله من علم لا ينفع –অনুপকারী বিদ্যা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতএব শরীয়ত যেসব জ্ঞানের নিন্দা করেছে, সেগুলো সম্পর্কে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিজ্ঞেস করো না এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সুন্নতের অনুসরণ করো। এ অনুসরণেই নিরাপত্তা নিহিত এবং ঘাঁটাঘাঁটিতে বিপদ লুক্কায়িত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان من العلم جهلا وان من القول عيا

–নিশ্চয় কোন কোন এলেম মূর্খতা এবং কোন কোন কথা হয়রানির কারণ।

বলাবাহুল্য, এলেম মূর্খতা হয় না; কিন্তু ক্ষতিসাধনে তার প্রভাব মূর্খতার অনুরূপ হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ সামান্য তওফীক অনেক এলেম অপেক্ষা উত্তম। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ বৃক্ষ অনেক, কিন্তু সবগুলো উপকারী নয়।

শব্দ পরিবর্তিত এলেম

প্রকাশ থাকে যে, মন্দ এলেম শরীয়তগত এলেমের সাথে মিশে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষ উৎকৃষ্ট নামসমূহ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে ভিন্ন অর্থে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এসব নাম যে উদ্দেশে ব্যবহার করতেন, মানুষ সেসব নাম বিকৃত করে অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এরূপ শব্দ পাঁচটি– ফেকাহ্, এলেম, তওহীদ, তায্কীর ও হেকমত। এগুলো উৎকৃষ্ট শব্দ। এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বীনের স্তম্ভ হতেন। কিন্তু এখন এগুলো মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এজন্যই এখন এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গের নিন্দা করা হলে তা আশ্চর্য ঠেকে। কেননা, প্রথমে এগুলো দ্বারা উত্তম ব্যক্তিবর্গ বিশেষিত হতেন।

প্রথম শব্দ ফেকাহ্কে আজকাল বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে– পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থাৎ, ফেকাহ্ হচ্ছে আশ্চর্য ধরনের শাখাগত বিষয় ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানা, এ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এ সম্পর্কিত উক্তিসমূহ মুখস্থ করা। যেব্যক্তি এ সম্পর্কে খুব চিন্তা-ভাবনা করে এবং অধিক মশগুল থাকে, তাকে বড় ফেকাহ্বিদ বলা হয়। অথচ পূর্ববর্তী যুগে ফেকাহ্ শব্দের এ অর্থ ছিল না; বরং তখন অর্থ ছিল আখেরাতের পথ এবং নফসের সূক্ষ্ম বিপদাপদ ও অনিষ্টকর আমলসমূহ জানা, ঘৃণিত দুনিয়া সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত হওয়া, আখেরাতের আনন্দ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং অন্তরে ভয়-ভীতি আচ্ছন্ন থাকা। এর প্রমাণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি—

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ -

"যাতে দ্বীন সম্পর্কে বোধশক্তি অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করে।"

অতএব, যে ফেকাহ্ দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হয়, সেটিই আমাদের বর্ণিত ফেকাহ্। তালাক, গোলাম মুক্ত করার মাসআলা এবং লেয়ান, সলম ও ইজারার শাখাগত বিষয়াদি নয়। কারণ, এগুলো দ্বারা মোটেই সতর্ক করা হয় না। বরং কেউ সদা সর্বদা এসব বিষয়ে মশগুল থাকলে তার অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا -

"তারা তাদের অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে না।" অর্থাৎ তারা ঈমানের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করে না। ফতোয়া হৃদয়ঙ্গম না করা উদ্দেশ্য নয়। মনে হয় ফেকাহ্ ও ফাহম সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। পূর্বে ও বর্তমানে এগুলো সে অর্থে ব্যবহৃত হত, যা আমরা লিখেছি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

"নিশ্চয় তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমাদের ভয় বেশী। এটা এজন্যে যে, তারা বুঝে না।"

এ আয়াতে কাফেররা যে আল্লাহকে কম ভয় করে এবং মানুষকে বেশী ভয় করে সে বিষয়কেই ফেকাহ্‌র অভাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখন চিন্তা কর, এটা শাখাগত ফতোয়া মনে না রাখার ফল, না আমরা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলো না থাকার ফল? রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলেছিলেন ঃ তোমরা বিজ্ঞ, দার্শনিক ও ফকীহ্। অথচ তারা শাখাগত ফতোয়া অবগত ছিল না।

মা'দ ইবনে ইবরাহীম যুহরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে অধিক ফকীহ্ কে? তিনি বললেন ঃ যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ্ তাআলাকে অধিক ভয় করে। তিনি যেন ফেকাহর ফলাফল বলে দিয়েছেন। খোদাভীতি বাতেনী এলেমের ফল- ফতোয়া ও মামলা-মোকদ্দমার ফল নয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ ফকীহ্ কে, আমি কি তোমাদেরকে তা বলব না? লোকেরা আরজ ক'রল ঃ জি হাঁ বলুন। তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ফকীহ্ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাঁর আযাব থেকে নির্ভীক করে না এবং অন্য কিছুর আশায় কোরআন বর্জন করে না।

একবার আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন ঃ

لان اقعد مع قوم تذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشمس احب الى من ان اعتق اربع رقاب -

যারা ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে বসা আমার কাছে চারটি গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) ইয়াযীদ রাকাশী ও যিয়াদ নিমেরীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "পূর্বে যিকিরের মজলিস তোমাদের এসব মজলিসের মত ছিল না। তোমাদের একজন কিসসা বলে, ওয়াজ করে, মানুষের সামনে খোতবা পাঠ করে এবং একের পর এক হাদীস বর্ণনা করে। আর আমরা বসে ঈমানের আলোচনা করতাম, কোরআন বুঝতাম, দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতাম এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত বর্ণনা করতাম।" এ রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) কোরআন বুঝা ও নেয়ামত বর্ণনাকে 'তাফাক্কুহ্' তথা দ্বীনের জ্ঞান বলেছেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- মানুষ পূর্ণ ফকীহ্ হয় না যে পর্যন্ত আল্লাহর ব্যাপারে অপরকে নিজের প্রতি নাখোশ না করে এবং কোরআনের বহু অর্থে বিশ্বাস না করে। এ রেওয়ায়েতটি আবু দারদার উপর মওকুফও বর্ণিত আছে। তাতে আরও আছে, এরপর সে নিজের নফসের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং তার প্রতি সর্বাধিক নাখোশ থাকবে।

ফারকাদ সনজী (রহঃ) কোন বিশেষ বিষয় হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলেন। জওয়াব শুনে ফারকাদ বললেন, ফেকাহবিদরা আপনার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। হাসান বসরী বললেন ঃ হে ফারকাদ! তুমি কি ফেকাহবিদ স্বচক্ষে কোথাও দেখেছ? ফকীহ সে ব্যক্তি, যে সংসারের প্রতি বিমুখ, পরকালের প্রতি উৎসাহী, দ্বীনের ব্যাপারে বুদ্ধিমান, বিরতিহীনভাবে পরওয়ারদেগারের এবাদতকারী, পরহেযগার, মুসলমানদের বিমুখতা থেকে আত্মরক্ষাকারী, তাদের ধন-সম্পদের প্রতি বিমুখ এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এখানে হযরত হাসান বসরী এতগুলো বিষয় উল্লেখ করলেন, কিন্তু একথা বললেন না যে, ফকীহ ফেকাহ শাস্ত্রের শাখাগত ফতোয়ারও হাফেয হবে। আমরা একথা বলি না যে, ফেকাহ শব্দটি বাহ্যিক বিধানাবলীর ফতোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং আমরা বলি, ব্যাপক অর্থে ফতোয়ার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হত। তবে অধিকাংশ মনীষী ফেকাহ শব্দটি আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অর্থেই ব্যবহার করতেন। এখন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় মানুষ ধোঁকায় পড়েছে। তারা কেবল ফতোয়ার বিধানাবলীতেই মশগুল হয়ে পড়েছে এবং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা এ পছন্দের উপর মনের দিক থেকে একটি ভরসা পেয়েছে। কেননা, আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র সূক্ষ্ম বিধায় তা পালন করা কঠিন। তার মাধ্যমে সরকারী পদ, জাঁকজমক ও অর্থকড়ি লাভ করা দুরূহ। তাই শয়তান এই বাহ্যিক ফেকাহ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার খুব সুযোগ পেয়েছে। যে ফেকাহ্ শরীয়তের একটি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র ছিল, শয়তান তা বিশেষ ফতোয়া শাস্ত্রের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়, এলেম শব্দটি পূর্বে আল্লাহর মারেফত, তাঁর আয়াতসমূহের অবগতি এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর ক্রিয়াকর্ম চেনার অর্থে ব্যবহৃত হত। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ مات تسعة اعشار العلم এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি এলেমকে মারেফত বলেছেন এবং নিজেই তফসীর করেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র এলেম উদ্দেশ্য।

মানুষ এ শব্দটিও বিশেষ অর্থে ধরে নিয়েছে। তারা প্রচার করে দিয়েছে, যেব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাথে ফেকাহ্র মাসআলা মাসায়েল নিয়ে খুব বিতর্ক করে এবং এতে ব্যাপৃত থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই আলেম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তার মাথায়ই শোভা পায়। পক্ষান্তরে যে বিতর্কে পারদর্শী নয়, অথবা তাতে পিছিয়ে থাকে, মানুষ তাকে দুর্বল মনে করে এবং আলেমদের মধ্যে গণ্য করে না। বস্তুতঃ এলেমের এ অর্থ পূর্বে ছিল না। এটা তাদেরই কারসাজি। এলেম ও আলেমের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সেসব আলেমের বিশেষণ, যাঁরা আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর বিধিবিধান, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এখন আলেম তাদেরকে বলা হয়, যারা শরীয়তের এলেম তো রাখেই না, কেবল বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে ঝগড়া-কলহ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। এতেই তারা অদ্বিতীয় আলেমগণের মধ্যে পরিগণিত হয়, যদিও তফসীর, হাদীস ইত্যাদি কিছুই জানে না। এ বিষয়ই অনেক শিক্ষার্থীর জন্যে মারাত্মক অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় শব্দ তওহীদের অর্থ এবং কালাম শাস্ত্র ও বিতর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া, প্রতিপক্ষের বিরোধপূর্ণ কথাবার্তা আয়ত্ত করা, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তৈরী করা, অধিক আপত্তি বের করা এবং প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করা। ফলে এ ধরনের অনেক নতুন দল নিজেদের উপাধি সাব্যস্ত করছে 'আহলে আদল ও তওহীদ' এবং কালামশাস্ত্রীদের নাম রেখেছে তওহীদের আলেম। অথচ এ শাস্ত্রের যেসব বিষয়বস্তু উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই প্রথম যুগে ছিল না; বরং তখন যারা বিতর্ক ও কলহের সূত্রপাত করত, তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হত। সে যুগের লোকেরা কোরআন পাকে বর্ণিত হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রমাণই হৃদয়ঙ্গম করত এবং তখন কোরআনের শিক্ষাই ছিল পূর্ণ শিক্ষা। তাদের মতে পরকালীন বিষয়কে তওহীদ বলা হত। এটা কালামশাস্ত্রীরা বুঝে না, বুঝলেও আমলে আনেন না। পরকাল বিষয়ের ব্যাখ্যা এই যে, উপায় ও কারণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে ভাল মন্দ সকল কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করা যাবে না। এটা তওহীদের একটি প্রধান মূলনীতি। এরই ফল হচ্ছে তওয়াক্কুল, যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এ তওহীদেরই এক ফল ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তাঁর সহচরগণ বললেন ঃ আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি বললেন ঃ চিকিৎসকই আমাকে অসুস্থ করেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তাঁর সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিকিৎসক আপনার রোগ সম্পর্কে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক বলেছেন- اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ আমি যা চাই, তাই করি।

তওহীদ এমন একটি উৎকৃষ্ট রত্ন, যার দু'টি আবরণ রয়েছে এবং আর দুটির একটি অপরটি অপেক্ষা রত্ন থেকে দূরবর্তী। লোকেরা তওহীদ শব্দটিকে বিশেষ আবরণের অর্থে এবং সেই বিশেষ শাস্ত্রের অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যদ্দ্বারা আবরণের হেফাযত হয়। তারা আসল রত্ন বাদ দিয়েছে। তওহীদের প্রথম আবরণ হচ্ছে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। এ তওহীদ খৃস্টানদের প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদের বিপরীত। কিন্তু এ তওহীদ কখনও মোনাফেকের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়; যার অন্তর বাইরের বিপরীত। তওহীদের দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে মুখে যে কলেমা উচ্চারণ করে, অন্তরে তার বিষয়বস্তুর বিপরীত বিশ্বাস না থাকা; বরং অন্তরে তা সত্য বলে প্রত্যয় থাকা। এটা সর্বসাধারণের তওহীদ। কালামশাস্ত্রীরা এ তওতীদকেই বেদআত থেকে রক্ষা করে। আর আসল রত্ন তওহীদ হচ্ছে উপায় ও কারণাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা এবং বিশেষভাবে তাঁরই এবাদত করা, অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত না করা। যারা নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, তারা এ তওহীদের বাইরে অবস্থান করে। কেননা, যেব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে তার খেয়াল খুশীকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়। আল্লাহ বলেন ঃ اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

"তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যে তার খেয়াল খুশীকে উপাস্য করে নিয়েছে?"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের খেয়াল খুশী হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য উপাস্য, যার উপাসনা পৃথিবীতে করা হয়। আসলেও চিন্তা করলে বুঝা যায়, মূর্তিপূজারীরা প্রকৃতপক্ষে মূর্তির পূজা করে না; বরং মনের খেয়াল খুশীর পূজা করে। কারণ, তাদের মন বাপদাদার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। তারা সেই আকর্ষণের অনুসরণ করে।

মানুষের প্রতি রাগ করাও এ তওহীদের পরিপন্থী। কেননা, যেব্যক্তি ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করবে, সে অন্যের প্রতি কিরূপে রাগ করতে পারে? মোট কথা, পূর্বে এ স্তরকে তওহীদ বলা হত। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। মানুষ একে কিভাবে পাল্টে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিয়েছে এবং ব্যক্তিক আবরণটি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে! তারা এ আবরণকেই প্রশংসা ও গর্বের বস্তু সাব্যস্ত করেছে। অথচ এটা প্রশংসার মূল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে কেবলামুখী হয়ে বলে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا ـ

"আমি একাগ্রতা সহকারে আমার মুখ সেই সত্তার দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"

এখন যদি তার অন্তর বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে না থাকে, তবে এর অর্থ এই হবে যে, সে প্রত্যহ দিনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলার সাথে মিথ্যা বলে। কেননা, মুখের অর্থ যদি বাহ্যিক মুখ হয় তবে সেটা তো সব দিক থেকে ফিরিয়ে কাবার দিকে রাখা হয়েছে। কা'বা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দিক নয় যে, কেউ কা'বার দিকে মুখ করলে আল্লাহ তা'আলার দিকে মুখ করা হবে। আর যদি মুখের অর্থ হয় অন্তরের ধ্যান, যা এবাদতের উদ্দেশ্য, তবে যেখানে অন্তর পার্থিব প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত, অর্থসম্পদ ও জাঁকজমক সঞ্চয়ের কৌশল আবিষ্কারে মগ্ন এবং সম্পূর্ণরূপে সেদিকেই নিবিষ্ট, সেখানে একথা কেমন করে সত্য হবে যে, আমি আমার মুখ সেই আল্লাহর দিকে করলাম, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? এ বাক্যটি আসল তওহীদের স্বরূপ স্থাপন করে। বাস্তবে সে-ই তওহীদপন্থী, যে সত্যিকার এক ছাড়া অন্য কাউকে দেখে না এবং অন্তর অন্য দিকে ফেরায় না। এ তওহীদ হচ্ছে এ আদেশ পালন করা ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

"বল, আল্লাহ। এরপর তাদেরকে তাদের বৃথা কথনে খেলাধুলা করতে দাও।"

এখানে মুখে বলা অর্থ নয়। কেননা, মুখ অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করে, যা কখনও সত্য কখনও মিথ্যা হয়। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার স্থান হচ্ছে অন্তর, যা তওহীদের উৎস।

চতুর্থ শব্দ যিকির ও তাযকীর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেন ঃ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

যিকিরের মজলিসের প্রশংসায় অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। উদাহরণতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন–

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال مجالس الذكر -

যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর, তখন বিচরণ কর, (অর্থাৎ, সংগ্রহ করে বেড়াও)। জিজ্ঞেস করা হল ঃ জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন ঃ যিকিরের মজলিস।

ان الله وملائكة سياحين فى الهواء سوى ملائكة الخلق اذا راوا مجالس الذكر ينادى بعضهم بعضا الا هلموا الى بغيتكم فياتونهم ويحفون بهم ويستمعون الا فاذكروا الله وكروا بانفسكم -

"মখলুকের ফেরেশতা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার কতক ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছে, তারা শূন্যে বিচরণ করে। তারা যখন যিকিরের মজলিস দেখে তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ চল, তোমাদের অভীষ্ট বিষয় এখানে রয়েছে। অতঃপর তারা যিকিরওয়ালাদের কাছে এসে তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং যিকির শুনে। সাবধান, আল্লাহর যিকির কর এবং নফ্সকে উপদেশ দাও।"

লোকেরা এ যিকির পরিবর্তন করে এমন সব বিষয়ের নাম যিকির রেখে দিয়েছে যা আজকালকার ওয়ায়েযরা সব সময় বর্ণনা করে। অর্থাৎ, কিসসা, কবিতা ইত্যাদির বর্ণনা। অথচ কিসসা বেদআত। পূর্ববর্তী মনীষীগণ কিসসা কথকের কাছে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে কিসসা ছিল না– হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ছিল। ফলে ফেতনা দেখা দেয় এবং কিসসা কথকরা বহিষ্কৃত হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে বললেন ঃ কিসসা কথকই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমাকে মসজিদ থেকে বের করেছে। সে না আসলে আমি বের হতাম না। যমরা বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সওরীকে বললাম ঃ আমরা কিসসা কথকের কাছে যাব? তিনি বললেন ঃ বেদআতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও। ইবনে আওন বলেন ঃ আমি ইবনে সিরীনের কাছে গিয়ে আরজ করলাম ঃ আজ তেমন ভাল কাজ হয়নি। আমীর কিসসা কথকদের কিসসা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমীর উত্তম তওফীক প্রাপ্ত হয়েছেন।

আ'মাশ (রহঃ) বসরার জামে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি ওয়ায করছে এবং বলছে ঃ আ'মাশ আমার কাছে রেওয়ায়েত করেছেন। একথা শুনে আ'মাশ বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং বগলের লোম উপড়াতে লাগলেন। ওয়ায়েয বলল ঃ মিয়া, তোমার লজ্জা করে না। আ'মাশ বললেন ঃ আমি তো সুন্নত কাজ করছি। এতে শরমের কি আছে? বরং তুমি মিথ্য বলছ যে, আ'মাশ তোমার কাছে রেওয়ায়েত করেছে। শুন, আমিই আ'মাশ। আমি তোমার কাছে কিছুই রেওয়ায়েত করিনি। আহমদ বলেন ঃ কিসসা কথক ও ভিক্ষুক সর্বাধিক মিথ্যুক। হযরত আলী (রাঃ) বসরার জামে মসজিদ থেকে কিসসা কথককে বের করে দেন এবং হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা শুনলেন– তাঁকে বের করেননি। কারণ, তিনি আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, নফসের দোষ ও বিপজ্জনক আমল সম্পর্কে হুশিয়ার করতেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি আল্লাহ্র নেয়ামত ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বান্দার অক্ষমতার কথা বলতেন এবং দুনিয়ার নিকৃষ্টতা, দোষ, ক্ষণস্থায়িত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরকালের পথে বিপদাপদের অবস্থা বর্ণনা করতেন। এটাই শরীয়তসম্মত উৎকৃষ্ট যিকির। এর প্রতিই আবু যর (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

"যিকিরের মজলিসে উপস্থিতি হাজার রাকআত (নফল নামায) পড়ার চেয়ে উত্তম। এলেমের মজলিসে যাওয়া হাজার রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করার চেয়ে এবং হাজার জানাযার পশ্চাতে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, কোরআন তেলাওয়াতের চেয়েও কি? তিনি বললেন ঃ কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতা এটি এলেম বলেই।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আতা (রঃ) বলেন ঃ যিকিরের একটি মজলিস ক্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়।

এখন মিষ্ট ও মসলাযুক্ত কথার উদগাতারা তাদের বাজে কথাবার্তার নাম দিয়েছে তাযকীর। অথচ তারা উৎকৃষ্ট যিকিরের পথ ভুলে কোরআন বহির্ভূত ও অতিরঞ্জিত কিসসা কাহিনীতে ব্যাপৃত। একান্ত সত্য হলেও কতক কিস্সা শোনা উপকারী এবং কতক শোনা অপকারী হয়ে থাকে। যেব্যক্তি এটা অবলম্বন করে, তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা এবং উপকারী অপকারী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ হয়ে যায়। এ কারণেই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ কারণেই ইমাম আহমদ বলেন ঃ সত্য অবস্থা বর্ণনাকারীর বড় প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যদি সে কিসসা কোন নবীর হয়, ধর্ম সম্পর্কিত হয় এবং কথকও সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কিস্সা শুনতে কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্ণনাকারীর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যেসব কিসসায় এমন ত্রুটি ও অসতর্কতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়, সেগুলো বর্ণনা করবে না এবং এমন বিরল ত্রুটি-বিচ্যুতিও বর্ণনা করবে না, যার পেছনে ত্রুটিকারী অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, যার ফলে সে ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য হয়ে গেছে। কিসসা কথক এ দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকলে তার কিসসা কথনে দোষ নেই। এসব শর্তসহ উৎকৃষ্ট কিসসা তাই হবে, যা কোরআন মজীদ ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন লোক আনুগত্য ও এবাদতে উৎসাহ যোগায় এমন গল্প রচনা করে নেয়া দুরস্ত মনে করে। তারা বলে ঃ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা। কিন্তু এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা। কেননা, সত্য ঘটনার অভাব নেই যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সত্ত্বেও ওয়াযে নতুন বিষয় আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। ছন্দ মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা মকরূহ ও বানোয়াট গণ্য হয়েছে। সেমতে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ছেলে ওমর প্রয়োজনবশতঃ তাঁর কাছে আসেন। তিনি ওমরকে ছন্দপূর্ণ কাব্যে নিজের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে শুনে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তোমাকে মন্দ মনে করি। তওবা না করা পর্যন্ত আমি তোমার প্রয়োজনের কথা শুনব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার মুখে তিনটি ছন্দপূর্ণ বাক্য শুনে বললেন ঃ হে ইবনে রাওয়াহা! নিজেকে ছন্দের বাঁধন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে দূরে রাখ। এ থেকে জানা যায়, যে ছন্দ দু'বাক্যের অধিক হয়, তা নিষিদ্ধ ছিল। জনৈক ব্যক্তি ভ্রূণহত্যায় হত্যার বিনিময় সম্পর্কে বলেছিল ঃ

كيف ندى من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل -

"যে খায়নি, পান করেনি, চিৎকার করেনি, তার রক্তপণ আমরা কিরূপে দেব? এরূপ বিষয় তো মাফ হয়ে যায়।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে বললেন ঃ বেদুঈন ব্যক্তির ছন্দের অনুরূপ ছন্দ রচনা কর।

ওয়াযের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কবিতা বলা খারাপ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ -

"পথভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। দেখ না, তারা প্রতি উপত্যকায় মাথা কুটে ফেরে?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ

আমি পয়গম্বরকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়।

যেসব কবিতা বলা ওয়ায়েযদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের মধ্যে এশকের জ্বালা, মাশুকের সৌন্দর্য, মিলনের আনন্দ ও বিরহের যন্ত্রণা বর্ণিত হয়। অথচ ওয়াযের মজলিস সর্বসাধারণ দ্বারাই পূর্ণ থাকে, যাদের অভ্যন্তর কামভাবে পরিপূর্ণ এবং অন্তর সুন্দর বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট। এমতাবস্থায় এসব কবিতা তাদের মনের সুপ্ত বিষয়কে উস্কানি দেয়। ফলে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তারা চিৎকার ও হাহুতাশ করে। মোট কথা, অধিকাংশ অথবা সব কবিতার পরিণতিই এক ধরনের অনিষ্টকর বিষয় হয়ে থাকে। তবে যেসব কবিতায় উপদেশ ও প্রজ্ঞা রয়েছে, কেবল সেগুলোই দলীল হিসাবে উল্লেখ করা এবং অন্য কোন প্রকার কবিতা ব্যবহার না করা উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ان من الشعر لحكمة নিশ্চয় কোন কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।

যদি মজলিসে বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিবর্গ সমবেত থাকে এবং জানা থাকে যে, তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত, তবে তাদের জন্যে সে কবিতা ক্ষতিকর নয়, যা বাহ্যতঃ মানুষের উদ্দেশে রচনা করা হয়েছে। কেননা, শ্রোতা যা শুনে তা সে ছাঁচেই গড়ে নেয়, যা তার অন্তরে প্রবল থাকে। 'সেমা' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ কারণেই হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) ছয় থেকে দশ জন লোকের মধ্যে ওয়ায করতেন। এর বেশী হলে কিছুই বলতেন না। তাঁর মজলিসে কখনও পূর্ণ বিশ জন লোক হয়নি। একবার ইবনে সালেমের ঘরের দরজায় কিছু লোক সমবেত হলে এক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ)-কে বলল ঃ আপনি বয়ান করুন। এখানে আপনার বন্ধুবর্গ উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এরা আমার বন্ধু নয়। এরা মজলিসের লোক। আমার বন্ধু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কতক সূফী দু'প্রকার কালাম গড়েছেন– একে তো তারা খোদায়ী এশ্‌ক ও মিলনের ব্যাপারে লম্বা চওড়া দাবী, যার পর বাহ্যিক আমলের কোন প্রয়োজন থাকেনি। এমনকি কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এক হয়ে যাওয়ার দাবীও করতে থাকে এবং বলে ঃ পর্দা সরে গেছে, দীদার হচ্ছে এবং সামনাসামনি সম্বোধন অর্জিত হচ্ছে। তারা আরও বলে ঃ আমাদের প্রতি এই আদেশ হয়েছে এবং আমরা এই বলেছি। এ ব্যাপারে তারা হুসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজের অনুরূপ হওয়ার দাবী করে, যাকে এমনি ধরনের কয়েকটি কথা বলার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তারা 'আনাল হক' উক্তি এবং হযরত বায়েযীদ বোস্তামীর উক্তিকে সনদ হিসাবে পেশ করে। অর্থাৎ, বায়েযীদ বোস্তামী থেকেও 'সোবহানী, সোবহানী বলার কথা বর্ণিত আছে।

এ ধরনের বাক্যের দ্বারা সর্বসাধারণের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এমন কি, কোন কোন কৃষক তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এমনি ধরনের দাবী করতে শুরু করে। কেননা, এ বাক্য অন্তরের কাছে খুব ভাল মনে হয়। এতে বাহ্যিক আমল করতে হয় না। মকাম ও হাল অর্জনের জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মশুদ্ধিও করতে হয় না। কাজেই নির্বোধেরা এরূপ দাবী করবে না কেন এবং পাগলামি ও বাজে কথা বকবে না কেন? কেউ তাদের এ সব বিষয় মানতে অস্বীকার করলে তারা বলে ঃ এ অস্বীকারের কারণ হচ্ছে এলেম ও বিতর্ক। এলেম একটি পর্দা এবং বিতর্ক নফসের আমল। আমরা যা অর্জন করেছি তা নূরের কাশফের মাধ্যমে কেবল বাতেন দ্বারা জানা যায়। মোট কথা, এমনি ধরনের বিষয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সর্বসাধারণের ক্ষতি এত বেড়ে গেছে যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ এ ধরনের কিছু কথা বলে, তবে তাকে মেরে ফেলা দশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখার তুলনায় ভাল হয়।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী থেকে বর্ণিত উক্তি সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমতঃ এর বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ এরূপ কথা তাঁর মুখে শুনে থাকে, তবে সম্ভবতঃ আল্লাহ্র উক্তিকেই বর্ণনার আকারে তিনি মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। যেমন বলতেন ঃ

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِىْ ـ

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব আমার এবাদত কর।" (সূরা তোয়াহা)

এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, যিনি এ আয়াত পাঠ করছেন তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন।

দ্বিতীয় প্রকার কালাম যা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এটি বাহ্যতঃ ভাল কিন্তু অর্থ ভয়াবহ। এতে কোন প্রকার উপকার হয় না। এসব কালাম স্বয়ং বক্তারই হৃদয়ঙ্গম হয় না; বরং পাগলামি ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার কারণে বলে দেয়। এ পাগলামির কারণ, যে কথা তার কানে পড়ে, তার অর্থ কমই স্মরণ রাখে। অধিকাংশ এরূপই।

অথবা বক্তা নিজে বুঝে কিন্তু অপরকে সে কালাম বুঝাতে পারে না। কিংবা মনের ভাব প্রকাশ করার মত বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় না। কারণ, বিদ্যাবুদ্ধি কম। এ ধরনের কালাম দ্বারা অন্তর পেরেশান এবং বুদ্ধি চিন্তাকে হয়রান করা ছাড়া কোন উপকার হয় না। হাঁ, এমন অর্থ বুঝে নেয়া যেতে পারে, যা উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি এসব কালামের অর্থ নিজের বাসনা অনুযায়ী বুঝবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যার অর্থ তারা বুঝে না, সে হাদীস সেই সম্প্রদায়ের জন্যে একটি আপদ হবে। তিনি আরও বলেন ঃ এমন কথা বল, যা তারা বুঝে। যা বুঝে না তা বলো না। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হোক? এ উক্তিটি এমন কালাম সম্পর্কে, যার বক্তা নিজে তা বুঝে বটে কিন্তু শ্রোতারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এরূপ কালাম বলা জায়েয হবে না। এ থেকে জানা যায়, যে কালাম স্বয়ং বক্তাই বুঝে না, তা বলা কেমন করে দুরস্ত হবে?

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যারা যোগ্য নয়, তাদেরকে জ্ঞানের কথা শুনিয়ো না। শুনালে জ্ঞানের কথার প্রতি তোমার বাড়াবাড়ি হবে। পক্ষান্তরে যারা যোগ্য, তাদের থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রেখো না। রাখলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। কোমলপ্রাণ চিকিৎসকের মত হয়ে যাও। সে যেখানে রোগ দেখে সেখানেই ওষুধ লাগিয়ে দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি অযোগ্যদের মধ্যে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে, সে মূর্খ। আর যে যোগ্য থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রাখে সে জালেম। জ্ঞানের কথা একটি প্রাপ্য হক। কিছু লোক এর অধিকারী। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দেয়া উচিত।

কেউ কেউ শরীয়তের বাহ্যিক শব্দ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা গ্রহণ করে না এবং তা থেকে এমন বাতেনী বিষয় উদ্ভাবন করে, যার কোন উপকারিতা নেই। যেমন, বাতেনী ফের্কার লোকেরা কোরআন মজীদের ভিন্ন অর্থ বের করে। এটাও হারাম এবং এর ক্ষতি অনেক বেশী। কেননা, শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন দলীল ও প্রয়োজন ছাড়াই যখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়া হবে, তখন শব্দের উপর কোন আস্থা থাকবে না। ফলে আল্লাহ ও রসূলের কালামের উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সকলের বাতেন এক রকম হয় না। তাতে পরস্পর বিরোধিতার আশংকা থাকে। ফলে শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ঢেলে নেয়া যেতে পারে। বাতেনী ফের্কা এভাবে গোটা শরীয়তকে বরবাদ করেছে। এ ফের্কার লোকেরা কোরআনের যে ব্যাখ্যা করে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ اذهب الى فرعون انه طغى (হে মূসা!) ফেরআউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এতে অন্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরআউনের অর্থও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তর। অন্তরই প্রত্যেক মানুষের অবাধ্য। وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' -বাতেনী ফের্কা বলে ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যেসব বস্তুর উপর ভরসা করা হয়, সেগুলো নিক্ষেপ করা উচিত। হাদীসে আছে تسحروا فان فى السحور بركة "তোমরা সেহরী খাও। সেহরীর মধ্যে বরকত আছে।" বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এর অর্থ সেহরীর সময় এস্তেগফার করা। তারা এমনিভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা আদ্যোপান্ত কোরআনকে বাহ্যিক অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য আলেমগণ কর্তৃক বর্ণিত তফসীর থেকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক যে বাতিল তা নিশ্চিত। যেমন ফেরআউনের অর্থ অন্তর নেয়া। কেননা, ফেরআউন একজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি ছিল। সে কাফের ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন- একথা আমাদের জানা। এমনিভাবে সেহ্র শব্দ দ্বারা এস্তেগফার অর্থ নেয়াও বাতিল। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন আহার করতেন এবং বলতেন ঃ

هلموا الى الغذاء المبارك অর্থাৎ, তোমরা বরকতের খাদ্যের দিকে এসো। মোট কথা, এসব ব্যাখ্যা হারাম ও পথভ্রষ্টতা। এগুলোর মধ্যে কোনটিই সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত নেই। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)- যিনি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান ও উপদেশদানে পাগলপারা ছিলেন, তাঁর পক্ষ থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত নেই। হাদীসে আছে-

من فسر القران برأيه فليتبوا مقعده من النار .

যেব্যক্তি নিজের মতানুযায়ী কোরআনের তফসীর করে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।

এ হাদীসে উপরোক্তরূপ বাক্যই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমে একটি উদ্দেশ্য ও মত ঠিক করে নিয়ে সেই মত প্রমাণ করার জন্যে কোরআনকে সাক্ষী করা এবং কোরআনের শব্দ থেকে আপন মতলব উদ্ধার করা। অথচ এর পেছনে কোন আভিধানিক সমর্থন নেই।

এ হাদীস থেকে একথা বুঝা ঠিক হবে না যে, চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে কোরআনের তফসীর করা যাবে না। কেননা, অনেক আয়াত সম্পর্কে সাহাবী ও তফসীরকারগণের পক্ষ থেকে পাঁচ ছয় ও সাত ধরনের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উক্তি বর্ণিত আছে। এটা জানা কথা, সবগুলো উক্তিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত নয়। কেননা, এসব উক্তি মাঝে মাঝে পরস্পর বিরোধীও হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো দীর্ঘ গবেষণাপ্রসূতই হয়ে থাকবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

اللهم فقهه فى الدين হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন।

যারা উপরোক্তরূপ অপব্যাখ্যা বৈধ মনে করে এবং বলে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তারা সে ব্যক্তিরই অনুরূপ, যে শরীয়তে উল্লেখ নেই এমন একটি বাস্তব সত্য বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীস গড়ে নেয় অথবা যে কোন বিষয় সে সত্য মনে করে, সে সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে একটি হাদীস তৈরী করে নেয়। এটা জুলুম ও গোমরাহী এবং নিম্নবর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত–

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار .

'যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।' বরং শব্দের অপব্যাখ্যা করা আরও খারাপ। কেননা, এর কারণে শব্দের উপর থেকেই আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং কোরআন বুঝার পথ রুদ্ধ হয়। এখন তুমি জেনে থাকবে যে, শয়তান মানুষের ইচ্ছাকে কিরূপ সৎ জ্ঞান থেকে সরিয়ে মন্দ জ্ঞানের দিকে নিয়ে গেছে। এগুলো মন্দ আলেমদের দ্বারা মর্মার্থ পরিবর্তনের বদৌলত প্রসার লাভ করেছে। যদি তুমি কেবল প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে তাদের অনুসরণ কর এবং প্রথম যুগে যেসকল ব্যাখ্যা সুবিদিত ছিল, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য না কর, তবে তোমার অবস্থাও শোচনীয় হবে।

পঞ্চম শব্দ হেকমত। আজকাল হাকীম শব্দটি চিকিৎসক, কবি ও জ্যোতির্বিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বরং যেব্যক্তি ফুটপাতে বসে নানা রূপ ভেল্কী দেখায়,, তাকেও হাকীম বলা হয়। অথচ হেকমতের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا .

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন। যে হেকমত প্রাপ্ত হয় সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ মানুষ যদি হেকমতের একটি বাক্য শেখে, তবে এটা তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এখন চিন্তা কর, পূর্বে হেকমত কি ছিল আর এখন কার্যতঃ কোন্ অর্থে চলে গেছে। অন্যান্য শব্দ এর উপরই অনুমান করে নাও এবং মন্দ আলেমদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, দ্বীনের উপর তাদের অনিষ্ট শয়তানদের তুলনায় অনেক বেশী। শয়তান তাদের মাধ্যমেই মানুষের মন থেকে দ্বীনকে বহিষ্কার করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ঘৃণ্যতম মানুষ কে? তিনি জওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ ইলাহী! ক্ষমা কর। অতঃপর বার বার জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি বললেন ঃ ঘৃণ্যতম মানুষ হচ্ছে মন্দ আলেম। সুতরাং ভাল ও মন্দ এলেম জানা হয়ে গেছে এবং আরও জানা হয়েছে যে, কি কারণে ভাল এলেম মন্দ এলেমের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। এখন তুমি ইচ্ছা করলে নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসরণ করবে। আর যদি প্রতারণার কূপে নিক্ষিপ্ত হতে চাও, তবে পরবর্তীদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে। যেসব জ্ঞান পূর্ববর্তীদের পছন্দনীয় ছিল সেগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে এলেমের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার অধিকাংশই বেদআত বা নতুন আবিষ্কার। রসূলে করীম (সাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ

بدآ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدآ فطوبى للغرباء فقيل ومن الغرباء . قال الذين يصلحون ما افسده الناس من سنتى والذين يحيون ما اماتوه من سنتى .

"ইসলামের সূচনা হয়েছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই ফিরে যাবে যেমন সূচনা হয়েছিল। অতএব সুসংবাদ একাকীদের জন্যে। প্রশ্ন করা হল ঃ একাকী কারা? তিনি বললেন ঃ যারা আমার সেই সুন্নতের সংস্কার করে, যা মানুষের হাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং যারা সেই সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে, যাকে মানুষ মেরে ফেলে।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা আজ যে বিষয় আঁকড়ে রয়েছ, তারা সে বিষয় আঁকড়ে থাকবে। অন্য হাদীসে আছে– তারা অনেক লোকের মধ্যে কম সংখ্যক সৎলোক। তাদের বন্ধুর তুলনায় শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। কেউ এ জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করলে মানুষ তার শত্রু হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন আলেমের অনেক বন্ধু দেখ, তখন বুঝে নাও সে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে কেবল সত্য কথা বললে অধিকাংশ মানুষ তার শত্রু হত।

কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে প্রশংসনীয় জ্ঞান

প্রকাশ থাকে যে, এদিক দিয়ে জ্ঞান তিন প্রকার– এক, যে জ্ঞানের অল্পও মন্দ, অধিকও মন্দ। দুই, যে জ্ঞানের অল্পও ভাল, অধিকও ভাল এবং তিন, যে জ্ঞান যতটুকুতে কাজ চলে, ততটুকু হলে তো ভাল, কিন্তু চাহিদার অতিরিক্ত হলে প্রশংসনীয় নয়। এ প্রকার তিনটি দেহের অবস্থার মতই। দেহের কোন কোন অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন সুস্থতা ও সৌন্দর্য। কতক অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, মন্দ বিবেচিত হয়; যেমন কুশ্রী হওয়া ও কুচরিত্র হওয়া। কতক অবস্থা এমন যে, তা মাঝামাঝি পরিমাণে হলে ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন অর্থ ব্যয়। এ ব্যাপারে অপব্যয় প্রশংসনীয় নয়, যদিও তা ব্যয়। প্রথম প্রকার জ্ঞান যার অল্প ও অধিক সবটাই মন্দ তা হল এমন জ্ঞান যাতে ইহকাল ও পরকালের কোন উপকারিতা নেই, অথবা যার ক্ষতি উপকারিতার তুলনায় বেশী। যেমন জাদু, তেলেসমাত ও জ্যোতির্বিদ্যা। এগুলোর কোনটির মধ্যেই ফায়দা নেই। মানুষের উৎকৃষ্ট সম্পদ জীবন এতে ব্যয় করা অনর্থক বরবাদ করার নামান্তর। আবার কোন জ্ঞানের দ্বারা পার্থিব কোন প্রয়োজন কখনো মিটে গেলেও এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হয়ে থাকে; বরং অপকারের তুলনায় এ উপকার তুচ্ছ মনে হয়। আর যে জ্ঞান আদ্যোপান্ত ভাল, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফত, তাঁর গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অভ্যাস ও নীতি জানা এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার রহস্য অবগত হওয়া। এ জ্ঞানই মূল উদ্দেশ্য এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের উপায়। এ জ্ঞানার্জনের যত বেশী চেষ্টাই করা হোক তা প্রয়োজনের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুলনায় কমই হবে। কেননা, এটা অতল দরিয়া। সকল পর্যটক তার তীরেই ঘুরাফেরা করে। এর অভ্যন্তরে নবী, ওলী ও দৃঢ় চিত্ত আলেম ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে এলেম শিক্ষা করা ও আখেরাত শাস্ত্রজ্ঞগণের জীবনী অধ্যয়ন করা কল্যাণকর হয়ে থাকে, এটা শুরুতে দরকার। পরিণামে এ শিক্ষায় যে বিষয় দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সাধনা, অধ্যবসায়, অন্তরের পরিশুদ্ধি, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকরণ এবং দুনিয়াতে নবী ওলীদের মিল সৃষ্টিকরণ। যে কেউ এ জ্ঞান লাভের জন্যে এভাবে চেষ্টা করবে, সে তার ভাগ্যে যতটুকু আছে তা পেয়ে যাবে। চেষ্টা পরিমাণে পাবে না। হাঁ, এতে সাধনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। সাধনা ব্যতীত কোন কিছু অর্জিত হয় না। এ ছাড়া হেদায়েতের কোন চাবি নেই।

তৃতীয় শিক্ষা (যা এক বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত ভাল)– সে শিক্ষা, যা আমরা ফরযে কেফায়ার বর্ণনায় লিখে এসেছি। মানুষের উচিত দু'টি বিষয় থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করা। হয় সে নিজের চিন্তা করবে এবং নিজের চিন্তা শেষ হলে অপরের চিন্তা করবে। কিন্তু নিজের সংশোধন করার পূর্বে অপরের সংশোধনে মশগুল হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এখন যদি তুমি নিজের চিন্তা কর, তবে সর্বপ্রথম সে জ্ঞান আহরণে মশগুল হও, যা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তোমার উপর ফরযে আইন। আর বাহ্যিক আমল যেমন নামায, রোযা, পবিত্রতা ইত্যাদিতে মশগুল হও। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান মানুষ বাদ দিয়ে রেখেছে, সেটি হচ্ছে অন্তরের গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে জানতে হবে, কোন্ গুণটি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ। কেননা, কোন মানুষ এমন নেই যার মধ্যে লোভ, লালসা, হিংসা, রিয়া ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলী নেই। এগুলো সবই মারাত্মক গুণ। এগুলোকে এমনিই রেখে কেবল বাহ্যিক আমলে মশগুল থাকা এমন, যেমন কেউ খোস-পাঁচড়া, ফোড়া ইত্যাদি রোগে কেবল ত্বকের উপর প্রলেপ দেয় এবং শিঙ্গা লাগিয়ে ভিতরের বদরক্ত বের করার ব্যাপারে অলসতা করে। যারা নামেই আলেম এবং কাঠমোল্লা, তারা কেবল বাহ্যিক আমল সম্পর্কেই বর্ণনা করে। আর আখেরাতের আলেমগণ বাতেনের সংস্কার ও অনিষ্টের উপকরণ দূর করা ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অধিকাংশ মানুষ কেবল বাহ্যিক আমল করে এবং অন্তর পরিষ্কার করে না। এর কারণ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সহজ এবং অন্তরের আমল কঠিন। এটা এমন, যেমন কেউ তিক্ত ও বিস্বাদ ওষুধ পান করা কঠিন মনে করে কেবল ত্বকের উপর ওষুধের প্রলেপ লাগায়। সে এতেই লিপ্ত থাকে এবং ভিতরে বদ উপকরণ বৃদ্ধি পেয়ে রোগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং তুমি যদি আখেরাত কামনা কর এবং চির ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি প্রত্যাশা কর, তবে বাতেনের রোগ ও তার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ কর। তৃতীয় খন্ডে আমরা এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। সেটা জানার পর তুমি সে উৎকৃষ্ট মকামে অবশ্যই পৌঁছাতে পারবে যা আমরা চতুর্থ খন্ডে বর্ণনা করেছি। কেননা, অন্তর মন্দ বিষয় থেকে মুক্ত হলে তাতে ভাল বিষয়ের জন্য স্থান সংকুলান হয়। ফরযে আইন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ফরযে কেফায়াতে ব্যাপৃত হয়ো না। বিশেষতঃ যখন অন্যেরা তা জানে ও পালন করে। কেননা, যেব্যক্তি অন্যের সম্ভাব্য সংশোধনের আশায় নিজের জীবন বিপন্ন করে, সে নির্বোধ। উদাহরণতঃ কারও কাপড়ের মধ্যে সাপ বিচ্ছু ঢুকে পড়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত, কিন্তু সে অপরের শরীর থেকে মাছি তাড়ানোর জন্যে পাখা খুঁজে ফিরে। এ ব্যক্তির চেয়ে বোকা আর কে হবে? যদি তুমি তোমার জাহের ও বাতেনের গোনাহ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হও এবং এটা তোমার সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়, যা মোটেই অসম্ভব নয়, তবে তখন অবশ্য ফরযে কেফায়ায় মশগুল হতে পার। এতে ধারাবাহিকতা ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থাৎ, প্রথমে কালামে মজীদ, এর পর হাদীস শরীফ, অতঃপর তফসীর এবং কোরআন শিক্ষা অর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে হাদীসের শিক্ষা ও তার শাখা-প্রশাখায় মশগুল হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ফেকাহ শাস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য মাযহাবসমূহ জানতে হবে— মতভেদ নয়। এর পর ফেকাহর নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা জীবনে যতদূর সম্ভব অর্জন করা কর্তব্য। কিন্তু সমগ্র জীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশে ডুবিয়ে রাখা অনুচিত। কেননা, জ্ঞান সীমাহীন এবং বয়স সীমিত।

এসব শাস্ত্র অন্য উদ্দেশ্যের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়, স্বয়ং কাম্য নয়। কাজেই এগুলোতে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া ঠিক নয় যে, আসল উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হয়ে যায়। কাজেই অভিধান শাস্ত্র ততটুকুই শিক্ষা করা উচিত, যদ্দ্বারা আরবী ভাষা বুঝা ও বলা যায়। এমনিভাবে ব্যাকরণ ততটুকু শিক্ষা করা দরকার, যতটুকুর সম্পর্ক কোরআন ও হাদীসের সাথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রয়েছে। শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে- (১) যতটুকুতে কাজ চলে, (২) মাঝারি স্তর এবং (৩) পূর্ণতার স্তর। এখন হাদীস, তফসীর, ফেকাহ ও কালাম শাস্ত্রের এ তিনটি স্তর বলে দেয়া হচ্ছে, যাতে অন্যান্য শাস্ত্রও অনুমান করে নেয়া যায়। তফসীর শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে কোরআনের দ্বিগুণ পুরু একটি কিতাব যেমন, আলী ওয়াহেদী নিশাপুরীর তফসীর ওজীয। মাঝারি স্তর হচ্ছে কোরআনের তিন গুণ পুরু একটি কিতাব। যেমন, নিশাপুরীর অন্য তফসীর ওসীত। পূর্ণতার স্তর আরও বেশী, যার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসের প্রথম স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের বিষয়বস্তু কোন পন্ডিত ব্যক্তির কাছে বুঝে নেয়া। বর্ণনাকারীদের নাম মুখস্থ করা জরুরী নয়। এ কাজ পূর্ববর্তী লোকেরা সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের কিতাবসমূহ বিশ্বাসযোগ্য মনে করাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। মাঝারি স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের সাথে সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ পাঠ করা। পূর্ণতার স্তর হচ্ছে দুর্বল, শক্তিশালী, সহীহ, মুয়াল্লাল ইত্যাদি যত প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে সবগুলো পাঠ করা এবং সনদের অনেক তরীকা, বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত, নাম ও গুণাবলী জানা। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে মুযানীর মুখতাসারের ন্যায় কিতাব পড়ে নেয়া। মাঝারি স্তর হচ্ছে আমার কিতাব ওসীতের সাথে আরও বড় বড় কিতাব পাঠ করা। কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে বর্ণিত আহলে সুন্নতের আকীদাসমূহ জেনে নেয়া। এর মাঝারি স্তর হচ্ছে আমার 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল এতেকাদের' মত একশ' পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। বেদআতীদের সাথে বিতর্ক করার জন্যেই কালামশাস্ত্রের প্রয়োজন। এটা কেবল সর্বসাধারণের স্বার্থেই উপকারী। বেদআতী ব্যক্তি সামান্য বিতর্ক জানলেও তার সাথে কালাম শাস্ত্র কমই উপকারী হয়। কারণ, বিতর্কে নিরুত্তর হয়ে গেলেও সে বেদআত ত্যাগ করবে না। সে নিজেকে অপক্ব মনে করে ধরে নেবে, এর জওয়াব অবশ্যই আছে, তবে আমি দিতে পারিনি।

মন্দ আলেমদের দোষ এই যে, তারা সত্যের নামে বিদ্বেষে বাড়াবাড়ি করে এবং প্রতিপক্ষকে ঘৃণার চোখে দেখে। এর ফল এই দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষও মোকাবিলা করতে উদ্যত হয় এবং বাতিলের পক্ষপাতিত্ব অধিক করে। যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয় তা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। যদি আলেমগণ শুভেচ্ছা ও হিতাকাঙ্ক্ষার পথ ধরে একান্তে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতিপক্ষকে উপদেশ দিত এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করত, তবে সম্ভবতঃ সফলতা অর্জিত হত।

পরবর্তী যমানায় যেসব বিরোধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে ধরনের রচনা, গ্রন্থ ও বিতর্ক আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমন পূর্ববর্তী যমানায় ছিল না। এগুলো থেকে মারাত্মক বিষের ন্যায় বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধিই ফেকাহবিদদেরকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত করেছে। আমার বক্তব্য তেমনি কোন ফেকাহবিদ শুনলে বলবে ঃ যে যা না পারে, সে তার দুশমন হয়ে যায়। এতে তোমার বুঝা উচিত নয় যে, আমি এ শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; বরং আমি এ শাস্ত্রে জীবনের একটি বড় অংশ নিয়োজিত করেছি। রচনা, তথ্যানুসন্ধান, বিতর্ক ও বর্ণনায় প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকেও পেছনে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু এর পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সরল পথ এলহাম করে এ শাস্ত্রের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন আমি এ শাস্ত্র বর্জন করে আত্মচিন্তায় মশগুল হয়েছি। কাজেই আমার উপদেশ তোমার কবুল করা উচিত। কেননা, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ঠিক হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে, ফতোয়া শরীয়তের স্তম্ভ এবং শরীয়তের কারণসমূহ বিরোধ না জেনে জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাই কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা জরুরী। এ যুক্তি শুনে তোমার পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, মাযহাবের কারণসমূহ স্বয়ং মযহাবে উল্লিখিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত সবই অহেতুক ঝগড়া। প্রথম যুগের লোকগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলো জানতেন না। অথচ অন্যদের তুলনায় তাঁরা ফতোয়া শাস্ত্র অনেক বেশীই জানতেন।

অতএব তোমার উচিত জ্বিন শয়তানদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং মানব শয়তানদের ধোঁকা থেকেও বেঁচে থাকা। মানব শয়তানরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত করার কাজে জ্বিন শয়তানদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছে।

সারকথা, তুমি পৃথিবীতে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে একাকী ধরে নাও এবং জান যে, মৃত্যু, আল্লাহর সামনে উপস্থিতি, হিসাব নিকাশ, বেহেশত-দোযখ সম্মুখে রয়েছে। এর পর চিন্তা কর, এই সামনের বস্তুগুলোর মধ্যে কোনটি তোমার জন্যে উপকারী। যেটি উপকারী সেটি অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট সবগুলো বর্জন কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক সূফী কোন একজন পরলোকগত আলেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি যেসব শাস্ত্র দ্বারা বিতর্ক করতেন, সেগুলোর অবস্থা কি? আলেম ব্যক্তি তার প্রসারিত হাতের তালুতে ফুঁ মেরে বললেন ঃ সব ধুলোর ন্যায় উড়ে গেছে। কেবল দু'রাকআত নামায আমার কাজে এসেছে, যা রাতের বেলায় আমি আদায় করতাম। হাদীসে বলা হয়েছে–

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه اوتوا الجدل ثم قرآ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون -

"হেদায়াত লাভ করার পর কোন সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তখন হয়েছে, যখন তারা কলহ ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ তারা কেবল কলহের জন্যেই আপনার এ নাম বর্ণনা করে। তারা তো কলহপ্রিয় সম্প্রদায়।"

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ (যাদের অন্তর বক্র) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে আছে– এরা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক এবং وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ –এদের থেকে বেঁচে থাকুন, যাতে ওরা আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে– আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বুঝিয়েছেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক হবে, যাদের উপর আমলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঝগড়া ও বিতর্কের দরজা খুলে যাবে। এক হাদীসে আছে– তোমরা এমন যমানায় আছ, যাতে আমলের দরজা খোলা আছে। অচিরেই এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যাদের অন্তরে বিবাদ ঢেলে দেয়া হবে। মশহুর এক হাদীসে আছে– ابغض الخلق الى الله تعالى الالد الخصم আল্লাহ তা'আলার কাছে মানুষের মধ্যে অধিক নিন্দনীয় হচ্ছে ঝগড়াটে ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ যে সম্প্রদায় বাকপটুতা প্রাপ্ত হয়, তারা আমল থেকে বঞ্চিত হয়। আলী ইবনে বসীর হিম্মামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা খলীল ইবনে আহমদের মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন ঃ আপনার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান আমি কাউকে পাইনি। এখন আপনার অবস্থা কি? খলীল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ আমি যে কাজে ব্যাপৃত ছিলাম তার অবস্থা তো তুমি জেনেছ? এ কলেমাগুলো ছাড়া কোন কিছু আমার জন্যে উপকারী হয়নি–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তর্কশাস্ত্রে মানুষের মনোযোগী হওয়ার কারণ

প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁরা ছিলেন একাধারে আলেমবিল্লাহ (আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী), তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দানের ব্যাপারে পারদর্শী। এ কারণেই ফেকাহবিদদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন তাঁদের কমই হত। কেবল যেসব ব্যাপারে পরামর্শ ছাড়া উপায় ছিল না, সেগুলোতেই ফেকাহবিদদের প্রয়োজন দেখা দিত। এজন্যই আলেমগণ একনিষ্ঠভাবে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রেই নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁদের অন্য কোন বৃত্তি ছিল না। তাঁরা আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং এ নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন এবং এ দায়িত্ব একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। তাঁরা সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য থেকে এ কথাই জানা যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণীর আলেম যোগ্যতা এবং বিধি-বিধান ও ফতোয়া সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান ছাড়াই শাসন কর্তৃত্বের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে ফেকাহবিদদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং সর্বাবস্থায় তাদেরকে সঙ্গে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তাবেয়ী আলেমগণের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা প্রথম যুগের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত, খাঁটি দ্বীনের অনুসারী এবং পূর্বসূরিদের পদাংক অনুসরণকারী ছিলেন। ফলে শাসকবর্গ তাঁদেরকে ডাকলে তাঁরা পালিয়ে ফিরতেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন। তাই বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের বিভিন্ন পদ দান করার জন্যে শাসকবর্গ আলেমগণকে পীড়াপীড়ি করত। খলীফা, ইমাম ও প্রশাসন সবাই আলেমগণের তোয়াজ করতেন, কিন্তু আলেমগণ তাদের হাতে ধরা দিতেন না। সমসাময়িক লোকেরা যখন আলেমগণের এই সম্মান প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা এলেম হাসিল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করার প্রতি মনোনিবেশ করল, যাতে শাসকবর্গের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। তারা ফতোয়া শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেদেরকে শাসকবর্গের সামনে উপস্থাপন করল। তাদের সাথে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন পদ ও পুরস্কার লাভ করল।

কিছু সংখ্যক তো এর পরেও বঞ্চিত রইল এবং কিছু সংখ্যকের উদ্দেশ্য সফল হল। যারা সফল হল, তারাও চাওয়ার লাঞ্ছনা এবং অনাহূত অবস্থায় দন্ডায়মান হওয়ার অবমাননা থেকে বাঁচতে পারল না। মোট কথা, যে ফেকাহবিদগণ পূর্বে প্রার্থিত ছিল, তারা এখন প্রার্থী হয়ে গেল। পূর্বে যারা শাসকবর্গের হাতে ধরা দিত না এবং সম্মানিত ছিল, এখন তাদের কাছে এসে তারা লাঞ্ছিত হল। কিন্তু এর পরেও যেসব আলেম তওফীকপ্রাপ্ত হলেন, তাঁরা সর্বদাই এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত রইলেন। সে যুগে মানুষের অধিকাংশ মনোযোগ ফতোয়া ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কেননা, পদ ও শাসনক্ষমতা লাভে এরই প্রয়োজন ছিল বেশী। তাদের পরে আকায়েদের রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষের আলোচনা শুনে কিছু সংখ্যক শাসকের মনে কারণসমূহের প্রমাণাদি শুনার আগ্রহ সৃষ্টি হল। জনসাধারণ যখন জানতে পারল, এই শাসকগণ কালাম শাস্ত্রের মোনাযারা ও বিতর্কের প্রতি আগ্রহী, তখন তারা এরই চর্চা শুরু করে দিল। এতে অনেক গ্রন্থ রচিত হল এবং বিতর্কের পদ্ধতি, প্রতিপক্ষের বক্তব্যে আপত্তি উত্থাপনের পন্থা আবিষ্কৃত হল। তারা মনে করল, আল্লাহর দ্বীনের পক্ষ থেকে মন্দ বিষয়সমূহ প্রতিহত করা, সুন্নতের পক্ষ থেকে লড়াই করা এবং বেদআতের মূলোৎপাটন করাই আমাদের লক্ষ্য। যেমন– তাদের পূর্বসূরি ফেকাহবিদগণ বলতেন, তাদের উদ্দেশ্য ফতোয়া উত্তমরূপে জানা এবং মুসলমানদের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের দায়িত্ব নেয়া।

এর কিছুকাল পরে এমন শাসকশ্রেণী আগমন করল, যারা কালাম শাস্ত্রের গবেষণা পছন্দের দৃষ্টিতে দেখল না। কারণ, এতে বিতর্কের দ্বার খুলে যাওয়ায় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমনকি, খুনাখুনি এবং জনপদ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারা ফেকাহ সম্পর্কিত মোনাযারা, বিশেষতঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রহঃ)-এর মাযহাবের উত্তম বিধান জানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। সেমতে জনসাধারণ কালাম শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র বাদ দিয়ে এই ইমামদ্বয়ের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিরোধীয় মাসআলাসমূহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ইমাম মালেক, আহমদ ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর মধ্যেকার মতভেদসমূহের প্রতি তারা তেমন কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেনি। তারা নিজেদের খামখেয়ালীতে একথা বুঝে নেয় যে, তাদের উদ্দেশ্য শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বের করা, দ্বীনের কারণসমূহ সপ্রমাণ করা এবং ফতোয়ার মূলনীতির ভিত্তি স্থাপন করা। এ সম্পর্কে তারা অনেক গ্রন্থ রচনা করে, যাতে নানারকম বিতর্ক লিপিবদ্ধ করা হয়। জনসাধারণ এখন পর্যন্ত এ নীতিই অনুসরণ করে আসছে। জানি না, আমাদের পরবর্তী যমানায় আল্লাহ তা'আলা কি অবধারিত করে রেখেছেন। মোট কথা, মতভেদ ও মোনাযারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এটাই ছিল কারণ। যদি শাসকশ্রেণী এগুলো ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়, তবে আলেমরাও তাদের অনুগামী হবে এবং এ বাহানা পেশ করা থেকে বিরত হবে না যে, যে শাস্ত্রে তারা মশগুল রয়েছে সেটা ধর্মীয় শাস্ত্র এবং আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য ছাড়া তাদের অন্য কিছু কাম্য নয়।

মোনাযারা

জানা উচিত, একশ্রেণীর আলেম কোন কোন সময় মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তাদের মোনাযারা বা বিতর্ক করার উদ্দেশ্য এমন বিষয়ে আলোচনা, যাতে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। কেননা সত্য কাম্য। চিন্তায় একে অন্যের সাহায্য করা এবং অনেক লোকের ঐকমত্য হওয়া নিঃসন্দেহে উপকারী। সাহাবায়ে কেরামও এ উদ্দেশেই পরস্পর পরামর্শ করতেন। উদাহরণতঃ তাঁরা দাদা বিদ্যমান থাকলে পৌত্রদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, মদ্যপানের শাস্তি, ফরায়েযের মাসআলা ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করতেন। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মুহাম্মদ, মালেক, আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ ইমাম থেকে বর্ণিত মতভেদও এ বিষয়ে সহায়ক। আমি তোমাকে এ বিভ্রান্তির অন্তর্নিহিত রহস্য বলে দিচ্ছি, সত্য বিষয়ে একে অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া অবশ্যই ধর্মসিদ্ধ। কিন্তু এর জন্যে কয়েকটি শর্ত ও আলামত রয়েছে।

প্রথম, মোনাযারা যেহেতু ফরযে কেফায়া। কাজেই যেব্যক্তি ফরযে আইন সমাপ্ত করেনি, তার পক্ষে এতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। যার উপর ফরযে আইন রয়েছে, সে যদি ফরযে কেফায়ায় ব্যাপৃত হয় এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলে, তার উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ, তবে সে মিথ্যাবাদী। সে সে ব্যক্তিরই মত, যে নিজে নামায পড়ে না এবং বস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত থেকে বলে ঃ আমার উদ্দেশ্য যারা উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়ে এবং পোশাক পায় না, তাদের সতর আবৃত করা। কেননা, এরূপ হওয়া সম্ভবপর এবং বাস্তবে কখনও এরূপ হয়েও থাকে। যেমন, ফেকাহবিদগণ বলেন, তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর, যদিও কম সংঘটিত হয়। আজ যারা মোনাযারায় ব্যাপৃত থাকে তারা সর্বসম্মতিক্রমে ফরযে আইন বিষয়সমূহ বর্জন করে বসেছে। যদি কারও উপর তাৎক্ষণিকভাবে কোন আমানত আদায় করা ওয়াজেব হয়ে থাকে এবং সে তাতে অবহেলা করার বাহানারূপে নামায পড়তে থাকে, যা বাহ্যতঃ সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ, তবে বলাবাহুল্য, এ নামায দ্বারা সে আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানই হবে। এ থেকে জানা গেল, আনুগত্যের কোন কাজ করাই মানুষের আনুগত্যশীল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না তাতে সময়, শর্ত ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য রাখা হয়।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা অপেক্ষা অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ না দেখা। যদি অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, এরপরও মোনাযারায় ব্যাপৃত হয়, তবে সে নাফরমান হবে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মানুষকে পিপাসায় কাতর হতে দেখে, কেউ যাদের খবর নেয় না। কিন্তু সে তাদেরকে পানি পান করাতে সক্ষম। এমতাবস্থায় সে পানি পান না করিয়ে যদি শিংগা লাগানোর কৌশল শিক্ষা করতে ব্যাপৃত হয় এবং বলে, এটা শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া; শহরে এরূপ কুশলী ব্যক্তি না থাকলে শহরবাসীরা রোগে কষ্ট পাবে। যদি তাকে কেউ বলে, শহরে শিংগা লাগানোর লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তবে সে বলে, এতে এ কাজটি যে ফরযে কেফায়া, তা তো বিলুপ্ত হয় না। মোট কথা, যেব্যক্তি এরূপ করে এবং নেহায়েত জরুরী কাজটি করে না, অর্থাৎ পিপাসার্ত মুসলমানদেরকে পানি পান করায় না, তার অবস্থা এ ব্যক্তির মতই, যে মোনাযারাকে ফরযে কেফায়া মনে করে তাতে ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য যেসব ফরযে কেফায়া কেউ পালন করে না, তাতে তৎপর হয় না। উদাহরণতঃ ফতোয়ার কথাই বলা যাক, এর জন্যে অনেক লোক রয়েছে। প্রত্যেক শহরে কিছু না কিছু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফরযে কেফায়া পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। যেমন অধিকাংশ শহরে মুসলমান চিকিৎসক নেই, যার সাক্ষ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে শরীয়তের আইনে গ্রাহ্য হয়। অথচ ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে কারও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি উৎসাহ নেই।

অনুরূপভাবে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি ফরযে কেফায়া। যারা মোনাযারা করে, তাদের অধিকাংশই মোনাযারার মজলিসে রেশমী পোশাক অথবা রেশমী ফরাশ বিছানো দেখে। অথচ সে এমন বিষয়ে মোনাযারা করে, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যদিও থাকে, তবে তার বর্ণনাকারী থাকে অনেক। এরপরও তারা বলে, তারা ফরযে কেফায়ায় মশগুল হয়ে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য কামনা করে। হযরত আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কখন বর্জিত হবে? তিনি বললেন ঃ "যখন তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেবে, বড়দের মধ্যে নির্লজ্জতা ও ছোটদের মধ্যে রাজত্ব চলে আসবে এবং নীচদের মধ্যে ফেকাহ্ তথা ধর্মীয় জ্ঞান।"

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যে মোনাযারা করবে তার মুজতাহিদ হতে হবে। অর্থাৎ নিজের অভিমত অনুসারে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রঃ) প্রমুখের মযহাবের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ফতোয়া দেবে না। এমনকি, সে যদি সত্য বিষয়টি ইমাম আযমের মযহাব থেকে জানতে পারে, তবে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য বর্জন করবে এবং সত্য যা জানবে তদনুযায়ী ফতোয়া দেবে। সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণ তাই করতেন। যেব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হয়, তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সে তার ইমামের উক্তি বর্ণনা করে দেয়। তার ইমামের মযহাবে কিছু দুর্বলতা জানতে পারলে সে তা বর্জন করে না। এরূপ ব্যক্তির মোনাযারায় ফায়দা নেই।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা এমন বিষয়ে করবে, যা হয়ে গেছে অথবা সত্বরই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এমনি ধরনের ঘটনাবলীতে পরামর্শ করেছেন, যা নতুন সংঘটিত হত অথবা প্রায়ই সংঘটিত হত। যেমন, ফরায়েযের বিষয়সমূহ। কিন্তু আজকাল যারা মোনাযারা করে, তাদেরকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যেসব ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই লিপ্ত হয়, সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে তারা প্রয়াস চালায় না;

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বরং এমন ব্যাপার তালাশ করে, যাতে কোন না কোন দিক দিয়ে বিবাদের অবকাশ থাকে। যেসকল ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে, সেগুলো প্রায়ই ছেড়ে দেয়া হয় এবং বলা হয়, এ বিষয়টি হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অথবা এটা নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার। আশ্চর্যের বিষয়, উদ্দেশ্য তো সত্যানুসন্ধান, অথচ হাদীসের দোহাই দিয়ে বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয় অথবা ছোটখাট বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়! সত্য বিষয়ে তো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে অভীষ্টে পৌঁছে যাওয়াই কাম্য হয়ে থাকে। দীর্ঘ আলোচনা কাম্য নয়।

পঞ্চম শর্ত, মজলিসে এবং আমীর ও শাসকদের সামনে মোনাযারা করা অপেক্ষা নির্জনতায় ও একান্তে মোনাযারা করা উত্তম মনে হতে হবে। কেননা, নির্জনতায় সাহস, চিন্তা-ভাবনা একত্রিত ও পরিষ্কার থাকে এবং সত্য বিষয় দ্রুত অনুধাবন করা যায়। পক্ষান্তরে লোকজনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হয়ে যায়– সত্যপন্থী হোক কিংবা মিথ্যাপন্থী। সকলেই জানে, এখন মোনাযারাকারীরা মজলিস ও জনগণের সমাবেশেই বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে অধিক আগ্রহী। একজন অন্যজনের সাথে বহু দিন থাকে, কিন্তু একান্তে কোন বক্তৃতা দেয় না; কিংবা একজন কিছু জিজ্ঞেস করলে অন্যজন জওয়াব দেয় না। যদি কোন আমীর ব্যক্তি উপস্থিত থাকে অথবা জনসমাগম হয়, তবে বক্তৃতার কোন দিক বাকী রাখে না, যাতে প্রমাণিত হয়, সে একজন জবরদস্ত বক্তা।

ষষ্ঠ শর্ত, সত্য বিষয়ের অন্বেষণে এমন অবস্থা হতে হবে, যেমন কেউ হারানো বস্তু অন্বেষণ করে। হারানো বস্তুটি তার হাত দিয়ে পাওয়া যাক বা অন্যের হাত দিয়ে– তাতে কোন পার্থক্য থাকে না। বিতর্কে নিজেকে প্রতিপক্ষের সাহায্যকারী মনে করতে হবে; বিপরীত ও শত্রুপক্ষ নয়। সে ভ্রান্তি প্রকাশ করে দিলে অথবা সত্য বিষয় বলে দিলে তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। উদাহরণতঃ হারানো বস্তুর অন্বেষণে যদি কেউ এক পথে চলতে থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্য সড়কে যেতে বলে, তবে সে সেই ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধন্যবাদ জানায়। তাকে মন্দ বলে না; বরং তার প্রতি খুশী হয়। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শের অবস্থা তাই ছিল। সেমতে এক মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষণের মধ্যে বাধা দিয়ে তাঁকে সত্য বিষয় অবগত করালে তিনি বললেন ঃ মহিলা ঠিক বলছে এবং পুরুষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(অর্থাৎ, আমি) ভুল করেছি। অন্য এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জওয়াব দিলেন। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, মাসআলাটি এরূপ নয়; বরং এরূপ। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ তোমার কথাই ঠিক। আমি ভুল করেছি। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরও জ্ঞানী রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে সে কথা বলে দিলেন যা থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু মূসা বললেন ঃ যতদিন এ আলেম তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। ঘটনাটি এই ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং মারা গেল। তার কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন ঃ 'সে জান্নাতে থাকবে।' তখন আবু মূসা (রাঃ) কূফার শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রশ্নকারীকে বললেন ঃ আমীরকে পুনরায় জিজ্ঞেস কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার প্রশ্ন বুঝেননি। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস কললেন। আমীর আবারও একই জওয়াব দিলেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন ঃ আমি বলি, যদি সে মারা যায় এবং সত্যে পৌছে থাকে, তবে জান্নাতী হবে। হযরত আবু মূসা বললেন ঃ আপনার কথাই ঠিক। বাস্তবে সত্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ন্যায়সঙ্গত কথাই বলা উচিত। আজকাল এ ধরনের কথা কোন সামান্য ফেকাহবিদের কাছে কেউ বর্ণনা করলেও সে মানবে না; বরং বলবে– এ মাসআলায় সত্যে পৌছার কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এটা সবাই জানে। মোট কথা আজকালকার মোনাযারাকারীদেরকে লক্ষ্য কর, যদি প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ পায়, তবে তাদের মুখমণ্ডল কেমন কাল হয়ে যায়। এরপর গোপনে গোপনে যতদূর সম্ভব, এ সত্য অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যেব্যক্তি তাদেরকে অভিযুক্ত করে, তারা সারা জীবন তার নিন্দা চর্চা করতে থাকে। তার পরও মোনাযারায় নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ বলতে তাদের লজ্জা করে না।

সপ্তম শর্ত, মোনাযারায় শরীক ব্যক্তি যদি এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণের দিকে যায় এবং এক আপত্তির বদলে অন্য আপত্তি পেশ করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোনাযারা এরূপই হত। বিতর্কের নবাবিষ্কৃত সূক্ষ্ম বিষয়াদি তাদের মোনাযারায় অনুপস্থিত ছিল। কেননা, সত্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সর্বদাই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মিথ্যার বিপরীত হয়ে থাকে। আর সত্য বিষয় কবুল করা ওয়াজেব। অথচ মোনাযারার মজলিসে দেখা যায়, সারাক্ষণ একে অপরের কথা খণ্ডনে এবং বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি তার ধারণায় কোন মূল বিধানের একটি কারণ বর্ণনা করলে অন্য ব্যক্তি জওয়াব দেয় ঃ মূল বিষয়ে এ বিধান হওয়ার কারণ এটিই, এর প্রমাণ কি? উত্তরে সে বলে ঃ আমার তো তাই মনে হয়। তুমি যদি অন্য কোন সুস্পষ্ট কারণ জান, তবে বর্ণনা কর। আমিও ভেবে দেখব। এরপর আপত্তিকারী পীড়াপীড়ি করে বলে ঃ কারণ অন্যটি; আমি তা জানি কিন্তু বলব না। কেননা, বলা আমার জন্যে জরুরী নয়। এরপর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে তা বর্ণনা করে না এবং মোনাযারার মজলিসে হট্টগোল হতে থাকে। আপত্তিকারী ব্যক্তি বুঝে না যে, 'আমি জানি কিন্তু বলব না'– তার একথা 'শরীয়ত বিরোধী' মিথ্যার নামান্তর। কেননা, যদি বাস্তবে কারণটি তার অজানা থাকে এবং কেবল প্রতিপক্ষকে অপারগ করে দেয়ার জন্যে জানার দাবী করে, তবে সে ফাসেক, মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র নাফরমান এবং তাঁর ক্রোধের পাত্র। পক্ষান্তরে যদি সে আপন দাবীতে সত্যবাদী হয়, তবুও সে ফাসেক। কারণ, সে একটি জানা শরীয়তগত বিষয় গোপন করে। অথচ তার মুসলমান ভাই তা জেনে চিন্তাভাবনা করার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস করছে। এটা সর্ববাদিসম্মত কথা যে, মানুষ ধর্মের যা কিছু জানে, কারও জিজ্ঞাসার পর তা বলা ও প্রকাশ করা ওয়াজেব। এখন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের বক্তব্য দেখে বিচার করা দরকার, তাদের মধ্যে এ ধরনের বিষয় শুনা গেছে কি? তাদের কেউ কখনও এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণে যেতে নিষেধ করেছেন কি? তারা কি কিয়াস ছেড়ে সাহাবীর উক্তি অবলম্বন করতে এবং হাদীস ছেড়ে আয়াত অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন? তাঁদের সকল মোনাযারা এমন হত যে, তাঁরা অন্তরে যা চিন্তা করেছেন, মুখে হুবহু তা বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা নিয়ে সকলে মিলে চিন্তাভাবনা করেছেন।

অষ্টম শর্ত, মোনাযারা এমন ব্যক্তির সাথে করতে হবে, যার কাছ থেকে উপকার আশা করা যায় এবং যে জ্ঞানের বিষয়ে ব্যাপৃত। আজকাল প্রায়শঃ দেখা যায়, যারা মোনাযারা করে তারা বড় বড় আলেমের সাথে মোনাযারা করতে ভয় পায়। আশংকা এই করা হয় যে, সত্য বিষয় তার মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লে মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা ফাঁস হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পড়বে। ফলে যারা অজ্ঞানী তাদের সাথে মোনাযারা করার উৎসাহ বেশী দেখা যায়, যাতে তাদের সামনে বাতিলকেই সপ্রমাণ করা যায়।

মোনাযারার এই আটটি শর্ত ছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শর্ত রয়েছে, কিন্তু এই আটটি শর্ত দ্বারাই তুমি মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে, সে আল্লাহ্র জন্যে মোনাযারা করে না অন্য কোন কারণে। সারকথা, শয়তান মানুষের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। বাস্তবে শয়তান হল মানুষের সর্ববৃহৎ দুশমন ও ধ্বংসকামী। যেব্যক্তি এই শয়তানের সাথে মোনাযারা করে না এবং অন্য লোকের সাথে এমন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মোনাযারায় প্রবৃত্ত হয়, যাতে ইজতিহাদকারী সত্য বিষয়ে পৌঁছে অথবা সত্য বিষয়ে পৌঁছার সওয়াবে অংশীদার হয়, সে শয়তানের ক্রীড়নক এবং খাঁটি লোকদের জন্যে একটি শিক্ষা।

মোনাযারা থেকে উদ্ভূত বিপদ

প্রকাশ থাকে যে, নিজে প্রবল হওয়া, অপরকে নিশ্চুপ করা, নিজের গুণগরিমা প্রকাশ করা, মানুষের মধ্যে শুদ্ধভাষিতা, বাগ্মিতা ও গর্ব প্রদর্শন করা এবং মানুষের মন নিজের দিকে আকৃষ্ট করা ইত্যাদি হীন উদ্দেশে যে মোনাযারা করা হয়, তা আল্লাহ তাআলার কাছে নিন্দনীয় ও শয়তানের কাছে প্রশংসনীয় বদঅভ্যাসসমূহের উৎস হয়ে থাকে। অহংকার, হিংসা, আত্মম্ভরিতা, লোভ-লালসা, জাঁকজমকপ্রিয়তা ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ অনিষ্টের সম্পর্ক মোনাযারার সাথে এমন, যেমন যেনা, গালি-গালাজ, হত্যা, চুরি ইত্যাদি বাহ্যিক অনিষ্টের সম্পর্ক মদ্যপানের সাথে। কোন ব্যক্তিকে মদ্যপান এবং এসব কুকর্ম করার ক্ষমতা দেয়া হলে যেমন সে মদ্যপানকে সামান্য মনে করে তা করে বসবে, এরপর মাতাল অবস্থায় অবশিষ্ট কুকর্মগুলো করে ফেলবে, তেমনি যার মনে অপরকে নিশ্চুপ করার আগ্রহ, মোনাযারায় জয়ী হওয়ার বাসনা এবং জাঁকজমক ও অহংকারপ্রীতি প্রবল থাকে, তার মনে সকল প্রকার লুকিয়ে থাকে এবং যাবতীয় বদভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হাদীস ও কোরআনের আলোকে আমরা এসব বদভ্যাসের নিন্দা তৃতীয় খন্ডে বর্ণনা করব। এখানে কেবল এমন কতিপয় বদভ্যাস বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলো মোনাযারা থেকে উদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিংসা। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ـ

"হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে হিংসা থেকে মুক্ত হয় না। কারণ, সে কখনও জয়ী হয় এবং কখনও পরাভূত হয়। কখনও তার যুক্তির প্রশংসা করা হয় আবার কখনও প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রশংসিত হয়। যে পর্যন্ত পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও এমন থাকবে, যে জ্ঞান গরিমা ও মোনাযারায় স্বনামখ্যাত অথবা মোনাযারাকারীর ধারণায় তার যুক্তিই অধিক শক্তিশালী, সে পর্যন্ত অবশ্যই সে হিংসা পোষণ করবে, প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ফিরে কেবল মোনাযারাকারীর দিকে আকৃষ্ট হোক এমনটা পছন্দ করবে। সত্য বলতে কি, হিংসা একটি জ্বলন্ত আগুন। যে এতে লিপ্ত হয়, সে দুনিয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে কালাতিপাত করে। আখেরাতের আযাব আরও বেশী ভয়ংকর। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান যেখানেই পাও, অর্জন কর। ফেকাহবিদদের যেসকল উক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে, সেগুলো গ্রহণ করো না। তারা পালের ছাগলের ন্যায় লড়াই করে।

দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে অহংকার করা। এ সম্পর্কে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ "যেব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করেন। আর যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উঁচু করেন।"

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

العظمة ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى واحدا فيهما قصمته ـ

"মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং বড়ত্ব আমার চাদর। যেব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে আমার সমকক্ষতার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেই।"

মোনাযারাকারীরা তাদের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের লোকদের সাথে অহংকার, বড়ত্ব অন্বেষণ এবং আপন যোগ্যতার চেয়ে বড় আসন লাভের বাসনা থেকে মুক্ত থাকে না। এমনকি, সভাপতির আসনের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিকটে অথবা দূরের জায়গায় বসার জন্যে পর্যন্ত লড়াই করে এবং পথ সংকীর্ণ হলে আগে যাওয়ার জন্যে খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। মাঝে মাঝে তাদের কতক অনভিজ্ঞ ও প্রতারক ব্যক্তি বলে থাকে, এলেমের ইযযত রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য। ঈমানদার ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এই বাহানায় তারা বিনয়কে লাঞ্ছনা বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা ও পয়গম্বরগণ বিনয়ের প্রশংসা করেছেন। যে অহংকার আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিন্দনীয়, তারা তাকে ধর্মের সম্মানরূপে আখ্যায়িত করে এবং শব্দ পরিবর্তন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এটা এলেম ও হেকমত শব্দকে পরিবর্তন করে অন্য অর্থ করারই মত।

আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। খুব কম মোনাযারাকারীই এ দোষ থেকে মুক্ত থাকে। অথচ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ "ঈমানদার ব্যক্তি পরশ্রীকাতর হতে পারে না।" এর নিন্দায় অনেক কিছু বর্ণিত আছে। মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন কাউকে দেখে যে, সে প্রতিপক্ষের কথায় মাথা নাড়ে এবং তার কথা ভালরূপে শুনে না, তখন সে উদ্বিগ্ন হয় এবং তার প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে।

আর একটি কুঅভ্যাস হচ্ছে গীবত তথা পরনিন্দা। আল্লাহ তাআলা একে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। মোনাযারাকারী ব্যক্তি এরূপ মাংস ভক্ষণেই অভ্যস্ত হয়ে থাকে। সে সর্বদা প্রতিপক্ষের কথাবার্তা উদ্ধৃত করে তার নিন্দা করে। সে চরম সাবধানী হলে এটা করে যে, প্রতিপক্ষের কথা সত্য সত্য বর্ণনা করে– মিথ্য বলে না, কিন্তু এতেও এমন কথা বর্ণনা করে না, যদ্দ্বারা তার দোষ, হেরে যাওয়া এবং মানহানি ঘটতে পারে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের আলোচনা গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মিথ্যা বলে, তবে সেটা তো পুরোই অপবাদ, যা গীবত থেকেও জঘন্য।

অপর একটি বদভ্যাস হচ্ছে আত্মপ্রশংসা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -

তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে মোত্তাকী সেটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ মন্দ সত্য কোন্টি? তিনি বললেন ঃ আত্মপ্রশংসা করা। যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে শক্তি-সামর্থ্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্বে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে নিজের প্রশংসা নিজেই করে থাকে। বরং মোনাযারার মাঝখানে বলে উঠে– এ ধরনের বিষয় আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। এগুলো আমার নখদর্পণে। আমি হাদীস ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী। সে এমনি ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা কখনও আস্ফালনের ছলে এবং কখনও নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশে বলে থাকে। বলাবাহুল্য, আস্ফালন এবং দর্প প্রদর্শন করা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

ছিদ্রান্বেষণও মোনাযারা থেকে উদ্ভূত একটি কুঅভ্যাস। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوا তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না। মোনাযারাকারী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দোষ অন্বেষণ করে ফিরে। এমনকি, তার শহরে কোন মোনাযারাকারীর আগমনের সংবাদ পেলে সে এমন ব্যক্তির খোঁজ করে, যে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে দিতে পারে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে করে দোষ জেনে নেয় এবং প্রয়োজনে সেগুলো প্রকাশ করে প্রতিপক্ষকে লজ্জা দেয়। এমনকি, তার শৈশবকালীন অবস্থা এবং দৈহিক দোষ যেমন টেকো হওয়া ইত্যাদিও জেনে নেয়। এর পর মোনাযারার সময় তাকে সামান্যও প্রবল হতে দেখলে প্রথমে সম্ভ্রমের খাতিরে ইশারা ইঙ্গিতে সেসব দোষ বর্ণনা করে। অন্যরাও এ বিষয়টি পছন্দ করে এবং স্বয়ং মোনাযারাকারী এক একটি সূক্ষ্ম অস্ত্ররূপে গণ্য করে। পক্ষান্তরে দুর্মুখ হলে প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় সেসব দোষ উল্লেখ করতে দ্বিধা করে না।

অপরের দুঃখে আনন্দিত হওয়া এবং আনন্দে দুঃখ করাও একটি বদ অভ্যাস, যা মোনাযারাকারীর মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ যে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে না, সে ঈমানদারদের চরিত্র থেকে বহু মনযিল দূরে অবস্থান করে। অতএব যেব্যক্তি গুণগরিমা প্রকাশ করে গর্ব করে, তার কাছে অবশ্যই তা ভাল লাগবে, যা তার সমকক্ষ ও গুণগরিমায় অংশীদারদের কাছে খারাপ লাগে। তাদের মধ্যে এমন শত্রুতা হবে, যেমন সতীনদের মধ্যে হয়ে থাকে। এক সতীন দূর থেকে অপর সতীনকে দেখে যেমন ক্ষেপে উঠে এবং মলিন হয়ে যায়, তেমনি মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন অপরকে দেখে, তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা এসে যায়; যেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সামনে ভূত এসে গেছে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে সে মহব্বত ও মুখ কোথায়, যা খাঁটি আলেমগণের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় হয়ে থাকে? যেরূপ ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সুখে দুঃখে শরীক থাকার কথা আলেমগণ থেকে বর্ণিত আছে, তা তাদের মধ্যে কোথায়? এমনকি, শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এখন আমরা জানি না, যাদের মধ্যে এলেম ও শিক্ষা একটি চূড়ান্ত শত্রুতার কারণ হয়ে গেছে, তারা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মযহাব অনুসরণের দাবী করে কিরূপে? এটা কিরূপে সম্ভব, গর্ব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মহব্বত ও সম্প্রীতি কায়েম থাকবে? এটা কখনও হতে পারে না। এ মোনাযারা যে মন্দ, তা জানার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, মোনাযারা তোমার কাছ থেকে মুমিনদের অভ্যাস ছাড়িয়ে নিয়ে মোনাফিকদের অভ্যাসের সাথে তোমাকে জড়িয়ে দেয়।

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে নেফাক তথা কপটতা। এর অনিষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ নয়। যারা মোনাযারা করে, তাদের কপটতাও করতে হয়। উদাহরণতঃ প্রতিপক্ষ অথবা তার বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত হলে অপারগ হয়ে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা হয়, তাদের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করা হয় এবং তাদের মর্তবায় বিশ্বাস প্রকট করা হয়। অথচ বক্তা নিজে ও সম্বোধিত ব্যক্তি এবং অন্য যারা শুনে, সকলেই জানে, এ সব বানোয়াট, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুষ্কর্ম বৈ কিছু নয়। বাহ্যতঃ মুখে বন্ধু হলেও আন্তরিকভাবে একে অপরের শত্রু। আল্লাহ তাআলা এহেন বদভ্যাস থেকে আপন আশ্রয়ে রাখুন।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন মানুষ এলেম শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয় এবং মুখে বন্ধু হয়ে থাকে, কিন্তু অন্তরে পরস্পরের শত্রু হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন, তাদেরকে বধির করে দেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করেন। অভিজ্ঞতার আলোকেও অবশ্যই এমনটি হতে দেখা গেছে।

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে সত্য কথার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও সে সম্পর্কে লড়াই করার স্পৃহা। মোনাযারাকারীদের কাছে সর্বাধিক মন্দ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয় হচ্ছে প্রতিপক্ষের মুখ থেকে সত্য প্রকাশ পাওয়া। এরূপ হলে মোনাযারাকারী তা অস্বীকার করা ও না মানার জন্যে সাধ্যানুযায়ী উঠে পড়ে লেগে যায় এবং যতদূর সম্ভব তা প্রতিহত করার জন্যে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ফলে সত্য বিষয়ে লড়াই করা তার মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়। যখনই কোন কথা কানে পড়ে, তখনই তাতে আপত্তি তোলার কথা ভাবতে থাকে। ক্রমশঃ এ বিষয়টি কোরআন পাকের দলীলসমূহে এবং শরীয়তের ভাষায়ও তার মনে প্রবল হয়ে যায়। সে এক দলীলের মোকাবিলা অন্য দলীল দ্বারা করে। অথচ বাতিলের মোকাবিলায়ও লড়াই ঝগড়া করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا فى اعلى الجنة ـ

যেব্যক্তি বাতিলপন্থী হয়ে ঝগড়া বর্জন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতের এক কোণে গৃহ নির্মাণ করেন। আর যেব্যক্তি সত্যপন্থী হয়ে কলহ বর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁর নিজের উপর মিথ্যা বলা এবং সত্য বিষয় মিথ্য প্রতিপন্ন করাকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। সেমতে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ ـ

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা গড়ে এবং সত্য বিষয়কে তার কাছে আসার পর মিথ্যা বলে জাহির করে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهٗ ـ

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণ দেয় এবং সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা বলে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব। এটা অধিক দুরারোগ্য ব্যাধি। এর দ্বারা সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

বর্ণিত দশটি আভ্যন্তরীণ দোষই সকল অনিষ্টের মূল। সম্ভ্রমশীল নয়-এমন লোকদের মধ্যেযেসব অনিষ্ট হয়ে যায়, সেগুলো এর অতিরিক্ত। উদাহরণতঃ এমনভাবে বিতর্ক করা যে, হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, কিলঘুষি, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, পিতামাতাকে ও ওস্তাদদেরকে মন্দ বলা এবং গালিগালাজ করার উপক্রম হয়ে যায়। এ ধরনের লোক মনুষ্যত্বের গণ্ডির বাইরে। যারা বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রমশীল, তাদের মধ্যে এ দশটি অনিষ্ট অবশ্যই থাকে। হাঁ, মাঝে মধ্যে কোন মোনাযারাকারী এগুলোর মধ্যে কতক বদভ্যাস থেকে বেঁচেও থাকে, যদি তার প্রতিপক্ষ তার চেয়ে নিম্নস্তরের হয় অথবা অনেক বেশী উঁচু স্তরের হয়, অথবা তার শহর থেকে দূরে বসবাস করে। আর যার প্রতিপক্ষ সমকক্ষ, নিকটে বসবাসকারী ও সমস্তরের হয়, সে এই দশটি বদভ্যাস থেকে মুক্ত হয় না। এ দশটি বদভ্যাস থেকে আরও দশটি কুকাণ্ড প্রকাশ পায়, যার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ দীর্ঘ মনে করে আমরা এখানে উল্লেখ করছি না। উদাহরণতঃ নাক সিঁট্‌কানো, রুষ্টতা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, জাঁকজমক, আস্ফালন, ধনী ও সরকারী কর্মচারীদের সম্মান এবং তাদের কাছে আসা-যাওয়া, তাদের হারাম ধন সম্পদ গ্রহণ, নিষিদ্ধ পোশাকে সজ্জিত হওয়া, গর্ব অহংকারভরে অপরকে হেয় মনে করা, বেশী কথা বলা, মন থেকে ভয় ও আশা তিরোহিত হওয়া, এমন গাফেল হওয়া যে, নামাযে দাঁড়িয়ে কত রাকআত পড়েছে এবং কি পড়েছে তা মনে না থাকা, কার কাছে মোনাজাত করছে, তাও বোধশক্তিতে না থাকা। মোনাযারাকারী ব্যক্তি সারাজীবন মোনাযারা সম্পর্কিত এলেমের মধ্যে ডুবে থাকে এবং উত্তম বাক্য বলা, ছন্দপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা, বিরল কথাবার্তা স্মরণ করা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকে। অথচ এগুলো আখেরাতে কোন উপকারে আসবে না। মোনাযারাকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাদের মধ্যে যেব্যক্তি অধিক ধার্মিক ও জ্ঞানী, তার মধ্যেও এসব বদভ্যাসের উপকরণ সঞ্চিত থাকে। সে মোজাহাদার মাধ্যমে একে গোপন রাখে। এই খারাপ অভ্যাসগুলো সে ব্যক্তির মধ্যেও বিদ্যমান থকে, যে ওয়াজ নসীহতে মশগুল থাকে, যদি ওয়াজ দ্বারা তার উদ্দেশ্য জনপ্রিয়তা অর্জন এবং ধন-দৌলত ও সম্মান অর্জন করা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি কোন ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভ, ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হওয়া এবং সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার উদ্দেশে এলেম, মযহাব ও ফতোয়ায় নিয়োজিত থাকে, তবে তার মধ্যে এসব অভ্যাস অপরিহার্যরূপে পাওয়া যাবে। মোট কথা, যেব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব ছাড়া অন্য কিছুর উদ্দেশে আলেম হবে, তার মধ্যেই এ সমস্ত বদভ্যাস পাওয়া যাবে। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতে মানুষের মধ্যে কঠোরতর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ্ তাআলা তার এলেম দ্বারা কোন উপকার পৌছাননি। এক্ষেত্রে তার এলেম উপকার না করে বরং ক্ষতি করেছে। যে এলেম অন্বেষণ করে তার অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে দুনিয়াতে রাজত্ব অন্বেষণ করে। যদি ঘটনাক্রমে রাজত্ব না পায় তবে আশা করা যায় না যে, সে অন্য লোকদের মত বেঁচে থাকবে; বরং তাকে অবশ্যই বড় বড় লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে। যদি বল, মোনাযারার অনুমতি দেয়ার মধ্যে উপকারিতা রয়েছে, এতে এলেম অন্বেষণের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা না থাকলে এলেম মিটে যাবে। তবে আমি বলব, তোমার এ কথা এক দিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু উপকারী নয়। কারণ ছেলেদেরকে খেলার বল, ডাংগুলি ও খেলাধুলার প্রতিশ্রুতি না দিলে তারা মক্তবের প্রতি আগ্রহী হয় না। এতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়া উত্তম হয়ে যায় না। এমনিভাবে জাঁকজমকপ্রীতি না হলে এলেম মিটে যাবে– এ বাক্য এ কথা বুঝায় না যে, যেব্যক্তি জাঁকজমক অন্বেষণ করবে, সে মুক্তি পাবে। বরং সে তো তাদেরই একজন যাদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله ليؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم -

"আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকের মাধ্যমেও এ দ্বীনকে শক্তিশালী করেন, যাদের দ্বীনে কোন অংশ নেই।"

অন্যত্র বলেন ঃ

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر -

"আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ দ্বীনকে শক্তি দান করেন।"

এ থেকে জানা গেল, যারা জাঁকজম প্রিয়, তারা নিজেরা তো ধ্বংস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয় বটে, কিন্তু কখনো কোন সময় তাদের দ্বারা অন্যদের মঙ্গল হয়, যদি তারা অন্যদেরকে সংসার বর্জনের আহ্বান জানায়। এটা এরূপ নেতাদের মধ্যে হয়, যাদের অবস্থা বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী মনীষীগণের বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ হয়; কিন্তু অন্তরে জাঁকজমকপ্রিয়তা লুক্কায়িত থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত মোমবাতির মত। সে নিজে জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু অন্যেরা তার কাছ থেকে আলো লাভ করে। অর্থাৎ, এই নেতাদের ধ্বংসের মাধ্যমে অন্যদের মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু যদি কোন নেতা সংসার অন্বেষণে উৎসাহ দেয়, তবে তাকে জ্বলন্ত অগ্নি মনে করতে হবে, সে নিজে প্রজ্বলিত এবং অপরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

মোট কথা, আলেমগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) যারা নিজেরাও ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। তারা এমন আলেম, যারা প্রকাশ্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে এবং দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। (২) যারা নিজেরাও ভাগ্যবান এবং অপরকেও ভাগ্যবান করে। তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে যাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহ্বান করে। (৩) যারা নিজেরা ধ্বংস হবে; কিন্তু অপরকে ভাগ্যবান করে। তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে আখেরাতের দিকে আহ্বান করে এবং বাহ্যতঃ নিজেরাও সংসার নির্লিপ্ত; কিন্তু তাদের অন্তরে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাঁকজমকের বাসনা লুক্কায়িত থাকে। এখন তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর, কোন্ শ্রেণীতে রয়েছ এবং কিসের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছ– দুনিয়ার না আখেরাতের? এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি নয়, আল্লাহ্ তাকে কবুল করবেন। ইনশাআল্লাহ্ আমরা রিয়া অধ্যায়ে বরং গোটা তৃতীয় খণ্ডে এমন আলোচনা করব, যাতে তুমি নিঃসন্দেহ হয়ে যাবে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আদব

শিক্ষার্থীর আদব অনেক হলেও সেগুলো মোটামুটি দশ ভাগে বিভক্ত। প্রথম আদব, শিক্ষার্থী নিজেকে হীন চরিত্র ও মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র রাখবে। কেননা, শিক্ষা হচ্ছে অন্তরের এবাদত, আভ্যন্তরীণ সংশোধন এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়। বাহ্যিক এবাদত নামায যেমন বাহ্যিক নাপাকী থেকে বাহ্যিক পবিত্রতা ছাড়া দুরস্ত হয় না, তেমনি আভ্যন্তরীণ এবাদত অর্থাৎ, এলেম দ্বারা অন্তরের এবাদতও মন্দ চরিত্র এবং নাপাক অভ্যাস থেকে পাক হওয়া ছাড়া দুরস্ত হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ بنى الدين على النظافة অর্থাৎ, ধর্ম-কর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ ۔

অর্থাৎ, মুশরিকরা নাপাক। এতে বুদ্ধিমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই নির্ভরশীল নয়, যা চোখে পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ মুশরিকরা গোসলও করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়ও পরিধান করে, অথচ তাদের অভ্যন্তরভাগ নাপাক থাকে। নাপাকী এমন বিষয়কে বলে, যা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। আভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকে বেঁচে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ নাপাকী পরিণামের দিক দিয়ে মারাত্মক। এ জন্যেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ لايدخل الملائكة بيتا فيه كلب ۔

"যে গৃহে কুকুর রয়েছে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"

অন্তর মানুষের একটি গৃহ, যাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত, প্রভাব ও অবস্থান হয়ে থাকে। ক্রোধ, কামনা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষ্যাপা কুকুর সদৃশ। অতএব অন্তরে যদি এসব কুকুর থাকে, তবে তাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত কিরূপে হবে।। শিক্ষার নূরও আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অন্তরে পৌছান। সেমতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ ۔

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ কোন মানুষের যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে পাঠিয়ে দেন তিনি কোন পয়গামবাহক; সে তাঁর আদেশে যা ইচ্ছা পৌঁছে দেয়।

অনুরূপভাবে জ্ঞান সংক্রান্ত রহমতের দায়িত্বেও ফেরেশতাগণ নিয়োজিত। তারা নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পাক পবিত্র। সুতরাং তারা পাক জায়গাই দেখে এবং তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার পবিত্র অন্তরেই ভরে দেয়। আমরা একথা বলি না যে, উল্লিখিত হাদীসে গৃহের অর্থ অন্তর এবং কুকুরের অর্থ ক্রোধ ও নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ বোঝানো হয়েছে। এরূপ বললে বাতেনিয়া সম্প্রদায় আপত্তি করবে, তোমরা আমাদেরকে যা করতে নিষেধ কর, এখন নিজেরাই তা করছ। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ হাদীসে এ বিষয়টির প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বাহ্যিক শব্দ পরিবর্তন করে আভ্যন্তরীণ অর্থ গ্রহণ এক কথা এবং বাহ্যিক অর্থ বহাল রেখে আভ্যন্তরীণ অর্থের প্রতি হুশিয়ারী অবলম্বন ভিন্ন কথা। দ্বিতীয়টি জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি। আলেম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের এটাই নিয়ম। কেননা, জ্ঞানার্জনের অর্থ হল, যে বিষয় অন্যদেরকে বলা হয় তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত না রাখা; বরং নিজেও তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যের উপর বিপদ দেখে, তবে সে একে নিজের জন্যে শিক্ষা মনে করে এবং সেও বিপদের লক্ষ্য হতে পারে বলে বুঝে নেয়। কারণ, দুনিয়াতে পরিবর্তন হতেই থাকে। সুতরাং অন্যের অবস্থা দেখে নিজের দিকে খেয়াল করা এবং দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা করা একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা।

অনুরূপভাবে মানব নির্মিত গৃহ থেকে তুমিও অন্তরের দিকে খেয়াল কর, যা আল্লাহ্ তাআলার একটি গৃহ বিশেষ। কুকুর তার মন্দ অভ্যাস অর্থাৎ, হিংস্রতা ও অপবিত্রতার কারণে নিন্দনীয়— আকার আকৃতির কারণে নয়। তুমি কুকুর থেকে তার হিংস্রতার ধ্যান কর এবং জেনে নাও, যে অন্তর ক্রোধ, লোভ-লালসা, দুনিয়ার জন্যে কলহ-বিবাদ এবং ধন-সম্পদের জন্যে মানুষকে অপমান করা ইত্যাদি কুঅভ্যাসে পরিপূর্ণ, সে অন্তর আভ্যন্তরীণ কুকুর এবং বাহ্যিক অন্তর। জ্ঞানের নূর অভ্যন্তরভাগ দেখে, বাইরের অঙ্গ নয়।

সুতরাং যদি কেউ বলে, অনেক লোক কুচরিত্রের অধিকারী হয়েও জ্ঞান অর্জন করেছে, তবে এর জওয়াব, এটা কখনও হতে পারে না। যেব্যক্তি কুচরিত্রের অধিকারী, সে আখেরাতে উপকারী ও চিরন্তন সৌভাগ্যের কারণ সত্যিকার জ্ঞান কখনও অর্জন করতে পারবে না। সে এ জ্ঞান থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনেক মন্‌যিল দূরে থাকবে। কারণ, এ জ্ঞানের সূচনাতেই শিক্ষার্থী জানবে, গোনাহ মারাত্মক সর্বনাশা বিষ। তুমি কখনও কাউকে জেনেশুনে মারাত্মক বিষ সেবন করতে দেখেছ কি? তুমি যে জ্ঞানের কথা শুনেছ, সেটা মানুষের একটি প্রথাগত বিষয়। তারা এটা মুখে উচ্চারণ করে এবং কখনও অন্তরে বার বার বলে। সত্যিকার জ্ঞানের উপর এর কোন দখল নেই। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক বর্ণনা দ্বারা জ্ঞান হয় না; বরং জ্ঞান অন্তরে গুপ্ত একটি নূর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে কেবল আল্লাহর ভয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۔

অর্থাৎ, একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। এখানে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানের বিশেষ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এদিক দিয়েই জনৈক অনুসন্ধানবিদ এ বাক্যের অর্থ করেছেন–

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم ان يكون الا الله ۔

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উদ্দেশে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। কিন্তু জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এর মর্মার্থ, জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়নি এবং এর স্বরূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়নি। কেবল বাহ্যিক শব্দ ও বাক্য অর্জিত হয়েছে। যদি বল, আমরা অনেক অনুসন্ধানী আলেম ও ফেকাহ্‌বিদকে দেখি, তাঁরা শাখা ও মূলনীতিতে সেরা বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য হয়; অথচ তাদের চরিত্র খারাপ। তবে এর জওয়াব হচ্ছে, তুমি যখন জ্ঞানের স্তর ও আখেরাতের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হবে, তখন বুঝতে পারবে, যে জ্ঞানে তারা মশগুল রয়েছেন, সেটা জ্ঞান হিসাবে খুব কমই উপকারী। জ্ঞান কেবল আল্লাহর উদ্দেশে অর্জন করলেই এবং আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য হলেই এর উপকার পাওয়া যায়। এদিকে আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি এবং সত্বরই এ অধ্যায়ে আরও সবিস্তার বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় আদব, শিক্ষার্থী সাংসারিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্ক হ্রাস করবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকবে। কেননা সকল সম্পর্কই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও বাধাদানকারী। আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দু'টি মন সৃষ্টি করেননি। ফলে চিন্তা বিভক্ত থাকলে জ্ঞানের প্রকৃত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্বরূপ উদঘাটনে ত্রুটি দেখা দেবে। এজন্যেই কেউ বলেছেন ঃ শিক্ষা তোমাকে তার সামান্য অংশও দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাতে সমস্ত মন প্রাণ নিবিষ্ট করবে। তুমি এরূপ করলে জ্ঞান তোমাকে যে সামান্য অংশ দেবে, তাও উপকারী কিনা জানা নেই। যে চিন্তা অনেক কাজে বিভক্ত থাকে, তা নালার পানির মত ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছু অংশ মাটি শুয়ে ফেলে এবং কিছু শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যায়। ফলে ক্ষেতে পৌঁছার মত পানি থাকে না।

তৃতীয় আদব, শিক্ষার্থী জ্ঞানের কারণে অহংকার করবে না এবং শিক্ষকের উপর শাসন চালাবে না; বরং নিজের ব্যাপার সর্বাবস্থায় পুরোপুরি শিক্ষকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে। তার উপদেশ তেমনি মান্য করবে, যেমন মূর্খ রোগী দয়ালু ও বিচক্ষণ ডাক্তারের কথা মান্য করে। শিক্ষাগুরুর সাথে বিনয়াবনত ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁর সেবা দ্বারা সওয়াব ও গৌরব কাম্য হওয়া দরকার। শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) জানাযার নামায পড়লে তাঁর খচ্চর তাঁর নিকটে আনা হয়, যেন তিনি তাতে সওয়ার হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আগমন করলেন এবং খচ্চরের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটি চেপে ধরলেন। যায়েদ ইবনে সাবেত বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই! আপনি লোহার আংটি ছেড়ে দিন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আলেম ও মহান ব্যক্তিদের সাথে এমনি ব্যবহার করার নির্দেশ আমি পেয়েছি। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁর হস্ত চুম্বন করে বললেন ঃ আমরাও আমাদের পয়গম্বরের পরিবার-পরিজনের সাথে এমনি ব্যবহার করার আদেশ পেয়েছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ খোশামোদ করা ঈমানদারের চরিত্র নয়; কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণে খোশামোদ করা যায়। সুতরাং শিক্ষার্থীর অহংকার করা উচিত নয়। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলেমের কাছেই পড়ব– অন্যের কাছে নয়– এটাও শিক্ষার্থীর এক প্রকার অহংকার। এটা নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। কেননা, জ্ঞান মুক্তি ও সৌভাগ্যের কারণ। যেব্যক্তি কোন ইতর হিংস্র জন্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে এ বিষয়ে পার্থক্য করবে না যে, তাকে আত্মরক্ষার কৌশল কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি না অজ্ঞাত ব্যক্তি বলে দেবে। বলাবাহুল্য, যারা আল্লাহ তা'আলাকে জানে না, তাদের জন্যে অগ্নিরূপী সর্বগ্রাসী শত্রুর ক্ষতি প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর ক্ষতির তুলনায় ভয়ংকর হবে। জ্ঞান ঈমানদারের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হারানো সম্পদ; যেখানে তা পাবে, সেখান থেকেই সৌভাগ্য মনে করে গ্রহণ করবে। কেউ এ জ্ঞান তার কাছে পৌঁছালে, সে যেই হোক তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে।

মোট কথা, বিনয়াবনত হওয়া ও কান লাগানো ছাড়া জ্ঞান অর্জিত হয় না।। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ـ

অর্থাৎ, "এতে সে ব্যক্তির চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে, যার অন্তর আছে অথবা যে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।"

অন্তর থাকার উদ্দেশ্য জ্ঞানের যোগ্যতা ও অনুধাবন করার প্রতিভা থাকা। অনুধাবনে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না মনোনিবেশ সহকারে শুনবে। যাতে কানে যা কিছু ফেলা হয়, তা ভালরূপে শুনে বিনয়, শোকর, আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা সহকারে কবুল করে নেয়। ওস্তাদের সামনে শাগরেদদের এমন থাকা উচিত, যেমন নরম মাটি, যার উপর অনেক বৃষ্টি পড়ে এবং মাটি সব পানি পান শুষে। ওস্তাদ কোন নিয়ম বললে শাগরেদ তার অনুসরণ করবে, নিজের মতামত খাটাবে না। কেননা, ওস্তাদ ভুল করলেও তা শাগরেদের নির্ভুলতা অপেক্ষা তার জন্যে অধিক উপকারী। অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন সূক্ষ্ম বিষয় জানা যায়, যা শুনলে অবাক লাগে। কিন্তু তার উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ অনেক গরম মেজাজের রোগীর চিকিৎসা চিকিৎসকরা গরম ওষুধ দ্বারাই করেন, যাতে রোগীর মধ্যে চিকিৎসার গুরুভার সহ্য করার মত উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নয়, তারা একথা শুনে আশ্চর্যবোধ করে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খিযির ও মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। হযরত খিযির বললেন ঃ

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ـ

অর্থাৎ "আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আপনি এমন বিষয় দেখে ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করেও যার তত্ত্ব আপনার আয়ত্ত্বাধীন নয়?"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরপর হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে শর্ত দিলেন, চুপ থাকতে হবে এবং আমি নিজে না জানানো পর্যন্ত প্রশ্ন করা চলবে না।

فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْأَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ـ

"অতএব আপনি যদি আমার সাথে থাকেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে আপনাকে বলি।" কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) সবর করতে পারলেন না, বার বার তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলেন। অবশেষে এটাই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেল। সারকথা, যে শাগরেদ তার ওস্তাদের মোকাবিলায় নিজের মত ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখে, সে তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলেছেন ঃ

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

এ থেকে জিজ্ঞেস করার অনুমতি জানা যায়। এর উদ্দেশ্য, বাস্তবে জিজ্ঞেস করা বৈধ। কিন্তু যেসব বিষয় জিজ্ঞেস করার অনুমতি ওস্তাদ দেন সেগুলোই জিজ্ঞেস করতে হবে। কেননা, যে কথা অনুধাবন করার ক্ষমতা তোমার নেই, তা জিজ্ঞেস করা খারাপ। এ কারণেই হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছিলেন।

মোট কথা, সময়ের পূর্বে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তোমার কি প্রয়োজন এবং তা কখন বলা উচিত, সে সম্পর্কে ওস্তাদ অবহিত রয়েছেন। যে পর্যন্ত বলার সময় না আসে, জিজ্ঞেস করার সময়ও আসে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আলেমের হক, তাকে অনেক প্রশ্ন করো না, জওয়াবের ব্যাপারে দোষারোপ করো না, যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন পীড়াপীড়ি করো না এবং সে ভুল করলে তাকে ক্ষমার্হ মনে কর। যে পর্যন্ত আলেম আল্লাহর আদেশের হেফাযত করে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা নিজের জন্য অপরিহার্য মনে কর। তার সামনে উপবেশন করো না।

চতুর্থ আদব, শিক্ষার্থী প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের মতভেদ শোনা থেকে বেঁচে থাকবে– সে দুনিয়ার জ্ঞান অন্বেষণ করুক অথবা আখেরাতের জ্ঞান। কেননা, মতভেদ শুনলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জ্ঞান-বুদ্ধি বিহ্বল, চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত ও মতামত শিথিল হয়ে পড়ে এবং উপলব্ধি ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূচনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে যায়। প্রথমে সে ওস্তাদের পছন্দনীয় কোন পন্থা বিশ্বাস করবে, এরপর অন্যান্য মাযহাব ও তাদের সন্দেহ শুনবে। যদি তার ওস্তাদ এক মত অবলম্বন করার ব্যাপারে পাকাপোক্ত না হয় এবং এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাব পাল্টানো ও তাঁদের উক্তি বর্ণনা করাই তাঁর অভ্যাস হয়, তবে এরূপ ওস্তাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এরূপ ওস্তাদ হেদায়াত করে কম এবং পথভ্রষ্ট করে বেশী। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? যে নিজেই হারিয়ে গেছে, সে অন্যকে পথ দেখাবে কেমন করে?

প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে সন্দেহের পেছনে পড়তে বারণ করা, কোন নও মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করারই মত। আর যে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, তাকে মতভেদসমূহে উৎসাহিত করা এমন, যেমন শক্ত ঈমানদারকে কাফেরদের সাথে দেখা সাক্ষাতে উৎসাহিত করা হয়। কেননা, প্রত্যেক কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক দরকার। এ জন্যেই ভীরু কাপুরুষকে কাফেরদের উপর হামলা করতে বলা হয় না; বরং বীরপুরুষকে এ কাজের জন্য ডাকা হয়। এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে কোন কোন দুর্বল লোক ধারণা করে যে, শক্ত লোকদের তরফ থেকে বর্ণিত শৈথিল্যে তাদের অনুসরণ করা জায়েয। তাঁরা বুঝেনি যে, শক্ত লোকদের কাজ কারবার দুর্বল লোকদের কাজ কারবার থেকে আলাদা। এ সম্পর্কে জনৈক শায়খ বলেন ঃ যেব্যক্তি আমাকে প্রথম অবস্থায় দেখেছে, সে যিন্দীক তথা খোদাদ্রোহী হয়ে গেছে। কারণ, শেষ অবস্থায় আমল বাতেনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ ফরয ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অন্যান্য আন্দোলন থেকে স্তব্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা মনে করে, এটা শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতা। অথচ বাস্তবে তা নয়; বরং এটা অন্তরের পর্যবেক্ষণের আওতায় সার্বক্ষণিক যিকিরে ব্যাপৃত থাকা, যা সর্বোত্তম আমল। দুর্বল ব্যক্তি অঙ্গের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটাকে পদস্খলন মনে করে এবং নিজেও তদ্রূপ করে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি এক গ্লাস পানিতে সামান্য নাপাক বস্তু ফেলে দেয় এবং বলে, সমুদ্রের জন্যে যা বৈধ তা গ্লাসের জন্যে আরও উত্তমরূপে বৈধ হওয়া উচিত। লোকটি জানে না যে, সমুদ্র তার শক্তির মাধ্যমে নাপাকীকে পানিতে পরিণত করে ফেলে এবং সমুদ্র প্রবল হওয়ার কারণে নাপাকীও সমুদ্রের মত হয়ে যায়। কিন্তু সামান্য নাপাকীই গ্লাসে প্রবল থাকে। সেটা গ্লাসকে নিজের মত নাপাক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে দেয়। এমনি ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে এমন বিষয় জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে, যা অন্যের জন্যে জায়েয নয়। উদাহরণতঃ তাঁর জন্যে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে। কেননা, তাঁকে যে শক্তি দান করা হয়েছিল, তার সাহায্যে তিনি স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' তথা সমতা বিধান করতে পারতেন– তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন। অন্য ব্যক্তি অল্প কয়েকজনের মধ্যেও ন্যায়বিচার করতে পারে না। বরং তাদের মধ্যকার ক্ষতি স্বয়ং তাকেও গ্রাস করবে; অর্থাৎ স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে বসবে। যেব্যক্তি ফেরেশতাকে কর্মকারের অনুরূপ মনে করে, সে সফলকাম হবে কি?

পঞ্চম আদব, শিক্ষার্থী কোন উৎকৃষ্ট শাস্ত্রই না দেখে পরিত্যাগ করবে না। এতটুকু দেখবে যাতে তার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এর পর যদি জীবনে কুলায়, তবে সে সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করবে। নতুবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করে তাতে পূর্ণতা অর্জন করবে এবং অবশিষ্ট শাস্ত্রগুলো অল্প বিস্তর অর্জন করবে। কেননা, শাস্ত্র একে অপরের সহায়ক ও পরস্পর জড়িত। কোন শাস্ত্র শিক্ষা না করা শত্রুতাবশতই হতে পারে। কেননা, মানুষ যা করতে পারে না তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ـ

অর্থাৎ, যখন তাঁর হেদায়েতে তারা পথে আসে না, তখন বলবে– এটা একটা সনাতন মিথ্যা।

জনৈক কবি বলেন, রোগের কারণে যার মুখের স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়, সে মিঠা পানিকেও তিক্ত মনে করে। মোটকথা, উৎকৃষ্ট শাস্ত্র স্তর অনুযায়ী বান্দাকে আল্লাহর পথের, পথিক করে দেয় অথবা পথ চলায় কিছু না কিছু সাহায্য করে।

ষষ্ঠ আদব, শিক্ষণীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি সহসা অবলম্বন করবে না; বরং ক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখবে। যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি থেকে শুরু করবে। কারণ, জীবন প্রায়শঃ সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই সাবধানতা হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তু থেকে উৎকৃষ্টটি অর্জন করবে এবং তা থেকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। অল্প জ্ঞান দ্বারা যে শক্তি অর্জিত হয়, তা সর্বোত্তম শিক্ষা তথা আখেরাত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়ক শিক্ষার উভয় প্রকার মোআমালা ও মোকাশাফায় ব্যয় করবে। এলমে মোআমালার অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে এলমে মোকাশাফা এবং এর পরিণতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মারেফাত। এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের উদ্দেশ্য সে বিশ্বাস নয়, যা জনসাধারণ বাপ-দাদার কাছ থেকে শুনে এসেছে অথবা মুখস্থ করে নিয়েছে। কালাম শাস্ত্রের পদ্ধতিও উদ্দেশ্য নয়, যাতে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কথা টিকিয়ে রাখা হয়। কালাম শাস্ত্রীদের উদ্দেশ্য এতটুকুই। বরং এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের উদ্দেশ্য হল এক প্রকার প্রত্যয়, যা সেই নূরের ফল, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে স্থাপন করে দেন, যখন বান্দা সাধনা করে তার অন্তরকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। অবশেষে বান্দা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যার সাক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) এভাবে দিয়েছেন– যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে আবু বকরের ঈমানই ভারী হবে। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু লোক শরীয়তের প্রবর্তক রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি শ্রবণ করার পর এর অনুরূপ যা কিছু শুনে, তাকে ঘৃণা করে এবং বলে যে, এগুলো সূফীদের অনর্থক ও দুর্বোধ্য কথাবার্তা।

সারকথা, তোমার সেই রহস্য জানার লোভ করা উচিত যা ফেকাহ্‌বিদ এবং কালামশাস্ত্রীদের সাহস ও আয়ত্তের বাইরে। এর অন্বেষণে লোভী না হয়ে তুমি এর পথ পাবে না।

মোট কথা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবকিছুর মূল লক্ষ্য যে শাস্ত্র, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফাত। এটা অতল সাগর। এতে সর্বাগ্রে রয়েছেন পয়গম্বরগণ, এর পর তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দু'জন দার্শনিকের চিত্র এক উপাসনালয়ে পরিদৃষ্ট হয়। তাদের একজনের হাতে রাখা একটি চিরকুটে লেখা ছিল ঃ যদি তুমি সকল বিষয় সংশোধন করে নাও, তবে মনে করো না যে, একটি বিষয়ও সংশোধন করতে পেরেছ, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ কর এবং তাঁকেই সকল কারণের মূল কারণ ও স্রষ্টা না জান। অপর হাতে রাখা চিরকুটে লিখিত ছিল ঃ আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের পূর্বে আমি পানি পান করতাম এবং পিপাসার্ত থাকতাম। অবশেষে যখন তাঁর মারেফাত অর্জিত হল তখন পানি পান করা ছাড়াই পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে গেল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম আদব, এমন কোন শাস্ত্রে পা রাখবে না, যে পর্যন্ত না তার আগে যেসব শাস্ত্র জানা দরকার সেগুলোর উপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয়। কেননা, শাস্ত্রসমূহ এক জরুরী ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত এবং এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের পথ। যে এই ক্রম ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সেই তওফীক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথার্থই পাঠ করে।" অর্থাৎ, এলেম ও আমলের দিক দিয়ে এক শাস্ত্রে পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য শাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হয় না। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে তাতে তার উপরের শাস্ত্রে উন্নতি করার নিয়ত রাখবে। যদি কোন শাস্ত্রে মতভেদ হয় অথবা তাতে কয়েকজনই ভুল করে অথবা এলেম অনুসারে আমল না করে, তবে সে শাস্ত্র অর্থহীন বলে আখ্যায়িত করো না। যেমন কেউ কেউ চিকিৎসকের ভুল দেখে চিকিৎসা শাস্ত্রকে অকেজো মনে করে, জ্যোতিষীর কথাবার্তা ঘটনাচক্রে সত্য হতে দেখে কিছু লোক এর নির্ভুলতায় বিশ্বাসী হয় এবং কিছু লোক অন্য জ্যোতিষীর ভুল জেনে একে অকেজো বলে। অথচ তারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ বিষয়টির বাস্তবতা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে যাচাই করে নেয়া উচিত। কেউই কোন শাস্ত্রে এতটুকু ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয় না যে, তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে যাবে। এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে দেখে সত্য চেনার চেষ্টা করো না; বরং সত্যকে জেনে নাও। এরপর সত্যপন্থীদেরকে আপনা আপনি জেনে যাবে।

অষ্টম আদব, শাস্ত্রসমূহ যে কারণে একটি অপরটি থেকে শ্রেষ্ঠ, তা জানতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব দু'বিষয়ের কারণে হয়– ফলাফলের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এবং শক্তিশালী প্রমাণের কারণে। উদাহরণতঃ ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র দেখলে দেখা যায়, প্রথমটির ফলাফল অনন্ত জীবনের সুখ এবং দ্বিতীয়টির ফলাফল ধ্বংসশীল জীবনের সুখ। সুতরাং এদিক দিয়ে ধর্ম শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, তার ফলাফল শ্রেষ্ঠ। অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অংকশাস্ত্রের প্রমাণসমূহ পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী। সুতরাং এটা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। যদি অংকশাস্ত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে দেখি, তবে চিকিৎসাশাস্ত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অংকশাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশই আন্দাজ অনুমান মাত্র।

এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলের পরিচয় বিষয়ক শাস্ত্রই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। আর যেসব শাস্ত্র এ শাস্ত্র পর্যন্ত পৌছার উপায় ও মাধ্যম, সেগুলোও শ্রেষ্ঠ। কাজেই এ শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ ও লোভ করা তোমার উচিত নয়।

নবম আদব, শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে নিজের অভ্যন্তরকে সদগুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা এবং পরিণামে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং ফেরেশতা ও উর্ধ্ব জগতের নৈকট্যশীলদের প্রতিবেশিত্ব অর্জন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ, জাঁকজমক, নির্বোধদের সাথে বিতর্ক এবং সমকক্ষদের উপর গর্ব করা না হওয়া উচিত। জ্ঞানের দ্বারা যার নিয়ত থাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, তার পক্ষে অবশ্যই এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা দরকার, যা এই উদ্দেশের নিকটবর্তী। অর্থাৎ তার আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিতাব ও সুন্নতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফতোয়াশাস্ত্র, অভিধানশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র ইত্যাদিকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না। এগুলো ফরযে কেফায়া শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান। আমরা আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের প্রশংসায় যে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি, এতে মনে করো না যে, উপরোক্ত শাস্ত্রসমূহ মন্দ। যারা এসব শাস্ত্রে আলেম, তারা তাদের মতই, যারা মাটির হেফাযত করে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে। অর্থাৎ, তাদের কেউ যুদ্ধ করে, কেউ সাহায্য করে, কেউ তাদের পানি পান করায় এবং কেউ তাদের সওয়ারীর হেফাযত করে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে তুলে ধরা নিয়ত হলে তাদের কেউই সওয়াব থেকে বঞ্চিত নয়। আলেমগণের অবস্থাও তদ্রূপ। আল্লহ্ তাআলা বলেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা আলেম, আল্লাহ তাদের মর্তবা উচ্চ করেন।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে তাদের অনেক মর্তবা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোট কথা, আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব আপেক্ষিক। কারও তুলনায় বেশী এবং কারও তুলনায় কম। তাঁরা স্বয়ং হেয় নয়। সুতরাং এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, যে এলেম উচ্চ মর্তবার নিম্নে, তা মূল্যহীন। বরং জানা উচিত যে, সর্বোচ্চ মর্তবা পয়গম্বরগণের, এর পর মজবুত আলেমগণের, এরপর সৎকর্মশীল বান্দাগণের– তাদের স্তর অনুযায়ী। সারকথা, যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে তার সওয়াব সে পাবে। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তার এলেম যাই হোক না কেন, তার জন্যে উপকারী হবে এবং তার মর্তবা অবশ্যই উচ্চ করবে।

দশম আদব, কোন্ শিক্ষা আসল উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী এবং কোন্‌টি দূরবর্তী, তা জানতে হবে; যাতে নিকটবর্তীকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং জরুরী জ্ঞান অবলম্বন করা যায়। জরুরী জ্ঞান অর্থ সে শিক্ষা যা তোমাকে চিন্তাশীল করবে। বলাবাহুল্য, দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র তোমার অবস্থাই তোমাকে চিন্তাশীল করে। দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আখেরাতের সুখ-শান্তি একত্রে অর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোরআন পাকে একথা বর্ণিত হয়েছে এবং অন্তর্দৃষ্টিও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই জ্ঞানই অনন্তকাল স্থায়ী হয়, সেটাই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় দুনিয়া হবে একটি মনযিল; দেহ হবে বাহন আর আমল হবে উদ্দেশের দিকে চলা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কেননা, সকল সুখ ও আনন্দ এতেই নিহিত। তবে পৃথিবীর কম লোকই এর মূল্য অনুধাবন করে।

জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ও দীদারের সাথে তুলনা করে দেখলে তা তিন প্রকার। দীদারের যা উদ্দেশ্য তা পয়গম্বরগণ অন্বেষণ করতেন এবং তাঁরাই এটা বুঝতেন। সে দীদার উদ্দেশ্য নয়, যা জনসাধারণ ও কালামশাস্ত্রীদের মস্তিষ্কে আসে। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুমি এলেমের এই প্রকারত্রয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

দৃষ্টান্ত এই– কোন গোলামকে বলা হল, যদি তুমি হজ্জ কর এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পূর্ণরূপে পালন কর, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে এবং রাজত্বও লাভ করবে। আর যদি তুমি হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হও এবং পথে কোন বাধার সম্মুখীন হও, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু রাজত্ব পাবে না। এখন এই গোলাম তিন প্রকার কাজের সম্মুখীন হবে– প্রথমতঃ সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা অর্থাৎ, উট ক্রয়, মশক তৈরী ও খাদ্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শস্য সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ দেশ ত্যাগ করে কা'বা গৃহের দিকে রওয়ানা হওয়া এবং তৃতীয়তঃ হজ্জের ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং এক একটি রোকন ক্রমানুসারে আদায় করা। এই তিনটি অবস্থা এবং এহরাম ও বিদায়ী তওয়াফ শেষ হওয়ার পর গোলাম আযাদী ও রাজত্বের অধিকারী হবে। প্রত্যেক অবস্থায় এই গোলামের অনেক স্তর রয়েছে। এখন যেব্যক্তি এখনও পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত, অথবা চলা শুরু করেছে, সে সৌভাগ্যের এতটুকু কাছাকাছি হবে না, যতটুকু সেব্যক্তি হবে যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দিয়েছে। কেননা, সে দুই অবস্থা অতিক্রম করে খুব কাছে পৌঁছে গেছে। অনুরূপভাবে জ্ঞানও তিন প্রকার। এক প্রকার সফরের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করার মত। এটা হচ্ছে চিকিৎসা ও ফেকাহ শিক্ষা এবং দুনিয়াতে দেহের উপযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহ। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা প্রান্তরে চলা ও উপত্যকা অতিক্রম করার মত। এটা হচ্ছে বদভ্যাসের ময়লা থেকে বাতেনকে পাক-পবিত্র করা এবং এমন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছা, যেখানে তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারে না। এসব বিষয় পথ চলার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর জ্ঞান অর্জন করা পথের মনযিলসমূহ জানার মত। অতিক্রম না করে কেবল মনযিল ও পথ জেনে নেয়া যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি চরিত্র শুদ্ধ না করে কেবল চরিত্র শুদ্ধির উপায় জেনে নেয়াও যথেষ্ট নয়। জ্ঞান ছাড়া চরিত্র শুদ্ধি হতে পারে না। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হজ্জ ও হজ্জের রোকনসমূহের মত। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ফেরেশতার জ্ঞান এবং এলমে মোকাশাফায় বর্ণিত বিষয়াদির জ্ঞান। এ প্রকার শিক্ষার পর মুক্তি ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়। কিন্তু নিরাপত্তা এ পথের প্রত্যেক পথিকেরই অর্জিত হয় যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়। যারা আল্লাহ তা'আলার আরেফ, তাদের ছাড়া অন্য কেউ সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। তারাই নৈকট্যশালী হয় এবং তাদের উপরই রহমত, সুখ ও জান্নাতের নেয়ামত বর্ষিত হয়। যারা পূর্ণতার স্তর থেকে দূরে থেকে যায়, তাদের নাজাত ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, অতঃপর যদি সে নৈকট্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও জান্নাতের নেয়ামত। আর যদি সে হয় ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

আর যারা উদ্দেশের প্রতি মনোযোগী হয় না এবং সেদিকে চলে না, অথবা চললেও আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়তে চলে না; বরং জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে চলে, তারা বাম দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হবে। তাদের জন্যে বলা হয়েছে ঃ

نُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ -

অর্থাৎ, তারা উত্তপ্ত পানি দ্বারা আপ্যায়িত হবে এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

মোট কথা, এলমে মোকাশাফার পরে সৌভাগ্য তথা সিদ্ধি লাভ হয়। আর এলমে মোকাশাফা এলমে মোআমালার পরে আসে। অর্থাৎ আখেরাতের পথে চলা এবং গুণাবলীর উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করার পর এলমে মোকাশাফা অর্জিত হয়। আমরা চিকিৎসা ও ফেকাহশাস্ত্রকে হজ্জের জন্যে পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার সাথে তুলনা করেছি। এর কারণ, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্যে তাঁর দিকে অন্তর চলে, দেহ নয়। আমাদের মতে অন্তর সেই মাংসপিন্ড নয় যা চোখে উপলব্ধ হয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার এক রহস্য। এটা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয় না। কখনও একে রূহ এবং কখনও নফসে মুতমায়িন্নাহ বলা হয়। শরীয়ত একে কলব তথা অন্তর বলে ব্যক্ত করে। কেননা, অন্তর হচ্ছে এ রহস্যের প্রথম সওয়ারী এবং অন্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেহ তার সওয়ারী ও হাতিয়ারে পরিণত হয়। এলমে মোকাশাফা দ্বারা এ রহস্যের অবস্থা চমৎকাররূপে জানা যায়। এ রহস্য প্রকাশযোগ্য নয়; বরং এ সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি নেই। বেশীর বেশী এতটুকু বলার অনুমতি আছে যে, এটি একটি উৎকৃষ্ট বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং খোদায়ী নির্দেশ। সেমতে আল্লাহ্ বলেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার নির্দেশের অংশ।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদ্দেশ্য এই যে, রূহ তার পালনকর্তার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ তাআলাই এর উৎস এবং তাঁর দিকেই সে প্রত্যাবর্তন করে। দেহ এ রূহের সওয়ারী, যাতে সওয়ার হয়ে সে চলে। আল্লাহর পথে দেহ অন্তরের জন্যে এমন, যেমন হজ্জের পথে দেহের জন্যে উট অথবা পানির মশক। অতএব যে আমলের উদ্দেশ্য দেহের কল্যাণ সাধন, সেটা সওয়ারীর কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্যও দেহের কল্যাণ সাধন। কেননা, দৈহিক স্বাস্থ্যের দেখাশোনার জন্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ধরে নাও, মানুষ যদি একা থাকত, তবে তার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হত– ফেকাহ্র প্রয়োজন হত না। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একাকী অবস্থায় জীবিত থাকতে পারে না। আহারের জন্যে হালচাষ, বপন এবং অন্ন ও বাসস্থান অর্জন প্রভৃতি একাকী সমাধা করা সম্ভব হতে পারে না। এর জন্যে অন্যের সাথে মেলামেশা করা ও সাহায্য চাওয়া জরুরী। মানুষ যখন পরস্পরে মেলামেশা করেছে এবং কামনা বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন পরস্পরে কলহ-বিবাদ ও মারামারি করে বরবাদ হতে শুরু করেছে। এ কলহ বিবাদই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে, যেমন দেহের পিত্তাদি বিগড়ে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে পিত্তাদির দূষিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং শাসন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বাহ্যিক ফ্যাসাদ দূর করে কামনা বাসনায় সমতা আনয়ন করা। পিত্তাদিতে সমতা কায়েম রাখার নিয়ম কানুন জানাকে ফেকাহশাস্ত্র বলা হয়। উভয়টি দেহের হেফাযতের জন্যে অন্তরের বাহন হয়। সুতরাং যেব্যক্তি কেবল ফেকাহ্ ও চিকিৎসাশাস্ত্রেই নিয়োজিত থাকে এবং নফসের উপর মোজাহাদা বা সাধনা না করে, সে যেন উট ক্রয় করে তার প্রতিপালনেই কেবল ব্যস্ত থাকে; কিন্তু হজ্জের পথে পা বাড়ায় না। যারা আত্মার সংশোধন তথা এলমে মোকাশাফার পথে চলমান, তাদের সাথে এই ফেকাহ্শাস্ত্রীদের তুলনা এমন, যেমন যারা হজ্জের রোকনসমূহ পালনে লিপ্ত, তাদের সাথে সে ব্যক্তির তুলনা, যে উট কিনে সেটিকে কেবল ঘাস খাওয়াচ্ছে– হজ্জের পথে রওয়ানা হচ্ছে না।

সুতরাং এ বিষয়টি প্রথমেই চিন্তা কর এবং সে ব্যক্তির উপদেশ মান্য কর, যে তোমার কাছে এর কোন মজুরি চায় না এবং যে সততঃ এতে মগ্ন রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তোমার জন্যে এ বিষয়টি অর্জিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে না। জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার জন্যে তোমাকে পূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর জন্যে এতটুকু আদবই যথেষ্ট মনে হয়।

শিক্ষকের আদব

জানা উচিত, জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের অবস্থা চার প্রকার, যেমন অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের চার অবস্থা হয়ে থাকে। প্রথম, মানুষ অর্থ সৃষ্টি করে। তখন তাকে উপার্জনকারী বলা হয়। দ্বিতীয়, আপন উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করে, তখন সে ধনী হয়ে যায় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে না। তৃতীয়, উপার্জিত অর্থ নিজের জন্যে ব্যয় করে, ফলে সে উপকৃত হয়। চতুর্থ, উপার্জিত অর্থ অন্যকে দেয়, তখন তাকে দাতা ও গুণী বলে গণ্য করা হয়। এই শেষ অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানেরও তদ্রূপ চারটি অবস্থা রয়েছে– এক, অর্জনের অবস্থা, দুই, অর্জিত জ্ঞানে এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যে, অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না থাকে, তিন, অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং চার, সে জ্ঞান দ্বারা অন্যের উপকার করা। শেষোক্ত অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, আমল করে এবং মানুষকে জ্ঞানদান করে– আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে তাকেই মহান বলা হয়। সে সূর্যের মত, অপরকে আলো দান করে এবং নিজেও আলোকময়। সে মেশকের মত, অপরকে সুগন্ধিতে আমোদিত করে এবং নিজেও সুগন্ধিযুক্ত। আর যেব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দান করে, কিন্তু নিজে আমল করে না, সে শাণের মত, লোহাকে ধারালো করে কিন্তু নিজে কাটে না, অথবা সূচের মত, যে অন্যের জন্যে পোশাক তৈরী করে, কিন্তু নিজে উলঙ্গ থাকে। মানুষ যখন শিক্ষাদানে মশগুল হয়, তখন সে একটি বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই এর আদব ও নিয়মাবলী স্মরণ রাখা উচিত। প্রথম শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদদেরকে সন্তানের মত স্নেহ করবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

انما انا لكم مثل الوالد لولد -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সন্তানের জন্যে যেমন পিতা, আমিও তোমাদের জন্যে তেমনি। অর্থাৎ, শিক্ষক শাগরেদদেরকে আখেরাতের আগুন থেকে বাঁচানোর নিয়ত করবেন। এটা পিতামাতার তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যেই শিক্ষকের হক পিতামাতার চেয়ে বেশী। কেননা, পিতামাতা সন্তানের ধ্বংসশীল জীবনের কারণ, আর শিক্ষক অক্ষয় জীবনের কারণ। শিক্ষক না থাকলে পিতামাতার কাছ থেকে অর্জিত বিষয় সন্তানকে স্থায়ী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিত, কিন্তু শিক্ষক বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকে বুঝব, যে আখেরাত শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। অথবা দুনিয়ার শাস্ত্র আখেরাতের নিয়তে শিক্ষা দেয়– দুনিয়ার নিয়তে নয়। কেননা, দুনিয়ার নিয়তে শিক্ষা দান করা মানে নিজে ধ্বংস হওয়া এবং অপরকে ধ্বংস করা। এমন শিক্ষকতা থেকে আল্লাহ হেফাযত করুন। এক পিতার পুত্ররা যেমন পারস্পরিক মহব্বত ও সম্প্রীতির সাথে থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সাহায্য করে, তেমনি এক ওস্তাদের শাগরেদদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকা উচিত। আখেরাত উদ্দেশ্য হলে শাগরেদরা এমনি হয়। কিন্তু দুনিয়া লক্ষ্য হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা হয়ে থাকে। যারা দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভের শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাইরে– إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই এবং তারা এ উক্তির বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۔

যারা বন্ধু, তারা সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে; কিন্তু খোদাভীরুরা শত্রু হবে না।

দ্বিতীয় শিষ্টাচার হচ্ছে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শরীয়তের কর্ণধার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণ করবে। অর্থাৎ শিক্ষার জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাইবে না, কোন বিনিময়ের নিয়ত করবে না এবং কৃতজ্ঞতাও প্রত্যাশা করবে না। বরং কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে শিক্ষা দেবে। শাগরেদের প্রতি অনুগ্রহ হচ্ছে– এরূপ মনে করবে না; বরং শাগরেদদের অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং এরূপ মনে করা জরুরী যে, তুমি তাদেরই কারণে গৌরবের অধিকারী হয়েছ। তারা তাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মশুদ্ধির কাজ তোমাকে সমর্পণ করেছে এবং তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ দিয়েছে; যেমন কোন ব্যক্তি তার ক্ষেত তোমাকে ধার দেয়, যাতে তুমি নিজের জন্যে তাতে ফসল উৎপন্ন কর। বলাবাহুল্য, এখানে ক্ষেতওয়ালার উপকারের তুলনায় তোমার উপকার বেশী হবে। সুতরাং শিক্ষাদানে শাগরেদের তুলনায় ওস্তাদের সওয়াব যখন বেশী হয়, তখন শাগরেদের উপর অনুগ্রহ করার কোন মানে নেই। শাগরেদ না হলে ওস্তাদ এ সওয়াব কোথায় পেত? তাই সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে চাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ

"বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" কেননা, ধনদৌলত ও দুনিয়ার সামগ্রী দেহের খাদেম এবং মনের সওয়ারী। তারা সকলেই এলেমের খেদমত করে। অতএব যেব্যক্তি এলেমের বিনিময়ে ধন-দৌলত চাইবে, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও জুতায় নাপাকী লেগে গেছে, সে তা পরিষ্কার করার জন্যে মুখে ঘষা দিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এতে যে খেদমতের যোগ্য, তাকে খাদেম করা হয় এবং যে খাদেম তাকে খেদমত পাওয়ার যোগ্য করা হয়। এটা চরম বিপ্লব। এ ধরনের লোক কেয়ামতে অপরাধীদের সাথে মাথা নীচু করে আল্লাহ তা'আলার সামনে দন্ডায়মান হবে। মোট কথা, গৌরব ও সম্মান ওস্তাদের প্রাপ্য। এখন দেখ, যারা বলে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য তাদের লক্ষ্য, ফেকাহ ও কালামশাস্ত্র শিক্ষাদানে তাদের দশা কি হবে? তারা ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি ব্যয় করে এবং জায়গীর লাভের জন্যে রাজা-বাদশাহদের নানা রকম লাঞ্ছনা ভোগ করে। তারা এটা বর্জন করলে কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না এবং কেউ তাদের কাছে আসবে না। তদুপরি ওস্তাদ শাগরেদের কাছে আশা করে, সে তার প্রত্যেক বিপদে কাজে লাগবে, শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে সাহায্য করবে, অমঙ্গলকামীদের সাথে শত্রুতা রাখবে এবং তার জাগতিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি গাধার ন্যায় বহন করবে। যদি শাগরেদ এসব বিষয়ে সামান্যও ত্রুটি করে, তবে ওস্তাদজী তার আন্তরিক দুশমন হয়ে যায়। এ ধরনের আলেম নেহায়েত নীচ ও হীন।

তৃতীয় শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ত্রুটি করবে না। উদাহরণতঃ শাগরেদ যদি যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে কোন মর্তবা লাভের পেছনে পড়ে অথবা জাহেরী এলেম অর্জন করার পূর্বে বাতেনী এলেমে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে তাকে নিষেধ করবে। এরপর তাকে বলবে, জ্ঞান অন্বেষণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে করবে– প্রভাব প্রতিপত্তি অন্বেষণ ও গর্ব করার জন্যে নয়। এটা যে মন্দ, একথা যথাসম্ভব প্রথমেই তার মনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কেননা, পাপাচারী আলেমের মঙ্গল কম এবং অনিষ্ট বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং যদি ওস্তাদ শাগরেদের অন্তর থেকে জেনে নেয়, সে দুনিয়া লাভের জন্যেই এলেম অর্জন করছে এবং ফেকাহশাস্ত্রে বিতর্ক করার এবং আহকামে মুনাযারার শিক্ষা লাভ করছে, তবে তাকে বিরত রাখবে এবং বলে দেবে, এগুলো আখেরাতের শিক্ষা নয় এবং এমন শিক্ষাও নয়, যার সম্পর্কে জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে এলেম শিখছি, কিন্তু এলেম আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের এলেম হচ্ছে এলমে তফসীর, এলমে হাদীস ও এলমে আখেরাত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী মনীষীগণ মশগুল থাকতেন। যদি শাগরেদ দুনিয়ার উদ্দেশে এসব এলেম শেখে, তবে তাকে নিষেধ করবে না। কেননা, শাগরেদ ওয়ায়েয হওয়ার লোভে এবং মানুষকে তার দলভুক্ত করার আশায় এসব এলেম শিখতে তৎপর হয় এবং প্রায়ই শিক্ষাজীবনে এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। ফলে সে তার নিয়ত ঠিক করে নেয়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি এবং দুনিয়াকে তুচ্ছ ও আখেরাতকে বড় করে দেখার শিক্ষাও রয়েছে। এতে আশা করা যায়, পরিণামে শাগরেদ সঠিক পথে এসে যাবে।

ওস্তাদ যেসব বিষয়ের উপদেশ অন্যকে দেবে, সেগুলো নিজেও মেনে চলবে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাঁকজমক সৃষ্টির বাসনা এমন, যেমন পাখী শিকারের জালের চারপাশে দানা ফেলে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি কামভাব সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকে। জাঁকজমকপ্রীতি সৃষ্টি করার কারণও তাই যে, এর মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা কায়েম থাকবে। এটা উল্লিখিত শিক্ষাসমূহের মধ্যে হতে পারে। কিন্তু নিছক বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি শিক্ষা করা এবং কালাম শাস্ত্রের কলহ বিবাদ আয়ত্ত করা এমন যে, মানুষ এগুলোতেই মশগুল থাকলে এবং অন্য শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্তরের কঠোরতা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গোমরাহীতে পড়ে থাকা ও জাঁকজমক প্রীতিই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোন উপকার হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা আপন রহমতে যাকে বাঁচিয়ে নেন অথবা যে এগুলোর সাথে অন্য ধর্মীয় শিক্ষাও মিলিয়ে নেয়, তার অবশ্য উপকার হতে পারে। একবার সুফিয়ান সওরীকে কেউ দুঃখিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমরা দুনিয়াদারদের জন্যে বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে গেছি। তারা এলেম শিক্ষা করার জন্যে আমাদের পেছনে পড়ে। এরপর যখন শিখে ফেলে, তখন বিচারক, গভর্নর অথবা দারোগা নিযুক্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ শিষ্টাচার, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উত্তম ও সঠিক পন্থা হল, শাগরেদকে কুচরিত্র থেকে যতদূর সম্ভব ইঙ্গিতে ও সস্নেহে নিষেধ করবে। কঠোর ভাষায় এবং ধমকের সুরে শাসাবে না। কেননা, স্পষ্ট ভাষা ভয়ভীতির পর্দা সরিয়ে দেয় এবং বিরুদ্ধাচরণে সাহস যোগায়। সেমতে ওস্তাদকুল শিরোমণি রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

"মানুষকে ছাগলের লেজ চূর্ণ করতে নিষেধ করা হলে তারা তা অবশ্যই চূর্ণ করবে আর বলবে, আমাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।"

হযরত আদম ও হাওয়ার কাহিনী এ বিষয়ের চমৎকার সাক্ষী। কাহিনী জেনে নেয়ার জন্যে আমরা তোমাকে এটা স্মরণ করিয়ে দেইনি, বরং তুমি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যাও। স্পষ্ট ভাষায় না বলার আরেক কারণ, যারা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী, তারা ইঙ্গিতে বললেও অর্থ বুঝে নেয় এবং বুঝে নেয়ার খুশী তাদেরকে আমল করতে উৎসাহিত করে– যাতে অন্যেরা জানে, বিষয়টি তার বুদ্ধিমত্তায় ধরা পড়েছে।

পঞ্চম শিষ্টাচার, ওস্তাদ যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয় তার উপরের শাস্ত্রসমূহের প্রতি শাগরেদের মন বীতশ্রদ্ধ করে না তোলা। উদাহরণতঃ যারা অভিধান শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস শাগরেদের সামনে ফেকাহকে মন্দ বলা এবং যারা ফেকাহ শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস হাদীস ও তফসীর শাস্ত্রের নিন্দা করা। তারা বলে ঃ হাদীস ও তফসীর নিছক ইতিহাসগত এবং শ্রবণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে বিবেকের কোন দখল নেই। কালামশাস্ত্রীরা ফেকাহকে ঘৃণা করে এবং বলে ঃ ফেকাহশাস্ত্র একটি শাখাগত ব্যাপার।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতে মহিলাদের মাসিকের কথা বর্ণিত হয়। এটা কালাম শাস্ত্রের মর্যাদা কিরূপে পেতে পারে, যাতে আল্লাহর সেফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়? ওস্তাদদের এ অভ্যাস খুবই মন্দ, যা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যে ওস্তাদ এক শাস্ত্র শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেয়, তার উচিত শাগরেদের মনে তার উপরের শাস্ত্র শিক্ষা করার পথও খুলে দেয়া।

ষষ্ঠ শিষ্টাচার, ওস্তাদ যেন এমন কোন কঠিন বিষয় বর্ণনা না করেন, যা হৃদয়ঙ্গম করতে শাগরেদের জ্ঞানবুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে, যাতে শাগরেদ ওস্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে অথবা তার বুদ্ধিবিভ্রাট না ঘটে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন ঃ আমরা পয়গম্বরগণ যেন মানুষকে তাদের স্তরে রেখে তাদের বুদ্ধি জ্ঞান অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলি– সেরূপ আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং শাগরেদ ভালরূপে বুঝবে– নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওস্তাদ শাগরেদের সামনে কোন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করবে না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের বোধগম্য নয়, তখন তাদের কিছু লোকের জন্য এটা ফেতনা হয়ে যায়। একবার হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এর মধ্যে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে, যদি এগুলোর সমঝদার থাকে। অর্থাৎ, আমি এসব জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করি না। কারণ, সমঝদার নেই। তিনি সত্যিই বলেছেন ঃ নেক বান্দাদের অন্তর রহস্যের আধার। এ থেকে জানা গেল, আলেম যা জানে, তা যে কোন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। এটা তখন, যখন শিক্ষার্থী বুঝে, কিন্তু উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর যখন বুঝেই না, তখন তার কাছে না বলা অধিক সঙ্গত। ঈসা (আঃ) বলেন ঃ শূকরের গলায় মণি-মাণিক্য পরায়ো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান মণি-মাণিক্যের চেয়ে উত্তম এবং যেব্যক্তি জ্ঞানকে খারাপ মনে করে, সে শূকরের চেয়ে অধম, এজন্যেই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ প্রত্যেককে তার বুদ্ধির মাপকাঠি অনুযয়ী মাপ এবং তদনুযায়ী তার সাথে কথা বল, যাতে তুমি তার কাছ থেকে বেঁচে থাক এবং এবং সে তোমার দ্বারা উপকৃত হয়। নতুবা সে মনোবলের সংকীর্ণতার কারণে মানবে না। জনৈক ব্যক্তি এক আলেমকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীস শুনেননি, যেব্যক্তি উপকারী এলেম গোপন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে, কেয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে। আলেম বললেন ঃ লাগামের কথা রাখ এবং চলে যাও। যদি কোন সমঝদার আসে এবং এলেম গোপন করি, তখন সে আমাকে লাগাম পরিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ

তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নির্বোধদের হাতে সমর্পণ করো না।

এতে হুশিয়ার করা হয়েছে, এলেম যেব্যক্তিকে খারাপ করে দেয় এবং বিভ্রান্তিতে ফেলে, তাকে এলেম থেকে বিরত রাখা উত্তম। অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন বস্তু দেয়া যোগ্যকে না দেয়ার তুলনায় কম জুলুম নয়; বরং উভয় কাজ সমান জুলুম।

সপ্তম শিষ্টাচার, যখন শাগরেদের অবস্থা জানা যায় যে, তার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, তখন ওস্তাদ তাকে তার উপযুক্ত স্থূল বিষয় বলে দেবেন এবং এতে সূক্ষ্ম কথাও আছে, একথাও তাকে বলবেন না। কেননা, এরূপ বললে সেই স্থূল বিষয়ে শাগরেদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাবে। তার মন বিক্ষিপ্ত হবে এবং বলবে, তাকে শিক্ষাদানে কুণ্ঠাবোধ করা হচ্ছে। নিজের ধারণায় প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, সে প্রতিটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপযুক্ত। প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার প্রতি এজন্যে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন। অথচ বাস্তবে সেই বেশী নির্বোধ, যে তার বুদ্ধি পূর্ণ হওয়ার ধারণায় বেশী আনন্দিত হয়। এ থেকে জানা যায়, সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেউ শরীয়ত অনুসারী হয় এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ নতুন ব্যাখ্যা ছাড়াই তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তার বিশ্বাসকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়; বরং তাকে তার কাজে মশগুল থাকতে দেয়া উচিত। কেননা, তার সামনে বাহ্যিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলে সে সাধারণের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে দাখিল হওয়া তার জন্যে সহজ হবে না। ফলে তার মধ্যে ও গোনাহের মধ্যে যে আড়াল ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। এর পর সে পুরোপুরি অবাধ্য শয়তান হয়ে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে। সুতরাং সাধারণের সামনে সূক্ষ্ম জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করা উচিত নয়; বরং তাদেরকে কেবল এবাদত এবং যেসব কাজ তারা করে, তাতে ঈমানদারী শিক্ষা দেয়া সমীচীন। কোরআনের বিষয়বস্তু অনুযায়ী জান্নাতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আগ্রহ এবং দোযখের ভয় দ্বারা তাদের অন্তর পূর্ণ করে দেয়া উচিত। তাদের সামনে কোন সন্দেহের অবতারণা করা যাবে না। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ তাদের মনে আটকে থাকে এবং তা বের হওয়া কঠিন হয়। ফলে তারা বরবাদ হয়ে যায়। সারকথা, সাধারণ লোকদের জন্যে বিতর্কের দ্বার উন্মোচিত করা উচিত নয়।

অষ্টম শিষ্টাচার, ওস্তাদ স্বীয় এলেম অনুযায়ী আমল করবেন। তার কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল থাকতে পারবে না। কারণ, এলেম অন্তরের চক্ষু দ্বারা জানা যায়, আর আমল বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা। বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখে এমন লোক অনেক। এমতাবস্থায় আমল এলেমের বিপরীত হলে হেদায়েত হবে না। যেব্যক্তি নিজে এক কাজ করে এবং অপরকে তা ক্ষতিকারক বলে করতে নিষেধ করে, মানুষ তার সাথে উপহাস করে এবং সেই কাজ করতে অধিক আগ্রহী হয়। তারা বলে, এ কাজটি ভাল ও আনন্দদায়ক না হলে ওস্তাদজী করেন কেন? ওস্তাদ ও শাগরেদ বাঁশ ও তার ছায়ার মত। যদি বাঁশ নিজে সোজা না হয়, তবে ছায়া সোজা হবে কিরূপে? আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও?

এতদসত্ত্বেও আলেমের উপর গোনাহের শাস্তি জালেমের তুলনায় বেশী হয়। কেননা, আলেম গোনাহে লিপ্ত হলে এক বিশ্ব গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। মানুষ তার অনুসরণ করে। যেব্যক্তি কোন কুরীতি আবিষ্কার করে, তার উপর নিজের এবং যারা এ কুরীতির অনুসরণ করে তাদের গোনাহ্ বর্তে থাকে। এ জন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ দু'ব্যক্তি আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে– এক, সেই আলেম, যে তার ইজ্জত হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। দুই, সেই মূর্খ, যে দরবেশ হওয়ার ভান করছে। কেননা, মূর্খ দরবেশ হয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং আলেম গোনাহ্ করে বিভ্রান্তি ছাড়ায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের আলামত

ভাল আলেম সম্পর্কে বর্ণিত শাস্তিবাণী থেকে জানা যায়, কেয়ামতে অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিকতর কঠোর শাস্তি মন্দ আলেমদের উপরই হবে। তাই যেসকল আলামত ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের মধ্যে পার্থক্য করে, সেগুলো জানা জরুরী। আমাদের মতে দুনিয়ার আলেম মানে মন্দ আলেম, যাদের উদ্দেশ্য এলেম দ্বারা দুনিয়া উপভোগ করা এবং দুনিয়াবাসীদের কাছে সম্মান, জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সকল মানুষের তুলনায় কঠোর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ্ তাআলা এলেম দ্বারা কোন উপকার দেননি। তিনি আরও বলেন ঃ এলেম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত মানুষ আলেম হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে-

العلم علمان علم على اللسان فذالك حجة الله تعالى على ابن ادم وعلم فى القلب وذالك العلم النافع .

এলেম দু'প্রকার- এক মৌখিক এলেম। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জব্দ করবেন। দুই, অন্তরস্থিত এলেম। এটাই উপকারী এলেম। আরও বলেন ঃ শেষ যমানায় এবাদতকারী মূর্খ হবে এবং আলেম পাপাচারী হবে। আরও বলেন ঃ আলেমদের সাথে গর্ব করা, বোকাদের সাথে তর্ক করা এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করো না। যে এরূপ উদ্দেশে এলেম শিখবে, সে দোযখে যাবে। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের এলেম গোপন করবে, আল্লাহ্ তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। আরও বলেন ঃ অবশ্যই আমি দাজ্জালকে ততটুকু ভয় করি না, যতটুকু দাজ্জাল নয় এমন ব্যক্তিকে ভয় করি। প্রশ্ন করা হল ঃ সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি পথভ্রষ্টকারী শাসকদেরকে ভয় করি। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেমে বেশী এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হেদায়েতে কম, সে আল্লাহ্ তাআলার থেকে বেশী দূরে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ কতদিন তুমি শেষ রাত্রের পথিকদের জন্যে পথ পরিষ্কার করবে এবং নিজে বিস্ময়াবিষ্টদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে? এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এলেমের বড় বিপদ। কেননা, আলেম ব্যক্তি হয় চিরতরে ধ্বংস হওয়ার পথে, না হয় চিরন্তন সৌভাগ্যের পথে থাকে। এলেমে ডুব দিয়ে যদি সৌভাগ্য না হয়, তবে নিরাপত্তা থেকেও বঞ্চিত থাকবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের জন্যে আমি মোনাফেক আলেমকে অধিক ভয় করি। প্রশ্ন করা হল ঃ মোনাফেক আবার আলেম হবে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ যে মুখে মুখে আলেম কিন্তু অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে জাহেল, সেই মোনাফেক আলেম। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে হয়ো না, যারা আলেম ও দার্শনিকদের মত এলেম রাখে; কিন্তু আমলে মূর্খদের সমান। এক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি এলেম শিক্ষা করতে চাই, কিন্তু ভয় হয়, কোথাও তা বিনষ্ট না করে দেই। তিনি বললেন ঃ তোমার এলেম ত্যাগ করে বসাই এলেম বিনষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। ইবরাহীম ইবনে ওকবাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অনুতাপ কার হয়? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সেই সর্বাধিক অনুতপ্ত হয়, যে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করে। মৃত্যুর সময় সেই আলেম সর্বাধিক অনুতপ্ত হবে, যে আমলে ত্রুটি করেছে। খলীল ইবনে আহমদ বলেন ঃ মানুষ চার প্রকার– এক, যে বাস্তবে জানে এবং এটাও জানে যে, সে জানে, এরূপ ব্যক্তি আলেম। তার অনুসরণ কর। দুই, যে জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সে জানে। সে নিদ্রিত। তাকে জাগাও। তিন, যে জানে না কিন্তু এটা জানে যে, সে জানে না। এরূপ ব্যক্তি হেদায়েতের যোগ্য। তাকে হেদায়েত কর। চার, যে জানে না এবং এটাও জানে না যে, সে জানে না, সে মূর্খ। তাকে বর্জন কর। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ এলেম আমলকে ডাকে। আমল সাড়া না দিলে এলেম বিদায় হয়ে যায়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ মানুষ যতক্ষণ এলেম অন্বেষণে থাকে, ততক্ষণ সে আলেম। আর যখন মনে করে, তার জানা হয়ে গেছে, তখন সে জাহেল। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আমার দয়া হয়– এক, যে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত ছিল, এরপর লাঞ্ছিত হয়ে গেছে। দুই, যে ধনী ছিল, এখন নিঃস্ব হয়ে গেছে। তিন, যে আলেমকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়ে দুনিয়া খেলা করে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন ঃ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু। আর অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা। এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার অর্থ এই ঃ আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে হেদায়েত ছেড়ে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে। যে দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে তার জন্যে আরও আশ্চর্য লাগে। তাদের চেয়ে অধিক আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে অপরের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রয় করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ان العالم ليعذب عذابا يطوف به اهل النار استعظاما لشدة عذابه .

আলেমকে এমন কঠোর আযাব দেয়া হবে, যার কঠোরতার কারণে দোযখীরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এতে বিপথগামী আলেমের আযাবের কথা বলা হয়েছে। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق اقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطوف به اهل النار فيقولون مالك فيقول كنت امر بالخير ولا اتيه وانهى عن الشروات به .

কেয়ামতের দিন আলেমকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা যাঁতাকল নিয়ে ঘুরে। দোযখীরা তার আশেপাশে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে– তোমার এ পরিণতি কেন? সে বলবে ঃ আমি অপরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম, নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম।

গোনাহের কারণে আলেমের আযাব দ্বিগুণ হওয়ার কারণ, সে জেনে শুনে নাফরমানী করে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, "মোনাফেক দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" কারণ, তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে খৃষ্টানদের চেয়ে অধিক ঘৃণিত বলেছেন; অথচ ইহুদীরা আল্লাহ তাআলাকে ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ (তিন জনের তৃতীয় জন) বলেনি, কিন্তু তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। সেমতে আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ তারা তাকে চেনে যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। অন্যত্র বলেন ঃ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ তাদের পরিচিতজন যখন তাদের কাছে আসল, তারা তাকে অস্বীকার করে বসল। অতএব আল্লাহর অভিসম্পাত অস্বীকারকারীদের উপর।

বালআম ইবনে বাউরার কাহিনীতে বলা হয়েছে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ـ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ـ

"তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম। অতঃপর সে সেগুলো থেকে বের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান তার পেছনে লাগল এবং সে পথভ্রান্তদের দলভুক্ত হয়ে গেল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে তাকে এগুলো দ্বারা উপরে তুলে নিতে পারতাম, কিন্তু সে পৃথিবীতে স্থায়ী হল এবং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করল। অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়। তুমি তার উপর বোঝা চাপালে হাঁপায় এবং ছেড়ে দিলেও হাঁপায়।

পাপাচারী আলেমের অবস্থাও তদ্রূপ। বালআমও আল্লাহর কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সে কামনাকে আঁকড়ে রইল। তাই তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে জ্ঞান প্রাপ্ত হোক না হোক সর্বাবস্থায় হাঁপায়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ মন্দ আলেমরা এমন, যেমন নালার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুখে কোন পাথর রেখে দেয়া হয়। সে নিজেও পানি পান করে না এবং তা ফসলের ক্ষেতে প্রবাহিত হতেও দেয় না। এসব হাদীস ও স্মরণীয় বাণী থেকে জানা যায়, দুনিয়াদার আলেম জাহেলের তুলনায়ও শোচনীয় অবস্থা এবং কঠোর আযাবে থাকবে। যারা সফলকাম ও নৈকট্যশীল আলেম, তাঁরা ভাল আলেম অর্থাৎ, আখেরাতের আলেম। তাঁদের অনেক আলামত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি, তাঁরা তাঁদের এলেম দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করেন না। কেননা, আলেমের সর্বনিম্নস্তর, সে দুনিয়ার হেয়তা, নীচতা, মলিনতা, স্থায়িত্বহীনতা এবং আখেরাতের মাহাত্ম্য, স্থায়িত্ব, তার নেয়ামতের পরিচ্ছন্নতা এবং রাজত্বের বিশালতা জেনে নেবে। সে আরও জানবে, দুনিয়া ও আখেরাত একে অপরের বিপরীত– দু'সতীনের মত– একজনকে খুশী করলে অন্যজন নাখোশ হয়ে যায়; নিক্তির দু'পাল্লার মত– একটি যতই নীচে ঝুঁকে, অপরটি ততই উপরে উঠে। অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মত– যতই একটির নিকটে যাবে ততই অপরটি থেকে দূরে সরে পড়বে। অথবা দুপেয়ালার মত– একটি ভর্তি ও অপরটি খালি; ভর্তিটি থেকে যে পরিমাণে খালিটি ভরবে, সেই পরিমাণে ভর্তিটি খালি হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি দুনিয়াকে এরূপ জানে না, তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। কারণ এটা দেখা ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই জানা যায়। যার জ্ঞান বুদ্ধিই ত্রুটিযুক্ত, সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি আখেরাতের মাহাত্ম্য ও স্থায়িত্ব বুঝে না, সে কাফের, ঈমান বর্জিত। যার ঈমানই নেই সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের বৈপরীত্য জানে না, সে পয়গম্বরগণের শরীয়ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং কোরআন পাক আদ্যোপান্ত অস্বীকার করে। এহেন ব্যক্তি আলেমরূপে গণ্য হবে কিরূপে? যেব্যক্তি এসব বিষয় জেনে আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেয় না, সে শয়তানের বন্দী। তার কামনা বাসনা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য তার উপর প্রবল হয়ে গেছে। এরূপ ব্যক্তিও আলেমদের দলভুক্ত হতে পারে না। হযরত দাউদ (আঃ)-এর রেওয়ায়েতেসমূহে আল্লাহ তাআলার উক্তি এভাবে বর্ণিত আছে– আলেম ব্যক্তি যখন তার কামনা অবলম্বন করে, তখন আমি তাকে সামান্যতম শাস্তি এই দেই যে, তাকে আমার মোনাজাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে দেই। হে দাউদ! আমার অবস্থা এমন আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করো না, যাকে দুনিয়া পাগলপারা করে দিয়েছে। তা হলে সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমাকে আমার মহব্বতের পথে বাধা দেবে। এ ধরনের লোক আমার বান্দাদের জন্যে ডাকাতস্বরূপ। হে দাউদ! তুমি কাউকে আমাকে অন্বেষণ করতে দেখলে তার খাদেম হয়ে যাও। হে দাউদ! যেব্যক্তি কোন পলাতক বান্দাকে আমার দিকে সরিয়ে আনে, আমি তাকে সতর্ককারী ও দায়িত্ববানরূপে লিপিবদ্ধ করি, তাকে কখনও শাস্তি দেই না। এ জন্যেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু। অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া কামনা করা। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাযী বলেন ঃ এলেম ও জ্ঞান দ্বারা যখন দুনিয়া কামনা করা হয়, তখন তার জ্যোতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মসঊদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন ঃ আলেম যখন কথা ফাঁস করে, তখন সে চোর। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি আলেমকে দুনিয়া প্রত্যাশী দেখ, তখন তাকে দ্বীনের ব্যাপারে দোষী মনে কর। কেননা, যে সে বিষয়ের প্রত্যাশী, সে তাতেই মগ্ন থাকে। মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি এক পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করেছি– আলেম যখন দুনিয়াকে মহব্বত করে, তখন আমি নিম্নতম শাস্তিস্বরূপ মোনাজাতের মিষ্টতা তার মন থেকে দূর করে দেই। জনৈক ব্যক্তি তার ভ্রাতাকে লেখল ঃ তোমাকে এলেম দান করা হয়েছে। এখন এলেমের নূর গোনাহের অন্ধকার দ্বারা নির্বাপিত করো না। নতুবা যেদিন আলেমগণ তাদের এলেমের আলোকে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায রাযী দুনিয়াদার আলেমদেরকে বলতেন ঃ আলেমগণ! তোমাদের প্রাসাদ কায়সারের মত এবং গৃহ কেসরার মত। তোমাদের পোশাক খুব পরিপাটি, মোজা জালুতের মত, সওয়ারী কারূনের মত, পাত্র ফেরআউনের মত, গোনাহ মূর্খের মত এবং মাযহাব শয়তানের মত। অতএব মুহাম্মদী শরীয়ত কোথায়? জনৈক ব্যক্তি একজন সাধককে জিজ্ঞেস করল ঃ যেব্যক্তি গোনাহ করলে শাস্তি পায়, আপনার মতে সে কি আল্লাহ তাআলাকে চেনে না? সাধক বললেন ঃ যার কাছে দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার রাখে, সে আল্লাহ তাআলাকে চেনে না– এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আখেরাতের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে ধন-সম্পদ বর্জন করা যথেষ্ট– এরূপ মনে করো না। কেননা, আড়ম্বরপ্রীতির ক্ষতি ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী। এ জন্যেই বিশর (রহঃ) বলেন–حدثنا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শব্দটি যা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, দুনিয়ার দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। তিনি দশ বস্তারও কিছু বেশী কিতাব দাফন করে দেন এবং বলেন ঃ আমার হাদীস বর্ণনা করার স্পৃহা আছে। এ স্পৃহা দূর হয়ে গেলে পরে হাদীস বর্ণনা করব। তাঁরই অথবা অন্য কোন বুযুর্গের উক্তি, যখন তোমার হাদীস বলার ইচ্ছা হয় তখন চুপ করে থাক। আর যখন ইচ্ছা না হয়, তখন হাদীস বর্ণনা কর। কারণ, শিক্ষাদান ও পথপ্রদর্শকের পদমর্যাদায় যে জাঁকজমকপ্রীতি আছে, তা সকল জাগতিক আনন্দের চেয়ে বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে তার ইচ্ছা অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য হবে। এ কারণেই সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ হাদীসের ফেতনা ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ফেতনার চেয়ে অধিক। এ ফেতনা অধিক ভয় করার যোগ্য বিধায় আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলেছেন–

وَلَوْ لَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ـ

"আমি যদি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম, তবে তাদের প্রতি আপনার মন সামান্য ঝুঁকে পড়ত।"

সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষ মৃত। আমেল ব্যতীত আলেমগণও সকলেই মাতাল। এখলাস ছাড়া সকল আমেলও ভ্রান্ত। যাদের এখলাস আছে তারাও ভীত, তাদের পরিণাম কি হবে? আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন হাদীস তলব করে অথবা বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে, তখন সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হাদীস তলবের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য থাকে উচ্চ সনদ লাভ অথবা এমন হাদীস তলব করা, যার প্রয়োজন আখেরাতে নেই। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির গতি আখেরাতের দিকে এবং সে দুনিয়ার পথে ধাবমান হয়, সে আলেম হবে কিরূপে? সালেহ ইবনে হাস্সান নফরী বলেন ঃ আমি অনেক বড় বড় ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা সকলেই হাদীসের পাপাচারী আলেম থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

يصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة -

"যে শিক্ষা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, কেউ যদি সেই শিক্ষা দুনিয়ার অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে অন্বেষণ করে, তবে সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"

আল্লাহ তা'আলা মন্দ আলেমের এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, সে এলেম দ্বারা দুনিয়া ভক্ষণ করে। তিনি ভাল আলেমের গুণস্বরূপ বিনয় ও সংসারের প্রতি অনাসক্তি উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার আলেম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا -

"যখন আল্লাহ তা'আলা কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন, তারা এই কিতাব মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা এই অঙ্গীকার পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং এর বিনিময়ে সামান্য দুনিয়া ক্রয় করে নিল। আখেরাতের আলেমদের শানে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

"কিতাবধারীদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর জন্যে বিনয়াবনত হয়ে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে না। তাদের জন্যেই তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক মনীষী বলেন ঃ আলেমগণ পয়গম্বরগণের দলভুক্ত হয়ে উত্থিত হবে। বিচারকদের হাশর হবে রাজা বাদশাহদের দলে। যে ফেকাহবিদ এলেম দ্বারা দুনিয়া হাসিল করে, সে-ও বিচারকদের অনুরূপ। আবু দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জনৈক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, যারা দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশে ফেকাহবিদ হয়, আমল না করার জন্যে এলেম শেখে, আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করে, মানুষের দৃষ্টিতে ছাগলের চামড়া পরিধান করে এবং তাদের অন্তর ব্যাঘ্রের মত, মুখ মধুর চেয়ে মিষ্ট, অন্তর ইলুয়ার চেয়ে তিক্ত, আমাকেই প্রতারণা করে এবং আমার সাথেই ঠাট্টা করে, তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের জন্যে এমন অনর্থ সৃষ্টি করব, যা সহনশীল ব্যক্তিও সইতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের আলেম দুব্যক্তি– এক, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, সে মানুষের মধ্যে তা ব্যয় করে এবং অর্থের লোভ করে না। এরূপ ব্যক্তির প্রতি আকাশের পাখী, সমুদ্রের মাছ, পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু এবং কেরামান কাতেবীন রহমতের দোয়া করে। সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে নেতা ও সম্ভ্রান্ত হয়ে আসবে; এমনকি, রসূলগণের সঙ্গে থাকবে। দুই, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, কিন্তু সে তা মানুষকে দান করতে কৃপণতা করে, অর্থের লোভ করে এবং এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট দুনিয়া ক্রয় করে। এরূপ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় আসবে। জনৈক ঘোষক মানুষের সামনে ঘোষণা করবে– সে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে এলেম দিয়েছিলেন কিন্তু, সে কৃপণতা করেছে। মানুষকে এলেম শেখায়নি এবং লোভের হাত প্রসারিত করেছে। সকল মানুষের হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আযাবের মধ্যে থাকবে।

এর চেয়েও কঠোর রেওয়ায়েত এটি– এক ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমত করত। সে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আমাকে মূসা সফিউল্লাহ একথা বলেছেন, মূসা নাজিউল্লাহ এরূপ বলেছেন এবং মূসা কলীমুল্লাহ এমন বলেছেন। অবশেষে তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ হয়ে যায়। সেব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) তার খোঁজ নিতে শুরু করলেন; কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে এক ব্যক্তি একটি শূকরের গলায় কালো রশি বেঁধে উপস্থিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হল এবং আরজ করল ঃ আপনি অমুক ব্যক্তিকে চেনেন? মূসা (আঃ) বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল ঃ এ শূকরটিই সেব্যক্তি। মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী! একে আসল আকৃতিতে ফিরিয়ে দিন, যাতে তাকে এরূপ দশা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন। আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পয়গম্বরগণ ও ওলীগণ আমাকে যেসব গুণে ডেকেছে, যদি তুমি সেসব গুণে আমাকে আহ্বান কর, তবুও আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করব না, কিন্তু যে কারণে আমি তার আকৃতি বিকৃত করে দিয়েছি, তা বলে দিচ্ছি। এ ব্যক্তি দ্বীনের বদলে দুনিয়া অন্বেষণ করত।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আরও কঠোর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আলেমের কাছে বলা যদি শ্রবণের চেয়ে উত্তম হয়, তবে এটা তার জন্যে একটি বিপদ। অথচ বলার মধ্যে সাজানো গুছানো ও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। বক্তা ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে না। চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা ও বুদ্ধিমত্তা নিহিত। কোন কোন আলেম তাদের এলেম কুক্ষিগত করে রাখে; অন্যের কাছেও এলেম থাকুক এটা তারা চায় না। এরূপ আলেম দোযখের প্রথম স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম এলেমের ব্যাপারে বাদশাহর মত হয়ে থাকে। কোন আপত্তি তোলা হলে অথবা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে, তারা রেগে-মেগে আগুন হয়ে যায়। এরূপ আলেম দোযখের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম তাদের এলেম ও উত্তম হাদীসগুলো বিশেষভাবে ধনীদের জন্যে উৎসর্গ করে, যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে এই এলেমের যোগ্য মনে করে না। এরূপ আলেম দোযখের তৃতীয় স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম নিজেদেরকে মুফতী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পদ গ্রহণকারীদেরকে পছন্দ করেন না। এরূপ আলেম দোযখের চতুর্থ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম দোযখের পঞ্চম স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম নিজের এলেমকে মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের উপায় সাব্যস্ত করে। এরূপ আলেম দোযখের ষষ্ঠ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম অহংকার ও আত্মম্ভরিতাকে নগণ্য বলে মনে করে, রূঢ় ভাষায় ওয়ায করে এবং কেউ উপদেশ দিলে নাক সিঁটকায়। এরূপ আলেম দোযখের সপ্তম স্তরে থাকবে। তোমার উচিত এলেমে চুপ থাকা, যাতে শয়তানের উপর প্রবল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হতে পার। কোন হাসির কথা ছাড়া কখনও হাসবে না এবং প্রয়োজন ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না। অন্য এক হাদীসে আছে–

ان العبد لينتشر له من الثناء ما يملا ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضه ـ

অর্থাৎ, "মানুষের সুখ্যাতি এত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, যা পূর্ব ও পশ্চিমকে পূর্ণ করে দেয়। অথচ আল্লাহর কাছে তা মাছির ডানার সমানও নয়।"

আরও বর্ণিত আছে, একবার হযরত হাসান বসরী ওয়াযের মজলিস থেকে উঠলে জনৈক খোরাসানী বিত্তশালী ব্যক্তি পাঁচ হাজার দেরহাম ও দশ থান চিকন কাপড়ের একটি পুঁটলি তাঁকে নযরানা হিসাবে পেশ করল। সে আরজ করল ঃ দেরহামগুলো খরচ করার জন্যে আর কাপড় পরিধান করার জন্যে পেশ করলাম। হযরত হাসান বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আপদমুক্ত রাখুন। এই দেরহাম ও থান তুলে নাও এবং নিজের কাছেই রেখে দাও। আমার এর প্রয়োজন নেই। যেব্যক্তি আমার মজলিসে বসে এমন নযরানা কবুল করে, সে যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে যাবে, তখন তার দ্বীনদারী থাকবে না। জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কোন আলেমের কাছে বসো না; বরং এমন আলেমের কাছে বসো, যে পাঁচটি বিষয় থেকে পাঁচটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করে– (১) সন্দেহ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে, (২) রিয়া থেকে এখলাসের দিকে, (৩) সংসারাসক্তি থেকে সংসার ত্যাগের দিকে, (৪) অহংকার থেকে বিনয়ের দিকে, (৫) শত্রুতা থেকে শুভেচ্ছার দিকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ وَّقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, অতঃপর কারূন সেজেগুজে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ হায়, কারূনের মত ধন আমরা কিরূপে পাব! নিশ্চয় সে মহা ভাগ্যবান। আর যারা এলেম প্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল ঃ তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া সওয়াব তাদের জন্যে উত্তম, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে। একথা তাদের মনেই লাগে, যারা সবরকারী।

এ আয়াতে আলেমদের এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তা অবলম্বন করে। আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁদের কাজ কথার বিপরীত হয় না। বরং তাঁরা কোন কাজ করার কথা তখনই বলেন, যখন নিজেরা তা করে নেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের কথা বল আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ـ

তোমরা যা করবে না তা বলবে, এটা আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে—

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ

তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করি, আড়ালে আমি করব— এটা আমি চাই না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ـ আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا —আল্লাহকে ভয় কর এবং জ্ঞানার্জন কর। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا —আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বললেন ঃ হে মরিয়ম তনয়, নিজেকে উপদেশ দাও। নিজে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে গেলে অপরকে উপদেশ দাও। নতুবা আমাকে লজ্জা কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

مررت ليلة اسرى بى باقوام كان تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من انتم قالوا كنا نأمر بالخير ولا ناتيه وننهى عن الشر وناتيه -

অর্থাৎ, মে'রাজের রাতে আমি এমন লোকদের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি বললাম ঃ তোমরা কারা? তারা বলল ঃ আমরা অপরকে সৎকাজ করতে বলতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না। অপরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেরা তা করতাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পাপাচারী আলেম ও মূর্খ আবেদের কারণে আমার উম্মত বরবাদ হবে। সকল মন্দের মন্দ হচ্ছে মন্দ আলেম এবং সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভাল আলেম। আওযায়ী বলেন ঃ খৃস্টানদের গোরস্থান এই মর্মে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করল যে, কাফের মৃতদের দূর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলে পাঠালেন ঃ মন্দ আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ তোমাদের মধ্যকার দুর্গন্ধের চেয়ে বেশী। ফোযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ আমি শুনেছি, কেয়ামতে পৌত্তলিকদের পূর্বে মন্দ আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যে জানে না, তার তো একবার দুর্ভোগ হবে; আর যে জানে এবং আমল করে না, তার দুর্ভোগ হবে সাত বার। শা'বী (রহঃ) বলেন, জান্নাতের কিছু লোক দোযখের কোন কোন লোককে দেখে বলবেন ঃ তোমরা দোযখে গেলে কেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের শিক্ষা দানের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন? তারা বলবে ঃ আমরা অপরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা পালন করতাম না। হাতেম আসাম্ম (রহঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সেই আলেমের চেয়ে অধিক অনুতাপ আর কারও হবে না, যে মানুষকে এলেম শিক্ষা দিয়েছে এবং মানুষ তদনুযায়ী আমল করেছে, কিন্তু সে আমল করেনি। মানুষ তো তার সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে ধ্বংস হয়েছে।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আলেম যখন তার এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তখন তার উপদেশ মানুষের মন থেকে এমনভাবে ফসকে যায়, যেমন মসৃণ পাথরের উপর থেকে পানির ফোঁটা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গড়িয়ে পড়ে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ মক্কা মোয়াজ্জমায় আমি এক পাথরের কাছ দিয়ে গেলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ আমাকে উল্টিয়ে জ্ঞান অর্জন কর। আমি পাথরটি উল্টিয়ে দিলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ তুমি যা জান, তদনুযায়ী আমল কর না। সুতরাং এমন বিষয় কেন জানতে চাও, যা তোমার জানা নেই। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ অনেক মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহকে ভুল বসে আছে। অনেকে আল্লাহর সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু নিজেরা ভয়হীন। অনেক মানুষ অপরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অনেক মানুষ আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, কিন্তু তার আয়াতসমূহ থেকে দূরে থাকে।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ আমরা যখন কথাবার্তা শুদ্ধ করলাম, তখন তাতে আর ভুল করলাম না, কিন্তু আমলে ভুল করলাম, তা ঠিক করিনি। আওযায়ী বলেন ঃ যখন বক্তব্যে অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে যায়, তখন বিনয় ও নম্রতা অবশিষ্ট থাকে না। আবদুর রহমান ইবনে গনম বলেন ঃ আমার কাছে দশ জন সাহাবী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে কোবায় জ্ঞানচর্চায় রত ছিলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে তশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ যে পরিমাণ ইচ্ছা শিখে নাও, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সওয়াব দেবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম শেখে এবং তদনুযায়ী আমল করে না, সে এমন, যেমন কোন নারী সংগোপনে যিনা করে এবং গর্ভ সঞ্চার হয়ে যায়। এর পর যখন গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন সে লাঞ্ছিত হয়। যেব্যক্তি এলেম অনুযায়ী আমল করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাকেও কেয়ামতের দিন সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত করবেন। হযরত মুআয (রহঃ) বলেন ঃ আলেমের পদস্খলনকে ভয় কর। কেননা, মানুষের মধ্যে তার কদর বেশী। তার পদস্খলনে মানুষ তার অনুসরণ করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন আলেমের পদস্খলন ঘটে, তখন তার পদস্খলনে এক বিশ্ব পদস্খলিত হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে দুনিয়ার মানুষ বরবাদ হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আলেমের পদস্খলন। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এমন এক সময় আসবে, যখন মনের মিষ্টতা তিক্ত হয়ে যাবে। তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এলেম দ্বারা আলেমের উপকার হবে না এবং তালেবে এলেমও উপকৃত হবে না। তখন আলেমদের অন্তর হবে লোনা মাটির মত, যার উপর পানির ফোঁটা পড়লেও সামান্য মিষ্টতাও অনুভূত হয় না। এটা তখন হবে যখন আলেমদের অন্তর দুনিয়ার মহব্বতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা অন্তর থেকে জ্ঞানের ঝরণা বের করে হেদায়েতের প্রদীপ নির্বাপিত করে দেবেন। তখন আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা মুখে বলবে ঃ আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু পাপাচার তাদের আমলের মধ্যে প্রকট থাকবে। ভাষার ছড়াছড়ি হবে এবং অন্তর দুষ্প্রাপ্য হবে। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, এটা এজন্যে হবে যে, ওস্তাদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখাবে এবং শাগরেদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখবে। তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত আছে– যে বিষয় তুমি জান না, তার এলেম অন্বেষণ করো না, যতটুকু জান তদনুযায়ী আমল কর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে যমানায় রয়েছ, তাতে কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতি সত্বর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ অনুযায়ী আমল করলেও মুক্তি পেয়ে যাবে। এটা হবে মিথ্যুকদের আধিক্যের কারণে। জেনে রাখ, আলেম হল কাযী তথা বিচারপতির মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

القضاة ثلثة قاضى قضى بالحق وهو يعلم فذالك فى الجنة وقاضى قضى بالجور وهو يعلم اولا يعلم فهما فى النار -

অর্থাৎ, বিচারপতি তিন প্রকার– এক, যে সত্য বিচার করে এবং সে আলেম। সে জান্নাতে থাকবে। দুই, যে অন্যায় বিচার করে এবং সে আলেম অথবা– তিন, আলেম নয়। এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে।

কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় এমন আলেম হবে, যারা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হতে বলবে এবং নিজেরা অনাসক্ত হবে না, মানুষকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং নিজেরা ভয় করবে না, মানুষকে শাসকবর্গের কাছে যেতে বারণ করবে এবং নিজেরা তাদের কাছে যাবে। এরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়া অবলম্বন করবে এবং মুখের জোরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাবে। ধনীদেরকে কাছে বসাবে– ফকীরদেরকে নয়। এরা এলেম নিয়ে লড়াই করবে, যেমন নারীরা পুরুষকে নিয়ে লড়াই করে। তাদের কোন সহচর অপরের কাছে বসলে তারা তার উপর রাগান্বিত হবে। এরা হবে অহংকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার দুশমন।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান কোন সময় এলেমের মাধ্যমেই তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ শয়তান বলবে– এলেম শেখ এবং শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমল করো না। সুতরাং মানুষ এলেমে ব্যাপৃত থাকবে এবং আমলে টালবাহানা করবে। অবশেষে সে কোন আমল না করেই মারা যাবে। সিররী সকতী (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি এলমে জাহেরের প্রতি লোভী ছিল। সে এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করলে আমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, কেউ বলছে ঃ আল্লাহ তোমাকে বিনাশ করুন, তুমি এলেমকে আর কত নাশ করবে? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমি তো এলেমকে স্মরণ করি। সে বলল ঃ এলেমকে স্মরণ করা হচ্ছে এলেম অনুযায়ী আমল করা। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি এলেমের অন্বেষণ বর্জন করে আমলে আত্মনিয়োগ করেছি। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক রেওয়ায়েত দ্বারা এলেম হয় না, বরং এলেম হচ্ছে খোদাভীতি। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যত ইচ্ছা এলেম শেখ, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ সওয়াব দেবেন না। কেননা, এলেম দ্বারা বোকাদের উদ্দেশ্য রেওয়ায়েত করা, আর আলেমদের উদ্দেশ্য নিজেদের পাহারা দেয়া। মালেক বলেন ঃ এলেম অর্জন করা ও তা ছড়িয়ে দেয়া উভয়ই ভাল, যদি নিয়ত ঠিক থাকে, কিন্তু যে বস্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সাথে থাকে তার উপর অন্য বস্তু অবলম্বন করো না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমল করার জন্যে কোরআন নাযিল হয়েছে। তোমরা এর পাঠ ও পাঠ দানকেই আমল সাব্যস্ত করে নিয়েছ। সত্বরই কিছু লোক হবে, যারা একে বর্শার মত সোজা করবে। তারা ভাল লোক হবে না। যে আলেম আমল করে না সে রোগীর মত, যে ওষুধের গুণাগুণ বর্ণনা করে, অথবা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে সুস্বাদু খাদ্যের নাম উচ্চারণ করে কিন্তু নিজে তা পায় না। এরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ وَلَكُمُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ। তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ যা বল তার কারণে। হাদীসে আছে– আমি আমার উম্মতের জন্যে যে বিষয়ের ভয় করি, তা হচ্ছে আলেমের পদস্খলন। কোরআনের বর্ণনা মতে আখেরাতের আলেমদের একটি আলামত, তাদের মনোযোগ এমন এলেমের দিকে থাকে, যা আখেরাতে কাজে আসে এবং এবাদতে উৎসাহ যোগায়। যেব্যক্তি আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে থাকে, সে সেই রোগীর মত, যে চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং চিকিৎসক কোথাও যাওয়ার জন্যে উদ্যত থাকে। সংকীর্ণ সময়ে রোগী চিকিৎসকের সাথে ওষুধের গুণাগুণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় মেতে উঠে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে না। এরূপ ব্যক্তির বোকামিতে কোন সন্দেহ আছে কি? রেওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল ঃ আমাকে কিছু এলেমের কথাবার্তা শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলাকে চিনেছ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে যাও। প্রথমে এসব বিষয়ে পাকাপোক্ত হও। এরপর তোমাকে নতুন নতুন বিষয়ও বলে দেব।

শাকীক বলখী (রহঃ)-এর শাগরেদ হাতেম আসামের মত শিক্ষা হওয়া উচিত। বর্ণিত আছে, একদিন শাকীক হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কতদিন ধরে আমার সাথে রয়েছ ? হাতেম বললেন ঃ তেত্রিশ বছর ধরে। শাকীক বললেন ঃ এ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কি শিখলে? হাতেম বললেন ঃ আমি আটটি মাসআলা শিক্ষা করেছি। শাকীক বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার সময় তোমার জন্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তুমি মাত্র আটটি বিষয় শিখলে ? হাতেম বললেন ঃ ওস্তাদ, আমি বেশী শিখিনি। মিথ্যা বলা আমি পছন্দ করি না। শাকীক বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো সে আটটি বিষয় কি, যা তুমি শিখেছ ? হাতেম বললেন ঃ প্রথম, আমি মানুষকে দেখলাম, প্রত্যেকের একটি প্রিয় বস্তু থাকে যা কবর পর্যন্ত তার সাথে থাকে। যখন সে কবরে পৌঁছে যায়, তখন সে প্রিয় বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাই আমি সৎকর্মকে আমার প্রিয় বস্তু সাব্যস্ত করেছি, যাতে আমি কবরে গেলে আমার প্রিয় বস্তুও আমার সাথে থাকে। শাকীক বললেন ঃ তুমি চমৎকার শিখেছ। এখন বাকী সাতটি বল। হাতেম বললেন ঃ দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছি ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

অর্থাৎ, "এবং কেউ তার পালনকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" আমি বুঝেছি, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যথার্থ। তাই আমি খেয়াল-খুশী দূর করার জন্যে নিজেকে শ্রমে নিযুক্ত করেছি। ফলে আমি আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

তৃতীয়, দুনিয়াতে দেখলাম, যার কাছে যে মূল্যবান বস্তু রয়েছে, তাকে সে হেফাযতে তুলে রাখে। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে দেখলাম– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা অবশিষ্ট থাকবে।"

এরপর মূল্যবান যা কিছু আমার হাতে এসেছে, তা আল্লাহর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে সেখানে মওজুদ থাকে।

চতুর্থ, আমি প্রত্যেক মানুষকে ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতি আকৃষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এসব বিষয়ে চিন্তা করে দেখলাম, এগুলো তুচ্ছ। এর পর আল্লাহ তা'আলার উক্তির দিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন– اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক পরহেযগারী অবলম্বন করেছে।

পঞ্চম, আমি মানুষকে দেখলাম, পরস্পরের প্রতি কুধারণা করে এবং একে অপরকে মন্দ বলে। এর কারণ হিংসা। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তি খোঁজ করে দেখলাম, তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

অর্থাৎ আমি মানুষের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে দিয়েছি। তাই আমি হিংসা পরিত্যাগ করে মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমি জেনেছি, রুজির বন্টন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়। তাই আমি মানুষের সাথে শত্রুতা ত্যাগ করেছি।

ষষ্ঠ, আমি মানুষকে পারস্পরিক হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত দেখেছি। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তাকে দুশমনরূপে গ্রহণ কর। তাই আমি কেবল শয়তানকেই আমার শত্রু সাব্যস্ত করেছি এবং তার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার শত্রুতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি শয়তান ছাড়া অন্য সকল মানুষের শত্রুতা বর্জন করেছি।

সপ্তম, আমি মানুষকে দেখেছি, প্রত্যেকেই এক টুকরা রুটির আকাঙ্ক্ষী। এ ব্যাপারে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং অবৈধ কাজকর্মের দিকে পা বাড়ায়। এর পর আমি আল্লাহর এরশাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি। তিনি বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ـ

অর্থাৎ পৃথিবীস্থ পত্যেক প্রাণীর রিযিক আল্লাহর যিম্মায়। এতে আমি বুঝলাম, আমি আল্লাহ তা'আলার সেই প্রাণীদেরই একজন, যাদের রিযিক তাঁর যিম্মায়। তাই আমি এমন সব কাজে মশগুল হয়েছি, যা আমার যিম্মায় আল্লাহর হক এবং আল্লাহর যিম্মায় আমার যা হক, তার অন্বেষণ বর্জন করেছি।

অষ্টম, আমি প্রত্যেক মানুষকে দেখলাম, বিশেষ কিছুর উপর ভরসা করে। কেউ বিষয়সম্পত্তির উপর, কেউ ব্যবসায়ের উপর এবং কেউ নিজের স্বাস্থ্যের উপর ভরসা করে। এভাবে প্রত্যেক সৃষ্টি তার মতই আরেক সৃষ্টির উপর ভরসা করে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলাম।

তিনি বলেন ঃ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তাই আমি আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করেছি। তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট।

শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন ঃ হে হাতেম! আল্লাহ্ তোমাকে তওফীক দিন। আমি তওরাত, ইনজীল, যবুর ও কোরআন পাকে চিন্তা করে সবগুলোর মূল এই আটটি বিষয়কে পেয়েছি। যে কেউ এ আটটি বিষয় অনুযায়ী আমল করবে, সে যেন এই আসমানী কিতাব চতুষ্টয় অনুযায়ীই আমল করবে। সারকথা, এ ধরনের এলেম উপলব্ধি করার ইচ্ছা আখেরাতের আলেমগণই করেন। দুনিয়াদার আলেমরা এমন এলেমে মশগুল হয়, যা থেকে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়; তারা সে এলেম ছেড়ে দেয়, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ আমি বুযুর্গগণকে দেখেছি, তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে পরহেযগারী ছাড়া অন্য কিছু শিখতেন না। আজকাল মানুষ কালাম শাস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু শেখে না।

আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা পানাহারের স্বাচ্ছন্দ্য, পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা এবং গৃহ ও আসবাবপত্রের সাজসজ্জার দিকে আকৃষ্ট হন না। বরং এসব ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেন। কারণ, এসব বিষয়ের আকর্ষণ যত কম হবে, ততই আল্লাহ্‌র নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি এর প্রমাণ ঃ

হাতেম আসাম্মের শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হাতেমের সাথে রায় প্রদেশে গেলাম এবং আমাদের তিনশ' বিশ ব্যক্তির কাফেলা হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হল। সকলেই ছিল কম্বল পরিহিত। কারও কাছে খাদ্যের থলে ছিল না। আমরা এক সওদাগরের বাড়ীতে মেহমান হলাম। লোকটি খুব সামর্থ্যবান না হলেও অতিথিবৎসল ছিল। সে রাত্রে আমাদের আতিথেয়তা করল। সকালে সে হাতেমকে বলল ঃ আপনার কিছু প্রয়োজন থাকলে বলুন। কেননা, আমি একজন অসুস্থ ফেকাহ্‌বিদকে দেখতে যাব। তিনি বললেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ। আর ফেকাহ্‌বিদকে দেখতে যাওয়া তো এবাদত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমিও তোমার সাথে যাব। অসুস্থ ফেকাহ্‌বিদ ছিল রায়ের বিচারপতি মোহাম্মদ ইবনে মোকাতেল। আমরা যখন তাঁর ঘরের দরজায় পৌঁছলাম, তখন কুরসীবিশিষ্ট সুরম্য দরজা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম, একজন আলেমের দরজাও এমন হতে পারে! অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আমরা দেখলাম, বাসভবনটি সুবিস্তৃত, সুন্দর গালিচা বিছানো ও সুদৃশ্য পর্দা ঝুলানো। হাতেম আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। এরপর আমরা সেই স্থানে গেলাম, যেখানে বিচারপতি ছিলেন। সেখানে নরম গদি বিছানো ছিল এবং তার উপর বিচারপতি শায়িত ছিলেন। শিয়রের দিকে জনৈক গোলাম পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সওদাগর বিচারপতির শিয়রের দিকে বসে কুশল জিজ্ঞেস করল। হাতেম দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারপতি তাঁকে বসার জন্যে ইশারা করলে তিনি বললেন ঃ আমি বসব না। বিচারপতি শুধাল ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? হাতেম বললেন ঃ হাঁ, আমি একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই। বিচারপতি বললেন ঃ জিজ্ঞেস করুন। হাতেম বললেন ঃ আপনি উঠে বসলে জিজ্ঞেস করব। বিচারপতি উঠে বসলে হাতেম বললেন ঃ আপনি কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন? বিচারপতি বললেন ঃ বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণের কাছ থেকে, যাঁরা আমার সামনে হাদীস বর্ণনা কচ্ছেন। হাতেম শুধালেন ঃ তাঁরা কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ সাহাবায়ে করামের কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ সাহাবায়ে কেরাম কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। হাতেম বললেন ঃ যে এলেম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিবরাঈল, জিবরাঈলের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণ এবং তাঁদের কাছ থেকে আপনি লাভ করেছেন, তাতে আপনি কোথাও একথাও শুনেছেন কি যে, যেব্যক্তির ঘরে পরিচারক থাকে, স্বাচ্ছন্দ্য বেশী থাকে, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড়। বিচারপতি বলল ঃ না শুনিনি। হাতেম শুধালেন ঃ তা হলে কি শুনেছেন? বিচারপতি বলল ঃ শুনেছি, যেব্যক্তি সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে, মিসকীনদেরকে ভালবাসে এবং আখেরাতের জন্য সাজসরঞ্জাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পূর্বেই পাঠিয়ে দেয়, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড় হবে। হাতেম বললেন ঃ তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অনুসরণ করছেন, না ফেরআউন ও নমরূদের অনুসরণ করছেন, যারা সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দিয়ে দালান তৈরী করেছিল? হে মন্দ আলেমগণ! আপনাদের মত লোকদেরকে দেখেই দুনিয়ালোভী মূর্খরা বলে, আলেমদের এ অবস্থা হলে তাদের অবস্থা কি এর চেয়েও খারাপ হবে না? একথা বলে হাতেম বিচারপতির কাছ থেকে চলে এলেন। বিচারপতি ইবনে মোকাতেলের অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। রায়ের লোকজন বিচারপতি ও হাতেমের এ কথোপকথনের কথা জানতে পেরে হাতেমকে বলল ঃ কাযভীনে তানাকেসী এই বিচারপতির চেয়েও অধিক জাঁকজমকপ্রিয়। হাতেম ইচ্ছা করেই তার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি একজন অনারব ব্যক্তি। আমি চাই, আপনি আমাকে ধর্মের সূচনা এবং নামাযের চাবি অর্থাৎ, ওযু শিখিয়ে দিন। তানাকেসী বলল ঃ খুব ভাল কথা। অতঃপর সে গোলামকে পানি আনতে বলল। গোলাম পানি নিয়ে এলে তানাকেসী বসে ওযু করল এবং তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করল। এরপর বলল ঃ এভাবে ওযু করা হয়। হাতেম বললেন ঃ আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন। আমিও ওযু করব, যাতে আমার পছন্দনীয় বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। অতঃপর হাতেম চার চার বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন। তানাকেসী বলল ঃ মিয়া সাহেব, আপনি পানির অপচয় করেছেন। কারণ, আপনি চার বার অঙ্গ ধৌত করেছেন। হাতেম বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, আমি এক অঞ্জলি পানির অপচয় করেছি, আর আপনি এত সব বিলাস সামগ্রী সঞ্চয়ের মধ্যে অপচয় করেননি? তানাকেসী টের পেয়ে গেল, ওযু শিক্ষা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এ বিষয়টি প্রকাশ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ প্রশ্ন শুনে তানাকেসী গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত আর জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল না।

এর পর হাতেম বাগদাদে গেলে বাগদাদের অধিবাসীরা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আপনি একজন অনারব লোক– থেমে থেমে কথা বলেন, কিন্তু যে কেউ আপনার সাথে কথা বলে, আপনি তাকে জব্দ করে দেন। ব্যাপার কি? হাতেম বললেন ঃ আমার তিনটি অভ্যাস আছে, যার বদৌলত আমি প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হই। প্রথম,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখন প্রতিপক্ষ হক কথা বলে, তখন আমি আনন্দিত হই। আর যখন সে ভুল কথা বলে তখন আমি দুঃখিত হই এবং নিজেকে সংযত রাখি। এ সংবাদ হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। লোকেরা তাঁকে হাতেমের কাছে নিয়ে এলে ইমাম আহমদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আবদুর রহমান! নিরাপত্তা কিসের মধ্যে? হাতেম বললেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! যে পর্যন্ত আপনার মধ্যে চারটি অভ্যাস সৃষ্টি না হবে, আপনি দুনিয়া থেকে নিরাপত্তা পাবেন না। প্রথম, মানুষ মূর্খতা প্রদর্শন করলে আপনি তাদেরকে মার্জনা করবেন। দ্বিতীয়, নিজের মূর্খতাকে তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। তৃতীয়, নিজের বস্তু, তাদেরকে দেবেন। চতুর্থ, আপনি তাদের বস্তু আশা করবেন না। এরূপ হয়ে গেলে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন।

হাতেম মদীনা মুনাওয়ারায় গেলে সেখানকার লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আগমন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ মদীনা? উত্তরে বলা হল, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাসাদ কোথায়? আমি সেখানে নামায পড়ব। লোকেরা বলল ঃ তাঁর তো কোন প্রাসাদ ছিল না। তাঁর বাসগৃহ খুবই নিম্নস্তরের ছিল। হাতেম বললেন ঃ তাঁর সাহাবীগণের প্রাসাদই দেখিয়ে দাও। তারা বলল ঃ তাঁদেরও কোন প্রাসাদ ছিল না। তাঁদের বাসগৃহ ভূমি সংলগ্ন ছিল। হাতেম বললেন ঃ তাহলে এটা কি ফেরআউনের শহর? লোকেরা তাঁকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ এ অনারব লোকটি বলে, এটা ফেরআউনের শহর। শাসনকর্তা বলল, সে কেন এরূপ বলে? হাতেম বললেন ঃ তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি একজন অনারব মুসাফির। শহরে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মদীনা কার? তারা বলল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা। আমি বললাম ঃ তাঁর প্রাসাদ কোথায়? এভাবে পূর্ণ ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে হাতেম বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন আমি জিজ্ঞেস করছি– আপনারা কার অনুসরণ করছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর না ফেরআউনের? ফেরাউন সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দ্বারা দালান নির্মাণ করেছে। শাসনকর্তা নিরুত্তর হয়ে হাতেমকে মুক্ত করে দিল।

সংসার নির্লিপ্ততা ও সাজসজ্জা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষীগণের আচার-অভ্যাস সম্পর্কে যথাস্থানে আরও বর্ণিত হবে। সুচিন্তিত অভিমত, বৈধ বিষয়-সম্পত্তি দ্বারা সাজসজ্জা করা হারাম নয়। কিন্তু তাতে সহজ থাকা তার প্রতি মহব্বতের কারণ হয়ে যায়। ফলে তা বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই হল সাবধানতা। কারণ, যেব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে নিশ্চিতই দুনিয়া থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি দুনিয়ার মধ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ থাকা যেত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া বর্জনের উপর এত জোর দিতেন না। এমনকি বর্ণিত আছে, نزع القميص المعلم তিনি ডোরাদার জামা খুলে ফেললেন। نزع خاتم الذهب فى اثناء الخطبة। তিনি খোতবার মাঝখানে স্বর্ণের আংটি খুলে ফেললেন। সংসার বর্জন সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক বিষয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ নওফলী হযরত মালেক ইবনে আনাসকে এই মর্মে পত্র লেখেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد فى الاولين والاخرين .

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মালেক ইবনে আনাসের প্রতি– হামদ ও সালামের পর– আমি শুনেছি, আপনি মিহিন বস্ত্র পরিধান করেন, পাতলা চাপাতি রুটি ভক্ষণ করেন, নরম শয্যায় উপবেশন করেন এবং দারোয়ান নিযুক্ত করেছেন। অথচ আপনি এলেমের আসনে সমাসীন। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সওয়ার হয়ে আপনার কাছে আসে। তারা আপনাকে নেতা বানিয়ে রেখেছে এবং আপনার কথা মান্য করে। অতএব আপনার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং বিনয় ও নম্রতা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেয়া। আমি উপদেশকল্পে এ পত্র লেখছি। এ খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ওয়াসসালাম। হযরত মালেক ইবনে আনাস এ পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

মালেক ইবনে আনাসের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদের প্রতি– আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার পত্র পেয়েছি এবং স্নেহ ও উপদেশে ধন্য হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাকওয়া দ্বারা লাভবান করুন এবং এ উপদেশের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দিন। আমিও আল্লাহ তাআলার কাছে তওফীক প্রার্থনা করছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর আনুগত্য করার সাধ্য কারও নেই। আপনি মিহিন বস্ত্র ও পাতলা চাপাতি রুটি ইত্যাদির কথা যা কিছু লেখেছেন, সবই সত্য। আমি বাস্তবে তাই করি এবং এজন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ.

অর্থাৎ কে হারাম করল আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি তার বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পাক পবিত্র খাদ্য বস্তুকে?

আমি জানি, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম। আপনি আমার কাছে পত্র লেখা অব্যাহত রাখবেন। আমিও আপনার কাছে পত্র লেখা পরিহার করব না। ওয়াসসালাম।

দেখ, ইমাম মালেক কেমন অকপটে স্বীকার করে নিলেন, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জনই করা উত্তম। এগুলো যে-মোবাহ বা বৈধ, তা-ও তিনি বলে দিলেন। বাস্তবে তাঁর উভয় উক্তিই সত্য। ইমাম মালেকের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এ ধরনের উপদেশের মধ্যে ইনসাফ ও স্বীকারোক্তি করতে পারেন, তবে তিনি বৈধ কাজের সীমানা জানতেও সক্ষম হবেন। ফলে তিনি বৈধ কাজ করে দ্বীনে শৈথিল্য, রিয়া ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু অন্যান্য লোকদের এরূপ মনোবল নেই যে বৈধ কাজের সীমা লংঘন করবে না। কেননা, বৈধ কাজ দ্বারা আনন্দ লাভ করার মধ্যে বিপদাশংকা অনেক। এটা আল্লাহর ভয় থেকেও অনেক দূরে। যাঁরা আখেরাতের আলেম, তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয়ের দাবী হচ্ছে আশংকাব বিষয় থেকে দূরে থাকা। আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি আলামত শাসকবর্গ থেকে দূরে থাকা। যে পর্যন্ত আলাদা থাকা সম্ভব হবে, তাদের কাছে যাবে না; বরং তাদের সাক্ষাৎ থেকেও বেঁচে থাকবে, যদিও তারা স্বয়ং আলেমগণের কাছে আসে। কেননা, দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ। এর লাগাম শাসকবর্গের হাতে। যেব্যক্তি শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করে, তাকে কিছু না কিছু তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভ্রষ্টতার কাজ করতে হয়। অথচ তারা হয়ে থাকে জালেম। প্রত্যেক দ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদের জুলুম ও অন্যায় কর্মকান্ডের নিন্দা করা ওয়াজেব। যেব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, সে তাদের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে হেয় মনে করবে, অথবা তা অপছন্দ করার ব্যাপারে নীরব থাকবে। এটা হবে দ্বীনের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন। অথবা সে তাদের ক্রিয়াকর্ম বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে। এটা হবে প্রকাশ্য মিথ্যা। অথবা সে তাদের দুনিয়া থেকে কিছু লাভ করতে চাইবে। এটা হারাম। হালাল ও হারাম অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করব যে, শাসকবর্গের সম্পদ থেকে কোন্‌টি গ্রহণ করা জায়েয আর কোন্‌টি নাজায়েয– ভাতা হোক, পুরস্কার হোক অথবা জায়গীর ইত্যাদি হোক। সারকথা, শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করা সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। আখেরাতের আলেমগণের তরীকা হচ্ছে সাবধানতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

"যে জঙ্গলে থাকে, সে জুলুম করে। যে শিকারের পেছনে পড়ে সে গাফেল হয় এবং যে বাদশাহর কাছে যায়, সে ফেতনায় পতিত হয়।" তিনি আরো বলেন ঃ

সত্বরই তোমাদের উপর শাসকবর্গ নিযুক্ত হবে, যাদের কিছু কাজ ভাল হবে এবং কিছু হবে মন্দ। সুতরাং যেব্যক্তি তাদের সাথে পরিচিত হবে না, সে দোষমুক্ত থাকেবে, যে তাদেরকে খারাপ মনে করবে সে বেঁচে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাবে। কিন্তু যেব্যক্তি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনুসরণ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। বলা হল ঃ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব না? তিনি বললেন– না। যতদিন তারা নামায পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো না।

সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ জাহান্নামে একটি জঙ্গল রয়েছে। তাতে সে আলেম থাকবে, যে বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। হুযায়ফা বলেন ঃ নিজেকে ফেতনার জায়গা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। জিজ্ঞেস করা হল ঃ ফেতনার জায়গা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা। তোমাদের কেউ যখন তাদের কাছে যায়, তখন মিথ্যা বিষয়ে তাদের প্রত্যয়ন করে এবং তার শানে এমন কথা বলে, বাস্তবে যা তার মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর আলেমগণ রসূলের আমানতদার, যে পর্যন্ত শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা না করে। যখন এরূপ করে, তখন তারা রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদেরকে ভয় কর এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। কেউ আ'মাশকে বলল ঃ আপনি এলেম জীবিত করে দিয়েছেন এ জন্যে যে, আপনার কাছে অনেক মানুষ এলেম শেখে। তিনি বললেন ঃ একটু সবর কর। যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের এক তৃতীয়াংশ পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই মরে যায়, এক তৃতীয়াংশ শাসকবর্গের দরজার সাথে চিমটে থাকে। তারা সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কম লোকই সাফল্য অর্জন করে। এ কারণেই সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন ঃ যখন আলেমকে দেখ, সে শাসকবর্গকে ঘিরে রয়েছে, তখন তার কাছ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, সে চোর। আওযায়ী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সে আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নেই, যে শাসনকর্তার কাছে যায়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সর্বনিকৃষ্ট আলেম সে, যে শাসকদের কাছে যায় এবং সর্বোত্তম শাসক সে যে আলেমদের কাছে যায়। মকহুল দামেশকী বলেন ঃ যেব্যক্তি কোরআন শেখে এবং দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, এরপর খোশামোদ ও লোভের পথে শাসনকর্তার সংসর্গ অবলম্বন করে, সে পদে পদে দোযখের অগ্নিতে প্রবেশ করে। সামনুন বলেন ঃ আলেমের জন্যে এটা খুবই মন্দ কথা যে, কেউ তার মজলিসে এসে শুনে, সে শাসনকর্তার কাছে চলে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমি বুযুর্গদের এই উক্তি শুনেছি, যখন আলেমকে দুনিয়াপ্রেমিক দেখ, তখন তাকে দ্বীনের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যাপারে দোষী মনে করো। আমি এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি শাসনকর্তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে আত্মসমালোচনা করে দেখেছি, এলেম থেকে আমি অনেক দূরে সরে পড়েছি। অথচ আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাসকদের সাথে মেলামেশা করি, তা তোমরা দেখ ও জান। আমি কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করি এবং প্রায়ই তাদের খাহেশের বিরোধিতা করি। আমি তাদের কাছে যতদূর সম্ভব না যাওয়ারই চেষ্টা করি। এছাড়া আমি তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি না এবং তাদের ঘরের পানি পর্যন্ত পান করি না। এরপর তিনি বলেন ঃ আমাদের যুগের আলেমরা বনী ইসরাঈলের আলেমদের চেয়েও অধম। তারা বাদশাহদেরকে বৈধ বিষয়াদি বলে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী কথাবার্তা শুনায়। অথচ যেসব কথাবার্তা বলা তাদের উপর ওয়াজেব, সেগুলো শুনালে শাসকরা তাদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের কাছে যাওয়া পছন্দ করবে না। যদিও এটা আল্লাহর কাছে তাদের নাজাতের ওসিলা হতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গপ্রাপ্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের ভাষায় ইনি ছিলেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)। হাসান বলেন ঃ তিনি শাসকবর্গের কাছে যেতেন না; বরং তাদেরকে ঘৃণা করতেন। তাঁর ছেলেরা তাঁকে বলল ঃ যারা ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভে আপনার সমান নয়, তারা শাসকবর্গের কাছে যায়। যদি আপনিও যেতেন তবে আমাদের জন্যে তা কল্যাণকর হত। তিনি বলেন ঃ বৎসগণ! দুনিয়া মৃত। কিছু লোক একে ঘিরে রেখেছে। আল্লাহর কসম, আমি যথাসম্ভব তাদের সাথে শরীক হবো না। ছেলেরা বলল ঃ তা হলে আপনি জীর্ণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ আমি ঈমানের সাথে জীর্ণ অবস্থায় মরে যাওয়াকে মোনাফেকীর মাধ্যমে বিত্তশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা উত্তম মনে করি। হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি ছেলেদেরকে হারিয়ে দিলেন এবং চমৎকার প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। কারণ, তিনি জেনে নিয়েছেন, মাটি মাংস ও মদ খেয়ে ফেলবে, কিন্তু ঈমান খাবে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শাসকদের কাছে গেলে মানুষ নিশ্চিতই মোনাফেকী থেকে বাঁচতে পারে না, যা ঈমানের পরিপন্থী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) সালমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে সালমা! শাসকবর্গের দরজায় যেয়ো না। কারণ, তুমি তাদের দুনিয়া থেকে তখনই কিছু অংশ পাবে, যখন তারা তোমার দ্বীন থেকে উৎকৃষ্ট অংশটি নিয়ে নেবে।

এ বিষয়টি আলেমদের জন্যে একটি বড় ফেতনা এবং তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। বিশেষতঃ এমন আলেমদের বিরুদ্ধে, যাদের কণ্ঠস্বর ভাল এবং কথাবার্তা সুমিষ্ট। শয়তান তাদেরকে একথাই বুঝায় যে, শাসকবর্গের কাছে গেলে এবং তাদেরকে উপদেশ দিলে তারা জুলুম থেকে বিরত থাকবে, শরীয়তের বিধি-বিধান তাদের মধ্যে জারি ও কায়েম হয়ে যাবে। শয়তান ক্রমান্বয়ে তাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, শাসকদের কাছে যাওয়া ধর্মীয় কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এরপর যখন আলেম তাদের কাছে যায়, তখন নম্র ভাষা ব্যবহার ও ধর্মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন না করে পারে না। তাদের তারীফ ও খোশামোদ না করেও পারে না। এতে দ্বীনের ক্ষতি হয়।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলতেন, আলেমগণ যখন জানতেন, তখন আমল করতেন, আমলে মশগুল হওয়ার পর অজ্ঞাত হতেন, অজ্ঞাত হওয়ার পর তাদের অন্বেষণ হত এবং অন্বেষণ হওয়ার পর তাঁরা পালিয়ে ফিরতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হযরত হাসান বসরীকে এই মর্মে চিঠি লেখলেন ঃ হামদ ও সালাতের পর নিবেদন, আপনি আমাকে এমন লোকদের সন্ধান দিন, যাঁদের কাছ থেকে আমি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারাদিতে সাহায্য নিতে পারি। তিনি জওয়াবে লেখলেন ঃ দ্বীনদাররা তো আপনার কাছে যাবার নয়। দুনিয়াদার আপনার কাম্য নয়। কাজেই আপনি অভিজাত ব্যক্তিবর্গকে সাথে রাখুন। তারা তাদের আভিজাত্য বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনা থেকে হেফাযতে রাখে। এ পত্র ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে লেখা হয়েছিল, যিনি সমকালীন যুগের সর্বাধিক সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। অতএব, এমন শাসকের কাছ থেকে দ্বীনদারদের দূরে থাকা শর্ত হলে, অন্যান্য শাসকের সাথে মেলামেশা করা কেমন করে ঠিক হবে!

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া করে ফতোয়া না দেয়া, বরং যে পর্যন্ত ফতোয়া দেয়া থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বেঁচে থাকার উপায় জানা থাকে, সে পর্যন্ত বেঁচে থাকা। সুতরাং কেউ যদি কোন আলেমকে এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করে, যার বিধান সে কোরআন অথবা অকাট্য হাদীস অথবা ইজমা অথবা জাহেরী কিয়াস থেকে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে বিধান বলে দেবে। আর যদি এমন প্রশ্ন করে, যাতে সন্দেহ হয়, তবে বলে দেবে– আমি জানি না। যদি এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, যার বিধান আলেম ব্যক্তির ইজতিহাদ ও অনুমান দ্বারা সঠিক জানা রয়েছে, তবে এতে সাবধানতা অবলম্বন করবে, বরং অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতে বলবে, যদি অন্য ব্যক্তি ঠিক ঠিক বলতে পারে। এটাই সাবধানতা। কেননা, ইজতিহাদের বিপদাশংকা নিজের ঘাড়ে রাখা গুরুতর ব্যাপার। হাদীসে বলা হয়েছে–

এলেম তিন প্রকার–(১) বিধান ব্যক্তকারী কোরআন, (২) প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং (৩) আমি জানি না। শা'বী বলেন ঃ আমি জানি না হচ্ছে অর্ধেক এলেম। যেব্যক্তি না জানার ক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ থাকে, তার সওয়াব সে ব্যক্তি থেকে কম নয়, যে সঠিক জওয়াব বলে দেয়। কারণ, না জানার কথা স্বীকার করা নফসের জন্যে খুবই কঠিন। মোট কথা, এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও মনীষীগণের রীতি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ অমুক শাসকের কাছে যাও, সে এ ধরনের বিষয়াদির যিম্মাদার। এ মাসআলা তার ঘাড়ে রেখে দাও।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে প্রত্যেক মাসআলায় ফতোয়া দেয়, সে উন্মাদ। তিনি আরও বলেন ঃ এলেমের ঢাল হচ্ছে আমি জানি না। এটি বিস্মৃত হলে কল্যাণ নেই।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানের জন্যে সে আলেমের চেয়ে কঠিন কেউ নেই, যে এলেম সহকারে বলে এবং এলেম সহকারে চুপ থাকে। শয়তান বলে, তাকে দেখ, তার বলার চেয়ে তার চুপ থাকা আমার উপর বেশ কঠিন। জনৈক বুযুর্গ আবদালের এই গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর খাদ্য হল উপবাস এবং যে পর্যন্ত তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, সে পর্যন্ত তিনি কথা বলেন না। কারও জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়ার লোক থাকলে তিনি চুপ থাকেন। বাধ্য হলে নিজে জওয়াব দেন। জিজ্ঞাসার পূর্বে বলাকে তিন কথা বলার গোপন অভিলাষ বলে মনে করেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গেলেন। লোকটি তখন বক্তৃতা করছিল। তারা বললেন ঃ সে যেন বলছে– আমাকে জেনে নাও। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি আলেম, যাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে সে মনে করে যেন তার চোয়াল টেনে বের করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে পুল বানিয়ে দোযখ অতিক্রম করতে চাও। আবু জাফর নিশাপুরী বলেন ঃ আলেম সে ব্যক্তি, যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে ভয় করে যে, কেয়ামতে এ প্রশ্ন যেন না উঠে, জওয়াব কোথা থেকে দিয়েছিলে ? ইবরাহীম তায়মীকে কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁদতেন এবং বলতেন ঃ তুমি আর কাউকে পেলে না, আমার উপর চড়াও হলে ? আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখয়ী, ইবরাহীম আদহাম ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ) দুই অথবা তিন ব্যক্তির সামনে কিছু বর্ণনা করতেন। বেশী লোক জমায়েত হয়ে গেলে নীরব থাকতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

আমি জানি না, ওযায়র নবী কিনা, আমি জানি না ইয়ামন সম্রাট তুব্বা অভিশপ্ত কিনা। আমি এটাও জানি না যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন কিনা ? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল, উত্তম জায়গা এবং সর্বনিকৃষ্ট জায়গা কোনটি ? তখন তিনি বললেন ঃ আমি জানি না। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলে তিনি তাঁকে এ প্রশ্ন করলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ আমি জানি না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ সর্বোত্তম জায়গা মসজিদ আর সর্বনিকৃষ্ট জায়গা বাজার। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে কেউ দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি একটির জওয়াব দিতেন এবং নয়টির ব্যাপারে নীরব থাকতেন। আর হযরত ইবনে মসউদ নয়টির জওয়াব দিতেন এবং একটির জওয়াবে নীরব থাকতেন। পূর্ববর্তী ফেকাহবিদদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা বলে দিতেন ঃ আমি জানি না। জানি বলার লোক খুব কম ছিল। সুফিয়ান সওরী, মালেক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বল, ফোযায়ল ইবনে আয়ায ও বিশর ইবনে হারেস প্রমুখ ফেকাহবিদ এমনি ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই জানি না বলতেন।

আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রঃ) বলেন ঃ আমি এই মসজিদে একশ' বিশ জন সাহাবী দেখেছি। তাঁদের কারও কাছে কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রশ্ন উপস্থিত হলে তাঁরা তা অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং অন্যজন তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রশ্নটি আবার প্রথম জনের জাছে ফিরে আসত। বর্ণিত আছে, আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে একজনের কাছে একটি ভাজা করা ছাগল হাদিয়াস্বরূপ পাঠানো হয়। তাঁরা তখন খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি ছাগলটি অন্য একজনের কাছে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের কাছে হাদিয়া প্রেরণ করলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে আবার প্রথম সাহাবীর কাছে ফিরে এল। এখন চিন্তা কর, আমাদের যুগে আলেমদের অবস্থা কেমন পাল্টে গেছে ? পূর্ববর্তীগণ যে বিষয় থেকে পালাতেন, আজ তাই কাম্য হয়ে গেছে এবং পূর্বে যা কাম্য ছিল, আজ তা ঘৃণার বস্তু হয়ে গেছে। ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব থেকে বেঁচে থাকার কথা এ হাদীস থেকেও জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তিন প্রকার ব্যক্তিই ফতোয়া দিবে– শাসক, শাসিত অথবা যে নিজেকে মুফতীরূপে প্রকাশ করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম চারটি বিষয় একে অপরের কাছে সমর্পণ করতেন– নামাযের ইমামত, ওসিয়ত, আমানত ও ফতোয়া। কেউ কেউ বলেন ঃ যার এলেম-কালাম কম হত, সে তড়িঘড়ি ফতোয়া দিতে প্রস্তুত হয়ে যেত। আর যে বেশী পরহেযগার হত, সে ফতোয়াকে বেশী পরিমাণে অপরের কাছে সমর্পণ করত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ পাঁচটি বিষয়ে মশগুল থাকতেন– কোরআন তেলাওয়াত, মসজিদ আবাদকরণ, আল্লাহর যিকির, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। এর কারণ তাঁরা হাদীসে শুনেছিলেন ঃ

মানুষের প্রত্যেকটি কথা তার জন্যে ক্ষতিকর– মঙ্গলজনক নয়, তিনটি কথা ব্যতীত– (১) সৎকাজে আদেশ (২) অসৎ কাজে নিষেধ এবং (৩) আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ তাদের অনেক পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই, কিন্তু যে খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির আদেশ করে। জনৈক আলেম ইজতিহাদকারী ও ফতোয়াদাতাদের মধ্য থেকে একজনকে স্বপ্নে দেখে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি যে ফতোয়া দিতেন এবং ইজতিহাদ করতেন, তার অবস্থা কিরূপ পেলেন ? জওয়াবে সে নাক সিঁটকিয়ে ও মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ আমি এর কোন মর্যাদা পাইনি এবং এর পরিণাম ভাল হয়নি। ইবনে হাসীন বলেন ঃ আলেমরা এমন প্রশ্নের জওয়াব বলে দেয়, যা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি সকল বসরী সাহাবীকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

মোট কথা, নীরব থাকা আলেমগণের একটি চিরন্তন রীতি ছিল। তাঁরা প্রয়োজন ব্যতীত কখনও কথা বলতেন না। হাদীসে আছে– তোমরা যখন কাউকে নীরবতা পালনকারী ও সংসারের প্রতি অনাসক্ত দেখ, তখন তার কাছে যাও। কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেম দু'প্রকার। এক, জনসাধারণের আলেম, সে মুফতী। এ ধরনের আলেম বাদশাহদের মোসাহেব হয়ে থাকে! দুই– বিশিষ্টদের আলেম। তাঁরা তওহীদ ও অন্তরের ক্রিয়াকর্মের আলেম। তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও একা থাকেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ যখন এলেম বেশী হয়, তখন কথা কমে যায় আর যখন কথা বেশী হয় তখন এলেম কমে যায়। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর কাছে এক পত্র লেখেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পত্রের মর্ম ছিল এই ঃ ভাই, আমি শুনেছি মানুষ আপনাকে চিকিৎসকের আসনে বসিয়েছে। আপনি রোগীদের চিকিৎসা করেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি আপনি বাস্তবিকই চিকিৎসক হন, তবে কথা বলবেন। কারণ, আপনার কথা রোগমুক্তি। আর যদি আপনি চিকিৎসক সেজে থাকুন, তবে ভাই আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুসলমানকে প্রাণে মারবেন না। এ পত্র পাওয়ার পর হযরত আবুদ্দারদাকে কেউ ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছু বলতেন না। হযরত আনাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ আমাদের নেতা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-কে প্রশ্ন কর। হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ জাবের ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস কর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে দেখিয়ে দিতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী হযরত হাসান বসরীর সামনে বিশটি হাদীস বর্ণনা করলেন। কেউ এগুলোর তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রেওয়ায়েত ছাড়া কিছুই জানি না। এরপর হাসান বসরী রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এক একটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাদীসের আলাদা তফসীর করলেন। শ্রোতারা তাঁর তফসীর ও স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ হল। বর্ণনাকারী সাহাবী এক মুঠি কংকর তুলে তাঁদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমরা আমাকে এলেমের কথা জিজ্ঞেস কর, অথচ তোমাদের এখানে এমন আলেম বিদ্যমান রয়েছে।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, তারা এলমে বাতেন শিক্ষা করা, অন্তরের দেখাশুনা করা, আখেরাতের পথ চেনা ও তাতে চলার প্রতি অধিক যত্নবান থাকেন এবং মোজাহাদা ও মোরাকাবা দ্বারা এসব বিষয়ের স্বরূপ জানার সত্যিকার আগ্রহ পোষণ করেন। কেননা, মোজাহাদা থেকে মোশাহাদা এবং অন্তর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়। এর পর এ থেকে অন্তরে প্রজ্ঞার ঝরণা প্রবাহিত হয়– শুধু কিতাবী শিক্ষা এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। বরং মানুষ যদি মোজাহাদা করে, অন্তরের দেখাশুনা করে, যাহেরী ও বাতেনী আমল করতে থাকে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত মন ও স্বচ্ছ চিন্তা নিয়ে বসে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়, তবে অপরিমিত ও অসীম প্রজ্ঞার আলোতে তার অন্তর খুলে যায়। এসব বিষয়ই হচ্ছে এলহামের চাবি ও কাশফের উৎস। অনেক শিক্ষার্থী বহু দিন পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু যতটুকু শুনেছিল, তা থেকে এক অক্ষরও অগ্রসর হতে পারে না। আর অনেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় এলেম হাসিল করে আমল ও অন্তরের দেখাশুনার প্রতি যেই মনোনিবেশ করে, অমনি আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা তার জন্যে খুলে দেন, যা দেখে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে সে বিষয়েরও এলেম দান করেন, যা সে শেখেনি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে– হে বনী ইসরাঈল! একথা বলো না যে, এলেম আকাশে রয়েছে, তাকে কে নামাবে ? অথবা এলেম ভূগর্ভে রয়েছে, তাকে কে উপরে উঠাবে ? অথবা এলেম সমুদ্রের উপরে রয়েছে, তাকে এপারে কে আনবে ? এলেম তো তোমাদের অন্তরে রক্ষিত। তোমরা আমার সামনে আধ্যাত্মবিদদের ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শন কর এবং সিদ্দীকদের চরিত্র অবলম্বন কর। আমি তোমাদের অন্তরে সে এলেম প্রকাশ করে দেব, যা তোমাদেরকে আবৃত করে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী বলেন ঃ আলেম আবেদ, যাহেদ সকলেই দুনিয়া থেকে গেছেন এবং তাদের অন্তর তালাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু সিদ্দীক ও শহীদদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তর রয়েছে খোলা। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন-

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ আল্লাহর কাছেই অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতীত কেউ এ চাবির খবর রাখে না। যদি দিলওয়ালাদের দিলের উপলব্ধি বাতেনের নূরের মাধ্যমে এলমে যাহেরের উপর প্রবল না হত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলতেন না ঃ তুমি নিজের মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

বান্দা নিরন্তর নফল এবাদত দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে বন্ধু করে নেই। আমি যখন তাকে বন্ধু করে নেই তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে শুনে-------। কেননা, কোরআন মজীদের অনেক গোপন রহস্য যিকির ফিকিরে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির অন্তরে এসে যায়। এসব রহস্য তফসীরে কোথাও থাকে না এবং তফসীরবিদদেরও জানা থাকে না। কেবল সে ব্যক্তিরই জানা থাকে, যে মারেফত লাভের ইচ্ছায় আপন অন্তরের পরিচর্যা করে। এসব রহস্যবিদদের সামনে পেশ করা হলে তাঁরাও এগুলোকে ভাল বলে এবং তাঁরাও জানতে পারে যে, এ আলো স্বচ্ছ অন্তরের এবং আল্লাহ্ তা'আলার কৃপার। এলমে মোকাশাফা ও এলমে মোআমালার অবস্থাও তেমনি। এসব এলেমের প্রত্যেকটি যেন এক অতল সমুদ্র। প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী তার অংশ অনুযায়ী এবং ভাল আমলের তওফীক অনুযায়ী এতে অবগাহন করতে সমর্থ হয়। এ ধরনের আলেমগণের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে বলেন ঃ মানুষের অন্তর একটি পাত্র বিশেষ- যে অন্তরে কল্যাণ বেশী, তাই উত্তম। মানুষ তিন প্রকার ঃ এক- আলেমে রব্বানী, দুই- যে মুক্তির জন্যে এলেম অর্জন করে। সে নিম্নস্তরের বোকা। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, বোকারা প্রত্যেক মিথ্যার প্রতি আহ্বানকারীর অনুসারী হয়ে যায়। এরা কোন এলেমের নূর থেকে আলো লাভ করে মজবুত বিষয়ের আশ্রয় নেয় না। এলেম ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। এলেম তোমার হেফাযত করে, আর তুমি ধন-সম্পদের হেফাযত কর। এলেম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পদ ব্যয় করলে হ্রাস পায়। এলেমের মহব্বত একটি গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যদ্দ্বারা জীবনে আনুগত্য অর্জিত হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম ব্যবহার পাওয়ার উপায়। এলেম শাসক এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধন-সম্পদ শাসিত। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার উপকারিতা দূর হয়ে যায়। যারা ধনী ছিল এবং দল বলের অধিকারী ছিল, তারা সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আলেমগণ মহাকালের অন্ত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। এর পর হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এখানে অনেক এলেম আছে, যদি এগুলো আয়ত্তকারী পাওয়া যায়। আমি আপদমুক্ত শিক্ষার্থী পাই না। এমন পাই যারা দ্বীনের হাতিয়ারকে দুনিয়া অন্বেষণে ব্যবহার করে, আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা তাঁর ওলীদের প্রতি কটূক্তি করে এবং আল্লাহর প্রমাণ নিয়ে তার সৃষ্টিকে দাবিয়ে রাখে। অথবা এমন পাই, যারা সত্যপন্থীদের অনুগত কিন্তু প্রথম সন্দেহ থেকেই তাদের অন্তরে সংশয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জেনে রাখ, বাতেনের বোঝা এরাও বহন করতে পারে না, বরং এরা লোভী, খায়েশের দাস, অর্থলিপ্সু এবং প্রবৃত্তির অনুসারী । চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে এদের মিল রয়েছে। ইলাহী, যখন এলেম আয়ত্তকারীরা মরে যাবে, যারা আল্লাহর নিদর্শনকে আল্লাহর উদ্দেশেই কায়েম করবে। তাঁরা হয় প্রকাশ্যে থাকবে, না হয় আত্মগোপনকারী ও পরাভূত হয়ে থাকবেন, যাতে আল্লাহর নিদর্শনসমুহ অকেজো হয়ে না যায়। তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং মর্যাদায় অধিক হবে। তাঁদের অস্তিত্ব বাহ্যতঃ নিরুদ্দেশ এবং তাঁদের চিত্র অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তাঁআলা তাদের মাধ্যমে আপন নিদর্শনসমূহের হেফাজত করবেন, যাতে তাঁরা এসব নিদর্শনকে তাঁদের মত লোকদের কাছে সমর্পণ করে এবং তাঁদের অন্তরে সেগুলো বপন করে দিতে পারেন। এলেম তাঁদেরকে বস্তুর স্বরূপ ও বিশ্বাসের গভীরে পৌঁছে দেয়। ধনীরা যে বিষয়কে কঠিন মনে করে, তা তাঁদের কাছে সহজ। গাফেলরা যে বিষয়ে আতংকিত হয়, তাঁরা তা দ্বারা মনোরঞ্জন করেন। সৃষ্টির মধ্যে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ওলী ও আমানতদার ; তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বায়ক এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সম্রাট। এরপর হযরত আলী (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আমি তাঁদের দীদারের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তাঁর বর্ণিত শেষোক্ত বিষয়বস্তু আখেরাতের আলেমগণের বিশেষণ। অধিক আমল ও অধিক মোজাহাদা দ্বারা এই এলেম অর্জিত হয়।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া। কেননা, বিশ্বাস দ্বীনের মূলধন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিশ্বাস হচ্ছে পূর্ণ ঈমান। অতএব এলমে একীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। অর্থাৎ, বিশ্বাসের সূচনা জানতে হবে। এরপর এটি অর্জনের পন্থা অন্তরের জন্যে আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে যাবে। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বিশ্বাস অর্জন কর। এর অর্থ, বিশ্বাসী লোকদের কাছে বস, তাঁদের কাছে বিশ্বাসের এলেম শ্রবণ কর এবং প্রতিনিয়ত তাঁদের অনুগামী হও, যাতে তোমার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, যেমন তাঁদের বিশ্বাস শক্তিশালী। কেননা, অল্প বিশ্বাস অনেক আমলের তুলনায় উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে বর্ণনা করা হল, এক ব্যক্তির বিশ্বাস ভাল, কিন্তু সে অনেক গোনাহ করে। অন্য এক ব্যক্তি এবাদতে খুব মেহনত করে, কিন্তু বিশ্বাস কম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কোন লোক নেই, যার গোনাহ নেই। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি যার মজ্জা এবং বিশ্বাস যার অভ্যাস, গোনাহ তার ক্ষতি করে না। কেননা, যখন গোনাহ করে তখন তওবা এস্তেগফার করে এবং অনুতপ্ত হয়। ফলে তা গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে কিছু অতিরিক্ত হয়, যদ্দারা সে জান্নাতে যায়। এজন্য রসূল করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে বস্তু তোমাদেরকে পরিমিত দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্বাস ও সবর । যেব্যক্তি এ উভয়টি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, সে যদি রাত্রি জাগরণ ও দিনের রোযা কখনও না করে, তবু তার ভয়ের কারণ নেই।

লোকমান (রহঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন ঃ বৎস! বিশ্বাস ছাড়া আমল করার সাধ্য হয় না। মানুষ ততটুকুই করে যতটুকু সে বিশ্বাস করে। আমলকারীর বিশ্বাস কম না হওয়া পর্যন্ত সে আমলে ক্রুটি করে না।

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (রাঃ) বলেন ঃ তওহীদ একটি নূর, আর শেরক একটি আগুন। শেরকের আগুন দ্বারা মুশরিকদের যত সৎকর্ম জ্বলে পুড়ে যায় । অপরপক্ষে তওহীদের নূর দ্বারা তওহীদপন্থীদের তার চেয়ে বেশী গোনাহ্ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়। এখানে নূরের অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় "মুকিনীন" তথা বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিশ্বাস সৎকর্ম ও সৌভাগ্যের উপায়।

এখন প্রশ্ন হয়, বিশ্বাসের অর্থ কি? এর শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার উদ্দেশ্য কি? এটা না বুঝা পর্যন্ত বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জওয়াব হচ্ছে, দুই শ্রেণীর লোক একীন তথা বিশ্বাস শব্দটিকে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহার করে। এক- মোনাযারা ও কালামশাস্ত্রীদের পরিভাষা। তারা বলে ঃ একীন অর্থ সন্দেহ না হওয়া। কারণ, কোন কিছুকে সত্য বলে জানার চারটি স্তর রয়েছে- (১) সত্য বলে জানা ও মিথ্যা বলে জানা সমান সমান। একে সন্দেহ বলে। উদাহরণতঃ তোমাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন কি দেবেন না? ব্যক্তিটির অবস্থা তোমার জানা নেই। এমতাবস্থায় তুমি হাঁ অথবা না কিছুই বলবে না; বরং উভয় বিষয়ের সম্ভাব্যতা তোমার কাছে সমান হবে। একে বলা হয় সন্দেহ। (২) তোমার মন সত্য ও মিথ্যা উভয় দিকের মধ্য থেকে এক দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং তুমি এটাও জানবে যে, অপর দিকটিও হতে পারে; কিন্তু তার হওয়া প্রথম দিক অগ্রাধিকার দেয়ার পরিপন্থী নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে তুমি সৎ ও মুত্তাকী বলে জান। তার অবস্থা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে এই অবস্থায় মরে গেলে তার আযাব হবে কি হবে না? এ ক্ষেত্রে তোমার মন তার আযাব না হওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকবে। কারণ, তার ভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তুমি আযাব হওয়ারও কোন কারণ তার অভ্যন্তরে ধরে নিতে পার। এ ধরে নেয়া প্রথম বিশ্বাসের সাথে জড়িত। এ ধরনের বিশ্বাসকে বলা হয় "যন" (ধারণা)। (৩) কোন বিষয়ের সত্যতা মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তার বিরপীতটা মনে উদয়ই হয় না এবং হলেও মন তা মেনে নিতে সম্মত হয় না। কিন্তু এ সত্যায়ন সত্যিকার মারেফত সহকারে না থাকা। অর্থাৎ, যদি খুব চিন্তা করা হয় এবং বিপরীতটির সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, তবে তা সম্ভবপর হওয়ার অবকাশ অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। এ সত্যায়নকে একীনের কাছাকাছি বিশ্বাস বলা হয়। শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের হয়ে থাকে। কেবল শুনে শুনেই তা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এমনি প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী তার মাযহাবের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করে এবং মনে করে, তার ইমামই সঠিক। যদি কেউ বলে, তোমার ইমাম ভুলও করতে পারেন, তবে সে তা মানতে রাযী হয় না। (৪) সত্যিকার মারেফতের স্তর, যা প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। এতে নিজেরও সন্দেহ থাকে না, অপরকেও সন্দেহে ফেলার কল্পনা করা যায় না। মোনাযারা ও কালামশাস্ত্রীদের কাছে এটাই একীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস। এ পরিভাষা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুযায়ী একীন শক্তিশালী ও দুর্বল হতে পারে না। কেননা, সন্দেহাতীত হওয়া সবল বা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা দূর করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিভাষা ফেকাহবিদ, সূফী ও অধিকাংশ আলেমের। তাঁদের মতে, যার মধ্যে ধারণা ও সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, তাই একীন। এতে অন্তরে প্রবল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। ফলে একথা বলা যায়, মৃত্যুর উপর অমুক ব্যক্তির একীন দুর্বল। অথবা সে মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ করে না। অথবা এরূপ বলা যায়, রুজি পৌঁছার উপর অমুক ব্যক্তির একীন শক্তিশালী। অথচ মাঝে মাঝে তার রুজি না পাওয়াও সম্ভব। সারকথা, মন যখন কোন বিষয়কে সত্য বলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এটা তার মনে এমনভাবে প্রবল হয়ে যায় যে, মনের উপর তারই রাজত্ব চলে এবং তারই দিক থেকে ভাল কাজের আগ্রহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা হয়, তখন এ অবস্থাকে একীন বলা হয়। এখন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী মৃত্যুর ব্যাপারে সকলের একীন সমান। অর্থাৎ, এতে কারও কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী একীন সকলের নেই। কেননা, কিছু লোক রয়েছে যারা কোন্ সময় মৃত্যুর কথা চিন্তাই করে না এবং তার প্রস্তুতিও নেয় না। মনে হয়, তাদের মৃত্যুর একীন নেই। পক্ষান্তরে কিছু লোকের মনকে এই একীন এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তারা তাদের সমগ্র শক্তি এর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করে রেখেছে; এর মধ্যে বিপরীত দিকটির কোন অবকাশই রাখেনি। এরূপ একীনকে শক্তিশালী একীন বলা হয়। এ প্রসঙ্গেই কোন মনীষী বলেছেন ঃ যে একীনে কোন সন্দেহ নেই, অথচ তা সেই সন্দেহের অনুরূপ যাতে কোন একীন নেই, তা মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু বলে আমার মনে হয় না।

আমরা আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেছি যে, তারা বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোযোগী হন। এতে আমাদের উদ্দেশ্য উভয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশ্বাস। অর্থাৎ, প্রথমে সন্দেহ দূর হওয়া, অতঃপর মনের উপর বিশ্বাস এমন প্রবল হওয়া যে, তারই আদেশ কার্যকর হয়। এটা জানার পর তুমি একথার উদ্দেশ্যও জানতে পারবে যে, একীন তিন প্রকার– (১) একীনের শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া, (২) একীনের কম ও বেশী হওয়া এবং (৩) একীনের প্রকাশ্য ও গোপন হওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া হচ্ছে, মনের উপর তার প্রাবল্য কেমন? এতে একীনের অশেষ অসংখ্য স্তর রয়েছে। মৃত্যুর প্রস্তুতিতে এসব স্তরের পার্থক্য অনুযায়ী মানুষও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। একীন যে প্রকাশ্য ও গোপন হয়, তাও অস্বীকার করা যায় না। আর একীন যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, সেগুলো কম বেশী হওয়ার কারণে একীনও কম বেশী হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– অমুক ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী আলেম। অর্থাৎ, তার জানা বিষয়াদি বেশী। এজন্যই আলেম কখনও শরীয়তের সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী একীন রাখে এবং কখনও কতক বিষয়ের উপর একীন রাখে।

এখন একীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি এবং কোন্ কোন্ কিষয়ে একীন কাম্য তা জানা দরকার। প্রকাশ থাকে যে, পয়গম্বরগণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, সেগুলো সবই একীনের স্থান। অতএব বুঝা যায়, এগুলো গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা এখানে কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তওহীদ। অর্থাৎ, সকল বস্তুকে সকল কারণের মূল কারণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনে করতে হবে এবং মধ্যবর্তী কারণসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না; বরং মধ্যবর্তী কারণসমূহকে আল্লাহর অনুগত মানতে হবে– তাদের কোন প্রভাব স্বীকার করা যাবে না। যেব্যক্তি এসব বিষয়কে সত্য জ্ঞান করবে, তাকে তওহীদপন্থী বলা হবে। সত্য জ্ঞান করার সাথে সাথে যদি মন থেকে সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবে প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী সে মুকিন তথা একীনকারী হবে।

যদি ঈমানের সাথে সত্য জ্ঞান এমন প্রবল হয় যে, মধ্যবর্তী বিষয়সমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ, সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হওয়ার মনোভাব অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যায় এবং সেগুলোকে পুরস্কারের ফরমান লেখকের তুলনায় তার কলম ও হাতের মত মনে করে, কলম ও হাতের প্রতি কেউ কৃতজ্ঞ হয় না এবং অসন্তুষ্টও হয় না; বরং এগুলোকে পুরস্কারদাতার হাতিয়ার মনে করে, তবে দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী তাকে একীনকারী বলা হবে। এই একীন প্রথম একীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তার ফল ও প্রাণ। যখন মানুষের কাছে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের এমন অধীন, যেমন লেখকের হাতে কলম, তখন তার অন্তরে তাওয়াক্কুল, সন্তুষ্টি ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শিরোধার্যতা প্রবল হবে এবং সে ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও অসচ্চরিত্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

একীনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রিযিকের দায়িত্ব সম্পর্কে একীন করা। আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, সকলের রিযিকই আল্লাহর যিম্মায়। এতে আল্লাহ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ প্রতিশ্রুত এই রিযিক অবশ্যই পৌঁছবে এবং ভাগ্যে যা আছে তা অবশ্যই প্রেরণ করা হবে। এ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ শরীয়তের আইন অনুযায়ী রিযিক অন্বেষণ করেও যা পাবে না তার জন্যে আফসোস করবে না এবং লোভ-লালসায় লিপ্ত হবে না। এ বিশ্বাস থেকেও কিছু আনুগত্য ও উত্তম চরিত্র প্রকাশ পাবে।

তৃতীয় স্তর, অন্তরে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু প্রবল হবে ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ - অর্থাৎ "অতঃপর যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে কণা পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে।" অর্থাৎ, সওয়াব ও আযাবে বিশ্বাস করতে হবে। এমনকি, বুঝতে হবে যে, সওয়াবের সাথে সৎকর্মের সম্পর্ক উদরপূর্তির সাথে রুটির সম্পর্কের মত এবং আযাবের সাথে গোনাহর সম্পর্ক মরে যাওয়ার সাথে বিষপান বা সর্প দংশনের সম্পর্কের মত। মানুষ উদরপূর্তির জন্য যেমন রুটির অন্বেষণ প্রয়াসী হয় এবং অল্প বিস্তর যাই পায় তার হেফাযত করে, তেমনি সৎকর্ম করতে প্রয়াসী এবং কমবেশী যাই হোক, তা অর্জন করতে আগ্রহী হতে হবে। মানুষ যেমন কম ও বেশী বিষ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনি সামান্য, অসামান্য, কম বেশী সকল প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ বিষয়ে একীন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী অধিকাংশ মুমিনের হয়ে থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশেষভাবে নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের হয়ে থাকে। এ বিশ্বাসের ফল এই হয় যে, মানুষ তার উঠাবসা, চলাফেরা ও বিপদাশংকা নিরীক্ষণ করতে থাকে এবং সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হয়। একীন যত বেশী প্রবল হয়, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং সৎকর্মের প্রস্তুতি তত বেশী হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ স্তর, আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমার সম্পর্কে জানেন এবং আমার মনের কুমন্ত্রণা, গোপন আশংকা ও চিন্তাসমূহ প্রত্যক্ষ করেন– এরূপ একীন করতে হবে। প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন প্রত্যেক মুমিনের অর্জিত হয়। অর্থাৎ, কেউ এতে সন্দেহ করে না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন দুর্লভ। তবে যাঁরা সিদ্দীক, তাঁরা এই একীনের অধিকারী হন। এর ফলস্বরূপ মানুষ একান্তেও তার সব কাজকর্মে আদব এবং শিষ্টাচার বজায় রাখে। কোন ব্যক্তি বাদশাহের দৃষ্টির সামনে উপবিষ্ট থাকলে সে সব সময় মাথা নীচু করে সকল কাজে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং শিষ্টাচার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। তেমনি মানুষ যখন জানবে, আল্লাহ তাআলা তার বাতেন সম্পর্কে যাহেরের মতই অবগত, তখন সে তার যাহেরী আমল ও বাতেনী চিন্তাভাবনা একই রূপ রাখতে চেষ্টা করবে। এ একীনে মানুষের মধ্যে লজ্জা, ভয়, বিনয়, নম্রতা, ও উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে এবং বড় বড় আনুগত্যের কারণ হয়। একীন যেন একটি বৃক্ষ, এসব চরিত্র যেন তার শাখা প্রশাখা। চরিত্র থেকে উদ্ভূত আমল ও আনুগত্য যেন ফল ও কলি, যা শাখা থেকে নির্গত হয়।

মোট কথা, একীনের মূল ভিত্তি এবং তার স্তর উপরোক্ত স্তরগুলো ছাড়া আরও অনেক রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ইনশাআল্লাহ এগুলো বর্ণিত হবে। একীনের শাব্দিক অর্থ বুঝাবার জন্যে এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে অনুধ্যান ও বিনয় সহকারে মাথানত করে চুপ থাকা– আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন বা নীরবতা সব কিছুতেই ভয়ের প্রতিফলন হওয়া; তাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হওয়া এবং তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই আমলের দলীল হওয়া। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ গাম্ভীর্যের সাথে বিনয় ও নম্রতার চেয়ে উত্তম পোশক আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করেননি। এটা পয়গম্বরগণের পোশাক এবং সিদ্দকী ও আলেমগণের লক্ষণ। বেশী কথা বলা, হাসিতে ডুবে থাকা, নড়াচড়া ও কথাবার্তায় পটু হওয়া– এগুলো সব আস্ফালন এবং আল্লাহর মহাশাস্তি ও গজব থেকে গাফেল থাকার লক্ষণ। এটা দুনিয়াদারদের রীতি, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে; আলেমগণের রীতি নয়। কেননা, সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেম তিন প্রকার– (১) যে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু তাঁর শাস্তির প্রকার সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে আদেশ করে। এ ধরনের এলেম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না। (২) যে আল্লাহকে জানে কিন্তু তাঁর আদেশ ও শাস্তির প্রকার জানে না, এরা সাধারণ ঈমানদার। (৩) যাঁরা আল্লাহকেও জানে এবং তাঁর আদেশ ও শাস্তির প্রকার সম্পর্কেও অবগত, তাঁরা সিদ্দীক। ভয় ও বিনয় কেবল তাঁদের উপরই প্রবল থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন– এলেম অর্জন কর এবং এলেমের জন্যে গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা অনুশীলন কর। যাঁর কাছে শিখবে তাঁর প্রতি বিনয়ী হও। তোমার কাছে যে জ্ঞান অর্জন করবে তাঁর পক্ষেও তোমার প্রতি বিনয়ী হওয়া উচিত। অত্যাচারী আলেম হয়ো না। এরূপ হলে তোমার এলেম মূর্খতা অপেক্ষাও মন্দ হবে। কেউ বলেন ঃ যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে এলেম দান করেন, তখন তাঁকে এলেমের সাথে সহনশীলতা, বিনয়, সচ্চরিত্রতা ও নম্রতাও দান করেন। একেই বলা হয় কল্যাণকর এলেম। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ যাঁকে এলেম, সংসার নির্লিপ্ততা, বিনয় ও সচ্চরিত্র দান করেন, সে মোত্তাকীদের ইমাম হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে আছে– আমার উম্মতের মধ্যে এমন উত্তম লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত দেখে প্রকাশ্যে হাসে এবং তাঁর আযাবের ভয়ে সংগোপনে ক্রন্দন করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে আর অন্তর আকাশে। তাদের প্রাণ ইহজগতে এবং জ্ঞান বুদ্ধি পরজগতে। তারা গাম্ভীর্য সহকারে চলে এবং ওসিলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। অর্থাৎ, যে বিষয় নৈকট্যের কারণ মনে করে তা পালন করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ সহনশীলতা এলেমের উযীর, নম্রতা তার পিতা এবং বিনয় তার পোশাক। বিশর ইবনে হারেস বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম দ্বারা রাজত্ব কামনা করে, আল্লাহর নৈকট্য তার সাথে শত্রুতা রাখে। কারণ, সে আকাশ ও পৃথিবীতে ঘৃণিত। বনী ইসরাঈলের কাহিনীসমূহে বর্ণিত আছে– জনৈক দার্শনিক ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে তিনশ' ষাটটি গ্রন্থ রচনা করে একজন খ্যাতিমান দার্শনিক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তখনকার পয়গম্বরের প্রতি ওহী পাঠান, অমুক ব্যক্তিকে বলে দাও, তুমি তোমার গ্রন্থ দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে দিয়েছ। কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই আমার নিয়ত করনি। তাই আমি কিছুই কবুল করিনি। দার্শনিক একথা শুনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হল। সে জনগণের সাথে মিশে গেল, বাজারে ঘুরাফেরা করল, বনী ইসরাঈলের সাথে পানাহার অবলম্বন করল এবং মনে মনে বিনয়ী হল। তখন আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরের প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওহী পাঠালেন– তাকে বলে দাও, এখন সে আমার সন্তুষ্টির তওফীক প্রাপ্ত হয়েছে।

আওযায়ী বেলাল ইবনে সা'দের এই উক্তি বর্ণনা করেন ঃ তোমরা শাহ্নার সিপাহীকে দেখলে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, অথচ নেতৃত্বলিপ্সু দুনিয়ার আলেমদেরকে দেখে খারাপ মনে কর না। পক্ষান্তরে এরা সিপাহীর তুলনায় অধিক ঘৃণার যোগ্য।

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা এবং সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। অতঃপর কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্ বন্ধু উত্তম? তিনি বললেন ঃ সে বন্ধু উত্তম যে তোমাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করে এবং তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ মন্দ সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে যে তোমাকে সাহায্য করে না, সে-ই মন্দ সঙ্গী। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। আরজ করা হল ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে, বলে দিন, যাতে আমরা তার সংসর্গে বসতে পারি। তিনি বললেন ঃ যাদের দিকে তাকালে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, তারা উত্তম। প্রশ্ন হল ঃ সর্বাধিক মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি মাগফেরাত কামনা করি। (এ কথাটি মন্দ লোকের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্যে বলা হয়েছে।) পুনরায় আরজ করা হল ঃ আপনি বলে দিন। তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক মন্দ লোক হচ্ছে বিপথগামী আলেম।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সে ব্যক্তিই অধিক নিশ্চিন্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে অধিক চিন্তা ভাবনা করত। আখেরাতে সে ব্যক্তিই হাসবে, যে দুনিয়াতে ক্রন্দন করত। আখেরাতে সর্বাধিক সুখী সে-ই হবে, যে দুনিয়াতে বহু দিন কষ্ট ভোগ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) এক খোতবায় বলেন ঃ তাকওয়া অবলম্বন করা সত্ত্বেও কারও আমলের ফসল যাতে ফ্যাকাসে ও ধ্বংস না হয়ে যায়, সে দায়িত্ব আমার। মানুষের মধ্যে সেই অধিক মূর্খ, যে তাকওয়ার মূল্য বুঝে না। আল্লাহ তাআলার কাছে সেই মন্দ, যে এলেম সকল জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ফেতনার অন্ধকারে হানা দেয় এবং নীচ লোকেরা তার নাম রাখে আলেম। তিনি আরও বলেন ঃ যখন তোমরা এলেম শুন, চুপ থাক এবং হাস্য-রসের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাথে মিশ্রিত করো না। নতুবা অন্তরে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেম যখন একবার হাসে, তখন এক গ্রাস এলেম মুখ দিয়ে বের করে দেয়। কেউ বলেন ঃ ওস্তাদের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকলে তার কারণে শাগরেদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হবে। প্রথম– সবর, দ্বিতীয়– বিনয় এবং তৃতীয়– সচ্চরিত্র। পক্ষান্তরে শাগরেদের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকলে ওস্তাদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়– জ্ঞানবুদ্ধি, শিষ্টাচার ও উত্তম বোধশক্তি। সারকথা, কোরআনে বর্ণিত চরিত্র থেকে আখেরাতের আলেমগণ মুক্ত নন। তারা আমলের জন্যে কোরআন পাঠ করেন– কেবল পড়া ও পড়ানোর জন্যে নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এটা দেখেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের পূর্বে ঈমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কোন সূরা নাযিল হলে আমরা তার হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এবং সূরার মধ্যে বিরতির জায়গা জেনে নিতাম। এখন আমি এমন লোক দেখছি, যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়। তারা আলহামদু থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফেলে, কিন্তু জানে না তাতে কি আদেশ নিষেধ রয়েছে এবং বিরতি কোথায় হবে? তারা কোরআনকে পচা খেজুরের মত ছড়িয়ে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পাঁচটি চরিত্র আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ। এগুলো কোরআন মজীদের পাঁচটি আয়াত থেকে বুঝা যায়– ভয়, নম্রতা, বিনয়, সচ্চরিত্র ও দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাত অবলম্বন। ভয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ –একমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

নম্রতা এই আয়াত থেকে জানা যায়– خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا –তারা আল্লাহর কাছে নম্র, তাঁর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে না।

বিনয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ –আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্যে বাহু নত রাখুন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সচ্চরিত্র এই আয়াত থেকে বুঝা যায়- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ -আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্যে নম্র স্বভাব হয়েছেন।

সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা এ আয়াত থেকে জানা যায়- وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - জ্ঞানপ্রাপ্তরা বলল : তোমাদের দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া সওয়াব মুমিন ও সৎকর্মীর জন্যে উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

জনৈক ব্যক্তি আরজ করল : বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ কি ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : নূর যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন তা গ্রহণ করার জন্যে বক্ষ খুলে যায়। জিজ্ঞেস করা হল : এর কোন পরিচয় আছে কি? তিনি বললেন : হাঁ, এর পরিচয় হল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হবে, পরকালের প্রতি মনোযোগী হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তারা অধিকাংশ কথাবার্তা এলেম ও আমল সম্পর্কে বলেন; বরং যেসব বিষয় আমল নষ্ট করে, মনকে পেরেশান করে, কুমন্ত্রণা জাগ্রত করে এবং অনিষ্ট সৃষ্টি করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন না। কেননা, অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা দ্বীনের মূল। আর যারা দুনিয়াদার আলেম তারা রাজ্যশাসন ও মামলা-মোকদ্দমার খুঁটিনাটি শাখা-প্রশাখা শিক্ষা করে। তারা এমন সব মাসআলা গড়ার কাজে পরিশ্রম করে, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কখনও বাস্তবে রূপ নেয় না, নিলেও তাদের জন্যে নয়- অন্যের জন্যে। অথচ যেসব বিষয় তাদের সাথে প্রতিনিয়ত লেগে থাকে, সেগুলো তারা ত্যাগ করেই বসে রয়েছে। যারা মানুষের কাছে নৈকট্যশীল ও প্রিয় হওয়ার উদ্দেশে এ ধরনের অবাস্তব ও অনাবশ্যক কাজ করে, তারাই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যাহত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতিদান এই, তারা দুনিয়াতেও মানুষের প্রিয় হয় না এবং আখেরাতেও আল্লাহর কাছে তাদের কর্মসমূহ মূল্যহীন; বরং তারা বিপদাপদে জড়িত হয়ে তিক্ত জীবন যাপন করে। তারা কেয়ামতে রিক্তহস্তে যাবে এবং আখেরাতের আলেমগণের সাফল্য ও সৌভাগ্য দেখে অনুতাপ করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা বেশীর ভাগ পয়গম্বরগণের কথাবার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং চরিত্র ও জীবনপদ্ধতিতে তিনি অন্যের তুলনায় বেশীর ভাগ সাহাবায়ে কেরামের নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁর এ দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবাই একমত। তাঁর অধিকাংশ ওয়ায-নসীহত, অন্তরের বিপদাশংকা, আমলের অনিষ্ট, নফসের কুমন্ত্রণা, নফসের গোপন ও সূক্ষ্ম খাহেশাতের অনিষ্ট সম্পর্কে হত। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এমন ওয়ায করেন যা আমরা অন্যদের কাছে শুনি না। আপনি এই ওয়ায কোথায় শিখলেন? তিনি বললেন ঃ সাহাবী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)-এর কাছ থেকে শিখেছি। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এমন কথাবার্তা বলেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একশ' সাহাবীর মধ্যে কারও মুখে শুনি না। আপনি এই কথাবার্তা কোথা থেকে আয়ত্ত করলেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমি এটা লাভ করেছি। অন্যরা তাঁকে কল্যাণের অবস্থা জিজ্ঞেস করত, আমি অনিষ্টের অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম। আমি কোথাও অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ি– এই আশংকায়ই এরূপ করতাম। কল্যাণ আমার কাছে আসবে– এটা আমি জানতাম। এক রেওয়ায়েতে আছে– আমি জানতাম, যে অনিষ্ট চেনে না সে কল্যাণও চেনে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করত– যে এমন ধরনের কাজ করে সে কি সওয়াব পাবে? অর্থাৎ, তাঁরা আমল ও ফযীলত সম্পর্কে প্রশ্ন রাখত আর আমি জিজ্ঞেস করতাম– ইয়া রসূলাল্লাহ, কিসে অমুক অমুক আমল নষ্ট করে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দেখলেন, আমি কেবল আমল নষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাকে বিশেষভাবে এ শিক্ষাই দান করলেন। হযরত হুযায়ফা নেফাক ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানার ব্যাপারেও একক ছিলেন। হযরত ওমর, ওসমান ও বড় বড় সাহাবীগণ তাঁকে ফেতনার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। মোনাফেকদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সংখ্যা বলে দিতেন– নাম বলতেন না। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নিজের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন– আমার মধ্যে কোন নেফাক তো নেই? তিনি তাঁকে নেফাক থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলতেন। হযরত ওমরকে কোন জানাযার নামায পড়ার জন্যে ডাকা হলে তিনি দেখতেন, সেখানে হুযায়ফা উপস্থিত আছেন কিনা? উপস্থিত থাকলে তিনি নামায পড়তেন, নতুবা পড়তেন না। হযরত হুযায়ফার উপাধি ছিল 'ছাহিবুস সির' অর্থাৎ রহস্যজ্ঞানী। মোট কথা, অন্তরের স্তর ও অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা আখেরাতের আলেমগণের রীতি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্যে অন্তরই প্রচেষ্টা চালায়। বর্তমানে এ শাস্ত্র দুর্লভ ও প্রাচীন হয়ে গেছে। কোন আলেম এ শাস্ত্রে কোন বিষয়ের প্রয়াসী হলে মানুষ আশ্চর্যবোধ করে এবং বলে ঃ এটা কেবল ওয়ায়েযদের ধোকা। তারা কেবল বিবাদ বিতর্কের মধ্যেই সত্যিকার বিষয় নিহিত আছে বলে মনে করে। কেননা, সত্য তিক্ত এবং তা জানা কঠিন। এর পথও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বিশেষতঃ অন্তরের গুণাবলী জানা ও অন্তরকে মন্দ চরিত্র থেকে পাক পবিত্র করা তো মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল। সুতরাং এমন পথের দিকে মানুষ বেশী আকৃষ্ট হবে কেমন করে। কথিত আছে, বসরায় একশ' বিশ জন ওয়ায়েয ছিল, কিন্তু তাদের তিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ একীন ও অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করত না। এ তিন জন ছিলেন সহল তস্তরী, ছবিহী ও আবদুর রহীম। তাদের ওয়াযে অসংখ্য জনসমাগম হত, কিন্তু এই তিন জনের ওয়াযে দশ জনের বেশী শ্রোতা থাকত না। কেননা, বিশেষ লোকগণই উৎকৃষ্ট বস্তুর যোগ্য হয়ে থাকে। আর জনগণকে যা দেয়া হয়, তা সহজ হয়ে থাকে। তার প্রার্থী হয় অনেক।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান গরিমায় অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের স্বচ্ছ উপলব্ধির উপর ভরসা করেন, কিতাব বা গ্রন্থের উপর করেন না। অন্যের কাছ থেকে শোনা বিষয়ের উপরও তাঁরা ভরসা করেন না। তাঁরা কেবল শরীয়তের কর্ণধার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তকলীদ তথা অনুসরণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের তকলীদও এদিক দিয়ে করেন, তাঁদের কাজকর্মগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শোনার উপর ভিত্তিশীল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন, সেগুলো অবশ্যই কোন তাৎপর্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল। কাজেই তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উক্তি ও কর্ম অনুসরণ করার পর সেগুলোর যথাযথ তাৎপর্য অনুসন্ধান করা উচিত। কেননা, আলেম যদি যা শুনে তাই মনে রাখে, তবে সে এলেমের পাত্র হবে– আলেম হবে না। এজন্যেই আগেকার দিনে এধরনের ব্যক্তিকে এলেমের পাত্র বলা হত, আলেম বলা হত না। সুতরাং যে কেবল মুখস্থ করে এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত নয়, তাকে আমরা আলেম বলব না। পক্ষান্তরে যার অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায় এবং সে হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়, সে আপনা আপনি অনুসৃত হয়ে যায়। অপরের তকলীদ করা তার উচিত নয়। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ এমন নয়, যার সব কথাই মেনে নেয়া যায়– কতক মেনে নেয়া হয় এবং কতক মেনে নেয়া হয় না। ইবনে আব্বাস ফেকাহ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর কাছে শিখেছিলেন এবং কেরাআত হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-ক শুনিয়েছিলেন। এরপর উভয় শাস্ত্রে উভয় ওস্তাদের সাথে মতভেদ করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা তো আমরা শিরোধার্য করে নেই। আর সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার কিছু অংশ গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ করি না। তাবেয়ীগণের কাছ থেকে যা পেয়েছি– সেক্ষেত্রে তাঁরাও মানুষ এবং আমরাও মানুষ। সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থার ইঙ্গিত স্বচক্ষে দেখেছেন। ইঙ্গিত দ্বারা তাঁরা যা জেনেছেন, তার সাথে তাঁদের অন্তর সম্পৃক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কের কারণে তাঁরা সত্যের উপর স্থির রয়েছেন। ইঙ্গিত দ্বারা যা বুঝা যায়, তা রেওয়ায়েত ও ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

অপরের কাছ থেকে শোনা কথার উপর ভরসা করা যখন অপছন্দীয় তকলীদ, তখন কিতাব ও রচনাবলীর উপর ভরসা করা আরও অবান্তর। বরং কিতাব ও রচনাবলী নতুন জিনিস। সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং কিছুটা তাবেয়ীগণের যুগে কোন কিতাব অথবা রচনা ছিল না। হিজরতের একশ' বিশ বছর পরে সমস্ত সাহাবী ও কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর ওফাতের পর রচনার সূত্রপাত হয়। সাহাবায়ে কেরাম তো হাদীসের কেতাব লেখা ও রচনা করা খারাপ মনে করতেন। তাঁরা আশংকা করতেন, মানুষ কিতাবের উপর ভরসা করে হাদীস মুখস্থ করা, কোরআন পাঠ করা এবং বুঝা ছেড়ে দিতে পারে। তাঁরা বলতেন ঃ আমরা যেমন মুখস্থ করি,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমরাও মুখস্থ কর। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী কোরআন মজীদকে মাসহাফ তথা গ্রন্থাকারে একত্রিত করা উপযুক্ত মনে করেননি। তাঁরা বলতেন ঃ যে কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) করেননি, আমরা তা কিরূপে করতে পারি ? কাজেই কোরআনকে এমনিভাবে রেখে দাও এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখে নাও। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) ও অবশিষ্ট সাহাবীগণ এই আশংকায় কোরআন লেখতে বললেন যে, মানুষ অবহেলা ও শৈথিল্য করবে অথবা পড়ার ক্ষেত্রে কোন শব্দ অথবা মিলের খেলাফ হলে তা দূর করার জন্যে কোন মূল পাওয়া যাবে না। এভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মনও এ কাজের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি কোরআন মজীদ সংগ্রহ করে মাসহাফে তথা পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম মালেককে মুয়াত্তা রচনা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ যে কাজ সাহাবায়ে কেরাম করেননি, আপনি তার উদ্ভাবন করবেন না। কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম রচিত কিতাব হচ্ছে ইবনে জুরায়জের কিতাব- যাতে মনীষীগণের উক্তি এবং মুজাহিদ, আতা ও হযরত ইবনে আব্বাসের শাগরেদদের বর্ণিত তফসীরসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। এটি মক্কা মোয়াযযমায় সংকলিত হয়। এরপর মা'মার ইবনে রাশেদ সানআনীর হাদীস সম্বলিত কিতাব ইয়ামনে গ্রন্থিত হয়। এরপর ইমাম মালেকের মুয়াত্তা এবং সুফিয়ান সওরীর জামে' রচিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে কালাম শাস্ত্রের রচনাবলী প্রকাশ পায় এবং প্রচুর পরিমাণে কলহ-বিবাদ ও বাজে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। মানুষ এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং কিসসা ও ওয়ায বলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

তখন থেকে একীন শাস্ত্র হ্রাস পেতে থাকে এবং পরে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, অন্তরের এলেম ও নফসের ভালমন্দ অবস্থা জানা একটি দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়। কয়েকজন আগ্রহী ব্যক্তি ছাড়া সবাই এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন সে-ই আলেম কথিত হয়, যে মোনাযারা করে, কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ওয়াযে খুব চটকদার ভাষায় ও ছন্দপূর্ণ বাক্যে কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে। এর কারণ, এগুলো জনসাধারণ শুনে, যারা জানে না, কোন্‌টি বাস্তব এলেম এবং কোন্‌টি অবাস্তব। সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ও এলেম তাঁদের জানা নেই যাতে তার সাথে মিলিয়ে দেখে নেবে যে, আজকালকার আলেমরা তাঁদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পূর্ণ বিপরীত। এদিক দিয়েই জনসাধারণ যাকে কিছু বলতে শুনেছে, তাকে আলেম বলে দিয়েছে। পরবর্তীরাও এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদেরই পদাংক অনুসরণ করেছে। ফলে আখেরাতের এলেম শিকায় উঠেছে। পূর্বেকার যুগে যখন দ্বীনের এই ঢিলে অবস্থা, তখন বর্তমানকালের অবস্থা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। এখন যদি কেউ কালাম শাস্ত্র অস্বীকার করে, তবে উন্মাদ বলা হয়। কাজেই এখন নীরবে নফসের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করাই উত্তম।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা বেদআত তথা নবাবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে সযত্নে বেঁচে থাকেন, যদিও সকল জনসাধারণ সে বিষয়ে একমত হয়ে যায়। যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে নতুন আবিষ্কৃত হয়, তাতে জনসাধারণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দরুন বিভ্রান্ত হন না। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনালেখ্য ও কাজকর্মের অন্বেষণে ব্রতী হন এবং দেখেন, তাঁদের শক্তি কি কি বিষয়ে নিয়োজিত ছিল– শিক্ষকতায়, রচনায়, মোনাযারায়, বিচারক ও শাসক হওয়ায়, ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী হওয়ায়, এতীমের মালের রক্ষক হওয়ায়, শাসকদের সাথে উঠাবসা করায় নিয়োজিত ছিল, না ভয়, চিন্তা-ভাবনা ও মোজাহাদায়, যাহের ও বাতেনের মোরাকাবায়, ছোট বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষায়, নফসের গোপন খায়েশ জানায় এবং শয়তানের চক্রান্ত উদঘাটন করায় তাঁরা মশগুল ছিলেন ? একথা নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, সে ব্যক্তিই বেশী আলেম এবং সত্যের অধিক নিকটবর্তী, যাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে অধিক মিল রয়েছে এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের পন্থা সম্পর্কে যে অধিক ওয়াকিফহাল । কেননা, দ্বীন তাঁদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে অধিক দ্বীনদার । একথা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন কেউ তাঁকে বলেছিল ঃ আপনি অমুক ব্যক্তির বিরোধিতা করেছেন। মোট কথা, তোমার কাজকর্ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানার অনুরূপ হলে সমকালীন লোকদের বিরোধিতার পরওয়া করো না। কারণ, লোকেরা তাঁদের মনের খাহেশ অনুযায়ী একটি নীতি ঠিক করে নিয়েছে এবং তারা একথা স্বীকার করতে সম্মত নয় যে, তাদের নীতি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ফলে তারা দাবী করে, এ নীতি ছাড়া জান্নাত লাভের কোন পথ নেই। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ ইসলামে দুই শ্রেণীর নতুন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লোক সৃষ্টি হয়ে গেছে– (১) যাদের নীতি খারাপ, কিন্তু তারা বলে যে, জান্নাত তার জন্যই, যার নীতি তাদের নীতির অনুরূপ। (২) ধনী দুনিয়াদার, যারা দুনিয়ার জন্যই সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয় এবং দুনিয়াই অন্বেষণ করে। সুতরাং তুমি উভয় শ্রেণীকে বর্জন কর এবং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে দাও। যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে, যাকে ধনীরা তাদের দুনিয়ার দিকে আর বেদআতীরা তাদের ভ্রষ্ট নীতির দিকে ডাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় দল থেকে দূরে রাখেন এবং সে পূর্ববর্তী মনীষীদের কর্মপন্থা অনুসরণ করে, তবে তুমিও তাঁর মতই হয়ে যাও। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে মওকুফ ও মরফু উভয় পন্থায় বর্ণিত আছে, শিক্ষণীয় বিষয় দুটিই– একটি কালাম ও অপরটি চরিত্র । কালামের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কালাম এবং চরিত্রের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র । সাবধান, তোমরা নতুন বিষয়াদি থেকে দূরে সরে থাক। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন বিষয় । নতুন বিষয় মানেই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা । খবরদার, নিজের জীবনকে বেশী মনে করো না, নতুবা তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে। মনে রেখো, যে বস্তু আসবে তা কাছেই । দূরে সে বস্তু যা আসে না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ কারণে বলেন ঃ সে ব্যক্তিই সুখী যে নিজের দোষ দেখে অন্যের দোষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে এবং গোনাহগারদের কাছ থেকে বেঁচে থাকে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ শেষ যমানায় সচ্চরিত্র হওয়া অনেক আমলের তুলনায় উত্তম হবে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে সৎকর্মে অগ্রণী । সত্বরই তোমাদের পরে এমন এক সময় আসবে, যখন উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে দৃঢ়পদ থাকে এবং কর্ম সম্পাদনে তড়িঘড়ি করে না। কেননা, সন্দেহ সংশয় হবে অনেক– এ উক্তি যথার্থ । কেননা, এ যুগে কাজকর্মে যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি না দেয় এবং যেসব কাজে সবাই লিপ্ত, তাতে সেও লিপ্ত হয়ে যায়, তবে সকলের মত সে-ও বরবাদ হবে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরও বিস্ময়কর উক্তি করেছেন। তিনি বলেন ঃ এসময়ে তোমাদের পুণ্য পূর্ববর্তী সময়ের পাপ, আর এখন যাকে তোমরা পাপ মনে কর তা পূর্বযুগে পুণ্য ছিল। তোমরা যতক্ষণ সত্যকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিনবে, ততক্ষণ কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ পুণ্য কাজ সাহাবায়ে কেরামের যুগে অস্বীকৃত ছিল। উদাহরণতঃ আজকাল পুণ্যের ধোঁকায় মসজিদসমূহের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং দালানের কারুকার্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করা হয়। মসজিদে কার্পেট বিছানো হয়। অথচ পূর্বে মসজিদে চট বিছানোও বেদআতরূপে গণ্য হত। কথিত আছে, মসজিদে ফরাশ ইত্যাদি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আবিষ্কার। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ মসজিদের মাটিতে কমই ফরাশ বিছাতেন। মোনাযারা বিতর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করাকেও আজকাল বড় পুণ্য কাজ মনে করা হয়। অথচ পূর্বে একে খুব মন্দ কাজ মনে করা হত। কোরআন পাঠ এবং আযানে সুরেলা কণ্ঠও এরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ তোমরা এখন এমন এক যমানায় রয়েছ, যাতে খাহেশ এলেমের অনুসারী, কিন্তু এক সময় আসবে যখন এলেম খাহেশের অনুসারী হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ মানুষ সুন্নত পরিত্যাগ করে নতুন নতুন বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত রয়েছে । এগুলোর মধ্যে এলেম খুব কম । আল্লাহ্ সাহায্য করুন । মালেক ইবনে আনাস বলেন ঃ মানুষ আজকাল যা জিজ্ঞেস করে, অতীতে তা জিজ্ঞেস করত না। আলেমগণ হারাম ও হালাল বর্ণনা করতেন না। আমি তাঁদেরকে মোস্তাহাব ও মকরূহ্ বর্ণনা করতে দেখেছি । অর্থাৎ, তাঁদের দৃষ্টি কেবল মোস্তাহাব ও মকরূহ বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত । হারাম থেকে তাঁরা বেঁচেই থাকতেন। আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলতেন ঃ কারও অন্তরে কোন ভাল বিষয় ইলহাম হলে সুন্নতে তার অস্তিত্ব আছে কিনা, যাচাই না করা পর্যন্ত আমল করা উচিত নয়। সুন্নতে তার অস্তিত্ব পাওয়া গেলে আল্লাহর শোকর করে আমল করবে। এ কথা বলার কারণ, আজকাল নতুন নতুন অনেক বিষয় শুনে মানুষ অন্তরে তা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এতে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হয়। ফলে মিথ্যাকে সত্য মনে করতে থাকে। তাই সাবধানতা জরুরী। এ কারণেই মারওয়ান ঈদের নামাযে ঈদগাহের সন্নিকটে মিম্বর তৈরী করালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে মারওয়ান! এটা কি বেদআত? মারওয়ান বলল ঃ এটা বেদআত নয়; বরং উত্তম কাজ। আপনি জানেন, অনেক লোক সমাগত হয়। তাই আমি সকলের কাছে আওয়ায পৌঁছাতে চেয়েছি। তিনি বললেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঃ আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তা থেকে উত্তম কাজ তুমি কখনও করবে না। আজ আমি তোমার পেছনে নামায পড়ব না। হযরত আবু সায়ীদের এ অস্বীকৃতির কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের খোতবা এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া করার সময় ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিতেন; মিম্বরে আরোহণ করতেন না। এক হাদীসে আছে–

من احدث فى ديننا ما ليس منه فهورد 'যেব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সে প্রত্যাখ্যাত।' অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– যেব্যক্তি আমার উম্মতকে ধোঁকা দেয়, তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। কেউ আরজ করল ঃ আপনার উম্মতকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ বেদআত সৃষ্টি করে তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ তাআলার এক ফেরেশতা প্রত্যহ ঘোষণা করে– যেব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নতের খেলাফ করে, সে তাঁর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে। যেব্যক্তি সুন্নত বিরোধী বেদআত সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে গোনাহগার হয়, সে অন্যান্য গোনাহগারের তুলনায় এমন, যেমন বাদশাহকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তি সে ব্যক্তির তুলনায়, যে কোন বিশেষ কাজে বাদশাহর কথা অমান্য করে। এ ত্রুটি বাদশাহ কখনও ক্ষমা করে দেন, কিন্তু সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তির দোষ কখনও ক্ষমা করেন না। কোন এক মনীষী বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সে বিষয়ে চুপ থাকা অন্যায় এবং যে বিষয়ে তাঁরা চুপ রয়েছেন, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বাড়াবাড়ি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মধ্যবর্তী পথ আঁকড়ে ধর। যে এ পথ থেকে এগিয়ে চলে যায়, সে ফিরে আসুক এবং যে পেছনে থেকে যায় সে এগিয়ে যাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পথভ্রষ্টরা অন্তরে পথভ্রষ্টতারও মিষ্টতা অনুভব করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا ـ

অর্থাৎ, যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে, তাদেরকে পরিত্যাগ কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি আরও বলেন ঃ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا অর্থাৎ, যার সামনে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করে পেশ করা হয়, সে তাকে কল্যাণকর মনে করে।

অতএব যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইবলীস তার সাঙ্গোপাঙ্গকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তারা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে ফিরে এলে ইবলীস জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি করলে? তারা বলল ঃ আমরা সাহাবীদের মত লোক দেখিনি। তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন চক্রান্তই সফল হয় না। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ইবলীস বলল ঃ বাস্তবিকই তোমাদের সাধ্য হবে না। কেননা, তাঁরা তাঁদের নবীর সংসর্গলাভ এবং কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু শীঘ্র তাঁদের পরে কিছু লোক জন্ম নেবে, যাদের কাছে তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। এরপর তাবেয়ীদের যুগ এলে ইবলীস আবার তার দলবল ছড়িয়ে দিল। তারা পূর্বের ন্যায় ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসে বলল ঃ আমরা তাঁদের মত অধিক আশ্চর্যজনক লোক দেখিনি। কোথাও আমাদের চক্রান্ত সফল হলে এবং কিছু গোনাহ করাতে পারলে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আল্লাহ তাঁদের পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন্। ইবলীস বলল ঃ তোমরা তাঁদের কাছ থেকেও কিছু পাবে না। কারণ, তাঁদের তওহীদ সঠিক এবং নবীর সুন্নত অনুসরণের কারণে সবল। তাঁদের পর এক সম্প্রদায় আসবে, যাদের দ্বারা তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। খাহেশের লাগাম ধরে তোমরা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাদের ক্ষমা করা হবে না। তারা এমন তওবা করবে না যে, আল্লাহ্ তাঁদের তওবার দৌলতে পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী লোকদের মধ্যে শয়তান বেদআত ছড়িয়ে একে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিল। ফলে তারা বেদআতকে হালাল জ্ঞান করল এবং দ্বীনের কাজ বলে ধরে নিল। তারা বেদআত করে ক্ষমা প্রার্থনাও করে না এবং তওবাও করে না। ইবলীস তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা টেনে নেয়। যদি বল, ইবলীস তো কারও সাথে কথা বলে না, অতএব বর্ণনাকারী এসব কথা কোথেকে জানলেন? এর জওয়াব, আধ্যাত্ম পুরুষের কাছে জগতের বহু গোপন রহস্য উদঘাটিত হয়। কখনও তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের অন্তরে অপ্রকাশিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়ে যায়। একে বলা হয় ইলহাম। কখনও সত্য স্বপ্নের আকারে তাঁরা রহস্য অবগত হয়ে যান এবং কখনও জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টান্ত দেখে রহস্য জেনে নেন। জাগ্রত অবস্থায় জেনে নেয়া নবুওয়তের একিট সুউচ্চ স্তর। যেমন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম স্তর। খবরদার, এই এলেম পাঠ করে তুমি সম্পূর্ণ তোমার বিবেকের বাইরের বিষয়সমূহ অস্বীকার করতে শুরু করো না। এ ব্যাপারে বড় বড় পণ্ডিতও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, যারা দাবী করত, তাঁরা সকল যুক্তিশাস্ত্রে বিজ্ঞ। বলাবাহুল্য, যে যুক্তিশাস্ত্র ওলীআল্লাহগণের এসব বিষয়কে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে, তা থেকে মূর্খতাই শ্রেয়ঃ। যারা ওলীদের এসব বিষয় অস্বীকার করে, তারা পয়গম্বরগণকেও অস্বীকার করতে পারে। ফলতঃ তারা ধর্মচ্যুত হয়ে যায়।

জনৈক সাধক বলেন ঃ আবদালগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। কারণ, এ যুগের আলেমগণকে দেখার সাধ্য তাঁদের নেই। তাঁদের মতে এ যুগের আলেমরা আল্লাহ তাআলাকে জানে না। অথচ নিজেদের এবং মূর্খদের ধারণায় তারা আলেম। সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ গাফেলদের কথা এবং দুনিয়ায় মগ্ন আলেমদের কথা শোনা উচিত নয়। বরং তারা যে কথা বলে, তাতে তাদেরকে দোষী মনে করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রিয় বিষয়বস্তুর মধ্যে মগ্ন থাকে এবং যে বিষয় প্রিয় বিষয়বস্তুর অনুকূল নয়, তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ

অর্থাৎ, "যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সীমালংঘন করাই যার কাজ, তার কথা মেনে চলো না।"

যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ নিজেদেরকে আলেম মনে করে, তাদের তুলনায় মূর্খ জনসাধারণও ভাল। কারণ, পাপী জনসাধারণ তাদের ক্রুটি ও গোনাহ্ স্বীকার করে এবং তজ্জন্য তওবা এস্তেগফার করে। কিন্তু এই আলেমরূপী জাহেলরা এমন এলেমে মশগুল থাকে, যদ্দারা দুনিয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্জন করা যায়। তাঁরা দ্বীনের পথে চলা থেকে গাফেল হয়ে তওবা এস্তেগফার কিছুই করে না এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই একই ধ্যানে মগ্ন থাকে। আল্লাহ যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন তাদের ছাড়া অধিকাংশ লোকেরই এ অবস্থা। তাদের সংশোধনের আশা নেই। তাই দ্বীনদার সাবধানী ব্যক্তির জন্যে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে তাদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে বসে থাকা। সেমতে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ "নির্জনবাস" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই ইউসুফ ইবনে আসবাত হুযায়ফা মারআশীকে লেখেছিলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি ধারণা করেন, আমি এমন পর্যায়ে রয়েছি, আমার সাথে খোদা স্মরণকারী কেউ নেই। কাউকে পাওয়া গেলে তার সাথে যিকির করা গোনাহের কাজই হয়। আর এ কথা যথার্থ। কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে গীবত করা অথবা গীবত শুনা থেকে বাঁচা যায় না। অথবা মন্দ কাজ দেখে চুপ থাকতে হয়। অথচ এলেম শিক্ষা দেয়া অথবা শিক্ষা করা মানুষের উত্তম অবস্থা। চিন্তা করলে দেখা যায়, এলেমকে দুনিয়া অন্বেষণের উপায় ও মন্দ কাজের ওসিলা করাই শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ওস্তাদ হবে তার সাহায্যকারী ও মন্দ কাজের উপকরণ প্রস্তুতকারী। যেমন, কেউ ডাকাতের হাতে তরবারি বিক্রয় করে। এলেমও তরবারি সদৃশ। এতে কল্যাণের যোগ্যতা এমন, যেমন তরবারিতে জেহাদের যোগ্যতা। কাজেই যেব্যক্তি ডাকাতির জন্যে তরবারি কিনতে চায় বলে ইঙ্গিতে জানা যায়, তার কাছে তরবারি বিক্রয় করা জায়েয নয়।

এ পর্যন্ত আখেরাতের আলেমগণের বারটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল। এর প্রত্যেকটিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের কিছু কিছু চরিত্র বিধৃত হয়েছে। অতএব তুমি হয় এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যাও, না হয় নিজের ত্রুটি স্বীকার করে এসব গুণে বিশ্বাসী হয়ে থাক। কিন্তু খবরদার, এ দু'পথ ছাড়া তৃতীয় পথ অবলম্বন করো না। নতুবা তুমি দুনিয়ার উপায়কে দ্বীন বলতে শুরু করবে এবং মিথ্যুকদের চরিত্রকেই খাঁটি আলেমগণের চরিত্র বলে সাব্যস্ত করবে। ফলে মূর্খতা ও অস্বীকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে ভিড়ে যাবে, যাদের বাঁচার কোন আশাই নেই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবেক ও তার মাহাত্ম্য

প্রকাশ থাকে যে, বিবেকের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না– বিশেষতঃ জ্ঞানের মাহাত্ম্য জেনে নেয়ার পর। কেননা, বিবেক হচ্ছে জ্ঞানের উৎসমূল। বিবেকের তুলনায় জ্ঞান এমন, যেমন বৃক্ষের তুলনায় ফল অথবা সূর্যের তুলনায় আলো। অতএব যে বিষয়টি দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়, তা শ্রেষ্ঠ হবে না কেন? চতুষ্পদ জন্তু হিতাহিত জ্ঞান কম থাকা সত্ত্বেও বিবেকের সামনে মাথা নত করে। সেমতে যে জন্তু সর্বাপেক্ষা বড় এবং বেশী ক্ষতিকর ও ভীতিপ্রদ, সে জন্তুও মানুষকে দেখে মাথা নুইয়ে দেয় এবং ভয় পায়। কারণ, এতটুকু বোধশক্তি তার আছে যে, মানুষ তার উপর প্রবল হয়ে যাবে। কেননা, সে যে কলাকৌশল জানে, তা আর কেউ জানে না। এজন্যেই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ বৃদ্ধ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন, যেমন নবী তার সম্প্রদায়ের মধ্যে। এটা বিপুল অর্থ-সম্পদ, বিশাল দেহ এবং অধিক শক্তির কারণে নয়; বরং অধিক অভিজ্ঞতার কারণে, যা বিবেকের ফসল। এ কারণেই তুর্কী, কুর্দী ও আরব জনসাধারণকে দেখা যায়, তারা মূর্খতায় চতুষ্পদ জন্তুদের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও মজ্জাগতভাবে বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এ কারণেই জনৈক শত্রু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শহীদ করতে চাইল এবং তার দৃষ্টি তাঁর নূরোজ্জ্বল তথা জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলের উপর পতিত হল, তখন সে কেঁপে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উজ্জ্বল ললাটে বিরাজমান নবুওয়তের নূর শত্রুর দৃষ্টিতে ঝলসে উঠল।

মোট কথা, বিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব জাজ্বল্যমান বিষয়। কিন্তু এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে যেসব কোরআনী আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে, এখানে সেগুলো উল্লেখ করাই আমাদের লক্ষ্য।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বিবেককে নূর বলে অভিহিত করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (আলো)।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি বিবেক থেকে উদ্ভূত এলেমকে রূহ, ওহী ও হায়াত (জীবন) বলে ব্যক্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ـ

অর্থাৎ, "এমনিভাবে আমি আমার আদেশে আপনার কাছে রূহ্ প্রেরণ করেছি।"

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ ـ

অর্থাৎ, "যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আলো দিয়েছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে।"

আল্লাহ্ তাআলা যেসব জায়গায় "নূর ও জুলুমাত" তথা আলো ও অন্ধকার উল্লেখ করেছেন, সেখানে অর্থ, এলেম ও মূর্খতা বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থাৎ, "তিনি তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহকে চেন এবং পরস্পর একে অপরকে বিবেকের উপদেশ দাও। এতে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ জানতে পারবে। জেনে রাখ, বিবেক তোমাদেরকে তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে মাহাত্ম্য দান করবে। জেনে রাখ, সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, যদিও সে দেখতে কুশ্রী, মান্যতায় নিকৃষ্ট এবং মর্যাদায় কম হয়। আর জাহেল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করে। তার তুলনায় শূকর ও বানর অধিক বিবেকবান। দুনিয়াদার তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না, তা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা বিবেক সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন– সামনে এস। সে সামনে এলে বললেন ঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এর পর আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ আমার ইযযত ও মাহাত্ম্যের কসম, আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার মাধ্যমেই সম্মান ছিনিয়ে নেব, তোমার মাধ্যমেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্মান দেব, তোমার কারণেই সওয়াব দেব এবং তোমার কারণেই শাস্তি দেব।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তির অতিরঞ্জিত প্রশংসা হলে তিনি বললেন ঃ লোকটির বিবেক কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত ও বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের ব্যাপারে তার অধ্যবসায়ের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করছি, আর আপনি তার বিবেকের অবস্থা জানতে চাইছেন, এটা কেন? তিনি বললেন ঃ বিবেকহীন ব্যক্তি মূর্খতার কারণে পাপাচারীর চেয়ে বেশী পাপ করে ফেলে। আসন্ন কেয়ামতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হওয়ার স্তর বিবেক অনুযায়ী উচ্চতর হবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের উপার্জনের মধ্যে বিবেক বুদ্ধির সমান কোন কিছু নেই। বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে হেদায়াতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষের বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন সঠিক হয় না। এক হাদীসে আছে–

"মানুষ তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার ও রাত্রি জাগরণকারীর স্তরে উন্নীত হয়। কারও বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সচ্চরিত্রতা পূর্ণ হয় না। বিবেক পূর্ণ হয়ে গেলে ঈমান পূর্ণ হয়, পরওয়ারদেগারের আনুগত্য অর্জিত হয় এবং সে তার দুশমন শয়তানের নাফরমান হয়ে যায়।"

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর একটি ভরসা আছে। ঈমানদারের ভরসা হল বিবেক। অতএব তার এবাদত তার বিবেক অনুযায়ী হবে। তুমি কি শুননি, দোযখে কাফেররা বলবে–

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ -

অর্থাৎ, "যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক খাটাতাম, তবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।"

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) তামীম দারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মধ্যে সর্দার কোন্‌টি? সে বলল ঃ বিবেক। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এ প্রশ্নই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছিলাম। তিনিও এ উত্তরই দেন এবং বলেন ঃ আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নেতৃত্ব কি? তিনি বললেন ঃ বিবেক। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অত্যধিক প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ লোকসকল, প্রত্যেক বস্তুর একটি বাহন আছে, মানুষের বাহন হচ্ছে বিবেক। তোমাদের মধ্যে তার যুক্তি প্রমাণই উত্তম, যার বিবেক বেশী। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মানুষকে একথা বলাবলি করতে শুনলেন ঃ অমুক অমুকের চেয়ে বেশী বীর প্রমাণিত হয়েছে এবং যুদ্ধের পরীক্ষায় অমুক অমুকের চেয়ে অধিক উত্তীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এসব বিষয় তোমরা জান না। লোকেরা আরজ করল ঃ তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ তারা ততটুকু যুদ্ধ করেছে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিবেক দান করেছিলেন। তাদের জয়-পরাজয়ও তাদের বিবেক অনুসারে হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের স্তর বিভিন্ন রূপ হয়েছে। কেয়ামতের দিন তারা তাদের বিবেক ও নিয়ত অনুসারে মর্যাদা লাভ করবে। বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ফেরেশতারা বিবেক দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঈমানদাররা তাদের বিবেক দ্বারা চেষ্টা করেছেন। অতএব যে আল্লাহর এবাদত করে, তার বিবেকও বেশী। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলাম, দুনিয়াতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন ঃ বিবেকের দ্বারা! আমি বললাম ঃ আখেরাতে কোন্ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন, বিবেক দ্বারা। আমি আরজ করলাম ঃ তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিদান হবে না? তিনি বললেন ঃ আয়েশা, তারা কর্ম ততটুকু করে থাকবে, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে বিবেক দিয়ে থাকবেন। অতএব বিবেক অনুপাতেই কর্ম হবে এবং তার প্রতিদান দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বিষয়ের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার আছে। মুমিনের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার হচ্ছে বিবেক। প্রত্যেক বস্তুর স্তম্ভ আছে। দ্বীনের স্তম্ভ বিবেক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি রক্ষক আছে। এবাদতকারীদের রক্ষক বিবেক। প্রত্যেক সওদাগরের পুঁজি আছে। মুজতাহিদদের পুঁজি বিবেক। প্রত্যেক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আহলে বায়তের জন্যে এক ব্যবস্থাপক আছে। সিদ্দীকগণের গৃহের ব্যবস্থাপক বিবেক। প্রত্যেক জনশূন্য স্থানের আবাদী আছে। আখেরাতের আবাদী বিবেক। প্রত্যেক মানুষের পেছনে এক কীর্তি থাকে, যার কারণে তার আলোচনা হয়। সিদ্দীকগণের এরূপ কীর্তি হল বিবেক। প্রত্যেক সফরের জন্যে একটি তাঁবু আছে। ঈমানদারদের তাঁবু বিবেক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কায়েম থাকে, তার বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, পূর্ণ বিবেকবান হয়ে নিজেকে উপদেশ দেয়, চক্ষুষ্মান হয়ে বিবেক অনুযায়ী সারা জীবন আমল করে এবং সাফল্য ও মুক্তি অর্জন করে। তিনি আরও বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে পূর্ণ বিবেকবান সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে অধিক ভয় করে এবং সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে যার দৃষ্টি সর্বাধিক ভাল হয়, যদিও নফল এবাদত কম করে।

বিবেকের স্বরূপ ও প্রকার

বিবেকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ লোক এদিকে লক্ষ্য রাখেনি, এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের একক সংজ্ঞা তালাশ করা উচিত নয়; বরং বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা আলাদা আলাদা ব্যক্ত করা দরকার । প্রথম অর্থ ঃ বিবেক এমন একটি গুণ, যদ্দ্বারা মানুষ সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে। অর্থাৎ, যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে চিন্তাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ ও গোপন কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবী এ অর্থ করেছেন। বিবেকের সংজ্ঞায় তিনি বলেন ঃ বিবেক এমন একটি শক্তি, যদ্দ্বারা মানুষ চিন্তাগত শাস্ত্র উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। এটা যেন একটা নূর, যা অন্তরে রাখা হয় এবং যদ্দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করার যোগ্য হয় । যেব্যক্তি এ সংজ্ঞা অস্বীকার করে এবং বিবেককে কেবল প্রকাশ্য শাস্ত্র জানার মধ্যে সীমিত করে, সে ইনসাফ করে না। কেননা, যেব্যক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে গাফেল অথবা যেব্যক্তি নিদ্রামগ্ন, তাদের উভয়কেই বিবেকবান বলা হয়; অথচ শাস্ত্র তখন তাদের মধ্যে অর্জিত থাকে না। কিন্তু কেবল শক্তি ও যোগ্যতা থাকার কারণেই তাদেরকে বিবেকবান বলা হয় ।

দ্বিতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন বালকের সত্তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভেতর পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৈধ বিষয়সমূহের বৈধ হওয়া এবং অসম্ভব বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান । উদাহরণতঃ এ বিষয়ের জ্ঞান, দুই একের দ্বিগুণ এবং এক ব্যক্তির একই সময়ে দু'স্থানে থাকা সম্ভব নয় । কোন কোন কালামশাস্ত্রী বিবেকের এ অর্থই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ বিবেক হচ্ছে কতক জাজ্বল্যমান জ্ঞান; যেমন সম্ভবপর বিষয়সমূহের সম্ভবপর হওয়ার এবং অসম্ভব বিষয়সমুহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান। এ অর্থও সঠিক । কেননা, এসব জ্ঞান বিদ্যমান আছে এবং এগুলোকে বিবেক বলাও ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু এর মধ্যে অনিষ্ট হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত শক্তিকে অস্বীকার করা এবং বলা, এসব জাজ্বল্যমান জ্ঞান ছাড়া বিবেক অন্য কিছু নয়। তৃতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা দৈনন্দিন অবস্থা অবলোকন ও তার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। কেননা, যেব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পারদর্শী ও ওয়াকিফহাল, তাঁকেই নিয়মানুযায়ী বিবেকবান বলা হয়। পক্ষান্তরে যে অভিজ্ঞতাগুণে গুণান্বিত নয়, তাকে জাহেল, স্থূলবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলা হয়। চতুর্থ অর্থ– উপরোক্ত স্বভাবগত শক্তি এতদূর হওয়া যে, বিষয়সমূহের পরিণাম জানতে থাকা এবং তাৎক্ষণিক আনন্দের প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করা ও দাবিয়ে রাখা। এ শক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে বিবেকবান বলা হয়। সে তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তির প্ররোচনা অনুযায়ী কাজ করে না। এ প্রকার বিবেক মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমেই সে জন্তু জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র।

সারকথা, প্রথম প্রকার বিবেক সবকিছুর মূল উৎস। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের শাখা এবং তার নিকটবর্তী । তৃতীয় প্রকারও দ্বিতীয় প্রকারের শাখা। কেননা, স্বভাবগত শক্তি ও জাজ্বল্যমান জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জিত হয়। চতুর্থ প্রকার শেষ ফলাফল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য । প্রথমোক্ত দু'প্রকার বিবেক সৃষ্টিগতভাবে অর্জিত হয় এবং শেষোক্ত দু'প্রকার অধ্যবসায়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বৎস! আমার মতে বিবেক দুপ্রকার– স্বভাবগত ও অধ্যবসায়গত। স্বভাবগত বিবেকের কোন প্রভাব অন্তরে না থাকলে অধ্যবসায়গত বিবেক দ্বারা কোন উপকার হয় না। এ হাদীসে প্রথমোক্ত বিবেক বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বিবেকের চেয়ে মহৎ কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি। চতুর্থ প্রকার বিবেককেই এ হাদীসে বুঝানো হয়েছে। মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করে, তখন তুমি তোমার বিবেক দ্বারা নৈকট্য অর্জন কর। আবু দারদার উদ্দেশে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তিতেও তাই বুঝানো হয়েছে– তুমি অধিক বিবেকবান হও, যাতে পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হতে পার। আবু দারদা আরজ করলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আমার জন্যে এটা কিরূপে সম্ভবপর হবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক, তাঁর ফরয কর্ম সম্পাদন কর এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। এতে দুনিয়াতে তোমার মাহাত্ম্য বাড়বে এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার নৈকট্য অর্জিত হবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর, উবাই ইবনে কা'ব ও আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সর্বাধিক আলেম কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক এবাদতকারী কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। আবার প্রশ্ন হল ঃ সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। তাঁরা আবার আরজ করলেন ঃ যেব্যক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী, বাহ্যতঃ শুদ্ধভাষী, দানশীল ও উচ্চ মার্যাদাশীল, সে-ই কি বিবেকবান নয় ? তিনি বললেন ঃ এগুলো তো পার্থিব জীবনের বিষয়। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীদের জন্যে আখেরাত ভাল। অতএব সে-ই বিবেকবান, যে মুত্তাকী– খোদাভীরু, যদিও সে দুনিয়াতে নীচ ও লাঞ্ছিত হয়। এক হাদীসে আছে– সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাঁর রসূলগণের সত্যায়ন করে এবং তাঁর এবাদত করে।

মনে হয়, মূল অভিধানে এবং ব্যবহারে আকল তথা বিবেক শব্দটি সেই মজ্জাগত শক্তির অর্থ বুঝানোর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তবে জ্ঞান ও শাস্ত্র অর্থে এর ব্যবহার হয় এজন্যে যে, জ্ঞান সে শক্তিরই ফলাফল। ফলাফল দ্বারাও কোন বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন, বলা হয়– এলেম হল খোদাভীতি আর সে ব্যক্তিই আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে। এখানে খোদাভীতি এলেমের ফল। এমনিভাবে অপ্রকৃতরূপে বিবেক শব্দটি তার ফলাফলের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য আভিধানিক আলোচনা নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিবেকের মধ্যে এই চারটি প্রকারই বিদ্যমান আছে। এ চারটির জন্যেই বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রথম প্রকার ছাড়া কোনটির অস্তিত্বে মতভেদ নেই। কিন্তু প্রথমটিও বিদ্যমান এবং সবগুলোর মূল– এটাই বিশুদ্ধ মত। সবগুলো জ্ঞান মজ্জাগত শক্তির মধ্যে আগত এবং প্রকাশ তখনই পায়, যখন কোন কারণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এগুলোকে বিদ্যমান করে দেয়। এগুলো বাইরে থেকে শক্তির মধ্যে আসে না, বরং তাতে লুক্কায়িত রয়েছে। এরপর কোন কারণবশতঃ প্রকাশ পায়। উদাহরণতঃ কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে এবং একত্রিত হয়ে অনুভূত হয়। বাইরে থেকে কোন কিছু পানির জন্যে কূপে নিক্ষেপ করা হয় না। বাদামের মধ্যে তেল এবং গোলাপ ফুলের মধ্যে গন্ধ এমনিভাবে লুক্কায়িত থাকে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা আলা বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ

অর্থাৎ যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের ঔরস থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাঁদের ব্যাপারে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? তারা বলল ঃ অবশ্যই।

এখানে তওহীদের স্বীকারোক্তি নেয়ার অর্থ আধ্যাত্মিক স্বীকারোক্তি নেয়া– মৌখিক নয়। কেননা, মৌখিক দিক দিয়ে তো কেউ স্বীকার করে এবং কেউ করে না। নিম্নোক্ত আয়াতেও তেমনি অর্থ বুঝানো হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে, তবে তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। অর্থাৎ অবস্থা বিবেচনা করা হলে তাদের মন ও বাতেন এ সাক্ষ্য দেবে। আরও বলা হয়েছে–

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রত্যেক মানুষের মজ্জা স্বভাব।

কেননা, আল্লাহকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা তার মধ্যে খুব নিকটবর্তী। এজন্যই মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত– এক, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং আপন মজ্জাগত বিষয়টি ভুলে গেছে। সে হচ্ছে কাফের। দুই, যে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করে নিয়েছে। উদাহরণতঃ কোন সাক্ষী গাফিলতির কারণে ঘটনার কথা ভুলে যায়,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরপর স্মরণ হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করার কথা অনেক জায়গায় এরশাদ করেছেন। যেমন- لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (যাতে তারা স্মরণ করে)- وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ (এবং যাতে বুদ্ধিমানরা স্মরণ করে)- وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ (এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর এবং তাঁর সেই অঙ্গীকার স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের সাথে সম্পাদন করেছেন।) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (আর আমি কোরআনকে স্মরণ করার জন্যে সহজ করেছি। অতএব আছে কি কোন স্মরণকারী?)

বর্ণিত প্রকারকে "স্মরণ করা" বলা অবান্তর নয়। কেননা, স্মরণ করা দু'প্রকার- (১) যে বিষয় অন্তরে উপস্থিত ছিল, পরে বিলুপ্ত হয়েছে, তা স্মরণ করা এবং (২) মানুষের মজ্জায় আগত বিষয় স্মরণ করা। যেব্যক্তি বিবেকের নূর দ্বারা দেখে, তার সামনে এসব স্বরূপ সুস্পষ্ট। আর যে তকলীদ (অনুসরণ) ও শ্রবণের উপর ভরসা করে- কাশফ ও দেখার উপর নির্ভর করে না, তার জন্যে অবশ্য এসব বিষয় কঠিন। এ কারণেই তাকে এ ধরনের আয়াতে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। সে স্মরণ করার অর্থ এবং মনের স্বীকারোক্তির ব্যাখ্যায় নানা রকম আজগুবি কথাবার্তা বলে। হাদীস ও আয়াতসমূহে তার ধারণায় অনেক বিরোধ মনে হতে থাকে। কখনও এটা এত প্রবল হয়ে যায় যে, সে এসব হাদীস ও আয়াতকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে এবং এগুলোকে অনর্থক বাজে মনে করতে শুরু করে। বলাবাহুল্য, সে সেই অন্ধ ব্যক্তির মত, যে কোন গৃহে প্রবেশ করে। গৃহে যাবতীয় আসবাবপত্র সাজানো-গুছানো রয়েছে। কিন্তু অন্ধ আসবাবপত্রের উপর পিছলিয়ে পড়ে এবং বলে, এসব পথ থেকে দূরে সরিয়ে স্বস্থানে রাখা হয় না কেন? তাকে বলা হবে, আসবাব তো স্বস্থানেই সাজানো গুছানো ছিল, কিন্তু দোষ তোমার দৃষ্টি শক্তির। তেমনি অন্তর্দৃষ্টির ত্রুটির কারণে হাদীস ও আয়াতসমূহে বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। অথচ তাতে বিরোধ কিছুই নেই, দোষ বিবেকের। অন্তর্দৃষ্টির ক্ষতি চর্মচক্ষুর ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী ও বৃহৎ। কেননা, মন আরোহীর মত এবং দেহ বাহনস্বরূপ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলাবাহুল্য, আরোহীর অন্ধ হওয়ায় ঘোড়ার অন্ধ হওয়ার তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। অন্তর্দৃষ্টিকে বাহ্যিক দৃষ্টির সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

অর্থাৎ, "অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি।"

আরও বলেছেন ঃ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ এভাবেই আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখিয়েছি।

এর বিপরীতকে আল্লাহ্ তাআলা অন্ধত্ব বলে অভিহিত করেছেন ঃ

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়।"

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ـ

অর্থাৎ যে এ পৃথিবীতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

পয়গম্বরগণের জন্যে যেসব বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর কিছু বাহ্যিক দৃষ্টির এবং কিছু অন্তর্দৃষ্টির ফলে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সবগুলোকে দেখাই বলা হয়েছে। সারকথা, যার অন্তর্দৃষ্টি শক্তিশালী নয়, সে দ্বীনের সারবস্তু ও স্বরূপ লাভ করতে পারে না।

বিবেক কম-বেশী হওয়া

বিবেক কম-বেশী হতে পারে কিনা, এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। এখানে যথার্থ বিষয়টি বর্ণনা করাই সমীচীন। এ সম্পর্কে প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার বিবেক ছাড়া সব বিবেকই কম-বেশী হতে পারে। একমাত্র বৈধ বিষয়সমূহের সম্ভবপর এবং অবৈধ বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়া এমন এক এলেম, যা কম-বেশী হতে পারে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদাহরণতঃ যেব্যক্তি একথা জানবে, দুই একের বেশী, সে একথাও জানবে, একই বস্তুর দু'স্থানে থাকা অসম্ভব। কিন্তু অবশিষ্ট তিন প্রকার বিবেক কম-বেশী হতে পারে। যেমন– চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ, স্বভাবগত শক্তি এত বেশী হওয়া যে, খাহেশকে উচ্ছেদ করে দেয়। এতে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, বরং এতে কেবল এক ব্যক্তির অবস্থাও বিভিন্ন রূপ হয়। এ পার্থক্য কখনও খাহেশের পার্থক্যের কারণে হয়। কেননা, বিবেকবান ব্যক্তি কখনও কতক খাহেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং কতক ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না, যদিও তা ত্যাগ করা অসম্ভব নয়। যেমন– যুবক ব্যক্তি ব্যভিচার ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার পর যখন বিবেক পূর্ণতা লাভ করে, তখন তা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। আবার কখনও এ পার্থক্য এ কারণে হয় যে, এলেম দ্বারা খাহেশের ক্ষতি জানা যায়, তাতে পার্থক্য হয়। এ জন্যেই কতক ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বেঁচে থাকতে চিকিৎসক সক্ষম হয়, কিন্তু তার সমান বিবেকবান অন্য ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় না, যদিও তার মোটামুটি বিশ্বাস থাকে, এ খাদ্য ক্ষতিকর। কিন্তু চিকিৎসকের এলেম পূর্ণ বিধায় তার ভয়ও বেশী। এ ক্ষেত্রে ভয় তার খাহেশ উচ্ছেদ করার ব্যাপারে বিবেকের সিপাহী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুর্খের তুলনায় আলেম গোনাহ ত্যাগ করতে অধিক সক্ষম। কেননা, সে গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং এলেমের কারণে পার্থক্য হলে এ ধরনের এলেমকেও আমরা বিবেক বলেছি এ জন্যে যে, এ এলেম স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করে। অতএব এ এলেমের পার্থক্য হুবহু বিবেকের পার্থক্য। কখনও এ পার্থক্য কেবল বিবেকশক্তির পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে এ শক্তি বেশী হলে খাহেশকে উচ্ছেদও বেশী করবে।

বিবেকের তৃতীয় প্রকার অভিজ্ঞতাও কম-বেশী হয়। কতক লোক দ্রুত বিষয়বস্তু বুঝে ফেলে এবং তাদের অভিমত প্রায়ই সঠিক হয়। আর কতক লোক এরূপ হয় না। সুতরাং এ প্রকার বিবেকের পার্থক্য অনস্বীকার্য। প্রথম প্রকার যা মূল; অর্থাৎ, স্বাভাবিক শক্তি, এর পার্থক্যও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, এটা একটা নূরের মত, যা অন্তরের উপর চমকাতে থাকে। এর সূচনা হয় হিতাহিত জ্ঞানের বয়স থেকে। এর পর তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অবশেষে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের সময় পূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রভাত রশ্মি শুরুতে এমন গোপন থাকে যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সূর্যোদয়ের ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার রীতি হচ্ছে, তিনি ধাপে ধাপে আবিষ্কার করেন। সেমতে বালকের মধ্যে বালেগ হওয়ার সময় কামশক্তি একযোগে প্রকাশ পায় না; বরং অল্প অল্প করে প্রকাশ পায়। সুতরাং যেব্যক্তি এই স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি অস্বীকার করে, সে যেন বিবেকের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে। আর যেব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবেক তেমনি ছিল, যেমন কোন গেঁয়ো হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি গেঁয়ো থেকেও অধম। এ শক্তিতে তফাৎ না হলে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ কেন হত এবং কেউ এত কম মেধাবী কেন হত যে, অনেক বুঝালে এবং শিক্ষক গলদঘর্ম হলে পরে বুঝতে পারবে? আবার কেউ এত প্রখর মেধাবী কেন হত যে, সামান্য ইশারা দিলেই বুঝে ফেলে এবং কেউ এত কামেল কেন হত, স্বয়ং তার মন থেকেই বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ উথলে উঠে– ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করার প্রয়োজনই হয় না। আল্লাহ বলেন ঃ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ -

অর্থাৎ "তার জ্বালানি নিজে থেকেই প্রজ্বলিত হওয়ার উপক্রম হয়, যদিও তকে আগুন স্পর্শ করে না। আলোর উপর আলো।"

এরূপ কামেল লোক হলেন পয়গম্বরগণ। সূক্ষ সূক্ষ্ম রূপ ও বিষয়াদি স্বয়ং তাঁদের অন্তরে কারও শেখানো ছাড়া এবং কারও কাছ থেকে শুনা ছাড়া উন্মোচিত হয়ে যায়। একে ইলহাম বলে ব্যক্ত করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের বিষয়বস্তুই এ হাদীসে বর্ণন করেছেন ঃ রূহুল কুদুস (জিব্রাঈল) আমার মনে আরোপ করলেন, তোমরা যাকে ইচ্ছা বন্ধু কর, তার কাছ থেকে বিরহ হবে, যত ইচ্ছা জীবিত থাক, মরতে একদিন হবেই এবং যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান তোমরা পাবেই। নবীগণকে ফেরেশতাদের এভাবে খবর দেয়া ওহী নয়, বরং এটা আলাদা ব্যাপার। কেননা, ওহীর মধ্যে নবী কানে আওয়াজ শুনেন এবং চোখে ফেরেশতাকে দেখেন। ইলহামে এটা নেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) "আমার মনে আরোপ করেছেন" বলে বলেছেন – অন্য কোন শব্দ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেননি। ওহীর অনেক স্তর রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা এলমে মোআমালার জন্যে উপযুক্ত নয়, বরং এটা এলমে মোকাশাফার বিষয়বস্তু। তুমি এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি ওহীর স্তরসমূহ জানতে পারে, সে ওহীর মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। কেননা, কোন বিষয় জানা এক জিনিস আর তা পাওয়া অন্য জিনিস। উদাহরণতঃ কোন অসুস্থ চিকিৎসকের জন্যে স্বাস্থ্য রক্ষার সকল স্তর জেনে নেয়া অবাস্তব নয় এবং কোন পাপাচারী আলেমের পক্ষে আদলের স্তরসমূহ জানা অসম্ভব নয়, অথচ এ চিকিৎসকের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং এ আলেমের আদলের কোন অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নবুওয়ত ও ওলীত্ব সম্পর্কে জানবে, তার নবী বা ওলী হওয়া জরুরী নয়। মোট কথা, কোন কোন মানুষ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই কোন কোন বিষয় বুঝতে পারে, আবার অনেকে বাইরের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ ছাড়া বুঝে না এবং কেউ কেউ এমনও থাকে যাদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকারী হয় না। এটা ঠিক ভূমির মত। ভূমি তিন প্রকার হয়ে থাকে – (১) যাতে পানি সঞ্চিত থাকে এবং প্রবল হয়ে তা থেকে আপন আপনি ঝরণা প্রবাহিত হতে থাকে । (২) যাতে কূপ খনন করার প্রয়োজন হয়। কূপ খনন না করলে পানি বের হয় না। (৩) যা খনন করলেও পানি নির্গত হয় না– শুষ্কই থেকে যায়।

বিবেক যে কম-বেশী হয়, হাদীস থেকে এর প্রমাণ আদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত । তাঁর জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। এ বক্তব্যের শেষ ভাগে তিনি আরশের মাহাত্ম্য উল্লেখ করে বললেন ঃ "ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করল, ইলাহী, আপনি আরশের চেয়েও বড় কোন কিছু সৃষ্টি করেছেন কি ? এরশাদ হল ঃ হাঁ, বিবেক আরশের চেয়েও বড়। প্রশ্ন হল, এর পরিমাণ কতটুকু ? আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা এটা পুরাপুরি জানতে পারবে না। তোমরা বালুকার সংখ্যা জান কি? উত্তর হল, না। আল্লাহ বললেন ঃ আমি বিবেককেও বালুকার সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেছি। কেউ এক রতি পেয়েছে, কেউ দু'রতি, কেউ তিন রতি এবং কেউ চার রতি পেয়েছে। আবার কেউ আট সেরের কাছাকাছি এবং কেউ এক উটের বোঝাই পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকায়েদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেমা তাইয়েবায় আহলে সুন্নতের আকীদা

প্রকাশ থাকে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্- এ কলেমার সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। এর প্রথম বাক্যে তওহীদ এবং দ্বিতীয় বাক্যে রেসালত বিধৃত হয়েছে। প্রথম বাক্য কয়েকটি বিষয় জানা উচিত।

প্রথম ঃ একত্ববাদ; অর্থাৎ একথা জানা যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক, তাঁর মত কেউ নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, যাঁর কোন শুরু নেই। তিনি সদা প্রতিষ্ঠিত, যাঁর কোন শেষ নেই। তিনি সদা বিদ্যমান, যাঁর কোন অবসান নেই। তিনি অক্ষয়, যাঁর কোন ক্ষয় নেই। তিনি মাহাত্ম্যের গুণাবলী দ্বারা সদা গুণান্বিত রয়েছেন এবং সদা থাকবেন। তিনিই সবার প্রথম এবং সবার শেষ। তিনিই জাহের এবং তিনিই বাতেন।

দ্বিতীয় ঃ পবিত্রতা ; অর্থাৎ, এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা সাকার নন, সীমিত পদার্থ নন, পরিণামবিশিষ্ট নন এবং বিভাজ্য নন। তিনি দেহের অনুরূপ নন, নিজে পদার্থ নন এবং কোন পদার্থ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও নয়। তি আর্‌য নন; অর্থাৎ অন্যের উপর ভর দিয়ে কায়েম নন এবং অন্যের উপর ভর দিয়ে যা কায়েম থাকে, তা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও নয়। কোন বিদ্যমান বস্তুর অনুরূপ তিনি নন এবং কোন বিদ্যমান বস্তুও তাঁর মত নয় । না তাঁর সমতুল্য কেউ আছে এবং না তিনি কারও অনুরূপ । কোন পরিমাণ তাঁকে সীমিত করতে পারে না এবং কোন দিকও তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবী তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। তিনি আরশের উপর এমনভাবে অবস্থিত যেমন তিনি নিজে বলেছেন এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আরশ স্পর্শ করা, তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অবস্থান নেয়া, তাতে অনুপ্রবেশ করা এবং স্থানান্তরিত হওয়া থেকে পবিত্র । আরশ তাঁকে বহন করে না, বরং আরশ ও আরশ বহনকারীদেরকে তাঁর কুদরত বহন করে রেখেছে। সবকিছুই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাঁর কুদরতের আওতাভুক্ত। তিনি আরশ, আকাশ এবং পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত সবকিছুর উপরে। তিনি এভাবে উপরে যে, আরশেরও নিকটে নন এবং পৃথিবী থেকেও দূরে নন। বরং তাঁর মর্যাদা এসব নৈকট্য ও দূরত্বের অনেক ঊর্ধ্বে । এতদসত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর সন্নিকটে এবং বান্দার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী । কেননা, তাঁর নৈকট্য দেহের নৈকট্যের অনুরূপ নয়, যেমন তাঁর সত্তা দেহের সত্তার অনুরূপ নয়। তিনি কোন বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন না এবং কোন বস্তু তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না। কোন স্থান তাঁকে বেষ্টন করবে তিনি এ বিষয়ের ঊর্ধ্বে, যেমন তিনি সময়ের বেষ্টনী থেকে মুক্ত । তিনি স্থান ও কালের জন্মের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । তিনি এখনও তেমনি আছেন যেমন পূর্বে ছিলেন। তিনি নিজ গুণাবলীতে সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাঁর সত্তায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই এবং অন্য কোন কিছুতেই তাঁর সত্তা নেই। তিনি পরিবর্তন ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র। তিনি আপন মাহাত্ম্যের গুণাবলীতে ক্ষয় ও পতন থেকে সর্বদা মুক্ত। তিনি গুণাবলীর পূর্ণতায় কোন সংযোজনের প্রয়োজন রাখেন না। বিবেক দ্বারাই তাঁর অস্তিত্ব আপনা আপনি জানা হয়ে যায় । জান্নাতে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, দীদার বা দর্শনের আনন্দ পূর্ণ করার জন্যে তিনি আপন সত্তা চর্মচক্ষে দেখিয়ে দেবেন।

তৃতীয় ঃ জীবন ও কুদরত। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা জীবিত, ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী। ক্লান্তি, অবসাদ, অসাবধানতা, নিদ্রা ও ক্ষয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর মৃত্যু নেই। আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাঁরই। আধিপত্য, ইযযত, সর্বশক্তিমত্তা, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে আবদ্ধ এবং সকল সৃষ্টি তাঁর মুঠোর মধ্যে পতিত। সৃষ্টি ও আবিষ্কারে তিনি স্বতন্ত্র ও একক। মানুষ ও তাদের ক্রিয়াকর্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিযিক ও মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন কিছু তাঁর কুদরতের বহির্ভূত নয়। তাঁর কদুরতের বস্তুসমূহ অগণিত এবং তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন শেষ নেই।

চতুর্থ ঃ এলেম অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এটা জানা। পাতাল থেকে নিয়ে আকাশের উপর পর্যন্ত যা কিছু হয়, সবই তাঁর নখদর্পণে। আকাশ ও পৃথিবীর কোন অণু পরমাণু তাঁর কাছে গোপন নয়,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বরং গভীর কালো রাতে কালো পাথরের উপর একটি কালো বর্ণের পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপ এবং বায়ুর অভ্যন্তরে ধূলিকণার গতিবিধি সম্পর্কেও তিনি সুপরিজ্ঞাত। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জেনে নেন এবং অন্তরের কুমন্ত্রণা, খটকা ও গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাঁর এলেম নিত্য ও অনন্ত। তিনি অনন্তকাল থেকে এই এলেম গুণে গুণান্বিত আছেন। তাঁর এলেম তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি এবং স্থানান্তর দ্বারা নতুন সৃষ্ট হয়নি।

পঞ্চম ঃ ইচ্ছা অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা এ জগতকে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন এবং নব নব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে এবং যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি। চোখের নিমেষ অথবা কোন আকস্মিক বিপদ আসা তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাঁর আদেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মুলতবীকারীও কেউ নেই। তাঁর তওফীক ও রহমত ছাড়া বান্দার জন্যে নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এবাদত ও আনুগত্যের কারও শক্তি নেই। যদি সমস্ত মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান একত্রিত হয়ে বিশ্বের কোন একটি পরমাণুকেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুজ্ঞা ছাড়া গতিশীল অথবা স্থিতিশীল করতে চায়, তবে কখনও তারা তা পারবে না। তাঁর ইচ্ছা গুণও অন্য সকল গুণের ন্যায় তাঁর সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি অনন্তকাল থেকে এসব গুণে গুণান্বিত। তিনি যখন যে বস্তু হওয়ার ইচ্ছা অনন্তকালের মধ্যে করেছেন, ঠিক তখনই অগ্র-পশ্চাত ব্যতিরেকে তা হয়েছে। তাঁর কোন অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে অমনোযোগী করে না।

ষষ্ঠ ঃ শ্রবণ ও দর্শন। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। কোন শ্রাব্য বস্তু যতই গোপন, কোন দ্রষ্টব্য বস্তু যতই সূক্ষ্ম হোক, তাঁর শ্রবণ ও দর্শন থেকে অব্যাহতি পায় না। কোন দূরত্ব কিংবা অন্ধকার তাঁর শ্রবণের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তিনি দেখেন, কিন্তু চক্ষু কোটর ও পলক থেকে তিনি মুক্ত, তিনি শুনেন; কিন্তু কর্ণকুহর থেকে পবিত্র। কেনা, তাঁর পবিত্র সত্তা যেমন সৃষ্টির সত্তার মত নয়, তেমনি তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ নয়।

সপ্তম ঃ কালাম অর্থাৎ, এটা জানা যে, আল্লাহ তাআলা কালাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেন। সত্তার সাথে কায়েম তাঁর নিত্য ও অনন্ত কালাম দ্বারা তিনি আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার ও শাস্তির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কালাম সৃষ্টির কালামের মত নয় যে, বায়ু থেকে অথবা বস্তুর আঘাত থেকে আওয়াজ হবে অথবা জিহ্বার নড়াচড়া ও ঠোঁটের মিল থেকে উচ্চারণ সৃষ্টি হবে; বরং তাঁর কালাম উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোরআন, তওরাত, ইনজীল ও যবুর তাঁর গ্রন্থ, যা তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাকের তেলাওয়াত মুখে হয়, পত্রে লিখিত হয় এবং অন্তরে হেফয করা হয়; এতদসত্ত্বেও কোরআন নিত্য এবং আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পত্রে স্থানান্তরিত হতে পারে না। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার কালাম কণ্ঠস্বর ও অক্ষর ব্যতিরেকে শ্রবণ করেছেন।

অষ্টম ঃ ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই তাঁর কর্ম দ্বারা সৃষ্ট এবং তাঁরই ন্যায়বিচার থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা আপন ক্রিয়াকর্মে প্রজ্ঞাময় এবং আপন বিধি-বিধানে ন্যায়বিচারক। তাঁর ন্যায়বিচার বান্দার ন্যায়বিচার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। কেননা, বান্দা জুলুম করতে পারে, অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে জুলুম কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি অন্যের মালিকানা লাভ করেন না। মোট কথা, তিনি ব্যতীত যত মানুষ জ্বিন, ফেরেশতা, শয়তান, আকাশ, পৃথিবী, জীবজন্তু, লতাপাতা, জড় পদার্থ, অজড় পদার্থ, উপলব্ধ ও অনুপলব্ধ বস্তু রয়েছে, সবই তিনি আপন কুদরতের দ্বারা নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অনন্তকালে তিনি একাই বিদ্যমান ছিলেন। এরপর স্বীয় কুদরত প্রকাশ এবং পূর্ব ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। একান্ত কৃপাবশেই তিনি সৃষ্টি করেন। এগুলো তাঁর উপর অপরিহার্য নয়। সুতরাং কৃপা, অনুগ্রহ ও নেয়ামত তাঁরই জন্যে শোভনীয়। কারণ, তিনি বান্দাদেরকে নানারকম আযাব ও বিপদাপদে ফেলে দিতে সক্ষম ছিলেন। এটাও তাঁর জন্যে ন্যায়বিচার হত, জুলুম হত না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল কারণে এ প্রতিশ্রুতি দেননি। কেননা, কারও জন্যে কোন কিছু করা তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। তাঁর কাছে কারও কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়াজেব প্রাপ্য নেই। কিন্তু মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অবশ্য প্রাপ্য রয়েছে, যা তিনি তাঁর পয়গম্বরগণের বাচনিক ওয়াজেব করেছেন। কেবল বিবেকের দৃষ্টিতে ওয়াজেব করেননি; বরং তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন এবং প্রকাশ্য মোজেযার মাধ্যমে তাঁদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিবাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাই রসূলগণকে সত্য জ্ঞান করা এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধান মেনে চলা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য।

এখন দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ অর্থাৎ, রেসালতের সাক্ষ্য দেয়ার কথা শুন। এটা বিশ্বাস করা উচিত, আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে উম্মী কোরায়শী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আরব, আজম, জ্বিন ও মানবের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত করেছেন। তবে যেগুলো তিনি বহাল রেখেছেন সেগুলো ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সকল মানুষের নেতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তথা তওহীদের সাক্ষ্য দেয়াকেই পূর্ণ ঈমান সাব্যস্ত করেননি, বরং এর সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ তথা রসূলের রেসালতের সাক্ষ্যও জুড়ে দিয়েছেন। তিনি ইহকাল ও পরকালের যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ সমুদয় বিষয়েই তাঁকে সত্যবাদী মনে করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার ঈমান কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে, যার সংবাদ মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন।

এসব অবস্থার মধ্যে প্রথম মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন। মুনকার ও নকীর দু'জন ভয়ংকর আকৃতির ফেরেশতা। তাঁরা কবরে বান্দাকে আত্মা ও দেহ সহকারে সোজা বসিয়ে দেয় এবং তাকে তওহীদ ও রেসালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেন ঃ তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? তাঁরা উভয়েই কবরের পরীক্ষক। মৃত্যুর পর প্রথম পরীক্ষা হয় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ।

দ্বিতীয়, কবরের আযাব নিশ্চিত বিশ্বাস করতে হবে। এ আযাব প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার সহকারে আত্মা এবং দেহ উভয়ের উপর যেভাবে আল্লাহ চাইবেন হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয়, মীযান তথা মানদণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এর দু'টি পাল্লা হবে এবং প্রত্যেক পাল্লা আকাশ ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমান বৃহদাকার হবে। তাতে আল্লাহ তাআলার কুদরতে আমলসমূহ ওজন করা হবে। সেদিন বাটখারা কণা ও সরিষা পরিমাণে হবে, যাতে ন্যায়বিচার যথার্থই পূর্ণ হয়। সৎ আমলনামা সুন্দর আকারে নূরের পাল্লায় রাখা হবে এবং এসব নেক আমলের মর্তবা আল্লাহর কাছে যত বেশী হবে, ততই আল্লাহর কৃপায় পাল্লা ভারী হবে। মন্দ আমলনামা বিশ্রী আকারে অন্ধকার পাল্লায় রাখা হবে এবং আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচারের দরুন পাল্লা হালকা হবে।

চতুর্থ, পুলসেরাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। দোযখের পৃষ্ঠে তরবারির চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম একটি পুল নির্মিত রয়েছে, সবাইকে এ পুল অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কাফেরদের পা এ পুল থেকে ফসকে যাবে এবং তারা দোযখে পতিত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কৃপায় মুমিনদের পা তাতে অটল থাকবে এবং তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

পঞ্চম, হাউজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। ঈমানদারগণ এ হাউজের কাছ দিয়ে যাবে। এটা রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাউজ। জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পুলসেরাত থেকে নীচে অবতরণের পর মুমিনরা এর পানি পান করবে। যে এর এক চুমুক পানি পান করবে, সে পরে কখনও পিপাসার্ত হবে না। এর প্রস্থ এক মাসের পথ। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। আকাশের তারার সমপরিমাণ পাত্র এর চারপাশে রক্ষিত থাকবে। জান্নাতের হাউজে কাওসার থেকে এসে দুটি নালা এ হাউজে পতিত হয়।

ষষ্ঠ, হিসাব-নিকাশে ঈমান আনতে হবে। হিসাব-নিকাশ বিভিন্ন রূপ হবে। কারও কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে, কাউকে ক্ষমা করা হবে এবং কেউ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁরা হবেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দা। পয়গম্বরগণের মধ্যে আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করবেন রেসালতের বিষয়বস্তু পৌঁছানো হয়েছে কি না। রসূলগণকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কাফেরদের মধ্যেও যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। বেদআতীদেরকে সুন্নতের ব্যাপারে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুসলমানদেরকে আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।

সপ্তম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, তওহীদে বিশ্বাসী গোনাহগাররা শাস্তিভোগের পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। শেষ পর্যন্ত কোন তওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তিই জাহান্নামে থাকবে না। এ থেকে তওহীদ বিশ্বাসীর চিরকাল জাহান্নামে না থাকার কথা জানা গেল।

অষ্টম, শাফায়াতে বিশ্বাস করতে হবে। প্রথমে পয়গম্বরগণ শাফায়াত করবেন, এরপর আলেমগণ, এরপর শহীদগণ,এর পর সকল মুসলমান শাফায়াত করবেন। তাঁদের মধ্যে যাঁর যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে হবে, তাঁর শাফায়াত ততটুকু গৃহীত হবে। যে মুমিন এমন থেকে যাবে, তাঁর জন্যে কেউ শাফায়াত করেনি, তাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় দোযখ থেকে বের করবেন। সুতরাং কোন মুমিন অনন্তকাল দোযখে থাকবে না। যার অন্তরে কণা পরিমাণও ঈমান থাকবে, সেও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে।

নবম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এরূপ ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), এরপর হযরত ওমর (রাঃ), এরপর হযরত ওসমান (রাঃ), এরপর হযরত আলী (রাঃ)।

দশম ঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং তাঁদের প্রশংসা করতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং মনীষীগণের উক্তি এগুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যেব্যক্তি এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হবে, সে আহলে সুন্নত দলের মধ্যে গণ্য হবে এবং পথভ্রষ্ট ও বেদআতীদের দল থেকে আলাদা থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে পূর্ণ বিশ্বাস দান করুন এবং দ্বীনের উপর কায়েম রাখুন।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আকায়েদের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ বলা আমাদের জন্যে একটি এবাদত। কিন্তু এ কলেমার যেসব মূলনীতি রয়েছে, সেগুলো না জানা পর্যন্ত কেবল মুখে এর সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে কোন ফায়দা নেই। এসব মূলনীতির উপরই এ কলেমার বাক্য দু'টি ভিত্তিশীল।

জানা দরকার, এ বাক্য দুটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও চারটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (১) আল্লাহ্ তাআলার সত্তা সপ্রমাণ করা এবং (২) তাঁর গুণাবলী সপ্রমাণ করা, (৩) তাঁর ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করা এবং (৪) তাঁর রসূলগণের সত্যতা সপ্রমাণ করা। এ থেকেই জানা গেল, ঈমান চারটি স্তম্ভের উপর এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভ দশটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল।

প্রথম স্তম্ভের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ। এ সম্পর্কে কোরআন প্রদর্শিত পন্থাই সর্বোত্তম। কেননা, আল্লাহ তাআলার বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম বর্ণনা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝ وَّالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝ وَّخَلَقْنٰكُمْ أَزْوَاجًا ۝ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَّجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝ وَّأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝ وَّجَنّٰتٍ أَلْفَافًا ۔

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতকে গজাল সদৃশ করিনি? আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্যে, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা উপার্জনের সময়। আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে মজবুত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাত আকাশ নির্মাণ করেছি এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপ তৈরী করেছি। আমি পানিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিপাত করি; তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্যে লাভজনক বস্তু নিয়ে সমুদ্রে চলমান নৌকায়, আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন ও তাতে ছড়িয়ে দেন সবরকম জীব-জন্তু, আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আদেশাধীন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বিচরণকারী মেঘমালার মধ্যে তাঁদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা বুঝে।"

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَّاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ـ

অর্থাৎ, "তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তাতে চন্দ্রকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তোমাদেরকে উৎপন্ন করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে–

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তা কি তোমারা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?"

অবশেষে বলা হয়েছে–

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।"

বলাবাহুল্য, যদি সামান্য সচেতন ব্যক্তিও এসব আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তাভাবনা করে, আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহের প্রতি এবং জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অদ্ভুত প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করে, তবে সে অবশ্যই জানতে পারবে, এই অভূতপূর্ব কারখানা ও অটল ব্যবস্থাপনার একজন রচয়িতা অবশ্যই রয়েছেন। তিনি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। বরং মানুষের মূল সৃষ্টিই এ বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। কারণ, মানুষ আল্লাহর কুদরতের অধীন। তাঁর কৌশল অনুযায়ী ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কেই সন্দেহ?"

এ জন্যেই মানুষকে তওহীদের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশে তিনি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ বলে উঠে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। মানুষকে একথা বলার নির্দেশ করা হয়নি যে, তাঁদের এক মাবুদ এবং বিশ্বের অন্য মাবুদ । কেননা, জন্মলগ্ন থেকেই এটা মানুষের মজ্জাগত বিষয় ছিল। তাই আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, "তাদেরকে যদি প্রশ্ন কর– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তাঁরা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ । আরও বলা হয়েছে–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ

অর্থাৎ, "অতএব আপনি একাগ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের উপর অনড় থাকুন। এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাবধর্ম, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিরীতির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন।"

মোট কথা, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বর্ণনায় মানুষের জন্মের এবং কোরআন পাকের প্রমাণ এত উঁচুর পরিমাণে বিদ্যমান যে, অন্য কোন প্রমাণ উল্লেখ্য করার প্রয়োজন নেই। তবুও আমরা বক্তব্য জোরদার করার উদ্দেশে কালাম শাস্ত্রের অনুসরণে এর একটি যুক্তিও লেখে দিচ্ছি। যে বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে না, তাকে পরিভাষায় 'হাদেস' তথা অনিত্য বলা হয়। এমন অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন কারণ অবশ্যই দরকার। এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এ বিশ্বও অনিত্য। কেননা, এক সময়ে এটা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এমন সময় আসবে, যখন থাকবে না। সুতরাং এ বিশ্বের অস্তিত্ব লাভের পেছনেও কোন কারণ অবশ্যই রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ কারণ হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই এ বিশ্বচরাচর অস্তিত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি হল. আল্লাহ তাআলা নিত্য, অনাদি ও চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের কোন আদি নেই; বরং প্রত্যেক বস্তুর তথা জীবিত ও মৃতের পূর্বে তিনিই আছেন। এর দলীল, আল্লাহ্ তাআলা 'কাদীম' তথা নিত্য না হয়ে 'হাদেস' তথা অনিত্য হলে তিনিও অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন নিত্য কারণের মুখাপেক্ষী হবেন। সেই কারণটিও অন্য একটি কারণের মুখাপেক্ষী হবে এবং সেটাও অন্য এক কারণের মুখাপেক্ষী হবে। এভাবে এ মুখাপেক্ষিতার কোন অন্ত থাকবে না। ফলে মূল কারণ অর্জিত হবে না। সুতরাং কোন না কোন পর্যায়ে গিয়ে একটি স্বয়ম্ভূ কারণ মানতে হবে, যেটি হবে নিত্য, চিরন্তন ও সর্বপ্রথম। এটাই আমাদের লক্ষ্য এবং এরই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাম বিশ্বস্রষ্টা, অস্তিত্বদাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ইত্যাদি।

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা অনাদি হওয়ার সাথে সাথে অনন্তও বটে। তাঁর অস্তিত্বের কোন অন্ত নেই; বরং তিনি প্রথম এবং তিনিই শেষ, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন। কারণ, যাঁর চিরন্তনতা সপ্রমাণিত, তাঁর বিলুপ্তি অসম্ভব। কেননা, তিনি বিলুপ্ত হলে হয় আপনা আপনি বিলুপ্ত হবেন, না হয় কোন বিলুপ্তকারীর বিলুপ্ত করার কারণে বিলুপ্ত হবেন। প্রথমটি বাতিল। কেননা, যাকে চিরন্তন কল্পনা করা হয়েছে, তার আপনা আপনি বিলুপ্তি সম্ভব হলে কোন বস্তুর আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভও সম্ভব হবে। বিলুপ্তকারী দ্বারা বিলুপ্ত হওয়াও বাতিল। কেননা, এই বিলুপ্তকারী নিত্য ও চিরন্তন হলে তার উপস্থিতিতে এ সত্তার অস্তিত্ব কিরূপে হল? প্রথমোক্ত দুটি মূলনীতির দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব ও চিরন্তনতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বিলুপ্তকারী হাদেস তথা অনিত্য হলে সে নিজেই চিরন্তনের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এমতাবস্থায় সে চিরন্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারে না।

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন আয়তনে পরিবেষ্টিত নন; বরং তিনি আয়তনের বেষ্টনী থেকে মুক্ত পবিত্র। এর প্রমাণ, প্রত্যেক বস্তু যে আয়তনে পরিবেষ্টিত রয়েছে, এর মূলে হয় সে বস্তু সে আয়তক্ষেত্রে অবস্থান করছে, না হয় সে ক্ষেত্র থেকে গতিশীল হচ্ছে। অবস্থান ও গতিশীলতা উভয়টি হাদেস তথা অনিত্য। এটা আল্লাহ তাআলার জন্যে নয়।

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা পদার্থ গঠিত শরীরী নন। কেননা, যা পদার্থ গঠিত, তাকেই শরীরী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা পদার্থ হওয়া এবং বিশেষ স্থানে অবস্থানকারী হওয়া যখন বাতিল, তখন তাঁর শরীরী হওয়াও বাতিল। জগত স্রষ্টার শরীরী হওয়া সঠিক হলে সূর্য, চন্দ্র অথবা অন্য কোন শরীরীকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করাও সম্ভবপর হবে।

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোন গুণ নন। কেননা, সকল শরীরীই নিশ্চিতরূপে হাদেস বা অনিত্য। যে এসব শরীরীকে অস্তিত্ব দান করবে, সে এগুলোর পূর্বে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মধ্যে কিরূপে অনুপ্রবেশ করতে পারেন? তিনি তো অনাদিকালে সকলের পূর্বে একাই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। নিজের পরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি শরীরী ও গুণসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

এ ছয়টি মূলনীতি থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান, নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি পদার্থ নন, শরীরী নন এবং গুণও নন। সমগ্র বিশ্ব পদার্থ, গুণ ও শরীরী। এতে প্রমাণিত হল, তিনি কারও মত নন এবং কেউ তাঁর মত নয়।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার সত্তা দিকের বিশেষত্ব থেকেও পবিত্র। কেননা, দিক ছয়টি– ঊর্ধ্ব, অধঃ, ডান, বাম, অগ্র ও পশ্চাৎ। আল্লাহ তাআলাই এগুলো সব মানব সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কেননা, তিনি মানুষের দুটি দিক সৃষ্টি করেছেন। একটি ভূমি সংলগ্ন, যাকে পা বলা হয় এবং অপরটি তার বিপরীত, যাকে মাথা বলা হয়। সুতরাং, ঊর্ধ্ব শব্দটি মাথার দিকের জন্য এবং অধঃ শব্দটি পায়ের দিকের জন্যে গঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি হাত সৃষ্টি করেছেন। প্রায়শঃ এর একটি অপরটি অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। যে হাতটি অধিক শক্তিশালী, তার নাম রাখা হয়েছে ডান এবং এর বিপরীত হাতের নাম বাম। এর পর যে দিকটি ডান তরফে তার নাম ডান দিক এবং যে দিকটি বাম তরফে তার নাম বাম দিক রাখা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি তরফ সৃষ্টি করেছেন। এক তরফে দেখে এবং চলে, সেই তরফের নাম হয়েছে অগ্র দিক এবং এর বিপরীত তরফের নাম সাব্যস্ত হয়েছে পশ্চাদ্দিক।

সুতরাং উপরোক্ত ছয়টি দিক মানব সৃষ্টির ফলস্বরূপ সৃজিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই আকারে সৃষ্টি করা না হত, বরং বলের মত গোলাকার সৃষ্টি করা হত, তবে এসব দিকেরও অস্তিত্ব থাকত না। সুতরাং এসব দিক হাদেস বা অনিত্য। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন এসব দিক থাকবে। মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে এসব দিকেরও বিলুপ্তি ঘটবে। অতএব আল্লাহ তাআলা এগুলোর দ্বারা অনাদিকালেও বিশেষত্ব লাভ করতে পারেন না এবং এখনও পারেন না। কেননা, মানব সৃষ্টির সময় তিনি কোন বিশেষ দিকে ছিলেন না।

আল্লাহ তাআলার জন্যে ঊর্ধ্ব হবে, এ বিষয় থেকে তিনি মুক্ত। কেননা, মাথা থেকে তিনি মুক্ত। মাথার দিককেই বলা হয় ঊর্ধ্ব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে অধঃ হতে পারে না, কেননা, তাঁর পা নেই। এখন প্রশ্ন হয়, দোয়ার সময় হাত আকাশের দিকে উঠানো হয় কেন? জওয়াব, আকাশের দিকেই দোয়ার কেবলা। এতে আরও ইশারা আছে, যার কাছে দোয়া চাওয়া হয়, তিনি প্রতাপশালী ও মহান। উচ্চতার দিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রবলতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর উর্ধ্বে রয়েছেন।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা সেই অর্থে আরশের উপর সমাসীন, যে অর্থ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সমাসীন হওয়ার যে অর্থ তাঁর বিশালতার পরিপন্থী নয় এবং যাতে অনিত্যতা, ফানা বা বিনাশের কোন দখল নেই। নিম্নোক্ত আয়াতে সমাসীন হওয়ার অর্থই বুঝানো হয়েছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ ـ

অর্থাৎ, "অতঃপর আল্লাহ্ আকাশে আরোহণ করলেন। তখন আকাশ ছিল ধোঁয়া।"

এ অর্থ কেবল প্রচণ্ডতা ও প্রবলতার দিক দিয়েই সম্ভব। অর্থাৎ, তিনি আকাশের উপর প্রবল হলেন। জনৈক কবি বলেন ঃ "এখন বাশার এরাকের উপর সমাসীন হল। সে তরবারি ও রক্তপাতের মুখাপেক্ষী হয়নি।" সত্যপন্থীদেরকে বাধ্য হয়ে এ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন মিথ্যাপন্থীরা অপারগ হয়ে وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন" আয়াতের ব্যাখ্যা করেছে, সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্য বেষ্টন করা ও জানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ـ

অর্থাৎ, "মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দু'অঙ্গুলির মাঝখানে অবস্থিত।"

এখানে অঙ্গুলির ব্যাখ্যা কুদরত ও প্রবলতা করা হয়েছে। এমনিভাবে الاسود يمين الله فى ارضه অর্থাৎ, হাজারে আসওয়াদ তথা "কৃষ্ণ প্রস্তর পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার দক্ষিণ হস্ত।" এর অর্থ নেয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়েছে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে রাখা হলে তা সম্ভব থাকে না। অনুরূপভাবে এক্ষেত্রে استوى শব্দের বাহ্যিক অর্থ অবস্থান করা ও স্থান নেয়া করা হলে আল্লাহ তাআলার শরীরী হওয়া এবং আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ আরশের সমান হবেন অথবা ছোট হবেন অথবা বৃহৎ হবেন। এসবই অসম্ভব। কাজেই বাহ্যিক অর্থ নেয়াও অম্ভব।

নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা আকার, পরিমাণ, দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতে চর্মচোখে দৃষ্টিগোচর হবেন। কেননা, তিনি বলেন ঃ

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -

অর্থাৎ, "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন প্রফুল্ল হবে– তাদের পালনকর্তাকে অবলোকন করবে।"

তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হন না। কারণ, আল্লাহ বলেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ -

অর্থাৎ, "দৃষ্টি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি দৃষ্টিসমূহকে উপলব্ধি করেন।"

তদুপরি এ কারণে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জওয়াবে তিনি নিজে বলেন ঃ

لَنْ تَرَانِىْ -

অর্থাৎ, "তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না।"

এখন কেউ বলুক, আল্লাহ তাআলার যে সিফাত হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষে জানা সম্ভব হল না, তা মুতাযেলা সম্প্রদায় কেমন করে জেনে নিল এবং দীদার অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আঃ) দীদারের প্রার্থনা কিরূপে করলেন? পরকালে দীদারের আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে নেয়ার কারণ, এতে কোন কিছু অসম্ভব হওয়া জরুরী হয় না। কেননা, দর্শনও এক প্রকার জ্ঞান ও কাশ্‌ফ। তবে তা জ্ঞান অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন দিকে না থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁর সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, তখন এমনি অবস্থায় দেখাও তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আল্লাহকে জানা যেমন আকার ছাড়াই সম্ভব,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তেমনি তাঁকে দেখাও আকার আকৃতি ব্যতিরেকেই সম্ভবপর।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলার কোন শরীক নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি একাই আবিষ্কার করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন সমতুল্য, সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যে তাঁর সাথে কলহ ও বিরোধ করতে পারে। এর প্রমাণ এই আয়াত–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا .

অর্থাৎ, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত আরও উপাস্য থাকত, তবে আকাশ ও পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি আল্লাহ দু'জন থাকে এবং তাঁদের মধ্যে কোন একজন কোন কাজ করতে চায়, তবে অন্যজন তার সাথে সায় দিতে বাধ্য হলে সে অক্ষম অপারগ বলে বিবেচিত হবে। সর্বশক্তিমান হবে না। আর যদি দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে প্রতিহত করতে ও বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়, তবে দ্বিতীয় জন শক্তিশালী ও প্রবল হবে আর প্রথম জন দুর্বল ও অক্ষম প্রতিপন্ন হবে; সর্বশক্তিমান হবে না।

দ্বিতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সপ্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান এবং এ উক্তিতে সত্যবাদী–

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থাৎ, "তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।"

এর কারণ, এ বিশ্ব কারিগরি দিক দিয়ে অত্যন্ত মজবুত এবং সৃষ্টিগতভাবে সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার অধীন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি চমৎকার বয়নযুক্ত, কারুকার্যখচিত ও সুসজ্জিত রেশমী বস্ত্র দেখে ধারণা করে, এটা কোন মৃত ব্যক্তি বয়ন করে থাকবে, যে কিছু করতে পারে না, তাহলে সে কি নির্বোধ মূর্খ বলে গণ্য হবে না? তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নির্মিত বিশ্বকে দেখেও তাঁর কুদরত অস্বীকার করা নিছক বোকামি বৈ নয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন অনুকণা নেই, যা তাঁর জ্ঞানে অনুপস্থিত। তিনি এ উক্তিতে সত্যবাদী–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি আরও বলেন–

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

অর্থাৎ, "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না, অথচ তিনি রহস্যজ্ঞানী সর্বজ্ঞ?" এতে নির্দেশ করেছেন, সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি করে নাও। কেননা, সামান্য বস্তুর মধ্যেও নিপুণ সৃষ্টি ও সাজানো গোছানো শিল্পকর্ম দেখে নিঃসন্দেহে শিল্পীর ব্যবস্থাপনা জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা জীবিত। কেননা, যার জ্ঞান ও কুদরত প্রমাণিত, তার জীবনও অবশ্যই প্রমাণিত হবে। যার কুদরত চলমান এবং যার জ্ঞান ও কৌশল অব্যাহত, তাকে যদি জীবিত নয় বলে কল্পনা করা যায়, তবে গতিশীল ও স্থিতিশীল থাকা অবস্থায় জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কেও সন্দেহ হতে পারে; বরং কারিগর, শিল্পী, শহরে ও বনে ঘুরাফেরাকারী এবং দেশ বিদেশের যত মুসাফির রয়েছে তাদের সকলের জীবন সম্পর্কেই সন্দেহ হতে পারে। এটা পথভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়।

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তআলা স্বীয় কর্মের ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা তাঁর ইচ্ছায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। কারণ, যে কাজ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, তার বিপরীত কাজটিও প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কুদরত উভয় কাজের সাথে একই রূপ সম্পর্ক রাখে। সুতরাং উভয় কাজের মধ্য থেকে এক কাজের দিকে কুদরতকে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটি ইচ্ছা থাকা একান্ত দরকার।

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অন্তরের কুমন্ত্রণা, চিন্তাভাবনা ও ধারণার মত গোপন বিষয়ও তাঁর দৃষ্টিতে অনুপস্থিত নয় এবং অন্ধকার রাতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিঁপড়ার শব্দও তাঁর শ্রবণের বাইরে নয়। কেননা, শ্রবণ ও দর্শন পূর্ণতার গুণ, অপূর্ণতার গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্যে শ্রবণ ও দর্শন স্বীকার না করলে তাঁর সৃষ্টি হয়ে যাবে পূর্ণ এবং তিনি অপূর্ণ হয়ে যাবেন। এছাড়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পিতার সামনে পেশকৃত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রমাণও বৈধ হবে না। তাঁর পিতা অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিমা পূজা করত। তিনি পিতাকে বললেন

لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ, "আপনি এমন প্রতিমার পূজা কেন করেন, যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন উপকার করে না।"

সুতরাং তুমিও যদি পিতার উপাস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, তবে তোমার প্রমাণাদি বাতিল হয়ে যাবে এবং আল্লাহর উক্তির সত্যতাও প্রতিষ্ঠিত হবে না- تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

অর্থাৎ, "এটা আমার প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তার কওমের মোকাবিলায় দান করেছি।"

যেমন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াই আল্লাহ তাআলার কর্তা হওয়া এবং অন্তর ও মস্তিষ্ক ছাড়া জ্ঞানী হওয়া প্রতীয়মান হয়েছে, তেমনি চক্ষুকোটর ছাড়া তাঁর দর্শক হওয়া এবং কর্ণকুহর ছাড়া শ্রোতা হওয়াও বুঝে নেয়া উচিত। এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা কথা বলেন এবং তাঁর কালাম (কথা) তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি সিফত। এ কালাম কণ্ঠস্বরও নয় এবং অক্ষরও নয়। তাঁর কালাম অন্যের কালামের অনুরূপ নয়, যেমন তাঁর সত্তা অন্যের সত্তার মত নয়। আসলে মনের কালামই সত্যিকার কালাম। অক্ষর ও কণ্ঠস্বর তো কেবল ব্যক্ত করার জন্য। যেমন, নড়াচড়া ও ইশারা দ্বারাও মাঝে মাঝে ব্যক্ত করা যায়। জানি না, কোন কোন লোকের কাছে এ বিষয়টি কেন দুর্বোধ্য হয়ে গেল। অথচ জাহেলিয়াত যুগের কবিদের কাছেও এটা দুর্বোধ্য ছিল না। তাই জনৈক কবি বলেন ঃ কালামের অস্তিত্ব কেবল অন্তরের মধ্যে। জিহ্বা এর প্রমাণ মাত্র। তবে কতক লোককে এসব বিষয় থেকে দূরে রাখার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কোন প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। হযরত মূসা (আঃ) দুনিয়াতে কণ্ঠস্বর ও অক্ষরবিহীন কালাম শ্রবণ করেছেন- যেব্যক্তি একথা অসম্ভব মনে করে, তবে তার উচিত আখেরাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেহ ও রংবিহীন বস্তু দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করা। কিন্তু এটা সে স্বীকার করে থাকে, যদিও এ পর্যন্ত এমন কোন বস্তু দেখেনি। সুতরাং দেখার ব্যাপারেও তাই স্বীকার করা উচিত, যা শ্রবণের ব্যাপারে বুঝে আসে।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত কালাম চিরন্তন। তার সকল সিফতও তেমনি। কেননা, অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার শানের পরিপন্থী। কারণ, অনিত্য বস্তুসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলার এলেম চিরন্তন। অর্থাৎ, তিনি সর্বদা আপন সত্তা, সিফত এবং যা কিছু সৃষ্টি করেন, সকলকে অনাদিকাল থেকে জানেন। যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করেন তখন তার এলেম নতুন অর্জিত হয় না; বরং অনাদি-অনন্তকালব্যাপী তা তাঁর রয়েছে।

নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা চিরন্তন। বিশেষ ও উপযুক্ত সময়ে সৃষ্টি কর্মের সাথে পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী অনাদিকালেই এ ইচ্ছার সম্পর্ক হয়ে আছে। কেননা, তাঁর ইচ্ছা অনিত্য হলে তিনি অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র সাব্যস্ত হবেন, যা তাঁর শানের পরিপন্থী।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা এলেম সহকারে আলেম, জীবন সহকারে জীবিত, শক্তি সামর্থ্য সহকারে শক্তিমান, ইচ্ছা সহকারে ইচ্ছাকারী, কালাম সহকারে মুতাকাল্লিম (বক্তা), শ্রবণ সহকারে শ্রোতা এবং দর্শক সহকারে দ্রষ্টা। এগুলো তাঁর চিরন্তন সিফত। অতএব যারা তাঁকে এলেম ব্যতিরেকে আলেম বলে, তারা যেন কাউকে ধন ব্যতিরেকে ধনী বলে, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

তৃতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি, বিশ্বে যা কিছু অনিত্য ও সৃষ্ট, তা আল্লাহ তাআলারই কর্ম ও আবিষ্কার। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা বিশ্ব সৃষ্টি করেনি। সুতরাং বান্দার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার কুদরতের সাথে জড়িত।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ মূলনীতির সমর্থন পাওয়া যায়–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

"অর্থাৎ, সবকিছুর স্রষ্টাই আল্লাহ।"

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং যা তোমরা কর, তাকে।"

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থাৎ, "তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের রহস্য জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেনই না বা কেন? তিনি রহস্যজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।"

দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা– এটা এ বিষয়কে জরুরী করে না, কাজকর্ম 'ইকতিসাব' তথা উপার্জন হিসাবে বান্দার ক্ষমতাধীন থাকবে না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা ও ক্ষমতাশালী উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। কুদরত তথা ক্ষমতা বান্দার একটি আল্লাহ প্রদত্ত গুণ, যা বান্দার উপার্জিত নয়। অর্থাৎ বান্দার ক্রিয়াকর্ম একটা কুদরতী গুণের অধীনে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টির দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন এবং ইকতিসাব ও উপার্জনের দিক দিয়ে বান্দার ক্ষমতার অধীন। কাজেই বান্দার ক্রিয়াকর্ম নিছক বাধ্যতামূলক নয়।

তৃতীয় মূলনীতি, বান্দার কর্ম বান্দার উপার্জন হলেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে নয়। এ থেকে বুঝা গেল, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সৎ অসৎ, লাভ-লোকসান, কুফর-ঈমান, গোমরাহী-হেদায়াত, আনুগত্য-নাফরমানী ইত্যাদি যা কিছু হয়, সব আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা দ্বারা হয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও বাসনায় প্রকাশ পায়। কেউ তাঁর ফয়সালা টলাতে পারে না এবং তাঁর আদেশ পেছনে হটাতে পারে না। তিনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহ এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। তিনি যা করেন তার জন্য কারও কাছে জওয়াবদিহি করেন না, তবে বান্দাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। এর ইতিহাসগত প্রমাণ হচ্ছে, সমগ্র উম্মত এ বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করে। ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا .

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন।"

لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ

অর্থাৎ "আমি ইচ্ছা করলে সকলকে সৎপথ দান করতাম।"

এর যৌক্তিক প্রমাণ হল, যদি আল্লাহ্ তাআলা গোনাহ্ ও অন্যায়কে খারাপ মনে করে এগুলোর ইচ্ছা না করেন, তবে এগুলো তাঁর দুশমন অভিশপ্ত ইবলীসের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মানুষের মধ্যে গোনাহ্ নাফরমানীই অধিক। তা হলে দেখা যায়, ইবলীস আল্লাহ্ তাআলার শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার ইচ্ছানুযায়ী মানুষ অধিক কাজ সম্পাদন করে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী কম কাজ সম্পাদন করা হয়। এখন বল, মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদা এমন স্তরে কিরূপে নামিয়ে দেবে, যে স্তরে গ্রামের কোন মাতাব্বরকে নামিয়ে দিলে সে-ও মাতাব্বরীকে ঘৃণা করতে শুরু করবে? অর্থাৎ, গ্রামে যদি মাতাব্বরের কোন শত্রু থাকে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী অধিক কাজ সম্পাদিত হয় মাতাব্বরের ইচ্ছা কমই পালিত হয়, তবে মাতাব্বর ব্যক্তি এমন মাতাব্বরীকে কি অবমাননাকর মনে করবে না? বেদআতীদের মতে মানুষের নাফরমানী, যা সংখ্যায় অধিক– আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার খেলাফে হয়ে থাকে। এটা আল্লাহ্ তাআলা দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার দলীল (নাউযু বিল্লাহ্)। সুতরাং যখন প্রমাণিত হল, বান্দার ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট, তখন এটাও প্রামাণিত হল যে, বান্দার ক্রিয়াকর্ম তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত হয়। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ তাআলা যে কাজের ইচ্ছা করেন তা করতে বান্দাকে নিষেধ করেন কিরূপে এবং যে কাজের ইচ্ছা তিনি করেন না, সে কাজের আদেশ করেন কিরূপে? এর জওয়াব হচ্ছে, আদেশ ও ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আদেশ করলেই ইচ্ছা করা জরুরী হয় না।

চতুর্থ মূলনীতি, সৃষ্টি, আবিষ্কার, আদেশ– এগুলো আল্লাহ্ তাআলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুগ্রহ, তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। মু'তাযেলা সম্প্রদায় বলে, এগুলো তাঁর উপর ওয়াজেব। কারণ, এর মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত। তাদের এ উক্তি ঠিক নয়। কেননা ওয়াজেবকারী তো তিনিই। অতএব তিনি নিজে কিরূপে ওয়াজেব হওয়ার লক্ষ্যস্থল হতে পারেন? ওয়াজেব এমন কাজকে বলা হয়, যা বর্জন করলে ভবিষ্যতে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতি হয়। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ওয়াজেব। এর অর্থ, এই আনুগত্য বর্জন করলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ, আখেরাতে শাস্তিভোগ করতে হবে। অথবা পিপাসিত ব্যক্তির উপর পানি পান করা ওয়াজেব। অর্থাৎ, এটা বর্জন করলে পরিণামে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই অর্থে আল্লাহ্ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হতেই পারে না।

পঞ্চম মূলনীতি, যে কাজ করার শক্তি বান্দার মধ্যে নেই, সেই কাজের আদেশ করা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে বৈধ, যদিও তিনি এরূপ আদেশ করেন না। কেননা, বৈধ না হলে এটা না করার প্রার্থনা অর্থহীন হবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলার উক্তিতে এরূপ প্রার্থনা প্রমাণিত রয়েছে—

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ -

অর্থাৎ, "হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব আরোপ করো না, যার শক্তি আমাদের নেই।"

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা কোন পূর্ব অপরাধ অথবা ভবিষ্যৎ সওয়াব ব্যতিরেকেই তাঁর সৃষ্টিকে কষ্ট ও শাস্তি দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্যে বৈধ। কেননা, তিনি আপন মালিকানায় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন— অন্যের মালিকানায় নয়। অপরের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে জুলুম বলা হয়। এটা আল্লাহ্র জন্যে অসম্ভব। কেননা, তাঁর সামনে অন্যের কোন মালিকানা নেই যে, তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে জুলুম হবে। এ বিষয়ের অস্তিত্বই এর বৈধ হওয়ার দলীল। আমরা জন্তু জানোয়ারকে যবেহ্ হতে দেখি। মানুষ তাদেরকে নানা রকম কষ্ট দিয়ে থাকে। অথচ পূর্বে তাদের তরফ থেকে কোন অপরাধ প্রকাশ পায় না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতে জন্তু-জানোয়ারকে জীবিত করবেন এবং তাদেরকে মানুষের কাছ থেকে নির্যাতনের বদলা দান করবেন, তবে তা শরীয়ত ও বিবেক উভয়ের গণ্ডির বাইরে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। বান্দার জন্যে যা অধিক উপযুক্ত, তা করা তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই লেখেছি যে, আল্লাহ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হওয়া বোধগম্য নয়। তিনি যা করেন তার জন্যে তাকে জওয়াবদিহি করতে হয় না। কিন্তু মানুষের কাজের জওয়াবদিহি রয়েছে।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার মারেফত ও এবাদত তাঁর ওয়াজেব করার দিক দিয়ে এবং শরীয়তের আইনের দিক দিয়ে ওয়াজেব।

নবম মূলনীতি, পয়গম্বর প্রেরণ নিষ্ফল নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায় এর বিপরীতে বলে, বিবেকের উপস্থিতিতে পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। এর জওয়াব হচ্ছে, আখেরাতে মুক্তির কারণ হয় এমন কাজ বিবেক দ্বারা জানা যায় না, যেমন বিবেক দ্বারা স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী ওষুধপত্র জানা যায় না। সুতরাং চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন তেমনি পয়গম্বরগণেরও প্রয়োজন। পার্থক্য হচ্ছে, চিকিৎসকের কথা অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়, আর পয়গম্বর মোজেযা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হন।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে খাতামুন্নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী)-রূপে এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের জন্যে রহিতকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমর্থন দান করেছেন; যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, কংকরের তসবীহ্ পাঠ করা, চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা, অঙ্গুলি থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। মুহাম্মদ (সাঃ) যে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমগ্র আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তা হচ্ছে কোরআন মজীদ। ভাষাশৈলী ও অলঙ্কার নিয়ে আরববাসীদের গর্বের অন্ত ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হল না। কেননা, কোরআনে যে চমৎকার রচনাশৈলী, ভাবের গাম্ভীর্য ও বাক্যাবলীর বিশুদ্ধতা রয়েছে, তার সমাবেশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আরবরা তাঁকে গ্রেফতার করেছে, লুটেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে; কিন্তু পারেনি কেবল কোরআনের মত রচনা পেশ করতে। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, পড়ালেখার ধারে-কাছেও যাননি। এতদসত্ত্বেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি কোরআন পাকে পূর্ববর্তী লোকদের নির্ভুল খবর এবং অনেক বিষয়ে অদৃশ্যের সংবাদাদি বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীকালে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এর দৃষ্টান্ত ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে।"

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, রোম পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী ভূভাগে, কিন্তু তারা এই পরাজয়ের প্র শীঘ্রই কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে।

মোজেযা রসূলের সত্যতার প্রমাণ। কেননা, যে কাজ করতে মানুষ অক্ষম তা আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ হবে না। এ ধরনের কাজ নবীর সাথে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেলে এর অর্থ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর সত্যতা ঘোষণা করা।

চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলগণের সত্যায়ন প্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, হাশর ও নশর হবে। শরীয়তে এর খবর বর্ণিত হয়েছে। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। বিবেকের বিচারে এর অস্তিত্ব সম্ভবপর। এর অর্থ হচ্ছে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা যে কুদরতের বলে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, সেই কুদরতের বলেই পুনরায় জীবিত করবেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ

অর্থাৎ "কাফের বলল, অস্থিসমূহ পচে যাওয়ার পর ওগুলো কে জীবিত করবে? বলে দিন ঃ যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতে প্রথমবার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবনের প্রমাণরূপে পেশ করা হয়েছে। অন্যত্র বলেন ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ

অর্থাৎ, "তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একই সত্তার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতই।"

বলাবাহুল্য, পুনরায় সৃষ্টি দ্বিতীয় সূচনা। সুতরাং এটা প্রথম সূচনার মতই সম্ভবপর।

দ্বিতীয় মূলনীতি, মুনকার নকীরের প্রশ্নকে সত্যায়ন করা ওয়াজেব। এটি বিবেকের দৃষ্টিতেও সম্ভবপর। কেননা, এতে জরুরী হয় যে, জীবন পুনরায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যেখানে সম্বোধন করা সম্ভবপর। এতে আপত্তি করা যায় না যে, মৃত ব্যক্তির অঙ্গসমূহ স্থির থাকে এবং মুনকার নকীরের প্রশ্ন শুনতে পায় না। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তিও বাহ্যতঃ স্থির থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে এমন কষ্ট ও স্বাদ অনুভব করে, যার প্রভাব জাগ্রত হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈলের কথাবার্তা শুনতেন এবং তাঁকে দেখতেন। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে থাকত তারা শুনত না এবং দেখত না। এমনকি কিছু জানতেও পারত না।

তৃতীয় মূলনীতি, কবরের আযাব শরীয়তে প্রমাণিত। আল্লাহ্ বলেন–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

অর্থাৎ, "তাদেরকে অগ্নিতে পেশ করা হয় সকাল-সন্ধ্যায়। যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে (বলা হবে), ফেরাউনের বংশধরকে কঠোরতম শাস্তিতে দাখিল কর।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

কবরের আযাব সম্ভবপর। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। মৃত ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড অংশ হিংস্র জন্তুদের পেটে এবং পক্ষীদের চঞ্চুতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কবরের আযাব সত্য হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, আযাবের ব্যথা প্রাণীর বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। প্রাণীর এসব বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে অনুভব শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া আল্লাহ তাআলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ মূলনীতি মীযান তথা দাঁড়িপাল্লা। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ, "আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব।"

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

অর্থাৎ, "অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।'

আল্লাহ তাআলার কাছে আমলের মর্যাদা যত বেশী হবে, আমলনামার ওজন তত বেশী হবে। এতে বান্দা তার আমলের পরিমাণ জেনে যাবে এবং সে স্পষ্ট বুঝবে, আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার হবে এবং সওয়াব দিলে তা হবে অনুগ্রহ।

পঞ্চম মূলনীতি পুলসেরাত, যা জাহান্নামের উপর নির্মিত এবং চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর এবং তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" এ পুল সম্ভবপর। তাই একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। যে আল্লাহ পাখীকে শূন্যে উড়াতে সক্ষম, তিনি মানুষকে এ পুলের উপর দিয়ে চালাতেও সক্ষম হবেন।

ষষ্ঠ মূলনীতি, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার সৃজিত। আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাআলা বলেন ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার মাগফেরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী। এটা খোদাভীরুদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।"

"প্রস্তুত করা হয়েছে" শব্দ থেকে জানা যায়, জান্নাত সৃজিত। তাই একে আক্ষরিক অর্থে থাকতে দেয়া ওয়াজেব। যদি কেউ বলে, বিচার দিবসের পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই, তবে এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলা যা কিছু করেন তজ্জন্য তার কোন জওয়াবদিহি নেই। বান্দার কৃতকর্মের জওয়াবদিহি আছে।

সপ্তম মূলনীতি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে সত্যপন্থী ইমাম (শাসক) হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর পরে হযরত ওমর (রাঃ), তাঁর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁর পরে হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর পরে ইমাম কে হবেন, সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অকাট্য কোন কথা বলেননি। যদি বলতেন, তবে তা অবশ্যই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত; যেমন বিভিন্ন শহরে তিনি যাঁদেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের বিষয় অজানা থাকেনি। এর তুলনায় ইমামের বিষয়টি আরও অধিক প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। এটা কিরূপে গোপন রইল? আর যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হলে তা মিটে গেল কিরূপে? আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল না কেন? সারকথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জনগণের পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বয়াতের তরীকায় খলীফা হয়েছেন। যদি বলা হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এরশাদ অন্যের জন্যে ছিল, তবে সকল সাহাবায়ে কেরামকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। একমাত্র রাফেযী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ এ ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেনি। আহলে সুন্নতের আকীদা হচ্ছে, সকল সাহাবীকে ভাল বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল যেমন তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তেমনি প্রশংসা করতে হবে। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে, তা সবই ছিল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইজতিহাদ ভিত্তিক, হযরত মোয়াবিয়ার ক্ষমতালিপ্সার কারণে নয়। হযরত আলী (রাঃ) ধারণা করেছিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘাতকদেরকে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করার পরিণতিতে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, তাদের গোত্রের লোক সংখ্যা অনেক বেশী এবং সেনাবাহিনীতে মিশে রয়েছে। তাই অপরাধীদেরকে সোপর্দ করার বিষয়টি তিনি বিলম্বিত করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। অপর দিকে হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মনে করেছেন, এত বড় অন্যায় সত্ত্বেও অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারটি বিলম্বিত করার অর্থ তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়া এবং এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করা। বড় বড় আলেমগণ বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন, তবে সত্যে উপনীত হন একজনই। হযরত আলী (রাঃ) ভুলের উপর ছিলেন– একথা কোন আলেম বলেন না।

অষ্টম মূলনীতি, সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব খেলাফতের ক্রমানুযায়ী। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে যা শ্রেষ্ঠত্ব, সেটাই বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তাআলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব কোন্‌টি এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং ক্রম তাঁরাই জানেন। যাঁরা কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারাবাহিকতা না বুঝে থাকলে খেলাফতকে এভাবে সাজাতেন না। কেননা, তাঁরা আল্লাহ তাআলার কাজে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করতেন না এবং কোন বাধাই তাঁদেরকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারত না।

নবম মূলনীতি, মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন খলীফা হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত ঃ পুরুষ হওয়া, পরহেযগার হওয়া, আলেম হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া ও কোরায়শী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ الائمة من قريش। অর্থাৎ, খলীফা কোরায়শদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পঞ্চগুণসম্পন্ন অনেক লোক বিদ্যমান থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি খলীফা হবেন। যেব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বিরোধিতা করে, সে বিদ্রোহী।

দশম মূলনীতি, খোদাভীরু এবং আলেম না হয়েও যেব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকে, তাকে পদচ্যুত করলে যদি জনগণের জন্যে অসহনীয় ফেতনা দেখা দেয়, তবে আমরা বলব, তার খেলাফত বৈধ। কেননা, তাকে পদচ্যুত করার পর অন্য কেউ খলীফা হবে কিংবা খেলাফতের পদ শূন্য থাকবে। অন্য কেউ খলীফা হলে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মুসলমানদের যে ক্ষতি হবে তা বর্তমান খলীফার মধ্যে কিছু শর্তের অনুপস্থিতির ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী হবে। বলাবাহুল্য, অধিক উপযোগিতা লাভের খাতিরেই এসব শর্ত। এখন অধিক উপযোগিতা অর্জিত না হওয়ার ভয়ে মূল উপযোগিতা হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পক্ষান্তরে খেলাফতের পদ শূন্য থাকলে শাসনকার্য অচল হয়ে পড়বে। তাই পূর্বাবস্থা বহাল থাকাই সঙ্গত।

মোট কথা, উপরোক্ত চারটি স্তম্ভে বর্ণিত চল্লিশটি মূলনীতিই হচ্ছে আকায়েদ। কেউ এগুলো বিশ্বাস করলে সে আহলে সুন্নতের অনুসারী এবং বেদআতী সম্প্রদায় থেকে আলাদা থাকবে। আমরা দোয়া করি– আল্লাহ স্বীয় তওফীক দ্বারা আমাদেরকে সত্যের উপর কায়েম রাখুন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন।

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم -

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে তিন প্রকার মত দেখা যায় ঃ (১) কেউ বলেন, উভয়টি এক ও অভিন্ন, (২) কেউ বলেন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন, পরস্পর মিলে না এবং (২) কেউ বলেন, বিষয় দুটিই, কিন্তু একটি অপরটির সাথে জড়িত। এখন আমরা তিন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে যা প্রকাশ্য সত্য, তা বর্ণনা করছি।

প্রথম প্রকার আলোচনা উভয়ের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে। সত্য হচ্ছে, ঈমানের অর্থ সত্যায়ন করা অর্থাৎ, সত্য বলে প্রকাশ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا "তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।" মুমিন অর্থ সত্যায়নকারী। ইসলামের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাধ্যতা, অস্বীকৃতি ও হটকারিতা বর্জন করা। সত্যায়ন এক বিশেষ স্থান অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা হয়। মুখ তার ভাষ্যকার। স্বীকার করা অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবগুলো দ্বারা হয়। কেননা, যে সত্যায়ন অন্তর দ্বারা হয়, তাই মেনে নেয়া ও অস্বীকার বর্জন করা, অনুরূপভাবে মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য পালন করা। সারকথা, অভিধানের দিক দিয়ে ইসলাম একটি ব্যাপক বিষয় এবং ঈমান বিশেষ বিষয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের নাম ঈমান। এ থেকে জানা গেল, প্রত্যেক সত্যায়নই মেনে নেয়া, কিন্তু প্রত্যেক মেনে নেয়া সত্যায়ন নয়।

দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের অর্থ সম্পর্কে। সত্য এই যে, শরীয়তে উভয়ের ব্যবহার তিনভাবে হয়েছে– উভয়কে এক অর্থে ধরে, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ধরে এবং একটির অর্থে অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত ধরে।

প্রথমোক্ত ব্যবহার– যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ -

অর্থাৎ, অতঃপর সেখানে যারা ঈমানওয়ালা ছিল, আমি তাদেরকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদ্ধার করলাম, কিন্তু সেখানে মাত্র একজন মুসলমানের গৃহ পাওয়া গেল।

এ ঘটনায় সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, গৃহ একটিই ছিল এবং এরই জন্যে মুমিনীন ও মুসলিমীন শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে।

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক তবে তাঁর উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হও।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। একবার তাঁকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জওয়াবে এ পাঁচটি স্তম্ভই উল্লেখ করেন। এ থেকে জানা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক এবং অভিন্ন। এবং উভয়টি ভিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত এই আয়াত-

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا ـ

অর্থাৎ, গেঁয়োরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি; বরং বল ঃ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আনুগত্য কবুল করেছি। এখানে ঈমান অর্থ কেবল অন্তরের সত্যায়ন এবং ইসলাম অর্থ মৌখিক সত্যায়ন। হাদীসে জিব্রাঈলে আছে, যখন তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলগণের প্রতি, কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং এ বিষয়ের প্রতি যে, ভাল ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এরপর প্রশ্ন হল ঃ ইসলাম কি? জওয়াবে তিনি এ পাঁচটি বিষয়ই উল্লেখ করে বললেন, এগুলো কথায় ও কাজে স্বীকার করার নাম ইসলাম। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তিকে তা দিলেন না। হযরত সা'দ (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তিকে দিলেন না, অথচ সে মুমিন? তিনি বললেন ঃ সে মুমিন নয়, মুসলিম। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা হলেও তিনি একই জওয়াব দিলেন।

ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ ইসলাম। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন ঃ ঈমান। এ থেকে জানা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন এবং একটি অপরটির অন্তর্ভুক্তও বটে। এটা অভিধানের দিক দিয়ে ব্যবহারে সর্বোত্তম। কেননা, ঈমান হচ্ছে আমলসমূহের মধ্যে একটি সর্বোত্তম আমল। আর ইসলাম মেনে নেয়ার নাম, অন্তর দ্বারা হোক, মুখে হোক অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হোক। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া। অন্তরের এ মেনে নেয়াই তসদীক তথা সত্যায়ন, যাকে ঈমান বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তগত বিধান সম্পর্কে। ঈমান ও ইসলামের শরীয়তগত বিধান দু'টি– একটি ইহলৌকিক, অপরটি পারলৌকিক। পারলৌকিক বিধান হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বের করা এবং তাতে চিরকাল থাকার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ـ

অর্থাৎ, "যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে।"

এতে মতভেদ রয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে বের হওয়া কোন্ ঈমানের ফল? কেউ বলে, কেবল বিশ্বাস করলেই এ ফল অর্জিত হবে। কেউ বলে, এ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকারোক্তি করা। আবার কেউ এর সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করাকেও যোগ করে। বাস্তব কথা, যার মধ্যে এ তিনটি গুণই পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। তার ঠিকানা নিশ্চিতই জান্নাত হবে। যার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যাবে এবং অল্প বিস্তর আমলও পাওয়া যাবে, একটি অথবা অধিক কবীরা গোনাহও সে করবে, তার সম্পর্কে মুতাযেলীরা বলে, সে ঈমানের বাইরে কিন্তু কুফরের মধ্যে দাখিল নয়, তার নাম ফাসেক। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। মুতাযেলীদের এ উক্তি বাতিল। যার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাস পাওয়া যায়, কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল করার পূর্বেই মারা যায়, সে নিজের কাছে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে। সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। কেননা, তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতার তাৎপর্য

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নোদ্ধৃত হাদীস ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بنى الدين على النظافة ধর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। مفتاح الصلوة الطهور নামাযের চাবি পবিত্রতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "এ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসেন।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন الطهور نصف الايمان অর্থাৎ, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।"

অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আলেমগণ এসব রেওয়ায়েত থেকে এ তথ্য উদঘাটন করেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরকে পবিত্র করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান।" এ বাক্যের উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া অবান্তর যে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গে পানি ঢেলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবে আর তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ময়লা অপবিত্রতা দ্বারা কলুষিত থাকবে। বরং উদ্দেশ্য, পবিত্রতা সম্পর্কিত কাজ। পবিত্রতার প্রকার চতুষ্টয় এই ঃ (১) বাহ্যিক দেহ ইত্যাদিকে বেওযুজনিত অপবিত্রতা ও আবর্জনা থেকে পাক করা, (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ ও পাপ থেকে পাক করা, (৩) অন্তরকে অসচ্চরিত্রতা ও কুঅভ্যাস থেকে পাক করা এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৪) বাতেন তথা অভ্যন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে পাক করা। এ শেষোক্ত প্রকারটি পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের বৈশিষ্ট্য। এখন প্রত্যেক প্রকারের যে অর্ধেক কাজ পবিত্রতা, তা এভাবে যে, চতুর্থ প্রকারের চরম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য মহিমা মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী মারেফত অন্তরে কখনও অনুপ্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "বলুন, আল্লাহ্। এরপর তাদেরকে তাদের ধ্যান-ধারণায় খেলা করতে দিন।"

কেননা, এ উভয়টি এক অন্তরে একত্রিত হয় না। কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দু'অন্তর সৃষ্টি করেননি যে, একটির মধ্যে খোদায়ী মারেফত থাকবে আর অপরটির মধ্যে গায়রুল্লাহ তথা অন্য কিছু থাকবে। সুতরাং অন্তর অন্য কিছু থেকে পাক করা এবং খোদায়ী মারেফত আসা দু'টি কাজ, যার অর্ধেক হল অন্তরকে পাক করা।

অনুরূপভাবে তৃতীয় প্রকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, অন্তরের প্রশংসনীয় চরিত্র ও শরীয়তী বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া। বলাবাহুল্য, অন্তর এগুলো দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ বিপরীত কুচরিত্র ও মন্দ বিশ্বাস থেকে পাক না হবে। সুতরাং এখানেও দু'টি বিষয় হল, যার অর্ধেক অন্তরকে পাক করা।

এমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করা এক কথা এবং এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা পূর্ণ করা অন্য কথা। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হল সেই আমলের অর্ধেক, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হওয়া উচিত। বাহ্যিক পবিত্রতাকেও এর মতই মনে করা উচিত। এভাবেই পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলা হয়েছে।

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে ঈমানের বিভিন্ন মকাম বা স্তর। প্রত্যেক মকামের একটি পর্যায় আছে। বান্দা নীচের পর্যায় অতিক্রম না করা পর্যন্ত উপরের পর্যায়ে কিছুতেই পৌছতে পারে না। উদাহরণতঃ অন্তরকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিন্দনীয় চরিত্র থেকে পাক করা এবং প্রশংসনীয় চরিত্র দ্বারা পূর্ণ করার পর্যায়ে পৌঁছা যাবে না, যে পর্যন্ত না নিন্দনীয় চরিত্র থেকে অন্তরকে পবিত্র করা হবে। আর যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করে এবাদতে ব্যাপৃত না করবে, সে অন্তরের পবিত্রতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। উদ্দেশ্য যত প্রিয় ও শুভ হয়, তার পথ ততই কঠিন ও দীর্ঘ হয়, তাতে অনেক দুর্গম ঘাঁটি থাকে। তোমার এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এসব বিষয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জিত হয় এবং অধ্যবসায় ছাড়াই লাভ করা যায়। যার অন্তর্দৃষ্টি এসব পর্যায় দেখার ব্যাপারে অন্ধ, সে কেবল বাহ্যিক পবিত্রতাকেই পবিত্রতা মনে করে। সে একেই লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে, এ নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে এবং এর পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি করে। সে তার সমস্ত সময় এস্তেঞ্জা, কাপড় ধোয়া, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত প্রবাহিত পানির সন্ধানে ব্যয় করে দেয়। সে জানে না, পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা অন্তর পবিত্র করার কাজে ব্যাপৃত রাখতেন এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদর্শন করতেন না। কাজেই হযরত ওমর (রাঃ) বিশেষ উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জনৈকা খৃষ্টান মহিলার কলসী থেকে পানি নিয়ে ওযু করেছিলেন। তাঁরা মসজিদে ফরাশ ছাড়া নামায পড়তেন এবং খালি পায়ে পথ চলতেন। যিনি কিছু না বিছিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তেন, তিনি শীর্যস্থানীয় বুযুর্গ বলে গণ্য হতেন। তাঁরা কেবল ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা ও অন্যান্য সুফ্ফাবাসী সাহাবী বলেন ঃ আমরা ভাজা করা গোশত খেতাম এবং নামাযের তকবীর হয়ে গেলে কংকরের মধ্যে অঙ্গুলি ঘষে নিয়ে নামাযে শরীক হয়ে যেতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে আমরা "উশনান" (সাবান জাতীয় ঘাস) কি জিনিস, জানতাম না। আমাদের পায়ের তলা হত আমাদের রুমাল। চর্বিযুক্ত কিছু খেলে পায়ের তালুতে হাত ঘষে নিতাম। কথিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলের পর প্রথমে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়– চালনি, উশনান, দস্তরখান ও পেট ভরে আহার।

মোট কথা, পূর্ববর্তীদের মনোযোগ কেবল অন্তরের পরিচ্ছন্নতার দিকে ছিল। তাঁদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া উত্তম। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন জুতা খুলে নামায

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পড়েছিলেন, যখন জিব্রাঈল (আঃ) এসে জুতার মধ্যে নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁকে জুতা খুলতে দেখে যখন মুসল্লীরাও জুতা খুলতে শুরু করে, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা জুতা খুললে কেন? এসব বাহ্যিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে পূর্ববর্তীরাও কড়াকড়ির পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আজকাল ঔদ্ধত্যের নাম রাখা হয়েছে পরিচ্ছন্নতা। এখন একেই ধর্মের ভিত্তি বলা হয়। অথচ অন্তর অহংকার, আত্মম্ভরিতা, রিয়া ও নেফাকের আবর্জনায় পরিপূর্ণ। এগুলোকে খারাপ মনে করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কেবল ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করে অথবা খালি পায়ে পথ চলে অথবা মসজিদের মাটিতে জায়নামায ছাড়াই নামায পড়ে, তবে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় এবং তাকে অপবিত্র আখ্যা দেয়া হয়। সোবহানাল্লাহ, বিনয় ও আড়ম্বরহীনতা– যা ঈমানের অঙ্গ, তাকে বলা হয় নাপাকী আর গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে বলা হয় পবিত্রতা।

এখানে আমরা কেবল বাহ্যিক পরিত্রতা বর্ণনা করব, যা তিন প্রকার ঃ (১) বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া, (২) হুকমী নাপাকী, যাকে "হদস" (বেওযু অবস্থা) বলা হয়, তা থেকে পাক হওয়া এবং (৩) দেহের উচ্ছিষ্ট থেকে পাক হওয়া।

প্রথম প্রকার– বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় দেখতে হবে ঃ (১) যে নাপাকী দূর করা হবে, (২) যে বস্তু দ্বারা দূর করা হবে এবং (৩) যে উপায়ে দূর করা হবে।

প্রথম বিষয়– যে নাপাকী দূর করা হবে তা তিন প্রকার– জড় পদার্থ, অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাণী এবং প্রাণীর অংশ বিশেষ।

জড় পদার্থের মধ্যে শরাব ও নেশার বস্তু ছাড়া সবকিছু পাক। প্রাণীর মধ্যে কুকুর, শূকর ও এতদুভয় থেকে উৎপন্ন বস্তু ছাড়া সব পাক। প্রাণী মারা গেলে পাঁচটি প্রাণী ব্যতীত সব নাপাক। পাঁচটি প্রাণী এই ঃ মানুষ, মাছ, ঝিনুক, শামুকের পোকা (খাদ্যে যেসব পোকা পড়ে, সেগুলো এর মধ্যে দাখিল)। যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই; যেমন মাছি, এগুলো পানিতে পড়ে গেলে পানি নাপাক হবে না। প্রাণীর অংশ বিশেষ দু'প্রকার– এক, যা প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এর বিধান মৃতের মতই। কিন্তু কেশ আলাদা হলে নাপাক হয় না। অস্থি নাপাক হয়ে যায়। দুই, যে তরল পদার্থ প্রাণীর অভ্যন্তর থেকে বের হয়। এর মধ্যে যেগুলো পরিবর্তিত হয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না, সেগুলো পাক; যেমন অশ্রু, ঘর্ম, থুথু। আর যেগুলোর ঠিকানা নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়, সেগুলো নাপাক; যেমন রক্ত, পুঁজ, পায়খানা, পেশাব সকল প্রাণীরই নাপাক। এসব নাপাকী অল্প হোক কিংবা বেশী, মাফ নেই। কিন্তু পাঁচটি বস্তু অল্প হলে মাফ– (১) ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর যদি নাপাকীর কিছু অংশ থেকে যায় এবং বের হওয়ার স্থান অতিক্রম না করে, তবে মাফ। (২) রাস্তায় চলতে যে কাদা স্বাভাবিকভাবে শরীরে লেগে যায় বা রাস্তার ধুলোবালি হলে মাফ। কিন্তু যতটুকু থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, ততটুকু মাফ। (৩) চামড়ার মোজার তলায় যে নাপাকী লেগে যায়, তা ঘষে নেয়ার পর মাফ। (৪) মশা-মাছির রক্ত অল্প হোক কিংবা বেশী, কাপড়ে লেগে গেলে মাফ। (৫) গায়ের রক্ত, পুঁজ ও বদরক্ত মাফ। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার ব্রন ঘষে দেন। তা থেকে রক্ত বের হয়। কিন্তু তিনি তা না ধুয়ে নামায পড়ে নেন। এই পাঁচ প্রকার নাপাকীর ব্যাপারে শরীয়তের শিথিল বিধান থেকে তোমার জানা উচিত যে, পবিত্রতার ব্যাপারটি সহজভিত্তিক। এ সম্পর্কে নতুন যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কেবল মনের ভিত্তিহীন কুমন্ত্রণা।

দ্বিতীয় বিষয়– যে বস্তু দ্বারা নাপাকী দূর করা হবে, তা দু'প্রকার ঃ জড় পদার্থ ও তরল পদার্থ। জড় পদার্থ হচ্ছে এস্তেঞ্জার ঢেলা, এটা শুষ্ক করে পাক করে দেয়। এ বস্তুটি শক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, নাপাকী শুষে নেয়া এবং নিজে হারাম না হওয়া শর্ত। তরল পদার্থের মধ্যে পানি ছাড়া অন্য কোন বস্তু নাপাকী দূর করতে পারে না। সে-ই নাপাকী দূর করে, যে নিজে পাক এবং যা অনাবশ্যক বস্তু মিশ্রিত হওয়ার কারণে বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত না হয়ে যায়। যদি পানিতে নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির স্বাদ অথবা রং অথবা গন্ধ বদলে যায়, তবে সেই পানি পাক থাকে না। যদি এই গুণত্রয়ের মধ্যে একটিও পরিবর্তিত না হয়, তবে সেই পানি নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, পানির পরিমাণ নয় মশক অথবা সোয়া ছয় মণ হলে পানি নাপাক হবে না। কিন্তু প্রবাহিত পানি যদি নাপাকী পড়ার কারণে বদলে যায়, তবে যতটুকু বদলে যায়, ততটুকু নাপাক। এর উজান ও ভাটির পানি নাপাক নয়।

তৃতীয় বিষয়– নাপাকী দূর করার উপায়, যদি নাপাকী এমন হয় যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেখা যায় না, তা যেখানে পড়ে, সেখানে পানি ঢেলে দেয়া যথেষ্ট। নাপাকী শরীরবিশিষ্ট হলে তা দূর করা জরুরী। যতক্ষণ তার স্বাদ বাকী থাকবে, ততক্ষণ শরীর বাকী আছে বুঝতে হবে। রং বাকী থাকার অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু রং যদি চিমটে যায় এবং ঘষা দেয়ার পরও না উঠে, তবে মাফ। গন্ধ থাকা নাপাকী বাকী থাকার দলীল। এটা মাফ নয়। মনের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্যে মনে করতে হবে যে, সকল বস্তু পবিত্র সৃজিত হয়েছে। অতএব যে কাপড়ের উপর নাপাকী দেখা যায় না এবং নাপাক বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, তা নিয়ে নামায পড়ে নেবে। এখানে নাপাকীর পরিমাণ খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার– হদস থেকে পাক হওয়ার মধ্যে ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে এস্তেঞ্জা।

পায়খানা করার রীতি-নীতিতে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত সেগুলো এই ঃ মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে জঙ্গলে যেতে হবে। সম্ভব হলে কোন কিছুর আড়ালে বসতে হবে। বসার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত গুপ্তস্থান খুলবে না। সূর্য, চন্দ্র ও কেবলার দিকে মুখ করে এবং পিঠ ফিরে বসবে না। মানুষ যেখানে বসে কথাবার্তা বলে, সেখানে পায়খানা পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে। স্থির পানি, ফলন্ত বৃক্ষের নীচে এবং গর্তে প্রস্রাব করবে না। যেদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে ফিরে প্রস্রাব করবে না। বসার মধ্যে বাম পায়ের উপর জোর দেবে। বাড়ীতে নির্মিত পায়খানায় গেলে ভেতরে যাওয়ার সময় বাম পা প্রথমে রাখবে এবং বাইরে আসার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন– একথা তোমাকে কেউ বললে তাকে সত্যবাদী মনে করবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন ঃ হে ওমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। ওজরবশতঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি আছে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। আমি তাঁর জন্যে ওযুর পানি আনলে তিনি ওযু করলেন ও মোজার উপর মসেহ করলেন। গোসলের জায়গায় প্রস্রাব করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের অধিকাংশ কুমন্ত্রণা এ থেকেই হয়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ প্রবাহিত পানি হলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাতে প্রসাব করতে দোষ নেই। পায়খানায় এমন কোন বস্তু সাথে নিয়ে যাবে না যাতে আল্লাহ অথবা তাঁর রসূলের নাম লেখা থাকে। উলঙ্গ মাথায় পায়খানায় যাবে না। পায়খানায় যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হীন নাপাকী তথা বিতাড়িত শয়তান থেকে।

বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَبْقٰى عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ ـ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং উপকারী বস্তু আমার মধ্যে রেখেছেন। এ দোয়া পায়খানার বাইরে এসে বলতে হবে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সবকিছু শিখিয়েছেন। এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবের রীতিনীতি পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এস্তেঞ্জায় হাড্ডি ও গোবর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রস্রাব-পায়খানায় কেবলার দিকে মুখ করতে বারণ করেছেন।

জনৈক বেদুঈন এক সাহাবীর সাথে ঝগড়া করে বলল, আমি জানি তুমি ভালরূপে পায়খানাও করতে পার না। সাহাবী জওয়াবে বললেন ঃ কেন জানব না? আমি তো এ ব্যাপারে পারদর্শী। আমি পথ থেকে দূরে চলে যাই, ঢেলা ব্যবহার করি, ঝোঁপের দিকে মুখ করি, বাতাসের দিকে পিঠ করি, পায়ের গোড়ালির উপর জোর দেই এবং নিতম্ব উপরে রাখি।

অন্য কোন লোকের কাছে তাকে আড়াল করে প্রস্রাব করাও জায়েয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। তা সত্ত্বেও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে এরূপ করেছেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এস্তেঞ্জার নিয়ম হচ্ছে, পায়খানা শেষ হলে পর তিনটি ঢেলা দিয়ে নাপাকী পরিষ্কার করবে। সাফ হয়ে গেলে ভাল, নতুবা চতুর্থ ঢেলা ব্যবহার করবে। অনুরূপভাবে প্রয়োজন হলে পঞ্চম ঢেলা নিতে হবে। কেননা, পাক-সাফ করা ওয়াজেব। তবে বিজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ঢেলা ব্যবহার করে, সে যেন বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে। প্রথম ঢেলা বাম হাতে নিয়ে পায়খানার রাস্তার সামনের দিকে রাখবে এবং ঘষে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ঢেলা নিয়ে পেছনের দিকে রাখবে এবং ঘষে সামনের দিকে আনবে। তৃতীয় ঢেলাটি নিয়ে পায়খানার রাস্তার চারপাশে ঘুরাবে। এরপর একটি বড় ঢেলা ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পুরুষাঙ্গ ধরে মুছে দেবে এবং তিন বার তিন জায়গায় মুছবে। চার ঢেলায় সাফ হয়ে গেলে বিজোড় করার জন্যে পঞ্চম ঢেলা ব্যবহার করবে। এরপর সেই স্থান থেকে সরে অন্যত্র বসে পানি ব্যবহার করবে। ডান হাতে পানি নিয়ে নাপাকীর স্থানে ঢালবে এবং বাম হাতে মুছে দেবে। এস্তেঞ্জা শেষে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِىْ مِنَ الْفَوَاحِشِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে নেফাক থেকে পবিত্র করুন এবং আমার লজ্জাস্থানকে অশ্লীলতা থেকে হেফাযতে রাখুন।

এরপর গন্ধ থেকে গেলে হাত প্রাচীরে অথবা মাটিতে ঘষে ধুয়ে নেবে। এস্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ "ঐ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা অধিকতর পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।"

বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোবা মসজিদের মুসল্লীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এমন কি পবিত্রতা অর্জন কর, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন? তারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরজ করল ঃ আমরা এস্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করি।

এস্তেঞ্জা সমাপ্ত হলে পর ওযু করবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ কখনও দেখা যায়নি যে, তিনি প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ওযু করেননি। মেসওয়াক দ্বারা ওযু শুরু করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মুখ কোরআনের পথ। একে মেসওয়াক দ্বারা পরিচ্ছন্ন করে নাও। মেসওয়াক করার সময় নিয়ত করবে, নামায, কোরআন তেলাওয়াত ও যিক্রুল্লাহর জন্যে মুখকে পবিত্র করছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেসওয়াকের পরের নামায মেসওয়াক ছাড়া পচাত্তর রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ

لو لا اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة.

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের জন্যে কঠিন হবে, এরূপ আশংকা না থাকলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রে কয়েক বার মেসওয়াক করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সব সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন। এমনকি, আমাদের ধারণা হল যে, এ সম্পর্কে বোধ হয় তাঁর প্রতি সত্বরই কোন আয়াত নাযিল হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মেসওয়াক জরুরী করে নাও। এটা মুখ পরিষ্কার করে এবং এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মেসওয়াক স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শ্লেষ্মা দূর করে। দাঁতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে মেসওয়াক করবে। একদিকে করলে তা প্রস্থে করবে। প্রত্যেক নামায ও ওযুর সময় মেসওয়াক করবে, যদিও ওযুর পরে নামায পড়া না হয়। নিদ্রা অথবা অনেকক্ষণ ঠোঁট বন্ধ রাখা অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে মেসওয়াক করবে।

মেসওয়াক শেষ হলে পর ওযুর জন্যে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে বিসমিল্লাহ বলে না, তার ওযু হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু হয় না। অতঃপর বলবে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই এবং হে পরওয়ারদেগার! আমার কাছে শয়তানদের আগমন থেকে আপনার আশ্রয় চাই।"

এর পর পানির পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বে কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَيْبَةِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বরকত চাই এবং অমঙ্গল ও ধ্বংস থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এর পর হদস দূর করার এবং এই ওযু দ্বারা নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে। মুখ ধোয়া পর্যন্ত এই নিয়ত বাকী রাখবে। মুখ ধোয়ার সময় পর্যন্ত ওযুর কথা ভুলে গেলে ওযু পূর্ণ হয় না। এর পর মুখের জন্যে অঞ্জলিতে পানি নেবে এবং তিন বার কুলি ও গরগরা করবে। রোযাদার হলে গরগরা করবে না। এরপর এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আপনার কিতাব তেলাওয়াত এবং আপনার অধিক যিকির করার কাজে আমাকে সাহায্য করুন।"

এরপর নাকের জন্যে অঞ্জলি ভরবে এবং তিন বার নাকে পানি দিয়ে শ্বাস টেনে নাকের ছিদ্রের ভেতর নিয়ে যাবে। এরপর পানি বের করে দেবে। নাকে পানি দেয়ার সময় এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ শুঁকতে দিন এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাক ঝাড়ার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْءِ الدَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোযখের দুর্গন্ধ থেকে আশ্রয় চাই এবং মন্দ গৃহ থেকে।

এরপর মুখমণ্ডলের জন্যে পানি নেবে এবং কপালে চুল উঠার জায়গা থেকে চিবুক পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত প্রস্থে তিন বার ধৌত করবে। কপালের যে দুই প্রান্ত চুল উঠে ভেতরে চলে যায়, তা মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাখিল নয়; বরং তা মাথার অন্তর্ভুক্ত। কানের উভয় লতির উপরও পানি পৌঁছানো উচিত। ভ্রূ, গোঁফ, গুচ্ছ ও পলক এই চার প্রকার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো উচিত। কেননা, এগুলো অধিকাংশ লোকের অল্পই হয়। দাড়ি পাতলা হলে গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। পাতলা হওয়ার আলামত হচ্ছে ত্বক দৃষ্টিগোচর হওয়া। পক্ষান্তরে ঘন দাড়ি হলে গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী নয়। চক্ষু অঙ্গুলি দ্বারা সাফ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। চক্ষু সাফ করার সময় নিয়ত করবে যেন, এতে চক্ষুর গোনাহ দূর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সকল অঙ্গ ধোয়ার সময় প্রত্যাশা করবে। মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ

اَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِىْ بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ

اَعْدَائِكَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় করুন, যেদিন আপনার ওলীদের মুখ জ্যোতির্ময় হবে এবং অন্ধকার দ্বারা আমার মুখ কালো করবেন না যেদিন আপনার শত্রুদের মুখ কাল হবে।

মুখ ধৌত করার সময় ঘন দাড়িতে খেলাল করা মোস্তাহাব। এরপর দুই কনুই পর্যন্ত উভয় হাত তিন বার ধৌত করবে। আংটি থাকলে তা নাড়াচাড়া করবে। পানি কনুইর উপর পর্যন্ত পৌঁছাবে। কেননা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেয়ামতের দিন ওযুকারীদের হাত, পা, মুখমণ্ডল ওযুর চিহ্নস্বরূপ উজ্জ্বল হবে। অতএব যত দূরে পানি পৌঁছবে, ততদূর পর্যন্তই উজ্জ্বল হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : من استطاع ان يطيل غرته فليفعل যে তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে :

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء .

অর্থাৎ, "ঈমানদারের অলংকার সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত ওযু পৌঁছবে।" প্রথমে ডান হাত ধৌত করবে এবং বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিন এবং আমার হিসাব সহজ করুন। বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُعْطِيْنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার বাম হাতে অথবা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই।

অতঃপর সমস্ত মাথা মাসেহ্ করবে। উভয় হাত ভিজিয়ে উভয় হাতের অঙ্গুলির মাথা মিলিয়ে নেবে, এরপর কপালের কাছে মাথায় রেখে ঘাড়ের দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আবার সামনের দিকে টেনে আনবে। এটা হল এক মাসেহ। অনুরূপভাবে তিন বার মাসেহ্ করবে। অতঃপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আবৃত করে নিন, আমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং আমাকে আপনার আরশের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছায়াতলে স্থান দিন। যেদিন আপনার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।"

এর পর উভয় কান ভিতরে ও বাইরে মাসেহ্ করবে। শাহাদতের উভয় অঙ্গুলি কানের ছিদ্রে ঢুকিয়ে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের বাইরের দিকে ঘুরাবে। এ সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اَللّٰهُمَّ اسْمَعْنِىْ مُنَادِىَ الْجَنَّةِ مَعَ الْاَبْرَارِ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের একজন করুন যারা কথা শুনে. অতঃপর উত্তম কথার অনুসরণ করে। হে আল্লাহ, আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে জান্নাতের ঘোষকের আওয়াজ শুনান।

এর পর ঘাড় মাসেহ্ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঘাড়ের মাসেহ কেয়ামতের দিন বেড়ি থেকে রক্ষা করে। এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ۔

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার ঘাড়কে দোযখ থেকে মুক্ত করুন। আমি আপনার কাছে শিকল ও বেড়ি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এর পর ডান পা ধৌত করবে এবং বাম হাতে পায়ের অঙ্গুলির নীচের দিক থেকে খেলাল করবে। এ সময় এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ فِى النَّارِ۔

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আমার পা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যেদিন দোযখে মানুষের পদস্খলন ঘটবে।" বাম পা ধৌত করার সময় বলবে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ فِى النَّارِ -

অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই পুলসেরাতে আমার পদস্খলন থেকে, যেদিন জাহান্নামে মোনাফেকদের পদস্খলন ঘটবে।"

পা ধোয়া শেষ হলে আকাশের দিকে মুখ তুলবে এবং বলবে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوْءً وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ عَبْدًا شَكُوْرًا صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ اَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَاُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! সপ্রশংস পবিত্রতা। কোন মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া। আমি মন্দ কাজ করেছি এবং নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে তওবা করি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীল বান্দায় পরিণত করুন এবং এমন করুন, যেন আমি আপনার অনেক যিকির করি এবং সকাল-সন্ধ্যায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি।

কথিত আছে, যেব্যক্তি ওযুর পর এই দোয়া পড়ে, তার ওযুর উপর মোহর এঁটে আরশের নীচে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে এই ওযু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে। তার সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যক্তির জন্যে লেখা হয়।

ওযুর মধ্যে কয়েকটি বিষয় মাকরূহ– (১) তিন বারের বেশী ধৌত করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার ধৌত করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে বেশী বার ধৌত করে, সে জুলুম করে এবং মন্দ কাজ করে। তিনি আরও বলেন ঃ সত্বরই এ উম্মতের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হবে, যারা দোয়া ও ওযুর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে। কথিত আছে, ওযুর মধ্যে বেশী পানির লোভ মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার লক্ষণ। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ কুমন্ত্রণার সূচনা প্রথমে পবিত্রতা থেকেই হয়েছে। হযরত হাসান বলেন ঃ এক শয়তান ওযুর মধ্যে মানুষের প্রতি হাসে। এই শয়তানের নাম "ওয়ালহান।" (২) পানি দূর হয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ঝাড়া দেয়া। (৩) ওযুর মধ্যে কথা বলা। (৪) মুখে চপেটাঘাতের মত করে পানি নিক্ষেপ করা। (৫) কেউ কেউ ওযুর পানি শরীর থেকে মুছে শুকানোকেও মাকরূহ বলেছেন। কেননা, এ পানি আমলনামার পাল্লায় ওজন করা হবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং যুহরী একথা বলেন। কিন্তু হযরত মুয়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড়ের প্রান্ত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে ওযুর পানি মুছেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি পানি শুকানোর কাপড় থাকত। (৬) কাঁসার পাত্র থেকে ওযু করা। (৭) রৌদ্রে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওযু করা।

ওযু শেষে নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করবে, আমার বাহ্যিক অঙ্গ যা মানুষ দেখে, তা পাক হয়ে গেছে। এখন অন্তর পবিত্র না করে আল্লাহর সাথে কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয়। অন্তর আল্লাহ দেখেন। এর পর অন্তর পাক করা, কুচরিত্র থেকে পবিত্র হওয়া এবং সচ্চরিত্রে ভূষিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। যেব্যক্তি কেবল বাহ্যিক অঙ্গ পবিত্র করাকেই যথেষ্ট মনে করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে বাদশাহকে গৃহে দাওয়াত করার পর গৃহাভ্যন্তর আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত রেখে কেবল বাইরে চুনার লেপ দেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বাদশাহের বিরাগভাজনই হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওযুর ফযীলত

ওযুর ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকিট হাদীস উদ্ধৃত করা হল–

من توضا فاحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما بشئى من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ওযু করে এবং সুন্দরভাবে ওযু করে, অতঃপর দুনিয়ার কোন কথা অন্তরে চিন্তা না করে দু'রাকআত নামায পড়ে, সে তার গোনাহ থেকে এমন নিষ্কৃতি পায়, যেমন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল।

الا انبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء فى المكاره ونقل الاقدام الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة فذالكم الرباط .

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে কি এমন বিষয় বলব না, যদ্দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহ মার্জনা এবং মর্যাদা উঁচু করেন? তা হল, মনে চায় না এমন সময়ে পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে পা বাড়ানো এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। এটা যেন আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা।" শেষ বাক্যটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার বললেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযু করলেন এবং এক একবার অঙ্গসমূহ ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন ঃ এটি এমন ওযু, যা ছাড়া আল্লাহ তাআলা নামায কবুল করেন না। এর পর তিনি দু'দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন এবং বললেন ঃ যেব্যক্তি দু'দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দু'বার সওয়াব দেবেন। অতঃপর তিনি তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা আমার ওযু, আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ওযু এবং আল্লাহর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওযু। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযুর মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার সমস্ত দেহ পাক করে দেন। আর যে স্মরণ না করে, তার দেহ কেবল পানি পৌঁছা পরিমাণ পাক হবে।

من توضا على طهر كتب الله به عشر حسنات -

অর্থাৎ, "যেব্যক্তি ওযুর উপর ওযু করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে দশটি সওয়াব লেখেন।"

الوضوء على الوضوء نور على نور -

অর্থাৎ "ওযুর উপর ওযু যেন নূরের উপর নূর।"

এ রেওয়ায়েতদ্বয় থেকে নতুন ওযুর উৎসাহ পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা ওযু করে এবং কুলি করে তখন গোনাহ তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যখন নাক সাফ করে, তখন নাক থেকে গোনাহ বের হয়; যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডল থেকে গোনাহ দূর হয়; এমনকি চোখের পলকের নীচ থেকে গোনাহ বের হয়ে যায়। যখন হাত ধৌত করে, তখন হাত থেকে গোনাহ দূর হয়। এমনকি নখের নীচ থেকেও দূর হয়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন মাথা থেকে কান পর্যন্তের গোনাহ বের হয়ে যায়। এর পর যখন পা ধৌত করে, তখন উভয় পায়ের গোনাহ নখের নীচ থেকে পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। এর পর তার মসজিদে গমন ও নামায পড়া উভয়টি অতিরিক্ত থাকে। বর্ণিত আছে– ওযুওয়ালা ব্যক্তি রোযাদারের মত। যেব্যক্তি ওযু করে এবং ভালরূপে করে, এর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম ওযু তোমা থেকে শয়তানকে দূর করে দেবে। মুজাহিদ বলেন ঃ যে করতে পারে, সে এটা করুক– নিদ্রা যাওয়ার সময় ওযু অবস্থায় যিকির করে ও এস্তেগফার পাঠ করে নিদ্রা যাবে। কেননা, আত্মা সেই অবস্থায় উত্থিত হবে যে অবস্থায় তাকে কবজ করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোসল

গোসলের নিয়ম হল, পানির পাত্রটি ডান পাশে রাখবে। প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে হাত তিন বার ধৌত করবে। এর পর শরীরে নাপাকী থাকলে তা ধুয়ে নেবে। অতঃপর নামাযের মত ওযু করবে। কিন্তু তখন পা না ধুয়ে গোসলের শেষে পা ধৌত করবে। ওযু শেষ হলে তিন বার ডান কাঁধের উপর নীচ পর্যন্ত পানি ঢালবে। এর পর বাম কাঁধে তিন বার, মাথায় তিন বার পানি ঢালবে। অতঃপর শরীর সামনে ও পশ্চাদ্দিকে ঘষে দেবে। চুল ও দাড়ি খেলাল করবে। চুল ঘন হোক কিংবা পাতলা– গোড়ায় পানি পৌছাবে। মহিলাদের কেশের গোড়ায় পানি পৌছবে না বলে আশংকা হলে বিনুনি খুলতে হবে, নতুবা নয়। দেহের ভাঁজের ভেতরে পানি পৌছল কিনা দেখতে হবে। এভাবে ওযু করে গোসল করলে গোসলের পর পুনরায় ওযু করতে হবে না। আধ্যাত্ম পথের পথিকদের জন্যে ওযু গোসল সম্পর্কে এতটুকু জানা ও করা জরুরী। মাঝে মাঝে অন্য যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হয়, সেগুলো ফেকাহ্র কিতাবসমূহে দেখে নেয়া উচিত। গোসলের এসব বিষয়ের মধ্যে দু'টি বিষয় ওয়াজেব– নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি পৌছানো।

গোসল চার কারণে ওয়াজেব হয়– বীর্যপাতের কারণে, স্ত্রী সহবাসের কারণে, হায়েযের পরে এবং নেফাসের পরে। এছাড়া অন্য সকল গোসল সুন্নত। যেমন, ঈদের দিনে গোসল, এহরামের জন্যে, আরাফাত অথবা মুযদালেফায় অবস্থানের জন্যে, মক্কায় প্রবেশ করার জন্যে এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনের গোসল। এক উক্তি অনুযায়ী বিদায়ী তওয়াফের জন্যে গোসল করা, কাফের নাপাক না হলেও মুসলমান হওয়ার সময় গোসল করা, পাগলের জ্ঞান ফিরে আসার সময় গোসল করা এবং মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতা গোসল করা মোস্তাহাব।

তায়াম্মুম

পানি পাওয়া না গেলে অথবা হিংস্র জন্তু কিংবা শত্রুর ভয়ে পানি পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম না হলে অথবা শরীরে কোন ক্ষত থাকলে কিংবা রোগাক্রান্ত হলে এবং পানির ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, পাক ও নরম মাটির উপর উভয় হাতের অঙ্গুলি মিলিয়ে থাবা মারবে। এর পর উভয় হাত মুখমণ্ডলের উপর মালিশ করবে। তখন নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে। মুখমণ্ডলের সকল অংশে ধুলা পৌঁছাতে হবে। এরপর মাটির উপর দ্বিতীয় থাবা মারবে। অতঃপর ডান হাতের চার অঙ্গুলি পরস্পর মিলিয়ে বাম হাতের চার অঙ্গুলির উপর এভাবে রাখবে যে, বাম অঙ্গুলির ভিতরের দিক এবং ডান অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ পরস্পর সংযুক্ত হবে। এর পর বাম হাতের চার অঙ্গুলিকে ডান হাতের পিঠের দিক দিয়ে কনুই পর্যন্ত ঘষতে ঘষতে নিয়ে যাবে। এতে হাতের তালু সংযুক্ত হবে না। কনুই পর্যন্ত পৌঁছার পর বাম হাতের তালু ডান হাতের ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে কব্জি পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং বাম অঙ্গুলির ভেতরের দিক দিয়ে ডান বৃদ্ধাঙ্গুলির বাইরের দিকে মাসেহ্ করবে। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর অনুরূপ আমল করবে। দু'থাবা দ্বারা হাতের সমস্ত অংশে ধুলা পৌঁছানো সম্ভব না হলে অধিক থাবা দেয়ায় দোষ নেই।

তৃতীয় প্রকার শরীরের বাহ্যিক আবর্জনা ও ময়লা ঃ আবর্জনা দু'প্রকার– ময়লা ও অতিরিক্ত অংশবিশেষ।

মানুষের মধ্যকার ময়লা আটটি ঃ (১) মাথার কেশের ময়লা ও উকুন। এগুলো ধোয়া, চিরুনি করা ও তেল দেয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার করা মোস্তাহাব, যাতে কেশের এলোমেলো অবস্থা ও চেহারার আতংকভাব দূর হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে চুলে তেল দিতেন ও চিরুনি করতেন। তিনি মাঝে মাঝে তেল দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার চুল আছে, তার উচিত চুলের পরিচর্যা করা। অর্থাৎ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার দাড়ি ছিল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ চুল পরিপাটি করার জন্যে তোমার কাছে কি তেল ছিল না? এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানের রূপ ধরে আগমন করে।

(২) কানের প্যাঁচে জমা ময়লা। এর মধ্যে যা উপরে থাকে তা মাসেহ দ্বারা দূর হয়ে যায়।

(৩) নাকের ভিতর জমাট ও শুকিয়ে যাওয়া তরল পদার্থ। নাকে পানি দিয়ে হাঁচি দিলে এগুলো দূর হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৪) দাঁত ও জিহ্বার কিনারার ময়লা। এটা কুলি ও মেসওয়াক করলে দূর হয়।

(৫) দাড়ি পরিপাটি না করলে তাতে ময়লা ও উকুন জমা হয়ে যায়। এগুলো ধৌত ও চিরুনি করে দূর করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা সফরে ও গৃহে চিরুনি, দাঁতের মাজন ও আয়না সঙ্গে রাখতেন। এটা আরবদের সাধারণ রীতি। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিনে দু'বার দাড়িতে চিরুনি করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাড়ি ঘন ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাড়িও তেমনি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দাড়ি দীর্ঘ ও পাতলা ছিল এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর দাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল এবং উভয় কাঁধ আবৃত করে রাখত। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরজায় এসে সমবেত হলে তিনি তাদের কাছে যেতে মনস্থ করলেন। আমি দেখলাম, তিনি পানির মটকায় উঁকি মেরে চুল ও দাড়ি পরিপাটি করে নিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ কাজ করলেন কেন? তিনি বললেন ঃ "হাঁ, আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, বান্দা যখন তার ভাইদের কাছে যাবে তখন সেজেগুজে যাবে।" মূর্খরা কখনও ধারণা করে, এটা লোক দেখানো সাজসজ্জার প্রতি মহব্বত, যা প্রশংসনীয় নয়। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্রকে অন্যের চরিত্রের মত মনে করে। অথচ এরূপ নয়। কেননা, তিনি দাওয়াতের কাজে আদিষ্ট ছিলেন। কাজেই মানুষের অন্তরে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল, যাতে তারা তাঁকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে না করে। তিনি যদি সেজেগুজে ও পরিপাটি হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত না হতেন, তবে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যেতেন এবং মানুষ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত; মোনাফেকরা কুধারণা করার সুযোগ পেত। মানুষকে দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক আলেমের উচিত ওয়াজ করার সময় নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এমন কোন অবস্থা প্রকাশ না করা, যাতে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। মোট কথা, এ বিষয়টি নিয়তের উপর ভিত্তিশীল। উল্লিখিত বিষয়ের নিয়তে সাজসজ্জা করা ভাল। আর যদি এই উদ্দেশে চুল এলামেলো রাখে যে, মানুষ তাকে দরবেশ মনে করবে, তবে এটা নিষিদ্ধ। যদি চুল পরিপাটি করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনে মশগুল হওয়ার কারণে চুল পরিপাটি না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে, তবে তা মন্দ নয়। এগুলো বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মধ্যবর্তী বাতেনী অবস্থা। কেয়ামতে যখন বাতেনের পরীক্ষা নেয়া হবে, তখন নিয়তের সত্য মিথ্যা ফুটে উঠবে। আমরা সেদিনের লজ্জা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(৬) অঙ্গুলির উপর ভাঁজের মধ্যে যে ময়লা জমা হয়, আরবরা তা খুব ধৌত করত। কেননা, তারা আহারের পর হাত ধৌত করত না। ফলে এসব ভাঁজের মধ্যে ময়লা থেকে যেত। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব স্থান ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন।

(৭) অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখের ময়লা দূর করার আদেশ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন। কারণ, সব সময় নখ কাটা সম্ভবপর নয় বিধায় নখের নীচে ময়লা জমে যায়। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটা, বগল ও নাভির নীচের লোম দূর করার জন্যে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার ওহী অবতরণে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। এর পর জিব্রাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন ঃ আপনি অঙ্গুলির মধ্যবর্তী ভাঁজ ধৌত করেন না, নখের ময়লা পরিষ্কার করেন না এবং দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্যে মেসওয়াক করেন না, এমতাবস্থায় আমি আপনার কাছে কিরূপে আসতে পারি? আপনি উম্মতকে এসব কাজ করতে বলে দিন! কতক আলেম فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ (পিতামাতাকে উফ্ বলো না) আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ 'উফ্' নখের ময়লাকে এবং তুফ কানের ময়লাকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ, পিতামাতাকে নখের ময়লার সমান গণ্য করো না। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দিও না যতটুকু কষ্ট নখের নীচে ময়লা জমে গেলে হয়।

(৮) সমস্ত শরীরে ঘর্ম ও পথের ধুলাবালি থেকে যে ময়লা জমে, এটা গরম পানি দ্বারা গোসল করে দূর করা যায়। হাম্মামে গোসল করায়ও কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণও সিরিয়ার হাম্মামসমূহে গোসল করেছেন। হযরত আবু দারদা ও আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ হাম্মাম ভাল জায়গা, শরীর পবিত্র করে এবং জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার কারও মতে হাম্মাম মন্দ জায়গা, উলঙ্গতা প্রকাশ করে এবং লজ্জা-শরম দূর করে। সত্য কথা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাম্মামের অশুভ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এর উপকারিতা লাভ করার মধ্যে কোন দোষ নেই।

মানুষের শরীরের অতিরিক্ত অংশ আটটি । এগুলো দূর করা উচিত।

(১) মাথার চুল। যেব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা কামনা করে, তার উচিত মাথার চুল মুণ্ডন করা। আর যেব্যক্তি তেল দেয় ও চিরুনি করে, সে তা রেখে দিতে পারে। কিন্তু মাথার কোথাও চুল রাখা এবং কোথাও না রাখা, যেমন টিকি রাখা– এটা জায়েয নয়। এটা দুশ্চরিত্রদের রীতি।

(২) গোঁফের চুল। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

قصوا الشوارب واعفوا اللحى .

গোঁফ কাট এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

جزوا الشوارب حفوا الشوارب .

এর অর্থ, গোঁফ ঠোঁটের উপর পর্যন্ত কেটে নাও। গোঁফ মুণ্ডন করার কথা কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। তবে মুণ্ডনের কাছাকাছি করে কাটা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত আছে। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গোঁফ লম্বা দেখে বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি আমার ঠোঁটের উপর মেসওয়াক রেখে গোঁফ কেটে দিলেন। গোঁফের দুই প্রান্তের চুল রেখে দেয়ায় দোষ নেই। হযরত ওমর প্রমুখ সাহাবী এরূপ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এর চুল মুখ ঢেকে রাখে না এবং পানীয় বস্তুও তাকে স্পর্শ করে না।

দাড়ি ছেড়ে দেয়ার মানে লম্বা হতে দেয়া। হাদীসে বলা হয়েছে– ইহুদীরা গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি কাটে। তোমরা তাদের বিপরীত কর। কোন কোন আলেম দাড়ি মুণ্ডন মাকরূহ ও বেদআত বলেছেন।

(৩) বগলের চুল। এটা চল্লিশ দিনে একবার উপড়ে ফেলা মোস্তাহাব। যেব্যক্তি শুরুতে উপড়ানোর অভ্যাস করে, তার জন্যে এটা সহজ। কিন্তু মুণ্ডন করার অভ্যাস হলে মুণ্ডনও যথেষ্ট। উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা এবং ময়লা জমতে না দেয়া।

(৪) নাভির নীচের চুল। এগুলো লোমনাশক ব্যবহার করে অথবা উপড়ে দূর করা মোস্তাহাব। এ কাজে চল্লিশ দিনের বেশী অতিবাহিত হতে না দেয়া উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৫) নখ কাটা। নখ বেড়ে গেলে দেখতে খারাপ দেখায় এবং তার নীচে ময়লা জমে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আবু হোরায়রা, নখ কেটে ফেল। যে নখ বেড়ে যায় তাতে শয়তান বসে। নখের নীচে যে যৎসামান্য ময়লা থাকে। তা ওযুর বিশুদ্ধতায় প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা, এ ময়লা পানি পৌঁছার পথে বাধা হয় না। অথবা প্রয়োজনের কারণে এ বিষয়টি সহজ করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটার আদেশ দিতেন এবং ময়লাকে খারাপ বলতেন, কিন্তু কখনও নামায পুনর্বার পড়ার আদেশ দিতেন না। নখ কাটার ক্রম সম্পর্কে কোন হাদীস পাইনি। কিন্তু শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি থেকে শুরু করতেন, এর পর তার ডান দিকের তিন অঙ্গুলির নখ কেটে বাঁ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত পৌঁছতেন। এর পর সকলের শেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটতেন। এ সম্পর্কে চিন্তা করার পর আমার কাছে এ রেওয়ায়েতটি সহীহ মনে হল। কেননা, এমন যুক্তিপূর্ণ বিষয় নবুওতের নূর ছাড়া জানা যায় না।

(৭) নাভি কাটা ও খতনা (লিঙ্গাগ্রের চর্মচ্ছেদন) করা। জন্মের সময় নাভি কাটা হয়। খতনা সম্পর্কে ইহুদীদের অভ্যাস হচ্ছে জন্মের সপ্তম দিনে করা। এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করা এবং সামনের দাঁত গজানো পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। এটা বিপদাশংকা থেকেও মুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ খতনা করা পুরুষের জন্যে সুন্নত এবং নারীদের জন্যে ইজ্জত।

(৮) দাড়ি লম্বা হয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কিত সুন্নত ও বেদআতসমূহ উল্লেখ করার জন্যে আমরা এটা সব শেষে বর্ণনা করছি। দাড়ি লম্বা হয়ে গেলে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এক মুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকীটা কেটে ফেলায় কোন দোষ নেই। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও অনেক তাবেয়ী এরূপ করেছেন। শা'বী ও ইবনে সিরীন (রহঃ) এটা উত্তম মনে করেছেন। কিন্তু হাসান ও কাতাদা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা বলেন, দাড়ি লম্বা থাকতে দেয়া মোস্তাহাব। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়ি লম্বা করতে বলেছেন। নখয়ী বলেন ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখলে তা ছাঁটে না কেন? এটা আমার কাছে বিস্ময়কর। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মধ্যবর্তী স্তর ভাল। এজন্যই বলা হয়, দাড়ি লম্বা হলে বুদ্ধি লোপ পায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দাড়ির মধ্যে দশটি বিষয় মাকরূহ। তন্মধ্যে কয়েকটি অন্যগুলো অপেক্ষা অধিক মাকরূহ।

প্রথম, কাল রং দ্বারা দাড়ি খেজাব করা। এটা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের যুবকদের মধ্যে তারা উত্তম যারা বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করে এবং তোমাদের বৃদ্ধদের মধ্যে তারা অধম, যারা যুবকদের বেশ ধারণ করে। বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, গাম্ভীর্য ও ভদ্রতায় বৃদ্ধের মত হবে- তাদের মত চুল সাদা করা নয়। আর যুবকদের বেশ ধারণ করার উদ্দেশ্য কাল রংয়ের খেজাব করা। হাদীসে একে দোযখীদের খেজাব বলা হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে কাফেরদের খেজাব বলা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি বিয়ে করল। সে কাল খেজাব করত। চুলের গোড়া সাদা হয়ে গেলে তার বার্ধক্য বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীর আত্মীয়রা এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর কাছে এ মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন এবং স্বামীকে খুব প্রহার করে বললেন ঃ তুই বার্ধক্য গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেছিস। কথিত আছে, অভিশপ্ত ফেরআউন সর্বপ্রথম কাল খেজাব করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক কবুতরের পুচ্ছের মত কাল খেজাব করবে। তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

দ্বিতীয়, হলুদ ও লাল রং দ্বারা খেজাব করা। এটা যুদ্ধে কাফেরদের কাছে বার্ধক্য গোপন করার উদ্দেশে জায়েয। আর যদি দ্বীনদারদের বেশ ধারণ করার নিয়তে হয়, অথচ দ্বীনদার না হয় তবে নাজায়েয। এ খেজাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হলদে রং মুসলমানদের খেজাব এবং লাল রং ঈমানদারদের খেজাব। আগেকার লোকেরা মেহদী দ্বারা লাল রংয়ের খেজাব করত এবং খলুক ও কতম দ্বারা হলুদ রংয়ের খেজাব করত। কোন কোন আলেম জেহাদের জন্যে কাল খেজাবও করেছেন। নিয়ত ঠিক হলে এবং খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হলে কাল খেজাবেও কোন দোষ নেই।

তৃতীয়, গন্ধক দ্বারা চুল সাদা করা, যাতে বয়স বেশী মনে হয় এবং মানুষ সম্মান করে। বয়স বেশী হওয়া মাহাত্ম্যের পরিচায়ক বলে গণ্য হয়। অথচ আসলে এরূপ নয়। মূর্খের বয়োবৃদ্ধিতে মূর্খতাই বৃদ্ধি পায়। এলেম বৃদ্ধির ফল, যা জন্মগত, এতে বার্ধক্য কোন প্রভাব বিস্তার করে না। হযরত ওমর (রাঃ) কম বয়সী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বড় বড়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাহাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখতেন, যা অন্যদের কাছে রাখতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যৌবনেই এলেম দান করেন এবং যৌবনের মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। অতঃপর তিনি এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন–

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ ـ

অর্থাৎ, "কাফেররা বলল ঃ আমরা এক যুবককে এই উপাস্যদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তার নাম ইব্রাহীম।"

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ـ

অর্থাৎ, তারা কতিপয় যুবক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছি।

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ـ

অর্থাৎ, "আমি তাকে শৈশবে শাসনক্ষমতা দিয়েছি।"

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ওফাত পান, তখন তাঁর দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না। লোকেরা বয়স বেশী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বার্ধক্যের দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ বার্ধক্য কি সত্যিই একটি দোষ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো দোষই মনে কর। কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকসাম একুশ বছর বয়সে কাযী তথা বিচারক নিযুক্ত হয়ে যান। এত কম বয়সের কারণে এক ব্যক্তি আদালত কক্ষেই তাঁকে কটাক্ষ করে বলল ঃ আল্লাহ কাযী সাহেবকে সাহায্য করুন, বয়স কত? ইয়াহইয়া বললেন ঃ আমি এতাব ইবনে ওসায়দের সমবয়সী, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে মক্কা মোয়াযযমার প্রশাসক ও কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। লোকটি এ জওয়াব শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল। ইমাম মালেক বলেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে পাঠ করেছি– দাড়ি যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। কেননা, দাড়ি পাঁঠারও থাকে। আবু আমর ইবনে আ'লা বলেন ঃ যখন তুমি কাউকে দীর্ঘদেহী, ক্ষুদ্র মাথা ও প্রশস্ত দাড়িবিশিষ্ট দেখ, তখন বুঝে নেবে সে বেওকুফ, যদিও সে উমাইয়া ইবনে আবদে শামসই হয়। আইউব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সুখতিয়ানী বলেন ঃ আমি এক বৃদ্ধকে জনৈক বালকের সামনে এলেম শিক্ষা করার জন্যে যেতে দেখেছি। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে তোমার পূর্বে এলেম আসে, সে সেই এলেমে তোমার ইমাম, যদিও সে বয়সে তোমার বেশ ছোট হয়। আবু আমর ইবনে আ'লাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ বৃদ্ধ কি এটা ভাল মনে করে যে, সে বালকের কাছে এলেম শিখবে? তিনি বললেন ঃ যদি সে মূর্খতাকে খারাপ মনে করে, তবে বালকের কাছে এলেম শিক্ষা করা ভাল মনে করবে।

চতুর্থ, বার্ধক্যকে খারাপ মনে করে দাড়ির সাদা চুল উপড়ে ফেলা। হাদীসে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শুভ্রতা মুমিনের নূর।

পঞ্চম, সমস্ত দাড়ি অথবা কিছু পরিমাণ উপড়ে ফেলা। এটা আকৃতির বিকৃতি সাধনের নামান্তর বিধায় মাকরূহ। এরূপ এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আদালতে এলে তিনি তার সাক্ষ্য কবুল করেননি। বালক হয়ে থাকার উদ্দেশে শুরুতে দাড়ি উপড়ে ফেলা খুবই খারাপ কথা। কেননা, দাড়ি পুরুষের অলংকার। ফেরেশতারা এভাবে কসম খায়- সেই সত্তার কসম, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা সজ্জিত করেছেন। দাড়ি সৃষ্টির পূর্ণতা, যদ্দ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। আহনাফ ইবনে কায়েসের দাড়ি ছিল না। তাঁর শিষ্যরা বলত ঃ যদি বিশ হাজার দেরহামেও দাড়ি বিক্রয় হত, তবে আমরা অবশ্যই তাঁর জন্যে ক্রয় করতাম। দাড়ি মন্দ কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই তো মানুষ সম্মান পায়, সম্ভ্রম লাভ করে এবং মজলিসে উচ্চ আসনে স্থান পায়। মানুষ দাড়িওয়ালাকে নামাযের জামাআতে ইমাম বানায়।

ষষ্ঠ, মহিলাদের দৃষ্টিতে সুন্দর দেখানোর জন্যে দাড়ি গোল করে কাটা। কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক তাদের দাড়ি কবুতরের পুচ্ছের মত গোল করে কাটবে এবং জুতা থেকে কাস্তের মত আওয়াজ বের করবে। ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

সপ্তম, দাড়ির অংশ কিছু বাড়িয়ে নেয়া; অর্থাৎ, উভয় গণ্ডের উপর কান পাট্টির যে চুল থাকে এবং যা বাস্তবে মাথার চুল, তা লম্বা করে দাড়ির সাথে মিলিয়ে নেয়া এবং অর্ধেক গণ্ডদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এটা সজ্জনদের আকৃতি ও স্বভাবের খেলাফ বিধায় মাকরূহ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অষ্টম, লোক দেখানোর জন্যে দাড়িতে চিরুনি করা। বিশর বলেন ঃ দাড়িতে দু'টি জঞ্জাল আছে– লোক দেখানোর খাতিরে চিরুনি করা এবং দরবেশী ফুটানোর জন্যে এলোমেলো রাখা।

নবম ও দশম, কাল অথবা সাদা দাড়িকে আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে দেখা। এ অনিষ্ট দেহের সকল অঙ্গেই হতে পারে; বরং প্রত্যেক কর্ম ও চরিত্রে আত্মম্ভরিতা নিন্দনীয়।

তিনটি হাদীস দ্বারা জানা গেছে, শরীরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুন্নত ঃ মাথার চুলে সিঁথি করা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, গোঁফ কাটা, মেসওয়াক করা, নখ কাটা, অঙ্গুলির উপর ও নীচের ভাঁজগুলো পরিষ্কার করা, বগলের চুল উপড়ানো, নাভির নীচের চুল মুণ্ডানো, খতনা করা এবং পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো খুব স্মরণ রাখা উচিত।

অন্তরের যে সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা ওয়াজেব, সেগুলো গণনাতীত। ইনশাআল্লাহ চতুর্থ খণ্ডে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নামাযের রহস্য

জানা উচিত, নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ, বিশ্বাসের দলীল, পুণ্য কাজের মূল এবং সর্বোত্তম এবাদত। এখানে আমরা নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম ও আভ্যন্তরীণ রহস্য তথা খুশু-খুযু, এখলাস ও নিয়তের অর্থ লিপিবদ্ধ করছি, যা আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের জন্যে জরুরী এবং যা ফেকাহ্ শাস্ত্রে সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আযানের ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মেশকের টিলায় অবস্থান করবে। তাদের হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকবে না এবং কোনরূপ আতংক তাদেরকে স্পর্শ করবে না। হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হওয়া পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন তেলাওয়াত করে, নামাযে ইমামতি করে এমতাবস্থায় যে, মুসল্লীরা মসজিদে আযান দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। তৃতীয় সে ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে দাসত্বে লিপ্ত; কিন্তু এই দাসত্ব তার আখেরাতের কাজকর্মে প্রতিবন্ধক হয় না। এক হাদীসে আছে-

لايسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة .

অর্থাৎ, মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর যেকোন জ্বিন, মানব ও বস্তু শোনে, তারা কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

আরও বলা হয়েছে ঃ মুয়াযযিন যে পর্যন্ত আযান দিতে থাকে, আল্লাহ তাআলার হাত তার উপর থাকে।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا .

অর্থাৎ, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?

এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটি মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن .

অর্থাৎ, "তোমরা যখন আযান শোন, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল।"

মুয়াযযিন যা বলে তা বলা মোস্তাহাব। কিন্তু যখন সে حى على الصلوة ও حى على الفلاح (তোমরা নামাযের দিকে এস, তোমরা কল্যাণের দিকে এস) বলে, তখন শ্রোতা বলবে- لاحول ولا قوة الا بالله আর যখন সে قد قامت الصلوة (নামায শুরু হয়েছে) বলে, তখন বলবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(আল্লাহ একে কায়েম ও স্থায়ী রাখুন যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী স্থায়ী থাকে)। ফজরের আযানে যখন মুয়াযযিন বলে ঃ الصلوة خير من النوم (নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম), তখন শ্রোতা বলবে ঃ قد صدقت وبررت (তুমি সত্য বলেছ ও ভাল কাজ করেছ)। আযান শেষে এই দোয়া বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, আপনি মুহাম্মদকে ওসিলা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে বেহেশতের প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জঙ্গলে নামায পড়ে, তার ডান দিকে একজন ফেরেশতা এবং বাম দিকে একজন ফেরেশতা নামায পড়ে। যদি সে আযান ও তকবীর বলে, তবে তার পেছনে পাহাড়ের মত ফেরেশতা নামায পড়ে।

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায মুমিনদের প্রতি নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

خمس صلوة كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة -

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। যেব্যক্তি এগুলো পালন করে এবং এগুলোর হককে হালকা মনে করে কিছু নষ্ট না করে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আর যে এগুলো আদায় করে না, তার জন্যে কোন অঙ্গীকার নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে দাখিল করবেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায সুমিষ্ট পানির নদীর মত, যা তোমাদের গৃহের দরজায় অবস্থিত। যে প্রত্যহ তাতে পাঁচ বার গোসল করে, তোমরা কি মনে কর যে, পাঁচ বার গোসলের পরও তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সকলেই আরজ করল ঃ কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায গোনাহসমূহ এমনিভাবে দূর করে দেয়, যেমন পানি ময়লা দূর করে দেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে−

ان الصلوة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر -

অর্থাৎ, "কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে পাঞ্জেগানা নামায মধ্যবর্তী সকল গোনাহ মাফ করিয়ে দেয়।"

আরও বলা হয়েছে ঃ আমাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, এশা ও ফজরের নামাযে হাযির হওয়া। এ দুটি নামাযে মোনাফেকরা আসতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নামায নষ্ট করে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্যান্য সৎকর্মের কোন মূল্য দেবেন না। আরও বলা হয়েছে ঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ। যে নামায বর্জন করে সে দ্বীনকে ভূমিসাৎ করে। কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সময়মত নামায পড়া। তিনি বললেন ঃ যেব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাযের হেফাযত করে, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু দ্বারা যথাসময়ে নামায আদায় করে, নামায তার জন্যে কেয়ামতে নূর ও প্রমাণ হবে। আর যে নামায নষ্ট করে, তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাশর ফেরআউন ও হামানের সাথে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ নামায জান্নাতের চাবি। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তওহীদের পর নামাযের চেয়ে প্রিয় কোন কিছু মানুষের উপর ফরয করেননি। আল্লাহ তাআলার কাছে নামাযের চেয়ে প্রিয় অন্য কিছু থাকলে ফেরেশতাদের জন্যে সেটিই এবাদতরূপে নির্দিষ্ট করতেন। অথচ তিনি তাদের কাছে থেকে নামাযের ক্রিয়াকর্মই গ্রহণ করেন। সেমতে কেউ রুকুকারী, কেউ সেজদাকারী, কেউ দণ্ডায়মান এবং কেউ উপবিষ্ট। তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই, সে কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। কারণ এতে তার তাওয়াক্কুল ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন, কেউ শহরের কাছে পৌঁছে গেলে বলা হয়, সে শহরে পৌঁছেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, মুহাম্মদ (সাঃ) তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, এর পর নামাযের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, সে নামাযের নিয়ত করা পর্যন্ত নামাযেই থাকে। তার এক পদক্ষেপে পুণ্য লেখা হয় এবং অপর পদক্ষেপে একটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতএব তকবীর শুনেই তোমাদের নামাযের জন্য দৌড়ানো উচিত নয়। কেননা, বড় সওয়াব সেই পাবে, যার গৃহ দূরে থাকে। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ঃ পদক্ষেপ বেশী হওয়ার কারণে সওয়াব বেশী হবে। বর্ণিত আছে, কেয়ামতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। এটা পূর্ণ পাওয়া গেলে অন্য সকল আমল গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এটি অসম্পূর্ণ হলে অন্য সকল আমল নামঞ্জুর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আবু হোরায়রা, তোমার গৃহের লোকজনকে নামায পড়ার আদেশ কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রুজি দেবেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ নামাযী সওদাগরের মত। পুঁজি না থাকলে সওদাগর মুনাফা পায় না। তেমনি নফল নামায কবুল হয় না, যে পর্যন্ত ফরয পূর্ণরূপে আদায় না করে। নামাযের সময় হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন ঃ দাঁড়াও, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ তা নির্বাপিত কর। অর্থাৎ, নামাযকে তোমার গোনাহের কাফফারা কর।

নামাযের রোকনসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ফরয নামায নিক্তির মত। যে পুরোপুরি মেপে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেবে. সে পুরোপুরি মেপে নেবে। ইয়াযীদ রাকাশী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায মাপে সমান ছিল। অর্থাৎ, সবগুলো রোকন তিনি একই মাপে আদায় করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি নামাযের জন্যে দাঁড়ায়। তাদের রুকু-সেজদা একই; কিন্তু নামাযে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়। এ হাদীসে তিনি খুশু অর্থাৎ, বিনয় ও একাগ্রতার প্রতি ইশারা করেছেন। আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সেই বান্দার প্রতি নজর দেবেন না, যে রুকু ও সেজদার মধ্যে পিঠ সোজা করে না। এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি নামাযে মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দেয়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তাআলা তার মুখকে গাধার মুখে পরিণত করে দেবেন? আরও বলা হয়েছে ঃ যেব্যক্তি নামায যথাসময়ে পড়ে, তার জন্যে উত্তমরূপে ওযু করে এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে, তার নামায উজ্জ্বল হয়ে উপরে আরোহণ করে বলে ঃ আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন যেমন তুমি আমার হেফাযত করেছ। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি নামায অসময়ে পড়ে, ওযু পূর্ণরূপে করে না এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে না, তার নামায কাল হয়ে উপরে গমন করে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা তোমার বিনাশ করুন, যেমন তুমি আমার বিনাশ করেছ। এর পর যখন এই নামায আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছে যায়, তখন তাকে কাপড়ের মত পুঁটলি তৈরী করে সেই ব্যক্তির মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ সে ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট চোর, যে নামাযে চুরি করে। হযরত ইবনে মসউদ ও সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন ঃ নামায একটি ওজনের নিক্তি। যে পূর্ণ দেবে সে পূর্ণ পাবে। আর যে কম দেবে সে তো জানেই, আল্লাহ তাআলা ওজনে কমদাতাদের সম্পর্কে কি বলেছেন।

জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

صلوة الجمع تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة .

জামাআতের নামায একা নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী মর্তবা রাখে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু লোককে কোন এক নামাযে উপস্থিত না পেয়ে বললেন ঃ আমি চাই যে, কাউকে নামায পড়ানোর আদেশ করি, এরপর নিজে সেই লোকদেরকে তালাশ করি, যারা নামাযে আসে না, এর পর তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, যারা নামাযে না এসে বসে থাকে, আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের কাছে যেতে চাই, এর পর লাকড়ি একত্রিত করে তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগের আদেশ দিতে চাই। তাদের কেউ যদি জানে, সে মাংসল হাড্ডি অথবা ছাগলের রান পাবে, তবে অবশ্যই এশার নামাযে আসবে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি এশার নামাযে হাযির হয়, সে যেন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নফল এবাদত করল। আর যে ফজরের নামাযে উপস্থিত হয় সে যেন পূর্ণ এক রাত্রি নফল এবাদত করল। এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ে, তার বক্ষ এবাদত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রঃ) বলেন ঃ বিশ বছর যাবত আমার অবস্থা এই যে, যখন মুয়াযযিন আযান দেয় তখন আমি সেজদার মধ্যেই থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বলেন ঃ আমি দুনিয়াতে কেবল তিনটি বস্তু কামনা করি ঃ এক– ভাই, আমি বক্র হলে সে আমাকে সোজা করবে। দুই– হালাল ও অন্যের হক থেকে মুক্ত খাদ্য এবং তিন– জামাআতের নামায। বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একবার কিছু লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ এ সময় শয়তান আমার পেছনে লেগেছিল। ফলে আমি মনে করলাম, আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আজ থেকে আমি আর কখনও ইমামত করব না। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আলেমদের কাছে আসা-যাওয়া করে না, তার পেছনে নামায পড়ো না। নখয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম ছাড়াই ইমামত করে, সে যেন সমুদ্রের পানি পরিমাপ করে, যা কম কিংবা বেশী এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হাতেম আসাম্ম বলেন ঃ আমি একবার জামাআতের নামায পাইনি। এজন্য কেবল আবু ইসহাক বোখারী এসে আমার কাছে শোক প্রকাশ করলেন। যদি আমার ছেলে মারা যেত, তবে দশ হাজার লোক এসে শোক প্রকাশ করত। আসলে ধর্মীয় বিপদ মানুষের কাছে দুনিয়ার বিপদের তুলনায় সহজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আযান শুনে নামাযে হাযির হয় না, সে কল্যাণ কামনা করে না এবং তার কাছ থেকেও কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ কেউ আযান শুনে নামাযে না আসলে সেই ব্যক্তির কানে গালা ঢেলে দেয়া উত্তম। বর্ণিত আছে, মায়মূন ইবনে মাহরান মসজিদে এলে কেউ বলল ঃ লোকেরা নামায পড়ে চলে গেছে। তিনি বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ জামাআতের ফযীলত আমার কাছে ইরাকের রাজত্ব লাভের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

من صلى اربعين يوما الصلوات في جماعة لاتفوته فيها تكبيرة الاحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি চল্লিশ দিন সবগুলো নামায জামাআতের সাথে এমনভাবে পড়ে, তাতে তকবীরে তাহরীমা ফওত হয় না, তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা দু'টি মুক্তি লেখে দেন– একটি কপটতা থেকে মুক্তি ও অপরটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

কথিত আছে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক উত্থিত হবে, যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল তারকার ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমরা দুনিয়াতে কি কি আমল করতে ? তারা বলবে ঃ আমরা যখন আযান শুনতাম তখন ওযুর জন্যে তৎপর হতাম। এতে অন্য কোন কাজ আমাদের প্রতিবন্ধক হত না। এর পর অন্য একটি দল উত্থিত হবে, যাদের মুখমন্ডল চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হবে। ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে তারা বলবে ঃ আমরা সময়ের পূর্বে ওযু করতাম । এর পর কিছু লোক উত্থিত হবে, যাদের চেহারা সূর্যের মত দীপ্তিমান হবে। তারা বলবে ঃ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম । বর্ণিত আছে, আগেকার বুযুর্গগণের প্রথম তকবীর ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত এবং জামাআত ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ধিক্কার দিতেন। সেজদার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ما تقرب العبد الى الله بشئ افضل من سجود خفى ـ

অর্থাৎ, বান্দা নীরব সেজদার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার উত্তম নৈকট্য অন্য কোন কিছুতে অর্জন করে না।

ما من مسلم يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة ـ

অর্থাৎ, যে মুসলমান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে সেজদা করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময়ে তার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ মাফ করে দেন।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে আমাকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জান্নাতে আপনার সাহচর্য দান করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি অধিক সেজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। বর্ণিত আছে, সেজদার অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য তাই, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ –সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও।

আল্লাহ্ বলেন–

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডলে সেজদার চিহ্নই তাদের পরিচয়।

কারও কারও মতে এখানে 'সেজদার চিহ্ন' বলে সেই ধুলাবালি বুঝানো হয়েছে, যা সেজদা করার সময় মুখমন্ডলে লেগে যায়। কেউ কেউ বলেন ঃ সেজদার চিহ্ন হচ্ছে খুশুর নূর, যা অন্তর থেকে বাহ্যিক অঙ্গে ফুটে উঠে। এ উক্তি বিশুদ্ধতম। কেউ বলেন ঃ এর অর্থ সেই নূর, যা ওযুর চিহ্নস্বরূপ কেয়ামতে চেহারায় উদ্ভাসিত হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যখন মানুষ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হায় বিপদ, সে সেজদার আদেশ পেয়ে সেজদা করেছে, ফলে জান্নাত পেয়েছে; আর আমি সেজদার আদেশ অমান্য করে জাহান্নাম পেয়েছি। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রত্যহ এক হাজার সেজদা করতেন। এ কারণেই মানুষ তাঁকে সাজ্জাদ নামে অভিহিত করে। বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মাটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর সেজদা করতেন না। ইউসুফ ইবনে আসবাত (রঃ) বলতেন ঃ যুবক সকল, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতার কদর কর। আমি কেবল সেই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করি, যে তার রুকূ সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করে। আমি এখন অসুস্থতার কারণে রুকূ সেজদা করতে পারি না। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন ঃ আমি সেজদা ছাড়া দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্যে দুঃখ করি না। ওকবা ইবনে মুসলিম (রঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবে– এ ছাড়া বান্দার কোন অভ্যাস আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয় নয়। সেজদার সময় ছাড়া এমন কোন সময় নেই, যাতে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। অতএব সেজদার মধ্যে অধিক দোয়া কর। নামাযের অন্যতম প্রধান বিষয় খুশুর ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না, যে পর্যন্ত যা বল তা না বুঝ।

এতে কেউ কেউ মাতালের অর্থ করেছেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হওয়া। কেউ বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বতে মত্ত হওয়া। ওয়াহাব বলেছেন ঃ বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য! অর্থাৎ, মদ্যপান করে মাতাল হওয়া। মোট কথা, এতে দুনিয়ার নেশা সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। কেননা, বলা হয়েছে– যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা না বুঝ। অনেক নামাযী এমন রয়েছে, যারা নেশার বস্তু পান করে না, কিন্তু নামাযে কি বলছে তার খবরও রাখে না। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من الدنيا غفرله ما تقدم من ذنبه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি দু'রাকআত নামায পড়ে এবং তাতে দুনিয়ার কোন কথা মনে মনে না বলে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করা হবে।

انما الصلوة تمسكن وتواضع وتضرع وتباؤس وتنادم

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وترفع يديك فتقول اللهم فمن لم يفعل فهى خداج -

অর্থাৎ, নামায তো অসহায়ত্বতা, বিনয়, অনুনয়, দুঃখ ও অনুতাপ বৈ কিছু নয়। তুমি তোমার হাত উত্তোলন কর, এর পর বল– হে আল্লাহ, হে আল্লাহ! যে এভাবে নামায পড়ে না, তার নামায অসম্পূর্ণ।

পূর্ববর্তী কোন এক আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– আমি সকল নামাযীর নামায কবুল করি না ; বরং যে আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় করে, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার না করে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্যে অন্নহীনকে অন্ন দেয়, তার নামায কবুল করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামায, হজ্জ, তওয়াফ ও ধর্মের অন্যান্য রোকন ফরয হওয়া কেবল আল্লাহর যিকিরের জন্যে। অতএব তোমার অন্তরে যদি এই উদ্দেশ্য জাগরূক না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও ভয়ভীতি থেকে তোমার অন্তর শূন্য থাকে, তবে তোমার যিকিরের কোন মূল্য নেই। জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

اذا صليت فصل صلوة مودع -

অর্থাৎ মনের খাহেশ, বয়স ইত্যাদিকে বিদায় করে মাওলার দিকে চল। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ -

অর্থাৎ, "হে মানুষ, তোমাকে আত্মরক্ষা করের তোমার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।"

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ -

অর্থাৎ, "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা তাঁর সাথে মিলিত হবে।"

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তিকে নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না, সে আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যাবে। নামায তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে বাক্যালাপ করার নাম। অতএব এটা গাফিলতির সাথে কিরূপে হবে? বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ হে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষ, যদি তোমার প্রভুর কাছে বিনানুমতিতে যেতে চাও এবং কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর সাথে কথা বলতে চাও, তবে এটা সম্ভবপর। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ওযু সহকারে নামাযে দাঁড়াও। এতেই বিনানুমতিতে তোমার প্রভুর সামনে চলে যাবে। এর পর মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর সাথে কথা বল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম, কিন্তু যখন নামাযের সময় হত, তখন তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরা তাঁকে চিনতাম না। তিনি আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যে এমনিভাবে মশগুল হতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا ينظر الله الى صلوة لايحضر فيها قلبه مع بدنه -

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা এমন নামাযের দিকে তাকাবেন না, যে নামাযে মানুষ তার অন্তরকে দেহসহ উপস্থিত না রাখে।"

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর অন্তরের অস্থির স্পন্দন দু'মাইল দূরত্বে শোনা যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলি বুলাতে দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তরে খুশু থাকত তবে অঙ্গের মধ্যেও তা প্রকাশ পেত। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কংকর নিয়ে খেলা করছে এবং বলছে ঃ ইলাহী, বেহেশতী হুরের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার তো উপযুক্ত পাথেয় নেই। তুমি বেহেশতী হুরের সাথে বিবাহ চাও আর কংকর নিয়ে খেলা কর। খলফ ইবনে আইউবকে কেউ বলল ঃ মাছির যে দাপট! নামাযে মাছি আপনাকে বিরক্ত করে নাকি? আপনি মাছি সরিয়ে দেন না? তিনি বললেন ঃ আমি নিজেকে নামায নষ্ট করে দেয়ার মত কোন কাজে অভ্যস্ত করি না। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনি ধৈর্য ধরেন কিরূপে? উত্তর হল ঃ আমি শুনেছি, অপরাধী শাহী বেত্রের নীচে ধৈর্য ধরে, যাতে মানুষ তাকে ধৈর্যশীল বলে। তারা এ নিয়ে পরস্পর গর্ব করে। আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তাঁর মাছির কারণে নড়াচড়া করতে পারি কি? মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রঃ) যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন গৃহের লোকজনকে বলতেন ঃ এখন তোমরা পরস্পর যত ইচ্ছা কথাবার্তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বল। আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনব না। একদিন তিনি বসরার জামে মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে মসজিদের একটি অংশ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। এজন্যে চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে সেখানে জড়ো হল। কিন্তু তিনি নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই টের পেলেন না। হযরত আলী (রাঃ) নামাযের সময় হলে কাঁপতে থাকতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত ঃ আমিরুল মুমিনীন, আপনার একি অবস্থা! তিনি বলতেন ঃ সেই আমানতের সময় এসেছে, যা আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের সামনে পেশ করেছিলেন, কিন্তু সকলেই তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। মানুষ তা বহন করেছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) যখন ওযু করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল ফেকাশে হয়ে যেত। তাঁর পত্নী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওযু করার সময় আপনার একি অভ্যাস ? তিনি বললেন ঃ তুমি জান না, আমি কার সামনে দাঁড়াতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত দাঊদ (আঃ) তাঁর মোনাজাতে বললেন ঃ ইলাহী, আপনার গৃহে (অর্থাৎ জান্নাতে) কে থাকবে? আপনি কার নামায কবুল করেন? জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন– হে দাউদ! যেব্যক্তি আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় বিনয় করে, আমার স্মরণে দিন অতিবাহিত করে, আমার কারণে নিজেকে কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিরন্নকে অন্ন দেয়, মুসাফিরকে আশ্রয় দেয় এবং বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়াপরবশ হয়, সে-ই আমার গৃহে থাকবে। আমি তারই নামায কবুল করি। তারই নূর আকাশমণ্ডলীতে সূর্যের মত ঝলমল করে। সে আমাকে ডাকলে আমি সাড়া দেই। সে যা চায় আমি তাকে তা দেই। মূর্খতাকে আমি তার জন্যে জ্ঞান করে দেই, গাফিলতিকে যিকির এবং অন্ধকারকে উজালা করে দেই। সে সর্বোপরি বেহেশত জান্নাতুল ফেরদাউসের মত, যার নদ-নদী কখনও শুষ্ক হয় না এবং ফলমূল বিস্বাদ হয় না। হাতেম আসাম্মকে কেউ তাঁর নামাযের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি পূর্ণরূপে ওযু করে নামাযের জায়গায় এসে বসি। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেলে আমি নামাযের জন্যে দাঁড়াই। কা'বা গৃহকে সম্মুখে রাখি, পুলসেরাতকে পদতলে, জান্নাতকে ডান দিকে, জাহান্নামকে বাম দিকে এবং মালাকুল মওতকে পিঠের পশ্চাতে কল্পনা করি। এর পর এ নামাযকেই সর্বশেষ নামায বলে মনে করি। অতঃপর ভয় ও আশা সহকারে দাঁড়িয়ে সশব্দে আল্লাহু আকবার বলি। উত্তমরূপে কেরাআত পড়ি। রুকু বিনয় সহকারে এবং সেজদা খুশু সহকারে আদায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করি। বাম পা বিছিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসি। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রাখি। আমি সমগ্র নামাযে এখলাস তথা আন্তরিকতা অবলম্বন করি। এর পরও এ নামায কবুল হল কিনা, তা আমি জানি না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চিন্তা ভাবনা সহকারে মাঝারি ধরনের দু'রাকআত নামায গাফিলতি সহকারে সারা রাত জেগে নফল পড়ার চেয়ে উত্তম।

নামাযের স্থান 'মসজিদে'র ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে।"

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصرا فى الجنة -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করে, যদিও তা কাতাত পক্ষীর বাসার সমান হয়, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

من الف المسجد الفه الله تعالى -

অর্থাৎ, "যেব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসেন।"

اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس -

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার পূর্বে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

আরও আছে– মসজিদের পড়শীদের নামায মসজিদে ছাড়া হয় না। আরও এরশাদ হয়েছে– যতক্ষণ নামাযী মসজিদে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। তারা বলে ইলাহী, এ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন; ইলাহী, তার প্রতি মেহেরবানী করুন; ইলাহী তাকে ক্ষমা করে দিন। এর জন্যে শর্ত হল, ওযুহীন না হওয়া এবং মসজিদের বাইরে না যাওয়া। এক হাদীসে আছে– শেষ যমানায় আমার উম্মতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিছু লোক মসজিদে বৃত্তাকারে বসবে। তাদের যিকির হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার মহব্বত। তুমি তাদের কাছে উপবেশন করো না। কেননা, এদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নেই। এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এক আসমানী কিতাবে বলেছেন ঃ পৃথিবীতে আমার গৃহ হচ্ছে মসজিসমূহ। যারা এগুলো আবাদ রাখে, তারা আমার যিয়ারত করে। সুতরাং মোবারক সেই বান্দা, যে তার গৃহ থেকে পাক সাফ হয়ে আমার গৃহে আমার যিয়ারতের জন্যে আসে। গৃহস্বামীর কর্তব্য হচ্ছে তার কাছে আগমনকারীদের সম্মান করা। আরও এরশাদ হয়েছে– তোমরা যদি কাউকে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে দেখ, তবে তার ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দাও। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে বসে সে পরওয়ারদেগারের সাথে উঠাবসা করে। অতএব তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলা সঙ্গত নয়। কোন তাবেয়ীর উক্তি অথবা হাদীসে বর্ণিত আছে, মসজিদে কথাবার্তা বলা সৎকর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে সাবাড় করে দেয়। নখয়ী বলেন ঃ আগেকার মনীষীগণ বিশ্বাস করতেন, অন্ধকার রাতে মসজিদে যাওয়া জান্নাত লাভের কারণ। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে বাতি জ্বালায়, বাতির আলো মসজিদে থাকা পর্যন্ত তার জন্যে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা মাগফেরাত কামনা করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ মরে গেলে পৃথিবীতে তার নামায পড়ার জায়গা এবং আকাশে তার আমল উঠার জায়গা তার জন্যে ক্রন্দন করে। এর সমর্থনে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ -

অর্থাৎ, "অতঃপর কাফেরদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করল না এবং তারা অবকাশপ্রাপ্ত ছিল না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাটি তার জন্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। আতা খোরাসানী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ যে ভূখণ্ডে সেজদা করে, কেয়ামতের দিন সেই ভূখণ্ড সেজদার সাক্ষ্য দেবে এবং সে মারা গেলে তার জন্যে ক্রন্দন করবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ যে ভূখন্ডের উপর নামায অথবা মনোনিবেশ সহকারে আল্লাহ তাআলার যিকির হয়, সে ভূখণ্ড তার পার্শ্ববর্তী ভূখন্ডের উপর গর্ব করে। সে যিকিরের সুসংবাদ সপ্ত স্তর যমীনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যে বান্দা দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তার জন্যে যমীন সজ্জিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম

নামাযী যখন ওযু করে, শরীর, স্থান ও বস্ত্র নাপাকী থেকে পাক করে নেয় এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত করে, তখন কেবলামুখী হয়ে উভয় পায়ের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব রেখে দণ্ডায়মান হবে। উভয় পা পরস্পর মেলাবে না। এভাবে দণ্ডায়মান হওয়া মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে 'সকদ' ও 'সকন' করতে নিষেধ করেছেন। সকদ মানে উভয় পা মিলিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং সকন অর্থ এক পায়ে জোর রেখে অপর পা বাঁকা করে রাখা। দণ্ডায়মান অবস্থায় উভয় হাঁটু ও কোমর সোজা রাখতে হবে। মাথা সোজাও রাখা যায় এবং নতও রাখা যায়। নত রাখা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী। দৃষ্টি জায়নামাযের উপর রাখা উচিত। যদি জায়নামায না থাকে, তবে প্রাচীরের কাছে দাঁড়াবে অথবা নিজের চারপাশে রেখা টেনে নেবে। এতে দৃষ্টির দূরত্ব কমে যায় এবং চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয় না। যদি জায়নামাযের কিনার থেকে অথবা রেখার সীমার বাইরে দৃষ্টি চলে যায়, তবে বাধা দিতে হবে। দণ্ডায়মান হওয়ার এ অবস্থা রুকু পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত। এভাবে কেবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেলে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে সূরা নাস পাঠ করবে। এর পর তকবীর বলবে।

যদি কোন মুক্তাদীর আগমন প্রত্যাশা করা হয়, তবে প্রথমে আযান দেবে। এরপর নিয়ত করবে। উদাহরণতঃ মনে মনে যোহরের নামাযের নিয়ত করে বলবে, আমি যোহরের ফরয আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করছি। এ নিয়ত তকবীরের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে। মনে একথা উপস্থিত করে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে যে, উভয় হাতের তালু উভয় কাঁধের বিপরীতে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের লতির বিপরীতে থাকবে। অঙ্গুলিসমূহের মাথা উভয় কানের বিপরীতে থাকবে। হাত এখানে স্থির হওয়ার পর অন্তরে নিয়ত উপস্থিত করে আল্লাহু আকবার বলবে এবং উভয় হাত নামাতে শুরু করবে। এর পর আল্লাহ আকবার পূর্ণ করে উভয় হাত নাভির উপরে এবং বুকের নীচে বাঁধবে। (এটা ইমাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শাফেয়ী [রঃ]-এর মাযহাব)। ডান হাত উপরে ও বাম হাত নীচে থাকবে এবং ডান হাতের শাহাদত ও মধ্যের অঙ্গুলিগুলো বাম হাতের কব্জির উপর ছড়িয়ে দেবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের বাহু ধরে রাখবে। রেওয়ায়েতসমূহে আল্লাহু আকবার বলা হাত উঠানোর সাথেও, হাত থেমে যাওয়ার সময়ও এবং বাঁধার জন্যে নামানোর সাথেও বর্ণিত আছে। কাজেই এই তিন সময়ের যে কোন সময় আল্লাহু আকবার বলা যায়। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহু আকবার বলার পর হাত ঝুলিয়ে দিতেন। এর পর কেরাআত পড়ার ইচ্ছা করলে ডান হাত বাম হাতের উপর বেঁধে নিতেন। এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে এ পদ্ধতি উত্তম।

এর পর শুরুর দোয়া পড়বে। আল্লাহু আকবারের সাথে এ দোয়া মিলিয়ে পড়া উত্তম–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (হানাফী মযহাব অনুযায়ী উক্ত দোয়াটি নিয়তের আগে পড়া হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বী লেখক এখানে স্বীয় মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। –অনুবাদক) এরপর বলবে–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার স্থান উচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।"

ইমাম এত দীর্ঘ বিরতি না দিলে মুক্তাদী এ অবস্থায় কেবল শেষোক্ত দোয়াটিই পড়ে নেবে। এর পর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতেহার কেরাআত শুরু করবে। সূরা ফাতেহা শেষ করে 'আমীন' শব্দটি একটু টেনে উচ্চারণ করবে। ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে কেরাআত সরবে পড়বে। মুক্তাদী হলে পড়বে না। এর পর একটি সূরা অথবা কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। কেরাআতের শেষ ভাগকে রুকুর আল্লাহু আকবারের সাথে মেলাবে না। বরং সোবহানাল্লাহ্ বলার সময় পরিমাণ বিরতি দেবে। ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ও মাগরিবে কিসারে মুফাসসালের কেরাআত পড়বে। যোহর, আছর ও এশার নামাযে وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ও তার মত অন্যান্য সূরা পাঠ করবে। সফর অবস্থায় ফজরের নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস পড়বে। ফজরের সুন্নতেও তাই পড়বে। কেরাআত শেষে রুকু করবে, এর জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে। তকবীর এতটুকু টেনে পড়বে যেন রুকুতে পৌঁছার পর শেষ হয়। রকুতে উভয় হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখবে এবং অঙ্গুলিসমূহ ছড়িয়ে গোছার দিকে কেবলামুখী রাখবে। এ সময় মাথা, ঘাড় ও পিঠ সমতল থাকবে। উভয় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা থাকবে। স্ত্রীলোক কনুই পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

রুকুতে তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলবে। ইমাম না হলে তিনের অধিক সাত ও দশ বার পর্যন্ত বলা উত্তম। এর পর রুকু থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতে বলতে সোজা হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়াবে এবং বলবে–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ ـ

এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদার জন্যে নত হবে। প্রথমে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাঁটু মাটিতে রাখবে, এর পর খোলা অবস্থায় হাতের তালু ও কপাল মাটিতে রাখবে এবং সকলের শেষে নাকের ডগা রাখবে। এ সময় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা রাখবে এবং স্ত্রীলোক হলে মিলিয়ে রাখবে। সেজদায় পেট উরু থেকে আলাদা রাখবে এবং উভয় উরু পৃথক রাখবে। স্ত্রীলোক পেট উরুর সাথে এবং উভয় উরু পরস্পরে মিলিয়ে রাখবে। হাত মাটিতে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে রাখবে না; বরং কনুই উপর রাখবে। কনুই মাটিতে লাগানো নিষিদ্ধ। সেজদায় তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলবে। আরও বেশী বার বলা উত্তম। ইমাম হলে তিন বারের বেশী বলা অনুচিত। এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে মাথা তুলে স্থিরভাবে বসে যাবে। বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখবে এবং উরুর উপর উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখবে। এরপর প্রথম সেজদার ন্যায় দ্বিতীয় সেজদা করবে এবং আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকআতও প্রথম রাকআতের মতই পড়বে। দ্বিতীয় রাকআত সেজদাসহ শেষ করার পর বসা অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়বে। তাশাহ্হুদ পড়ার সময় দু'সেজদার মাঝখানে যেভাবে বসেছিলে, সেভাবে বসবে। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখবে। তাশাহ্হুদের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলো বন্ধ করে নেবে। শেষ তাশাহহুদের মধ্যে দরূদের পর দোয়া মাসূরা পাঠ করবে। এরপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। মুখ এতটুকু ফেরাবে যেন পেছনের মুসল্লী তার ডান গাল দেখতে পায়। এর পর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে একইভাবে সালাম বলবে। প্রথম সালামে ডান দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। তেমনি দ্বিতীয় সালামে বাম দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। ইমাম হলে নামাযের সকল তকবীর সরবে বলবে। ইমাম ইমামতির নিয়ত করবে। এতে সওয়াব হবে। যদি ইমামতির নিয়ত না করে নামায পড়ে নেয়, মুক্তাদীর নামায দুরস্ত হবে এবং জামাআতের সওয়াব সকলেই পাবে। ইমাম নামাযের দোয়া, আঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়বে। ফজরের দু'রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে ইমাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আলহামদু ও অন্য সূরা সরবে পাঠ করবে। পরবর্তী রাকআতসমূহে কেবল আলহামদু পড়বে এবং নীরবে পড়বে। সালামের পর ইমাম বুকের বিপরীতে দুই হাত তুলে দোয়া করবে এবং দোয়ার পর মুখমণ্ডলের উপর হাত বুলিয়ে নেবে।

নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো এই ঃ নামাযে করজোড়ে দণ্ডায়মান হওয়া এক পায়ে জোর দিয়ে অপর পা ঘোড়ার মত বাঁকা করে রাখা। কুকুরের মত বসা; অর্থাৎ, নিতম্বে বসে উভয় হাঁটু খাড়া করে উভয় হাত মাটিতে রেখে দেয়া। এমনভাবে চাদর ইত্যাদি জড়িয়ে নামায পড়া যেন হাত ভেতরেই থাকে এবং রুকু সেজদায়ও হাত বাইরে না আনা। ইহুদীরা এরূপ করত, তাই তাদের মত করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু সেজদা করার সময় হাত কোর্তা ইত্যাদিতেও হাত ভেতরে রাখা উচিত নয়। সেজদা করার সময় পরিধেয় বস্ত্র পেছনে অথবা সামনে দিয়ে তুলে নেয়া। ইমাম আহমদ কোর্তার উপর লুঙ্গি বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। কোমরে হাত রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় বাহু শরীর থেকে আলাদা রেখে কোমরে হাত রাখা, ইমামের জন্যে আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথেই কেরাআত শুরু করে দেয়া এবং কেরাআত খতম হতেই রুকুর তকবীর বলা, মুক্তাদীর জন্যে নিজের শুরুর তকবীরকে ইমামের তকবীরের সাথে এবং সালামকে ইমামের সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া, এছাড়া প্রথম সালামকে দ্বিতীয় সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যে নিষিদ্ধ। উভয় সালাম আলাদাভাবে বলতে হবে। প্রস্রাব অথবা পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে পড়া, মোজা পরিধান করে নামায পড়া– এগুলো খুশুর পরিপন্থী। তেমনি ক্ষুধা-পিপাসা নিয়ে নামায পড়াও মাকরূহ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রাতের খানা এসে গেলে এবং নামাযের তকবীর হলে আগে খানা খেয়ে নাও; কিন্তু নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে অথবা মন স্থির থাকলে আগেই নামায পড়বে। অন্য এক হদীসে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যে নামাযে মন উপস্থিত না থাকে, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। এক হাদীসে আছে– নামাযের মধ্যে সাতটি কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাক দিয়ে রক্ত আসা, নিন্দা, কুমন্ত্রণা, হাই তোলা, চুলকানো, এদিক ওদিক দেখা এবং কোন কিছু নিয়ে খেলা করা। কেউ কেউ ভুল সন্দেহকেও এর সাথে যোগ করেছেন। জনৈক মনীষী বলেন ঃ নামাযের মধ্যে চারটি কাজ অন্যায়– এদিক ওদিক তাকানো, মুখ মোছা, কংকর সমান করা এবং মানুষের চলার পথ সামনে রেখে নামায পড়া।

অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকে ঢুকানো এবং অঙ্গুলি ফুটানো, মুখ আবৃত করা, রুকুতে হাতের এক তালু অপর তালুর সাথে মিলিয়ে উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমরা প্রথমে এরূপ করতাম; এরপর এটা নিষিদ্ধ হয়েছে। সেজদা করার সময় মাটিতে ফুঁক দেয়া অথবা হাতে কংকর সমান করা। কেননা, নামাযে এসব কর্মের প্রয়োজন নেই। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রাচীরে হেলান দেয়া, যদি এমনভাবে হেলান দেয় যে, হেলানের বস্তু সরিয়ে নিলে সে নির্ঘাত পড়ে যাবে, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযের ফরয ও সুন্নত

উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব ও উত্তম সবই রয়েছে। আধ্যাত্ম পথের পথিক যাতে সবগুলো পালন করে, এজন্যে সবগুলো একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন আমরা সবগুলো আলাদা আলাদা বলে দিচ্ছি। উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বারটি বিষয় ফরয ঃ (১) নিয়ত করা, (২) তকবীর বলা, (৩) দণ্ডায়মান হওয়া, (৪) সূরা ফাতেহা পাঠ করা, (৫) হাতের তালু হাঁটুতে স্থিরভাবে রেখে রুকু করা, (৬) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, (৭) স্থিরভাবে সেজদা করা, এতে হাত মাটিতে রাখা ওয়াজেব নয়, (৮) সেজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসা, (৯) দ্বিতীয় বৈঠক করা, (১০) শেষ তাশাহ্হুদ পড়া, (১১) শেষ তাশাহ্হুদে দুরূদ পাঠ করা এবং (১২) প্রথম সালাম ফেরানো। এই বারটি ছাড়া অবশিষ্টগুলো ওয়াজেব নয়; বরং সুন্নত ও মোস্তাহাব।

ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য হল, যে কাজ না করলে নামায দুরস্ত হয় না তা ফরয এবং যে কাজ না করলেও নামায শুদ্ধ হয়, তা সুন্নত। অথবা ফরয কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় এবং সুন্নত কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় না। এভাবে ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হয়, সুন্নত ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোস্তাহাব তরক করলে শাস্তি হয় না এবং পালন করলে সওয়াব হয়, এমতাবস্থায় পার্থক্য কি হল? এর জওয়াব এই, সওয়াব, শাস্তি ও হওয়ার ব্যাপারে সকল সুন্নতই অভিন্ন। এতে করে সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। এগুলোর পার্থক্যের বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছি। উদাহরণ এই ঃ মানুষকে দু'টি কারণেই বিদ্যমান ও পূর্ণাঙ্গ বলা হয়- আভ্যন্তরীণ বিষয় ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কারণে। আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে জীবন ও আত্মা। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো সকলেরই জানা। এসব অঙ্গের কতক এমন, এগুলো না হলে মানুষ মানুষ থাকে না; যেমন অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্ক ইত্যাদি। এগুলো না থাকলে মানুষের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবন তো বিনষ্ট হয় না; কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায়। যেমন- চক্ষু, হাত, পা, জিহ্বা। কতক অঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবনও বিনষ্ট হয় না এবং জীবনের উদ্দেশ্যও ফওত হয় না; কিন্তু সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন- ভ্রূ, দাড়ি, চোখের পলক এবং সুন্দর বর্ণ। কতক অঙ্গ এমন, যেগুলো না থাকলে আসল সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় না; যেমন ভ্রূ বক্র হওয়া, দাড়ি ও পলক কৃষ্ণ বর্ণ হওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল হওয়া এবং গৌরবর্ণ হওয়া। এমনিভাবে নামায এবাদত ও শরীয়ত নির্মিত একটি আকৃতি। এ আকৃতি অর্জন করা আমাদের জন্যে এবাদত নির্ধারিত হয়েছে। এ আকৃতির আত্মা ও জীবন তথা আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে খুশু, নিয়ত, মনের উপস্থিতি ও এখলাস। এর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে রুকু, সেজদা, দাঁড়ানো ও অন্যান্য ফরয কর্ম। এগুলো মানুষের অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্কের অনুরূপ। এগুলো না হলে নামায হয় না। আর যে যে কাজ সুন্নত; যেমন শুরুর দোয়া ও প্রথম তাশাহ্হুদ, সেগুলো হাত, পা ও চক্ষুর অনুরূপ। এগুলো না হলে নামাযের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না; যেমন- হাত, পা ও চক্ষু না থাকলে জীবন বিনষ্ট হয় না, বরং মানুষ কুশ্রী হয়ে যায় এবং সকলেই তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নামাযে কেবল ততটুকু কাজ করে, যতটুকু দ্বারা নামায দুরস্ত হয়ে যায় এবং সুন্নত পালন করে না, সে সেই ব্যক্তির মত, যে কোন বাদশাহের কাছে এমন এক গোলাম উপঢৌকন পাঠায়, যে জীবিত; কিন্তু হাত পা কর্তিত। নামাযে যেসব কাজ মোস্তাহাব, সেগুলোর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মর্তবা সুন্নতের চেয়ে কম। এগুলো সৌন্দর্যের জরুরী বিষয়রূপে পরিগণিত; যেমন যিকির ইত্যাদি- এগুলো সৌন্দর্যের পরিপূরক বিষয়বস্তু; যেমন ভ্রূ বক্র হওয়া, দাড়ি গোলাকার হওয়া ইত্যাদি।

সারকথা, নামায মানুষের কাছে একটি নৈকট্যের উপায় ও উপঢৌকন, যদ্দ্বারা সে সত্যিকার শাহানশাহের দরবারে নৈকট্য কামনা করে; যেমন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বাদশাহের নৈকট্য লাভের জন্যে তার দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করে। মানুষের এই উপঢৌকন প্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে পেশ হয়ে বিচারের দিন আবার তার কাছে ফিরে আসবে। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে এ উপঢৌকনের আকার আকৃতি সর্বাঙ্গ সুন্দর করুক এবং ইচ্ছা করলে বিশ্রী করুক। সর্বাঙ্গ সুন্দর করলে তারই উপকার এবং বিশ্রী করলে তারই অপকার হবে। মানুষ যদি ফেকাহ্‌শাস্ত্রে পারদর্শিতার সুবাদে ফরয ও সুন্নতের এই পার্থক্য বুঝে নেয়, সুন্নত তাকে বলে যা না করা জায়েয এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সুন্নত ছেড়ে দেয়, তবে সে সেই চিকিৎসকের মত হবে যে বলে, চক্ষু বিনষ্ট করে দিলেও মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে। বলাবাহুল্য, চক্ষুবিহীন গোলাম বাদশাহের কাছে উপঢৌকন পেশ করে তার নৈকট্য প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং যেব্যক্তি নামাযের রুকু সেজদা পূর্ণ করে না, এ নামাযই হবে তার প্রথম দুশমন। নামায বলবে, পরওয়ারদেগার তোমাকে বরবাদ করুন, যেমন তুমি আমাকে বরবাদ করেছিলে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্ত

নামাযে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। এর প্রমাণ অনেক। আল্লাহ বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।

এ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, নামাযে অন্তরের উপস্থিতি ওয়াজেব। নামাযে গাফেল থাকা স্মরণের বিপরীত। অতএব যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, সে আল্লাহর স্মরণের জন্যে নামায কায়েমকারী কিরূপে হবে?

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

এখানে নিষেধ পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে, যদ্দারা বুঝা যায়, গাফেল হওয়া হারাম।

حَتّٰى تَعْلَمُوْنَ مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত যা বল, তা না বুঝ।

এতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণ সেই ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যে গাফেল, কুমন্ত্রণায় মগ্ন এবং পার্থিব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

নামায তো অসহায়ত্ব ও অনুনয় বৈ কিছুই নয়। হাদীসের শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটাই নামায, যার মধ্যে অসহায়ত্ব ও অনুনয়-বিনয় থাকে। এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তির নামায তাকে মন্দ ও অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে না, সেই নামায তার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে দূরত্বই বৃদ্ধি করে। বলাবাহুল্য, গাফেল ব্যক্তির নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজের পথে অন্তরায় নয়। এরশাদ হয়েছে– অনেক নামাযী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমন, তাদের নামায থেকে তারা কেবল কষ্ট ও শ্রমের অংশই পায়। এতে গাফেল ছাড়া অন্য কোন নামাযী উদ্দেশ্য নয়। আরও বলা হয়েছে– বান্দা তার নামাযের ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে বুঝে।

এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত বক্তব্য, নামাযী তার পরওয়ারদেগারের সাথে মোনাজাত (কানাকানি) করে। হাদীসে এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গাফিলতি সহকারে যে কথা বলা হয়, তা নিশ্চিতই মোনাজাত হবে না। যাকাত, রোযা ও হজ্জ এমন ফরয কর্ম, যেগুলো গাফিলতি সহকারে আদায় করলেও আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। যাকাত প্রদান স্বয়ং মানুষের ধনলিপ্সার বিপরীত এবং মনের জন্যে কঠিন কাজ। এমনিভাবে রোযা মানুষের পাশবিক শক্তিকে দাবিয়ে রাখে এবং যে খাহেশ দুশমন ইবলীসের হাতিয়ার, সেই খাহেশ ভেঙ্গে চুরমার করে। হজ্জও তেমনি কষ্টকর ও কঠিন কাজ। এতে এত পরিশ্রম আছে যদ্দ্বারা পরীক্ষা অর্জিত হয়ে যায়– সম্পাদনের সময় অন্তর উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু নামাযে যিকির, কেরাআত, রুকু, সেজদা, দণ্ডায়মান হওয়া ও বসা ছাড়া কিছুই নেই। এখন দেখতে হবে, যিকিরের উদ্দেশ্য সম্বোধন ও বাক্যালাপ করা, না কেবল মুখে অক্ষর ও স্বর উচ্চারণ করা, শেষোক্ত বিষয়টি যিকিরের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা, গাফেল ব্যক্তির জন্যে প্রলাপ বকার সময় জিহ্বা নাড়াচাড়া করা মোটেই কঠিন নয়। এরূপ যিকির পরীক্ষা হতে পারে না। বরং যিকিরের উদ্দেশ্য হবে মনের ভাব প্রকাশ করে বাক্যালাপ করা। এটা অন্তর উপস্থিত না করে অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ মনকে গাফেল রেখে মুখে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ উচ্চারণ করলে একে কেউ প্রার্থনা বলবে না। সুতরাং যিকির দ্বারা অনুনয়-বিনয় ও দোয়া উদ্দেশ্য না হলে গাফিলতির সাথে জিহ্বা নাড়াচাড়া করা কঠিন হবে কি? অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর এটা মোটেই কঠিন কাজ নয়। এরূপ ব্যক্তি নামাযের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্তর স্বচ্ছ হওয়া ও ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া থেকে অনেক দূরে থাকবে। এটা হল কেরাআত ও যিকির সম্পর্কে কথা। এখন রুকু ও সেজদার উদ্দেশ্য তাযীম তথা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন। মানুষ যদি তার কাজ দ্বারা আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে, তবে সে তার কাজ দ্বারা গাফেল অবস্থায় সম্মুখে রক্ষিত কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মূর্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে এবং এটা বিশুদ্ধ হবে। রুকু ও সেজদা যখন ভক্তি প্রদর্শন থেকে শূন্য হবে, তখন থেকে যাবে কেবল পিঠ ও মাথার নাড়াচাড়া। এটা এতটুকু কঠিন কাজ নয়, এর দ্বারা বান্দার পরীক্ষা উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা একে ধর্মের স্তম্ভ করা যেতে পারে, কুফুর ও ইসলামের পার্থক্য সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং হজ্জ ও অন্যান্য সকল এবাদতের অগ্রে স্থান দেয়া যেতে পারে। নামাযের এই মাহাত্ম্য কেবল তার বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের কারণে, এটা আমাদের বোধগম্য নয়। হাঁ, মোনাজাত তথা আল্লাহর সাথে সংগোপনে কথা বলার উদ্দেশ্য যোগ হলে নামায রোযা, হজ্জ এবং যাকাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবাদত হয়ে যায়; বরং কোরবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নামায। আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে নফলের মোজাহাদা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা কোরবানীর বিধান দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে বলেছেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে এসব জন্তুর মাংস ও রক্ত পৌছে না; কিন্তু তোমাদের তাক্ওয়া তাঁর কাছে পৌছে।

এখানে তাকওয়া অর্থ এমন গুণ, যা অন্তরের উপর প্রবল হয়ে আদেশ পালনের কারণ হয়। কোরবানীতে এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা নামাযের উদ্দেশ্য হবে না কিরূপে?

মোট কথা, উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ একথা জ্ঞাপন করে যে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন, কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। অতএব আমার উপস্থাপিত বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁদের বিপরীত। এর জওয়াব এই, ফেকাহবিদগণ মানুষের বাতেন তথা অন্তর সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন না এবং তাঁরা অন্তর চিরে আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার চেষ্টাও করেন না; বরং তাঁরা ধর্মের বাহ্যিক বিধানাবলীকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তিশীল করেন। তাঁদের মতে, বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মই জাগতিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখন এই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম আখেরাতে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে কি-না, এ আলোচনা ফেকাহর গণ্ডির বাইরে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এছাড়া অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া আমল পূর্ণ হওয়ার উপর কোন ইজমা দাবী করা যায় না। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি খুশু সহকারে নামায পড়ে না, তার নামায ফাসেদ। এক রেওয়ায়েতে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যে নামাযে অন্তর উপস্থিত নয়, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, যেব্যক্তি নামাযে থেকে ইচ্ছাপূর্বক ডান ও বামের ব্যক্তিকে চিনতে পারে, তার নামায হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা নামায পড়ে অথচ তা থেকে তার জন্যে ছয় ভাগের এক ও দশ ভাগের এক অংশও লিখিত হয় না। কেবল ততটুকুই লেখা হয়, যতটুকু সে বুঝে শুনে পড়ে। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন ঃ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, বান্দা তার নামাযের ততটুকু অংশই পায় যতটুকু সে অন্তরে উপস্থিত রেখে পড়ে। তিনি তো অন্তরের উপস্থিতির উপর ইজমাই দাবী করলেন। পরহেযগার ফেকাহবিদ ও আখেরাতের আলেমগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের অসংখ্য উক্তি বর্ণিত আছে। সত্য এই, শরীয়তের প্রমাণাদি দেখা উচিত। হাদীস ও মনীষীবর্গের উক্তি থেকে বাহ্যতঃ এটাই বুঝা যায় যে, অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু বাহ্যিক বিধানাবলীতে ফতোয়ার স্থান মানুষের ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। এদিক দিয়ে মানুষের জন্যে সমগ্র নামাযে অন্তর উপস্থিত রাখা শর্ত করে দেয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, এটা করতে স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই অক্ষম। সমগ্র নামাযে শর্ত করা যখন সম্ভবপর হল না, তখন বাধ্য হয়েই এমনভাবে শর্ত করতে হল যে, একটি মুহূর্তে যেন অন্তর উপস্থিত থাকে। নামাযের অন্য সব মুহূর্তের তুলনায় আল্লাহু আকবার বলার মুহূর্তটি এ শর্তের জন্যে অধিক উপযুক্ত। তাই ফতোয়ায় কেবল এ মুহূর্তটিই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা আশাবাদী, যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত খারাপ হবে না, যে নামাযই পড়ে না। কেননা, গাফেল তো বাহ্যতঃ কিছু কর্মের উদ্যোগ নিয়েছে এবং অন্তরকে এক মুহূর্ত হলেও উপস্থিত করেছে। যেব্যক্তি ভুলবশতঃ ওযু ছাড়া নামায পড়ে নেয়, তার নামায আল্লাহ তাআলার কাছে বাতিল। কিন্তু তার কাজ ও ওযর অনুযায়ী কিছু সওয়াব সে পাবে। এতদসত্ত্বেও ফেকাহবিদগণ গাফিলতি সহকারে নামায দুরস্ত হওয়ার যে ফতোয়া দেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন ফতোয়া দিতে পারি না। কেননা, এ ফতোয়া মুফতীকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাধ্য হয়েই দিতে হয়; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন নামাযের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির জানা উচিত, গাফিলতি নামাযের জন্যে ক্ষতিকর।

সারকথা, অন্তরের উপস্থিতি নামাযের প্রাণ। এ প্রাণ অবশিষ্ট থাকার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত থাকা। এর যতবেশী অন্তর উপস্থিত থাকবে, ততই নামাযের অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। যে জীবিত ব্যক্তির নড়াচাড়া নেই, সে মৃতের কাছাকাছি। সুতরাং যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থেকে কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত রাখে, তার নামায ঐ জীবিত ব্যক্তির মত, যার নড়াচাড়া নেই। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি- তিনি যেন গাফিলতি দূর করা এবং অন্তরের উপস্থিতি অর্জনের ব্যাপারে আমাদেরকে উত্তমরূপে সাহায্য করেন।

যেসব আভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা নামাযের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয়

প্রকাশ থাকে যে, এসব বিষয় বুঝানোর জন্যে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ছয়টি শব্দ সবগুলো বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত করে। এখন কারণ ও প্রতিকারসহ এসব শব্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম শব্দ হচ্ছে হুযুরে দিল (অন্তরের উপস্থিতি)। এর উদ্দেশ্য, মানুষ যে কাজ করছে এবং যে কথা বলছে, সেটি ছাড়া অন্যান্য কাজ ও কথা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ, অন্তর কাজ ও কথা উভয়টি জানবে এবং এ দুটি ছাড়া অন্য কিছুতে তার চিন্তা ঘুরাফেরা করবে না। মানুষ যে কাজে লিপ্ত, তার চিন্তা যখন সেই কাজ ছাড়া অন্য দিকে না যায় এবং স্মৃতিতে সেই কাজই জাগরূক থাকে, তখন তার অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় শব্দ ফাহম অর্থাৎ কালামের অর্থ বুঝা। এটা অন্তরের উপস্থিতি থেকে ভিন্ন। কেননা, প্রায়ই অন্তর শব্দের সাথে উপস্থিত থাকে এবং অর্থের সাথে উপস্থিত থাকে না। ফাহমের উদ্দেশ্য অন্তরে শব্দের অর্থ জানা। এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কোরআনের অর্থ ও তসবীহ্ বুঝার ব্যাপারে সকলেই একরূপ নয়। অনেক সূক্ষ্ম অর্থ নামাযী ঠিক নামাযের মধ্যেই বুঝে নেয়, অথচ পূর্বে তার অন্তরে এ অর্থ কখনও ছিল না। এ কারণেই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ করতে বারণ করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ এমন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করায়, যা মন্দ কাজে প্রতিবন্ধক হয়।

তৃতীয় শব্দ তাযীম (ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন)। এটা অন্তরের উপস্থিতি ও ফাহম থেকে ভিন্ন। কেননা, মানুষ তার গোলামের সাথে কথা বলে, অন্তরও হাযির থাকে এবং নিজের কথার অর্থও বুঝে; কিন্তু গোলামের তাযীম করে না। এ থেকে জানা গেল, তাযীম হুযুরে দিল ও ফাহমের উর্ধ্বে।

চতুর্থ শব্দ 'হয়বত' অর্থাৎ ভয়। এটা তাযীমেরও উর্ধ্বে। বরং হয়বত সেই ভয়কে বলে, যা তাযীম থেকে উদ্ভূত হয়। বিচ্ছু, গোলামের অসচ্চরিত্রতা ইত্যাকার সামান্য জিনিসের ভয়কে হয়বত বলে না; বরং প্রতাপশালী বাদশাহকে ভয় করার নাম হয়বত।

পঞ্চম শব্দ রাজা অর্থাৎ আশা। এটাও পূর্ববর্তী সবগুলো থেকে ভিন্ন। অনেক মানুষ কোন বাদশাহের তাযীম করে। তার প্রতাপকে ভয় করে; কিন্তু তার কাছে কোন কিছু আশা করে না। বান্দার উচিত নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার সওয়াব আশা করা।

ষষ্ঠ শব্দ হায়া অর্থাৎ লজ্জা-শরম। এটা পূর্ববর্তী পাঁচটি থেকে আলাদা। কেননা, এর উৎপত্তি নিজের ভুল ত্রুটি উপলব্ধি করা থেকে। অতএব তাযীম, ভয় ও আশা এমন হতে পারে, যাতে হায়া নেই। অর্থাৎ, ত্রুটির ধারণা ও গোনাহের কল্পনা না থাকলে হায়া হবে না।

মোট কথা, উপরোক্ত ছয়টি বিষয় দ্বারা নামাযের প্রাণ পূর্ণাঙ্গ হয়। এখন এগুলোর কারণ আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে।

মনের উপস্থিতির কারণ হিম্মত তথা চিন্তা-ফিকির। মানুষের মন তার হিম্মতের অনুকরণ করে। যে বিষয় মানুষকে চিন্তান্বিত করে দেয় তাতেই তার অন্তর উপস্থিত থাকে। চিন্তার কাজে অন্তর উপস্থিত থাকাই মানুষের মজ্জা। নামাযে অন্তর উপস্থিত না হলে অন্তর বেকার থাকবে না; বরং যে পার্থিব বিষয়ে চিন্তা ব্যাপৃত থাকবে তাতেই অন্তর উপস্থিত থাকবে। কাজেই নামাযে অন্তর উপস্থিত করার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে, চিন্তাকে নামাযের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। চিন্তা নামাযের দিকে ঘুরবে না, যে পর্যন্ত প্রকাশ না পায় যে, প্রার্থিত লক্ষ্য নামাযের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এ বিষয়ের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আখেরাত উত্তম, চিরস্থায়ী ও প্রার্থিত লক্ষ্য। নামায এ লক্ষ্য অর্জনের উপায়। এ বিষয়কে দুনিয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিকৃষ্টতার সাথে যোগ করলে উভয়ের সমষ্টি দ্বারা নামাযে অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হবে। তুমি যখন কোন শাসনকর্তার কাছে যাও, যে তোমার উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না, তখন এ ধরনের বিষয় চিন্তা করলে অন্তর হাযির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সকল প্রকার লাভ লোকসান এবং পৃথিবীর ও আকাশের রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর সাথে মোনাজাতের সময় যদি তোমার অন্তর উপস্থিত না হয়, তবে এর কারণ তোমার ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছুকে মনে করো না। এ অবস্থায় তোমার উচিত ঈমান শক্তিশালী করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া। এর উপায় পূর্ণরূপে অন্যত্র বর্ণনা করা হবে।

অন্তরের উপস্থিতির পর ফাহমের কারণ হচ্ছে চিন্তাকে সদা ব্যাপৃত রাখা এবং অর্থোপলব্ধির দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। এর উপায় তাই, যা অন্তর উপস্থিত করার উপায়। এর সাথেই চিন্তার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে এবং যেসব কুমন্ত্রণা অন্তরকে বিমুখ করে দেয়, সেগুলো দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। এ ধরনের কুমন্ত্রণা দূর করার প্রতিকার হচ্ছে এগুলোর উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, অর্থাৎ যেসব উপকরণের দিকে কুমন্ত্রণা ধাবিত হয়, সেগুলো নিজের কাছে না রাখা। কেননা, মানুষ যে বস্তুকে প্রিয় মনে করে, তার আলোচনা বেশী করে। এ আলোচনা নিশ্চিতই অন্তরে ভীড় সৃষ্টি করে। এ কারণেই যারা গায়রুল্লাহকে ভালবাসে, তাদের নামায কুমন্ত্রণা মুক্ত হয় না।

দু'টি বিষয় জানার কারণে অন্তরে তাযীম সৃষ্টি হয়– (১) আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পরিচয় লাভ করা, যা মূল ঈমান। কেননা, যেব্যক্তি আল্লাহর মাহাত্ম্যের বিশ্বাসী হবে না, তার মন আল্লাহর সামনে নত হবে না। (২) নিজের হেয়তা ও নীচতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এ দু'টি বিষয় জানা থেকে অনুনয়, বিনম্র ভাব ও খুশু জন্ম লাভ করে, যাকে তাযীম বলা হয়। যে পর্যন্ত নিজের নীচতা জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ জ্ঞানের সাথে যুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাযীম ও খুশুর অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না।

হয়বত ও ভয় আল্লাহ্ তাআলার কুদরত, প্রাবল্য ও তাঁর ইচ্ছা প্রযোজ্য হওয়ার জ্ঞান থেকে জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ, একথা হৃদয়ঙ্গম করবে, যদি আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে ধ্বংস করে দেন, তবে তাঁর রাজত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। এর সাথে পয়গম্বর ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওলীগণের উপর আগত বিপদাপদ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করবে। মোট কথা, আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় মানুষ যত বেশী লাভ করবে, হয়বত বা ভয়ও ততই বেশী হবে।

'রাজা' তথা আশার কারণ এই, মানুষ আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ, কৃপা ও নেয়ামতকে চিনবে এবং নামাযের কারণে তিনি যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা সত্য মনে করবে। যখন ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর কৃপার জ্ঞান অর্জিত হবে, তখন উভয়ের সমষ্টি মানুষের অন্তরে নিশ্চিতই আশার সৃষ্টি করবে।

'হায়া' তথা লজ্জা-শরম সৃষ্টি হওয়ার উপায় হচ্ছে, মানুষ এবাদতে নিজেকে ত্রুটিকারী মনে করবে এবং বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ তাআলার যথার্থ হক আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না। সাথে সাথে একথাও জানবে, অন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। এসব জ্ঞান থেকে নিশ্চিতরূপে যে অবস্থা উৎপন্ন হবে, তাকেই হায়া বলা হয়।

অতএব উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি অর্জন করতে হলে তার কারণ জানতে হবে। কেননা, কারণ জানা হয়ে গেলে তার প্রতিকার আপনা আপনি জানা যায়। উপরে বর্ণিত জ্ঞানসমূহ একীনের স্তরে পৌঁছে যেতে হবে। তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারবে না। এগুলো অন্তরে প্রবলও হতে হবে। একীনের অর্থ যে সন্দেহ না থাকা এবং অন্তরে প্রবল হওয়া, একথা আমরা এলেম অধ্যায়ে লেখে এসেছি। যে পরিমাণে একীন হয়, সেই পরিমাণে অন্তর খুশু করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম, কিন্তু নামাযের সময় এসে গেলে তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনতাম না। বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হে মূসা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ কর, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝেড়ে নাও এবং খুশু ও স্থিরতা সহকারে থাক। যখন আমার যিকির কর তখন জিহ্বাকে অন্তরের পেছনে রাখ। যখন আমার সামনে দাঁড়াও, তখন লাঞ্ছিত দাসের মত দাঁড়াও। সাচ্চা মুখে ও ভীত অন্তরের সাথে আমার কাছে মোনাজাত কর। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি আরও ওহী প্রেরণ করেন– হে মূসা! তোমার উম্মতকে বলে দাও,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, আমি নিজেকে কসম দিয়েছি, যে কেউ আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে স্মরণ করব। সুতরাং তোমার উম্মত আমাকে স্মরণ করলে আমি তাদেরকে লানত সহকারে স্মরণ করব। এ হচ্ছে গাফেল নয়– এমন গোনাহগারের অবস্থা। যদি গাফিলতি ও গোনাহ উভয়টি একত্রিত হয়, তবে অবস্থা কি হবে?

আমরা উপরে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি, এগুলোতে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ। কতক মানুষ এমন গাফেল যে, নামায সবগুলো পড়ে, কিন্তু এক মুহূর্তও অন্তর উপস্থিত হয় না। আবার কেউ কেউ এমন, নামায পূর্ণরূপে পড়ে এবং এক মুহূর্তও অন্তর অনুপস্থিত থাকে না; বরং মাঝে মাঝে চিন্তাকে এমনভাবে নামাযে নিয়োজিত রাখে, তাদের কাছে কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলেও তারা তার খবর রাখেন না। এ কারণেই মুসলিম ইবনে ইয়াসার নামাযে দাঁড়িয়ে মসজিদের একাংশের পতন ও এ কারণে লোকজনের জড়ো হওয়ার বিষয় জানতে পারেননি। কোন কোন মনীষী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু কোন সময় চিনতে পারলেন না, ডান দিকে কে এবং বাম দিকে কে দাঁড়িয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরের স্ফুটন দু'মাইল দূর থেকে শুনা যেত। কিছু লোকের মুখমন্ডল নামাযের সময় ফ্যাকাসে হয়ে যেত এবং স্কন্ধ কাঁপতে থাকত। এসব ব্যাপার মোটেই অবাস্তব নয়। কেননা, দুনিয়াদারদের ধমক এবং দুনিয়ার বাদশাহদের ভয়ে এর চেয়েও অনেক বেশী ভীতকম্পিত হতে দেখা যায়। অথচ তারা অক্ষম ও দুর্বল। তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাও নগণ্য ও তুচ্ছ। এমনকি, কোন ব্যক্তি বাদশাহ অথবা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে কোন নালিশ সম্পর্কে কথা বলার পর যখন চলে আসে, তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়– বাদশাহের আশেপাশে কারা ছিল এবং বাদশাহের পোশাক কি ছিল, তবে সব কিছুতেই বলবে, জানি না। কেননা, নিজের কাজে মগ্ন থাকার কারণে বাদশাহের পোশাক অথবা আশেপাশের লোকজনকে দেখার কোন ফুরসতই তার ছিল না। যেহেতু প্রত্যেকেই তার আমলের বিভিন্ন অংশ পাবে, তাই নামাযে প্রত্যেকের অংশ ততটুকুই হবে, যতটুকু সে ভয়, খুশু ও তাযীম করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা দেখেন অন্তর– বাহ্যিক নড়াচড়া নয়। এজন্যেই কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ কেয়ামতে মানুষ সেই অবস্থায় উত্থিত হবে, যা তার নামাযে হবে। অর্থাৎ নামাযে যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিমাণ প্রশান্তি, স্থিরতা ও আনন্দ হবে, কেয়ামতে সে সেই পরিমাণে প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই বলেছেন। কেননা, মানুষের হাশর সেই অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় সে মরবে। আর মানুষ মরবে সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় সে জীবন যাপন করেছে। এতে তার অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে– বাহ্যিক শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। কেননা, অন্তরের গুণাবলী দ্বারাই পরকালে আকার আকৃতি তৈরী করা হবে এবং নাজাত সে-ই পাবে, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে। আল্লাহ স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও তওফীক দিন।

অন্তরের উপস্থিতির সহায়ক ব্যবস্থা

প্রকাশ থাকে যে, মুমিনের জন্য জরুরী আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভক্তি রাখা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখা এবং আপন ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া । অর্থাৎ, ঈমানের পর এসব অবস্থা থেকে মুমিন পৃথক হবে না, যদিও এগুলোর শক্তি তার বিশ্বাসের শক্তি অনুযায়ী হবে। সুতরাং নামাযের মধ্যে এসব অবস্থার অনুপস্থিতি এ কারণেই হবে যে, নামাযীর চিন্তা বিক্ষিপ্ত, ধ্যান বিভক্ত, অন্তর মোনাজাতে অনুপস্থিত এবং মন নামায থেকে গাফেল। নামায থেকে গাফিলতি কুমন্ত্রণার কারণে হয়, যা মনের উপর নেমে এসে মনকে ব্যাপৃত করে দেয়। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা দূর করাই অন্তরের উপস্থিতি লাভের উপায়। কোন বস্তু তখনই দূর হয়, যখন তার কারণ দূর হয়। তাই এখন কুমন্ত্রণার কারণ জানা দরকার। কুমন্ত্রণার কারণ হয় কানে ও চোখে পড়ে এমন কোন বিষয় হবে, না হয় কোন গোপন বিষয় হবে। কানেও চোখে পড়ে এমন বস্তুও মাঝে মাঝে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চিন্তা এসব বস্তুর পেছনে পড়ে সেগুলো থেকে অন্য বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। উচ্চ মর্যাদাশীল ও উচ্চ সাহসী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সামনে কোন বস্তু থাকলে তা তাকে গাফেল করে না, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির চিন্তা বিক্ষিপ্ত না হয়ে পারে না। এর প্রতিকার হচ্ছে এ ধরনের বস্তুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা– চোখ বন্ধ করে অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামায পড়া। এর জন্যে প্রাচীরের কাছে নামায পড়াও উত্তম, যাতে দৃষ্টির দূরত্ব দূরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। রাস্তায়, চিত্র ও কারুকার্যের স্থানে এবং রঙ্গিন বিছানায় নামায পড়া উচিত নয়। এ কারণেই আবেদগণ ক্ষুদ্র অন্ধকার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রকোষ্ঠে নামায পড়তেন, যাতে কেবল সেজদা করার স্থান সংকুলান হত। শক্তিশালী আবেদগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি নত করে নিতেন এবং দৃষ্টিকে সেজদার জায়গার বাইরে যেতে দিতেন না। ডান ও বামের মুসল্লীকে না চেনাই ছিল তাদের মতে নামাযের পূর্ণতা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সেজদার জায়গায় না তরবারি রাখতেন, না কালামে মজীদ। কিছু লেখা পেলে তা মিটিয়ে দিতেন।

কুমন্ত্রণার কারণ কোন গোপন বিষয় হলে সেটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, যেব্যক্তির চিন্তা জাগতিক ব্যাপারাদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তার চিন্তা এক বিষয়ে সীমিত থাকে না; বরং সর্বদাই এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের দিকে ধাবমান থাকে। দৃষ্টি নত করা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। এরূপ কুমন্ত্রণা দূর করার উপায় হচ্ছে মনকে জোর করে নামাযে পঠিত বিষয় বুঝার মধ্যে লাগিয়ে রাখা এর জন্য সহায়ক বিষয়। নিয়ত বাঁধার পূর্বে মনকে নতুন করে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিপদ এবং মৃত্যু পরবর্তী ভয়ংকর অবস্থা মনের সামনে পেশ করবে। মনকে সকল চিন্তার বিষয় থেকে মুক্ত করবে এবং এমন কোন ব্যস্ততা রাখবে না, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান ইবনে আবী শায়বাকে বলেছিলেন–

انى نسيت ان اقول لك ان تخمر القدر الذى فى البيت فانه لاينبغى ان يكون فى البيت شئ يشغل الناس عن صلواتهم -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে গৃহের হাঁড়ির মুখ বন্ধ করার কথা বলতে ভুলে গেছি। কেননা, গৃহে এমন বস্তু না থাকা উচিত, যা মানুষকে নামাযে বাধা দেয়।

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে চিন্তা স্থির রাখার উপায়। যদি এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর চিন্তা স্থির না হয়, তবে রোগের মূলোৎপাটনকারী জোলাব ছাড়া নাজাতের কোন পথ নেই। জোলাব এই যে, যেসব বিষয় মনকে অন্যত্র ব্যাপৃত করে দেয় এবং অন্তরের উপস্থিতি বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং সেগুলোর খাহেশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেবে। কেননা, যে বিষয় মানুষকে নামাযে বাধা দেয়, সে বিষয় তার ধর্মের বিপরীত এবং দুশমন ইবলীসের বাহিনী। কাজেই একে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পূর্ণ দূর না করে বাধা দিতে থাকা অধিক ক্ষতিকর। একে আলাদা করে দেয়ার মধ্যেই এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তি নিহিত। বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে আবু জহম দু'পাড়বিশিষ্ট একটি কাল চাদর প্রেরণ করলে তিনি তা পরিধান করে নামায পড়লেন। নামাযের পর চাদরটি খুলে বললেন ঃ এটি আবু জহমের কাছে নিয়ে যাও। সে আমাকে নামায থেকে গাফেল করে দিয়েছে। আমাকে আমার সাদা চাদর এনে দাও। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জুতায় নতুন চামড়ার টুকরা সংযোজনের আদেশ দেন। এর পর নামাযে তার দিকে তাকান। নামায শেষে তিনি টুকরাটি খুলে পুরাতন টুকরা সংযোজন করতে বলেন। একবার তিনি এক জোড়া জুতা পরিধান করলেন, যা তাঁর কাছে ভাল মনে হল। তিনি সেজদা করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে অনুনয় বিনয় করেছি, যাতে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। এর পর জুতা জোড়াটি বাইরে নিয়ে প্রথমে যে প্রার্থী পেলেন, তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমার জন্যে নরম চামড়ার পুরাতন জুতা জোড়া ক্রয় কর। অতঃপর সে জোড়াই তিনি পরিধান করলেন। হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোনার আংটি পরে মিম্বরে উঠলেন, এরপর সেটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি আমাকে ব্যাপৃত রেখেছে। কখনও এটি দেখি এবং কখনও তোমাদেরকে দেখি। বর্ণিত আছে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর বাগানে নামায পড়লেন। একটি বেগুনী রংয়ের পাখী বৃক্ষের উপর যাওয়ার জন্যে উড়ল। পাখীটি তাঁর কাছে খুবই সুন্দর মনে হল। তিনি এক মুহূর্ত সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফলে কত রাকআত নামায পড়লেন তা মনে রইল না। এর পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ফেতনার কথা উল্লেখ করলেন এবং আরজ করলেন ঃ আমি বাগানটি সদকা করে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করুন। অন্য এক ব্যক্তির কথা বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। বাগানের বৃক্ষসমূহ ফলভারে নুয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্য নামাযের মধ্যেই তার কাছে খুব ভাল লাগল। ফলে তিনি নামাযের রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলেন। বিষয়টি তিনি হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ বাগানটি সদকা করে দিলাম। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোট কথা, পূর্ববর্তী মনীষীগণ চিন্তার মূল কর্তন করার জন্যে এসব উপায় অবলম্বন করতেন। বাস্তবে চিন্তার কারণের মূলোৎপাটন করার পদ্ধতি এটাই। এছাড়া অন্য কোন কৌশল উপকারী হবে না। কেননা, মনকে নরমভাবে স্থির করার যে কথা আমরা লেখেছি, তা দুর্বল চিন্তার ক্ষেত্রে উপকারী। কিন্তু খাহেশ ও চিন্তা জোরদার হলে তাতে তা উপকারী নয়; বরং খাহেশ তোমাকে টানবে এবং তুমি খাহেশকে টানবে। শেষ পর্যন্ত খাহেশই প্রবল হবে এবং সমগ্র নামায এই দ্বন্দ্বের মাঝে অতিবাহিত হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত এই, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নীচে বসে তার চিন্তা সাফ রাখতে চায়। কিন্তু বৃক্ষের উপর পাখীরা বসে চেঁচামেচি করে তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত করে দেয়। লোকটি একটি লাঠি হাতে নিয়ে পাখীদেরকে উড়িয়ে দেয় এবং পুনরায় আপন চিন্তায় মশগুল হয়। পাখীরা আবার এসে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় কেউ এসে লোকটিকে বলল ঃ যে কৌশল তুমি অবলম্বন করেছ তা কখনও সফল হবে না। যদি তুমি এ থেকে নিষ্কৃতি চাও, তবে বৃক্ষটি উৎপাটিত করে দাও। খাহেশরূপী বৃক্ষের অবস্থাও তদ্রূপ। এর শাখা-প্রশাখা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর উপর চিন্তা পাখীদের ন্যায় দাপাদাপি করে অথবা আবর্জনার উপর মাছির ন্যায় ভন্‌ভন্‌ করে। মাছিকে তাড়িয়ে দিলে আবার আসে। মনের কুমন্ত্রণাও তেমনি। খাহেশ অনেক। মানুষ এ থেকে খুব কম মুক্ত। সবগুলোর মূল শিকড় এক, অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত। যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রয়েছে এবং যে দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহান্বিত, তার নামাযে নিবিষ্টতার স্বচ্ছ আনন্দ অর্জিত হওয়ার আশা করা উচিত নয়। তবুও তার মোজাহাদা তথা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যেভাবেই হোক মনকে নামাযের দিকে ফেরানো এবং চিন্তার কারণসমূহ হ্রাস করা উচিত। এ ওষুধ তিক্ত এবং মনের কাছে বিস্বাদ। কিন্তু রোগ পুরাতন ও দুরারোগ্য হয়ে গেছে। এমনকি, বুযুর্গগণ এমন দু'রাকআত নামায পড়ার ইচ্ছা করেছেন, যাতে দুনিয়ার বিষয়সমূহ মনে না আসে। কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়নি। তাঁরাই যখন এরূপ দু'রাকআত নামায পড়তে সক্ষম হলেন না, তখন আমাদের মত লোক এটা আশা করতে পারে কি? আমরা যদি কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত অর্ধেক কিংবা তিন ভাগের একা ভাগ নামাযও পাই, তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, যারা সৎকর্মের সাথে কুকর্মও মিশ্রিত করে দিয়েছে। মোট কথা, দুনিয়ার চিন্তা ও পরকালের সাহস এমন, যেমন তেলপূর্ণ পেয়ালায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পানি ঢাললে যে পরিমাণ পানি পেয়ালায় যাবে, সেই পরিমাণ তেল নিশ্চিতই বের হয়ে পড়বে। উভয়ের একত্র মিলন সম্ভবপর হবে না।

নামাযের প্রত্যেক রোকন ও শর্তের জরুরী বিষয়

আখেরাত কাম্য হলে নামাযের শর্ত ও রোকনসমূহে আমরা যেসকল বিষয় লেখছি, সেগুলো থেকে গাফেল না হওয়া অত্যাবশ্যক। নামাযের শর্ত অর্থাৎ যেসকল কাজ নামাযের পূর্বে হয়, সেগুলো এই ঃ ওয়াক্ত, পবিত্রতা অর্জন, উলঙ্গতা দূরীকরণ, কেবলামুখী হওয়া, সোজা দাঁড়ানো এবং নিয়ত করা। সুতরাং যখন মুয়াযযিনের আযান শুন, তখন অন্তরে কেয়ামতের ডাকের ভয়াবহতা উপস্থিত কর। আযান শুনামাত্রই বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে তাতে সাড়া দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে যাও এবং তাড়াতাড়ি কর। কেননা, যারা মুযাযযিনের আযান শুনে তাড়াতড়ি করবে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সোহাগ ভরে ডাকা হবে। আযান শুনার পর তুমি তোমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি তা আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ পাও, তবে জেনে রাখ, বিচার দিবসে তুমি সুসংবাদ ও সাফল্যের আওয়াজ শুনতে পাবে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ ارحنا يا بلال

অর্থাৎ, হে বেলাল! নামায ও আযান দ্বারা আমাকে সুখ ও স্বস্তি দান কর। কেননা, নামাযের মধ্যেই ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর চোখের শীতলতা।

পবিত্রতা সম্পর্কে কথা এই, তুমি যখন নামাযের জায়গা পাক করে নাও, এর পর কাপড় ও বাহ্যিক দেহ পবিত্র করে নাও, তখন অন্তরের পবিত্রতা থেকে গাফেল হয়ো না। এ পবিত্রতার জন্যে তওবা ও গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে এসব গোনাহ না করার জন্যে কৃতসংকল্প হও। এসব বিষয় দ্বারা অন্তরকে অবশ্যই পাক করে নাও।। কেননা, অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দেখার স্থান।

উলঙ্গতা দূরীকরণের অর্থ এরূপ মনে কর, বাহ্যিক দেহের যে অংশের উপর মানুষের দৃষ্টি পড়ে সেটা যখন আবৃত করবে, তখন অন্তরের যেসকল দোষত্রুটি পরওয়ারদেগার ব্যতীত কেউ জানে না, সেগুলো আবৃত করবে না কেন? সুতরাং সেসব দোষ অন্তরে উপস্থিত কর, সেগুলো আবৃত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করার জন্যে নফসকে অনুরোধ কর। এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি থেকে এসব দোষ গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু অনুতাপ, লজ্জা ও ভয় এগুলোর জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। এসব দোষ অন্তরে উপস্থিত করার ফলস্বরূপ তোমার অন্তরে লক্কায়িত ভয় ও লজ্জা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তখন নফস নত হবে এবং অনুতাপে অন্তর আচ্ছন্ন হবে। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সামনে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেমন পাপী, দুশ্চরিত্র ও পলাতক গোলাম তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে প্রভুর সামনে নতমস্তকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দণ্ডায়মান হয়।

কেবলামুখী হওয়ার অর্থ তো তোমার বাহ্যিক মুখমণ্ডল সব দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাবা গৃহের দিকে করে নেবে। এখন তুমি কি মনে কর, সকল কাজ কারবার থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে আল্লাহ্র আদেশের দিকে করা কাম্য নয়? কখনও এরূপ মনে করো না; বরং মনে কর, এটা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম সবগুলো অন্তরকে আন্দোলিত করার জন্যে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত ও একদিকে স্থির রাখার জন্যে। ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। সুতরাং দেহের প্রতি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অন্তরের প্রতিও মনোযোগ দরকার। অর্থাৎ, মুখমণ্ডল যেমন কাবা গৃহের দিকে থাকবে, যা মুখমণ্ডলকে অন্য সকল দিক থেকে না ফিরিয়ে হতে পারে না, তেমনি অন্তরও আল্লাহ তাআলার দিকে থাকবে, যা অন্তরকে সবকিছু থেকে মুক্ত না করে হতে পারে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় এবং তার খাহেশ, মুখমণ্ডল ও অন্তর আল্লাহ তাআলার দিকে থাকে, তখন সে জন্মদিনের মতই নিষ্পাপ অবস্থায় নামায খতম করে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এই, দেহ ও মন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে নির্দেশ পালনের জন্য দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় যে মাথা সমস্ত অঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ, তা নত ও বিনম্র হওয়া উচিত । মাথার উচ্চতা দূর করার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত, অন্তরে অনুনয় ও বিনয়ভাব অবশ্যই থাকবে। নামাযে দাঁড়ানো দ্বারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্মরণ করবে । মনে করবে, যেন তুমি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে আছ এবং তিনি তোমাকে দেখছেন। যদি তুমি এর যথার্থ প্রতাপ উপলব্ধি করতে না পার, তবে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন দুনিয়ার কোন বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে থাক; বরং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক ততক্ষণ এটা মনে কর, তোমাকে তোমার পরিবারের একজন খুব সাধু ব্যক্তি দেখে যাচ্ছে কিংবা যাকে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণতা দেখাতে চাও, সে তোমাকে দেখছে। কেননা, এরূপ কোন ব্যক্তি দেখলে তোমার হাত পা স্থির ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে থাকে, যাতে সে বলে, তুমি নামাযে বিনয় ও নম্রতা কর। অথচ সে প্রকৃতপক্ষে অক্ষম। সুতরাং একজন অক্ষম ব্যক্তির সামনে যখন তোমার মনের এই অবস্থা হয়, তখন মনকে এই বলে শাসাও, তুই আল্লাহ তা'আলার মারেফত ও মহব্বত দাবী করিস। তাঁর সামনে এরূপ করতে তোর লজ্জা হয় না? তুই একজন সামান্য বান্দার প্রতি সম্মান দেখাস এবং তাকে ভয় করিস, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করিস না। এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, লজ্জা কিভাবে হয়, তখন তিনি বললেন ঃ এমনভাবে লজ্জা কর, যেমন তোমার পরিবারের কোন সাধু ব্যক্তির সামনে লজ্জা করে থাক।

নিয়তের মধ্যে অন্তরে একথা পাকাপোক্ত করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নামাযের যে আদেশ করেছেন তা আমি মেনে নিয়েছি। এর পর আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ, তাঁর আযাবের ভয় এবং সওয়াবের প্রত্যাশা সহকারে নামায পূর্ণরূপে পড়া, নামাযের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা এবং একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সব কাজ করার সংকল্প করা উচিত। এক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে। বেআদব ও গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মোনাজাত করার অনুমতি দিয়েছেন। কার সাথে এবং কিভাবে মোনাজাত করছ, তা লক্ষ্য করবে। এমতাবস্থায় তোমার ঘর্মাক্ত কলেবর কম্পমান এবং ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া উচিত।

মুখে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর যেন এ উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে। অর্থাৎ, অন্তরে যদি অন্য কোন বস্তুকে আল্লাহ অপেক্ষা বড় মনে কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার সাক্ষ্য দেবেন, যদিও তোমার মৌখিক উক্তিটি সত্য হয়। যেমন, সূরা মুনাফিকুনে মোনাফেকদের মৌখিক সত্য উক্তি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ, তারা অন্তরে রেসালত স্বীকার করে না। কেবল মুখে বলে, আপনি আল্লাহর রসূল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শুরুর দোয়ায় তুমি বল–

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ -

অর্থাৎ, আমি আমার মুখ তাঁর দিকে করলাম, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

এখানে শরীরের মুখ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শরীরের মুখ তো তুমি কেবলার দিকে করেই রেখেছ। আল্লাহ কেবলার মধ্যে বেষ্টিত নন। হাঁ, অন্তরের মুখকে তুমি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে করতে পার। এখন চিন্তা কর, তোমার অন্তরের মুখ বাড়ী-ঘর, বাজার ও যাবতীয় কাজ-কারবারে রয়েছে, না আল্লাহ তা'আলার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে? খবরদার, নামাযের শুরুতেই মিথ্যা ও বানোয়াটকে প্রশ্রয় দিয়ো না। অতএব চেষ্টা করা উচিত যেন অন্তরের মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকেই থাকে। এটা সমগ্র নামাযে না পারলে যখন এ কলেমা মুখে বল, তখন তো কথাটা সত্য হওয়া উচিত। আর যখন মুখে বল حَنِيْفًا مُّسْلِمًا একাগ্রভাবে মুসলমান হয়ে– তখন মনে মনে চিন্তা কর, মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। তুমি বাস্তবে এরূপ না হলে একথায় মিথ্যাবাদী হবে। সুতরাং এরূপ হওয়ার জন্যে এখনই চেষ্টা কর। আর যখন বল وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আমি মুশরিকদের মধ্য হতে নই, তখন অন্তরে গোপন শেরকের কথা চিন্তা কর। কেননা–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।

এ আয়াতখানি সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার এবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও মানুষের প্রশংসা কামনা করে। সুতরাং এ শেরক থেকে যত্ন সহকারে বেঁচে থাকা উচিত। আর যখন তুমি মুখে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বল, তুমি মুশরিক নও আর এ শেরক থেকে মুক্ত হলে না, তখন তোমার খুব লজ্জিত হওয়া উচিত । কেননা অল্প হোক বেশী হোক – সবই শেরক। যখন বল – مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যে, তখন জানবে, তোমার অবস্থা গোলামের মত, যে নিজের পক্ষে নিরুদ্দেশ এবং মালিকের পক্ষে উপস্থিত । এ কলেমা যদি এমন ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়, যার হাসি, উঠাবসা, জীবনের আনন্দ ও মৃত্যু আতঙ্ক দুনিয়ার কাজের জন্যে হয়, তবে এ কলেমা তার অবস্থার সাথে সমাঞ্জস্যশীল নয়। যখন বল, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন জানবে, শয়তান তোমার দুশমন। সে তোমার অন্তরকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। কেননা, তুমি আল্লাহর জন্যে সেজদা কর– এটা তার জন্যে হিংসার কারণ । সে এক সেজদা বর্জন করার কারণে গলায় লানতের বেড়ি পড়েছে এবং অনন্তকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়েছে। তুমি যে শয়তান থেকে আশ্রয় চাও, এটা তখনই ঠিক হবে যখন শয়তানের পছন্দনীয় বিষয়াদি বর্জন কর এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন কর। কেবল মুখে আশ্রয় চাওয়া চথেষ্ট নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্যে যদি কোন হিংস্র জন্তু অথবা দুশমন আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তি নিজের স্থান ত্যাগ না করে মুখে বলে, আমি তোমা থেকে এই অজেয় দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করি, তবে এতে তার কোন উপকার হবে না। আশ্রয় তখনই হবে, যখন সে স্থান ত্যাগ করে দুর্গের মধ্যে চলে যাবে। এমনিভাবে যেব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসারী, যা শয়তানের প্রিয় ও আল্লাহর অপ্রিয়, তার জন্যে মুখে আউযু বিল্লাহ্ বলা উপকারী হবে না। বরং তাকে এই মৌখিক উক্তির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দুর্গে আশ্রয় নেয়ার ইচ্ছা করতে হবে। তাঁর দুর্গ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আমার দুর্গ। যেব্যক্তি আমার দুর্গে প্রবেশ করে, সে আযাব থেকে নিরাপদ থাকে । এ দুর্গে সে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, যার মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ নয় । যে তার খাহেশকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে, সে শয়তানের ক্ষেত্রে বিচরণ করে– আল্লাহ তা'আলার দুর্গে নয়। শয়তান মানুষকে নামাযের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরকাল চিন্তায় এবং সৎকর্মের ভাবনায় নিয়োজিত করে দেয় । এটাও শয়তানের একটা ধোঁকা, যাতে নামাযে যা পড়া হয়, নামাযী তা না বুঝে। মনে রেখ, কেরাআতের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক হয়, তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা। কেননা, জিহবা নাড়াচাড়া করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ বুঝা উদ্দেশ্য ।

কেরাআতের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার হয়ে থাকে – (১) যার জিহবা গতিশীল ; কিন্তু অন্তর গাফেল। (২) যার জিহবা নড়াচাড়া করে এবং অন্তর জিহবার অনুসরণ করে। সে ভাষা এমনভাবে বুঝে ও শুনে, যেন অন্যের কাছ থেকে শুনেছে। এটা আসহাবে ইয়ামীন তথা দক্ষিণপন্থীদের স্তর। (৩) যার অন্তর প্রথমে অর্থের দিকে দৌড়ে, এর পর জিহবা তার অনুসারী হয়ে সেসব অর্থ ব্যক্ত করে । নৈকট্যশীলদের জিহবা অন্তরের ভাষ্যকার ও অনুগামী হয়ে থাকে – অন্তর জিহবার অনুগামী হয় না। যখন বল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। তখন নিয়ত কর, আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম শুরু করার জন্যে তাঁর কাছে বরকত চাই। এর অর্থ এই মনে কর, সব বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। অতএব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ও ঠিক হয়। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর । কারণ, সকল নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেব্যক্তি কোন নেয়ামতকে গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে জানে অথবা গায়রুল্লাহর প্রশংসা করতে চায় এবং তাকে আল্লাহর আদেশের অধীন মনে করে না, তার জন্য বিসমিল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা ক্ষতিকর হবে। যখন বল, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম দয়ালু ও মেহেরবান, তখন অন্তরে তাঁর সকল প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য উপস্থিত কর, যাতে তাঁর রহমত তোমার কাছে প্রস্ফুটিত হয় এবং তুমি আশান্বিত হও। এরপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বিচার দিবসের মালিক বলে অন্তরে তাঁর তা'যীম ও ভয় জাগ্রত কর । কেননা, তিনি প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের মালিক। সুতরাং সেদিনের ভয়াবহতাকে ভয় করা উচিত । এরপর اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা তোমারই এবাদত করি বলে এখলাস নতুন করে নাও এবং শক্তি সামর্থ্য থেকে অক্ষমতা একথা দ্বারা নতুন করে নাও, وَاِيَّاكَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন অন্তরে এটা নিশ্চিত করে নাও, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁর এবাদতের তওফীক প্রাপ্ত হওনি। তোমাকে এবাদতের তওফীক দিয়ে এবং মোনাজাতের যোগ্য করে তিনি তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। যদি তিনি তোমাকে এবাদতের তওফীক থেকে বঞ্চিত করতেন, তবে তুমিও অভিশপ্ত শয়তানের সাথে দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হতে।

এসবের পর এখন তুমি তোমার সওয়াল নির্দিষ্ট কর এবং তাঁর কাছে তোমার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রার্থনা করে বল ঃ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এর ব্যাখ্যা ও বিবরণের জন্যে বল صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি হেদায়েতের নেয়ামত বর্ষণ করেছ। বলাবাহুল্য, তাঁরা হলেন পয়গম্বরগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ এবং পথভ্রষ্টদের পথও নয়। এরা হল কাফের ইহুদী, খৃষ্টান ও সাবেয়ী সম্প্রদায়। এর পর এই আবেদনের মঞ্জুরী চেয়ে বল اٰمِيْنَ অর্থাৎ এরূপই কর। এভাবে আলহামদু সূরা পাঠ করলে আশ্চর্য নয়, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এক হাদীসে কুদসীতে বলেন ঃ আমি নামাযকে আমার মধ্যে ও বান্দাদের মধ্যে আধাআধি করে নিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা তা পাবে যা সে চেয়েছে। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার উদ্দেশ্য তাই। এর অর্থ এই, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে। আল্লাহ তা'আলা মহান ও প্রতাপান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে স্মরণ করেছেন– এ ছাড়া নামাছে আর কিছু না থাকলে এটাই যথেষ্ট হত । কিন্তু যেখানে সওয়াবেরও আশা আছে, সেখানে তো সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। অনুরূপভাবে যে সূরা তুমি পাঠ কর, তার অর্থ বুঝার চেষ্টা কর। কেরাআত পাঠে আল্লাহ তাআলার আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা, শাস্তিবাণী, উপদেশ, পয়গম্বরগণের খবর ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখের ব্যাপারে তোমার গাফেল হওয়া উচিত নয়। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একটি হক আছে। উদাহরণতঃ ওয়াদার হক আশা করা, শাস্তিবাণীর হক ভয় করা, আদেশ ও নিষেধের হক তা পালন করার সংকল্প করা, উপদেশের হক উপদেশ গ্রহণ করা, অনুগ্রহ উল্লেখ করার হক তাঁর শোকর করা এবং পয়গম্বরগণের খবর বর্ণনার হক শিক্ষা গ্রহণ করা। নৈকট্যশীলরা এসব হক চেনেন এবং আদায় করেন। সেমতে যারারাহ্ ইবনে আবী আওফা নামাযে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ – (যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে) তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম নখয়ী যখন إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে) শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে পড়তেন এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকত। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি বিষণ্ন অবস্থায় নামায পড়তেন। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও শাস্তিবাণী দ্বারা অন্তর দগ্ধীভূত হওয়াই মানুষের জন্য উপযুক্ত। কেননা, গোনাহগার ও লাঞ্ছিত বান্দা প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে থাকে। এর পর কেরাআতে অক্ষরের উচ্চারণ ভালরূপে কর। দ্রুত পাঠ করো না। কেননা, আস্তে পাঠ করলে বুঝতে সহজ হয়। রহমত ও আযাবের আয়াতগুলো আলাদা আলাদা স্বরে পাঠ কর। ইবরাহীম নখয়ী এ ধরনের আয়াত অত্যন্ত নীচ স্বরে পাঠ করতেন–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন উপাস্য নেই।

বর্ণিত আছে, কোরআন পাঠককে কেয়ামতের দিন বলা হবে ঃ পাঠ কর এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হও। ভালরূপে পাঠ কর; যেমন দুনিয়াতে পাঠ করতে। সমগ্র কেরাআতে দণ্ডায়মান থাকার ইশারা হচ্ছে অন্তর আল্লাহ তাআলার সাথে একই অবস্থায় উপস্থিত থাকুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নামাযীর প্রতি মনোযোগী হন যে পর্যন্ত নামাযী অন্য দিকে ধ্যান না করে। অন্য দিকে দেখা থেকে মাথা ও চক্ষুর হেফাযত করা যেমন ওয়াজেব, তেমনি নামায ছাড়া অন্য দিকে ধ্যান করা থেকেও অন্তরের হেফাযত করা জরুরী। সুতরাং অন্তর অন্য দিকে সন্নিবেশিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হলে তাকে স্মরণ করাও যে, আল্লাহ তাআলা তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। অন্তরে খুশু জরুরী করে নাও। কেননা, অন্য দিকে ধ্যান করা থেকে মুক্তি খুশুরই ফল। অন্তর খুশু করলে বাহ্যিক অঙ্গও খুশু করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তর খুশু করত, তবে তার অঙ্গও খুশু করত। রাজা ও প্রজার অবস্থা একই রূপ হয়ে থাকে। তাই দোয়ায় বলা হয়েছে– এলাহী, রাজা ও প্রজা উভয়কে ঠিক কর। বলাবাহুল্য, রাজা হচ্ছে অন্তর এবং প্রজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাযে পেরেকের মত এবং ইবনে যুবায়র (রাঃ) কাঠের মত থাকতেন। কোন কোন বুজুর্গ রুকুতে এমনভাবে থাকতেন যে, পাখীরা পাথর মনে করে উপরে এসে বসত। এসব বিষয় দুনিয়াতে বাদশাহদের সামনে মনের চাহিদায় হয়ে যায়। অতএব, রাজাধিরাজ আল্লাহর অবস্থা যারা জানে, আল্লাহর সামনে তাদের এরূপ অবস্থা কেন হবে না? যেব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র সামনে খুশু করে এবং আল্লাহর সামনে তার হাত পা খেলাধুলায় মত্ত হয়, সে আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। সে জানে না, আল্লাহ্ তার অন্তর ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে জ্ঞাত।

الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও এবং নামাযীদের মধ্যে তোমার নড়াচাড়া দেখেন।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইকরিমা বলেন ঃ তিনি দাঁড়ানো, রুকু, সেজদা ও বসার সময় দেখেন। রুকু ও সেজদা আদায় করার সময় নতুন নিয়ত ও সুন্নত অনুসরণের সাথে তাঁর আযাব থেকে ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করে উভয় হাত উত্তোলন কর এবং নতুন নম্রতা সহকারে রুকু কর। মনকে নরম করার চেষ্টা কর এবং নিজের হেয়তা ও আল্লাহ্র ইযযত কল্পনা কর। অন্তরে এর উপস্থিতির জন্যে জিহ্বা দ্বারা সাহায্য লও; অর্থাৎ মুখে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ (আমার মহান প্রভু পবিত্র)–এ বাক্যটি বার বার বল, যাতে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য জোরদার হয়। এর পর রুকু থেকে মাথা তুলে তাঁর রহমত আশা কর। অন্তরের এই আশাকে মুখে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে জোরদার কর। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, আল্লাহ তার কথা শুনেন। এর পর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শোকর বয়ান কর। এতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব, প্রশংসা আপনারই) বল। প্রশংসা বৃদ্ধির জন্যে এ শব্দগুলোও বল مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ অর্থাৎ, পূর্ণ পৃথিবী ও পূর্ণ আকাশমণ্ডলী পরিমাণে আপনার প্রশংসা। এর পর সেজদার জন্যে নত হও। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের হেয়তা। নিজের মুখমণ্ডল, যা সকল অঙ্গের মধ্যে অধিকতর প্রিয়, তাকে সর্বনিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটির উপর স্থাপন কর। মাটিতে সরাসরি সেজদা সম্ভব হলে মাটিতেই সেজদা কর। কেননা, এতে অনেক অনুনয় বিনয় অর্জিত হয়। নিজেকে নীচতম জায়গায় রাখার পর জানবে, তুমি তোমার নফসকে যেখানকার ছিল সেখানেই রেখে দিয়েছ। তুমি মূলতঃ মাটি থেকেই সৃজিত হয়েছ এবং মাটিতেই পুনরায় ফিরে যাবে। তখন অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্য নতুনভাবে জাগ্রত কর এবং বল سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (আমার মহান প্রভু পবিত্র)– এ বাক্যটি বার বার বলে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য জোরদার কর। যখন তুমি তোমার অন্তর নরম হওয়ার কথা জানতে পার, তখন আল্লাহ্ তাআলার রহমত আশা কর। কেননা, তাঁর রহমত দুর্বল ও লাঞ্ছিতের দিকেই ধাবিত হয়– আস্ফালনকারীর দিকে নয়। এখন আল্লাহু আকবার বলতে বলতে মাথা উত্তোলন কর এবং একথা বলে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ হে রব! ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং যে গোনাহ আপনি জানেন, তা মার্জনা করুন। অথবা যে দোয়া তোমার পছন্দ হয় বল। এর পর বিনয় পাকাপোক্ত করার জন্যে এমনিভাবে দ্বিতীয় সেজদা কর। যখন তাশাহহুদের জন্যে বস, তখন আদবের সাথে বস এবং পরিষ্কার বল, নৈকট্যের যত কিছু রয়েছে– দরূদ হোক অথবা তাইয়্যেবাত তথা পবিত্র চরিত্র হোক, সকলই আল্লাহ্ তাআলার জন্যে। আত্তাহিয়্যাতুর অর্থ তাই। এর পর নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা অন্তরে উপস্থিত করে বল اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ (হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত হোক)। মনে মনে সত্যিকারভাবে কামনা কর, এই সালাম তাঁর কাছে পৌঁছবে এবং তিনি এর জওয়াব অধিকতর পূর্ণতা সহকারে তোমাকে দান করবেন। এর পর তুমি নিজের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাআলার সকল নেক বান্দার প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সালাম বল এবং আশা কর, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এর জওয়াবে নেক বান্দাদের সংখ্যা পরিমাণে পূর্ণ সালাম দান করবেন। এর পর আল্লাহ তাআলার একত্ব ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য দাও এবং শাহাদতের উভয় বাক্য পাঠ করে আল্লাহর অঙ্গীকারকে নতুন কর। নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত কোন দোয়া খুশু, নম্রতা, অসহায়তা, অক্ষমতা ও কবুল হওয়ার সত্যিকার প্রত্যাশা সহকারে পাঠ কর। দোয়ায় পিতামাতা ও সকল ঈমানদারকে শরীক কর। সালাম বলার সময় ফেরেশতা ও উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ত কর। সালাম দ্বারা নামায পূর্ণ করার নিয়ত কর এবং মনে মনে আল্লাহর শোকর কর, তিনি তোমাকে এই এবাদতটি পূর্ণ করার তওফীক দিয়েছেন। এটাকেই তোমার জীবনের শেষ নামায মনে কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ ছলে বলেছিলেন। নামায বিদায়ী নামাযের মত করে পড়। এর পর মনে মনে নামাযে ত্রুটি করার ভয় ও শরম কর এবং আশংকা কর, নামায কোথাও নামঞ্জুর না হয়ে যায়। এর সাথে সাথে এ আশাও কর, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় এ নামায কবুল করে নেবেন। ইয়াহইয়া ইবনে ওহাব নামায শেষে কিছুক্ষণ থেমে যেতেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে বিষণ্নতার ছাপ দৃষ্টিগোচর হত। ইব্রাহীম নখয়ী নামাযের পর এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন যেন তিনি রুগ্ন। এ অবস্থা সেসব নামাযীর, যারা নামাযে খুশু করেন, সর্বক্ষণ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর সাথে মোনাজাতে ব্যাপৃত হন। সুতরাং নামাযে এসকল বিষয়ের অনুবর্তী হওয়া মানুষের উচিত। এগুলোর মধ্য থেকে যতটুকু অর্জিত হয়, তার জন্যে আনন্দিত হওয়া এবং যতটুকু অর্জিত না হয়, তার জন্যে দুঃখ করা উচিত। গাফেলদের নামায তো সুখকর নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা রহমত করলে ভিন্ন কথা। তাঁর রহমত বিস্তৃত ও ব্যাপক। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন স্বীয় রহমত দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নেন এবং মাগফেরাত দ্বারা আমাদের দোষত্রুটি গোপন করে নেন। অক্ষমতা স্বীকার করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

জেনে রাখ নামাযকে আপদ থেকে পাক করা, একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করা এবং উল্লিখিত খুশু, তাযীম, শরম ইত্যাদি শর্ত সহকারে পড়া অন্তরে নূর হাসিল হওয়ার প্রধান উপায়। এ নূর কাশ্ফ তথা দিব্যদৃষ্টিতে দেখার চাবি। আল্লাহর ওলীগণ কাশফের মাধ্যমে যে আকাশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং প্রভুত্বের রহস্য জেনে নেন, তাও নামাযের মধ্যেই বিশেষতঃ সেজদাবস্থায় জেনে নেন। কেননা, সেজদার মাধ্যমে বান্দা তার পরওয়ারদেগারের নিকটবর্তী হয়। এজন্যেই আল্লাহ বলেন ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ সেজদা কর এবং নৈকট্য হাসিল কর। প্রত্যেক নামাযীর নামাযে ততটুকু কাশফ হয়, যতটুকু সে দুনিয়ার জঞ্জাল থেকে পাক পবিত্র থাকে। এটা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও কাশ্ফ শক্তিশালী, কারও দুর্বল, কারও কম, কারও বেশী কারও সুস্পষ্ট এবং কারও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারও সামনে হুবহু বিষয় উন্মোচিত হয় এবং কেউ বিষয়ের দৃষ্টান্ত জানতে পারেন। যেমন কেউ দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পেয়েছেন এবং শয়তানকে কুকুরের আকারে তার উপর বুক লাগিয়ে থাকতে দেখেছেন। কাশফের বিষয়ও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কারও সামনে তার ক্রিয়াকর্ম। কিন্তু মানুষ এসব কাশফের বিষয় অস্বীকার করতে খুবই তৎপর। কারণ, যে বিষয় প্রত্যক্ষ নয়, তা অস্বীকার করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। মাতৃগর্ভে শিশুর যদি বুদ্ধি জ্ঞান থাকত, তবে সে শূন্যে মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করত। অল্প বয়স্ক শিশুর যদি পার্থক্য জ্ঞান থাকত, তবে সে সেসব বিষয় অস্বীকার করত, যা বড়রা আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে জানে। মানুষের অবস্থা তাই। যে অবস্থায় সে থাকে তার পরবর্তী অবস্থা সে অস্বীকার করে। যেব্যক্তি ওলীত্বের অবস্থা স্বীকার করে না, তার জন্যে নবুওয়তের অবস্থা অস্বীকার করাও জরুরী। অথচ মানুষ অনেক অবস্থার মধ্যে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং নিজের স্তরের পরবর্তী স্তর অস্বীকার করা মানুষের উচিত নয়। যেব্যক্তি কাশফওয়ালা নয়, তার কমপক্ষে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেই প্রত্যক্ষ করে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আছে– বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাআলা নিজের ও তার মধ্যকার সকল পর্দা দূর করে দেন এবং তাকে নিজের সামনে নিয়ে আসেন। ফেরেশতারা তার কাঁধ থেকে নিয়ে শূন্য পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ে তার নামাযের সাথে নামায পড়ে এবং তার দোয়ায় আমীন বলে। নামাযীর উপর আকাশের শূন্য থেকে তার মাথার সিঁথি পর্যন্ত পুণ্য বর্ষিত হয়। একজন ঘোষক ঘোষণা করে– যদি এই মোনাজাতকারী জানত, কার সাথে সে মোনাজাত করছে, তবে এদিক ওদিক তাকাত না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামাযীদের জন্যে আকাশের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সাথে নামাযীর সততা নিয়ে গর্ব করেন। সুতরাং আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা নামাযীর মুখোমুখি হওয়া আমাদের বর্ণিত কাশফেরই ইঙ্গিত বহন করে। তওরাতে লিখিত আছে– আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সামনে ক্রন্দনরত অবস্থায় নামাযে দণ্ডায়মান হতে অক্ষম হয়ো না। কেননা, আমি তোমার অন্তরের নিকটবর্তী এবং তুমি গায়েব থেকে আমার নূর প্রত্যক্ষ করেছ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা জানতাম, নামাযী অন্তরের যে নম্রতা ও ক্রন্দন অনুভব করে, তা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের নিকটবর্তী হন, এ নৈকট্য স্থানের দিক দিয়ে নয় বিধায় হেদায়াত, রহমত ও পর্দা দূর করাই উদ্দেশ্য হবে। কথিত আছে, বান্দা যখন নামায পড়ে, তখন ফেরেশতাদের দশটি সারি তার জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করে। প্রত্যেক সারিতে দশ হাজার ফেরেশতা থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এই বান্দাকে নিয়ে এক লক্ষ্য ফেরেশতার সামনে গর্ব করে থাকেন। এর এক কারণ, মানুষ নামাযে একই সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, বসে, রুকু করে এবং সেজদা করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব কাজ চল্লিশ হাজার ফেরেশতার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের মধ্যে যারা দণ্ডায়মান, তারা কেয়ামত পর্যন্ত রুকু করবে না; যারা রুকুকারী তারা সেজদা করবে না; আর যারা সেজদাকারী, তারা কেয়ামত পর্যন্ত মাথা তুলবে না। উপবিষ্টদের অবস্থাও তদ্রূপ। দ্বিতীয় কারণ, ফেরেশতাদেরকে যে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, তা সর্বদা অপরিবর্তনীয়। এতে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। সেমতে কোরআন পাকে স্বয়ং ফেরেশতাদের উক্তি বর্ণিত আছে– وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (আমাদের প্রত্যেকের জন্যে এক নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে)। এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থা ফেরেশতাদের মত নয়। মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি করতে থাকে। সে সর্বক্ষণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং এতে উন্নতি করতে থাকে। এ উন্নতির দ্বার ফেরেশতাদের জন্যে রুদ্ধ। তাদের প্রত্যেকের সেই মর্যাদা যার উপর সে দণ্ডায়মান এবং সে এবাদত নির্দিষ্ট, যাতে সে মশগুল। তার না মর্যাদা পরিবর্তিত হয়, না সে এবাদতে ক্রটি করে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ يُسَبِّحُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার এবং অলসতা করে না। তারা দিবারাত্র পবিত্রতা বর্ণনা করে- ক্লান্ত হয় না।

উন্নতির চাবিকাঠি নামাযে নিহিত। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থাৎ, যারা নামাযে খুশু করে, সেই মুমিনরাই সফল।

এখানে ঈমানের পর এক বিশেষ নামাযের গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে নামাযে খুশু থাকে। এর পর এই সফলকামদের গুণাবলী নামাযী দ্বারা খতম করে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ -অর্থাৎ, এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে খবরদার। এরপর এসব গুণের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

অর্থাৎ, তারাই অধিকারী জান্নাতুল ফেরদাউসের, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আমি জানি না, যারা মনকে গাফেল রেখে কেবল জিহ্বা নাড়াচাড়া করে, তারা এই মহান মর্যাদার অধিকারী হবে কিভাবে? এজন্যেই তাদের বিপরীত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ -

অর্থাৎ, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে ঃ আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

মোট কথা, নামাযীরাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, আল্লাহ তাআলার নূর প্রত্যক্ষ্যকারী এবং তাঁর নৈকট্য দ্বারা লাভাবান হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এমন লোকদের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন, যাদের কথা ভাল এবং কাজ মন্দ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন আমরা খুশুকারীদের কয়েকটি প্রাণোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

প্রকাশ থাকে যে, খুশু ঈমান ও বিশ্বাসের ফল। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের উপলব্ধি থেকে অর্জিত হয়। যে খুশু অর্জন করে, সে নামাযে এবং নামাযের বাইরে খুশু করে। এমনকি, নির্জনে এবং পায়খানায়ও খুশু করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অবগত– এ জ্ঞানই খুশুর কারণ। এছাড়া আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জ্ঞান থেকেও খুশু সৃষ্টি হয়। এ তিনটি জ্ঞান কেবল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ ও খুশুর কারণে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করেননি। রবী ইবনে খায়সাম দৃষ্টি ও মস্তক এতটা নত রাখতেন যে, কিছু লোক তাঁকে অন্ধ মনে করত। তিনি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর গৃহে কুড়ি বছর পর্যন্ত যাতায়াত করেন। তাঁর বাঁদী খায়সামাকে দেখে বলত ঃ আপনার অন্ধ বন্ধু আগমন করেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একথা শুনে মুচকি হাসতেন। তিনি যখন দরজার কড়া নাড়া দিতেন, তখন বাঁদী বের হয়ে তাঁকে নতমস্তক ও চক্ষু মুদিত অবস্থায় দেখতে পেত।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁকে দেখে বলতেন ঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

অর্থাৎ, অনুনয়কারীদেরকে সুসংবাদ শুনাও।

তিনি আরও বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে দেখলে খুবই প্রীত হতেন । একদিন তিনি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর সাথে কর্মকারদের মধ্যে গেলেন। যখন আগুনের শিখা প্রজ্বলিত দেখলেন, তখন সজোরে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) নামাযের সময় পর্যন্ত তাঁর শিয়রে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফিরে এল না। অবশেষে তাঁকে পিঠে তুলে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। পরের দিন প্রায় সেই সময়ে তাঁর হুশ হল, যে সময়ে বেহুশ হয়েছিলেন । ফলে পাঁচটি নামায তাঁর কাযা হয়ে গেল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁর শিয়রে বসে বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, ভয় একেই বলে। এই রবী ইবনে খায়সম বলতেন ঃ আমি এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করেছি, আমি কি বলি এবং আমাকে কি বলা হবে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ নামাযে খুশুকারীদের অন্যতম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছিলেন। তিনি যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর কন্যা দফ্ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাত এবং মহিলারা পরস্পর ইচ্ছামত কথাবার্তা বলত । কিন্তু তিনি কিছুই শুনতেন না এবং বুঝতেন না। একদিন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন কোন কথা বলে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমার দন্ডায়মান হওয়া এবং সেখান থেকে দু'গৃহের মধ্যে থেকে একটির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে উদয় হয়। কেউ বলল ঃ আমাদের মনে দুনিয়ার যেসব কথাবার্তা আসে, সেগুলো আপনি অন্তরে পান ? তিনি বললেন ঃ যদি আমার দেহে বর্শা বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার চলে যায়, তবে এটা আমার কাছে নামাযে দুনিয়ার কথা চিন্তা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। মুসলিম ইবনে ইয়াসারও এমনি বুযুর্গ ছিলেন । নামায পড়ার সময় মসজিদের একাংশ ভূমিসাৎ হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা টের পারননি। জনৈক বুযুর্গের একটি অঙ্গ পচে যাওয়ার কারণে তা কেটে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি তাতে সম্মত হলেন না। এক ব্যক্তি বলল ঃ নামাযের মধ্যে তিনি কোন কষ্ট টের পান না। সেমতে নামাযে থাকা অবস্থায় তাঁর অঙ্গ কর্তন করা হল । জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন দুনিয়ার কোন কথা চিন্তা করে কি? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ নামাযের মধ্যেও করে না এবং নামাযের বাইরেও করে না। কোন কোন বুযুর্গ কুমন্ত্রণার ভয়ে সংক্ষেপে নামায পড়তেন। বর্ণিত আছে, আম্মার ইবনে ইয়াসির সংক্ষেপে একটি নামায আদায় করলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সংক্ষেপে পড়লেন কেন? তিনি বললেন ঃ তুমি দেখেছ, আমি নামাযের সীমা একটুও হ্রাস করিনি। আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে পড়েছি। বর্ণিত আছে, হযরত তালহা ও যুবায়র (রাঃ) সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন । তাঁরা বলতেন ঃ এতটুকু দ্বারা আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে দেই। আবুল আলিয়াকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (যারা তাদের নামাযে উদাসীন)- এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন ঃ যারা জানে না, কত রাকআতের পর নামায শেষ হবে। হাসান বসরী বলেন ঃ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের সময় নামায পড়তে ভুলে যায়; এমনকি সময় অতিবাহিত হয়ে যায় । কেউ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ বলেন ঃ যারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া সওয়াব এবং বিলম্বে পড়া গোনাহ মনে করে না। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক নামায পড়লেন এবং তাঁর কেরাআতে একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কেরাআতে কি পাঠ করেছি ? সকলেই চুপ করে রইল। হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আপনি অমুক সূরা পাঠ করেছেন এবং তার মধ্য থেকে অমুক আয়াতটি ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা জানি না, আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে কি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উবাইকে বাহবা দিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্যে করে বললেন ঃ তোমাদের কি হল, তোমরা নামাযে উপস্থিত হও এবং কাতার পূর্ণ কর। তোমাদের নবী তোমাদের সামনে থাকেন। কিন্তু তোমরা টের পাও না, তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে কি পাঠ করেন? শুন, বনী ইসরাঈলও এমন করেছিল । আল্লাহ তাআলা তাদের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন –তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তোমরা আপন দেহ আমার সামনে রাখ এবং আপন কথা আমাকে দাও; কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে অনুপস্থিত থাক। তোমরা যা করছ, তা বাতিল। এ থেকে বুঝা যায়, ইমামের কেরাআত শ্রবণ করা ও বুঝা নিজে সূরা পাঠ করার স্থলাভিষিক্ত। মোট কথা, এসব কাহিনী একথা জ্ঞাপন করে যে, নামাযের মূল বিষয় হচ্ছে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি । গাফেল অবস্থায় কেবল নড়াচড়া করা আখেরাতে কম ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও খুশুর তওফীক দান করুন।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমামের করণীয়

প্রকাশ থাকে যে, নামাযের পূর্বে কেরাআত ও আরকানের মধ্যে এবং সালামের পরে ইমামের কিছু কিছু করণীয় রয়েছে। নামাযের পূর্বে ইমামের করণীয় ছয়টি ঃ

(১) যারা তাঁকে পছন্দ করে না, সে তাদের ইমামতি করবে না। যদি কতক লোক নাপছন্দ করে এবং কতক পছন্দ করে, তবে সংখ্যাধিক্যের অভিমত কার্যকর হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু লোক সৎ ও দ্বীনদার হলে তাদের কথাই ধর্তব্য হওয়া উত্তম । হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার উপরে উঠে না। এক, পলাতক গোলাম; দুই, যে মহিলার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিন, এমন লোকদের ইমাম, যারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। মুসল্লীদের অসন্তুষ্টির সাথে ইমামতি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি তখনও নিষিদ্ধ যখন মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ বেশী আলেম ও কারী হয়। হাঁ, যদি সে ইমামতি না করে, তবে অন্য লোক আগে যেতে পারে। এসব ব্যাপার না থাকলে মুসল্লীরা আগে যেতে বললে আগে চলে যাবে। একে অপরকে ইমামতি করতে বলা মাকরূহ। কথিত আছে, তকবীর হয়ে যাওয়ার পর কিছু লোক ইমামতি করার জন্যে একে অপরকে বলার কারণে তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন । এর কারণ ছিল এই, তাঁরা ইমামতির জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন অথবা নিজের জন্যে ভুলের আশংকা এবং মানুষের নামাযের ক্ষতিপূরণ দানের ভয় করতেন। কেননা, ইমাম মুক্তাদীদের নামাযের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। আরেক কারণ ছিল, তাঁদের মধ্যে যেব্যক্তি ইমামতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁর অন্তর মুক্তাদীদের কাছে শরমের কারণে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে যেত; বিশেষতঃ সরবে কেরাআত পড়ার অবস্থায়। ফলে নামাযে এখলাস থাকত না।

(২) কাউকে আযান ও ইমামতির মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্বাধীনতা দেয়া হলে তার উচিত ইমামতি গ্রহণ করা। কেননা, উভয়টি ফযীলতের কাজ হলেও একই ব্যক্তির জন্য উভয় কাজ করা মাকরূহ। ইমাম ও মুয়াযযিন ভিন্ন ভিন্ন লোক হওয়া উচত। উভয়টি যখন একত্রিত করা যায় না, তখন ইমামতিই উত্তম। কেউ কেউ আযান উত্তম বলেছেন। আমরা এর ফযীলত ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আযান উত্তম হওয়ার আরেক কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন–

الامام ضامن والمؤذن مؤتمن

অর্থাৎ, ইমাম জামানতদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার।

এতে জানা গেল, ইমামতির মধ্যে জামানতের আশংকা আছে। আরও এরশাদ হয়েছে–

الامام امير فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا

অর্থাৎ, ইমাম শাসক, যখন সে রুকু করে তোমরা রুকু কর এবং যখন সে সেজদা করে তখন তোমরা সেজদা কর।

হাদীসে আরও আছে– যদি ইমাম নামায পুর্ণ করে, তবে সওয়াব সে এবং মুক্তাদী সকলেই পাবে। আর যদি অপূর্ণ নামায পড়ে, তবে শাস্তি তারই হবে– মুক্তাদীদের নয়। এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সৎপথ দেখান এবং মুয়াযিনদেরকে ক্ষমা করুন।

অতএব মাগফেরাত তলব কারা উচিত। কেননা, সৎপথ প্রার্থনাও মাগফেরাতের জন্যেই হয়।

এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি এক মসজিদে সাত বছর ইমামতি করে তাঁর জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। আর যে চল্লিশ বছর আযান দেয়, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণিত আছে, এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে, ইমামতি উত্তম। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওমর (রাঃ) স্থায়ীভাবে ইমামতি করেছেন। এটা ঠিক, এতে জামানতের আশংকা আছে; কিন্তু ফযীলতও আশংকার সাথেই হয়ে থাকে। যেমন শাসক ও খলীফা হওয়া উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছরের এবাদত থেকে উত্তম। বলাবাহুল্য, এটাও আশংকামুক্ত নয়। ইমামতি উত্তম বিধায় ইমামের অধিক আলেম হওয়া ওয়াজিব। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইমাম তোমাদের শাফায়াতকারী হবে। সুতরাং তোমরা নামায সাফ করতে চাইলে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানাও ।

জনৈক মনীষী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের পর আলেমদের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। আলেমগণের পর ইমামগণের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। কেননা, এ তিনটি পক্ষই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মখলুকের মধ্যে মাধ্যম। পয়গম্বরগণ নবুওয়তের কারণে; আলেমগণ এলেমের কারণে এবং ইমামগণ দ্বীনের প্রধান স্তম্ভ নামাযের কারণে এবং সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যে একেই প্রমাণস্বরূপ উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেছিলেন ঃ নামায ধর্মের স্তম্ভ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাঁকে আমাদের দ্বীনের জন্যে পছন্দ করেছিলেন, তাঁকেই আমরা আমাদের দুনিয়ার জন্যে পছন্দ করলাম। সাহাবায়ে কেরাম হযরত বেলালকে খেলাফতের জন্যে পছন্দ করেননি এবং এই যুক্তি দেননি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে আযানের জন্যে পছন্দ করেছিলেন। আযান উত্তম। তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্যে পছন্দ করে নেই।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলঃ আমাকে এমন আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি মুয়াযযিন হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটা আমা দ্বারা হবে না। তিনি বললেন ঃ তবে ইমাম হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ তবে ইমামের পেছনে নামায পড়। এ হাদীসে অগ্রে আযানের কথা বলার কারণে আযানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ মনে করেছিলেন, লোকটি ইমামতি করতে রাজি হবে না। কেননা, আযান তার ইচ্ছাধীন কাজ। ইমামতি অন্যরা নিযুক্ত করলে এবং আগে বাড়িয়ে দিলে হয়। তাই প্রথমে মুয়াযযিন হতে বলেছেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৩) ইমাম নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়বে। কেননা, আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত শেষ ওয়াক্তের উপর এমন, যেমন পরকালের ফযীলত ইহকালের উপর। হাদীসে আছে, বান্দা শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ে, এতে তার নামায ফউত হয় না; কিন্তু আউয়াল ওয়াক্ত তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। জামাআত বড় হবে– এই আশায় নামায দেরীতে আদায় করা উচিত নয়; বরং আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত হাসিলে তৎপর হওয়া উচিত। নামাযে লম্বা সূরা পাঠ করবে। এটা জামাআত বড় হওয়ার তুলনায় উত্তম। মনীষীগণ দুব্যক্তি এসে গেলে জামাআতের জন্যে তৃতীয় জনের অপেক্ষা করতেন না এবং জানাযায় চার জন এসে গেলে পঞ্চম জনের অপেক্ষা করতেন না। একবার সফরে ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওযুর কারণে বিলম্ব হয়ে গেলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমাম করে দেয়া হলে তিনি নামায পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামাআতের সাথে এক রাকআত ফউত হয়ে যায়। তিনি তা পড়ার জন্যে দণ্ডায়মান হলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ ঘটনার জন্যে আমরা মনে মনে ভীত ছিলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা ঠিকই করেছ এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। একবার যোহরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেরী হয়ে গেলে মুসল্লীরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সামনে বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আগমন করলেন, তখন সকলেই নামাযে ছিল, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুয়াযযিন ইমামের জন্যে অপেক্ষা করবে– ইমাম মুয়াযযিনের জন্যে নয়। ইমাম এসে গেলে অন্য কারও জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না।

(৪) ইমাম এখলাসের সাথে ইমামতি করবে এবং নামাযের সকল শর্তে আল্লাহ তাআলার আমানত আদায় করবে। এখলাস এই, ইমামতির জন্যে কোন পারিশ্রমিক নেবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান ইবনে আবুল আছ সকফীকে আমীর নিযুক্ত করে বললেন ঃ এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন করবে, যে আযানের জন্যে পারিশ্রমিক না নেয়। আযান নামাযের সহায়ক উপায়। এর জন্য যখন পারিশ্রমিক না নিতে বলেছেন, তখন নামাযের জন্যে আরও উত্তমরূপে না নেয়া উচিত। ইমাম যদি মসজিদের জন্যে ওয়াকফকৃত আমদানী থেকে নিজের ভরণ-পোষণ নিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নেয় অথবা বাদশাহের কাছ থেকে অথবা জনগণের কাছ থেকে কিছু পায়, তবে এটা নেয়া হারাম নয়, কিন্তু মাকরূহ। তারাবীহর ইমামতির জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া ফরয নামাযের ইমামতির জন্যে নেয়া অপেক্ষা অধিক মাকরূহ। এ পারিশ্রমিক ইমাম নিজের নিয়মিত উপস্থিতি এবং মসজিদের সাজসরঞ্জাম দেখাশোনা করার বিনিময়ে মনে করে নেবে– নামাযের বিনিময় নয়। আমানত হল, অন্তরে পাপাচার, কবীরা গোনাহ ও সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা। ইমামতির দায়িত্ব পালনকারীকে এসব বিষয় থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, সে মানুষের শাফায়াতকারী ও তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী হয়ে থাকে। কাজেই তাদের মধ্যে তাঁর উত্তম ব্যক্তি হওয়া উচিত। এমনিভাবে বেওযু হওয়া থেকে এবং নাপাকী থেকে পাক হতে হবে। কেননা, এসব বিষয় সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত হয় না। সুতরাং নামাযের মধ্যে বেওযু হওয়ার কথা স্মরণ হলে অথবা ওযু নষ্ট হয়ে গেলে লজ্জা করবে না; বরং নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তির হাত ধরে তাকে খলীফা করে দেবে। নামায চলাকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাপাকীর কথা স্মরণ হলে তিনি খলীফা নিযুক্ত করে দেন এবং গোসল করে পুনরায় নামাযে শরীক হন। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ে নাও; কিন্তু পাঁচ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ো না–

(১) যে সর্বদা মদ্যপান করে, (২) প্রকাশ্য পাপাচারী, (৩) পিতামাতার নাফরমান, (৪) বেদআতী এবং (৫) পলাতক গোলাম।

(৫) কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত এবং ডানে-বামে না দেখা পর্যন্ত ইমাম নিয়ত বাঁধবে না। কাতারসমূহে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ইমাম তা ঠিক করে নিতে বলবে। আগেকার মনীষীগণ কাঁধে কাঁধ মিলাতেন এবং পরস্পরের হাঁটু মিলিয়ে নিতেন। মুয়াযযিন একামতের জন্যে এতটুকু অপেক্ষা করবে, যেন আহারকারী আহার শেষ করে নেয় এবং কেউ প্রস্রাব-পায়খানায় থেকে থাকলে তা থেকে ফারেগ হয়ে যায় । কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাব-পায়খানার চাপের মুখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

(৬) ইমাম তকবীরে তাহরীমা ও সকল তকবীর সজোরে বলবে এবং মুক্তাদী এমনভাবে বলবে যেন নিজে শুনে। ইমাম তকবীর বলার পরে মুক্তাদী তকবীর বলবে; অর্থাৎ, ইমামের তকবীর শেষ হলে মুক্তাদী তকবীর শুরু করবে। একাকী নামায পড়ার সময় ইমামতির নিয়ত করে

www.islamfind.wordpress.com

দাঁড়াবে, যাতে সওয়াব পাওয়া যায়। যদি ইমামতির নিয়ত না করে এবং লোকেরা এসে তাঁর এক্তেদার নিয়ত করে, তবে সকলের নামায হয়ে যাবে এবং মুক্তাদীরা জামাআতের সওয়াবও পাবে; কিন্তু ইমাম ইমামতির সওয়াব পাবে না।

কেরাআতের মধ্যে ইমামকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন– (১) শুরুর দোয়া, আঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হবে। আলহামদু ও অন্য সূরা ফজরের উভয় রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে সজোরে পড়বে। একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তিও এমনিভাবে পড়বে।

(২) সূরা পাঠ করার পর রুকুর পূর্বে ইমাম সামান্য বিরতি দেবে, যাতে কেরাআত রুকুর তকবীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেরাআত তকবীরের সাথে মিলিয়ে দিতে হাদীসে নিষেধ আছে।

ফজরের নামাযে মাসানী থেকে দুটি সূরা পড়বে– যাতে একশ' আয়াতের কম থাকে। ফজরের নামাযে দীর্ঘ কেরাআত পড়া সুন্নত । কোন কোন আলেম সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা মাকরূহ লেখেছেন। এটা তখন যখন কোন সূরার প্রথমাংশ পড়ে ছেড়ে দেয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা ইউনুসের কিছু অংশ পাঠ করেছেন। যখন মূসা (আঃ) ও ফেরআউনের আলোচনা এসেছে, তখন রুকুতে চলে গেছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি ফজরের নামাযে সূরা বাকারার এক আয়াত– قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا কে এক রাকআতে এবং দ্বিতীয় রাকআতে– رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ পাঠ করেছেন। তিনি শুনলেন, বেলাল বিভিন্ন সূরা থেকে পাঠ করেন। তাঁকে এর কারণে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের সাথে মিলিয়ে পড়ি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, বেশ তাই কর। যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত, আছরে এর অর্ধেক এবং মাগরিবে মুফাসসালের শেষ আয়াতসমূহ অথবা শেষ সূরাসমূহ পাঠ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশেষ যে মাগরিবের নামায পড়েছিলেন, তাতে সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। এর পর ওফাত পর্যন্ত তিনি নামায পড়েননি। সারকথা, সংক্ষিপ্ত কেরাআত পাঠ করা উত্তম; বিশেষতঃ যখন জামাআত খুব বড় হয়। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ লোকজনকে নামায পড়ায়, তখন সংক্ষিপ্ত কেরাআত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পড়বে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কাজের লোক থাকে। একাকী পড়লে যত ইচ্ছা লম্বা কেরাআত পড়বে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এক জনগোষ্ঠীকে এশার নামায পড়াতেন। একদিন তিনি তাতে সূরা বাকারা পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা পড়ে নিল। লোকেরা বলাবলি করল, লোকটি মোনাফেক হয়ে গেছে। লোকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি মুয়ায ইবনে জাবালকে শাসিয়ে বললেন ঃ তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে এবং ধর্মচ্যুত করতে চাও? তুমি সূরা আ'লা, সূরা তারেক ও সূরা যুহা পাঠ কর।

নামাযের রোকনসমূহের মধ্যে ইমাম রুকু ও সেজদা হালকা করবে এবং তিন বারের বেশী তসবীহ পড়বে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নামায আর কারও দেখিনি। এ নামায হালকাও হত এবং পূর্ণরূপে আদায় হত। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে নামায পড়লেন যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি এই যুবকের নামাযকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে দশ দশ বার তসবীহ বলতাম। এটা ভাল; কিন্তু জামাআত বড় হলে তিন বার বলা উত্তম। জামাআতে কেবল দ্বীনদার সাধক শ্রেণীর লোক থাকলে দশ বার বলায় ক্ষতি নেই। মুক্তাদীরা ইমামের আগে কোন কিছু করবে না; বরং রুকু ও সেজদায় তাঁর পশ্চাতে যাবে। ইমামের মাথা মাটিতে না পৌঁছা পর্যন্ত মুক্তাদী সেজদার জন্যে নত হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক্তেদা এভাবেই করতেন। ইমাম রুকুতে ভালরূপে না যাওয়া পর্যন্ত মুক্তাদী রুকুর জন্যে নত হবে না। সালাম ফেরানোর সময় ইমাম উভয় সালামে মুসল্লী ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। ফরয নামায পড়ার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র নফল নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এরূপই করেছেন। হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের পর নিম্নোক্ত দোয়া বলা পর্যন্ত বসে থাকতেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমামতির এসব নিয়ম-নীতি পালন করার তওফীক দিন।

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুমআর ফযীলত

জানা উচিত, জুমআর দিন একটি মহান দিন। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ইসলামকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং একে মুসলমানের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, যখন জুমআর দিন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে।

এ আয়াতে দুনিয়ার কাজকর্মে মশগুল হওয়া এবং জুমআয় যাওয়ার পরিপন্থী সকল কাজ-কারবার হারাম করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله عزوجل فرض عليكم الجمعة فى يومى هذا فى مقامى هذا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমআ ফরয করেছেন আমার এদিনে ও এ স্থানে। এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ

من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি বিনা ওযরে তিন বার জুমআ তরক করে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। সে জুমআ ও জামাআতে উপস্থিত হত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। এখন তার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন ঃ সে দোযখী । লোকটি একমাস পর্যন্ত তাঁর কাছে এসে এ প্রশ্নই করল এবং তিনি উত্তর দিলেন, সে দোযখী। হাদীসে আছে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে জুমআর দিন দেয়া হলে তারা এতে বিরোধ করল। তাই তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ উম্মতের জন্যে একে ঈদ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তাঁর হাতে একটি উজ্জ্বল আয়না ছিল। তিনি বললেন ঃ এটা জুমআ । যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন, যাতে আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্যে এটা ঈদ হয় । আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জুমআ দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে? তিনি বললেন ঃ এতে একটি সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত আছে। যেব্যক্তি এ মুহূর্তে নিজের কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে, যদি সেই কল্যাণ তার নসীবে না থাকে, তবে তার তুলনায় অনেক বেশী তার জন্য সঞ্চিত রাখবেন। অথবা কেউ এ মুহূর্তে কোন বালা মসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে যদি সেই বালা মসিবত তার নসীবে লেখা থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা বালা-মুসিবত অপেক্ষা বড় বালা-মসিবত থেকেও তাকে রক্ষা করবেন। আমাদের কাছে এদিন সকল দিনের সর্দার। আমরা একে আখেরাতে يوم المزيد বৃদ্ধির দিন বলব। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আপনার পরওয়ারদেগার জান্নাতে একটি শুভ্র ও মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত উপত্যকা নির্দিষ্ট করেছেন। জুমআর দিন হলে তিনি ইল্লিয়্যীন থেকে তথায় তাঁর সিংহাসনে অবতরণ করবেন এবং মানুষের জন্যে দ্যুতি বিকিরণ করবেন, যাতে তারা তাঁকে দেখতে পায়। এক হাদীসে আছে, যে সর্বোত্তম দিনের উপর সূর্য উদিত হয়েছে, তা হচ্ছে জুমআর দিন। এদিনে হযরত আদম (আঃ) সৃজিত হয়েছেন। এদিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। এদিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয়েছে। এদিনেই তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। এদিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে। এদিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন আল্লাহর কাছে বৃদ্ধির দিন। আকাশে ফেরেশতারা একে তা-ই বলে। এদিনেই জান্নাতে খোদায়ী দীদার হবে।

হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জুমআর দিনে ছয় লক্ষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন জুমআর দিন সহি-সালামত থাকে, তখন অন্য দিনও সহি-সালামত থাকে। তিনি আরও বলেছেন ঃ প্রত্যহ সূর্য যখন আকাশের মাঝখানে থাকে, তখন দোযখ উত্তপ্ত করা হয়। তখন নামায পড়ো না; কিন্তু জুমআর দিন সবটুকুই নামাযের সময়। এদিনে দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না। হযরত কা'ব বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা শহরসমূহের মধ্যে মক্কা মোয়াযযমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, মাসসমূহের মধ্যে রমযানকে, দিনসমূহের মধ্যে জুমআকে এবং রাত্রিসমূহের মধ্যে শবে কদরকে ফযীলত দিয়েছেন। কথিত আছে, পক্ষীসমূহ এবং ইতর কীট-পতঙ্গ জুমআর দিনে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ সালাম, সালাম, এটা ভাল দিন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে শহীদের সওয়াব লেখেন এবং কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেন।

জুমআর শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য নামাযে যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো জুমআর মধ্যেও শর্ত। কিন্তু কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত জুমআর মধ্যে রয়েছে, যা অন্যান্য নামাযে নেই। প্রথমতঃ যোহরের সময় হওয়া। সুতরাং যদি জুমআর নামাযে ইমামের সালাম আসরের সময়ে পড়ে যায়, তবে জুমআ বাতিল হবে। তখন ইমামের জন্যে জরুরী হবে, দু'রাকআত আরও বাড়িয়ে যোহর পূর্ণ করা। দ্বিতীয়তঃ জুমআর জন্যে উপযুক্ত স্থান শর্ত। সুতরাং জঙ্গলে, বিজন স্থানে ও তাঁবুতে জুমআর নামায হয় না। এর জন্যে অস্থাবর দালান বিশিষ্ট স্থান জরুরী। তৃতীয়তঃ জামাআত হওয়া শর্ত। শাফেয়ী মাযহাবে কমপক্ষে চল্লিশ জন এবং হানাফী মাযহাবে ইমামসহ তিন জন হওয়া জরুরী। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের কয়েক জায়গায় জুমআ হলে যে ইমাম শ্রেষ্ঠ, তাঁর পেছনে জুমআ পড়া উত্তম। এক্ষেত্রে মুসল্লীদের সংখ্যাধিক্যও লক্ষণীয় ব্যাপার। চতুর্থতঃ দু'খোতবা দেয়া এবং উভয় খোতবার মাঝখানে বসা। প্রথম খোতবায় চারটি বিষয় থাকা ওয়াজিব– (১) আল্লাহর প্রশংসা করা এবং কমপক্ষে আলহামদু লিল্লাহ বলা, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৩) তাকওয়ার উপদেশ দেয়া এবং (৪) কোরআন পাক থেকে একটি আয়াত পাঠ করা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খোতবায়ও এ চারটি বিষয় ওয়াজিব। কিন্তু আয়াত পাঠের জায়গায় দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব। উভয় খোতবা শ্রবণ করাও ওয়াজিব।

প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান মুসলমান ব্যক্তির উপর জুমআ ফরয। যাদের উপর জুমআ ফরয তাদের জন্যে বৃষ্টি, কর্দমাক্ততা, ভয়, অসুস্থতা ও অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশুনা করার ওযরে জুমআ তরক করার অনুমতি আছে। তাদের জন্যে জুমআর নামায শেষ হওয়ার পর যোহর পড়া মোস্তাহাব। যদি জুমআর নামাযে গোলাম, মুসাফির ও মগ্ন ব্যক্তি হাযির হয় তবে তাদের জুমআ দুরস্ত হবে। যোহরের নামায পড়তে হবে না।

জুমআর আদব

জুমআর ফযীলত লাভের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে তৎপর হওয়া উচিত। সেমতে আসরের পর দোয়া, এস্তেগফার ও তসবীহ্ পাঠে মশগুল হবে। কেননা, এ সময়টি জুমআর মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তের সমান ফযীলত রাখে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের জীবিকা ছাড়া আরও একটি অনুগ্রহ আছে, যা থেকে তিনি তাকে দেন, যে তাঁর কাছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং জুমআর দিন তা তলব করে। বৃহস্পতিবার দিন কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করবে। সুগন্ধিও যোগাড় করবে। এ রাত্রে জুমআর দিনে রোযা রাখার নিয়ত করবে। এর অনেক সওয়াব। কিন্তু এর সাথে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের রোযা মিলিয়ে নেবে। কেননা, শুধু জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ। এ রাত্রিটি নামায ও খতমে কোরআনে অতিবাহিত করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কেউ কেউ এ রাতে স্ত্রীসহবাস মোস্তাহাব বলেছেন। তাঁরা এ হাদীসের উদ্দেশ্য তাই বলেছেন ঃ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل

আল্লাহ রহম করুন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে প্রথম ওয়াক্তে জুমআয় আসে, শুরু থেকে খোতবা শুনে এবং গোসল করায় ও গোসল করে। এখানে গোসল করায় অর্থ স্ত্রীকে গোসল করায়। এসব কাজ করলে পূর্ণরূপে জুমআকে স্বাগত জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গাফেলদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শ্রেণী থেকে বের হয়ে যাবে, যারা সকাল বেলায় জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্ দিন? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জুমআর পূর্ণ অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে একদিন পূর্ব থেকে এর অপেক্ষা করে। আর ক্ষুদ্র অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে সকালে জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্ দিন? কোন কোন বুযুর্গ জুমআর পূর্ব রাতে জামে মসজিদেই থাকতেন।

জুমআর দিন ফজর হতেই গোসল করা উচিত, যদিও তখন জামে মসজিদে না যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি সময়েই মসজিদে যাওয়া উচিত, যাতে গোসল ও মসজিদে যাওয়া কাছাকাছি সময়ে হয়। জুমআর দিন গোসল করা তাকিদসহ মোস্তাহাব। কোন কোন আলেম একে ওয়াজিব বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -

অর্থাৎ, জুমআর গোসল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব।

এক মশহুর হাদীসে আছে–

من اتى الجمعة فليغتسل -

অর্থাৎ, যে জুমআয় উপস্থিত হয়, তার গোসল করা উচিত।

মদীনার মুসলমানরা কাউকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে এরূপ বলত ঃ তুমি তার চেয়েও খারাপ, যে জুমআর দিন গোসল করে না।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদে আগমন করলেন। এ সময়ে আগমন খারাপ মনে করে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এটা কোন্ সময়? অর্থাৎ, আগে এলেন না কেন? হযরত ওসমান (রাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ আমি আযান শুনার পর দেরী করিনি। ওযু করেই চলে এসেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ একটি নয়, দুটি হল। আপনি তো জানেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকিদ সহকারে জুমআর দিন গোসল করার জন্যে বলতেন। আপনি কেবল ওযু করলেন। এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন ওযু করে, সে ভাল করে। আর যে গোসল করে সে সর্বোত্তম কাজ করে। এ থেকে জানা গেল, গোসল তরক করাও জায়েয।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জুমআর দিন সাজসজ্জা করা মোস্তাহাব। তিনটি বিষয় সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত- পোশাক, পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে মেসওয়াক করা, চুল কাটা, নখ কাটা ও গোঁফ কাটা। এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও করা উচিত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন নখ কাটে, আল্লাহ তাআলা তার নখ থেকে রোগ দূর করে দেন। নিজের কাছে যে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি থাকে, তা জুমআর দিন ব্যবহার করবে, যাতে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং উপস্থিত মুসল্লীরা আরাম বোধ করে। পুরুষদের জন্যে উত্তম সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকট এবং রং অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে নারীদের জন্যে সেই সুগন্ধি উত্তম, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ গোপন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখে, তার মনোকষ্ট কম হয় এবং যার সুগন্ধি উৎকৃষ্ট, তার বুদ্ধি বাড়ে। সাদা পোশাক সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলার কাছে সাদা পোশাক অধিক পছন্দনীয়। কাল পোশাকে কোন সওয়াব নেই। কেউ কেউ কাল পোশাকের দিকে তাকানো মাকরূহ বলেছেন। জুমআর দিনে পাগড়ী পরিধান করা মোস্তাহাব। ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমআর দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। সুতরাং গরমে কষ্ট হলে নামাযের পূর্বে ও পরে পাগড়ী খুলে ফেলায় দোষ নেই।

জামে মসজিদে সকালেই রওয়ানা হওয়া উচিত। এর সওয়াব অনেক। যাওয়ার সময় খুশু সহকারে থাকবে। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে আউয়াল ওয়াক্তে যায় সে যেন একটি উট কোরবানী করে; যে দ্বিতীয় প্রহরে যায়, সে যেন একটি গরু কোরবানী করে; যে তৃতীয় প্রহরে যায়, সে যেন শিংবিশিষ্ট ভেড়া কোরবানী করে; যে চতুর্থ প্রহরে যায়, সে যেন খোদার পথে মুরগী যবেহ করে এবং যে পঞ্চম প্রহরে যায়, সে যেন একটি ডিম আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে। ইমাম যখন খোতবার জন্যে বের হয়ে আসেন, তখন আমলনামা বন্ধ করে দেয়া হয়, কলম তুলে নেয়া হয় এবং ফেরেশতারা মিম্বরের কাছে সমবেত হয়ে যিকির শ্রবণ করে। এ সময় যারা আসে তারা কোন সওয়াব পায় না। সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রথম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়াক্ত, এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর, রৌদ্র প্রখর থাকা পর্যন্ত তৃতীয় প্রহর এবং এ সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত চতুর্থ ও পঞ্চম প্রহর। এ দু'প্রহরে সওয়াব কম । সূর্য ঢলে পড়ার পর নামাযের সময়। এতে কোন সওয়াব নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষ জানত, তবে সেগুলোর জন্যে মানুষ সওয়ারীতে বসে রওয়ানা হয়ে যেত- (১) আযান, (২) জামাআতের প্রথম সারি এবং (৩) ভোরে জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া ।

এক হাদীসে আছে, জুমআর দিন ফেরেশতারা হাতে রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম নিয়ে জামে মসজিদের দরজাসমূহে বসে যায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে আগমনকরীদের নাম লিপিবদ্ধ করে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন বান্দা জুমআর দিনে দেরী করে, তখন ফেরেশতারা তাকে তালাশ করে এবং তার অবস্থা একে অপরের কাছে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে ঃ ইলাহী, যদি দারিদ্র্যের কারণে তার দেরী হয়ে থাকে, তবে তাকে ধনাঢ্য কর। রোগের কারণে দেরী হয়ে থাকলে তাকে সুস্থতা দান কর। কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দেরী হলে তাকে অবসর দান কার। কোন খেলার কারণে দেরী হয়ে থাকলে তার অন্তর এবাদতের দিকে ফিরিয়ে দাও। প্রথম শতাব্দীতে সেহরীর সময় এবং সোবহে সাদেকের পরে রাস্তা জনাকীর্ণ থাকত। লোকজন প্রদীপ হাতে জামে মসজিদে ঈদের দিনের মত দলে দলে গমন করত। আস্তে আস্তে এটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলামে এটাই প্রথম বেদআত ছিল, লোকজন জুমআর দিন ভোরে মসজিদে যাওয়া ত্যাগ করল। ইহুদী খৃস্টানদের দেখেও মুসলমানের লজ্জা হয় না। তারা তাদের এবাদত গৃহে শনিবার ও রবিবার প্রত্যূষে যায়। দুনিয়াপ্রার্থীরাও ক্রয়-বিক্রয় মুনাফা উপার্জনের জন্যে খুব ভোরে বাজারে যায়। আখেরাতের প্রার্থীদের কি হল, তারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয় না ? কথিত আছে, মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন তারা ততটুকু নৈকট্য পাবে, যতটুকু প্রত্যূষে জুমআয় গমন করবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) জামে মসজিদে খুব ভোরে গিয়ে দেখেন, তিন ব্যক্তি তাঁরও আগে মসজিদে বিদ্যমান রয়েছে। এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ঃ চার জনের মধ্যে আমি চতুর্থ হলাম ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জামে মসজিদে প্রবেশ করার পর মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে এবং সামনে দিয়ে যাবে না। অনেক আগে গেলে এরূপ করার প্রয়োজনই হবে না। মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে পুল করে মানুষকে তার উপর দিয়ে যেতে বলা হবে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর খোতবা দেয়ার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে এসে বসে গেছে। নামাযের পর তিনি সেই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি আজ আমাদের সাথে জুমআয় শরীক হলে না? লোকটি বলল ঃ হুযুর, আমি তো জুমআয় উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে দেখেছিলাম। এতে ইঙ্গিত আছে, লোকটির আমল বেকার হয়েছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, লোকটি আরজ করল ঃ হুযুর আমাকে দেখেননি? তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি, তুমি দেরীতে এসেছ এবং মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। হাঁ, প্রথম কাতার খালি পড়ে থাকলে মানুষের উপর দিয়ে যাওয়া দূষণীয় নয়। কারণ, তখন মানুষ নিজেরাই নিজেদের হক নষ্ট করে এবং ফযীলতের স্থান ছেড়ে দেয়। হযরত হাসান বলেন ঃ যারা জুমআর দিনে জামে মসজিদের দরজায়ই বসে যায়, তাদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাও। তাদের কোন ইযযত নেই।

নামায পড়ার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে যাবে না। নামাযী নিজে স্তম্ভ অথবা প্রাচীরের কাছে বসবে, যাতে কেউ সামনে দিয়ে না যায়। নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে নামায ফাসেদ হয় না ঠিক; কিন্তু এটা নিষিদ্ধ । রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমানের জন্যে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের জন্যে ছাই ও ধুলা হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা ভাল। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কেউ জানত নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া কত বড় গোনাহ্, তবে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে উত্তম হত। যদি স্তম্ভ, প্রাচীর অথবা বিছানো জায়নামাযের ভিতরের ভাগ দিয়ে কেউ গমন করে, তবে নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া । যদি না মানে তবে আবার হটিয়ে দেবে। যদি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এর পরও না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সামনে দিয়ে কেউ গেলে তিনি সজোরে ধাক্কা দিতেন। ফলে সে মাটিতে পড়ে যেত। প্রায়ই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। মারওয়ানের কাছে এ অভিযোগ গেলে মারওয়ান বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন। নামাযীর উচিত সামনে এক হাত দীর্ঘ কোন খুঁটি পুঁতে নেয়া, যাতে সীমা চিহ্নিত হয়ে যায়।

জুমআর নামাযে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে। এর সওয়াব অনেক। রেওয়ায়েত আছে– যেব্যক্তি পরিবারের লোকজনকে গোসল করায়, নিজে গোসল করে, সকালে মসজিদে যায়, প্রথম খোতবা পায় এবং ইমামের কাছে থেকে খোতবা ও কেরাআত শ্রবণ করে, এটা তার জন্যে দু'জুমআর মধ্যবর্তী দিন এবং আরও তিন দিনের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে প্রথম কাতার অন্বেষণ করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি ইমামের কাছে এমন কোন বিষয় থাকে, যা পরিবর্তন করতে তুমি অক্ষম; যেমন ইমাম রেশমী বস্ত্র পরিহিত হলে অথবা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাযে এলে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকা তোমার জন্যে উত্তম। কেননা, এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে থাকলে তোমার ধ্যান বিক্ষিপ্ত হবে। কোন কোন আলেম এহেন অবস্থায় নিরাপত্তার খাতিরে প্রথম কাতার বর্জন করেছেন। বিশর ইবনে হারেসকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা আপনাকে ভোর বেলায় মসজিদে আসতে দেখি। কিন্তু আপনি শেষ কাতারসমূহে নামায পড়েন। এটা কেন? তিনি বললেন ঃ অন্তরের নৈকট্য উদ্দেশ্য– দেহের নয়। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, পেছনের কাতারে থাকা অন্তরের জন্যে ভাল। সুফিয়ান সওরী শোয়ায়েব ইবনে হরবকে মিম্বরের কাছে আবু জাফর মনসুরের খোতবা শুনতে দেখলেন। নামাযান্তে সুফিয়ান শোয়ায়েবকে বললেন ঃ মনসুরের কাছে আপনাকে বসা দেখে আমি বিচলিত হয়েছি। যদি আপনি তার মুখে এমন কোন কথা শুনেন, যার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়, তবে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন কি? এরা কাল পোশাকের বেদআত আবিষ্কার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছে। শোয়ায়েব বললেন ঃ হাদীসে কি ইমামের কাছে থাকতে এবং খোতবা শুনতে বলা হয়নি? সুফিয়ান বললেন ঃ এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের বেলায় প্রযোজ্য। এদের কাছ থেকে তো যত দূরে থাকা যায়, ততই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। হযরত সাঈদ ইবনে আমের বলেন ঃ আমি হযরত আবু দারদার সাথে নামায পড়ি। তিনি নামাযে পেছনের কাতারে যেতে লাগলেন। অবশেষে আমরা সর্বশেষ কাতারে চলে গেলাম। নামাযান্তে আমি তাঁকে বললাম ঃ প্রথম কাতার কি সব কাতার অপেক্ষা উত্তম নয়? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু এটা রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এ উম্মতের প্রতি রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নামাযে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন, তখন তার পেছনে যত মানুষ থাকে, সকলকে ক্ষমা করে দেন। অতএব আমি এই আশা নিয়ে সকলের পেছনে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখের কাতারের যার প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টি দেবেন, তাঁর ওসিলায় আমার মাগফেরাত হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু দারদা এ বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং যেব্যক্তি এরূপ নিয়ত সহকারে পেছনের কাতারে থাকে, অন্যকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তার জন্যে এতে কোন দোষ নেই। প্রকাশ থাকে যে, মিম্বরের সাথে সংলগ্ন পূর্ণ কাতারকে প্রথম কাতার ধরা হবে। সুতরাং মিম্বর যদি কোন কাতারকে কেটে দেয়, তবে মিম্বরের দু'পাশে যে কাতার, তা পূর্ণ কাতার নয়। তাই একে প্রথম কাতার ধরা হয় না। হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন ঃ মিম্বরের সম্মুখস্থ কাতার প্রথম কাতার। কেননা. এটাই মিম্বর সংলগ্ন কাতার। এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি ইমামের সম্মুখে থাকে এবং তাঁর খোতবা শুনে। কিন্তু মিম্বরের প্রতি লক্ষ্য না করে যে কাতার কেবলার অধিক নিকটবর্তী, তাকে প্রথম কাতার বলা সম্ভবপর।

ইমাম যখন মিম্বর যান, তখন নামায বন্ধ করতে হবে এবং কথাবার্তাও মওকুফ করতে হবে। এ সময় খোতবা শ্রবণ করতে হবে। কোন কোন সাধারণ লোকের অভ্যাস এই, মুয়াযযিন আযান দিতে উঠলে তারা সেজদা করে। হাদীসে ও গুণীজন বাক্যে এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত আলী ও হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চুপচাপ খোতবা শুনে তার জন্যে দুটি সওয়াব, যে খোতবা শুনে না এবং চুপ থাকে, তার জন্যে এক সওয়াব এবং যে শুনে বাজে কথা বলে, তার জন্যে দু'গোনাহ্ লেখা হয়। আর যেব্যক্তি শুনে না এবং বাজে কথা বলে, তার জন্যে এক গোনাহ্ লেখা হয় ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اوصه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له .

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমাম খোতবা পাঠ করার সময় সঙ্গীকে বলে ঃ চুপ থাক, সে বাজে কথা বলে। আর যে বাজে কথা বলে তার জুমআ হয় না।

এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল, ইশারা করে অথবা কংকর নিক্ষেপ করে চুপ করাতে হবে– কথা বলে নয়। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খোতবা পাঠ করছিলেন, তখন আমি উবাই ইবনে কাবকে প্রশ্ন করলাম, এ সূরা কবে নাযিল হয়েছিল। হযরত উবাই আমাকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর থেকে নামার পর উবাই আমাকে বললেন ঃ যাও, তোমার জুমআ নেই। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেনঃ উবাই ঠিক বলেছে । যেব্যক্তি দূরে বসার কারণে খোতবা শুনতে অক্ষম, তার চুপ থাকা উচিত । হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চার সময়ে নফল নামায মাকরূহ – ফজরের পরে, আসরের পরে, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং ইমাম যখন খোতবা দেন।

জুমআর নামায শেষ হলে কথা বলার পূর্বে সাত বার আলহামদু লিল্লাহ, সাত বার কুল হুয়াল্লাহু এবং সাত বার কুল আউযু সূরাদ্বয় পাঠ করবে। বর্ণিত আছে, যে এরূপ করবে সে এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় পাবে। জুমআর পরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, হে অমুখাপেক্ষী, হে প্রশংসিত, হে প্রথমে সৃষ্টিকারী, হে পুনর্বার সৃষ্টিকারী, হে দয়ালু, হে প্রিয়, আমাকে আপনার হালাল রিযিক দ্বারা হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ব্যতীত সব কিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী করুন।

বর্ণিত আছে, কেউ যথারীতি এ দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সৃষ্ট জীব থেকে বেপরওয়া করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌঁছান। এর পর জুমআর পরবর্তী ছয় রাকআত নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে দু'রাকআত, চার রাকআত এবং ছয় রাকআত পড়ার বিভিন্ন রূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো বিভিন্ন অবস্থায় দুরস্ত । অতএব ছয় রাকআত পড়লে সবগুলো রেওয়ায়েত পালিত হয়ে যাবে। জুমআ শেষে আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে থাকা উচিত । মাগরিব পর্যন্ত থাকলে আরও ভাল । বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জামে সমজিদে আসরের নামায পড়ে, সে হজ্জের সওয়াব পায় এবং যে মাগরিবের নামাযও পড়ে, সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পায় । যদি রিয়ার আশংকা থাকে অথবা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুল হওয়ার ভয় হয়, তবে আল্লাহর যিকির করতে করতে এবং তাঁর নেয়ামতের কথা ভাবতে ভাবতে গৃহে ফিরে আসাই উত্তম। এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্তর ও মুখের হেফাযত করবে, যাতে জুমআর দিনের উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি বিনষ্ট না হয়। জামে মসজিদে ও অন্যান্য মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা উচিত নয় । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এমন সময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদসমূহে দুনিয়ার কথাবার্তা বলবে। তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্কই নেই। তুমি তাদের কাছে বসো না ।

জুমআর দিনের অন্যান্য আদব

সকালে অথবা জুমআর নামাযের পরে অথবা আসরের পরে এলেমের মজলিসে উপস্থিত হবে। কিন্তু কিস্সাকথক ওয়ায়েদের মজলিসে যাবে না। তাদের কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নেই। আখেরাতের পথিক জুমআর সমস্ত দিন দান খয়রাত ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করবে, যাতে উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি হাতছাড়া না হয়। নামাযের পূর্বে কোন মজলিস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হলে তাতে যাওয়া উচিত নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর নামাযের পূর্বে হাল্‌কা তথা মজলিস করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন হক্কানী আলেম সকালে জামে মসজিদে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও শাস্তি বর্ণনা করে ওয়ায করলে তাঁর কাছে বসবে। এরূপ ওয়াজ শ্রবণ করা নফল এবাদত অপেক্ষা উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এলেমের মজলিসে হাজির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

নামাযান্তে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এতে দুনিয়া অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং রোগীকে দেখা, জানাযায় শরীক হওয়া এবং এলেম শিক্ষা করা উদ্দেশ্য । আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে কয়েক জায়গায় এলেমকে 'ফযল' তথা অনুগ্রহ বলেছেন। এক জায়গায় বলেছেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ, আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট। আরও বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ـ

অর্থাৎ, আমি দাউদকে এলেম দান করেছি।

সুতরাং জুমআর দিনে এলেম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া উত্তম এবাদত। কিসসাকথকদের মজলিসে যাওয়া অপেক্ষা নামায উত্তম। কেননা, পূর্ববর্তীরা কিসসাকথন বেদআত মনে করতেন। তাঁরা কিসসা কথকদেরকে জামে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জামে মসজিদে নিজের জায়গায় এসে দেখেন, জনৈক কিসসাকথক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সেস্থানে কিছু বর্ণনা করছে। তিনি বললেন ঃ আমার জায়গা থেকে উঠে যাও। সে বলল ঃ আমি উঠব না। আমি অগ্রে এখানে বসেছি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কোতোয়ালকে ডেকে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করলেন। নিছক বয়ান করাই সুন্নত হলে তাকে বহিষ্কার করা কিরূপে জায়েয হত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا يضمن احدكم اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا توسعوا .

তোমাদের কেউ যেন তার মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে; বরং তোমরা সরে যাও এবং তাকে জায়গা দাও।

হযরত ইবনে ওমরের জন্যে কেউ নিজের স্থান ছেড়ে দিলে তিনি তাতে বসতেন না, যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেখানে না বসত। বর্ণিত আছে, জনৈক কিসসাকথক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের আঙ্গিনায় বসত। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ লোকটি তার কিসসা দ্বারা আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি যিকির ও তসবীহ করতে পারছি না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে এমন পিটুনি দিলেন যে, তার কোমরে একটি ছড়ি ভেঙ্গে ফেললেন।

জুমআর মধ্যে যে মুহূর্তটি উৎকৃষ্ট ও বরকতময়, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। হাদীসে আছে, জুমআয় একটি মুহূর্ত আছে, যাতে কোন মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্ত কোন্‌টি, তাতে মতভেদ আছে। যেমন, সূর্যোদয়ের সময়, নামাযে দাঁড়ানোর সময়, আসরের শেষ সময় এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেকার সময় ইত্যাদি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং খাদেমাকে বলতেন ঃ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক। যখন দেখ সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন আমাকে খবর দাও। খাদেমা তাই করত। হযরত ফাতেমা এ সময় দোয়া ও এস্তেগফারে মশগুল হতেন। তিনি বলতেন ঃ এ মূহূর্তের অপেক্ষায় থাকা উচিত। তিনি এটি তাঁর পিতার কাছ থেকে অবলম্বন করেছিলেন। কোন কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আলেম বলেন ঃ এ মুহূর্তটি সারা দিনের মধ্যে অনির্ধারিত। যেমন শবে কদর অনির্ধারিত, যাতে বশী পরিমাণে এর অপেক্ষা করা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ এ মুহূর্তটি জুমআর দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন শবে কদর পরিবর্তিত হতে থাকে। এ উক্তি অধিক সঙ্গত। হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বলেন ঃ এটি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত; অর্থাৎ, সূর্যাস্তের সময়। একথা শুনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ শেষ মুহূর্ত কিরূপে হতে পারে? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এ মুহূর্তটি নামায পড়া অবস্থায় পায়। দিনের শেষ মুহূর্ত তো নামাযের সময় নয়। কা'ব (রঃ) বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি একথা বলেননি, যেব্যক্তি বসে নামাযের অপেক্ষা করে সে নামাযেই থাকে? আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, বলেছেন। কা'ব বললেন ঃ কাজেই এটাও নামাযের সময়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব আরও বলতেন, এ মুহূর্তটি আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের জন্যে, যারা এদিনের হকসমূহ আদায় করে। সুতরাং এ রহমত তখন হওয়া উচিত, যখন হক আদায় সমাপ্ত হয়। মোট কথা, এ সময় এবং ইমামের মিম্বরে আরোহণের সময় উভয়টি উৎকৃষ্ট। উভয় সময়ে দোয়া করা উচিত।

জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। তিনি বলেন ঃ যে কেউ জুমআর দিনে আমার প্রতি আশি বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার আশি বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা কিরূপে দরূদ প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ এভাবে বল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ.

হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা, নবী, রসূল ও উম্মী নবী মুহাম্মদের প্রতি।

এটা একবার হল। এমনিভাবে আশি বার পূর্ণ কর। এ ছাড়া অন্য যেকোন দরূদ পাঠ করলে এমনকি তাশাহ্হুদের দরূদ পাঠ করলেও তাকে দরূদ পাঠকারী বলা হবে। দরূদের সাথে এস্তেগফারও করা উচিত। জুমআর দিন এস্তেগফার করাও মোস্তাহাব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জুমআর দিন অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। বিশেষ করে সূরা কাহফ পাঠ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর দিন অথবা তার রাতে সূরা কাহফ পাঠ করে, তাকে তার পড়ার স্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত নূর দান করা হয় এবং দ্বিতীয় জুমআ ও আরও তিন দিনের মাগফেরাত করা হয়। সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। সে ব্যথা, পেটের ফোড়া, বাত, কুষ্ঠ এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে। সম্ভব হলে জুমআর দিনে অথবা রাত্রে কোরআন খতম করা মোস্তাহাব। এতে অনেক সওয়াব রয়েছে।

জামে মসজিদে প্রবেশ করে চার রাকআত না পড়া পর্যন্ত বসবে না। এর প্রত্যেক রাকআতে পঞ্চাশ বার করে সূরা এখলাস পাঠ করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি এ আমল করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে। তাহিয়্যাতের দু'রাকআতও পড়তে ভুল করবে না, যদিও ইমাম খোতবা দিতে থাকে। এমতাবস্থায় দ্রুত পড়ে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে তাই করতে আদেশ করেছেন। মোট কথা, জুমআর দিন সময় এভাবে বন্টন করা উচিত– সকাল থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের জন্যে, জুমআর পর থেকে আসর পর্যন্ত এলেম শোনার জন্যে এবং আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তসবীহ ও এস্তেগফারের জন্যে।

জুমআর দিনে দান-খয়রাত করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত, এমন ব্যক্তিকে দেবে না যে ইমামের খোতবার সময় দানের আবেদন করে এবং ইমামের কথা বলার সঙ্গে কথা বলে। এরূপ ব্যক্তিকে দান করা মাকরূহ। ইমাম আহমদের পুত্র সালেহ বলেন ঃ জুমআর দিন জনৈক মিসকীন ইমামের খোতবা পাঠের সময় দানের আবেদন করল। সে আমার পিতার বরাবর ছিল। জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে এক খন্ড রৌপ্য দিল মিসকীনকে দেয়ার জন্যে। আমার পিতা তা গ্রহণ করলেন না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, তাকে ভিক্ষা দেয়া কতক আলেমের মতে মাকরূহ; কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অথবা বসে চাইলে দেয়ায় দোষ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কা'ব আহবার (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর জন্যে আসে, এর পর ফিরে গিয়ে দু'প্রকার বস্তু খয়রাত করে, পুনরায় মসজিদে এসে পূর্ণ রুকু সেজদা সহকারে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে এই দোয়া করে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ -

অর্থাৎ, এরপর সে যেকোন দোয়া করবে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। জুমআর দিনকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে। এতে দুনিয়ার কোন কাজ করবে না। বেশী পরিমাণে ওযিফা পাঠ করবে এবং এদিন সফর শুরু করবে না। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর রাত্রে সফর করে, তার উভয় ফেরেশতা তার জন্যে বদ দোয়া করে। জুমআর ফজরের পরে তো সফর নিষিদ্ধই, যদি কাফেলা চলে না যায়।

সারকথা, জুমআর দিনে ওযিফা পাঠ ও দান-খয়রাত বেশী করে করবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে ভাল কাজ নেন। আর যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে খারাপ কাজ নেন, যাতে এ খারাপ কাজ তাঁর আযাব আরও বাড়িয়ে দেয়।

নামাযের বিবিধ মাসআলা

০ অল্প কর্ম দ্বারা নামায বাতিল হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অল্প কর্মও মাকরূহ। প্রয়োজন এই ঃ সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে সরিয়ে দেয়া, বিচ্ছু দংশন করবে বলে আশংকা হলে সেটিকে এক অথবা দুই আঘাতে মেরে ফেলা এবং অপরিহার্য হলে শরীর চুলকানো। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) উকুন ও মাছি নামাযের মধ্যে ধরে ফেলতেন এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) উকুন মেরে ফেলতেন। হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখা উত্তম। নামাযে অল্প কর্ম থেকেও বিরত থাকা পূর্ণতার স্তর। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ নামাযে শরীর থেকে মাছি সরাতেন না এবং বলতেন ঃ আমি নিজেকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করি না।

০ নামাযে থুথু নিক্ষেপ করলে নামায বাতিল হবে না। কারণ, এটা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অল্প কর্ম। থুথুর কারণে আওয়াজ সৃষ্টি না হলে তাকে কালাম গণ্য করা হবে না। এতদসত্ত্বেও নামাযে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে থুথু নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন, সেভাবে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ নয়। সেমতে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার মসজিদে থুথু দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এর পর তিনি খেজুরের একটি ডাল দ্বারা থুথু ঘষে দিলেন এবং সামান্য জাফরান এনে সেখানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করা হোক? সকলেই বলল ঃ এটা কেউ পছন্দ করে না। তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন নামাযে প্রবেশ কর, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও কেবলার মাঝখানে থাকেন। কতক রেওয়ায়েতে আছে– তোমাদের সামনে থাকেন। অতএব সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করা উচিত নয়; ডান দিকেও উচিত নয়; বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে। (এটা মসজিদের বাইরে নামায পড়লে।) বেগতিক হলে নিজের কাপড়ে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কাপড়টি ঘষে দেবে।

○ মুক্তাদীর দন্ডায়মান হওয়ার সুন্নত তরীকা এই, মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান দিকে সামান্য পেছনে সরে দাঁড়াবে। একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাঁড়াবে না; বরং হয় কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়বে; না হয় কাতার থেকে কাউকে নিজের সাথে টেনে নেবে। যদি একাই দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার নামায মাকরূহ হবে।

○ যেব্যক্তি পরবর্তী রাকআতসমূহে ইমামের সাথে শরীক হয়, তাকে মসবুক বলা হয়। মসকবুক যে রাকআতে শরীক হয়, সে রাকআতই তার নামাযের শুরু। ইমাম নামায শেষ করলে এর উপর ভিত্তি করে সে অবশিষ্ট নামায পড়ে নেবে। তকবীরে তাহরীমার পর রুকুর তকবীর বলে যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং তার সাথে স্থিরভাবে রুকু করা যায়, তবে সেই রাকআত পাওয়া গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামের সাথে সস্থিরে রুকু করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে উঠে পড়ে, তবে সেই রাকআত ফওত হয়ে গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামকে সেজদায় অথবা তাশাহহুদে পাওয়া যায়, তবে মসবুক ব্যক্তি কেবল তকবীরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাহরীমা বলে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে– পরবর্তী তকবীর বলবে না।

০ যেব্যক্তি নামায পড়ার পর নিজের কাপড়ে নাপাকী দেখে, তার জন্য পুনরায় নামায পড়া মোস্তাহাব। নামাযের অভ্যন্তরে নাপাকী দেখলে নাপাক কাপড় পৃথক করে ফেলবে এবং নামায পূর্ণ করে নেবে। তবে নতুন করে নামায পড়া মোস্তাহাব। একবার জিবরাঈল এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নামাযের মধ্যে খবর দিলেন, আপনার জুতায় নাপাকী লেগে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জুতা খুলে ফেললেন, কিন্তু নতুনভাবে নামায পড়েননি।

০ রুকু, সেজদা ও অন্যান্য আমলে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া মুক্তাদীর পক্ষে জায়েয নয়। এমনিভাবে এসব কাজ ইমামের সাথে সাথে করাও উচিত নয়; বরং এসব কাজে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে এবং পরে আদায় করবে। এক্তেদার অর্থ এটাই। যদি ইচ্ছাপূর্বক ইমামের সাথে সাথে এসব কাজ করে, তবে নামায বাতিল হবে না। যেমন, ইমামের সমান সমান দাঁড়ালে নামায বাতিল হয় না। সুতরাং কেউ ইমামের আগে রোকন আদায় করলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

ما يخشى الذى يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমামের পূর্ব (সেজদা থেকে) মাথা উত্তোলন করে, সে কি ভয় করে না, আল্লাহ্ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন?

ইমাম থেকে এক রোকন পেছনে থাকা নামায বাতিল করে না। উদাহরণতঃ ইমাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু মুক্তাদী এখনও রুকু করল না। তবে এতটুকু পেছনে থাকা মাকরূহ । যদি ইমাম সেজদায় মাথা রেখে দেয় এবং মুক্তাদী তখনও রুকুতে না যায়, তবে মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যেব্যক্তি নামাযে উপস্থিত হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে নামাযে খারাপ কিছু করতে দেখলে তা থেকে বারণ করার অধিকার রাখে। কোন মূর্খ ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরূপ করলে তাকে নম্রভাবে শিখিয়ে দেবে, যেমন কাতার সোজা করা, একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাঁড়ালে তাকে নিষেধ করা, ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করলে তাকে মানা করা। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কাউকে খারাপভাবে নামায পড়তে দেখে নিষেধ করে না, সে গোনাহে তার সাথে শরীক হবে। বেলাল ইবনে সাদ বলেন ঃ গোপনে ক্রটি করলে যে করে সে-ই দায়ী হবে; কিন্তু প্রকাশ্য ক্রটির সংশোধন কেউ না করলে তার ক্ষতি ব্যাপক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, হযরত বেলাল (রাঃ) নামাযের কাতার সোজা করতেন এবং মুসল্লীদের পায়ের ঘিঁটে দোররা মারতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নামাযে তোমার ভাইদের খোঁজ কর। যদি তাদেরকে না দেখ, তবে রুগ্ন হলে দেখতে যাও এবং সুস্থ হলে জামাআত তরক করার কারণে তিরস্কার কর। মসজিদে প্রবেশ করে কাতারের ডান দিকে যাওয়া উচিত। রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে ডান দিকে এত বেশী লোক থাকত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বাম দিক উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ পেশ করা হল। ফলে তাকে বলতে হল ঃ যেব্যক্তি মসজিদের বাম দিক আবাদ করবে, তার দুটি সওয়াব হবে। কাতারে কোন নাবালেগ ছেলেকে দেখলে তাকে সরিয়ে বয়স্ক ব্যক্তি তার স্থলে দাঁড়াতে পারে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নফল নামায

প্রকাশ থাকে যে, ফরয ছাড়া আরও তিন প্রকার নামায রয়েছে– সুন্নত, মোস্তাহাব ও তাতাব্বু (تطوع)। সুন্নত নামায বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সেসব নামায, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়মিতভাবে পাঠ করেছেন; যেমন ফরয নামাযসমূহের পরবর্তী সুন্নত নামাযসমূহ, চাশতের নামায ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি । যে পথে চলা হয়েছে, তাকে বলা হয় সুন্নত । অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পথে নিয়মিত চলেছেন, তাই হবে সুন্নত। মোস্তাহাব বলে আমাদের উদ্দেশ্য সেই নামায, যার মাহাত্ম্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে তা নিয়মিত পড়া বর্ণিত নেই। যেমন, গৃহ থেকে বের হওয়া ও গৃহে আগমনের সময়কার নামায। তাতাব্বু বলে আমরা সেই নামায বুঝিয়েছি, যা সুন্নত ও মোস্তাহাবের আওতায় পড়ে না; অর্থাৎ এ নামাযের পক্ষে বিশেষ কোন হাদীস নেই। কিন্তু বান্দা আল্লাহর সাথে মোনাজাতে উৎসাহী হয়ে এ নামায পড়ে। এই তিন প্রকার নামাযকেই নফল নামায বলা হয় । কেননা, নফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত । বলাবাহুল্য, এই তিন প্রকার নামায ফরযের অতিরিক্ত । এসব উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য আমরা উপরোক্ত তিনটি পরিভাষা নির্দিষ্ট করেছি। কেউ এই পরিভাষা বদলে দিতে চাইলে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কেননা, উদ্দেশ্য বুঝে নেয়ার পরে শব্দের কোন গুরুত্ব থাকে না।

উপরোক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এসব স্তরের মর্যাদায়ও পার্থক্য রয়েছে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়মিত পড়ার মধ্যে এবং এগুলোর হাদীসের মধ্যেও সহীহ্ ও মশহুরের পার্থক্য রয়েছে। এর ভিত্তিতেই আমরা বলি, জামাআতের সুন্নতসমূহ একান্তের সুন্নত অপেক্ষা উত্তম। জামাআতের সুন্নতসমুহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ঈদের নামায, এর পর সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায, এর পর বৃষ্টির জন্য নামায। একান্তের সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বেতেরের নামায, এর পর ফজরের সুন্নত, এর পর অন্যান্য নামাযের সুন্নত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রকাশ থাকে যে, নফল নামাযসমূহ দু'প্রকার– (১) কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন, সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টির নামায এবং (২) সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত । সময়ের পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে এসব নফল নামাযেরও পুনরাবৃত্তি হয়। এই প্রকার নফল আটটি– পাঞ্জেগানা নামাযসমূহের নফল নামায পাঁচটি এবং তিনটি হচ্ছে চাশতের নামায, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামায এবং তাহাজ্জুদের নামায।

(১) পাঞ্জেগানা নামাযের মধ্যে ফজরের সুন্নত দু'রাকআত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ –

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ـ

ফজরের দু'রাকআত দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। এর সময় সোবহে সাদেক থেকে শুরু হয়ে যায়। আকাশের কিনারায় ফজরের পূর্বে বিস্তৃত শুভ্র রেখাকে সোবহে সাদেক বলা হয়। শুরুতে এটা চেনা খুবই কঠিন। এর জন্যে চন্দ্রের উদয় অস্তের সময় জানতে হবে। প্রতি মাসে দু'বার চন্দ্র দ্বারা সোবহে সাদেক চেনা যায়। ছাব্বিশতম রাতে চাঁদ সোবহে সাদেকের সাথে উদিত হয় এবং দ্বাদশতম রাতে চাদের অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে প্রায় সোবহে সাদেক হয়ে যায়। যে আখেরাত তলব করে, তার জন্যে চাঁদের এসব মনযিল চেনা জরুরী। এতে রাত্রিকালীন সময়ের পরিমাণ ও সোবহে সাদেক চেনা যায়। যখন ফজরের ফরয সময় শেষ হয়, তখন সুন্নতের সময়ও শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় এসব নামায পড়া যায় না। ফরযের পূর্বে এ দু'রাকআত পড়া সুন্নত। মসজিদে আসার পর যদি ফরযের তকবীর হয়ে যায়, তবে ফরয নামাযেই শামিল হয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اذا قضيت الصلوة فلا صلوا المكتوبة ـ

'নামাযের তকবীর হয়ে গেলে ফরয ছাড়া কোন নামায পড়া যাবে না।' ফরয নামায শেষ হলে সুন্নত পড়ে নেবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়লে তাও আদায় হবে। কেননা, সময়ের মধ্যে সুন্নত ফরযের অনুগামী। তবে জামাআত ফওত না হলে এ সুন্নত ফরযের পূর্বে পড়া সুন্নত। মোস্তাহাব এই, এ সুন্নত গৃহে সংক্ষেপে পড়ে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে বসে যাবে। ফরয পড়া পর্যন্ত কোন নামায পড়বে না। এর পর সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকবে।

(২) যোহরের সুন্নত ছয় রাকআত। ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দু'রাকআত। এ দু'রাকআত সুন্নতে মোআক্কাদা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যেব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকআত নামায পড়ে এবং তার কেরাআত, রুকু ও সেজদা ভালরূপে করে, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে এবং রাত্রি পর্যন্ত তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে।

(৩) আসরের পূর্বে চার রাকআত নফল নামায। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে আসরের পূর্বে চার রাকআত পড়ে।

সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দাখিল হওয়ার আশা নিয়ে এই চার রাকআত পড়া মোস্তাহাব। তিনি যোহরের দু'রাকআতের অনুরূপ নিয়মিতভাবে আসরের এই চার রাকআত পড়েননি।

(৪) মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকআত সুন্নত। এক্ষেত্রে একটি ভিন্ন রেওয়ায়েত উবাই ইবনে কাব, ওবাদা ইবনে সামেত, আবু যর, যায়দ ইবনে সাবেত প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের ফরযের পূর্বে আযান ও একামতের মাঝখানে দু'রাকআত দ্রুত পড়ে নেয়া উচিত। কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ আমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত পড়তাম। ফলে নতুন আগন্তুক মনে করত, আমরা মাগরিব পড়ে নিয়েছি। এটা আসলে এই হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে দাখিল– بين كل اذانين صلوة لمن شاء প্রত্যেক দু'আযান অর্থাৎ, আযান ও একামতের মধ্যে নামায রয়েছে। যে চায় সে পড়ুক। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) এই দু'রাকআত পড়তেন। কিন্তু লোকেরা এজন্যে তাঁর সমালোচনা শুরু করলে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৫) এশার ফরযের পর চার রাকআত সুন্নত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পর চার রাকআত পড়ে শুয়ে পড়তেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নামায একটি সুরক্ষিত কল্যাণ। যার ইচ্ছা কম নিক এবং যার ইচ্ছা বেশী নিক। এ থেকে জানা গেল, প্রত্যেকেই নফল নামায ততটুকু অবলম্বন করবে, যতটুকু তার কল্যাণের প্রতি আগ্রহ থাকে। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রকাশ পেয়েছে, নফলসমূহের মধ্যে কতক অধিক মোআক্কাদ (জোরদার) এবং কতক কম মোআক্কাদ। সুতরাং অধিক মোআক্কাদ নফল ছেড়ে দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেননা, নফল নামায ফরযের জন্যে পরিপূরক হয়ে থাকে। কাজেই নফল বেশী না পড়লে ফরয ক্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়।

(৬) বেতেরের নামায। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পরে তিন রাকআত বেতের পড়তেন। প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى দ্বিতীয় রাকআতে কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতেরের পর দু'রাকআত বসে বসে পড়তেন এবং নিদ্রার পূর্বে দু'রাকআত পড়তেন। প্রথম রাকআতে সূরা যিলযাল এবং দ্বিতীয় রাকআতে তাকাসুর পাঠ করতেন। রাত্রিকালীন নফল নামাযের শেষে বেতের পড়া উত্তম। সুতরাং তাহাজ্জুদের পরে বেতের পড়া ভাল।

(৭) চাশতের নামায নিয়মিত পড়া একটি উত্তম আমল। এর সংখ্যা সর্বোচ্চ আট রাকআত বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) চাশতের নামায আট রাকআত পড়েছেন এবং খুব দীর্ঘ করে ও উত্তমরূপে পড়েছেন। এ সংখ্যা অন্য কোন রাবী বর্ণনা করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) চাশতের নামায নিয়মিতভাবে চার রাকআত পড়েছেন এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বেশীর সীমা উল্লেখ করেননি। এ থেকে জানা যায়, তিনি চার রাকআত নিয়মিত পড়তেন– এর কম পড়তেন না এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়তেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাশতের নামায ছয় রাকআত দু'ওয়াক্তে পড়তেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদয়ের পর সূর্য যখন সামান্য উপরে উঠতো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত পড়তেন। এরপর যখন সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়তো এবং সূর্য আকাশের পূর্ব প্রান্তে থাকত, তখন চার রাকআত পড়তেন। মোট কথা, সূর্য যখন অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত, তখন দু'রাকআত পড়তেন এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে উঠার পর চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং চাশতের সময় এভাবে নির্ণীত হবে, সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধেক হলে চাশত পড়া উচিত; যেমন সূর্য ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধাংশের সময় আসরের নামায পড়া হয়। অতএব আসরের সময়ের বিপরীত সময় হচ্ছে চাশতের সময়। এ সময়টি চাশতের উত্তম সময়। নতুবা সূর্য উপরে উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় চাশত পড়া যায়।

(৮) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামাযও সুন্নতে মোআক্কাদা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা এর রাকআত সংখ্যাদ্বয় বর্ণিত আছে। এ নামাযের সওয়াব অনেক। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (তাদের পার্শ্ব নিদ্রার স্থান থেকে আলাদা থাকে।) আয়াতে ঐ নামাযই বুঝানো হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে মাগরিব ও এশার মাঝখানে নামায পড়ে, তার এ নামায আল্লাহর দিকে রুজুকারীদের নামায। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখে এবং নামায ও কোরআন পাঠ ছাড়া অন্য কোন আলাপ-আলোচনা না করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে দুটি প্রাসাদ তৈরী করেন, যা পরস্পরের একশ' বছরের দূরত্বে অবস্থিত। তার জন্যে উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে এত বৃক্ষ রোপণ করেন, দুনিয়ার সকল বাসিন্দা তাতে ঘুরাফেরা করতে চাইলে তাদের জন্যে স্থান সংকুলান হবে।

এর পর আসে সপ্তাহের দিন ও রাত্রির নফল নামায। দিনের মধ্যে আমরা প্রথমে রবিবার থেকে শুরু করছি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রবিবার দিন চার রাকআত পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আমানার রাসূলু একবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে খৃস্টান পুরুষ ও খৃস্টান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নারীর সমসংখ্যক সওয়াব লেখবেন। তাকে একজন নবীর সওয়াব দেবেন এবং এক হজ্জ ও ওমরা তার জন্যে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেক রাকআতের বদলে হাজার নামাযের সওয়াব লেখবেন। প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে জান্নাতে একটি মেশকের শহর দেবেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রবিবার দিন অধিক নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার একত্ব ঘোষণা কর। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। অতএব যেব্যক্তি রবিবার দিন যোহরের ফরয ও সুন্নতের পর চার রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও আলিফ লাম সেজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা মুলক পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতঃ সালাম ফেরায়, এর পর দাঁড়িয়ে আরও দু'রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতেও এ সূরাই পড়ে, এর পর আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, আল্লাহ তাআলার জন্যে তার প্রয়োজন মেটানো অপরিহার্য হয়ে যাবে।

সোমবার– হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন সূর্য উপরে উঠার পর দু'রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, এখলাস, ফালাক ও নাস একবার পাঠ করে এবং সালামের পর দশ বার এস্তেগফার ও দশ বার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল গোনাহ মাফ করে দেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন বার রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং নামায শেষে সূরা এখলাস ও এস্তেগফার বার বার পড়ে, তাকে কেয়ামতের দিন অমুকের পুত্র অমুক কোথায়, উঠ এবং তোমার সওয়াব নাও, বলে আহ্বান করা হবে। অতঃপর প্রথম সওয়াবস্বরূপ তাকে এক হাজার বেহেশতী পোশাক দেয়া হবে। তার মাথায় মুকুট রাখা হবে। তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তখন এক হাজার ফেরেশতা তার অভ্যর্থনার জন্যে পৃথক পৃথক উপঢৌকন নিয়ে আগমন করবে এবং তার সাথে সাথে থাকবে।

মঙ্গলবার– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার দিন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে দশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং সূরা এখলাস তিন বার পাঠ করে, তার সত্তর দিনের গোনাহ লেখা হবে না। সত্তর দিনের মধ্যে সে মারা গেলে শহীদের মর্তবা নিয়ে মারা যাবে এবং তার সত্তর বছরের গোনাহ মার্জনা করা হবে।

বুধবার- হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবারে দ্বিপ্রহরের পূর্বে বার রাকআত নামায পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার, সূরা এখলাস তিন বার এবং সূরা ফালাক ও নাস তিন বার পাঠ করে, তাকে আরশের কাছ থেকে ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলে ঃ হে আল্লাহর বান্দা আবার আমল কর। তোমার পূর্ব গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তার কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা। কেয়ামতের কঠোরতা দূরীভূত করে দেবেন। সেদিন থেকেই তার জন্যে একজন পয়গম্বরের আমল উপরে উঠতে থাকবে।

বৃহস্পতিবার- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিন যোহর ও আসরের মধ্যে দু'রাকআত নামায পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একশ' বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা এখলাস একশ' বার এবং দরূদ একশ' বার পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সওয়াব দান করবেন, যে রজব, শাবান ও রমযানের রোযা রাখে। তাকে হজ্জের সমান সওয়াব দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে মুমিন ও তাওয়াক্কুলকারীদের সংখ্যা পরিমাণে সওয়াব লেখবেন।

শুক্রবার- হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ জুমআর দিন একটি নামায আছে। যে মুমিন বান্দা সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পর পূর্ণরূপে ওযু করে ঈমান ও সওয়াবের আশায় চাশতের দু'রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলা দুশ' নেকী লিখেন এবং দুশ' গোনাহ মার্জনা করেন। যে চার রাকআত পড়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার চারশ' মর্তবা উঁচু করে দেন। যে আট রাকআত পড়ে, তার আটশ' মর্তবা উঁচু করেন এবং সকল গোনাহ মাফ করে দেন। আর যে বার রাকআত পড়ে, তার জন্যে বারশ' নেকী লিপিবদ্ধ করেন, বারশ'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কুকর্ম তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন এবং জান্নাতে বারশ' মর্তবা উঁচু করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন জামে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জুমআর পূর্বে চার রাকআত নামাযে প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা এখলাস পঞ্চাশ বার পাঠ করে, সে মৃত্যুর সময় জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে অথবা তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে।

শনিবার– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি শনিবার দিন চার রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার ও সূরা কাফিরূন তিন বার এবং নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক অক্ষরের বদলে এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব লেখেন, এক বছরের দিনের রোযা ও রাতের এবাদতের সওয়াব দান করেন, এক শহীদের সওয়াব দেন এবং কেয়ামতে পয়গম্বর ও শহীদগণের সাথে আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।

এখন রাত্রিসমূহের অবস্থা শুনা উচিত।

রবিবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যেব্যক্তি রবিবার রাতে কুড়ি রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পর সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার পাঠ করে নিজের পিতামাতার জন্যে একশ' বার মাগফেরাতের দোয়া করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি একশ' বার দরূদ প্রেরণ করে, নিজের শক্তি থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করে, অতঃপর বলে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اٰدَمَ صَفْوَةُ اللّٰهِ
وَفِطْرَتُهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ وَعِيْسٰى
رُوْحُ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبُ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই, আদম আল্লাহর মনোনীত ও তাঁর ফিতরত, ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, মূসা আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী, ঈসা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর রূহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর হাবীব। সে তাদের সংখ্যা পরিমাণে সওয়াব পাবে, যারা আল্লাহ তাআলার সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তা বিশ্বাস করে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে শান্তিপ্রাপ্তদের সাথে উত্থিত করবেন এবং জান্নাতে পয়গম্বরগণের দলভুক্ত করবেন।

সোমবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার রাতে চার রাকআত নামায পড়ে– প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস দশ বার, দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস কুড়ি বার, তৃতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস ত্রিশ বার এবং চতুর্থ রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস চল্লিশ বার পাঠ করে, এর পর সালাম ফিরিয়ে পঁচাত্তর বার সূরা এখলাস পড়ে নিজের ও পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা আল্লাহ তাআলা নিজের উপর জরুরী করে নেন। এ নামাযকে সালাতে হাজত বলা হয়।

মঙ্গলবার রাত্রি– এ রাতে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস প্রতিটি পনর বার, সালামের পর আয়াতুল কুরসী পনর বার এবং এস্তেগফার পনর বার পাঠ করবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে একবার আলহামদু, সূরা কদর এবং এখলাস সাত সাত বার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন এবং কেয়ামতের দিন এ নামায তাকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করবে।

বুধবার রাত্রি– হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবার রাতে তিন সালাম সহকারে ছয় রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু লিল্লাহর পর قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ থেকে দু'আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে এবং নামাযান্তে বলে جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ (আল্লাহ মুহাম্মদকে আমাদের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রতিদান দিন।) –আল্লাহ তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সত্তর বছরের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং তার জন্যে দোযখ থেকে পরিত্রাণপত্র লেখে দেবেন। আরও বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি বুধবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা ফালাক দশ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদুর পর সূরা নাস দশ বার, সালামের পর দশ বার এস্তেগফার এবং দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার সওয়াব লেখার জন্যে প্রত্যেক আকাশ থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার সওয়াব লেখতে থাকে।

বৃহস্পতিবার রাত্রি- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে বৃহস্পতিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু পাঁচ বার, আয়াতুল কুরসী পাঁচ বার, এখলাস পাঁচ বার, পাঁচ পাঁচ বার ফালাক ও নাস এবং নামাযান্তে পনর বার এস্তেগফার পাঠ করে, তার সওয়াব পিতামাতাকে বখশে দেয়, পিতামাতার হক তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, যদিও সে পিতামাতার অবাধ্যতা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বস্তু দেবেন, যা সিদ্দীক ও শহীদগণকে দেবেন।

শুক্রবার রাত্রি- হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত নামায আদায় করে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার এবং এখলাস এগার বার পাঠ করে, সে যেন আল্লাহ তাআলার এবাদত বার বছর পর্যন্ত এভাবে করল, দিনের বেলায় রোযা রাখল এবং রাতে নফল নামায পড়ল। হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে জামাআতের সাথে এশার নামায পড়ে, উভয় সুন্নত পড়ে এবং ফরয ও সুন্নতের পর দশ রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস এক এক বার পাঠ করতঃ বেতেরের তিন রাকআত পড়ে এবং ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে থাকে, সে যেন সমগ্র রাত্রি নফল নামায পড়ল। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ উজ্জ্বল দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর অর্থাৎ শুক্রবার রাত্রি ও দিনে।

শনিবার রাত্রি- হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ যে শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। সে যেন প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীকে খয়রাত বন্টন করল। তাকে ক্ষমা করা আল্লাহ্ নিজের জন্যে জরুরী করে নেন।

চার প্রকার নফল নামায প্রতিবছর একবার করে আদায় করতে হয়– (১) দু'ঈদের নামায, (২) তারাবীহ্, (৩) রজবের নামায ও (৪) শা'বানের নামায। দু'ঈদের নামায –এই নামায সুন্নতে মোআক্কাদা তথা ওয়াজিব। এটি ধর্মের একটি নিদর্শন। এতে সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, তিন বার তকবীর অর্থাৎ নিম্নোক্ত বাক্যাবলী বলা ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যে অনেক প্রশংসা। সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর; যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।

ঈদুল ফেতরের রাত্রি থেকে ঈদের নামায পর্যন্ত এ তকবীরের সময়। ঈদুল আযহায় এ তকবীর ৯ তারিখের ফজর থেকে শুরু করবে এবং ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত চলবে। এতে মতভেদও আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উক্তি এটাই। নামাযসমূহের পরে এ তকবীর বলতে হবে; কিন্তু ফরয নামাযের পরে পড়ার উপর জোর বেশী।

দ্বিতীয়, ঈদের দিনের সকালে গোসল করবে, সাজগোজ করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। পুরুষদের জন্যে চাদর ও পাগড়ী উত্তম।

তৃতীয়, এক পথে ঈদগাহে যাবে এবং অন্য পথে ফিরে আসবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। তিনি যুবতী নারী ও পর্দানশীনদেরকেও ঈদে যেতে অনুমতি দিতেন।

চতুর্থ, ঈদের নামাযের জন্যে শহরের বাইরে যাওয়া মোস্তাহাব। কিন্তু মক্কা মোয়াযযমা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে মসজিদে নামায পড়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উচিত। বৃষ্টি বর্ষিত হলে মসজিদে ঈদের নামায পড়াতে দোষ নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হলে ইমাম দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নামায পড়িয়ে দেয়ার অনুমতি কোন ব্যক্তিকে দেবেন এবং নিজে সমর্থ লোকদেরকে নিয়ে বাইরে যাবেন। সকলেই তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে।

পঞ্চম, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ঈদের নামাযের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। কোরবানী করার সময় ১০ তারিখে সূর্যোদয়ের এতটুকু পরে শুরু হয়, যতটুকু সময়ের মধ্যে দু'রাকআত নামায ও দু'খোতবা হয়ে যায়। এর পর এই সময় ১৩ তারিখের শেষ পর্যন্ত থাকে। ঈদুল আযহার নামায সকালে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, নামাযের পরে কোরবানী করতে হয়। ঈদুল ফেতরের নামায দেরীতে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এ নামাযের আগে সদকায়ে ফেতর বন্টন করতে হয়। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা।

ষষ্ঠ, ঈদের নামাযের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মানুষ তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যায়। ইমাম সেখানে পৌঁছে বসবে না এবং নফল পড়বে না। অন্যেরা নফল পড়তে পারে। এর পর একজন ঘোষক الصلوة جامعة (নামায শুরু হচ্ছে) বলে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবে। অতঃপর ইমাম দু'রাকআত পড়বে। প্রথম রাকআতে তকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তকবীর ছাড়া তিন বার আল্লাহু আকবার বলবে। এর পর আলহামদুর পরে সূরা ক্বাফ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে اقتربت الساعة পড়বে। দ্বিতীয় রাকআতে কেরাআত শেষে অতিরিক্ত তিন তকবীর বলবে। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবে এবং মাঝখানে বসবে।

সপ্তম, ভেড়া কোরবানী করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বহস্তে একটি ভেড়া যবেহ করেন এবং বলেন ঃ

بسم الله والله اكبر هذا عنى وعن من لم يضح من امتى -

—শুরু আল্লাহর নামে। আল্লাহ মহান। এটা আমার পক্ষ থেকে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে, যে কোরবানী করেনি।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যেব্যক্তি যিলহজ্জের চাঁদ দেখে এবং তার কোরবানী করার ইচ্ছা থাকে, সে যেন চুল ও নখ না কাটে। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে একজন তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কোরবানী করত এবং তারা সকলেই খেত ও খাওয়াত। তিন দিন অথবা আরও বেশী দিন কোরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয। প্রথমে এটা নিষিদ্ধ ছিল। পরে অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ ঈদুল ফেতরের পর বার রাকআত ও ঈদুল আযহার পর ছয় রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। এটা মসনূন আমল।

তারাবীহ– তারাবীহ কুড়ি রাকআত। এটা সুন্নতে মোআক্কাদা। তবে দুই ঈদের নামাযের তুলনায় এর উপর জোর কম। তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম, না একা পড়া– এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নামায দুই অথবা তিন রাতে জামাআত সহকারে পড়েছিলেন। এর পর জামাআতে পড়েননি এবং বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, এটা তোমাদের উপর ওয়াজিব না হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে তারাবীহের জামাআতে একত্রিত করে দেন। কেননা, ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল না। সুতরাং কতক আলেম হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কাজের কারণে বলেন, তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম। এ ছাড়া সকলের সমবেত হওয়ার মধ্যে বরকত আছে। একাকিত্বে মাঝে মাঝে আলস্যও স্পর্শ করে। সমাবেশ দেখলে মন প্রফুল্ল হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ তারাবীহ একা পড়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আমার এ মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে একশ' নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এসব নামাযের চেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তির নামায, যে তার গৃহের কোণে দু'রাকআত পড়ে এবং তার খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাখে না। এর কারণ, রিয়া ও বানোয়াট অধিকতর সমাবেশের মধ্যেই হয়ে থাকে। একান্তে মানুষ এগুলো থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি ইচ্ছে, তারাবীহ জামাআতে পড়াই ভাল। কেননা, কতক নফল নামায জামাআত সিদ্ধ। তারাবীহর প্রকাশও কর্তব্য।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রজবের নামায– রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রোযা রাখে, অতঃপর মাগরিব ও এশার মাঝখানে দু' দু'রাকআত করে বারো রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা কদর তিন বার, সূরা এখলাস বারো বার এবং নামাযান্তে পঁচাত্তর বার এই দরূদ পড়ে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه এর পর সেজদায় সত্তর বার বলে– سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ অতঃপর মাথা তুলে সত্তর বার বলে رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْاَعْظَمُ –এর পর দ্বিতীয় সেজদা করে এবং প্রথম সেজদায় যা বলেছিল তাই বলে, এর পর সেজদার মধ্যেই নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করে, তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করা হবে। তার সব গোনাহ্ মার্জনা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, বালুকার সংখ্যা, পাহাড়ের ওজন এবং বৃক্ষের পত্রসম হয়। কেয়ামতের দিন সে তার পরিবারের সাতশ' মানুষের শাফায়াত করবে, যারা দোযখের যোগ্য হবে।

শাবানের নামায– শাবানের ১৫ তারিখ রাতে দু'দু'রাকআত করে একশ' রাকআত পড়বে। প্রতি রাকআতে আলহামদুর পরে এগার বার সূরা এখলাস পড়বে। এক'শ' রাকআত সম্ভবপর না হলে দশ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে একশ' বার সূরা এখলাস পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায পড়তেন এবং একে 'সালাতে খায়র' বলতেন। মাঝে মাঝে তারা এ নামায জামাআতেও পড়তেন। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ ত্রিশ জন সাহাবী আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যেব্যক্তি রাতে এ নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে সত্তর বার রহমতের দৃষ্টি দেবেন এবং প্রত্যেক বারের দৃষ্টিতে তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তার মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে মাগফেরাত।

আর এক প্রকার নফল নামায রয়েছে যা ফরযের সাথে সম্পৃক্ত এবং কোন বিশেষ সময়ের সাথে জড়িত নয়। যেমন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায, বৃষ্টির নামায, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গ্রহণের নামায

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لايخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذالك فافزعوا الى ذكر الله والصلوة ـ

"নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না। যখন এই গ্রহণ দেখ, তখন দ্রুত যিকির ও নামাযের দিকে ধাবিত হও।" তিনি একথা তখন বলেছিলেন, যখন তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু হয়েছিল এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এতে লোকেরা বলাবলি করছিল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ নামায পড়ার নিয়ম এই– যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন মাকরূহ সময়ে হলেও মানুষকে নামাযের জন্যে الصلوة جامعة বলে আহ্বান করবে। এর পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে দু'টি রুকু করবে। প্রথম রুকু বড় হবে এবং দ্বিতীয় রুকু ছোট। কেরাআত সরবে পড়বে না। প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা বাকারা পাঠ করবে। প্রথম রুকুর পরে দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামুদ ও আলে এমরান পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকআতে কেয়ামে আলহামদু ও সূরা নেসা এবং প্রথম রুকুর পর দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামদু ও সূরা মায়েদা পড়বে, আথবা কোরআনের যেখান থেকে ইচ্ছা পড়বে। যদি প্রত্যেক কেয়ামে কেবল আলহামদুই পাঠ করে তবুও যথেষ্ট হবে। ছোট ছোট সূরা পড়লেও কোন দোষ নেই। নামায দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য গ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়া। প্রথম রুকুতে একশ' আয়াত পরিমাণে, দ্বিতীয় রুকুতে আশি আয়াত পরিমাণে, তৃতীয় রুকুতে সত্তর আয়াত পরিমাণে এবং চতুর্থ রুকুতে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণে তসবীহ্ পাঠ করবে। সেজদা ও রুকুর অনুরূপ হওয়া উচিত। এর পর নামায শেষে দু'টি খোতবা পাঠ করবে। মাঝখানে বসবে। উভয় খোতবার মানুষকে সদকা দেয়ার ও তওবা করার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আদেশ দেবে। চন্দ্রগ্রহণেও তাই করবে। কিন্তু তাতে কোরআন সরবে পাঠ করবে না। কেননা, এ নামায রাতের বেলায় হবে। যতক্ষণ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ এই নামায পড়ার সময়। নামাযের মধ্যেই গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে নামায সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ করে নেবে।

বৃষ্টির নামায– যখন নদীর পানি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষকে তিন দিন রোযা রাখতে বলা ইমামের জন্য মোস্তাহাব। এ সময় ইমাম সাধ্যানুয়ায়ী খয়রাত করা, কারও পাওনা থাকলে তা আদায় করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করারও উপদেশ দেবে। এর পর চতুর্থ দিন আবাল বৃদ্ধবনিতাসহ গোসল করে বের হবে। অনুনয় বিনয় প্রকাশ পায় এমন ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করবে এবং বিনয়ের ভঙ্গিমায় গমন করবে। কেউ কেউ বলেন ঃ চতুষ্পদ জীব-জন্তুসমূহ সাথে নিয়ে যাওয়া মোস্তাহাব। হাদীসে বলা হয়েছে–

لو لا صبيان رضيع ومشائخ راكع وبهائم راتع اصب عليكم العذاب صبا ـ

অর্থাৎ, "যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু, এবাদতে লিপ্ত মাশায়েখ ও চারণকারী চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করা হত।"

বিস্তীর্ণ মাঠে একত্রিত হওয়ার পর ইমাম তাদেরকে ঈদের নামাযের ন্যায় দু'রাকআত নামায পড়াবেন; কিন্তু তাতে অতিরিক্ত তকবীর থাকবে না। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবেন। উভয় খোতবার অধিকাংশ বিষয়বস্তু এস্তেগফার অর্থাৎ কৃত গোনাহখাতা থেকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। দ্বিতীয় খোতবার মাঝখানে ইমাম মুসল্লীদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়ে যাবে এবং নিজের চাদর এমনভাবে ওলটপালট করবে, যেন নীচের অংশ উপরে এবং ডানের অংশ বামে চলে যায়। মুসল্লীরাও তাদের চাদরের দিক এমনিভাবে পাল্টে নেবে। তখন আস্তে আস্তে দোয়া করবে। চাদর পাল্টানোর মধ্যে এই শুভ ইঙ্গিত রয়েছে, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির স্থিতি এমনিভাবে পাল্টে যাক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। এর পর ইমাম মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খোতবা শেষ করবে এবং চাদর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পাল্টানো অবস্থায়ই থাকতে দেবে। দোয়া এভাবে করবে; ইলাহী, আপনি আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ এবং তা কবুল করার ওয়াদা দিয়েছেন। অতএব আমরা আপনার আদেশ অনুযায়ী দোয়া করছি। এখন আপনার ওয়াদা অনুযায়ী তা কবুল করুন। ইলাহী, আমরা যেসব গোনাহ্ করেছি, সেগুলো মার্জনা করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদের রিযিক বৃদ্ধি ও বৃষ্টির জন্যে আমাদের দোয়া কবুল করুন।

জানাযার নামায– এ নামাযের নিয়ম সুবিদিত। এক সহীহ্ রেওয়ায়েতে আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত দোয়াটি এ নামাযে অধিক ব্যাপক। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এক জানাযার নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি যে দোয়া করেন তা দোয়া মুখস্থ করে নিয়েছি। তিনি বলছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمْ نُزُلَهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ
الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ
دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ
وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তাঁর মাগফেরাত করুন, তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর প্রবেশ পথ (কবর) বিস্তৃত করুন, তাঁকে বরফ ও শিলার পানি দিয়ে গোসল দিন, তাঁকে গোনাহ থেকে পবিত্র করুন, যেমন আপনি সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পবিত্র করেছেন, তাঁকে তাঁর গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দিন, তাঁর পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার দিন, তাঁর স্ত্রীর বদলে উত্তম স্ত্রী দিন, তাঁকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় দিন।"

হযরত আওফ বলেন ঃ এ দোয়া শুনে আমার বাসনা হল, হায়, এ মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ দোয়া যদি আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে হত! যেব্যক্তি দ্বিতীয় তকবীরে শরীক হয়, সে ইমামের সাথে অবশিষ্ট তকবীরগুলো বলবে এবং সালামের পর ছুটে যাওয়া তকবীরটি আদায় করে নেবে, যেমন মসবুক ব্যক্তি সালামের পর ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করে। তকবীরসমূহই জানাযার নামাযের বাহ্যিক আরকান। সেমতে অন্যান্য নামাযের রাকআতসমূহের স্থলাভিষিক্ত এ নামাযের তকবীরগুলো হওয়া উচিত। এটা আমার মতে অধিক যুক্তিসঙ্গত, যদিও আরও সম্ভাবনা আছে। জানাযার নামাযের সওয়াব এবং এর সাথে গমনের ফযীলত সম্পর্কে অনেক মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। সেগুলো উল্লেখ করে আমরা বিষয়বস্তু দীর্ঘ করতে চাই না। এর সওয়াব অনেক বেশী । কেননা, এটা ফরযে কেফায়া। নফল তার জন্যেই, যার উপর অন্য ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না । নির্দিষ্ট না হলেও সে ফরযে কেফায়ারই সওয়াব পায়। জানাযার নামাযে অধিক লোকের উপস্থিতি মোস্তাহাব । বেশী লোক হলে দোয়া বেশী হবে এবং তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এমনও থাকবে, যার দোয়া কবুল হয়। কুরায়ব বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তার জানাযায় কত লোক উপস্থিত হয়েছে দেখ । আমি দেখার পর বললাম ঃ অনেক লোক হয়েছে। তিনি বললেন ঃ চল্লিশ জন হয়েছে ? আমি বললাম ঃ হাঁ । তিনি বললেন ঃ এখন জানাযা বের কর । আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– যদি কোন মুসলমান মারা যায় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশ ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সুপারিশ মৃত ব্যক্তির জন্য কবুল করেন। লোকজন যখন জানাযার সাথে কবরস্থানে পৌছে অথবা এমনিতেও কবরস্থানে যায়, তখন এই দোয়া করবে–

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ -

অর্থাৎ, গৃহবাসী মুমিন ও মুসলমানদের প্রতি সালাম । আমাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হব। দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে প্রস্থান না করা উত্তম । দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলবে– ইলাহী, আপনার বান্দা আপনার কাছে সমর্পিত হয়েছে। আপনি তার প্রতি রহম করুন। ইলাহী, তার উভয় পার্শ্ব থেকে মাটি সরিয়ে দিন। তার আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দিন, তার আমল কবুল করুন। ইলাহী, সে সৎ হলে সওয়াব দ্বিগুণ করুন এবং গোনাহগার হলে তার গোনাহ্ ক্ষমা করুন।

তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায– এ দু'রাকআত নামায সুন্নত। জুমআর দিনে ইমাম খোতবা পাঠ করলেও এ নামায পড়া উচিত। যদি কেউ মসজিদে গিয়ে ফরয অথবা কাযা নামাযে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় এবং সওয়াব অর্জিত হয়ে যায়। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার প্রারম্ভ এমন এবাদত থেকে শূন্য না হওয়া, যা মসজিদের জন্যে নির্দিষ্ট, যাতে মসজিদের হক আদায় হয়। এজন্যই ওযুবিহীন অবস্থায় মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। যদি মসজিদ হয়ে অন্য দিকে যাওয়ার জন্যে অথবা মসজিদে বসার জন্যে প্রবেশ করে, তবে চার বার সোবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলে নেবে। কথিত আছে, এর সওয়াব দু'রাকআত নামাযের সমান। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে মাকরূহ সময়গুলোতে অর্থাৎ, আসর ও ফজর নামাযের পর সূর্য ঢলে পড়ার সময় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকআত পড়া মাকরূহ নয়। কেননা, বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর দু'রাকআত পড়লে কেউ আরজ করল ঃ আপনি তো আমাদেরকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ এ দু'রাকআত নামায আমি যোহরের পরে পড়তাম, কিন্তু বাইরের লোক নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আজ পড়তে পারিনি। এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় জানা গেল– (১) এমন নামায পড়া এ সময়ে মাকরূহ, যার কোন কারণ নেই। নফল নামাযের কাযা একটি দুর্বল কারণ। কেননা, আলেমগণ এ সম্পর্কে একমত নন, নফলের কাযা পড়া উচিত কিনা এবং যে নফল কাযা হয়ে যায়, তার মত নামায পড়ে দিলে নফলের কাযা হয়ে যাবে কিনা। সুতরাং এই দুর্বল কারণের জন্যে যখন আসরের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পর নফল মাকরূহ রইল না, তখন মসজিদে আসা, যা একটি পূর্ণাঙ্গ কারণ, তার জন্য আরও উত্তমরূপে মাকরূহ থাকবে না। এ কারণেই জানাযা এসে গেলে জানাযার নামায, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায কোন সময়ই মাকরূহ নয়। কেননা, এসব নামাযের কারণ আছে। মাকরূহ সেই নামায হয়, যার কারণ নেই। (২) আরও জানা গেল, নফলের কাযা পড়া দুরস্ত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নফলের কাযা পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদ্রার আধিক্য অথবা রোগের কারণে রাত্রি বেলায় উঠতে না পারলে দিনের বেলায় বার রাকআত পড়ে নিতেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ যেব্যক্তি নামাযে থাকার কারণে মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব দিতে পারে না, তার উচিত সালামের পর তা কাযা করে নেয়া, যদিও তখন মুয়াযযিন চুপ হয়ে যায়। যদি কারও কোন নির্দিষ্ট ওযিফা থাকে এবং ওযরবশতঃ তা আদায় করতে না পারে, তবে অন্য সময়ে তা আদায় করে নেবে, যাতে তার নফ্স আরামপ্রবণ না হয়ে উঠে। সুতরাং এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া একে তো নফসের মোজাহাদার জন্যে ভাল, দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل ـ

আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পছন্দনীয় আমল তাই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে আল্লাহর এবাদত করে, এরপর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

ওযুর নামায– ওযু করার পর দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। কারণ, ওযু একটি সওয়াবের কাজ। এর উদ্দেশ্য নামায পড়া। বে-ওযু হওয়ার আশংকা সব সময় লেগে থাকে। তাই নামাযের পূর্বেই ওযু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার এবং প্রথম ওযুর শ্রম নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেমতে ওযু করার সাথে সাথে দু'রাকআত পড়ে নেয়া মোস্তাহাব, যাতে উদ্দেশ্য ফওত না হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর হাদীস থেকে এটা জানা গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে বেলালকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি আমার আগে এখানে পৌঁছে গেলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিরূপে। বেলাল বললেন ঃ আমি কিছু জানি না। কেবল এতটুকু জানি, যখন আমি নতুন ওযু করি তখনই দু'রাকআত নামায পড়ে নেই।

গৃহে গমন ও নির্গমনের নামায– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তুমি যখন গৃহ থেকে বের হও, তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমার অশুভ নির্গমনের জন্যে বাধা হবে। আর যখন তুমি গৃহে গমন কর, তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়া উচিত। এ কারণে এহরাম বাঁধার সময় দু'রাকআত, সফরের শুরুতে দু'রাকআত এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গৃহে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম থেকে বর্ণিত। জনৈক সালেহ ব্যক্তি যখন কোন খাদ্য খেতেন অথবা পানি পান করতেন, তখন, দু'রাকআত নামায পড়ে নিতেন।

মানুষের কাজকর্ম তিন প্রকার– (১) কতক কাজ বার বার হয়ে থাকে, যেমন পানাহার। এ ধরনের কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

كل امر ذى بال لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر -

অর্থাৎ, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থাকে।

(২) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু তাতে গুরুত্ব থাকে। যেমন– বিবাহ, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা সহকারে শুরু করা মোস্তাহাব। উদাহরণতঃ যে বিবাহ দেয় সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ– আমি আমার কন্যা তোমার বিবাহে দিলাম এবং যে বিবাহ করে সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ– আমি বিবাহ কবুল করলাম। সাহাবায়ে কেরাম উপদেশ দান ও পরামর্শ করার কাজে প্রথমে আল্লাহর হামদ করতেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৩) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু হওয়ার পর বেশী দিন স্থায়ী থাকে এবং তাতে গুরুত্ব পাওয়া যায়। যেমন সফর করা, নতুন গৃহ ক্রয় করা, এহরাম বাঁধা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ করার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। গৃহে আগমন ও গৃহ থেকে নির্গমন এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন কাজ। এটাও যেন এক ছোট্ট সফর।

এস্তেখারার নামায– যেব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা করে; কিন্তু কাজটি করা ভাল হবে কি না করা ভাল হবে, তা কিছুই জানে না, তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'রাকআত নামায পড়তে বলেছেন। সে প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস পাঠ করবে। নামাযান্তে এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَقَدِّرْهُ لِىْ ثُمَّ يَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَقَدِّرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি, আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার কাছে শক্তি এবং আপনার মহান কৃপা প্রার্থনা করি। কেননা, আপনি শক্তিমান, আমার কোন শক্তি নেই। আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ, যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটি আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর হয়, তবে এটি আমার জন্য অবধারিত করুন, অতঃপর একে আমার জন্যে সহজ করুন এবং এতে বরকত দিন। আর যদি আপনি জানেন, এ কাজটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে ক্ষতিকর, তবে এ কাজ আমা থেকে এবং আমাকে এ কাজ থেকে দূরে রাখুন, আমার জন্যে কল্যাণ অবধারিত করুন, তা যেখানেই থাকুক না কেন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এস্তেখারার দোয়া কোরআনের আয়াতের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দিতেন । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন দু'রাকআত নামায পড়বে এবং সে কাজের নাম উল্লেখপূর্বক উপরোক্ত দোয়া করবে। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যেব্যক্তি চারটি বিষয় প্রাপ্ত হয়, সে চারটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয় না। যে শোকর প্রাপ্ত হয় সে অতিরিক্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় না; যে তওবা প্রাপ্ত হয় সে কবুল থেকে বঞ্চিত হয় না; যে এস্তেখারা লাভ করে সে মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং যে পরামর্শ প্রাপ্ত হয়, সে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয় না।

হাজতের নামায– যেব্যক্তি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্যে তার উচিত হাজতের নামায পড়া । ওহায়ব ইবনুল ওরদ (রহঃ) বলেন ঃ যেসব দোয়া অগ্রাহ্য হয় না, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, বান্দা বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী ও কুল হুওয়াল্লাহু পড়বে। এর পর সেজদা করতঃ এই দোয়া পড়বে–

سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ

اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَايَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ

اِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِى الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزِّ وَالْكَرَمِ

سُبْحَانَ ذِى الطَّوْلِ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ

وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ

الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ

اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মাহাত্ম্যকে আপন চাদর করেছেন এবং তদ্দ্বারা মহৎ হয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করেছেন। পবিত্র সেই সত্তা, একমাত্র যাঁর জন্যে তসবীহ উপযুক্ত । পবিত্র, অনুগ্রহ ও কৃপাবিশিষ্ট সত্তা। পবিত্র ইযযত ও দানশীলতাবিশিষ্ট সত্তা । পবিত্র নেয়ামতবিশিষ্ট সত্তা । ইলাহী, আমি আপনার কাছে আপনার আরশের জন্যে উপযুক্ত ইযযতের মাধ্যমে এবং আপনার কিতাবের চূড়ান্ত রহমতের মাধ্যমে, আপনার উচ্চ শানের মাধ্যমে এবং আপনার পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের মাধ্যমে, যা কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্ত অতিক্রম করতে পারে না- এই প্রার্থনা করছি, মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

এর পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করবে, যদি তা কোন গোনাহের বিষয় না হয় । ইনশাআল্লাহ এ প্রার্থনা কবুল হবে। ওহায়ব বলেন ঃ প্রাচীন লোকগণ বলতেন, এ দোয়া বোকাদেরকে শিখিয়ো না। নতুবা তারা এর মাধ্যমে গোনাহের কাজে সাহায্য নেবে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ রেওয়ায়েতটি রসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সালাতুত্তাসবীহ্‌- এ নামাযটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হুবহু বর্ণিত আছে। এটা কোন সময় ও কারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ নামায একবার পড়া থেকে কোন সপ্তাহ অথবা মাস খালি না থাকা মোস্তাহাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পিতৃব্য আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন ঃ আমি আপনাকে একটি বস্তু দিচ্ছি, একটি বিষয় শেখাচ্ছি। আপনি যখন এটা করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার ভূত-ভবিষ্যৎ, পরাতন ও নতুন, জানা ও অজানা এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ্ মাফ করে দেবেন। বিষয়টি এই, আপনি চার রাকআত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা পাঠ করবেন। যখন প্রথম রাকআতের কেরাআত শেষ হয়, তখন দন্ডায়মান অবস্থায় সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পনর বার, এরপর রুকু করে রুকুতে দশ বার এই কলেমা পড়বেন, এর পর দাঁড়িয়ে এই কলেমা দশ বার, এর পর সেজদা করে সেজদায় দশ বার, মাথা তুলে বসা অবস্থায় দশ বার, এভাবে প্রতি রাকআতে মোট পঁচাত্তর বার এই কলেমা পাঠ করে চার রাকআত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামায সম্পন্ন করবেন। সম্ভব হলে এ নামায প্রত্যেক দিন পড়ুন, নতুবা প্রত্যেক জুমআর দিনে একবার, এটাও সম্ভব না হলে মাসে একবার পড়ুন। এক রেওয়ায়েতে আছে, শুরুতে সানা পড়বেন, এর পর পনের বার উপরোক্ত তসবীহ্ কেরাআতের পূর্বে এবং দশ বার কেরাআতের পরে পাঠ করবেন; রাকআতের অবশিষ্টাংশে প্রথম রেওয়ায়েতের অনুরূপ পাঠ করবেন; কিন্তু দ্বিতীয় সেজদার পর কিছুই পাঠ করবেন না। এই রেওয়ায়েত উত্তম। উভয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার রাকআত এক সালামে এবং রাতের বেলায় চার রাকআত দু'সালামে পড়বে। কেননা, হাদীসে আছে– صلوة الليل مثنى مثنى (রাতের নফল নামায দু'রাকআত করে)। উপরোক্ত কলেমার পরে وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ কলেমা যোগ করা উত্তম। কতক রেওয়ায়েতে এ কলেমাও বর্ণিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত নফল নামাযসমূহের মধ্যে তাহিয়্যাতুল মসজিদ, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায ছাড়া অন্য কোন নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব নয়। ওযুর দু'রাকআত, সফরের দু'রাকআত, গৃহ থেকে বের হওয়ার নামায এবং এস্তেখারার নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না। কেননা, এসবের কারণ দুর্বল এবং মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা জোরদার। অতএব এসব নামায প্রথমোক্ত তিন প্রকার নামাযের মর্তবায় পৌঁছে না। আমি কতক সূফীকে মাকরূহ ওয়াক্তে ওযুর দু'রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। অথচ এটা নীতিবিরুদ্ধ। কেননা, ওযু নামাযের কারণ নয়; বরং নামায ওযুর কারণ হয়। কাজেই নামায পড়ার জন্যে ওযু করা উচিত। এটা নয় যে, নামায পড়বে ওযু করার জন্যে। যেব্যক্তি মাকরূহ ওয়াক্তে তার ওযু নামায থেকে খালি রাখতে চায় না, তার উচিত ওযুর পরে দু'রাকআত কাযার নিয়ত করা। কেননা, তার যিম্মায় কোন কাযা নামায থাকা সম্ভবপর। কাযা নামায মাকরূহ ওয়াক্তেও মাকরূহ নয়। কিন্তু মাকরূহ ওয়াক্তে নফলের নিয়ত করার কোন কারণ নেই। এসব ওয়াক্তে নফল নামায পড়তে নিষেধ করার পেছনে তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য। প্রথম, সূর্যপূজারীদের সাথে সামঞ্জস্য থেকে আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয়, শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা। হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয় হয় আর তার সাথে শয়তানের মস্তকের একটি প্রান্ত সংযুক্ত থাকে । সূর্য উপরে উঠে গেলে তা পৃথক হয়ে যায় । যখন ঠিক দ্বিপ্রহর হয় তখন আবার মিলিত হয়ে যায় । যখন ঢলে পড়ে তখন চলে যায়। এর পর যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে, তখন শয়তানের মাথা আবার সংযুক্ত হয় এবং অস্ত যাওয়ার পর আলাদা হয়ে যায় । রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ তিন সময়ে পড়তে নিষেধ করে তার কারণ বলে দিয়েছেন। তৃতীয়, আধ্যাত্ম পথের পথিক সর্বদা নিয়মিত নামায পড়ে। এবাদত একই প্রকারে নিয়মিত করা পরিণামে বিষণ্নতা সৃষ্টি করে। যদি এক ঘন্টা এবাদত বন্ধ রাখা হয় তবে প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছা নতুনতর হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা

জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ করেছেন এবং নামাযের পর এর কথাই উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُو الزَّكٰوةَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة ـ

অর্থাৎ, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত – এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল, নামায কয়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা।

যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত প্রদান করা। আহ্নাফ ইবনে কয়স (রাঃ) বলেন ঃ আমি কয়েকজন কোরায়েশের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় হযরত আবু যর (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করলেন। তিনি বললেন ঃ কাফেরদেরকে শুনিয়ে দাও একটি দাগের খবর, যা তাদের পিঠে লাগবে এবং পাঁজরের হাড্ডি হয়ে বের হবে। আরেকটি দাগ তাদের গ্রীবায় লাগবে এবং কপাল পার হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এমন সময়ে পৌঁছলাম, যখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন ঃ কাবার পালনকর্তার কসম, তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত । আমি আরজ করলাম ঃ হুযুর, কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ যাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যারা ডানে, বামে, সম্মুখে ও পেছনে ধন-সম্পদ ছড়ায় এবং খয়রাত করে (তাদের কথা আলাদা), এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম । তিনি আরও বললেন ঃ যে উটওয়ালা, ছাগলওয়ালা ও গরুওয়ালা তাদের যাকাত প্রদান করে না, কেয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব বড় ও মোটাতাজা হয়ে আসবে এবং এ ব্যক্তিকে শিং দ্বারা গুঁতো মারবে আর খুর দ্বারা পিষ্ট করবে। যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জন্তু তাকে মারা শেষ করবে, তখন পুনরায় এমনিভাবে শুরু করবে। মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব অব্যাহত থাকবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাতের প্রকার ও ওয়াজেব হওয়ার কারণ

ধন-সম্পদের দিক দিয়ে যাকাত ছয় প্রকার । নিম্নে প্রত্যেক প্রকার আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকার– গৃহপালিত জন্তুর যাকাত প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন ব্যক্তির উপর ওয়াজেব । তার বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত । এখন যে চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ওয়াজেব হয় তার জন্যে শর্ত পাঁচটি ; প্রথমতঃ বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। কেননা, যাকাত কেবল উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে ফরয। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার মধ্যে ফরয নয়। দ্বিতীয় ঃ জঙ্গলে ঘাস খাওয়া ; কেননা, যেসকল জন্তু গৃহেই ঘাস খায়, সেগুলোর উপর যাকাত নেই। তৃতীয়তঃ এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لازكوة الا فى مال حتى يحول عليه الحول ـ

অর্থাৎ, যে মালের উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয় না, তাতে যাকাত নেই।

এ বিধানে বাচ্চা জন্তু বড় জন্তুর অনুগামী হয়। অর্থাৎ, বড় জন্তুর উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে বাচ্চাদেরও যাকাত দিতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে, যদিও সেগুলোর এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা বিক্রয় করে দেয়া হয় অথবা দান করা হয়, তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। চতুর্থতঃ মালের উপর পূর্ণ মালিকানা শর্ত। ফলে হারানো মালের যাকাত দেয়া ওয়াজেব নয়, যে পর্যন্ত তা পুনরায় হস্তগত না হয়। হস্তগত হলে অতীত দিনেরও যাকাত ওয়াজেব হবে। যার কর্জ তার সম্পূর্ণ মালের অধিক, তার উপর যাকাত নেই। কেননা, এরূপ মালের কারণে সে ধনী নয়। এ মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তাকে ধনী বলা যেত । পঞ্চমতঃ নেসাব পূর্ণ হওয়া । এটা প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আলাদা আলাদা । উদাহরণতঃ উটের সংখ্যা পাঁচ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। উট পাঁচটি হলে তাতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দু'বছর বয়সের একটি ছাগল যাকাতস্বরূপ দিতে হবে। দশটি উটে দু'টি, পনরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি ছাগল দিতে হবে। উট পঁচিশটি হলে তাতে একটি বিনতে মাখায অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে দিতে হবে। ছত্রিশটি উটে একটি বিনতে লাবুন, অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে– দিতে হবে। ছেচল্লিশটি উটে একটি হিক্কা অর্থাৎ, চতুর্থ বছরের মাদী উট দিতে হবে। একষট্টিটি উটে জিযআ, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সের একটি উষ্ট্রী দিতে হবে। ছিয়াত্তরে দুটি বিনতে লাবুন, একানব্বইয়ে দু'হিক্কা এবং একশ' একুশ উটে তিনটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এর পর উটের সংখ্যা একশ' ত্রিশ হয়ে গেলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। এই হিসাবে একশ' ত্রিশটিতে একটি হিক্কা ও দুটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। গাভী ও বলদে ত্রিশটি হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই। ত্রিশটি হয়ে গেলে একটি তবী (দ্বিতীয় বছরে উপনীত নর বাছুর) যাকাত দিতে হবে । চল্লিশটি হলে একটি মুসিন্না অর্থাৎ, যে মাদী বাছুর তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে– দিতে হবে। ষাটটি হলে দুটি তবী দিতে হবে। এর পর প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি মুসিন্না ও প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি তবী যাকাত দিতে হবে। চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত ছাগল ভেড়ার মধ্যে যাকাত নেই। চল্লিশটি হলে তাতে একটি ভেড়ার 'জিযআ' (পূর্ণ এক বছরের ভেড়া) অথবা ছাগলের 'ছানিয়া' (পূর্ণ দু'বছরের ছাগল) দিতে হবে। এরপর একশ' বিশ পর্যন্ত এ হার অব্যাহত থাকবে। একশ' একুশটি হলে দুশ' পর্যন্ত দু'টি ছাগল দিতে হবে। দুশ'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক হয়ে গেলে তিনশ' নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং চারশ' হয়ে গেলে চারটি ছাগল দিতে হবে। অতঃপর প্রতি শ'তে একটি করে ছাগল দিতে হবে। নেসাবের মধ্যে দু'শরীকের যাকাত এক মালিকের মতই হবে। উদাহরণতঃ দু'ব্যক্তির শরীকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাদের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে এবং তিন ব্যক্তির শরীকানায় একশ' বিশটি ছাগল থাকলে সকলের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে । অথচ আলাদা করলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি করে ছাগল পড়ে এবং তাতে একটি করে ছাগল ওয়াজেব হতে পারে। পালের মধ্যে সুস্থ জন্তু থাকলে অসুস্থ জন্তু যাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা জায়েয নয়। ভাল জন্তুর মধ্যে ভাল এবং মন্দ জন্তুর মধ্যে মন্দ জন্তুই নিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ খাদ্য জতীয় ফসলের যাকাত। এরূপ ফসল আটশ' সের অর্থাৎ বিশ মণ হলে তাতে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। ফলমূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই। খোরমা ও কিশমিশ শুষ্ক অবস্থায় বিশ মণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজেব।

তৃতীয় প্রকার ঃ রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাত। খাঁটি রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হল, তার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রৌপ্য আরও বেশী হলে এ হিসাবেই যাকাত ওয়াজেব হবে, যদিও এক দেরহাম বেশী হয়। স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা। এতেও বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব। এক রতি বেশী হলেও এ হিসাবেই যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে নেসাব থেকে এক রতি কম হলেও যাকাত ওয়াজেব হবে না।

চতুর্থ প্রকার ঃ পণ্য দ্রব্যের যাকাত। এতে সোনা রূপার মত চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। এর বছর গণনা সেদিন থেকে হবে, যেদিন পণ্যদ্রব্য কেনার নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যবসায়ীর মালিকানায় আসে। যদি সেই নগদ অর্থ নেসাবের কম হয় অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসা করার নিয়তে মাল ক্রয় করে, তবে বছরের শুরু ক্রয় করার সময় থেকে হবে। বছরের শেষে পণ্যদ্রব্যের যে মুনাফা অর্জিত হয়, মূলধনের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে মুনাফার উপর যাকাত ওয়াজেব হয়ে যায়। মুনাফার উপর নতুনভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম প্রকার ঃ মাটির নীচে পুঁতে রাখা মাল ও খনিজ সামগ্রীর যাকাত। পুঁতে রাখা মাল মানে সেই মাল, যা কুফরের আমলে পুঁতে রাখা হয় এবং এমন জমিনে পাওয়া যায়, ইসলামী আমলে যার উপর কারও মালিকানা হয়নি। যেব্যক্তি এই পুঁতে রাখা মাল পাবে, তার কাছ থেকে সোনা-রূপা হলে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। এতে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। নেসাবের শর্ত না হওয়াও উত্তম। কেননা, এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব হওয়ার কারণে যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে এর সামঞ্জস্য বেশী। নেসাবের শর্ত রাখা হলেও তা অবান্তর নয়। কেননা, এই এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাতের মাসরাফ তথা ব্যয় খাত একই। এ কারণেই সহীহ্ মাযহাব অনুযায়ী খাঁটি সোনা রূপাকেই 'দফীনা' তথা পুঁতে রাখা মাল বলা হবে, অন্য কিছুকে নয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে কেবল সোনা-রূপার উপরই যাকাত ওয়াজেব হয়- অন্য কোন দ্রব্যের উপর ওয়াজেব হয় না। সোনা-রূপা খনি থেকে বের করে নেয়ার পর বিশুদ্ধতম উক্তি মোতাবেক তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব হবে। এ উক্তি অনুযায়ী নেসাব হওয়া শর্ত। বছর অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে দু'উক্তির মধ্যে এক উক্তি হচ্ছে, খনির সোনা-রূপার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব। কাজেই বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই।

সাবধানতা হচ্ছে অল্প হোক কি বেশী, সকল প্রকার খনি থেকে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা এবং বিশেষভাবে সোনা-রূপার খনি নয়- প্রত্যেক খনি থেকে এক-পঞ্চমাংশ দেয়া- যাতে মতভেদের কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ সদকায়ে ফেতর। এটা এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যার কাছে ঈদুল ফেতরের দিনে তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত এক ছা' খাদ্য মৌজুদ থাকে। তিন সের আধা ছটাকে এক ছা' হয়। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ মাথাপিছু এক ছা'। পরিবারে যে খাদ্য খাওয়া হয়, তা অথবা তা থেকে উত্তম খাদ্য দেবে। সুতরাং পরিবারে গম খাওয়া হলে যব দেয়া দুরস্ত নয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া হলে যেটি উত্তম সেটি দেবে; যেকোন একটি দিলেও হবে। (১) পুরুষ গৃহকর্তার উপর তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ-পোষণ করতে হয়, এমন আত্মীয়দের সদকা দেয়া ওয়াজেব। যেমন, বাপ-দাদা, মা-নানী ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যাদের ভরণ পোষণ কর, তাদের সদকায়ে ফেতর আদায় করে দাও। স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে ফেতরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে। যদি কারও কাছে এতটুকু খাদ্যই অতিরিক্ত হয়, যা কতক লোকের পক্ষ থেকে দিতে পারে, তবে কতক লোকের পক্ষ থেকেই আদায় করবে। তবে যাদের ভরণ-পোষণের তাকিদ বেশী, প্রথমে তাদের ফেতরা দেবে।

মোট কথা, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির এসব বিধান জেনে নেয়া উচিত এবং কোন বিরল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আলেমগণের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে তার উপর আমল করা দরকার।

(১) হানাফী মাযহাবমতে সদকায়ে ফেতর এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, অন্ন বস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়। এ নেসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। এ সদকা সে নিজের থেকে, নিজের সন্তানদের পক্ষ থেকে এবং খেদমতের গোলামদের পক্ষ থেকে আদায় করবে। স্ত্রী এবং বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে দিতে হবে না। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ গম ও গম জাতীয় খাদ্যের অর্ধ ছা' এবং যব ও খেজুরের এক ছা'। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিলেও সদকায়ে ফেতর আদায় হবে।

যাকাতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী

বাহ্যিক শর্তাবলী ঃ উল্লেখ্য, যাকাতদাতা ব্যক্তি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। প্রথমতঃ মনে মনে ফরয যাকাত দেয়ার নিয়ত করা। অমুক অমুক মালের যাকাত দেই- এরূপ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। ওলীর নিয়ত উন্মাদ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের নিয়তের স্থলবর্তী হবে। তদ্রূপ শাসনকর্তার নিয়ত মালের মালিকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে- যদি মালের মালিক যাকাত না দেয়। কিন্তু এটা দুনিয়ার বাহ্যিক বিধান। আখেরাতে সে দাবী থেকে মুক্ত হবে না যে পর্যন্ত নতুনভাবে যাকাত না দেয়। যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকিল করা হলে এবং তখন নিয়ত করে নিলে অথবা উকিলকে নিয়তেরও উকিল করা হলে যথেষ্ট হবে। কেননা, নিয়তের জন্যে উকিল করাও নিয়ত। দ্বিতীয়তঃ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তড়িঘড়ি যাকাত দেয়া উচিত। সদকায়ে ফেতর ঈদের দিন থেকে বিলম্বিত করা উচিত নয়। যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মালের যাকাত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিতে বিলম্ব করে, সে গোনাহগার হবে। এর পর যদি তার মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যাকাতের প্রাপককে পাওয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে যাকাত তার যিম্মায় থেকে যাবে। যদি যাকাতের প্রাপক না পাওয়ার কারণে বিলম্ব হয় এবং ইতিমধ্যে মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে যাকাত যিম্মায় থাকবে না। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যাকাত দেয়া জায়েয যদি মাল নেসাব পরিমাণে হয়ে যায়। দু'বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়াও জায়েয। অগ্রিম যাকাত দিলে যদি যাকাত গ্রহীতা মিসকীন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায় অথবা দর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা অন্য কোন মাল প্রাপ্তির কারণে ধনী হয়ে যায়, অথবা মালের মালিকের মাল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যা কিছু সে অগ্রিম দিয়েছিল তা যাকাতরূপে গণ্য হবে না। দেয়ার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্ত যোগ করে না থাকলে এটা ফেরত লওয়াও সম্ভবপর নয়। কাজেই মালের মালিককে অবশ্যই পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রিম যাকাত দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ যাকাতস্বরূপ যে মাল ওয়াজেব হয়, তার বিনিময়ে মূল্য দিতে পারবে না; বরং যে মাল ওয়াজেব হয় তাই দেবে। এমনকি, স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ দেবে না, যদিও মূল্য বাড়িয়েই দেয়া হয়। সম্ভবতঃ যারা ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য বুঝে না, তারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা কেবল দেখে, ফকীরের অভাব দূর করাই উদ্দেশ্য। অথচ এটা প্রকৃত জ্ঞানের কথা নয়। কেননা, ফকীরের অভাব দূর করা যাকাতের উদ্দেশ্য ঠিকই; কিন্তু এটা পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্যের একটি অংশ মাত্র। শরীয়তের ওয়াজেব বিষয়সমূহ তিন প্রকার। এক, নিছক এবাদত। এতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কোন দখল নেই। উদাহরণতঃ হজ্জে কংকর নিক্ষেপ করা। এতে কাজটি শুরু করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য, যাতে বান্দা তার দাসত্ব ও গোলামী এমন কাজ দ্বারা প্রকাশ করে, যার অর্থ বোধগম্য নয়। কেননা, যে কাজের অর্থ বোধগম্য, তা সম্পাদনে মানুষের মনও সাহায্য করে। ফলে তাতে খাঁটি দাসত্ব প্রকাশ পায় না। কারণ একমাত্র মাবুদের আদেশের কারণেই কর্ম সম্পাদন করাকে দাসত্ব বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম এমনি ধরনের। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় এহরামে এরশাদ করেন ঃ

لبيك لحجة حقا تعبدا ورقا .

আমি উপস্থিত আছি দাসত্বস্বরূপ হজ্জের জন্যে। অর্থাৎ, এ এহরাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে দাসত্ব প্রকাশ করা এবং যেভাবে আদেশ হয়েছে তা মেনে নেয়া এমন কোন যুক্তি ব্যতিরেকে, যা এ আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্ম এমন, যার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য রয়েছে– নিছক এবাদত বা দাসত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়; যেমন কর্জ শোধ করা এবং ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফেরত দেয়া। এতে নিয়ত ও কর্মই ধর্তব্য নয়; বরং হকদারের কাছে তার হক আসল অথবা বিনিময়– যেকোন আকারে পৌঁছে গেলেই ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। এ দু'প্রকার ওয়াজেব সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা, ফলে সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তৃতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্মে বান্দার অভাব দূর করা এবং তার দাসত্ব পরীক্ষা করা উভয় বিষয় উদ্দেশ্য। এ প্রকার ওয়াজেব কর্মে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব এবং যে বিষয় অধিক প্রকাশ্য, তার দিকে লক্ষ্য রেখে অপর বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, অপর বিষয়টি অর্থাৎ দাসত্ব পরীক্ষার দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। যাকাত এমনি ধরনের একটি ওয়াজেব কর্ম। ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত অন্য কেউ এ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয়। যাকাতে গরীবের অভাব দূর করা একটি প্রকাশ্যতম বিষয় বিধায় এটা সহজে বোধগম্য। বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত প্রদান করে দাসত্ব প্রকাশ করাও শরীয়তের লক্ষ্য। এদিক দিয়েই যাকাত নামায ও হজ্জের সমকক্ষ হয়ে ইসলামের একটি স্তম্ভ সাব্যস্ত হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই, প্রত্যেক প্রকারের মাল পৃথক করা, তা থেকে যাকাতের পরিমাণ বের করা এবং তা বর্ণিত আট প্রকার খাতে বন্টন করা একটি কঠিন কাজ। এতে শৈথিল্য করলে গরীবের স্বার্থে কোন ত্রুটি দেখা দেয় না; কিন্তু দাসত্ব প্রকাশে অবশ্যই ত্রুটি থেকে যায়।

চতুর্থতঃ যাকাতের অর্থ অন্য শহরে স্থানান্তর করবে না। কেননা প্রত্যেক শহরের মিসকীন সেই শহরের যাকাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থানান্তর করা হলে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। স্থানান্তর করলে এক উক্তি অনুযায়ী যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু মতভেদজনিত সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ভাল। কাজেই প্রত্যেক শহরের যাকাতের মাল সেই শহরের গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে।

পঞ্চমতঃ কোরআনের বর্ণিত আট প্রকার খাতের মধ্যে থেকে যে কয় প্রকার খাত শহরে বিদ্যমান আছে, যাকাতের মাল ততভাগে ভাগ করবে। কেননা, নির্ধারিত খাতে যাকাতের অর্থ পৌঁছানো যাকাতদাতার উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়াজেব। إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الخ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাই। অর্থাৎ, যাকাত এই লোকদের কাছে পৌঁছা উচিত। এ আয়াতটি এমন, যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি ওসিয়ত করে, তার এক-তৃতীয়াংশ মাল ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে। এ ওসিয়ত এটাই চায় যে, তার মালের মধ্যে উভয় প্রকার লোক অংশীদার থাকবে। আয়াতেও সকল প্রকারের অংশীদারিত্ব বুঝানো হয়েছে। এবাদত অধ্যায়ে বাহ্যিক বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয়। আট প্রকারের মধ্যে দু'প্রকার খাত তো অধিকাংশ শহরেই অনুপস্থিত। এক, অন্তর জয় করার জন্যে যাদেরকে যাকাত দেয়া হয় এবং দুই, যাকাতের কর্মচারীবৃন্দ। চার প্রকার খাত সকল শহরেই বিদ্যমান আছে– ফকীর-মিসকীন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও নিঃস্ব মুসাফির। দু'প্রকার খাত কতক শহরে পাওয়া যায় এবং কতক শহরে পাওয়া যায় না। তারা হল গাযী ও মুকাতাব।

সুতরাং যাকাতদাতার শহরে যদি পাঁচ প্রকার খাত বিদ্যমান থাকে, তবে যাকাতের অর্থ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করবে এবং প্রত্যেক প্রকার খাতকে এক ভাগ দেবে। প্রত্যেক খাতের সমান সংখ্যক ব্যক্তিকে দেয়াই ওয়াজেব নয়; বরং এক প্রকারের দশ ব্যক্তিকে এবং অন্য প্রকারের বিশ ব্যক্তিকে দেয়ার অধিকার যাকাতদাতার রয়েছে। তবে প্রত্যেক প্রকারের সংখ্যা যেন তিন জনের কম না হয়। সুতরাং শহরে পাঁচ প্রকার খাত বিদ্যমান থাকলে যাকাত পনর-ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করবে। যাকাতের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এভাবে বন্টন করা কঠিন হলে অন্য যাকাতদাতাদের সাথে শরীক হয়ে যাবে এবং সকলের মাল একত্রিত করে পনর ব্যক্তিকে সমর্পণ করবে, যাতে তারা পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয়। কেননা, সকলকে দেয়া জরুরী।

যাকাতের আভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার

জানা উচিত, যারা আখেরাতের কামনা করে, তাদের জন্যে যাকাত প্রদানে কয়েকটি আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। প্রথমতঃ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা এবং একথা অনুধাবন করা, যাকাত কোন দৈহিক এবাদত নয়; আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ। এতদসত্ত্বেও এটা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সাব্যস্ত হল কেন? যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ তিনটি–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(১) শাহাদতের উভয় কলেমা পাঠের মানে হল তওহীদকে অপরিহার্য করা এবং মাবুদের একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা। এটা এমনভাবে পূর্ণ করতে হবে, যেন তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রিয় না থাকে। কেননা, মহব্বত অংশীদারিত্ব কবুল করে না এবং কেবল মুখে তওহীদ উচ্চারণ করা তেমন উপকারী নয়। বরং মহব্বত আছে কিনা, প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ দ্বারা তা পরীক্ষা করা যায়। মানুষের কাছে মাল ও অর্থকড়ি অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কেননা, এটাই সাংসারিক কার্যোদ্ধারের মোক্ষম হাতিয়ার। দুনিয়াতে মানুষ অর্থ-সম্পদকেই আপন মনে করে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। অথচ মৃত্যুর মধ্যে আরাধ্য পরম প্রিয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। তাই মানুষের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্যে কাম্য ও প্রিয় অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে বিসর্জন দিতে বলা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, এটা জেহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভের আগ্রহে প্রাণ বিসর্জন দেয়া এবং অর্থকড়ি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থ ব্যয় করার এই রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণী তারা, যারা তওহীদকে সত্যিকাররূপে মেনে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করে সমস্ত ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারা নিজেদের কাছে না কোন আশরাফী রাখে, না টাকা-পয়সা। যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কোন সুযোগই তারা রাখে না। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দুশ' দেরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব ? তিনি বলেন ঃ শরীয়তের আইনে সাধারণ মানুষের উপর পাঁচ দেরহাম ওয়াজেব, কিন্তু আমাদের উপর গোটা দুশ' দেরহামই দিয়ে দেয়া ওয়াজেব। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন দান খয়রাতের ফযীলত বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ এবং হযরত ওমর (রাঃ) অর্ধেক মাল দান করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিবারের জন্যে কি রেখেছ ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখেছি। হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি রেখেছ? তিনি বললেন ঃ পরিবারের জন্যে ততটুকু রেখে দিয়েছি, যতটুকু এখানে উপস্থিত করেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের মধ্যে ততটুকু তফাৎ, যতটুকু তোমাদের কথার মধ্যে তফাৎ। দ্বিতীয় শ্রেণী তারা, যারা অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং অভাব-অনটনের সময় খয়রাতের মওসুমের অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের মর্তবা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কম। সঞ্চয় করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা, বিলাসব্যসনে উড়িয়ে না দেয়া এবং প্রয়োজন মেটানোর পর কিছু বেঁচে গেলে সময় সুযোগ বুঝে তা সৎপথে ব্যয় করা। তারা কেবল যাকাতের অর্থ প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং অন্য দান-খয়রাত করে। নখয়ী, শা'বী, আতা ও মুজাহিদ প্রমুখ আলেমের অভিমত, অর্থ সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক আছে। শা'বীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ হাঁ, আরও হক আছে। তুমি আল্লাহ তাআলার এই এরশাদ শ্রবণ করনি, وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى এবং মালের মহব্বত সত্ত্বেও তা আত্মীয় ও অনাথদেরকে দান করে। এই আলেম وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (আমি তাদেরকে যা দেই, তা থেকে তারা ব্যয় করে।) এবং وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ (তোমরা আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় কর।) আয়াত দুটিকেও তাদের দাবীর সপক্ষে পেশ করে বলেন ঃ এসব আয়াত যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক হক এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । অর্থ এই, ধনী ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে পেলে যাকাত ছাড়া অন্য মাল দ্বারা তার অভাব দূর করবে। এ সম্পর্কে ফেকাহ্ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, অভাবের কারণে কেউ মরণাপন্ন হয়ে গেলে তার অভাব দূর করা অন্যদের উপর ফরযে কেফায়া। কিন্তু এতে বলা যায়, ধনী ব্যক্তির উপর কেবল এতটুকু ওয়াজেব, যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা তার অভাব দূর হয়ে যায়, সেই পরিমাণ অর্থ তাকে কর্জ দেবে । যাকাত দিয়ে থাকলে দান করে দেয়া তার উপর ওয়াজেব নয়। কেউ কেউ বলেন ঃ দান করাই ওয়াজেব– কর্জ দেয়া দুরস্ত নয়। মোট কথা, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে কর্জ দেয়া হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়া, যা সর্বসাধারণের স্তর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় শ্রেণী তারা, যারা কেবল ওয়াজেব যাকাত আদায় করেই ক্ষান্ত থাকে – বেশীও দেয় না এবং কমও দেয় না। এটা সর্বনিম্ন মর্তবা । সাধারণ মানুষ তাই করে। কারণ তারা ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট ও কৃপণ হয়ে থাকে এবং পরকালের আসক্তি তাদের মধ্যে কম। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ـ

অর্থাৎ, যদি তিনি তোমাদের কাছে অর্থ সম্পদ চান এবং পীড়াপীড়ি করেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে।

যাকাত ওয়াজেব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষকে কৃপণতা দোষ থেকে মুক্ত করা। কেননা, এটা হচ্ছে অন্যতম বিনাশকরী দোষ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى يتبع وعجائب المرء بنفسه ـ

তিনটি বিষয় বিনাশকারী– লোভ, খেয়ালখুশী এবং আত্মপ্রীতি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

যাদেরকে লোভ–লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই সফলকাম। বলাবাহুল্য, অর্থ সম্পদ দান করার অভ্যাস গড়ে তোলাই কৃপণতা দোষ দূর করার উপায় । এ কারণের দিক দিয়ে যাকাত পবিত্রকারী ; অর্থাৎ যাকাত যাকাতদাতাকে কৃপণতার মারাত্মক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দেয়। এ পবিত্রকরণ ততটুকু হবে, যতটুকু মানুষ দান করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ ও খুশী অনুভব করবে। যাকাত ওয়াজেব হওয়াব তৃতীয় কারণ, নেয়ামতের শোকর আদায় করা। কেননা, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যেমন বান্দার শরীরে নিহিত নেয়ামতের শোকর, তেমনি আর্থিক এবাদত অর্থসম্পদে নিহিত নেয়ামতেরও শোকর। সুতরাং যেব্যক্তি গরীবকে অভাবী হয়ে তার কাছে হাত পাততে দেখেও আল্লাহ তাআলার শোকর করে না যে, আল্লাহ তাকে ধনী করেছেন এবং অপরকে তার প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন, সে অত্যন্ত নীচ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় আদব, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করে দেয়া, যাতে তাদের খোদায়ী আদেশ পালনে আগ্রহ বুঝা যায়, গরীবরা মানসিক শান্তি লাভ করে এবং সময়ের বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকা যায়। বিলম্বে যাকাত আদায় করার মধ্যে অনেক বিপদাপদের আশংকা থাকে। প্রথমতঃ এতে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং অন্তরে পুণ্যের প্রেরণা প্রকাশ পেলে তাকে সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান করবে। এরূপ প্রেরণা ফেরেশতা কর্তৃক অবতীর্ণ হয়ে থাকে। মুমিনের অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে থাকে। তাতে পরিবর্তন আসতে দেরী লাগে না। এছাড়া শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অপকর্মের আদেশ করে। তাই সৎকর্মের প্রেরণা অন্তরে উদয় হওয়া গনীমত মনে করবে। একত্রে যাকাত দিলে তা আদায় করার জন্যে কোন উত্তম মাস নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে মাসের গুণে নৈকট্য অধিক অর্জিত হয়। উদাহরণতঃ বছরের প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম মাসে অথবা পবিত্র রমযান মাসে যাকাত দেবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসে সর্বাধিক দান খয়রাত করতেন; এমনকি গৃহে কোন কিছু রাখতেন না। রমযানে শবে কদরেরও ফযীলত আছে, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলতেন ঃ রমযান বলো না। কেননা, এটা আল্লাহ তাআলার একটি নাম; বরং রমযান মাস বলো। যিলহজ্জ মাসও অন্যতম সম্মান ও ফযীলতের মাস। এতে হজ্জে আকবর হয়। কোরআনে উল্লিখিত আইয়্যামে মালূমাত এবং আইয়্যামে মাদুদাত এ মাসেই রয়েছে। রমযান মাসের শেষ দশ দিন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অধিক ফযীলত রাখে।

তৃতীয় আদব হচ্ছে সুখ্যাতি ও রিয়া থেকে দূরে থাকার জন্যে গোপনে যাকাত আদায় করা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

افضل الصدقة جهد المقل الى فقير فى سر .

সর্বোত্তম দান এই যে, দরিদ্র ও সম্বলহীন ব্যক্তি শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে তা গোপনে কোন ফকীরকে দিয়ে দেবে। জনৈক আলেম বলেন ঃ তিনটি বিষয় দান-খয়রাতে সওয়াব ভান্ডার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে গোপনে দান করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা গোপনে কোন কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি তা প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতা থেকে প্রকাশ্য খাতায় স্থানান্তর করেন। এর পর যদি সে এ কর্মের কথা অন্য কাউকে বলে, তবে গোপন ও প্রকাশ্য উভয় খাতা থেকে তা দূর করে রিয়ার খাতায় লেখে দেয়া হয়। এক মশহুর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেদিন ছায়াতলে রাখবেন যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি, যে কোন কিছু দান করলে তার বাম হাতও জানতে পারে না যে, ডান হাত কি দান করেছে। এক হাদীসে আছে- وصدقة السر تطفى غضب الرب। গোপন দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নির্বাপিত করে। আল্লাহ বলেনঃ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ যদি দান খয়রাত গোপনে ফকীরদের হাতে পৌঁছাও, তবে এটা তোমাদের জন্যে উত্তম। গোপনে দান করার উপকারিতা হচ্ছে রিয়া ও খ্যাতির কুফর থেকে আত্মরক্ষা করা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা খ্যাতির জন্যে দান করে, দানের কথা অন্যের কাছে বলে এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের দান কবুল করেন না। যে দানের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায় সে খ্যাতি অন্বেষণ করে। যে জনসমাবেশে দান করে, সে রিয়াকার। গোপনে দান করলে এ দুটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বুযুর্গগণ গোপনে খয়রাত করার ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। গ্রহীতা যাতে দাতাকে চিনতে না পারে সে ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এজন্যে কেউ কেউ অন্ধের হাতে খয়রাত রেখে দিতেন। কেউ ফকীরের গমন পথে ও তার বসার জায়গায় খয়রাত ফেলে রাখতেন। কেউ ঘুমন্ত ফকীরের কাপড়ের কোণে খয়রাত বেঁধে দিতেন। কেউ অন্যের হাতে ফকীরের কাছে পৌঁছে দিতেন যাতে ফকীর দাতার অবস্থা না জানে। তারা আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করার উপায় সৃষ্টি করা এবং খ্যাতি ও রিয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশে এভাবে দান খয়রাত করতেন। যদি কোন এক ব্যক্তিকে অবহিত না করে খয়রাত করা অসম্ভব হয়, তবে মিসকীনকে সমর্পণ করার জন্যে একজন উকিলের হাতে খয়রাত সোপর্দ করা উত্তম। এতে মিসকীন জানতে পারবে না, দাতা কে? কারণ মিসকীন জানলে রিয়া ও অনুগ্রহ উভয়টি হয়। আর উকিলের জানার মধ্যে কেবল রিয়াই হবে। সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশে দান করলে দানকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। কেননা, যাকাতের উদ্দেশ্য কৃপণতা দূর এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধনসম্পদের মহব্বত হ্রাস করা। ধনসম্পদের মহব্বতের তুলনায় খ্যাতির মহব্বত মনকে অধিক আচ্ছন্ন করে। আখেরাতে উভয়টিই ক্ষতিকর। কিন্তু কৃপণতা কবরে দংশনকারী বিচ্ছুর এবং রিয়া বিষধর সর্পের আকৃতি লাভ করবে। মানুষকে উভয় শত্রু দুর্বল ও নির্ধন করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে এদের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় অথবা হ্রাস পায়।

চতুর্থ আদব, যেখানে জানা যায়, প্রকাশ্যে দান করলে অন্যরা উৎসাহিত হবে, সেখানে প্রকাশ্যে দান করবে। এক্ষেত্রে রিয়া থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় আমরা রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। প্রকাশ্যে দান করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۔

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা খুবই ভাল। এটা এমন স্থলে, যেখানে অপরকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় অথবা সওয়ালকারী জনসমাবেশে সওয়াল করে। এক্ষেত্রে রিয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে দান বর্জন করা উচিত নয় ; বরং দান করা উচিত এবং মনকে যথাসম্ভব রিয়া থেকে মুক্ত রাখা দরকার। কারণ, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে অনুগ্রহ প্রকাশ ছাড়া আর একটি অপকারিতা আছে। তা হচ্ছে, ফকীরের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। কেননা, অধিকাংশ ফকীর তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করে। সুতরাং প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে সে যখন নিজের পর্দা নিজেই খুলে দেয়, তখন তার বেলায় এই অপকারিতা নিষিদ্ধ নয়। উদাহরণতঃ কেউ যদি গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচার করে, তবে প্রকাশ করা ও খোঁজাখুঁজি করা অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেব্যক্তি নিজে পাপাচার প্রকাশ করে, অন্যেরা তার পাপাচার প্রকাশ করলে তা তার জন্যে শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু এ শাস্তির আসল কারণ সে নিজেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

من القى جلباب الحياء فلاغيبة له ۔

অর্থাৎ, যেব্যক্তি লজ্জার মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত গীবত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً ۔

অর্থাৎ, আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ আয়াতে প্রকাশ্যে দান করারও আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করার উপকারিতা আছে।

মোট কথা, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে যেসব উপকারিতা ও অপকারিতা রয়েছে, সেগুলো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত। ব্যক্তি বিশেষে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। কতক পরিস্থিতিতে কতক ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম হয়। উপকারিতা ও অপকারিতা জানার পর কিভাবে দান করা উত্তম, তা আপনা আপনিই ফুটে উঠবে।

পঞ্চম আদব, দান-খয়রাতকে مـن ও اذى দ্বারা পণ্ড না করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে مـن ও اذى দ্বারা বাতিল করো না। এ দুটি শব্দের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন ঃ مـن শব্দের অর্থ দানের কথা আলোচনা করা এবং اذى শব্দের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে দান করা। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি مـن করে, তার দান নিষ্ফল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اذى কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ দানের কথা আলোচনা করা এবং মানুষের কাছে বলে বেড়ানো। কেউ বলেন ঃ مـن -এর উদ্দেশ্য হল দানের বিনিময়ে ফকীরের কাছ থেকে কাজ নেয়া আর اذى শব্দের অর্থ ফকীরকে লজ্জা দেয়া। কারও মতে, مـن হল দান করে ফকীরের কাছে অহংকার করা। আর সওয়াল করার কারণে ফকীরকে ধমকানো হলো اذى রসূলে আকরাম (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ প্রকাশকারীর দান কবুল করেন না। আমার মতে مـن -এর একটি শিকড় ও ভিত্তি আছে, যা অন্তরের অবস্থাসমূহের অন্যতম। এই অবস্থা মুখে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এর মূল হচ্ছে নিজেকে এরূপ মনে করা যে, সে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহ করেছে। অথচ তার মনে করা উচিত ছিল, ফকীর তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। সে আল্লাহ তাআলার হক তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। ফলে সে পবিত্র হবে ও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। যদি ফকীর দান কবুল না করত, তবে সে এই হকের মধ্যে আবদ্ধ থাকত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ দান-খয়রাত ফকীরের হাতে পৌছার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার হাতে পড়ে। কাজেই বুঝা উচিত, দাতা আল্লাহ তাআলার হক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেয় আর ফকীর তা গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার রিযিক নেয়। দানের মাল প্রথমে আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, এর পর ফকীর পায়। মনে করুন, এই ধনী ব্যক্তির যিম্মায় যদি কারও কর্জ থাকত এবং সে বলে দিত, এই কর্জের টাকা আমার খাদেম অথবা গোলামকে দিয়ে দিয়ো, যার পানাহার ও ভরণ-পোষণ আমার যিম্মায়, তবে খাদেম অথবা গোলামকে কর্জের টাকা দিয়ে ধনী ব্যক্তি কি মনে করতে পারত, সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে? এরূপ মনে করলে এটা তার নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা হবে। কেননা, পানাহার ও ভরণ পোষণ যার দায়িত্বে, সে-ই তার প্রতি অনুগ্রহ করে। ধনী ব্যক্তি তো কেবল তার কর্জের টাকা শোধ করে। সুতরাং কর্জ শোধ করা নিজেরই উপকার– অন্যের প্রতি অনুগ্রহ নয়। উপরে যাকাত ওয়াজেব হওয়ার যে তিনটি কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলো অথবা তার কোন একটি কারণ বুঝে নিলে কোন দাতা নিজেকে অন্যের প্রতি অনুগ্রহকারীরূপে চিন্তা করতে পারবে না। বরং এটাই বুঝবে যে, সে নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করেছে; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রকাশ করার জন্যে অথবা নিজেকে কৃপণতার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্যে অথবা ধনসম্পদের শোকর আদায় করার জন্যে দান করছে। এ তিন অবস্থায় তার মধ্যে ও ফকীরের মধ্যে অনুগ্রহের কোন ব্যাপার নেই। এ মূল কথা বিস্মৃত হলে এবং নিজেকে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করলে সে দানের কথা আলোচনা করে এবং ফকীরের কাছে প্রতিদান কামনা করে। اذى শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধমকানো, কটু কথা বলা ও কঠোর ব্যবহার করা, কিন্তু অন্তরে এর উৎপত্তির কারণ দু'টি– এক, ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া খারাপ মনে করা এবং দুই, এরূপ মনে করা, আমি ফকীর অপেক্ষা উত্তম। অভাবী হওয়ার কারণে ফকীর মর্তবায় আমার চেয়ে কম। এ দুটি বিষয়ই মূর্খতাপ্রসূত। উদাহরণতঃ অর্থকড়ি দেয়া খারাপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা। কারণ, কেউ যদি হাজার দেরহামের বিনিময়ে এক দেরহাম দেয়া খারাপ মনে করে, তবে তার চেয়ে নির্বোধ আর কে হবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে অর্থ দান করা হয়। এগুলো অর্থের তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অথবা কৃপণতার অনিষ্ট দূর করার জন্যে অর্থ দান করা হয়। অথবা বেশী নেয়ামত পাওয়ার আশায় কিংবা শোকারগুজারীর জন্যে দান করা হয়। এসব কারণের মধ্যে কোনটিই খারাপ নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ নিজেকে ফকীর অপেক্ষা উত্তম মনে করা মূর্খতা। কেননা, মানুষ যদি ধনাঢ্যতার তুলনায় দারিদ্র্যের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফযীলত জানতে পারে এবং ধনীদের বিপদাপদ অবগত হতে পারে, তবে সে কখনও ফকীরকে হেয় মনে করবে না। বরং তার মাধ্যমে বরকত হাসিল করবে এবং তার মর্তবা কামনা করবে। কারণ, ধনীদের মধ্যে যেব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হবে, সে ফকীরদের চেয়ে পাঁচ'শ বছর পরে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ هم الاخسرون ورب الكعبة কাবার প্রভুর কসম, তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আবু যর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? তিনি বললেন ঃ هم الاكثرون اموالا অর্থাৎ, যাদের কাছে প্রভূত ধনদৌলত রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা ফকীরের জন্যে ধনী ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। সে স্বীয় প্রচেষ্টায় অর্থ উপার্জন করে, পরিশ্রম করে তা বাড়ায় এবং হেফাযত করে। এর পর ফকীরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দান করা তার জন্যে জরুরী করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ফকীরের রুজির জন্যে সে কাজ কারবার করে, তাকে কিরূপে হেয় মনে করতে পারে? ফকীর ধনী ব্যক্তির চেয়ে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ধনী ব্যক্তি অপরের হক নিজের যিম্মায় গ্রহণ করে এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদের হেফাযত করে। যখন সে মারা যায়, তখন অন্যে সেই ধনসম্পদ ভক্ষণ করে। এমতাবস্থায় ফকীরকে দেয়া কিরূপে খারাপ হতে পারে? এভাবে যখন দান করা খারাপ মনে করবে না; তখন ফকীরকে পেয়ে খুশী হবে, তার প্রশংসা করবে এবং তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে। ফলে من ও اذى কিছুই থাকবে না। দান করার পর নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করার একটি বাহ্যিক প্রতিকার আছে। তা হচ্ছে, দাতা ফকীরের সামনে এমন কাজ করবে, যা কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ঋণী ব্যক্তি করে। সেমতে কোন কোন বুযুর্গ ফকীরের সামনে দান রেখে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দান কবুল করার জন্যে তাকে অনুরোধ করতেন। মনে হত যেন তিনিই সওয়ালকারী। বুযুর্গগণ তাঁদের কাছে ফকীরের আগমন ভাল মনে করতেন না; বরং তাঁরা স্বয়ং ফকীরের কাছে গিয়ে দান করা সমীচীন মনে করতেন। কতক বুযুর্গ হাতে দানের অর্থ রেখে ফকীরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন যাতে ফকীর তা তুলে নেয় এবং ফকীরের হাতই উপরে থাকে। হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) যখন কিছু খয়রাত কোন ফকীরের কাছে প্রেরণ করতেন, তখন দূতকে বলে দিতেন ঃ ফকীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দোয়ার যেসব বাক্য বলবে, সেগুলো মুখস্থ করে আসবে। দূত ফিরে এসে দোয়ার বাক্য বর্ণনা করলে তাঁরাও সেসব দোয়ার বাক্য ফকীরের জন্যে উচ্চারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের খয়রাত বাঁচানোর জন্যে আমরা দোয়ার বদলে দোয়া করে দিলাম। মোট কথা, পূর্ববর্তীগণ দান করে ফকীরের কাছে দোয়া আশা করতেন না। কেননা, দোয়াও দানের একটি প্রতিদানের মত। কেউ তাদের জন্যে দোয়া করলে বিনিময়ে তার জন্যে তেমনি দোয়া তাঁরা করে দিতেন। হযরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) তাই করেছিলেন। যাকাতের মধ্যে من ও اذى না থাকার শর্ত নামাযের মধ্যে খুশু তথা বিনয়ের শর্তের স্থলবর্তী। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নামায সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ليس للمرء من صلوة الا ما عقل মানুষ নামাযের যতটুকু অংশ বুঝে, ততটুকুই পায়। যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لا يقبل الله صدقة منان আল্লাহ্ তাআলা কোন অনুগ্রহ প্রকাশকারীর খয়রাত কবুল করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও দানগ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়ে তোমাদের খয়রাতসমূহ বরবাদ করো না। এ শর্তের অনুপস্থিতিতেও ফেকাহবিদরা ফতোয়া দেন, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ আদব, নিজের দানকে কম মনে করা। কারণ, অনেক মনে করলে আত্মপ্রীতিতেও লিপ্ত হবে, যা একটি মারাত্মক ব্যাধি। আত্মপ্রীতি আমলসমূহ বাতিল করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا .

হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত করে দিয়েছিল, অতঃপর তা তোমাদের কোন উপকার করেনি।

বলা হয়, এবাদতকে যতই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা হবে, তা আল্লাহর কাছে ততই বড় হবে। পক্ষান্তরে গোনাহকে যতই বড় মনে করা হবে, তা আল্লাহর কাছে ততই ক্ষুদ্র হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তিনটি বিষয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যতীত খয়রাত পূর্ণ হয় না– এক, খয়রাতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা, দুই খয়রাত আদায়ে বিলম্ব না করা এবং তিন, গোপনে খয়রাত করা। আত্মপ্রীতি ও বড় মনে করা সকল এবাদতেই রয়েছে। এর প্রতিকার হল এলেম ও আমল। এলেম একথা জানা যে, সমস্ত মালের মধ্যে দশ ভাগের একভাগ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ খুবই কম। এ পরিমাণ খয়রাত নেহায়েত নিম্নস্তরের খয়রাত। সুতরাং এই নিম্নস্তরের খয়রাতের জন্যে লজ্জা করা উচিত– একে বড় মনে করা উচিত নয়। আর যদি কেউ সমস্ত মাল অথবা অধিকাংশ মাল খয়রাত করে তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, মাল তার কাছে কোত্থেকে এল এবং সে তা কোথায় ব্যয় করছে। মাল তো আসলে আল্লাহ তাআলার। তিনি অনুগ্রহপূর্বক বান্দাকে দান করেছেন এবং ব্যয় করার তওফীক দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে অধিকাংশ দান করে তাকে বড় মনে করা উচিত নয়। যদি দোয়ার নিয়তে মাল দান করে, তবে যার বিনিময়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ সওয়াব পাবে, তাকে বড় মনে করবে কেন? আমল এই যে, লজ্জিত হয়ে দান করবে। কারণ, অবশিষ্ট মাল নিজের কাছে রেখে দেয়া হয়। এটা যেন এমন, যেমন কেউ কারও কাছে কিছু আমানত রাখে। এর পর ফেরত দেয়ার সময় কিছু অংশ ফেরত দেয় এবং কিছু অংশ রেখে দেয়। এটা লজ্জার বিষয় নয় কি? মাল সমস্তটাই আল্লাহর। তিনি সমস্তটা দান করার আদেশ দেননি। কারণ, কৃপণতার কারণে এ আদেশ পালন করা তোমাদের জন্যে কঠিন হত। সেমতে তিনি নিজেই বলেন ঃ فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا অর্থাৎ, যদি তিনি আতিশয্য সহকারে সমস্ত মাল দান করার আদেশ দেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে; সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে দান করবে না।

সপ্তম আদব, নিজের মালের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট; পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয় তাই খয়রাতের জন্যে বেছে নেয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্যে, যে গোনাহ ছাড়া হালাল উপায়ে অর্জিত মাল দান করে। নিকৃষ্ট মাল দান করার মানে হচ্ছে নিজের অথবা পরিবারের লোকদের জন্যে উৎকৃষ্ট মাল রাখা এবং আল্লাহ তাআলার উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে বেআদবী। যদি কেউ মেহমানের সাথে এরূপ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যবহার করে এবং ভাল খাদ্য নিজেরা খেয়ে মেহমানের সামনে খারাপ খাদ্য পেশ করে, তবে মেহমান নিঃসন্দেহে তার শত্রু হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি মাটি থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর। তোমরা ব্যয় করার জন্যে অপবিত্র বস্তুর নিয়ত করো না, যা তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে গ্রহণ করতে পার না। অর্থাৎ এমন বস্তু দান করো না, যা তোমরা লজ্জা ও অপছন্দ ছাড়া গ্রহণ কর না।

মোট কথা, আপন পালনকর্তার জন্যে এমন বস্তু পছন্দ করো না। হাদীসে আছে, এক দেরহাম লক্ষ দেরহামকেও পেছনে ফেলে দেয়। কারণ, মানুষ এই একটি দেরহামকে তার উৎকৃষ্ট ও হালাল মাল থেকে সানন্দে দান করে। আর কখনও লক্ষ দেরহাম এমন মাল থেকে দান করা হয়, যাকে সে নিজেই খারাপ মনে করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহর জন্যে এমন বস্তু সাব্যস্ত করে, যা তারা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ ـ

তারা তাদের অপছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করে। তাদের মুখ মিথ্যা বর্ণনা করে, পুণ্য তাদের জন্যই। এটা স্বতঃসিদ্ধ, তাদের জন্যে রয়েছে অগ্নি।

অষ্টম আদব, দান খয়রাতের জন্যে এমন লোক তালাশ করা, যাদের দ্বারা দান-খয়রাত মর্যাদাশীল ও পবিত্র হয়। যেনতেন লোকের হাতে তা পৌঁছে দেয়া ঠিক নয়। ছয়টি গুণের মধ্যে থেকে দুটি গুণ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদেরকে খয়রাত দেবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম- এমন লোক তালাশ করবে, যে পরহেযগার, সংসারবিমুখ ও কেবল আখেরাতের ব্যবসায়ে লিপ্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا تاكل الا طعام تقى ولا ياكل طعامك الاتقى -

পরহেযগার ব্যক্তির খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়।

এর কারণ, পরহেযগার ব্যক্তি খেয়ে তার পরহেযগারীকে শক্তি যোগাবে। ফলে যে খাওয়াবে সে তার এবাদতে শরীক হয়ে যাবে। হাদীসে আরও আছে- তোমরা তোমাদের খাদ্য পরহেযগারদেরকে খাওয়াও আর অনুগ্রহ যা কর, ঈমানদারদের প্রতি কর। জনৈক আলেম তার দানের মাল সুফী ফকীরগণ ছাড়া অন্য কাউকে দিতেন না। তাকে কেউ বলল ঃ এ মাল বিশেষ এক সম্প্রদায়কে না দিয়ে সকল ফকীরকে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ না, এই বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহসিকতা আল্লাহর জন্যে ব্যয়িত হয়ে যায়।। তারা উপবিষ্ট হলে তাদের সাহসিকতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এক ব্যক্তিকে দান করে যদি আমি তার সাহসিকতা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করতে পারি, তবে এটা আমার মতে হাজার ব্যক্তিকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যাদের সাহসিকতা কেবল সংসারের দিকেই নিবিষ্ট। এ উক্তিটি হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর কাছে কেউ উত্থাপন করলে তিনি একে চমৎকার উক্তি বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন ঃ এ লোকটি একজন ওলী আল্লাহ। বহু দিন যাবত আমি এর চেয়ে উত্তম উক্তি শ্রবণ করিনি। কথিত আছে, এক সময় এই বুযুর্গ ব্যক্তি আর্থিক সংকটে পড়ে দোকান বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন। হযরত জুনায়দ তাঁর কাছে কিছু পুঁজি প্রেরণ করে বললেন ঃ এই অর্থ দ্বারা দোকানের মাল কিনে নাও, দোকান বন্ধ করো না। তোমার মত ব্যক্তির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিকর নয়। লোকটি ছিলেন সবজি বিক্রেতা। কোন দরিদ্র লোক তাঁর কাছ থেকে সবজি ক্রয় করলে তিনি দাম নিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে এলেমধারী ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে। তাকে দিলে তার এলেমকে সাহায্য যোগানো হবে। এলেম এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যদি তাতে নিয়ত ঠিক তাঁকে। হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ) দান-খয়রাত বিশেষভাবে এলেমধারীদেরকে দিতেন। কেউ তাঁকে বলল ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপনার খয়রাত ব্যাপকভাবে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ আমি নবুওয়তের মর্তবার পর আলেমদের মর্তবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মর্তবা আছে বলে জানি না। আলেমের মন যদি অভাব অনটনে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে এলেমের জন্যে সময় সুযোগ পাবে না। কাজেই তাঁকে দেয়ার অর্থ এলেমের জন্যে তাঁকে সুযোগ করে দেয়া।

তৃতীয়– তাকওয়ায় সাচ্চা ও তওহীদে পাকা ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে। তওহীদে সাচ্চা হওয়ার অর্থ, যখন কারও কাছ থেকে খয়রাত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও শোকর করবে এবং মনে করবে, এ নেয়ামত তাঁরই পক্ষ থেকে। মধ্যবর্তী ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দরবারে বান্দার শোকর এটাই যে, সে সকল নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, নিজের ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে অপরকে নেয়ামতদাতা সাব্যস্ত করবে না। যেব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপরের শোকর করে, সে যেন নেয়ামতদাতাকে চেনেই না এবং বিশ্বাস করে না যে, মধ্যবর্তী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তাকে দানে বাধ্য করেছেন এবং দানের আসবাবপত্র সরবরাহ করেছেন। সে যদি দান না করতে চাইত, তবে তা পারত না। কেননা, পূর্বাহ্নে আল্লাহ মনে জাগরূক করেছেন যে, দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক কল্যাণ নিহিত। যেব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে, তার দৃষ্টি আল্লাহ ব্যতীত অপরের দিকে যাবে না। দাতার জন্য এরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস প্রশংসা ও শোকরের চেয়ে বেশী উপকারী। যেব্যক্তি দান করার কারণে প্রশংসা ও দোয়া করে, সে দান না করার কারণে নিন্দা এবং বদ দোয়াও করতে পারবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক ফকীরের কাছে কিছু খয়রাত প্রেরণ করে দূতকে বলে দিলেন ঃ ফকীর যা বলে মনে রাখবে। ফকীর খয়রাত গ্রহণ করে বলল ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি রিযিকদানকারীকে ভুলেন না এবং শোকরকারীকে বরবাদ করেন না। ইলাহী! আপনি আমাকে বিস্মৃত না হলে আপনার রসূল (সাঃ)-কে এমন করুন যে, তিনি আপনাকে না ভুলে যান। দূত এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানালে তিনি ফকীরের উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেখ, এই ফকীর তার দৃষ্টি কিভাবে আল্লাহ তাআলাতে নিবদ্ধ করেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে তওবা করতে বললে সে বলল ঃ আমি কেবল আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাআলার দিকে তওবা করি– মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি হকদারের হক চিনতে পেরেছ। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ মোচনের আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আয়েশা! দাঁড়াও, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মস্তক চুম্বন কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এরূপ করবো না। আমি আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! তাকে ছাড়, কিছু বলো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতা আবু বকরকে এই জওয়াব দেন–

الحمد لله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শোকর। এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন অনুগ্রহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অস্বীকৃতি জানাননি, অথচ অপবাদ মোচনের তাঁর মাধ্যমেই হযরত আয়েশার কাছে পৌঁছেছিল। নেয়ামত আল্লাহ তাআলা ছাড়া অপরের পক্ষ থেকে মনে করা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। সেমতে আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ -

যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেবদেবীদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়।

যেব্যক্তির অন্তর মাধ্যমের প্রতি তাকানো থেকে মুক্ত নয় এবং একে নিছক মাধ্যম মনে করে না, তার মন যেন শেরকে খফী তথা গোপন শেরক থেকে আলাদা হয়নি। তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং স্বীয় তওহীদকে শেরকের ময়লা ও সন্দেহ থেকে পরিষ্কার করা।

চতুর্থ– যারা আপন অবস্থা গোপন রাখে, অভাব-অভিযোগ ও কষ্টের কথা খুব একটা বর্ণনা করে না, অথবা যেব্যক্তি পূর্বে ধনী ছিল, এখন সর্বস্বহারা, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করে না এবং পুরোপুরি ভদ্রতা বজায় রেখে জীবন যাপন করে– এরূপ লোককে খয়রাত দেবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

সওয়াল থেকে বেঁচে থাকার কারণে মূর্খরা তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের গায়ে পড়ে সওয়াল করে না। অর্থাৎ, সওয়াল করার মধ্যে আতিশয্য করে না। কারণ, তারা আপন বিশ্বাসে ধনী এবং সবর দ্বারা সম্মানী। প্রত্যেক মহল্লায় ধার্মিক লোকদের মাধ্যমে এরূপ ব্যক্তিদের তালাশ করা উচিত। এরূপ সম্ভ্রমী লোকদের মনের অবস্থা খয়রাতকারীদের জানা উচিত। কেননা, তাদেরকে খয়রাত দেয়া প্রকাশ্য সওয়ালকারীদেরকে খয়রাত দেয়ার তুলনায় কয়েক গুণ বেশী সওয়াব রাখে।

পঞ্চম– যারা অধিক সন্তান-সন্ততিসম্পন্ন অথবা রোগাক্রান্ত অথবা কোন কারণে দুর্দশাগ্রস্ত, তাদেরকে খয়রাত দেবে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

সেসব ফকীরের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে আটকা পড়েছে, তারা স্বদেশে চলাফেরা করতে পারে না। অর্থাৎ, যারা আখেরাতের পথে পরিবার-পরিজনের কারণে অথবা রুজি-রোজগারের স্বল্পতার কারণে অথাব আত্মসংশোধনের কারণে আটকা পড়েছে। ফলে দেশে সফর করার শক্তি রাখে না। কেননা, এসব কারণে তাদের হাতে পায়ে জিঞ্জির পড়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এক গৃহের লোকদেরকে এক পাল ছাগল অথবা দশটি ছাগল অথাবা আরও বেশী দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অনুযায়ী দান করতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে কেউ জাহ্‌দুল বালা'র উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ সন্তান সন্ততির আধিক্য এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতা।

ষষ্ঠ– যে ফকীর আত্মীয় এবং রক্তের সাথে সম্পর্কশীল, তাকে খয়রাত দেবে। এতে খয়রাতও হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় থাকবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অনেক সওয়াব। হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি এক দেরহাম দিয়ে আমার কোন ভাইয়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে তা আমার মতে বিশ দেরহাম খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। যদি বিশ দেরহাম দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে এটা একশ' দেরহাম খয়রাত করার চেয়ে ভাল। পরিচিতদের মধ্যে বন্ধুদেরকে আগে দান করা উচিত; যেমন অপরিচিতদের তুলনায় আত্মীয়কে আগে দেয়া উত্তম।

মোট কথা, এসব প্রার্থিত গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খয়রাত দেয়া উচিত। এগুলোর প্রত্যেকটিতে অনেক স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর অন্বেষণ করা উচিত। কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের মধ্য থেকে কয়েকটি পাওয়া গেলে তাকে নেয়ামত মনে করতে হবে। যে উপযুক্ত লোক খোঁজাখুঁজি করবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। ভুল হয়ে গেলেও এক সওয়াব নষ্ট হবে না।

যাকাতের হকদার হওয়ার কারণ

প্রকাশ থাকে যে, এমন ব্যক্তি যাকাতের হকদার, যে মুসলমান, স্বাধীন (হাশেমী ও মুত্তালেবী বংশীয় নয়) এবং যার মধ্যে কোরআন বর্ণিত আটটি গুণের মধ্য থেকে কোন একটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই আটটি গুণ إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাফের, গোলাম ও হাশেমী বংশীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। নিম্নে আট প্রকার লোক আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম প্রকার– ফকীর। যার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই এবং যে উপার্জনক্ষম নয়, তাকে ফকীর বলা হয়। যার কাছে একদিনের খাদ্য ও পোশাক আছে, সে ফকীর নয়; বরং মিসকীন। অর্ধেক দিনের খাদ্য থাকলে সে ফকীর। সওয়াল করা যেব্যক্তির অভ্যাস সে ফকীর দলের বাইরে নয়। কেননা, সওয়াল করা কোন উপার্জনের পেশা নয়। হাঁ, উপার্জন করতে সক্ষম হলে সে ফকীরদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যন্ত্রপাতি দিয়ে উপার্জন করতে সক্ষম ব্যক্তিও ফকীর, তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া জায়েয। যদি কেউ এমন পেশা অবলম্বনে করতে সক্ষম না হয়, যা তার ভদ্রতা ও মর্যাদার অনুপযোগী, তবে সে ফকীর বলেই গণ্য হবে। এমনিভাবে আলেম ব্যক্তির যদি কোন পেশা গ্রহণ এলেম চর্চায় বাধ্য সৃষ্টি করে, তবে সে-ও ফকীর। পেশা গ্রহণ করো

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবাদতে বাধা সৃষ্টি করলেও তা করা উচিত। কেননা, খয়রাতের তুলনায় কাজ করা উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন طلب الحلال فريضة بعد الفريضة হালাল জীবিকা অন্বেষণ ঈমানী ফরযের পরের ফরয। উদ্দেশ্য, উপার্জনের চেষ্টা করা দরকার। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হালাল-হারামের সন্দিগ্ধ উপার্জন সওয়াল অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় প্রকার– মিসকীন। যার আয় ব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট নয়, তাকে মিসকীন বলা হয়। অতএব কেউ হাজার দেরহামের মালিক হয়েও মিসকীন হতে পারে। পক্ষান্তরে একটি কুড়াল ও রশির মালিক হয়েও মিসকীন না হতে পারে। মাথা গোঁজার মত গৃহ ও অবস্থানুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ থাকলেই মানুষ মিসকীনদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও মানুষকে মিসকীনদের দল থেকে খারিজ করে দেয় না। ফেকাহ্ শাস্ত্রের কিতাবসমূহের মালিকানাও মিসকিনীর পরিপন্থী নয়। কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মালিক না হলে তার উপর সদকায়ে ফেতর ওয়াজেব নয়। কিতাবপত্র এবং পোশাক পরিচ্ছদও গৃহের জরুরী আসবাবপত্রের অনুরূপ। তবে কিতাবের প্রয়োজন বুঝার ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। তিনটি উদ্দেশে কিতাবের প্রয়োজন হয়, পড়া, পড়ানো ও অধ্যয়ন করা। চিত্তবিনোদন কোন প্রয়োজন নয়। উদাহরণতঃ কবিতা, ইতিহাস, সংবাদপত্র এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারী নয় এমন কিতাব সংগ্রহ এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। এ ধরনের কিতাব মিসকিনীর পরিপন্থী। বেতনভুক্ত শিক্ষক যেসকল কিতাবের সাহায্যে পাঠদান করে, সেগুলো তার জন্যে দর্জি প্রমুখ পেশাদার ব্যক্তিদের যন্ত্রপাতির অনুরূপ। এগুলো থাকলেও কেউ মিসকীন হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার– আমেল (কর্মচারী)। বিচারক ও শাসনকর্তা ছাড়া যারা যাকাত আদায় করে, তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। দলপতি, হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, নকল নবীশ প্রমুখ কর্মচারীও এর মধ্যে দাখিল। তাদের কাউকে এ কাজের সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেয়া যাবে না।

চতুর্থ প্রকার– তারা, যাদেরকে মন জয় করার উদ্দেশে যাকাতের অর্থ দেয়া হয়। তারা আপন আপন গোত্রের সর্দার হয়ে থাকে। তাদেরকে দেয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখা এবং তাদের অধীনস্থদেরকে উৎসাহ প্রদান করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম প্রকার– মুকাতাব। যে গোলামকে তার প্রভু কিছু অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে বলে, তাকে মুকাতাব বলা হয়। মুকাতাবের অংশ তার প্রভুকে দেয়া উচিত। স্বয়ং মুকাতাবকে দেয়াও জায়েয। প্রভু তার মালের যাকাত মুকাতাবকে দেবে না। কেননা, সে এখনও তার গোলাম।

ষষ্ঠ প্রকার– ঋণী ব্যক্তি। যারা বৈধ কাজে ঋণ গ্রহণ করে, অতঃপর দারিদ্র্যের কারণে শোধ করতে পারে না; তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। গোনাহের কাজে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে যে পর্যন্ত তওবা না করে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। ধনী ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ থাকলে যাকাতের অর্থ দ্বারা তা শোধ করা যাবে না। তবে সে কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা শোধ করতে অসুবিধা নেই।

সপ্তম প্রকার– গাজী। সরকারী ভাতাভুকদের রেজিস্টারে যার কোন ভাতা নেই; তাকে যাকাতের একটি অংশ দেয়া উচিত– যদিও সে ধনী হয়। এতে জেহাদে সাহায্য করা হবে।

অষ্টম প্রকার– মুসাফির। যেব্যক্তি সফরের উদ্দেশে আপন শহর থেকে রওয়ানা হয়, সে মুসাফির। সফর গোনাহের উদ্দেশে না হলে এবং মুসাফির ব্যক্তি নিঃস্ব হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। তার স্বগৃহে ধন সম্পদ থাকলে তাকে এতটুকু দিতে হবে, যদ্দ্বারা সে গৃহে পৌঁছতে পারে।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত আট প্রকার হকদার ব্যক্তিকে কিরূপে চেনা যাবে? জওয়াব, ফকীর ও মিসকীনের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তিই যথেষ্ট হবে। এ জন্যে সাক্ষ্য ও কসম নিতে হবে না। আমি ফকীর– কেউ একথা বললেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে, যদি সে মিথ্যাবাদী বলে দৃঢ় বিশ্বাস না হয়। জেহাদ ও সফর ভবিষ্যতের ব্যাপার। যদি কেউ বলে, সে সফর অথবা জেহাদের ইচ্ছা রাখে, তবে তাকে দেয়া জায়েয। যদি কেউ পরবর্তীতে এই ইচ্ছা পূর্ণ না করে, তবে যা দেয়া হয়, তা ফেরত নিতে হবে। অবশিষ্ট চার প্রকার হকদারকে চেনার জন্যে সাক্ষী অত্যাবশ্যক। এ পর্যন্ত হকদার হওয়ার শর্ত ও কারণসমূহ বর্ণিত হল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাকাত গ্রহীতার আদব

যাকাত গ্রহীতার আদব পাঁচটি ঃ (১) সে মনে করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক চিন্তা ছাড়া সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে অন্যের উপর যাকাত ওয়াজেব করেছেন। মানুষের নিষ্ঠাকে আল্লাহ তাআলা এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ কেবল আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের কথা চিন্তা করবে– অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন হবে না। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ আমি মানুষ ও জ্বিনকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদি রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী বান্দার উপর কামনা-বাসনা ও অভাব-অনটন চাপিয়ে তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তাই অনুগ্রহস্বরূপ তাকে বিভিন্ন নেয়ামতও পৌছানো হয়েছে, যাতে তার অভাব অনটন মোচনের জন্যে যথেষ্ট হয়। এ দৃষ্টিতে প্রভূত ধন-সম্পদ সৃষ্টি করে বান্দার হাতে দেয়া হয়েছে। এসব ধন-সম্পদ বান্দার প্রয়োজনাদি মেটানোর ওসিলা এবং এবাদতের জন্যে অবকাশ লাভের উপায়। আল্লাহ তাআলা কতক বান্দাকে অগাধ ধন-দৌলত দান করেছেন, যাতে তা তাদের জন্যে পরীক্ষা হয়। কতক লোককে তিনি তাঁর মহব্বত দ্বারা গৌরবান্বিত করে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যেমন দরদী ও স্নেহশীল চিকিৎসক রোগীকে কুপথ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখে। অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে দুনিয়াব অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম থেকে আলাদা রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ধনীদের হাত দিয়ে তাদের কাছে পৌছিয়েছেন, যাতে উপার্জনের চিন্তা, সঞ্চয়ের পরিশ্রম, হেফাযতের পেরেশানী ধনীদের দায়িত্বে থাকে এবং তার লাভ ফকীররা ভোগ করে; ফলে তারা আল্লাহ তাআলার এবাদতেই সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফকীরদের প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার পরম নেয়ামত। ফকীরদের উচিত এ নেয়ামতের কদর করা এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে আল্লাহ তাদের প্রতি একান্তই কৃপা করেছেন।

সারকথা, ফকীর যা নেবে, তদ্দ্বারা স্বীয় রিযিক ও এবাদতে সাহায্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লাভের উদ্দেশে নেবে। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে এ দানের অর্থ আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত খাতে ব্যয় করবে। যদি এই অর্থ দ্বারা পাপ কাজে সাহায্য লাভ করে, তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হবে এবং তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হবে।

(২) ফকীর দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং তার জন্যে নেক দোয়া করবে। দোয়া এভাবে করবে যেন দাতাকে মধ্যবর্তী ছাড়া অন্য কিছু মনে না করা হয়। বরং এটাই বুঝবে, আল্লাহর নেয়ামত পৌঁছার পথ ও উপায় এ ব্যক্তি হয়ে গেছে। এ ধারণা নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করার পরিপন্থী নয়। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে- من لم يشكر الناس لم يشكر الله যেব্যক্তি মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহ তাআলার শোকর করে না। আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলের জন্যে তার প্রশংসা অনেক জায়গায় করেছেন। উদাহরণতঃ এক জায়গায় বলেছেন- نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ আইউব চমৎকার বান্দা। সে আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গ্রহীতা এভাবে দোয়া করবে- আল্লাহ পবিত্র লোকদের অন্তরের সাথে আপনার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং সৎকর্মীদের কর্মের সাথে আপনার কর্মকে পরিষ্কার করুন। শহীদদের আত্মা সাথে আপনার আত্মার প্রতি রহমত নাযিল করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তাকে কিছু বিনিময় দাও। আর কিছু সম্ভব না হলে তার জন্যে দোয়া কর। এত দোয়া কর যেন প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার মনে বিশ্বাস জন্মে। শোকরের পরিশিষ্ট হচ্ছে, দানের মধ্যে কিছু দোষ থাকলে তা গোপন করবে এবং তার নিন্দা করবে না। দাতা যদি না দেয়, তবে তাকে লজ্জা দেবে না। দিলে তার কাজকে মানুষের সামনে বড় বলে প্রকাশ করবে। কেননা, দাতার আদব হল নিজের দানকে ছোট মনে করা এবং কৃতজ্ঞ হওয়া।

(৩) গ্রহীতা যে অর্থ নিতে চায়, তা হারাম কিনা প্রথমে দেখে নেয়া উচিত। নাজায়েয ও হারাম হলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অন্য কোথাও থেকে তাকে দেয়াবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যার কল্পনাও সে করে না। এরূপ নয় যে, কেউ হারাম থেকে বিরত থাকলে সে হালাল মাল পাবে না। মোট কথা, সরকারী কর্মচারীদের মাল এবং যাদের উপার্জন অধিকাংশই হারাম, তাদের মাল গ্রহণ করবে না। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক হলে এবং প্রদত্ত মালের কোন মালিক জানা না থাকলে প্রয়োজনমাফিক তা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা, এরূপ মাল খয়রাত করে দেয়াই বিধান।

(৪) গ্রহীতা সন্দেহের জায়গা থেকে বেঁচে থাকবে এবং যা নেবে তার পরিমাণে সন্দেহ হলে যতটুকু জায়েয, ততটুকুই নেবে। নিজের মধ্যে হকদার হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে– একথা না জানা পর্যন্ত নেবে না। উদাহরণতঃ যদি ঋণী হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে ঋণের পরিমাণের বেশী নেবে না। যদি মুসাফির হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে পাথেয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছা পর্যন্ত যানবাহনের যা ভাড়া লাগে, তার বেশী নেবে না। এসব বিষয়ের আন্দাজ গ্রহীতা নিজের ইজতেহাদ দ্বারা করবে। এর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। মোট কথা, প্রয়োজন পরিমাণ হয়ে গেলে যাকাতের মাল বেশী গ্রহণ করবে না; বরং এই বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়, এই পরিমাণ গ্রহণ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পোষ্যদের জন্যে এক বছরের খাদ্য একত্রিত করেছেন। অতএব ফকীর ও মিসকীনের জন্যে এ সীমাই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যদি একমাস অথবা একদিনের প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়, তবে এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

যাকাত ও খয়রাত থেকে ফকীরের কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, এ সম্পর্কে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ এত বেশী কম বলেন যে, একদিন এক রাতের খাদ্যের বেশী না নেয়া তাদের মতে ওয়াজেব। তাদের এ দাবীর সমর্থনে সহল ইবনে হানযালিয়া বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে। তা এই, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মালদারী থাকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবস্থায় সওয়াল করতে নিষেধ করেছেন। এর পর মালদারী কি, এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেছেন- সকাল ও সন্ধ্যার খাদ্য থাকা। কেউ কেউ বলেন, ধনাঢ্যতার সীমা হচ্ছে যাকাতের নেসাব। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যাকাত কেবল ধনাঢ্যদের উপর ফরয করেছেন। তারা এর অর্থ এই বের করেছেন, নিজের জন্যে এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যাকাতের নেসাব পর্যন্ত গ্রহণ করা জায়েয। কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা পঞ্চাশ দেরহাম বলেছেন। কেননা, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من سال وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه خموس وقيل وما غناه قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب -

যেব্যক্তি মালদার হওয়া সত্ত্বেও সওয়াল করবে, সে কেয়ামতের দিন মুখমণ্ডলে ঘা নিয়ে উপস্থিত হবে। প্রশ্ন করা হল ঃ মালদারী কি? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দেরহাম অথবা তার সমতুল্যের স্বর্ণ। কথিত আছে, এ হাদীসের একজন রাবী দুর্বল। কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা চল্লিশ দেরহাম বর্ণনা করেছেন। কেননা, আতা ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من سأل وله اوقية فقد الحف فى السوال এক ওকিয়া অর্থাৎ, চল্লিশ দেরহাম থাকা সত্ত্বেও যেব্যক্তি সওয়াল করে, সে অযথা সওয়াল করে। অন্য আলেমগণ বিষয়টি অধিক প্রশস্ত করে বলেছেন ঃ ফকীর এই পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে, তদ্দ্বারা এক খণ্ড জমিন ক্রয় করে জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অথবা কোন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। কেননা, জীবিকার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়াকেই নিশ্চিন্ততা বলে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন এই দান কর, তখন ধনী করে দাও। কারও কারও মতে, কোন ব্যক্তি ফকীর হয়ে গেলে সে এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে, যদ্দ্বারা তার পূর্বাবস্থা বহাল হয়ে যায়, যদিও তা দশ হাজার দেরহাম দ্বারা হয়। একবার হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় বাগানের দিকে তাঁর ধ্যান চলে যাওয়ায় তিনি বললেন ঃ আমি এ বাগান খয়রাত করলাম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি এ বাগান তোমার আত্মীয়দের মধ্যে খয়রাত কর। এটা তোমার জন্যে ভাল। সেমতে তিনি বাগানটি হযরত হাস্সান ও আবু কাতাদাহ্ (রাঃ)-কে দান করে দিলেন। একটি খোরমার বাগান পেয়ে তারা উভয়েই ধনী হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক গেঁয়ো ব্যক্তিকে একটি বাচ্চা উট সেটির পিতামাতাসহ দিয়ে দেন। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, ফকীররা বেশী গ্রহণ করতে পারে। আমাদের মতে, নিম্নে এক দিবা-রাত্রির খাদ্য অথবা চল্লিশ দেরহাম থাকলে সওয়াল করবে না এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরাফেরা করবে না। ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে পরহেযগার ব্যক্তিকে বলে দেয়া উচিত, তুমি তোমার মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, অন্যেরা তোমাকে যত ফতোয়াই দিক না কেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাই বলেছিলেন। গ্রহীতা যদি সেই মালের ব্যাপারে মনে কোন খটকা পায়, তবে আল্লাহকে ভয় করে মাল গ্রহণ করা উচিত। ফতোয়াকে বাহানা বানিয়ে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, যাহেরী আলেমগণের ফতোয়া প্রয়োজনের শর্ত থেকে মুক্ত এবং এতে অনেক সন্দেহ থাকে। ধার্মিক ও আখেরাতের পথিকদের অভ্যাস সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা।

(৫) ফকীর মালদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে, তার উপর কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব। জানার পর দেখবে, যতটুকু সে পেয়েছে তা মোট যাকাতের এক-অষ্টমাংশের বেশী কিনা। বেশী হলে তা নেবে না। কেননা, সে এবং তার আরও দু'জন শরীক মিলে কেবল এক-অষ্টমাংশের হকদার। সুতরাং সে এক অষ্টমাংশের এক-তৃতীয়াংশ নেবে, বেশী নেবে না। এটা জিজ্ঞেস করা অধিকাংশ লোকের উপর ওয়াজেব। কারণ, মানুষ এই ভাগাভাগির প্রতি লক্ষ্য করে না মূর্খতার কারণে অথবা সহজ করার কারণে। তবে হারাম হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল না হলে এসব বিষয় জিজ্ঞেস না করা জায়েয।

নফল দান-খয়রাত ও তার ফযীলত

নফল দান খয়রাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সদকা কর যদিও তা একটি খেজুর হয়। কেননা, এটা ক্ষুধার্তের কিছু না কিছু কষ্ট দূর করে এবং গোনাহকে এমনভাবে নির্বাপিত করে, যেমনভাবে পানি অগ্নি নির্বাপিত করে। তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরও বলেন ঃ

اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة

অর্থাৎ, এক খন্ড খেজুর দান করে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তা না পাও, তবে ভাল কথা বলে আত্মরক্ষা কর।

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে মুসলমান বান্দা তার পবিত্র উপার্জন থেকে সদকা করে– আল্লাহ তাআলা পবিত্রকেই গ্রহণ করেন– আল্লাহ তাআলা এই সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তা লালন-পালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চা লালন-পালন করে। অবশেষে খেজুর বেড়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ যখন তুমি শুরবা রান্না কর তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দাও। অতঃপর তা থেকে প্রতিবেশীদেরকে দান কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে বান্দা ভাল সদকা দেয়, আল্লাহ তার সম্পদে অনেক বরকত দেন।

এক হাদীসে আছে–

كل امرا فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس .

অর্থাৎ, হাশরের মাঠে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

আরও আছে–

الصدقة تسد سبعين بابا من الشر

অর্থাৎ, সদকা অনিষ্টের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে।

আরও আছে–

صدقة السر تطفى غضب الرب .

অর্থাৎ, গোপন সদকা পালনকর্তার ক্রোধ নির্বাপিত করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে– যেব্যক্তি সচ্ছলতাবশতঃ দান করে, সে সওয়াবে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়, যে অভাবের কারণে তা কবুল করে। এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই, যেব্যক্তি সদকা কবুল করে নিজের অভাব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দূর করে, যাতে ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সে সেই দাতার সমান, যে তার দান দ্বারা ধর্মের অগ্রগতির নিয়ত করে। কেউ রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ কোন্‌টি সদকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ এমন সময়ে সদকা করা উত্তম, যখন মানুষ সুস্থ থাকে, মাল আটকে রাখতে চায়, অনেক দিন বাঁচার আশা রাখে এবং উপবাসকে খুব ভয় করে। সদকা দিতে এতদূর বিলম্ব করবে না যে, মরণোন্মুখ অবস্থায় বলতে থাকবে, এই পরিমাণ অমুককে এবং এই পরিমাণ অমুককে দেবে, অথচ তখন তোমার মাল অন্যের অর্থাৎ ওয়ারিসদের হয়ে গেছে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা সদকা কর। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি নিজের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি স্ত্রীর জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে, তিনি বললেন ঃ এটি সন্তানদের জন্য ব্যয় কর। লোকটি আরজ করল, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে, তিনি বললেন এটি খাদেমের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আর একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা যেখানে ভাল মনে কর, ব্যয় কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ পরিবারের জন্যে সদকা হালাল নয়। কারণ, সদকা মানুষের সম্পদের ময়লা। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়, ফেরেশতারা তার গৃহের উপর সাত দিন পর্যন্ত ছায়া দান করেন না। দুটি কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের হাতে সোপর্দ করতেন না– নিজে করতেন। এক, ওযুর পানি নিজে রাখতেন ও তা ঢেকে দিতেন এবং দুই, মিসকীনকে নিজের হাতে দান করতেন। তিনি বলেন ঃ সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে এক খেজুর অথবা দুই খেজুর এবং এক লোকমা অথবা দুই লোকমা দিয়ে বিদায় করা হয়; বরং সেই মিসকীন যে সওয়াল থেকে বিরত থাকে। তুমি এ আয়াত পড়ে দেখ–

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

অর্থাৎ, তারা মানুষের কাছে গায়ে পড়ে সওয়াল করে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করায়, সে মিসকীনের গায়ে ঐ বস্ত্রের তালি থাকা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নফল সদকা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দেরহাম খয়রাত করেন অথচ তাঁর কোর্তায় তালিই থাকত। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ ইলাহী, ধনসম্পদ ও ধনাঢ্যতা আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে দান করুন। সম্ভবতঃ সে তা আমাদের অভাবগ্রস্তদেরকে পৌঁছাবে। আবদুল আজীজ ইবনে ওমায়র (রহঃ) বলেন ঃ নামায মানুষকে অর্ধেক পথে পৌঁছায়, রোযা বাদশাহের দ্বারে নিয়ে যায় এবং সদকা বাদশাহের সামনে উপস্থিত করে। ইবনে আবিল জা'দ (রহঃ) বলেন ঃ সদকা মানুষ থেকে সত্তর প্রকার অনিষ্ট দূর করে। প্রকাশ্যে সদকা দেয়ার তুলনায় গোপনে দেয়ায় সত্তর গুণ বেশী সওয়াব। সদকা সত্তর শয়তানের চোয়াল বিদীর্ণ করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি সত্তর বছর আল্লাহ তাআলার এবাদত করার পর কোন একটি কবীরা গোনাহ করায় তার এবাদত বাতিল করে দেয়া হল। অতঃপর সে এক মিসকীনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে এক খন্ড রুটি সদকা করল। ফলে আল্লাহ তার অপরাধ মার্জনা করে সত্তর বছরের এবাদত বহাল করে দিলেন। লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ তুমি যখন কোন গোনাহ কর, তখন সদকা করবে। ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন ঃ সদকার দানা ব্যতীত কোন দানা দুনিয়ার পাহাড়ের সমান হয়ে যায় বলে আমার জানা নেই। সদকার দানা অবশ্যই এতটুকু হয়ে যায়। আবদুল আজীজ ইবনে আবী রুয়াদ বলেন ঃ প্রথম যমানায় বলা হত, তিনটি বিষয় জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে দাখিল– রোগ গোপন করা, সদকা গোপন করা এবং বিপদাপদ গোপন করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমলসমূহ একে অপরের উপর গর্ব করল। সদকা বলল ঃ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবদুল্লাহ (রহঃ) চিনি খয়রাত করতেন এবং বলতেন ঃ আমি দেখলাম, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণ নেকী পাবে না।

আমি চিনি ভালবাসি, একথা আল্লাহ তাআলা জানেন। নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর জন্যে যে বস্তু দেব তাতে কোন দোষ থাকা আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পছন্দনীয় নয়। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন মানুষ সকল দিন অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। অতঃপর যেব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্যে ক্ষুধার্তকে আহার দিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে পেট ভরে আহার করাবেন। যেব্যক্তি আল্লাহর জন্যে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরিধান করিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বস্ত্র পরিধান করাবেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধনাঢ্য করে দিতেন– তোমাদের মধ্যে ফকীর থাকত না। কিন্তু তিনি একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ ফকীর ধনীর সদকার যতটুকু মুখাপেক্ষী, যদি ধনী তার তুলনায় আপন সদকার সওয়াবের অধিক মুখাপেক্ষী না হয়, তবে তার সদকা অনর্থক। এ সদকা তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ যে পানি সদকা করা হয় এবং মসজিদে পান করানো হয়, তা থেকে ধনী ব্যক্তি পান করলে আমরা দোষ মনে করি না। কেননা, যে পানি সদকা করে, সে পিপাসার্তদের জন্যে সদকা করে। বিশেষভাবে ফকীর-মিসকীনকে সদকা করার নিয়ত তার থাকে না। কথিত আছে, জনৈক দাস বিক্রেতা এক বাঁদী সঙ্গে নিয়ে হযরত হাসান বসরীর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই বাঁদী এক দুই দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতে সম্মত আছ কি? সে বলল ঃ না। হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ তাআলা তো এক পয়সা ও এক লোকমা সদকা করার বিনিময়ে বেহেশতের হুর দিতে সম্মত আছেন।

সদকা গোপনে ও প্রকাশ্যে গ্রহণ করা

আধ্যাত্ম পথের পথিকগণ মতভেদ করেছেন, সদকা গোপনে বা প্রকাশ্যে গ্রহণ করার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম। কারও মতে গোপনে গ্রহণ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল। আমরা প্রথমে উভয় বিষয়ের উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা করব, এর পর যা সত্য তার ব্যাখ্যা করব। প্রকাশ থাকে যে, গোপনে সদকা গ্রহণ করার উপকারিতা পাঁচটি।

(১) গ্রহীতার গোপনীয়তা বজায় থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে ভদ্রতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, অভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সওয়াল করার ভীতি দূর হয়ে যায়।

(২) গোপনে সদকা গ্রহণ করলে মানুষের অন্তর ও মুখ নিরাপদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে। কেননা, প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে মানুষ তার প্রতি হিংসা করে অথবা তার গ্রহণ অপছন্দ করে একথা ভেবে যে, সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও সদকা গ্রহণ করেছে অথবা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করেছে। হিংসা ও কুধারণা বড় গোনাহ। মানুষকে এসব গোনাহ থেকে নিরাপদ রাখা উত্তম। আবু আইউব সুখতিয়ানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি নতুন বস্ত্র পরিধান করি না এই আশংকায়, কোথাও প্রতিবেশীদের মনে হিংসা সৃষ্টি না হয়ে যায়। অন্য এক দরবেশ বলেন ঃ আমি আমার ভাইদের খাতিরে অধিকাংশ বস্তুর ব্যবহার বর্জন করি, যাতে তারা একথা না বলে যে, তার কাছে এটা কোত্থেকে এল? ইবরাহীম তায়মীর গায়ে নতুন জামা দেখে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভাই খায়সামা আমাকে পরিধান করিয়েছে। যদি জানতাম, তার পরিবারের লোকেরা এটা জানে, তবে কখনও কবুল করতাম না।

(৩) গোপনে দান গ্রহণ করলে দাতাকে গোপনে আমল করতে সাহায্য করা হয়। বলাবাহুল্য, দান গোপনে করাই উত্তম। অতএব এ ব্যাপারে গ্রহীতা দাতাকে সাহায্য করলে উত্তম কাজে সাহায্য করা হবে, যা নিঃসন্দেহে ভাল। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রচেষ্টা ছাড়া গোপনে দান হতে পারে না। ফকীর নিজের অবস্থা প্রকাশ করে দিলে দাতার অবস্থাও প্রকাশ হয়ে পড়বে। এক ব্যক্তি জনৈক আলেমকে প্রকাশ্যে কিছু দান করলে তিনি গ্রহণ করলেন না। অন্য এক ব্যক্তি তাকে গোপনে কিছু দান করলে তিনি গ্রহণ করলেন। অতঃপর এ কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার খয়রাতে আদব ও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে– গোপনে দিয়েছে। তাই আমি কবুল করেছি। এক ব্যক্তি জনৈক দরবেশ সুফীকে জনসমাবেশে কিছু দান করলে দরবেশ তা ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি বলল ঃ যে বস্তু আপনাকে আল্লাহ তাআলা দিলেন, তা গ্রহণ করলেন না কেন? দরবেশ বললেন ঃ যে বস্তু একান্তভাবে আল্লাহর ছিল, তাতে অপরকে শরীক করে নিয়েছ। কেবল আল্লাহর দেখা তুমি যথেষ্ট মনে করনি। কাজেই তোমার শেরক আমি তোমার কাছেই ফিরিয়ে দিলাম। জনৈক সাধক এক বস্তু গোপনে কবুল করে নিলেন, যা তিনি প্রকাশ্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দাতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ প্রকাশ্যে দেয়ার কারণে তুমি আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করিনি। এখন গোপনে দেয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করেছ। তাই আনুগত্যের কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যদি আমি জানতাম, কোন ব্যক্তি দান করে তার আলোচনা করবে না এবং অন্যের কাছে বলবে না, তবে আমি তার দান গ্রহণ করতাম।

(৪) গোপনে গ্রহণ করলে গ্রহীতা অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে লাঞ্ছনা হয়। নিজেকে লাঞ্ছিত করা ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে শোভন নয়। কোন আলেমকে গোপনে কেউ কিছু দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং প্রকাশ্যে দিলে গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন ঃ প্রকাশ্যে নেয়ার মধ্যে এলেমের লাঞ্ছনা এবং আলেমগণের বেইযযতী হয় । তাই আমি দুনিয়ার ধন-সম্পদকে উঁচু করে বিনিময়ে এলেম ও আলেমগণকে নীচু করি না।

(৫) গোপনে গ্রহণ করলে শরীকানার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে কোন উপঢৌকন আসে, তার কাছে যত লোক থাকে, তারা সকলেই উপঢৌকনে শরীক থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্য হলেও তা উপঢৌকন। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের দেয়া উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে রূপা অথবা খাদ্য, যা খাওয়ানো হয়। এতে রূপাকেও উপঢৌকন বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল, জনসমাবেশে সকলের সম্মতি ছাড়া বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কিছু দেয়া মাকরূহ। সকলের সম্মতি সন্দিগ্ধ বিধায় একান্তে দিলে এই সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এখন সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা এবং অন্যের কাছে তার আলোচনা করার মধ্যে যেসকল উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। এতে চারটি উপকারিতা আছে।

(১) সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ পায়, নিজের অবস্থা সম্পর্কে অপরকে ধোঁকা দেয়া হয় না এবং রিয়া থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ, এতে বাস্তব অবস্থাই প্রকাশ পায়। এরূপ হয় না যে, বাস্তব অবস্থা অন্যরূপ এবং লোক দেখানোর উদ্দেশে তা প্রকাশ করা হয় না।

(২) প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে জাঁকজমকপ্রীতি দূর হয়ে যায়, দাসত্ব ও দীনতা প্রকাশ পায়, অহংকার ও অভাবমুক্ততার দাবী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায় এবং মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়া যায়। এ কারণেই জনৈক সাধক তাঁর শিষ্যকে বলেন ঃ সদকা সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে নেবে। এরূপ করলে তোমার ব্যাপারে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল হবে, যাদের মনে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না । এট তো অভীষ্ট লক্ষ্যই। কেননা, এটা তোমার ধর্মের নিরাপত্তার জন্য অধিক উপকারী । আরেক দল হবে, যাদের মনে তোমার প্রতি সহানুভূতি বেশী হবে। কারণ, তুমি আপন অবস্থা ঠিক ঠিক প্রকাশ করে দিয়েছ। এটা তোমার ভাইয়ের কাম্য। কারণ, তার উদ্দেশ্য বেশী বেশী সওয়াব পাওয়া। সে যখন তোমাকে মহব্বত বেশী করবে তখন সে সওয়াবও অবশ্যই পাবে। এ সওয়াব তুমিও পাবে। কেননা, তার সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ তুমিই।

(৩) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে তওহীদকে শেরক থেকে বাঁচানো যায়। কেননা, সাধকের দৃষ্টি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে নিবদ্ধ হয় না। গোপনও প্রকাশ্য তার জন্যে সমান। এ অবস্থার পরিবর্তন তওহীদে শেরকের নামান্তর । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যেব্যক্তি গোপনে গ্রহণ এবং প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করত, আমরা তার দোয়ার কোনই মূল্য দিতাম না । উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হালের ক্ষতি বৈ নয়। দৃষ্টি সর্বদা এক আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা উচিত। কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তাঁর মুরীদগণের মধ্যে একজনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। এটা অন্য মুরীদদের কাছে দুঃসহ মনে হলে বুযুর্গ ব্যক্তি তাদের কাছে সেই মুরীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাইলেন। সেমতে প্রত্যেক মুরীদকে একটি করে মুরগী দিয়ে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেকেই আপন আপন মুরগী এমন জায়গা থেকে জবাই করে আনবে, যেখানে অন্য কেউ না দেখে। সকল মুরীদ গিয়ে আপন আপন মুরগী জবাই করে আনল । কিন্তু সেই মুরীদ জীবিত মুরগী নিয়ে এল । বুযুর্গ তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এমন কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্রই দেখেন। বুযুর্গ ব্যক্তি মুরীদগণকে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট । সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি ধ্যান দেয় না।

(৪) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে শোকরের সুন্নত আদায় হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ তুমি তোমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পালনকর্তার নেয়ামত বর্ণনা কর। নেয়ামত গোপন করা অকৃতজ্ঞতার শামিল । যারা আল্লাহর নেয়ামত গোপন করে, আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন এবং কৃপণ আখ্যা দেন। বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতা করতে আদেশ করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ গোপন করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন, তখন বান্দাকে সেই নেয়ামতের উপযোগী দেখাও পছন্দ করেন। এক ব্যক্তি জনৈক সাধককে গোপনে কিছু দিলে সাধক আপন হাত উঁচু করে বললেন ঃ এটা দুনিয়ার বস্তু। এটা প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম। আখেরাতের কাজ গোপন করা উত্তম। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তোমাকে জনসমাবেশে কিছু দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর। এর পর একান্তে তা ফেরত দিয়ে দাও। সদকার ক্ষেত্রে শোকরের প্রতি উৎসাহ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزوجل যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর করে না। শোকর প্রতিদানের স্থলবর্তী হয়ে থাকে । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তার প্রতিদান দাও। প্রতিদান সম্ভব না হলে উত্তমরূপে তার প্রশংসা কর এবং সেই পর্যন্ত দোয়া কর, যে পর্যন্ত প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার বিশ্বাস না জন্মে। মুহাজিরগণ মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শোকর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা আনসারদের চেয়ে উত্তম লোক দেখিনি। আমরা তাঁদের কাছে এলে তাঁরা আপন বিষয়-সম্পত্তি আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। আমাদের আশংকা হচ্ছে, সব সওয়াব তাঁরাই নিয়ে যাবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, তা নয়। তোমরা যে তাঁদের শোকর করেছ এবং প্রশংসা করেছ, এতে প্রতিদান হয়ে গেছে।

এসব উপকারিতা জানার পর এখন জানা দরকার, এ সম্পর্কে বর্ণিত মতভেদ মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়; বরং এটা হাল তথা অবস্থার মতভেদ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ ক্ষেত্রে সত্য এই যে, গোপনে গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় উত্তম অথবা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বরং এটা নিয়তের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। হাল ও ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে নিয়ত আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এখলাসবিশিষ্ট ব্যক্তির উচিত নিজের দেখাশুনা করা এবং বিভ্রান্তিতে না পড়া। এ ব্যাপারে মনের প্রতারণা ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করার তুলনায় গোপনে গ্রহণ করার কারণসমূহের মধ্যে ধোঁকা প্রতারণা বেশী রয়েছে– যদিও উভয়ের মধ্যেই প্রতারণা আছে। গোপনে গ্রহণ করার মধ্যে প্রতারণার কারণ, মন গোপনে গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী থাকে। কারণ, এতে জাঁকজমক ও মর্যাদা বহাল থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান ঠিক থাকে। কেউ মিসকীনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং দাতাকে তার প্রতি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদানকারীরূপে দেখে না। এই রোগ মনের মধ্যে গোপন থাকে এবং শয়তান এর মাধ্যমে উপকারিতা প্রকাশ করে। এমনকি, পূর্ববর্ণিত পাঁচটি উপকারিতাকেই গোপনে গ্রহণ করার কারণরূপে উল্লেখ করে।

প্রকাশ্যে গ্রহণ করার প্রতিও মন আগ্রহী থাকে। কারণ, এতে দাতার মন প্রফুল্ল হয় এবং সে দানে উৎসাহিত হয়। এখানে শয়তান বলে, শোকর আদায় করা সুন্নত এবং গোপন রাখা রিয়া। এমনকি, শয়তান পূর্বোল্লিখিত চারটি উপকারিতাকেও প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যাতে প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

অতএব ফয়সালা এই যে, দাতাকে দেখতে হবে। যদি সে শোকর ও প্রকাশ্যে দেয়া পছন্দ করে, তবে তার দান গোপন রাখবে এবং শোকর করবে না। কেননা, শোকর তলব করা একটি জুলুম। এই জুলুমের কাজে তাকে সাহায্য না করা চাই। পক্ষান্তরে যদি দাতা শোকর পছন্দ না করে, তবে গ্রহীতা তার শোকর করবে এবং দান প্রকাশ করবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে লোকেরা এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে মেরে ফেলেছ। সে শুনলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে না। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের প্রশংসা তাদের উপস্থিতিতে করতেন। কারণ, তিনি তাদের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন, এ প্রশংসা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হবে না। বরং তাদের সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ আরও বৃদ্ধি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে। উদাহরণতঃ তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সে গেঁয়ো লোকদের সর্দার। অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের সর্দার আগমন করলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। এক ব্যক্তির কথাবার্তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুব ভাল লাগলে তিনি বললেন ঃ ان من البيان لسحرا নিঃসন্দেহে কিছু বর্ণনা জাদু হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন ঃ اذا امدح المؤمن ربى الايمان فى قلبه মুমিনের প্রশংসা করা হলে তার অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজেকে সম্যক চেনে, মানুষের প্রশংসা তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। সারকথা, জনসমাবেশে গ্রহণ করা এবং একান্তে না করা উত্তম ও নিরাপদ পন্থা। হাঁ, যদি মারেফত কামেল হয় এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ ও গোপনে গ্রহণ উভয়টি সমান হয়ে যায়, তবে গোপনে গ্রহণ করার মধ্যেও দোষ নেই। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। আলোচনায় আছে– বাস্তবে পাওয়া ভার। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং তওফীক দান করুন।

সদকা গ্রহণ করা উত্তম না যাকাত

ইবরাহীম খাওয়াস, জুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ বুযুর্গের অভিমত হচ্ছে, যাকাতের তুলনায় সদকার অর্থ গ্রহণ করা উত্তম। কেননা, যাকাতের অর্থ গ্রহণ করলে মিসকীনদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা হয়। এছাড়া যাকাতের হকদার হওয়ার জন্যে যেসকল বিশেষণ ও শর্ত উল্লিখিত আছে, সেগুলো নিজের মধ্যে থাকে না। সদকার মধ্যে এ ব্যাপারে অবকাশ বেশী । কেউ কেউ বলেন ঃ যাকাত গ্রহণ করা উচিত– সদকা নয়। কেননা, যাকাত গ্রহণ করলে মানুষকে ফরয আদায়ে সাহায্য করা হয়। সকল মিসকীন যাকাত নেয়া ত্যাগ করলে সকল মানুষ গোনাহ্গার হবে। এছাড়া যাকাত কারও অনুগ্রহ নয়। এটা মালদারের যিম্মায় আল্লাহর ওয়াজেব হক। এর মাধ্যমে অভাবী বান্দাদের রুজি অর্জিত হয়। আরও কারণ, যাকাত অভাবের কারণে গ্রহণ করা হয়। অভাব প্রত্যেক ব্যক্তির নিশ্চিতরূপে জানা থাকে। কিন্তু সদকা গ্রহণ করা দ্বীনদারীর কারণে হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাতা তাকেই সদকা দেয়, যার দ্বীনদারী সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে, এ বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ হয়। যে ধরনের অবস্থা প্রবল এবং যেরূপ নিয়ত হয়, সেই ধরনের বিধান হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে, তার মধ্যে যাকাতের হকদার হওয়ার শর্ত আছে কিনা, তবে তার যাকাত গ্রহণ না করা উচিত । আর যদি নিজেকে হকদার বলে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ আছে, যা সে উত্তম পথে ব্যয় করেছে। এখন ঋণ শোধ করার কোন উপায় নেই। এরূপ ব্যক্তি নিশ্চিতরূপেই যাকাতের হকদার । তাকে সদকা ও যাকাতের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে চিন্তা করবে– যদি আমি এই সদকা গ্রহণ না করি, তবে মালিক সদকা করবে না। এমতাবস্থায় সে সদকাই গ্রহণ করবে। আর যদি যাকাত নিলে মিসকীনদের কোন অসুবিধা না হয়, তবে সদকা ও যাকাত প্রত্যেকটি গ্রহণ করবে। এতদসত্ত্বেও নফসকে হেয় করার ব্যাপারে যাকাত গ্রহণের প্রভাব সম্ভবতঃ অনেক বেশী ।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযার তাৎপর্য

প্রকাশ থাকে যে, রোযা ঈমানের এক-চতুর্থাংশ । কারণ, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الصوم نصف الصبر (রোযা সবরের অর্ধেক) এবং অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ الصبر نصف الايمان (সবর ঈমানের অর্ধেক)। এ থেকে জানা গেল, রোযা ঈমানের অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ। রোযা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় ইসলামের সকল রোকনের মধ্যে এটা সেরা রোকন। সেমতে আল্লাহ তাআলার উক্তি রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেছেন। উক্তিটি এই ঃ সকল সৎ কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত হবে; কিন্তু রোযা একান্তভাবে আমার জন্যে বিধায় আমিই এর প্রতিদান দেব। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করা হবে।

রোযা সবরের অর্ধেক। তাই এর সওয়াব হিসাব-কিতাবের আওতা বহির্ভূত হবে ! শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ উক্তিই যথেষ্ট, তিনি এরশাদ করেন ঃ

والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل يذر شهوته وطعامه وشرابه لاجلى فالصوم لى وانا اجزى به ـ

আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ– নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ বলেন, রোযাদার তার কামনা-বাসনা ও পানাহার একমাত্র আমার জন্যে পরিত্যাগ করে। অতএব রোযা আমার জন্যে এবং আমিই এর প্রতিদান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

للجنة باب يقال له الريان لايدخله الا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى هى جزاء صومه ـ

জান্নাতের একটি দ্বারকে বলা হয় 'বাবুর রাইয়ান'। এতে রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। রোযাদারকে তার রোযার বিনিময়ে আল্লাহর দীদারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ

للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء ربه ـ

রোযাদারের দুটি আনন্দ। এক আনন্দ ইফতারের সময় এবং এক আনন্দ তার পালনকর্তার দীদার লাভ করার সময়।

এক হাদীসে আছে– প্রত্যেক বস্তুর একটি দরজা আছে। এবাদতের দরজা হল রোযা। আরও বলা হয়েছে ঃ রোযাদারের নিদ্রা এবাদত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন রমযান মাস শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানকে শিকল পরানো হয়। জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে– যারা কল্যাণ কামনা কর, তারা এগিয়ে আস এবং যারা অনিষ্ট কামনা কর তারা সরে যাও। কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে– তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা পাঠিয়েছ, তার বিনিময়ে আজ জান্নাতে স্বচ্ছন্দে পানাহার কর। এর তফসীর প্রসঙ্গে ওকী বলেন, এখানে অতীত দিন বলে রোযার দিন বুঝানো হয়েছে। কেননা, রোযার দিনে তারা পানাহার ত্যাগ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংসার ত্যাগ ও রোযাকে গর্বের বিষয়সমূহের মধ্যে এক কাতারে রেখেছেন। সংসার ত্যাগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যুবক এবাদতকারীকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, হে আমার জন্যে আপন বাসনা বর্জনকারী যুবক, হে আমার সন্তুষ্টিতে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! তুমি আমার কাছে ফেরেশতার মতই। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাদার সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাকে দেখ, সে আমার কারণে তার কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করেছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ

অর্থাৎ, কেউ জানে না তাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্যে কি লুক্কায়িত রয়েছে, যা তাদের চক্ষুকে শীতল করবে।

কোরআনের এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এখানে আমল বলে রোযা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সবরকরীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থাৎ, সবরকারীকে বেহিসাব পুরস্কার দেয়া হবে।

এ থেকে জানা যায়, সবরকারীর জন্যে অগণিত সওয়াবের স্তূপ সাজানো হবে, যা অনুমানও করা যায় না। এরূপ হওয়াই সমীচীন। কেননা, রোযা আল্লাহ তাআলার জন্যে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে গৌরবোজ্জ্বল। সকল এবাদতই আল্লাহর জন্যে। তবুও রোযা কাবা গৃহের ন্যায় প্রাধান্য রাখে, যদিও সমস্ত ভূপৃষ্ঠই আল্লাহর। রোযার এই প্রাধান্য দুটি কারণে– (১) রোযা রাখার অর্থ কয়েকটি বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং কয়েকটি বিষয় বর্জন করা। এটি আভ্যন্তরীণ কাজ। এতে এমন কোন আমল নেই, যা চোখে দেখা যায়। অন্যান্য এবাদত মানুষের দৃষ্টিতে থাকে। কিন্তু রোযা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেখে না। (২) রোযা আল্লাহ তাআলার শত্রুর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং প্রবল হয়। কেননা, কামনা-বাসনা হচ্ছে শয়তানের ওসিলা বা হাতিয়ার, যা পানাহারের মাধ্যমে শক্তিশালী হয় । এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান মানুষের ধমনী (রক্ত চলার পথে) বিচরণ করে। সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা তার পথসমূহ সংকীর্ণ করে দাও। এদিকে লক্ষ্য করে রসূলে পাক (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ সর্বদা জন্নাতের দরজা খট্‌খটাও। আরজ করা হল ঃ কিসের মাধ্যমে? তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার মাধ্যমে। যেহেতু রোযা বিশেষভাবে শয়তানের মূলোৎপাটন করে, তার চলার পথ রুদ্ধ এবং সংকীর্ণ করে, তাই রোযা বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়েছে। কেননা, শয়তানের মূলোৎপাটনে আল্লাহ সাহায্য করেন। বান্দাকে সাহায্য করা নির্ভর করে বান্দার পক্ষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে আল্লাহকে সাহায্য করার উপর। সে মতে আল্লাহ বলেনঃ

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় রাখবেন।

মোট কথা, চেষ্টা শুরু করা বান্দার পক্ষ থেকে এবং বিনিময়ে হেদায়েত তথা সৎপথ প্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। যেমন– আল্লাহ বলেনঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ, যারা আমার পথে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি। আরও বলেনঃ اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। পরিবর্তনের জন্যে কামনা-বাসনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, কামনা বাসনা শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। যে পর্যন্ত এই বিচরণ ক্ষেত্র সবুজ শ্যামল থাকবে, শয়তানের বিচরণ বন্ধ হবে না। বিচরণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতাপ বান্দার কাছে প্রকাশ পাবে না এবং দীদারের পথে পর্দা পড়ে থাকবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেনঃ যদি মানুষের অন্তরে শয়তানের যাতায়াত না থাকত, তবে মানুষ ঊর্ধ্বজগত নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হত। এদিক দিয়ে রোযা এবাদতসমূহের দরজা ও ঢাল।

রোযার বাহ্যিক ওয়াজেবসমূহ

(১) রমযান মাসের সূচনা জ্ঞাত হওয়া। এটা চাঁদ দেখা অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায়। চাঁদ দেখার উদ্দেশ্য চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা জানা, যা একজন আদেল ব্যক্তির কথায় হতে পারে। ঈদুল ফেতরের চাঁদ দুজন আদেল ব্যক্তির কথা ছাড়া প্রমাণিত হয় না। যেব্যক্তি একজন আদেল ব্যক্তির কাছে চাঁদ দেখার কথা শুনে এবং বিশ্বাস করে, তার উপর রোযা ওয়াজেব হবে, যদিও সরকারীভাবে রোযা রাখার আদেশ না হয়। যদি এক শহরে চাঁদ দেখা যায় ও অন্য শহরে দেখা না যায় এবং উভয় শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশী হলে প্রত্যেক শহরের বিধান আলাদা হবে। (প্রকাশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে যে, হানাফী মাযহাবে দেশের এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল শহরের মানুষের উপর রোযা রাখা ওয়াজেব হবে, দূরত্ব বেশী হোক কিংবা কম।)

(২) প্রত্যেক রোযার জন্যে রাত থেকে নির্দিষ্ট করে ও বিশ্বাস সহকারে নিয়ত করা। সুতরাং সমগ্র রমযান মাসের নিয়ত এক দফায় করে নিলে যথেষ্ট হবে না। দিনের বেলায় নিয়ত করলে রমযানের রোযা হবে না; বরং নফল রোযা হবে। (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা চলে।) শুধু রোযার নিয়ত করলে জায়েয হবে না, বরং নির্দিষ্ট করে রমযানের ফরয রোযার নিয়ত করতে হবে। (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শুধু রোযা কিংবা নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের ফরয রোযাই হবে।) আগামীকাল রমযান হলে রোযা রাখব- এরূপ সন্দেহজনক নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিয়ত করতে হবে। (হানাফী মাযহাবে এটা জরুরী নয়।)

(৩) রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় পেটে কোন কিছু যেতে না দেয়া। সুতরাং রোযা রেখে জেনে-শুনে কিছু খেলে অথবা পান করলে অথবা নাকের ছিদ্র পথে কোন বস্তু পেটে চলে গেলে অথবা পেটে ওষুধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যে বস্তু ইচ্ছা ব্যতিরেকে পেটে চলে যায়; যেমন পথের ধুলাবালি অথবা মাছি অথবা কুলি করার সময় পানি, তাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু কুলিতে গরগরা করার সময় পেটে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা, এটা রোযাদারের ত্রুটি। রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

(৪) স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা। যদি রাত্রে সহবাস করে অথবা স্বপ্নদোষ হয় এবং নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, তবে তাতে রোযা নষ্ট হয় না।

(৫) বীর্যপাত করা থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাসের মাধ্যমে অথবা সহবাস ছাড়াই বীর্যস্খলন ঘটাবে না। এরূপ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। স্ত্রীকে চুম্বন করলে অথবা কাছে শোয়ালে রোযা নষ্ট হয় না, যে পর্যন্ত বীর্যপাত না হয়, কিন্তু এসব কাজ মাকরূহ।

(৬) বমি করা থেকে বিরত থাকা। ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনা আপনি হলে রোযা নষ্ট হবে না। গলা থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অথবা বুক থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হলে রোযা নষ্ট হবে না। যদি শ্লেষ্মা মুখে পৌঁছার পর তা গিলে ফেলে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

রোযার কাযা ও কাফফারা

কোন ওযরের কারণে অথবা ওযর ছাড়াই রোযা না রাখলে তার কাযা করা ওয়াজেব। রমযানের রোযার কাযা একাদিক্রমে (ফাঁক না দিয়ে) করা ওয়াজেব নয়। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে রোযার কাফফারা ওয়াজেব হয় না। (হানাফী মাযহাবে ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার অথবা সহবাস করে রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজেব হয়।) উদাহরণতঃ পানাহার এবং সহবাস ব্যতীত বীর্যপাত ঘটালে কেবল কাযা ওয়াজেব হবে- কাফফারা নয়। কাফফারা হল একটি গোলাম মুক্ত করা। এটি সম্ভব না হলে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা। এটাও সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে খাওয়ানো। যাদের রোযা নিজেদের দোষে নষ্ট হয়ে যায়, তাদের উপর ইমসাক অর্থাৎ দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। কষ্টের আশংকা না থাকলে সফরে রোযা রাখা এবং কষ্টের আশংকা থাকলে রোযা না রাখা উত্তম। শায়খে ফানী অর্থাৎ যে বৃদ্ধ রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না, সে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে অর্ধ সা' গম দান করবে।

রোযার সুন্নতসমূহ

রোযার সুন্নত ছয়টি- (১) বিলম্বে সেহরী খাওয়া, (২) খোরমা অথবা পানি দ্বারা মাগরিবের নামাযের পূর্বে ইফতার করা, (৩) দ্বিপ্রহরের পরে মেসওয়াক না করা, (৪) রমযান মাসে দান খয়রাত করা, (৫) কোরআন পড়া ও পড়ানো এবং (৬) মসজিদে এতেকাফ করা; বিশেষতঃ শেষ দশ দিনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন খুব এবাদত করতেন- নিজেও মেহনত করতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও মেহনত করাতেন। কারণ, এই দশ দিনের মধ্যে শবে কদর রয়েছে। এই দশ দিন নিরন্তর এতেকাফ করা উত্তম। এতেকাফের নিয়ত করার পর শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদ থেকে বের হলে নিরন্তর এতেকাফ হবে না। যেমন, কোন রোগীকে দেখার জন্যে, সাক্ষ্য দেয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে এবং যিয়ারত করার জন্যে বের হওয়া। প্রস্রাব পায়খানার জন্যে বের হলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওযু ব্যতীত অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া যাবে না। দেহের কিছু অংশ মসজিদ থেকে বের করলে এতেকাফের নিরন্তরতা ভঙ্গ হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে বের করে দিতেন এবং তিনি চিরুনি করে দিতেন।

রোযার আভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, রোযার তিনটি স্তর আছে– সাধারণের রোযা, বিশেষ ব্যক্তিগণের রোযা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা।

সাধারণের রোযা হচ্ছে, উদর ও লজ্জাস্থানকে কামোদ্দীপনা পূর্ণ করা থেকে বিরত রাখা; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে, অন্তরকে দুঃসাহস, পার্থিব চিন্তা এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখা। এই প্রকার রোযা আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত ছাড়া অন্য বস্তুর চিন্তা এবং সাংসারিক চিন্তার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। হাঁ, ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু পার্থিব চিন্তা জরুরী, ততটুকুর চিন্তা রোযা নষ্ট করে না। কেননা, এটা আখেরাতের পাথেয়– দুনিয়ার নয়। এমনকি, বুযুর্গগণ বলেন ঃ যেব্যক্তি দিনের বেলায় এ চিন্তায় ব্যাপৃত হয় যে, ইফতারীর ব্যবস্থা করে নেয়া দরকার, তাকে ভ্রান্ত বলা হবে। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা কম করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুত রিযিকে বিশ্বাস কম রাখে। এটা নবী, সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণের স্তর। আমরা এ স্তরের অধিক বর্ণনা দিতে চাই না। এই রোযা তখন অর্জিত হয়, যখন মানুষ সমস্ত সাহসিকতা সহকারে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করে, অন্য সবকিছুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু তার উপর আচ্ছন্ন হয়ে যায়–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ -

বল, আল্লাহ, অতঃপর তাদেরকে তাদের ছিদ্রান্বেষা নিয়ে খেলা করতে দাও।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রোযা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ছয়টি বিষয় দ্বারা এই রোযা পূর্ণতা লাভ করে।

(১) দৃষ্টি নত রাখা, মন্দ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এমন বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মন্দ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শয়তানের একটি বিষ মিশ্রিত তীর। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে এটা বর্জন করে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করে। হযরত জাবের (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ

خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة شهوة .

পাঁচটি বিষয় রোযাদারের রোযা নষ্ট করে দেয়– মিথ্যা বলা, কুটনামি করা, পশ্চাদনিন্দা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা।

(২) অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, জুলুম, কলহ বিবাদ ইত্যাদি গর্হিত কর্ম থেকে রসনা সংযত রাখা, সাধ্যমত নিরবতা পালন করা এবং যিকির ও তেলাওয়াতে ব্যাপৃত থাকা এটা জিহ্বার রোযা। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ পরনিন্দা রোযা বিনষ্ট করে। হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে– দুটি অভ্যাস রোযা নষ্ট করে– পরনিন্দা ও মিথ্যা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রোযা ঢাল। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন যেন মূর্খোচিত ও অশ্লীল কথা না বলে। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে অথবা গালি দিলে সে যেন বলে দেয়– আমি রোযাদার। এক হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে দু'জন মহিলা রোযা রাখে। রোযার শেষ ভাগে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা তীব্র আকার ধারণ করে এবং তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। তারা রোযা ভঙ্গের অনুমতি নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একজনকে প্রেরণ করল। তিনি প্রেরিত লোকের হাতে একটি পেয়ালা দিয়ে বললেন ঃ মহিলাদ্বয়কে বলো, তারা যা খেয়েছে তা যেন এই পেয়ালায় বমি করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেয়। একজন মহিলা তাজা রক্ত ও টাটকা মাংস দিয়ে অর্ধেক পেয়ালা ভরে দিল। অপর মহিলাও এসব বস্তু বমি করল। ফলে পেয়ালা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু দ্বারা রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দ্বারা রোযা নষ্ট করেছে। তারা একে অপরের কাছে বসে পরনিন্দায় মেতে উঠেছে। তাদের এই পরনিন্দাই পেয়ালায় গোশতের আকারে দেখা যাচ্ছে।

(৩) কুকথা শ্রবণ থেকে কর্ণকে বিরত রাখা। কেননা, যেসব কথা বলা হারাম সেগুলো শ্রবণ করাও হারাম। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারীদের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۔

অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী।

আরও বলা হয়েছে–

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۔

তাদের দরবেশ ও আলেমগণ তাদেরকে গোনাহের কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না কেন?

সুতরাং পরনিন্দা শুনে চুপ থাকা হারাম। আল্লাহ বলেন اِنَّهُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ (তখন তোমরাও তাদের মত।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم ۔ (গীবতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই গোনাহে শরীক।)

(৪) হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খারাপ বিষয় থেকে এবং ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে বিরত রাখা। কেননা, যদি কেউ সারাদিন হালাল থেকে বিরত থাকে এবং হারাম দ্বারা ইফতার করে, তবে তার রোযা কিছুই হয় না। সে সেই ব্যক্তির মত, যে একটি প্রাসাদ তৈরী করে এবং একটি নগরী বিধ্বস্ত করে। কেননা, হালাল খাদ্যের আধিক্যই ক্ষতিকর। এ ক্ষতি হ্রাস করার জন্যে রোযার বিধান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যেব্যক্তি অনেক ওষুধ সেবনের ক্ষতিকে ভয় করে বিষ পান করে, সে নির্বোধ। হারাম খাদ্য বিষতুল্য, যা ধর্ম বরবাদ করে এবং হালাল খাদ্য ওষুধস্বরূপ, যা কম খাওয়া উপকারী এবং বেশী খাওয়া ক্ষতিকর। রোযার উদ্দেশ্য হালালের ক্ষতি হ্রাস করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন-

অনেক রোযাদারের রোযায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। কেউ বলেন, যে হারাম দ্বারা ইফতার করে, হাদীসে তাকেই বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে হালাল খাদ্য থেকে বিরত থাকে এবং মানুষের গোশত অর্থাৎ গীবত দ্বারা ইফতার করে, যা হারাম। আবার কেউ কেউ বলেন, যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে না, হাদীসে তাকে বুঝানো হয়েছে।

(৫) ইফতারে হালাল খাদ্য এত বেশী খেতে নেই যাতে পেট স্ফীত হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল খাদ্য দ্বারা পরিপূর্ণ পেটের চেয়ে অধিক মন্দ পাত্র আর একটিও নেই। এছাড়া সারা দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার ক্ষতি ইফতারের সময় পূরণ করে নেয়া হলে মানুষ রোযা দ্বারা শয়তানকে কিরূপে দাবিয়ে রাখবে এবং কামভাবকে কিরূপে চূর্ণ করবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোযার মধ্যে নানা প্রকারের খাদ্যের আয়োজন হয়ে থাকে। সেমতে মানুষের অভ্যাস এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা রমযান মাসের জন্যে সব খাদ্য গুছিয়ে রাখে এবং রমযানে এত বেশী খায়, যা অন্য সময় কয়েক মাসেও খায় না। বলাবাহুল্য, রোযার উদ্দেশ্য পেট খালি রাখা এবং কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করা, যাতে তাকওয়া শক্তিশালী হয়। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদরকে অভুক্ত রাখার পর যখন খাদ্যস্পৃহা অনেক বেড়ে যায়, তখন পেট পুরে ও তৃপ্তি সহকারে সুস্বাদু খাদ্য খেলে নফসের আনন্দ শক্তি আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এমন সব কুবাসনা জাগ্রত হয়, যা রমযান মাস না হলে হয় তো জাগ্রত হত না। মোট কথা, যেসব শক্তি মানুষকে মন্দ কাজের দিকে টেনে নেয়ার ওসিলা এবং শয়তানের হাতিয়ার, সেগুলোকে দুর্বল করা রোযার উদ্দেশ্য। এটা অল্প ভক্ষণ ছাড়া অর্জিত হয় না। অর্থাৎ, রোযার রাতে এতটুকু খাবে, যতটুকু রোযা ছাড়া প্রত্যেক রাতে খাওয়ার অভ্যাস ছিল। রোযা রেখে দ্বিপ্রহর ও রাত্রির খাদ্য এক সাথে খেয়ে ফেললে সেই রোযা দ্বারা কোন উপকার হবে না। ক্ষুধা, পিপাসা ও দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার কারণে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিনের বেলায় বেশী নিদ্রা না যাওয়া মোস্তাহাব। রাতেও কিছু দুর্বলতা থাকা ভাল, যাতে তাহাজ্জুদ ও ওজিফা সহজসাধ্য হয়। এতে শয়তান মনের আশেপাশে ভিড়তে পারবে না। ফলে মানুষের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বজগত উদ্ভাসিত হয়ে গেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শবে কদর সেই রাত্রকেই বলে, যাতে ঊর্ধ্বজগতের কিছু মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। যেব্যক্তি অন্তর ও বুকের মধ্যে খাদ্যের আড়াল সৃষ্টি করে, সে ঊর্ধ্ব জগতের অন্তরালে থেকে যায়।

(৬) ইফতারের পর মনে একাধারে আশা ও ভয় এবং সন্দেহ থাকা। কেননা, একথা কারও জানা নেই যে, রোযাদারের রোযা কবুল হয়েছে কিনা এবং সে নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা। প্রত্যেক এবাদত শেষে এমনি ধরনের অবস্থা থাকা ভাল। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী ঈদের দিন একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যারা তখন হাস্যরত ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা রমযান মাসকে দৌড়ের মাঠ করেছেন, যাতে সকল মানুষ তার আনুগত্যের জন্যে মাঠে দৌড় দেয়। কিছু লোক তো অগ্রসর হয়ে মনযিলে মকছুদে পৌঁছে গেছে। আর কিছু লোক পেছনে থেকে নিরাশ হয়েছে। যেদিন অগ্রগামীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে এবং বাতিলপন্থীরা বঞ্চিত রয়েছে, সেদিন যারা হাসি-তামাশা করে, তাদের প্রতি বিস্ময় লাগে। আল্লাহর কসম, প্রকৃত পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলা হলে মকবুল ব্যক্তিরা আনন্দের আতিশয্যে ক্রীড়া-কৌতুক বর্জন করবে এবং প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিরা দুঃখের আতিশয্যে হাস্য, রসিকতা থেকে বিরত থাকবে। আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ)-কে কেউ বলল ঃ আপনি বুড়ো মানুষ। রোযা আপনাকে দুর্বল করে দেয়। এ জন্যে কোন উপায় করা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক। তিনি বললেন ঃ আমি একটি দীর্ঘ সফরের জন্যে রোযাকে প্রস্তুত করছি। আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে সবর করা তাঁর আযাবে সবর করার তুলনায় অনেক সহজ। এ পর্যন্ত রোযার ছয়টি আভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণিত হল।

যেব্যক্তি কেবল উদর ও লজ্জাস্থানের কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকে এবং এগুলো পালন করে না, ফেকাহবিদগণ তাদের রোযা জায়েয বলে থাকেন। এখন যদি প্রশ্ন হয়, ফেকাহবিদগণ যে রোযাকে জায়েয বলেন, আপনি তা অশুদ্ধ বলেন কেন, তবে আমার পক্ষ থেকে এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জওয়াব হচ্ছে, ফেকাহবিদগণ বাহ্যদর্শী। তাঁরা এমন দলীল দ্বারা বাহ্যিক শর্তাবলী প্রমাণ করেন, যা বাতেনী শর্তাবলীর মধ্যে আমাদের বর্ণিত দলীলের তুলনায় নেহায়েত দুর্বল। বিশেষতঃ পরনিন্দা, কলহ-বিবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বাহ্যদর্শী ফেকাহবিদগণকে এমন বিধান দিতে হয়, যাতে গাফেল ও সংসারাসক্ত ব্যক্তিরাও দাখিল থাকতে পারে। তাই বহ্যিক শর্তাবলী দৃষ্টে অনেক বিষয়কে তাদের শুদ্ধ বলতে হয়। কিন্তু আখেরাতবিদগণের মতে শুদ্ধ হওয়ার অর্থ কবুল হওয়া। আর কবুল হওয়ার মানে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা। তাঁরা বলেন ঃ রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার একটি গুণ ক্ষুধা পিপাসা থেকে মুক্ত হওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা এবং কামনা-বাসনা চূর্ণ করার ব্যাপারে যথাসাধ্য ফেরেশতাগণের অনুসরণ করা। মানুষের মর্তবা চতুষ্পদ জন্তুর মর্তবা থেকে ঊর্ধ্বে; কেননা, মানুষ বিবেকের সাহায্যে তার কামনা-বাসনা চূর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু চেষ্টার মাধ্যমে কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বলে মানুষের মর্তবা ফেরেশতাগণের নীচে। এ কারণেই মানুষ যখন কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন সে أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ তথা নিম্নতমদের স্তরে নেমে যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুর কাতারে শামিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন মানুষ কামনা-বাসনার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়, তখন أَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ তথা মর্যাদার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে ফেরেশতাগণের স্তরে পৌঁছে যায়। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী। যে লোক তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের মত অভ্যাস গড়ে তোলে, সে-ও তাদের মত আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যায়। এই নৈকট্য স্থান ও দূরত্বের দিক দিয়ে নয়; বরং গুণাবলীর দিক দিয়ে। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে রোযার মূল উদ্দেশ্য যখন এই, তখন দ্বিপ্রহরের খাদ্য দেরী করে সন্ধ্যার খাদ্যের সাথে একেবারে খেয়ে নিলে এবং সারাদিন কামনা বাসনায় নিমজ্জিত থাকলে কি উপকার হবে? এরূপ রোযা দ্বারা উপকার হলে এই হাদীসের অর্থ কি যে, অনেক রোযাদারের রোযা ক্ষুধায় তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না? এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ঃ অনেক রোযাদার রোযাখোর এবং অনেক রোযাখোর রোযাদার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, রোযাখোর হয়েও রোযাদার তারা, যারা আপন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ থেকে মুক্ত রেখে পানাহার করে এবং রোযাদার হয়েও রোযাখোর তারা, যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত তো থাকে; কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ থেকে বিরত রাখে না। রোযার অর্থ ও মূল লক্ষ্য অবগত হওয়ার পর জানা গেল, যেব্যক্তি পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু গোনাহের কাজ করে রোযা নষ্ট করে দেয়, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে ওযুর অঙ্গ তিন বার মাসেহ করে নেয়। এখানে সে বাহ্যতঃ তিন বার মাসেহ করল; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে ধৌত করা ছিল, তা ছেড়ে দিল। এরূপ ব্যক্তির নামায অজ্ঞতার কারণে তার মুখের উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। যেব্যক্তি খেয়ে রোযা নষ্ট করে এবং আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে এক একবার অঙ্গ ধৌত করে। তার নামায ইনশাআল্লাহ্ মকবুল। কেননা, সে আসল ফরয আদায় করেছে, যদিও ফযীলত বর্জন করেছে। আর যেব্যক্তি পানাহার বর্জন করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও রোযা রাখে অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধৌত করে। সে আসল ও ফযীলত উভয়টি অর্জন করেছে, যা পূর্ণতার স্তর।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় রোযা একটি আমানত। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এই আমানতের হেফাযত করা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ـ

(আল্লাহ্ আদেশ করেন, তোমরা আমানত আমানতের মালিকদের কাছে পৌঁছে দাও।) আয়াত পাঠ শেষে তিনি আপন কান ও চোখের উপর হাত রেখে বললেন ঃ কানে শুনা এবং চোখে দেখা আমানত। যদি শুনা ও দেখা রোযার অন্যতম আমানত না হত, তবে তিনি কখনও বলতেন না যে, কেউ বিবাদ করতে চাইলে বলে দেবে– আমি রোযাদার। অর্থাৎ, আমি আমার জিহ্বা আমানত রেখেছি। আমি তার হেফাযত করব। তোমাকে জওয়াব দিয়ে এই হেফাযত কিরূপে নষ্ট করব?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নফল রোযা

প্রকাশ থাকে যে, উত্তম দিনে রোযা রাখা উত্তম হয়ে থাকে। উত্তম দিনসমূহের মধ্যে কতক সম্বৎসরের মধ্যে, কতক প্রত্যেক মাসে এবং কতক প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায়। সম্বৎসরের মধ্যে যেসব দিন পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে আরাফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ও মহররমের দশ দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শা'বান মাসে এত বেশী রোযা রাখতেন যে, মনে হত তাও যেন রমযান মাস। এক হাদীসে আছে- রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হচ্ছে মহররমের রোযা। এর কারণ, মহররম বছরের প্রথম মাস। এ মাসকে সৎ কাজ দ্বারা পরিপূর্ণ করলে সারা বছর এর বরকত আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে- মহররম মাসে একদিন রোযা রাখা অন্য মাসের ত্রিশ রোযার চেয়েও উত্তম। রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা মহররমে ত্রিশ রোযার চেয়ে উত্তম। এক হাদীসে আছে- যেব্যক্তি মহররম মাসে তিন দিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে রোযা রাখে, তার প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে সাতশ' বছরের এবাদতের সওয়াব লেখা হয়। এক হাদীসে আছে- শাবানের অর্ধেকের পর রমযান পর্যন্ত কোন রোযা নেই। এ কারণেই রমযানের পূর্বে কিছু দিন রোযা না রাখা উত্তম। শাবানের রোযার সাথে রমযানের রোযা মিলিয়ে দেয়াও জায়েয। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এরূপও করেছেন। কোন কোন সাহাবী সম্পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন, যাতে রমযান মাসের মত না হয়ে যায়। মোট কথা, যিলহজ্জ, মহররম রজব ও শাবান উত্তম মাস। এক হাদীসে আছে, যিলহজ্জের দশ দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে আমল করলে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হয়। এর এক দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান। এর এক রাত্রির জাগরণ শবে কদরে জাগরণের সমান। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহর পথে জেহাদ করাও কি এই দিনের আমলের সমান নয়। তিনি বললেন ঃ জেহাদও সমান নয়, তবে যদি তার ঘোড়া মারা যায় এবং সে নিজে শহীদ হয়।

যেসকল দিন মাসের মধ্যে উত্তম পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে মাসের শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিনসমূহ। মাসের মধ্যবর্তী দিনগুলোকে আইয়ামে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বীয বলা হয়। এগুলো হচ্ছে চান্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখ। সপ্তাহের উত্তম দিন হচ্ছে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। উল্লিখিত উত্তম দিনগুলোতে রোযা রাখা ও বেশী পরিমাণে খয়রাত করা মোস্তাহাব। এসব দিনের বরকতে আমলের সওয়াব অনেক বেড়ে যায়।

সর্বকালের রোযার মধ্যে আরও অতিরিক্ত দিনসহ এ সকল দিনও শামিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সাধককুলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ সর্বকালের রোযা মাকরূহ বলেন। হাদীস থেকে তাই বুঝা যায়। সর্বকালীন রোযার এক প্রকার হচ্ছে দুই ঈদের দিন এবং তাশরীকের দিনগুলোতেও রোযা রাখা। একে সওমে দাহর বলা হয়। এই প্রকার রোযা যে মাকরূহ, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া সর্বকালীন রোযার মধ্যে রোযার বিরতি জনিত সুন্নত, থেকে মুখ ফেরানো হয় এবং রোযাকে নিজের উপর জরুরী করে নেয়া হয়। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে রোযা না রাখার যে অনুমতি আছে, তা পালন করা আল্লাহ পছন্দ করেন, যেমন ফরয ও ওয়াজেব পালন করা তিনি পছন্দ করেন। এ কারণেও সর্বকালীন রোযা মাকরূহ। যদি সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে উপরোক্ত দুটি অনিষ্টের মধ্য থেকে একটিও না হয় এবং সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে নফসের কল্যাণ জানা যায়, তবে সর্বকালীন রোযা রাখবে। কেননা, অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী সর্বকালীন রোযা রেখেছেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি দাহরের রোযা রাখে,'জাহান্নামে তার জন্য কোন স্থান থাকে না।

রোযার আর একটি স্তর হচ্ছে অর্ধ দাহরের রোযা রাখা। অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা। এভাবে সারা জীবন রোযা রাখা। এটা নফসের জন্যে অধিক কঠিন। ফলে নফস খুব দমিত হয়। হাদীসে এ রোযার ফযীলত বর্ণিত আছে। এ রোযায় বান্দা একদিন সবর করে ও একদিন শোকর করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে দুনিয়ার ধন-ভান্ডারের চাবি এবং ভূপৃষ্ঠে সমাহিত ধন-সম্পদ পেশ করা হয়েছে। আমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বলেছি ঃ আমি একদিন অভুক্ত থাকব এবং একদিন পেট পুরে আহার করব। যেদিন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পেট পুরে খাব, সেদিন আপনার প্রশংসা করব। আর যেদিন অভুক্ত থাকব, সেদিন আপনার কাছে মিনতি করব। এক হাদীসে আছে–

আমার ভাই দাঊদ (আঃ)-এর রোযা উত্তম রোযা ছিল। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা রাখতেন না।

জীবনের অর্ধেক দিন রোযা রাখা সম্ভব না হলে এক-তৃতীয়াংশ দিন রোযা রাখবে। অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে এবং দুদিন রোযা রাখবে না। মাসের প্রথম তিন দিন, আইয়ামে বীযের তিন দিন এবং শেষ তিন দিন রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশে এবং উত্তম দিনেও রোযা হয়ে যায়। সপ্তাহে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী হয়ে যায়।

যেব্যক্তি অন্তরের সূক্ষ্ম অবস্থা বুঝে এবং আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে, কোন কোন সময় চায়, সে সর্বকালে রোযা রাখুক এবং কখনও চায়, সর্বকালে রোযা না রাখুক। আবার কখনও চায়, মাঝে মাঝে রোযা রাখুক। এ কারণেই বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও এত রোযা রাখতেন যে, লোকেরা মনে করত তিনি আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। কখনও এত বেশী দিন রোযাহীন অবস্থায় অতিবাহিত করতেন যে, মানুষ মনে করত, তিনি আর রোযা রাখবেন না। তিনি রাত্রিকালে এত বেশী নিদ্রা যেতেন, মনে করা হত, তাহাজ্জুদের জন্যে গাত্রোত্থান করবেন না। আবার জাগরণও এত বেশী করতেন যে, বলা হত আর নিদ্রা যাবেন না। কোন কোন আলেম নিরন্তর চার দিনের বেশী রোযাহীন অবস্থায় থাকা মাকরূহ বলেছেন। তাঁদের মতে এটা অন্তরকে কঠোর করে, বদভ্যাস সৃষ্টি করে এবং কামনা বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে। বাস্তবে রোযাহীন অবস্থা অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ প্রভাবই সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ যারা দিনে ও রাতে দু'বার আহার করে, তাদের জন্যে এটা খুবই ক্ষতিকর।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম অধ্যায়

হজ্জের তাৎপর্য

ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে হজ্জ সারা জীবনের এবাদতের সৌন্দর্য ও আমলের পরিণাম এবং ইসলাম তথা ধর্মের পূর্ণতা। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

অর্থাৎ, অদ্য আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে পছন্দ করলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

যেব্যক্তি হজ্জ না করে মারা যায়, সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খ্রীস্টান হয়ে মরুক, তাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং এমন এবাদতের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, যা না হলে ধর্ম অপূর্ণ থেকে যায় এবং যার বর্জনকারী ইহুদী ও খ্রীস্টানের সমান হয়ে যায়। সেমতে এই মহান রোকনের ব্যাখ্যা, আরকান, সুনান, মোস্তাহাব ও ফযীলত বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা আবশ্যক।

হজ্জের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ -

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও যে, তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং কৃশকায় উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্জের ঘোষণা করতে বললেন, তখন তিনি সজোরে বললেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ তাআলা একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। তোমরা এর হজ্জ কর। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কণ্ঠ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কানে পৌঁছে দিলেন, যাদের সম্পর্কে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত জানতেন যে, তারা হজ্জ করবে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (তারা যেন তাদের উপকারের স্থানে পৌঁছে)। কতক তফসীরকারের মতে উপকারের স্থান হচ্ছে হজ্জ মওসুমের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আখেরাতের সওয়াব। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে শয়তানের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব।

কতক তফসীরবিদ বলেন, এখানে সরল পথ বলে মক্কা মোয়ায্যমার পথ বুঝানো হয়েছে। শয়তান মানুষকে হজ্জ করতে নিষেধ করার উদ্দেশে এ পথে বসে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

যেব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, অতঃপর শ্লীলতা হানি না করে ও পাপাচার না করে, সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন ঃ শয়তানকে আরাফার দিনের চেয়ে বেশী অন্য কোন দিন অধিক লাঞ্ছিত, অধিক বিতাড়িত, অধিক হেয় ও অধিক ক্রুদ্ধ দেখা যায় না। এর কারণ আল্লাহর রহমতের অবতরণ এবং বড় গোনাহসমূহ ক্ষমাকরণ সে স্বচক্ষে দেখতে পায়। কথিত আছে, কতক গোনাহ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ব্যতীত মাফ হয় না। হযরত ইমাম জাফর (রহঃ) একে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। জনৈক নৈকট্যশীল কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ বর্ণনা করেন, অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের আকৃতি ধারণ করে একদিন তাঁর কাছে আগমন করে। তিনি তাকে ক্ষীণ দেহ, ফ্যাকাসে বর্ণ, ক্রন্দনরত ও কোমর ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর কান্নার কারণ কি? ইবলীস বললঃ হাজীগণ আল্লাহকে উদ্দেশ করেই বেরিয়ে পড়েছে। কোন ব্যবসা বাণিজ্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের লক্ষ্য নয়। যদি আল্লাহ তাদেরকে বঞ্চিত না করেন, তবেই তো আমার সর্বনাশ। এ দুঃখেই আমি কাঁদছি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর ক্ষীণদেহী হওয়ার কারণ কি? সে বলল ঃ আল্লাহর পথে ঘোড়ার চেঁচামেচি আমাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো আমার পথে চেঁচামেচি করলে আমি আনন্দিত হতাম। বুযুর্গ বললেন ঃ তোকে বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? সে বলল ঃ আল্লাহর আনুগত্যে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আমাকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। তারা গোনাহের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করলে আমার কাছে পছন্দনীয় কাজ হত। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর কোমর ভেঙ্গে গেল কেন? ইবলীস বলল ঃ বান্দার এই দোয়ার কারণে যে, ইলাহী, আমি তোমার কাছে শুভ পরিণাম কামনা করি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরা করার নিয়তে গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মারা যায়, তার জন্যে হজ্জকারী ও ওমরাকারীর সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর যেব্যক্তি দুই হেরেম শরীফের যেকোন একটিতে মারা যায়, তাকে হিসাব-নিকাশের জন্যে পেশ না করেই বলা হবে– জান্নাতে প্রবেশ কর।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মকবুল হজ্জ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। আরও বলা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরা করে, তারা আল্লাহ তাআলার দূত ও মেহমান। তারা কিছু যাঞ্ছা করলে তিনি তা দান করেন, মাগফেরাত চাইলে মাগফেরাত করেন, দোয়া করলে কবুল করেন এবং সুপারিশ করলে মঞ্জুর করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

সর্ববৃহৎ গোনাহগার সে ব্যক্তি, যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেও ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কা'বা গৃহের উপর প্রত্যহ একশ' বিশটি রহমত নাযিল হয়। ষাটটি তওয়াফকারীদের জন্যে, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্যে এবং বিশটি দর্শকদের জন্যে। এক হাদীসে আছে, বায়তুল্লাহর তওয়াফ বেশী বেশী কর। এটি বড় এবাদত। কেয়ামতের দিন আমলনামায় একে পাবে এবং এর সমান ঈর্ষাযোগ্য আর কোন আমল পাবে না। এ কারণেই হজ্জ ও ওমরা ছাড়া প্রথমেই তওয়াফ করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোস্তাহাব। এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নগ্নপদে ও নগ্ন দেহে সাত চক্কর তওয়াফ করে, সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে। আর যেব্যক্তি সাত চক্কর তওয়াফ বৃষ্টির মধ্যে করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করা হয়। কথিত আছে, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার গোনাহ মাফ করলে যেব্যক্তি সেই বান্দার স্থানে পৌঁছে, তারও মাগফেরাত করা হয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ আরাফার দিন শুক্রবার পড়লে আরাফাতে উপস্থিত সকলকে আল্লাহ তাআলা মাগফেরাত দান করেন। যে শুক্রবারে আরাফা পড়ে, সেই দিনটি দুনিয়ার সকল দিনের চেয়ে উত্তম। এদিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জ করেন এবং তাঁর আরাফাতের ময়দানে থাকা অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম।

আহলে কিতাবের বক্তব্য ছিল– যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হত, তবে যেদিন নাযিল হত, সেদিনকে আমরা ঈদ করে নিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, এ আয়াতটি দু'ঈদের দিনে নাযিল হয়েছে; অর্থাৎ আরাফা ও শুক্রবার দিনে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

হে আল্লাহ! হাজীকে ক্ষমা কর এবং হাজী যার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা কর। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে মোয়াফফাক (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি হজ্জ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন ঃ হে ইবনে মোয়াফফাক, তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ করেছ? আমি আরজ করলামঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়কা বলেছ? আমি আরজ করলাম ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ এর প্রতিদান আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন দেব। মানুষ যখন হিসাব-নিকাশের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কঠোরতা ভোগ করতে থাকবে, তখন আমি হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে দাখিল করে দেব। মুজাহিদ ও অন্য আলেমগণ বলেন ঃ হাজীগণ যখন মক্কা মোয়াযযমায় আসে, তখন ফেরেশতারা উষ্ট্রারোহীদেরকে সালাম করে, গাধায় আরোহীদের সাথে করমর্দন করে এবং যারা পায়ে হেঁটে আসে, তাদের সাথে কোলাকুলি করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রমযানের পরে মারা যায় অথবা জেহাদের পরে অথবা হজ্জের পরে, সে শহীদ হয়ে মারা যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাজীদের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। যিলহজ্জ, মহররম, সফর ও রবিউল আউয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত তারা যাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে তাদেরকেও মাফ করে দেয়া হয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের রীতি ছিল, তাঁরা গাজীদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে সঙ্গে যেতেন এবং হাজীদেরকে আনার জন্যে এগিয়ে যেতেন। তাঁরা তাঁদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে চুম্বন করতেন এবং যে পর্যন্ত হাজীরা গোনাহে লিপ্ত না হত, তাঁদের দোয়া চাইতেন।

আলী ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ আমি এক বছর হজ্জে আরাফার রাতে মসজিদে খায়ফে অবস্থান করলাম। স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করলেন। তাদের একজন অপরজনকে 'আবদুল্লাহ' বলে ডাক দিলে অপরজন বলল ঃ লাব্বায়িক। প্রথম ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি জান এ বছর কতজন লোক আমাদের পালনকর্তার গৃহের হজ্জ করেছে? দ্বিতীয় জন বলল ঃ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ এবার ছয় লাখ লোক হজ্জ করেছে। এখন তুমি বলতে পার কি তাদের মধ্যে কতজনের হজ্জ কবুল হয়েছে? দ্বিতীয় জন বলল ঃ আমার জানা নেই। প্রথম জন বলল ঃ তাদের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্জ কবুল হয়েছে। একথা বলার পর উভয় ফেরেশতা আকাশের দিকে উঠে আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হলাম। এক নিদারুণ দুঃখ আমায় চেপে বসল। আমি নিজের কথা চিন্তা করে মনে মনে বললাম ঃ যখন ছয় জনেরই মাত্র হজ্জ কবুল হয়েছে, তখন আমি তাদের মধ্যে কোথায় থাকব। যখন আমি আরাফা থেকে ফিরে এসে মাশআরে হারামের নিকটে রাত্রি যাপন করলাম, তখন এ চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মাত্র এই কয়েকজনের হজ্জ কবুল হল! চিন্তার মধ্যেই আমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আবার স্বপ্নে দেখলাম, সেই দুই ফেরেশতা পূর্বেকার আকার আকৃতিতে অবতরণ করল এবং একজন অপরজনকে ডেকে পূর্বের কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর একজন বলল ঃ তুমি কি জান অদ্য রাতে আমাদের পরওয়ারদেগার কি আদেশ দিয়েছেন? দ্বিতীয় ফেরেশতা বলল ঃ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলা ছয় জনের প্রত্যেককে এক এক লাখ মানুষ দিয়েছেন, অর্থাৎ এই ছয় জনের সুপারিশ ছয় লাখ মানুষের জন্যে মঞ্জুর হবে। ইবনে মোয়াফফাক্ বলেন ঃ এর পর যখন আমার চক্ষু খুলল, তখন আমার আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ এক বছর হজ্জে যখন আমি সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলাম, তখন যাদের হজ্জ নামঞ্জুর হয়েছে, তাদের কথা চিন্তা করলাম। সেমতে আমি দোয়া করলাম ইলাহী, আমি আমার হজ্জ ও তার সওয়াব সেই ব্যক্তিকে দান করলাম, যার হজ্জ কবুল হয়নি। ইবনে মোয়াফফাক বলেন, রাতে আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ হে আলী, তুমি আমার সামনে দানশীলতা প্রকাশ করছ! জেনে রাখ, আমি দানশীলতা ও দাতাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সকল দাতার চেয়ে অধিক দাতা ও দানশীল আমিই। সারা জাহানের মানুষের তুলনায় দান করার যোগ্যতা আমার বেশী। আমি যাদের হজ্জ কবুল করিনি, তাদেরকে এমন লোকদের যিম্মায় দিয়েছি যাদের হজ্জ কবুল করেছি।

বায়তুল্লাহ ও মক্কা মোয়ায্যমার ফযীলত

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, প্রতিবছর অনূন্য ছয় লাখ মানুষ এ গৃহের হজ্জ করবে। কম হলে আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা এ সংখ্যা পূর্ণ করে দেবেন। কেয়ামতের দিন বায়তুল্লাহ নববধূর ন্যায় হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে। দুনিয়াতে যাঁরা হজ্জ করেছেন বা করবেন তাঁরা এর গেলাফে ঝুলে থাকবেন এবং চারপাশে চলবেন। অবশেষে বায়তুল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাজীরাও সাথে জান্নাতে দাখিল হবে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ হাজারে আসওয়াদ (কাল পাথর)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জান্নাতের ইয়াকূতসমূহের মধ্যে একটি ইয়াকূত। কেয়ামতের দিন এটি দু'চক্ষুবিশিষ্ট হয়ে উত্থিত হবে। তার একটি জিহ্বাও থাকবে, তদ্দ্বারা সে সেই ব্যক্তির জন্যে সাক্ষ্য দেবে, যে তাকে নিষ্ঠা ও সততা সহকারে চুম্বন করে থাকবে। রসূলুল্লাহ্ হাজারে আসওয়াদকে বার বার চুম্বন করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি এর উপর সেজদাও করেছেন। সওয়ারীতে বসে তওয়াফ করলে তিনি আপন ছড়ির অগ্রভাগ পাথরে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এই পাথরটি চুম্বন করার পর বললেন ঃ আমি জানি, তুমি একটি পাথর বৈ আর কিছু নও। কারও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন করতাম না। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলেন। এর পর পেছন ফিরে হযরত আলী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ আবুল হাসান, এটা অশ্রুপাত করার স্থান। এখানে দোয়া কবুল হয়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই পাথর ক্ষতি ও উপকার করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে? হযরত আলী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদম সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন, তখন একটি লিপি লেখে এই পাথরকে খাইয়ে দেন। সুতরাং এই পাথর ঈমানদারের জন্যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং কাফেরদের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাক্ষ্য দেবে। কথিত আছে, এই পাথর চুম্বন করার সময় এই দোয়া পাঠ করা হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এ কাজ করছি তোমার প্রতি ঈমানের কারণে, তোমার কিতাব সত্যায়ন করা ও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে। এতে সেই অঙ্গীকারই বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে– মক্কা মোয়াযযমায় একদিন রোযা রাখা এক লাখ রোযার সমান। এক দেরহাম খয়রাত করা এক লাখ দেরহাম খয়রাত করার সমান। এমনিভাবে প্রত্যেক পুণ্য কাজ এক লাখ পুণ্য কাজের সমান। কথিত আছে– সাত চক্করের একটি তওয়াফ এক ওমরার সমান এবং তিনটি ওমরা এক হজ্জের সমান। এক হাদীসে আছে–

عمرة فى رمضان كحجة معى -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রমযানে একটি ওমরা করা আমার সাথে এক হজ্জ করার সমান। আর এক হাদীসে আছে–

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার কবরের মাটি বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আমি বাকী নামক গোরস্থানে যাব এবং তাদের হাশর আমার সাথে হবে। এর পর আমি মক্কাবাসীদের কাছে যাব এবং আমার হাশর দুই হেরেমের মাঝখানে হবে। এক হাদীসে আছে ঃ হযরত আদম (আঃ) যখন হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলল ঃ হে আদম! আপনার হজ্জ কবুল হয়েছে। আমরা এ গৃহের হজ্জ দু'হাজার বছর পূর্বে করেছি। এক রেওয়ায়েতে আছে– আল্লাহ তাআলা প্রতি রাত্রে পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সকলের অগ্রে হেরেমের অধিবাসীদেরকে এবং তাদের মধ্যে কা'বা মসজিদের লোকদেরকে দেখেন। এমতাবস্থায় যাকে তওয়াফ করতে দেখেন তাকে ক্ষমা করে দেন, যাকে নামায পড়তে দেখেন তাকে মাগফেরাত দান করেন এবং যাকে কেবলামুখী দন্ডায়মান দেখেন তাকেও মাগফেরাত দান করেন। কথিত আছে– প্রত্যহ যখন সূর্য অস্ত যায় তখন বায়তুল্লাহর তওয়াফ একজন আবদাল অবশ্যই করেন এবং প্রত্যেক রাত্রির প্রভাতে একজন আওতাদ ব্যক্তি কাবার তওয়াফ করেন। এ তওয়াফ না থাকা পৃথিবী থেকে কাবার উঠে যাওয়ার কারণ হবে এবং মানুষ সকালে গাত্রোত্থান করে দেখবে, কাবার স্থান শূন্য। সেখানে কাবার কোন চিহ্ন নেই। এটা তখন হবে, যখন সাত বছর পর্যন্ত কাবার হজ্জ কেউ করবে না। এরপর কোরআনের অক্ষর মাসহাফ থেকে মুছে যাবে। মানুষ সকালে দেখবে কোরআনের পাতা অক্ষর শূন্য সাদা হয়ে আছে। এর পর মানুষের মন থেকে কোরআন মিটিয়ে ফেলা হবে। ফলে তার একটি শব্দও কারও মনে থাকবে না। এর পর মানুষ কবিতা, রাগ-রাগিনী ও জাহেলিয়াত যুগের কেস্সা-কাহিনীতে মেতে থাকবে। দাজ্জাল বের হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। কেয়ামত তখন এত নিকটবর্তী হবে যেমন, গর্ভ ধারণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভবতীর যে কোন সময় সন্তান প্রসব আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে– এ গৃহটি তুলে নেয়ার পূর্বে বেশী পরিমাণে এর তওয়াফ করে নাও। কারণ, দুবার এ গৃহ বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বার তুলে নেয়া হবে। হযরত আলীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন– যখন আমি দুনিয়াকে ধ্বংস করতে চাইব, তখন নিজের ঘর থেকে শুরু করব। প্রথমে একে ধ্বংস করে পরে দুনিয়া ধ্বংস করব।

মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান ঃ সাবধানী আলেমগণ তিন কারণে মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান অনুচিত মনে করেন। প্রথমতঃ তাঁরা বেশী দিন অবস্থানের কারণে বিতৃষ্ণভাব এবং তার দৃষ্টিতে মক্কা শরীফের মর্যাদাও অন্যান্য শহরের সমান হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন। কেননা, এটা মক্কার প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে অন্তরের উষ্ণতা লাঘবে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জ সমাপ্ত করার পর হাজীগণকে তাকিদ দিয়ে বলতেন ঃ ইয়ামনের অধিবাসীরা, তোমরা ইয়ামনে চলে যাও। সিরিয়ার অধিবাসীরা, তোমরা সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং ইরাকীরা ইরাকের পথ ধর। এ জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) অধিক তওয়াফ করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, না জানি মানুষ এ গৃহকে নিজের বাড়ী ঘরে পরিণত করে নেয়। ফলে এর যথাযথ সম্মান ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ দূরে থাকলে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিকটে আসার জন্যে আকুতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা কাবা গৃহকে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا (মানুষের সম্মিলন ও শান্তির স্থল) বলেছেন। যেখানে বার বার আসা হয়, তাকে সম্মিলিত স্থল বলা হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি তুমি অন্য শহরে অবস্থান কর এবং তোমার মন মক্কার প্রতি উৎসুক থাকে, তবে এটা মক্কায় অবস্থান করে মক্কার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক মানুষ খোরাসানে বসবাস করে; কিন্তু তারা কাবা প্রদক্ষিণকারীদের তুলনায় মক্কার অধিক নিকটবর্তী। কথিত আছে– আল্লাহ তাআলার কিছু নৈকট্যশীল বান্দা এমন রয়েছেন যে, স্বয়ং কাবা গৃহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদের তওয়াফ করে।

তৃতীয়তঃ মক্কার মাহাত্ম্যের কারণে এখানে গোনাহ করলে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা অধিক। ওয়াহাব রেওয়ায়েত করেন– আমি এক রাতে হাতীমে কাবায় নামাযরত ছিলাম। হঠাৎ কাবা প্রাচীর ও পর্দার মাঝখান থেকে আমার কানে আওয়াজ এল (কারা বলছে), হে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিবরাঈল! আমার চার পাশে তওয়াফকারীরা যেসকল বাজে ওযিফা পাঠ করে, তাতে আমার দুঃখ হয়। এই অভিযোগ আমি প্রথমে আল্লাহর কাছে করি, অতঃপর তোমার কাছে করি। যদি তারা এসব বিষয় থেকে বিরত না হয়, তবে আমি এমন এক ঝাঁকুনি দেব যাতে আমার প্রতিটি পাথর সেই পাহাড়ে চলে যাবে, যেখান থেকে এগুলো আনা হয়েছিল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে কেবল পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই তা পাপ হিসাবে লেখা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

যেব্যক্তি এখানে মন্দ অভিপ্রায়বশতঃ বক্র পথে চলার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। অর্থাৎ, এ শাস্তি কেবল ইচ্ছা করার উপর বলা হয়েছে। কথিত আছে, মক্কায় যেমন সৎ কাজ দ্বিগুণ হয়, তেমনি অসৎ কাজও দ্বিগুণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ মক্কায় খাদ্য শস্য কিনে গুদামজাত করা এবং দুর্মূল্যের আশায় অপেক্ষা করা হরম শরীফে খোদাদ্রোহিতা করার শামিল। তিনি আরও বলেন ঃ যদি আমি রুকিয়াতে সত্তরটি গোনাহ করি তবে এটা আমার কাছে মক্কায় এক গোনাহ করার চেয়ে লঘু। রুকিয়া মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি মনযিল। এ ভয়ের কারণেই কোন কোন অবস্থানকারীর অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁরা হরম শরীফের মাটিতে প্রস্রাব-পায়খানা করতেন না; বরং এ জন্যে হরমের বাইরে চলে যেতেন। কেউ কেউ পূর্ণ এক মাস মক্কায় থেকেও আপন পার্শ্ব মাটিতে রাখেননি। মক্কায় অবস্থান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে কোন কোন আলেম সেখানকার ঘর ভাড়া নেয়া মাকরূহ বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, মক্কায় অবস্থান করা যে মাকরূহ, এর কারণ হচ্ছে সেই পবিত্র স্থানের হক আদায় করতে মানুষের অক্ষমতা। সুতরাং আমরা যখন বলি, মক্কায় অবস্থান না করা উত্তম, তখন এর অর্থ, সেখানে অবস্থান করে গোনাহ করা এবং বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে, এত অধিকাল অবস্থান না করা ভাল। এ অর্থ নয় যে, হক আদায় করার পরেও অবস্থান করা মাকরূহ হবে। এটা কিরূপে হতে পারে? মক্কা তো এমন স্থান যেখানে অবস্থান করার আকাঙ্ক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও ব্যক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছেন। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন, তখন কাবার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আল্লাহর ভূপৃষ্ঠে তুমি শ্রেষ্ঠ। সকল স্থানের তুলনায় তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি আমি তোমার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত না হতাম, তবে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। এ ছাড়া কাবা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবাদত। এমতাবস্থায় এটা কিরূপে সম্ভব যে, এতে অবস্থান না করা অবস্থান করার তুলনায় সর্বাবস্থায় উত্তম হবে?

মদীনা মোনাওয়ারার ফযীলত ঃ মক্কার পরে পৃথিবীর কোন শহর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শহর মদীনা তাইয়েবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানেও আমল দ্বিগুণ হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

আমার এই মসজিদে এক নামায মক্কার মসজিদে হারাম বাদে অন্য সকল মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম। অনুরূপভাবে মদীনায় প্রত্যেকটি আমল হাজার আমলের সমান। মদীনার পরের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাসের। তাতে এক নামায পাঁচশ' নামাযের সমান। আমলের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মদীনার মসজিদে এক নামায দশ হাজার নামাযের সমান, বায়তুল মুকাদ্দাসে এক হাজার নামাযের সমান এবং মসজিদে হারামে এক লাখ নামাযের সমান। তিনি আরও বলেন–

যে কেউ মদীনার কঠোরতা সহ্য করবে, আমি কেয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হব। আরও বলা হয়েছে– যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাই করে। কেননা, যে মদীনায় মারা যাবে আমি তার সুপারিশকারী হব।

উপরোক্ত তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থান সমান, যুদ্ধের ব্যূহ ছাড়া। শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে ব্যূহে অবস্থান করার ফযীলত অনেক। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

সফর করা যাবে না; কিন্তু তিন মসজিদের দিকে– মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা। কোন কোন আলেম এই হাদীসের ভিত্তিতে পবিত্র স্থান ও কামেল ব্যক্তিবর্গের কবরে যেতে নিষেধ করেছেন। এই দলীল সঠিক বলে আমার মনে হয় না। কেননা, কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যিয়ারত কর। উপরোক্ত হাদীস মসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাযারসমূহের বিধান তদ্রূপ নয়। কেননা, তিনটি মসজিদ ছাড়া সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। এমন কোন শহর নেই, যেখানে মসজিদ নেই। তাই সফর করে অন্য মসজিদে যাওয়ার কোন মানে নেই। কিন্তু মাযার সবগুলো এক পর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ্ তাআলার কাছে ওলীগণের মর্তবা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি তাঁদের মাযার যিয়ারতের বরকতও আলাদা আলাদা। তবে কেউ যদি এমন গ্রামে বাস করে যেখানে মসজিদ নেই, তার জন্যে মসজিদবিশিষ্ট গ্রামের সফর জায়েয। এর পর আমি জানি না হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরের মাযারে যেতে নিষেধ করা হবে কিনা। নিষেধ করা তো একান্তই অসম্ভব। সুতরাং যখন তাঁদের মাযারে যাওয়া জায়েয বলা হবে, তখন ওলী আল্লাহগণের মাযারে যাওয়া নাজায়েয হবে কেন? এ হচ্ছে সফরের কথা। এখন অবস্থানের বিধান শুন। সফরের উদ্দেশ্য এলেম হাসিল করা না হলে মুরীদের জন্যে গৃহে অবস্থান করাই ভাল, যদি তার অবস্থা ঠিক থাকে। আর যদি অবস্থার নিরাপত্তা না থাকে, তবে এমন জায়গা তালাশ করবে, যেখানে কেউ তাকে চেনে না এবং ধর্মের নিরাপত্তা থাকে। যেখানে একনিষ্ঠভাবে এবাদত করা যায়, মুরীদের জন্যে তেমন স্থান সর্বোত্তম। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শহর সবগুলো আল্লাহর এবং মানুষ সকলেই তাঁর বান্দা। এমতাবস্থায় যেখানে নম্রতা ও সুযোগ সুবিধা দেখবে, সেখানে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তাআলার শোকর করবে।

আবু নায়ীম বলেন ঃ আমি হযরত সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, তিনি পাথেয় সামগ্রীর থলেটি কাঁধে চাপিয়ে এবং পানির কলসটি হাতে নিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন? তিনি বললেন ঃ এমন শহরে চললাম, যেখানে এক দেরহাম দিয়ে আমার এই থলেটি ভরে নিতে পারি। অন্য এক রেওয়ায়েতে তাঁর এই জওয়াব বর্ণিত আছে– আমি এক গ্রামে সুলভ মূল্যের কথা শুনেছি। সেখানে অবস্থান করব। তুমিও যখন কোন শহরে সুলভ মূল্যের কথা শুনবে, তখন সেখানে চলে যেও। এতে তোমার ধর্মও ঠিক থাকবে এবং চিন্তা-ভাবনা কম করতে হবে। তিনি বলতেন ঃ এটা অশুভ যমানা। এতে অখ্যাত ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারে না। খ্যাতদের তো কথাই নেই। এখন মানুষ ধর্মকে ফেতনার কবল থেকে বাঁচানোর জন্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে হিজরত করবে। তিনি আরও বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর কসম, কোন্ শহরে যে থাকব তা বুঝে উঠতে পারি না। লোকেরা বলল ঃ খোরাসানে থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে বিভিন্ন মাযহাব এবং খারাপ মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। লোকেরা বলল ঃ সিরিয়ায় থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে সুখ্যাতি হয়ে যায়। কেউ বলল ঃ ইরাকে থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেটা জালেমদের দেশ। বলা হল ঃ মক্কায় বসবাস করুন। তিনি বললেন ঃ মক্কা জ্ঞান ও দেহকে জীর্ণ করে দেয়। একবার জনৈক মুসাফির তাঁকে বলল ঃ আমি নিয়ত করেছি, এখন মক্কায় বসবাস করব। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি– (১) প্রথম কাতারে নামায পড়ো না, (২) কোন কোরায়শীর সংসর্গ অবলম্বন করো না এবং (৩) সদকা প্রকাশ্যে দিয়ো না। প্রথম কাতারে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ, এতে মানুষ খ্যাত হয়ে যায়। অর্থাৎ, কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে তাকে খোঁজ করা হয়। ফলে আসল বানোয়াট হয়ে যায়।

হজ্জের শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ জায়েয হওয়ার শর্ত দুটি– সময় হওয়া ও মুসলমান হওয়া। কাজেই কোন শিশু হজ্জ করলেও তা সঠিক হবে। সে যদি ভালমন্দ বুঝার ক্ষমতা রাখে তবে নিজে এহরাম বাঁধবে। আর যদি ছোট হয় তবে তার পক্ষ থেকে ওলী এহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম তথা তওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি সব করিয়ে দেবে। হজ্জের সময় শওয়াল মাস থেকে শুরু করে যিলহজ্জের দশম রাত্রি অর্থাৎ কোরবানীর দিনের সোবহে সাদেক পর্যন্ত। সুতরাং যেব্যক্তি এ সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে এহরাম বাঁধবে, তার হজ্জ হবে না– ওমরা হবে। ওমরার সময় সারা বছর।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি– মুসলমান হওয়া, মুক্ত হওয়া, বালেগ হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া এবং সামর্থ্য থাকা। সুতরাং যদি নাবালেগ শিশু ও গোলাম এহরাম বাঁধে এবং আরাফার দিনে নাবালেগ বালেগ হয়ে যায় ও গোলাম মুক্ত হয়ে যায় কিংবা মুযদালেফায় এরূপ হয় এবং সোবহে সাদেকের পূর্বে আরাফায় চলে যায়, তবে তাদের সেই হজ্জের দ্বারাই ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কেননা, আরাফাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই প্রকৃতপক্ষে হজ্জ। আর এটা বালেগ ও মুক্ত অবস্থায় সম্ভব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হজ্জের নফল হওয়ার শর্ত বালেগের জন্যে পূর্বে ফরয হজ্জ আদায় করা। কেননা, ফরয হজ্জ সর্বাগ্রে, এর পর আরাফাতে অবস্থান করে থাকলে তার কাযার স্তর, এর পর মান্নতের হজ্জ, এর পর অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করার স্তর এবং সর্বশেষে নফল হজ্জের স্তর। এ ক্রম জরুরী। এর খেলাফ নিয়ত করলেও হজ্জ এই ক্রমানুসারেই হবে। অর্থাৎ, কারও উপর হজ্জ ফরয থাকলে সে যদি মান্নতের নিয়তে অথবা কারও স্থলাভিষিক্ত হয়ে হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না এবং তার নিজের ফরয হজ্জ হয়ে যাবে।

হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার জন্যে সামর্থ্য এই যে, প্রথমতঃ সুস্থ হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হওয়া এবং স্থলপথে ও নৌপথে ভয়ভীতি না থাকা। তৃতীয়তঃ যাওয়া এবং দেশে ফিরে আসার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থকড়ি থাকা। এ ছাড়া সে যাদের ভরণপোষণ করে, তাদের খরচপত্রও ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্যে থাকা।

বিকলাঙ্গ ব্যক্তির জন্যে সামর্থ্য হচ্ছে এই পরিমাণ অর্থ থাকা, যা দ্বারা সে নিজের পক্ষ থেকে অন্য একজনকে হজ্জ করতে পাঠাবে, যে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ করবে, অতঃপর পরবর্তী বছর বিকলাঙ্গের পক্ষ থেকে হজ্জ করবে।

যেব্যক্তির সামর্থ্য হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ওয়াজেব; কিন্তু বিলম্বে যাওয়াও জায়েয। তবে এতে হজ্জ করতে না পারার আশংকা রয়েছে। জীবনের শেষ পর্যন্ত যদি হজ্জ করে নিতে পারে, তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ করার পূর্বে কেউ মারা যায়, তবে সে গোনাহগার হয়ে আল্লাহর সামনে যাবে। সে ওসিয়ত করে না থাকলেও তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে হজ্জ করাতে হবে। ঋণের অবস্থাও তদ্রূপ। ওসিয়ত ছাড়াই তা শোধ করতে হয়। যদি এক বছর কারও সামর্থ্য হয়, কিন্তু সে হজ্জে গেল না, অতঃপর হজ্জ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে-ও মারা গেল, তবে তাকে হজ্জের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে মারা যায়, সে গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি শহরে শহরে এই পরওয়ানা পাঠাতে চাই যে, হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ করে না,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ ও তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন ঃ আমরা যদি জানি, এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয ছিল; কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই সে মারা গেছে, তবে আমরা তার জানাযার নামায পড়ব না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ যেব্যক্তি যাকাত না দিয়ে এবং হজ্জ না করে মারা যায়, সে পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদন করে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ـ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি যা আমি পরিত্যাগ করেছি।

এখানে সৎকর্ম বলে হজ্জ বুঝানো হয়েছে। হজ্জের আরকান পাঁচটি। এগুলো ব্যতীত হজ্জ সঠিক হয় না– এহরাম বাঁধা, তওয়াফ করা, তওয়াফের পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করা, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এবং এক উক্তি অনুযায়ী কেশ মুন্ডন করা। ওমরার আরকানও তাই। তবে ওমরার মধ্যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হয় না। হজ্জের কতকগুলো ওয়াজেব কর্ম আছে। সেগুলো ছেড়ে দিলে কোরবানীর জন্তু যবেহ করে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। এরকম ওয়াজেব কর্ম ছয়টি ঃ (১) মীকাত (এহরামের নির্দিষ্ট স্থান) থেকে এহরাম বাঁধা। কেউ এহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করে গেলে একটি ছাগল যবেহ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। (২) কংকর নিক্ষেপ করা। এটা ছেড়ে দিলে সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী করা জরুরী। (৩) আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা। (৪) রাত্রে মুযদালেফায় যাওয়া, (৫) রাত্রে মিনায় অবস্থান করা এবং (৬) বিদায়ী তওয়াফ করা। এ চারটি ছেড়ে দিলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী জরুরী এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জরুরী নয়; বরং মোস্তাহাব।

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ ও ওমরা তিন প্রকারে আদায় করা যায়– (১) এফরাদ। এটা সর্বোত্তম। এর নিয়ম, প্রথমে শুধু হজ্জ করবে। হজ্জ শেষে হরমের বাইরে গিয়ে এহরাম বাঁধবে এবং ওমরা করবে। ওমরার এহরামের জন্যে হরমের বাইরে সর্বোত্তম স্থান জেয়েররানা, এর পর তানয়ীম, এর পর হুদায়বিয়া। যারা এফরাদ করে, তাদের উপর কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোরবানী ওয়াজেব নয়। নফল কোরবানী করতে পারে।

(২) কেরান, অর্থাৎ এহরামে হজ্জ ও ওমরা উভয়টির নিয়ত করবে এবং বলবে ঃ لبيك حجة وعمرة معا (আমি হজ্জ ও ওমরা একসাথে করার জন্যে উপস্থিত)। এরূপ ব্যক্তির জন্যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম করাই যথেষ্ট। এতেই ওমরাও আদায় হয়ে যায়। যেমন গোসল দ্বারা ওযু আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার দৌড় আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে করে নেয়, তবে দৌড় তো উভয়টির পক্ষ থেকে গণ্য হবে; কিন্তু তওয়াফ হজ্জে গণ্য করা হবে না। কেননা, হজ্জে তওয়াফের জন্যে শর্ত হচ্ছে আরাফাতে অবস্থানের পরে করা। যে কেরান করে, তার উপর একটি ছাগল যবেহ করা ওয়াজেব। তবে মক্কার অধিবাসী হলে ওয়াজেব নয়। কেননা, সে মীকাত ছেড়ে দেয়নি। তার মীকাত মক্কা। (৩) তামাত্তোর নিয়ম– মীকাত থেকে ওমরার এহরাম বাঁধবে। অতঃপর হজ্জের এহরাম বাঁধবে। পাঁচটি বিষয় ছাড়া তামাত্তো হয় না– (১) যে তামাত্তো করবে, তার বাসস্থান ও মসজিদে হারামের মধ্যে শরীয়তসম্মত সফরের দূরত্ব না থাকা, (২) হজ্জের পূর্বে ওমরা করা, (৩) হজ্জের মাসসমূহেই ওমরা করা, (৪) হজ্জের মীকাত পর্যন্ত ফিরে না যাওয়া এবং (৫) তার হজ্জ ও ওমরা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হওয়া। তামাত্তোকারীর উপর একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজেব। ছাগল পাওয়া না গেলে ১০ই যিলহজ্জের পূর্ব পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখবে এবং দেশে ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। হজ্জের দিনে তিন রোযা না রাখলে দেশে ফিরে নিরন্তর অথবা ফাঁক দিয়ে দশটি রোযা রাখবে। কেরানে ছাগল না পাওয়া গেলেও এভাবে রোযা রাখবে। এই তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার হচ্ছে এফরাদ, এর পর তামাত্তো, এর পর কেরান।

হজ্জ ও ওমরায় ছয়টি বিষয় নিষিদ্ধ– (১) কোর্তা, পায়জামা, মোজা ও পাগড়ী পরিধান করা। এমতাবস্থায় লুঙ্গি, চাদর ও সেন্ডেল পরিধান করা উচিত। সেন্ডেল না হলে জুতা পরিধান করবে। লুঙ্গি না হলে পায়জামা পরবে। মাথা আবৃত করা উচিত নয়। কারণ, পুরুষের এহরাম মাথায়। মহিলা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করতে পারে যদি মুখ এমন বস্তু দ্বারা আবৃত না করে, যা মুখমন্ডলে লাগে। কেননা, মহিলার এহরাম মুখমন্ডলে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(২) সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুগন্ধি লাগালে এবং কাল পোশাক পরিধান করলে একটি ছাগল কোরবানী করা জরুরী হবে।

(৩) চুল মুন্ডন করা ও কাটা নিষিদ্ধ। এটা করলেও ছাগল কোরবানী করা জরুরী। সুরমা লাগানো এবং চুলে চিরুনি করায় কোন দোষ নেই।

(৪) স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। এটা যবেহ ও মাথা মুন্ডনের পূর্বে করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং উট, গরু অথবা সাতটি ছাগল যবেহ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর যদি যবেহ ও মাথা মুন্ডনের পরে করে, তবে কোরবানী ওয়াজেব হবে; কিন্তু হজ্জ বাতিল হবে না।

(৫) স্ত্রীর সাথে এমনভাবে চুম্বন, কোলাকুলি করা এবং তাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, যাতে মযি বের হয়ে পড়ে। এতে এক ছাগল কোরবানী করা জরুরী।

(৬) জঙ্গলের শিকার বধ করা নিষিদ্ধ, যার গোশত খাওয়া যায়। এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করলে তার উপর এই শিকারের মতই চতুষ্পদ জন্তু দেয়া ওয়াজেব হবে। নদীর শিকার হালাল। এতে কোন দম নেই।

সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বাহ্যিক কর্মসমূহ

গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় থেকে এহরাম বাঁধা পর্যন্ত আটটি বিষয় সুন্নত ঃ

(১) সফরের ইচ্ছা করার সময় প্রথমে তওবা করবে। যাদের হক বলপূর্বক আত্মসাত করে থাকবে, তাদেরকে তা ফেরত দেবে। ঋণ থাকলে তা শোধ করবে। যাদের ভরণ-পোষণ তার যিম্মায়, ফিরে আসা পর্যন্ত তা তাদেরকে দেবে। কারও আমানত থাকলে তা তাকে সমর্পণ করবে। যাতায়াতের খরচের জন্যে পর্যাপ্ত হালাল ও পবিত্র টাকা-পয়সা সাথে নেবে, যাতে সংকটে পড়তে না হয় এবং সামর্থ্যানুযায়ী ফকীর-মিসকীনের প্রতিও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে পারে। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কিছু খয়রাত করবে। এটা অর্থ সম্পর্কিত সুন্নত।

(২) একজন সৎ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুভাবাপন্ন সফরসঙ্গী তালাশ করবে, যাতে সে পথের বিপদাপদে বল ভরসা দিতে পারে। অতঃপর বন্ধুবান্ধব, ভাই-বেরাদর ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যথারীতি বিদায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নেবে এবং তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়বে– أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ আমি তোমার ধর্ম, তোমার আমানত ও তোমার কর্মের পরিণতি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। অর্থাৎ তোমার পরিণতি শুভ হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসাফিরের জন্যে এই দোয়া করতেন ঃ

فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَكُنْفِهٖ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَجَنَّبَكَ الرَّدِّى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর হেফাযতে ও আশ্রয়ে সমর্পণ করি। আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমাকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, তোমার গোনাহ্ ক্ষমা করুন এবং যেদিকে তুমি যাও সেদিকেই তোমাকে মঙ্গলের সম্মুখীন করুন। এটা সফরসঙ্গী সম্পর্কিত সুন্নত।

(৩) গৃহ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করার সময় প্রথমে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পড়বে। সালামের পর হাত তুলে পূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা সহকারে দোয়া করবে– ইলাহী, তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী। তুমিই আমাদের গৃহ, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নায়েব ও রক্ষক। আমাদেরকে ও তাদেরকে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো। ইলাহী, এ সফরে আমরা তোমার কাছে পরহেযগারী প্রার্থনা করি। আমরা যেন এমন কর্ম করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। ইলাহী, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদেরকে সফরের দূরত্ব অতিক্রম করিয়ে দাও, সফর আমাদের জন্যে সহজ কর। সফরে আমাদের দেহের, ধন-সম্পদের ও ধর্মের নিরাপত্তা দান কর এবং তোমার গৃহের, তোমার নবী (সাঃ)-এর কবরের যিয়ারত পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাও। ইলাহী, আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট থেকে, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসা থেকে এবং পরিবারের লোকজন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা থেকে। ইলাহী, আমাদেরকে ও তাদেরকে আপন হেফাযতে গ্রহণ কর, আমাদের থেকে ও তাদের থেকে আপন নেয়ামত ছিনিয়ে নিও না এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে যে আরাম দিয়ে রেখেছ, তা পরিবর্তন করো না। এটা গৃহ থেকে বের হওয়া সম্পর্কিত সুন্নত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৪) গৃহের দরজায় পৌঁছে এই দোয়া করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ يُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْ يُذَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ يُزَلَّ اَوْ
اَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ۔

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গোনাহ থেকে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। পরওয়ারদেগার, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা আমার লাঞ্ছিত হওয়া থেকে অথবা আমাকে পদস্খলিত করা থেকে অথবা আমার জুলুম করা থেকে অথবা আমার প্রতি জুলুম করা থেকে। আরও বলবে– ইলাহী, আমি অহংকারবশে, আস্ফালনবশে ও সুখ্যাতির জন্যে বের হইনি; বরং তোমার ক্রোধের ভয়ে, তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তোমার ফরয আদায় করার জন্যে, তোমার নবীর সুন্নত পালন করার জন্যে এবং তোমার দীদারের আগ্রহে বের হয়েছি।

পথ চলার সময় নিম্নরূপ দোয়া পড়বে–

হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যে আমি চলেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমাকেই আঁকড়ে ধরেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি। হে আল্লাহ! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার আশা। অতএব আমাকে বাঁচাও সেই বিষয় থেকে, যা আমার সামনে আসে, যার ব্যবস্থা আমি করতে পারি না এবং যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। তোমার প্রশংসা মহান। তুমি ছাড়া মাবুদ নেই। হে আল্লাহ, আমাকে তাকওয়ার পাথেয় দাও, আমার গোনাহ্ মাফ কর এবং আমি যেখানেই যাই মঙ্গলকে আমার সাথী কর।

(৫) যানবাহনে সওয়ার হওয়ার সময় নিম্নরূপ দোয়া পাঠ করা সুন্নত–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَمَا لَمْ يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ كُلَّهٗ اِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِىْ جَمِيْعِ اُمُوْرِىْ عَلَيْكَ اَنْتَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ ـ

আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই; কিন্তু সুউচ্চ ও মহান আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে এবং তিনি যা চাননি তা হয়নি। পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তা বশ করতে পারতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে মুখ করেছি, আমার সকল বিষয় তোমাকে সমর্পণ করেছি এবং সকল বিষয়ে তোমার উপর ভরসা করেছি। তুমি আমার জন্যে যথেষ্ট ও চমৎকার কার্যনির্বাহী।

সওয়ারীর উপর সুস্থিরে বসা ও সওয়ারী নিয়ন্ত্রণে আসার পর সাত বার বলবে–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

আল্লাহ পবিত্র! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ্ মহান। আরও বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْرِ ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ পথ পদর্শন না করলে আমরা পথ পেতাম না। হে আল্লাহ, তুমিই সওয়ারীর পিঠে বহন করিয়েছ। সকল বিষয়ে তোমার কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৬) সওয়ারী থেকে অবতরণের ক্ষেত্রে সুন্নত এই যে, রৌদ্র প্রখর না হওয়া পর্যন্ত অবতরণ করবে না। রাতের বেলায় অনেক পথ অতিক্রম করে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শেষ রাতে চল। রাতে এত পথ চলা যায়, যা দিনে যায় না। রাতে কম ঘুমানো উচিত, যাতে রাতের বেলায় পথ চলতে সহায়ক হয়। মনযিল দৃষ্টিগোচর হলে বলবে–

হে আল্লাহ্! পালনকর্তা সপ্ত আকাশের এবং সেসব বস্তুর, যাদের উপর সপ্ত আকাশ ছায়াপাত করে এবং পালনকর্তা সপ্ত পৃথিবীর এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে শয়তানরা পথভ্রষ্ট করেছে এবং পালনকর্তা শয়তানের এবং তাদের যাদেরকে বাতাস উড়িয়ে নেয় এবং পালনকর্তা সমুদ্রের এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে সমুদ্র বয়ে নিয়ে যায়– আমি তোমার কাছেএই মনযিলের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে এই মনযিলের অকল্যাণ থেকে এবং এতে যা আছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। তাদের দুষ্টদের অনিষ্ট আমা থেকে হটিয়ে দাও। মনযিলে অবতরণ করে দু'রাকআত নামায পড়বে। এর পর বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ

হে আল্লাহ্! আমি আল্লাহর পূর্ণ কলেমা দ্বারা– যেগুলোকে কোন সৎ ও অসৎ অতিক্রম করতে পারে না– সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। যখন রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে, তখন বলবে ঃ

হে পৃথিবী! আমার ও তোমার রব আল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে তোমার ও তোমার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার উপর যা বিচরণ করে, তা থেকে। আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে প্রত্যেক সিংহ, অজগর, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে এবং শহরবাসী, পিতা ও সন্তান এবং যারা রাতে ও দিনে বসবাস করে, তার অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৭) পথ চলার সময় সাবধানে চলবে এবং দিনের বেলায় কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে চলবে না। কারণ, এতে কোন তস্করের হাতে মারা যাওয়া অথবা পথ ভুলে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাত্রে নিদ্রার সময় হুশিয়ার থাকবে। রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত প্রসারিত করবে না। শেষ রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছু উঠিয়ে রাখবে এবং হাতের তালুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে এমনিভাবে নিদ্রা যেতেন। কেননা, অন্যভাবে নিদ্রা গেলে নিদ্রা গভীর হয়ে যেতে পারে। রাতের বেলায় দু'জন সঙ্গী পালাক্রমে জাগ্রত থেকে একে অপরের পাহারা দেয়া মোস্তাহাব। রাতে অথবা দিনে শত্রু কিংবা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আয়াতুল কুরসী, شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সূরা এখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নেবে। সর্বশেষে এই দোয়া পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِىَ اللّٰهُ
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَايَاتِى بِالْخَيْرَاتِ اِلَّا
اللّٰهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَايَصْرِفُ السُّوْءَ اِلَّا اللّٰهُ حَسْبِىْ وَكَفٰى
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مُنْتَهًى وَلَا دُوْنَ اللّٰهِ
مَلْجَاً كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ
تَحَصَّنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاسْتَعَنْتُ بِالْحَىِّ الَّذِىْ لَا
يَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِىْ لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنَا
بِرُكْنِكَ الَّذِىْ لَايَرَامُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا
فَلَاتَهْلِكُ وَاَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاءُنَا اَللّٰهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا
قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَاَمَائِكَ بِرَافَةٍ وَرَحْمَةٍ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ
الرَّاحِمِيْنَ -

(প্রথমাংশের অর্থ পূর্বের দোয়াসমূহে বর্ণিত হয়েছে।) মঙ্গল আনয়ন করে না; কিন্তু আল্লাহ। আল্লাহই অনিষ্ট বিদূরিত করেন। আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট। যে দোয়া করে আল্লাহ্ তার কথা শুনেন। আল্লাহর পশ্চাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন শেষ সীমা নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি ও আমার রসূলগণ জয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রান্ত। আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকে দুর্গ করেছি এবং সাহায্য চেয়েছি চিরঞ্জীবের কাছে, যিনি মারবেন না। ইলাহী, আপন চোখে আমাদের হেফাযত কর, যে নিদ্রিত হয় না এবং আমাদেরকে আশ্রয় দাও আপন ইযযত দ্বারা, যা তলব করা হয় না। ইলাহী, আপন কুদরত দ্বারা আমাদের প্রতি রহম কর, যাতে আমরা ধ্বংস না হই, যখন তুমি আমাদের ভরসা ও আশা। ইলাহী, আমাদের প্রতি তোমার দাস দাসীদের অন্তরকে কৃপাশীল করে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।

(৮) পথিমধ্যে কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করলে তিন বার আল্লাহু আকবার বলে এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

হে আল্লাহ্! সকল গৌরবের উপরে তোমার গৌরব এবং তোমার প্রশংসা সর্বাবস্থায়। নিম্নভূমিতে অবতরণ করার সময় 'সোবহানাল্লাহ' বলবে। সফরে মনে আতঙ্ক দেখা দিলে এই দোয়া পড়বে–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلْتِ السَّمٰوٰتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ

যিনি বিশ্ব জাহানের মহান অধিপতি, ফেরেশতাগণ ও জিব্রাঈলের পরওয়ারদেগার, যার ইযযত ও প্রতাপে আকাশমণ্ডলী আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

মীকাত থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত এহরামের আদব

মীকাত অর্থাৎ এহরাম বাঁধার স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত আদব পাঁচটি ঃ

(১) যে প্রসিদ্ধ স্থানে হাজীরা এহরাম বাঁধে, সেখানে পৌঁছার পর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহরামের নিয়তে গোসল করবে, দেহকে খুব পরিষ্কার করবে, মাথায় ও দাড়িতে চিরুনি করবে, নখ কাটবে এবং গোঁফ ছাঁটবে।

(২) সেলাই করা পোশাক খুলে ফেলবে। অতঃপর এহরামের পোশাক তথা একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরিধান করবে। সাদা পোশক আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়। পোশাক ও শরীরে সুগন্ধি লাগাবে। এহরামের পরেও সুগন্ধির অংশবিশেষ থেকে গেলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিঁথিতে মেশকের চিহ্ন এহরামের পরেও লোকেরা দেখেছে, যা তিনি এহরামের পূর্বে লাগিয়েছিলেন।

(৩) এহ্রাম পরিধান করার পর যখন চলা শুরু করবে, তখন হজ্জ, ওমরা, কেরান অথবা এফরাদের নিয়ত করবে। এহ্রাম সহীহ হওয়ার জন্যে মনে মনে ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। তবে 'লাব্বায়কার' এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাযির। প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার। সাম্রাজ্য তোমার, তোমার কোন শরীক নেই। আরও বেশী বলতে চাইলে এরূপ বলবে-

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ لِحَجَّةٍ حَقًّا وَتَعَبُّدًا وَرِقًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

আমি হাযির। আমি তৎপর। যাবতীয় কল্যাণই তোমার হাতে। আগ্রহ তোমার প্রতি। আমি হাযির হজ্জের জন্যে। প্রকৃত বন্দেগী ও গোলামীর জন্যে। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বংশধরের প্রতি রহমত করুন।

(৪) লাব্বায়েক বলার মাধ্যমে এহরাম হয়ে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়া বলা মোস্তাহাব-

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَاَعِنِّىْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِهٖ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ نَوَيْتُ اَدَاءَ فَرِيْضَتِكَ فِى الْحَجِّ فَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَاٰمَنُوْا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَفْدِكَ الَّذِيْنَ رَضِيْتَ عَنْهُمْ وَارْتَضَيْتَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ فَيَسِّرْلِىْ اَدَاءَ مَا نَوَيْتُ مِنَ الْحَجِّ اَللّٰهُمَّ قَدْ اَحْرَمَ لَكَ لَحْمِىْ وَشَعْرِىْ وَدَمِىْ وَعَصَبِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَحَرَّمْتُ عَلٰى نَفْسِى النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلُبْسَ الْمُخِيْطِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ ـ

হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করতে চাই। অতএব একে আমার জন্য সহজ কর। এর ফরয আদায়ে আমাকে সাহায্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল কর। ইলাহী, আমি হজ্জে তোমার ফরয আদায় করার নিয়ত করেছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমার আদেশে সাড়া দিয়েছে, তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছে এবং তোমার আদেশ অনুসরণ করেছে। আমাকে তোমার সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং যাদের হজ্জ তুমি কবুল করেছ। ইলাহী, যে হজ্জের নিয়ত করেছি তা আদায় করা আমার জন্য সহজ কর। ইলাহী, তোমার জন্য আমার মাংস, আমার চুল, আমার রক্ত, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা এহরাম বেঁধেছে। আর আমি নিজের উপর নারী, সুগন্ধি ও সেলাই করা কাপড় কেবল তোমার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের উদ্দেশে হারাম করে দিয়েছি। এহরামের সময় থেকে পূর্ববর্ণিত ছয়টি নিষিদ্ধ বিষয় হারাম হয়ে যায়।

(৫) এহরাম অব্যাহত থাকার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে লাব্বায়কা বলা মোস্তাহাব; বিশেষত সঙ্গী-সাথীদের সাথে সাক্ষাতের সময়, সমাবেশের সময়, উচ্চভূমিতে উঠার সময়, নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় এবং সওয়ারীতে উঠানামা করার সময় সরবে লাব্বায়কা বলা উচিত। চীৎকার করে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে বলতে হবে না। কেননা, উদ্দেশ্য আল্লাহকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শুনানো। তিনি বধির ও অনুপস্থিত নন যে, চীৎকার করতে হবে। হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে হারাম, মসজিদে খায়ফ ও মসজিদে মীকাতে উচ্চ স্বরে লাব্বায়কা বললে ক্ষতি নেই। এ তিনটি মসজিদই হজ্জের আরকান আদায় করার জায়গা। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য মসজিদে নীরবে লাব্বায়কা বললে কোন দোষ হবে না।

মক্কায় প্রবেশ করার আদব

মক্কায় প্রবেশ করার পর তওয়াফ পর্যন্ত আদব ছয়টি ঃ

মক্কায় প্রবেশের জন্যে যী-তুয়ায় গোসল করবে। হজ্জে সুন্নত গোসল নয়টি– (১) এহরামের জন্যে মীকাতে, (২) মক্কায় যাওয়ার জন্যে, (৩) তওয়াফের জন্যে, (৪) আরাফাতে অবস্থানের জন্যে, (৫) মুযদালেফায় অবস্থানের জন্যে (৬) তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে, (৭-৮) দু'গোসল দু'জামরার কংকর নিক্ষেপের জন্যে– জামরা আকাবার কংকর নিক্ষেপের জন্য গোসল নেই, (৯) বিদায়ী তওয়াফের জন্যে।

(২) মক্কার বাইরে যখন হরমের সীমায় প্রবেশ করবে তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَاَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَبَشَرِىْ عَلَى النَّارِ وَاٰمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ ـ

হে আল্লাহ! এটা তোমার হরম ও আশ্রয়স্থল। অতএব আমার মাংস, রক্ত ও ত্বককে জাহান্নামের জন্যে হারাম কর, পুনরুত্থানের দিন আমাকে আযাব থেকে নিরাপদ রাখ এবং আমাকে তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(৩) মক্কায় কুদা গিরিপথ দিয়ে পানির স্রোতের দিকে যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মধ্যবর্তী পথ ছেড়ে এ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা ভাল। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় কুদা গিরিপথ দিয়ে রেব হবে। এটা কিছু নীচু ও প্রশস্ত।

(৪) মক্কায় প্রবেশের সময় বনী জুমাহে পৌঁছালে কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়বে। তখন এই দোয়া বলা উচিত–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ اَكْبَرُ اَللّٰـهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَزِدْهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مَنْ حَجَّهُ بِرًّا وَكَرَامَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِىْ جَنَّتَكَ وَاَعِذْنِىْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমা থেকে শান্তি। তোমার গৃহ শান্তির গৃহ। তুমি বরকতওয়ালা, হে প্রতাপশালী, সম্মানিত, হে আল্লাহ! এটা তোমার গৃহ, যাকে তুমি মহত্ত্ব দিয়েছ, সম্মান দিয়েছ ও গৌরবান্বিত করেছ। হে আল্লাহ! বৃদ্ধি কর তার মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান। আরও বৃদ্ধি কর তার ভয়ভীতি। যে এ গৃহের হজ্জ করে তার সততা ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্যে খুলে দাও, আমাকে তোমার জান্নাতে দাখিল কর এবং আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও।

(৫) মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় বনী শায়বার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

আল্লাহর নামে শুরু, আল্লাহর সাহায্যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর পথে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী। কা'বা গৃহের নিকটবর্তী হলে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। হে আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদের প্রতি, যিনি তোমার বান্দা, তোমার রসূল, ইব্রাহীমের প্রতি, যিনি তোমার খলীল এবং সকল নবী ও রসূলের প্রতি। অতঃপর হাত তুলে নিম্নরূপ দোয়া করবে–

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই স্থানে আমার হজ্জের প্রথম কর্মে প্রার্থনা করছি, আমার তওবা কবুল কর, আমার ত্রুটি মার্জনা কর এবং আমার উপর থেকে গোনাহের বোঝা নামিয়ে দাও। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর পবিত্র গৃহে পৌঁছিয়েছেন, যে গৃহকে তিনি মানুষের জন্যে করেছেন প্রত্যাবর্তনের স্থল ও আশ্রয়। একে আরও করেছেন বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্যে হেদায়াত। হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, এ শহর তোমার শহর, এ হরম তোমার হরম, এ গৃহ তোমার গৃহ। আমি তোমার রহমত তলব করতে এসেছি। আমি অক্ষমের মত, তোমার শাস্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তির মত, তোমার রহমত প্রার্থীর মত, তোমার সন্তুষ্টি কামনাকারীর মত তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

(৬) এর পর কাল পাথরের কাছে গিয়ে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে এবং চুম্বন করে বলবে– হে আল্লাহ্! আমি আমার আমানত প্রত্যর্পণ করলাম এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করলাম। তুমি এই পূর্ণতায় সাক্ষী থাক। চুম্বন সম্ভবপর না হলে পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে এ দোয়া পড়ে নেবে। এর পর তওয়াফ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দেবে না। এ তওয়াফকে 'তওয়াফে কুদুম' বলা হয়। তখন অন্যান্য লোক ফরয নামাযে নিয়োজিত থাকলে নিজেও ফরয নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং পরে তওয়াফ করবে।

তওয়াফের আদব

তওয়াফে কুদুম অথবা অন্য কোন তওয়াফ শুরু করলে ছয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ

(১) নামাযের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ, অযু করতে হবে, কাপড়-চোপড়, শরীর ও তওয়াফের জায়গা পাক হতে হবে এবং নগ্নতা দূর করতে হবে। কেননা, কা'বা গৃহের তওয়াফও নামাযের সমতুল্য।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতে অবশ্য পারস্পরিক কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তওয়াফের পূর্বে এস্তেবাগ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ, চাদরের প্যাঁচ ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রেখে দেবে। এমতাবস্থায় চাদরের এক প্রান্ত পিঠে ঝুলবে এবং অপর প্রান্ত বুকের উপর। তওয়াফের শুরু থেকে 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করবে। তওয়াফের দোয়াসমূহ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

(২) এস্তেবাগ সমাপ্ত হলে কা'বা গৃহকে বাম দিকে রাখবে এবং কাল পাথরের সামান্য দূরে দাঁড়াবে, যাতে তওয়াফের শুরুতে সমস্ত দেহ কাল পাথরের বিপরীত দিকে চলে যায়। নিজের মধ্যে এবং কাবা ঘরের মধ্যে তিন কদম দূরত্ব রাখা উচিত, যাতে কাবা গৃহের কাছেও থাকে এবং শাযরাওয়ানের উপর তওয়াফও না হয়। এটা কাবার অন্তর্ভুক্ত। কাল পাথরের কাছে শাযরাওয়ান মাটির সাথে মিশে গেছে। এখানে ধোকা লাগে। যে এর উপর দিয়ে তওয়াফ করে, তার তওয়াফও হয় না। কেননা, সে যেন কাবার অভ্যন্তরে তওয়াফ করে। অথচ কাবার বাইরে তওয়াফ করার আদেশ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, শাযরাওয়ান কাবা প্রাচীর প্রস্থ। প্রাচীর তৈরী করার সময় এই প্রস্থটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই পরিত্যক্ত প্রস্থকে শাযরাওয়ান বলা হয়। মোট কথা, কাল পাথরের নিকট থেকে তওয়াফ শুরু করবে।

(৩) তওয়াফের শুরুতে অর্থাৎ, কাল পাথর থেকে সামনে আগমনের পূর্বেই এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্র নামে শুরু। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ, আমি এই তওয়াফ করছি তোমার প্রতি বিশ্বাসের কারণে, তোমার কিতাবকে সত্য মনে করার কারণে, তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করার কারণে। এরপর তওয়াফ শুরু করে কাল পাথর থেকে এগিয়ে কাবা গৃহের বিপরীতে পৌঁছবে । তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই দোয়া বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهٰذَا الْاَمْنُ اَمْنُكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই গৃহ তোমার গৃহ, এই হরম তোমার হরম, এই আশ্রয় তোমার আশ্রয়। এটা দোযখ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। স্থান বলার সময় মকামে ইবরাহীমের দিকে ইশারা করে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهُكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ عَلَى النَّارِ وَاٰمِنِّىْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِىْ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার গৃহ মহান এবং তোমার সত্তা কৃপাশীল। তুমি সেরা রহমতকারী। অতএব আমাকে দোযখ থেকে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দান কর। আমার রক্ত মাংসকে দোযখের জন্যে হারাম করে দাও। আমাকে কেয়ামত দিবসের ত্রাস থেকে আশ্রয় দাও এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। অতঃপর সোবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ বলতে বলতে রোকনে এরাকীতে পৌঁছবে। তখন এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে শেরক, সন্দেহ, কুফর, নেফাক, বিভেদ, দুশ্চরিত্রতা থেকে এবং পরিবার, ধন-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে কুদৃশ্য দেখা থেকে। অতঃপর মীযাবে পৌঁছে বলবে–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنِىْ بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দাও, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। হে আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পেয়ালা দিয়ে শরবত পান করাও, যাতে আমার পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অতঃপর রোকনে শামীর বিপরীতে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি একে পরিণত কর মকবুল হজ্জ, কৃতজ্ঞ সায়ী (দৌড়), মার্জনাকৃত গোনাহ ও এমন ব্যবসায়, যাতে কখনও লোকসান হয় না। হে পরাক্রান্ত, হে ক্ষমাশালী! হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর। তুমি যে গোনাহ জান, তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি অধিক সম্মানী ও মহৎ। রোকনে ইয়ামানীর বিপরীতে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কুফর থেকে। আরও আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, কবরের আযাব, জীবন ও মরণের পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে। রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মাঝখানে পৌঁছে বলবে–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও পরকালে কল্যাণ দান কর। আপন রহমতে আমাদেরকে কবর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। অতঃপর কাল পাথরের কাছে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ بِرَحْمَتِكَ اَعُوْذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার রহমতে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পাথরের পরওয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় চাই ঋণ থেকে, মনের সংকীর্ণতা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

এভাবে এক চক্কর পূর্ণ হল। এমনিভাবে সাত চক্কর দেবে এবং প্রত্যেক চক্করে উপরোক্ত দোয়াসমূহ যথারীতি পাঠ করবে।

(৪) প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক চলবে। রমলের অর্থ দ্রুত চলা এবং কাছে কাছে পা রাখা। এটা দৌড়ের চেয়ে কম এবং গতিতে স্বাভাবিক চলার চেয়ে বেশী। এস্তেবাগ ও রমল করার উদ্দেশ্য নির্ভীকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শন করা। কাফেরদেরকে নিরাশ করার জন্যে প্রথম যুগে এটা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু পরেও এ সুন্নত অব্যাহত রয়ে গেছে। রমল কাবা ঘরের সন্নিকটে করা উত্তম। কিন্তু ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে দূরত্ব থেকে রমল করাই ভাল। অর্থাৎ, তওয়াফের স্থানের কিনারে রমল করবে এবং তিন চক্কর রমল করার পর কাবা গৃহের সন্নিকটে ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবে। অতঃপর স্বাভাবিক গতিতে চার চক্কর দেবে। প্রত্যেক চক্করে কাল পাথর চুম্বন করতে পারলে ভাল। ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে হাতে কাল পাথরের দিকে ইশারা করে হাত চুম্বন করবে। এমনিভাবে রোকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন এবং আপন গণ্ড তার উপর রাখতেন। তবে কাল পাথর চুম্বন করা এবং রোকনে ইয়ামানীকে কেবল হাতে স্পর্শ করা উত্তম। কারণ, এ রেওয়ায়েতেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বেশী প্রসিদ্ধ।

(৫) তওয়াফের সাতটি চক্কর সমাপ্ত হয়ে গেলে মুলতাযামে, অর্থাৎ কাল পাথর এবং কাবা গৃহের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে আগমন করবে। এটা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান। এখানে প্রাচীরের সাথে চিমটে যাবে। পর্দা ধরে নিজের পেট প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে দেবে। ডান গণ্ড প্রাচীরে রাখবে এবং হাত ও হাতের তালু তাতে ছড়িয়ে দেবে। এ সময় নিম্নোক্ত দোয়া করবে–

"হে প্রাচীন গৃহের প্রভু! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর। আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও। আমাকে প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে রক্ষা কর। আমাকে সন্তুষ্ট কর তোমার দেয়া রিযিকের উপর এবং আমাকে দেয়া তোমার রিযিকে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা এবং এটা জাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান। হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি তোমার কাছে আগমনকারীদের মধ্যে অধিক সম্মানিত কর।"

এর পর এ স্থানে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল পয়গম্বরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, নিজের বিশেষ মকসূদের জন্যে দোয়া এবং গোনাহের মাগফেরাত কামনা করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ স্থানে খাদেমদেরকে বলতেন ঃ আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের সামনে নিজের গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করতে পারি।

(৬) মুলতাযামে করণীয় সমাপ্ত হলে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত নামায পড়বে। পথম রাকআতে কুল ইয়াআইউহাল কা-ফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে কুল হুআল্লাহ পাঠ করবে। এটা তওয়াফের দু'রাকআত। যুহরী বলেন ঃ চিরাচরিত সুন্নত এটাই যে, প্রত্যেক সাত চক্কর শেষে দু'রাকআত নামাযে পড়বে। যদি অনেক তওয়াফ করে এবং সবগুলোর পরে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়, তাও জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। সাত চক্কর মিলে এক তওয়াফ হয়। তওয়াফের দু'রাকআত পড়ার পর নিম্নরূপ দোয়া বলবে–

"হে আল্লাহ! সহজ করে দাও আমার জন্যে কঠিন বিষয়, আমাকে রক্ষা কর কঠিন বিষয় থেকে এবং আমাকে ইহ ও পরকালে ক্ষমা কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হে আল্লাহ! আমাকে আপন কৃপায় গোনাহ্ থেকে রক্ষা কর, যাতে তোমার নাফরমানী না করি, আমাকে তোমার তওফীক দ্বারা আনুগত্যে সাহায্য কর, আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে আলাদা রাখ এবং আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমাকে, তোমার ফেরেশতাগণকে, তোমার রসূলগণকে এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে ভালবাসে। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ফেরেশতাগণের, রসূলগণের ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের প্রিয় কর। হে আল্লাহ! তুমি যেমন আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, তেমনি আপন কৃপায় ও ক্ষমতাবলে আমাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমার দ্বারা আপন আনুগত্য ও রসূলের আনুগত্যের কাজ নাও এবং আমাকে এমন ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও, যার কোন প্রতিকার নেই।"

অতঃপর কাল পাথরের কাছে পুনরায় আসবে এবং সেটি চুম্বন করে তওয়াফ শেষ করবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সাত চক্কর দিয়ে কাবা গৃহের তওয়াফ করে এবং দু'রাকআত নামায পড়ে, সে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পায়। এ পর্যন্ত তওয়াফের পদ্ধতি বর্ণিত হল। এতে নামাযের শর্তসমূহ ছাড়া আরও ওয়াজেব এই যে, সমগ্র কা'বার চার পাশে সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। কাল পাথর থেকে শুরু করতে হবে এবং কাবা গৃহকে বাম দিকে রেখে মসজিদের ভিতরে এবং কাবার বাইরে তওয়াফ করতে হবে। সবগুলো চক্কর নিরন্তর করতে হবে। মামুলী ফাঁকের বেশী ফাঁক দেয়া যাবে না। এ ছাড়া আর যেসব বিষয় রয়েছে, সেগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাব।

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো

তওয়াফ শেষ করার পর বাবে সাফা দিয়ে বাইরে যাবে। এটা রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সোজাসুজি একটি দরজা। এ দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে পৌঁছবে। এর কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করার পর কাবা গৃহ দৃষ্টিগোচর হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত কা'বা গৃহ দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেন। সাফা পাহাড়ের গোড়া থেকে দৌড়ানো তথা 'সায়ী' শুরু করা যথেষ্ট।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সিঁড়ি বেয়ে উপরে আরোহণ করা মোস্তাহাব। কিছু সিঁড়ি নতুন তৈরী হয়েছে, সেগুলোও বাদ দেবে না। বাদ দিলে 'সায়ী' পূর্ণ হবে না। (অধুনা সাফা পাহাড়ের গোড়ায় এত বেশী মাটি জমে গেছে যে, গোড়া থেকে এবং দু'এক সিঁড়ি উপরে উঠলেও কা'বা দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এখন সিঁড়িতে না চড়লেও সায়ী অপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা নেই।) সাফা থেকে সায়ী শুরু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাত বার সায়ী করবে। সাফা পাহাড়ে আরোহণের সময় কা'বার দিকে মুখ করে যে দোয়া পড়া হয় তা নিম্নরূপ–

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কারণ তিনি আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। কল্যাণ তাঁর হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তিনি আপন ওয়াদা পালন করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন (অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ে), আপন বাহিনীকে জয়ী করেছেন এবং একা কাফের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন (অর্থাৎ, খন্দক যুদ্ধে), আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালক আল্লাহর জন্যে। আল্লাহ্ পবিত্র। স্মরণ কর তাঁকে সন্ধ্যায় ও দুপুরে। তাঁরই প্রশংসা আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সন্ধ্যায় এবং দ্বিপ্রহরে। তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে। ভূমি মরে যাওয়ার পর তাকে জীবিত করেন, এমনিভাবে তোমরা উত্থিত হবে। তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিরস্থায়ী ঈমান, সত্যিকার বিশ্বাস, উপকারী জ্ঞান, বিনয়ী অন্তর ও যিকিরকারী জিহ্বা প্রার্থনা করি। আরও প্রার্থনা করি ক্ষমা, নিরাপত্তা এবং ইহ ও পরকালীন স্থায়ী শান্তি।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী দোয়া করবে। এর পর নেমে সায়ী শুরু করবে এবং বলতে থাকবে–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ্ তুমি জান তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি সম্মানিত! দানশীল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দান কর। আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অতঃপর সবুজ মাইল ফলক পর্যন্ত নম্রতা বজায় রেখে চলবে। সাফা পাহাড় থেকে নেমেই এই মাইল ফলক পাওয়া যায়। মসজিদে হারামের দিকে আসতে গিয়ে যখন ছয় হাত দূরত্ব থেকে যায়, তখন দ্রুত চলবে। অর্থাৎ, রমলের মত গতিতে চলবে। পরবর্তী মাইল ফলক পর্যন্ত এভাবেই চলবে। অতঃপর ধীরগতিতে চলবে। মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তার সিঁড়িতে চড়বে, যেমন সাফা পাহাড়ে চড়েছিলে। এখানে সাফা পাহাড়ে যে দোয়া পড়েছিলে, সে দোয়াই পড়বে। এটা হল সায়ী। পুনরায় যখন সাফা পাহাড়ে যাবে, তখন দু'বার সায়ী হবে। এমনিভাবে সাত বার সায়ী করবে। প্রত্যেক সায়ীতে দু'টি মাইল ফলকের মাঝখানে রমল করবে। সায়ী সমাপ্ত হওয়ার পর বুঝতে হবে, দু'টি কাজ অর্থাৎ, তওয়াফ ও সায়ী সমাপ্ত হল। উভয়টি সুন্নত। সায়ী করার সময় ওযু থাকা মোস্তাহাব- ওয়াজেব নয়। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে সায়ী করলে এটাই রোকন হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। কেননা, সায়ী আরাফাতে অবস্থানের পরে হওয়া শর্ত নয়; বরং এটা তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে শর্ত। তবে তওয়াফের পরে সায়ী করা শর্ত।

আরাফাতে অবস্থান

যদি হাজী আরাফার দিনে আরাফাতে পৌঁছে, তবে তওয়াফে কুদুম ও মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে করবে না। বরং প্রথমে আরাফাতে অবস্থান করবে। আরাফার কয়েক দিন পূর্বে পৌঁছালে মক্কায় প্রবেশ করে তওয়াফে কুদুম করবে এবং যিলহজ্জ পর্যন্ত এহ্রাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। ইমাম এই তারিখেই যোহরের পরে কাবার নিকটে খোতবা দেবেন এবং হাজীদেরকে আদেশ দেবেন ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে। হাজীগণ ৯ই যিলহজ্জ ভোরে সেখান থেকে আরাফায় যাবে। দ্বিপ্রহরের পরে আরাফাতে অবস্থানের ফরয আদায় করবে। কেননা, আরাফাতে অবস্থানের সময় ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ সোবহে সাদেক পর্যন্ত। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্যে সামর্থ্য থাকলে মক্কা থেকে শেষ অবধি পদব্রজে চলা মোস্তাহাব। মসজিদে ইবরাহীম (আঃ) থেকে অবস্থানের স্থান পর্যন্ত পদব্রজে চলার তাকিদ আছে। এটা উত্তম।

হাজীগণ মিনায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বেন—

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنٰى فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এটা মিনা। অতএব তুমি আমার প্রতি সেই নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ কর, যদ্দ্বারা তুমি তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করেছ।"

নয় তারিখের রাতে মিনায় অবস্থান করবে। এ সময়ের সাথে হজ্জের কোন কাজ সম্পৃক্ত নয়। ভোর হলে ফজরের নামায পড়বে এবং সাবীর পাহাড়ের উপরে সূর্য উঠে গেলে এই দোয়া পড়ে আরাফাতে রওয়ানা হয়ে যাবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدْوَةٍ وَقَدْوَتِهَا قَطُّ وَاَقْرِبْهَا مِنْ رِضْوَانِكَ اَبْعِدْهَا مِنْ سَخَطِكَ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَاِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَيْكَ اِعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تُبَاهِيْ بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ وَاَفْضَلُ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এ ভোর আমার সকল ভোর অপেক্ষা উত্তম কর। একে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী কর, তোমার ক্রোধ থেকে দূরবর্তী কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে ভোর করেছি, তোমাকেই আশা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমার সত্তারই ইচ্ছা করেছি। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের নিয়ে তুমি আজ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করবে।"

আরাফাতে পৌঁছে নামেরা মসজিদের সন্নিকটে তাঁবু স্থাপন করবে। এখানেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। আরাফাতে অবস্থানের জন্যে গোসল করা উচিত। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে ইমাম সংক্ষিপ্ত খোতবা পাঠ করে বসে যাবেন, অতঃপর দ্বিতীয় খোতবা শুরু করবেন। মুয়ায্যিন আযান দেবে। আযানে দুই তকবীর মিলিয়ে বলবে। তকবীর শেষে ইমাম খোতবা শেষ করে যোহর ও আসর এক আযান ও দু'তকবীর সহকারে পড়বে। নামায কসর পড়বে। নামাযের পর অবস্থানস্থলে গিয়ে আরাফাতে অবস্থান করবে– আরনা উপত্যকায় অবস্থান করবে না। মসজিদে ইবরাহীমের সম্মুখবর্তী অংশ আরনার এবং পশ্চাতের অংশ আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে আরাফাতের স্থান সেখানে বিছানো বড় বড় পাথর দ্বারা জানা যায়। অবস্থানের সময় আল্লাহর প্রশংসা, দোয়া ও তওবা বেশী পরিমাণে করবে। সেদিন রোযা রাখবে না, যাতে সারাদিন দোয়া পাঠ করার শক্তি থাকে। আরাফার দিনে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে না; রবং কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও দোয়ায় মগ্ন থাকবে। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করা উচিত নয়, যাতে সে রাতও দ্বিতীয় দিনের রাত আরাফাতেই একত্রিত হয়। এর দ্বিতীয় উপকার এই যে, চাঁদ দেখায় ভুল হলে কিছু সময় আরাফাতে অবস্থান হয়ে যাবে। যেব্যক্তি দশই যিলহজ্জ ভোর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, তার হজ্জ বাতিল হয়ে যায়। তার উচিত ওমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে এহরাম ছেড়ে দেয়া এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করা।

আরাফার দিনে সর্বাধিক সময় দোয়ায় ব্যয় করবে। কারণ, এ স্থানে ও এরূপ সমাবেশে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। আরাফার দিনে যেসব দোয়া রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে সেগুলো পড়া উচিত। এরূপ একটি দোয়ার সারমর্ম নিম্নরূপ–

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরজীবী– মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই হাতে কল্যাণ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার জিহ্বায় নূর দাও। হে আল্লাহ, আমার বক্ষ উন্মোচন কর এবং আমার কর্ম আমার জন্যে সহজ কর। হে আল্লাহ! প্রশংসার মালিক, তোমারই প্রশংসা যেমন আমরা করে থাকি। বরং তার চেয়েও উত্তম প্রশংসা তোমার। তোমারই জন্যে আমার নামায, আমার হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু। তোমারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন এবং তোমারই দিকে আমার সওয়াব। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে মনের কুমন্ত্রণা, দুরবস্থা এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে সে বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা বাতাস বয়ে আনে এবং যমানার ধ্বংসাত্মক বস্তুর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে তোমার দেয়া সুস্থতার বিবর্তন থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ থেকে এবং তোমার যাবতীয় ক্রোধ থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা কর। আজ সন্ধ্যায় আমাকে এমন নেয়ামত দান কর, যা আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে এবং আপন গৃহের হাজীদের মধ্য থেকে কাউকে দান করনি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী, হে আল্লাহ! হে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, অনুগ্রহ প্রেরণকারী, হে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা, তোমার সামনে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় ফরিয়াদ করে। তোমার কাছে আমরা প্রয়োজন যাঞ্ছা করি। আমার প্রয়োজন এই যে, আমাকে এই পরীক্ষাগারে ভুলো না, যখন দুনিয়ার মানুষ আমাকে ভুলে যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুন, আমার অবস্থান দেখ, আমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জান, আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, নিঃস্ব ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত, সন্ত্রস্ত, গোনাহ্ স্বীকারকারী, আমি তোমার কাছে মিসকীনের মত প্রার্থনা করি এবং তোমার সামনে গোনাহ্গার লাঞ্ছিতের মত মিনতি করি, ভীত ক্ষতিগ্রস্তের ন্যায় তোমাকে ডাকি, এমন ব্যক্তির ন্যায়, যার গর্দান তোমার উদ্দেশে নত হয়, যার অশ্রু তোমার জন্যে প্রবাহিত হয়, যার দেহ তোমার জন্যে নুয়ে পড়ে এবং যার নাক তোমার জন্যে ধুলাধূসরিত হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার দয়া থেকে বঞ্চিত করো না, তুমি আমার জন্যে মেহেরবান ও দয়ালু হও হে উত্তম দাতা। ইলাহী, আমি তো নিজেকে তিরস্কার করি। ইলাহী, পাপ আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার আমলের কোন ওসিলা নেই এবং প্রত্যাশা ব্যতীত আমার কোন সুপারিশকারী নেই। ইলাহী, আমি জানি আমার গুনাহ তোমার কাছে আমার কোন মর্যাদা বাকী রাখেনি এবং ওযর করার কোন পথ অবশিষ্ট রাখেনি, কিন্তু তুমি দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলাহী, যদি আমি তোমার রহমত পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্য নাও হই, তবুও তোমার রহমত তো আমার কাছে পৌঁছার যোগ্য। ইলাহী, তোমার রহমত সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত এবং আমিও এক সৃষ্টি। ইলাহী, আমার গোনাহ যদিও বৃহৎ, কিন্তু তোমার ক্ষমার তুলনায় নেহায়েত ক্ষুদ্র। অতএব আমার গোনাহসমূহ মাফ কর হে কৃপাশীল। ইলাহী, তুমি তো তুমিই আর আমি আমিই। আমি বার বার গোনাহের দিকে ফিরে যাই, আর তুমি বার বার মাগফেরাতের দিকে ফিরে যাও। ইলাহী, যদি তুমি তোমার আনুগত্যশীলদের ছাড়া কারও প্রতি রহম না কর, তবে গোনাহ্গাররা কার কাছে কাকুতি-মিনতি করবে? ইলাহী, আমি তোমার আনুগত্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিবৃত্ত রয়েছি এবং তোমার নাফরমানীতে জেনেশুনে রত হয়েছি। অতএব তুমি পবিত্র, আমার উপর তোমার প্রমাণ কত বৃহৎ এবং তোমার ক্ষমা আমার প্রতি কত বড় আশীর্বাদ! আমি তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি আমা থেকে বেপরওয়া। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমাই কর। হে তাদের উত্তম যাদেরকে দোয়াকারী ডাকে, হে তাদের শ্রেষ্ঠ, যাদের কোন প্রত্যাশাকারী প্রত্যাশা করে, ইসলামের ইযযত ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দায়িত্বকে আমি তোমার সামনে ওসিলা করছি। অতএব আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ কর। আমাকে এই জায়গা থেকে প্রয়োজন মিটিয়ে বিদায় দাও। আমি যা চেয়েছি, তা আমাকে দান কর। আমি যে বিষয়ের বাসনা করেছি তা পূরণ কর। ইলাহী, আমি সে দোয়া করছি যা তুমি শিখিয়েছ। অতএব আমাকে সে আশা থেকে বঞ্চিত করো না, যা তুমি আমাকে বলেছ। ইলাহী, তুমি আজ রাতে সে বান্দার সাথে কি ব্যবহার করবে, যে আপন গোনাহ্ স্বীকার করে তোমার কাছে বিনয় প্রকাশ করে, আপন গোনাহের কারণে মিসকীন, আপন আমলের কারণে তোমার সামনে মিনতি করে, তোমার প্রতি তওবা করে, জুলুম করার কারণে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ক্ষমার জন্যে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে, অভাব দূরীকরণে তোমাকে অন্বেষণ করে, আপন অবস্থানের জায়গায় তোমার কাছে প্রত্যাশা করে, অথচ তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহ অনেক। হে আশ্রয়স্থল প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির, প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু, যে সৎকাজ করে সে তোমার রহমতে সফল হয় এবং যে গোনাহ্ করে, সে তার গোনাহের কারণে বরবাদ হয়। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই এসেছি, তোমার আঙ্গিনায় অবস্থান করছি, তোমাকেই আশা করছি, তোমার কাছে যা আছে তা তলব করছি, তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি, তোমার রহমত আশা করছি, তোমার শাস্তিকে ভয় করছি, তোমারই কাছে গোনাহের বোঝা নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তোমার সম্মানিত গৃহের হজ্জ করেছি। হে সেই সত্তা! যে প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজনসমূহের মালিক এবং যে নিশ্চুপদের মনের কথা জানে, হে সেই সত্তা, যার সাথে আর কোন প্রভু নেই, যার কাছে দোয়া করা যায় এবং যার কোন স্রষ্টা নেই, যাকে ভয় করা যায়।

হে সেই সত্তা, বেশী সওয়াল করলে যার দানশীলতাই কেবল বৃদ্ধি পায় এবং বেশী প্রয়োজন হলে যার অনুগ্রহ ও কৃপাই শুধু বেড়ে যায়। হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক মেহমানের জন্যে ভোজ রেখেছ। আমরা তোমার মেহমান। অতএব আমাদের জন্যে জান্নাতী ভোজের ব্যবস্থা কর। হে আল্লাহ! প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের জন্যে একটি পুরস্কার রয়েছে, প্রত্যেক যিয়ারতকারীর জন্যে এক সম্মান রয়েছে, প্রত্যেক সওয়ালকারীর জন্যে এক দান রয়েছে, প্রত্যেক আশাকারীর জন্যে এক সওয়াব রয়েছে, প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্যে এক প্রতিদান রয়েছে, প্রত্যেক রহমকারীর জন্যে এক রহমত রয়েছে, প্রত্যেক আগ্রহীর জন্যে তোমার কাছে নৈকট্য রয়েছে এবং প্রত্যেক ওসিলা অন্বেষণকারীর জন্যে ক্ষমা রয়েছে। আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি তোমার সম্মানিত গৃহের দিকে, আমরা অবস্থান করেছি মহান স্থানসমূহে এবং উপস্থিত হয়েছি এসব বরকতময় ভূমিতে, তোমার কাছে যা আছে তার আশা নিয়ে। অতএব তুমি প্রত্যাশাকে বিফল করো না।

ইলাহী, তুমি একের পর এক এত নেয়ামত দিয়েছ যাতে আমাদের মন শান্ত হয়ে গেছে। তুমি চিন্তার স্থান এত ব্যাপক করেছ যে, নির্বাক বস্তুসমূহ তোমার প্রমাণ উচ্চারণে মুখর হয়ে রয়েছে। তুমি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছ যে, তোমার ওলীগণও তোমার হক আদায়ে অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তুমি এত নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছ যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তোমার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ বর্ণনা করেছে। তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমার কুদরত দ্বারা এমনভাবে সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছ যে, প্রত্যেক বস্তু তোমার ইযযতের সামনে মাথা নত করেছে এবং সকল মুখমণ্ডল তোমার মাহাত্ম্যের মোকাবিলায় নত হয়ে গেছে। তোমার বান্দারা যখন অসৎ কাজ করে তখন তুমি সহ্য কর এবং সময় দাও। পক্ষান্তরে তারা সৎকাজ করলে তুমি কৃপা কর ও কবুল কর। তারা নাফরমানী করলে তুমি গোপন কর। তারা ত্রুটি করলে তুমি ক্ষমা কর। আমরা দোয়া করলে তুমি কবুল কর আর ডাকলে শ্রবণ কর। আমরা তোমার প্রতি মনোযোগী হলে তুমি নিকটবর্তী হও। আর তোমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে তুমি আমাদের আহ্বান কর। ইলাহী, তুমি তোমার প্রকাশ্য কিতাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছ ঃ কাফেরদেরকে বল, তারা কুফর থেকে বিরত হলে তাদের অতীত কুকর্ম ক্ষমা করা হবে। সুতরাং অস্বীকারের পর তাদের তরফ থেকে কলেমায়ে তওহীদের স্বীকারোক্তিতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমরা তো তওহীদের সাক্ষ্য বিনীতভাবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য আন্তরিকতা সহকারে দেই। অতএব এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে আমাদের অতীত গোনাহসমূহ মাফ করে দাও। এতে আমাদের অংশ নও-মুসলিমদের অংশ থেকে কম করো না। ইলাহী, আমাদের কেউ তার গোলাম মুক্ত করে তোমার নৈকট্য হাসিল করলে তুমি তা পছন্দ কর। আমরা তো তোমার গোলাম; আর তুমি অনুগ্রহ করার অধিক যোগ্য। অতএব আমাদেরকে মুক্ত কর, তোমার আদেশ– আমরা যেন আমাদের মধ্যকার গরীব মিসকীনদেরকে খয়রাত দেই। আমরা তোমার কাছে মিসকীন এবং তুমি খয়রাত দানের অধিক যোগ্য। অতএব আমাদেরকে খয়রাত দাও। যারা আমাদের উপর জুলুম করে, তাদেরকে ক্ষমা করার উপদেশ তুমি আমাদেরকে দিয়েছ। আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর তুমি কৃপা করার অধিক হকদার, অতএব আমাদেরকে মার্জনা কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। আপন রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।

এছাড়া খিযির (আঃ)-এর দোয়াও বেশী পরিমাণে পাঠ করবে। তা এই–

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْاَصْوَاتُ يَا مَنْ لَا تُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ الْحَاجُّ الْمُحِيْنِ وَلَا تُضْجِرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِيْنَ اَذِقْنَا بَرْدَ عَفُوِّكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ ـ

অর্থাৎ, হে সেই সত্তা, যাঁকে তার এক অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে উদাসীন করে না, এক আবেদন অন্য আবেদন শুনা থেকে গাফেল করে না এবং যার কাছে অনেক কণ্ঠস্বর বিমিশ্র হয় না। হে সেই সত্তা, যাঁকে অনেক আবেদন বিরত করে না এবং যাঁর কাছে অনেক ভাষা বিভিন্ন নয়। হে সেই সত্তা! যাঁকে ঠকায় না হটকারীদের পীড়াপীড়ি এবং যাঁকে অনেক আবেদনকারীর আবেদন বিমর্ষ করে না, তুমি আমাদেরকে তোমার ক্ষমার শীতলতা এবং রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাও।

এছাড়া আরও দোয়া জানা থাকলে তা পড়বে। (এ ক্ষেত্রে "হেযবুল আমরের" দোয়া খুব চমৎকার। এতে কোরআন ও হাদীসের দোয়া শামিল রয়েছে।) নিজের জন্যে, পিতামাতার জন্যে এবং সকল মুসলমান নারী ও পুরুষের মাগফেরাতের জন্যে খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করবে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কোন কিছুই বড় নয়। মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ আরাফাতে বলেছিলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমার কারণে সকল মানুষের আবেদন নামঞ্জুর করো না। বকর মুযানীর কাছে জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ আমি আরাফাতের হাজীদেরকে দেখে ধারণা করলাম, আমি তাদের মধ্যে না থাকলে সকলেরই মাগফেরাত হয়ে যেত।

অবস্থানের পরবর্তী করণীয় বিষয়

আরাফাতে অবস্থানের পরবর্তী করণীয় হচ্ছে মুযদালেফায় অবস্থান, জামরায় কংকর নিক্ষেপ, যবেহ করা, কেশ মুণ্ডন ও তওয়াফ করা।

সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে ফেরার পথে গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করা উচিত। কতক লোকের রীতি অনুযায়ী ঘোড়া অথবা উট দৌড়ানো উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওয়ারীর ঘোড়া ও উট দৌড়াতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুচারুরূপে পথ চল। কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পিষ্ট করো না এবং মুসলমানকে কষ্ট দিয়ো না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুযদালেফায় পৌঁছে গোসল করবে। মুযদালেফা হরমের অন্তর্ভুক্ত। তাই গোসল করে এখানে প্রবেশ করবে। পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলে অধিক উত্তম এবং হরমের সম্মানের উপযোগী। পথিমধ্যে সজোরে লাব্বায়ক বলতে থাকবে। মুযদালেফায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهٖ مُزْدَلِفَةُ جُمِعَتْ فِيْهَا السُّنَّةُ مُخْتَلِفَةً نَسْئَلُكَ حَوَائِجَ مُؤْتَنِفَةً فَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهٗ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهٗ ـ

হে আল্লাহ্! এটা মুযদালেফা। এতে বিভিন্ন সুন্নতের সমাবেশ হয়েছে। আমরা তোমার কাছে নতুনভাবে প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের দোয়া তুমি কবুল কর এবং যারা তোমার উপর ভরসা করলে তুমি তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও।

অতঃপর মুযদালেফায় এশার সময়ে মাগরিব এবং এশা এক আযান ও দু'তকবীরসহ একত্রে পড়বে। এশার নামায কসর পড়বে। উভয় ফরযের মাঝখানে কোন নফল পড়বে না। কিন্তু উভয় ফরযের পরে মাগরিব ও এশার নফল এবং বেতের পড়ে নেবে। প্রথমে মাগরিবের ও পরে এশার নফল পড়বে। এর পর এ রাত্রি মুযদালেফায় কাটাবে। এ রাত্রিটি হজ্জের করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেউ অর্ধ রাত্রির পূর্বে সেখান থেকে চলে গেলে তাকে 'দম' তথা কোরবানী করতে হবে। দরূদ ও ওযিফার মধ্য দিয়ে এ রাত্রি অতিবাহিত করা উত্তম, সওয়াবের কাজ। রাত্রির অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেলে সেখান থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নেবে। এখানে নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। তাই জামরার জন্যে এখান থেকে সত্তরটি কংকর কুড়িয়ে নেবে। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হেতু বেশী নিলেও ক্ষতি নেই। কংকর হালকা হওয়া চাই, যাতে অঙ্গুলির ডগায় আসে। এর পর অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়বে এবং রওয়ানা হয়ে যাবে। মুযদালেফার শেষ সীমা মাশ'আরে হারামে পৌঁছে থেমে যাবে এবং চার দিক ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকবে। বলবে–

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الْحَرَامِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মাশআরে হারাম, খানায়ে কাবা, সম্মানিত মাস, রোকন ও মকামের ওসিলায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর রূহের প্রতি আমাদের সালাম ও অভিবাদন পৌঁছে দাও এবং আমাদেরকে শান্তির গৃহে দাখিল কর, হে প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত।

অতঃপর সেখান থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' নামক স্থানে পৌঁছে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে ময়দান অতিক্রম করে যাবে। পদব্রজে গেলে দ্রুত হেঁটে যাবে। ১০ই যিলহজ্জের ভোর হয়ে গেলে কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও তকবীর বলবে। এভাবে মিনায় পৌঁছবে। এখানে জামরা সামনে পড়বে। জামরা সংখ্যায় তিনটি। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরা এমনিতেই অতিক্রম করে যাবে। দশ তারিখে এগুলোতে কোন কাজ করতে হয় না। যখন তৃতীয় জামরা আকাবায় পৌঁছবে এবং সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যাবে, তখন এই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। এ জামরাটি কেবলামুখী ব্যক্তির ডান দিকে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। কংকর মারার স্থানটি একটু উঁচুতে। কংকর মারার নিয়ম হচ্ছে, কেবলার দিকে অথবা জামরার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, অতঃপর হাত তুলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। এ সময় লাব্বায়কার পরিবর্তে তকবীর বলবে। প্রত্যেক কংকরের সাথে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ وَرَغْمِ الشَّيْطٰنِ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقَ بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ۔

অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর আনুগত্য করার এবং শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করছি। হে আল্লাহ! তোমার কিতাবকে সত্য জ্ঞান করার জন্যে এবং তোমার নবীর সুন্নত অনুসরণ করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করেছি।"

কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে লাব্বায়কা ও তকবীর উভয়টি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু ফরয নামাযের পর নয় তারিখের যোহর থেকে তের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারিখের আসরের পর পর্যন্ত তকবীর বলা অব্যাহত রাখবে। নামাযের পরে তকবীর এভাবে পড়বে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

এদিন দোয়ার জন্যে জামরার কাছে অবস্থান করবে না; বরং আপন বাসস্থানে গিয়ে দোয়া করবে। অতঃপর সঙ্গে কোরবানীর জীব থাকলে তা যবেহ করবে। নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম। যবেহ করার সময় এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَاِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এ কোরবানী তোমার পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে, তোমারই কারণে আদায় হয়েছে এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আমার পক্ষ থেকে এটা কবুল কর, যেমন তুমি তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষ থেকে কবুল করেছিলে।"

উট কোরবানী করা উত্তম, এর পর গরু, এর পর ছাগল। ছাগলের তুলনায় দুম্বা কোরবানী করা উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– الاضحية الكبش الاقرن উত্তম কোরবানী শিংবিশিষ্ট দুম্বা। সাদা রং লালিমা মিশ্রিত কাল ও কাল রঙের চেয়ে উত্তম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন– একটি সাদা দুম্বা কোরবানীর বেলায় দু'টি কাল দুম্বার চেয়ে উত্তম। নফল কোরবানী হলে তা থেকে খাবে। দোষযুক্ত জীব কোরবানী করবে না। যেসব দোষের কারণে কোরবানী হয় না, সেগুলো এই ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ল্যাংড়া হওয়া, নাক অথবা কান কর্তিত হওয়া, কান উপরে অথবা নীচে বিদীর্ণ হওয়া, শিং ভাঙ্গা হওয়া, সামনের পা খাটো হওয়া, অত্যধিক জীর্ণশীর্ণ হওয়া। কোরবানীর পরে কেশ মুণ্ডন করবে। কেশ মুণ্ডনের সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَثْبِتْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَامْحِ عَنِّىْ بِهَا سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার জন্যে এটির প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি নেকী রাখ, প্রত্যেক চুলের বদলে একটি গোনাহ্ মিটিয়ে দাও এবং প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তোমার কাছে আমার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দাও।"

নারী তার কেশ সামান্য ছোট করবে। টেকো ব্যক্তির জন্যে মাথায় খুর ফিরিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। কেশ মুণ্ডনের সাথে সাথে এহরাম খতম হয়ে যায়। নারী সম্ভোগ ও শিকার ব্যতীত অন্যান্য সকল নিষিদ্ধ কাজ এর পর হালাল হয়ে যায়। এখন মক্কায় গিয়ে তওয়াফ করবে। এ তওয়াফ হজ্জের রোকন। একে তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। এর সময় দশ তারিখের অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। শেষ ওয়াক্তের কোন সীমা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা বিলম্বে এ তওয়াফ করা যায়। কিন্তু তওয়াফ না করা পর্যন্ত এহরামের কিছু প্রভাব বাকী থাকবে। অর্থাৎ, নারী সম্ভোগ করতে পারবে না। তওয়াফে যিয়ারত করে নেয়ার পর নারী সম্ভোগ করতে পারবে এবং পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবে। এর পর বাকী থাকে কেবল আইয়ামে তশরীকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং মিনায় রাত্রি অতিবাহিত করা। এ দু'টি কাজ এহরাম খতম হওয়ার পরে হজ্জের অনুসরণে ওয়াজিব। তওয়াফে যিয়ারত দু'রাকআত নামাযসহ। তওয়াফে কুদুমের পর যদি সাফা মারওয়ার সায়ী না করে থাকে, তবে এখন তওয়াফে যিয়ারতের পর পূর্বোল্লিখিত নিয়মে সায়ী করে নেবে। পূর্বে সায়ী করে থাকলে সেটাই রোকন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার করতে হবে না। এহরাম থেকে হালাল হওয়ার উপায় তিনটি ঃ কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডন করা ও তওয়াফে যিয়ারত করা। যবেহসহ এ তিনটিকে আগে পাছে করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তম, এর পর যবেহ করা, এর পর মাথা মুণ্ডন করা এবং অবশেষে তওয়াফে যিয়ারত করা।

ইমামের জন্যে সূর্য ঢলে পড়ার পর দশ তারিখে খোতবা পাঠ করা সুন্নত। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিদায়ী খোতবা ছিল। হজ্জে মোট চারটি খোতবা আছে– একটি সাত তারিখে, একটি নয় তারিখে, একটি দশ তারিখে এবং একটি মিনা থেকে প্রথম বিদায়ের দিন অর্থাৎ বার তারিখে। এ চারটি খোতবাই দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে পড়ার পর। নয় তারিখে আরাফার খোতবা দু'টি। বাকীগুলো এক এক খোতবা। দু'খোতবার মাঝখানে কিছু বসতে হবে।

তওয়াফে যিয়ারত শেষ করার পর রাতের বেলায় থাকা এবং কংকর মারার জন্যে মিনায় ফিরে আসবে। এগার তারিখে যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন কংকর মারার জন্যে গোসল করবে এবং প্রথম জামরার দিকে রওয়ানা হবে। এটা আরাফাতের দিক থেকে প্রথমে ঠিক সড়কের উপর অবস্থিত। সেখানে সাতটি কংকর মারবে। অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তা থেকে সামান্য আলাদা হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তাআলার হামদ ও তকবীর পাঠ করে অন্তরের উপস্থিতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনয় সহকারে ততক্ষণ দোয়া করবে যতক্ষণ সময় সূরা বাকারা পাঠ করতে লাগে। এর পর দ্বিতীয় জামরার দিকে অগ্রসর হবে। সেখানেও প্রথম জামরার অনুরূপ কংকর নিক্ষেপ করবে। এর পর সামনে অগ্রসর হয়ে জামরা আকাবাতেও সাতটি কংকর মারবে। এর পর কোন কাজ না করে আপন বাসস্থানে এসে রাত কাটাবে। পরদিন অর্থাৎ, বার তারিখের যোহরের নামায বাদে একুশটি কংকর আগের দিনের মত তিনটি জামরায় মারবে। এর পর ইচ্ছা করলে মিনায় অবস্থান করবে এবং ইচ্ছা করলে মক্কায় ফিরে আসবে। সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করলে ভালো। আর যদি রাত্রি পর্যন্ত মিনা ত্যাগ না করে, তবে তার জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়; বরং রাত্রে মিনায় অবস্থান করে তের তারিখে পূর্বের ন্যায় একুশটি কংকর মারতে হবে। রাত্রে না থাকলে এবং কংকর নিক্ষেপ করলে কোরবানী করতে হবে। এ কোরবানীর গোশ্ত সদকা করে দেবে। মিনায় অবস্থানের রাত্রিগুলোতে কাবা গৃহের যিয়ারত করা জায়েয। তবে রাত্রে মিনাতেই থাকতে হবে। মিনায় থাকাকালে ফরয

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামাযসমূহ ইমামের পেছনে মসজিদে খায়ফে পড়বে। এর অনেক সওয়াব। মিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মুহাস্‌সারে বিরতি দেয়া উত্তম। আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানে পড়বে এবং সামান্য নিদ্রা যাবে। এটা সুন্নত। অনেক সাহাবী থেকে এ সুন্নত বর্ণিত আছে। এটা করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না।

ওমরা ও তার পরবর্তী করণীয়

যেব্যক্তি হজ্জের আগে অথবা পরে ওমরা করতে চায়, তার উচিত গোসল করে ওমরার কাপড় পরিধান করা এবং ওমরার মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা। তার জন্যে উত্তম মীকাত হচ্ছে জেয়েররানা। এটা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম, এর পরে তানয়ীম ও এর পরে হুদায়বিয়া। এহরাম করার সময় ওমরার নিয়ত করে লাব্বায়কা বলবে এবং মসজিদে আয়েশায় গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে। এখানে যা মনে চায় দোয়া করবে। এর পর লাব্বায়কা বলতে বলতে মক্কায় আসবে এবং মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে ঢুকে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে। অতঃপর সাত চক্কর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাত বার সায়ী করবে। সায়ী শেষে মাথা মুণ্ডন করবে। এখন ওমরা পূর্ণ হয়ে গেল। যেব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করে, তার উচিত ওমরা ও তওয়াফ বেশী করে করা এবং কাবা গৃহের পানে বেশী পরিমাণে তাকানো। কাবা গৃহের অভ্যন্তরে নগ্নপদে গাম্ভীর্য সহকারে প্রবেশ করবে। যমযম কূপের পানি অধিক পরিমাণে পান করবে। সম্ভব হলে অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজ হাতে পানি তুলে পান করবে। এত বেশী পান করবে যেন উদর ভর্তি হয়ে যায়। এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ وَّسَقَمٍ وَّارْزُقْنِى الْاِخْلَاصَ وَالْيَقِيْنَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

হে আল্লাহ! এ পানিকে প্রত্যেক অসুখ বিসুখের প্রতিষেধক কর এবং আমাকে আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা নসীব কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ماء زمزم لما شرب له অর্থাৎ, যমযমের পানি যে মকসূদে পান করা হয়, তা হাসিল হয়। তাই দোয়া করা উচিত।

বিদায়ী তওয়াফ

হজ্জ ও ওমরার পর যখন দেশে ফিরতে মনে চায়, তখন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কা'বা থেকে বিদায় নেবে। এই বিদায় নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত পন্থায় সাত চক্করের তওয়াফ করবে। এতে রমল ও এস্তেবাগ করবে না। তওয়াফ শেষে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে আসবে। অতঃপর দোয়া ও কাকুতি মিনতি করবে। বলবে-

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা- তোমার গোলামের ও তোমার বাঁদীর পুত্র। আমার জন্য নিয়োজিত বস্তুতে তুমি আমাকে সওয়ার করিয়েছ, তোমার শহরসমূহ পরিভ্রমণ করিয়েছ এবং আপন নেয়ামত আমাকে পৌঁছিয়েছ, এমনকি হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করতে আমাকে সাহায্য করেছ। সুতরাং আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তুমি আমাকে আরও বেশী সন্তুষ্টি দাও। নতুবা এখন তোমার গৃহ থেকে দূরে যাওয়ার পূর্বে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। এটা আমার দেশে ফেরার সময়, যদি তুমি অনুমতি দাও- এমতাবস্থায় যে, আমি যেন তোমার বদলে অন্য কাউকে অবলম্বন না করি, তোমার গৃহের পরিবর্তে অন্য গৃহ পছন্দ না করি, যেন তোমার প্রতি বিরূপ এবং তোমার গৃহের প্রতি অসন্তুষ্ট না হই। হে আল্লাহ! দৈহিক সুস্থতা ও ধর্মীয় হেফাযতকে আমার সঙ্গী কর। আমার প্রত্যাবর্তন সুন্দর কর। জীবিত থাকা পর্যন্ত আমাকে তোমার আনুগত্য দান কর। আমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রিত কর। তুমি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখ। হে আল্লাহ! একে তোমার গৃহে আমার সর্বশেষ উপস্থিতি করো না। যদি সর্বশেষ উপস্থিতি কর, তবে এর বিনিময়ে আমাকে জান্নাত দান কর।"

এর পর দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কা'বা গৃহ থেকে চক্ষু না ফেরানো উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মদীনার যিয়ারত ও তার আদব

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন–

من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي .

যেব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার যিয়ারত করে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

তিনি আরও বলেন–

من وجد سعته ولم يفد الى فقد جفاني .

যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে না আসে, সে আমার প্রতি জুলুম করে।

আরও বলেন–

من جاءني زائرا لايهمه الا زيارتي كان حقا على الله سبحنه ان اكون له شفيعا .

যেব্যক্তি যিয়ারতের উদ্দেশে আগমন করে এবং আমার যিয়ারত ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা না থাকে, আল্লাহর যিম্মায় তার হক হয়ে যায় যে, আমি তার সুপারিশকারী হই।

সুতরাং যেব্যক্তি মদীনার যিয়ারত করার ইচ্ছা করে, তার পথিমধ্যে বেশী করে দরূদ পাঠ করা উচিত। মদীনার প্রাচীর ও বৃক্ষসমূহের উপর দৃষ্টি পতিত হলে সে বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِىْ وِقَايَةً مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ .

হে আল্লাহ! এটা তোমার রসূলের হরম। অতএব তুমি একে আমার জন্যে দোযখ থেকে আত্মরক্ষার উপায় ও মন্দ হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তির কারণ করে দাও।

অতঃপর প্রস্তরময় ভূমিতে গোসল করবে; সুগন্ধি লাগাবে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজের উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে। এর পর বিনয় ও তাযীম সহকারে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

শুরু আল্লাহর নামে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্মের নিয়মে। পরওয়ারদেগার, আমাকে সত্যের উপর দাখিল কর, সত্যের উপর বের কর এবং আমার জন্যে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য বরাদ্দ কর।

অতঃপর মসজিদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে গিয়ে মিম্বরের কাছে এভাবে দু'রাকআত নামায পড়বে যেন মিম্বরের স্তম্ভ ডান কাঁধের বরাবর থাকে, মুখ সেই স্তম্ভের দিকে থাকবে, যার বরাবরে সিন্দুক রাখা আছে এবং মসজিদের কেবলায় অবস্থিত বৃত্তটি চোখের সামনে থাকবে। এ স্থানটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাঁড়ানোর জায়গা ছিল। ইদানীং মসজিদের যদিও পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি চেষ্টা করবে যাতে পরিবর্তনের পূর্বেকার আসল মসজিদে নামায পড়া যায়। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওযা মোবারকে যাবে এবং তাঁর মুখমণ্ডলের বামে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, পিঠ কা'বার দিকে এবং মুখ রওযা মোবারকের প্রাচীরের দিকে থাকবে। সেই প্রচীরের কোণের স্তম্ভ থেকে চার হাত দূরে দাঁড়াবে। প্রাচীরে হাত লাগানো অথবা চুম্বন করা সুন্নত নয়; বরং তাযীম সহকারে দূরে দাঁড়ানো অধিকতর সমীচীন। দাঁড়িয়ে বলবে ঃ সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর নবী! সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর বিশ্বস্ত! সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর হাবীব। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর মনোনীত। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর পছন্দনীয়। সালাম তোমার প্রতি হে আহমদ। সালাম তোমার প্রতি হে মুহাম্মদ। সালাম তোমার প্রতি হে আবুল কাসেম। সালাম তোমার প্রতি হে কুফর বিলুপ্তকারী। সালাম তোমার প্রতি হে পেছনে আগমনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে সতর্ককারী। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্রতম। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্র। সালাম তোমার প্রতি হে আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। সালাম তোমার প্রতি হে রসূলগণের সর্দার। সালাম তোমার প্রতি হে সর্বশেষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নবী। সালাম তোমার প্রতি হে বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে কল্যাণের নেতা। সালাম তোমার প্রতি হে পুণ্য উদঘাটনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে রহমতের নবী। সালাম তোমার প্রতি হে উম্মতের পথপ্রদর্শক। সালাম তোমার প্রতি হে উজ্জ্বল হাত পা বিশিষ্ট মুমিনদের নেতা। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পরিবারবর্গের প্রতি, যাঁদের থেকে আল্লাহ নাপাকী দূর করেছেন এবং যাঁদেরকে পবিত্র করেছেন। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পূত পবিত্র সহচরগণের প্রতি এবং তোমার পবিত্রাত্মা সহধর্মিণীগণের প্রতি, যাঁরা মুমিনগণের জননী। আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন প্রতিদান দিন যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীকে তাঁর কওমের পক্ষ থেকে এবং কোন রসূলকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। যখনই স্মরণকারীরা তোমাকে স্মরণ করে এবং যখনই উদাসীনরা তোমা থেকে উদাসীন হয়। অগ্রগামীদের ও পশ্চাদগামীদের প্রতি। আল্লাহ আমাদেরকে তোমার মাধ্যমে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং মূর্খতা থেকে জ্ঞানের পথে এনেছেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, তুমি তাঁর বান্দা, রসূল, বিশ্বস্ত, মনোনীত, সৃষ্টির মধ্যে পছন্দনীয়। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছ, আমানত যথার্থরূপে আদায় করেছ, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছ, শত্রুর সাথে জেহাদ করেছ, উম্মতকে সৎপথে পরিচালিত করেছ এবং আমরণ আপন প্রভুর এবাদত করেছ। অতএব রহমত নাযিল করুন আল্লাহ তোমার প্রতি, তোমার পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, শান্তিবর্ষণ করুন, গৌরব, সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করুন।

যদি কেউ তার সালাম পৌঁছানোর কথা বলে থাকে, তবে বলবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ অমুকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সালাম।

অতঃপর এক হাত পরিমাণ সরে এসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর প্রতি সালাম পড়বে। কেননা, তাঁর মাথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাঁধের কাছে রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাথা হযরত আবু বকরের কাঁধের কাছে রয়েছে। তাই আরও এক হাত সরে এসে তাঁকেও সালাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَاوِنِيْنَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ مَادَامَ حَيًّا وَالْقَائِمِيْنَ فِىْ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ خَيْرَ مَاجُزِىَ وَزِيْرَىْ نَبِيٍّ عَنْ دِيْنِهٖ ـ

"তোমাদের প্রতি সালাম হে রসূলুল্লাহর উযীরদ্বয়, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত ধর্মের কাজে তাঁর সাহায্যকারীদ্বয় এবং তাঁর পরে উম্মতের মধ্যে ধর্মীয় কাজের ব্যবস্থাপকদ্বয়। তোমরা এক্ষেত্রে তাঁর হাদীস অনুসরণ করেছ এবং তাঁর সুন্নত মেনে চলেছ। অতএব তোমাদেরকে আল্লাহ এমন প্রতিদান দিন, যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীর উযীরদ্বয়কে তাঁর ধর্মের পক্ষ থেকে দিয়েছেন।"

এর পর সরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাথার কাছে কবর ও ইদানীং নির্মিত স্তম্ভের মাঝখানে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং বলবে ঃ ইলাহী, তুমি বলেছ এবং তোমার কথা সত্য–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

"যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর তোমার কাছে আসে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চায়, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।"

ইলাহী, আমরা তোমার এরশাদ শুনেছি, তোমার আদেশ পালন করে তোমার রসূলের কাছে এসেছি এবং তাঁকে তোমার দরবারে আমাদের অজস্র গোনাহের ব্যাপারে সুপারিশকারী করেছি। আমরা গোনাহ্ থেকে তওবা করছি এবং নিজেদের ভুলত্রুটি স্বীকার করছি। ইলাহী, আমাদের তওবা কবুল কর, নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশ আমাদের ব্যাপারে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মঞ্জুর কর এবং তোমার কাছে তাঁর মর্যাদার দৌলতে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান কর।

এর পর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

হে আল্লাহ! মুহাজির ও আনসারগণকে ক্ষমা কর এবং ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হে আল্লাহ! একে তোমার নবীর কবরে এবং তোমার হরমে আমার শেষ উপস্থিতি করো না হে পরম দয়ালু।

এর পর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং অনেক দোয়া করবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন–

"আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যস্থলে বেহেশতের একটি বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর হাউজে কাওসারের উপর অবস্থিত।" সুতরাং মিম্বরের কাছে দোয়া করবে। মিম্বরের নীচের স্তরে হাত রাখা মোস্তাহাব। বৃহস্পতিবার দিন ওহুদ পাহাড়ে যাওয়া এবং শহীদগণের কবর যিয়ারত করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ ফজরের নামায মসজিদে নববীতে পড়ে যিয়ারত করতে যাবে এবং ফিরে এসে যোহরের নামায মসজিদে নববীতে পড়বে। এতে কোন ফরয নামায মসজিদের জামাআত থেকে ফওত হবে না। আরও মোস্তাহাব এই যে, প্রত্যহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করার পর জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে যাবে এবং হযরত ওসমান গনী, হযরত হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও ইমাম জা'ফর সাদেকের কবর যিয়ারত করবে এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মসজিদে নামায পড়বে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম ইবনে রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত সফিয়্যা প্রমুখের কবরও যিয়ারত করবে। তাঁরা জান্নাতুল বাকীতেই সমাহিত রয়েছেন।

প্রত্যেক শনিবারে মসজিদে কোবায় গিয়ে নামায পড়াও মোস্তাহাব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন– যে কেউ বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে কোবায় এসে নামায পড়ে, তার জন্যে এক ওমরার সমান সওয়াব রয়েছে। মসজিদে কোবা সংলগ্ন আরিস কূপের যিয়ারত করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে থুথু মোবারক নিক্ষেপ করেছিলেন। এমনিভাবে আরও মসজিদসমূহের যিয়ারত করবে। কথিত আছে, মদীনায় মসজিদ ও যিয়ারতের স্থান সর্বমোট ত্রিশটি। যতদূর সম্ভব এগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কূপে ওযু করতেন, সেগুলোতে যাবে এবং রোগমুক্তির জন্যে তাবাররুক মনে করে সেগুলোর পানি দিয়ে গোসল করবে এবং পান করবে। এরূপ কূপ সাতটি।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে মদীনায় বসবাস করতে পারলে তার সওয়াব অনেক বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

لايصبر على لاوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامة .

"যেব্যক্তি মদীনার কষ্ট সহ্য করে সেখানে বসবাস করে, আমি কেয়ামতের দিন তার জন্যে সুপারিশকারী হব।"

তিনি আরও বলেন–

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها احد الا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة

"যে মদীনায় মরতে সক্ষম হয়, সে যেন মদীনাতে মরে। কেননা, যে কেউ মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদানকারী হব।।"

কাজ শেষে মদীনা ত্যাগ করার ইচ্ছা করলে মোস্তাহাব হচ্ছে, রওযা মোবারকে পুনরায় আসবে এবং পূর্বোল্লিখিত যিয়ারতের দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং পুনরায় যিয়ারতে হাযির হওয়ার তওফীক দানের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। এর পর ছোট রওযায় দু'রাকআত নামায পড়বে। এটা মসজিদের ভিতরকার সেই স্থান, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়াতেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা বাইরে রাখবে এবং এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ بِبَيْتِكَ وَحُطَّ اَوْزَارِىْ بِزِيَارَتِهٖ وَاصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِى السَّلَامَةَ وَيَسِّرْ رُجُوْعِىْ اِلٰى اَهْلِىْ وَوَطَنِىْ سَالِمًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল কর। একে তোমার গৃহে আমার শেষ উপস্থিতি করো না। এর যিয়ারত দ্বারা আমার পাপের বোঝা নামিয়ে দাও। সফরে নিরাপত্তাকে আমার সঙ্গী কর এবং আমার নিরাপদে দেশে ফেরা সহজ কর হে পরম দয়ালু।"

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সুন্নত

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন জেহাদ অথবা হজ্জ ইত্যাদি থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন উচ্চ ভূমিতে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন এবং এই দোয়া পাঠ করতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ رَبَّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ -

অর্থাৎ, আমরা ফিরে এসেছি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী, সেজদাকারী ও প্রভুর প্রশংসাকারী হয়ে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একা পরাস্ত করেছেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এ শব্দও বর্ণিত আছে–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। রাজত্ব তাঁরই। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সফর থেকে ফেরার সময় এই সুন্নত পালন করা উচিত।

আপন বসতি এলাকা দৃষ্টিগোচর হলে সওয়ারী দ্রুত চালাবে এবং এই দোয়া পড়বে- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এতে স্থিতি ও উত্তম রিযিক নসীব কর।

এর পর গৃহে খবর পৌঁছানোর জন্যে কাউকে পাঠাবে। কেননা, পূর্বাহ্নে ফিরে আসার সংবাদ দেয়া সুন্নত। রাতের বেলায় গৃহে আসা ঠিক নয়। শহরে প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন। গৃহে প্রবেশ করে বলবে-

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا .

আমি তওবাপরওয়ারদেগারের প্রতি সফর থেকে ফেরা অবস্থায়, যাতে তিনি কোন গোনাহ না রাখেন।

বাড়ীতে থাকাকালে আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও রওযা মোবারকের যিয়ারতের যে নেয়ামত দান করেছেন, তা বিস্মৃত হবে না এবং এর প্রতি উদাসীন হয়ে ক্রীড়া কৌতুক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে অকৃতজ্ঞ হবে না। কেননা, এটা মকবুল হজ্জের পরিচায়ক নয়। বরং মকবুল হজ্জের আলামত হচ্ছে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখেরাতের প্রতি অধিক আসক্ত হবে এবং গৃহের যিয়ারতের পর গৃহের মালিক আল্লাহর যিয়ারতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

হজ্জের আভ্যন্তরীণ আদব নিম্নরূপ-

(১) হালাল অর্থ ব্যয় করে হজ্জ করা এবং এমন কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত না হওয়া, যদ্দ্বারা মনোযোগ বিভক্ত হয়ে পড়ে; বরং মনোযোগ বিশেষভাবে কেবল আল্লাহর যিকির ও তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিবিষ্ট হওয়া। এক হাদীসে বর্ণিত আছে- শেষ যমানায় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে হজ্জ করতে বের হবে। এক, রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তারা দেশ ভ্রমণ ও তামাশার উদ্দেশে; দুই, ধনী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তিরা ব্যবসার খাতিরে; তিন, ফকীররা ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে এবং চার, আলেমরা সুখ্যাতি লাভের আশায় হজ্জে যাবে। এ হাদীসে দুনিয়ার সেসব উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলো হজ্জে অর্জিত হতে পারে। এগুলো হজ্জের ফযীলতের পরিপন্থী। যারা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে হজ্জ করে, তারা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে বাদ পড়ে; বিশেষতঃ এসব উদ্দেশ্য যদি বিশেষভাবে হজ্জের সাথেই সম্পৃক্ত হয়। উদাহরণতঃ মজুরি নিয়ে অন্যের জন্যে হজ্জ করলে আখেরাতের কাজে দুনিয়া তলব করা হবে। পরহেযগারদের কাছে এটা নিন্দনীয়। হাঁ, যদি কেউ মক্কায় বসবাস করার নিয়ত করে এবং সেখানে পৌঁছার খরচ তার কাছে না থাকে, তবে এ নিয়তে অন্যের কাছ থেকে কিছু নেয়ায় দোষ নেই। মোট কথা, আখেরাতকে দুনিয়া লাভের উপায় করবে না; বরং দুনিয়াকে আখেরাত লাভের উপায় করতে হবে। অন্যের হজ্জ করার বেলায় কাবার যিয়ারত এবং মুসলমান ভাইয়ের ফরয আদায় করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার নিয়ত করতে হবে। এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা এক হজ্জের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন– প্রথম, যে হজ্জের ওসিয়ত করে, দ্বিতীয়, যে হজ্জ জারি করে এবং তৃতীয়, যে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে। আমরা একথা বলি না যে, যেব্যক্তি নিজের হজ্জ করে নিয়েছে, তার জন্যে অপরের হজ্জের মজুরি নেয়া নাজায়েয ও হারাম। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ না করা উত্তম। একে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা আখেরাতের কারণে দুনিয়া দিয়ে দেন; কিন্তু দুনিয়ার কারণে আখেরাত দান করেন না। কিরূপ মজুরি নেয়া জায়েয, তার দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত আছে। যেব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে এবং মজুরি গ্রহণ করে, সে হযরত মূসা (আঃ)-এর জননীর মত। তিনি আপন শিশুকে দুগ্ধ পান করিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতেন। অতএব যেব্যক্তি হজ্জের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করার ব্যাপারে মূসা জননীর মত হয়, তার জন্যে মজুরি নেয়ায় কোন দোষ নেই; অর্থাৎ হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশেই মজুরি নেবে এবং মজুরি পাওয়ার উদ্দেশে হজ্জ করবে না। যেমন মূসা জননীর মজুরি নেয়ার কারণ ছিল আপন শিশুকে দুগ্ধ পান করানো এবং নিজের অবস্থাও মানুষের কাছে গোপন রাখা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(২) পথিমধ্যে খোদাদ্রোহীদেরকে টাকা পয়সা দেবে না। যারা টাকা-পয়সা নেয়, তারা মক্কার ধনী ও আরব সরদারদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। এরা পথের মধ্যে বসে মানুষকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেয়। এদেরকে টাকা পয়সা দেয়া জুলুমের কাজে সাহায্য করা এবং জুলুমের উপকরণ সরবরাহ করার নামান্তর। তাই এই অর্থ দেয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে কোন উপায় অবশ্যই করা উচিত। কোন কোন আলেম বলেন ঃ নফল হজ্জ না করা এবং রাস্তা থেকে ফিরে আসা এই জালেমদেরকে সাহায্য করার চেয়ে উত্তম। এটা একটা নবাবিষ্কৃত বেদআত। এটা মেনে নেয়ার অনিষ্ট হচ্ছে, এতে করে এই জুলুম একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে। এটা বহাল থাকার মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের অপমান ও লাঞ্ছনা। আলেম ঠিকই বলেছেন। এ টাকা পয়সা জবরদস্তিমূলকভাবে নেয়া হয়। কাজেই এতে দাতার কোন দোষ নেই। একথা বলে কেউ দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না। কেননা, ঘরে বসে থাকলে অথবা রাস্তা থেকে ফিরে এলে কেউ জোর করে টাকা-পয়সা নেবে না। এই জালেমরা যাকে সুখী সচ্ছল দেখে, তার কাছেই বেশী চায়। ফকীরের বেশে দেখলে কেউ চায় না। কাজেই বুঝা গেল, এই অপারগ অবস্থাটা নিজেরই সৃষ্টি করা।

(৩) পাথেয় অধিক পরিমাণে সঙ্গে নেবে। কৃপণতা ও অপব্যয় ছাড়া মাঝারি পন্থায় সানন্দে দান ও ব্যয় করবে। অপব্যয়ের অর্থ আমাদের মতে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়া এবং ধনীদের ন্যায় বিলাস-ব্যসনের আসবাবপত্র রাখা। অধিক দান খয়রাতে অপব্যয় হয় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ অপব্যয়ে কল্যাণ নেই এবং খয়রাতে অপব্যয় নেই। হজ্জের পথে পাথেয় দান করে দেয়ার মানে আল্লাহর পথে ব্যয় করা, যাতে এক দেরহাম সাতশ' দেরহামের সমান হয়ে থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সফরে ভাল পাথেয় রাখাও দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত। হাজীদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার নিয়ত সর্বাধিক খাঁটি, পাথেয় পবিত্র এবং বিশ্বাস ভাল হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فقيل يا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

رسول الله ما بر الحج فقال طيب الكلام واطعام الطعام .

অর্থাৎ, মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়। কেউ জিজ্ঞেস করল, মকবুল হজ্জ কি, তিনি বললেন ঃ ভাল কথা বলা এবং আহার করানো।

(৪) হজ্জে গিয়ে অশ্লীলতা, অপকর্ম ও কলহ বিবাদ করা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

অর্থাৎ, রফস, ফুসুক ও জিদাল হজ্জে নেই। রফসের মধ্যে সর্বপ্রকার অনর্থক অশ্লীল কথাবার্তা অন্তর্ভুক্ত। নারীদের সাথে কথাবার্তা বলা, দৌড়াদৌড়ি করা, সঙ্গমের অবস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করাও এর মধ্যে দাখিল। কেননা, এসব বিষয় দ্বারা সহবাসের আগ্রহ জাগে, যা হজ্জে নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ কাজের আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়ও নিষিদ্ধ। 'ফুসুক' শব্দের অর্থ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যাওয়া, তা যেভাবেই হোক। জিদাল বলে যে ঝগড়া-বিবাদ পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাকে। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জে নির্লজ্জ কথা বলে, তার হজ্জ কলুষিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাল কথা বলা এবং আহার করানোকে মকবুল হজ্জ বলেছেন। কথা কাটাকাটি করা ভাল কথার বিপরীত। তাই জরুরী যে, হজ্জের পথে মানুষ তার সঙ্গী, খাদেম প্রমুখের কাজে বেশী আপত্তি করবে না; বরং সকল হাজীর সামনে নত হয়ে থাকবে। সচ্চরিত্রতা নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেবে। অপরকে কষ্ট না দেয়াই কেবল সচ্চরিত্রতা নয়; বরং অপরের দেয়া কষ্ট নীরবে সহ্য করাও সচ্চরিত্রতা। কেউ কেউ বলে ঃ সফরকে সফর বলার কারণ, সফর মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোল। এ কারণেই এক ব্যক্তি যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করল, সে অমুক ব্যক্তিকে চেনে, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কখনও তার সাথে সফরে ছিলে? সে বলল ঃ না, কখনও ছিলাম না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমার জানামতে তুমি তাকে চেন না। কেননা সফর দ্বারা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী জানা যায়।

(৫) যদি শক্তি থাকে, তবে পদব্রজে হজ্জ করবে। এটা উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে পুত্রদেরকে ওসিয়ত করেন- বৎসগণ! পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে। কেননা, যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করে, সে প্রতি পদক্ষেপে হরমের নেকীসমূহ থেকে সাতশ' নেকী পায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হরমের নেকী কি? তিনি বললেন ঃ এক নেকী লাখ নেকীর সমান। হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্য পথের তুলনায় মক্কা থেকে আরাফাত পর্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে চলা অধিক মোস্তাহাব। যদি পাঁয়ে হাঁটার সাথে আপন গৃহ থেকেই এহরামও বেঁধে নেয় তবে কথিত আছে, এটা হচ্ছে হজ্জ পূর্ণ করা, যার আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ, হজ্জ ও ওমরাকে আল্লাহর জন্যে পূর্ণ কর। হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর তাই করেছেন। কোন কোন আলেম বলেন ঃ সওয়ার হওয়া উত্তম। এতে অর্থ ব্যয় হয় এবং মন সংকীর্ণ হয় না। কষ্টও কম হয়। এতে নিরাপত্তা ও হজ্জ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখলে এ উক্তি প্রথম উক্তির বিপরীত নয়। কাজেই পদব্রজে চলা যার পক্ষে সহজ, তার জন্যে পদব্রজে চলা উত্তম। আর যদি কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ত্রুটি দেখা দেয়, তবে তার জন্যে সওয়ার হওয়া উত্তম। জনৈক আলেমকে কেউ প্রশ্ন করল, ওমরার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম, না এক দেরহাম দিয়ে একটি গাধা ভাড়া করে নেবে? বললেন- যদি এক দেরহাম ব্যয় করা তার কাছে অধিক অপ্রিয় হয়, তবে গাধা ভাড়া করা তার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার তুলনায় উত্তম। আর যদি ধনীদের ন্যায় পায়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর মনে হয় তবে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এ জওয়াবে যে দিক অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। মোট কথা, এটাও একটা দিক। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। এমতাবস্থায় সওয়ারীতে যে টাকা ব্যয় হত, তা খয়রাত করে দেবে। আর যদি কারও মন পায়ে হাঁটা ও খয়রাত করার দ্বিগুণ কষ্ট পছন্দ না করে তবে উপরোক্ত আলেম বর্ণিত পন্থাই উত্তম।

(৬) ভগ্নদশা, এলোকেশ ও ধুলাধূসরিত থাকবে- সাজসজ্জা করবে না এবং গর্ব ও ধনাঢ্যতার সামগ্রীর প্রতি প্রবণতা দেখাবে না, যাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোথাও অহংকারী ও আরামপ্রিয়দের তালিকাভুক্ত না হয়ে যায় এবং ফকীর, মিসকীন ও সংকর্মপরায়ণদের কাতার থেকে খারিজ না হয়ে যায়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে মলিন বদন থাকা ও পায়ে হাঁটার আদেশ করেছেন এবং অলসতা বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– হাজী সে ব্যক্তির যার কেশ এলোমেলো থাকে এবং শরীর থেকে গন্ধ আসে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার গৃহের যিয়ারতকারীদেরকে দেখ, কেমন প্রশস্ত ও গভীর গিরিপথ দিয়ে মলিন বদন ও ধুলাধূসরিত অবস্থায় চলে আসছে। এক আয়াতে আছে– ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ অর্থাৎ, এর পর তারা তাদের ধুলা-ময়লা খতম করুক। تفث শব্দের অর্থ চুল এলোমেলো এবং ধুলাধূসরিত হওয়া। একে খতম করার অর্থ কেশ মুণ্ডন করা, গোঁফ ও নখ কাটা। হযরত ওমর (রাঃ) সেনানায়কদের চিঠি লেখেন যে, পুরাতন বস্ত্র পরিধান কর এবং কঠোরতা সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তোল। কেউ বলেন ঃ ইয়ামনবাসীরা হাজীদের সৌন্দর্য। কেননা, তারা বিনম্র, ভগ্নদশা এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের চরিত্রে চরিত্রবান। বিশেষভাবে লাল পোশাকে পরিধান এবং সুখ্যাতির বিষয়াদি থেকে সাধারণত বিরত থাকতে হবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সহচরগণ এক মনযিলে নেমে উট চরাতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, উটের গদিতে লাল রংয়ের চাদর পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, এই লাল রং তোমাদের উপর প্রবল হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ একথা শুনে আমরা সকলেই উঠে দাঁড়ালাম এবং চাদরগুলো উটের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলাম। ফলে কতক উট পালিয়ে গেল।

(৭) চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা সেটির পিঠে চাপাবে না। উটের পিঠে খাট সংযুক্ত করাও তার শক্তির বাইরে এবং এর উপর নিদ্রা যাওয়া সেটির জন্যে কষ্টকর। বুযুর্গগণের নিয়ম ছিল, তাঁরা উটের পিঠে নিদ্রা যেতেন না; কেবল বসে বসে ঝিমিয়ে নিতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জন্তুর পিঠে থাকতেন না; বরং কিছু সময় বসতেন এবং কিছু সময় নেমে পায়ে হেঁটে যেতেন। রসূলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা উটের পিঠকে চৌকি বানিয়ে নিয়ো না। কাজেই সকালে জন্তুকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে জন্তুর পিঠ থেকে নেমে পড়া উচিত। এটা সুন্নত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে। কোন কোন বুযুর্গ জন্তু ভাড়া করার সময় শর্ত করতেন, জন্তুর পিঠ থেকে নামবেন না এবং পূর্ণ ভাড়া দেবেন। এর পর নেমে পড়তেন, যাতে জন্তু আরাম পায় এবং তার সওয়াব তাঁদের আমলনামায় লিখিত হয়, মালিকের আমলনামায় লিখিত না হয়ে।

যেব্যক্তি জন্তুকে কষ্ট দেয় এবং সেটির উপর সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপায়, কেয়ামতের দিন তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উটকে বললেন ঃ কেয়ামতের দিন পরওয়ারদেগারের সামনে আমার সাথে বিতর্ক করবে না। আমি কখনও তোর পিঠে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপাইনি। সারকথা, প্রত্যেক জন্তুর সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে সওয়াব রয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে নেমে পড়লে জন্তুও আরাম পায় এবং মালিকও খুশী হয়। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মোবারকের কাছে আরজ করল ঃ অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার চিঠিখানা নিয়ে যান এবং প্রাপককে পৌঁছে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি উটের মালিককে জিজ্ঞেস করে নেই। সে অনুমতি দিলে তোমার চিঠি নিয়ে যাব। আমি উটটি ভাড়া করে নিয়েছি। এ ঘটনায় শিক্ষণীয় যে, চিঠি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও হযরত ইবনে মোবারক কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করলেন! অথচ চিঠির কোন ওজন হয় না। বলাবাহুল্য, তাকওয়ার ক্ষেত্রে এটাই সতর্কতার পথ। কেননা, বিনানুমতিতে সামান্য ওজন বহন করার পথ খোলা হলে আস্তে আস্ত বেশী বোঝা চাপিয়ে দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না।

(৮) হজ্জে ওয়াজেব না হলেও নৈকট্য লাভের নিয়তে জন্তু যবেহ্ করবে। আর কোরনাবীর জন্য উৎকৃষ্ট ও মোটা তাজা জন্তু ক্রয় করার চেষ্টা করবে। নফল কোরবানীর গোশত থেকে নিজে খাবে, ওয়াজেব কোরবানী হলে খাবে না।

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ (যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করে)– এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিদর্শনসমূহের সম্মান করার অর্থ উৎকৃষ্ট ও মোটাতাজা জন্তু কোরবানী করা।

কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হলে মীকাত থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কোরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় কম মূল্যে ক্রয় করার চিন্তা করবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তিনটি বস্তু বেশী মূল্যে ক্রয় করতেন– এতে কম মূল্যে ক্রয় করার চেষ্টা খারাপ মনে করতেন– হজ্জে যবেহ্ করার জন্তু, কোরবানীর জন্তু এবং গোলাম। কেননা, এগুলোর মধ্যে সেটিই উৎকৃষ্ট ও উত্তম, যার মূল্য বেশী। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত ওমরের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি একবার হজ্জে যবেহ্ করার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান উষ্ট্রী সংগ্রহ করেন। লোকেরা তাঁর কাছ থেকে উষ্ট্রীটি তিনশ' আশরাফী দিয়ে কিনে নিতে চাইলে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন– আপনি অনুমতি দিলে এটি বিক্রয় করে এর মূল্য দিয়ে অনেকগুলো উট নিয়ে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, হাদীর জন্যে এটিই পাঠিয়ে দাও। এর কারণ, উৎকৃষ্ট একটি বস্তু অনেকগুলো নিকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষাও শ্রেয়। তখনকার দিনে তিনশ' আশরাফী দিয়ে ত্রিশটি উট কেনা যেত। এতে গোশতের প্রাচুর্য হত। কিন্তু কোরবানীতে গোশত উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে কৃপণতার দোষ থেকে পবিত্র করা এবং খোদায়ী তাযীমের অলংকার দ্বারা অলংকৃত করা। আল্লাহ্ বলেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর কাছে কোরবানীর জন্তুর মাংস পৌঁছে না, রক্তও না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি।"

বেশী মূল্যে ক্রয় করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়– জন্তুর সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী। এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মকবুল হজ্জ হচ্ছে জোরে লাব্বায়কা বলা এবং উষ্ট্রী কোরবানী করা। হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ কোরবানীর দিন আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের কোন আমল যবেহ্ করার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোরবানী কেয়ামতের দিন শিং ও খুরসহ উপস্থিত হবে। এ কোরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহর কাছে একটি মর্তবা অর্জন করে নেয়। অতএব এতে তোমরা মনে মনে খুশি হও। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্যে সেটির ত্বকের প্রতিটি লোমের বদলে সওয়াব রয়েছে এবং রক্তের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে নেকী রয়েছে। এগুলো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

(৯) হজ্জে কোরবানীর জন্তু ও দান খয়রাতে যা ব্যয়িত হয় তজ্জন্য মনে মনে আনন্দিত হবে। অনুরূপভাবে কোন ক্ষতি অথবা আর্থিক ও দৈহিক বিপদ হলে তজ্জন্যে দুঃখ করবে না। এটা হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত। হজ্জের পথে ক্ষতি ও বিপদ হলে তাতে এমন সওয়াব পাওয়া যায়, যেমন আল্লাহর পথে এক দেরহাম খরচ করলে তাতে দশ দেরহামের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। কথিত আছে, মকবুল হজ্জের অন্যতম আলামত হচ্ছে পূর্বে যে সকল গোনাহ করত, হজ্জের পর সেগুলো না করা। সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ভ্রাতৃত্ব করা এবং খেলাধুলা ও গাফিলতির মজলিসের পরিবর্তে আল্লাহর যিকিরের মজলিসে যাতায়াত করা।

নিয়ত খাঁটি করা ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার উপায়

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, ধর্মের মধ্যে এর মর্তবা কি, এর পর হজ্জ করার আগ্রহ হওয়া, ইচ্ছা করা, সকল বাধা-বিপত্তি দূর করা, এহরামের বস্ত্র ক্রয় করা, পাথেয় সংগ্রহ করা, সওয়ারীর জন্তু ভাড়া করা, দেশের বাইরে যাওয়া, পথ অতিক্রম করা, মীকাত থেকে লাব্বায়কা সহকারে এহরাম বাঁধা, মক্কায় প্রবেশ করা এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হজ্জ সম্পন্ন করা। –এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে, জ্ঞানীদের জন্যে আছে অর্থবহ ইঙ্গিত।

এক্ষণে আমরা এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় উল্লেখ করছি। এগুলো সম্যক বুঝে এর কারণসমূহ জেনে নিলে প্রত্যেক হাজী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার অন্তরের স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অনুযায়ী এসবের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

বোধ– জানা উচিত, মানুষ যে পর্যন্ত কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র না হয়, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহকে যথেষ্ট মনে করে ভোগ-বিলাস থেকে বিরত না হয় এবং তার সকল আচার-আচরণ ও চলাফেরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে না হয়ে যায়, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্যেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অনুসারীরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতো, গভীর বনে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতো এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গ লাভের উদ্দেশে সাময়িক ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে পরকালীন স্থায়ী সুখের আশায় কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতো। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে তাদের প্রশংসা করে বলেন–

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীজন ও সংসারত্যাগী দরবেশ এবং তারা অহংকার করে না।

অতঃপর এ বিষয়টি যখন প্রাচীন হয়ে গেল এবং মানুষ কামনা-বাসনার অনুসরণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলার এবাদতের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আখেরাতের পথ পুনঃ প্রবর্তন এবং পূর্ববর্তী রসূলগণের পথে চলা নবায়ন করার জন্যে প্রেরণ করলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছে ঃ আপনার ধর্মে বৈরাগ্য এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আছে কিনা? তিনি জওয়াবে বলেছেন– আল্লাহ তাআলা এ দু'টি বিষয়ের বিনিময়ে আমাদেরকে দু'টি বিষয় দান করেছেন– জেহাদ ও উচ্চ ভূমিতে তকবীর বলা, অর্থাৎ, হজ্জ। মোট কথা, এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআল্যর এটা অনুগ্রহ যে, হজ্জকে তাদের জন্যে বৈরাগ্য করে দিয়েছেন, এর পর কাবা গৃহকে 'আমার ঘর' বলে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে মানুষের অভীষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। তিনি কাবার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্যে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিকে হরম করেছেন এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরাফাতকে হরমের সম্মুখবর্তী মাঠের মত করেছেন। এর পর তিনি এ জায়গায় শিকার ও বৃক্ষ কর্তন হারাম করে এর সম্মান অধিকতর জোরদার করে দিয়েছেন। তিনি একে বাদশাহদের দরবারের মত করেছেন। যিয়ারতকারীরা দূর দূরান্ত থেকে মলিন ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় প্রভুর জন্যে নতমস্তকে এবং তাঁর প্রতাপ ও ইযযতের সামনে বিনম্র ও বিনীতভাবে চলে আসে। এতদসত্ত্বেও তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তাআলা কোন গৃহে আবদ্ধ হওয়া এবং কোন শহরে অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এতে করে তাদের বন্দেগী বেড়ে যায় এবং আনুগত্য ও বশ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই হজ্জে এমন সব ক্রিয়াকর্ম ফরয করা হয়েছে, যার সাথে মানুষ পরিচিত নয় এবং বুদ্ধি-বিবেক যার কারণ খুঁজে পায় না। উদাহরণতঃ প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে কয়েক বার আসা-যাওয়া করা ইত্যাদি। এ ধরনের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা পূর্ণ বন্দেগী প্রকাশ পায়। কেননা, অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে কিছু মানসিক আনন্দ আছে; যেমন যাকাতে দানশীলতা আছে, মন থেকে কৃপণতা দূর করা এর কারণ। এটা বিবেক বুদ্ধির কাম্য। রোযার মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন আছে, যা শয়তানের হাতিয়ার। নামাযে সেজদা, রুকু ও অন্যান্য নম্রতাসূচক কাজকর্ম করে আল্লাহ তাআলার জন্যে বিনম্র হওয়া আছে এবং আল্লাহর তাযীমের সাথে বান্দা পরিচিত। কিন্তু সায়ীর চক্কর, কংকর নিক্ষেপ এবং এ ধরনের অন্যান্য কিয়াকর্ম পালন করার কারণ আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন বৈ কিছু নয়। কেননা, আল্লাহর আদেশ অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে। এক্ষত্রে বিবেক বুদ্ধির তৎপরতা শিকায় উঠে। কেননা, যেসকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব বিবেক বুঝে ফেলে, সেগুলোর প্রতি মনের কিছু আগ্রহ থাকে। এ আগ্রহই সে বিষয়টি পালন করতে উৎসাহ যোগায়। এ ধরনের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ পায় না। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا আমি উপস্থিত আছি সত্যিকার হজ্জের জন্যে এবং বন্দেগীর জন্যে। এ কথা তিনি নামায, রোযা ইত্যাদির বেলায় বলেননি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষের মুক্তিকে তাদের মনের চাহিদা বিরুদ্ধ ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত করা এবং মুক্তির লাগাম শরীয়তের এখতিয়ারে রাখা– এ দু'টি বিষয় খোদায়ী রহস্যের কাম্য ছিল, যাতে মানুষ তাদের ক্রিয়াকর্মে আনুগত্যের উপায় সম্পর্কে ইতস্ততঃ করে। এ জন্যে যেসব ক্রিয়াকর্মের কারণ অনুসন্ধানে বিবেক বুদ্ধি পথ পায় না, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে সকল এবাদতের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতম এবাদত প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা, মনকে স্বভাব চরিত্রের চাহিদা থেকে সরিয়ে দেয়া গোলামীর লক্ষ্য। এ থেকেই বুঝা যায়, এবাদতসমূহের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হজ্জের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। মূল হজ্জ বুঝার জন্যে এতটুকু বর্ণনাই ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট।

আগ্রহ– এ বিষয়টি যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করা থেকেই অন্তরে হজ্জ করার আগ্রহ জাগে এবং বিশ্বাস জন্মে যে, গৃহটি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর। তিনি একে রাজকীয় দরবারের অনুরূপ করেছেন। অতএব যেব্যক্তি এ দরবার অভিমুখে যাত্রা করে, সে আল্লাহর দিকে যাত্রা করে এবং তাঁর যিয়ারত করে। যেব্যক্তি দুনিয়াতে এ গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তার যিয়ারত বিনষ্ট না হওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে তার খোদায়ী দীদার নসীব হওয়াই সমীচীন। কেননা, দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ও ধ্বংসশীলতার কারণে দীদারের নূর কবুল করা ও তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। পরজগতে দৃষ্টিশক্তি স্থায়িত্বের সহায়তা লাভ করবে এবং পরিবর্তন ও ধ্বংসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাই তখন নজর ও দীদারের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এতদসত্ত্বেও কাবা গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করা ও তার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণে খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী কাবার মালিককে দেখার হক সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং খোদায়ী দীদারের আগ্রহ কাবা দর্শনের প্রতি আগ্রহান্বিত করবে। কেননা, কাবার দীদার আল্লাহর দীদারের কারণ। এছাড়া আশেকের মনে মাশুকের বস্তুর প্রতি ঔৎসুক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কাবা আল্লাহ তাআলার গৃহ। সুতরাং কেবল এই সম্পর্কের দিকে দিয়েই কাবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত সওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া উচিত।

ইচ্ছা– এ ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করবে, কাবা গৃহের যিয়ারতের উদ্দেশেই সে আপন পরিবার-পরিজন ত্যাগ করতে এবং কামনা বাসনা ও ভোগবিলাস বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হয়েছে। সুতরাং সে কাবা গৃহ ও তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মালিকের মর্যাদা খুব বড় মনে করবে। তার জানা উচিত, সে এক বিরাট কাজের ইচ্ছা করেছে যা অত্যন্ত কষ্টকর। যে বড় কাজের অন্বেষী হয়, সে বড় কষ্টে পড়ে। সে তার ইচ্ছাকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে নিবিষ্ট করবে এবং রিয়া ও সুখ্যাতি থেকে দূরে রাখবে। একথা মনে গেঁথে নেবে, একমাত্র খাঁটি ইচ্ছা ও কর্মই মকবুল হবে। এটা খুবই মন্দ কথা, মানুষ বাদশাহের গৃহ ও হরমের নিয়ত করবে আর লক্ষ্য অন্য কিছু সাব্যস্ত করে নেবে। সুতরাং যা উৎকৃষ্ট, তার পরিবর্তে নিকৃষ্টকে অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

সম্পর্কচ্ছেদ– এর উদ্দেশ্য, সকল হকদারকে তাদের হক সমর্পণ করবে এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে খাঁটিভাবে তওবা করবে। কেননা, হকও একটি সম্পর্ক এবং প্রত্যেক সম্পর্ক একজন কর্জদাতার অনুরূপ, যে জামার কলার চেপে ধরে বলে ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? শাহানশাহের গৃহে যেতে চাও, অথচ আপন গৃহে তাঁর আদর্শকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পালন করছ না? তুমি যদি চাও, তোমার যিয়ারত কবুল হোক, তবে তাঁর আদেশ পালন কর। জুলুমের মাধ্যমে যাদের হক ছিনিয়ে নিয়েছ, তাদের হক প্রত্যর্পণ কর। সর্বপ্রথম গোনাহ থেকে তওবা কর এবং অন্তরকে সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও, যাতে শাহানশাহের দিকে অন্তরের চেহারা দিয়ে মনোনিবেশ করতে পার। যেমন বাহ্যতঃ তুমি তাঁর গৃহের দিকে মুখ করে আছ। এরূপ না করলে তুমি এই সফর থেকে শুরুতে দুঃখ-কষ্ট এবং পরিণামে ধিকৃত হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাবে না। দেশের সাথে সম্পর্ক এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করবে যেন সেখান থেকে চিরতরে বিদায় নেয়া হচ্ছে। মনে করে নেবে যেন সেখানে আর ফিরে আসবে না। পরিবার পরিজন ও সন্তানদের জন্য ওসিয়ত লেখে দেবে। কেননা, মুসাফির ব্যক্তি মৃত্যুর লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে; তবে যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন তার কথা ভিন্ন। হজ্জের সফর করার জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় স্মরণ করবে, পরকালের সফরের জন্যেও এমনিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সফর সত্বরই করতে হবে। হজ্জের সফরে যা কিছু করবে তা দ্বারা পরকালের সফর সহজ হওয়ার আশা করবে। এ জন্যে প্রস্তুতিতে পরকালের সফর বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পাথেয়– হালাল জায়গা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। যদি মনে বাসনা থাকে, পাথেয় অনেক হোক, দূর-দূরান্তের সফর সত্ত্বেও তা উদ্বৃত্ত হোক এবং মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত না হোক, তবে স্মরণ রাখা উচিত, পরকালের সফর এ সফরের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তার পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়া ব্যতীত অন্য যে বস্তুকে পাথেয় জ্ঞান করা হয় তা মৃত্যুর সময় পশ্চাতে থেকে যাবে এবং ধোঁকা দেবে; যেমন টাটকা রান্না করা খাদ্য সফরের প্রথম মনযিলেই বাসী হয়ে পচে যায়। এর পর ক্ষুধার সময় মানুষ তা খেতে পারে না। কাজেই যে আমল পরকালের পাথেয় সেই আমল যাতে মৃত্যুর পর সঙ্গ ত্যাগ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী।

আরোহণের জন্তু– সফর করার সময় যখন আরোহণের জন্তু সামনে আসে, তখন মনে মনে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করবে যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তুকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে কষ্ট না হয় এবং সফর হাল্কা হয়। এ ছাড়া স্মরণ করবে, পরজগতের সওয়ারী একদিন এমনিভাবে সামনে আসবে অর্থাৎ জানাযার প্রস্তুতি হবে এবং তাতে সওয়ার হয়ে পরজগতের সফর করতে হবে। মোট কথা, হজ্জের অবস্থা কিছুটা পরজগতের সফরের অনুরূপ বিধায় জন্তুর পিঠে হজ্জের সফর করাটা পরজগতের পাথেয় হয় কিনা, তা অবশ্যই দেখে নেয়া উচিত। কেননা, পরজগতের সফর মানুষের খুবই নিকটবর্তী। কে জানে মৃত্যু নিকটেই কিনা এবং উটের উপর সওয়ার হওয়ার পূর্বেই শবাধারের উপর সওয়ার হয়ে যাবে কিনা। শবাধারের উপর অবশ্যই সওয়ার হতে হবে। পক্ষান্তরে পাথেয় সংগ্রহ অনিশ্চিত বিধায় হজ্জের সফরও একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং অনিশ্চিত সফরে সাবধান হওয়া এবং পাথেয় ও সওয়ারীর জন্তুর সাহায্য নেয়া আর নিশ্চিত সফরের ব্যাপারে গাফেল থাকা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে?

এহরামের পোশাক– এহরামের পোশাক ক্রয় করার সময় আপন কাফনও তাতে জড়ানোর কথা স্মরণ করবে। কেননা কাবা গৃহের নিকটে পৌঁছে এহরামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সে পর্যন্ত সফর পূর্ণ হয় কিনা কে জানে। কাফনে জড়ানো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিশ্চিত। আল্লাহর ঘরের যিয়ারত যেমন সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদের বিপরীত পোশাক ছাড়া হয়নি, তেমনি মৃত্যুর পর আল্লাহর যিয়ারতও সেই পোশাক ব্যতীত হবে না, যা দুনিয়ার পোশাকের বিপরীত। এহরামের পোশাকও কাফনের কাপড়ের অনুরূপ সেলাইবিহীন।

শহর থেকে বের হওয়ার সময় মনে করবে, আমি আমার দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন সফরে যাচ্ছি, যা দুনিয়ার সফরের অনুরূপ নয়। তখন সে মনে মনে চিন্তা করবে, কিসের ইচ্ছা করছে, কোথায় যাচ্ছে এবং কার যিয়ারত করতে রওয়ানা হচ্ছে। তখন বুঝে নেবে, সে রাজাধিরাজের পানে তার যিয়ারতকারীদের দলভুক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যারা ডাক দেয়ার সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছে, প্রেরণা দেয়ার সাথে সাথে আগ্রহান্বিত হয়েছে এবং আদেশ পেয়ে দূরদূরান্ত এলাকা অতিক্রম করে সকলকে ত্যাগ করে মহীয়ান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী গৃহ অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, যাতে প্রভুর যিয়ারতের পরিবর্তে তার গৃহের যিয়ারত করে অন্তর তুষ্ট করতে এবং অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ করতে পারে। অন্তরে কবুলের প্রত্যাশা রাখবে। আপন আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা করবে। তিনি তাঁর গৃহের যিয়ারতকারীদের জন্যে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। কাজেই প্রত্যাশা করবে, তিনি আপন ওয়াদা পূর্ণ করবেন। আরও আশা রাখবে, যদি তুমি কাবা গৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে না পার এবং পথিমধ্যে মারা যাও, তবে আল্লাহর সাথে তাঁর পথের পথিক অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে। কেননা, তিনি নিজে বলেন–

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ

যেব্যক্তি দেশত্যাগী অবস্থায় তার গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, এর পর মারা যায়, তার সওয়াব আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে যায়।

জঙ্গলে প্রবেশ করে মীকাত পর্যন্ত গিরিপথসমূহ দেখার সময় সেসব ভয়ংকর অবস্থা স্মরণ করবে যা মৃত্যুর পর দুনিয়া থেকে বের হয়ে কেয়ামতের মীকাত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। এর প্রত্যেক অবস্থার সাথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেয়ামতের প্রত্যেক অবস্থার মিল খুঁজে নেবে। উদাহরণতঃ দস্যুদের আতংক দ্বারা মুনকার নকীরের প্রশ্নের আতংক স্মরণ করবে। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা কবরের সাপ বিচ্ছু ধ্যান করবে। আপন বাড়ীঘর ও আত্মীয়-স্বজনের বিরহ দ্বারা কবরের ত্রাস, কঠোরতা ও একাকিত্ব চিন্তা করবে। মোট কথা, আপন কথায় ও কাজে যে ভয় করবে, তা কবরের ভয়ের জন্যে পাথেয় করবে। মীকাতে 'লাব্বায়কা' বলর অর্থ এই মনে করবে, আল্লাহর ডাকে 'হাযির আছি' বলে সাড়া দিচ্ছে। তখন এই সাড়া কবুল হওয়ার আশা করবে এবং ভয় করবে, কোথাও لا لبيك ولا سعديك না বলে দেয়া হয়; অর্থাৎ, তুমি হাযির নও এবং তৎপর নও। তাই ভয় ও আশার মাঝখানে থাকবে এবং নিজের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কৃপার উপর ভসসা রাখবে। কেননা, 'লাব্বায়কা' বলার সময়ই হচ্ছে হজ্জের সূচনা এবং এটা বিপদের সময়। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ একবার হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধে সওয়ারীর উপর বসতেই তাঁর শরীরের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং নিজের মধ্যে 'লাব্বায়কা' বলার শক্তি পেলেন না। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি 'লাব্বায়কা' বলছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হয়, কোথাও আমাকে لا لبيك ولا سعديك বলে না দেয়া হয়। এর পর যখন তিনি 'লাব্বায়কা' বললেন, তখন অজ্ঞান হয়ে সওয়ারী থেকে নীচে পড়ে গেলেন। হজ্জ পূর্ণ করা পর্যন্ত তাঁর এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মান দারানীর সাথে একবার হজ্জে গিয়েছিলাম। তিনি এহরাম বেঁধে এক মাইল পর্যন্ত চুপচাপ চলে এলেন এবং 'লাব্বায়কা' বললেন না। এর পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ হে আহমদ! আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন, বনী ইসরাঈলের জালেমদেরকে বলে দাও তারা যেন আমাকে কম স্মরণ করে। কেননা, তাদের মধ্যে যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে অভিসম্পাত সহকারে স্মরণ করি। হে আহমদ! আমি শুনেছি, যেব্যক্তি অবৈধ হজ্জ করে এবং লাব্বায়কা বলে, আল্লাহ তাআলা তার জওয়াবে বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك তুমি উপস্থিত নও এবং তৎপর নও, যে পর্যন্ত তোমার হাতে যা আছে তা ফিরিয়ে না দাও। অতএব, আমিও এরূপ জওয়াব পাওয়া থেকে শংকামুক্ত নই।

আল্লাহ বলেছেন- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার কর। এ ডাকের জওয়াব দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন মীকাতে সজোরে 'লাব্বায়কা' বলবে তখন ধ্যান করবে, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কারণে মানুষ এমনিভাবে আহূত হবে এবং কবর থেকে উঠে কেয়ামতের মাঠে একত্রিত হবে। তাদের অনেক প্রকার থাকবে। কেউ হবে নৈকট্যশীল এবং কেউ আল্লাহর গজবে নিপতিত। কেউ গৃহীত হবে এবং কেউ নিগৃহীত। তারা শুরুতে ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে; যেমন মীকাতে হাজীগণ হজ্জ পূর্ণ করতে পারবে কিনা এবং হজ্জ কবুল হবে কিনা, সে বিষয়ে দোদুল্যমান থাকে। মক্কায় প্রবেশ করার সময় মনে করবে, এখন নিরাপদে হরমে পৌঁছে গেছি। আশা করবে, মক্কায় প্রবেশের বদৌলত আল্লাহ তাআলা আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আশংকা করবে, যদি আমি নৈকট্যের যোগ্য না হই, তবে হরমে আসার কারণে গোনাহগার ও গজবের যোগ্য সাব্যস্ত হব। কিন্তু সব সময় আশা প্রবল থাকা উচিত। কেননা, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যাপক এবং কাবা গৃহের সম্মান অত্যধিক। যারা আসে, তাদের প্রতি আল্লাহ কৃপা করেন এবং যারা এর আশ্রয় চায় ও দোহাই দেয়, তাদের সম্মান বিনষ্ট করেন না।

কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়ার সময় তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত করবে এবং মনে করবে যেন গৃহের প্রভুকে দেখতে পাচ্ছ। তখন আশা করবে, আল্লাহ তাআলা যেমন তাঁর মহান গৃহ দেখা নসীব করেছেন, তেমনি তাঁর পবিত্র সত্তার দীদারও নসীব করবেন। আল্লাহ্ তাআলার শোকর করবে, তিনি এমন মর্তবায় উন্নীত করেছেন এবং তাঁর কাছে আগমনকারীদের দলভুক্ত করেছেন। তখন একথাও ধ্যান করবে যে, কেয়ামতে সকল মানুষ জান্নাতে দাখিল হওয়ার আশায় এমনিভাবে জান্নাতের পানে ধাবিত হবে। এর পর তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিছু লোক ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবে এবং কিছু লোককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যেমন হাজীদের দু'টি দল হয়েছে- এক দলের হজ্জ কবুল এবং এক দলের হজ্জ নামঞ্জুর। হজ্জে যেসকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সেগুলো দেখে আখেরাতের বিষয়াদির স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত হবে না। কারণ, হাজীদের সকল অবস্থা আখেরাতের অবস্থা জ্ঞাপন করে।

কাবা গৃহের তওয়াফকে নামায গণ্য করবে। তাই তওয়াফের সময় অন্তরে তাযীম, ভয়, আশা ও মহব্বত এমনভাবে হাযির করবে, যেমন 'নামাযের রহস্য' অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি। প্রকাশ থাকে যে, তওয়াফের দিক দিয়ে মানুষ সেই সকল নৈকট্যশীল ফেরেশতার অনুরূপ হয়ে যায়, যারা আরশের চার পাশে সমবেত হয়ে তওয়াফ করে। এটা মনে করবে না যে, তওয়াফের উদ্দেশ্য দেহের তওয়াফ করা; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরের যিকিরের তওয়াফ প্রভুর চার পাশে করা। ফলে তওয়াফের সূচনা ও শেষ যেমন কাবা গৃহের উপর হয়, তেমনি যিকিরের সূচনা ও শেষ প্রভুর উপরই হতে হবে।

জানা উচিত, উৎকৃষ্ট তওয়াফ হচ্ছে অন্তরের তওয়াফ, যা আল্লাহর দরবারের চার পাশে হয়। কাবা গৃহ বাহ্যিক জগতে সেই দরবারের একটি নমুনা। কেননা, আল্লাহর দরবার আভ্যন্তরীণ জগতে অবস্থিত। ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন বাহ্যিক জগতে দেহ অন্তরের নমুনা। অন্তর অদৃশ্য জগতে রয়েছে, ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। আরও জেনে নেবে, বাহ্যিক জগত অদৃশ্য জগতের সিঁড়ি সেই ব্যক্তির জন্যে, যার জন্যে আল্লাহ্ এই দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এই উক্তির মধ্যে। বায়তুল মামুর আকাশে কা'বার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। ফেরেশতারা তার তওয়াফ করে, যেমন মানুষ কাবার তওয়াফ করে। অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের তওয়াফ করতে অক্ষম বিধায় সাধ্যমত সেই ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার জন্যে তাদেরকে কাবা গৃহের তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ওয়াদা করা হয়েছে, যারা কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যেব্যক্তি ফেরেশতাদের অনুরূপ তওয়াফ করতে সক্ষম, সে এমন ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা যায়, স্বয়ং কাবা তার যিয়ারত ও তওয়াফ করে। কতক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ কোন কোন ওলী আল্লাহর অবস্থা এমনি দেখেছেন।

'হাজারে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করার সময় এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর আনুগত্যের শপথ করছো। অতঃপর এই শপথ পূর্ণ করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে। কেননা, যেব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শপথ ভঙ্গ করে, সে গজবের যোগ্য হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

الحجر الاسود يمين الله عز وجل فى الارض يصافح بها خلقه كما يصلح الرجل اخاه

অর্থাৎ, 'হাজারে আসওয়াদ' পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার দক্ষিণ হস্ত। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করেন, যেমন মানুষ তার ভাইয়ের সাথে করমর্দন করে। কা'বার গেলাফ ধারণ এবং মুলতাযামকে ধরার সময় নিয়ত করবে, গৃহ এবং গৃহের প্রভুর মহব্বতে নৈকট্য অন্বেষণ করছো। দেহের স্পর্শকে বরকত মনে করবে এবং আশা করবে, দেহের যে অংশ কা'বার সাথে সংযুক্ত হবে, তা অগ্নি থেকে হেফাযতে থাকবে। গেলাফ ধরার সময় নিয়ত করবে, মাগফেরাত ও শান্তির অন্বেষণে কাকুতি-মিনতি ও পীড়াপীড়ি করছো; যেমন কোন অপরাধী যার কাছে অপরাধ করে, তার আঁচল জড়িয়ে ধরে, অপরাধের জন্যে তার সামনে মিনতি সহকারে প্রকাশ করে, তুমি ব্যতীত আমার কোথাও ঠিকানা নেই। এখন আমি তোমার আঁচল ছাড়ব না যে পর্যন্ত না অপরাধ ক্ষমা কর এবং ভবিষ্যতের জন্যে অভয় না দাও।

কা'বা গৃহের চত্বরে সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী তথা দৌড়াদৌড়ি এমন, যেমন গোলাম বাদশাহের প্রাসাদের চত্বরে বার বার আনাগোনা করে, যাতে খেদমতে আন্তরিকতা প্রকাশ পায় এবং রহমতের দৃষ্টি লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। অথবা যেমন কেউ বাদশাহের কাছে যায়, এর পর বাইরে চলে আসে কিন্তু একথা জানে না, বাদশাহ্ তার সম্পর্কে কি আদেশ করবেন– মঞ্জুর করবেন, না নামঞ্জুর করবেন। ফলে সে বার বার প্রাসাদের চত্বরে আসা-যাওয়া করে যে, প্রথম বারে রহম না করলে দ্বিতীয় বারে রহম করবেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আসা-যাওয়া করার সময় মনে করবে, কেয়ামতের ময়দানে মীযানের উভয় পাল্লার মাঝখানে এমনিভাবে ঘুরাফেরা করতে হবে। সাফাকে নেকীর পাল্লা এবং মারওয়াকে বদীর পাল্লা মনে করে নেবে। এর পর ধারণা করবে, এই পাল্লাদ্বয়ের মাঝখানে এমনিভাবে আসা-যাওয়া করতে হবে এটা দেখার জন্যে যে, কোন্ পাল্লাটি ভারী হয় এবং কোন্‌টি হালকা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরাফাতে অবস্থান করার সময় যখন মানুষের ভীড়, উচ্চ আওয়ায, ভাষার বিভিন্নতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আপন আপন ইমামের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলা দেখবে, তখন একথা স্মরণ করবে, কেয়ামতের ময়দানেও সকল উম্মত আপন আপন পয়গম্বরসহ এমনিভাবে একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক উম্মত তাদের পয়গম্বরের অনুসরণ করবে। তারা তাঁদের শাফায়াত আশা করবে এবং কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পেরেশান থাকবে। আরাফাতে যখন এই ধারণা মনে উদয় হয়, তখন কাকুতি-মিনতি ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া অপরিহার্য করে নেবে, যাতে কামিয়াব ও রহমতপ্রাপ্ত দলের সাথে হাশর হয়। এ স্থানে নিজের আশা কবুলই মনে করবে। কেননা, এই দরবার শরীফে আল্লাহর রহমত সকলের উপর নাযিল হয়। এই রহমত আসার ওসিলা হয় কুতুব ও আবদালগণের অন্তর। কুতুব ও আবদালের দল থেকে এ ময়দান কখনও খালি থাকে না। সৎকর্মপরায়ণগণও এখানে অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং হিম্মত একত্রিত হয়ে যখন তাদের অন্তর মিনতি করতে তাঁকে, হাত আল্লাহর দিকে প্রসারিত হয়, মস্তক তাঁর দিকে উত্তোলিত হয় এবং হিম্মত সহকারে রহমত তলব করার জন্যে তারা আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করেন, তখন এরূপ ধারণা করবে না যে, তারা আপন আশায় বঞ্চিত থাকবেন এবং তাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবে। বরং তখন তাদের উপর সর্বব্যাপী রহমত নাযিল হয়। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ তাআলা আমার মাগফেরাত করেননি– আরাফাতে উপস্থিত থেকে এরূপ ধারণা করা গোনাহ্। হিম্মতসমূহের সমাবেশই হজ্জের রহস্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। হিম্মতসমূহের একত্রিত হওয়া এবং এক জায়গায় একই সময়ে অন্তরসমূহের একে অন্যকে সাহায্য করা– আল্লাহর রহমত নামিয়ে আনার এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর নেই।

কংকর নিক্ষেপের মধ্যে ইচ্ছা করবে, বন্দেগী প্রকাশ করার জন্যে আদেশ পালন করছি। এ কাজে বিবেক ও মনের কোন আনন্দ নেই। এর স্থলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে বিতাড়িত শয়তান আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর হজ্জে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করা অথবা তাঁকে কোন গোনাহে লিপ্ত করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিতাড়িত এবং তার আশা বিনষ্ট করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কংকর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিক্ষেপের আদেশ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যের ইচ্ছা করবে। যদি কেউ বলে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিধায় তাকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। আমাদের সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না, এমতাবস্থায় কংকর মারার উদ্দেশ্য কি? এর জওয়াব হচ্ছে, এই আপত্তি শয়তানের পক্ষ থেকে। সে-ই আমাদের মনে এটা জাগ্রত করেছে– যাতে আমাদের কংকর মারার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমরা মনে করি, এটা তো খেলাধুলার মত একটা নিষ্ফল কাজ। এটা আমরা করব কেন? সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে মজবুত হয়ে শয়তানকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপ করতঃ তাকে প্রতিহত করতে হবে। এখানে বুঝতে হবে, আমরা প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করলেও বাস্তবপক্ষে তা শয়তানের মুখে মারি এবং তার পিঠ ভেঙ্গে দেই। কেননা, যে আদেশ পালনে মন ও বিবেকের কোন আনন্দ নেই, তা পালন করার মধ্যেই শয়তানের লাঞ্ছনা ও অবমাননা নিহিত রয়েছে।

কোরবানীর জন্তু যবেহ্ করার সময় জানবে, এ কাজ আদেশ প্রতিপালনের কারণে নৈকট্যশীল এবাদত। এ কারণেই জন্তুটি এবং জন্তুর অঙ্গসমূহ উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। এতে আশা করা উচিত, আল্লাহ তাআলা এর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গকে অগ্নি থেকে মুক্ত করবেন। এরূপই ওয়াদা হয়েছে। সুতরাং জন্তুটি যত বড় হবে এবং তার অঙ্গ যত বেশী সবল হবে, ততই দোযখের অগ্নি থেকে রেহাই বেশী হবে।

মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীরসমূহের উপর নজর পড়লে মনে মনে ধ্যান করা উচিত, এটি সেই শহর, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ)-এর জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাঁর দারুল হিজরত করেছেন। এ স্থানেই তিনি আল্লাহ তাআলার ফরয ও সুনান জারি করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। এখানেই তিনি আল্লাহর ধর্ম প্রচার করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর সমাধি রচনা করেছেন। রসূলের দু'জন উযীরের কবরও এখানে রেখেছেন, যারা তাঁর পরে সত্য প্রচারে ব্রতী হন। এর পর মনে মনে কল্পনা করবে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল মদীনার মাটিতে পড়ে থাকবে এবং তাঁর পা পড়েনি এমন কোন জায়গা নেই। এরূপ কল্পনা করার পর গাম্ভীর্য ও ভয় সহকারে মাটিতে পা রাখবে এবং চিন্তা করবে, পাক মদীনার প্রত্যেক অলিগলিতে তিনি বিচরণ করে থাকবেন। এর পর তাঁর চলাফেরার গতিতে মিনতি ও গাম্ভীর্য কল্পনা করবে। আরও কল্পনা করবে, আল্লাহ তাআলা নিজের কি পরিমাণ মারেফত তাঁর অন্তরে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তিনি তাঁর যিকিরকে কতটুকু উচ্চ করেছেন যে, নিজের যিকিরের সাথে তাঁর যিকির সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যেব্যক্তি তাঁর তাযীম করে না, আল্লাহ তার আমল বাতিল করে দেন। এর পর ধ্যান করবে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তাদের প্রতি যারা তাঁর সংসর্গ লাভ করেছেন এবং সৌন্দর্য দর্শন ও বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এর পর নিজের জন্য আফসোস করবে যে, এ দৌলত তোমার নসীব হয়নি এবং সাহাবীগণের সঙ্গও নসীব হয়নি। এর পর ধ্যান করবে দুনিয়াতে তো তাঁর যিয়ারত ভাগ্যে জুটল না, আখেরাতে জুটবে কিনা সন্দেহ। গোনাহের কারণে সম্ভবতঃ পরিতাপের দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখতে হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– কেয়ামতের দিন কিছু লোককে আমার সম্মুখে আনা হবে। তারা বলবে ঃ হে মুহাম্মদ! আমি বলব ঃ ইলাহী, এরা আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি সব নতুন কর্ম উদ্ভাবন করেছে। তখন আমি বলব ঃ দূর হয়ে যাও। দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, সুতরাং যদি তুমিও তাঁর শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে থাক, তবে তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে আশা এটাই রাখবে, আল্লাহ তাআলা তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবেন না। কেননা, আল্লাহ তোমাকে ঈমান দান করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারতের জন্যে তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে এনেছেন। কোন ব্যবসা বাণিজ্য অথবা জাগতিক আনন্দ তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল তাঁর মহব্বত এবং তাঁর পবিত্র কীর্তি দেখার আগ্রহ তোমাকে টেনে এনেছে। কেননা, তাঁকে দেখা যখন তোমার নসীব হল না, তখন তাঁর কবরের প্রাচীরের উপর দৃষ্টি পতিত হওয়াতেই তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। আল্লাহ তাআলা এসব আয়োজন যখন তোমার জন্যে করেছেন, তখন তোমার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই তাঁর জন্যে উপযুক্ত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখন তুমি মসজিদে নববীতে পৌঁছবে তখন ধ্যান করবে, এ স্থানকেই আল্লাহ তাআলার নবী (সাঃ) এবং মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম লোকদের জন্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহর ফরযসমূহ প্রথমে এস্থানেই পালিত হয়েছে। এস্থানেই সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিবর্গ জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও সমবেত আছেন। এমন স্থানে প্রবেশ করায় তোমার খুব আশা হওয়া উচিত, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহমতই করবেন। এর পর খুশু ও সম্মান সহকারে মসজিদে প্রবেশ করবে। এ পবিত্র ভূমি খুশু ও নম্রতা করারই উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বর্ণনা করেন, হযরত ওয়ায়স কারনী একবার হজ্জে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। তিনি মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান হলে লোকেরা তাঁকে বলল ঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর কবর শরীফ এটা। একথা শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। যে শহরে মুহাম্মদ (সাঃ) মাটির অভ্যন্তরে রয়েছেন, সেই শহর আমার ভাল লাগে না। দাঁড়ানো অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত করা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় এভাবেই করা হত। তাঁর জীবদ্দশায় যতটুকু তাঁর দেহের নিকটবর্তী হবে, কবরেও ততটুকু নিকটবর্তী হবে। জীবিত অবস্থায় যেমন তাঁর দেহ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বেআদবী মনে করতে, তেমনি এখনও করা উচিত। কেননা, স্পর্শ করা ও চুম্বন করা খৃস্টান ও ইহুদীদের রীতি। জানা উচিত, রসূলে পাক (সাঃ) তোমার উপস্থিতি, দণ্ডায়মান হওয়া এবং যিয়ারত করার বিষয় অবগত হন এবং তোমার দরূদ ও সালাম তাঁর খেদমতে পৌঁছে। সুতরাং যিয়ারতের সময় তুমি কল্পনা কর, তিনি তোমার সম্মুখে কবরে বিদ্যমান আছেন। এর পর মনে মনে তাঁর মহান মর্তবার কথা চিন্তা কর। দরূদ ও সালাম পৌঁছার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তার কাজ হল উম্মতের সালাম তাঁর কাছে পৌঁছানো। এটা সেই লোকদের জন্যে, যারা তাঁর কবর শরীফে উপস্থিত হয়নি। অতএব যারা কবর শরীফ যিয়ারত করার আগ্রহে স্বদেশ ত্যাগ করে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হয়, তাদের সালাম কিরূপে পৌঁছবে না?

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا। যেব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশ বার দরূদ প্রেরণ করবেন। এটা কেবল মুখে দরূদ পাঠ করার প্রতিদান। কিন্তু যেব্যক্তি তাঁর যিয়ারতের জন্যে কায়মনোবাক্যে উপস্থিত হয়, তার প্রতিদান কিরূপ হবে?

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বরের কাছে যাবে এবং কল্পনা করবে, তিনি মিম্বরে দণ্ডায়মান আছেন এবং বিপুল সংখ্যক মুহাজির ও আনসার তাঁর চার পাশে বৃত্তাকারে বসে আছেন। তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যেন কেয়ামতে তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব না থাকে।

এ পর্যন্ত হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্তরের ওযিফা বর্ণিত হল। হজ্জ সমাপনান্তে অন্তরে চিন্তা ও ভয় অপরিহার্য করে নেবে। আশংকা করবে, কে জানে তোমার হজ্জ কুবল হল কিনা! তুমি প্রিয়জনদের তালিকাভুক্ত হয়েছ, না বিতাড়িতদের দলে গ্রথিত হয়েছ। এ বিষয়টি নিজের অন্তর ও কাজকর্ম দ্বারা জেনে নেবে। অর্থাৎ, হজ্জের পর যদি অন্তরকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আল্লাহর মহব্বতের দিকে অধিক আসক্ত দেখ এবং আমল শরীয়তের নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হতে দেখ, তবে হজ্জ কবুল হয়েছে বলে ধরে নিতে পার। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার হজ্জ কবুল করেন যাকে প্রিয় মনে করেন। তিনি যাকে প্রিয় মনে করেন তার পরিচালক হয়ে যান, মহব্বতের চিহ্ন তার উপর প্রকাশ করেন এবং আপন শত্রু ইবলীসের চাপ তার উপর থেকে সরিয়ে দেন। সুতরাং এ ধরনের বিষয় প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে, হজ্জ কবুল হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ব্যাপার উল্টা হয়, তবে বিচিত্র নয়, এ সফরে দুঃখ, কষ্ট ও গ্লানি ছাড়া অন্য কিছুই অর্জিত হয়নি। (নাউযু বিল্লাহ)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম
ইমাম গায্যালী (রাহঃ)

অনুবাদ
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা
সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা ঃ ৫৫-বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন
(দ্বিতীয় খণ্ড)

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ
মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ
রমযান ১৪০৭ হিজরী

৬ষ্ঠ সংস্করণ
জমাদিউস সানী ১৪২৬ হিজরী
জুলাই ২০০৫ ইংরেজী
আষাঢ় ১৪১২ বাংলা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৭০.০০ টাকা

ISBN : 984-8631-021-5

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের আরজ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল্-গায্যালী রচিত 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীনঃ বিগত আট শতাধিক বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তাঁর এ অমরগ্রন্থ যেমন এক পথভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসিলম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গায্যালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য আমীর-ওমারাগণের মতই তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল বর্ণাঢ্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের ব্যাপক স্খলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতো। ইহুদী-নাসারাদের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন কোন সময় এ চিন্তা তাঁকে আত্মহারা করে ফেলতো। এ ভাবনা-চিন্তারই এক পর্যায়ে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে মৃতকল্প মুসলিম জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করে তোলা একমাত্র দ্বীনের স্বল্প আবে হায়াত পরিবেশনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর তা বিলাসপূর্ণ জীবনের অর্গলে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে পরিবার-পরিজন এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যাঁর সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আব্রু ঢেকে দিনের পর দিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জীবনে ইমাম সাহেব পবিত্র মক্কা, মদীনা, বাইতুল মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দামেশকের জামে মসজিদের মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইমাম সাহেবের এ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল এহইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা। এ গ্রন্থে ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ তাঁকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

এ মহাগ্রন্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পট-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আউয়ুবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান– যাঁদের নিয়ে মুসিলম উম্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গায্যালীর ভাবশিষ্য, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ভক্ত পাঠক।

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড অনুবাদের প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে চাই, এ মহাগ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই আমরা এ কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংস্করণে যথাসাধ্য সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশান্স থেকে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোরআন তেলাওয়াতের আদব	৯
কোরআন মজীদের ফযীলত	১০
গাফেলের তেলাওয়াতের নিন্দা	১৪
তেলাওয়াতের বাহ্যিক আদব	১৬
তেলাওয়াতের আভ্যন্তরীণ আদব	২৯
বিবেকের সাহায্যে কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গ	৫৩

নবম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
যিকির ও দোয়া	৬৯
যিকিরের ফযীলত	৬৯
মজলিসে যিকিরের ফযীলত	৭৩
লা-ইলাহা ইল্লাহ'র ফযীলত	৭৫
দোয়ার ফযীলত ও আদব	৮৯
দোয়ার আদব দশটি	৯০
দরূদের ফযীলত	১০১
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া	১১১
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া	১১৫
হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ)-এর দোয়া	১১৬
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দো৷	১১৬
হযরত কাবিসা বিন মোখরেক (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া	১১৮
হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া	১১৯
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া	১২০
হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া	১২০
হযরত খিযির (আঃ)-এর দোয়া	১২১
হযরত মারূফ কারখী (রঃ)-এর দোয়া	১২১
হযরত ওতবা (রঃ)-এর দোয়া	১২২
হযরত আদম (আঃ)-এর	১২২
হযরত আলী (রাঃ)-এর দোয়া	১২৩
হযরত সোলাইমান তাইমী (রঃ)-এর দোয়া	১২৪

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়	পৃষ্ঠা
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত দোয়া	১২৬
বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া	১৩৮
বাজারে প্রবেশের দোয়া	১৩৯
দশম অধ্যায়	
ওযিফা ও রাত্রি জাগরণের ফযীলত	১৪৩
ওযিফার ফযীলত ও ধারাবাহিকতা	১৪৪
ওযিফার সময় ক্রমবিন্যাস	১৪৯
দিনের ওযিফাসমূহের ক্রমবিন্যাস	১৪৯
ওযিফার কলেমা দশটি	১৫৩
অবস্থাভেদে ওযিফার প্রকার	১৭৮
মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী এবাদতের ফযীলত	১৮৪
রাত জাগরণ ও এবাদতের ফযীলত	১৮৬
বাত জাগরণ সহজ হওয়ার আভ্যন্তরীণ শর্ত	১৯২
রাতের সময় বন্টন	১৯৪
বছরের উৎকৃষ্ট দিন ও রাত	১৯৬
আহার গ্রহণ	১৯৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	
একা খাওয়ার আদব	২০০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব	২১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মেহমানের সামনে খানা পেশ করা	২১৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
দাওয়াতের আদব	২২০
দাওয়াত কবুল করার আদব পাঁচটি	২২২
দাওয়াত খাওয়ার জন্যে উপস্থিতির আদব	২২৬
খাদ্য আনার আদব	২২৭
একাদশ অধ্যায়	
বিবাহ	২৩৬
বিবাহের ফযীলত ও বিবাহের প্রতি বিমুখতা	২৩৬
বিবাহের ফযীলত সংক্রান্ত সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহ	২৩৯
বিবাহের উপকারীতা	২৪২
বিবাহের কারণে সৃষ্ট বিপদাপদ	২৫৪

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বিবাহ বন্ধনে শর্ত চতুষ্টয়	২৬১
বিবাহ বন্ধনের আদব	২৬১
কনের অবস্থা	২৬২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
পারস্পরিক জীবনযাপনের আদব	২৭২
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক	২৯৬
জীবিকা উপার্জন	৩০৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জীবিকা উপার্জনের ফযীলত	৩০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ব্যবসা বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী	৩১১
বায়ে সলম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের দশটি শর্ত	৩১৭
ইজারা বা ভাড়ায় ক্রয়	৩১৮
মুযারাবা	৩২০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
লেনদেন সুবিচারের গুরুত্ব এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা	৩২৩
চতর্থ পরিচ্ছেদ	
লেনদেনে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা	৩৩৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
ব্যবসায়ীদের জন্য জরুরী দিকনির্দেশনা	৩৪১
দ্বাদশ অধ্যায়	
হালাল ও হারাম	৩৪৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	
হালালেল ফযীলত ও হারামের নিন্দা	৩৪৮
হালাল হরামের প্রকারভেদ	৩৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের স্তর ও স্থানভেদ	৩৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
প্রাপ্ত ধন সম্পদ যাচাই করা জরুরী	৩৬৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে তওবাকারীর মুক্তির উপায়	৩৭৩

www.islamfind.wordpress.com

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকীয় পুরস্কার ও ভাতার বিবরণ ৩৮০

রাজকীয় আমদানীর খাত ৩৮০

ষষ্ট পরিচ্ছেদ

যালেম শাসকের সাথে মেলামেশার স্তর ৩৯২

বাদশাহের কাছ থেকে সরে থাকা ৩৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপস্থিত জরুরী মাসআলা ৪১১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সঙ্গ, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব ৪১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফযীলত এবং শর্ত ৪১৮

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব ৪২৬

আল্লাহ'র জন্যে শত্রুতা ৪৩৩

আল্লাহর জন্য শত্রুতার স্তর ৪৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহচর্য ও বন্ধুত্বের কর্তব্য ৪৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ মুসলমান ভাই ও প্রতিবেশীর হক ৪৮৮

মুসলমান ভাইয়ের হক ৪৯০

প্রতিবেশীর হক ৫২৩

সন্তান ও পিতামাতার হক ৫২৯

গোলাম ও চাকরের হক ৫৩৩

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অষ্টম অধ্যায়

কোরআন তেলাওয়াতের আদব

প্রকাশ থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি নবী করীম (সাঃ) দ্বারা তাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং অবতীর্ণ কিতাব কোরআন দ্বারা তাদের উপর আনুগত্যের দায়িত্ব চাপিয়েছেন। কোরআন এমন এক ঐশীগ্রন্থ, যার মধ্যে অগ্র বা পশ্চাৎ থেকে মিথ্যা অনুপ্রবেশ করে না। চিন্তাশীলদের জন্যে এর কিস্সা-কাহিনী ও বর্ণনা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে বিধি-বিধানের বিশদ বর্ণনা এবং হালাল হারাম পৃথকীকরণের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে বিধায় এর মাধ্যমে সরল সঠিক পথে চলা সহজতর হয়ে গেছে। কোরআনই সত্যিকার আলো-নূর। এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ঈমান ও তওহীদে ব্যাধি দেখা দিলে তা থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। উদ্ধতদের মধ্যে যে এই কোরআনের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ তাআলা তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। যে এই গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করেছে, সে আল্লাহর নির্দেশ থেকে পথভ্রান্ত হয়েছে। হাবলে মতীন (সুদৃঢ় রশি), নূরে মুবীন (প্রোজ্জ্বল আলো) এবং ওরওয়া ওসকা (মজবুত বন্ধন)-এর বিশেষণ এবং স্বল্প-বিস্তর ও ছোট-বড় সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করা এর কাজ। এর বৈচিত্র্যাবলীর না আছে কোন শেষ এবং জ্ঞানীদের কাছে এর উপকারিতাসমূহের না আছে কোন চূড়ান্ত সীমা। তেলাওয়াতকারীদের কাছে অধিক তেলাওয়াতে একে পুরানো মনে হয় না; বরং প্রতিবারই নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থই পূর্ববর্তী সকল মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছে। জ্বিনরা এ কিতাব শ্রবণ করে দ্রুত তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এভাবে তাদেরকে অবহিত করে ঃ

فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ـ

অর্থাৎ তারা বলল ঃ আমরা এক অত্যাশ্চর্য কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সৎপথে পরিচালনা করে। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন থেকে আমরা আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

যে এ গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনে, সে-ই তওফীকপ্রাপ্ত এবং যে এতে বিশ্বাসী হয়, সে-ই সত্যায়নকারী; যে একে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, সে হেদায়াত পায় এবং যে এর নীতি পালন করে সে ভাগ্যবান ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।

মানুষের অন্তরে ও সহীফাতে একে সংরক্ষিত রাখার উপায় হচ্ছে দৈনন্দিন তেলাওয়াত, এর আদব ও শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমল এবং শিষ্টাচার পালন করা। এ কারণেই এসব বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা জরুরী। নিম্নে চারটি শিরোনাম এসব দিয়ে বর্ণিত হবে।

কোরআন মজীদের ফযীলত

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করার পর মনে করে, কেউ হয়তো তার চেয়ে বেশী সওয়াব লাভ করেছে, সে ঐ বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে করে, যা আল্লাহ্ বৃহৎ করেছেন।

০ কেয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী কোরআন অপেক্ষা বড় মর্তবার হবে না-না কোন নবী, না ফেরেশতা এবং না অন্য কোন ব্যক্তি।

০ যদি কোরআন চামড়ার মধ্যে থাকে, তবে তাতে আগুন লাগবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

○ আমার উম্মতের উত্তম এবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত।

○ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা সূরা তোয়াহা ও ইয়াসীন পাঠ করেন। ফেরেশতারা শুনে বলল ঃ এই কোরআন যাদের প্রতি অবতীর্ণ হবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। যে সকল অন্তর একে হেফ্য করবে তারা এবং যে সকল মুখে এটি পঠিত হবে তারা কত সুখী।

○ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কোরআন শেখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।

○ আল্লাহ বলেন ঃ কোরআন পাঠ যে ব্যক্তিকে আমার কাছে সওয়াল ও দোয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে শোকরকারীদের চেয়ে উত্তম সওয়াব দান করি।

কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি কাল মেশকের স্তূপের উপর অবস্থান করবে। তারা ভীত হবে না এবং তাদের কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে না যে পর্যন্ত না অন্য লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারাদি সম্পন্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন পাঠ করে, মানুষের ইমাম হয় এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

○ কোরআন তেলাওয়াত কর এবং মৃত্যুকে স্মরণ কর।

○ গায়িকা বাঁদীর গান তার মালিক যতটুকু শুনে, আল্লাহ্ কারীর কোরআন পাঠ তার চেয়ে অধিক শুনেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন পাঠ কর এবং ঝুলন্ত কোরআন যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে; অর্থাৎ কোরআন তোমার কাছে আছে এটাই যথেষ্ট মনে করো না। কারণ, যে অন্তর কোরআনের পাত্র, আল্লাহ্ তাকে আযাব দেন না।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা কর, তখন কোরআন অধ্যয়ন কর। কেননা, এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। এটাও তাঁরই উক্তি যে, তোমরা কোরআন পাঠ কর। তোমরা এর প্রত্যেকটি হরফের বদলে দশটি করে সওয়াব পাবে। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম এক হরফ; বরং আলিফ এক হরফ,লাম দ্বিতীয় হরফ এবং মীম তৃতীয় হরফ। তিনি আরও বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজের কাছে দরখাস্ত করে তখন যেন কোরআনেরই দরখাস্ত করে। কারণ, কোরআনের সাথে মহব্বত রাখলে আল্লাহ ও রসূলের সাথে মহব্বত রাখবে। পক্ষান্তরে কোরআনের প্রতি শত্রুতা রাখলে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি শত্রুতা রাখবে।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত জান্নাতের এক একটি স্তর এবং তোমাদের গৃহের প্রদীপ। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, তার উভয় পার্শ্বে নবুওয়ত লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। পার্থক্য হল তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ যে গৃহে কোরআন পঠিত হয়, গৃহবাসীদের জন্য সেটি প্রশস্ত হয়ে যায়, তার কল্যাণ বেড়ে যায় এবং তাতে ফেরেশতা আগমন করে ও শয়তান বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কোরআন পাঠ করা হয় না, সেই গৃহবাসীদের জন্য সেটি সংকীর্ণ হয়ে যায়, তার কল্যাণ হ্রাস পায় এবং ফেরেশতা চলে যায় ও শয়তান এসে বাসা বেঁধে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম ঃ ইলাহী, যে সকল বিষয় দ্বারা তোমার নৈকট্য অর্জন করা হয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তম কোন্ বিষয়টি? আল্লাহ বলেন ঃ হে আহমদ , সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে আমার কালাম দ্বারা নৈকট্য অর্জন করা। আমি বললামঃ ইলাহী, অর্থ বুঝে, না অর্থ বুঝা ছাড়াই? আদেশ হল ঃ উভয় প্রকারে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার কোরআন পাঠ শুনবে, তখন মনে হবে যেন তারা ইতিমধ্যে তেমনটি আর শুনেনি।

ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরানের হাফেয তার এমন হওয়া উচিত যে, বাদশাহ থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কারও কাছে তার কোন প্রয়োজন নেই; বরং সকল মানুষ তারই মুখাপেক্ষী। তিনি আরও বলেনঃ কোরআনের হাফেয ইসলামের ধ্বজাধারী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার উচিত ক্রীড়াকৌতুক ও বাজে বিষয়াদিতে মশগুল না হওয়া। এটাই কোরআনের তাযীমের দাবী।

সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন কোরআন পাঠ করে, তখন ফেরেশতা তার উভয় চোখের মাঝখানে চুম্বন করে। আমর ইবনে মায়মুন বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযান্তে কোরআন খুলে একশ আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর আমলের সমান সওয়াব দান করেন।

বর্ণিত আছে, খালেদ ইবনে ওকবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ আমার সামনে কোরআন পাঠ করুন। তিনি إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। খালেদ আরজ করলেন ঃ আবার পাঠ করুন। তিনি পুনরায় পাঠ করলেন। খালেদ বললেন ঃ এতে মিষ্টতা ও মাধুর্য আছে। এর নিম্নভাগ বৃষ্টির মত বর্ষণ করে এবং উপরিভাগ অনেক ফলবান। এটা মানুষের কথা নয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, কোরআনের চেয়ে বেশী মূল্যবান কোন সম্পদ নেই এবং এরপরে কোন অভাবও নেই। ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা হাশরের শেষভাগ সকাল বেলায় পাঠ করে এবং সেদিন মারা যায়, তার জন্যে শহীদের মোহর অংকিত হবে। যে বিকাল বেলায় পাঠ করে এবং সে রাতে মারা যায়, তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে।

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি জনৈক আবেদকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এখানে তোমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী কেউ নেই? সে কোরআন মজীদের দিকে হাত বাড়িয়ে সেটি আপন কাঁধে রাখল এবং বলল ঃ এটি আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্লেষ্মা দূর হয়- মেসওয়াক করা, রোযা রাখা এবং কোরআন পাঠ করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গাফেলদের তেলাওয়াতের নিন্দা ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ অনেক মানুষ কোরান তেলাওয়াত করে, অথচ কোরআন তাদেরকে অভিসম্পাত করে।

মায়সারা বলেন ঃ পাপাচারী ব্যক্তির পেটে কোরআন মুসাফির ও অসহায়।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ কোরআনের হাফেয যখন কোরআন পাঠের পর আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তখন দোযখের ফেরেশতা মূর্তিপূজারীদের তুলনায় এরূপ হাফেযকে দ্রুত পাকড়াও করে।

জনৈক আলেম বলেন ঃ যখন কেউ কোরান পাঠ করে, এর পর অন্য কথাবার্তা তাতে মিলিয়ে দেয় এবং পুনরায় কোরআন পাঠ করতে থাকে, তখন তাকে বলা হয়– আমার কালামের সাথে তোর কি সম্পর্ক?

ইবনে রিমাহ্ বলেন ঃ আমি কোরআন হেফয করে অনুতাপ করেছি। কেননা, আমি শুনেছি, কেয়ামতে কোরআন ওয়ালাদেরকে সেই প্রশ্ন করা হবে, যা পয়গম্বরগণকে করা হবে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের হাফেযকে অনেকভাবে চেনা যায়– রাতে, যখন মানুষ নিদ্রিত থাকে, (২) দিনে, যখন মানুষ ত্রুটি করে, (৩) তার দুঃখে যখন মানুষ আনন্দিত হয়, (৪) তার কান্নার কারণে যখন মানুষ হাসে, (৫) তার চুপ থাকার কারণে যখন মানুষ এদিকে ওদিকের বাক্যালাপে মশগুল হয় এবং (৬) তার বিনয়ের কারণে যখন মানুষ অহংকার করে। হাফেযের উচিত অধিক চুপ থাকা এবং নম্র হওয়া- নির্দয়, কথায় বাধাদানকারী, হট্টগোলকারী ও কঠোর হওয়া উচিত নয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এই উম্মতের অধিকাংশ মোনাফেক কারী হবে। তিনি আরও বলেন ঃ যে পর্যন্ত কোরআন তোমাকে মন্দ কাজ করতে বারণ করে, সে পর্যন্ত কোরআন পাঠ কর। কোরআনের তেলাওয়াত মন্দ কাজে বাধা না দিলে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো না। অর্থাৎ এরূপ পড়া ও না-পড়া সমান। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোরআনের হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করে, কোরআনের সাথে তার পরিচয় হয়নি। জনৈক মনীষী বলেন ঃ বান্দা এক সূরা তেলাওয়াত শুধু করে আর ফেরেশতা তার জন্যে রহমতের দোয়া করে। সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই দোয়া চলে। কতক বান্দা সূরা শুরু করে এবং ফেরেশতা সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অভিসম্পাত করে। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এরূপ হয় কেন? তিনি বললেন ঃ কোরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানলে ফেরেশতা রহমতের দোয়া করে, নতুবা অভিসম্পাত করে।

জনৈক আলেম বলেন ঃ মানুষ কোরান তেলাওয়াত করে এবং অজ্ঞাতে নিজেকে অভিসম্পাত করে। অর্থাৎ সে বলে ঃ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ। খবরদার, যালেমের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, অথচ যালেম সে নিজেই। সে নিজের উপর যুলুম করে। সে আরও বলে ঃ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ। খবরদার মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত; অথচ সে নিজেই একজন মিথ্যাবাদী। হযরত হাসান বসরী বলেনঃ তোমরা কোরআনকে মনযিল এবং রাত্রিকে উট সাব্যস্ত করেছ। উটে সওয়ার হয়ে মনযিল অতিক্রম কর। তোমাদের পূর্ববর্তীরা কোরআনকে পালনকর্তার ফরমান মনে করত। তারা রাতে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করত এবং দিনে তা পালন করত।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন অনুযায়ী আমল করার জন্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু লোকেরা এর পড়া ও পড়ানোকেই আমল মনে করে নিয়েছে। এক ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআন পাঠ করে এবং এর একটি হরফও ছাড়ে না; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না।

হযরত ইবনে ওমর ও জুন্দুব (রাঃ)-এর হাদীসে আছে– আমাদের এত বয়স হয়েছে। আমাদের সময়ে মানুষ কোরআনের পূর্বে ঈমান লাভ করত। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কোন সূরা নাযিল হত, তখন তারা সেই সূরার হালাল ও হারাম শিখত, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবগত হত এবং বিরতির স্থান সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করত; কিন্তু এর পরে আমরা এমন লোক দেখেছি যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়েছে। তারা আলহামদু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত পড়ে যায়; কিন্তু এতে আদেশ নিষেধের আয়াত কোন্‌টি এবং বিরতির জায়গা কোথায় তা কিছুই বুঝে না, ব্যস কেবল ঘাসের মত কেটে চলে যায়।

তওরাতে বর্ণিত আছে– আল্লাহ বলেন ঃ হে আমার বান্দারা, তোমাদের লজ্জা নেই; পথে চলা অবস্থায় যদি কারও চিঠি তোমাদের হাতে আসে, তোমরা পথের পার্শ্বে চলে যাও এবং চিঠির এক একটি শব্দ পাঠ কর। তার কোন মর্ম ছাড় না। অথচ আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব নাযিল করেছি। এতে এক একটি বিষয় একাধিকবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করেছি, যাতে তোমরা তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হৃদয়ঙ্গম কর; কিন্তু তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি কি তোমাদের কাছে পত্রদাতার চেয়ে অধম হয়ে গেলাম? তার পত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ কর আর আমার কিতাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর? তোমাদের কোন ভাই মাঝখানে কথা বললে তাকে থামিয়ে দাও। আমিও তোমাদের প্রতি অভিনিবেশ করি এবং তোমাদের সাথে কথা বলি; কিন্তু তোমরা মনে প্রাণে আমার দিক থেকে বিমুখ থাক। আমার মর্যাদা কি তোমাদের ভাইয়ের সমানও নয়?

তেলাওয়াতের বাহ্যিক আদব

যে তেলাওয়াত করবে, তার ওযু থাকতে হবে। সে দন্ডায়মান হোক অথবা উপবিষ্ট, উভয় অবস্থায় আদব ও গাম্ভীর্য থাকতে হবে। চারজানু হয়ে, বালিশে হেলান দিয়ে অহংকারের ভঙ্গিতে বসবে না। একাকী এমনভাবে বসবে, যেমন ওস্তাদের সামনে বসা হয়। তেলাওয়াতের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করা। এরূপ তেলাওয়াত সর্বোত্তম আমল। যদি ওযু ছাড়া শুয়ে শুয়ে কোরআন পড়া হয়, তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ওযুসহ দাঁড়িয়ে পড়ার মত সওয়াব হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যারা আল্লাহর যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে, পার্শ্বের উপর শুয়ে এবং পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর সৃজন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

এ আয়াতে সকল অবস্থারই প্রশংসা করা হয়েছে; কিন্তু দাঁড়িয়ে যিকির করার কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে, সে প্রত্যেক হরফের বদলে একশ'টি সওয়াব পায়। যে নামাযে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে সে প্রত্যেক হরফের বদলে পঞ্চাশটি সওয়াব পায় এবং যে ওযু ছাড়া পাঠ করে সে দশটি নেকী পায়। রাতের বেলায় নামাযে দাঁড়িয়ে পড়া সর্বোত্তম। কেননা, রাতের বেলায় মন খুব একাগ্র থাকে । হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ রাতের বেলায় বেশীক্ষণ দাঁড়ানো ভাল এবং দিনের বেলায় অধিক সেজদা ভাল। কেরাআত কম-বেশী পাঠ করার ব্যাপারে মানুষের অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন। কেউ দিবারাত্রির মধ্যে এক খতম করে, কেউ দু'খতম এবং কেউ তিন খতম পর্যন্ত করেছেন। আবার কেউ এক মাসে এক খতম করে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি অনুসরণ করা উত্তম ঃ من قرا القران فى اقل من ثلاث لم يفقهه -

যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কোরআন খতম করে, সে কোরআন বুঝে না। কারণ, এর বেশী পাঠ করা যথার্থ তেলাওয়াতের পরিপন্থী। হযরত আয়েশা (রাঃ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে শুনলেন, সে অত্যন্ত দ্রুত কোরআন পাঠ করে । তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি কোরআনও পড়ে না- চুপ করেও থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে ওমরকে বললেন ঃ সপ্তাহে এক খতম কর। কয়েকজন সাহাবী এরূপই করতেন। যেমন হযরত ওসমান (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), ইবনে মসউদ (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ। মোট কথা, কোরআন খতমের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম, দিবা-রাতে এক খতম করা। একে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন। দ্বিতীয়, প্রত্যহ এক পারা পড়ে মাসে এক খতম করা। এ পরিমাণটি খুবই কম, যেমন প্রথমটি খুবই বেশী। তৃতীয়, সপ্তাহে এক খতম করা। চতুর্থ, সপ্তাহে দু'খতম করা, যাতে তিন দিনের কাছাকাছি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সময়ে এক খতম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মোস্তাহাব হচ্ছে, এক খতম দিনে শুরু করবে এবং এক খতম রাতে। দিনের খতমকে সোমবারে ফজরের দু'রাকআতে অথবা দু'রাকআতের পরে আর রাতের খতম জুমআর দিনের রাতে মাগরিবের দু'রাকআতে অথবা দু'রাকআতের পরে সমাপ্ত করবে। যাতে দিনের শুরুতে এবং রাতের শুরুতে উভয় খতম সমাপ্ত হয়। কেননা, রাতে খতম হলে ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াতকারীর জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং দিনে খতম হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দোয়া করতে থাকে। সুতরাং দিন ও রাত্রির শুরুভাগে খতম করার ফায়দা এই যে, ফেরেশতাদের দোয়ার বরকত সমগ্র রাত ও দিনে পরিব্যাপ্ত হবে।

কতটুকু পড়তে হবে, এর বিবরণ হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী যদি আবেদ হয় এবং আমলের সাহায্যে আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করতে চায়, তবে এক সপ্তাহে দু'খতমের কম পড়বে। আর যদি শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে এক সপ্তাহে এক খতম করলেও দোষ নেই। যদি কেউ কোরআনের অর্থে চিন্তাভাবনা করে তেলাওয়াত করে, তবে একমাসে এক খতমই যথেষ্ট । কারণ, তাকে বার বার পড়তে হবে এবং অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

যে ব্যক্তি সপ্তাহে এক খতম করবে, সে কোরআনকে সাতটি মনযিলে ভাগ করে নেবে। সাহাবায়ে কেরামও এরূপ মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত ওসমান (রাঃ) জুমআর রাতে শুরু থেকে সূরা মায়েদার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন এবং শনিবার রাতে আনআম থেকে সূরা হুদ পর্যন্ত, রবিবার রাতে সূরা ইউসুফ থেকে মারইয়াম পর্যন্ত, সোমবার রাতে তোয়াহা থেকে কাসাস পর্যন্ত, মঙ্গলবার রাতে আনকাবুত থেকে সোয়াদ পর্যন্ত, বুধবার রাতে যুমার থেকে আররাহমান পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াকেয়া থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ইবনে মসউদও সাত মনযিলেই তেলাওয়াত সমাপ্ত করতেন; কিন্তু তাঁর ক্রম পৃথক ছিল । কোরআনের সাতটি মনযিল রয়েছে– প্রথম মনযিল সূরা ফাতেহা থেকে তিন সূরার,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় মনযিল পাঁচ সূরার, তৃতীয় মনযিল সাত সূরার, চতুর্থ মনযিল নয় সূরার, পঞ্চম মনযিল এগার সূরার, ষষ্ঠ মনযিল তের সূরার এবং সপ্তম মনযিল সূরা কাফ থেকে পরবর্তী সূরাসমূহের। এটা কোরআনের এক পঞ্চমাংশ, এক দশমাংশ ও অন্যান্য অংশে বিভক্ত হওয়ার পূর্বেকার কথা। এগুলো পরবর্তী সময়ে স্থিরীকৃত হয়েছে।

লেখার ব্যাপারে মোস্তাহাব হচ্ছে, কোরআন মজীদ পরিষ্কার ও ঝকঝকে অক্ষরে লেখবে। লাল কালি দিয়ে নোক্তা ও চিহ্ন সংযোজন করায় দোষ নেই । এ কাজ পাঠককে ভুল পাঠ থেকে রক্ষা করে। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন (রঃ) কোরআন মজীদকে এক পঞ্চমাংশ, এক দশমাংশ ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করা খারাপ মনে করতেন। শা'বী ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরাও লাল কালি দিয়ে নোক্তা সংযোজন করতেন। তাঁরা বলতেন ঃ কোরআন মজীদকে পরিষ্কার ও ঝকঝকে রাখ। যাঁরা এসব বিষয় মাকরূহ বলতেন, সম্ভবতঃ তাঁদের যুক্তি ছিল, এভাবে ক্রমশঃ বাড়াবাড়ির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তাই এতে কোন দোষ না থাকলেও বাড়াবাড়ির পথ রুদ্ধ করা এবং পরিবর্তনের কবল থেকে কোরআনকে রক্ষা করার জন্যে তারা নোক্তা সংযোজন করাও মাকরূহ বলতেন; কিন্তু যেক্ষেত্রে এসব দ্বারা কোন অনিষ্ট হয়নি এবং সকলের মতে স্থির রয়েছে যে, এগুলো দ্বারা অক্ষর সনাক্ত করা সহজ হয়, তখন এগুলোর ব্যবহারে কোন দোষ নেই এবং এগুলো নবাবিষ্কৃত হওয়ায়ও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেননা, অধিকাংশ নবাবিষ্কৃত বিষয় ভাল। সেমতে তারাবীহ্ সম্পর্কে বলা হয়, এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আবিষ্কার এবং চমৎকার আবিষ্কার । এটা ভাল বেদআত । খারাপ বেদআত সে বেদআতকে বলা হয় যা সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায় এবং সুন্নতকে বদলে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলতেন– আমি নোক্তা সংযোজিত কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকি; কিন্তু নিজে তাতে সংযোজন করি না। আওযায়ী ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেন– কোরআন প্রথমে মাসহাফের মধ্যে সাফ (নোক্তাবিহীন) ছিল। সর্বপ্রথম তাতে 'বা' ও 'তা'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অক্ষরে নোক্তা সংযোজন করা হয়। এতে কোন দোষ নেই; বরং এটা কোরআনের আলো। এর পর আয়াতের শেষে বড় বিন্দু আবিষ্কৃত হয়। এতেও কোন দোষ নেই। এর মাধ্যমে আয়াতসমূহের শুরু জানা যায়। এর পর শেষ ও সূচনার চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হয়।

আবু বকর বযলী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মাসহাফে এ'রাব (স্বরচিহ্ন তথা যের, যবর, পেশ) সংযোজন করা কেমন? তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই।

খালেদ খাদ্দা বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে সিরীনের খেদমতে হাযির হয়ে দেখি, তিনি এ'রাব সংযোজিত কোরআন মজীদ পাঠ করছেন। অথচ তিনি এ'রাবকে খারাপ মনে করতেন। কথিত আছে, এ'রাব হাজ্জাজের আবিষ্কৃত । সে কারীদেরকে একত্রিত করে। তারা কোরআনের শব্দ ও অক্ষর গণনা করে তা সমান ত্রিশ পারায় ভাগ করে এবং এক চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ ইত্যাদি চিহ্ন সংযুক্ত করে।

কোরআন মজীদ থেমে থেমে উত্তমরূপে পড়া মোস্তাহাব। কেননা পড়ার উদ্দেশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা। থেমে থেমে উত্তমরূপে পড়লে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাওয়া যায়। এ কারণেই হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কেরাআতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ দ্রুতবেগে সমগ্র কোরআন পড়ে যাওয়ার তুলনায় থেমে থেমে কেবল সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান পাঠ করা আমার কাছে অধিক ভাল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি যদি সূরা যিলযাল ও সূরা কারেয়া বুঝে শুনে পাঠ করি, তবে এটা সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান টেনে হেঁচড়ে পাঠ করার চেয়ে উত্তম মনে করি। মুজাহিদ (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দু'ব্যক্তি নামাযে একত্রে দাঁড়িয়ে একজন কেবল সূরা বাকারা পাঠ করল এবং অন্যজন সমগ্র কোরআন পড়ে নিল। তাদের মধ্যে কে বেশী সওয়াব পাবে ? তিনি বললেন ঃ উভয়েই সমান সওয়াব পাবে। স্মর্তব্য, অর্থ বুঝার কারণেই কেবল থেমে থেমে পড়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোস্তাহাব নয়। কেননা, যে ব্যক্তি আরব নয়, সে আরবী ভাষা বুঝে না। সে কোরআনের অর্থ কিরূপে বুঝবে? অথচ থেমে থেমে পড়া তার জন্যও মোস্তাহাব । আসলে থেমে থেমে পড়ার মধ্যে কোরআনের সম্মান ও ইজ্জত বেশী হয়। দ্রুত পড়ার তুলনায় এর তাসিরও বেশী হয়।

তেলাওয়াতের সাথে ক্রন্দন করা মোস্তাহাব । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন পড় আর ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে না পার তবে কাঁদার মত আকৃতি ধারণ কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালেহ মুররী বলেন ঃ আমি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে কোরআন পড়েছি। তিনি শুনে বললেন ঃ সালেহ, এটা তো কেরাআত হল। কান্না কোথায়? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি সেজদার আয়াত পাঠ কর, তখন না কেঁদে সেজদা করো না। যদি তোমাদের কারও চোখ থেকে অশ্রু বের না হয়, তবে অন্তরে ক্রন্দন করা উচিত। ইচ্ছা করে কান্নার উপায় হচ্ছে মনে বেদনাবোধ উপস্থিত করা। কেননা, বেদনা থেকেই কান্নার উৎপত্তি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন বেদনা সহকারে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমরা সেভাবেই কোরআন পড়। মনে বেদনাবোধ উপস্থিত করার পন্থা হচ্ছে কোরআনের ধমক, সতর্কবাণী, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা এবং কোরআনের আদেশ নিষেধ পালনে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি'র কথা চিন্তা করা। এতে অবশ্যই দুঃখ কান্না সৃষ্টি হবে। যদি এর পরও দুঃখ ও কান্না অন্তরে উপস্থিত না হয়, তবে তা অন্তরের একান্ত কঠোর হওয়ার আলামত। এ জন্যও ক্রন্দন করা উচিত।

আয়াতসমূহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ, সেজদার আয়াত পাঠ করলে সেজদা করবে অথবা অন্যের কাছে সেজদার আয়াত শুনলে যখন সে সেজদা করে, তখন শ্রোতাও করবে। তবে সেজদা করার জন্যে ওযু থাকা শর্ত। কোরআন মজীদে চৌদ্দটি সেজদার আয়াত আছে। সূরা হজ্জে দু'টি এবং সূরা সোয়াদে সেজদা নেই। [ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর মতেও মোট সেজদা চৌদ্দটি ; কিন্তু সূরা হজ্জের দু'টির স্থলে প্রথমটি এবং সূরা সোয়াদে একটি।] এ সেজদার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাটিতে কপাল ঠেকানো এবং সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে তকবীর বলে সেজদা করা। সেজদার মধ্যে সেজদার আয়াতের সাথে মিল রেখে দোয়া করবে। উদাহরণতঃ যখন এই আয়াত পড়বে– خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পালনকর্তার প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এমতাবস্থায় যে, তারা অহংকার করে না।) তখন এই দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ وَعَلٰى اَوْلِيَائِكَ ـ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সেজদাকারীদের, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমি তোমার আদেশের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের দলভুক্ত হওয়া থেকে অথবা তোমার ওলীদের উপর বড়াইকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এমনিভাবে প্রত্যেক আয়াতের সামঞ্জস্য রেখে দোয়া পড়বে।

নামাযের জন্যে যা যা শর্ত, তেলাওয়াতের সেজদার জন্যেও তা শর্ত। অর্থাৎ, সতর আবৃত করা, কেবলামুখী হওয়া, কাপড় ও দেহ পবিত্র হওয়া ইত্যাদি । সেজদার আয়াত শুনার সময় যার ওযু থাকে না, সে যখন ওযু করবে তখন সেজদা করবে। কেউ কেউ তেলাওয়াতের সেজদা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্যে বলেছেন, হাত তুলে তাহরীমার নিয়ত করার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে, এর পর সেজদার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে, এর পর মাথা তোলার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে এবং সব শেষে সালাম ফেরাবে। কেউ কেউ তাশাহ্হুদ পড়ার কথাও বলেছেন; কিন্তু নামাযের সাথে মিল দেখানো ছাড়া এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে এরূপ মিল দেখানো অবান্তর । কেননা, এতে কেবল সেজদারই আদেশ আছে। তাই এ শব্দেরই অনুসরণ করা উচিত; কিন্তু সেজদায় যাওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে শুরুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহু আকবার বলা সমীচীন। এছাড়া অন্যান্য বিষয় অবান্তর মনে হয়। তেলাওয়াত শুরু করার সময় আদব হচ্ছে একথা বলা ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করি। হে প্রভু, শয়তানদের প্ররোচনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে হে প্রভু, ওরা আমার কাছে হাযির হওয়া থেকে ।

এর পর সূরা নাস ও সূরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং প্রত্যেক সূরা শেষে বলবে ঃ

صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَلَّغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِهٖ وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা পৌঁছিয়েছেন। ইলাহী, তুমি এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত কর। এর মাধ্যমে আমাদেরকে বরকত দাও। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র । আমি শক্তিশালী চিরজীবী আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি।

তেলাওয়াতের মধ্যে তসবীহ তথা পবিত্রতাসূচক আয়াত এলে বলবে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ মহান। দোয়া এবং এস্তেগফারের আয়াত এলে দোয়া ও এস্তেগফার পড়বে। আশার আয়াত এলে আশা করবে এবং ভয়ের আয়াত এলে আশ্রয় চাইবে। এগুলো মুখে বলবে অথবা মনে মনে কামনা করবে। হযরত হুযায়ফা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা শূরু করে যখনই কোন রহমতের আয়াত পড়েছেন, রহমত প্রার্থনা করেছেন। যখনই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আযাবের আয়াত পড়েছেন, আশ্রয় চেয়েছেন এবং যখনই পবিত্রতার আয়াত পাঠ করেছেন, সোবহানাল্লাহ্ বলেছেন। তেলাওয়াত সমাপ্ত হলে পর সেই দোয়া পড়বে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খতমের সময় পড়তেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কোরআন দ্বারা আমার প্রতি রহম কর। কোরআনকে আমার জন্যে ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমতে পরিণত কর। হে আল্লাহ্, আমি এর যতটুকু বিস্মৃত হয়েছি, তা স্মরণ করিয়ে দাও, যতটুকু শিখতে পারিনি তা শিখিয়ে দাও এবং আমাকে এর তেলাওয়াত নসীব কর, দিবা ও রাত্রির ক্ষণসমূহে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায়। একে আমার জন্যে প্রমাণ বানাও হে বিশ্ব পালক!

কেরাআত এতটুকু সশব্দে পড়া অবশ্য জরুরী যতটুকুতে নিজে শুনতে পায়। কেননা, কেরাআত অর্থ সশব্দে হরফ উচ্চারণ করা। নিজে শুনা এর সর্বনিম্ন স্তর। যে কেরাআত নিজে শুনে না তা দ্বারা নামায হবে না। এতটুকু সশব্দে পড়া, যা অপরে শুনে, তা একদিক দিয়ে ভাল এবং একদিকে মন্দ । আস্তে পড়া যে মোস্তাহাব, তা এই রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় – রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আস্তে পড়া সশব্দে পড়ার উপর এমন ফযীলত রাখে, যেমন গোপনে সদকা করা প্রকাশ্যে সদকা করার উপর ফযীলত রাখে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– সশব্দে কোরআন পাঠকারী এমন, যেমন প্রকাশ্যে সদকা দানকারী। এক হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে– গোপন আমল প্রকাশ্য আমল অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী। অনুরূপভাবে আরও এরশাদ হয়েছে– خير الرزق ما يكفى وخير

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الذكر الخفى। উত্তম রিযিক যা পরিতুষ্টি আনে এবং উত্তম যিকির যা গোপনে হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে কেরাআত প্রতিযোগিতা করে সশব্দে পড়ো না। এক রাতে সায়ীদ ইবনে মূসাইয়েব (রাঃ) মসজিদে নববীতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে সজোরে কোরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। সায়ীদ ইবনে মূসাইয়েব তাঁর গোলামকে বললেন ঃ এ নামাযীর কাছে গিয়ে তাকে নীচু স্বরে কেরাআত পড়তে বল। গোলাম বলল ঃ মসজিদ তো আমাদের একার নয়। এ ব্যক্তিরও এতে নামায পড়ার অধিকার আছে। আমি কিরূপে তাকে নিষেধ করব? অতঃপর হযরত সায়ীদ উচ্চ স্বরে বললেন ঃ হে নামাযী, তোমার যদি নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে আওয়ায নীচু কর। আর যদি মানুষকে শুনানো মকসুদ হয়, তবে আল্লাহ তাআলার কাছে এটা তোমার কোন উপকারে আসবে না। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ চুপ হয়ে গেলেন। তিনি সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে জুতা নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তিনি তখন মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসক ছিলেন।

সশব্দে পড়া যে মোস্তাহাব, তা এই হাদীস দ্বারা জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কয়েকজন সাহাবীকে রাতের নামাযে সশব্দে কেরাআত পড়তে শুনে তা সঠিক বলে অভিহিত করেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠে নামায পড়ে, তখন যেন কেরাআত সশব্দে পড়ে। কেননা, ফেরেশতারা এবং সে গৃহের জ্বিনরা তার কেরাআত শুনে এবং সেই নামায তারাও পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁর তিন জন সাহাবীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তিনি হযরত আবু বকরকে খুব আস্তে আস্তে কেরাআত পড়তে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি যার সাথে কথা বলছি, তিনি অবশ্যই আমার কথা শুনেন। অতঃপর তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওমরকে সজোরে কেরাআত পড়তে দেখেন এবং-এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত ওমর বললেন ঃ আমি নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করি এবং শয়তানকে বিব্রত করি। অতঃপর তিনি হযরত বেলালকে দেখেন, তিনি এক সূরার কয়েক আয়াত এবং অন্য এক সূরার কয়েক আয়াত পাঠ করছেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের সাথে যুক্ত করছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জন সম্পর্কেই বললেন ঃ তোমরা চমৎকার কাজ করছ। যখন সরব ও নীরব উভয় প্রকার কেরাআতের পক্ষে হাদীস বিদ্যমান তখন উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, আস্তে পাঠ করা রিয়া থেকে অধিকতর দূরবর্তী । এতে কৃত্রিমতার অবকাশ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের জন্যে রিয়া ও কৃত্রিমতার আশংকা করে, তার জন্যে আস্তে পড়াই উত্তম। আর যদি কেউ এরূপ আশংকা না করে এবং সজোরে পাঠ করলে অপরের পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তবে তার জন্যে সজোরে পাঠ করা উত্তম। কেননা, এতে আমল বেশী হয় এবং এর উপকার অন্যেরাও পায়। বলাবাহুল্য, যে কল্যাণ অন্যেরাও পায়, তা সেই কল্যাণ থেকে শ্রেষ্ঠ, যা কেবল একজনে পায়। এছাড়া সরব কেরাআত পাঠকের মনকে হুশিয়ার রাখে এবং তাকে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য একাগ্র করে। আরও আশা থাকে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি কেরাআত শুনে জেগে উঠবে এবং এবাদতে মশগুল হবে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, কোন গাফেল ব্যক্তি পাঠককে দেখে হুশিয়ার হয়ে যায়। সে প্রভাবান্বিত হয় এবং কিছু করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। সুতরাং এসব নিয়তের কোন একটি নিয়ত থাকলে সরবে পাঠ করা উত্তম। । আর যদি সবগুলো নিয়তের সমাবেশ ঘটে, তবে সওয়াবও বহুগুণ বেড়ে যাবে। কেননা, নিয়ত অধিক হলে আমলও অধিক হয় এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই আমরা বলি, মাসহাফ দেখে কোরআন পাঠ করা মুখস্থ পাঠ করার চেয়ে উত্তম। কেননা, এতে চোখের দেখা অতিরিক্ত আমল । তাই সওয়াবও অতিরিক্ত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ দেখে কোরআন পাঠ করার সওয়াব সাত গুণ বেশী । কেননা, মাসহাফ দেখাও এবাদত। হযরত ওসমান (রাঃ) এত বেশী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাসহাফ দেখে তেলাওয়াত করতেন যে, তাঁর কাছে দু'টি মাসহাফ ছিঁড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সাহাবী দেখেই কোরআন পাঠ করতেন। যেদিন মাসহাফ দেখা হত না, সেদিনকে তাঁরা খারাপ মনে করতেন। মিসরের জনৈক ফেকাহ্‌বিদ সেহরীর সময় হযরত ইমাম শাফেয়ীর কাছে আগমন করেন। তখন তাঁর সামনে কোরআন খোলা ছিল। ইমাম শাফেয়ী ফেকাহ্‌বিদকে বললেন ঃ ফেকাহ্ তোমাকে কোরআন থেকে বিরত রেখেছে। আমাকে দেখ, আমি এশার নামায পড়ে সামনে কোরআন রাখি, আর ভোর পর্যন্ত তা বন্ধ করি না। মধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করা এবং সাজিয়ে গুছিয়ে কেরাআত উচ্চারণ করা উচিত; কিন্তু অক্ষরগুলো এত বেশী টেনে পড়া উচিত নয় যাতে শব্দ বদলে যায় অথবা তার গাঁথুনি বিনষ্ট হয়ে যায়; বরং এক প্রকার সজ্জিত করে কেরআন পাঠ করবে। এটা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ زينوا القران باصواتكم

তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কোরআনকে সজ্জিত কর। তিনি আরও বলেন ঃ ما اذن الله لشئ ما اذن لنبى يتغنى بالقران

আল্লাহ্ তাআলা কোন বিষয়ের এতটুকু আদেশ দেননি, যতটুকু সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়ার জন্যে কোন পয়গম্বরকে আদেশ দিয়েছেন। আরও এরশাদ হয়েছে– ليس منا من لم يتغنى بالقران যে সুললিত স্বরে কোরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বর্ণিত আছে, এক রাতে রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি অনেক বিলম্বে আগমন করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি এক ব্যক্তির কেরাআত শুনছিলাম। এমন মধুর কণ্ঠ ইতিপূর্বে আমি শুনিনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উঠে সেখানে পৌঁছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লোকটির কেরাআত শুনে ফিরে এলেন। অতঃপর বললেন ঃ লোকটি আবু হুযায়ফার মুক্ত গোলাম। আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন। অন্য এক রাতে রসূলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আকরাম (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদের তেলাওয়াত শ্রবণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনার পর তিনি বললেন ঃ

من اراد ان يقرا القران عفنا كما انزل فليقراه على قراءة ابن عم عبد -

যে ব্যক্তি ধীরে ও সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পড়তে চায়, যেমনটি অবতীর্ণ হয়েছে, সে যেন ইবনে মসঊদের কেরাআতের মত করে পড়ে।

একবার রসূলে করীম (সাঃ) ইবনে মসঊদকে বললেন ঃ আমাকে কোরআন শুনাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি তো কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আপনাকে শুনাব কি করে? তিনি বললেন ঃ অন্যের মুখ থেকে কোরআন শ্রবণ করা আমার পছন্দনীয়। এর পর ইবনে মসঊদ কোরআন পড়ে যাচ্ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্রু বহাচ্ছিলেন। একবার হযরত আবু মূসা আশআরীর কোরআন পাঠ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এ লোকটি দাঊদ (আঃ) পরিবারের কিছু লাহান প্রাপ্ত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে আবু মূসা আশআরী আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি শুনছেন জানতে পারলে আমি আপনার জন্যে আরও সুন্দর করে পাঠ করতাম। কারী হায়সাম বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একবার স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে এরশাদ করলেন ঃ হায়সাম, তুমিই কোরআনকে আপন কণ্ঠস্বর দ্বারা সজ্জিত করে থাক? আমি আরজ করলাম ঃ জি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কোন সমাবেশে একত্রিত হতেন, তখন একজনকে কোরআনের কোন সূরা পাঠ করতে বলতেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসাকে বলতেন ঃ আমাদের পালনকর্তার কথা স্মরণ করাও। তিনি তার সামনে এতক্ষণ কোরআন পাঠ করতেন যে, নামাযের সময় পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হত। তখন লোকেরা তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলতেন ঃ আমরা কি নামাযে নই? এটা ছিল আল্লাহ্ তায়ালার সেই এরশাদের প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইঙ্গিত وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (আল্লাহ্‌র স্মরণই বড়)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত শুনবে, সেটা তার জন্যে কেয়ামতের দিন নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হবে। শ্রোতার জন্যে এত সওয়াব হলে পাঠকের জন্যে কি পরিমাণ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তেলাওয়াতের আভ্যন্তরীণ আদব

প্রথমতঃ খোদায়ী কালামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ও কৃপা উপলব্ধি করতে হবে যে, তিনি সুউচ্চ আরশ থেকে এই কালামকে মানুষের বোধগম্য করে অবতীর্ণ করেছেন। এটা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার একটা মেহেরবানী যে, যে কালাম ছিল তাঁর চিরন্তন সিফত ও সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তার অর্থসম্ভার তিনি মানুষের বোধগম্য করে দিয়েছেন। এখন এই সিফত অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের সাথে জড়িত হয়ে মানুষের জন্যে দেদীপ্যমান হয়ে গেছে। অথচ অক্ষর ও কণ্ঠস্বর হল মানুষের সিফত বা বৈশিষ্ট্য; কিন্তু মানুষ নিজের সিফতকে মাধ্যম না বানিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সিফত হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয় বিধায় খোদায়ী সিফতকে অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। যদি এরূপ করা না হত, তবে আরশও এই কালাম শ্রবণ করে স্থির থাকতে পারত না এবং মর্ত্যলোকেরও তা শুনার সাধ্য হত না; বরং তার মহিমা ও নূরের কিরণে আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত সবকিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সুদৃঢ় না রাখলে তিনি তাঁর কালাম শুনার মত শক্তি সাহস পেতেন না; যেমন তাঁর সামান্য দ্যুতি সহ্য করার শক্তি তূর পাহাড়ের হয়নি এবং পাহাড় ভেঙ্গে খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। খোদায়ী কালামের মহিমা এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝতে হবে, যা মানুষের বোধশক্তির অন্তর্গত। তাই জনৈক সাধক একে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, লওহে মাহফুযে কালামে ইলাহীর প্রত্যেকটি অক্ষর কাফ পর্বতের চেয়েও বৃহৎ। যদি সকল ফেরেশতা একযোগে এর একটি অক্ষর বহন করতে চায়, তাবে তা বহন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করার শক্তি তাদের হয় না। অবশেষে লওহে মাহফুযের ফেরেশতা ইসরাফীল (আঃ) এসে তা বহন করেন। তার বহন করাও আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে– নিজস্ব শক্তি বলে নয়; আল্লাহ্ তাআলা তাকে তা বহন করার শক্তি দান করেছেন এবং এতে তাঁকে নিয়োজিত রেখেছেন।

খোদায়ী কালাম মহামহিমান্বিত । এর তুলনায় মানুষের বোধশক্তি খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এতদসত্ত্বেও এ কালাম যে মানুষের বোধগম্য হয়েছে, জনৈক দার্শনিক এর একটি চমৎকার কারণ ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, তিনি জনৈক বাদশাহকে পয়গম্বরগণের শরীয়ত অনুসরণ করতে বললে বাদশাহ তাঁকে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। দার্শনিক প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর দিলেন, যা বাদশাহের বোধগম্য হতে পারে। অতঃপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলুন তো, আপনারা পয়গম্বরগণের আনীত কালাম সম্পর্কে দাবী করেন যে, এটা মানুষের কালাম নয়; বরং আল্লাহ তাআলার কালাম । তা হলে এ কালাম মানুষ বুঝে কিরূপে? দার্শনিক জওয়াব দিলেন ঃ আমরা দেখি; মানুষ যখন কোন চতুষ্পদ জন্তু অথবা পক্ষীকে সামনে অগ্রসর হওয়া, পেছনে সরে যাওয়া, সম্মুখে মুখ করা অথবা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ইত্যাদি বুঝাতে চায়, তখন অবশ্যই তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে নেমে যেতে হয় এবং আপন উদ্দেশ্য এমন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হয়, যা জন্তুদের বোধগম্য ; যেমন টক টক করা, শীস দেয়া, হুমহুম বলা ইত্যাদি । অনুরূপভাবে মানুষও আল্লাহর কালাম পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। ফলে পয়গম্বরগণও মানুষের সাথে সে কৌশলই অবলম্বন করেন যা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে অবলম্বন করে। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহর কালাম মানুষের বোধগম্য অক্ষরের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। প্রজ্ঞাবোধক অর্থসম্ভার এসব অক্ষরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে বিধায় এসব অর্থসম্ভারের মহিমায় কালাম মহিমান্বিত হয়। সুতরাং স্বর যেন প্রজ্ঞাবোধক অর্থসম্ভারের দেহ ও গৃহ আর প্রজ্ঞা হল স্বরের আত্মা ও প্রাণ। মানুষের দেহ যেমন আত্মা থাকার কারণে সম্মানিত ও সম্ভ্রমযুক্ত হয়, তেমনি কালামের স্বর এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অক্ষরসমূহও অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার কারণে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়। প্রজ্ঞার কালাম সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে আদেশ প্রদানকারী, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও প্রশংসনীয় সাক্ষী হয়ে থাকে। এ থেকেই আদেশ ও নিষেধ নির্গত হয়। মিথ্যার সাধ্য নেই, প্রজ্ঞাপূর্ণ কালামের সামনে টিকে থাকে, যেমন ছায়া সূর্য কিরণের সামনে টিকে থাকতে পারে না। মানুষ প্রজ্ঞার সকল স্তর অতিক্রম করার শক্তি রাখে না, যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্যের দেহ অতিক্রম করতে পারে না; কিন্তু সূর্যের আলো মানুষ ততটুকুই পায়, যতটুকু দ্বারা তাদের চক্ষু আলোকিত হয় এবং কেবল আপন প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দেখে নেয়। মোট কথা, খোদায়ী কালামকে এমন একজন বাদশাহ বুঝতে হবে, যার মুখমন্ডল অজ্ঞাত; কিন্তু আদেশ অব্যাহত। অথবা এমন সূর্য ভাবতে হবে, যার মূল উপাদান আগোচরে, কিন্তু আলো দেদীপ্যমান। অথবা এমন একটি উজ্জ্বল তারকা মনে করতে হবে, যাকে দেখে সে ব্যক্তিও পথ পেয়ে যায় যে তার গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না।

সারকথা, খোদায়ী কালাম উৎকৃষ্ট ধনভান্ডারসমূহের চাবিকাঠি এবং এমন আবে হায়াত, যে ব্যক্তি এ থেকে পান করে সে অমর হয়ে যায় এবং এটা এমন মহৌষধ, যে ব্যক্তি এটা সেবন করে, সে কখনও রুগ্ন হয় না।

কালামকে বুঝার জন্যে দার্শনিকের এ বর্ণনা একটি ক্ষুদ্র বিষয়। এলমে মোয়ামালায় এর বেশী বর্ণনা করা সমীচীন নয় বিধায় আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হলো।

দ্বিতীয়তঃ তেলাওয়াতকরীর উচিত তেলাওয়াত শুরু করার সময় আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত করা এবং একথা জানা যে, সে যা পাঠ করছে তা মানূষের কালাম নয়। কালামে পাকের তেলাওয়াতে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ। যারা পাক পবিত্র, তারাই কেবল কোরআন স্পর্শ করবে। কোরআনের বাহ্যিক জিলদ ও পাতাসমূহ যেমন মানুষ পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি এর আভ্যন্তরীণ অর্থও যাবতীয় অপবিত্রতা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া এবং তাযীমের নূরে আলোকিত হওয়া ছাড়া আসতে পারে না। প্রত্যেক হাত যেমন কোরআনের জিলদ স্পর্শ করার যোগ্য নয়, তেমনি প্রত্যেক জিহবাও তার হরফসমূহ তেলাওয়াত করার কিংবা তার অর্থসম্ভার অর্জন করার সামর্থ্য রাখে না। এমনি ধরনের তাযীমের কারণে ইকরিমা ইবনে আবু জাহল যখন কোরআন খুলতেন, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়তেন এবং বলতেন– এটা আমার পরওয়ারদেগারের কালাম, এটা আমার প্রভুর কালাম।

সারকথা, কালামের মাহাত্ম্যের দ্বারা মুতাকাল্লিমের তথা আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য হয়। মুতাকাল্লিমের মাহাত্ম্য অন্তরে ততক্ষণ আসে না, যতক্ষণ না তাঁর গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। সুতরাং তেলাওয়াতকারী নিজের অন্তরে আরশ, কুরসী, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জ্বিন, মানব, জীবজন্তু ও বৃক্ষের কথা উপস্থিত করে ভাববে যে, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা, এগুলোর উপর ক্ষমতাবান এবং এগুলোর রুজিদাতা এক আল্লাহ্। সকলেই তাঁর কুদরতের অধীনে এবং তাঁর অনুগ্রহ, কৃপা, রহমত, আযাব ও প্রতাপের আওতাভুক্ত। তিনি নেয়ামত দিলে তা তাঁর কৃপা আর শাস্তি দিলে তা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। তিনি বলেন ঃ বেহেশতের জন্যে, আমার কোন পরওয়া নেই। কোন কিছুর পরওয়া না হওয়া খুবই মহত্ত্বের কথা। এসব বিষয় চিন্তা করলে মুতাকাল্লিমের মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত হয়। এর পর কালামের মাহাত্ম্য তাতে স্থান পায়।

তৃতীয়তঃ তেলাওয়াতের সময় অন্তর উপস্থিত থাকা এবং অন্য কোন চিন্তা মনে না থাকা উচিত। কোরআনে আছে– يَيَحْيَى خُذِ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ قوة বলে চেষ্টা ও অধ্যবসায় বুঝানো হয়েছে। চেষ্টা অধ্যবসায় সহকারে কিতাব গ্রহণ করার অর্থ কিতাব পাঠ করার সময় সকল চিন্তাভাবনা ও হিম্মত কিতাবের মধ্যেই ব্যাপৃত রাখা– অন্য কিছু চিন্তা না করা। জনৈক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআন মজীদ পাঠ করার সময় আপনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মনে মনে অন্য কোন কথা চিন্তা করেন কিনা? তিনি বললেন ঃ কোরআনের চেয়ে বেশী অন্য কোন বিষয় আমার প্রিয় নয়, যার কথা আমি চিন্তা করব। জনৈক বুযুর্গ যখন কোন সূরা পাঠ করতেন এবং তাতে মন নিবিষ্ট হত না, তখন তা পুনরায় পাঠ করতেন । এটা কালামের তাযীম থেকে উৎপন্ন হয়। কেননা, মানুষ যে কালাম পাঠ করে, তার তাযীম করলে সে তার সঙ্গ লাভ করে এবং তার প্রতি গাফেল হয় না। কোরআন মজীদে মন লাগার মত বিষয়াদি রয়েছে। শর্ত, যোগ্য পাঠক হতে হবে।

চতুর্থতঃ পঠিত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এটা অন্তরের উপস্থিতি থেকে আলাদা বিষয়। মাঝে মাঝে তেলাওয়াতকারী কোরআন ব্যতীত অন্য বিষয় চিন্তা করে না; কিন্তু কোরআন কেবল মুখে উচ্চারণ করে, তার অর্থ বুঝে না। অথচ পাঠ করার উদ্দেশ্য অর্থ বুঝা এবং চিন্তাভাবনা করা। এ কারণেই কোরআন থেমে থেমে পড়া সুন্নত । বাহ্যতঃ থেমে থেমে পড়লে অন্তর চিন্তা করবে এবং বুঝতে থাকবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে এবাদত বুঝে-সুজে করা হয় না, তাতে বরকত হয় না এবং যে তেলাওয়াতে চিন্তাভাবনা নেই; তাতে কল্যাণ নেই। যদি তেলাওয়াতকারী পুনরায় তেলাওয়াত না করে অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করতে পারে, তবে পুনরায় তেলাওয়াত করা উচিত; কিন্তু ইমামের পেছনে এরূপ করা অনুচিত। কেননা, ইমামের পেছনে এক আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং ইমাম অন্য আয়াতে মশগুল হলে সেটা এমন হবে, যেমন কোন ব্যক্তি তার কানে একটি কথা বলার পর সে একথা নিয়েই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং অবশিষ্ট কথা কিছুই বুঝে না। এটা তখনও প্রযোজ্য, যখন ইমাম রুকুতে চলে যায় অথচ মোক্তাদী ইমামের পঠিত আয়াত সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে; বরং ইমাম যে রোকনে যায় এবং যা কিছু পড়ে, মোক্তাদী তাই চিন্তা করবে। অন্য কিছু চিন্তা করা কুমন্ত্রণার অন্তর্ভুক্ত। আমের ইবনে আবদে কায়স বলেন ঃ নামাযে আমার মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার মনে কি পার্থিব বিষয়াদির কুমন্ত্রণা দেখা দেয়? তিনি বললেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পার্থিব বিষয়াদির কুমন্ত্রণার তুলনায় তো আমি যবেহ হয়ে যাওয়া উত্তম মনে করি; বরং ব্যাপার হচ্ছে, আমার অন্তর নিজের পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াতে ব্যাপৃত হয়ে যায় এবং ভাবতে থাকে, এখান থেকে কিরূপে ফিরবে। দেখ, এ বিষয়টিকেও তিনি কুমন্ত্রণা মনে করছেন। এ বিষয়টি হযরত হাসান বসরীর সামনে আলোচিত হলে তিনি বললেন ঃ যদি আমের ইবনে আবদে কায়সের এ অবস্থা সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করেননি। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করলেন এবং বিশ বার তার পুনরাবৃত্তি করলেন। এ পুনরাবৃত্তির কারণ এটাই ছিল যে, তিনি এর অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। হযরত আবু যর (রাঃ)-থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এক রাতে সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং সমস্ত রাত একই আয়াত বার বার পাঠ করলেন। আয়াতটি ছিল এই ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থাৎ, যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

তামীমে দারী একবার এ আয়াতেই সমস্ত রাত অতিবাহিত করে দেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অর্থাৎ, গোনাহগাররা কি ধারণা করে যে, আমি তাদেরকে সে ব্যক্তিদের মত করে দেব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে? তাদের জীবন মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের এ ফয়সালা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

একবার সায়ীদ ইবনে জুবায়ের এ আয়াতটি পাঠ করতে করতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভোর করে দেন- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (হে অপরাধীর দল, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।) জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি একটি সূরা শুরু করি, এতে এমন কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করি যে, ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সূরা শেষ হয় না। অন্য একজন বলেন ঃ যেসব আয়াত আমি বুঝি না এবং যেসব আয়াতে আমার মন বসে না, সেগুলো পাঠে সওয়াব হবে বলে আমি মনে করি না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ আমি এক আয়াত পাঠ করি এবং চার পাঁচ রাত এতেই অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি নিজে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ না করলে অন্য আয়াত পাঠ করার সুযোগই হয় না। জনৈক বুযুর্গ সূরা হুদেই ছয় মাস কাটিয়ে দেন। তিনি এ সূরাটিই বার বার পাঠ করেন। জনৈক সাধক বলেন ঃ আমার খতম একটি সাপ্তাহিক, একটি মাসিক, একটি বার্ষিক এবং একটি এমন, যা আমি ত্রিশ বছর ধরে শুরু করেছি, কিন্তু এখনও শেষ করতে পারিনি। অর্থাৎ, চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধান যত বেশী হয়, খতমের মেয়াদ ততই দীর্ঘ হয়ে যায়। তিতি আরও বলেন ঃ আমি নিজেকে মজুরের স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছি। তাই আমি রোজের কাজও করি, সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক হিসেবেও করি। পঞ্চমতঃ কোরআনের প্রত্যেক আয়াতের বিষয়বস্তু বের করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কেননা, কোরআনে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং পয়গম্বরগণের অবস্থা, তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি, তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী, আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ এবং জান্নাত ও দোযখের বিষয়স্তু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত উদাহরণতঃ এই ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।)

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ۔

অর্থাৎ, তিনি বাদশাহ, সর্বপ্রকার দোষমুক্ত সত্তা, নিরাপত্তাদানকারী, পরাক্রমশালী, মহান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সুতরাং এসব নাম ও সিফত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে, যাতে গোপন রহস্য প্রকাশ পায়। এগুলোর মধ্যে অনেক অর্থসম্ভার লুক্কায়িত রয়েছে যা তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। হযরত আলী (রাঃ) এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে কোন কথা গোপনে বলেননি, যা অন্যের কাছে প্রকাশ করেননি; কিন্তু সত্য, আল্লাহ তাআলা কোন কোন বান্দাকে কোরআন বুঝার ক্ষমতা দান করেন। সুতরাং হযরত আলী বর্ণিত এই বুঝার ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জ্ঞান কামনা করে, তার উচিত কোরআন মজীদের জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা। আল্লাহ্ তাআলার নাম ও সিফতসমূহের মধ্যে কোরআনের অধিকাংশ জ্ঞান নিহিত। এগুলোর মধ্যে থেকে অধিকাংশ লোক তাই জেনেছে, যা তাদের বোধশক্তির উপযুক্ত। তারা এগুলোর গভীরে পৌঁছাতে পারেনি।

আল্লাহ্ তাআলার ক্রিয়াকর্মের মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা, মৃত্যু দান করা ইত্যাদি। এসব ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নাম ও গুণাবলী বুঝা উচিত। কেননা, ক্রিয়া কর্তার অবস্থা জ্ঞাপন করে এবং ক্রিয়ার মাহাত্ম্য দিয়ে কর্তার মাহাত্ম্য জানা যায়। তাই ক্রিয়ার মধ্যে কর্তাকে প্রত্যক্ষ করা উচিত। শুধু ক্রিয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখবে না। কেননা, যে আল্লাহ্কে চেনে, সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁকে দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের দেখা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহকে দেখে না, সে যেন আল্লাহর পরিচয়ই পায়নি। যে আল্লাহকে চিনেছে, সে জানে, আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সকল বস্তু বাতিল এবং তাঁর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। এ বিষয়টি এলমে মোকাশাফার সূচনা। এ কারণেই তেলাওয়াতকারী যখন আল্লাহর এই এরশাদ পাঠ করে ঃ

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ - اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ - اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ - اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা যে বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা যে পানি পান কর, তার ব্যপারে চিন্তা করেছ কি? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তা লক্ষ্য করেছ কি?)

এসব আয়াত পাঠ করার সময় দৃষ্টিকে আগুন, পানি, বীজ বপন ও বীর্যপাত থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত নয়; বরং সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। উদাহরণতঃ বীর্য সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, বীর্য একই উপাদানে গঠিত ছিল। এ থেকে অস্থি, মাংস, শিরা, উপশিরা কিরূপে নির্মিত হল? বিভিন্ন আকারের মাথা, হাত, পা, কলিজা, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি কিরূপে গঠিত হল? এর পর তাতে শ্রবণ, দর্শন, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সদগুণাবলী এবং ক্রোধ, কাম, কুফর, মূর্খতা, পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বাজে তর্ক-বিতর্ক করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব কিরূপে সৃষ্টি হল? আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ -

অর্থাৎ, মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর সে হয়ে গেল সুস্পষ্ট তার্কিক।

মোট কথা, যখনই ক্রিয়াকে দেখবে, তখনই কর্তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। পয়গম্বরগণের অবস্থা যখন শুনবে, তাঁদের প্রতি কিভাবে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল, নির্যাতন করা হয়েছিল এবং কতককে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল, তখনই বুঝে নেবে, আল্লাহ্ তাআলা পরাঙ্মুখ। তিনি রসূলগণেরও মুখাপেক্ষী নন এবং তাদেরও মুখাপেক্ষী নন, যাদের প্রতি রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন । তিনি সকলকে ধ্বংস কর দিলে তাঁর রাজত্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা দেবে না। এর পর পরিণামে যখন পয়গম্বরগণকে সাহায্যদানের অবস্থা শুনবে তখন বুঝবে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি সত্যকে সাহায্যদান করেন।

আদ, সামুদ প্রভৃতি মিথ্যারোপকারী সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে আল্লাহ্

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাআলার প্রতাপ ও প্রতিশোধকে ভয় করবে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা শুনেও এমনি ধরনের চিন্তা করবে। কোরআনে বর্ণিত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিগোচর হলে সে সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করবে। কেননা, কোরআন থেকে যেসব তত্ত্ব বুঝা যায়, সেগুলো পুরোপুরি লেখা সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ, আর্দ্র ও শুষ্ক সকলই প্রকাশ্য কিতাবে রয়েছে।

অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, যদি সমুদ্র কালি হয়ে হয়ে যায় আমার পালনকর্তার বাণীসমূহ লেখার জন্যে, তবে বাণী শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি এর অনুরূপ আরও কালি এনে নেই।

আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই। এদিক দিয়েই হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুর তফসীর দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করে দিতে পারি। এখানে আমরা যা উল্লোখ করেছি, তা কেবল পথ খুলে দেয়ার জন্যে করেছি। অন্যথায় এ বিষয়টি পুর্ণরূপে বর্ণনা করার আশাই করা যায় না। যে ব্যক্তি কোরআন মজীদের বিষয়বস্তু সামান্যও বুঝে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِىْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ, তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান পাতে। অবশেষে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে বলে ঃ এ মাত্র সে কি বলল? এদের অন্তরেই আল্লাহ্ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন।

ষষ্ঠতঃ কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে যেসকল বাধাবিপত্তি রয়েছে, সেগুলো থেকে একাগ্র চিত্ত হতে হবে। অধিকাংশ লোক যারা কেরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি, তাদের না বুঝার কারণ এটাই যে, শয়তান তাদের অন্তরের উপর বাধাবিপত্তির আবরণ রেখে দিয়েছে। ফলে কোরআনের বিস্ময়কর অর্থসম্ভার তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لو لا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا الى الملكوت .

অর্থাৎ, যদি শয়তানরা মানুষের অন্তরের উপর অবিরাম চক্কর দিতে না থাকত, তবে তারা ফেরেশতা জগতকেও দেখতে পেত।

যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত এবং যা বিবেকের নূর ছাড়া জানা যায় না, তাই ফেরেশতা জগতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের অর্থসম্ভারও এমনি ।

কোরআন বুঝার পথে আবরণ চারটি। প্রথম, এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া যে, কোরআনের অক্ষরসমূহকে মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকেই উচ্চারণ করা উচিত। কারীদের উপর নিয়োজিত একটি শয়তান এ ব্যাপার তদারক করে থাকে– যাতে সে কারীদের প্রচেষ্টা কোরআনের অর্থ বুঝা থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে কারীদেরকে প্রত্যেকটি অক্ষর বার বার উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে যে, অক্ষরটি এখনও সঠিক মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়নি। সুতরাং যে ক্ষেত্রে কারীদের প্রচেষ্টা ও চিন্তাভাবনা কেবল অক্ষরসমূহের মাখরাজেই সীমিত থেকে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কোরআনের অর্থ কিরূপে পরিস্ফুট হবে? যে ব্যক্তি শয়তানের এ ধরনের প্রতারণার শিকার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়, সে ক্ষেত্রবিশেষে শয়তানের একজন বড় ভাঁড়ে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে, কোন মতবাদ শুনে তার অনুসারী হয়ে যাওয়া এবং প্রশংসা করা। এরূপ ব্যক্তি তার বিশ্বাসের শিকলে আবদ্ধ থাকে। ফলে তার অন্তরে নিজের বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন কথা স্থান পায় না। তার দৃষ্টি কেবল নিজের শুনা কথার উপর নিবদ্ধ থাকে। যদি সে দূর থেকে কোন আলো দেখতে পায় এবং কিছু অর্থ তার বিশ্বাসের খেলাফ প্রকাশ পায়, তবে অনুসরণরূপী শয়তান তার উপর চড়াও হয়ে বলে ঃ এ কথা তোমার মনে কিরূপে এল? এটা তো তোমার বুযুর্গদের আকীদার খেলাফ। এর পর লোকটি এসব অর্থকে শয়তানের প্রবঞ্চনা মনে করে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। এ অর্থেই সুফী বুযুর্গগণ বলেন, জ্ঞান এক প্রকার আবরণ। এখানে জ্ঞান বলে তারা এমন আকায়েদের জ্ঞান বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ লোক কেবল অনুসরণের দিক থেকে অবলম্বন করে নেয়, অথবা মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা বিতর্কমূলক বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে শিখিয়ে দেয়। নতুবা সত্যিকার জ্ঞান হচ্ছে কাশফ ও অন্তর্দৃষ্টির নূর প্রত্যক্ষ করা। এটা কোনরূপেই আবরণ হতে পারে না, এরূপ জ্ঞানই চরম প্রার্থিত বিষয়।

তৃতীয় আবরণ হচ্ছে, কোন গোনাহে অব্যাহতভাবে লিপ্ত থাকা অথবা অহংকারী হওয়া অথবা পার্থিব বিষয়াদির মোহে পতিত হওয়া। এগুলোর কারণে অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং তাতে মরিচা পড়ে যায়। আয়নায় মরিচা পড়ে গেলে যেমন তাতে প্রতিচ্ছবি যথাযথ প্রতিফলিত হয় না, তেমনি এগুলো থাকলে অন্তরে সত্যের দ্যুতি পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠে না। অন্তরের উপর মোহ ও কামনার স্তূপ যত বেশী হবে ততই এর তরফ থেকে কোরআনের অর্থের উপর বেশী আবরণ পড়বে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বোঝা যত হালকা হবে, ততই অর্থের দ্যুতি নিকটে এসে যাবে। কেননা, যার প্রতিচ্ছবি আয়নার মত, মোহ মরিচার মত এবং কোরআনের অর্থ সেই চিত্রের মত যার প্রতিচ্ছবি আয়নায় প্রতিফলিত হয়। অন্তর থেকে মোহ দূর করা আয়না ঘষে মেজে পরিষ্কার করার অনুরূপ। এজন্যেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত যখন দীনার ও দেরহামকে বড় মনে করবে, তখন তার কাছ থেকে ইসলামের ভীতি দূর হয়ে যাবে। তারা যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন ওহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ এর অর্থ, তারা কোরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

চতুর্থ আবরণ হচ্ছে, বাহ্যতঃ কোন তফসীর পড়ে নিয়ে এরূপ বিশ্বাস করে নেয়া যে, হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ কোরআনের যে তফসীর বর্ণনা করছেন, তা ছাড়া কোরআনের অন্য কোন তফসীর নেই। কেউ অন্য অর্থ বললে সে তার বিবেক দ্বারাই তা বলে। এরূপ তফসীরকার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি নিজের মতামত দ্বারা কোরআনের তফসীর করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে নেয়। এরূপ বিশ্বাসও কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়।

চতুর্থ শিরোনামে আমরা বর্ণনা করব যে, মতামত দ্বারা তফসীর করার অর্থ কি?

সপ্তমতঃ কোরআনের প্রত্যেকটি সম্বোধন নিজের জন্যে মনে করবে। অর্থাৎ, কোন আদেশ নিষেধ শুনলে মনে করবে, এ আদেশ নিষেধ আমাকে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তি বাণী শুনলে তা নিজের জন্যে মনে করবে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরগণের কিস্‌সা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ থেকে শিক্ষা দান করা লক্ষ্য। কেননা, কোরআন পাকের সবগুলো কিস্‌সার বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্যে কিছু না কিছু উপকারী।

এজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে প্রতিষ্ঠা দান করি।

অতএব তেলাওয়াতকারীর মনে করে নেয়া উচিত, আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের অবস্থা তথা নির্যাতনের মুখে তাঁদের ধৈর্য এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার কাহিনী বর্ণনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে আমাদের অন্তরকে সত্যের উপর কায়েম রাখতে চান। আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যই কোরআন নাযিল করেননি; বরং কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রতিষেধক, হেদায়াত, নূর, রহমত। তাই আল্লাহ্ সকল মানুষকে কোরআনরূপী নেয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর তোমাদের উপদেশের জন্যে তোমাদের উপর যে কিতাব ও প্রজ্ঞা নাযিল হয়েছে তাকে?

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উপর এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ। তোমরা কি বুঝ না?

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ـ

অর্থাৎ, এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের কাছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ وَاتَّبِعُوْآ اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুসরণ কর।

আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوقِنُونَ

অর্থাৎ, এটা মানুষের জন্যে উপদেশ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ, এটা মানুষের জন্য বর্ণনা এবং খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

এসব আয়াত থেকে জানা গেল, সম্বোধন সকল মানুষকেই করা হয়েছে। তেলাওয়াতকারীও তাদের একজন বিধায় সেও নিঃসন্দেহে তাতে শরীক। তাই মনে করা উচিত, সম্বোধন দ্বারা সে-ই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

অর্থাৎ– আমার প্রতি এই কোরআন ওহীযোগে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এই কোরআন পৌঁছে, সতর্ক করি।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী বলেন ঃ যার কাছে কোরআন পৌঁছে, তার সাথে যেন আল্লাহ তাআলা কথা বলেন। তেলাওয়াতকারী যখন নিজেকে সম্বোধিত মনে করবে, তখন যেনতেনভাবে তেলাওয়াত করবে না; বরং এমনভাবে তেলাওয়াত করবে, যেমন গোলাম তার প্রভুর পরওয়ানা পাঠ করে, যাতে প্রভু লেখে, তাকে বুঝেসুজে কাজ করতে হবে। এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ঃ এই কোরআন আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে পত্র ও ওয়াদা-অঙ্গীকারসহ আগমন করেছে, যাতে এগুলো আমরা নামাযের মধ্যে বুঝি এবং একান্তে অবগত হয়ে আনুগত্যের কাজে বাস্তবায়ন করি। হযরত মালেক ইবনে দীনার বলতেন ঃ হে কোরআনধারীগণ, কোরআন তোমাদের অন্তরে কি বপন করেছে? কোরআন মুমিনের জন্যে বসন্তকাল, যেমন মাটির জন্যে বৃষ্টি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বসন্তকাল। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের সাহচর্য অবলম্বন করে, সে লাভবান হয়, না হয় লোকসান দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا -

অর্থাৎ, কোরআন মুমিনের জন্যে প্রতিষেধক ও রহমত এবং এটা গোনাহগারদের জন্যে কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

অষ্টম আদব এই যে, তেলাওয়াতের সময় যখন যে ধরনের বিষয়বস্তু আসবে, তখন সে ধরনের প্রভাব কবুল করবে। চিন্তা, ভয় ও আশার আয়াতসমূহ পাঠকালে, অন্তরে সে অবস্থাই সৃষ্টি করবে। যার অন্তরে আল্লাহর মারেফত কামেল হবে, তার অন্তরে অধিকাংশ সময় ভয় প্রবল থাকবে। কেননা, কোরআনের আয়াতসমূহে সংকোচন অনেক বেশী। উদাহরণতঃ রহমত ও মাগফেরাতের আলোচনা এমন সব শর্তের সাথে জড়িত দেখা যায়, যা অর্জন করতে সাধক অক্ষম হয়ে পড়ে। দেখ, মাগফেরাতের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি সে ব্যক্তির মাগাফেরাত করি, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে থাকে। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থাৎ, পড়ন্ত দিনের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

এতেও চারটি শর্ত উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে সংক্ষেপ করা হয়েছে সেখানেও এমনি একটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে, যাতে সবগুলো শর্ত দাখিল। উদাহরণতঃ বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সজ্জনদের নিকটবর্তী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখানে রহমতের জন্যে সজ্জন হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। সজ্জন হওয়ার জন্যে পূর্বোল্লিখিত সকল শর্তের উপস্থিতি দরকার। কোরআনের আদ্যোপান্ত পাঠ করলে এমনি ধরনের বিষয়স্তু অনেক পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, তার মধ্যে ভয় ও চিন্তা থাকাই যথার্থ। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যে কোরআন পাঠ করে ও তার প্রতি ঈমান রাখে, তার চিন্তা অনেক বেড়ে যায় এবং আনন্দ হ্রাস পায়। সে কাঁদে বেশী এবং হাসে কম। তার দুঃখ ও কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং আরাম ও কর্মহীনতা কমে যায়। ওহায়ব ইবনে ওয়ার্দ বলেন ঃ আমি হাদীস ও ওয়াযের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি; কিন্তু কোরআনের তেলাওয়াত ও চিন্তাভাবনা যত বেশী অন্তরকে নরম করে এবং চিন্তাকে টেনে আনে, তত বেশী আর কোন কিছুই পারে না। মোট কথা, তেলাওয়াত দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার গুণে গুণান্বিত হয়ে যাওয়া। উদাহরণতঃ শাস্তির আয়াতে এবং যে আয়াতে মাগফেরাতকে অনেক শর্তের সাথে জড়িত করা হয়েছে, সেখানে এতটুকু ভীত হবে যেন মরেই যাবে। আর যেখানে রহমত ও মাগফেরাতের ওয়াদা করা হয়েছে, সেখানে এমন খুশী হবে যেন খুশীতে উড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ও নাম বর্ণিত হওয়ার সময় তার প্রতাপের সামনে বিনম্র হওয়া ও তাঁর মাহাত্ম্য জানার কারণে মস্তক নত করে দেবে। যখন কাফেরদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের অসম্ভব উক্তি পাঠ করবে, যেমন আল্লাহ্ সন্তানধারী, তাঁর পত্নী আছে— তখন কণ্ঠস্বর নীচু করে দেবে এবং মনে মনে লজ্জিত হবে। জান্নাতের অবস্থা বর্ণিত হওয়ার সময় অন্তরে তাঁর প্রতি আগ্রহ জাগ্রত করবে এবং জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার সময় তার ভয়ে কেঁপে উঠবে। রসূলে করীম (সাঃ) একবার হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমাকে কোরআন পাঠ করে শুনাও। হযরত ইবনে মসঊদ বলেন ঃ আমি সূরা নিসা শুরু করে এই আয়াতে পৌঁছলাম—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী ডাকব এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর সাক্ষ্যদাতারূপে?

এ সময় দেখলাম, রসূলে করীম (সাঃ))-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ এখন বন্ধ কর। এটা বলার কারণ, এ অবস্থা প্রত্যক্ষকরণে তখন তাঁর অন্তর নিমজ্জিত ছিল। কেউ কেউ শাস্তির আয়াত শুনে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যেতেন। আবার কেউ কেউ এমনও ছিলেন যে, আয়াত শুনতে শুনতে তাদের আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গিয়েছিল। সারকথা, এ ধরনের প্রভাবের ফলে তেলাওয়াতকারী নিছক নকলকারী থাকে না। উদাহরণতঃ

إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

অর্থাৎ, আমি পরওয়ারদেগারের অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের আযাবকে ভয় করি।

এ আয়াত পাঠ করার সময় যদি অন্তরে ভয় না থকে, তবে এটা কেবল কালাম নকল করা হবে।

অনুরূপভাবে- عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ, তোমার উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে।

এ আয়াত পাঠ করার সময় যদি ভরসা ও প্রত্যাবর্তনের অবস্থা না হয়, তবে এটা মৌখিক উদাহরণই হবে। এরূপ পাঠক নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহের প্রতীক হয়ে যাবে-

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ -

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক রয়েছে, যারা কিতাবের খবর রাখে না; কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। অর্থাৎ, কেবল তেলাওয়াতই জানে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ـ

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কিছু নিদর্শনাবলী রয়েছে, যেগুলোর কাছ দিয়ে তারা পথ চলে এবং সেদিকে ধ্যান করে না।

কেননা, কোরআন পাকে এসব নিদর্শন উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে। পাঠক এগুলো এড়িয়ে গেলে এবং প্রভাবান্বিত না হলে বলতে হবে যে, সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের চরিত্রে ভূষিত হয় না, সে যখন কোরআন পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার কালামের সাথে তোর কি সম্পর্ক? তুই তো আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই নিয়েছিস। তুই যদি আমার দিকে প্রত্যাবর্তন না করিস, তবে আমার কালাম পাঠ করার প্রয়োজন নেই। পাপী ব্যক্তির বার বার কোরআন পাঠ করা এমন, যেমন কেউ রাজকীয় পরওয়ানা সারা দিনে কয়েকবার পাঠ করে এবং তাতে নির্দেশ থাকে, দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ কর; কিন্তু সে দেশকে উৎসন্ন করার কাজে লিপ্ত থাকে এবং পরওয়ানাটি কেবল পাঠ করেই ক্ষান্ত থাকে। সে যদি পরওয়ানা পাঠ না করত এবং রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করত, তবে এতে রাজকীয় পরওয়ানার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন এবং রাজকীয় ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা সম্ভবতঃ কম হত। এ কারণেই ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন ঃ আমি কোরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করি; কিন্তু যখন কোরআনের বিষয়বস্তু স্মরণ করি, তখন ভীত হয়ে পড়ি এবং তেলাওয়াত ছেড়ে তসবীহ ও এস্তেগফার পাঠ করতে শুরু করি। যে ব্যক্তি কোরআনের আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার কর্ম এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ـ

অর্থাৎ, তারা তাকে পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং এর বদলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুচ্ছ বস্তু ক্রয় করল। তারা খুব মন্দ ক্রয় করে।

এ জন্যেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যতক্ষণ মনে চায় এবং মন নরম থাকে, ততক্ষণ কোরআন পাঠ কর। এ অবস্থা না থাকলে কোরআন পাঠ ক্ষান্ত কর। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত হয়, তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুনে যা মনে হয় সে আল্লাহকে ভয় করে, সেই সুকণ্ঠ কারী । তিনি আরও বলেন ঃ খোদাভীরুর মুখ থেকে কোরআন যেরূপ ভাল শুনা যায়, তেমন অন্য কারও মুখ থেকে শুনা যায় না। সুতরাং কোরআন পাঠের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অন্তরে এসব অবস্থা প্রকাশ পাওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা। নতুবা কেবল শব্দ উচ্চারণে জিহবা নাড়াচাড়া করলে লাভ কি? এজন্যেই জনৈক কারী বলেন ঃ আমি আমার ওস্তাদকে কোরআন পাঠ করে শুনালাম। এর পর পুনরায় শুনানোর জন্যে যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ আমার সামনে পাঠ করাকেই তুমি আমল মনে করে নিয়েছ। যাও, আল্লাহর সামনে পাঠ কর এবং দেখ তিনি কি নির্দেশ করেন এবং কি বুঝাতে চান। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম হাল ও আমল অর্জনে ব্যাপৃত থাকতেন। রসূলে করীম (সাঃ) এক লাখ বিশ হাজার সাহাবী রেখে ওফাত পান; কিন্তু তাঁদের মধ্যে সমগ্র কোরআনের হাফেয ছিলেন খুবই সীমিত সংখ্যক । অধিকাংশ সাহাবী একটি অথবা দু'টি সূরা হেফয করতেন। যাঁরা সূরা বাকারা ও সূরা আনআম হেফয করতেন, তাঁদেরকে আলেম বলে গণ্য করা হত। এক ব্যক্তি কোরআন শিখতে এসে যখন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

অর্থাৎ, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

আয়াতে পৌঁছল, তখন একথা বলে চলে গেল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ লোকটি ফকীহ্ (আলেম) হয়ে ফিরে গেছে। বাস্তবে সে অবস্থাই প্রিয় ও দুর্লভ, যা আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারের অন্তরে আয়াত বুঝার পরে দান করেন। কেবল জিহবা নাড়াচাড়া করা তেমন উপকারী নয়; বরং যে ব্যক্তি মুখে তেলাওয়াত করে এবং আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে এই আয়াতের প্রতীক হওয়ার যোগ্য–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا - قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى -

অর্থাৎ, যে আমার কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্যে রয়েছে সংকীর্ণ জীবিকা। আমি কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশরে সমবেত করব। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করলে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ আগমন করেছিল; তুমি সেগুলো বিস্মৃত হয়েছিলে। আজ তুমিও তদ্রূপ বিস্মৃত হবে।

অর্থাৎ, তুমি আয়াতসমূহ চিন্তাভাবনা ছাড়াই পরিত্যাগ করেছিলে এবং কোন পরওয়া করনি।

বলাবাহুল্য, যে তেলাওয়াতে জিহবা, বোধশক্তি ও অন্তর শরীক থাকে, তাকেই যথার্থ তেলাওয়াত বলা হয়। জিহবার কাজ অক্ষর শুদ্ধ করে পড়া। বোধশক্তির কাজ অর্থ বর্ণনা করা এবং অন্তরের কাজ হচ্ছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আদেশ পালন করা ও প্রভাবান্বিত হওয়া। সুতরাং জিহবা যেন উপদেশদাতা, বোধশক্তি যেন ভাষ্যকার এবং অন্তর যেন উপদেশ গ্রহিতা।

নবম আদব হচ্ছে, তেলাওয়াতে এতটুকু উন্নতি করা যাতে মনে হয় কোরআন আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে শুনছে, নিজের কাছ থেকে নয়। কেননা, তেলাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী নিজেকে ধরে নেবে যেন সে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত্ করছে, আল্লাহ্ তার দিকে দেখছেন এবং তেলাওয়াত শুনছেন। এ স্তরে তেলাওয়াতকারীর মধ্যে প্রার্থনা, খোশামোদ, নম্রতা ও অক্ষমতার অবস্থা প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, সে নিজের অন্তর দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেখছেন, স্বীয় কৃপায় তাকে সম্বোধন করেন এবং অনুগ্রহবশতঃ তার কাছে গোপন রহস্যের কথা বলেন। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকারী লজ্জা, সম্মান প্রদর্শন, শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে অবস্থান করবে।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী কালামের ভেতরে এ কালাম যাঁর সেই আল্লাহকে দেখবে এবং শব্দের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ, নিজেকে দেখবে না, নিজের কেরাআতের প্রতি লক্ষ্য করবে না এবং নিজের উপর নেয়ামত সম্পর্কেও ধ্যান করবে না; বরং সমগ্র শক্তি ও চিন্তা আল্লাহর রহমতে সীমিত ও নিবদ্ধ করে দেবে। এটা নৈকট্যশীলদের স্তর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীনের স্তর । যে কেরাআত এই তিন স্তরের বাইরে থাকে, সেটা গাফেলদের কেরাআত। ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) তৃতীয় স্তর এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে সৃষ্টির জন্যে আপন দ্যুতি বিকিরণ করেছেন। কিন্তু সৃষ্টি তা দেখে না। একবার তিনি নামাযে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে কেউ তাঁকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আমি আয়াতটি বার বার মনে মনে পাঠ করছিলাম। অবশেষে আমি তা মুতাকাল্লিম আল্লাহর কাছ থেকে শুনলাম। ফলে তাঁর কুদরত দেখার জন্যে আমার দেহ স্থির রইল না। এ স্তরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মিষ্টতা এবং মোনাজাতের আনন্দ অত্যধিক অর্জিত হয়। এ কারণেই জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ আমি কোরআন পাঠ করতাম, কিন্তু তার মিষ্টতা অনুভব করতাম না। অবশেষে এভাবে পাঠ করলাম যেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনছি। তিনি তাঁর সহচরগণকে শুনাচ্ছেন। এর পর আর এক স্তর উপরে ওঠে এভাবে পাঠ করলাম যেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শিক্ষা দিচ্ছেন আর আমি শুনছি। এর পর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আরও একটি স্তর দান করলেন। এখন আমি কোরআন মুতাকাল্লিম আল্লাহ্র কাছ থেকে শুনি এবং এমন মিষ্টতা ও আনন্দ অনুভব করি, যাতে সবর করা যায় না। হযরত ওসমান ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ অন্তর পবিত্র হয়ে গেলে কোরআন তেলাওয়াত করে তৃপ্ত হওয়া যায় না। এটা বলার কারণ, পবিত্রতার ফলে কালামে মুতাকাল্লিমকে প্রত্যক্ষ করার দিকে অন্তর উন্নতি লাভ করে। এ কারণেই সাবেত বানানী বলেন ঃ বিশ বছর তো আমি কোরআনে কেবল শ্রমই স্বীকার করেছি; কিন্তু বিশ বছর তা থেকে মিষ্টতাও পেয়েছি। তেলাওয়াতকারী যদি মুতাকাল্লিমকেই প্রত্যক্ষ করে এবং অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তবে আল্লাহ্ তাআলার এসব আদেশ পালনকারী হবে- فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।

لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ .

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করো না।

সারকথা, যে ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে। যে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে, তার দৃষ্টিপাতে কিছুটা গোপন শেরক থাকবে। অথচ খাঁটি তওহীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না করা।

দশম আদব, আপন শক্তি ও বল ভরসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। উদাহরণতঃ যখন সৎকর্মপরায়ণদের প্রশংসা ও ওয়াদার আয়াত পাঠ করবে, তখন নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে তাকেও শামিল করুন। পক্ষান্তরে যখন গজব ও ক্রোধের আয়াত এবং গোনাহ্গারদের নিন্দা পাঠ করবে, তখন নিজেকে দেখবে এবং ধরে নেবে, এই সম্বোধন তাকেই করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে। এ কারণেই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) দোয়া করতেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে জুলুম ও কুফর থেকে মাগফেরাত চাই। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ জুলুম তো বুঝা যায়; কিন্তু আপনি কুফর থেকে মাগফেরাত চান কিরূপে? তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ বড় জালেম ও অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, এই কুফর (অকৃতজ্ঞতা) থেকে মাগফেরাত চাই। এটা মানুষের জন্যে আয়াতদৃষ্টে নিশ্চতরূপে প্রমাণিত। ইউসুফ ইবনে আসবাতকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন কি দোয়া করেন? তিনি বললেন ঃ দোয়া কি করব, আপন গোনাহের মাগফেরাত সত্তর বার চাই। মোট কথা, কোরআন তেলাওয়াতে নিজেকে গোনাহের কাঠগড়ায় দেখলে এটা তার নৈকট্য লাভের কারণ হয়। এই ভয় তাকে নৈকট্যের এক স্তরে পৌঁছে দেয়। এ স্তর প্রথম স্তর থেকে উত্তম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দূরে থেকে নৈকট্য প্রত্যক্ষ করে, তাকে ভয়হীনতা দান করা হয়, যা পরিণামে তাকে প্রথম স্তরের দূরত্ব থেকে আরও দূরে পৌঁছিয়ে দেয়। হাঁ, তেলাওয়াতকারী যদি নিজের দিকে ভ্রুক্ষেপই না করে এবং তেলাওয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ না করে, তবে তার সামনে উর্ধ্ব জগতের রহস্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সোলায়মান ইবনে আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সাধক ইবনে সওবান একদিন তাঁর ভাইকে বললেন ঃ আমি তোমার কাছে ইফতার করব। এর পর তিনি সকাল পর্যন্ত সেখানে যেতে পারেননি। পরদিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে ভাই বলল ঃ আপনি আমার কাছে ইফতার করার ওয়াদা করে এলেন না, ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ আমি তোমার সাথে ওয়াদা না করলে যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণে আসতে পারিনি তা বলতাম না। ব্যাপার এই যে, আমি এশার নামায় শেষে মনে মনে ভাবলাম, তোমার কাছে যাওয়ার পূর্বে বেতেরও পড়ে নেই । কারণ, এর মধ্যে মৃত্যু এসে গেলে বেতের পড়ার সুযোগ হবে না। যখন আমি বেতেরের দোয়া পড়তে লাগলাম, তখন আমার সামনে একটি বাগিচা পেশ করা হল । এতে জান্নাতের বিভিন্ন ফুল শোভা পাচ্ছিল। আমি তন্ময় হয়ে সকাল পর্যন্ত ফুলগুলো দেখলাম। এ কারণে তোমার কাছে যাওয়ার সময় পাইনি। এ ধরনের কাশফ তখন হয়, যখন মানুষ নিজ থেকে, নিজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা থেকে এবং কামনা-বাসনার ধ্যান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। এ কাশফ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তন্ময়তা অনুযায়ী বিশেষ রূপ ধারণ করে। উদাহরণতঃ যখন আশার আয়াত পাঠ করে এবং তার তন্ময়তার উপর সুসংবাদ প্রবল হয়, তখন তার সামনে জান্নাতের চিত্র ভেসে উঠে। সে তাও এমনভাবে দেখে, যেন চর্মচক্ষে বাহ্যতঃ দেখে যাচ্ছে। আর যদি তন্ময়তার উপর ভয় প্রবল হয়, তবে জাহান্নাম দৃষ্টিতে ভেসে উঠে এবং সে জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। এর কারণ, কোরআন মজীদে নরম-গরম, কোমল কঠোর, আশাব্যঞ্জক, ভীতিপ্রদ ইত্যাদি সকল প্রকার কালাম রয়েছে। মুতাকাল্লিম আল্লাহর গুণাবলী যেমন বহুবিধ, তেমনি তাঁর কালামের বিষয়বস্তুও বহুবিধ। আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে রহমত, কৃপা, প্রতিশোধ, পাকড়াও ইত্যাদি। তাঁর এসব গুণই তাঁর কালামে পাওয়া যায়। সুতরাং যে ধরনের কালাম প্রত্যক্ষ করবে, অন্তরের হালও তেমনি বদলে যাবে। কেননা, এটা অসম্ভব যে, কালাম বদলে যাবে আর শ্রোতার হাল অপরিবর্তিত থাকবে।

বিবেকের সাহায্যে কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গ

সুফী বুযুর্গগণ তাসাওউফের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের কোন কোন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করে থাকেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ থেকে বর্ণিত নয়। যারা কোরআনের বাহ্যিক তফসীর পাঠ করে এবং জানে, তারা এ ব্যাপারে সুফীগণের প্রতি কেবল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দোষারোপই করে না; বরং তাদের এ ব্যাখ্যাকে কুফর পর্যন্ত বলে থাকে। কেননা, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من فسر القران برايه فليتبوأ مقعده من النار ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপন মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসীর করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

দোষারোপকারীদের এ বক্তব্য সঠিক হলে কোরআন বুঝার অর্থ এছাড়া আর কিছুই থাকে না যে, বর্ণিত তফসীরসমূহ মুখস্থ করে নিতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের বক্তব্য সঠিক না হলে উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য কি, তা আলোচনা করতে হবে।

যারা বলে, কোরআনের অর্থ তাই, যা বাহ্যিক তফসীরে বর্ণিত রয়েছে, তারা নিজেদের বিদ্যার চরম সীমারই খবর দেয়। নিজেদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তারা ঠিক কথাই বলে; কিন্তু অন্যদেরকে যে তারা নিজেদের স্তরে টেনে আনতে চায়, এ ব্যাপারে তারা ভ্রান্ত। কেননা, হাদীস ও মনীষীগণের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে অবকাশ রয়েছে। সেমতে হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তাঁর কালামের বোধশক্তি দান করেন। বর্ণিত অনুবাদ ছাড়া কোরআনের যদি অন্য কোন অর্থ না হয়, তবে এই বোধশক্তির উদ্দেশ্য কি? রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কোরআনের একটি বাহ্যিক এবং একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। আর আছে একটি সীমা ও একটি উদয়াচল। এ রেওয়ায়েতটি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকেও তাঁরই উক্তি হিসেবে বর্ণিত আছে। তিনি ছিলেন তফসীরবিদ সাহাবীগণের অন্যতম। সুতরাং বাহ্যিক অর্থ, অভ্যন্তরীণ অর্থ, সীমা ও উদয়াচল– এ সবের কি অর্থ?

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুর তফসীর দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করতে পারি। এ উক্তির অর্থ কি? আলহামদুর বর্ণিত ও বাহ্যিক তফসীর তো খুবই সামান্য। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত ফকীহ হয় না, এ পর্যন্ত সে কোরআনকে কয়েক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভাগে ভাগ না করে নেয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ প্রত্যেক আয়াতের ষাট হাজার অর্থ আছে এবং যেসব অর্থ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, সেগুলো আরও বেশী। অন্য একজন বলেন ঃ কোরআন সত্তর হাজার দু'শ বিদ্যা পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। কেননা, প্রত্যেক কলেমার জন্যে একটি বিদ্যা রয়েছে। প্রত্যেকেরই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থ এবং সীমা ও উদয়াচল রয়েছে বিধায় অর্থ চতুর্গুণ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে পুনঃ পুনঃ বিশ বার আবৃত্তি করেন। অর্থ বুঝার জন্যেই এরূপ করেছেন। নতুবা এর অনুবাদ ও তফসীর তো স্পষ্টই ছিল। এর পুনরাবৃত্তির কি প্রয়োজন ছিল? হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কেউ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সে কোরআন নিয়ে আলোচনা করুক। এটাও কেবল বাহ্যিক তফসীর দ্বারা অর্জিত হয় না।

সারকথা, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলীর মধ্যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোরআনে তাঁর সত্তা, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন শেষ নেই। কোরআনে এগুলোর প্রতি সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এগুলোর বিশদ বিবরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা কোরআন বুঝার উপর নির্ভরশীল। কেবল বাহ্যিক তফসীর দ্বারা বিশদ বিবরণের ঈঙ্গিত জানা যায় না। যে সকল প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিষয়ে মানুষের মতভেদ রয়েছে, কোরআন মজীদে সেগুলোর প্রতি ইশারা ঈঙ্গিত আছে। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া এসব ঈঙ্গিত কেউ জানতে পারে না। এমতাবস্থায় বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ ও তফসীর এসব ইঙ্গিত বুঝার জন্যে কিরূপে যথেষ্ট হতে পারে? এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اقرءوا القران والتمسوا غرائبه ـ

অর্থাৎ, তোমরা কোরআন পাঠ কর এবং তার রহস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্বেষণ কর। হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমার উম্মত তার মূল ধর্ম পরিত্যাগ করে বাহাত্তর দলে বিভক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে পড়বে। সকল দলই পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী হবে এবং জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেবে। এ পরিস্থিতি দেখা দিলে তোমরা কোরআন মজীদকে আঁকড়ে থাকবে। কারণ, এতে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের অবস্থাও স্থান পেয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান বিধানও এতে বিদ্যমান। প্রতাপশালীদের মধ্য থেকে যে এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে চুরমার করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোরআন ছাড়া অন্য কিছুতে জ্ঞান অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। কোরআন আল্লাহর মজবুত রশি, সুস্পষ্ট নূর এবং মহোপকারী প্রতিষেধক। যে একে ধারণ করে, সে সুরক্ষিত থাকে। যে এর অনুসরণ করে, সে মুক্তি পায়। এর রহস্যমন্ডিত বিষয়সমূহ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না এবং অনেক পাঠ করার কারণে পুরাতনও হয় না। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নযোগে আমাকে উম্মতের বিভেদ ও অনৈক্যের সংবাদ দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি যদি সে যুগ পাই, তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কালাম শেখবে এবং তাতে যা কিছু আছে তা মেনে চলবে। মুক্তির উপায় এটাই। আমি তিন বার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি একই জওয়াব দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন বুঝে নেয়, সে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্ণনা করে। এতে তিনি এদিকেই ইশারা করেছেন যে, কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। হযরত ইবনে আব্বাস وَمَنْ يُّؤْتَي الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا (যাকে হেকমত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।) –এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হেকমতের অর্থ কোরআন বুঝার শক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ

অর্থাৎ, অতঃপর আমি ফয়সালাটির বোধশক্তি দান করলাম সোলায়মানকে। আর প্রত্যেককেই আমি দিয়েছি সাম্রাজ্য ও জ্ঞান। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আয়াতে হযরত দাঊদ ও সোলায়মান উভয়কে যা দান করা হয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছে জ্ঞান ও সাম্রাজ্য। আর হযরত সোলায়মানকে বিশেষভাবে যা দেয়া হয়েছিল তার নাম বোধশক্তি রাখা হয়েছে এবং তা অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। এসব বিষয় থেকে জানা যায়, কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে অনেক অবকাশ আছে। বর্ণিত বাহ্যিক তফসীর কোরআনের বিষয়বস্তুসমূহের চূড়ান্ত সীমা নয় যে, একে অতিক্রম করা যাবে না। কিন্তু এটাও ঠিক, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্বোক্ত হাদীসে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসীর করতে নিষেধ করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি কোরআন সম্পর্কে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কিছু বলি, তবে কোন্ ভূপৃষ্ঠ আমাকে বহন করবে এবং কোন্ আকাশ আমাকে লুকাবে? এছাড়া আরও যে সকল রেওয়ায়েতে এই নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য তফসীরের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরফ থেকে বর্ণনা ও শুনা যথেষ্ট মনে করা উচিত এবং নিজের মতামত ও বিবেক দ্বারা পৃথক অর্থ বুঝা অনুচিত। এছাড়া নিষেধাজ্ঞার অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে শ্রুত বিষয়াদি ছাড়া কেউ অন্য কিছু বলতে পারবে না – এরূপ উদ্দেশ্য হওয়া কয়েক কারণে অকাট্যরূপে বাতিল ।

প্রথম কারণ, শুনার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনতে হবে অথবা তফসীরটি তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হতে হবে। অথচ এটা কোরআনের সামান্য অংশের তফসীরেই পাওয়া যায়। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, যে তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বলেন, তা অগ্রাহ্য হবে এবং তাকেও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তফসীর আখ্যা দেয়া হবে। কেননা, তাঁরা এই তফসীর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেননি। অন্য সাহাবীগণের তফসীরের অবস্থাও একই রূপ হবে।

দ্বিতীয় কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তফসীরবিদগণ কোন কোন আয়াতের তফসীরে মতভেদ করেছেন। তাঁদের এসব বিভিন্নমুখী উক্তির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সমন্বয় সাধন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এগুলো সব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনা অসম্ভব। এ থেকে অকাট্যরূপে জানা যায় যে, প্রত্যেক তফসীরবিদ সেই অর্থই বলেছেন, যা তিনি ইজতিহাদ দ্বারা বুঝতে পেরেছেন। সূরাসমূহের শুরুতে উল্লিখিত খন্ড অক্ষরসমূহের ব্যাপারে সাতটি বিভিন্নমুখী উক্তি বর্ণিত আছে। উদাহরণতঃ আলিফ-লাম-মীম সম্পর্কে কেউ বলেন, এগুলো আর-রহমানের অক্ষর। কেউ বলেন ঃ আলিফ অর্থ আল্লাহ্, লাম অর্থ লতীফ (কৃপাকারী) এবং মীম অর্থ রহীম (দয়ালু)। কেউ অন্য কথা বলেন। এগুলো এক অর্থে একত্রিত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সবগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত কিরূপে হতে পারে?

তৃতীয় কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়ায় বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে বোধশক্তি দান কর এবং কোরআনের তফসীর শিক্ষা দাও।

সুতরাং কোরআনের ন্যায় তফসীরও যদি শ্রুত ও সংরক্ষিত হয়, তবে এর জন্যে হযরত ইবনে আব্বাসকে নির্দিষ্ট করার কি অর্থ হবে?

চতুর্থ কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِيْ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ এ আয়াতে আলেমদের জন্যে اِسْتِنْبَاط (উদ্ভাবন)-এর কথা প্রমাণিত আছে, যার অর্থ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোন কিছু জানা। বলাবাহুল্য, এটা শ্রুত বিষয় নয় — ভিন্ন কিছু। উপরোক্ত সবগুলো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কেবল শ্রুত বিষয় দ্বারা কোরআনের তফসীর করার ধারণা বাতিল; বরং কোরআন থেকে স্ব স্ব বোধশক্তি ও বিবেক অনুযায়ী বিষয়াদি চয়ন করা প্রত্যেক আলেমের জন্যে জায়েয। তবে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা দুই অর্থে ধরে নেয়া যায়। প্রথম— কোন বিষয়ে কারও কোন মতামত থাকে এবং সেদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা রাখে। এর পর এই মতামত সঠিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাব্যস্ত করার জন্যে আপন মতামত ও খাহেশ অনুযায়ী কোরআনের অর্থ বর্ণনা করে। যদি তার এই মতামত না থাকত, তবে কোরআন থেকে এই অর্থ সে জানত না। এটা কখনও সজ্ঞানে হয়, যেমন কেউ কোন একটা বেদআতকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্যে, কোরআনের কোন কোন আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করে। অথচ সে জানে আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। কিন্তু সে তার প্রতিপক্ষকে ধোকা দেয়। কখনও সে জানে না, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। কিন্তু আয়াতটি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে বিধায় যে অর্থ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে, সেদিকেই তার মতামত গড়ে উঠে এবং সে সেদিককেই অগ্রাধিকার দান করে। এ ধরনের তফসীরের প্রেরণাদাতা মতামতই হয়ে থাকে। মতামত না থাকলে এ তফসীরও তার মতে প্রবল হত না। কখনও মানুষের একটি বিশুদ্ধ মতলব থাকে এবং তার জন্যে কোরআন থেকে প্রমাণ তালাশ করে। অতঃপর সে এমন আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যার সম্পর্কে জানে, এই আয়াতের এই উদ্দেশ্য নয়। উদাহরণতঃ কেউ রাতের শেষ প্রহরে এস্তেগফার করার সপক্ষে এ হাদীসটি পেশ করে ঃ

تسحروا فان في السحور بركة -

অর্থাৎ, তোমরা সেহরী কর। সেহরী করার মধ্যে বরকত আছে। সে বলে ঃ

এখানে সেহরী করার অর্থ রাতের শেষ প্রহরে যিকির করা। অথচ সে জানে, এর উদ্দেশ্য রোযার জন্যে সেহরী খাওয়া। অথবা কেউ কোন কঠোরপ্রাণ ব্যক্তিকে সাধনা করার নির্দেশ দিয়ে এ আয়াতটি প্রমাণস্বরূপ পেশ করা اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (ফেরাউনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে।) অতঃপর সে বলে, আয়াতে ফেরাউন বলে অন্তর বুঝানো হয়েছে। এটাও মতামতের ভিত্তিতে তফসীর। এ ধরনের তফসীর কোন কোন ওয়ায়েয তাদের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে যদিও তাদের নিয়ত সঠিক, তবুও এ ধরনের তফসীর নিষিদ্ধ। ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনও খারাপ উদ্দেশে মানুষকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধোকা দেয়ার জন্যে এবং নিজের মাযহাবে দাখিল করার উদ্দেশে এ ধরনের তফসীরকে কাজে লাগায় এবং কোরআনের অর্থ নিজস্ব মত অনুযায়ী বলে দেয়। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে জানে আয়াতের প্রকৃত অর্থ এটা নয়। মোট কথা, অশুদ্ধ ও মনের খেয়াল-খুশীর অনুগামী মতামতের ভিত্তিতে তফসীর করা নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ ইজতিহাদের মাধ্যমে তফসীর করলে তা নিষিদ্ধ তফসীরের আওতাভুক্ত হবে না। রায় তথা মতামত শব্দটি যদিও শুদ্ধ অশুদ্ধ উভয় প্রকার মতামত বোঝায়, কিন্তু কোন সময় রায় বিশেষভাবে সেই মতামতকেই বলা হয়, যা খেয়াল-খুশীর অনুগামী।

বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয় অর্থ এই ধরে নেয়া যায় যে, অনেকেই আরবী শব্দাবলী সম্পর্কে বাহ্যিক ধারণা নিয়েই কোরআনের তফসীর করতে প্রবৃত্ত হয়। এতে শ্রুত কোন কিছু থাকে না। তারা কোরআনের অপ্রচলিত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে না এবং অস্পষ্ট ও পরিবর্তিত শব্দ সম্পর্কেও তারা বিশেষজ্ঞ নয়। কোরআনের সংক্ষেপকরণ পদ্ধতি, উহ্যকরণ নীতি এবং অগ্রে ও পশ্চাতে উল্লেখকরণ নীতিরও কোন খবর তারা রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয় এবং কেবল আরবী বুঝা সম্বল করেই কোরআনের অর্থ চয়নে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চিতরূপেই অনেক ভুল করবে এবং খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে তফসীরকারদের দলভুক্ত হবে। কেননা, বাহ্যিক অর্থ বুঝার জন্যে প্রথমে বর্ণনা ও শ্রবণ দরকার। বাহ্যিক তফসীরে পাকাপোক্ত হওয়ার পর অবশ্য বোধশক্তি ও চয়ন শক্তি বেড়ে যায়।

যে সকল অপ্রচলিত শব্দ আরবদের কাছে শুনা ছাড়া বুঝা যায় না, সেগুলো বহু প্রকার। নিম্নে আমরা কয়েক প্রকারের দিকে ইশারা করে দিচ্ছি, যাতে এগুলোর মাধ্যমে অন্যগুলোর অবস্থাও পরিস্ফুট হয় এবং এ কথাও জানা যায় যে, শুরুতে বাহ্যিক তফসীর আয়ত্ত ও পাকাপোক্ত করা ছাড়া কোরআনের অভ্যন্তরীণ রহস্য পর্যন্ত পৌঁছার আশা দুরাশা মাত্র। যে ব্যক্তি বাহ্যিক তফসীরে পাকাপোক্ত হওয়া ছাড়াই কোরআনী রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার দাবী করে, সে সে ব্যক্তির মত, যে দরজায় পা না রেখেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার দাবী করে। কেননা, বাহ্যিক তফসীর অভিধান শিক্ষা করার স্থলবর্তী, যা বুঝার জন্যে অত্যাবশ্যক।

যে সকল বিষয় সম্পর্কে আরবদের কাছে শুনা জরুরী, সেগুলো অনেক। প্রথম উহ্যকরণ প্রক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত করা। যেমন, وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَا النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا এর অর্থ হচ্ছে, আমি চোখ খুলে দেয়ার জন্যে সামুদ সম্প্রদায়কে একটি উষ্ট্রী দিলাম। তারা তাকে হত্যা করে নিজেদের উপর জুলুম করল। এখানে বাহ্যিক শব্দাবলী দেখে পাঠক ধারণা করবে, উষ্ট্রীটি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিল, অন্ধ ছিল না। তারা কি কি জুলুম করল, নিজেদের উপর, না অন্যের উপর – পাঠক তাও জানবে না।

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ এ আয়াতে حب (মহব্বত) শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, গোবৎসের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর সিক্ত করে দেয়া হয়েছিল। اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ – এ আয়াতের উদ্দেশ্য, আমি তোমাকে জীবিতদের আযাবের দ্বিগুণ এবং মৃতদের আযাবের দ্বিগুণ আস্বাদন করাব। এখানে عذاب শব্দটি উহ্য রয়েছে এবং জীবিত ও মৃতদের স্থলে حيوة ও ممات শব্দদ্বয় বলা হয়েছে। আভিধানিক অলংকারে এই উহ্যকরণ ও পরিবর্তন সিদ্ধ। وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا এ বাক্যে اهل শব্দটি উহ্য আছে। অর্থাৎ, জিজ্ঞেস কর সেই গ্রামের অধিবাসীদেরকে, যেখানে আমরা ছিলাম।

ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –এখানে ثقلت শব্দের অর্থ গোপন হওয়া। অর্থাৎ কেয়ামত আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের কাছে গোপন। কোন বস্তু গোপন থাকলে তা ভারী হয়ে যায়। তাই শব্দের পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং اهل শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ এখানে شكر শব্দটি উহ্য । অর্থাৎ তোমাদেরকে রুজি দেয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শোকর এই কর যে, তোমরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর। وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ এখানে السنة শব্দটি উহ্য। অর্থাৎ, আমাদেরকে দাও যার ওয়াদা তুমি রসূলগণের বাচনিক করেছ। اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এখানে নামপুরুষের সর্বনামটি কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অথচ তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়নি। حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এতে সর্বনামটি شمس -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۤءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى এখানে يقولون শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে ঃ আমরা এ জন্যেই তাদের পূজা করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে দেয়।

দ্বিতীয়, পরিবর্তিত শব্দ বর্ণিত হওয়া। যেমন وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ শব্দে سينا- এর পরিবর্তে سنين বর্ণিত হয়েছে এবং سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ তে الياس-এর স্থলে الياسين বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়, কালাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা, যা বাহ্যতঃ কালামের সংলগ্নতা ছিন্ন করে। যেমন–

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۤءَ اَنْ يَّتَّبِعُوْنَ ـ

এখানে ان يتبعون পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শরীকদের এবাদত করে, তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে।

চতুর্থ, শব্দের অগ্র পশ্চাৎ হওয়া। এরূপ স্থলে মানুষ সাধারণতঃ ভুল করে বসে। যেমন–

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى -এটা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এভাবে বুঝতে হবে وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَاجَلٌ مُّسَمًّى لَّكَانَ لِزَامًا এরূপ না হলে اجل শব্দটিতে যবর হওয়া উচিত যেমন- لِزَامًا তে হয়েছে।

পঞ্চম, শব্দ অস্পষ্ট হওয়া, যা অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- امة روح - شئ - قرين ইত্যাদি শব্দ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّايَقْدِرُ عَلٰى شَئٍ এখানে এর অর্থ ভরণ-পোষণে ব্যয় করা।

অন্যত্র বলা হয়েছে- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَايَقْدِرُ عَلٰى شَئٍ এখানে شئ এর অর্থ ন্যায় ও সততার আদেশ করা।

فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَئٍ –এখানে شئ বলে পালন কর্তৃত্বর গুণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যোগ্যতা সৃষ্টির আগে যা জিজ্ঞেস করা সাধকের জন্যে বৈধ নয়।

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَئٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ এখানে شئ এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা।

এখন قرين শব্দের বিভিন্ন অর্থ দেখা যাক। আল্লাহ বলেন ঃ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ -এখানে قرين -এর অর্থ নিয়োজিত ফেরেশতা।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ -এখানে قرين বলে শয়তান বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে -امة শব্দটি আরবীতে আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

এক ঃ দল অর্থে, যেমন- وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ সেখানে একদল লোককে পেল, যারা পানি পান করাচ্ছিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুই ঃ পয়গম্বরের অনুসারী অর্থে, যেমন আমরা বলি- আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত।

তিন ঃ সৎ ও ধর্মীয় নেতা অর্থে, যেমন- اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন ধর্মীয় নেতা, আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও একাগ্র চিত্তে।

চার ঃ ধর্ম অর্থে, যেমন- اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ -আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক ধর্মের উপর পেয়েছি।

পাঁচ ঃ সময় কাল অর্থে, যেমন- اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

ছয় ঃ দৈহিক গড়ন অর্থে, যেমন বলা হয় فلان حسن الامة অমুক ব্যক্তির দৈহি গড়ন সুন্দর।

সাত ঃ একক ও অনন্য ব্যক্তি অর্থে, যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েলকে সৈন্যদের সাথে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন ঃ امة وحدة অর্থাৎ, সে উম্মতের অনন্য ব্যক্তি।

আট ঃ মা অর্থে, যেমন বলা হয় هذه امة زيد সে যায়েদের মা।

ষষ্ঠ ঃ ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করা। উদাহণতঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ . রমযান মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রাতের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে, না দিনের বেলায়- তা প্রকাশ পায় না। এর পর বলা হয়েছে- اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ আমি এক মোবারক রাতে কোরআন নাযিল করেছি। এতে রাতে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু সেটা কোন্ রাত ছিল, তা জানা যায় না। ত্ররপর বলা হয়েছে-

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আমি কোরআন নাযিল করেছি শবে-কদরে। এতে সময়ের প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়সমুহ এমন যে হাদীস ও রেওয়ায়েতের বর্ণনা এবং আরবদের কাছে শুনা ব্যতীত এগুলোর জন্যে অন্য কিছু যথেষ্ট হয় না। কোরআন মজীদ আদ্যোপান্ত এ ধরনের বিষয় বিবর্জিত নয়। কারণ, এটা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, তাই ايجاز (সংক্ষেপকরণ), تطويل (দীর্ঘকরণ), اضمار (সর্বনাম আনা), حذف (উহ্যকরণ), ابدال (পরিবর্তন করা), تقديم (অগ্রে আনা), تاخير (পশ্চাতে আনা) ইত্যাদি যত প্রক্রিয়া আরবী ভাষায় প্রচলিত ও ব্যবহৃত, সবগুলোই কোরআনে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক আরবী ভাষা বুঝেই কোরআনের তফসীর করতে প্রবৃত্ত হয় এবং শ্রবণ ও বর্ণনাকে কাজে না লাগায়, তবে সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তফসীর করে। হাদীসে এরূপ তফসীরই নিষিদ্ধ করা হয়েছে– কোরআনের অপার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা নিষিদ্ধ করা হয়নি। মোট কথা, বাহ্যিক তফসীর তথা শব্দাবলীর অনুবাদ জানা অর্থসম্ভারের স্বরুপ বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ এর বাহ্যিক অনুবাদ হচ্ছে, আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। এ অর্থের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কেননা, এতে নিক্ষেপ করা এবং না করার কথা একই সাথে বলা হয়েছে। বাহ্যতঃ এতে দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমাহার হয়েছে। তবে এটা বুঝে নিলে কোন অসুবিধা থাকে না যে, নিক্ষেপ করা এক দিক দিয়ে এবং নিক্ষেপ না করা অন্য দিক দিয়ে। যেদিক দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়নি, সে দিক দিয়ে আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। অনুরূপভাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে– قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ওদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ওদেরকে শাস্তি দেন। এতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে শাস্তিদাতা কিরূপে বুঝেন ? যদি বলা হয়– আল্লাহ্ তাআলাই যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাতকে সক্রিয় করেন, তাই তিনি শাস্তিদাতা, তাহলে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ কি? এসব অর্থের স্বরূপ এলমে মুকাশাফার এক অথৈ সমুদ্র মন্থন করেই জানা যায়– বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ এতে উপকারী নয়। এটা জানার জন্যে প্রথমে বুঝতে হবে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার কুদরত তথা সামর্থ্যের সাথে জড়িত। এ কুদরত আল্লাহ্ তাআলা কুদরতের সাথে সংযুক্ত। এমনি ধরনের অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়ার পর ফুটে ওঠবে যে, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ। ধরে নেয়া যাক, যদি এসব অর্থের রহস্য উদঘাটন এবং এর প্রাথমিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জানার কাজে কেউ সারা জীবন ব্যয় করে দেয়, তবে সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। কোরআন মজীদের এমন কোন কলেমা নেই, যার তথ্যানুসন্ধানে এধরনের বিষয়াদির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পাকাপোক্ত আলেমগণ এসব রহস্য সেই পরিমাণে জানতে পারেন, যে পরিমাণে তাদের এলমে আধিক্য, অন্তরে স্বচ্ছতা, আগ্রহে পর্যাপ্ততা এবং অন্বেষণে আন্তরিকতা থাকে। প্রত্যেকের জন্যে উন্নতির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কেউ এর উপরের সীমায়ও উন্নতি করতে পারে, কিন্তু সকল স্তর অতিক্রম করে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ -

অর্থাৎ, যদি সমুদ্র কালি হয় এবং সকল বৃক্ষ কলম হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্র কলেমাসমূহের রহস্য লেখে শেষ করা যাবে না। এ কারণেই রহস্য বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে থাকে, অথচ আয়াতের বাহ্যিক অনুবাদ ও তফসীর সকলেই জানে; কিন্তু বাহ্যিক তফসীর তাৎপর্য বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়।

নিম্নে তাৎপর্য বুঝার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে, যা জনৈক সাধক সেজদার অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি দোয়া থেকে বুঝতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পেরেছেন। দোয়াটি এই ঃ

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

অর্থাৎ, আমি তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই তোমার ক্রোধ থেকে। আমি তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি থেকে। আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমা থেকে। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি এমন, যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ। অর্থাৎ, রসূলে করীম (সাঃ)-কে সেজদা দ্বারা নৈকট্য লাভ করার আদেশ করা হলে তিনি সেজদায় নৈকট্য লাভ করলেন। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে কতক গুণ দ্বারা কতক গুণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সেমতে সন্তুষ্টি গুণ দ্বারা ক্রোধ গুণ থেকে আশ্রয় চাইলেন এবং ক্ষমা গুণ দ্বারা শাস্তি প্রদানের গুণ থেকে আশ্রয় কামনা করলেন। এর পর তাঁর নৈকট্য আরও বেড়ে গেল এবং প্রথম নৈকট্য এরই মধ্যে একীভূত হয়ে গেল। তখন তিনি গুণাবলী থেকে সত্তায় উন্নীত হলেন এবং বললেন ঃ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমা থেকে । এর পর তাঁর নৈকট্য এত বৃদ্ধি পেল যে, তিনি এই ভেবে লজ্জিত হলেন, নৈকট্যের পর্যায় থেকে আশ্রয় চাই– এ কেমন কথা! তখনই তিনি তারীফ প্রশংসার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন ঃ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। এর পর তিনি প্রশংসাকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করাও ত্রুটি জ্ঞান করলেন এবং বললেন ঃ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ তুমি এমন, যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ।

মোট কথা, সাধকের জন্যে এধরনের রহস্য উদঘাটিত হয়। এর পর এসব রহস্যের আরও অনেক স্তর আছে। অর্থাৎ নৈকট্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা, বিশেষ নৈকট্য সেজদায় হওয়া, এক গুণ দ্বারা অন্য গুণ থেকে আশ্রয় চাওয়া, সত্তা থেকে সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি । এসব রহস্য বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু এগুলো বাহ্যিক অনুবাদের খেলাফও নয়, বরং এগুলো দ্বারা বাহ্যিক অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ ও মহিমান্বিত হয়। কোরআনের অভ্যন্তরীণ অর্থসম্ভার বুঝতে হবে– এ কথা বলার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্যও তাই যে, এসব অর্থসম্ভার বাহ্যিক অনুবাদের খেলাফ হবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ مُصْطَفٰى وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى۔

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

নবম অধ্যায়

যিকির ও দোয়া

কোরআন তেলাওয়াতের পরে আল্লাহ্ তায়ালার যিকির ও তাঁর দরবারে ব্যাকুল হৃদয়ে দোয়ার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য পেশ করার চাইতে উত্তম কোন মৌখিক এবাদত নেই বিধায় যিকির ও দোয়ার ফযীলত এবং এতদুভয়ের আদব ও শর্ত বর্ণনা করা জরুরী। নিম্নে পাঁচটি শিরোনামে আমরা এসব বিষয় বর্ননা করব।

যিকিরের ফযীলত

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।

সাবেত বানানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি জানি, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে কখন স্মরণ করেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এটা কিরূপে জানেন ? তিনি বললেন ঃ আমি যখন তাঁকে স্মরণ করি, তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○ তোমরা বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ـ

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে তওয়াফের জন্যে রওয়ানা হও, তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে তাকে স্মরণ কর।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেমন তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাকে বরং আরও বেশী স্মরণ কর।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ

যারা স্মরণ করে আল্লাহকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বস্থিত অবস্থায়।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ـ

অতঃপর নামাযান্তে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বস্থিত অবস্থায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাতে-দিনে, জলে স্থলে, বাড়ীতে-সফরে, সচ্ছলতায় নিঃস্বতায়, রুগ্নাবস্থায় সুস্থাবস্থায় এবং যাহেরে বাতেনে যিকির করতে থাক। মোনাফেকদের নিন্দা করে বলা হয়েছে "

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।

اُذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাক মনে মনে, মিনতি সহকারে, ভয় সহকারে, জোরে কথা বলার চেয়ে কম শব্দে, সকাল ও সন্ধ্যায়। তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -আল্লাহর যিকির সর্ববৃহৎ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর দু'অর্থ। এক, তোমরা আল্লাহকে যতই স্মরণ কর, তার চেয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করা নিঃসন্দেহে বড় কথা। দুই, আল্লাহ তা'আলার যিকির অন্য সকল এবাদতের তুলনায় বড়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

০ গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী এমন, যেমন শুকনা ও ভাঙ্গা গাছপালার মাঝখানে কোন সবুজ বৃক্ষ থাকে।

ذكر الله فى الغافلين كالمقاتل فى الفارين যে গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকির করে, সে যেন পলায়নপর লোকদের মধ্যে যুদ্ধ করে।

ذكر الله فى الغافلين كالحى بين الاموات গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তির ন্যায়।

০ এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি বান্দার সাথে থাকি যে পর্যন্ত সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ঠোঁট নড়াচড়া করে।

০ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী আমলসমূহের মধ্যে যিকির অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ আমল নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর পথে জেহাদও নয়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জেহাদও নয়; কিন্তু যদি তরবারি দ্বারা মারতে মারতে তরবারি ভেঙ্গে ফেলে, আবার মারে ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে এবং আবার মারে ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে।

০ যে কেউ জান্নাতের পুষ্পোদ্যানে বিচরণ পছন্দ করে, তার বেশী করে যিকির করা উচিত।

০ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর যিকিরে রত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সর্বোত্তম আমল।

০ তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকরে রত থাক, যাতে এ সময় তোমাদের কোন গোনাহ না হয়।

০ সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা, আল্লাহর পথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তরবারি ভেঙ্গে ফেলা এবং জলস্রোতের মত অর্থ দান করার চেয়েও উত্তম।

০ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন ঃ যখন বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। অর্থাৎ, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না। বান্দা যখন আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তাদের সে সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে আমার পানে আস্তে চললে আমি তার পানে দ্রুতবেগে চলি; অর্থাৎ তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল করি।

০ আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আপন আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ভয়ে কান্নাকাটি করে।

০ হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না, যা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম; তোমাদের কাছে অনেক পরিচ্ছন্ন, তোমাদের মর্তবাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ, তোমাদের জন্যে সোনারূপা দান করার চেয়েও ভাল এবং শত্রুর সাথে সংঘর্ষে [illegible] হয়ে নিজে মরা এবং তাদেরকে মারার চেয়েও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সে কথাটি কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করবে।

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাকে আমার যিকির আমার কাছে চাওয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে এমন বস্তু দেব, যা যারা চায়, তাদেরকে দেয়া বস্তু অপেক্ষা উত্তম হবে।

এ সম্পর্কে মহৎ ব্যক্তিগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

০ হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আমরা শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ হে ইবনে আদম! তুমি আমাকে এক ঘন্টা সকালে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক ঘন্টা আছরের পরে স্মরণ করে নিও। আমি এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তোমার জন্যে যথেষ্ট হব।

○ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যিকির দু'প্রকার। এক, মনে মনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা, যাতে আল্লাহ ব্যতীত কেউ না জানে। এটা খুবই উৎকৃষ্ট যিকির এবং এর সওয়াব বেশী। এর চেয়েও উত্তম যিকির হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে তখন স্মরণ করা, যখন তিনি বঞ্চিত করে দেন।

○ বর্ণিত আছে, সকল মানুষ পিপাসার্ত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে; কিন্তু যারা যিকিরকারী, তারা পিপাসার্ত হবে না।

○ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীরা কোন কিছুর জন্যে পরিতাপ করবে না, কিন্তু সেই মুহূর্তটির জন্যে পরিতাপ করবে, যা তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাতে আল্লাহর যিকির করেনি।

মসলিসে যিকিরের ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা কোন মজলিসে যিকির করে, তাদেরকে ফেরেশতারা ঘিরে নেয়, রহমতের দ্বারা আবৃত করে এবং আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব জগতে তাদের কথা আলোচনা করেন।

○ যারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে এবং সেই যিকির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না, তাদেরকে একজন ফেরেশতা আকাশ থেকে ডেকে বলে ঃ ওঠ, তোমাদের মাগফেরাত হয়ে গেছে। তোমাদের পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

○ যারা কোন জায়গায় বসে আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে না এবং নবী (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে না, তারা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করবে।

○ হযরত দাউদ (আঃ) বলেন ঃ ইলাহী, যখন আপনি আমাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেখেন, আমি যিকিরকারীদের মজলিস থেকে ওঠে গাফেলদের মজলিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন আমার পা ভেঙ্গে দিন। এটাও আপনার একটি কৃপা হবে।

০ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ একটি নেক মজলিসের দ্বারা ঈমানদারদের বিশ লাখ মন্দ মজলিসের কাফফারা হয়ে যায়।

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আকাশের অধিবাসীরা পৃথিবীবাসীদের সেসব গৃহের দিকে তাকাবে, যেগুলোতে আল্লাহর যিকির হতে থাকবে। সে ঘরগুলো তাদের চোখে তারকার মত জ্বলজ্বল করতে থাকবে।

০ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, তখন শয়তান তার দোসর দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং দুনিয়াকে বলে ঃ দেখছ, এরা কি করছে? দুনিয়া বলে ঃ করতে দাও। এরা যখন আলাদা হয়ে যাবে, আমি ঘাড়ে ধরে ওদেরকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার বাজারে গিয়ে লোকজনকে বললেন ঃ তোমরা এখানে রয়েছ, ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হচ্ছে! লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হল, কিন্তু সেখানে কোন অর্থ-সম্পদ দেখল না। তারা ফিরে গিয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলল ঃ আমরা তো কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন হতে দেখলাম না। হযরত আবু হোরায়রা বললেন ঃ তাহলে কি দেখেছ? তারা বললঃ কিছু লোককে দেখলাম তারা আল্লাহর যিকির করছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করছে। তিনি বললেন ঃ এগুলোই তো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি।

০ হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমলনামা লিপিবদ্ধকারীগণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও অনেক ফেরেশতা পৃথিবীতে যিকিরের মজলিস তালাশ করে ফিরে। তারা যখন কোন জনসমষ্টিকে আল্লাহর যিকির করতে দেখে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ আপন কাজে চল। অতঃপর সকল ফেরেশতা সেখানে আসে এবং দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত যিকিরকারীদেরকে ঘিরে নেয়। এর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি কাজে দেখে এসেছ? ফেরেশতারা আরজ করেঃ আমরা তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তারা আপনার প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা আমাকে দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখে নেয়, তা হলে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে বেশীর ভাগ সময়ই আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করবে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি বস্তু থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতারা বলে ঃ তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ বলেন ঃ তারা জাহান্নাম দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নেয়, তবে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে আরও বেশী আশ্রয় চাইবে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলে ঃ তারা জান্নাতপ্রার্থী। আল্লাহ বলেন ঃ তারা জান্নাত দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ দেখে নিলে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে তারা আরও বেশী জান্নাত কামনা করবে। এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদেরকে ক্ষমা করলাম। ফেরেশতারা আরজ করেঃ ইলাহী, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যিকিরের নিয়তে সেখানে আসেনি; বরং নিজের কোন কাজে এসেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ তারা এমন লোক যে, তাদের সাথে উপবেশনকারী কোন ব্যক্তিও তাদের বরকত থেকে বঞ্চিত হয় না।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যা কিছু আমি এবং আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বলেছেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম উক্তি হচ্ছে– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

০ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই কালেমা পাঠ করবে, তা তার জন্যে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান হবে। তার জন্যে একশ' নেকী লেখা হবে। তার একশ' পাপ মোচন করা হবে। সে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। তার আমল থেকে উত্তম অন্য কারও আমল হবে না, সে ব্যক্তি ছাড়া, যে একশ'বারের বেশী এই কলেমা পাঠ করবে।

০ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই কলেমা পাঠ করবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

তার জন্যে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে যেতে পারবে।

০ যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তারা কবরে এবং কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময় আতঙ্কগ্রস্ত হবে না। আমি যেন দেখছি, তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সময় মাথা থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছে এবং মুখে বলছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

০ হে আব হোরায়রা, তুমি যে সৎকর্ম করবে, তা কেয়ামতের দিন ওজন করা হবে, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিলে তা ওজন করার জন্যে কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি সত্য মনে এই কলেমা পাঠ করে, তার পাল্লায় যদি এই কলেমা রাখা হয় এবং সপ্ত আকাশ, সপ্ত পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লাই ঝুকে পড়বে।

০ যদি সত্য মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকিরকারী ভূপৃষ্ঠ পরিমাণও গোনাহ নিয়ে আসে, তবুও আল্লাহ তাআলা সব গোনাহ মাফ করবেন।

০ হে আবু হুরায়রা! মরনোম্মখ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য শিক্ষা দাও। এটা গোনাহসমূহকে বিনাশ করে। আবু হোরায়রা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা তো মৃতদের জন্যে। জীবিতদের জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কি? তিনি বললেন ঃ তাদের জন্যে আরও বেশী বিনাশ করে।

من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة ـ

যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

০ নিঃসন্দেহে তোমরা সকলেই জান্নাতে যাবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি মূলক ব্যবহার করবে, তার কথা ভিন্ন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর সাথে অস্বীকৃতিমূলক ব্যবহার কি? তিনি বললেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা। অতএব তোমরা বেশী পরিমাণে এই কলেমা উচ্চারণ কর। নতুবা একদিন তোমাদের মধ্যে ও এই কলেমার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। কেননা, এটা কলেমায়ে তওহীদ, কলেমায়ে আখলাক, কলেমায়ে তাকওয়া, কলেমায়ে-তাইয়েবা, দাওয়াতুল হক (সত্যের আহ্বান) এবং "ওরওয়ায়ে-ওছকা" তথা মজবুত রশি। জান্নাতের মূল্যও এটাই।

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

অর্থাৎ, পুণ্যের বদলা পুণ্য ছাড়া কিছুই নয়। এতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পুণ্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং পরকালের পুণ্য হচ্ছে জান্নাত। এমনিভাবে- لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

অর্থাৎ, যারা পুণ্য কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য এবং অতিরিক্ত আরও। এ আয়াতেও সে কথাই বলা হয়েছে।

০ হযরত বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশ বার বলবে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

০ আমর ইবনে শোআয়বের রেওয়ায়েতে রসূলূল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি একদিনে দু'শ বার উপরোক্ত কলেমা পাঠ করবে, তার অগ্রে সে-ও যাবে না যে তার পূর্বে ছিল এবং তাকে সেও পাবে না, যে তার পরে হবে, কিন্তু যে তার চেয়ে উত্তম আমল করবে, সে অবশ্য তার অগ্রে থাকবে।

০ হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বাজারে বলবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

তার জন্যে দশ লক্ষ নেকী লেখা হবে এবং তার দশ লক্ষ গোনাহ মার্জনা করা হবে। জান্নাতে তার জন্যে একটি গৃহ নির্মিত হবে।

০ বর্ণিত আছে, বান্দা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখন এই কলেমা তার আমলনামার দিকে অগ্রসর হয় এবং যে গোনাহের উপর দিয়ে যায়, তাকে মিটিয়ে দেয়। অবশেষে নিজের মত কোন নেকী দেখে তার পার্শ্বে বসে পড়ে।

০ আবু আইউব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

বলে, তা তার জন্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে চারজন গোলাম মুক্ত করার সমান হবে।

০ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে উপরোক্ত কলেমার সাথে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যোগ করে পাঠ করে, সে মাগফেরাত চাইলে মাগফেরাত হয়ে যাবে, দোয়া করলে তা কবুল হবে এবং ওযু করে নামায পড়লে নামায কবুল হবে।

সোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও অন্যান্য যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

০ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 'সোবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবর ৩৩ বার এবং শ' পূর্ণ করার জন্যে উপরোক্ত কলেমা ১ বার বলে, তার গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

০ যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে, তার গোনাহ দূর হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

০ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমার তরফ থেকে সংসার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ফেরেশতাদের নামায এবং মানুষের তসবীহ পাঠ কর না কেন? এতে রুজি পাওয়া যায়। লোকটি বলল ঃ এটা কি? এরশাদ হল ঃ সোবহে সাদেক থেকে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'সোনহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীমি আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে নেবে। সংসার তোমার কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ধরা দেবে। এ দোয়ার প্রত্যেক কলেমা দ্বারা আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন। তারা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তসবীহ পাঠ করবে এবং তুমি তার সওয়াব পাবে।

০ বান্দা যখন আলহামদু লিল্লাহ বলে, তখন তা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলকে পূর্ণ করে দেয়। এর পর যখন দ্বিতীয় বার বলে, তখন সপ্তম আকাশ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু পূর্ণ করে দেয়। এর পর যখন তৃতীয় বার বলে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ চাও, তুমি পাবে।

০ রেফায়া জারনী বর্ণনা করেন– আমরা একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললেন, তখন এক ব্যক্তি পেছন থেকে বলল ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ নামাযান্তে তিনি বললেন ঃ কে বলেছিল? লোকটি আরজ করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি বলেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি ত্রিশ জনের কিছু বেশী ফেরেশতাকে দেখলাম, এ কলেমাটি প্রথমে লেখার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

○ নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহ্র প্রতাপ, পবিত্রতা, একত্ব ও প্রশংসার যিকির করে, তাদের এসব কলেমা আরশের চারপাশে ঘুরাফেরা করে। মৌমাছির মত ভন ভন শব্দ করে এগুলো পরওয়ারদেগারের সামনে যিকিরকারীদের আলোচনা করে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বদা তোমাদের আলোচনা হোক, এটা কি তোমরা পছন্দ কর না?

○ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –বলা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম। এক রেওয়ায়েতে এর সাথে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্যটিও সংযুক্ত রয়েছে।

○ এ চারটি কলেমা আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক পছন্দনীয় سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –এসব কলেমা বলে যে কাজ শুরু করা হবে, তাতে কোন ত্রুটি হবে না।

○ আবু মালেক আশআরীর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ বলা দাঁড়ি পাল্লা পূর্ণ করে দেয় এবং সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ বলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পূর্ণ করে দেয়। নামায নূর। খয়রাত দলীল। সবর আলো। কোরআন লাভ ও লোকসানের প্রমাণ। সকল মানুষ ভোরে ওঠে হয় নিজেদেরকে বিক্রি করে দেয়, না হয় নিজেদেরকে ক্রয় করে এবং মুক্ত করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

○ হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ দুটি কলেমা জিহ্বায় হালকা, দাঁড়ি পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। একটি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ এবং অপরটি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

○ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম- কোন কালামটি আল্লাহ তাআলার অধিকতর প্রিয়? তিনি বললেন ঃ যে কালামটি তিনি ফেরেশতাদের জন্যে বেছে রেখেছেন অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

○ আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামের মধ্য থেকে এসব কলেমা বেছে নিয়েছেন- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বান্দা যখন সোবহানাল্লাহ্ বলে, তখন তার জন্যে বিশটি নেকী লেখা হয় এবং তার বিশটি গোনাহ দূরা করা হয়। যখন আল্লাহু আকবর বলে, তখনও তাই করা হয়। এভাবে শেষ কলেমা পর্যন্ত উল্লেখ করে বললেন, প্রত্যেকটি বলার পর তাই করা হয়।

○ হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে- যে ব্যক্তি সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে, তার জন্যে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

○ হযরত আবু যর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে- নিঃস্ব সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, ধনীরা সওয়াব নিয়ে গেছে। তারা আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের মত রোযা রাখে এবং অতিরিক্ত মাল খরচ করে, আমরা তা পারি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের জন্যে সদকা করার কিছু দেননি? তোমাদের জন্যে প্রত্যেক সোবহানাল্লাহ বলা সদকা, আলহামদু লিল্লাহ বলা সদকা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদকা, ভাল কাজের আদেশ করা সদকা, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সদকা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমরা স্ত্রীর সাথে কামভাব চরিতার্থ করব– এতেও সওয়াব পাওয়া যাবে? তিনি বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, যদি কাম-বাসনা হারাম স্থানে ব্যয় করতে, তবে গোনাহ হত কিনা? তাঁরা আরজ করলেন ঃ অবশ্যই গোনাহ হত। তিনি বললেন ঃ এমনিভাবে হালাল স্থানে তা ব্যয় করলে সওয়াব হবে।

০ হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– ধনীরা সওয়াবে আমাদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। আমরা যা বলি, তা তারাও বলে, কিন্তু তারা ব্যয় করে– আমরা করি না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন আমল বলে দিচ্ছি, যা তুমি করলে তোমার অগ্রগামীকে ধরে ফেলবে এবং তোমার পশ্চাদগামীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে। তবে যে তোমার কথামত কথা বলে, তার কথা ভিন্ন। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ে নেবে।

০ বুসরা বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ মহিলাগণ, তোমরা নিজেদের জন্যে সোবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুব্বুহুন কুদ্দুসুন বলা অপরিহার্য করে নাও। এতে শৈথিল্য করো না। অঙ্গুলির গিরায় গুনে নেবে। অঙ্গুলি কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে এবং কথা বলবে।

০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অঙ্গুলিতে সোবহানাল্লাহ গণনা করতে দেখেছি।

০ হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সাক্ষ্য দেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলছে যে, আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি সর্ববৃহৎ। বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে যে, আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি একক। আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন শরীক নেই। বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। গোনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার ক্ষমতা অন্য কেউ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি এসব কলেমা মৃত্যুর সময় বলে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না।

০ মুসাইয়্যিব ইবনে সা'দ তাঁর পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কারও প্রত্যহ এক হাজার সৎকর্ম করার সাধ্য নেই। লোকেরা আরজ করল ঃ হাঁ, এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ যে একশ'বার সোবহানাল্লাহ বলে নেবে, তার জন্যে এক হাজার সৎকর্ম লেখা হবে এবং তার এক হাজার পাপ দূর করা হবে।

০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (অথবা আবু মূসা)! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্য থেকে একটি ভান্ডারের কথা বলব না? তিনি আরজ করলেন ঃ এরশাদ করুন। তিনি বললেন ঃ বল 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহকে পালনকর্তা জেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে ধর্ম জেনে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল ও নবী জেনে সন্তুষ্ট।

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এই কলেমা পড়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া রীতিমত পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

০ মুজাহিদ বলেন ঃ মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয় এবং বিসমিল্লাহ বলে, তখন ফেরেশতা বলে– তোকে হেদায়াত করা হয়েছে। যখন বলে تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ (আল্লাহর উপর ভরসা করলাম), তখন ফেরেশতা বলে– তোর জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখন বলে ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, তখন ফেরেশতা বলে– তোর হেফাযত করা হয়েছে। এর পর তার কাছ থেকে শয়তান আলাদা হয়ে যায়। কারণ, তার উপর শয়তানের শক্তি চলে না। সে আল্লাহর হেদায়াত ও হেফাযতে দাখিল হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর যিকির জিহ্বায় হালকা এবং কম কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও সকল এবাদতের তুলনায় অধিক উপকারী কিরূপে হয়ে গেল? অথচ এবাদতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। এর জওয়াব হচ্ছে, এ বিষয়ের যথার্থ অনুসন্ধান তো এলমে মুকাশাফা ছাড়া অন্য কোথাও শোভনীয় নয়, কিন্তু এলমে মুয়ামালায় যতটুকু আলোচনা সম্ভব, তা হচ্ছে, যে যিকির কার্যকর ও উপকারী হয়, তা হচ্ছে অন্তরের উপস্থিতি সহকারে সার্বক্ষণিক যিকির। কেবল মুখে যিকির করা ও অন্তর গাফেল থাকা খুব কমই উপকারী। এ কথাটি হাদীস থেকেও জানা যায়। কোন এক মুহূর্তে অন্তর উপস্থিত হওয়া এবং অন্য মুহূর্তে দুনিয়াতে মশগুল হয়ে আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল হওয়া কম উপকারী। বরং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অন্তরের উপস্থিতি সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময়ে সকল এবাদতের অগ্রবর্তী; বরং এর মাধ্যমেই যিকির সকল এবাদতের উপর শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে এবং এটাই সকল কার্যগত এবাদতের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যিকিরের একটি শুরু ও একটি পরিণাম আছে। যিকিরের শুরু অনুরাগ ও মহব্বতের কারণ হয় এবং পরিণাম হচ্ছে, অনুরাগ ও মহব্বত যিকিরের কারণ হয়ে যায়। মহব্বতের কারণেই যিকির অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুরাগ ও মহব্বত যিকির করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই কাম্য। কেননা, শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থায় কখনও জোরপূর্বক আপন মন ও জিহ্বাকে কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রেখে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যাপৃত করে এবং খোদায়ী তওফীকে তা অব্যাহত রেখে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কেননা, অভ্যাসগতভাবে দেখা যায় যে, কারও সামনে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আলোচনা করা হলে এবং তার গুণাবলী বার বার তাকে শুনানো হলে সে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মহব্বত করতে থাকে। বরং কখনও অধিক আলোচনা দ্বারাই সে তার আশেক হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শুরুতে জোরপূর্বক যিকির দ্বারা আশেক হয়ে পরিণামে সে অধিক যিকির করতে এমন বাধ্য হয় যে, যিকির না করে থাকতেই পারে না। কেননা, যে যাকে মহব্বত করে, সে তার যিকির বেশী করে। এটাই নিয়ম। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার যিকির প্রথমে জোরপূর্বক হলেও তার ফলস্বরূপ পরিণামে আল্লাহর সাথে মহব্বত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকির না করে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। এটাই অর্থ জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত এই উক্তির, 'আমি বিশ বছর পর্যন্ত কোরআনের উপর কেবল মেহনতই করেছি। এর পর বিশ বছর কোরআন থেকে রত্ন আহরণ করেছি? এই রত্ন অনুরাগ ও মহব্বত ছাড়া কোন কিছু দ্বারা প্রকাশ পায় না। দীর্ঘ দিন জোরপূর্বক কষ্ট স্বীকার করলেই অনুরাগ ও মহব্বত অর্জিত হয় এবং তা মজ্জাগত হয়ে যায়। এ বিষয়টিকে অবান্তর মনে করবে না। কেননা, আমরা দেখি, মানুষ মাঝে মাঝে কোন বস্তু জোরপূর্বক খায় এবং বিস্বাদ হওয়ার কারণে তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু জোরপূর্বক গলাধঃকরণ করে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ফলে শেষ পর্যন্ত বস্তুটি তার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায় এবং সে তা না খেয়ে থাকতে পারে না। মোট কথা, মানুষ অভ্যাসের দাস। প্রথমে যে কাজ সে জোরপূর্বক করে, শেষে তা তার মজ্জায় পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা অনুরাগ অর্জিত হয়ে গেলে অবশিষ্ট সবকিছু থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া মৃত্যুর সময় সে সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। পরিবারের লোক, ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কবরে তার সঙ্গে যাবে না। আল্লাহর যিকির ছাড়া সেখানে কিছুই থাকবে না। সুতরাং যিকিরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তা দ্বারা উপকৃত হবে এবং বাধা-বিপত্তি দূর হওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করবে। পার্থিব জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন যিকিরে বাধা সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পর কোন বাধা থাকবে না। তখন সে প্রিয়জনের সাথে একান্তে বাস করবে। তখন তার অবস্থা খুব উন্নত হবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরশাদ করেনঃ রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মনে এ কথা রেখে দিয়েছেন যে, তোমার প্রিয় বস্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। এখানে পার্থিব বস্তু বুঝানো হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংসশীল।

মৃত্যু মানে অস্তিত্ব লোপ পাওয়া; এর সাথে আল্লাহর যিকির কিরূপে থাকতে পারে? এ যুক্তির ভিত্তিতে মৃত্যুর পর যিকির করার কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। কেননা, মৃত্যুর কারণে মানুষ এমন বিলুপ্ত হয় না, যা যিকিরের পরিপন্থী। বরং সে কেবল দুনিয়া ও বাহ্যিক জগত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফেরেশতা জগত থেকে বিলুপ্ত হয় না। নিম্নোক্ত দু'টি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

القبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة -

কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

ارواح الشهداء فى حواصل طيور خضر •

অর্থাৎ শহীদগণের আত্মা সবুজ পক্ষীকুলের পাকস্থলীতে থাকে। নিম্নোক্ত এরশাদেও এই ঈঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ হে অমুক, হে অমুক, তোমরা পরওয়ারদেগারে ওয়াদা সত্য পেয়েছ কিনা ? পরওয়ারদেগার আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি।

হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা শুনে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, তারা কিরূপে শুনবে এবং কিভাবে জওয়াব দেবে ? তারা তো মরে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তোমরা আমার কথা তাদের চেয়ে বেশী শুন না। পার্থক্য হচ্ছে, তারা জওয়াব দেয়ার শক্তি রাখে না। এ রেওয়ায়েতটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে। মুমিনদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন সে, তাদের আত্মা সবুজ পক্ষীকুলের পাকস্থলীতে আরশের নীচে ঝুলতে থাকে। হাদীসসমূহে বর্ণিত এই অবস্থা মৃত্যুর পর আল্লাহর যিকিরের পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে রিযিক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেন, তাতে তারা খুশী।

আল্লাহ্র যিকির শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে শাহাদতের মর্তবা শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কেননা, শাহাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে যাওয়া যে, অন্তর আল্লাহর মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । সুতরাং কোন বান্দা যদি আল্লাহর মধ্যে ডুবে থাকতে সক্ষম হয়, তবে যুদ্ধের সারি ছাড়া তার জন্যে এ অবস্থায় অন্য কোনরূপে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। কেননা, যুদ্ধের সারিতে নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এমনকি, সমগ্র দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। এগুলো জীবনের জন্যে আবশ্যক হয়ে থাকে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে যখন জীবনেরই কোন মূল্য থাকে না, তখন এসব বস্তুর কি মূল্য থাকবে ? এ থেকে জানা গেল, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মর্তবা অনেক বড়। কোরআন ও হাদীসে এর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর আনসারী শহীদ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পুত্র জাবের (রাঃ)-কে বললেন ঃ জাবের, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। জাবের আরজ করলেন ঃ উত্তম, আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমার পিতাকে জীবিত করে নিজের সামনে এভাবে বসিয়েছেন যে, তার মধ্যে ও আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যে কোন আড়াল ছিল না। এর পর আল্লাহ্ বললেন ঃ হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে দান করব। তোমার পিতা বলল ঃ ইলাহী, আমার বাসনা, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, যাতে আমি আপনার পথে এবং আপনার রসূলের আনুগত্যে পুনরায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার আদেশ পূর্বে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জারি হয়ে গেছে– মানুষ মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে যাবে না। নিহত হওয়া এহেন পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুর কারণ। যদি নিহত না হয় এবং দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে, তবে দুনিয়ার কামনা - বাসনায় পুনরায় লিপ্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। এ কারণেই সাধকগণ খাতেমা অর্থাৎ শেষ অবস্থার ব্যাপারে খুব ভীত থাকেন। অন্তর যতই আল্লাহর যিকরে লেগে থাকুক, কিন্তু তা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং দুনিয়ার কামনা বাসনার দিকে কিছু না কিছু দৃষ্টি রাখে। সুতরাং শেষ অবস্থায় যদি অন্তর দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে আচ্ছন্ন থাকে এবং তদবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে অনুমান এটাই যে, মৃত্যুর পর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা করবে। কেননা, মানুষ যে অবস্থায় জীবন যাপন করে, সে অবস্থায়ই হাশর হয়। এমতাবস্থায় বিপদাশংকা থেকে অধিক আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করা। এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, শহীদের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন করা অথবা বীরত্বে খ্যাতি অর্জন করা ইত্যাদি না হওয়া চাই। এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ শহীদ হলে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সে জাহান্নামে যাবে। বরং শহীদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর বাণী সমুন্নত করা। নিম্নোক্ত আয়াতে এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিই দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে।

শহীদের অবস্থা কলেমায়ে তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উদ্দেশের অনুরূপ। কেননা, এই কলেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক উদ্দেশ্য মাবুদ এবং প্রত্যেক মাবুদ ইলাহ তথা উপাস্য। শহীদ ব্যক্তি তার অবস্থার ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন উদ্দেশ্য নেই। আর যে ব্যক্তি এই কলেমা তার মুখের ভাষায় বলে এবং তার অবস্থা এই কলেমার অনুরূপ না হয় তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। সে বিপদমুক্ত নয়। এসব কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাকে সকল যিকিরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কোন কোন জায়গায় উৎসাহ দানের উদ্দেশে সর্বাবস্থায় এ কলেমা উচ্চারণ করাকেই যিকির বলেছেন এবং কোন কোন জায়গায় আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার শর্ত সহযোগে বলেছেন– من قال لا اله الا الله مخلصا (যে ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে)। ইখলাসের অর্থ হচ্ছে মৌখিক উক্তির অনুরূপ অবস্থা হওয়া। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন শেষ অবস্থায় আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যাদের অবস্থা, মুখের কথা এবং যাহের ও বাতেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুরূপ।

দোয়ার ফযীলত ও আদব

এ সম্পর্কিত আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ -

অর্থাৎ, হে নবী, আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন বলে দিন, আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি দোয়াকারীর দোয়ায় সাড়া দেই। অতএব তারা যেন আমার আদেশ পালন করে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে দোয়া কর। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

অর্থাৎ বলে দিন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর অথবা রহমানের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছে, তাঁর বহু উত্তম নাম রয়েছে, এখন যে নামেই ইচ্ছা দোয়া কর।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তা বলেন ঃ তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়ায় সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার এবাদতে অহংকার করে, তারা সত্বরই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এ সম্পর্কে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ

০ নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ الدعاء هو العبادة (দোয়াই হল এবাদত) অতঃপর তিনি اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

০ الدعاء مخ العبادة অর্থাৎ দোয়া এবাদতের সারবস্তু।

০ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়ার চেয়ে বড় কোন কিছু নেই।

০ দোয়া দ্বারা তিনটি বিষয়ের কোন না কোন একটি অর্জিত হয় দোয়াকারীর গোনাহ মার্জনা করা হয় অথবা সে কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় অথবা কোন নেকী তার জন্যে সঞ্চিত রাখা হয়।

০ আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তিনি প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা চমৎকার এবাদত।

দোয়ার আদব দশটি ঃ

(১) দোয়ার জন্যে উত্তম দিনসমূহের দিকে তাকিয়ে থাকা; যেমন, বছরে আরাফার দিন, মাসসমূহের মধ্যে রমযান মাস, সপ্তাহের মধ্যে জুমুআর দিন এবং রাতের প্রহরসমূহের মধ্যে সেহরীর সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (তারা সেহরীর সময়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে।) রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতি রাত্রে শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকার সময় দুনিয়ার আসমানে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দান করেন এবং বলেন ঃ এমন কে আছে, যে আমার কাছে দোয়া করবে আর আমি তা কবুল করব? বর্ণিত আছে, হযরত এয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন- سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ (আমি সত্বরই তোমাদের জন্যে পরওয়ারদেগারের কাছে মাগফেরাতের দরখাস্ত করব)। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেহরীর সময় দোয়া করা। সেমতে তিনি রাতের শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করেন এবং দোয়া প্রার্থনা করেন। সন্তানরা তাঁর পেছনে আমীন আমীন বলেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ আমি তাদের অপরাধ মার্জনা করলাম এবং তাদেরকে পয়গম্বর করলাম।

(২) উত্তম অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহর পথে সৈন্যরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে এবং যখন ফরয নামাযের জন্যে তকবীর বলা হয়, তখন আকাশের দরজা খুলে যায়। এসব সময় দোয়া করাকে উত্তম সুযোগ মনে করবে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ নামাযসমূহ উৎকৃষ্ট মুহূর্তে নির্ধারিত হয়েছে। অতএব নামাযের পরে দোয়া করা অপরিহার্য করে নাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আযান ও একামতের মাঝখানে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। বাস্তবে সময় উৎকৃষ্ট হলে অবস্থাও উৎকৃষ্ট হয়। উদাহরণতঃ সেহরীর সময় মনের পরিচ্ছন্নতা, আন্তরিকতা এবং উদ্বেগজনক বিষয়াদি থেকে মুক্ত হওয়ার সময়। আরাফা ও জুমআর দিন উদ্যমসমূহের একত্রিত হওয়া এবং আল্লাহর রহমত নামিয়ে আনার জন্যে অন্তরসমূহের ঐকমত্যের সময়। এছাড়া সেজদার অবস্থাও দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা সকল অবস্থা অপেক্ষা সেজদার অবস্থায় তার পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে রুকু ও সেজদায় কোরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব তোমরা রুকুতে আল্লাহর তাযীম কর এবং সেজদায় দোয়া করার খুব চেষ্টা কর। এ অবস্থা দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত।

(৩) কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা এবং হাত এতটুকু উঁচুতে তোলা যাতে বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে আগমন করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া করলেন। সালমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের পরওয়ারদেগার লজ্জাশীল দাতা। বান্দা যখন তাঁর দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে, তখন তিনি খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়ায় হাত এতটুকু উপরে তুলতেন যাতে তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত। তিনি দোয়ায় উভয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে তখন দোয়া করছিল এবং শাহাদতের উভয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করছিল। তিনি বললেন ঃ এক অঙ্গুলি দিয়েই ইশারা কর। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ শৃঙ্খলবদ্ধ হওয়ার পূর্বে হাতগুলো দোয়ার জন্যে উত্তোলন কর।

দোয়া শেষে উভয় হাত মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেয়া উচিত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উভয় হাত দোয়ায় প্রসারিত করতেন, তখন মুখমন্ডলে না বুলিয়ে সরাতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দোয়া করতেন, তখন উভয় হাতের তালু মিলিয়ে নিতেন এবং ভিতরের অংশ মুখের দিকে রাখতেন। দোয়ায় আকাশের দিকে দৃষ্টি না রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ লোকেরা যেন দোয়ায় তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকে। নতুবা তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।

(৪) নিম্নস্বরে দোয়া করা। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহযাত্রী হয়ে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি তকবীর বললেন। লোকেরাও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খুব উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ লোকসকল, যাকে তোমরা ডাকছ, তিনি বধির এবং অনুপস্থিত নন; বরং তিনি তোমাদের ও তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের মাঝখানে রয়েছেন। কোরআন বলে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا অর্থাৎ, তুমি নামাযে উচ্চ শব্দ করো না এবং চুপিসারেও পড়ো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য, দোয়া সশব্দেও করো না এবং একেবারে নিঃশব্দেও করো না; বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আপন নবী যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاءً خَفِيًّا অর্থাৎ, যখন সে তার পরওয়ারদেগারকে আস্তে ডাক দিল।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বিনীত ও নীচু স্বরে ডাক।

(৫) দোয়ায় ছন্দ মিলানোর চেষ্টা না করা। দোয়ার অবস্থা কাকুতি মিনতি ও বিনয়ের অবস্থা হওয়া উচিত। এতে ছন্দের মিল সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা থাকা সমীচীন নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সত্বরই কিছু লোক এমন হবে, যারা দোয়ায় সীমালঙ্ঘন করবে।

কেউ কেউ– اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তাকে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে ডাক,তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

–এই আয়াতের তফসীরে বলেন, এখানে 'সীমালঙ্ঘনকারী' বলে দোয়ায় সযত্নে ছন্দের মিল সৃষ্টিকারীকে বুঝানো হয়েছে। সেমতে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া না করাই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তম। কেননা, অন্য দোয়া করলে তাতে সীমালঙ্ঘনের আশংকা থাকে। ভাল দোয়া কোন্‌টি, তা সকলের জানা নেই। এ কারণেই হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে হাদীস অথবা তাঁরই উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতেও আলেমগণের প্রয়োজন হবে। যখন জান্নাতীদেরকে বলা হবে– তোমরা বাসনা কর, তখন কিভাবে বাসনা করতে হবে তা তাদের জানা থাকবে না। অবশেষে আলেমগণের কাছ থেকে শিখে বাসনা করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ দোয়ায় ছন্দের মিল সৃষ্টি থেকে দূরে থাক। তোমাদের জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং যে কথা ও কাজ মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে, তা প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যে কথা ও কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে, তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করি। পূর্ববর্তী জনৈক বুযুর্গ এক ওয়ায়েযের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। ওয়ায়েয তখন ছন্দ মিলিয়ে দোয়া করছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সামনে কাব্যিক বাহাদুরী প্রদর্শন করছ? সাক্ষী থাক– আমি হাবীব আজমীকে দোয়া করতে দেখেছি, যাঁর দোয়ার বরকত দেশময় খ্যাত। তিনি তার দোয়ায় এর বেশী বলতেন না–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَيِّدِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَاتَفْضَحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ۔

— হে আল্লাহ, আমাদেরকে খাঁটি ও নির্মল কর। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করো না। হে আল্লাহ, আমাদের সৎকাজের তওফীক দান কর। মানুষ চতুর্দিক থেকে জড়ো হয়ে তারপেছনে দোয়া করত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ লাঞ্ছনা ও অক্ষমতার ভাষায় দোয়া কর– বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় নয়। কথিত আছে, আলেম ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবদালগণের মধ্যে কেউ দোয়ায় সাতটি বাক্যের বেশী বলতেন না। সূরা বাকারার শেষাংশ এর প্রমাণ। কোরআনের অন্য কোথাও বান্দার দোয়া এর চেয়ে বেশী উল্লিখিত হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, ছন্দের মিল বলে প্রয়াস সহকারে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। এটা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির পরিপন্থী। এখানে ছন্দের স্বাভিবিক মিল উদ্দেশ্য নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত দোয়ার মধ্যেও ছন্দের মিল বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এটা সযত্ন প্রয়াস ও বানোয়াট নয়। স্বাভাবিকভাবে আগত। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমুহকেই যথেষ্ট মনে করবে অথবা ছন্দের মিলের জন্যে প্রয়াস ছাড়াই কাকুতি-মিনতিসহকারে দোয়া করবে। মনে রাখবে, অক্ষমতাই আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয়।

(৬) আগ্রহ ও ভয়সহকারে দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা সৎকাজে অগ্রগামী হত এবং আমার কাছে আশা ও ভয়সহকারে দোয়া করত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করে নেন, তখন তার অনুনয়-বিনয় শুনার জন্যে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।

(৭) অকাট্যরূপে দোয়া করা এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, তখন এরূপে বলা উচিত নয় যে,ইলাহী! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি রহম কর; বরং দৃঢ়তার সাথে আবেদন করা উচিত যে, আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর। কেননা, আল্লাহর উপর কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারে না। তিনি আরও বলেন ঃ খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করা উচিত। কেননা, আল্লাহর জন্যে কোন কিছুই বড় নয়। অন্য এক হাদীসে আছে– আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া কর। মনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা গাফেল অন্তরের দোয়া কবুল করেন না। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ তুমি নিজের দোষত্রুটি অবগত হয়ে দোয়া থেকে বিরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকো না। মনে করো না যে, তুমি অসৎ, তোমার দোয়া কবুল হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সর্বাধিক মন্দ অর্থাৎ, অভিশপ্ত শয়তানের দোয়াও কবুল করেছেন। সেমতে কোরআনে আছে-

قَالَ رَبِّ أَنْظِرْنِيْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ .

অর্থাৎ, শয়তান বলল ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দাও। আল্লাহ বললেন ঃ যা তোকে সময় দেয়া হল।

(৮) উত্তম অবস্থায় দোয়ার শব্দাবলী তিন বার বলা। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলে তিনবার করতেন এবং কোন কিছু চাইলে তিন বার চাইতেন। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিলম্ব হয়ে গেছে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের দোয়া তখন কবুল হবে, যখন তোমরা তড়িঘড়ি করবে না এবং এরূপ বলবে না যে, আমি দোয়া করলাম অথচ কবুল হল না। দোয়া করার সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক কিছু চাইবে। কেননা, আল্লাহ মহান দাতা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বিশ বছর যাবত একটি বিষয় চেয়ে দোয়া করছি, এখনও কবুল হয়নি, কিন্তু কবুল হবে বলে আমার আশা আছে। বিষয়টি হচ্ছে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করার তওফীক কামনা করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চাওয়ার পর যদি জানতে পারে যে, দোয়া কবুল হয়েছে, তবে সে বলবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার নেয়ামত দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। দোয়া কবুলে কিছু বিলম্ব হলে এরূপ বলবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।

(৯) আল্লাহর যিকির দ্বারা দোয়া শুরু করা এবং প্রথমেই সওয়াল না করা। সালামা ইবনে আকওয়া বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কখনও এই কলেমা না বলে দোয়া শুরু করতে শুনিনি-

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ ـ

অর্থাৎ আমার মহান সুউচ্চ দাতা পরওয়ারদেগার পবিত্র।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন সওয়াল করতে চায়, তার উচিত প্রথমে দরূদ পড়া এবং দরূদ দ্বারা দোয়া সমাপ্ত করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা উভয় দরূদ কবুল করেন। কাজেই দরূদদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিষয় কবুল না করে ছেড়ে দেবেন– এটা তাঁর শানের জন্যে শোভন নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর কাছে সওয়াল কর, তখন আমার প্রতি দরূদ পাঠ দ্বারা শুরু কর। আল্লাহ তা'আলার শান এরূপ নয় যে, কেউ তাঁর কাছে দুটি বিষয় চাইলে একটি পূর্ণ করবেন এবং অপরটি করবেন না।

(১০) তওবা করা এবং হকদারদের হক তাদেরকে অর্পণ করে পূর্ণ উদ্যম সহকারে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করা। এ বিষয়টি মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এটাই মূল কথা। কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি বনী ইসরাঈলের সাথে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন, কিন্তু বৃষ্টি হলো না। অতঃপর তিনি তিন দিন বাইরে থাকলেন, তবুও বৃষ্টি হল না। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওহী পাঠালেন, আমি তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দোয়া কবুল করব না। তোমাদের মধ্যে চোগলখোর রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, কোন্ ব্যক্তি চোগলখোর তা আমাকে বলে দিন। তাকে আমরা বহিষ্কার করব। আদেশ হল হে মূসা, আমি চোগলখুরী করতে নিষেধ করে নিজেই তা করব– এ কেমন কথা! মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বললেন ঃ তোমরা সকলেই চোগলখুরী থেকে তওবা কর। সকলেই তওবা করল। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

সায়ীদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক বাদশার আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনসাধারণ বৃষ্টির জন্যে দোয়া করল। বাদশাহ বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, না হয় আমি তাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কষ্ট দেব। জনগণ বলল, আপনি আল্লাহ তা'আলাকে কিরূপে কষ্ট দেবেন? তিনি তো আকাশে আছেন। বাদশাহ বলল, আমি তাঁর ওলী ও অনুগতদেরকে হত্যা করব। এটাই তাঁর কষ্টের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টি দান করলেন।

সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আমি শুনেছি, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একবার সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি লেগে থাকে। ফলে মানুষ মৃতদের ও শিশুদেরকে খেয়ে ফেলে। তারা পাহাড়ে গিয়ে গিয়ে ক্রন্দন করত ও কাকুতি মিনতি করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের পয়গম্বরের কাছে ওহী পাঠালেন; আমার দিকে চলে চলে যদি তোমাদের হাঁটু পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যায়, তোমাদের তোলা হাত আকাশের মেঘমালা স্পর্শ করে এবং দোয়া করতে করতে জিহ্বা ক্লান্ত হয়ে যায়, তবুও আমি কারও দোয়া কবুল করব না এবং ক্রন্দনকারীর প্রতি দয়া করব না, যে পর্যন্ত না হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। অতঃপর যখন সকলেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হল, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তারা বৃষ্টির জন্যে কয়েক বার বাইরে গেল, কিন্তু বৃষ্টি হল না এবং পয়গম্বরের কাছে ওহী এল ঃ তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নাপাক দেহে আমার দিকে আস এবং যে হাতে খুন করেছ, সেই হাত আমার দিকে প্রসারিত কর। তোমরা হারাম হাতের দ্বারা উদর পূর্ণ করে রেখেছ। ফলে তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ বেড়ে গেছে। এখন দূরবর্তী হওয়া ছাড়া তোমরা আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।

আবু সিদ্দীক নাজী বলেন ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) একবার বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন এবং পথিমধ্যে একটি পিপীলিকাকে উল্টে পড়ে থাকতে দেখলেন। পিপীলিকাটি পা আকাশের দিকে তুলে বলছিল, ইলাহী, আমরাও তোমার অন্যতম সৃষ্টি। তোমার রুজি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। অপরের গোনাহের বিনিময়ে আমাদেরকে ধ্বংস করো না। হযরত সোলায়মান (আঃ) লোকদেরকে বললেন ঃ ফিরে চল। অন্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রাণীর দোয়ায় তোমরা বৃষ্টি পেয়ে গেছ। আওযায়ী বলেন ঃ একবার লোকজন বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হল। তাদের মধ্যে বেলাল ইবনে সা'দ দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ করার পর বললেন ঃ উপস্থিত লোকজন, তোমরা তোমাদের পাপ-তাপের কথা স্বীকার কর কিনা? সকলেই বলল, নিশ্চয় স্বীকার করি। অতঃপর বেলাল ইবনে সা'দ বললেন, ইলাহী, আমরা শুনেছি তুমি তোমার কোরআন মজীদে বলেছ- مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করেছি। অতএব তোমার মাগফেরাত আমাদের মত লোকদের জন্যেই। ইলাহী, আমাদের মাগফেরাত কর, আমাদের প্রতি রহম কর এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর বেলাল হাত উত্তোলন করলেন। লোকেরাও হাত তুলল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি বর্ষিত হল।

মালেক ইবনে দীনারকে লোকেরা বলল, আপনি আমাদের জন্যে পরওয়ারদেগারের কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে করছ বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি প্রস্তর বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে। অর্থাৎ, আমাদের পাপ-তাপ প্রস্তর বর্ষণের যোগ্য।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একবার বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে বের হলেন। ময়দানে পৌঁছে তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা গোনাহ করেছ, তোরা ফিরে যাও। এ কথা বলার পর এক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন ঃ তুমি কি কোন গোনাহ করনি? সে বললঃ আমি অন্য কোনা গোনাহ জানি না, তবে একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আমার কাছ দিয়ে এক মহিলা চলে গেল। আমি তাকে চোখে দেখলাম। মহিলা চলে গেলে আমি চোখে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে উপড়ে ফেললাম এবং সেই মহিলার পেছনে নিক্ষেপ করলাম। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তুমি দোয়া কর। আমি আমীন বলে যাই। সেমতে লোকটি দোয়া করতেই আকাশ মেঘমালায় ছেয়ে গেল এবং প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইয়াহইয়া গাস্‌সানী বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর আমলে অনাবৃষ্টি হলে লোকেরা আলেমদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তিকে মনোনীত করল এবং তাদের সাথে দোয়া করতে বের হল। একজন আলেম বললঃ ইলাহী, তুমি তওরাতে বলেছ–কেউ আমার উপর জুলুম করলে আমরা যেন তাকে মাফ করি। ইলাহী, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। দ্বিতীয় আলেম বললঃ ইলাহী, তুমি তওরাতে বলেছ–আমরা যেন আমাদের গোলামদেরকে মুক্ত করে দেই। ইলাহী, আমরাও তোমার গোলাম। অতএব তুমি আমাদেরকে মুক্ত কর। তৃতীয় আলেম বললঃ ইলাহী তুমি তওরাতে বলেছ– আমাদের দরজায় মিসকীন এসে দাঁড়ালে আমরা যেন তাকে বঞ্চিত না করি। ইলাহী, আমরাও মিসকীন এবং তোমার দরজায় দণ্ডায়মান। আমাদের দোয়া নামঞ্জুর করো না। এরূপ দোয়ার পর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

আতা সলমী বলেন ঃ এক বছর অনাবৃষ্টি হলে আমরা বৃষ্টির দোয়ার জন্যে বাইরে গেলাম। পথে সা'দুন নামক পাগলকে কবরস্থানে দেখা গেল সে আমাকে দেখে বললঃ এটা কেয়ামতের দিন, না মানুষ কবর থেকে বের হচ্ছে? আমি বললাম ঃ এসবের কিছুই নয়। বরং বৃষ্টি হয় না; তাই মানুষ দোয়া করতে বের হয়েছে। সে বলল ঃ হে আতা, কোন্ অন্তরে দোয়া কর– যমীনের অন্তরে, না আকাশের অন্তরে? আমি বললাম ঃ আকাশের অন্তরে। সে বললঃ কখনও নয়। হে আতা, মেকি মুদ্রাওয়ালাদেরকে বলে দাও– তারা যেন সে মুদ্রা না চালায়। কেননা, পরখকারী খুবই হুশিয়ার। এর পর সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললঃ ইলাহী, শহরগুলোকে বান্দাদের গোনাহের কারণে ধ্বংস করো না, বরং তোমার গোপন নামসমূহের বরকতে আমাদেরকে প্রচুর মিঠা পানি দান কর, যাতে বান্দারা জীবিত হয় এবং শহরগুলো সিক্ত হয়। তুমিই সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। আতা বলেন ঃ সা'দুনের এই দোয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই আকাশ গর্জে উঠল, বিদ্যুৎ চমকে ওঠল এবং মুষলধারে বারিপাত শুরু হল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দরূদের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং সালাম বল।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) একদিন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বাইরে এসে বললেন ঃ আমার কাছে জিব্রাঈল (আঃ) এসে বলল ঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশ বার রহমত প্রেরণ করি এবং আপনার উম্মতের কেউ এক বার সালাম প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশ বার সালাম প্রেরণ করি? এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, যে পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। অতএব ইচ্ছা করলে কেউ কম দরূদ পড়ুক অথবা বেশী পড়ুক। আরও বলা হয়েছে– সে ব্যক্তি আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। ঈমানদারের জন্যে এটাই যথেষ্ট কৃপণতা যে, তার সামনে আমার আলোচনা হলে সে আমার প্রতি বেশী দরূদ প্রেরণ করে না। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হয় এবং তার দশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি আযান একামত শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, তার জন্যে আমার শাফায়াত অপরিহার্য হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু– তুমি তোমার রসূল ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর, তাকে ওছিলা, ফযীলত ও সুউচ্চ মর্যাদা দান কর এবং কেয়ামতের দিন শাফায়াতের ক্ষমতা দান কর।

আরও বলা হয়েছে – পৃথিবীতে কিছু ফেরেশতা বিচরণ করে। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়। যখন কেউ আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা আমার আত্মা আমার মধ্যে ফেরত পাঠাবেন, যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দিতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তোমার বান্দা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধর, পত্নীগণ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি রহমত প্রেরণ কর ; যেমন রহমত প্রেরণ করেছ ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি ও ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি। মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পত্নীগণ ও সন্তান-সন্ততিকে বরকত দাও ; যেমন বরকত দিয়েছ ইবরাহীমকে (আঃ) ও তাঁর বংশধরকে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত পবিত্র।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পর লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)-কে ক্রন্দন করতে করতে এ কথা বলতে শুনল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; একটি খোরমা বৃক্ষের শাখার উপর আপনি খোতবা পাঠ করতেন। এ শাখাটি আপনার বিরহে আহাজারি শুরু করে। অবশেষে আপনি তার উপর হাত রেখে দিলে সে চুপ হয়ে যায়। এখন আপনার বিরহে আপনার উম্মতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আহাজারি আরও অধিক শোভনীয়। ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক; আল্লাহ তা'আলার কাছে আপনার মর্যাদা এত দূর উন্নীত হয়েছে যে, আপনার আনুগত্য আল্লাহ নিজের আনুগত্য সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আল্লাহর কাছে আপনার মর্তবা এতটুকু উন্নীত হয়েছে যে, আপনার ত্রুটি আপনাকে বলার আগেই আল্লাহ তা মার্জনা করে দিয়েছেন। সেমতে বলা হয়েছে–

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। আপনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন কেন? ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ-হোক; আপনার মর্যাদা এত উচ্চে যে, আপনাকে সকল নবীর শেষে প্রেরণ করেছেন এবং কোরআনে সকলের পূর্বে আপনাকে উল্লেখ করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى ـ

–যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম– আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার কাছ থেকে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, আপনার মর্তবা এতটুকু যে, দোযখীরা দোযখের বিভিন্ন স্তরে আযাবে পতিত হয়ে বাসনা করবে হায়, আমরা যদি রসূলের আনুগত্য করতাম! সেমতে কোরআনে তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَ

–হায় আফসোস, আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম! ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক; আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা মূসা ইবনে এমরানকে একটি প্রস্তর খন্ড দান করেছিলেন, তা থেকে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হত। এটা আপনার অঙ্গুলির জন্যে অভূতপূর্ব ছিল না। আপনার অঙ্গুলি থেকে পানির ফোয়ারা বয়ে যেত। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান (আঃ)-কে বায়ু দান করেছিলেন, যা সকাল-সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এটা আপনার বোরাকের চেয়ে অধিক বিস্ময়কর ছিল না, যাতে সওয়ার হয়ে আপনি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে সে রাতের ফজরের নামায নিজ গৃহে পড়েছেন। আপনার প্রতি রহমত হোক ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক ইয়া রসূলাল্লাহ; আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়মকে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মোজেযা দান করেছিলেন। এটা এ ঘটনা থেকে অধিক আশ্চর্যজনক ছিল না যে, বিষমিশ্রিত ভাজা করা ছাগল আপনার সাথে কথা বলেছিল। সেটির বাহু আরজ করেছিল ঃ আমাকে খাবেন না। আমার মধ্যে বিষ আছে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; হযরত নূহ (আঃ) স্বজাতির জন্যে এই দোয়া করেছিলেন–

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۔

–হে আল্লাহ! পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটি গৃহও অক্ষত ছাড়বেন না। আপনি আমাদের জন্যেও এরূপ দোয়া করলে আমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। অথচ আপনার পৃষ্ঠদেশ পিষ্ট করা হয়েছে, আপনার মুখমন্ডল আহত হয়েছে এবং সামনের দাঁত ভেঙ্গেছে, কিন্তু আপনি কল্যাণকর কথাই বলে গেছেন। আপনি বলেছেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ –হে আল্লাহ, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা কর। তারা অবুঝ। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আপনি বয়স কম পেয়েছেন। এ সত্ত্বেও এত লোক আপনার অনুসারী হয়েছে যা হযরত নূহ (আঃ)-এর হয়নি। অথচ তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আপনার প্রতি অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করেছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং তাঁর প্রতি অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইয়া রসূলাল্লাহ আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক ; যদি আপনি নিজের কাছে নিজের সমতুল্য লোক ছাড়া অন্য কাউকে না বসাতেন, তবে সঙ্গে বসার সৌভাগ্য আমরা কোথায় পেতাম! যদি আপনি নিজের সমকক্ষ লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন, তবে এ সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত থাকতাম। যদি আপনি নিজের মত ব্যক্তির সাথে খাদ্য গ্রহন করতেন, তবে আপনার সাথে আহার করার গৌরব আমরা অর্জন করতে পারতাম না, কিন্তু আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, সঙ্গে বসে আহার করেছেন, পশমী-বস্ত্র পরিধান করেছেন, গাধায় সওয়ার হয়েছেন, অপরকে পেছনে সওয়ার করিয়েছেন, নিজের খাদ্য মাটিতে রেখেছেন এবং অঙ্গুলি লেহন করেছেন। এসব কাজ আপনি বিনয়বশত করেছেন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন এবং সালাম প্রেরণ করুন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতাম, কিন্তু সালাম বলতাম না। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ তুমি আমার প্রতি দরূদ পূর্ণ কর না কেন? এর পর যখনই লেখেছি দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করেছি।

আবুল হাসান শাফেয়ী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

(আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদের প্রতি রহমত প্রেরণ করুক যতবার স্মরণ করে তাঁকে স্মরণকারীগণ এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয় গাফেল লোকেরা।)-এর বিনিময়ে সে আপনার কাছ থেকে কি পেয়েছে? তিনি বললেন ঃ সে আমার পক্ষ থেকে এই পেয়েছে যে, কেয়ামতের ময়দানে তাকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করানো হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এস্তেগফারের ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ, যারা অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে, অতঃপর তাদের গোনাহের জন্যে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আলকামা ও আসওয়াদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন মজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে, কোন বান্দা গোনাহ করে এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মার্জনা করেন। তন্মধ্যে একটি উপরোল্লেখিত আয়াত ও অপরটি এই ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

—যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

অর্থাৎ অতঃপর তোমার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী। আরেক আয়াতে আছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

অর্থাৎ ভোর রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ। রসূলে করীম (সাঃ) প্রায়ই এই দোয়া উচ্চারণ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থাৎ পবিত্র তুমি হে আল্লাহ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী দয়ালু।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে এস্তেগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক দুঃখ দূর করেন এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় করে দেন। তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমি দিনে সত্তর বার আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাত চাই এবং তাঁর সামনে তওবা করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অগ্র-পশ্চাত সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও যিনি এস্তেগফার ও তওবা করতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— আমার অন্তরে ময়লা এসে যায় যে পর্যন্ত না আমি প্রত্যহ একশ' বার এস্তেগফার করি। অন্য এক হাদীসে আছে—

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

যে ব্যক্তি এই কলেমা বিছানায় শোয়ার সময় তিন বার বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান অথবা মরুভূমির বালু কণার সমান অথবা বৃক্ষসমূহের পাতার সমান অথবা দুনিয়ার দিনসমূহের সমান হয়। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পরিবারের লোকজনের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতাম। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমার ভয় হয়, কোথাও আমার কঠোর ভাষা আমাকে দোযখে না দাখিল করে দেয়। তিনি বললেন ঃ তুমি এস্তেগফার পড় না কেন? আমি তো দিনে একশ'বার এস্তেগফার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এস্তেগফারে এই কলেমা পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْـئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ, মাফ কর আমার গোনাহ, আমার মূর্খতা, আমার কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং যা তুমি আমার চেয়েও বেশী জান। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার বিদ্রূপের গোনাহ, আমার ভুলবশতঃ গোনাহ, আমার জেনেশুনে করা গোনাহ। এগুলোর সবই আমি করেছি। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার ভবিষ্যত গোনাহ, আমার অতীত গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ এবং যে গোনাহ তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। তুমিই রহমত অগ্রে নিয়ে যাও এবং তুমিই পেছনে রাখ। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এর পর যদি সে তওবা করতঃ গোনাহ থেকে বিরত হয় এবং এস্তেগফার করে, তবে তার অন্তরের দাগ মিটে যায়। পক্ষান্তরে গোনাহ বেশী করলে দাগ আস্তে আস্তে বড় হয় এবং অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। একেই বলা হয় ران যার উল্লেখ এই আয়াতে আছে- كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, কখনও নয়; বরং তাদের অন্তরে তারা যা করত, তার মরিচা পড়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে এবং বলে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা গোনাহ করার পর জেনেছে, তার একজন পালনকর্তা আছেন, যিনি গোনাহের শাস্তি দেন এবং পাপ মার্জনা করেন। অতএব, হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি এস্তেগফার করতে থাকে, তাকে অব্যাহত গোনাহকারী বলা হয় না যদিও সে দিনে সত্তর বার একই গোনাহ করে ; বর্ণিত আছে, নিম্নোক্ত কলেমাসমূহ উত্তম এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ووعدك ما استطعت اعوذبك من شر ما صنعت ابوءلك بنعمتك على وابوء على نفسى بذنبى فقد ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفرلى ذنوبى ما قدمت منها وما اخرت لايغفر الذنوب جميعا الا انت ـ

অর্থাৎ, ইয়া ইলাহী, তুমি আমার রব এবং আমি তোমার বান্দা। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি সাধ্যমত তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর আছি। আমি তোমার কাছে আমার মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি এবং আমার গোনাহ স্বীকার করি। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। তুমি ক্ষমা কর আমার গোনাহ, যা আমি আগে করেছি এবং পিছনে করেছি। তুমি ব্যতীত সকল গোনাহ কেউ ক্ষমা করতে পারে না।

খালেদ ইবনে মেদান বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় তারা, যারা আমার মহব্বতের কারণে পারস্পরিক মহব্বত রাখে এবং যাদের মন মসজিদের সাথে বাঁধা থাকে এবং সকাল থেকেই এস্তেগফার করে। আমি যখন পৃথিবীর লোকদেরকে শাস্তি দিতে চাই, তখন তাদের কথা মনে পড়ে। তখন তাদের বরকতে পৃথিবীর লোকদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করি। হযরত কাতাদাহ বলেন ঃ কোরআন মজীদ তোমাদেরকে তোমাদের রোগ ও প্রতিকার উভয়টিই বলে দেয়। তোমাদের রোগ হচ্ছে গোনাহ এবং প্রতিকার হচ্ছে এস্তেগফার। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যারা ধ্বংস হয়, তাদের জন্যে অবাক লাগে যে, মুক্তির উপায় হাতে থাকার পরেও তারা কিরূপে ধ্বংস হয়! লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ এস্তেগফার। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন না, তার অন্তরে এস্তেগফার করার কথা জাগ্রত করে দেন। ফোযায়ল বলেন ঃ গোনাহ বর্জন না করে এস্তেগফার হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের তওবা। খ্যাতনাম্নী তাপসী রাবেয়া বলেন ঃ আমাদের এস্তেগফারের জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনেক এস্তেগফার দরকার। অর্থাৎ গাফেল অন্তর নিয়ে এস্তেগফার করাও একটি গোনাহ ও ঠাট্টা। এর জন্যে পৃথক এস্তেগফার করা উচিত। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে ব্যক্তি অনুতাপ করার পূর্বে এস্তেগফার করে, সে অজ্ঞাতে আল্লাহ তাআলার সাথে ঠাট্টা করে।

আবু আবদুল্লাহ ওয়াররাক বলেন ঃ যদি তোমার ঘাড়ে সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গোনাহ থাকে এবং তুমি তোমার আন্তরিকতা সহকারে পরওয়ারদেগারের কাছে এই দোয়া কর, তবে ইনশাআল্লাহ, তোমার গোনাহ দূর হয়ে যাবে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتُّكَ بِهٖ مِنْ نَفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَهٗ غَيْرُكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَتَيْتُهٗ فِىْ ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِىْ مَلَاءٍ وَخَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা থেকে তওবা করার পর পুনরায় করেছি। আমি এস্তেগফার করছি এমন ওয়াদা থেকে, যা আমি নিজে তোমার সাথে করেছি, অতঃপর তা পূর্ণ করিনি। আমি এস্তেগফার করছি এমন আমল থেকে, যার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জন; কিন্তু পরে তাতে অন্য সত্তাও মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমি এস্তেগফার করছি এমন নেয়ামত থেকে, যা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, আমি তা দ্বারা গোনাহের কাজে সাহায্য নিয়েছি। হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা আমি দিনের আলোকে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাতের অন্ধকারে জনসমক্ষে, নির্জনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি, হে সহনশীল। কারও মতে এটা হযরত আদম (আঃ)-এর এবং কারও মতে হযরত খিযির (আঃ)-এর এস্তেগফার।

বর্ণিত দোয়া

কারণ ও দোয়াকারী ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এসব দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় এবং প্রত্যেক নামাযের পরে পাঠ করা মোস্তাহাব। এগুলোর মধ্য থেকে নিম্নে আমরা সতরটি দোয়া উদ্ধৃত করছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া, যা তিনি ফজরের সুন্নতের পর পাঠ করতেন বলে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা আব্বাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি সন্ধ্যায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমার খালা মায়মূনার গৃহে অবস্থান করছিলেন। এর পর তিনি রাত্রে ওঠে নামায পড়তে থাকেন। ফজরের সুন্নত পড়া শেষ হলে তিনি এ দোয়া পাঠ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتَنَ وَتُصْلِحُ بِهَا دِيْنِىْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِىْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا صَادِقًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهٗ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَاءِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ ضَعُفَ رَائِىْ وَقَلَّتْ حِيْلَتِىْ وَقَصُرَ عَمَلِىْ
وَافْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَاَسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ يَا شَافِىَ
الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ
وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ ـ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَائِىْ
وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَاُمْنِيَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَّهٗ
اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَاِنِّىْ اَرْغَبُ
اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْئَلُكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ
مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ حَرْبًا لِاَعْدَائِكَ وَسِلْمًا
لِاَوْلِيَآئِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ
مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ ـ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا
الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ يَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ
اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ وَمَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ
الشُّهُوْدِ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ وَالْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ
وَاَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ بِالْغِرّو قَالَ بِهٖ
سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِىْ
التَّسْبِيْحُ اِلَّا بِهٖ سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ
وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِىْ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ
نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ وَنُوْرًا فِىْ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

بَصَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ وَنُوْرًا فِى لَحْمِىْ وَنُوْرًا
فِىْ دَمِىْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا فِى دَمِىْ
وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ وَنُوْرًا
عَنْ يَمِيْنِىْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِىْ وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ
اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ نُوْرًا وَاعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন রহমত প্রার্থনা করি, যদ্দ্বারা তুমি আমার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবে। আমার দ্বিধাবিভক্ত বিষয়াদিকে সংহত করবে। আমার পেরেশানী দূর করবে, আমার মহব্বতকে ফিরিয়ে আনবে, আমার দ্বীন সংশোধন করবে, আমার অদৃশ্য বস্তুর হেফাযত করবে, আমার উপস্থিত বিষয়কে উচ্চ করবে, আমার আমল পবিত্র করবে, আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করবে, আমার অন্তরে সুমতি জাগাবে এবং সকল মন্দকাজ থেকে আমাকে রক্ষা করবে। আমাকে সত্যিকার ঈমান দান কর। এমন বিশ্বাস দান কর, যার পরে কোন কুফর নেই। এমন রহমত দান কর, যদ্দ্বারা আমি তোমার কাছে মৃত্যুর সময় সাফল্য প্রার্থনা করি, শহীদদের মর্তবা, ভাগ্যবানদের জীবন, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য এবং পয়গম্বরগণের সাহচর্য প্রার্থনা করি। ইলাহী, আমি তোমার কাছে আমার অভাব পেশ করি, যদিও আমার কলাকৌশল দুর্বল এবং আমার আমল সামান্য। আমি তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। অতএব আমি তোমার কাছে সওয়াল করি হে শাসক, হে দুঃখ বিমোচনকারী, তুমি যেমন সমুদ্রসমূহ আলাদা রেখেছ, তেমনি আমাকে আলাদা রাখ দোযখের আযাব থেকে, ধ্বংসের আহ্বান থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, যে কল্যাণের ওয়াদা তুমি কোন বান্দাকে দিয়েছ অথবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে যে কল্যাণ দান করবে, কিন্তু আমার উদ্যম আমল ও আশা সেই পর্যন্ত পৌঁছে না, আমি সেই কল্যাণের ব্যাপারেও তোমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করি এবং প্রার্থনা করি হে রাব্বুল আলামীন! ইলাহী, আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কর এবং পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী করো না। তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা এবং তোমার ওলীদের সাথে সন্ধিকারী বানাও। আমরা যেন তোমার মহব্বতের কারণে মহব্বত করি সে ব্যক্তিকে, যে তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে তোমার আনুগত্য করে। আমরা যেন তোমার শত্রুতার কারণে শত্রুতা করি সে ব্যক্তির সাথে, যে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। হে আল্লাহ, এটা দোয়া এবং কবুল করা তোমার কাজ। এটা চেষ্টা এবং ভরসা তোমারই উপর। আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি নেই এবং এবাদত করার সাধ্য নেই; মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। হে মজবুত রশির (অর্থাৎ ধর্ম ও কোরআনের) এবং সঠিক বিষয়ের মালিক, তোমার কাছে সওয়াল করি শাস্তির দিনে নিরাপত্তা, অনন্ত দিনে জান্নাত, নৈকট্যশীলতা, রুকুকারী, সেজদাকারী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের সাথে। নিশ্চয় তুমি দয়ালু, প্রিয়। তুমি যা ইচ্ছা তা কর। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ইযযতের চাদর পরিধান করেছেন এবং তদ্দ্বারা মহান হয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যাকে ছাড়া কারও পবিত্রতা বর্ণনা করা সমীচীন নয়। কৃপা ও অনুগ্রহের মালিক পবিত্র। দান ও সামর্থ্যের মালিক পবিত্র। পবিত্র তিনি, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! দান কর আমার অন্তরে নূর, আমার কবরে নূর, আমার কর্ণে নূর, আমার চোখে নূর, আমার কেশে নূর, আমার ত্বকে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার অস্থিতে নূর, আমার সম্মুখে নূর, আমার পশ্চাতে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর এবং আমার নীচে নূর। হে আল্লাহ, আমার নূর বৃদ্ধি কর, আমাকে নূর দান কর এবং আমার জন্যে নূর কর।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! এই কলেমাগুলোর মধ্যে সকল প্রকার দোয়া রয়েছে। এগুলোর অর্থ পরিপূর্ণ। ইহকাল ও পরকালের জরুরী বিষয়াদি এবং সমস্ত প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তুমি এগুলো অপরিহার্য করে নাও এবং পাঠ কর। কলেমাগুলো এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلَةٍ وَاٰجِلَةٍ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ -

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণ কল্যাণ প্রার্থনা করি বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সকল অনিষ্ট থেকে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং এমন কথা ও কাজ প্রার্থনা করি, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাই, যা তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার কাছে সেই বিষয় থেকে আশ্রয় চাই, যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)। আমার প্রার্থনা, তুমি আমার জন্যে যে বিষয়ের ফয়সালা করেছ,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার পরিণাম আমার জন্যে আপন কৃপাগুণে শুভ কর হে পরম দয়ালু।

হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে ফাতেমা, আমার উপদেশ শুনতে তোমার কোন বাধা আছে কি? আমি বলছি– এই দোয়া কর ঃ

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ -

অর্থাৎ, "হে চিরজীবী, হে শক্তিধর, তোমার রহমতের ফরিয়াদ জানাই। আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সোপর্দ করো না এবং আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে এভাবে দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوْسٰى نَبِيِّكَ وَعِيْسٰى كَلِمَتِكَ وَرُوْحِكَ وَبِكَلَامِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَزَبُوْرِ دَاوُدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحَيْتَهُ اَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ اَوْ سَائِلٍ اَعْطَيْتَهُ اَوْ غَنِيٍّ اَغْنَيْتَهُ اَوْ فَقِيْرٍ اَغْنَيْتَهُ اَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَهُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ تَثْبُتُ بِهٖ اَرْزَاقُ الْعِبَادِ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمٰوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ اِسْتَقَلَّ بِهٖ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

عَرْشِكَ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوِتْرِ
الْمُنَزَّلُ فِىْ كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ الْفَوْزِ الْمُبِيْنِ وَاَسْئَلُكَ
بِاِسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ
وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَبِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تَرْزُقَنِى الْقُرْاٰنَ
وَالْعِلْمَ وَتَخْلُطَهٗ بِلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَتَسْتَعْمِلَ
بِجَسَدِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَاِنَّهٗ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ ۔

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সওয়াল করি তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে, তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে, তোমার সাথে কথোপকথনকারী মূসা (আঃ)-এর মাধমে, তোমার কলেমা ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে, মূসা (আঃ)-এর তওরাতের মাধ্যমে, ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জীলের মাধ্যমে, দাউদ (আঃ)-এর যবুরের মাধ্যমে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোরআনের মাধ্যমে, তোমার প্রেরিত প্রত্যেক ওহীর মাধ্যমে, তোমার জারিকৃত প্রত্যেক ফয়সালার মাধ্যমে, যে সওয়ালকারীকে তুমি দান করেছ, তার মাধ্যমে, যে ধনীকে তুমি খুশী করেছ তার মাধ্যমে, যে ফকীরকে তুমি ধনী করেছ, তার মাধ্যমে এবং যে পথভ্রষ্টকে তুমি হেদায়েত দান করেছ, তার মাধ্যমে। আমি সওয়াল করি তোমার সেই নামের ওসিলায়, যা তুমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছ। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যদ্দারা বান্দার রিযিক কায়েম থাকে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যাকে তুমি পৃথিবীর উপর রেখেছ, ফলে সে স্থির হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওছিলায়, যাকে তুমি আকাশমন্ডলীর উপর স্থাপন করেছ, ফলে আকাশ উঁচু হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যাকে তুমি পর্বতমালার উপর স্থাপন করেছ, ফলে পর্বতমালা অটল হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যদ্দারা তোমার আরশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্থির হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি তোমার পাক-পবিত্র, একক, বিজোড় নামের ওসিলায়, যা তোমার তরফ থেকে তোমার কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমার নিকট তোমার নামে দোয়া করি যা দিবসের উপর স্থাপন করেছ বলে তা আলো দেয় এবং রাতের উপর স্থাপন করেছ বলে তা অন্ধকার হয়। তোমার সম্মানে, সাহায্যে, তোমার গৌরবের সাহায্যে, তোমার সম্মানিত মুখমণ্ডলের সাহায্যে দোয়া করি যেন তুমি আমাকে কুরআনের রিযিক ও অর্থ দান কর এবং আমার মাংস, রক্ত, কর্ণ ও চক্ষুর সহিত তা মিশ্রিত কর এবং তা দ্বারা আমার শরীরকে কার্যে নিযুক্ত কর তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের সাহায্যে। কেননা, তোমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত অন্য কোন শক্তি সামর্থ্য নেই হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

হযরত বোরায়দা আসলামী (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বোরায়দা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে বোরায়দা! আমি কি তোমাকে কতগুলো কলেমা শেখাব না? আল্লাহ যার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাকে তিনি এগুলো শিক্ষা দেন এবং সে কখনও এগুলো ভুলে যায় না। হযরত বোরায়দা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই তা আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, তুমি বল, হে মাবুদ! আমি দুর্বল, তোমার সন্তুষ্টি আমার দুর্বলতাকে যেন অবরুদ্ধ করে, আমার ঝুটি ধরে যেন আমাকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে আমার সন্তুষ্টির শেষ সীমা করে। হে মাবুদ! আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা কর। আমি অপমানিত, আমাকে সম্মানিত কর। আমি দরিদ্র আমাকে ধনবান কর। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়!

হযরত কাবিসা বিন মোখরেক (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

যখন কাবিসা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বললেন, আমাকে এমন কলেমা শিখিয়ে দিন যা আল্লাহর সাহায্যে আমার উপকারে আসে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, যা পূর্বে করতে সমর্থ ছিলাম এখন তার অনেক কিছুতেই অসমর্থ হয়ে পড়েছি। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, যখন তুমি ফজরের নামায পড়বে, নামাযের বাদে তিন বার পড়বে– সোবহানাল্লাহি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীম লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। যখন তুমি এই দোয়া পড়বে– দুশ্চিন্তা, কষ্ট, ব্যাধি বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগ ইত্যাদি থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে। এ দোয়াটি তোমার দুনিয়া সম্পর্কিত ফায়দায় আসবে। আর যদি তুমি পাঠ কর "আল্লাহুম্মাহদিনী মিন ইন্দিকা ওয়া আফদি আলাইয়্যা মিন ফাদলিকা ওয়ানশুর আলাইয়্যা মির রাহমাতিকা ওয়ানযিল আলাইয়্যা মিন বারাকাতিকা অর্থাৎ হে মাবুদ! তোমার নিকট থেকে আমাকে হেদায়াত দাও। তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে অনুগ্রহ কর। তোমার রহমত থেকে আমাকে রহমত দান কর। তোমার বরকত থেকে আমাকে বরকত দান কর। অতঃপর তিনি বললেন, শুনে রাখ! যখন কোন বান্দা এভাবে এ দোয়াটি পড়বে তার জন্য রোজ কেয়ামতে চারটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে কোন দরজা দিয়ে সে মঞ্জিলে মকসূদে প্রবেশ করতে পারবে। হুযুর (সাঃ) আরও বললেন, এ দোয়া আমার আখেরাত সম্বন্ধে উপকারে আসবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে বলা হল, তোমার ঘর উড়ে গেছে (তাঁর মহল্লায় আগুন লেগেছিল)। তিনি বললেন, তেমন ইচ্ছা আল্লাহর হয়নি। তাঁকে কথাটি তিন বার বলা হল এবং তিনিও তিন বারই বললেন, তেমন ইচ্ছা আল্লাহর হয়নি। তার পর তাঁর নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আবু দারদা! আগুন আপনার গৃহের নিকট এসে আপনা থেকে নিভে গেছে। তিনি বললেন, আমি তা পূর্বেই জেনে গেছি। তখন তাঁকে বলা হল, আমরা জানি না তোমার কোন্ কথা অধিক আশ্চর্যজনক। তিনি বললেন, আমি হুযুর (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই কলেমা রাতে বা দিনে পাঠ করে, কোন কিছুই তার অনিষ্ট করে না। আমি সে কলেমাটিই পাঠ করেছি। যথা ঃ হে মাবুদ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার উপর ভরসা করি। তুমি সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহর শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত অন্যের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা হয় না। জেনে রাখ, আল্লাহ সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী এবং তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত। হে মাবুদ! আমার নফসের মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং প্রত্যেক প্রাণীর মন্দ হতে, যাদের ঝুটি তোমার হাতের মুঠোয়। নিশ্চয় আমার প্রভু সরল ও সত্য পথে অধিষ্ঠিত। আরবী ভাষায় দোয়াটি এরূপ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রাব্বুল আরশিল আযীমি লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি। মা শাআল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন। ই'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমান ওয়া আহসা কুল্লা শাইয়িন আদাদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আন্তা আখিযুম বিনাসিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা সিরাতিম্ মুস্তাক্বীম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যহ ভোর বেলা আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করতেন– হে মাবুদ! এ তোমার নতুন সৃষ্টি, তোমার আনুগত্যে একে উন্মুক্ত কর এবং তোমার ক্ষমা ও সন্তুষ্টিতে একে শেষ কর। এর মধ্যে তুমি আমার জন্য নেকী দাও এবং আমার নিকট থেকে তা কবুল কর। একে পবিত্র কর। আমার জন্য একে দুর্বল কর এবং এর মধ্যে যদি আমি কোন কিছু মন্দ করি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়, প্রেমময় ও সম্মানিত।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি প্রত্যূষে আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করে সে দিনের শোকর আদায় করে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করতেন– হে মাবুদ! আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করছি। যা আমি অপছন্দ করি তা' দূর করতে আমি অসমর্থ এবং যা আমি আশা করি তা' সফল করতে আমি সমর্থ নই। চাবিকাঠি অন্যের হাতে। তবে আমলের বদৌলতে আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রত্যূষে জাগ্রত হই। আমা থেকে অধিক দরিদ্র আর কেউ নেই। হে মাবুদ! আমার শত্রু যেন আমার ব্যাপারে আনন্দিত না হয়। আমার বন্ধু যেন আমাকে মন্দ না জানে। আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাকে কোনরূপ বিপন্ন করো না। আমার পার্থিব চিন্তা বড় করো না। যারা আমার প্রতি দয়াশীল নয়, তুমি তাদের উপর আমাকে ন্যস্ত করো না হে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী।

হযরত খিযির (আঃ)-এর দোয়া

বর্ণিত আছে, যে কোন মৌসুমে হযরত খিযির (আঃ) ও হযরত ইলইয়াস (আঃ) আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করতেন– আল্লাহর নামে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহর শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। সমস্ত নেয়ামতই আল্লাহর নিকট থেকে আসে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। সমস্ত কল্যাণ আল্লাহর হাতে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহ ব্যতীত মন্দ দূর করার সাধ্য আর কারুরই নেই। যে ব্যক্তি প্রত্যূষে এই দোয়া তিন বার পাঠ করে, সে অগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়া থেকে, পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে এবং নিজে বা নিজের মাল-সামান অপহৃত হওয়া থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদ থাকে।

হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর দোয়া

মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ) বলেছেন, হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ) আমাকে বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে দশটি কলেমা শিক্ষা দেব না? তার পাঁচটি অপার্থিব। যে ব্যক্তি ঐ কলেমাগুলোর দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে, সে আল্লাহকে তার নিকট পাবে। আমি বললাম, আপনি আমাকে সেগুলো লেখে দিন। তিনি বললেন, না; বরং আমি তা তোমার নিকট বার বার বলছি, যেরূপ বকর বিন খানিস (রহঃ) আমার নিকট তা বার বার বলেছিলেন। যথা ঃ আমার দ্বীনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার দুনিয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সম্মানিত আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, যখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল আল্লাহই যথেষ্ট। কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ নিয়ে যে ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার নিকট আসে, শক্তিশালী আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। মৃত্যুকালে করুণাময় আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। হিসাবের কালে সম্মানিত আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। আমলসমূহ মীযানে মাপার কালে দয়ালু আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। পুলসেরাতের নিকট মহাশক্তিমান আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ ব্যতীত কোন দ্বিতীয় উপাস্য নেই। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর উপর আমি নির্ভর করি। তিনিই গৌরবান্বিত আরশের মালিক। যে ব্যক্তি প্রত্যহ সাত বার এ দোয়া পাঠ করে, তার আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। চাই সে ব্যক্তি সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী।

হযরত ওতবা (রহঃ)-এর দোয়া

হযরত ওতবা (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর কোন এক বুযুর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি ওতবা (রহঃ)-এর নিকট থেকে শুনলেন, আমি নিম্নোক্ত দোয়ার গুণে বেহেশতে প্রবেশ করেছি। যথা ঃ হে মাবুদ! হে পথপ্রদর্শক এবং গোনাহগারদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী ও ভুলত্রুটি মার্জনাকারী! তুমি তোমার বিপদাপন্ন বান্দার প্রতি রহম কর, তোমার মুসলমান বান্দাদের প্রতি দয়া কর, আর আমাদেরকে সেই জীবিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের রিযিক অর্জিত হচ্ছে আর তুমি যাদের প্রতি নেয়ামত বিতরণ করেছ, অর্থাৎ নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ এবং অন্যান্য সৌভাগ্যশীলদের সাথে আমার এ দোয়া কবুল কর।

হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করার ইচ্ছা করলেন, হযরত আদম (আঃ) তখন খানায়ে কা'বার চারদিকে সাত বার তওয়াফ করেন। তার পর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, হে মাবুদ! তুমি আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত। অতএব তুমি আমার ওযর কবুল কর। তুমি আমার আবশ্যকতা জান, অতএব আমার দোয়া মঞ্জুর কর। আমার মনের ভিতর গুপ্ত কি রয়েছে তা' তুমি অবগত। অতএব আমার গোনাহ ক্ষমা কর। হে মাবুদ! তোমার নিকট আমি ঈমানের দোয়া করছি, যেন আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মন সুসংবাদ লাভ করে। আমি সত্য একীন কামনা করছি, যে পর্যন্ত আমি জানতে পারি যে, যা আমার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ তা' আমার উপর পতিত হবে না। যে সন্তুষ্টি আমাকে দেয়া হয়েছে তা' আমি চাই, হে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী! তখন আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠালেন, হে আদম! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার বংশধরদের মধ্যে যে এই দোয়ার দ্বারা আমার নিকট দোয়া করবে আমি তাকেও ক্ষমা করব। তার দুঃখ, চিন্তা ও দরিদ্রতা দূর করে দেব। তাকে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর চেয়ে বেশী লাভ দেব। তাছাড়া পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি তার নিকট স্বেচ্ছায় ছুটে আসবে, যদিও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) নিম্নোক্ত কালাম শরীফ দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। হুযুর (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন নিজেই নিজের গৌরব প্রকাশ করে বলতে থাকেন, আমি আল্লাহ, বিশ্ব জগতের প্রভু। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী। আমি আল্লাহ, আমার পিতা নেই, সন্তান নেই। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি ক্ষমাশীল, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি প্রত্যেক জিনিসের আদি সৃষ্টিকর্তা এবং সকল কিছুর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন। আমি মহাজ্ঞানী, মহাসম্মানিত, রহীম ও রহমান, বিচার দিনের মালিক, মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা, অদ্বিতীয়, একক অভাবশূন্য, যিনি স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করেননি, যিনি বিজোড়, অদৃশ্য ও দৃশ্য বস্তু যার জ্ঞাত, যিনি পবিত্র, যিনি মহান মালিক, যিনি প্রশান্ত, যিনি মুমিন, যিনি মুহাইমিন, যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত, গৌরবান্বিত, সৃষ্টিকর্তা, পরিবর্তনকারী, উচ্চ, ধ্বংসকারী, সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, মহাসম্মানিত, প্রশংসা ও গৌরবের একচ্ছত্র অধিকারী, গুপ্ত ও প্রকাশ্য জিনিস সবিশেষ জ্ঞাত, শক্তিশালী, ক্ষমাশীল রিযিকদাতা। প্রত্যেকটি কলেমার পূর্বে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরোক্ত গুণবাচক নামসমূহ উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সে যেন বলে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত উপাস্য নেই। যে ব্যক্তি এভাবে দোয়া পাঠ করে, তাকে সেজদাকারী এবং বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। তারা বেহেশতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের নিকট অবস্থান করবে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আসমানে এবাদতকারীদের সওয়াব লেখা হবে।

সোলায়মান তাইমী (রহঃ)-এর দোয়া

বর্ণিত রয়েছে, ইউনুস বিন আবিদ (রহঃ) রোম শহরে শাহাদাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সোলায়মান তাইমী (রহঃ)-এর কোন্ কাজটি উত্তম দেখেছ? তিনি বললেন, আমি একস্থানে তাঁর আল্লাহর প্রশংসা দেখেছি। তা' এরূপ ঃ

"সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি অ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"

অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনই শক্তি সামর্থ্য নেই।

অর্থাৎ অধিক সওয়াবের দিনকে, নতুন সুপ্রভাতকে, আমলনামা লেখককে এবং তাদের সাক্ষীদেরকে মারহাবা। আমাদের এদিন ঈদের দিন। লেখ আমরা যা বলি। আল্লাহর নামে শুরু, যিনি প্রশংসিত, পবিত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহব্বতকারী, মখলুকের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করেন। আমি সকালে গত্রোত্থান করেছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে, তাঁর সাক্ষাতের সত্যায়নকারী হয়ে, তাঁর প্রমাণের স্বীকৃতিদাতা হয়ে, গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, আল্লাহর পালনকর্তৃত্বের প্রতি নতশির হয়ে, আল্লাহ ছাড়া অপরের উপাস্য হওয়া অস্বীকারকারী হয়ে, আল্লাহর প্রতি ফকীর হয়ে, আল্লাহর উপর ভরসাকারী হয়ে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে। আমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর নবী-রসূলগণকে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে, আল্লাহর অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিসমূহকে এ বিষয়ে সাক্ষী করছি যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। হাউজ সত্য। শাফায়াত সত্য। মুনকার-নকীর সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। কেয়ামত সংঘটিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। এ সাক্ষ্যের উপরই আমি জীবিত রয়েছি এবং এরই উপর মৃত্যু বরণ করব। এরই উপর ইনশাআল্লাহ পুনরুত্থিত হব। হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার গোলাম। আমি সাধ্যমত তোমার ওয়াদার উপর রয়েছি। হে আল্লাহ আমি আশ্রয়ের দোয়া করি তোমার কাছে তোমার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বস্তুর অনিষ্ট থেকে। ইলাহী, আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। অতএব, আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ ক্ষমা করবে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের পথ দেখায় না। আমা থেকে কুচরিত্র দূর করে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ কুচরিত্র দূর করে না। আমি হাযির আছি এবং আনুগত্যে তৎপর রয়েছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে। আমি তোমার তরফ থেকে এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকে তওবা করি। ইলাহী, আমি তোমার প্রেরিত রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখি। ইলাহী, আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ নবী উম্মী মুহাম্মদের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর বংশধরের প্রতি। তাদের প্রতি অনেক সালাম। আমার কালামের শেষে ও শুরুতে। সকল নবী রসূলের উপরও রহমত নাযিল করুন। আমীন, হে বিশ্ব পালক।

ইলাহী, আমাদেরকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাউজে উপনীত কর এবং তাঁর পানপাত্র দ্বারা তৃপ্তিদায়ক ও সহজসেব্য শরবত পান করাও, এর পর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাতে আমরা কখনও পিপাসিত না হই। আমাদেরকে তাঁর দলে উত্থিত কর এমতাবস্থায়, যেন আমরা লাঞ্ছিত না হই, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী না হই, সন্দেহকারী না হই, ফেতনায় পতিত না হই, গজবে পতিত না হই এবং পথভ্রষ্ট না হই। ইলাহী, আমাকে দুনিয়ার ফেতনা থেকে বাঁচাও। তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয় বিষয়ের তওফীক দাও। আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর। ইহকাল পরকালে আমাকে মজবুত উক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমি জালেম হলেও আমাকে বিভ্রান্ত করো না। পবিত্র, পবিত্র হে সুউচ্চ, হে মহান, হে স্রষ্টা, হে দয়ালু, হে প্রতাপান্বিত। তিনি পবিত্র, যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে পর্বতমালা ও তার প্রতিধ্বনি। তিনি পবিত্র, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে সমুদ্র তার তরঙ্গমালাসহ। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে মৎস্যকুল আপন ভাষায়। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী এবং তাদের ভিতরকার ও উপরকার সবকিছু। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে তার সৃষ্টির সকল বস্তু! তুমি একক। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি জীবন দাও। তুমিই মরণ দাও। তুমি চিরজীবী। তোমার মৃত্যু নেই। তোমার হাতেই কল্যাণ। তুমি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত দোয়া

এসব দোয়া আবু তালেব মক্কী, ইবনে খোযায়মা ও ইবনে মোনযেরের সংগ্রহ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত হয়েছে। যারা আখেরাত কামনা করে, সকালে উঠার সময় তাদের কিছু ওযীফা থাকা মোস্তাহাব। ওযিফা অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। রসূলে করীম (সাঃ) যে সকল দোয়া করেছেন, সেগুলোতে তাঁর অনুসরণ করতে চাইলে নামাযের পর দোয়ার শুরুতে এরূপ পাঠ করা উচিত–

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

অর্থাৎ, পবিত্র, আমার সুউচ্চ দাতা প্রভু। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এর পর তিন বার বলবে ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পালনকর্তা– এতে আমি সন্তুষ্ট। ইসলাম ধর্ম, এতে আমি সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মদ (সাঃ) নবী– এতে আমি সন্তুষ্ট। আরও বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطٰنِ وَشِرْكِهٖ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই নিজ প্রবৃত্তির অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরক থেকে। আরও বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ ـ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاَقِلْنِيْ عَثَرَاتِيْ وَاحْفِظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ ـ اَللّٰهُمَّ لَاتُؤْمِنَّ مَكْرَكَ وَلَاتُوَلِّنِيْ غَيْرَكَ وَلَاتَنْزِعْ عَنِّيْ سَتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِيْ ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি ক্ষমা এবং আমার ধর্মীয়, পার্থিব, আর্থিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা। হে আল্লাহ, গোপন কর আমার দোষ, অভয় দান কর আমার ভয়ে, ক্ষমা কর আমার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং হেফাযত কর আমার সম্মুখ, পেছন, ডান, বাম এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপর দিক থেকে। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি নীচের দিক থেকে। অতর্কিতে ধ্বংস হওয়া থেকে। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার আযাব থেকে নির্ভীক করো না এবং তোমাকে ছাড়া অন্যের কাছে সোপর্দ করো না। আমার উপর থেকে তোমার পর্দা হটিয়ে নিও না। আমাকে তোমার স্মরণ বিস্মৃত হতে দিয়ো না এবং আমাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করো না। এর পর তিন বার সাইয়্যেদুল এস্তেগফার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

(এর অনুবাদ পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।) অতঃপর তিন বার এ দোয়া পাঠ করবে : اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ ইলাহী, আমাকে আমার দেহে নিরাপত্তা দাও, কর্ণে নিরাপত্তা দাও এবং চোখে নিরাপত্তা দাও। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আরও বলবে :

اللهم انى اسئلك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واعوذ بك ان اظلم او يظلم او اعتدى او يعتدى على او اكسب خطيئة او ذنبا لا تغفر اللهم انى اسئلك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد واسئلك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسئلك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا متقبلا واسئلك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

تعلم واستغفرك بما تعلم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب ـ اللهم اغفرلي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت فانك انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شئ قدير وعلى كل غيب شهيد ـ اللهم انى اسئلك ايمانا لايرتد ونعيما لاينفد وقرة عين الابد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فى اعلى جنة الخلد ـ اللهم انى اسئلك الطيبت وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واسئلك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقرب الى حبك وان تتوب على وتغفر لى وترحمنى واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنى اليك من غير مفتون ـ اللهم بعلمك الغيب وقد ربك على الخلق احيني ما كانت الحيوة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى واسئلك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة العدل فى الرضاء والغضب والقصد فى الغنى والفقر ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك واعوذبك من ضراء مضرة وفتنة مضلة ـ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحلون به علينا مصائب الدنيا ـ اللهم املا وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن فى نفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك واجعلك ـ اللهم احب الينا ممن سواك واجعلنا اخشى لك ممن سواك ـ اللهم اجعل

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اول يومنا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا ـ اللهم اجعل اوله رحمة واوسطه نعمة واخره مكرمة مغفرة الحمد لله الذى تواضع كل شئ لعظمته وذل كل شئ لعزته وخضع كل شئ ملته واستسلم كل شئ لقدرته والحمد لله الذى سكن كل شئ لهيبته واظهر كل شئ بحكمة وتصاغر كل شئ لكبريائه ـ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وازواج محمد وذريته وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم فى العلمين ـ انك حميد مجيد ـ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك النبى الامى رسولك الامين واعطه المقام المحمود الذى وعدته يوم الدين ـ اللهم اجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا لمحابك مناوصرفنا بحسن اختيارك لنا نسئلك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه ـ اللهم بقدرتك على تب على انك انت التواب الرحيم وبحلمك عنى اعف عنى انك انت الغفار الحليم وبعلمك بى ارفق بى انك انت ارحم الراحمين وبملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها على انك انت الملك الجبار سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوء وظلمت نفسى فاغفرلى ذنبى انك انت ربى انه لايغفر الذنوب الا انت

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اللهم الهمنى رشدى وقنى شر نفسى اللهم ارزقنى حلالا لا
تعاقبنى عليه وقنعنى بما رزقتينى استعملنى به صالحا
تقبله منى اللهم انى اسئلك العفو والعافية وحسن اليقين
والمعافاة فى الدنيا والاخرة يا من لاتضره الذنوب ولا تنفعه
المغفرة هب لى ما لايضرك واعطنى ما لا ينقصك ربنا افرغ
علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولى فى الدنيا والاخرة
توفنى مسلما والحقنى بالصالحين انت ولينا فاغفرلنا
وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة
وفى الاخرة ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير
ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظلمين ربنا لا تجعلنا فتنة
للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا
على القوم الكفرين ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف
رحيم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا
اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ـ ربنا
واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا
تخلف الميعاد ـ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا
تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين ـ رب اغفرلى ولوالدى وارحمهما كما ربينى صغيرا ـ واغفر للمؤمنين والمؤمنت والمسلمين والمسلمت والاحياء منهم والاموات رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم وانت خير الراحمين وخير الغافرين ـ انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে দোয়া করি ফয়সালার পর তোমার সন্তুষ্টি, মৃত্যুর পর শীতল জীবন, তোমার পানে দৃষ্টিপাত করার আনন্দ এবং তোমার দীদারের আগ্রহ কোন ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি ছাড়াই ও কোন বিভ্রান্তকারীর ফেতনা ছাড়াই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, আমি কারও উপর জুলুম করি অথবা কেউ আমার উপর জুলুম করুক অথবা আমি সীমালঙ্ঘন করি কিংবা আমার উপর সীমালঙ্ঘন করা হোক অথবা আমি এমন কোন অন্যায় ও গোনাহ করি, যা তুমি ক্ষমা করবে না। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কাজে কর্মে দৃঢ়তা এবং সৎকর্মের উপর অটলতা। আমি আরও প্রার্থনা করি তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তোমার এবাদতে সুষ্ঠুতা। আমি আরও চাই সুস্থ অন্তর, সরল চরিত্র, সত্যবাদী জিহ্বা ও গ্রহণযোগ্য আমল। আমি চাই তোমার জানা বিষয়সমূহের কল্যাণ। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার জানা বিষয়সমূহের অনিষ্ট থেকে। তোমার জানা গোনাহ থেকে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। কেননা, তুমি জান, আমি জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় অবগত। হে আল্লাহ, ক্ষমা কর আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আগের গোনাহ, আমার পেছনের গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ। নিশ্চয় তুমিই আপন রহমতে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখ এবং সকল অদৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ কর। হে আল্লাহ, আমি এমন ঈমান চাই, যা টলে না, এমন নেয়ামত চাই, যা খতম হয় না, আর চাই চোখের চিরস্থায়ী শীতলতা এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গ। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পবিত্র বস্তু চাই। আর চাই সৎকর্মের সম্পাদন ও অসৎ কর্মের বর্জন এবং ফকীর মিসকীনের ভালবাসা। আমি চাই তোমার মহব্বত, তোমাকে যারা মহব্বত করে, তাদের মহব্বত, এমন প্রত্যেক আমলের মহব্বত, যা তোমার মহব্বতের নিকটবর্তী করে। আরও চাই, তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে ক্ষমা কর এবং যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফেতনায় পতিত করতে চাও, তখন আমাকে ফেতনায় না ফেলে নিজের দিকে তুলে নাও। হে আল্লাহ, তোমার অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান দ্বারা এবং তোমার কুদরত দ্বারা আমাকে ততদিন জীবিত রাখ, যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে তখন মৃত্যু দাও, যখন মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণকর হয়। আমি যেন দেখে ও না দেখে তোমাকে ভয় করি, সন্তুষ্টি ও ক্রোধের সময় ন্যায় কথা বলি, দারিদ্র্যে ও ধনাঢ্যতায় সোজা পথে চলি, তোমার দিকে চেয়ে আনন্দ অনুভব করি এবং তোমার দীদারের প্রতি আগ্রহান্বিত থাকি। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি থেকে এবং বিভ্রান্তকারী ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত কর এবং হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার এতটুকু ভয় নসীব কর যা আমাদের মধ্যে ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে আড়াল হয়ে যায়, এতটুকু আনুগত্য দান কর, যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাও এবং এতটুকু বিশ্বাস দাও, যার ফলে দুনিয়ার বিপদাপদ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। ইলাহী, আমাদের মুখমণ্ডল তোমার লজ্জায় এবং আমাদের অন্তর তোমার ভয়ে পূর্ণ করে দাও। আমাদের মনে তোমার এমন মাহাত্ম্য সঞ্চার কর,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যার ফলে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার খেদমতে নত হয়ে যায়। হে আল্লাহ, তোমাকে আমাদের কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম কর। আমরা যেন অন্য সবকিছুর চেয়ে তোমাকেই অধিক ভয় করি। হে আল্লাহ, এদিনের শুরু ভাগকে কল্যাণ, মধ্যভাগকে সাফল্য এবং শেষ ভাগকে নাজাতে পরিণত করে দাও। হে আল্লাহ, এর শুরু ভাগকে কর রহম, মধ্যভাগকে নেয়ামত এবং শেষ ভাগকে দান ও মাগফেরাত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর মাহাত্ম্যের সামনে প্রত্যেক বস্তু অবনত, যাঁর ইয্যতের সামনে প্রত্যেক বস্তু নম্র, যাঁর রাজত্বের সামনে প্রত্যেক বস্তু অক্ষম এবং যাঁর কুদরতের সামনে প্রত্যেক বস্তু অনুগত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যাঁর ভয়ে সবকিছু স্থির হয়ে আছে, যিনি প্রত্যেক বস্তু প্রজ্ঞা সহকারে প্রকাশ করেছেন এবং যার বড়ত্বের সামনে সবকিছু ক্ষুদ্র। হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর বংশধরের প্রতি, তাঁর পত্নীগণের প্রতি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রতি এবং বরকত দাও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে, তাঁর বংশধরকে, তাঁর পত্নীগণকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিকে; যেমন তুমি বরকত দিয়েছ ইবরাহীমকে সারা বিশ্বে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, পবিত্র। ইলাহী, রহম প্রেরণ কর তোমার বান্দা, উম্মী নবী ও বিশ্বস্ত রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এবং তাঁকে দাও প্রশংসিত স্থান কেয়ামতের দিন, যার ওয়াদা তুমি করেছ। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার সাবধানী ওলীদের সফলকাম দলের ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করে দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। আমাদেরকে এমন বিষয়ের তওফীক দাও, যা তোমার প্রিয়। আমাদেরকে ভালরূপে পছন্দ করে ফেরাও। আমরা তোমার কাছে চাই পূর্ণ কল্যাণ, তার শুরু ও পরিণতি। আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই পূর্ণ অনিষ্ট থেকে, তার শুরু ও পরিণতি থেকে। হে আল্লাহ, তুমি আমার উপর সক্ষম বিধায় আমাকে তওবার তওফীক দান কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। তুমি আমার প্রতি সহনশীল বিধায় আমাকে মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, সহনশীল। তুমি আমাকে জান বিধায় আমার সাথে নম্র ব্যবহার কর। নিশ্চয় তুমি পরম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দয়ালু। তুমি আমার মালিক বিধায় আমাকে আমার নিজের মালিক কর এবং আমার নফসকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ো না। নিশ্চয় তুমি প্রতাপশালী, শাহানশাহ্। হে আল্লাহ, আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি মন্দ কর্ম করেছি এবং নিজের উপর জুলম করেছি। অতএব আমার গোনাহ মাফ কর। নিশ্চয় তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ মাফ করার নেই। হে আল্লাহ, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। ইলাহী, আমাকে হালাল রিযিক দান কর, যার কারণে আমাকে শাস্তি দেবে না এবং তোমার দেয়া রিযিকের উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখ। এর মাধ্যমে আমাকে তোমার কাছে গ্রহণীয় সৎকর্মে নিয়োজিত কর। ইলাহী, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা, নিরাপত্তা ও সুন্দর বিশ্বাস প্রার্থনা করি। হে এমন সত্তা, গোনাহ যার ক্ষতি করে না এবং মাগফেরাত যার মর্যাদা খর্ব করে না, আমাকে এমন বিষয় দান কর, যা তোমার ক্ষতি করে না এবং তোমার মর্যাদা হ্রাস করে না। হে প্রভু, আমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় সবর দাও এবং মুসলমানরূপে ওফাত দাও। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার সুহৃদ। আমাকে মুসলমানরূপে ওফাত দাও এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও, তুমিই আমাদের সুহৃদ। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। আমাদের জন্যে লেখ এ জগতে নেকী এবং আখেরাতে নেকী। হে পরওয়ারদেগার, আমরা তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং প্রত্যাবর্তনস্থল তোমারই দিকে। হে প্রভু, আমাদেরকে জালেম কওমের জন্যে ফেতনা করো না। হে প্রভু, আমাদেরকে কাফেরদের জন্যে ফেতনা করো না। আমাদেরকে ক্ষমা কর হে প্রভু। নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। হে পরওয়ারদেগার, আমাদের গোনাহ এবং কাজকর্মে আমাদের অপব্যয় মার্জনা কর, আমাদের পদযুগল দৃঢ় রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। হে পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং মুমিনদের জন্যে আমাদের অন্তরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে পরওয়ারদেগার, তুমি মহব্বতকারী, দয়ালু। পরওয়ারদেগার, আমাদের দাও তোমার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের কাজকে সুশৃংখল কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দাও দুনিয়াতে নেকী, আখেরাতে নেকী এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। পরওয়ারদেগার, আমরা এক ঘোষককে একথা ঘোষণা করতে শুনেছি– তোমরা ঈমান আন তোমাদের পালনকর্তার প্রতি। অতএব, আমরা ঈমান এনেছি। পরওয়ারদেগার, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের কুকর্ম মিটিয়ে দাও এবং আমাদেরকে সজ্জনদের সাথে ওফাত দাও। পরওয়ারদেগার, তুমি তোমার রসূলগণের মুখে আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। পরওয়াদেরগার, আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর বোঝা আরোপ করো না, যেমন চাপিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। পরওয়ারদেগার, যে বিষয়ের শক্তি আমাদের নেই তা আমাদের উপর আরোপ করো না। আমাদেরকে মার্জনা কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। পরওয়ারদেগার, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা কর, যেমন শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। তুমি ক্ষমা কর মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে, মুসলমান পুরুষ ও নারীদেরকে এবং তাদের জীবিত ও মৃতদেরকে। পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ তুমি জান তা মার্জনা কর। তুমি পরাক্রান্ত, সম্মানিত। তুমি দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। পাপ থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার সাধ্য কারও নেই মহান সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী। হে আল্লাহ মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর ও সহচরগণের প্রতি রহমত প্রেরণ করুন এবং অনেক অনেক সালাম পৌঁছান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে সকল দোয়ায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কিছু থেকে আশ্রয় চেয়েছেন সেগুলো এই ঃ

হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে কৃপণতা থেকে। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে অথর্ব বয়সে পৌঁছে যাওয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই সংসারের ফেতনা থেকে আমি আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই এমন লোভ থেকে, যা অন্য লোভের দিকে পরিচালনা করে, অস্থানে লোভ করা থেকে এবং যেখানে আশা নেই সেখানে লোভ করা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই এমন এলেম থেকে যা উপকার করে না, এমন অন্তর থেকে যা নত হয় না, এমন দোয়া থেকে যা গৃহীত হয় না এবং এমন মন থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। আমি আশ্রয় চাই ক্ষুধা থেকে। কেননা, এটা মন্দ শয্যাসঙ্গী। আমি আশ্রয় চাই খেয়ানত থেকে; কেননা, এটা মন্দ সহচর। আরও আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, চরম বার্ধক্য থেকে, অকেজো বয়সে পৌঁছা থেকে, দাজ্জালের ফেতনা থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই নম্র, বিনয়ী ও তোমার পথে প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর। ইলাহী, আমি চাই তোমার মাগফেরাতের শর্তসমূহ, তোমার মাগফেরাতের কারণসমূহ, প্রত্যেক গোনাহ থেকে নিরাপত্তা, প্রত্যেক সৎকর্মের সুযোগ, জান্নাত লাভে সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই পতনজনিত মৃত্যু থেকে, আরও আশ্রয় চাই দুঃখ থেকে, নিমজ্জিত হওয়া থেকে, প্রাচীর ধসে পড়া থেকে এবং তোমার পথে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরও আশ্রয় চাই দুনিয়াকামী হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই যা জানি তার অনিষ্ট থেকে এবং যা জানি না তার অনিষ্ট থেকে। ইলাহী, তুমি আমাকে মন্দ অভ্যাস, মন্দ কর্ম, রোগ ও খেয়াল খুশী থেকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই বিপদের কঠোরতা থেকে, ভাগ্যাহত হওয়া থেকে, মন্দ তকদীর থেকে এবং শত্রুর হাসি থেকে। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই কুফর, ঋণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও দারিদ্র্য থেকে। আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফেতনা থেকে। ইলাহী, আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুর অনিষ্ট থেকে এবং জিহ্বা ও অন্তরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই স্বীয় বাসস্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে। কেননা, সফরের প্রতিবেশী বদলে যায়। ইলাহী আমি আশ্রয় চাই, নিষ্ঠুরতা থেকে, গাফিলতি থেকে, দারিদ্র্য, উপবাস, লাঞ্ছনা ও অভাবগ্রস্ততা থেকে। আরও আশ্রয় চাই কুফর, দারিদ্র্য, পাপাচার কলহ, নেফাক, কুচরিত্র, খ্যাতি ও রিয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই বধিরতা, মূকতা, অন্ধত্ব, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠরোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই তোমার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া, সুস্থতা বিগড়ে যাওয়া, আকস্মিক আযাব ও তোমার ক্রোধ থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও ফেতনা, কবরের আযাব ও ফেতনা, ধনাঢ্যতার অনিষ্ট, দারিদ্র্যের অনিষ্ট এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাই কর্জ ও গোনাহ থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই নফস থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। অন্তর থেকে, যা নত হয় না। নামায থেকে, যা উপকার করে না। দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না। আমি আশ্রয় চাই জীবনের অনিষ্ট থেকে, বুকের ফেতনা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই কর্জের আধিক্য থেকে, শত্রুর প্রাবল্য থেকে এবং শত্রুর হাসি থেকে।

বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া

পূর্বে আমরা মুয়াজ্জিনের আযানের দোয়া লিপিবদ্ধ করে এসেছি। এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে পায়খানায় যাওয়া ও বাইরে আসার দোয়া এবং ওযুর দোয়াও লেখে এসেছি। এগুলো যথাস্থানে পাঠ করা উচিত। এক্ষণে বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কতিপয় দোয়া উদ্ধৃত হচ্ছে।

কোন কাজ করার উদ্দেশে গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَلتُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে শুরু। হে পরওয়ারদেগার, আমি আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, আমি কারও উপর জুলুম করি অথবা কেউ আমার উপর জুলুম করুক কিংবা আমি কারও সাথে মূর্খতা করি অথবা কেউ আমার সাথে মূর্খতা করুক। পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। কুকর্ম থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার সাধ্য নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, ভরসা আল্লাহ্র উপরই

কোন মজলিস থেকে ওঠার পর মজলিসে যেসব অনর্থক কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারা স্বরূপ কোন দোয়া পাঠ করতে চাইলে এই দোয়া পাঠ করবে–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ
وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। আমি মন্দ কাজ করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ মার্জনা করে না।

বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়বে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত মাবূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মরণ দেন। তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিরজীবী, মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁর হাতে কল্যাণ। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আমি এই বাজারের এবং বাজারে যা আছে সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করি। ইলাহী, আমি এই বাজারের অনিষ্ট এবং বাজারস্থিত সবকিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। ইলাহী আমি আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, এ বাজারে আমি কোন পাপের কসম খাই অথবা অলাভজনক ক্রয়-বিক্রয় করি।

ঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থাৎ, ইলাহী, তুমি হারামের পরিবর্তে হালালকেই আমার জন্যে যথেষ্ট কর এবং তোমার কৃপা দ্বারা আমাকে অন্যের দিক থেকে পরাঙ্মুখ করে দাও।

নতুন বস্ত্র পরিধান করলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ كَسَوْتَنِىْ هٰذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, তুমি আমাকে এই বস্ত্র পরিধান করিয়েছ। অতএব তোমারই প্রশংসা। আমি এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশে এটা তৈরী হয়েছে তার কল্যাণ চাই এবং উদ্দেশ্যের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

অলক্ষুণে কোন কিছু দেখে মন খারাপ হলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِىْ بِالْحَسَنٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يُذْهِبُ بِالسَّيِّئٰتِ اِلَّا اَنْتَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কেউ শুভকর্ম ঘটায় না এবং তুমি ব্যতীত কেউ অশুভ বিষয় দূর করে না। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত মন্দ থেকে বাঁচার এবং শুভ কাজ সাধনের সাধ্য কারো নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঝড় তুফানের সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ اَوْ خَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি দোয়া করি এই বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যে বিষয় দিয়ে একে প্রেরণ করেছ, তার কল্যাণ এবং এর অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

বজ্র গর্জন শুনলে বলবে ঃ

سُبْحٰنَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, বজ্র যার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতারাও যার ভয়ে পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি পবিত্র।

প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তাআলার যা ফয়সালা তা তো হবেই, এটা অনিবার্য। এমতাবস্থায় দোয়ার উপকারিতা কি? এর জওয়াব, দোয়া দ্বারা বিপদাপদ দূর হওয়াও আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। দোয়া বিপদ টলে যাওয়ার কারণ এবং রহমত টেনে আনার উপায় হয়ে থাকে; যেমন ঢাল তীর প্রতিহত করার কারণ এবং বৃষ্টি সবুজ ঘাস উৎপন্ন হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। ঢাল ও তীরে যেমন মোকাবিলা হয়, তেমনি দোয়া ও বিপদাপদের মধ্যে মোকাবিলা হয়। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্য অস্ত্র ধারণ না করা জরুরী নয়। আল্লাহ বলেন ঃ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ তোমরা তোমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নাও।

আসল ব্যাপার, কারণের সাথে ঘটনার জড়িত হওয়াটা প্রথম ফয়সালা, যাকে কাযা বলা হয়। এর পর আস্তে আস্তে এক একটি কারণের ভিত্তিতে ঘটনা সংঘটিত হতে থাকাটা দ্বিতীয় ফয়সালা, যাকে কদর (বিধিলিপি) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের তকদীরে কল্যাণ রেখে কোন কারণের উপর সীমিত রেখেছেন। যে ব্যক্তির অন্তশ্চক্ষু খোলা, তার মতে এসব বিষয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ ছাড়া দোয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপকারিতা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দোয়ার সাহায্যে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্তরের উপস্থিতি হতে পারে, যা এবাদতের চরম লক্ষ্য। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ দোয়া এবাদতের নির্যাস। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে, অভাব অথবা বিপদাপদ দেখা দিলেই তাদের অন্তর আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ অর্থাৎ মানুষকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।

সুতরাং দোয়ার প্রয়োজন আছে। দোয়া মানুষের অন্তরকে কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয় সহকারে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করে। এর মাধ্যমেই যিকির অর্জিত হয়, যা সেরা এবাদত। এ কারণেই নবী, ওলী ও গুণী ব্যক্তিবর্গের উপর বালা-মসিবত বেশী আসে। ধনাঢ্যতা প্রায়ই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণ হয়ে থাকে, যা দোয়ার পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى অর্থাৎ মানুষ সীমালঙ্ঘন করেই থাকে; সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দশম অধ্যায়

ওযিফা ও রাত্রি জাগরণের ফযীলত

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের অনুগত করেছেন; এ উদ্দেশে নয় যে, মানুষ এর উঁচু গৃহসমূহে থেকে যাবে; বরং উদ্দেশ্য, মানুষ পৃথিবীকে একটি বিশ্রামাগার মনে করবে এবং এখান থেকে এমন পাথেয় সংগ্রহ করে নেবে, যা তার আসল দেশের সফরে কাজে লাগবে। মানুষ এখান থেকেই কর্ম ও গুণগরিমার উপঢৌকন আহরণ করবে, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে এবং মনে করবে, বয়স ও আয়ুষ্কাল মানুষকে এমনভাবে নিয়ে যায় যেমন নৌকা তার আরোহীদের নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকে। এ বিশ্ব চরাচরে সকল মানুষই মুসাফির। বয়স এ সফরের দূরত্ব, শ্বাস-প্রশ্বাস এর পদক্ষেপ। এবাদত ও আনুগত্য এ সফরের পুঁজি এবং কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহআদি এ পথের দুর্ধর্ষ ডাকাত। এ সফরের লাভ হচ্ছে জান্নাতে বিশাল সাম্রাজ্য ও চিরস্থায়ী নেয়ামত সহকারে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে সাফল্য অর্জন। আর লোকসান হচ্ছে জাহান্নামের অসহ্য আযাব ও লোহার বেড়ী পরিধান সহকারে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতিটি বিশ্বাসই অত্যন্ত মূল্যবান। যে ব্যক্তির একটি নিঃশ্বাস গাফেল অবস্থায় অতিবাহিত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোন আমল না করে, সে কেয়ামতের দিন এত বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এই সত্য বিপদাশংকা ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে তওফীকপ্রাপ্তরা কর্মতৎপর হয়ে যাবতীয় কামবাসনা ও লোভ মোহ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর যিকিরে দিবারাত্র অতিবাহিত করার উদ্দেশে প্রত্যেক ওয়াক্তে আলাদা আলাদা ওযিফা নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায়। এ কারণেই আলোচ্য গ্রন্থেও ওযিফাসমূহের বিশদ বিবরণ পেশ করা সমীচীন মনে হয়। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী দু'টি শিরোনামে এ লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওযিফার ফযীলত ও ধারাবাহিকতা

জানা উচিত, অন্তশ্চক্ষুসম্পন্ন মনীষীগণের মতে আল্লাহ্ তাআলার দীদার ব্যতীত মুক্তির কোন উপায় নেই। এ দীদার লাভের একমাত্র পন্থা, বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হবে, আরেফ হবে এবং তদবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সার্বক্ষণিক যিকির ব্যতীত যেমন আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত অর্জন করা যায় না, তেমনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্মে ফিকির তথা চিন্তা ভাবনা ছাড়া তাঁর মারেফত হাসিল করা যায় না। সার্বক্ষণিক যিকির ফিকির তখনই সহজলভ্য হয়, যখন কেউ দুনিয়া ও তার কামনা-বাসনা বিদায় দিয়ে দেয় এবং জীবন ধারণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বাদে সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়। এসকল বিষয়ের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে নিজের দিবারাত্রির সম্পূর্ণ সময় যিকির ফিকিরে ডুবিয়ে রাখা। মানুষ স্বভাবগতভাবে এক প্রকারের যিকির ফিকির দ্বারা ক্লান্ত হয়ে যায়। সে নির্দিষ্ট কোন একটি পদ্ধতির উপর সবর করতে পারে না। তাই প্রত্যেক সময়ের জন্যে পৃথক পৃথক ওযিফা নির্দিষ্ট করা জরুরী, যাতে এ পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে মানুষের আনন্দ বেশী হয় এবং আগ্রহ বেড়ে যায়। এ কারণেই ওযিফাসমূহের বণ্টন বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়েছে। সুতরাং যেব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে চায়, তার উচিত সমস্ত সময় এবাদতে ব্যয় করা। আর যে ব্যক্তি তার নেকীর পাল্লা ভারী দেখতে চায়, সে যেন তার অধিকাংশ সময় এবাদতে নিয়োজিত রাখে। যে ব্যক্তি কিছু নেক আমল করে এবং কিছু মন্দ আমল, তার ব্যাপারটি বিপজ্জনক। তবুও আল্লাহ তাআলার কৃপায় আশা করা যায়, সেও রক্ষা পাবে। যারা অন্তরের চোখে দেখে, তাদের কাছে দিবারাত্রির সময় যিকির ও ফিকিরে ব্যয় করার উৎকর্ষতা আপনা আপনি পরিস্ফুট। কিন্তু কেউ যদি অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী না হয়, সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলার বাণীসমূহ দেখে নিতে পারে এবং ঈমানের নূর দ্বারা বিচার করতে পারে, এসব বাণী থেকে কি বুঝা যায়? অথচ রসূলে করীম (সাঃ) সকল বান্দা অপেক্ষা অধিকতর নৈকট্যশীল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং মর্তবায় সকলের উর্ধ্বে ছিলেন। তবুও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার জন্যে রয়েছে অধিক কর্মব্যস্ততা। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার যিকির করুন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ধ্যানে মগ্ন হোন।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا -

অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার নাম যিকির করুন। রাতে তাঁর প্রতি সেজদায় অবনত হোন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পরে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন গাত্রোত্থান করেন এবং রাত্রির কিছু অংশে ও তারকা ডুবে যাওয়ার পরে।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيلًا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় এবাদতে রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অনুকূল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ـ

অর্থাৎ, রাত্রির কিছু অংশে এবং দিবাভাগে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, সম্ভবতঃ আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ـ

অর্থাৎ, নামায কায়েম করুন দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে; নিশ্চয়ই নেকী পাপ কর্ম দূর করে দেয়।

এর পর লক্ষ্য করা উচিত, যারা আল্লাহ তা'আলার সফলকাম বান্দা, তাদের সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন ? উদাহরণতঃ এরশাদ হয়েছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রির প্রহরসমূহে সেজদা ও দন্ডায়মান অবস্থায় এবাদতে মগ্ন থাকে, আখেরাতের ভয় রাখে এবং পরওয়ারদেগারের রহমত আশা করে, সে কি তার সমান হবে? যে তা করে না, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞান, তারা কি সমান?

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ـ

অর্থাৎ, তারা শয্যা গ্রহণ করে না এবং ভয় ও আশা সহকারে তাদের পালন কর্তার কাছে দোয়া করে।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ـ

অর্থাৎ, যারা তাদের পালনকর্তার জন্যে সেজদাবনত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

— তারা রাত্রির অল্প অংশই নিদ্রা যেত এবং শেষ রাতে এস্তেগফার করত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র, তোমাদের বিকালে এবং তোমাদের ভোরে (অর্থাৎ সর্বদা) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসা এবং শেষ প্রহরে ও দ্বিপ্রহরে। অর্থাৎ সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা কর।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ـ

অর্থাৎ, তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করলে জানা যাবে যে, সময়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সময়কে ওযিফা দ্বারা সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ রাখা হচ্ছে আল্লাহর দিকে পৌঁছার পথ। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা তারা, যারা যিকিরের জন্যে সূর্য, চন্দ্র ও ছায়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ –সূর্য ও চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী চলে।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ـ

অর্থাৎ, তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে প্রলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এর পর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্যে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও।

সুতরাং এরূপ ধারণা করবে না যে, চন্দ্র সূর্যের গতিবিধি সুশৃঙ্খল ও হিসাবাধীন হওয়া এবং ছায়া, আলো ও তারকারাজি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এগুলো দ্বারা দুনিয়ার কাজে সাহায্য লওয়া। বরং এগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো দ্বারা সময়ের পরিমাণ জেনে তাতে আল্লাহর এবাদত করা এবং আখেরাতের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত ও দিনকে একে অপরের পশ্চাদগামী করে সৃষ্টি করেছেন সেই ব্যক্তির জন্যে, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

অর্থাৎ, দিন ও রাত্রির একটিকে অপরটির স্থলবর্তী হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যাতে রাতের কোন এবাদত থেকে গেলে তা দিয়ে পূরণ করে নেয়া যায় এবং দিনের এবাদত থেকে গেলে রাতে তা পূরণ করা যায়। এতে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা যিকির ও শোকরের জন্যে– অন্য কিছুর জন্যে নয়। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ـ

অর্থাৎ আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে নিষ্প্রভ করে দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমরা পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার।

ওযিফার সময় ও ক্রমবিন্যাস ঃ দিবাভাগের ওযিফা সাতটি এবং রাত্রিকালীন চারটি। দিনের বেলার প্রথম ওযিফার সময় সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এটা খুবই অভিজাত সময়। এর আভিজাত্য বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা এ সময়ের কসম খেয়েছেন–

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ অর্থাৎ ভোরের কসম, যখন, সেটি আবির্ভূত হয়। নিজের প্রশংসায় বলেছেন فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ভোরের আবিষ্কর্তা। এ সময়েই সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে রাত্রির কালো ছায়া সংকুচিত হয়ে যায়। তখন মানুষকে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর, যখন সন্ধ্যা হয় এবং যখন ভোর হয়।

দিনের ওযিফাসমূহের ক্রমবিন্যাস ঃ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে আল্লাহকে স্মরণ করে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

এ দোয়াটি শেষ পর্যন্ত পড়বে। যা প্রথম অধ্যায়ে জাগ্রত হওয়ার পর পড়ার আলোচনায় লিখিত হয়েছে। দোয়া পাঠ করার সময়ই পোশাক পরিধান করবে। পোশাক পরিধানে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং তা দ্বারা এবাদতে সাহায্য নেয়ার নিয়ত করবে, রিয়া ও অহংকারের নিয়ত করবে না। প্রয়োজন হলে পায়খানায় যাবে এবং বাম পা প্রথমে পায়খানার ভিতর রাখবে। এ সময় সেই দোয়া পাঠ করবে, যা পবিত্রতা অধ্যায়ে পায়খানায় যাওয়া ও বের হওয়ার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর সুন্নত অনুযায়ী মেসওয়াক করবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এরপর সকল সুন্নত ও দোয়াসহ ওযু করবে। এসব সুন্নত ও দোয়া আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি। তাই এ অধ্যায়ে এগুলো কেবল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আগে পরে আদায়ের কথা বলা হবে। সম্পূর্ণ দোয়ার পুনরাবৃত্তি করা হবে না। ওযু সমাপনান্তে ফজরের দু'রাকআত সুন্নত নিজ গৃহে আদায় করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করতেন। সুন্নতের পর এ দোয়াটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ عِنْدِكَ (শেষ পর্যন্ত)। এর পর মস্জিদে রওয়ানা হবে এবং এ সময়কার জন্য নির্ধারিত দোয়া পাঠ করবে।

নামাযের জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে না; বরং ধীরস্থিরভাবে চলবে। হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মসজিদের ভিতরে ডান পা প্রথম রাখবে এবং মসজিদে যাওয়ার দোয়া পাঠ করবে। এর পর ফাঁকা থাকলে প্রথম সারিতে জায়গা নেবে। মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাবে না এবং কাউকে কষ্ট দেবে না। ফজরের সুন্নত নামায গৃহে না পড়ে থাকলে সুন্নত আদায় করে তৎপর দোয়ায় মশগুল হবে। গৃহে পড়ে থাকলে দুরাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে জামাআতের অপেক্ষায় বসে থাকবে। জামাআত অন্ধকার থাকতে আদায় করা মোস্তাহাব। (হানাফী মাযহাবে যথেষ্ট ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা মোস্তাহাব।) কোন ওয়াক্তের জামাত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, বিশেষতঃ ফজর ও এশার জামাত কখনও ছাড়বে মা। এগুলোতে সওয়াব বেশী। আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামায সম্পর্কে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু করতঃ নামাযের জন্যে মসজিদে যাবে, তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে সওয়াব হবে এবং একটি পাপ মোচন করা হবে। সৎকাজের সওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। নামায শেষে সূর্যোদয়ের পর মসজিদ থেকে বের হলে তার দেহে যত লোম রয়েছে, সেই পরিমাণ সওয়াব তার জন্যে লেখা হবে। আর যদি চাশতের নামাযও পড়ে বের হয় তবে প্রতি রাকআতের বদলে দশ লক্ষ নেকীর সওয়াব পাবে। পূর্ববর্তী বযুর্গগণ ভোর হওয়ার পূর্বে মসজিদে গমন করতেন। জনৈক তাবেয়ী বলেন ঃ আমি ভোর হওয়ার পূর্বেই মসজিদে গিয়ে দেখি, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমার পূর্বে পৌঁছে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ ভাতিজা, এ সময়ে গৃহ থেকে কি মতলবে বের হয়েছ? আমি বললাম ঃ ফজরের নামায পড়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে। তিনি বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ। আমরা এরূপ বের হওয়া এবং মসজিদে বসে থাকাকে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ)-এর সাহচর্যে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করার সমান মনে করতাম। হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের গৃহে আগমন করলেন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-ও নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা নামায পড় না কেন? আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের প্রাণ আল্লাহ্র হস্তগত। তিনি যখন আমাদেরকে ওঠাতে চান, তখনই উঠি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে গেলেন। কিন্তু আমি শুনলাম তিনি স্বীয় উরুতে করাঘাত করতে করতে বলছিলেন ঃ

وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ সকল কিছুর চেয়ে অধিক বিতর্ক করে।

ফজরের সুন্নত ও তৎপরবর্তী দোয়া শেষে একামত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এস্তেগফার ও তসবীহে মশগুল থাকা উচিত। অর্থাৎ, এ সময় সত্তর বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ এবং একশ'বার سُبْحَنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করবে। এর পর সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফরয নামায পড়বে। এসব আদব আমরা নামায অধ্যায়ে লেখে এসেছি। নামাযান্তে মসজিদে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি যে জায়গায় ফজরের নামায পড়ি সেখানে বসে থাকা এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করাকে চারটি গোলাম মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করি। বর্ণিত আছে, তিনি ফজরের নামাযান্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের জায়গায় বসে থাকতেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি সূর্যোদয়ের পর দু'রাকআত নামায পড়তেন। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরওয়ারদেগারের রহমতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলতেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ হে ইবনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আদম, ফজরের নামায এবং আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণ আমার যিকির করলে তোমার জন্যে এ দুসময়ের মাঝখানে আমিই যথেষ্ট হব। অতএব সূর্যোদয় পর্যন্ত কথাবার্তা না বলে এই চার প্রকার ওযিফা পাঠ করা উচিত–

(১) দোয়া, (২) যিকির, (৩) কোরআন তেলাওয়াত এবং (৪) ফিকির তথা ভাবনা করা। নামায শেষ হলেই দোয়া শুরু করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধরের প্রতি। ইলাহী, তুমিই শান্তি, তোমা থেকেই শান্তি এবং শান্তি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আমাদেরকে শান্তি সহকারে জীবিত রাখ এবং আমাদেরকে শান্তির বাসগৃহে তথা জান্নাতে দাখিল কর। তুমি মহান হে প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত।

এর পর এই দোয়া শুরু করবে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلٰى الْوَهَّابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا
شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْلُ النِّعْمَةِ
وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ, আমার পরওয়ারদেগার পবিত্র, মহান, সুউচ্চ, অতি দাতা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এবং তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিরজীবী, মৃত্যুবরণ করবেন না। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি নেয়ামত, কৃপা ও উত্তম প্রশংসার অধিকারী। আমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদত করি, যদিও তা কাফেরদের পছন্দনীয় নয়।

এর পর নবম অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শিরোনামে লিখিত দোয়াসমূহ পাঠ করবে। সম্ভব হলে সবগুলো পড়বে, নতুবা যতটুকু স্মরণ আছে অথবা যতটুকু আপন অবস্থার উপযোগী, ততটুকু পাঠ করবে।

যিকিরের কলেমা সেগুলোই যেগুলো বার বার পাঠ করতে হয়। এগুলো বার বার পাঠ করার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রত্যেক কলেমা তিন বার অথবা সত্তর বার পাঠ করা এবং মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছে দশ বার পাঠ করা। সুতরাং অবসর অনুযায়ী এগুলো বার বার পাঠ করবে। বলাবাহুল্য, বেশী পড়ার সওয়াব বেশী। তবে দশ বার পড়া নিয়মিত অব্যাহত রাখা সম্ভব বিধায় এটাই উত্তম। যে ওযিফার বেশী সংখ্যা সব সময় পড়া যায় না, তার কম সংখ্যা সব সময় পড়া উত্তম। অন্তরের উপর এর প্রভাব বেশী পড়ে। এটা ফোঁটা ফোঁটা পানির ন্যায়, যা পর পর মাটিতে পতিত হয়। তাতে গর্ত সৃষ্টি হয়ে যায়, সেখানে পাথরও থাকে। পক্ষান্তরে অধিক সংখ্যক ওযিফা, যা অনিয়মিত পাঠ করা হয়, তা সেই পানির ন্যায়, যা একযোগে অথবা বিলম্বের পর কয়েকবারে ঢেলে দেয়া হয়। এ পানির কোন প্রভাব অনুভূত হবে না।

ওযিফার কলেমা দশটি

(١) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

(٢) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(٣) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحِ ـ

(٤) سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

(٥) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ ـ

(٦) اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

(٧) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

(٨) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

(٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ـ

(١٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

এ দশটি কলেমা দশ বার করে পাঠ করলে একশ' বার হয়ে যাবে। এটা একই কলেমা একশ' বার পাঠ করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটির সওয়াব ও ফযীলত আলাদা আলাদা। প্রত্যেকটি দ্বারা অন্তর এক প্রকার আনন্দ পায়। এক কলেমা থেকে অন্য কলেমায় যাওয়াও মনের জন্যে সুখকর ও ক্লান্তিনাশক।

কোরআন তেলাওয়াতে মোস্তাহাব হচ্ছে, এমন আয়াত পাঠ করবে, যেগুলোর ফযীলত হাদীসে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত। এছাড়া شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-এর সাথে আরও দু'আয়াত قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

لَقَدْ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ থেকে পর্যন্ত لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ رَسُوْلَهُ থেকে সূরা ফাতাহ্‌র শেষ পর্যন্ত, يَتَّخِذْ وَلَدًا থেকে সূরা বনী ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত, সূরা হাদীদের শুরুর পাঁচ আয়াত এবং هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ থেকে সূরা হাশরের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। আর যদি 'মুসাব্বাআতে আশার' পাঠ করা হয়, তবে পুরোপুরি সওয়াব পাওয়া যাবে। 'মুসাব্বাআতে আশার' সেই দশটি কলেমাকে বলা হয়, যা হযরত খিযির (আঃ) হযরত ইবরাহীম তায়মী (রহঃ)-কে উপহারস্বরূপ শিক্ষা দেন এবং এগুলো প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় সাত সাত বার পাঠ করার উপদেশ দেন। এগুলো পাঠ করলে সকল দোয়ার সওয়াব অর্জিত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, যয়ন ইবনে দাররা একজন আবদাল ছিলেন। তিনি রেওয়ায়েত করেন– একবার আমার এক ভাই সিরিয়া থেকে আগমন করে আমাকে একটি উপহার দিয়ে বলে ঃ এটা কবুল করুন। এটা উৎকৃষ্ট উপহার। আমি বললাম ঃ তোমাকে এ উপহার কে দিল? সে বলল ঃ আমাকে ইবরাহীম তায়মী দান করেছেন। আমি বললাম ঃ তুমি ইবরাহীম তায়মীকে জিজ্ঞেস করনি যে, তিনি এটা কোথায় পেলেন? সে বলল ঃ হাঁ, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জওয়াবে তিনি বললেন, তিনি কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় বসে তাহলীল, তসবীহ ও তাহমীদে মশগুল ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম করতঃ ডান পার্শ্বে বসে যায়। তিনি জীবনে কখনও এমন সুন্দর সুশ্রী পুরুষ দেখেননি এবং তাঁর পোশাকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, শুভ্র ও সুগন্ধিযুক্ত পোশাকও দেখেননি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন? আপনি কে এবং কোত্থেকে আগমন করলেন? আগন্তুক বলল ঃ আমি খিযির। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমার কাছে কি উদ্দেশে আগমন করেছেন। খিযির বললেন ঃ আপনার সাথে সালাম কালাম করতে এসেছি। আমার কাছে একটি উপহার আছে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যা আমি আপনাকে দিতে চাই। কেননা, আপনার প্রতি আমার মনে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত রয়েছে। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ উপহারটি কি? খিযির বললেন ঃ সূর্যোদয় ও তার আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা কাফিরূন এবং আয়াতুল কুরসী সাত সাত বার পাঠ করবেন. অতঃপর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ কলেমাটি সাত বার, দরূদ শরীফ সাত বার, নিজের জন্যে, পিতা-মাতার জন্যে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্যে এস্তেগফার সাত বার এবং নিম্নোক্ত দোয়া সাত বার পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ

কিন্তু সাবধান, কোন সকাল সন্ধ্যায় এ আমল তরক করা উচিত হবে না। ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ আমি খিযির (আঃ)-কে বললাম ঃ এ উপহার আপনাকে কে দান করল, আমি তা জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দান করেছেন। আমি বললাম ঃ আপনি এর সওয়াব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ আপনি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত লাভ করবেন, তখন এর সওয়াব জিজ্ঞেস করে নেবেন। তিনিই বলে দেবেন।

ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশতারা যেন আমাকে বহন করে জান্নাতে পৌঁছে দিল। সেখানে আমি বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখলাম। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম– এসব সাজসরঞ্জাম কার জন্যে? তারা বলল ঃ যে কেউ তোমার মত আমল করবে, তার জন্যে। ইবরাহীম জান্নাতে দেখা অনেক বস্তুর বর্ণনা দিলেন এবং বললেন ঃ আমি সেখানকার ফল খেয়েছি, পানি পান করেছি। আমার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করেছেন। তাঁর সাথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সত্তর জন পয়গম্বর এবং সত্তর সারি ফেরেশতা ছিল। প্রত্যেক সারিতে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণে ফেরেশতা ছিল। তিনি আমাকে সালাম দ্বারা গৌরবান্বিত করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, খিযির বলেন, তিনি এ হাদীসটি আপনার কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন ঃ খিযির ঠিকই বলেছেন। তিনি যা বলেছেন, সত্য বলেছেন। পৃথিবীর লোকদের মধ্যে তিনিই আলেম, আবদালদের সরদার এবং আল্লাহর সৈনিকদের অন্যতম। অতঃপর আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে ব্যক্তি এ আমল করে এবং আমি স্বপ্নে যা দেখেছি তা না দেখে, সে কি তা পাবে যা আমি পেয়েছি? তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন– এই ওযিফার আমলকারী যদিও আমাকে না দেখে এবং জান্নাত না দেখে, তবুও তার সমস্ত কবীরা গোনাহ মাফ করা হবে। তার উপর থেকে আল্লাহ্ তাআলা ক্রোধ প্রত্যাহার করে নেবেন। বাম দিকের ফেরেশতাকে পূর্ণ এক বছরের পাপ লিপিবদ্ধ না করার আদেশ দেবেন। সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন– এই ওযিফার আমল সে-ই করবে, যাকে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যবানরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই বর্জন করবে, যে হতভাগারূপে সৃজিত হয়েছে। কথিত আছে, ইবরাহীম তায়মী চার মাস পর্যন্ত কিছুই পানাহার করেননি। এটা সম্ভবতঃ এ স্বপ্ন দেখার পরবর্তী অবস্থাই হবে।

কোরআন তেলাওয়াতের পর ফিকিরও একটি নিয়মিত কর্ম হওয়া উচিত। কি বিষয়ে ফিকির করবে এবং কিভাবে ফিকির করবে, তার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ খণ্ডে ফিকির অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু ফিকির মোটামুটি দু'প্রকার।

প্রথম, এমন বিষয়ে ফিকির করা, যা এলমে মোআমালায় উপকারী। উদাহরণতঃ নিজের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব নিকাশ করা, সামনের দিনগুলোর ওযিফা নির্দিষ্ট করা, কল্যাণের পরিপন্থী বিষয়সমূহ প্রতিহত করা, নিজের পাপের স্মরণ করা, যেসব বিষয়ের দ্বারা আমলে ত্রুটি দেখা দেয় সেগুলো চিন্তা করা, যাতে আমল সংশোধিত হয় এবং অন্তরে নিজের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমল সম্পর্কে ও মুসলমানদের সাথে লেনদেন করার ব্যাপারে উত্তম নিয়ত হাযির করা।

দ্বিতীয়, এমন বিষয়ে ফিকির করা, যা এলমে মোকাশাফায় উপকারী। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামত এবং তা উপর্যুপরি লাভ করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা, যাতে আল্লাহর অধিক মারেফত অর্জিত হয় এবং তাঁর অধিক শোকর করা যায়। অথবা আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, যাতে আল্লাহ্র কুদরতের মারেফত বৃদ্ধি পায় এবং শাস্তি ও প্রতিশোধের ভয় বেশী হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটির অনেক বিভাগ রয়েছে। কারও জন্যে এগুলোতে ফিকির করার অবকাশ আছে এবং কারও জন্যে নেই। এ সম্পর্কে চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ফিকির একটি সেরা এবাদত। কেননা, এতে যিকিরও আছে এবং অতিরিক্ত আরও দু'টি বিষয় আছে। এক, মারেফত বেশী হওয়া। কারণ, ফিকির মারেফত ও কাশফের চাবি। দুই, মহব্বত বেশী হওয়া। কেননা, অন্তর যার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হয় তাকেই মহব্বত করে। আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য, তাঁর গুণাবলী, অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকর্ম ও কুদরতের মারেফত ব্যতীত পরিস্ফুট হয় না। ধারাবাহিকতা এভাবে হয়– ফিকির দ্বারা মারেফত অর্জিত হয়, মারেফত দ্বারা মাহাত্ম্য এবং মাহাত্ম্যের মাধ্যমে মহব্বত সৃষ্টি হয়। যিকিরও মহব্বতের কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু মারেফতের কারণে যে মহব্বত হয়, তা মহব্বতের তুলনায় অনেক শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী ও বড় হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি কারও সৌন্দর্য চোখে দেখে এবং তার সুন্দর চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম প্রশংসনীয় অভ্যাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অবগত হয়ে তার প্রতি আশেক হয়ে যায়। অন্য এক ব্যক্তি কোন অনুপস্থিত লোকের সৌন্দর্য ও গুণের কথা কয়েকবার মোটামুটিভাবে শুনে বিস্তারিত অবগত না হয়েই তার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। এখানে প্রথম ব্যক্তির এশক ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মহব্বত সমান নয়। কেননা, কথায় বলে, شنیده کے بود مانند دیده অর্থাৎ শোনা বিষয় চাক্ষুষ দেখার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মত হবে কেমন করে? মারেফত অর্জনকারীর মহব্বত প্রত্যক্ষদর্শীর মহব্বতের অনুরূপ হয়ে থাকে এবং যিকিরকারীর মহব্বত শ্রবণকারীর মহব্বতের মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যারা মনে ও মুখে সব সময় আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে এবং কেবল অনুকরণগত ঈমান দ্বারা রসূলের আনীত বিষয়সমূহকে সত্য জ্ঞান করে, তাদের কাছে আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটি মোটামুটি বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি তারা অন্যদের বলার কারণে বিশ্বাস স্থাপন করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর মারেফত অর্জনকারী, তারা আল্লাহর প্রতাপ প্রতিপত্তি ও সৌন্দর্য অন্তরের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে, যা বাহ্যিক চর্মচক্ষু থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই এতটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারে, যতটুকু তার জন্যে পর্দা উন্মুক্ত হয়। আল্লাহর সৌন্দর্য পর্দার কোন শেষ নেই। তবে যেসব পর্দাকে নূর বলা সঙ্গত এবং সেগুলো পর্যন্ত সাধক পৌঁছে মনে করতে থাকে যে, সে আসল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেগুলোর সংখ্যা সত্তর। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি তিনি এগুলো তুলে দেন, তবে তাঁর চেহারার নূর সমগ্র সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। এসব পর্দাও একটির চেয়ে আরেকটি প্রখর এবং পরস্পর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির নূরের মত বিভিন্নতর। প্রথম অবস্থায় সবচেয়ে ক্ষুদ্র নূর প্রকাশ পায়, এর পর আরও বেশী এবং এর পর আরও বেশী নূর আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণেই জনৈক সুফী বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ক্রমোন্নতিতে তাঁর সামনে যেসকল নূর প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর স্তর বর্ণনা করেছেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰى كَوْكَبًا

অর্থাৎ, যখন তাঁর সামনে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি তারকা দেখতে পেলেন।

এ আয়াতের তফসীরে বুযুর্গগণ বলেন ঃ যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে গোটা ব্যাপারটি সন্দিগ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি একটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নূরের পর্দায় উপনীত হলেন, যা অন্যান্য নূর থেকে কম ছিল। এ কারণেই একে 'তারকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ আয়াতে 'তারকা' বলে রাতের জ্বলজ্বলে 'তারকা' বুঝানো হয়নি। কেননা, এসব তারকা সম্পর্কে প্রত্যেকেই জানে যে, এগুলো 'রব' হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং যে বস্তুকে সাধারণ মানুষও খোদা মনে করে না, তাকে খলীলুল্লাহ্ কিরূপে খোদা বলতে পারতেন? এসব পর্দাকে যে নূর বলা হয়েছে, তার অর্থও আলো নয়, যা চোখে দেখা যায়; বরং এখানে নূর বলে তাই বুঝানো হয়েছে, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূর একটি তাকের মত, যাতে রয়েছে প্রদীপ।

এখন আমরা এ আলোচনা থেকে কলম ফিরিয়ে নিচ্ছি। কেননা, এটা এলমে মোআমালার বাইরে। এর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা কাশফ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। খুব কম লোকের সামনেই এ দরজা উন্মুক্ত হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কেবল এলমে মোআমালায় উপকারী বিষয়াদি নিয়েই ফিকির করা সম্ভব। এ ফিকির অর্জিত হলে এর উপকারও অনেক।

মোট কথা, যে আখেরাত তলব করে, তার উচিত দোয়া, যিকির, তেলাওয়াত ও ফিকির– এ চারটি বিষয়ের ওযিফা ফজরের নামাযের পরে করা, বরং সর্বদা নিয়মিত নামাযান্তে এই ওযিফা করা। কেননা নামাযের পরে এগুলোর চেয়ে বড় কোন ওযিফা নেই। এসব বিষয়ের ক্ষমতা অর্জন করার উপায় হচ্ছে, নিজের কর্ম ও ঢাল নিয়ে নেয়া। অর্থাৎ, রোযা এমন একটি ঢাল, যা দ্বারা শয়তানের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। শয়তানই বড় শত্রু এবং কল্যাণের পথে বাধা।

সোবহে সাদেকের পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নত ও দু'রাকআত ফরয ছাড়া সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এসময় যিকিরে মশগুল থাকতেন। এসময়ে যিকির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করাই উত্তম; কিন্তু যদি ফরয নামাযের পূর্বে নিদ্রা প্রবল হয় এবং নামায ছাড়া তা দূর না হয়, তবে নিদ্রা দূর করার উদ্দেশে নামায পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

দিনের ওযিফার দ্বিতীয় সময় সূর্যোদয় থেকে চাশতের সময় পর্যন্ত। 'চাশত' বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত যতটুকু সময়, তার অর্ধেক হওয়া। বার ঘণ্টার দিন ধরা হলে সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টার মধ্যে চাশত হবে। অর্থাৎ, চার প্রহরের মধ্য থেকে এক প্রহর অতিবাহিত হবে। এই এক প্রহরে দুটি অতিরিক্ত ওযিফা রয়েছে। প্রথম চাশতের নামায। এর অবস্থা আমরা 'নামাযের রহস্য' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এশরাকের সময় দু'রাকআত নামায পড়া উত্তম। যখন সূর্য কিরণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সূর্য অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যায়, তখনকার সময়কে এশরাক বলা হয়। চার, ছয় অথবা আট রাকআত নফল তখন পড়বে, যখন রৌদ্র কিরণে বালু গরম হয়ে যায় এবং পা ঘর্মাক্ত হতে থাকে। যে ব্যক্তি চাশত ও এশরাকের যেকোন একটি নামায পড়বে, তার জন্যে চাশতের সময় খুবই উত্তম। কেউ যদি সূর্য অর্ধ বর্শা পর্যন্ত উপরে উঠার সময় থেকে ঢলে পড়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়ে নেয়, তবে সে-ও আসল সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এ নামাযের সময় হচ্ছে দু'টি মাকরূহ সময়ের মধ্যকার সময়। এই সমগ্র সময়কে চাশতই বলা হয়। এশরাকের দু'রাকআত পড়ার সময় তখন হয়, যখন সূর্যোদয়ের মাকরূহ সময় অতিবাহিত হয়ে নামায পড়ার অনুমোদিত সময় শুরু হয়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শয়তানের শিংও বের হয়। যখন সূর্য উঁচু হয়, তখন শয়তান তা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

এ সময়ের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ওযিফা হচ্ছে মুসলমান জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন করা। উদাহরণতঃ কোন রোগীর হাল-হকিকত জিজ্ঞেস করতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, তাকওয়ার কাজে সাহায্য করা, এলেমের মজলিসে হাযির হওয়া এবং কোন মুসলমানের অভাব দূর করা। এ ধরনের কোন কাজ না থাকলে উপরোক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চার ওযিফা অর্থাৎ, দোয়া যিকির, তেলাওয়াত ও ফিকিরে মশগুল থাকবে। ইচ্ছা করলে নফল নামাযে ব্যাপৃত থাকবে। কারণ, সোবহে সাদেক হওয়ার পর নফল নামায মাকরূহ থাকলেও এ সময়ে মাকরূহ নয়।

দিনের ওযিফার তৃতীয় সময় চাশতের সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। এ সময়ের ওযিফাও উপরোক্ত চারটি বিষয় এবং অতিরিক্ত দু'টি বিষয়। প্রথম, জীবিকা উপার্জনে মশগুল হওয়া। সুতরাং ব্যবসায়ী হলে সততা ও ঈমানদারীর সাথে ব্যবসা করবে। পেশাদার হলে মানুষের হিত সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং কোন কাজে আল্লাহর যিকির বিস্মৃত হবে না। প্রত্যহ উপার্জন করতে সক্ষম হলে সেদিনের প্রয়োজন পরিমাণে উপার্জন করে ক্ষান্ত হবে। এই পরিমাণে উপার্জন করার পর পরওয়ারদেগারের ঘরে গিয়ে আখেরাতের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। কেননা, আখেরাতের পাথেয় অধিক দরকারী। এর মুনাফা অনন্তকাল স্থায়ী। সেমতে বলা হয়, ঈমানদার ব্যক্তিকে তিনটি কাজের কোন না কোন একটি করতে দেখা যায়। হয় সে মসজিদে নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকে, না হয় জনকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন গৃহে থাকে, না হয় কোন জরুরী কাজে নিয়োজিত থাকে। অধিকাংশ লোক জরুরী বস্তুর পরিমাণ কি তা জানে না। না হলেও চলে, সেটাকেও তারা জরুরী মনে করে নেয়। এর কারণ, শয়তান তাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এ সময়ের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ওযিফা হচ্ছে দুপুরের ঘুম। এটা এই দৃষ্টিতে সুন্নত যে, এর মাধ্যমে রাত্রি জাগরণে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন– দিনের বেলায় রোযা রাখতে সহায়ক বিধায় সেহরী খাওয়া সুন্নত। সুতরাং রাতে না জেগেও যদি কেউ দিনে ঘুমায়, তবে সে কোন সৎকাজ করেনি। দিনের ঘুমের সময় যদি কেউ গাফেল লোকদের সাথে গল্প গুজবে মেতে থাকে, তবে তার জন্যে দিনে ঘুমানোই উত্তম। কেননা, ঘুমানোর মধ্যে চুপ থাকা ও নিরাপত্তা তো রয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এক যমানা আসবে, যখন চুপ থাকা ও ঘুমিয়ে পড়া সকল আমলের সেরা আমল হবে। অনেক এবাদতকারীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তম অবস্থা হচ্ছে নিদ্রার অবস্থা। এটা তখনও যখন এবাদতে এখলাস না থাকে এবং নামের উদ্দেশে এবাদত করা হয়। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ঘুমানোর সময়কে নিরাপত্তার জন্যে ভাল মনে করতেন। মোট কথা, নিরাপত্তা ও রাত জাগরণের নিয়তে দিনে ঘুমানো সওয়াবের কাজ। কিন্তু সূর্য ঢলে পড়ার এতটুকু পূর্বে জাগ্রত হওয়া উচিত, যাতে নামাযের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যায়।

দিনের ওযিফার চতুর্থ সময় সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে যোহরের ফরয ও সুন্নত নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত। এ সময় দিনের সকল সময় অপেক্ষা ছোট ও উত্তম। সুতরাং সূর্য ঢলার পূর্বে ওযু করে মসজিদে উপস্থিত হবে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে এবং মুয়াজ্জিন আযান শুরু করে, তখন আযানের জওয়াব পর্যন্ত সবর করবে। এর পর আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়কে এবাদতে ব্যয় করার জন্যে উঠে দাঁড়াবে। খোদায়ী উক্তি وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ এ সময়ই বুঝানো হয়েছে। এসময় চার রাকআত নামায পড়বে। এসব রাকআত লম্বা করে পড়া উচিত। কেননা, এ সময়ে আকাশের দরজা খোলা থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা পছন্দ করতেন যে, এ সময় তাঁর কোন আমল উপরে উত্থিত হোক। এর পর জামাতে যোহরের ফরয নামায পড়বে এবং ফরযের পর দু'রাকআত পড়বে।

দিনের ওযিফার পঞ্চম সময় যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত। এ সময় মসজিদে বসে যিকির ও নামাযে মশগুল থেকে আসরের নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। কেননা, এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা উৎকৃষ্ট আমল। এটা ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি। কেউ তখন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে নামাযীদের তেলাওয়াতের গুঞ্জন মৌমাছির আওয়াযের মত শুনতে পেত। যদি ঘরে থাকলে ধর্মের নিরাপত্তা ও ফিকিরে একাগ্রতা বেশী হয়, তবে ঘরে চলে যাওয়াই উত্তম। যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে ঘুমিয়ে নেয়, তার জন্যে এ সময় ঘুমানো মাকরূহ। কেননা, দিনে দু'বার ঘুমানো ভাল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন– এক, আশ্চর্যের বিষয় ছাড়াই হাসা; দুই, ক্ষুধা ছাড়াই খাদ্য গ্রহণ করা এবং তিন, রাত জাগরণ ছাড়াই দিনের বেলায় ঘুমানো। দিবা রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা ঘুমানোই ঘুমের সুষম পরিমাণ। রাত্রি বেলায় আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকলে দিনে ঘুমানোর কোন অর্থ নেই। তবে রাতে কম ঘুমিয়ে থাকলে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে আট ঘণ্টা পূর্ণ করা যেতে পারে। ষাট বছর বয়স হলে তা থেকে বিশ বছর কমে যাওয়াটাই মানুষের জন্যে যথেষ্ট। প্রত্যহ আট ঘন্টা ঘুমালেই তা হয়। রুটি যেমন দেহের খাদ্য, তেমনি ঘুমও আত্মার খাদ্য বিধায় ঘুম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এরই মাঝারি পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক আট ঘন্টা। এর কম ঘুমালে মাঝে মাঝে দেহের স্থিরতা বিনষ্ট হয়। কেউ ক্রমান্বয়ে অনিদ্রার অভ্যাস গড়ে তুললে সেটা তার জন্যে ক্ষতিকর না-ও হতে পারে।

দিনের ওযিফার ষষ্ঠ সময় আসরের সময় থেকে শুরু হয়। সূরা আসরে আল্লাহ তাআলা وَالْعَصْرِ বলে এ সময়েরই কসম খেয়েছেন এবং وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বাক্যের দু'রকম তফসীরের এক তফসীর অনুযায়ী عشى বলে এ সময়কেই বুঝানো হয়েছে। এ সময়ে আযান ও একামতের মাঝখানে চার রাকআত ব্যতীত কোন নামায নেই। সুতরাং ফরয সমাপনান্তে পূর্বোল্লিখিত চার প্রকার ওযিফায় মশগুল হওয়া উচিত এবং তা সূর্য ফেকাসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখা কর্তব্য। এ সময়ে নামায নিষিদ্ধ বিধায় চিন্তাভাবনা সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। এতে উপরোক্ত চারটি ওযিফারই সওয়াব অর্জিত হবে।

দিনের ওযিফার সপ্তম সময় সূর্য ফেকাসে হওয়ার সময় থেকে শুরু হয়। প্রথম সময়টি যেমন ছিল সূর্যোদয়ের পূর্বে, তেমনি এই শেষ সময়টি সূর্যাস্তের পূর্বে। আল্লাহ্ তাআলার এ উক্তিতে এ সময়ই বুঝানো হয়েছে– فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ হযরত হাসান বসরী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ দিনের শুরু ভাগের তুলনায় দিনের শেষ ভাগের সম্মান বেশী করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা দিনের শুরু ভাগকে দুনিয়ার জন্যে এবং শেষ ভাগকে আখেরাতের জন্যে নির্ধারিত রাখতেন। এ সময়ে বিশেষ তসবীহ ও এস্তেগফার মোস্তাহাব এবং প্রথম সময়ে লিখিত ওযিফা সাধারণভাবে মোস্তাহাব। সূর্যাস্তের পূর্বে সূরা ওয়াশ্‌শামস, সূরা ওয়াল্লাইল, ফালাক ও নাস পাঠ করা মোস্তাহাব। সূর্য ডুবতে থাকার সময় এস্তেগফার পড়তে থাকা ভাল। এর পর মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ –হে আল্লাহ্, এটা তোমার রাত্রির আগমন ও দিনের নির্গমন। অতঃপর মুয়ায্‌যিনের জওয়াব দেবে এবং মাগরিবের নামাযে মশগুল হবে।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে দিনের অবসান ঘটে। এখন বান্দার উচিত নিজের হিসাব নেয়া। কেননা, তার পথের একটি মনযিল অতিক্রান্ত হয়ে গেল। যদি সে দিনটি বিগত দিনের সমান হয়, তবে তার লোকসান হয়েছে বলতে হবে। আর যদি বিগত দিনের তুলনায় খারাপ হয়, তবে অভিশপ্ত বলতে হবে। কেননা, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেদিন আমার কল্যাণের দিক দিয়ে অধিক ভাল না হয়, সেদিনে যেন আমার বরকত না হয়। সুতরাং যদি দেখ, সমগ্র দিন প্রচুর নেক কাজে অতিবাহিত হয়েছে, তবে এটা একটা সুসংবাদ। এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যদি বিপরীত অবস্থা হয়, তবে রাত্রি দিনের স্থলবর্তী, যা কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, রাতে তা পূরণ করার সংকল্প করবে।

রাত্রির ওযিফার পাঁচটি সময়ের মধ্য থেকে প্রথম সময় সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লাল আভা দূর হওয়া পর্যন্ত। এর পরেই এশার সময় এসে যায়। এ সময়ের ওযিফা এই ঃ প্রথমে মাগরিবের নামায পড়বে। এর পর এশা পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকবে। আওয়াবীনও এ সময়েরই নামায, যা تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ আয়াতে বুঝানো হয়েছে। সেমতে হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আছে, জনৈক ব্যক্তি এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নামায বুঝানো হয়েছে। তোমরা এ নামায অপরিহার্য করে নাও। কেননা, এটা দিনের অনর্থক কর্মকাণ্ড দূর করে এবং তার পরিণাম শুভ করে।

রাত্রির ওযিফার দ্বিতীয় সময় এশার সময়ের সূচনা থেকে মানুষ নিদ্রা যাওয়ার সময় পর্যন্ত। এ সময় থেকেই অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন– وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ, রাত্রির কসম ও অন্ধকারের কসম, যা তাতে ঘনিয়ে আসে। এ সময়ের ওযিফা তিনটি। প্রথম এশার ফরয ছাড়া দশ রাকআত নামায পড়বে। চার রাকআত ফরযের পূর্বে, যাতে আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় খালি না থাকে এবং ছয় রাকআত ফরযের পরে; প্রথমে দু'রাকআত ও পরে চার রাকআত। এসব রাকআতে কোরআনের বিশেষ আয়াত পাঠ করবে; যেমন সূরা বাকারার শেষ আয়াত, আয়াতুল করসী, সূরা হাদীদের শুরু এবং সূরা হাশরের শেষ। দ্বিতীয়ত তের রাকআত পড়বে। যার শেষে থাকবে বেতের। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে বেশীর চাইতে বেশী এই পরিমাণ নামায পড়েছেন। হুশিয়ার ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে এসব রাকআতের সময় নির্দিষ্ট করে নেয়। আর শক্ত সামর্থ্য ব্যক্তি রাত্রির শেষ দিকে এ নামায পড়ে, কিন্তু রাত্রির শুরুতে পড়াই সাবধানতা। কেননা, শেষ রাতে চোখ না খোলারও সম্ভাবনা থাকে। তবে শেষ রাতে উঠা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে শেষ রাতে পড়াই উত্তম। এসব রাকআতে বিশেষ বিশেষ সূরা থেকে তিনশ' আয়াত পরিমাণ পাঠ করা উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীন, আলিফ-লাম-মীম সাজদা, দুখান, মুলক, যুমার ও ওয়াকেআ। তৃতীয়তঃ বেতের পাঠ করা। তাহাজ্জুদের অভ্যাস না থাকলে এটা ঘুমানোর পূর্বেই পড়ে নেয়া উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেতের পাঠ না করে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকলে বিলম্বে বেতের পড়া উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রাত্রির নফল নামায দু' দু'রাকআত। ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে এক রাকআত পড়ে বিজোড় করে নেবে।

বেতেরের পর এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব ঃ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَتَعَزَّزْتَ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرْتَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ, আমি শাহানশাহ, অত্যন্ত পবিত্র, জিব্রাঈল ও ফেরেশতাগণের পরওয়ারদেগারের পবিত্রতা বর্ণনা করি। হে আল্লাহ, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে মাহাত্ম্য দ্বারা আবৃত করে রেখেছ, তুমি আপন কুদরতে মহিমান্বিত হয়েছ এবং মৃত্যু দ্বারা বান্দাদেরকে পরাভূত করে রেখেছ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরয ছাড়া অধিকাংশ নামায বসে পড়তেন। তিনি বলতেন ঃ যে বসে বসে নফল নামায পড়ে, সে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় কম সওয়াব পাবে এবং যে শুয়ে শুয়ে পড়ে, সে বসে পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাবে। এ থেকে জানা যায়, নফল শুয়ে পড়াও জায়েয।

রাত্রির ওযিফার তৃতীয় সময় হচ্ছে ঘুমানোর সময়। ঘুমকে ওযিফা মনে করাতেও কোন দোষ নেই। কেননা, যথাযথ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘুমালে ঘুমও এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দা যদি ওযু সহকারে আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাতে যায়, তবে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাকে নামায পাঠকারী লেখা হবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, বান্দা ওযু সহকারে ঘুমালে তার রূহকে আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়। এটা সাধারণ বান্দাদের জন্যে। অতএব আলেম ও স্বচ্ছ মনের অধিকারীদের জন্যে এরূপ হবে না কেন? তারা তো নিদ্রায় অনেক রহস্য অবগত হন। এজন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আলেমের নিদ্রা এবাদত এবং তার শ্বাস গ্রহণ তসবীহ্। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি রাতে জেগে কি কর? তিনি বললেন ঃ আমি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকি। মোটেই ঘুমাই না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিছুক্ষণ পর পর কোরআন তেলাওয়াত করি। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন ঃ আমি প্রথমে ঘুমাই, এর পর জাগ্রত থাকি। নিদ্রার মধ্যে সওয়াবের নিয়ত তাই করি, যা জাগরণে কর। এর পর তাঁরা উভয়েই আপন আপন অবস্থা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলে তিনি বললেন ঃ আবু মূসা, মুয়ায তোমার চেয়ে অধিক ফেকাহ্‌বিদ (আইনবিদ)।

ঘুমাবার আদব দশটি ঃ (১) ওযু ও মেসওয়াক করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা যখন ওযু সহকারে ঘুমায় তখন তার রূহ আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়। ফলে তার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। ওযু সহকারে না ঘুমালে তার রূহ আরশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তখন সে বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন দেখে। এরূপ স্বপ্ন সত্য হয় না। এ হাদীসে ওযুর অর্থ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। অদৃশ্যের পর্দা সরে যাওয়ার মধ্যে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাই কার্যকর হয়ে থাকে।

(২) মেসওয়াক ও অযুর পানি শিয়রে রেখে শেষ রাতে উঠার নিয়ত করা। এর পর চোখ খুলতেই মেসওয়াক করে নেবে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ রাতে যতবার চোখ খুলত ততবারই মেসওয়াক করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র রাতে কয়েকবার মেসওয়াক করতেন– প্রত্যেক ঘুমের সময় এবং প্রত্যেক জাগরণের সময় পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ওযু করার মত পানি না পেলে কেবল ওযুর অঙ্গ পানি দ্বারা মুছে নিতেন। তাও না পেলে তারা কেবলামূখী হয়ে বসে যিকির, দোয়া ও ফিকিরে মশগুল থাকতেন। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় এটাই তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার নিয়ত করে শয্যা গ্রহণ করে, এর পর সকাল পর্যন্ত তার চোখ না খোলে, সে তাহাজ্জুদ পড়ার সওয়াব পেয়ে যাবে, তার ঘুম আল্লাহর জন্য সদকা হবে।

(৩) কোন ব্যক্তির কোন ওসিয়ত করার থাকলে সে যখনই ঘুমাতে যাবে, তখনই ওসিয়তটি লেখে শিয়রে রেখে দেবে। কেননা, ঘুমের ভেতরও রূহ কবজ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ওসিয়ত ছাড়াই যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তি মরে যায়, তাকে আলমে বরযখে কেয়ামত পর্যন্ত বলার অনুমতি দেয়া হয় না। মৃতরা তার যিয়ারতে আসে এবং কথাবার্তা বলে; কিন্তু সে বলে না। তখন তারা পরস্পরে বলে ঃ এই মিসকীন ওসিয়ত ছাড়া মরেছে। আকস্মিক মৃত্যুর আশংকায় ওসিয়ত করে দেয়া মোস্তাহাব। এটা আকস্মিক মৃত্যু শিথিল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত নয় এবং মানুষের হক আদায়ে গাফেল, তার জন্যে তা শিথিলকারক নয়।

(৪) সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং মুসলমানদের প্রতি পরিষ্কার মন নিয়ে ঘুমাবে। মনে মনে কাউকে জ্বালাতন করার কথা স্মরণ করবে না এবং নিদ্রাভঙ্গের পর কোন গোনাহের ইচ্ছা করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় শয্যা গ্রহণ করে যে, কাউকে জ্বালাতন করার নিয়ত রাখে না এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না, তার সকল গোনাহ্ মার্জনা করা হবে।

(৫) উৎকৃষ্ট বিছানা বিছিয়ে আরামপ্রিয় না হওয়া; বরং বিছানা বর্জন করবে; অথবা এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। জনৈক বুযুর্গ বিছানা বিছানো মাকরূহ মনে করতেন এবং ঘুমের জন্যে বিছানা জৌলুস মনে করতেন। সুফ্ফাবাসী সাহাবায়ে কেরাম ঘুমাতে গিয়ে মাটিতে কিছুই বিছাতেন না। তারা বলতেন ঃ আমরা মাটি দিয়েই সৃজিত হয়েছি এবং মাটতেই মিশে যাব। তারা একে মনের নম্রতা ও বিনয়ের জন্যে অধিক কার্যকর মনে করতেন। সুতরাং কারও মন যদি এ কষ্ট সহ্য করতে সম্মত না হয়, তবে মাঝারি ধরনের বিছানা বিছিয়ে নেবে।

(৬) নিদ্রা প্রবল না হওয়া পর্যন্ত শয়ন করবে না এবং নিদ্রা জবরদস্তি টেনে আনবে না। হাঁ, যদি কেউ শেষ রাতে উঠার জন্যে নিদ্রার সাহায্য চায়, তবে চেষ্টা করে নিদ্রা আনতে দোষ নেই। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ নিদ্রা প্রবল হলেই নিদ্রা যেতেন, ক্ষুধা প্রবল হলেই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজন হলেই কথা বলতেন। এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের শানে বলেন ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (তারা রাত্রির সামান্য অংশে নিদ্রা যেত।) নিদ্রা যদি এত প্রবল হয় যে, নামায ও যিকিরে বাধা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সৃষ্টি করে; তবে ঘুমিয়ে থাকা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে কেউ আরজ করল ঃ অমুক মহিলা রাতে নামায পড়ে। নিদ্রা প্রবল হলে সে একটি রশিতে ঝুলতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ করা উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব নামায পড়বে এবং নিদ্রা প্রবল হলে ঘুমিয়ে পড়বে। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে– নিদ্রা যায় না এবং রোযা রাখে, ইফতার করে না। তিনি বললেন ঃ আমি তো নামাযও পড়ি, নিদ্রাও যাই এবং রোযাও রাখি, ইফতারও করি। এটা আমার তরীকা। যে এই তরীকা থেকে মুখ ফেরায়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা এ ধর্মের সাথে মোকাবিলা করো না। এটা মজবুত ধর্ম। যে কেউ এর সাথে মোকাবিলা করবে, অর্থাৎ সাধ্যাতিরিক্ত কাজ নিজের জন্যে জরুরী করে নেবে, সে পরাভূত হবে এবং ধর্ম প্রবল থাকবে।

(৭) কেবলামুখী হয়ে ঘুমাবে। এটা দু'প্রকার– এক, চিত হয়ে শুয়ে মুখ কেবলার দিকে রাখা; যেমন মৃতকে শোয়ানো হয়। দুই, ডান পার্শ্বে শুয়ে মুখ এবং শরীরের সামনের অংশ কেবলার দিকে রাখা; যেমন লহদ ধরনের কবরে মৃতকে রাখা হয়।

(৮) শোয়ার সময় দোয়া করবে এবং বলবে ঃ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ শোয়ার সময় বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠ করা মোস্তাহাব; যেমন আয়াতুল করসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াত এবং নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۔

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য। কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া, তিনি দয়াময়, অতিশয় মেহেরবান। নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনে, দিবারাত্রির পরিবর্তনে, নৌকায়, যা চলে সমুদ্রে মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে, আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যা দ্বারা তিনি মৃত্তিকাকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দেন, বায়ু ও মেঘমালার ঘূর্ণনে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে আজ্ঞাবহ হয়ে আছে– নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

কথিত আছে, যে কেউ শোয়ার সময় এই আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কালামে মজীদ মুখস্থ করিয়ে দেন। সে কখনও তা ভুলে না। এছাড়া সূরা আরাফের এই আয়াত পাঠ করবে–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ـ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তার আদেশের অনুগামী করে। জেনে রেখো, সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা তাঁরই কাজ। আল্লাহ বরকতময়। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাক কাকুতি-মিনতিভরে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তোমরা পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। এর পর قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ থেকে সূরা বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। এ আয়াত পাঠ করলে একজন ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করে তোমার হেফাযত করবে এবং মাগফেরাতের দোয়া করবে। এর পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দেবে এবং মুখমন্ডলে ও সমগ্র দেহে হাত বুলিয়ে নেবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন।

(৯) শোয়ার সময় এই ধ্যান করবে যে, ঘুম হল এক প্রকার মৃত্যু এবং জাগরণ এক প্রকার জীবন লাভ। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

আল্লাহ প্রাণ হস্তগত করে নেন, যখন তাদের মৃত্যুর সময় হয়। আর যাঁর মরণের সময় হয়নি তার প্রাণ হস্তগত করেন নিদ্রায়।

আরও বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে হস্তগত করে নেন রাতে। এসব আয়াতে নিদ্রাকে ওফাত (হস্তগত করা) নাম দেয়া হয়েছে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে নিদ্রা এমন, যেমন দুনিয়া আখেরাতের মাঝখানে আলমে বরযখ। লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ বৎস, যদি মৃত্যুতে সন্দেহ কর, তবে ঘুমিয়ো না। তুমি যেভাবে ঘুমাও ঠিক সেভাবে মরে যাবে। আর যদি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে সন্দেহ কর, তবে ঘুমের পর জাগ্রত হয়ো না। ঘুমের পর যেমন তুমি জাগ্রত হও, তেমনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন ঘুমাতেন তখন আপন গাল ডান হাতের উপর রাখতেন এবং মনে করতেন, আজই ওফাত পেয়ে যাবেন। তখন তিনি সব শেষে এই দোয়া করতেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ ـ

(দোয়া অধ্যায়ে উল্লিখিত এ দোয়ার শেষ পর্যন্ত।)

(১০) জাগ্রত হওয়ার সময় দোয়া পড়া। যখনই কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় কিংবা পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তখনই সেই দোয়া পড়া উচিত, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়তেন। অর্থাৎ এই দোয়া–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক প্রবল পরাক্রান্ত, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রভু, পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। এ বিষয়ের চেষ্টা করবে যেন নিদ্রার সময়ও সবশেষে অন্তরে আল্লাহ্র যিকির এবং জাগরণের সময়ও সর্বপ্রথম মনে আল্লাহর যিকির জারি থাকে। এটা মহব্বতের পরিচয়। সুতরাং যখন চোখ খুলবে এবং উঠতে চাইবে, তখন জাগরণের সেই দোয়া পড়বে, যার শুরু এভাবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

রাত্রির ওযিফার চতুর্থ সময় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ছয় ভাগের এক ভাগ বাকী থাকা পর্যন্ত। এ সময়ে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠা উচিত। কেননা, তাহাজ্জুদ তাকেই বলে, যা 'হুজুদ' অর্থাৎ, নিদ্রার পরে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন– وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى অর্থাৎ, রাত্রির কসম, যখন তা স্থিতিশীল হয়। রাত্রির স্থিতিশীলতা তখন হয়, যখন কোন চক্ষু খোলা থাকে না, আল্লাহর সেই চক্ষু ছাড়া, যাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রাত্রির কোন্ অংশটিতে দোয়া অধিক কবুল হয়? তিনি বললেন ঃ রাত্রির মাঝামাঝি অংশে। হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার এবাদত করতে চাই। এর জন্যে সর্বোত্তম সময় কোন্‌টি? আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে দাউদ, রাতের শুরুতেও উঠ না এবং রাতের শেষেও না। কেননা, যে রাতের শুরুতে জাগ্রত থাকে, সে শেষ রাতে ঘুমিয়ে থাকে। আর যে শেষ রাতে জাগ্রত থাকে, সে শুরুতে জাগে না। কাজেই তুমি রাতের ঠিক মাঝখানে এবাদত কর। এতে তুমি আমার সাথে একা থাকবে এবং আমি তোমার সাথে একা থাকব ও তোমার প্রয়োজন মেটাব। শেষ রাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তখন আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতাপ অবতরণ করে। এ সময়ের ওযিফা এরূপ ঃ জাগরণের দোয়া শেষ করে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযু করবে। এর পর জায়নামাযে এসে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

অর্থাৎ, এর পর দশ বার সোবাহানাল্লাহ, দশ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশ বার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। এর পর বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ -

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় যে দোয়া পড়তেন, সেই দোয়া পড়বে ঃ

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد انت بهاء السموات والارض ولك الحمد انت زين السموات والارض ولك الحمد انت قيام السموات والارض ومن فيهن ومن عليهن انت الحق ومنك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم ات نفسى تقواها وزكها كما انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنى لاحسن الاعمال فانه لايهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت اسئلك مسئلة البائس المسكين وادعوك دعاء المضطر الذليل فلا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين واكرم المعطين ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো। তোমারই প্রশংসা, তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৌন্দর্য। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর শোভা। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মেরুদন্ড, যারা এগুলোর মধ্যে আছে, যারা এগুলোর উপরে আছে– সকলের মেরুদন্ড। তুমি সত্য। তোমা থেকে সত্য উদ্ভাসিত। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জাহান্নাম সত্য। পুনরুত্থান সত্য। পয়গম্বরগণ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য।

হে আল্লাহ, তোমারই জন্যে মুসলমান হয়েছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমারই সাহায্যে (শত্রুদের সাথে) বিবাদ করেছি এবং তোমারই নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর যা আমি অগ্রে পাঠিয়েছি, যা পরে পাঠিয়েছি, যা গোপনে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা অপচয় করেছি। তুমিই অগ্রবর্তী, তুমিই পশ্চাৎবর্তী। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, যেমন তুমি উত্তম পবিত্রকারী। তুমি এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অভিভাবক। তুমি এর প্রভু। হে আল্লাহ, আমাকে সুন্দরতম আমলের পথ দেখাও। সুন্দরতম আমলের পথ তুমি ব্যতীত কেউ দেখায় না। আমা থেকে আমার নফসের কুকর্ম ফিরিয়ে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ এর কুকর্ম ফেরায় না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি বিপন্ন মিসকীনের মত এবং তোমার কাছে দোয়া করি অভাবগ্রস্ত লাঞ্ছিতের মত। অতএব আমাকে হে পরওয়ারদেগার! দোয়ায় বঞ্চিত করো না এবং আমার প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু হও হে সর্বোত্তম প্রার্থিত সত্তা ও সম্ভ্রান্ততম দাতা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলে করীম (সাঃ) যখন রাতে উঠে নামায শুরু করতেন, তখন এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসা কর। আমাকে বিতর্কিত সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন কর তোমার আদেশ দ্বারা। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন কর।

এর পর নামায শুরু করবে এবং ছোট দু'রাকআত পড়বে। এর পর দু'রাকআত যতদূর সম্ভব বড় পড়বে। প্রত্যেক দু'রাকআতে সালামের পর একশ' বার সোবহানাল্লাহ বলা মোস্তাহাব। এতে স্বস্তি পাওয়া যাবে এবং নামাযে আনন্দ বেশী হবে। সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রের নামাযে প্রথমে দু'রাকআত হালকা পড়তেন, এর পর দু'রাকআত লম্বা পড়তেন, এর পর তৃতীয় দু'রাকআত দ্বিতীয় দু'রাকআতের তুলনায় ছোট এবং চতুর্থ দু'রাকআত তৃতীয় দু'রাকআতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চেয়ে ছোট পড়তেন। এমনিভাবে তের রাকআত হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে সশব্দে কেরাত পড়তেন, না নিঃশব্দে? তিনি বললেন ঃ কখনও সশব্দে পড়তেন আবার কখনও নিঃশব্দে।

রাতের ওযিফার পঞ্চম সময় হচ্ছে রাতের ছয় ভাগের শেষ এক ভাগ। একে সেহরীর সময় বলা হয়।

এ সময় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ, সেহরীর সময়ে তারা এস্তেগফার করে।

এর অর্থ কারও মতে নামায পড়া। কেননা, নামাযেও এস্তেগফার থাকে। এ সময়টি ফজরের নিকটবর্তী। এটা রাতের ফেরেশতাদের চলে যাওয়ার এবং দিনের ফেরেশতাদের আগমনের সময়। এ সময়ের ওযিফা চতুর্থ সময়ের ন্যায় নামাযই বটে। সোবহে সাদেক হয়ে গেলে রাতের ওযিফার সমাপ্তি ঘটে এবং দিনের সময় শুরু হয়।

মোট কথা, যারা আবেদ তথা এবাদতকারী, তাদের জন্যে সময়ের এই ক্রমবিন্যাস বর্ণিত হল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রত্যহ এগুলো ছাড়া আরও চারটি বিষয় মোস্তাহাব মনে করতেন– রোযা রাখা, সদকা দেয়া (যদিও সামান্য হয়), রোগীদের হালহকিকত জিজ্ঞেস করা এবং জানাযায় উপস্থিত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, যে কেউ এ চারটি কাজ একদিনে করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যদি এগুলোর মধ্যে ঘটনাক্রমে কোনটি করা হয় এবং কোনটি করার সুযোগ না হয়, তবে নিয়ত অনুযায়ী সবগুলোর সওয়াব পাবে। আগেকার লোকেরা সারাদিনে কোন কিছুই খয়রাত না করা খারাপ মনে করতেন, যদিও তা একটি খোরমা অথবা পিয়াজ অথবা রুটির টুকরাও হত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতে মানুষ তার সদকার ছায়াতলে থাকবে– শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক ভিক্ষুককে একটি আঙ্গুর দিলেন। এতে সেখানে উপস্থিত সকলেই একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ তোমাদের কি হল? এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আঙ্গুরের বহু কণার ওযন আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। সুতরাং এই আঙ্গুরে তো অজস্র কণা রয়েছে।

অবস্থাভেদে ওযিফার প্রকার ঃ জানা উচিত, যারা আখেরাতের চাষাবাদ করতে চায় এবং আখেরাতের পথ অবলম্বন করে, তারা সর্বমোট ছয় প্রকার লোক হতে পারে– আবেদ, আলেম, তালেবে এলেম, শাসক, পেশাজীবী ও একত্ববাদী। একত্ববাদী সে ব্যক্তি, যে সর্বদা এক আল্লাহ পাকের মধ্যে ডুবে থাকে– অন্য কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন তাদের সকলের ওযিফা আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত জানা উচিত।

(১) আবেদ– অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যে কেবল এবাদতেই মগ্ন থাকে। এছাড়া তার অন্য কোন কাজ নেই। সে এবাদত ছেড়ে দিলে নিষ্কর্মা বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তার জন্যে সময় ও ওযিফার ক্রমবিন্যাস তাই যা আমরা দিবারাত্রির সময়সমূহে বর্ণনা করেছি। তবে এতে সামান্য পরিবর্তন হওয়া দূষণীয় নয়। সে তার অধিকাংশ সময় কেবল নামাযে অথবা তেলাওয়াতে অথবা সোবহানাল্লাহ বলার মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারও ওযিফা একদিনে বার হাজার বার সোবহানাল্লাহ বলা ছিল। কেউ ত্রিশ হাজার বার সোবহানাল্লাহ বলতেন। কারও কারও নিয়ম ছিল, তিনশ' রাকআত থেকে নিয়ে ছয়শ' ও হাজার রাকআত পর্যন্ত পড়া। বর্ণিত আছে, তাঁরা দিবারাত্রির মধ্যে কমপক্ষে একশ' রাকআত নামায পড়তেন। কোন কোন লোকের ওযিফা ছিল অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করা। কেউ একদিনে এক খতম এবং কেউ দু'খতম করতেন বলে বর্ণিত আছে। আবার কেউ এক দিন অথবা সমগ্র রাত একই আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনায় অতিবাহিত করে দিতেন। কুরয ইবনে ছায়রা মক্কায় অবস্থানকালে এক দিনে সাত চক্করের সত্তর তওয়াফ করতেন এবং এমনিভাবে রাতে সত্তর তওয়াফ করতেন। এর সাথে সাথে দিবারাতে দু'খতম কোরআন তেলাওয়াতও করতেন। এখন হিসাব করলে দেখা যায়, দিবারাত্রির তওয়াফের মধ্যে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরত্ব হয়। প্রত্যেক সাত চক্করের পর তওয়াফের দু'রাকআত যোগ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিলে দু'শ আশি রাকআত হয়। অতএব এটা যে খুব কষ্টের কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

এসকল ওযিফার মধ্যে কোন্ ওযিফায় অধিকাংশ সময় ব্যয় করা উত্তম, এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা যায়, নামাযে দাঁড়িয়ে চিন্তাভাবনা করে ও অর্থ বুঝে কোরআন পাঠ করার মধ্যে সকল ওযিফাই শামিল থাকে, কিন্তু এটা নিয়মিতভাবে করা কঠিন বিধায় প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী উত্তম ওযিফা বিভিন্নরূপ হবে। ওযিফার উদ্দেশ্য অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র করা এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা অলংকৃত করা। সুতরাং প্রত্যেকেরই আপন অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যে ওযিফার প্রভাব অন্তরে বেশী প্রতিফলিত হয়, তাই নিয়মিতভাবে করা উচিত। যদি তাতে ক্লান্তি বোধ হয় তবে অন্য ওযিফা বদলে নেবে। হযরত ইবরাহীম আদহাম জনৈক আবদালের কাহিনী বর্ণনা করেন, তিনি এক রাতে নদীর কিনারে নামাযরত ছিলেন। হঠাৎ উচ্চ সুরে একটি তসবীহ তাঁর কানে এল। তিনি কাউকে না দেখে বললেন ঃ আমি ফেরেশতা এবং এই নদীতে নিয়োজিত আছি। আমি যেদিন সৃজিত হয়েছি সেদিন থেকে এই তসবীহ্ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি। আবদাল নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজের নাম মুহাল হায়ীল বলল। আবদাল বললেন ঃ এ তসবীহ্ পাঠ করার সওয়াব কি ? সে ফেরেশতা বলল ঃ যে ব্যক্তি এই তসবীহ্ একশ' বার পাঠ করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে বেহেশতে আপন স্থান দেখে নেয় অথবা তাকে দেখানো হয়। তসবীহ্টি এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الدَّيَّانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الشَّدِيْدِ الْاَرْكَانِ سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَاتِىْ بِالنَّهَارِ سُبْحَانَ مَنْ لَّا يَشْغَلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمُسَبَّحِ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ -

অর্থাৎ, আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি প্রতিফলদাতা সুউচ্চ আল্লাহ্র। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি মজবুত রোকনবিশিষ্ট আল্লাহ্র। আমি পবিত্রতা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণনা করি সেই সত্তার যিনি রাতকে নিয়ে যান এবং দিনকে আনয়ন করেন। পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই সত্তার, যাঁকে এক কাজ অন্য কাজ থেকে বিরত রাখে না। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি স্নেহময় ও অনুগ্রহময় আল্লাহ্র । আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি আল্লাহ্র, যাঁর পবিত্রতা সর্বত্র বর্ণিত হয়।

সুতরাং এই তসবীহ অথবা অন্য কোন তসবীহর প্রভাব অন্তরে অনুভব করলে তাই নিয়মিত করে যাবে।

(২) আলেম– যে ফতোয়াদান, পাঠদান ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে মানুষের উপকার করে, তাকে আলেম বলা হয়। তার ওযিফা আবেদের ওযিফা থেকে ভিন্ন হবে। কেননা, আলেমের জন্যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, গ্রন্থ রচনা করা ও পাঠ দান করা জরুরী। এ সবের জন্যে সময় দরকার। ফরয ও সুন্নতের পর এসব কাজের চেয়ে বড় কিছুই নেই। এলেমের মধ্যে তো আল্লাহর যিকির নিয়মিত হয়ই; এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করা হয়। মানুষের উপকার করা তথা তাদেরকে আখেরাতের পথ বলে দেয়া এরই মাধ্যমে হয়। আমাদের মতে, যে এলেমের মর্তবা এবাদতের উপরে, তা হল সেই এলেম, যা মানুষকে পরকালের ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং দুনিয়াতে সংসারবিমুখ করে দেয়। এমন এলেম আমাদের উদ্দেশ্য নয় যা দ্বারা অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয় হওয়ার বাসনা বৃদ্ধি পায়। আলেমের জন্যেও সময় ভাগ করে নেয়া সমীচীন। কেননা, সমস্ত সময় শিক্ষায় ব্যাপৃত রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই আলেমের সময় এভাবে বন্টন হওয়া উচিত– ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সে সমস্ত ওযিফায় কাটাবে, যেগুলো আমরা দিনের ওযিফায় প্রথম সময়ে উল্লেখ করেছি। সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কেউ আখেরাতের নিমিত্ত পড়তে চাইলে পাঠদানে ব্যয় করবে। এরূপ শিক্ষার্থী না থাকলে এ সময় ফিকিরে অতিবাহিত করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দুরূহ বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করবে। দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত রচনা ও অধ্যয়নে ব্যয় করবে । আসর থেকে সূর্য বিবর্ণ হওয়া পর্যন্ত কেউ তফসীর, হাদীস অথবা উপকারী এলেম পাঠ করলে তা শ্রবণে মশগুল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকবে। এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এস্তেগফার ও তসবীহ্ পাঠে ব্যাপৃত থাকবে। রাতের সময় বণ্টনে আলেমের জন্যে তাই উত্তম, যা ইমাম শাফেয়ী করেছিলেন। তিনি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগে অধ্যয়ন ও পাঠদান করতেন, দ্বিতীয় ভাগে নামায পড়তেন এবং শেষ তৃতীয় ভাগে নিদ্রা যেতেন। এটা শীতকালে সম্ভব। গ্রীষ্মকালে সম্ভবতঃ এটা সহনীয় হবে না। তবে দিনের বেলায় যথেষ্ট ঘুমিয়ে নিলে হতে পারে।

(৩) **তালেবে এলেম**— এলেমের অন্বেষণে মশগুল থাকা যিকির ও নফল নামাযে ব্যাপৃত থাকার তুলনায় অনেক উত্তম। তাই আলেম ও তালেবে এলেমের সময় বণ্টন প্রায় একই রূপ। পার্থক্য এই যে, যখন আলেম উপকারদানে মশগুল থাকবে, তখন তালেবে এলেম উপকার গ্রহণে মশগুল থাকবে।

(৪) **পেশাজীবী**— তাকে পরিবার পরিজনের জন্যে উপার্জন করতে হয়। পরিবার-পরিজনকে উপবাসে রেখে সমস্ত সময় এবাদতে ডুবে থাকা তার জন্যে জায়েয নয়। সুতরাং তার উচিত কাজের সময় বাজারে যাওয়া এবং আপন পেশায় মশগুল হওয়া। তবে পেশায় আল্লাহ্র যিকির বিস্মৃত না হয়ে তসবীহ্ ইত্যাদি অব্যাহত রাখবে। এগুলো কাজ করার সাথেও সম্ভবপর। প্রয়োজন অনুযায়ী উপর্জন হয়ে গেলে উপরোল্লিখিত ওযিফা পালন করবে। যদি সারা দিন পেশায় লেগে থাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন দান করে দেয়, তবে এটা ওযিফার চেয়ে উত্তম। কেননা, যে এবাদতের ফায়দা অন্যেরাও পায়, তা সেই এবাদত থেকে উত্তম, যার উপকার বিশেষভাবে এক ব্যক্তিই লাভ করে। সদকা-খয়রাতের নিয়তে উপার্জন করা এমন একটি এবাদত, যা মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে দেয়। এতে অন্যের উপকার হয় এবং মুসলমানদের দোয়া অর্জিত হয়। ফলে সওয়াব দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে যায়।

(৫) **শাসক**— যেমন ইমাম, বিচারক, সাধারণ মানুষের ব্যাপারাদির নির্বাহী কর্মকর্তা। এরূপ ব্যক্তির জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং শরীয়ত অনুযায়ী খাঁটি নিয়তে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা উল্লিখিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওযিফাসমূহের তুলনায় উত্তম। এরূপ শাসক ব্যক্তির জন্যে উপযুক্ত হচ্ছে দিনের বেলায় ফরয নামাযকে যথেষ্ট মনে করে জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকা এবং রাতের বেলায় উল্লিখিত ওযিফাসমূহ আদায় করা; যেমন হযরত ওমর (রাঃ) করতেন। তিনি বলতেন ঃ ঘুমের সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমি দিনের বেলায় ঘুমালে মুসলমানদের অধিকার বিনষ্ট হয়, আর রাতের বেলায় ঘুমালে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়।

(৬) **একত্ববাদী**– যে এক আল্লাহ পাকের মহিমায় ডুবে থাকে, এছাড়া তার অন্য কোন চিন্তাই থাকে না, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে সে ভালবাসে না, অন্য কাউকে ভয় করে না এবং অন্য কারও কাছে রিযিক আশা করে না, সে কোন কিছু দেখলে তাতে কেবল আল্লাহ্ তাআলাই দৃষ্টিগোচর হয়। যে ব্যক্তি এমন স্তরে পৌঁছে যায়, তার সময় বন্টন করার প্রয়োজন নেই; বরং ফরয এবাদতের পর তার ওযিফা একটিই, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সর্বাবস্থায় অন্তরকে হাযির রাখা। অর্থাৎ, তার মনে যা উদয় হয়; কানে যে আওয়াজ পড়ে এবং দৃষ্টিতে যা ভেসে উঠে, সবগুলোতে শিক্ষা ও ফিকির অর্জিত হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির যাবতীয় অবস্থাই তার মর্তবা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে থাকে। ফলে তার মতে এবাদতে এবাদতে কোন পার্থক্য থাকে না। এরূপ লোকদের বেলায়ই আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি সত্য প্রতিপন্ন হয়।

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗاۤ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ -

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদেরকে এবং তাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ কর, তখন গুহায় গিয়ে বস। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভু রহমত ছড়িয়ে দেবেন।

নিম্নোক্ত আয়াতেও তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -

অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার দিকে যাচ্ছি, তিনি আমাকে পথ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রদর্শন করবেন। এটা সিদ্দীকগণের মর্তবার শেষ সীমা। দীর্ঘকাল ওযিফা জপ করার পরই মানুষ এ মর্তবায় উন্নীত হতে পারে।

উপরে যা কিছু বর্ণিত হল, সবগুলোই আল্লাহর দিকের পথ। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, প্রত্যেকেই আপন তরীকায় আমল করে। অতঃপর কে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত, তা আপনার পালনকর্তা জানেন।

হেদায়াতপ্রাপ্ত সকলেই, কিন্তু একজনের হেদায়াত অন্যজনের চেয়ে বেশী। এক হাদীসে বলা হয়েছে- ঈমানের ৩৩৩টি তরীকা রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি তরীকার সাক্ষ্য দিয়েও মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সারকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের তরীকা বিভিন্নরূপ হলেও সবগুলোই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার তরীকা। পার্থক্য কেবল নৈকট্যের স্তরে । যার মধ্যে আল্লাহর মারেফত বেশী, সে আল্লাহর বেশী নৈকট্যশীল। মারেফত বেশী তারই হবে যে আল্লাহর এবাদত বেশী করে। ওযিফার ব্যাপারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে মূল কথা হচ্ছে স্থায়ীভাবে করা। কেননা, ওযিফার উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন। কোন আমল এক দু'বার করলে তার প্রভাব কমই হয়ে থাকে; বরং এর কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল তাই যা পরিমাণে কম হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর আমল স্থায়ী ছিল। তিনি যখন কোন আমল করতেন, স্থায়ীভাবে করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কোন এবাদতে অভ্যস্ত করে দেন, সে অতিষ্ঠ হয়ে তা ত্যাগ করলে আল্লাহ ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী এবাদতের ফযীলত

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম নামায হচ্ছে মাগরিবের নামায। মুসাফির ও গৃহে বসবাসকারী কারও জন্যে এ নামায হ্রাস করা হয়নি। এর দ্বারা রাতের নামায শুরু এবং দিনের নামায সমাপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকআত পড়বে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না সোনার প্রাসাদ বলেছেন না রূপার প্রাসাদ। আর যে ব্যক্তি এর পর চার রাকআত পড়বে, তার ত্রিশ বছরের অথবা চল্লিশ বছরের গোনাহ মাফ করা হবে। হযরত উম্মে সালামা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কেউ মাগরিবের পর ছয় রাকআত পড়বে, তার জন্যে এসব রাকআত পূর্ণ এক বছরের এবাদতের সমান হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে জমাতের মসজিদে এ'তেকাফ করবে এবং নামায ও তেলাওয়াত ব্যতীত সকল প্রকার কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। প্রত্যেক প্রাসাদের দূরত্ব একশ' বছরের পথ হবে। উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এসব বাগানে সারা পৃথিবীর মানুষের স্থান সংকুলান হবে। আবদাল কুরয ইবনে দাররা বলেন ঃ আমি হযরত খিযিরকে বললাম ঃ আমাকে এমন কিছু বলুন যা আমি প্রতি রাত্রে করতে পারি। তিনি বললেন ঃ মাগরিবের নামায পড়ার পর তুমি এশা পর্যন্ত নামাযেই থাক এবং কারও সাথে কথা বলো না। প্রত্যেক দু'রাকআতের পর সালাম ফেরাও। প্রত্যেক রাকআতে একবার আলহামদু এবং তিন বার সূরা এখলাস পাঠ কর। অতঃপর এশার নামায শেষে আপন গৃহে চলে যাও এবং কারও সাথে কথা না বলে দু'রাকআত নামায পড়। প্রতি রাকআতে আলহামদু একবার এবং সূরা এখলাস সাত বার পড়। অতঃপর সালাম ফেরানোর পরে সেজদা কর এবং সাত বার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর কাছে মাগফেরাত প্রার্থনা কর। এর পর সাত বার এই দোয়া পাঠ কর ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

অতঃপর সেজদা থেকে মাথা তুলে বসে যাও এবং হাত তুলে এই দোয়া পড় ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ يَارَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ -

অর্থাৎ, হে চিরজীবী, হে চির বিরাজমান, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী, হে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাবুদ, হে দুনিয়া ও আখেরাতের দাতা দয়ালু, হে রব, হে রব, হে আল্লাহ হে আল্লাহ।

এর পর দাঁড়িয়ে হাত তুলে এই দোয়াই কর। এর পর যেখানে ইচ্ছা কেবলামুখী হয়ে ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে পড় এবং দরূদ পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়। আমি বললাম ঃ আপনি এই দোয়া কার কাছ থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকেই শিখেছি। কথিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া ও এই নামাযের প্রতি সুধারণাবশতঃ তা নিয়মিত পালন করবে, সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে। যারা এই আমল করেছে, তাদের কেউ কেউ স্বপ্নে দেখেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সেখানে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কথাবার্তাও হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাত জাগরণ ও এবাদতের ফযীলত

এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এই ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি কখনও রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধেক এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ জাগরণ করেন।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيْلًا -

অর্থাৎ, এবাদতের জন্যে রাত জাগরণ কঠিন, অথচ অভিনিবেশ ও বুঝার পক্ষে অনুকূল।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ, তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ أٰنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ -

অর্থাৎ, সে রাতের প্রহরসমূহে সেজদা করে ও দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং পালনকর্তার রহমত আশা করে (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না)?

এর অনেক ফযীলত সম্পর্কে হাদীসেও বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান তোমাদের একজনের গ্রীবায় নিদ্রাবস্থায় তিনটি গিরা লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরায় একথা বলে ফুঁক দেয় যে, এখনও রাত অনেক বাকী, ঘুমিয়ে থাক। যদি লোকটি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তবে একটি গিরা খুলে যায়। যদি ওযু করে, তবে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে, তবে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। সে সকালে হৃষ্টচিত্তে শয্যাত্যাগ করে। নতুবা মন্দ ও অলস হয়ে গাত্রোত্থান করে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আলোচনা হয় যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অমুক ব্যক্তি ভোর পর্যন্ত সারা রাত ঘুমায়। তিনি বললেন ঃ তার কানে শয়তান পেশাব করে দেয়। এক হাদীসে আছে, শয়তানের কাছে একটি ঘ্রাণের বস্তু, একটি চাট্নি ও একটি অঞ্জন আছে। যখন সে কাউকে ঘ্রাণ দেয়, তখন তার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যখন চাটনি চাটায়, তখন তার মুখ ক্ষুরধার ও অশ্লীল হয়ে যায়। আর যখন কাউকে অঞ্জন লাগিয়ে দেয়, তখন রাতে ভোর পর্যন্ত নিদ্রায় বিভোর থাকে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان من الليل ساعة لايوافقها عبد مسلم سئل الله تعالى فيها خيرا الا اعطاه اياه.

অর্থাৎ, রাতের একটি মুহূর্ত আছে। তাতে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রাতের বেলায় অধিক পরিমাণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল ফুলে যায়। লোকেরা তা দেখে আরজ করল ঃ আপনার তো অগ্রপশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনি এত কষ্ট করেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? একবার তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বললেন ঃ যদি তুমি চাও যে, জীবিতাবস্থায়, কবর ও পুনরুত্থানে তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত থাকুক, তবে রাতে উঠে নামায পড় এবং এই নামায দ্বারা পালনকর্তার সন্তুষ্টি কামনা কর। হে আবু হোরায়রা, তুমি তোমার গৃহের কোণে নামায পড়। তোমার গৃহের নূর আকাশে ছোট বড় তারকার ন্যায় হবে। তিনি আরও বলেন ঃ রাতের এবাদত অপরিহার্য করে নাও। এটা পূর্ববর্তী ভাগ্যবানদের তরীকা। এর ফলে আল্লাহর নৈকট্য, গোনাহ থেকে দুরত্ব, রোগমুক্তি ও দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি লাভ হয়। আরও বলেন ঃ রাতে নামায পড়া যার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সে যদি নিদ্রাধিক্যের কারণে কোনদিন নামায পড়তে না পারে, তবে এই নামাযের সওয়াব তার জন্যে লেখা হবে এবং লাভের মধ্যে সে ঘুমাবে। হযরত আবু যর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ যদি তুমি সফরের ইচ্ছা কর, তবে তার জন্যে কি কিছু পাথেয় সংগ্রহ কর না? আবু যর বললেন ঃ জি হাঁ, করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে কেয়ামতের সফর পাথেয় ছাড়া কিরূপে হবে? হে আবু যর, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলব না, যা সেদিন তোমার কাজে লাগবে? আবু যর আরজ করলেন ঃ বলুন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ কেয়ামত দিবসের প্রচন্ড উত্তাপ থেকে অব্যাহতির জন্যে একদিন রোযা রাখ, রাতের অন্ধকারে কবরের আতংক থেকে মুক্তির জন্যে দু'রাকআত নামায পড়, বড় বড় বিষয়ের জন্যে হজ্জ কর এবং কোন মিসকীনকে কিছু সদকা দাও, অথবা কোন হক কথাই বলে দাও অথবা কোন খারাপ বিষয় থেকে চুপ থাক।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে এক ব্যক্তি এমন সময় উঠে নামায পড়ত ও কোরআন তেলাওয়াত করত, যখন মানুষ ঘুমে বিভোর হয়ে থাকত। সে এই বলে দোয়া করত– হে দোযখের প্রভু, আমাকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দাও। একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আলোচিত হলে তিনি বললেন ঃ লোকটি যখন এই দোয়া, করে তখন আমাকে খবর দিও। সেমতে তিনি সেখানে গমন করলেন এবং তার দোয়া শ্রবণ করলেন। সকাল হলে তিনি লোকটিকে বললেন ঃ মিয়া! তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত চাও না কেন? সে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার সে সাধ্য কোথায়? আমার আমল এই যোগ্য নয়। এ কথা বলার অল্প পরেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ লোকটিকে বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে দাখিল করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ভাল লোক– যদি সে রাতে নামায পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে একথা জানালে তিনি ভবিষ্যতে রাত জাগরণ ও নামায অপরিহার্য করে নিলেন। সেমতে তাঁর গোলাম নাফে' বলেন ঃ তিনি রাতে নামায পড়তেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সেহরীর সময় হল কি না? আমি বলতাম ঃ হয়নি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি আবার নামায পড়তেন। এভাবে আরও এক দু'বার প্রশ্নোত্তরের পরে আমি বলতাম ঃ হাঁ, হয়ে গেছে। তখন তিনি বসে সোবহে সাদেক পর্যন্ত এস্তেগফার করতে থাকতেন।

এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা সেই পুরুষের প্রতি রহম করুন, যে রাত জেগে নামায পড়ে, অতঃপর তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে এবং সে-ও নামায পড়ে। যদি স্ত্রী না উঠে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীলোকের প্রতি রহম করুন, যে রাত জেগে নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর সে-ও নামায পড়ে। যদি স্বামী না উঠে, তবে তার চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার ওযিফা অথবা ওযিফার কিছু অংশ আদায় করতে না পারে, সে যদি ফজর ও যোহরের মাঝামাঝি সময়ে তা কিছু অংশ আদায় করে নেয়, তবে তা রাত্রে আদায় করার মতই লিখিত হবে।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, রাত্রে যখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাঁর পড়ার আওয়াজ মৌমাছির গুন গুন শব্দের মত সকাল পর্যন্ত শুনা যেত। এক রাতে সুফিয়ান সওরী খুব পেট ভরে আহার করলেন, অতঃপর বললেন ঃ গাধাকে বেশী ঘাস দেয়া হলে কাজও বেশী নেয়া হয়। সুতরাং সকাল পর্যন্ত এবাদত করতে থাক।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়ে তাদের মুখমন্ডল অন্যদের চেয়ে সুশ্রী হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এর কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে একান্তে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের নূরের কিছু অংশ পরিয়ে দেন।

আবদুল আজীজ ইবনে আবী রাওয়াদ গভীর রাত্রে নিজের শয্যার কাছে আসতেন, অতঃপর তার উপর হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ তুমি নরম ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর কসম, জান্নাতে তোমার চেয়েও নরম বিছানা রয়েছে। এর পর তিনি সমগ্র রাত নামাযে নিয়োজিত থাকতেন। হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফুযায়ল বলেন ঃ যখন রাত আমার সামনে আসে, তখন প্রথম প্রথম তার দৈর্ঘ্যের কথা ভেবে আমার ভয় লাগে, কিন্তু যখন আমি কোরআন পাঠ শুরু করে দেই, তখন আমার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে যায়। হযরত হাসান বলেন ঃ মানুষ কোন গোনাহ করলে, তার কারণে রাত জাগরণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ফুযায়ল বলেন ঃ তুমি যদি রাত্রে জাগ্রত থাকতে এবং দিনে রোযা রাখতে না পার, তবে বুঝে নিও যে, তুমি বঞ্চিত এবং তোমার গোনাহ অনেক হয়ে গেছে। রবী বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেয়ীর গৃহে বহু রাত শয়ন করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি রাতে সামান্যই নিদ্রা যেতেন। আবুল জুয়াইরিয়া বলেন ঃ আমি হযরত ইমাম আবু হানীফার সাথে ছয় মাস অবস্থান করেছি। এ সময়ে কোন এক রাতে তিনি আপন পার্শ্ব মাটিতে লাগাননি। হযরত ইমাম আবু হানীফার নিয়ম ছিল, অর্ধ রাত এবাদত করা, কিন্তু একবার কিছু লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা পরস্পরে বলাবলি করল, এ লোকটি সারা রাত এবাদত করে। একথা শুনে তিনি মনে মনে বললেন ঃ তারা আমার এমন গুণ বর্ণনা করছে, যা আমার মধ্যে নেই। এর পর থেকে তিনি সারা রাত এবাদত শুরু করে দেন। রাতের জন্যে তাঁর কোন বিছানা থাকত না।

মালেক ইবনে দীনার এক রাতে এই আয়াত পাঠ করে করে ভোর করে দিয়েছিলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা অনেক গোনাহ উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মত করে দেব যাতে তাদের জীবনও মৃত্যু সমান সমান হবে? তাদের এই সিদ্ধান্ত খুবই মন্দ। মুগীরা ইবনে হাবীব বলেন ঃ আমি মালেক ইবনে দীনারকে দেখলাম, তিনি এশার পরে ওযু করলেন, অতঃপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিজের দাড়ি ধরলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইলাহী, মালেকের বার্ধক্যকে দোযখের জন্যে হারাম করে দাও। ইলাহী, তুমি তো জান কে জান্নাতে আর কে দোযখে থাকবে। এ দু'দলের মধ্যে মালেক কোন্ দলে? এ দু'গৃহের মধ্য থেকে মালেকের গৃহ কোন্‌টি? সকাল পর্যন্ত তিনি এমনিভাবে কাঁদতে থাকেন।

রাত জাগরণ সহজ হওয়ার উপায় ঃ প্রকাশ থাকে যে, রাত জাগরণ মানুষের জন্যে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তওফীক দেন এবং যারা এর সহজ হওয়ার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ পালন করে, তাদের জন্যে মোটেও কঠিন নয়। এর বাহ্যিক শর্ত চারটি ঃ

প্রথম, খাদ্য বেশী না খাওয়া। কেননা, বেশী খেলে পানি বেশী পান করবে। ফলে ঘুম বেশী হবে এবং জাগা দুরূহ হবে। জনৈক বুযুর্গ প্রত্যেক রাতে দস্তরখানের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ মূরীদগণ, বেশী খেয়ো না। বেশী খেলে পানি বেশী পান করবে এবং বেশী ঘুমাবে; এর পর মৃত্যুর সময় বেশী আফসোস করবে। মোট কথা, খাদ্যের বোঝা থেকে পাকস্থলী হালকা থাকা একটি মূল বিষয়।

দ্বিতীয়, দিনের বেলায় এমন কোন কষ্টের কাজ না করা, যা দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয় এবং শিরা-উপশিরা শিথিল হয়ে যায়। কেননা, এর কারণেও বেশী ঘুম হয়।

তৃতীয়, সামান্য দিবা-নিদ্রা পরিত্যাগ না করা। রাত জাগরণের জন্যে এটা সুন্নত।

চতুর্থ, দিনের বেলায় সাধ্যমত গোনাহ থেকে দূরে থাকা। কেননা, গোনাহের কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং রহমত লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি আরামে নিদ্রা যাই। রাত জাগা পছন্দ করি। এজন্যে ওযুর পানি প্রস্তুত রাখি, কিন্তু কি কারণে যে জাগতে পারি না, তা বুঝি না। তিনি বললেন ঃ তোমার গোনাহ্ তোমাকে বিরত রাখে। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আমি একটি গোনাহের কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সেই গোনাহটি কি ছিল? তিনি বললেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে মনে মনে বলেছিলাম ঃ সে রিয়াকার।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোট কথা, গোনাহমাত্রই অন্তরকে কঠোর করে দেয় এবং তাহাজ্জুদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে হারাম খাদ্যের প্রভাব এ ব্যাপারে খুব বেশী হয়ে থাকে। অন্তরকে স্বচ্ছ করতে এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে হালকা লোকমা যত প্রভাব বিস্তার করে, ততটা অন্য কোন উপায়ে হয় না। সাধকগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং শরীয়তের সাক্ষ্যের আলোকে এ বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধি করে থাকেন।

রাত জাগরণ সহজ হওয়ার অভ্যন্তরীণ শর্তও চারটি ঃ

প্রথম, মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, বেদআত ও জাগতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্তর পরিষ্কার হওয়া। যার অন্তর সাংসারিক চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে, তার রাত জাগরণ নসীব হয় না। জাগলেও নামাযে মন লাগে না। চিন্তা-ভাবনাই তার মন আচ্ছন্ন করে রাখে।

দ্বিতীয়, মনের উপর ভয় প্রবল এবং বেঁচে থাকার আশা কম থাকা। কেননা, আখেরাতের ভয়াবহতা এবং দোযখের বিভিন্ন স্তরের কথা চিন্তা করলে ঘুম থাকতে পারে না। বর্ণিত আছে, সোহায়ব নামক বসরার জনৈক গোলাম সারা রাত জেগে থাকত। তার প্রভু তাকে বলল ঃ তোর সারা রাত জেগে থাকার কারণে দিনে কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। গোলাম বলল ঃ দোযখের কথা মনে হলে সোহায়বের ঘুম আসে না। অন্য এক গোলামকে কেউ সারারাত জেগে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ যখন আমি দোযখকে স্মরণ করি, তখন ভয় বেড়ে যায়। আর যখন জান্নাতের কথা স্মরণ করি, তখন আগ্রহ ধরে রাখতে পারি না। এ দো'টানার মধ্যে আমার ঘুম হয় না।

তৃতীয়, রাত জাগরণের ফযীলত সম্পর্কিত কোরআনী আয়াত, হাদীস ও মহান ব্যক্তিবর্গের উক্তিসমূহ পাঠ করে জাগরণের সওয়াব জানা, যাতে জান্নাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি জেহাদ থেকে বাড়ী ফিরলে তার স্ত্রী শয্যা তৈরী করে বসে রইল, কিন্তু তিনি মসজিদে গিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাযে রত থাকলেন। সকালে স্ত্রী বলল ঃ আমি দীর্ঘ দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন এসেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সকাল পর্যন্ত নামাযেই কাটিয়ে দিলে? বুযুর্গ বললেন ঃ আমি জান্নাতের এক হুরের ঔৎসুক্যে জেগেছিলাম এবং বাড়ীঘর ও স্ত্রীর কথা বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম।

চতুর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত রাখা এবং এই বিশ্বাস প্রবল করা যে, এবাদতে যা বলা হয় তা পরওয়ারদেগারের সাথে সরাসরি কথা বলার শামিল। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত হলে তাঁর সাথে একান্তে থাকা পছন্দনীয় হবে এবং কথা বলে আনন্দ পাওয়া যাবে। এ আনন্দকে অবান্তর মনে করা উচিত নয়। কেননা, যুক্তি ও বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যুক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি বাহ্যিক রূপলাবণ্যের ভিত্তিতে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, সে নির্জনে প্রেমাস্পদের সাথে থেকে ও তার সাথে প্রেমালাপ করে পরম আনন্দ অনুভব করে। সারা রাত তার ঘুম আসে না। যদি বল, সুশ্রী প্রেমাস্পদকে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তো দৃষ্ট হন না। এমতাবস্থায় কিরূপে আনন্দ পাওয়া যাবে? এর জওয়াব হচ্ছে, প্রেমাস্পদ সুন্দর পর্দার আড়ালে অথবা অন্ধকার গৃহে থাকলে সে নিকটেই আছে– একথা ভেবে আশেক আনন্দ পায়। সে এতেই সুখ অনুভব করে যে, মাশুকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারছে এবং মাশুককে শুনিয়ে তাকে স্মরণ করতে পারছে। এক্ষেত্রে মাশুক জওয়াব না দিলেও নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আশেক পুলকিত হয়।

এই আনন্দের বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ হচ্ছে, যারা রাত জাগরণ করে, তারা এই আনন্দের কারণেই রাতকে খুব খাটো ও সংক্ষিপ্ত মনে করে দুঃখ করে থাকে। সেমতে জনৈক রাত জাগরণকারী বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এবং রাত যেন ঘোড় দৌড়ের দু'টি ঘোড়া। ভোর পর্যন্ত কখনও রাত আমার আগে চলে যায় এবং আমাকে যিকির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্য একজন বলেন ঃ মাত্র এক ঘন্টা রাত হয়ে থাকে। এতে আমার দু'রকম অবস্থা হয়। যখন অন্ধকার আসতে দেখি, তখন আনন্দিত হই। এই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করার আগেই ভোর হয়ে যাওয়ার দুঃখ ছাড়া অন্য কোন দুঃখ নেই। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যায়। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায়, আমার আনন্দের সীমা থাকে না এই ভেবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে, এখন পরওয়ারদেগারের সাথে নির্জনতা নসীব হবে। পক্ষান্তরে সূর্যোদয়ের সময় এই ভেবে দুঃখিত হই যে, এখন লোকজন আমার কাছে আসবে। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ ক্রীড়ামোদীরা ক্রীড়া-কৌতুকে থেকে যে আনন্দ পায়, রাত জাগরণকারীরা রাতের বেলায় তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায়। রাত না থাকলে আমি কখনও দুনিয়াতে থাকা পছন্দ করতাম না। জনৈক আলেম বলেন ঃ দুনিয়াতে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের সমতুল্য কোন কিছু নেই। তবে রাতের বেলায় কাকুতি-মিনতিকারীরা মোনাজাতের যে আনন্দ পায়, তা অবশ্য জান্নাতী নেয়ামতসমূহেরই অনুরূপ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মোনাজাতের আনন্দ দুনিয়ার নয়, জান্নাতের সামগ্রী। এটা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীদের জন্যে প্রকাশ করেছেন। অন্য কেউ এটা পায় না। ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ দুনিয়া তিনটি আনন্দ অবশিষ্ট রয়েছে– রাত জাগরণ, ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ এবং জামাতে নামায পড়া।

রাতের সময় বন্টন ঃ জানা উচিত, পরিমাণের দিক দিয়ে রাত জাগরণ সাত প্রকার হতে পারে।

প্রথম, সারা রাত জেগে থাকা। এটা বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে আত্মনিবেদিত মহান ব্যক্তিবর্গের কাজ। রাত জাগরণই তাদের খোরাক। তারা অধিক জাগরণে ক্লান্ত হন না এবং দিনের বেলায় ঘুমান। কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী বুযুর্গের এটাই নিয়ম ছিল। তাঁরা এশার ওযূ দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। আবু তালেব মক্কী বর্ণনা করেন– সকলের জানা মতেই চল্লিশ জন তাবেয়ী এরূপ ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন এমনও ছিলেন যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই আমল অব্যাহতভাবে করে গেছেন; যেমন মদীনার সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও সফওয়ান ইবনে সলীম, মক্কার ফুযায়ল ইবনে আয়ায ও ওয়াহাব ইবনুল ওরদ, ইয়ামানের তাউস ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কুফার রবী ইবনে খায়সাম ও হাকাম, সিরিয়ার আবী সোলায়মান দারানী ও আলী ইবনে বাকার, পারস্যের হাবীব আবু মোহাম্মদ ও আবু জাবের সালমানী, এছাড়া আরও অনেকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয়, অর্ধ রাত জাগ্রত থাকা। এধরনের লোক পূর্ববর্তীদের মধ্যে অসংখ্য ছিলেন। এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হচ্ছে, রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ এবং শেষ এক ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করা, যাতে এবাদত ও জাগরণ মধ্যস্থলে হয়।

তৃতীয়, রাত্রির এক তৃতীয়াংশ জাগ্রত থাকা। এ অবস্থায় রাত্রির প্রথমার্ধ এবং এক ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করা উত্তম। সর্বাবস্থায় শেষ রাত্রে ঘুমানো ভাল। এতে ফজরের সময় তন্দ্রা আসে না। এছাড়া শেষ রাত্রে ঘুমালে মুখমন্ডল ফেকাশে কম হয়। হযরত দাউদ (আঃ) এভাবেই রাত জাগরণ করতেন।

চতুর্থ, রাতের এক ষষ্ঠাংশ অথবা এক পঞ্চমাংশ জাগ্রত থাকা। এর জন্যে উত্তম রাতের শেষার্ধ থেকে জাগা।

পঞ্চম, জাগ্রত থাকার কোন সময় নির্দিষ্ট না করা। কেননা, রাতের পরিমাণ সঠিকভাবে পয়গম্বর ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন অথবা সৌরবিজ্ঞানীরা জানেন। এরূপ জাগরণের জন্যে সমীচীন হচ্ছে, প্রথম রাতে ঘুম আসা পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে, এর পর যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখন উঠে এবাদত করবে। নিদ্রা প্রবল হলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। এই অবস্থায় এক রাতে দু'বার ঘুমানো ও দু'বার জাগা হবে। রাতের পরিশ্রম একেই বলে। এটাই সকল আমলের মধ্যে অধিক কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। রসূলে করীম (সাঃ)-এর অভ্যাস তাই ছিল। হযরত ইবনে ওমর ও অন্যান্য প্রধান সাহাবায়ে কেরামের পন্থাও তাই ছিল।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর রাত জাগরণ পরিমাণের দিক দিয়ে একই রকম ছিল না। তিনি কখনও অর্ধ রাত, কখনও এক তৃতীয়াংশ, কখনও দু'তৃতীয়াংশ এবং কখনও এক ষষ্ঠাংশ জাগ্রত থাকতেন। সূরা মুযযাম্মিলের এ আয়াত থেকে তাই জানা যায় ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ـ

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা জানেন আপনি কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ জাগ্রত থাকেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন– আমি সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাতকালীন নামায ভালভাবে দেখেছি। তিনি এশার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে জাগ্রত হন এবং আকাশের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا আয়াতটি اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বিছানা থেকে একটি মেসওয়াক বের করে মেসওয়াক করতঃ ওযু করেন। এর পর আমার জানামতে যতক্ষণ নামায পড়লেন, ততক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। এর পর ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, যতক্ষণ তিনি নামায পড়েছিলেন, ততক্ষণই ঘুমালেন। অতঃপর জাগ্রত হলেন। প্রথমবার যে আয়াত পাঠ করেছিলেন তাই পাঠ করলেন এবং প্রথমবার যা যা করেছিলেন, এবারও তাই করলেন।

ষষ্ঠ, চার রাকআত অথবা দু'রাকআত পড়ার পরিমাণ সময় জাগ্রত থাকা। এটাই রাত জাগরণের সর্বনিম্ন পরিমাণ। ওযু করা কঠিন হলে কেবলামুখী বসে কিছুক্ষণ যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকলে এরূপ ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলার কৃপায় তাহাজ্জুদ পড়ুয়াদের তালিকায় লেখে নেয়া হবে।

সপ্তম, যদি মাঝ রাতে উঠা কঠিন বোধ হয়, তবে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় এবং এশার পরবর্তী সময়কে এবাদত শূন্য ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। অতঃপর এরূপ ব্যক্তি সোবহে সাদেকের পূর্বেই উঠে পড়বে। এভাবে রাতের উভয় প্রান্তে জাগরণ ও এবাদত হয়ে যাবে।

বছরের উৎকৃষ্ট দিন ও রাত ঃ প্রকাশ থাকে যে, বছরের পনেরটি রাত্রির ফযীলত বেশী। এসব রাত্রে জাগ্রত থাকা ও এবাদত করা তাকিদ সহকারে মোস্তাহাব।

এগুলোর মধ্যে ছয়টি রাত রমযান মাসেই রয়েছে। শেষ দশকের পাঁচটি বিজোড় রাত অর্থাৎ, রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। এগুলোর মধ্যে শবে কদর তালাশ করা হয়। এর পর সতের তারিখের রাত । এ দিনেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন ঃ এ রাতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবশিষ্ট নয় রাত হল ঃ (১) মহররম মাসের প্রথম রাত, (২) আশুরার রাত, (৩) রজব মাসের প্রথম রাত, (৪) রজবের পনের তারিখের রাত, (৫) রজবের সাতাশ তারিখের রাত- শবে-মে'রাজ । এ রাতে একটি নামায হাদীসে বর্ণিত আছে। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ রাতে বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা পাঠ করবে, দু'রাকআতের পর আত্তাহিয়্যাতু ও সব শেষে সালাম ফেরাবে, এর পর একশ' বার সোবহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদু লিল্লাহ্ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়বে, একশ' বার এস্তেগফার, একশ' বার দরূদ পড়ে নিজের জন্যে যা ইচ্ছা দোয়া করবে এবং সকালে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল দোয়া কবুল করবেন, যদি তা গোনাহের দোয়া না হয়। (৬) শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত। এ রাতে একশ' রাকআত নামায আছে। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা এখলাস দশ বার পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায তরক করতেন না। (৭) আরাফার রাত (৮-৯), দুই ঈদের রাত । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে এবাদত করবে, তার অন্তর অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিনে মরবে না।

বছরের উৎকৃষ্ট দিন উনিশটি। এসব দিনে ওযিফা পাঠ করা মোস্তাহাব। দিনগুলো এই ঃ (১) আরাফার দিন, (২) আশুরার দিন, (৩) রজবের সাতাইশ তারিখের দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রজবের সাতাইশ তারিখ রোযা রাখে, তার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ষাট মাসের রোযা লেখে দেন। এ দিনেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রেসালত নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। (৪) রমযান মাসের সতের তারিখ। এটা বদর যুদ্ধের দিন। (৫) শাবান মাসের পনের তারিখ। (৬) জুমুআর দিন। (৭) ঈদের দিন, (৮-৬) যিলহজ্জ মাসের দশ দিন (আরাফার দিন পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় এ দিন বাদ)। কোরআনের ভাষায় এই দিনগুলোকে আইয়ামে মালুমাত বলা হয় এবং (১৭-১৯) তিন দিন আইয়ামে তাশরীকের অর্থাৎ, যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারিখ। কোরআনের ভাষায় এগুলোকে আইয়ামে মাদুদাত বলা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন জুমুআর দিন ভালরূপে অতিব্যহিত হয়, তখন সকল দিন ভালরূপে অতিবাহিত হয় এবং যখন রমযান মাস সহীহ সালামত থাকে, তখন সমগ্র বছর সহীহ সালামত থাকে। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাঁচ দিন নিজের আনন্দে মত্ত থাকবে, সে আখেরাতে আনন্দ পাবে না। এই পাঁচ দিন হচ্ছে– ঈদের দু'দিন, জুমুআর দিন, আরাফার দিন ও আশুরার দিন।

সপ্তাহের দিনগুলোতে উত্তম হচ্ছে বৃহস্পতিবার ও সোমবার। এ দু'দিন মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উত্তোলিত হয়। অবশ্য এসব বিষয়ের সম্যক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলরই রয়েছে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আহার গ্রহণ

প্রকাশ থাকে যে, বুদ্ধিমানদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে খোদায়ী দীদার লাভ করে ধন্য হওয়া । খোদায়ী দীদার পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র পথ হচ্ছে এলেম ও আমল তথা জ্ঞানার্জন ও কর্ম সম্পাদন। দৈহিক সুস্থতা ব্যতিরেকে এ দু'টি বিষয় অব্যাহতভাবে সক্রিয় রাখা অসম্ভব। ক্ষুধার সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে থাকলেই দৈহিক সুস্থতা নিশ্চিত হয়। এ কারণেই আগের কালের জনৈক বিশিষ্ট বুযুর্গ বলেন ঃ খাদ্য গ্রহণ করাও একটি এবাদত। বিশ্ব প্রতিপালকও এ বিষয়বস্তু ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا (তোমরা পাক-পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।) সুতরাং যে ব্যক্তি এ উদ্দেশে খাদ্য গ্রহণে উদ্যত হয় যে, এর দ্বারা এলেম ও আমলে সাহায্য হবে এবং তাকওয়া অর্জনে সামর্থ্য অর্জিত হবে, তার উচিত খাদ্য গ্রহণে সংযত আচরণ করা। সে যেন নিজেকে এমনভাবে ছেড়ে না দেয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চারণভূমিতে নির্বিচারে ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা, যে খাদ্য ধর্মের সহায়ক, তাতে ধর্মের নূর প্রকাশ পাওয়া দরকার। ধর্মের নূর হচ্ছে খাদ্য গ্রহণে সুন্নত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে কেউ তার ক্ষুধাকে শরীয়তের পাল্লায় ওজন করে খাদ্য গ্রহণে অগ্রসর হয় অথবা খাদ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, গোনাহ্ও দূরে সরিয়ে দেয় এবং সওয়াবও হাসিল করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ নিজের মুখে অথবা তার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দেয়, তাতে তাকে সওয়াব দেয়া হয়। এর সওয়াব তখন পাওয়া যাবে, যখন লোকমা দেয়া ধর্মের কারণে ও ধর্মের খাতিরে এবং তাতে খাদ্য গ্রহণের আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই নিম্নে আমরা খাওয়ার ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব, আদব ও প্রকার প্রকৃতি বলে দিচ্ছি।

প্রকাশ থাকে যে, আহার গ্রহণ চার প্রকারে হয়ে থাকে– এক, একা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাওয়া, দুই, অনেক মানুষের সাথে খাওয়া, তিন, মেহমানদের সামনে খানা পেশ করা এবং চার, দাওয়াতে খাওয়া। তাই চারটি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একা খাওয়ার আদব

খাওয়ার পূর্বে সাতটি বিষয় জরুরী ঃ

(১) খাদ্যবস্তু স্বয়ং হালাল হওয়ার পর উপার্জনের দিক দিয়েও পাক-পবিত্র এবং সুন্নত ও তাকওয়ার পন্থা মোতাবেক হবে। শরীয়ত গর্হিত কোন পন্থায় এবং খেয়াল খুশীমত কোন উপায়ে উপার্জিত না হওয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র খাদ্য খাওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি হত্যা নিষিদ্ধ করার পূর্বে অবৈধ পন্থায় উপার্জন সামগ্রী ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন, যাতে হারাম সামগ্রী অত্যন্ত মন্দ এবং হালাল সামগ্রী খুব বড় জ্ঞান করা হয়। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ـ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, পারস্পরিক সম্মতিক্রমে লেনদেন ছাড়া তোমরা পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং পরস্পরকে হত্যা করো না।

মোট কথা, পাক-পবিত্র হওয়াই খাদ্যবস্তুর মূল কথা। এটা ধর্মের ফরয ও মূলনীতিসমূহের অন্যতম।

(২) হাত ধৌত করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفع الهم ـ

খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা দারিদ্র্য এবং খাওয়ার পরে ধৌত করা দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করে। এক রেওয়ায়েতে আছে– খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা নিঃস্বতা দূর করে। এর একটি কারণ, কাজকর্ম করলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাতে কিছু না কিছু ময়লা লেগে থাকে। তাই হাত ধৌত করা পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। আরেক কারণ, খাওয়া ধর্ম কর্মে সাহায্য লাভের ইচ্ছায় একটি এবাদত। সুতরাং নামাযের আগে ওযুর ন্যায় এর আগেও কোন কিছু করা দরকার।

(৩) খাদ্যবস্তু এমন দস্তরখানের উপরে রাখবে, যা মাটিতে বিছানো থাকে। এটা দস্তরখান উঁচুতে বিছানো অপেক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মের অধিক নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে দস্তরখান এলে তিনি তা মাটিতে বিছাতেন। এটা বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। এটা না হলে খাদ্যবস্তু 'সফরা' নামক দস্তরখানে রাখবে। এতে সফরের কথা স্মরণ হয়। সফরের কথা স্মরণ হলে আখেরাতের সফর এবং তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করার কথা অন্তরে জাগ্রত হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) কখনও খাঞ্চা ও উপহার পরিবেশনের থালায় আহার করেননি। কেউ প্রশ্ন করল ঃ তা হলে কিসে আহার করতেন? তিনি বললেন ঃ দস্তরখানে। কেউ কেউ বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর পরে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে– উঁচু খাঞ্চা, চালুনি, ওশনান (সাবানের কাজ করে এমন এক প্রকার ঘাস) এবং উদরপূর্তিকরণ। প্রকাশ থাকে যে, আমরা দস্তরখানে খাওয়া উত্তম বলেছি, কিন্তু এটা বলি না যে, উঁচু দস্তরখানে খাওয়া মাকরূহ অথবা হারাম। কেননা, এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নেই। আমরা বলি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে চারটি বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে। এর জওয়াব হচ্ছে, প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বেদআতই নিষিদ্ধ নয়; বরং সেই বেদআতই নিষিদ্ধ, যার বিপরীতে কোন সুন্নত প্রতিষ্ঠিত থাকে। উপরন্তু কারণাদি বদলে গেলে কোন কোন অবস্থায় বেদআত আবিষ্কার করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। উঁচু দস্তরখানের কারণ শুধু এতটুকুই যে, খাদ্যকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হয়, যাতে খাওয়া সহজ হয়। এ ধরনের বিষয়াদিতে মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। সেমতে নবাবিষ্কৃত চারটি বস্তু একরূপ নয়। এগুলোর মধ্যে ওশনান উত্তম বস্তু। এতে পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান। হাত ধৌত করার উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নতা। ওশনান দ্বারা পরিচ্ছন্নতা উত্তমরূপে অর্জিত হয়। প্রথম যুগের মানুষের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এটা ব্যবহার না করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, তাদের এই অভ্যাস ছিল না অথবা এটা সুলভ ছিল না, অথবা তারা অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে মশগুল থাকতেন। ফলে মাঝে মাঝে হাতও ধৌত করতেন না এবং রুমালের স্থলে পায়ের তলায় হাত মুছে নিতেন। এটা শরীয়তে অনুমোদিত যদি তাতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের নিয়ত না থাকে। উঁচু দস্তরখানে আহার করাও অনুমোদিত যদি তা খাওয়া সহজ করার উদ্দেশে হয় এবং অহংকার ও ঔদ্ধত্যের নিয়তে না হয়। এর পর উদরপূর্তিকরণের কথা থেকে যায়। এটা বিষয় চতুষ্টয়ের মধ্যে কঠোরতম বেদআত । কেননা, এ থেকে অনেক বড় রকমের কামনা বাসনা উৎপন্ন হয় এবং দেহের শিরা উপশিরা স্পন্দিত হয়, তাই এগুলোর পার্থক্য জানা কর্তব্য।

(৪) দস্তরখানে প্রথমে যে ভঙ্গিতে বসবে, শেষ পর্যন্ত সে ভঙ্গিতেই বসে থাকবে। রসূলে করীম (সাঃ) মাঝে মাঝে দু'জানু হয়ে উভয় পায়ের পিঠের উপর বসে আহার করতেন এবং কখনও ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসতেন। তিনি বলতেন ঃ আমি হেলান দিয়ে বসে খাই না। আমি তো একজন দাস মাত্র । তাই দাসের মতই খাই এবং দাসের মতই বসি। হেলান দিয়ে বসে পানি পান করা পাকস্থলীর জন্যেও ক্ষতিকর। শুয়ে ও হেলান দিয়ে খাওয়া মাকরূহ, কিন্তু বুট ইত্যাদি এভাবে খাওয়া মাকরূহ নয়। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) চিৎ হয়ে শুয়ে ঢালের উপর 'কাক' (এক প্রকারের ক্ষুদ্রাকৃতি রুটি) রেখে খেয়েছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাও এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

(৫) খাদ্য গ্রহণে আল্লাহর এবাদতে সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার নিয়ত করবে, যাতে এ আহারের মধ্যেও আনুগত্যের বিষয় বহাল থাকে। খাদ্য গ্রহণে আনন্দ ও সুখ লাভের নিয়ত করবে না। ইবরাহীম ইবনে শায়বান বলেন ঃ আমি আশি বছর ধরে কোন বস্তু নিজের কামনা-বাসনার কারণে খাই না। এর সাথে সাথে কম খাওয়ার ইচ্ছাও পাকাপোক্ত করে নেবে। কেননা, উদরপূর্তি থেকে কম খেলেই এবাদতে সামর্থ্য অর্জনের নিয়ত সাচ্চা হবে। কারণ, উদরপূর্তি এবাদতের পরিপন্থী । তাই বেশী খাওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিবর্তে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ما ملا ادمى وعاء اشر من بطنه حسب ابن ادم لقمان يقمن صلبه فان لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس ـ

মানুষ নিজের উদরের চেয়ে অধিক মন্দ কোন পাত্র পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্যে কয়েকটি লোকমা যথেষ্ট, যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখবে। যদি তা না করে, তবে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য খাবে, এক তৃতীয়াংশ পানি পান করবে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ শ্বাস নেয়ার জন্যে খালি রাখবে। উপরোক্ত নিয়তের মধ্যে এটাও অত্যাবশ্যক যে, যখন ক্ষুধা লাগবে তখনই খাওয়ার জন্যে হাত বাড়াবে। অর্থাৎ খাওয়ার পূর্ববর্তী বিষয়সমূহের মধ্যে ক্ষুধা লাগাও একটি জরুরী বিষয়। এর পর উদরপূর্তির আগেই হাত সরিয়ে নেবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হবে না। কম খাওয়ার উপকারিতা এবং আস্তে আস্তে খাদ্য হ্রাস করার পদ্ধতি তৃতীয় খন্ডের 'খাদ্য বাসনা দমন' অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

(৬) উপস্থিত খাদ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং রসনাতৃপ্তি, অধিক অন্বেষণ ও ব্যঞ্জনের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। রুটি থাকতে ব্যঞ্জনের অপেক্ষা না করাই রুটির তাযীম। হাদীসে রুটির তাযীম করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, বেঁচে থাকা এবং এবাদতের সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার মত খাদ্যে অনেক বরকত। একে হেয় মনে করা উচিত নয়; বরং সময় প্রশস্ত হলে রুটির সামনে বসে নামাযের অপেক্ষা করা উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء রাতের খানা এবং এশার নামায উভয়টি একযোগে উপস্থিত হলে প্রথমে রাতের খানা খাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মাঝে মাঝে ইমামের আওয়াজ শুনেও রাতের আহার ছেড়ে উঠতেন না। আর যদি খাওয়ার প্রতি বেশী আগ্রহ না থাকে এবং বিলম্বে খেলে ক্ষতিও না হয়, তবে প্রথমে নামায আদায় করাই উত্তম, কিন্তু যখন খানা এসে যায়, নামাযেরও তকবীর হয়, দেরীতে খেলে খানা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন প্রথমে খেয়ে নেয়া মোস্তাহাব। এর জন্যে সময় প্রশস্ত হওয়া শর্ত ; খাওয়ার আগ্রহ থাকুক বা না থাকুক । কেননা, হাদীসে খাওয়ার প্রতি আগ্রহের শর্ত নেই। এর এক কারণ, ক্ষুধায় দুর্বল না হলেও উপস্থিত খাদ্যের প্রতি মনে কিছু না কিছু লক্ষ্য থেকে যায় ।

(৭) খাওয়ার মধ্যে অনেক হাত আনার চেষ্টা করবে, যদিও আপন স্ত্রী পরিবার পরিজনের হাতই হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه অর্থাৎ, তোমরা সকলে সমবেত হয়ে আহার কর। এতে তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা আহার করতেন না। তাই ছিল তাঁর নিয়ম। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ যে খাদ্যে অনেক হাত একত্রিত হয়, সেটাই উত্তম খাদ্য।

খাওয়ার সময়কার জরুরী আদবসমূহ হল– খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বল। প্রতি লোকমায় বিসমিল্লাহ বললে তা আরও উত্তম হবে, যাতে খাওয়ার মোহ মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না দেয়। পথম লোকমায় 'বিসমিল্লাহ' দ্বিতীয় 'লোকমায়' বিসমিল্লাহির রাহমান এবং তৃতীয় লোকমায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে বলবে, যাতে অন্যদেরও স্মরণ হয়ে যায়। ডান হাতে খাবে এবং নেমক দ্বারা শুরু ও শেষ করবে। ছোট লোকমা মুখে দিয়ে উত্তমরূপে চিবাবে এবং একটি গলাধঃকরণ না করা পর্যন্ত অন্য লোকমার দিকে হাত বাড়াবে না। কোন খাদ্যের নিন্দা করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করতেন না। তিনি ভাল লাগলে খেতেন, নতুবা খেতেন না। ফলমূল ছাড়া অন্য খাদ্যে নিজের নিকটবর্তী স্থান থেকে খাবে। ফলমূলে অন্য দিকেও হাত প্রসারিত করলে দোষ নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কাছের দিক থেকে খাও, কিন্তু তিনি ফলমূলে অন্য দিকেও হাত বাড়াতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ ফল-মূল সব এক প্রকার নয়। থালার চারপাশ থেকে এবং খাদ্যের মাঝখান থেকে খাবে না; যেমন রুটির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাঝখান থেকে খেয়ে কিনারা ছেড়ে দেয়া। বরং কিনারাসহ খাবে, রুটি কম হলে টুকরা টুকরা করে নেবে। ছুরি দিয়ে কাটবে না। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। হাদীসে আদেশ আছে, দাঁত দিয়ে গোশত কেটে কেটে খাও। রুটির উপর পেয়ালা ইত্যাদি রাখবে না– ব্যঞ্জন রাখলে দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রুটির তাযীম কর। আল্লাহ তা'আলা একে আকাশের বরকত থেকে নাযিল করেছেন। রুটি দ্বারা হাত মোছা বে-আদবী। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ লোকমা পড়ে গেলে তা তুলে নেবে এবং তাতে কিছু লাগলে তা দূর কর। পতিত খাদ্য শয়তানের জন্যে থাকতে দেবে না। খাওয়ার পর অঙ্গুলি না চাটা পর্যন্ত রুমাল দিয়ে হাত মুছবে না। কেননা, বরকত কোন্ খাদ্যে আছে তা কারও জানা নেই। গরম খাদ্যে ফুঁ দেয়া নিষিদ্ধ। খাওয়া সহজ না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে। খোরমা বিজোড় সংখ্যক খাবে– সাত, এগার অথবা একুশ। খাঞ্চার মধ্যে খোরমা ও তার বীচি একত্রে রাখবে না। হাতেও একত্রিত করবে না; বরং বীচি হাতের তালুতে রেখে ফেলে দেবে। যে বস্তু খাওয়া খারাপ মনে করবে, সেটা পেয়ালায় রেখে দেবে না; বরং উচ্ছিষ্টের সাথে রেখে দেবে, যাতে কেউ ধোকায় পড়ে তা খেয়ে না ফেলে। আহারকালে বেশী পানি পান করবে না। তবে গলায় লোকমা আটকে গেলে অথবা সত্যিকার পিপাসা হলে পান করবে। কারও মতে এটা চিকিৎসা শাস্ত্রে মোস্তাহাব। এতে পাকস্থলী মজবুত হয়। পানি পান করার আদব হচ্ছে, ডান হাতে গ্লাস নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে পান করবে। পাতলা চুমুকে আস্তে আস্তে পান করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পানি মুখে পান কর। বড় চুমুকে উপর্যুপরি পান করো না। এতে কলিজা রোগাক্রান্ত হয়। দাঁড়িয়ে ও শুয়ে পানি পান করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এভাবে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে যে বর্ণিত আছে, তা সম্ভবতঃ কোন ওযরের কারণে হবে। পানি পান করার পর রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি একে সুপেয় ও তৃষ্ণা নিবারক করেছেন আপন রহমতে এবং একে আমাদের গোনাহের বিনিময়ে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি।

অনেক লোকের মধ্যে পানি বিতরণ করতে হলে ডান দিক থেকে শুরু করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার দুধ পান করেন। তাঁর বাম দিকে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং একজন বেদুঈন, ডানদিকে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ হুযুর, হযরত আবু বকরকে দিন, কিন্তু তিনি বেদুঈনকে দিয়ে বললেন ঃ ডান দিক হকদার, এর পর যে তার ডানে থাকবে সে পাবে। তিন শ্বাসে পানি পান করবে এবং সব শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে। শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে। 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা উত্তম। প্রথম শ্বাস নেয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, দ্বিতীয় শ্বাস নেয়ার পর "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আররাহমানির রাহীম" বলবে। এ পর্যন্ত প্রায় বিশটি আদব বর্ণিত হল। এগুলো হাদীস ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল থেকে জানা যায়।

খাওয়ার পরবর্তী আদবগুলো হচ্ছে ঃ উদরপূর্তির পূর্বেই হাত গুটিয়ে নেবে। অঙ্গুলিসমূহ চেটে রুমাল দিয়ে মুছে নেবে। এর পর হাত ধৌত করবে এবং দস্তরখান থেকে খাদ্যকণা চয়ন করে খেয়ে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দস্তরখানে পড়ে থাকা খাদ্য তুলে খেয়ে নেবে, সে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে এবং তার সন্তানরা সুস্থ থাকবে। এর পর দাঁত খেলাল করবে। খেলালের সাথে দাঁতের ফাঁক থেকে যা বের হবে তা গলাধঃকরণ করবে না; বরং ফেলে দেবে। হাঁ দাঁতের গোড়া থেকে জিহ্বার অগ্রভাগে যা আসবে, তা গিলে ফেলায় কোন দোষ নেই। খেলালের পর কুলি করবে। থালা চাটবে এবং তার পানি পান করে নেবে। কথিত আছে, যে থালা চাটে এবং তার ধোয়া পানি পান করে, সে এক গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পায়। আর খাদ্যকণা চয়ন করা জান্নাতের হুরগণের মোহরানা। খানা খেয়ে মনে মনে আল্লাহর শোকর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমার দেয়া পরিচ্ছন্ন রিযিক ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর শোকর কর। হালাল খাদ্য খেয়ে এই দোয়া পাঠ করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنَا طَيِّبًا وَّاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নেয়ামত দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে এবং বরকত অবতীর্ণ হয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন খাদ্য খাওয়ান এবং আমাদের দিয়ে সৎকর্ম করান। সন্দেহমুক্ত খাদ্য খেয়ে ফেললে এই দোয়া করা উচিত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর। হে আল্লাহ, এ খাদ্যকে আপনার অবাধ্যতার জন্যে আমাদের শক্তি করবেন না।

আহারের পর কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং লিঈলাফি কুরায়শ সূরাদ্বয় পাঠ করবে। প্রথমে দস্তরখান থেকে উঠবে না। অন্যের খাদ্য খেলে তার জন্যে এই দোয়া করবে-

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ خَيْرَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا رَزَقْتَهٗ وَيَسِّرْ لَهٗ اَنْ يَّفْعَلَ فِيْهِ خَيْرًا وَقَنِّعْهُ بِمَا اَعْطَيْتَهٗ وَاجْعَلْنَا وَاِيَّاهُ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তার মাল বৃদ্ধি করুন, তাকে দেয়া রিযিকে বরকত দিন, যাতে সে তা থেকে খয়রাত করে। তাকে আপনার দানে তুষ্ট করুন এবং আমাকে ও তাকে শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। কারও গৃহে রোযার ইফতার করলে এই দোয়া করবে-

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ .

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুক। তোমাদের সজ্জনরা ভক্ষণ করুক এবং তোমাদের জন্যে ফেরেশতারা রহমতের দোয়া করুন।

সন্দেহযুক্ত খাদ্য খেয়ে ফেললে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ করা উচিত যাতে অশ্রুজলে সেই অগ্নির উত্তাপ স্তিমিত হয়ে যায়, যা এরূপ খাদ্য খাওয়ার কারণে সামনে আসবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

كل لحم نبت من حرام فالنار اولى ولى به .

অর্থাৎ, হারাম খাদ্যে উৎপন্ন মাংসের জন্যে অগ্নিই অধিক হকদার।

যে ব্যক্তি হারাম খেয়ে কান্নাকাটি করে, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যে হারাম খেয়ে নির্বিঘ্নে খেলাধুলায় মেতে থাকে। উদ্দেশ্য, কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া ভাল।

দুধ পান করলে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনার দেয়া রিযিকে আমাদের জন্যে বরকত দিন এবং তা আরও বেশী দিন।

দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেলে زِدْنَا مِنْهُ -এর স্থলে وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِّنْهُ বলবে। কেননা উপরোক্ত দোয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। কেননা, দুধের উপকারিতা ব্যাপক। আহারের পর এ দোয়া পাঠ করাও মোস্তাহাব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا يَا كَافِىَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِىْ مِنْهُ شَيْءٌ وَاَطْعَمْتَ مِنْ جُوْعٍ وَاٰمَنْتَ مِنْ خَوْفٍ ذٰلِكَ اَلْحَمْدُ اَوَيْتَ مِنْ يَتِيْمٍ هَدَيْتَ مِنْ ضَلَالَةٍ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَاَغْنَيْتَ مِنْ عِيْلَةٍ فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا دَائِمًا طَيِّبًا نَافِعًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ ـ اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْنَا طَيِّبًا فَاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا فَاجْعَلْهُ عَوْنًا لَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَسْتَعِيْنَ بِهٖ عَلٰى مَعْصِيَتِكَ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়েছেন এবং জায়গা দিয়েছেন আমাদের সর্দার ও মওলাকে। হে প্রত্যেক বস্তুর জন্যে যিনি যথেষ্ট এবং তার জন্যে কেউ যথেষ্ট হয় না, আপনি আমাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অতএব আপনার জন্যে প্রশংসা। আপনি ঠিকানা দিয়েছেন এতীমকে, পথ প্রদর্শন করেছেন পথভ্রষ্টকে এবং ধনী করেছেন নিঃস্বকে। অতএব আপনার জন্যে প্রশংসা, অনেক প্রশংসা সদা সর্বদা, পবিত্র, উপকারী ও বরকতপ্রাপ্ত; যেমন আপনি এর হকদার। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে পবিত্র বস্তু আহার করিয়েছেন এবং আমাদের দিয়ে সৎকর্ম করিয়েছেন। অতএব একে আমাদের জন্যে আপনার এবাদতে সহায়ক করুন। একে আপনার অবাধ্যতায় সহায়ক করা থেকে আমরা আশ্রয় চাই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব সাতটি ঃ

(১) সমাবেশে কোন ব্যক্তি অধিক বয়স অথবা অধিক গুণী হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রাধিকারের হকদার হলে প্রথমে নিজে খাওয়া শুরু করবে না, কিন্তু নিজেই নেতা ও অনুসৃত হলে সকল মানুষ একত্রিত হতেই খাওয়া শুরু করবে এবং তাদেরকে অধিক অপেক্ষায় ফেলে রাখবে না।

(২) খাওয়ার সময় চুপচাপ থাকবে না। এটা অনারবদের অভ্যাস। বরং উত্তম কথাবার্তা এবং খাওয়ার ব্যাপারে সৎকর্মপরায়ণদের গল্প ইত্যাদি বলতে থাকবে।

(৩) আপন সঙ্গীর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ সে খায় তার চেয়ে বেশী খেতে সচেষ্ট হবে না। কেননা, খানা অভিন্ন হলে এবং সঙ্গী অপরের বেশী খাওয়ায় সম্মত না হলে বেশী খাওয়া হারাম। বরং সঙ্গীকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সঙ্গী কম খেলে তাকে খেতে উৎসাহিত করবে এবং আরও খেতে বলবে।

(৪) এমনভাবে খাবে যাতে সঙ্গীর 'খাও' বলার প্রয়োজন না হয়। কোন কোন আদববিদ বলেন, যারা খায় তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যার সঙ্গীকে 'খাও' বলার কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। অন্য কেউ দেখছে বলে আপন পছন্দের জিনিস খাওয়া ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা এক প্রকার লৌকিকতা। হাঁ যদি সঙ্গীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বেশী খাওয়ার সুযোগদানের উদ্দেশে কম খায়, তবে এটা উত্তম। অনুরূপভাবে অন্যের সাথে সহযোগিতা করার নিয়তে এবং অন্যকে উৎসাহিত করার ইচ্ছায় বেশী খাওয়াও ভাল। হযরত ইবনে মোবারক উৎকৃষ্ট খোরমা বন্ধুদের সামনে রাখতেন এবং বলতেন ঃ যে বেশী খাবে তাকে "এক বীচি এক দেরহাম" হিসাবে পুরস্কৃত করব। এর পর তিনি বীচি গণনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতেন। যার বীচি যত বেশী হত, তাকে সেই পরিমাণ দেরহাম দিতেন। এটা সংকোচ দূর করা এবং প্রফুল্লতা অর্জনের জন্যে করতেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যে অধিক খায় এবং বড় বড় লোকমা নেয়। পক্ষান্তরে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিক বোঝা, যার খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে দেখাশুনা করতে হয়। তিনি আরও বলতেন, অন্যের সাথে মানুষের মহব্বত তখন ভালরূপে জানা যায়, যখন সে তার গৃহে গিয়ে নিঃসংকোচে খায়।

৫। থালার মধ্যে হাত ধৌত করা দোষের কথা নয়। একা খেলে থালায় থুথুও ফেলতে পারে, কিন্তু সমাবেশে এরূপ করা উচিত নয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও সাবেত বানানী একবার এক ভোজসভায় একত্রিত হন। হাত ধোয়ার জন্যে থালা এলে হযরত আনাস (রাঃ) তা সাবেত বানানীর দিকে বাড়িয়ে দেন। তিনি হাত ধৌত করতে দ্বিধা করলে হযরত আনাস বললেন ঃ তোমার ভাই তোমার তাযীম করলে কবুল করা উচিত, অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা, তাযীম আল্লাহ্ তাআলা করান। বর্ণিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ একবার অন্ধ আলেম আবু মোআবিয়াকে দাওয়াত করেন। খলিফা স্বহস্তে মেহমানের হাত ধুইয়ে দিয়ে বললেন ঃ আপনি জানেন কে আপনার হাত ধুইয়ে দিয়েছেন? আবু মোআবিয়া বললেন ঃ না। হারুনুর রশীদ বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনার হাত ধুইয়ে দিয়েছেন। আবু মোআবিয়া বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এলেমের তাযীম করেছেন আল্লাহ তাআলাও আপনার তাযীম করুন। যদি হাত ধোয়ার বাসনে কয়েক ব্যক্তি এক সাথে হাত ধুয়ে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এটা বিনয়ের নিকটবর্তী কাজ। এতে বেশী অপেক্ষাও করতে হয় না। পক্ষান্তরে একজনের হাত ধোয়া পানি ফেলে দেয়ার পরই অন্য একজন হাত ধুবে। বরং বাসনে পানি জমা হতে দেবে। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم তোমরা নিজেদের ওযুর পানি একত্রিত কর। আল্লাহ্ তোমাদের বিশৃংখলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সুসংহত করবেন। কোন কোন হাদীসবিদ এখানে ওযুর পানির অর্থ করেছেন খাওয়ার পরবর্তী হাত ধোয়ার পানি। উদ্দেশ্য, হাত ধোয়ার পানি একত্রিত থাকবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর আমেলগণকে লেখেন, মানুষের সামনে থেকে হাত ধোয়ার বাসন তখন উঠাতে হবে, যখন তা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কখনও অনারবদের মত করা হবে না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ সকলে মিলে এক বাসনে হাত ধৌত কর এবং অনারবদের অভ্যাস বর্জন কর। যে খাদেম হাত ধৌত করায়, কেউ কেউ তার দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ এবং বসে বসে পানি ঢালা উত্তম বলেছেন। কেননা, এটা বিনয়ের নিকটবর্তী। কারও কারও মতে তার বসা খারাপ ও মাকরূহ। সেমতে বর্ণিত আছে, জনৈক খাদেম বসে বসে একজন বুযুর্গের হাত ধোয়ালে বুযুর্গ দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের দাঁড়ানো জরুরী। আমাদের মতে যে হাত ধোয়ায়, তার দাঁড়ানো উত্তম। এতে হাত ধোয়ানো সহজ হয় এবং যে হাত ধোয়ায়, তার বিনয় প্রকাশ পায়।

(৬) সঙ্গে যারা খায় তাদের প্রতি তাকাবে না এবং তাদের খাওয়া দেখবে না। এরূপ করলে সঙ্গী লজ্জা বোধ করবে; বরং নিজের খাওয়ায় মশগুল থাকবে। যদি দেখা যায়, তুমি হাত গুটিয়ে নিলে অন্যরা খেতে দ্বিধা করবে, তবে তুমি তাদের পূর্বে হাত গুটিয়ে নেবে না; বরং তাদের সাথে অল্প অল্প খেতে থাকবে। তারা খুব খেতে থাকবে। তারা খুব খেয়ে নিলে শেষ পর্যায়ে তুমি ক্ষুধা পরিমাণে খেয়ে নেবে। কোন কারণবশতঃ খেতে না পারলে সকলের সামনে ওযর বলে দেবে, যাতে তারা খেতে লজ্জাবোধ না করে।

(৭) এমন কোন কাজ করবে না, যা অন্যের কাছে খারাপ লাগে। যেমন– থালায় হাত ঝাড়া এবং লোকমা নেয়ার সময় থালার উপর ঝুঁকে পড়া। মুখ থেকে কোন কিছু বের করতে হলে খাদ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে বের করবে। যে টুকরা দাঁত দিয়ে কাটা হয়, তা শুরবায় রাখবে না এবং ঘৃণা লাগার মত কোন কাজ করবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেহমানদের সামনে খানা পেশ করা

প্রকাশ থাকে যে, মুসলমান ভাইয়ের সামনে খানা পেশ করার সওয়াব অনেক। হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ যখন তোমরা ভাইদের সাথে দস্তরখানে বস, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাক। কেননা, তোমার বয়স থেকে এই মুহূর্তের হিসাব নেয়া হবে না। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ মানুষ নিজের এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য যা ব্যয় করে তার হিসাব অবশ্যই নেয়া হবে; কিন্তু ধর্মীয় ভাইদেরকে খাওয়ানোর জন্যে যে ব্যয়ভার বহন করে, তার কোন হিসাব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা এর হিসাব নিতে লজ্জাবোধ করেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও সামনে যে পর্যন্ত দস্তরখান বিছানো থাকে এবং সে না উঠে, সেই পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্যে রহমতের দোয়া করতে থাকে।

খোরাসানের জনৈক আলেম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি তার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সামনে অনেক খাদ্য পেশ করতেন, যা তাদের দ্বারা খাওয়া সম্ভবপর হত না। তিনি বলতেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি, যখন মেহমানগণ খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে নেয়, তখন তাদের বাড়তি খাদ্য যে খাবে, কেয়ামতের দিন তার কাছ থেকে এ বাড়তি খাদ্য ভক্ষণের হিসাব নেয়া হবে না। তাই আমি মেহমানের সামনে অনেক খাদ্য পেশ করাকে ভাল মনে করি, যাতে বাড়তি খাদ্য আমি খেয়ে নেই। এক হাদীসে আছে– মানুষ তার ভাইদের সাথে যে খাদ্য খায়, তার কাছ থেকে সে খাদ্যের হিসাব নেয়া হয় না। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ লোকজনের সাথে বেশী খেতেন এবং একাকী কম খেতেন। এক হাদীসে আছে– তিনটি বিষয়ের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে না– সেহরীর খাদ্য, ইফতারের খাদ্য এবং যে খাদ্য মুসলমান ভাইদের সাথে খাওয়া হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি এক সা' খাদ্যের জন্যে মুসলমান ভাইদেরকে একত্রিত করি, তবে তা আমার কাছে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও উত্তম। হযরত ইবনে ওমর বলতেন ঃ সফরে উৎকৃষ্ট পাথেয় থাকা এবং বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করা মানুষের অন্যতম বদান্যতা। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন ঃ খাওয়ার জন্যে একত্রিত হওয়া উত্তম চরিত্র। তাঁরা কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে সমবেত হতেন এবং বিদায় হওয়ার সময় কিছু খেয়েই বিদায় হতেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন ঃ হে ইবনে আদম, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি আমাকে অন্ন দাওনি। বান্দা বলবে ঃ ইলাহী, আপনি তো বিশ্বের পালনকর্তা, আমি আপনাকে অন্ন দেব কিরূপে? আল্লাহ বলবেন ঃ তোমার মুসলমান ভাই ভুখা ছিল। তুমি তাকে খেতে দাওনি। যদি তাকে খেতে দিতে তবে তা আমাকেই দেয়া হত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তার তাযীম কর। তিনি আরও বলেন ঃ জান্নাতে এমন বাতায়ন রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু পরিদৃষ্ট হয়। এ বাতায়ন তাদের জন্যে, যারা নরম কথাবার্তা বলে এবং নিরন্নকে অন্ন দেয়। রাতে মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তারা নামায পড়ে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে অপরকে খাওয়ায়। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি তার ভাইকে পেট ভরে খাওয়ায় এবং পিপাসা নিবৃত্ত করে পানি পান করায়, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। প্রত্যেক দু'খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে পাঁচ'শ বছরের পথ।

মেহমান আসার ব্যাপারেও কিছু আদব রয়েছে। কারও কাছে গেলে যাওয়ার সময় আন্দাজ করে যাওয়া এবং যখন সে খেতে থাকে, তখন উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ .

অর্থাৎ, তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুতির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপেক্ষা না করে আহারের জন্যে নবী গৃহে প্রবেশ করো না।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন খাদ্যের দিকে যায়, যার জন্যে তাকে ডাকা হয়নি, সে যাওয়ার সময় ফাসেক হবে এবং হারাম খাবে, কিন্তু কেউ যদি ঘটনাক্রমে খাওয়ার সময়ে পৌঁছে যায় তবে তার জন্যে গৃহকর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত না খাওয়া সমীচীন । যদি মনে হয় গৃহকর্তা অন্তর দিয়েই সঙ্গে খাওয়াতে চায়, তবে তার সাথে শরীক হয়ে যাবে। আর শরমে পড়ে খাওয়াতে চায় বলে মনে হলে খাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয় এবং খাওয়ার উদ্দেশেই কোন ভাইয়ের কাছে যায়, তবে এতে কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সময় ক্ষুধার্ত ছিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলে আবুল হায়সাম ইবনে কায়হান ও আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে চলে গেলেন কিছু খাওয়ার উদ্দেশে। এটাই ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অভ্যাস। আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ মসঊদীর তিনশ' ষাট জন বন্ধু ছিল। তিনি সারা বছর প্রত্যেকের বাড়ীতে একদিন করে থাকতেন। অন্য এক বুযুর্গের ত্রিশ জন বন্ধু ছিল। তিনি এক এক মাসে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসতেন। অন্য এক বুযুর্গের সাত জন বন্ধু ছিল। তিনি সপ্তাহের সাত দিন সাত জনের বাড়ীতে বেড়াতেন। তাবাররুকের নিয়তে এই বুযুর্গগণের খেদমত এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং কেউ যদি বন্ধুর গৃহে এসে তাকে না পায় এবং ভরসা রাখে, তার এখানে কিছু খেলে সে খুশী হবে, তবে সে বন্ধুর অনুমতি ছাড়াই সেখানে খেতে পারে। কেননা, অনুমতি সন্তুষ্টি বুঝার উদ্দেশেই দরকার হয়, বিশেষতঃ খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে। কেউ কেউ মুখে পরিষ্কার অনুমতি দেয়, কিন্তু মনে সন্তুষ্ট থাকে না। এরূপ লোকের খাদ্য খাওয়া অনুমতি সত্ত্বেও মাকরূহ। বন্ধুদের গৃহে খাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা أَوْ صَدِيْقِكُمْ বলেছেন। অর্থাৎ, বন্ধুদের কাছে খেলেও কোন গোনাহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত বরীরার বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে যান। বরীরা তখন বাড়ী ছিলেন না। সেখানে খয়রাতের খাদ্য বিদ্যমান ছিল। তিনি খেয়ে নিলেন এবং বললেন, সদকা তার ঠিকানায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পৌঁছে গেছে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন, বরীরা তাঁর খাওয়ার কথা জানতে পারলে আনন্দে বাগ বাগ হয়ে যাবেন। এদিক দিয়েই গৃহকর্তা প্রবেশের অনুমতি দেবে জানা থাকলে জিজ্ঞাসা করে প্রবেশ করা জরুরী নয়। জানা না থাকলে জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে ও তাঁর সহচরগণ হযরত বসরীর গৃহে গেলে যা পেতেন, অনুমতি ছাড়াই খেয়ে ফেলতেন। তখন হাসান বসরী এসে এ অবস্থা দেখে বলতেন ঃ আমরা এমনই থাকতাম। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী বাজারে ফলবিক্রেতার দোকানে দাঁড়িয়ে কখনও এই ঝুড়ি থেকে এবং কখনও ঐ ঝুড়ি থেকে শুকনা খোরমা বের করে খাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে হেশাম বললেন ঃ হে আবু সায়ীদ, পরহেযগারীর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এই দোকানদারের মাল তার অনুমতি ছাড়াই খেয়ে যাচ্ছেন? হযরত হাসান বললেন ঃ আমার সামনে খাওয়া সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ কর তো। হেশাম সূরা নূরের আয়াতটি أَوْ صَدِيْقِكُمْ পর্যন্ত পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ صَدِيْق বলে কি বুঝানো হয়েছে? হযরত হাসান বললেন ঃ এমন বন্ধু, যার দ্বারা মন সুখী হয় এবং যার প্রতি অন্তরের প্রশস্তি থাকে। একবার কিছু লোক হযরত সুফিয়ান সওরীর গৃহে গিয়ে তাঁকে পেলেন না। তারা ঘরের দরজা খুলে দস্তরখান নামিয়ে খেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সুফিয়ান সওরী এসে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে বুযুর্গগণের অভ্যাস স্মরণ করিয়ে দিলে। তাঁরাও এমনি করতেন। একবার কিছু লোক জনৈক তাবেয়ীর সাথে দেখা করতে গেল। তখন তাঁর কাছে খাওয়ার কিছুই ছিল না। তিনি এক বন্ধুর ঘরে গেলেন। বন্ধু ঘরে ছিলেন না। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, ব্যঞ্জন ও রুটি প্রস্তুত রয়েছে। তিনি সবগুলো এনে মেহমানদের সামনে রেখে দিলেন। বন্ধু বাড়ী ফিরে কিছুই পেলেন না। লোকেরা তাকে জানাল, অমুক ব্যক্তি নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন ঃ ভালই করেছেন। পরে বন্ধুর সাথে দেখা হলে তাবেয়ী বললেন ঃ ভাই, তোমার মেহমান এলে আমার ঘরে যা পাও, নিয়ে যেয়ো।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন খানা পেশ করার আদব শুনুন। প্রথম কথা হচ্ছে, লৌকিকতা করবে না। যা উপস্থিত থাকে সামনে পেশ করে দেবে। কিছুই না থাকলে এবং পয়সাও না থাকলে এজন্যে ধার করবে না। যদি খানা থাকে কিন্তু তা পেশ করতে মন না চায়, তবে পেশ করবে না। জনৈক বুযুর্গ এক দরবেশের কাছে গেলেন। দরবেশ তখন খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ যদি আমি এই খাদ্য ধার করে না আনতাম, তবে তোমাকেও খাওয়াতাম। জনৈক বুযুর্গের মতে লৌকিকতা হচ্ছে ধার করা খাদ্য দর্শনার্থীকে খাওয়ানো। ফুযায়ল বলতেন ঃ লোকেরা লৌকিকতার কারণে পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে। এক ব্যক্তি তার ভাইকে দাওয়াত করে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। এ কারণে সে পুনরায় তার কাছে আসে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন কোন বন্ধু আমার কাছে এলে তা আমার জন্যে মোটেই কঠিন হয় না। কারণ, আমি তার জন্যে লৌকিকতা করলে এর অর্থ হবে, আমি বন্ধুর আগমনকে খারাপ মনে করি এবং বিরক্তিবোধ করি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বন্ধুর কাছে যেতাম। একদিন তাকে বললাম ঃ তুমি একা এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য খাও না। আমিও খাই না। তা হলে আমরা একত্রে খেলে এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য হবে কেন? এখন থেকে হয় তুমি লৌকিকতা পরিহার করবে, না হয় আমি এখানে আসা বন্ধ করে দেব। দু'টির একটি হওয়া উচিত। বন্ধুবর লৌকিকতা পরিহার করলেন এবং আমরা আজীবন একত্রে বসবাস করলাম। গৃহে যা কিছু থাকে সমস্তই পেশ করে দেয়া এবং পরিবার-পরিজনের জন্যে কিছু না রাখাও লৌকিকতা পরিহারের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে দাওয়াত করলে তিনি তিনটি শর্তে দাওয়াত কবুল করলেন- (১) বাজার থেকে তাঁর জন্যে কিছু আনা যাবে না, (২) গৃহে যা আছে তা পেশ করতে বিরত না থাকা এবং (৩) পরিবার-পরিজনের জন্যে না রেখে পেশ করা যাবে না।

জনৈক বুযুর্গ গৃহে যত প্রকার খাদ্য থাকত, প্রত্যেক প্রকার থেকে কিছু কিছু পেশ করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌র কাছে গেলে তিনি আমাদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ লৌকিকতা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের জন্যে লৌকিকতা করতাম। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ কেউ স্বেচ্ছায় তোমার সাথে দেখা করতে এলে যা উপস্থিত থাকে, তাই পেশ করবে। আর যদি তাকে দাওয়াত করে আন তবে তোমার পক্ষে যা সম্ভব তাতে ত্রুটি রাখবে না। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ, আমরা যেন মেহমানের জন্যে এমন বস্তু যোগাড় করতে সচেষ্ট না হই, যা আমাদের কাছে নেই; যা মৌজুদ থাকে, তাই যেন আমরা মেহমানের সামনে পেশ করি।

দ্বিতীয় আদব হচ্ছে, মেযবানের কাছে কোন নির্দিষ্ট খাদ্যের ফরমায়েশ করবে না। কেননা, মাঝে মাঝে ফরমায়েশকৃত বস্তু উপস্থিত করা কঠিন হয়। মেযবান যদি দু'খাদ্যের মধ্যে একটি পছন্দ করতে বলে তবে যেটি সহজলভ্য, সেটি পছন্দ করবে। এটাই সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে- রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি পছন্দ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তিনি সহজলভ্যটিই পছন্দ করেছেন। হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন ঃ আমি এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে হযরত সালমান (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি এবং কিছু বিস্বাদ নিমক পেশ করলেন। আমার বন্ধু বলল ঃ এই নিমকের সাথে পুদিনা হলে চমৎকার হত। হ্যরত সালমান (রাঃ) বাইরে গেলেন এবং নিজের ওযুর লোটা বন্ধক রেখে পুদিনা আনলেন। আহার সমাপনান্তে আমার বন্ধু বলল ঃ সেই আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে তাঁর দেয়া রুজিতে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন। হযরত সালমান বললেন ঃ যদি আল্লাহর দেয়া রুজিতে তুমি সন্তুষ্ট থাকতে, তবে আমার লোটা বন্ধক রাখতে হত না। এই নির্দিষ্ট খাদ্যের ফরমায়েশ না করা তখন, যখন মেহমান জানে, মেযবানের জন্যে এটি সরবরাহ করা কঠিন হবে অথবা সে ফরমায়েশকে খারাপ মনে করবে। আর যদি জানে ফরমায়েশ করলে মেযবান খুশী হবে এবং খাদ্যটিও সহজলভ্য, তবে এমতাবস্থায় ফরমায়েশ করা নিষিদ্ধ নয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী বাগদাদে জাফরানীর গৃহে অবস্থানকালে এরূপ করেছিলেন। জাফরানীর নিয়ম ছিল, যত প্রকার খাদ্য তৈরী করা হত তার একটি তালিকা লেখে বাঁদীর হাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিয়ে দিত। একদিন সেই তালিকা ইমাম শাফেয়ী নিয়ে নিজের কলম দ্বারা এক প্রকার খাদ্য অতিরিক্ত লেখে দিলেন। জাফরানী দস্তরখানে সেই খাদ্য দেখে বলল ঃ আমি তো এর অনুমতি দেইনি। এর পর সেই তালিকা সামনে এল, যাতে ইমাম শাফেয়ী নিজে লেখে দিয়েছিলেন। জাফরানী তাঁর লেখা দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে সে বাঁদীকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিল। ইমাম শাফেয়ী ফরমায়েশ করেছেন– এটাই ছিল তার আনন্দের কারণ।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আহার তিন প্রকার– (১) ফকীরদের সাথে আহার করা। এ সময় তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। (২) ভাই-বন্ধুদের সাথে আহার করা। এসময় ক্রীড়া কৌতুক সহকারে খাওয়া ভাল। (৩) দুনিয়াদারদের সাথে খাওয়া। তাদের সাথে আদব সহকারে খাওয়া উচিত।

তৃতীয় আদব হচ্ছে, মেযবান মেহমান ভাইকে ফরমায়েশ করার অনুরোধ করবে, অতঃপর তার ফরমায়েশ পূর্ণ করবে। এটা খুব ভাল কথা এবং এতে সওয়াব ও ফযীলত অনেক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, তার মাগফেরাত হবে। আর যে তার মুসলমান ভাইকে তুষ্ট করে, সে যেন আল্লাহ্ তাআলাকে তুষ্ট করে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে সেই বস্তু খাওয়ায়, যা সে চায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে দশ লক্ষ সওয়াব লেখেন এবং দশ লক্ষ পাপ তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন। এছাড়া তার দশ লক্ষ মর্তবা উচ্চ করে দেন এবং তাকে ফেরদাউস, আদন ও খালা এই তিন জান্নাত থেকে খেতে দেন।

চতুর্থ আদব, আগন্তুককে একথা বলবে না যে, আপনার জন্যে খানা আনব কিনা; বরং খানা মৌজুদ থাকলে জিজ্ঞাসা না করেই তা সামনে পেশ করবে। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ তোমার ভাই তোমার সাথে দেখা করতে এলে তাকে একথা বলো না যে, কিছু খাবে অথবা খানা আনব? বরং জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই খানা সামনে রেখে দাও। খেলে ভাল, নতুবা ফেরত নিয়ে যাবে। যদি খাওয়ানোর উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তার সামনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাওয়ার কথা বর্ণনা করা উচিত নয়। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আপন পরিজনকে নিজের খাদ্য না খাওয়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে তাদের সামনে তা উল্লেখ করবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাওয়াতের আদব

নিম্নে আমরা এ বিষয়বস্তুটি ছয়টি শিরোনামে বর্ণনা করছি ঃ

(১) দাওয়াতের ফযীলত ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মেহমানের জন্যে লৌকিকতা করো না। এতে তাকে মন্দ মনে করা হবে। যে মেহমানকে মন্দ জ্ঞান করে, সে আল্লাহকে মন্দ জ্ঞান করে। আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি মেহমানের আপ্যায়ন করে না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তির বাড়ীতে গেলেন। তার কাছে অনেক উট-গরু ছিল, কিন্তু সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আপ্যায়ন করল না। এর পর তিনি এক মহিলার গৃহে গেলেন। তার কাছে ছাগপাল ছিল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে একটি ছাগল যবেহ করল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ এ দুই ব্যক্তির তফাৎ দেখ। এই চরিত্র আল্লাহ্ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যাকে সদাচার দিতে ইচ্ছা করেন, দিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে বর্ণনা করেন– একবার রসূলে পাক (সাঃ)-এর গৃহে মেহমান আগমন করলে তিনি আমাকে বললেন, অমুক ইহুদীর কাছে গিয়ে বল, আমার এখানে মেহমান এসেছে। আমাকে যেন কিছু আটা ধার দেয়। ইহুদী বলল ঃ আল্লাহর কসম, কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি ধার দেব না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ আমি আকাশে বিশ্বস্ত এবং পৃথিবীতে বিশ্বস্ত। সে আমাকে ধার দিলে অবশ্যই তা শোধ করতাম। আমার লৌহবর্মটি নিয়ে যাও এবং তার কাছে বন্ধক রাখ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমান ব্যতীত আহার করতেন না। তিনি আহারের পূর্বে এক দুই ক্রোশ পর্যন্ত পথ চলে মেহমান তালাশ করতেন। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণেই তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় "আবুয যায়ফান" (মেহমানওয়ালা)। তিনি খাঁটি নিয়তে মেহমানকে আপ্যায়ন করতেন বিধায় আজ পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীমে অতিথিপরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। কোন রাত এমন যায় না যে, সেখানে তিন থেকে দশ ও একশ' মেহমান পর্যন্ত আহার না করে। এ মকামের ব্যবস্থাপকরা বলেন- এ পর্যন্ত কোন রাত মেহমান থেকে শূন্য যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ আহার করানো এবং সালাম চর্চা করা। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যে গৃহে মেহমান আসে না, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। দাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে থেকে এ কয়টি উল্লেখ করেই এখন দাওয়াতের আদব বর্ণনা করছি।

প্রথম আদব ঃ মুত্তাকী-পরহেযগারদেরকে দাওয়াত করবে- পাপাচারীদেরকে নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে-ই দাওয়াত করেছে, তিনি তার জন্যে এই দোয়া করেছেন- তোমার খাদ্য সৎলোকদের আহার্য হোক। এক হাদীসে আছে- পরহেযগার লোকদের ছাড়া অন্য কারও খাদ্য খাবে না। তোমার খাদ্যও যেন মুত্তাকী ছাড়া অন্য কেউ না খায়।

দ্বিতীয় আদব ঃ বিশেষভাবে ধনীদের দাওয়াত করবে না, বরং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে দাওয়াত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সেই ওলীমার খাদ্য সকল খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, ফকীরদের করা হয় না।

তৃতীয় আদব ঃ দাওয়াতে নিজের আত্মীয়দেরকে বাদ দেবে না। কারণ, তাদেরকে বাদ দিলে তারা বিচলিত হবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন হবে। এমনিভাবে বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনের মধ্যে স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কতককে অধিক গুরুত্ব দিলে অন্যরা মনঃক্ষুণ্ণ হবে।

চতুর্থ আদব ঃ গর্ব অহঙ্কারের নিয়তে দাওয়াত করবে না; বরং ভাইদের অন্তর আকৃষ্ট করা, সুন্নতের অনুসরণ করা এবং ঈমানদারদের মন তুষ্ট করার নিয়তে দাওয়াত করবে।

পঞ্চম আদব ঃ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করবে না, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, দাওয়াত কবুল করা তার জন্যে কঠিন।

ষষ্ঠ আদব ঃ এমন ব্যক্তিকেই দাওয়াত করবে, যার দাওয়াত কবুল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা দাওয়াতকারী ভাল বলে জানে। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত করে অথচ তার দাওয়াত কবুল করা মনে মনে খারাপ জানে, তার দাওয়াত একটি গোনাহ। অপর পক্ষে এ দাওয়াত কবুল করলে তার উপর দু'গোনাহ হবে।

মুত্তাকী ব্যক্তিকে খাওয়ালে তার তাকওয়ায় এবং পাপাচারীকে খাওয়ালে তার পাপাচারে শক্তি যোগানো হয়। জনৈক দর্জি হযরত ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি বাদশাহদের কাপড় সেলাই করি। এমতাবস্থায় আমি জালেমদের সাহায্যকারী নই তো? তিনি বললেন ঃ জালেমদের সাহায্যকারী তো তারা, যারা তোমার হাতে সুই-সুতা বিক্রি করে। তুমি তো স্বয়ং জালেম। সাহায্যকারী হওয়ার কথা কি জিজ্ঞেস কর?

দাওয়াত কবুল করা ঃ দাওয়াত কবুল করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কতক জায়গায় মানুষ একে ওয়াজিবও বলে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لو دعيت الى كراع لاجبت ولو اهدى الى ذراع لقبلت .

অর্থাৎ, যদি আমাকে কেউ ছাগলের পায়ের হাড় খেতে দাওয়াত করে, তবুও আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব, আর যদি কেউ আমাকে খাসীর বাহু হাদিয়া দেয়, তবে আমি তা কবুল করব।

দাওয়াত কবুল করার আদব পাঁচটি ঃ

১। (ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করবে না; অর্থাৎ, এমন যেন না হয় যে, ধনী দাওয়াত দিলে কবুল করবে এবং দরিদ্র দাওয়াত দিলে কবুল করবে না। এটা অহংকার বিধায় নিষিদ্ধ। এই অহংকারের কারণে অনেকে দাওয়াত কবুল করাই বাদ দিয়েছে। তারা বলে ঃ শুরবার অপেক্ষায় বসে থাকা একটি যিল্লতীর কাজ। কোন কোন অহংকারী আবার ধনীদের দাওয়াত কবুল করে এবং দরিদ্রের করে না। এটাও সুন্নতের খেলাফ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোলাম, মিসকীন সকলের দাওয়াতই কবুল করতেন। একবার হযরত হাসান (রাঃ) কয়েকজন মিসকীনের কাছ দিয়ে গমন করেন। তারা তখন রুটির টুকরা মাটিতে ছড়িয়ে রেখে সকলেই বসে খাচ্ছিল। হযরত হাসান খচ্চরে সওয়ার হয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করলেন। তারা সালামের জওয়াব দিয়ে বলল ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র, আসুন খানা খান। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা, আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। একথা বলে তিনি খচ্চর থেকে নামলেন এবং তাদের সাথে মাটিতে বসে আহার করলেন। এর পর সালাম করে খচ্চরে সওয়ার হলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। তোমরাও আমার দাওয়াত কবুল কর। তারা বলল ঃ উত্তম। তিনি তাদেরকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। তারা সেদিন আগমন করলে তিনি উৎকৃষ্ট খাদ্য তাদের সামনে পেশ করেন এবং নিজেও তাদের সাথে বসে খেলেন।

যারা দাওয়াতকে যিল্লতীর কাজ বলে, তাদের জওয়াব, এটা সুন্নত বিরোধী কথা। বাস্তবে এরূপ নয়। কেননা, দাওয়াত কবুল করা তখনই যিল্লতী, যখন দাওয়াতকারী দাওয়াত কবুল করলে সন্তুষ্ট এবং অনুগ্রহভাজন না হয়; বরং দাওয়াতকে অন্যের উপর অনুগ্রহ মনে করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে যাওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি জানতেন, দাওয়াতকারী অনুগ্রহ স্বীকার করবে এবং ইহকাল পরকালে নিজের গৌরব ও মর্যাদা মনে করবে।

মোট কথা, দাওয়াত কবুল করার বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ। যদি মনে হয়, দাওয়াতকারী আহার করানো বোঝা মনে করে এবং কেবল গর্ব ও লৌকিকতার খাতিরে দাওয়াত করে, তবে তার দাওয়াত কবুল করা সুন্নত নয়; বরং কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। জনৈক সুফী এরশাদ করেন ঃ এমন ব্যক্তির দাওয়াত খাও, যে মনে করে তুমি তোমার রিযিক খাচ্ছ এবং তোমার যে আমানত তাঁর কাছে ছিল, তা সে প্রত্যর্পণ করে অনুগ্রহভাজন হচ্ছে। সিররী সকতী (রহঃ) বলেন ঃ আমি এমন লোকমা অন্বেষণ করি, যাতে কোন গোনাহ আমার উপর না বর্তায় এবং কোন মানুষের অনুগ্রহ না থাকে। আবু তোরাব বখশী বলেন ঃ একবার আমার সামনে খাদ্য এলে আমি তা খেতে অস্বীকার করলাম। এর পর চৌদ্দ দিন ভুখা থাকতে হল। তখন জানলাম, এটা সেই অস্বীকারের শাস্তি।

(২) বেশী দূরে হওয়ার কারণে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করবে না; যেমন দাওয়াতকারী নিঃস্ব হলে অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং যতটুকু দূরত্ব সহ্য করার অভ্যাস আছে, ততটুকু দূরত্বে দাওয়াত হলে অস্বীকার করবে না। তওরাতে অথবা অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে আছে– এক মাইল হেঁটে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস কর, দুই মাইল চলে জানাযার সঙ্গে থাক, তিন মাইল চলে দাওয়াত কবুল কর এবং চার মাইল চলে এমন ভাইয়ের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাথে সাক্ষাত কর, যে আল্লাহর সূত্রে ভাই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ কোরাউল গামীমে আমাকে দাওয়াত করে, তবে আমি তা কবুল করব। কোরাউল গামীম মদীনা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানে সেখানে পৌঁছে ইফতার করেছিলেন এবং সফরে এ স্থানেই নামাযে কসর করেছিলেন।

(৩) রোযাদার হওয়ার কারণে দাওয়াত অস্বীকার করবে না; বরং দাওয়াতে যাবে। যদি রোযা ভঙ্গ করলে দাওয়াতকারী খুশী হয়, তবে রোযা ভঙ্গ করবে। মুসলমানকে খুশী করার ইচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার মধ্যেও সেই সওয়াব কামনা করবে, যা রোযা রাখলে হত। এ বিধান নফল রোযার ক্ষেত্রে, কিন্তু যদি জানা যায়, সে লৌকিকতা প্রদর্শন হেতু রোযা ভঙ্গ করতে বলছে, তবে এড়িয়ে যাবে এবং রোযা ভঙ্গ করবে না। এক ব্যক্তি রোযার ওযর দেখিয়ে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ তোমার ভাই তোমার জন্যে মেহনত করেছে, আর তুমি বলছ, তুমি রোযাদার। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধবের খাতিরে রোযা ভঙ্গ করা খুব চমৎকার পুণ্যের কাজ। সুতরাং এ নিয়তে রোযা ভঙ্গ করা এবাদত ও সদাচার বিধায় এ সওয়াব রোযার সওয়াবের চেয়ে বেশী।

(৪) যদি খাদ্য সন্দেহযুক্ত হয়, অথবা বিছানা হালাল উপায়ে উপার্জিত না হয়, অথবা রেশমী বিছানা হয়, অথবা থালা-বাসন রূপার হয়, অথবা প্রাণীর চিত্র ছাদে কিংবা প্রাচীরে লাগানো থাকে অথবা সেতার বাঁশী ও ক্রীড়া কৌতুকের সাজ-সরঞ্জাম থাকে অথবা গীবত, পরনিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা ও প্রতারণা শুনতে হয়, অথবা এমনি প্রকার কোন বেদআত থাকে, তবে এসব কারণে দাওয়াত কবুল করবে না। এমতাবস্থায় দাওয়াত কবুল করা মোস্তাহাব থাকে না; বরং এসব বিষয়ের সম্ভাবনা থাকলে দাওয়াত হারাম ও মাকরূহ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। দাওয়াতকারী জালেম, বেদআতী, ফাসেক অথবা দুষ্ট প্রকৃতির লোক হলেও একই বিধান।

(৫) এক বেলা পেট ভরে খাবে দাওয়াত এই উদ্দেশে হওয়া উচিত নয়। এরূপ উদ্দেশ্য থাকলে এটা দুনিয়ার জন্যে আমল হবে। বরং দাওয়াত কবুল করার মধ্যে নিয়ত সঠিক রাখবে, যাতে আমলটি বিশেষভাবে আখেরাতের জন্যে হয়ে যায়। সঠিক নিয়ত অনেক প্রকারে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হতে পারে। উদাহরণতঃ সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করবে অথবা এই নিয়ত করবে যে, দাওয়াত কবুল করলে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী থেকে বেঁচে যাব। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من لم يجب الداعى فقد عصى الله ورسوله যে দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমানী করে। অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ অনুযায়ী মুসলমান ভাইকে সম্মান করার নিয়ত করবে। কেননা, তিনি বলেন ঃ من اكرم اخاه المؤمن فكانما اكرم الله যে ব্যক্তি মুমিনকে সম্মান করে সে যেন আল্লাহকে সম্মান করে। অথবা মুমিনের মন সন্তুষ্টির নিয়ত করবে। যেমন হাদীসে আছে من سر مؤمنا فقد سر الله –যে মুমিনকে সন্তুষ্ট করে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। অথবা এই নিয়ত করবে যে, দাওয়াত কবুল করলে কেউ তার প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না এবং মুসলমানকে হেয় মনে করে দাওয়াত কবুল করেনি– এরূপ অপবাদ আরোপ করবে না। মোট কথা, এসবের মধ্যে যেকোন একটির নিয়ত করলে দাওয়াত করা এবাদতরূপে গণ্য হবে। আর যদি কেউ সবগুলো নিয়ত করে, তবে তা আরও উত্তম। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলতেন ঃ আমি চাই, আমার প্রত্যেক আমলে একটি নিয়ত হোক, এমন কি পানাহারের মধ্যেও নিয়ত হোক। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه-

অর্থাৎ, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যা সে নিয়ত করে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকেই থাকবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার দিকে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার দিকে হবে, তার হিজরত তার দিকেই থাকবে, যার জন্যে সে হিজরত করবে।

নিয়ত কেবল আনুগত্য ও বৈধ কাজের মধ্যেই ফলদায়ক হয়–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিষিদ্ধ কাজে ফলদায়ক হয় না। উদাহরণতঃ কেউ যদি সঙ্গীদেরকে খুশী করার নিয়তে মদ্যপান করে অথবা অন্য কোন হারাম কাজ করে, তবে এই নিয়ত উপকারী হবে না এবং এখানে একথা বলা ঠিক হবে না যে, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। বরং যে জেহাদ একটি আনুগত্যের কাজ, তাতেও যদি কেউ গর্ব অথবা অর্থোপার্জনের নিয়ত করে, তবে তা আনুগত্যের কাজ থাকবে না।

দাওয়াত খাওয়ার জন্যে উপস্থিতির আদব ঃ প্রথমতঃ গৃহে এসে প্রধান স্থানে উপবেশন করবে না; বরং বিনয় প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত হতে অধিক দেরী করবে না যে, মানুষ অপেক্ষায় বসে থাকবে এবং এত শীঘ্রও আসবে না যে, দাওয়াতের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সমাপ্তও না হয়। তৃতীয়তঃ ভিড়ের সময় এমনভাবে বসবে না যাতে অন্যের অসুবিধা হয়। বরং গৃহকর্তা কোথাও বসতে ইশারা করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। যদি উপস্থিত কেউ তাযীমের জন্যে কোন উঁচু জায়গা বলে দেয়, তবে তখন বিনয় করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان من التواضع لله الرضاء بالدون من المجلس -

আল্লাহর জন্যে বিনয় এটাও যে, তুমি বসার জায়গা থেকে নিম্নস্তরে বসতে রাজি হয়ে যাবে। চতুর্থতঃ যে কক্ষে মহিলারা রয়েছে এবং পর্দা ঝুলানো রয়েছে, তার দরজার সামনে বসবে না। পঞ্চমতঃ যে জায়গায় খাদ্য এনে রাখা হয়, সেদিকে বেশী তাকাবে না। কারণ, এটা অধৈর্য ও লোভের পরিচায়ক। ষষ্ঠতঃ বসার সময় যে কাছে থাকে; তাকে সালাম করবে ও কুশল জিজ্ঞেস করবে। মেযবান মেহমানকে কেবলার দিক, পায়খানা ও ওযুর জায়গা বলে দেয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেক হযরত ইমাম শাফেয়ীর সাথে তাই করেছিলেন। হযরত ইমাম মালেক খাওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম নিজে হাত ধৌত করেন এবং বলেন ঃ খাওয়ার পূর্বে প্রথমে গৃহকর্তার হাত ধোয়া উচিত। কেননা, সে মানুষকে দাওয়াত করে। তাই প্রথমে সে হাত ধুয়ে সকলকে খাওয়া শুরু করতে সাহায্য করবে, কিন্তু খাওয়া শেষে গৃহকর্তা সকলের পরে হাত ধুবে। সপ্তমতঃ দাওয়াতের স্থানে পৌঁছে গর্হিত কোন কিছু দেখলে যদি তা বন্ধ করতে সমর্থ হয় তবে বন্ধ করে দেবে। নতুবা মুখে তার নিন্দা বর্ণনা করে ফিরে যাবে। গর্হিত বিষয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এগুলো ঃ রেশমী বিছানা, সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার, প্রাচীরে চিত্র থাকা, গান বাজনা হওয়া, মহিলাদের খোলা মুখে উপস্থিতি ইত্যাদি, কিন্তু প্রাচীরে শোভা বর্ধনের জন্যে রেশমী কাপড় ঝুলানো হারাম নয়। কেননা, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা পুরুষদের জন্যে হারাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

هذان حرام على ذكور امتى حل لاناثها এগুলো আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম এবং মহিলাদের জন্যে হালাল। প্রাচীরে রেশমী বস্ত্র থাকলে তা পুরুষদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। প্রাচীর গাত্রে রেশমী বস্ত্র হারাম হলে কাবা শরীফের সৌন্দর্য বর্ধনও হারাম হত। কাজেই একে মোবাহ্ বলা উত্তম।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ বলুন, আল্লাহর সৌন্দর্য কে নিষিদ্ধ করল?

খাদ্য আনার আদব ঃ প্রথমতঃ খাদ্য দ্রুত আনবে। এতে মেহমানের তাযীম হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের তাযীম করে। অধিকাংশ মেহমান এসে গেলে এবং দু'একজন অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিতদের খাতিরে দ্রুত খাদ্য পেশ করা অনুপস্থিতদের খাতিরে বিলম্বে খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম। হাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি ফকীর হলে অথবা পেছনে থেকে গেলে সে মনঃক্ষুণ্ন হবে মনে হলে তার অপেক্ষা করায় দোষ নেই।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ -এর এক অর্থ এরূপও নেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে দ্রুত খাদ্য পেশ করাই ছিল তাদের তাযীম। অন্য একটি আয়াত এর দলীল। বলা হয়েছে ঃ

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ, অতঃপর অবিলম্বে একটি ভাজা করা বাছুর নিয়ে এল। অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَاۤءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ অর্থাৎ, সে গৃহাভ্যন্তরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দৌড়ে গেল, নিয়ে এল একটি ঘৃতপক্ক বাছুর। এখানে راغ বলে দ্রুত যাওয়া বুঝানো হয়েছে।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাংসের একটি রান এনেছিলেন, কিন্তু দ্রুত এনেছিলেন বিধায় তাকে عجل বলা হয়েছে। হযরত হাতেম আসাম্ম (রঃ) বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় ছাড়া তড়িঘড়ি করা শয়তানের কাজ। পাঁচটি বিষয় এই ঃ মেহমানকে খাওয়ানো, মৃতের কাফন দাফন করা, কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেয়া, ঋণ শোধ করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করা। এ পাঁচটি বিষয়ে তড়িঘড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত। দ্বিতীয়তঃ ক্রম অনুযায়ী খাদ্য পেশ করবে; অর্থাৎ, ফলমূল থাকলে তা প্রথমে পেশ করবে। কেননা, ফলমূল দ্রুত হজম হয় বিধায় এটা পাকস্থলীতে নীচে থাকার যোগ্য। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে– وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (এবং তাদের পছন্দনীয় ফলমূল), এ বাক্যেও বলা হয়েছে যে, ফলমূল প্রথমে পেশ করা উচিত। এর পর বলা হয়েছে– وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ আর পাখীর মাংস, যা তারা কামনা করবে। ফলমূলের পরে মাংস ও ছরীদ পেশ করা উত্তম। শুরবার সাথে রুটির টুকরা মিশ্রিত করে ছরীদ প্রস্তুত করা হয়। আরবে এ খাদ্য উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে গণ্য। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ, যেমন অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ছরীদ। সকল খাদ্যের পরে কিছু মিষ্টান্ন হলে যাবতীয় উৎকৃষ্ট খাদ্যের সমাবেশ হয়ে যায়। উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হয়েছে– اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى (আমি তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি।) এতে মান্না অর্থ মধু এবং সালওয়া বলে গোশত বুঝানো হয়েছে। গোশতকে সালওয়া বলার কারণ, গোশত থাকলে অন্য ব্যঞ্জন থেকে সান্ত্বনা (সালওয়ার আভিধানিক অর্থ) হয়ে যায় এবং অন্য কোন কিছু তার স্থলাভিষিক্ত হয় না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ سيد الادم لحم অর্থাৎ, গোশত ব্যঞ্জনের সর্দার। মান্না ও সালওয়া উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ তোমরা আমার প্রদত্ত পরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। এ থেকে বুঝা গেল, মিষ্টান্ন ও গোশত উভয়টিই উৎকৃষ্ট খাদ্য।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয়তঃ খাদ্যের প্রকারসমূহের মধ্যে যেটি অধিক সুস্বাদু, সেটি প্রথমে পেশ করবে, যাতে যার ইচ্ছা, সে এটি পুরাপুরি খেয়ে নেয়। পূর্ববর্তীদের নিয়ম ছিল, তাঁরা সকল প্রকার খাদ্য একযোগে এনে রাখতেন, যাতে প্রত্যেকেই পছন্দসই খাদ্য খেতে পারে। গৃহকর্তার কাছে এক প্রকার ছাড়া অন্য খাদ্য না থাকলে সে তা বলে দিত, যাতে মেহমানরা তৃপ্ত হয়ে খেয়ে নেয় এবং কখনও উৎকৃষ্ট খাদ্যের অপেক্ষায় না থাকে। জনৈক শায়খ বলেন ঃ আমার সামনে সিরিয়ার জনৈক শায়খ এক প্রকার খাদ্য পেশ করলে আমি বললাম ঃ আমাদের ইরাকে এ খাদ্য সকলের শেষে পেশ করা হয়। তিনি বললেন ঃ আমাদের সিরিয়াতেও তাই নিয়ম। আসলে তিনি অন্য কোন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করাননি। তাই আমি খুব লজ্জা পেলাম। অন্য একজন বলেন ঃ আমরা কিছু সংখ্যক লোক এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। গৃহকর্তা ছাগলের ভাজা করা মাথা শুরবাসহ পেশ করলেন। আমরা অন্য খাদ্য অথবা গোশতের অপেক্ষায় সেটি খেলাম না, কিন্তু অবশেষে গৃহকর্তা আমাদের সামনে হাত ধোয়ার পাত্র পেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরের মুখ পানে তাকাতে লাগলাম। জনৈক রসিক বলে ফেললেন ঃ শরীর ছাড়া মাথা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলারই রয়েছে। সে রাত আমরা ক্ষুধার্তই রয়ে গেলাম। এদিক দিয়ে সকল প্রকার খাদ্য একযোগে পেশ করা অথবা যা আছে তা বলে দেয়া মোস্তাহাব, যাতে মেহমানরা অপেক্ষা না করে।

চতুর্থতঃ যে পর্যন্ত মেহমান সকল প্রকার খাদ্য ভালরূপে খেয়ে হাত গুটিয়ে না নেয়, সে পর্যন্ত থালা তুলে নেয়া উচিত নয়। কেননা, কারও কারও হয় তো শেষে আসা খাদ্যটি পূর্বেকার খাদ্যসমূহের তুলনায় অধিক প্রিয় হতে পারে, অথবা তখনও তৃপ্ত না হয়ে আসতে পারে। থালা তুলে নিলে তাদের অসুবিধা হবে। সন্তোরী ছিলেন রসিক সুফী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক দুনিয়াদার কৃপণের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে যান। একটি ভাজা করা খাসী সামনে এলে মেহমানরা সেটি খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। তা দেখে কৃপণ গৃহকর্তা অস্থির হয়ে গোলামকে বলে ঃ এই খাসীটি ছেলেদের জন্যে তুলে নিয়ে যা। গোলাম সেটি তুলে নিয়ে অন্দরে যেতে থাকলে সন্তোরী তার পেছনে পেছনে দৌড় দিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন,সন্তোরী বললেন ঃ ছেলেদের সাথে খাব। তখন গৃহকর্তা লজ্জিত হয়ে খাসীটি ফিরিয়ে আনল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চমতঃ এই পরিমাণ খাদ্য পেশ করবে। যা সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়, কেননা, পর্যাপ্ত পরিমাণের কম পেশ করলে ভদ্রতা কলুষিত হবে এবং বেশী করলে বানোয়াট ও যশের জন্যে হবে; বিশেষতঃ যখন সবগুলো খেয়ে ফেলা মনে মনে পছন্দনীয় না হয়।

অবশ্য যদি অনেক খাদ্য এভাবে পেশ করে যে, সবগুলো খেয়ে ফেললে গৃহকর্তা খুশী হবে এবং কিছু রেখে দিলে বরকত মনে করবে, তবে অনেক খাদ্য পেশ করায় দোষ নেই। কেননা, হাদীসে আছে, এ খাদ্যের কোন হিসাব হবে না। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম তাঁর দস্তরখানে অনেক খাদ্য হাযির করেছিলেন। সুফিয়ান সওরী বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, এতে অপচয় হবে বলে আপনি আশংকা করেন না? ইবরাহীম বললেন ঃ খাদ্যের ব্যাপারে অপচয় নেই। মোট কথা, এ নিয়তে না হলে খাদ্যের প্রাচুর্য নিঃসন্দেহে লৌকিকতা। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গর্ব করে খাওয়ায়, তার দাওয়াত কবুল করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু পেশ করার কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখ থেকে কখনও বাড়তি খাদ্য তুলে নেয়া হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য তাঁর সামনে পেশ করতেন না এবং নিজেরাও খুব উদরপূর্তি করে খেতেন না। ফলে অল্প খাদ্যই যথেষ্ট হয়ে যেত। গৃহের লোকজনের জন্যে তাদের অংশ আলাদা করে রাখা উচিত। তাদেরকে যেন মেহমানদের কাছ থেকে উদ্বৃত্তের আশায় বসে থাকতে না হয়। যদি মেহমানের কাছে উদ্বৃত্ত না হয়, তবে তারা মনঃক্ষুণ্ন হবে এবং মেহমানদেরকে মন্দ শুনাবে। মেহমানকে এমন খাদ্য খাওয়ানো জরুরী নয়, যাকে অন্যরা খারাপ মনে করে। এটা মেহমানদের পক্ষে খেয়ানত। উদ্বৃত্ত খাদ্য মেহমানের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। হাঁ, যদি গৃহকর্তা মনের খুশীতে এর অনুমতি দেয় অথবা ইঙ্গিতদৃষ্টে তার আনন্দিত হওয়া বুঝা যায়, তবে নেয়ায় দোষ নেই। মেযবানের সম্মতি থাকলেও সকল মেহমানের মধ্যে যাতে ইনসাফ সহকারে বন্টন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই তার সামনের উদ্বৃত্ত খাদ্য নেবে। সঙ্গী রাজি হলে তার সামনের খাদ্যও নিতে পারবে।

দাওয়াত থেকে প্রত্যাবর্তনের আদব ঃ প্রথমতঃ মেযবান মেহমানের সাথে গৃহের দরজা পর্যন্ত যাবে। এটা সুন্নত এবং মেহমানের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাযীম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীসে মেহমানের তাযীম করার নির্দেশ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেহমানের সম্মান হচ্ছে গৃহের দরজা পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া। হযরত আবু কাতাদা বলেন ঃ আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দূত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি স্বয়ং তার খেদমত করতে প্রস্তুত হন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা তার খেদমত করব। আপনি কষ্ট করবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তা হয় না। নাজ্জাশী আমার সহচরদের তাযীম করেছিলেন। তাই আমি এর প্রতিদান দিতে চাই। মেহমানের পূর্ণ তাযীম হচ্ছে তার সামনে হাসিমুখে থাকা এবং আসা যাওয়ার সময় ও দস্তরখানে ভাল কথাবার্তা বলা। আওযায়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মেহমানের তাযীম কি? তিনি বললেন ঃ হাসিমুখে থাকা ও উৎকৃষ্ট কথাবার্তা বলা। ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ বলেন ঃ আমরা যখনই আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লার কাছে এসেছি, তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তাও ভাল বলেছেন এবং খাদ্যও চমৎকার খাইয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ মেহমানের উচিত আদর আপ্যায়ন কম হয়ে থাকলেও মেযবানের কাছ থেকে আনন্দ চিত্তে বিদায় হওয়া। কেননা, এটা সচ্চরিত্র ও বিনয়ের অঙ্গ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার সচ্চরিত্র দ্বারা রোযাদার ও রাত জাগরণকারীর মর্যাদা অর্জন করে নেয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্য থেকে এক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি খানা খেয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাল। বুযুর্গ তখন গৃহে ছিলেন না। পরে এসে শুনলেন, অমুক ব্যক্তি ডেকে পাঠিয়েছিল। সেমতে তিনি সেখানে গেলেন। তখন সকল মেহমান খানা খেয়ে চলে গিয়েছিল। গৃহকর্তা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ এখন তো খাওয়া দাওয়া শেষ। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিছু বেঁচে গেছে? সে বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ এক আধ টুকরা রুটি থাকলেও নিয়ে এস। গৃহকর্তা বলল ঃ তাও নেই। বুযুর্গ বললেন ঃ পাতিল নিয়ে এস, মুছে নেই। গৃহকর্তা বলল ঃ পাতিল আমি ধুয়ে ফেলেছি। অতঃপর আল্লাহর শোকর বলে বুযুর্গ সেখান থেকে হাসি খুশী চলে এলেন। লোকেরা বলল ঃ ব্যাপার কি, যে ব্যক্তি আপনাকে কিছু খাওয়াল না, অথচ আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট? বুযুর্গ বললেন ঃ সে আমার সাথে ভাল কথা বলেছে। পরিষ্কার নিয়তেই সে আমাকে ডেকেছিল এবং পরিষ্কার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়তেই বিদায় দিয়েছে। একেই বলে বিনয় ও সচ্চরিত্র । কথিত আছে, ওস্তাদ আবুল কাসেম জুনায়দকে একটি ছেলে চার বার এই বলে ডাকতে গিয়েছিল যে, আমার পিতা আপনাকে খেতে ডেকে পাঠিয়েছেন। ছেলেটির পিতা তাকে চার বারই খাওয়াবে না বলে সাফ জওয়াব দিয়ে দিল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারই ছেলের কথায় চলে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ছেলেটি এই ভেবে খুশী হবে যে, আমার কথা মেনেছেন এবং তার পিতাও খুশী হবে যে, আমার সাফ জওয়াব শুনে চলে গেছেন। এঁরা ছিলেন পবিত্রাত্মা। আল্লাহর জন্যে বিনয়ে তাঁরা নত হয়ে যেতেন এবং তওহীদ নিয়েই প্রশান্ত থাকতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য করতেন না । কেউ হেয় মনে করলে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ন হতেন না এবং কেউ তাযীম করলে প্রফুল্ল হতেন না। বরং প্রত্যেক বিষয়কে তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করতেন। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলতেন ঃ আমি দাওয়াত কবুল করি। কেননা, এতে জান্নাতের খাদ্য স্মরণ হয়। অর্থাৎ, দাওয়াতের খাদ্যের ন্যায় জান্নাতের খাদ্যও বিনা ক্লেশে অর্জিত হবে এবং তার কোন হিসাব নেয়া হবে না।

তৃতীয়তঃ মেযবানের সম্মতি ও অনুমতি ব্যতীত তার কাছ থেকে চলে যাবে না। সাধ্য পরিমাণে তার মনের দিকে খেয়াল রাখবে। মেহমান হয়ে গেলে তিন দিনের বেশী অবস্থান করবে না। কেননা, মেযবান বিরক্তিবোধ করে চলে যাওয়ার কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الضيافة ثلاثة ايام فما زاد صدقة অর্থাৎ, মেহমানী তিন দিন। এর বেশী হলে তা সদকা।

তবে গৃহকর্তা খাঁটি মনে অবস্থান করতে পীড়াপীড়ি করলে অবস্থান করা জায়েয। গৃহকর্তার কাছে মেযবানের জন্যে একটি বিছানা থাকা দরকার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এক বিছানা স্বয়ং পুরুষের জন্যে, এক বিছানা স্ত্রীলোকের জন্যে, এক বিছানা মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থ বিছানা থাকলে তা হবে শয়তানের জন্যে।

(৬) **পরিশিষ্ট** ঃ ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ বাজারে খাদ্য খাওয়া নীচতা। তিনি একে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে একটি রেওয়ায়েত হযরত ইবনে ওমর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে চলাফেরা অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করে নিতাম। জনৈক ব্যক্তি একজন খ্যাতনামা সুফীকে বাজারে খেতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল। সুফী বললেন ঃ ক্ষুধা লাগবে বাজারে আর খাব গিয়ে ঘরে– এ কেমন কথা! লোকটি বলল ঃ তা হলে মসজিদে চলে যেতেন? সুফী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলার গৃহে খাওয়ার জন্যে যাব– এটা আমার কাছে লজ্জার কথা।

উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, যারা বাজারে খাওয়া বিনয় মনে করে, তাদের জন্যে বাজারে খাওয়া ভাল। পক্ষান্তরে যারা একে লজ্জাহীনতা মনে করে, তাদের জন্যে মাকরূহ। সুতরাং এ বিধানটি মানুষের অভ্যাসভেদে বিভিন্ন রূপ হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি নিমক দিয়ে সকালের খানা শুরু করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর থেকে সত্তর প্রকার বালা দূর করে দেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ একুশটি লাল কিশমিশ খায়, সে তার দেহে খারাপ কোন কিছু দেখবে না। মাংস খেলে মাংস বাড়ে। হালুয়া খেলে পেট বেড়ে যায় এবং অণ্ডকোষ ঝুলে পড়ে। গরুর মাংস রোগ, তার দুধ আরোগ্য, তার ঘি ওষুধ এবং চর্বি দেহ থেকে সমপরিমাণ রোগ দূর করে দেয়। কোরআন মজীদের তেলাওয়াত ও মেসওয়াক শ্লেষ্মা নিবারক। যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন চায়, সে যেন সকালের খানা প্রাতঃকালে খায়, সন্ধ্যায় কম আহার করে এবং জুতা পরিধান করে।

হাজ্জাজ জনৈক চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে এমন বিষয় বলে দিন, যা আমি মেনে চলি এবং লঙ্ঘন না করি। চিকিৎসক বলল ঃ মহিলাদের মধ্যে যুবতী ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না। মাংস কেবল জওয়ান পশুর খাবেন। পাকা কলা ভালরূপে না পাকা পর্যন্ত খাবেন না। রোগ ছাড়া ওষুধ খাবেন না। যা খাবেন উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবেন। সেই খাদ্য খাবেন যা মনে চায়। খেয়ে পানি পান করবেন না। আর পানি পান করে খাবেন না, প্রস্রাব পায়খানা আটকে রাখবেন না। দিনের খাদ্য খেয়ে নিদ্রা যাবেন এবং রাতের খাদ্য খেয়ে নিদ্রার পূর্বে পায়চারি করবেন, তা একশত কদম হলেও। জনৈক হাকীম তার পুত্রকে বলল ঃ সকালে কিছু খাওয়া ছাড়া বের হয়ো না। খাদ্যে সংযম সুস্থ ব্যক্তির জন্যে ক্ষতিকর, যেমন অসংযম রোগীর জন্যে ক্ষতিকর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে বাড়ীতে কেউ মারা যায়, সে বাড়ীতে খাদ্য পাঠানো মোস্তাহাব। সেমতে জাফর ইবনে আবী তালেবের মৃত্যু সংবাদ এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জাফরের গৃহের লোকজন মৃতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে খাদ্য তৈরী করতে পারবে না। তাদের কাছে কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দাও। কাজেই এটা সুন্নত।

জালেমের খাদ্য খাবে না। জোরজবরদস্তি করলে সামান্য খাবে। কথিত আছে, যুন্নুন মিসরী গ্রেফতার হয়ে কিছু দিন কয়েদখানায় অতিবাহিত করেন। তাঁর এক ধর্ম ভগ্নী সুতা কেটে কয়েদখানার দারোগার হাতে খানা প্রেরণ করলে তিনি তা খেলেন না। মুক্তি পাওয়ার পর সেই ভগ্নী এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ খাদ্য হালাল ছিল; কিন্তু জালেমের পাত্রে এবং তার হাতে এসে ছিল। তাই আমি খাইনি। অর্থাৎ, দারোগার মারফতে না এলে খেতাম। বলাবাহুল্য, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকওয়া।

ফাতাহ্ মুসেলী (রঃ) একবার বিশরে হাফীর সাথে দেখা করতে গেলেন। বিশর দেরহাম বের করে খাদেম আহমদকে বললেন ঃ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভাল ব্যঞ্জন কিনে আন। আহমদ বলেন ঃ আমি খুব পরিচ্ছন্ন রুটি, কিছু দুধ ও উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে আনলাম এবং সবগুলো ফাতাহ্ মুসেলীর সামনে রেখে দিলাম। তিনি খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বিশরে হাফী আমাকে বললেন ঃ আহমদ, আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য আনতে বলেছিলাম কেন, জান? এর কারণ ছিল, উৎকৃষ্ট খাদ্য আন্তরিক শোকর ওয়াজিব করে। ফাতাহ আমাকে খেতে বলেননি। এর কারণ, মেযবানকে খেতে বলা মেহমানের জন্যে জরুরী নয়। অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন কেন জান? এর কারণ, তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হলে পাথেয় নেয়া ক্ষতিকর হয় না। তিনি যেন এসব মাসআলা তোমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আবু আলী রুদবারী এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন, তিনি দাওয়াত করে এক হাজার বাতি জ্বালালেন। এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলল ঃ আপনি অপব্যয় করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি ভিতরে গিয়ে সে বাতিটি নিভিয়ে দাও যেটি আমি আল্লাহর ওয়াস্তে জ্বালিনি। সে ভিতরে গিয়ে শত চেষ্টা করল, কিন্তু একটি বাতিও নিভাতে পারল না। অবশেষে সে হার মানতে বাধ্য হল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী খাওয়া চার প্রকার। এক, এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ। দুই, দু'আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা অহংকার। তিন, তিন আঙ্গুলে খাওয়া। এটা সুন্নত তরীকা। চার, পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা তীব্র লোভের পরিচায়ক।

চারটি বস্তু দেহকে দুর্বল করে– অধিক সহবাস, অধিক দুঃখ, প্রায়ই খালি পেটে পানি পান করা এবং বেশী পরিমাণে টক খাওয়া।

তিনটি বস্তু দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে– কেবলামুখী হয়ে বসা, নিদ্রার সময় সুরমা লাগানো এবং সবুজ বনানী দেখা।

পয়গম্বরগণ চিৎ হয়ে শয়ন করেন। কেননা তাঁরা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। আলেম ও আবেদগণ ডান পার্শ্বে শয়ন করেন। রাজা-বাদশাহ্‌রা খাদ্য হজম হওয়ার জন্যে বাম পার্শ্বে শয়ন করেন। উপুড় হয়ে শয়ন করা শয়তানের কাজ।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একাদশ অধ্যায়

বিবাহ

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ ধর্ম কাজে সহায়ক, শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উপায়। এই সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের মোকাবিলায় গর্ব করবেন। এ দিক দিয়ে বিবাহের কারণাদি অনুসন্ধান, সুন্নতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদব সম্পর্কে আলোচনা খুবই সমীচীন। আমরা এর উদ্দেশ্য, প্রকার ও প্রয়োজনীয় বিধানাবলী তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহের ফযীলত ও বিবাহের প্রতি বিমুখতা

বিবাহের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ এর ফযীলত এমনি বর্ণনা করেন যে, বিবাহ করা আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অপেক্ষা উত্তম। কেউ ফযীলত স্বীকার করেন; কিন্তু নারী সহবাসের উদ্দীপনা না থাকলে এবাদতের জন্যে নির্জনবাসকে উত্তম বলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আমাদের এ যুগে বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ। আগেকার যুগে এর ফযীলত ছিল। তখন মহিলাদের বদভ্যাস ছিল না। এখন বাস্তব সত্য কি, তা পক্ষ ও বিপক্ষের হাদীস বর্ণনা এবং বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করার পরই জানা যাবে। তাই আমরা এ পরিচ্ছেদটি চার ভাগে বিভক্ত করছি।

বিবাহের ফযীলত ঃ এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এই ঃ وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ (তোমাদের বিধবাদেরকে বিবাহ দাও।) এখানে صيغة الامر ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে বিবাহ ওয়াজিব বুঝা যায়। وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ (স্বামীদেরকে বিয়ে করে নিতে তাদেরকে বাধা দিয়ো না।) এখানে বিয়েতে বাধাদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের প্রশংসা ও গুণকীর্তনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً (আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছি ।) একথা অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশের স্থলে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওলীগণের প্রশংসাও করছেন, তারা তাঁর কাছে সন্তান সন্ততির জন্যে আবেদন করেন। সেমতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থাৎ, যারা বলে, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির তরফ থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের অগ্রদূত করুন।

বলা হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে সেই পয়গম্বরগণেরই উল্লেখ করেছেন, যারা সপত্নীক ছিলেন। হাঁ, দুজন পয়গম্বর হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যতিক্রম। তাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু সহবাস করেননি। কেবল বিবাহের ফযীলত অর্জন ও বিবাহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিবাহ করেছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন বিবাহ করবেন এবং সন্তানাদিও হবে।

বিবাহের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো এই ঃ

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হয়, সে আমার প্রতি বিমুখ হয়।

النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার ধর্মকে মহব্বত করে, সে যেন আমার সুন্নত পালন করে।

تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط ـ

বিবাহ কর এবং অনেক সংখ্যক হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে কেয়ামতের দিন অন্য সকল উম্মতের উপর গর্ব করব। এমনকি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গর্ভপাতজনিত শিশুদের নিয়েও।

ومن رغب عن سنتى فليس منى وان من سنتى النكاح فمن احبنى فليستن بسنتى -

অর্থাৎ, যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিবাহ আমার অন্যতম সুন্নত। অতএব, যে আমাকে মহব্বত করে, সে যেন আমার সুন্নত পালন করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে দারিদ্র্যের ভয়ে বিবাহ বর্জন করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। এ হাদীসে যে কারণে বিবাহ থেকে বিরত থাকা হয়, সেই কারণের নিন্দা করা হয়েছে– বিবাহ বর্জনের নিন্দা করা হয়নি। আরও বলা হয়েছে, যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। এক হাদীসে আছে–

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاء -

অর্থাৎ, যার যৌন সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, এতে দৃষ্টি বেশী নত থাকে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাযত হয়। আর যে বিবাহ করতে না পারে সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা তার জন্যে খাসী হওয়ার শামিল।

এ থেকে জানা গেল, বিবাহের ফযীলতের কারণ হচ্ছে চক্ষু ও লজ্জাস্থান দূষিত হওয়ার আশংকা। খাসী হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোযার কারণে কামভাব হ্রাস পাওয়া। এক হাদীসে আছে– যখন তোমার কাছে এমন কেউ আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততায় তুমি সন্তুষ্ট, তখন তার বিবাহ করে দাও। এরূপ না করলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি হবে। এখানে ফযীলতের কারণ গোলযোগের আশংকা বর্ণিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে নিজে বিবাহ করবে অথবা অন্যের বিবাহ করে দেবে, সে আল্লাহ তাআলার ওলী হওয়ার হকদার হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ধর্ম সংরক্ষিত করে নেয়। এখন বাকী অর্ধেকের জন্যে তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিবাহের ফযীলতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণ হচ্ছে বিরোধ থেকে বাঁচা এবং অনর্থ থেকে দূরে থাকা। কেননা, দুটি বস্তুই মানুষের ধর্ম বিনষ্ট করে– লজ্জাস্থান ও পেট। বিবাহ করলে লজ্জাস্থানের বিপদ থেকে বাঁচা যায়। আরও বলা হয়েছে– মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি বিষয় বাকী থাকে। একটি হচ্ছে সৎ সন্তান। যে মৃত পিতার জন্যে দোয়া করে। বলাবাহুল্য, সন্তান হওয়ার উপায় বিবাহ ছাড়া কিছুই নয়।

বিবাহের ফযীলত সম্পর্কিত সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহ ঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ ধর্মপরায়ণতা বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে না। কেবল দুটি বিষয়ই বিবাহে বাধা দান করে– অক্ষমতা ও দুশ্চরিত্রতা। এতে তিনি বিবাহের বাধা দুটি বিষয়ে সীমিত করে দিয়েছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিবাহ না করা পর্যন্ত আবেদের এবাদত পূর্ণ হয় না। এর উদ্দেশ্য বিবাহ এবাদতের পরিশিষ্ট, কিন্তু বাহ্যতঃ তার উদ্দেশ্য এই মনে হয় যে, কামভাব প্রবল হওয়ার কারণে অন্তরের নিরাপত্তা বিবাহ ব্যতীত কল্পনীয় নয়। অন্তরের নিরাপত্তা ছাড়া এবাদত হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর কয়েকজন গোলাম যখন বালেগ হয়ে যায়, তখন তাদেরকে একত্রিত করে তিনি বললেন ঃ তোমরা বিবাহ করতে চাইলে আমি বিবাহ করিয়ে দেব। কারণ, মানুষ যখন যিনা করে, তখন তার অন্তর থেকে ঈমান বের করে নেয়া হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ ধরে নেয়া যাক, আমার বয়সের মাত্র দশ দিন বাকী আছে, তবু বিবাহ করে নেয়াই আমার কাছে ভাল মনে হয়, যাতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে অবিবাহিত গণ্য হয়ে না যাই। হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের দুই স্ত্রী মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নিজেও মহামারীতে আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায়ও বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর সাথে অবিবাহিত হয়ে সাক্ষাৎ করতে আমার লজ্জা বোধ হয়। এ দুটি উক্তি থেকে বুঝা যায়, এ দুজন সাহাবীর মতে কামভাবের প্রাবল্য থেকে আত্মরক্ষা ছাড়া বিবাহের অন্যান্য ফযীলতও ছিল। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একাধিক বিবাহ করেছেন এবং বলতেন ঃ আমি কেবল সন্তানের জন্যে বিবাহ করি। জনৈক সাহাবী কেবল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতই করতেন এবং রাতে তাঁর কাছেই থাকতেন। তিনি একদিন উক্ত সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি বিয়ে কর না কেন? সাহাবী আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, একে তো আমি নিঃস্ব, কোন বিষয় আশয় নেই, দ্বিতীয়তঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপনার খেদমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবার একথা বললে সাহাবী একই জওয়াব দিলেন, কিন্তু এবার সাহাবী মনে মনে চিন্তা করলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মঙ্গল আমার চেয়ে বেশী বুঝেন। আমার জন্যে যা অধিক সমীচীন এবং আল্লাহর নৈকট্যের কারণ, তা তিনি জানেন। যদি তৃতীয় বার বলেন, তবে বিয়ে করে নেব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃতীয় বার বললে সাহাবী আরজ করলেন ঃ আপনি আমার বিয়ে করিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অমুক গোত্রে গিয়ে বল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমাদের মেয়ে আমার সাথে বিয়ে দিতে। সাহাবী আরজ করলেন ঃ হুযুর, আমার কাছে কিছু নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহ করে তোমাদের এ ভাইকে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন এবং এই সাহাবীকে সেই গোত্রে নিয়ে বিবাহ করিয়ে দিলেন। এর পর লোকের ওলীমা খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলে সাহাবীদের সকলে মিলে একটি ছাগলের ব্যবস্থা করে দেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বার বার বিয়ে করতে বলা এ কথাই জ্ঞাপন করে যে, খোদ বিবাহের মধ্যে ফযীলত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবাহের প্রয়োজন জানতে পেরেছিলেন।

কথিত আছে, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে জনৈক আবেদ এবাদতে সমসাময়িক সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ের পয়গম্বরের সামনে তার আলোচনা হলে পয়গম্বর বললেন ঃ যদি একটি সুন্নত বর্জন না করত, তবে সে চমৎকার ছিল বটে। আবেদ পয়গম্বরের কথা শুনে দুঃখিত হয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ আমি কোন্ সুন্নতটি বর্জন করেছি? পয়গম্বর বললেন ঃ তুমি বিবাহ বর্জন করেছ। আবেদ আরজ করল ঃ আমি বিবাহ নিজের উপর হারাম করিনি, কিন্তু আমি নিঃস্ব, আমার ব্যয়ভার অন্যে বহন করে। এ কারণে কেউ আমাকে কন্যা দান করে না। পয়গম্বর বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার কন্যা দিচ্ছি। সেমতে আবেদের সাথে পয়গম্বর কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিশর ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনটি বিষয়ে আমার উপর ফযীলত রাখেন। প্রথম, তিনি নিজের জন্যে ও অন্যের জন্যে হালাল রুজি অন্বেষণ করেন, আর আমি কেবল নিজের জন্যেই অন্বেষণ করি। দ্বিতীয়, তিনি বিবাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করার অবকাশ রাখেন; কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সংকীর্ণ। তৃতীয়, তিনি জনগণের ইমাম।

কথিত আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পত্নী অর্থাৎ, আবদুল্লাহ জননী যেদিন ইন্তেকাল করেন, তার পরের দিন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করে নেন এবং বলেন ঃ আমার মনে হয় যেন রাতে আমি অবিবাহিত। বিশরকে লোকে বলল, মানুষ আপনাকে বিবাহের সুন্নত বর্জনকারী বলে থাকে। বিশর বললেন ঃ আপত্তিকারীদেরকে বলে দাও, আমি ফরযের কারণে সুন্নত থেকে বিরত রয়েছি। পুনরায় কেউ তাঁর বিবাহের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াত আমাকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ মহিলাদেরও নিয়মানুযায়ী হক আছে, যেমন তাদের উপর স্বামীদের হক আছে। বর্ণিত আছে, বিশরকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে আমার মর্যাদা উঁচু হয়েছে এবং পয়গম্বরগণের মর্তবার কাছে পৌঁছেছে; কিন্তু বিবাহিতদের মর্তবা পর্যন্ত পৌছেনি। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ অধিক পত্নী দুনিয়াদারী নয়। কেননা, হযরত আলী (রাঃ) অন্য সাহাবীগণের তুলনায় অধিক সংসারত্যাগী ছিলেন। অথচ তাঁর চার জন পত্নী ছিলেন।

বিবাহের প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণ ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ দুশ' বছর পরে মানুষের মধ্যে সেই উত্তম হবে, যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কম রাখবে। তার না স্ত্রী থাকবে, না বাচ্চা। তিনি আরও বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তার স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির হাতে ধ্বংস হবে। তারা দারিদ্র্যের খোঁটা দেবে এবং তাকে এমন কাজ করতে বলবে, যা তার আয়ত্তাধীন নয়। ফলে সে এমন পথে পদচারণা করবে, যেখানে তার ধর্ম বরবাদ হবে। কাজেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এক হাদীসে আছে– সন্তান-সন্ততি কম হওয়াও দুই ধনাঢ্যতার একটি। পক্ষান্তরে পরিবার-পরিজন বেশী হওয়াও দুই দারিদ্র্যের একটি। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ একা ব্যক্তি আমলের স্বাদ ও অন্তরের প্রশস্ততা যতটুকু পায়, সপত্নীক ব্যক্তি ততটুকু পায় না। একথাও তিনিই বলেন– আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে পাইনি, যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিবাহ করার পর তার প্রথম মর্তবায় কায়েম রয়েছে। তিনি আরও বলেন ঃ তিনটি বিষয় যে অন্বেষণ করে সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক, যে জীবিকা অন্বেষণ করে, দুই, যে কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং তিন, যে হাদীস লেখে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যে বান্দার কল্যাণ করতে চান, তাকে অর্থকড়ি, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে মশগুল করেন না। একদল লোক এ উক্তি নিয়ে বিতর্ক করার পর সাব্যস্ত করে যে, এ অর্থকড়ি, স্ত্রী ও সম্পদ মোটেই থাকবে না; বরং উদ্দেশ্য এগুলো থাকবে ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা হবে না। এ বিষয়টিই আবু সোলায়মান দারানীর এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, অর্থকড়ি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি যে বস্তুই তোমাকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাই তোমার জন্যে অলক্ষুণে। মোট কথা, যারা বিবাহ থেকে বিরত হওয়ার কথা বলেছেন, তারা সর্বাবস্থায় বলেননি; বরং একটি শর্তাধীনে বলেছেন। বিবাহের ফযীলতও সর্বাবস্থায় এবং শর্তাধীনে বর্ণিত আছে। তাই বিবাহের উপকারিতা ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিবাহের উপকারিতা ঃ সন্তান হওয়া, কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করা, ঘরকন্নার ব্যবস্থা করা, দল বৃদ্ধি করা, মহিলাদের সাথে থাকার ব্যাপারে আত্মিক সাধনা করা– সংক্ষেপে এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে বিবাহের উপকারিতা। এখন প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা দরকার।

(১) সন্তান হওয়া ঃ সবগুলোর মধ্যে এটাই মূল। মানব বংশ অব্যাহত রাখার উদ্দেশেই বিবাহ প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে জগৎ মানবশূন্য হয়ে না যায়। নর ও নারীর মধ্যে নিহিত কাম-বাসনা সন্তান হওয়ার একটি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। যেমন জন্তুকে জালে আবদ্ধ করার জন্যে দানা ছড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি নর নারীর সহবাসস্পৃহা সন্তান লাভের একটি উপায়। খোদায়ী শক্তি এসব ঝামেলা ছাড়াই মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল; কিন্তু খোদায়ী প্রজ্ঞা এটাই চেয়েছে যে, ঘটনাবলী কারণাদির মধ্যেই সীমিত থাকুক। যদিও এর প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আপন কুদরত জাহির করা, বিস্ময়কর কারিগরি সম্পন্ন করা এবং স্বীয় পূর্ব ইচ্ছা, নির্দেশ ও কলমের লিখন অনুযায়ী অস্তিত্ব দান করার জন্যে এ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। কামপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত অবস্থায় সন্তান লাভের উপায় হিসেবে বিবাহ করলে তা চারি প্রকারে সওয়াবের কারণ হয়, যা বিবাহের ফযীলতের মূল কথা। এমনকি এগুলোর কারণেই বুযুর্গগণ অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সামনে যাওয়া পছন্দ করেননি। প্রথম, সন্তান লাভের চেষ্টা করা আল্লাহ তাআলার মর্জির অনুকূল। কেননা, এতে মানব জাতির অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় ঃ এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত পাওয়া যায়। কেননা, যে সংখ্যাধিক্য নিয়ে তিনি গর্ব করতেন, এ চেষ্টা তারই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, মৃত্যুর পর সৎকর্মপরায়ণ সন্তানের দোয়া আশা করা যায়। চতুর্থ, কচি বয়সে সন্তান মারা গেলে সে সুপারিশকারী হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম প্রকারটি সর্বাধিক সূক্ষ্ম এবং জনাসাধারণের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। অথচ আল্লাহ তাআলার অভূতপূর্ব কারিগরি ও বিধানাবলী সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞাত, তাদের মতে এটাই সর্বাধিক শক্তিশালী ও সঠিক প্রকার। এর প্রমাণ, যদি কোন মনিব তার গোলামকে বীজ, কৃষিক্ষেত্র সরবরাহ করে এবং গোলামও সে কাজ করতে সক্ষম হয়, তবে গোলাম অলসতা করে কৃষিকাজের সাজসরঞ্জাম বেকার ফেলে রাখলে এবং বীজ নষ্ট করে দিলে অবশ্যই মনিবের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হবে। এখন দেখা দরকার, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কি সরবরাহ করেছেন? তিনি মানুষকে যুগল সৃষ্টি করেছেন, নরকে প্রজননযন্ত্র ও অণ্ডকোষ দিয়েছেন এবং কটিদেশে বীর্য সৃষ্টি করে তা শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অপর দিকে নারীর গর্ভাশয়কে বীর্য ধারণের পাত্র করেছেন। এর পর নর নারী উভয়ের উপর কামপ্রবৃত্তি ও যৌনবাসনা চাপিয়ে দিয়েছেন। এসব আয়োজন স্পষ্ট ভাষায় স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। যদি আল্লাহ তাআলা রসূলের (সাঃ) মুখে আপন উদ্দেশ্য বর্ণনা নাও করতেন, তবুও বুদ্ধিমানদের জন্যে এসব আয়োজন ও সাজসরঞ্জামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝে নেয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূল (সাঃ)-এর মুখে এ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ تناكحوا تناسلوا তোমরা পরস্পরে বিবাহ কর এবং বংশ বিস্তার কর। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি বিবাহ থেকে বিরত থাকবে সে কৃষিকাজে বিমুখ, বীজ ধ্বংসকারী এবং আল্লাহ তাআলার আয়োজন ব্যর্থকারী হিসেবে গণ্য হবে। সে প্রকৃতির সেই উদ্দেশ্য ও রহস্যের খেলাফ করবে, যা সৃষ্টি অবলোকন করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এ কারণেই শরীয়ত সন্তান হত্যা করতে এবং জীবিত কবরস্থ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। কেননা, এটাও অস্তিত্ব পূর্ণ হওয়ার পরিপন্থী। সার কথা, যে বিবাহ করে, সে এমন একটি বিষয় পূর্ণ করতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সচেষ্ট হয়, যা পূর্ণ করা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যে বিবাহ থেকে বিরত থাকে, সে এমন বস্তুকে বিনষ্ট ও বেকার করে দেয়, যা বিনষ্ট করা আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়। এছাড়া সে সেই বংশের গতি স্তব্ধ করে দেয়, যা আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন এবং সে নিজেই কৌশল করে, যাতে তার মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি তার স্থলাভিষিক্ত না হয়। যদি বিবাহের কারণ যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই হত, তবে হযরত মুয়ায মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বলতেন না যে, আমাকে বিবাহ করাও, যাতে আল্লাহ তাআলার কাছে অবিবাহিত অবস্থায় না যাই। এখানে প্রশ্ন হয়, তখন তাঁর সন্তানের আশা ছিল না, তবুও বিবাহের বাসনা করার কারণ কি ছিল? এর জওয়াব, সন্তান সহবাসের ফলে হয়। সহবাসের কারণ যৌনস্পৃহা। এটা বান্দার ইচ্ছাধীন নয়। যৌনস্পৃহায় গতিবেগ সঞ্চার করে, কেবল এমন বিষয় মওজুদ করাই বান্দার ইচ্ছাধীন। এটা সর্বাবস্থায় হতে পারে। সুতরাং যে বিবাহ করে সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করে। অবশিষ্ট বিষয়গুলো তার আয়ত্তের বাইরে। এ কারণেই পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জন্যেও বিবাহ করা মোস্তাহাব। বিবাহ সন্তান লাভের উপায়, এর দ্বিতীয় কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। যে বস্তু দ্বারা তিনি গর্ব করবেন, তার প্রাচুর্য বিবাহ দ্বারাই হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর কার্য থেকেও তা বুঝা যায়। বর্ণিত আছে, তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। তিনি বলতেন ঃ আমি সন্তানের জন্যে বিবাহ করি। হাদীসে বর্ণিত বন্ধ্যা নারীর নিন্দা থেকেও একথা বুঝা যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ গৃহের কোণের মাদুর বন্ধ্যা নারীর তুলনায় উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ خير نسائكم الولود الودود -যে নারী সন্তান প্রসব করে এবং ভালবাসে, সে তোমাদের উত্তম স্ত্রী। আরও বলা হয়েছে- কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান প্রসবকারিণী নারী সুন্দরী বন্ধ্যা নারী অপেক্ষা উত্তম। এসব রেওয়ায়েত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, বিবাহের ফযীলতে সন্তান চাওয়ারও দখল আছে। কেননা, সুন্দরী স্ত্রী পুরুষের পবিত্রতা কায়েম রাখা, দৃষ্টি নত রাখা এবং কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে অধিক শোভনীয়। এতদসত্ত্বেও সন্তানের দিকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলাকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় কারণ– মৃত্যুর পর সৎ সন্তান থাক, যে পিতার জন্যে দোয়া করবে। হাদীসে আছে, সন্তানের দোয়া পিতার সামনে নূরের খাঞ্চায় রেখে পেশ করা হয়। কোন কোন লোক বলে, মাঝে মাঝে সন্তান সৎ হয় না। এটা বাজে কথা। কেননা, ধর্মপরায়ণ মুসলমানের সন্তান প্রায়শঃ সৎ-ই হবে; বিশেষতঃ যখন তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করা হয় এবং ভাল কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। সারকথা, সৎ হোক কিংবা অসৎ, সর্বাবস্থায় ঈমানদারের দোয়া পিতা-মাতার জন্যে উপকারী হয়ে থাকে। সন্তান সৎকাজ করে দোয়া করলে পিতা তার সওয়াব পাবে। কেননা, সন্তান তার উপার্জন, কিন্তু অসৎ কাজ করলে পিতাকে তজ্জন্যে জওয়াবদিহি করতে হবে না। কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

একজনের পাপের বোঝা অন্য জনে বহন করবে না।

উপরোক্ত বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

অর্থাৎ, আমি মিলিয়ে দেব তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদের কোন আমল হ্রাস করব না। অর্থাৎ, তাদের আমল হ্রাস না করে অতিরিক্ত অনুগ্রহস্বরূপ তাদের সন্তানকে তাদের সাথে সংযুক্ত করে দেব।

চতুর্থ কারণ– অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার জন্যে সুপারিশকারী হবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান তার পিতামাতাকে জান্নাতের দিকে টেনে নেবে। কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে– সন্তান পিতামাতার কাপড় ধরবে, যেমন আমি তোমার কাপড় ধরছি। আরও বলা হয়েছে– সন্তানকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে। সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে থেমে যাবে এবং রাগ করে বলবে ঃ আমার পিতামাতা সঙ্গে থাকলে আমি জান্নাতে যাব। তখন আদেশ হবে– তার পিতামাতাকে তার সাথে জান্নাতে দাখিল কর। অন্য হাদীসে আছে, কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্যে সন্তানরা সমবেত হলে ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। সন্তানরা জান্নাতের দরজায় আসবে। তাদেরকে বলা হবে– মুসলমানের সন্তানরা, তোমরা ভিতরে এস। তোমাদের কোন হিসাব-কিতাব নেই। সন্তানরা বলবে ঃ আমাদের পিতামাতা কোথায়? ফেরেশতারা বলবে ঃ তারা তোমাদের মত নয়। তাদের পাপকর্ম আছে। তাদের হিসাব-নিকাশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আছে। একথা শুনে সন্তানরা হঠাৎ গোঁ ধরবে এবং জান্নাতের দরজায় ফরিয়াদ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন ঃ এই ফরিয়াদ কিসের? ফেরেশতারা বলবে ঃ ইলাহী, এরা মুসলমানদের সন্তান। এরা বলে ঃ আমরা পিতামাতাকে সঙ্গে না নিয়ে জান্নাতে যাব না। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করবেন– এই দলের মধ্যে যাও এবং তাদের পিতামাতার হাত ধরে জান্নাতে দাখিল কর। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من مات له اثنان من الولد فقد احتظر محتظرا من النار .

অর্থাৎ, যার দু'সন্তান মারা যায়, তার মধ্যে ও জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে একটি প্রাচীর অন্তরায় হয়ে যাবে। আরও আছে–

من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم قيل يا رسول الله واثنان قال واثنان .

অর্থাৎ, যার তিনটি সন্তান বালেগ হওয়াব পূর্বে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত রহমতস্বরূপ। কেউ প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মারা গেলে? তিনি বললেন ঃ দু'জন মারা গেলেও তাই হবে।

জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা বিবাহ করতে বলত, কিন্তু তিনি কিছুদিন পর্যন্ত অস্বীকার করতে থাকেন। একদিন ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলেনঃ আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বিয়ে করিয়ে দিল এবং বিয়ে করার খাহেশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। বুযুর্গ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমাকে ছেলে দেবেন এবং শৈশবে তার মৃত্যু হবে। ফলে পরকালে সে আমার উপকারে আসবে। এর পর বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন কেয়ামত কায়েম হয়েছে। সকলের সাথে আমিও কেয়ামতের ময়দানে দন্ডায়মান। পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্য সবই পিপাসায় তেমনি কাতর। এর পর দেখি, কিছু সংখ্যক শিশু কাতার ডিঙ্গিয়ে চলে আসছে। তাদের মাথায় নূরের রুমাল এবং হাতে রূপার পাত্র ও স্বর্ণের গ্লাস। তারা এক একজনকে পানি পান করিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে এবং অনেককে ছেড়েও চলেছে। আমি এক শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম ঃ পিপাসায় আমার শোচনীয় অবস্থা। আমাকে পানি পান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করাও। সে বলল ঃ আমরা মুসলমানদের সন্তান– শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলাম।

কোরআনে বলা হয়েছে وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রে প্রেরণ কর।

এর এক অর্থ এরূপও করা হয়েছে, এখানে উদ্দেশ্য শিশুদেরকে অগ্রে প্রেরণ করা। মোট কথা, উপরোক্ত চারটি কারণ থেকেই জানা গেল, বিবাহের ফযীলত বেশীর ভাগ এ কারণেই যে, এটা সন্তান লাভ করার উপায়।

বিবাহের দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, শয়তানের চক্রান্ত থেকে হেফাযতে থাকা, কামস্পৃহা দমিত রাখা এবং দৃষ্টি নত রাখা। এতে করে লজ্জাস্থান সংরক্ষিত হয়ে যায়। হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে– যে বিবাহ করে সে তার অর্ধেক ধর্ম বাঁচিয়ে নেয়। অতঃপর বাকী অর্ধেকের জন্যে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এ উপকারিতা প্রথম উপকারিতার তুলনায় কম। কেননা, কামস্পৃহার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিবাহ যথেষ্ট; কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তান লাভ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে বিবাহ করে, সে মর্তবায় সেই ব্যক্তির উপরে, যে কেবল কামস্পৃহার বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিবাহ করে। তবে কামস্পৃহা সন্তান লাভে সহায়ক হয়ে থাকে। এতে আর একটি রহস্য বিদ্যমান যে, কামস্পৃহা চরিতার্থ করার মধ্যে এমন আনন্দ রয়েছে, যা চিরস্থায়ী হলে তার সমতুল্য কোন আনন্দ নেই। এ আনন্দ জান্নাতে প্রতিশ্রুত আনন্দের সন্ধান দেয়। এটা উদ্রেক করার কারণ, যে আনন্দের স্বাদ জানা থাকে না, তার প্রতি উৎসাহিত করা অনর্থক হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে নারী সম্ভোগের উৎসাহ দেয়া মোটেই উপকারী নয়। সুতরাং স্বাদ জানার জন্যেই মানুষের মধ্যে কামস্পৃহা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে সে জান্নাতে একে চিরস্থায়ী করতে আগ্রহী হয়, যা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের উপর নির্ভরশীল। এখন আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ও রহমত চিন্তা করা দরকার যে, এক কামস্পৃহার মধ্যে তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'প্রকার জীবন নিহিত রেখেছেন। বাহ্যিক জীবন এভাবে যে, কামস্পৃহার মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকে। এটাও মানব জাতির জন্যে এক প্রকার স্থায়িত্ব। আর আভ্যন্তরীণ জীবন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হচ্ছে পারলৌকিক জীবন, যার কারণ কামস্পৃহাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কামস্পৃহার দ্রুত অবসান দেখে মানুষ চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আনন্দ লাভের ফিকির করে এবং সেটা অর্জন করার জন্যে এবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব কামস্পৃহার কারণেই যেন জান্নাতের নেয়ামত হাসিলের সাধনা করা সহজ হয়ে যায়। সারকথা, কামোদ্দীপনা দমন হেতু বিবাহ করা শরীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই ব্যক্তির জন্যে, যে অক্ষম ও পুরুষত্বহীন নয়। অধিকাংশ মানুষই এরূপ। এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, কামস্পৃহা প্রবল হলে এবং তা দমন করার মত তাকওয়ার শক্তি না থাকলে মানুষ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে–

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ـ

অর্থাৎ, এমনটি না করলে পৃথিবীতে অনর্থ ও মহাগোলযোগ হবে।

কামস্পৃহা প্রবল হওয়ার সময় তাকওয়ার বাধা থাকলেও এর পরিণতি হবে, মানুষ কেবল বাহ্যিক অঙ্গকে বিরত রাখবে অর্থাৎ, দৃষ্টি নত ও লজ্জাস্থান সংরক্ষিত রাখবে; কিন্তু অন্তরকে কুমন্ত্রণা ও কুচিন্তা থেকে বাঁচানো তার ক্ষমতার বাইরে থাকবে। তার মনে এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব থাকবে এবং সহবাসের চিন্তাভাবনা হবে। মাঝে মাঝে এটা নামাযের ভেতরে উপস্থিত হতে পারে এবং নামাযের মধ্যে এমন কল্পনা আসতে পারে যা মানুষের কাছে বলা লজ্জার কারণে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্ তাআলা মনের অবস্থা জানেন। মনই মুরীদের জন্যে আখেরাতের পথে চলার একমাত্র পুঁজি। কাজেই মনে কুচিন্তা থাকা খুবই খারাপ। সদা-সর্বদা রোযা রাখলেও কুমন্ত্রণার মূল উৎপাটিত হয় না। হাঁ, রোযা রাখতে রাখতে দেহ দুর্বল এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেলে কুমন্ত্রণা দূর হওয়া সম্ভবপর। এসব কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আবেদের এবাদত বিবাহ দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। কামস্পৃহার প্রাধান্য একটি ব্যাপক মসিবত। কম মানুষই এ থেকে মুক্ত থাকে। لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا আমাদেরকে এমন বোঝা বহন করতে দিয়ো না, যার শক্তি আমাদের নেই। –এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন ঃ এখানে কামোদ্দীপনা বুঝানো হয়েছে ঃ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا –মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে –এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ এখানে দুর্বল অর্থ যে নারী সম্ভোগের ব্যাপারে সবর করে না। হযরত কাইয়াস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ যখন মানুষের পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়, তখন তার দুই তৃতীয়াংশ বুদ্ধি লোপ পায়। কেউ বলেন ঃ তার তৃতীয়াংশ দ্বীনদারী বরবাদ হয়ে যায়। নাওয়াদেরুত্তাফসীরে বর্ণিত আছে, مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যখন তা ঘনীভূত হয় –এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে উদ্দেশ্য পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হওয়া। মোট কথা, এটা এমন এক বিপদ, যা উত্তেজিত হলে তার মোকাবিলা জ্ঞানবুদ্ধি এবং দ্বীনদারীও করতে পারে না। এদিকেই ইশারা করা হয়েছে এই হাদীসে–

ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذى الباب منكن .

অর্থাৎ, নারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– আমি এমন কোন স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প দ্বীনওয়ালা দেখিনি, যে বুদ্ধিমানদের উপর তোমাদের চেয়ে অধিক প্রবল হয়ে যায়।

রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَقَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার কানের, আমার চোখের, আমার অন্তরের এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে। এখন বুঝা উচিত, যে বিষয় থেকে রসূলে পাক (সাঃ) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, অন্য ব্যক্তি সে বিষয়ে অবহেলা কিরূপে করতে পারে?

বিবাহের তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে চিত্তবিনোদন এবং এর দ্বারা এবাদতে শক্তি সঞ্চয়। কেননা, মন এবাদত থেকে সব সময় পলায়নপর থাকে। এটা তার মজ্জাবিরোধী। সুতরাং মনকে সদাসর্বদা তার খেলাফ কাজে লাগিয়ে রাখলে সে অবাধ্য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে বিনোদনের মাধ্যমে তাকে সুখ দিলে সে খুশী থাকবে। নারীর সাথে চিত্তবিনোদনে এমন সুখ পাওয়া যায়, যা সকল ক্লেশ দূর করে দেয়। সুতরাং বৈধ বিষয় দ্বারা মনকে সুখ দেয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا .

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, যাতে সে তার কাছে অবস্থান করে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন ঃ এক মূহূর্ত হলেও মনকে সুখ দাও। কেননা, যখন মনকে দিয়ে বলপূর্বক কাজ নেয়া হয়, তখন মন অন্ধ হয়ে যায়। বিবাহের চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, ঘরকন্নার ব্যবস্থাপনা তথা রান্নাবান্না করা, ঝাড় দেয়া, বিছানা করা ও থালাবাসন মাজা। কেননা, গৃহে পুরুষ একা থাকলে এসব কাজ করা তার জন্যে কঠিন হবে। এতে তার অনেক সময় নষ্ট হবে। ফলে এলেম ও আমলের জন্যে অবসর পাবে না। এদিক দিয়ে সাধ্বী নারী ঘরকন্নার ব্যবস্থাপনা করে তার স্বামীর ধর্মকর্মে সহায়তা করে। এ কারণেই আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সাধ্বী সুনিপুণা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা দুনিয়াদারীর মধ্যে গণ্য হয় না। কেননা, তার মাধ্যমে পুরুষ আখেরাতের কাজ করার সময় পায়।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۔

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে পুণ্য দান কর।

–এ আয়াতের তফসীরে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন ঃ এখানে দুনিয়ার পুণ্য বলে সুশীলা সুনিপুণা স্ত্রী বুঝানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ বান্দাকে ঈমানের পর ভাগ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কোন কিছু দেয়া হয়নি। স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আশীর্বাদ হয়ে থাকে যে, কোন দান তাদের বিনিময় হতে পারে না। আবার কতক এমন গলার বেড়ী হয় যে, তাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণের বিনিময়েও রেহাই পাওয়া যায় না। রসূলে আকরাম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব দু'টি বিষয়ে– এক, তাঁর স্ত্রী অবাধ্যতার কাজে তাঁর মদদগার ছিল। আর আমার পত্নী আল্লাহ তাআলার আনুগত্যমূলক কাজে আমার সাহায্য করে। দ্বিতীয়, তাঁর শয়তান কাফের ছিল আর আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। সে ভাল কাজ ছাড়া কিছু আদেশ করে না। মোট কথা, এটাও এমন এক উপকারিতা, যা সৎলোকেরা কামনা করে, কিন্তু এ উপকারিতার পূর্বশর্ত হচ্ছে, দু'পত্নী থাকা চলবে না। কেননা, দু'পত্নী থাকলে প্রায়ই পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জীবন নিরানন্দ হয়ে যায়।

বিবাহের পঞ্চম উপকারিতা, এতে নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেননা, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা, তাদের আচার-আচরণ মনের বিরোধী হলেও সবর করা, তাদের জন্যে কষ্ট করা, তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা, তাদেরকে ধর্মের পথ বলে দেয়া, তাদের খাতিরে হালাল উপার্জনে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করা এবং তাদের লালনপালন করা– এসবই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, এগুলো প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনতুল্য। স্ত্রী ও পুত্র-পরিজন হচ্ছে প্রজা। প্রজার হেফাযত উচ্চস্তরের কাজ। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يوم من وال عادل افضل من عبادة سبعين سنة -

অর্থাৎ, ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছর এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি নিজের ও অপরের সংশোধনে আত্মনিয়োজিত, সে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে কেবল নিজের সংশোধনে মশগুল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উৎপীড়ন সহ্য করে, সে তার মত নয়, যে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে মত্ত রাখে। মোট কথা, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের চিন্তাভাবনা করা আল্লাহর পথে জেহাদ করার মতই। তাই বিশরে হাফী (রাহঃ) বলেছিলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমার উপর তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তন্মধ্যে একটি, তিনি নিজের জন্যে ও অপরের জন্যে হালাল রুজি অন্বেষণ করেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মানুষ পরিবার-পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে তা খয়রাততুল্য। মানুষ সেই লোকমারও সওয়াব পায় যা সে তার স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়। এক বুযুর্গ জনৈক আলেমের কাছে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যেক আমল থেকে কিছু অংশ দিয়েছেন, এমন কি, হজ্জ জেহাদ ইত্যাদি থেকেও। আলেম বললেন ঃ তোমাকে আবদালের আমল তো দেয়াই হয়নি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদালের আমল কি উত্তর হল– হালাল উপার্জন করা এবং পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। ইবনে মোবারক যখন তাঁর ভাইদের সাথে জেহাদে ছিলেন, তখন একদিন বললেন ঃ তোমরা সেই আমল জান কি, যা আমাদের এই জেহাদ অপেক্ষা উত্তম, তারা বললেন ঃ না, আমরা জানি না। তিনি বললেন ঃ আমি জানি। প্রশ্ন হল ঃ সেটা কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সন্তানওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না, রাতে জেগে ছা-বাচ্চাদেরকে তৃপ্ত দেখে এবং তাদেরকে আপন কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়, তার আমল আমাদের এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জেহাদের চেয়ে উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معى فى الجنة كهاتين .

অর্থাৎ, যার নামায ভাল হয়, পরিবার-পরিজন বেশী হয়, অর্থসম্পদ কম হয় এবং যে মুসলমানদের পশ্চাৎ নিন্দা করে না, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

অন্য এক হাদীসে আছে–

ان الله يحب الفقير المتعفف بالعيال

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নিঃস্ব, সংযমী, পরিজনশীলকে ভালবাসেন।

হাদীসে আরও আছে– বান্দার গোনাহ অনেক হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিবার-পরিজনের চিন্তায় লিপ্ত করে দেন, যাতে তার গোনাহ দূর হয়ে যায়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ কিছু গোনাহ এমন আছে, তাঁর কাফফারা পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্পর্কে এক হাদীসে আছে, কিছু গোনাহ এমন আছে, যা জীবিকা উপার্জনের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন কিছু দূর করতে পারে না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من كان له ثلث بنات فانفق عليهن واحسن اليهم حتى يغنيهن الله عنه اوجب الله له الجنة البتة الا ان يعمل ما لايغفرله .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাদের ভরণপোষণ করে ও ততদিন তাদের দেখাশোনা করে, যতদিন আল্লাহ্ তাদেরকে স্বনির্ভর করে না দেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে নিশ্চিতরূপে জান্নাত ওয়াজিব করে দেন, কিন্তু সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করলে ভিন্ন কথা।

কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তার স্ত্রীর সাথে খুব সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করতেন। অবশেষে একদিন স্ত্রী মারা গেল। লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বললে তিনি বললেন ঃ না, আমার মানসিক শান্তির জন্যে একজনই যথেষ্ট ছিল। এর কিছুদিন পর বুযুর্গ বললেন ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক সপ্তাহ পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে কিছু লোক অবতরণ করছে এবং একে অপরের পেছনে শূন্যে চলে আসছে। যখন একজন আমার নিকটে নামে, তখন আমাকে দেখে তার পেছনের জনকে বলে ঃ অলক্ষুণে এ ব্যক্তিই। পেছনের জন বলে, হাঁ। এমনিভাবে তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে বলে এবং সে হাঁ বলে। আমি ভয়ে তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে পারি না। অবশেষে সকলের পরে এক বালক আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম ঃ মিয়া, সে হতভাগা কে, যার দিকে তোমরা ইশারা করছ? বালকটি বলল ঃ সে তুমি। আমি বললাম, এর কারণ কি? সে বলল ঃ যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, আমরা তাদের আমলের সাথে তোমার আমল উপরে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছে যাতে আমরা তোমার আমল জেহাদে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের আমলের সাথে লিপিবদ্ধ করি। আমরা জানি না তুমি নতুন কি কান্ড করেছ, যার কারণে এই আদেশ হয়েছে। এর পর সেই বুযুর্গ তার সঙ্গীদেরকে বিবাহ করিয়ে দিতে বললেন এবং অবশিষ্ট জীবন স্ত্রী-পরিজনের সাথে অতিবাহিত করলেন।

বর্ণিত আছে, কিছু লোক পয়গম্বর হযরত ইউনুস (আঃ)-এর গৃহে মেহমান হল। তিনি মেহমানদের আদর আপ্যায়নের জন্যে যখন অন্দরে আসা-যাওয়া করতেন, তখনই স্ত্রী তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করত এবং কটু কথা বলত, কিন্তু তিনি চুপ থাকতেন। মেহমানরা তাঁর এই সহনশীলতা দেখে অবাক হল। তিনি বললেন ঃ অবাক হবেন না। কেননা, আমি আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, পরকালে আমাকে যে শাস্তি দেয়ার আছে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। এতে এরশাদ হল, তোমার শাস্তি অমুক ব্যক্তির কন্যা। তাকে বিবাহ করে নাও। সেমতে আমি তাকে বিবাহ করেছি। আপনারা যে দুর্ব্যবহার দেখলেন, তাতে আমি সবর করি। এসব বিষয়ে সবর করলে ক্রোধ দমিত এবং অভ্যাস সংশোধিত হয়। কেননা, যে ব্যক্তি একা অথবা কোন সদাচারীর সঙ্গী হয়ে থাকে, তার নফসের মালিন্য ফুটে উঠে না এবং অভ্যন্তরীণ নষ্টামি প্রকাশ পায় না। তাই এ ধরনের ঝামেলায় ফেলে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং সবরের অভ্যাস গড়ে তোলা আধ্যাত্ম পথের পথিকের জন্যে অপরিহার্য। এতে তার অভ্যাস সুষম এবং অন্তর নিন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পাকসাফ হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিবার পরিজনের জন্যে সবর করাও একটি এবাদত। মোট কথা, এটাও বিবাহের একটি উপকারিতা, কিন্তু এ থেকে কেবল দু'প্রকার ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারে– (১) যে সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ও চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা করে, তার জন্যে এর মাধ্যমে সাধনার পথ জানা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথবা, (২) যে ব্যক্তি চিন্তাভাবনা ও অন্তরের গতিবিধি থেকে মুক্ত এবং কেবল বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি করে নেয়, এরূপ ব্যক্তির জন্যে স্ত্রী, পরিবার পরিজনের জন্যে হালাল উপার্জন এবং তাদের লালন পালন দৈহিক এবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা, দৈহিক এবাদতের ফায়দা অপরে পায় না। আর যে ব্যক্তি মূল মজ্জার কি দিয়ে সংশোধিত চরিত্রের অধিকারী অথবা পূর্ব সাধনার কারণে যার অভ্যাস মার্জিত, তার জন্যে এই উপকারিতার উদ্দেশে বিবাহ করা জরুরী নয়। কেননা, প্রয়োজনীয় সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম তার অর্জিতই রয়েছে।

বিবাহের কারণে সৃষ্ট বিপদাপদ ঃ প্রথম বিপদ হালাল রুজি-রোজগারে অক্ষম হওয়া। এটা সর্বাধিক মারাত্মক বিপদ। কেননা, প্রত্যেকেই হালাল রুজি-রোজগার করতে পারে না, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে যখন জীবন যাপন পদ্ধতি ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে, তখন মানুষ বিবাহ করলে বিবাহের কারণে অর্থের অন্বেষণও বেশী হবে। সে হারাম দ্বারা পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে বাধ্য হবে। ফলে নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে। পক্ষান্তরে যে অবিবাহিত, সে এই বিপদ থেকে মুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ হয় হয় যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্দ জায়গায় ঢুকে পড়ে এবং স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূরণের পেছনে পড়ে ইহকালের বিনিময়ে স্বীয় পরকাল বিক্রি করে দেয়। এক হাদীসে আছে বান্দাকে দাঁড়িপাল্লার নিকটে দাঁড় করা হবে। তার কাছে পাহাড়সম পুণ্য থাকবে। তখন তাকে পরিবার পরিজনের দেখাশুনা ও খেদমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং অর্থ সম্পদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা হবে, কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কিসে ব্যয় করেছে, অবশেষে এসব দাবী পূরণ তার সমস্ত পুণ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার কাছে কোন পুণ্যই থাকবে না। তখন ফেরেশতারা সজোরে বলবে– এই ব্যক্তির পরিবার-পরিজন দুনিয়াতে তার সমস্ত নেকী খেয়ে ফেলেছে। আজ সে তার আমলের বিনিময়ে বন্ধক হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কথিত আছে, কেয়ামতে সর্বপ্রথম মানুষকে যারা জড়িয়ে ধরবে, তারা হবে তার পরিবার-পরিজন। তারা তাকে আল্লাহ্ তাআলার সামনে দাঁড় করিয়ে বলবে ঃ ইলাহী, তার কাছ থেকে আপনি আমাদের প্রতিদান নিন। আমরা যা জানতাম না, সে আমাদেরকে তা বলেনি এবং আমাদের অজ্ঞাতে আমাদেরকে হারাম খাইয়েছে। এর পর তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দা দ্বারা পাপ কাজ করাতে চান, তখন দুনিয়াতে তার উপর দংশনকারী আযাব চাপিয়ে দেন, যে তাকে দংশন করতে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি পরিবার পরিজন মূর্খ হওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ্ নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে যাবে না। মোট কথা, এ বিপদটি এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, এ থেকে কম লোকই মুক্ত হবে। হাঁ, যার কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অথবা হালাল উপায়ে উপর্জিত যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ রয়েছে এবং সে অল্পে তুষ্ট ও অধিক ধন-সম্পদ অন্বেষণ থেকে বিরত, সে এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। ইবনে সালেম (রহঃ)-কে কেউ বিবাহ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমাদের এ যুগে বিবাহ করা, তার জন্যেই উত্তম, যার কামস্পৃহা গাধার মত প্রবল। গাধা মাদীকে দেখলে শত পিটুনি খেয়েও তার কাছ থেকে সরে না। পক্ষান্তরে যার নফস তার আয়ত্তে থাকে, তার জন্যে বিবাহ না করা উত্তম।

বিবাহের দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে, তাদের আচার অভ্যাসে সবর করতে এবং তাদের পীড়নে সহনশীল হতে অক্ষমতা। এ বিপদটি প্রথম বিপদের তুলনায় কম। কেননা, এতে সক্ষম হওয়া প্রথমটিতে সক্ষম হওয়ার তুলনায় সহজ। নারীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা, তাদের হক আদায় করা, হালাল রুজি অন্বেষণের মত কঠিন নয়, কিন্তু এতে অবশ বিপদাশংক্যা আছে। কেননা, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন প্রজাতুল্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. মানুষ যাদের ভরণ পোষণ করে তাদের হক নষ্ট করা গোনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে পলায়ন করে, সে সেই পলাতক গোলামের মত, যে তার প্রভুর কাছ থেকে পলায়ন করে। পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরে না আসা পর্যন্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার নামায রোযা কিছুই কবুল হয় না। আর যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম, সে তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পলাতক গোলামেরই মত। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। এতে নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে বলা হয়েছে। মানুষ কখনও নিজের হকও আদায় করতে পারে না। এমতাবস্থায় বিবাহ করলে তার উপর দ্বিগুণ হক ওয়াজিব হয়ে যাবে। নিজের সাথে অন্যও শামিল হবে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বিবাহ করতে আপত্তি করেন এবং বলেন ঃ আমি নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এর উপর অন্যকে কিরূপে সংযুক্ত করি। অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম আদহাম বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন ঃ আমি নিজের কারণে কোন মহিলাকে বিপদে ফেলতে চাই না। অর্থাৎ, তার হক আদায় করতে এবং তার উপকার করতে আমি অক্ষম। বিশরে হাফীও এমনি ওযর পেশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি আমার বিবাহের পথে বাধা– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ নারীদেরও তেমনি হক রয়েছে, যেমন তাদের কাছে অন্যের হক রয়েছে।

সারকথা, এটাও একটা ব্যাপক বিপদ, যদিও প্রথম বিপদের তুলনায় এর ব্যাপকতা কম। এ বিপদ থেকে এমন ব্যক্তিই নিরাপদ থাকবে যে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, নারী চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাদের কটু কথায় ধৈর্যশীল এবং তাদের হক আদায় করতে আগ্রহী, কিন্তু এখন তো অধিকাংশ লোক নির্বোধ, কটুভাষী, কঠোর স্বভাব এবং বেইনসাফ, যদিও নিজের জন্যে খুব ইনসাফ প্রত্যাশী। এরূপ লোকদের জন্যে অবিবাহিত থাকাই অধিক নিরাপদ।

বিবাহের তৃতীয় বিপদ, স্ত্রী-পুত্র পরিজন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং দুনিয়াদারীর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। এ বিপদটি প্রথমোক্ত দু'বিপদের তুলনায় কম ব্যাপক। এ বিপদে মানুষের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্যে অগাধ সাজ-সরঞ্জাম সঞ্চয় করতে ও তা রেখে যেতে সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, যেসব বিষয় আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে তা পরিবার পরিজন হোক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অথবা অর্থ-সম্পদ হোক, সমস্তই অমঙ্গলজনক হয়ে থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এসব বিষয় তাকে কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত করে দেবে। কেননা, এটা তো প্রথম ও দ্বিতীয় বিপদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; বরং উদ্দেশ্য, স্ত্রী পুত্র পরিজনের কারণে মানুষ বৈধ বস্তু দ্বারা বিলাসব্যসন, হাসি-তামাশা ও উপভোগে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। বিবাহের কারণে এ ধরনের ব্যস্ততা বহুলাংশে বেড়ে যায়। মন এগুলোতে ডুবে যায় সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও মানুষ আখেরাতের চিন্তা ও প্রস্তুতি গ্রহণের ফুরসত পায় না। এরূপ ক্ষেত্রেই হযরত ইব্রাহীম আদহাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নারীর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার দ্বারা কিছুই হতে পারে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্থাৎ, বিবাহ দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ হয়।

এ পর্যন্ত বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা পূর্ণরূপে বর্ণিত হল। এখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা উত্তম, না অবিবাহিত থাকা উত্তম, তা সর্বাবস্থায় বলা যায় না। কেননা, এসব বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া যায় না। বরং নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য হবে এসব উপকারিতা অপকারিতাকে কষ্টিপাথর মনে করে তাতে নিজের অবস্থা পরখ করা। যদি নিজের মধ্যে অপকারিতা না পায় এবং উপকারিতা বিদ্যমান থাকে, তবে জেনে নেবে, বিবাহ করাই তার জন্যে উত্তম। উদাহরণতঃ যদি তার কাছে হালাল অর্থসম্পদ বিদ্যমান থাকে, সে সচ্চরিত্রবান হয়, এমন পাকা দ্বীনদার হয় যে, বিবাহের কারণে আল্লাহ্র স্মরণে পার্থক্য হবে না এবং সর্বোপরি যৌবনের কারণে কামস্পৃহা দমিত করার প্রয়োজন থাকে, তবে তার জন্যে বিবাহ করা নিশ্চিতরূপেই উত্তম। আর যদি এসব উপকারিতা অনুপস্থিত থাকে এবং অপকারিতা বিদ্যমান থাকে, তবে নিঃসন্দেহে অবিবাহিত থাকা, তার জন্যে শ্রেয়। পক্ষান্তরে যদি উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়টি বিদ্যমান থাকে, যেমন– আমাদের যুগে এটাই প্রবল, তবে ন্যায়ের মানদণ্ডে পরিমাপ করতে হবে যে, উপকারিতা দ্বারা তার দ্বীনদারী কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং অপকারিতা দ্বারা ক্ষতি কতটুকু হবে, যদি প্রবল ধারণা একদিকে হয়ে যায়, তবে সেই অনুযায়ী মীমাংসায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপনীত হবে। উদাহরণতঃ দুটি উপকারিতা অধিক প্রকাশমান– সন্তান হওয়া এবং কামস্পৃহা দমিত হওয়া। তদনুরূপ বিপদও দুটি অধিক দেখা যায়, একটি হারাম উপার্জনের প্রয়োজন এবং অপরটি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত হওয়া। এখন আমরা চারটিকেই একটি অপরটির বিপরীতে ধরে নিয়ে বলি, যদি কোন ব্যক্তি কামস্পৃহার কষ্টে না থাকে এবং বিবাহের উপকারিতা কেবল সন্তান হওয়াই হয়, তবে উল্লিখিত দুটি অপকারিতা বিদ্যমান থাকলে তার জন্যে অবিবাহিত থাকাই উত্তম। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহর স্মরণে বাধা হয়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং হারাম উপার্জনেও কল্যাণ নেই। এ দুটি অপকারিতার কারণে যে ক্ষতি হবে, তা কেবল সন্তানের জন্যে চেষ্টা করার উপকারিতা দ্বারা পূরণ হবে না কেননা, সন্তানের জন্যে বিবাহ করলে সন্তানের জীবন যাপনের ব্যাপারেও চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এই জীবন একটি অনিশ্চিত বিষয়। অথচ দ্বীনদারীতে অপকারিতার ক্ষতি নিশ্চিত। দ্বীনদারীকে নির্বিঘ্ন রাখার মধ্যেই কল্যাণ। কেননা, দ্বীনদারী হচ্ছে পুঁজি। এটা নষ্ট হয়ে গেলে আখেরাতের জীবন বরবাদ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সন্তানের কল্যাণ উপরোক্ত দুটি বিপদের একটিরও বিপরীত হতে পারে না। তবে যদি সন্তানের সাথে কামস্পৃহা দমিত করার প্রয়োজনও অধিকতর প্রবল হয় তবে দেখতে হবে, বিবাহ না করলে যদি যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংক্ষা থাকে, তবে তার জন্যে বিবাহ করা উত্তম। কেননা, যে দুতরফা বিপদে ফেঁসে গেছে– বিবাহ না করলে যিনায় লিপ হবে এবং করলে হারাম উপার্জন করবে। উভয়েরর মধ্যে হারাম উপার্জন যিনার তুলনায় কম মারাত্মক। যদি বিশ্বাস রাখে যে, সে বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হবে না, কিন্তু দৃষ্টি নত রাখতে সক্ষম হবে না, তবে বিবাহ না করা ভাল। কেননা পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং হারাম উপার্জন করা উভয়টি হারাম হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, হারাম উপার্জন সব সময় হয় এবং এর কারণে সে নিজে এবং পরিবারের সকলেই গোনাহগার হয়, কিন্তু কুদৃষ্টি কদাচিত হয় এবং এ কারণে বিশেষভাবে সে নিজেই গোনাহগার হয়, অন্য কেউ তাতে শরীক হয়। এছাড়া এটা দ্রুত শেষও হয়ে যায়। কুদৃষ্টি যদিও চোখের যিনা, কিন্তু হারাম খাওয়ার তুলানায় এটা দ্রুত মাফ হতে পারে। তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি কুদৃষ্টির কারণে যিনায় লিপ্ত হবার ভয় থাকে, তবে তার অবস্থাও যিনায় লিপ্ত হবার ভয়ের মতই। মোট কথা, উপরোক্ত বিপদসমূহকে উপকারিতার সাথে তুলনা করে তদনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। যেব্যক্তি এসব রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে, তার জন্যে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের বর্ণিত বিভিন্নমুখী অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না। কেননা, বিবাহের প্রতি উৎসাহ এবং অনীহা অবস্থাভেদে উভয়টিই সঠিক। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিপদাপদ মুক্ত ব্যক্তির জন্যে এবাদতের উদ্দেশে অবিবাহিত থাকা উত্তম, না বিবাহ করা উত্তম, তবে এর জওয়াবে আমরা বলি, তার জন্যে উভয়টিই উত্তম। কেননা বিবাহ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এবাদতের পরিপন্থী নয়, বরং এ দৃষ্টিতে পরিপন্থী যে, এতে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং হালাল পথে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলে বিবাহও উত্তম। কারণ, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা এবাদত করা এবং এক মুহূর্তও আরাম না করা সম্ভবপর নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এক ব্যক্তি সর্বক্ষণ অর্থোপার্জনে ব্যয়িত হয় এবং পাঞ্জেগানা ফরয নামায, পানাহার ও প্রস্রাব পায়খানার সময় ছাড়া নফল এবাদতের জন্যে কোন সময় থাকে না, তবে তার জন্যেও বিবাহ করা ভাল। কেননা, হালাল অর্থোপার্জন, স্ত্রী পুত্র পরিজনের খেদমত, সন্তান লাভের প্রয়াস এবং নারী স্বভাবে সবর করার মধ্যেও নানা প্রকার এবাদত নিহিত রয়েছে, যার সওয়াব নফল এবাদতের চেয়ে কম নয়। পক্ষান্তরে যদি সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা জ্ঞান, চিন্তাভাবনা ও অন্তরের ভ্রমের মাধ্যমে এবাদত করে এবং বিবাহ করলে এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তার জন্যে বিবাহ না করা উত্তম।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বিবাহ করা উত্তম হলে হযরত ঈসা (আঃ) বিবাহ করলেন না কেন এবং আল্লাহর এবাদত উত্তম হলে হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) এত অধিক বিবাহ করলেন কেন, তবে এর জওয়াব এই যে, যেব্যক্তি সক্ষম, উচ্চ সাহসী এবং অধিক শক্তির অধিকারী, তার জন্যে উভয় বিষয়ই উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চূড়ান্ত পর্যায়ের শক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন তাই তিনি উভয় মাহাত্ম্য অর্জন করেছেন, অর্থাৎ, নয় পত্নীর স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিবাহ তাঁর জন্যে এবাদতে প্রতিবন্ধক হয়নি। যেমন জগতের বড় বড় দার্শনিকদের জন্যে প্রস্রাব-পায়খানার কাজ পার্থিব চিন্তাভাবনায় বাধা সৃষ্টি করে না, তারা বাহ্যতঃ প্রস্রাব পায়খানার কাজে মশগুল থাকেন এবং তাঁদের অন্তর আপন অভীষ্ট কর্মে নিমজ্জিত থাকে তেমনি রসূলে পাক (সাঃ)ও আপন উচ্চ মর্যাদার কারণে দুনিয়ার কাজকর্ম করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং এতে কোন বাধা অনুভব করতেন না। এ কারণেই এমন সময়েও তাঁর প্রতি ওহী নাযল হত, যখন তিনি নিজের পত্নীর সাথে শয্যায় থাকতেন। অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে এই মর্যাদা ধরে নেয়া সম্ভব, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বুঝতে হবে যে, নর্দমা সামান্য খড়কুটা দ্বারা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে এ কারণে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুরূপ অন্যকে মনে করা অনুচিত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিবাহ না করার কারণ, তিনি নিজের ক্ষমতার পতি লক্ষ্য করে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। অথবা সম্ভবতঃ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তাতে পারিবারিক ব্যস্ততা ক্ষতিকর হত অথবা তাতে বিবাহ ও এবাদত উভয়টি একত্রে সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি এবাদতের পথই বেছে নিয়েছেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ বন্ধনের শর্ত চতুষ্টয়

প্রথম ওলী তথা অভিভাবকের অনুমতি। মহিলার কোন অভিভাবক না থাকলে শাসনকর্তার অনুমতি তার স্থলবর্তী হবে। দ্বিতীয় মহিলা প্রাপ্ত বয়স্কা বা পূর্ব বিবাহিতা হলে তার সম্মতি। যদি কুমারী হয় এবং পিতা অথবা দাদা ছাড়া অন্য কেউ অভিভাবক হয়, তাহলেও মহিলার অনুমতি শর্ত। তৃতীয়তঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি, যারা বাহ্যতঃ বিশ্বাস্ত হবে, অর্থাৎ, অপকর্মের তুলনায় সৎকর্ম বেশী করে এমন । যদি এমন দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকে, যাদের অবস্থা জানা নেই, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। চতুর্থ ইজাব ও কবুল হওয়া।

বিবাহ বন্ধনের আদব ঃ প্রথমতঃ পাত্রীর অভিভবকের সাথে পূর্বাহ্ণে যোগাযোগ স্থাপন করবে, কিন্তু পাত্রী ইদ্দতে থাকলে পয়গাম দেবে না। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর পয়গাম দেবে। অনুরূপভাবে যদি অন্য কেউ বিবাহের পয়গাম দিয়ে থাকে, তবে তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পয়গাম দেবে না। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে খোতবা হবে এবং ইজাব কবুলের সাথে হামদ ও নাত থাকবে। উদাহরণতঃ ওলী বলবে– আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালাতু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি নিজের অমুক কন্যাকে তোমার বিবাহে দিলাম। বর বলবে– আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস সালাতু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি এই মোহরানার বিনিময়ে তার বিবাহ কবুল করলাম। মোহরানা নির্দিষ্ট ও কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। হামদ ও নাত খোতবার পূর্বেও মোস্তাহাব। তৃতীয়তঃ কনে কুমারী হলে বরের হাল অবস্থা কনের শ্রুতিগোচর করা উচিত। কেননা, এটা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার জন্যে উপযুক্ত। এ কারণেই বিবাহের পূর্বে কনে দেখে নেয়াও মোস্তাহাব। চতুর্থত ঃ দুজন সাক্ষী ছাড়া আরও কিছু সৎলোকের বিবাহ মজলিসে উপস্থিত থাকা উচিত। পঞ্চমতঃ বিবাহে সুন্নত পালন, দৃষ্টি নত রাখা, সন্তান লাভ করা এবং এর বর্ণিত উপকারিতাসমূহের নিয়ত করবে– কেবল মনের কামনা চরিতার্থ করা লক্ষ্য না হওয়া কর্তব্য। অন্যথায় এই বিবাহ দুনিয়ার কাজে গণ্য হবে। মনের কামনা থাকা উপরোক্ত তিনটি নিয়তের পরিপন্থী নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অধিকাংশ এবাদতকর্ম মনের খাহেশের অনুকূল হয়ে যায়। মোস্তাহাব হল বিবাহ মসজিদে ও শওয়াল মাসে করা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আমার বিবাহও শওয়াল মাসে হয় এবং আমরা প্রথম শওয়াল মাসেই মিলিত হই।

কনের অবস্থা ঃ কনের অবস্থা সম্পর্কে দু'প্রকার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, বিবাহের পরিপন্থী বিষয়াদি থেকে কনে মুক্ত কিনা তা দেখার দরকার এবং দ্বিতীয়, দেখা উচিত, তাকে বিবাহ করলে জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে কিনা এবং উদ্দেশ্য হাসিল হবে কিনা।

নিম্নে বিবাহের পরিপন্থী বিষয়াদি বর্ণিত হচ্ছে ঃ

১। অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী হওয়া। ২। অন্য স্বামীর কাছে থেকে তালাকপ্রাপ্তির পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইদ্দতে থাকা। ৩। মুখে কোন কুফরী কলেমা উচ্চারণ করার কারণে ধর্মত্যাগী হওয়া। ৪। অগ্নিপূজারী হওয়া। ৫। মূর্তিপূজারী ও যিনদীক হওয়া অর্থাৎ কোন ঐশী গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হওয়া। এমন নারীও এর অন্তর্ভুক্ত, যার মাযহাব হচ্ছে হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা অথবা এমন বিষয়ে বিশ্বাস করা, যার বিশ্বাসীকে শরীয়ত কাফের বলে। এ ধরনের কোন নারীকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। ৬। যে সকল আত্মীয়কে বিবাহ করা হারাম, কনে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অর্থাৎ মা, নানী, দাদী, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, বোন, ভাতিজী, ভাগ্নেয়ী ও তাদের সকলের সন্তান, ফুফু ও খালা হওয়া। ৭। দুধ পান করার কারণে হারাম হওয়া। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধ পান করার কারণেও সেসব আত্মীয় হারাম, কিন্তু পাঁচ বারের কম দুধ পান করলে ইমাম শাফেয়ীর মতে হারাম হয় না। (ইমাম আবু হানীফার মতে একবারেও হারাম হয়ে যায়।) জামাতা হওয়ার করণে হারাম হওয়া। উদাহরণতঃ বর ইতিপূর্বে কনের কন্যা, পৌত্রী অথবা দৌহিত্রীকে বিবাহ করে থাকলে এমতাবস্থায় এই কনেকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, কোন নারীকে কেবল বিবাহ করলেই তার মা, দাদী প্রমুখ হারাম হয়ে যায়। আর যদি সহবাসও করে, তবে তার সন্তানও হারাম হয়ে যায়। অথবা এমন কনে হওয়া, যাকে বরের পিতা অথবা পুত্র ইতিপূর্বে বিবাহ করেছে। এরূপ কনেও বরের জন্যে হারাম। ৯। কনের পঞ্চম স্ত্রী হওয়া। অর্থাৎ, বরের বর্তমানে চার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্ত্রী রয়েছে। সুতরাং পঞ্চম মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। ১০। বরের বিবাহে পূর্ব থেকে কনের ভগিনী, অথবা ফুফু অথবা খালা থাকা। কেননা, এমন দু'মহিলাকে এক সাথে বিবাহে রাখা হারাম, যাদের মধ্যে এমন আত্মীয়তা বিদ্যমান যে, একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অন্যজনের সাথে তার বিবাহ জায়েয হয় না। ১১। এই কনেকে পূর্বে এই বরের তিন তালাক দেয়া। এরূপ তালাকপ্রাপ্তা কনে এই বরের জন্যে হালাল নয়, যে পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করার পর তালাক না দেবে। ১২। হজ্জ অথবা ওমরার এহরাম বাঁধা। বর ও কনের মধ্য থেকে যেকোন একজন এহরাম বাঁধলে এহরাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ জায়েয হবে না। ১৩। কনের পূর্ব বিবাহিতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া। এরূপ কনের বিবাহ প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরেই জায়েয হবে। ১৪। কনের পূর্ববিবাহিতা এতীম হওয়া। এরূপ কনের বিবাহও প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরই, জায়েয হবে।

এখন সুন্দর জীবন যাপন ও উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্যে কনের যেসমস্ত সদগুণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

প্রথম, কনের সতী ও দ্বীনদার হওয়া উচিত। এটি মূল গুণ। এদিকে খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। কেননা, কনে যদি নীচ জাত, অসতী ও কম দ্বীনদার হয়, তবে বরের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। সমাজে তার মুখ কাল হবে এবং তার জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। যদি সে আত্মসম্মানী হয়, তবে আজীবন বিপদ ও দুঃখে পতিত থাকবে। আর যদি মুখ বুজে থাকে, তবে নিজের দ্বীনদারী ও ইযযত কলংকিত হবে। অসতী হওয়ার সাথে যদি কনে সুন্দরীও হয়, তবে তো ঘোর বিপদ। কেননা, বর তাকে বিচ্ছিন্ন করাও পছন্দ করবে না এবং তার অপকর্ম সইতেও পারবে না। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মতই হবে, যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করেছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে ফিরিয়ে দেয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে আরজ করল ঃ আমি তাকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তবে তাকে থাকতে দাও। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থাকতে দাও বলেছেন। কেননা, তিনি আশংকা করেছেন, এ ব্যক্তি তালাক দিয়ে দিলে আসক্তির কারণে তার পশ্চাদ্ধাবন করবে এবং নিজেও বরবাদ হয়ে যাবে। আর যদি কনের দ্বীনদারী এমন খারাপ হয় যে, সে স্বামীর অর্থ-সম্পদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিনষ্ট করে, তাহলেও জীবন দুর্বিষহ হবে। কেননা, স্বামী তার কাণ্ড কারখানায় চুপ থাকলে এবং নিষেধ না করলে তার গোনাহে শরীক হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। ফলে অসমীচীন কর্মে নিষেধ করা এ আয়াতদৃষ্টে জরুরী। পক্ষান্তরে নিষেধ করলে এবং ঝগড়াবিবাদ করলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। অন্য এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি কোন নারীকে তার অর্থ সম্পদ ও রূপলাবণ্যের কারণে বিবাহ করে, তাকে তার অর্থসম্পদ ও রূপ থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর যে তার দ্বীনদারীর কারণে বিবাহ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অর্থসম্পদ ও রূলাবন্যে উভয়টি দান করেন। আরও বলা হয়েছে– রূপ-লাবণ্যের কারণে নারীকে বিবাহ করোনা। হয় তো তার রূপলাবণ্যই তাকে ধ্বংস করে দেবে। ধনসম্পদের কারণেও বিবাহ করবে না। হয় তো তার ধন-সম্পদই তাকে অবাধ্য করে দেবে। বরং বিবাহ দ্বীনদারীর কারণে করা উচিত। দ্বীনদারীর উপর বেশী জোর দেয়ার কারণ, দ্বীনদার নারী স্বামীর দ্বীনদারীতে সহায়ক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার না হলে স্বামীকেও দ্বীনদারী থেকে ফিরিয়ে নেয়।

দ্বিতীয় গুণ সদাচারী হওয়া। যেব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যে ও দ্বীনদারীতে সাহায্য প্রত্যাশা করে, তার জন্যে সদাচারিণী স্ত্রী একটি বড় আর্শীর্বাদ। কেননা, স্ত্রী প্রগলভ, কটুভাষিণী ও কঠোর স্বভাব হলে তার দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। স্ত্রীদের কটু কথায় সবর করা এমন একটি বিষয়, যা দ্বারা ওলীগণের পরীক্ষা নেয়া হয়। জনৈক আরব বলেন ঃ ছয় প্রকার নারীকে বিবাহ করো না– আন্নানা, মান্নানা, হান্নানা, হাদ্দাকা, বাররাকা ও শাদ্দাকা।

"আন্নানা" সেই নারীকে বলা হয় যে সর্বদা কাতরায় ও হায় আফসোস করতে থাকে এবং রোগিনী হয়ে থাকে। এরূপ নারীর বিবাহে কোন বরকত নেই।

"মান্নানা" সেই নারীকে বলা হয়, যে স্বামীর প্রতি প্রায়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলে, আমি তোমার জন্যে এই করেছি সেই করেছি।

"হান্নানা" সেই নারীকে বলা হয়, যে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি অথবা তার সন্তানদের প্রতি আসক্ত থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

"হান্দাকা" সেই নারীকে বলা হয় যে সবকিছুর উপরই লোভ পোষণ করে এবং তা পেতে চায়। এর পর তা ক্রয় করার জন্যে স্বামীকে তাগিদ দেয়।

"বাররাকা" হেজাযীদের পরিভাষায় সেই নারীকে বলা হয়, যে সারাদিন কেবল সাজসজ্জা ও প্রসাধনে মেতে থাকে। আর ইয়ামানীদের পরিভাষায় সেই নারীকে বলা হয়, যে খেতে বসে রাগ করে এবং একাই খায়। প্রত্যেক বস্তু থেকে নিজের অংশ আলাদা করে রাখে।

"শাদ্দাকা" সেই নারীকে বলে, যে খুব বকবক করে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যেসকল অভ্যাস পুরুষের জন্য মন্দ সেগুলো নারীর জন্য প্রশংসনীয়। এ জাতীয় অভ্যাস হচ্ছে কৃপণতা, অহংকার ও ভীরুতা। কেননা, নারী কৃপণ হলে নিজের ও স্বামীর অর্থসম্পদ বাঁচিয়ে রাখবে। অহংকারী হলে প্রত্যেকের সাথে নম্র ও মোহনীয় কথাবার্তা বলতে ঘৃণা করবে। আর ভীরু হলে সবকিছুকে ভয় করে চলবে, গৃহের বাইরে যাবে না এবং স্বামীর ভয়ে অপব্যয়ের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

তৃতীয় গুণ রূপলাবণ্য। এ গুণটিও এজন্যে কাম্য যে, এর ফলে স্বামী যিনা থেকে মুক্ত থাকে। স্ত্রী কুশ্রী হলে মানুষ স্বভাবতই অতৃপ্ত থাকে। এছাড়া যার মুখমণ্ডল সুশ্রী হবে, তার চরিত্রও ভাল হয়। এটাই সাধারণ নিয়ম। আমরা পূর্বে লেখেছি যে, কনের দ্বীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী এবং রূপলাবণ্যের কারণে তাকে বিবাহ করা উচত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, রূপলাবণ্যের প্রতি লক্ষ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন দ্বীনদারীর অভাব হয়, তখন কেবল রূপলাবণ্যে আসক্ত হয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। কেননা, শুধু সুন্দরী হওয়া বিবাহে উৎসাহিত করে ঠিক, কিন্তু দ্বীনদারীর ব্যাপারে শিথিল করে দেয়। তবে রূপলাবণ্যের কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই মহব্বত ও সম্প্রীতি থাকে বিধায় এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয়। মহব্বতের কারণাদি বিবেচনা করাতে শরীয়তও নির্দেশ দিয়েছে। এ কারণেই বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া মোস্তাহাব। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন, তখন তোমাদের উচিত তাকে দেখে নেয়া। কেননা, এটা পারস্পরিক প্রেম-প্রীতির জন্যে উপযোগী। তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরও বলেন ঃ

ان فى اعين الانصار شيئا فاذا اراد احدكم ان يتزوج منهن فلينظر اليهن .

অর্থাৎ, আনসারদের চোখে কিছু আছে। যখন তোমাদের কেউ তাদের কাউকে বিবাহ করতে চায়, তখন তাকে দেখে নেয়া উচিত। কথিত আছে, আনসাররা ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন। কেউ বলেন ঃ তাদের চোখ ছোট ছিল। পূর্ববর্তী কোন কোন বুযুর্গ এমন ছিলেন, যাঁরা অভিজাত পরিবারে বিবাহ করলেও পাত্রী দেখে নিতেন। আ'মাশ বলেন ঃ পূর্বে না দেখে যে বিবাহ করা হয় তার পরিণতি হয় দুঃখ কষ্ট। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টিতে তো চরিত্র ও দ্বীনদারী জানাই যায় না– কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য জানা যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, রূপলাবণ্যের প্রতি খেয়াল রাখাও শরীয়তে কাম্য। বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি চুলে খেযাব লাগিয়ে বিবাহ করে নেয়। কয়েকদিন পর তার খেযাব সরে গেলে শ্বশুরালয়ের লোকেরা খলীফার কাছে নালিশ করে বসে যে, তারা যুবক মনে করে তার কাছে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিল। খলীফা লোকটিকে শাস্তি দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছ। বর্ণিত আছে, হযরত বেলাল ও হযরত সোহায়ব রূমী (রাঃ) এক আরব পরিবারে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন। গৃহকর্তা তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে হযরত বেলাল বললেন ঃ আমি বেলাল এবং সে আমার ভাই সোহায়ব। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আমরা গোলাম ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। আমরা নিঃস্ব ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে ধনবান করেছেন। আপনারা আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে আলহামদু লিল্লাহ আর অস্বীকার করলে সোবহানাল্লাহ। অতঃপর তাদেরকে বলা হলঃ আপনাদের বিবাহ হয়ে যাবে। হযরত সোহায়ব হযরত বেলালকে বললেন ঃ হায়, তুমি আমাদের ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করতে পারতে, যা আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে আনজাম দিয়েছি! হযরত বেলাল বললেন ঃ চুপ থাক। আমরা সত্য কথা বলে দিয়েছি। এ সততাই বিবাহ সম্পন্ন করেছে। বাহ্যিক রূপলাবণ্য ও আভ্যন্তরীণ চরিত্র উভয়ের মধ্যে ধোঁকা হতে পারে। রূপলাবণ্যের ধোঁকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেখার মাধ্যমে দূর করা মোস্তাহাব। চারিত্রিক ধোঁকা দোষগুণ শুনার মাধ্যমে দূর হতে পারে। তাই বিবাহের পূর্বে উভয় কাজ সেরে নেয়া উচিত, কিন্তু দোষগুণ ও চরিত্র মাধুর্য কেবল বুদ্ধিমান, সত্যবাদী এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে যেন কনের পক্ষ না হয় এবং শত্রুও না হয়। কেননা, ইদানীং বিবাহপূর্ব বিষয়াদিতে এবং কনের গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের মন স্বল্পতা ও বাহুল্যপ্রবণ হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে সত্য কথা বলে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্ত করার প্রচলন অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

মোট কথা, যেব্যক্তি কেবল সুন্নত আদায়, সন্তানলাভ ও ঘরকন্নার জন্যে বিবাহ করতে চায়, সে যদি রূপলাবণ্যের প্রতি উৎসাহী না হয়, তবে এটা সংসারবিমুখতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা, রূপলাবণ্যও একটি পার্থিব বিষয়, যদিও মাঝে মাঝে এবং কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা দ্বীনদারীতে সহায়ক হয়। হযরত আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সংসারবিমুখতা সবকিছুতেই হয়, এমনকি স্ত্রীর মধ্যেও হয়। সংসারবিমুখতা অবলম্বন করার জন্যে মানুষ কোন বৃদ্ধাকে বিবাহ করতে পারে। মালেক ইবনে দীনার বললেন ঃ মানুষ এতীম ও নিঃস্ব মহিলাকে বিবাহ করে না, যাকে খাওয়ালে পরালে সওয়াব পাওয়া যায়, ভরণপোষণ সহজ হয় এবং সামান্যতে সন্তুষ্ট থাকে; বরং তারা দুনিয়াদারদের কন্যাকে বিবাহ করে, যে সর্বদা নতুন নতুন কামনা বাসনা উপস্থিত করে বলে, আমাকে অমুক শাড়ী পরাও, অমুক বস্তু খাওয়াও। ইমাম আহমদ দু'ভগিনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধিমতী কোন্‌টি, তাঁকে উত্তরে বলা হয় ঃ যে বুদ্ধিমতী, তার চোখ নেই। তিনি বললেন ঃ আমি এই অন্ধকেই বিবাহ করব। মোট কথা, যেব্যক্তি আনন্দের জন্যে নয়, বরং প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশে বিবাহ করতে চায়, তার নিয়মনীতি এরূপই হওয়া উচিত, কিন্তু যেব্যক্তি আনন্দ ব্যতীত দ্বীনদারী ঠিক রাখতে পারে না, তার রূপলাবণ্য দেখা উচিত। কারণ, বৈধ বিষয় দ্বারা আনন্দ লাভ করা দ্বীনদারীর একটি দুর্গ। কথিত আছে, সুন্দরী, চরিত্রবতী, কালকেশী আনতনয়না, গৌরবর্ণা ও স্বামী নিবেদিতা স্ত্রী কেউ পেয়ে গেলে সে যেন বেহেশতের হুর পেয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের পত্নীদেরকে এসব বিশেষণেই বিশেষিত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ خَيْرَاتٌ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

عُرُبًا আনতনয়না। قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ অর্থাৎ, চরিত্রবতী, সুন্দরী। حِسَانٌ أَتْرَابًا সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। حُوْرٌ عِيْنٌ অপ্সরা আয়তলোচনা। বলাবাহুল্য, এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خير نسائكم من اذا نظر اليها زوجها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فى نفسها وما له ـ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সেই উত্তম, যাকে দেখে তার স্বামী আনন্দিত হয়, যে স্বামীর আদেশ পালন করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের হেফাযত করে এবং স্বামীর ধনসম্পদ দেখাশুনা করে। বলাবাহুল্য, সোহাগিনী স্ত্রীকে দেখেই স্বামী আনন্দিত হয়।

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, মোহরানা কম হওয়া। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, তারাই উত্তম স্ত্রী, যাদের চেহারা-নমুনা ভাল এবং মোহরানা কম। তিনি সীমাতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন এবং নিজে কোন কোন বিবাহ দশ দেরহাম ও গৃহের আসবাবপত্রের বিনিময়ে করেছেন। গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি আটা পেষার যাঁতা, একটি মাটির কলসী ও একটি নরম গদি। তিনি কোন বিবির বিবাহে যব দ্বারা ওলীমা করেছেন, কোন বিবির ওলীমা খোরমা দ্বারা এবং কোন বিবির ওলীমা ছাতু দ্বারা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) অধিক মোহরানা ধার্য করতে নিষেধ করে বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও চারশ' দেরহামের অধিক মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করেননি এবং নিজের কন্যাগণের বিবাহেও এর বেশী মোহরানা ধার্য করেননি। যদি অধিক মোহরানা ধার্য করার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য থাকত তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবার আগে তা করতেন। কতিপয় সাহাবী বিবাহে এ পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা হিসাবে ধার্য করেন, যার মূল্য পাঁচ দেরহামের বেশী ছিল না। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রাঃ) আপন কন্যার বিবাহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সাথে দু'দেরহামের বিনিময়ে দেন। তিনি রাতের বেলায় আপন কন্যাকে নিয়ে তার গৃহের দ্বারে পৌছে দিয়ে আসেন এবং সাত দিন পর কন্যার কাছে গিয়ে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। সকল ইমামের মাযহাব পালন করার নিয়তে মোহরানা দশ দেরহাম ধার্য করলে কোন ক্ষতি নেই। হাদীসে আছে, স্ত্রী তখন মোবারক হয় যখন তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাড়াতাড়ি সন্তান হয় এবং মোহরানা কম হয়। আরও আছে, সেই স্ত্রীর মধ্যে বরকত বেশী যার মোহরানা সবচেয়ে কম। স্ত্রীর পক্ষ থেকে মোহরানা বেশী হওয়া যেমন মাকরূহ, তেমনি পুরুষের পক্ষ থেকে স্ত্রীর ধন-সম্পদের খবর নেয়াও মাকরূহ। ধনসম্পদের লোভে বিবাহ করা উচিত নয়। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন কেউ বিবাহ করে এবং জিজ্ঞেস করে, কনের কি কি ধন-সম্পদ আছে, তখন বুঝে নেবে সে চোর। স্বামী কোন উপহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করলে এই নিয়ত করবে না যে, এর বদলে সেখান থেকে বেশী পাওয়া যাবে। তদ্রূপ কনের পরিবারের লোকজন কিছু পাঠালেও এরূপ নিয়ত করবে না। বেশী পাওয়ার নিয়ত করা খুবই খারাপ। তবে উপহার পাঠানো মোস্তাহাব ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কারণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ تهادوا وتحابوا (একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি কর।) এতে বেশী পেতে চাওয়া আল্লাহ তাআলার এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ, অধিক পাওয়ার নিয়তে দিয়ো না। মোট কথা, বিবাহে এ ধরনের কাজ মাকরূহ ও বেদআত। এটা ব্যবসা ও জুয়ার মত এবং এতে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

পঞ্চম গুণ– কনের বন্ধ্যা না হওয়া। যদি বন্ধ্যাত্ব জানা যায়, তবে সেই কনেকে বিবাহ করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ عليكم بالولود অর্থাৎ, এমন কনেকে বিবাহ করবে, যে সন্তান দেয় এবং স্বামী আসক্তা হয়। সুতরাং কনের পূর্বে বিবাহ না হওয়ার কারণে যদি সে বন্ধ্যা কি না তা জানা না যায়, তবে স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করবে। কারণ, এ দু'টি গুণ কনের মধ্যে থাকলে তার সন্তান দেয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ষষ্ঠ গুণ– কুমারী হওয়া। হযরত জাবের (রাঃ) এক পূর্ব বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ করলে রসূলে করীম (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না কেন, এতে তুমি তার প্রতি এবং সে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত। স্ত্রী কুমারী হওয়ার উপকারিতা তিনটি ঃ (১) স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত জন্মে। এছাড়া প্রথম পরিচিতজনের সাথে মন লাগে। যে নারী পূর্বে একজন পুরুষের সঙ্গ লাভ করে আসে এবং অবস্থা দেখে-শুনে আসে, পূর্ব পরিচিত বিষয়াদির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিপরীতে কোন কিছুতে রাজি না হওয়া তার জন্যে বিচিত্র নয়। এটাই দ্বিতীয় স্বামীকে খারাপ মনে করার কারণ হয়ে যেতে পারে। (২) কুমারী স্ত্রীকে স্বামী মহব্বত করে। কেননা, যে নারীকে অন্য কেউ স্পর্শ করে, তার প্রতি স্বামীর মনে স্বভাবগতভাবে ঘৃণা থাকে। মনে এ ধারণা উদয় হতেই স্বামীর মন ভারী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন কোন লোক অত্যধিক আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। (৩) কুমারী হলে স্ত্রী প্রথম স্বামীকে স্মরণ করে না। এ স্মরণও জীবনে এক প্রকার তিক্ততা সৃষ্টি করে। প্রথম প্রিয়জনের প্রতি যে মহব্বত হয়, প্রায়শঃ সেটাই সর্বাধিক পাকাপোক্ত হয়।

সপ্তম গুণ– অভিজাত বংশের অর্থাৎ, দ্বীনদার ও সৎ পরিবারের কনে হওয়া। কেননা, এরূপ পরিবারের মেয়েরা আপন সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় মনোযোগী হয়। যে নারী স্বয়ং শিষ্ট ও বিনীত নয়, সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে শিষ্ট ও বিনীত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اياكم وخضراء الدمن অর্থাৎ, তোমরা গোবরের স্তূপের শাক-সব্জি থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ গোবরের স্তূপের শাক-সব্জি কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দরী নারী, যে নীচ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তিনি আরও বলেন ঃ নিজের বীর্যের জন্যে ভাল নারী পছন্দ কর। কেননা, আত্মীয়তার শিরা পিতামাতার চরিত্র সন্তানের মধ্যে টেনে আনে।

অষ্টম গুণ– কনের নিকট সম্পর্কীয়া না হওয়া। এটা কামস্পৃহা হ্রাস করে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নিকট সম্পর্কীয়া নারীকে বিবাহ করো না, দুর্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। কামস্পৃহা দুর্বল হওয়াই সন্তান দুর্বল হওয়ার কারণ। কেননা, কামস্পৃহা দৃষ্টি ও স্পর্শ শক্তি থেকে উদ্দীপ্ত হয়। নারী নতুন ও অপরিচিতা হলে এই শক্তি জোরদার হয়। যে নারী সর্বদা এক সময় দৃষ্টির সামনে থাকে, তাকে দেখতে দেখতে মানুষ নিস্পৃহ হয়ে যায় এবং পূর্ণ আকর্ষণ থাকে না। ফলে কামস্পৃহাও উদ্দীপ্ত হয় না।

মোট কথা, কনের উপরোক্ত গুণসমূহের কারণে তাকে বিবাহ করার আগ্রহ জন্মায়। বরের স্বভাব-চরিত্র ভালরূপে যাচাই করে নেয়া কনের অভিভাবকেরও কর্তব্য। অভিভাবকের উচিত, কনের প্রতি স্নেহপরবশ হওয়া এবং এমন ব্যক্তির সাথে তাকে বিবাহ না দেয়া, যার দৈহিক গঠনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন ত্রুটি আছে, অথবা যার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় অথবা যে দ্বীনদারীতে দুর্বল অথবা স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষম অথবা বংশগত দিক দিয়ে কনের সমকক্ষ নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কনেকে বিবাহ দেয়ার মানে তাকে বাঁদী করা। অতএব নিজের কন্যাকে কোথায় দিচ্ছ তা দেখে নাও। কনের জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। কেননা, বিবাহের কারণে সে এমন বন্দিদশায় পড়ে যা থেকে রেহাই পেতে পারে না। পুরুষ এরূপ নয়। সে সর্বাবস্থায় তালাক দিতে সক্ষম। যখন কোন ব্যক্তি তার কন্যার বিবাহ কোন জালেম, পাপাচারী, বেদআতী অথবা মদখোরের সাথে দেয়, তখন সে নিজের দ্বীনদারীতে কলংক লেপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র হয়। কেননা, সে আত্মীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করে এরূপ পাত্রের হাতে কন্যাদান করে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ কয়েকজন লোক আমার কন্যার জন্যে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছে। আমি কার সাথে তাকে বিবাহ দেব। তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যেব্যক্তি খোদাভীরু, তার সাথে বিবাহ দাও। কেননা, সে তোমার কন্যাকে ভালবাসবে এবং খাতির সমাদর করবে। সে তোমার কন্যাকে অপছন্দ করলেও জুলুম করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি পাপাচারীর হাতে কন্যাদান করে, সে আত্মীয়তা ছিন্ন করে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারস্পরিক জীবন যাপনের আদব

স্বামীর করণীয় আদব ঃ যেসকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর জন্যে জরুরী, নিম্নে সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা হল।

প্রথম আদব ওলিমা, এটা মোস্তাহাব। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন- এটা কি? তিনি আরজ করলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি এবং খোরমার বীচি পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা সাব্যস্ত করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بارك الله لك اولم ولو بشاة মোবারক হোক। একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা কর। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত সফিয়্যাকে বিয়ে করার পর খোরমা ও ছাতু দিয়ে ওলীমা করেন। স্বামীকে মোবারকবাদ দেয়া মোস্তাহাব। যেব্যক্তি তার কাছে আসবে, সে এরূপ বলবে ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে মোবারক করুন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের মধ্যে পুণ্য কাজে মতৈক্য সৃষ্টি করে দিন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন- فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দফ বাজানো ও হৈচৈ করা। আরও বলা হয়েছে-

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف -

এ বিবাহ ঘোষণা কর, একে মসজিদে সম্পন্ন কর এবং এর জন্যে দফ্ বাজাও।

রবী বিনতে মোয়াওভেয রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে বাসর রাত্রির ভোরে এসে আমার শয্যায় বসে গেলেন। আমাদের কয়েকজন বালিকা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে আমার পরিবারের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিহত ব্যক্তিদের কীর্তিগাথা আবৃত্তি করছিল। তাদের একজন এমনও বলে ফেলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকাল যা ঘটবে তা জানেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে একথা বলতে বারণ করে বললেন ঃ পূর্বে যা বলছিলে, তাই বল।

দ্বিতীয় আদব স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা এবং দয়াপরবশ হয়ে তাদের নিপীড়ন সহ্য করা। কেননা, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি অপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, মহিলাদের সঙ্গে সদাচরণ সহকারে জীবন যাপন কর। ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওসিয়ত ছিল তিনটি বিষয়। সেগুলো বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ

الصلوة الصلوة وما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لايطيقون الله الله فى النساء انهن عوان فى ايديكم اخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর, নামায কায়েম কর। তোমরা যেসকল গোলাম ও বাঁদীর মালিক, তাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কাজ করতে বলো না। স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের হাতে বন্দী। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছ এবং তাদের লজ্জাস্থান আল্লাহর কলেমা উচ্চারণ করে হালাল করেছ।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যেব্যক্তি তার স্ত্রীর অসদাচরণে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এই পরিমাণ সওয়াব দেবেন, যে পরিমাণ হযরত আইউব (আঃ)-কে তাঁর বিপদের কারণে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী তার স্বামীর বদমেযাজীতে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরাউন-পত্নী আছিয়ার সমান সওয়াব দান করবেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার, স্ত্রীর সাথে সদাচরণের অর্থ স্ত্রী পীড়ন না করলে সদাচরণ করা নয়; বরং অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর পীড়নের জওয়াবে সদাচরণ করা। স্ত্রী রাগ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে তার রাগ সহ্য করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিগণও তাঁর সামনে রাগ করতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ সারাদিন তাঁর সাথে কথা বলতেন না। তিনি এসব বিষয় নীরবে সহ্য করতেন এবং তাঁদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন না। হযরত ওমর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ)-এর পত্নী একবার তাঁর কথার জওয়াব দিলে তিনি রাগতস্বরে বললেন ঃ হে উদ্ধত, তুমি আমার কথার জওয়াব দিচ্ছ। পত্নী বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিগণও তাঁর কথার জওয়াব দেন। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। হযরত ওমর বললেন ঃ হাফসা জওয়াব দিয়ে থাকলে সে খুব খারাপ করেছে। অতঃপর তিনি কন্যা হাফসাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে হাফসা, সিদ্দীকের কন্যা হবার লোভ করো না। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদরিণী। তুমি কখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথার জওয়াব দেবে না।

বর্ণিত আছে, পবিত্র বিবিগণের একজন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বুকে হাত রেখে তাঁকে ধাক্কা দেন। এ জন্যে তাঁর মা তাঁকে শাসালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ ছাড়, তাকে কিছু বলো না। এই পত্নীরা তো এর চেয়ে বড় কান্ডও করে! একবার রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলে তাঁরা উভয়েই হযরত আবু বকরের কাছে বিচারপ্রার্থী হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বললেন ঃ তুমি আগে বলবে, না আমি বলব। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি বলুন, কিন্তু সত্য সত্য বলবেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বললেন ঃ তুই কি বলছিস, হযরত কি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে পারেন। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আশ্রয় চাইলেন এবং তাঁর পেছনে গিয়ে লুকালেন। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমরা তোমাকে এজন্যে ডাকিনি এবং তুমি এরূপ করবে এটাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। একবার কোন এক কথায় রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনিই বলেন, আপনি পয়গম্বর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে তা সহ্য করে নিলেন। রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বলতেন ঃ আয়েশা, আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝে নিতে পারি। তিনি আরজ করলেন ঃ আপনি তা কেমন করে বুঝতে পারেন? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন কসম খেতে গিয়ে বল– মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আল্লাহর কসম, আর রাগের অবস্থায় বল– ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহর কসম। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কেবল আপনার নামটিই বর্জন করি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে প্রেম হয়, তা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ-এর মধ্যকার প্রেম। তিনি হযরত আয়েশাকে বলতেন ঃ আমি তোমার সাথে এমন যেমন আবু সূরা তার স্ত্রী উম্মে সূরার সাথে ছিল, কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দিব না। (শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত উম্মে সূরার হাদীসটি সুবিদিত। তা একদিন এগার জন মহিলা হযরত আয়েশার কাছে সমবেত হয়ে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করল। এই এগার জনের মধ্যে উম্মে সরাও ছিল। তার স্বামী তার সাথে অনেক সদ্ব্যবহার করেছিল এবং অবশেষে তালাক দিয়েছিল। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই মহিলাদের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে একথা বলেছিলেন।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীদেরকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে পীড়ন করো না। আল্লাহর কসম, আমার কাছে যখন ওহী আসে, তখন আমি তার লেপের নীচে থাকি। (অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে এরূপ হয়নি।) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নারী ও শিশুদের প্রতি সবার তুলনায় অধিক দয়াশীল ছিলেন।

তৃতীয় আদব, পীড়ন সহ্য করা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে হাসি তামাশা ও আনন্দ করবে। এতে তাদের মন প্রফুল্ল হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি বিবিগণের সাথে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেন এবং কাজে ও চরিত্রে তাদের স্তরে নেমে যেতেন। এমন কি বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন। একদিন হযরত আয়েশা দৌড়ে জিতে গেলেন। এর পর একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দৌড়ে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আয়েশা! (রাঃ) এটা সেদিনের প্রতিশোধ। হাদীসে আছে, অন্য সব মানুষের তুলনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিবিগণের সাথে অধিক আনন্দ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি আবিসিনিয়ার লোকদের আওয়ায শুনলাম। তারা আশুরার দিন খেলাধুলা করছিল। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও। আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি খেলোয়াড়দেরকে ডাকলেন। তারা হাযির হলে তিনি দরজার উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের হাত কপাটের উপরে ছড়িয়ে দিলেন। আমি আমার চিবুক তাঁর হাতের উপর রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ্

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, আর কত। আমি দুই কিংবা তিন বার বললামঃ আর একটু রাখুন। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ আয়েশা, আর না। এবার শেষ কর। আমি, বললাম ঠিক আছে, চলুন । তার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খেলোয়াড়দেরকে ইশারা করলে তারা চলে গেল। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله

মুমিনদের মধ্যে অধিক কামেল মুমিন সে ব্যক্তি, যার অভ্যাস ভাল এবং সে পরিবার পরিজনের প্রতি অধিক কৃপাশীল। এক হাদীসে আছে- خيركم خيركم لنسائه وانا خيركم لنسائي তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীদের জন্যে সর্বোত্তম । আমি আমার স্ত্রীদের জন্যে তোমাদের চাইতে উত্তম।

হযরত ওমর (রাঃ) কঠোর চিত্ত হওয়া সত্ত্বেও বলেন ঃ পুরুষের উচিত নিজের ঘরে শিশুদের মত থাকা। যখন তার কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয় তখন পুরুষ হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত জাবেরকে বলেছিলেন, – কুমারী নারীকে বিবাহ করলে না কেন, যাতে তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সে তোমার সাথে আনন্দ করতো।

চতুর্থ আদব, স্ত্রীর চাহিদার এত বেশী অনুসরণ করবে না যাতে তার মেযাজ বিগড়ে যায় এবং তার সামনে নিজের কোন ভয়ভীতি না থাকে বরং এতে সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। খারাপ কিছু দেখলে তাতে কখনও সম্মত হবে না। স্ত্রী শরীয়ত অথবা ভদ্রতা বিরোধী কোন কিছু করলে তৎক্ষণাৎ ক্রোধ প্রকাশ করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি স্ত্রৈণ অর্থাৎ, স্ত্রী যা চায় তাই করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উপুড় করে দোযখে ফেলে দেবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, স্ত্রীদের মর্জির বিপরীত কাজ কর, এতে বরকত হয়। তিনি আরও বলেন ঃ স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তারা যে পরামর্শ দেয় তার বিপরীত কর। হাদীসে আছে- স্ত্রীর গোলাম ধ্বংস হোক। এর কারণে, স্ত্রীর খাহেশের বিষয়াদিতে তার আনুগত্য করলে তার গোলামী করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্ত্রীর মালিক করেছেন, কিন্তু সে নিজেকে তার গোলাম করে দিয়েছে। ফলে ব্যাপার উল্টে গেছে। সে কোরআনে বর্ণিত শয়তানের এই উক্তিরও আনুগত্য করেছে- وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমি মানুষকে আদেশ করব, তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পাল্টে দিক। পুরুষের হক ছিল অনসৃত হওয়ার– অনুসারী হওয়ার নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে নারীদের উপর শাসক সাব্যস্ত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ অর্থাৎ, পুরুষরা স্ত্রীদের উপর শাসক। সুতরাং স্ত্রীদের লাগাম সামান্য শিথিল করে দিলে তারা পুরুষদেরকে কয়েক হাত হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে লাগাম টেনে রাখলে এবং জায়গা মত কঠোর হলে স্ত্রীরা আয়ত্তে থাকবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, তুমি তাদের সম্মান করলে তারা তোমাকে অপদস্থ করবে এবং তুমি অপদস্থ করলে তারা তোমান সম্মান করবে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে স্ত্রী , দ্বিতীয়টি খাদেম এবং তৃতীয়টি নিবর্তী। ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য, যদি কেবল সন্মান কর এবং মাঝে মাঝে নরমের সাথে সাথে শক্ত না হও, শক্ত কথা না বল, তবে নিঃসন্দেহে মাথায় চড়ে বসবে। মোট কথা, আকাশ ও পৃথিবী সমতা এবং মধ্যবর্তিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তিতা থেকে সামান্য বিচ্যুত হলে ব্যাপার উল্টে যায়। তাই বুদ্ধিমানের উচিত হল স্ত্রীর সাথে আনুকূল্য ও বিরোধিতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং প্রত্যেক ব্যাপারে সত্যের অনুসরণ করা, যাতে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কেননা, স্ত্রীদের কলাকৌশল অত্যন্ত মন্দ এবং তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য। তাদের মানসিকতায় অসদাচরণ ও জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতা প্রবল। এতে সমতা তখনই আসবে, যখন নরম ও শক্ত উভয় প্রকার ব্যবহার তাদের সাথে করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিপদ থেকে আশ্রয় চাইবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দুশ্চরিত্রা নারী । সে বার্ধক্যের পূর্বেই বৃদ্ধ করে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিগণ ছিলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম । তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ انتن صواحبات يوسف তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সহচরী। (রসূলুল্লাহ্ [সাঃ] ওফাতের পূর্বে যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং নামায পড়ানোর শক্তি তাঁর ছিল না, তখন এরশাদ করেন ঃ আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। এতে হযরত আয়েশা আপত্তি করে বলেন ঃ আমার পিতা কোমলচিত্ত। মানুষ আপনার স্থান শূন্য দেখে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপরোক্ত বাক্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ, তুমি যে আবু বকরকে নামায পড়াতে নিষেধ করছ, এটা সত্য পরিহার করে খেয়াল-খুশীর দিকে ঝুঁকে পড়ার শামিল।) এক হাদীসে আছে–

لايفلح قوم تملكهم امراة -

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায়ের মালিক নারী, তার কল্যাণ হবে না।

পঞ্চম আদব, স্ত্রীদের প্রতি কুধারণায় তাদের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধানে বাড়াবাড়ি করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) স্ত্রীদের গোপন বিষয়সমূহের পেছনে পড়তে বারণ করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি স্ত্রীদের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হতে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় প্রবেশের পূর্বে বললেন ঃ রাতের বেলায় স্ত্রীদের কাছে যাবে না। এই আদেশ উপেক্ষা করে দুই ব্যক্তি বাড়ি গিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখতে পেল। প্রসিদ্ধ এক হাদীসে আছে–

المراة كالضلع ان قومته كسرته فدعه تستمتع به على عوج

অর্থাৎ, নারী পাঁজরের অস্থির ন্যায় বাঁকা। একে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। অতএব বাঁকা অবস্থায়ই এর দ্বারা উপকৃত হও। নারী চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশে এ কথাটি বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলছেন ঃ

ان من الغيرة يبغضها الله عزوجل وهى غيرة الاهل على اهله من غير ريبة -

অর্থাৎ, কোন কোন আত্মসম্মানবোধ আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। তাহল স্ত্রীর উপর পুরুষের আত্মসম্মানবোধ, যা কোন সন্দেহ ছাড়াই হয়। কেননা, এরূপ আত্মসম্মনবোধের উৎস হচ্ছে কুধারণা, যা করা নিষিদ্ধ। আত্মসম্মানবোধ যথাস্থানে প্রশংসনীয়। মানুষের মধ্যে তা অবশ্যই থাকা উচিত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। মুমিনের আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। মানুষের উপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ। তিনি আরও বলেন ঃ সা'দের আত্মসম্মান দিয়ে তোমরা কি কর? আল্লাহর কসম, আমি সা'দের তুলনায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী। আল্লাহ্ তাআলা আমার চেয়ে অধিক আত্মসম্মান রাখেন। এই আত্মসম্মানের কারণেই তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পাপাচার হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলার তুলনায় অন্য কারও আপত্তি করা অধিক পছন্দনীয় নয়। এ কারণেই তিনি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা রসূল প্রেরণ করেছেন। তারীফও তাঁর চেয়ে অধিক অন্য কেউ পছন্দ করে না। এ কারণেই তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি মেরাজ রজনীতে জান্নাতের ভেতরে একটি প্রাসাদ দেখেছি। তার আঙ্গিনায় একটি বাঁদী ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদ কার। কেউ জওয়াব দিল ঃ ওমরের। আমি তার অভ্যন্তরভাগ দেখতে চাইলাম, কিন্তু হে ওমর, তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা মনে পড়ে গেল। হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি কি আপনাকে আত্মসম্মানবোধ দেখাব? হযরত হাসান বসরী বলতেন ঃ কাফেরদের গা ঘেঁষে চলার জন্যে তোমরা স্ত্রীদেরকে বাজারে পাঠিয়ে দাও! যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সে ধ্বংস হোক।

আত্মসম্মানবোধের প্রয়োজন তখন হয় না, যখন স্ত্রীর কাছে বেগানা পুরুষ আসে না এবং স্ত্রী বাজারে বের হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নারীর জন্যে উত্তম কি, তিনি বললেন ঃ উত্তম, সে বেগানা পুরুষকে দেখবে না এবং কোন বেগানা পুরুষও তাকে দেখবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ এমন জওয়াব দেবে না কেন, কেমন বাপের মেয়ে! সাহাবায়ে কেরাম প্রাচীরের ছিদ্র বন্ধ করে দিতেন, যাতে মহিলারা পুরুষদেরকে না দেখে। হযরত মুয়ায (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে আলো আসার ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখে শাস্তি দিয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ স্ত্রীদেরকে উৎকৃষ্ট পোশাক দিয়ো না, তা হলে গৃহ মধ্যে থাকবে। কারণ এই, মহিলারা ছন্নছাড়া অবস্থায় বাইরে যাওয়া পছন্দ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মহিলার গৃহ মধ্যে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুক। তিনি শুরুতে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে বৃদ্ধাদের ছাড়া অন্যদের জন্যে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি না থাকা উত্তম। বরং এটা সাহাবায়ে কেরামের আমলেও সঙ্গত ছিল না। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর মহিলারা যেসব বিষয় উদ্ভাবন করেছে, তা যদি তিনি জানতেন তবে তাদেরকে বাইরে যেতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবশ্যই নিষেধ করতেন। একবার হযরত ইবনে ওমর এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন- لاتمنعوا اماء الله مساجد الله অর্থাৎ, আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে অর্থাৎ, মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। তখন তাঁর পুত্র বলে উঠল ঃ আল্লাহর কসম, আমরা বারণ করব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ পুত্রকে প্রহার করলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ঃ আমি বলি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন বলেন। আর তুই কিনা তা অমান্য করছিস। এর অর্থ কি, তাঁর পুত্রের এই বিরোধিতার কারণ ছিল, পরিবর্তিত অবস্থা তাঁর জানা ছিল। ইবনে ওমরের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ, বাহ্যতঃ কোন কারণ বর্ণনা না করেই পুত্র হাদীসের বিপরীত উক্তি করেছিল। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদেরকে বিশেষভাবে ঈদের নামাযে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাও স্বামীদের অনুমতি দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে। বর্তমান যুগেও সতী-সাধ্বী নারীদের স্বামীর অনুমতিক্রমে বাইরে যাওয়া জায়েয, কিন্তু না যাওয়াতেই সাবধানতা বেশী। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তামাশা ও অনাবশ্যক কাজের জন্যে মহিলাদের বাইরে যাওয়া সাধারণ ভদ্রতারও পরিপন্থী। এতে মাঝে মাঝে অনর্থও সৃষ্টি হয়। এর পর বাইরে গেলে পুরুষদের দিক থেকে দৃষ্টি নত রাখবে। আমরা বলি না, নারীর মুখমণ্ডলও নারীর জন্যে গোপনীয়, বরং ফেতনার অবস্থায় পুরুষের মুখমণ্ডল দেখা হারাম। ফেতনার ভয় না থাকলে হারাম নয়। কেননা, পূর্ববর্তী যুগে পুরষরা সর্বদাই খোলামেলা চলাফেরা করেছে এবং মহিলারা অবগুণ্ঠন লাগিয়ে বের হয়েছে। পুরুষদের মুখমণ্ডল মহিলাদের জন্যে গোপনীয় হলে পুরুষদেরকেও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হত।

ষষ্ঠ আদব, স্ত্রীদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে সমতা বজায় রাখবে। অর্থাৎ, এতে সংকীর্ণতাও অবলম্বন করবে না এবং অপব্যয়ও করবে না, বরং মধ্যম পর্যায়ে খরচপত্র দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ كُلُوا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا তোমরা খাও, পান কর এবং অপব্যয় করো না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ, হাতকে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং পুরোপুরি খুলতে দিয়ো না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ خيركم خيركم لاهله তোমাদের মধ্যে সে লোক উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে উত্তম। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ এক দীনার তুমি জেহাদে ব্যয় করবে, এক দীনার গোলাম মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকা দেবে এবং এক দীনার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। এগুলোর মধ্যে অধিক সওয়াব সে দীনারের হবে, যা তুমি পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। কথিত আছে, হযরত আলী (রাঃ)-এর চার কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে প্রতি চার দিনে এক দেরহাম গোশত ক্রয় করতে দিতেন।

নিজে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে এবং পরিজনকে তা থেকে খাওয়াবে না, গৃহকর্তার জন্যে এটা সমীচীন নয়, এটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। যদি গৃহকর্তার এরূপ একা খাওয়াই কাম্য হয়, তবে গোপনে খাওয়া উচিত। অন্যদের সামনে এরূপ খাদ্যের আলোচনা করাও উচিত নয়, যা তাদেরকে খাওয়ানো উদ্দেশ্য নয়। যখন খেতে বসবে, তখন ঘরের সকলকে সঙ্গে নিয়ে বসবে। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সে ঘরের লোকজনের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন, যারা একত্রে বসে আহার করে।

সপ্তম আদব, পুরুষের পক্ষে হায়েযের বিধানাবলী শেখা উচিত, যাতে এ দিনগুলোতে কি কি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব, তা জানা যায়। স্ত্রীকেও শিক্ষা দেয়া দরকার, হায়েযের সময়কার কোন্ কোন্ নামাযের কাযা পড়তে হবে এবং কোন্ কোন্ নামাযের কাযা পড়তে হবে না। কেননা, কোরআন শরীফে স্ত্রীকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্যে পুরুষদের প্রতি এই বলে নির্দেশ রয়েছে, قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে দোযখ থেকে রক্ষা কর।) অতএব স্ত্রীকে আহলে সুন্নতের বিশ্বাসসমূহ শিক্ষা দেয়া পুরুষের জন্যে অপরিহার্য। যদি স্ত্রী বেদআতে কান দিয়ে থাকে, তবে তা তার মন থেকে দূর করবে। দ্বীনদারীর ব্যাপারে অলসতা করলে তাকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবে এবং হায়েয ও এস্তেহাযার প্রয়োজনীয় মাসআলা বলে দেবে। মাসআলা শেখার জন্যে স্বামী যথেষ্ট হলে এর জন্য কোন আলেমের কাছে যাওয়া স্ত্রীর জন্যে বৈধ নয়। পুরুষ স্বল্প জ্ঞান হলেও যদি কোন মুফতীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রশ্নের জওয়াব এনে দিতে পারে, তবুও তার জন্যে বাইরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাওয়া জায়েয নয়। অন্যথায় স্ত্রীর বাইরে যাওয়া এবং জিজ্ঞেস করে নেয়া জায়েয; বরং ওয়াজিব। এমতাবস্থায় স্বামী নিষেধ করলে গোনাহগার হবে। যদি স্ত্রী ফরযগুলো শিখে নেয়, তবে অধিক শিক্ষার জন্যে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ওয়াজের মসলিসে যাওয়া জায়েয নয়। স্ত্রী হায়েয এস্তেহাযার কোন বিধান না জানার কারণে পালন করে না এবং স্বামীও শিক্ষা দেয় না, এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে যাবে। নতুবা গোনাহে তার অংশীদার হবে।

অষ্টম আদব, একাধিক স্ত্রী থাকলে স্বামী তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত সমতা প্রতিষ্ঠা করবে এবং কারও দিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে না। যদি সফরে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় তবে লটারিযোগে নির্ধারণ করবে। লটারিতে যার নাম আসে, তাকেই সাথে নিয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরূপ করতেন। কোন স্ত্রীর পালা বাদ পড়লে তার কাযা করবে। এটা ওয়াজিব। বেশী স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচারের বিধানাবলী জেনে নেয়া দরকার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كان له امراتان فمال الى احدهما دون الاخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل -

অর্থাৎ, যার দু'স্ত্রী থাকে, অতঃপর সে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে কেয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার এক পার্শ্ব ঝুঁকে থাকবে।

বলাবাহুল্য, স্বামীর উপর কেবল খরচ দেয়া ও শয়ন করার মধ্যে ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব– ভালবাসা ও সহবাসে ওয়াজিব নয়। কেননা, এটা মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ অর্থাৎ, আন্তরিক মহব্বতে ন্যায়বিচার করতে তোমরা কস্মিনকালেও সক্ষম হবে না। এটা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। যদিও তোমরা এটা করতে আগ্রহী হও। সহবাসও আন্তরিক মহব্বতের অনুগামী। রসূলে করীম (সাঃ) বিবিগণকে খরচপত্র দেয়া ও রাতে সঙ্গে থাকার ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতেন এবং বলতেন ঃ ইলাহী, যে বিষয় আমার আয়ত্তে তাতে আমি এই চেষ্টা করেছি। এখন যে বিষয়ের মালিক আপনি এবং যা আমার আয়ত্তাধীন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়, তাতে ন্যায়বিচার করার সাধ্য আমার নেই। অর্থাৎ, আন্তরিক ভালবাসা আমার ইচ্ছাধীন নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) সব বিবির তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক প্রিয় ছিলেন। সবাই একথা জানতেন। শেষ রোগশয্যায় তাঁর খাট প্রত্যহ সেই বিবির গৃহে পৌঁছে দেয়া হত, যার পালা থাকত। তিনি রাতে সেখানে থাকতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, সকালে আমি কোথায় থাকব? এতে একজন বিবি বুঝে নিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হযরত আয়েশার পালার দিন জিজ্ঞেস করা। এর পর সকল বিবি মিলে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা আপনাকে অনুমতি দিলাম, আপনি আয়েশার ঘরেই থাকুন। প্রতি রাতে আপনাকে এক এক জায়গায় পৌঁছানোর কারণে আপনার কষ্ট হয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সবই এতে রাজি? বিবিগণ বললেন ঃ হাঁ, আমরা সবাই রাজি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে আয়েশার গৃহে নিয়ে চল। কোন স্ত্রী নিজের পালা অন্য স্ত্রীকে দান করে দিলে এবং স্বামীও তাতে সম্মত থাকলে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত সওদাকে বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তালাক দিতে ইচ্ছা করলে তিনি নিজের পালা হযরত আয়েশাকে দিয়ে দেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করেন ঃ আমাকে তালাক দেবেন না, যাতে কেয়ামতে আপনার বিবিগণের দলে আমার হাশর হয়। তাঁর এই আবেদন গৃহীত হয় এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে কোন পালা নির্দিষ্ট করতেন না; বরং হযরত আয়েশার পালা হত দু'রাত এবং অন্যদের এক এক রাত।

নবম আদব, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয় এবং বনিবনার কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে, তবে স্বামীর পরিবারের একজন ও স্ত্রীর পরিবারের একজন– এই দুই জন সালিস বসবে। উভয় সালিস তাদের অবস্থা দেখবে। যদি তারা পুনর্মিলন চায়, তবে পুনর্মিলন করিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রাঃ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ করানোর জন্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। সে আপোষ না করিয়ে ফিরে এলে তিনি তাকে শাসিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন– إِنْ يُّرِيْدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا। স্বামী-স্ত্রী সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাআলা উভয়ের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টি করে দেবেন। অথচ তুমি আপোষ না করিয়েই ফিরে এলে? লোকটি পুনরায় গেল এবং নিয়ত ঠিক করে স্বামী-স্ত্রীর সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলল। ফলে পুনর্মিলন সক্ষম হয়ে গেল। এটা তখন, যখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উভয়ের পক্ষ থেকে কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হয়। আর যদি বিশেষভাবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হয়, তবে স্বামী স্ত্রীর উপর প্রবল বিধায় তার উচিত শাসন করা এবং বল প্রয়োগে স্ত্রীকে বাধ্য করা। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী নামায না পড়ে, তবে স্বামী জবরদস্তি তাকে নামায পড়াবে, কিন্তু শাসনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তা হচ্ছে, প্রথম উপদেশ দেবে এবং আখেরাতের আযাব ও নিজের শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করবে। এটা উপকারী না হলে শয্যায় স্ত্রীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শয়ন করবে অথবা একই ঘরে থেকে নিজের বিছানা আলাদা করে নেবে। তিন রাত পর্যন্ত তাই করবে। যদি তাও কার্যকর না হয়, তবে স্ত্রীকে এমনভাবে মারধর করবে, যাতে কষ্ট তো হয়, কিন্তু জখম হবে না এবং হাড্ডি ভাঙ্গবে না। মুখে মারবে না। এটা নিষিদ্ধ! জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন ঃ যখন স্বামী খাবে, স্ত্রীকে খাওয়াবে এবং যখন নিজে পরবে, তখন স্ত্রীকে পরাবে। যদি মারার প্রয়োজন হয় তবে নির্মমভাবে মারবে না। আলাদা শয়ন করলে একই ঘরে শয়ন করবে। স্ত্রীর কোন দ্বীনদারীর ব্যাপারে রাগ করলে দশ-বিশ দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে শয়ন বর্জন করা স্বামীর জন্যে জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এমন করেছেন। একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে তিনি কিছু উপহার প্রেরণ করেন। হযরত যয়নব তা ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিবির ঘরেই তশরীফ রাখতেন, তিনিই আরজ করতেন ঃ যয়নব আপনার কদর করেনি। আপনার দেয়া উপহার সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল বিবিকে সতর্কবাণী শুনিয়ে পূর্ণ একমাস তাঁদের সাথে রাগ করে রইলেন। এর পর তাঁদের কাছে গেলেন।

দশম আদব হচ্ছে সহবাস সংক্রান্ত আদব। সহবাসে মোস্তাহাব হচ্ছে বিসমিল্লাহ বলে সূরা এখলাস পাঠ করবে এবং আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে এই দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تَخْرُجَ ذٰلِكَ مِنْ صُلْبِىْ -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তখন এই দোয়া পড়বে–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ, আমাকে আলাদা রাখ শয়তান থেকে এবং শয়তানকে আলাদা রাখ তোমার দেয়া সন্তান থেকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সন্তান জন্ম নিলে এই দোয়ার বরকতে শয়তান তার কোন ক্ষতি করবে না। এর পর বীর্যস্খলনের সময় নিকটবর্তী হলে ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে এই দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَّجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আত্মীয় ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সহবাসের সময় নিজেকে এবং স্ত্রীকে কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করে নেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক ঢেকে নিতেন এবং বিবিকে বলতেন ঃ গাম্ভীর্য সহকারে থাক। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করতে চায়, তখন যেন গাধার মত উলঙ্গ না হয়। সহবাসের পূর্বে প্রেমালাপ ও চুম্বন করা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্ত্রীর উপর চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পতিত না হয়; বরং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে দূত বিনিময় হওয়া উচিত। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দূত বিনিময় কি? তিনি বললেন ঃ চুম্বন ও প্রেমালাপ। অন্য এক হাদীসে আছে– তিনটি বিষয় পুরুষের অক্ষমতার পরিচায়ক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আলাপ না করে, প্রীতি সৃষ্টি না করে, কাছে শয়ন না করেই স্ত্রী অথবা বাঁদীর সাথে সহবাস শুরু করা এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নেয়া ও স্ত্রীর প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে দেয়া।

তিন রাতে সহবাস করা মাকরূহ– মাসের প্রথম ও শেষ রাতে এবং পনর তারিখের রাতে । কোন কোন আলেম জুমুআর দিন ও জুমুআর রাতে সহবাস করা মোস্তাহাব বলেছেন। পুরুষের বীর্যস্খলন হলে কিছুক্ষণ এমনিভাবে থেমে থাকবে, যাতে স্ত্রীর প্রয়োজনও পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, মাঝে মাঝে স্ত্রীর বীর্যস্খলন বিলম্বে হয়। তখন পুরুষের সরে যাওয়া তার পীড়ার কারণ হয়। একযোগে বীর্যস্খলন হওয়াকে স্ত্রী ভাল মনে করে। স্বামীর উচিত প্রতি চার দিনে একবার সহবাস করা। অবশ্য এর চেয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বেশী কমও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে স্ত্রীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা স্ত্রীকে সতী পুণ্যবতী রাখা স্বামীর উপর ওয়াজিব। হায়েযের দিনগুলোতে এবং পরে গোসল করার পূর্বে সহবাস করবে না। কোরআন পাকে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কথিত আছে, এতে সন্তান কুষ্ঠগ্রস্ত হয়। হায়েযের দিনগুলোতে সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সমগ্র শরীর ভোগ করা জায়েয। পেছনের দিক অর্থাৎ, মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা নাজায়েয। কেননা, হায়েযওয়ালী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নোংরামির কারণে হারাম। মলদ্বারে সহবাস করলে সর্বাবস্থায় নোংরামি হয়ে থাকে। সুতরাং এর নিষেধাজ্ঞা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অধিকতর কঠোর। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ-এর অর্থ, যখন ইচ্ছা আপন শস্যক্ষেত্রে আস। এই অর্থ নয় যে, যেদিক দিয়ে ইচ্ছা আস। হায়েযের দিনগুলোতে নাভি থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় বেঁধে রাখা স্ত্রীর জন্যে মোস্তাহাব। হায়েযের দিনগুলোতে স্ত্রীর সাথে আহার করা ও সাথে শয়ন করা জায়েয। সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে জননেন্দ্রিয় ধুয়ে নেয়া উচিত। রাতের শুরুভাগে সহবাস করা মাকরূহ। কেননা, এতে নাপাক অবস্থায় শয়ন করতে হয়। সহবাসের পর ঘুমাতে অথবা কিছু খেতে চাইলে নামাযের ওযুর মত ওযু করে নেয়া সুন্নত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যেতে পরে কি না? তিনি বললেন ঃ হাঁ, যদি ওযু করে নেয়। এক্ষেত্রে ওযু ছাড়া নিদ্রা যাওয়ার অনুমতিও রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নাপাক অবস্থায় পানিতে হাত না লাগিয়ে ঘুমিয়ে থাকতেন।

সহবাসের অন্যতম আদব হচ্ছে বাইরে বীর্যস্খলন না ঘটানো; বরং বীর্যস্খলন গর্ভাশয়ের মধ্যেই হওয়া উচিত। আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করতে চাইবেন সে তো সৃষ্টি হবেই। এমতাবস্থায় বীর্যস্খলন প্রত্যাহার করায় কি লাভ? এর পর বাইরে বীর্যস্খলন ঘটানো বৈধ কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের চারটি বিভিন্ন মাযহাব রয়েছে। কোন কোন আলেম সর্বাবস্থায় একে বৈধ বলেন। কেউ কেউ সর্বাবস্থায় হারাম বলেন। কারও মতে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বৈধ এবং সম্মতি ছাড়া অবৈধ। কোন কোন আলেম বলেন, এটা বাঁদীর সঙ্গে বৈধ এবং স্বাধীন নারীর সাথে অবৈধ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমাদের মতে বিশুদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, এ কাজটি বৈধ এবং উত্তম দিক বর্জনের অর্থে মাকরূহ। এটা তেমনি মাকরূহ, যেমন বলা হয়, যিকির ও নামায ব্যতীত মসজিদে চুপচাপ বসে থাকা মাকরূহ। এটা মাকরূহ তাহরীমীও নয়, তানযিহীও নয়। কেননা, এর নিষেধাজ্ঞা কোরআন হাদীসে প্রমাণিত নেই।

অতঃপর জানা উচিত, গর্ভপাত করা এবং জীবন্ত শিশু প্রোথিত করা পাপ। কেননা, এতে একটি বিদ্যমান বস্তুর উপর অত্যাচার চালানো হয়। এর পর বিদ্যমান হওয়ারও কয়েকটি স্তর আছে।

(১) বীর্য গর্ভাশয়ে পতিত হওয়া এবং স্ত্রীর বীর্যের সাথে মিলে জীবন লাভের যোগ্য হওয়া। এমতাবস্থায় একে নষ্ট করা পাপ। (২) যদি এটা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়, তখন নষ্ট করা পাপ পূর্বের তুলনায় বেশী। (৩) যদি সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার হয় তখন নষ্ট করা আরও বড় পাপ। (৪) যদি সন্তান জীবিতাবস্থায় মাতৃগর্ভে থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন নষ্ট করা সর্বাধিক অন্যায় কাজ।

আমরা গর্ভাশয়ে বীর্য পতিত হওয়াকে অস্তিত্ব লাভের প্রাথমিক স্তর বলেছি– পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্যস্খলনকে বলিনি। এর কারণ ভ্রূণ কেবল পুরুষের বীর্যের দ্বারা তৈরী হয় না; বরং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে অথবা পুরুষের বীর্য ও হায়েযের রক্তের সংমিশ্রণে তৈরী হয়। জনৈক বিশ্লেষক লেখেছেন, মাংসপিণ্ড আল্লাহ তাআলার আদেশে হায়েযের রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। এর সাথে রক্তের সম্পর্ক দুইয়ের সাথে দুধের সম্পর্কের অনুরূপ। হায়েযের রক্ত জমাট হওয়ার জন্যে পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ জরুরী; যেমন দুধ জমাট বাঁধার জন্যে জমাট দইয়ের সংমিশ্রণ শর্ত। মোট কথা, বীর্য জমাট হওয়ার কাজে নারীর বীর্য একটি স্তম্ভ এবং নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য সন্তানের অস্তিত্ব লাভের জন্যে এমন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব লাভে এক পক্ষের প্রস্তাব ও অপর পক্ষের গ্রহণ হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করে এবং অপর পক্ষ তা গ্রহণ না করে, তবে অপর পক্ষকে বিক্রয় ভেঙ্গে দেয়ার দোষে দোষী বলা হবে না। হাঁ, প্রস্তাব ও গ্রহণ উভয়টি হয়ে যাওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিক্রয় ভঙ্গ করা বলা হবে। পুরুষের পৃষ্ঠদেশে বীর্য থাকলে যেমন সন্তান সৃষ্টি হয় না, তেমনি পুরুষাঙ্গ থেকে বের হওয়ার পরেও সন্তান সৃষ্টি হয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না, যে পর্যন্ত নারীর বীর্য অথবা হায়েযের রক্তের সাথে মিশ্রিত না হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বাইরে বীর্যস্খলন উপরোক্ত কারণে মাকরূহ না হলেও কুনিয়তের কারণে মাকরূহ হবে। কেননা খারাপ নিয়তেই এ ধরনের কাজ করা হয়, যাতে কিছু গোপন শেরকের লেশ থাকে। এর জওয়াব, পাঁচ প্রকার নিয়ত এ কাজের কারণ হয়ে থাকে।

প্রথম নিয়ত বাঁদীদের বেলায়। তা হচ্ছে, পুরুষ দেখে, বাঁদীর গর্ভ থেকে সন্তান হলে বাঁদী মুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। ফলে সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এমন উপায় করা প্রয়োজন যাতে বাঁদী চিরকাল তার বাঁদী থাকে। বলাবাহুল্য, আপন মালিকানা বিনষ্ট হওয়ার কারণাদি দূর করা নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় নিয়ত স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও স্বাস্থ্য অটুট রাখা; যাতে সে স্বাস্থ্যবতী ও প্রাণবন্ত থাকে। কেননা, প্রসব বেদনার মধ্যে অনেক বিপদাশংকা থাকে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের নিয়তও নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয় নিয়ত সন্তানের সংখ্যাধিক্যের কারণে ব্যয় বেড়ে যাওয়ার আশংকা করা। এটাও নিষিদ্ধ নয়, যাতে মানুষকে অধিক আমদানীর শ্রম স্বীকার করতে এবং অবৈধ আমদানীর পথে পা বাড়াতে না হয়। কেননা, সাংসারিক ব্যয় কম থাকা দ্বীনদারীর জন্য সহায়ক। তবে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا বাক্যে আল্লাহ রিযিকের যে ওয়াদা করেছেন, তার উপর ভরসা করার মধ্যেই রয়েছে মাহাত্ম্য ও পূর্ণতা। সুতরাং এই তৃতীয় প্রকার নিয়ত করলে একটি মহৎ ও উত্তম বিষয় বর্জন করা হয়, কিন্তু পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে আমরা এটা নিষিদ্ধ বলতে পারি না।

চতুর্থ নিয়ত হচ্ছে এ বিষয়ের আশংকা যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে বিবাহ দিতে হবে এবং কাউকে জামাতা করার কলংক অর্জন করতে হবে। এ কলংকের ভয়ে আরবরা কন্যা সন্তানকে হত্যা করত এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এ নিয়ত অবশ্যই মহাপাপ। এ নিয়তে কেউ গর্ভাশয়ের বাইরে বীর্যস্খলন ঘটালে সে গোনাহগার হবে।

পঞ্চম নিয়ত স্বয়ং স্ত্রীর বাধাদান। সে গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে বীর্যস্খলনে সম্মত হয় না। কারণ, সে নিজেকে ইযযতের অধিকারিণী মনে করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় এবং প্রসব বেদনা, নেফাস ও স্তন্যদান থেকে সযত্নে বেঁচে থাকে। এ ধরনের নিয়ত খুবই গর্হিত। খারেজী সম্প্রদায়ের মহিলাদের এরূপ অভ্যাস ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বসরায় তশরীফ নিয়ে গেলে এমনি এক মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাকে কাছেই আসতে দেননি।

মোট কথা, জন্মশাসন দূষণীয় নয় যদি তা সঠিক নিয়তে করা হয়। এখন প্রশ্ন হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا। যেব্যক্তি সন্তান সন্ততির ভয়ে বিবাহ বর্জন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ আপনি বিবাহ বর্জন ও বাইরে বীর্যস্খলনকে একই রূপ বলেন এবং সন্তানের ভয়ে একে মাকরূহ বলেন না! এর জওয়াব, আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়– এর অর্থ, সে আমাদের অনুরূপ এবং আমাদের পথ ও সুন্নতের অনুসারী নয়। আমাদের সুন্নত হচ্ছে উত্তম কাজ করা। আবার প্রশ্ন হয়, অন্যত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কাজকে ذالك الواد الخفى। (গোপন সন্তান প্রোথিতকরণ) বলেছেন, এর পর وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেছেন। এটি সহীহ হাদীসের রেওয়ায়েত। এর জওয়াব, সহীহ রেওয়ায়েতে এর বৈধতাও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী হওয়া প্রমাণিত হয় না। আরও প্রশ্ন হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বাইরে বীর্যস্খলন ঘটানো ক্ষুদ্রাকারের জীবন্ত প্রোথিতকরণ। আমরা এর জওয়াবে বলি, হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তি একটি 'কিয়াস' তথা অনুমান। তিনি অস্তিত্বকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে তা দূর করা ক্ষুদ্রাকারের জীবন্ত প্রোথিতকরণ বলেছেন। এই কিয়াস দুর্বল। তাই হযরত আলী (রাঃ) এটা শুনে মেনে নেননি এবং বলেন, কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা ছাড়া জীবন্ত প্রোথিতকরণ প্রমাণিত হয় না। এর পর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, যাতে স্তরগুলো বর্ণিত হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ۔

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে বীর্যের আকারে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এর পর আমি বীর্যকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এর পর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। এর পর তিনি وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ আয়াতটি পাঠ করলেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত কিয়াস কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? কেননা বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل ـ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে যখন কোরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন আমরা আযল (বাইরে বীর্যস্খলন) করতাম। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

كنا نعزل فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ـ

অর্থাৎ, আমরা আযল করতাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

হযরত জাবের থেকে আর একটি সহীহ্ রেওয়ায়েত রয়েছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আমার একটি বাঁদী আছে। সে খেদমত করে এবং বৃক্ষে পানি দেয়। আমি তার সাথে সহবাস করি, কিন্তু আমি চাই না, তার গর্ভ সঞ্চার হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدرلها ـ

অর্থাৎ, তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল কর, কিন্তু যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে তা আসবেই। কয়েকদিন পর লোকটি আবার এসে আরজ করল ঃ আমার সে বাঁদী গর্ভবতী হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, তার ভাগ্যে লেখা সন্তান অবশ্যই আসবে। এসব রেওয়ায়েত বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একাদশ আদব সন্তান সংক্রান্ত। প্রথম, ছেলে সন্তান হলে অধিক খুশী এবং কন্যা সন্তান হলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। কেননা, কেউ জানে না তার জন্যে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মঙ্গলজনক; বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কন্যা সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তা ও সওয়াব অধিক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির একটি কন্যা থাকে এবং সে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, লালন-পালন করে ও তার উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পূর্ণ করে, সেই কন্যা তার জন্যে ডানে বামে দোযখের আড়াল হয়ে তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তান লাভ করে এবং তারা যতদিন পিতার কাছে থাকে, ততদিন পিতা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, সেই কন্যাদ্বয় তাকে জান্নাতে দাখিল করবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ যেব্যক্তি বাজার থেকে নতুন বস্তু আপন সন্তানদের জন্যে কিনে আনে, সে যেন তাদের জন্যে খয়রাত নিয়ে আসে। তার উচিত এই বস্তু পুত্রদের পূর্বে কন্যাদের মধ্যে বন্টন শুরু করা। কেননা, যেব্যক্তি কন্যাকে খুশী করে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করে। যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আল্লাহ্ তার উপর দোযখ হারাম করে দেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كانت له ثلاث بنات او اخوات نصبر على لاواتهن وصنواتهن ادخله الله الجنة بفضل رحمة اياهن -

অর্থাৎ, যেব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান অথবা বোন থাকে এবং তাদের বিপদাপদ ও নির্মমতায় সবর করে, আল্লাহ তাকে কন্যাদের প্রতি করুণা করার কল্যাণে জান্নাতে দাখিল করবেন। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ যদি দু'কন্যা থাকে? তিনি বললেন ঃ দু'কন্যার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে। এক ব্যক্তি বলল ঃ একজন হলে? তিনি বললেন ঃ একজন হলেও।

দ্বিতীয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর কানে আযান দেবে। হযরত রাফে (রাঃ)-এর পিতা বর্ণনা করেন ঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হলে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কানে আযান দিয়েছেন। আমি এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছি। আরও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

من ولد له مولود فاذن فى اذنه اليسرى دفعت عنه ام الصبيان -

অর্থাৎ, যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অতঃপর সে তার বাম কানে আযান দেয়, সেই সন্তান 'উম্মুছ ছিবইয়ান' রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। যখন শিশুর মুখ খোলে, তখন সর্বপ্রথম তাকে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শিক্ষা দেয়া এবং সপ্তম দিনে খতনা করা মোস্তাহাব। এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

তৃতীয়, শিশুর উত্তম নাম রাখবে। এটাও শিশুর হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন- اذا سميتم فعبدوا অর্থাৎ, যখন নাম রাখ, তখন যেন নামের প্রথম অংশ 'আবদ' (বান্দা) হয়। احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। سموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى অর্থাৎ, তোমরা আমার নামে নাম রাখ। তবে আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না। আলেমগণ বলেন ঃ এ নিষেধাজ্ঞা কেবল রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে ছিল। তখন তাঁকে 'আবুল কাসেম' নামে ডাকা হত। এখন অন্যের জন্যে এই নাম রাখা দূষণীয় নয়। তবে তাঁর নাম ও ডাকনাম এক ব্যক্তির জন্যে একত্রিত করা উচিত নয়, হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এই নিষেধাজ্ঞাও কেবল তাঁর আমলে ছিল। এক ব্যক্তির ডাকনাম ছিল আবু ঈসা (ঈসার বাপ)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনে বললেন ঃ ঈসা (আঃ)-এর তো বাপ ছিল না। এ থেকে জানা গেল, আবু ঈসা নাম রাখা মাকরূহ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তারও নাম রাখা উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি শুনেছি গর্ভপাতের সন্তান কেয়ামতের দিন পিতার পেছনে পেছনে ফরিয়াদ করবে এবং বলবে, তুমি আমাকে নামহীন ছেড়ে দিয়ে নষ্ট করেছ। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একথা শুনে বললেন ঃ তা কেমন করে হবে? পিতা তো জানতেও পারে না যে, গর্ভপাতজনিত সন্তান ছেলে না মেয়ে। এমতাবস্থায় সে কিরূপে নাম রাখবে? জওয়াবে আবদুর রহমান বললেন ঃ অনেক নাম আছে, যা পুরুষ ও নারী উভয়েরই হতে পারে; যেমন আম্মারা, তালহা, ওতবা ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم -

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের নামে ও তোমাদের পিতার নামে আহূত হবে। অতএব তোমরা সুন্দর সুন্দর নাম রাখ। কারও নাম খারাপ থাকলে তা বদলে দেয়া মোস্তাহাব। রসূলে করীম (সাঃ) 'আছ' (পাপী) -এর নাম পাল্টে আবদুল্লাহ রেখেছিলেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর নাম ছিল বাররাহ। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিজেই নিজেকে ভাল বল। উল্লেখ্য, 'বাররাহ' অর্থ নিরপরাধ। এর পর তিনি এই নাম পাল্টে যয়নব রাখলেন।

চতুর্থ, সন্তান জন্ম গ্রহণের পর আকীকা করবে। পুত্রের জন্যে দু'টি ছাগল এবং কন্যার জন্য একটি ছাগল জবাই করবে। আকীকার জন্তু নর হোক কিংবা মাদী, তাতে কিছু আসে যায় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) পুত্রের আকীকায় দুটি ছাগল এবং কন্যার আকীকায় একটি ছাগল জবাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর আকীকায় একটি ছাগল জবাই করেন। এ থেকে জানা গেল, এক ছাগল জবাই করলেও ক্ষতি নেই। ভূমিষ্ঠ শিশুর চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা অথবা রূপা খয়রাত করা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর জন্মের সপ্তম দিন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ তার চুল মুণ্ডন করে চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আকীকার জন্তুর হাড়া ভাঙ্গা উচিত নয়।

পঞ্চম, সন্তানের কণ্ঠ তালুতে খোরমা অথবা মিষ্টি মেখে দেবে। আবু বকর তনয়া হযরত আসমা (রাঃ) বলেন ঃ কোবায় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র আমার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে এনে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খোরমা চিবিয়ে তার রস আবদুল্লাহর মুখে দিলেন। তাই সর্বপ্রথম তার পেটে যা পড়ে, তা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লালা মোবারক। এর পর তিনি তার তালুতে খোরমা মেখে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন । মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিশু সে-এই জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই তার জন্মগ্রহণে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুসলমানদের আনন্দের সীমা ছিল না; কেননা, লোকেরা বলাবলি করতো যে, ইহুদীরা তোমাদের উপর জাদু করেছে। তোমাদের সন্তান সন্ততি হবে না।

দ্বাদশ আদব তালাক সংক্রান্ত। প্রথম, তালাক একটি বৈধ কাজ, কিন্তু বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে এর চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় দ্বিতীয়টি নেই। এটা তখনই বৈধ হয়, যখন এর দ্বারা অন্যায় উৎপীড়ন উদ্দেশ্য না থাকে, অর্থাৎ, স্ত্রীকে তালাক দেয়া একটি উৎপীড়ন। অপরকে উৎপীড়ন করা জায়েয নয়; কিন্তু স্ত্রী দোষী হলে অথবা স্বামীর তালাক দেয়ার প্রয়োজন হলে জায়েয হবে।

সেমতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا -

অর্থাৎ, স্ত্রীরা যদি তোমাদের অনুগত হয় তবে বিচ্ছিন্নতার পথ তালাশ করো না।

যদি স্বামীর পিতা পুত্র বধূকে মন্দ মনে করে, তবে তাকে তালাক দিয়ে দেয়া উচিত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে অপছন্দ করতেন এবং আমাকে তালাক দিতে বলতেন। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভিমত চাইলে তিনি বললেন ঃ হে ইবনে ওমর, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। এ হাদীস থেকে জানা যায়, পিতার হক অগ্রে, কিন্তু এটা তখন, যখন পিতার অপছন্দ করাটা কুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। যেমন হযরত ওমরের মত পিতার হক নিঃসন্দেহে অগ্রে। স্ত্রী যদি স্বামীকে পীড়ন করে অথবা তার পরিবারকে খারাপ বলে, তবে স্ত্রী দোষী। তেমনি যদি দুশ্চরিত্র হয় ও দ্বীনদার না হয়, তা হলেও দোষী। কোরআনে আছে— وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (মহিলারা বের হবে না; কিন্তু যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজ করে।) এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ স্ত্রী পরিবারের লোকজনকে মন্দচারী বললে এবং স্বামীকে কষ্ট দিলে এও তার নির্লজ্জ কাজ। যদিও এ বিষয়বস্তুটি ইদ্দত সম্পর্কিত; কিন্তু এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য বুঝা যায়। যদি উৎপীড়ন স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্ত্রীর উচিত কিছু অর্থসম্পদ দিয়ে স্বামীর কবল থেকে মুক্তি লাভ করা। স্ত্রীকে যে পরিমাণ অর্থসম্পদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশী নেয়া এক্ষেত্রে স্বামীর জন্যে মাকরূহ। স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থসম্পদ দেয়ার কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ (স্ত্রী মুক্তিপণস্বরূপ যা দেয়, তাতে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নেই।) মোট কথা, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে যতটুকু পায়, সে পরিমাণ অথবা তার চেয়ে কম মুক্তিপণ দেয়া উচিত। স্ত্রী অহেতুক তালাক প্রার্থনা করলে সে গোনাহগার হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ايما امراة سألت زوجها طلاقها من غير باس لم ترح رائحة الجنة অর্থাৎ, যে স্ত্রী কোন ভয় ও প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে فالجنة عليها حرام –তার উপর জান্নাত হারাম বলা হয়েছে।

তালাক দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর উচিত চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা– (১) যে তোহ্র তথা হায়েয থেকে পাক থাকার সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি, সেই তোহরে তালাক দেয়া। কেননা, যে তোহরে সহবাস হয়ে গেছে, সে তোহরে তালাক দেয়া বেদআত ও হারাম। যদিও তালাক হয়ে যায়। কেননা, এমতাবস্থায় স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ এরূপ তালাক দিলে তার উচিত রুজু করা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরকে বললেন ঃ তাকে রুজু করতে বল। এর পর যখন তার স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হবে, এর পর আবার যখন হায়েয হবে ও আবার পাক হবে, তখন ইচ্ছা করলে তালাক দেবে। নতুবা থাকতে দেবে। এখানে হযরত ইবনে ওমরকে দু'তোহর অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, যাতে রুজু করার উদ্দেশ্য কেবল তালাক দেয়া না হয়ে যায়। (২) তালাক দেবে, দুই অথবা তিন তালাক এক সাথে দেবে না। কেননা, ইদ্দতের পর এক তালাক দ্বারাও সেই উপকার হয়, যা তিন তালাক দ্বারা হয়; অর্থাৎ, স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু এক তালাক দেয়ার মধ্যে আরও দু'টি উপকার আছে। এক, যদি তালাক দেয়ার পর স্বামী অনুতপ্ত হয়, তবে ইদ্দতের দিনগুলোতে রুজু করতে পারে। দুই, ইদ্দতের পর আবার এই স্ত্রীকে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারে। যদি তিন তালাক দেয়ার পর অনুতপ্ত হয়, তবে হালাল করার প্রয়োজন হবে এবং দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হালাল একটি নিন্দনীয় কাজ। এতে অপরের স্ত্রীর মধ্যে নিয়ত লেগে থাকে এবং তার তালাকের অপেক্ষা করা হয়। তিন তালাকই এসব অনিষ্টের কারণ। এক তালাক দিলে উদ্দেশ্যও সাধিত হয়ে যায় এবং অনিষ্টও হয় না। তবে তিন তালাক একত্রে দেয়া হারাম নয়; বরং এসব অনিষ্টের কারণে মাকরূহ। (৩) সম্প্রীতির পরিবেশে তালাক দেবে এবং নির্মমতা ও ঘৃণা সহকারে তালাক দেবে না। আকস্মিক বিরহের কারণে স্ত্রীর যে কষ্ট হবে, তা দূর করার জন্যে হাদিয়াস্বরূপ স্ত্রীকে কিছু দিয়ে তার মন খুশী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَتِّعُوهُنَّ অর্থাৎ, যে স্ত্রীর বিবাহে মোহরানা উল্লেখ করা হয়নি তাকে 'মুতআ' দেয়া ওয়াজিব। (৪) বিবাহ ও তালাক উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল- স্ত্রীর প্রতি আপনার সন্দেহ কি? তিনি বললেন ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাঁস করে না। এর পর যখন তিনি তালাক দিয়ে দিলেন, তখন জিজ্ঞেস করা হল, আপনি তাকে কেন তালাক দিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি বেগানা স্ত্রীর গোপন তথ্য কেন প্রকাশ করব? মোট কথা, স্বামীর উপর স্ত্রীর যেসকল হক রয়েছে, এ পর্যন্ত সেগুলো বর্ণিত হল।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ঃ এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা, বিবাহ প্রকারান্তরে বাঁদী হওয়ার নামান্তর বিধায় স্ত্রী যেন স্বামীর বাঁদী হয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর হক যে বেশী, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ايما امراة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة -

অর্থাৎ, যে স্ত্রী এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কোন এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল ঃ উপর তলার কক্ষ থেকে নীচে নামবে না। নীচে তার পিতা বসবাস করত। ঘটনাক্রমে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্ত্রী নীচে পিতার কাছে নামার অনুমতি চেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। শেষ পর্যন্ত পিতা মারা গেলে সে আবার অনুমতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রার্থনা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। ফলে পিতা সমাধিস্থও হয়ে গেল; কিন্তু সে নীচে নামল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহিলাকে বলে পাঠালেন ঃ তুমি যে স্বামীর আদেশ পালন করেছ, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার মাগফেরাত করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

اذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها ـ

অর্থাৎ, যখন স্ত্রী পাঞ্জেগানা নামায পড়ে, রমযান মাসের রোযা রাখে, আপন গুপ্ত অঙ্গের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে তার পালনকর্তার জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্যকে ইসলামের রোকনসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ গর্ভবতী নারী, সন্তান প্রসবকারিণী নারী, দুগ্ধদানকারিণী নারী, সন্তানদের প্রতি দয়াশীলা নারী, স্বামীর সাথে যে অসদাচারণ করে, যদি তা না করত, তবে তাদের মধ্যে যারা নামাযী, তারা জান্নাতে প্রবেশ করত। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اطلعت فى النار فاذا اكثر اهلها النساء فقلن لم يا رسول الله قال يكثرن اللعن ويكفرن العشيرة ـ

অর্থাৎ, আমি দোযখে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ বাসিন্দাই মহিলা। মহিলারা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এর কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ মহিলারা অভিসম্পাত বেশী করে এবং স্বামীদের না-শোকরী করে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে পুরুষ জান্নাতীদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ মহিলারা কোথায়? উত্তর হল ঃ দু'টি লাল বস্তু তাদের জান্নাতে আসার পথে বাধা হয়েছে। একটি স্বর্ণ ও অপরটি জাফরান। অর্থাৎ, অলংকার ও রঙ্গিন পোশাক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক যুবতী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলাল্লাহ্, আমি যুবতী। মানুষ আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু বিবাহ আমার কাছে ভাল লাগে না। এখন জানতে চাই, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ ধরে নেয়া যাক, স্বামীর আপাদমস্তক পুঁজে ভর্তি। যদি স্ত্রী এই পুঁজ চেটে নেয়, তবুও তার শোকর আদায় করতে পারবে না। মহিলা বলল ঃ আমি বিবাহ করব কি? তিনি বললেন ঃ করে নাও। বিবাহ করা উত্তম । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ খাসআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমি স্বামীহীনা, বিবাহ করতে চাই। এখন স্বামীর হক কি, জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ স্বামীর এক হক, সে যদি উটের পিঠে থেকেও সহবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্ত্রী অস্বীকার করতে পারবে না। আরেক হক, কোন বস্তু তার গৃহ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে দেবে না। দিলে তুমি রোযা রেখে কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তই থাকবে। তোমার রোযা কবুল হবে না। যদি তুমি স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর থেকে বের হও, তবে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। এক হাদীসে আছে–

لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها .

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ করতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম যেন সে তার স্বামীকে সেজদা করে।

এরূপ বলার কারণ, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক বেশী । রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ স্ত্রী আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার অধিকতর নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে তার কক্ষের অভ্যন্তরে থাকে। স্ত্রীর পক্ষে গৃহের আঙ্গিনায় নামায পড়া মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর কক্ষের ভেতরকার কক্ষে নামায পড়া কক্ষের ভেতরে নামায পড়ার তুলনায় শ্রেয়ঃ। এটা বলার কারণ, স্ত্রীর অবস্থার উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা পর্দার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে অবস্থায় পর্দা বেশী হবে, সে অবস্থাই তার জন্যে উত্তম। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان (নারী হল নগ্নতা । সে যখন বের হয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন শয়তান উঁকি দিয়ে দেখে।) তিনি আরও বলেন ঃ স্ত্রীর দশটি নগ্নতা রয়েছে। সে যখন বিবাহ করে তখন স্বামী একটি নগ্নতা ঢেকে দেয়। আর যখন সে মারা যায়, তখন কবর দশটি নগ্নতা আবৃত করে দেয়। মোট কথা, স্বামীর হক স্ত্রীর উপর অনেক। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি– একটি আত্মরক্ষা ও পর্দা এবং অপরটি প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্র দাবী না করা এবং স্বামীর উপার্জন হারাম হলে তা থেকে বেঁচে থাকা। সেমতে পূর্ববর্তীকালে নারীর অভ্যাস তাই ছিল। তখন কোন পুরুষ সফরে গেলে তার স্ত্রী ও কন্যারা তাকে বলত ঃ খবরদার! হারাম উপার্জন করবে না। আমরা ক্ষুধা ও কষ্টে সবর করব; কিন্তু দোযখের আগুনে সবর করতে পারব না। সে যুগের এক ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করলে তার প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ হল। সবাই তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি তার সফরে সম্মত হচ্ছ কেন? সে তো তোমার খরচের জন্যে কিছুই রেখে যাচ্ছে না! স্ত্রী বলল ঃ আমি আমার স্বামীকে যেদিন থেকে দেখেছি, ভক্ষকই পেয়েছি– রিযিকদাতা পাইনি। আমার পালনকর্তা আমার রিযিকদাতা। এখন ভক্ষক চলে যাবে এবং রিযিকদাতা আমার কাছে থাকবে। রাবেয়া বিনতে ইসমাঈল আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারীর কাছে নিজের বিবাহের পয়গাম দিলে এবাদতের কারণে তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বলেন ঃ স্ত্রীর খাহেশ আমার নেই। আমি এবাদতেই মগ্ন থাকতে চাই। রাবেয়া বললেনঃ আমি আমার অবস্থায় তোমার চেয়ে অধিক মগ্ন রয়েছি। পুরুষের খাহেশ আমার নেই, কিন্তু আমি আমার পূর্ব স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক ধন সম্পদ পেয়েছি। আমি চাই তুমি এসব ধন-সম্পদ তোমার সঙ্গীদের মধ্যে ব্যয় কর এবং তোমার মাধ্যমে আমি সজ্জনদের পরিচয় লাভ করি। আহমদ বললেন ঃ আমি আগে আমার ওস্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেই। অতঃপর তিনি হযরত সোলায়মান দারানীর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি রাবেয়ার কথা শুনে বললেন ঃ তাকে বিয়ে করে নাও। সে আল্লাহর ওলী। কেননা, এরূপ কথাবার্তা ওলীরা বলেন। আহমদ বলেন ঃ ইতিপূর্বে ওস্তাদ আমাকে বিবাহ করতে বারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যে কেউ বিয়ে করেছে, সে-ই বদলে গেছে। এর পর আমি রাবেয়াকে বিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলাম। এই রাবেয়াও সিরিয়ায় তেমনি ছিল, যেমন ছিল বসরায় রাবেয়া বসরী।

স্বামীর ধনসম্পদ অযথা ব্যয় না করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য; বরং সে স্বামীর ধনসম্পদের হেফাযত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ স্ত্রীর জন্যে হালাল নয় যে, সে স্বামীর গৃহ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কোন খাদ্যবস্তু অন্যকে দেবে। তবে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে কাঁচা খাদ্য সামগ্রী দিতে পারে। যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে খাওয়ায়, তবে সওয়াব স্বামী নেবে এবং গোনাহ স্ত্রীর উপর থাকবে। পিতামাতার উপর কন্যা সন্তানের হক তাদেরকে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং স্বামীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করার শিক্ষা দেবে। বর্ণিত আছে, আসমা বিনতে খারেজা করারী তাঁর কন্যার বিয়ের সময় তাকে এরূপ উপদেশ দান করেন ঃ যে গৃহে তুমি এসেছিলে, এখন সেখান থেকে বের হয়ে এমন শয্যায় যাচ্ছ, যে সম্পর্কে তুমি ওয়াকিফহাল ছিলে না। তুমি এমন ব্যক্তির কাছে থাকবে, যার সাথে পূর্ব থেকে পরিচয় ছিল না। অতএব তুমি তার পৃথিবী হবে। ফলে সে তোমার আকাশ হবে। তুমি তার জন্যে শান্তির কারণ হলে সে তোমার সুখের কারণ হবে। তুমি তার বাঁদী হলে সে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার কাছে যাবে না যে, তোমাকে ঘৃণা করে এবং দূরেও থাকবে না যে, দ্রুত ভুলে যায়; বরং সে তোমার কাছে থাকলে তুমি তার নিকটে থাকবে। সে আলাদা থাকলে তুমি দূরে থাকবে। তার নাক, কান ও চোখের দিকে লক্ষ্য রাখবে। সে যেন তোমার কাছ থেকে সুগন্ধি ছাড়া অন্য কিছুর ঘ্রাণ না পায়। সে যখন শুনে তখন যেন তোমার কাছ থেকে ভাল কথা শুনে এবং যখন দেখে তখন যেন ভাল কিছু দেখে।

স্ত্রীর আদবসমূহের মধ্যে একশ' কথার এক কথা, স্ত্রী আপন গৃহে বসে চরকায় সূতা কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকবে। ছাদে আরোহণ করে এদিক ওদিক তাকাবে না। প্রতিবেশীদের সাথে কথা কম বলবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের গৃহে যাবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার সম্মান করবে। প্রত্যেক কাজে তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে না। স্বামীর অনুমতিক্রমে গৃহ থেকে বের হলেও পুরাতন কাপড়-চোপড়ে আবৃতা হয়ে বের হবে। সড়কের মধ্যস্থলে ও বাজার থেকে বেঁচে চলবে। সর্বপ্রযত্নে নিজের অবস্থার উন্নতি ও ঘর-কন্নায় নিয়োজিত থাকবে এবং নামায-রোযার সাথে সম্বন্ধ রাখবে। স্বামীর কোন বন্ধু দরজায় আওয়াজ দিলে যদি স্বামী গৃহে না থাকে, তবে তার সাথে কোন কথা না বলাই নিজের স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবী। স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। খুব সেজেগুজে থাকবে এবং স্বামী সম্ভোগ করতে চাইলে তজ্জন্যে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকবে। সন্তানদের প্রতি স্নেহমমতা করবে। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দেবে না। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে জান্নাতে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে হারাম করেছেন, কিন্তু আমি এক মহিলাকে দেখব সে জান্নাতের দরজার দিকে আমার আগে আগে যেতে থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করব, ব্যাপার কি, এই মহিলা আমার আগে যাচ্ছে? আমাকে বলা হবে; হে মুহাম্মদ (সাঃ)! এ মহিলা সুন্দরী রূপবতী ছিল। তার দুটি এতীম শিশু ছিল। সে তাদের ব্যাপারে সবর করেছে। ফলে তার যে দুর্দশা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এই আত্মত্যাগ পছন্দ করে তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। স্ত্রীর অন্যতম আদব হচ্ছে, স্বামীর সাথে আপন রূপ-লাবণ্য নিয়ে গর্ব না করা এবং স্বামী কুশ্রী হওয়ার কারণে তাকে হেয় মনে না করা। আসমায়ী বলেন ঃ আমি জঙ্গলে গিয়ে একজন নেহায়েত রূপসী মহিলাকে দেখলাম। সাথে তার স্বামীকে দেখলাম চরম কুশ্রী কদাকার। আমি মহিলাকে বললাম ঃ আশ্চর্যের বিষয়, তুমি এমন ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে সুখী আছ! সে বলল ঃ চুপ কর। তুমি ভুল করছ। আসল ব্যাপার হচ্ছে সম্ভবতঃ সে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির কোন কাজ করেছে, যার বিনিময়ে আমাকে লাভ করেছে। আর খুব সম্ভব আমার দ্বারা স্রষ্টার মর্জির খেলাফ কোন কাজ হয়েছে, যার শাস্তিস্বরূপ আমি এই স্বামী পেয়েছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে যা পছন্দ করেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকব না কেন? আসমায়ী বলেন ঃ মহিলা আমাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর করে দিল। স্ত্রীর অন্যতম আদব, সে কোন অবস্থাতেই স্বামীকে পীড়ন করবে না। হযরত মোয়ায ইবনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জাবালের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لاتؤذى امراة زوجها فى الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لاتوذينه قاتلك الله فانما هو عندك رحيل يوشك ان يفارقك الينا ـ

অর্থাৎ. দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে পীড়ন করে, তখন তার বেহেশতী হুর স্ত্রী দুনিয়ার স্ত্রীকে বলে ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি তাকে পীড়ন করো না। সে-তো তোমার কাছে মুসাফির। সত্বরই তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর কর্তব্য হবে তার জন্যে চার মাস দশ দিনের বেশী শোক প্রকাশ না করা। এটা বিবাহের অন্যতম হক। স্ত্রী এই চার মাস দশ দিন সুগন্ধি ও সাজসজ্জা থেকে বেঁচে থাকবে। যয়নব বিনতে আবু সালামা বলেন ঃ আমি আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর পর তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রঙের সুগন্ধি এনে আপন গালে মালিশ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

لايحل لامرة تؤمن بالله واليوم الاخر ان لا تحد على ميت اكثر من ثلثه ايام الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرة ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে– এমন কোন মহিলার জন্যে মৃতের কারণে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়, কিন্তু স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। শোক পালনকালে স্ত্রী মৃত স্বামীর গৃহেই থাকবে। বাপের বাড়ী চলে যাওয়া জায়েয নয়। স্ত্রীর অন্যতম আদব, স্বামীর গৃহে যেসব কাজ সম্পাদন করা তার জন্যে সম্ভব, সেগুলো অম্লান বদনে করবে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেন–

হযরত যোবায়রের সাথে আমার বিবাহ হলে তাঁর কোন ধন-সম্পদ ছিল না। না ছিল কোন গোলাম, না ছিল বাঁদী। কেবল একটি ঘোড়া ও পানি আনার জন্যে একটি উট ছিল। ফলে আমিই তার ঘোড়াকে ঘাস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পানি দিতাম এবং উটের জন্যে খোরমার বীচি কুটে খাবার দিতাম। পানি ভরে আনতাম এবং মশক সেলাই করতাম। এ ছাড়া আটা পিষতাম এবং দু'ক্রোশ দূর থেকে মাথায় বহন করে বীচি আনতাম। অবশেষে আমার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার কাছে একটি বাঁদী পাঠিয়ে দিলেন। এতে আমি অনেক কাজকর্ম থেকে মুক্তি পাই। একদিন আমার মাথায় বীচির বস্তা ছিল, তখন পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। সাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের পেছনে সওয়ার করিয়ে নেয়ার জন্যে আপন উষ্ট্রীকে বসার জন্যে ইশারা করলেন, কিন্তু পুরুষদের সাথে চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম এবং আমার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ স্মরণ করলাম। কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার লজ্জা আঁচ করে চলে গেলেন। বাড়ি ফিরে আমি আমার স্বামী যোবায়রের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তুমি যে মাথায় বীচি বহন করেছ, এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সওয়ার হওয়ার তুলনায় আমার জন্যে কঠিনতর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জীবিকা উপার্জন

প্রকাশ থাকে যে, পরম প্রভু ও কারণাদির স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা পরকালকে প্রতিদান ও শাস্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন এবং ইহকালকে করেছেন মেহনত ও উদ্যম সহকারে কর্মতৎপর হয়ে উপার্জন করার স্থান। কেবল পরকালীন চিন্তায় ব্যস্ত থাকার মধ্যেই ইহলৌকিক তৎপরতা সীমিত নয়; বরং জীবিকার চিন্তাও পরকালীন চিন্তার উপায় ও সহায়ক। সেমতে اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ (দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র) কথাটি প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। ইহকাল থেকেই ক্রমান্বয়ে পরকালের পর্যায় আসে। আজকাল দুনিয়ার মানুষ এ ক্ষেত্রে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত– এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকার মধ্যে এমনই বিভোর যে, পরকালের কথা ভুলেও চিন্তা করে না। এরা বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের দল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক পরকালের কর্মব্যস্ততায় জীবিকা থেকে উদাসীন। এরা উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক সমতার খুব নিকটবর্তী; অর্থাৎ, জীবিকার কাজকর্ম পরকালের জন্যেই করে। এরা মধ্যপন্থী ও মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। বলাবাহুল্য, যেব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণে নিজের জন্যে সততার পথ অপরিহার্য করে নেয় না, সে কখনও মধ্যবর্তিতার স্তর লাভ করতে সক্ষম হবে না এবং যে পর্যন্ত জীবিকা অন্বেষণে শরীয়তের আদবসমূহের অনুসারী হবে না, তার জন্যে দুনিয়া কখনও আখেরাতের ওসিলা হবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশার আদবসমূহ, উপার্জনের প্রকার ও পন্থাসমূহ পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবিকা উপার্জনের ফযীলত

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে জীবিকা উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا অর্থাৎ, এবং আমি দিনকে করেছি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জীবিকা আহরণের সময়। অনুগ্রহ প্রকাশ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ, এতে নিহিত রেখেছেন তোমাদের জীবিকা কিন্তু তোমরা কমই শোকর কর।

এ আয়াতে জীবিকাকে নেয়ামত বলা হয়েছে এবং এর জন্যে শোকর তলব করা হয়েছে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ করবে– এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই।

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমার সাথে রয়েছে এমন লোক যারা যমীনে ভ্রমণ করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করে।

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, অতঃপর ছড়িয়ে পড় পৃথিবীতে এবং অন্বেষণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ।

এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এই–

من الذنوب لايكفرها الا الهم فى المعيشة অর্থাৎ, কিছু গোনাহ আছে, যাকে জীবিকা উপার্জনের চিন্তাই দূর করতে পারে।

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء অর্থাৎ, সত্যপরায়ণ ব্যবসায়ীকে কেয়ামতের দিন সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে একত্রিত করা হবে।

من طلب الدنيا حلا لا تعففا عن المسئلة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অর্জন করে হাত পাতা থেকে বাঁচার জন্যে, সন্তান-সন্ততির সুখের চেষ্টা করার জন্যে এবং প্রতিবেশীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতি দয়া করার জন্যে, সে পূর্ণিমার রাতের আলোকোদ্ভাসিত চাঁদের ন্যায় মুখমন্ডল নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

একদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় জনৈক যুবক, সুঠাম কর্মতৎপর সাহাবীকে ভোরবেলায় কাজকর্মে মশগুল দেখে সকলেই বলল ঃ হায়, তার যৌবন ও কর্মতৎপরতা যদি আল্লাহর পথে ব্যয়িত হত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ বলো না। কেননা, সে যদি নিজেকে হাত পাতা থেকে বাঁচানোর জন্যে কাজকর্ম করে, তবে সে আল্লাহর পথেই রয়েছে। আর যদি সে নিজের বৃদ্ধ পিতা মাতা ও দুর্বল শিশুদের খাতিরে কাজকর্ম করে, যাতে অভাবগ্রস্ত না হয়, তবুও সে আল্লাহর পথেই ব্যস্ত রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্যে কোন কাজকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই পছন্দ করেন। আর যেব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়ার উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপছন্দ করেন। এক হাদীসে আছে– আল্লাহ তা'আলা পেশাজীবী ঈমানদারকে ভালবাসেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

احل ما اكل الرجل من كسبه (মানুষ যা খায়, তার মধ্যে সর্বাধিক হালাল হচ্ছে তার উপার্জন)। আরও বলা হয়েছে–তোমরা ব্যবসাবাণিজ্য কর। কেননা, এতেই রয়েছে রিযিকের দশটি অংশের মধ্যে নয়টি। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কাজ কর? সে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলার এবাদত করি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ভরণ-পোষণ কে করে? সে বলল ঃ আমার এক ভাই। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই তোমার চেয়ে বেশী এবাদতকারী। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার জানা মতে তোমাদেরকে যেসব কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী করে দেয়, সেগুলো সম্পাদনের আদেশ আমি তোমাদেরকে না দিয়ে ছাড়িনি। পক্ষান্তরে আমার জানা মতে, যেসব কাজ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দোযখের নিকটবর্তী করে, সেগুলো থেকে নিষেধ করতেও আমি কসুর করিনি। জিবরাঈল (আঃ) আমার মনে একথা জাগিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি বিলম্বে হলেও তার রিযিক পুরোপুরি লাভ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না; অতএব তোমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় রিযিক অন্বেষণ কর। এ হাদীসে উত্তম পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, রিযিক অন্বেষণ করো না। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, বিলম্বে রিযিক প্রাপ্তি যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে রিযিক অন্বেষণ করার কারণ না হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আছে, তা তার অবাধ্যতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ বাজার আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান। যেব্যক্তি এখানে আসবে, সে কিছু না কিছু নেবে। আরও বলা হয়েছে ঃ খড়ির বোঝা পিঠে বহন করে জীবিকা উপার্জন করা কোন ধনী ব্যক্তির কাছে হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম; ধনী ব্যক্তি কিছু দান করুক বা না করুক। অন্য এক হাদীসে আছে–

من فتح على نفسه بابا من السوال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের একটি দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তার সামনে দারিদ্র্যের সত্তরটি দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

এ সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি এই ঃ লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বৎস, হালাল উপার্জন দ্বারা নিঃস্বতা দূর করবে। কেননা, যে ফকীর হয়ে যায়, তার মধ্যে তিনটি বিষয় সৃষ্টি হয়–(এক) দ্বীনদারীতে তরলতা, (দুই) জ্ঞানবুদ্ধির দুর্বলতা এবং (তিন) ভদ্রতার অবসান। এই তিনটি বিষয়ের চেয়েও মারাত্মক হল মানুষ তাকে ঘৃণা করে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রিযিক অন্বেষণ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহ আমাকে রিযিক দাও বলা উচিত নয়। কেননা, তুমি জান, আসমান থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য বর্ষিত হয় না। যায়েদ ইবনে সালামা নিজের ক্ষেতে বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে দেখে বললেন ঃ তুমি চমৎকার কাজ করছ। মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া উচিত। এতে তোমার দ্বীনদারী অধিক সংরক্ষিত থাকবে এবং এভাবেই তুমি মানুষের প্রতি অধিক কৃপা করতে পারবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন কাউকে দেখি সে বেকার– দুনিয়ার কাজও করে না এবং দ্বীনের কাজও করে না, তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইবরাহীম নখয়ীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ বলুন, সাধু ব্যবসায়ী আপনার অধিক পছন্দনীয়, না সেই ব্যক্তি, যে এবাদতের জন্যে মুক্ত হয়ে আছে? তিনি বললেন ঃ আমি সাধু ব্যবসায়ীকে অধিক ভালবাসি। কেননা, সে জেহাদে লিপ্ত রয়েছে। শয়তান তাকে কখনও মাপে, কখনও ওজনে, কখনও গ্রহণে এবং কখনও প্রদানে ধোঁকা দিতে চায়। সে শয়তানের সাথে লড়াই করে। তার আনুগত্য করে না। এ ক্ষেত্রে হযরত হাসান বসরীর বিচার বিপরীত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি বাজারে যাওয়া ও পরিবারের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় করার জায়গা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ করা আনন্দদায়ক মনে করি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার পশুপক্ষীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

تغدوا خماصا وتروح بطانا

অর্থাৎ, পাখীরা সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত উঠে এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে নেয়। উদ্দেশ্য, রিযিকের অন্বেষণে পাখীরাও সকাল বেলায় এদিক ওদিক বেরিয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ স্থলপথে ও নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং খেজুর বাগানের পরিচর্যা করতেন। তাঁদের অনুসরণ যথেষ্ট। আবু কালাবা (রহঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমি যদি তোমাকে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত দেখি, তবে তা মসজিদের কোণে বসে থাকতে দেখার চেয়ে উত্তম। আওযায়ী হযরত ইবরাহীম আদহামের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর মাথায় খড়ির বোঝা। তিনি বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, এত পরিশ্রম করেন কেন? আপনার খেদমতের জন্যে তো আপনার ভাই-ই যথেষ্ট। হযরত ইবরাহীম আদহাম জওয়াব দিলেন ঃ হে আবু আমর, আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলো না। আমি শুনেছি, যেব্যক্তি হালাল অন্বেষণে কোন অপমানের জায়গায় দাঁড়ায়, তার জন্যে জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ তুমি হাত, পা গুটিয়ে রাখবে এবং অন্য ব্যক্তি তোমাকে খাওয়াবে, আমাদের মতে এর নাম এবাদত নয়; বরং প্রথমে দু'রুটির চিন্তা কর, এর পর এবাদত কর। মোট কথা, এ পর্যন্ত শরীয়তমতে হাত পাতার নিন্দা এবং অপরের খেদমতের উপর ভরসা করার অনিষ্ট বর্ণিত হল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যেব্যক্তির কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ নেই, উপার্জন করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া তার কোন গতি নেই। এখন কিছু বিপরীত উক্তি শুনা দরকার। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই আদেশ করেননি যে, আমি ধন দৌলত সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হয়ে যাই; বরং আমার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয়েছে–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত নিজ পালনকর্তার এবাদত করুন।

অনুরূপভাবে হযরত সালমান ফারেসীকে কেউ বলল ঃ আপনি আমাকে অন্তিম উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ হজ্জ অথবা পালনকর্তার মসজিদ নির্মাণ করা অবস্থায় তোমাদের কারও মৃত্যু হোক বা না হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা মানুষের কাছ থেকে দলীলের টাকা নেয়া অবস্থায় যাতে কারও মৃত্যু না হয়, সেজন্যে তওবা করা দরকার।

এই বৈপরীত্যের জওয়াব, এসব হাদীসের সমন্বয় সাধন অবস্থার বিস্তারিত আলোচনার উপর নির্ভরশীল। আমরা একথা বলি না যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু থেকে সর্বাবস্থায় উত্তম; বরং আমাদের উদ্দেশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদের ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা মন্দ। কেননা, এতে দুনিয়ার দিকে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করতে হয়, যার মোহ যাবতীয় গোনাহের মূল। এর সাথে যদি মানুষের কাছ থেকে করও আদায় করা হয়, তবে তা জুলুম ও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সালমান ফারেসীর উক্তিতে এ ধরনের বাণিজ্যই উদ্দেশ্য, কিন্তু নিজের ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণে যথেষ্ট হয়– এই পরিমাণ ধন দৌলত পাওয়ার লক্ষ্যে ব্যবসা করলে তা হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম। চার ব্যক্তির জন্যে কোন পেশা না করা উত্তম। প্রথম, যেব্যক্তি শারীরিক এবাদতে আবেদ। দ্বিতীয়, যেব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং এলমে হাল ও এলমে কাশফে অন্তরের আমল অর্জন করেছে। তৃতীয়, যে বাহ্যিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আলেম মানুষের দ্বীনদারীতে সহায়ক কাজকর্মে মশগুল; যেমন মুফতী, মুফাসসির ও মোহাদ্দেস। চতুর্থ, যেব্যক্তি মানুষের জাগতিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বে নিয়োজিত; যেমন শাসনকর্তা, বিচারপতি প্রমুখ। এই চার প্রকার লোকের জন্যে উপার্জনে মশগুল হওয়ার তুলনায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উত্তম। তারা বায়তুল মাল থেকে নয়; বরং আলেম ও ফকীহদের জন্যে ওয়াকফকৃত তহবিল থেকে নিজেদের ভরণ-পোষণ নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি গুণ আরও অনেক বর্ণনাতীত গুণসহ বিদ্যমান ছিল। তাই তাঁকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ করা হয়েছে- ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ করা হয়নি। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন সহচরগণ তাঁকে ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কেননা, ব্যবসা করলে মুসলমানদের কাজ করার মত অবসর পাওয়া যেত না। তাই তিনি বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণে অর্থ নিতেন। পরে ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি ওসিয়ত করেন, যে পরিমাণ অর্থ তিনি নিয়েছেন সেই পরিমাণ অর্থ যেন বায়তুল মালে ফেরত দেয়া হয়।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুগুলো জানা যে কোন উপার্জনশীল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। কেননা, হাদীসে যে বলা হয়েছে– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, এর উদ্দেশ্যও সেই জ্ঞান, যার প্রয়োজন পড়ে। তাই যেব্যক্তি এ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু জ্ঞাত হবে, সে যেসব বিষয় ব্যবসা-বাণিজ্য ফাসেদ করে দেয়, সেগুলো জানতে পারবে এবং আদান-প্রদানে সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। যদি কোন খুঁটিনাটি দুরূহ বিষয় সামনে আসে, তবে জিজ্ঞেস করে না জানা পর্যন্ত সেই বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারবে। কেননা, ফাসেদকারী কারণসমূহ সংক্ষেপে না জানলে সে কিরূপে বুঝবে যে, বিরত থাকা ও জিজ্ঞেস করা কখন ওয়াজিব? যদি কোন আদান-প্রদানকারী বলে যে, সে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করবে না; বরং আপন কাজ করে যাবে এবং যখন কোন দুরূহ ব্যাপার সামনে আসবে, তখনই তার মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেবে, তবে এ ব্যক্তিকে জওয়াব দেয়া হবে যে, যখন তুমি ফাসেদকারী বিষয়সমূহ সংক্ষেপে জানবে না, তখন কিরূপে বুঝবে, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার যোগ্য? তুমি তো শুদ্ধ ও বৈধ মনে করেই আদান-প্রদান করে যাবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাও হবে অবৈধ। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বাজারে ঘুরাফেরা করতেন এবং কোন কোন ব্যবসায়ীকে চাবুক মেরে বলতেন ঃ আমাদের বাজারসমূহে তারাই ক্রয়-বিক্রয় করবে, যারা মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। অন্যথায় জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে সুদ খেয়ে বসবে। নিম্নে বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আমরা আলাদাভাবে তুলে ধরেছি।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথম রোকন–ক্রেতা-বিক্রেতা ঃ এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর উচিত চার ব্যক্তির সাথে ক্রয়বিক্রয় না করা। প্রথম বালক, দ্বিতীয় উন্মাদ, তৃতীয় গোলাম এবং চতুর্থ অন্ধ। কেননা, বালক ও উন্মাদ শরীয়তে মুকাল্লাফ নয়। অর্থাৎ, তারা শরীয়তের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত। বালককে যদি তার ওলী ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবুও তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্রয়-বিক্রয় ইমাম শাফেয়ীর মতে জায়েয নয়। বালক ও উন্মাদের হাতে কেউ নিজের কোন বস্তু দিলে তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তা দাতারই বিনষ্ট হবে। বালক ও উন্মাদ তার ক্ষতিপূরণ দেবে না। অন্ধ অদৃশ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় করবে, তাই তার সাথে ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। অন্ধ যদি কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তবে উকিলের সাথে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কাফেরের সাথে ক্রয়বিক্রয় জায়েয; কিন্তু তার কাছে কোরআন শরীফ বিক্রয় করা উচিত নয়। যুদ্ধাবস্থায় কাফেরের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। বিক্রয় করলে তা অগ্রাহ্য হবে এবং বিক্রেতা আল্লাহর কাছে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয় রোকন- পণ্যবস্তু ঃ অর্থাৎ, সেই বস্তু, যা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যায়, তা পণ্যবস্তু হোক অথবা তার মূল্য। এতে ছয়টি শর্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম শর্ত, পণ্যদ্রব্য সত্তার দিক দিয়ে নাপাক হতে পারবে না । নাপাক বস্তুর ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। উদাহরণতঃ কুকুর, শূকর, গোবর, পায়খানা, হাতীর দাঁত ও তা দ্বারা নির্মিত পাত্র ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয নয়। কারণ মৃত্যুর কারণে হাড় নাপাক হয়ে যায়। হাতীকে জবাই করলেও পাক হয় না। এছাড়া মদ ক্রয়বিক্রয় করা এবং যেসব জন্তু খাওয়া জায়েয নয়, সেগুলোর চর্বি ক্রয়বিক্রয় করাও জায়েয নয়, যদিও এর দ্বারা বাতি জ্বালানো ও নৌকায় মালিশ করার উপকার পাওয়া যায়। পাক তেল নাপাকী পড়ার কারণে নাপাক হয়ে গেলে তা ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয। কেননা, খাওয়া ছাড়া এটা অন্য উপকারে আসতে পারে এবং সত্তাগতভাবে নাপাক নয়- বরং বাইরের নাপাকী দ্বারা নাপাক হয়েছে। অনুরূপভাবে রেশম পোকার ডিম ক্রয়বিক্রয় করার মধ্যে আমার মতে কোন দোষ নেই। কারণ, এটা প্রাণীর মূল, যা উপকারী। মৃগনাভি ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয। হরিণের জীবদ্দশায় এটা নাভি থেকে আহরণ করা হলে এটাকে পাক বলাই উচিত।

দ্বিতীয় শর্ত, পণ্যদ্রব্য উপকারী হতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ও সর্পের ক্রয়বিক্রয় অবৈধ। সাপ দ্বারা সাপুড়েদের যে উপকার হয়, তা ধর্তব্য নয়। বিড়াল, মৌমাছি, চিতা বাঘ, সিংহ এবং শিকারী জন্তু অথবা যেগুলোর চামড়া কাজে লাগে, সেগুলোর ক্রয়বিক্রয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জায়েয। বোঝা বহনের উদ্দেশে হাতীর ক্রয়বিক্রয়ও জায়েয। তোতা পাখী, ময়ূর ও সুশ্রী বর্ণযুক্ত জন্তুর ক্রয় বিক্রয় জায়েয। এগুলো খাওয়ার কাজে না এলেও এগুলোর সুমধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা চিত্তবিনোদন একটি বৈধ উদ্দেশ্য। কুকুর দেখতে সুশ্রী হলেও তা ক্রয়বিক্রয় উচিত নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুর ক্রয়বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বাঁশী, সারঙ্গী, বীণা ও তারের বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। কেননা, এতে শরীয়তসম্মত কোন উপকারিতা নেই। এমনিভাবে মেলায় যে সমস্ত মাটির খেলনা ও পুতুল বিক্রয় হয়, সেগুলো ক্রয় করা বৈধ নয়; বরং শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। জন্তু-জানোয়ারের ছবি অংকিত কাপড় বিক্রয় করা জায়েয; কিন্তু এগুলো পেতে রাখা অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে– ঝুলানো অবস্থায় নয়। এ ধরনের একটি পর্দার কাপড় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বলেছিলেন ঃ এটা বিছানা বানিয়ে নাও।

তৃতীয় শর্ত, যে জিনিস বিক্রয় হবে, তা বিক্রেতার মালিকাধীন থাকতে হবে অথবা মালিকের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হতে হবে। সুতরাং মালিক নয়– এমন ব্যক্তির কাছ থেকে মালিকের অনুমতি আশা করে কোন জিনিস কিনলে তা বৈধ হবে না। পরে যদি মালিক সম্মতও হয়ে যায়, তবুও নতুনভাবে ক্রয় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে পরে জানতে পারলে সম্মত হয়ে যাবে– এই আশায় স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর জিনিস ক্রয় করা অথবা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর জিনিস ক্রয় করা অথবা পিতার কাছ থেকে পুত্রের জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি শুদ্ধ হবে না। কেননা, মালিকের সম্মতি ক্রয়ের পূর্বে থাকতে হবে। বাজারসমূহে এ ধরনের কেনাবেচা হয়। দ্বীনদারদের উচিত এ ধরনের কেনাবেচা থেকে বেঁচে থাকা।

চতুর্থ শর্ত, বিক্রয়ের জিনিসটি যেন এমন হয় যে, তা শরীয়তসম্মতভাবে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে সমর্পণ করা যায়। এরূপ না হলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন– পলাতক গোলাম, পানির ভিতরকার মাছ, গর্ভস্থ বাচ্চা এবং জন্তুর পিঠের লোম বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে স্তনের ভিতরকার দুগ্ধ বিক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা, এগুলো ক্রেতাকে সমর্পণ করা কঠিন। এমনিভাবে বাচ্চা ছোট হলে তাকে রেখে তার মাকে বিক্রয় করা শুদ্ধ নয়, যেমন মাকে রেখে এরূপ বাচ্চা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিক্রয় করাও দুরস্ত নয়। কেননা, এখানে বিক্রীত বস্তু ক্রেতার কাছে সমর্পণ করলে বাচ্চা তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাচ্চাকে তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হারাম।

পঞ্চম শর্ত, বিক্রয়ের জিনিস নির্দিষ্ট থাকতে হবে এবং পরিমাণ ও গুণ জানা থাকতে হবে। এ থেকে জানা গেল, যদি বিক্রেতা বলে, এই ছাগল অথবা সম্মুখের এই থানগুলো থেকে যে কোন একটি থান অথবা থানের যেদিক থেকে ইচ্ছা এক গজ কাপড় অথবা এই যমীন থেকে যেদিক ইচ্ছা দশ গজ যমীন বিক্রয় করলাম, তবে এই বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীরা এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। পরিমাণ জানার ব্যাপারে চোখে দেখে অনুমান করা যথেষ্ট। আর জিনিস দেখে তার গুণ জানা যায়। সুতরাং অনুপস্থিত জিনিস বিক্রি করা জায়েয হবে না। হাঁ, যদি পূর্বে দেখে থাকে এবং দেখার পর এতদিন অতিবাহিত হয়েছে যাতে সাধারণতঃ পরিবর্তন হয় না, তবে বিক্রয় জায়েয হবে।

ষষ্ঠ শর্ত, বিনিময়ের দিক দিয়ে বিক্রেতা যে জিনিসের মালিক, বিক্রয়ের পূর্বে তা তার দখলে এসে যাওয়া উচিত। বিক্রেতার দখলে আসেনি, এমন জিনিস বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সকল বস্তু সমান। অস্থাবর জিনিসের দখল তুলে নেয়ার মাধ্যমে হয় এবং যমীন তথা স্থাবর জিনিসের দখল অন্যের কোন কিছু তাতে না থাকা এবং অন্যের ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হয়।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের তৃতীয় রোকন- প্রস্তাব গ্রহণ ঃ এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও তার সাথে সাথেই উদ্দেশ্যজ্ঞাপক ভাষায় তা গ্রহণ হওয়া জরুরী। এ প্রস্তাব ও গ্রহণ পরিষ্কার ভাষায় হতে হবে; যেমন বিক্রেতা বলবে– আমি এ বস্তু তোমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করলাম। ক্রেতা বলবে– আমি গ্রহণ করলাম। অথবা ইঙ্গিতে বলবে– যেমন বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে এই জিনিস এত টাকার বদলে দিলাম এবং ক্রেতা বলবে, আমি গ্রহণ করলাম। একথা বলে উভয়ের উদ্দেশ্য ক্রয়বিক্রয়ই হবে; কিন্তু কোন মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে বাগদানের সম্ভাবনাও হতে পারে। নিয়ত করলে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। আর পরিষ্কার ভাষায় বললে কোন বিবাদই থাকে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেনাবেচায় চুক্তির চাহিদার খেলাফ কোন শর্ত সংযোজন করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ কিছু বেশী দেয়ার শর্তে অথবা পণ্যদ্রব্য বাড়ী পৌছে দেয়ার শর্তে কেনাবেচার চুক্তি করলে তা জায়েয হবে না। হাঁ, পণ্যদ্রব্য বাড়ী পৌছানোর মজুরি পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিলে তা জায়েয হবে। যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা প্রস্তাব এবং গ্রহণের বাক্য মুখে উচ্চারণ না করে কেবল আদান-প্রদান করে নেয়, তবে এ ধরনের কেনাবেচা ইমাম শাফেয়ীর মতে সিদ্ধ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে মামুলী পণ্যসামগ্রীর বেলায় তা জায়েয। কেননা, এরূপ কেনাবেচা সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনে শুরায়হ এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার উক্তি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। বাস্তবে এ উক্তিই সমতার অধিকতর নিকটবর্তী। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং মানুষের মধ্যে এর প্রচলন বেশী। এতদসত্ত্বেও প্রস্তাব ও গ্রহণ বর্জন না করাই খোদাভীরু দ্বীনদারদের উচিত।

সুদের লেনদেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুদ হারাম করেছেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর নীতি ব্যক্ত করেছেন। অতএব যারা সোনারূপার লেনদেন করে, অথবা খাদ্য শস্যের ব্যবসা করে, তাদের উপর সুদ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ সুদ দু'জিনিসেই হয়– সোনারূপা এবং খাদ্য শস্যে। সোনারূপার ব্যবসায়ীদেরকে বাকী দেয়া ও কমবেশী দেয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বাকী দেয়া থেকে বেঁচে থাকার অর্থ, সোনারূপার যে বস্তু সোনারূপার অন্য যে বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করবে, তা হাতে হাতে হওয়া দরকার; অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্য এবং ক্রেতা পণ্য সামগ্রী একই মজলিসে হস্তগত করবে। বিক্রেতা নিজের প্রাপ্য আজ নেবে এবং ক্রেতাকে তার প্রাপ্য কাল অথবা কিছুক্ষণ পরে সমর্পণ করবে– এটা যেন না হয়। সুতরাং পোদ্দার যদি সোনা অথবা রূপা টাকশালে আজ জমা দেয় এবং তার বিনিময়ে আশরফী অথবা টাকা আগামীকাল গ্রহণ করে, তবে এই ক্রয়বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে। এটা হারাম এ কারণেও যে, এতে পণ্য ও তার মূল্য সমান সমান হয় না। কেননা, টাকশালে সোনারূপার ওজন মুদ্রার ছাপ লাগার পর তা থাকে না, যা পূর্বে ছিল। কম বেশী থেকে বেঁচে থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকবে– প্রথম, মুদ্রার খন্ড অংশ পূর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। উভয়টি এক রকম না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি জায়েয হবে না। দ্বিতীয়,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাঁটিকে কৃত্রিমের বদলে বিক্রয় করবে না যদি উভয়ের ওজনে পার্থক্য হয়। যে মুদ্রার ওজন কম, কিন্তু মাল খাঁটি, সেটিকে এমন মুদ্রার সাথে বদলাবে, যার মাল কৃত্রিম, কিন্তু ওজন বেশী। এ উভয় লেনদেন তখন নাজায়েয, যখন রূপা রূপার বিনিময়ে এবং সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। অপরপক্ষে সোনার বিনিময়ে রূপা কিংবা রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করা হলে কমবেশী হওয়া জায়েয। সোনা ও রূপার সংমিশ্রণে গঠিত আশরফীর মধ্যে সোনার পরিমাণ অজানা থাকলে তার লেনদেন জায়েয হবে না। হাঁ, এরূপ মুদ্রা শহরে প্রচলিত থাকলে আমরা তার লেনদেন জায়েয বলব, যদি প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন না হয়। তাম্র মিশ্রিত টাকার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, এগুলোর উদ্দেশ্য রূপা, যার পরিমাণ জানা নেই। শহরে প্রচলিত থাকলে এগুলোর লেনদেনও জায়েয। কেননা, তখন উদ্দেশ্য রূপা নয়। তবে রূপার বিনিময়ে এগুলোর লেনদেন না হওয়া উচিত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রণে গঠিত অলংকার স্বর্ণের বা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করা বৈধ নয়। এগুলো স্বর্ণের পরিমাণ জানা থাকলে আসবাবপত্রের বিনিময়ে ক্রয় করা উচিত। যদি অলংকারের উপর স্বর্ণের গিল্টি এমনভাবে করা হয় যে, আগুনে রেখে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না, তবে এরূপ অলংকার রূপার বিনিময়ে অথবা সোনা রূপার কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয। এখন খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের স্মরণ রাখা উচিত, এক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যদি বিক্রয়ের সামগ্রীও হয় এবং মূল্যও হয় অথবা শুধু বিক্রয়ের সামগ্রী হয় কিংবা শুধু মূল্য হয়, তবে একই মজলিসে পারস্পরিক হস্তান্তর হতে হবে। উদাহরণতঃ গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে এক হাতে দেবে এবং অন্য হাতে নেবে। বিক্রয়ের সামগ্রী এবং মূল্য এক জাতীয় হলে অর্থাৎ গমের বদলে গম বিক্রয় করলে উভয়টি সমান হওয়াও জরুরী। এ ক্ষেত্রে অনেক নাজায়েয লেনদেন মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। উদাহরণতঃ মানুষ কসাইকে জীবিত ছাগল দেয় এবং এর বিনিময়ে গোশত নগদ অথবা বাকী নেয়। এটাও হারাম। অথবা কলুকে নারকেল, তিল, জাফরান, সরিষা ইত্যাদি দিয়ে এগুলোর বিনিময়ে নগদ অথবা বাকী তেল নেয়। এগুলো সবই হারাম। যে জিনিস দ্বারা কোন খাদ্য-বস্তু তৈরী হয়, সেই জিনিসের বিনিময়ে সেই খাদ্যবস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয– ওজনে সমান হোক কিংবা কম বেশী হোক। উদাহরণতঃ গমের বিনিময়ে রুটি ও ছাতু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিক্রয়ের বস্তু ও মূল্য সমান সমান হলে তখন সুদ হবে না, যখন সেই খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয়যোগ্য হয়, অর্থাৎ কাঁচামাল না হয়। আর যদি সঞ্চয়যোগ্য না হয় অর্থাৎ এক অবস্থায় না থাকে, তবে সমান সমান বিক্রয় করলেও সুদ হবে। এ কারণেই কাঁচা খোরমার বিক্রয় কাঁচা খোরমার বিনিময়ে এবং আঙ্গুরের বিক্রয় আঙ্গুরের বিনিময়ে জায়েয নয়– সমান সমান হোক কিংবা কমবেশী। (সুদ সম্পর্কিত উপরোক্ত বক্তব্য শাফেয়ী মাযহাবের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের, যা হানাফী মযহাবের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।) ব্যবসায়ীদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা ও অনিষ্টের স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার ব্যাপারে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ হলে অথবা কোন বিষয় বোধগম্য না হলে তাদের জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত। যদি এতটুকু বিষয়ও জানা না থাকে, তবে কোথায় জিজ্ঞেস করত হবে, সে সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ থাকবে এবং অজ্ঞাতে সুদ ও হারাম লেনদেনে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বায়ে-সলম বা অগ্রিম ক্রয়বিক্রয়ের দশটি শর্ত ঃ (১) অগ্রিম দেয় পুঁজি নির্দিষ্ট ও জানা থাকা, যাতে অপর পক্ষ বিনিময়ে বস্তু দিতে সক্ষম না হলে পুঁজিওয়ালা তার পুঁজি ফেরত নিতে পারে। সুতরাং পুঁজিওয়ালা যদি এক থলে ভর্তি টাকা অনুমান করে এই বলে দিয়ে দেয় যে, এর বিনিময়ে এই পরিমাণ গম নেবে, তবে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই বিনিময় জায়েয হবে না। (২) চুক্তির মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মজলিসের মধ্যেই পুঁজি সমর্পণ করতে হবে। অপরপক্ষ পুঁজি হস্তগত নাকরে মজলিস থেকে আলাদা হয়ে গেলে বিনিময় জায়েয হবে না। (৩) যে বস্তু অগ্রিম ক্রয় করা হয়, তা এমন হতে হবে, যার গুণ বর্ণনা করা যায়; যেমন খাদ্য শস্য, জন্তু-জানোয়ার, খনিজ দ্রব্য, তুলা, পশম, দুধ, মাংস ইত্যাদি। (৪) যেসব বস্তু গুণগত মান বর্ণনা করা যায়, সেগুলোর গুণগত মান বর্ণনা করতে হবে, এমন কি কোন গুণ যেন অবশিষ্ট থেকে না যায়, যার কারণে বস্তুর মূল্য অসহনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা, এরূপ গুণগত মান বর্ণনা করা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখে নেয়ার স্থলবর্তী হয়ে থাকে। (৫) মেয়াদের উপর অগ্রিম ক্রয় করা হলে মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এরূপ বলা চলবে না যে, ফসল কাটা পর্যন্ত অথবা ফল পাকা পর্যন্ত অগ্রিম ক্রয় করছি; বরং মাস ও দিনের হিসাবে মেয়াদ নির্দিষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতে হবে। কারণ, ফসল কাটা এবং ফল পাকা আগে পিছে হতে পারে। (৬) ক্রীত বস্তু এমন হতে হবে, যা মানুষ প্রতিশ্রুত সময়ে দিতে পারে এবং বিলুপ্ত না হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে। যদি কোন স্বাভাবিক আপদের কারণে জিনিসটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুত মেয়াদে সমর্পণ করা সম্ভব না হয়, তবে পুঁজিদাতা ইচ্ছা করলে প্রয়োজনীয় সময় দেবে এবং ইচ্ছা করলে লেনদেন বাতিল করে নিজের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেবে। (৭) যদি সমর্পণ করার স্থান পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে জিনিষটি সমর্পণ করার স্থান চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে কলহ সৃষ্টি না হয়। (৮) ক্রীত বস্তুকে অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যাবে না। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যাবে না যে, এই ক্ষেতের গম অথবা এই বাগানের ফল নেব। কেননা, এরূপ শর্তের কারণে ক্রীত বস্তু যে ঋণ, তা বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি অমুক শহরের ফল বলা হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই এবং সেই শহরের ফলই দিতে হবে। (৯) ক্রীত বস্তু দুর্লভ না হওয়া চাই। উদাহরণতঃ মোতির এমন গুণ উল্লেখ করা, যা খুবই বিরল। (১০) মূল্য বা পুঁজি খাদ্য জাতীয় বস্তু হলে ক্রীত বস্তুটি খাদ্য জাতীয় না হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে পুঁজি সোনা-রূপা হলে ক্রয়ের জিনিস সোনা-রূপা না হওয়া উচিত। সুদের বর্ণনায় আমরা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

ইজারা বা ভাড়ায় ক্রয় ঃ এতে প্রথম বিষয় ভাড়া এবং দ্বিতীয় বিষয় ইজারাদারের মুনাফা। এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বর্ণিত ভাষাই ধর্তব্য হবে। ইজারার মধ্যে ভাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের অনুরূপ। তাই যেসব শর্ত আমরা মূল্যের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করে এসেছি, ভাড়ার বেলায়ও সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এক্ষেত্রে মানুষ যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত, শরীয়তে সেগুলোর কোন মূল্য নেই। উদাহরণতঃ নির্মাণের বিনিময়ে গৃহ ইজারা দেয়া হয় এবং নির্মাণের পরিমাণ জানা থাকে না। যদি ভাড়ার টাকা নির্দিষ্ট করে ভাড়াটের সাথে শর্ত করা হয় যে, এই টাকা নির্মাণে নিয়োজিত করবে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা, নির্মাণে নিয়োজিত করার কাজটি অজানা। যদি জন্তুর চামড়া ছিলিয়ে নেয় এবং চামড়াকে মজুরি নির্দিষ্ট করে অথবা আটা পিষিয়ে তার ভূষিকে মজুরি নির্দিষ্ট করে, তবে এই ইজারা বাতিল হবে। মোট কথা, মজুরি ও ইজারাদারের কর্ম দ্বারা যা অর্জিত হয়, তাকে মজুরি ও ভাড়া সাব্যস্ত করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাতিল। যদি দোকান ও গৃহের ভাড়ার ক্ষেত্রে অনেক দিনের ভাড়া একত্রিত করে বলে দেয় যে, প্রতি মাসের ভাড়া এক দীনার, এর পর কত মাস তা বর্ণনা না করে, তবে মেয়াদ অজ্ঞাত থাকার কারণে ইজারা জায়েয হবে না।

ইজারার দ্বিতীয় রোকন হল, সেই মুনাফা, যা ইজারার উদ্দেশ্য এবং তা হল কেবল কর্ম। বৈধ, নির্দিষ্ট ও শ্রমসাধ্য কর্মের জন্যে ইজারা জায়েয। ইজারার কেবল শাখা-প্রশাখা এই সামগ্রিক নীতির অধীন। ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আমরা এসব শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থে কেবল সেসব বিষয় বর্ণনা করব, যা প্রায়ই কাজে লাগে। সুতরাং যে কর্মের জন্যে ইজারা ও ঠিকা হয়, তাতে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম, সেই কর্ম কিছু কষ্ট ও শ্রমসাধ্য হতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, দোকান সাজানোর জন্যে খাদ্যবস্তু ইজারা নেয়া জায়েয নয়। দ্বিতীয়, মুনাফা ছাড়া কোন উদ্দিষ্ট বস্তু যেন ইজারাদারের মালিকানায় চলে না যায়। উদাহরণতঃ ইজারাদার এ উদ্দেশে আঙ্গুর বৃক্ষ ইজারা নিল যে, তা থেকে উৎপন্ন আঙ্গুর সে নেবে অথবা দুধ পাওয়ার আশায় গাভী ইজারা নেয়া। এ ধরনের ইজারা বৈধ নয়, কিন্তু শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর জন্যে কোন মহিলাকে মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত করা জায়েয। এ অবস্থায় দুধ আলাদা করা যায় না বিধায় দুধ মহিলার অনুগামী হয়ে যাবে। এটা আলাদাভাবে উদ্দিষ্টও হয় না। তৃতীয়, কর্মটি এমন হতে হবে, যা মজুর বাহ্যতঃ ও শরীয়ত অনুযায়ী মালিককে দিতে পারে। সুতরাং যদি কোন দুর্বল ব্যক্তিকে এমন কাজের জন্যে মজুর নিযুক্ত করা হয়, যা সে করতে পারে না, তবে এই ইজারা জায়েয হবে না। শরীয়ত অনুযায়ী যেসব কর্ম হারাম সেগুলোও মজুর দিতে পারে না। যেমন- ঋতুবতী মহিলাকে মসজিদে ঝাড়ু দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করা অথবা স্বর্ণকারকে সোনারূপার পাত্র তৈরী করার জন্যে মজুরি দেয়া। এসবই বাতিল। চতুর্থ, সে কর্মটি যেন এমন না হয়, যা করা মজুরের উপর ওয়াজিব এবং এমনও না হয়, যা মালিকের পক্ষ থেকে অন্য কেউ করে দিলে চলে না। সুতরাং জেহাদ করার জন্যে মজুরি নেয়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে যে এবাদত একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন আদায় করতে পারে না, তার জন্যেও মজুরি নেয়া বৈধ নয়। কেননা, এই এবাদত মালিকের পক্ষ থেকে হবে না; বরং মজুরের পক্ষ থেকে হবে। হাঁ, অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃতকে গোসল দেয়া, কবর খনন করা, মৃতকে দাফন করা এবং জানাযা বহন করার জন্যে মজুরি নেয়া জায়েয। পঞ্চম, সে কর্ম ও মুনাফা জ্ঞাত হওয়া দরকার। উদাহরণতঃ কাপড়ের ক্ষেত্রে দর্জির কাজ বলে দিতে হবে। শিক্ষককে সূরার শিক্ষা ও তার পরিমাণ জানিয়ে দিতে হবে। জন্তুর পিঠে বোঝা বহনের ক্ষেত্রে বোঝার পরিমাণ ও পথের দূরত্ব বলে দিতে হবে। মোট কথা, যেসব বিষয় স্বভাবতঃ বিরোধের কারণ হতে পারে, সেগুলো অস্পষ্ট না রেখে প্রথমেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ইজারা সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনাই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। এতে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জানা হয়ে যাবে এবং কঠিন স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে, যাতে বিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞেস করে নেয়া যায়। এছাড়া যাবতীয় মাসআলা যথার্থ বিস্তারিতরূপে জানা মুফতীর কাজ- জনসাধারণের নয়।

মুযারাবা বা স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যবসা ঃ এই লেনদেনের রোকন তিনটি। প্রথম, পুঁজি। এতে শর্ত হল, তা নগদ ও নির্দিষ্ট হবে এবং উদ্যোক্তাকে সমর্পণ করে দিতে হবে। নগদ অর্থ, পুঁজি আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হলে মুযারাবা জায়েয হবে না। কারণ, এগুলো দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। নির্দিষ্ট হওয়া অর্থ, এক থলে ভর্তি টাকা দিলে মুযারাবা বৈধ হবে না। কারণ, এতে মুনাফার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকবে। উদ্যোক্তাকে সমর্পণ করার ফায়দা হল, মালিক পুঁজি নিজের হাতে রাখার শর্ত করলে মুযারাবা শুদ্ধ হবে না। এ অবস্থায়ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রোকন মুনাফা। এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, অংশ হিসাবে নির্ধারিত হওয়া, অর্থাৎ, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক অথবা অন্য কোন অংশ নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ বলা যাবে না যে, একশ' টাকা দেব এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা আমার। কেননা, মুনাফা একশ' টাকার বেশী না-ও হতে পারে। তখন উদ্যোক্তার শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। তৃতীয় রোকন হচ্ছে, উদ্যোক্তার কর্ম। এতে কোন নির্দিষ্ট কর্মের শর্ত আরোপ করা যাবে না। উদাহরণতঃ যদি এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, পুঁজি দিয়ে গৃহপালিত জন্তু ক্রয় করবে এবং তা দ্বারা বাচ্চা প্রজননের উদ্যোগ নেবে। বাচ্চাগুলো পরস্পরে ভাগ করে নেবে। অথবা গম ক্রয় করে রুটি তৈরী করবে। এতে যা মুনাফা হবে, তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভাগাভাগি করে নেবে। এরূপ করলে তা জায়েয হবে না। কেননা, রুটি তৈরী ও গৃহপালিত জন্তুর রাখালী করা ব্যবসা বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এগুলো শিল্পকর্ম। যদি উদ্যোক্তার সাথে শর্ত করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি ছাড়া অন্যের কাছ থেকে ক্রয় করা যাবে না, অথবা এ বিশেষ ব্যবসা করা যাবে না, তবে মুযারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

দুব্যক্তির মধ্যে মুযারাবার চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে উদ্যোক্তা পুঁজির মধ্যে উকিলের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। পুঁজির মালিক যখন ইচ্ছা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে, কিন্তু বাতিল করার সময় যদি মুযারাবার মাল আসবাবপত্রের আকারে থাকে এবং তাতে কোন লাভ না হয়, তবে তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আসবাবপত্রকে নগদে পরিণত করে দেয়ার কথা বলার এক্তিয়ার মালিকের হবে না। যদি উদ্যোক্তা বলে, আমি আসবাবপত্র বিক্রি করে দেই এবং মালিক অস্বীকার করে, তবে মালিকের কথাই ধর্তব্য হবে। তবে যদি উদ্যোক্তা এমন গ্রাহক পায়, যার কাছে বিক্রয় করলে লাভ হবে, তবে উদ্যোক্তার কথা ধর্তব্য হবে। আর যদি পুঁজির উপর লাভও হয় এবং লাভ ও পুঁজি আসবাবপত্র আকারে থাকে, তবে উদ্যোক্তা পুঁজি পরিমাণ আসবাব বিক্রয় করে নগদ করে নেবে এবং অবশিষ্ট আসবাব লাভের মধ্যে থেকে যাবে। তাতে উভয়েই অংশীদার হবে। বছরের শুরুতে মালিক ও উদ্যোক্তা যাকাতের জন্যে মালের মূল্য অনুমান করবে। কিছু লাভ হলে উদ্যোক্তাই তার মালিক হয়ে যাবে।

মালিকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা মুযারাবার পণ্য সফরে নিয়ে যেতে পারে না। নিয়ে গেলে এবং বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ উদ্যোক্তা দেবে। কেননা, সফরে নিয়ে গেলে তার সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে যদি মালিকের অনুমতিক্রমে উদ্যোক্তা পণ্য সফরে নিয়ে যায়, তবে পরিবহন ও পাহারার ব্যয় উদ্যোক্তার মাল থেকে দেয়া হবে, কিন্তু থান খোলা, ভাঁজ করা এবং অল্প কাজ, যা ব্যবসায়ীরা নিজেরা করে, তার জন্যে মজুরি দেয়ার এখতিয়ার উদ্যোক্তার নেই। যে শহরে মুযারাবার চুক্তি হয়, উদ্যোক্তা যতদিন সেই শহরে থাকে, ততদিন তার খাওয়া পরা ও বাসস্থানের ব্যয় বহন করবে; কিন্তু দোকানের ভাড়া তার যিম্মায় থাকবে না, কিন্তু উদ্যোক্তা যখন বিশেভভাবে মুযারাবার জন্যে সফর করবে, তখন তার ভরণপোষণ পুঁজি থেকে নির্বাহ করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অংশীদারী লেনদেন ঃ অংশীদারী ক্রয়বিক্রয়ের চার প্রকার থেকে তিন তিন প্রকারই বাতিল। প্রথম প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজ নিজ পুঁজি পৃথক রেখে পৃথক ক্রয়বিক্রয় করে, কিন্তু একজন অপরজনকে বলে, যত টাকা লাভ অথবা লোকসান হবে, তাতে আমরা উভয়েই অংশীদার থাকব। এ ধরনের অংশীদারীকে 'শিরকতে মুফাওয়াযা' বলা হয়, যা বাতিল। দ্বিতীয় প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজ নিজ কাজের মজুরিতে একে অপরের অংশীদারিত্ব শর্ত করে নেয়। 'শিরকতে অবদান' নামে অভিহিত এই অংশীদারীও বাতিল। তৃতীয় প্রকার, দু'ব্যক্তির একজন থাকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। ব্যবসায়ীরা তার কথা শুনে। সে অপরজনকে প্রভাব খটিয়ে পণ্যসামগ্রী নিয়ে দেয় এবং অপরজন তা বিক্রয় করে। এতে যা লাভ হয়, তাতে উভয়েই অংশীদার হয়। 'শিরকতে ওজুহ্' নামক এই অংশীদারীও বাতিল। চতুর্থ প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজেদের টাকা পয়সা এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, ভাগাভাগি না করলে তা পৃথক করা কঠিন হয়। এর পর প্রত্যেকেই একে অপরকে 'তাসাররুফ' তথা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। উভয়ে যে মুনাফা অর্জন করে, তাতে উভয়েই অংশীদার হয়। একে বলা হয় 'শিরকতে এনান'। এটা জায়েয ও বৈধ। এই অংশীদারীর বিধান হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুঁজির পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসানে অংশীদার হবে। পুঁজি ছাড়া অন্য কিছুকে লাভ-লোকসান বণ্টনের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা যাবে না। উদাহরণতঃ একজনের পুঁজি এক-তৃতীয়াংশ হলে সে লাভ-লোকসানের এক-তৃতীয়াংশ পাবে- অর্ধেক পাবে না। তাদের একজনকে বরখাস্ত করা হলে তার ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে। বণ্টনের ফলে পরস্পরের মালিকানা আলাদা হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ উক্তি মতে, এই অংশীদারীত্ব অভিন্ন আসবাবপত্রের মাধ্যমেও জায়েয- নগদ পুঁজিরও প্রয়োজন নেই। মুযারাবা এরূপ নয়। তাতে নগদ পুঁজি থাকা জরুরী। সারকথা, ফেকাহ শাস্ত্রের এতটুকু শিক্ষা করা প্রত্যেক পেশাজীবীর জন্যে জরুরী। নতুবা অজ্ঞাতসারে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেনদেনে সুবিচারের গুরুত্ব এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা

প্রকাশ থাকে যে, লেনদেন অনেক সময় এমনভাবে হয়, মুফতী যাকে শুদ্ধ ও জায়েয বলে। এ লেনদেন বাতিল না হলেও এতে এমন জুলুম থাকে, যে কারণে লেনদেনকারী আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত হয়। এখানে জুলুম বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়। এটা দু'প্রকার- এক, যার ক্ষতি ব্যাপক এবং দুই, যার ক্ষতি বিশেষভাবে লেনদেনকারী ভোগ করে। ব্যাপক জুলুমের অনেক ধরন রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি আমরা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথম, মূল্য বৃদ্ধির নিয়তে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা। এতে শস্য-বিক্রেতা শস্য গুদামজাত করে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকে। এটা ব্যাপক জুলুমের কাজ। যে এরূপ করে, সে শরীয়তে নিন্দার যোগ্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من احتكر الطعام اربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে, অতঃপর তা সদকা করে দিলেও তাতে আটকে রাখার কাফ্ফারা হবে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে, সে আল্লাহ তাআলার কোপানল থেকে অব্যাহতি পাবে না এবং আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সে যেন একটি প্রাণ সংহার করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখে, তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) জনৈক গুদামজাতকারীর খাদ্য শস্য আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। একই হাদীসে খাদ্য শস্য গুদামজাত না করার সওয়াব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বাইরে থেকে খাদ্য শস্য ক্রয় করে আনে এবং সেদিনের দর অনুযায়ী বিক্রয় করে দেয়, সে যেন সেই খাদ্য শস্য খয়রাত করে দেয়। এক রেওয়ায়েতে আছে-

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ওয়াসেত থেকে এক নৌকা গম ক্রয় করে বসরায় প্রেরণ করেন এবং নিজের উকিলকে লেখে পাঠান, যেদিন নৌকা বসরায় প্রবেশ করবে, সেদিনই গম বিক্রয় করে দেবে, দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। ঘটনাক্রমে যেদিন পৌঁছল, সেদিন দাম কম ছিল। ব্যবসায়ীরা উকিলকে বলল ঃ এক সপ্তাহ পরে বিক্রয় করলে মুনাফা কয়েকগুণ বেশী হবে। উকিল এক সপ্তাহ অপেক্ষা করল এবং তাদের কথা অনুযায়ী বেশী লাভ হল। এর পর বুযুর্গ মালিকের কাছে এই সংবাদ লেখে পাঠালে তিনি জওয়াবে লেখলেন ঃ মিয়া, আমি অল্প লাভে সন্তুষ্ট ছিলাম, যাতে আমার দ্বীনদারী রক্ষা পায়। তুমি আমার কথার বিরুদ্ধে কাজ করেছ। আমার এটা কাম্য নয় যে, লাভ কয়েকগুণ বেশী হোক এবং এর বিনিময়ে আমার দ্বীনদারী হ্রাস পাক। তুমি বড় অন্যায় করেছ। এখন আমার পত্র পৌছামাত্র এর কাফ্ফারা হিসাবে সমস্ত মালপত্র বসরার ফকীরদেরকে খয়রাত করে দাও। সম্ভবত এতে আমি সওয়াব না পেলেও খাদ্য শস্য আটকে রাখার গোনাহ থেকে অব্যাহতি পাব।

প্রকাশ থাকে যে, খাদ্য শস্য আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা সর্বাবস্থায় থাকলেও এতে সময় ও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুর দিক দিয়ে নিষেধাজ্ঞা খাদ্য জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাপক। সুতরাং কোন রকম খাদ্যই আটকে রাখা উচিত নয়। তবে যে সকল বস্তু মানুষের খাদ্য অথবা খাদ্যের সহায়ক নয়, তা খাওয়া হলেও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ওষুধ, পক্ষী ছানা, জাফরান ইত্যাদি। যে বস্তু খাদ্যের সহায়ক, যেমন গোশত, ফলমূল এবং যা মাঝে মাঝে খাদ্যের স্থলবর্তী হয়ে যায়, যদিও সব সময় খাদ্য বলা হয় না, এরূপ বস্তু আটকে রাখা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম এসব বস্তুকেও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। তারা ঘি, মধু, ঘন নির্যাস, পনীর, যয়তুনের তেল ইত্যাদি আটকে রাখা হারাম বলেছেন। কারও মতে এগুলো আটকে রাখার মধ্যে কোন দোষ নেই। সময়ের দিকে দিয়ে নিষেধাজ্ঞা কারও মতে সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। বসরায় গম পৌছার যে কাহিনী একটু আগে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও একথাই বোঝা যায়। আবার কারও মতে নিষেধাজ্ঞা সকল সময়ে প্রযোজ্য নয়; বরং যে সময় দেশে খাদ্য শস্যের অভাব থাকে এবং মানুষ দুর্ভিক্ষাবস্থায় থাকে তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাদ্য শস্য আটকে রাখা নিষিদ্ধ। আর যদি দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য থাকে এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত না হয়, তখন খাদ্য শস্যের মালিক খাদ্য শস্য গুদামজাত করে রাখলে এবং দুর্ভিক্ষ কামনা না করলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। দুর্ভিক্ষের দিনে মধু, ঘি ইত্যাদি আটকে রাখলেও ক্ষতি হয়। অতএব আটকে রাখা হারাম হওয়া না হওয়া ক্ষতি হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তবে ক্ষতি না হলেও খাদ্য শস্য আটকে রাখা মাকরূহ। কেননা, খাদ্য শস্যের মালিক ক্ষতির প্রত্যাশী না হলেও তার সূচনার প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ দর বৃদ্ধি তার লক্ষ্য থাকে। স্বয়ং ক্ষতি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি ক্ষতির ভূমিকা ও সূচনা তথা দর বৃদ্ধিও নিষিদ্ধ। তবে এর অনিষ্ট ক্ষতির অনিষ্টের তুলনায় কম। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা কম বেশী হবে। সারকথা, খাদ্য শস্যের ব্যবসা পছন্দনীয় নয়। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্য মুনাফা। খাদ্য শস্য মানুষের টিকে থাকার মূল বস্তু। মুনাফা যেহেতু মূল্যের অতিরিক্ত হয়ে থাকে, তাই এটা এমন সব জিনিসের মধ্যে কামনা করা উচিত, যা মানুষের মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক তাবেয়ী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ তুমি তোমার পুত্রকে দুই বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে এবং দুই ধরনের পেশায় নিয়োজিত করো না। দু'রকম ক্রয়-বিক্রয়ের একটি হচ্ছে খাদ্য শস্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং অপরটি হচ্ছে কাফনের ক্রয়-বিক্রয়। কেননা, খাদ্য শস্য বিক্রেতা খাদ্য শস্যের দুর্মূল্য কামনা করে এবং কাফন বিক্রেতা মানুষের মৃত্যু কামনা করে। দুই পেশার মধ্যে একটি হচ্ছে কসাইগিরি– এতে অন্তর পাষাণ হয়ে যায় এবং অপরটি হচ্ছে স্বর্ণালংকার নির্মাণ। অলংকার নির্মাতারা দুনিয়ার মানুষকে সোনারূপা দ্বারা সজ্জিত করে দিতে চায়।

ব্যাপক ক্ষতির দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, অচল টাকা দেয়া। লেনদেনকারী না জেনে শুনে অচল টাকা রাখলে এতে তার ক্ষতি হয়। ফলে এটা জুলুম। আর যদি কেউ জেনে শুনে রাখে, তবে সে অপরকে দেবে । এভাবে যার হাতেই যাবে, সে অপরকে দেবে এবং সকলের গোনাহ প্রথম ব্যক্তির উপর বর্তাবে। কেননা, সেই এই কুপ্রথার প্রচলনকারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কুকর্মের প্রচলন করে এবং তার পরে অন্যেরা তা পালন করে তার উপর এই কুকর্মের গোনাহ হবে এবং যারা তার পরে তা তা পালন করে, তাদের গোনাহও তার উপর চাপাবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং তাদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ একটি অচল টাকা প্রচলিত করা একশ' টাকা চুরি করার চেয়েও গুরুতর পাপ। কেননা, চুরি একটি নাফরমানী, যা চোরের মৃত্যুর পর খতম হয়ে যায়, কিন্তু অচল টাকা প্রচলিত করা একটি বেদআত- যা প্রচলনকারী উদ্ভাবন করে। এটা শত শত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। যে পর্যন্ত সেই টাকা চলতে থাকবে, তাতে মানুষের ধন-সম্পদে যে অনিষ্ট ও ক্ষতি হবে, তার পাপও মরে যায় এবং অত্যন্ত দুর্ভোগ সে ব্যক্তির জন্যে, যে নিজে মরে যায় কিন্তু তার গোনাহ একশ দু'শ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এ কারণে সে কবরে আযাব ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থাৎ, আমি তাদের পেছনে ছেড়ে যাওয়া কীর্তিসমূহও লিপিবদ্ধ করব, যেমন তাদের সেই আমল লিপিবদ্ধ করব, যা তারা জীবদ্দশায় করে।

আরও এরশাদ হয়েছে- يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ

অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন বলে দেয়া হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পেছনে ছেড়ে এসেছে। এখানে যা পেছনে ছেড়ে এসেছে বলে সেই কুকীর্তি বুঝানো হয়েছে, যার প্রচলন মানুষ করে যায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্যেরা তা করে। এখন জানা উচিত, অচল টাকা সম্পর্কে পাঁচটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, এরূপ টাকা দ্বীনদার ব্যবসায়ীর হাতে এলে তার উচিত টাকাটি কূপে নিক্ষেপ করা, যাতে পরে কারও হাতে না পড়ে। একে ভেঙ্গে ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়াও জায়েয। দ্বিতীয়, ব্যবসায়ীর উচিত টাকা পয়সা পরখ করার পদ্ধতি শিখে নেয়া, যাতে সে তার হাত দিয়ে কোন মুসলমানকে অচল টাকা দিয়ে গোনাহগার সাব্যস্ত না হয়। তৃতীয়, যদি কেউ লেনদেনকারীকে এরূপ টাকা দিয়ে বলে দেয় যে, এই টাকা অচল, তবুও সে গোনাহের গন্ডির বাইরে থাকবে না। কেননা, যে এরূপ টাকা নেয়, সে অপরকে তার অজ্ঞাতে দেয়ার জন্যেই নেয়। এরূপ নিয়ত না থাকলে কখনই তা নিত না। চতুর্থ, হাদীসে বলা হয়েছে-

رحم الله سهل البيع وسهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء.

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ রহম করুন বিক্রয়ে নম্রতাকারীর প্রতি এবং ক্রয়ে নম্রতাকারীর প্রতি।

হাদীসের এই দোয়ার বরকতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়তে অচল টাকা গ্রহণ করবে এবং টাকাটি কূপে নিক্ষেপ করার অবিচল ইচ্ছা রাখবে। পঞ্চম, আমাদের মতে অচল টাকার অর্থ সেই টাকা, যাতে রূপা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত– কেবল গিল্টিই গিল্টি থাকে অথবা আশরাফী হলে তাতে স্বর্ণের নামগন্ধও থাকে না। যে টাকায় রূপা ও গিল্টি মিশ্রিত থাকে, যদি শহরে এরূপ টাকার প্রচলন থাকে, তবে তা দ্বারা লেনদেন করার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে শহরে প্রচলন থাকলে তা দ্বারা লেনদেন করা জায়েয– রূপার পরিমাণ জানা থাক বা না থাক। শহরে প্রচলন না থাকলে তা দ্বারা লেনদেন তখনই জায়েয হবে, যখন তার রূপার পরিমাণ জানা থাকবে। মোট কথা, ব্যবসা বাণিজ্যে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নফল এবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়েও অধিক সওয়াবের কারণ। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাধু ব্যবসায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় প্রকার জুলুমের কারণে বিশেষভাবে লেনদেনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না করাকে বলা হয় আদল বা সুবিচার। এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি হল, অপরের জন্যে তাই পছন্দ করা যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। সুতরাং যে আচরণ তোমার সাথে কেউ করলে তোমার খারাপ লাগে, সে ব্যবহার অন্যের সাথে তোমার করা কিছুতেই সমীচীন নয়। তোমার কাছে নিজের টাকার মর্যাদা ও অপরের টাকার মর্যাদা সমান হওয়া উচিত। এই সামগ্রিক নীতির বিশদ বিবরণ চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত। প্রথম, পণ্যসামগ্রীর গুণস্বরূপ এমন বিষয় বর্ণনা করবে না, যা তাতে নেই। দ্বিতীয়, পণ্যসামগ্রীর গোপন দোষ কোন অবস্থাতেই গোপন করবে না। তৃতীয়, পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ ও ওজন সম্পর্কে কোন বিষয় অস্পষ্ট রাখবে না। চতুর্থ, পণ্যের প্রকৃত দর গোপন রাখবে না যে, প্রতিপক্ষ দর জানার পর সে জিনিস ক্রয় করতে অস্বীকার করে। এখন এই বিষয় চতুষ্টয়ের বিস্তারিত বর্ণনা শোনা দরকার।

প্রথম বিষয়, পণ্যসামগ্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা না করা। কেননা, প্রশংসা করা দু'অবস্থা থেকে খালি নয়– প্রথমতঃ এমন বিষয় বর্ণনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে, যা জিনিসের মধ্যে বাস্তবে নেই। এটা পরিষ্কার মিথ্যাচার। ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করলে মিথ্যা ছাড়া জুলুম এবং প্রতারণার দায়েও তাকে অভিযুক্ত করা হবে। দ্বিতীয়তঃ এমন বিষয় বর্ণনা করবে, যা জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে এবং বর্ণনা না করলেও ক্রেতা তা জানতে পারবে। এমতাবস্থায় তার বর্ণনা বাজে ও অনর্থক কথা হবে। এই অনর্থক কথার জন্যে তাকে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আল্লাহ বলেন ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

অর্থাৎ মানুষ যা-ই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।

হাঁ, যদি এমন অভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণনা করে, যা বর্ণনা না করলে ক্রেতা জানতে পারে না, তবে তাতে কোন দোষ হবে না যদি অতিরঞ্জিত না হয়, কিন্তু এসব বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে কসম খাবে না। হাদীসে আছে– দুর্ভোগ সেই ব্যবসায়ীর জন্যে, যে বলে, হাঁ আল্লাহর কসম, না, আল্লাহর কসম এবং দুর্ভোগ সেই কারিগরের জন্যে, যে কাল ও পরশুর ওয়াদা করে। অন্য এক হাদীসে আছে– মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্যকে প্রসার দেয়, কিন্তু উপার্জন মিটিয়ে দেয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না– অহংকারী, দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং কসমের মাধ্যমে আপন পণ্যসামগ্রীকে প্রসারদাতা।

দ্বিতীয়, পণ্যের বাহ্যিক ও গোপন সকল দোষ প্রকাশ করবে। কিছুই চেপে যাবে না। কোন দোষ গোপন করলে বিক্রেতা জালেম ও প্রতারক হবে। প্রতারণা হারাম। কাপড়ের ভাল পিঠ প্রকাশ করলে এবং অপর পিঠ গোপন রাখলে প্রতারণা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক শস্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। তার শস্য খুব ভাল দেখাচ্ছিল। তিনি শস্যস্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু আর্দ্রতা অনুভব করে বললেন ঃ একি! দোকানদার বললঃ এটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে তুমি ভিজা খাদ্য শস্য উপরে রাখলে না কেন? শুন, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। দোষ বলে দিয়ে মুসলমানদের শুভ কামনা করা যে ওয়াজিব, তা এই হাদীস দ্বারা জানা যায়– হযরত জারীর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে ইসলামের বয়াত করার পর প্রস্থানোদ্যত হলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাপড় ধরে টান দেন এবং তাকে বসতে বলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করা তার ইসলামের জন্যে শর্ত সাব্যস্ত করে দেন। এর পর থেকে হযরত জারীরের নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতেন, তখন তার দোষ ক্রেতাকে ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন ঃ এখন তুমি ইচ্ছা করলে ক্রয় কর, ইচ্ছা না হয় ক্রয় না কর। লোকেরা তাকে বলল ঃ এরূপ করলে তোমার বিক্রয় কোনটিই পূর্ণ হবে না। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে অঙ্গীকার করেছি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করব। অর্থাৎ, এভাবে বিক্রয় না করলে অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ হবে। একবার ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ) বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার কাছেই এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী বিক্রয় করছিল। ক্রেতা উষ্ট্রীর দাম তিনশ' দেরহাম বিক্রেতাকে দিয়ে চলে যেতে লাগল। হযরত ওয়াসেলা তখন অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি যখন ক্রেতাকে উষ্ট্রি নিয়ে চলে যেতে দেখলেন, তখন তার পেছনে দৌড় দিলেন এবং ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই উষ্ট্রী গোশতের জন্যে ক্রয় করেছ, না সওয়ারীর জন্যে? ক্রেতা বলল ঃ সওয়ারীর জন্যে। ওয়াসেলা বললেন ঃ আমি এর পায়ে একটি ফাটল দেখেছি। এটি মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে চলতে সক্ষম হবে না। অতঃপর ক্রেতা ফিরে এসে উষ্ট্রী বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দিল। বিক্রেতা তার দাম আরও একশ' দেরহাম হ্রাস করে ওয়াসেলাকে বলল ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি আমার বিক্রয় নস্যাৎ করে দিয়েছ। ওয়াসেলা বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করব। তিনি আরও বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি

لا يحل لاحد يبيع بيعا الا ان يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا تبينه ـ

অর্থাৎ পণ্যের দোষ বর্ণনা না করে পণ্য বিক্রয় করা কারও জন্যে হালাল নয়। আর যে ব্যক্তি সেই দোষ জানে, তার জন্যে বর্ণনা না করে থাকা জায়েয নয়। মোট কথা, পূর্ববর্তীরা মুসলমানের শুভ কামনাকে একটি অতিরিক্ত ফযীলতের বিষয় মনে করতেন না; বরং তারা বিশ্বাস করতেন, এটা ইসলামের অন্যতম শর্ত এবং বয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এটা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অধিকাংশ মানুষের জন্যে কঠিন। তাই সৎ ও সাবধানী ব্যক্তিরা এসব ঝগড়ায় পড়ে না। তারা নির্জনবাস অবলম্বন করে খাঁটি এবাদত করে। কেননা, মানুষের সাথে মিলেমিশে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা এমন দুরূহ প্রচেষ্টা, যা সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ করতে পারে না। দু'টি বিষয় বিশ্বাস করা ব্যতীত এ কাজ মানুষের জন্যে সহজ হয় না। প্রথমতঃ বিশ্বাস করতে হবে যে, দোষ গোপন করে বিক্রয় করলে রুযী বৃদ্ধি পায় না, বরং বরকত দূর হয়ে যায় এবং এই বিচ্ছিন্ন পাপ একত্রিত হয়ে একদিন হঠাৎ সমস্ত সম্পদ বিলীন করে দেয়। সেমতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তির একটি গাভী ছিল। সে তার দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করত। একবার এমন এক বন্যা এল যা তার গাভীটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লোকটির ছেলে বলল ঃ এই সে বিচ্ছিন্ন পানি, যা আমরা দুধের সাথে মিশ্রিত করেছিলাম, হঠাৎ একত্রিত হয়ে আমাদের গাভী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

البيعان اذا صدقا فى بيعهما وانصحا بورك لهما فى بيعهما واذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما ـ

অর্থাৎ, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য কথা বলে এবং একে অপরের শুভ কামনা করে, তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। আর যখন তারা দোষ গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ছিনিয়ে নেয়া হয়। এক হাদীসে আছে–

يد الله على الشريكين مالم يتخاونا واذا تخاونا رفع يده عنهما ـ

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দুই শরীকের উপর ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তারা খেয়ানত না করে। আর যখন খেয়ানত করে, তখন তাঁর সাহায্যের হাত তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

মোট কথা, খেয়ানতের মাধ্যমে অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পায় না, যেমন খয়রাত করলে তা হ্রাস পায় না। যে ব্যক্তি মাপ ব্যতীত অন্য কোনভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে বলে স্বীকার করে না, সে আমাদের এই বক্তব্য বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যে জানে, মাঝে মাঝে এক টাকার বরকত দ্বারা দীন দুনিয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায় এবং কখনও আল্লাহ তা'আলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাজার হাজার টাকা থেকে বরকত এমনভাবে তুলে নেন যে, সেই টাকা মালিকের ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, ফলে সে বলতে বাধ্য হয়, হায়, আমার কাছে যদি এত টাকা না থাকত। সে একথার সত্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, খেয়ানত দ্বারা ধন বৃদ্ধি পায় না এবং খয়রাত দ্বারা হ্রাস পায় না। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস করতে হবে, পরকালের কল্যাণ দুনিয়ার কল্যাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধনসম্পদের উপকারিতা বয়ঃক্রম শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় এবং বান্দার হক ঘাড়ে থেকে যায়। এমতাবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করার বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাতছাড়া করা পছন্দ করবে? বলাবাহুল্য, ধর্মের নিরাপত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে ও উৎকৃষ্ট। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত পার্থিব ব্যাপারাদিকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার না দেয়, সেই পর্যন্ত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানুষের উপর থেকে আল্লাহর গজব দূর করতে থাকে। মোট কথা, ক্রয়-বিক্রয় হোক কিংবা কারিগরি, সকল ক্ষেত্রেই প্রতারণা হারাম। কারিগরেরও উচিত তার কাজে এমন শৈথিল্য না করা, যা তার নিজের দেয়া কাজে অন্য কারিগর করলে সে তা পছন্দ করবে না। কারিগর সুন্দর ও মজবুত কাজ করবে এবং তাতে কোন দোষ থাকলে তা বলে দেবে । এভাবে সে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। কেউ বলতে পারে, পণ্যের দোষ বর্ণনা করা ব্যবসায়ীর উপর ওয়াজিব হলে তার ব্যবসা শিকায় উঠতে বাধ্য। এর জওয়াব হচ্ছে, ব্যবসায়ী প্রথমেই নির্দোষ পণ্য ক্রয় করবে, যা বিক্রয় না হলে সে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারে। এছাড়া অল্প লাভে বিক্রয় করবে। এতে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে বরকতও দেবেন এবং ধোঁকা দেয়ারও প্রয়োজন হবে না, কিন্তু মুশকিল হল, মানুষ অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয় না এবং অনেক লাভ প্রতারণা ছাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং সুষ্ঠুরূপে ব্যবসা করলে এমন দোষী পণ্য ক্রয় করবে না, যা বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি ঘটনাক্রমে এমন কোন বস্তু এসে যায়, তবে তার দোষ বলে দেবে এবং দোষসহ তার যা দাম হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

হযরত ইবনে সিরীন (রহঃ) একটি ছাগল বিক্রয় করে ক্রেতাকে বললেন ঃ এর একটি দোষ আছে, সেটাও শুন। সে ঘাস পায়ে মাড়িয়ে দেয়। হাসান ইবনে সালেহ এক বাঁদী বিক্রয় করে ক্রেতাকে বললেন ঃ আমার এখানে থাকা অবস্থায় একবার তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়েছিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোট কথা, বুযুর্গগণ লেনদেনে সামান্য বিষয়ও বলে দিতেন।

তৃতীয়, পণ্যের পরিমাণ ও ওজন গোপন করবে না। সমান মাপ এবং সাবধানতা সহকারে মাপার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। সুতরাং অন্যের কাছ থেকে যে মাপ নেবে অন্যকেও সেভাবে মেপে দেবে । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

অর্থাৎ, মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন মানুষকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

এ থেকে মুক্তির উপায় এটাই যে, অপরকে মেপে দেয়ার সময় পাল্লা কিছু ঝুঁকিয়ে দেবে এবং নিজে নেয়ার সময় সমানের চেয়ে কিছু কম নেবে। কেননা, ঠিক সমান খুব কমই হতে পারে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক রতির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দুর্ভোগ ক্রয় করব কেন? তাই তিনি নিজের হক নেয়ার সময় আধা রতি কম নিতেন এবং অপরকে দেয়ার সময় এক রতি বেশী দিতেন। তিনি আরও বলতেন ঃ সে ব্যক্তির জন্যে দুর্ভোগ, যে এক রতির বিনিময়ে জান্নাত বেচে দেয়, যে জান্নাতের বিনিময় আকাশ ও পৃথিবীর সমান। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ ধরনের বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জোর তাকিদ করেছেন। কেননা, এগুলো বান্দার হক, যা থেকে তওবা হতে পারে না। কেননা, এখানে কার কার হক রয়ে গেছে, তা জানা থাকে না। জানা থাকলে অবশ্য তাদেরকে জড়ো করে হক শোধ করা যেত। রসূলে করীম (সাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করার পর যে মূল্য ওজন করত, তাকে বলতেন ঃ زن وارجع অর্থাৎ, মূল্য ওজন কর এবং ঝুঁকিয়ে দাও। ফোযায়ল (রহঃ) একবার তাঁর পুত্রকে একটি আশরাফী ধৌত করতে দেখলেন। আশরফীটি ভাঙ্গানো উদ্দেশ্য ছিল। তাই তা থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হচ্ছিল, যাতে ময়লার কারণে তার ওজন বেশী না হয়ে যায়। ফোযায়ল বললেন ঃ বৎস, তোমার এ কাজ দু'টি হজ্জ ও দশটি ওমরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি একথা ভেবে অবাক হই যে, সেই ব্যবসায়ী ও বিক্রেতার নাজাত কিরূপে হবে, যারা দিনের বেলায় মাপজোখ করে এবং রাতে ঘুমিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে।। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ হে কলিজার টুকরা, সর্প যেমন দুই পাথরের মাঝখানে ঢুকে পড়ে, তেমনি পাপ দুই লেনদেনকারীর মাঝখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়।

সারকথা, দাঁড়িপাল্লার ব্যাপারটি খুবই গুরুতর। এক আধ রতি দিয়ে এ থেকে নাজাত পাওয়া সম্ভব। যে ব্যক্তি নিজের হক অন্যের কাছ থেকে আদায় করে এবং যেভাবে আদায় করে সেভাবে অন্যের হক শোধ করে না, সে-ও মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে মাপের জিনিসসমূহে সমান সমান না করা হারাম করার উদ্দেশ্য এটাই যে, ন্যায় ও ইনসাফ বর্জন করা হারাম। এটা প্রত্যেক কাজেই হতে পারে। যে ব্যক্তি খাদ্য শস্যে মাটি মিশ্রিত করে বিক্রয় করবে, সে মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যে কসাই গোশতের সাথে এমন হাড্ডি মেপে দেবে, যা সাধারণভাবে মাপা হয় না, তার অবস্থাও তেমনি হবে। বস্ত্র বিক্রেতা যখন গজ দিয়ে বস্ত্র মেপে ক্রয় করে, তখন বস্ত্রকে ঢিলা রাখে; কিন্তু বিক্রয় করার সময় খুব টেনে মাপে, যাতে কিছু বেড়ে যায়। এ ধরনের সব কাজকর্ম মানুষকে আয়াতে বর্ণিত দুর্ভোগের উপযুক্ত করে দেয়।

চতুর্থ, পণ্যের দর সত্য সত্য বলবে– কিছুই গোপন করবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শহরের বাইরে গিয়ে শহরে আগমনকারী কাফেলার কাছ থেকে মিথ্যা দর শুনিয়ে পণ্য ক্রয় করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ لاتلقوا الركبان ومن تلقها نصاحب السلعة بالخيار بعد ان يقدم السوق অর্থাৎ, বাইরের সওদাগরদের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে ক্রয় করো না। কেউ এরূপ ক্রয় করলে বাজারে আসার পর পণ্যের মালিকের এখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে বিক্রয় বহাল রাখবে এবং ইচ্ছা করলে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত নেবে। অর্থাৎ, বিক্রেতা যদি জানতে পারে, ক্রেতা মিথ্যা দর বলেছিল, তবে তার এই এখতিয়ার থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লেনদেনে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদল (ন্যায়বিচার) এবং 'এহসান' (অনুগ্রহ প্রদর্শন) উভয়টিরই নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ন্যায়বিচার মুক্তির কারণ। এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজি বেঁচে থাকার মত। অনুগ্রহ প্রদর্শন পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের কারণ। এটা ব্যবসায়ে মুনাফা হওয়ার অনুরূপ। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মূল্য পাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে এবং আসল মুনাফা অন্বেষণ করে না, তাকে বুদ্ধিমান গণ্য করা হয় না। তেমনি পারলৌকিক লেনদেনেও যে ব্যক্তি কেবল ন্যায়বিচার ও জুলুম বর্জন করেই ক্ষান্ত থাকে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না, তাকে ধর্মপরায়ণ বলা যায় না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ

অর্থাৎ, অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আর বলা হয়েছে-

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদের নিকটবর্তী। অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন কাজ করা, যদ্দ্বারা লেনদেনকারীদের উপকার হয়; কিন্তু তা করা ওয়াজিব নয়; বরং নিজের পক্ষ থেকে সদাচরণস্বরূপ করা হয়। কেননা, যেসব কাজ করা ওয়াজিব, সেগুলো ন্যায়বিচার ও জুলুম বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি পালন করার মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রদর্শনের স্তর অর্জিত হয়। প্রথমতঃ অন্যের এমন লোকসান না করা, যা সাধারণতভাবে করা হয় না। কিছু না কিছু লোকসান করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, ক্রয়বিক্রয় মুনাফার জন্যে করা হয়। আর কিছু বেশী নেয়া ছাড়া মুনাফা হতে পারে না। এই বেশী নেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সাধারণ নিয়মের বেশী না হয়। কেননা, যে ক্রেতা সাধারণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়মের বেশী মুনাফা দেবে, সে হয় এই পণ্যের প্রতি অধিক আগ্রহী হবে, না হয় আপাততঃ এর প্রয়োজন তার অধিক হবে। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা অধিক মুনাফা না নেয়, তবে এটা তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হবে। অন্যথায় প্রতারণা না হলে সম্ভবতঃ বেশী মুনাফা নেয়া জুলুম নয়। কোন কোন আলেমের মতে মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশী মুনাফা নিলে ক্রেতা জানার পর পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকারী হবে, কিন্তু আমাদের অভিমত তা নয়, বরং আমরা বলি, কম মুনাফা নেয়া অনুগ্রহের শামিল।

কথিত আছে, ইউনুস ইবনে ওবায়দের দোকানে বিভিন্ন দামের বস্ত্রজোড়া ছিল, কোনটি চারশ' দেরহামের এবং কোনটি দু'শ দেরহামের। একদিন তিনি যখন তাঁর ভাতিজাকে দোকানে রেখে নামায পড়তে গেলেন, তখন এক বেদুঈন এসে একটি চারশ' দেরহামের বস্ত্রজোড়া চাইল। ভাতিজা দু'শ দেরহামের বস্ত্রজোড়া থেকে একটি বের করে দেখাল। বেদুঈন পছন্দ করে সানন্দে চারশ' দেরহাম দিয়ে দিল এবং বস্ত্রজোড়াটি হাতে নিয়ে চলে যেতে লাগল। পথিমধ্যে ইউনুস ইবনে ওবায়দ নিজের দোকানের বস্ত্রজোড়া চিনতে পেরে বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কত দিয়ে কিনলে? বেদুঈন বলল ঃ চারশ' দেরহাম দিয়ে। ইউনুস বললেন ঃ এর দাম দু'শ দেরহামের বেশী নয়। এটা ফেরত দাও। বেদুঈন বলল ঃ আমাদের শহরে এটা পাঁচশ' দেরহামের মাল। আমি সানন্দে এটা পছন্দ করেছি এবং চারশ' দেরহাম দিয়েছি। অতঃপর ইউনুস তাকে অনেকটা জোর করেই দোকানে নিয়ে গেলেন এবং দু'শ' দেরহাম ফেরত দিলেন। এর পর তিনি ভাতিজাকে শাসিয়ে বললেন ঃ এত মুনাফা লুটতে এবং মুসলমানদের শুভ কামনা বর্জন করতে তোর লজ্জা হল না? ভাতিজা বললেন ঃ সে তো নিজেই এত দেরহাম দিতে রাজি ছিল। তিনি বললেন ঃ তা হলে নিজের জন্যে যা পছন্দ করতে, তার জন্যে তা পছন্দ করলে না কেন? এ কাজটিই যদি দাম গোপন করে প্রতারণার মাধ্যমে হত, তবে তা হত এক প্রকার জুলুম, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে আছে–

غبن المرسل حرام -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের উপর আস্থা রাখে, তাকে ধোঁকা দেয়া হারাম। যোবায়র ইবনে আদী বলতেন ঃ আমি আঠার জন সাহাবীকে এমন দেখেছি যে তাঁরা ভাল করে এক দেরহামের গোশতও কিনতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জানতেন না। অতএব এমন আত্মভোলাদের ক্ষতি করা এবং তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়া জুলুম। অধিক লাভ নেয়ার ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকার ধোঁকা কিংবা সমকালীন দর গোপন করা প্রায়ই হয়ে থাকে। অনুগ্রহ প্রদর্শনের এক পন্থা হযরত সিররী সকতী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি ষাট দীনার মূল্য দিয়ে এক বস্তা বাদাম ক্রয় করেন এবং আপন ডায়রীতে তার মুনাফা তিন দীনার লেখে রাখেন। অর্থাৎ, তিনি প্রতি দশ দীনারে আধা দীনার মুনাফা ঠিক করলেন। এর পর বাদামের দর বেড়ে গেল এবং নব্বই দীনার প্রতি বস্তা বিক্রি হতে লাগল। জনৈক খরিদ্দার তাঁর কাছে এসে বাদামের বস্তা ক্রয় করতে চাইল। তিনি বললেন ঃ নিয়ে যাও। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞেস করলে তিনি তেষট্টি দীনার বললেন। খরিদ্দারও সৎ ও সাধু ব্যবসায়ী ছিল। সে বলল ঃ বর্তমান দর প্রতি বস্তা নব্বই দীনার। সিররী সকতী বললেন ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এর বেশী নেব না। তেষট্টি দীনারেই বিক্রয় করব। খরিদ্দার বলল ঃ আমিও আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করেছি, কোন মুসলমানের ক্ষতি করব না। অতএব নব্বই দীনার দিয়েই নেব। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর পর না সিররী নব্বই দীনার দিয়েই বিক্রয় করলেন এবং না খরিদ্দার তেষট্টি দীনারে ক্রয় করল। এটা ছিল তাঁদের উভয়ের তরফ থেকে অনুগ্রহ প্রদর্শন।

বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদেরের বস্ত্রালয়ে কিছু চোগা (পোশাক বিশেষ) ছিল। কিছু পাঁচ টাকা দামের এবং কিছু দশ টাকা দামের। গোলাম তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঁচ টাকার চোগা দশ টাকায় বিক্রয় করেছে। ক্রেতা বলল ঃ কোন দোষ নেই। আমি রাজি আছি। তিনি বললেন ঃ আপনি রাজি বটে; কিন্তু আমি আপনার জন্যে তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্যে পছন্দ করি। আপনি তিনটি কাজের একটি করুন— হয় দশ টাকা মূল্যের চোগা নিয়ে নিন, না হয় পাঁচ টাকা ফেরত নিন, না হয় আমার বস্ত্র আমাকে ফেরত দিন এবং আপনার মূল্য নিয়ে যান। ক্রেতা বলল ঃ আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিন। তিনি পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেন। ক্রেতা পাঁচ টাকা নিয়ে চলে গেল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ এই দোকানদার কে? এক ব্যক্তি বলল ঃ ইনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের। ক্রেতা বলল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাঁরই বদৌলত দুর্ভিক্ষে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মোট কথা, অনুগ্রহ প্রদর্শন হল, যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জায়গায় যে বস্তুতে যে পরিমাণ মুনাফা নেয়ার সাধারণ রীতি থাকে, তার চেয়ে বেশী না নেয়া। যে ব্যক্তি অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকে, তার দোকানে লেনদেন বেশী হয় এবং বেশী লেনদেনের কারণে তাঁর ফায়দাও বেশী হয়। ফলে বরকত দেখা যায়। হযরত আলী (রাঃ) কুফার বাজারে দোররা নিয়ে ঘুরাফেরা করতেন এবং বলতেন ঃ ব্যবসায়ীরা, নিজেদের হক নাও এবং অন্যের হক দাও। এতে তোমরা বেঁচে থাকবে। অল্প লাভ ফিরিয়ে দিয়ো না। তা হলে বেশী লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তিনটি— প্রথমতঃ আমি অল্প মুনাফা হলেও পণ্য বিক্রি করে দেই। দ্বিতীয়তঃ কেউ আমার কাছে জন্তু চাইলে আমি তা বিক্রি করতে দ্বিধা করি না। তৃতীয়তঃ আমি কখনও বাকী বিক্রি করি না।

কথিত আছে, একবার তিনি এক হাজার উষ্ট্রী বিক্রি করেন। লাভের মধ্যে কেবল এগুলোর রশি তাঁর কাছে রইল। এর পর প্রত্যেকটি রশি এক দেরহামে বিক্রয় করে তিনি এক হাজার দেরহাম মুনাফা অর্জন করেন। আর এক হাজার সেদিনের খোরাক থেকে বেঁচে গেল।

দ্বিতীয়, কোন দুর্বল অথবা নিঃস্ব ব্যক্তির কাছ থেকে কোন জিনিস ক্রয় করলে নিজে কিছু লোকসান স্বীকার করে নিলে দুর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। এভাবে ক্রেতা এই হাদীসে বর্ণিত দোয়ার হকদার হয়ে যাবে—

رحم الله سهل البيع سهل الشراء .

অর্থাৎ, যে ক্রয় ও বিক্রয় সহজ করে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তবে যে ধনী ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুনাফা নেয়, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা ভাল নয়; বরং বিনা সওয়াবে অর্থ বিনষ্ট করার শামিল। এক হাদীসে আছে— الغبون فى الشراء لامحمود ولا ماجور যে ব্যক্তি ক্রয়ে ঠকে যায়, সে প্রশংসার পাত্রও নয় এবং তাকে সওয়াবও দেয়া হয় না। বসরার কাযী ও তাবেয়ী আয়ায ইবনে মুয়াবিয়া অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ না আমি ধূর্ত এবং না কোন ধূর্ত আমাকে ঠকাতে পারে। অপরকে না ঠকানো এবং নিজে না ঠকাই বাহাদুরী। হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশংসায় কেউ কেউ লেখেছেন, তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কাউকে ধোঁকা দিতেন না এবং কেউ তাঁকে ধোঁকা দিতে পারত না। হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ক্রয় বিক্রয় করার সময় খুব যাচাই করে নিতেন এবং সামান্য বিষয়ের জন্যে অনেক কথা বলতেন; কিন্তু কাউকে দেয়ার সময় অনেক বেশী দিয়ে দিতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন ঃ যে দেয়, সে নিজের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। কাজেই যত দেবে ততত বেশী তার ফযীলত জানা যাবে। পক্ষান্তরে ক্রয়বিক্রয়ে যে ঠকে যায় সে তার বুদ্ধি হ্রাস করে; অর্থাৎ, ঠকা হল বুদ্ধির ত্রুটি।

তৃতীয়, মূল্য ও ঋণ শোধ নেয়ার সময় ত্রিবিধ উপায়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন হতে পারে। এক, কিছু মাফ করে দিয়ে, দুই, আর কিছু সময় দিয়ে এবং তিন, দাম নেয়ার ব্যাপারে নম্রতা করে। এগুলো মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দরিদ্রকে সময় দেয় অথবা তার ঋণ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকে অল্প ও সহজ হিসাব নেবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ধার দেয়, সেই মেয়াদ পর্যন্ত প্রত্যহ খয়রাতের সওয়াব পাবে। মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি আরও সময় দেয়, তবে প্রত্যহ কর্জের সমান খয়রাত করার সওয়াব পাবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু অনুয়ায়ী কোন কোন বুযুর্গ ভাল মনে করতেন না যে, ঋণী তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিক। কেননা, কর্জ যতদিন অপরিশোধিত থাকবে, ততদিন কর্জদাতা প্রত্যহ সেই পরিমাণ টাকা খয়রাত করার সমান সওয়াব পেতে থাকবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, হুযুর (সাঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি– সদকার সওয়াব দশ গুণ এবং কর্জের সওয়াব আঠার গুণ। কেউ কেউ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন, সদকা অভাবগ্রস্ত এবং অভাবহীন সবার হাতেই পড়ে, কিন্তু কর্জ চাওয়ার জিল্লতী অভাবী ছাড়া অন্য কেউ বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয় করে ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য তখনই নেয় না এবং তাগাদাও করে না, সে-ও কর্জদাতার অনুরূপ। কথিত আছে, হযরত হাসান বসরী একটি খচ্চর চারশ' দেরহামে বিক্রি করলেন। মূল্য দেয়ার সময় ক্রেতা বলল ঃ আবু সায়ীদ, কিছু রেয়াত করুন। তিনি বললেন, যাও, আমি তোমাকে একশ' দেরহাম ছেড়ে দিলাম। সে বলল ঃ এখন আপনি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ আরও একশ' দেরহাম মাফ করলাম। অতঃপর তিনি ক্রেতার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছ থেকে অবশিষ্ট মাত্র দু'শ দেরহাম নিলেন। কেউ আরজ করল ঃ এতে তো অর্ধেক মূল্য রয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ অনুগ্রহ হলে এরূপই হওয়া উচিত।

চতুর্থ, কর্জ শোধ করার ব্যাপারে অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপায় হল, কর্জের টাকা এমনভাবে কর্জদাতার কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে তার তাগাদা করার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ خيركم احسنكم قضاء অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে উত্তমরূপে শোধ দেয়। কর্জ শোধ করার সামর্থ্য হয়ে গেলে দ্রুত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এবং যেভাবে দেয়া শর্ত, তার চেয়ে উত্তম উপায়ে শোধ করে দেয়া উচিত। কর্জ শোধ করতে অক্ষম হলে এ নিয়তই রাখবে, যখন হাতে টাকা আসবে তখনই শোধ করে দেবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই নিয়তে কর্জ গ্রহণ করে যে, হাতে আসামাত্রই দিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যাতে তার হেফাযত করে এবং কর্জ শোধ করা পর্যন্ত তার জন্যে দোয়া করে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু অবগত হয়ে পূর্ববর্তী কয়েকজন বুযুর্গ প্রয়োজন ছাড়াও কর্জ গ্রহণ করতেন। কোন কর্জদাতা কঠোর ভাষায় কথা বললে তা বরদাশত করা এবং তার সাথে নরম ব্যবহার করা উচিত। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ হবে। বর্ণিত আছে, একবার জনৈক কর্জদাতা মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল এবং কর্জ শোধ না করা পর্যন্ত সে তাঁর সাথে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কথা বলল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে সাবধান করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ যেতে দাও, হকদার বলেই সে এমন করেছে। কর্জদাতা ও কর্জ গ্রহীতার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলে তৃতীয় ব্যক্তির উচিত কর্জদাতার পক্ষপাতিত্ব না করা। কারণ, কর্জদাতা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থেকে কর্জ দেয়, আর কর্জ গ্রহীতা নিজের অভাবের তাড়নায় কর্জ গ্রহণ করে, তাই অভাবগ্রস্তের রেয়াত করাই সমীচীন। হাঁ, যখন কর্জগ্রহীতা সীমালজ্ঘন করে তখন তার সাহায্য এভাবে করা উচিত, যাতে সে সীমালজ্ঘন থেকে বিরত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নিজের ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালেম হোক অথবা মজলুম। কেউ আরজ করল ঃ জালেম হলে তার সাহায্য কিভাবে করব? তিনি বললেন ঃ জুলুম থেকে বিরত রাখাই তার সাহায্য।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম, কোন ক্রেতা পণ্যদ্রব্য ফেরত দিতে চাইলে তা অনুমোদন করবে। কেননা, ফেরত সে-ই দেবে, যে ক্রয়-বিক্রয়ে অনুতপ্ত হবে এবং নিজের জন্যে তাকে ক্ষতিকর মনে করবে। সুতরাং নিজের জন্যে এমন বিষয় পছন্দ করা উচিত নয়, যা তার ভাইয়ের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে অনুতপ্ত ব্যক্তির লেনদেন ফেরত দেবে, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন তার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

ষষ্ঠ, বাকী দিলে ফকীর ও নিঃস্বদেরকে দেবে এবং লেনদেনের সময় নিয়ত করবে যে, সামর্থ্য না হলে তাদের কাছে দাবী করব না। সেমতে পূর্ববর্তী সাধু ব্যবসায়ীদের কাছে দুটি হিসাব বহি থাকত। একটির শিরোনাম কিছুই হত না। তাতে অজ্ঞাত, দুর্বল ও নিঃস্বদের নাম লেখা থাকত। কোন ফকীর তাদের দোকানে এসে যদি বলত, আমার অমুক খাদ্য শস্য ও ফলের প্রয়োজন; কিন্তু আমার হাতে দাম নেই, তবে বুযুর্গ ব্যবসায়ী বলতেন ঃ নিয়ে যাও। যখন তোমার হাতে দাম হয় তখন দিয়ে যেয়ো। এর পর তিনি তার নাম সেই হিসাব বহিতে লেখে রাখতেন। পূর্ববর্তী বুযুর্গণ এরূপ ব্যবসায়ীকেও সাধু মনে করতেন না; বরং তাকেই সাধু গণ্য করতেন, যে ফকীরের নামই খাতায় লেখত না এবং তার যিম্মায় কোন কর্জ রাখত না; বরং ফকীরকে বলে দিত, যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে যাও। তোমার কাছে দাম হলে দিয়ে যাবে। নতুবা এটা তোমার জন্যে হালাল করে দেয়া হল।

মোট কথা, এগুলো ছিল পূর্ববর্তী ভাল মানুষদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি। এগুলো সব বর্তমানে মিটে গেছে। এখন কেউ এ সব নিয়মনীতির উপর কায়েম থাকলে সে যেন এই পন্থাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। প্রকাশ থাকে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের জন্যে একটি কষ্টিপাথর, যদ্দ্বারা তাদের দ্বীনদারী ও তাকওয়া পরীক্ষা করা হয়। এজন্যেই বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী তার গুণ-কীর্তন করে, সফরে গেলে সফরসঙ্গী তার প্রশংসা করে এবং বাজারে লেনদেনকারীরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তাকে ভাল বলে, তখন সে ব্যক্তির সাধুতায় কোন সন্দেহ করা উচিত নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ীদের জন্যে জরুরী দিকনির্দেশনা

ব্যবসায়ীর উচিত ধর্মের ভয় রাখা অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজে ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা; জীবিকার ধান্ধায় পড়ে পরকাল থেকে গাফেল হয়ে জীবন বরবাদ করা উচিত নয়। পরকালের লোকসান জাগতিক মুনাফা দ্বারা পূরণ হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত পুঁজি বাঁচিয়ে রাখা। মানুষের পুঁজি হচ্ছে তার ধর্ম। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁর ওসিয়তে বলেন, দুনিয়াতে তোমার কোন অংশ জরুরী, কিন্তু তোমার আখেরাতের অংশের প্রয়োজন অধিক। অতএব এখান থেকেই শুরু কর এবং প্রথমে আখেরাতের অংশ গ্রহণ কর। দুনিয়ার অংশ এমনিতেই আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে তুমি তোমার আখেরাতের অংশ ভুলে যেয়ো না। দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পুণ্য এখান থেকেই অর্জিত হয়।

জানা উচিত, ধর্মের প্রতি ব্যবসায়ীর খেয়াল সাতটি বিষয় দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম, ব্যবসায়ের শুরুতে নিয়ত ও বিশ্বাস সঠিক রাখতে হবে। এই নিয়তে ব্যবসা করবে যে, জীবিকার জন্যে সওয়াল করতে না হয় এবং অপরের মুখাপেক্ষী না হতে হয়; বরং হালাল উপার্জনলব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা ধর্মকর্মে সাহায্য নেয়া এবং পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা লক্ষ্য হতে হবে। এভাবে ব্যবসায়ী ব্যক্তি অর্থ দ্বারা জেহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সকল মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষার নিয়ত করবে এবং অপরের জন্যে তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। লেনদেনে ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের পন্থা অনুসরণের নিয়ত করবে, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আরও নিয়ত করবে যে, বাজারে ভালমন্দ যা দেখবে, তাতে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কিত নীতি পালনে কোনরূপ ত্রুটি করবে না। অন্তরে এসব নিয়ত ও আকীদা পোষণ করলে ব্যবসায়ী আখেরাতের একজন পথিক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কিছু ধনসম্পদ পাওয়া গেলে তা হবে মুনাফা। আর যদি দুনিয়ার কিছু লোকসান হয়, তবে আখেরাতে ফায়দা লাভ করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয়, ফরযে কেফায়া পালন করার উদ্দেশে ব্যবসায়ে অথবা শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করবে। কেননা, শিল্পকর্ম অথবা ব্যবসা সম্পূর্ণ বর্জিত হলে জীবিকার কারখানা অচল হয়ে পড়বে এবং অধিকাংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, সকলের ব্যবস্থাপনাই সকলের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতায় সম্পন্ন হচ্ছে। এক এক দল মানুষ এক এক কাজের যিম্মাদার। যদি সকল মানুষ একই শিল্পকর্ম করতে শুরু করে এবং অন্য সকল শিল্প বর্জিত হয়, তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। "আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমত"– কেউ কেউ এই হাদীসকে এই অর্থে নিয়েছেন যে, মতবিরোধের উদ্দেশ্য এখানে আলাদা আলাদা শিল্পকর্ম ও পেশা। শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে কিছু অত্যন্ত উপকারী এবং কিছু অনাবশ্যক। কারণ, এগুলো দ্বারা পরিণামে আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা ও জাগতিক সাজসজ্জা হয়ে থাকে। অতএব এমন শিল্পকর্ম অবলম্বন করা উচিত, যাদ্বারা মুসলমানদের উপকার হয় এবং যা ধর্ম-কর্মে আবশ্যক। পক্ষান্তরে বাহ্যিক সাজ-সজ্জায় শিল্প থেকে দূরে থাকতে হবে; যেমন কারুকার্য করা, স্বর্ণের কাজ করা, চুনার আস্তর করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজকে ধর্মপরায়ণতা মাকরূহ মনে করে। ক্রীড়া-কৌতুকের সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা হারাম। এগুলো নির্মাণ থেকে বেঁচে থাকা জুলুম পরিহারের মধ্যে শামিল। এমনিভাবে পুরুষের জন্যে রেশমী জামা সেলাই করা এবং পুরুষের সোনার আংটি গড়া পাপ, এ মজুরি হারাম।

তৃতীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে দুনিয়ার বাজার যেন ব্যবসায়ীকে আখেরাতের বাজার থেকে বিমুখ না করে। আল্লাহর মসজিদসমূহ হচ্ছে আখেরাতের বাজার। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেনঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন কোন গৃহকে উঁচু করার এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ করেছেন। সেখানে এমন লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর যিকির, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান থেকে গাফেল করে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব বাজারের সময় হওয়া পর্যন্ত দিনের প্রথম অংশকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে; অর্থাৎ, তখন মসজিদে বসে ওযিফা ইত্যাদি পাঠ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসায়ীদেরকে বলতেন ঃ দিনের শুরুকে আখেরাতের জন্যে নির্ধারিত কর এবং এর পরবর্তী সময়কে দুনিয়ার জন্যে রেখে দাও। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাই করতেন। এক হাদীসে আছে, রাত ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসরের সময় আল্লাহ তাআলার দরবারে সমবেত হয়। তখন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলে ঃ আমরা তাদেরকে নামায পড়ার অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও নামায পড়া অবস্থায় পেয়েছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি– আমি তাদেরকে ক্ষমা করলাম। এর পর ব্যবসায়ী যখন দিনের মধ্যভাগে যোহর কিংবা আসরের আযান শুনবে, তখন অন্য কোন কাজের আগ্রহ না করে সোজা মসজিদের দিকে রওয়ানা হবে। তখন কোন কাজ থাকলে তা পরিত্যাগ করবে। কেননা, জামাতে ইমামের সাথে প্রথম তকবীর না পাওয়া এতবড় ক্ষতি, যা পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু দিয়ে পূরণ করা যাবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নিয়ম ছিল, তাঁরা আযান হওয়ার সাথে সাথে দোকানে বালক ও যিম্মীদেরকে রেখে মসজিদে চলে যেতেন। তাঁরা নামাযের সময় দোকানের হেফাযত করার জন্যে এই বালক ও যিম্মীদেরকে কিছু মজুরি দিতেন। এভাবেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত।

চতুর্থ, এতটুকুতেই ক্ষান্ত হবে না; বরং বাজারে থাকার সময় সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করবে এবং তসবীহে মশগুল থাকবে। কেননা, বাজারে গাফেলদের মধ্য আল্লাহর স্মরণে অনেক ফযীলত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ গাফেলদের ভেতরে থেকে আল্লাহর যিকিরকারী এমন, যেমন পলাতকদের মধ্যে জেহাদকারী অথবা মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে আছে, শুষ্ক ঘাসের মধ্যে সবুজ সতেজ বৃক্ষ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে এসে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে, তার জন্যে লক্ষ পুণ্যের সওয়াব লেখা হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তাঁর শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি চিরজীবী- অমর। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

হযরত ইবনে ওমর, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে ও অন্য কয়েকজন মনীষী কেবল এই দোয়ার ফযীলত হাসিল করার জন্যে বাজারে যেতেন।

পঞ্চম, বাজার ও ব্যবসায়ের প্রতি এত মোহ পোষণ না করবে যাতে সবার আগে বাজারে যেতে হয় এবং সময় শেষে ফিরতে হয়। অথবা ব্যবসায়ের খাতিরে সমুদ্রে সফর করবে না, এটা মাকরূহ। বলা হয়, যে ব্যক্তি সমুদ্রের সফর করে সে রিযিক অন্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যায়। এক হাদীসে আছে, তিন কাজ- হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ ছাড়া অন্য কাজের জন্যে সামুদ্রিক সফর করবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ বলতেন ঃ বাজারে প্রথমে প্রবেশ করো না এবং শেষে বের হয়ো না। কারণ, এরূপ করলে শয়তান ডিম-বাচ্চা দেয়। এক হাদীসে আছে- সর্বনিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাজার এবং বাজারীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যে সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে এবং সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। এই নিবৃত্তি তখন পূর্ণাঙ্গ হবে, যখন মানুষ জীবিকার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়। যে পরিমাণ অর্জিত হয়ে গেলে সে বাজার থেকে চলে আসবে এবং আখেরাতের ব্যবসায়ে মশগুল হবে। পূর্ববর্তী মনীষীদের নিয়ম এমনি ছিল। তাঁদের কেউ কেউ তিন পয়সা পেয়ে গেলেই বাজার থেকে চলে আসতেন এবং এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। হাম্মাদ ইবনে সালমা রেশমী বস্ত্রের ঝোলা বিক্রয়ের জন্যে সামনে রেখে দিতেন। প্রায় ছয় আনা অর্জিত হয়ে গেলে তিনি ঝোলা তুলে নিয়ে বাড়ী চলে আসতেন।

ষষ্ঠ, কেবল হারাম থেকে আত্মরক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকবে না; বরং সন্দেহের স্থান, সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকেও বেঁচে থাকবে। এ ব্যাপারে ফতোয়া কি বলে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাইবে। মনে কোন রকম খট্‌কা অনুভব করলে তা থেকে বেঁচে থাকবে। কোন সন্দেহযুক্ত বস্তু সামনে এলে তার অবস্থা লোকের কাছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। অন্যথায় সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়া হবে। একবার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে দুধ উপস্থিত করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুধ কোথায় পেলে? লোকটি আরজ করল ঃ ছাগলের স্তন থেকে লাভ করেছি। তিনি বললেন ঃ ছাগল কোত্থেকে এল? লোকটি বলল ঃ অমুক জায়গা থেকে। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধ পান করলেন এবং বললেন ঃ আমাদের পয়গম্বর সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, উৎকৃষ্ট মাল ছাড়া খেতে পারব না এবং সৎকাজ ছাড়া কিছু করতে পারব না। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকেও তাই নির্দেশ করেছেন, যা পয়গম্বরগণকে করেছেন। সেমতে বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাবে।

আর রসূলগণকে বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ـ

অর্থাৎ, হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু থেকে খান এবং সৎকর্ম সম্পাদন করুন।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই দুধের মূল এবং মূলের মূল পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছেন। এর বেশী জিজ্ঞেস করেননি। কেননা, এর বেশীতে জটিলতা রয়েছে। আমরা সত্বরই হালাল ও হারাম অধ্যায়ে লেখব যে, এই প্রশ্ন করা কোথায় ওয়াজিব হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর খেদমতে পেশকৃত প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে এই প্রশ্ন করতেন না। এতে বুঝা যায়, সর্বত্র এই প্রশ্ন করা জরুরী নয়। যার সাথে লেনদেন করবে সে জালেম, চোর, খেয়ানতকারী অথবা সুদখোর কিনা দেখে লেনদেন করবে। এরূপ হলে তার সাথে লেনদেন করবে না। কেননা, এরূপ ব্যক্তির সাথে লেনদেন করলে তার কুকর্মে সাহায্য করা হবে।

সারকথা, এখন যমানা খুব নাজুক। তাই ব্যবসায়ীর উচিত মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে নেয়া। এক ভাগের সাথে লেনদেন করবে এবং এক ভাগের সাথে করবে না। যাদের সাথে লেনদেন করবে, তারা তুলনামূলকভাবে কম হওয়া হওয়া উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এক ছিল সত্য যুগ। তখন মানুষ যদি বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করত, কার সাথে লেনদেন করব? তখন উত্তর পেত, যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন কর। এর পর এমন যুগ এল যখন উত্তরে বলা হত, যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন কর; কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অমুক অমুকের সাথে করো না। এর পর আর এক যুগ এল, যখন বলা হত, কারও সাথে লেনদেন করো না, কিন্তু অমুক অমুকের সাথে কর। এখন আমার ভয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে এমনও থাকবে না। বলাবাহুল্য, এই বুযুর্গ যা আশংকা করতেন, এখন তা বিদ্যমান রয়েছে।

সপ্তম, প্রত্যেক লেনদেনকারীর সাথে নিজের যাবতীয় অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কেননা, কেয়ামতের দিন যাবতীয় কথা ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হয়, কেয়ামতে ব্যবসায়ীকে এমন সবার সাথে দাঁড় করানো হবে, যাদের সাথে সে লেনদেন করেছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক ব্যবসায়ীকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? সে বলল ঃ আমার সামনে পঞ্চাশ হাজার আমলনামা খুলে দিয়েছেন। আমি আরজ করলাম, এই সবগুলো গুনাহ্? এরশাদ হল– এগুলো তোমার লেনদেন। যাদের সাথে লেনদেন করেছ তাদের প্রত্যেকের আমলনামা আলাদা আলাদা এবং এতে আদ্যোপান্ত তোমার ও তাদের লেনদেন লিখিত রয়েছে। এ পর্যন্ত ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের বিষয় বর্ণিত হল। সুতরাং যে ব্যবসায়ী কেবল ন্যায়বিচার করে ক্ষান্ত থাকবে, সে সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যে ন্যায়বিচারের সাথে অনুগ্রহও প্রদর্শন করবে, সে নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কেউ এই উভয়টির সাথে ধর্মীয় ওযিফাসমূহ– যা পাঁচটি পরিচ্ছেদে লিখিত হয়েছে, পালন করে যায়, তবে সে সিদ্দীকগণের মধ্যে গণ্য হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বাদশ অধ্যায়

হালাল ও হারাম

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

طلب الحلال فريضة على كل مسلم অর্থাৎ, হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, কিন্তু এ ফরযটি বুঝা অন্যান্য ফরযের তুলনায় বিবেকের জন্যে যেমন কঠিন, তেমনি এটা পালন করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অত্যন্ত কঠিন। ফলে এ ফরযের জ্ঞান ও আমল উভয়টিই অধিকাংশ লোক প্রায় ভুলতে বসেছে। এ জ্ঞান সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে আমল আরও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, মূর্খেরা মনে করে নিয়েছে, হালাল দুনিয়া থেকে পুরাপুরি বিদায় নিয়েছে এবং হালাল পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন পবিত্র বলতে নদীর পানি এবং কারও মালিকানাধীন নয় এমন যমীনের উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ দু'টি ছাড়া আর যত মাল আছে, তাতে লেনদেনের অনিয়মের কারণে কলুষতা এসে গেছে। যেহেতু পানি ও ঘাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কঠিন, তাই হারামের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মূর্খেরা দ্বীনের এ ফরযটি পেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং মাল ও ধন-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কাজটি বর্জন করে বসেছে। অথচ বাস্তব অবস্থা এরূপ নয়। যা হালাল তা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট, হারামও প্রকাশ্য এবং আলাদা। এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ। তবে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে মিলিত থাকে। যেহেতু এই সর্বশেষ বেদআতের ক্ষতি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক হয়ে পড়েছে এবং এটা দাবানলের মত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এটা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো নেহায়েত জরুরী এবং হালাল হারাম ও সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নিম্নে আমরা সাতটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়বস্তু বর্ণনা করব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

হালালের ফযীলত ও হারামের নিন্দা

এ সম্পর্কে কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا অর্থাৎ, তোমরা খাও পবিত্র বস্তু এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। এ আয়াতে আমল করার পূর্বে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে পবিত্র বস্তু বলে হালাল সামগ্রী বুঝানো হয়েছে।

لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। এখানে অন্যায়ভাবে খাওয়া অর্থে হারাম ভক্ষণ বোঝানো হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ـ

অর্থাৎ, যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভরে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়ে যাও।

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা পাবে তোমাদের মূলধন।

مَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ অর্থাৎ, যে আবার সুদ নেবে সেই হবে দোযখী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথমে সুদ খাওয়া আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শামিল এবং পরিণামে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে। হালাল ও হারাম সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এখন এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত ইবনে মসঊদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হালাল অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কোন কোন আলেমের মতে এখানে জ্ঞানের অর্থ হালাল ও হারামের জ্ঞান এবং উভয় হাদীসের উদ্দেশ্যই এক। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে হালাল সামগ্রী উপার্জন করে খাওয়ায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার পথে জেহাদ করে। আর যে সাধুতা সহকারে হালাল অর্জন করে, সে শহীদগণের স্তরে থাকবে। আরও বলা হয়েছে ঃ

من اكل الحلال اربعين يوما نور الله قلبه واجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه -

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন হালাল খাদ্য আহার করে, আল্লাহ তার অন্তর আলোকিত করেন এবং তার অন্তর থেকে প্রজ্ঞার ঝরণা তার মুখে প্রবাহিত করেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্যে দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেন। তিনি বললেন ঃ اطيب طعمتك تستجب دعوتك অর্থাৎ, তোমার খাদ্য পবিত্র ও হালাল কর, তা হলেই তোমার দোয়া কবুল হবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার দুনিয়ালোভীদের আলোচনা করার পর বললেন ঃ অনেক বিক্ষিপ্ত মলিন মুখ ও ধূলি ধূসরিত ব্যক্তি রয়েছে, যাদের পানাহার হারাম, উপার্জন হারাম এবং হারাম দ্বারা লালিত পালিত, তারা হাত তুলে বলে ঃ হে পালনকর্তা, হে পালনকর্তা! তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার এক ফেরেশতা প্রত্যেক রাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে ঘোষণা করে– যে ব্যক্তি হারাম খায়, তার ফরয, নফল কিছুই কবুল হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি কাপড় দশ দেরহাম দিয়ে ক্রয় করে এবং তার ভেতরে এক দেরহাম হারাম থাকে, তার দেহে যে পর্যন্ত সে কাপড় থাকবে আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করবেন না। আরও বলেন ঃ হারাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে উৎপন্ন মাংসের জন্যে দোযখই অধিক উপযুক্ত। আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করে, তার পরওয়া করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে কোন্ পথ দিয়ে জাহান্নামে ঢোকাবেন, তারও পরওয়া করবেন না। আরও বলা হয়েছে–

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করতে করতে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে যায়, তার রাত এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং ভোরে যখন সে উঠবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি গোনাহের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করে তা খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার যাবতীয় ব্যয়কে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এক হাদীসে আছে– সুদের এক দেরহাম আল্লাহ তাআলার কাছে মুসলমান অবস্থায় ত্রিশটি যিনার চেয়ে গুরুতর। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে– পাকস্থলী দেহের চৌবাচ্চা। শিরা-উপশিরা তৃষ্ণার্ত হলে এই চৌবাচ্চার দিকে যায়। পাকস্থলী সুস্থ হলে শিরাগুলোও সুস্থতা সহকারে পানি পান করে ফিরে আসে। আর পাকস্থলী অসুস্থ হলে শিরাসমূহ অসুস্থ হয়ে ফিরে। দ্বীনদারীর জন্যে খাদ্য যেমন, ইমারতের জন্যে ভিত্তি তেমনি। ভিত্তি মজবুত ও সোজা স্থাপিত হলে ইমারত সোজা ও উঁচু হবে। পক্ষান্তরে ভিত্তি বাঁকা এবং দুর্বল হলে ইমারত ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের উক্তি রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার নিজের গোলামের উপার্জিত দুধ পান করেছিলেন। এর পর গোলামকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এক সম্প্রদায়ের জন্যে ভবিষ্যত গণনা করেছিলাম, তারা আমাকে এই দুধ দিয়েছিল। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) গলায় অঙ্গুলি ঢুকিয়ে বমি করতে শুরু করলেন। এমন কি গোলামের ধারণা হল তাঁর দম বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ইলাহী, আমি সেই দুধের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, যা আমার শিরা উপশিরায় মিশে গেছে। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার যাকাতের উটের দুধ পান করে ফেলেন। পরে জানতে পেরে গলায় অঙ্গুলি ঢুকিয়ে বমি করে দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ এবাদত থেকে গাফেল, যার নাম হারাম থেকে বেঁচে থাকা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যদি তোমরা নামায পড়তে পড়তে ধনুকের মত বাঁকা এবং রোযা রাখতে রাখতে লাকড়ির মত কৃশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে যাও, তবুও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এসব আমল কবুল করবেন না, যে পর্যন্ত হারাম থেকে বেঁচে না থাক। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ যে যা পেয়েছে তা এভাবেই পেয়েছে যে, পেটে যা ফেলেছে ভেবে চিন্তে ফেলেছে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আহার্য বুঝে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার নাম সিদ্দীকগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেন। অতএব হে মিসকীন, যখন তুমি রোযার ইফতার কর, তখন দেখে নাও কার কাছে ইফতার করছ। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি যমযমের পানি পান করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার নিজের বালতি থাকলে পান করতাম। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে হারাম মাল ব্যয় করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে নিজের বস্ত্র পেশাব দ্বারা পবিত্র করে। অথচ পাক পানি ছাড়া বস্ত্র পাক হয় না। তেমনি হালাল মাল ছাড়া অন্য কিছু গোনাহ দূর করে না। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে, তার অন্তর কাল হয়ে যায়। কোরআনের আয়াত– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ এর অর্থও তাই। একবার ফোযায়ল ইবনে আয়ায, ইবনে ওয়ায়না ও ইবনে মোবারক (রহঃ) মক্কা মোয়াযযমায় ওহায়ব ইবনে ওবায়েদ (রহঃ)-এর কাছে সমবেত হন এবং খোরমার কথা আলোচনা করেন। ওহায়ব বললেন ঃ খোরমা আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি তা খাই না। কেননা, মক্কার খেজুর বাগানগুলি যুবায়দা প্রমুখের বাগানের সাথে মিশে গেছে। একথা শুনে ইবনে মোবারক বললেন ঃ যদি আপনি এত চুলচেরা দেখেন, তবে রুটি খাওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। ওহায়ব কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ গম উৎপাদনের ভূখন্ড আশেপাশের ভূখন্ডের সাথে মিশে গেছে। একথা শুনতেই ওহায়ব বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। সুফিয়ান সওরী ইবনে মোবারককে বললেন ঃ তুমি এ লোকটিকে মেরে ফেলেছ। তিনি বললেন ঃ আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেন এই চুলচেরা বিশ্লেষণ ছেড়ে দেন। ওহায়বের জ্ঞান ফিরে এলে তিনি সারাজীবন রুটি খাবেন না বলে কসম খেলেন। এর পর তিনি ক্ষুধা লাগলে দুধ পান করে নিতেন। একবার তাঁর জননী দুধ আনলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুধ কোথাকার? মা বললেন ঃ অমুক ব্যক্তির ছাগলের দুধ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছাগলটি তার কাছে কোত্থেকে এল এবং মূল্য কোথা থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিল? মা এসব কথা বলে দেয়ার পর তিনি দুধের পাত্রটি মুখের কাছে নিলেন, কিন্তু বললেন ঃ আরেকটি কথা রয়ে গেছে। এই বকরী কোথায় ঘাস খেত? মা চুপ হয়ে গেলেন। তিনিও দুধ পান করলেন না। কারণ ছাগলটি এমন জায়গায় ঘাস খেত, যেখানে মুসলমানদের কিছু হক ছিল। স্নেহময়ী জননী বললেন ঃ পান করে নাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাইব– এটা আমার কাছে ভাল মনে হয় না। অর্থাৎ, পান করলে তাঁর নাফরমানী যেখানে নিশ্চিত, সেখানে ইচ্ছা করে নাফরমানী করার পর ক্ষমা চাওয়া ঠিক নয়। মোট কথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সন্দিগ্ধ বস্তু থেকে এভাবেই গা বাঁচিয়ে চলতেন।

হালাল ও হারামের প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, হালাল ও হারামের বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। সত্যান্বেষী ব্যক্তি যদি তার খাদ্য তালিকা ফতোয়ার দৃষ্টিতে হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী করে এবং এ ছাড়া অন্য কিছু না খায়, তবে তার জন্যে এই দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন পন্থায় খাদ্য সংগ্রহ করে, তার হালাল-হারাম বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। এই বিশদ বিবরণ আমি ফেকাহ গ্রন্থের সাহায্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে সংক্ষেপে হালাল সম্পদ অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করব।

সম্পদ দু'প্রকার– সত্তাগত হারাম অথবা অর্জনে ত্রুটির কারণে হারাম। প্রথম প্রকার যেমন মদ, শূকর ইত্যাদি। এর বিবরণ হচ্ছে, পৃথিবীতে খাদ্য জাতীয় বস্তু তিন প্রকার ঃ (১) খনিজ পদার্থ, যেমন, লবণ, মাটি ইত্যাদি, (২) উদ্ভিদ জাতীয় এবং (৩) প্রাণী জাতীয়। খনি থেকে নির্গত বস্তুসমূহ ক্ষতিকর বিধায় হারাম। কোন কোন বস্তু বিষতুল্য। রুটি খাওয়া ক্ষতিকর হলে তা-ও হারাম হত। মাটি খাওয়াও ক্ষতির কারণেই হারাম। এ থেকে বুঝা গেল, খনিজ পদার্থের কোন অংশ শুরবা অথবা কোন তরল খাদ্যে পড়ে গেলে খাদ্য হারাম হবে না। উদ্ভিদের মধ্যে যেসব বস্তু বুদ্ধি নাশ করে; যেমন– ভাং, গাঁজা ইত্যাদি, অথবা জীবননাশ করে; যেমন– বিষবৃক্ষ অথবা স্বাস্থ্য বিনাশ করে, সেগুলো হারাম। মোট কথা, শরাব ও মাদক দ্রব্য ছাড়া অন্যগুলো কোন না কোন কারণে হারাম হয়, কিন্তু মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা নয়। মাদক দ্রব্যের অল্প খেলেও হারাম, তাতে নেশা হোক বা না হোক। এর এক কারণ সত্তাগত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাপাকী এবং অন্য কারণ গুণগত অর্থাৎ. মাদকতা সৃষ্টিকারী উগ্রতা। বিষাক্ত বস্তু থেকে যদি ক্ষতির গুণ দূর হয়ে যায়– পরিমাণ হ্রাস করার কারণে অথবা অন্য বস্তু মিশ্রিত করার কারণে, তবে তা হারাম হবে না।

প্রাণী দু'প্রকার– খাদ্য ও অখাদ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর খাদ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত রয়েছে। যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সেগুলোও শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ্ করা শর্ত। শিকার ও যবেহ্ অধ্যায়ে এসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেসব প্রাণী শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ্ করা হয় না অথবা মরে যায়, সেগুলো হারাম। তবে টিড্ডি ও মাছ হালাল। স্বভাবগত অপছন্দের কারণে মাছি, বিচ্ছু ইত্যাদি রক্তহীন প্রাণী মাকরূহ। মরার কারণে এগুলো নাপাক হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করেছেন, মাছি খাদ্যে পড়ে গেলে তা পুরোপুরি ডুবিয়ে ফেলে দাও। খাদ্য কোন সময় গরম থাকে, ফলে মাছি পড়ার সাথে সাথে মরে যায়। যদি কোন পিঁপড়া অথবা মাছি ব্যঞ্জনের পাত্রে রান্না হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে পাত্রের সমস্ত ব্যঞ্জন ফেলে দেয়া জরুরী নয়।

যেসব প্রাণী খাওয়া হয়, শরীয়ত মত যবেহ্ করলেও সেগুলোর সকল অঙ্গ খাওয়া হালাল হয় না; বরং রক্ত, মল এবং যা যা নাপাক সব হারাম। দ্বিতীয়তঃ যে সম্পদ অর্জনে ত্রুটির কারণে হারাম হয় তার বর্ণনা সুবিস্তৃত। এ ধরনের সম্পদকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম, মালিকবিহীন মাল। যেমন– খনি থেকে কিছু বের করা, পতিত জমি আবাদ করা, অন্যের মালিকানায় শিকার করা, জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, নদীর পানি নেয়া। এসব সামগ্রীতে কারও মালিকানার সম্পর্ক না থাকলে এগুলো হালাল এবং যে এগুলো সংগ্রহ করবে, সে মালিক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়, যে বস্তু এমন লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তি নেয়া হয়, যাদের কাছ থেকে নেয়াতে বাধা নেই। যেমন, যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমত সামগ্রী, অথবা যুদ্ধ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালে ফায়। এই মাল তখনও হালাল হয়, যখন এ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে হকদারদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বণ্টন করা হয়।

তৃতীয়, যে বস্তু এমন লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তি নেয়া হয়, যারা ওয়াজিব প্রাপ্য আদায় করে না এবং সম্মতি ছাড়াই নেয়ার যোগ্য হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায়। এই সব বস্তুও কয়েকটি শর্তে হালাল; যখন হকদার হওয়ার কারণ পূর্ণ হয়, যখন ওয়াজিব পরিমাণেই নেয়া হয়, যখন বিচারক, বাদশাহ অথবা হকদার নেয়। এসব শর্ত পূর্ণ হলে যেসব বস্তু নেয়া হবে, তা হালাল।

চতুর্থ, যে মাল বিনিময়ের আকারে মালিকের সম্মতিক্রমে নেয়া হয়। এটা তখন হালাল হয়, যখন উভয় বিনিময়ের শর্তাবলী, ক্রেতা বিক্রেতা এবং প্রস্তাব ও গ্রহণের শর্তাবলী ঠিকভাবে পালন করা হয় এবং অন্যায় শর্তসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। এসব শর্ত ফেকাহর কিতাবুল বুয়ুতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম, যে মাল মালিকের সম্মতিক্রমে বিনিময় ছাড়াই নেয়া হয়। এটা তখন হালাল হয়, যখন মাল, দাতা গ্রহীতা ও দানের শর্ত পূর্ণ করা হয় এবং কোন ওয়ারিসের ক্ষতি না হয়। হেবা, ওসিয়ত ও সদকা অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

ষষ্ঠ, যে মাল ইচ্ছা ছাড়াই মানুষ প্রাপ্ত হয়; যেমন, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি। এটা তখন হালাল হয়, যখন মৃত ব্যক্তি হালাল উপায়ে সেই সম্পত্তি অর্জন করে। এছাড়া ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কর্জ ও ওসিয়ত আদায় হয়ে যায়, ওয়ারিসদের অংশ ন্যায়ভাবে বণ্টন হয় এবং যাকাত, হজ্জ, কাফফারা ইত্যাদি ওয়াজিব হক আদায় হয়। ফেকাহর কিতাবুল ওসায়া ও কিতাবুল ফরায়েযে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মোট কথা, আমরা আমদানীর সবগুলো উপায়ের দিকে সংক্ষেপে ইশারা করলাম যাতে সত্যান্বেষী ব্যক্তি বুঝে নেয় যে, তার আমদানী বিভিন্ন উপায়ে হলে এসব বিষয় তাকে জেনে নিতে হবে। সে প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। জিজ্ঞাসা না করে কিছু করবে না। কেননা, কেয়ামতের দিন যেমন আলেমকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি তোমার এলমের খেলাফ কেন করলে, তেমনি মূর্খকেও বলা হবে, তুমি তোমার মূর্খতা আঁকড়ে রইলে কেন, শিখে নিলে না কেন? তুমি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই এরশাদ জানতে না যে, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয!

হালাল ও হারামের স্তরভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যা হারাম তাই ভ্রষ্ট, কিন্তু কতক হারামের মধ্যে ভ্রষ্টতা বেশী এবং কতক হারামের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অল্প। অনুরূপভাবে যা হালাল তাই পাক সাফ, কিন্তু কোন কোন হালাল অধিক পাক এবং কতক অল্প। উদাহরণতঃ ডাক্তার বলে ঃ সকল মিষ্টি গরম, কিন্তু কতক মিষ্টি অধিক গরম যেমন, চিনি এবং কতক কম গরম, যেমন গুড়। আমরা এখানে হারাম থেকে বাঁচার চারটি স্তর উল্লেখ করেছি।

প্রথম, আদেল ব্যক্তির ওয়ারা তথা পরহেযগারী। এটা সেই হারাম থেকে বেঁচে থাকার নাম, যাতে লিপ্ত হলে মানুষ ফাসেক হয়ে যায় এবং আদেল থাকে না। এটা জাহান্নামে দাখিল হওয়ার কারণ। এই পরহেযগারী তখন অর্জিত হয়, যখন ফেকাহবিদরা যাকে হারাম বলেন তা থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয়, সালেহীন তথা সৎকর্মপরায়ণদের পরহেযগারী। এটা সন্দেহযুক্ত হারাম থেকে আত্মরক্ষার নাম।

তৃতীয়, মুত্তাকী তথা খোদাভীরুদের পরহেযগারী। এটা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম, যা ফতোয়াদৃষ্টে হারাম নয় এবং হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কিন্তু হারামের দিকে পৌঁছে দেয়ার আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ,, যেসব বিষয়ে কোন ভয় নেই, সেগুলো ভয়ের বিষয়সমূহের কারণে বর্জন করা। হাদীসে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لاباس به مخافة مما به باس -

অর্থাৎ, বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত সে দোষমুক্ত বিষয়ের ভয়ে দোষহীন বিষয় বর্জন না করে।

চতুর্থ, সিদ্দীকগণের পরহেযগারী। এটা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম, যা দোষমুক্ত নয় এবং তদ্দ্বারা দোষমুক্ত বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ারও আশংকা নেই, কিন্তু একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয় না অথবা যাতে তাঁর এবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়ত থাকে না। সিদ্দীকগণ এরূপ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতেন।

বর্ণিত প্রথম স্তরের হারামেরও কয়েকটি স্তর আছে। উদাহরণতঃ ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কারও মাল নেয়া তেমন হারাম নয়; যেমন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হারাম কারও কাছ থেকে মাল ছিনিয়ে নেয়া। বরং ছিনিয়ে নেয়া মাল অধিক হারাম। এই পার্থক্য এভাবে জানা যায়, শরীয়ত যে সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে কঠোরতা, শাস্তিবাণী উচ্চারণ ও তাকিদ বেশী করেছে, সেগুলো অবলম্বন করা অধিক গোনাহ এবং যেখানে কঠোরতা কম, সেখানে গোনাহ কম। তওবা অধ্যায়ে সগীরা ও কবীরা গোনাহের পার্থক্য প্রসঙ্গে বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন বস্তু কোন ফকীর, সাধু অথবা এতীমের কাছ থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা কোন সবল, ধনী অথবা ফাসেকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার তুলনায় অধিক ভ্রষ্টতাপূর্ণ। সুতরাং বিষয় থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটিও স্মর্তব্য, যদি গোনাহগারদের বিভিন্ন স্তর না থাকত তবে দোযখের স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হত না।

দ্বিতীয় স্তরের হারামের উদাহরণ হচ্ছে সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। তবে কোন কোন সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব। এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা মাকরূহ। এ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াসওয়াসা তথা শংকাশীলদের পরহেযগারী। যেমন– কোন ব্যক্তি এই আশংকায় শিকার করে না যে, সম্ভবতঃ শিকারটি কোন মানুষের হাত থেকে ছুটে চলে এসেছে। কাজেই শিকার করলে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে। এ ধরনের সাবধানতার নাম ওয়াসওয়াসা। সন্দিগ্ধ বিষয়ের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

তৃতীয় স্তরের পরহেযগারীর প্রমাণ হচ্ছে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এই উক্তি–

لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لاباس به مخافة مما به باس ـ

অর্থাৎ, বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছবে না যে পর্যন্ত দোষযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় দোষমুক্ত বিষয় বর্জন না করে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা হালালের নবম দশম অংশ বর্জন করতাম এই আশংকায় যে, কোথাও হারামে লিপ্ত না হয়ে পড়ি। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ হওয়ার উপায় হল বিন্দু পরিমাণ বিষয়েও তাকওয়া অবলম্বন করা। এমন কি, হালাল মনে করা হয়– এমন কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন বিষয়কেও হারাম হওয়ার ভয়ে বর্জন করা। এই বর্জন তাকওয়াকারী ও দোযখের আগুনের মাঝে আড়াল হয়ে যাবে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ এক ব্যক্তির কাছে একশ' দেরহাম পাওনা ছিলেন। লোকটি তা নিয়ে এলে তিনি নিরানব্বই দেরহাম গ্রহণ করলেন। কোথাও বেশী হয়ে যায়- এই আশংকায় তিনি সম্পূর্ণ দেরহাম নিলেন না। জনৈক ব্যবসায়ী বুযুর্গ যখন অন্যের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য নিতেন, তখন একরতি কম নিতেন এবং যখন অপরকে দিতেন, তখন বেশী দিতেন। যেসব বিষয়কে মানুষ সাধারণতঃ কিছু মনে করে না এবং চোখ বন্ধ করে রাখে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকাও এ পর্যায়ের পরহেযগারী। যদিও ফতোয়ার দৃষ্টিতে এগুলো হালাল, কিন্তু একবার দরজা খুলে গেলে মানুষ অন্য গুরুতর কাজও নির্দ্বিধায় করে নিতে পারে। এমনি এক ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ) বলেন ঃ আমি একটি ভাড়ার ঘরে বসবাস করতাম। একবার একটি চিঠি লেখে দেয়ালের মাটি দিয়ে চিঠিটি শুকাতে চাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, দেয়াল আমার মালিকানাধীন নয়, কিন্তু আমার মন (নফস) বলে উঠল ঃ এটুকু মাটির অস্তিত্বই কি! সেমতে আমি মাটি নিয়ে কাজ সেরে নিলাম। এর পর ঘুমালে স্বপ্ন দেখলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলছে ঃ মিয়া সাহেব, যে বলে এতটুকু মাটির হাকিকত কি? তার অবস্থা আগামীকল্য জানতে পারবে। এর অর্থ সম্ভবতঃ কেয়ামতে এরূপ ব্যক্তি মুত্তাকীদের মর্তবা পাবে না। এই অর্থ নয় যে, এ কাজের জন্যে কোন আযাব ভোগ করতে হবে। এ ধরনের আর একটি বর্ণনা- খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে বাহরাইন থেকে মেশক এলে তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, কোন মহিলা এই মেশ্‌ক মেপে এর পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করলে ভাল হত। তাঁর স্ত্রী আতেকা বললেন ঃ আমি মাপতে পারি। হযরত ওমর কোন জওয়াব না দিয়ে আবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। আতেকা আবার বললেন ঃ আমি মাপতে পারি। হযরত ওমর বললেন ঃ আমি চাই না, তুমি মাপার পর নিক্তির ধূলিকণা নিজের ঘাড়ে মেখে নাও । যার ফলে অন্য মুসলমানদের তুলনায় এই মেশ্‌ক দ্বারা আমি অধিক লাভবান হই। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ)-এর সামনে মুসলমানদের জন্যে মেশ্‌ক মাপা হচ্ছিল। তিনি নিজের নাক বন্ধ করে নিলেন, যাতে সুগন্ধি প্রবেশ না করে। লোকেরা এই অবান্তর কাজের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঃ মেশ্‌কের উপকারিতা তো সুগন্ধিই। আমি অন্যের চেয়ে বেশী উপকার লাভ করব কেন? শৈশবে হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) যাকাতের খোরমা থেকে একটি খোরমা হাতে তুলে নিলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ, রেখে দাও।

চতুর্থ স্তরের পরহেযগারী হচ্ছে সিদ্দীকগণের পরহেযগারী । তাঁদের মতে যে বস্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নয় তাই হারাম। তাঁরা এই আয়াত অনুযায়ী আমল করেন–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

অর্থাৎ, আপনি বলুন আল্লাহ। এর পর তাদেরকে তাদের বাজে কথা নিয়ে খেলা করতে দিন।

সিদ্দীক তারা, যারা আল্লাহ্‌কে এক বলে এবং কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে একান্ত ভাবে তাঁরই জন্য নিবেদিত থাকে। তাঁরা গোনাহের কাজ করেন না; পরন্তু এমন কাজও করেন না, যার মূলে কোন গোনাহ মিলিত থাকে । সেমতে হযরত বিশরে হাফী (রহঃ) শাসকবর্গের খনন করা খালের পানি পান করতেন না। কেননা, খাল পানি প্রবাহিত হওয়ার এবং তাঁর কাছে পৌঁছার কারণ ছিল। যদিও পানি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু এতে এমন খাল দ্বারা উপকার লাভ করা হত, যা হারাম অর্থে খনন করা হয়েছিল।

মোট কথা, পরহেযগারীর একটি হচ্ছে সূচনা । তা হল, ফতোয়া যাকে হারাম বলে তা থেকে বেঁচে থাকবে। একে বলা হয় আবেদদের পরহেযগারী । আর একটি হচ্ছে পরহেযগারীর শেষ প্রান্ত । অর্থাৎ, সিদ্দীকগণের পরহেযগারী তা এই যে, যেসব বস্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নয়; বরং খাহেশের তাড়নায় লাভ করা হয়েছে অথবা অপছন্দনীয় পন্থায় পাওয়া গেছে, অথবা যেসব মাকরূহ, সেসবগুলো থেকে বেঁচে থাকবে। এই দু'প্রান্তের মাঝখানে সাবধানতার অনেক স্তর রয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির ব্যাপারে যত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হওয়া থেকে দূরে থাকবে, আখেরাতের স্তর তেমনি বিভিন্ন হবে, যেমন দুনিয়াতে পরহেযগারীর স্তর বিভিন্ন হবে। হারাম মালের পার্থক্য অনুযায়ী জালেমদের জন্যে দোযখের স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের স্তর ও স্থানভেদ

রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ

الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع الحرام كالراعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه -

অর্থাৎ, হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ। অনেকেই এগুলো জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয় থকে বেঁচে থাকে, সে নিজের ইযযত ও ধর্ম পরিচ্ছন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হয়, সে হারামে লিপ্ত হয়; যেমন রাজকীয় শিকার ক্ষেত্রের আশেপাশে যে পশু চরানো হয় সেগুলো প্রায়ই তাতে ঢুকে পড়ে। এই হাদীসে তিন প্রকারেরই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী প্রকারটি কঠিন, যা অনেকেই জানে না। অর্থাৎ, সন্দিগ্ধ বিষয়। তাই এর বর্ণনা ও এর স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা আবশ্যক। কেননা, অধিকাংশ মানুষ যা জানে না, কম সংখ্যক মানুষ তা জানে। অতএব আমরা বলি, স্পষ্ট হালাল সেই বস্তু, যার সত্তা থেকে হারাম হওয়ার কারণাদি আলাদা থাকে এবং যাতে হারাম অথবা মাকরূহ হওয়ার কারণাদির কোন দখল থাকে না। এর দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সেই পানির মত, যা বর্ষিত হওয়ার সময় মানুষ নিজের জমি অথবা বৈধ জমিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে নেয়। পক্ষান্তরে নির্ভেজাল হারাম সেই বস্তু, যাতে হারামকারী কোন গুণ সন্দেহাতীতরূপে বিদ্যমান থাকে; যেমন শরাবের তীব্র মাদকতা গুণ এবং প্রস্রাবে নাপাকী গুণ অথবা যে বস্তু কোন অকাট্যরূপে নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়; যেমন জুলুম, সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। এই দুই প্রান্ত সুস্পষ্ট। এগুলোতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই উভয় প্রান্তে সেই বস্তুও অন্তর্ভুক্ত যা হালাল বলে জানা রয়েছে, কিন্তু অপরের হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে এই সম্ভাবনার পক্ষে ধরে নেয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও কল্পনা ছাড়া কোন কারণ নেই। যেমন, স্থল অথবা জলের শিকার হালাল, কিন্তু কেউ হরিণ শিকার করলে তাতে এই সম্ভাবনাও থাকে যে, এটি কেউ পূর্বে শিকার করেছিল এবং তার হাত থেকে ছুটে গেছে। অনুরূপভাবে কেউ মাছ ধরলে তাতে সম্ভাবনা থাকে যে, পূর্বে কেউ ধরেছিল এবং তার হাত থেকে পিছলে পানিতে পড়ে গেছে। যেহেতু এই সম্ভাবনার কোন কারণ নেই; তাই এ শিকারও স্পষ্ট হালালের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্ভাবনাকে ওয়াসওয়াসা তথা অমূলক সংশয় মনে করা উচিত। এ থেকে বেঁচে থাকাকে আমরা সংশয়বাদী তথা কল্পনাকারীদের পরহেযগারী বলব। এটা সন্দিগ্ধ বিষয়ের মধ্যে গণ্য। বরং সন্দিগ্ধ বিষয় তাই, যার হালাল হওয়া ও হারাম হওয়ার অবস্থা আমাদের উপর সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়; অর্থাৎ, দু'রকম বিশ্বাস দু'রকম কারণ থেকে উৎপন্ন হওয়া এবং একটিও অগ্রগণ্য না হওয়া। এখন জানা উচিত, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্র চারটি।

প্রথম ক্ষেত্র, উভয় সম্ভাবনা সমান থাকবে অথবা একটি প্রবল হবে। যদি উভয় সম্ভাবনা সমান থাকে, তবে যে বিধান পূর্বে জানা থাকবে, তাই বহাল থাকবে। সন্দেহের কারণে অন্য বিধান দেয়া হবে না। পূর্বের বিধান দেখে বর্তমানের উপর সেই বিধান বহাল রাখার এই প্রকারকে বলা হয় 'এস্তেসহাব।' পক্ষান্তরে যদি ধর্তব্য অর্থ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা প্রবল থাকে তবে প্রবল সম্ভাবনা অনুযায়ী বিধান হবে। এ বিষয়টি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ছাড়া স্পষ্ট হবে না। তাই আমরা একে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমতঃ হালাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ব থেকে জানা না থাকা। এর পর হালাল হওয়ার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। এরূপ সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি শিকার লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। শিকার আহত হয়ে পানিতে পড়ে গেল। এর পর শিকারটি মৃত পাওয়া গেল। এখানে জানা নেই যে, পানিতে ডুবে মরেছে, না তীরের আঘাতে মরেছে? অতএব এ শিকার খাওয়া হারাম। কেননা, এক বিশেষ পন্থায় মরা ছাড়া শিকারটি হারাম ছিল। এখন এই বিশেষ পন্থার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। সুতরাং মিশ্রিত বিধানটি সন্দেহের কারণে পরিত্যক্ত হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই পরিস্থিতিতেই আদী ইবনে হাতেমকে বলেছিলেন ঃ এই শিকার খেয়ো না। সম্ভবতঃ তোমার কুকুর ছাড়া অন্য কিছু একে হত্যা করেছে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছে যখন কোন বস্তু আসত এবং সেটি সদকা, না হাদিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ থাকত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।

বর্ণিত আছে, তিনি এক রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করলে জনৈক পত্নী কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি একটি খোরমা পেয়ে খেয়ে নিয়েছি। এখন এটি সদকা ছিল কিনা, সেই আশংকায় ঘুম হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার হল, হালাল হওয়া পূর্ব থেকে জানা। এখন হারাম হওয়ার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে হালালের বিধানই বহাল থাকবে। উদাহারণতঃ দু'জন পুরুষ দু'জন মহিলাকে বিবাহ করল। আকাশে একটি উড়ন্ত পাখী দেখে একজন বলল ঃ এটা কাক হলে তার স্ত্রী তালাক। দ্বিতীয় জন বলল ঃ এটা কাক না হলে তার স্ত্রী তালাক। এরপর অবস্থা পরিষ্কার হওয়ার পূর্বেই পাখীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে কোন স্ত্রীই তালাক হবে না। তৃতীয় প্রকার, আসলেই হারাম হওয়া, কিন্তু তাতে এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যা প্রবল ধারণা অনুযায়ী হালাল হওয়া ওয়াজিব করে। এরূপ বস্তু সন্দিগ্ধ হয়ে থাকে। এর বিধান হচ্ছে, প্রবল ধারণাটি শরীয়তসম্মত ও ধর্তব্য কি-না তা দেখা উচিত। শরীয়তসম্মত হলে বস্তুটি হালাল হবে এবং তা থেকে বেঁচে থাকা পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণতঃ শিকারের গায়ে তীর নিক্ষেপ করার পর তা দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। এর পর কোথাও মৃত পাওয়া গেল। তীর ছাড়া অন্য কোন জখম সেটির গায়ে নেই। এখানে পড়ে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী এই শিকারটি হালাল। এমনি মাসআলায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদী ইবনে হাতেমকে শিকার খেতে নিষেধ করেছেন। এটা পরহেযগারী ও তানযিহীস্বরূপ নিষেধ। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ শিকার খাওয়ার অনুমতিও বর্ণিত আছে। চতুর্থ প্রকার, আসলে হালাল হওয়া, কিন্তু তার মধ্যে এমন শরীয়তসম্মত ও ধর্তব্য বিষয় প্রকাশ পায়, যা প্রবল ধারণা অনুযায়ী হারাম হওয়া ওয়াজিব করে। এখানে বস্তুটি হারাম বলেই বিধান দেয়া হবে। উদাহরণতঃ পানির দু'টি পাত্রের মধ্যে থেকে একটি সম্পর্কে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, এটি নাপাক, তবে সে পাত্রের পানি পান করা অথবা তা দিয়ে ওযু করা হারাম হবে। তবে এই প্রবল ধারণা তখনই ধর্তব্য হবে, যখন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান কোন আলামতের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায় হল, হারাম ও হালাল বস্তু পরস্পরে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়া যাতে পার্থক্য করা যায় না। এর কয়েকটি প্রকার আছে।

প্রথম প্রকার, কোন সীমিত বস্তু সীমিত বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়; যেমন একটি মৃত ছাগল যবেহ্ করা একটি অথবা দশটি ছাগলের সাথে মিশে যাওয়া, অথবা দু'ভগিনীর একজন বিবাহ করার পর সন্দেহ হওয়া যে, কোন্ ভগিনীকে বিবাহ করেছিল। এ ধরনের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। কেননা, এতে আলামত ও ইজতিহাদের কোন দখল নেই। এছাড়া সীমিত বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ হওয়ার কারণে সবগুলো মিলে যেন এক বস্তু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার, সীমিত হারাম বস্তু সীমাহীন হালাল বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া; যেমন একজন অথবা দশ জন দুধ শরীক মহিলা কোন বড় শহরের মহিলাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় সমগ্র শহরের মহিলাদের বিবাহ করা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য নয়। বরং যাকে ইচ্ছা বিবাহ করা যায়। এর প্রমাণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় একটি ঢাল চুরি হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে দুনিয়াতে কেউ ঢাল ক্রয় করা থেকে বিরত থাকেনি। মোট কথা, দুনিয়া হারাম থেকে তখনই বাঁচতে পারে, যখন দুনিয়ার সকল মানুষ গোনাহ্ পরিত্যাগ করবে। সুতরাং দুনিয়াতে যখন এ ধরনের বেঁচে থাকা শর্ত নয়, তখন শহরেও শর্ত হবে না। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে তো সকল বস্তুই সীমিত। এমতাবস্থায় এখানে সীমিত ও সীমাহীন বস্তুর সংজ্ঞা কি? মানুষ ইচ্ছা করলে কোন শহরের বাসিন্দাদের গণনা করতে পারে। সুতরাং এটা সীমাহীনের দৃষ্টান্ত হবে কিরূপে? এর জওয়াব, এ ধরনের বিষয়সমূহের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে কাছাকাছি সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়। সেমতে আমরা বলি, সীমাহীন বস্তুর সংজ্ঞা এই যে, যদি এক মাঠে সকলেই সমবেত হয়, তবে দর্শক দেখা মাত্রই তাদেরকে গণনা করা কঠিন মনে করে; যেমন হাজার দু'হাজার, তবে তা সীমাহীন। আর যদি সহজেই গণনা করা যায়; যেমন দশ বিশ জন, তবে সীমিত। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সংখ্যাসমূহকে প্রবল ধারণার মাধ্যমে যে কোন একদিকে মিলিয়ে দেয়া হয়। যে সংখ্যায় সন্দেহ দেখা দেয়, তাতে মন থেকে ফতোয়া নেয়া উচিত। কারণ, যা গোনাহ, তা মনে বাজে। এরূপ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওয়াবেসাকে বলেছিলেন ঃ

استفت قلبك وان افتوك وامروك

অর্থাৎ, নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাও, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দেয় এবং আদেশ করে।

বলাবাহুল্য, মুফতী বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ফতোয়া দেয় এবং আল্লাহ তা'আলা আভ্যন্তরীণ অবস্থার মালিক। মুফতীর ফতোয়া মানুষকে আখেরাতে গোনাহ থেকে মুক্তি দেবে না।

তৃতীয় প্রকার হল সীমাহীন হালাল সীমাহীন হারামের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। যেমন, আজকালকার ধন দৌলত। এধরনের মিশ্রণের ফলে কোন নির্দিষ্ট বস্তু হারাম হয় না, যাতে হালাল ও হারাম হওয়ার উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। হাঁ, যদি তাতে হারাম হওয়ার কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তবে তা হারাম হবে, কিন্তু লক্ষণ না থাকলে সেই বস্তু বর্জন করা পরহেযগারী এবং গ্রহণ করা হালাল। সেটি খেলে মানুষ ফাসেক হবে না। হারাম হওয়ার লক্ষণসমূহ পরে বর্ণিত হবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সেই বস্তুটি জালেম শাসনকর্তার কাছ থেকে পাওয়া। বর্ণিত এই বিধানের প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় সুদের টাকা এবং শরাবের মূল্য যিম্মীদের কাছ থেকে আদায় হয়ে সরকারী ধন-সম্পদের সাথে মিশে যেত। সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বলেছিলেন– আমি সর্বপ্রথম আব্বাসের সুদ ছেড়ে দিচ্ছি, তখন সকলেই সুদের লেনদেন বর্জন করেনি, যেমন শরাব বিক্রি করা কেউ বর্জন করেনি। সেমতে বর্ণিত আছে– জনৈক সাহাবী শরা বিক্রি করলে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ অমুকের প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত হোক। সে সর্বপ্রথম শরাব বিক্রি করার প্রথা চালু করেছে। এ বিক্রয়ের কারণ ছিল, কেউ কেউ শরাব হারাম হওয়ার ফলে শরাব বিক্রয় এবং শরাবের মূল্যও হারাম হয়ে গেছে একথা বুঝতে পারেনি।

এযীদের সৈন্যরা তিন দিন পর্যন্ত মদীনা তাইয়েবা লুট করেছিল। কয়েকজন সাহাবী জালেম শাসকদের লুটতরাজের এই যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু মদীনার লুটের মাল হতে পারে -এই আশংকায় কোন সাহাবীই বাজারে ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দেননি। সুতরাং তাঁরা এই মিশ্রণকে বাধা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মনে করেননি। পূর্ববর্তীগণ যে বিষয় অপরিহার্য করেননি, এখন যদি কেউ সেটাকে অপরিহার্য করে নেয় এবং ধারণা করে, সে শরীয়তের এমন বিষয় বুঝে নিয়েছে, যা পূর্ববর্তীরা বুঝতে পারেনি, তবে সে পাগল। পূর্ববর্তীরা শরীয়তের জ্ঞান আমাদের তুলনায় অনেক বেশী রাখতেন। তাঁদের চেয়ে বেশী শরীয়ত বুঝা আমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্যে অসম্ভব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় সুদ, চুরি, লুটতরাজ, গনীমত সামগ্রীর খেয়ানত ইত্যাদি হালাল ধনসম্পদের তুলনায় অনেক কম ছিল, কিন্তু আমাদের যুগে লেনদেনের ভ্রষ্টতা ও শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে, সুদের প্রাচুর্য এবং জালেম শাসকদের বাড়াবাড়ির কারণে মানুষের অধিকাংশ ধনসম্পদ দূষিত ও হারাম হয়ে যাচ্ছে। অতএব এসব ধনসম্পদ কেউ পেলে এবং তাতে কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকলে হালাল বলা হবে, না হারাম? জওয়াব হচ্ছে, এই মাল হারাম নয়। তবে এটা গ্রহণ না করাই পরহেযগারীর মধ্যে দাখিল।

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার তৃতীয় স্থান হল, যে কারণে বস্তু হালাল হয়, তাতে কোন গোনাহ্ সংযুক্ত হয়ে যাওয়া। এই গোনাহ হয় কারণের ইঙ্গিত অর্থাৎ, সঙ্গের বস্তুর মধ্যে; অথবা পরিণতির মধ্যে, অথবা ভূমিকার মধ্যে, অথবা বিনিময়ের মধ্যে সংযুক্ত হবে। সর্বাবস্থায় গোনাহটি এমন না হওয়া শর্ত, যা দ্বারা আক্দ বা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এখন এই চার প্রকার গোনাহের উদাহরণ বর্ণিত হচ্ছে।

ইঙ্গিতের মধ্যে গোনাহ্ হওয়ার উদাহরণ জুমুআর দিনে আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে, কিন্তু এ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ তথা চুক্তি বাতিল হওয়া বুঝা যায় না। অতএব এ থেকে বিরত থাকা অবশ্য পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং এর নাম সন্দেহ রাখাও ভুল। কেননা, সন্দেহের ব্যবহার অধিকাংশ দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখানে কোন দ্বিধা নেই।

পরিণতির মধ্যে গোনাহ্ সংযুক্ত হওয়ার উদাহরণ শরাব প্রস্তুতকারীর কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা অথবা দস্যুদের কাছে তরবারি বিক্রি করা। এধরনের বিক্রি শুদ্ধ কি-না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কিয়াস অনুযায়ী এই ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ এবং মূল্য হালাল, তবে বিক্রয়কারী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহগার হবে; যেমন ছিনতাই করা ছুরি দিয়ে যবেহ্ করলে গোনাহগার হয় এবং যবেহ করা জন্তু হালাল হয়। বিক্রেতার গোনাহ্ এ কারণে হয় যে, সে গোনাহের কাজে অপরকে সাহায্য করে। মূল্য মাকরূহ এবং তা গ্রহণ না করা পরহেযগারী– হারাম নয়।

ভূমিকায় গোনাহ সংযুক্ত হওয়ার তিন স্তর। সর্ববৃহৎ স্তরের উদাহরণ সেই ছাগলের গোশত খাওয়া; যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে ঘাস খেয়েছে। এটা কঠিন মাকরূহ। এই গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব না হলেও জরুরী পরহেযগারী। পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গ থেকে এই পরহেযগারী বর্ণিত রয়েছে। সেমতে আবু আবদুল্লাহ্ তূসী (রহঃ)-এর একটি ছাগল ছিল, সেটির দুধ তিনি পান করতেন। তিনি প্রত্যহ ছাগলটিকে কাঁধে তুলে জঙ্গলে ছেড়ে আসতেন। ছাগল ঘাস খেত এবং তিনি নামায পড়তেন। একদিন এক অসাবধান মুহূর্তে ছাগলটি এক ব্যক্তির বাগানের ধারে আঙ্গুরের পাতা খেতে লাগল। এর পর তিনি ছাগলটি বাগানেই ছেড়ে এলেন; বাড়ি আনা হালাল মনে করলেন না। দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ বিশর ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সেই পানি পান থেকে বিরত থাকেন, যা জালেম শাসকদের খনন করা খালে প্রবাহিত হত। অপর একজন বুযুর্গ সেই বাগানের আঙ্গুর খাননি, যাতে জালেমদের খনন করা খাল থেকে পানি দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় স্তরের উদাহরণ এমন হালাল খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকা, যা কোন গোনাহগারের হাতে পরিবেশিত হয়; যেমন কোন ব্যভিচারী কোন হালাল খাদ্য পরিবেশন করলে তা না খাওয়া, কিন্তু এরূপ বিরত থাকা ওয়াসওয়াসার নিকটবর্তী এবং বাড়াবাড়ি। কেননা, ব্যভিচার দ্বারা কোন বস্তু পরিবেশন করার শক্তি অর্জিত হয় না। এধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হলে পরিণামে এরূপ ব্যক্তির হাত থেকেও কোন বস্তু নেয়া যাবে না, যে গীবত, মিথ্যাচার অথবা এধরনের কোন কোন গোনাহ করে। এটা খুবই বাড়াবাড়ি।

উপরোক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে কেবল প্রথম স্তরটি মুফতীর ফতোয়ার আওতায় পড়ে। পরবর্তী দু'টি স্তর ফতোয়ার বাইরে। এগুলো সম্পর্কে ফতোয়া তাই, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেছিলেন– মানুষ তোমাকে ফতোয়া দিলেও তুমি মনের কাছে ফতোয়া চাও। এটা মুত্তাকী ও সালেহ ব্যক্তিবর্গের পরহেযগারী। বাস্তবে তাঁরা মন থেকে ফতোয়া জেনে নেন। গোনাহ তাঁদের অন্তরে বাজে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ স্থান প্রমাণাদির পরস্পর বিরোধিতার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। এটা তিন প্রকারে বিভক্ত– (১) শরীয়তের প্রমাণাদির বৈপরীত্য, (২) লক্ষণ বৈপরীত্য এবং (৩) সামঞ্জস্যশীল বিষয়াদির বৈপরীত্য।

প্রথম প্রকার, শরীয়তের দলীলসমূহের বৈপরীত্য; যেমন কোরআন পাকের দুই আয়াত অথবা দুই হাদীস অথবা দুই কিয়াসের পরস্পর বিরোধী হওয়া। বৈপরীত্যের এ সবগুলো প্রকারই সন্দেহের কারণ হয়ে থাকে। এতে যদি হারাম হওয়ার দিকটি অগ্রগণ্য হয়, তবে এটাই অবলম্বন করা ওয়াজিব। আর যদি হালাল হওয়ার দিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হয়, তবে তা অবলম্বন করা জায়েয, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা ভাল। পরহেযগারীর ক্ষেত্রে বিরোধের স্থান থেকে বেঁচে থাকা মুফতী ও মুকাল্লেদ উভয়ের জন্যে জরুরী। তবে মুকাল্লেদ শহরের যে মুফতীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে, তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা তার জন্যে জায়েয। মুফতীর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া জনশ্রুতি দ্বারা জানা যায়। যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা মানুষের কাছে শুনে নির্ণয় করা যায়। ফতোয়া প্রার্থীর জন্যে সুবিধামত মাযহাব বেছে নেয়া জায়েয নয়; বরং যে মাযহাব তার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সেই মাযহাবের অনুসরণ এমনভাবে করবে, যেন কখনও তার বিরুদ্ধাচরণ না হয়। হাঁ, যদি তার মাযহাবের ইমাম কোন বিষয়ে ফতোয়া দেয় এবং এতে অন্য মাযহাবের ইমামের বিরোধ পাওয়া যায়, তবে এমনভাবে আমল করবে যাতে উভয় মাযহাবের উপর আমল হয়ে যায়। এখানে বিরোধ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী– পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যদি মুজতাহিদের মতে প্রমাণসমূহ পরস্পর বিরোধী হয় এবং ধারণা ও অনুমান দ্বারা হালাল হওয়ার দিক অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, তবে মুজতাহিদের জন্যে পরহেযগারী হচ্ছে, সে বিষয় থেকে নিজে বেঁচে থাকবে এবং ফতোয়া হালাল বলে মেনে নেবে। সেমতে পূর্ববর্তী মুফতীগণ অনেক ব্যাপারে হালাল হওয়ার ফতোয়া দিতেন, কিন্তু পরহেযগারীবশতঃ নিজেরা তা করতেন না, যাতে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার, এমন লক্ষণসমূহের বৈপরীত্য, যেগুলো হালাল ও হারাম হওয়া জ্ঞাপন করে। উদাহরণতঃ কোন এক সময়ে লুণ্ঠিত এক প্রকার সামগ্রী বর্তমানে বাজারে দুর্লভ। এমন সামগ্রী যদি কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়, তবে এখানে উভয় প্রকার লক্ষণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিদ্যমান। যার কাছে আছে, তার সততা ও ধর্মপরায়ণতা এটা হালাল হওয়ার প্রমাণ। পক্ষান্তরে এ সামগ্রীর দুর্লভ্যতা এবং লুটের মাল ছাড়া কম পওয়া যাওয়া এ বিষয়ের দলীল যে, এটা হারাম। সুতরাং এখানে পরস্পর বিরোধী দু'প্রকার লক্ষণের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এখানে যদি কোন এক দিক অগ্রাধিকারযোগ্য হয়, তবে তদনুযায়ী বিধান হবে, কিন্তু এ সামগ্রী থেকে বেঁচে থাকা হবে পরহেযগারী। অগ্রাধিকার প্রকাশ না পেলে 'তাওয়াক্কুফ' তথা বিধান মওকুফ রাখা ওয়াজিব হবে।

তৃতীয় প্রকার, সামঞ্জস্যশীল বস্তুসমূহের বৈপরীত্য; যেমন কোন ব্যক্তি ফকীহগণকে কোন মাল দান করার ওসিয়ত করল। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ফেকাহ শাস্ত্রে পন্ডিত, সে এই ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি একদিন অথবা এক মাস আগে ফেকাহ শুরু করেছে সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদ্দুভয়ের মধ্যবর্তী অসংখ্য স্তর রয়েছে, যেগুলোতে সন্দেহ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে মুফতী তার ধারণা অনুযায়ী ফতোয়া দেন। সন্দেহের যত স্থান রয়েছে, তন্মধ্যে এ প্রকারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কেননা, এর কোন কোন ক্ষেত্রে মুফতীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। সে কোন কৌশল খুঁজে পায় না। দরিদ্রদের মধ্যে যে সদকা-খয়রাত বন্টন করা হয়, তার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, যার কাছে কিছুই নেই, সে নিশ্চিতই দরিদ্র। আর যার কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে, সে নিশ্চিতই ধনী, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে অনেক সূক্ষ্ম স্তর রয়েছে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি গৃহ, গৃহের আসবাবপত্র, বস্ত্র ও বই পুস্তক রয়েছে। এখন যদি এগুলো প্রয়োজন পরিমাণে থাকে, তবে তার সদকা গ্রহণের পথে কোন বাধা নেই। আর যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী থাকে, তবে বাধা আছে, কিন্তু প্রয়োজনের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। এটা অনুমান দ্বারা জানা যায় এবং অত্যধিক আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে এ হাদীসটিই একমাত্র উপকারী– دع ما يريبك الى ما لا يريبك অর্থাৎ, সন্দেহের বিষয় পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয় অবলম্বন কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাপ্ত ধনসম্পদ যাচাই করা জরুরী

প্রকাশ থাকে যে, কেউ তোমার সামনে কোন খাদ্য অথবা হাদিয়া পেশ করলে অথবা তুমি তা থেকে ক্রয় করতে কিংবা দান গ্রহণ করতে চাইলে তা যাচাই করা জরুরী নয়। বরং কোন কোন অবস্থায় জিজ্ঞেস করা ও অবস্থা যাচাই করা ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় হারাম। আবার কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও কোন অবস্থায় মাকরূহ। তাই এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল, যেসব জায়গায় সন্দেহ হয়, সেখানেই জিজ্ঞেস ও যাচাই করা। সন্দেহের জায়গা সম্পদের মালিকের সাথে অথবা স্বয়ং সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। তাই বিষয়টি দু'টি শিরোনামে বর্ণনা করা হচ্ছে।

মালিকের অবস্থা যাচাই করা ঃ মালিকের অবস্থা তিন প্রকার হতে পারে– অজ্ঞাত, সন্দিগ্ধ অথবা কোন প্রকারে জ্ঞাত। অজ্ঞাত হওয়ার অর্থ, মালিকের সাথে এমন কোন ইঙ্গিত নেই, যদ্দ্বারা তার ভ্রষ্টতা ও জুলুম জানা যায়; যেমন সিপাহীর পোশাক অথবা পদক এবং সাধুতারও কোন আলামত নেই; যেমন সুফী, ব্যবসায়ী ও আলেমের পোশাক পরিচ্ছদ। উদাহরণতঃ তুমি কোন অখ্যাত গ্রামে পৌঁছে এমন এক ব্যক্তিকে পেলে, যার অবস্থা তোমার কিছুই জানা নেই এবং তার মধ্যে এমন কোন আলামতও নেই, যদ্দ্বারা তাকে সাধু কিংবা দুষ্ট বলা যায়। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে অজ্ঞাত অবস্থাধারী। তাকে সন্দিগ্ধ বলা যাবে না। কেননা, কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দু'কারণ থেকে উদ্ভূত পরস্পর বিরোধী দু'বিশ্বাস থাকাকে বলা হয় সন্দেহ। এখানে কোন বিশ্বাসও নেই, কারণও নেই। অধিকাংশ ফেকাহবিদ অজ্ঞাত ও সন্দিগ্ধের পার্থক্য জানে না বিধায় বিষয়টি বর্ণিত হল।

এই প্রকার মালিকের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিধান হচ্ছে যাচাই না করা। অর্থাৎ, কোন অজ্ঞাত মালিক যদি তোমার সামনে খাদ্য পেশ করে অথবা হাদিয়া পাঠায় অথবা তুমি তার দোকান থেকে কিছু ক্রয় করতে চাও, তবে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করা জরুরী নয়। বরং তার মুসলমান হওয়া এবং বস্তুটি তার কব্জায় থাকাই তোমার গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরূপ বলা অপরিহার্য নয় যে, জুলুম ও ভ্রষ্টতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বিধায় এ মালও তদ্রূপই হবে। এরূপ বললে এটা হবে ওয়াসওয়াসা এবং এতে বিশেষ মুসলমানের প্রতি কুধারণা হয়। অথচ কোন কোন কুধারণা গোনাহ। আমরা জানি, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জেহাদে ও সফরে বিভিন্ন গ্রামে গমন করতেন এবং খানার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। শহরসমূহে গেলে বাজার থেকে বেঁচে থাকতেন না। অথচ হারাম মাল তাঁদের যমানায়ও বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সন্দেহ ছাড়া কখনও যাচাই করেছেন বলে শুনা যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও সামনে যা আসত তার অবস্থা যাচাই করতেন না। বরং শুরুতে মদীনায় অবস্থানকালে কেউ কিছু প্রেরণ করলে তিনি সদকা না হাদিয়া তাও জিজ্ঞেস করে নিতেন। কেননা, তখন অবস্থার চাহিদা এমনিই ছিল। মদীনায় নিঃস্ব মুহাজিরগণ তাঁর কাছে থাকতেন। তাই প্রেরিত বস্তু সদকা হওয়ার ধারণাই প্রবল ছিল। এছাড়া দাতার মালিকানা এবং তার মুসলমান হওয়া একথা জ্ঞাপন করে না যে, বস্তুটি সদকা নয়। কেউ দাওয়াত করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা কবুল করে নিতেন এবং সদকা থেকে খাওয়ানো হবে কিনা, তা জিজ্ঞেস করতেন না। কারণ, সদকার খাদ্য দ্বারা দাওয়াত করার অভ্যাস সাধারণতঃ নেই। উম্মে সুলায়ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দাওয়াত করেছিলেন এবং এমন খাদ্য পেশ করেছিলেন, যাতে লাউ ছিল। এসব দাওয়াতে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন বলে কোথাও বর্ণিত নেই। মোট কথা, যার অবস্থা অজ্ঞাত, তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং জিজ্ঞেস না করা উচিত। তবে কেউ যদি না জানা পর্যন্ত পেটে কিছু দিতে না চায়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে ভাল কথা। তার উচিত তা না খাওয়া। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন কি? খেতে হলে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই খেয়ে নেবে। কেননা, জিজ্ঞেস করার অর্থ কষ্ট দেয়া, গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং আতংকে ফেলে দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে হারাম। মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার গোনাহ হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু খাওয়ার গোনাহের চেয়ে কম নয়। যদি তার অবস্থা অন্যের কাছে এমনভাবে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে জেনে নেয়, তবে তাতে কষ্ট আরও বেশী হয়। আর যদি সে জানতে না পারে, তবে এটা কুধারণা, গোপনীয়তা ফাঁস করা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং গীবতের ভূমিকা। এই সবগুলো বিষয় একই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক; কারণ, কোন কোন ধারণা পাপ, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।

অনেক মূর্খ দরবেশ জিজ্ঞাসাবাদ করে মানুষকে আতংকগ্রস্ত করে এবং কর্কশ ও পীড়াদায়ক কথা বলে ফেলে। এটা শয়তান তাদের মনের মধ্যে সজ্জিত করে দেয়, যাতে তারা মানুষের মধ্যে হালালখোর বলে খ্যাত হয়ে যায়। ধর্মপরায়ণতাই এর কারণ হলে মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়ার ভয় তারা বেশী করত। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পছন্দনীয় তরীকা। যে ব্যক্তি তাঁদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে চায়, সে গোমরাহ ও বেদআতী। কেননা, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– যদি কেউ ওহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবে তা সাহাবায়ে কেরামের এক রতি পরিমাণ স্বর্ণ দান করার সমান হবে না।এছাড়া রসূলে করীম (সাঃ) হযরত বরীরা (রাঃ)-এর প্রেরিত খাদ্য খেলে লোকেরা আরজ করল ঃ এই খাদ্য বরীরা সদকায় পেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এটা তার জন্যে সদকা ছিল, আমার জন্যে হাদিয়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, এই সদকা বরীরাকে কে দিয়েছিল? কেননা, সদকাদাতা তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল।

মালিকের সন্দিগ্ধ হওয়ার অর্থ মালিকের সাথে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন লক্ষণ পাওয়া যাওয়া। প্রথমে আমরা সন্দেহের আকার বর্ণনা করব, এর পর তার বিধান লেখব। সন্দেহের আকার এই যে, যে বস্তু মালিকের কব্জায় আছে, তার হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ মালিকের দৈহিক গড়নে, পোশাকে অথবা কর্ম ও কথায় পাওয়া যায়। তার দৈহিক গড়ন উদাহরণতঃ জংলী দস্যু অথবা জালেমের মত; মোটা গোঁফ, মাথার চুল দষ্কৃতকারীদের অনুরূপ। তার পোশাক উদাহরণতঃ জালেম সিপাহীদের মত। তার কর্ম ও কথার মধ্যে হালাল নয়, এমন বিষয়াদির প্রতি সাহসিক উদ্যম পাওয়া যায়। এসব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে, এ লোকটি সম্পদের ব্যাপারেও অসাবধানতার পক্ষপাতী হবে। যে মাল হালাল নয়, তাও গ্রহণ করে থাকবে। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে সন্দেহের আকার আকৃতি। এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে কেউ কিছু কিনতে অথবা হাদিয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গ্রহণ করতে অথবা দাওয়াত কবুল করতে চাইলে দেখতে হবে, এখানে কব্জা একটি দুর্বল দলীল এবং তার বিপরীতে এমন সব লক্ষণ বিদ্যমান, যদ্দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই এগুলো করা জায়েয না হওয়া উচিত। এ বিধানকেই আমরা পছন্দ করি এবং ফতোয়াও তাই দেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করতে এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে বলেছেন। হাদীসে এটা করা বাহ্যতঃ ওয়াজিব বুঝা গেলেও মোস্তাহাব হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এছাড়া এরূপ সন্দেহের স্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকা, না হাদিয়া জিজ্ঞেস করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর গোলামের উপার্জনের অবস্থা জানতে চেয়েছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) দুধের অবস্থা যাচাই করেছিলেন। এগুলো সব সন্দেহের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এগুলোকে পরহেযগারী মনে করা সম্ভব নয়। কেননা, এসব লক্ষণ অধিকার ও মুসলমানিত্বের পরিপন্থী।

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে মালিকের অবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, যদ্দ্বারা সম্পদের হালাল হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির বাহ্যিক সাধুতা ও ধর্মপরায়ণতা জানা থাকা, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হতে পারে বিধায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং যাচাই করা জরুরী নয়; বরং এখানে আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হওয়া উচিত। কেননা, বাহ্যিক সাধু ব্যক্তির হারাম মাল নিতে উদ্যত হওয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্যত হওয়ার তুলনায় সন্দেহ থেকে অনেক দূরে। এ ছাড়া ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের খাদ্য আহার করা নবী ও ওলীগণের অভ্যাস। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لا تاكل الا طعام الاتقى ولا ياكل طعامك الا الاتقى -

অর্থাৎ, তুমি পরহেযগারদের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়, কিন্তু যদি অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায়, লোকটি জালেম, গায়ক অথবা সুদখোর, তবে অভিজ্ঞতার সামনে বাহ্যিক পোশাক ও পরহেযগারীর কোন মূল্য নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যাচাই করা অবশ্যই ওয়াজিব।

সম্পদ সম্পর্কিত যাচাই ঃ হারাম ও হালাল সম্পদ মিশ্রিত হয়ে গেলে যাচাই করতে হয়। যেমন প্রচুর পরিমাণ চোরাই মাল বাজারীরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্রয় করে নিল। এরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রকাশ পায় যে, বাজারীদের অধিকাংশ মাল চোরাই তথা হারাম মাল, তবে যে ব্যক্তি এ বাজার থেকে ক্রয় করবে, তার উপর যাচাই করে নেয়া ওয়াজিব। আর যদি প্রকাশ পায়, বাজারীদের অধিকাংশ মাল হারাম নয়, তবে যাচাই করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম বাজারে ক্রয় থেকে বিরত থাকতেন না; অথচ এসব বাজারে সুদের দেরহাম এবং গনীমতে খেয়ানতের মালও থাকত। হযরত ওমর (রাঃ) আযারবাইজানে প্রেরিত পত্রে লেখেছিলেন ঃ তোমরা এমন শহরে রয়েছ, যেখানে মৃত জন্তুর চামড়া শুকানো হয়। অতএব যবেহ করা ও মৃত জন্তুর ব্যাপারটি যাচাই করে নিয়ো। এতে যাচাই করার নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু এর সাথে তিনি এই নিদের্শ দেননি যে, নগদ টাকা-পয়সাও যাচাই করে নাও, সেটা মৃত জন্তুর চামড়ার মূল্য, না যবেহ করা জন্তুর চামড়ার মূল্য? কেননা, চামড়া বিক্রি হলেও অধিকাংশ নগদ টাকা-পয়সা চামড়ার দাম ছিল না, কিন্তু চামড়া অধিকাংশ মৃত জন্তুরই হত। তাই এগুলো যাচাই করার নিদের্শ দিলেন।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে তওবাকারীর মুক্তির উপায়

প্রকাশ থাকে যে, তওবাকারীর কাছে হালাল হারাম উভয় প্রকার মাল মিশ্রিত থাকলে তার জন্যে দু'টি কাজ করা অপরিহার্য। প্রথম নিজের মাল থেকে হারাম মালকে পৃথক করা এবং দ্বিতীয়তঃ হারাম মাল ব্যয় করা। সেমতে এই পরিচ্ছেদটি দু'টি শিরোনামে বর্ণিত হচ্ছে।

হারাম মাল পৃথক করা ঃ জানা উচিত, যে ব্যক্তি তওবা করে, তার নিকট হারাম মাল থাকলে তা আলাদা করতে হবে। তার মিশ্রিত মাল হয় ওজন করা যায়– এমন হবে, যথা খাদ্য শস্য, তৈল, মুদ্রা ইত্যাদি; না হয় এমন হবে, যা ওজন করা যায় না; যথা গোলাম, গৃহ প্রভৃতি। এখন যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কিছু মাল অর্জন করে এবং জানে যে, সে কোন কোন সামগ্রী বেশী মুনাফায় বিক্রি করতে যেয়ে মিথ্যা বলেছে এবং কিছু মালে সত্য বলেছে, অথবা কোন ব্যক্তি তেল চুরি করে নিজের তেলে মিশ্রিত করে নেয় কিংবা খাদ্য শস্য ও অর্থের বেলায়ও এরূপ হয়, তবে হারাম মাল পৃথক করতে হলে দেখতে হবে, সে হারাম মালের পরিমাণ জানে কি না? যদি পরিমাণ জানা থাকে; যেমন, অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ, তবে অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ আলাদা করে নেবে। আর যদি পরিমাণ জানা না থাকে, তবে সন্দেহ ও একীনের মধ্যে একীনের দিকটি অবলম্বন করে সে পরিমাণ মাল আলাদা করবে অথবা প্রবল ধারণা অনুযায়ী কাজ করবে। এর উপায় হল, তার অধিকারে মালের মধ্যে উদাহরণতঃ অর্ধেক হালাল এবং এক তৃতীয়াংশ হারাম। অবশিষ্ট এক ষষ্ঠমাংশের মধ্যে তা হালাল না হারাম সন্দেহ রয়েছে। এখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। যদি হালাল বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে হালালের মধ্যে রাখবে এবং হারাম বলে প্রবল ধারণা হলে হারামের মধ্যে রাখবে। যদি কোন দিকেই প্রবল ধারণা না হয়; বরং সন্দেহই থেকে যায়, তবে হালালের সাথে রেখে দেয়া জায়েয এবং হারামের সাথে রাখা পরহেযগারী।

নিম্নে উপরোক্ত বর্ণনার পরিপূরক কয়েকটি মাসআলা বর্ণিত হচ্ছে।

(১) এক ব্যক্তি অন্য আরও কয়েক ব্যক্তির সাথে জনৈক মৃত ব্যক্তির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়ারিস। সরকার এই মৃত ব্যক্তির একটি ভূখন্ড বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল, এখন সেই ভূখন্ড ফেরত দিচ্ছে। এটা সকল ওয়ারিসের প্রাপ্য হবে। যদি সরকার এই ভূখণ্ডের অর্ধেক ফেরত দেয় এবং এই ব্যক্তির অংশও অর্ধেক হয়, তবু অন্যান্য ওয়ারিস এই অর্ধেকের মধ্যে তার সাথে শরীক হবে। কেননা, তার অর্ধেক পৃথক নয়। কাজেই বলা যাবে না যে, তার অর্ধেক ফেরত দিয়েছে এবং অন্যদের অংশ বাজেয়াপ্ত রয়ে গেছে। সরকার আলাদার নিয়ত করলেও তা আলাদা হবে না।

(২) এক ব্যক্তির কাছে কোন জালেম শাসনকর্তার দেয়া একটি ভূখণ্ড ছিল। সে তা থেকে কিছু ফসল পেত। এখন সে তওবা করতে চায়। তার উচিত যতদিন এই ভূখণ্ডের ফসল খেয়েছে, আশেপাশের দর অনুযায়ী ততদিনের ভাড়া প্রকৃত মালিককে দিয়ে দেয়া। অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত প্রত্যেক মাল থেকে এরূপ মুনাফা অর্জিত হলে তার বিধানও তদ্রূপ। এরূপ না করলে তওবা হবে না। গোলাম, বস্ত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি সাধারণতঃ যে সকল বস্তুর ভাড়া হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাবধানতা হচ্ছে অধিকতর মজুরি ধার্য করে তা মালিককে দিয়ে দেয়া।

(৩) যে ব্যক্তি ওয়ারিসী সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু জানে না মৃত ব্যক্তি হালাল উপায়ে এ সম্পত্তি অর্জন করেছিল না হারাম উপায়ে। হালাল হারাম জানার কোন লক্ষণও নেই। এমতাবস্থায় সকল আলেম একমত যে, এই সম্পত্তি ওয়ারিসের জন্যে হালাল। আর যদি ওয়ারিস নিশ্চিতরূপে জানে যে, এ সম্পত্তিতে হারাম আছে, কিন্তু কি পরিমাণ হারাম, তা সন্দিগ্ধ, তবে অনুমান করে হারাম আলাদা করে দেবে। আর যদি হারাম হওয়ার জ্ঞান না থাকে, কিন্তু মৃত ব্যক্তি জালেম শাসনকর্তার কর্মচারী ছিল বিধায় হারামের সম্ভাবনা আছে, তবে এ সম্পত্তি থেকে বেঁচে থাকা পরহেযগারী– ওয়াজিব নয়। যদি ওয়ারিস জানে যে, মৃত ব্যক্তির কিছু মাল জুলুমের পথে অর্জিত ছিল, তবে সেই পরিমাণ মাল পৃথক করে দেয়া ওয়ারিসের জন্যে অপরিহার্য হবে। কোন কোন আলেম বলেন, বের করা ওয়াজিব হবে না এবং গোনাহ মৃত ব্যক্তির যিম্মায় থাকবে। এর প্রমাণস্বরূপ একটি রেওয়ায়েত পেশ করা হয়। তা হল, বাদশাহের জনৈক কর্মচারী মারা গেলে জনৈক সাহাবী বললেন ঃ এখন তার মাল তার ওয়ারিসদের জন্যে পবিত্র হয়ে গেছে। অবশ্য এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল। কারণ, এতে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবতঃ কোন অসাবধান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাহাবী বলে থাকবেন। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা অসাবধানও ছিলেন। সম্ভ্রমের খাতিরে আমরা তাঁদের নাম উল্লেখ করছি না। চিন্তার বিষয় হল, যে মালে নিশ্চিতরূপেই হারাম মিশ্রিত থাকে তা অর্জনকারীর মৃত্যুর কারণে বৈধ কিরূপে হয়ে যাবে? হাঁ, ওয়ারিসের জানা না থাকলে বলা যায়, যা সে জানে না, তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে না। সুতরাং যে ক্ষেত্রে ওয়ারিস জানে না, এই মালে নিশ্চিতরূপেই হারাম আছে, সেই মাল তার জন্যে পবিত্র বিবেচিত হবে।

হারাম মাল ব্যয় করা ঃ হারাম মাল পৃথক করার পর যদি তার মালিক নির্দিষ্ট থাকে, তবে সেই মাল মালিকের কাছে অথবা তার ওয়ারিসের কাছে অর্পণ করবে। মালিক সেই স্থানে না থাকলে তার জন্যে অপেক্ষা করবে অথবা যেখানে থাকে, সেখানে পৌঁছে দেবে। এই মালে কিছু বৃদ্ধি ও মুনাফা হলে মালিকের আসা পর্যন্ত তাও জমা রাখবে। আর যদি মালিক নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হয় এবং নির্দিষ্ট করারও কোন আশা না থাকে, তবে পরিস্থিতি খুব স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেই মাল জমা রাখবে। কোন সময় মালিক অনেক হওয়ার কারণে মাল ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, গনীমতের মাল খেয়ানত করার পর যোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। এখন তাদেরকে একত্রিতও করা যায় না। একত্রিত করা গেলেও এক দীনার উদাহরণতঃ দু'হাজার যোদ্ধার মধ্যে কিরূপে বণ্টন করা যাবে? সুতরাং এরূপ মাল সদকা করে দিতে হবে। আর যদি সেই মাল বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মাল অথবা সরকারী ধনাগারের মাল হয়, যা জনহিতকর কাজের জন্যে হয়ে থাকে, তবে সে মাল পুল, মসজিদ, সরাইখানা এবং মক্কা মোয়াযযমার পথে ঝরণা নির্মাণের কজে ব্যয় করতে হবে, যাতে সে পথে চলাচলকারী মুসলমানরা উপকৃত হয়। এখানে সদকা ও জনহিতকর কাজ করা- এ দুটির দায়িত্ব কাযী তথা বিচারককে দেয়া উচিত। সুতরাং উপরোক্ত হারাম মাল কোন ধার্মিক কাযী পেলে তার হাতে সমর্পণ করবে। যে কাযী হারাম মাল নিজের জন্যে হালাল মনে করে, তার হাতে সমর্পণ করলে মালের ক্ষতিপূরণ সমর্পণকারীর যিম্মায় থাকবে। এমতাবস্থায় কোন ধর্মভীরু আলেমের হাতে সমর্পণ করবে অথবা তাকে কাযীর সাথে সহকর্মী করে দেবে। এসব ব্যবস্থা সম্ভবপর না হলে নিজেই সমস্ত কার্যনির্বাহ করবে। কেননা, উদ্দেশ্য হল ব্যয় করা। তবে অনেকেই জনহিতকর কাজ প্রকৃতপক্ষে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন্‌টি তা জানে না বিধায় সাহায্যকারীর প্রয়োজন। সুতরাং উপযুক্ত সাহায্যকারী পাওয়া না গেলে আসল ব্যয় পরিত্যাগ করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, হারাম বস্তু সদকা করা যে বৈধ তার প্রমাণ কি? মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তা সদকা করবে কিরূপে? এছাড়া কোন কোন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী হারাম মাল সদকা করা জায়েযই নয়। সেমতে ফোযায়ল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর হাতে হারাম দু'দেরহাম এসে গেলে তিনি তা পাথরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ আমি পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু সদকা করব না। এর জওয়াব হচ্ছে, হারাম মাল সদকা করা যে জায়েয, তার পক্ষে হাদীস, মনীষী বাক্য এবং কিয়াস রয়েছে। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একটি ভাজা করা আস্ত ছাগল খাওয়ার জন্যে পেশ করা হলে ছাগলটি অলৌকিকভাবে তাঁকে বলল ঃ আমি হারাম। অতঃপর তিনি সেটি বন্দীদেরকে খাইয়ে দিতে আদেশ করলেন, অর্থাৎ, সদকা করে দিতে বললেন। এছাড়া রোম ও পারস্যের যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআন শরীফে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔

অর্থাৎ, নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমকরা পরাজিত হয়েছে। এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা জয়লাভ করবে।

কাফেররা এর সত্যতা চ্যালেঞ্জ করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমে কাফেরদের সাথে বাজি ধরলেন। এর পর আল্লাহ তা'আলা যখন কাফেরদের মাথা হেঁট করালেন, তখন হযরত আবু বকর বাজিতে জিতে মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করলেন। তিনি বললেন ঃ এই মাল হারাম। একে খয়রাত করে দাও। মনীষী উক্তি হচ্ছে, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একটি বাঁদী ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধ করার সময় বিক্রেতাকে খুঁজে পেলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। এর পর তিনি বাঁদীর মূল্য খয়রাত করে দিলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী, আমি এটা বাঁদীর মালিকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। সে রাযী হলে ভাল, নতুবা এর সওয়াব আমাকে দিয়ো। হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হল– এক ব্যক্তি গনীমতের মালে খেয়ানত করল। যোদ্ধারা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সে তওবা করল। সে এই গনীমতের মাল কি করবে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ খয়রাত করে দেবে। এ সম্পর্কে কিয়াস হচ্ছে, হারাম মাল হয় ধ্বংস করে দিতে হবে, না হয় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। কারণ, তার মালিক পাওয়ার আশা নেই। বলাবাহুল্য, সমুদ্রে নিক্ষেপ করার তুলনায় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করাই উত্তম। কেননা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে নিজের পক্ষ থেকেও বিনষ্ট হবে এবং মালিকের পক্ষ থেকেও বিনষ্ট হবে। কারই কোন ফায়েদা হবে না, কিন্তু গরীবকে দিয়ে দিলে সে মালিকের জন্যে দোয়া করবে। মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সদকা করলে সওয়াব হবে না– একথা ঠিক নয়। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে– ক্ষেতের ফসল এবং ফলের বৃক্ষ থেকে যে পরিমাণ মানুষ ও পশুপাখী খায়, সে পরিমাণ সওয়াব চাষী ও বৃক্ষরোপণকারী পায়। বলাবাহুল্য, এটা তাদের ইচ্ছা ছাড়াই পাওয়া যায়। এখন এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) মুহাসেবী (রহঃ) বলেন ঃ কারও হাতে শাসনকর্তার কাছ থেকে কোন মাল পৌঁছলে এই মাল শাসনকর্তাকেই ফিরিয়ে দেবে। কেননা, সে ভাল করেই জানে এটা কাকে দেয়া উচিত। এই ফিরিয়ে দেয়া খয়রাত করার চেয়ে উত্তম। শাসনকর্তার জ্ঞানে হয় তো এই মালের কোন নির্দিষ্ট মালিক আছে। এমতাবস্থায় এটা খয়রাত করা জায়েয হলে কারও কাছ থেকে মাল চুরি করে তা খয়রাত করাও জায়েয হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন ঃ যদি জানা যায় যে, শাসনকর্তা এই মাল মালিককে ফেরত দেবে না, তবে তা খয়রাত করে দেবে। কেননা, এমতাবস্থায় শাসনকর্তাকে দিলে জুলুমে সাহায্য করা এবং জুলুমের কারণ বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া মালিকের হকও বরবাদ হবে। কাজেই মালিকের পক্ষ থেকে খয়রাত করে দেয়াই উত্তম।

(২) যখন কোন ব্যক্তির মালিকানায় হালাল, হারাম ও সন্দিগ্ধ মাল থাকে এবং সমগ্র মাল তার প্রয়োজনের বেশী না হয়, তখন সে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট হলে বিশেষভাবে নিজের জন্যে হালাল মাল আর সন্দিগ্ধ মাল পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। কেননা, মানুষ বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে বেশী। এখানে নিজে হারাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খেলে তা জেনে শুনে খাওয়া হবে, কিন্তু পরিবার পরিজনরা না জেনে খাবে। কাজেই, তাদের ওযর আছে তার ওযর নেই।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি হারাম মাল ফকীরকে খয়রাত করে, তবে অকাতরে দেয়া জায়েয। আর যদি নিজের উপর ব্যয় করে, তবে যথাসম্ভব কম ব্যয় করবে। পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করলে মাঝামাঝি পরিমাণে ব্যয় করবে।

(৪) হারাম মাল পিতামাতার কাছে থাকলে তাদের সাথে খাওয়া ত্যাগ করবে। তারা অসন্তুষ্ট হলেও তাদের কথা মানবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে কোন মানুষের আদেশ পালন করা জায়েয নয়। আর সন্দিগ্ধ মাল হলে তাদের সাথে না খাওয়া পরহেযগারী। এর বিপরীতে পিতামাতার সন্তুষ্টিও পরহেযগারী; বরং ওয়াজিব। কাজেই বিরত থাকলে এমনভাবে বিরত থাকবে যেন তাদের কাছে অসহনীয় না হয়।

(৫) যে ব্যক্তির কাছে হারাম মাল আছে, তার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হয় না। কেননা, সে নিঃস্ব। আর যদি সন্দিগ্ধ মাল থাকে, যা হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, তবে হালাল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হবে।

(৬) যে ব্যক্তির কাছে হারাম মাল আছে এবং সে তা নিজের প্রয়োজনের জন্যে আটকে রেখেছে, সে যদি নফল হজ্জ করতে চায়, তবে পদব্রজে গেলে এই মাল খেতে পারবে। কেননা, হজ্জ ছাড়াও সে এই মাল খেত। সুতরাং হজ্জে খাওয়া আরও ভাল। আর যদি পদব্রজে যেতে সক্ষম না হয় এবং সওয়ারীর মুখাপেক্ষী হয়, তবে এরূপ প্রয়োজনের জন্যে এই মাল ব্যয় করা জায়েয নয়।

(৭) যে ব্যক্তি ফরয হজ্জের জন্য সন্দিগ্ধ মাল নিয়ে রওয়ানা হয়, সে পবিত্র মাল থেকে খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করবে। সারা পথে সম্ভব না হলে এহরাম বাঁধার পর থেকে এহরাম খোলা পর্যন্ত সময়ে পবিত্র খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে আরাফার দিনে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া যেন এমতাবস্থায় না হয় যে, খাদ্যও হারাম এবং পরনের পোশাকও হারাম; বরং সেদিন পেটে হারাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাদ্য এবং দেহে হারাম পোশাক না রাখার চেষ্টা করবে। কেননা, সন্দিগ্ধ মাল প্রয়োজনের জন্যে জায়েয বলা হলেও এর অর্থ এই নয় যে, তা হালাল হয়ে গেছে। যদি আরাফার দিনেও হালাল খাদ্য ও হালাল পোশাক সম্ভবপর না হয়, তবে মনে মনে ভয় ও দুঃখ করবে যে, যে মাল পাক নয়, তা আমি অপারগ ও অক্ষম অবস্থার কারণেই খাচ্ছি। এতে আশা করা যায়, এই ভয় ও দুঃখের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দেবেন এবং ক্রুটি মার্জনা করবেন।

(৮) হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পিতা ধন সম্পদ রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি এমন লোকদের সাথে লেনদেন করতেন, যাদের সাথে লেনদেন করা মাকরূহ। এখন আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা যে পরিমাণ মুনাফা লাভ করেছেন, সেই পরিমাণ মাল বাদ দাও এবং অবশিষ্ট মাল নিজে রেখে দাও। লোকটি আরজ করল ঃ তাঁর কিছু ঋণ অন্যের কাছে এবং অন্য লোকের কিছু ঋণ তাঁর কাছে প্রাপ্য আছে। তিনি বললেন ঃ তাঁর কাছে যার প্রাপ্য আছে তা শোধ কর এবং যা প্রাপ্য আছে, তা আদায় কর। ইমাম আহমদের এই জওয়াব সঠিক। এ থেকে বুঝা যায়, আন্দাজ করে হারাম পরিমাণ বের করে দেয়া তাঁর মতে জায়েয। ধনের ব্যাপারে তিনি এ বিষয়ের উপর ভরসা করেছেন যে, ঋণ নিশ্চিত। সন্দেহের কারণে একে বর্জন করা উচিত নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকীয় পুরস্কার ও ভাতার বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি বাদশাহের কাছ থেকে কোন পুরস্কার কিংবা ভাতা গ্রহণ করে, তার দু'টি বিষয় অবশ্যই দেখা উচিত। এক, সেই অর্থ বাদশাহের কাছে আমদানীর কোন্ খাত থেকে এসেছে ? দুই, অর্থ গ্রহণকারীর নিজের যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কি পরিমাণ পাওয়ার যোগ্য ?

রাজকীয় আমদানীর খাত ঃ চাষাবাদযোগ্য খাস ভূমি ছাড়া যে অর্থ বাদশাহের জন্যে হালাল এবং যাতে প্রজারা অংশীদার, তা দু'প্রকার। প্রথম প্রকার যা কাফেরদের কাছ থেকে হস্তগত হয়; যেমন যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত, যুদ্ধ ছাড়াই প্রাপ্ত মালে ফায় এবং জিযিয়া ও সন্ধির অর্থ, যা শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যা মুসলমানদের কাছ থেকে হস্তগত হয়, এর মধ্যে কেবল দু'শ্রেণীর মাল বাদশাহের জন্য হালাল- (১) ওয়ারেসীর মাল অথবা সেই মাল, যার কোন ওয়ারিস সাব্যস্ত না হয় এবং (২) ওয়াকফের মাল, যার কোন মুতাওয়াল্লী নেই। এসব খাত ছাড়া যত খরচ ও জরিমানা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া হয় এবং উৎকোচের অর্থ, সবগুলো হারাম। অতএব যদি বাদশাহ কোন ফেকাহ্‌বিদ প্রমুখের জন্যে কোন জায়গীর কিংবা পুরস্কার কিংবা উপহার দেয়, তবে তা আট অবস্থার বাইরে নয়- হয় জিযিয়ার আমদানী থেকে প্রদান করবে না হয় বেওয়ারিস ওয়ারিসী সম্পত্তি থেকে, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে, নিজের খাস মালিকানা থেকে, নিজের ক্রয় করা মালিকানা থেকে, মুসলমানদের কাছ থেকে, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী থেকে, কোন ব্যবসায়ী থেকে অথবা খাস ধনভান্ডার থেকে বরাদ্দ করবে। এখন প্রত্যেকটির অবস্থা শুনা দরকার।

প্রথমঃ জিযিয়া, যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয় এবং একভাগ নির্দিষ্ট খরচের জন্যে রাখা হয়। যদি বাবদশাহ এই এক ভাগ থেকে কিংবা চার ভাগ থেকে দেয় এবং পরিমাণও সাবধানতা সহকারে নির্ধারণ করে, তবে এই অর্থ ফেকাহ্‌বিদ প্রমুখের জন্যে হালাল এই শর্তে যে, মাথাপিছু এক দীনার অথবা চার দীনার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বার্ষিকের চেয়ে বেশী হবে না। কেননা, এর পরিমাণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য বাদশাহ যে কোন এক উক্তি অনুযায়ী আমল করতে পারে এই শর্তে যে, যে যিম্মীর কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়, সে যেন কোন নিশ্চিত হারাম পেশায় নিয়োজিত না থাকে।

দ্বিতীয় ঃ ওয়ারিসী মাল ও বেওয়ারিস মাল। এগুলোও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত, যে ব্যক্তি এই মাল ছেড়ে গেছে, তার সব মাল না কম মাল হারাম ছিল। এর বিধান পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। মাল হারাম না হলে দেখতে হবে যাকে দেয়া হচ্ছে, তাকে দেয়া মঙ্গলজনক কিনা। মঙ্গলজনক হলে কতটুকু মঙ্গলজনক?

তৃতীয় ঃ ওয়াকফের মাল। ওয়ারিসী মালে যে সব বিষয় বিবেচ্য, এখানেও তাই বিবেচ্য। অতিরিক্ত বিষয়, ওয়াকফকারীর শর্তও দেখতে হবে যে, তা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না।

চতুর্থ ঃ বাদশাহের আবাদ করা ভূমি। এখানে বিবেচ্য বিষয় হল, ভূমি আবাদ করার সময় বাদশাহ মজুরদেরকে মজুরি দিয়েছে কিনা এবং হালাল মাল থেকে দিয়েছে কিনা। বলপূর্বক আবাদ করিয়ে থাকলে বাদশাহ সে ভূমির মালিক হয়নি এবং সেটা হারাম। আর হারাম মাল থেকে মজুরি দিয়ে থাকলে সে ভূমি সন্দিগ্ধ, যার বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম ঃ বাদশাহের ক্রয় করা সম্পত্তি। এর মূল্য হারাম মাল দ্বারা পরিশোধ করে থাকলে হারাম এবং সন্দিগ্ধ মাল দ্বারা পরিশোধ করলে সন্দিগ্ধ হবে।

ষষ্ঠ ঃ মুসলমানদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী অথবা যে মালে গনীমত ও জরিমানা একত্রিত করে, তার কাছ থেকে নেয়া। এই মাল নিঃসন্দেহে হারাম। এরূপ মাল থেকে পুরস্কার, ভাতা কিংবা উপহার গ্রহণ করবে না। এ যুগে অধিকাংশ জায়গীর এমনি ধরনের, কিন্তু ইরাকের যমীন এরূপ নয়।

সপ্তম ঃ এরূপ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেয়া, যে স্বয়ং বাদশাহের সাথে লেনদেন করে, অন্য কারও সাথে করে না। তার মাল রাজকীয় ধনভাণ্ডারের মালের মতই। আর যদি অন্যের সাথে বেশী লেনদেন করে, তবে বাদশাহের লেখা অনুযায়ী যা দেবে, তা বাদশাহের কাছে পাওনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে। এর বিনিময় হারাম দ্বারা শোধ করলে হারাম হবে এবং এর বিধান পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অষ্টম ঃ খাস ধনভাণ্ডার থেকে নেয়া কিংবা এমন কর্মচারীর কাছ থেকে নেয়া, যার কাছে হালাল ও হারাম উভয়ই সঞ্চিত হয়। বাদশাহের আমদানী হারাম ছাড়া কিছু না থাকলে নিশ্চিত হারাম হবে। যদি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে যে, শাহী ধনভাণ্ডারে হারাম হালাল উভয়ই আছে এবং যা দেয়া হচ্ছে তা হালাল কিংবা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে কেউ কেউ বলেন, যে বস্তু নিশ্চিতরূপে হারাম নয়, তা গ্রহণ করা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, হালাল বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, সন্দেহ কখনও হালাল হয় না। এই উভয় মতই বাড়াবাড়ি। মাঝামাঝি মত তাই, যা আমরা লেখেছি। অর্থাৎ, শাহী মাল অধিকাংশ হারাম হলে গ্রহণ করা হারাম।

শাহী ভাণ্ডারে হালাল হারাম উভয় প্রকার মাল থাকলে এবং যা দেয়া হয়, তার হারাম হওয়া প্রমাণিত না হলে যারা তা গ্রহণ করা জায়েয বলেন, তারা প্রমাণস্বরূপ বলেন, অনেক সাহাবী জালেম বাদশাহদের যমানা দেখেছেন এবং তাদের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত আবু আইউব আনসারী, জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক, মেসওয়ার ইবনে মাখরামা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সেমতে হযরত আবু হোরায়রা এবং আবু সায়ীদ (রাঃ) মারওয়ান ইবনে হাকাম ও ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন এবং অনেক তাবেয়ীও গ্রহণ করেছেন; যেমন শা'বী, ইবরাহীম, হাসান বসরী ও ইবনে আবী লায়লা। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হারূন রশীদের কাছ থেকে এক দফায় হাজার দীনার গ্রহণ করেছিলেন এবং ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফাগণের কাছ থেকে অনেক ধন-সম্পদ নেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বাদশাহ্ তোমাকে যা দেয়, তা কবুল কর। সে তোমাকে হালাল থেকেই দেয়। পক্ষান্তরে যাঁরা রাজকীয় দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা পরহেযগারীর ভিত্তিতেই অস্বীকার করেছেন। তাঁরা আশংকা করেছেন, কোথাও এমন মাল না এসে যায় যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হালাল নয় এবং দ্বীনদারী বরবাদ করার কারণ হয়ে যায়। হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়সকে একবার বললেন ঃ মনের খুশীতে দিলে দান গ্রহণ কর। দান যদি তোমার দ্বীনদারীর বিনিময় হয়ে যায়, তবে তা বর্জন কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ কেউ আমাদেরকে কোন দান দিলে আমরা কবুল করে নেই আর না দিলে সওয়াল করি না। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে কিছু দিলে তিনি চুপ করে থাকতেন, আর না দিলে কিছুই বলতেন না। হযরত মসরূক (রহঃ) বলেন ঃ সদাসর্বদা দান গ্রহণকারীরা ক্রমান্বয়ে হারাম দান গ্রহণ করতে শুরু করবে। নাফে' হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মুখতার তাঁর কাছে ধন-দৌলত প্রেরণ করলে তিনি তা কবুল করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমি কারও কাছে সওয়াল করি না এবং আল্লাহ আমাকে যা দেন, তা প্রত্যাখ্যান করি না। নাফে আরও বর্ণনা করেন, ইবনে মুয়াম্মার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে ষাট হাজার দেরহাম প্রেরণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা বিলিয়ে দেন। এর পর জনৈক সওয়ালকারী আগমন করলে তিনি যাদেরকে দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কর্জ করে সওয়ালকারীকে দেন। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার কাছে গমন করলে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমি আপনাকে এমন দান দেব, যা ইতিপূর্বে কোন আরবকে দেইনি এবং ভবিষ্যতেও দেব না। এর পর তিনি চার লক্ষ দেরহাম পেশ করলেন। হযরত ইমাম হাসান তা কবুল করে নিলেন। হাবীব ইবনে আবু সাবেত বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রদত্ত মুখতারের উপঢৌকন দেখেছি। তাঁরা উভয়েই সেই উপঢৌকন কবুল করে নেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে উপঢৌকন কি ছিল? তিনি বললেন ঃ নগদ অর্থ ও বস্ত্র। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) এরশাদ করেন, তোমার কোন বন্ধু যদি রাজকর্মচারী কিংবা ব্যবসায়ী হয়– যে সুদ থেকে বেঁচে থাকে না, সে যদি তোমাকে ভোজের দাওয়াত করে অথবা কোন বস্তু দেয়, তবে তা কবুল করে নাও। এটা জায়েয। গোনাহ্ ও শাস্তি তার যিম্মায় থাকবে। সুদ গ্রহীতার ক্ষেত্রে যখন কবুল করা প্রমাণিত হল, তখন জালেমের ক্ষেত্রেও তাই হবে। কেননা, উভয়ের অবস্থা একই রূপ। হযরত ইমাম জাফর সাদেক নিজের পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইমাম হোসাইন (রাঃ) হযরত আমীর মোয়াবিয়ার উপঢৌকন কবুল করতেন। হাকীম ইবনে জোবায়র (রাঃ) বলেন ঃ আমি হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ফোরাতের নিম্নাঞ্চলের ওশর আদায়ের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আদায়কারীদের কাছে এই বলে লোক পাঠালেন, তোমাদের কাছে যা আছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও, খাওয়াও। তারা খাদ্য পাঠিয়ে দিল। তিনি তা খেলেন এবং আমাকেও খাওয়ালেন। হযরত ইবরাহীম নখয়ী বলেন ঃ কাজকর্মচারীদের উপঢৌকন কবুল করায় কোন দোষ নেই। কেননা, তারা শ্রমজীবী। তাদের ধনাগারে ভাল-মন্দ সকল প্রকার মাল থাকে। তারা তোমাকে ভাল মাল থেকেই উপঢৌকন দেবে। দেখ, উপরোল্লিখিত সকলেই জালেম বাদশাহর উপঢৌকন কবুল করেছেন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা এই উপঢৌকন কবুল করেননি তাদের কাজ হারাম হওয়ার দলীল নয়; বরং তারা পরহেযগারীর কারণে কবুল করেননি। যেমন, খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু যর গেফারী প্রমুখ পরহেযগারীর কারণে অনেক হালালও গ্রহণ করতেন না। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কবুল করা থেকে বুঝা যায়, রাজকীয় ধন-সম্পদ কবুল করা জায়েয। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে কবুল করার তুলনায় কবুল না করা অতি উত্তম। জালেম বাদশাহদের মাল গ্রহণ করা যাদের মতে জায়েয, এ পর্যন্ত তাদের বক্তব্য পেশ করা হল।

এই বক্তব্যের জওয়াব, যাদের কবুল করার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদেরই কবুল করতে অস্বীকার করা ও ফেরত দেয়ার কথাও বর্ণিত আছে এবং কবুল করার রেওয়ায়েত অপেক্ষা কবুল না করার রেওয়ায়েত অধিক।

জানা উচিত, রাজকীয় ধনসম্পদ পরহেযগারগণের পক্ষে কবুল করা না করার চারটি স্তর আছে। তন্মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে বাদশাহদের ধনসম্পদ কিছুই কবুল না করা; যেমন পূর্ববর্তী যমানার পরহেযগারগণ করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীন করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বায়তুল মাল থেকে যা কিছু নিয়েছিলেন, সবগুলো হিসাব করে ইন্তেকালের পূর্বে বায়তুল মালে জমা করিয়ে দেন। একবার হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল মালের ধনরাশি বণ্টন করছিলেন, এমন সময় তাঁর এক কন্যা এসে একটি দেরহাম তুলে নেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে ধরার জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমনভাবে ছুটলেন যে, চাদর এক কাঁধ থেকে পড়ে গেল। কন্যা কাঁদতে কাঁদতে গৃহে চলে গেল এবং দেরহামটি মুখের মধ্যে পুরে নিল। হযরত ওমর (রাঃ) তার মুখে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেরহামটি বের করে নিয়ে এলেন এবং যথাস্থানে রেখে বললেন ঃ লোক সকল! এই মাল থেকে ওমর ও তার সন্তানদের ততটুকুই প্রাপ্য, যতটুকু দূরবর্তী ও নিকটবর্তী মুসলমানদের প্রাপ্য। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) একবার বায়তুল মাল ঝাড়ু দিয়ে একটি দেরহাম পান। তিনি সেই দেরহামটি হযরত ওমরের ছোট শিশু পুত্রকে দিয়ে দিলেন। সে সেখানে ঘুরাফেরা করছিল। হযরত ওমর তার হাতে দেরহাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় পেলে? পুত্র বলল ঃ আবু মূসা আমাকে দিয়েছেন। তিনি আবু মূসাকে ডেকে এনে বললেন ঃ তোমার জানা মতে মদীনাবাসীদের কোন গৃহ ওমরের গৃহ অপেক্ষা অধিক হেয় ছিল নাকি? তোমার ইচ্ছা, উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) এমন কেউ না থাক, যে তার হক আমার কাছে তলব করবে না। এ কথা বলে তিনি দেরহামটি বায়তুল মালে রেখে দিলেন, অথচ সেটা হালাল বৈ ছিল না, কিন্তু তাঁর আশংকা ছিল, হয় তো এতটুকু প্রাপ্য তাঁর হবে না। তিনি দ্বীনদারী ও ইযযত রক্ষার্থে নিজের প্রাপ্যের অপেক্ষা কম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে রাজকীয় ধনসম্পদ সম্পর্কে অনেক কঠোর বক্তব্য শুনেছিলেন। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) যখন ওবাদা ইবনে সামেতকে যাকাত আদায় করার জন্যে প্রেরণ করেন, তখন বললেন ঃ হে আবুল ওলীদ! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি কেয়ামতের দিন একটি উষ্ট্রীকে কাঁধে বহন করে আনবে, আর উষ্ট্রী উচ্চৈস্বরে চীৎকার করতে থাকবে অথবা একটি গাভীকে আনবে, যেটি প্রচণ্ড শব্দে হাম্বা রব করতে থাকবে, অথবা একটি ছাগলকে আনবে, সেটি চেঁচাতে থাকবে। ওবাদা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপই কি হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ– এরূপই হবে। তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করেন, তার অবস্থা ভিন্ন। ওবাদা আরজ করলেন ঃ যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি কখনও কোন বস্তুর অসহায় বাহক হব না। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে এ ভয় আমি করি না, কিন্তু আমার আশংকা, তোমরা ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাদীসে বায়তুল মালের অর্থ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এই সম্পদের ব্যাপারে আমি নিজেকে এমন উপলব্ধি করি, যেমন এতীমের সম্পত্তির ওলী হয়ে থাকে। প্রয়োজন না হলে আমি এ সম্পদ থেকে দূরে থাকি, আর প্রয়োজন হলে নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে এ থেকে খাই। বর্ণিত আছে, হযরত তাউসের পুত্র তাঁর পক্ষ থেকে একটি জাল পত্র লেখে খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে দিলে খলীফা তাকে তিনশ' আশরাফী দিয়ে দিলেন। এই ঘটনা অবগত হয়ে হযরত তাউস নিজের একখণ্ড ভূমি বিক্রয় করে খলীফার কাছে তিনশ' আশরাফী পাঠিয়ে দিলেন। অথচ তিনি ছিলেন খ্যাতনামা ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। এ স্তরটি পরহেযগারীর শ্রেষ্ঠতম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বাদশাহদের ধনসম্পদ গ্রহণ করা, কিন্তু তখন, যখন জানা যায় যে, যা গ্রহণ করা হচ্ছে তা হালাল পন্থায় অর্জিত। এখানে বাদশাহদের মালিকানায় অন্য হারাম মাল থাকলেও তা ক্ষতিকর হবে না। অধিকাংশ পরহেযগার সাহাবীগণের গ্রহণ করা এই নীতির ভিত্তিতেই ছিল। উদাহরণতঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যধিক পরহেযগারী করতেন। তিনি না জেনে না শুনে কিরূপে শাহী ধনসম্পদ কবুল করতে পারতেন? তিনি তো বাদশাহদেরকে সর্বাধিক অপছন্দ এবং তাদের ধনসম্পদের সর্বাধিক সমালোচনা করতেন। সেমতে একবার রাজকর্মচারী ইবনে আমেরের কাছে লোকজন সমবেত ছিল। হযরত ইবনে ওমরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে আমের রাজকর্মচারী হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে দণ্ডিত হওয়ার ভয় ব্যক্ত করছিলেন। লোকেরা বলল ঃ আশা করা যায়, আপনি আল্লাহর কাছে দণ্ডিত না হয়ে পুরস্কৃত হবেন। কেননা, আপনি কূপ খনন করিয়েছেন, হাজীদের কাফেলাকে পানি পান করিয়েছেন এবং এই কাজ করেছেন, সেই কাজ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) চুপচাপ শুনলেন। ইবনে আমের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এসব কথা তখন সত্য হবে, যখন উপার্জন ভাল হয় এবং ব্যয়ও সুষ্ঠুভাবে করা হয়। তোমাকে তো ভুগতেই হবে। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি জওয়াবে বললেন ঃ দূষিত বিষয় গোনাহের বিনিময় হতে পারে না। তুমি বসরার শাসনকর্তা ছিলে। আমার ধারণায় তুমি তাতে পাপই অর্জন করেছ। ইবনে আমের আরজ করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

لايقبل الله صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ওযু ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং খেয়ানতের মাল থেকে সদকা কবুল করেন না।

হযরত ইবনে ওমরের এ উক্তি সেই মালের ব্যাপারে ছিল, যা ইবনে আমের খয়রাতে ব্যয় করেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে একবার তিনি বললেন ঃ যেদিন থেকে রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে, আমি পেট ভরে আহার করিনি। একবার ইবনে আমের হযরত ইবনে ওমরের গোলাম নাফে'কে ত্রিশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা, ইবনে আমেরের দেরহাম আমাকে ফেতনায় না ফেলে দেয়। এই বলে তিনি নাফে'কে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে দুনিয়া আকৃষ্ট করেনি– হযরত ইবনে ওমর ছাড়া। তাঁকে দুনিয়া আকৃষ্ট করতে পারেনি। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবনে ওমরের মত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারে না যে, তিনি হালাল না জেনেই কোন মাল কবুল করে থাকবেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে বাদশাহের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তা ফকীর ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। যে মালের কোন নির্দিষ্ট মালিক নেই, শরীয়তে তার বিধান এরূপই। বাদশাহ যদি এমন হয় যে, তার কাছ থেকে না নেয়া হলে সে নিজে বণ্টন করবে না; বরং তা জুলুমের সহায়তায় ব্যয় করবে, তবে তার কাছে মাল রেখে দেয়ার চেয়ে গ্রহণ করে বণ্টন করে দেয়া উত্তম। কোন কোন আলেমের অভিমত তাই। অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ এই প্রকারেই বাদশাহদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতেন। এই জন্যেই হযরত ইবনে মোবারক বলেন ঃ আজ যারা শাহী দান গ্রহণ করে এবং হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে, তারা তাঁদের অনুসরণ করে না। কেননা, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা সবই বণ্টন করে দিয়েছেন। এমন কি ষাট হাজার দেরহাম বণ্টন করার পরও অন্য একজন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সওয়ালকারীর জন্যে মজলিস থেকেই কর্জ করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও তাই করেছেন। জাবের ইবনে যায়েদও গ্রহণ করে তা খয়রাত করে দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ বাদশাহদের কাছ থেকে গ্রহণ করে বণ্টন করে দেয়া তাদের কাছে থাকতে দেয়ার তুলনায় আমার কাছে ভাল মনে হয়। ইমাম শাফেয়ী হারুন রশীদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন, তাও কয়েক দিনের মধ্যেই খয়রাত করে দিয়েছিলেন, নিজের জন্যে একটি দানাও রাখেননি।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, মাল হালাল হওয়ার প্রমাণ নেই, তা বণ্টনের উদ্দেশে নয়; বরং নিজের ভোগ করার জন্যে গ্রহণ করা, কিন্তু এমন বাদশাহ্র কাছে থেকে গ্রহণ করা, যার অধিকাংশ মাল হালাল। চার জন খোলাফায়ে রাশেদীনের পরও সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগের খলীফাগণ এরূপই ছিলেন। তাদের অধিকাংশ মাল হারাম ছিল না। এর দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর এরশাদ– বাদশাহ্ হালাল পন্থায় যে মাল প্রাপ্ত হয় তাই বেশী। এই চতুর্থ স্তরকে একদল আলেম জায়েয বলেছেন। আমরা নিষেধ তখন করি, যখন হারামের অংশ বেশী বলে অনুমিত হয়।

উপরোক্ত স্তরসূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর একথা বুঝা সহজ যে, এ যুগের জালেম বাদশাহদের জায়গীর ও ভাতা তেমন নয়, যেমন পূর্বে ছিল। কেননা, এ যুগের বাদশাহদের মাল সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ হারাম। হালাল ছিল কেবল যাকাত, ফায় ও গনীমতের খাত। এ যুগে এগুলোর অস্তিত্ব নেই। এখন বাকী রয়েছে জিযিয়া, যা জুলুমের মাধ্যমে আদায় করা হয়। ফলে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। এছাড়া পূর্বেকার জালেম বাদশাহরা সাহাবী ও তাবেয়ীদের যমানার নিকটবর্তী ছিল বিধায় জুলুম সম্পর্কে অধিক সচেতন ছিল। তারা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সন্তুষ্টিতে আগ্রহী ছিল। তারা চাওয়া ছাড়াই উপঢৌকন ইত্যাদি তাঁদের খেদমতে পাঠিয়ে দিত এবং কবুল করলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করত। তাঁরা বাদশাহদের কাছ থেকে নিয়ে ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাঁদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে, শাসকদের মন তাকেই কিছু দিতে চায়, যে তাদের খেদমত করতে পারে, দল বৃদ্ধি করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, দরবারে শরীক হয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করতে পারে, দোয়া করতে পারে, সদাসর্বদা স্তুতি বাক্য পাঠ করতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পারে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশংসা করতে পারে। আর যারা এসব যিল্লতী সম্পাদন করতে সম্মত নয় তাদের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, শাসকরা তাদেরকে একটি পয়সাও দেবে না, যদিও সমসাময়িক ইমাম উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ীই হয়। এসব কারণে বর্তমান যুগের শাসকদের কাছ থেকে হালাল মাল হলেও নেয়া জায়েয নয়। আর হারাম অথবা সন্দিগ্ধ মাল হলে তো নিঃসন্দেহেই নেয়া জায়েয নয়। এখন যে কেউ শাসকদের মাল গ্রহণ করে এবং নিজেকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সাথে তুলনা করে, সে কর্মকারকে ফেরেশতাদের সাথে তুলনা করে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বাদশাহদের আমদানীর খাতসমূহের মধ্যে কোন্‌টি হালাল ও কোন্‌টি হারাম। এখন যদি কোন ব্যক্তি হালাল খাত থেকে তার হক পরিমাণে ঘরে বসে পায়, কারও তোষামোদ ও খেদমত করার প্রয়োজন না হয়, বাদশাহদের প্রশংসা করতে না হয় এবং তাদের মতলবে একমত হতে না হয় তবে সেই মাল গ্রহণ করা হারাম হবে না, কিন্তু কয়েক কারণে মাকরূহ হবে, যা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

পরিমাণ ও গুণ ঃ কতক মালের প্রাপক নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ওয়াকফের মাল, যাকাতের মাল, ফায়-এর এক পঞ্চমাংশ ও গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। কতক মালের মালিক স্বয়ং বাদশাহ, যেমন তার চাষযোগ্য ভূমি অথবা তার ক্রীত সম্পত্তি। বাদশাহের মালিকানাধীন এসব সম্পদ থেকে যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দিতে পারে। তাই আমরা সে সব সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো জনহিতকর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট। যেমন ফায়-এর চার-পঞ্চমাংশ এবং বেওয়ারিস ত্যাজ্য সম্পত্তি। এসব সম্পদ তাদেরকেই দেয়া উচিত, যাদেরকে দিলে জনগণের কল্যাণ হয় অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে অক্ষম। যে ব্যক্তি ধনী এবং যাকে দিলে জনগণের কোন কল্যাণ হয় না, বায়তুল মালের অর্থ তাকে না দেয়া উচিত। এতে আলেমগণের মতভেদ থাকলেও না দেয়াটাই বিশুদ্ধ। হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি থেকে বুঝা যায়, বায়তুল মালের অর্থে প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার রয়েছে মুসলমান হওয়ার কারণে। এতদসত্ত্বেও তিনি সকল মুসলমানের মধ্যে অর্থ বন্টন করতেন না; বরং তাদেরকেই দিতেন, যার উপকার মুসলমানরা পায় এবং যে এই কাজ না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে উপার্জনে মশগুল হলে সে কাজ হতে পারে না, এরূপ ব্যক্তির হক প্রয়োজন পরিমাণে বায়তুল মালে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ নীতি অনুযায়ী প্রয়োজন পরিমাণে বায়তুল মালে হক রয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আলেম, যাদের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন, ফেকাহ্, হাদীস ও তফসীরের আলেম এবং এগুলোর শিক্ষক ও তালেবে এলেম। কেননা, তারা প্রয়োজন পরিমাণে না পেলে এলেম অর্জন করতে পারবে না। সে সব কর্মচারীও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের কর্ম দুনিয়ার উপকারের সাথে জড়িত। যেমন, সেনাবাহিনীর লোকজন, যারা দেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। দেশের চিকিৎসকগণও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের এবং এ ধরনের অন্যান্য আলেমগণের ভাতা বায়তুল মাল থেকে দেয়া উচিত, যাতে কেউ পারিশ্রমিক ছাড়া চিকিৎসা করাতে চাইলে তাদের দ্বারা করাতে পারে। তাঁদের মধ্যে প্রয়োজন থাকা শর্ত নয়; বরং ধনী হলেও তাঁদেরকে ভাতা দিতেন, অথচ তাঁদের সকলের প্রয়োজন ছিল না। ভাতার পরিমাণও নির্দিষ্ট নয়; বরং শাসনকর্তার অভিমতের উপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা ততটুকু দিতে পারবেন, যদ্দ্বারা ধনী হয়ে যায় এবং যাকে ইচ্ছা প্রয়োজন পরিমাণে দিতে পারবেন। সাময়িক উপযোগিতা ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী এরূপ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। সেমতে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার কাছ থেকে এক দফায় চার লাখ দেরহাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুসংখ্যক লোককে বার্ষিক বার হাজার দেরহাম দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি কিছু লোককে দশ হাজার এবং কিছু লোককে ছয় হাজার দেরহাম করেও দিতেন।

সারকথা, বায়তুল মাল উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের হক এবং তাদের মধ্যে বিনাদ্বিধায় বণ্টন করা উচিত। অনুরূপভাবে এই মাল থেকে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে উপঢৌকন ও পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করার ক্ষমতাও বাদশাহের আছে, কিন্তু এতে উপযোগিতার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যখন কোন বিজ্ঞ ও বীর পুরুষকে পুরস্কৃত করা হবে, তখন অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে এবং অনুরূপ কাজ করতে আগ্রহী হবে। এসব বিষয় বাদশাহের ইজতিহাদের সাথে জড়িত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জালেম বাদশাহদের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমতঃ জালেম শাসক শাসন ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। সে হয় পদত্যাগ করবে না হয় তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় সে যখন প্রকৃতপক্ষে শাসকই নয়, তখন তার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করা কিরূপে দুরস্ত হবে? দ্বিতীয়ত জালেম শাসক তার অর্থ সকল হকদারকে দেয় না। এমতাবস্থায় তার কাছ থেকে দু'একজন কিরূপে নিতে পারে? এর পর কথা হল, দু'একজন তাদের অংশ পরিমাণে নিলে দুরস্ত হবে কিনা? না মোটেই না নেয়া অথবা যা-ই পাওয়া যায় তা-ই নেয়া জায়েয। প্রথম অবস্থায় আমাদের অভিমত হচ্ছে, কেউ আপন অংশ পরিমাণে নিলে তাকে নিষেধ করা যাবে না। কেননা, জালেম শাসক শক্তিমান হলে তাকে বরখাস্ত করা কঠিন হয়ে থাকে এবং অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করলে অসহনীয় ফাসাদ দেখা দেয়। ফলে জালেম শাসককেই থাকতে দেয়া এবং তার আনুগত্য করা জরুরী হয়ে যায়। আজকাল তো 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই কার্যকর। জোরওয়ালারা যার বয়াত করে নেয় সেই খলীফা। অতএব যা পাওয়া যায় তাই নেয়া কেয়াসসম্মত। অবশিষ্ট যারা না পায় তাদের প্রতি জুলুম থেকে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জালেম শাসকের সাথে মেলামেশার স্তর

প্রকাশ থাকে যে, জালেম শাসকদের সাথে তিন প্রকার অবস্থা হতে পারে। এক, তাদের কাছে যাওয়া। এটা কম মন্দ অবস্থা। দুই, জালেম শাসকদের তোমার কাছে আসা। এটা অপেক্ষাকৃত কম মন্দ অবস্থা। তিন, তাদের থেকে সম্পূর্ণ সরে থাকা। যেমন, তুমিও তাদেরকে দেখবে না এবং তারাও তোমাকে দেখবে না। এটা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত অবস্থা। এখন প্রত্যেক অবস্থার গুণাগুণ আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

জালেম শাসকদের কাছে যাওয়া ঃ এ সম্পর্কে হাদীসে অনেক কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টি যে কত নিন্দনীয়, নিম্নোদ্ধৃত বাণীসমূহ থেকে তা সহজেই বুঝা যাবে। রসূলে করীম (সাঃ) জালেম শাসকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم او كاد ان يسلم ومن وقع معهم فى دنياهم فهم منهم -

অর্থাৎ, যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সে মুক্তি পাবে। যে তাদের থেকে পৃথক থাকবে সে নিরাপদ থাকবে অথবা নিরাপত্তার নিকটবর্তী বলে গণ্য হবে। আর যে তাদের সাথে তাদের দুনিয়াতে লিপ্ত হবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।

উদ্দেশ্য, যে তাদের থেকে সরে থাকবে, সে তাদের গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে, কিন্তু তাদের উপর আযাব নাযিল হলে সে আযাব থেকে অব্যাহতি পাবে না। কারণ, সে প্রতিবাদ করেনি এবং সৎকাজের আদেশ বর্জন করেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমার পরে এমন শাসক হবে, যারা মিথ্যা বলবে এবং জুলুম করবে। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং তাদের জুলুমে সহায়তা করবে, সে আমা থেকে মুক্ত এবং আমি তার থেকে মুক্ত। সে আমার হাউজে অবতীর্ণ হবে না। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ابغض القراء الى الله تعالى يزورون الامراء -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত সে সকল ক্বারী, যারা শাসকদের দরবারে গিয়ে উপনীত হয়।

এক হাদীসে আছে– শাসকদের মধ্যে উত্তম তারা, যারা আলেমগণের নিকট যায়। আর আলেমগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা যারা শাসকদের কাছে যায়। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

العلماء امناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم -

অর্থাৎ, আলেমগণ আল্লাহর বান্দাদের উপর রসূলগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, যে পর্যন্ত তারা শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা না করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে রসূলগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তোমরা এ ধরনের আলেম থেকে হুঁশিয়ার থাক এবং দূরে সরে থাক।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞানীগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ ফেতনার জায়গা থেকে দূরে থাক। প্রশ্ন করা হল ঃ ফেতনার জায়গা কি? তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা। তোমাদের কেউ শাসকবর্গের কাছে গেলে মিথ্যা কথায় তাদেরকে সত্যবাদী বলে এবং যে গুণ তাদের মধ্যে নেই তা বর্ণনা করে।

হযরত আবু যর (রাঃ) সালামাকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বললেন ঃ হে সালামা! বাদশাহদের দরজায় যেয়ো না, গেলে তুমি তাদের দুনিয়া থেকে যা পাবে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তারা তোমার দ্বীন থেকে নিয়ে নেবে। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ দোযখে একটি উপত্যকা আছে, যাতে কেবল সেই কারীদের স্থান হবে, যারা বাদশাহদের কাছে যাতায়াত করে। আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নয়, যে কোন রাজকর্মচারীর নিকট স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে যাতায়াত করে। সমনূন (রহঃ) বলেন ঃ আলেমের জন্যে এটা খুব মন্দ ব্যাপার যে, তার মজলিসে এসে তাকে না পেয়ে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে– তিনি কোথায় আছেন? তখন জওয়াবে বলা হয়– তিনি শাসকের কাছে আছেন। যদি কোন আলেমকে দুনিয়ার সাথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মহব্বত রাখতে দেখ, তবে তাকে দ্বীনদারীতে দোষী মনে করবে। আমি এই নীতিবাক্য আগে শুনতাম, কিন্তু এখন নিজে তা পরীক্ষা করে নিয়েছি। অর্থাৎ, আমি যখন বাদশাহের কাছে গেছি, তখন তাদের দরবার থেকে বের হওয়ার পর আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতি মোহ অনুভব করেছি। অথচ আমি বাদশাহের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলি এবং তার খেয়াল-খুশীর সমর্থন করি না।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ কারী আবেদ যদি শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তা হয় মোনাফেকী, আর যদি ধনীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তা হয় রিয়া। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ে ভিড় বৃদ্ধি করে, তাকে তাদের মধ্যেই গণ্য করা হয়। এর অর্থ জালেমদের দল বৃদ্ধি করলে তাকে জালেমই বলা হবে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন বাদশাহের কাছে যায়, তখন তার দ্বীন তার কাছেই থাকে, কিন্তু যখন সেখান থেকে ফিরে আসে, তখন দ্বীন বিদায় হয়ে যায়। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ সে বাদশাহকে এমন কথা বলে সন্তুষ্ট করে, যে কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করার পর জানতে পারলেন, সে এক সময় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কর্মচারী ছিল। তিনি কালবিলম্ব না করে তাকে বরখাস্ত করলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমি তো তার আমলে অল্প কয়েক দিন কাজ করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তার সংসর্গে একদিন অথবা কয়েক মুহূর্ত থাকাই অকল্যাণ ও অনর্থ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যতই শাসকদের নৈকট্যশীল হয়, ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব তেলের ব্যবসা করতেন এবং বলতেন ঃ এই ব্যবসার কারণে শাসকদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ওহায়ব (রহঃ) বলেন ঃ যেসব মানুষ বাদশাহদের কাছে যায় তারা উম্মতের জন্যে জুয়াড়ীদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। যুবায়রী (রহঃ) যখন বাদশাহের সাথে মেলামেশা শুরু করলেন, তখন তাঁর জনৈক ধর্মীয় ভাই তাঁর কাছে এই মর্মে পত্র লেখলেন ঃ হে আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তোমার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে রহমতের দোয়া করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমার পরিচিত জনের কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তুমি বড় প্রবীণ। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত তোমার ওজনও বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তিনি তাঁর কিতাবের জ্ঞান তোমাকে দান করেছেন এবং তাঁর রসূলের সুন্নত শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আলেমগণের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُوْنَهٗ ـ

অর্থাৎ, স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা লোকদের কাছে অবশ্যই এই কিতাব বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।

মনে রেখো, যে কাজ তুমি করছ, তার সামান্যতম অনিষ্ট এই যে, তুমি জালেমের ভীতি দূর করে দিয়েছ। আপন সান্নিধ্য দ্বারা সে ব্যক্তির সামনে ভ্রষ্টতার পথ সহজ করে দিয়েছ, যে কোন হক আদায় করেনি এবং কোন কুকর্ম বর্জন করেনি। জালেমরা তোমাকে নৈকট্যশীল করে আপন জুলুমের কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছে, যাতে তাদের জুলুমের যাঁতাকল তোমার চারপাশে ঘুরে। তুমি তাদের জন্যে সেতু হয়ে গেছ, যাতে বিপদে তোমার উপর দিয়ে পার হওয়া যায়। তুমি তাদের ভ্রষ্টতার স্তর অতিক্রম করার জন্যে সিঁড়ির মত ব্যবহৃত হচ্ছ। তোমার কারণে তারা আলেমদের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করবে এবং মূর্খদের মন নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। অতএব তারা যতটুকু তোমার নষ্ট করেছে, তার মোকাবিলায় তোমার ফায়দা নগণ্য। তুমি কি এই আয়াতের প্রতীক হতে ভয় কর না যে, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ الخ অতঃপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল অযোগ্যরা, যারা নামায বিনষ্ট করল! মনে রেখো, তোমার লেনদেন এমন এক সত্তার সাথে, যিনি তোমার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত নন এবং তোমার ক্রিয়াকর্ম থেকে গাফেলও নন। এখন তুমি তোমার রুগ্ন দ্বীনদারীর চিকিৎসা কর এবং পাথেয় প্রস্তুত কর। কারণ, সফর দূরদূরান্তের এবং আল্লাহ তাআলার কাছে কোন বিষয় পৃথিবীতে ও আকাশে গোপন নয়। ওয়াস সালাম।

এসব হাদীস ও জ্ঞানীগণের উক্তি থেকে জানা যায়, বাদশাহদের সাথে মেলামেশায় কি ধরনের ফেতনা ফাসাদ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিম্নে আমরা ফেকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এসবের বিবরণ পেশ করব, যদ্দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই মেলামেশার মধ্যে কোন্‌টি হারাম, কোনটি মাকরূহ ও কোন্‌টি বৈধ?

যে ব্যক্তি বাদশাহের কাছে যায়, সে নিজের কর্মের দ্বারা, মৌন সম্মতির দ্বারা, কথাবার্তার দ্বারা অথবা বিশ্বাস দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানীর সম্মুখীন হয়। কর্ম দ্বারা নাফরমানী এভাবে যে, বাদশাহের কাছে যাওয়া অধিকাংশ অবস্থায় জবরদখলকৃত ঘরে প্রবেশের মত হয়ে থাকে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষমতার মসনদই তো জোরপূর্বক দখলকৃত। জবরদখল করা কোন ঘরে প্রবেশ করা তো নিঃসন্দেহে হারাম। এখানে যদি বলা হয়, এটা হালকা বিষয়, যা মানুষ সাধারণতঃ মার্জনা করে থাকে; যেমন খোরমা অথবা একখণ্ড রুটি তুলে নিলে কেউ আপত্তি করে না, তবে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়– এমন বস্তুর মধ্যে মার্জনা হয়ে থাকে। জবরদখলকৃত বস্তুতে সাধারণতঃ মার্জনা হয় না। আর যদি জালেম নিজের মালিকানাধীন জায়গায় থাকে, তবুও তার কাছে যাওয়া হারাম। কেননা, তার জায়গা হারাম উপায়ে অর্জিত। যদি ধরে নেয়া যায়, তার জায়গা তাঁবু ইত্যাদি হালাল মাল দ্বারা অর্জিত, তবে এমতাবস্থায় কেবল সম্মুখে যাওয়া এবং আসসালামু আলাইকুম বলা পর্যন্ত গোনাহগার হবে না, কিন্তু যদি জালেমকে তোয়াজ করা হয় অথবা তার সামনে নত হয়, তবে তাতে নিঃসন্দেহে গোনাহ্ হবে।

মৌন সম্মতি দ্বারা নাফরমানী এভাবে হয় যে, যে জালেম বাদশাহের দরবারে যাবে, সে রেশমী ফরশ, সোনার পাত্র, বাদশাহ এবং বাদশাহের গোলামদের রেশমী বস্ত্র ইত্যাদি হারাম বস্তু সামগ্রী দেখবে। গোনাহের বস্তু সামগ্রী দেখে যে চুপ থাকে, সে সেই গোনাহে শরীক হয়ে যায়। এছাড়া তাদের অশ্লীল কথাবার্তা, মিথ্যা ভাষণ, গালি-গালাজ, পীড়াদায়ক উক্তি, গীবত ইত্যাদি হারাম বিষয়াদি শুনে চুপ থাকা হারাম। সে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ওয়াজিব কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়ে চুপ করে থাকে। এটা গোনাহ। যদি বলা হয়, সে ভয়ে কিছু বলে না, তাই এটা ওযর, তবে জওয়াব, তার সেখানে যাওয়ারই কি প্রয়োজন ছিল? অবৈধ কাজ করার প্রয়োজন কেবল শরীয়তসম্মত ওযর দ্বারা হতে পারে। অতএব সে সেখানে না গেলে এবং সেগুলো না দেখলে অসৎ কাজে নিষেধ করাও তার কর্তব্য হত না। সুতরাং উপরোক্ত ওযর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই আমরা বলি, যে ব্যক্তি জানে যে, অমুক জায়গায় অনাচার হচ্ছে যা দূর করা সম্ভবপর নয়, সেখানে তার যাওয়া জায়েয নয়। কারণ, সেখানে গেলে অনাচার দেখেও চুপ করে থাকতে হবে। কাজেই দেখা থেকেই বিরত থাকা উচিত।

জালেম বাদশাহের জন্যে এরূপ দোয়া করা জায়েয ঃ আল্লাহ আপনাকে পুণ্য দান করুন, অথবা আল্লাহ আপনাকে সৎ কাজের তওফীক দান করুন অথবা আল্লাহ পাক তাঁর আনুগত্যে আপনার হায়াত দরাজ করুন। অথবা এমনি ধরনের দোয়া করবে, কিন্তু প্রভু বলে দীর্ঘায়ু ও সমস্ত নেয়ামত পূর্ণ করার দোয়া করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তার মুখ থেকে কোন ভ্রান্ত কথা বের হলেও এরূপ বলা জায়েয নয় যে, হুযর (সাঃ) যথার্থই এরশাদ করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ

من دعا لظالم بالبقاء احب ان يعص الله فى ارضه -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি জালেমের জন্যে দীর্ঘায়ুর দোয়া করে, সে চায়, আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী অব্যাহত থাকুক।

এমনিভাবে অতিরঞ্জিত দোয়া করা ও তার প্রশংসা বর্ণনা করা জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পাপাচারীর প্রশংসা করা হলে আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন। এক হাদীসে আছে–

من اكرم فاسقا فقد اعان على هدم الاسلام -

অর্থাৎ, যে ফাসেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সে ইসলামকে বিধ্বস্ত করতে সহায়তা করে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ এক জালেম জনশূন্য জঙ্গলে মরতে থাকলে তাকে পানি পান করানো উচিত কিনা? তিনি বললেন ঃ না; তাকে মরতে দেয়া উচিত। পান পানি করানো তাকে জুলুমে সাহায্য করার নামান্তর। অন্যেরা এ বিষয়ে বলেন, তাকে পানি এতটুকু পান করানো উচিত, যাতে তার দেহে প্রাণ ফিরে আসে।

যেব্যক্তি জালেমকে ভালবাসে, সে যদি জুলুমের কারণে ভালবাসে তবে গোনাহগার হবে। আর যদি অন্য কোন কারণে ভালবাসে, তবে ওয়াজিব তরক করার কারণে পাপী হবে। ওয়াজিব ছিল জালেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। সে উল্টা ভালবাসলো। এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অথবা তিনটি কল্যাণ ও অনিষ্টের বিষয় একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গেলে কল্যাণকর বিষয়ের কারণে তাকে ভালবাসা এবং অনিষ্টকর বিষয়ের কারণে তার সাথে শত্রুতা রাখা উচিত। শত্রুতা ও ভালবাসা কিরূপে একত্রিত হতে পারে, তা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

মোট কথা, দু'টি ওযর ছাড়া বাদশাহদের কাছে যাওয়া জায়েয নয়– এক তাদের কাছ থেকে হাযির হওয়ার পরওয়ানা জারি হলে যাবে এবং দুই, কোন মুসলমান ভাইয়ের উপর থেকে জুলুম দূর করার জন্যে অথবা নিজের উপর জুলুম না হওয়ার নিয়তে যাবে। এসব ওযরের কারণে যাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু শর্ত, মিথ্যা বলবে না এবং প্রশংসা করবে না।

বাদশাহের স্বয়ং কারও কাছে আসা ঃ যদি স্বয়ং জালেম বাদশাহ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে সালামের জওয়াব দেয়া জরুরী এবং তার সম্মানে দাঁড়ানোও হারাম নয়। কেননা, এলেম ও দ্বীনের সম্মান করার কারণে সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সম্মানের বদলে সম্মান করা এবং সালামের বদলে জওয়াব দেয়া উচিত, কিন্তু একান্তে আগমন করলে তার সম্মানে না দাঁড়ানোই উত্তম, যাতে দ্বীনের ইযযত তার কাছে জাহির হয়, জুলুম তার দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সে জানতে পারে যে, আল্লাহ যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাঁর বিশিষ্ট বান্দারাও সেব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যদি জনসমাবেশে মিলিত হবার জন্য আসে, তবে প্রজাদের সন্মুখে বাদশাহর প্রতি সম্মান দেখানো জরুরী। সুতরাং এই নিয়তে দণ্ডায়মান হলে কোন দোষ নেই। এর পর সাক্ষাতের সুযোগে বাদশাহকে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব। যদি সে এমন হারাম কাজ করে, যা হারাম বলে সে জানে না এবং জানিয়ে দিলে সে কোজটি বর্জন করবে বলে আশা করা যায়, তবে সে কাজটি যে হারাম, তা বলে দেয়া ওয়াজিব। আর যেসব বিষয় হারাম বলে সে নিজে জানে; যেমন মদ্যপান, জুলুম করা, সেগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। মোট কথা, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে, তোমার উপদেশ বাদশাহের মধ্যে কার্যকর হবে, তবে তিনটি বিষয় তোমার উপর ওয়াজিব। এক, যে বিষয় বাদশাহ জানে না তা তাকে বলে দেবে। দুই, সে জেনেশুনে যেসব কাজ করে, তার জন্যে তাকে সতর্ক করবে। তিন, যে বিষয়ে সে গাফেল সেদিকে তাকে পথ প্রদর্শন করবে।

মুহাম্মদ ইবনে সালেহ বলেন ঃ আমি হাম্মাদ ইবনে সালমার কাছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তাঁর গৃহে চারটি বস্তু ছাড়া কিছুই নেই। (১) তাঁর বসার চাটাই, (২) তেলাওয়াতের জন্যে একখানি কোরআন শরীফ, (৩) কিতাবের একটি বস্তা এবং (৪) ওযুর লোটা। একদিন যখন আমি তাঁর কাছে ছিলাম, হঠাৎ দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। জানা গেল, শাসক মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান আগমন করেছে। তিনি অনুমতি দিয়ে সে ভিতরে এসে সম্মুখে বসে গেল। সে আরজ করল ঃ ব্যাপার কি, আমি যখনই আপনাকে দেখি ভীত হয়ে পড়ি? হাম্মাদ বললেন ঃ এর কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আলেম যখন তার এলেম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় করে। আর যখন এলেম দ্বারা ধনভাণ্ডার গড়ে তুলতে চায়, তখন সে স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুকে ভয় করে। এর পর মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান চল্লিশ হাজার দেরহাম তাঁর খেদমতে উপহার পেশ করে আরজ করল ঃ এগুলো আপনি আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি বললেন ঃ যাদের উপর জুলুম চালিয়ে তুমি এগুলো অর্জন করেছ, তাদেরকে ফেরত দাও। মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান আরজ করল ঃ আল্লাহর কসম, যে মাল আমি আপনার খেদমতে পেশ করছি, তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি– জুলুম করে কারও কাছ থেকে অর্জন করিনি। হাম্মাদ বললেন ঃ আমার এই মালের কোন প্রয়োজন নেই। মুহাম্মদ বলল ঃ আপনি এ মাল গ্রহণ করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি বণ্টনে ইনসাফ করতে পারব বলে ভরসা পাই না। যে ব্যক্তি এ মাল থেকে কিছু পাবে না, সে হয় তো বলবে, আমি বণ্টনে ইনসাফ করিনি। ফলে আমার কারণে তার গোনাহ হবে। অতএব এ মাল আমার কাছ থেকে দূরেই রাখ।

বাদশাহদের কাছ থেকে সরে থাকা ঃ বাদশাহদের কাছ থেকে এমনভাবে সরে থাকা ওয়াজিব যাতে সে নিজেও তাদেরকে না দেখে এবং তারাও যেন তাকে না দেখে। কেননা, এক্ষেত্রে এভাবেই নিরাপত্তা বিদ্যমান। সুতরাং বাদশাহদের জুলুমের কারণে অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা, তাদের দীর্ঘায়ু কামনা না করা, তাদের প্রশংসা না করা, যারা তাদের তল্পীবাহক, তাদের কাছে না যাওয়া, তাদের কাছ থেকে সরে থাকার কারণে কোন বস্তু না পেলে তজ্জন্যে পরিতাপ না করা ওয়াজিব। আর বাদশাহদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকলে তা আরও ভাল। যদি অন্তরে এই ধারণা জন্মে যে, বাদশাহদের কাছে অনেক সম্পদ এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিলাস সামগ্রী আছে, তবে আসাম্মের উক্তি স্মরণ করবে। তিনি বলতেন ঃ আমার ও বাদশাহদের মধ্যে মাত্র এক দিনের তফাৎ। কেননা, গতকালকের আনন্দ তো আর আজ তাদের কাছে বসে নেই। আর আগামীকাল কি হবে, সে ব্যাপারে আমি ও তারা উভয়েই শংকিত। সুতরাং কেবল আজকের দিনই বাকী রইল। এক দিনে কি হতে পারে? অথবা হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর উক্তি স্মরণ করবে। তিনি বলতেন ঃ ধনী ব্যক্তিরা পানাহার ও পোশাকে আমাদের শরীক। তারাও পানাহার করে এবং পোশাক পরিধান করে, আমরাও তাই করি। তাদের কাছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকে, যা তারা দেখে এবং আমরাও তাদের সাথে দেখতে পাই। পার্থক্য হচ্ছে, এই ধন-সম্পদের হিসাব তাদেরকে দিতে হবে আর আমরা তা থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন জালেমের জুলুম অথবা পাপীর পাপ সম্পর্কে অবগত হয়, এই অবগতি যেন তার মন থেকে সেই জুলুম ও পাপের গুরুত্ব হ্রাস করে দেয়, এটা জরুরী। কেননা যে ব্যক্তি কুকর্ম করে, সে অবশ্যই মন থেকে পতিত হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর হকে ত্রুটি করে, তাকে এমন খারাপ মনে কর, যেমন তোমার হকে ত্রুটি করলে মনে করতে।

যদি বল, পূর্ববর্তী আলেমগণ তো বাদশাহদের কাছে যেতেন, তবে এর জওয়াব হচ্ছে, প্রথমে তাঁদের কাছ থেকে বাদশাহদের কাছে যাওয়ার রীতি-নীতি শিখে নাও। এর পর গেলে কোন দোষ নেই। বর্ণিত আছে, বাদশাহ হেশাম ইবনে আবদুল মালেক হজ্জের উদ্দেশে মক্কা মোয়াযযমায় উপনীত হয়ে বলল ঃ সাহাবীগণের কেউ থেকে থাকলে তাঁকে আমার সামনে নিয়ে আস। লোকেরা বলল ঃ তাঁরা তো সকলেই ইন্তেকাল করে গেছেন। সে বলল ঃ কোন তাবেয়ীকে আন। সেমতে লোকেরা হযরত তাউস ইয়ামনীকে (রাহঃ) ডেকে আনল। তিনি হেশামের সামনে গিয়ে জুতা জোড়া ফরাশের কিনারে খুললেন এবং আমীরুল মুমিনীন বলে সালাম না করে বললেন ঃ হে হেশাম, সালামুন আলাইকা। তিনি তার কুনিয়তও উল্লেখ করলেন না। সালামের পর হেশামের ঠিক সামনে আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হেশাম, কেমন আছেন? তাঁর কান্ড দেখে হেশাম ক্রুদ্ধ হল। এমন কি, তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু লোকেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, সে এখন আল্লাহ ও রসূলের হেরেমে আছে। এখানে এটা হতে পারে না। হেশাম হযরত তাউসকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলল ঃ তুমি এহেন কর্ম করলে কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি করেছি? এতে হেশামের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে বলল ঃ তুমি আমার সামনে জুতাজোড়া খুলেছ। আমার হস্ত চুম্বন করনি। আমাকে 'আমিরুল মুমিনীন' বলে সালাম করনি। আমার কুনিয়ত উল্লেখ করনি। আমার মুখের সামনে আমার অনুমতি ছাড়াই আসন গ্রহণ করেছ এবং জিজ্ঞেস করেছ– হেশাম, কেমন আছেন? হযরত তাউস জওয়াবে বললেন ঃ জুতা খোলার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি প্রত্যহ পাঁচবার রব্বুল ইযযত আল্লাহ পাকের সামনে জুতা খুলি। তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধও হন না এবং আমাকে শাস্তিও দেন না। হস্ত চুম্বন না করার কারণ, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি– পুরুষের জন্যে কারও হস্ত চুম্বন করা জায়েয নয়। তবে স্বামী কামবশতঃ স্ত্রীর হস্ত আর পিতা স্নেহবশতঃ সন্তানের হস্ত চুম্বন করতে পারে। আমি আমিরুল মুমিনীন বলে আপনাকে সালাম করিনি। এর কারণ, সকল মানুষ আপনার শাসনক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট নয়; তাই আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করিনি। কুনিয়ত উল্লেখ না করার হেতু হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণকে নাম ধরেই ডেকেছেন, কুনিয়ত সহকারে নয়। তিনি বলেছেন– ইয়া দাউদ, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া ঈসা। এর বিপরীতে তিনি তাঁর দুশমনদের কুনিয়ত উল্লেখ করেছেন ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ (আবু লাহাবের হস্তদ্বয় নিপাত যাক।) সামনে বসার কথা যে বলেছেন, এর কারণ, আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামে পর্বতশৃঙ্গের মত সর্প আর খচ্চরের অনুরূপ বিচ্ছু রয়েছে । এরা সেই সব শাসককে দংশন করবে, যারা তাদের প্রজাদের প্রতি ইনসাফ করে না। এর পর হযরত তাউস সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মিনায় আবু জাফর মনসুরের নিকট তশরীফ নিলে সে আরজ করল ঃ আপনি আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করুন। হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কারণ, তুমি জুলুম ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিয়েছ। মনসুর মাথা নত করল। এর পর মাথা তুলে বলল ঃ আপনার অভাব অনটন পেশ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কেবল মুহাজির ও আনসার-সন্তানগণের তরবারির জোরে এই মর্যাদায় পৌঁছেছ। এখন তাঁদের সন্তানরা ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। আল্লাহকে ভয় কর এবং তাদের হক তাদের হাতে সমর্পণ কর। মনসুর আবার মাথা নত করল। অবশেষে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাথা তুলে বলল ঃ নিজের প্রয়োজন বলুন। তিনি বললেন ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হজ্জ করার পর তাঁর কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– আমি কি পরিমাণ ব্যয় করলাম? কোষাধ্যক্ষ আরজ করেছিলেন ঃ দশ দেরহামের কিছু বেশী। আর এখন তোমার সাথে এত মাল দেখছি, যা উটও বহন করতে পারে না। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। এই ছিল আগেকার যুগের মনীষীগণের বাদশাহদের কাছে যাওয়ার রীতিনীতি। তাঁরা বাদশাহদের জুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিরোধ করার জন্যে জীবনপন করে দিতেন।

ইবনে আবী নমলা (রহঃ) আবদুল মালেকের কাছে তশরীফ নিয়ে গেলে সে আরজ করল ঃ কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কেয়ামতের ক্রোধ, তিক্ততা ও ধ্বংসকারিতা দেখে তারাই কেবল স্থির থাকতে পারবে, যারা আপন প্রবৃত্তিকে নারাজ করে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করে থাকবে। আবদুল মালেক কেঁদে ফেলে বলল ঃ আমি যতদিন বেঁচে থাকব, এ বাক্যটি চোখের সামনে রাখব। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খলীফা হলে সকল সাহাবী তাঁর খেদমতে হাযির হলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) অনেক বিলম্বে উপস্থিত হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এজন্যে তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ আমি রসূলে খোদা (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– মানুষ যখন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার নিযুক্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে দূরে সরে পড়েন। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বসরার শাসনকর্তার দরবারে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– "বাদশাহের চেয়ে বেশী বেওকুফ কেউ নয়। যে আমার নাফরমানী করে, তার চেয়ে অধিক প্রতারক কেউ নয়। হে মন্দ রাখাল, আমি তোমাকে মোটা তাজা ও সুস্থ ভেড়া-ছাগল দিয়েছি। তুমি তাদের গোশত খেয়ে এবং পশম পরিধান করে সেগুলিকে কংকালসার করে দিয়েছ। বসরার শাসনকর্তা বলল ঃ আপনি কি জানেন, কেন আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এত নির্ভীক? তিনি বললেন ঃ না। সে বলল ঃ এর কারণ, আপনি আমাদের কাছে কম আশা করেন এবং ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেন না। একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) খলীফা সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে সোলায়মান ভীত কম্পিত হয়ে গেল। হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বললেন ঃ এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আওয়াজ। যখন তাঁর আযাবের আওয়াজ শুনবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? কথিত আছে, সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক মক্কার উদ্দেশে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে আবু হাযেমকে (রহঃ) ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমরা মৃত্যুকে খারাপ মনে করি কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ, তুমি তোমার আখেরাতকে বরবাদ করেছ এবং দুনিয়াকে আবাদ করেছ। তাই আবাদ ভূমি থেকে পতিত ভূমিতে যাওয়া খারাপ মনে কর। সোলায়মান প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে যাওয়ার অবস্থাটা কেমন হবে? তিনি বললেন ঃ নেক বান্দারা এমনভাবে যাবে, যেমন কোন মুসাফির ব্যক্তি গৃহে ফিরে আসে। আর গোনাহগাররা এমনভাবে যাবে যেমন কোন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সামনে ধরে আনা হয়। সোলায়মান কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ হায়, আমি যদি জানতাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার অবস্থা কিরূপ হবে! আবু হাযেম (রহঃ) বললেন ঃ নিজের অবস্থা কোরআন মজীদের অনুরূপ করে নাও। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ অর্থাৎ, নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণরা নেয়ামতের মধ্যে এবং পাপাচারীরা জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। সোলায়মান বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত কোথায়? তিনি বললেন ঃ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্ম সম্পাদনকারীদের নিকটবর্তী। সোলায়মান জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে বেশী সম্মানিত? তিনি বললেন ঃ যারা মুত্তাকী বা খোদাভীরু। প্রশ্ন হল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকার সাথে ফরযসমূহ আদায় করা। প্রশ্ন হল ঃ কথার মধ্যে অধিক শ্রবণযোগ্য কথা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সত্য বাক্য তার সামনে বলা, যার কাছে আশাও করা হয় এবং যাকে ভয়ও করা হয়। প্রশ্ন হল ঃ মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? উত্তর হল ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে আমল করে এবং মানুষকে এজন্যে উদ্বুদ্ধ করে। প্রশ্ন হল ঃ মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জালেম ভাইয়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং নিজের আখেরাতকে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে। এর পর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সোলায়মান প্রশ্ন করলেন ঃ আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আবু হাযেম বললেন ঃ আগে বল, তুমি আমাকে শাস্তি দেবে কি না? বললেন ঃ না, বরং উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! তোমাদের পিতৃপুরুষরা জনগণের উপর তরবারির ধার প্রয়োগ করে এই দেশ জবরদখল করেছে। মুসলমানদের সাথে পরামর্শও করেনি এবং তাদের সম্মতিক্রমেও দখল করেনি। অবশেষে তারা অনেক খুনখারাবি করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হায়, এখন যদি তুমি জানতে, তারা কি করেছে এবং জনগণ তাদেরকে কি বলেছে! সোলায়মানের সহচরদের থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আবু হাযেম! আপনি একথাটি ভাল বলেননি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আলেমগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারা জনগণের কাছে সত্য কথা বর্ণনা করবেন এবং সত্য গোপন করবেন না। সোলায়মান আরজ করলেন ঃ আমরা পূর্বপুরুষদের এই কলংক মোচন করব কিরূপে? তিনি বললেন ঃ হালাল পথে ধন উপার্জন কর এবং যথাস্থানে ব্যয় কর। তিনি বললেন ঃ এটা কার দ্বারা সম্ভবপর? আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। আবু হাযেম বললেন ঃ ইলাহী, সোলায়মান আপনার দোস্ত হলে তার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সহজ করে দিন। আর শত্রু হলে তাকে জোর করে হলেও আপনার প্রিয় কাজে নিয়োজিত করুন। অতঃপর সোলায়মান বললেন ঃ আপনি আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি সংক্ষেপে ওসিয়ত করছি– আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা এতদূর ধ্যান কর যে, তিনি যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা করতে যেন তোমাকে না দেখেন এবং যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, তা করতে যেন তোমাকে দুর্বল না পান। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) আবু হাযেমকে বললেন ঃ আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ শয়ন করে ধ্যান করবে যে, মৃত্যু তোমার মাথার উপরে বিদ্যমান এবং এটা ইন্তেকালের সময়। এর পর ধ্যান করবে– এই মুহূর্তে কোন্ গুণটি তুমি নিজের মধ্যে থাকা পছন্দ কর এবং কোন্ গুণটি থাকা পছন্দ কর না। যে গুণটি থাকা পছন্দ কর, সেটি তখন থেকেই অবলম্বন কর এবং যে গুণটি পছন্দ কর না, সেটি তখনই বর্জন কর। কেননা, সম্ভবতঃ আখেরাতের সময় নিকটবর্তী।

জনৈক বেদুঈন সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের কাছে এলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি তাকে বললেন ঃ কি চাও? সে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে কিছু বলব। সহ্য করে নেবেন। সহ্য না করলে পরে আফসোস করবেন। সোলায়মান বললেন ঃ আমার সহনশীলতা এত বিস্তৃত যে, যার কাছ থেকে উপদেশ আশা করি না এবং দোয়ার সম্ভাবনা দেখি, তার সাথেও সহনশীল আচরণ করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে উপদেশ দেবে এবং প্রতারণা করবে না, তার সাথে সহনশীল হব না কেন? বেদুঈন বলল ঃ হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার চারপাশে এমন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থে মন্দ পথ অবলম্বন করছে এবং দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করছে। তারা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করছে। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে তো তারা আপনাকে ভয় করেছে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেনি। তারা আখেরাতের সাথে যুদ্ধ এবং দুনিয়ার সাথে সন্ধি পছন্দ করেছে। অতএব আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে বিষয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি করেছেন, আপনি সে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিনিধি করবেন না। কারণ, তারা আমানত বিনষ্ট করতে এবং মুসলমানদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে কোন ক্রটি করেনি। তাদের কাজকর্মের জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে, কিন্তু আপনার কাজ-কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। আপনি নিজের পরকাল নষ্ট করে তাদের দুনিয়া সুখকর করবেন না। কেননা, সে ব্যক্তিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের পরকাল বিনষ্ট করে। সোলায়মান বললেন ঃ হে বেদুঈন! তুমি তোমার মুখের তরবারি দিয়ে পাষাণ বিদীর্ণ করতে চাইলে, কিন্তু এত ধার কি তোমার তরবারিতে আছে? বেদুঈন বলল ঃ ঠিক বলেছেন, কিন্তু এসব কথা আপনার উপকারের জন্যে, ক্ষতির জন্যে নয়।

বর্ণিত আছে, সাধক আবু বকর হযরত মোআবিয়ার কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে মোআবিয়া, আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, যতই দিন অতিবাহিত হয়ে রাত্রি আগমন করে, ততই তুমি দুনিয়া থেকে দূরবর্তী এবং পরকালের নিকটবর্তী হচ্ছ। তোমার পেছনে এমন অন্বেষণকারী আছে, যার কবল থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। তোমার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, যার আগে তুমি যেতে পারবে না। তুমি সত্বরই সেই সীমায় পৌঁছে যাবে এবং অনতিবিলম্বে সেই অন্বেষণকারী তোমাকে এসে ধরবে। আমরা এবং আমাদের সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই ধ্বংসশীল। যেখানে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমরা যাব, সেটা অক্ষয়। আমাদের ক্রিয়াকর্ম ভাল হলে প্রতিদানও ভাল হবে, আর মন্দ হলে প্রতিদানও মন্দ হবে।

মোট কথা, যারা আখেরাতের আলেম, তারা বাদশাহদের কাছে এভাবে যেতেন, যা উপরে বর্ণিত হল, কিন্তু দুনিয়াদার আলেমরা তাদের কাছে যায় নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশে। তারা শাসকবর্গকে নানা ধরণের অন্যায়ে সম্মতি দেয় এবং সূক্ষ্ম কৌশল ও নিজেদের মতলব অনুযায়ী পরিত্রাণের উপায় বলে দেয়। যদি ওয়ায প্রসঙ্গে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ বর্ণনাও করে, তবুও তাতে উদ্দেশ্য শাসকবর্গের সংশোধন থাকে না; বরং স্বীয় মাহাত্ম্য, জাঁকজমক ও শাসকবর্গের দৃষ্টিতে প্রিয় হওয়া উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে বোকামিবশতঃ দু'টি ভুল করা হয়। এক, জনগণকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, আমাদের শাসকদের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করা। অথচ অন্তরে প্রায়শঃ একথা থাকে না। উদ্দেশ্য যা থাকে, তা হচ্ছে সুখ্যাতি অর্জন করা এবং শাসকদের কাছে পরিচিত হওয়া। সংশোধন উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, যদি অন্য কোন আলেম এই সংশোধনের দায়িত্ব নেয় এবং তার ওয়ায প্রভাবশালী হতে দেখা যায়, তবে এতে তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করা উচিত যে, যে গুরুদায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, তা অন্যের হাতে সম্পন্ন হয়ে গেছে। ফলে আমি কষ্ট থেকে বেঁচে গেছি। উদাহরণতঃ কোন দুরারোগ্য রোগীর শুশ্রূষা করা একজনের উপর জরুরী হলে যদি অন্য কেউ এসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে স্বভাবতই প্রথম ব্যক্তি সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং যদি কেউ নিজের ওয়াযকে অন্যের ওয়াযের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবেই বুঝা যাবে উদ্দেশ্য শাসকদের সংশোধন নয়; বরং অন্য কিছু।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়, আমি কোন মুসলমানের উপর থেকে জুলুম অপসারিত করার জন্যে শাসকদের কাছে যাই। এটাও আত্মপ্রবঞ্চনা এবং যাচাই করার কষ্টিপাথরও তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

বাদশাহদের কাছে যাওয়ার নিয়মনীতি সুস্পষ্ট হওয়ার পর আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করছি, যদ্দ্বারা বাদশাহদের সাথে মেলামেশা করা ও তাদের বস্তু সামগ্রী নেয়ার কিছু অবস্থা জানা যাবে।

(১) বাদশাহ্ কিছু বস্তু সামগ্রী ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করার জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমার কাছে প্রেরণ করলে যদি সে সামগ্রীর কোন নির্দিষ্ট মালিক থাকে, তবে তা নেয়া তোমার পক্ষে হালাল নয়। আর যদি নির্দিষ্ট মালিক না থাকে তবে তা গ্রহণ করে মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। বণ্টন না করে নিজে নিয়ে নিলে গোনাহগার হবে। কোন কোন আলেম গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেন। এখন এতে উত্তম কোন্‌টি তাই দেখা উচিত।

আমরা বলি, যদি তিনটি আশংকা থেকে মুক্ত হও, তবে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে উত্তম। প্রথম আশংকা– তোমার গ্রহণ করার কারণে বাদশাহের বুঝে নেয়া যে, তার সম্পদ পবিত্র। পবিত্র না হলে তুমি তার জন্যে হাত বাড়াতে না। সুতরাং পরিস্থিতি এরূপ হলে সে সম্পদ গ্রহণ করবে না। কারণ, তা গ্রহণ করা বিপজ্জনক। কেননা, তোমার হাতে এই সম্পদ বণ্টন করলে যে কল্যাণ হবে, তা সে অনিষ্টের তুলনায় কম হবে, যা বাদশাহের হারাম সম্পদ উপার্জনে সাহসী হওয়ার কারণে হবে।

দ্বিতীয় আশংকা হল তোমার দেখাদেখি অন্য আলেম অথবা জাহেলের সে সম্পদ গ্রহণ জায়েয মনে করা এবং তা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন না করা। এ অনিষ্টটি প্রথম অনিষ্টের তুলনায় বড়। সেমতে কিছু লোক গ্রহণ করার বৈধতার সপক্ষে ইমাম শাফেয়ীকে পেশ করে, কিন্তু তিনি যে ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন, তা দেখে না। অতএব, অনুসৃত ব্যক্তির এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, তার কাজ অনেক মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন ঃ এক বাদশাহের সামনে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হল। বাদশাহ জনসমক্ষে তাকে জবরদস্তিমূলকভাবে শূকরের মাংস খাওয়াতে চাইল। সে খেল না। এর পর তার সামনে ছাগলের গোশত রেখে তরবারি উচিয়ে হুমকি দেয়া হল, সে তাও খেল না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ লোকেরা জেনেছে, আমাকে শূকরের মাংস খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন যদি আমি জীবিত অবস্থায় তাদের সামনে যেতাম এবং কিছু খেয়ে নিতাম, তবে তারা জানত না, আমি কি খেয়েছি। ফলে তারা গোমরাহ হয়ে যেত।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ ও তাউস (রহঃ) একবার হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের কাছে গেলেন। লোকটি ছিল খামখেয়ালী প্রকৃতির। শীতের দিনে সে একটি খোলা মজলিসে বসে ছিল। তাঁরা উভয়েই নির্ধারিত আসনে বসে গেলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোলামকে একটি চাদর এনে তাউসের গায়ে পরিয়ে দিতে বলল। সে আদেশ পালন করল। তাউস নিজের কাঁধ হেলাতে লাগলেন। অবশেষে চাদর কাঁধ থেকে পড়ে গেল। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ স্বীকার করলাম, আপনার চাদরের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এটি গ্রহণ করে সদকা করে দিলে কি ক্ষতি হত? তিনি বললেন ঃ তাহলে লোকেরা কেবল এটাই বলত, তাউস চাদর গ্রহণ করেছেন। আমার সদকা করা তারা দেখত না। তাই আমি এটা গ্রহণ করিনি।

তৃতীয় আশংকা হল, বাদশাহ কেবল তোমার কাছেই বিশেষভাবে প্রেরণ করেছে– অন্য কারও কাছে প্রেরণ করেনি– দেখে তোমার অন্তরে তার প্রতি মহব্বত উথলে উঠা। এরূপ আশংকা থাকলে কখনও গ্রহণ করবে না। কেননা, জালেমদের প্রতি মহব্বত বিষতুল্য। এটা এমন ব্যাধি, যার কোন প্রতিকার নেই। কেননা মানুষ যাকে মহব্বত করে তার দোষত্রুটির ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করাই মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ اللهم لاتجعل الفاجر عندى هدا فيحبه قلبى ইলাহী, আমাকে কোন পাপাচারীর কাছে ঋণী করবেন না। করলে আমার অন্তর তাকে ভালবাসতে থাকবে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের অন্তর মহব্বত থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে না। কথিত আছে, জনৈক শাসক হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ)-এর কাছে দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন ঃ তিনি নিঃশেষে তা ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। এর পর তাঁর কাছে মুহম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই শাসক তোমার কাছে যে দেরহাম পাঠিয়েছিল, তা কি করেছ? তিনি বললেন ঃ আমার খাদেমদেরকে জিজ্ঞেস কর। খাদেমরা বলল ঃ তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বিলিয়ে দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– তোমার অন্তরে সেই শাসকের প্রতি মহব্বত এখন বেশী, না অর্থ পাঠানোর পূর্বে বেশী ছিল? তিনি বললেন ঃ এখন বেশী। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বললেন, আমি তাই আশংকা করছিলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' সত্যই বলেছেন। কেননা, যখন শাসককে মহব্বত করবে, তখন তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে এবং তার পদচ্যুতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপছন্দ করবে; বরং তার শাসন বিস্তৃত হওয়া এবং সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া পছন্দ করবে। এসব বিষয় জুলুমের সহায়ক কারণ।

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) ও ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে সন্তুষ্ট থাকে, সে অনুপস্থিত থাকলেও এমন হবে যেন সে কাজে শরীক ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ـ

অর্থাৎ, যারা জালেম, তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

কোন কোন তফসীরকারের মতে এর অর্থ হচ্ছে, জালেমদের কাজ-কর্মে সম্মত হয়ো না। সুতরাং তোমার যদি অতটুকু সামর্থ্য থাকে যে, সম্পদ গ্রহণ করলে বাদশাহদের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে না, তবে গ্রহণ করা মোটেও দূষণীয় হবে না। সে মতে বসরার জনৈক আবেদের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তিনি বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করে হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করল ঃ আপনি কি বাদশাহদেরকে ভালবাসার আশংকা করেন না? তিনি বললেন ঃ যদি কেউ আমাকে হাতে ধরে জান্নাতে দাখিল করিয়ে দেয়, এর পর সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তবে এতটুকু সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও আমার অন্তর তাকে মহব্বত করবে না। কেননা, যে সত্তা তাকে আমার হাত ধরতে বাধ্য করেছে, তাঁর খাতিরেই আমি এ ব্যক্তিকে শত্রু মনে করি। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করা কোন কোন কারণে জায়েয হলেও বর্তমান যুগে তা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। কেননা, বর্তমান যুগে বাদশাহের ধন সম্পদ গ্রহণ করা উপরোক্ত অনিষ্ট থেকে মুক্ত নয়।

(২) যদি কেউ প্রশ্ন করে, বাদশাহের দেয়া সম্পদ গ্রহণ করা এবং ফকীরদের মধ্যে বন্টন করা যখন জায়েয, তখন বাদশাহের সম্পদ চুরি করে তা ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া জায়েয হবে না কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, তা জায়েয নয়। কেননা, বাদশাহের সম্পদ এমনও হতে পারে যার কোন নির্দিষ্ট মালিক রয়েছে এবং বাদশাহ তার কাছে তা ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ত রাখে। সুতরাং চুরি করা সম্পদ সেই সম্পদের মত নয়, যা বাদশাহ নিজে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কেননা, বাদশাহ সম্পর্কে সাধারণত এরূপ ধারণা করা যায় না যে, কোন সম্পদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মালিক জানা সত্ত্বেও সে তা খয়রাত করে দেবে। সুতরাং বাদশাহের দেয়া এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সে সেই সম্পদের মালিক কে তা জানে না। যদি কোন বাদশাহ এসব ব্যাপারে অসাবধান হয়, তবে তার সম্পদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর না নেয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

(৩) জালেমদের নির্মিত পুল, সরাইখানা, মসজিদ ইত্যাদির ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ, পুলের উপর দিয়ে যাওয়া প্রয়োজনের সময় জায়েয এবং যথাসম্ভব তা থেকে বিরত থাকা পরহেযগারী। নৌকা পাওয়া গেলে পরহেযগারীর দাবী জোরদার হয়ে যাবে। নৌকা পাওয়া গেলেও পুলের উপর দিয়ে যাওয়া আমরা জায়েয বলেছি। এর কারণ, পুলের সামগ্রীসমূহের যখন কোন নির্দিষ্ট মালিক জানা নেই, তখন তার বিধান হচ্ছে খয়রাতে ব্যয় করা। পুলের উপর দিয়ে যাওয়াও একটি খয়রাত, কিন্তু যদি জানা যায়, পুলের ইট ও পাথর অমুক বাড়ী, কবরস্থান অথবা মসজিদ থেকে উঠিয়ে এনে লাগানো হয়েছে, তবে সে পুল দিয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

যদি মসজিদ জবর দখল করা যমীনে নির্মিত হয়, তবে তার ভেতরে জমাত কিংবা জুমআর জন্যে যাওয়া কস্মিনকালেও জায়েয নয়। এমনকি, যদি ইমাম মসজিদের ভেতরে দাঁড়ায়, তবে তুমি তার পিছনে মসজিদের বাইরে দাঁড়াবে। কেননা, জবরদখলকৃত যমীনে নামায পড়লে যদিও ফরয থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এক্তেদাও জায়েয হয়ে যায়, কিন্তু তার ভেতরে দাঁড়ানো গোনাহ। যদি জালেমরা এমন সামগ্রী দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে, যার মালিক জানা নেই, তবে অন্য মসজিদ পাওয়া গেলে সেখানে চলে যাওয়াই পরহেযগারী। অন্য মসজিদ না থাকলে জুমআ ও জামাত তরক করবে না। কেননা, এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, জালেম নির্মাতা নিজের মালিকানার অর্থেই নির্মাণ করেছে। জবরদখলকৃত যমীনে নির্মিত মসজিদে নামায পড়তে কোন দোষ নেই, যদি সে যমীনের নির্দিষ্ট কোন মালিক না থাকে। মসজিদে জালেমদের বিছানো চাটাই ও মাদুরের মালিক নির্দিষ্ট থাকলে তার উপর বসা হারাম। মালিক নির্দিষ্ট না থাকলে এগুলো বিছানো জায়েয, কিন্তু যথাসম্ভব এগুলো বর্জন করা এবং যে মসজিদে জালেমদের বিছানো চাটাই নেই, সেখানে চলে যাওয়া পরহেযগারী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপস্থিত জরুরী মাসআলা

(১) প্রশ্ন করা হয়েছে, সুফীগণের খাদেম বাজার থেকে তাদের জন্যে যে খাদ্য সংগ্রহ করে আনে অথবা নগদ মূল্য দিয়ে কিনে আনে, তা থেকে অন্য কারও পক্ষে কিছু খাওয়া হালাল কি না? আমি এর জওয়াব এই দিয়েছি যে, অন্য সুফী ব্যক্তির এ থেকে খাওয়া যে হালাল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সুফী নয়, সে খাদেমের সম্মতিক্রমে খেলে তা-ও হালাল। তবে সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। হালাল হওয়ার কারণ, সুফীগণের খাদেমকে যারা কোন বস্তু দেয়, তারা সুফীগণের কারণে দেয়, কিন্তু গ্রহণকারী খাদেম নিজে সুফীগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির কারণে মানুষের কাছ থেকে কিছু পেলে সে তার মালিক হয়ে যায়– সন্তান-সন্ততি মালিক হয় না। সে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যকেও এ থেকে খাওয়াতে পারে।

(২) প্রশ্ন করা হওয়ছে যে, কিছু বস্তু সামগ্রী সুফীদের জন্যে ওসিয়ত করা হল। এখন এই সম্পদ কিরূপ লোকের মধ্যে ব্যয় করতে হবে? আমি জওয়াবে বললাম, তাসাওউফ একটি অন্তরের বিষয়, যা বাইরে থেকে জানা যায় না। তাসাওউফের স্বরূপও নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়; বরং কয়েকটি বাহ্যিক বিষয় বর্ণনা করা যায়, যার উপর ভরসা করে পরিভাষায় মানুষকে সুফী বলা হয়। এ ব্যাপারে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। (১) নেক হওয়া, (২) ফকীর হওয়া, (৩) সুফীদের পোশাক পরা, (৪) কোন পেশায় নিয়োজিত না থাকা এবং (৫) সুফীদের খানকায় তাঁদের সাথে মিলেমিশে থাকা। এসব গুণের মধ্যে কোন কোনটি এমন যে, তা মানুষের মধ্যে না থাকলে সুফী শব্দও তার জন্যে প্রয়োগ করা হবে না। উদাহরণত যে ব্যক্তি নেক নয়, বরং ফাসেক, সে সুফী কথিত হওয়ার যোগ্য হবে না। কেননা, সুফী সাধারণতঃ নেক লোককে বলা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির ফাসেকী প্রকাশ পাবে সে সুফীদের পোশাক পরিধান করলেও তাদের জন্যে ওসিয়ত করা সম্পদের হকদার হবে না। এ ক্ষেত্রে সগীরা গোনাহ ধর্তব্য নয়। ফাসেকীর অর্থ কবীরা গোনাহ করা। পেশা অবলম্বন করা এবং উপার্জনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মনিয়োগ করাও হকদার হওয়ার পরিপন্থী। সুতরাং কৃষক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানে কিংবা গৃহে পেশায় লিপ্ত ও মজুর সে সম্পদের হকদার নয়, যা সুফীদের জন্যে ওসিয়ত করা হয়। হাঁ, লেখা ও সেলাই করা, যা সুফীদের দ্বারা হতে পারে, তা যদি গৃহে হয় এবং দোকানে না হয়, তবে তা হকদার হওয়ার পরিপন্থী নয়। এই ক্ষতি সুফীদের সাথে থাকা ও অন্যান্য গুণ দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। ওয়ায করা এবং দরস দেয়া সুফী শব্দের পরিপন্থী নয়; যদি পোশাক, সুফীদের সাথে থাকা এবং ফকীরী পাওয়া যায়। কেননা, সুফীর সাথে কারী, ওয়ায়েয, আলেম ও মুদাররেস হওয়ার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ফকীরী হচ্ছে, যদি কারও কাছে এই পরিমাণ মাল হয়ে যায়, যদ্দরুন মানুষ বাহ্যতঃ তাকে সচ্ছল বলতে থাকে, তবে সুফীদের জন্যে ওসিয়তকৃত মাল গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয নয়, কিন্তু যদি মাল থাকে এবং তা দ্বারা ব্যয় নির্বাহ না হয়, তবে তার হক বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে সুফীদের সাথে থাকারও প্রভাব আছে। তবে কেউ যদি সুফীদের সাথে না থাকে; বরং নিজের বাড়ী অথবা মসজিদে থাকে, কিন্তু পোশাক ও চরিত্র তাদেরই মত হয়, তবে সে-ও সে মালে শরীক হবে। যদি পোশাকও তাদের মত না হয় এবং অন্যান্য গুণ পাওয়া যায়, তবে শরীক হবে না। যে ফকীর সুফীদের মত পোশাক পরে না এবং খানকায়ও থাকে না, সে সুফী বলে গণ্য হবে না। যে সুফীর স্ত্রী আছে, ফলে সে কখনও গৃহে এবং কখনও খানকায় থাকে, সে সুফীদের দল থেকে খারিজ হবে না।

(৩) প্রশ্ন করা হয়েছে, ঘুষ ও উপঢৌকনের মধ্যে পার্থক্য কি? উভয়টিই সম্মতিক্রমে দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্যও উভয়ের মধ্যে এক থাকে। এমতাবস্থায় ঘুষ হারাম এবং উপঢৌকন হালাল হল কেন?

আমি জওয়াব দিলাম, উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কখনও অর্থ ব্যয় করে না, কিন্তু অর্থ দেয়ার উদ্দেশ্য পাঁচ প্রকার হতে পারে। (১) আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশে অর্থ দেয়া। কেননা, যাকে দেয়া হবে সে নিঃস্ব, সম্ভ্রান্ত, আলেম অথবা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হবে। যদি কাউকে নিঃস্ব মনে করে দেয়া হয়; কিন্তু বাস্তবে সে নিঃস্ব না হয়, তবে গ্রহণকারীর জন্যে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। যদি আলেম হওয়ার কারণে অর্থ দেয়া হয়, তা গ্রহণ করা তখন হালাল হবে, যখন সে দাতার বিশ্বাসের অনুরূপ আলেম হবে। যদি দাতা তাকে কামেল মনে করে দেয়, যাতে সওয়াব বেশী হয়, কিন্তু সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কামেল নয়, তবে গ্রহণ করা তার জন্যে হালাল হবে না। আর যদি ধর্মপরায়ণতার কারণে অর্থ দেয়া হয় আর অন্তরে সে এমন ফাসেক যে দাতা জানতে পারলে তাকে দিত না, তবে তার জন্যেও গ্রহণ করা হালাল হবে না। এমন নেক লোক কমই হয়, যাদের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ হয়ে গেলে মানুষের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক গোপন রাখাই এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রিয় করে রাখে। অতএব ধর্মপরায়ণতার কারণে যা পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

(২) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেয়া; যেমন ফকীর ব্যক্তি উপঢৌকন পাওয়ার আশায় কোন ধনীকে কিছু দেয়। এটা বিনিময়ের শর্তে উপঢৌকন। এটা গ্রহণ করা তখনই হালাল হবে, যখন যে বিনিময়ের আশায় দেয়া হয়, তা পাওয়া যায় এবং লেনদেনের সকল শর্তও তাতে বিদ্যমান থাকে।

(৩) কোন নির্দিষ্ট কাজ দ্বারা সাহায্যের উদ্দেশে দেয়া। উদাহরণতঃ বাদশাহের কাছে এক ব্যক্তির কোন প্রয়োজন রয়েছে। সে বাদশাহের উকিল কিংবা অন্য কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে কিছু হাদিয়া দেয়। বলাবাহুল্য, এটাও বিনিময়ের শর্তে উপঢৌকন। এখানে হাদিয়ার বিনিময়ে যে কাজটি সে হাসিল করতে চায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটি হারাম কাজ হলে এই হাদিয়া গ্রহণ করা হারাম, যেমন হারাম ভাতা জারি হওয়া কিংবা কোন ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করা। আর যদি সে কাজটি করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব থাকে, তবে এর জন্যে উপঢৌকন নেয়া হারাম। যেমন– জুলুম প্রতিরোধ করা কিংবা সাক্ষ্য দেয়া। কেননা, যার জুলুম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, তার উপর জুলুম প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব। এ ধরনের কাজের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাই ঘুষ, যা নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি সে কাজটি হারাম না হয় এবং করাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব না হয়; বরং বৈধ হয়; এছাড়া কাজটি সম্পাদনও এমন শ্রমসাধ্য হয়, যার কারণে সাধারণ লোক মজুরি নিয়ে থাকে, তবে এ ধরনের কাজের বিনিময়ে হাদিয়া নেয়া এই শর্তে হালাল যে, গ্রহীতা দাতার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেবে। এ হাদিয়াটি মজুরির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্থলবর্তী। উদাহরণতঃ কাউকে এরূপ বলা, আমার এ আর্জিটি বাদশাহের কাছে পৌঁছে দিলে তোমাকে এক দীনার দেব। বিচারকের সামনে উকিলের বিতর্ক এবং সেজন্যে মজুরি নেয়াও এই পর্যায়ে পড়ে, যদি সে বিতর্ক হারাম ব্যাপারে না হয়। যদি কারও উদ্দেশ্য সামান্য কথায় হাসিল হয়ে যায়, যার জন্যে কোন শ্রম স্বীকার করতে হয় না, কিন্তু কথাটি কোন সম্মানী কিংবা প্রতিপত্তিশালীর মুখ দিয়ে উপকারী হয়; যেমন রাজকর্মচারী কিংবা উজির মুখ দিয়ে দারোয়ানকে বলে দেয়া যে, এই ব্যক্তি এলে তাকে বাধা দিয়ো না, তবে এর বিনিময়ে কিছু নেয়া হারাম। কেননা, প্রতিপত্তির বিনিময়ে কিছু নেয়ার বৈধতা শরীয়তে প্রমাণিত নেই; বরং এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি কোন ওষুধ জানে, যা অন্যে জানে না, তা বলে দেয়ার বিনিময় নেয়াও এ পর্যায়ে হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি এমন এক ওষুধীর কথা জানে, যা অর্শ্বরোগে ফলপ্রদ, কিন্তু মজুরি ছাড়া কাউকে তা বলে না, এরূপ মজুরি নেয়া জায়েয নয়। কেননা, সামান্য মুখ নেড়ে দেয়ার কোন মূল্য হতে পারে না। হাঁ, এই ওষুধীর জ্ঞান অর্জন করতে যদি তার অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পরিমিত মজুরি নেয়া জায়েয।

(৪) অন্যের মহব্বত লাভ করার উদ্দেশে দেয়া। অর্থাৎ, যাকে দেয়া হয় তার অন্তরের মহব্বত লাভ করা এবং এই মহব্বতের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল না করা। এরূপ দেয়া শরীয়তে মোস্তাহাব ও কাম্য। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ تهادوا وتحابوا (পারস্পরিক উপঢৌকন আদান-প্রদান কর এবং পরস্পরের বন্ধু হও।) সারকথা, যদিও মানুষ মহব্বতের জন্যেই মহব্বত করে না; বরং উপকারের লক্ষ্যেই মহব্বত করে থাকে, কিন্তু যখন উপকার নির্দিষ্ট না থাকে এবং বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে উপকার লাভের কোন নির্দিষ্ট প্রেরণা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তখন যা দেয়া হয় তাকেই হাদিয়া বলে। এই হাদিয়া গ্রহণ করা হালাল।

(৫) প্রতিপত্তি ও জাঁকজমকের কারণে কাউকে হাদিয়া দেয়া, যাতে তার আন্তরিক নৈকট্য ও মহব্বত লাভ করা যায়, ফলে নিজের সীমিত অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ সাধিত হয়। যদি এই প্রতিপত্তি জ্ঞানগত অথবা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বংশগত হয়, তবে এর বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা, এটা বাহ্যতঃ হাদিয়া হলেও ঘুষসদৃশ। আর যদি এই প্রতিপত্তি শাসন ক্ষমতার প্রতিপত্তি হয়; যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিচারক, সরকারী পদাধিকারী, যাকাত আদায়কারী অথবা রাজস্ব আদায়কারী হয়– এরূপ না হলে কেউ তাকে হাদিয়া দিত না, তবে এটা ঘুষ, যা হাদিয়ার আকারে পেশ করা হয়। কেননা, দাতার উদ্দেশ্য আপাততঃ নৈকট্য ও মহব্বত অর্জন হলেও একটা বিশেষ স্বার্থবুদ্ধি সামনে রেখেই তা জালেমের জন্যে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, শাসকদের কাছ থেকে অনেক স্বার্থ হাসিল করা যায়। এটা যে নিছক মহব্বত নয়, তার লক্ষণ হচ্ছে, তখন যদি অন্য কোন ব্যক্তি শাসক হয়ে যায়, তবে সেই হাদিয়া পূর্বের শাসককে দেবে না; বরং নতুন শাসককে দেবে। এ ধরনের হাদিয়া কঠোর মাকরূহ, কিন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এখানে কারণ পরস্পর বিরোধী। অর্থাৎ, একে খাঁটি হাদিয়া বলা হবে, না এমন ঘুষ বলা হবে যা কেবল প্রতিপত্তিবশতঃ কোন নির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্যে দেয়া হয়– এটা নিশ্চিত নয়। যখন অনুমানগত মিল একটি অপরটির পরিপন্থী হয় তখন হাদীস কোন একটিকে শক্তিশালী মনে করলে তাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাদীসে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এক যমানা আসবে, যখন হাদিয়ার নামে হারামকে হালাল মনে করা হবে এবং জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআনে বর্ণিত সুহত কি? জবাবে তিনি বললেন, কেউ কারও কাজ করে দেয়ার পর তার কাছে হাদিয়া আসা। সম্ভবতঃ তাঁর মতে কাজ করার অর্থ এখানে কিছু বলে দেয়া, যাতে কোন কষ্ট হয় না। অথবা মজুরির নিয়ত ছাড়াই দান স্বরূপ কাজ করে দেয়া। এর পর যদি বিনিময় স্বরূপ পরে কিছু আসে, তবে তা নেয়া জায়েয হবে না।

হযরত মসরূক এক ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করলেন। পরে সে তাঁর খেদমতে এক বাঁদী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বাঁদী ফেরত দিলেন এবং বললেন ঃ যদি আগে জানতাম তোমার মনে এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অভিপ্রায়, তবে কখনও তোমার জন্যে সুপারিশ করতাম না। এখন তোমার যতটুকু প্রয়োজন রয়ে গেছে, তাতে একটি কথাও বলব না। হযরত তাউসের কাছে বাদশাহ প্রদত্ত হাদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ হারাম। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর দু'পুত্র একবার বায়তুল মাল থেকে সম্পদ নিয়ে মুযারাবা স্বরূপ ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করেছিলেন। তিনি সেই মুনাফা পুত্রদ্বয়ের কাছ থেকে নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন এবং বলেন ঃ লোকেরা তোমাদেরকে আমার স্বজন মনে করে এটা দিয়েছে। অর্থাৎ, শাসনগত প্রতিপত্তির কারণে এই মুনাফা অর্জিত হয়েছে। হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর পত্নী একবার রোম সম্রাজ্ঞীর কাছে সুগন্ধি হাদিয়া প্রেরণ করেন। জওয়াবে সম্রাজ্ঞী তার কাছে কিছু মণিমুক্তা পাঠিয়ে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই মুক্তা তার কাছ থেকে নিয়ে বিক্রি করে দেন। অতঃপর সুগন্ধির মূল্য তাকে দিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন। হযরত জাবের ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বাদশাহদের হাদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা একে খেয়ানতের মাল আখ্যা দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হাদিয়া ফেরত দিলে লোকেরা আরজ করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদিয়া কবুল করতেন। তিনি বললেন ঃ তাঁর জন্যে সেটা হাদিয়া ছিল এবং আমাদের জন্যে ঘুষ। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লোকেরা দিত নবুওয়তের কারণে, শাসনক্ষমতার কারণে নয়। আর আমাদেরকে শাসন ক্ষমতার কারণেই দেয়। এসব হাদীস ও রেওয়ায়েতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সেই হাদীসটি, যা আবু হুমায়দ সায়েদী বর্ণনা করেছেন। তিনি রেওয়ায়েত করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইযদ গোত্রের যাকাতের জন্যে একজন কর্মকর্তা প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে কিছু মাল নিজের কাছে রেখে দেয় এবং বলে ঃ এগুলো আমি হাদিয়া হিসাবে পেয়েছি। এর পর অবশিষ্ট মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্পণ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি সত্যবাদী হলে তোমার মায়ের গৃহে বসে রইলে না কেন, যাতে এখানে হাদিয়া আসত। এর পর তিনি মুসলমানদের সামনে এই ভাষণ দিলেন ঃ

مالی استعمل الرجل منکم فیقول هذه لکم وهذه لکم
وهذا لی هدیة - الا حبس فی بیت امه یهدی له والذی نفسی

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

بيده لاياخذ منكم احد شيئا بغير حقه الا اتى الله يحمله فلا يأتين احدكم يوم القيامة ببعير له رغاء او بقرة له خوار او شاة تيعر -

অর্থাৎ, ব্যাপার কি, আমি তোমাদের কাউকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করি। সে বলে ঃ এটা মুসলমানদের জন্যে, আর এটা আমার জন্যে হাদিয়া। সে তার মায়ের গৃহে বসে থাকলে কি কেউ তাকে হাদিয়া দিত? কসম সেই সত্তার, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ– তোমাদের যে কেউ অন্যায়ভাবে কিছু নেবে, সে তা বয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে উপস্থিত হবে। অতএব তোমাদের কেউ যেন কেয়ামতের দিন চীৎকাররত উট নিয়ে অথবা হাম্বারবরত গরু নিয়ে অথবা ক্রন্দনরত ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন, এমনকি, তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ ইলাহী, আমি পৌঁছালাম কি না? মোট কথা, হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা যখন এহেন কঠোরতা প্রমাণিত হয়, তখন বিচারক ও কর্মকর্তাদের উচিত, তারা যেন নিজেদেরকে গৃহে উপবিষ্ট মনে করে নেয়। এর পর পদচ্যুত ও গৃহে বসা অবস্থায় যে বস্তু তারা হাদিয়া পায়, চাকুরীরত অবস্থায় তা নেয়া দুরস্ত। আর যে বস্তু সম্পর্কে জানে যে, এটা কেবল শাসনক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়, সেটা নেয়া হারাম। যদি কোন বন্ধুর হাদিয়ার ব্যাপারে এই মীমাংসা কঠিন হয়, তবে সেটা সন্দিগ্ধ বিধায় পরিহার করা উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সঙ্গ, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বত ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব একটি উৎকৃষ্টতম বিষয়। মানবিক অভ্যাস ও আচরণ থেকে যেসকল শক্তি উদ্ভূত হয়, সেগুলোর মধ্যে এটি অধিক পবিত্র ও নমনীয়, কিন্তু এর কিছু শর্ত আছে, যেগুলো পাওয়া গেলে মানুষকে আল্লাহর জন্যে বন্ধুর কাতারে গণ্য করা হয় এবং কতিপয় হক আছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে এই বন্ধুত্ব মালিন্যের সংমিশ্রণ ও শয়তানী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া বন্ধুত্বের এসব হক আদায় করলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং শর্তসমূহ পূরণ করলে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। তাই আমরা এ অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফযীলত এবং শর্ত

জানা উচিত যে, সম্প্রীতি সচ্চরিত্রতার এবং বিদ্বেষ অসচ্চরিত্রতার ফল। সচ্চরিত্রতা পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও আনুকূল্যের কারণ হয় এবং অসচ্চরিত্রতা ঘৃণা, শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার ফল। বলাবাহুল্য, বৃক্ষ ভাল হলে ফলও ভাল হয়। ধর্মে সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সচ্চরিত্রতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন : إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق যে বস্তু অধিকতর মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়, তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র।

হযরত উসামা ইবনে শরীক বলেন : আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, মানুষ যা যা পেয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম কোন্‌টি? তিনি বললেন : সচ্চরিত্র।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : بعثت لاتمم محاسن الاخلاق (আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সচ্চরিত্রতাকে পূর্ণতা দান করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।) তিনি আরও বলেন ঃ اثقل ما يوضع فى الميزان خلق حسن। (দাঁড়িপাল্লায় যা ওজন করা হবে, তার মধ্যে অধিক ভারী হবে সচ্চরিত্র।) তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার আকার-আকৃতি ও চরিত্র সুন্দর করেছেন, সে দোযখের যোগ্য নয়। একবার তিনি হযরত আবু হোরায়রাকে বললেন ঃ হে আবু হোরায়রা, সচ্চরিত্র নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সচ্চরিত্র কি? জওয়াব হল ঃ যে তোমার কাছ থেকে আলাদা থাকে, তুমি তার সাথে মিলিত থাক। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে মাফ কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। শুধু সম্প্রীতির প্রশংসায় এত আয়াত, হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যা তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে যথেষ্ট। বিশেষত ঃ যখন সম্প্রীতির সূত্র খোদাভীতি, ধর্মপরায়ণতা ও আল্লাহর মহব্বত হয়, তখন তো এর শ্রেষ্ঠত্ব সোনায় সোহাগা হয়ে যায়। সম্প্রীতি মানুষের প্রতি একটি নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা এই মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলেন ঃ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, আপনি পৃথিবীস্থ সবকিছু ব্যয় করেও মানুষের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন।

বিভেদের নিন্দা ও তা থেকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে; তিনি তা থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হও। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويولفون -

অর্থাৎ, তোমাদের মজলিসে আমার অধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল, যার অন্তর অন্যের জন্যে কোমল এবং যে অন্যের সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করে ও অন্যেরা যার সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখে।

তিনি আরও বলেন ঃ ঈমানদার সম্প্রীতির আচরণ করে এবং তার সাথে সম্প্রীতির আচরণ করা হয়। যে সম্প্রীতি রক্ষা করে না এবং যার সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করা হয় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের প্রশংসায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান তাকে সৎ বন্ধু দান করেন। সে ভুলে গেলে বন্ধু তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে স্মরণ করলে তবে বন্ধু তাকে সাহায্য করে। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ যখন ধর্মীয় দু'ভাই মিলিত হয়, তখন তারা দু'হাত সদৃশ, যারা একে অপরকে ধৌত করে। আর দুই ঈমানদার যখন মিলিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা এককে অপরের দ্বারা কিছু উপকৃত করেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের এমন স্তরে পৌঁছাবেন, যা অন্য কোন আমল দ্বারা লাভ করা যায় না। আবু ইদরীস খওলানী বলেন ঃ আমি হযরত মুয়ায (রাঃ)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর উদ্দেশে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ, পুনঃ সুসংবাদ– আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন কিছু লোকের জন্যে আরশের চারপাশে চেয়ার বিছানো হবে। তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করবে। সব মানুষ ভীতবিহ্বল হবে, কিন্তু তারা ভীতবিহ্বল হবে না। তারা আল্লাহ তা'আলার ওলী। তারা ভয় ও দুঃখ করবে না। লোকেরা আরজ করল ঃ তারা কারা ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারী। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এই রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে– আরশের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চারপাশে নূরের মিম্বর থাকবে। এই মিম্বরের উপর একদল লোক থাকবে, যাদের পোশাকও মুখমণ্ডল হবে নূরের। তারা নবীও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু নবী ও শহীদগণ তাদের ঈর্ষা করবে। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ তারা হল আল্লাহর ওয়াস্তে পারস্পরিক মহব্বতকারী। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর বৈঠকে বসে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আলাদা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, যে অপরজন থেকে অধিক মহব্বত রাখে। বলা হয়, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তাদের মধ্যে একজনের মর্তবা উচ্চ হলে অপরজনের মর্তবাও তার সাথে উচ্চ করা হবে এবং তাকে প্রথম জনের সাথে সংযুক্ত করা হবে; যেমন সন্তানদেরকে পিতামাতার সাথে এবং এক আত্মীয়কে অন্য আত্মীয়ের সাথে সংযুক্ত করা হবে। কেননা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব হলে তা আত্মীয়তার চেয়ে কম হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ -

অর্থাৎ, আমি তাদের সাথে সন্তানদেরকে সংযুক্ত করে দেব এবং তাদের কোন আমলহ্রাস করব না।

নবী করীম (সাঃ)-এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার মহব্বত তাদের জন্যে অবধারিত, যারা আমার খাতিরে একে অপরের কাছে আসা-যাওয়া করে। আমার মহব্বত তাদের জন্যে ওয়াজিব, যারা আমার জন্যে পরস্পরে মহব্বত করে। তাদের জন্যেও আমার মহব্বত জরুরী, যারা আমার খাতিরে একে অপরকে সাহায্য করে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ان الله تعالى يقول يوم القيامة اين المتحابون بجلالى اليوم اظلهم فى ظلى يوم لاظل الا ظلى -

আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ কোথায় আমার প্রতাপের খাতিরে মহব্বতকারীরা, আমি আজ তাদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দেব; যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا فى الله اجتماعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت له عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انى اخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه .

অর্থাৎ, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না– এক, ন্যায়পরায়ণ শাসক। দুই, যে যুবক আল্লাহর এবাদতে যৌবন অতিবাহিত করে। তিন, যার মন মসজিদ থেকে বাইরে আসার পর থেকে মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। চার, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে মহব্বত করে, আল্লাহর ওয়াস্তেই মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যেই আলাদা হয়। পাঁচ, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অশ্রু বহায়। ছয়, যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী রমণী প্ররোচিত করলে সে বলে – আমি আল্লাহকে ভয় করি, সাত, যে ব্যক্তি দান করে এবং এত গোপনে করে যে, ডান হাত কি দিল তা বাম হাত জানতে পারে না।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– কোন ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর) জন্যে ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে রওয়ানা হলে আল্লাহ তা'আলা তার পথে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ অমুক ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে। ফেরেশতা বলল ঃ তার সাথে তোমার কোন কাজ নেই? লোকটি বলল ঃ না। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি একে অপরের আত্মীয়? সে বলল না। ফেরেশতা শুধাল ঃ সে তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেছে কি? সে বলল না। ফেরেশতা বলল ঃ তা হলে কেন যাও? সে জওয়াব দিল ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে মহব্বত করি। ফেরেশতা বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মহব্বত করেন এবং তোমার জন্যে তিনি জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। হাদীসে আরও বলা হয়েছে– ঈমানের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রজ্জুসমূহের মধ্যে অধিক মজবুত রজ্জু হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা। এ হাদীসের কারণেই মানুষের কিছু শত্রু থাকা জরুরী, যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা হবে এবং কিছু বন্ধু থাকা জরুরী, যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হবে। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর কাছে ওহী পাঠালেন, তুমি দুনিয়াতে বৈরাগ্য করেছ। এতে তুমি সুখ পেয়েছ। তুমি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার দিকে মনোযোগী হয়েছ। ফলে তোমার ইযযত বৃদ্ধি পেয়েছে। বল, আমার জন্যে কোন শত্রুর সাথে শত্রুতা অথবা কোন বন্ধুকে মহব্বত করেছ কিনা? রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করেছেন– ইলাহী, আমার উপর কোন পাপাচারীর অনুগ্রহ রাখবেন না, যে কারণে সে আমার মহব্বত পায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠান– যদি তুমি সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের সমপরিমাণ আমার এবাদত কর আর আল্লাহর জন্যে মহব্বত ও আল্লাহর জন্যে শত্রুতা তোমার মধ্যে না থাকে, তবে সে এবাদত আমার কোন উপকারে আসবে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ গোনাহগারদের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি কর, তাদের কাছ থেকে দূরে আসার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন কর এবং তাদেরকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রুহাল্লাহ, তাহলে আমরা কার কাছে বসব? তিনি বললেন ঃ তাদের কাছে বস, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাদের বক্তৃতা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যাদের আমল তোমাদেরকে আখেরাতের প্রতি আগ্রহান্বিত করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন– হে এমরান তনয়, সাবধান থাক এবং নিজের জন্যে সহচর অন্বেষণ কর। যে বন্ধু আমার সন্তুষ্টিতে তোমাদের সাথে একমত হয় না, সে তোমার দুশমন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ওহী পাঠালেন– হে দাউদ, তুমি নির্জন প্রকোষ্ঠে একা থাক কেন? জওয়াব হল– ইলাহী, আমি তোমার খাতিরে সৃষ্টিকে মন্দ জ্ঞান করেছি। এরশাদ হল, হে দাউদ, হুশিয়ার হও এবং নিজের জন্যে বন্ধু অন্বেষণ কর। যে বন্ধু আমার আনন্দে তোমার সাথে একমত নয়, তার সাথে থেকো না। সে তোমার দুশমন। সে তোমার অন্তর কঠোর করে দেবে এবং তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর জীবন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, এর কি পদ্ধতি যে, সকল মানুষ আমাকে মহব্বতও করবে এবং আমার ও আপনার মধ্যবর্তী সম্পর্কও বজায় থাকবে? আদেশ হল– দাউদ, মানুষের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহার কর এবং আমার ও তোমার সম্পর্কের ব্যাপারে এহসান কর। এক রেওয়ায়েতে আছে– দুনিয়াদারদের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী এবং আখেরাতওয়ালাদের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী মেলামেশা কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় সে ব্যক্তি, যে অধিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে এবং যার সাথে অধিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর অধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি, যে কানকথা বলে এবং ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আরও বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলার এক ফেরেশতার অর্ধেক দেহ আগুনের এবং অর্ধেক বরফের। সে বলে– ইলাহী, তুমি যেমন বরফ ও আগুনের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছ, তেমনি তোমার নেক বান্দাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি কর। এক হাদীসে আছে– যখন কোন বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে নতুন বন্ধু সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্যে নতুন মর্তবা নির্ধারণ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বন্ধু অবশ্যই বানাও। কারণ, বন্ধু দুনিয়াতেও উপকারে আসে এবং আখেরাতেও। দোযখীরা সেদিন বলবে–

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ অর্থাৎ, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি আমি অবিরাম রোযা রাখি, সারারাত বিনিদ্র এবাদত করি এবং নিজের উৎকৃষ্ট মাল দৌলত আল্লাহর পথে দিয়ে দেই, তবুও মৃত্যুর সময় আমার অন্তরে আল্লাহর অনুগতদের মহব্বত এবং তাঁর নাফরমানদের প্রতি ঘৃণা না থাকলে এসব এবাদত আমার কোন উপকারে আসবে না। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) জীবন সায়াহ্নে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আপনি জানেন, আমি আপনার নাফরমানী করলেও আপনার অনুগত বান্দাদেরকে মহব্বত করতাম। ইলাহী, আমার এ অভ্যাসকে আমার জন্যে আপনার নৈকট্যের কারণ করুন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এই বিষয়বস্তুর বিপরীতে বলেন ঃ হে আদম সন্তান! মানুষ যাকে মহব্বত করবে, তার সাথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকবে- এই উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, তুমি সজ্জনদের মর্তবা তাদের মত আমল না করে পাবে না। ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও তো তাদের পয়গম্বরগণকে মহব্বত করে, অথচ তারা তাঁদের মর্তবায় নয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিছু আমল অথবা সম্পূর্ণ আমল সজ্জনদের অনুরূপ না হলে কেবল মহব্বত উপকারী নয়। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) তাঁর কোন এক ওয়াযে বলেন ঃ তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসে থাকতে চাও এবং আল্লাহ তাআলার পড়শী হয়ে পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের সাথে বাসস্থান কামনা কর, কিন্তু কোন্ মুখে? কোন্ কামনা তুমি ত্যাগ করেছ? কোন্ ক্রোধটি তুমি সংবরণ করেছ? কোন্ সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করেছ। কোন্ নিকট বন্ধুর কাছ থেকে তুমি আল্লাহর জন্য দূরে সরে পড়েছ? কোন দূরবর্তী ব্যক্তিকে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে নিকট বন্ধ করেছ? বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা নিকট হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার জন্যে নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, সদকা দিয়েছি এবং যাকাত দিয়েছি। বলা হল ঃ নামায তোমার জন্যে দলীল, রোযা তোমার ঢাল, সদকা ছায়া এবং যাকাত নূর। আমার জন্যে কি করেছ? হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, বলে দাও তোমার জন্যে আমল কোন্টি? এরশাদ হল ঃ তুমি কখনও আমার জন্যে কোন বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু বানিয়েছ কি? তখন মূসা (আঃ) জানতে পারলেন, আল্লাহর জন্যে কারও শত্রু হওয়া এবং আল্লাহর খাতিরে কারও বন্ধু হওয়া উৎকৃষ্ট আমল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি রোকন এবং মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্তর বছর এবাদত করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তার হাশর সেই ব্যক্তির সাথে করবেন যাকে সে মহব্বত করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ফাসেকের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ। এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে বলল ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি? তিনি বললেন ঃ যার খাতিরে তুমি আমাকে মহব্বত কর, তিনি তোমাকে মহব্বত করুন। এর পর তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে এ বিষয় থেকে আশ্রয় চাই যে, লোকে আমাকে তোমার খাতিরে মহব্বত করবে, আর তুমি আমাকে শত্রু মনে করবে। এক ব্যক্তি দাউদ তায়ীর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঃ কেবল আপনার সাক্ষাৎ। তিনি বললেন ঃ তুমি সাক্ষাৎ করে ভাল কাজই করেছ, কিন্তু আমি আমার নিজের অবস্থা চিন্তা করি। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কে– দরবেশ, আবেদ না নেকবখত যে, মানুষ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে? তবে আমি কি বলব? আমি তো কিছুই নই। এর পর তিনি নিজেকে শাসিয়ে বললেন ঃ যৌবনে তুমি ফাসেক ছিলে। এখন বার্ধক্যে রিয়াকার হয়ে গেছ। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারীরা যখন পরস্পরে মিলিত হয়ে একে অপরকে দেখে আনন্দিত হয়, তখন তাদের গোনাহসমূহ ঝরে পড়ে, যেমন শীতকালে বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আপন ভ্রাতার মুখমন্ডল ভালবাসা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখা এবাদত।

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং পার্থিব স্বার্থে বন্ধুত্ব ঃ জানা উচিত, সংসর্গ দু'প্রকার। একটি ঘটনাপ্রসূত; যেমন একে অপরের পড়শী হওয়ার কারণে সংসর্গ হওয়া অথবা পাঠশালায় সঙ্গে থাকার কারণে অথবা বাজারে একত্রিত হওয়ার কারণে কিংবা এক জায়গায় চাকুরী করার কারণে কিংবা সফরসঙ্গী হওয়ার কারণে সংসর্গ হওয়া। অপরটি, যে সংসর্গ ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়। এখানে দ্বিতীয় প্রকার সংসর্গ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেননা, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিতরূপেই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইচ্ছাকৃত কর্মেই সওয়াব ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। সংসর্গের অর্থ কাছে বসা ও মেলামেশা করা। কাউকে প্রিয় মনে করলেই মানুষ তার কাছে বসে এবং তার সাথে মেলামেশা করে। অপ্রিয় ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই মানুষের স্বভাব। মানুষের এই মহব্বত চার প্রকার হতে পারে। প্রথম প্রকার, একজন অপরজনকে কেবল তার সত্তার কারণে মহব্বত করা। এটা সম্ভব। কেননা, যখন একজন অপরজনকে দেখবে, চিনবে এবং তার চরিত্র প্রত্যক্ষ করবে, তখন সে তাকে ভাল বলে জানবে এবং অপার স্বাদ অনুভব করবে। ভাল মনে করা মজ্জাগত মিল ও একাত্মতার অনুগামী হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় দু'ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি হয়ে যায়। অথচ এর কারণ না বাহ্যিক লাবণ্য হয়ে থাকে, না অভ্যাসের সৌন্দর্য হয়ে থাকে; বরং এর কারণ হয় অন্তর্গত মিল ও সাদৃশ্য। এই অন্তর্গত মিল ও সাদৃশ্য গোপন বিষয় এবং এর কারণসমূহও মানুষের অজানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসে এ রহস্যই বর্ণনা করেছেন–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف .

অর্থাৎ, আত্মাসমূহ সৈনিকের ন্যায় একত্রিত রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আদিকালে পরস্পর পরিচিত হয়, তারা দুনিয়াতে পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপন করে। আর যারা অপরিচিত থেকে যায়, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা থাকে।

এতে বলা হয়েছে, পরিচিত না হওয়া পৃথক থাকার এবং সম্প্রীতি মিলের পরিণতি। কোন কোন আলেম এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করে সেগুলোকে দু'দলে বিভক্ত করেছেন এবং আরশের চারপাশে প্রদক্ষিণ করিয়েছেন। দু'দলের মধ্য থেকে যে দু' দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে, তারা দুনিয়াতেও সম্প্রীতি সহকারে বাস করে। এক হাদীসে আছে– দু'মুমিনের আত্মা এক মাসের দূরত্ব থেকে এসে মিলিত হয়; অথচ তারা পরস্পরকে কখনও দেখেনি। বর্ণিত আছে, মক্কা মোয়াযযমায় এক ভাঁড় মহিলা ছিল। মদীনায়ও অমনি আরেক মহিলা ছিল। মক্কার ভাঁড় মহিলা একবার মদীনায় গিয়ে ঘটনাচক্রে মদীনার ভাঁড় মহিলার গৃহে অতিথি হয়ে একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁকে খুব হাসাল। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার গৃহে মেহমান হয়েছ? সে বলল ঃ অমুক মহিলার গৃহে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার রসূল সত্যই বলেছেন– الارواح جنود الخ

অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয়, পারস্পরিক মিলের ফলেই সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চরিত্রের মধ্যে মিল হওয়া বোধগম্য, কিন্তু যেসব কারণে এই মিল হয়, তা আবিষ্কার করা মানুষের সাধ্যের অতীত। জ্যোতির্বিদরা এ ব্যাপারে যেসব কথা বলে, তা প্রলাপোক্তি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং যে রহস্য মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়নি, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? কেননা, মানুষকে জ্ঞান অল্পই দান করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কোন মুমিন এমন মজলিসে যায়, যেখানে একশ মোনাফেক এবং একজন মাত্র মুমিন রয়েছে, তবে সে মুমিনের কাছেই গিয়ে বসবে। পক্ষান্তরে যদি কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোনাফেক এমন মজলিসে যায়, যেখানে একশ' জন মুমিন ও একজন মাত্র মোনাফেক রয়েছে, তবে সে সেই মোনাফেকের সাথেই গিয়ে বসবে। এতে বুঝা যায়, বস্তুর আকর্ষণ তার অনুরূপ বস্তুর প্রতি থাকে। হযরত মালেক ইবনে দীনার বলতেন ঃ দশ ব্যক্তির মধ্যে দু'জনের ঐকমত্য তখনই হবে, যখন একের মধ্যে অপরের কোন গুণ বিদ্যমান থাকবে। মানুষের আকার-আকৃতি পক্ষীকুলের জাত ও শ্রেণীর মত। উড়ার কাজে দুই জাতের পক্ষী কখনও একমত হয় না এবং মিল ছাড়া তাদের উড্ডয়ন এক সাথে হয় না। সেমতে প্রসিদ্ধ উক্তি আছে–

کبوتر باکبوتر باز بازباز - کند همجنس با همجنس پرواز

অর্থাৎ, কবুতর কবুতরের সাথে, বাজপাখী বাজপাখীর সাথে এবং এক জাতের পক্ষী তার সমজাতীয় পক্ষীর সাথে উড়ে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রঃ) একদিন কাককে কবুতরের সাথে উড়তে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন, যে, এরা কিরূপে সঙ্গী হল। এরা তো এক জাতের নয়। এর পর গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, এরা উভয়েই খোঁড়া। কাজেই এরা একমত হয়ে গেছে। তাই জনৈক দার্শনিক বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার সমআকৃতির মানুষের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে,। যেমন পাখীরা তাদের সমজাতের সাথে আকাশে উড়ে। দুব্যক্তি কয়েকদিন একত্রিত থাকলে তারা যদি সমআকৃতিবিশিষ্ট না হয়, তবে অবশ্যই পৃথক হয়ে যাবে।

মোট কথা, মানুষের পারস্পরিক মহব্বত কখনও তার সত্তার কারণে হয়– বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন ফায়দার কারণে নয়। বরং অন্তর্গত মজ্জা ও গোপন চরিত্রই মানুষকে এই মহব্বতে উদ্বুদ্ধ করে। রূপলাবণ্যের মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি তাতে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হয়। কেননা, কাম-প্রবৃত্তি ছাড়াও সুন্দর মুখাকৃতি স্বতন্ত্রভাবে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। ফলমূল, কলি, পুষ্প, লাল রঙ মিশ্রিত সেব, প্রবাহমান পানি এবং সবুজের মেলা দৃষ্টিকে প্রচুর আনন্দ দান করে। অথচ এগুলোর সত্তা ছাড়া অন্য কোন কুবাসনা মাঝখানে থাকে না। এই মহব্বত মজ্জাগত, খাহেশপ্রসূত এবং খোদাদ্রোহীদেরও হয় বিধায় আল্লাহর জন্য মহব্বত এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু এই মহব্বতের মধ্যে কোন কুউদ্দেশ্য ঢুকে পড়লে তা মন্দ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ হালাল নয় এমন সুন্দরী মহিলাকে কামপ্রবৃত্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চরিতার্থ করার উদ্দেশে মহব্বত করা। আর যদি কোন উদ্দেশ্য না ঢুকে তবে এই মহব্বত বৈধ- প্রশংসনীয়ও নয়, নিন্দনীয়ও নয়। বলাবাহুল্য, মহব্বত তিন প্রকার- প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় ও বৈধ।

দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত হল, কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে একজন অপরজনকে মহব্বত করা। এই মহব্বত উদ্দেশ্যের মাধ্যম হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, প্রিয় বস্তুর মাধ্যমও প্রিয় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তিকে অন্য বস্তুর খাতিরে মহব্বত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে শুধু সে প্রিয় নয়, বরং অন্য বস্তুটিও প্রিয় হয়ে থাকে। তবে ব্যক্তিটি প্রিয় বস্তুর উপায় বিধায় সেও প্রিয়। এ কারণেই মানুষ টাকা-পয়সাকে প্রিয় মনে করে। অথচ টাকা-পয়সার সত্তার সাথে মানুষের উদ্দেশ্য জড়িত নয়। কেননা, টাকা-পয়সা খাওয়াও যায় না, পরাও যায় না, কিন্তু এটা অন্য প্রিয় বস্তু লাভ করার উপায়। অনেক মানুষের অবস্থাও তাই। অন্যরা তাদেরকে টাকা পয়সার ন্যায় মহব্বত করে। কারণ, তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাদের মাধ্যমে যশ, অর্থ অথবা জ্ঞান অর্জিত হয়। উদাহরণতঃ মানুষ শাসককে এ কারণেই মহব্বত করে যে, তার অর্থ অথবা যশ দ্বারা উপকার হয়। অতএব যে উদ্দেশ্যের জন্যে কোন প্রিয় ব্যক্তিকে মাধ্যম করা হয় তা যদি কেবল পার্থিব হয়, তবে এই মাধ্যমের মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হবে না। যদি উদ্দেশ্য পার্থিব হওয়ার মধ্যেই সীমিত না হয়, কিন্তু যে মহব্বত করে, তার উদ্দেশ্য যদি কেবলই পার্থিব উপকার হয়, তবে তাও আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হবে না। যেমন, শাগরেদ ওস্তাদকে এলেম হাসিলের জন্যে মহব্বত করে। এখানে এলেমের উপকারিতা যদিও কেবল পার্থিব হওয়ার মধ্যেই সীমিত নয়; কিন্তু শাগরেদের উদ্দেশ্য যদি তা দ্বারা কেবল দুনিয়া অর্জন ও জনপ্রিয়তা লাভই হয়, তবে তার মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে না। অবশ্য যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে এলেম হাসিল করে, তবে ওস্তাদের মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে হবে।

এই মহব্বত দু'প্রকার। একটি নিন্দনীয় ও অপরটি বৈধ। যদি এলেমকে নিন্দনীয় উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় করার নিয়ত থাকে, তবে মহব্বতও নিন্দনীয় হবে। আর বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ত থাকলে মহব্বতও বৈধ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় প্রকার মহব্বত হল, একজন অপরজনকে আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে মহব্বত করা। এই মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি নিজের ওস্তাদ কিংবা পীরকে এ কারণে মহব্বত করে যে, তার মাধ্যমে এলেম ও আমল দুরস্ত হবে এবং এই এলেম ও আমল দ্বারা আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে। অনুরূপভাবে যে ওস্তাদ তার শাগরেদকে একই কারণে, মহব্বত করে, তার মহব্বতও আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ খয়রাত করে এবং মেহমান সমবেত করে, তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে রান্না করায়, সে যদি কোন পারদর্শী বাবুর্চিকে মহব্বত করে, তবে এই মহব্বতও আল্লাহর জন্যে হবে। আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলি, যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজনাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে, অর্থাৎ খাদ্য পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি সকল প্রয়োজন নিজের কাছ থেকে সরবরাহ করে, যাতে সেই ব্যক্তি এলেম ও আমলের জন্যে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে এ কারণে মহব্বত করে, তবে সেও আল্লাহর জন্যে মহব্বতকারী হবে। সেমতে পূর্ববর্তীদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের পার্থিব প্রয়োজনাদির দায়িত্ব কতক ধনী ব্যক্তি গ্রহণ করেছিল। ফলে তারা উভয়ই আল্লাহর জন্যে মহব্বতকারী ছিলেন। আমরা আরও বলি, যে ব্যক্তি শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজের দ্বীনদারী বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কোন সতী নারীকে বিবাহ করে এবং স্ত্রীকে ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসাবে মহব্বত করে, তার মহব্বতও আল্লাহর জন্যে হবে। এ কারণেই পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করার অনেক সওয়াব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি, খাদ্যের লোকমা স্ত্রীর মুখে তুলে দিলেও সওয়াব পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমরা বলি, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও দুনিয়া অর্জন উভয় বিষয়ের উপায় একত্রিত থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও দুনিয়ার মহব্বত একত্রিত থাকে, তারা উভয় বিষয়ের সুবিধার জন্যে একে অপরকে মহব্বত করে, তবে তারাও আল্লাহ জন্যে মহব্বতকারী গণ্য হবে। কেননা, আল্লাহর মহব্বত হওয়ার জন্যে এটা শর্ত নয় যে, দুনিয়ার মহব্বত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকবে। এর প্রমাণ, পয়গম্বরগণকে যে দোয়া করতে আদেশ করা হয়েছে, তাতে দুনিয়া ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আখেরাত উভয়টি একত্রিত করা হয়েছে। সেমতে এক দোয়া এই ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর দোয়ায় বলেন ঃ ইলাহী, আমার বিরুদ্ধে আমার শত্রুকে হাসিও না। আমার কারণে আমার বন্ধুর ক্ষতি করো না, আমার ধর্ম কাজে বিপদ দিয়ো না এবং দুনিয়াকে আমার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য করো না। এ দোয়ায় শত্রুর হাসি দূর করা পার্থিব উপকার। তিনি একথা বলেননি যে, দুনিয়াকে কখনও আমার লক্ষ্য করো না; বরং দোয়ায় বলেছেন, দুনিয়াকে আমার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য করো না। আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সাঃ) এক দোয়ায় বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সেই রহমত প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা তোমার মাহাত্ম্যের গৌরব দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করি। তিনি আরও বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী আমাকে দুনিয়া আখেরাতের বিপদ ও আযাব থেকে নিরাপত্তা দান কর। মোট কথা, পার্থিব আনন্দ দু'প্রকার। এক, যা আখেরাতের আনন্দের পরিপন্থী এবং তাতে বাধা সৃষ্টিকারী। এ ধরনের আনন্দ থেকে পয়গম্বরগণ নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং অপরকে বিরত থাকতে বলেছেন। দ্বিতীয়, যা আখেরাতের আনন্দের অন্তরায় নয়। এসব আনন্দ থেকে পয়গম্বরগণ কখনও হাত গুটিয়ে নেননি; যেমন বিবাহ করা এবং হালাল খাওয়া ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রকার মহব্বত হল, একজন অন্যজনকে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা। অর্থাৎ, এতে এলেম ও আমল সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা লক্ষ্য হবে না এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য হবে না। মহব্বতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকারটি সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও গোপন হলেও এর অস্তিত্ব সম্ভব। কেননা, প্রবল হল, মহব্বতের প্রভাব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হল, প্রিয়জনকে অতিক্রম করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। উদাহরণতঃ কারও প্রতি কারও মহব্বত বেশী হয়ে গেলে সে প্রিয়জনের প্রিয়জন, খাদেম এবং প্রশংসাকরীকেও মহব্বত করে থাকে। বাকিয়্যা ইবনে ওলীদ বলেন ঃ যখন ঈমানদার অন্য ঈমানদারকে মহব্বত করে, তখন তার কুকুরকেও মহব্বত করে। তার এই উক্তি বাস্তবেও সঠিক। বিখ্যাত আশেকদের অবস্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং কবিদের কবিতা থেকেও একথা বুঝা যায়। এ কারণেই প্রিয়জনের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দেয়া হয় এবং গৃহ, মহল্লা ও পড়শীদেরকে মহব্বত করা হয়।

মোট কথা, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় জানা জায়, মহব্বত প্রিয়জনের সত্তা অতিক্রম করে প্রিয়জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে এটা প্রবল মহব্বতের বৈশিষ্ট্য। এমনিভাবে যখন আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল হয়ে অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন আল্লাহ ছাড়া যত বস্তু রয়েছে, সবগুলোর প্রতিই তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যত কিছু রয়েছে, সবগুলো তাঁর কুদরতের পরিচায়ক। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে কেউ নতুন ফল আনলে তিনি তা চোখে লাগাতেন এবং তাযীম করে বলতেন– আমার পরওয়ারদেগার এই মাত্র একে অস্তিত্ব দান করেছেন। (অর্থাৎ, কোন পাপী হাত পা একে দলিত করেনি এবং মাটিতে পড়ে থাকেনি; বরং এই মাত্র আদেশ পেয়ে অদৃশ্য জগত থেকে অস্তিত্বের জগতে নতুন আগমন করেছে।) সারকথা, আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে বস্তু সত্তাগতভাবে অপছন্দনীয়, তাও পছন্দনীয় মনে হতে থাকে। সে বস্তু বেদনাদায়ক হলেও মহব্বতের আতিশয্যে ব্যথা অনুভূত হয় না; বরং এটা আমার প্রিয়জনের– এই আনন্দের নীচে ব্যথা চাপা পড়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহর প্রেমে কোন কোন প্রেমিকের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তারা বলে, আমরা মসিবত ও নেয়ামতের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। কেননা, উভয়টিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে।

انچه از دوست میرسد نیکو ست বন্ধুর কাছ থেকে যা আসে তা ভালই। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর নাফরমানী করে যদি ক্ষমাও পাওয়া যায়, তবু আমি নাফরমানী করতে চাই না। সমনূন (রহঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ বিষয়টি একটি কবিতায় নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করেছেন–

হে আল্লাহ! তোমাকে ছাড়া আমার স্বস্তি নেই। তুমি যেমন ইচ্ছা তা পরীক্ষা করে নাও।

আল্লাহর জন্যে শত্রুতার স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্যে মহব্বত করা ওয়াজিব, তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহর জন্যে শত্রুতা পোষণ করা জরুরী। উদাহরণতঃ তুমি এক ব্যক্তিকে এ কারণে মহব্বত কর যে, সে আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও প্রিয় বান্দা। এখন যদি সে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তবে তার সাথে শত্রুতা রাখা তোমার জন্যে অপরিহার্য হবে। কেননা, সে আল্লাহর নাফরমান ও তাঁর ক্রোধের পাত্র হয়েছে। মোট কথা, যে কারণে মহব্বত হয়, তার বিপরীত কারণ পাওয়া গেলে শত্রুতা হবেই। এদিক দিয়ে মহব্বত ও শত্রুতা একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের প্রত্যেকটি অন্তরে বদ্ধমূল থাকে এবং প্রবল হওয়ার সময় প্রকাশ পায়। যা প্রকাশ পায়, তদনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম ফুটে উঠে। অর্থাৎ, মহব্বত থেকে নৈকট্য ও একাত্মতা প্রকাশ পায় এবং শত্রুতা থেকে দূরত্ব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কাজে প্রকাশ পাওয়ার পর প্রথমটিকে পরিভাষায় মোআলাত এবং দ্বিতীয়টিকে মোআদাত বলা হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছে– তুমি আমার ব্যাপারে কারও সাথে মোআলাত অথবা মোআদাত করেছ কি?

কোন ব্যক্তির মধ্যে এককভাবে মোআলাত কিংবা মোআদাত পাওয়া গেলে সেখানে ব্যাপার সহজ। অর্থাৎ, কারও মধ্যে কেবল আল্লাহর আনুগত্য আছে বলে জানলে তাকে তুমি মহব্বত করতে পার কিংবা কেবল পাপাচার আছে বলে জানলে তার সাথে শত্রুতা রাখতে পার, কিন্তু সমস্যা তখন দেখা দেয়, যখন কারও মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়টি পাওয়া যায়। তখন তুমি বলতে পার, এর একটি অপরটির বিপরীত বিধায় মহব্বত ও শত্রুতা একত্রিত করব কিরূপে? এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলার জন্যে এই উভয় বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে নেই। কেননা, এক ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হতে পারে, যার কিছু পছন্দনীয় ও কিছু অপছন্দনীয়। কাজেই তুমি সেই ব্যক্তিকে কোন কারণে মহব্বত করবে এবং কোন কারণে শত্রুতা করবে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী কিন্তু বজ্জাত। এমতাবস্থায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সে তাকে এক কারণে মহব্বত করবে এবং এক কারণে ঘৃণা করবে। প্রশ্ন হয়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ইসলাম আনুগত্যের মাপকাঠি। অতএব ইসলাম সত্ত্বেও মুসলমানের সাথে শত্রুতা রাখা যাবে কিরূপে? এর জওয়াব, ইসলামের কারণে মুসলমানকে মহব্বত করবে এবং গোনাহের কারণে তার সাথে শত্রুতা করবে। কাফের ও পাপাচারীর সাথে শত্রুতায় যেমন একটু পার্থক্য হবে, তেমনি ইসলামের কারণে মহব্বত ও গোনাহের কারণে শত্রুতার মধ্যে একটু পার্থক্য করলেই চলবে এবং এতটুকু মহব্বত দ্বারাই তার প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আনুগত্য ও ত্রুটিকে নিজের ব্যাপারে আনুগত্য ও ত্রুটির অনুরূপ মনে কর। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি কোন উদ্দেশে তোমার সাথে একমত হয় এবং অন্য উদ্দেশে বিরোধিতা করে, তার সাথে এমন মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন কর যে, তার প্রতি সন্তুষ্টও হবে না এবং অসন্তুষ্টও হবে না। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও তোমার এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হল, শত্রুতা কিভাবে প্রকাশ করা যাবে? জওয়াব, কথায় ও কাজে শত্রুতা প্রকাশিত হতে পারে। কথায় এভাবে যে, কখনও তার কর্মে সাহায্য করবে না এবং কখনও তার কর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করবে, কিন্তু শত্রুতা অপরাধ অনুযায়ী হতে হবে । কেউ যদি ভুল করে নিজেও অনুতপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে না করে, তবে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। যদি কেউ একটির পর একটি সগীরা অথবা কবীরা গোনাহ করতে থাকে, তবে তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে পূর্বে গাঢ় বন্ধুত্ব না থাকলে এভাবে শত্রুতার চিহ্ন প্রকাশ করা জরুরী যে, তুমি তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার প্রতি কম মনোযোগ দেবে অথবা গাল মন্দ করবে। এটা পৃথক হয়ে যাওয়ার তুলনায় কঠিন। সুতরাং সগীরা গোনাহে আলাদা হয়ে যাবে এবং কবীরা গোনাহে গালিগালাজ করবে।

অনুরূপভাবে কাজের মাধ্যমে শত্রুতা প্রকাশ করারও দুটি স্তর রয়েছে। নিম্নস্তর হচ্ছে সাহায্য ও আনুকূল্য বর্জন করা এবং উচ্চস্তর হচ্ছে তার কাজ নষ্ট করে দেয়া এবং তার কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে না দেয়া। যেমন, শত্রুরা একে অপরের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেসব উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা গোনাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে গোনাহ করতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে গোনাহ বর্জনে যেসকল উদ্দেশ্যের কোন প্রভাব নেই, সেসব উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দেয়া উচিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি মদ্যপান করে আল্লাহর নাফরমানী করেছে। এখন সে একজন মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। বলাবাহুল্য, বিবাহ না মদ্যপানে বাধা দেয় না উৎসাহ প্রদান করে। কাজেই তুমি সক্ষম হলে তাকে সাহায্য করে বিবাহ করিয়ে দাও। আর ইচ্ছা করলে বাধা দিয়ে বিবাহ ভণ্ডুল করে দাও। এমতাবস্থায় বাধা দেয়া তোমার জন্যে জরুরী নয়। হাঁ, ক্রোধ প্রকাশ করার জন্যে সাহায্য না করলে দোষ নেই। সে যদি তোমার কোন আত্মীয়ের সাথে বিশেষ অপরাধ করে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করা খুব ভাল। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে গুণী ও ধনী ব্যক্তিরা যেন আত্মীয়, মিসকীন ও মোহাজেরদের দান না করার জন্যে কসম না খায়। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করুন?

এই আয়াতের শানে নুযুল হল, মেসতাহ্ ইবনে আছাছা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় যোগদান করেছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) পূর্বে তাকে অর্থ সাহায্য দিতেন। এ ঘটনার পর তিনি তাকে কিছু দেবেন না বলে কসম খেলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এখানে মেসতাহের অপরাধ নিঃসন্দেহে গুরুতর ছিল। সে হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছিল, কিন্তু সিদ্দীকগণের নীতি হল, কেউ তাদের উপর জুলুম করলে ক্ষমা করে দেয়া। তাই আয়াতে এ শিক্ষাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এর পর হযরত আবু বকর মেসতাহের অর্থ সাহায্য পুনরায় চালু করে দেন।

যে নিজের উপর জুলুম করে তার প্রতি অনুগ্রহ করাই উত্তম, কিন্তু যে অপরের উপর জুলুম করে এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তার প্রতি অনুগ্রহ করা মজলুমের প্রতি অন্যায় করারই নামান্তর। অথচ মজলুমের হকের প্রতি খেয়াল রাখা এবং জালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে মজলুমের মনকে শক্ত করা আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন, কিন্তু যদি তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজেই মজলুম হও, তবে ক্ষমা করে দেয়াই তোমার জন্যে উত্তম। গোনাহগারদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, জালেম, বেদআতী এবং আল্লাহ তাআলার সেসব নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করা উচিত, যদ্দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়। আর যারা নিজের বিরুদ্ধে গোনাহ করে, তাদের ব্যাপারেও পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ এমন গোনাহগারদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কেউ অতি মাত্রায় অপছন্দ করে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ত্যাগ করেছেন। সেমতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সামান্য বিষয়ে বুযুর্গদের সাথে মেলামেশা বর্জন করতেন। একবার ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বলেছিলেন– কিছু চাই না। তবে বাদশাহ কিছু পাঠিয়ে দিলে তা কবুল করে নেব। এ কথার কারণে ইমাম আহমদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করেন। অনুরূপভাবে তিনি হারেস মুহাসেবী (রহঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ বর্জন করেন এ কারণে যে, তিনি মুতাযেলা সম্প্রদায়ের খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ইমাম আহমদ বললেন ঃ এ পুস্তিকায় তুমি প্রথমে মুতাযেলীদের আপত্তি উদ্ধৃত করেছ, এর পর জওয়াব দিয়েছ। ফলে তুমি নিজেই মানুষকে সন্দেহে পতিত করেছ। প্রশ্ন হয়, শত্রুতা প্রকাশের নিম্নস্তর হচ্ছে সাক্ষাৎ বর্জন করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং সঙ্গ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। এসব বিষয় কি ওয়াজিব? মানুষ কি এগুলো না করলে গোনাহগার হবে? জওয়াব হচ্ছে, বাহ্যিক জ্ঞান অনুযায়ী এসব বিষয় করতে মানুষ বাধ্য নয় এবং এগুলো ওয়াজিব হওয়ারও বিধান পাওয়া যায় না। কেননা, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় মদ্যপান করেছে এবং কুকর্ম করেছে, তারা তাঁর সাক্ষাৎ থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়েনি; বরং কেউ কেউ তাদের গালমন্দ করত, শত্রুতা প্রকাশ করত, মুখ ফিরিয়ে নিত, কিন্তু কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করত না। আবার কেউ কেউ তাদেরকে করুণার দৃষ্টিতেও দেখত এবং তাদের কাছে থেকে দূরে থাকা পছন্দ করত না।

আল্লাহর জন্যে শত্রুতার স্তর ঃ প্রশ্ন হয়, কর্মের মাধ্যমে শত্রুতা প্রকাশ করা ওয়াজিব না হলেও এটা যে মোস্তাহাব, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। অবাধ্য ও ফাসেকদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অতএব তাদের সাথে ব্যবহারে পার্থক্য কিরূপে করতে হবে? সকলের সাথে একই রকম ব্যবহার করা উচিত কিনা? এর জওয়াব হচ্ছে, খোদাদ্রোহীরা সাধারণতঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কাফের, (২) সেই বেদআতী, যে তার বেদআতের প্রতি অন্যকে আহ্বান করে এবং (৩) যে কাজেকর্মে গোনাহ করে, কিন্তু সঠিক আকীদা রাখে। এখন প্রত্যেক শ্রেণীর সাথে ব্যবহারের স্তর আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথমে কাফেরের বিধান শুন। কাফের যুদ্ধাবস্থায় থাকলে সে হত্যা ও গোলাম করার যোগ্য। আর যিম্মী হলে তাকে নির্যাতন করা বৈধ নয়। তবে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হবে, তার পথেঘাটে নত হয়ে চলতে হবে। তুমি প্রথমে তাকে সালাম বলবে না। সে "আসসালামু আলাইকা" বললে তুমি জওয়াবে 'ওয়া আলাইক' বলবে। তার সাথে কথাবার্তা বলা, লেনদেন করা এবং সঙ্গে খাওয়া জায়েয, কিন্তু এগুলো না করা উত্তম, কিন্তু বন্ধুদের সাথে যেরূপ খেলাখুলি মেলামেশা করা হয়, তা যিম্মীর সাথে করা কঠোর মাকরূহ। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যে, তারা সেই ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে, যে আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করে, যদিও সে তাদের পিতা অথবা পুত্র হয়। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমান ও মুশরিক এত দূরে যে, তাদের একজনের অগ্নি অন্যজনের দৃষ্টিগোচর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ সে বেদআতী, যে তার বেদআতের প্রতি অন্যকে আহবান করে। তার বিধান হচ্ছে, যদি বেদআত কাফের করে দেয়ার মত হয় তবে তার ব্যাপারটি যিম্মীর চেয়ে গুরুতর। আর যদি এমন বেদআত হয়, যদ্দ্বারা কাফের হয় না, তবে তার ব্যাপার তার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে কাফেরের তুলনায় হালকা, কিন্তু মুসলমানদের উচিত তাকে কাফেরের তুলনায় অধিক অপছন্দ করা। কেননা, কাফেরের অনিষ্ট মুসলমানদের দিকে সংক্রামক নয়। কেননা, মুসলমানরা তাকে কাফের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলে বিশ্বাস করে। ফলে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং সে নিজেও মুসলমান হওয়ার দাবী করে না, কিন্তু বেদআতী একথাই বলে যে, সে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করে সেটাই সত্য। সুতরাং তার অনিষ্ট অন্যের দিকে সংক্রমিত হয়। অতএব তার সাথে শত্রুতা রাখা, সাক্ষাৎ বর্জন করা, তাকে ঘৃণা করা, মন্দ বলা এবং মানুষকে তার কাছে আসতে না দেয়া চরম পর্যায়ের মোস্তাহাব। সে নির্জনে সালাম করলে জওয়াব দিতে দোষ নেই, কিন্তু যদি জানা যায়, সালামের জওয়াব না দিলে বেদআতের প্রতি তার মন বীতশ্রদ্ধ হবে; তার জওয়াব না দেয়া উত্তম। কেননা, সালামের জওয়াব দেয়া যদিও ওয়াজিব, কিন্তু সামান্য উপযোগিতার কারণেও তা ওয়াজিব থাকে না। উদাহরণতঃ কেউ প্রস্রাব পায়খানায় থাকলে সালামের জওয়াব দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব নয়। বেদআতীকে শিক্ষা দেয়া একটি জরুরী উপযোগিতা। যদি বেদআতী জনসমাবেশে সালাম করে, তবে জওয়াব বর্জন করা উত্তম, যাতে জনসাধারণ তাকে ঘৃণা করে এবং তার বেদআতকে খারাপ মনে করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেদআতীকে ধমকায়, তার কথা ও কাজ অমান্য করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি বেদআতকে অপমানিত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে নম্রতা করে, তার প্রতি সম্মান দেখায় অথবা প্রফুল্ল বদনে তার সাথে সাক্ষাৎ করে, সে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে।

তৃতীয় পর্যায়, যে কাজকর্মে গোনাহ্ করে, কিন্তু সঠিক আকীদা পোষণা করে, এরূপ গোনাহ তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার গোনাহ, যদ্দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়; যেমন জুলুম, ছিনতাই, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, পরনিন্দা ইত্যাদি। যারা এ ধরনের গোনাহ করে, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া উত্তম। কেননা, মানুষের জন্যে কষ্টদায়ক গোনাহ কঠোর হয়ে থাকে এবং এক গোনাহ অপর গোনাহ থেকেও কঠোর হয়ে থাকে। যেমন, খুনের জুলুম, অর্থের জুলুম ও ইযযতের জুলুম। এই গোনাহকারীদেরকে অপমান করা ও তাদের প্রতি বিমুখ হওয়া খুবই জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় প্রকার সে গোনাহগার, যে গোলযোগ সৃষ্টি করে, মানুষকে গোলযোগে উৎসাহিত করে। এতে মানুষের কষ্ট না হলেও তাদের ধর্ম বিনষ্ট হয়। এটা প্রথম প্রকারের নিকটবর্তী এবং তা থেকে কিছু হালকা। এর বিধানও অপমান করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আলাদা থাকা এবং সালামের জওয়াব না দেয়া।

তৃতীয় প্রকার সেই গোনাহগার, যে মদ্যপান অথবা কোন ওয়াজিব বর্জন করে ফাসেক হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির ব্যাপার হালকা, কিন্তু গোনাহ করা অবস্থায় তাকে দেখলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও কার্যকর পন্থায় বাধা দিতে হবে। কেননা, কুকর্ম থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। যদি গোনাহে লিপ্ত অবস্থায় দেখা না যায় কিন্তু জানা থাকে যে, সে অমুক গোনাহে অভ্যস্ত, তবে উপদেশে কাজ হবে মনে করলে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে নম্রভাবে অথবা কঠোরভাবে উপদেশ দেবে। আর যদি জানা যায়, উপদেশে কাজ হবে না, তবে সালামের জওয়াব না দেয়া এবং মেলামেশা বর্জন করার ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে পাপাচারের গোনাহ বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে কেবল গোনাহগারেরই ক্ষতি হয়, তা যে খুব হালকা ব্যাপার, তার দলীল এই হাদীস– জনৈক মদ্যপায়ীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কয়েকবার প্রহার করা হয়। এর পরও সে মদ্যপান থেকে বিরত হল না। ফলে আবারও ধৃত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আনীত হল। জনৈক সাহাবী বললেন ঃ তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। সে অত্যধিক মদ্যপান করে। রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীকে বললেন ঃ আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। এ থেকে বুঝা গেল, নম্রতা করা রুক্ষতা ও কঠোরতার তুলনায় উত্তম।

সংসর্গের গুণাবলী ঃ প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক মানুষ সংসর্গের যোগ্যতা রাখে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি অনুসরণ করে। কাজেই তোমাদের কেউ কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকে যাচাই করে নেবে। সুতরাং যার সংসর্গ অবলম্বন করা হবে, তার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলী থাকা অবশ্যই জরুরী। সংসর্গের মাধ্যমে যে সকল উপকারিতা কাম্য হয়ে থাকে, সেগুলোর দিক দিয়ে এসব গুণ সংসর্গের জন্যে শর্ত হওয়া উচিত। কেননা, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পৌঁছার জন্যে যা জরুরী, তাকেই শর্ত বলা হয়। অতএব জানা গেল, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শর্তের বিকাশ ঘটে।

পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় প্রকার উপকারিতাই সংসর্গের মাধ্যমে কাম্য হয়ে থাকে। পার্থিব উপকারিতা হল অর্থ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা শুধু সাক্ষাৎ ও সাহচর্য দ্বারা মনোরঞ্জন করা ইত্যাদি। এগুলো বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মীয় উপকারিতাসমূহের মধ্যেও অনেক উপকারিতার সমাহার হয়ে থাকে; যেমন এক, জ্ঞানগরিমা ও কর্মের দ্বারা উপকৃত হওয়া; দুই, এবাদতে উত্যক্তকারী ও বাধাদানকারীদের জ্বালাতন থেকে নিরাপদ থাকার দিক দিয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা উপকৃত হওয়া; তিন, যাতে জীবিকার অন্বেষণে সময় নষ্ট না হয় সেজন্যে কারও টাকা পয়সা দ্বারা উপকার লাভ করা; চার, প্রয়োজন ও অভাব অনটনে সাহায্য নেয়া, পাঁচ, কেবল দোয়ার বরকত হাসিল করা। ছয়, আখেরাতে সুপারিশ আশা করা। পূর্ববর্তী জনৈক মনীষী বলেন ঃ অনেক বন্ধু তৈরী কর। কেননা, প্রত্যেক ঈমানদার বন্ধুই তোমার জন্যে সুপারিশ করবে। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, তুমি কোন বন্ধুর শাফায়াতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে। এক তফসীরে-

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ -

আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের পক্ষে ঈমানদারদের শাফায়াত কবুল করে বন্ধুদেরকে তাদের সাথে জান্নাতে দাখিল করবেন। কথিত আছে, কোন বান্দার মাগফেরাত হয়ে গেলে সে তার বন্ধুদের জন্যে সুপারিশ করবে। এ কারণেই কিছুসংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী সংসর্গ, সম্প্রীতি ও মেলামেশা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন! তাদের মতে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা মন্দ কাজ।

উপরোক্ত ধর্মীয় উপকারিতাসমূহের প্রত্যেকটিরই কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যার অবর্তমানে এসব উপকারিতা অর্জিত হয় না। এসব শর্তের বিস্তারিত বর্ণনা সুদীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, যে ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা হবে, তার মধ্যে পাঁচটি বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম, জ্ঞানবুদ্ধি, দ্বিতীয়, সচ্চরিত্রতা, তৃতীয়, পাপাচারী না হওয়া, চতুর্থ, বেদআতী না হওয়া এবং পঞ্চম, সংসারলোভী না হওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন এজন্য যে, এটাই আসল পুঁজি। নির্বোধ ব্যক্তির সংসর্গে কোন কল্যাণ নেই। এ সংসর্গের পরিণাম নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতা; যদিও তা অনেক দিনের হয়। হযরত আলী (রাঃ) এক কবিতায় বলেন, তুমি আমার কথা মেনে মূর্খের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাক। মূর্খের বন্ধুত্ব জ্ঞানীকে বরবাদ করে দেয়। মূর্খের সাথে বন্ধুত্বের পরিণামস্বরূপ মানুষ তোমাকে মূর্খ বলে স্মরণ করবে। সা'দী সিরাজী তাঁর পান্দেনামায় এ বিষয়টিই এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

زجاهل حذرکردن اولی بود - کزوتننگ دنیا وعقبی بود -

অর্থাৎ, মূর্খের কাছ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। কারণ, এতে ইহকাল ও পরকালে দোষী হতে হয়। কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি উপকার ও সাহায্যের নিয়তে কোন কিছু করলে তা বন্ধুর জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই বলা হয়– নির্বোধের কাছ থেকে আলাদা থাকা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের নামান্তর। আমাদের মতে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে বাস্তবতার আলোকে বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করে।

সচ্চরিত্রতার প্রয়োজন এ কারণে যে, অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস্তবতার আলোকে বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু তাদের উপর যখন ক্রোধ কিংবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যায় অথবা কৃপণতা ও কাপুরুষতার চাপ পড়ে, তখন তারা প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে বসে এবং যে বিষয়কে তারা ভাল মনে করে, তার বিপরীত কাজ করে। কারণ, তারা নিজেদের স্বভাবকে দমন করতে এবং চরিত্র সংশোধন করতে অক্ষম হয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বনে কোন ফায়দা নেই।

পাপাচারীর সংসর্গ অবলম্বন না করার কারণ, যে পাপাচারী তার পাপাচারে পীড়াপীড়ি করে, ফলে তার সংসর্গেও কোন উপকার হয় না। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে, সে কবীরা গোনাহে পীড়াপীড়ি করে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, তার বন্ধুত্বে ভরসা করা অনুচিত। স্বার্থ বদলে গেলে সে-ও বদলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ -

অর্থাৎ, তার আনুগত্য করো না; যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۔

অর্থাৎ, যে এ বিষয়ে বিশ্বাসী নয়, সে যেন আপনাকে এর প্রতি বিমুখ না করে দেয় এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۔

অর্থাৎ, অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নিন সে ব্যক্তির দিক থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۔

অর্থাৎ, আমার প্রতি প্রবর্তন করে, আপনি তার পথ অনুসরণ করুন।

এছাড়া পাপাচার ও পাপাচারীকে দেখলে এবং তার সাথে মেলামেশা করলে গোনাহ অন্তরের জন্যে সহজ হয়ে যায় এবং গোনাহের প্রতি অন্তরে ঘৃণা থাকে না। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন ঃ জালেমদের প্রতি তাকিয়ো না। তাকালে তোমার ভাল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। পাপাচারীদের থেকে আলাদা থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ۔

অর্থাৎ, যখন মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা বলে– সালামত (নিরাপত্তা)। অর্থাৎ, আমরা যেন তোমাদের গোনাহ থেকে সালামত থাকি।

বেদআতীর কাছ থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন এজন্যে যে, তার সংসর্গে থাকলে তার বেদআত ও অনিষ্ট অপরের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থাকে। বেদআতী ব্যক্তি মেলামেশা থেকে বঞ্চিত ও পৃথক থাকারই যোগ্য। এমতাবস্থায় তার সংসর্গ কিরূপে অবলম্বন করা যায়। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের (রহঃ) রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) ধর্মপরায়ণ বন্ধুর অন্বেষণে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন ঃ সত্যিকার বন্ধুকে অপরিহার্য করে নাও এবং তার সমর্থনে জীবন অতিবাহিত কর। কেননা, সে সুখের সময় তোমার শোভা এবং অসময়ে তোমার সহায় হবে। শত্রুর কাছ থেকে সরে থাক। নতুবা তার কুকর্ম শিখে ফেলবে। কাজ-কারবারে খোদাভীরুদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যারা দুনিয়ালোভী, তাদের সংসর্গ বিষতুল্য। কেননা, অপরের অনুকরণ করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। বরং একজন তার সহচর অন্যজনের স্বভাব থেকে কিছু চুরি করে নেয়; অথচ সহচর তা টেরও পায় না। সুতরাং দুনিয়ালোভীর সাথে উঠাবসা করলে দুনিয়ার লোভই উন্নতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে সংসারত্যাগীর সাথে উঠাবসা করলে সংসার ত্যাগের প্রেরণাই বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই দুনিয়াদারদের সংসর্গ মাকরূহ এবং পরকালের প্রতি আগ্রহীদের সংসর্গ মোস্তাহাব।

উপরে সচ্চরিত্রতার বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আলকামা আতারদী জীবন সায়াহ্নে তার পুত্রকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বৎস, তোমার কারও সংসর্গে থাকার প্রয়োজন হলে এমন ব্যক্তির সাথে থাকবে, যার খেদমত করলে সে তোমার হেফাযত করবে। তার কাছে বসলে সে তোমাকে সৌন্দর্য দান করবে। তোমার তরফ থেকে কোন কষ্ট পেলে সে তা বরদাশত করবে। তুমি কল্যাণের হাত প্রসারিত করতে চাইলে সে প্রসারিত করবে। তোমার কোন গুণ দেখলে সে তা গণ্য করবে এবং কোন দোষ দেখলে তা প্রতিহত করবে। তুমি তার কাছে কিছু চাইলে সে দেবে। তুমি বিপদগ্রস্ত হলে সে সমবেদনা প্রকাশ করবে। তোমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে। তুমি কোন কাজ করতে চইলে সে তোমাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেবে। বলাবাহুল্য, এ ওসিয়ত সংসর্গের সকল কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। সবগুলো কর্তব্য পালন করা এতে শর্ত করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রাহঃ) বলেন ঃ খলীফা মামুন এই ওসিয়তের কথা শুনে বললেন ঃ এরূপ লোক কোথায়? কেউ বলল ঃ আপনি কি এই ওসিয়তের কারণ বুঝতে পেরেছেন? খলীফা বললেন ঃ না। লোকটি বলল ঃ আলকামার উদ্দেশ্য ছিল কারও সংসর্গ অবলম্বন না করা। তাই তিনি এতশব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। জনৈক আবেদ ব্যক্তি বলেন ঃ সেই লোকের সংসর্গ অবলম্বন করবে, যে তোমার ভেদ গোপন করে, দোষত্রুটি প্রকাশ না করে, বিপদে সাহায্য করে, উত্তম বস্তুসমূহে তোমাকে অগ্রাধিকার দেয়, তোমার চরিত্র মাধুর্য প্রচার করে এবং দোষ অব্যক্ত রাখে। এরূপ লোক পাওয়া না গেলে নিজের সংসর্গই অবলম্বন করবে। হযরত আলী (রাঃ) এক কবিতায় বলেন ঃ সেই তোমার সত্যিকার বন্ধু যে তোমার সাথে থাকে, তোমার কল্যাণের জন্যে নিজের ক্ষতি করে। দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমার অবস্থা শোচনীয় হলে সে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে তোমাকে সুখদান করে। জনৈক আলেম বলেন ঃ কেবল দু'ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা উচিত। এক, যার কাছ থেকে তুমি কিছু ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা করতে পার, ফলে তোমার উপকার হবে। দুই, যাকে তুমি কিছু ধর্মের কথাবার্তা বললে সে মেনে নেবে। এছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষ চার প্রকার– (১) সম্পূর্ণ মিষ্ট, যা খেয়েও খাওয়ার স্পৃহা থেকে যায়, (২) সম্পূর্ণ তিক্ত, যা খাওয়া যায় না, (৩) টক-মিষ্ট; এরূপ ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে কিছু হাসিল করার আগেই তুমি তার কাছ থেকে কিছু হাসিল কর এবং (৪) লবণযুক্ত; এরূপ ব্যক্তিকে কেবল প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো উচিত।

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গ অবলম্বন করো না। প্রথম, মিথ্যাবাদী। তুমি তার কাছে প্রতারিত হবে। সে মরীচিকার মত– দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করবে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করবে। দ্বিতীয়, নির্বোধ। তুমি তার কাছে কিছুই পাবে না। সে তোমার উপকার করতে চেয়েও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অপকার করে বসবে। তৃতীয়, কৃপণ। তুমি তার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মুখাপেক্ষী হলে সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে। চতুর্থ, কাপুরুষ। সে বিপদ মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে পালাবে। পঞ্চম, ফাসেক। সে এক লোকমা অথবা এরও কমের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রি করে দেবে। 'লোকমার কম' কি– জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ লোকমা আশা করার পর তা না পাওয়া। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ আমার কাছে কোন চরিত্রহীন কারী এসে বসলে তার তুলনায় চরিত্রবান ফাসেকের বসা ভাল মনে হয়। ইবনুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমাকে আমার ওস্তাদ আবু সোলায়মান বলেছেন– হে আহমদ! দু'ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে বসো না। এক, যার কাছ থেকে তুমি সাংসারিক কাজ-কারবারে উপকার লাভ করতে পার এবং দুই, যার সাথে থাকলে তোমার আখেরাতের উপকার হয়। সহল তস্তরী বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিত– প্রথম, অত্যাচারী গাফেলের কাছ থেকে; দ্বিতীয়, দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শনকারী আলেমের কাছ থেকে এবং তৃতীয়, মূর্খ সুফীর কাছ থেকে।

এখন জানা উচিত, সংসর্গের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শর্তসমূহ নির্ধারিত হবে। কেননা, আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সংসর্গের যেসকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের শর্ত থেকে ভিন্নতর হবে। সেমতে বিশর বলেন ঃ ভাই তিন প্রকার। এক, আখেরাতের জন্যে, এক দুনিয়ার জন্যে এবং এক চিত্ত বিনোদনের জন্যে। এক ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো বিষয় কমই থাকে। বরং এগুলো কয়েক ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। অতএব তাদের মধ্যে শর্তও বিভিন্ন হওয়া জরুরী। কথিত আছে, মানুষ বৃক্ষ এবং উদ্ভিদসদৃশ। কোন কোন বৃক্ষ ছায়া দান করে; কিন্তু ফল দেয় না। তারা এমন লোক, যাদের কাছ থেকে দুনিয়া আখেরাত কোথাও উপকার পাওয়া যায় না। কেননা, দুনিয়ার উপকার-অপকার অপসৃয়মান ছায়ার ন্যায় দ্রুত লোপ পায়। কতক বৃক্ষ ফল দেয় কিন্তু ছায়া দেয় না। এগুলো সেই লোকদের মত, যারা পরকালের কাজে আসে– দুনিয়ার কোন কাজে আসে না। কতক বৃক্ষ থেকে ফল ও ছায়া উভয়টিই পাওয়া যায়। কতক বৃক্ষ ফল ছায়া কোনটিই দেয় না; যেমন বাবলা বৃক্ষ। এটা কেবল কাপড় ছিন্ন করে– খাওয়াও যায় না, পানও করা যায় না। জন্তুদের মধ্যে এর মত রয়েছে ইঁদুর ও বিচ্ছু এবং মানুষের মধ্যে তারা, যাদের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কোন উপকার হয় না; বরং মানুষকে কেবল পীড়াই দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, কেউ যদি এমন সহচর না পায়, যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর কোন একটি অর্জন করা যায়, তবে তার জন্যে একাকিত্বই উত্তম। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যাদের সামনে মানুষ লজ্জাবোধ করে, তাদের কাছে বসে তোমার এবাদত পুনরুজ্জীবিত কর। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে এমন লোকদের সংসর্গই বিপদে ফেলেছে, যাদের সামনে আমি লজ্জা করতাম না। ওসমান বলেন ঃ বৎস, আলেমগণের কাছে বস এবং তাদের হাঁটুর সাথে হাঁটু মেলাও। কেননা, অন্তর এলেম ও হেকমত দ্বারা এমনভাবে সজীব হয়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলে মৃত মাটি জীবিত হয়ে উঠে। এখন আমরা সংসর্গের কর্তব্য ও অপরিহার্য বিষয়সমূহ যথাযথ পালন করার উপায় লিপিবদ্ধ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহচর্য ও বন্ধুত্বের কর্তব্য

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি বন্ধন; তেমনি ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বও দু'ব্যক্তির মধ্যে একটি বন্ধন। বিবাহের মধ্যে যেমন কতিপয় হক আদায় করা ওয়াজিব, তেমনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও কিছু হক তামিল করা জরুরী। উদাহরণতঃ যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবে, তোমার উপর তার মোটামুটি আট প্রকার হক থাকবে। প্রথম হক তোমার ধন-সম্পদে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দু'ভাই দু'হাত সদৃশ, যার একটি অপরটিকে ধৌত করে। এখানে দু'হাত সদৃশ বলা হয়েছে, পা সদৃশ বলা হয়নি। কেননা, উভয় হাত একই উদ্দেশ্য সাধনে একে অপরের সাহায্য করে। অনুরূপভাবে উভয় ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব তখন পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন তারা একই লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সঙ্গ দেয়। ফলে তারা যেন একাত্ম হয়ে যায়। এই একত্বের দাবীস্বরূপ তারা লাভ-লোকসান ও আপদে বিপদে একে অপরের শরীক হবে।

ধন-সম্পদ দ্বারা বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করার তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে বন্ধুকে খাদেম ও পরিচারক মনে করা এবং নিজের বাড়তি সম্পদের মাধ্যমে তার দেখাশুনা করা। সুতরাং যখন বন্ধুর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তোমার কাছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকে, তখন চাওয়া ছাড়াই তা তার হাতে সমর্পণ কর। এমতাবস্থায় যদি চাওয়ার দরকার হয়, তবে ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য পালনে তুমি ত্রুটি করেছ বলতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বন্ধুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনে করা এবং ধন-সম্পদে তার শরীকানা পছন্দ করা; এমন কি, নিজের ধন-সম্পদ আধাআধি বন্টন করে দেয়া। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীগণ বন্ধুর সাথে এরূপ ব্যবহারই করতেন। তাঁরা একটি চাদর পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করে অর্ধেক নিজে রাখতেন এবং অর্ধেক বন্ধুকে দিয়ে দিতেন। তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বন্ধুকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং তার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের অগ্রে স্থান দেয়া, এটা সিদ্দীকগণের স্তর। এ স্তরের পূর্ণতা হচ্ছে অপরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। বর্ণিত আছে, একবার খলীফার সামনে কয়েকজন সুফীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হলে খলীফা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সকলের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এই সুফীগণের মধ্যে আবুল হোসাইন নূরী (রহঃ)-ও ছিলেন। তিনি সবার আগে জল্লাদের সামনে গেলেন এবং বললেন ঃ সর্বপ্রথম আমাকে হত্যা কর। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ আমি এই মুহূর্তে আমার ভাইদের জীবনকে আমার জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে চাই। এই উক্তির কারণে খলীফা সকলকে মুক্ত করে দিলেন।

যদি উপরোক্ত তিনটি স্তরের কোন একটি স্তর তুমি তোমার বন্ধুর সাথে অর্জন করতে না পার, তবে বুঝে নেবে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এখনও তোমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তুমি কেবল সাধারণ নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী মানুষের সাথে মেলামেশা করে যাচ্ছ। বিবেক ও ধর্মের দৃষ্টিতে এটা মোটেই ধর্তব্য নয়। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি বন্ধুকে বাহুল্য মনে করে না, সে এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করুক, যার হাত আল্লাহ কবুল করেন। পূর্ববর্তী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্বনিম্ন স্তরও পছন্দ করতেন না। বর্ণিত আছে, ওতবা তাঁর বন্ধুর গৃহে এসে বললেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ থেকে এখন চার হাজার দেরহাম আমার প্রয়োজন। বন্ধু বলল ঃ দু'হাজার নিয়ে যাও। এতে ওতবা মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ তুমি দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছ। তোমার লজ্জা করা উচিত, আল্লাহর জন্যে বন্ধুত্বের দাবী করে একথা বলছ। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্ন স্তরের অধিকারী, তার সাথে দুনিয়ার কাজ কারবার করা উচিত নয়। আবু হাযেম বলেন ঃ তোমার আল্লাহর ওয়াস্তে কোন ভাই থাকলে তার সাথে পার্থিব কাজ কারবার করো না। এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি, যে ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্নস্তরের অধিকারী। ভ্রাতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে মুমিনের প্রশংসা করেছেন–

وَاَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰى بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ অর্থাৎ, তাদের ব্যাপারাদি তাদের মধ্যে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা তারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদ মিশ্রিত ছিল। কেউ নিজের আসবাবপত্র অন্যের কাছ থেকে আলাদা রাখত না। জনৈক বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, কেউ "আমার জুতা" বললে তিনি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতেন। ফাতাহ মুসেলী তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন। বন্ধু বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে টাকার সিন্দুক আনতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন। অতঃপর তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থ সিন্দুক থেকে নিয়ে চলে গেলেন। গৃহকর্তা বাড়ী ফিরে এলে বাঁদী তাকে ঘটনা বলল। বন্ধু আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ যতি তোর কথা সত্য হয়, তবে তুই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ আমি আপনার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি এই ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত আছ কি? সে আরজ করল ঃ আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ এই ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পর তুমি তোমার দীনার ও দেরহামে আমার চেয়ে অধিক হকদার থাকবে না। লোকটি বলল ঃ আমি এখন পর্যন্ত এই স্তরে পৌঁছতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার কাছ থেকে বিদায় নাও।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের পকেটে অথবা থলেতে হাত ঢুকিয়ে যা ইচ্ছা তা তার অনুমতি ছাড়া নেয় কিনা? লোকটি আরজ করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তোমরা ভাই ভাই নও। কিছু লোক হযরত হাসান বসরীর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আপনি কি নামায পড়ে নিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকেরা বলল ঃ বাজারের লোকেরা তো এখনও পড়েনি। তিনি বললেন ঃ বাজারের লোকদের কাছ থেকে ধর্মের রীতিনীতি কে শিক্ষা করে? আমি তো আরও শুনেছি, তাদের কেউ তার ভাইকে দেরহাম দেয় না। একথাটি তিনি বিস্ময়ভরে বললেন। জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম আদহামের খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি তখন বায়তুল মোকাদ্দাস গমনে উদ্যত ছিলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমি আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন ঃ এই শর্তে হতে পারে যে, তোমার দ্রব্য-সামগ্রীতে আমার ক্ষমতা তোমার চেয়ে বেশী হবে। লোকটি বলল ঃ এটা আমি পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তোমার সত্য কথায় আমি প্রীত হলাম। বর্ণিত আছে, কেউ তাঁর সঙ্গী হলে সঙ্গী তাঁর মর্জির বিপক্ষে কিছু করত না। তিনিও মর্জিমাফিক ব্যক্তিকেই সঙ্গে নিতেন। একবার এক ব্যক্তিকে পদব্রজে পথ চলতে দেখে হযরত ইবরাহীম আদহাম আপন সঙ্গীর গাধাটি তার অনুমতি ছাড়াই তাকে দিয়ে দিলেন। সঙ্গী এসে বিষয়টি জানতে পেরে চুপ করে রইল এবং খারাপ মনে করল না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক সাহাবীর কাছে হাদিয়াস্বরূপ ছাগলের মস্তক এলে তিনি চিন্তা করলেন, আমার অমুক ভাই এ জিনিসটির অধিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুখাপেক্ষী। সেমতে তিনি মস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মস্তকটি সাত জনের হাত ঘুরে পুনরায় প্রথম সাহাবীর হাতেই গেল। বর্ণিত আছে হযরত মসরুক একবার মোটা অংকের টাকা ধার করেন। তাঁর বন্ধু খায়সামা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি গিয়ে খায়সামার অজান্তে তার ঋণ শোধ করে দেন। এর পর খায়সামা গোপনে হযরত মসরূকের ঋণ শোধ করে দেন। যখন রসূলে করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ ইবনে রবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন, তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার নিজের ও তার ধন-সম্পদের মধ্যে ক্ষমতা দিয়ে বললেন ঃ এগুলো তোমার, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। হযরত সা'দ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এগুলোতে বরকত দান করুন। অতঃপর এগুলো কবুল করে তিনি তাই করলেন, যা হযরত আবদুর রহমান করেছিলেন। এখানে হযরত সা'দের কাজটি ছিল সমতা আর হযরত আবদুর রহমান প্রথমে যা করেছিলেন, তা ছিল আত্মত্যাগ। এতদুভয়ের মধ্যে আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ। হযরত আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে সমস্ত দুনিয়া আমার হস্তগত হয়ে যায় এবং আমি তা কোন বন্ধুর মুখে দিয়ে দেই, তবে একেও আমি তার জন্যে কমই মনে করব। এটাও তাঁরই উক্তি, আমি খাদ্যের লোকমা তো কোন বন্ধুকে খাওয়াই বটে, কিন্তু তার স্বাদ আমার গলায় অনুভব করি। বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করা ফকীরদের জন্যে ব্যয় করার চেয়ে উত্তম বিধায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বিশ দেরহাম কোন বন্ধুকে দেয়া আমার কাছে একশ' দেরহাম কোন ফকীরকে খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। এটাও তাঁরই উক্তি, যদি আমি এক সা' খাদ্য তৈরী করে বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ করি, তবে এটা আমার কাছে একটি গোলাম মুক্ত করার চেয়ে ভাল।

বলাবাহুল্য, আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে সকলেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই অনুসরণ করে থাকেন। তাঁর নীতি তাই ছিল। সেমতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক সাহাবীর সাথে জঙ্গলে তশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে দু'টি মেসওয়াক চয়ন করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল সোজা অপরটি বাঁকা। তিনি সোজা মেসওয়াকটি সাহাবীকে দিয়ে দিলে সাহাবী আরজ করলেন ঃ আমার তুলনায় আপনি এর অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে এক মুহূর্তও থাকে, তাকে সংসর্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, সে এতে আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করেছিল কিনা? এ হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সংসর্গে স্বার্থত্যাগ করা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করা। অন্য এক দিন রসূলে করীম (সাঃ) এক কূপে গোসল করতে গেলেন। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান একটি চাদর দিয়ে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। তাঁর গোসল সমাপ্ত হলে হুযায়ফা গোসল করতে বসলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাদর হাতে নিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযায়ফা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক– আপনি এরূপ করবেন না, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানলেন না। তিনি গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত চাদর দিয়ে আড়াল করে রইলেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যখন দু'ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গী হয়, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অদিক প্রিয় সেই হয়, যে তার সঙ্গীর সাথে অধিক কোমল হয়। বর্ণিত আছে, মালেক ইবনে দীনার ও মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে, হযরত হাসান বসরীর গৃহে এমন এক এক সময় গিয়ে হাযির হলেন যখন তিনি গৃহে ছিলেন না। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' হযরত হাসানের চৌকির নীচে থেকে একটি খাদ্য ভর্তি পিয়ালা বের করে খেতে লাগলেন। মালেক ইবনে দীনার বললেন ঃ যে পর্যন্ত গৃহকর্তা না আসে, তোমার এ খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' তাঁর কথা মানলেন না, খেতে থাকলেন। ইতিমধ্যে হযরত হাসান বসরী গৃহে ফিরে এসে বললেন ঃ মালেক, পূর্বে আমাদের অবস্থা এমনি ছিল। আমরা ছিলাম পরস্পরের অকপট ও অকৃত্রিম বন্ধু। তোমাদের ও তোমাদের সমসাময়িকদের জন্মগ্রহণ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বন্ধুদের গৃহে লৌকিকতা না করা স্বচ্ছ বন্ধুত্বের পরিচায়ক।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ أَوْمَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيْقِكُمْ অর্থাৎ, তার গৃহ থেকে খাওয়া তোমাদের জন্যে গোনাহ নয়, যার চাবির মালিক তোমরা হয়েছ, অথবা বন্ধুর গৃহ থেকে।

পূর্ববর্তীদের রীতি ছিল, তারা আপন গৃহের চাবি বন্ধুর হাতে দিয়ে দিতেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাকে দান করতেন, কিন্তু বন্ধু তাকওয়ার কারণে তাদের সম্পদ থেকে খেত না। অবশেষে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে বন্ধুদের মালে খোলামেলা ব্যবহার করার অনুমতি দান করলেন।

বন্ধুর দ্বিতীয় হক হচ্ছে সওয়াল করার পূর্বে তার অভাব দূর করা এবং নিজের বিশেষ প্রয়োজনের উপর তার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে সাহায্য করা। বন্ধুকে সাহায্য করার কয়েকটি স্তর আছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সওয়াল করার সময় তার প্রয়োজন মেটানো এবং হাসিমুখে ও খুশী মনে তা করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন তুমি কোন বন্ধুর সামনে নিজের প্রয়োজন পেশ কর এবং সে তা পূর্ণ করে না, তখন পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দাও। সম্ভবতঃ সে ভুলে গেছে। যদি এর পরও পূর্ণ না করে; তবে তার উপর আল্লাহু আকবার বলে এই আয়াত পাঠ করে নাও– وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ الاية অর্থাৎ, সে এবং মৃত ব্যক্তি এমতাবস্থায় সমান।

ইবনে বাশরামা তার বন্ধুর একটি বড় কাজ করে দিলে বন্ধু তার কাছে কিছু উপঢৌকন নিয়ে হাযির হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কেন? বন্ধু বলল ঃ এটা এজন্যে যে, আপনি আমার একটি বড় কাজ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সালামতে রাখুন; তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখ। তুমি যখন কোন বন্ধুর সামনে নিজের প্রয়োজনের কথা বল, তখন সে যদি তা পূর্ণ করতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা না করে, তা হলে ওযু করে তার উপর জানাযার নামায পড়ে নাও এবং তাকে মৃত মনে কর। হযরত জা'ফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ আমি আমার শত্রুদের অভাব-অনটন অনতিবিলম্বে পূর্ণ করি। কেননা, আমার আশংকা হয়, তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে তারা আমার প্রতি বেপরওয়া হয়ে যাবে। শত্রুদের সাথে এই ব্যবহার হলে বন্ধুদের সাথে কিরূপ হবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। পূর্ববর্তীগণের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা বন্ধুর পরিবারবর্গের দেখাশুনা তার মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত করতেন; তাদের অভাব-অনটন দূর করতেন এবং প্রত্যহ তাদের কাছে গিয়ে নিজের অর্থকড়ি ব্যয় করতেন। ফলে মৃতের এতীম শিশুরা কেবল নিজের পিতাকে চোখে দেখত না; কিন্তু তার স্নেহ-মমতা বিদ্যমান পেত। সত্যি কথা বলতে কি, যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ফলাফল এরূপ নয়, তাতে কোন কল্যাণ নেই। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তির বন্ধুত্বে তোমার উপকার হয় না, তার শত্রুতাও তোমার জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্ষতিকর নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ সাবধান, পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার কিছু পাত্র আছে, তা হচ্ছে অন্তর। সে পাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যা সর্বাধিক পরিষ্কার, অধিক শক্ত এবং অধিক নরম। অধিক পরিষ্কার গোনাহের ব্যাপারে, অধিক শক্ত ধর্মকর্মে এবং অধিক নরম ভাই-বন্ধুদের ক্ষেত্রে।

সারকথা, তোমার কাছে তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন তোমার নিজের প্রয়োজনের মত হয়ে যাওয়া উচিত; বরং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যেমন নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হও না, তেমনি বন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হবে না। তার সওয়াল ও প্রয়োজন ব্যক্ত করার দরকার নেই। তাকে এমনভাবে সাহায্য কর যেন তুমি জানই না যে, সাহায্য করছ। সে যে তোমার সাহায্য কবুল করে, এজন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাক। কেবল অভাব দূর করেই ক্ষান্ত থেকো না; বরং চেষ্টা কর যাতে সম্মান প্রদর্শন ও ত্যাগ স্বীকারের সূচনা তোমার পক্ষ থেকে হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলতেন ঃ আমার বন্ধু আমার কাছে সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ, পরিবার-পরিজন আমাকে সংসারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর বন্ধু আখেরাতের কথা অন্তরে জাগরিত করে।

তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে বিদায় দেয়ার সময় তার পেছনে কিছুদূর চলে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন কয়েকজন ফেরেশতাকে জান্নাত পর্যন্ত তার পেছনে চলার জন্যে আরশের নীচ থেকে প্রেরণ করবেন। হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ তিন অবস্থায় তুমি তোমার বন্ধুর খবর নাও– পীড়িত হলে তার সেবাযত্ন কর, কাজে ব্যস্ত থাকলে তাকে সাহায্য কর এবং বিস্মৃত হলে স্মরণ করিয়ে দাও। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ডানে-বামে তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে মহব্বত করি। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। রসূলে পাক (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা যখন কাউকে মহব্বত কর, তখন তার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নাও। এর পর সে অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রূষা কর এবং কাজে ব্যস্ত থাকলে সাহায্য কর। হযরত শা'বী বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের সাথে উঠাবসা করে, এর পর বলে, আমি তার মুখাকৃতি চিনি; কিন্তু নাম জানি না; এ ধরনের পরিচয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নির্বোধদের। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার মতে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যে আমার সাথে উঠাবসা করে। তিনি আরও বলেন ঃ যে আমার মজলিসে তিন বার আসে, আমি বুঝতে পারি, তার প্রতিদান দুনিয়ার দ্বারা হবে না। সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ যে আমার সাথে উঠা বসা করে, আমার কাছে তার হক তিনটি– আমার কাছে থাকলে তাকে মারহাবা বলা, কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং কাছে বসলে তাকে ভালরূপে জায়গা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পরে দয়াশীল।) এতেও পারস্পরিক দয়া, মমতা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্নেহ ও অনুগ্রহের পরিশিষ্ট হল কোন সুস্বাদু খাদ্য একা না খাওয়া এবং তাকে ছাড়া কোন আনন্দ মজলিসে যোগদান না করা; বরং তার বিরহে বিষণ্ন ও আতংকগ্রস্ত থাকা।

বন্ধুর তৃতীয় হক হচ্ছে, কয়েকটি স্থানে নিশ্চুপ থাকা এবং মুখ না খোলা। প্রথম, তার দোষ তার সামনে বা পেছনে বর্ণনা না করা; বরং দোষত্রুটি সম্পর্কে না জানার ভান করা। দ্বিতীয়, তার কথা খন্ডন না করা। তৃতীয়, তার অবস্থা অন্বেষণ না করা। তাকে পথিমধ্যে অথবা কোন কাজে দেখা গেলে এবং সে কোথায় থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে– এসব বিষয় নিজে বর্ণনা না করলে তাকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে চুপ থাকবে। কেননা, মাঝে মাঝে তা বর্ণনা করা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে অথবা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতে পারে। চতুর্থ, বন্ধু যেসব গোপন কথা তোমার কাছে বলেছে সেগুলো ফাঁস করা থেকে বিরত থাকবে; অন্য কারও কাছে কখনও বলবে না। এমন কি, নিজের অথবা তার বন্ধুর কাছেও না। বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেলেও তার গোপন কথা ফাঁস করা আন্তরিক ভ্রষ্টতার লক্ষণ। পঞ্চম, বন্ধুর আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকবে। ষষ্ঠ, কেউ তাকে গালি দিলে তার সামনে সেই গালির কথা বলবে না। কেননা, গালি যেন সেও দেয়, যে মুখের উপর তা উদ্ধৃত করে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারও সামনে এমন কথা উদ্ধৃত করতেন না, যা তার অপ্রিয়। কথা উদ্ধৃতকারী দ্বারা প্রথমে কষ্ট হয়, এর পর আসল বক্তা দ্বারা। অন্য কেউ বন্ধুর প্রশংসা করলে তা গোপন করা উচিত নয়। কেননা, প্রথমে আনন্দ উদ্ধৃতকারীর দ্বারা হয়, এর পর প্রকৃত বক্তা দ্বারা। এছাড়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রশংসা গোপন করা হিংসার অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা, বন্ধুর অপ্রিয় বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিরব থাকা উচিত। বন্ধুর নিন্দাও দোষ এবং তার পরিবারের দোষ বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে হারাম। দু'টি বিষয় চিন্তা করলে তুমি তোমার বন্ধুর দোষ বর্ণনা করার জন্যে মুখ খুলবে না। প্রথমত তুমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা কর। যদি তাতে কোন দোষ দেখ, তবে বন্ধুর দোষকে অসহনীয় মনে করো না। তুমি মনে কর, যেমন আমি একটি দোষ করার ব্যাপারে অপারগ এবং তা বর্জন করতে অক্ষম, তেমনি সে-ও হয়ত একটি অভ্যাসে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মানুষ কোথায়? আর যদি তুমি বন্ধুকে সকল দোষ থেকে মুক্তই দেখতে চাও, তবে মানুষ থেকে দূরে চলে যাও এবং কারও সংসর্গ অবলম্বন করো না। কেননা, জগতে যত মানুষ আছে, তাদের মধ্যে দোষও আছে, গুণও আছে। কারও গুণ বেশী থাকলে তাকেই সংসর্গের জন্যে উত্তম মনে করে নাও। মোট কথা, ভদ্র ঈমানদার ব্যক্তি সর্বদা নিজের বন্ধুর গুণাবলীই দৃষ্টিতে রাখে, যাতে অন্তর থেকে তার প্রতি বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব অংকুরিত হয়। পক্ষান্তরে কপট ও নীচ ব্যক্তি সর্বদা দোষ ত্রুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

হযরত ইবনে মোবারক (রাহঃ) বলেন ঃ ঈমানদার ওযর তালাশ করতে থাকে এবং কপট ভুলভ্রান্তি অন্বেষণ করে। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ বন্ধুদের ত্রুটি ক্ষমা করা মহত্ত্ব। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

استعيذوا بالله من جار السوء الذى ان راى خيرا ستره وان راى شرا ظهره -

অর্থাৎ, মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সে ভাল কাজ দেখলে তা গোপন করে এবং মন্দ দেখলে প্রকাশ করে দেয়।

এমন কোন লোক নেই, যাকে কয়েকটি গুণের কারণে ভাল বলা যাবে না। অনুরূপভাবে তাকে মন্দও বলা যায়। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। পরবর্তী দিন তারই নিন্দা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কাল তুমি তার প্রশংসা করেছিলে, আজ নিন্দা করছ? সে আরজ করল ঃ কালও আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার সম্পর্কে সত্য বলেছিলাম এবং আজও মিথ্যা বলছি না। সে কাল আমাকে সন্তুষ্ট রেখেছিল। তাই তার যেসব গুণ আমার জানা ছিল, সেগুলো বর্ণনা করেছি, কিন্তু আজ সে আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। তাই তার যেসব দোষ আমি জানতাম, সেগুলো বর্ণনা করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ان من البيان لسحرا (কোন কোন বর্ণনা জাদুতুল্য)। বিষয়টিকে তিনি খারাপ মনে করেই জাদুর সাথে তুলনা করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে– البذاء والبيان شعبتان من النفاق (অশ্লীল কথাবার্তা ও বাকচাতুর্য মোনাফেকীর দুটি শাখা)। আরও বলা হয়েছে– ان الله يكره لكم البيان كل البيان (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বাকচাতুর্য অপছন্দ করেন)।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই করে এবং কোন গোনাহ করে না। পক্ষান্তরে এমনও কেউ নেই, যে কেবল নাফরমানীই করে– আনুগত্য করে না। অতএব যার আনুগত্য নাফরমানীর উপর প্রবল, সেই আদেল। আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তি যখন আদেল সাব্যস্ত হয়, তখন তুমি যদি নিজের হকের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তিকে আদেল মনে কর, তবে এটা অধিক বাঞ্ছনীয় নয় কি? বন্ধুর দোষত্রুটি বর্ণনা করার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা যেমন ওয়াজিব, তেমনি অন্তর দিয়ে নিশ্চুপ থাকাও ওয়াজিব। অর্থাৎ, তার প্রতি অন্তরে কুধারণা ঘোষণা করা অন্তরের গীবত। এটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। এর চূড়ান্ত পর্যায় যে পর্যন্ত বন্ধুর কাজকে ভাল অর্থে নেয়া সম্ভবপর হয়, সেই পর্যন্ত তা খারাপ অর্থে নেয়া উচিত নয়, কিন্তু যে দোষ নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পায় তা তাকে বলা গেলেও যথাসম্ভব সেটি ভুলক্রমে হয়েছে বলে ধরে নেয়া জরুরী।

কুধারণা দু'প্রকার। এক, লক্ষণ বিদ্যমান থাকার কারণে কুধারণা হওয়া। এরূপ কুধারণা মানুষ মন থেকে দূর করতে পারে না। দুই, কুবিশ্বাসপ্রসূত কুধারণা। উদাহরণতঃ বন্ধু এমন কোন কাজ করল, যা ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কিন্তু তার প্রতি তোমার বিশ্বাস ভাল নয় বিধায় তুমি কাজটিকে খারাপ অর্থেই ধরে নিচ্ছ। অথচ কোন লক্ষণ বিদ্যমান নেই, যদ্দ্বারা কাজটি খারাপ হতে পারে। এ ধরনের কুধারণা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তরের নষ্টামি বৈ কিছু নয় এবং এটা কেবল বন্ধুর বেলায়ই নয়, যে কোন মুসলমান সম্বন্ধে এরূপ কুধারণা পোষণ করা হারাম। তাই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله قد حرم على المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء .

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুমিনের উপর অন্য মুমিনের রক্ত, ধনসম্পদ, মান-সম্মান ও তার প্রতি কুধারণা পোষণ হারাম করেছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ فان الظن اكذب الحديث (তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কুধারণা অধিকতর মিথ্যা বিষয়)। কুধারণার ফলস্বরূপ মানুষ গোপনে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে ঘাঁটাঘাঁটি করে এবং অলক্ষ্যে তার কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর রাখে। অথচ রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ولاتجسسوا ولا تحسسوا ولاتقاطعوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا .

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের গোপন তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করো না। একে অপরের পেছনে লেগে থেকো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ো না এবং আল্লাহর সমস্ত বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

এ থেকে জানা গেল, দোষত্রুটি গোপন করা এবং তা না জানার ভান করা ধর্মপরায়ণদের অভ্যাস। দোষ গোপন করা এবং সদগুণ প্রকাশ করার ফযীলতের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, দোয়া মাসুরায় আল্লাহ তাআলাকে এসব গুণে গুণান্বিত করে বলা হয়েছে– يا من اظهر بالجميل وستر القبيح। অর্থাৎ, যিনি সদগুণ প্রকাশ করেন এবং দোষ গোপন করেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াকেই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। তিনি যখন দোষ গোপন করেন এবং বান্দার গোনাহ ক্ষমা করেন, তখন তুমি এরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে ক্ষমা করবে না, যে তোমার সমপর্যায়ভুক্ত অথবা তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এবং কোন অবস্থাতেই তোমার গোলাম অথবা সৃষ্ট নয়। একবার হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুচরবর্গকে বললেন ঃ যখনা তোমরা তোমাদের কোন ভাইকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিদ্রাবস্থায় দেখ এবং বাতাস তার উপর থেকে বস্ত্র উড়িয়ে নেয়, তখন তোমরা কি কর? তারা নিবেদন করল ঃ আমরা তাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দেই। তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমরা তার গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করে দাও। অনুচররা আরজ করল ঃ সোবহানাল্লাহ্! কে এরূপ করে? তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নিজের ভাই সম্পর্কে কোন কথা শুনে, তখন তার সাথে অন্য আরও খারাপ কথা মিলিয়ে দেয়। খবরদার! ততক্ষণাৎ পর্যন্ত মানুষের ঈমান কামেল হয় না যে পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্যে তা-ই পছন্দ না করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে। ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্ন স্তর হল অন্যের কাছে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করবে, আপন ভাইয়ের সাথে সেই ব্যবহার করা। বলাবাহুল্য, মানুষ অন্যের কাছে এমনি প্রত্যাশা করে যে, সে তার দোষত্রুটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিক। এই প্রত্যাশার পরিপন্থী কর্ম কারও কাছ থেকে প্রকাশ পেলে তাকে লাল চোখ দেখানো হয়। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, নিজে অন্যের কাছে চোখ ফিরিয়ে নেয়া আশা করবে; কিন্তু অন্যের দোষ দেখে সে তা গোপন করবে না! এরূপ বে-ইনসাফের জন্যে কোরআনে অভিসম্পাত বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ
وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

অর্থাৎ, অভিসম্পাত মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্যে, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

যার মন অন্যের জন্যে যতটুকু ইনসাফ পছন্দ করে, অন্যের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশী ইনসাফ পেতে চায়, সে এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অন্তর্নিহিত একটি রোগই অন্যের দোষ গোপনে ত্রুটি করার মূল কারণ। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের অন্তরকে নষ্টামিতে পরিপূর্ণ করে দেয়। এগুলো তার অন্তরে সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত চাপা ও বন্দী থাকে। সুযোগ পেলেই বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং লজ্জা শরমের বাধা অপসারিত হয়। তখনই অন্তরের ভ্রষ্টামি নিঃসৃত হতে থাকে। সুতরাং যখন অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তখন কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব করা উচিত নয়। বরং আলাদা থাকা উত্তম। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ ভাইদের সাথে বাহ্যতঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাগারাগি করা অন্তরে হিংসা-দ্বেষ রাখার চেয়ে উত্তম। যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা থাকে, তার ঈমান দুর্বল এবং তার ব্যাপারটি বিপজ্জনক। এরূপ অন্তর খোদায়ী দীদারের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র তাঁর পিতার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি ইয়ামনে থাকাকালে তাঁর প্রতিবেশী ছিল জনৈক ইহুদী। সে তাঁর কাছে তওরাতের বিষয়াদি বর্ণনা করত। একদিন ইহুদী সফর থেকে ফিরে এলে তিনি তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে মুসলমান হতে বললে আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। আমাদের জন্যে একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা তওরাতের সত্যায়ন করে। ইহুদী বলল ঃ তুমি সঠিক বলছ, কিন্তু তোমাদের পয়গম্বর যে বিধান এনেছেন, তা তোমরা পালন করতে পারবে না। আমরা এই পয়গম্বর এবং তাঁর উম্মতের পরিচয় তওরাতে এভাবে পাই যে, কোন ব্যক্তি তার অন্তরে বিদ্বেষ রেখে দরজার চৌকাঠের বাইরে পা রাখবে না। নিজের কাছে গচ্ছিত ভেদ ফাঁস না করাও একটি মৌখিক হক। প্রয়োজনবোধে- অমুক কোন গোপন কথা আমাকে বলেনি বলে অস্বীকার করাও জায়েয। এটা মিথ্যা হলেও এরূপ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ওয়াজিব নয়। নিজের দোষত্রুটি ও ভেদের কথা গোপন করা মিথ্যা বলার মাধ্যমে হলেও যেমন জায়েয, তেমনি বন্ধুর খাতিরে এতটুকু পাপ করাও বৈধ। কেননা, বন্ধু নিজেরই স্থলাভিষিক্ত; যেন এক প্রাণ দু'দেহ। এটাই বন্ধুত্বের স্বরূপ। তাই বন্ধুকে দেখিয়ে কোন আমল করলে তাতে রিয়া হবে না এবং আমলটি আন্তরিক আমল থেকে বের হয়ে বাহ্যিক আমল হয়ে যাবে না। কেননা, বন্ধুর আমল জানা নিজের আমল জানার মতই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من ستر عورة اخيه ستره الله تعالى فى الدنيا والاخرة .

যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

من ستر عورة اخيه فكانما احيا مؤودة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ গোপন করে, সে যেন কবরে প্রোথিতকে জীবিত করে। আরও বলা হয়েছে-

اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو امانة .

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যখন কেউ কথা বলে, অতঃপর অন্য দিকে তাকায়, তখন তার কথাটি আমানত হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিনটি মজলিস ছাড়া সকল মজলিসের কথাবার্তাই আমানত। প্রথম, যে মজলিসে অন্যায় খুন করা হয়। দ্বিতীয়, যে মজলিসে যিনাকে হালাল মনে করা হয়। তৃতীয়, যে মজলিসে অবৈধ উপায়ে মাল বৈধ করা হয়। এক হাদীসে আছে– যারা পরস্পরে একত্রে বসে, তারা আমানত সহকারে বসে। তারা একে অন্যের অপ্রিয় কথা প্রকাশ করবে না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল ঃ আপনি গোপন বিষয়সমূহের হেফাজত কিরূপে করেন? তিনি বললেন ঃ আমি গোপন বিষয়সমূহের জন্যে কবর হয়ে যাই। বলা হয়, ভাল মানুষদের বক্ষ গোপন ভেদ সমূহের কবর হয়ে থাকে। নির্বোধের মন মুখে থাকে এবং বুদ্ধিমানের জিহ্বা অন্তরে থাকে। নির্বোধ মনের কথা গোপন রাখতে পারে না– অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে দেয়। এ কারণেই নির্বোধদের সাথে সাক্ষাৎ বর্জন, তাদের সংসর্গ, এমন কি তাদের চেহারা দর্শন থেকে পর্যন্ত বেঁচে থাকা ওয়াজিব। জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ আমি ভেদ গোপন করি এবং গোপন করার বিষয়টিও গোপন করি। ইবনুল মুরতায বলেন ঃ আমাকে কেউ কোন কথা গোপন রাখতে বললে আমি নিজের বক্ষে তাকে সমাধিস্থ করে দেই।

অন্য একজন আরও এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ আমার বক্ষের গোপন কথা মৃতের মত নয়। কেননা, মৃত ব্যক্তির হাশরে পুনরুত্থিত হবার আশা থাকে। বরং আমি গোপন কথা এমনভাবে বিস্মৃত হয়ে যাই, যেন সে সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও অবগত ছিলাম না। এক ব্যক্তি তার একটি গোপন কথা তার বন্ধুকে বলে জিজ্ঞেস করল ঃ কথাটি তোমার মনে আছে? বন্ধু জওয়াব দিল ঃ না, ভুলে গেছি। আবু সায়ীদ সওরী (রহঃ) বলেন ঃ তুমি কোন ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব করতে চাইলে প্রথমে তাকে রাগান্বিত কর। এর পর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর, যাতে সে তার কাছে তোমার অবস্থা ও গোপন কথা জিজ্ঞেস করে। যদি সে তোমার সম্পর্কে ভাল বলে এবং তোমার গোপন তথ্য ফাঁস না করে, তবে তার সাথে বন্ধুত্ব কর। আবু যায়েদকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কিরূপ লোকের সংসর্গ অবলম্বন করেন? তিনি বললেন ঃ যে আমার সেই গোপন অবস্থা জানে, যা আল্লাহ তা'আলা জানেন। এর পর তা এমনভাবে গোপন করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যেমন আল্লাহ তা'আলা গোপন করেন। যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাকে নিষ্পাপ দেখতে পছন্দ করে না, তার সঙ্গ লাভে কোন কল্যাণ নেই। আর যে ব্যক্তি রাগের অবস্থা গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, সে দুরাচার। প্রসন্ন অবস্থায় বিশ্বস্ত থাকা তো প্রত্যেক সুস্থ মনেরই স্বভাব।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) একবার তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললেন ঃ আমি দেখি, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে বয়োবৃদ্ধদের উপর অগ্রগণ্য মনে করেন। তাই আমি পাঁচটি বিষয় বলছি; এগুলো মনে রেখো। প্রথম, তাঁর কোন গোপন তথ্য ফাঁস করো না। দ্বিতীয়, তাঁর কাছে কারও গীবত করো না। তৃতীয়, তাঁর সামনে কোন মিথ্যা কথা বলো না। চতুর্থ, তাঁর কোন আদেশ অমান্য করো না। পঞ্চম, এমন কাজ করো না, যদ্দ্বারা তুমি তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হও।

বন্ধুর কথার মাঝখানে বাধা না দেয়াও অন্যতম মৌখিক হক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন নির্বোধের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ো না। সে তোমাকে নির্যাতন করবে। জ্ঞানীর কথায়ও বাধা সৃষ্টি করো না। সে তোমাকে শত্রু মনে করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে বাতিল হয়েও অন্যের কথা কাটাকাটি বর্জন করবে, তার জন্যে জান্নাতের এক প্রান্তে গৃহ নির্মিত হবে। যে ব্যক্তি হক থাকা সত্ত্বেও কথা কাটাকাটি বর্জন করবে, তার জন্যে সর্বোচ্চ জান্নাতে বাসস্থান নির্মাণ করা হবে। এটা কথা কাটাকাটি বর্জন করার সওয়াব। অথচ নিজে বাতিল হলে কথা না কেটে চুপ থাকা ওয়াজিব এবং হক হলে চুপ থাকা নফল, কিন্তু নফলের সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ, হকের উপর থেকে চুপ থাকা অত্যন্ত কঠিন বাতিল হয়ে চুপ থাকার তুলনায়। সওয়াব কষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকে। কথা কাটাকাটি করা দু'ভাইয়ের মধ্যে হিংসার অনল প্রজ্বলিত হওয়ার শক্তিশালী কারণ। তাই বিরোধ প্রথমে মতামতে, এর পর কথাবার্তায় এবং অবশেষে দেহের মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব কথা কাটাকাটি যেন পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদও বটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা রেখো না এবং পরস্পরকে হিংসা করো না। তিনি আরও বলেন ঃ

المسلم اخو المسلم لايظلمه ولايحرمة ولايخذله يحسب للمرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। তারা একে অপরকে জুলুম করে না, বঞ্চিত করে না এবং লাঞ্ছিতও করে না। ব্যক্তির জন্যে এতটুকু অনিষ্টই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে। সর্বাধিক ঘৃণা হচ্ছে কথা কেটে দেয়া। কেননা, যে অপরের কথা প্রত্যাখ্যান করে, সে হয় তাকে মূর্খ ও নির্বোধ মনে করে, না হয় তার ভ্রান্তি প্রমাণিত করে। উভয় বিষয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আতংকের কারণ। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন পরস্পর কথা কাটাকাটি করছিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ কথা কাটাকাটি পরিহার কর। এতে মঙ্গল কম এবং ভাইদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অক্ষম সে ব্যক্তি, যে বন্ধু অন্বেষণে ত্রুটি করে এবং এর চেয়েও অক্ষম সে ব্যক্তি, যে বন্ধু লাভ করে হারিয়ে ফেলে। বলাবাহুল্য, অধিক কথা কাটাকাটি হল বন্ধু হারানো, বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ হাজার ব্যক্তির বন্ধুত্বের বিনিময়ে হলেও এক ব্যক্তির শত্রুতা ক্রয় করবে না। সারকথা, কথা কাটাকাটির একমাত্র কারণ হচ্ছে নিজের জ্ঞান-গরিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক প্রকাশ করা। এতে অহংকার, ঘৃণা, মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি সবকিছু পাওয়া যায়। অতএব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্যে এসব বিষয় কিরূপে শামিল হবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আপন ভাইয়ের কথা কেটে দিয়ো না, তার সাথে ঠাট্টা করো না এবং এমন ওয়াদা করো না যা পালন করবে না। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা মানুষকে টাকা পয়সা দাও, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তাদের পাওয়া উচিত প্রসন্নতা ও সচ্চরিত্রতা। বলাবাহুল্য, কথা কাটাকাটি করা সচ্চরিত্রতার পরিপন্থী। পূর্ববর্তীগণ এ কাজটি করতে এত ভয় পেতেন যে, তাঁরা বন্ধুর কথা পুনরুক্তি করতেন না। তাঁদের নীতি ছিল, বন্ধুকে যদি বলা হয়, চল, আর সে জিজ্ঞেস করে, কোথায়? তবে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে চল বলার সাথে সাথে চলা শুরু করতে হবে, জিজ্ঞেস করা যাবে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ইরাকে বসবাস করত। অভাব অনটনের সময় আমি তার কাছে গিয়ে বলতাম ঃ তোমার অর্থ-সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দাও। সে একটি থলে আমার সামনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রেখে দিত। আমি থলে থেকে প্রয়োজন মত টাকা পয়সা নিয়ে নিতাম। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আমার কিছু অর্থের দরকার। সে বলল ঃ কি পরিমাণ? এ কথা শুনতেই বন্ধুত্বের মিষ্টতা আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে গেল। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন তুমি তোমার বন্ধুর কাছে কিছু চাও এবং সে জিজ্ঞেস করে- কি করবে? তখন সে ভ্রাতৃত্বের হক বর্জন করে দেয়।

ভ্রাতৃত্বের চতুর্থ হক হচ্ছে, মুখে কথা বলা। কেননা, বন্ধুর সামনে মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকা যেমন ভ্রাতৃত্বের দাবী, তেমনি বন্ধুর পছন্দীয় কথাবার্তা তার সামনে বর্ণনা তার দাবী। বরং এ বিষয়টি ভ্রাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। কিছু উপকার অর্জনের জন্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়- অপকার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নয়। চুপ থাকার অর্থ মুখের দ্বারা অপরকে জ্বালাতন না করা। অতএব মানুষের উচিত বন্ধুর সাথে কথা বলা, আলাপ করা এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা। উদাহরণতঃ বন্ধু পেরেশানীর সম্মুখীন হলে অথবা কোন সংকটে পড়লে তার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করবে এবং মুখে বলবে, আমিও তোমার দুঃখে দুঃখিত। যেসব পরিস্থিতিতে বন্ধু সুখী ও আনন্দিত হয়, সেগুলোতেও শরীক হওয়ার কথা মুখে ব্যক্ত করবে। কেননা, সুখে দুঃখে অংশীদার হওয়াই বন্ধুত্বের অর্থ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اذا احب احدكم اخاه فليخبره (তোমাদের কেউ তার ভাইকে মহব্বত করলে তাকে মহব্বত সম্পর্কে অবহিত করে দেবে)। কেননা, অবহিত করলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। উদাহরণতঃ যদি কারও প্রতি তোমার মহব্বত হয়ে যায় এবং সে তা না জানে, তবে মহব্বতের উন্নতি হবে না। পক্ষান্তরে সে জানতে পারলে তোমার প্রতিও তার মনে মহব্বত সৃষ্টি হবে। তুমি যখন জানবে, তোমার প্রতি তারও মহব্বত রয়েছে, তখন তার প্রতি তোমার মহব্বত অবশ্যই বেড়ে যাবে। এমনিভাবে উভয়পক্ষ থেকে পলে পলে মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শরীয়তে ঈমানদারদের পারস্পরিক মহব্বত কাম্য ও পছন্দনীয়। এ কারণেই শরীয়ত প্রবর্তক রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহব্বতের উপায় শিক্ষা দিয়ে বলেছেন ঃ

تهادوا وتحابوا অর্থাৎ, একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং মহব্বত কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুখে বলার আরেক হক হল, বন্ধুর মনপূত নামে তাকে ডাকা। সামনে ও পেছনে তার সেই পছন্দসই নামটি উচ্চারণ করতে হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যদি বন্ধুর সাথে ব্যবহারে তিনটি বিষয় মেনে চল, তবে তোমাদের সাথে তার বন্ধুত্ব-অকৃত্রিম হয়ে যাবে। এক, সাক্ষাৎ করার সময় প্রথমে বন্ধুকে সালাম কর। দুই, যত্ন সহকারে তাকে বসাও। তিন, যে নাম তার পছন্দসই, সে নামে তাকে ডাক। আরেকটি হক হচ্ছে, যার সামনে বন্ধু নিজের তারীফ পছন্দ করে, তার সামনে যেসব গুণ তুমি জান, সেগুলো বর্ণনা কর। এটা মহব্বতে আকৃষ্ট করার একটি বড় উপায়। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের তারীফ করাও তেমনি, কিন্তু এই তারীফ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত না হওয়া উচিত। এর চেয়ে জরুরী বিষয়, যদি অন্য ব্যক্তি বন্ধুর প্রশংসা করে তবে সানন্দে বন্ধুর কাছে এই প্রশংসা বর্ণনা করবে। এটা গোপন করা নিছক হিংসা ছাড়া কিছুই হবে না। আর একটি হক, বন্ধু যদি তোমার সাথে কোন উত্তম ব্যবহার করে, তবে তুমি তার শোকর আদায় করবে। এমন কি, যদি সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা করে এবং তা পূর্ণ না হয়, তবুও শোকর আদায় করবে। যে বিষয়টি মহব্বত আকর্ষণে সর্বাধিক কার্যকর তা হচ্ছে, বন্ধুর পেছনে কেউ তাকে মন্দ বললে কিংবা তার মানহানির চেষ্টা করলে তুমি তার পক্ষ সমর্থনে তৎপর হয়ে যাবে এবং বক্তাকে চুপ করিয়ে দেবে। এ পরিস্থিতিতে চুপ থাকা হিংসা ও আন্তরিক ঘৃণার কারণ এবং বন্ধুত্বের হক আদায়ে ত্রুটির পরিচায়ক হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'বন্ধুকে দু'হাতের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ এটাই যে, এক বন্ধু অপর বন্ধুর সাহায্য করবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- المسلم اخو المسلم لايظلمه ولايخذله অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। বন্ধুর নিন্দা শুনা সাক্ষাৎ তাকে লাঞ্ছিত করা এবং শত্রুর হাতে সমর্পণ করার শামিল। কেননা, বন্ধুর ইযযত ক্ষত-বিক্ষত হতে দেয়া তার দেহের মাংস খন্ড-বিখন্ড হতে দেয়ার নামান্তর। একে এরূপ মনে কর, যেমন, কুকুর তোমাকে ছিঁড়ে ফেলছে এবং তোমার মাংসখন্ড ছিটকে দিচ্ছে, কিন্তু তোমার ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে এবং তোমার প্রতি অনুকম্পা করছে না। এ দৃশ্য তোমার কাছে কেমন খারাপ মনে হবে। অথচ ইযযত ভূলুণ্ঠিত হওয়া মাংস খন্ড-বিখন্ড হওয়ার চেয়েও অধিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ অর্থাৎ, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা একে অপছন্দ কর। আত্মা স্বপ্নে লওহে মাহফুয প্রত্যক্ষ করে। ফেরেশতারা এই প্রত্যক্ষ করা বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারে প্রদর্শন করে। তারা গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার আকারে পেশ করে থাকে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, সে মৃতের মাংস খাচ্ছে, তবে এর ব্যাখ্যা হবে, সে মানুষের গীবত করে। কেননা, কোন বিষয়কে আকৃতি দান করার সময় ফেরেশতারা সেই বিষয়ের মর্মগত মিলের প্রতিও লক্ষ্য রাখে। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল ভ্রাতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা, শত্রুর নিন্দাবাদের সময় বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করা এবং নিন্দুকের নিন্দা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া ওয়াজিব।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ বন্ধুর গীবতের সময় তুমি তাকে এমনভাবে উল্লেখ করবে, যেমন তুমি চাও যে, তোমার গীবতের সময় কেউ তোমাকে উল্লেখ করুক। এমতাবস্থায় দুটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা তোমার জন্যে উপকারী। প্রথম, মনে কর, যে কথা তোমার বন্ধুর ব্যাপারে কেউ বলল, তা যদি তোমার ব্যাপারে বলা হত এবং তোমার বন্ধু সেখানে উপস্থিত থাকত, তবে তোমার বন্ধুর কাছে তুমি কি আশা করতে? তখন বন্ধুর যে বক্তব্য তোমার পছন্দ হত, তাই তার ব্যাপারে বিদ্রূপকারীদের সাথে তোমার বলা উচিত। দ্বিতীয়, মনে কর, তোমার বন্ধু দেয়ালের পেছনে দণ্ডায়মান এবং তোমার বক্তব্য শুনছে। তার ধারণা, তুমি তার উপস্থিতি জান না। তখন তার পক্ষ সমর্থনে তুমি যা বলবে, তাই তার অবর্তমানেও বলা উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ আমার কোন ভাইয়ের আলোচনা তার অনুপস্থিতিতে হলে আমি মনে করে নেই, সে এখানে উপবিষ্ট রয়েছে। ফলে আমি এমন কথা বলি, যা সে উপস্থিত থাকলে পছন্দ করত। অপর এক বুযুর্গ বলেনঃ যখন আমার বন্ধুর আলোচনা হয়, তখন আমি নিজেকে তার আকৃতিতে মনে করে নেই এবং তার সম্পর্কে এমন কথা বলি, যা আমার সম্পর্কে কেউ বললে পছন্দ করি। মানুষ নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, নিজের ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করা খাঁটি মুসলমানী। হযরত আবু দারদা (রাঃ) এক জোয়ালে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দু'টি বলদকে জোতা অবস্থায় দেখলেন, সে দুটো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। ইতিমধ্যে একটি বলদ দাঁড়িয়ে শরীর চুলকাতে লাগল। দ্বিতীয় বলদটিও সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি এই দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর জন্যে যারা বন্ধুত্ব করে, তাদের অবস্থাও এমনিই। তারা উভয়েই আল্লাহর জন্যে কাজে নিয়োজিত থাকে। একজন দাঁড়ালে অন্যজনও তার অনুরূপ দাঁড়িয়ে যায়। একে অপরের অনুরূপ হওয়ার মাধ্যমেই এখলাস পূর্ণতা লাভ করে। যার মহব্বতে এখলাস নেই সে মোনাফেক। এখলাস হচ্ছে সম্মুখে-পিছনে, মুখে-অন্তরে, ভিতরে-বাইরে এবং একাকিত্বে ও জনসমক্ষে এক রকম হওয়া। এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়াই বন্ধুত্বের ত্রুটি এবং ঈমানদারদের পথের বাধা। যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বাবস্থায় এক রকম রাখতে সক্ষম নয়, তার উচিত বন্ধুত্বের নাম মুখে না নেয়া এবং নির্জনবাস অবলম্বন করা। কেননা, বন্ধুত্বের হক আদায় করা কঠিন। তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বন্ধুত্বের বিরাট সওয়াব হাসিল করার যোগ্য। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার প্রতিবেশী, তার হক উত্তমরূপে আদায় কর; তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তোমার সংসর্গে আছে, তার হক উত্তমরূপে আদায় কর; তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের মৌখিক হকসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান। কেননা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম নয়। অর্থসম্পদে বন্ধুকে শরীক করা যখন বন্ধুত্বের হক সাব্যস্ত হয়েছে. তখন শিক্ষায় অংশীদার করা আরও উত্তমরূপে বন্ধুত্বের হক। অর্থাৎ, তুমি যদি শিক্ষায় পারদর্শী হও, তবে যেসব শিক্ষা বন্ধুর জন্যে পরকাল ও ইহকালে উপকারী, সেগুলো তাকে শেখাও। তোমার শিক্ষাদানের পর যদি সে তদনুযায়ী আমল না করে, তবে তাকে উপদেশ দেয়া তোমার কর্তব্য। অর্থাৎ, মন্দ কর্মের অনিষ্ট এবং তা বর্জন করার উপকারিতা তার সামনে বর্ণনা কর, যাতে সে কুকর্ম থেকে বিরত থাকে, কিন্তু এসব উপদেশ নির্জনে দেবে, যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে। কেননা, জনসমক্ষে উপদেশ দেয়া, লজ্জা দেয়া ও অপমান করার নামান্তর। পক্ষান্তরে একাকিত্বে উপদেশ দেয়া স্নেহ ও হিতাকাঙ্ক্ষার মধ্যে গণ্য। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

المؤمن مرأة المؤمن। অর্থাৎ, ঈমানদার একজন ঈমানদারের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আয়না। উদ্দেশ্য, সে তার দ্বারা এমন বিষয় জেনে নিতে পারে, যা নিজে নিজে জানতে পারে না। একজন মুমিন তার মুমিন ভাইয়ের মাধ্যমে নিজের দোষ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, যেমন আয়না দ্বারা মানুষের বাহ্যিক দোষসমূহ জেনে নিতে পারে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যে তার ভাইকে গোপনে বুঝায়, সে তাকে উপদেশ দেয় এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর যে শাসন করে, সে অপমান করে এবং দোষ দেয়। মুসইরকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে, তাকে আপনি ভালবাসেন কি না? তিনি বললেন ঃ যদি সে আমাকে একান্তে নিয়ে নসীহত করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে ভালবাসি। পক্ষান্তরে জনসমক্ষে নসীহত করলে আমি তাকে ভালবাসি না। তিনি ঠিকই বলেছেন। কেননা, জনসমক্ষে নসীহত করা অপমান বৈ কিছুই নয়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়জনকে শাসন করবেন; কিন্তু জনসমক্ষে নয়; বরং তাদেরকে নিজের আশ্রয়ে রেখে আলাদাভাবে তাদের গোনাহ সম্পর্কে গোপনে অবহিত করবেন। তাদের মোহরবন্ধ আমলনামা সেই ফেরেশতাদের হাতে দেয়া হবে, যারা তাদের সাথে জান্নাত পর্যন্ত যাবে। জান্নাতের দরজায় পৌঁছার পর ফেরেশতারা মোহরবন্ধ আমলনামা তাদের হাতে সমর্পণ করবে, যেন তারা তা পাঠ করে নেয়। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র, তাদেরকে জনসমক্ষে ডাকা হবে এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের গোনাহের সাক্ষ্য দেবে। এতে তাদের অপমান লাঞ্ছনা চরমে পৌঁছবে। আল্লাহ তা'আলা সেদিনের অবমাননা থেকে আমাদের সকলকে আপন আশ্রয়ে রাখুন! যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সংসর্গ একাত্মতার মাধ্যমে অবলম্বন কর, মানুষের সংসর্গ উপদেশের মাধ্যমে, প্রবৃত্তির সংসর্গ বিরোধিতার মাধ্যমে এবং শয়তানের সংসর্গ শত্রুতার মাধ্যমে অবলম্বন কর।

প্রশ্ন হয়, উপদেশের মধ্যে তো দোষ উল্লেখ করতে হবে। এতে অন্তরে ঘৃণা উৎপন্ন হবে। এমতাবস্থায় উপদেশ ভ্রাতৃত্বের হক কিরূপে হবে? জওয়াব, সে দোষ উল্লেখ করলে অন্তরে ঘৃণা উৎপন্ন হয়, যে দোষের উপস্থিতি বন্ধু নিজে নিজেই জানে, কিন্তু যে দোষ আছে বলে সে নিজে অবগত নয়, সে সম্পর্কে অবগত করা সাক্ষাৎ স্নেহ ও অনুগ্রহ। বন্ধু বুদ্ধিমান হলে এতে তার অন্তর উপদেশদাতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে। নির্বোধদের সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। কেননা, তোমার কোন নিন্দনীয় কাজ অথবা মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে কেউ তোমাকে অবহিত করলে এটা এমন হবে, যেমন তোমার কাপড়ের মধ্যে কোন বিচ্ছু অথবা সর্প লুকিয়ে আছে এবং তোমার সর্বনাশ করতে উদ্যত রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি তোমাকে এই সর্প সম্পর্কে অবহিত করল। এখন তুমি যদি এই ব্যক্তির উপদেশ খারাপ মনে কর, তবে তোমার চেয়ে অধিক নির্বোধ কে হবে? বলাবাহুল্য, মন্দ অভ্যাসসমূহও বিচ্ছু এবং সর্পের মতই মানুষের পরকাল ধ্বংস করে দেয়। কেননা এগুলো মানুষের অন্তরাত্মাকে দংশন করে। এগুলোর বিষ দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছুর বিষের চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। হযরত ওমর (রাঃ) দোষ সম্পর্কে অবহিত করাকে হাদিয়া আখ্যা দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার ভাইয়ের কাছে তার দোষের হাদিয়া নিয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত সালমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার মতে আমার যে দোষ আপনি শুনেছেন, তা বর্ণনা করুন। সালমান বললেন ঃ এ বিষয়ে আমাকে মাফ করুন, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আপনার কাছে দু'টি পোশাক আছে। একটি দিনে পরিধান করেন অপরটি রাতের বেলায়। আমি আরও শুনেছি, আপনি দস্তরখানে দু'প্রকার ব্যঞ্জন একত্রিত করেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এগুলোর জন্যে চিন্তা করবেন না। এ দুটি ছাড়া আরও কিছু শুনেছেন কি? বললেন ঃ না। হুযায়ফা মারআশী একবার ইউসুফ ইবনে সাবাকে লেখেন ঃ আমি শুনেছি তুমি তোমার ধর্ম দুপয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছ। জনৈক দুধওয়ালা বন্ধুকে তুমি দুধের দাম জিজ্ঞেস করলে সে ছয় পয়সা চাইল, তুমি চার পয়সা বললে সে দিয়ে দিল। অতএব তুমি তোমার মাথার উপর থেকে গাফেলদের পাল্লা নামিয়ে দাও এবং অনবধানতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও। জেনে রাখ, যে কোরআন পাঠ করে এবং এতে ধনী না হয়ে দুনিয়াদার হয়ে যায়, আমার আশংকা, না জানি সে আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে ঠাট্টাকারী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মিথ্যুকদের এই বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা উপদেশদাতাকে শত্রু মনে করে। এরশাদ হয়েছে–

وَلٰكِنْ لَّا يُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থাৎ, কিন্তু তারা নসীহতকারীদেরকে ভালবাসেন না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিন্তু তুমি যদি জান, তোমার বন্ধু নিজের দোষ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করতে পারছে না, তবে লক্ষ্য করবে সে তা গোপন করে কিনা। যদি গোপন করে, তবে তুমি তা ফাঁস করবে না। আর যদি দোষটি প্রকাশ্যে করে, তবে নম্রতা সহকারে উপদেশ দেবে। যাতে সে তোমার কাছ থেকে পলায়ন না করে। যদি জানা যায়, উপদেশ তার মধ্যে ক্রিয়া করবে না এবং সে নিজের মন থেকে বাধ্য, তবে উপদেশ না দিয়ে চুপ থাকাই উত্তম। এসব কথা সেসব বিষয়ে, যেগুলো বন্ধুর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তোমার হকে ত্রুটি করার সাথে সম্পর্ক রাখে। এগুলোতে সহনশীল হওয়া এবং মার্জনা করা ওয়াজিব। অবশ্য বিষয়গুলো যদি এমন হয় যে, মেলামেশা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, তবে নিরালায় শাসন করা বন্ধুত্ব বর্জন করার চেয়ে উত্তম। শাসনও ইশারা-ইঙ্গিতে করা পরিষ্কার ভাষায় করার চেয়ে ভাল এবং কাগজে লেখে দেয়া মৌখিক বলা অপেক্ষা উত্তম। সহ্য করা সর্বাধিক উত্তম। কেননা, তোমার বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য তার সম্মান করা ও হক আদায় করা হওয়া উচিত। এরূপ নিয়ত করা উচিত নয় যে, তাকে তুমি তোমার কাজে লাগাবে এবং সে তোমার সাথে নম্রতা করবে। আবু বকর কাত্তানী বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আমার সংসর্গে থাকতে লাগল, যা আমার মনের উপর কঠিন ছিল। আমি একদিন তাকে একটি বস্তু দিয়ে দিলাম, যাতে আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব দূর হয়ে যায়; কিন্তু তা দূর হল না। এর পর আমি তার হাতে ধরলাম এবং কক্ষের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললাম ঃ তোমার পা আমার গালে রাখ। সে অস্বীকার করলে আমি বললাম ঃ অবশ্যই রাখতে হবে। অতঃপর সে তার পা আমার গালে রাখল। এতে আমার মন থেকে বিরুদ্ধ ভাবটি চলে গেল। আবু আলী রাবতী বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ রাযীর সংসর্গ অবলম্বন করতে চাইলাম। তিনি জঙ্গলে গমন করতেন। আমার বাসনা শুনে তিনি বললেন ঃ শাসক আপনিই হবেন। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার প্রত্যেকটি কথা তোমাকে মানতে হবে। আমি বললাম ঃ শিরোধার্য। এর পর তিনি একটি থলিয়ায় সফরের আসবাবপত্র রাখলেন এবং নিজের পিঠে তুলে নিলেন। আমি যখনই তাকে বলতাম, বোঝাটি আমাকে দিন, তিনি বলতেন ঃ আমি শাসক নই কিনা? আমার কথা মান্য করা তোমার কর্তব্য। এক রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। তাঁর কাছে ছিল একটি চাদর। তিনি আমাকে বসিয়ে দিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সকাল পর্যন্ত আমার উপর চাদর টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তখন মনে মনে বলছিলাম ঃ হায়, আমি যদি তাঁকে শাসক মেনে না নিতাম।

বন্ধুত্বের পঞ্চম হক হচ্ছে, বন্ধুর ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা। বন্ধুর ভুল-ত্রুটি দু'প্রকার হতে পারে। (এক), কোন গোনাহ করার মাধ্যমে ধর্ম কর্মে ত্রুটি করবে, না হয় (দুই), বিশেষভাবে তোমার হকে ত্রুটি করবে। গোনাহ্ করা অথবা গোনাহের উপর কায়েম থাকার কারণে যে ত্রুটি হয় তার জন্যে তোমার উচিত তাকে নম্রভাবে নসীহত করা, যাতে তার বক্রতা দূর হয়ে যায় এবং সে পরহেযগারীর দিকে ফিরে আসে। যদি তুমি নম্রভাবে নসীহত করতে না পার এবং সে গোনাহের উপরই কায়েম থাকে, তবে এরূপ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব বহাল রাখা অথবা সম্পর্কচ্ছেদ করার ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অভিমত বিভিন্ন রূপ। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যখন কারও বন্ধু নিজের অবস্থা পাল্টে দেয়, তখন ভাল অবস্থার কারণে যেমন তাকে মহব্বত করেছিল, তেমনি মন্দ অবস্থার কারণে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁর মতে এটাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ও শত্রুতার দাবী। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী বলেন ঃ যখন তোমার বন্ধুর অবস্থা বদলে যায় এবং পূর্বের অবস্থা না থাকে, তখন এ কারণে তাকে পরিত্যাগ করো না। কেননা, মানুষ কখনও সৎ থাকে এবং কখনও অন্যায় করে ফেলে। সর্বদা এক অবস্থার উপর অটল থাকে না। হযরত নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার বন্ধু কোন গোনাহ করলে এই গোনাহের কারণে তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করো না। কেননা, সে আজ গোনাহ করবে– কাল ছেড়ে দেবে। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের সাথে আলেমের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করো না। কেননা, আলেম ত্রুটি-বিচ্যুতি করে; কিন্তু পরে তা ছেড়ে দেয়। এক হাদীসে আছে– আলেমের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ভয় কর এবং তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করো না। আশা কর, সে তার কর্মকান্ড পরিত্যাগ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। সে মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। একবার এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমন করলে তিনি তাকে শুধালেন ঃ আমার অমুক ভাই কেমন আছে? লোকটি আরজ করল ঃ সে আপনার ভাই হবে কেন? সে তো শয়তানের ভাই। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল ঃ সে অনেক কবীরা গোনাহ্ করেছে এবং অবশেষে মদ্যপান শুরু করেছে। হযরত ওমর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ) বললেন ঃ তুমি যখন সিরিয়ায় ফিরে যাও, তখন আমাকে খবর দিয়ো। লোকটি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলে হযরত ওমর (রাঃ) একটি চিঠিতে লেখলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ, এই কিতাব পরাক্রমশালী জ্ঞানময় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। এর পর তিরস্কার ও ভর্ৎসনার কথা লেখলেন। লোকটি পত্র পাঠ করে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা ঠিক বলেছেন এবং ওমর আমাকে নসীহত করেছেন। এর পর সে তওবা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। কথিত আছে, এক ব্যক্তি কারও প্রতি আসক্ত হওয়ার পর তার আল্লাহর ওয়াস্তের বন্ধুকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলল ঃ আমি অপরাধ করেছি। এখন তুমি যদি আমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখতে চাও, তবে রেখো না। সে জওয়াব দিল ঃ আমি এরূপ নই যে, তোমার ক্রটির কারণে বন্ধুত্ব খতম করে দেব। এর পর সে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিজ্ঞা করল, যে পর্যন্ত বন্ধুকে কাম প্রবৃত্তি থেকে উদ্ধার করা না হয়, সে পানাহার কিছুই করবে না। অতঃপর সে অনশন শুরু করল। সে প্রত্যেক দিন তার বন্ধুকে অবস্থা জিজ্ঞেস করত। বন্ধু বলত ঃ অন্তর পূর্বাবস্থায়ই অটল রয়েছে। সে দুঃখে ও ক্ষুধায় দিন দিন কাতর হতে লাগল। অবশেষে বিনা পানাহারে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমার অন্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কামাসক্তি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।

অনুরূপ আর একটি প্রচলিত গল্প হচ্ছে, পূর্ববর্তীগণের মধ্যে দু'বন্ধু ছিল। তাদের একজন সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। জনৈক ব্যক্তি অপর বন্ধুকে বলল ঃ আপনি তার সাথে দেখাসাক্ষাৎ ত্যাগ করেন না কেন? সে তো পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বন্ধু বলল ঃ এ সময়েই তো তার কাছে থাকা আমার জন্যে অধিক জরুরী। এ দুঃসময়ে তাকে বর্জন করব কিরূপে? এখন তার হাত ধরে নম্র ভাষায় তাকে বুঝাব এবং পূর্বেকার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবস্থায় ফিরে আসতে বলব। কবি সত্যই বলেছেন–

دوست ان دانم که گیرد دست درست

درپریشان حالی ودرماندگی ۔

সংকট মুহূর্তে যে বন্ধুর হাত ধরে; আমি তাকেই সত্যিকার বন্ধু মনে করি।

বনী ইসরাঈলের গল্পে বর্ণিত আছে, দু'বন্ধু এক পাহাড়ে বসে এবাদত করত। তাদের একজন গোশত কেনার জন্যে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এল। সে কসাইয়ের দোকানে এক বেশ্যাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং নির্জনে তার সাথে কুকর্ম করল। তিন দিন পর্যন্ত সে বেশ্যার কাছেই পড়ে রইল এবং লজ্জার কারণে বন্ধুর কাছে ফিরে গেল না। বন্ধু তিন দিন তাকে না দেখে শহরে চলে এল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে করে বেশ্যার বাড়ীতে তার সন্ধান পেল। দেখামাত্রই সে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং চুম্বনের পর চুম্বন করতে লাগল। প্রথমোক্ত বন্ধু নিজের অপরাধের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ছিল বিধায় বলতে লাগল ঃ তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না। সে বলল ঃ বন্ধু, তোমার অবস্থা আমি জেনে ফেলেছি। এ সময়ে তুমি আমার যতটুকু প্রিয়, ততটুকু পূর্বে কখনও ছিলে না। বন্ধু যখন দেখল, অপরাধ করা সত্ত্বেও সে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে না, তখন তার সাথে চলে এল এবং পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেল। অপরাধী বন্ধুর ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণের এটাই ছিল নীতি। এ নীতি হযরত আবু যর (রাঃ)-এর নীতি অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ। তবে তাঁর নীতিও নিঃসন্দেহে ভাল এবং নিরাপদ। প্রশ্ন হতে পারে, গোনাহগারের সাথে তো শুরুতেই বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। অতএব বন্ধু গোনাহ করলে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ওয়াজিব হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তীগণের নীতি অধিক সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ হবে কিরূপে? জওয়াব হচ্ছে, এ নীতির মধ্যে নম্রতা, অন্তরকে আকৃষ্ট করা এবং অনুকম্পা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গোনাহ থেকে ফিরে এসে তওবা করতে পারে। কেননা, সংসর্গ ও মেলামেশা অব্যাহত থাকার কারণে লজ্জা ও অনুতাপ উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব লাভ করবে। পক্ষান্তরে অপরাধী সংসর্গ আশা করতে না পারলে গোনাহের উপর স্থির থেকে যাবে। বিচক্ষণতার সাথে এ নীতিটি অধিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণ, বন্ধুত্ব আত্মীয়তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেলে তার হক দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তা বজায় রাখা ওয়াজিব হয়। বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং তা মেনে চলার এক পন্থা হচ্ছে প্রয়োজনের মুহূর্তে বন্ধুকে ত্যাগ না করা। ধর্মীয় প্রয়োজন অন্য সকল প্রয়োজনের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গোনাহ্ করার কারণে বন্ধু যে বিপদে পতিত হয়, তার কারণে ধর্মীয় প্রয়োজন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তার রেয়াত করা, তাকে পরিত্যাগ না করা এবং তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা একান্ত জরুরী, যাতে এই ব্যবহার তাকে বিপদমুক্তিতে সহায়তা করে। বস্তুতঃ বিপদাপদের জন্যেই বন্ধুত্ব হয়। ধর্ম নষ্ট হওয়ার মত বড় বিপদ আর কি হতে পারে? গোনাহ্গার ব্যক্তি যখন কোন পরহেযগারের সংসর্গে থাকে এবং তার খোদাভীতি ও ওজিফা প্রত্যক্ষ করে, তখন কিছু দিনের মধ্যে সেও গোনাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গোনাহের উপর স্থির থাকতে লজ্জাবোধ করে। যেমন, কোন অলস ব্যক্তি কোন কর্মপটুর সাথে থাকলে সে অলস থাকতে পারে না। কর্মপটু হয়ে যায়। জাফর ইবনে সোলায়মান বলেন ঃ যখন আমার আমলে শৈথিল্য দেখা দেয় তখন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে দেখি এবং এবাদতে তাঁর একাগ্রতার কথা কল্পনা করি। এতে আমার এবাদতের আনন্দ পূর্ববৎ হয়ে যায়। অলসতা দূর হয়ে যায় এবং আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত খুব কর্মচঞ্চল থাকি। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য, বন্ধুত্ব বংশগত ক্রমধারার অনুরূপ। গোনাহের কারণে বংশের কাউকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ, যদি তারা আপনার নাফরমানী করে, তবে বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কর্ম থেকে মুক্ত।

এখানে আমি তোমাদের থেকে মুক্ত একথা বলা হয়নি। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তা ও বংশগত অধিকারের খাতিরেই এরূপ বলা হয়নি। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনার অমুক ভাই এমন সব গোনাহে জড়িয়ে পড়েছে, আপনি তাকে পরিত্যাগ করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি তার কর্মকাণ্ড খারাপ মনে করি, কিন্তু সে আমার ভাই, তাকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মীয়তার ভ্রাতৃত্বের তুলনায় অধিক দৃঢ় হয়ে থাকে। জনৈক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হল ঃ ভাই ও বন্ধুর মধ্যে আপনার কাছে কে অধিক প্রিয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি ভাইকেও তখন মহব্বত করি, যখন সে আমার বন্ধু হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার অনেক ভাই তোমার মায়ের গর্ভে থেকে জন্মগ্রহণ করেনি। এ কারণেই বলা হয়েছে, আত্মীয়তা বন্ধুত্বের মুখাপেক্ষী, কিন্তু বন্ধুত্ব আত্মীয়তার মুখাপেক্ষী নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ এক দিনের বন্ধুত্ব সৌজন্য, এক মাসের বন্ধুত্ব আত্মীয়তা এবং এক বছরের বন্ধুত্ব নিকট আত্মীয়তা। যে কেউ এটা ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। মোট কথা, বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর তা বজায় রাখা ওয়াজিব। তবে প্রথমেই গোনাহগারের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, পূর্ব থেকে তার কোন হক থাকে না। পূর্ব থেকে যদি তার আত্মীয়তার হক থাকে, তবে তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করা উচিত নয়; বরং ভাল ব্যবহার করা উচিত। এর প্রমাণ, প্রথমেই বন্ধুত্ব না করা নিন্দনীয়ও নয়, অপছন্দনীয়ও নয়; বরং বলা হয়, একাকিত্বই উত্তম, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব চিরতরে ছিন্ন করতে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে খারাপ। এটা তালাক ও বিবাহের মতই। বিবাহ না করার চেয়ে তালাক দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক দূষণীয়। রসূলে করীম (সাঃ) ভ্রাতৃত্ব ছিন্ন করার ব্যাপারে এরশাদ করেন ঃ

شرار عباد الله المشاءون بالنميمة والمفرقون بين الاحبة .

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার দুষ্ট বান্দা তারাই যারা পরনিন্দা করে বেড়ায় এবং বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ শয়তান চায় তোমার বন্ধু এমন কোন কাজ করুক, যদ্দরুন তুমি তাকে পরিত্যাগ কর এবং মেলামেশা বর্জন কর। এখন তুমি যদি তাই কর, তবে শয়তানের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে এবং তার উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ, মানুষকে গোনাহে জড়িত করা যেমন শয়তানের কাম্য, তেমনি বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াও তার পছন্দনীয়। সুতরাং কোন বন্ধু যখন ভুল করে এবং শয়তানের এক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়, তখন বন্ধুর সাথে দেখাশোনা বর্জন করে শয়তানের দ্বিতীয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদ্দেশ্য পূর্ণ করার আবশ্যকতা আছে কি? এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর অপর ব্যক্তি যখন তাকে গালিগালাজ করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধমকে দিলেন এবং বললেন ঃ আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ, এক উদ্দেশ্য তো তার সিদ্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টি তুমি সিদ্ধ করো না।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বন্ধুত্ব অব্যাহত রাখা এবং প্রথমে বন্ধুত্ব না করার মধ্যে পার্থক্য ফুটে উঠেছে। একে এভাবেও বলা যায়, গোনাহ্গারদের সাথে মেলামেশা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাও নিষিদ্ধ। সুতরাং বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী, কিন্তু বন্ধুত্বের হক মানতে থাকা অপরটিকে জোরদার করে। তাই এটাই উত্তম।

এ পর্যন্ত বন্ধুর ধর্ম সম্পর্কিত ত্রুটিবিচ্যুতির অবস্থা বর্ণিত হল। যেসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষভাবে বন্ধুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো সকলের মতেই মার্জনা করা উত্তম; বরং যেসকল ত্রুটির কোন ভাল অজুহাত হতে পারে, সেগুলো সেই অর্থেই ধরে নেয়া ওয়াজিব। সেমতে বলা হয়, বন্ধুর জন্য তার বন্ধুর অপরাধের কোন ওযর বের করা উচিত। এর পরও মন না মানলে নিজেকেই ধিক্কার দেবে এবং বলবে ঃ তুই কেমন পাষাণ যে, তোর বন্ধু ওযরখাহী করে, আর তুই মানিস না? এতে বুঝা যায়, তুই-ই দোষী– বন্ধুর অপরাধ নয়। সুতরাং বন্ধুকে ভাল বলা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার প্রতি রাগ করবে না, কিন্তু তা হতে পারে না। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ যাকে ক্রুদ্ধ করা হয়; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ হয় না, সে গাধা যাকে মানানো হয়, কিন্তু সে মানে না, সে শয়তান সুতরাং মানুষের জন্যে গাধা হওয়াও উচত নয় এবং শয়তান হওয়াও উচিত নয়। বরং নিজেই বন্ধুর স্থলবর্তী হয়ে নিজেকে মানাবে এবং না মেনে শয়তান হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

বন্ধু সত্য মিথ্যা যে কোন ওযর পেশ করুক, তা মেনে নেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من اعتذر اليه اخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل اثم صاحب المكس -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ. যার সামনে তার ভাই ওযর পেশ করে এবং সে কবুল করে না, তার সে ব্যক্তির মত পাপ হবে, যে বলপূর্বক কর আদায় করে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

المؤمن سريع الغضب سريع الرضاء ـ

অর্থাৎ, মুমিন দ্রুত রাগ করে এবং দ্রুত রাযী হয়ে যায়।

এখানে মুমিন রাগ করে না বলা হয়নি। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ والكاظمين الغيظ অর্থাৎ, এবং যারা ক্রোধ দমন করে। এখানে "যারা ক্রোধ করে না" বলা হয়নি। এর কারণ, অভ্যাসের দিক দিয়ে এটা সম্ভবপর নয় যে, কাউকে আঘাত করা হবে, আর সে ব্যথা অনুভব করবে না। অবশ্য আঘাত সহ্য করা এবং রাগ হজম করে নেয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় রাগের বিপরীত আমল করা যায়। রাগ প্রতিশোধ নেয়ার দাবী করে। এখানে প্রতিশোধ বর্জন করা তো সম্ভব, কিন্তু রাগ অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব নয়।

আবু সোলায়মান দারানী আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এ যুগে তুমি কারও সাথে বন্ধুত্ব করলে বন্ধুর কোন মন্দ বিষয় জেনে তাকে শাসন করো না। যদি শাসন কর তবে জওয়াবে পূর্বের চেয়েও মন্দ বিষয় দেখার আশংকা রয়েছে। আহমদ বলেন ঃ আমি বিষয়টি পরীক্ষা করে সত্য পেয়েছি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বন্ধুর অপরাধে সবর করা তাকে শাসন করার চেয়ে ভাল। শাসন করা দেখা সাক্ষাৎ বর্জনের তুলনায় এবং দেখা সাক্ষাৎ বর্জন গীবত করার তুলনায় উত্তম। গীবত করার সময় শত্রুতায় বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ـ

অর্থাৎ, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও শত্রুদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما

وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমার বন্ধুকে মাঝারি ধরনের মহব্বত কর। সে হয় তো কোনদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথে মাঝারি ধরনের শত্রুতা রাখ। হয় তো সে কোন দিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের ষষ্ঠ হক হল বন্ধুর জন্যে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এমন দোয়া করা, যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। অনুরূপভাবে তার পরিবার ও আত্মীয়দের জন্যে দোয়া করা। নিজের জন্যে যেমন দোয়া করবে, বন্ধুর জন্যেও তেমনি দোয়া করবে। কেননা, বাস্তবে তার জন্যে দোয়া করার মানেই নিজের জন্যে দোয়া করা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب قال الملك لك مثل ذلك -

অর্থাৎ, যখন কেউ তার বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ তোমার জন্যেও অনুরূপ হবে। এক রেওয়ায়েতে ফেরেশতা বলে কথাটির স্থলে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমি এ দোয়া প্রথমে তোমার জন্যে কবুল করব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ বন্ধুর জন্যে দোয়া করলে এত কবুল হয়, যা নিজের জন্যে করলে হয় না। আর এক হাদীসে আছে– دعوة الرجل لاخيه فى الغيب لاترد অর্থাৎ, বন্ধুর অনুপস্থিতে তার জন্যে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। হযরত আবু দারদা বলেন ঃ আমি সেজদায় আমার সত্তর জন বন্ধুর জন্যে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে দোয়া করি। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইস্পাহানী বলেন ঃ এমন সৎ বন্ধু পাওয়া কঠিন, যে তোমার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা যখন তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে এবং তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেয়ে সুখে মত্ত থাকে, তখন সে একা তোমার জন্যে দুঃখ করে, তোমার অতীত আমল ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে শংকাবোধ করে এবং রাতের অন্ধকারে তোমার জন্যে দোয়া করে; অথচ তুমি মাটির স্তূপের নীচে পড়ে থাক। এ ব্যাপারে সে ফেরেশতাদের অনুসরণ করে। হাদীসে আছে– যখন কেউ মারা যায়, তখন লোকে বলে ঃ কি ছেড়ে গেছে? ফেরেশতারা বলে ঃ পরবর্তী জীবনের জন্যে কি পাঠিয়েছে? অতীত আমল ভাল হলে ফেরেশতারা খুশী হয়, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে এবং তার জন্যে সুপারিশ করে। কথিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আছে, বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে যে ব্যক্তি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে, তাকে এমন লেখা হবে যেন সে জানাযায় উপস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কবরে মৃতের অবস্থা পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার মত হয়। যে পানিতে ডুবতে থাকে, সে সবকিছুরই আশ্রয় নিতে চায়। মৃত ব্যক্তিও নিজের পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অথবা আত্মীয়দের দোয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। মৃতদের কবরে জীবিতদের দোয়ায় পাহাড়সম নূর এসে যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মৃতদের জন্যে দোয়া জীবিতদের উপঢৌকনের মত। এক ফেরেশতা দোয়াকে একটি নূরের খাঞ্চায় রেখে নূরের রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের কাছে নিয়ে যায় এবং বলে ঃ এই উপঢৌকন তোমার অমুক বন্ধু অথবা অমুক আত্মীয় পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয়, যেমন জীবিতরা উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হয়।

বন্ধুত্বের সপ্তম হক 'ওফা' (বন্ধুত্ব রক্ষাকরণ) ও এখলাস। ওফার অর্থ হল, বন্ধুর জীবদ্দশা পর্যন্ত বন্ধুত্বের উপর দৃঢ় থাকা এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার অব্যাহত রাখা। কেননা, বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতে উপকার লাভ। যদি মৃত্যুর পূর্বেই বন্ধুত্ব খতম হয়ে যায়, তবে এত পরিশ্রম ও চেষ্টা অর্থহীন হয়ে যাবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আখেরাতে যে সাত ব্যক্তি আল্লাহ্র ছায়ায় স্থান পাবে, তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি তারা, যারা পরস্পর আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করেছে, তার উপরই স্থির রয়েছে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মৃত্যুর পর অল্প ওফাও জীবদ্দশার অনেক ওফা অপেক্ষা উত্তম। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক বৃদ্ধার তাযীম করেছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধার অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এই বৃদ্ধা খাদীজার আমলে আমার কাছে আসত। মোট কথা, বন্ধুর সকল বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা বন্ধুত্ব রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্মান প্রদর্শনের প্রভাব বন্ধুর মনে তার নিজের সম্মান করার তুলনায় বেশী হয়। স্নেহ ভালবাসার জোর তখনই জানা যায়, যখন তা বন্ধুকে অতিক্রম করে তার আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছায়। এমনকি, বন্ধুর দরজার কুকুরকে অন্যান্য কুকুরের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সর্বক্ষণ বন্ধুত্ব রক্ষা করা না হলে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। কেননা, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে, তাদের প্রতি শয়তানের যে হিংসা হয়, তা সেই দু'ব্যক্তির প্রতি হয় না, যারা কোন ভাল কাজে একে অপরের সহায়তা করে। শয়তান সর্বদা বন্ধুদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার চেষ্টায় থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথাই বলে, শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে থাকে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاۤءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ -

অর্থাৎ, তিনি আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন; শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পর।

বলা হয়, যখন দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ তখনই হতে পারে যখন তাদের কেউ গোনাহ করে। বিশর (রঃ) বলতেন ঃ যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ত্রুটি করে, তখন আল্লাহ্ তার কাছ থেকে তার বন্ধুকে ছিনিয়ে নেন। এ কারণেই হযরত ইবনে মোবারক বলেন ঃ বন্ধুদের সাথে বসা এবং মিতব্যয়িতার দিকে ফিরে আসাই সর্বাধিক সুস্বাদু বস্তু। যে মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়, তাকেই চিরন্তন মহব্বত বলা হয়। আর যে মহব্বত কোন স্বার্থের ভিত্তিতে হয়, তা সে স্বার্থ দূর হয়ে গেলেই বিদূরিত হয়ে যায়। আল্লাহর জন্যে মহব্বতের এক ফল এই যে, এতে ধর্মীয় ও জাগতিক কোন ব্যাপারেই হিংসা হয় না। হিংসার কোন কারণও নেই। কেননা, এক বন্ধুর যে সম্পদ থাকে, তার উপকারিতা অপর বন্ধু পায়। আল্লাহ্ তাআলা এরূপ বন্ধুদেরকে এ গুণেই বিশেষিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, তারা যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে নিজেদের অন্তরে কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্বার্থপরতা অনুভব করে না এবং তারা নিজেদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, অন্তরে স্বার্থ থাকাই হিংসা।

মহব্বত রক্ষাকরণের এক উপায় হল, নিজে যত উচ্চ মর্যাদায়ই পৌঁছে থাক না কেন, বন্ধুর আতিথ্যে নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করা। শান-শওকত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বন্ধুদের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা নীচতা। জনৈক বুযুর্গ তাঁর পুত্রকে ওসিয়ত করে বললেন ঃ বৎস, যার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণসমূহ থাকে, কেবল তার সংসর্গই অবলম্বন করবে– তার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সে তোমার কাছে আসবে। তুমি তার মুখাপেক্ষী না হলে সে তোমার কাছে কিছু আশা করবে না। তার মর্যাদা বেড়ে গেলে সে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করবে না।

মহব্বত রক্ষা করার আরেকটি উপায় হল, বন্ধুর বিরহ ও বিচ্ছেদকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে করা। ইবনে ওয়ায়নার সম্মুখে এ সম্পর্কিত একটি কবিতা পাঠ করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি কিছু লোকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছি। তাদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার পর ত্রিশ বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু কখনও কল্পনায় আসে না যে, তাদের বিরহ বেদনা মন থেকে মুছে গেছে। বন্ধুত্ব রক্ষা করার আর একটি উপায়, বন্ধুর বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ না শোনা। বিশেষতঃ এমন লোকদেরর কাছ থেকে না শোনা, যারা প্রথমে জাহির করে যে, তারা অমুকের বন্ধু, এর পর তার বিরুদ্ধেই বিদ্বেষসূচক কথাবার্তা বলে। পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টির এটা একটা সূক্ষ্ম উপায়। যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করে না এবং বন্ধুর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শ্রবণ করে, তার বন্ধুত্ব ক্ষণভঙ্গুর হয়ে থাকে। জনৈক ব্যক্তি একজন দার্শনিককে বলল ঃ আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। দার্শনিক বললেন ঃ তিনটি বিষয় মেনে নিলে আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করব। এক, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনবে না, দুই– আমার কথার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না এবং তিন– ছলনা ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমাকে দলিত করবে না। বন্ধুত্ব রক্ষা করার আর একটি উপায় হল, বন্ধুর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমার বন্ধু তোমার শত্রুর অনুগত হয়ে যায়, তখন তোমার শত্রুতায় উভয়েই অংশীদার হয়।

বন্ধুত্বের অষ্টম হক বন্ধুকে কষ্ট না দেয়া। অর্থাৎ, তার উপর এমন কোন বোঝা চাপাবে না এবং তাকে এমন কোন ফরমায়েশ দেবে না,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাতে তার কষ্ট হয়। কাজেই তার কাছে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদের সাহায্য এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইবে না। মনে করবে, বন্ধুর দোয়ায় বরকত হবে, তার সাক্ষাতে মন প্রফুল্ল হবে এবং ধর্মকর্মে সাহায্য পাওয়া যাবে। বন্ধুর কোন কাজ করে দিলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে তার বন্ধুর কাছে এমন বস্তু কামনা করে, যা বন্ধু তার কাছে কামনা করে না, সে বন্ধুর প্রতি জুলুম করে। যে তার বন্ধুর কাছ থেকে এমন বস্তু পেতে চায়, যা বন্ধু তার কাছ থেকে পেতে চায়, সে বন্ধুকে কষ্টে ফেলে দেয়। আর যে বন্ধুর কাছে কিছুই চায় না, সে বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করে। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুদের মধ্যে নিজেকে মর্যাদার চেয়ে বড় করে রাখবে, সে নিজেও গোনাহগার হবে এবং তার বন্ধুরাও গোনাহগার হবে। যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা অনুযায়ীই বন্ধুদের মধ্যে থাকবে, সে নিজে কষ্ট করবে এবং বন্ধুদেরকেও কষ্ট দেবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদার চেয়ে কম হয়ে তাদের মধ্যে থাকবে, সে নিজে এবং বন্ধুরা সকলেই আরামে থাকবে। অধিকতর হালকা থাকার উপায় হল, লৌকিকতা দূরে সরিয়ে রাখা; এমনকি, যে কাজে নিজের কাছে লজ্জা করবে না, তাতে বন্ধুদের কাছেও লজ্জা করবে না। হযরত জুনায়েদ বলেন ঃ আল্লাহ্র জন্যে বন্ধুত্বকারী দু'ব্যক্তি যদি একজন অপরজনের কাছে লজ্জা করে, তবে কারও না কারও মধ্যে অবশ্যই রোগ থাকবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধুদের মধ্যে সে-ই নিকৃষ্টতম, যে তোমার জন্যে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। ফলে তোমাকে তার খাতির-তোয়াজ করতে হয় এবং তা সম্ভব না হলে ওযর পেশ করার প্রয়োজন হয়। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষের মধ্যে লৌকিকতার কারণেই বিভেদ সৃষ্টি হয়। একজন অপরজনের কাছে গেলে সে তার জন্যে লৌকিকতা করে। হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ আমি চার শ্রেণীর সুফী বুযুর্গগণের সাথে বাস করেছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ত্রিশ ব্যক্তির সংসর্গ লাভ করেছি; অর্থাৎ হারেস মুহাসেবী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ, হাসান সোহী ও তাঁর অনুচরবৃন্দ, সিররী সকতী ও তাঁর দল এবং ইবনে কুরায়বী ও তাঁর সহচরবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে যে কোন দুব্যক্তি পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং লৌকিকতা প্রদর্শন করেছে, তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণ, তাদের একজনের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক রোগ ছিল।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ যে বন্ধু আমার সাথে লৌকিকতা করে, বন্ধুদের মধ্যে সেই আমার কাছে সর্বাধিক কঠিন এবং যার সাথে আমি এমনভাবে থাকি, যেমন একাকী থাকি, সে আমার কাছে সবচেয়ে হালকা বন্ধু। জনৈক সুফী বলেন ঃ এমন লোকের সাথে থাক যে, সৎকর্ম করলে তার দৃষ্টিতে বেড়ে না যাও এবং গোনাহ করলে তার কাছে তোমার মর্যাদা হ্রাস না পায় ; উভয় অবস্থাতে তার কাছে সমান থাক। একথা বলার কারণ, এর ফলে লৌকিকতা ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেউ বলেন ঃ দুনিয়াদারদের সাথে আদব সহকারে থাকা উচিত, আখেরাত ওয়ালাদের সাথে জ্ঞান সহকারে এবং সাধকদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা থাক। আর একজন বলেন ঃ এমন ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন কর যে, গোনাহ তুমি করলে তওবা সে করে এবং তার সাথে মন্দ ব্যবহার করলে উল্টা সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তোমার কষ্টের বোঝা নিজে বহন করে এবং তোমাকে কোন কষ্ট দেয় না। এ উক্তির প্রবক্তা বন্ধুত্বের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এ কারণেই হযরত জুনায়দকে যখন কেউ বলল ঃ বর্তমান যুগে বন্ধু বিরল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করার মত ব্যক্তি কোথায় ? তখন তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তিন বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন ঃ যদি এমন বন্ধু চাও যে তোমাকে কষ্ট থেকে বাঁচাবে এবং তোমার কষ্ট নিজের মাথায় তুলে নেবে, তবে এরূপ বন্ধু অবশ্যই বিরল। পক্ষান্তরে যদি এমন বন্ধু চাও, যার খেদমত তুমি করবে এবং সে কষ্ট দিলে তুমি সবর করবে, তবে আমার কাছে এরূপ লোক অনেক আছে, যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করতে পার। এখন জানা উচিত, মানুষ তিন প্রকার– এক, যার সংসর্গে তোমার উপকার হবে। দুই, তুমি যার কিছু উপকার করতে পারবে এবং তোমা দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তার দ্বারা তোমার উপকারও হয় না। তিন, যার কোন উপকার তুমি করতে পার না; কিন্তু তার সংসর্গে তোমার ক্ষতি হয়। এরূপ ব্যক্তি নির্বোধ চরিত্রহীন। তার সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ থেকে দূরে থেকো না। কেননা, তার দ্বারা দুনিয়াতে উপকার না হলেও আখেরাতে উপকার হবে। তার সুপারিশ,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দোয়া এবং তার খেদমত করার সওয়াব তুমি পাবে। প্রথম প্রকার মানুষ সর্বাবস্থায় সংসর্গের যোগ্য। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, তুমি আমার কথা মানলে তোমার অনেক বন্ধু হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তুমি তাদের দুঃখে দুঃখী হলে, তাদের জ্বালাতন সহ্য করলে এবং তাদের প্রতি হিংসা না করলে তারা তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি পঞ্চাশ বছর মানুষের সংসর্গে কাটিয়েছি। কখনও আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে কলহ হয়নি। কেননা, আমি তাদের মধ্যে নিজের ভরসায় বাস করেছি। কারও উপর বোঝা চাপাইনি। যার অভ্যাস এরূপ হবে, তার অনেক বন্ধু হবে। কষ্ট না দেয়ার আর এক উপায় হল, বন্ধুর নফল এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি ও আপত্তি না করা। কোন কোন সুফী এই শর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন যে, চারটি বিষয়ে একই রূপ থাকবে। একজন সর্বদা রোযা রাখলে অপরজন বলবে না যে, রোযা ভঙ্গ কর; একজন সর্বদা রোযা না রাখলে অপরজন বলবে না যে, রোযা রাখ; একজন সারা রাত নিদ্রা গেলে অপরজন বলবে না যে, উঠ এবং একজন সারা রাত জেগে নামায পড়লে অপরজন বলবে না যে, ঘুমাও।

জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা লৌকিকতাকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انا والاتقياء من امتى براء من التكلف অর্থাৎ, আমি এবং আমার উম্মতের পরহেযগার লোকেরা লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ীতে চারটি কাজ করে, তার বন্ধুত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়- এক, বন্ধুর বাড়ীতে পানাহার করা; দুই, পায়খানায় যাওয়া; তিন, নামায পড়া এবং চার, নিদ্রা যাওয়া। অন্য একজন বুযুর্গের সামনে এসব বিষয় আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ পঞ্চম কাজটি রয়ে গেছে। তা হল, সস্ত্রীক বন্ধুর গৃহে গেলে সেখানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কেননা, এই পাঁচটি কাজের জন্যেই গৃহ নির্মাণ করা হয়। নতুবা আবেদদের এবাদতের জন্যে তো মসজিদই অধিক আরামের জায়গা। এসব কাজ বন্ধুর গৃহে হয়ে গেলে বন্ধুত্ব পূর্ণাঙ্গ, লৌকিকতা দূরীভূত এবং অকপট ভাব অর্জিত হয়ে যায়। আরবের লোকেরা সালামের জওয়াবে বলে- মারহাবা, আহলান ওয়া সাহলান। এতে উপরোক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'মারহাবা' শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমার জন্যে আমার মনে ও গৃহে বিস্তৃত জায়গা রয়েছে। 'আহলান' শব্দের অর্থ এ গৃহ তোমার। এখানে তোমার মন বসবে। আমাদের প্রতি তোমার মনে কোন আতংক ভাব থাকবে না। 'সাহ্লান' শব্দের অর্থ, তুমি যা চাইবে, তা তোমার জন্যে সহজলভ্য হবে। তা পূর্ণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। সহজলভ্যতা ও লৌকিকতা বর্জন এভাবে পূর্ণ হবে যে, তুমি নিজেকে বন্ধু অপেক্ষা কম মর্যাদাবান মনে করবে, তার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে এবং নিজের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। বন্ধুকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বাস্তবে শ্রেষ্ঠ তুমি হবে। আবু মোয়াবিয়া আসওয়াদ বলেন ঃ আমার বন্ধু আমার চেয়ে উত্তম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তা কেমন করে? তিনি বললেন ঃ আমার প্রত্যেক বন্ধু আমাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে। যে ব্যক্তি আমাকে নিজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি তোমার জন্যে তাই পছন্দ না করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে, তার সংসর্গে কোন কলাণ নেই। সমতার দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখা সর্বোচ্চ স্তর এবং পূর্ণাঙ্গ স্তর হচ্ছে বন্ধুকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ তোমাকে কেউ সর্বনিকৃষ্ট বললে যদি তুমি ক্রুদ্ধ হও, তবে তুমি সর্বনিকৃষ্টই বটে। অর্থাৎ, সর্বদা মনে নিকৃষ্ট হওয়ার বিশ্বাস থাকা উচিত। কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বন্ধুকে হেয় মনে করবে। অথচ সাধারণ মুসলমানকেও হেয় মনে করা অনুচিত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يحسب المرء من الشران يحقر اخاه المسلم অর্থাৎ, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে তার মুসলমান ভাইকে হেয় মনে করাই যথেষ্ট।

লৌকিকতা বর্জনের এক উপায় হল নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের পরামর্শ মেনে নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ, কাজকর্মে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গ্রহণ কর। নিজের কোন রহস্য বন্ধুদের কাছে গোপন করবে না।

মাওলানা ইয়াকুব কারখী বলেন ঃ আসওয়াদ ইবনে সালেম আমার পিতৃব্য হযরত মারূফ কারখীর বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার এসে তাঁকে বললেন – বিশর ইবনে হারেস আপনার সাথে মহব্বতের বন্ধন স্থাপন করতে চান। তিনি আপনার সামনা সামনি এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ, আপনি তাঁর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করে নিন এভাবে যে, আপনি জানেন অথবা তিনি। তিনি এমন মহব্বত চান, যা তিনি সওয়াবের কারণ বলে জানেন এবং ধর্তব্য বলে স্বীকার করেন। এ জন্যে তিনি কয়েকটি শর্ত করেন।

এক, মহব্বতের এ ব্যাপারটি জানাজানি না হওয়া চাই। দুই, আপনার ও তার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়া চাই। কারণ, তিনি অধিক সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। হযরত মারূফ বললেন ঃ ভাই! আমি যখন কাউকে মহব্বত করি, তখন দিবারাত্র তার বিচ্ছেদ চাই না এবং সর্বক্ষণ তার সাথে দেখা করি। সর্বাবস্থায় তাঁকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেই। অতঃপর হযরত মারূফ ভ্রাতৃত্বের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন। বক্তব্যের মাঝখানে বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী মুর্তযার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ফলে তাঁকে জ্ঞানগরিমায় শরীক করেছিলেন। কোরবানীর জন্তু তাঁকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং নিজের প্রিয়তমা কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কিছুর কারণ কেবল বন্ধুত্বই ছিল। যেহেতু তুমি বিশরের আবেদন নিয়ে আমার কাছে এসেছ, তাই আমি তোমাকে সাক্ষী করে বলছি– আমি তার সাথে এই শর্তে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করলাম, তিনি যদি আমার সাথে দেখা করা অপছন্দ করেন, তবে যেন আমার সাথে দেখা করতে না আসেন, কিন্তু আমার মন যখনই চাইবে, আমি তাঁকে দেখতে চলে যাব। আমরা যেখানে মিলিত হই, তিনি যেন সেখানে আমার সাথে দেখা করেন। তিনি যেন কোন ভেদ আমার কাছে গোপন না করেন এবং সকল অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। অতঃপর আসওয়াদ ইবনে সালেম এসব কথাবার্তা বিশরের কাছে গিয়ে বললে তিনি আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সব কথা মেনে নিলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপরে আমরা বন্ধুত্বের যাবতীয় হক সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এসব পূর্ণরূপে তখন আদায় হয়, যখন আদায় করার মধ্যে বন্ধুদের উপকার এবং তোমার ক্ষতি হয়। এমনভাবে আদায় করা যাবে না, যাতে তোমার উপকার এবং বন্ধুদের অপকার হয়। আর একটি কাজ করা উচিত। তা হচ্ছে, তুমি নিজেকে বন্ধুদের খাদেমের স্থলাভিষিক্ত মনে করবে এবং নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাদের অধিকার আদায়ে নিয়োজিত রাখবে। উদাহরণতঃ চক্ষু দ্বারা তাদেরকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে তারা এটা বুঝতে পারে। তাদের গুণাবলী দেখবে এবং দোষ-ত্রুটি থেকে অন্ধ হয়ে যাবে। তারা তোমার দিকে মুখ করে কথা বললে তুমি দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবে না।

বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যারা বসত, তিনি তাদের প্রত্যেককে আপন মোবারক চেহারার ভাগ দিতেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকের দিকে মুখ ফেরাতেন। যে কেউ তাঁর কথা শুনত, সে-ই মনে করত, তার প্রতি তাঁর সর্বাধিক কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর মজলিস লজ্জা, বিনয় ও বিশ্বস্ততার মজলিস ছিল। তিনি নিজের বন্ধুদের সামনে সর্বাধিক হাসতেন। সহচরেরা যে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনি তাতে অধিক বিস্ময় প্রকাশ করতেন। মুখের সাথে সম্পর্কশীল হকসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কান সম্পর্কিত হক, বন্ধু যখন কিছু বলবে, তখন তার কথা সাগ্রহে শুনবে; তাকে সত্য মনে করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং আপত্তি উত্থাপন করে কথা কেটে দেবে না। কোন কারণে কথা শুনতে না পারলে ওযর পেশ করবে। বন্ধুর অপ্রিয় কথাবার্তা শ্রবণ থেকে কানকে বাঁচিয়ে রাখবে। হাত সম্পর্কিত হক হচ্ছে, হাতে সম্পন্ন করা হয় এমন বিষয়াদিতে বন্ধুদের সাহায্য করবে। পা সম্পর্কিত হক হচ্ছে, পায়ের দ্বারা বন্ধুদের পেছনে খাদেমের ন্যায় চলবে। যতটুকু তারা আগে বাড়ায় তাদের থেকে ততটুকু আগে বাড়বে এবং তারা যতটুকুই নৈকট্য দেয়; ততটুকুই নিকটে থাকবে । তারা বৈঠকে আগমন করলে তাদের সম্মানে দাঁড়াবে এবং যে পর্যন্ত তারা না বসে, তুমি বসবে না। যেখানে জায়গা থাকবে সেখানেই বসে যাবে। পূর্ণ একাত্মতা হয়ে গেলে এসব হকের মধ্যে কতক সহজও হয়। যেমন, দাঁড়ানো, ওযর পেশ করা ইত্যাদি। লৌকিকতা লুপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে গেলে বন্ধুদের সাথে সেই ব্যবহারই করা হয়, যা নিজের সাথে করা হয়। কেননা, এই বাহ্যিক আদবসমূহ অন্তরের পরিচ্ছন্নতার শিরোনাম। অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেলে এসব বাহ্যিক আদবের প্রয়োজন থাকে না। যে ব্যক্তির দৃষ্টি সৃষ্টির সংসর্গের দিকে থাকে, সে কখনও বক্র হয়, কখনও সোজা। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টি স্রষ্টার দিকে থাকে, সে বাহ্যতঃ সোজা থাকে এবং অন্তরকে মহব্বত ও সৃষ্টির মহব্বত দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কেননা, বান্দার খেদমত আল্লাহর ওয়াস্তে খেদমতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। সচ্চরিত্রতা ছাড়া এটা মানুষ অর্জন করতে পারে না।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে মনীষী উক্তি ঃ যদি তুমি উত্তমরূপে মেলামেশা করতে চাও, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুশীলন কর।

বন্ধু ও শত্রুর সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর। তাদেরকে হেয় করো না এবং নিজে ভীত হয়ো না। গাম্ভীর্য অবলম্বন কর– এতটুকু নয় যে, অহংকার হয়ে যায়। বিনয়ী হও– এতটুকু নয় যে, লাঞ্ছিত হয়ে যাও। সকল কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর। বাহুল্য ও স্বল্পতা সকল কাজেই নিন্দনীয়। নিজের দু'দিকে বার বার মুখ ফিরিয়ে দেখো না। যখন বস, সস্থিরে বস, যাতে মনে না হয় যে, তুমি প্রস্থানোদ্যত। অঙ্গুলি ফুটিয়ো না এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে খেলা করো না। নাকে অঙ্গুলি ঢুকিয়ো না। বার বার থুথু নিক্ষেপ করো না এবং বার বার নাক পরিষ্কার করো না। জনসমক্ষে অধিক হাই তুলো না, এমনকি, নামায এবং একাকিত্বেও। মজলিসে হৈ চৈ করো না। কথা লাগাতার ও সাজিয়ে বল, কেউ ভাল কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুন। মহিলাদের ন্যায় খুব সাজগোজ করো না এবং গোলামদের মতো নোংরা থেকো না। সুরমা ও তৈল অধিক ব্যবহার করো না। অত্যাচারীকে বীর বলো না। আপন স্ত্রী-পুত্রের কাছেও নিজের অর্থসম্পদের পরিমাণ ব্যক্ত করো না– অন্যদের তো কথাই নেই। কেননা, তাদের ধারণায় ধন-সম্পদ কম হলে তুমি তাদের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাবে; পক্ষান্তরে বেশী হলে তারা কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে না। তাদেরকে এতটুকু ভীতিগ্রস্ত করো না যাতে তোমার কাছেও না ঘেঁষে এবং এত সোহাগও করো না যাতে মাথায় চড়ে বসে। গোলাম ও চাকরদের সাথে হাসিঠাট্টা করো না। এতে তোমার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি বাদশাহ্ তোমাকে নৈকট্য দান করে তবে তার সাথে এমনভাবে থাক, যেন বর্শার ফলার উপর আছ। বাদশাহ তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকলে মনে করো না কোন সময় অপ্রসন্ন হবে না। তার পরিবর্তনকে ভয় করতে থাক। তার সাথে এমন কথাবার্তা বল, যা সে আশা করে। তাকে তোমার প্রতি কৃপাশীল দেখে তার স্ত্রী-পুত্র ও চাকরদের ব্যাপারে দখল দিয়ো না। কেননা, যে বাদশাহের পারিবারিক ব্যাপারে দখল দেয়, সে এমনভাবে ভূমিসাৎ হয়, যে কখনও উঠে দাঁড়াতে পারে না। সুসময়ের বন্ধু থেকে বেঁচে থাক। কেননা, সে শত্রুর চেয়ে ভয়ংকর।

কোন মজলিসে গেলে প্রথমে সালাম কর। যারা পূর্বে এসেছে, তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যেয়ো না; বরং যেখানে খালি জায়গা দেখ, সেখানে বসে পড়। বসার সময় যে নিকটে থাকে তাকে সালাম কর।

পথিমধ্যে প্রথমতঃ বসা উচিত নয়। যদি বস, তবে দৃষ্টি নত রাখ। মজলুমের সাহায্য কর এবং কেউ পথ ভুলে গেলে তাকে পথ বলে দাও। সালামের জওয়াব দাও। কেউ সওয়াল করলে তাকে কিছু দান কর। সৎ কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। থুথু ফেলার জন্যে জায়গা তালাশ কর। কেবলার দিকে এবং ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ করো না, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে নিক্ষেপ কর।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ মুসলমান ভাই ও প্রতিবেশীর হক

মানুষ সামাজিক জীব। অপরের সাথে মেলামেশা না করে একাকী জীবন ধারণ করা তার পক্ষে সুকঠিন। তাই মেলামেশার নিয়মনীতি শিক্ষা করা জরুরী। অপরের সাথে তার হক পরিমাণে আদব বজায় রাখা উচিত। আর হক হয়ে থাকে সম্পর্কের পরিমাণে। সম্পর্ক হয় আত্মীয়তার হবে, যা সবচেয়ে খাস; না হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হবে, যা সবচেয়ে ব্যাপক; না হয় প্রতিবেশিত্ব কিংবা সফর অথবা পাঠশালার সংসর্গের। এসব সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যেকটির অনেক স্তর রয়েছে। উদাহরণতঃ আত্মীয় মাহরাম (মহিলাদের এমন আত্মীয়, যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) হলে তার হক অধিক। মাহরামের চেয়েও অধিক হক পিতামাতার। অনুরূপভাবে প্রতিবেশীর হক গৃহের নিকটত্ব ও দূরত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। মুসলমান ভাইয়ের হকের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তার সাথে পরিচয় যত গভীর হবে, হকও তত বেশী হবে। উদাহরণতঃ যার সঙ্গে শুনে পরিচয় লাভ করা হয়, তার হকের তুলনায় সে ব্যক্তির হক বেশী হবে, যার সাথে মুখোমুখি পরিচয় আছে। পরিচয়ের পর মেলামেশার মাধ্যমে হক অধিক সুদৃঢ় হয়ে যায়। এমনিভাবে সংসর্গের স্তরও বিভিন্ন রূপ। উদাহরণতঃ পাঠশালার সংসর্গের হক সফরের সংসর্গের হকের তুলনায় অধিক জোরদার। বন্ধুত্বের অবস্থাও তদ্রূপ। বন্ধুত্ব শক্তিশালী হয়ে গেলে তা ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়। আরও বৃদ্ধি পেলে তা হয় মহব্বত এবং আরও সম্প্রসারিত হলে হয়ে যায় 'খুল্লত'। এ থেকে জানা গেল, খলীল হাবীবের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী। কেননা, হাবীব তাকে বলে যে অন্তরে স্থান করে নেয় এবং খলীল তাকে বলে যে শিরা-উপশিরায় গ্রথিত হয়ে যায়। অতএব যে খলীল হবে সে হাবীবও হবে। কিন্তু কেউ হাবীব হলে খলীলও হবে না। অভিজ্ঞতার আলোকে বন্ধুত্বের বিভিন্ন স্তর থাকা সুস্পষ্ট। খুল্লতকে আমরা ভ্রাতৃত্বের উপরে বলেছি। এর অর্থ, যে অবস্থাকে খুল্লত বলা হয় তা ভ্রাতৃত্বের অবস্থার তুলনায় পূর্ণাঙ্গতম। এটি আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ থেকে জানতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ولكن

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

صاحبكم خليل الله ـ

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে খলীল করতাম। কিন্তু আমি হলাম আল্লাহ তা'আলার খলীল। কেননা, খলীল তাকে বলা হয়, প্রিয়জনের মহব্বত যার অন্তরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুপ্রবেশ করে এবং সমগ্র অন্তরকে বেষ্টন করে নেয়। নবী করীম (সাঃ)-এর অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে খোদায়ী মহব্বত ছাড়া অন্য কোন মহব্বত বেষ্টন করেনি। তাই তাঁর খুল্লতে কারও অংশীদারিত্ব হতে পারেনি; অথচ তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে ভাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

يا على انت منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة ـ

অর্থাৎ, হে আলী, তুমি আমার কাছে এমন, যেমন মূসা (আঃ)-এর কাছে হারুন ছিলেন; তবে হারুন নবী ছিলেন, তুমি নবী নও; এই যা তফাৎ।

এখানে তিনি হযরত আলীর জন্যে নবুওয়ত অস্বীকার করেছেন, যেমন হযরত আবু বকরের জন্যে খুল্লত অস্বীকার করেছেন। সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ভ্রাতৃত্বে হযরত আলী মুর্তযার সাথে শরীক। তবে আত্মীয়তা ও খুল্লতের যোগ্যতা উভয়টি তাঁর অর্জিত ছিল, যা হযরত আলীর ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) একাধারে আল্লাহ তা'আলার খলীল ও হাবীব দুইই ছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি একদিন হর্ষোৎফুল্ল বদনে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীল পদে বরণ করেছেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে করেছিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার হাবীব এবং তাঁর খলীল। এ বক্তব্য থেকে জানা গেল, সম্পর্ক শুরু হয় পরিচয় থেকে। এর আগে কোন সম্পর্ক নেই এবং খুল্লতের পরে বন্ধুত্বের কোন স্তর নেই। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যেসব স্তর রয়েছে, সেগুলো মধ্যবর্তী স্তর। বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের হক ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহব্বত এবং খুল্লতের হকও এগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের স্তরে যে পরিমাণে পার্থক্য হয়, সে পরিমাণে এগুলোর হকের স্তরেও তফাৎ হয়ে থাকে। চূড়ান্ত হক হল প্রিয়জনকে নিজের প্রাণ ও ধন সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া; যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রাণ ও যাবতীয় ধনৈশ্বর্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) নিজের দেহকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে ঢাল করেছিলেন। এখন আমরা মুসলমান ভাই, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গোলাম চাকরদের হক চারটি বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করতে চাই।

মুসলমান ভাইয়ের হক ঃ মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম বলবে। আহ্বান করলে সাড়া দেবে। হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। পীড়িত হলে দেখতে যাবে। মরে গেলে জানাযায় হাযির হবে। তোমার ব্যাপারে কসম খেলে তার কসম বাস্তবায়িত করবে। উপদেশ চাইলে উত্তম উপদেশ দেবে। পশ্চাতে তাকে মন্দ বলবে না; তার জন্যে তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে পছন্দ করবে এবং তাই অশুভ মনে করবে যা নিজের জন্যে অশুভ মনে করবে। এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমানের হকসমূহের মধ্যে চারটি বিষয় তোমার জন্যে অপরিহার্য। এক, সৎকর্মীকে সাহায্য করা; দুই, যে পাপ করে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা; তিন, যে হতভাগা তার জন্যে দোয়া করা এবং চার, যে তওবা করে, তাকে মহব্বত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার উক্তি رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পরে অনুকম্পাশীল)– এর অর্থ, এই উম্মতের কোন অসৎ কর্মী ব্যক্তি কোন সৎ কর্মীকে দেখে এরূপ দোয়া করবে– ইলাহী, তুমি তাকে প্রদত্ত কল্যাণে বরকত দান কর, একে তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তার ফায়দা আমাকে দান কর। পক্ষান্তরে সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তিকে দেখে এরূপ দোয়া করবে– ইলাহী, তাকে হেদায়াত কর, তওবার তওফীক দাও এবং তার পাপ মার্জনা কর।

নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مثل المؤمنين فى ودهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا منه تداعى سائره بالحمى والسهر -

অর্থাৎ, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও কৃপার ক্ষেত্রে মুমিনরা এক দেহের মত। যখন দেহের কোন অংশ ব্যথাযুক্ত হয়, তখন সর্বাঙ্গে জ্বর ও অনিদ্রার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণ দেখা দেয়। হযরত আবু মূসার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে–

المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا .

অর্থাৎ, ঈমানদার ঈমানদারের জন্যে দালানের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে। মুসলমান ভাইয়ের একটি হক হচ্ছে তাকে কথা ও কাজের দ্বারা কষ্ট না দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

অর্থাৎ, সে-ই প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অন্য এক দীর্ঘ হাদীসে এরশাদ হয়েছে– তুমি যদি এসব কাজ করতে না পার, তবে এতটুকুই কর যে, মানুষের অনিষ্ট করো না। এটা হবে তোমার পক্ষ থেকে একটি সদকা। এক হাদীসে বলা হয়েছে– তোমরা কি জান মুসলমান কে? লোকেরা আরজ করল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। লোকেরা আরজ করল ঃ তা হলে মুমিন কে? তিনি বললেন ঃ যার তরফ থেকে অন্য মুমিনের জান ও মাল নিরাপদ থাকে। লোকেরা বলল ঃ মুহাজির কে? তিনি বললেন ঃ যে মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এবং তা থেকে বিরত থাকে। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ তোমার অন্তর যদি আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ হয় এবং তোমার হাত ও জিহ্বা থেকে যদি অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, তবে তাই ইসলাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ দোযখীদের উপর খোস-পাঁচড়া চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে অধিক চুলকানোর কারণে তাদের কারও অস্থি বেরিয়ে পড়বে এবং ত্বক ও মাংস উড়ে যাবে। তাকে কেউ নাম ধরে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে ঃ তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ? সে বলবে ঃ হাঁ, খুব কষ্ট পাচ্ছি। তখন বলা হবে,– তুমি যে মুমিনদেরকে জ্বালাতন করতে, এটা তারই শাস্তি। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে সানন্দে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। দুনিয়াতে সে পথ থেকে একটি বৃক্ষ কেটে দিয়েছিল, যা পথিকদের জন্যে কষ্টের কারণ ছিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন, যা পালন করে উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اعزل الاذى عن طريق المسلمين ۔ অর্থাৎ, মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে কেউ মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে একটি পুণ্য লেখবেন, যার ফলস্বরূপ তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। আরও বলা হয়েছে, মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কষ্টদায়ক দৃষ্টিতে ইশারা করা হালাল নয়। রবী ইবনে খায়সাম বলেন ঃ মানুষ দু'রকম। এক, ঈমানদার। তাকে কষ্ট দিয়ো না এবং দুই মূর্খ। তার সাথে মূর্খ হয়ো না।

মুসলমানের প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং অহংকার না করাও একটি হক। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ অর্থাৎ, আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিতকে পছন্দ করেন না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী করেছেন, কেউ যেন কারও সাথে গর্ব না করে। কেউ গর্ব করলে সহ্য করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ)-কে বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۔ অর্থাৎ, মার্জনা করুন, সৎ কাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايانف ولايتكبر ان يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى حاجته ۔

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্ব অহংকার করতেন না। তিনি বিধবা ও মিসকীনদের কাছে গিয়ে তাদের অভাব অনটন দূর করতেন।

এক মুসলমানের নিন্দা অন্য মুসলমানের কাছে না করা এবং একজনের কাছে যা শুনে তা অন্যের কাছে না পৌঁছানোও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لايدخل الجنة قتات অর্থাৎ, যে পরোক্ষে অপরের নিন্দা করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

খলীল ইবনে আহমদ বলেন ঃ যে তোমার কাছে অপরের নিন্দা বলবে, সে তোমার নিন্দা অপরের কাছে বলবে। আর যে তোমার কাছে অপরের খবর বলবে, সে তোমার খবরও অপরের কাছে বলবে।

আর একটি হক হল, পরিচিতজনের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তিন দিনের বেশী সাক্ষাৎ বর্জন করবে না। আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

لايحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث ملقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما يبدأ بالسلام ـ

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা কিংবা পরস্পর দেখা হলে একজনের এদিকে এবং অন্যজনের ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা জায়েয নয়। তাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

من اقال مسلما عشرته اقاله الله يوم القيامة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি মার্জনা করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

হযরত ইকরিমা বলেন– আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন ঃ তুমি তোমার ভাইদের অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছ, তাই আমি তোমার আলোচনা আলোচকদের মাঝে সমুন্নত করে দিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله ـ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্যে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সম্মান বিনষ্ট করা হলে তিনি সে জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মার্জনা করেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সম্মানই বৃদ্ধি করেছেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ما نقص مال من صدقة وما زاد الله رجلا بعفو الاعز او

ما من احدتواضع الله الا رفعه الله -

অর্থাৎ, সদকা করার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না। কেউ মার্জনা করলে আল্লাহ কেবল তার সম্মানই বৃদ্ধি করেন। যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চতাই দান করেন।

আর একটি হক হল, সম্ভব হলে সাধ্যমত সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা। এ ব্যাপারে কে অনুগ্রহের যোগ্য এবং কে অযোগ্য, তা দেখবে না। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের বংশ পরম্পরায় বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে অনুগ্রহের যোগ্য, তার প্রতিও অনুগ্রহ কর এবং যে যোগ্য নয়, তার প্রতিও অনুগ্রহ কর। কেননা, যার প্রতি অনুগ্রহ করবে, সে যদি যোগ্য না হয়, তবে তুমি তো অনুগ্রহ করার যোগ্য। একই সিলসিলা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে- ঈমানের পর বিবেকের চাহিদা হচ্ছে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হাত ধরে ফেললে যতক্ষণ সে নিজেই না ছাড়ত, তিনি নিজের হাত ছাড়াতেন না। তাঁর উরু সহচরদের উরু থেকে এগিয়ে আছে বলে মনে হত না। কেউ তাঁর সাথে কথা বললে তিনি তার দিকে মুখ ফেরিয়ে রাখতেন এবং যতক্ষণ কথা শেষ না হত, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাতেন না। আর একটি হক হল কোন মুসলমানের কাছে তার অনুমতি ছাড়া না যাওয়া। তিন বার অুনমতি চাওয়ার পর যদি অনুমতি দেয়, তবে ভাল। অন্যথায় ফিরে আসবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ অনুমতি তিন বার চাইতে হবে। প্রথমবার সে চুপ করে থাকবে। দ্বিতীয় বার প্রবেশ করার ব্যাপারে পরামর্শ করবে এবং তৃতীয়বার হয় অনুমতি দেবে, না হয় ফিরে যেতে বলবে।

আর একটি হক হচ্ছে, সকল মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করবে এবং প্রত্যেকের সাথে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে। মূর্খের সাথে জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বললে নিজেও কষ্ট পাবে এবং অপরকেও কষ্ট দেবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করাও একটি হক। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا .

অর্থাৎ, সে আমার দলভুক্ত নয়, যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না। ছোটদেরকে স্নেহ করা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রীতি । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- বয়োবৃদ্ধ মুসলমানের সম্মান করা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শামিল। বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করার পরিশিষ্ট হল, অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের সামনে কথা না বলা। সেমতে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন- জোহায়নিয়া গোত্রের এক কাফেলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তাদের মধ্যে থেকে একটি বালক কথা বলার জন্যে দণ্ডায়মান হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ থাম। বয়স্ক লোক কোথায়? সে কথা বলুক। এক হাদীসে বলা হয়েছে- যে যুবক কোন বৃদ্ধের সম্মান করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে বৃদ্ধের বয়স পর্যন্ত পৌছার পর কাউকে ঠিক করে দেন, যে তার সম্মান করে। এতে দীর্ঘ জীবন লাভের সুসংবাদ রয়েছে এবং এতে জানা যায়, বৃদ্ধের সম্মান করার তওফীক সে-ই পায়, আল্লাহ্ তাআলা যার জন্যে দীর্ঘ জীবন লেখে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফর থেকে এলে শিশুরা তাঁর সাথে দেখা করতে যেত। তিনি তাদের কাছে অবস্থান করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, শিশুদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারা কাছে এলে তিনি সওয়ারীতে কাউকে আগে এবং কাউকে পেছনে বসিয়ে নিতেন। এর পর সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন- তোমরাও শিশুদেরকে সওয়ারীতে তুলে নাও। পরে শিশুরা এ নিয়ে গর্ব করত এবং একে অপরকে বলত ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওয়ারীতে নিজের সামনে বসিয়েছেন এবং তোকে পেছনে। দোয়া, বরকত ও নাম রাখার জন্যে যে সকল শিশুকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আনা হত, তিনি তাদেরকে নিজের কোলে শুইয়ে দিতেন। প্রায়ই সেসব শিশু তাঁর গায়ে পেশাব করে দিত। কেউ শিশুকে ভয় দেখালে তিনি বলতেন- শিশুর পেশাব বন্ধ করো না; তাকে পেশাব করতে দাও। অবশেষে শিশু পূর্ণরূপে পেশাব করে নিত। অতঃপর তিনি দোয়া করতেন এবং তার নাম রাখতেন। এতে শিশুর পরিবারের লোকেরা আনন্দিত হত এবং এমন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধারণা করত না যে, শিশুর পেশাবের কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট পেয়েছেন। তারা শিশুকে নিয়ে চলে গেলে তিনি পেশাব ধুয়ে নিতেন।

সকলের সাথে হাসি-খুশী থাকা এবং নম্র কথা বলাও একটি হক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা কি জান দোযখ কার জন্যে হারাম? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ তার জন্যে হারাম, যে নম্র, ভদ্র ও মিশুক। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সদা প্রফুল্ল ব্যক্তিকে ভালবাসেন। জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে। তিনি বললেন ঃ সালাম দেয়া ও সুন্দর কথা বলা মাগফেরাতের অন্যতম কারণ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة -

অর্থাৎ, তোমরা একখণ্ড শুষ্ক খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তাও না পাও তবে পবিত্র কথাবার্তা দিয়ে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ জান্নাতের কয়েকটি বাতায়ন আছে, তা দ্বারা বাইরের বস্তু ভিতর থেকে এবং ভিতরের বস্তু বাইরে থেকে দেখা যায়। জনৈক বেদুঈন আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এগুলো কাদের জন্যে? তিনি বললেন ঃ যে ভালরূপে কথা বলে, নিরন্নকে অন্ন দেয় এবং রাতের বেলায় তখন নামায পড়ে, যখন মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন— আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, ওয়াদা পূর্ণ করবে, আমানত আদায় করবে, সত্যবাদিতা অবলম্বন করবে, প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এতীমের প্রতি দয়া করবে, সালাম করবে এবং বিনয়ী হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক মহিলা পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে বলল ঃ আমি কিছু আরজ করতে চাই। তাঁর সঙ্গে তখন কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ তুমি গলির যেদিকে ইচ্ছা বসে যাও। আমি কাছে বসে তোমার কথা শুনে নেব। মহিলা তাই করল। তিনি কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনলেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সত্তর বছর রোযা রাখল। সে প্রতি সপ্তম দিনে ইফতার করত। সে আল্লাহ তাআলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছে প্রার্থনা করল ঃ ইলাহী, আমাকে দেখাও, শয়তান কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে? অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন তার প্রার্থনা কবুল হল না, তখন সে বলল ঃ আমার ও আমার পালনকর্তার ব্যাপারে যে অন্যায় আমি করেছি, তা জানতে পারলে সেটা আমার এই প্রার্থনার চেয়ে উত্তম হত। তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা বলল ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমার এ উক্তিটি আমার কাছে তোমার অতীত এবাদতের তুলনায় উত্তম। আল্লাহ তোমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন। এখন দেখে নাও। সে দেখল, মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যার চারপাশে শয়তানরা মাছির মত ভন্ ভন্ করছে না। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, এই শয়তানদের থেকে কে বেঁচে থাকে? এরশাদ হল ঃ পরহেযগার এবং নম্র ব্যক্তি।

মুসলমানের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ওয়াদা একটি দান। তিনি আরও বলেন ঃ ওয়াদা একটি ঋণ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ثلاث فى المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان

অর্থাৎ, মোনাফেকের মধ্যে তিনটি অভ্যাস রয়েছে– সে যখনই কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখনই ওয়াদা করে, খেলাফ করে এবং যখনই আমানত প্রাপ্ত হয়, খেয়ানত করে। অন্য এক হাদীসে আছে–

ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام اذا حدث كذب الخ

অর্থাৎ, তিনটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে মোনাফেক, যদিও নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। যখনই সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ------ ।

আর একটি হক রয়েছে। তা হল, তুমি মুসলমান ভাইয়ের সাথে সে কাজই করবে, যে কাজ তুমি মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমার জন্য কামনা কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি অভ্যাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বান্দার ঈমান পূর্ণ হয় না। প্রথম, দারিদ্র্য সত্ত্বেও আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পথে ব্যয় করা। দ্বিতীয়, আপন নফসের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। তৃতীয়, সালাম করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যে ব্যক্তি দোযখ থেকে দূরে থাকা এবং জান্নাতে দাখিল হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কলেমার সাক্ষ্য দেয় এবং মানুষের সাথে এমন কাজ করে, যে কাজ মানুষ তার সাথে করাটা সে আশা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ সহচরদের সাথে উত্তমরূপে উঠাবসা কর, তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে। মানুষের জন্যে তাই পছন্দ কর যা নিজের জন্যে পছন্দ কর তা হলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে, চারটি কাজ কর, যা তোমার জন্যে এবং তোমার সন্তানদের জন্যে সকল কাজের মূল। তন্মধ্যে একটি বিশেষভাবে আমার জন্যে, একটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, একটি আমার ও তোমার জন্যে অভিন্ন এবং একটি তোমার ও মানুষের জন্যে অভিন্ন। যে কাজটি বিশেষভাবে আমার জন্যে, তা হচ্ছে, তুমি আমার এবাদত করবে এবং কাউকে আমার শরীক সাব্যস্ত করবে না। যে কাজটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, তা হচ্ছে, তোমার আমল, যার প্রতিদান আমি তোমাকে গুরুতর প্রয়োজনের সময় দেবে। যে কাজটি তোমার ও আমার জন্যে অভিন্ন, তা হচ্ছে, তুমি দোয়া করবে, আর আমি তা কবুল করব। যে কাজটি তোমার ও মানুষের জন্যে অভিন্ন, তা হল, তুমি তাদের সাথে এমন কাজ করবে, যা তারা তোমার সাথে করুক বলে তুমি আশা কর। হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করলেন ঃ ইলাহী, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ কে? আল্লাহ বললেন ঃ যে মানুষের বিনিময় নিজের কাছ থেকে নেয়।

আর একটি হক হল, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আকার আকৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাবান প্রতিভাত হয়, তুমি তার বেশী সম্মান করবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে। বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এক সফরে এক মনযিলে অবতরণ করলেন। এমন সময় জনৈক ভিক্ষুক উপস্থিত হল। তিনি খাদেমকে বললেন ঃ এই মিসকীনকে একটি রুটি দিয়ে দাও। এর পর জনৈক অশ্বারোহী আগমন করল। তিনি খাদেমকে বললেন ঃ তাকে ডাক এবং খানা খাইয়ে দাও। লোকেরা আরজ করল ঃ মিসকীনকে তো আপনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একটি রুটি দিয়ে বিদায় করলেন আর এই অশ্বারোহীকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। এটা কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে মর্যাদা সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরও উচিত তাদেরকে সেই মর্যাদায় রাখা। মিসকীন লোকটি রুটি পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই ধনী ব্যক্তিকে একটি রুটি দিয়ে দেয়া আমি সমীচীন মনে করিনি। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার এক কক্ষে তশরীফ নিয়ে গেলে সাহাবায়ে কেরাম এত অধিক সংখ্যায় সেখানে জমায়েত হলেন যে, কক্ষে তিল ধারণের জায়গাও রইল না। এর পর জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী সেখানে এলেন। তিনি ভিতরে জায়গা নেই দেখে দহলিজে বসে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র চাদরটি তার কাছে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন ঃ চাদরে বসে পড়। জরীর চাদরটি হাতে নিয়ে চোখে লাগালেন এবং চুম্বন করে অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর চাদরটি ভাঁজ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ হুযুর, আপনার পবিত্র কাপড়ের উপর বসার যোগ্য আমি নই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইযযত দিন, যেমন আপনি আমাকে ইযযত দিয়েছেন। এর পর রসূলে আকরাম (সাঃ) ডানে বামে চোখ বুলিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের নেতা আগমন করলে তোমরা তার সম্মান করো। অনুরূপভাবে কারও উপর কারও পুরাতন হক থাকলে তার সম্মান করাও জরুরী। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ধাত্রী মাতা হালিমা তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি তাঁর জন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দেন এবং বলেন ঃ মা, আমার কাছে এসে খুব ভাল করেছেন। এর পর তাকে চাদরে বসিয়ে বললেন ঃ সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ কবুল করব। যা চাইবেন তাই দেব। হালিমা বললেন ঃ আমি আমার সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য সুপারিশ করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার ও বনী হাশেমের অংশে যে পরিমাণ লোক পড়বে, আমি তাদেরকে আপনার হাতে সমর্পণ করব। এর পর চতুর্দিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের আওয়ায উঠল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমরাও আমাদের অংশ তাঁকে দিলাম। রসূলে করীম (সাঃ) হালিমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন। তাঁকে একটি খাদেম দিলেন এবং খায়বর থেকে প্রাপ্ত নিজের অংশের সম্পদ তাঁকে দান করলেন, যা হযরত ওসমান (রাঃ) এক লাখ দেরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিনে নেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর এক হক হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আপোষ করে দেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলব না, যা নামায রোযা ও দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ অবশ্যই বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, পরস্পর সন্ধি স্থাপন করা পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করা ধর্মের জন্য মারাত্মক। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

افضل الصدقة اصلاح ذات البين অর্থাৎ, পারস্পরিক সমঝোতা স্থাপন করাই হল সর্বোত্তম সদকা।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার রসূলে করীম (সাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় এত হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ল। তা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক– আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি রব্বুল ইযযত আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসল। তাদের একজন আরজ করল, ইয়া রব, আমার হক তার কাছ থেকে দিইয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা অপর ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমার ভাইয়ের হক দিয়ে দাও। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমার পুণ্য থেকে কিছুই বাকী নেই যা আমি তাকে দেব। আল্লাহ তাআলা বাদীকে বললেন ঃ এখন তুমি কি করবে? তার কাছে তো কোন পুণ্যই অবশিষ্ট নেই। সে আরজ করল ঃ আমার কিছু গোনাহ তাকে দেয়া হোক। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ এটা বড় কঠিন দিন। এদিনে একজনের গোনাহ অন্য জনকে দেয়ারও প্রয়োজন হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা বাদীকে বললেন ঃ চোখ তুলে জান্নাতের দিকে তাকাও। সে তাকিয়ে বলতে লাগল ঃ ইয়া রব, আমার মনে হয় সেখানে মণিমুক্তা খচিত রৌপ্যের শহর ও স্বর্ণের প্রাসাদ রয়েছে। এটা কোন নবী, সিদ্দীক অথবা শহীদের জন্যে? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ যে এগুলোর দাম দেবে এগুলো তারই জন্যে। সে আরজ করল ঃ পরওয়ারদেগার, এগুলোর দাম কার কাছে আছে? এরশাদ হল ঃ তোমার কাছে। সে আরজ করল ঃ সেটা কি? আল্লাহ বললেন ঃ মুসলমান ভাইকে ক্ষমা করা। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমি ক্ষমা করলাম। আল্লাহ বললেন ঃ তা হলে উঠ নিজের ভাইয়ের হাত ধরে তাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জান্নাতে দাখিল কর। এর পর রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। পরস্পর সমঝোতা করতে থাক। কেননা, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন মুমিনদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করবেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خير اونمى خيرا

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে দুই ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে এবং ভাল কথা বলে অথবা সমঝোতার উদ্দেশে কোন ভাল খবর এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়।

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা ওয়াজিব। কেননা, মিথ্যা বর্জন করা ওয়াজিব। কোন ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত তরক করা যায় না, যে পর্যন্ত অধিক জোরদার ওয়াজিব যিম্মায় না চেপে যায়। অতএব দু'ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনকারী যখন মিথ্যাবাদী নয় তখন পারস্পরিক সমঝোতা মিথ্যা বর্জন অপেক্ষা অধিক জোরদার ওয়াজিব হল। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

كل الكذب مكتوب الا ان يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب خدعة او يكذب بين الاثنين فيصلح بينهما او يكذب لامراته ليرضيها ـ

অর্থাৎ, প্রত্যেক মিথ্যা লিখিত হয়; কিন্তু তিন প্রকার লিখিত হয় না। প্রথম, যুদ্ধে মিথ্যা বললে। কেননা, যুদ্ধ মানেই চালাকী। দ্বিতীয়, দু'ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের উদ্দেশে মিথ্যা বললে এবং তৃতীয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মিথ্যা বললে।

সকল মুসলমানের দোষ গোপন করাও একটি হক। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من ستر على مسلم ستره الله تعالى فى الدنيا والاخرة ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ গোপন করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরও বলা হয়েছে– যে বান্দা অপরের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ দেখেও গোপন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবী মায়েয তাঁর ব্যভিচারের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, তিনি বললেন ঃ তুমি যদি একে কাপড়ের নীচে আবৃত করে নিতে, তবে এটা তোমার জন্যে ভাল হত। এথেকে জানা যায়, নিজের দোষ গোপন রাখাও মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। কেননা, নিজের মুসলমানীর হক তার উপর তেমনি জরুরী, যেমন অন্যের মুসলমানীর হক জরুরী। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমি কোন মদ্যপায়ীকে পাকড়াও করলে আমার কাছে এটাই ভাল মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখুন। কোন চোরকে পাকড়াও করলেও আমার কাছে তাই ভাল মনে হয়। হযরত ওমর (রাঃ) এক রাতে মদীনায় টহল দানকালে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে যিনা করতে দেখলেন। তিনি সকালে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ ধরে নাও যদি কোন খলীফা কোন পুরুষ ও নারীকে যিনা করতে দেখে এবং তাদের উপর "হদ" (যিনার শাস্তি) জারি করে, তবে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বললেন ঃ আপনি খলীফা। আপনার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বললেন, হদ জারি করা আপনার জন্যে জায়েয নয়। জারি করলে আপনার উপর হদ কায়েম করা হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা যিনার হদ জারির জন্যে অন্ততপক্ষে চার জন সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপরিহার্য করেছেন। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) কয়েকদিন চুপ থেকে আবার সেই প্রশ্ন তুললেন। সকলে প্রথম অভিমতই ব্যক্ত করলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাই বললেন যা প্রথমে বলেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, খোদায়ী শাস্তিসমূহের ব্যাপারে খলীফা নিজের জ্ঞান অনুসারে রায় দিতে পারেন কিনা, এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) সন্দিহান ছিলেন। তাই তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে নেয়ার পর্যায়ে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। এ কথা বলেননি যে, আমি এরূপ দেখেছি। কারণ, এটা তার জন্যে নাজায়েয হওয়ার আশংকা ছিল। শরীয়তে দোষ গোপন করাই যে কাম্য, এর জন্যে এ ঘটনাটি একটি বড় প্রমাণ। কেননা, সকল দোষের মধ্যে জঘন্যতম দোষ হচ্ছে যিনা। এর প্রমাণ চার জন সাক্ষীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে, যারা পুরুষাঙ্গকে নারী যৌনাঙ্গের ভিতরে এমনভাবে দেখবে, যেমন সুরমাদানির ভিতরে শলাকা থাকে। চার জন লোকের এভাবে দেখা কখনও হয় না। যদি বিচারক নিজে সত্যি সত্যি এটা জেনেও নেয়, তবুও তা ফাঁস করা তার জন্যে বৈধ নয়। এখন এক দিকে যিনা দমন করা রহস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, এর শাস্তি রাখা হয়েছে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এটা নিঃসন্দেহে সর্ববৃহৎ শাস্তি। অপর দিকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দোষ গোপন করার নির্দেশের বিষয়টিও চিন্তা কর। তিনি গোনাহগার মানুষের উপর কেমন পুরু পর্দা ফেলে দিয়েছেন। ফলে যিনার অবস্থা ফাঁস হওয়ার পথ সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা আশা করি, কেয়ামতের দিন এই বিরাট কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার দোষ দুনিয়াতে গোপন করে, তখন তাঁর কৃপার পক্ষে এটা কিরূপে সম্ভব যে, কেয়ামতে তা ফাঁস করে দেবেন? আর যদি তিনি দুনিয়াতে ফাঁস করে দেন, তবে পরকালে পুনরায় ফাঁস না করার ব্যাপারে অধিক কৃপাশীল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় টহল দিচ্ছিলাম। আমরা একটি প্রদীপ দেখতে পেয়ে সেদিকে চললাম। কাছে পৌঁছে দেখি একটি রুদ্ধদ্বার গৃহের অভ্যন্তরে লোকজন হৈ চৈ করছে। হযরত ওমর আমার হাত ধরে বললেন ঃ এ গৃহ কার জান? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এটা রবিয়া ইবনে উমাইয়ার গৃহ। এরা এখন মদ্যপানে মত্ত। তুমি কি বল, এদেরকে গ্রেফতার করব? আমি বললাম ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ করেছি। আল্লাহ বলেছেন ঃ ولا تجسسوا, অর্থাৎ, গোপন বিষয় তালাশ করে ফিরো না। অতঃপর আমি হযরত ওমরকে তেমনি রেখে চলে এলাম। এ থেকে জানা যায়, দোষ গোপন করা এবং তার পেছনে না পড়া ওয়াজিব। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ যদি তুমি মানুষের দোষের পেছনে পড়, তবে তারা বিগড়ে যাবে অথবা বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তারা শুন, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষের পেছনে পড়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলমান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভাইয়ের দোষের পেছনে পড়ে আল্লাহ তাআলা তার দোষের পেছনে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা যার দোষের পেছনে পড়েন, তাকে লাঞ্ছিত করে দেন, যদিও সে নিজের গৃহের অভ্যন্তরে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি কোন ব্যক্তিকে খোদায়ী শাস্তি পাওয়ার মত অপরাধে লিপ্ত দেখি, তবে তাকে গ্রেফতার করব না এবং কাউকে ডাকব না যে পর্যন্ত না আমার সাথে অন্য কেউ থাকে। অর্থাৎ, দু'জন সাক্ষী থাকলে অবশ্য সে ব্যক্তি গ্রেফতারের যোগ্য হয়ে যাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে ধরে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ এ লোকটি মাতাল। তিনি বললেন ঃ এর ঘ্রাণ লও। ঘ্রাণ লওয়ার পর জানা গেল সে বাস্তবিকই মদ্যপান করেছে। তিনি লোকটিকে মাতলামি দূর হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখলেন। অতঃপর জল্লাদকে বললেন ঃ একে হাত উঁচু করে শরীরের বিভিন্ন অংশে বেত্রাঘাত কর। জল্লাদ আদেশ পালন করল। এর পর যে ব্যক্তি অপরাধীকে নিয়ে এসেছিল, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি অপরাধীর কি হও? সে বলল ঃ আমি তার চাচা। হযরত ইবনে মসঊদ বললেন ঃ তুমি উত্তমরূপে তার শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্র গঠন করনি এবং তার দোষ গোপন করনি। এতদূর পৌঁছে যাওয়ার পর দন্ডবিধান করা শাসকের কর্তব্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন- وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে।

এর পর হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ আমার মনে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বপ্রথম কোন্ চোরের হাত কেটেছিলেন। জনৈক চোরকে তাঁর খেদমতে হাযির করা হলে তিনি তার হস্ত কর্তন করলেন। কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল মলিন হয়ে গেল। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, মনে হয় আপনি এর হস্ত কর্তন খারাপ মনে করেছেন? তিনি বললেন ঃ খারাপ মনে না করার কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। লোকেরা আরজ করল ঃ তা হলে আপনি একে মাফ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ এতদূর পৌঁছে গেলে দন্ড জারি করা বিচারকের কর্তব্য । আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ, তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হস্ত কর্তন করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল এমন বিবর্ণ হল যেন তাতে ছাই পড়ে গেছে। বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) যখন এক রাতে মদীনায় টহল দিচ্ছিলেন, তখন এক গৃহ থেকে একজন পুরুষের গানের আওয়াজ শুনলেন। তিনি প্রাচীরে আরোহণ করে দেখলেন, পুরুষটির কাছে একজন মহিলা ও মদের পাত্র রক্ষিত রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র দুশমন, তুই কি মনে করিস আল্লাহ্ তোর দোষ গোপন করবেন, আর তুই তার নাফরমানী করে যাবি? সে আরজ করল ঃ আমিরুল মুমিনীন, আপনি তড়িঘড়ি করবেন না। আমি আল্লাহ্ তা'আলার একটি আদেশ লঙ্ঘন করেছি ; কিন্তু আপনি তিনটি বিষয়ে তাঁর নাফরমানী করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوْا (তোমরা দোষ অনুসন্ধান করো না।) অথচ আপনি তাই করছেন। তিনি বলেছেন ঃ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا (ছাদের উপর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা সৎকর্ম নয়।) আপনি প্রাচীর টপকে আমার কাছে এসেছেন । আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا -

অর্থাৎ, নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশে করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর; অর্থাৎ, অনুমতি গ্রহণ না কর। আপনি অনুমতি ও সালাম ব্যতিরেকেই আমার গৃহে চলে এসেছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি তোকে ছেড়ে দেই, তবে ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবি কিনা? সে বলল ঃ আমিরুল মুমিনীন, আমাকে ক্ষমা করলে আমি জীবনে কখনও এ কাজ করব না। অতঃপর তিনি তাকে তদবস্থায় রেখে ফিরে এলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের কানে কানে কথা বলবেন– এ সম্পর্কে আপনি রসূল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে কি শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে কাছে ডাকবেন এবং তাহাদের উপর নিজ রহমতের ছায়া বিস্তার করে মানুষের কাছ থেকে তাদেরকে গোপন করে নেবেন। এর পর বলবেন ঃ তোমার অমুক গোনাহ মনে আছে কি? বান্দা আরজ করবে, ইয়া রব, মনে আছে। এভাবে যখন আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে তার সকল গোনাহের স্বীকারোক্তি নিয়ে নেবেন এবং বান্দা নিজেকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করবে, তখন এরশাদ করবেন ঃ হে আমার বান্দা, আমি দুনিয়াতে তোমার দোষ গোপন করেছিলাম, যাতে আজ তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। এর পর বান্দার হাতে তার পুণ্যের তালিকা দেয়া হবে। কাফের ও মোনাফেকদের অবস্থা হবে, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরা বলবে– এরাই নিজের পালনকর্তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

এক হাদীসে আছে– كل امتى معا فى الا المجاهرون

অর্থাৎ, আমার সকল উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে; কিন্তু প্রকাশ্যে গোনাহকারীরা হবে না। সে ব্যক্তিও প্রকাশ্যে গোনাহকারী গণ্য হবে, যে গোপনে গোনাহ করার পর মানুষকে তা জানিয়ে দেয়। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

من استمع ستر قوم وهم له كارهون صب فى اذنيه الانك يوم القيامة ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোপন ভেদ শুনে এবং তারা সেটা অপছন্দ করে, কেয়ামতের দিন তার কানে রাঙ্গতা গালিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর একটি হক হল, অপবাদের জায়গা থেকে দূরে থাকতে হবে, যাতে মুসলমানদের মন তোমার প্রতি কুধারণা থেকে এবং তাদের জিহ্বা তোমার গীবত থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, তারা তোমাকে মন্দ বলে যদি আল্লাহর নাফরমানী করে এবং এ নাফরমানীর কারণ তুমিই হও তবে তুমিও এতে অংশীদার হবে। সেমতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

অর্থাৎ, কাফেররা যে সকল প্রতিমার পূজা করে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। তা হলে কাফেররা না বুঝে ধৃষ্টতা সহকারে আল্লাহকে গাল মন্দ করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেয়, তোমাদের মতে সে কেমন? লোকেরা আরজ করল ঃ কোন ব্যক্তি কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? এটা কি সম্ভব? তিনি বললেন ঃ হাঁ, গালি দেয়, তা এভাবে যে, সে অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয়, জওয়াবে সে তার পিতামাতাকে গালি দেয়। ফলে সে যেন নিজেই নিজের পিতামাতাকে গালি দিল।

সারকথা, গোনাহের কারণ হওয়া নিজে গোনাহ করার মতই। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার তাঁর কোন পত্নীর সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে চলে গেল। তিনি লোকটিকে ডাকিয়ে এনে বললেন ঃ সে আমার স্ত্রী সফিয়্যা। লোকটি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি অন্যের বেলায় ধারণা করলেও আপনারা বেলায় ধারণা করতাম না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের জায়গা দিয়ে চলে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে- রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফে ছিলেন। দু'ব্যক্তি সেখান দিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ জেনে রাখ, সে আমার স্ত্রী সফিয়্যা। আমার আশংকা হল, শয়তান না তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে অপবাদের জায়গায় দাঁড় করায়, এর পর তার প্রতি কেউ কুধারণা করে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিরস্কার না করে। কেননা, সে এরূপ না করেলে কেউ তার প্রতি কুধারণা করত না। হযরত ওমর এক ব্যক্তিকে পথিমধ্যে কোন এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে তাকে দোররা মারতে লাগলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমিরুল মুমিনীন, সে আমার স্ত্রী । তিনি বললেন ঃ তা হলে এমন জায়গায় কথা বললে না কেন, যেখানে কেউ তোমাকে দেখবে না?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর একটি হক হচ্ছে, কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে যদি তোমার কদর মর্যাদা থাকে, তবে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রয়োজন হলে তার কাছে সুপারিশ করবে। এতে তুমিও সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ মানুষ আমার কাছে এসে তাদের বিভিন্ন অভাব-অনটন ব্যক্ত করে। তোমরা আমার কাছেই থাক। অতএব সুপারিশ কর; সওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর হাতে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন। হযরত মোয়াবিয়ার রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে সুপারিশ কর, যাতে সওয়াব পাও। এক হাদীসে আছে– মুখের সদকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সদকা নেই। কেউ প্রশ্ন করল, মুখের সদকা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ সুপারিশ দ্বারা। এর কারণে রক্ত সংরক্ষিত হয়, অপরের উপকার হয় এবং তার উপর থেকে বিপদ কেটে যায়। হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, বরীরার স্বামী ছিল মুগীস নামক জনৈক গোলাম। মুগীসের চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সে বরীরার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, মুগীস বরীরাকে এত ভালবাসে; অথচ বরীরা তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। অতঃপর তিনি বরীরাকে বললেন ঃ চমৎকার হত যদি তুমি তার কাছে ফিরে যেতে। সে-তো তোমার সন্তানের পিতা। বরীরা আরজ করল ঃ যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি তাই করব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আদেশ করি না; বরং সুপারিশ করি। সালাম করা এবং মোসাফাহা করাও একটি হক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা শুরু করে, তার কথার জওয়াব দিয়ো না যে পর্যন্ত না সে সালাম করে। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম না করেই অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সরে যাও এবং বল– আসসালামু আলাইকুম, আমার ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি? হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন নিজের ঘরে যাও, তখন ঘরের লোকদেরকে সালাম কর। কেননা, যে এরূপ করে, তার ঘরে শয়তান আসে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি আট বছর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস, ওযু পূর্ণ কর। এতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। আমার উম্মতের মধ্যে যার সাথে দেখা হয় তাকে সালাম কর। এতে তোমার পুণ্য বৃদ্ধি পাবে। যখন তুমি নিজ গৃহে প্রবেশ কর, তখন গৃহের লোকদের সালাম কর। এতে তোমার গৃহে বরকত বুদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ۔

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয়, তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম সালাম কর অথবা উল্টে তাই বল। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

والذى نفسى بيده لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا ادلكم على عمل اذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم ۔

অর্থাৎ, সে আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে দাখিল হবে না যে পর্যন্ত মুমিন না হবে এবং তোমরা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত একে অপরকে মহব্বত না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল বলে দেব না, যা পালন করলে তোমরা একে অপরকে মহব্বত করবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ বলে দিন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের খুব চর্চা কর।

আরও বলা হয়েছে– যখন মুসলমান অপরকে সালাম করে, তখন ফেরেশতা তার প্রতি সত্তর বার রহমত প্রেরণ করে। আরও বলা হয়েছে, যখন মুসলমান অপর মুসলমানের কাছ দিয়ে চলে যায় এবং সালাম করে না, তখন ফেরেশতারা বিস্মিত হয়। আরও বলা হয়েছে–

يسلم الراكب على الماشى واذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم ۔

অর্থাৎ সওয়ার ব্যক্তি যে পায়ে হাঁটে তাকে সালাম করবে। অনেক লোকের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে সাক্ষাতের উপঢৌকন ছিল সেজদা। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সালাম দান করেছেন, যা জান্নাতীদের উপঢৌকন। আবু মুসলিম খাওলানী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রহঃ) লোকজনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম করতেন না। তিনি বলতেন ঃ সালাম না করার কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, আমি আশংকা করি, লোকজন আমার সালামের জওয়াব দেবে না। ফলে ফেরেশতারা তাদের প্রতি লানত করবে। সালামের সাথে মুসাফাহা করাও সুন্নত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ "আসসালামু আলাইকুম"। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তির জন্যে দশটি পুণ্য। এর পর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।' তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি বিশটি পুণ্য পাবে। এর পর আর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি পাবে ত্রিশটি নেকী। হযরত আনাস (রাঃ) শিশুদের কাছ দিয়ে গেলে তাদেরকে সালাম করতেন এবং বলতেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) এরূপ করেছেন। আবদুল হামিদ ইবনে বাহরাম (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মসজিদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে একদল মহিলা বসে ছিল। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম করলেন। বর্ণনাকারী আবদুল হামিদও হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হাতে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم فى الطريق فاضطروهم الى اضيقه ـ

অর্থাৎ, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে প্রথমে সালাম করো না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لاتصافحوا اهل الذمة ولا ابتدأ وهم بالسلام فاذا لقيتموهم فى الطريق فاضطروهم الى اضيقه ـ

অর্থাৎ, যিম্মীদের সাথে মোসাফাহা করো না এবং তাদেরকে প্রথমে সালাম করো না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য কর।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদল ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ 'আসসামু আলাইকা' (আপনি নিপাত যান)।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "আলাইকুম" (তোমরা)। হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমি বললাম, "বাল আলাইকুম ওয়াল্লানাতু" (বরং তোরা নিপাত যা এবং তোদের প্রতি লানত)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ তা'আলা নম্রতা পছন্দ করেন। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি শুনেননি এরা কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ আমিও তো "আলাইকুম" বলে দিয়েছি। এক হাদীসে আছে–

يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير .

অর্থাৎ, সওয়ার ব্যক্তি যে পায়ে হাঁটে তাকে সালাম করবে। যে পায়ে হাঁটে সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে। অল্পসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম করবে। আরও বলা হয়েছে– তোমাদের কেউ কোন মজলিসে এলে সালাম করা উচিত। ইচ্ছা হলে মজলিসে বসবে। এর পর দাঁড়ালে সালাম করবে। কেননা, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের তুলনায় অধিক আইনসিদ্ধ নয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন দুই ঈমানদার পরস্পর মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে, তখন তাদের মধ্যে সত্তরটি রহমত বন্টন করা হয়। তাদের মধ্যে যে অধিক হাসিমুখ, সে ঊনসত্তরটি পায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে একশ'টি রহমত বন্টন করা হয়। যে প্রথমে সালাম করে, তার ভাগে পড়ে নব্বইটি এবং অপর ব্যক্তি পায় দশটি। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ মোসাফাহা বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের পারস্পরিক সালামের পরিশিষ্ট হচ্ছে মোসাফাহা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– মুসলমানকে চুম্বন করা নিজ ভাইয়ের সাথে মোসাফাহার শামিল। বরকত হাসিল করা ও সম্মান করার উদ্দেশে বুযুর্গ ব্যক্তির হাত চুম্বন করায় কোন দোষ নেই। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হস্ত চুম্বন করেছি। কা'ব ইবনে মালেক বলেন ঃ যখন আমার তওবা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, তখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁর হস্ত চুম্বন করি। একবার জনৈক বেদুঈন আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে আপনার মস্তক ও হস্ত চুম্বন করার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন এবং বেদুঈন তাঁর মস্তক ও হস্ত চুম্বন করল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে মোসাফাহা করেন, হস্ত চুম্বন করেন, অতঃপর উভয়েই সজোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। হযরত বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ) ওযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। এর পর ওযু শেষ করে সালামের জওয়াব দিলেন এবং হাত বাড়িয়ে মোসাফাহা করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি জানতাম মোসাফাহা করা অনারবদের অভ্যাস। তিনি বলেন ঃ দুই মুসলমান যখন মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে, তখন উভয়ের গোনাহ ঝরে পড়ে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন ব্যক্তি লোকজনের কাছ দিয়ে যায় এবং তাদেরকে সালাম করে, যদি তারা তার সালামের জওয়াব দেয়, তবে তার মর্যাদা লোকজনের উপর এক স্তর উন্নত হবে। কারণ সে তাদেরকে সালাম মনে করিয়ে দিয়েছে। আর যদি তারা সালামের জওয়াব না দেয়, তবে তাদের চেয়ে উত্তম একটি দল অর্থাৎ, ফেরেশতারা তার সালামের জওয়াব দেবে। সালাম করার সময় মাথা নত করা নিষেধ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাদের একজন অন্য জনের সামনে নত হবে কি না? তিনি বললেন ঃ না। আমরা বললাম ঃ একজন অন্যজনকে চুম্বন করবে কি না? তিনি বললেন, হাঁ। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যখনই সাক্ষাৎ করেছি, তখনই তিনি মোসাফাহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে তালাশ করলেন। আমি ঘরে ছিলাম না। যখন জানলাম, তখন তিনি তখতের উপর ছিলেন। তদবস্থায় তিনি আমার সাথে মোআনাকা (কোলাকুলি) করলেন। এ থেকে জানা গেল, কোলাকুলি করা ভাল। আলেমগণের সম্মানার্থে তাদের সওয়ারীর পাদান ধরে রাখার কথা হাদীসে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর পাদান ধরেছিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাদান ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাই কর। কারও সম্মানার্থে দন্ডায়মান হওয়া মাকরূহ নয়, যদি সেই ব্যক্তি তেমনটি আশা না করে। যদি সে নিজে চায় যে, মানুষ দাঁড়িয়ে তার সম্মান করুক, তবে দাঁড়ানো মাকরূহ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু আমাদের নিয়ম ছিল, তাঁকে দেখে আমরা দাঁড়াতাম না। কারণ, আমরা জানতাম তিনি এটা পছন্দ করেন না। তিনি একবার বললেন ঃ তোমরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ো না; যেমন অনারবরা দাঁড়ায়। তিনি আরও বলেন ঃ

من سره يمثل الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ـ

অর্থাৎ, লোকজনের দাঁড়িয়ে থাকা যার জন্যে আনন্দদায়ক হয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আরও বলা হয়েছে ঃ

لايقوم الرجل لرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا اوتفسحوا ـ

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্যে দাঁড়িয়ে আবার বসবে না; কিন্তু তোমরা মজলিসে স্থান সংকুলান করবে।

এ নিষেধাজ্ঞার কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ থেকে বেঁচে থাকতেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রস্রাব করার সময় সালাম করলে তিনি জওয়াব দানে বিরত থাকেন। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি প্রস্রাব পায়খানায় ব্যস্ত থাকে, তাকে সালাম করা মাকরূহ। শুরুতে আলাইকুমুস সালাম বলে সালাম করাও মাকরূহ। এক ব্যক্তি এ শব্দ প্রয়োগে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করলে তিনি বললেন ঃ এটা মৃতের উপঢৌকন। তিনি একথাটি তিন বার বলে অবশেষে বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে দেখা করলে বলবে– "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। যে ব্যক্তি কোন মজলিসে এসে সালাম করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতঃপর বসার জায়গা পায় না, তার সেখান থেকে ফিরে যাওয়া উচিত নয়; বরং সে কাতারের পেছনে বসে যাবে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় তিন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের দু'জন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেল। একজন সামান্য জায়গা পেয়ে বসে পড়ল এবং দ্বিতীয় জন লোকজনের পেছনে বসে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি স্থান না দেখে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কাজ শেষে বললেন ঃ এই তিন জন লোকের অবস্থা আমি বর্ণনা করছি শুন। একজন তো আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছে। আল্লাহ তাকে স্থান দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন 'হায়া' তথা লজ্জা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তার ব্যাপারে হায়া করেছেন। তৃতীয়জন পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে দু'জন মুসলমান পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং মোসাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করা হয়।

আর একটি হক হল, সক্ষম হলে মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের ইযযত, জান ও মাল জালেমের কবল থেকে রক্ষা করবে, জালেমকে প্রতিহত করবে এবং মজলুমের সাহায্য করে তার পক্ষ থেকে জালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবীস্বরূপ এটা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অপর ব্যক্তিকে মন্দ বললে তৃতীয় ব্যক্তি তার পক্ষ হয়ে তাকে বাধা দিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভাইয়ের ইযযত রক্ষা করে, তার এ কর্ম তার জন্যে দোযখ থেকে আড়াল হয়ে যাবে।

আরও বলা হয়েছে– যে মুসলমান তার ভাইয়ের ইযযত বাঁচায়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যার সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের কুৎসা রটনা করা হয় এবং ক্ষমতা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রতিহত করে না, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। পক্ষান্তরে এমতাবস্থায় যে তার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করবে, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। হযরত জাবের ও তালহা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান অপর মুসলমানের সাহায্য এমন জায়গায় করে না, যেখানে তার ইযযত ও সম্মান বিনষ্ট হতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা এমন স্থানে তার সাহায্য করবেন না, যেখানে তার অন্তর সাহায্য প্রত্যাশা করবে।

হাঁচির জওয়াব দেয়াও একটি হক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে হাঁচি দেয়, সে বলবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)। আর যে জওয়াব দেবে, সে বলবে- يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। যে হাঁচি দেয় সে পুনরায় বলবে- يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করুন)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির হাঁচির জওয়াব দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির জওয়াব দিলেন না। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করেছে; কিন্তু তুমি নিশ্চুপ রয়েছ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মুসলমানকে তিন বার হাঁচির জওয়াব দেবে। এর বেশী হাঁচি দিলে সেটা সর্দি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নীচ স্বরে হাঁচি দিতেন এবং নাক কাপড় কিংবা হাতে আবৃত করে নিতেন। হযরত আবু মূসা আশআরী বলেন ঃ ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলুন; কিন্তু তিনি ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ বলতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليضع يده على فيه فاذا قال اه اه فان الشيطن يضحك من خوفه ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ হাঁচি হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর হাই শয়তানের পক্ষ থেকে। যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন মুখের উপর হাত রাখবে। সে যখন আহ, আহ, করে, তখন শয়তান তার ভয়ে হাস্য করে।

হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ এস্তেঞ্জার অবস্থায় হাঁচি এলে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ এমতাবস্থায় মনে মনে আলহামদু লিল্লাহ বলে নেবে। কা'ব আহবার হযরত মূসা (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, ইলাহী, তুমি নিকটে হলে আমি নিঃশব্দে তোমাকে কিছু বলব আর দূরবর্তী হলে সশব্দে বলব। আল্লাহ এরশাদ করলেন ঃ যে কেউ আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ আমরা কোন সময় এমন অবস্থায় থাকি, যাতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, যেমন নাপাকী বা প্রস্রাব-পায়খানার অবস্থা। আল্লাহ্ বললেন ঃ সর্বাবস্থায় আমাকে স্মরণ কর।

আর একটি হক হল, দুষ্ট লোকের সাথে পালা পড়লে সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা কোন কোন মানুষের সামনে হাসি; কিন্তু অন্তর তাদেরকে অভিসম্পাত করে। বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা প্রদর্শনের অর্থ এটাই। এটা তাদের সাথে করা হয়, যাদের তরফ থেকে অনিষ্টের আশংকা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (তারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে)। وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ سيئة তথা মন্দ বলে অশ্লীলতা এবং حسنة বলে সালাম ও সৌজন্য বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে আসতে দাও। সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে জঘন্যতম ব্যক্তি। এর পর লোকটি ভেতরে এলে তিনি তার সাথে অত্যন্ত নম্র কথাবার্তা বললেন। এতে আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধারণা হল, তাঁর কাছে লোকটির ইজ্জত রয়েছে। লোকটি চলে গেলে আমি আরজ করলাম ঃ যখন সে আসতে চেয়েছিল, তখন তো আপনি এমন এমন মন্তব্য করলেন, এর পর তার সাথে এমন নম্র কথা বললেন; এর রহস্য কি? তিনি বললেন ঃ আয়েশা, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক হীন মর্যাদাসম্পন্ন সে ব্যক্তি হবে, যার কটূক্তির কারণে মানুষ তার সঙ্গ ত্যাগ করে । এক হাদীসে আছে– যে বিষয়ের মাধ্যমে মানুষ তার ইজ্জত বাঁচায়, তা হল তার জন্যে সদকা। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মানুষের সাথে মেলামেশা তাদের কর্ম অনুযায়ী কর এবং অন্তর দিয়ে তাদের থেকে আলাদা থাক। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপায় বের করা পর্যন্ত যাদের সংসর্গে না থেকে উপায় নেই, তাদের সাথে যে ব্যক্তি সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করে না, সে বুদ্ধিমান নয়।

ধনীদের সাথে উঠাবসা থেকে বিরত থাকা, দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করা এবং এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ -

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।'

হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর রাজত্বকালে যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং কোন দরিদ্র লোককে দেখতেন, তখন তার কাছে গিয়ে বসতেন এবং বলতেন ঃ এক মিসকীন অন্য এক মিসকীনের সাথে একত্রে বসেছে। কথিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'হে মিসকীন' বলে কেউ ডাকলে এটা তাঁর কাছে অন্য যে কোন সম্বোধনের তুলনায় অধিকতর প্রিয় ছিল। কা'ব আহবার (রঃ) বর্ণনা করেন, কোরআনের যেস্থানে 'হে ঈমানদারগণ' বলা হয়েছে, তাওরাতে সেখানে 'হে মিসকীনগণ' বলা হয়েছে। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ দোযখের সাতটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দরজা রয়েছে– তিনটি ধনীদের জন্যে, তিনটি নারীদের জন্যে এবং একটি দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্যে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আমি শুনেছি কোন একজন নবী আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী, আমি কিভাবে জানব যে, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট? এরশাদ হল, লক্ষ্য করবে দরিদ্ররা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট কি না? এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, নিজেকে মৃতদের সাথে উঠাবসা থেকে বাঁচাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, মৃত কারা? উত্তর হল ঃ ধনাঢ্যরা। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, ইলাহী আমি তোমাকে কোথায় খুঁজব? উত্তর হল ঃ ভগ্নহৃদয়দের কাছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ পাপাচারীর ধনৈশ্বর্য দেখে ঈর্ষা করো না। কারণ, তুমি জান না, মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা হবে। তার পেছনে তো একজন তাড়াহুড়াকারী গ্রহীতা (মৃত্যু) লেগে আছে। এতীমের সেবাযত্নের ফযীলত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন এতীমকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখে, যার পিতা-মাতা মুসলমান ছিল, তার জন্যে জান্নাত নিশ্চিতরূপে ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন–

انا وكافل اليتيم كهاتين ويشير باصبعيه .

অর্থাৎ, আমি এবং এতীমদের ভরণপোষণকারী এ দুটির মত। একথা বলার সময় তিনি দু'অঙ্গুলির দিকে ইশারা করছিলেন। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি এতীমের মাথায় অনুগ্রহের হাত বুলাবে, যতগুলো চুলের উপর দিয়ে তার হাত যাবে, ততগুলো নেকী সে পাবে। আরও বলা হয়েছে– মুসলমানদের গৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহ উত্তম, যাতে এতীম থাকে এবং তার সাথে সদাচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে সেই গৃহ সর্বনিকৃষ্ট, যাতে এতীম থাকে; কিন্তু তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা এবং তাকে প্রফুল্ল করার প্রয়াস পাওয়াও একটি হক। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ না করে। আরও বলা হয়েছে–

ان احدكم مرأة اخيه فاذا راى فيه شيئا فليمطه عنه .

অর্থাৎ, তোমাদের একজন অপর জনের আয়না। যখন তার মধ্যে কোন কিছু দেখে, তখন তা দূর করে দেয়া উচিত। অন্য এক হাদীসে আছে– যে কোন ঈমানদারকে শাস্তি দেয়, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেবেন। আরও বলা হয়েছে, রাতে কিংবা দিনে এক ঘন্টা নিজের ভাইয়ের কাজে ব্যয় করবে– কাজ পূর্ণ হোক বা না হোক, এটা তার জন্যে দু'মাস এ'তেকাফ করার চেয়ে উত্তম হবে। এক হাদীসে আছে–

انصر اخاك ظالما او مظلوما فقيل كيف ننصره ظالما قال تمنعه من الظلم .

অর্থাৎ, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। প্রশ্ন করা হল ঃ আমরা জালেমকে কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন ঃ তাকে জুলুম করতে নিষেধ করবে। আরও বলা হয়েছে– ঈমানদারকে প্রফুল্ল করা, তার কোন দুঃখ দূর করা, ঋণ আদায় করা এবং ক্ষুধার্ত হলে অন্নদান করা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আরও বলা হয়েছে– দু'টো অভ্যাস সবচেয়ে মন্দ– আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহর বান্দাদের ক্ষতি করা। পক্ষান্তরে দু'টি অভ্যাসের চেয়ে বড় কোন পুণ্য কাজ নেই– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার বান্দাদের উপকার করা। রুগ্ন ব্যক্তিকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করাও একটি হক। এ হকের জন্যে রোগীর পরিচিত হওয়া এবং মুসলমান হওয়া যথেষ্ট। এর নিয়ম হল, রোগীর কাছে কিছুক্ষণ বসবে, প্রশ্ন কম করবে, সমবেদনা প্রকাশ করবে এবং আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়া করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করার পূর্ণতা হচ্ছে, তার কপালে অথবা হাতের উপর নিজের হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে, কেমন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আছেন? যে ব্যক্তি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করে, সে যেন জান্নাতের খর্জূর বাগানে উপবেশন করে। সে যখন উঠে, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা রাত পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ বান্দা অসুস্থ হলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে বলেন ঃ দেখ সে তার অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীদের কাছে কি বলে। যদি অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীদের আগমনে রোগী আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তবে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে আরজ করে, অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই জানেন। এর পর আল্লাহ বলেন ঃ যদি আমি এই বান্দাকে ওফাত দেই, তবে তাকে জান্নাতে দাখিল করা, যদি আরোগ্য দেই; তবে তার গোশতের চেয়ে ভাল গোশত দেয়া, রক্তের চেয়ে ভাল রক্ত দেয়া এবং তার গোনাহ মাফ করা আমার জন্য অপরিহার্য, এগুলো আমি করবই। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান তাকে বিপদাপদে জড়িত করেন, যাতে সে গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা একবার সুন্নত এবং অধিক বার নফল। শিষ্টাচার হচ্ছে উত্তম সবর করা, অভিযোগ ও অস্থিরতা কম করা, দোয়া প্রার্থনা করা এবং ওষুধের সাথে ওষুধ স্রষ্টার উপর ভরসা করা।

মুসলমানের জানাযার সাথে চলাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে জানাযার পেছনে চলে সে এক কীরাত সওয়াব পায়। সহীহ হাদীসে আছে, কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এ হাদীসটি শুনে বললেন ঃ আমি এ পর্যন্ত অনেক কীরাত আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করেছি। জানাযার পেছনে চলার উদ্দেশ্য, মুসলমানের হক আদায় করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা। মকহুল দামেশকী জানাযা দেখে বলতেন– আমরাও আসছি। এটা উপদেশ– কিন্তু এখন গাফিলতি চরমে পৌঁছেছে। পূর্ববর্তীরা চলে যায় কিন্তু পরবর্তীরা বুঝে না। ইবরাহীম যাইয়াত লোকজনকে মৃতের জন্যে রহমতের দোয়া করতে দেখে বলতেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্যে রহমতের দোয়া করলে তা উত্তম হত। কেননা, এই মৃত ব্যক্তি তো তিনটি মনযিল থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। অর্থাৎ,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মালাকুল মওতের আকৃতি দেখে নিয়েছে, মৃত্যুর তিক্ততা আস্বাদন করেছে এবং খাতেমার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের এসব মনযিল সামনে রয়ে গেছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

يتبع الميت ثلثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله ـ

অর্থাৎ, মৃতের পেছনে তিনটি বস্তু চলে। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে এবং একটি বাকী থাকে। অর্থাৎ, তার পরিবারের লোকজন, অর্থ সম্পদ ও তার আমল পেছনে চলে। এর পর পরিবারের লোকজন ও অর্থসম্পদ ফিরে আসে এবং আমল তার সঙ্গে থেকে যায়।

মুসলমানের কবর যিয়ারত করাও একটি হক। এর উদ্দেশ্য দোয়া, শিক্ষা এবং অন্তরকে নরম করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি কবরস্থানে পৌঁছে একটি কবরের কাছে বসে গেলেন। আমি অন্যদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। তিনি কাঁদলেন এবং আমিও কাঁদলাম। তিনি শুধালেন, তুমি কাঁদলে কেন? আমি আরজ করলাম ঃ আপনার কান্নার কারণে। তিনি বললেন ঃ এটা আমার জননী আমেনা বিনতে ওয়াহাবের কবর। আমি পরওয়ারদেগারের কাছে যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। এর পর আমি তাঁর জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করার আবেদন করলে তা মঞ্জুর হল না। তাই আমি কেঁদেছি, যা সন্তানের জন্যে স্বাভাবিক। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কবরে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—

ان القبر اول منازل الاخرة فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر وان لم ينج منه فما بعده اشد ـ

অর্থাৎ কবর হল আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি কবরবাসী এখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মনযিলসমূহ সহজ। আর যদি এখানে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুক্তি না পায়, তবে পরবর্তী মনযিলসমূহ আরও কঠিন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কবর মৃতের সাথে প্রথমে বলে, আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর, নির্জন গৃহ, মুসাফিরখানা, অন্ধকার মনযিল। এসব বস্তু আমি তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। তুমি আমার জন্যে কি উপকরণ সংগ্রহ করেছ? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ শুন, আমি তোমাদেরকে আমার নিঃস্বতার দিনের কথা বলছি। এটা সে দিন, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায়ই কবরের কাছে বসে থাকতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ আমি এমন লোকদের কাছে বসি, যারা আমাকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের কাছ থেকে চলে গেলে তারা আমার গীবত করে না। হাতেম আসাম্ম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরস্থান হয়ে গমন করে, অতঃপর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কবরবাসীদের জন্যেও দোয়া করে না, সে নিজের সাথে এবং কবরবাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এক হাদীসে আছে- প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করে, হে কবরবাসীরা, তোমরা কার উপর ঈর্ষা কর? তারা বলে, আমরা মসজিদের বাসিন্দাদের উপর ঈর্ষা করি। কারণ, তারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং আল্লাহর যিকির করে। আমরা তা করতে পারি না। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরকে অধিক স্মরণ রাখবে, সে কবরকে জান্নাতের একটি বাগানরূপে পাবে। আর যে কবরের স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে, সে তাকে দোযখের একটি গর্তরূপে পাবে। রবী ইবনে খায়সাম নিজের গৃহে একটি কবর খুদে রেখেছিলেন। অন্তরে কঠোরতা অনুভব করলেই তিনি তাতে শুয়ে পড়তেন। ঘন্টাখানেক শোয়ার পর এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার, আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি পেছনে ফেলে আসা কর্মসমূহের মধ্যে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি। এর পর বলতেন ঃ হে রবী, তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন সৎকর্ম করে নাও সে দিনের আগে, যখন আর ফিরিয়ে দেয়া হবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ আমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সাথে কবরস্থানে গেলাম। তিনি কবর দেখেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, মায়মুন, এগুলো আমার পিতৃপুরুষ বনী উমাইয়ার কবর। দেখে মনে হয়, তারা যেন দুনিয়াবাসীদের আনন্দ উৎসবে কখনও শরীক ছিল না। দেখ, এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। রয়ে গেছে কেবল কিসসা-কাহিনী। সাপ বিচ্ছুতে তাদের দেহ খেয়ে ফেলেছে। এর পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি বিলাস-ব্যসনে মত্ত এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক তাদের চেয়ে বেশী কাউকে জানি না।

প্রতিবেশীর হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে সকল হক বর্ণিত রয়েছে, প্রতিবেশীর হক সেগুলো থেকে আলাদা। তাই প্রতিবেশী মুসলমান হলে তার হক অন্য মুসলমানের তুলনায় বেশী হবে। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ প্রতিবেশী তিন প্রকার, প্রথম যার হক একটি; দ্বিতীয়, যার হক দুটি এবং তৃতীয়, যার হক তিনটি। যার হক তিনটি, সে হচ্ছে মুসলমান, আত্মীয় প্রতিবেশী। যার হক দু'টি সে মুসলমান প্রতিবেশী। আর যার হক একটি, সে মুশরিক তথা বিধর্মী প্রতিবেশী। এখানে লক্ষ্ণীয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল প্রতিবেশীত্বের কারণে মুশরিকের হক সাব্যস্ত করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে ব্যক্তি তোমার প্রতিবেশী, তার হক উত্তমরূপে মেনে চল। এতে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আরও বলা হয়েছে–

ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه .

অর্থাৎ, জিবরাঈল আমাকে সর্বদা প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করতেন। এমন কি, আমার ধারণা হল, তাকে ওয়ারিস করে দেবেন।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন প্রথম যে দুই ব্যক্তি বাদানুবাদে লিপ্ত হবে তারা হবে দুই প্রতিবেশী। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মসউদের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ আমার এক প্রতিবেশী আমাকে জ্বালাতন করে, গালি দেয় এবং অতিষ্ঠ করে। তিনি বললেন ঃ যাও, যদি সে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য কর। রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করা হল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে এবং সারারাত জেগে এবাদত করে; কিন্তু সে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ সবর কর। এর পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারের অভিযোগ শুনে তিনি বললেন ঃ তোমার গৃহের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। লোকটি তাই করল। লোকজন তার আসবাবপত্রের কাছে এসে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি হল? কেউ বলে দিত, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিয়েছে। তখন লোকেরা বলত, আল্লাহ তার প্রতি লানত করুন। অবশেষে তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বলল ঃ তোমার আসবাবপত্র তুলে নাও। আল্লাহর কসম, পুনরায় আমি আর এরূপ করব না। এক হাদীসে বলা হয়েছে– বরকত ও অমঙ্গল স্ত্রী, গৃহ ও ঘোড়ার মধ্যে হয়ে থাকে। স্ত্রীর বরকত হচ্ছে মোহরানা কম হওয়া, বিবাহ সহজে সম্পন্ন হওয়া এবং সচ্চরিত্রা হওয়া। স্ত্রীর অমঙ্গল হচ্ছে, মোহরানা বেশী হওয়া, বিবাহ কষ্ট সহকারে সম্পন্ন হওয়া এবং চরিত্র নষ্ট হওয়া। গৃহের বরকতময় হওয়ার অর্থ প্রশস্ত হওয়া এবং প্রতিবেশী ভাল হওয়া। গৃহের অমঙ্গলজনক হওয়ার অর্থ সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী খারাপ হওয়া। ঘোড়ার বরকত হচ্ছে, অনুগত হওয়া ও উত্তম স্বভাবসম্পন্ন হওয়া এবং তার অমঙ্গল হচ্ছে হঠকারী হওয়া। জানা দরকার, প্রতিবেশীর হক কেবল এটাই নয় যে, তাকে কষ্ট দেবে না। কেননা, এ গুণটি পাথর, ইট ইত্যাদি জড় পদার্থের মধ্যেও আছে। এগুলো কাউকে কষ্ট দেয় না। বরং তার হক হচ্ছে সে কষ্ট দিলে বরদাশত করবে। কেবল বরদাশত করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং তার সাথে নম্র ব্যবহার করবে এবং দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে। কথিত আছে, নিঃস্ব প্রতিবেশী কেয়ামতের দিন তার ধনী প্রতিবশীকে জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে– পরওয়ারদেগার, তাকে জিজ্ঞেস করুন সে তার দয়া থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত রেখেছে এবং আমার উপর তার দরজা কেন বন্ধ রেখেছে? ইবনে মুক'নে খবর পেলেন, তার প্রতিবেশী ঋণের দায়ে নিজের গৃহ বিক্রি করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেলেছে। তিনি প্রায়ই তার দেয়ালের ছায়ায় বসতেন। তিনি বললেন ঃ যদি সে নিঃস্বতার কারণে গৃহ বিক্রি করে, তবে আমার দ্বারা তার প্রাচীরের ছায়ায় বসার হক আদায় হবে না। অতঃপর তিনি প্রতিবেশীকে গৃহের মূল্য দিয়ে বললেন ঃ গৃহ বিক্রয় করো না। জনৈক বুযুর্গ বলেন, তাঁর গৃহে ইঁদুরের উৎপাত অনেক বেড়ে গেছে। এতে এক ব্যক্তি তাঁকে বিড়াল পালনের পরামর্শ দিল। তিনি বললেন ঃ এতে বিড়ালের শব্দ শুনে ইঁদুরগুলো প্রতিবেশীর গৃহে চলে যাবার আশংকা রয়েছে। যে বিষয় আমি নিজের জন্যে পছন্দ করি না, তা প্রতিবেশীর জন্যে কিরূপে পছন্দ করব?

সংক্ষেপে প্রতিবেশীর হক এই ঃ তাকে প্রথমে সালাম করবে। তার সাথে দীর্ঘ কথাবার্তা বলবে না এবং তার অবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে না। অসুস্থ হলে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবে এবং বিপদে সান্ত্বনা দেবে ও সঙ্গ ত্যাগ করবে না। আনন্দে মোবারকবাদ জানাবে এবং নিজেও তার সাথে আনন্দ প্রকাশ করবে। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবে। ছাদের উপর থেকে তার গৃহের দিকে তাকাবে না। প্রাচীরের উপর কাঠ রেখে, নালা থেকে পানি ফেলে অথবা আঙ্গিনায় মাটি ফেলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না। তার বাড়ীতে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ করবে না। তার কোন দোষ জানা গেলে তা গোপন করবে। সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অবিলম্বে তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে। সে বাড়ীতে না থাকলে তার বাড়ী দেখাশুনা করা থেকে গাফেল হবে না। পার্থিব অথবা ধর্মীয় কোন বিষয় তার অজানা থাকলে ঠিক ঠিক বলে দেবে। সাধারণ মুসলমানের যেসব হক আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও সেগুলো পালন করতে তৎপর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কি? প্রতিবেশীর হক হল, সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা, কর্জ চাইলে তাকে কর্জ দেয়া, অসুস্থ হলে খবর নেয়া এবং মারা গেলে জানাযার সাথে চলা, তার সাফল্যে মোবারকবাদ দেয়া, বিপদে পড়লে সমবেদনা প্রকাশ করা। তার অনুমতি ছাড়া তোমাদের দালান গৃহ উঁচু করবে না, যাতে তার আলো বাতাস বন্ধ হতে পারে। কোন ফলমূল কিনলে তাকে হাদিয়া দেবে। নতুবা গোপনে নিজের গৃহে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আনবে এবং শিশুদেরকে ফল নিয়ে বাইরে যেতে দেবে না, যাতে তার শিশুদের মনে কষ্ট না হয়। তোমার পাতিলের সুগন্ধি দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ো না। কিন্তু তখন, যখন এক চামচ তার বাড়ীতেও পাঠিয়ে দাও। প্রতিবেশীর হক কি তোমরা জান? সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ– প্রতিবেশীর হক সে-ই আদায় করতে পারে, যার প্রতি আল্লাহর রহমত হয়।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমরের কাছে ছিলাম। তাঁর এক গোলাম যবেহ করা ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে গোলাম, ছাগল সাফ করার কাজ হয়ে গেলে প্রথমে আমার প্রতিবেশী ইহুদীকে গোশত দেবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। গোলাম বলল ঃ আপনি কয়বার বলবেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করতেন। এমন কি, আমরা আশংকা করলাম, প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দেবেন না তো! হেশাম বলেন ঃ হযরত হাসান বসরীর মতে কোরবানীর গোশত ইহুদী, খৃস্টানদেরকে খাওয়াতে কোন দোষ ছিল না। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে ওসিয়ত করলেন, ব্যঞ্জন পাকালে তাতে শুরবা বেশী দেবে। এর পর প্রতিবেশীর জন্যে কিছু অংশ পাঠিয়ে দেবে। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার দু'জন প্রতিবেশী। একজনের দরজা আমার সামনে এবং অন্যজনের দরজা একটু দূরে। মাঝে মাঝে আমার কাছে দু'জনকে দেয়ার মত জিনিস থাকে না। অতএব তাদের মধ্যে কার হক বেশী? তিনি বললেন ঃ যার দরজা তোমার সামনে তার হক বেশী। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের পুত্রকে প্রতিবেশীর সাথে রুক্ষ ব্যবহার ও কটু কথা বলতে দেখে বললেন ঃ প্রতিবেশীর সাথে এরূপ করো না। কারণ, কথা থেকে যায় এবং মানুষ চলে যায়। হাসান ইবনে ঈসা নিশাপুরী লেখেন ঃ আমি আবদুর রহমান ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করলাম– প্রতিবেশী আমার কাছে অভিযোগ করে যে, আমার গোলাম তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে; কিন্তু গোলাম তা অস্বীকার করে। এখন গোলামকে প্রহার করতেও আমার মন চায় না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণ, সে হয় তো অপরাধী নয়। তাকে একদম ছেড়ে দেয়াও খারাপ মনে হয়। কারণ, এতে প্রতিবেশী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আমি কি করব? হযরত আবদুর রহমান জওয়াবে বললেন ঃ তোমার গোলাম তোমার সাথে কোন অপরাধ করলে তাকে তখন সাজা দিয়ো না। এর পর যখন প্রতিবেশী অভিযোগ করে, তখন পূর্ব অপরাধের জন্যে শাসন কর। এমতাবস্থায় প্রতিবেশীও সন্তুষ্ট হবে এবং গোলামেরও সেই অপরাধেই সাজা হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম চরিত্রের দশটি বিষয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। এগুলো পুত্রের মধ্যে থাকতে পারে এবং পিতার মধ্যে না-ও থাকতে পারে– (১) সত্যবাদিতা, (২) লোকের সাথে সদ্ব্যবহার, (৩) ভিক্ষুককে দান করা, (৪) সদাচরণের প্রতিদান দেয়া, (৫) আত্মীয়তা বজায় রাখা, (৬) আমানতের হেফাযত করা, (৭) প্রতিবেশীর হক মেনে চলা, (৮) সহচরের সম্মান করা, (৯) অতিথি সেবা করা এবং (১০) লজ্জা করা। এটা সবগুলোর মূল বিষয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে মুসলমান মহিলাগণ, কোন প্রতিবেশিনী যেন তার প্রতিবেশিনীর প্রেরিত বস্তুকে নগণ্য মনে না করে, যদিও তা ছাগলের খুরই হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আমি কোন কাজ ভাল করেছি, না খারাপ করেছি– একথা কিরূপে জানব? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার প্রতিবেশীকে ভাল করেছ বলতে শুন, তবে জানবে ভাল করেছ। আর যদি প্রতিবেশীকে খারাপ করেছ বলতে শুন, তবে জানবে খারাপ করেছ।

আত্মীয় স্বজনের হক ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

يقول الله تعالى انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি রহমান। আর এই রেহেম তথা আত্মীয়তা নামকে আমি আমার নাম থেকে নির্গত করেছি। অতএব যে এই আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আমি তাকে বজায় রাখব। আর যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একে ছিন্ন করবে, আমি তাকে ছিন্ন করব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

من سره ان يبسط له فى رزقه وان ينسأله فى اثره فليصل رحمه -

যে ভাল মনে করে যে, তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক এবং রিযিক বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে।

এক হাদীসে আছে– যে এ বিষয়ে আনন্দিত হয় যে, তার আয়ু দীর্ঘ হোক এবং রিযিক বেড়ে যাক, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে, আত্মীয়তা অধিক বজায় রাখে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে। হযরত আবু যর বলেন ঃ আমার বন্ধু (সাঃ) আমাকে আদেশ করেছেন– আত্মীয়তা বজায় রাখ যদিও তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয় এবং সত্য কথা বল যদিও তিক্ত হয়। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশে বের হন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ যদি আপনি সুন্দরী রমণী ও লাল উট লাভ করতে চান, তবে মুদাল্লাজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করুন। সেখানে এগুলোর প্রাচুর্য আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুদাল্লাজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আত্মীয়তা বজায় রাখে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে আমার জননী আগমন করলে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমার মা এসেছেন। তিনি এখনও মুশরিক। আমি তার সাথে দেখা করব কি? তিনি বললেন হাঁ। এক রেওয়ায়েতে আছে; আমি তাকে কিছু দেব কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আত্মীয়তা বজায় রাখ। এক হাদীসে বলা হয়েছে; ফকীর মিসকীনকে সদকা করলে একটি সদকাই হয়; কিন্তু আত্মীয়কে কিছু দিলে দুটি সদকা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

অর্থাৎ, তোমার প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্য লাভ করবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর প্রিয় বাগানটি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চাইলেন। তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ এই বাগান আল্লাহ্‌র পথে ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন একে তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে, এমন আত্মীয়কে দান করা উত্তম। এটা এমন, যেমন বলা হয়েছে, তার সাথে মিল যে তোমার থেকে আলাদা থাকে; তাকে দাও যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তাকে মার্জনা কর যে তোমার উপর জুলুম করে।

সন্তান ও পিতামাতার হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, আত্মীয়তা যত নিকটতর ও মজবুত হয়, হকও ততই জোরদার হয়। সন্তানের সাথে পিতামাতার আত্মীয়তাই সর্বাধিক মজবুত ও নিকটবর্তী । তাই অন্যান্য আত্মীয়ের চেয়ে পিতামাতার হক বেশী । পিতামাতা সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান যদি পিতাকে গোলাম অবস্থায় পায়, অতঃপর তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে, তবুও পিতার হক আদায় হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা নামায, রোযা, হজ্জ ওমরা ও আল্লাহর পথে জেহাদ করার চেয়ে উত্তম। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি সকালে পিতা ও মাতা উভয়কে সন্তুষ্ট করবে, তার জন্যে জান্নাতের দিকে দু'টি দরজা খুলে যায়। সন্ধ্যায় যে এরূপ করে তার জন্যেও তাই হয়। পিতামাতার একজন থাকলে এক দরজাই খুলবে– যদিও তারা উভয়েই জুলুম করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সকালে পিতামাতাকে নারাজ করে, তার জন্যে দোযখের দিকে দু'টি দরজা খুলে যায়। আর যে সন্ধ্যায় নারাজ করে, তার অবস্থাও তদ্রূপ। একজন থাকলে এক দরজা খুলবে– যদিও তারা জুলুম করে। একথাগুলো তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। এক হাদীসে আছে– জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচ'শ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু নাফরমান সন্তান ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী তার ঘ্রাণ পাবে না। আরও বলা হয়েছে, নিজের পিতামাতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী অনুগ্রহ কর। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ হে মূসা, যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তি তার পিতামাতার আনুগত্য করে, আমি তাকে অনুগত হিসাবে লেখি। আর যে ব্যক্তি পিতামাতার নাফরমানী করে এবং আমার আনুগত্য করে, আমি তাকে নাফরমান হিসেবে লেখি। কথিত আছে, যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে গেলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-দাঁড়াননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, তুমি তোমার পিতার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া কঠিন মনে করলে কি? আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, তোমার ঔরস থেকে কোন নবী পয়দা করব না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কেউ সদকা দিতে চাইলে নিজের পিতামাতার নামে দিতে পারে, যদি তারা মুসলমান হয়। এই সদকার সওয়াব তারা উভয়ে পাবে এবং পুত্রও তাদের সমান সওয়াব পাবে, তাদের সওয়াব হ্রাস করা ব্যতীতই। মালেক ইবনে রবীয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় বনী সালমার এক ব্যক্তি এসে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা মারা গেছেন। আমার উপর তাদের আদায় করার মত কোন হক আছে কি? তিনি বললেন ঃ তাদের জন্যে নামায পড়ে মাগফেরাতের দোয়া কর, তাদের অঙ্গীকার-ওসিয়ত পূর্ণ কর, তাদের বন্ধুদের সম্মান কর এবং তাদের কারণে যেসব আত্মীয়তা আছে সেগুলো বজায় রাখ। তিনি আরও বলেন ঃ মায়ের সাথে সদাচরণ পিতার তুলনায় দ্বিগুণ। আর বলা হয়েছে ঃ মায়ের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ মা পিতার তুলনায় অধিক মেহেরবান হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন ঃ নিজের সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমার পিতা-মাতার যেমন তোমার উপর হক রয়েছে, তেমনি তোমার সন্তানের প্রতিও হক রয়েছে। এক হাদীসে আছে– আল্লাহ সেই পিতার প্রতি রহম করুন, যে তার সন্তানকে সৎ হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, এমন মন্দ কাজ করে না, যদ্দ্বারা সন্তান নাফরমান হয়ে যায়। কথিত আছে, সন্তান সাত বছর বয়স পর্যন্ত পিতার খেলনা ও ফুলের তোড়া, আরও সাত বছর পর্যন্ত খাদেম, এর পর হয় দুশমন, না হয় শরীফ। আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান জন্মের সপ্তম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিনে তার নাম রাখবে ও আকীকা করবে এবং চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করবে। ছয় বছর হলে তাকে আদব শিক্ষা দেবে। বয়স নয় বছর হলে তার বিছানা আলাদা করে দেবে। তের বছর বয়স হলে তাকে নামায পড়ার জন্যে প্রয়োজনবোধে প্রহার করবে। যখন বয়স ষোল বছরে পৌঁছে, তখন বিয়ে করাবে এবং হাত ধরে বলবে– আমি তোমাকে আদব শিখিয়েছি, লেখাপড়া করিয়েছি এবং বিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার ফেতনা থেকে এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সন্তানের হক পিতার উপর এই যে, তাকে ভাল আদব শেখাবে এবং তার ভাল নাম রাখবে। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের কাছে নিজের পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ তুমি কখনও তাকে বদদোয়া করেছ কি? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি নিজেই তাকে নষ্ট করেছ। এখন এর কি প্রতিকার! সন্তানের প্রতি দয়া ও নম্রতা করা মোস্তাহাব। আকরা ইবনে হাবেস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখলেন, তিনি শিশু ইমাম হাসানকে আদর করছেন। আকরা আরজ করলেন ঃ আমার দশটি সন্তান আছে,আমি তাদের মধ্যে কাউকে আদর করিনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ من لا يرحم لا يرحم (যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে একদিন বললেন ঃ ওসামার মুখ ধুয়ে দাও। আমি তার মুখ ধৌত করতে লাগলাম। কিন্তু ঘৃণা লাগছিল। তিনি আমার হাত ঝটকা দিয়ে নিজেই ধুয়ে দিলেন এবং আদর করলেন। অতঃপর বললেন ঃ সে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, মেয়ে হয়নি। একবার তিনি যখন মিম্বরে ছিলেন, তখন হাসান (আঃ) পিছলে পড়ে গেলেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি ফেতনা বৈ নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ একদিম রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঘাড়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। তিনি সেজদায় অনেক বিলম্ব করলেন; এমন কি, নামাযীরা মনে করল, হয় তো আজ কোন নতুন ব্যাপার ঘটেছে। নামাযান্তে মুসল্লীরা আরজ করল ঃ আপনি দীর্ঘ সেজদা করেছেন। ফলে আমরা নতুন কিছু ঘটেছে বলে ধারণা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার সন্তান আমার উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিল, তাই তার মতলব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দেয়া ভাল মনে করিনি। এতে কয়েকটি উপকারিতা পাওয়া গেল– প্রথম, আল্লাহর নৈকট্য, যা সেজদা অবস্থায় অধিক সময় কাটল। দ্বিতীয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা প্রকাশ পেল। তৃতীয়, উম্মতকে দয়া শিক্ষা দেয়া হল। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– সন্তানের সুগন্ধি জান্নাতের সুগন্ধি সদৃশ। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়েসকে তলব করে বললেন ঃ সন্তান সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, সন্তানরা আমাদের অন্তরের ফল এবং পিঠের বালিশ। আমরা তাদের জন্যে অনুগত পৃথিবী ও ছায়াবিশিষ্ট আকাশ। তাদের জন্যেই আমরা বড় বড় বিপদে ঢুকে পড়ি। তারা কিছু চাইলে দেবেন, রাগ করলে আদর করে তুষ্ট করবেন। তখন তারা মনে প্রাণে আপনাকে ভালবাসবে। আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। তাহলে আপনার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে তারা আপনার দ্রুত মৃত্যু কামনা করবে। আমীর মোয়াবিয়া বললেন ঃ আহনাফ, আল্লাহর কসম, তোমার আগমনের পূর্বে আমি এযীদের প্রতি ভীষণ রাগান্বিত ছিলাম। আহনাফ চলে গেলে আমীর মোয়াবিয়া এযীদের প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং দু'লাখ দেরহাম ও দু'শ থান তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এযীদ এথেকে অর্ধেক আহনাফকে দিয়ে দিল।

এসব হাদীসদৃষ্টে বুঝা যায়, পিতামাতার হক অত্যন্ত জোরালো। এটা ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকেও অধিক জোরদার। এতে অতিরিক্ত দু'টি বিষয় রয়েছে– (১) অধিকাংশ আলেমের মতে, সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব। তবে খাঁটি হারাম কাজে ওয়াজিব নয়। যদি তারা তোমাকে ছাড়া খেতে নারাজ হয়, তবে তোমার উচিত তাদের সাথে খাওয়া। কেননা, সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করার নাম পরহেযগারী। আর পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিবের উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরহেযগারী অগ্রাধিকার পেতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন নফল কাজে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সফর করা তোমার জন্যে জায়েয নয়। বিলম্ব না করে ফরয হজ্জে যাওয়াও নফল। কেননা, বিলম্বেও তা আদায় করা যায়। এলেমের অন্বেষণে সফর করাও নফল। তবে যদি নামায, রোযা ও অন্যান্য ফরযের এলেম হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকে এবং শহরে কোন শিক্ষাদাতা না থাকে, তবে পিতামাতার হক আদায়ে আবদ্ধ না থেকে দেশ ছেড়ে দেবে। নতুবা তাদের ইচ্ছা ছাড়া সফর করবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামন থেকে হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে জেহাদ করার সংকল্প প্রকাশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়ামনে তোমার পিতামাতা আছে কি? সে আরজ করল ঃ আছে। তিনি শুধালেন ঃ তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে কি? সে আরজ করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথমে গিয়ে তাদের অনুমতি নাও। অনুমতি দিলে এসে জেহাদ কর। নতুবা যতটুকু সম্ভব তাদের আনুগত্য কর। কেননা, এটা তওহীদের পরে সর্বোত্তম আমল, যা তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে নিয়ে যাবে। অন্য এক ব্যক্তি জেহাদের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছে কি? সে আরজ করল ঃ আছে। তিনি বললেন ঃ তার সাথে থাক। জান্নাত তার পদতলে। অন্য এক ব্যক্তি খেদমতে হাযির হয়ে হিজরতের বয়াত করার আবেদন করল এবং বলল ঃ আমার পিতামাতাকে কাঁদিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যাও এবং যেমনি কাঁদিয়েছ তেমনি হাসাও। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده .

অর্থাৎ, বড় ভাইদের হক ছোট ভাইদের উপর পুত্রের উপর পিতার হকের অনুরূপ।

গোলাম ও চাকরদের হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল, তোমরা তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরকে খাওয়াবে; যা পরিধান করবে, তা থেকে তাদেরকে পরিধান করাবে। তাদের দ্বারা বলপূর্বক এমন কাজ করাবে না যার সাধ্য তাদের নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ করবে তাকে রাখবে, আর যাকে অপছন্দ করবে তাকে বিক্রি করে দেবে। আল্লাহর সৃষ্টিকে আযাব দিয়ো না। তিনি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে তাদের মালিকানাধীন করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা খাদেমের ত্রুটি-বিচ্যুতি কয়বার মার্জনা করব? তিনি চুপ করে রইলেন। এর পর বললেন ঃ প্রত্যহ সত্তর বার মার্জনা করবে। হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক শনিবারে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত আওয়ালী যেতেন। তিনি যদি গোলামদেরকে কোন সাধ্যাতীত কাজে নিয়োজিত দেখতেন, তবে তাদের কাজ কিছুটা হ্রাস করে দিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সওয়ারীতে দেখলেন। তার গোলাম তার পেছনে দৌড়ে আসছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, একেও তোমার পেছনে বসিয়ে নাও। কারণ, সে তোমার ভাই। তোমার মধ্যে যেমন প্রাণ আছে তেমনি তার মধ্যেও আছে। লোকটি গোলামকে পেছনে বসিয়ে নিল। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা বললেন ঃ বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যায় যে পর্যন্ত গোলাম তার পেছনে পায়ে হেঁটে চলে। আহনাফ ইবনে কায়েসকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখেছেন? তিনি বললেন ঃ কায়েস ইবনে আসেমের কাছে। তাঁর প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে, তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর বাঁদী কাবাবের একটি শিক তাঁর কাছে নিয়ে এল। শিক বাঁদীর হাত থেকে ছুটে গিয়ে কায়েসের ছেলের উপর পড়ে। ফলে সে আহত হয়ে মারা গেল। বাঁদী অত্যন্ত ভীত হল। তিনি ভাবলেন, মুক্ত করা ছাড়া তার ভয় দূর করা যাবে না। তিনি বললেন ঃ ভয় করিস না। যা, তুই মুক্ত। আওন ইবনে আবদুল্লাহর গোলাম তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে তিনি বলতেন, তুই তোর প্রভুর মত হয়ে গেছিস। তোর প্রভু আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে আর তুই তোর মনিব প্রভুর নাফরমানী করিস। একদিন গোলাম তাঁকে অনেক ব্যথা দিলে তিনি বললেন ঃ তোর ইচ্ছা আমি তোকে প্রহার করি। কিন্তু তা হবে না। যা, তুই মুক্ত। মায়মুন ইবনে মেহরানের কাছে মেহমান এলে তিনি বাঁদীকে তাড়াতাড়ি খানা আনতে বললেন। বাঁদী হাতে খাদ্যভর্তি পেয়ালা নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হল। পা পিছলে যাওয়ার কারণে গরম খাদ্য তার প্রভুর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাথায় পড়ে গেল। তিনি আর্তচিৎকার করে বললেন ঃ আমাকে জ্বালিয়ে দিল রে। বাঁদী শশব্যস্ত হয়ে আরজ করল ঃ হে নেকী ও আদবের গুরু, আল্লাহ্ তাআলার এরশাদ অনুযায়ী কাজ করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার এরশাদ কি? বাঁদী বলল ঃ আল্লাহ্ বলেন– وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ। যারা ক্রোধকে দমন করে। মায়মুন বললেন ঃ আমি ক্রোধ দমন করলাম। বাঁদী বলল ঃ এর পর আল্লাহ্ বলেছেন– وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে। তিনি বললেন ঃ আমি তোকে ক্ষমা করলাম। বাঁদী বলল ঃ আরও কিছু সদাচরণ করুন। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ্ সদাচরণকারীদেরকে ভালবাসেন। তিনি বললেন ঃ তুই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ জনৈক সাহাবী তাঁর গোলামকে প্রহার করলেন । গোলাম বলতে শুরু করল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন, কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোলামের ফরিয়াদ শুনে সাহাবীর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে সাহাবী প্রহার বন্ধ করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এই গোলাম তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়েছে; কিন্তু তুমি মাফ করনি। এখন আমাকে দেখে হাত গুটিয়ে নিয়েছ। সাহাবী লজ্জিত হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সে মুক্ত। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এরূপ না করতে, তবে দোযখের আগুন তোমার মুখ ভস্ম করে দিত। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– গোলাম যখন তার প্রভুর কল্যাণে কাজ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার এবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করে, তখন সে দ্বিগুণ সওয়াব পায়। আবু রাফে (রাঃ) যখন মুক্ত হলেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আমি দু'রকম সওয়াব পেতাম। এখন একটি চলে গেল। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে এরূপ তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে এবং এরূপ তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যারা সর্বপ্রথম দোযখে ঢুকবে। যে তিন ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে, তাদের একজন শহীদ, দ্বিতীয় জন সেই গোলাম, যে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত উত্তমরূপে করে এবং প্রভুর মঙ্গলের জন্যে কাজ করে। তৃতীয় জন পুণ্যবান, অধিক সন্তানবিশিষ্ট, সওয়াল বর্জনকারী ব্যক্তি। আর যে তিন ব্যক্তি সর্বপ্রথম দোযখে ঢুকবে, তাদের প্রথম জন জালেম আমীর; দ্বিতীয় জন এমন ধনী, যে আল্লাহর হক আদায় করে না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং তৃতীয় জন আস্ফালনকারী ফকীর। হযরত আবু মসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় পেছনের দিক থেকে দু'বার শব্দ শুনলাম, হে আবু মসঊদ, খবরদার। মুখ ফিরিয়ে দেখি রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আমার হাত থেকে বেত পড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তার উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা তোমার উপর আল্লাহ্ তাআলার রয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যখন তোমাদের কেউ গোলাম ক্রয় করে, তখন প্রথমে যেন তাকে মিষ্টি খাওয়ায়। এটা তার পক্ষে ভাল। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও জন্যে তার গোলাম খানা নিয়ে এলে সে যেন তাকে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। এরূপ না করলে তাকে আলাদা দিয়ে দেবে। এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছে দেখল, তিনি আটা গুলছেন। লোকটি আরজ করল ঃ আপনি গুলছেন কেন? গোলাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ গোলামকে অন্য কাজে পাঠিয়েছি। তাকে এক সাথে দু'কাজ দেয়া আমি পছন্দ করিনি। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته তোমরা সকলেই প্রজাওয়ালা। তোমাদের প্রত্যেককেই তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

মোট কথা, গোলামের হক সংক্ষেপে এই ঃ খাদ্য ও পোশাকে তাদেরকে নিজের শরীক করবে এবং তাদের দ্বারা সাধ্যাতিরিক্ত কাজ নেবে না। তাদেরকে অহংকার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না। তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করবে। তাদের প্রতি ক্রোধ হলে চিন্তা করবে, তুমিও তো আল্লাহ্ তাআলার গোলাম, তাঁর আনুগত্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি করে থাক। তিনি শাস্তি দেন না। এ গোলাম অন্যায় করে থাকলে তাতে আশ্চর্য কি? আল্লাহ্ তাআলা তোমার উপর অধিক ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় খণ্ড
সমাপ্ত

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(তৃতীয় খণ্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা ঃ ৫৫-বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন
তৃতীয় খণ্ড
ইমাম গাযযালী (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ
মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
রমযান ঃ ১৪০৭ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১০ হিজরী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
যিলহজ্জ ঃ ১৪২০ হিজরী
বৈশাখ ঃ ১৪০৬ বাংলা
এপ্রিল ঃ ১৪৯৯ ইংরেজী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
রজব ঃ ১৪২৩ হিজরী

পঞ্চম সংস্করণ
ডিসেম্বর- ২০০৩ ইংরেজি
পৌষ- ১৪১০ বাংলা
শাওয়াল- ১৪২৪ হিজরী

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা

ISBN-984-8367-411

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদু লিল্লাহ! মহাগ্রন্থ "এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এর তৃতীয় খণ্ডেরও পুনঃ মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো। ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট তিনটি খণ্ডও যাতে শীঘ্রই পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়া যায়, সে জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায়, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই একে একে প্রতীক্ষিত সে খণ্ডগুলিও প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অবশ্য প্রত্যেক মহৎ কাজের সফল বাস্তবায়ন একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে।

"এহইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এর মত একটা মকবুল গ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বময় সমভাবে নন্দিত, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জ্ঞান সাধকের নিকটই এ গ্রন্থ সমভাবে সমাদৃত, কোন মানুষের রচিত অন্য কোন বইয়ের ভাগ্যে এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ আর সম্ভব হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। ফলে দুনিয়ার প্রায় সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষাতেই এই কিতাবের পূর্ণাঙ্গ বা অংশ বিশেষের অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তাই যতই দিন যাচ্ছে কিতাবটির আগ্রহী পাঠক সংখ্যার পরিধি ততই বিস্তৃত হচ্ছে।

প্রথম দুটি খণ্ড বের হওয়ার পর অনেকেই আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তী সংস্করণগুলি আরও সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকে আবার কটু কথা বলে আমাদের উদ্যমকে অবদমিত করারও চেষ্টা করেছেন। উল্লিখিত সবার জন্যই আমাদের আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেককেই স্ব স্ব নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল দান করেন। কারণ, সবার দ্বারাই আমরা উপকৃত হয়েছি। ত্রুটিগুলি শনাক্ত করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়ার দিশা লাভ করেছি।

আবারও বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, আমাদের জ্ঞান যেহেতু সীমিত এবং তৎসঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত সময় ও সাজসরঞ্জাম আমাদের নাই, তাই মুদ্রণে এমনকি অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়। সহৃদয় সুধীগণ মেহেরবানী করে ভুল ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিয়ে অশেষ নেকীর ভাগী হতে পারেন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়
শা'বান, ১৪০৯ হিজরী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নির্জনবাসের আদব	৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নির্জনবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দলীল	৭
নির্জনবাস সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা	১৬
সপ্তম অধ্যায়	
সফর ও তার আদব	৪৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আদব, নিয়ত ও উপকারিতা	৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সফরের রুখসতসমূহের বিবরণ	৫৯
অষ্টম অধ্যায়	
সেমা ও তার আদব	৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ	৬৩
সঙ্গীত বৈধ হওয়ার প্রমাণ	৬৬
সঙ্গীত হারাম হওয়ার কারণ	৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সেমার প্রভাব ও আদব	৮২
সেমা ও ওজদ	৮৪
নবম অধ্যায়	
সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ	৯৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আদেশ নিষেধের ফযীলত ও বর্জনের নিন্দা	৯৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আদেশ নিষেধের রোকন ও শর্ত	১০৫
যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয় তার শর্ত	১১২
আদেশ নিষেধের আদব	১১৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ব্যাপক অস্বীকার্য বিষয়	১২১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
শাসক শ্রেণীকে আদেশ ও নিষেধ করা	১২৬

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরের রহস্যাবলী	১৬১
কলব তথা অন্তরের লশকর	১৬৪
অন্তরের আভ্যন্তরীণ খাদেম	১৬৬
মানব অন্তরের বৈশিষ্ট	১৬৯
অন্তরের গুণাবলী	১৭৩
জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে অন্তরের দৃষ্টান্ত	১৭৭
যৌক্তিক, ধর্মীয়, জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে অন্তরের অবস্থা	১৮৩
এলহামের ক্ষেত্রে সূফী ও আলেমেদের পার্থক্য	১৮৮
সুফী সম্প্রদায়ের শিক্ষা পদ্ধতি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	১৯০
কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অন্তরের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার	১৯৬
শয়তানী পথসমুহের কিঞ্চিৎ বিবরণ	২০৮
যিকিরের সময় কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয় কি না?	২২৭
পরিবর্তনের দিক দিয়ে অন্তরের প্রকারভেদ	২৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা চরিত্র সংশোধন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা	২৩৭
সচ্চরিত্রতার ফযীলত ও অসচ্চরিত্রার নিন্দা	২৩৭
সচ্চরিত্রা ও অসচ্চরিত্রার স্বরূপ	২৪১
সাধনা দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া না হওয়া	২৪৬
সচ্চরিত্র কিরূপে অর্জিত হয়	২৪৯
চরিত্র সংশোধনের উপায়	২৫২
অন্তরের রোগ ও স্বাস্থ্যের বিবরণ	২৫৫
নিজের দোষ কিরূপে চেনা যায়	২৫৭
কাম বর্জন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা	২৫৯
সচ্চরিত্রতার আলামত	২৬৫
শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সচ্চরিত্রতা	২৭২

একাদশ অধ্যায়

উদর ও লজ্জাস্থানের খাহেশের প্রতিকার	২৭৬
ক্ষুধার উপকারিতা ও তৃপ্তির বিপদাপদ	২৮১
উদরের খাহেশ চূর্ণকারী সাধনা	২৮৭
ক্ষুধা ও তার ফযীলতে মিতাচার	২৯৭
রিয়ার বিপদাপদ	৩০১
লজ্জাস্থানের খাহেশ	৩০৩
মুরীদের বিবাহ করা না করা	২০৫

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়	পৃষ্ঠা
যিনা ও কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা	৩১২
দ্বাদশ অধ্যায়	
জিহ্বার বিপদাপদ	৩২০
জিহ্বার বিপদাশংকা ও চুপ থাকার ফযীলত	৩২১
অনর্থক কথাবার্তা	৩২৪
খুসুমত তথা বিবাদ	৩২৯
কথার প্রাঞ্জলতার জন্যে লৌকিকতা	৩৩০
অশ্লীল কথন ও গালি গালাজ	৩৩১
অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা	৩৩৩
গান ও কবিতা আবৃত্তি	৩৩৪
হাসি ঠাট্টা	৩৩৬
উপহাস ও কৌতুক	৩৩৮
মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম	৩৪১
যে যে স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয	৩৪২
গীবত	২৪৫
গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায়	৩৫০
গীবত জায়েয হওয়ার কারণ	৩৫৪
গীবতের কাফফারা	৩৫৬
চোগলখোরী	৩৫৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ক্রোধ ও হিংসা	৩৬৫
ক্রোধের স্বরূপ	৩৬৮
সাধনার দ্বারা ক্রোধ দূর হয় কিনা	৩৭২
জোশের সময় ও ক্রোধের প্রতিকার	৩৭৮
ক্রোধ হজম করার ফযীলত	৩৮২
প্রতিশোধের জন্যে যে পরিমাণ কথা বলা দুরস্ত	৩৮৬
বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল	৩৮৯
নম্রতার ফযীলত	৩৯২
হিংসার নিন্দা	৩৯৩
হিংসার স্বরূপ, প্রকার ও বিধান	৩৯৭
হিংসার চিকিৎসা	৪০৪
যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব	৪০৭

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ অধ্যায়
নির্জনবাসের আদব

প্রকাশ থাকে যে, নির্জনবাস ও মানুষের সাথে মেলামেশা– এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু অনিষ্ট আছে, যে কারণে মানুষ পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে না। আবার অনেক গুণও আছে, যে কারণে মানুষ এগুলোর প্রতি উৎসুক হয়। নির্জনবাস অবলম্বনের প্রতি অনেক আবেদ ও দরবেশের ঝোঁক দেখা যায়। তারা একে মেলামেশার উপর অগ্রাধিকার দান করেন। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে মেলামেশা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের যে ফযীলত বর্ণনা করেছি, তা বাহ্যতঃ নির্জনবাসের বিপরীত, যার প্রতি অধিকাংশের ঝোঁক রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে যা সত্য তা প্রকাশ করা জরুরী। পরবর্তী দু'টি পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি বিধৃত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
নির্জনবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দলীল

এ সম্পর্কে মতভেদ এত গভীর যে, তাবেয়ীগণের মধ্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে। সেমতে সুফিয়ান সওরী, ইবরাহীম ইবনে আদহাম, দাউদ তায়ী, ইবনে আয়ায, সোলায়মান খাওয়াস, ইউসুফ ইবনে আসবাত, হুযায়ফা মারআশী এবং বিশরে হাফীর মাযহাব হল, নির্জনবাস অবলম্বন করা উচিত। এটা মেলামেশার চেয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব, শা'বী, ইবনে আবী লায়লা, হেশাম ইবনে ওরওয়া, ইবনে শাবরামা, শোরায়হ, শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে ওয়ায়না, ইবনে মোবারক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্য আলেম অধিকাংশ তাবেয়ীর এই অভিমত পছন্দ করেন যে, মেলামেশা করা, অনেক বন্ধু করা, মুমিনদের মধ্যে সম্প্রীতি হওয়া, ধর্মের কাজে তাদের সাহায্য নেয়া মোস্তাহাব। আলেমগণ এ সম্পর্কে কতকগুলো মিশ্র বাক্য প্রয়োগ করেছেন। কোন কোন বাক্য দ্বারা উভয় মাযহাবের মধ্য থেকে কোন এক মাযহাবের প্রতি ঝোঁক এবং কোন কোন উক্তি দ্বারা ঝোঁকের কারণ বুঝা যায়। এখন প্রথম প্রকার উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকার উক্তি অনিষ্ট ও উপকারিতার আলোচনায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা সকলেই নির্জনবাস থেকে আপন আপন অংশ গ্রহণ কর। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ নির্জনবাস এবাদত। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বন্ধু হওয়ার জন্যে, কোরআন সঙ্গী হওয়ার জন্যে এবং মৃত্যু উপদেশদাতা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্‌কে সাথী করে নাও এবং মানুষকে এক তরফে রাখ। আবুর রবী' দরবেশ দাউদ তায়ীকে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ায় রোযা এবং আখেরাত ইফতারের জন্যে রাখ। মানুষের কাছ থেকে এমনভাবে পলায়ন কর, যেমন মানুষ ব্যাঘ্র থেকে পলায়ন করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তওরাতের কিছু বাক্য আমার স্মরণ আছে– তা হল, মানুষ অল্পে তুষ্ট হলে স্বাবলম্বী হয়। মানুষের কাছ থেকে আলাদা হলে আপদমুক্ত থাকে। কামপ্রবৃত্তি বর্জন করলে স্বাধীন হয়। হিংসা বর্জন করলে ভদ্র হয়। অল্পে সবর করে অনেক মুনাফা অর্জন করে। ওহায়ব ইবনুল ওয়ারদ বলেন ঃ আমি শুনেছি, হেকমতের দশটি অংশ আছে। তন্মধ্যে নয়টি চুপ থাকা এবং একটি নির্জনবাস অবলম্বন করার মধ্যে। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ এখন আপন গৃহে নিশ্চুপ বসে থাকার দিন এসেছে। কথিত আছে, হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) জানাযায় আসতেন, রোগীদের হাল জিজ্ঞেস করতেন এবং বন্ধুবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সবগুলো বর্জন করলেন। তিনি বলতেন ঃ মানুষ তার সকল ওযরই বর্ণনা করবে– এটা সহজ বিষয় নয়। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-কে কেউ বলল ঃ আপনি আমাদের জন্যে কিছু ফুরসত বের করলে ভাল হত। তিনি বললেন ঃ ফুরসত বিদায় হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই ফুরসত পাওয়া যাবে। ফোযায়ল বলেন ঃ মানুষ যদি পথিমধ্যে দেখা হলে আমাকে সালাম না করে এবং আমি অসুস্থ হলে আমার হাল জিজ্ঞেস না করে, তবে আমি তাদের কাছে ঋণী থাকব। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ রবী ইবনে খায়সাম তাঁর গৃহের দরজায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি পাথর এসে তাঁর বুকে আঘাত করল এবং রক্তাক্ত করে দিল। তিনি বুকের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিলেন– হে রবী, এখন তো তোর উপদেশ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং জানাযা বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনও দরজায় বসলেন না। বশীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ মানুষের সাথে পরিচয় কম কর। কেননা তুমি জান না, কেয়ামতে তোমার কি অবস্থা হবে? যদি লাঞ্ছনা হয়, তবে তোমার পরিচিত জন কম হলেই উত্তম। জনৈক শাসক হাতেম আসাম্মের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার কাছে আপনার কোন কাজ থাকলে বলুন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি বললেন ঃ বড় কাজ হচ্ছে, তুমি আমাকে দেখো না এবং আমি তোমাকে দেখব না। এক ব্যক্তি সহল তস্তরী (রহঃ)-কে বলল ঃ আমি আপনার কাছে থাকার ইচ্ছা রাখি। তিনি বললেন ঃ যখন আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মারা যাবে, তখন কে সাথে থাকবে? তখন যে সাথে থাকে, তার কাছেই তোমার থাকা উচিত। ফোযায়লকে কেউ বলল ঃ আপনার পুত্র আলী বলে– হায়, আমি যদি এমন জায়গায় থাকতাম, যেখান থেকে আমি মানুষকে দেখতাম, কিন্তু মানুষ আমাকে দেখত না। একথা শুনে ফোযায়ল কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আলীর জন্যে আফসোস, সে কথা বলেছে, কিন্তু অসম্পূর্ণ বলেছে। পূর্ণ কথা তখন হত, যখন বলত, না আমি কাউকে দেখতাম, না কেউ আমাকে দেখত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সেই মজলিস সর্বোত্তম, যা তোমার গৃহের অভ্যন্তরে হয়। সেখানে তুমি কাউকে দেখ না এবং কেউ তোমাকে দেখে না। মোট কথা, নির্জনবাসের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, এগুলো তাঁদের উক্তি। এখন উভয় পক্ষের প্রমাণাদি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়।

মেলামেশা পছন্দকারীদের প্রমাণ ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا الاية তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতভেদ করেছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে সম্প্রীতির কারণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এসব প্রমাণ দুর্বল। কেননা, প্রথম আয়াতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ কোরআন পাক ও শরীয়তের মূলনীতিতে মতের বিভিন্নতা, মাযহাবসমূহের মতবিরোধ। দ্বিতীয় আয়াতে সম্প্রীতি স্থাপনের মানে হচ্ছে, অন্তর থেকে সেসব হিংসা-দ্বেষ বের করে দেয়া, যা গোলযোগ ও কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে থাকে। নির্জনবাস এসব বিষয়ের পরিপন্থী নয়। নির্জনবাসের মধ্যে এগুলো হতে পারে। তাদের দ্বিতীয় দলীল এই হাদীস–

اَلْمُؤْمِنُ اِلْفٌ مَأْلُوفٌ وَلَاخَيْرَ فِيْمَنْ لَايَاْلِفُ وَلَايُؤْلَفُ

ঈমানদার বন্ধুত্ব করে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়। যে বন্ধুত্ব করে না এবং যার সাথে বন্ধুত্ব করা হয় না, তার মধ্যে কল্যাণ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ দলীলটিও দুর্বল। এতে অসচ্চরিত্রতার অনিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার কারণে বন্ধুত্ব হতে পারে না। যে চরিত্রবান ব্যক্তি মেলামেশা করলে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং অপরও তার সাথে বন্ধুত্ব করে; কিন্তু নিজের নিরাপত্তা ও সংশোধনের নিমিত্ত মেলামেশা বর্জন করে, এ হাদীসে তাকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। তৃতীয় দলীল এই– রসূলে করীম (সঃ) বলেন- مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَقَدْ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু মূর্খতা যুগের মৃত্যুর মত। অন্য এক হাদীসে আছে-

مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فِىْ اِسْلَامٍ وَامِعٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ -

মুসলমানদের ইসলামে সুসংহত থাকা অবস্থায় যে মুসলমানদের বিরোধিতা করে, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের জাল ছিন্ন করে দেয়।

এ দলীলটিও অগ্রাহ্য। কেননা, এখানে দলের অর্থ সেই দল, যে একজন ইমামের বয়াতে একমত। অতএব যে এই দলের বিরোধিতা করবে সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। কাজেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ মতবিরোধ করা। এই হাদীসে নির্জনবাসের কোন উল্লেখ নেই। চতুর্থ দলীল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন দিনের বেশী সাক্ষাৎ বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। সেমতে তিনি বলেন ঃ যে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী সময় ত্যাগ করে এবং মরে যায়, সে দোযখে যাবে। তিনি আরও বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্যে হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করবে। তাদের মধ্যে যে আগে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে যাবে। আরও বলা হয়েছে– যে তার ভাইকে ছয় দিনের বেশী ত্যাগ করে, সে তার ঘাতকের মত। সুতরাং কেউ নির্জনবাস করলে সে তার বন্ধু ও পরিচিত জনকে ত্যাগ করবে, যা এসব হাদীসদৃষ্টে নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দলীলও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই ত্যাগ করার অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কথা বলা, সালাম করা ও মামুলী মেলামেশা বর্জন করা। অসন্তুষ্টি ছাড়া মেলামেশা বর্জন করা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া দুই স্থানে তিন দিনের বেশীও মেলামেশা বর্জন করা জায়েয। এক, যদি জানা যায়, তিন দিনের বেশী ত্যাগ করলে প্রতিপক্ষ সঠিক পথে এসে যাবে এবং দুই, যদি মেলামেশা বর্জন করার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত আছে বলে মনে করা হয়। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা যদিও ব্যাপক, কিন্তু এ দু'টি স্থান এর ব্যতিক্রম। কেননা, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে যিলহজ্জ, মহররম ও সফর মাসের কিছু দিন পর্যন্ত বর্জন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পত্নীগণকে এক মাস পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কসম খেয়ে তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে উপরের কক্ষে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর খাদ্য রাখা হত। সেখানে ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করার পর যখন তিনি নীচের তলায় নেমে আসেন, তখন আরজ করা হল, আপনি তো ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করেছেন। তিনি বললেন ঃ মাস কখনও ঊনত্রিশ দিনেও হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করবে, কিন্তু তখন, যখন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। এ হাদীসে ব্যতিক্রমের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এর উপর ভিত্তি করেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ নির্বোধ থেকে আলাদা থাকা উচিত। কেননা, নির্বুদ্ধিতার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সম্মুখে কেউ বলল, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেনি। তিনি বললেন ঃ এ কাজটি পূর্ববর্তীদের মধ্যেও কয়েকজন বুযুর্গ করেছেন। সেমতে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করে ওফাত পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। হযরত ওসমান গনী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বর্জন করে রেখেছিলেন। এসব সাক্ষাৎ বর্জন এই অর্থে ছিল যে, এই বুযুর্গগণ নিজেদের নিরাপত্তা এর মধ্যেই দেখেছিলেন। পঞ্চম দলীল, এক ব্যক্তি এবাদতের জন্যে পাহাড়ে চলে গেলে লোকেরা তাকে ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করল। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না এবং তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। সম্ভবতঃ এটা বলার কারণ ছিল, ইসলামের প্রথম যুগে জেহাদ অত্যাবশ্যকীয় ছিল। নির্জনবাসের কারণে জেহাদ বাদ পড়ে যেত। সেমতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র যুগে আমরা জেহাদের জন্যে বের হলাম। আমরা একটি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে নির্মল পানির একটি ছোট ঝরনা ছিল। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি লোকজন থেকে আলাদা হয়ে এখানে একান্তে বাস করলে চমৎকার হত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা না করে এরূপ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ এরূপ করো না। কেননা, আল্লাহ্র পথে তোমাদের অবস্থান করা আপন গৃহে ষাট বছর এবাদত করার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তোমরা জান্নাতে দাখিল হও, এটা কি তোমরা চাও না? আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর। দুধের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধারাসমূহ বের করার মাঝখানে যতটুকু সময় থাকে, ততটুকু সময় যে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। ষষ্ঠ দলীল, হযরত মুআয ইবনে জাবালের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةَ وَالشَّاذَّ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَامَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ ۔

শয়তান মানুষের বাঘ। সে মানুষকে ছাগলের বাঘের ন্যায় গ্রাস করে। গ্রাস করে তাকে, যে দূরে থাকে, যে কিনারায় থাকে এবং যে একা থাকে। তোমরা ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে বেঁচে থাক। সকলের সাথে থাক এবং জমাত ও মসজিদের সাথে থাক। এ হাদীসে নির্জনবাস তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে জ্ঞানার্জনের পূর্বে নির্জনবাস অবলম্বন করে। এর বর্ণনা পরে আসবে।

নির্জনবাসের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ ঃ নির্জনবাসের সপক্ষদের প্রথম দলীল এই আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ الاية ۔

আমি পৃথক হচ্ছি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা এবাদত কর তাদের থেকে। আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করি। আর এক আয়াতে আছে–

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۔

অতঃপর যখন সে পৃথক হয়ে গেল তাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের উপাস্যদের থেকে, তখন আমি দিলাম তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব এবং আমি প্রত্যেককে করেছি নবী।

এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্জনবাসের কারণে এই নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ দলীলটিও অগ্রাহ্য। কেননা, কাফেরদের সাথে মেলামেশার একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া। যখন এ ব্যাপারে নিরাশ হতে হয় এবং জানা যায়, তারা দাওয়াত মানবে না, তখন তাদেরকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আমাদের আলোচনা মুসলমানদের সাথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মেলামেশা সম্পর্কে। তাদের সাথে মেলামেশায় বরকত হয়। সেমতে বর্ণিত আছে, কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আপনি মাটির আবৃত পাত্র থেকে ওযু করা অধিক পছন্দ করেন; না সেসব চৌবাচ্চা থেকে, যেগুলো থেকে মানুষ ওযু করে থাকে? তিনি বললেন ঃ পানির চৌবাচ্চা থেকে ওযু করা অধিক পছন্দ করি, যাতে মুসলমানদের হাতের বরকত হাসিল হয়। আরও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কা'বা গৃহের তওয়াফ করেন, তখন যমযম কূপের কাছে গেলেন তার পানি পান করার উদ্দেশে। এমন সময় দেখলেন, চামড়ার পাত্রে খেজুর ভিজানো আছে। মানুষ সেগুলো হাতে পিষে দিয়েছে এবং তাই হাতে নিয়ে পান করছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে এখান থেকে পান করাও। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এগুলো হাতে পেষা নবীয। আপনি বললে গৃহে রক্ষিত ও আবৃত মৃৎপাত্র থেকে পরিষ্কার শরবত এনে দেই। তিনি বললেন ঃ আমাকে এখান থেকেই পান করাও, যেখান থেকে সকলে পান করে। আমি মুসলমানদের হাতের বরকত চাই। সার কথা, কাফের ও প্রতিমাদের থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের কাছ থেকেও পৃথক হওয়া উচিত। অথচ তাদের সাথে মেলামেশা করলে অনেক বরকত লাভ হয়। দ্বিতীয় দলীল, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন– وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে আমা থেকে পৃথক হয়ে যাও। আসহাবে কাহফের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَأْوُوْا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ الاية ـ

যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাস্যদের থেকে পৃথক হয়ে গেছ, তখন আশ্রয় গ্রহণ কর গুহায়। তোমাদের রব তোমাদের জন্যে কিছু রহমত ছড়িয়ে দেবেন।

এতে নির্জনবাসের আদেশ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর যখন কোয়ায়শরা নির্যাতন চালায়, তখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে পার্বত্য উপত্যকায় চলে যান এবং নিজের বিশেষ সহচরগণকে নির্জনবাস অবলম্বন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দেন। সেমতে সকলেই হিজরত করেন। পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হল, তখন সকলেই মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর সাথে মিলিত হন। এ প্রমাণের মধ্যেও একথাই বিধৃত হয়েছে যে, কাফেরদের কাছ থেকে নিরাশ হয়েই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা নির্জনবাস অবলম্বন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদের কাছ থেকে নির্জনে চলে যাননি। আসহাবে কাহফের সদস্যবর্গও একে অপরের কাছ থেকে নির্জনবাস অবলম্বন করেননি; অথচ তাঁরা সকলেই ঈমানদার ছিলেন; বরং তাঁরা কাফেরদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ছিলেন। সুতরাং তাদের নির্জনবাস প্রমাণ হতে পারে না। তৃতীয় দলীল, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একবার ওকবা ইবনে আমের জোহানী জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন– আপন গৃহে আবদ্ধ থাক, মুখ বন্ধ রাখ এবং পাপের জন্যে কান্নাকাটি কর। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল, কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ

هُوَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى قِيْلَ ثُمَّ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

ঈমানদার, জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদকারী। প্রশ্ন হল, এর পর কে? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি, যে পাহাড়ের কোন গুহায় আলাদা বসে আল্লাহর এবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ الْغَنِىَّ الْخَفِىَّ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা পরহেযগার, মালদার, গোপন বান্দাকে পছন্দ করেন।

এসব হাদীসও প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, ওকবা ইবনে আমেরকে উপরোক্ত রূপ জওয়াব দেয়ার কারণ ছিল, তিনি নবুওয়তের নূর দ্বারা বুঝে নেন যে, তাঁর জন্যে ঘরে বসে থাকা মেলামেশা করার তুলনায় অধিক উপযুক্ত ও নিরাপদ। এ কারণেই সকল সাহাবীকে তিনি এই আদেশ দেননি। প্রায়ই এমন হয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে নির্জনবাসের মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত থাকে– মেলামেশায় নয়। যেমন কারও পক্ষে জেহাদে যাওয়ার চেয়ে গৃহে বসে থাকা ভাল হয়। এর অর্থ এরূপ হয় না যে, জেহাদ বর্জন করা উত্তম। মানুষের সাথে মেলামেশা সাধনা ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে, সে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের কষ্টে সবর করে না। এমনিভাবে (رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ يَعْبُدُ رَبَّهُ) হাদীসে সেই ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে স্বভাবগতভাবে দুষ্ট। মানুষ তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাথে মেলামেশা করে কষ্ট পায়। আল্লাহ্ পরহেযগার, ধনী, গোপন বান্দাকে পছন্দ করেন– এই হাদীসে পরিচয়হীন মেলামেশা করতে এবং খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতে ইশারা করা হয়েছে। নির্জনবাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, অনেক সংসারত্যাগীকে দুনিয়ার মানুষ চেনে এবং অনেক মেলামেশাকারী অখ্যাতই থেকে যায়। চতুর্থ দলীল, রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে, আমি কি তা বলব না? তাঁরা আরজ করলেন ঃ অবশ্যই। আপনি এরশাদ করুন। তিনি হাতে পশ্চিম দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে আল্লাহ্র পথে আপন ঘোড়ার লাগাম ধরে নিজে ধাওয়া করার অথবা অপরের তার প্রতি ধাওয়া করার প্রতীক্ষায় থাকে। আমি তোমাদেরকে সে ব্যক্তির কথাও বলছি, যে তার পরে উত্তম। অতঃপর তিনি হেজাযের দিকে হাতে ইশারা করে বললেন ঃ তার পরে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে ছাগলের পালে নামায আদায় করে, যাকাত দেয়, নিজের মালের মধ্যে আল্লাহ্র হক চেনে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে একান্তে বাস করে।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার পর এখন আমরা বলছি, সন্তোষজনক প্রমাণ কোন পক্ষেই পাওয়া যায়নি। তাই সত্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে নির্জনবাসের উপকারিতা ও প্রয়োজনাদি পুংখানুপুংখরূপে খতিয়ে দেখা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্জনবাস সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, নির্জনবাস ও মেলামেশা সম্পর্কে মনীষীগণের মতভেদ বিবাহ এবং চিরকৌমার্যব্রতের মধ্যে মতভেদের অনুরূপ। বিবাহ অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করেছি যে, সর্বাবস্থায় একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির উপর বলা যায় না; বরং অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে কারও জন্যে বিবাহ এবং কারও জন্যে কৌমার্যব্রত উত্তম। সেমতে বিবাহের বিপদাপদ ও উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্জনবাসের উপকারিতা লিপিবদ্ধ করছি। নির্জনবাসের উপকারিতা দ্বিবিধ– একটি পার্থিব, অপরটি পারলৌকিক। দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন– এবাদত ও চিন্তা ভাবনায় মগ্ন থেকে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য অর্জন করা অথবা মেলামেশার উপর ভিত্তিশীল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যেমন, রিয়া, পরনিন্দা, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ থেকে চুপ থাকা, খারাপ সঙ্গীদের মন্দ চরিত্র ও দুষ্ট ক্রিয়াকর্ম নিজের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া ইত্যাদি। পার্থিব উপকারিতার উদাহরণ যেমন– নির্জনতায় কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হওয়া, সেমতে পেশাদার ব্যক্তিরা একাকিত্বে তাদের পেশার কাজও খুব করে নেয়, সেসব অনিষ্ট থেকেও বেঁচে থাকে যা মেলামেশার মধ্যে হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ জগতের চাকচিক্যের দিকে তাকানো, মনে-প্রাণে সে দিকে আকৃষ্ট হওয়া, অপরের বস্তুর জন্যে লালায়িত হওয়া, তার বস্তুতে অপরের লালসা করা ইত্যাদি। নির্জনবাসের কারণে মানুষ এসব জাগতিক আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে নির্জনবাসের উপকারিতা। এক্ষণে আমরা এগুলোকে ছয়টি উপকারিতায় সীমিত করে বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

প্রথম উপকারিতা, এবাদত ও চিন্তা-ভাবনার জন্যে অবসর লাভ করা, মানুষের সাথে বাক্যালাপের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারাদিতে এবং মর্ত ও স্বর্গলোকে খোদায়ী রহস্য জানার কাজে আত্মনিয়োগ করার সৌভাগ্য নির্জনবাসের মাধ্যমে নসীব হয়ে থাকে। কেননা, এসব বিষয় অবসর মুহূর্ত চায়। মেলামেশা করলে অবসর মুহূর্ত থাকে না। সুতরাং নির্জনবাসই এসব সৌভাগ্য অর্জনের উপায়। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) শুরুতে হেরা পাহাড়ে সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে নির্জনবাস করতেন। নবুওয়তের নূর পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। এর পর সৃষ্টি তাঁর মধ্যে ও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে আড়াল হত না। বাহ্যিক দেহ দিয়ে তিনি সৃষ্টির সাথে ছিলেন এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতেন। মানুষ ধারণা করত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু), কিন্তু তিনি বলে দিলেন, তাঁর সবকিছু আল্লাহ্র মধ্যে নিমজ্জিত। তিনি বলেন ঃ

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله -

আমি যদি কাউকে খলীল করতাম, তবে আবু বকরকেই খলীল করতাম; কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ, আমি) আল্লাহ্র খলীল।

বাহ্যতঃ মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকা এবং অন্তরে মনে-প্রাণে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা নবুওয়তের শক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তিই যেন নফসের ধোঁকায় এসে এই মর্তবার লালসা না করতে থাকে। তবে কোন কোন ওলীর মর্তবা এতটুকু হয়ে যাওয়া অবান্তর নয়। সেমতে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলছি, অথচ মানুষ ধারণা করে, তাদের সাথে কথা বলছি। এটা সেই ব্যক্তির জন্যে সহজলভ্য, যে আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয় এবং তাতে অপরের জন্যে কোন অবকাশ না থাকে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, যারা মানুষের আশেক, তাদের অবস্থাও এমন হয়ে যায় যে, মানুষের সাথে দেখা করে, কিন্তু কাউকে চেনে না এবং কারও আওয়াযও শুনে না। বিবেকবানদের কাছে পরকালের ব্যাপার খুবই গুরুতর। এর চিন্তায় কারও অবস্থা এরূপ হয়ে যেতে পারে। তবে নির্জনবাস দ্বারা সহায়তা নেয়া অধিকাংশের জন্যে উত্তম। এ কারণেই জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নির্জনবাসের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন ঃ নির্জনবাস দ্বারা কাম্য চিন্তা ভাবনার স্থায়িত্ব এবং অন্তরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভ উদ্দেশ্য, যাতে উৎকৃষ্ট জীবন অর্জিত হয় এবং মারেফতের মিষ্টতা আস্বাদন করা যায়। জনৈক দরবেশকে বলা হল, নির্জনবাসে আপনার ধৈর্য অত্যধিক। তিনি বললেন ঃ আমি একা থাকি না। পরওয়ারদেগার আমার সাথে উপবিষ্ট থাকেন। আমি যখন চাই, তিনি আমাকে কিছু বলুন, তখন তাঁর কিতাব কোরআন পড়তে শুরু করি। আর যদি চাই, আমি তাঁকে কিছু বলি তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামাযে রত হয়ে যাই। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ আমি ইবরাহীম ইবনে আদহামকে সিরিয়ার শহরসমূহে দেখে আরজ করলাম ঃ আপনি খোরাসান একদম ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি আরাম এখানেই পেয়েছি। আমার ধর্মকর্ম নিয়ে এখানে আমি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ঘুরাফেরা করছি। আমাকে কেউ দেখলে এ কথা বলে ঃ লোকটি সন্দেহজনক অথবা কোন উষ্ট্রচালক কিংবা মাঝি। হযরত হাসান বসরীকে লোকেরা বলল ঃ এখানে এক ব্যক্তিকে আমরা যখনই দেখি, একা একটি স্তম্ভের আড়ালে বসে থাকতে দেখি। সে আপনার মজলিসে শরীক হয় না। তিনি বললেন ঃ তাকে আবার দেখলে আমাকে জানাবে। সেমতে একদিন তাকে পুনরায় দেখে হযরত হাসানকে জানানো হল। তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমার মনে হয় তুমি নির্জনতা পছন্দ কর। কিন্তু মানুষের কাছে বসতে তোমার কিসে বাধা? লোকটি জওয়াব দিল ঃ আছে কোন ব্যাপার, যে কারণে আমি লোকজনের কাছে বসি না। হযরত হাসান বসরী বললেন ঃ তাহলে লোকে যাকে হাসান বলে তার কাছেই বস। সে বলল, আমি যে কাজে আছি, তাতে কারও কাছে বসার ফুরসত আমার নেই। তিনি বললেন ঃ মিয়া সাহেব, সে কাজটি কি? সে বলল ঃ সকাল সন্ধ্যায় আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে; আর আমি গোনাহ্ করি। তাই আমি উত্তম মনে করেছি যে, নেয়ামতের কারণে আল্লাহ্র শোকর করব এবং নিজের গোনাহের কারণে তাঁর কাছে মাগফেরাতের আবেদন করব। এ দু'টি কাজের কারণে আমি ফুরসত পাই না। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা, আমার মতে তুমি হাসানের চেয়ে অধিক সমঝদার। অতএব যে কাজে আছ, তাতেই মগ্ন থাক। কথিত আছে, হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হারম ইবনে হাব্বান তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি শুধালেন ঃ কেন এলে? হারম জওয়াব দিলেন ঃ তোমার কাছ থেকে মহব্বত লাভ কার জন্যে এসেছি। ওয়ায়েস বললেন ঃ আমি এমন কাউকে জানি না, যে তার পরওয়ারদেগারকে চেনার পর অন্যের কাছ থেকে মহব্বত লাভ করে। ফোযায়ল বলেন ঃ আমি রাত আসতে দেখে আনন্দিত হই যে, এখন পরওয়ারদেগারের সাথে একাকী থাকতে পারব। কিন্তু যখন সকাল হতে দেখি, তখন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করি। কারণ, এখন লোকজন এসে আমাকে ঘিরে ফেলবে এবং এমন কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসবে, যে আমাকে পরওয়ারদেগার থেকে গাফেল করে দেবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন ঃ ভাগ্যবান তারা, যারা দুনিয়াতেও বিলাস করে এবং আখেরাতেও বিলাস করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে তো তারা আল্লাহর সাথে সংগোপনে বাক্যালাপ করতেই থাকে, আখেরাতেও তাঁর পড়শী হয়ে থাকবে। যুন্নুন মিসরী বলেন ঃ একান্তে পরওয়ারদেগারের সাথে বাক্যালাপ করার মধ্যেই ঈমানদারদের খুশী ও আনন্দ। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ মানুষ যখন নিজের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্বের গুণ খুঁজে পায় না, তখন নিজ থেকেই আতংক অনুভব করে। এ কারণেই মানুষের সাথে মেলামেশা করে এই আতংক দূর করতে চাই। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের গুণ থাকে, তখন সে নির্জনতা তালাশ করে, যাতে নির্জনতা দ্বারা চিন্তা-ভাবনায় সাহায্য নেয় এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। মোট কথা, নির্জনবাসের বড় উপকারিতা হচ্ছে এবাদত ও চিন্তা-ভাবনার ফুরসত পাওয়া।

দ্বিতীয় উপকারিতা, মেলামেশার কারণে মানুষ প্রায়ই সে সকল গোনাহের সম্মুখীন হয়, নির্জনবাসের কারণে যেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এরূপ গোনাহ্ চারটি– গীবত (পরনিন্দা), রিয়া, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ থেকে চুপ থাকা এবং স্বভাবের মধ্যে গোপনে গোপনে কুচরিত্র ও অপকর্ম দাখিল হওয়া, যা জাগতিক লোভ-লালসা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। গীবতের অবস্থা হচ্ছে, এর কারণসমূহ জানতে পারলে বুঝতে পারবে, মেলামেশার অবস্থায় এ থেকে বেঁচে থাকা এক দুঃসাধ্য কাজ। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই গীবত থেকে বাঁচতে পারে না। কারণ, এটা সাধারণ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তারা যেখানে সেখানে বসে অপরের গীবত করতে থাকে এবং এতে অসাধারণ আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। তারা এর মাধ্যমেই একাকিত্বের আতংক দূর করে থাকে। সুতরাং যদি তুমি মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মতই কথাবার্তা বল, তবে তুমি গোনাহ্গার এবং পরওয়ারদেগারের ক্রোধের যোগ্য হয়ে যাবে। আর যদি নিশ্চুপ থাক তবুও গীবতকারী গণ্য হবে। কেননা, যে গীবত শুনে, সে-ও গীবতকারীর মতই দোষী। আর যদি মানুষকে গীবত করতে নিষেধ কর, তবে তারা তোমার দুশমন হয়ে যাবে এবং তোমারই গীবত করতে শুরু করবে। ফলে "রুরিতে ধুলা দূর, জগত হল ধুলায় ভরপুর"-এর মত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে; বরং এটাও আশ্চর্য নয় যে, তারা গীবতের সীমা পেরিয়ে তোমাকে গালিগালাজ করতে থাকবে। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ধর্মের মূলনীতিসমূহের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্যতম ও ওয়াজিব। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করবে, সে অবশ্যই খারাপ বিষয়াদি দেখবে। এমতাবস্থায় যদি সে নিশ্চুপ থাকে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে নিষেধ করলে নিজেকে নানা ধরনের ক্ষতির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবে; বরং আশ্চর্য নয় যে, যেসব কাজ করতে নিষেধ করবে, তার চেয়ে জঘন্য অপরাধ দেখতে হবে। নির্জনবাসে এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ লোকসকল, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

'মুমিনগণ, তোমরা নিজের চরকায় তেল দাও। তোমরা হেদায়াত পেয়ে গেলে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' কিন্তু একে যথার্থ স্থানে ব্যবহার করো না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

اِذَا رَاَى النَّاسُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ .

মানুষ যখন মন্দ কাজ দেখে এবং তা পরিবর্তন করে না, তখন আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আযাব দেবেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, এমন কি এ কথাও বলবেন– তুমি যখন মন্দ কাজ দেখেছিলে, তখন নিষেধ করলে না কেন? এর পর যদি আল্লাহ্ বান্দাকে জওয়াব অনুধাবন করান, তবে সে আরজ করবে, ইলাহী, আমি তোমার রহম আশা করতাম এবং মানুষকে ভয় করতাম। এটা তখন, যখন মারপিটের কিংবা অসাধ্য কোন কাজের ভয় করে। এর পরিচয় কঠিন অথচ বিপদ মুক্ত নয়। নির্জনবাসে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ পরীক্ষা করে, সে প্রায়শঃ অনুতপ্ত হয়। কেননা, সৎ কাজের আদেশ একটি ঝুঁকে পড়া প্রাচীর সোজা করার মত বিপদসংকুল কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীরটি তার উপরই পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। হাঁ, যদি কিছু লোক তাকে সাহায্য করে এবং প্রাচীরটি ধরে রাখে, তবে অবশ্য কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই প্রাচীর সোজা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে সৎ কাজের আদেশে সাহায্যকারী কোথায়? এজন্যেই নির্জনবাস অবলম্বন করা উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রিয়া এমন একটি দুরারোগ্য ব্যাধি, যা থেকে বেঁচে থাকা আবদাল ও আওতাদের জন্যেও সুকঠিন– অন্যদের তো কথাই নেই। কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে তাদের আতিথ্য করতে হবে এবং তাদের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করতে হবে। যে এগুলো করবে– সে রিয়া করবে। যে মানুষকে দেখানোর জন্যে কাজ করবে, সে সেসব গোনাহে পতিত হবে– যাতে মানুষ পতিত আছে। ফলে তারা যেমন বরবাদ হয়েছে, সে-ও বরবাদ হবে। এতে কমপক্ষে ক্ষতি হচ্ছে, নেফাক তথা কপটতা অপরিহার্য হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ পরস্পরে শত্রু– এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুমি মেলামেশা করলে যদি প্রত্যেকের সাথে তার মর্জি মাফিক ব্যবহার না কর, তবে উভয়ের কাছে দুশমন বলে চিহ্নিত হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের সাথে তার মর্জি অনুযায়ী কথা বল, তবে তুমি হবে জঘন্যতম সৃষ্টি। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

تَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

'তোমরা দু'মুখো ব্যক্তিকে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ পাবে, যে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অন্য মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়।'

মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্যে সাক্ষাতের সময় আগ্রহ ও আনন্দ তো অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়। অথচ এটা মূলেই মিথ্যা অথবা অতিরিক্ত পরিমাণটি মিথ্যা হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারীকে তার কুশল জিজ্ঞাসা, তার প্রতি মায়া-মমতা প্রকাশ করাও জরুরী হয়ে থাকে। সুতরাং তুমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস কর, আপনি কেমন আছেন? বাড়ীর সকলেই ভাল তো? অথচ তাদের প্রতি কোন মনোযোগই না থাকে, তবে এটা নির্ভেজাল মোনাফেকী। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ বাড়ী থেকে বের হয়; পথিমধ্যে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন ব্যক্ত করে বলে, আমার অমুক কাজটি করে দিন। এতে বাহ্যতঃ সে খুব কৃতার্থ হয় যে, তুমি তাকে একটি কাজ করে দিতে বলেছ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে কাজটি করে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি বাড়ী ফেরার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকেও রাগান্বিত করে এবং নিজের দ্বীনকেও বরবাদ করে। সিররী সকতী বলেন ঃ যদি আমার কাছে কোন বন্ধু আসে এবং আমি তাকে দেখানোর জন্য নিজের দাড়ি হাতে পরিপাটি করি, তবে আমি আশংকা করি, আমার নাম কোথাও মোনাফেকদের তালিকায় লেখা হয়ে না যায়। ফোযায়ল একাকী মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক বন্ধু তাঁর কাছ গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন এলে? বন্ধু বলল ঃ মনোরঞ্জনের জন্যে। তিনি বললেন ঃ এটা তো আতংকের কাজ। কেননা, তুমি আমাকে দেখানোর জন্যে সাজসজ্জা করতে চাও এবং আমি তোমাকে দেখানোর জন্যে সেজেগুজে বসে থাকি। তুমি আমার খাতিরে মিথ্যা বল এবং আমি তোমার খাতিরে মিথ্যা বলি। সুতরাং এর চেয়ে ভাল হয়, তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, না হয় আমি তোমার কাছ থেকে উঠে পড়ি। জনৈক আলেম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে মহব্বত করেন, তার কাছে আপন মহব্বত গোপনও রাখতে চান। তাউস খলীফা হেশামের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ কেমন আছেন? হেশাম ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ তুমি আমাকে "আমীরুল মুমীনীন" বললে না কেন? তাউস বললেন ঃ সকল মুসলমান আপনার খেলাফতে একমত নয়। তাই আমার আশংকা হল, আমীরুল মুমীনীন বললে কোথাও আমি মিথ্যাবাদী হয়ে না যাই। যে ব্যক্তি এভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে, সে মানুষের সাথে মেলামেশা করলে দোষ নেই। নতুবা নিজের নাম মোনাফেকদের তালিকায় লেখাতে সম্মত হলে মেলামেশা করুক।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ যখন পরস্পরে মিলিত হতেন, তখন কুশল জিজ্ঞেস করা ও জওয়াব দেয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। কেননা, তাঁরা ধর্মের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন– দুনিয়ার অবস্থা নয়। সেমতে হাতেম আসাম্ম হামেদ লাফফাফকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ নিরাপদ ও সুস্থ আছি। হাতেমের কাছে এই জওয়াব ভাল মনে হল না। তিনি বললেন ঃ হামেদ, নিরাপত্তা তো পুলসেরাত পার হওয়ার পর পাওয়া যাবে এবং সুস্থতা জান্নাতে আছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, আজ আপনি কেমন? তিনি বলতেন ঃ এমন আছি, যে বস্তু আশা করি তা এগিয়ে আনতে পারি না এবং যে বস্তু ভয় করি তা পিছিয়ে নিতে পারি না। আমলের বদলে বন্ধক আছি। কল্যাণ সম্পূর্ণ অন্যের হাতে। সুতরাং কোন অভাবী আমার চেয়ে অধিক অভাবী নয়। রবী ইবনে খায়সামকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ দুর্বল গোনাহ্গার আছি। কিসমতের দানাপানি পূর্ণ করছি এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। হযরত আবু দারদাকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ দোযখ থেকে মুক্তি পেলে ভালই আছি। সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ তাঁর শোকর তাঁর সামনে করি। এক মন্দ কাজ অন্য মন্দ কাজের সামনে এবং একটি থেকে পলায়ন করে অন্যটির কাছে যাই। হযরত ওয়ায়েস করনীকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ তার অবস্থা কি জিজ্ঞেস কর, যে সন্ধ্যা হলে সকাল পাবে কিনা জানে না এবং সকাল হলে সন্ধ্যা পাবে কিনা বলতে পারে না। মালেক ইবনে দীনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ বয়স হ্রাস পাচ্ছে এবং গোনাহ্ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনৈক দার্শনিককে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ পরওয়ারদেগারের রিযিক খাচ্ছি আর তাঁর দুশমন ইবলীসের আনুগত্য করছি। কেউ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে জিজ্ঞেস করল ঃ কেমন আছেন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ আখেরাতের দিকে এক মনযিল অগ্রসর হচ্ছে, তার অবস্থা কি হবে নিজেই বুঝে নাও। হামেদ লাফফাফকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একটি দিন ও একটি রাত সহীহ সালামতে অতিবাহিত হওয়ার কামনা করছি। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনার কোন দিনই কি সহীহ-সালামতে অতিবাহিত হয় না? তিনি বললেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাফরমানী করি না, সেদিনটি সহীহ সালামতে যায়। এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলল ঃ সে ব্যক্তির অবস্থা কি হবে, যে দূরদূরান্তের সফর পাথেয় ছাড়াই অতিক্রম করতে চায়, সান্ত্বনাদাতা সাথী ছাড়া কবরে যায় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের সামনে প্রমাণ ব্যতীত উপস্থিত হয়। হাসসান ইবনে আবী সেনানকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনি কেমন? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি কেমন হবে, যে মরে যাবে, এরপর পুনরুত্থিত হবে এবং হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) জনৈক নিঃস্ব ছাপোষা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলল ঃ তার অবস্থা কি হবে, যার ঘাড়ে পাঁচশ দেরহাম ঋণ আছে এবং ঘরে অনেক পোষ্য রয়েছে? ইবনে সীরীন আপন গৃহে গেলেন এবং এক হাজার দেরহাম এনে লোকটিকে দিয়ে বললেন ঃ পাঁচশ' দেরহাম দিয়ে ঋণ শোধ করবে এবং পাঁচশ দেহাম বাল-বাচ্চাদের জন্যে রেখে দেবে। হযরত ইবনে সীরীনের কাছে তখন এই এক হাজার দেরহাম ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ আর কোন দিন কারও অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ, তিনি আশংকা করলেন, অবস্থা জিজ্ঞেস করার পর সাহায্য করতে না পারলে জিজ্ঞাসা রিয়া ও মোনাফেকী বলে গণ্য হবে।

সারকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধর্মের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে অন্তরের হাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। দুনিয়ার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে এবং অন্যের কিছু অভাব-অনটন জানা গেলে তা দূর করার জন্যে সাধ্যমতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি তাদেরকে জানি, যারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না; কিন্তু একজন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপরজনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উজাড় করে দিলে দ্বিতীয়জন তাতে বাধ সাধতেন না। এখন আমি এমন লোক দেখি, যারা একে অপরের আতিথ্য ও সমাদর এতদূর করে যে, গৃহের মুরগীর অবস্থা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে ছাড়ে না। কিন্তু একজন যদি অকপট হয়ে অপরজনের এক পয়সাও নিতে চায়, তবে সে কখনও তা দেয় না। এটা রিয়া ও মোনাফেকী ছাড়া আর কি? এর আলামত হল, যখন দু'ব্যক্তি পরস্পরে সাক্ষাৎ করে তখন একজন বলে 'মেযাজ শরীফ'– অপরজন বলে, আপনার মেযাজ লতীফ? প্রথমজন জওয়াবের অপেক্ষা করে না এবং দ্বিতীয়জন তার প্রশ্নের জওয়াব দেয় না; বরং নিজের প্রশ্ন পেশ করে। এর কারণ এটাই যে, তারা উভয়ই জানে, এটা নিছক একটা লোকদেখানো লৌকিকতার ব্যাপার। মাঝে মাঝে অন্তরে থাকে হিংসা-বিদ্বেষ, কিন্তু মুখে জিজ্ঞেস করা হয় কুশল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা 'আসসালামু আলাইকুম' বলতেন এবং তখন বলতেন, যখন অন্তর সুস্থ থাকত। এখন বলা হয়, আপনি কেমন, খোদা তা'আলা আপনাকে সুস্থ রাখুন, আপনার মেযাজ মোবারক কেমন? আল্লাহ্ আপনাকে ভাল রাখুন ইত্যাদি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলো সব বেদআতের পথে আমদানী করা হয়েছে– সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে নয়। এতে কেউ অসন্তুষ্ট হয় হোক। এরূপ বলার কারণ, তুমি যদি সাক্ষাত হওয়া মাত্রই অপরকে বল মেযাজ শরীফ, তবে এটা বেদআত। এক ব্যক্তি আবু বকর ইবনে আইয়াশকে প্রশ্ন করল ঃ মেযাজ শরীফ? তিনি তাকে জওয়াব দিলেন না এবং বললেন ঃ আমাকে এই বেদআত থেকে মাফ রাখ। মোট কথা, মেলামেশা প্রায়ই লৌকিকতা, রিয়া ও মোনাফেকী থেকে মুক্ত হয় না। এগুলোর মধ্যে কোনটি নিষিদ্ধ ও হারাম এবং কোনটি মকরূহ, নির্জনবাসের কারণে এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে ও অভ্যাসে তাদের সাথে শরীক হয় না, মানুষ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং তাকে অসহনীয় মনে করবে। তারা তার গীবত করবে এবং তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হবে। ফলে তাদের ধর্মকর্ম এ ব্যক্তির কারণে বরবাদ হবে। অন্যের ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র দেখে তার মধ্যে সেই ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া একটি গোপন ব্যাধি, যা বুদ্ধিমানরাও টের পায় না– গাফেলদের তো কথাই নেই। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তির কাছে অনেক দিন বসে, তবে তার মনের অবস্থা পূর্বের তুলনায় বদলে যাবে। অর্থাৎ, তার কাছে বসার পূর্বে তার মনে যতটুকু ঘৃণা ছিল এখন ততটুকু থাকবে না। কেননা, মন্দ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাজ দেখতে দেখতে মনের কাছে তা সহজ হয়ে যায় এবং তা যে মন্দ, তা মন থেকে মুছে যেতে থাকে। মানুষ মন্দ কাজকে গুরুতর মনে করে বলেই তা থেকে বিরত থাকে। বার বার দেখার কারণে যখন তা গুরুতর থাকে না, তখন বাধাদানকারী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ স্বয়ং সেই মন্দ কাজ করতে সম্মত হয়ে যায়। যখন মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত অন্যকে কবীরা গোনাহ করতে দেখে, সে সগীরা গোনাহ তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। এ কারণেই যে ব্যক্তি ধনীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তার উপর আল্লাহর নেয়ামতকে কম মনে করে। ধনীর সংসর্গ অবলম্বন করার কারণই হচ্ছে নিজের কাছে যা আছে তা কম মনে করা। পক্ষান্তরে ফকীরের সংসর্গ অবলম্বন করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যে সকল নেয়ামত দান করেছেন, সেগুলোকে বড় মনে করা। অনুগত ও অবাধ্যদের দিকে তাকানোর প্রভাবও তেমনি। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কেবল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দিকেই তাকায় যে, তারা এবাদত কিভাবে করেছেন, কিরূপে দুনিয়া থেকে আলাদা রয়েছেন, সে নিজেকে সব সময় সামান্য এবং নিজের এবাদতকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। ফলে সে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা অবশ্যই করবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াদারদের অবস্থা দেখবে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তাদের বিমুখতা, দুনিয়াতে ডুবে থাকা এবং গোনাহে অভ্যস্ত হওয়া, সে নিজের মধ্যে সৎ কাজের সামান্য আগ্রহ পেলেও তার কারণে নিজেকে বড় মনে করবে। এটাই ধ্বংসের পথ। মন বদলে যাওয়ার জন্য কেবল ভাল-মন্দ বিষয় শ্রবণ করা যথেষ্ট- দেখার কোন প্রয়োজনই হয় না।

নির্জনবাসের তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে, এর বদৌলতে গোলযোগ ও কলহ-বিবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এগুলোতে জড়িত না হওয়ার ফলে ধর্ম ও প্রাণ উভয়ই নিরাপদ থাকে। গোলযোগ ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে খুব কম শহরই মুক্ত। তাই যে কেউ জনপদ থেকে আলাদা থাকবে, সে গোলযোগ ইত্যাদি থেকেও নিরাপদ থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) ফেতনা ও গোলযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন- এক সময় আসবে, যখন মানুষের অঙ্গীকার বিনষ্ট হয়ে যাবে, বিশ্বস্ততা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এমন হয়ে যাবে, অতঃপর তিনি হাতের অঙ্গুলিসমূহ একটি অপরটির ভিতরে রেখে দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ এমন দুঃসময়ে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ আপন গৃহে বসে থাক, মুখ বন্ধ রাখ, যা জান তা কর, যা জান না তা বর্জন কর এবং বিশিষ্ট লোকদের পথ অনুসরণ কর- জনসাধারণের পথ বর্জন কর। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَبَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ـ

সেদিন নিকটবর্তী, যখন মুসলমানের উত্তম মাল হবে ছাগল-ভেড়ার পাল। সে এগুলোকে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিপাতের জায়গায় নিয়ে ফিরবে এবং নিজের ধর্ম নিয়ে গোলযোগ থেকে পলায়ন করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ সত্বরই এমন দিন আসবে, যখন ধার্মিকের ধর্ম নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু যে তার ধর্মকে নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এবং এক গর্ত থেকে অন্য গর্তে শৃগালের ন্যায় পালিয়ে ফিরবে, তার ধর্ম বেঁচে যাবে। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপ কখন হবে? তিনি বললেন ঃ যখন আল্লাহ্র নাফরমানী ছাড়া জীবিকা অর্জিত হবে না। এ সময় এলে কৌমার্যব্রত পালন করা ওয়াজিব হবে। প্রশ্ন হল, আপনি আমাদেরকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন। কৌমার্যব্রত কিরূপে ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন ঃ সে সময় এলে মানুষের ধ্বংস তার পিতামাতার হাতে হবে; পিতামাতা না থাকলে স্ত্রী-সন্তানের হাতে এবং তারাও না থাকলে আত্মীয়-স্বজনের হাতে হবে। লোকেরা আরজ করল ঃ এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তারা তাকে দারিদ্র্যের জন্যে ভর্ৎসনা করবে। ফলে সে সাধ্যাতীত কাজ করবে, যা পরিণামে তার ধ্বংসের কারণ হবে। এ হাদীসটি যদিও কৌমার্যব্রত সম্পর্কে, কিন্তু নির্জনবাসও এ থেকে মুক্ত থাকে না এবং জীবিকা উপার্জন গোনাহ ছাড়া করতে পারে না। আমি একথা বলি না যে, হাদীসে যে যমানার কথা বলা হয়েছে, তার সময় এটাই; বরং এটা সময়ের আগেই হয়ে গেছে। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরীর এই উক্তি প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র কসম, নির্জনবাস ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফেতনা ও "হরজের" দিনগুলোর কথা বললে আমি আরজ করলাম ঃ হরজ কি? তিনি বললেন ঃ যখন মানুষ তার সঙ্গীর তরফ থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমি আরজ করলাম ঃ যদি আমি সে সময় পাই তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ নিজের প্রাণ ও হাত বিরত রাখ এবং গৃহের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আমি বললাম ঃ যদি কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে আমার কাছে চলে আসে? তিনি বললেন ঃ আপন কক্ষে ঢুকে পড়। আমি বললাম ঃ যদি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ কক্ষের মধ্যেও এসে পড়ে? তিনি বললেন ঃ মসজিদে দাখিল হয়ে যাও এবং এমনিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। আমীর মোয়াবিয়ার খেলাফতকালে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে যখন লোকেরা যুদ্ধে বের হতে বলল, তখন তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি যুদ্ধে যাব না। হাঁ, এক শর্তে যেতে পারি তোমরা যদি আমাকে এমন তরবারি দাও, যে চোখে দেখে এবং মুখে বলে। সে কাফের দেখলে আমাকে বলে দেবে এবং আমি তাকে হত্যা করব। আর ঈমানদার দেখলে বলবে– সে ঈমানদার। আমি তাকে হত্যা করব না। তিনি আরও বললেন ঃ আমাদের ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কিছু লোক উন্মুক্ত পথে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ধূলিঝড় শুরু হয়ে গেল। ফলে পথ চেনার জো রইল না। কেউ বলল ঃ পথ ডান দিকে। কেউ কেউ সেদিকেই চলা শুরু করল এবং হতাশ হয়ে ঘুরাফেরা করল। আবার কেউ বলল ঃ পথ বাম দিকে। কেউ কেউ সে দিকে গিয়ে বিফল মনোরথ হল। কিছু লোক সেখানেই অবস্থান করল এবং ঝড় থেমে যাওয়া পর্যন্ত সবর করল। ঝড় থেমে যাওয়ার পর সঠিক পথ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। মোট কথা, হযরত সা'দ ও অন্য কতক সাহাবী গোলযোগে শরীক হলেন না এবং ফেতনা দমিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা করলেন না।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সংবাদ পেলেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইরাকের পথে রওয়ানা হয়েছেন। তিনিও রওয়ানা হলেন এবং তিন মনযিল দূরে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম বললেন ঃ ইরাক। অতঃপর তিনি ইরাক থেকে আগত চিঠিপত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্র তাঁকে দেখালেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আপনি এসব চিঠি ও প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর ভরসা করে ইরাক যাবেন না। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মানলেন না। হযরত ইবনে ওমর বললেন ঃ আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটি পছন্দ করতে বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আখেরাত পছন্দ করলেন। আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা। আল্লাহর কসম, আপনাদের মধ্য থেকে কেউ দুনিয়ার শাসক হবে না। আপনার জন্যে যা মঙ্গলজনক, তাই আপনাকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ হে শহীদ, আপনাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। তখন দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন; কিন্তু ফেতনার দিনগুলোতে চল্লিশ জনের বেশী সাহাবী এতে শরীক হওয়ার সাহস করেননি। তাউস (রহঃ) আপন গৃহে বসে রইলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে এবং শাসকরা জুলুম করতে শুরু করেছে। এসব দেখে বসে আছি। হযরত ওরওয়া (রাঃ) আকীকে অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে বসে রইলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মসজিদ ত্যাগ করে অট্টালিকায় বসে আছেন? তিনি বললেন ঃ আমি দেখলাম, তোমাদের মসজিদসমূহে ক্রীড়া-কৌতুক হয়, বাজারে এবং গলিতে অশ্লীল অনর্থক কাজ-কারবার চলে। তাই এ পথ অবলম্বন করেছি। এতে এসব বিষয় থেকে মুক্তি আছে। এসব বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, নির্জনবাসের এক উপকারিতা হচ্ছে কলহবিবাদ ও গোলযোগ থেকে নিরাপদ থাকা।

নির্জনবাসের চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, এতে মানুষের জ্বালাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষ কখনও তোমাকে গীবত করে জ্বালাতন করে, কখনও কুধারণাবশতঃ অপবাদ আরোপ করে এবং কখনও এমন প্রার্থনা করে, যা পূর্ণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মেলামেশা করলে তোমার ক্রিয়াকর্ম ও কথাবার্তা তাদের দৃষ্টির সামনে থাকে। যে কাজ ও কথার স্বরূপ তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না, তা স্মরণে রাখে এবং অনিষ্টের সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ করে দেয়। সুতরাং তুমি যদি নির্জনে থাক, তবে এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন হবে না। যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এতে সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করবে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মে শরীক হবে, তার দুশমন অবশ্যই থাকবে। সে গোপনে ষড়যন্ত্র করবে। কেননা, যে অত্যধিক দুনিয়ালোভী, সে অপরকেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। নির্জনবাসে এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। যারা নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন, তাদের উক্তি থেকেও এরূপ আভাস পাওয়া যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে পরীক্ষা করে নাও, যাতে তাকে শত্রু মনে না কর। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নির্জনবাসে কুসঙ্গী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-কে কেউ বলল ঃ ব্যাপার কি, আপনি মদীনা মোনাওয়ারায় গমন করেন না? তিনি বললেন ঃ এখন সেখানে যারা রয়ে গেছে, তারা নেয়ামত দেখে হিংসা করে অথবা অপরের কষ্ট দেখে আনন্দিত হয়। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু আমাকে পত্রে এই বিষয়বস্তু লেখেছে– মানুষ আগে ওষুধ ছিল, যদ্দ্বারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমরা চিকিৎসা করতাম। কিন্তু এখন মানুষ এমন ব্যাধি হয়ে গেছে, যার কোন চিকিৎসা নেই। অতএব তাদের কাছ থেকে পলায়ন কর, যেমন সিংহ দেখে পলায়ন করে থাক। জনৈক আরব সদাসর্বদা একটি বৃক্ষের কাছে থাকত এবং বলত ঃ আমার এই সঙ্গী তিনটি স্বভাব রাখে। আমি কথা বললে সে তা অপরের কানে পৌঁছায় না। আমি তার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করলেও সে বরদাশত করে। আমি অশালীন কাজ করলে সে ক্রুদ্ধ হয় না। হযরত হাসান বলেন ঃ আমি হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা করলে খ্যাতনামা ওলীআল্লাহ্ সাবেত বানানী সংবাদ পেয়ে বললেন ঃ আমি আপনার সাথে হজ্জে যেতে চাই। আমি বললাম ঃ মিয়া সাহেব, আল্লাহর দেয়া পর্দার মধ্যে থাকাই আমাদের জন্য উত্তম। আমার আশংকা হয়, এক সাথে থাকলে একের কাছে অপরের এমন অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়বে, যাতে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব উক্তি থেকে নির্জনবাসের আর একটি উপকারিতা জানা যায়। তা হল দ্বীনদারী, সৌজন্য, চরিত্র, ফকিরী ইত্যাদির সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দোষ গোপন থাকে। মানুষ তার দ্বীন ও দুনিয়ার ক্রিয়াকর্মে এমন দোষ অবশ্যই রাখে, যা গোপন রাখাই ইহকাল ও পরকালে তার জন্যে উপযুক্ত। এই দোষ প্রকাশ হয়ে পড়লে নিরাপত্তা বাকী থাকে না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আগেকার লোক কাঁটাবিহীন পত্র ছিল; কিন্তু আজকালকার লোক পত্রবিহীন কাঁটা। হযরত আবু দারদার যমানা ছিল প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তখন যদি এই অবস্থা হয়, তবে তাঁর পরবর্তীকালে অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মালেক ইবনে দীনারের খেদমতে পৌঁছে দেখি তিনি একাকী বসে আছেন। একটি কুকুর তাঁর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আমি কুকুরটিকে তাড়াতে চাইলে তিনি বললেন ঃ একে কিছু বলো না। সে কাউকে কষ্ট দেয় না। সে কুসঙ্গীর চেয়ে উত্তম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং লোকজন থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তারা উটে আরোহণ করলে উটের পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, ঘোড়ায় সওয়ার হলে তার কোমর ব্যথিত করে এবং ঈমানদারদের অন্তরে স্থান করলে তাকে বিনষ্ট করে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পরিচিতজনের সংখ্যা হ্রাস কর। তোমার অন্তর ও দ্বীনদারী নিরাপদ থাকবে। হক হালকা হবে। কারণ, পরিচিতজন যত বেশী হবে, হকও ততই বেশী হবে এবং সকল হক আদায় করা দুঃসাধ্য হবে। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ যাকে চেন, তার কাছে অপরিচিত হয়ে যাও এবং যাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চেন না, তার সাথে আর পরিচয় করো না।

নির্জনবাসের পঞ্চম উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে কেউ তোমার কাছে কিছু আশা করবে না এবং তুমিও অন্যের কাছে আশা করবে না। মানুষের আশা ছিন্ন হওয়া একটি নেহায়েত উপকারী বিষয়। কেননা, মানুষকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর নয়। কাজেই নিজের সংশোধনে ব্যাপৃত থাকাই উত্তম। নিম্নতম ও সহজ হক হচ্ছে জানাযায় যাওয়া, অসুখে-বিসুখে হাল জিজ্ঞেস করা, ওলীমা ও বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হওয়া। এগুলোর মধ্যে আছে অনর্থক সময় নষ্ট করা এবং বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া। মাঝে মাঝে এমনও হয়, মানুষ এগুলোর মধ্যে কতক হক আদায় করতে সক্ষম হয়। ওযর যদিও গ্রহণীয় হয়ে থাকে, কিন্তু কতক ওযর প্রকাশ করার যোগ্য হয় না। ফলে হকদার এ কথাই বলে, তুমি অমুকের হক আদায় করেছ এবং আমার হক আদায় করনি। এটাই শত্রুতার কারণ হয়ে যায়। সেমতে বলা হয়, যে ব্যক্তি রোগীর হাল জিজ্ঞেস করে না, সে চায়, রোগী মারা যাক, যাতে আরোগ্য লাভের পর তার কাছে লজ্জিত হতে না হয়। যে ব্যক্তি কারও সুখে-দুঃখে শরীক হয় না তার প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যে একজনের কাজে শরীক হয় এবং অন্য জনের কাজে শরীক হয় না, তাকে কেউ ভাল বলে না। যদি কেউ দিবারাত্র সর্বক্ষণ হক আদায়ে ব্যাপৃত থাকে, তবুও সকল হক আদায় করতে পারবে না। যার দ্বীন অথবা দুনিয়ার কোন ব্যস্ততা আছে, সে কিরূপে সকল হক আদায় করবে? হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধব বেশী থাকার মানে কর্জদাতা বেশী থাকা; অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধব যত বেশী হবে, তত বেশী হক আদায় করতে হবে। অন্যের কাছ থেকে তোমার আশা বিচ্ছিন্ন হওয়াও কম উপকারী বিষয় নয়। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার বাহার ও সাজসজ্জা দেখে, তার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাসনা থেকে লালসার উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ লালসায় ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ফলে কষ্ট ভোগ করতে হয়। নির্জনবাস অবলম্বন করলে দেখার সুযোগ হবে না। ফলে লোভ-লালসাও হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ -

অর্থাৎ, বিভিন্ন মানুষকে আমি যে ভোগ্যসামগ্রী দান করেছি, তুমি তার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করো না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انظروا إلى من هو دونكم ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليكم

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তার দিকে তাকাও, যে তোমার চেয়ে কম এবং তার দিকে তাকিয়ো না, যে তোমার চেয়ে বেশী। এটা তোমার উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে না করার পক্ষে সহায়ক।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি প্রথমে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বসতাম। ফলে সর্বদা মনঃক্ষুণ্ণ ও উদাস থাকতাম। এরপর আমি ফকীরদের সংসর্গ অবলম্বন করলাম। এখন বেশ সুখে আছি। কথিত আছে, মুযনী (রহঃ) একদিন ফুসতাতের জামে মসজিদের দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলেন, এমন সময় ইবনে আবদুল হাকাম তার বাহিনী সমভিব্যাহারে সেখান দিয়ে গমন করল। মুযানী তার অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্যে পরীক্ষা করেছি তোমরা সবর কর কি না তা দেখার জন্যে।

মুযনী বললেন ঃ হাঁ আমি সবর করব। তিনি ছিলেন নিঃস্ব ব্যক্তি। মোট কথা, যে আপন গৃহে থাকে, সে এ ধরনের পরীক্ষায় পড়ে না।

নির্জনবাসের ষষ্ঠ উপকারিতা হচ্ছে, এতে অভদ্র ও নির্বোধদেরকে দেখা এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার কষ্টভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরূপ লোকদেরকে দেখা যেন অর্ধেক অন্ধত্ব। আ'মাশকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার চক্ষু ঝলসে গেছে কেন? তিনি বললেন ঃ ঝগড়াটে লোকেদেরকে দেখার কারণে। কথিত আছে, ইমাম আবু হানীফাও আ'মাশের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন, এর বিনিময়ে তাকে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন। আপনি বিনিময়ে কি পেয়েছেন? আ'মাশ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন ঃ চোখের বিনিময়ে আমাকে এই দিয়েছেন যে, আমাকে ভারী লোকদের দেখা থেকে রক্ষা করেছেন। আপনিও তাদের একজন। ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছিল, একবার ভারী ব্যক্তিকে দেখে সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

প্রথমোক্ত উপকারিতা বাদে বাকীগুলো জাগতিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ধর্মের সাথেও এগুলোর সম্পর্ক হতে পারে। কেননা, মানুষ যখন ভারী লোককে দেখে কষ্ট পাবে, তখন তার গীবত করতে শুরু করবে। এটা পরিণামে ধর্মের জন্যে অনিষ্টকর। নির্জনবাসে এসব অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যায়।

অনিষ্ট ঃ এখন আমরা নির্জনবাসের অনিষ্ট বর্ণনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য অপরের সাহায্যে অর্জিত হয়, সেগুলো মেলামেশা ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। বলাবাহুল্য, নির্জনবাস অবলম্বন করলে এ সকল উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে। এগুলোর ফওত হওয়াই নির্জবাসের ক্ষতি। এখন মেলামেশার উপকারিতাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, নির্জনবাসের কারণে এতগুলোর উপকারিতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এগুলোই হচ্ছে নির্জনবাসের অনিষ্ট তথা বিপদ। নিম্নে বিপদগুলো এক একটি করে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

নির্জনবাসের প্রথম বিপদ হচ্ছে, এতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ফওত হয়ে যায়, যার ফযীলত আমরা এলেম অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি। এই উভয় কাজ দুনিয়াতে বড় এবাদতসমূহের অন্যতম। মেলামেশা ছাড়া এগুলো সম্ভবপর নয়। হাঁ, এটা ঠিক যে, শিক্ষার অনেক প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কতক জরুরী নয়। যে শিক্ষা অর্জন করা মানুষের উপর ফরয, তা যদি না শেখে এবং নির্জনবাস অবলম্বন করে, তবে গোনাহগার হবে। যদি ফরয পরিমাণে শিখে নেয়, এরপর এবাদত করতে মনে চায়, তবে নির্জনবাস করতে দোষ নেই। আর যদি কেউ বর্ণনাগত ও যুক্তিগত সকল শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করার ক্ষমতা রাখে, তার জন্যে সেগুলো শিক্ষা করার পূর্বে নির্জনবাস অবলম্বন করা নেহায়েত ক্ষতির কথা। এ কারণেই ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য বুযুর্গ বলেন ঃ প্রথমে আলেম হও, এরপর নির্জনবাসী হও। যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভের পূর্বে নির্জনবাসী হয়, সে প্রায়ই নিদ্রায় অথবা অন্য কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চিন্তায় আপন মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে। বেশীর বেশী সে সম্পূর্ণ সময় ওযিফার মধ্যে ডুবে থাকে এবং দৈহিক আমল করতে থাকে; কিন্তু অন্তর নানারকম প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তার প্রচেষ্টা নিষ্ফল এবং আমল বাতিল করতে থাকে; অথচ সে টেরও পায় না। সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাতের বিশ্বাসে নানা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে মন ভুলিয়ে রাখে এবং প্রায়ই নানা দুষ্ট কুমন্ত্রণার সম্মুখীন হয়। ফলে সে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং মনে মনে নিজেকে "আবেদ" মনে করতে থাকে। মোট কথা, শিক্ষা ধর্মকর্মের মূল শিকড় এবং অজ্ঞ জনসাধারণ ও মূর্খদের নির্জনবাসে কোন কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নির্জনে এবাদত করার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয় এবং নির্জনে কি কি বিষয় জরুরী, তা জানে না, তার নির্জনবাসে কোন উপকার নেই। কেননা, মানুষের নফস রোগীর মতই বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসার মুখাপেক্ষী। যদি কোন মূর্খ রোগী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে থাকে, সে নিঃসন্দেহে কেবল রোগযন্ত্রণাই ভোগ করে যাবে। সুতরাং আলেম ব্যতীত অন্য কারও জন্যে নির্জনবাস সমীচীন নয়। শিক্ষাদান কার্যেও বিরাট সওয়াব আছে, যদি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের নিয়ত সঠিক হয়। এ যুগে আলেমরা যদি ধর্মের নিরাপত্তা কামনা করে, তবে নির্জনবাস অবলম্বন করুক। কেননা, আজকাল এমন কোন শিক্ষার্থী দৃষ্টিগোচর হয় না, যে ধর্মের উপকারের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করে। আজকাল শিক্ষার্থীরা কেবল মসৃণ কথাবার্তা অন্বেষণ করে, যদ্দ্বারা ওয়াযে জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে অথবা সমসাময়িকদেরকে পেছনে ফেলে দেয়ার জন্যে, শাসকবর্গের নৈকট্য লাভের জন্যে এবং গর্ব ও আত্মম্ভরিতার স্থলে ব্যবহার করার জন্যে তারা মুনাযারা তথা বিতর্কের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে। ফেকাহ্ সম্বন্ধীয় রেওয়ায়েতসমূহের উপর ভিত্তি করে ফতোয়াদান শিক্ষা আজকাল সর্বাধিক জনপ্রিয়। কিন্তু প্রায়শঃ সমসাময়িকদের অগ্রে থাকা এবং সরকারী পদ লাভ করে অর্থ সঞ্চয় করাই এ শিক্ষা অর্জনের কারণ হয়ে থাকে। অতএব এ ধরনের শিক্ষার্থীদের থেকে বেঁচে থাকাই ধর্ম ও সাবধানতার দাবী। যদি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়, যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার কাছে শিক্ষা গোপন করা কবীরা গোনাহ। এরূপ শিক্ষার্থী পাওয়া গেলেও বড় বড় শহরে দু'একজনের বেশী পাওয়া যায় না। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আমরা অন্য উদ্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; কিন্তু আমাদের শিক্ষা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উদ্দেশের জন্য নিবেদিত হতে অস্বীকার করেছে। এ উক্তি দ্বারা ধোঁকা খেয়ে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আলেম ব্যক্তি অন্য উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করলেও পরবর্তীতে তারা আল্লাহ্র দিকে রুজু করে। কেননা, অধিকাংশ আলেমের অবস্থা আমাদের সামনেই রয়েছে। তারা দুনিয়ার অন্বেষণেই মৃত্যুবরণ করে এবং এ লালসায়ই জীবনপাত করে। সংসারবিমুখ আলেম খুব কমই দেখা যায়। এখন আমরা শুনা কথার উপর ভরসা করব, না দেখা ঘটনা বিশ্বাস করব। কথায় বলে, শুনা কথা দেখা ঘটনার মত বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। এছাড়া সুফিয়ান সওরী যে শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেটা হচ্ছে হাদীস, তফসীর এবং পয়গম্বর ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত শিক্ষা। এসব শিক্ষা খোদাভীতির কারণ হয়ে থাকে। এগুলো আপাততঃ প্রভাবশালী না হলেও পরবর্তীতে প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কিন্তু কালাম ও ফেকাহ্ শিক্ষা এরূপ নয়। এগুলো যারা দুনিয়া লাভের নিয়তে শিক্ষা করে, তারা আজীবন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুনিয়ালোভীই থেকে যায়। সম্ভবতঃ এই কিতাবে আমরা যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি, যদি শিক্ষার্থী দুনিয়ালাভের নিয়তেই এগুলো শিক্ষা করে, তবে তাকে অনুমতি দেয়া যায়। কেননা, আশা করা যায়, শেষ বয়সে সে সঠিক পথে ফিরে আসবে। কারণ, এই কিতাব আল্লাহ্ তাআলার ভয় সৃষ্টি করা, আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। এসব বিষয়বস্তু হাদীস ও কোরআনে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। কালাম ও ফেকাহ্ শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় না।

সুতরাং শিষ্য সংখ্যা কম করা এবং নির্জনবাস অবলম্বন করার মধ্যেই সবধানতা নিহিত। যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়তে শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত, তার জন্যে এ যুগে আপন কাজ পরিত্যাগ করাই উত্তম। কেননা, আবু সোলায়মান খাত্তাবী এ যুগের সঠিক চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন– যারা তোমার কাছে বসতে এবং পড়াশুনা করতে আগ্রহী, তাদেরকে বর্জন কর। তুমি তাদের কাছ থেকে অর্থ ও সুনাম কিছুই পাবে না। তারা বাহ্যতঃ বন্ধু হলেও অন্তরে দুশমন। যখন তোমাকে দেখে, তখন খোশামোদ করে এবং পশ্চাতে মন্দ বলে। কাছে এসে তোমার ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে এবং বাইরে গিয়ে তোমার কুৎসা রটনা করে। শিক্ষা অর্জন করা এদের উদ্দেশ্য নয়; বরং জাঁকজমক ও অর্থোপার্জনই এদের লিপ্সা। তারা তোমাকে নিজেদের মতলব হাসিলের সিঁড়ি বানাতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য সাধনে তোমার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তারা তোমার ঘোর শত্রু হয়ে যায়। তারা চায়, তুমি তোমার ইযযত, ধর্ম সব তাদের জন্যে ব্যয় কর। অর্থাৎ, তাদের শত্রুকে শত্রু মনে কর এবং তাদের প্রবঞ্চনায় সাহায্য কর। তাদের মর্জি, তুমি আলেম হয়ে তাদের জন্যে বোকা হও এবং অনুসৃত ও সরদার হয়ে তাদের হীন অনুসারী হও। এ কারণেই বলা হয়, অজ্ঞদের থেকে সরে থাকা পূর্ণ মনুষ্যত্ব।

নির্জনবাসের দ্বিতীয় বিপদ, এতে নিজে উপকার লাভ করা ও পরোপকার করা ফওত হয়ে যায়। নিজে উপকার লাভ করা লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটা মেলামেশা ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব যে ব্যক্তি লেনদেন ও উপার্জনের মুখাপেক্ষী, সে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নির্জনবাস বর্জনকারী হবে। লেনদেনে যদি শরীয়তের নিয়ম কানূন মেনে চলতে চায়, তবে মেলামেশা সুকঠিন হবে। যদি কারও কাছে এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, মিতব্যয়ী হলে যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে তার জন্যে নির্জনবাস উত্তম। কেননা, এখন গোনাহ ছাড়া জীবিকা উপার্জনের কোন পথ নেই। হাঁ, যদি কেউ হালাল উপায়ে উপার্জন করে দান-খয়রাত করতে চায়, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা সেই নির্জনবাস থেকে উত্তম, যা কেবল নফল এবাদতের জন্যে অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সেই নির্জনবাস থেকে উত্তম নয়, যা আল্লাহর মারেফত ও শরীয়ত শাস্ত্রের গবেষণার জন্যে অবলম্বন করা হয়। পরোপকার অর্থ ব্যয় করে অথবা দৈহিক খেদমতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, খাঁটি নিয়তে পারিশ্রমিক ছাড়া মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানোর অশেষ সওয়াব আছে। কিন্তু মেলামেশা ছাড়া এটা হতে পারে না। অতএব যে মানুষের কাজ করে দিতে সক্ষম, এর সাথে শরীয়তের সীমাও লজ্ঘন না করে, তার জন্যে মেলামেশা নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম।

নির্জনবাসের তৃতীয় বিপদ, এতে সংশোধিত হওয়া ও সংশোধন করা ফওত হয়ে যায়। সংশোধিত হওয়া দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য নফসের সাধনা করা এবং মানুষের জ্বালাতন সহ্য করা, যাতে নফস শিথিল হয়ে যায় এবং কামভাব দমিত হয়। নফসের এরূপ হওয়াও মেলামেশা ছাড়া হতে পারে না। যার চরিত্র মার্জিত নয় এবং কামভাব শরীয়তের সীমার অনুগত নয়, তার জন্যে নির্জনবাসের চেয়ে মেলামেশা উত্তম। এ কারণেই খানকায় যারা সূফীদের খেদমত করে, তারা এ কাজটি ভাল বুঝে। মানুষের কাছে সওয়াল করার কারণে তাদের নফসের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যায় এবং সূফীগণের দোয়া দ্বারা বরকত লাভ হয়। অতীত যুগের শুরুতে এ খেদমতের এটাই ছিল কারণ। এখন এতে কুউদ্দেশ্য শামিল হয়ে গেছে। এখন খেদমতের জন্যে বলার কারণ হচ্ছে অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনেক ধনসম্পদ লাভ করা। যদি খেদমতের নিয়ত তাই হয়, তবে এর চেয়ে নির্জনবাসই উত্তম, যদিও কোন কবরের কাছে হয়। আর যদি বাস্তবেই নফসের অহমিকা দূর করার নিয়ত থাকে, তবে সে সাধনার মুখাপেক্ষী, তার জন্যে এই খেদমত নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম। আধ্যাত্ম পথের শুরুতে সাধনার প্রয়োজন হয়। সাধনা অর্জিত হওয়ার পর এটা বুঝতে হবে যে, ঘোড়াকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশেই শিক্ষা দেয়া হয় না; বরং পথ অতিক্রমের জন্যে সওয়ারী করা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়ার জন্যে শিক্ষা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মানুষের দেহ তার অন্তরের সওয়ারী। এতে সওয়ার হয়ে অন্তর আখেরাতের পথ অতিক্রম করে। এতে অনেক কামনা-বাসনা আছে বিধায় সওয়ারী পথিমধ্যে অবাধ্য হয়ে যেতে পারে। তাই সাধনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সওয়ারীই। সুতরাং কেউ যদি সারা জীবন সাধনার মধ্যে অতিবাহিত করে দেয়, তবে সে হবে সেই ব্যক্তির মত, যে সারা জীবন ঘোড়াকে শিক্ষা দেয় এবং তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পিঠে সওয়ার হয়ে পথ অতিক্রম করে না। এমতাবস্থায় ঘোড়ার শিক্ষিত হওয়ার উপকার এটাই হবে যে, সে ঘোড়ার কামড় ও লাথি মারা থেকে নিরাপদ থাকবে। যদিও এ উপকারটিও উদ্দেশ্য; কিন্তু এরূপ উপকার তো মৃত জন্তু থেকেও অর্জিত হয়। ঘোড়া তো রাখা হয় সেটির দ্বারা জীবনে কিছু কাজ নেয়ার জন্যে। এমনিভাবে দেহের কামনা বাসনা থেকে মুক্তি তো নিদ্রা ও মৃত্যু দ্বারাও অর্জিত হয়। কিন্তু কেবল কামনা বাসনা বর্জনই উদ্দেশ্য নয়; বরং এরপর আখেরাতের পথ অতিক্রম করাও উদ্দেশ্য। সুতরাং কামনা বাসনা বর্জন ও কেবল সাধনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের উচিত নয়। কাজেই সাধনার পর কি করতে হবে, সেটা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে এসে নির্জনবাস তার জন্যে মেলামেশার তুলনায় অধিক সহায়ক হবে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির জন্যে শুরুতে মেলামেশা উত্তম এবং পরিণামে নির্জনবাস উত্তম।

সংশোধন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অপরকে সাধনায় লিপ্ত করা; যেমন মুরশিদগণ সূফীগণের সাথে করে থাকেন। এটাও মেলামেশা ছাড়া হতে পারে না। অর্থাৎ মুরশিদ যে পর্যন্ত মুরীদদের সাথে মেলামেশা না করে, তাদের সংশোধন করতে সক্ষম হবে না।

নির্জনবাসের চতুর্থ বিপদ, এতে অপরের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ সঙ্গ হাসিল করা ও অপরকে বন্ধুসুলভ সঙ্গ দেয়া ফওত হয়ে যায়। এটা সেই ব্যক্তির কাম্য হয়, যে ওলীমা, ভোজসভা ও মনোরঞ্জনের জায়গায় যায় না। এর পরিণাম বিলাসগত আনন্দ এবং কখনও ধর্মপরায়ণতাও হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মাশায়েখের কাছ থেকে সঙ্গ হাসিল করে এ কারণে যে, তারা সর্বদা খোদাভীতি ও পরহেযগারীর মধ্যে মগ্ন থাকে। কাজেই তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা দেখে বন্ধুসুলভ সঙ্গ লাভ করা মোস্তাহাব।

নির্জনবাসের পঞ্চম বিপদ, মানুষ নিজে সওয়াব পাওয়া ও অপরকে সওয়াব পৌঁছানো থেকে বঞ্চিত থাকে। নিজে সওয়াব পাওয়ার উপায় হচ্ছে জানাযায় যাওয়া, রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা, ঈদের নামাযে শরীক হওয়া, জুমুআয় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। যে নির্জনবাস করে, তার জন্যে সকল নামাযের জামাতে যোগদান করা জরুরী। জামাত বর্জন করার অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। হাঁ, জামাতের সওয়াব না পাওয়ার সমতুল্য কোন বাহ্যিক ক্ষতির আশংকা থাকলে জামাত বর্জন করা যায়। কিন্তু এরূপ কমই হয়ে থাকে। অপরকে সওয়াব পৌঁছানোর উপায়, নিজের দরজা খোলা রাখবে, যাতে রুগ্ন অবস্থায় মানুষ এসে তার হাল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিজ্ঞেস করে এবং বিপদে সান্ত্বনা ও আনন্দে মোবারকবাদ দেয়। কেননা, এতে মানুষ সওয়াব পায়।

নির্জনবাসের ষষ্ঠ বিপদ, এতে বিনয় ফওত হয়ে যায়। নির্জনতা অবলম্বনের কারণ কখনও অহংকারও হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈলের জনৈক দার্শনিক দর্শন শাস্ত্রে তেষট্টিটি পুস্তক রচনা করেছিল। এরপর তার ধারণা হল, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তার নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, অমুক ব্যক্তিকে বলে দাও সে তার বকবক দ্বারা সারা পৃথিবী ভরে দিয়েছে। আমি এর মধ্য থেকে কিছুই কবুল করি না। দার্শনিক নির্জনবাস অবলম্বন করল এবং মাটির নিচে কুঠরীতে চলে গেল। অতঃপর মনে মনে বলল ঃ আমি এবার পরওয়ারদেগারের মহব্বতে পৌঁছে গেছি। আল্লাহ তাআলা নবীর প্রতি আবার ওহী পাঠালেন, তাকে বলে দাও, সে আমার সন্তুষ্টি পাবে না যে পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা এবং তাদের জ্বালাতন সহ্য না করে। অতঃপর সে মানুষের সাথে মেলামেশা করল, তাদের কাছে বসল, সঙ্গে আহার করল এবং বাজারে ঘুরাফেরা করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, তাকে বলে দাও, সে আমার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, কিছু লোকের নির্জনবাসের কারণ অহংকারই হয়ে থাকে। তারা এজন্যে মজলিসে যায় না যে, কেউ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না এবং অগ্রে বসাবে না। কিংবা তারা মনে করে, মানুষের সাথে মেলামেশা না করলে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। কিছু লোক এ জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করে যে, মেলামেশার কারণে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং দরবেশী ও এবাদতের যে বিশ্বাস তাদের প্রতি রয়েছে, তা খতম হয়ে যাবে। ফলে তারা তাদের গৃহকে আপন কুকর্মের জন্যে আড়াল করে নেয়। তারা গৃহে কোন সময়ই যিকির ফিকিরে ব্যয় করে না। তাদের পরিচয় হচ্ছে, স্বয়ং কারও কাছে যাওয়া পছন্দ করে না; কিন্তু অন্যরা তাদের কাছে আসুক, এটা খুব কামনা করে। বরং জনসাধারণ ও আমীর ওমরারা তাদের দরজায় সমবেত হলে এবং তাদের হস্ত চুম্বন করলে তারা অত্যন্ত খুশী হয়। এসব লোক যদি এবাদতে মশগুল থাকার কারণে মেলামেশা ঘৃণা করত, তবে নিজের যাওয়া যেমন তাদের কাছে ভাল মনে হত না, তেমনি অপরের আগমনও তারা অপছন্দ করত; যেমন ফোযায়ল (রহঃ)-এর অবস্থা এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে, তিনি বন্ধুকে দেখে বললেন ঃ তুমি শুধু এ জন্যে এসেছ যে, আমি তোমার সামনে সেজে বসে থাকি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং তুমি আমার সামনে। অথবা যেমন হাতেম আসাম্ম তাঁর সাথে সাক্ষাৎকামী আমীরকে বলেছিলেন ঃ আমার প্রয়োজন, না আমি তোমাকে দেখব, না তুমি আমাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি একাকিত্বে আল্লাহর যিকিরে মশগুল নয়, তার নির্জনবাসের কারণ এটাই যে, সে অতি মাত্রায় মানুষের সাথে মশগুল আছে; অর্থাৎ তার মন চায়, মানুষ তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখুক। এরূপ নির্জনবাস কয়েক কারণে মূর্খতা। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শিক্ষা ও ধর্মকর্মে বড় হয়, মেলামেশা ও বিনয়ের কারণে তার মর্যাদা হ্রাস পায় না। সেমতে হযরত আলী (রাঃ) খোরমা ও লবণ বাজার থেকে আপন কাপড়ে ও হাতে বহন করে আনেন। হযরত আবূ হোরায়রা, হোযায়ফা, উবাই ইবনে কাব ও ইবনে মসউদ (রাঃ) খড়ির বোঝা ও আটার পুটলি কাঁধে বহন করে আনতেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) যখন শাসনকর্তা ছিলেন, তখন খড়ির বোঝা মাথায় বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন– তোমাদের আমীরকে পথ দাও। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওদা ক্রয় করতেন এবং নিজেই গৃহে নিয়ে যেতেন। কোন কোন সাহাবী আরজ করতেন, আমার হাতে দিন। আমি নিয়ে যাই। তিনি বলতেন ঃ বস্তুর মালিক তা নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার। হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ভিক্ষুকদের কাছ দিয়ে গমন করতেন। তারা রুটির টুকরা ভক্ষণ করত এবং বলত সাহেবজাদা! থামুন, আমাদের সাথে আহার করুন। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং পথে বসে তাদের সাথে আহার করতেন। এরপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ যারা মানুষের সন্তুষ্টি ও ভক্তিশ্রদ্ধা কামনা করে, তারা বিভ্রান্ত। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থ চিনতে পারলে বুঝতে পারবে, মানুষ দ্বারা কোন কিছু হয় না। লাভ-লোকসান, উপকার ক্ষতি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। সহল তস্তরী তাঁর জনৈক মুরীদকে বললেন ঃ তুমি অমুক আমল কর। মুরীদ বলল ঃ লোকলজ্জার কারণে আমি এটা করতে পারি না। তিনি সকল মুরীদকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ দু'টি গুণের মধ্য থেকে একটি গুণে গুণান্বিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ মারেফতের স্বরূপ জানতে পারে না– হয় মানুষ তার দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে এবং দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারকে ছাড়া কাউকে দেখবে না, অন্য কাউকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে করবে না; না হয় তার নফস তার অন্তরের সামনে তুচ্ছ হয়ে যাবে। মানুষ কি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবস্থায় তাকে দেখবে, এ ব্যাপারে সে নফসের পরওয়া করবে না। হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ এমন কেউ নেই, যার বন্ধু ও শত্রু নেই। অতএব যে আল্লাহ্র অনুগত তার সাথে থাকা ভাল। হযরত হাসান বসরীকে কেউ বলল ঃ আপনার মজলিসে কিছু লোক আসে। উদ্দেশ্য, আপনি ওয়াযে কোথায় কোথায় ভুল করেন তা লক্ষ্য করতে এবং আপনাকে প্রশ্ন করে করে বিরক্ত করতে। তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ এটা খারাপ মনে করো না। আমি আমার নফসকে জান্নাতে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে রেখেছি। আমি এ বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী। আমি কখনও বলিনি যে, মানুষের মুখ থেকে অক্ষত থাকব। কারণ, আমি জানি, আল্লাহ তাআলা যিনি মানুষের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা এবং মৃত্যুদাতা, তিনিও মানুষ থেকে অক্ষত নন। অতএব আমি অক্ষত থাকব কিরূপে? হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন ঃ ইয়া রব, মানুষের রসনাকে আমা থেকে ফিরিয়ে রাখ। আদেশ হল ঃ হে মূসা, এটা তো এমন বিষয়ের প্রার্থনা, যা আমি নিজের জন্যে পছন্দ করিনি- তোমার জন্যে কিরূপে করব? আল্লাহ তাআলা হযরত ওযায়র (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠান- আমি তোমাকে মানুষের মুখে মেসওয়াকের মত করব, তারা তোমাকে চর্বণ করবে- এটা যদি তুমি পছন্দ না কর, তবে তোমাকে আমার কাছে বিনয়ীদের মধ্যে লেখব না। সারকথা, মানুষ ভাল বিশ্বাস রাখুক, সাধু বলুক, এ উদ্দেশে যে ব্যক্তি নিজেকে গৃহে আবদ্ধ রাখে, সে দুনিয়াতেও ক্লেশ ভোগ করে এবং আখেরাতেও আযাব থেকে নিস্তার পাবে না। নির্জনবাস এমন ব্যক্তির জন্যেই মোস্তাহাব, যে সদা-সর্বদা পরওয়ারদেগারের যিকির, ফিকির, এবাদত ও মারেফতে ডুবে থাকে।

নির্জনবাসের সপ্তম বিপদ, এতে অভিজ্ঞতা ফওত হয়ে যায়, যা মানুষের সাথে মেলামেশা ও তাদের প্রাত্যহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি-বিবেক, ইহকাল ও পরকালের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং উপযোগিতা অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পটু নয়; তার নির্জনবাসে কোন কল্যাণ নেই। তাই প্রথমে লেখাপড়া শিখতে হবে। এ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যাবে এবং এতটুকু যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট অভিজ্ঞতা পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনার মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে- মেলামেশার প্রয়োজন নেই। যেসকল অভিজ্ঞতা অধিক জরুরী, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের নফ্স, চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ পরীক্ষা করা। এটা নির্জনতায় হতে পারে না। উদাহরণতঃ যার মধ্যে হিংসা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিদ্বেষ আছে, সে নির্জনে বাস করলে তার হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে না। মানুষের এসব গুণাগুণ অত্যন্ত মারাত্মক, যা পরীক্ষার মাধ্যমে দূর করা ওয়াজিব। যেসব কারণে হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো থেকে দূরে থেকে হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিকার সম্ভব নয়। কেননা, হিংসা বিদ্বেষের গুণাগুণসম্পন্ন অন্তর ফোঁড়া সদৃশ, যার মধ্যে পুঁজ ও রক্ত ভর্তি থাকে। ফোঁড়া নাড়া না দিলে কিংবা হাত না লাগালে ফোঁড়ার ব্যথা অনুভব হবে না। এখন যদি নাড়া দেয়ার কোন লোক ফোঁড়ার কাছে না থাকে, তবে যার ফোঁড়া, সে নিজেকে সুস্থই মনে করবে, কিন্তু কেউ নাড়া দিলে ফোঁড়া থেকে পুঁজ ও দূষিত পদার্থ বের হতে থাকবে; যেমন আবদ্ধ পানি ফোয়ারা দিয়ে বের হতে থাকে। এমনিভাবে যে অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, কৃপণতা, ক্রোধ ও অন্যান্য কুচরিত্র ভর্তি থাকে, সেই অন্তরকে নাড়া দিলেই এসব কুচরিত্র ফুটে উঠতে থাকে। এ কারণেই যারা আধ্যাত্ম পথের পথিক, তারা আপন নফসের পরীক্ষা নিতেন। পরীক্ষার পর যদি নফসের মধ্যে অহংকার দেখতেন, তবে পানির মশক কোমরে বেঁধে অথবা খড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে ফিরতেন, যাতে নফস থেকে অহংকার দূর হয়ে যায়। মোট কথা, নফসের বিপদ ও শয়তানের চক্রান্ত গোপন থাকে। খুব কম লোকই এগুলো জানে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ত্রিশ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছিলেন; অথচ এগুলো তিনি জামাতের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আদায় করেছিলেন। এই পুনরায় পড়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ একদিন আমি ওযরবশতঃ পেছনে পড়ে গেলাম এবং প্রথম সারিতে স্থান পেলাম না। আমি দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ালাম। পেছনে পড়ার কারণে কিছু লোক আমার দিকে তাকাচ্ছিল। এতে আমার নফস লজ্জা অনুভব করছিল। তখন আমি জানলাম, আমার অতীত নামাযগুলো রিয়া মিশ্রিত ছিল। সারকথা, মেলামেশার একটি বড় ও সুস্পষ্ট উপকারিতা হচ্ছে, এতে নিন্দনীয় গুণসমূহ জানা হয়ে যায়। এ জন্যেই বলা হয়, সফর চরিত্র প্রকাশ করে দেয়। কেননা, সফরও এক প্রকার মেলামেশা– যা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়।

নির্জনবাসের উপকারিতা ও বিপদাপদ জানার পর একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নির্জনবাস উত্তম কিংবা উত্তম নয়– সর্বাবস্থায় একথা বলা নিতান্তই ভুল; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার অবস্থা, তার সঙ্গী ও সঙ্গীর অবস্থা দেখা উচিত। আরও দেখা উচিত, মেলামেশার কারণ কি এবং মেলামেশার কারণে কোন্ কোন্ উপকারিতা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং কি উপকার পাওয়া যাবে? এরপর উপকার ও ক্ষতি তুলনা করতে হবে। তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গিয়ে সত্য বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে এবং কোন্টি উত্তম তা জানা যাবে। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য চূড়ান্ত মীমাংসা। তিনি বলেন ঃ হে ইউনুস, মানুষের কাছে সংকুচিত হয়ে থাকা শত্রুতার কারণ এবং তাদের সাথে অধিক খোলামেলা থাকা অসৎ সঙ্গী সৃষ্টি করে। অতএব এমনভাবে থাকা উচিত, না সংকুচিত, না খোলামেলা। শেখ সা'দী (রহঃ) বলেন ঃ

نه چند ان درشتی کن که از تو سیر
گردندنه چند ان نرمی که برتو دلیر

অর্থাৎ, মানুষের সাথে এতটুকু কঠোরতা করো না যে, তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং এতটুকু নম্রতাও করো না যে, তোমার মাথায় চড়ে বসে।

মোট কথা, মেলামেশা ও নির্জনবাসের মধ্যে সমতা আবশ্যক। এটা অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে এবং উপকারিতা ও বিপদাপদ দেখে নিলে উত্তম পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সত্য ঠিক এটাই। এছাড়া কেউ কেউ যা বলেছে, তা অসম্পূর্ণ; বরং প্রত্যেকেই এমন বিশেষ অবস্থা উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে সে নিজে রয়েছে। অন্য ব্যক্তি, যে এ অবস্থার মধ্যে নয়, তার সম্পর্কে একথা বলা ঠিক হবে? বাহ্যিক শিক্ষায় সুফী ও আলেমের মধ্যে এটাই পার্থক্য। সুফী সেই বক্তব্যই পেশ করে, যে অবস্থার মধ্যে সে নিজে থাকে। এ কারণে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সুফীদের জওয়াব বিভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে আলেম বাস্তব ক্ষেত্রে যা সত্য, তাই উদঘাটন করে এবং নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে না। এ কারণে আলেম যা বলে, তাই সত্য হয়। এতে বিরোধের অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা, সত্য সর্বদা একই হবে আর অসত্য অনেক হয়ে থাকে। এসব কারণেই সুফী বুযুর্গগণকে যখন দরবেশী কি, জিজ্ঞেস করা হল, তখন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব দিলেন। সেই জওয়াব যদিও জওয়াবদাতার অবস্থানুসারে সত্য; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কেননা, সত্য তো এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ আবু আবদুল্লাহ্কে দরবেশী কি, জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ নিজের উভয় আস্তিন প্রাচীরে মেরে বলা– আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা, এটাই দরবেশী। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) এর জওয়াবে বলেন ঃ দরবেশ সে ব্যক্তি, যে সওয়াল করে না এবং কারও অসুবিধা সৃষ্টি করে না। তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে সে চুপ হয়ে যায়। সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ দরবেশ সেই ব্যক্তি, যে সওয়াল করে না এবং সঞ্চয় করে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ দরবেশী হচ্ছে তোমার কাছে কিছু না থাকা। কোন সময় থাকলেও তাকে নিজের মনে না করা। ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ দরবেশী হচ্ছে অভিযোগ না করা এবং নেয়ামত প্রকাশ করা। উদ্দেশ্য, যদি একশ' জনকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে একশ'টি ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ দু'টি জওয়াবও একরকম হবে না। কিন্তু কোন না কোন দিক দিয়ে সবগুলো জওয়াবই সঠিক হবে। কেননা, প্রত্যেকের জওয়াব তার অবস্থার বর্ণনা হবে। এ কারণেই এ সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তি এমন দেখা যাবে না, যাদের একজন অপরজনকে সুফীবাদে সুদৃঢ় বলে এবং তার প্রশংসা করে; বরং প্রত্যেকেই দাবী করে, সেই প্রকৃত সত্যের সাধক। কিন্তু শিক্ষার নূর যখন চমকে উঠে, তখন সবকিছু বেষ্টন করে নেয় এবং গোপনীয়তার পর্দা ফাঁস করে দেয়। কোন মতবিরোধ থাকতে পারে না। সুফীগণের মতবিরোধের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমরা সূর্য ঢলে পড়ার সময় আসল ছায়া সম্পর্কে নানাজনের নানা উক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। কেউ বলে গ্রীষ্মকালে ছায়া দুকদম হয়। কেউ বলে অর্ধেক কদম হয়। কেউ এতে আপত্তি করে বলে শীতকালে সাত কদম হয়। আবার কেউ পাঁচ কদম বলে। সূফীগণের জওয়াবের অবস্থাও তেমনি। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শহরের আসল ছায়া দেখে জওয়াব দেয়। এটা সঠিক; কিন্তু অপরের জওয়াবকে ভুল আখ্যা দেয়া অন্যায়। কেননা, সে সারা বিশ্বকে নিজের শহর অথবা তার মত মনে করে নেয়। আলেম ব্যক্তি জানে, ছায়া কি কারণে ছোট বড় হয় এবং বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন হয়? নির্জনবাস ও মেলামেশার ফযীলত সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এখন যদি কেউ নির্জনবাসকে নিজের জন্যে শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর নিরাপদ মনে করে, তবে তার জন্যে নির্জনবাসের আদব কি, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিচ্ছি। প্রথমে নিয়ত করতে হবে, তার দ্বারা যেন অন্যের কোন অনিষ্ট না হয়। দ্বিতীয়, মানুষের যোগদান থেকে নিরাপদ থাকার নিয়ত করবে। তৃতীয়, মুসলমানদের হক আদায়ে ত্রুটি থেকে মুক্তির নিয়ত করবে। চতুর্থ, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর এবাদতের জন্যে মুক্ত হওয়ার নিয়ত করবে। এভাবে নিয়ত করার পর নির্জনে এলেম, আমল ও যিকির ফিকিরে আত্মনিয়োগ করবে। মানুষকে অধিক আসা যাওয়া করতে বারণ করবে। নতুবা অধিকাংশ সময় একাগ্রতা হবে না। শহরের খবরাখবর শুনবে না। কেননা, খবরাখবর কানে পড়া এমন, যেমন মাটিতে বীজ পড়া, যা অবশ্যই অংকুরিত হয় এবং শিকড় ও ডালাপালা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে খবরও মনের মধ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং নানা কুমন্ত্রণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কুমন্ত্রণা থেকে অন্তর মুক্ত হওয়া নির্জনবাসের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। অল্প জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অধিক জীবিকা পেতে চাইলে বাধ্য হয়ে মেলামেশা করতে হবে। প্রতিবেশীদের জ্বালাতনে সবর করতে হবে। তারা যদি নির্জনবাসের কারণে প্রশংসা করে অথবা মেলামেশা বর্জন করার কারণে তিরস্কার করে, তবে কিছুই শুনবে না এবং আপন ধ্যানে মগ্ন থাকবে। কেননা, এসব বিষয় অল্প শুনলেও অনেক ক্ষতি করে। কোন ওযিফা পাঠ কিংবা যিকির করার সময় মনকে উপস্থিত রাখবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতাপ, গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে ফিকির করবে অথবা আমলের সূক্ষ্মতা ও মনের রিপুগুলোর কথা চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এগুলোকে দমন করতে সচেষ্ট হবে। গৃহের কোন লোক অথবা একজন সৎসঙ্গীও থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে নির্জনবাসী দিনে এক ঘন্টা তার সাথে মনোরঞ্জন করে এবং উপর্যুপরি মেহনত থেকে স্বস্তি লাভ করে। নির্জনবাসে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করতে হবে। একাকিত্বে মনে বিরক্তি দেখা দিলে মনে করবে, কবরে কে সাথে থাকবে? সেখানেও তো একা থাকতে হবে। যে আল্লাহ্র যিকির ও মারেফতের সঙ্গ লাভ করে, মৃত্যুর পরও তার এই সঙ্গ বিনষ্ট হয় না; বরং এই সঙ্গের কারণে সে জীবিত ও প্রফুল্ল থাকে যেমন– শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে শহীদ হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত– পালনকর্তার রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ তাদেরকে দান করেছেন, তজ্জন্যে তারা প্রফুল্ল। আল্লাহ্র জন্যে মেহনতকারী ব্যক্তিও মৃত্যুর পর শহীদ হয়। কেননা, সে-ই মুজাহিদ, যে আপন নফস ও খাহেশের বিরুদ্ধে জেহাদ করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ নফসের জেহাদই বড় জেহাদ। সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি; অর্থাৎ, নফসের জেহাদের দিকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম অধ্যায়

সফর ও তার আদব

প্রকাশ থাকে যে, সফর ঘৃণার বস্তু থেকে নিষ্কৃতির উপায় এবং কাম্য বস্তু পাওয়ার মাধ্যমে। সফর দু'প্রকার– এক, বাহ্যিক শারীরিকভাবে স্বদেশ থেকে আলাদা হয়ে নির্জন প্রান্তরে ভ্রমণ করা এবং দুই, অন্তরগত সফর; অর্থাৎ, অন্তরের মর্ত্যলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করা। উভয় প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার সফর উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি জন্মাবস্থার উপর স্থির থাকে এবং বাপদাদার কাছ থেকে যা শিখেছে তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ত্রুটি ও লোকসানের স্তরেই সন্তুষ্ট থাকে এবং জান্নাতের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের বিনিময়ে বর্বরতার অন্ধকার প্রকোষ্ঠই বেছে নেয়।

এ সফরে প্রবেশ করা সুকঠিন বিধায় এর জন্যে কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী দরকার। কিন্তু একে তো পথ অজ্ঞতার, দ্বিতীয়তঃ কোন পথপ্রদর্শক নেই, তাই এ পথে কোন ভ্রমণকারী নেই এবং দিগন্ত ও ঊর্ধ্ব জগতের বিচরণ ক্ষেত্রে কোন বিচরণকারী নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ পথের দিকেই আহ্বান করেন। তিনি বলেন ঃ سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ আমি দেখিয়ে দেব তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। অন্যত্র বলেন ঃ وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ - পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমরা কি দেখ না? এ সফর থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছ দিয়ে গমন কর সকাল বেলায় এবং রাত্রে। তোমরা কি বুঝ না এবং এ আয়াতেও-

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যেগুলোর কাছ দিয়ে তারা গমন করে। কিন্তু এগুলোতে ধ্যান দেয় না।

এই সফর যে ব্যক্তির নসীব হয়, সে শারীরিকভাবে নিজ দেশে এবং বাসস্থানেই থাকে; কিন্তু অন্তর দ্বারা জান্নাতের সুবিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে। এ সফরের ঝরণায় ও ঘাটে ভয় সংকীর্ণতা নেই এবং অধিক ভিড়ের কারণে কোন ক্ষতি হয় না; বরং যাত্রীদের সংখ্যা বেশী হলে এর ফলাফল ও উপকারিতা বেশী হয়। এর চিরস্থায়ী ফলাফল থেকে কাউকে বাধা দেয়া হয় না এবং ক্রমবর্ধমান উপকারিতা থেকে নিষেধ করা হয় না। কোন যাত্রী নিজে অলসতা করলে অথবা নড়াচড়ায় বিরতি দিলে সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।

যারা দৈহিকভাবে সফর করে, তাদের সফরের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় জ্ঞানার্জন এবং ধর্মকর্মে সহায়তা লাভ হয়, তবে তারা আখেরাতের পথিক বলে গণ্য হবে। এরূপ সফরের কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করলে সফরকারী দুনিয়াদার ও শয়তানের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে এগুলোর প্রতি সদাসর্বদা লক্ষ্য রাখলে সফরকারী এমন উপকারিতা লাভ করবে, যদ্দরুন সে আখেরাত অন্বেষণকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। নিম্নে আমরা সফরের আদব ও শর্তসমূহ দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদব, নিয়ত ও উপকারিতা

সফর এক প্রকার গতিশীলতা ও মেলামেশার নাম। এতে অনেক উপকারিতা ও বিপদাপদ আছে। মানুষ সফর এ জন্যে করে যে, কোন বস্তু তাকে সজোরে স্বস্থান থেকে বের করে দেয়। সেই বস্তু না থাকলে সে সফর করত না। অথবা সফর করার কারণ কোন উদ্দেশ্য কিংবা কাম্য বস্তু অর্জন করা হয়ে থাকে। যে বস্তু থেকে পালিয়ে সফর করা হয়, তা কোন পার্থিব বিষয় হবে; সেমতে শহরে প্লেগ ও মহামারী থাকা কিংবা ফেতনা ও গোলযোগ থাকা, খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হওয়া ইত্যাদি। অথবা সেই বস্তু ধর্ম সম্পর্কিত হবে। উদাহরণতঃ শহরে থাকলে জাঁকজমক ও অর্থলিপ্সার সাথে জড়িত হয়ে পড়া। এ কারণেও শহর ত্যাগ করা উচিত। যে বস্তু অর্জন করার জন্যে সফর করা হয় তাও হয় পার্থিব হবে, যেমন অর্থসম্পদ ও প্রতিপত্তির অন্বেষণ, অথবা ধর্ম সম্পর্কিত হবে। এটা হয় এলেম হবে, না হয় আমল। এলেম তিন প্রকার- এক, ফেকাহ্, হাদীস, তফসীর ইত্যাদির এলেম। দুই, চরিত্র ও গুণাবলীর এলেম। তিন, পৃথিবীর নিদর্শন ও আশ্চর্য বিষয়সমূহের এলেম; যেমন যুলকারনাইন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করেছিলেন। আমল দুই প্রকার- এক এবাদত; যেমন হজ্জ, ওমরা ও জেহাদের সফর। দুই, যিয়ারতের সফর; যেমন মক্কা মদীনা ও বায়তুল মোকাদ্দাসের সফর। কখনও ওলী ও আলেমগণের যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা হয়। জীবিত থাকলে তাঁদেরকে দেখা বরকতের কারণ হয় এবং তাঁদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে তাঁদেরকে অনুসরণের আগ্রহ জোরদার হয়। মৃত হলে তাঁদের কবর যিয়ারত করা হয়। এই বক্তব্য অনুযায়ী সফরের যত প্রকার বের হয়, নিম্নে সবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকার- এলেমের জন্যে সফর করা। ফরয এলেমের জন্যে সফর করলে সফরও ফরয হবে এবং নফল এলমের জন্যে সফর করলে সফরও নফল হবে। উপরে এলেমের তিন প্রকার বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে যেকোন একটির জন্যে সফর করলে সওয়াব পাওয়া যাবে। ফেকাহ্, হাদীস, তফসীর ইত্যাদি ধর্মীয় এলেম সম্পর্কে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যে আপন গৃহ থেকে এলেমের অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে থাকে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ -

অর্থাৎ, যে এলেমের অন্বেষণে পথ চলে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রহঃ) একটি হাদীসের খোঁজে অনেক দিনের সফর করতেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) দশ জন সাহাবীসহ মদীনা থেকে মিসরে সফর করেছিলেন। কেননা, তিনি শুনেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীস আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সেমতে একমাস সামনে হেঁটে তিনি এ হাদীসটি শুনলেন। সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে আমাদের আমল পর্যন্ত এমন আলেম কমই হবেন, যাঁরা এলেম হাসিল করার জন্যে সফর করেননি।

আপন নফস ও চরিত্রের এলেমও জরুরী। কেননা, অভ্যাস সংশোধন ও চরিত্র গঠন ছাড়া আখেরাতের পথে চলা সম্ভবপর নয়। যে নিজের অন্তরের ভেদ ও গুণাগুণের অনিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে না, সে অন্তরকে এগুলো থেকে পবিত্র করবে কিরূপে? সফর তাকেই বলে, যদ্দ্বারা চরিত্র প্রকাশ পায়। কারণ সফর শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ হওয়া। চরিত্র প্রকাশ পায় বলেই একে সফর বলা হয়েছে। তাই হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি যখন কোন সাক্ষীর পরিচয় বর্ণনা করল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার সাথে কোন দিন সফর করেছ? সে বলল ঃ না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমার জানামতে তুমি তার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নও। বিশর (রহঃ) বলতেন ঃ কারীগণ, সফর কর, যাতে পবিত্র হয়ে যাও। কারণ, পানি যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন পবিত্র হয়ে যায়। আর অনেক দিন এক জায়গায় স্থির থাকলে বদলে যায়। সারকথা, মানুষ যতদিন দেশে থাকে ততদিন অভ্যস্ত বিষয়সমূহের সাথেই পরিচিত থাকে; খারাপ চরিত্র প্রকাশ পায় না। কেননা, মনের বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগই হয় না। আর যখন সফরের কষ্টভোগ করে এবং অভ্যস্ত বিষয়সমূহের মধ্যে পরিবর্তন দেখে, তখন চরিত্রের গোপন বিষয়সমূহ উদঘাটিত হয়ে যায় এবং দোষ গুণ ধরা পড়ে। ফলে প্রতিকার করা সম্ভবপর হয়। এ ছাড়া সফরে আল্লাহ্ তা'আলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিদর্শনাবলী তথা পরস্পরে মিলিত বিভিন্ন স্থান, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, রকমারি জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কারণ, এদের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দান করে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু এই সাক্ষ্য ও তসবীহ্ সে-ই বুঝে, যে কান লাগায় এবং উপস্থিত অন্তর দিয়ে শুনে। নতুবা দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমোহিত অবিশ্বাসী ও গাফেলরা এগুলো দেখেও না, শুনেও না। কারণ তেমন কান ও চোখ তাদের নেই। কোরআনের ভাষায় তাদের অবস্থা এই ঃ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অংশটা জানে। পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বেখবর। আরও বলা হয়েছে- اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ তারা শ্রবণ থেকে বিচ্যুত। এখানে বাহ্যিক শ্রবণ উদ্দেশ্য নয়। কারণ বাহ্যিক শ্রবণ থেকে তারা বিচ্যুত ছিল না। বাহ্যিক শ্রবণ দ্বারা আওয়ায ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। এক্ষেত্রে মানুষের কোন বিশেষত্ব নেই; বরং সকল জীবজন্তু আওয়ায শুনে। কিন্তু অন্তরের কান দ্বারা অবস্থার ভাষা শুনা যায়, যা মুখের ভাষা থেকে ভিন্ন। যেমন– কেউ বাবুই পাখী ও চড়াইয়ের কিস্‌সা বর্ণনা করে যে, বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়ুই। কুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই। মোট কথা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কোন কণা নেই, যা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু মানুষ কণার সাক্ষ্য ও তসবীহ্ বুঝে না। কেননা বাহ্যিক কানের সংকীর্ণ গহ্বর থেকে অন্তরের অনন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে সফর তাদের নসীব হয়নি। যদি প্রত্যেক অক্ষম ব্যক্তিই এ সফর করে নিত, তবে পক্ষীকুলের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য হত না এবং হযরত মূসা (আঃ)-এরই খোদায়ী কালাম শ্রবণ করার বিশেষত থাকত না। যে ব্যক্তি পদার্থসমূহের পাতায় পাতায় খোদায়ী কলমে লিখিত সাক্ষ্যসমূহ অন্বেষণ করার নিয়তে সফর করে, তার দৈহিক সফর অনেক করতে হবে না; বরং সে এক জায়গায় অবস্থান করে আপন অন্তরকে সকল আবিলতা থেকে মুক্ত করবে, যাতে প্রতিটি কণার তসবীহ-ধ্বনি শুনে স্বস্তি পায়। এরূপ ব্যক্তির জঙ্গলে ঘোরাফেরা করার কি প্রয়োজন? তার উদ্দেশ্য তো রহস্যময় আকাশমণ্ডলী থেকে অর্জিত হতে পারে। কারণ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সকলেই তার আজ্ঞাবহ। অতএব যে ব্যক্তির আশেপাশে স্বয়ং কা'বা তওয়াফ করে, সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি কোন মসজিদের তওয়াফের জন্যে শ্রম স্বীকার করে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

দ্বিতীয় প্রকার– এবাদতের জন্যে সফর করা; যেমন হজ্জ ও জেহাদের জন্যে সফর করা। হজ্জের রহস্য অধ্যায়ে আমরা এর ফযীলত, আদব এবং যাহেরী বাতেনী আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেছি। পয়গম্বর, সাহাবী, তাবেয়ী, আলেম ও ওলীগণের কবর যিয়ারতের জন্যে সফরও এর মধ্যে দাখিল। যাঁদেরকে জীবদ্দশায় দেখা বরকতের কারণ, মৃত্যুর পর তাঁদের কবর যিয়ারত করাও তেমনি বরকতের কারণ। এজন্যে সফর করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لاتشد الرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا ومسجد الاقصى .

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে সফর করবে না– মসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।

এ হাদীসটি আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মসজিদসমূহের বিধান। অর্থাৎ এ তিনটি মসজিদ একই পর্যায়ের। নতুবা এটা জানা কথা যে, পয়গম্বর ও ওলীগণের কবর যিয়ারতের মূল ফযীলতেও পার্থক্য হয়। স্থানের যিয়ারত করার কোন মানে নেই। কাজেই উপরোক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থান যিয়ারত করার জন্যে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ফযীলতও অনেক। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছেন এবং পাঁচটি নামায সেখানে আদায় করে পরের দিন সেখান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন– ইলাহী, যে ব্যক্তি এ মসজিদে আগমন করে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তার উদ্দেশ্য না থাকে, সে যতক্ষণ মসজিদে থাকে, ততক্ষণ তুমি তোমার রহমতের দৃষ্টি তার উপর থেরে সরিয়ে নিয়ো না। তাকে গোনাহ থেকে এমন পবিত্র করে দিয়ো যেমন সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করে নেন।

তৃতীয় প্রকার– ধর্মকর্ম ব্যাহত হওয়ার কারণে সফর করা। এ সফরও ভাল– কেননা, অসহনীয় বিষয় থেকে পশ্চাদসরণ করা নবী-রসূলগণের সুন্নত। যেসব বিষয় থেকে পলায়ন করা ওয়াজিব, সেগুলোর মধ্যে শাসনক্ষমতা, জাঁকজমক ও জাগতিক সম্পর্কের আধিক্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্যতম। কেননা, এসব বিষয় অন্তরের একাগ্রতা বরবাদ করে দেয়। অন্তর যে পরিমাণে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে অবসর পাবে, সেই পরিমাণে ধর্মকর্মে মশগুল হওয়া সম্ভবপর হবে। জাগতিক কাজ-কারবার ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি থেকে অন্তরের অবসর পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক, প্রয়োজনাদি হালকা হোক কিংবা ভারী, যার প্রয়োজনাদি হালকা সে মুক্তি পাবে এবং যার ভারী, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলার শোকর, তিনি মুক্তিকে এ বিষয়ের সাথে জড়িত করেননি যে, সকল গোনাহ্ ও বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে; বরং তিনি আপন অসীম কৃপায় যাদের বোঝা হালকা, তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। হালকা বোঝা তার, যার প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা বেশীর ভাগ দুনিয়ার দিকে নয়। বিস্তৃত জাঁকজমক ও অধিক সম্পর্কের কারণে স্বদেশে এটা সম্ভব নয়। কেননা, সফর করা, অখ্যাত হওয়া এবং যথাসম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পর্যন্তও অন্তর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। এরপর আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন এবং মনে শক্তি ও অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন। ফলে তার কাছে সফর ও দেশে থাকা উভয়টি সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর যিকির থেকে কোন কিছু তাকে বাধা দিতে পারবে না, কিন্তু এরূপ হওয়া খুবই বিরল। এখন তো অন্তরের উপর দুর্বলতাই প্রবল। এতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার একত্রে স্থান সংকুলান খুব কমই হয়। হাঁ, এ শক্তিতে পয়গম্বর ও ওলীগণ বলীয়ান হয়ে থাকেন। প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ পর্যন্ত পৌঁছা সুকঠিন; তবুও পরিশ্রম ত্যাগ করা উচিত নয়। প্রচেষ্টারও এতে অল্পবিস্তর দখল আছে। এ ক্ষেত্রে অন্তরগত শক্তির বিভিন্নতা এমন, যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাহ্যিক শক্তি বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কতক সবল সুঠাম পাহলোয়ান ব্যক্তি একাই আড়াই মণ বোঝা বহন করতে পারে। যদি কোন দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তি বোঝা বহনের অনুশীলন করে, সে-ও পাহলোয়ানের স্তরে পৌঁছে যাবে, তবে এটা কখনও হবার নয়। হাঁ, পারদর্শিতা ও প্রচেষ্টার ফলে তার শক্তি কিছুটা বেড়ে যাবে। সুতরাং উচ্চস্তরে পৌঁছার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পরিশ্রম বর্জন করা উচিত নয়। এটা নেহায়েত মূর্খতা ও চরম পথভ্রষ্টতা। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ফেতনার ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে দিতেন। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ এ সময়টা এত খারাপ যে, এতে অজ্ঞাতদেরও শান্তিতে থাকার উপায় নেই– খ্যাতিনামাদের তো কথাই নেই। এ সময় এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যাওয়া উচিত। আবু নয়ীম বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, খাদ্যের থলে কোমরে বেঁধে এবং হাতে মাটির পাত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি এক গ্রামে সুলভে দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। সেখানেই অবস্থান করতে চাই। তোমরাও এরূপ শুনলে তাই করো। তোমাদের দ্বীনদারী নিরাপদ থাকবে। বস্তুতঃ এ সফরটি ছিল দুর্মূল্যের কারণে। ইবরাহীম খাওয়াস এক শহরে চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করতেন না।

চতুর্থ প্রকার– দেহের ক্ষতি করে এমন বস্তু থেকে সফর করা; যেমন প্লেগ, মহামারী ইত্যাদি। প্লেগ ছাড়া এ ধরনের অন্যান্য কারণে সফর করায় কোন ক্ষতি নেই; বরং সফরের উপকারিতা যদি ওয়াজিব হয়, তবে সফরও ওয়াজিব হবে এবং মোস্তাহাব হলে সফরও মোস্তাহাব হবে। প্লেগ থেকে পলায়ন করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। ওসামা ইবনে যায়দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ فِي الْاَرْضِ فَيَذْهَبُ .. مَرَّةً وَيَاتِي اُخْرٰى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ فِي الْاَرْضِ فَلَا يَقْدَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِارْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ .

অর্থাৎ, এ রোগটি একটি আযাব। তোমাদের পূর্ববর্তী এক উম্মতকে এই আযাব দেয়া হয়েছিল। এরপর এটা পৃথিবীতেই থেকে যায় এবং একবার চলে যায় ও একবার আসে। কেউ যদি কোন দেশে এ রোগের কথা শুনে, তবে সে যেন সেখানে না যায়। আর তুমি যেখানে থাক, সেখানে এই রোগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত "তা'ন" (ঠাট্টা বিদ্রূপ) ও "তা'উন" (প্লেগ) দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমি আরজ করলাম ঃ "তা'ন"-এর অর্থ তো আমরা জানি; কিন্তু "তা'উন" কি? তিনি বললেন ঃ তা'উন হচ্ছে উটের স্ফীতির মত একটি স্ফীতি, যা মানুষের পিঠের নীচে ও নরম অংশে দেখা দেয়। এতে যে মুসলমান মারা যায় এবং যে সওয়াবের আশায় তা'উনের জায়গায় অবস্থান করে, সে যেন জেহাদের অপেক্ষায় বসে থাকে। আর যে পলায়ন করে, সে যেন জেহাদের সারি থেকে পলায়ন করে। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, প্লেগ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ এবং প্লেগের মধ্যে যাওয়াও নিষিদ্ধ। এর রহস্য চতুর্থ খণ্ডে তাওয়াক্কুল অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সারকথা, সফর মন্দ, ভাল অথবা মোবাহ্ হবে। মন্দ সফর হয় হারাম হবে; যেমন গোলামের পলায়ন করা অথবা পিতামাতার অবাধ্য হয়ে সফর করা। না হয় মকরূহ হবে; যেমন যে শহরে প্লেগ থাকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। ভাল সফরও হয় ওয়াজিব হবে; যেমন হজ্জের সফর এবং ফরয এলেমের অন্বেষণে সফর। না হয় মোস্তাহাব হবে; যেমন আলেম ও মাশায়েখের যিয়ারত করার জন্যে সফর। সকল প্রকার সফরে নিয়ত আখেরাতই থাকা উচিত। ওয়াজিব ও মোস্তাহাব সফরে এরূপ নিয়ত থাকতে পারে; কিন্তু হারাম ও মকরূহ সফরে অসম্ভব। মোবাহ্ সফর নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সফরের উদ্দেশ্য যদি মাল অন্বেষণ হয়, যাতে সওয়াল করতে না হয়, পরিবার-পরিজনের কাছে সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত মাল সদকা করা যায়, তবে নিয়তের কারণে এই মোবাহ্ সফর আখেরাতের আমল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি রিয়া ও খ্যাতির নিয়তে হজ্জের সফরে যায়, তবে এই নিয়তের কারণে সফরটি আখেরাতের আমল হবে না। কেননা, হাদীসে আছে- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ –আমল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। এটা ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহ্ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য– নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, নিয়তের প্রভাবে কোন নিষিদ্ধ বিষয় সিদ্ধ হয়ে যায় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সফরকারী ব্যক্তির উপর কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন। তারা তার উদ্দেশ্য দেখে এবং প্রত্যেককে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিফল দান করা হয়। যার উদ্দেশ্য দুনিয়া থাকে, তাকে দুনিয়া দেয়া হয় এবং তার আখেরাত থেকে কয়েক গুণ হ্রাস করে দেয়া হয়। তার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যার উদ্দেশ্য থাকে আখেরাত, তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয় এবং তার প্রচেষ্টা সুসংহত করা হয়। ফেরেশতারা তার জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করে।

নিম্নে সফরের কয়েকটি আদব বর্ণনা করা হচ্ছে-

(১) সফরের ইচ্ছা করার সময় পূর্বে কারও কোন হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা তাকে সমর্পণ করবে, ঋণ শোধ করবে, পোষ্যবর্গকে খরচ দেয়ার কথা ভাববে এবং আমানত থাকলে তা মালিকের হাতে পৌঁছে দেবে। পাথেয় এই পরিমাণে বেশী নেবে, যাতে প্রয়োজনে সফরসঙ্গীদেরকে দেয়ার অবকাশ থাকে। সফরে ভাল কথাবার্তা বলা, সফরসঙ্গীদেরকে খাওয়ানো এবং উত্তম চরিত্র প্রকাশ করা নেহায়েত জরুরী। কেননা, সফর অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(২) সফরের জন্যে সঙ্গী বেছে নেবে। একাকী সফর করবে না। ধর্মকর্মে সহায়তা করতে পারে, এমন সঙ্গী হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সফরে তিন জন হয়ে গেলে একজনকে দলনেতা করে নাও। আগেকার যুগের বুযুর্গগণ তাই করতেন। তাঁরা দলের নেতাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিযুক্ত করা নেতা বলতেন। এমন ব্যক্তিকে নেতা করতে হবে, যার চরিত্র সর্বাধিক ভাল এবং যে সঙ্গীদের প্রতি অধিক দয়ালু। নেতার প্রয়োজন এ জন্যে যে, গন্তব্যস্থল, পথ ও সফরের উপযোগিতা নির্ধারণের ব্যাপারে নানাজনের নানামত হয়ে থাকে। যদি একজনের মতের উপর নির্ভর করা হয়, তবে ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকবে। নতুবা কথায় বলে– "অধিক বামুনে যজ্ঞ নষ্ট।" এরপর নেতার কর্তব্য হবে সঙ্গীদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং নিজেকে তাদের জন্যে ঢালে পরিণত করা; যেমন বর্ণিত আছে, একবার আবদুল্লাহ্ মরুযী সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আবু আলী রেবাতী তাঁর সঙ্গী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ এই শর্তে মঞ্জুর যে, হয় তুমি নেতা হবে, না হয় আমি নেতা হব। আবু আলী বললেন ঃ নেতা আপনিই হবেন। এর পর আবদুল্লাহ্ মরুযী সমগ্র সফরে নিজের এবং আবু আলীর পাথেয় আপন কাঁধে বহন করলেন। এক রাতে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি সমস্ত রাত্রি সঙ্গীর মাথার উপর চাদর ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, যাতে সে বৃষ্টির পানিতে ভিজে না যায়। আবু আলী তাকে বাধা দিলে তিনি বলতেন ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। তুমি আমাকে নেতা মেনে নিয়েছ। এখন আমি যা চাইব তাই করব। তোমার কর্তব্য আমার আনুগত্য করা। আবু আলী মনে মনে বলতেন ঃ কি কুক্ষণে আমি তাঁকে শাসক ও নেতা বলে মেনে নিয়েছি। এর চেয়ে তো আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। তিনি আমার জন্যে এত কষ্ট করে যাচ্ছেন!

(৩) রওয়ানা হওয়ার সময় পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত এই দোয়া করবে-

استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك .

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমানত রাখছি তোমার দ্বীনদারী, ঘড়বাড়ী এবং তোমার শেষ আমল।

বর্ণনাকারী তাবেয়ী বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফরে ছিলাম। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতে চাইলাম, তখন তিনি কয়েক পা আমার সাথে চললেন এবং বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লোকমানের এই উক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণনা করতে শুনেছি– আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন বস্তু সোপর্দ করা হলে তিনি তার হেফাযত করেন। আমি আল্লাহ্‌কে তোমার ধর্মকর্ম, ঘরবাড়ী ও শেষ আমল সোপর্দ করছি। যায়দ ইবনে কাইয়েমের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সফর করতে চায়, তখন সে পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। কারণ, তাদের দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বরকত দেবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাউকে বিদায় দিতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ

زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমার গোনাহ্ মাফ করুন এবং যেখানেই তুমি যাও, তোমাকে কল্যাণমুখী করুন।

এ দোয়াটি সফরকারীর জন্যে তারা করবে, যারা তাকে বিদায় দিবে। মূসা ইবনে ওয়ারদান বলেন ঃ আমি এক সফরের ইচ্ছা করে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় শেখাচ্ছি, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বিদায় হওয়ার জন্যে শিখিয়েছিলেন। তুমি এই দোয়া কর–

استودعت الله الذى لايضيع ودائعه

অর্থাৎ, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছি। তাঁর হাতে যা সোপর্দ করা হয়, তা তিনি বিনষ্ট করেন না।

(৪) সফরের পূর্বে এস্তেখারার নামায পড়বে, যার নিয়ম আমরা নামায অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সফরের চার রাকআত নামায পড়ে নেবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল, আমি একটি সফরের মান্নত করেছি। একটি ওসিয়ত লেখে রেখেছি। এখন সফরে যাওয়ার পূর্বে ওসিয়তটি কার কাছে সোপর্দ করব– পিতার কাছে, পুত্রের কাছে, না ভাইয়ের কাছে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গৃহে রেখে যাওয়ার জন্যে এর চেয়ে উত্তম কোন কিছু নেই যে, রওয়ানা হওয়ার সময় গৃহে চার রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পড়বে, অতঃপর এই দোয়া পড়বে ঃ

اللهم انى اتقرب بهن اليك فاخلفنى بهن فى اهلى ومالى

–ইলাহী, আমি এই রাকআতগুলো দিয়ে তোমার নৈকট্য কামনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করছি। অতএব এগুলোকে আমার নায়েব করে দাও আমার পরিবার পরিজন ও অর্থসম্পদের মধ্যে।

ফলস্বরূপ এই চার রাকআত নামায সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার গৃহের রক্ষক হয়ে যাবে।

(৫) গৃহের দরজায় পৌঁছে এই দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْ اُذَلَّ وَاَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

–আল্লাহ্র নামে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছি। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ থেকে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই। পরওয়ারদেগার, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে ও অপরকে পথভ্রষ্ট করা থেকে, নিজে বিচ্যুত হওয়া থেকে ও অপরকে বিচ্যুত করা থেকে, নিজে জুলুম করা থেকে ও মজলুম হওয়া থেকে এবং নিজে মূর্খতা করা থেকে ও আমার সাথে কারও মূর্খতা করা থেকে।

(৬) কোন মনযিলে অবস্থানের পর সেখান থেকে খুব ভোরে রওয়ানা দেবে। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃহস্পতিবার দিন তাবুকের উদ্দেশে খুব ভোরে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং এই দোয়া করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার উম্মতকে তার ভোরবেলার চলায় বরকত দাও।

বৃহস্পতিবার দিন সফর শুরু করা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন লশকর প্রেরণ করতেন, তখন প্রত্যূষে প্রেরণ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কারও কাছে তোমাদের কোন কাজ থাকলে প্রত্যূষে যেয়ে তা করে নাও। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– ইলাহী, আমার উম্মতকে প্রত্যূষে গাত্রোত্থানে বরকত দাও। জুমুআর দিন ফজরের পরে সফর না করা উচিত। নতুবা জুমুআ তরকের গোনাহ্ হবে। কেননা, জুমুআর দিনের প্রথম অংশও জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ।

(৭) সূর্য খুব উত্তপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মনযিলে অবস্থান নেবে না। এটা সুন্নত। অধিকাংশ পথ রাতের বেলায় অতিক্রম করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রাতের আঁধারে চল। কেননা, রাতে যে পরিমাণ দূরত্ব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতিক্রম করা যায়, দিনে তা পারা যায় না। পথিমধ্যে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করার সময় বলবে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

ইলাহী, সকল উচ্চের উপরে তুমি উচ্চ এবং তোমারই প্রশংসা সর্বাবস্থায়।

উচ্চভূমি থেকে নিম্নে অবতরণ করার সময় "সোবহানাল্লাহ্" বলবে।

(৮) দিনের বেলায় কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকবে এবং রাতে নিদ্রাকালে হুঁশিয়ার থাকবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত বিছিয়ে নিতেন এবং রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছুটা খাড়া রাখতেন, অতঃপর হাতের তালুতে মস্তক রাখতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল গভীর-নিদ্রা না আসা। এমন যেন না হয় যে, নিদ্রিত অবস্থায় সূর্যোদয় হয়ে যায়, ফলে নামায কাযা হয়। রাতের বেলায় সকল সঙ্গী মিলে পালাক্রমে প্রহরা দেয়ার ব্যবস্থা করা মোস্তাহাব।

(৯) সওয়ার হয়ে সফর করলে সওয়ারীর উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে না এবং তার মুখে প্রহার করবে না। সওয়ারীর পিঠে নিদ্রা যাবে না। কেননা, নিদ্রাবস্থায় মানুষ ভারী হয়ে যায়। ফলে জন্তুর কষ্ট হয়। পরহেযগার ব্যক্তিগণ একটু ঝিমিয়ে নেয়া ছাড়া জন্তুর উপর কখনও নিদ্রা যেতেন না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সওয়ারীর পিঠকে চৌকি বানিয়ে নিয়ো না। সকাল-সন্ধ্যায় সওয়ারী থেকে নেমে তাকে কিছু আরাম দেয়া মোস্তাহাব।

(১০) সফরে ছয়টি বস্তু সাথে নেয়া উচিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে পাঁচটি বস্তু সঙ্গে নিতেন- আয়না, সুরমাদানী, মেসওয়াক, চিরুনি ও কেঁচি। এক রেওয়ায়েতে ছয়টি বস্তুর উল্লেখ আছে ঃ অর্থাৎ, আয়না, শিশি, কেঁচি, মেসওয়াক, সুরমাদানী ও চিরুনি।

(১১) সফর থেকে ফিরে আসার আদব- রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ, ওমরা অথবা অন্য কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রত্যেক যমীনে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন এবং এই দোয়া করতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ـ

আপন বস্তি দৃষ্টিগোচর হলে এই দোয়া পড়বেঃ

اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এই বস্তিতে আমাকে স্থিতিশীলতা ও উত্তম রিযিক দান কর।

এরপর কাউকে আগমনের বার্তা দিয়ে গৃহে প্রেরণ করবে, যাতে অকস্মাৎ গৃহে উপস্থিত হয়ে খারাপ কিছু দেখতে না হয়। রাতের বেলায় গৃহে না পৌঁছা উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন, এরপর গৃহে প্রবেশ করতেন। সফর থেকে ফেরার সময় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কিছু উপঢৌকন আনা সুন্নত। কেননা, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর দিকে সকলেই তাকিয়ে থাকে এবং উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হয়। সফরে তাদের কথা স্মরণ করা হয়েছে, একথা ভেবে তাদের আনন্দ আরও বেড়ে যায়।

এ পর্যন্ত সফরের বাহ্যিক আদবসমূহ বর্ণিত হল। এখন এর আভ্যন্তরীণ আদব সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে।

সফর তখনই অবলম্বন করবে, যখন সফরে ধর্মকর্ম বেশী হয়। ধর্মকর্মের প্রতি মনে বিরূপভাব লক্ষ্য করলে সেখানেই থেমে যাবে এবং ফিরে আসবে। মন যেখানে চায়, সেখানে মনযিল করবে। এর খেলাফ করবে না। কোন শহরে প্রবেশ করার সময় সেখানকার কামেল ব্যক্তিগণের যিয়ারত করার নিয়ত করবে। কোন শহরে এক সপ্তাহ অথবা দশ দিনের বেশী অবস্থান করবে না। হাঁ, যে কামেল ব্যক্তির কাছে যাও, তিনি যদি বেশী অবস্থান করতে বলেন তবে কোন দোষ নেই। যতদিনই অবস্থান কর, সত্য ফকীর ব্যতীত কারও কাছে বসবে না। যদি কোন ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাও, তবে তিন দিনের বেশী থাকবে না। এটাই আতিথেয়তার সীমা। কিন্তু ভাইয়ের কাছে বিচ্ছেদ কষ্টকর হলে বেশী থাকতে দোষ নেই। কোন শায়খের যিয়ারত করতে গেলে তার কাছে একদিন ও রাতের বেশী অবস্থান করবে না। নিজেকে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল করবে না। এতে সফরের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে। শহরে প্রবেশ করেই অন্য কিছুতে ব্যাপৃত না হয়ে সোজা শায়খের গৃহে চলে যাবে। শায়খ গৃহে থাকলে দরজায় খট্ খট্ শব্দ করবে না এবং ভিতরে যাওয়ারও অনুমতি চাইবে না; বরং তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শায়খ বাইরে আগমন করলে আদব সহকারে তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সামনে গিয়ে সালাম করবে এবং কিছু বলবে না। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলে যতটুকু জিজ্ঞেস করেন, ততটুকুরই জওয়াব দেবে। অনুমতি না নিয়ে শায়খকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করবে না। সফরে থাকাকালে শহরের খাদ্য ও কষ্টের কথা বেশী আলোচনা করবে না এবং বন্ধুদের নাম বেশী নেবে না; বরং শায়খ ও ফকীরগণের আলোচনা করবে। সফরে বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত বর্জন করবে না; বরং প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে এরূপ কবর তালাশ করবে। সফরে তেলাওয়াত ও যিকির এমনভাবে করবে, যাতে অন্যে না শুনে। কেউ কথা বলতে এলে যিকির মুলতবী রেখে কথা বলবে। এরপর পূর্ববৎ যিকির করবে। যদি সফর অথবা গৃহে অবস্থান থেকে মন ঘাবড়ে যায়, তবে এর বিরোধিতা করা উচিত। কারণ, নফসের বিরোধিতায় বরকত আছে। যদি সাধু পুরুষগণের খেদমত নসীব হয়ে যায়, তবে তাঁদের খেদমতে অতিষ্ঠ হয়ে সফর করা উচিত নয়। কেননা, এটা নেয়ামতের নাশোকরী। যদি নিজের মধ্যে গৃহে অবস্থানের তুলনায় সফরে ক্ষতি অনুভূত হয়, তবে জেনে নেবে যে, সফর ভাল নয়। এমতাবস্থায় গৃহে ফিরে আসবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সফরের রুখসতসমূহের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, সফরের শুরুতে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কিছু পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজন হয়। দুনিয়ার পাথেয় হচ্ছে খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। যদি কাফেলার সাথে সফর করা হয় অথবা পথিমধ্যে স্থানে স্থানে জনপদ থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করে পাথেয় ছাড়া বের হলেও কোন ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে একাকী সফর করলে কিংবা যাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় নেই তাদের সাথে সফর করলে এবং পথিমধ্যে জনপদ না থাকলে পাথেয় ছাড়া সফর করা জায়েয নয়। যদি সফরকারী ব্যক্তি এমতাবস্থায় সপ্তাহ কিংবা আট-দশ দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকার ক্ষমতা রাখে, তবে পাথেয় ছাড়া সফর করা জায়েয হবে। আর যদি এরূপ ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে, তবে পাথেয় ছাড়া সফর করা গোনাহ্। কারণ, এটা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার শামিল। আসবাবপত্র সম্পূর্ণ বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

আখেরাতের পাথেয় হচ্ছে এলেম তথা শিক্ষা, যার প্রয়োজন ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি এবাদতের মধ্যে হয়ে থাকে। সফরকারী ব্যক্তি এ পাথেয়ও অবশ্যই সঙ্গে নেবে। কেননা, সফর কতক বিধানকে সহজ করে দেয়; যেমন নামায কসর (হ্রাস) করা, রোযা না রাখা ইত্যাদি। কাজেই কতটুকু সহজ করে এবং কখন সহজ করে, এসব বিষয় জানা থাকা দরকার। সফরে কতক বিধান কঠিনও হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বাড়ীতে থাকাকালে মোটেই থাকে না, যেমন কেবলার অবস্থা জানা এবং নামাযের সঠিক সময় নিরূপণ করা। বাড়ীতে থাকাকালে মসজিদ দেখেই কেবলা এবং মুয়াযযিনের আযান শুনে নামাযের সময় জানা যায়, কিন্তু সফরে এসব বিষয় কখনও নিজে জেনে নেয়া আবশ্যক হয়।

নিম্নে সফরে প্রাপ্ত রুখসত (সহজকৃত বিষয়সমূহ) বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) সফরে মোজার উপর মসেহ্ করা– সফওয়ান ইবনে আসসাল (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে মুসাফির অবস্থায় তিন দিবারাত্র পর্যন্ত পা থেকে মোজা না খুলতে বলেছেন। এ থেকে জানা গেল, পূর্ণ ওযু করার পর যে ব্যক্তি মোজা পরিধান করে, সে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার সময় থেকে তিন দিবারাত্র পর্যন্ত প্রত্যেক ওযুর মধ্যে মোজার উপর মসেহ করতে পারে। গৃহে অবস্থানকারী হলে এই মাসেহ্ এক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিবারাত্র পর্যন্ত জায়েয। পাঁচটি শর্তে মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়েয। এক, পূর্ণ অযুর উপর মোজা পরিধান করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি ডান পা ধৌত করার পর ডান পায়ে মোজা পরিধান করে, অতঃপর বাম পা ধুয়ে বাম পায়ে মোজা পরিধান করে, তবে অসমাপ্ত ওযুর উপর মোজা পরিধান করার কারণে তার জন্যে মোজার উপর মসেহ্ করা জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত ডান পায়ের মোজা খুলে আবার পরিধান না করে। দুই, মোজা এমন মজবুত হতে হবে, যা পায়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা যায়। কারণ, মোজা পরিধান করে মনযিলের পর মনযিল চলে যাওয়াই অভ্যাস। তিন, যে পর্যন্ত পা ধৌত করা ফরয, ততটুকু জায়গায় যেন মোজা ছিন্ন না থাকে। ছিন্ন থাকলে ফরয খুলে যাওয়ার কারণে মসেহ্ দুরস্ত হবে না। চার, মোজা পরিধান করার পর তা খুলবে না। খুললে নতুনভাবে ওযু করে পরিধান করতে হবে। কেবল উভয় পা ধুয়ে নিলেও যথেষ্ট হবে। পাঁচ, ধৌত করার জায়গার ঠিক উপরে মসেহ্ করতে হবে। সুতরাং পায়ের গোছার উপর মসেহ্ করলে দুরস্ত হবে না। মসেহ্ করার সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে পায়ের পিঠের মোজার উপর ভিজা হাত বুলিয়ে দেবে। এমনভাবে বুলাবে, যাকে মসেহ্ বলা যায়। তিন অঙ্গুলি দিয়ে মসেহ্ করলে কারও মতভেদ বাকী থাকে না। পূর্ণাঙ্গ মসেহ্ হচ্ছে মোজার উপরে এবং নীচে একবার মসেহ্ করা– দু'বার নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করেছেন। মসেহ্ করার পদ্ধতি হচ্ছে, উভয় হাত ভিজিয়ে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহের মাথা ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলোর উপর রেখে নীচের দিকে আস্তে আস্তে টেনে আনবে। এমনিভাবে বাম হাতের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ বাম মোজার গোড়ালির নীচে রেখে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত পৌছাবে। যদি একামত (গৃহে থাকা) অবস্থায় মসেহ্ করে, এর পর মুসাফির হয়ে যায়, অথবা মুসাফির অবস্থায় মসেহ্ করার পর মুকীম হয়ে যায়, তবে উভয় অবস্থায় মুকীমের বিধান প্রবল থাকবে। অর্থাৎ এক দিবারাত্র পর্যন্ত মসেহ্ চলবে। মোজা পরিধান করার পর বেওযু হওয়ার সময় থেকে দিবারাত্রির হিসাব করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কেউ গৃহে বাসকালে সকালে মোজা পরিধান করে, এরপর মসেহ্ করার পূর্বেই সফরে বের হয় এবং সূর্য ঢলে পড়ার সময় বে-ওযু হয়, তবে তিন দিবারাত্রি গণনা সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে করবে। অর্থাৎ চতুর্থ দিন সূর্য ঢলে পড়লে পা ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি গৃহে অবস্থানকালে মোজা পরিধান করে এবং বেঅযু হয়, এরপর সফর শুরু করে, তবুও তিন দিবারাত্র পর্যন্ত মসেহ্ করবে। কিন্তু গৃহে থাকাকালে যদি মসেহ্ করে নেয়, এর পর সফর শুরু করে, তবে কেবল এক দিবারাত্র পর্যন্তই মসেহ্ করবে। যে ব্যক্তি গৃহে কিংবা সফরে মোজা পরিধান করতে চায়, তার জন্যে সর্প, বিচ্ছু, কাঁটা ইত্যাদির আশংকায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোজা ঝেড়ে নেয়া মোস্তাহাব। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মোজা-জোড়া আনিয়ে একটি মোজা পরিধান করলেন। একটি কাক এসে অপর মোজাটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং একটু দূরে নিক্ষেপ করল। তখন মোজার ভিতর থেকে একটি সর্প বের হল। এতে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা এবং কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন মোজা না ঝেড়ে পরিধান না করে।

(২) তায়াম্মুম করা। পানি পাওয়া সুকঠিন হলে মাটি পানির বিকল্প। সুকঠিন হওয়ার অর্থ, পানি এতটুকু দূরে, যেখানে গেলে চিৎকার করলে কাফেলা পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছে না। ফলে কেউ সাহায্যের জন্যে যেতে পারে না। কাফেলা থেকে এতটুকু দূরে কোন মুসাফির প্রস্রাব-পায়খানা করতে সাধারণতঃ যায় না। পানির কাছে কোন দুশমন অথবা হিংস্র প্রাণী থাকলেও পানি পাওয়া সুকঠিন হয়। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয। পান করার প্রয়োজনে পানি থাকলে এবং সঙ্গে অন্য কোন পানি না থাকলেও তায়াম্মুম করা দুরস্ত। যদি সঙ্গীদের মধ্য থেকে কারও পানি পান করার প্রয়োজন হয়, তবে সেই পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয নয়; বরং মূল্যের বিনিময়ে অথবা বিনা মূল্যে সেই পানি সঙ্গীকে দেয়া অপরিহার্য। যদি শুরবা পাকানো অথবা রুটি ভেজানোর জন্যে পানির প্রয়োজন থাকে, তবে তায়াম্মুম করা দুরস্ত হবে না। এমতাবস্থায় শুরবা পাকাবে না, রুটি ভেজাবে না; বরং ওযু করবে। অন্য কেউ পানি দান দান করলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, কিন্তু পানির মূল্য দান করতে হলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। পানি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হলে তা ক্রয় করা ওয়াজিব এবং বেশী মূল্যে বিক্রয় হলে ক্রয় করা ওয়াজিব নয়; ববং তায়াম্মুম করা জায়েয। পানির অভাবে যদি কেউ তায়াম্মুম করার ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে পানি তালাশ করবে। মনযিলের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে দেখবে, নিজের আসবাবপত্র ও ঘটিবাটি খুঁজে দেখবে। যদি আসবাবপত্রে রাখা পানির কথা ভুলে যায় অথবা কাছেই কূপ ছিল, কিন্তু তালাশ করেনি, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়, তবে পুনরায় নামায পড়া অপরিহার্য হবে। যদি জানা যায়, শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়া যাবে, তবে প্রথম ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়া উত্তম। কেননা, জীবনের ভরসা নেই এবং প্রথম ওয়াক্তে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকে। তাই এটা অগ্রগণ্য।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার সফরে তায়াম্মুম করলেন। লোকেরা আরজ করল ঃ আপনি তায়াম্মুম করলেন, অথচ মদীনার দালানকোঠা অদূরেই দেখা যাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত জীবিত থাকব কি? নামায শুরু করার পর পানি পাওয়া গেলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামায বাতিল হবে না এবং ওযু করাও জরুরী হবে না। তবে নামায শুরু করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে ওযু করতে হবে। তালাশ করার পর পানি না পাওয়া গেলে ধুলা মিশ্রিত মাটিতে দু'হাতের অঙ্গুলি বন্ধ করে একবার মারবে এবং উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মসেহ্ করবে। এর পর উভয় হাতের অঙ্গুলি ছড়িয়ে দ্বিতীয় বার মারবে এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ্ করবে। যদি একবারে সকল জায়গায় ধুলা না পৌঁছে, তবে আরও একবার হাত মাটিতে মেরে নেবে। তায়াম্মুম দ্বারা এক ফরয পড়ার পর যত ইচ্ছা নফল পড়া যায়। অন্য ওয়াক্তের ফরয পড়তে চাইলে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। (এ মাসআলাটি শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী লিখিত।) নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা যাবে না। যদি এই পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কতক অঙ্গ ধৌত করা যায়, তবে কতক অঙ্গে পানি ব্যবহার করে পূর্ণ তায়াম্মুম করে নেবে।

(৩) সফরের তৃতীয় রুখসত ফরয নামাযে কসর করা। মুসাফির ব্যক্তি যোহর, আসর ও এশার নামাযে চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত পড়বে। যদি মুসাফির মুকীম ইমামের এক্তেদা করে, তবে চার রাকআতই পড়বে।

(৪) সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে সাওয়ারীর উপর নফল পড়তেন– সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। এ ক্ষেত্রে সওয়ারীর কেবলামুখী হওয়া জরুরী নয়। যেব্যক্তি সওয়ারীর উপর নফল পড়বে, সে ইশারায় রুকু-সেজদা করবে। সেজদার জন্যে রুকু অপেক্ষা অধিক নত হবে।

(৫) পদব্রজে চলা অবস্থায় সফরে নফল পড়া দুরস্ত। এমতাবস্থায় রুকু ও সেজদার জন্যে ইশারা করবে এবং তাশাহ্হুদের জন্যে বসবে না। কেননা, বসতে হলে রুখসতের ফায়দা কি? তবে পদব্রজে চলন্ত ব্যক্তি নফল পড়লে কেবলামুখী হয়ে তকবীরে তাহরীমা করে নেবে। কারণ, এক মুহূর্তের জন্যে রাস্তা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু সওয়ার ব্যক্তির জন্যে সওয়ারীর মুখ ফেরানো অসুবিধাজনক। পথিমধ্যে নাপাকী থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা মাড়াবে না। মাড়ালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সওয়ার ব্যক্তির সওয়ারীর পায়ের নীচে নাপাকী পড়লে নামায নষ্ট হবে না।

(৬) মুসাফির ব্যক্তির জন্যে সফরে রোযা না রাখা জায়েয। কিন্তু সকালে গৃহে থাকলে এর পর সফর শুরু করলে সেদিনের রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। রোযাদার মুসাফির দিন শেষ হওয়ার পূর্বে গৃহে এসে গেলে সেই রোযা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়। ইচ্ছা করলে রোযা ছেড়ে দিতে পারে। মুসাফিরের জন্যে রোযা না রাখার চেয়ে রাখা উত্তম। কিন্তু রোযা ক্ষতির কারণ হলে না রাখাই উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অষ্টম অধ্যায়

সেমা ও তার আদব

প্রকাশ থাকে যে, লোহা ও পাথরের মধ্যে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত এবং পানির নীচে মাটি আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি অন্তরের মধ্যে আন্তরিক উৎকর্ষ ও রহস্যসমূহ লুক্কায়িত আছে। এগুলো বিকশিত করার জন্যে রাগ তথা সঙ্গীতের সুর অপেক্ষা উত্তম কোন উপায় নেই। কর্ণ ছাড়া অন্তরে যাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। ভারসাম্যপূর্ণ ও সুমধুর সঙ্গীতলহরী অন্তরের আভ্যন্তরীণ ভালমন্দ রহস্যসমূহ ফুটিয়ে তোলে। কেননা, অন্তর ভর্তি পাত্রসদৃশ। একে উপুড় করলে তাই বের হবে, যা দ্বারা তা ভর্তি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সঙ্গীতের সুরও অন্তরের জন্যে সত্যিকার কষ্টিপাথর। সঙ্গীত দ্বারা যখন অন্তর আন্দোলিত হবে, তখন তাই প্রকাশ পাবে, যা অন্তরের উপর প্রবল। অন্তর স্বভাবগতভাবে সঙ্গীতের অনুগত। এমনকি, এর কারণে সে তার ভালমন্দ সবকিছু প্রকাশ করে দেয়। তাই "সেমা" (ধর্মসঙ্গীত) ও তা থেকে সৃষ্ট "ওয়াজদ" (উন্মত্ততা ও মূর্ছা) সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক। এতদুভয়ের উপকারিতা, বিপদাপদ এবং আকার-আকৃতিও ব্যাখ্যা করা জরুরী। এ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল একে নিষিদ্ধ ও একদল বৈধ বলেন। আমরা নিম্নে দু'টি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ

প্রথমে সঙ্গীত হয় এবং তা থেকে অন্তরে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে "ওয়াজদ" বলা হয়। ওয়াজদের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত হয়। এ আন্দোলন ভারসাম্যপূর্ণ না হলে "ইযতিরাব" (চাঞ্চল্য) বলা হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ হলে এর নাম হয় "তাল ও নাচ।" আমরা প্রথমে সঙ্গীতের বিধান লিপিবদ্ধ করব এবং এ সম্পর্কিত মতভেদসমূহ উদ্ধৃত করব। এর পর সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সবশেষে যারা একে হারাম বলে, তাদের প্রমাণসমূহের জওয়াব উল্লেখ করব।

কাযী আবু তাইয়েব তাবারী ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সওরী ও আরও অনেক আলেমের এমন সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা জানা যায়, তাঁরা সকলেই সঙ্গীত হারাম বলতেন। ইমাম শাফেয়ী "কিতাবুল কাযা" গ্রন্থে বলেন ঃ গান বাতিল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়সমূহের ন্যায় একটি মন্দ ক্রীড়া। যে অধিক গান করে, সে বেওকুফ। তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যবর্গের মতে, যে মহিলা মাহরাম নয়, তার কাছ থেকে সঙ্গীত শ্রবণ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়– সে প্রকাশ্যে থাকুক কিংবা পর্দার অন্তরালে, মুক্ত হোক কিংবা বাঁদী। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ বাঁদীর মালিক যদি বাঁদীর গান শুনার জন্যে লোকজনকে একত্রিত করে, তবে তাকে নীচ বলা হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা সুর-তান বাজানোকে খারাপ মনে করতেন এবং একে খোদাদ্রোহীদের আবিষ্কার আখ্যা দিতেন। কোরআন থেকে গাফেল করাই ছিল এ আবিষ্কারের উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন ঃ "নরদ" (দাবার মত এক প্রকার ক্রীড়া) খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিক মকরূহ। কেননা, এর অপকৃষ্টতা হাদীস দ্বারা জানা যায়। আমি "শতরঞ্জ" তথা দাবা খেলা পছন্দ করি না এবং অন্য যেসব খেলা রয়েছে, সবগুলো আমি মকরূহ মনে করি। কেননা, খেলা ধার্মিক ব্যক্তিদের কাজ নয়। ইমাম মালেক সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন, কোন বাঁদী ক্রয় করার পর যদি জানা যায় যে, সে গায়িকা, তবে তাকে ফেরত দেয়া ক্রেতার জন্যে জায়েয। মদীনাবাসী সকল আলেমের মাযহাবও তাই– একা এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনে সা'দ ছাড়া। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সকল ক্রীড়া-কৌতুক খারাপ মনে করতেন এবং সঙ্গীত শুনতে নিষেধ করতেন। সুফিয়ান সওরী, হাম্মাদ, ইবরাহীম, শাবী প্রমুখ কুফাবাসী সকল আলেমের অবস্থাও তাই।

আবু তালেব মক্কী (রহঃ) অনেক আলেমের তরফ থেকে সঙ্গীতের বৈধতা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর, ইবনে যোবায়র, মুগীরা ইবনে শো'বা, মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রমুখ সঙ্গীত শুনেছেন, অনেক তাবেয়ী এবং বুযুর্গগণও শ্রবণ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, আমাদের মতে মক্কার মধ্যে সর্বদাই হেজাযীরা বছরের শ্রেষ্ঠ দিনসমূহে সঙ্গীত শ্রবণ করে এসেছেন; যেমন তাশরীকের দিনসমূহে। মক্কাবাসীর ন্যায় মদীনাবাসীরাও আমাদের এই সময়কাল পর্যন্ত সব সময় সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন। আমরা আবু মারওয়ান কাযীকে দেখেছি, তাঁর কাছে কয়েকজন গায়িকা বাঁদী ছিল। তিনি সুফীদের জন্যে এদেরকে রেখেছিলেন। এরা তাঁদেরকে রাগ শুনাত। হযরত আতার কাছে দু'টি গায়িকা বাঁদী ছিল, যারা তাঁর বন্ধুদেরকে সঙ্গীত শুনাত। আবু তালেব মক্কী আরও বলেন ঃ আবুল হাসান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইবনে সাম (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি কিরূপে সঙ্গীত অস্বীকার করেন, অথচ হযরত জুনায়দ, সিররী সকতী ও যুন্নুন মিসরী (রহঃ) সঙ্গীত শুনতেন? তিনি বললেন ঃ আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন একে জায়েয বলেছেন এবং শ্রবণ করেছেন, তখন আমি একে স্বীকার করব না কেন? সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়ার শ্রবণ করতেন এবং বলতেন, আমি তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক স্বীকার করি না। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন ঃ তিনটি বিষয় আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে– এক, সুশ্রী হওয়া নিরাপত্তাসহ; দুই, উত্তম কথাবার্তা ধর্মপরায়ণতাসহ এবং তিন, বন্ধুত্ব হৃদ্যতাসহ। আমি কোন কোন কিতাবে হুবহু এ উক্তি হারেস মুহাসেবী থেকে বর্ণিত দেখেছি। হারেস মুহাসেবী সংসারবিমুখ এবং ধর্মকর্মের হেফাযতে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও রাগ ও সঙ্গীত বৈধ জ্ঞান করতেন। ইবনে মুজাহিদের রীতি ছিল, তিনি দাওয়াত তখনই কবুল করতেন, যখন তাতে সঙ্গীতও থাকত। যেসকল আওলিয়া সঙ্গীত শুনে অজ্ঞান হয়ে যেতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবুল খায়ের আসকালানী। তিনি সেমা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এতে সঙ্গীত বিরোধীদের খণ্ডন করেছেন। আরও অনেকে বিরোধীদের উক্তিসমূহ খণ্ডন করে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি খিযির (আঃ)-কে দেখে আরজ করলাম, সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের আলেমগণ মতভেদ করেন, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এটা নির্মল ও স্বচ্ছ। আলেমগণের পদ ব্যতীত এতে অন্য অন্য কারো পদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। মমশাদ দিনূরী বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, সঙ্গীতকে আপনি খারাপ মনে করেন কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি একে খারাপ মনে করি না, কিন্তু তাদেরকে বলে দিয়ো তারা যেন এর আগে কোরআন পাঠ করে এবং কোরআন পাঠ করেই খতম করে। তাহের ইবনে বেলাল হামদানী ওয়াররাক আলেমগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি জেদ্দার জামে মসজিদে এ'তেকাফরত ছিলাম। একদিন একদল লোককে মসজিদের এক কোণে কিছু গাইতে দেখে মনে মনে খারাপ ভাবলাম এবং বিস্মিত হয়ে বললাম– আল্লাহ্র গৃহে কবিতা পাঠ করা হচ্ছে! সেদিনই রাত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি মসজিদের সেই কোণে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর বরাবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আছেন, যিনি কিছু কবিতা পাঠ করছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কবিতা শ্রবণ করে ওজদের অবস্থায় আপন বুকে হাত রাখছেন। আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মনে মনে বললাম- যারা কবিতা শ্রবণ করছিল, তাদেরকে খারাপ মনে করা ঠিক হয়নি। এখানে তো স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) শ্রবণ করছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনাচ্ছেন। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এটা নিশ্চিত সত্য অথবা তিনি বললেন ঃ এটা অন্যতম সত্য। ঠিক কোন্ বাক্যটি বলেছিলেন তা আমার সঠিকভাবে স্মরণ নেই। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ দরবেশগণের প্রতি তিন জায়গায় রহমত অবতীর্ণ হয়- খাওয়ার সময়, কেননা উপবাস না করে তারা খায় না; পরস্পরে আলোচনা করার সময়, কেননা সিদ্দীকগণের মকাম ছাড়া তারা অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করে না এবং সঙ্গীত শ্রবণ করার সময়; কারণ তারা উন্মত্ততা সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করে এবং হকের সম্মুখে থাকে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করার অনুমতি দিতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ কেয়ামতের দিন সঙ্গীত আপনার নেকীর পাল্লায় থাকবে, না বদীর পাল্লায়? তিনি বললেন ঃ কোন পাল্লায়ই থাকবে না। এটা সেই لَغْوٌ তথা বাজে বিষয়ের অনুরূপ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ اَيْمَانِكُمْ বাজে বিষয়ের কসম খাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরপাকড় করবেন না।

মোট কথা, সঙ্গীত সম্পর্কে উপরোক্তরূপ উক্তিসমূহ বর্ণিত আছে। অনুসরণের ক্ষেত্রে সত্যান্বেষী ব্যক্তি এসব উক্তিকে পরস্পর বিরোধী পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে কিংবা যেদিকে মনের ঝোঁক দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এটা ঠিক নয়; বরং সত্যকে সত্যরূপে অন্বেষণ করা উচিত; অর্থাৎ, এতে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ অথবা বৈধ জানা যায়, সেগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার, যাতে পরিণামে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। আমরা নিম্নে তাই করছি।

সঙ্গীত বৈধ হওয়ার প্রমাণ ঃ জানা উচিত, সঙ্গীত হারাম বলার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এ কারণে শাস্তি দেবেন। এটা নিছক বিবেকবুদ্ধি দিয়ে জানার বিষয় নয়; বরং এর জন্যে কোরআন-হাদীসের প্রমাণ আবশ্যক। বলাবাহুল্য, শরীয়তের বিষয়সমূহ জানা দু'টি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ- এক, নস্ এবং দুই, কিয়াস, যা নস সম্পর্কিত বিষয়ের উপর করা হয়। নস্ সেই বিষয়কে বলা হয়, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন উক্তি অথবা কর্ম দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং কিয়াস সেই বিষয়কে বলা হয়, যা তাঁর ভাষা ও কর্মদৃষ্টে বুঝা যায়। সুতরাং যদি কোন বিষয়ে নস্ না থাকে এবং কিয়াসও কল্পনা না করা যায়, তবে সে বিষয়কে হারাম বলা বাতিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বরং সে বিষয়টি অন্যান্য বৈধ বিষয়ের মত গণ্য হবে। সঙ্গীতের বেলায় আমরা তাই দেখি। এর নিষিদ্ধতার পক্ষে না আছে কোন নস্, না আছে কোন কিয়াস; বরং নস্ ও কিয়াস উভয়টি সঙ্গীত বৈধ হওয়ার কথা জ্ঞাপন করে। কিয়াস এভাবে জ্ঞাপন করে যে, সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি বিষয় একত্রিত আছে। প্রথমে এসব বিষয় আলাদা আলাদা দেখে অবশেষে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

সুতরাং প্রথমে দেখা দরকার সঙ্গীত কি? বলাবাহুল্য, সঙ্গীত হচ্ছে এমন সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বর শ্রবণ করা, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সংজ্ঞায় ব্যাপক বিষয় হচ্ছে সুললিত স্বর। এটাও দু'প্রকার– ভারসাম্যপূর্ণ স্বর এবং ভারসাম্যপূর্ণ নয়, এমন স্বর। ভারসাম্যপূর্ণ স্বরও দু'প্রকার– এক, যার অর্থ বুঝা যায়; যেমন কবিতা এবং দুই, যার অর্থ বুঝা যায় না; যেমন জীবজন্তুর স্বর। সুললিত স্বর শ্রবণ করা শ্রুতিমধুর হওয়ার কারণে এমন বিষয় নয় যে, হারাম হবে। বরং এটা নস্ ও কিয়াসদৃষ্টে হালাল। কিয়াস হচ্ছে, এর পরিণতি হল শ্রবণেন্দ্রিয় একটি বিশেষ বস্তু দ্বারা পুলক অনুভব করে। মানুষের একটি বিবেক শক্তি ও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একটি উপলব্ধি আছে। যেসকল বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, তন্মধ্যে কতক ইন্দ্রিয়ের কাছে ভাল লাগে এবং কতক খারাপ লাগে। উদাহরণতঃ দৃষ্টিশক্তি সবুজ বনানী, প্রবাহিত পানি, সুশ্রী মুখমণ্ডল সকল সুন্দর রং দেখে আনন্দ অনুভব করে এবং ময়লাযুক্ত রং, কুশ্রী চেহারা ইত্যাদি খারাপ মনে করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকল প্রকার সুগন্ধি ভালবাসে এবং দুর্গন্ধকে ঘৃণা করে। আস্বাদন ইন্দ্রিয় সুস্বাদু ও চর্বিযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে এবং তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তু অপছন্দ করে। বিবেক শক্তি জ্ঞান ও মারেফত দ্বারা আনন্দিত হয় এবং মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা ব্যথিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যেসকল বস্তু উপলব্ধ হয়, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। কতক শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে ভাল লাগে; যেমন কোকিলের কুহু কুহু স্বর, উত্তম বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায ইত্যাদি এবং কতক খারাপ লাগে; যেমন গাধার চেঁচামেচি। এই ইন্দ্রিয়ের আনন্দানুভূতিকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দাভূতির উপর কিয়াস করে বৈধ বলা অযৌক্তিক নয়। অনুরূপভাবে নস্ দ্বারাও জানা যায় যে, সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রদত্ত মধুর কণ্ঠস্বর তাঁর একটি অনুগ্রহরূপে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন ঃ وَيَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ –তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে, এর অর্থ সুমধুর কণ্ঠস্বর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাদীসে আছে–

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ –আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে– যেব্যক্তি সুললিত স্বরে কোরআন পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার তেলাওয়াত সেই প্রভুর তুলনায় অধিক শ্রবণ করেন, যে তার বাঁদীর সঙ্গীত শ্রবণ করে। এক হাদীসে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর প্রশংসায় এরশাদ হয়েছে– তিনি সুললিত স্বরে যবুর তেলাওয়াত করতেন। এমনকি, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে মানুষ, জ্বিন, বন্য পশু এবং পক্ষীকুল পর্যন্ত সমবেত হয়ে যেত। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীর প্রশংসায় বলেন ঃ

لَقَدْ اُعْطِىَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ –আবূ মূসাকে দাঊদ বংশের এক সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন–

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ –সর্বাধিক শ্রুতিকটু শব্দ হচ্ছে গাধার শব্দ।

এ উক্তি সুললিত স্বরের প্রশংসা জ্ঞাপন করে। যদি কেউ বলে যে, সুললিত স্বর এই শর্তে বৈধ যে, তা কোরআন তেলাওয়াতে হবে, তবে তাকে একথাও অবশ্যই বলতে হবে, বুলবুলির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম। কেননা, এটাও কোরআন তেলাওয়াত নয়। বুলবুলির কণ্ঠস্বর শুনা যদি দুরস্ত হয়, তবে যে কণ্ঠস্বরে প্রজ্ঞা ও বিশুদ্ধ অর্থ পাওয়া যায়, তা শ্রবণ করা নাজায়েয হবে কেন? বলাবাহুল্য, কতক কবিতা আদ্যোপান্ত প্রজ্ঞা হয়ে থাকে। সুললিত স্বর সম্পর্কে এই আলোচনা করা হল। এখন সুললিত স্বরের সাথে ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা, ভারসাম্য এক বিষয় এবং সুললিত হওয়া ভিন্ন বিষয়। প্রায়ই স্বর ভাল হয়, কিন্তু ভারসাম্য থাকে না। কখনও ভারসাম্য থাকে, কিন্তু স্বর ভাল হয় না। উৎপত্তিস্থলের দিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ স্বর তিন প্রকার। এক, যা জড় পদার্থ থেকে নির্গত হয়; যেমন বাঁশীর স্বর, তারের ঝংকার, কাষ্ঠের সুরতান এবং ঢোলকের শব্দ। দুই, যা মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়। তিন, যা প্রাণীকুলের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়; যেমন বুলবুলি, ঘুঘু ও অন্যান্য সুকণ্ঠী পক্ষীর আওয়ায। এই প্রকার আওয়ায যেমন সুললিত হয়, তেমনি ভারসাম্যপূর্ণও হয়। এর সূচনা ও পরিণতিতে তালমিল থাকে। ফলে শুনতে ভাল লাগে। সারকথা, সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এসব স্বর শ্রবণ করা হারাম হতে পারে না। কেননা, কারও মাযহাব এরূপ নয় যে, বুলবুলির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম। এটা হতে পারে না, এক পাখীর কণ্ঠস্বর হারাম হবে এবং অন্যটির হবে না। জড় পদার্থ এবং প্রাণীর মধ্যেও এরূপ কোন তফাৎ নেই যে, প্রাণীর স্বর দুরস্ত হবে এবং জড় পদার্থের স্বর দুরস্ত হবে না। অতএব, যে স্বর মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় অথবা কাষ্ঠ থেকে বের করা হয় অথবা ঢোলক কিংবা দফ বাজানোর ফলে সৃষ্ট হয়, সবগুলো বুলবুলির কণ্ঠস্বরের সাথে কিয়াস করে দুরস্ত হওয়া উচিত। তবে শরীয়ত যেগুলো নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো এর ব্যতিক্রম; যেমন ক্রীড়াকৌতুকের সাজসরঞ্জাম এবং তারের বাদ্য। এগুলো হারাম হওয়ার কারণ আনন্দ পাওয়া নয়। কেননা, আনন্দ পাওয়ার কারণে এগুলো হারাম হলে আনন্দ পাওয়ার সকল বস্তুই মানুষের জন্যে হারাম হয়ে যেত। বরং এগুলো হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষের মদ্যপানের আসক্তি অত্যন্ত বেশী ছিল। তাই একে কঠোরভাবে হারাম করা হয় এবং শুরুতে মদের মটকা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ করা হয়। এর সাথে সাথে যেসকল বস্তু মদ্যপায়ীদের অপরিহার্য নিদর্শন ছিল; যেমন বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি, সেগুলোও হারাম করা হয়। কেননা, এগুলো মদ্যপানের অনুগামী বস্তু। উদাহরণতঃ বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া হারাম। কারণ, এটা ব্যভিচারের ভূমিকা। অথবা অল্প মদ নেশার কারণ না হলেও তা হারাম। কেননা, অল্প পানের অভ্যাস শেষ পর্যন্ত বেশী পানে বাধ্য করবে। মোট কথা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি হারাম হয়েছে মদের অনুগামী হওয়ার কারণে। কেননা, প্রথমতঃ এসব বস্তু মদ্যপানের দিকে আহ্বান করে। যে আনন্দ এগুলো দ্বারা অর্জিত হয়, তা মদ দ্বারাই ষোলকলায় পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যেব্যক্তি অল্প দিন হয় মদ ত্যাগ করেছে, এসব বাদ্যযন্ত্র দেখলে তার পূর্বের মদের মজলিস স্মরণ হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলো স্মরণ হওয়ার কারণ হয়। স্মরণ হলে আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আগ্রহ অধিক হলে তা মদ্যপানের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই মদ নিষিদ্ধ করার শুরুতে আরবে প্রচলিত চার প্রকারের বিশেষ মদ্যপাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এগুলো দেখলেই মদ স্মরণ হয়ে যেত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি মদ্যপান সহকারে সঙ্গীত শ্রবণে অভ্যস্ত হয় এবং সঙ্গীত শুনলেই মদ মনে পড়ে যায়, তবে তাকে এ কারণেই সঙ্গীত শুনতে মানা করা হবে। তৃতীয়তঃ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমাবেশ করা পাপাচারী ফাসেকদেরই অভ্যাস। এ মিলের কারণে এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা, যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হয়। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণেই আমরা বলি, যদি কোন সুন্নতকে বেদআতীরা তাদের পরিচয় চিহ্ন করে নেয়, তবে তাদের সাথে মিলের আশংকায় সেই সুন্নতটি বর্জন করা জায়েয। অনুরূপভাবে ডুগডুগি বাজানো হারাম। কেননা, এটা বানরওয়ালা বাজায়। মোট কথা, উপরোক্ত তিনটি কারণে তারের বাদ্যযন্ত্র যেমন– বীণা, বেহালা, সারঙ্গী ইত্যাদি হারাম হয়েছে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢাকঢোল ইত্যাদি বৈধ। এগুলোকে পাখীদের আওয়াযের উপর কিয়াস করে বৈধ করা হয়েছে। কারণ, মদের সাথে এগুলোর সম্পর্ক নেই। মদ্যপায়ীরা এগুলো বাজায় না এবং এতে মদের মজলিস স্মরণ হয় না। এতে মদ্যপায়ীদের সাথে মিলও প্রকাশ পায় না।

ভারসাম্যপূর্ণ স্বরের এক প্রকার ছিল, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়; যেমন কবিতা। এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, কবিতা মানুষের কণ্ঠ থেকেই নির্গত হয়। তাই নিশ্চিতরূপে বৈধ। হাঁ, এক্ষেত্রে দেখতে হবে, কবিতার বিষয়বস্তু কিরূপ? যদি বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ ধরনের হয়, তবে এর গদ্য ও পদ্য উভয়ই হারাম এবং একে মুখে আবৃত্তি করাও হারাম, সঙ্গীত সহকারে আবৃত্তি হোক বা সঙ্গীত ব্যতিরেকে হোক। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ কবিতা এক প্রকার কালাম; ভাল হলে ভাল এবং খারাপ হলে খারাপ। কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন ঃ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً –কতক কবিতা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা। তিনি কবি হাসসান ইবনে সাবেতের জন্যে মসজিদে একটি মিম্বর স্থাপন করাতেন, যাতে তিনি তার উপর দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কীর্তিগাথা বর্ণনা করেন এবং কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের জওয়াব দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে হাসসানকে শক্তি যোগান যে পর্যন্ত সে কাফেরদের জওয়াব দেয় এবং রসূলের গৌরবগাথা বর্ণনা করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কবিতা পাঠ করতেন এবং তিনি মুচকি হাসতেন। ওমর ইবনে শরীদের পিতা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে উমাইয়া ইবনে আবুস্সলতের একশ' পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করলাম। তিনি প্রত্যেকবার বলতেন ঃ আরও আবৃত্তি কর। কবিতার মধ্যে মনে হয় সে যেন মুসলমান। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, সফরে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য 'হুদী' পাঠ করা হত। উটের পিছনে হুদী পাঠ করার প্রথা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের যমানায় সব সময় চালু ছিল। হুদী এক প্রকার কবিতাই, যা সুললিত স্বরে ও ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীত সহকারে পাঠ করা হত। এতে উটের গতিবেগ বেড়ে যেত। সাহাবীগণের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ এটা অপছন্দ করেছেন বলে বর্ণিত নেই; বরং মাঝে মাঝে তারা এটা করার অনুরোধ করতেন।

সঙ্গীত মনকে আন্দোলিত করে এবং মনের প্রবল ভাবকে উত্তোলিত করে। তাই আমরা বলি, আত্মার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীতের সম্পর্ক রাখার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার একটি ভেদ। ফলে সঙ্গীত আত্মার মধ্যে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণতঃ কতক সঙ্গীত দ্বারা প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয় এবং কতক সঙ্গীত দ্বারা বিষাদ ফুটে উঠে। কোন কোন সঙ্গীতে হাসির উদ্রেক হয়। কতক সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষের হাত, পা, মস্তক ইত্যাদি অঙ্গ আন্দোলিত হতে থাকে। এখানে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, এটা বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার কারণে হয়, তারের ঝংকারেও এরূপ হয়ে থাকে। কচি শিশুর মধ্যেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। যখনই তাকে সুললিত স্বরে ঘুম পাড়ানী গান শুনানো হয়, তখনই সে কান্না ছেড়ে চুপ হয়ে যায় এবং স্বরধ্বনি শুনতে থাকে। অথচ সে কোন অর্থ বুঝে না। অনুরূপভাবে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন উটও হুদী গানের এমন প্রভাব গ্রহণ করে যে, ভারী ভারী বোঝাও সে এর কারণে হালকা মনে করতে থাকে। স্ফূর্তির আতিশয্যে সে দূরবর্তী পথকে নিকটবর্তী মনে করে। বড় বড় বিজন প্রান্তরে উট যখন বোঝা ও হাওদার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনও হুদীর আওয়াজ শুনে মাথা তুলে তাকায় এবং হুদী গানে কান লাগিয়ে দ্রুতবেগে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে অধিক বোঝা ও দ্রুত চলার কারণে উট মরেও যায়, কিন্তু তখন হুদীর আনন্দে সে কিছুই টের পায় না।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ দীনূরী বর্ণনা করেন, একবার জঙ্গলে আরবের একটি গোত্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল– তাদের এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত করে তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুতে প্রবেশ করে আমি দেখলাম, এক গোলাম হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দরজার সামনে কয়েকটি উট মরে পড়ে আছে। আর একটি মরেনি', কিন্তু মৃতপ্রায় গোলাম আমাকে বলল ঃ আপনি মেহমান। আপনার কর্তব্য আমার প্রভুর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করা। আমার প্রভু অত্যন্ত অতিথিবৎসল। তিনি এতটুকু বিষয়ের জন্যে আপনার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করবেন না। সম্ভবতঃ তিনি আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেবেন। অতঃপর মেযবান যখন আমার সামনে খাদ্য উপস্থিত করল, তখন আমি খেতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম ঃ যে পর্যন্ত আপনি এই গোলামের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল না করেন, আমি খাদ্য গ্রহণ করব না। মেযবান বলল ঃ এই গোলাম আমাকে ফতুর করে দিয়েছে এবং আমার সর্বস্ব বিনষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে কি করেছে? মেযবান জওয়াব দিল ঃ এ কয়েকটি উটের ভাড়ার উপর আমার জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সে এগুলোর পিঠে অতিমাত্রায় বোঝা চাপিয়েছে। তার কণ্ঠস্বর সুমধুর। সে যখন হুদীতে টান দিল, তখন উটগুলো তিন দিনের পথ একদিনে অতিক্রম করল। এর পর বোঝা নামানোর সাথে সাথে সবগুলো উট মারা গেল। কেবল একটি উট এখনও জীবিত আছে, যা সত্বরই মারা যাবে বলে মনে হয়, কিন্তু আপনি আমার মেহমান। মেহমানের খাতিরে এই গোলাম আপনাকে দান করলাম। এর পর গোলামের কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে আমার ঔৎসুক্যের অন্ত রইল না। সকালে আমার মেযবান গোলামকে বলল ঃ হুদী পাঠ কর। তখন সে একটি কূপ থেকে পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিল। হুদী গানে টান দিতেই সেই উট এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল এবং রশি ছিঁড়ে ফেলল। আমিও উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। আমার মনে পড়ে না, জীবনে কখনও এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনেছি।

এ থেকে জানা গেল, সঙ্গীতের প্রভাব অন্তরে অনুভূত হয়। সঙ্গীত যার অন্তরকে নাড়া দেয় না, সে অসম্পূর্ণ, সমতাবিচ্যুত, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত এবং মনের দিক দিয়ে উট, পশুপক্ষী এমনকি সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে অধিকতর স্থুল। কেননা, ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীত সকলকেই কমবেশী দোলা দেয়। এ কারণেই হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে পক্ষীকুল শূন্যমণ্ডলে স্থির হয়ে যেত। অন্তরে এই প্রভাব বিস্তারের দিকে লক্ষ্য করলে সঙ্গীতকে সর্বাবস্থায় বৈধ অথবা সর্বাবস্থায় হারাম বলা ঠিক হয় না; এটা অবস্থা, ব্যক্তি এবং সঙ্গীতের ধরনভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্তরের ভিতরকার ভাবের যে বিধান, সঙ্গীতের বিধানও তাই। আবু সোলায়মান বলেন ঃ সঙ্গীত অন্তরে সেই ভাব সৃষ্টি করে না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং মনের ভিতরে যে ভাব লুক্কায়িত থাকে, সঙ্গীত তাকেই আন্দোলিত করে থাকে। মোট কথা, বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সাত জায়গায় ভারসাম্যপূর্ণ ও ছন্দপূর্ণ বাক্যাবলী গাওয়ার নিয়ম আছে। প্রথম জায়গা হাজীদের গাওয়া। তারা কবিতায় ঢাকঢোল বাজায় এবং সঙ্গীত গেয়ে ফিরে। এটা বৈধ। কেননা, এসব কবিতায় কাবার প্রশংসা করা হয় এবং মকামে ইবরাহীম, যমযম, হাতীম ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের উল্লেখ করা হয়। এর প্রভাব হচ্ছে, পূর্ব থেকে হজ্জের আগ্রহ থাকলে এসব কবিতা শুনে আগ্রহ আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। নতুবা আগ্রহ তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হজ্জ পুণ্য কাজ বিধায় তার আগ্রহ ভাল। অতএব আগ্রহ সৃষ্টি করা তা যে-কোন উপায়ে হোক, ভালই হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় জায়গা গাজীদের গান। তারাও মানুষকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ছন্দময় কবিতা গায়। এটাও বৈধই; কিন্তু গাজীদের কবিতা এবং গাওয়ার নিয়ম হাজীদের থেকে ভিন্ন হওয়া দরকার। কেননা, জেহাদের আগ্রহ ও বীরত্বগাথা বর্ণনা, কাফেরদের প্রতি রোষ সৃষ্টি, জান ও মালকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বীরত্বের কবিতা পাঠ দ্বারাই হয়ে থাকে। জেহাদ বৈধ হলে এটা বৈধ এবং জেহাদ মোস্তাহাব হলে এটাও মোস্তাহাব, কিন্তু তাদের জন্যেই যাদের জেহাদে যাওয়া জায়েয।

তৃতীয় জায়গা মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় বীরদের গান। এই কাব্যগানের উদ্দেশ্য নিজেকে বীরত্ব প্রদর্শনে এবং সাহসিকতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ায়, উদ্বুদ্ধ করা। এসব কাব্যে বাহাদুরী ও বিজয় ঘোষণা করা হয়। ভাষা উচ্চাঙ্গের এবং কণ্ঠস্বর ভাল হলে এর প্রভাব অধিক হয়ে থাকে। মল্লযুদ্ধে এ ধরনের কবিতা গাওয়া বৈধ এবং মোস্তাহাব। মল্লযুদ্ধে মোস্তাহাব, কিন্তু মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নিষিদ্ধ। হযরত আলী ইবনে আবী তালেব, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ সায়ফুল্লাহ প্রমুখ বীর সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই কবিতা পাঠ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ জায়গা কারও মৃত্যুর কারণে বিলাপ ও শোকগাথা গাওয়া। এর প্রভাব হচ্ছে বিষাদ ও উদাসভাব সৃষ্টি করা। বিষাদ দু'প্রকার ঃ একটি প্রশংসনীয় ও অপরটি নিন্দনীয়। কোন কিছু খোয়া যাওয়ার কারণে যে বিষাদ হয়, তা নিন্দনীয়। এ কারণে বিষাদ করতে আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে−

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ −যাতে তোমরা দুঃখ না কর তার জন্যে, যা ফওত হয়ে গেছে। মৃতের জন্যে দুঃখ করাও এর মধ্যে দাখিল। এতে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তে যেন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের বিষাদ নিন্দনীয় বিধায় শোকগাথা দ্বারা একে উত্তোলিত করাও নিন্দনীয়। এ কারণেই বিলাপ ও শোকগাথা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রশংসনীয় বিষাদ হচ্ছে ধর্মকর্মে অক্ষমতা এবং পাপরাশি স্মরণ করে বিষাদ করা। এ জন্যে কান্নাকাটি করা এবং কান্নাকাটির ভান করা উত্তম। হযরত আদম (আঃ) এ জন্যেই কান্নাকাটি করতেন। এ বিষাদে ক্ষতিপূরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয় বিধায় হযরত দাউদ (আঃ)-এর শোকগাথা প্রশংসনীয় ছিল। কেননা, অধিক কান্নাকাটি ও বিষাদ গোনাহের কারণে ছিল। সেমতে তিনি নিজে বিষণ্ন হতেন এবং অপরকেও বিষণ্ন করতেন, নিজে কাঁদতেন এবং অপরকেও কাঁদাতেন। তাঁর শোকগাথার মজলিস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে জানাযা বের হত। তিনি এই বিলাপ ভাষা ও সুর সহকারে করতেন।

পঞ্চম জায়গা আনন্দোৎসব ও উল্লাস প্রকাশের জন্যে গাওয়া। যেমন ঈদের দিনে, বিবাহ মজলিসে, অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমনে, ওলীমা, আকীকা, পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণে এবং খতনা ও হিফযে কোরআনে আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশে গাওয়া জায়েয। কেননা, কতক স্বরভঙ্গি দ্বারা আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তোলিত হয়। অতএব যেসব ক্ষেত্রে আনন্দ-উল্লাস করা জায়েয, সেখানে আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তোলন করাও জায়েয। যখন রসূলে আকরাম (সাঃ) মদীনা তাইয়েবাকে শুভ পদার্পণ দ্বারা গৌরবান্বিত করেন, তখন মহিলারা ছাদের উপর দফ বাজিয়ে গীত গাচ্ছিল–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ (ছানিয়াতুল বিদা গিরিপথ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদিত হয়েছে।) এটা তাঁর শুভাগমনের উল্লাস ছিল বিধায় এতে সুর, লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গি করাও প্রশংসনীয় ছিল। বর্ণিত আছে, কতক সাহাবী যখন উল্লসিত হতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে এক পায়ে ভর দিয়ে নাচানাচি করতেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশার গৃহে গমন করলেন। তখন সেখানে মিনা দিবস উপলক্ষে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল ও নৃত্য করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করে শায়িত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলে তিনি মুখমণ্ডলের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন ঃ আবু বকর, ছাড়, এদেরকে কিছু বলো না। জান না, এটা ঈদের দিন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন আর আমি মসজিদে হাবশীদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) এসে আমাকে শাসালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে বনী আরকাদা, তোমরা নির্বিঘ্নে খেলা প্রদর্শন কর। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সখীরাও এতে যোগ দিত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখলে লজ্জায় কক্ষে চলে যেত। তিনি আমার সাথে খেলার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন। এক হাদীসে আছে– নবী করীম (সাঃ) একদিন হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কি? তিনি বললেন ঃ আমার পুতুল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলোর মাঝখানে এটা কি? তিনি আরজ করলেন ঃ ঘোড়া। তিনি বললেন ঃ এই ঘোড়ার দুপাশে এগুলো কি? তিনি আরজ করলেন ঃ পাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা হয় নাকি? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ আপনি শুনেননি, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়ার পাখা ছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে রসূলে করীম (সাঃ) এত হাসলেন যে, তাঁর উভয় দন্তপাটি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আমাদের মতে পুতুলের হাদীসটি বালিকাদের অভ্যাস ধরতে হবে। তারা পূর্ণ অবয়ব ছাড়াই মাটি অথবা কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরী করে নেয়। কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সেই ঘোড়ার দু'টি পাখা কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

ষষ্ঠ জায়গা প্রেমিকদের রাগ। এর উদ্দেশ্য আগ্রহকে নাড়া দেয়া, এশক বৃদ্ধি পাওয়া এবং মনের স্থিরতা লাভ হয়ে থাকে। প্রেমাস্পদের সম্মুখে হলে এতে আনন্দ অধিক হয়। আর বিরহের স্থলে হলে উদ্দেশ্য আগ্রহকে উত্তোলিত করা হয়। এ ধরনের রাগও হালাল, যদি প্রেমাস্পদ এমন হয় যার মিলন বৈধ। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি তার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেলে সে আনন্দ লাভের উদ্দেশে স্ত্রীর রাগ শ্রবণ করতে পারে।

সপ্তম জায়গা এমন লোকদের সঙ্গীত শ্রবণ করা, যারা আল্লাহ তাআলার এশকে বিভোর এবং তাঁর দীদারে আগ্রহী, তারা যেদিকে তাকায়, কেবল তাঁর নূর দেখতে পায় এবং যে স্বর শুনে, তা তাঁর কাছ থেকেই মনে করে। সেমা এরূপ লোকদের আগ্রহ উত্তোলিত করে এবং এশক ও মহব্বত পাকাপোক্ত করে। সেমা তাদের অন্তরে চকমকি পাথরের কাজ করে এবং এমন কাশফ লতীফা প্রকাশ প্রকাশ করে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে এর স্বাদ গ্রহণ করে সে-ই বুঝে। যার অনুভূতি এর স্বাদ গ্রহণে অক্ষম, সে এর মর্ম জানে না। সুফীগণের পরিভাষায় এ অবস্থার নাম "ওজুদ", যা "ওজদ" (পাওয়া) ধাতু থেকে নির্গত। অর্থাৎ, তারা মনের মধ্যে এমন অবস্থা পায়, যা সঙ্গীতের পূর্বে জানা থাকে না। এসব অবস্থার কারণে পরে এগুলোর অনুগামী এমন এমন বিষয় সৃষ্টি হয়, যা অন্তরকে আপন অনলে দগ্ধ করে এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে এমন পরিষ্কার করে দেয়, যেমন আগুনে পুড়ে সোনা রূপা পরিষ্কার ও নির্মল হয়ে যায়। এর পর মোশাহাদা ও মোকাশাফা হয়, যা সকল খোদাপ্রেমিকের পরম ও চরম লক্ষ্য এবং যাবতীয় এবাদতের ফল।

সঙ্গীত হারাম হওয়ার কারণ ঃ পাঁচটি কারণে রাগ তথা সঙ্গীত হারাম হয়ে থাকে। প্রথম, গায়িকা এমন নারী হলে, যাকে দেখা হালাল নয় এবং যার গানে ফেতনার আশংকা থাকে। শ্মশ্রুবিহীন বালকের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিধানও তাই। কারণ, তার গানেও ফেতনার আশংকা থাকে। দ্বিতীয়, এমন বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত করলে, যা রাখা মদ্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য; যেমন সেতার, বেহালা ইত্যাদি তারের বাদ্যযন্ত্র। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যন্ত্র বৈধ; যেমন– দফ, কাষ্ঠনির্মিত বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। তৃতীয়, সঙ্গীতের বাণীতে ত্রুটি থাকলে; অর্থাৎ, অশ্লীল, বাজে, বিদ্রূপাত্মক এবং আল্লাহ্, রসূল ও সাহাবায়ে কেরামের শানে অসত্য বিষয়বস্তু সম্বলিত হলে সেই সঙ্গীত বৈধ নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের শানে এ ধরনের সঙ্গীত কবিতা রচনা করে থাকে। এ ধরনের কবিতা গীতরূপে এবং গীত ছাড়াও শ্রবণ করা হারাম। অনুরূপভাবে সেই কবিতাও হারাম, যাতে কোন বিশেষ মহিলার রূপলাবণ্য বর্ণনা করা হয়। কেননা, কোন নির্দিষ্ট মহিলার এমন আলোচনা পুরুষদের সামনে জায়েয নয়, যদ্দ্বারা তার দৈহিক অবস্থা ফুটে উঠে। তবে সাধারণভাবে নারী অঙ্গের চিত্র ও সৌন্দর্য কবিতায় বর্ণনা করা এবং তা গাওয়া হারাম নয়। শ্রোতার উচিত এ বর্ণনাকে কোন নির্দিষ্ট সুন্দরী নারীর জন্যে কল্পনা না করা। হাঁ, আপন বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে কল্পনা করায় দোষ নেই। কাফের ও বেদআতীদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা গাওয়া জায়েয। সেমতে কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করে কবিতা আবৃত্তি করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে এর অনুমতি দান করেছিলেন। চতুর্থ, শ্রোতার মধ্যে অনিষ্ট থাকার কারণে সঙ্গীত হারাম হয়; যেমন কামভাব প্রবল থাকা এবং ভরা যৌবনে থাকা। এরূপ ব্যক্তির জন্যে সঙ্গীত শ্রবণ করা হারাম। তার অন্তরে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মহব্বত প্রবল হোক বা না হোক। কেননা, সে যখনই কেশগুচ্ছ, গাল এবং বিরহ ও মিলনের বর্ণনা শুনবে, তখনই তার কামভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং কল্পনায় কোন নির্দিষ্ট সুন্দরী নারী ভেসে উঠবে। ফলে তার কামানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য, অন্তরে শয়তান বাহিনী (অর্থাৎ, কামভাব) এবং আল্লাহ্র বাহিনী (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির নূর)– এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে। তবে যার মধ্যে এক বাহিনী বিজয়ী হয়ে যায় এবং অপর বাহিনী সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তার ভিতরকার যুদ্ধ মওকুফ হয়ে যায়। আজকাল অধিকাংশ অন্তরকে শয়তান বাহিনী জিতে নিয়েছে। এমতাবস্থায় নতুনভাবে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন; যাতে অন্তর থেকে শয়তানের পা উপড়ে যায়। শয়তানের অস্ত্র বাড়ানো কিছুতেই উচিত নয়। এ ধরনের লোকের জন্যে সঙ্গীত শয়তান বাহিনীর অস্ত্র শাণিত করার শামিল। এরূপ ব্যক্তির সেমা'র মজলিস থেকে চলে যাওয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উচিত। নতুবা সঙ্গীত দ্বারা তার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে। সঙ্গীত হারাম হওয়ার পঞ্চম কারণ, শ্রোতার সাধারণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল নয় যে, সেমা তার কাছে ভাল মনে হবে এবং তার মধ্যে কামভাবও প্রবল নয় যে, সঙ্গীত তার জন্যে নিষিদ্ধ হবে। এরূপ লোকের জন্যে সেমা' অন্যান্য বৈধ আনন্দের মতই, কিন্তু সে যদি সেমাকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয় এবং অধিকাংশ সময় এতেই ব্যয় করে, তবে সে নির্বোধ, যার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। কেননা, ক্রীড়াকৌতুক সব সময় করা গোনাহ্। সগীরা গোনাহ্ সব সময় করলে যেমন কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায়, তেমনি বৈধ কাজ সব সময় করলে গোনাহ্ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ হাবশীদের পেছনে সব সময় পড়ে থাকা এবং তাদের খেলাধুলা দেখা নিষিদ্ধ, যদিও তা আসলে নিষিদ্ধ নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা দেখেছেন। এটা গালে তিল থাকার মত। তিল যদিও কাল, কিন্তু গালে একটি দু'টি থাকলে ভালই দেখায় আর অনেকগুলো থাকলে বিশ্রী হয়ে যায়। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে, কোন বস্তু বৈধ হলে তার অধিক মাত্রাও বৈধ হবে এবং কোন কোন বস্তু আধিক্যের কারণে হারাম হয়ে যায়। অতএব, সেমাও মাঝে-মধ্যে হলে বৈধ এবং নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হলে অবৈধ।

যারা হারাম বলে, তাদের দলীল ও জওয়াব ঃ প্রথম দলীল- আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ কতক লোক ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ), হাসান বসরী ও মখফী (রঃ) বলেন ঃ "ক্রীড়ার কথাবার্তা" মানে সঙ্গীত। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন গায়িকা বাঁদীকে, তার ক্রয় বিক্রয়, তার মজুরি এবং তার শিক্ষাকে। এর জওয়াব হল, এই হাদীসে সেই বাঁদীকে বুঝানো হয়েছে, যে মদের মজলিসে পুরুষদের সামনে গান গায়। এটা যে হারাম, তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আরবরা গায়িকা বাঁদী দ্বারা নিষিদ্ধ গান গাওয়াত। যদি কেবল প্রভু নিজের সামনে গাওয়ায়, তবে এ হাদীস দ্বারা তার নিষিদ্ধতা বুঝা যায় না। আয়াতে যে ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরে এ কথাও বলা হয়েছে, যাতে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়। এটা বাস্তবে হারাম। কিন্তু সকল গানই আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে নয়। আয়াতে এমন সঙ্গীতই উদ্দেশ্য, যা বিচ্যুত করার নিয়তেই হয়। এটা কেবল সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কেউ যদি মানুষ পথভ্রষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হোক– এ নিয়তে কোরআনও পাঠ করে, তবে তাও হারাম হবে। সেমতে বর্ণিত আছে, জনৈক মোনাফেক নামাযে ইমামতি করত এবং সূরা আবাসা ছাড়া অন্য কোন সূরা তেলাওয়াত করত না। কারণ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শাসানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এ কাজ হারাম মনে করে মোনাফেককে হত্যা করতে চাইলেন। কেননা, তার উদ্দেশ্য ছিল পথভ্রষ্ট করা। সুতরাং কবিতা ও গানের উদ্দেশ্য পথভ্রষ্ট করা হলে তা নিঃসন্দেহে হারাম হবে। দ্বিতীয় দলীল– আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ـ

তোমরা কি এই বাণী দেখে বিস্মিত হও, হাস্য কর, ক্রন্দন কর না এবং খেলা তামাশা কর?

কথিত আছে, হেমইয়ারী ভাষায় "সমূদ" সঙ্গীতকে বলা হয়। এ থেকেই "সামিদূন" উদ্ভূত হয়েছে। এ আয়াতের জওয়াব হল, যদি আয়াতে উল্লিখিত হলেই হারাম হয়ে যায়, তবে হাস্য করা এবং ক্রন্দন করাও হারাম হওয়া দরকার। কেননা, এগুলোও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যদি বলা হয়, এখানে হাসির অর্থ বিশেষ হাসি; অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার কারণে মুসলমানের প্রতি বিদ্রূপের হাসি, তবে আমরাও বলব, সঙ্গীত দ্বারা বিশেষ সঙ্গীত উদ্দেশ্য, যা মুসলমানদের প্রতি উপহাস সম্পর্কিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ (পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে।) এখানে কাফের কবি উদ্দেশ্য। এই অর্থ নয় যে, পদ্য রচনা করাই হারাম।

তৃতীয় দলীল– হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম শয়তানই বিলাপ করেছে এবং সে-ই প্রথমে গান গেয়েছে। এতে সঙ্গীত ও বিলাপ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জওয়াব হচ্ছে, বিলাপ হলেই তা হারাম হয় না; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিলাপ এর ব্যতিক্রম ছিল এবং গোনাহের কারণে গোনাহগারের বিলাপও এর ব্যতিক্রম। এমনিভাবে যে সঙ্গীত দ্বারা বৈধ বিষয়ের প্রতি আনন্দ, বিষাদ ও আগ্রহ আন্দোলিত হয়, তাও ব্যতিক্রমভুক্ত; যেমন ঈদের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে বালিকাদের গান গাওয়া এবং মদীনায় শুভাগমনের দিন মহিলাদের গীত গাওয়া।

চতুর্থ দলীল– হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি সঙ্গীতে কণ্ঠ দেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শয়তানকে তার স্কন্ধে প্রেরণ করেন। সে তার উভয় গোড়ালি দিয়ে গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত গায়কের বুকে আঘাত করতে থাকে। এর জওয়াব হচ্ছে, এই হাদীসে সঙ্গীতের কতক প্রকার বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, যে সঙ্গীত দ্বারা শয়তানের অভীষ্ট তথা কামভাব ও মানুষের প্রতি এশক উত্তেজিত হয়, কিন্তু যে সঙ্গীত দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঔৎসুক্য অথবা ঈদের আনন্দ অথবা কোন মহান ব্যক্তির আগমনের উল্লাস বৃদ্ধি পায়, তা শয়তানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বিধায় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পঞ্চম দলীল হচ্ছে, ওকবা ইবনে আমেরের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ খেলাধুলার সকল বস্তু বাতিল, কিন্তু আপন ঘোড়াকে ঘুরানো-ফেরানো, তীর নিক্ষেপ করা এবং স্ত্রীর সাথে আনন্দ গীত গাওয়া– এগুলো বাতিল নয়। এর জওয়াব হচ্ছে, বাতিল বললেই হারাম বলা হয় না; বরং বাতিলের অর্থ অনর্থক স্বীকার করে নিলেও হাবশীদের খেলাধুলা দেখা এই তিনের মধ্যে দাখিল থেকে হারাম হবে না। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ –তিনটি কারণের মধ্য থেকে যেকোন একটি কারণ ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়) এখানে সীমিতের মধ্যে অসীমকে কেয়াস করে চতুর্থ এবং পঞ্চম কারণকেও সংযুক্ত করে নেয়া হয়।

ষষ্ঠ দলীল– হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন ঃ যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বয়াত হয়েছি, কখনও গীত গাইনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিনি। এর জওয়াব হচ্ছে, এ উক্তি হারাম হওয়ার দলীল হলে ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাও হারাম হওয়া দরকার। এছাড়া এটা কোত্থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান কেবল হারাম বস্তুই বর্জন করতেন?

সপ্তম দলীল– হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ সঙ্গীত অন্তরে নেফাক তথা কপটতার জন্ম দেয়; যেমন পানি শাকসব্জি উৎপন্ন করে। কেউ কেউ এ উক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও বর্ণনা করেছেন। অথচ এটা সহীহ্ নয়। আরও বলা হয়, কিছু লোক হযরত ইবনে ওমরের সম্মুখ দিয়ে এহরাম বাঁধা অবস্থায় গমন করল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি গান গাচ্ছিল। তিনি দু'বার বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল না করুন। নাফে' বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমরের সঙ্গে পথিমধ্যে ছিলাম। তিনি এক রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনে কানে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিলেন এবং এ পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলেন। তিনি কেবল আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন– তুমি বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ কি না? অবশেষ যখন আমি বললাম ঃ না, আর শুনা যায় না, তখন তিনি কান থেকে অঙ্গুলি বের করে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি। ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সঙ্গীত অপকর্মের দূত। ইয়াযিদে ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ সঙ্গীত থেকে দূরে থাক। কারণ, এটা কামভাব বৃদ্ধি করে, মনুষ্যত্ব ধূলিসাৎ করে, মদের বিকল্প এবং নেশার মত প্রভাব বিস্তার করে। যদি তুমি শুনই, তবে নারীদের সঙ্গীত শুনো না। কেননা, এটা ব্যভিচার দাবী করে।

এখন এ সমস্ত উক্তির জওয়াব লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেছেন– সঙ্গীত কপটতা সৃষ্টি করে- এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গায়কের মধ্যে এই প্রভাব ফেলে। কেননা, তার লক্ষ্যই থাকে নিজেকে অন্যদের সামনে পেশ করা এবং আপন কণ্ঠস্বর তাদেরকে শুনানো। এটা কপটতা, কিন্তু এ থেকে সঙ্গীত হারাম বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করলেও অন্তরে কপটতা ও রিয়া সৃষ্টি হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করা হারাম নয়। হযরত ইবনে ওমরের উক্তি– আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল না করুন– এ থেকেও সঙ্গীত হারাম বলে প্রমাণিত হয় না। বরং তারা এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিল বিধায় নারীদের আলোচনা তাদের জন্যে সমীচীন ছিল না। তাদের ভাবসাব দেখে তিনি বুঝে নেন যে, তাদের সঙ্গীত বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের আগ্রহ-প্রসূত নয়; বরং নিছক ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে। তাই তিনি এটা অপছন্দ করলেন। তাঁর কানে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়া দ্বারাও হারাম হওয়া প্রণাণিত হয় না। কেননা, এতে আছে, তিনি নাফে'কে কানে অঙ্গুলি ঢুকাতে বলেননি এবং শুনতে নিষেধ করেননি। তবে তাঁর নিজের এ কাজ করার কারণ হচ্ছে, তিনি নিজের মনকে এই আওয়াজ শুনা থেকে পবিত্র রেখেছেন, যাতে যে ধ্যানে তিনি ছিলেন, তা ব্যাহত অথবা যিকির বাধাপ্রাপ্ত না হয়। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এ কারণেই তা করেছিলেন। তিনিও হযরত ইবনে ওমরকে বাঁশীর আওয়াজ শুনতে নিষেধ করেননি। সুতরাং বুঝা যায়, হারাম হওয়ার কারণে তিনি এরূপ করেননি; বরং এটা উত্তম ছিল। আমাদের মতে অধিকাংশ অবস্থায় এটা বর্জন করা উত্তম; বরং দুনিয়ার অধিকাংশ বৈধ বস্তু বর্জন করা ভাল, যদি অন্তরে তার প্রভাব পড়ার ধারণা প্রবল হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে আবু জাহমের প্রেরিত পোশাক খুলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেলেছিলেন। কারণ, তাতে চিত্র অংকিত ছিল। ফলে তাঁর অন্তর তাতে মশগুল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয় যে, কাপড়ে চিত্র অংকন করা হারাম? ফোযায়লের উক্তি– সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র এবং এর কাছাকাছি অন্যান্য উক্তির জওয়াব হচ্ছে, এটা পাপাচারী, যুবক ও কামপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ্গীতের অবস্থা। সকল সঙ্গীতের এ অবস্থা হলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর গৃহে দু'বালিকার সঙ্গীত শ্রবণ করা হত না।

এটা অনস্বীকার্য যে, সঙ্গীত খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দুনিয়া সবটুকুই খেলাধুলা। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) আপন পত্নীকে বলেছিলেন ঃ তুমি গৃহের কোণে একটি খেলনা মাত্র। অনুরূপভাবে রং তামাশা অশ্লীল না হলে বৈধ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এছাড়া আমরা বলি, খেলাধুলা মনকে স্বস্তি দান করে এবং চিন্তার বোঝা লাঘব করে। উদাহরণতঃ যারা লেখাপড়া করে, তাদের জুমার দিন ছুটি ভোগ করা উচিত। কেননা, একদিনের ছুটি অন্যান্য দিনের কাজে স্ফূর্তি আনয়নে সহায়ক হয়। মোট কথা, ছুটি কাজে সহায়তা করে এবং খেলাধুলা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সাহায্য করে। খেলাধুলা মানসিক ক্লান্তির প্রতিকার বিধায় এটা বৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু এর আধিক্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন ওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন না করা বাঞ্ছনীয়। এ নিয়তে খেলাধুলা করলে তাতে সওয়াবও হবে। আনন্দ ও স্বস্তি ছাড়া সঙ্গীত যার মধ্যে অন্য কোন কুপ্রভাব ফেলে না, তার জন্যে সঙ্গীত মোস্তাহাব হওয়া উচিত, যাতে এর মাধ্যমে সে মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে পারে। হাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এটা কামেলের মর্তবার নীচে। কামেল সে ব্যক্তিই, যে নিজের মনকে স্বস্তি দেয়ার ব্যাপারে সত্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কথায় বলে– সৎকর্মপরায়ণদের পুণ্য কাজ নৈকট্যশীলদের জন্যে উপকারী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সেমার প্রভাব ও আদব

উল্লেখ্য, সেমার প্রথম স্তর হচ্ছে শ্রুত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়া, দ্বিতীয় স্তর হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পর ওজ্দ হওয়া এবং তৃতীয় স্তর ওজদের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলন হওয়া। নিম্নে এ তিনটি স্তরই আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

সেমা হৃদয়ঙ্গম হওয়া ঃ এটা শ্রোতার অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। শ্রোতার অবস্থা চারটি ঃ প্রথম- স্বাভাবিকভাবে শ্রবণ করা; অর্থাৎ, সুর ও তালের আনন্দ ছাড়া সেমার অন্য কোন প্রভাব গ্রহণ না করা। এরূপ শ্রবণ বৈধ এবং সেমার স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর। কেননা, এ স্তরে উট এবং চতুষ্পদ জন্তুও শ্রোতার অংশীদার। বরং এ রুচির জন্যে কেবল প্রাণ থাকা দরকার। প্রত্যেক প্রাণী সুললিত স্বর দ্বারা এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে থাকে। দ্বিতীয়- অবস্থা বুঝে সুঝে শ্রবণ করা এবং বিষয়বস্তুকে কোন নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কল্পনা করতে থাকা। যুবক ও কামপ্রবণরা এরূপ শ্রবণ করে। এটা খারাপ ও নিষিদ্ধ- একথা বলাই যথেষ্ট। এর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় অবস্থা শ্রুত বিষয়কে নিজের অবস্থার মধ্যে কল্পনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে শ্রোতা যেসকল অবস্থার সম্মুখীন হয়- কখনও সমর্থ হয় এবং কখনও অক্ষমতা দেখা দেয়- এগুলো করে যাওয়া। মুরীদ বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরের মুরীদরা এভাবে শ্রবণ করে থাকে। সঙ্গীতের বিষয়বস্তু নিজের অবস্থার মধ্যে কল্পনা করার কয়েকটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

জনৈক সুফী এক ব্যক্তিকে কবিতা গাইতে শুনল যার মর্মার্থ নিম্নরূপ-

-দূত আমাকে বলল ঃ কাল তুমি সাক্ষাৎ করবে। আমি বললাম ঃ কি বলছ, কিছু খবরও রাখ?

উল্লিখিত মর্ম সম্বলিত কবিতা শুনে সূফী এতটুকু উত্তেজিত হল যে, বারবার পড়তে লাগল এবং "তুমি"র জায়গায় "আমি" বলতে লাগল। এর পর আনন্দের আতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর তাকে এই ওজদের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই এরশাদ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল- জান্নাতীরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইবনে দাররাজ বর্ণনা করেন– আমি ও ইবনে কূতী বসরা ও আয়লার মধ্যস্থলে দজলার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি সুরম্য প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হল। প্রাসাদের বারান্দায় এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। তার সামনে এক বাঁদী কবিতা আবৃত্তি করছিল যার মর্ম নিম্নরূপ–

–প্রত্যহ তোমার অবস্থার মধ্যে নব নব পরিবর্তন হচ্ছে। এ ছাড়াও তো আরও কিছু করা তোমার জন্যে শোভনীয়।

ঘটনাক্রমে তখন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত জনৈক ফকীরবেশী যুবক বারান্দার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর শুনে সে বাঁদীকে বলল ঃ তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম এবং তোমার প্রভুর হায়াতের কসম, তুমি চরণটি পুনরায় আবৃত্তি কর। বাঁদী পুনরায় তা আবৃত্তি করলে যুবক বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমার অবস্থার পরিবর্তনও তাই। অতঃপর সে একটি মর্মভেদী চীৎকার করে প্রাণত্যাগ করল। ইবনে দাররাজ বলেন ঃ অতঃপর আমি আমার সঙ্গীকে বললাম– এখন তো আমরা একটি ফরয কাজের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি। এ লোকটির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। গৃহস্বামী বাঁদীকে বলল ঃ তুই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত। এর পর বসরার লোকজন বেরিয়ে এল এবং যুবকের জানাযায় শরীক হল। দাফন শেষে গৃহস্বামী তাদেরকে বলল ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি– এ প্রাসাদসহ আমার যত ধনসম্পদ আছে, সমস্তই ওয়াকফ করলাম। আমার সকল বাঁদী মুক্ত। অতঃপর সে তার পোশাক খুলে ফেলল এবং একটি লুঙ্গি পরিধান করে ও অপরটি কাঁধে ফেলে অজানার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। লোকজন তার বিরহে কান্নাকাটি করছিল। সে কোথায় গেল, কি করল, পরে আর তা জানা গেল না। যুবকটি আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিজের অবস্থায় সব সময় ডুবে থাকত এবং এ কাজে যথার্থ আদবের ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম মনে করত। অন্তরের দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার কারণে খুব দুঃখ করত। তার অবস্থার সাথে খাপ খায় এমন কবিতার আওয়াজ যখন তার কানে পড়ল, তখন সে কল্পনা করল– আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হচ্ছে, প্রত্যহ তুমি নতুন রং পরিবর্তন করছ। এরূপ না করাই তোমার জন্যে শ্রেয়।

চতুর্থ অবস্থা– শ্রোতার এমন হওয়া যে, সে সকল হাল ও মকাম অতিক্রম করে এখন আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছু বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এমনকি, সে নিজেকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে সাক্ষাত খোদায়ী উপস্থিতির দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা সেই মহিলাদের অনুরূপ, যারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মুখশ্রী দেখার সময় আপন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপন অঙ্গুলি কেটে ফেলেছিল এবং এমন অচেতন হয়ে পড়েছিল যে, অঙ্গুলি কর্তনের কোন খবরই তাদের ছিল না। এ ধরনের অবস্থাকে "ফানা ফিন্নফস" বলা হয়; অর্থাৎ, অহংকেও বিস্মৃত হয়ে যাওয়া। বলাবাহুল্য, যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে, সে অন্য সব কিছুকে আরও বেশী বিস্মৃত হয়ে যাবে। সে যেন একমাত্র আল্লাহ্র সত্তা (যার কাছে সে উপস্থিত) ছাড়া অন্য সব বস্তু থেকে ফানা হয়ে যায়। এমনকি, মোশাহাদা (প্রত্যক্ষ করা) থেকেও ফানা হয়ে যায়। কেননা, অন্তর যদি মোশাহাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে এবং নিজের দিকে ধ্যান দেয় যে, সে মোশাহাদা করছে, তবে আল্লাহ্ থেকে গাফেল হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ যখন কেউ দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু দেখার মধ্যে বেশী মাত্রায় নিমজ্জিত হয়, তখন দেখার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ থাকে না এবং যে চোখ দিয়ে দেখে, সেই চোখের প্রতিও খেয়াল থাকে না। যে অন্তর দ্বারা আনন্দ অনুভব করে, সেই অন্তরও কল্পনায় থাকে না। অনুরূপভাবে কোন বস্তুকে জানা এক বিষয় এবং সেই জানাকে জানা ভিন্ন বিষয়। যেব্যক্তি কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, যখন তার ধ্যানে সেই জ্ঞাত হওয়ার জ্ঞান হবে, তখন সে সেই বস্তু সম্পর্কে গাফেল সাব্যস্ত হবে। ফানার এ অবস্থা অধিকাংশ সময় বিদ্যুতের চমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়– দীর্ঘস্থায়ী হলে তা সহ্য করার শক্তি মানুষের নেই; বরং মাঝে মাঝে এই বোঝার নীচে মানুষ ছট্ফট্ করে মৃত্যুবরণ করে। সেমতে বর্ণিত আছে, আবুল হাসান নূরী (রঃ) এক সেমার মজলিসে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা শুনতে পান ঃ–

–আমি সর্বদা তোমার মহব্বতে এমন মজলিসে পৌঁছি, যেখানে পৌঁছার সময় জ্ঞানবুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে যায়।

উদ্বৃত বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা শুনামাত্রই তার মধ্যে ওজদ্ দেখা দেয় এবং তিনি একদিকে রওয়ানা হয়ে যান। ঘটনাক্রমে তিনি এক জঙ্গলে পৌঁছলেন, সেখান থেকে সদ্য বাঁশ কেটে নেয়া হয়েছিল এবং বাঁশের শিকড়গুলো ধারালো অবস্থায় খাড়া ছিল। তিনি এগুলোর মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত সেই কবিতা আওড়াতে থাকেন। তাঁর পদযুগল রক্তাপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল। এর পর তিনি কয়েকদিন জীবিত থাকেন এবং পরম প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে চলে যান। এ ধরনের বোধশক্তি ও ওজ্দ সিদ্দীকগণের হয়ে থাকে। সেমার সকল স্তরের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ স্তর।

সেমা ও ওজদ ঃ আত্মার সাথে সেমার মিল সম্পর্কে সুফী ও দার্শনিক বুযুর্গগণ বক্তব্য পেশ করে থাকেন। ওজদের স্বরূপ সম্পর্কে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাঁদের পক্ষ থেকে অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে আমরা তাঁদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করব। এর পর যে উক্তিটি সুচিন্তিত, তা বর্ণনা করব। সুফীকুল শিরোমণি হযরত যুন্নুন মিসরী (রঃ) বলেন ঃ সেমা সত্যের আগন্তুক। অন্তরকে সত্যের দিকে আন্দোলিত করার জন্যে এর আগমন হয়ে থাকে। অতএব যে সত্যান্বেষায় এটা শুনবে, সে "মুহাক্কিক" তথা সত্যান্বেষী। আর যে প্রবৃত্তির তাড়নায় শুনবে, সে "যিন্দীক" তথা অবিশ্বাসী। তাঁর মতে সেমার মধ্যে ওজদ হচ্ছে সত্যের প্রতি অন্তরের ঝোঁক। অর্থাৎ, যখন সেমার আগন্তুক আসবে, তখন সত্য মওজুদ পাবে। কারণ, তার নামই সত্যের আগন্তুক। আবুল হুমায়ুন দাররাজ সেমার মধ্যে ওজদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– ওজদ সেই অবস্থাকে বলে, যা সেমার সময় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ সেমা আমাকে সৌন্দর্যের মাঠে দৌড়িয়ে নিয়ে যায়, ওজদে ফেলে দেয় এবং অকৃত্রিমতার পানপাত্র পান করায়। আমি এর মাধ্যমে খোদায়ী সন্তুষ্টির স্তরসমূহ অর্জন করেছি এবং পবিত্রতার বাগিচায় ও পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করেছি। শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ সেমার বাহ্যিক রূপ ফেতনা এবং আভ্যন্তরীণ রূপ সতর্কীকরণ। যেব্যক্তি ইশারা বুঝে, তার জন্যে সতর্কীকরণের অবস্থা শ্রবণ করা হালাল। আর যে বুঝে না, সে ফেতনা ও বিপদে পড়তে চায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যারা মারেফতের অধিকারী, তাদের জন্যে সেমা আত্মার খোরাক। আমর ইবনে ওসমান মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ ওজদ সত্যের দিকে মুকাশাফার নাম। আবু সায়ীদ ইবনে আরাবী বলেন ঃ ওজদ হচ্ছে যবনিকা দূর হওয়া, বন্ধুকে প্রত্যক্ষ করা, বিবেক মওজুদ হওয়া, অদৃশ্যকে দেখা, অন্তরের সাথে কথা বলা এবং অহংকার দূর করতে অভ্যস্ত হওয়া। তিনি আরও বলেন ঃ ওজদ বিশেষত্বের প্রথম স্তর এবং অদৃশ্য বিষয়সমূহ সত্যায়ন করার কারণ। সাধক যখন ওজদের স্বাদ আস্বাদন করে এবং তার অন্তরে এর নূর চমকে, তখন তার মনে কোন সন্দেহ সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। এক্ষণে আমরা ওজদ কাকে বলা উচিত, সে সম্পর্কে যা সত্য তাই লিপিবদ্ধ করছি। প্রকাশ থাকে যে, সেমার ফলস্বরূপ যে অবস্থা প্রকাশ পায়, তার নাম ওজদ। অর্থাৎ, শ্রোতা সঙ্গীত শ্রবণ করার পর নিজের মধ্যে একটি নতুন অবস্থা পায়। এ অবস্থার পরিণতি মুশাহাদা ও মুকাশাফা হবে অথবা আগ্রহ, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অস্থিরতা, আনন্দ, পরিতাপ, বিমোচন, সংকোচন ইত্যাদি হবে। সেমা এমন হালকে প্রস্ফুটিত করে অথবা শক্তিশালী করে। সুতরাং সেমা যদি এমন দুর্বল হয় যে, শ্রোতার বাহ্যিক দেহ আন্দোলিত করে না, তবে এরূপ অবস্থাকে ওজদ বলা হবে না। বাহ্যিক দেহে অবস্থার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিবর্তন জানা গেলেই কেবল তাকে ওজদ বলা হবে। এটা দুর্বল ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। যার ওজদ হয়, সে হাত পা যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তার বাহ্যিক অবস্থা সেই পরিমাণে পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকে। ফলে প্রায়ই এমন হয় যে, ওজদ অন্তরে শক্তিশালী থাকে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থায় পরিবর্তন আসে না। এক্ষেত্রে যার ওজদ হয়, সে শক্তিশালী হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওজদ দুর্বল হওয়ার কারণে বাইরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর কালাম কোরআন মজীদ শ্রবণ করে সুফীগণের ওজদ হয় না এবং কবিদের কালাম সঙ্গীত শ্রবণ করে ওজদ হয়ে যায়। যদি ওজদ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দানই হত, সত্য হত এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা ও বাতিল না হত, তবে সঙ্গীতের তুলনায় কোরআন দ্বারা অধিকতর ওজদ হওয়া উচিত ছিল। এর জওয়াব হচ্ছে, যে ওজদ সত্য, তা আল্লাহ তাআলার মহব্বতের আতিশয্য এবং তাঁর দীদারের আগ্রহ থেকে উৎপন্ন হয়। এ ধরনের ওজদ কোরআন মজীদ শ্রবণ করলেও স্ফুটিত হয়। পক্ষান্তরে যে ওজদ সৃষ্ট বস্তুর মহব্বত ও এশক থেকে উৎপন্ন হয়, তা অবশ্য কোরআন মজীদ শুনলে স্ফুটিত হয় না। কোরআন মজীদ শুনল যে ওজদ হয়, তার সাক্ষী স্বয়ং কোরআন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

الا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –শুনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

আরও বলা হয়েছে–

مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

–বার বার পঠিত কোরআন। এর কারণে তাদের লোমকূপ শিউরে উঠে, যারা পালনকর্তাকে ভয় করে। এর পর তাদের লোমকূপ ও অন্তর আল্লাহর যিকিরে নরম হয়।

অতএব প্রশান্তি, দেহের লোমকূপ শিউরে উঠা, ভয় এবং অন্তরের নম্রতা– এগুলো ওজদ ছাড়া কিছু নয়। কেননা. ওজদ তাকেই বলা হয়, যা শ্রবণ করার কারণে শ্রবণের পরে নিজের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–মুমিন তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আরও এরশাদ হয়েছে,–

لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ـ

যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনত ও বিদীর্ণ হতে দেখতে।

এসব আয়াতে বর্ণিত ভীতি ও বিনয় হচ্ছে ওজদ। তবে এগুলো হাল জাতীয় ওজদ– মুকাশাফা জাতীয় নয়। তবে এগুলো কোন সময় মুকাশাফা ও হুশিয়ারীর কারণ হয়ে যায়। কোরআন শ্রবণ করার সময় খোদাপ্রেমিকগণের ওজদ হয়েছে– এমন কাহিনী বিস্তর। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ সূরা হুদ আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে। এটাও ওজদেরই খবর। কেননা, বার্ধক্য বিমর্ষতা ও ভীতির ফল। বিমর্ষতা ও ভীতি ওজদের মধ্যে দাখিল। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সূরা নেসা তেলাওয়াত করলেন এবং এই আয়াতে পৌঁছলেন–

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ـ

–তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা হাযির করব এবং (হে রসূল!) আপনাকে হাযির করব তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতারূপে!

এ আয়াতে পৌঁছতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ব্যস ব্যস। সাথে সাথে তাঁর নয়নদ্বয় থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলে করীম (সাঃ) নিজে পাঠ করলেন কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে এ আয়াত পাঠ করল–

ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما

–নিশ্চয় আমার কাছে বেড়ী, আগুনের স্তূপ, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

সাথে সাথে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করেন–

ان تعذبهم فانهم عبادك যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি রহমতের আয়াত পাঠ করলে দোয়া করতেন এবং সুসংবাদ প্রার্থনা করতেন। বলাবাহুল্য, সুসংবাদ প্রার্থনা করা ওজদ। কোরআন শ্রবণে যাদের ওজদ হয়, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ـ

–তারা যখন শুনে রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে সত্যকে জানার কারণে।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর বক্ষে উনানের উপর ডেগচির ন্যায় স্ফুটনের শব্দ শুনা যেত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যেও অনেকে কোরআন শ্রবণ করে ওজদ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। তাঁদের কেউ কেউ ছিটকে পড়েছেন, কেউ কেউ ক্রন্দন করেছেন এবং কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে তদবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কথিত আছে, সুরারা ইবনে আবি আওফা রিকাকায় লোকজনকে নামায পড়াতেন। একবার এক রাকআতে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন :

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ –যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন।

এটা পাঠ করতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং মেহরাবের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন :

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার আযাব সংঘটিত হবে। তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

আয়াতটি শুনে তিনি চীৎকার করে উঠলেন এবং বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এর পর তিনি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। আবু জরীর তাবেয়ীর সামনে সালেহ মুররী কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করলে তিনি চীৎকার করে মারা যান। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জনৈক কারীকে পাঠ করতে শুনলেন–

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

এটা এমন দিন যে, তারা কথা বলতে পারবে না এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এমনিভাবে আরও অনেকের কাছ থেকে অনেক গল্প বর্ণিত আছে। সুফী বুযুর্গগণের অবস্থাও তাই বর্ণিত হয়েছে। শিবলী (রহঃ) রমযানের রাতে এক ইমামের পেছনে আপন মসজিদে নামায পড়তেন। ইমাম এই আয়াত পাঠ করল–

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

–আমি ইচ্ছা করলে আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারি।

এটা শুনে হযরত শিবলী (রঃ) এমন জোরে চীৎকার করলেন যে, লোকেরা মনে করল তাঁর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে। তিনি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন এবং তাঁর কাঁধ অবিরাম কাঁপতে লাগল। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রাঃ) হযরত সিররী সকতীর দরবারে গিয়ে দেখেন, সেখানে এক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হযরত সিররী বললেন ঃ লোকটি কোরআন পাকের এক আয়াত শুনে বেহুশ হয়ে গেছে। হযরত জুনায়দ বললেন ঃ তার কানের কাছে সেই আয়াত পুনরায় পাঠ করুন। আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এল। হযরত সিররী জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ প্রতিকারটি তুমি কোথায় পেলে? জুনায়দ বললেন– হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর অন্ধত্ব সৃষ্ট জীবের কারণে (অর্থাৎ, পুত্র ইউসুফের বিরহে) ছিল। এর পর সৃষ্ট জীব দ্বারাই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। যদি তাঁর অন্ধত্ব আল্লাহর কারণে হত, তা হলে সৃষ্ট জীব দ্বারা (অর্থাৎ, ইউসুফের মিলন দ্বারা) তিনি চক্ষুষ্মান হতে পারতেন না। হযরত সিররী এই জওয়াব শুনে খুবই প্রীত হলেন। জনৈক সুফী এক কারীকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ـ

হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

তিনি আয়াতটি পুনরায় পাঠ করিয়ে বললেন ঃ চিত্তকে কত ফিরে আসতে বলি, কিন্তু সে ফিরে আসে না। এর পর মত্ত অবস্থায় এমন চীৎকার দিলেন যে, প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হয়, যদি কোরআন শ্রবণ ওজদ সৃষ্টি করতে পারে, তবে সুফীগণ কাওয়ালদের সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্যে কেন একত্রিত হন? ক্বারীদের কাছে সমবেত হয়ে কোরআন শ্রবণ করেন কেন? সুতরাং কোন দাওয়াতে একত্রিত হওয়ার সময় কোন কারীকে ডেকে আনা উচিত–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাওয়ালকে নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কালাম সঙ্গীতের চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এর জওয়াব হচ্ছে, কোরআন শ্রবণ ওজদের কারণ বটে, কিন্তু এর তুলনায় ওজদের উদ্দীপনা সেমা দ্বারা বেশী হয় কয়েকটি কারণে। প্রথমত কোরআন পাকের সবগুলো আয়াত শ্রোতার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। উদাহরণতঃ যেব্যক্তির মধ্যে বিষাদ, আগ্রহ অথবা অনুতাপের অবস্থা প্রবল, নিম্নোক্ত আয়াত কিরূপে তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে? يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আদেশ করছেন যে, এক পুত্র দু'কন্যার সমান অংশ পাবে। এতে উত্তাধিকারের বিধান বর্ণিত হয়েছে। অপরপক্ষে কবিরা যেসকল কবিতা রচনা করে, সেগুলো মনের অবস্থাই ব্যক্ত করে। ফলে কবিতা দ্বারা মনের অবস্থা বুঝতে তেমন বেগ পেতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ কোরআনের আয়াতসমূহ অধিকাংশ লোকের স্মৃতিতে সংরক্ষিত এবং মনে প্রায়ই জাগরূক থাকে। আর যে কথা প্রথমবার শুনা হয়, তার প্রভাব অন্তরে বেশী হয়। দ্বিতীয়বার শুনলে প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তৃতীয়বারে তো প্রভাব থাকেই না বলা যায়। যার মধ্যে ওজদ প্রবল, তাকে যদি বলা হয়, সর্বদাই এক কবিতা আবৃত্তি করে দিনে একবার অথবা সপ্তাহে একবার ওজদ কর, তবে সে কিছুতেই পারবে না। তবে কবিতা বদলে দিলে অবশ্য তার মধ্যে নতুন ওজদ সৃষ্টি হবে, যদিও বিষয়বস্তু তাই থাকে এবং কেবল শব্দ বদলে দেয়া হয়। কারীর জন্যে সর্বক্ষণ নতুন কোরআন পাঠ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, কোরআন সীমিত। এর শব্দও বদলানো যায় না। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) গ্রামীণ লোকদেরকে কোরআন পাঠ শুনে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন, আমরাও এক সময় এরূপ ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, হযরত আবু বকরের অন্তর গ্রামীণ লোকদের চেয়েও অধিক শক্ত ছিল অথবা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর কালামের প্রতি তাঁর ততটুকু মহব্বত ছিল না, যতটুকু গ্রামীণ লোকদের ছিল। বরং মূল কথা ছিল, অন্তরে বার বার আসার কারণে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কাওয়াল অচেনা ও নতুন কবিতা সব সময় পড়তে পারে, কিন্তু কারী সব সময় নতুন আয়াত তেলাওয়াত করতে পারে না।

সেমার পঞ্চ আদব ও তার ভালমন্দ প্রভাব ঃ এ পর্যন্ত আমরা সেমা হৃদয়ঙ্গম করা ও ওজ্দ– এ দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছি। এক্ষণে তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ, ওজদের বাহ্যিক প্রভাব তথা চীৎকার করা, ক্রন্দন করা ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বস্ত্র ছিন্ন করা সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমে সেমার পাঁচটি আদব বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আদব হচ্ছে, সেমার মধ্যে স্থান কাল ও সহচরবৃন্দের প্রতি দেখা উচিত। সেমতে হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ সেমার মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় সেমা শ্রবণ করা উচিত নয়। তিনটি বিষয় হচ্ছে, সময় কাল, স্থান ও মজলিসের সহচরবৃন্দ। কালের প্রতি লক্ষ্য রাখার মানে হচ্ছে, খানা হাযির হওয়ার সময়, ঝগড়া বিবাদের সময়, নামাযের সময় অথবা অন্য কোন অন্তরায় থাকার সময় সেমা না হওয়া দরকার। এসব সময়ে সেমা হলে তাতে মন বসবে না। ফলে কোন উপকার হবে না। স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চলন্ত পথে অথবা বিশ্রী গৃহে অথবা যে গৃহে ধ্যান আকর্ষণকারী কোন বস্তু থাকে, তাতে সেমা না হওয়া উচিত। সহচরবৃন্দের প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ হচ্ছে, এমন কোন ব্যক্তি যেন মজলিসে না থাকে, যে সমমনা নয় অথবা যে সেমা অস্বীকার করে অথবা যে অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে মুক্ত। কেননা, এরূপ ব্যক্তির উপস্থিতি অস্বস্তিকর হবে এবং অন্তর তার দিকে মশগুল থাকবে। এ কারণেই যদি কোন অহংকারী দুনিয়াদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, যে লোক দেখানোর জন্যে নৃত্য করে ও বস্ত্র ছিন্ন করে, তবে এরূপ লোকও অন্তরের অস্বস্তির কারণ হয়। তাদের থেকেও দূরে থাকা জরুরী। মোট কথা, এসব শর্তের অনুপস্থিতিতে সেমা শ্রবণ না করাই উত্তম।

দ্বিতীয় আদব হচ্ছে, যদি মুরীদদের জন্য সেমা ক্ষতিকর হয়, তবে তাদের সামনে শায়খের সেমা শ্রবণ না করা উচিত। কাজেই শায়খ পূর্বাহ্নে মুরীদদের অবস্থা দেখে নেবেন। তিন প্রকার মুরীদের জন্যে সেমা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। (১) যে মুরীদ আত্মিক পথে বাহ্যিক আমল ছাড়া অন্য কিছু আয়ত্ত করেনি এবং সেমার কোন স্বাদই পায়নি। এরূপ মুরীদের সেমায় মশগুল হওয়া নিষ্ফল। তার উচিত যিকির অথবা অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া। সেমা তার জন্যে অযথা সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছু নয়। (২) যে মুরীদ সেমার রুচি রাখে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার মধ্যে জৈবিক বাসনা ও কামভাব বিদ্যমান আছে এবং এগুলোর বিপদাপদ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই মাঝে মাঝে সেমা তার মধ্যে ক্রীড়া ও কামভাব জাগ্রত করে দিতে পারে এবং সাধনার পথে বাধা হয়ে যেতে পারে। (৩) যে মুরীদ কামভাব ও তার বিপদাপদ থেকে মুক্ত এবং অন্তরে খোদায়ী মহব্বতও প্রবল, কিন্তু সে বাহ্যিক এলেম পূর্ণরূপে অর্জন করেনি, আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামসমূহ এবং সিফাত সম্পর্কেও সম্যক অবগত হয়নি, আল্লাহর জন্যে কি বৈধ এবং কি অবৈধ, তাও জানেনি, এরূপ ব্যক্তির সামনে সেমার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলে সে যা কিছু শুনবে, তাই আল্লাহ তাআলার মধ্যে কল্পনা করবে– বৈধ হোক বা না হোক। এমতাবস্থায় সঙ্গীত দ্বারা যে উপকার হত, তার তুলনায় ক্ষতি বেশী হবে। কেননা, আল্লাহর শানে বৈধ নয় এরূপ বিষয় আল্লাহর মধ্যে কল্পনা করলে কাফের হয়ে যাবে। সহল তশতরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ওজদের পক্ষে কোরআন ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় না, তা বাতিল। মোট কথা, সেমা পদস্খলনের জায়গা। দুর্বলদেরকে এ থেকে আলাদা রাখা ওয়াজেব। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে শয়তানকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুই আমাদের সহচরদেরকেও বশ করতে পারিস? সে বলল ঃ হাঁ, দু'সময়ে! সেমার সময় এবং দৃষ্টিপাত করার সময়। এই দু'সময়ে তাদের উপর আমার দখল হয়ে যায়। এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে জনৈক বুযুর্গ বললেন ঃ আমি শয়তানকে দেখলে বলতাম ঃ তোর মত নির্বোধ কেউ নেই। যে শুনার সময় আল্লাহর কাছ থেকেই শুনে এবং দেখার সময় আল্লাহকেই দেখে, তার উপর জয়ী হবি কিরূপে? জুনায়দ বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

তৃতীয় আদব হচ্ছে, কাওয়াল যা কিছু বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এদিক-ওদিক ভ্রূক্ষেপ কম করবে। শ্রোতাদের দিকে তাকাবে না। তাদের উপর ওজদ প্রকাশ পেলে তা দেখবে না; বরং নিজের দিকে ধ্যান দেবে এবং মনের দেখাশুনা করবে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে তোমাকে কি দেন, সেদিকে দেখবে। নড়াচড়া করবে না। এতে জলসার সহচরেরা পেরেশান হবে। এমনভাবে বসবে যেন দেহ নড়াচড়া না করে। খাকরানো ও হাই তোলা থেকে বিরত থাকবে। তালি বাজানো, নৃত্য করা ইত্যাদি সকল কৃত্রিম ও লোক দেখানো কাণ্ড পরিহার করবে। সেমার সময় অনাবশ্যক কথা বলবে না। ওজদ প্রবল হয়ে গেলে তা তিরস্কারযোগ্য নয়, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করবে। লোক-নিন্দার ভয়ে পূর্বাবস্থায় কায়েম থাকবে না। জবরদস্তি ওজদ প্রকাশ করা অনুচিত। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে ওয়ায করলেন। এক ব্যক্তি ওয়ায শুনে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার প্রতি ওহী পাঠলেন– তাকে বলে দাও, সে যেন আমার জন্যে অন্তরকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, বস্ত্রকে নয়। আবু আমর বললেন ঃ যে অবস্থা নিজের মধ্যে নেই, সঙ্গীত শুনে তা প্রকাশ করা ত্রিশ বছর গীবত করার চেয়েও খারাপ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ আদব হচ্ছে, নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হলে দণ্ডায়মান হবে না এবং উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করবে না, কিন্তু যদি রিয়া ব্যতিরেকে নৃত্য করে এবং কান্নার আকৃতি ধারণ করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, কান্নার আকৃতি ধারণ করলে ভয় সৃষ্টি হয় এবং নৃত্য আনন্দ ও স্ফূর্তির কারণ হয়। মোবাহ আনন্দকে আন্দোলিত করা জায়েয। নৃত্য অবৈধ হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হাবশীদের নৃত্য পরিদর্শন করতেন না। আনন্দের আতিশয্যে কোন কোন সাহাবীও নৃত্য করেছেন বলে বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত আমীর হামযার শিশু কন্যার প্রতিপালন কে করবে– এ নিয়ে যখন হযরত আলী মুর্তযা, তাঁর ভ্রাতা জাফর এবং যায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর মধ্যে কলহ দেখা দেয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তুমি আমার এবং আমি তোমার। একথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জাফরকে বললেন, তুমি আমার আকৃতি ও চরিত্রের অনুরূপ হয়েছ। একথা শুনে তিনি হযরত আলীর চেয়েও অধিক নৃত্য করলেন। তিনি হযরত যায়দকে বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও মওলা। একথা শুনে তিনি নৃত্যে হযরত জাফরকেও হার মানিয়ে দিলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই শিশুকন্যা জাফরের কাছে লালিত-পালিত হবে। কেননা, তার খালা জাফরের স্ত্রী। খালা মায়ের সমান। মোট কথা, মানুষ আনন্দের আতিশয্যে নৃত্য করে। সুতরাং আনন্দ বৈধ হলে এবং নাচের মাধ্যমে উন্নত ও জোরদার হলে নাচ প্রশংসনীয় ও বৈধ হবে। পক্ষান্তরে আনন্দ অবৈধ হলে নৃত্যও অবৈধ হবে। এতদসত্ত্বেও নাচানাচি বুযুর্গ ও অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের জন্যে সমীচীন নয়। কেননা, এটা অধিকাংশ ক্রীড়া-কৌতুকের ছলে হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যে বিষয় ক্রীড়া-কৌতুকের শামিল, তা থেকে অনুসৃত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেঁচে থাকা উচিত, যাতে তারা সাধারণ দৃষ্টিতে হেয় না হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের অনুসরণ বর্জন না করে। ওজদের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করার অনুমতি নেই, কিন্তু যদি ওজদ এতদূর প্রবল হয় যে, মানুষ তার এখতিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে ভিন্ন কথা। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হবে, যার দ্বারা জবরদস্তি কোন কাজ করানো হয়।

পঞ্চম আদব হচ্ছে, যদি জলসার কোন ব্যক্তি সত্যিকার ওজদের কারণে দাঁড়িয়ে যায় অথবা ওজদ প্রকাশ করা ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় দাঁড়িয়ে যায় এবং তার খাতিরে সকলেই দণ্ডায়মান হয়, তবে তুমিও দণ্ডায়মান হবে। কেননা, জলসার শরীকদের সাথে মিল রাখা সংসর্গের অন্যতম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শিষ্টাচার। এক্ষেত্রে "যেমন দেশ তেমন বেশ" হওয়া উচিত। কেননা, সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধাচরণ আতংকের কারণ হয়ে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন- خالقوا الناس باخلاقهم অর্থাৎ, মানুষের সাথে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মেলামেশা কর। বিশেষত অভ্যাস যদি এমন হয়, যার সাথে মিল রাখলে সামাজিক শিষ্টাচার পালিত হয় এবং মানুষ খুশী হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে মিল রাখা জরুরী। সাহাবায়ে কেরামের আমলে এটা ছিল না বিধায় কেউ যদি একে বেদআত বলে, তবে এর জওয়াব হচ্ছে, যত মোবাহ্ কাজ রয়েছে, সবগুলো সাহাবায়ে কেরামের আমলে ছিল না। কাজেই প্রত্যেক বেদআত নিষিদ্ধ বেদআত নয়। বরং যে বেদআত কোন সুন্নতের বিরুদ্ধে যায়, তাই নিষিদ্ধ। আলোচ্য বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন আগন্তুকের জন্যে দাঁড়ানো আরবদের অভ্যাস ছিল না। এমনকি, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যেও কোন কোন অবস্থায় দাঁড়াতেন না। হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে এটা জানা যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নেই বিধায় যেসব এলাকায় আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে, সেখানে তা নিষিদ্ধ হবে না। কেননা, সম্মান প্রদর্শন করা ও মন খুশী করাই এর উদ্দেশ্য।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নবম অধ্যায়

সৎকাজে আদশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

প্রকাশ থাকে যে, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ করতে মানা করা ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। এর জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। যদি এ কাজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়, তবে নবুওয়ত নিরর্থক, ধর্মকর্ম অন্তর্হিত, শৈথিল্য ব্যাপক, পথভ্রষ্টতা চরম, মূর্খতা সর্বব্যাপী এবং ফেতনার বাজার গরম হয়ে যাবে। তবে যে বিষয়ের আশংকা ছিল, তা এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ, ধর্মের এই মূল স্তম্ভটি বর্তমানে সর্বত্র উপেক্ষিত। এর স্বরূপ ও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। মানুষ জৈবিক বাসনা ও কাম-প্রবৃত্তিতে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় স্বাধীন হয়ে গেছে। ভূপৃষ্ঠে এমন সত্যিকার ঈমানদার এখন দুর্লভ, যে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। এমতাবস্থায় যেব্যক্তি এই ত্রুটি দূর করতে এবং এই ছিদ্র বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে, সে সকল মানুষের মধ্যে সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করার কারণে সুখ্যাত হবে এবং এমন পুরস্কারে ভূষিত হবে, যার সমতুল্য কোন পুরস্কার নেই। আমরা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু চারটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদেশ ও নিষেধের ফযীলত এবং বর্জনের নিন্দা

এ সম্পর্কে কোরআন পাকের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـ

তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় থাকা চাই, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। তারা সৎকাজ করার আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে, তারাই হবে সফলকাম।

এই আয়াতে প্রথম বিষয় হচ্ছে, এতে আদেশসূচক পদবাচ্য অর্থাৎ, وَلْتَكُنْ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যায়, এ কাজটি ওয়াজিব। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, সাফল্যকে বিশেষভাবে এর সাথেই জড়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে– তারাই হবে সফলকাম। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা একটি ফরযে কেফায়া– ফরযে আইন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়। যদি মুসলিম জাতির কিছু লোকও এ কাজটি সম্পাদন করে, তবে অবশিষ্টরা ফরয থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, এরূপ বলা হয়নি যে, তোমরা সকলেই এ কাজে ব্রতী হও। বরং বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায়ের এ কাজ সম্পাদন করা উচিত। এ কারণেই এক বা এ কাধিক ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদন করলে অন্যরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে, কিন্তু বিশেষ সফলতা তাদেরই প্রাপ্য হবে, যারা এ কাজ করবে। পক্ষান্তরে যদি সমগ্র জাতি এ কাজ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তবে শাস্তি সবাইকে ভোগ করতে হবে; বিশেষত যাদের এ কাজের ক্ষমতা আছ।

لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَأُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

আহলে কিতাবের সকলেই সমান নয়। একদল সরল পথে রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, সেজদা করে, আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কাজে প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হয়। তারাই সৎকর্মপরায়ণ।

এ আয়াতে কেবল আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করাকেই সৎকর্মপরায়ণতা আখ্যা দেয়া হয়নি; বরং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ.

ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষরা একে অপরের সাহায্যকারী। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং নামায কায়েম করে।

এ আয়াতে ঈমানদারের বিশেষণে বলা হয়েছে যে, তারা ভাল কাজের আদেশ করে। অতএব যারা এটা বর্জন করবে, তারা ঈমানদারদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ۔

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের বাচনিক অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল পাপিষ্ঠ এবং সীমালংঘনকারী। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করত না, যা তারা করত, তা খুবই মন্দ!

এ আয়াতে তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ কঠোর ভাষায় এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মন্দ কাজে নিষেধ বর্জন করেছিল।

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ۔

–তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে।

এ আয়াত থেকে আদেশ ও নিষেধের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। কেননা বলা হয়েছে, এ ধরনের লোক সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ۔

অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম, যারা অসৎ কাজ করতে নিষেধ করত এবং যালেমদেরকে শোচনীয় শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

এতে মন্দ কাজে নিষেধকারীদের রক্ষা পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ۔

–যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে।

এ আয়াতে আদেশ নিষেধকে নামায ও যাকাতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, এটা ওয়াজিব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ

তোমরা সৎকাজে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।

এখানে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে, সৎকাজে উৎসাহ যোগাবে, কল্যাণের পথ সুগম করবে এবং যতদূর সম্ভব অনিষ্ট ও সীমালঙ্ঘনের পথ রুদ্ধ করে দেবে।

لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ـ

পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা তাদেরকে পাপাচারের কথা বলতে এবং হারাম খেতে নিষেধ করল না কেন? তাদের ক্রিয়াকর্ম খুবই মন্দ।

এতে বলা হয়েছে, নিষেধ বর্জন করার কারণে তারা গোনাহগার হয়েছে।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ ـ

তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন প্রভাবশালী লোক যদি না থাকত যারা পৃথিবীতে দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করত।

এতে বলা হয়েছে, যারা দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করত, তাদের ছাড়া আমি সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ

মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্য দাও যদিও তা স্বীয় স্বার্থ, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।

অতএব পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এটাই হচ্ছে সৎকাজের আদেশ।

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের অধিকাংশ কানাঘুষায় কল্যাণ নেই; কিন্তু যে দান-খয়াতের, সৎকাজের এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের আদেশ করে যে এটা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত, তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করব।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .

–যদি মুমিনদের দু'দল পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।

অবাধ্যতা করতে মানা করা এবং আনুগত্যে আনাই হচ্ছে সন্ধি স্থাপন। তারা এটা না মানলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ .

যে দল অবাধ্য হয়, তোমরা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্র আদেশের দিকে ফিরে না আসে।

এরই নাম অসৎ কাজে নিষেধ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ মুসলমানগণ, তোমরা কোরআন শরীফের একটি আয়াত পাঠ কর এবং তার বিপরীত তফসীর করে থাক। আয়াতটি এই–

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

–মুমিনগণ, তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যদি হেদায়াত পাও, তবে কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কিছু আসে-যায় না।

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

مَا بَيْنَ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِىْ وَفِيْهِمْ مَنْ يَقْدِرُ اَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ اِلَّا يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ .

যে সম্প্রদায় গোনাহ্ করে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে, যে তাদেরকে নিষেধ করতে সক্ষম, যদি সে নিষেধ না করে, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতের সময়কাল এখন নয়। কেননা, এখন উপদেশ মানা হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখন সংকাজের আদেশ করা হলে নির্যাতন ভোগ করতে হবে এবং তুমি কিছু বললে কেউ তা শুনবে না। তখন তোমাকে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং শুধু নিজের চিন্তা করতে হবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর দুষ্ট লোকদেরকে চাপিয়ে দেবেন। তখন তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি দোয়া করলেও তা কবুল হবে না। অর্থাৎ, ভাল লোকদেরকে কেউ ভয় করবে না। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন- লোকসকল, আল্লাহ তা'আলার আদেশ হচ্ছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ সে দিন আসার পূর্বে, যখন তোমরা দোয়া করলে তা কবুল হবে না। এক হাদীসে আছে- আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, কিসে তোমাকে মন্দ কাজে নিষেধ করা থেকে বিরত রাখল? তখন যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে জওয়াব শিখিয়ে দেন, তবে সে আরজ করবে ঃ ইলাহী, আমি তোমার উপর ভরসা করেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম। অন্য হাদীসে এরশাদ হয়ছে- মানুষের সব কথাবার্তা ক্ষতিকর হয়ে থাকে- উপকারী হয় না; কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। এটা ক্ষতিকর হয় না। আরও বলা হয়েছে- আল্লাহ্ তা'আলা বিশিষ্ট লোকগণকে সাধারণ লোকদের গোনাহের কারণে শাস্তি দেন না, কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি কোন কুকর্ম করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশিষ্ট লোকেরা বাধা না দেয়, তবে বিশিষ্ট লোকদের উপর আযাব নাযিল করা হয়।

আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের স্ত্রীরা অবাধ্য হয়ে যাবে, যুবকরা কুকর্ম শুরু করবে এবং তোমরা জেহাদ পরিত্যাগ করবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি অবশ্যই হবে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহর কব্জায় আমার প্রাণ, তার কসম, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এর চেয়ে গুরুতর ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি দশা হবে যখন তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে না এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে না? প্রশ্ন করা হল ঃ এটা কি হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, এর চেয়েও গুরুতর কাজ হবে। শ্রোতারা আরজ করল ঃ এর চেয়ে গুরুতর কাজ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা ভাল কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভাল মনে করবে? তারা আরজ করল ঃ ইয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলাল্লাহ্! এটাও হবে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, এর চেয়েও কঠিন ব্যাপার হবে। প্রশ্ন হল, এর চেয়ে কঠিন ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা অসৎ কাজের আদেশ করবে এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করবে? শ্রোতারা আরজ করল ঃ এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কসম খেয়ে বলেন ঃ আমি তাদের উপর এমন ফেতনা বসিয়ে দেব যে, বুদ্ধিমানরা বিপাকে পড়ে যাবে। ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন– যেব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার কাছে দাঁড়িয়ো না। কেননা, যে সেখানে উপস্থিত থাকে এবং এই বিপদ প্রতিরোধে সচেষ্ট হয় না, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়, তার কাছেও দাঁড়িয়ো না। কেননা, যে তার কাছে থেকে যুলুম প্রতিরোধ করে না, তার উপরও লা'নত বর্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যেব্যক্তি কোন স্থানে উপস্থিত থাকে, সত্য বলা থেকে বিরত থাকা তার জন্যে অনুচিত। কেননা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হবে না এবং যে রিযিক তার তকদীরে আছে, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে না। (এমতাবস্থায় সত্য কথা বলতে ভয় কিসের?) এ হাদীসটি এ কথা জ্ঞাপন করে যে, যালেম ও ফাসেকদের গৃহে যাওয়া দুরস্ত নয় এবং এমন স্থানেও যাওয়া জায়েয নয়, যেখানে মন্দ কাজ দেখতে হয় এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। কেননা, হাদীসে উপস্থিত ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। এ কারণেই কোন কোন পূর্ববর্তী বুযুর্গ নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন, হাটে-বাজারে, ঈদের ময়দানে এবং জনসমাবেশে সর্বত্রই কুকর্ম সংঘটিত হয় এবং তাঁরা তা দূর করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় মানুষের কাছ থেকে হিজরত অপরিহার্য। এ কারণেই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) বলেন ঃ পরিব্রাজকরা আপন ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এর কারণ তাই, যা আমরা ভোগ করছি; অর্থাৎ, তারা দেখেছে, অনাচার প্রকট এবং সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন। উপদেশদাতার কথা কেউ মানে না এবং ফেতনা-ফাসাদে সবাই লিপ্ত। তারা আশংকা করেছে, কোথাও খোদায়ী আযাব তাদেরকে স্পর্শ করে না বসে। তাই তারা এমন লোকদের সাথে বসবাস করার চেয়ে হিংস্র প্রাণীর সাথে বসবাস এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করার চেয়ে

www.islamfind.wordpress.com

লতাপাতা খেয়ে জীবন নির্বাহ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এর পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর। আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী। এর পর তিনি বলেন ঃ কিছু লোক পলায়ন করেছে। যদি আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের মধ্যে কোন রহস্য না রাখতেন, তবে আমরা বলতাম, নবী তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কেননা, আমরা জেনেছি, ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও মোসাফাহা করে এবং হিংস্র প্রাণীরা তাদের দর্শন লাভ করে বাইরে চলে যায়। তাদের কেউ হিংস্র প্রাণীকে ডাক দিলে তারা সাড়া দেয়। আর যদি জিজ্ঞেস করে, কোন্ স্থানে যাওয়ার আদেশ পেয়েছ, তবে হিংস্র প্রাণীরা তাদেরকে তা বলে দেয়। অথচ তারা নবী নয়। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কোন গোনাহে উপস্থিত থাকে এবং তাকে খারাপ মনে করে, সে এমন যেন সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যে গোনাহে উপস্থিত থাকে না, কিন্তু তাকে ভাল মনে করে, সে এমন, যেন তাতে উপস্থিত রয়েছে। হাদীসের অর্থ হচ্ছে, কোন প্রয়োজনে গোনাহের জায়গায় উপস্থিত থাকে অথবা ঘটনাক্রমে তার সামনে গোনাহ হতে থাকে। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে গোনাহের জায়গায় যাওয়া নিষিদ্ধ।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন– আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবীর সহচর হয়েছে। তারা আপন আপন সম্প্রদায়ে থেকে আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা, তাঁর কিতাব ও আদেশ অনুসারে কাজ করতে থাকবে। অবশেষে যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে তুলে নেবেন, তখন সহচরেরা আল্লাহর কিতাব ও আদেশ অনুসারে এবং তাঁর নবীর সুন্নত অনুসারে আমল করতে থাকবে। যখন তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, তখন এক সম্প্রদায় হবে, যারা মিম্বরে চড়ে এমন এমন কথা বলবে, যা তারা জানে এবং কাজ এমন করবে, যা জানে না। এরূপ সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদারের উপর ওয়াজিব হবে। যদি হাতে জেহাদ করতে সক্ষম না হও, তবে মুখে জেহাদ করবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তবে অন্তর দ্বারা জেহাদ করবে। এর পর ইসলাম নেই। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এক বস্তির লোকজন পাপাচারী ছিল। তাদের মধ্যে চার ব্যক্তি তাদের ক্রিয়াকর্ম খারাপ মনে করত। তাদের একজন এই অনাচারের বিরুদ্ধে তৎপর হল। সে লোকজনকে বলল, তোমাদের কুকর্ম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিত্যাগ কর, কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করল কুকর্ম পরিত্যাগ করল না। সে তাদেরকে মন্দ কথা বলল। জওয়াবে তারাও তাকে মন্দ বলল। অবশেষে সে তাদের সাথে যুদ্ধ করল, কিন্তু যুদ্ধে তারাই জয়ী হল। এর পর সে তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। তারা মানেনি। আমি তাদেরকে গালমন্দ করেছি, প্রত্যুত্তরে তারাও আমাকে গালমন্দ করেছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু তারাই জয়ী হয়েছে। এর পর সে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল। এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি অসৎ কাজে নিষেধ করতে তৎপর হল এবং প্রথম ব্যক্তির ন্যায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে আল্লাহর দরবারে নালিশ করে অন্যত্র চলে গেল। এমনিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তিও তাই করল।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এই চার জনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির মর্তবা সবচেয়ে কম ছিল, কিন্তু তোমাদের মধ্যে তার সমতুল্যও দুর্লভ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এমন জনপদও ধ্বংস হয় কি, যেখানে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ থাকে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। প্রশ্নকারী এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কেননা, সৎকর্মপরায়ণরা অলসতা করে এং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে চুপ থাকে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জনৈক ফেরেশতাকে আদেশ করলেন, অমুক শহরকে তার বাসিন্দাদের উপর উল্টিয়ে দাও। ফেরেশতা আরজ করল ঃ ইয়া রব, সেই শহরে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে এক মুহূর্তও আপনার নাফরমানী করেনি। আল্লাহ বললেন ঃ তার উপর এবং সকল অধিবাসীর উপর শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কেননা, বস্তিবাসীদের নাফরমানী দেখে এক মুহূর্তের জন্যেও তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করলেন, এক জনপদের অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হল। তাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল, যাদের আমল পয়গম্বরগণের আমলের মত ছিল। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা কিরূপে হল? তিনি বললেন ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে ক্রুদ্ধ হত না এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করত না। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আরও জেহাদ আছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, পৃথিবীতে আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করে, তারা শহীদদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত এবং পৃথিবীতে চলাফেরা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন এবং জান্নাতকে তাদের জন্যে এমন সজ্জিত করেন, যেমন উম্মে সালামার জন্যে সজ্জিত হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্র খাতিরে শত্রুতা রাখে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তারা শহীদদের কক্ষের উপরে থাকবে। প্রত্যেক কক্ষে তিন লক্ষ দরজা হবে। কিছু দরজা ইয়াকুত ও সবুজ পান্না নির্মিত হবে এবং প্রত্যেক দরজায় নূর থাকবে। তাদের এক ব্যক্তির বিবাহ তিন লক্ষ আলোচনা হুরের সাথে হবে। যখন সে তাদের কোন একজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তখন সে বলবে– তোমার মনে আছে কি যে, অমুক দিন তুমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছিলে? আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, শহীদগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক মহৎ কে? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি, যে কোন যালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং এ কারণে নিহত হয়। যদি যালেম শাসনকর্তা তাকে হত্যা না করে, তবে সে যতদিন জীবিত থাকবে তার আমলনামায় গোনাহ্ লেখা হবে না।

এ সম্পর্কিত মহাজন উক্তি নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কর। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কোন অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপিয়ে দেবেন। সে তোমাদের বড়দের সম্মান করবে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে না। তোমাদের সৎলোকেরা তাকে বদদোয়া দিলে সেই বদদোয়া কবুল হবে না। তোমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়ে সাহায্য পাবে না। ক্ষমা প্রার্থনা করলে তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ জীবিতদের মধ্যে মৃত কে? তিনি বললেন ঃ যে মন্দ কাজ হতে দেখে হাত লাগিয়ে তা প্রতিহত করে না, মুখে মন্দ বলে না এবং অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে না। বেলাল ইবনে সা'দ বলেন ঃ নাফরমানী যখন গোপনে করা হয়, তখন তা কেবল যে নাফরমানী করে, তারই ক্ষতি করে, কিন্তু যখন প্রকাশ্যে করা হয় এবং কেউ নিষেধ করে না, তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাধারণ মানুষের ক্ষতি সাধন করে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজেকে ছাড়া অন্য কারও উপর ক্ষমতা রাখে না, সে যদি নিজের বেলায় আদেশ ও নিষেধের কর্তব্য পালন করে এবং অন্যেরা মন্দ কাজ করলে তাকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে, তবে এতটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। ফোযায়লকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ কিছু লোক আদেশ ও নিষেধ করে কাফের হয়ে গেছে। কারণ, আদেশ ও নিষেধের প্রত্যুত্তরে তাদের উপর যে নির্যাতন করা হয়, তাতে তারা সবর করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আদেশ নিষেধের রোকন ও শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, আদেশ নিষেধের গোটা ব্যাপারটি চার ভাগে বিভক্ত ঃ (১) আদেশ ও নিষেধকারী, (২) যাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়, (৩) যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয়; অর্থাৎ, সৎকাজ ও গোনাহ এবং (৪) স্বয়ং আদেশ ও নিষেধ। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা রোকন ও শর্ত আছে।

আদেশ ও নিষেধকারীর শর্ত ঃ আদেশ ও নিষেধকারী হওয়ার জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে "মুকাল্লাফ" (শরীয়তের বিধিবিধান পালনের যোগ্য) হওয়া; অর্থাৎ, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কেননা, যে মুকাল্লাফ নয়, তার জন্যে শরীয়তের কোন বিধান পালন করা জরুরী নয়। আমরা এখানে যেসকল শর্ত লিপিবদ্ধ করব, সেগুলো ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, জায়েয হওয়ার নয়। কাজেই যে বালক ভালমন্দের জ্ঞান রাখে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি, সে মুকাল্লাফ না হলেও ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা তার জন্যে জায়েয। উদাহরণতঃ সে শরাব মাটিতে ঢেলে দিতে এবং খেলাধুলার সামগ্রী ভেঙ্গে দিতে পারে। এটা করলে সে সওয়াব পাবে এবং তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই।

দ্বিতীয় শর্ত মুমিন মুসলমান হওয়া। কেননা, ধর্মকে সমুন্নত রাখার অপর নাম হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। অতএব যে ধর্ম অস্বীকার করে এবং ধর্মের শত্রু, সে এর যোগ্য হবে কিরূপে?

তৃতীয় শর্ত "আদেল" (অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত) হওয়া। এটা কারও কারও মতে শর্ত। তারা বলেন ঃ যে ফাসেক তথা পাপাচারী, তার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ দুরস্ত নয়। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কে তাদের প্রথম দলীল হচ্ছে, কোরআন মজীদে সেই লোকদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যারা যা বলে, তদনুযায়ী কাজ করে না।

আল্লাহ বলেন ঃ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? আরও বলা হয়েছে-

كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ـ

'তোমরা যা করবে না, তা বলবে- এটা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়।'

দ্বিতীয় দলীল- রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ মে'রাজের রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছেও গিয়েছি, যাদের ঠোঁট কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল ঃ আমরা ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজেরা তা করতাম। তৃতীয় দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, তুমি নিজেকে উপদেশ দাও। যখন সে উপদেশ মেনে নেয়, তখন অপরকে উপদেশ দাও। নতুবা আমার কাছে লজ্জা কর। চতুর্থ দলীল হচ্ছে, অপরকে পথ প্রদর্শন করা নিজে পথে থাকারই শাখা। এমনিভাবে অপরকে সোজা করা নিজে সোজা হওয়ার শাখা। সুতরাং যেব্যক্তি নিজে পথপ্রাপ্ত হবে না, সে অপরকে কিরূপে পথ দেখাবে?

তাদের এসব দলীল নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সত্য হচ্ছে, যে ফাসেক, তার জন্যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা জায়েয। এর প্রমাণ হচ্ছে, দেখতে হবে, আদেশ ও নিষেধকারীর জন্যে সকল গোনাহ থেকে মাসুম তথা পবিত্র হওয়া শর্ত কি না? যদি বলা হয় শর্ত, তবে এটা উম্মতের এজমার বিপরীত। এছাড়া এর মানে হবে আদেশ ও নিষেধের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়া। কেননা, নিষ্পাপ সাহাবীগণও ছিলেন না। অন্যদের তো কথাই নেই। এ কারণেই সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রহঃ) বলেন ঃ যদি আদেশ ও নিষেধ কেবল সেই ব্যক্তি করে, যার মধ্যে কোন গোনাহ নেই, তবে কেউ এ কর্তব্য পালন করতে পারবে না। ইমাম মালেক এ উক্তি পছন্দ করেছেন। যদি বলা হয়, সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়, ফলে রেশমী বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তির জন্যে জায়েয আছে, সে যিনা ও মদ্যপান থেকে নিষেধ করতে পারে; তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হলে আমরা জিজ্ঞেস করব, মদ্যপায়ীর জন্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা জায়েয হবে কি? যদি বলা হয়, জায়েয নয়, তবে এটা এজমার খেলাফ। কেননা, মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীতে সর্বদাই সৎ, বীর মদ্যপায়ী, এতীমদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারকারী সর্বপ্রকার লোক থাকত। তাদেরকে জেহাদ করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে হয়নি এবং পরবর্তীকালেও নিষেধ করা হয়নি। যদি বলা হয়, মদ্যপায়ীর জন্যে জেহাদ করা জায়েয, তবে আমরা প্রশ্ন করব, তার জন্যে হত্যা করতে নিষেধ করাও জায়েয হবে কি না? জায়েয না হলে আমরা বলব, তা হলে মদ্যপায়ী ও রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীর মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত যে, রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীর জন্যে মদ্যপানে নিষেধ করা জায়েয। অথচ হত্যা, মদ্যপান এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান একই পর্যায়ের মন্দ কাজ। এগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যদি বলা হয়, মদ্যপায়ীর জন্যে হত্যা করতে নিষেধ করা জায়েয এবং এর কারণ হচ্ছে, যেব্যক্তি একটি গোনাহ করে, তার জন্যে এর মতই এবং এর চেয়ে নিম্নস্তরের গোনাহ থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়; বরং সে উপরের স্তরের গোনাহ থেকে নিষেধ করতে পারে। তবে এ দাবী জবরদস্তি এবং এর কোন দলীল নেই। কেননা, এটা অসম্ভব নয় যে, মদ্যপায়ী যিনা ও হত্যা থেকে নিষেধ করবে এবং যে যিনা করে, সে মদ্যপান থেকে নিষেধ করবে; বরং এটাও অসম্ভব নয় যে, একজন নিজে মদ্যপান করবে এবং তার গোলাম ও চাকরদেরকে মদ্যপান করতে নিষেধ করবে। সে বলবে, নিষেধ মান্য করা এবং অপরকে নিষেধ করা এ দু'টি বিষয়ই আমার উপর ওয়াজিব। এখন একটি বিষয়ে যদি আমি গোনাহ করি, তবে অপরটিতেও আল্লাহর নাফরমান হওয়া আমার জন্যে কিরূপে অপরিহার্য হবে? যদি কেউ বলে, এ বক্তব্যদৃষ্টে কেউ বলতে পারে, আমার উপর ওযু ও নামায দুটি বিষয়ই ওয়াজেব, কিন্তু আমি ওযু করব, নামায পড়ব না এবং সেহরী খাব, রোযা রাখব না; তবে এর জওয়াব হচ্ছে, এতদুভয়ের মধ্যে ওযু নামাযের জন্যে ওয়াজিব, এমনিতে ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে সেহরী খাওয়া রোযার জন্যে। রোযা না হলে সেহরী খাওয়া মোস্তাহাব হত না, কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তু এরূপ নয়। এখানে অপরের সংশোধন নিজের সংশোধনের জন্যে এবং নিজের সংশোধন অপরের সংশোধনের জন্যে উদ্দেশ্য হয় না। তবে ওযু ও নামাযের ক্ষেত্রে এতটুকু বিষয়ই জরুরী হয় যে, যেব্যক্তি ওযু করে কিন্তু নামায পড়ে না, তার শাস্তি সেই ব্যক্তির তুলনায় কম হবে, যে ওযু ও নামায উভয়টি বর্জন করে। এমনিভাবে যেব্যক্তি অপরকে নিষেধ করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং নিজে বিরত থাকা উভয়টি বর্জন করবে, তার শাস্তি সেই ব্যক্তির তুলনায় বেশী হবে, যে অপরকে নিষেধ করে; কিন্তু নিজে নিষেধ মানে না।

এক্ষণে যারা কোরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, তাদের জওয়াব হচ্ছে, আয়াতে ভাল কাজ বর্জন করার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে– আদেশ করার নিন্দা করা হয়নি, কিন্তু আদেশ দ্বারা তাদের এলেমের জোর পাওয়া যায়। আর যে আলেম, সে সৎকাজ বর্জন করলে শাস্তি অধিক হয়। কারণ, এলেমের শক্তি থাকলে তার কোন ওযর থাকে না। এছাড়া لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعَلُونَ –আয়াতে মিথ্যা ওয়াদা বুঝানো হয়েছে। প্রথমে নিজেকে উপদেশ দাও– হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির মধ্যে মৌখিক আদেশ ও নিষেধ করার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এটা আমরাও স্বীকার করি, ফাসেকের মৌখিক উপদেশ তাদের জন্যে উপকারী নয় যারা তার পাপাচার সম্পর্কে অবগত আছে। এ উক্তির শেষে বলা হয়েছে– আমাকে লজ্জা কর, এ থেকেও অপরকে উপদেশ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায় না; বরং এর অর্থ হচ্ছে, অধিক জরুরী বিষয় ত্যাগ করে কম জরুরী বিষয়ের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ো না; যেমন কথায় বলে– প্রথমে পিতার সম্মান কর, এর পর প্রতিবেশীর। নতুবা লজ্জা কর।

কারও কারও মতে চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, আদেশ ও নিষেধের কাজ সম্পাদন করার জন্যে ইমাম তথা শাসনকর্তার পক্ষ থেক অনুমতি আবশ্যক। তারা সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তির আদেশ ও নিষেধের অধিকার প্রমাণ করেন না, কিন্তু আমাদের মতে এ শর্তটি ঠিক নয়, বরং অনিষ্টকর। কেননা, আমরা যেসকল আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, সেগুলো থেকে জানা যায়, যেব্যক্তি কুকর্ম হতে দেখে চুপ করে থাকবে, সে গোনাহগার হবে। কেননা, যেখানেই দেখুক, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা তার উপর ওয়াজিব। আশ্চর্যের বিষয়, রাফেযী সম্প্রদায় আরও বাড়াবাড়ি করে বলে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ জায়েযই নয় যে পর্যন্ত নিষ্পাপ ইমাম আত্মপ্রকাশ না করেন। তাদের মতে নিষ্পাপ ইমাম আত্মগোপন করে আছেন। এ সম্প্রদায় আলোচনা করারই যোগ্য নয়।

তবে আদেশ ও নিষেধের একটি বিশেষ স্তর আছে, যাতে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদর্শন অর্থাৎ মারপিট করা হয়। এতে উভয় পক্ষে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খুনাখুনির উপক্রম হতে পারে বিধায় এই স্তরে শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে আদেশ ও নিষেধ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা হবে।

কোন ফাসেককে মূর্খ, নির্বোধ, বদকার ইত্যাদি বলে সতর্ক করা সত্য কথা বলারই নামান্তর। সত্য কথার দাবী হচ্ছে, তা নির্দ্বিধায় বলতে হবে। বরং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যালেম শাসনকর্তার মুখের উপর সত্য কথা বলা সর্বোত্তম স্তর। অতএব যেখানে শাসনকর্তার সামনে সত্য বলার নির্দেশ রয়েছে, সেখানে শাসনকর্তার অনুমতির প্রয়োজন কিরূপে হবে? পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সর্বদাই যালেম শাসনকর্তার সামনে সত্য প্রকাশ করে গেছেন। এটাও এ বিষয়ের দলীল এবং অকাট্য এজমা যে, এক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নয়। সেমতে বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে হাকাম ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা পাঠ করলে এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ খোতবা তো নামাযের পরে হয়। মারওয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ আমি তোমাকে বুঝে নেব। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বললেন ঃ সে যে বিষয়ে আদিষ্ট ছিল, তা বলে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ যেব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তাকে মন্দ মনে করে। এটা দুর্বলতম ঈমান। সুতরাং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই আদেশ থেকে এটাই বুঝেছিলেন যে, শাসকবর্গও এতে দাখিল। এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি নেয়ার অর্থ কি? বর্ণিত আছে, খলীফা মহেদী মক্কা মোয়াযযমায় আগমন করে কিছুদিন অবস্থান করেন। এর পর যখন তিনি তওয়াফ করতে যান, তখন লোকজনকে কা'বা গৃহের আশপাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মরযুক লাফিয়ে উঠে তার জামার কলার ধরে ঝাঁকানি দিলেন এবং বললেন ঃ দেখ, তুমি কি করছ! তোমাকে এ গৃহের অধিক হকদার কে বানিয়েছে যে, দূর অথবা নিকট থেকে যে এ গৃহে আসবে, তুমি তাকে বাধা দেবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ –এ গৃহে স্থানীয় বহিরাগত সকলেই সমান।

খলীফা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এর পর তাঁকে গ্রেফতার করে বাগদাদে নিয়ে এলেন, কিন্তু এমন শাস্তি দেয়া ভাল মনে করলেন না, যাতে জনগণের মধ্যে তাঁর অবমাননা হয়। তাই তাঁকে ঘোড়ার আস্তাবলে বন্ধ করে দিলেন, যাতে তিনি ঘোড়ার পদাঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে যান। মানুষকে কামড় দেয়, এমন একটি ঘোড়া তাঁর নিকটে রেখে দেয়া হল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে তাঁর বশীভূত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে দিলেন। ফলে তিনি কোন প্রকার কষ্ট পেলেন না। এর পর খলীফা থাকে একটি কক্ষে বন্ধ করে চাবি নিজের হাতে রেখে দিলেন। তিন দিন পর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন এবং লতাপাতা খেতে লাগলেন। খবর পেয়ে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে বের করেছে? তিনি বললেন ঃ যে আমাকে বন্ধ করেছিল। খলীফা শুধালেন ঃ কে বন্ধ করেছিল? তিনি বললেন ঃ যে আমাকে বের করেছে। খলীফা বিচলিত হয়ে ক্রোধে গর্জন করে বললেন ঃ তোমার কি ভয় নেই? আমি তোমাকে মেরে ফেলব। তিনি মাথা তুলে বললেন ঃ যদি মউত ও হায়াত তোমার করায়ত্ত হত, তবে অবশ্যই আমি ভয় করতাম। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ জেলে আটক রইলেন। মাহদীর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে মুক্ত করল। তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

হাব্বান ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ একবার ভ্রমণে বের হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বনী হাশেমের সোলায়মান ইবনে আবু জাফর। খলীফা বললেন ঃ তোমার একটি বাঁদী চমৎকার গান গাইত। তাকে ডেকে আন। বাঁদী এল এবং গান গাইল। কিন্তু খলীফার পছন্দ হল না। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ তোমার কি হয়েছে? গান জমছে না কেন? বাঁদী বলল ঃ এ বাদ্যযন্ত্রটি আমার নয়। খলীফা খাদেমকে তার বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। খাদেম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসছিল, ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ পথিমধ্যে খেজুরের আঁটি কুড়াচ্ছিল। খাদেম তাকে বলল ঃ বড় মিয়া, রাস্তা ছাড়। বৃদ্ধ মাথা তুলে তার হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখতে পেল। সে তৎক্ষণাৎ তা খাদেমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল। ফলে বাদ্যযন্ত্রটি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। খাদেম তাকে গ্রেফতার করে মহল্লার বিচারকের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ একে হাজতে আটকে রাখ। সে আমীরুল মুমেনীনের অপরাধী। বিচারক বলল ঃ বাগদাদে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন এবাদতকারী নেই। সে আমীরুল মুমেনীনের অপরাধী হল কিরূপে? খাদেম বলল ঃ আমি যা বলছি, তা মেনে নাও। তর্ক করো না। এর পর খাদেম খলীফার কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। খলীফা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সোলায়মান বলল ঃ এত রাগ করার প্রয়োজন কি? মহল্লার বিচারককে আদেশ দিন, সে বৃদ্ধকে হত্যা করে লাশ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করুক। খলীফা বললেন ঃ না, আমি তাকে ডেকে প্রথমে কথা বলব। সেমতে বৃদ্ধ উপস্থিত হলে খাদেম বলল ঃ তুমি তোমার বগলে বাঁধা খর্জূর আঁটির পুটলিটা ফেলে দাও; এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পর খলীফার সামনে উপস্থিত হও। বৃদ্ধ বলল ঃ এটা আমার রাতের খাদ্য। খাদেম বলল ঃ রাতে আমরা খাইয়ে দেব। এজন্যে চিন্তা করো না। বৃদ্ধ বলল ঃ তোমাদের খাদ্য আমার দরকার নেই। তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে খলীফা বললেন ঃ এসব কথার প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধকে আমার কাছে আসতে দাও। অতঃপর বৃদ্ধ সালাম করে খলীফার কাছে বসে গেল। খলীফা বললেন ঃ বড় মিয়া, তুমি যে কাণ্ডটি করলে এর কারণ কি? বৃদ্ধ জওয়াব দিল ঃ আমি কি করেছি? তুমি আমার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিয়েছ– এ কথা সরাসরি বলতে খলীফা সংকোচ বোধ করলেন। কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পর বৃদ্ধ জওয়াব দিল ঃ আমি আপনার পিতৃপুরুষদেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করতে শুনতাম ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ -

নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার করার, অনুগ্রহ প্রদর্শন করার ও আত্মীয়দেরকে দান করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীল, অপছন্দনীয় ও বিদ্রোহমূলক কাজ করতে।

আমি একটি অপছন্দনীয় বস্তু দেখেছি এবং তা ভেঙ্গে দিয়েছি। খলীফা বললেন ঃ ভালই করেছ– ভেঙ্গে দিয়েছ। এ ছাড়া খলীফা তাকে আর কিছু বললেন না। বৃদ্ধ বাইরে চলে এলে খলীফা খাদেমকে একটি থলে দিয়ে বললেন ঃ তার পেছনে যাও এবং দেখ, সে লোকজনদের কাছে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলে কি না? যদি কিছু না বলে, তবে এই থলেটি তাকে দিয়ে দিও। অন্যথায় দিয়ো না। বৃদ্ধ বাইরে এসে দেখল তার পুঁটলি থেকে একটি আঁটি মাটিতে পড়ে গেছে। সে সেটি পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল এবং লোকজনের কাছে কিছুই বলল না। খাদেম তাকে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন তোমাকে এ থলেটি নিয়ে যেতে বলেছেন। বৃদ্ধ বলল ঃ খলীফাকে বলে দিয়ো এটি যেখান থেকে নিয়েছে, সেখানেই যেন ফেরত দিয়ে দেয়।

এসব গল্প থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্যে কোন শাসনকর্তার অনুমতি লাভ করার মোটেই প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম শর্ত হচ্ছে আদেশ ও নিষেধকারীর ক্ষমতাবান হওয়া। কেননা, অক্ষম ব্যক্তির উপর অন্তর দ্বারা আদেশ নিষেধ করা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব নয়। কারণ, যে আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখে, সে তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাফরমানীকে খারাপ জ্ঞান করে এবং অন্তরে ঘৃণা করে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কাফেরদের সাথে জেহাদ কর হাত দ্বারা। যদি তা সম্ভব না হয় এবং কেবল তাদের সামনে নাক সিট্‌কাতে পার, তবে তাই কর। মনে রাখা দরকার, অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে কার্যত অনিষ্ট হওয়া এবং কষ্ট পাওয়া জরুরী নয়; বরং যেক্ষেত্রে অনিষ্ট হওয়া ও কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে অক্ষমতা আছে বলতে হবে। এই অক্ষমতার কারণেও আদেশ নিষেধ করা ওয়াজিব থাকবে না। যদি জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে না এবং নিষেধ করলে কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে, তবে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়; বরং কতক ক্ষেত্রে আশ্চর্য নয় যে, হারাম হবে। এ ধরনের স্থানে না যাওয়া এবং গৃহে বসে থাকা অপরিহার্য। যদি জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে না; কিন্তু কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব। যদি অবস্থা এর বিপরীত হয়; অর্থাৎ, জানা যায় যে, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে; কিন্তু কষ্ট ভোগ করতে হবে, তবে এ অবস্থায়ও নিষেধ করা মোস্তাহাব। নিষেধ করা ওয়াজিব হওয়ার একটি মাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে, যেখানে জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে এবং কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই। এ অবস্থাকেই বলা হয় "সর্বাবস্থায় সক্ষমতা।"

যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয় তার শর্ত ঃ এর জন্যে চারটি শর্ত। প্রথম শর্ত, সেই বস্তুটির মুনকার তথা অস্বীকার্য হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তে তা নিষিদ্ধ হওয়া। আমরা "অস্বীকার্য" শব্দটি ব্যবহার করেছি- গোনাহ বলিনি। কেননা, এটা গোনাহ থেকে ব্যাপকতর। উদাহরণতঃ যদি কেউ বালক অথবা উন্মাদকে শরাব পান করতে দেখে, তবে শরাব ফেলে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। অথচ বালক ও উন্মাদের জন্যে শরাব পান করা গোনাহ নয়। কিন্তু অস্বীকার্য অবশ্যই। সুতরাং অস্বীকার্য শব্দের মধ্যে গোনাহসহ সকল প্রকার কুকর্ম দাখিল রয়েছে। এটি সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ হতেও ব্যাপক। কেননা, নিষেধ কেবল কবীরা গোনাহের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া, বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি সগীরা গোনাহ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় শর্ত, অস্বীকার্য বিষয়টি আপাত বিদ্যমান হওয়া। কেননা, যেব্যক্তি শরাব পান সমাপ্ত করে নেয় অথবা যে ভবিষ্যতে শরাব পান করবে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়।

তৃতীয় শর্ত, অস্বীকার্য বিষয়টি কোনরূপ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিষেধকারীর সামনে প্রকাশ হওয়া। এমতাবস্থায় যদি কেউ গৃহে লুকিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহ্ করে এবং গৃহের দরজা বন্ধ করে নেয়, তবে গুপ্তচরবৃত্তি করে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক গৃহের প্রাচীরে আরোহণ করে গৃহকর্তাকে দেখতে পান এবং নিষেধ করেন। গৃহকর্তা আরজ করল ঃ আমীরুল-মুমেনীন, আমি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী একভাবে করেছি। আর আপনি তিনভাবে করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? গৃহকর্তা বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– وَلَا تَجَسَّسُوْا –তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না। আপনি গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَاتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। আপনি প্রাচীর টপকিয়ে গৃহে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ

তোমরা আপন গৃহ ছাড়া কারও গৃহে কথাবার্তা না বলে এবং গৃহের লোকদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। আপনি সালাম করেননি।

হযরত ওমর অগত্যা নিরুত্তর হয়ে গৃহকর্তাকে ছেড়ে দিলেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করেন ঃ যদি আমি স্বচক্ষে কোন কুকর্ম সংঘটিত হতে দেখি, তবে কোন সাক্ষ্য ছাড়াই অপরাধীর উপর "হদ" (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) জারি করতে পারব কি না? হযরত আলী (রাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ হদের ব্যাপারটি কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সাথে জড়িত। এতে একজন যথেষ্ট হবে না। প্রশ্ন হয়, অস্বীকার্য বিষয় প্রকাশ্যে হওয়া এবং গোপনে হওয়ার সংজ্ঞা কি? জওয়াব হচ্ছে, যেব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে নেয় এবং প্রাচীরের আড়ালে চলে যায়, তার কাছে কেবল অস্বীকার্য বিষয় জানার জন্যে যাওয়ার অনুমতি নেই। হাঁ, যদি গৃহের বাইরে থেকে জানা যায়, এ গৃহে খারাপ কাজ হচ্ছে, তবে তাও প্রকাশ্য। উদাহরণতঃ বাইরে থেকে বাঁশী অথবা বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনা গেলে যে শুনবে, সে গৃহে প্রবেশ করে বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিতে পারে।

চতুর্থ শর্ত, ইজতিহাদ ছাড়াই জানা যে, এটা অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং যেসকল বিষয় ইজতিহাদী, সেগুলোতে নিষেধ করা যাবে না। উদাহরণতঃ কোন হানাফী মতাবলম্বীর জন্যে জায়েয নয় যে, সে কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শাফেয়ী মতালম্বীকে এমন যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করবে, যাতে বিসমিল্লাহ্‌ বলা হয়নি। অনুরূপভাবে কোন শাফেয়ী মতাবলম্বীর জন্যে জায়েয নয় যে, সে হানাফী মতাবলম্বীকে "নবীয" (যাতে নেশা নেই) পান করতে নিষেধ করবে। কেননা, এগুলো ইজতিহাদী বিষয়।

যাকে নিষেধ করা হবে তার শর্ত ঃ এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এটা বলাই যথেষ্ট যে, তার মানুষ হওয়া শর্ত– মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধি-বিধানের যোগ্য) হওয়া শর্ত নয়। সেমতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বালক মদ্যপান করলে তাকেও নিষেধ করতে হবে, যদিও সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। এমনিভাবে উন্মাদ ব্যক্তি যিনা করলে তাকেও নিষেধ করতে হবে। তবে কিছু কাজ উন্মাদের জন্যে অস্বীকার্য নয়, যেমন নামায না পড়া, রোযা না রাখা ইত্যাদি।

স্বয়ং আদেশ ও নিষেধের স্বরূপ ঃ এর কয়েকটি স্তর ও আদব আছে। প্রথম স্তর, অস্বীকার্য বিষয়টি খোঁজাখুঁজি করা। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটা গুপ্তচরবৃত্তি বিধায় নিষিদ্ধ। অতএব অন্যের গৃহে কান পেতে বাদ্যের আওয়াজ শ্রবণ করা যাবে না। দ্বিতীয় স্তর, অস্বীকার্য বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যে, এটা নিষিদ্ধ। কেননা, মাঝে মাঝে অজ্ঞতার কারণেও মানুষ এটা করে থাকে এবং জ্ঞাত হওয়ার পর তা বর্জন করে। উদাহরণতঃ গ্রামীণ মানুষ নামায পড়ে; কিন্তু রুকু-সেজদা উত্তমরূপে করে না। এ ক্ষেত্রে এটাই মনে করা হয় যে, সে জানে না, এভাবে নামায পড়লে নামায হয় না। যদি সে নামায না হওয়াতেই সম্মত থাকত, তবে নামাযই পড়ত না। অতএব তাকে নম্রতা সহকারে জ্ঞাত করে দেয়া ওয়াজিব। নম্রতা সহকারে এ জন্যে যে, জ্ঞাত করা প্রসঙ্গে অপরকে প্রকারান্তরে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এতে অপরের মনে কষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিশেষত শরীয়তের বিষয়াদি সম্পর্কে মূর্খ কথিত হতে সম্মত হয়– এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতএব জ্ঞাত করা যখন মূর্খতা দোষ প্রকাশ করার নামান্তর, তখন এর পরিণতি অপরের মনে কষ্ট দেয়া। তাই এ কষ্ট দূর করার উপায় হচ্ছে নম্র ভাষায় জ্ঞাত করা। উদাহরণতঃ উপরোক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলা হবে– ভাই, মানুষ শিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমিও নামাযের মাসআলা– মাসায়েল সম্পর্কে মূর্খ ছিলাম। কিন্তু আলেমগণ শিখিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় তোমার গ্রামে কোন আলেম নেই। আলেমগণ আমাকে শিখিয়েছেন যে, নামাযে এভাবে স্থিরতা সহকারে রুকু-সেজদা করতে হবে। নইলে নামায ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব তুমিও এ বিষয়টি মনে রেখো এবং তদনুযায়ী নামায পড়ো। তৃতীয় স্তর, উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে নিষেধ করা। এটা তাদের জন্যে যারা অস্বীকার্য বিষয়কে অস্বীকার্য জেনেও তা করে; যেমন কোন ব্যক্তি অব্যহতভাবে মদ্যপান করে, যুলুম করে অথবা মুসলমানের গীবত করে। তাকে উপদেশ দেয়া এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা উচিত। তাকে এমন হাদীস শুনানো উচিত, যাতে এসব কাজের জন্য শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস ও পরহেযগারদের কাহিনী শুনানো উচিত। এক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিপদ থেকেও আত্মরক্ষা করা উচিত। তা হচ্ছে, আপন জ্ঞান-গরিমার আস্ফালন ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার নিয়তে উপদেশ দান করা আশ্চর্য নয়। এরূপ নিয়তে উপদেশ দিলে তা যে অনিষ্ট দূর করার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়, তার চেয়ে বড় অনিষ্টের বিষয় হবে। এটা এমন হবে, যেমন কেউ নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে অগ্নি থেকে রক্ষা করে। এটা চরম মূর্খতা, ভয়াবহ আপদ এবং শয়তানের অভিনব জাল। এতেই মানুষের পদস্খলন ঘটে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে দোষ-ক্রটি সম্পর্কে অবগত করে দেন এবং হেদায়াতের নূর দ্বারা যার অন্তশ্চক্ষু উন্মোচিত করে দেন, সে-ই এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। চতুর্থ স্তর গালমন্দ ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করে নিষেধ করা। এর প্রয়োজন তখন, যখন নম্রতায় কার্যোদ্ধার হয় না। নম্রতায় কাজ হলে কঠোর ভাষার প্রয়োজন নেই। মোট কথা, উপদেশ নসীহত ফলদায়ক না হলেই কেবল কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে নিষেধ করতে হবে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের উপাস্যদের জন্যে! তোমাদের কি ঘটে কিছু নেই?

কঠোর ভাষা বলে আমাদের উদ্দেশ্য অশ্লীল বকাবকি এবং মিথ্যা বলা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন ভাষা বলা, যা অশ্লীল গণ্য হয় না; যেমন হে মূর্খ, হে নির্বোধ, হে পাপিষ্ঠ, তোর কি আল্লাহর ভয় নেই, ইত্যাদি বলা। কেননা, যে মন্দ কাজ করে, সে নির্বোধ। নির্বোধ না হলে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী কেন করত? সে-ই বুদ্ধিমান, যার বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য রসূলে করীম (সাঃ) দেন। এরশাদ হয়েছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হুশিয়ার সে-ই, যার নফস অনুগত এবং যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যে কাজ করে। আর নির্বোধ সে-ই, যে নফ্সের খেয়ালখুশীতে তার আনুগত্য করে এবং আল্লাহর কাছে মিথ্যা বাসনা করে।

যদি জানা যায়, কঠোর ভাষা বললেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না, তবে কিছু বলাই উচিত নয়; বরং বাহ্যিক অসন্তোষ প্রকাশ এবং তাকে হেয় জ্ঞান করেই ক্ষান্ত থাকবে। পঞ্চম স্তর, বল প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দ কাজের সরঞ্জামাদি নষ্ট করে দেয়া। উদাহরণতঃ ক্রীড়া-কৌতুকের সাজ-সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেলা, মদ মাটিতে ঢেলে দেয়া, রেশমী পোশাক দেহ দেখে খুলে ফেলা, নাপাক অবস্থায় মসজিদে বসে থাকলে কান ধরে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি, কিন্তু এই স্তরকে তখনই কার্যকর করা যাবে, যখন পূর্বোক্ত স্তরগুলো বিকল হয়ে যায়। এ স্তরটি কতক গোনাহে সম্ভবপর এবং কতক গোনাহে সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ মুখ ও অন্তরের গোনাহ্ বল প্রয়োগে নষ্ট করা যায় না। ষষ্ঠ স্তর, ধমক দেয়া এবং ভীতি প্রদর্শন করা। উদাহরণতঃ এ কথা বলা যে, এ কাজ পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। এতে আদব, যে কাজ করতে পারবে না, তা বলবে না; যেমন বলবে না যে, তোমার বাড়ী লুটে নেব। সপ্তম স্তর, হাতে, পায়ে প্রহার করা এবং অস্ত্র বের না করা। প্রয়োজনবোধে এটা সর্বসাধারণও করতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ, মন্দ কাজটি দফা হয়ে গেলে হাত-পা গুটিয়ে নিতে হবে।

আদেশ ও নিষেধকারীর আদব ঃ প্রকাশ থাকে যে, যেব্যক্তি অপরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান, পরহেযগারী ও সচ্চরিত্রতা। জ্ঞানের প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে আদেশ ও নিষেধের সীমা জানা থাকে এবং কোন্ স্থলে আদেশ ও নিষেধ করতে হবে, তা বুঝতে পারে। পরহেযগারীর প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে আদেশ ও নিষেধকারীর উপদেশ নসীহত জনপ্রিয় হয়। কেননা, ফাসেক ব্যক্তির মুখে সদুপদেশ শুনলে মানুষ হাসে। আর যার মধ্যে সচ্চরিত্রতা গুণ থাকে, সে কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে নম্র হয়। আদেশ ও নিষেধের জন্যে এটা মূলকথা। জ্ঞান ও পরহেযগারী এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কেননা, যখন ক্রোধ উদ্বেলিত হয়, তখন তার মূলোৎপাটনের জন্যে জ্ঞান ও পরহেযগারী যথেষ্ট হয় না। পরহেযগারীও পূর্ণাঙ্গ তখনই হয়, যখন তার সাথে সচ্চরিত্রতা ও ক্রোধ দমনের ক্ষমতা এসে মিলিত হয়। উপরোক্ত তিনটি গুণের কারণেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আদেশ ও নিষেধ সওয়াবের কাজ হয় এবং তা দ্বারা অস্বীকার্য বিষয়টিও দূরীভূত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি এরশাদও এসব আদবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সে করবে, যে নম্রতা করে আদেশ করায়, নম্রতা করে নিষেধ করায়, সহনশীল হয় নিষেধ করায় এবং সমঝদার হয় নিষেধ করায়। এ থেকে বুঝা গেল, আদেশ ও নিষেধের কাজে সমঝদার হওয়া শর্ত।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ফাসেক হওয়ার কারণে সৎ কাজের আদেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, বরং উদ্দেশ্য, ফাসেকের কথার প্রভাব মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হয় না। নতুবা সৎকাজের আদেশ করার জন্যে সকল গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী নয়। কেননা, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– আমরা কি সৎ কাজের আদেশ করব না, যে পর্যন্ত সেই সৎকাজ নিজেরা না করে নেই এবং আমরা কি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করব না যে পর্যন্ত সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা না করি? তিনি বললেন ঃ না; বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, যদিও সকল সৎ কাজ নিজেরা না কর এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ কর, যদিও সকল অসৎ কাজ থেকে নিজেরা বেঁচে থাক না। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ তাঁর পুত্রগণকে ওসিয়ত করেন, যখন তোমাদের কেউ সৎ কাজের আদেশ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন আপন মনে সবর করতে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং আল্লাহ তাআলার সওয়াবের উপর ভরসা করে। কেননা, যে সওয়াবের উপর ভরসা করে, সে নির্যাতনের কষ্ট অনুভব করে না। এ থেকে বুঝা গেল, আদেশ ও নিষেধের অন্যতম আদব হচ্ছে সবর করা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজের আদেশের কাছেই সবর উল্লেখ করেছেন। সেমতে হযরত লোকমানের উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ـ

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং যে কষ্টের সম্মুখীন হও, তাতে সবর কর।

আর একটি আদব হচ্ছে পার্থিব সম্পর্ক হ্রাস করা, যাতে ভয় এবং মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা না থাকে। জনৈক বুযুর্গের একটি বিড়াল ছিল। তিনি এর জন্যে প্রতিবেশী কসাইয়ের কাছ থেকে প্রত্যহ মাংসখণ্ড গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি কসাইকে কোন অসৎ কাজে লিপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেখে প্রথমে বিড়ালটিকে গৃহ থেকে বের করে দিলেন। এর পর কসাইকে সেই অসৎ কাজ করতে নিষেধ করলেন। কসাই বিরক্ত হয়ে বলল ঃ ভবিষ্যতে আপনার বিড়ালের জন্যে কিছুই দেব না। বুযুর্গ বললেন ঃ বিড়াল তাড়িয়ে দিয়েই আমি তোমাকে নিষেধ করতে এসেছি। এখন তোমার কাছে আমি কিছু আশা করি না। সত্য বলতে কি, বুযুর্গের এ উক্তি যথার্থ। কেননা, যেব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আশা ছিন্ন করবে না, সে আদেশ ও নিষেধ করতে সক্ষম হবে না। যে আশা করে তার দিক থেকে মানুষের মন ভাল থাকুক এবং মানুষ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক, সে কিরূপে আদেশ ও নিষেধ করার সাহস করবে? হযরত কা'ব আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে তোমার মান-মর্যাদা কিরূপ? তিনি বললেন ঃ ভাল। কা'ব বললেন ঃ তওরাত তো বলে, মানুষ যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, তখন স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তার মান-মর্যাদা ভাল থাকে না। আবু মুসলিম জওয়াব দিলেন ঃ তওরাতের কথা সত্য। জনৈক ওয়ায়েয খলীফা মামূনকে কঠোর ভাষায় সদুপদেশ দিলে খলীফা বললেন ঃ মিয়া সাব, নম্র ভাষায় কথা বল। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে যিনি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন– ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন– যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁকে নম্রতা করার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

'তাকে নরম কথা বল; সম্ভবত সে চিন্তা করবে অথবা ভয় করবে।'

আদেশ ও নিষেধকারীর উচিত এক্ষেত্রে পয়গম্বরগণের অনুসরণ করা। হযরত আবু উমামা বর্ণনা করেন– একবার জনৈক যুবক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে যিনার অনুমতি দিন। এতে উপস্থিত লোকজন তার প্রতি ভীষণ চটে গেল এবং বের করে দিতে চাইল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে থাকতে দাও। এর পর যুবককে বললেন ঃ আমার কাছে এস। সে কাছে এসে সম্মুখে বসে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, তোমার মা যিনা করুক– এটা তুমি পছন্দ করবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ বীর পুরুষদের কাজই এটা যে, তারা মায়ের যিনা সহ্য করতে পারে না। আচ্ছা বল তো, তুমি তোমার কন্যার জন্যে যিনা পছন্দ করবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ হাঁ, বীর পুরুষেরা তাদের কন্যার জন্যেও যিনা পছন্দ করে না। এর পর তিনি ফুফু ও খালাকে নিয়েও এমনি প্রশ্ন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াবে যুবকটি কেবল 'না'-ই বলে গেল। এর পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত যুবকটির বুকের উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী, এর অন্তর পরিষ্কার করে দিন, তার গোনাহ্ মাফ করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন। আবু উমামা বলেন ঃ এর পর এই যুবকটির কাছে যিনার চেয়ে জঘন্য পাপাচার অন্য কিছু ছিল না। হযরত ফোযায়ল ইবনে আয়াযকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বাদশাহের দান গ্রহণ করেন। এটা কেমন? তিনি বললেন ঃ তিনি আপন পাওনার চেয়ে কমই নেন। এর পর তিনি সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাকে একান্তে নিয়ে যান এবং বলেন ঃ হে আলেম সম্প্রদায়, আপনারা শহরের প্রদীপ ছিলেন। আপনাদের কাছ থেকে মানুষ আলো লাভ করত। এখন আপনারা অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। আপনারা পথহারাদের জন্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। আপনাদের দেখে দেখে মানুষ পথ চলত। এখন আপনারা দিকভ্রমের কারণ হয়ে গেছেন। এই শাসকবর্গের অর্থ গ্রহণ করতে আপনারা লজ্জা করেন না। এই অর্থ কোথা থেকে আসে, তা আপনাদের জানা আছে কি? এ কাজ করার পরও আপনারা বালিশে হেলান দিয়ে বলেন– অমুক অমুকের কাছ থেকে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে সুফিয়ান মাথা তুলে কয়েকবার আহ্, আহ্ বললেন, এর পর আরজ করলেন ঃ আল্লাহর কসম, হে আবু আলী, আমি নেকবখত নই; কিন্তু নেকবখতগণের প্রতি মহব্বত অবশ্যই রাখি। হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন ঃ ছেলা ইবনে আশইয়াম (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার পাজামা গিঁঠের নীচে ছিল। মুরীদরা তার সাথে কঠোর ব্যবহার করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ এ কাজটি আমাকে করতে দাও। আমি তোমাদেরকে এই উৎকণ্ঠা থেকে বাঁচিয়ে দেব। অতঃপর তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ ভাতিজা, তোমার সাথে একটি কথা আছে। লোকটি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ চাচাজান, সেটি কি? তিনি বললেন ঃ আমি চাই তুমি তোমার পাজামা নিজেই গিঁঠের উপরে তুলে নাও। সে "ভাল কথা" বলে অমনি পাজামা উপরে তুলে নিল। এর পর তিনি মুরীদগণকে বললেন ঃ যদি তোমরা তার সাথে রূঢ় আচরণ করতে, তবে সে অস্বীকার করে বসত এবং তোমাদেরকে মন্দ বলত। মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া বলেন ঃ আমি এক রাত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের কাছে গেলাম। তিনি মাগরিবের নামায পড়ে গৃহে আগমন করছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন, জনৈক মদমত্ত কোরায়শী তরুণ একজন মহিলাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফরিয়াদ শুনে লোকজন একত্রিত হয়ে যুবককে মারতে উদ্যত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি লোকজনকে বললেন ঃ আমার ভাতিজাকে ছেড়ে দাও। এর পর তিনি তরুণকে কাছে ডাকলেন। সে লজ্জিত অবস্থায় কাছে এলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ আমার সাথে চল। তিনি তাকে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং খাদেমকে বললেন ঃ একে তোমার কাছে রাখ। এর নেশা কেটে গেলে সে কি কাণ্ড করেছে তা তাকে বলবে এবং আমার সাথে দেখা না করে যেতে দেবে না। সেমতে নেশা কেটে যাওয়ার পর খাদেমের মুখে ঘটনা শুনে তরুণ খুব লজ্জিত হল এবং কান্নাকাটি করল। এর পর তাকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ তুমি আপন আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে যে কাণ্ড করলে তাতে তোমার লজ্জা করা উচিত ছিল। তুমি কি জান না তুমি কার সন্তান? আল্লাহকে ভয় কর এবং তওবা কর। তরুণ মাথানত করে কাঁদতে লাগল। অতঃপর মাথা তুলে বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করলাম, জীবনে আর কোন দিন নবীয পান করব না এবং মন্দ কাজের ধারে-কাছে যাব না। আমি তওবা করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকে কাছে টেনে মস্তকে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ শাবাশ বেটা, এমনি চাই। এর পর থেকে সে তাঁর কাছেই থাকত এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করত। বলাবাহুল্য, নম্রতার বদৌলতেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফাতাহ্ ইবনে মানজরফ বলেন ঃ জনৈক সুঠাম সবল ব্যক্তি এক মহিলাকে ধরে ফেলে। তার হাতে ছিল ছোরা। কেউ তার কাছে গেলে সে ছোরা দিয়ে তাকে আক্রমণ করত। কেউ তার কাছে যাওয়ার সাহস করত না। মহিলাটি তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য আর্তনাদ করছিল। এমন সময় প্রখ্যাত সূফী বিশর ইবনে হারেস সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি আপন কাঁধ দিয়ে লোকটির কাঁধে ঘর্ষণ করলেন। অমনি সে ধরাশায়ী হল। হযরত বিশর সেখান থেকে চলে গেলেন। মহিলাটিও অক্ষত অবস্থায় সেখান থেকে প্রস্থান করল। লোকেরা দুর্বৃত্তটির কাছে গিয়ে তাকে ঘর্মাক্ত কলেবর দেখতে পেল। জিজ্ঞাসার জওয়াবে সে বলল ঃ আমি কিছুই জানি না। তবে একজন বৃদ্ধ লোক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোর কাজ-কর্ম এবং তোকে দেখছেন। এ কথা শুনামাত্রই আমার পা যুবগল অবশ হয়ে গেল। আমি জানি না, লোকটি কে ছিল। লোকেরা বলল ঃ তিনি বিশর ইবনে হারেস। সে বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ, এখন তিনি আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন! সে সেদিনই জ্বরে আক্রান্ত হল এবং সপ্তম দিনে মারা গেল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ব্যাপক অস্বীকার্য বিষয়

অস্বীকার্য বিষয়সমূহ দু'প্রকার- মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। মাকরূহ বিষয় থেকে নিষেধ করা মোস্তাহাব এবং চুপ থাকা মাকরূহ- হারাম নয়। আর নিষিদ্ধ বিষয়ে শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়া এবং চুপ থাকা হারাম। এ ধরনের অস্বীকার্য বিষয়সমূহ মসজিদে, বাজারে, পথিমধ্যে ও অন্যান্য স্থানে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আমরা এগুলো আলাদা আলাদাভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

মসজিদ ও তেলাওয়াত সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ প্রথম, নামাযের রুকু ও সেজদা 'ইতমিনান' সহকারে তথা ধীরস্থিরভাবে না করে নামায নষ্ট করা। এই ইতমিনান না করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে নিষেধ করা ওয়াজিব। (হানাফী মাযহাবে ইতমিনান বর্জন নামায শুদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী নয়।)

দ্বিতীয়, কোরআন মজীদ ভুল তেলাওয়াত করা। এটা করতে নিষেধ করা এবং শুদ্ধরূপে তেলাওয়াত শিখিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেব্যক্তি কোরআন পাঠে বেশী ভুল করে, সে যদি শুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তবে শুদ্ধ করা পর্যন্ত তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ভুল তেলাওয়াত করলে গোনাহ্গার হবে। যদি জিহ্বার জড়তার কারণে শুদ্ধ পাঠের ক্ষমতা না থাকে, তবে তেলাওয়াত বর্জন করে কেবল আলহামদু সূরা শিখতে ও তা শুদ্ধ করতে সচেষ্ট হবে।

তৃতীয়, আযানে মুয়াযযিনদের স্বর অধিক দীর্ঘ করা, হাইয়া আলাস্সালাহ্ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার সময় বক্ষ কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে নেয়া- এগুলো মাকরূহ অস্বীকার্য বিষয়। মুয়াযযিনদেরকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করা ওয়াজিব। যদি তারা জ্ঞাতসারে এরূপ করে, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব।

চতুর্থ, খতীবের এমন কালো পোশাক পরিধান করা, যাতে রেশমী সূতা অধিক, অথবা তার হাতে সোনালী তরবারি থাকা- এগুলো ফেস্ক বিধায় নিষেধ করা ওয়াজিব।

পঞ্চম, যে ওয়ায়েয তার ওয়াযে বেদআত মিশ্রিত করে অথবা মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করে, সে ফাসেক। তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। বেদআতী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়ায়েযের ওয়াযে যোগদান করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আদেশ করেন–

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ -

আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট না হয়।

ষষ্ঠ, জুমুআর দিনে ওষুধ, খাদ্য, তাবিয ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া, ভিক্ষুকদের দণ্ডায়মান হওয়া এবং কবিতা ও কোরআন পাঠ করা, যাতে মুসল্লীরা শুনে কিছু দান করে, ইত্যাদি অস্বীকার্য বিষয়। মসজিদের বাইরে হলে অবশ্য মোবাহ্; যেমন ওষুধ, খাদ্য ও কিতাব বিক্রয় করা। এগুলো মসজিদের ভিতরেও জায়েয; কিন্তু না করা উত্তম, কিন্তু সদা-সর্বদার জন্য মসজিদকে দোকান বানিয়ে নেয়া হারাম এবং এটা নিষেধ করতে হবে।

সপ্তম, উন্মাদ, বালক ও মাতালদের মসজিদে আসা অস্বীকার্য বিষয়। বালকরা মসজিদে অধিক খেলাধুলা না করলে তাদের প্রবেশে দোষ নেই। তারা মসজিদে সদা-সর্বদা খেলা করলে নিষেধ করা ওয়াজিব। যে উন্মাদ মসজিদে চুপচাপ থাকে, অশ্লীল বকাবকি করে না এবং উলঙ্গ হয় না, তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া ওয়াজিব নয়।

রাস্তা ও বাজার সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয়ঃ বাজারসমূহে যেসকল অসৎ কাজ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পণ্যদ্রব্য মুনাফায় বিক্রি করার ব্যাপারে মিথ্যা বলা হয়। অতএব যেব্যক্তি বলে, আমি এটি এত টাকায় কিনেছি এবং এত টাকায় বিক্রি করব, সে যদি এতে মিথ্যা বলে, তবে সে ফাসেক। আর যেব্যক্তি এ অবস্থা জানে, ক্রেতাকে এই মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত করা তার উপর ওয়াজিব। যদি সে বিক্রেতার খাতিরে চুপ থাকে, তবে গোনাহগার হবে এবং খেয়ানতে বিক্রেতার অংশীদার হবে। দ্বিতীয়, পণ্যদ্রব্যের দোষ ক্রেতার কাছে গোপন রাখা। যেব্যক্তি দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত, ক্রেতাকে বলে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। নতুবা এর অর্থ হবে, সে মুসলমান ভাইয়ের আর্থিক ক্ষতিতে রাজি আছে। এটা হারাম। তৃতীয়, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অবৈধ শর্ত করা, যার অভ্যাস মানুষের আছে। এটা নিষেধ করা ওয়াজিব। কেননা, এতে লেনদেন ফাসেদ হয়ে যায়। চতুর্থ, ঈদের দিনে শিশুদের জন্যে খেলনা এবং প্রাণীর ছবি বিক্রয় করা উচিত নয়। এগুলো ভেঙ্গে দেয়া এবং বিক্রয় করতে নিষেধ করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার পাত্র এবং রেশমী বস্ত্র বিক্রয় করাও তেমনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিষিদ্ধ। রাস্তার অস্বীকার্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে গৃহ সংলগ্ন স্থানে খুঁটি গেড়ে চত্বর নির্মাণ করা, বৃক্ষ রোপণ করা, রাস্তায় বারান্দা, গ্যালারী ও ছাদ নির্মাণ করা, কাষ্ঠ পুঁতে রাখা এবং বোঝা ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রাখা। এতে যদি রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, অথবা পথিকদের পায়ে টক্কর লাগে, তবে এগুলো সব গর্হিত কাজ। যদি রাস্তা এত প্রশস্ত হয় যে, এতে কারও কোন ক্ষতি হয় না, তবে নিষেধ করা উচিত নয়। এমনিভাবে গবাদিপশু রাস্তায় এমনভাবে বাঁধা যাবে না, যাতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পথিকদের গায়ে প্রস্রাব-পায়খানার ছিটা পড়ে। কসাই যদি তার দোকানের সামনে গবাদিপশু যবেহ করে এবং এতে রাস্তা রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবে তাকে নিষেধ করা হবে। রাস্তায় আবর্জনা নিক্ষেপ করা, খরবুযা, তরমুজ ও কলার ছাল ফেলে রাখা অথবা পানি ঢেলে চলার পথ পিচ্ছিল করে দেয়া অপছন্দনীয় কাজ। এগুলো করতে নিষেধ করতে হবে। যে কুকুর মানুষকে কামড় দেয়, সেটি দরজায় বসিয়ে রাখতে নিষেধ করা ওয়াজেব।

দাওয়াত সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরুষ মেহমানদের জন্যে রেশমী ফরশ বিছানো, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা, জীব-জন্তুর চিত্র সম্বলিত পর্দা ঝুলানো, গান-বাজনার ব্যবস্থা করা, পুরুষ অতিথিদের দেখার জন্যে মহিলাদের ছাদের উপর সমবেত হওয়া– এসব বিষয় নিষিদ্ধ ও অস্বীকার্য। এগুলো দূর করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দূর করতে অক্ষম, তার সেখানে বসা নাজায়েয। রৌপ্য নির্মিত ক্ষুদ্র সুরমাদানীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রৌপ্য নির্মিত সুরমাদানী দেখে ভোজসভা থেকে বাইরে চলে যান। দাওয়াতের মজলিসে কোন ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কিংবা স্বর্ণের আংটি পরিহিত থাকলে তার কাছে বসা জায়েয নয়। দাওয়াতে খাদ্যে অপব্যয় করাও একটি গর্হিত কাজ। অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করাই শুধু অপব্যয় নয়; বৈধ কাজে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করাকেও অপব্যয় বলা হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান মানুষের অবস্থাদৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন অবস্থায় নিষেধ করা ওয়াজিব হবে। উদাহরণতঃ জনৈক ছা-পোষা ব্যক্তির কাছে এক হাজার টাকা আছে। এ টাকা ছাড়া তার অন্য কোন আমদানী নেই। সে যদি এই টাকা সম্পূর্ণ ওলিমা অনুষ্ঠানে ব্যয় করে দেয়, তবে তাকে এই অপব্যয় থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 'তুমি আপন হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করো না, অর্থাৎ,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যথাসর্বস্ব ব্যয় করে দিয়ো না; যদি কর, তবে তিরস্কৃত ও অনুতপ্ত হয়ে বসে থাকবে।'

এ আয়াতটি মদীনার এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ বন্টন করে দিয়েছিল। পরে যখন তার পরিজনরা তার কাছে খরচ চাইল, তখন সে কিছুই দিতে পারল না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين -

অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অযথা ব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই।

অতএব যেব্যক্তি এরূপ অপব্যয় করে, তাকে নিষেধ করা উচিত। হাঁ, যেব্যক্তি একা পরিবার-পরিজন বলতে কেউ নেই এবং সে তাওয়াক্কুল করারও বদ্ধমূল ক্ষমতা রাখে, তার জন্যে সমস্ত ধন-সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দেয়া জায়েয, কিন্তু ছাপোষা ও তাওয়াক্কুলে অক্ষম ব্যক্তির জন্যে এটা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে প্রাচীর গাত্রে নকশা অংকনে সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করাও হারাম অপব্যয়, কিন্তু যার কাছে অগাধ ধন-সম্পদ আছে, তার জন্যে হারাম নয়। কেননা, সাজসজ্জাও একটি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য। চিরকালই মসজিদের ছাদে এবং প্রাচীরে কারুকার্য হয়ে এসেছে। অথচ সৌন্দর্যবর্ধন ছাড়া এসব কারুকার্যের অন্য কোন উপকারিতা নেই। পোশাক ও খাদ্যের শোভাবর্ধনের বিধানও তাই; অর্থাৎ, এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মোবাহ্, কিন্তু যার ধন-সম্পদ কম, তার জন্যে অপব্যয় এবং বিত্তশালীদের জন্যে জায়েয।

যেসকল অস্বীকার্য বিষয়ে সাধারণ মানুষ লিপ্ত ঃ আজকাল যারা গৃহে বসে থাকে, তারাও মানুষকে ধর্মের কথা বলা, শিক্ষা দেয়া ও সৎকাজের উৎসাহ দেয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। এখন শহরেও অধিকাংশ লোক নামাযের শর্তসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। গ্রামে তো হবেই। শহরের প্রতিটি মহল্লায় ও মসজিদে একজন আলেম থাকা আবশ্যক, যিনি মানুষকে ধর্মের কথাবার্তা শিক্ষা দেবেন। এমনিভাবে প্রত্যেক গ্রামে এ কাজের জন্যে একজন আলেম থাকা দরকার। যে আলেম তার 'ফরযে আইন' সমাপ্ত করেছে এবং 'ফরযে কেফায়া' পালন করার অবসর আছে, তার উচিত তার শহরের আশেপাশে যারা বাস করে, তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে শরীয়তের বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া। সে নিজের পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং তা থেকেই খাবে– অজ্ঞদের খাদ্য খাবে না। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্য সন্দেহযুক্ত। যদি একজন আলেমও এ কাজে ব্রতী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়, তবে অবশিষ্ট সকল আলেম এ দায়িত্ব থেকে খালাস পেয়ে যাবে। নতুবা সকলেই অপরাধী হবে। আলেমরা এ জন্যে অপরাধী হবে যে, তারা শহরের বাইরে গিয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং অজ্ঞরা এজন্যে অপরাধী হবে যে, তারা শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটি করেছে। যে সাধারণ ব্যক্তি নামাযের শর্তসমূহ জানে, অপরকে শিক্ষা দেয়া তার উপর ওয়াজিব। নতুবা গোনাহে সে-ও শরীক থাকবে। এটা জানা কথা যে, কোন ব্যক্তি মায়ের পেট থেকে শরীয়তের আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং আলেমদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। অতএব যেব্যক্তি একটি মাসআলাও জানবে– তাকেও সে বিষয়ের আলেম বলা হবে। এতেও সন্দেহ নেই যে, আলেমদের গোনাহ্ বেশী হবে। কারণ, তাদের শিক্ষা দেয়া ও বলে দেয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা আছে। তাদের শান ও পেশাই হচ্ছে, যা কিছু রসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে তাদের কাছে পৌঁছে তা অন্যের কাছে পৌছে দেয়া। আলেমরাই পয়গম্বরগণের ওয়ারিস এবং এই অর্থেই ওয়ারিস। লোকেরা ভালরূপে নামায পড়ে না– এ ওযর দেখিয়ে কারও গৃহে বসে থাকা এবং মসজিদে না আসা জায়েয নয়। বরং এ অবস্থা জানা গেলে শিক্ষা দেয়া ও নিষেধ করার জন্যে বাইরে আসা তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যে জানে, বাজারে একটি অস্বীকার্য কাজ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়, সে যদি তা দূর করতে সক্ষম হয়, তবে গৃহে বসে থাকা এবং তা দূর না করা তার জন্যে জায়েয নয়। যদি সে অস্বীকার্য কাজটি দেখা থেকে গা বাঁচাতে চায়, তবু বের হওয়া তার জন্যে জরুরী। কেননা, যখন এ কারণে বের হবে যে, যতটুকু কুকর্ম দূর করতে সক্ষম হবে, ততটুকু দূর করবে, তখন সেই অস্বীকার্য কাজটি দেখায় তার কোন ক্ষতি হবে না। বলাবাহুল্য, কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ছাড়া দেখলে সেই দেখাই ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

মোট কথা, প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, ফরযসমূহ অব্যাহতভাবে পালন এবং হারাম বিষয়াদি পরিত্যাগ করে প্রথমে আত্মসংশোধন করা। নিজের সংশোধনের পর গৃহের লোকজনকে এসব বিষয় শিক্ষা দেবে, এর পর পড়শীদেরকে, এর পর মহল্লাবাসীকে, এর পর শহরবাসীকে, এর পর শহরের আশেপাশের লোকদেরকে, অবশেষে গ্রামবাসীদেরকে শিক্ষা দেবে। যে এলাকায় এক ব্যক্তিও কোন ধর্মীয় ফরয সম্পর্কে জাহেল থাকবে এবং কোন আলেমের নিজে গিয়ে অথবা অন্যের মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষমতা থাকে, সেই পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। যারা ধর্মের চিন্তা রাখে, তাদের জন্যে এ কাজটি নেহায়েত জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শাসক শ্রেণীকে আদেশ ও নিষেধ করা

ইতিপূর্বে আমরা আদেশ ও নিষেধের কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছি। এগুলোর মধ্যে শাসকবর্গের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর জায়েয; অর্থাৎ, জ্ঞাত করা ও উপদেশ দেয়া। চতুর্থ স্তর অর্থাৎ, জোরে জবরে শাসিতদের জন্যে শাসকদের নিষেধ করা জায়েয নয়। কারণ, এতে অনর্থ ও গোলযোগ সংঘটিত হবে। ফলে নেকী বরবাদ এবং গোনাহ অবশ্যম্ভাবী হবে। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ, কঠোর ভাষায় নিষেধ করা; যেমন শাসককে "হে যালেম", "হে খোদাদ্রোহী" ইত্যাদি বলা– এতে যদি ব্যাপক অনিষ্টের আশংকা থাকে এবং বক্তা ছাড়া অন্যদেরও ক্ষতি হয়, তবে এরূপ বলা জায়েয নয়। আর যদি কেবল বক্তারই ক্ষতি এমনকি, প্রাণনাশের আশংকা হয়, তবে জায়েয; বরং মোস্তাহাব। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি ছিল, তাঁরা শাসকবর্গকে আদেশ ও নিষেধ করার ব্যাপারে প্রাণনাশের আশংকাকে তুচ্ছ মনে করতেন এবং নানাবিধ বিপদাপদ ও শাস্তি অম্লান বদনে বরণ করে নিতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন, আদেশ ও নিষেধ করার পরিণতিতে যদি মারা যান, তবে শহীদ হবেন। যেমন নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন,

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فِي ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَتَلَهُ .

সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, এর পর সে ব্যক্তি, যে কোন শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আদেশ ও নিষেধ করে। অতঃপর শাসক তাকে হত্যা করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

শ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্যের বাণী উচ্চারণ করা।

শাসকবর্গকে উপদেশ দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সত্যিকার রীতিনীতি তাই, যা পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে। আমরা এ সম্পর্কিত কিছু গল্প ও কাহিনী হালাল হারাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে এসেছি। এখানে কেবল সেসব গল্প উদ্ধৃত করতে চাই, যেগুলো দ্বারা উপদেশের আকার আকৃতি এবং শাসকবর্গের গর্হিত কর্মকাণ্ড অস্বীকার করার অবস্থা জানা যায়। এসব গল্পের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কোরায়শ সর্দারদেরকে নিষেধ করার গল্প। গল্পটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওরওয়া (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঘোর শত্রু কোরায়শ সর্দারেরা তাঁর উপর যে যে নির্যাতন চালিয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর নির্যাতন আপনি কোন্টি দেখেছেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ একদিন আমি কোরায়শদের কাছে গেলাম। তারা হাতীমে কা'বায় সমবেত ছিল। তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলল, আমরা তার ব্যাপারে অনেক সহ্য করেছি, যা অন্য কারও ব্যাপারে কখনও করিনি। সে আমাদের জ্ঞানীদেরকে বেওকুফ বলেছে, পূর্বপুরুষদেরকে গালি দিয়েছে, আমাদের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করেছে এবং আমাদের উপাস্যদের উদ্দেশে কটূক্তি করেছে, কিন্তু আমরা এসব গুরুতর বিষয়ে সবর করেছি। তারা এসব কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি 'হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার পর তওয়াফ করতে করতে তাদের কাছ দিয়ে গেলেন। কাছে আসার সাথে সাথে সমবেত কোরায়শরা তাঁর প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। এর পর তওয়াফের দ্বিতীয় চক্করে তিনি যখন আবার তাদের কাছে এলেন, তখন তারা আবার বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দিল। এমনিভাবে তৃতীয়বার যখন তারা এমনি আচরণ প্রদর্শন করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে কোরায়শ দল, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু আনয়ন করছি। (অর্থাৎ ইসলাম তোমাদের কাছে মৃত্যুর মত অসহনীয়।) একথা শুনে সকলেই মাথা নীচু করে নিল। তারা এমন চুপ হয়ে গেল যেন প্রত্যেকের মাথায় কোন পাখী বসে আছে। এ বাক্যটির প্রভাবে ইতিপূর্বে যেব্যক্তি তাঁকে যন্ত্রণাদানে অধিক উৎসাহী ছিল, সে-ও যে নম্র থেকে নম্র ভাষা পেল, তা দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তারা বলল ঃ হে আবুল কাসেম, আপনি নির্বিঘ্নে চলে যান। আপনি মূর্খ নন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অগত্যা চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন কোরায়শরা পুনরায় হাতীমে সমবেত হল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। তারা পরস্পরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়েই কথাবার্তা বলছিল। এমন সময় তিনি দৃষ্টিগোচর হলেন। তারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একযোগে লাফিয়ে উঠল এবং চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে নিল। তারা প্রশ্ন করতে লাগল ঃ আপনিই এমন বলেন, আপনিই এমন বলেন? তারা সেসব কথা উল্লেখ করছিল, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের প্রতিমা ও ধর্ম সম্পর্কে বলতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ হাঁ, আমিই এসব কথা বলি। এর পর আমি দেখলাম, জনৈক কোরায়শী তাঁর চাদর ধরে হেঁচকা টান দিল এবং তাঁকে হেঁচড়াতে লাগল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা কি তাঁকে এজন্যে মেরে ফেলবে যে, তিনি বলেন আমার পালনকর্তা আল্লাহ্? এর পর কোরায়শরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। আমি দেখলাম, কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এর আগে কখনও এত যন্ত্রণা দেয়নি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় ছিলেন, এমন সময় ওকবা ইবনে আবু মুয়ীত সেখানে এসে তাঁর পবিত্র কাঁধে হাত রাখল। অতঃপর নিজের চাদর তাঁর গলায় রেখে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাইল। এমন সময় হযরত আবু (রাঃ) বকর দৌড়ে এসে ওকবাকে ঘাড় ধরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينت من ربكم .

'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই অপরাধে হত্যা করতে চাও, যে সে আল্লাহকে নিজের পালনকর্তা বলে? অথচ সে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে।'

বর্ণিত আছে, হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মুসলমানদের ভাতা বন্ধ করে দেন। একদিন তিনি খোতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় আবু মুসলিম খাওলানী (রঃ) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে মোয়াবিয়া, যেসব অর্থসম্পদ তুমি আটকে রেখেছ, সেগুলো না তোমার পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার বাপের পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার মায়ের পরিশ্রমলব্ধ। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এতে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে সকলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন ঃ তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই বসে থাক। এক ঘন্টা পর তিনি গোসল করে বের হয়ে বললেন ঃ আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলল, যাতে আমার ভীষণ রাগ ধরে গেল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃজিত। অগ্নি পানি দ্বারাই নির্বাপিত হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে কারও ক্রোধ হলে সে যেন গোসল করে নেয়। আমিও তাই অন্দরে গিয়ে গোসল করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এসেছি। এখন বলছি– আবু মুসলিম ঠিকই বলেছে। এই ধন-সম্পদ আমার পিতা এবং মাতা কারও উপার্জিত নয়। অতএব মুসলমানগণ এস, আপন আপন ভাতা নিয়ে যাও।

যাব্বা ইবনে মুহসিন আন্তরী বলেন ঃ বসরায় আমাদের গভর্নর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তাঁর রীতি ছিল, যখন খোতবা দিতেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার হামদ পাঠ করতেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করতেন এবং খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া করতেন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্যই করতেন না। আমার কাছে এটা খারাপ মনে হল। একদিন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম ঃ আপনি প্রথম খলীফার প্রতি লক্ষ্য করেন না। আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? তিনি কয়েক জুমায় তাই করলেন। এর পর তিনি হযরত ওমরের খেদমতে অভিযোগ লেখে পাঠালেন, যাব্বা ইবনে মুহসিন আমার খোতবার মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করে। খলীফা জওয়াবে লেখলেন, যাব্বাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেমতে হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে খলীফার কাছে প্রেরণ করলেন। মদীনায় পৌঁছে আমি খলীফার দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি বাইরে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ আমি যাব্বা ইবনে মুহসিন, যাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ 'মারহাবা'-ও নয় এবং 'আহলান'-ও নয়। আমি আরজ করলাম ঃ মারহাবা তো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, আর 'আহলান'-এর আস্থা, আমি পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই রাখি না। এখন বলুন, আপনি যে আমাকে আমার শহর থেকে বিনা অপরাধে ডেকে আনলেন, এটা কি কারণে জায়েয বিবেচিত হল? তিনি বললেন ঃ তোমার মধ্যে এবং আমার গভর্নরের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের জানতে চাই। আমি বললাম ঃ তাহলে শুনুন, তাঁর রীতি হচ্ছে, তিনি খোতবা পাঠ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার হামদ ও সানা পাঠ করে দরূদ পড়তেন, এর পর আপনার জন্যে দোয়া করতেন। তাঁর এ কাণ্ড দেখে আমি ক্ষুব্ধ হই। একদিন সামনে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি ধ্যান দেন না কেন? তিনি কয়েক জুমায় তাই করলেন, এর পর আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তুমি আমার গভর্নরের তুলনায় অধিক তওফীকপ্রাপ্ত এবং সুপথপ্রাপ্ত। তুমি আমার ত্রুটি মার্জনা কর। আল্লাহ্ তাআলা তোমার ত্রুটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মার্জনা করবেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মাফ করুন হে আমীরুল মুমেনীন। অতঃপর তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আবু বকর সিদ্দীকের একটি দিন ও রাত ওমর এবং তার বংশধরের চেয়ে উত্তম। আমি কি তোমাকে সেই রাত ও দিনের কথা বলব না। আমি আরজ করলাম ঃ উত্তম, বলুন। তিনি বললেন ঃ আবু বকর সিদ্দীকের সে রাত হচ্ছে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুশরিকদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছায় রাতের বেলায় মক্কা থেকে বের হলেন, তখন আবুবকর তাঁর সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি কখনও তাঁর অগ্রে, কখনও পেছনে, কখনও ডানে এবং কখনও বামে চলতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে আবু বকর, ব্যাপার কি? আমি তো তোমাকে অন্য কোন সময় এরূপ করতে দেখিনি। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যখন আমি মনে করি, কেউ ওৎ পেতে বসে আছে কি না, তখন আপনার অগ্রে চলে যাই, আর যখন দৌড়ে আসার কথা চিন্তা করি, তখন পেছনে চলে যাই। ডানে বামেও আপনার হেফাযতের খাতিরে চলি। কারণ, আপনার ব্যাপারে আমি শংকিত।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সারারাত পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চললেন। ফলে পায়ের অঙ্গুলি ফুলে টন্ টন্ করতে লাগল। হযরত আবু বকর (রাঃ) অঙ্গুলির এই অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাঁধে বসিয়ে দৌড় দিলেন এবং সওর পাহাড়ের গুহায় পৌঁছে নামিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আপনি গুহায় যাবেন না যে পর্যন্ত আমি প্রথম তাতে প্রবেশ না করি। কেননা, গুহায় কোন ইতর প্রাণী থাকলে তাতে আমার ক্ষতি হোক– আপনার না হোক। এ কথা বলে হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহার অভ্যন্তরে গেলেন। যখন সেখানে কোন কিছু দেখলেন না, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গুহার মধ্যে কিছু ফাটল ছিল, যাতে সর্প ও বিচ্ছু বাস করত। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফাটলের মুখে নিজের পা রেখে দিলেন এই আশংকায় যে, কোথাও কোন কিছু বের হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দংশন না করে। ঘটনাক্রমে একটি সর্প হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করল। যন্ত্রণার চোটে অশ্রুতে তাঁর কপোল ভেসে যাচ্ছিল। রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে বলছিলেন ঃ হে আবু বকর, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا 'চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এর পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকরের জন্যে সান্ত্বনা নাযিল করলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর একটি ঘটনা শুন হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রথম ভাগে আরবের অনেক লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ বলে, আমরা নামায পড়ব, কিন্তু যাকাত দেব না। তিনি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ইচ্ছা করলেন। আমি তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার জন্যে তাঁর খেদমতে গেলাম। আমি বললাম ঃ হে নায়েবে রসূল! আপনি মানুষকে বুঝান এবং তাদের প্রতি নম্রতা প্রকাশ করুন। তিনি আমাকে বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, কুফরে তুমি এত শক্ত ছিলে আর ইসলামে এত ঢিলে হয়ে গেছ! আমি তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে বুঝাব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, যদি লোকেরা আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব। এর পর আমরা তাঁর সাথে থেকে জেহাদ করেছি এবং পরিষ্কাররূপে বুঝতে পেরেছি, তিনি সুপথপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর অভিমতই সঠিক। এটা হচ্ছে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দিনের অবস্থা। এর পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবু মূসা আশআরীকে তিরস্কার করে লেখে পাঠালেন– তুমি এরূপ কর কেন? দোষ তোমারই।

আসমায়ী বলেন ঃ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার রাজত্বকালে হজ্জ পালন করতে এসে একদিন মক্কায় সিংহাসনে বসলেন। তার চারপাশে প্রত্যেক গোত্রের শীর্ষস্থানীয় সর্দাররা সমবেত ছিল। ঠিক এ সময় হযরত আতা ইবনে আবু রুবাহ্ খলীফার কাছে আগমন করলেন। খলীফা তাঁকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ালেন এবং সিংহাসনে নিজের পার্শ্বে বসালেন। অতঃপর খলীফা তাঁর সামনে বসে আরজ করলেন ঃ আপনি কেন কষ্ট করে আগমন করেছেন? আতা বললেন ঃ হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহ্ তাআলার হেরেম ও তাঁর রসূলের হেরেমের ব্যাপারে সব সময় আল্লাহ্কে ভয় করবেন। এসব স্থানের অধিবাসীদের খবরাখবর নেবেন। মুহাজির ও আনসারগণের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন। তাদের দৌলতেই আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবেন। সাধারণ মুসলমানদের কাজ-কারবারের প্রতি সুনজর রাখবেন। তাদের বিষয়ে বিশেষভাবে আপনিই জিজ্ঞাসিত হবেন। যারা আপনার দ্বারে আগন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ভয় রাখবেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হবেন না এবং তাদের সামনে আপন দ্বার রুদ্ধ করবেন না, যাতে আপনার কাছে আসতে না পারে। খলীফা আরজ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলেন ঃ ভাল, আমি আপনার কথামতই কাজ করব। এর পর হযরত আতা প্রস্থানোদ্যত হলে খলীফা তাঁকে ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আবু মুহাম্মদ, এতক্ষণ আপনি অন্যদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তা পূর্ণ করব বলে ওয়াদা করেছি। এখন নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করুন। তিনি বললেন ঃ মানুষের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আবদুল মালেক বললেন ঃ আভিজাত্য ও মর্যাদা একেই বলে।

কথিত আছে, একদিন ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তার দারোয়ানকে বললেন ঃ দরজায় দাঁড়াও। কেউ এ পথে গেলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার কথাবার্তা শুনব। দারোয়ান দরজায় দাঁড়াল। এমন সময় আতা ইবনে আবু রুবাহ্ সেই পথে যাচ্ছিলেন। দারোয়ান তাঁকে চিনত না। সে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীনের কাছে চল। এটা তাঁর আদেশ। আতা খলীফার কাছে গেলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আতা ওলীদের নিকটে পৌঁছে বললেন ঃ আসসালামু আলাইকুম হে ওলীদ! খলীফা দারোয়ানের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ হতভাগা, আমি তোকে বলছিলাম এমন ব্যক্তিকে আনতে, যে আমাকে কিস্‌সা-কাহিনী শুনাবে। আর তুই কিনা এমন একজনকে এনেছিস, যে আমাকে সেই নামে ডাকা পছন্দ করে না, যা আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে মনোনীত করেছেন (অর্থাৎ, আমীরুল মুমেনীন)। দারোয়ান বলল ঃ এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ পথে আসেনি। এর পর খলীফা আতাকে বললেন ঃ বসুন। কথাবার্তার মধ্যে আতা খলীফার সামনে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করলেন– জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হাবাব। আল্লাহ্ তাআলা এটি সেই শাসনকর্তার জন্যে রেখেছেন, যে তার শাসনকার্যে যুলুম করে। এ কথা শুনে খলীফা ওলীদ ভীষণ আর্তচীৎকার করে দেওয়ানখানার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) আতা (রঃ)-কে বললেন ঃ আপনি আমীরুল মুমেনীনকে মেরে ফেলেছেন। আতা তাঁর হাত ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর, এটা বাস্তব অবস্থা। অতঃপর আতা সেখান থেকে চলে গেলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করতেন ঃ হাতে চাপ দেয়ার প্রভাবে কয়েক বছর পর্যন্ত আমার হাতে ব্যথা ছিল।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক ইবনে আবী শুমায়লা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে গেলেন। আবদুল মালেক তাঁকে বললেন ঃ কিছু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলুন। তিনি বললেন ঃ কি বলব, আপনি তো জানেন, বক্তা যে কথা বলে, তা তার জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে, সেই কথা ছাড়া, যা আল্লাহর ওয়াস্তে বলা হয়। আবদুল মালেক কেঁদে উঠলেন; অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, মানুষ তো চিরকালই একে অপরকে উপদেশ দেয়। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, কেয়ামতে কোন মানুষই কথার তিক্ততা গলায় আটকে যাওয়া এবং ধ্বংস প্রত্যক্ষ করা থেকে মুক্তি পাবে না। তবে তারা মুক্তি পাবে, যারা নিজেকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে। আবদুল মালেক আবার কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ আমি এসব অমিয় বাণী আজীবন চিত্রের ন্যায় চোখের সামনে রাখব।

ইবনে আয়েশা বলেন ঃ একবার হাজ্জাজ বসরা ও কুফার আলেমগণকে ডেকে পাঠালে আমরা সকলেই গেলাম। হযরত হাসান বসরী (রঃ) সকলের পশ্চাতে গেলেন। হাজ্জাজ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে "মারহাবা" বলল এবং একটি চেয়ার আনিয়ে সিংহাসনের কাছে তাঁকে বসাল। অনেক কথাবার্তার পর হাজ্জাজ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর উদ্দেশে গালিগালাজ করতে লাগল। আমরাও তার কথার সাথে সায় দিচ্ছিলাম। ভয়ে আমরা তার কথা মেনে নেয়া ছাড়া আর কিছু বলছিলাম না। হযরত হাসান বসরী থুতনীর নীচে অঙ্গুলি চেপে চুপচাপ বসে ছিলেন। হাজ্জাজ তাঁকে বলল ঃ আপনি চুপ কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিছু বলতে পারি না। হাজ্জাজ বলল ঃ আপনি আলী সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। হাসান বসরী বললেন ঃ আমি শুনেছি, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ -

"যে কেবলার উপর আপনি এতদিন ছিলেন, তাকে আমি এ জন্যেই নির্দিষ্ট করেছিলাম, যাতে কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে করে না তা জেনে নেই। আল্লাহ্ যাদের হেদায়াত করেছেন, তাদের ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর ব্যাপার ছিল। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবার নন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল, দয়ালু।"

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আলী মোর্তাযা (রাঃ) সেই ঈমানদার লোকদের একজন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়াত দান করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে, তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই, তাঁর জামাতা এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয়জন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ব থেকে লেখে দিয়েছিলেন, তা সমস্তই তাঁর অর্জিত। তোমার পক্ষে এবং অন্য কারও পক্ষে এটা সম্ভবপর নয় যে, তুমি তাঁর এসব শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত করে দেবে অথবা এগুলোর মধ্যে ও তাঁর মধ্যে অন্তরায় হয়ে যাবে। এটাও আমার অভিমত যে, যদি হযরত আলী মোর্তাযা (রাঃ) কোন মন্দ কাজ করেনও, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছ থেকে হিসাব নেবেন। আমার মতে তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে উত্তম উক্তি নেই। এ কথা শুনে হাজ্জাজ নাক সিট্‌কিয়ে ক্রুদ্ধ অবস্থায় সিংহাসন থেকে নেমে পড়ল এবং পশ্চাতের একটি কক্ষে চলে গেল। আমরা সকলেই বেরিয়ে এলাম। সুপ্রসিদ্ধ আলেম আমের শা'বী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর হাত ধরে বললাম, হে আবু সায়ীদ, আপনি হাজ্জাজকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন এবং তার সিনা বিদ্বেষে ভরে দিয়েছেন। হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ হে আমের, আমার কাছ থেকে সরে যাও। লোকে বলে, আমের শা'বী কুফার আলেম, কিন্তু তুমি একজন শয়তান প্রকৃতির মানবরূপী শাসকের কাছে এসে তার মর্জি মোতাবেক কথা বল এবং তার মতামতকে সঠিক বল। ধিক তোমার প্রতি! তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তখন তুমি সত্য বলতে, না হয় চুপ থাকতে। তা হলে শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে। আমের জওয়াব দিলেন ঃ আমি তার কথায় সায় দিয়েছি ঠিক, কিন্তু আমি জানতাম, তার কথায় অনিষ্ট আছে। হাসান বসরী বললেন ঃ এটা তোমার বিরুদ্ধে গোনাহের আরও বড় প্রমাণ।

অন্য একদিনের ঘটনা। আমের বলেন ঃ হাজ্জাজ হযরত হাসান বসরীকে ডেকে পাঠাল। তিনি উপস্থিত হলে হাজ্জাজ বলল ঃ আপনিই কি বলেন যে, সেই শাসক নিপাত যাক, যে আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করেছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি বলি। সে বলল ঃ এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এর কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আলেমদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা কোন কিছু গোপন করবে না– মানুষের কাছে বর্ণনা করে দেবেন। এরশাদ হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

'স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ কিতাবওয়ালাদের (অর্থাৎ আলেমদের) কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা এই কিতাব অবশ্যই মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।'

হাজ্জাজ বলল ঃ ব্যস, বেশী কথা বলবেন না। রসনা সংযত করুন। খবরদার, ভবিষ্যতে যেন এমন কথাবার্তা আর না শুনি, যা আমার কাছে খারাপ লাগে। নতুবা আপনার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।

কথিত আছে, হাতীত যাইয়াত হাজ্জাজের সম্মুখে নীত হলে হাজ্জাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ কি হে, তুমিই নাকি হাতীত যাইয়া!? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমিই হাতীত। তোমার মনে যা চায় জিজ্ঞেস কর। আমি মকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে তিনটি অঙ্গীকার করেছি– (১) আমাকে প্রশ্ন করা হলে আমি সত্য জওয়াব দেব, (২) বিপদ হলে সবর করব এবং (৩) নিরাপদ থাকলে শোকর করব। হাজ্জাজ বলল ঃ তুমি আমার সম্পর্কে কি বল? তিনি বললেন ঃ আমি বলি, তুমি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম দুশমন। তুমি মানুষের মানহানি কর এবং অপবাদ লাগিয়ে হত্যা কর। সে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ সে অপরাধে তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তুমিই তার সকল অপরাধের মধ্যে এক অপরাধ। হাজ্জাজ আদেশ দিল– একে শাস্তি দাও। সেমতে তাঁর শরীরে বাঁশের চোকলা লাগিয়ে তাঁকে মাটিতে হেঁচড়ানো হল। ফলে দেহের মাংস খসে গেল, কিন্তু তিনি উহ্ পর্যন্ত করলেন না। হাজ্জাজকে বলা হল, হাতীত এখন মরণোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে। এতে ইতর হাজ্জাজ বলল ঃ তাকে তুলে বাজারে নিক্ষেপ কর। জা'ফর বলেন ঃ আমি এবং তার একজন সঙ্গী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাতীত, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে পানি পান করাও। আমরা পানি এনে দিলাম। তিনি পানির সাথে সাথে মৃত্যুর পেয়ালাও পান করে নিলেন। তাঁর বয়স ছিল আঠার। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

কথিত আছে, গভর্নর আমর ইবনে হুবায়রা একবার বসরা, কুফা, মদীনা ও সিরিয়ার আলেমগণকে একত্রিত করে নানাবিধ প্রশ্ন করল এবং আমের শা'বীর সাথেও আলোচনা করল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল পেল। এর পর হাসান বসরীকেও পরখ করার পর বলল ঃ কুফা ও বসরার আলেম এঁরা দুজনই। অতঃপর সকলকে বিদায় দিয়ে শা'বী ও হাসান বসরীকে একান্তে নিয়ে গেল। সে আমের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শা'বীকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে আবু আমর, আমি আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্নর, তার বিশ্বাসভাজন এবং তার আনুগত্যে আদিষ্ট। প্রজাদের কাজ আমার হাতে সোপর্দ এবং তাদের হক আমার উপর অপরিহার্য। আমি চাই তারা সকল বিপদাপদ থেকে হেফাযতে থাকুক। আমি তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এর পর দেশবাসীর কাছ থেকে আমি এমন কথা শুনি, যাতে তাদের প্রতি আমার রাগ হয়। এতে আমি তাদের ভাতা মওকুফ করে বায়তুল মালে রেখে দেই। নিয়ত এই থাকে যে, পরে ফেরত দিয়ে দেব, কিন্তু ইতিমধ্যে আমীরুল মুমেনীন এজীদ জানতে পারেন এবং আমাকে লেখে পাঠান, এই অর্থ আর ফেরত দিয়ো না। এখন আমি খলীফার আদেশ অমান্যই করি কিভাবে এবং পালনই করি কিরূপে? অথচ আমি আনুগত্যেই আদিষ্ট। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের ব্যাপারে আমার গোনাহ হবে কি না? আমি আমার নিয়তের অবস্থা বলেই দিয়েছি। শা'বী জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে পুণ্য দান করুন। বাদশাহ্ পিতৃতুল্য। তিনি ভুল-নির্ভুল উভয় প্রকার কাজ করেন। এ জন্যে আপনাকে পাকড়াও করা হবে না। ইবনে হুবায়রা এ জওয়াব শুনে খুবই আনন্দিত হল এবং বলল ঃ আল্লাহর শোকর, আমাকে পাকড়াও করা হবে না। এর পর ইবনে হুবায়রা হাসান বসরীকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে আবু সায়ীদ, আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমি আপনার কথা শুনেছি, আপনি আমীরুল মুমিনীনের গভর্নর, তার বিশ্বস্ত এবং আনুগত্যে আদিষ্ট। প্রজাদের মঙ্গল সাধন আপনি অপরিহার্য মনে করেন। বাস্তবে প্রজাদের হক আপনার জন্যে অপরিহার্য এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা আপনার উপর ওয়াজিব। আমি আবদুর রহমান ইবনে সামরা কারশী সাহাবীর মুখে শুনেছি রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি প্রজাদের শাসক হয়ে শুভেচ্ছা সহকারে তাদের হেফাযত করে না, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। আপনি আরও বলেছেন, আপনি কখনও কখনও প্রজাদের ভাতা বাজেয়াপ্ত করে দেন এবং এতে তাদের হিতসাধন ও আনুগত্য নিয়ত থাকে। কিন্তু এজীদ তা জেনে ফেলে এবং সেই অর্থ ফেরত না দেয়ার আদেশ জারি করে। তখন তার আদেশ পালন করবেন, না প্রত্যাখ্যান করবেন, তা আপনি ভেবে পান না। আমি বলি, আপনার জন্যে এজীদের হকের তুলনায় আল্লাহ্ তাআলার হক অধিক অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করা একটি হক। তাঁর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং আপনি এজীদের লিখিত আদেশ কোরআনের সামনে পেশ করুন। যদি একে আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাআলার আদেশের অনুকূলে পান, তবে বাস্তবায়ন করুন। আর বিরুদ্ধে পেলে পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করুন। হে ইবনে হুবায়রা, আল্লাহকে ভয় করুন। অচিরেই তাঁর দূত আপনার কাছে আসবে এবং আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে। এই সুপ্রশস্ত প্রাসাদ থেকে বের করে আপনাকে সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরে পৌঁছে দেবে। এই রাজত্ব ও পৃথিবীর সবকিছু আপনি পেছনে ফেলে যাবেন এবং আল্লাহ তাআলার সামনে যেমন কর্ম তেমন ফল পাবেন। হে ইবনে হুবায়রা, আল্লাহ আপনাকে এজীদের কবল থেকে রক্ষা করুন, কিন্তু এজীদের সাধ্য নেই, আপনাকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তাআলার আদেশ সকল আদেশের ঊর্ধ্বে। তাঁর নাফরমানী করে কারও আনুগত্য করার বিধান নেই। আমি আপনাকে আল্লাহর সেই আযাব থেকে সতর্ক করছি, যা পাপীদের থেকে প্রত্যাহার করা হয় না। ইবনে হুবায়রা বলল ঃ হে শায়খ, ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না। আমীরুল মুমেনীন তো শাসক, জ্ঞানী ও গুণী। আল্লাহ তাআলা তাকে উম্মতের শাসক নিযুক্ত করেছেন কিছু বুঝেই এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ত দেখেই। অতএব তার সমালোচনা করবেন না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ হে ইবনে হুবায়রা, হিসাব তোমার মাথার উপরে এবং বেত্রের বদলে বেত্র। আল্লাহ তাআলা ওৎ পেতে আছেন। জেনে রাখ, যেব্যক্তি তোমাকে উপদেশ দেয় এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে, সে তার চেয়ে উত্তম, যে তোমাকে বিভ্রান্ত করে এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইবনে। হুবায়রা এ কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। শা'বী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরীকে বললাম, আপনি ইবনে হুবায়রাকে উত্তেজিত করে দিয়েছেন। ফলে তার কাছ থেকে যে দান পাওয়ার আশা ছিল, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমের শা'বী, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। এমন সর্বনাশা কথা বলো না। শা'বী বলেন ঃ এর পর হযরত হাসান বসরীর জন্যে উপঢৌকন এল। তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেল, কিন্তু আমি কিছুই পেলাম না। বাস্তবে তাঁর সাথে যে ব্যবহার করা হল, তিনি তারই উপযুক্ত ছিলেন এবং আমার সাথে যা করা হল, আমি তারই যোগ্য ছিলাম। আমি যত আলেম দেখেছি, হাসান বসরীর মত কাউকে দেখিনি। যখনই কোন সমাবেশে আমরা একত্রিত হয়েছি, তিনি আমাদের সকলের উপর বিজয়ী হয়েছেন। কারণ, তিনি আল্লাহর জন্যে কথা বলেছেন, আর আমরা শাসকদের মন তুষ্ট করার জন্যে বলেছি। আমি সেদিন থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন শাসকের কাছে তার পক্ষপাতিত্ব করার জন্যে যাব না।

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ আমার চাচা মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন– একবার আমি খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের দরবারে ছিলাম। সেখানে ইবনে আবী যীব এবং মদীনার গভর্নর হাসান ইবনে যায়দও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় গেফার গোত্রের লোকজন সেখানে আগমন করল। তারা খলীফার কাছে হাসান ইবনে যায়দের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করলে হাসান বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, ইবনে আবী যীবের কাছে জিজ্ঞেস করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আবী যীব বললেন ঃ এরা মানুষের মানহানি করে এবং মানুষকে খুব কষ্ট দেয়। খলীফা গেফারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা শুনলে তো তিনি কি বললেন? গেফারীরা বলল ঃ আপনি তার কাছে হাসান ইবনে যায়দের অবস্থাও জিজ্ঞেস করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি অন্যায় আদেশ দেন এবং স্বীয় খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন। খলীফা হাসানকে বললেন ঃ তুমি তো শুনলে তোমার সম্পর্কে কি রিপোর্ট হল। ইবনে আবী যীব সরল ও সাধু মানুষ। হাসান বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, তাঁকে আপনার নিজের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করেন? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। খলীফা বললেন ঃ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন ঃ আপনি কসম দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, যেন নিজের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। খলীফা পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি এই ধন-সম্পদ ন্যায়ভাবে গ্রহণ করেননি– অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এমন লোকদের জন্যে ব্যয় করেছেন, যারা এর যোগ্য ছিল না। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, যুলুম অবিচার আপনার দরজায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কথা শুনে খলীফা মনসুর আপন স্থান থেকে সরলেন এবং ইবনে আবী যীবের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন ঃ মনে রাখবেন, যদি আমি এখানে না বসতাম, তবে পারসিক, রোমীয় ও তুর্কীরা এ স্থান আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিত। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, হযরত ওমরও শাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং সমান বন্টন করেছেন। তারা পারস্য ও রোমের ঘাড়ে ধরে তাদের নাক মাটিতে ঘষে দিয়েছেন। মনসুর ইবনে আবী যীবের ঘাড় ছেড়ে দিলেন এবং এ কথা বলে বিদায় দিলেন– আপনি সত্য কথা বলেন,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এটা আমার জানা না থাকলে আমি অবশ্যই আপনাকে হত্যা করতাম। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আল্লাহর কসম হে আমীরুল মুমেনীন, আপনার পুত্র মাহ্দীর চেয়েও আমি আপনার অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী। ইবনে আবী যীব মনসুরের মজলিস থেকে বের হলে পর সুফিয়ান সওরীর সাথে সাক্ষাৎ হল। সুফিয়ান বললেন ঃ আপনি এই যালেমের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু কথাটি আমার কাছে খারাপ লেগেছে যে, আপনি তার পুত্রকে "মাহ্দী" (হেদায়াতপ্রাপ্ত) বলেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমি তাকে "হেদায়াতপ্রাপ্ত" অর্থে মাহদী বলিনি; বরং সকল মানুষ মাহদীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বিধায় মাহদী বলেছি।

আবদুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আমি সমুদ্রোপকূলে ছিলাম। খলীফা মনসুর লোক পাঠিয়ে আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এল। আমি দরবারে পৌঁছে খেলাফতের রীতি অনুযায়ী সালাম করলাম। খলীফা সালামের জওয়াব দিয়ে আমাকে বসতে বলল। আমি বসতেই সে বলল ঃ অনেক দিন হয় আপনি আমার কাছে আসেন না, এর কারণ কি? আমি বললাম ঃ আমার কাছে আপনার প্রয়োজন কি? সে বলল ঃ কিছু শিখতে চাই। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, তা হলে আমি যা বলব তা মনে রাখবেন– ভুলে যাবেন না। খলীফা বলল ঃ আমি নিজেই যখন জিজ্ঞেস করছি, তখন ভুলে যাব কেন? এ প্রয়োজনেই আমি আপনার কাছে লোক পাঠিয়েছি। আমি বললাম ঃ আমার আশংকা হয়, আপনি শুনবেন, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করবেন না। আমি একথা বলতেই রবী আমাকে হুশিয়ার করে দিল এবং তরবারির কবজায় হাত রাখল। খলীফা তাকে শাসিয়ে বলল ঃ এটা সওয়াবের মজলিস– শাস্তির মজলিস নয়। এতে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে গেল এবং কথা বলার জন্যে মনের কপাট খুলে গেল। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে এবং তিনি আতিয়্যা ইবনে বুসরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন– যে বান্দার কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ আসে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক নেয়ামত বৈ নয়। সে যদি সেটা কৃতজ্ঞতা সহকারে কবুল করে নেয়, তবে উত্তম। নতুবা সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে, যাতে এর কারণে তার গোনাহ্ বেশী হয় এবং আল্লাহ্ এর কারণে তার প্রতি বেশী নারাজ হন। আমীরুল মুমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে এবং তিনি আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– যে শাসক প্রজাদের অহিতকামী হয়ে মারা যাবে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আমীরুল মমেনীন, আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার সত্য। তিনি আপনার প্রজাদের অন্তর আপনার প্রতি নরম করে দিয়েছেন এবং আপনাকে শাসনক্ষমতা দান করেছেন। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে যিনি উম্মতের প্রতি অনুকম্পাশীল, দয়ালু, মনে প্রণে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আল্লাহ ও উম্মতের কাছে প্রসংসনীয় ছিলেন। অতএব আপনারও উচিত আল্লাহর ওয়াস্তে উম্মতের মধ্যে সত্য কায়েম করা, ন্যায়বিচার সহকারে থাকা, তাদের দোষ গোপন করা, ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শ্রবণ করা, তাদের জন্যে ফটক বন্ধ না করা, তাদের সুখে সুখী এবংর দুঃখে দুঃখী হওয়া। আমীরুল মুমেনীন, পূর্বে আপনার কেবল নিজের চিন্তা ছিল; এখন সকল মানুষের বোঝা আপনার কাঁধে। আরব ও আজম এবং কাফের ও মুসলিম আপনার করায়ত্ত। আপনার ন্যায়পরায়ণতায় তাদের প্রত্যেকের অংশ আছে। যখন তারা দলে দলে দাঁড়াবে এবং কেউ আপনার তরফ থেকে বিপদে ফেলার অভিযোগ করবে এবং কেউ কোন হক আত্মসাৎ করার অভিযোগ করবে, তখন আপনার কি অবস্থা হবে? হে আমীরুল মমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে শুনেছি তিনি ওরওয়া ইবনে রোয়ায়মের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে একটি খর্জূর শাখা ছিল, যদ্দ্বারা তিনি মেসওয়াক করতেন এবং মোনাফেকদেরকে সতর্ক করতেন। তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল আগমন করে আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! এই শাখা কিসের? এর দ্বারা আপনি আপনার উম্মতের মন ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি উম্মতের পিঠের চামড়া তুলে দেয়, তাদের রক্ত প্রবাহিত করে, তাদের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং তাদেরকে দেশান্তরিত করে দেয়, তার কি দশা হবে? হে আমীরুল মুমেনীন আমি মকহুল থেকে তিনি সিয়াদা থেকে, তিনি হারেসা থেকে এবং হারেসা হাবীব ইবনে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নিজের কাছ থেকে "কেসাস" (প্রতিশোধ) নিতে বললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাত দিয়ে অজ্ঞাতসারে জনৈক বেদুঈনের গায়ে বেত লেগেছিল। তৎক্ষণাৎ জিব্রাঈল তাঁর কাছে এসে আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যালেম ও অহংকারীরূপে পেরণ করেননি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেদুঈনকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। বেদুঈন বলল ঃ আমি আপনাকে ক্ষমা করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিয়েছি। আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমি এমন নই। আপনি যদি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতেন, তবু আমি 'কেসাস' নিতাম না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করলেন। হে আমীরুল মুমেনীন, নিজের উপকারের জন্যে অধ্যবসায় করুন এবং পরওয়ারদেগারের কাছে শাস্তি প্রার্থনা করুন। সেই জান্নাতে আগ্রহী হোন, যার প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান এবং যার শানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও জন্যে জান্নাত থেকে এক ধনুক পরিমাণে অর্জিত হওয়া পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম। হে আমীরুল মুমেনীন! যদি রাজত্ব আপনার পুর্ববর্তীদের জন্যে চিরস্থায়ী থাকত, তবে আপনি তা পেতেন না। এমনিভাবে আপনার কাছেও থাকবে না; যেমন অন্যদের কাছে থাকেনি। হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি জানেন, আপনার পিতামহ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ـ

এ কোরআনের কি হল, সগীরা-কবীরা কোন গোনাহ্ই গণনা না করে ছাড়ে না ?

কোরআনের এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে সগীরা অর্থ মুচকি হাসা এবং কবীরা অর্থ হাসা। অতএব যখন মুচকি হাসা ও পূর্ণ হাসা সগীরা এবং কবীরা গোনাহ্ সাব্যস্ত হল, তখন হাতের কাজ ও মুখের উক্তিসমূহের কি অবস্থা হবে? হে আমীরুল মুমেনীন! আমি শুনেছি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছেন– যদি কোন ছাগল ছানা ফোরাতের কিনারে অনাহারে মারা যায়, তবে আমি আশংকা করি এ সম্পর্কে না আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়। এখন বলুন, যারা আপনার বিছানায়ই থাকে এবং আপনার ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত থাকে, তার হিসাব আপনাকে দিতে হবে না কি? হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি জানেন আপনার পিতামহ নিম্নোক্ত আয়াতের কি তফসীর করেছেন?

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হে দাঊদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাহলে খেয়াল-খুশী তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।

তিনি বলেন– আল্লাহ্ তাআলা যবুর কিতাবে এরশাদ করেছেন, যখন বাদী ও বিবাদী তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তোমার মনে তাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একজনের প্রতি ঝোঁক থাকে তখন কখনও একথা চিন্তা করো না যে, হক সে-ই লাভ করুক এবং বিজয়ী সে-ই হোক । যদি এরূপ চিন্তা কর, তবে আমি তোমার নাম নবুওয়তের দফতর থেকে কেটে দেব। এর পর তুমি আমার খলীফাও থাকবে না এবং কোন মাহাত্ম্যও পাবে না । হে দাউদ, আমি আমার রসূলগণকে উটের রাখালের মত করেছি। রাখালরা পথঘাট সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে এবং শাসন নরমভাবে করে। মোটা উটকে বেঁধে রাখে এবং দুর্বল ও কৃশ উটের সামনে ঘাস পানি দেয়। হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি এমন দায়িত্বের সাথে জড়িত আছেন, যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সামনে তা পেশ করা হত, তবে তারা ভয়ে তা বহন করতে অস্বীকার করত। দেখুন, আমার কাছে এযীদ ইবনে জাবের ও তাঁর কাছে আবদুর রহমান ইবনে ওমর আনসারী বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জনৈক আনসারীকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেন। কয়েকদিন পর তিনি দেখলেন, সে কাজে যোগদান করেনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি তোমার কর্মস্থলে গেলে না কেন? তুমি কি জান না, তুমি আল্লাহর পথে জেহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে? সে বলল ঃ কি করব, সাহস পাই না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন? আনসারী বলল ঃ আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যেব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে ঘাড়ে হাতবাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। একমাত্র ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু তার হাত খুলতে পারবে না। এর পর তাকে জাহান্নামের পুলের উপর খাড়া করা হবে। পুল তাকে এমনভাবে নাড়া দেবে যে, তার গ্রন্থিসমূহ আপন স্থান থেকে সরে যাবে। এর পর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে এবং হিসাবে-নিকাশ করা হবে। যদি সৎকর্মী হয় তবে সৎকর্মের কারণে বেঁচে যাবে। আর কুকর্মী হলে পুল সেই স্থান থেকে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নামে সত্তর বছর দূরত্বে নীচে পতিত হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই হাদীস কার কাছে শুনেছ? সে বলল ঃ হযরত আবু যর ও সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর কাছে। তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁদের উভয়কে ডেকে আনলেন এবং হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে এ হাদীসটি শুনেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হায়, হায়, শাসনকার্যে এত অনিষ্ট থাকলে এ কাজ কে করবে? হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন ঃ সে-ই করবে, যার নাক আল্লাহ তা'আলা কেটে দেন এবং গণ্ড মাটিতে মিশিয়ে দেন। আওযায়ী বলেন ঃ এ পর্যন্ত শুনে মনসুর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুখে রুমাল দিয়ে এত কাঁদল যে, আমাকেও কাঁদিয়ে দিল । আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমেনীন, আপনার প্রপিতামহ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মক্কা, তায়েফ অথবা ইয়ামনের শাসনক্ষমতা চেয়েছিলেন। জওয়াবে তিনি এরশাদ করেছিলেন ঃ চাচাজান, যদি আপনি নিজেকে কষ্ট থেকে দূরে রাখেন, তবে এটা সেই রাজত্ব থেকে উত্তম যা আপনি বেষ্টন করতে পারবেন না। পিতৃব্যের হিতাকাঙ্ক্ষায়ই তিনি একথা বলছিলেন। হযরত আব্বাসকে তিনি আরও বলছিলেন– আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। যখন وَانْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আপনি আপনার নিকটআত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।) আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্বাস, সফিয়্যা ও ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। আমার কর্ম আমার জন্যে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে উপকারী হবে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ বুদ্ধিদীপ্ত সৎকর্মী ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। তার কোন দোষ যাহির না হওয়া চাই; আত্মীয়-তোষণ করবে বলে আশংকা না থাকা চাই এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারেও প্রভাবিত না হওয়া চাই। তিনি আরও বলেন ঃ শাসক চার প্রকার। (১) যে নিজেও পরিশ্রম করে এবং কর্মচারীদের কাছ থেকেও পরিশ্রম নেয়। সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর মত। তার উপর আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। (২) যে কিছুটা দুর্বল। নিজে পরিশ্রম করে, কিন্তু কর্মচারীরা অলসতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা রহমত না করলে সে ধ্বংসের মুখোমুখি! (৩) যে কর্মচারীদের কাছ থেকে পরিশ্রম নেয়; কিন্তু নিজে অলসতা করে। এরূপ শাসক একাই ধ্বংস হয়ে যায়। (৪) যে নিজেও অলসতা করে এবং কর্মচারীরাও তাই করে। এখানে সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হে আমীরুল মুমেনীন! আমি শুনেছি, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ আমি যখন আপনার কাছে আগমন করেছি, তখন কেয়ামতে প্রজ্বলিত করার জন্য ইন্ধন দোযখের অগ্নির উপর রেখে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে দোযখের অবস্থা বর্ণনা করুন । জিবরাঈল বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা দোযখ প্রজ্বলিত করার আদেশ দিলে হাজার বছর পর্যন্ত তা প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে দোযখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। এর পর আরও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে তা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এর পর আরও হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এখন দোযখ ঘোর কাল ও অন্ধকারময়। ফলে তার পুল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং অগ্নিশিখাও নির্বাপিত হয় না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, যদি দোযখীদের একটি বস্ত্রও পৃথিবীবাসীদেরকে দেখানো হয়, তবে সকলেই মারা যাবে এবং যদি দোযখের এক বালতি পানি পৃথিবীর সব পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে যে কেউ সেই পানি পান করবে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। কোরআনে উল্লিখিত দোযখের শিকলসমূহের মধ্য থেকে যদি একটি শিকল পৃথিবীর সকল পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয়, তবে সকল পাহাড় গলে তরল হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তিকে দোযখে দাখিল করার পর বের করে দুনিয়াতে আনা হয়, তবে তার দুর্গন্ধে, ভয়ে ও কুৎসিত চেহারা দেখে সকল মানুষ মারা যাবে। এ অবস্থা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং জিবরাঈলও তাঁর সাথে ক্রন্দন করলেন। এর পর জিবরাঈল আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ, আপনার তো আগে পরের সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে গেছে, আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার কান্না কৃতজ্ঞতার কান্না, কিন্তু আপনি তো বিশ্বস্ত আত্মা এবং আল্লাহ্ তাআলার ওহীর আমানতদার ফেরেশতা, আপনি কাঁদলেন কেন? জিবরাঈল আরজ করলেন ঃ আমি আশংকা করি, আমার অবস্থা কোথাও হারুত মারুতের মত না হয়ে যায়। তাই আমি আমার মর্যাদার উপর ভরসা পাই না। মোট কথা, তাঁদের অবিরাম ক্রন্দনে আকাশ থেকে ঘোষণা করা হল, হে জিবরাঈল, হে মুহাম্মদ, আমি তোমাদের উভয়কে এ বিষয় থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি যে, তোমরা আমার নাফরমানী করবে এবং আমি তোমাদেরকে আযাব দেব। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সকল পয়গম্বরের উপর এমন, যেমন জিবরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব সকল ফেরেশতার উপর। আমীরুল মুমেনীন! আমি আরও শুনেছি, হযরত ওমর (রাঃ) দোয়া করেছিলেন- ইলাহী! বাদী বিবাদীর মধ্য থেকে যে অন্যায় করে, সে আমার নিকটাত্মীয় হোক বা না হোক, যদি তুমি জান আমি তার পক্ষপাতিত্ব করি, তবে আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিয়ো না। আমীরুল মুমেনীন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক মাহাত্ম্য হচ্ছে তাকওয়া। যেব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে ইযযত ও সম্মান কামনা করে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা উঁচু করেন এবং সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাফরমানী করে সম্মান তলব করে, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ হচ্ছে আপনার প্রতি আমার উপদেশ, ওয়াসসালামু আলাইকুম। এর পর আমি প্রস্থানোদ্যত হলাম। মনসুর জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন অনুমতি দিলে দেশে বাল-বাচ্চাদের কাছে যাব ইনশাআল্লাহ্। মনসুর বলল ঃ আমি অনুমতি দিলাম। আমি আপনার উপদেশে ধন্য ও কৃতজ্ঞ। আমি এটা কবুল করলাম। আল্লাহ্ তাআলা তওফীক দিন ও সাহায্য করুন। আমি তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর উপরই ভরসা করি। আমি আশা করি আপনি আমাকে এরূপ নেক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার উক্তি মকবুল এবং উপদেশদানের সাথে আপনার কোন মতলব জড়িত থাকে না। আমি বললাম ঃ তাই করব ইনশাআল্লাহ্।

মুহাম্মদ ইবনে মুসইব বলেন ঃ মনসুর তাঁর জন্যে পাথেয় দেয়ার নির্দেশ দিল, কিন্তু আওযায়ী তাতে সম্মত হলেন না এবং বললেন ঃ এর প্রয়োজন নেই। আমি আমার উপদেশকে পার্থিব ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চাই না। এর পর মনসুর আর পীড়াপীড়ি করেনি।

ইবনে মুহাজির বলেন ঃ খলীফা মনসুর মক্কায় হজ্জ করতে এসে সরকারী বাসভবন থেকে শেষ রাত্রে তওয়াফ করতে বের হত এবং তওয়াফ ও নামায আদায় করত। কেউ তা জানতে পারত না। সকাল হলে সে বাসভবনে ফিরে আসত। তখন মুয়াযযিন এসে তাকে সালাম করত এবং সে মুসল্লীদের নামায পড়াত। এক রাতে সেহরীর সময় সে হরম শরীফে তওয়াফ করছিল, এমন সময় এক ব্যক্তিকে মুলতাযামের কাছে এ কথা বলতে শুনল ঃ ইলাহী, আমি তোমার দরবারে অভিযোগ করছি! পৃথিবীতে নাফরমানী ও ফাসাদ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যুলুম ও লালসা হক এবং হকদারদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে। মনসুর একথা শুনে কানখাড়া করে লোকটির মোনাজাত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করল। এর পর মসজিদের কাছে বসে লোকটিকে ডাকল। দূত যেয়ে বলল ঃ চল, আমীরুল মুমেনীন তোমাকে ডাকছে। লোকটি দু'রাকআত নামায পড়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে দূতের সাথে রওয়ানা হল। মনসুরকে সালাম করতেই সে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি যে বলেছ- পৃথিবীতে নাফরমানী ও ফাসাদ হচ্ছে এবং যুলুম ও লালসা হক এবং হকদারদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে- এর মানে কি? তোমার একথা শুনে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন! যদি আপনি আমাকে প্রাণের অভয় দেন, তবে আমি সব কথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মূল শিকড়সহ আপনাকে বলে দেব। নতুবা আমি নিজের ধান্ধায়ই ব্যাপৃত থাকব। মনসুর বলল ঃ তোমাকে প্রাণের অভয় দিলাম। লোকটি বলল ঃ সত্য বলতে কি, যেব্যক্তির মধ্যে এতটুকু লালসা এসে গেছে যে, সে হক ও হকদারের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে এবং নাফরমানী ও ফাসাদ নিবারণে প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে, সে ব্যক্তি স্বয়ং আপনি। মনসুর বলল ঃ হতভাগা, আমার মধ্যে এত লালসা কেন আসবে, অর্থসম্পদ, সোনাদানা এবং ক্ষমতা সবই তো আমার করতলগত। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, যে পরিমাণ লালসা আপনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেই পরিমাণ অন্য কারও মধ্যে প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ। দেখুন তো, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মুসলমানদের শাসক করেছিলেন, যাতে আপনি তাদের কাজ-কারবার ও ধন-সম্পদের হেফাযত করেন, কিন্তু আপনি তাদের কাজ-কারবার থেকে গাফেল হয়ে তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। নিজের মধ্যে ও তাদের মধ্যে ইট, চুনার প্রাচীর, লৌহ-দরজা এবং সশস্ত্র দারোয়ান খাড়া করেছেন। আপনি নিজেকে প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়েছেন, যাতে সাধারণ মুসলমান আপনার কাছে যেতে না পারে। সরকারী কর্মচারীদেরকে ধন-সম্পদ একত্রিত করা এবং খেরাজ আদায় করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপন উজির ও সহকারী যালেমদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি ভুলে গেলে তারা স্মরণ করিয়ে দেয় না, আর আপনি ভাল কাজ করতে চাইলে তারা সহযোগিতা করে না। আপনি তাদেরকে অর্থ-সম্পদ, যানবাহন ও অস্ত্র দিয়ে যুলুমের কাজে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া, যাদের নাম আপনি উজিরদেরকে বলে দিয়েছেন– অন্য কেউ যেন আপনার কাছে না আসে। কোন মজলুম, দুর্দশাগ্রস্ত ভুখা-নাঙ্গা মানুষ আপনার কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ করুক, আপনি এর অনুমতি দেননি। অথচ তাদের প্রত্যেকেরই সরকারী ধন-সম্পদে হক আছে। আপনি যেসকল পারিষদকে খাস মোসাহেব নিযুক্ত করেছেন এবং সাধারণ প্রজাকুলের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তারা যখন দেখল, রাজকোষ থেকে কতক সম্পদ আপনি নিজ ভোগ-বিলাসের জন্যে নিয়ে যান এবং তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন না, তখন তারা মনে মনে বলল, খলীফা আল্লাহর হকে খেয়ানত করে, আমরা খেয়ানত করব না কেন? তাই তারা পরস্পরে ঐকমত্য করে নিল যে, যারা প্রজাদের গোপন তথ্যাবলী জানে, তারা যেন খলীফার কাছে পৌঁছাতে না পারে কিংবা যেসকল কর্মচারী সৎপথে থাকতে চায়, তারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যেন আপন আপন পদে বহাল থাকতে না পারে। আপনার ও আপনার মোসাহেবদের এ সকল কীর্তিকলাপের কারণে সাধারণ মানুষ আপনার পারিষদবর্গকে ভয় করে। কর্মচারীরা তাদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করে তাদের সাথে ভাব করে নিয়েছে, যাতে তারা নির্বিচারে প্রজাদের উপর যুলুম করে যেতে পারে। এর পর অন্যান্য প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা আপনার পারিষদবর্গকে ঘুষ দিয়ে তাদের নিম্নস্তরের লোকদের উপর ইচ্ছামত যুলুম করার পারমিট হাসিল করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর শহরসমূহ অবাধ্যতা, যুলুম ও ফাসাদে পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার মোসাহেবরা আপনার অজ্ঞাতে ক্ষমতায় আপনার অংশীদার হয়ে গেছে। কোন বিচারপ্রার্থী বিচার লাভের আশায় আগমন করলে তারা তাকে আপনার কাছে যেতে দেয় না। আপনার সওয়ারী বের হওয়ার সময় তারা কোন আর্জি লেখে আপনার হাতে দিতে চাইলে তারা আপনার নিষেধাজ্ঞার কথা শুনতে পায়। আপনি এক ব্যক্তিকে মযলুমদের হক দেখাশুনা করার জন্যে নিযুক্ত করেছেন। মজলুমরা তার কাছে গেলে যদি মোসাহেবরা শুনতে পায়, তবে দেখাশুনাকারীকে বলে দেয় যে, তার আর্জি খলীফার কাছে পেশ করো না। ফলে দেখাশুনাকারী কর্মচারীটি মোসাহেবদের ভয়ে যা চায়, তা আপনার কাছে বলতে পারে না। মযলুম ব্যক্তি যখন চেষ্টা সত্ত্বেও যুলুমের প্রতিকার পায় না, তখন আপনার সওয়ারী বের হওয়ার সময় আপনার কাছে ফরিয়াদ পেশ করে। তখন তাকে এমন বেদম প্রহার করা হয় যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে থাকে না। আপনি তাকিয়ে থাকেন– না হাতে বাধা দেন, না মুখে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমানের কি করার থাকে? এর আগে উমাইয়া বংশের রাজত্ব ছিল। মজলুম তাদের মধ্যে পৌঁছলে অনতিবিলম্বে তার মোকদ্দমা পেশ করা হত এবং ইনসাফ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে শাহী দরজায় মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। চতুর্দিক থেকে তারা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি চাই! এর পর তারা তার মোকদ্দমা শাহী দরবারে পেশ করে ইনসাফ করিয়ে দিত। আমীরুল মুমেনীন, আমি এক সময় চীন দেশে সফর করতাম। একবার আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার রাজা বধির হয়ে গেছে। শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় সে অহরহ কান্নাকাটি করত। একদিন উযীররা তাকে এত কান্নাকাটি করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি বধির হয়ে গেছি। এতে আমার নিজের যে বিপদ হয়েছে, তার জন্যে আমি দুঃখ করি না। আমার দুঃখ এ জন্যে যে, মযলুমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করবে, কিন্তু আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পাব না। এর পর রাজা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলল ঃ আমি শ্রবণশক্তি হারিয়েছি, তাতে কি হয়েছে? আমার চক্ষু তো বিদ্যমান আছে। আজ থেকে রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও- কেউ লাল পোশাক পরিধান করতে পারবে না। একমাত্র যে মযলুম, সে-ই লাল পোশাক পরিধান করবে। আমি পোশাক দেখে ধরে নেব সে মযলুম। এর পর তার যুলুমের প্রতিকার করব। এর পর রাজা হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে সকাল-বিকাল ঘোরাফেরা করত, যাতে কোন মযলুম দৃষ্টিগোচর হলে তাকে ইনসাফ দেয়া যায়। আমীরুল মুমেনীন, চিন্তার বিষয়, চীনের রাজা মুশরিক হয়েও মুশরিক প্রজাকুলের প্রতি এতটুকু সদয় হতে পারলে আপনি তো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান রাখেন এবং আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্যের সন্তান, মুসলমান প্রজাকুলের জন্যে আপনার কতটুকু মেহেরবান হওয়া দরকার! এসব উপদেশ শুনে মনসুর হো হো করে কাঁদতে লাগল। এর পর জিজ্ঞেস করল ঃ যে রাজত্ব আমি লাভ করেছি, তা কিভাবে পরিচালনা করব? সকল মানুষই তো বিশ্বাসঘাতক দৃষ্টিগোচর হয়। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আপনি উঁচুস্তরের ইমাম ও মুরশিদ আলেমগণকে সঙ্গে রাখুন। খলীফা বলল ঃ তারা তো আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। লোকটি বলল ঃ তাদের সরে থাকার কারণ হচ্ছে, তারা আশংকা করে কোথাও আপনি তাদের দিয়ে সেই কাজ না করান, যে কাজ কর্মচারীদের দিয়ে করিয়ে থাকেন। বরং আপনি দরজা উন্মুক্ত করুন, দারোয়ান হ্রাস করুন, মযলুমের শোধ যালেমের কাছ থেকে নিন, যালেমকে যুলুম থেকে বিরত রাখুন, হালাল ও পবিত্র উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করুন এবং ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে বন্টন করুন। এর পর আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যারা এখন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, তারা আপনার কাছে আসবে এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে আপনাকে সাহায্য করবে। মনসুর বলল ঃ ইলাহী, এই লোকের কথামত কাজ করার তওফীক আমাকে দান কর। এমন সময় হরম শরীফের মুয়াযযিন এসে মনসুরকে সালাম করল। নামায পড়ানোর পর মনসুর শাহী দরবারের রক্ষীকে আদেশ দিল ঃ সেই লোকটিকে আমার দরবারে হাযির কর। যদি হাযির করতে না পার, তবে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। রক্ষী অমনি তার খোঁজে বের হল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখল, ঠিক সে ব্যক্তি একটি উপত্যকায় নামায পড়ছে। রক্ষী অপেক্ষা করতে লাগল। নামায শেষে সে লোকটিকে বলল ঃ মিয়া সাব, আপনি আল্লাহকে ভয় করেন? লোকটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলল ঃ হাঁ। রক্ষী বলল ঃ তাহলে আপনি আমার সাথে খলীফার কাছে চলুন। খলীফা কসম খেয়েছেন– আমি আপনাকে সাথে না নিয়ে গেলে তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন। লোকটি বলল ঃ এখন তো যাওয়ার কোন উপায় নেই। রক্ষী বলল ঃ তাহলে মনসুর আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবেন। লোকটি বলল ঃ না, মারবে না। অতঃপর সে একটি লিখিত বস্তু বের করে রক্ষীর হাতে দিয়ে বলল ঃ এটি নাও এবং তোমার পকেটে রেখে দাও। এতে প্রশস্ততার দোয়া লিখিত আছে! রক্ষী বলল ঃ প্রশস্ততার দোয়া কি? সে বলল ঃ এই দোয়া শহীদগণ ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা অন্য কাউকে দান করেন না। রক্ষী বর্ণনা করে, আমি লোকটিকে বললাম ঃ আপনি যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তখন আর একটি অনুগ্রহ করুন, দোয়াটি আমাকে বলে দিন এবং এর গুণাগুণ সম্পর্কেও জ্ঞাত করুন। লোকটি বলল ঃ যেব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করবে, তার গোনাহ বিলুপ্ত হবে, দুশমনের বিরুদ্ধে স্থায়ী সাহায্য পাবে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে "সিদ্দীক" লিখিত হবে এবং শহীদ হওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে মারা যাবে না। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ كَمَا لَطُفْتَ فِىْ عَظْمَتِكَ دُوْنَ اللُّطَفَاءِ وَعَلَوْتَ بِعَظْمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ اَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ وَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّدُوْرِ كَالْعَلَانِيَّةِ عِنْدَكَ وَعَلَانِيَّةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِىْ عِلْمِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَىْءٍ بِعَظْمَتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ ذِىْ سُلْطَانٍ سُلْطَانَكَ وَصَارَ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ كَلِمَةً بِيَدِكَ اجْعَلْ لِىْ مِنْ كُلِّ هَمٍّ اَمْسَيْتُ فِيْهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوْبِىْ وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيْئَتِىْ وَسَتْرَكَ عَلٰى قَبِيْحِ عَمَلِىْ اَطْمَعَنِىْ اَنْ اَسْئَلَكَ مَالَا اَسْتَوْجِبُهُ لِمَا قَصَّرْتُ فِيْهِ اَدْعُوْكَ اٰمِنًا وَاَسْئَلُكَ مُتَاَنِّسًا اِنَّكَ الْمُحْسِنُ لِىْ وَاَنَا الْمُسِىْءُ اِلٰى نَفْسِىْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ بِالنِّعَمِ وَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ بِالْمَعَاصِىْ وَلٰكِنَّ الثِّقَةَ بِكَ حَمَلَتْنِىْ عَلَى الْجُرْاَةِ عَلَيْكَ فَعُدْ بِفَضْلِكَ وَاِحْسَانِكَ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

'ইলাহী! আপনি আপন মাহাত্ম্যে সকল পবিত্রের চেয়ে পবিত্র এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপন মহত্ত্ব দ্বারা সকল মহানের উপর মহান। আপনি আপনার পৃথিবীর পাতালের বস্তু জানেন যেমন জানেন আপনার আরশের উপরকার বস্তু। অন্তরের গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ্য উক্তির ন্যায় এবং প্রকাশ্য ও গোপন কথা আপনার জানায় একই রূপ। আপনার মাহাত্ম্যের সামনে প্রত্যেক বস্তু অবনমিত এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী আপনার প্রতাপের সামনে হীন। দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারাদি সম্পূর্ণ আপনার করায়ত্ত। আমার জন্যে প্রশস্ততা ও নিষ্কৃতির পথ করে দিন প্রত্যেক শংকা থেকে, যাতে আমি লিপ্ত আছি। ইলাহী, আপনি আমার গোনাহ্ মাফ করেছেন, আমার ত্রুটি মার্জনা করেছেন এবং আমার মন্দ কাজ ঢেকে রেখেছেন— এগুলো আমাকে আশা দিয়েছে যে, আমি আপনার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা করি, যার যোগ্য আমি নই গোনাহের কারণে। আমি আপনার কাছে অবাধে দোয়া করি। নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আর আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায়কারী। অতএব আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে কি সম্পর্ক? আপনি নেয়ামত দিয়ে আমার বন্ধু হন, আর আমি গোনাহ্ করে আপনার শত্রু হই, কিন্তু আপনার উপর আমার ভরসা আমাকে সাহস প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছে। অতএব আপনি আমার প্রতি পূর্ববৎ কৃপা ও অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।'

রক্ষী বলে, আমি এই কাগজ পকেটে রেখে দিলাম। এর পর অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আমীরুল মুমেনীনের কাছে চলে এলাম। আমি সালাম করতেই তিনি মাথা তুলে আমার দিকে দেখলেন, অতঃপর মুচকি হেসে বললেন ঃ তুমি বোধ হয় খুব যাদু জান। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, যাদু কি, আমি জানি না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা কললাম ঃ খলীফা বললেন ঃ বুযুর্গ ব্যক্তি তোমাকে যে কাগজখণ্ড দিয়েছেন, তা আন। আমি কাগজটি তার হাতে দিলে তিনি তা দেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি বেঁচে গেলে। এর পর তিনি আমাকে দশ হাজার দেরহাম দেয়ার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ তুমি জান এই বুযুর্গ কে? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ইনি হযরত খিযির (আঃ)।

আবু এমরান জওফী বলেন ঃ হারুনুর রশীদ যখন খেলাফতের গদিতে বসলেন, তখন আলেমগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাকে মোবারকবাদ দেন। খলীফাও রাজকোষ উজাড় করে উপঢৌকন ও পুরস্কার দিতে শুরু করেন। হারুনুর রশীদ খেলাফত লাভের পূর্বে আলেম ও দরবেশগণের সাথে উঠাবসা করতেন এবং বাহ্যত সংসারের প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনাসক্তি ও ভগ্নদশার অধিকারী ছিলেন। হযরত সুফিয়ান সওরীর সাথে তার দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। খলীফা হওয়ার পর হযরত সুফিয়ান তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করেন। তিনি তাকে মোবারকবাদ দিতে আসেননি। হারুনুর রশীদ তাঁর সাথে একান্তে কিছু কথাবার্তা বলতে আগ্রহী হলেন, কিন্তু হযরত সুফিয়ান এলেন না। তিনি হারুনুর রশীদের বর্তমান পদমর্যাদারও পরওয়া করলেন না। বিষয়টি খলীফার জন্য পীড়াদায়ক ছিল। তাই তিনি হযরত সুফিয়ান সওরীর খেদমতে এই মর্মে একটি পত্র লেখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা হারুনুর রশীদ আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে তার ভাই সুফিয়ান সওরীর নামে-

হামদ, নাত ও সালাম পর সমাচার, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন এবং একে নিজের জন্যে ও নিজের সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। আমি আপনার সাথে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি, তার সম্পর্ক ছিন্ন করিনি এবং আপনার বন্ধুত্ব ভঙ্গ করিনি; বরং এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে উত্তম মহব্বত ও পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত আছে। যদি আল্লাহ্ তাআলা খেলাফতের গুরুভার আমার স্কন্ধে অর্পণ না করতেন, তবে আমি হামাগুড়ি দিয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হতাম। কেননা, আমার অন্তর আপনার মহব্বতে পরিপূর্ণ। আমার ও আপনার বন্ধুদের মধ্যে এমন কেউ বাকী নেই, যে আমাকে মোবারকবাদ দিতে আসেনি। আমিও রাজকোষ উন্মুক্ত করে এত পুরস্কার বিতরণ করেছি যে, আমার চক্ষু শীতল ও অন্তর প্রফুল্ল হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি তশরীফ আনতে বিলম্ব করছেন এবং এখন পর্যন্ত শুভাগমন করেননি। তাই আমি এ পত্রখানা পরম আগ্রহ সহকারে আপনার খেদমতে প্রেরণ করলাম। হে আবু আবদুল্লাহ্, আপনি জানেন, ঈমানদারের সাথে সাক্ষাতের কি পরিমাণ সওয়াব বর্ণিত আছে। যখন এই আগ্রহভরা পত্রটি আপনার হাতে পৌঁছবে, তখন কালবিলম্ব না করে আপনি এখানে পদার্পণ করুন।

চিঠি লেখা সমাপ্ত করে হারুনুর রশীদ উপস্থিত সভাসদদের দিকে তাকালেন। উদ্দেশ্য, এ পত্রটি কে সুফিয়ান সওরীর কাছে নিয়ে যাবে? কিন্তু সকলেই হযরত সুফিয়ান সওরীর গরম মেযাজ সম্পর্কে অবগত ছিল। তাই কেউ সাহস করল না। খলীফা বললেন ঃ দারোয়ানদের মধ্য থেকে একজনকে ডাক। সেমতে ওব্বাদ তালেকানী নামীয় এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল। খলীফা বললেন ঃ ওব্বাদ, আমার পত্রটি নিয়ে কুফায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাও। বস্তিতে প্রবেশ করে বনী সওর গোত্রের কথা জিজ্ঞেস করবে। এর পর সুফিয়ান সওরী সম্পর্কে জেনে নেবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমার এ পত্রটি তাঁর হাতে দেবে। খবরদার, তাঁর যা অবস্থা দেখবে, শুনবে, তা মনে প্রাণে স্মরণ রাখবে– বিন্দুমাত্রও বিস্মৃত হবে না। এর পর হুবহু তা আমার কাছে এসে বর্ণনা করবে। ওব্বাদ পত্র নিয়ে গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হয়ে গেল। কুফায় পৌছে বনী সওরের কথা জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে দিল। এর পর সুফিয়ান সওরীর হাল জিজ্ঞেস করলে কেউ বলল ঃ তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন। ওব্বাদ বর্ণনা করেন ঃ আমি মসজিদের পথ ধরলাম। আমি তাঁকে দেখতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে জানাশুনা বিতাড়িত শয়তান থেকে। ইলাহী, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সেই আগন্তুক থেকে, যে আমার কাছে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনভাবে আসে। তাঁর এসব কথার প্রভাবে আমি সংকীর্ণ হয়ে গেলাম। তিনি যখন আমাকে মসজিদের গেইটে সওয়ারী থেকে নামতে দেখলেন, তখন নামায পড়তে লাগলেন। অথচ তখন কোন নামাযের সময় ছিল না। আমি ঘোড়া বাইরে বেঁধে রেখে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তাঁর সহচররা মাথা নত করে বসে ছিল– তাঁরা যেন চোর; বাদশাহের শাস্তির ভয়ে তটস্থ। আমি সালাম করলে কেউ মাথা তুলে আমাকে দেখল না, অঙ্গুলির ইশারায় সালামের জওয়াব দিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ আমাকে বসতে বলল না। তাদের ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কম্পন দেখা দিল। আমি চিন্তা করলাম, ইনিই হবেন সুফিয়ান সওরী, যিনি নামায পড়ছেন। আমি পত্রটি তাঁর সম্মুখে নিক্ষেপ করলাম। তিনি পত্র দেখে কেঁপে উঠলেন এবং এমনভাবে আত্মরক্ষা করলেন, যেন সেজদার জায়গায় সর্প আবির্ভূত হয়েছে। অতঃপর তিনি নামায শেষ করে চোগার আস্তিনে হাত জড়িয়ে পত্রটি ধরলেন এবং পেছন দিকে সহচরদের কাছে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ এটি পড়ে নাও। আমি এমন বস্তুতে হাত লাগাতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই, যা যালেম স্পর্শ করেছে। এক ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে পত্রটি খুলল, যেন তাতে সর্প রয়েছে, যা দংশন করতে উদ্যত। সে পত্রটি আদ্যোপান্ত পাঠ করল। পত্র পাঠ সমাপ্ত হলে হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ যালেমের পত্রের অপর পৃষ্ঠায় জওয়াব লেখে দাও। সহচররা বলল ঃ হে আবু আবদুল্লাহ্, পত্র লেখক একজন খলীফা। তাই একটি পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট কাগজে জওয়াব লেখা সমীচীন। তিনি বললেন ঃ না, তার পত্রের অপর পিঠেই জওয়াব লেখ। সে এ কাগজটি হালাল উপায়ে অর্জন করে থাকলে এর সওয়াব পাবে, অন্যথায় শাস্তি ভোগ করবে। যালেম যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাগজ স্পর্শ করেছে, তা আমাদের কাছে থাকা উচিত নয়। থাকলে আমাদের ধর্ম বিনষ্ট করবে। সহচররা জিজ্ঞেস করল ঃ কি জওয়াব লেখব? তিনি বললেন ঃ লেখ,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বান্দা মুনীব সুফিয়ান ইবনে সায়ীদ সওরীর পক্ষ থেকে সেই বান্দার প্রতি, যে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত এবং ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত; অর্থাৎ, হারুনুর রশীদের প্রতি–

সালাম, হামদ ও নাতের পর সমাচার, আমি এ পত্র তোমাকে এ কথা জানানোর জন্যেই লেখছি যে, আমি তোমার মহব্বতের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি। এখন আমি তোমার দুশমন হয়ে গেছি। কেননা, তুমি নিজে স্বীকার করেছ, তুমি রাজকোষ উন্মুক্ত করে আমার মহব্বতে ব্যয় করে ফেলেছ। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী করেছ যে, তুমি মুসলমানদের ধন-সম্পদ অযথা ব্যয় করেছ। তুমি আপন কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকনি; বরং আমি দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে পত্র লেখেছ, যাতে তোমার বিরুদ্ধে আমি এবং আমার সহচররা, যারা এ পত্র পাঠ করেছে– সাক্ষী হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, আমরা কাল কেয়ামতে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে তোমার অন্যায় কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দেব। হে হারুন, তুমি মুসলমানদের রাজকোষ অযথা উজাড় করে দিয়েছ। অথচ এতে কোরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী সাত দল মানুষের হক ছিল। তোমার এ কাজে কোন্ দলটি সন্তুষ্ট হয়েছে? যাদের মন ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে দান করা হয়, তারা সন্তুষ্ট হয়েছে, না যাকাতের কর্মচারীরা, না আল্লাহর পথে জেহাদকারীরা, না মুসাফিররা, না কোরআন বাহক আলেম অথবা বিধবা মহিলা অথবা অনাথ শিশুরা সন্তুষ্ট হয়েছে? সুতরাং এখন জিজ্ঞাসাবাদের জওয়াব দেয়ার জন্যে তৎপর হও এবং নিজের বিপদ দূর করার চিন্তা কর। জেনে রেখ, তুমি অচিরেই ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং তোমাকে তোমার নিজের সম্পর্কে পাকড়াও করা হবে। কেননা, তুমি এলেম, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, কোরআন মজীদ ও পুণ্যবানদের কাছে বসার স্বাদ বিনষ্ট করে দিয়েছ এবং নিজের জন্যে যুলুম ও যালেমদের নেতা হওয়া পছন্দ করে নিয়েছ। হে হারুন, তুমি সিংহাসনে উপবেশন করেছ, রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছ এবং দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছ। এসব পর্দা দ্বারা তুমি বিশ্ব পালকের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছ। এর পর তোমার যালেম সিপাহীদেরকে দরজা ও পর্দার কাছে বসিয়ে দিয়েছ। তারা মানুষের উপর যুলুম করে– ইনসাফ করে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজেরা মদ্যপান করে এবং অন্য কেউ পান করলে তাকে বেদম প্রহার করে। নিজেরা যিনা করে এবং অন্য যিনাকারদের উপর "হদ" (যিনার শাস্তি) জারি করে। এমনিভাবে নিজেরা চুরি করে এবং অন্য চোরদের হস্ত কর্তন করে। শরীয়তের বিধি-বিধান যেন তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। হে হারুন, কাল কি হবে যখন একজন ঘোষক আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ একত্রিত কর যালেমদেরকে এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদেরকে। তোমাকে ঘাড়ের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার সামনে পেশ করা হবে। তোমার ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া অন্য কোন কিছু এই বন্ধন খুলতে না। অন্য যালেমরা তোমার চারপাশে থাকবে। তুমি সরদার ও নেতা হয়ে সকলকে দোযখে নিয়ে যাবে। হে হারুন, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে কেয়ামতে ঘাড়ে ধরে পেশ করার জায়গায় হাযির করা হয়েছে, আর তুমি তোমার পুণ্যসমূহ অপরের পাল্লায় দেখতে পাচ্ছ এবং নিজের গোনাহ্ ছাড়া অন্যদের গোনাহ্ও তোমার পাল্লায় দেখে যাচ্ছ। বিপদের পর বিপদ, অন্ধকারের উপর অন্ধকার। অতএব হে হারুন, আমার ওসিয়ত মনে রাখ। তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি তা পালন করে যাও। মনে রেখ, আমি তোমার শুভেচ্ছায় ও হিতোপদেশে কোন ত্রুটি বাকী রাখিনি। অতএব তুমি তোমার প্রজাকুলের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। উম্মতে মুহাম্মদীর ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের উপর খেলাফত উত্তমরূপে পরিচালনা কর। জেনে রাখ, যদি খেলাফত খলীফাদের কাছে স্থায়ী হত তবে তোমার কাছে পৌঁছত না। খেলাফত তোমার কাছ থেকেও চলে যাবে। এমনিভাবে দুনিয়া সকল মানুষকে একজন একজন করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ভাণ্ডার সংগ্রহ করে নেয়, যা তার জন্যে উপকারী এবং কেউ কেউ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার ধারণা, তুমিও তাদেরই একজন, যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত। খবরদার, এরপরে আমার কাছে কোন পত্র লেখবে না। আমিও কোন জওয়াব লেখব না। ওয়াস্সালাম।

ওব্বাদ বর্ণনা করে, এ পত্রটি লেখিয়ে ভাঁজ করা ও মোহর লাগানো ছাড়াই আমার দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। আমি পত্রটি নিয়ে কুফার বাজারে এলাম। হযরত সুফিয়ান সওরীর উপদেশ আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি বাজারে পৌঁছে উচ্চ স্বরে ডাক দিলাম ঃ হে কুফাবাসীগণ! উপস্থিত লোকেরা আমাকে বলল ঃ বলুন, কি বলতে চান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি বললাম ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে পলাতক ছিল। এখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আপনারা কেউ তাকে ক্রয় করবেন কি? লোকেরা আমার কাছে আশরফী এনে হাযির করল। আমি বললাম ঃ আমার আশরফীর প্রয়োজন নেই; বরং আমি একটি মোটা সূতী কোর্তা ও একটি পশমী কম্বল চাই। লোকেরা আমাকে তাই এনে দিল। আমি সেগুলো পরিধান করে নিলাম এবং খলীফার সামনে যে পোশাক পরতাম, তা খুলে ফেললাম। আমার সঙ্গে যে অস্ত্র ছিল, তা ঘোড়ার পিঠে রেখে ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। অবশেষে যখন খলীফা হারুনুর রশীদের দরজায় পৌঁছলাম, তখন লোকেরা আমাকে খালি পায়ে, পদব্রজে, অদ্ভুত পোশাক পরিহিত দেখে খুব ঠাট্টা-পরিহাস করল। অতঃপর আমি যখন খলীফার সম্মুখে গেলাম এবং তিনি আমাকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন কয়েকবার উঠাবসা করলেন, এর পর দাঁড়িয়ে অনুতাপ প্রকাশ করে বললেন ঃ আফসোস, দূত উপকৃত হয়েছে এবং প্রেরক বঞ্চিত হয়েছে। সংসার দিয়ে কি হবে? রাজত্ব আমার কি উপকারে আসবে? অপসৃয়মাণ ছায়ার মত দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সওরী আমাকে যেমন খোলা চিঠি দিয়েছিলেন, আমি তেমনি তা খলীফার হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি পাঠ করছিলেন আর ক্রন্দন করছিলেন। তার কান্নার আওয়াজ ক্রমশ উঁচু হচ্ছিল। খলীফার জনৈক সভাসদ বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, সুফিয়ান সওরীর ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনি যদি তার হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে দরবারে হাযির করান, তবে অন্যরা শিক্ষা পেয়ে যাবে। হারুনুর রশীদ বললেন ঃ হে দুনিয়ার বান্দারা, আমাকে এ কাজ থেকে মাফ কর। যে তোমাদের বিভ্রান্তিতে পড়ে, সে অত্যন্ত হতভাগা। তোমরা জান না সুফিয়ান সওরী অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি। তাঁকে বাধা দিয়ো না। এর পর সুফিয়ান সওরীর পত্রটি সব সময় খলীফা হারুনুর রশীদের পার্শ্বে থাকত। তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক নামাযের পর পত্রটি পাঠ করতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে মহরান বলেন ঃ হারুনুর রশীদ হজ্জ করার পর কুফায় এসে অবস্থান করেন। এর পর তার প্রস্থানের ডংকা বাজানো হয়। লোকজন এসে জড়ো হতে থাকলে বাহলুল পাগলও সেখানে এসে বসে গেল। এমন সময় খলীফা উটের পিঠে চাঁদোয়াযুক্ত হাওদায় বসে বের হলেন। বাহলুল উচ্চস্বরে ডেকে বলল ঃ ইয়া আমীরুল মুমেনীন! খলীফা মুখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে বললেন ঃ লাব্বায়াকা ইয়া বাহলুল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আতঃপর বাহলুল বলল ঃ আমি হাদীস শুনেছি আয়মন ইবনে তাবেল থেকে. তিসি কেদামত ইবনে আবদুল্লাহ আমেরী থেকে, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হজ্জে আরাফাত থেকে ফিরতে দেখেছি । তিনি উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। এ সময় না ছিল মারপিট, না ছিল ধাক্কাধাক্কি এবং না ছিল বাঁচো বাঁচো রব। আমীরুল মুমিনীন, এ সফরে আপনার জন্যে বিনয় প্রদর্শন করা উত্তম, অহংকার ও যুলুম করার তুলনায়। হারুন একথা শুনে ক্রন্দন করলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে বাহলুল, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আরও কিছু বল। বাহলুল বলল ঃ উত্তম হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ ও দৈহিক শ্রী দান করেন, অতঃপর সে ধনসম্পদ খয়রাত করে, দৈহিক সৌন্দর্যে সংযমী থাকে, তাকে আল্লাহর বিশেষ তালিকায় পুণ্যবানদের সাথে লেখে নেয়া হয়। খলীফা বললেন ঃ বাহলুল, তুমি চমৎকার বলেছ! অতঃপর তাকে কিছু পুরস্কার দিলেন। বাহলুল বলল ঃ এটা যার কাছ থেকে নিয়েছেন তাকে ফেরত দিন। আমার এর প্রয়োজন নেই। খলীফা বললেন ঃ তোমার কোন ঋণ থাকলে তা আমি শোধ করে দেই? বাহলুল বলল ঃ কুফার সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ করা ঠিক নয়। খলীফা বললেন ঃ আমি তোমার জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারণ করে দেই, যাতে তোমার অন্নচিন্তা না থাকে। বাহলুল আকাশের দিকে মাথা তুলে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আমি এবং আপনি উভয়ই আল্লাহ তাআলার পরিবার। এটা অসম্ভব যে, তিনি আপনাকে স্মরণে রাখবেন আর আমাকে ভুলে যাবেন। এর পর খলীফা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

আহমদ ইবনে ইবরাহীম মুকরী বলেন ঃ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আবুল হাসান সওরী (রঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোন অস্বীকার্য বিষয় থাকলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তা বিনষ্ট করে দিতেন। একদিন তিনি 'মাশারায়ে মাখামীন' নামক নদীতে অযু করছিলেন, এমন সময় একটি নৌকা দেখতে পেলেন, যার মধ্যে ত্রিশটি মট্‌কা রয়েছে। প্রত্যেকটি মটকার গায়ে 'লুত্‌ফ' শব্দটি লেখা ছিল। তিনি এর অর্থ বুঝতে পারলেন না। কেননা পণ্য ও পারিবারিক ব্যবহারের কোন বস্তুর নাম লুত্‌ফ ছিল বলে তাঁর জানা ছিল না। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এসব মটকার মধ্যে কি আছে? মাঝি বলল ঃ আপনার এতে প্রয়োজন কি? আপনি নিজের কাজ নিজে করে যান। একথা শুনে হযরত সওরীর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আমি চাই এগুলোতে কি আছে তা আমাকে বলে দাও।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাঝি বলল ঃ আপনি তো সুফী মানুষ, একথা শুনে আপনার লাভ কি? এগুলো খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহর শরাব। তিনি বললেন ঃ শরাব! মাঝি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ ঐ যে মুদগরটি দেখা যাচ্ছে, এটি আমার হাতে দাও। এতে মাঝি রাগ করে তার গোলামকে বলল ঃ দাও দেখি মুদগরটি তার হাতে। দেখা যাক কি করে। মুদগর হাতে পেয়েই তিনি নৌকায় সওয়ার হয়ে একটি একটি করে মট্‌কা ভেঙ্গে চুরমার করতে লাগলেন। অবশেষে একটি মট্‌কা রেখে তিনি সবগুলো ভেঙ্গে দিলেন। মাঝির ফরিয়াদে তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসক ইউনুস ইবনে আফলাহ্ তাড়াতাড়ি এসে সওরীকে গ্রেফতার করে খলীফা মুতাযিদের দরবারে পাঠিয়ে দিল। খলীফা মুতাযিদের তরবারি প্রথমে চলত, মুখ পরে ফুটত। তাই সকলেরই বিশ্বাস ছিল, খলীফা তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। আবুল হাসান সওরী বলেন ঃ আমাকে যখন খলীফার সামনে নেয়া হয়, তখন সে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল এবং তার হাতে ছিল একটি বেত্রদন্ড। আমাকে দেখেই সে বলল ঃ তুমি কে? আমি বললাম ঃ আমি একজন সৎ এবং অসৎ কাজে আদেশ ও নিষেধকারী। সে বলল ঃ তোমাকে এ পদ কে দান করল? আমি বললাম ঃ যে আপনাকে খেলাফতের পদ দান করেছে। খলীফা কিছুক্ষণ মাথা নত করে রাখল, এর পর মাথা তুলে বলল ঃ তুমি এ কান্ড করলে কেন? আমি বললাম ঃ আমি আপনার অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ভাবলাম, আপনার যে অনিষ্ট আমি দূর করতে পারি, তা দূর করতে ক্রুটি করব কেন? এর পর খলীফা মাথা নত করে আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে লাগল। এর পর মাথা উঁচু করে বলল ঃ সকল মটকার মধ্য থেকে একটি মটকা কিরূপে বেঁচে গেল? আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন অনুমতি দিলে আমি এর কারণ বর্ণনা করব! খলীফা বলল ঃ বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন! আমি যখন মটকার দিকে ধাবিত হই, তখন আমার অন্তর আল্লাহ তাআলার প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল এবং আল্লাহর দাবীর ভয়ে মন আচ্ছন্ন ছিল। তাই আমি এগুলো ভেঙ্গে দেয়ার দুঃসাহস করতে পেরেছি। মানুষের ভয়ভীতি আমার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না। সবগুলো মটকা ভাঙ্গার সময় আমার মধ্যে এ অবস্থাটি ছিল, কিন্তু শেষ মটকাটির কাছে পৌঁছার সময় আমার মধ্যে খলীফার মটকাসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার একটি অহংকার আস্ফালন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তখনই আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। যদি এ সময়ও আমার মধ্যে পূর্ববৎ উদ্দীপনা অব্যাহত থাকত, তবে এ মটকা কেন, সমগ্র পৃথিবী মটকায় পরিপূর্ণ থাকলেও আমি একের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পর এক ভেঙ্গে চলে যেতাম– কোন কিছুরই পরওয়া করতাম না। খলীফা বলল ঃ যাও, আমি তোমাকে অবাধ ক্ষমতা দিলাম, যে কোন অস্বীকার্য বিষয় ইচ্ছা কর বিনষ্ট করে দাও। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন! এখন আপনার আদেশ শুনে বিনষ্ট করা আমি ভাল মনে করি না। কেননা, পূর্বে আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিনষ্ট করতাম। এখন আপনার আদেশের অধীনে বিনষ্ট করা হবে। খলীফা বলল ঃ তোমার মতলব কি? আমীরুল মুমেনীন! আমি চাই আপনি আমাকে সহীহ-সালামতে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ করুন। সেমতে খলীফা তাই করল। এর পর শায়খ আবুল হাসান সওরী বসরায় চলে এলেন। আবার কোন কারণে খলীফার সামনে যেতে হয়– এই ভয়ে তিনি অধিকাংশ সময় বসরাতেই অতিবাহিত করেন। মুতাযিদের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে যান।

সারকথা, আলেমগণ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে শাসকবর্গের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের পরওয়া কমই করতেন। বরং তারা আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা করতেন। যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাহাদত দান করতেন, তবে তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যেহেতু তারা খাঁটি ও অকৃত্রিম নিয়তে এ কর্তব্য সম্পাদন করতেন, তাই তাদের বাণীর প্রভাবে কঠোরতর অন্তরও মোমের মত গলে নরম হয়ে যেত। এখন তো লোভ-লালসা আলেমদের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এখন তারা কিছুই বলে না। যদি বা বলে, তাতে কোন উপকার হয় না। কেননা, মুখের কথা তাঁদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয় না। তারা সাচ্চা হলে অবশ্যই সফলকাম হত! কেননা, প্রজাকুল খারাপ হওয়ার মূলে রয়েছে শাসকবর্গ খারাপ হওয়া। আর শাসকবর্গের দোষত্রুটির মূলে রয়েছে আলেমদের দোষত্রুটি। অর্থ ও খ্যাতির মহব্বত আলেমদেরকে পথভ্রান্ত করে দিয়েছে। যেব্যক্তির মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হবে, সে নীচ হীন লোকদেরকেও আদেশ-নিষেধ করতে সক্ষম হবে না– শাসক ও বড়লোকদেরকে তো দূরের কথা। আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দশম অধ্যায়

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্ত, যাঁর মহিমা অনুধাবনে হৃদয় ও মন হতবুদ্ধি এবং নূরের কিঞ্চিৎ দ্যুতির কারণে চক্ষু ও দৃষ্টি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি গোপন রহস্যাবলী এবং অন্তরে লুক্কায়িত ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাঁর রাজত্ব পরিচালনায় উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। দোষ গোপন করা এবং হৃদয় পরিবর্তন করা তাঁর কাজ এবং 'গাফফারুয্ যুনুব' (গোনাহ মার্জনাকারী) ও 'সাত্তারুল উয়ুব' (দোষ গোপনকারী) তাঁর নাম। দুরূদ ও সালাম হযরত শাফীউল মুয্নিবীন সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি, যিনি ধর্মের শৃঙ্খলা বিধান করেছেন এবং ধর্মদ্রোহীদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছেন। তাঁর পবিত্র বংশধর ও পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অসংখ্য সালাম।

প্রকাশ থাকে যে, যে মর্যাদা ও উৎকর্ষের কারণে মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা বলে পরিচিত, তা হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের মারেফেতের যোগ্যতা। এ মারেফতই ইহকালে মানুষের সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা এবং পরকালে তার সম্পদ ও সরঞ্জাম। মারেফতের যে যোগ্যতা অন্তরকে দান করা হয়েছে, তা অন্য কোন অঙ্গকে দান করা হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা, তাঁকে চেনা, তাঁর জন্যে কাজ করা এবং তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া– এগুলো অন্তরেরই কাজ। হাযিরযোগ্য বস্তুসমূহের কাশ্‌ফও অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর হাতিয়ার, অনুগামী ও খেদমতগার মাত্র। অন্তর এগুলোকে এমনভাবে কাজে লাগায়, যেমন মালিক গোলামকে এবং শাসক শাসিতকে কাজে লাগায়। মোট কথা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত থাকলে অন্তরই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে অন্যের প্রতি অধিক নিবিষ্ট হলে এ অন্তর আল্লাহ্ তাআলা থেকে আড়াল হয়ে যায়। অন্তরের সাথেই হিসাব-নিকাশের সম্পর্ক এবং অন্তরকে সম্বোধন করেই আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছতা ও আত্মশুদ্ধি নসীব হয়ে গেলে অন্তর সাফল্য লাভ করে এবং অপবিত্রতা ময়লার মধ্যে পড়ে থাকলে অন্তর দুর্ভাগ্য ও নৈরাশ্যের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সারকথা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য অন্তরই করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেবল এবাদতের কারণে নূর ছড়িয়ে পড়ে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পক্ষান্তরে গোনাহ এবং অবাধ্যতাও অন্তরেরই কাজ। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাপ কর্মের চিহ্ন ফুটে উঠে। অন্তরের আলো ও তমসা থেকেই বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং অপকৃষ্টতা প্রকাশ পায়। কেননা, পাত্র থেকে তাই টপকে পড়ে, যা তার মধ্যে থাকে। মানুষ যখন তার অন্তরকে জেনে নেয়, তখন সে নিজের সম্পর্কে জ্ঞানী হয়ে যায়। নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপরই আল্লাহ তাআলার মারেফত ভিত্তিশীল। অন্তর সম্পর্কে অজ্ঞান হলে মানুষ নিজের সম্পর্কে অজ্ঞান থেকে যায়। ফলে, সে আল্লাহ তাআলাকেও চিনতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ তাদের অন্তর সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহ তাদের ও তাদের অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে আড়াল হয়ে যান। আল্লাহ তাআলার আড়াল হওয়ার অর্থ, তিনি অন্তরকে "মুশাহাদা" (প্রত্যক্ষকরণ) "মুরাকাবা" (ধ্যানমগ্নতা) ও অন্তর্গত গুণাবলী অনুধাবন করতে দেন না। তিনি এটা জানতে দেন না যে, অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যে কিভাবে ঘুরাফেরা করে, কিভাবে সে মাঝে মাঝে সর্বনিম্ন স্তরের দিকে ঝুঁকে পড়ে শয়তান হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে ধাবমান হয়ে নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণের স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। যেব্যক্তি ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী অর্জনের আশায় আপন অন্তরের অবস্থা জানার চেষ্টা করে না, সে তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই পাপাচারী।'

অতএব বুঝা গেল, অন্তরকে চেনা এবং তার গুণাবলীর স্বরূপ উদঘাটন করা আসল ধর্ম এবং আধ্যাত্ম পথের বুনিয়াদ। আমরা এ গ্রন্থের প্রথমার্ধে বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কিত এবাদত ও লেনদেনের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছি, যাকে "এলমে যাহের" বলা হয়। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তর ধ্বংসকারী ও উদ্ধারকারী অবস্থাসমূহ বর্ণনা করার ওয়াদা করেছিলাম। অন্তরের এ সকল অবস্থা জানার নাম "এলমে বাতেন।" উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষণে এলমে বাতেন শুরু করার পূর্বে দুটি পরিচ্ছেদ লেখা জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে অন্তরের আশ্চর্যজনক গুণাবলী ও চরিত্র বর্ণিত হবে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা ও তার চরিত্র শুদ্ধির উপায় বিবৃত হবে। এখন আমরা অন্তরের রহস্যাবলী চলতি বর্ণনাভঙ্গিতে উল্লেখ করছি, যাতে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা অন্তরের উর্ধ্বজগত সম্পর্কিত আশ্চর্য অবস্থাসমূহ প্রায়শ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরের রহস্যাবলী

প্রকাশ থাকে যে, নফস, রূহ, কলব ও আকল- ধ্বংসকারী ও উদ্ধারকারী বিষয়সমূহের আলোচনায় ব্যবহৃত এই শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থের বিভিন্নতা ও এদের প্রতীক সম্পর্কে কম আলেমই অবগত আছেন। এদের অর্থ না জানা এবং বিভিন্ন ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবস্থা না জানার কারণেই অধিকাংশ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই আমরা এসব শব্দের সেই অর্থ বর্ণনা করব, যার সাথে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত।

প্রথম শব্দ 'কলব', এর অর্থ দু'টি। এক, বক্ষস্থলের বাম দিকে অবস্থিত লম্বা ত্রিকোণ মাংসপিন্ড। এর মাঝখানে শূন্যগর্ভতা আছে, যাতে কাল রক্ত থাকে। এটাই রূহের উৎস ও আকর, কিন্তু এর আকার-আকৃতি বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এটা ডাক্তারদের কাজ। এ ধরনের কলব তথা হৃদয় চতুষ্পদ জন্তু এমনকি মৃতদের মধ্যেও থাকে। কলবের দ্বিতীয় অর্থ, এটি একটি আধ্যাত্মিক লতীফা (সূক্ষ্ম বিষয়), উপরোক্ত শারীরিক কলবের সাথে এই লতীফার সম্পর্ক আছে। এ লতীফাটিই মানুষের স্বরূপ, বোধশক্তির আওতাভুক্ত, আলেম, সম্বোধিত ও তিরস্কৃত। হিসাব-নিকাশের সম্পর্কও এর সাথেই। শারীরিক কলবের সাথে এই লতীফার যে সম্পর্ক, তা অনুধাবন করতে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ঘুরপাক খেয়ে যায়। কেননা, শারীরিক কলবের সাথে এর সম্পর্ক গুণীর সাথে গুণাবলীর সম্পর্কের মত, অথবা যন্ত্রপাতির সাথে কারিগরের সম্পর্কের মত, অথবা গৃহের সাথে গৃহবাসীর সম্পর্কের মত। আমরা দু'কারণে এই লতীফার স্বরূপ বর্ণনা করছি না। প্রথম, এ বিষয়টি "উলুমে মুকাশাফা" তথা অদৃশ্য রহস্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা আমাদের এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়, এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান রূহের ভেদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। অথচ এ ভেদ সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) কিছুই বলেননি। সুতরাং অন্যদেরও এসম্পর্কে মুখ খোলা অনুচিত। এ গ্রন্থে আমরা কেবল এ লতীফার গুণাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করব। কেননা, এলমে মোয়ামালা এর উপরই ভিত্তিশীল। এতে স্বরূপ বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় শব্দ রূহের ও দু' অর্থ। প্রথম, রূহ্ একটি সূক্ষ্ম দেহ, যার উৎস শারীরিক কলবের শূন্যগর্ভ। এই শূন্যগর্ভ থেকে এটা রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে এই রূহের ছড়িয়ে পড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জীবন ও পঞ্চইন্দ্রিয় দান করা এমন, যেমন কোন গ্রহে একটি প্রদীপ রেখে দেয়া হলে তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানেই এই আলো পৌঁছে, সে স্থানই উজালা হয়ে যায়। সুতরাং রূহ্ প্রদীপসদৃশ এবং জীবন আলোসদৃশ। রূহের এই অর্থ হচ্ছে চিকিৎসাবিদগণের পরিভাষা। এ অর্থ বর্ণনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। রূহের দ্বিতীয় অর্থ, রূহ মানুষের মধ্যে একটি বোধশক্তিসম্পন্ন লতীফা। কলবের দ্বিতীয় অর্থে আমরা যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি, এখানেও সেই ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত আয়াতে রূহের এই অর্থই বুঝানো হয়েছে ঃ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي –বলে দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

রূহের এই দ্বিতীয় অর্থই অত্র গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় শব্দ হচ্ছে নফ্স। এটি একাধিক অর্থে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দু'টি অর্থ আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে। প্রথম, মানুষের নফ্স এমন একটি বস্তু, যা ক্রোধশক্তি ও কামশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুফীগণের মধ্যে এই অর্থ অধিক প্রচলিত। তাদের মতে নফসের মধ্যেই মানুষের নিন্দনীয় গুণাবলী একত্রিত আছে। এ কারণেই তারা বলেন, নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা এবং নফ্সকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া উচিত। হাদীসে এই নফস সম্পর্কেই বলা হয়েছে– সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তোমার নফ্স, যা তোমার পার্শ্বে রয়েছে। নফসের দ্বিতীয় অর্থ, নফ্স একটি খোদায়ী লতীফা, যা অবস্থাভেদে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়। বাস্তবে এটাই মানুষ। মানুষ যখন কামনাকে প্রতিরোধ করে, তখন এই নফসের চাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং আনুগত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন একে "নফ্সে মুতমায়িন্নাহ্" (প্রশান্ত চিত্ত) বলা হয়। যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً.

–হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

কেননা, নফসের প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তার আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে আসা কল্পনা করা যায় না। বরং সে আল্লাহ তাআলার কাছ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে দূরে চলে যায় এবং শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যায়। আর যদি আনুগত্যের উপর নফসের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ না হয়, কিন্তু কামনা-বাসনা প্রতিরোধ করতে থাকে, তবে তাকে বলা হয় "নফ্‌সে লাওয়ামা" (তিরস্কারকারী নফস)। কেননা, সে তার মালিককে আল্লাহর এবাদতে ত্রুটি করতে দেখে তিরস্কার করে। কোরআন পাকে এ নফসেরও উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ঃ

لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ –কসম তিরস্কারকারী নফসের।

আর যদি নফস কামনা-বাসনার প্রতিরোধ না করে; বরং কামপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয়, "নফ্‌সে আম্মারা বিস্‌সূ" অর্থাৎ, জোরেজবরে কুকর্মের আদেশকারী নফস। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইউসুফ (আঃ) অথবা আযীযে মিসরের পত্নীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ –আমি আমার নফসকে নির্দোষ বলি না। কেননা, নফ্‌স জোরেশোরে কুকর্মের আদেশ করে।

চতুর্থ শব্দ "আকল"। এটাও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দুটি অর্থের সাথে আমাদের উদ্দেশ্য জড়িত। প্রথম, কখনও এর অর্থ নেয়া হবে একটি শিক্ষামূলক গুণ, যার স্থান কলব। দ্বিতীয় অর্থ, কখনও আকলের অর্থ নেয়া হয় শিক্ষার বোধশক্তি। এমতাবস্থায় আকলও উল্লিখিত লতীফা হবে।

সুতরাং আকল বলে কখনও শিক্ষাগুণ এবং কখনও শিক্ষাগুণের পাত্র বুঝানো হয়। নিম্নোক্ত হাদীসে দ্বিতীয় অর্থই বুঝানো হয়েছে ঃ اول ما خلق الله العقل –আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন। কেননা, শিক্ষাগুণ তো আপনা-আপনি বিদ্যমান হতে পারে না। তার বিদ্যমান হওয়ার জন্যে পাত্র দরকার। সুতরাং এই পাত্র তার পূর্বে অথবা তার সাথে সাথে সৃষ্ট হওয়া জরুরী। নতুবা তাকে সম্বোধন করা হবে না। এ হাদীসেই আছে, আল্লাহ্ তাআলা আকলকে বললেন ঃ সামনে এসো। সে সামনে এলো। আবার বললেন ঃ পিঠ ফিরিয়ে নাও। সে পিঠ ফিরিয়ে নিল।

এখন জানা উচিত, ১। কলব, ২। নফস, ৩। রূহ্ ও ৪। আকল –এই চারটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, শারীরিক কলব, শারীরিক রূহ, কাম-নফস ও জ্ঞান। একটি পঞ্চম অর্থ আছে, যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই চারটি শব্দেরই অভিন্ন অর্থ; অর্থাৎ মানবীয় বোধশক্তির লতীফা। সুতরাং শব্দ হল চারটি এবং অর্থ পাঁচটি। পঞ্চম অর্থটি প্রত্যেক শব্দের অভিন্ন অর্থ বিধায় প্রত্যেক শব্দের অর্থ দু'টি। কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে ব্যবহৃত কলবের অর্থ সেই লতীফা, যদ্দ্বারা মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ অবগত হয়। রূপকভাবে এর দ্বারা মানুষের বক্ষস্থিত কলবও বুঝানো হয়। কেননা, এই লতীফা ও শারীরিক কলবের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। শারীরিক কলবের মধ্যস্থতায়ই এই কলব মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে নিয়োজিত করে। শারীরিক কলব যেন এই লতীফার পাত্র ও বাহন। এ কারণেই সহল তস্তরী বলেন ঃ কলব হচ্ছে আরশ এবং বক্ষ কুরসী। অর্থাৎ শারীরিক কলব ও বক্ষ হচ্ছে লতীফার রাজধানী, যেখান থেকে লতীফার কার্যক্রম শুরু হয়।

কলব তথা অন্তরের লশকর

প্রকাশ থাকে যে, অন্তর, রূহ ও অন্যান্য জগতে আল্লাহ্ তাআলার লশকর এত বেশী যে, এগুলোর স্বরূপ ও গণনা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ –আপনার পালনকর্তার লশকর তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

এখন আমরা অন্তরস্ত আল্লাহ্ তাআলার কয়েকটি লশকর সম্পর্কে বর্ণনা করছি। কেননা, আমাদের আলোচনা অন্তর সম্পর্কেই।

অন্তরের দুটি লশকর। এক, যা চর্মচক্ষে দেখা যায় এবং দুই, যা অন্তশ্চক্ষে অনুধাবন করা যায়। এই উভয় প্রকার লশকর অন্তরের জন্যে খাদেম ও সাহায্যকারী। যে লশকর চোখে দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে হাত, পা, জিহ্বা, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা এবং অন্যান্য সকল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অন্তর এগুলোকে যেভাবে চায় কাজে লাগায়। অন্তরের আনুগত্য করার জন্যেই এগুলো সৃজিত হয়েছে। অন্তরের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা এদের নেই এবং এরা অন্তরের বৈরীও হতে পারে না। উদাহরণত, অন্তর যখন চক্ষুকে খোলার আদেশ দেয়, তখন সে খুলে যায়। থাকে চলার আদেশ করলে সে চলতে থাকে। জিহ্বাকে বলার আদেশ করলে সে বলতে থাকে। অন্য সকল অঙ্গের অবস্থাও তথৈবচ। অন্তরের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের আনুগত্য এমন, যেমন আল্লাহ্ তাআলার জন্যে ফেরেশতাদের আনুগত্য। কারণ, ফেরেশতাগণও আনুগত্যের জন্যেই সৃজিত। তারা আনুগত্যের খেলাফ করার ক্ষমতা রাখে না। কোরআনের ভাষায় তাদের অবস্থা এই ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ –তারা আল্লাহ্র আদেশের নাফরমানী করে না এবং তাই করে, যা করার আদেশ হয়।

তবে পার্থক্য হচ্ছে, ফেরেশতারা আপন আনুগত্য ও খোদায়ী আদেশ পালনের বিষয় অবগত থাকে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্য দূরের কথা, আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবগত নয়। বলাবাহুল্য, অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি সফরের জন্যে। সেই সফর হচ্ছে খোদায়ী মারেফত এবং খোদায়ী দীদারের মনযিল অতিক্রম করার সফর।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ –আমি জ্বিন ও মানবকে কেবল আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।

অন্তরের এই সফরের জন্যে সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। তাই অন্তরকে সওয়ারী, পাথেয় ইত্যাদি দান করা হয়েছে। দেহ হচ্ছে অন্তরের সওয়ারী এবং পাথেয় জ্ঞান ও শিক্ষা। দুনিয়াতে বসবাস করা ছাড়া আল্লাহ্র পথে চলা বান্দার জন্যে সম্ভবপর নয়। কেননা, বড় মনযিলে পৌছার জন্যে ছোট মনযিল অতিক্রম করা জরুরী। তাই দুনিয়াকে পরকালের শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে। অন্তরকে ইহজগতে অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। দেহরূপী সওয়ারীর সাহায্যে সে ইহজগতে পৌছে যায়। সুতরাং দেহের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক। হেফাযত হচ্ছে দেহকে অনুকূল খাদ্য সরবরাহ করা এবং ধ্বংসের কারণাদি দূর করা। এদিক দিয়ে খাদ্য হাসিল করার জন্যে দুটি খাদেমের প্রয়োজন দেখা দিল। একটি বাতেনী, যার নাম ক্ষুধা ও মনের স্পৃহা এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, হাত ইত্যাদি, যদ্দ্বারা খাদ্য অর্জিত হয়। এছাড়া ধ্বংসের কারণ থেকে বাঁচার জন্যে দুটি লশকরের প্রয়োজন দেখা দিল। একটি বতেনী, যাকে ক্রোধ বলা হয়। যার কারণে শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হয় এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, হাত, পা ইত্যাদি। দেহে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন হাতিয়ারের মত কাজ করে। এখন যেব্যক্তি খাদ্যের মুখাপেক্ষী, সে যদি খাদ্যের অবস্থা না জানে, তবে কেবল খাদ্যের স্পৃহা ও ক্ষুধায় কাজ হবে না। তাই খাদ্যের অবস্থা জানার জন্যে অন্তরকে দু'টি খেদমতগার দেয়া হয়েছে। একটি বাতেনী অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক স্থান তথা কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা ইত্যাদি।

সারকথা, অন্তরের খাদেম তিন প্রকার। প্রথম প্রকার, যা অন্তরকে কোন বস্তুর প্রতি উৎসাহিত করে– উপকার লাভের প্রতি, যেমন ক্ষুধা;

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অথবা ক্ষতি দূর করার প্রতি, যেমন ক্রোধ। এই প্রকার খাদেমকে এরাদা তথা ইচ্ছাও বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার, যা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গতিশীল করে। একে বলা হয় ক্ষমতা ও শক্তি। এটা সমস্ত অঙ্গে বিশেষত শিরা-উপশিরার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে দেখা, ঘ্রাণ লওয়া, শ্রবণ করা, আস্বাদন করা ও স্পর্শ করার শক্তি, যা নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রকারের নাম উপলব্ধি জ্ঞান। এসব বাতেনী লশকরের মধ্য থেকে প্রত্যেকটির জন্যে যাহেরী লশকরও রয়েছে। অর্থাৎ, রক্ত, মাংস, চর্বি, অস্থি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উদাহরণতঃ স্পর্শ শক্তির সম্পর্ক অঙ্গুলির সাথে এবং দর্শন শক্তির সম্পর্ক চোখের সাথে। আমরা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করব না। কেননা, এগুলো বাহ্যজগত। আমরা বরং অন্তরের সেসব লশকর সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ, তৃতীয় প্রকার উপলব্ধি শক্তি সম্পর্কে। এই শক্তি দু'প্রকার। প্রথম প্রকার সেসব শক্তি, যাদের ঠিকানা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; অর্থাৎ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয় প্রকার সেসব শক্তি, যাদের বাসস্থান বাতেনী মনযিলসমূহের মধ্যে নিহিত; অর্থাৎ, মস্তিষ্কের কোটরসমূহের মধ্যে। এই দ্বিতীয় প্রকারও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কেননা, মানুষ কোন বস্তুকে দেখে যখন চক্ষু বন্ধ করে নেয় তখন সে সেই বস্তুর চিত্র মনের মধ্যে পায়। একে বলা হয় "খেয়াল" তথা কল্পনা। এর পর এই চিত্র কতক বিষয় মনে রাখার মাধ্যমে মানুষের সাথে থাকে। একে বলা হয় স্মরণশক্তি। এর পর সে এই স্মরণ করা বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং কতককে কতকের সাথে মিলায়। ফলে যা ভুলে গিয়ে থাকে তা স্মরণ হয়ে যায়। কতক চিত্র হুবহু মনের মধ্যে থেকে যায়। এর পর সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয় অভিন্ন চেতনার মাধ্যমে আপন কল্পনায় একত্রিত করে নেয়। এ থেকে জানা গেল, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে অভিন্ন চেতনা, কল্পনা, চিন্তা, জল্পনা ও স্মরণ রাখা। আল্লাহ তাআলা এসব শক্তি সৃষ্টি না করলে মস্তিষ্ক এগুলো থেকে খালি থাকত। যেমন– হাত, পা এগুলো থেকে খালি রয়েছে।

অন্তরের আভ্যন্তরীণ খাদেম

জানা উচিত, ক্রোধ ও কামনা –অন্তরের এ দুটি খাদেম কখনও পুরা মাত্রায় অন্তরের আনুগত্য করে। তখন অন্তর অধ্যাত্ম পথে চলার ব্যাপারে এগুলো থেকে সাহায্য পায়। বরং আল্লাহর দিকে সফরে এ দুটিকে উত্তম সঙ্গী মনে করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এ দুটি খাদেম অন্তরের অবাধ্য ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। তখন তারা অন্তরের বরবাদ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। ফলে অন্তর চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের সফর থেকে বিরত থাকে, কিন্তু অন্তরের আরও সাহায্যকারী রয়েছে; যেগুলোকে শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও চিন্তা-ভাবনা বলা হয়। এহেন সংকট মুহূর্তে ক্রোধ ও বাসনার মোকাবিলা করার জন্যে এগুলোর সাহায্য নেয়া উচিত। কেননা, ক্রোধ ও কামনা কখনও শয়তানের দলে ভিড়ে অন্তরের উপর অনন্তর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যদি অন্তর উপরোক্ত খাদেমদের সাহায্য না নেয় এবং ক্রোধ ও কামনার অনুগত হয়ে যায়, তাহলেও ধ্বংস ও প্রকাশ্য ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। অধিকাংশ লোককে দেখা যায়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে অনেক কৌশল খুঁজে ফিরে। অথচ বুদ্ধির প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে কামনার অনুগত থাকা সমীচীন। এখন আমরা তিনটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি।

প্রথম দৃষ্টান্ত, মনে করুন মানুষের নফস অর্থাৎ, পূর্ববর্ণিত লতীফা বাদশাহ্, দেহ তার রাজধানী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কর্মী ও আমলা, বিবেকশক্তি তার হিতাকাঙ্ক্ষী উযীর, ক্রোধ তার রাজধানীর প্রধান পুলিশ কর্মচারী এবং কামনা– বাসনা তার দুশ্চরিত্র গোলাম, যে এই রাজধানী শহরে খাদ্যশস্য ইত্যাদি আনয়ন করে। সে এত ধূর্ত, মিথ্যুক ও নোংরা যে, শুভাকাঙ্ক্ষারূপে আগমন করে, কিন্তু তার শুভাকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদি-অন্ত ষড়যন্ত্র ও মারাত্মক বিষ নিহিত থাকে। বিচক্ষণ উযীরের সাথে কথায় কথায় বিবাদ করা তার অভ্যাস। এমনকি, কোন মুহূর্ত তার কথা কাটাকাটি থেকে খালি থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ্ তার রাজত্ব পরিচালনায় উযীরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এবং এই দুশ্চরিত্র গোলামের কথাবার্তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে নিঃসন্দেহে রাজকার্য সঠিকভাবে ও ইনসাফ সহকারে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে বাদশাহ্‌কে বুঝে নিতে হবে, গোলামের বিরুদ্ধাচণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। উযীরের মন রক্ষার্থে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তাকেও উপদেশ দিতে হবে এবং উযীরের পক্ষে থেকে তাকে এই দুশ্চরিত্র গোলাম ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর মোতায়েন করতে হবে, যাতে গোলাম সীমালঙ্ঘন করতে না পারে এবং পরাভূত ও শাসিত থেকে যায়! অনুরূপভাবে যদি নফস বুদ্ধির সাহায্য নেয়, ক্রোধকে কামনার উপর চাপিয়ে রাখে এবং কখনও ক্রোধকে দমন করার জন্যে কামনার সাহায্য নেয়, তবে নফসের সকল শক্তি সমতার উপর কায়েম থাকবে এবং চরিত্র উন্নত হবে। যেব্যক্তি এ পন্থা বর্জন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে, সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

–তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশীকে আপন মাবুদ করে নিয়েছে। আল্লাহ্ জেনে-শুনেই তাকে পথভ্রান্ত করেছেন।

অথবা এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

–এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত। তার উপর বোঝা চাপালে সে হাঁপায় এবং বোঝা না চাপিয়ে ছেড়ে দিলেও হাঁপায়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার নফসকে কামনা থেকে ফিরিয়ে রাখে, তার সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

–আর যে তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আপন নফসকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, মনে করুন, দেহ একটি শহর এবং এর বিচক্ষণ প্রশাসক হচ্ছে বুদ্ধি। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়সমূহ এই শহরের লশকর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রজা এবং কামনা ও ক্রোধ এই শহরের দুশমন। তারা এই শহরে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রজাদেরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক। এখন দেহকে একটি পরিখা মনে করা উচিত, যার মধ্যে বাদশাহ স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে। সে যদি যুদ্ধ করে দুশমনকে বিতাড়িত অথবা পরাভূত করে দেয়, তবে তার এ কাজ আল্লাহ্র দরবারে পছন্দনীয় হবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–যারা ধন ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের উপর অধিক মর্যাদা দান করেন।

পক্ষান্তরে বাদশাহ যদি পরিখা বিনষ্ট ও প্রজাদেরকে বিপন্ন করে দেয়, তবে সে সর্বোচ্চ দরবারে নিন্দার পাত্র হবে এবং তাকে এর শাস্তি দেয়া হবে। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে -এরূপ ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন বলা হবে, হে দুষ্টমতি রক্ষক, তুমি গোশত খেয়েছ এবং দুধ পান করেছ, কিন্তু হারানো উদ্ধার করনি এবং ভগ্নাবস্থাকে ঠিক করনি। আজ আমি তোমার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করব। এই জেহাদের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

–আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, বুদ্ধিকে একজন আরোহী মনে করা উচিত, যার ইচ্ছা শিকার করার। কামনাকে তার ঘোড়া এবং ক্রোধকে তার কুকুর খেয়াল করা দরকার। এখন যদি আরোহী পারদর্শী হয় এবং ঘোড়া ও কুকুর প্রশিক্ষাণপ্রাপ্ত হয়, তবে অবশ্যই অভীষ্ট অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আরোহী স্বয়ং আরোহণ বিদ্যায় মূর্খ হয় এবং ঘোড়া অবাধ্য ও কুকুর উন্মাদ হয়, তবে না ঘোড়া তার কথামত কাজ করবে এবং না কুকুর তার ইশারায় শিকারের দিকে ধাবিত হবে। এরূপ ব্যক্তির জন্যে শিকার করা দূরের কথা, প্রাণ রক্ষা করাই কঠিন হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্তে আরোহীর অনভিজ্ঞতা মানে মানুষের মূর্খতা ও জ্ঞানশক্তির অভাব, ঘোড়ার অবাধ্যতা মানে কামনার প্রাবল্য, বিশেষত উদরের কামনা ও যৌন কামনার প্রাবল্য এবং কুকুরের উন্মত্ততার মানে ক্রোধের প্রাবল্য। আল্লাহ্ তাআলা আপন কৃপায় মানুষকে এগুলো থেকে রক্ষা করুন।

মানব অন্তরের বৈশিষ্ট্য

প্রকাশ থাকে যে, আমরা যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, সেগুলো আল্লাহ্ তাআলা সকল জন্তু-জানোয়ারকেও দান করেছেন। উদাহরণতঃ কাম-ক্রোধ এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সকল প্রাণীরই অর্জিত আছে। সেমতে ছাগল যখন ব্যাঘ্রকে দেখে ফেলে, তখন তার শত্রুতা মনে মনে আঁচ করে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। এ থেকে জানা যায়, পশুর মধ্যেও অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি বিদ্যমান আছে।

এখন আমরা এমন বিষয় বর্ণনা করব, যা একান্তভাবে মানুষের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পাওয়া যায়, যার কারণে সে সৃষ্টির সেরা এবং খোদায়ী নৈকট্য লাভের যোগ্য হয়েছে। এরূপ বিষয় দুটি । একটি জ্ঞান ও অপরটি ইচ্ছা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির জ্ঞান না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের গণ্ডির মধ্যে দাখিল, না জন্তু-জানোয়ার এতে মানুষের সাথে শরীক। বরং সামগ্রিক জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহের জ্ঞানও মানুষের বৈশিষ্ট্য। উদাহরণতঃ মানুষ এই জ্ঞান রাখে যে, এক ব্যক্তির একই সময়ে একই অবস্থায় দু'স্থানে বিদ্যমান হওয়া অসম্ভব। ইচ্ছার মানে, মানুষ যখন জ্ঞান দ্বারা কোন কাজের পরিণতি চিন্তা করে এবং তাতে কল্যাণ দেখে, তখন তার মনে সেই কল্যাণ হাসিল করার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয়েছে ইচ্ছা। এটা কামনার ইচ্ছার বিপরীত। উদাহরণতঃ কামনা ইনজেকশনের প্রতি অনীহা পোষণ করে, কিন্তু জ্ঞান তার ইচ্ছা করে এবং এর জন্যে টাকা-পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করে। যদি আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞান সৃষ্টি করতেন এবং ইচ্ছাকে সৃষ্টি না করতেন, তবে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিষ্ফল হয়ে যেত।

মোটকথা, মানুষের অন্তরস্থিত জ্ঞান ও ইচ্ছা পশুকুলের মধ্যে নেই; বরং প্রথমে শিশুদের মধ্যেও থাকে না। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের মধ্যে ইচ্ছার উদ্ভব হয়, কিন্তু কাম, ক্রোধ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সমস্তই তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। হাঁ, শিশুর মধ্যে এসব জ্ঞান অর্জিত হওয়ার দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হচ্ছে তার অন্তরে জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহের জ্ঞান এসে যাওয়া। এই স্তরে প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়সমূহের জ্ঞান তার মধ্যে অর্জিত হবে না, কিন্তু সে তা অর্জিত হওয়ার কাছাকাছি চলে যাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে কর্ম, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হওয়া। জ্ঞানের স্তরটি মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখর, কিন্তু এতে অসংখ্য ও অশেষ ধাপ রয়েছে এবং জ্ঞানের আধিক্য ও স্বল্পতার দিক দিয়ে মানুষে মানুষে অনেক তফাৎ হয়। এছাড়া জ্ঞান অর্জনের পন্থার মধ্যেও তফাৎ হয়। কতক অন্তর প্রথম ধাপেই মুকাশাফা ও ইলহাম দ্বারা এ জ্ঞান অর্জন করে নেয়। কতক অন্তর অধ্যবসায় ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করে। এতেও অনেকে মেধাবী এবং কতক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে নবী, আলেম, ওলী ও বিজ্ঞজনের স্তর বিভিন্নরূপ এবং উন্নতির কোন শেষ সীমা নেই। কেননা, জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এতে সেই পয়গম্বরের মর্যাদা সর্বোচ্চ, যার সামনে সকল স্বরূপ কেবল মুকাশাফা ও ইলহামের মাধ্যমে উদঘাটিত হয়ে যায়। এই সৌভাগ্যের বদৌলতই বান্দা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করে এবং এসব স্তরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উন্নতি করাই সাধকদের মনযিল। এসব মনযিলের কোন শেষ নেই; বরং প্রত্যেক সাধক যে মনযিলে উপনীত হয়, তার সেই মনযিল ও নীচের মনযিলের অবস্থা জানা থাকে, কিন্তু সম্মুখের মনযিল সম্পর্কে তার কিছুই জানা থাকে না। তবে মাঝে মাঝে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসস্বরূপ সেসব মনযিলকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; যেমন আমরা নবুওয়ত ও নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁদের অস্তিত্বকে সত্য বলে জানি; কিন্তু নবুওয়তের স্বরূপ নবী ব্যতীত কেউ জানে না।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত সকলের জন্যে ব্যাপক। এতে কারও সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃপণতা নেই, কিন্তু এই রহমত সেসব অন্তরে প্রকাশ পায়, যারা রহমতের অপেক্ষায় থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের জীবনের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের অনেক প্রবাহ আসে। অতএব তোমরা এর অপেক্ষায় থাক। রহমতের অপেক্ষায় থাকার মানে, অন্তরকে পাক সাফ রাখবে এবং দুশ্চরিত্রতা ও মালিন্য থেকে বেঁচে থাকবে। এই দুশ্চরিত্রতা ও মলিনতার কারণেই কতক অন্তরে খোদায়ী নূর অনুপস্থিত থাকে। নতুবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কার্পণ্য ও বাধা থাকে না। কেননা, অন্তরের অবস্থা পাত্রের মত। পাত্রে যতক্ষণ পানি ভর্তি থাকে, তাতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে যখন অন্তর গায়রুল্লাহ্র সাথে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাতে খোদায়ী মারেফত প্রবেশ করে না! নিম্নোক্ত হাদীসে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلَى قُلُوْبِ بَنِيْ آدَمَ لَنَظَرُوْا إِلَى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ

–যদি শয়তান আদম সন্তানদের অন্তরের চারপাশে ঘুরাফেরা না করত, তবে তারা আকাশের ফেরেশতা ও স্বর্গলোক দেখতে পেত। সার কথা, মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও কর্মের জ্ঞান। এতেই মানুষের পূর্ণতা এবং এই পূর্ণতার কারণে সৌভাগ্য ও খোদায়ী দরবারে উপস্থিতি অর্জিত হয়। সুতরাং যেব্যক্তি তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে কাজে নিয়োজিত করে, যদ্দ্বারা তার জ্ঞানার্জনে সহায়তা হয়, সে ফেরেশতাদের অনুরূপ এবং তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য। যে সকল মহিলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে এসেছিল, আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–সে তো মানুষ নয়! সে তো একজন সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা!

পক্ষান্তরে যেব্যক্তি তার সমস্ত সাহসিকতা দৈহিক আরাম-আয়েশে ব্যয় করে এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মত খেয়ে যায়, সে পশুর স্তরে দাখিল হয়ে নিছক আনাড়ি বলদ হবে, না হয় শূকরের ন্যায় লোভী হবে। অথবা কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউকারী হবে। অথবা উটের ন্যায় বিদ্বেষকারী হবে। অথবা চিতাবাঘের ন্যায় দাম্ভিক হবে। অথবা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত হবে। এই সবগুলো বিষয় কোন একজনের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে হবে পুরাপুরি বিতাড়িত শয়তান। মানুষের সৌভাগ্য পূর্ণরূপে এ বিষয়ের মধ্যেই নিহিত যে, সে আল্লাহ্‌র দীদারকে নিজের লক্ষ্য স্থির করবে, পরকালকে আবাসস্থল মনে করবে, দুনিয়াকে মনযিল, দেহকে যানবাহন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খাদেম জ্ঞান করবে এবং বোধশক্তিকে বাদশাহ সাব্যস্ত করবে, যার রাজধানী হচ্ছে অন্তর মস্তিষ্কের অগ্রভাগে অবস্থিত কল্পনাশক্তি হচ্ছে সেই বাদশাহের দূত। কেননা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সংবাদ তার কাছে একত্রিত হয়। মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে অবস্থিত স্মরণশক্তি হচ্ছে তার কোষাধ্যক্ষ, জিহ্বা ভাষ্যকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লেখক এবং পঞ্চইন্দ্রিয় তার গুপ্তচর। পঞ্চইন্দ্রিয় নিজ নিজ এলাকার সংবাদ একত্রিত করে কল্পনাশক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। সে এগুলো কোষাধ্যক্ষ অর্থাৎ, স্মরণশক্তির কাছে সোপর্দ করে। এর পর কোষাধ্যক্ষ বাদশাহ্ অর্থাৎ, বোধশক্তির দরবারে পেশ করে। বাদশাহ রাজত্ব পরিচালনার জন্যে যে সকল সংবাদ জরুরী, সেগুলো গ্রহণ করে নেয়। যে মানুষ নিজেকে এভাবে সক্রিয় রাখে, সে ভাগ্যবান, সফলকাম এবং খোদায়ী নেয়ামতের শোকরকারী হয়। পক্ষান্তরে যে এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, সে হতভাগা, লাঞ্ছিত ও অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হয়ে পরিণামে আযাব, শাস্তি ও পরকালীন দুর্ভোগের পাত্র হয়ে যায় (নাউযু বিল্লাহ)। আমাদের বর্ণিত এ দৃষ্টান্তের প্রতি হযরত কাব ইবনে আহবার ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলাম, মানুষের মধ্যে চক্ষু পথপ্রদর্শক, কান রক্ষক, জিহ্বা ভাষ্যকার, হাত লশকরের দু'বাহু, পা দূত এবং অন্তর বাদশাহ। সুতরাং বাদশাহ ভাল হলে তার অনুচরবর্গ ভাল হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি। হযরত আলী (রাঃ) অন্তরের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন ঃ পৃথিবীতে আল্লাহর পাত্র হচ্ছে অন্তর। সেই অন্তর আল্লাহর অধিক প্রিয়, যে নরম, স্বচ্ছ ও শক্ত। অতএব তোমরা মুসলমান ভাইদের সাথে নরম, বিশ্বাসে স্বচ্ছ এবং ধর্মের ব্যাপারে কঠোর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে। এতে এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

–তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে সংবেদনশীল।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব-

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

–আয়াতের তফসীরে বলেন, এটা মুমিনের নূর ও তার অন্তরের দৃষ্টান্ত। তিনি– أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ

–আয়াতের তফসীরে বলেন, এটা মোনাফেকের অন্তরের দৃষ্টান্ত। যায়েদ ইবনে আসলাম কোরআনে উল্লিখিত "লওহে মাহফুয" (সংরক্ষিত ফলক) সম্পর্কে বলেন, এটা মুমিনের অন্তর। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ অন্তর ও বক্ষের উপমা হচ্ছে আরশ ও কুরসী।

অন্তরের গুণাবলী ও উদাহরণ ঃ জানা উচিত, মানব সৃষ্টি ও গঠনে চারটি মিশ্রণ আছে, যে কারণে তার মধ্যে হিংস্র, শয়তানী, পৈশাচিক ও স্বর্গীয় –এই চার প্রকার গুণের সমাবেশ ঘটেছে। মানুষের গঠনে ক্রোধ আছে বিধায় সে হিংস্র প্রাণীসুলভ কাজ-কর্ম করে এবং শত্রুতা, বিদ্বেষ, হাতাহাতি ও গালিগালাজ করে। কামভাবের মিশ্রণ থাকার কারণে সে পশুসুলভ কর্ম অর্থাৎ, লোভ, লালসা, হিংসা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। মানুষ স্বয়ং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে খোদায়ী আদেশ; যেমন আল্লাহ বলেন ঃ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي –বলুন, রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অংশ। এ কারণে সে প্রভুত্ব দাবী করে। এছাড়া সে স্বাতন্ত্র্য, প্রভুত্ব, উপাস্যতা ও নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বিষয় পছন্দ করে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তাকে জ্ঞানী বলা হলে সে পুলকিত হয় এবং মূর্খ বলা হলে নাখোশ হয়। বলাবাহুল্য, সকল বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া এবং সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা পালনকর্তার অন্যতম গুণাবলী। মানুষের মধ্যে শয়তানী গুণাবলীও রয়েছে, যদ্দরুন সে দুষ্ট বলে কথিত হয়। সে নিজের মতলব ছলচাতুরী, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে হাসিল করে এবং উপকারের প্রতিদানে অপকার করে। এগুলো শয়তানের স্বভাব।

মানুষের উপরোক্ত চারটি মিশ্রণ তার অন্তরে সমাবেশিত আছে। সুতরাং তার মজ্জার মধ্যে যেন শূকর, কুকুর, শয়তান ও প্রজ্ঞাশীল সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। শূকর হচ্ছে তার কামস্বভাব। কেননা, শূকর তার বর্ণ ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আকৃতির কারণে নিন্দনীয় নয়; বরং অতিরিক্ত লোভ ও অধিক আহারের কারণে সে নিন্দার পাত্র। কুকুর হচ্ছে মানুষের ক্রোধ। কেননা, কুকুর যে দংশন করে, তা তার আকার-আকৃতির কারণে নয়; বরং তার মধ্যে হিংস্রতা ও শত্রুতা নিহিত থাকার কারণে। এমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরেও হিংস্র প্রাণীর মত কষ্ট প্রদান ও ক্রোধ এবং শূকরের মত লোভ-লালসা মওজুদ রয়েছে। সুতরাং শূকর তার লোভ-লালসার কারণে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আহ্বান করে এবং হিংস্র প্রাণী ক্রোধের কারণে যুলুম ও নিপীড়নের দিকে আহ্বান করে। অপর দিকে শয়তান তাদের লোভ ও ক্রোধকে উত্তেজিত করতে থাকে। সে তাদের মূর্খতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করতে থাকে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যা প্রজ্ঞাবান সত্তার মত, তাকে শয়তানের কলাকৌশল প্রতিহত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে যদি তাই করে, তবে পরিস্থিতি অনেকটা ঠিক থাকবে। দেহের রাজত্বে ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে এবং সবকিছু সঠিক পথে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রজ্ঞাবান সত্তা অর্থাৎ, জ্ঞান-বুদ্ধি এদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম না হয়, তবে এরা তাকে দাবিয়ে রাখে এবং তার কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করে। তখন তাকে কুকুরকে সন্তুষ্ট রাখার এবং শূকরের পেট ভরার কৌশল খুঁজতে হয়। সে সর্বক্ষণ কুকুর ও শূকরের গোলাম থেকে যায়। অধিকাংশ লোকের অবস্থা তাই। তাদের বেশীরভাগ চেষ্টা পেট ও কামনা-বাসনার সেবায় ব্যয়িত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, তারা মূর্তিপূজারীদেরকে ঘৃণা করে এবং মূর্তিপূজার নিন্দায় সোচ্চার থাকে, কিন্তু যদি স্বয়ং তাদের অবস্থার উপর থেকে যবনিকা সরিয়ে দেয়া এবং কাশ্‌ফওয়ালাদের ন্যায় তাদের অবস্থাকে মূর্ত করে জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে দেখানো হয়, তবে দেখা যাবে, তারা কখনও শূকরের সামনে সেজদা করেছে এবং কখনও তার আদেশ ও ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করেছে। অথবা দেখা যাবে, তারা এক ক্ষেপা কুকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার এবাদত ও পূজা-অর্চনা করছে। এতে করে তারা আপন শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট থাকে। কেননা, শয়তান শূকর ও কুকুরকে মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। ফলে তারা আসলে শূকর ও কুকুরের পূজা করে না; বরং শয়তানের আরাধনা করে। মোট কথা, মানুষ যদি তার চলাফেরা, নিশ্চলতা, কথাবার্তা, চুপ থাকা এবং উঠাবসার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখা যাবে, সমস্ত দিন সে কেবল এসব বস্তুরই এবাদতে সচেষ্ট থাকে। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায়। কেননা, এর ফলে সে মালিককে চাকর,
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রভুকে দাস এবং প্রবলকে দুর্বল সাব্যস্ত করে। মালিক ও প্রভু হওয়ার যোগ্য ছিল জ্ঞানবুদ্ধি, যাকে মানুষ কামনারূপী শূকর, ক্রোধরূপী কুকুর ও শয়তানের অনুগত সেবাদাসে পরিণত করে দেয়। এই আনুগত্যের ফল দাঁড়ায়, তার অন্তরে বিভিন্ন মন্দ স্বভাবের মরিচা পড়তে থাকে এবং পরিণামে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কামনারূপী শূকরের আনুগত্যের ফলে যে সকল মন্দ স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো হচ্ছে নির্লজ্জতা, দুশ্চরিত্রতা, ব্যয়বহুলতা, কৃপণতা, লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি। আর ক্রোধরূপী কুকুরের আনুগত্য থেকে উদ্ভূত মন্দ স্বভাবগুলো হচ্ছে আত্মপ্রশংসা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, বিদ্রূপ, অপরকে হেয় জ্ঞান করা, অনিষ্ট সাধন করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ক্রোধ ও কামনাপ্রীতির ফলে শয়তানের আনুগত্য থেকে উদ্ভূত মন্দ স্বভাবগুলো হচ্ছে, প্রতারণা, ধূর্তামি, ছলচাতুরী, প্রবঞ্চনা, আত্মসাৎকরণ, অশ্লীল কথন ইত্যাদি। অপরপক্ষে যদি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি প্রবল হয় এবং কামনারূপী শূকরকে প্রতিহত করা হয়, তবে অন্তরে অনেক সদগুণ জন্মলাভ করে। যেমন– জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস, বস্তুনিচয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত মারেফত, জ্ঞান-গরিমায় সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। এছাড়া এমতাবস্থায় কামনা ও ক্রোধের পূজা করতে হয় না। কামনারূপী শূকরকে প্রতিহত করলে আরও যেসকল সৎস্বভাব উৎপন্ন হয়, সেগুলো হচ্ছে, সাধুতা, অল্পে তুষ্টি, স্থিরতা, সংসারনির্লিপ্ততা, খোদাভীতি, প্রফুল্লতা, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ক্রোধশক্তিকে নত ও পরাভূত রাখলে এবং প্রয়োজনীয় সীমায় আনয়ন করলে বীরত্ব, দয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, স্থৈর্য, ধৈর্য, ক্ষমা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি সৎস্বভাবের বিকাশ ঘটে। সুতরাং অন্তরকে আয়না মনে করা উচিত, যার মধ্যে এসব বিষয়ের প্রভাব একের পর এক প্রতিফলিত হতে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত সৎস্বভাবসমূহের প্রভাবে অন্তররূপী আয়নার চমক ও জ্যোতি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তাতে আল্লাহ্‌র দ্যুতি বিকশিত হয় এবং প্রার্থিত ধর্মীয় বিষয়াদির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। এই প্রকার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ قَلْبِهِ –যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তার জন্যে একটি উপদেশদাতা অন্তর নির্দিষ্ট করে দেন।

এরূপ অন্তরেই আল্লাহ্ তাআলার যিকির অবস্থান গ্রহণ করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الا بذكر الله تطمئن القلوب –শুনে রাখ, আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

পক্ষান্তরে যে সকল নিন্দনীয় প্রভাব অন্তরের উপর ছায়াপাত করে, সেগুলো কাল ধোঁয়ার মত হয়ে থাকে। এগুলোর কারণে অন্তররূপী আয়না ক্রমশ কালবর্ণ ধারণ করতে থাকে, অবশেষে আল্লাহ্ থেকে আড়াল হয়ে যায়। কোরআন মজীদে এ অবস্থাকেই طبع ও رين অর্থাৎ, 'মোহর মারা ও 'মরিচা পড়া' বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে–

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون –বরং তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে।

অন্য আয়াতে আছে–

ان لو نشاء اصبنهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون –আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করব এবং তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দেব, ফলে তারা শ্রবণ করবে না।

মোটকথা, অধিক গোনাহের কারণে যখন অন্তরের উপর মোহর লেগে যায়, তখন অন্তর সত্যোপলব্ধির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায়। সে আখেরাতের বিষয়াদি হালকা ও দুনিয়ার কাজ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এতেই সর্বশক্তি ব্যয় করে। সে যখন আখেরাতের অবস্থা শ্রবণ করে, তখন এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এই উপদেশ তার মধ্যে স্থান করে না এবং তওবার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করে না। এরূপ ব্যক্তিদের অবস্থা হচ্ছে–

قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحب القبور

–'তারা আখেরাত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরবাসীদের বিষয়ে কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।'

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্তর কাল হওয়ার অর্থও তাই। মায়মুন ইবনে মহরান বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। তওবা করলে এ দাগ মিটে যায়। এর পর পুনরায় গোনাহ্ করলে এই দাগ আরও বেড়ে যায় এবং বাড়তে বাড়তে অবশেষে সমগ্র অন্তর কাল হয়ে যায়। এরই অপর নাম মরিচা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

قلب المؤمن اجر وفيه سراج يزهر وقلب الكافر اسود منكوس

–'মুমিনের অন্তর পরিষ্কার। তাতে প্রদীপ জ্বলে। আর কাফেরের অন্তর কাল ও অধোমুখী।"

এ থেকে জানা গেল, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও কামপ্রবৃত্তির বিরোধিতা অন্তরকে ঔজ্জ্বল্য দান করে এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কারণে অন্তর কাল হয়ে যায়। সুতরাং যে গোনাহ করে, তার অন্তর কাল হয়ে যায়। যদি কেউ গোনাহের পরে সৎকাজ করে পূর্বের প্রভাব মিটিয়ে দিতে চায়, তবে কাল দাগ মিটে গেলেও নূরের মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে যায়। যেমন– আয়নায় ফুঁ মেরে পরিষ্কার করার পর আবার ফুঁ মেরে পরিষ্কার করলে কিছু না কিছু পঙ্কিলতা থেকেই যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ অন্তর চার প্রকার। (১) পরিষ্কার অন্তর। তাতে প্রদীপ জ্বলে। এটা মুমিনের অন্তর। (২) কাল অধোমুখী অন্তর। এটা কাফেরের অন্তর। (৩) গেলাফে আবৃত মুখ বাঁধা অন্তর। এটা মোনাফেকের অন্তর। (৪) এমন অন্তর, যাতে ঈমান ও নেফাক উভয়টি রয়েছে। এতে ঈমানের প্রভাব এমন, যেমন সবুজ ঘাসকে পবিত্র পানি আরও সতেজ করে তোলে। আর নেফাকের প্রভাব এমন, যেমন পুঁজ ক্ষতস্থানকে আরও বিস্তৃত করে দেয়। অতএব ঈমান ও নেফাকের মধ্যে যেটি প্রবল হবে, অন্তরের অবস্থা তদনুরূপ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فإذاهم مبصرون –নিশ্চয় যারা খোদাভীরু, শয়তানের কল্পনা স্পর্শ করতেই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়।

এ আয়াত ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারা অন্তরের ঔজ্জ্বল্য অর্জিত হয়। আর যারা খোদাভীরু, তারাই আল্লাহকে স্মরণ করে। অতএব জানা গেল, খোদাভীতি স্মরণ তথা যিকিরের ফটক, যিকির কাশফের দরজা এবং কাশফ হচ্ছে বৃহৎ নূর অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার দীদারের দ্বার।

জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে অন্তরের দৃষ্টান্ত

প্রকাশ থাকে যে, জ্ঞানের পাত্র হচ্ছে অন্তর। অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম বস্তু সমগ্র দেহের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমগ্র দেহ যার আনুগত্য ও সেবা করে। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের জন্যে এই অন্তর এমন, যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বস্তুসমূহের জন্যে আয়না। অর্থাৎ, বস্তুসমূহের চিত্র যেমন আয়নার মধ্যে চিত্রিত হয়ে বিদ্যমান থাকে, তেমনি প্রত্যেক জানা বিষয়ের চিত্র অন্তর আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে স্পষ্টরূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে আয়না, বস্তুর চিত্র এবং আয়নায় তা প্রতিফলিত হওয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, তেমনি অন্তরের মধ্যেও তিনটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন। এক, অন্তর; দুই, বস্তুসমূহের স্বরূপ এবং তিন, স্বরূপসমূহের চিত্র জানা, যা অন্তরে উপস্থিত হয়। এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ধরার জন্যে তিনটি বিষয় জরুরী। ধারণকারী, যেমন হাত; যাকে ধারণ করা হয়, যেমন তরবারি এবং হাত ও তরবারির মিলন, যাকে ধরা বলা হয়। এমনিভাবে জানা বিষয়ের চিত্র অন্তরে পৌঁছলে তাকে এলেম তথা জ্ঞান বলা হয়। মাঝে মাঝে বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকে এবং অন্তরও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু জ্ঞান হয় না। কেননা, জ্ঞান বলা হয় বস্তুর স্বরূপ অন্তরে পৌঁছে যাওয়াকে। উদাহরণতঃ তরবারিও বিদ্যমান এবং হাতও উপস্থিত, কিন্তু তরবারি হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত 'ধরা' বলা হবে না। পার্থক্য হচ্ছে, ধরার মধ্যে হুবহু তরবারি হাতে পৌঁছে যায়, কিন্তু জানা বস্তু হুবহু অন্তরে চলে যায় না; বরং তার স্বরূপ চলে যায়। উদাহরণতঃ কেউ অগ্নিকে জেনে নিলে স্বয়ং অগ্নি তার মধ্যে যাবে না; বরং বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে অগ্নির যে স্বরূপ, তা অন্তরে যায়। এদিক দিয়ে অন্তরকে আয়নার সাথে তুলনা করাই উত্তম। কেননা, আয়নার মধ্যেও স্বয়ং বস্তু চলে যায় না; বরং বস্তুর অনুরূপ একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়।

অন্তরকে আয়নার সাথে তুলনা করার একটি বড় কারণ হল, আয়নার মধ্যে পাঁচটি কারণে চিত্র জানা যায় না। প্রথম, আয়নাই ভাল না হওয়া এবং তার মধ্যে ত্রুটি থাকা। দ্বিতীয়, আয়নার মধ্যে অন্য কোন কারণে ময়লা জমে থাকা। তৃতীয়, যে বস্তু আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হবে, তা সম্মুখে না থাকা কিংবা উদাহরণতঃ পেছনে থাকা। চতুর্থ, বস্তু ও আয়নার মাঝখানে আড়াল থাকা। পঞ্চম, যে বস্তুর চিত্র আয়নায় দেখতে হবে, তার সঠিক দিক জানা না থাকা। ফলে আয়না ঠিক জায়গায় রাখা যায় না। অনুরূপভাবে অন্তর আয়নার মধ্যেও সকল ক্ষেত্রে সত্য বিষয়টি উদ্ভাসিত হতে পারে, কিন্তু অন্তরে কতক জ্ঞান না আসার কারণ সেই পাঁচটি, যার কিঞ্চিত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম কারণ, স্বয়ং অন্তর ত্রুটিপূর্ণ হওয়া; যেমন শিশুদের অন্তর। এতে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উদ্ভাসিত হয় না।

দ্বিতীয় কারণ, গোনাহ ও নাফরমানীর ময়লা, যা অধিক কামলিপ্সার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণে অন্তরের উপর এসে জমা হয় এবং তার ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা বিনষ্ট করে দেয়। এই কালিমার কারণে অন্তরে সত্য বিষয়টি ফুটে উঠতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, বিবেক-বুদ্ধি তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং কখনও তার কাছে ফিরে আসে না। অর্থাৎ, তার অন্তরে এমন কালিমা পড়ে যায়, যার প্রভাব কখনও দূরীভূত হয় না। কেননা, গোনাহের পরে পুণ্য কাজ করলেও তার কারণে সেই প্রভাব দূর হবে না, কিন্তু সে যদি গোনাহ্ না করত এবং পুণ্য কাজই করত, তবে নিঃসন্দেহে অন্তরে নূর বৃদ্ধি পেত। প্রথমে গোনাহ্ করার কারণে পুণ্য কাজের তেমন উপকার হয়নি। বরং গোনাহের পূর্বে অন্তর যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল– নূর বৃদ্ধি পেল না। বাস্তবে এটা এমন ভয়ংকর ক্ষতি, যার কোন প্রতিকার নেই। দেখ, যে আয়নায় একবার মরিচা পড়ে যায়, এর পর তা ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়, তা সেই আয়নার সমান হয় না, যা মরিচা ছাড়াই পরিষ্কার রাখা হয়। মোট কথা, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে ধাবিত হওয়া এবং কামলিপ্সা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আন্তরিক স্বচ্ছতার কারণ হয়ে থাকে।

এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –'যারা আমাকে পাওয়ার জন্যে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব।'

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –'যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ে আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন।'

তৃতীয় কারণ, প্রার্থিত স্বরূপের প্রতি বিমুখ হওয়া। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি আনুগত্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ, কিন্তু তার অন্তর সত্যান্বেষী নয়। বরং অধিকাংশ শারীরিক এবাদত কিংবা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে আপন প্রচেষ্টা ব্যাপৃত রাখে। এরূপ ব্যক্তির অন্তর যদিও স্বচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে সত্যের দ্যুতি বিদ্যমান থাকে না। এতে সেই বিষয়ই উদঘাটিত হয়, যার কল্পনায় সে মগ্ন থাকে। অতএব যেব্যক্তি আপন প্রচেষ্টাকে জাগতিক কামলিপ্সা ও তার আনন্দে ব্যাপৃত রাখে, তার সামনে সত্য বিষয় কিরূপে উদঘাটিত হতে পারে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ কারণ "হিজাব" তথা আড়াল থাকা। উদাহরণতঃ কোন আনুগত্যশীল ব্যক্তি তার কামলিপ্সা দাবিয়ে রেখেছে। সে কোন সত্য উদঘাটনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করলে মাঝে মাঝে তার সামনে সত্য উদঘাটিত হয় না। কেননা, সে পৈতৃক অনুকরণ কিংবা সুধারণার কারণে কোন একটি বিশ্বাস মনে পোষণ করে নেয়। এ বিশ্বাসটিই সত্য বিষয়ের মধ্যে ও তার অন্তরের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। সে শৈশবকাল থেকে যে বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়, সেই বিশ্বাস অন্তরে কোন বিপরীত বিশ্বাস উদঘাটিত হওয়ার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি বড় অন্তরায়, যার কারণে অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ও বিভিন্ন মতের বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সত্যের আড়ালে রয়ে গেছেন। বরং অধিকাংশ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যাদের চিন্তা-ভাবনা যমীন ও আকাশের রাজ্যে বিচরণ করে, তারাও এই বালায় গ্রেফতার আছেন।

পঞ্চম কারণ, প্রার্থিত সত্যের দিক সম্পর্কে অজ্ঞতা। উদাহরণতঃ কোন বিদ্যার্থী যদি কোন অজানাকে জানতে চায়, তবে যে পর্যন্ত জানা তথ্যসমূহকে জ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে বিন্যস্ত না করবে, সেই পর্যন্ত প্রার্থিত ফল অর্জিত হবে না। কেননা, যেসকল জ্ঞান মজ্জাগত নয়, সেগুলো অন্যান্য জানা তথ্যসমূহের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত হতে পারে না। যেমন– নর ও মাদী ব্যতীত বাচ্চা আসতে পারে না। কেউ যদি ঘোটক শাবক লাভ করতে চায়, তবে তা উট ও গাধা থেকে অর্জিত হবে না; বরং এর জন্যে ঘোটক-ঘোটকী দরকার। অনুরূপভাবে প্রত্যেক জ্ঞানের জন্যে দু'টি বিশেষ মূল ও একটি বিন্যাস পদ্ধতি প্রয়োজন। এতে প্রার্থিত জ্ঞান অর্জিত হবে। সুতরাং এসব মূল বিষয় ও বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে থাকে; যেমন আয়নায় সঠিক দিক না জানার কারণে চিত্র প্রতিফলিত হয় না। এ বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল, কোন ব্যক্তি যদি আয়নায় তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে চায়, তবে আয়না মুখের সামনে রাখলে পৃষ্ঠদেশ দেখা যাবে না। কেননা, আয়না পিঠের বিপরীতে নয়। আয়না পিঠের বিপরীতে রাখলেও পিঠ দৃষ্টিগোচর হবে না; বরং স্বয়ং আয়নাও দেখা যাবে না। কেননা, আয়না তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পিঠ দেখতে হলে আরও একটি আয়নার প্রয়োজন হবে। একটি পিঠের বিপরীতে রাখবে এবং অপরটি চোখের সামনে এমনভাবে রাখবে যে, উভয় আয়না একটি অপরটির বিপরীতে থাকে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পারে। কেননা, তার পিঠের প্রতিচ্ছবি পেছনের আয়নায় পড়বে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং তার প্রতিচ্ছবি সামনে রক্ষিত অপর আয়নায় পড়বে। এমনিভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তের চেয়েও অধিক বিচিত্র ধরনের কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার এসব কর্মকাণ্ড আপনা আপনি জানা হয়ে যায়। এটাই অন্তরের জন্যে সত্যোপলব্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক অন্তরেরই মজ্জাগতভাবে সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা নেই। কেননা, এ যোগ্যতা একটি খোদায়ী বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই অন্তরাত্মা সকল সৃষ্টি থেকে ভিন্ন ও সেরা। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে এ বিষয়টিই এরশাদ করেছেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

–'আমি আমানতটি পেশ করেছি আকাশমণ্ডলীর সামনে, পৃথিবীর সামনে এবং পর্বতমালার সামনে। অতঃপর কেউ তা বহন করতে স্বীকৃত হল না। তারা ভীত হয়ে গেল, কিন্তু মানুষ তা বহন করেছে।'

অর্থাৎ, মানুষ একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালা থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করছে এবং খোদায়ী আমানত বহন করার যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। এই আমানত হচ্ছে অধ্যাত্ম জ্ঞান তথা মারেফত ও তাওহীদ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর এই আমানত বহন করার যোগ্য, কিন্তু আমরা যেসকল কারণ বর্ণনা করেছি সেগুলোর ফলস্বরূপ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। এ জন্যেই নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

–প্রত্যেক নবজাত শিশু 'ফিতরত" তথা মূল ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এর পর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী এবং খৃস্টান বানিয়ে দেয়।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلَى قُلُوْبِ بَنِىْ آدَمَ لَنَظَرُوْا إِلَى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ –'যদি আদম সন্তানের অন্তরের চারপাশে শয়তানরা ঘুরাফেরা না করত, তবে সে আকাশের ফেরেশতা ও রহস্যাবলী অবলোকন করত।' এতে কতক কারণ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অন্তর ও ঊর্ধ্ব জগতের মধ্যে আড়াল হয়ে থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তির মধ্যেও এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কোথায় আছেন– পৃথিবীতে, না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আকাশে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ঈমানদার বান্দাদের অন্তরে আছেন। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে– পৃথিবীতে আমার সংকুলান হয় না– আকাশেও না। আমার সংকুলান আমার মুমিন বান্দার অন্তরে হয়, যে অন্তর নরম ও স্থির। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমার অন্তর আল্লাহকে যখন দেখেছে, তখনই তাকওয়ার কারণে নূর আড়াল হয়ে গেছে। যার সামনে থেকে আড়াল দূর হয়ে যায়, তার অন্তরে ঊর্ধ্ব জগতের চিত্র ফুটে উঠে। সকল এবাদত ও দৈহিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া। আর স্বচ্ছতার লক্ষ্য হচ্ছে অন্তরে খোদায়ী মারেফতের দ্যুতি এসে যাওয়া। মারেফতের এই দ্যুতিই নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে ঃ

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه –আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের জন্যে যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে একটি নূরের উপর থাকে। বলাবাহুল্য, এই দ্যুতি ও ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর সর্বসাধারণের ঈমান। নিছক অনুকরণের উপর এর ভিত্তি। দ্বিতীয় স্তর দার্শনিকদের ঈমান। এতে কিছু যুক্তি প্রমাণও থাকে, কিন্তু এটাও সর্বসাধারণের ঈমানের কাছাকাছি। তৃতীয় স্তর আরেফ তথা বিভুজ্ঞানীদের ঈমান, যা একীনের নূর থেকে অর্জিত হয়। আমরা এ তিনটি স্তরকে একটি উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করছি। উদাহরণতঃ যায়েদ গৃহে আছে– এ কথা তিনভাবে জানা যায়। প্রথমতঃ কোন সত্যবাদী ব্যক্তির বর্ণনা, যার সত্যবাদিতা বার বার পরীক্ষিত হয়েছে এবং যার কথায় মিথ্যার অবকাশ নেই। এরূপ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করা যাবে যে, যায়েদ নিঃসন্দেহে গৃহে আছে। এটা নিছক অনুকরণমূলক ঈমানের দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষের অবস্থা তাই। তারা জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে পৌঁছে পিতামাতার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান, কুদরত, ইচ্ছা ইত্যাদি সকল সেফাত, পয়গম্বরগণের আগমন এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধান সত্য হওয়ার কথা শুনে এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর আজীবন এর উপরই কায়েম থাকে। এর বিরুদ্ধে অন্তরে কোন কল্পনা আসে না। কেননা, পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি তারা সুধারণা পোষণ করে। এ ধরনের ঈমান পারলৌকিক মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। এরূপ মুমিন ব্যক্তি কোরআনে বর্ণিত "আসহাবে ইয়ামীনের" সর্বনিম্ন স্তর। সে "মোকাররাব" তথা নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, নৈকট্যশীল হওয়ার জন্যে কাশ্ফ এবং বক্ষ একীনের আলোকে আলোকিত হওয়া জরুরী, যা এ ধরনের ঈমানে অনুপস্থিত। এছাড়া এ'তেকাদ তথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কতক লোক কিংবা অনেক লোকের বর্ণিত খবরে ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা থাকে। ইহুদী ও খৃস্টানদের অন্তরও তাদের পিতামাতার কথায় প্রশান্ত হয়, কিন্তু তারা যেসব আকীদা পোষণ করে, সেগুলো ভ্রান্ত। কেননা, তাদের অন্তরে ভ্রান্তিই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আকীদা সত্য।'

দ্বিতীয়, প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে গৃহের ভিতর থেকে যায়েদের শব্দ শ্রবণ করা। এর মাধ্যমেও জানা যায় যে, যায়েদ গৃহে আছে। অপরের কাছে শুনে যে পরিমাণ বিশ্বাস হয়, নিজ কানে শব্দ শুনে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস হবে। কেননা, আওয়াজ শুনলে যার আওয়াজ, তার সমস্ত আকার-আকৃতি চিন্তায় উপস্থিত হয়ে যায় এবং অন্তরে বদ্ধমূল হয়, এই আওয়াজ অমুকের। এটা দ্বিতীয় প্রকার ঈমানের দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে কিছু প্রমাণেরও মিশ্রণ আছে, কিন্তু ভ্রান্তির সম্ভাবনা এর মধ্যেও রয়েছে। কেননা, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের সাথে মিলেও যেতে পারে। কেউ কেউ আবার অন্যের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করতে পারে।

তৃতীয়, তুমি নিজে গৃহের ভিতরে গিয়ে যায়েদকে দেখে নেবে যে, সে গৃহে উপস্থিত আছে। এটা বিভুজ্ঞানী নৈকট্যশীল ও সিদ্দীকগণের ঈমান। একেই মারেফত ও মুশাহাদা বলা হয়। কারণ, তাদের ঈমান মুশাহাদা তথা প্রত্যক্ষকরণের পরে হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে সর্বসাধারণ ও দার্শনিকের ঈমানও শামিল এবং তাতে কেবল প্রত্যক্ষকরণের স্তরটি অতিরিক্ত, সে কারণে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। হাঁ, এর মধ্যে কাশফ ও জ্ঞানের পরিমাণে তফাৎ হয়। জ্ঞানের পরিমাণে তফাৎ এমন, যেন কোন ব্যক্তি গৃহের আঙ্গিনায় গিয়ে যায়েদকে খুব আলোর মধ্যে দেখে এবং অন্য ব্যক্তি কোন কক্ষে অথবা রাতের বেলায় দেখে। এখানে প্রথম ব্যক্তির দেখা অধিক কামেল হবে। এমনিভাবে প্রত্যক্ষকরণের ক্ষেত্রে কেউ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও দেখে জেনে নেয় এবং কেউ এ থেকে বঞ্চিত থাকে। জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে এ হচ্ছে অন্তরের অবস্থা।

যৌক্তিক, ধর্মীয়, জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে অন্তরের অবস্থা

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অন্তর স্বভাবগতভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি গ্রহণে তৎপর। এখন বলা হচ্ছে, যেসব জ্ঞান অন্তরে আসে, সেগুলো দু'প্রকার– যুক্তিগত ও শরীয়তগত। যুক্তিগত জ্ঞানও দু'প্রকার– এক, যা শিক্ষালব্ধ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয় এবং দুই, যা শিক্ষালব্ধ। যে জ্ঞান শিক্ষালব্ধ তাও দু'প্রকার– জাগতিক ও পারলৌকিক। যুক্তিগত জ্ঞান বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন জ্ঞান, যার কারণ নিছক যুক্তি– অনুকরণ ও শ্রবণ নয়। এর মধ্যে সেই জ্ঞান শিক্ষালব্ধ নয়, যাতে জানা যায় না যে, এই জ্ঞান কোথা থেকে এবং কিভাবে অর্জিত হয়েছে? উদাহরণতঃ এটা জানা যে, এক ব্যক্তি একই সময় দুটি গৃহে থাকতে পারে না এবং একই বস্তু নশ্বর, অবিনশ্বর কিংবা উপস্থিত ও অনুপস্থিত একই সাথে হতে পারে না। এ জ্ঞান মানুষ শৈশবকাল থেকে অর্জন করে, কিন্তু সে জানে না, দু'গৃহে থাকা এটা কখন এবং কিভাবে অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ, এর কোন বাহ্যিক ও নিকটবর্তী কারণ জানে না। নতুবা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে এসেছে, এটা জানে। আর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান হচ্ছে, যাতে শিক্ষা ও প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকারকে 'আকল' বলা হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আকল দু'প্রকার– স্বভাবগত ও শ্রবণগত। স্বভাবগত আকল ব্যতীত শ্রবণগত আকলের কোন ফায়দা নেই; যেমন সূর্যকিরণ দ্বারা অন্ধের কোন উপকার হয় না।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

مَا خَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ –আল্লাহ তাআলা আকল অপেক্ষা অধিক মহৎ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি।

এখানে প্রথম প্রকার আকল বুঝানো হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَنْوَاعِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبْ اَنْتَ بِعَقْلِكَ –'যখন মানুষ নানা প্রকার পুণ্য কাজ দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে, তখন তুমি আপন আকল দ্বারা নৈকট্য লাভ কর।'

এখানে দ্বিতীয় প্রকার আকল বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দরকার। মোট কথা, অন্তরকে মনে করতে হবে চক্ষু এবং স্বভাবগত আকলকে বুঝতে হবে দৃষ্টিশক্তিরূপে। দৃষ্টিশক্তি অন্ধের মধ্যে থাকে না, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে থাকে, যদিও সে তার চক্ষু বন্ধ করে নেয় অথবা অন্ধকার রাত্রে থাকে। যে কলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার জানা বিষয় অন্তরে মুদ্রিত করে, তাকে সূর্যের গোল পরিমণ্ডল মনে করা উচিত। শৈশবে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কারণ এটাই যে, তখন পর্যন্ত মানসপটে জ্ঞান চিত্রিত করার যোগ্যতা থাকে না। "কলম" বলে আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সৃজিত এমন একটি বস্তু, যদ্দারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তরে জ্ঞানের চিত্র আঁকা হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন ঃ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।

আল্লাহ তাআলার কলম আমাদের কলমের মত নয়। যেমন– তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মোট কথা, অন্তশ্চক্ষু ও চর্মচক্ষুর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহে মিল আছে, কিন্তু সম্মান ও মর্যাদায় কোন মিল নেই। এ মিলের কারণেই আল্লাহ তাআলা অন্তরের উপলব্ধিকে দেখা বলে ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى –অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি।

আরও বলা হয়েছে ঃ

كَذَالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখাতে থাকি।

এ আয়াতে আত্মোপলব্ধিকে দেখা বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এমনিভাবে নিম্নের আয়াতসমূহে উপলব্ধির বিপরীত বিষয়কে অন্ধত্ব বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ – –নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। তবে বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়। مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى –যে এ জগতে অন্ধ থাকে, সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। এ পর্যন্ত যৌক্তিক জ্ঞানের কথা বর্ণিত হল। এক্ষণে ধর্মীয় জ্ঞানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

ধর্মীয় জ্ঞান পয়গম্বরগণের অনুসরণ তথা আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস শিক্ষা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর মাধ্যমেই অন্তরগত গুণাবলী পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে এবং অন্তরগত রোগ-ব্যাধি ও ব্যথার উপশম ঘটে। যৌক্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও সেটা অন্তরের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের বিষয়সমূহ আপনা আপনি আকল তথা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু শ্রবণের পর যথাযথ বুঝার জন্যে আকলের প্রয়োজন হয়। এ থেকে প্রমাণিত হল, শ্রবণ ছাড়া আকলের উপায় নেই এবং আকল থেকে শ্রবণের পলায়নের পথ নেই। যেব্যক্তি কেবল তাকলীদ তথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুসরণই করে যায় এবং আকলকে শিকায় তুলে রাখে, সে মূর্খ। অনুরূপভাবে যে কেবল আকলকেই যথেষ্ট মনে করে এবং কোরআন ও হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, সে উদ্ধত। অতএব উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা উচিত। কেননা, যৌক্তিক জ্ঞান খাদ্যের মত এবং শরীয়তের জ্ঞান ওষুধের অনুরূপ। রুগ্ন ব্যক্তি যদি ওষুধ না খায়, তবে কেবল খাদ্য খেয়ে তার রোগ দূর হবে না। এমনিভাবে অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা সেসব ভেষজ দ্বারা হতে পারে, যা শরীয়তের হাসপাতালে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ওযীফা, এবাদত ও সৎকর্ম। সুতরাং যেব্যক্তি তার রোগাক্রান্ত অন্তরের চিকিৎসা এবাদত দ্বারা করবে না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন- সেই রুগীর ক্ষতি হয়, যে ওষুধ না খেয়ে কেবল খাদ্য খেতে থাকে।

যারা বলে, যৌক্তিক জ্ঞান শরীয়তের জ্ঞানের বিপরীত, কাজেই উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়, তারা অজ্ঞতার কারণে এ কথা বলে। তারা অন্তশ্চক্ষুর নূর থেকে বঞ্চিত। বরং তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তের কতক জ্ঞানও পরস্পর বিরোধী প্রতিভাত হয়ে থাকে। তারা এগুলোর সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়ে ধারণা করতে থাকে যে, শরীয়তই ত্রুটিপূর্ণ। অথচ এরূপ মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের নিজেদের অক্ষমতা। উদাহরণতঃ জনৈক অন্ধ ব্যক্তি কারও গৃহে প্রবেশ করার পর ঘটনাক্রমে বাসনকোসনের উপর তার পা পড়ে গেল। এতে সে বলতে লাগল ঃ এ গৃহের লোকেরা কেমন যে, পথের মধ্যে বাসনকোসন রেখে দেয়। এগুলো যথাস্থানে রাখল না কেন? জওয়াবে গৃহের লোকেরা বলল ঃ মিয়া সাহেব, বাসনকোসন তো যথাস্থানেই রাখা আছে, কিন্তু অন্ধত্বের কারণে আপনিই পথের দিশা পাননি। আশ্চর্যের বিষয়, আপনি নিজের ত্রুটি দেখলেন না, অপরের দোষ ধরতে শুরু করেছেন!

হাঁ, যৌক্তিক জ্ঞান ও শরীয়তের জ্ঞান এদিক দিয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেউ এগুলোর কোন একটিতে সর্বপ্রযত্নে মনোনিবেশ করলে অপরটি থেকে সে প্রায়শ গাফেল থেকে যায়। এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতের তিনটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক উক্তিতে তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাত নিক্তির দু'পাল্লার মত। দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে, উভয়টি পূর্ব ও পশ্চিমের মত। তৃতীয় উক্তিতে বলেছেন- এরা দু'সতীনের মত। একটি রাজি হলে অপরটি নারাজ হয়ে যায়। এ কারণেই দেখা যায়, যারা দুনিয়ার বিষয়াদিতে খুব চালাক-চতুর হয়, তারা আখেরাতের ব্যাপারাদিতে মূর্খ থেকে যায়। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে পারদর্শী হয়, তারা প্রায়ই দুনিয়ার জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়। কেননা, অধিকাংশ লোকের আকল-শক্তি উভয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয় অর্জনে সক্ষম হয় না। একটি শিখলে অপরটিতে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে– অধিকাংশ জান্নাতী আত্মভোলা। অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে অচেতন। হযরত হাসান বসরী এক ওয়াযে বলেন ঃ আমি এমন লোকদের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যাদেরকে তোমরা দেখলে পাগল বলতে এবং তারা তোমাদেরকে দেখলে শয়তান বলত। অতএব, কোন অভিনব ধর্মীয় বিষয়কে যদি যাহেরী আলেমগণ অস্বীকার করে, তবে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ করা উচিত নয়; বরং বুঝা দরকার যে, কেউ পূর্ব দিকে গমন করে যেমন পশ্চিমের বস্তু পেতে পারে না, তাদের অস্বীকারও তেমনি। দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ও এই পর্যায়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ -

–নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং তা দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে গাফেল।

আরও বলা হয়েছে–

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ -

–তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে এবং তারা আখেরাতের খবর রাখে না।

অন্য এক আয়াতে আছে–

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ -

–অতএব সেই ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার যিকিরের প্রতি বিমুখ হয়ে পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের বিদ্যার দৌড় এ পর্যন্তই।

মোট কথা, আল্লাহ তাআলা আপন কৃপায় যাদেরকে উভয় জাহানের জ্ঞান দান করেন, তারাই কেবল দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন এবং তারা হলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তাদের অন্তরে সকল বিষয়ের সংকুলান হয়ে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এলহামের ক্ষেত্র সুফী ও আলেমের পার্থক্য

জানা উচিত, যে জ্ঞান শিক্ষালব্ধ নয়; বরং কখনও কখনও অন্তরে জাগরিত হয়ে যায়, তাকে এলহাম বলা হয়। এই জ্ঞান কয়েক প্রকারে অন্তরে জাগরিত হয়। কখনও মনে হয়, কেউ অজ্ঞাতে অন্তরে ঢেলে দিয়েছে এবং কখনও শিক্ষার পদ্ধতিতে অর্জিত হয়। প্রথম প্রকারকে 'নফখ ফিল কলব' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'এতেবার' ও 'এস্তেবসার' আখ্যা দেয়া হয়। এলহাম কখনও এমনভাবে হয় যে, বান্দা বুঝতেও পারে না, এই জ্ঞান কোথা থেকে কিভাবে অর্জিত হল। এটা আলেম ও সুফীগণের জন্যে হয়। আবার কখনও জ্ঞান লাভের পন্থা পদ্ধতি বান্দার জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ফেরেশতা অন্তরে জ্ঞান ঢেলে দেয়, সে বান্দার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এই প্রকার এলহামকে ওহী বলা হয়। এটা পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য। যে জ্ঞান উপার্জন ও প্রমাণের মাধ্যমে হাসিল হয়, তা আলেমগণের জ্ঞান।

সত্য হচ্ছে, সকল বিষয়ের মধ্যে সত্যকে জেনে নেয়ার যোগ্যতা অন্তরের রয়েছে, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি কারণই এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পাঁচটি কারণ যেন অন্তররূপী আয়না ও লওহে মাহফুযের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। লওহে মাহফুয এমন একটি সংরক্ষিত ফলক, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয় চিত্রিত আছে। এই ফলক থেকে অন্তরের উপর জ্ঞান প্রতিফলিত হওয়া এমন, যেমন এক আয়নার প্রতিচ্ছবি অন্য আয়নায় দৃষ্টিগোচর হয়। উভয় আয়নার মধ্যবর্তী আড়াল যেমন কখনও হাতে সরিয়ে দেয়া হয় এবং কখনও আপনা-আপনি বাতাসের চাপে সরে যায়, তেমনি মাঝে মাঝে খোদায়ী কৃপার সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং অন্তশ্চক্ষুর সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। ফলে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ কতক বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। এটা কখনও স্বপ্নে হয়। এতে ভবিষ্যতের অবস্থা জানা হয়ে যায়। সম্পূর্ণ পর্দা সরে যাওয়া মৃত্যুর পরই সম্ভবপর। মাঝে মাঝে জাগ্রত অবস্থায়ও পর্দা সরে যায় এবং সাথে সাথে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে বিস্ময়কর জ্ঞানের বিষয়াদি অন্তরে উন্মোচিত হয়ে যায়। এই উন্মোচন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে এবং এর স্থায়িত্ব খুবই বিরল। সারকথা, অন্তরে জ্ঞান এলহাম হওয়া ও জ্ঞানার্জন করা– এতদুভয়ের মধ্যে কেবল পর্দা সরে যাওয়ার পার্থক্য আছে। এছাড়া পাত্র ও কারণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পর্দা সরে যাওয়াটা বান্দার এখতিয়ারে নেই। এমনিভাবে ওহী ও এলহামের মধ্যে এছাড়া কোন তফাৎ নেই যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওহীর মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যম অর্থাৎ, ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এলহামে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু অর্জিত হয় ফেরেশতার মাধ্যমেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ ـ

অর্থাৎ, কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক প্রেরণের মাধ্যমে, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান পেঁছে দেবে।

এখন জানা উচিত, সুফী সম্প্রদায় এলহামী জ্ঞানের প্রতি উৎসাহী হয়ে থাকেন– শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রতি নয়। এ কারণেই তারা গ্রন্থকারদের লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন না এবং উক্তি ও প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা করেন না। তারা বলেন ঃ প্রথমে খুব সাধনা করা উচিত এবং কুস্বভাব ও যাবতীয় সাংসারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কায়মনোবাক্যে সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। এটা অর্জিত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বান্দার অন্তরের কার্যনির্বাহী ও যিম্মাদার হয়ে যাবেন। তিনি যিম্মাদার হয়ে গেলে বান্দার প্রতি রহমত ছায়াপাত করবে এবং অন্তরে নূর চমকাতে থাকবে। ফলে ঊর্ধ্ব জগতের রহস্য তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। অন্তরের সামনে থেকে আড়াল দূর হয়ে যাবে এবং খোদায়ী বিষয়াদির সত্যাসত্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। এ বক্তব্য অনুযায়ী বান্দার কাজ এতটুকু যে, সে কেবল আত্মশুদ্ধি করবে এবং খাঁটি ইচ্ছা সহকারে খোদায়ী রহমতে জ্ঞানোন্মেষের জন্যে অপেক্ষমাণ ও পিপাসার্ত থাকবে। এভাবে পয়গম্বর ও ওলীগণের সামনে সত্য উদঘাটিত হয়ে অন্তর নূরানী হয়ে যায়। এটা লেখাপড়া ও গ্রন্থ পাঠ দ্বারা হয় না। কারণ, যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।

যাহেরী আলেমগণ জ্ঞানলাভের উপরোক্ত পদ্ধতি অস্বীকার করেন না। তারা স্বীকার করেন যে, বিরল হলেও এভাবে মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কেননা, অধিকাংশ নবী ও ওলীর অবস্থা তাই হয়, কিন্তু তাঁরা বলেন, এ পদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন এবং এর ফলাফল বিলম্বে পাওয়া যায়। এর জন্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো অর্জন করাও খুবই দূরূহ ব্যাপার। কেননা, যাবতীয় সম্পর্ক এমনভাবে ছিন্ন করা এক রকম অসম্ভব। যদি ছিন্ন হয়েও যায়, তবে তা অব্যাহত থাকা আরও বেশী কঠিন। কেননা, সামান্য কুমন্ত্রণা ও শংকার কারণে অন্তর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَشَدُّ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ فِىْ غَلْيَانِهَا ـ

–মুমিনের অন্তর ফুটন্ত পানির চেয়েও অধিক স্ফুটিত হতে থাকে।

এছাড়া এই সাধনায় কখনও মেযাজ বিগড়ে যায়, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। পূর্ব থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মনকে সুসংযত করে না নিলে অন্তরে নানাবিধ ক্ষতিকর চিন্তা এসে ভিড় জমায়। এগুলো দূর না করা পর্যন্ত মন এগুলোতেই লিপ্ত থাকে, অথচ সারা জীবনেও এগুলোর সমাধান হয় না। এ পথে চলেছেন, এমন অনেক সুফী একই চিন্তায় বিশ বছর পর্যন্ত জড়িয়ে রয়েছেন। পূর্ব থেকে জ্ঞানার্জন করে নিলে এ ধরনের চিন্তার সমাধান তাঁরা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যেতেন। এ থেকে জানা যায়, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হওয়ার পদ্ধতিই নির্ভরযোগ্য এবং উদ্দেশ্যের অধিক অনুকূল। আলেমগণ বলেন, সুফী সম্প্রদায় এমন, যেমন কোন ব্যক্তি ফেকাহ শেখে না এবং বলে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফেকাহ শেখেননি। তিনি ওহী ও এলহামের মাধ্যমে ফকীহ হয়েছিলেন। সুতরাং আমিও সদা সর্বদা সাধনা করে করে ফকীহ হয়ে যাব। যে কেউ এরূপ চিন্তা করে, সে নিজের উপর যুলুম করে এবং মূল্যবান জীবন বিনষ্ট করে। অতএব প্রথমে জ্ঞানার্জন ও আলেমগণের বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এর পর প্রতীক্ষায় থাকবে যে, যা অন্য আলেমগণের জানা নেই, তা যেন সে জেনে নেয়। সম্ভবত সাধনার পরে এটি অর্জিত হয়ে যাবে।

সুফী সম্প্রদায়ের শিক্ষা পদ্ধতি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

জানা উচিত, যার অন্তরে সামান্য বিষয়ও এলহামের পথে উন্মোচিত হয়, তাকেই 'আরেফ' (বিভুজ্ঞানী) বলা হবে। আর যার অন্তর কখনও এরূপ অনুভব করে না, তারও এ বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত। কেননা, মারেফত তথা বিভুজ্ঞান মানুষের একটি মজ্জাগত ব্যাপার। এর পক্ষে শরীয়তসম্মত প্রমাণ অভিজ্ঞতা ও কাহিনী বিদ্যমান আছে। প্রমাণ এই– আল্লাহ্ তা'আলা [illegible] ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

–যারা আমার পথে সাধনা ও অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি।

অর্থাৎ কাশফ ও এলহামের পদ্ধতিতে তাদের অন্তর থেকে প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق لعمل حتى يستوجب النار ـ

–যে ব্যক্তি তার এলেম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই বিষয়ের এলেম দান করেন, যা সে জানে না। তাকে আমল করার তওফীক দেন। ফলে সে জান্নাতের হকদার হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তার এলেম অনুযায়ী আমল করে না, সে জানা বিষয়ে হয়রান হয় এবং আমল করার তওফীক পায় না। ফলে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب

–যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌঁছান।

অর্থাৎ আপত্তি ও সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন, জ্ঞান ও মেধা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াই দান করেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ

يايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ـ

–মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বিষয় দান করবেন।

এখানে 'ফোরকান' মানে নূর, যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ার মধ্যে প্রায়ই এই নূর প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ঃ

اللهم اعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي بصري نورا ـ

–হে আল্লাহ, আমাকে নূর দান করুন, আমার নূর বৃদ্ধি করুন, আমার অন্তরে নূর দিন এবং আমার কবরে ও আমার নয়নে নূর দিন।

এমনকি, তিনি আরও বলতেন ঃ আমার কেশ ও রক্ত-মাংসে এবং অস্থির মধ্যে নূর দান করুন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে একটি নূরের উপর থাকে।

এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এরশাদ করেন ঃ এর অর্থ বক্ষের প্রশস্ততা। অর্থাৎ অন্তরে যখন নূর ঢেলে দেয়া হয়, তখন তার জন্যে বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যায়। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের জন্যে এই দোয়া করেন–

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل

–হে আল্লাহ, তাকে ধর্মীয় বোধশক্তি দান করুন এবং ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন।

হযরত আলী রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কথা গোপনে বলেননি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন কোন বান্দাকে কিতাবুল্লাহর জ্ঞান দান করেন। এটা শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। يؤتى الحكمة من يشاء –আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 'হেকমত' দান করেন– এই আয়াতে কেউ কেউ হেকমতের অর্থ করেছেন আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান। ففهمنها سليمن –আমি সোলায়মানকে তা বুঝিয়ে দিলাম। এখানে কাশফের মাধ্যমে সোলায়মান (আঃ) যা বুঝেছিলেন, তাকেই 'বুঝিয়ে দিলাম' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার দৃষ্টিতে আল্লাহর নূর দ্বারা পর্দার অন্তরালের বস্তু ভেসে উঠে। তিনি কসম খেয়ে বলেন ঃ নির্ঘাত সত্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সত্য বিষয় মুমিনদের অন্তরে ঢেলে দেন এবং মুখে উচ্চারিত করে দেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى

মুমিনের দূরদর্শিতাকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

العلم علمان فعلم باطن فى القلب فذلك هو العلم النافع -

এলেম দু'প্রকার। এক এলেম অন্তরে লুক্কায়িত। এটাই উপকারী এলেম। জনৈক আলেমকে অন্তরে লুক্কায়িত এলেমের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ তা'আলার রহস্যাবলীর অন্যতম, যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি আপন ওলীদের অন্তরে ঢেলে দেন। কোন ফেরেশতা কিংবা মানুষ তা অবগত নয়। কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাকওয়া হেদায়াত ও কাশফের চাবি। এই হেদায়াত ও কাশফকেই শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান বলা হয়। এরশাদ হয়েছে–

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين

–এটা মানুষের জন্যে বর্ণনা এবং তাকওয়া বিশিষ্টদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশ।

এখানে হেদায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাকওয়া বিশিষ্টদের উল্লেখ করা হয়েছে। আবু ইয়াযীদ বলতেন ঃ আলেম সেই ব্যক্তির নাম নয়, যে কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করে নেয়, এর পর যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন মূর্খ কথিত হয়। বরং আলেম তাকে বলা হয়, যে পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে যখন ইচ্ছা পাঠ ও মুখস্থ করা ছাড়া বস্তুনিচয়ের জ্ঞান অর্জন করে নেয়। এরূপ জ্ঞানকেই এলমে রব্বানী বলা হয়। واتينه من لدنا علما (আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে এলম দিয়েছি।) আয়াতে এই এলেমের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা সকল এলেমই তাঁর তরফ থেকে। তফাৎ হচ্ছে, কতক জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে হয়, তাকে 'এলেমে লাদুন্নী' বলা হয় না। বরং যে এলেম বাইরের কোন অভ্যস্ত কারণ ছাড়াই অন্তরে উপস্থিত হয়, তাকেই এলমে লাদুন্নী বলা হয়। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের মধ্য থেকে এখানে কিঞ্চিত উল্লেখ করা হল।

এখন এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বুযুর্গগণের হয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কন্যা আয়েশাকে বললেন ঃ তোমরা দু'ভাই ও দুবোন। অথচ তাঁর পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন এবং পরে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। এখানে তিনি জন্মের পূর্বেই জেনে নেন যে, কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর খোতবার মাঝখানে বলে উঠেন يا سارية الجبل –অর্থাৎ তিনি কাশফের মাধ্যমে জানলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীকে শত্রু সৈন্যরা ধাওয়া করছে। তখনই তিনি মুসলিম বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে সরে যেতে আহ্বান করলেন। তাঁর এই কণ্ঠস্বর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কানে পৌঁছে যাওয়া একটি বড় কারামাত। আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওসমান (রাঃ)-এর খেদমতে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে জনৈকা মহিলাকে পেয়ে আমি তার দিকে তাকালাম এবং তার রূপ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এর পর হযরত ওসমানের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছে আগমন করে এমতাবস্থায় যে, তার চোখে-মুখে যিনার চিহ্ন থাকে। তোমার কি জানা নেই যে, কুদৃষ্টি করা হচ্ছে চোখের যিনা? তুমি তওবা কর। নতুবা তোমাকে সাজা দেব। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরেও ওহী আগমন করে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে জানা যায়। আবু সাঈদ খেরাম বর্ণনা করেন, একবার আমি হেরেম শরীফে গেলাম। সেখানে খেরকা পরিহিত এক ফকীরকে দেখে মনে মনে বললাম ঃ এ ধরনের মানুষই সমাজের উপর বোঝা হয়ে থাকে। ফকীর তৎক্ষণাৎ আমাকে কাছে ডাকল এবং বলল ঃ الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه

–আল্লাহ তোমাদের মনের কথা জানেন। অতএব সাবধান হয়ে যাও।

এতে আমি মনে মনে এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করলাম। এর পর ফকীর সজোরে বলল ঃ هو الذى يقبل التوبة عن عباده

–তিনি (আল্লাহ) বান্দার তওবা কবুল করেন।

একথা বলে ফকীর আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। যাকারিয়া ইবনে দাউদ রেওয়ায়েত করেন, একবার আবুল আব্বাস ইবনে মসরূক অসুস্থ আবুল ফযল হাশেমীকে দেখতে যান। আবুল ফযল ছিলেন ছাপোষা নিঃস্ব ব্যক্তি। জীবন যাপনের জন্যে বাহ্যিক কোন উপকরণ তার ছিল না। আবুল আব্বাস যখন প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন মনে মনে চিন্তা করলেন, ইয়া আল্লাহ! এ লোকটি কোথেকে খাবার সংগ্রহ করে? তৎক্ষণাৎ আবুল ফযল তাকে ডেকে বললেন ঃ খবরদার! কখনও এরূপ অনর্থক কথা চিন্তা করো না। আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য কৃপা অনেক।

আহমদ নকীব বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত শিবলীর খেদমতে গেলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আহমদ, আল্লাহ তাআলা সকলকে পরিচয়ের জন্যে মস্তিষ্ক দান করেছেন। আমি বললাম ঃ হযরত, ব্যাপার কি, একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি এই মুহূর্তে যখন বসা ছিলাম, তখন আমার মনে ধারণা সৃষ্টি হল যে, তুমি কৃপণ। আহমদ বললেন ঃ হযরত, আমি তো কৃপণ নই। এর পর তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিন্তা করে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তুমি কৃপণ। অতঃপর আমি মনে মনে সংকল্প করলাম– আজ যা কিছু পাব, তা প্রথমে যে ফকীরের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকে দান করে দেব। এমনি সময় এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে পঞ্চাশটি আশরফী দিয়ে গেল। আমি এগুলো নিয়ে সংকল্প অনুযায়ী রাস্তায় বের হলাম। এক জায়গায় দেখলাম, জনৈক অন্ধ ফকীর নাপিতের কাছে মাথা মুণ্ডাচ্ছে। আমি তার কাছে যেয়ে আশরফীগুলো দিতে চাইলে সে বলল ঃ নাপিতকে দিয়ে দাও। আমি নাপিতকে দিতে গেলে বলল ঃ এই ফকীর মাথা মুণ্ডাতে বসেছে অবধি আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন মজুরি গ্রহণ করব না। অগত্যা আমি আশরফীগুলো নদীতে নিক্ষেপ করে বললাম ঃ যে কেউ তোদের ইযযত করে, আল্লাহ্ তাকেই লাঞ্ছিত করেন।

হামযা ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত আবুল খায়রের গৃহে রওয়ানা হলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, তার গৃহে কিছু খাব না। যখন আমি গৃহ থেকে বের হলাম, তখন দেখলাম, তিনি খাদ্যের একটি খাঞ্চা নিয়ে আমার গৃহে আসছেন। তিনি বললেন ঃ নাও, এখন খাও। এটা তো আমার গৃহ নয়। এই বুযুর্গের অনেক প্রসিদ্ধ কারামত আছে। সেমতে ইবরাহীম রকী রেওয়ায়েত করেন, আমি একবার তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন, কিন্তু সূরা ফাতেহাও ভালরূপে পড়তে পারলেন না। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তার কাছে আসা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়েছে। নামাযের পর আমি এস্তেঞ্জার জন্যে বাইরে গেলাম। একটি সিংহ আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি আবুল খায়রের কাছে ফিরে এসে ঘটনা বিবৃত করলে তিনি সেখান থেকেই সিংহকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ কি হে, আমি কি বলিনি, আমার মেহমানদের কোন অসুবিধা করবে না? একথা শুনেই সিংহ সরে গেল। প্রয়োজন সেরে যখন আমি ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার বাহ্যিক দিকটাকে সোজা করেছ। তাই সিংহকে দেখে ভয় পেয়েছ, কিন্তু আমি আমার বাতেন (অভ্যন্তর) ঠিক করেছি। তাই সিংহ আমাকে ভয় করে। এমনি ধরনের আরও অসংখ্য কাহিনী থেকে মাশায়েখের অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের মনের কথা জানা এবং তাদের অন্তরের বিশ্বাস বলে দেয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। হাঁ, যে অস্বীকার করে, তার জন্যে এসব কাহিনী যথেষ্ট নয়, কিন্তু দু'টি অকাট্য দলীল আছে, যেগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অভূতপূর্ব সত্য স্বপ্ন, যদ্দ্বারা অবস্থা উন্মোচিত হয়। কেননা, স্বপ্নে যখন অদৃশ্য জগতের অবস্থা ফুটে উঠা সম্ভবপর হয়, তখন জাগ্রত অবস্থায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, স্বপ্নে ইন্দ্রিয় অচল হয়ে থাকে এবং বাহ্যিক অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে লিপ্ত হয় না। এটা প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায়ও সংঘটিত হয়। যেমন কেউ যখন কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকে, তখন না শুনে কোন আওয়ায এবং না দেখে কোন বস্তু।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে অদৃশ্য জগত ও ভবিষ্যত বিষয়াদি সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংবাদ প্রদান করা। কোরআন ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। এটা যখন নবীর জন্যে প্রমাণিত হল, তখন নবী নয় –এমন ব্যক্তির জন্যেও প্রমাণিত হতে পারে। কেননা, নবী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়সমূহের স্বরূপ জেনে নেন এবং সংস্কার কাজে মশগুল থাকেন। অতএব এরূপ কোন ব্যক্তি থাকাও সম্ভব, যিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়সমূহের স্বরূপ জানবেন; কিন্তু সংস্কার কাজে মশগুল থাকবেন না। এরূপ ব্যক্তিকে নবী না বলে ওলী বলা হবে। এখন যে ব্যক্তি নবীগণকে মানবে এবং সত্য স্বপ্নের সত্যায়ন করবে, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, অন্তরের দু'টি দরজা রয়েছে– একটি বহির্জগত অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দিকে এবং অপরটি ঊর্ধ্বজগতের দিকে, একেই বলা হয় এলহাম ও ওহী। এ দু'টি দরজা স্বীকার করে নিলে কেউ একথা বলতে পারবে না যে, এলেম কেবল শিক্ষা ও অভ্যস্ত কারণসমূহের মধ্যেই সীমিত।

কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অন্তরের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার

মানুষের অন্তরে একের পর এক যে সকল প্রভাব আসে, ফলে অন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে, সেগুলোকে 'খাওয়াতির' বলা হয়। খাওয়াতির থেকে প্রবণতা এবং প্রবণতা থেকে সংকল্প, ইচ্ছা ও নিয়ত গতিশীল হয়। খাওয়াতির দু'প্রকার– শুভ ও অশুভ। অশুভ খাওয়াতিরের পরিণতি ক্ষতিকর হয় এবং শুভ খাওয়াতির দ্বারা আখেরাতে উপকার পাওয়া যায়। শুভ খাওয়াতিরকে এলহাম এবং অশুভ খাওয়াতিরকে ওয়াস্‌ওয়াসা তথা সন্দেহ, শংকা ও কুমন্ত্রণা বলা হয়। শুভ খাওয়াতিরের মূল কারণ ফেরেশতা এবং অশুভ খাওয়াতিরের মূল উদগাতা শয়তান। ফেরেশতা এমন এক মখলুককে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও জ্ঞান পৌঁছানো, সত্য কাশফ, মঙ্গলের ওয়াদা এবং সৎকাজের আদেশ করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে শয়তান এমন এক মখলুক, যার কাজ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এর বিপরীত: অর্থাৎ অনিষ্টের ওয়াদা, অশ্লীল কাজের আদেশ এবং দান খয়রাতের সময় দারিদ্র্যের ভয় দেখানো ইত্যাদি। এ থেকে জানা গেল, কুমন্ত্রণার বিপরীত হচ্ছে এলহাম এবং শয়তানের বিপরীত ফেরেশতা। মানুষের অন্তর সদা-সর্বদা এই শয়তান ও ফেরেশতার টানাহেঁচড়ার মধ্যে অবস্থান করে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

فى القلب لمتان لمة من الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله سبحانه وليحمد لله ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى من الخير .

অন্তরে দু'ধরনের উঠানামা হয়। একটি ফেরেশতার তরফ থেকে। তার কাজ হল মঙ্গলের ওয়াদা প্রদান এবং সত্য বিষয়কে সত্য জানা। যে এটা অনুভব করে, তার জানা উচিত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অপর উঠানামা শত্রু অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে। তার কাজ হল অনিষ্টের ওয়াদা দেয়া এবং সত্যকে মিথ্যা মনে করা। যে এটা অনুভব করে, সে যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে।

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ الشيطن يعدكم الفقر ويامر بالفحشاء শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ ইচ্ছা অন্তরের চারপাশে ঘুরাফেরা করে। এক প্রকার ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এক প্রকার শত্রুর পক্ষ থেকে। অতএব আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে ইচ্ছা করার সময় বিরাম দেয়। যদি ইচ্ছাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানে, তবে তা কার্যকর করে। আর যদি শত্রুর পক্ষ থেকে জানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করে। অন্তরের এই টানাহেঁচড়ার প্রতি নিম্নোক্ত হাদীসে ইশারা করা হয়েছে- قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দু'অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থান করে।

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র যে, তাঁর অস্থি ও রক্তমাংসে গঠিত অঙ্গুলি হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যেমন অঙ্গুলি দ্বারা দ্রুত কাজ করে এবং অপরের দ্রুততাকে অঙ্গুলি হেলিয়ে ব্যক্ত করে, তেমনি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ও শয়তানকে কাজে লাগান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরা উভয়ই অন্তর পরিবর্তনে মানুষের অঙ্গুলির মতই।

জন্মগতভাবেই অন্তরের মধ্যে ফেরেশতার প্রভাব ও শয়তানের প্রভাব কবুল করার যোগ্যতা সমান সমান। একটির অগ্রাধিকার অপরটির উপর নেই। হাঁ, কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিরোধিতার মাধ্যমে একটি অপরটির উপর প্রবল হয়ে যায়। অর্থাৎ, মানুষ যদি কাম ও ক্রোধের দাবী অনুযায়ী কাজ করে, তবে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে যায়। তখন তার অন্তর শয়তানের আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা হয়ে যায়। কেননা, কামপ্রবৃত্তিই শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যদি কেউ কামপ্রবৃত্তিকে পরাভূত করে ফেরেশতাসুলভ চরিত্র অবলম্বন করে, তবে তার অন্তর ফেরেশতাদের মনযিল ও বাসস্থান হয়ে যায়। যেহেতু মানুষের অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সকল প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, তাই প্রত্যেক অন্তরে শয়তানেরও কুমন্ত্রণা দেয়ার অবকাশ আছে। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

ما منكم من احد الا وله شيطانة قالوا وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله عافنى عليه فاسلم ولايامر الا بخير .

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেরই একটি শয়তান আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনারও হে আল্লাহর রসূল? উত্তর হল ঃ আমারও, কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে ভাল ছাড়া মন্দ আদেশ দেয় না।

বলাবাহুল্য, কামপ্রবৃত্তির মাধ্যমেই শয়তান অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। অতএব আল্লাহ তাআলা যার প্রতি কৃপা করেন কামপ্রবৃত্তিকে তার এমন অনুগত করে দেন যে, উপযুক্ত সীমা ছাড়া তা প্রকাশ পায় না, তার কামপ্রবৃত্তি তাকে অনিষ্টের দিকে আহ্বান করে না, বরং শয়তান তাকে মঙ্গলের কথা ছাড়া কিছু বলে না। অন্তর যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তখন শয়তান সুযোগ পায় না এবং চলে যায়। এ সময় ফেরেশতা তার কাজ করে। অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তানের লশকরদের দ্বন্দ্ব সব সময় লেগেই থাকে, যে পর্যন্ত অন্তর এক লশকরের অনুগত না হয়ে যায়। যে লশকর বিজয়ী হয়, অন্তর তারই আবাসস্থল হয়ে যায়। অপর লশকরের আগমন হলেও তা সংঘর্ষের আকারে হয়ে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ অন্তরের অবস্থা হচ্ছে, শয়তানের লশকর তাদেরকে বিজিত ও বশীভূত করে নিয়েছে এবং তাদের মালিক হয়ে বসেছে। এরূপ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তর কুমন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। তারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছে। শয়তানের জোর কম না হওয়া পর্যন্ত এসব অন্তর ফেরেশতার বশীভূত হবে না। শয়তানের জোর কম করার উপায় হচ্ছে, কামপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী থেকে অন্তরকে খালি করা এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা তা পূর্ণ করা। এভাবেই ফেরেশতার প্রভাব অন্তরে নেমে আসে। জাবের ইবনে ওবায়দা আদভী বলেন ঃ আমি আলা ইবনে যিয়াদকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এটা ঠিক এমন, যেমন এক গৃহে চোর প্রবেশ করল। যদি গৃহে কিছু থাকে, তবে চোর মরিয়া হয়ে তা নিয়ে যাবে। আর যদি কিছু না থাকে, তবে খালি হাতেই চলে যাবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অন্তর কামপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী থেকে খালি থাকে, তাতে শয়তান প্রবেশ করে না, করলেও খালি হাতে ফিরে যায়। এ কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ

ان عبادى ليس لك عليهم سلطن -

অর্থাৎ, (হে শয়তান!) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে যেন আল্লাহ্র বান্দা নয়। তাকে খেয়ালখুশীর বান্দা বলা দরকার। সেমতে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– افرأيت من اتخذ الهه هواه দেখ তো, যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশীকে উপাস্য করে নিয়েছে।

এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, খেয়ালখুশীর অনুসরণকারী খেয়ালখুশীর বান্দা। এরূপ ব্যক্তির উপরই আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিজয়ী করে দেন। শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ হাদীসে আল্লাহর যিকিরই উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবনুল আস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! শয়তান আমার মধ্যে ও আমার নামাযের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। অর্থাৎ নামায ও কেরাআতের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا -

অর্থাৎ, এই শয়তানকে খানযাব বলা হয়। তুমি যখন একে অনুভব কর, তখন 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমর ইবনে আস বলেন ঃ আমি এই এরশাদ অনুযায়ী আমল করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেলাম। অনুরূপভাবে এক হাদীসে বলা হয়েছে–

ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعذ بالله منه -

অর্থাৎ, ওযুর মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্যে ওলহান নামক এক শয়তান আছে, এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শয়তান বিদূরিত হওয়ার একটি চমৎকার কারণ আছে, তা হচ্ছে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অন্তর থেকে তখনই দূর হবে, যখন এই কুমন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় অন্তরে উপস্থিত থাকে। কেননা, যিকির যখন অন্তরে স্থান লাভ করবে, তখন এর পূর্বে অন্তরে যা ছিল, তা তাতে থাকবে না। সুতরাং মনকে অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত করলে শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হতে পারে। তবে অন্য বিষয়েও কুমন্ত্রণা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, কিন্তু আল্লাহ্র যিকির ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থিতিতে শয়তানের সাধ্য নেই যে, অন্তরের ধারে-কাছে আসে, কিন্তু শয়তানকে দূর করার ক্ষমতা তাদেরই আছে, যারা মুত্তাকী এবং প্রায়ই যিকিরে মশগুল থাকে। এরূপ লোকদের কাছে অসতর্ক মুহূর্তে শয়তান এলেও গোপনে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذا هم مبصرون -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা শয়তানের স্পর্শ পেয়েই সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। من شر الوسواس الخناس আয়াতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ শয়তান অন্তরে ছড়িয়ে থাকে। যখন অন্তর আল্লাহর যিকির করে, তখন সে কষ্টে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর পর অন্তর গাফেল হয়ে গেলে শয়তান আবার ছড়িয়ে পড়ে। যিকির ও কুমন্ত্রণা আলো ও অন্ধকারের মত একটি অপরটির বিপরীত। এই বৈপরীত্যের কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ استحوذ عليهم الشيطن فانسهم ذكر الله শয়তান তাদের কাবু করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن ادم فان هو ذكر

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الله اختس وان نسى الله تعالى التقم قلبه -

অর্থাৎ, শয়তান তার শুঁড় মানুষের অন্তরের উপর স্থাপন করে । যদি মানুষ আল্লাহর যিকির করে, তবে সে সরে যায়। আর যদি আল্লাহকে ভুলে যায়, তবে শয়তান তার অন্তর গ্রাস করে নেয়।

ইবনে আওয়া রেওয়ায়েত করেন, মানুষ যখন চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেও তওবা করে না, তখন শয়তান খুশী হয়ে তার মুখে হাত বুলিয়ে বলে ঃ এ চেহারাটি সাফল্য লাভ করবে না।

মোট কথা, কামপ্রবৃত্তির মানুষের রক্ত-মাংসে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। ফলে শয়তানের রাজত্বও তার রক্ত-মাংসের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং অন্তরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে–

ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا المجارى بالجوع -

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্ত চলার পথে চলাচল করে। অতএব তোমরা ক্ষুধার সাহায্যে তার চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দাও।

এরূপ বলার কারণ হচ্ছে, ক্ষুধার কারণে কামপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে শয়তানের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। অন্তর যে চতুর্দিক থেকে কামপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত–

لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তোমার সরল পথে বসে থাকব, এর পর তাদের কাছে আসব সামনে থেকে, পশ্চাৎ থেকে এবং ডান ও বাম দিক থেকে।

নিম্নোক্ত হাদীসেও এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে–

ان الشيطان قعد لابن ادم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقال اتسلم ونترك دين ابائك فعصاه اسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال اتترك ارضك وسماءك فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد للمجاهد فقال هو تلف النفس والمال تقاتل

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فتقتل فتنكح نساءك وتقسم مالك فعصاه وجاهد ـ

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের কয়েকটি পথে বসে। সে ইসলামের পথে বসে এবং বলে ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করে পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেবে? মানুষ তার কথা না মেনে মুসলমান হয়ে যায়। এর পর শয়তান হিজরতের পথে বসে এবং বলে ঃ তুমি কি হিজরত করে মাতৃভূমি ত্যাগ করবে? মানুষ একথা মানে না এবং হিজরত করে। এর পর শয়তান জেহাদের পথে বসে এবং বলে ঃ যুদ্ধ করার মানে তো জান ও মাল বিনষ্ট করা । তুমি যুদ্ধ করলে নিহত হবে। মানুষ তাও মানে না এবং জেহাদ করে।

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে শয়তানের কথা অমান্য করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুমন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ কুমন্ত্রণা মনের এমন কিছু কল্পনা, যেমন জেহাদকারী ভাবতে থাকে, আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী অপরের বিবাহিত হয়ে যাবে। এ ধরনের কল্পনার আসল কারণ শয়তান। এই শয়তান থেকে মানুষের পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার আদেশ অমান্য করাই উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শয়তান কি বস্তু, সূক্ষ্ম শরীরী কিনা? শরীরী হয়ে মানবদেহে কিরূপে প্রবেশ করে? এ ধরনের প্রশ্ন ঠিক এমন, যেমন কারও কাপড়-চোপড়ে সাপ ঢুকে গেলে সে সাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপায় চিন্তা করে না; বরং প্রশ্ন করতে থাকে, সাপের রঙ ও আকৃতি কিরূপ এবং দৈর্ঘ প্রস্থ কি? এরূপ প্রশ্ন নিছক মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দুশমন তথা শয়তানের অস্তিত্ব তো নিশ্চিতরূপেই জানা গেল। এখন চেষ্টা করা উচিত যাতে এই দুশমন ক্ষতি সাধন করতে না পারে। এ উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে অধিকাংশ স্থানে এরশাদ করেছেন, মানুষ শয়তানকে বিশ্বাস করে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করুক। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ان الشيطن لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحب السعير ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তাকে দুশমনরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যাতে তারা জাহান্নামী হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

الم اعهد اليكم يبنى ادم ان لاتعبدوا الشيطن انه لكم عدو مبين -

অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের আরাধনা করো না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অতএব, এ দুশমন থেকে বেঁচে থাকাই মানুষের কর্তব্য। এটা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তার বংশ কি এবং বাসস্থান কোথায়? হাঁ, জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে, এই দুশমনের হাতিয়ার কি কি? উপরে বর্ণিত হয়েছে, শয়তানের হাতিয়ার হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি। আলেমদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট, কিন্তু তার সত্তাকে চেনা এবং ফেরেশতাদের স্বরূপ জানা– এটা আরেফ তথা বিভুজ্ঞানীদের বিষয়, যারা কাশফে ডুবে থাকে।

এখানে জানা দরকার, অন্তরে যে সকল খেয়াল জাগে, সেগুলো তিন প্রকার। এক, যে খেয়াল নিশ্চিতরূপেই কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। এগুলো যে এলহাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই, যে খেয়াল নিশ্চিতরূপেই অনিষ্টের দিকে আহ্বান করে। এগুলো যে কুমন্ত্রণা, তাতে কারও দ্বিমত নেই। তিন, যে খেয়াল মাঝামাঝি। এগুলো ফেরেশতার পক্ষ থেকে, না শয়তানের পক্ষ থেকে, তা জানা যায় না। এতে খুব ধোকা হয় এবং পার্থক্য করা খুব কঠিন। কেননা, কিছু সৎকর্মপরায়ণ লোককে শয়তান প্রকাশ্যভাবে অনিষ্টের দিকে আহ্বান করতে পারে না; বরং অনিষ্টকে কল্যাণের আকৃতি দিয়ে তাদের সামনে পেশ করে। এতে অধিকাংশ লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ শয়তান আলেমকে উপদেশের ভঙ্গিতে বলে ঃ সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখ। সকলেই মূর্খতায় গ্রেফতার, গাফলতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং দোযখের কিনারায় দণ্ডায়মান। তাদের প্রতি রহম করে তাদেরকে সর্বনাশ থেকে বাঁচানো উচিত এবং ওয়ায-নসীহত করা দরকার। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এলেমের নেয়ামত, উজ্জ্বল মন-মস্তিষ্ক, চিত্তাকর্ষক বাগ্মিতা এবং সুললিত কণ্ঠস্বর দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। এমতাবস্থায় তুমি আল্লাহর নাশোকরী কিরূপে করতে পার এবং জ্ঞান প্রচারে বিরত হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হবে কিরূপে? ওয়ায নসীহত করে মানুষকে সৎপথে আনা দরকার। শয়তান এমনিভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে কৌশলে আলেম ব্যক্তিকে ওয়ায করতে সম্মত করে। এর পর তার মনে এই ধারণ সৃষ্টি করে দেয় যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে মিষ্ট ভাষায় ওয়ায না করলে তোমার কথাবার্তা মনে প্রভাব বিস্তার করবে না এবং কেউ সৎপথ পাবে না। সে আলেম ব্যক্তির সামনে হরহামেশা এমনি ধরনের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। অথচ এতে তার মূল উদ্দেশ্য থাকে এই আলেমকে রিয়াতে লিপ্ত করে দেয়া, যাতে তার মধ্যে সম্মানপ্রাপ্তি, খাদেমের আধিক্য, জ্ঞান ও যশের অহংকার এবং অপরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস গড়ে উঠে। সে প্রকাশ্যে শুভেচ্ছার কথা বলে; কিন্তু বাস্তবে আলেম বেচারার সর্বনাশের ফিকির করে। এরূপ আলেমের প্রতি ইশারা করে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان الله ليويد هذا الدين بقوم لاخلاق لهم - وان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই ধর্মকে এমন লোকদের দ্বারা শক্তিশালী করবেন, যারা বেশী দ্বীনদার হবে না। আল্লাহ্ পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারা এই ধর্মকে জোরদার করবেন।

একবার বিতাড়িত শয়তান হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামনে এসে আরজ করল ঃ বল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। তিনি বললেন ঃ এই কালেমা সঠিক, কিন্তু তোর কথায় আমি এটা উচ্চারণ করব না। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শয়তান শুভেচ্ছার ভিতর দিয়েও প্রতারণা করে। শয়তানের এ ধরনের শঠতা গণনাতীত। এসব প্রতারণার কারণে তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, যারা কেবল বাহ্যিক অনিষ্টকেই অনিষ্ট মনে করে এবং শুধু প্রকাশ্য গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। এ খণ্ডের শেষভাগে আমরা শয়তানের কিছু প্রতারণা লিপিবদ্ধ করব। সময় পেলে সম্ভবত এই বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কে একটি কিতাবই লেখে তার নাম রাখব 'তালবীসে ইবলীস' (ইবলীসের বিভ্রান্তি)। কেননা, আজকাল শয়তানের প্রতারণা মানুষের মধ্যে বিশেষত মাযহাব ও আকীদাসমূহের মধ্যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ, মানুষ শয়তানের ধোকাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়।

অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, অন্তরে যে ইচ্ছা আসে তাতে বিরতি ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জেনে নেবে যে, এটা ফেরেশতার পক্ষ থেকে, না শয়তানের পক্ষ থেকে? এটা তাকওয়ার নূর, পর্যাপ্ত এলেম ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া জানা যায় না। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذان

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

هم مبصرون -

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকওয়ার অধিকারীরা শয়তানের স্পর্শ পাওয়ার সময় এলেমের নূর কাজে লাগায়। ফলে তাদের খটকা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী নয়, কামপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে সে শয়তানের ধোকায় বিশ্বাস করে নেয় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় প্রকাশ পেল, যা তারা ধারণাও করত না। অর্থাৎ, তারা তাদের যে সকল আমলকে পুণ্য কাজ মনে করত, সবগুলো পাপকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এলমে মুয়ামালায় সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিষয় হচ্ছে নফ্স ও শয়তানের প্রতারণাকে জানা। এটা প্রত্যেক বান্দার উপর ফরযে আইন, কিন্তু মানুষ এ থেকে গাফেল হয়ে এমন এলেমের মধ্যে মশগুল হয়েছে, যদ্দারা কুমন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এবং শয়তান প্রবল হয়।

অধিক কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে অন্তরে প্রবণতা আসার দরজা বন্ধ করে দেয়া। এই দরজা হচ্ছে বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরীণ কামপ্রবৃত্তি ও সাংসারিক সম্পর্ক। অন্ধকার গৃহে বসে থাকলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বন্ধ হয়ে যায়। আর পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ থেকে আলাদা হয়ে অভ্যন্তরীণ কুমন্ত্রণা বন্ধ হয় গেলে। এ পর্যায়ে কেবল তখল্লী তথা নির্জনতার পথ খোলা থাকবে, যা সর্বদা অন্তরে অব্যাহত থাকে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকির ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু শয়তান অন্তরকে সেখানেও ছাড়ে না এবং আল্লাহর যিকির বিস্মৃত করতে থাকে। এমতাবস্থায় মোজাহাদা তথা সাধনা করা উচিত। মৃত্যু দ্বারা এই সাধনা চূড়ান্ত হয়। কেননা, মানুষ যে পর্যন্ত জীবন্ত থাকে, শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তবে সাধনার বলে শয়তানের আনুগত্য থেকে মুক্ত এবং তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু দেহে রক্ত থাকা পর্যন্ত এই সাধনা জরুরী। কেননা, শয়তানের দ্বার সারা জীবন মানুষের সামনে খোলা থাকে, কখনও বন্ধ হয় না। এই দ্বার হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। দ্বার যখন উন্মুক্ত এবং শত্রুও সজাগ, তখন সাধনা ছাড়া কাজ হবে না।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ হে আবু সাঈদ! শয়তান নিদ্রামগ্ন হয় কি? তিনি বললেন ঃ যদি সে নিদ্রামগ্ন হত, তবে আমরা শান্তি পেতাম। সারকথা, মুমিন বান্দা শয়তান থেকে মুক্তি পায় না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তবে তার জোর হ্রাস করতে পারে। হাদীসে আছে ঃ

ان المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى احدكم بعيره فى سفره .

অর্থাৎ, তোমরা যেমন উটকে সফরে শীর্ণ করে দাও, তেমনি ঈমানদার ব্যক্তি শয়তানকে শীর্ণ করতে পারে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনের শয়তান ক্ষীণ হয়ে থাকে। কায়েস ইবনে হাজ্জাজ বলেন, আমার শয়তান একদিন আমাকে বলতে লাগল ঃ আমি তোমার কাছে উটের মত সবল ও শক্তিশালী এসেছিলাম। এখন তালপাতার সেপাই হয়ে গেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কিরূপে? সে বলল ঃ তুমি আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা আমাকে শীর্ণ করে দিচ্ছ।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, যারা তাকওয়ার অধিকারী, তাদের সামনে বাহ্যিক শয়তানী দরজা বন্ধ হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু শয়তানী চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে তাদেরও পদস্খলন ঘটে যায়। কেননা, এসব চক্রান্ত দ্রুত জানা যায় না। যেমন আমরা আলেমদের সাথে চক্রান্তের একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করেছি। ব্যাপারটি আরও কঠিন এজন্যে যে, অন্তরের সামনে শয়তানের যেসব দরজা খোলা রয়েছে, সেগুলো অনেক। আর ফেরেশতাদের দরজা মাত্র একটি। এই একটি মাত্র দরজা সবগুলো দরজার মধ্যে সন্দিগ্ধ হয়ে গেছে। এসব দরজার মধ্যে বান্দার অবস্থা এমন, যেমন কোন মুসাফির অন্ধকার রাতে কোন জঙ্গলে দণ্ডায়মান। সেই জঙ্গলে অনেকগুলো দুর্গম পথ রয়েছে। এমতাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি দুই উপায়ে সঠিক পথ জানতে পারে– অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান দ্বারা অথবা সূর্যের আলো দ্বারা। অতএব এসব দরজা জানার ব্যাপারে মুত্তাকীর অন্তর দিব্যদৃষ্টি ও জ্ঞানের স্থলে রয়েছে এবং কোরআন ও সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞান হচ্ছে সূর্যালোকের মত। এ দু'উপায়ে অবশ্যই সঠিক পথ জানা যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে মাটির একটি রেখা টানলেন, এর পর বললেন ঃ এটা আল্লাহর পথ। অতঃপর এই রেখার ডানে ও বামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ঃ এগুলো শয়তানের পথ। প্রত্যেক পথে একটি শয়তান দাঁড়িয়ে মানুষকে তার দিকে ডাকছে। এর পর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل -

অর্থাৎ, এটা হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অনেক পথে চলো না।

তিনি ডান ও বাম দিকের রেখাগুলোকেই 'অনেক পথ' বললেন। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়তানের পথ যে অনেক একথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা তার একটি সূক্ষ্ম পথের দৃষ্টান্তও লিপিবদ্ধ করেছি, যে পথে সে আলেম ও আবেদদেরকে পরিচালনা করে। অথচ এরা তাদের কামপ্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম এবং প্রকাশ্য গোনাহেও লিপ্ত হয় না। এখন আমরা একটি সুস্পষ্ট পথের উল্লেখ করতে চাই। মানুষ কারণে অকারণে এ পথে চলতে শুরু করে।

ঘটনাটি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে জনৈক সংসারত্যাগী দরবেশ ছিল। তাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শয়তান এক কৌশল অবলম্বন করে। সে এক বালিকার গলা টিপে দেয় এবং তার পরিবারের লোকজনের মনে একথা জাগ্রত করে দেয় যে, এর চিকিৎসা অমুক দরবেশের কাছে আছে। সেমতে তারা বালিকাকে দরবেশের কাছে নিয় গেল। দরবেশ প্রথমে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করল, কিন্তু তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে সম্মত হল। তারা বালিকাকে দরবেশের কাছে রেখে গেল। এর পর শয়তান এসে দরবেশকে বালিকার সাথে অপকর্ম করতে প্রলুব্ধ করল। দরবেশ আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত শয়তানের প্রতারণার সামনে টিকে থাকতে পারল না। সে অপকর্ম করে বসল। ফলে বালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। তখন শয়তান এসে তার মনে একথা সৃষ্টি করল যে, এখন তো তোর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। পরিবারের লোকজন আসবে। সে তাদেরকে মুখ দেখাবে কি করে? সুতরাং তাকে হত্যা করে দাফন করে দেয়াই উত্তম। কেউ জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দেবে, অসুখে মারা গেছে। দরবেশ তাই করল। এর পর শয়তান বালিকার আত্মীয়দের কাছে যেয়ে তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, দরবেশ বালিকার সাথে এমন এমন করেছে এবং হত্যা করে দাফন করে দিয়েছে। আত্মীয়রা দরবেশের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। দরবেশ সন্তোষজনক জওয়াব দিতে না পারায় তারা তাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার জন্যে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তখন শয়তান দরবেশের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলল ঃ এগুলো সব আমার কাজ। এখন যদি আমার কথা মেনে নাও, তবে খুন থেকে রক্ষা পেতে পার। দরবেশ শুধাল ঃ কি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করব, বল। প্রাণ তো বাঁচাতে হবে। শয়তান বলল ঃ আমাকে দুটি সেজদা করলেই তুমি বেঁচে যাবে। দরবেশ অগত্যা দু'টি সেজদা করে নিল। সেজদা করার পর শয়তান বলল ঃ আমি কিছুই করতে পারব না। তুমি কে, তাও আমি জানি না। এ ব্যক্তির অবস্থাই আল্লাহ তাআলা কোরআনের নিম্নোদ্বৃত আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ

كمثل الشيطن اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك ـ

অর্থাৎ, শয়তানের উক্তির মত, যখন সে মানুষকে বলল ঃ কুফর কর। যখন মানুষ কুফর করল, তখন শয়তান বলল ঃ আমি তোমা থেকে মুক্ত।

চিন্তা করা উচিত, শয়তান কত বড় প্রতারক! সে দরবেশকে কিভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত করে দিল! দরবেশ তো শুধু চিকিৎসার ব্যাপারে তার কুমন্ত্রণা মেনে নিয়েছিল। এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। শুরুতে দরবেশ এটাই ভেবেছিল যে, চিকিৎসা করা খুবই ভাল কাজ। এ থেকে জানা গেল, শয়তান প্রথমে মনে এমন বিষয় জাগ্রত করে দেয় যে, মানুষ ভাল কাজে উৎসাহী হওয়ার কারণে তাকে ভাল মনে করে, কিন্তু শেষ পরিণতি তার করায়ত্ত থাকে না। এক বিষয় থেকে আরেক বিষয় এমন সৃষ্টি হয়ে যায়, যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভবপর হয় না। হাদীসে আছে ঃ

من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ স্থানের আশেপাশে ঘুরাফেরা করে, সে যে কোন সময় নিষিদ্ধ স্থানের অভ্যন্তরে চলে যেতে পারে।

শয়তানী পথসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ

জানা দরকার, মানুষের অন্তর একটি দুর্গ সদৃশ। দুশমন শয়তান এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একে করতলগত করতে চায়। এখন যদি দুর্গের দ্বারসমূহের হেফাযত করা হয় এবং শয়তানের প্রবেশপথে পাহারা বসানো হয়, তবে অন্তর বিপদ মুক্ত থাকবে, কিন্তু যে ব্যক্তি এর দ্বার সম্পর্কেই অজ্ঞ, সে হেফাযত করতেও অক্ষম। অন্তরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমান বালেগ বান্দার উপর ফরযে আইন। যে কাজ ফরযে আইন আদায় করার উপায় হয়, তাও ওয়াজিব। এ থেকে জানা গেল, শয়তানী পথ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ওয়াজিব। বলাবাহুল্য, এসব পথ হচ্ছে বান্দার অন্তহীন স্বভাব ও অভ্যাস, কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমরা এখানে কয়েকটি বড় বড় পথের পরিচয় তুলে ধরব। যেগুলোতে শয়তানী লশকরসমূহের অধিক ভিড় থাকে।

শয়তানের প্রথম প্রবেশপথ হচ্ছে কাম ও ক্রোধ। কেননা, ক্রোধের কারণে জ্ঞানবুদ্ধি রহিত হয়। জ্ঞানবুদ্ধি স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে শয়তানের হামলা শুরু হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন শয়তান তাকে নিয়ে এমন খেলা করে, যেমন শিশুরা বল নিয়ে খেলা করে। বর্ণিত আছে, ইবলীস হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করল ঃ আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা রসূল করেছেন এবং বাক্যালাপের গৌরব দান করেছেন। আমিও তাঁরই সৃজিত। আমা দ্বারা একটি পাপ হয়ে গেছে। এখন আমি তওবা করতে চাই। তওবা কবুল হওয়ার জন্যে আপনি আল্লাহর কাছে আমার পক্ষ থেকে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) তার প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি যখন তূর পর্বতে গমন করে আল্লাহর সাথে কথা বলার পর প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন রাব্বুল ইযযত এরশাদ করলেন ঃ হে মূসা! অঙ্গীকার পূর্ণ কর। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ইবলীস চায়, তার তওবা কবুল হোক। এরশাদ হল ঃ ইবলীস আদমের কবর সেজদা করলে তার তওবা কবুল হবে। হযরত মূসা (আঃ) ফিরে এসে ইবলীসকে বললেন ঃ তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার আমি পূর্ণ করেছি। আদেশ হয়েছে, আদমের কবর সেজদা করলে তোমার তওবা কবুল হবে। অভিশপ্ত শয়তান একথা শুনে ক্রুদ্ধ হল এবং অহংকার সহকারে বলতে লাগল ঃ আমি জীবদ্দশায় যাকে সেজদা করিনি, মৃত্যুর পর কেন তার কবর সেজদা করতে যাব? কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করেছেন, তাই আমার কাছে আপনার হক আছে। আমি একটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তিনটি ক্ষেত্রে আপনি আমাকে স্মরণ করবেন। এতে আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারব না। এক ঃ ক্রোধের অবস্থায়; কেননা, আমার আত্মা আপনার অন্তরে এবং আমার চোখ আপনার চোখে রয়েছে। দেহের যে যে অংশে রক্ত চলাচল করে, আমি সেখানে চলাচল করি। কাজেই ক্রোধের অবস্থায় আমাকে অবশ্যই স্মরণ করবেন। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন আমি তার নাকে ফুঁ দিয়ে দেই। এর পর আমি কি করি, না করি, সে কিছুই টের পায় না। দুই ঃ যুদ্ধের সারিতে আমাকে স্মরণ করবেন। কেননা, যুদ্ধের সারিতে আমি যোদ্ধাকে তার বাড়ী-ঘর, স্ত্রী ও সন্তানদের কথা স্মরণ করিয়ে দেই; যাতে সে পলায়ন করে। তিন ঃ আরও স্মরণ রাখবেন, বেগানা নারীর কাছে তার মাহরামের অনুপস্থিতিতে কখনও বসবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণ, তখন আমি আপনার ও তার মধ্যে পয়গামবাহক হয়ে যাই, যাতে উভয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়। মোট কথা, ইবলীস এতে কামপ্রবৃত্তি, ক্রোধ ও লোভের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কেননা, আদমকে মৃত্যুর পর সেজদা না করার কারণ ছিল প্রতিহিংসা এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার কারণ হয় দুনিয়ার লোভ। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বড় বড় প্রবেশপথ।

অনুরূপভাবে জনৈক ওলী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইবলীসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মানুষের মনের উপর তুমি কখন প্রবল হও? ইবলীস জওয়াব দিল ঃ ক্রোধ ও খাহেশের সময় আমি তাকে চেপে ধরি। কথিত আছে, শয়তান বলে– মানুষ আমার উপর কোনরূপেই প্রবল হতে পারে না। কেননা, সে যখন হাস্যরত ও আনন্দিত থাকে, তখন আমি তার অন্তরে থাকি আর যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন উড়ে তার মাথায় পৌঁছে যাই।

শয়তানের দ্বিতীয় বড় প্রবেশপথ হচ্ছে হিংসা ও মোহ। এই মোহ মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। হাদীসে আছে ঃ حبك الشئ يعمى ويصم বস্তুর মহব্বত ও মোহ তোমাকে অন্ধ এবং বধির করে দেয়। হিংসা ও মোহের কারণে যখন জ্ঞানের আলো বিদূরিত হয়ে যায়, তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখনই শয়তান সুযোগ পায় এবং মোহের বস্তুকে তার দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশ্রী করে দেখায়, যদিও তা বাস্তবে কুশ্রী হয়। হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকায় সওয়ার হন, তখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর একটি করে জোড়া তাতে তুলে নেন। নৌকার মধ্যে তিনি জনৈক অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নৌকায় সওয়ার হলে কেন? সে আরজ করল ঃ আপনার সঙ্গীদের অন্তর নিতে এসেছি। তাদের দেহ আপনার সাথে থাকবে আর অন্তর আমার সাথে। হযরত নূহ (আঃ) বললেন ঃ তুমি তো আল্লাহর দুশমন বিতাড়িত শয়তান। বের হয়ে যাও এখান থেকে। সে আরজ করল ঃ পাঁচটি বিষয় দ্বারা আমি মানুষের সর্বনাশ করব। তন্মধ্যে তিনটি আপনাকে বলে দেব– দু'টি বলব না। ইতিমধ্যে ওহী এল, যে তিনটি বিষয় সে আপনাকে বলতে চায়, সেগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। সে দুটি বিষয় জিজ্ঞেস করুন, যেগুলো সে গোপন করতে চায়। তিনি দুটি বিষয় জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল ঃ দু'টি বিষয় হচ্ছে হিংসা ও লোভ। এ দুটি বিষয় কখনও আমাকে ধোকা দেয় না এবং মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ভুল করে না। হিংসা তো এমন বিষয়, যদ্দ্বারা আমি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান হয়েছি। আর লোভ এমন জিনিস যে, আদমের জন্যে একটি বৃক্ষ ছাড়া গোটা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জান্নাত বৈধ হয়েছিল; কিন্তু আমি লোভের সাহায্যেই কার্য সিদ্ধ করেছি এবং আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছি।

শয়তানের প্রধান প্রধান প্রবেশপথসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে উদরপূর্তি করে আহার করা– যদিও তা হালাল এবং পবিত্র আহার্য বস্তু দ্বারা হয়। কেননা, উদরপূর্তির কারণে কামভাব সতেজ হয়। কামভাব শয়তানের হাতিয়ার। বর্ণিত আছে, ইবলীস অনেকগুলো ফাঁদ হাতে নিয়ে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ফাঁদ কেন? সে আরজ করল ঃ এগুলো হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি, যদ্দ্বারা আমি মানুষকে কাবু করি। হযরত ইয়াহইয়া শুধালেন ঃ এতে আমার জন্যেও কোন ফাঁদ আছে কি? ইবলীস জওয়াব দিল ঃ হাঁ, আপনি যখন উদরপূর্তি করে আহার করেন, তখন আমি আপনার জন্যে নামায ও যিকির ভারী করে দেই। তিনি আবার শুধালেন ঃ এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি? ইবলীস বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ আমিও শপথ করে বলছি, কখনও উদরপূর্তি করে আহার করব না। শয়তান বলল, ঃ আমিও শপথ করছি, মুসলমানের সাথে কখনও শুভেচ্ছার কথা বলব না। কথিত আছে, পেট ভরে আহার করার কুফল ছয়টি। প্রথম, এতে অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয়, এতে মানুষের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা থাকে না। কেননা, সে সকলকে ভরা পেট মনে করে। তৃতীয়, আল্লাহ তাআলার এবাদত কঠিন হয়ে যায়। চতুর্থ, জ্ঞানের কথাবার্তা শুনে অন্তর নরম হয় না। পঞ্চম, অপরকে উপদেশ দিলে তাতে কারও অন্তর প্রভাবিত হয় না। ষষ্ঠ, উদর রোগব্যাধির আবাসস্থল হয়ে যায়।

শয়তানের আর একটি বড় পথ হচ্ছে সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ ইত্যাদি পছন্দ করা। শয়তান যখন এ বিষয়টি মানুষের মধ্যে প্রবল দেখে, তখন সে সর্বদাই প্ররোচিত করে যে, গৃহ খুব উঁচু ও প্রশস্ত তৈরী করে তার ছাদ ও প্রাচীরসমূহ সজ্জিত করা উচিত। এমনিভাবে পোশাক ও সওয়ারীও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া দরকার। এর পর সারাজীবন এতেই নিয়োজিত রাখে। শয়তান একবার মানুষকে এতে নিয়োজিত দেখলে পুনরায় তার কাছে আসার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কেননা, মানুষের শখ আপনা-আপনি এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে এই কামনা-বাসনা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। এতে পরকালের সর্বনাশ এবং কুফরেরও আশংকা আছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শয়তানের অন্যতম প্রবেশপথ হচ্ছে অপরের কাছে লোভ করা। কেননা, অন্তরে লোভ প্রবল হলে শয়তান শিক্ষা দেয় যে, যার কাছে লোভ করা হয়, তার সামনে খুব সাজসজ্জা ও লৌকিকতা প্রকাশ করতে হয়। ফলে তার সামনে এত রিয়া করা হয়, যেন সেই তার মাবুদ ও উপাস্য। তার দৃষ্টিতে প্রিয়পাত্র হওয়ার কৌশল উদ্ভাবনে সে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের স্থলে জেনেশুনে চুপ করে থাকে। হযরত সফওয়ান ইবনে সলীম রেওয়ায়েত করেন, একবার ইবলীস আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালার সামনে এসে বলল ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি– মনে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কিছু শেখার প্রয়োজন আমার নেই। সে বলল ঃ ভাল কথা হলে মনে রাখবে, নতুবা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে। কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে লোভের কোন বস্তু চাইবে না।

কাজেকর্মে তড়িঘড়ি করা এবং দৃঢ়তা বর্জন করাও শয়তানের একটি প্রবেশপথ। হাদীসে বলা হয়েছে–

العجلة من الشيطان والتانى من الله تعالى

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ এবং ধীরে-সুস্থে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

এর কারণ হচ্ছে, কাজকর্ম ভেবেচিন্তে করা উচিত। এর জন্যে বিচার-বিবেচনা ও সময়ের প্রয়োজন। তাড়াহুড়ার মধ্যে এটা সম্ভবপর নয়। তড়িঘড়ির মধ্যে শয়তান মানুষের উপর অনিষ্ট চাপিয়ে দেয়; অথচ মানুষ টেরও পায় না। বর্ণিত আছে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হন, তখন শয়তান ইবলীসের কাছে এসে বলল ঃ আজ সকল মূর্তি উপুড় হয়ে গেছে, ব্যাপার কি? ইবলীস বলল ঃ মনে হয় নতুন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তুমি এখানেই থাক। আমি দেখছি ব্যাপার কি? ইবলীস তখনি ভূপৃষ্ঠে উড়ে গেল; কিন্তু অনেক হন্যে হয়েও কিছু জানতে পারল না। এর পর দেখল, হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশতারা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। ইবলীস তার দলের মধ্যে ফিরে এসে বলল ঃ গতরাত্রে একজন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন। অথচ যে কোন মহিলা গর্ভবতী হয় অথবা সন্তান প্রসব করে, আমি সেখানে উপস্থিত থাকি, কিন্তু এই শিশুর জন্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। মনে হয় আজ থেকে মূর্তিপূজার আসর তেমন জমবে না। কাজেই তোমরা তড়িঘড়ির সময় মানুষকে বিভ্রান্ত কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শয়তানের আরেকটি বড় পথ হচ্ছে টাকা-পয়সা, আসবাবপত্র, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি। এসব বস্তু যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তখন এগুলোর উপর শয়তানের পাহারা বসে। কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাতে যদি অতিরিক্ত একশ' করে টাকা এসে যায়, তবে তার মনে দশটি এমন খাহেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, যার প্রত্যেকটি পূর্ণ করার জন্যে একশ' টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে তার কাছে যে পরিমাণ টাকা থাকে, তা দ্বারা কার্যোদ্ধার হয় না; বরং আরও নয়শ' টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ যখন একশ' টাকাও ছিল না, তখন সে সচ্ছল ও পরাঙ্মুখ ছিল। সে কেবল মনে করে, একশ' টাকা পেয়ে ধনী হয়ে গেছে; কিন্তু এটা বুঝে না যে, একশ' টাকা পাওয়ার কারণে আরও নয়শ' টাকার অভাবে পড়ে গেছে। এমনিভাবে অধিকতর বস্তুর চিন্তা করতে করতে পরিণামে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়।

হযরত সাবেত বানানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন রসূলে করীম (সাঃ) রেসালতপ্রাপ্ত হন, তখন ইবলীস তার সাঙ্গপাঙ্গকে বলল ঃ নতুন কিছু ঘটেছে। খোঁজ কর। অমনি শয়তানের দল এদিক-ওদিক ছুটে গেল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। ইবলীস বলল ঃ তোমরা এখানে থাক। আমি খবর আনছি। এর পর সে খবর আনল, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পয়গম্বর করেছেন। এখন তোমরা তাঁর অনুচরদের খবর নাও। শয়তানের দল নিরাশ হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ এমন লোক আমরা কখনও দেখিনি। যদি আমরা তাদের দ্বারা কোন গোনাহ করিয়ে নেই, তারা অমনি নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে তাদের সকল গোনাহ্ মিটে যায়। ইবলীস বলল ঃ অধীর হয়ো না; কিছু দিন অপেক্ষা কর। যখন তারা দেশ-বিদেশ জয় করবে এবং দুনিয়া তাদের হাতে আসবে, তখন আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে।

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ঈসা (আঃ) একটি প্রস্তরখণ্ড মাথার নীচে রেখে দেন। ইবলীস তাঁর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে লাগল ঃ হযরত, আপনিও দেখা যায় দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তরখণ্ডটি দূরে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটা দুনিয়াসহ তোর জন্যই। চিন্তা করলে দেখা যায়, যার কাছে বালিশের জায়গায় পাথর থাকে, তার এতটুকু দুনিয়া তো অর্জিত হয়ে যায়, যদ্দ্বারা শয়তান আঘাত হানতে সক্ষম হয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে উঠে এবং তার নিকটে একটি পাথরও থাকে, তবে শয়তান অবশ্যই তার মনে একথা জাগ্রত করবে যে, এই পাথরে একটু হেলান দিয়ে নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমতাবস্থায় ঘুমের প্রতি আকর্ষণ হয়ে যাবে। কেননা, কথায় বলে, গাড়ী দেখলে পা ফুলে। যদি কাছে পাথর না থাকত, তবে মনে এই কল্পনা জাগত না এবং ঘুমের প্রতিও আকর্ষণ হত না। এ হচ্ছে পাথরের অবস্থা, কিন্তু যার কাছে বড় বড় বালিশ, তুলতুলে ফরাশ এবং আরাম-আয়েশের সর্বোত্তম উপকরণ রয়েছে, সে আল্লাহর এবাদত করে কি স্বাদ পেতে পারে?

শয়তানের আরেকটি বড় প্রবেশপথ হচ্ছে কৃপণতা ও দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়। এ বিষয়টি মানুষকে সদকা, খয়রাত ইত্যাদি কিছুই করতে দেয় না। বরং ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত করতে ও পুঁতে রাখতে উৎসাহিত করে। এরূপ লোকদের জন্যে কোরআন মজীদে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি উচ্চারিত হয়েছে। খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ শয়তান বলে, মানুষ আমার উপর যতই প্রবল হোক না কেন, তিনটি বিষয়ে আমার অবাধ্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমি যা বলি, সে তাই করে। এক, অন্যায়ভাবে কারও ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। দুই, ধনসম্পদ অযথা ব্যয় করা এবং তিন, যেখানে ব্যয় করা প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় না করা। আবু সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ দারিদ্র্যের ভয় দেখানোর চেয়ে বড় কোন হাতিয়ার শয়তানের কাছে নেই। মানুষ এটা মেনে নিলে অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং সত্য বিষয় থেকে বিরত থাকে। সে কেবল মতলবের কথাই বলে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ করতে থাকে। ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্যে শয়তানের আড্ডা বাজারে উপস্থিত থাকাও কৃপণতা ও লালসার অন্যতম আপদ। হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ ইবলীস পৃথিবীতে অবতরণ করে পরওয়ারদেগারের কাছে আবেদন করল ঃ ইলাহী, তুমি আমাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে আপন রহমত থেকে বিতাড়িত করেছ। এখন আমার থাকার জায়গা কোথায়? আল্লাহ বললেন ঃ হাম্মাম (স্নানাগার) তোর থাকার জায়গা। ইবলীস বলল ঃ আমার জন্য একটি বৈঠকখানাও নির্দেশ করা হোক। এরশাদ হল ঃ বাজার ও চৌরাস্তা তোর বৈঠকখানা। ইবলীস আরজ করল ঃ আমার খোরাক কি হবে? উত্তর হল ঃ যে খাদ্যের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেটাই তোর খোরাক। ইবলীস আরজ করল ঃ আমাকে পানীয় দান করুন। জওয়াব হল ঃ নেশার বস্তু তোর পানীয়। ইবলীস আরজ করল ঃ আমাকে একটি সংবাদ মাধ্যমও প্রদান করা হোক। এরশাদ হল ঃ বাদ্যযন্ত্র তোর সংবাদ মাধ্যম। ইবলীস আরজ করল ঃ আমার শিকার ক্ষেত্র কোন্‌টি হবে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ বললেন ঃ মহিলারা তোর শিকার ক্ষেত্র।

মত ও পথ সম্পর্কিত বিদ্বেষও শয়তানের একটি বড় প্রবেশপথ। এর সারকথা হচ্ছে, নিজের বিরুদ্ধে মতামত পোষণকারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া ও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা। এই দোষ দ্বারা শয়তান আবেদ ফাসেক উভয়েরই সর্বনাশ করে থাকে। কেননা, অন্যের প্রতি দোষারোপ করা এবং তার কুকীর্তি বর্ণনা করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যখন শয়তান এ প্রবৃত্তিকে মানুষের দৃষ্টিতে হক সাব্যস্ত করে, তখন অন্তরে এর প্রতি মোহ জন্মে যায় এবং মানুষ সর্বপ্রযত্নে এতে আত্মনিয়োগ করে। সে মনে করে, সে ধর্মের খেদমত করছে। অথচ বাস্তবে সে শয়তানের অনুসরণ করে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মহব্বতের ব্যাপারে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; কিন্তু নিজে হারামখোর, মিথ্যাবাদী ও কলহপ্রিয়। তাকে হযরত আবুবকর রাঃ) দেখলে নিজের বড় শত্রু জ্ঞান করতেন। কেননা, তাঁর বন্ধু সেই ব্যক্তি হবে, যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর ভাবাদর্শ মেনে চলে এবং বাজে কথাবার্তা থেকে রসনা সংযত রাখে। যেমন– হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে অনর্থক কথাবার্তা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মুখে কংকর পুরে রাখতেন। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তি তাঁর আদর্শ অনুসরণ না করে কিরূপে তাঁর মহব্বত দাবী করতে পারে? অনুরূপভাবে কোন কোন লোক হযরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বতের ব্যাপারে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অথচ নিজে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এবং হারাম ধসসম্পদ দ্বারা খুব জাঁকজমক প্রকাশ করে। অথচ হযরত আলী (রাঃ) খেলাফত আমলেও এমন বস্তু পরিধান করেছেন, যার মূল্য এক টাকার চেয়েও কম ছিল। সুতরাং এমন ব্যক্তির প্রতি তিনি কিরূপে প্রসন্ন হবেন? বরং কেয়ামতের দিন এ ব্যক্তি তাঁর দুশমন হবে।

সারকথা, শয়তানী কল্পনাবিলাসের ফলে এসব লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যে কেউ হযরত আবু বকর ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বত নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে দোযখের অগ্নি থেকে বেঁচে থাকবে। তারা এ হাদীসটি দেখে না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ اعمل فانى لااغنى عنك من الله شيئا নিজে আমল কর। কেননা, আমি আল্লাহর সামনে তোমার কোন উপকার করতে পারব না। তাদের অবস্থাও তদ্রূপ, যারা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রঃ)-এর ব্যাপারে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। অতএব যারা কোন এক ইমামের মাযহাব দাবী করে এবং তাঁর জীবনাদর্শ অবলম্বন করে না, কেয়ামতের দিন সেই ইমামই তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমার মাযহাব তো আমল ছিল– বাগাড়ম্বর ছিল না। তুমি আমার আমলের বিরুদ্ধাচরণ করলে কেন? হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এরশাদ করেন যে, শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে যেসকল পাপকর্ম সজ্জিত করেছি, সেগুলোতে তারা আল্লাহর কাছে এস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। এর পর আমি এমন গোনাহ্ গড়ে দিয়েছি, যাতে তারা এস্তেগফার করবে না। তা হচ্ছে মনের খাহেশ, যা ধর্মের কাজ মনে করে করা হয়। অভিশপ্ত শয়তানের এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কেননা, এ ধরনের কাজে মানুষ জানেই না যে, পরিণামে নাফরমানী হচ্ছে। জানলে তারা অবশ্যই এস্তেগফার করত।

শয়তানের আরেকটি বড় কৌশল, মানুষ আপনা আপনি অপরের পারস্পরিক বিরোধ ও কলহের মধ্যে লেগে যায়। সেমতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ একদল লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল। শয়তান চাইল, তারা এখান থেকে প্রস্থান করুক এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক, কিন্তু কিছু করতে না পেরে সে অপর একটি দলের মধ্যে ভিড়ে গেল, যারা সাংসারিক কথাবার্তায় ব্যাপৃত ছিল। সে তাদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে দিল। ফলে খুনখারাবী শুরু হয়ে গেল। এতে প্রথম দল যিকির ভঙ্গ করে চলে গেল এবং তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দিল। এখানে শেষোক্ত দলে খুনখারাবী হোক– এটা শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং প্রথম দলকে স্থানত্যাগে বাধ্য করাই তার লক্ষ্য ছিল।

শয়তানের এক তরীকা হচ্ছে, সে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলী এবং এমন বিষয়সমূহের আলোচনায় জড়িয়ে ফেলে, যা তাদের বোধগম্য নয়। ফলে তারা মূল ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন ধারণা করতে থাকে, যা কুফর ছাড়া কিছু নয়। হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فاذا وجد احدكم ذالك فليقل امنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে বলে ঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? সে উত্তরে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা। এর পর শয়তান জিজ্ঞেস করে ঃ আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কেউ যখন নিজের মধ্যে এই অবস্থা অনুভব করে, তখন সে বলুক– আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এটা বললে তার এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে।

এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের কুমন্ত্রণার প্রতিকারের আলোচনা করার অনুমতি দেননি। কেননা, এই কুমন্ত্রণা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয়– আলেমদের মনে দেখা দেয় না। সুতরাং জনসাধারণের উচিত ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করে এবাদত ও জীবিকা উপার্জনের কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া। সাধারণ মানুষ যদি যিনা ও চুরি করে, তবে এটা এ ধরনের কুমন্ত্রণার পেছনে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি না জেনে না শুনে আল্লাহ ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলবে, সে অজ্ঞাতেই কাফের হয়ে যাবে। এটা এমন হবে, যেমন কেউ সাঁতার না শিখে উত্তাল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শয়তানের দ্বারসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে অপর মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يايها الذين امنوا اجتنبو كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ـ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছ শুন, তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা করা পাপ।

সুতরাং যে কেউ অপরের প্রতি কুধারণা করবে, শয়তান তাকে তার গীবত করতেও প্ররোচিত করবে। অথবা সে অপরের হক আদায় করবে সম্মান প্রদর্শনে শৈথিল্য করবে এবং তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে। এগুলো সব সর্বনাশা কাজ। এ কারণেই শরীয়তে অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ আছে। হাদীসে আছে اتقوا مواضع التهمة তোমরা অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) অপবাদের স্থান থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ) সফিয়্যা বিনতে হুয়াই থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন ঋতুবতী হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় সেখান থেকে ফিরে আসার জন্যে রওয়ানা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হলে তিনিও আমার সাথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে দু'জন আনসারীর সাথে দেখা হল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করে যেতে লাগল। তিনি তাদেরকে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার স্ত্রী সফিয়্যা-উম্মুল মুমিনীন। তারা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি সুধারণা রাখি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা ঠিক। কিন্তু শয়তান মানুষের সাথে দেহের রক্তের মত মিশে আছে। তাই আমি আশংকা করলাম, কোথাও তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে দেয়। এখানে দেখা উচিত, নবী করীম (সাঃ) উম্মতের প্রতি কতটুকু স্নেহপরায়ণ ছিলেন! তিনি আনসারীদ্বয়কেও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং উম্মতকে অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার পন্থাও শিখিয়ে দিলেন, যাতে কোন বিশিষ্ট আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি অপবাদের ব্যাপারটিকে হালকা মনে না করে এবং আত্মম্ভরিতার কারণে এরূপ ধারণা না করে যে, মানুষ তার প্রতি সুধারণাই পোষণ করবে। কারণ, যত বড় পরহেযগারই হোক না কেন, সকল মানুষ তার সমান ভক্ত হবে না; বরং কেউ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং কেউ অসন্তুষ্ট। যারা সন্তুষ্ট, তারা তার দোষ দেখবে না; কিন্তু অসন্তুষ্টরা দোষ গেয়েই ফিরবে। অতএব কুধারণা ও দুষ্ট লোকদের অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। কেননা, দুষ্টরা সকল মানুষের প্রতি কুধারণা রাখে। সুতরাং যখন এমন কোন লোক দেখা যায়, যে মানুষের প্রতি কুধারণা করে এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে নিজের অন্তরে ভ্রষ্টামি পোষণ করে এবং এই দোষ অন্বেষণ তারই বহিঃপ্রকাশ। কারণ, সে সকলকে নিজের মতই মনে করে। জানা দরকার, দোষ অন্বেষণ মোনাফেকের কাজ। মুমিনের বক্ষ সকল মানুষের তরফ থেকে পরিষ্কার থাকে।

এ পর্যন্ত অন্তরের দিকে শয়তানের প্রবেশপথ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেয়া হল। তার সবগুলো পথ লিপিবদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে জানা উচিত, মানুষের যত মন্দ স্বভাব রয়েছে, সবগুলো শয়তানের হাতিয়ার এবং প্রবেশপথ। এখন প্রশ্ন হয়, শয়তানকে দূরে রাখার উপায় কি এবং তাকে দূরে রাখার জন্যে মুখে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে দেয়া যথেষ্ট কি না? জওয়াব, শয়তানের সকল পথ বন্ধ করে দেয়াই অন্তরকে তার কুপ্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়। অর্থাৎ, অন্তরকে যাবতীয় মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। এর বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এক খণ্ডে কেবল মারাত্মক স্বভাবগুলো বর্ণনা করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যেকটি স্বভাবের জন্যে একটি আলাদা অধ্যায় জরুরী। যেমন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভবিষ্যতে এর বিশদ বর্ণনা হবে। এখানে এতটুকু বলা জরুরী যে, যখন অন্তর এসব স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তাতে কেবল আনাগোনাই করতে থাকে– স্থায়ীভাবে আসন গাড়ে না। আল্লাহর যিকির এই আনাগোনার পথে বাধা হয়ে যায়। কেননা, অন্তর কুস্বভাব থেকে মুক্ত হলেই যিকির তাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, নতুবা যিকিরও কেবল আনাগোনার পর্যায়ে থেকে যায়। অন্তরের উপর তার কোন ক্ষমতা থাকে না এবং শয়তানকেও দূর করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে শয়তান দূর করার বিষয়টিকে মুত্তাকীদের সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা মুত্তাকী, তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করলে তারা হুঁশিয়ার হয়ে যায়, অতঃপর তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়।

মোট কথা, শয়তানকে ক্ষুধার্ত কুকুরের অনুরূপ মনে করতে হবে। কারও কাছে ভাত, মাংস ইত্যাদি না থাকলে কেবল 'ধ্যাৎ' বললেই সরে যাবে; কিন্তু সামনে খাদ্যসামগ্রী থাকলে ক্ষুধার্ত কুকুর অবশ্যই খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। তখন কেবল 'ধ্যাৎ' বলে কুকুরকে সরানো যাবে না। এমনিভাবে যে অন্তরে শয়তানের খাদ্য নেই, তার কাছ থেকে শয়তান শুধু যিকির দ্বারা সরে যাবে; কিন্তু কামপ্রবৃত্তি প্রবল হলে অন্তর শয়তানের করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর যিকিরকে দূরে সরিয়ে রাখবে। মুত্তাকীদের অন্তর কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত থাকে বিধায় তাতে শয়তানের আগমন কুপ্রবৃত্তির কারণে নয়; বরং গাফলতির কারণে হয়ে থাকে। যখন তাদের অন্তর যিকির থেকে গাফেল থাকে, তখন নিজের পথ বের করে নেয়। পুনরায় আবার যিকির শুরু করলে শয়তান হটে যায়। এর প্রমাণ, আল্লাহ তাআলা শয়তান দূর করার জন্যে বলেছেনঃ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ

অতঃপর আশ্রয় প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে। এমনিভাবে যিকির সম্পর্কিত আরও অনেক আয়াত এবং হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– একবার মুমিনের শয়তান ও কাফেরের শয়তান এক জায়গায় মিলিত হল। কাফেরের শয়তান অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান মসৃণ ও সুন্দর পোশাক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিহিত ছিল। অপরপক্ষে মুমিনের শয়তান বিবস্ত্র, শীর্ণ ও ধূলি ধূসরিত ছিল। কাফেরের শয়তান তাকে শুধাল ঃ তুমি এমন শীর্ণ কেন? সে বলল ঃ আমি যার সাথে থাকি, সে পানাহার, বস্ত্র পরিধান এবং মাথায় তেল মালিশ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে। ফলে আমি খানাপানি, বস্ত্র ও তেল পাই না। তাই ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ ও এলোকেশী হয়ে থাকি। একথা শুনে কাফেরের শয়তান বলল ঃ ভাই, আমি যার সাথে থাকি, সে এসব কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। তাই আমি তার সকল কাজে শরীক থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর এই দোয়া করতেন–

اللهم انك سلطت علينا عدوا بصيرا لعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لانراهم اللهم فايسه منى كما ايسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর এক শত্রুকে ক্ষমতা দান করেছেন, যে আমাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সে এবং তার দলবল আমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে, যেখান থেকে আমরা তাদেরকে দেখি না। হে আল্লাহ! অতএব আপনি তাকে আশা থেকে নিরাশ করুন, যেমন তাকে আপনার রহমত থেকে নিরাশ করেছেন। তাকে আমাদের থেকে হতাশ করুন, যেমন আপনার ক্ষমা থেকে হতাশ করেছেন। তার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যেমন তার মধ্যে ও আপনার রহমতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন ঃ একদিন মসজিদের পথে শয়তানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে চেনেন? আমি বললাম ঃ তুমি কে? সে বলল, আমি ইবলীস। আমি শুধালাম ঃ কি উদ্দেশে এসেছ? সে বলল ঃ আমি চাই আপনি এই দোয়া কাউকে না শেখান। আমি আপনার পথে কণ্টক হব না। আমি বললাম ঃ আমি কাউকে নিষেধ করব না। যে কেউ পড়তে পারে। তোমার মনে যা চায় তাই কর। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেন ঃ এক শয়তান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে নামাযের অবস্থায় আগুনের মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কেরাআত ও এস্তেগফারের পরও সে সরে যেত না। এরপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরচ করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপনি এই দোয়া পাঠ করুন–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেগুলোর খেলাফ করে না সাধু ও অসাধুরা– সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং পৃথিবী থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং আকাশে উত্থিত হয়, আর দিবারাত্রির ফেতনার অনিষ্ট থেকে এবং দিবারাতে আগত দুর্ঘটনার অনিষ্ট থেকে।

রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করলে শয়তানের মশাল নিভে যায় এবং সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন, এক শয়তান আপনার সাথে প্রতারণা করতে চায়। আপনি যখন শয্যা গ্রহণ করেন, তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নেবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

لَقَدْ اَتَانِى الشَّيْطٰنُ وَنَازَ عَنِى فَاَخَذْتُ بِحَلْقِهٖ فَوَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ مَا اَرْسَلْتُهٗ حَتّٰى وَجَدْتُّ بَرْدَ مَاءِ لِسَانِهٖ عَلٰى يَدِىْ وَلَوْلَا دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاَصْبَحَ طَرِيْحًا فِى الْمَسْجِدِ -

অর্থাৎ, আমার কাছে শয়তান এসে বাদানুবাদ শুরু করলে আমি তার গলা টিপে ধরলাম। আল্লাহর কসম! আমি তাকে ততক্ষণ ছাড়িনি, যতক্ষণ না তার থুথুর শীতলতা আমার হাতে অনুভব করলাম। যদি আমার ভাই সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে সে মসজিদে ভূতলশায়ী হয়ে থাকত।

আরও বর্ণিত আছে–

مَا سَلَكَ عُمَرُ فَجًّا اِلَّا سَلَكَ الشَّيْطٰنُ فَجًّا اِلَّذِىْ سَلَكَ عُمَرُ -

অর্থাৎ, হযরত ওমর যে পথে চলেছেন, সেই পথে শয়তান চলেনি।

এর কারণ, তাঁর অন্তর শয়তানের প্রবেশপথ ও খাদ্য থেকে পবিত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছিল অর্থাৎ খাহেশের কোন দখল ছিল না। সুতরাং যদি অন্য কোন ব্যক্তি যিকির দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় শয়তানকে দূরে রাখতে চায়, তবে এটা অসম্ভব। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি ওষুধ সেবন করে কিন্তু পরহেয করে না; অথচ পাকস্থলী দূষিত পদ্দার্থে পরিপূর্ণ। এমতাবস্থায় ওষুধের উপকার আশা করা যায় না। এখানে যিকরকে ওষুধ এবং তাকওয়াকে পরহেয মনে করতে হবে। যে অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত, যিকির দ্বারা সেই অন্তর থেকে শয়তান দূর হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

–নিশ্চয় এতে চিন্তার বিষয় আছে তার জন্যে, যার অন্তর আছে।

সুতরাং যদি কেউ শয়তান থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবে তাকে প্রথমে তাকওয়ার পরহেয অবলম্বন করতে হবে, এরপর যিকিরের ওষুধ সেবন করতে হবে। তাহলেই শয়তান তার কাছ থেকে পলায়ন করবে, যেমন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে পলায়ন করেছিল। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং বাহ্যত শয়তানকে মন্দ বলো না, যখন অন্তরে তুমি তার বন্ধু অর্থাৎ আজ্ঞাবহ। এক আয়াতে বলা হয়েছে– ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ –তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। এই আয়াত অনুযায়ী দোয়া করা হয়, কিন্তু কবুল হয় না। এমনিভাবে আল্লাহর যিকির করার পরও শয়তান দূর হয় না। কেননা, যিকির ও দোয়ার শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করলঃ বলুন, আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন, অথচ আল্লাহ বলেছেন– তোমরা দোয়া কর, আমি কবুল করব? তিনি জওয়াব দিলেন, তোমাদের অন্তর মৃত। প্রশ্ন করা হল ঃ অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আটটি অভ্যাস এর কারণ। ১। তোমরা আল্লাহর হক জেনেও তা পালন কর না। ২। তোমরা কোরআন পাঠ কর, কিন্তু তদনুযায়ী আমল কর না। ৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত দাবী কর; কিন্তু তাঁর সুন্নত পালন কর না। ৪। মৃত্যুকে ভয় কর, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। ৫। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে তোমরা শয়তানকে শত্রু মনে কর; কিন্তু তোমরা গোনাহের কাজে তার সাথে মিত্রতা কর। ৬। তোমরা দোযখকে ভয় কর বলে দাবী কর; কিন্তু নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করেছ। ৭। জান্নাতকে মনে প্রাণে কামনা কর; কিন্তু তার জন্যে কোন কাজ কর না। ৮। সকালে ঘুম থেকে উঠেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজের দোষসমূহ পশ্চাতে ফেলে দাও, আর অন্যের দোষ খুঁজতে শুরু কর। এসব কারণে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়ে গেছেন। কাজেই দোয়া কবুল করবেন কিরূপে?

একই শয়তান মানুষকে বিভিন্ন পাপাচারের প্রতি আহ্বান করে, না আলাদা আলাদা পাপাচারের জন্যে আলাদা আলাদা শয়তান রয়েছে– এ বিষয়টি জানা এলমে মোয়ামালায় মোটেই জরুরী নয়। এখানে জরুরী হচ্ছে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আপন কাজে ব্যস্ত থাকা। কথায় বলে, আম খাও– বৃক্ষ গণনা করো না। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রত্যেক প্রকার গোনাহের জন্যে একটি করে নির্দিষ্ট শয়তান রয়েছে। সেই বিশেষ গোনাহের প্রতি আহ্বান করাই তার কাজ। এই হিসাব অনুযায়ী শয়তানের অসংখ্য দল রয়েছে। কেননা, ঘটনার বিভিন্নতা থেকে কারণের বিভিন্নতা জানা যায়। এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ শয়তানের সন্তান পাঁচটি । তাদের প্রত্যেককে এক এক কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। এক সন্তানের নাম ছিবর। তাকে বিপদাপদের কাজ দেয়া হয়েছে। সুতরাং হা-হুতাশ করা, পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা, বিলাপ করা ইত্যাদি সব তারই প্ররোচনায় হয়ে থাকে। দ্বিতীয় সন্তানের নাম আওয়ার । তার কাজ হচ্ছে যিনার প্রতি উস্কানি দেয়া। তৃতীয় মবসূত, যাকে মিথ্যাচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ ওয়াসেম। সে গৃহে যেয়ে মানুষের সামনে আত্মীয়-স্বজনের দোষত্রুটি পেশ করে এবং তাকে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে । পঞ্চম জলম্বুর। সে বাজারে থাকে এবং সকল প্রকার গোলযোগ সংঘটিত করে। শয়তানের ন্যায় ফেরেশতাদের মধ্যেও প্রাচুর্য রয়েছে। হযরত আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

وكل بالمؤمن ماة وستون ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذبون الذباب من قصعة العسل في اليوم الصائب لو بدأ لكم لرءيتموه على كل سهل وجبل باسطا يده فاعز فاه لو وكل العبد الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين .

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–মুমিনের উপর একশ' ষাট জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। তারা তার উপর থেকে এমন বিষয় প্রতিহত করে, যার সাধ্য তার নেই। তন্মধ্যে চোখের জন্যে সাত জন ফেরেশতা রয়েছে, যারা এমনভাবে প্রতিহত করে, যেমন গ্রীষ্মকালে মধুর পেয়ালা থেকে মাছি প্রতিহত করা হয়। যাকে প্রতিহত করা হয়, তা যদি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে দেখবে, সে প্রত্যেক নিম্নভূমি ও পাহাড়ের উপর বাহু প্রসারিত এবং মুখ বিস্তৃত করে রয়েছে। যদি মুমিন বান্দাকে এক মুহূর্তের জন্যেও তার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শয়তানরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

আইউব ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেন– আমি জেনেছি, আদম সন্তানের সাথে জিন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে– হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি শয়তানকে আমার শত্রু করে দিয়েছ। এখন তোমার সাহায্য না হলে আমি তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব না। এরশাদ হল ঃ তোমার যে সন্তান হবে, তার উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। তিনি আরজ করলেন ঃ আরও বেশী দান করা হোক। আদেশ হল ঃ যদি কেউ একটি পাপ করে, তবে এক পাপেরই শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পুণ্যের প্রতিদান দশ গুণ থেকে যত বেশী ইচ্ছা আমি দেব। এরপর আরও বেশী সাহায্যের আবেদন করলে আল্লাহ বললেন ঃ যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকবে, তওবার দরজা বন্ধ হবে না। অপর দিকে শয়তান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করল ঃ ইলাহী, তুমি মানুষকে আমা থেকে শ্রেষ্ঠ করেছ। এখন আমাকে সাহায্য করা না হলে আমি কিরূপে বিজয়ী হব? এরশাদ হল ঃ আদমের ঘরে যে সন্তান হবে, তার সাথে সাথে তোরও সন্তান হবে। সে আরজ করল, আরও বেশী সাহায্য দান করা হোক। আদেশ হল ঃ দেহে যেমন রক্ত চলাচল করে, তেমনি তুইও তাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করবি এবং তাদের বক্ষে আসন করে নিবি। শয়তান আরও সাহায্যের আবেদন করলে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ

اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطن الا غرورا .

অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ডেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে ওয়াদা দে। শয়তান তাদেরকে প্রবঞ্চনা ছাড়া কোন ওয়াদা দেয় না।

হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وحشاش الارض وصنف فى ظل كالريح فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله الانسان ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كما قال الله تعالى لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل وصنف اجسامهم كاجسام بنى ادم وارواحهم ارواح الشياطين ـ

–আল্লাহ তাআলা জিনকে তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী হচ্ছে সর্প, বিচ্ছু ও কীটপতঙ্গ। আরেক শ্রেণী হচ্ছে শূন্যস্থিত বায়ুর ন্যায়। আরেক শ্রেণীর কারণে সওয়াব ও আযাব দেয়া হয়। মানুষকেও আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ নিজে বলেন ঃ তাদের অন্তর আছে, যদ্দ্বারা তারা হৃদয়ঙ্গম করে না; তাদের চক্ষু আছে, যদ্দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে, যদ্দ্বারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং আরও নিকৃষ্ট। আরেক শ্রেণী এমন, যাদের দেহ মানুষের দেহের মত; কিন্তু আত্মা শয়তানদের মত। আরেক শ্রেণী তারা, যারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার ছায়ায় থাকবে। সেদিন আল্লাহ তাআলার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া হবে না।

ওহায়ব ইবনুল ওরদ বলেন ঃ শয়তান একবার হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ আমি আপনাকে উপদেশ দিতে চাই। তিনি বললেন ঃ তোর উপদেশের কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আদম সন্তানদের অবস্থা বর্ণনা কর। শয়তান বলল ঃ আমাদের কাছে আদম সন্তানরা তিন ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার তারা, যাদের কাছে আমরা যাই এবং প্ররোচনা দিয়ে বশীভূত করি; কিন্তু তারা এস্তেগফার ও তওবা করতে শুরু করে। ফলে আমাদের জমানো খেলা পণ্ড হয়ে যায়। পুনরায় যদি আমরা কিছু প্রচেষ্টা চালাই, তবে তারা পরেও তাই করে। এ প্রকার মানুষ আমাদের জন্যে খুবই কঠিন। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ আমাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাতে এমন থাকে, যেমন খেলোয়াড়ের হাতে বল থাকে। তাদেরকে আমরা যেদিকে ইচ্ছা পরিচালনা করি। এদের ব্যাপারে আমাদের কোন ভাবনা নেই। তৃতীয় প্রকার তারা, যারা আপনার মত নিষ্পাপ। তাদের উপর আমাদের কোন কারসাজি চলে না।

প্রকাশ থাকে যে, শয়তান আসল আকৃতিতেও দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিভিন্ন আকৃতিতেও। তবে শয়তান সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। ফেরেশতাগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের আসল আকৃতিও আছে। নবুওয়তের নূর দ্বারা তাদের আসল আকৃতি দেখা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈলকে আসল আকৃতিতে মাত্র দু'বার দেখেছিলেন। একবার তিনি স্বয়ং হযরত জিব্রাঈলকে তার আসল আকৃতি দেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। সেমতে জিব্রাঈল হেরা পর্বতে আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। দ্বিতীয়বার মেরাজের রাতে সিদরাতুল মুন্তাহায় তাকে আসল আকৃতিতে দেখেন। এছাড়া অন্যান্য সময় জিব্রাঈল হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে আগমন করেছেন। দেহইয়া কালবী (রাঃ) নেহায়েত সুশ্রী ছিলেন।

অধিকাংশ সময় কাশ্ফবিশিষ্ট বুযুর্গগণের সামনে আসল আকৃতির মিছাল তথা নমুনা ভেসে উঠে। উদাহরণতঃ শয়তান জাগ্রত অবস্থায় আকৃতি ধারণ করে তাদের দৃষ্টির সামনে আসে। তখন তারা শয়তানকে দেখেন এবং কথাও শুনেন। বলাবাহুল্য, কাশ্ফবিশিষ্ট বুযুর্গগণ জাগ্রত অবস্থায় এমন বিষয় জানতে পারেন, যা অন্যরা কেবল স্বপ্নেই জানতে পারে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই মর্মে দোয়া করে– ইলাহী, আমাকে মানুষের অন্তরের সেই স্থান দেখান– যেখানে শয়তান থাকে। এরপর সে স্বপ্নে দেখল, এক ব্যক্তির দেহ স্বচ্ছ স্ফটিকের মত; অর্থাৎ তার ভিতরের সবকিছু বাইরে থেকে দেখা যায়। শয়তান ব্যাঙের আকৃতিতে তার বাম ঝুটিতে কাঁধ ও কানের মধ্যস্থলে বসে আছে। সে তার চিকন ও লম্বা শুঁড় লোকটির অন্তরে প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকেই কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। লোকটি যখন যিকর করে, তখন শয়তান সরে যায়। এমনি ধরনের ব্যাপার কখনও জাগ্রত অবস্থায় হুবহু দেখা যায়। সেমতে জনৈক কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ দেখেন, শয়তান কুকুরের আকৃতি ধারণ করে মৃতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মানুষকে সেদিকে আহবান করছে। অর্থাৎ, তিনি দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যিকিরের সময় কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয় কি না

প্রকাশ থাকে যে, অন্তরের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী আলেমগণের এ বিষয়ে মতামত পাঁচ প্রকার। একদল আলেমের মত হচ্ছে, যিকির দ্বারা কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন– فاذا ذكر الله خنس অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান চুপ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলের উক্তি হচ্ছে, মূল কুমন্ত্রণা দূর হয় না– তার প্রভার বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, যখন যিকির দ্বারা অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়, তখন কুমন্ত্রণা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকলে কথার আওয়ায শুনেও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তৃতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, কুমন্ত্রণাও ছিন্ন হয় না এবং প্রভাবও বিনষ্ট হয় না; বরং প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কুমন্ত্রণা হয়, কিন্তু খুবই দুর্বল! চতুর্থ দল বলেন, সামান্য সময়ের যিকির দ্বারা কুমন্ত্রণা খতম হয়ে যায় এবং ততটুকু সময়ের কুমন্ত্রণা দ্বারা যিকির খতম হয়ে যায়। যিকির ও কুমন্ত্রণা একের পর এক দ্রুতগতিতে আসার কারণে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা চালু হয়ে যায়। উদাহরণতঃ একটি গোলকের গায়ে কয়েকটি আলাদা বিন্দু বসিয়ে যদি গোলকটিকে দ্রুতগতিতে ঘুরানো হয়, তবে সেই বিন্দুগুলো একটি গোলাকার চক্র বলে মনে হবে। কেননা, দ্রুতগতির কারণে বিন্দুগুলো মনে হবে যেন একটি অপরটির সাথে মিলিত। এই দল প্রমাণ পেশ করেন যে, উপরোক্ত হাদীসে 'শয়তান চুপ হয়ে যায়' বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যিকর করার সময় কুমন্ত্রণা অনুভব করি। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বর্ণিত উক্তি অনুযায়ীই হতে পারে। পঞ্চম দলের অভিমত হচ্ছে, কুমন্ত্রণা ও যিকির অন্তরের উপর সর্বদা একে অপরের পেছনে চলে এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। কোন ব্যক্তি একই অবস্থায় যেমন আপন চক্ষু দ্বারা দুই বস্তু দেখতে পারে, তেমনি অন্তরও দুই বস্তুর অবস্থানস্থলে হতে পারে। হাদীসে আছে ঃ

ما من عبد الا وله اربعة اعين عينان فى راسه يبصربها امر دنياه وعينان فى قلبه يصبر بها امر دينه .

–প্রত্যেক বান্দার চারটি করে চক্ষু আছে। দুটি তার মস্তকে, যদ্দারা সে তার দুনিয়ার ব্যাপারাদি দেখে এবং দু'টি অন্তরে, যদ্দারা সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আখেরাতের বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করে। এটি হযরত মুহাসেবীর মাযহাব। আমাদের মতে সবগুলো উক্তিই সঠিক, কিন্তু সর্বপ্রকার কুমন্ত্রণার কথা কোন এক উক্তিতে বর্ণিত হয়নি। প্রত্যেকেই যেমন কুমন্ত্রণা দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। তাই আমরা এক্ষণে কুমন্ত্রণার প্রকারভেদ বর্ণনা করব।

কুমন্ত্রণা তিন প্রকার। প্রথম, সত্য বিষয়কে সন্দিগ্ধ করে কুমন্ত্রণা দেয়া। উদাহরণতঃ শয়তান এভাবে বুঝাবে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা উচিত নয়। জীবনের অনেক কামনা-বাসনা এতদিন বিসর্জন দেয়া আযাব বৈ নয়। এসময় যদি বান্দা আল্লাহ তা'আলার হক, তাঁর বিরাট পুরস্কার ও শাস্তিকে স্মরণ করে এবং নিজেকে বুঝায় যে, কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা অবশ্যই কঠিন; কিন্তু জাহান্নামের অগ্নি সহ্য করা আরও অধিক কঠিন, তবে শয়তান প্রশ্রয় পাবে না, পালিয়ে যাবে। কেননা, শয়তান এ কথা বলবে না যে, দোযখের কষ্ট গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার কষ্টের তুলনায় হালকা এবং একথাও বলবে না যে, গোনাহের পরিণতি দোযখ ভোগ নয়। যদি বলেও, তবে কোরআনে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে বান্দা তার কথা শুনবে না। অনুরূপভাবে যদি আত্মম্ভরিতার জন্যে কুমন্ত্রণা দেয় এবং অন্তরে একথা জাগ্রত করে যে, আজ মারেফত ও এবাদতে তোমার সমতুল্য কেউ নেই, তবে শয়তান হটে যাবে। যদি বান্দা স্মরণ করে যে, তার মারেফত, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং আত্মম্ভরিতা কিসের? মোট কথা, এই প্রথম প্রকারের কুমন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। যারা আরেফ এবং ঈমানের আলোকে আলোকিত, তাদের কাছে এই প্রকার কুমন্ত্রণা থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়, কাম-প্রবৃত্তিকে গতিশীল করে কুমন্ত্রণা দেয়া। যদি কাম-প্রবৃত্তিকে এমন বিষয়ের প্রতি গতিশীল করে, যার সম্পর্কে বান্দা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, এটা গোনাহ্, তবে শয়তান কামভাব উত্তেজিত করা থেকে বিরত হবে না ঠিক; কিন্তু এমন উত্তেজিত করবে না, যাতে গতিশীলতা থাকে। পক্ষান্তরে যদি এমন বিষয়ের প্রতি গতিশীল করে, যার গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে বান্দা নিশ্চিত নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুমন্ত্রণা প্রভাবশালী হবে এবং তা দূর করার জন্যে সাধনার প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা থাকবে; কিন্তু স্তিমিত অবস্থায় থাকবে।

তৃতীয়, অনুপস্থিত বিষয় স্মরণ করিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়া। এতে অন্তর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখন যিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করে, তখন কুমন্ত্রণা কিছুটা দূর হয়ে যায় এবং পুনরায় এসে পড়ে। আবার দূর হয়ে যায় এবং আবার আসে। এমনিভাবে যিকির ও কুমন্ত্রণা একের পর এক আসতে থাকে। ফলে ধারণা হতে থাকে যে, উভয়েরই একটি অব্যাহত ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং যেন উভয় বিষয়ের ঠিকানা অন্তরে দুটি জায়গা। এ ধরনের কুমন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হওয়া সুকঠিন, তবে অসম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه .

–যে ব্যক্তি দু'রাকআত এমনভাবে নামায পড়ে যে, তাতে তার মন দুনিয়ার কোন কথা না বলে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

সুতরাং এটা অসম্ভব হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উল্লেখ করতেন না। হাঁ, আল্লাহর মহব্বতে পরিবেষ্টিত অন্তরেই এটা সম্ভব। কেননা, অন্তর যে বিষয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকে, সে বিষয় ছাড়া অন্তরে অন্য কোন কিছু আসে না। যেমন আশেক ব্যক্তি এশকের চিন্তায় নিমজ্জিত থাকলে তার অন্তরে মাশুকের কথা ছাড়া অন্য কিছু আসে না। সুতরাং কুমন্ত্রণার উপরোক্ত প্রকারত্রয় থেকে বুঝা যায়, বর্ণিত পাঁচটি মাযহাবই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য।

সারকথা, এক মুহূর্ত অথবা কিছু সময়ের জন্যে শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু সারা জীবনের জন্যে তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই অবান্তর; বরং অসম্ভব। কেননা, এটা সম্ভবপর হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন সময় কোন কুমন্ত্রণা হত না। অথচ কুমন্ত্রণা তাঁরও হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে– একবার নামাযে তিনি আপন বস্ত্রের কারুকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। নামাযান্তে সেই বস্ত্র খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ شغلنى من الصلوة এটা আমাকে নামাযে বাধা দিয়েছে। পুরুষের জন্যে স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। খোতবা পাঠ করার সময় সেটির উপর দৃষ্টিপাত হলে তিনি তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন– نظرة اليه ونظرة اليكم تولدت –আমি একবার এর দিকে এবং একবার তোমাদের দিকে দেখি। বস্ত্রের কারুকার্য ও স্বর্ণের আংটির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ ছিল কুমন্ত্রণা। তাই তিনি এগুলো দূরে নিক্ষেপ করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, সাংসারিক আসবাবপত্র ও টাকা পয়সার কুমন্ত্রণা তখনই ছিন্ন হবে, যখন এগুলো আলাদা করে দেয়া হবে। যে পর্যন্ত মালিকানায় একটি টাকাও থাকবে, শয়তান তারই কুমন্ত্রণা দেবে। একে কিভাবে মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা যায়, কিভাবে ব্যয় করা যায় এবং কিভাবে প্রকাশ করে বড়লোকী ফুটানো যায় ইত্যাদি বহু প্রকার কুমন্ত্রণা অন্তরে আসতে থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কাজ-কারবারে জড়িত হয়ে যে ব্যক্তি আশা করে যে, সে শয়তান থেকে মুক্তি পাবে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যে সর্বাঙ্গে মধু মেখে মনে করতে থাকে যে, এর উপর মাছি বসবে না। এটা অসম্ভব।

মোট কথা, দুনিয়া কুমন্ত্রণার একটি সুবৃহৎ ফটক। এতে গমন পথ একটি নয়– অসংখ্য। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ শয়তান প্রথমে মানুষের কাছে গোনাহের দিক থেকে আসে। এতে মানুষ অবাধ্য হলে উপদেশের ছলে আগমন করে এবং কোন বেদআতের সাথে জড়িত করে দেয়। এতেও মানুষ অবাধ্য হলে তাকে কঠোরতার আদেশ দিয়ে যা হারাম নয়, তাও হারাম করার প্রয়াস পায়। এতেও কাজ না হলে ওযু ও নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি এতেও কার্য সিদ্ধি না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে সৎকর্ম সহজ করে দেয়। অতঃপর সৎকর্মপরায়ণতার সুবাদে মানুষ যখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন শয়তান তাকে আত্মম্ভরিতার বেড়াজালে ফাঁসিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ কাজে শয়তান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং কোন ত্রুটির অবকাশ রাখে না। কেননা, শয়তান জানে, এ ফাঁদে আটকা না পড়লে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

পরিবর্তনের দিক দিয়ে অন্তরের প্রকারভেদ

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্তর বিভিন্ন পথে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক অন্তর এমন, যার উপর চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষিত হতে থাকে। একদিক থেকে কোন কিছুর প্রভাব তার উপর পড়লে দ্বিতীয় দিক থেকে তার বিপরীত কোন প্রভাব এসে যায়। ফলে প্রথম প্রভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ যদি শয়তান অন্তরকে মানসিক খেয়াল-খুশীর দিক থেকে টানে, তবে ফেরেশতা এসে তাকে সেই বিষয় থেকে বিরত রাখে। যদি এক শয়তান একটি মন্দ কাজ করতে বলে, তবে অন্য শয়তান তাকে অন্য দিকে টেনে নেয়। যদি এক ফেরেশতা অন্তরকে এক বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করে, তবে অন্য ফেরেশতা অন্য বস্তুর দিকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উৎসাহিত করে। সুতরাং অন্তর কখনও দু'ফেরেশতার টানা হেচঁড়ার মধ্যে থাকে, কখনও দু'শয়তানের এবং কখনও এক ফেরেশতা ও এক শয়তানের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়, কিন্তু কোন সময়েই অবসর পায় না। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে–

ونقلب افئدتهم وابصارهم

–আমি তাদের হৃদয় ও নয়নযুগল পাল্টে দেই।

আল্লাহ তাআলা অন্তরকে এক অভিনব বস্তুরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং একে অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছেন। এসব আশ্চর্যজনক বস্তু ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্যক অবহিত করা হয়েছিল। তাই তিনি প্রায়ই এভাবে কসম খেতেন ঃ ومقلب القلوب –অন্তর পরিবর্তনকারীর কসম।

এছাড়া তিনি প্রায়ই এই দোয়া করতেন– يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করতেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও অন্তরের ব্যাপারে ভীত? তিনি বলতেন– আল্লাহ ইচ্ছা করলে অন্তরকে সোজা রাখেন এবং বক্র করতে চাইলে বক্র করে দেন। এক রেওয়ায়েতে আছে– অন্তর চড়ুই পাখীর মত সর্বক্ষণ নাচানাচি করতে থাকে। হাদীসে অন্তরের আরও দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে–

مثل القلب فى تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها .

–পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্তর ডেগের মত, যখন তাতে খুব স্ফুটন আসে।

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

مثل القلب كمثل ريشة الارض ملاة تقلبها الرياح ظهر البطن

–অন্তর জঙ্গলের পাখীর মত, যাকে ঝড়ের বায়ু ওলট পালট করতে থাকে।

যারা আপন আপন অন্তরের অবস্থা দেখা-শুনা করে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোরাকাবায় মগ্ন থাকে, কেবল তারাই অন্তরের উপরোক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে।

ভাল অথবা মন্দের উপর অন্তরের প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এতদুভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থাকার ব্যাপারে অন্তর তিন প্রকার। প্রথম প্রকার সেই অন্তর, যা তাকওয়া ও খোদাভীতিতে পূর্ণ, সাধনা দ্বারা পরিশোধিত এবং কুঅভ্যাস থেকে পাক পবিত্র। এরূপ অন্তরে অদৃশ্যের ভাণ্ডার ও উর্ধ্বজগত থেকে প্রেরণা আসে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি সেই প্রেরণা নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপৃত হয়, যাতে তার কল্যাণ ও উপকারিতার রহস্য অবগত হওয়া যায়। এরপর অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা যখন রহস্য অবগত হয়ে যায়, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি বলে দেয় যে, এ কাজটি করা জরুরী। ফেরেশতা এই অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে, এর মূল উপাদান পরিষ্কার, বুদ্ধিমত্তার নূরে আলোকিত এবং ফেরেশতাদের থাকার যোগ্য। তখন বহু ফেরেশতা তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং একের পর এক অসংখ্য সৎকাজের প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এসব সৎকাজ তার জন্যে সহজও করে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى -

—অতঃপর যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তমকে গ্রহণ করে, আমি তার জন্যে সুখকর পরিণামের পথ সহজ করে দেই।

এই প্রকার অন্তরে মারেফতের সূর্য উদিত হয়, যার কিরণে গোপন শেরকও অদৃশ্য থাকে না। অথচ গোপন শিরক অন্ধকার রাতে কাল পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক রহস্যাবৃত থাকে। এমনিভাবে অন্যান্য গোপন বিষয়ও এই অন্তরের কাছে গোপন থাকে না। ফলে শয়তানের কোন চক্রান্ত সফল হয় না। শয়তান দাঁড়িয়ে প্রতারণার অনেক মাসআলাযুক্ত কথা বলে; কিন্তু অন্তর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। এই প্রকার অন্তর যখন বিনাশকারী বিষয়াদি থেকে পাক সাফ হয়ে যায়, তখন শোকর, সবর, ভয়, আশা, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, মহব্বত, সন্তুষ্টি, আগ্রহ, তাওয়াক্কুল, চিন্তাভাবনা, আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি উদ্ধারকারী গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হয়ে যায়। এরূপ অন্তরের প্রতিই আল্লাহ তাআলা অভিনিবেশ করেন এবং এরই নাম 'কলবে মুতমাইন্নাহ' তথা প্রশান্ত অন্তর, যা এই আয়াতে বুঝান হয়েছে— الا بذكر الله تطمئن القلوب

—খবরদার, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিম্নোক্ত আয়াতে এই অন্তরই উদ্দেশ্য–

ياايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك

–অর্থাৎ, হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পরওয়ারদেগারের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

দ্বিতীয় প্রকার অন্তর প্রথমটির বিপরীত। অর্থাৎ, খেয়াল-খুশীতে পরিপূর্ণ। বদভ্যাস দ্বারা কলুষিত। এই প্রকার অন্তরের সামনে শয়তানের দরজা থাকে উন্মুক্ত এবং ফেরেশতাদের দরজা তালাবদ্ধ। এরূপ অন্তরে অনিষ্টের সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে তার মধ্যে মানসিক খেয়াল-খুশীর একটি শংকা জাগরিত হয়। সে শাসক জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে উপযোগিতা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি পূর্ব থেকেই খেয়াল-খুশীর সেবায় অভ্যস্ত থাকে, সর্বদা তার খাতিরে কৌশল আবিষ্কারে রত থাকে এবং তারই মর্জি অনুযায়ী কাজ করে। তাই এখনও নফসেরই সহযোগিতা করে এবং তদনুযায়ী জওয়াব দেয়। ফলে খেয়াল-খুশীর বক্ষ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং তার তমসা বিস্তৃতি লাভ করে। জ্ঞান-বুদ্ধি পরাভূত হয়ে যায়। শয়তান সুযোগ পেয়ে খুব পা ছড়ায় এবং বাহ্যিক সাজসজ্জা, প্রতারণা, দীর্ঘ আশা এবং এমনি ধরনের অসার বিষয়সমূহের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকে। অবশেষে ঈমানের শাসন দুর্বল এবং বিশ্বাসের প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াদা, শাস্তি ও পরকাল ভীতির বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, খেয়াল-খুশীর একটি কাল ধূম্র নির্গত হয়ে অন্তরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্তরের নূরকে নিষ্প্রভ করে দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থা তখন এমন হয়ে যায়, যেমন কারও চোখ তীব্র ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সে দেখতে পারে না। কামভাবের প্রাবল্যের দরুন অন্তরের অবস্থা এমনি হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান ও সুমতি মোটেই থাকে না। সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে না এবং তৎপ্রতি কানও লাগায় না। এমতাবস্থায় শয়তান হামলা করে। কামভাবে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়াল-খুশীর ইচ্ছানুযায়ী গতিশীল হয়। এই প্রকার অন্তরের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইশারা করা হয়েছে–

ارءيت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا -

অর্থাৎ, আপনি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছেন, 'যে তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খেয়াল-খুশীকে আপন উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? আপনি কি তার দায়িত্ব নেবেন? না, আপনি ধারণা করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে অথবা বুঝে? তারা চতুষ্পদ জন্তু বৈ নয়; বরং তাদের পথ আরও অধিক ভ্রষ্ট।

لقد حق القول على اكثرهم فهم لايؤمنون

–তাদের অধিকাংশের জন্যে আল্লাহর শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না।

وسواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون তাদেরকে সতর্ক করা এবং না করা তাদের জন্যে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

কতক অন্তরের অবস্থা সকল প্রকার কাম-বাসনার ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে এবং কোন কোন অন্তর কতক কাম-বাসনার বেলায় এরূপ হয়। উদাহরণতঃ কতক লোক কতক গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু যখন কোন সুশ্রী চেহারার উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন সংযম হারিয়ে ফেলে, বুদ্ধি-বিবেচনা বিদায় হয়ে যায় এবং অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। কিছু লোক জাঁকজমক, প্রতিপত্তি ও অহংকারের সামগ্রী দেখলে তা অর্জন করার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। আবার কতক লোক নিজের সম্পর্কে কোন অপমানজনক উক্তি ও সমালোচনা শুনলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। কেউ কেউ টাকা-পয়সা নেয়ার সময় এমন রূঢ় হয়ে যায় যে, ভদ্রতা ও খোদাভীতির রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এ সবের কারণ, অন্তর খেয়াল-খুশীর কাল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং অন্তর্দৃষ্টির নূর ঘোলাটে হয়ে যায়। ফলে লজ্জা-শরম, ঈমান ও ভদ্রতাকে শিকায় রেখে শয়তানী অভিপ্রায় অর্জনের চেষ্টায় লেগে যায়।

তৃতীয় প্রকার অন্তর এমন, যার মধ্যে খেয়াল-খুশীর প্রবণতা প্রকাশ পায় এবং তাকে অনিষ্টের দিকে আকৃষ্ট করে। তখনই ঈমানের প্রবণতা আসে এবং তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। কামপূজারী নফস তখন অনিষ্টের প্রবণতার পক্ষপাতিত্ব করতে তৎপর হয়ে উঠে। এ সময় কামভাব কিছুটা প্রবল হয় এবং ভোগবিলাস ও আনন্দ ভাল মনে হতে থাকে। অতঃপর জ্ঞান-বুদ্ধি কল্যাণমুখী প্রবণতার প্রশংসা করে এবং কামপ্রবৃত্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বলে ঃ এটা মূর্খতার কাজ এবং চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুদের আচরণের অনুরূপ, যারা পরিণামের পরওয়া করে না এবং কুকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নফস জ্ঞান বুদ্ধির এই উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়। এ সময় শয়তান জ্ঞান-বুদ্ধির উপর হামলা চালায় এবং বলে ঃ শুষ্ক বৈরাগ্য কেমন? তুমি কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিরত হও কেন? দুনিয়ার আরও মানুষ কি ভোগবিলাসে মত্ত নয়? তোমার ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ ছাড়া কিছু নেই। মানুষ তোমাকে দেখে হাসবে। দেখ, অমুক অমুক ব্যক্তি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কেমন সুখে দিন যাপন করছে। তুমি মর্তবায় তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাও না কেন? অমুক আলেম ব্যক্তিও তো তাই করে। নিষিদ্ধ হলে সে এরূপ করত না। এ ধরনের কথা শুনে নফস শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন ফেরেশতা শয়তানের উপর চড়াও হয় এবং অন্তরকে এভাবে বুঝায়– যে ব্যক্তি ভোগ-বিলাসের পেছনে পড়ে এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে না, সে ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি কি ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে সন্তুষ্ট হয়ে চিরস্থায়ী বেহেশতী সুখ বর্জন করতে চাও? তুমি কি দোযখের আযাবের ভয়াবহতা কল্পনা করে কামপ্রবৃত্তিতে সবর করার কষ্ট সহ্য করতে পার না? অপরের অনুকরণে তুমি নিজের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাচ্ছ। এটা মস্ত বড় ধোঁকা। অপরের গোনাহ তোমার আযাব হালকা করবে না। অন্য মানুষ যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রতাপে চলাচল করে এবং তোমার একটি শীতল গৃহ থাকে, তবে তুমি অন্যদের সাথে রৌদ্র তাপের কষ্ট ভোগ করবে, না আপন গৃহে সুখে থাকবে? যদি অপরের সাথে রৌদ্রতাপে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার ভয় লাগে, তবে অপরের সাথে দোযখের আযাবে প্রবেশ করতে ভয় কর না কেন? এই উপদেশের ফলে নফস ফেরেশতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবে সে শয়তান ও ফেরেশতা উভয়ের দ্বন্দ্বে জড়িত থাকে। এমতাবস্থায় যদি অন্তরে শয়তানী স্বভাব প্রবল থাকে, তবে শয়তানেরই অনুগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি ফেরেশতার স্বভাব প্রবল থাকে, তবে শয়তানী প্ররোচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হয় না; বরং আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এমন কাজই প্রকাশ পায়, যদ্দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এটি তাকদীরগত ব্যাপার। কেননা, হাদীস অনুযায়ী মুমিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থিত। অর্থাৎ শয়তান ও ফেরেশতা এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে এবং অন্তর এদিক-ওদিক পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু এক পক্ষের দিকে চিরকাল অটল থাকা খুবই কম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان

يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

—আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সজোরে আকাশে আরোহণ করে।

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده -

—যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর প্রবল হবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে তোমাদের সাহায্য কে করবে?

এ থেকে জানা গেল, পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টকরণ তাঁরই কাজ। তাঁর আদেশ কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না এবং তাঁর ফয়সালা কেউ বিলম্বিত করতে পারে না। তিনিই জান্নাত সৃষ্টি করে তার জন্যে কিছু লোককে সৃষ্টি করেছেন এবং তেমনি কাজে নিয়োজিত করেছেন। দোযখও তাঁরই তৈরী এবং এর জন্যে কিছু লোক সৃজিত হয়েছে। তাদেরকেও তেমনি কাজে লাগানো হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহর ব্যাপার অনেক উর্ধ্বে– لايسئل عما يفعل وهم يسئلون তিনি যা করেন, তজ্জন্যে কারও কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

এ পর্যন্ত অন্তরের আশ্চর্যজনক অবস্থাসমূহের সামান্যই বর্ণিত হল। এর পূর্ণ বর্ণনা এলমে মোয়ামালায় সমীচীন নয়; বরং এলমে মোয়ামালার সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু বর্ণনা করেই এ আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা, চরিত্র সংশোধন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা

জানা উচিত, সচ্চরিত্রতা নবীকুল শিরোমণি (সাঃ)-এর একটি উজ্জ্বল গুণ। সিদ্দীকগণের আমলসমূহের মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক দ্বীনদারী, পরহেযগারদের সাধনার ফল এবং আবেদদের অধ্যবসায়ের পরিণতি একেই বলা উচিত। পক্ষান্তরে অসচ্চরিত্রতা মারাত্মক বিষতুল্য। অপমান, লাঞ্ছনা, অপকীর্তি ও অখ্যাতি এর মাধ্যমেই হয়। এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের দলে গ্রথিত করে দেয়। মোট কথা, অসচ্চরিত্রতা অন্তরের এমন ব্যাধি, যদ্দ্বারা চিরন্তন জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। দৈহিক রোগ কেবল দৈহিক জীবনকেই ব্যাহত করে।

চিকিৎসকগণ এমন রোগের চিকিৎসা করে, যদ্দ্বারা ধ্বংসশীল জীবনের ধারা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্যে তারা নীতিমালা, রোগ নিরূপণ ও উপসর্গ নির্ণয় পদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করে। সুতরাং অন্তরের যেসব ব্যাধির কারণে চিরন্তন জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেগুলোর চিকিৎসার জন্যেও আইন-কানুন রচনা করা অত্যাবশ্যক। এই চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। কেননা, প্রত্যেক অন্তরে কোন না কোন ব্যাধি অবশ্যই থাকে। যদি এর চিকিৎসা করা না হয়, তবে এ থেকে শত শত দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মলাভ করতে পারে। কাজেই অন্তরের এই রোগ চেনা, তার কারণসমূহ জানা এবং এর সুচিকিৎসার জন্যে তৎপর হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য। কোরআনের বাণী قد افلح من زكها (যে একে শুদ্ধ করে, সে সফলকাম হয়।) –এতে অন্তরের চিকিৎসাই উদ্দেশ্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে অন্তরের কতক রোগ ও তার চিকিৎসা সংক্ষেপে বর্ণনা করব। বিস্তারিত বর্ণনা পরে পৃথকভাবে আসবে।

সচ্চরিত্রতার ফযীলত ও অসচ্চরিত্রতার নিন্দা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করে বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

انك لعلى خلق عظيم

–নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল কোরআন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে–

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجهلين ـ

অর্থাৎ, ক্ষমা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের থেকে নিবৃত্ত থাকুন।

এই আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিব্রাঈলকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অতঃপর জিব্রাঈল আকাশে গেলেন এবং ফিরে এসে আরজ করলেন ঃ এর উদ্দেশ্য, যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। যে আপনাকে না দেয়, আপনি তাকে দেবেন এবং যে আপনার প্রতি অন্যায় করে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

অর্থাৎ, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি।

তিনি আরও বলেন ঃ

اثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী বস্তু যা রাখা হবে, তা হবে আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতা।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ধর্ম কি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রবান হওয়া। এরপর লোকটি ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এসে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও প্রত্যেক বার তাকে একই জওয়াব দিলেন, অবশেষে বললেন ঃ اما تفقه هو ان لاتغضب –তুমি কি বুঝ না? এটা হচ্ছে তোমার ক্রুদ্ধ না হওয়া। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ অশুভ ব্যাপার কি?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি বললেন ঃ سؤ الخلق অর্থাৎ, অসচ্চরিত্রতা। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। সে আরজ করল ঃ আরও বলুন। এরশাদ হল ঃ কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তার পশ্চাতে সৎকাজ কর। এতে সেই গোনাহ্ মিটে যাবে। লোকটি বলল ঃ আরও বলুন। তিনি বললেন ঃ خالق الناس بخلق حسن মানুষের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রতা। হযরত ফোযায়ল থেকে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ বলল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু তার চরিত্র খারাপ। সে মুখ দ্বারা পড়শীদেরকে পীড়ন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ لاخير فيها هى من اهل النار তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই; সে দোযখী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– সর্বপ্রথম দাঁড়িপাল্লায় যে বস্তু ওজন করা হবে, তা হবে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা। আল্লাহ তাআলা যখন ঈমান সৃষ্টি করলেন, তখন ঈমান বলল ঃ ইলাহী, আমাকে শক্তি দান কর। সেমতে আল্লাহ তাকে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা দ্বারা শক্তিশালী করলেন। কুফর সৃষ্টি করার পর সেও আল্লাহর কাছে শক্তি প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাকে কৃপণতা ও অসচ্চরিত্রতা দিয়ে জোরদার করলেন। হযরত জারীর ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুশ্রী করেছেন। অতএব তুমি তোমার চরিত্রও সুন্দর কর। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (সাঃ) সর্বাধিক সুশ্রী ও সর্বাধিক চরিত্রবান ছিলেন। হযরত আবু মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া ছিল এই– اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দৈহিক সৌন্দর্য দান করেছেন। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করুন। ওসামা ইবনে শরীক (রাঃ) বলেন ঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন বেদুঈনরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল– বান্দাকে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি দান করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রতা। বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর কাছে কয়েকজন কোরায়শ মহিলা সমবেত ছিল এবং জোরে জোরে কথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলছিল। হযরত ওমরের আওয়ায শুনে তারা দ্রুতবেগে পর্দার আড়ালে চলে গেল। হযরত ওমর (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হাস্যরত পেলেন। তিনি হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কয়েকজন মহিলার আচরণ আমার হাসির কারণ। একটু আগে তারা আমার কাছে ছিল। তোমার আগমন টের পেয়ে তারা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হুযুর, আপনিই তো ভয় করার অধিক যোগ্য ছিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বললেন ঃ বেকুবরা, তোমরা আমাকে ভয় কর, আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ভয় কর না? তারা জওয়াব দিল ঃ হাঁ, তোমাকেই ভয় করি। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তুলনায় রূঢ়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الاسلك فجا غير فجك .

অর্থাৎ, হে ইবনুল খাত্তাব, আল্লাহর কসম! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখবে, সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে।

এক হাদীসে আছে ঃ ان العبد ليبلغ من سوء خلقه اسفل درك جهنم –নিশ্চয় বান্দা তার অসচ্চরিত্রতার কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।

লোকমান হাকীমকে তার পুত্র জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে কোন্ স্বভাবটি উত্তম। তিনি বললেনঃ ধর্মপরায়ণতা। পুত্র বলল ঃ দুটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ ধর্মপরায়ণতা ও ধনাঢ্যতা। প্রশ্ন হল ঃ তিনটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? উত্তর হল ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা ও লজ্জাশীলতা। আবার প্রশ্ন হল ঃ চারটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? জওয়াব হল ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা, লজ্জাশীলতা ও সচ্চরিত্রতা। পুত্র আবার জিজ্ঞেস করল ঃ যদি পাঁচটি হয়? তিনি বললেন ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা, লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা। প্রশ্ন হল ঃ যদি ছয়টি হয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ বৎস, এই পাঁচটি স্বভাবের সমাবেশ ঘটলেই মানুষ পরিষ্কার পরহেযগার, আল্লাহর ওলী ও শয়তান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বেশীর কি প্রয়োজন? হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যে অসচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, সে নিজেকে পীড়ন করে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার সচ্চরিত্রতার বদৌলত জান্নাতের উচ্চস্তরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পৌঁছে যায়, যদিও এবাদত না করে এবং অসচ্চরিত্রতার কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়, যদিও সে আবেদ হয়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ চরিত্রহীন মানুষ ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্রের ন্যায়, যা জোড়া লয় না এবং মাটিও হয়ে যায় না। বর্ণিত আছে, একবার ছহব ইবনুল মোবারকের সঙ্গে জনৈক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সফরে রওয়ানা হয়। তিনি তাকে খুব আদর যত্ন করতে থাকেন। সফরের পর যখন লোকটি আলাদা হয়ে গেল, তখন তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। লোকেরা ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তার প্রতি আমার করুণা হয়। আমি তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি; কিন্তু তার অসচ্চরিত্রতা তার সাথেই রয়ে গেছে– আলাদা হয়নি। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেন ঃ মানুষের চারটি অভ্যাস এমন যে, আমল ও এলেম কম হলেও সে উচ্চ মর্তবা লাভ করতে পারে। অভ্যাসগুলো হচ্ছে– সহনশীলতা, নম্রতা, দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতা। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ অসচ্চরিত্রতা এমন একটি বিপদ, যা থাকলে সৎ কর্মের আধিক্যও উপকারী হয় না। পক্ষান্তরে সচ্চরিত্রতা এমন শোভা যে, এটা থাকলে মন্দ কাজের প্রাচুর্যও তেমন ক্ষতিকর হয় না। হযরত ইবনে আব্বাসকে কেউ বংশমর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ যার চরিত্র যত বেশী ভাল, সে বংশমর্যাদায় ততবেশী সম্ভ্রান্ত। হযরত ইবনে আতা বলেন ঃ গৌরবের আসন একমাত্র সচ্চরিত্রতা দ্বারাই অর্জিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ সচ্চরিত্রতায় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। চরিত্রে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তারাই যারা এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করে চলে।

সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতার স্বরূপ

সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেকেই অনেক কিছু লেখেছেন; কিন্তু এর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সকলেই নীরব। কেবল এর ফলাফল ও পরিণতি লিখিত হয়েছে, তাও পূর্ণ মাত্রায় নয়; বরং যার যা বুঝে এসেছে, তাই লেখেছেন। তার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও ফলাফল বিস্তারিতভাবে কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। আমরা এখানে সে সবের কিছু উদ্ধৃত করছি।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ সচ্চরিত্রতা হচ্ছে মনখোলা থাকা, অর্থসম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। ওয়াসেতী বলেন ঃ দরিদ্রতায় ও ধনাঢ্যতায় মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা। শাহ কিরিয়ানী বলেন ঃ কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং কষ্ট সহ্য করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবু ওসমান বলেন ঃ উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। সহল তস্তরীকে সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া; বরং যালেমের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা করা এবং তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করা। তাঁর অপর উক্তি এই ঃ রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কুধারণা না করা, তাঁর উপর ভরসা করা এবং যে বিষয়ের তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পূর্ণ হয়ে গেলে চুপ থাকা; তাঁর হক ও বান্দার হকে তাঁর নাফরমানী না করা; বরং আনুগত্য করা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সচ্চরিত্রতা তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত; হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা, হালাল রুজি অন্বেষণ করা এবং পরিজনের উপর অধিক ব্যয় না করা। আবু সাঈদ খেরায বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর দিকে প্রত্যাশী না হওয়ার নাম সচ্চরিত্রতা। এমনি ধরনের আরও অনেক উক্তির মধ্যে কেবল সচ্চরিত্রতার ফলাফল উল্লিখিত হয়েছে এবং স্বয়ং সচ্চরিত্রতার স্বরূপ বর্ণিত হয়নি। তাই এক্ষণে আমরা এর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

জানা উচিত, আরবীতে 'খালক' ও 'খুল্ক'— এ দু'টি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, অমুক ব্যক্তির খালক ও খুলক উভয়টি ভাল। অর্থাৎ, সে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যের অধিকারী। সুতরাং জানা গেল, 'খাল্ক' বলে বাহ্যিক আকৃতি এবং 'খুলক' বলে অভ্যন্তরীণ আকৃতি বুঝানো হয়। কেননা, মানুষ দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। একটি দেহ, যা চোখে দেখা যায় এবং অপরটি আত্মা অর্থাৎ, নফস, যা অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক দ্বারা জানা যায়। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির একটি আকৃতি আছে— ভাল হোক অথবা মন্দ। যে নফস বিবেকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তার মান-মর্যাদা দেহের তুলনায় বেশী। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলাও একে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যাতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন ঃ

انى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين -

অর্থাৎ, আমি একটি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে দেই এবং তার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁকে দেই, তখন তোমরা (হে ফেরেশতাকুল) তার উদ্দেশে সেজদায় লুটিয়ে পড়।

এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, দেহ সম্বন্ধযুক্ত মাটির সাথে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রূহ তথা আত্মা সম্বন্ধযুক্ত আল্লাহ্ তাআলার সাথে। এখানে রূহ্ ও নফ্স একই বস্তু।

মোট কথা, 'খুলক' (চরিত্র) শব্দের সংজ্ঞা, খুল্ক নফসের মধ্যে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যদ্দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতি দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় সচ্চরিত্রতা। পক্ষান্তরে যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায়, তবে তার নাম হয় অসচ্চরিত্রতা। এখানে "নফসের মধ্যে বদ্ধমূল" বলার কারণ, যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে কোন প্রয়োজনে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করে দেয়, তবে একে দানশীলতারূপী সচ্চরিত্রতা বলা হবে না, যে পর্যন্ত এটা তার অন্তরের বদ্ধমূল অভ্যাস না হয়। ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে "চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে" কথাটি যোগ করার কারণ, যদি কেউ অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রয়াস সহকারে অর্থ ব্যয় করে অথবা আপন ক্রোধকে দমন করে, তবে একে দানশীলতা ও সহনশীলতার চরিত্র বলা হবে না। মোট কথা, এখানে চারটি বিষয় জরুরী। (১) ভাল অথবা মন্দ ক্রিয়াকর্ম, (২) তাতে সক্ষমতা, (৩) তাকে চেনা এবং (৪) নফসের মধ্যে এমন আকৃতি থাকা, যদ্দ্বারা ভাল অথবা মন্দের মধ্য থেকে একটি সহজ হয়ে যায়। সুতরাং শুধু ক্রিয়াকর্মকে চরিত্র বলা হবে না। কেননা, অনেক মানুষের মধ্যে দানশীলতার চরিত্র আছে; কিন্তু নিঃস্বতা অথবা অন্য কোন কারণে দান করতে পারে না। কিংবা কতক লোকের মধ্যে কৃপণতার চরিত্র আছে, কিন্তু লোক দেখানোর উদ্দেশে দান করে। সক্ষমতার নামও চরিত্র নয়। কেননা, সক্ষমতার সম্বন্ধ দানশীলতা ও কৃপণতার সাথে সমান এবং প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে দানশীলতা ও কৃপণতার ক্ষমতা রাখে। এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে কৃপণতা ও দানশীলতার চরিত্র আছে। কেবল চেনাও চরিত্র নয়। কেননা, চেনাও সক্ষমতার ন্যায় ভাল মন্দ উভয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ, যে আকৃতি দ্বারা নফস ভাল ও মন্দ ক্রিয়াকর্মের জন্যে তৎপর হয় তারই নাম চরিত্র। বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমন শুধু একটি অঙ্গ– উদাহরণতঃ নেত্রদ্বয় সুন্দর হলেই পূর্ণাঙ্গ হয় না; বরং নাক, মুখ, গণ্ড সবগুলো সুশ্রী হলে বাহ্যিক সৌন্দর্য পূর্ণ হয়; তেমনি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের জন্যে চারটি বিষয় রয়েছে। এগুলো সুন্দর হলে সচ্চরিত্রতা পূর্ণাঙ্গ হবে। অর্থাৎ কারও মধ্যে যখন এ চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে সুসমন্বিত থাকবে, তখন তাকে সচ্চরিত্র বলা হবে। এ চারটি বিষয় হচ্ছে জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, কামশক্তি ও সমতাশক্তি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়কে সমতার পর্যায়ে রাখার ক্ষমতা। জ্ঞানশক্তির উপকারিতা হচ্ছে, মানুষ এর মাধ্যমে কথাবার্তায় সত্য, মিথ্যা, বিশ্বাসে হক ও বাতিল এবং কাজে, কর্মে ভাল ও মন্দ জেনে নেয়। জ্ঞানশক্তি এরূপ হয়ে গেলে তার ফলস্বরূপ প্রজ্ঞা অর্জিত হয়, যা সকল সচ্চরিত্রতার মূল এবং যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا -

অর্থাৎ, যে প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

আর ক্রোধশক্তি এবং কামশক্তির ফায়দা হচ্ছে ক্রোধ ও কাম উভয়টি প্রজ্ঞা অনুযায়ী হবে এবং প্রজ্ঞার ইশারায় পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, বুদ্ধি ও শরীয়ত যা পছন্দ করে, তেমনই আমল করবে। সমতাশক্তির উদ্দেশ্যও তাই, অর্থাৎ,. ক্রোধ ও কামকে বুদ্ধি ও শরীয়তের অনুসারী করে দেয়ার ক্ষমতা হবে।

যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে বিদ্যমান থাকবে, তাকে সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্র বলা হবে। যার মধ্যে কেবল একটি বিষয় অথবা দু'টি বিষয় থাকবে, তাকে সেদিক দিয়েই চরিত্রবান বলা হবে, যেমন মুখমণ্ডলের কোন কোন অংশ সুশ্রী হলে সেই অংশকেই সুশ্রী বলা হয়, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলকে সুশ্রী বলা হয় না। ক্রোধশক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় বীরত্ব এবং কামশক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় সাধুতা। এ দু'টি পর্যায়ই প্রশংসনীয়। এতে কমবেশী নিন্দনীয়।

জানা দরকার, জ্ঞানশক্তির সমতা দ্বারা সুপরিচালন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, বিশুদ্ধ অভিমত, সূক্ষ্ম আমল ও নফসের গোপন আপদ সম্পর্কিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর বাহুল্য দ্বারা ধোকা, প্রতারণা ও বিদ্বেষ জন্মলাভ করে। এর স্বল্পতা দ্বারা অনভিজ্ঞতা, অচেতনতা, নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদনা অস্তিত্ব লাভ করে। ক্রোধশক্তির সমতা অর্থাৎ, বীরত্ব থেকে যে যে গুণের সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে– দয়া, সাহসিকতা, ঔদার্য, বিনয়, সহনশীলতা, ক্রোধ দমন, গাম্ভীর্য ইত্যাদি। এর বাহুল্য থেকে অহংকার, আস্ফালন, রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া, অহমিকা ইত্যাদি স্বভাব জন্মলাভ করে এবং এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, অপমান, লাঞ্ছনা, ভয়, জরুরী কাজে সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি। দোষ প্রকাশ পায়। কামশক্তির সমতা অর্থাৎ, সাধুতা থেকে সৃষ্ট গুণাবলী এই ঃ দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, সবর, অল্পে তুষ্টি, পরহেযগারী, নির্লোভ হওয়া ইত্যাদি এর স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে সৃষ্ট স্বভাবগুলো এই ঃ লালসা, নির্লজ্জতা, অপব্যয়, পরিজনের জন্যে কম ব্যয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা, বেইয্যতী, অশ্লীলতা, অনর্থক খোশামোদ, হিংসা, অপরের দুঃখে হাসা, ধনীদের মধ্যে লাঞ্ছিত হওয়া, ফকীরদেরকে হেয় মনে করা ইত্যাদি। মোট কথা, উপরোক্ত প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাধুতা ও মিতাচার,– এ চারটি বিষয় হচ্ছে চরিত্র মাধুর্যের মূল। অবশিষ্ট সবগুলো এসবের শাখা-প্রশাখা। এ চারটি বিষয়েরই পূর্ণ সমতার পর্যায় রসূলে আকরাম (সাঃ) ছাড়া অপর কারও নছীব হয়নি। তাঁর পরে সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে ব্যক্তি এসব চরিত্রে তাঁর যত বেশী নিকটবর্তী, সে সেই পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী। আর যে দূরবর্তী, সে দূরবর্তী। যে ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো চরিত্র বিদ্যমান, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, সকল মানুষ তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব বিশেষণে বিশেষিত নয়; বরং এগুলোর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, তাকে জনবসতি থেকে বের করে দেয়া হবে। কেননা, সে বিতাড়িত শয়তানের নিকটবর্তী।

কোরআন মজীদেও মুমিনদের গুণাবলীতে উপরোক্ত চরিত্রসমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ـ

অর্থাৎ, মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এর পর সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করেছে। তারাই সাচ্চা।

আল্লাহ ও রসূলের প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা বিশ্বাসশক্তির মাধ্যমে হয়, যা বুদ্ধির ফল ও প্রজ্ঞার চরম পরিণতি। ধনসম্পদের বিনিময়ে জেহাদ করা দানশীলতা, যা কামশক্তিকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে হয়। প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ হচ্ছে বীরত্ব, যা ক্রোধশক্তিকে সমতার পর্যায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলা হয়েছে–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর এবং পরস্পরে দয়াশীল।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কঠোরতা ও দয়া পৃথক পৃথক পাত্রে হয়। সুতরাং না সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা করা পূর্ণতা, না সর্বক্ষেত্রে দয়া।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাধনা দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া না হওয়া

যাদের উপর বাতিল বিশ্বাসের প্রধান্য রয়েছে, তাদের জন্যে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে অধ্যবসায় ও সাধনা করা কঠিন। এই শ্রেণীর লোকেরা বলে যে, চরিত্রে পরিবর্তন হতেই পারে না। তারা এই দাবীর দুটি কারণ বর্ণনা করে থাকে। প্রথম হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ আকৃতির নাম হচ্ছে 'খুল্‌ক' তথা চরিত্র। যেমন বাহ্যিক আকৃতিকে বলা হয় 'খাল্‌ক'। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ বেঁটে ব্যক্তি তার দৈহিক উচ্চতা বাড়াতে পারে না এবং দীর্ঘদেহী ব্যক্তি বেঁটে হতে পারে না। তেমনি কুশ্রী ব্যক্তি সুশ্রী এবং সুশ্রী কুশ্রী হতে পারে না। সুতরাং অভ্যন্তরীণ দোষকে এমনি মনে করে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কারণ, সচ্চরিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন। দীর্ঘ সাধনা দ্বারা জানা গেছে, এগুলোর মূলোৎপাটন কখনও হয় না। কারণ, এগুলো হচ্ছে মেযাজ ও স্বভাবের দাবী। সুতরাং সাধনার পেছনে পড়া নিষ্ফল ও জীবনকে বিনষ্ট করার নামান্তর। এক্ষণে আমরা এ দু'টি কারণের জওয়াব লিপিবদ্ধ করছি।

যদি চরিত্রে পরিবর্তন না হত, তবে ওয়ায, নসীহত, শাসন ইত্যাদি সমস্তই পন্ডশ্রম হত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন বলতেন যে حَسِّنُوا اَخْلَاقَكُمْ –তোমরা তোমাদের চরিত্র সুন্দর কর? মানুষ তো দূরের কথা, এই পরিবর্তন জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও সম্ভবপর। দেখ, বাজপাখীর পলায়নী স্বভাব কিরূপে মেলামেশায় পরিবর্তিত হয়ে যায়? তালীমের প্রভাবে শিকারী কুকুর কেমন সুশিক্ষিত হয়ে যায়? সে শিকারকে শুধু ধরে ফেলে, লোভ মোটেই করে না। অবাধ্য ঘোড়া সহিসের কেমন অনুগত ও বাধ্য হয়ে যায়। এগুলো চরিত্রের পরিবর্তন নয় তো কি? এক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব জগতের কতক বস্তু এমন, যেগুলোর অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ। তাতে যে যে বিষয়ের প্রয়োজন ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন মানুষের ইচ্ছায় তাতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন আকাশ, নক্ষত্র ও মানুষ এবং জীবজন্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর কতক বস্তু এমন, যার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে নিহিত আছে। পূর্ণতার শর্তাদি পাওয়া গেলে সে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছতে পারে। এসব শর্ত কখনও মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে। উদাহরণতঃ আমের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আঁটি ফলও নয়, বৃক্ষও নয়; কিন্তু এমনভাবে সৃজিত যে, মামুলী পরিচর্যা করলে তা বৃক্ষ হতে পারে। যখন আঁটি বান্দার ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তখন ক্রোধ ও কাম পরিবর্তিত হয়ে গেলে তা অবান্তর হবে কেন? তবে মোটেই কোন প্রভাব থাকবে না– এভাবে মূল্যোৎপাটন করা আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু এগুলোকে দাবিয়ে রাখা এবং অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা বশে রাখা সম্ভবপর। আমাদের প্রতি আদেশও তাই এবং এটাই আমাদের মুক্তি ও আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার উপায়। হাঁ, মানুষের স্বভাব বিভিন্নরূপ। কতক স্বভাব দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং কতক বিলম্বে। স্বভাবের বিভিন্নতার কারণ দুটি। এক, যাকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য, জন্মের গোড়া থেকে স্বভাবের সাথে তার জড়িত থাকা। উদাহরণতঃ কাম, ক্রোধ ও অহংকার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু কামকে পরিবর্তন করা সর্বাধিক কঠিন। কেননা, এটা জন্মের গোড়া থেকে মানুষের সাথে রয়েছে। সেমতে শৈশব থেকে শিশুর খাহেশ হয়। ক্রোধ প্রায়শ সাত বছর বয়সে সৃষ্টি হয়। এর পর বিচারশক্তি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ, স্বভাব কখনও অধিক কর্ম দ্বারাও মযবুত হয়। মানুষ স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে এবং একেই পছন্দনীয় ও উৎকৃষ্ট মনে করে। এক্ষেত্রে মানুষের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম হচ্ছে, মানুষ যেমন জন্মগ্রহণ করে, তেমনি থেকে যায় এবং সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। সকল বিশ্বাস থেকে গাফেল ও মুক্ত। এমন মানুষের চিকিৎসা দ্রুত সম্ভবপর। তার জন্যে কেবল একজন ওস্তাদ ও মুর্শিদ প্রয়োজন হয়। মনের মধ্যে সাধনার প্রেরণা থাকলে অল্প দিনের মধ্যে তার চরিত্র সংশোধিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর এমন মানুষ, যে মন্দ কাজের জ্ঞান তো রাখে, কিন্তু সৎকর্মে অভ্যস্ত নয়। মন্দ কাজকেই ভাল মনে করে। এ ব্যাপারে সে তার খাহেশের অনুসারী এবং বিশুদ্ধ মতের প্রতি বিমুখ। এতদসত্ত্বেও আপন কর্মের ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এরূপ ব্যক্তির সৎপথে আসা প্রথম স্তরের তুলনায় কঠিন। কেননা, এতে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন হবে– এক, কুকর্ম ত্যাগ করানো এবং দুই, সৎকর্মের অভ্যাস গড়ে তোলা। মোট কথা, এরূপ ব্যক্তি সাধনায় বিশেষভাবে তৎপর হলে প্রভাবিত হতে পারে। তৃতীয় স্তর এমন মানুষ, যে বিশ্বাস করে যে, চরিত্রহীনতার কাজ খুব ভাল এবং তা করা ওয়াজিব। তার লালন-পালনও চরিত্রহীনতার উপর হয়। এরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। তার সংশোধনের আশা নেই। কেননা, এখানে গোমরাহীর কারণ অনেক। চতুর্থ স্তর এমন মানুষ, যে কুকর্মে লালিত-পালিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক মন্দ কাজ করা এবং মানুষের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধ্বংস সাধন করাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কাজ মনে করে। এ স্তরটি সর্বাধিক গুরুতর। উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে নির্ভেজাল মূর্খ, দ্বিতীয় স্তর গোমরাহ মূর্খ, তৃতীয় স্তর মূর্খ ও গোমরাহ ফাসেক এবং চতুর্থ স্তর মূর্খ, গোমরাহ, ফাসেক ও দুর্মতি।

এখন দ্বিতীয় কারণের জওয়াব শুনুন। তাদের উক্তি হচ্ছে, সচ্চরিত্রতার দ্বারা কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য। মানুষের মধ্যে এটা অসম্ভব। বাস্তব সত্য হল, মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য নয়; বরং কাম-ক্রোধও মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। মানব চরিত্রে এগুলো থাকাও জরুরী। যদি মানুষের মধ্যে আহারের খাহেশ না থাকে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা যদি সহবাসের খাহেশ না থাকে, তবে বংশবিস্তার ব্যাহত হবে। অনুরূপভাবে ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলে ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহকে প্রতিহত করতে পারবে না। ফলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। মোট কথা, কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বল্পতা ও বাহুল্য বর্জন করে এগুলোকে সমতার পর্যায়ে রাখাই লক্ষ্য। কোন মানুষ কাম ও ক্রোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। কেননা, পয়গম্বরগণও এগুলো থেকে মুক্ত ছিলেন না। হাদীসে আছে ঃ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ –আমি তো মানুষ বৈ নই। মানুষ যেমন রাগ করে, আমিও তেমনি রাগ করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে মরযীর খেলাফ কোন কিছু বর্ণিত হলে রাগে তাঁর গণ্ডদেশ লাল হয়ে যেত, কিন্তু তখনও সত্য কথাই বলতেন। ক্রোধও তাঁকে সত্যের গণ্ডির বাইরে যেতে দিত না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ –এতে এমন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা রাগ করে, কিন্তু রাগকে দাবিয়ে রাখে। একথা নাই যে, তারা রাগই করে না। এ থেকে জানা গেল, কাম ও ক্রোধের সমতার পর্যায়ে আসা সম্ভবপর। চরিত্রের পরিবর্তন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য তাই। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। চরিত্রের মধ্যে স্বল্পতা ও বাহুল্যের স্তর উদ্দেশ্য নয়, বরং মধ্যবর্তী স্তর কাম্য। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত–

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

–তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না; বরং মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে।

এতে দানশীলতার প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী স্তর। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ـ

অর্থাৎ, তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং তাকে পুরাপুরি প্রসারিতও করো না।

অনুরূপভাবে খানাপিনার খাহেশে সমতা কাম্য লালসা ও অনীহা অপছন্দনীয়। আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

অর্থাৎ, খাও, পান কর- অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

হাদীসে বলা হয়েছে- خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا -সব ব্যাপারে মধ্যবর্তী স্তরই উত্তম।

সচ্চরিত্রতা কিরূপে অর্জিত হয়?

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সচ্চরিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কামশক্তি ও ক্রোধশক্তির সমতা এবং এগুলো শরীয়তের অনুগত হওয়া। এ বিষয়টি দুই উপায়ে অর্জিত হয়। প্রথম, আল্লাহ তাআলার দান হিসেবে। অর্থাৎ, জন্মলগ্ন থেকে মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী ও চরিত্রবান হবে। কাম ও ক্রোধ তার উপর প্রবল হবে না; বরং উভয়টি শরীয়তের অনুগত থাকবে। এরূপ ব্যক্তি তালীম ছাড়াই আলেম হয়ে যায়। যেমন হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এমন বিষয় মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে থাকা অবান্তর নয়। অধিকাংশ শিশু শুরু থেকেই দাতা, নির্ভীক ও স্পষ্টভাষীরূপে জন্ম গ্রহণ করে। কতক এর বিপরীত হয়, কিন্তু অন্যদের সাথে মেলামেশায় এটা তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। আবার কখনও শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় উপায়- অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে চরিত্র অর্জন করা। অর্থাৎ নফসকে এমন কাজে নিয়োজিত করা, যদ্দ্বারা চরিত্রের প্রার্থিত বিষয় হাসিল হয়ে যায়। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি দানশীলতার চরিত্র অর্জন করতে চায়, সে কষ্ট সহকারে দানশীলদের কাজ অর্থাৎ অর্থ ব্যয় অবলম্বন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে সব সময় এ কাজ করতে থাকবে। অবশেষে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। ফলে সে দানশীল হয়ে যাবে। শরীয়তের উৎকৃষ্ট চরিত্রাবলী এমনিভাবে অর্জিত হতে পারে। এর চূড়ান্ত হচ্ছে, এ কাজে সংশিষ্ট আনন্দ অনুভব করবে। উদাহরণতঃ দানশীল তাকেই বলা হবে, যে অর্থব্যয় করে আনন্দ অনুভব করে। হাদীসে আছে ঃ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ –নামাযে আমার চোখের শীতলতা নিহিত আছে। যে পর্যন্ত এবাদত ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন খারাপ মনে হবে এবং নফস কঠিন মনে করবে, সে পর্যন্ত ত্রুটি থেকে যাবে, পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ –নিশ্চয় এটা কঠিন, কিন্তু বিনয়ীদের জন্যে কঠিন নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اُعْبُدِ اللّٰهَ فِى الرِّضَاءِ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَفِى الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদত সন্তুষ্টির অবস্থায় কর। যদি সক্ষম না হও, তবে অসহনীয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক বরকত আছে।

উপস্থিত সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট নয় যে, কখনও এবাদতে মজা পাবে ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হবে এবং কখনও হবে না; বরং মজা পাওয়া ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হওয়া আজীবন অব্যাহত থাকতে হবে। এর পর বয়স যতই বাড়বে, এই সৌভাগ্য অধিক দৃঢ় হবে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখন প্রশ্ন করা হল, সৌভাগ্য কি? তখনও তিনি বললেন ঃ

طُوْلُ الْعُمْرِ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ –অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যে দীর্ঘজীবী হওয়া।

এদিক দিয়েই নবীগণ ও ওলীগণ মৃত্যুকে খারাপ মনে করতেন। কেননা, দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। সুতরাং দীর্ঘ জীবনের কারণে এবাদত যত বেশী হবে, ততই সওয়াব বেশী হবে এবং নফস পবিত্র ও পবিত্রতম হবে। এছাড়া এবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরের উপর তার প্রভাব হওয়া। এই প্রভাব তখনই হবে, যখন এবাদত অধিক দীর্ঘ ও অধিক স্থায়ী হয়। এখন জানা দরকার, চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য নফস থেকে জাগতিক মহব্বত দূর হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর মহব্বত তাতে প্রতিষ্ঠিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হওয়া, এমনকি তার কাছে আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন কিছু না থাকা। সেমতে ধন-সম্পদও এমন বিষয়ে ব্যয় করবে, যদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং কাম ক্রোধকেও এমনভাবে কাজে লাগাবে, যাতে আল্লাহকে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এটা তখন হবে, যখন এসব কাজ শরীয়ত ও বিবেক অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, এর পর এ ধরনের কাজে মজাও পায়। যদি কেউ নামাযে শান্তি ও চোখের শীতলতা পায় কিংবা এবাদত সুখকর মনে হতে থাকে, তবে এটা মোটেই অবান্তর নয়। অভ্যাসের কারণে নফসের মধ্যে এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে। দেখ, নিঃস্ব জুয়াড়ি জুয়া খেলে কেমন আনন্দ পায়! অথচ যে অবস্থায় সে পতিত তাতে যদি অন্যরা পতিত হয়, তবে জুয়া ছাড়াই জীবন অসহনীয় হয়ে যাবে। জুয়ার কারণে ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়, পরিবারে বিশৃংখলা দেখা দেয়, এর পরও জুয়ার প্রতি ভালবাসা ও টান লেগেই থাকে। চোর-পকেটমারদের উপর কেমন বেত্রাঘাত বর্ষিত হয়, হাত কাটা হয়; কিন্তু তারা একে গর্বের বিষয় মনে করে এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করে আনন্দিত হয়। এমনকি, তাদের দেহ কেটে খন্ড খন্ড করা হলেও তারা চোরাই মালের সন্ধান দেয় না এবং সঙ্গী চোরদের নাম বলে না। এটা এ কারণেই যে, তারা তাদের কাজকে বাহাদুরীর চরমোৎকর্ষ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সুতরাং অভ্যাসের কারণে বাতিল বিষয়ে এমন আনন্দ পাওয়া গেলে সত্য বিষয়ে দীর্ঘ দিন অভ্যাস করলে তাতে আনন্দ পাওয়া যাবে না কেন?

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্রতা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ, প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে এসব কাজ করলে অবশেষে তা স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হয়। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি 'ফকীহ' হতে চায়, তবে প্রথমে সে ফকীহদের ক্রিয়াকর্ম যথারীতি অনুশীলন করবে। অর্থাৎ ফেকাহ্ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহ বার বার মুখে উচ্চারণ করবে; যাতে অন্তরের উপর ফেকাহর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এটা হয়ে গেলে সে ফকীহ্ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে দানশীল, সাধু, সহনশীল ও বিনম্র হতে চায়, তার উচিত শুরুতে এহেন লোকদের ক্রিয়াকর্ম মনের উপর জোর দিয়ে সম্পন্ন করা, যাতে আস্তে আস্তে এসব কাজ তার স্বভাবে স্থান করে নেয়। এটা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফেকাহ্র অন্বেষী ব্যক্তি যেমন একদিন অনুশীলন বন্ধ রাখলে ফেকাহ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং একদিনের অনুশীলন দ্বারা ফকীহ হয়ে যায় না, তেমনি যেব্যক্তি সৎকর্ম দ্বারা আত্মশুদ্ধি চায়, সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একদিনের এবাদত দ্বারা এই মর্তবা পেতে পারে না এবং একদিনের অবাধ্যতা দ্বারা এই মর্তবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। একটি কবীরা গোনাহ্ চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কারণ হয় না– বুযুর্গগণের এই উক্তির অর্থ তাই। হাঁ, একদিনকে কর্মহীন রাখা দ্বিতীয় দিনকে কর্মহীন রাখার কারণ হয়। এর পর ক্রমে ক্রমে মন অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে একদিন আরব্ধ কর্মই পরিত্যাগ করে বসে। অনুরূপভাবে একট সগীরা গোনাহ্ করলে সে আরেকটি সগীরা গোনাহকে টেনে আনে। সুতরাং একদিনের বন্ধকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

চরিত্র সংশোধনের উপায়

জানা উচিত যে, মনের চিকিৎসা দেহের চিকিৎসার অনুরূপ। অধিকাংশ দেহ সুস্থ ও সমতাবিশিষ্টই হয়ে থাকে। এর পর খাদ্য ও অন্যান্য কারণে পাকস্থলীতে ত্রুটি দেখা দেয় এবং দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে মনও বিশুদ্ধ এবং সমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর পর বাইরের প্রভাব দ্বারা তা কলুষিত হয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ـ

–প্রত্যেক শিশু মূল ঈমানের উপর জন্মগ্রহণ করে, এর পর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজারী বানায়।

দেহ যেমন শুরুতে পূর্ণাঙ্গ হয় না; বরং লালন-পালন ও খাদ্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ হয়, তেমনি নফসও অপূর্ণ জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ণতার যোগ্যতা তার মধ্যে থাকে। আত্মশুদ্ধি, চরিত্র সংশোধন ইত্যাদি দ্বারা পরে কামেল হয়ে যায়। দেহ সুস্থ হলে চিকিৎসক কেবল সুস্থতা অক্ষুণ্ন রাখার উপায় করে, আর দেহ অসুস্থ হলে চিকিৎসক স্বাস্থ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। এমনিভাবে মানুষের নফস পাক সাফ হলে তাকে তেমনি রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর যদি নফসে কোন পূর্ণতার গুণ না থাকে, তবে তা অর্জন করার ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে।

যে কারণে দেহের সমতা বিনষ্ট হয়, তার বিপরীত বস্তু দ্বারা দেহের চিকিৎসা করা হয়। উদাহরণতঃ উত্তাপের কারণে রোগ হলে তার চিকিৎসা শৈত্য দ্বারা করা হয়।এমনিভাবে আন্তরিক রোগের চিকিৎসাও তার বিপরীতদভ বস্তু দ্বারা হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ মূর্খতার চিকিৎসা শিক্ষা দ্বারা, কৃপণতার চিকিৎসা দানশীলতা দ্বারা এবং অহংকারের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিকিৎসা বিনয় দ্বারা হয়। দৈহিক রোগে ওষুধের তিক্ততা সহ্য করতে হয় এবং মনে চায় এমন কুপথ্য থেকে সবর করতে হয়। এমনিভাবে আন্তরিক রোগে সাধনার তিক্ততা এবং চিকিৎসার কষ্ট বরদাশত করা দরকার; বরং এ ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন আরও বেশী। কেননা, মৃত্যু হলে দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি হয়ে যায়; কিন্তু অন্তরের রোগ এমন যে, মৃত্যুর পরও অনন্তকাল পর্যন্ত থেকে যায়। দৈহিক রোগের চিকিৎসক যদি সকল প্রকার রোগীকে একই ওষুধ সেবন করায়, অধিকাংশ রোগী মারা যাবে। এমনিভাবে আন্তরিক রোগের চিকিৎসক মুর্শিদ ও ওস্তাদ সকল মুরীদকে একই লাঠি দিয়ে হাঁকালে তাদেরও সর্বনাশ না হয়ে গত্যন্তর নেই। মুর্শীদের উচিত মুরশীদের রোগ, অবস্থা, বয়স ও মেযাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যে, তার দ্বারা কোন্ প্রকার সাধনা সম্ভবপর। এটা জানার পর মুর্শিদ তার দ্বারা সাধ্যানুযায়ী কষ্টের কাজ নেবে। উদাহরণতঃ মুরীদ মূর্খ হলে এবং শরীয়তের বিধি-বিধান না জানলে প্রথমে তাকে ওযু,নামায ও বাহ্যিক এবাদত শিক্ষা দেবে। সে হারাম ধন-সম্পদ ও গোনাহে মশগুল থাকলে তা বর্জন করার আদেশ দিবে। যখন তার বাহ্যিক অবস্থা বাহ্যিক এবাদতের অলংকারে অলংকৃত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ্য গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন অবস্থার ইঙ্গিতে তার অভ্যন্তরের দিকে মনোযোগ দিয়ে তার চরিত্র ও আন্তরিক রোগ পর্যবেক্ষণ করবে। যদি জানা যায় যে, তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, তবে সেগুলো খয়রাত করতে বলবে, যাতে ধন-সম্পদের চিন্তা থেকে মন মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি মুরীদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে বাজারে ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে পাঠিয়ে দেবে। কেননা, নফসের ঔদ্ধত্য ও অহমিকা লাঞ্ছনা ছাড়া দূর হয় না। ভিক্ষার চেয়ে অধিক লাঞ্ছনার কোন কাজ নেই। অহংকার দূর না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখবে। কারণ, ঔদ্ধত্য ও অহংকার অন্তরের মারাত্মক রোগ। আর যদি মুরীদের মধ্যে দৈহিক পারিপাট্য প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে ময়লা ও আবর্জনার জায়গায় ঝাড়ু দিতে বলবে এবং বাবুর্চিখানা ও ধোঁয়ার জায়গায় বসতে বলবে, যে পর্যন্ত তার মেযাজ থেকে পরিপাট্য হটে না যায়। কেননা, যারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি করে, তাদের মধ্যে ও নববধূর মধ্যে কি পার্থক্য? মানুষ তার দেহের পূজা করুক অথবা মূর্তির আরাধনা করুক— এতেও কোন তফাৎ নেই। কেননা, যখন অন্যের এবাদত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা থেকে আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে আপন নফস ও প্রতিমা উভয়ই সমান। যদি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুরীদের মধ্যে আহারের লালসা প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রোযা রাখাবে, কম খাওয়াবে এবং সুস্বাদু খাদ্য পাকিয়ে অন্যকে খাওয়াতে বলবে– নিজে খাবে না। সবরের অভ্যাস ও খাওয়ার লোভ দূর না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখবে। যদি জানা যায়, মুরীদ যুবক ও বিবাহযোগ্য; কিন্তু স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম, তবে তাকে রোযা রাখার আদেশ করবে। এতে খাহেশ না কমলে বলবে যে, রাতে পানি দিয়ে ইফতার কর এবং দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় খানা খাও– পানি পান করো না। এছাড়া গোশত ও তরকারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেবে– যাতে তার নফস লাঞ্ছিত হয় এবং খাহেশ কমে যায়। কেননা, শুরুতে ক্ষুধা অপেক্ষা ভাল কোন চিকিৎসা নেই। যদি মুরীদের মধ্যে ক্রোধ প্রবল দেখা যায়, তবে সহনশীলতার আদেশ করবে এবং কোন বদমেযাজ ব্যক্তির সাথে দিয়ে তার আনুগত্য করতে বলবে। এভাবে তার নফস সহনশীলতায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সেমতে কোন কোন বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা স্বীয় নফসকে সহনশীলতায় অভ্যস্ত এবং ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস করার জন্যে এমন লোকদের মজুরি করতেন, যারা উঠতে বসতে গালি দিত। এভাবে তারা নফসকে সবর করতে বাধ্য করতেন এবং ক্রোধ দাবিয়ে রাখতেন। হিন্দু যোগীরা এবাদতে আলস্য দূর করার জন্যে সারারাত একই অবস্থায় দন্ডায়মান থাকে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে অন্তরের চিকিৎসার পদ্ধতি জানা যায়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেক রোগের জন্যে আলাদা আলাদা চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা নয়। এটা পরে বর্ণিত হবে। এখানে উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, এক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে চলা। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র কথায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

–যে তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে ফিরিয়ে রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

যদি কোন ব্যক্তি খাহেশ বর্জনের সংকল্প করার পর খাহেশের উপকরণাদির সম্মুখীন হয়, তবে একে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে নেবে। তখন উচিত হবে সবর করা এবং সংকল্পে অটল থাকা। কেননা, সংকল্প ছেড়ে দিলে নফস তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বরং সংকল্প ভঙ্গ করলে নিজের জন্যে একটি শাস্তি নির্দিষ্ট করে নেবে, যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোরাকাবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শাস্তি দিয়ে সতর্ক না করলে নফস প্রবল হয়ে খাহেশ অনুযায়ী কাজ করবে। ফলে সাধনা বরবাদ হয়ে যাবে।

অন্তরের রোগ ও স্বাস্থ্যের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ একটি বিশেষ কাজের জন্যে সৃজিত হয়েছে। যদি সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কাজ সাধিত না হয় কিংবা অস্থিরতা সহকারে সাধিত হয়, তবে অঙ্গটিকে সুস্থ বলা হবে না। উদাহরণতঃ ধরতে না পারা হাতের রোগ এবং দেখতে না পারা কিংবা দেখা কঠিন হওয়া চোখের রোগ। অনুরূপভাবে অন্তরের রোগ তাকে বলা হবে, যার কারণে অন্তর তার বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম না হয়। অন্তরের বিশেষ কাজ হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মারেফত, মহব্বত, এবাদত এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আনন্দ পাওয়া। এছাড়া প্রত্যেক বস্তুর খাহেশের উপর এই আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং এরই জন্যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে সাহায্য চাওয়া ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

–আমি মানব ও জিনকে কেবল আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। এ থেকে জানা গেল, মানব অন্তরের বিশেষ কাজ হচ্ছে এবাদত ও আল্লাহ্র মারেফত। আসলে এটাই হওয়া উচিত, যাতে মানুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেননা, পানাহার, সহবাস ও দেখার ক্ষেত্রে মানুষ জন্তু থেকে পৃথক নয়। বরং এসব বস্তুকে মূল স্বরূপ অনুযায়ী জানার ক্ষেত্রে পৃথক। সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। তাই কেউ যদি সকল বস্তু চেনে এবং সৃষ্টাকে না চেনে, তবে সে কিছুই চিনল না। আল্লাহ্কে চেনার আলামত হচ্ছে তাঁর মহব্বত। যে আল্লাহ্কে চিনে নেয়, সে তাঁর মহব্বতে বিভোর হয়ে যায়। মহব্বতের চিহ্ন হচ্ছে, সে আল্লাহ্র উপর দুনিয়া, দুনিয়াস্থিত সবকিছু এবং আপন প্রিয় বস্তুসমূহকে অগ্রাধিকার দেবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوه حتى ياتى الله بامره -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, সমাজ, অর্থসম্পদ, যা উপার্জন কর, ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দার ভয় কর এবং বাসভবন, যা তোমরা পছন্দ কর, তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা অপেক্ষা, তবে আল্লাহ্র আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুতরাং যার কাছেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তু অধিক প্রিয় হয়, তার অন্তর রুগ্ন। এগুলো হচ্ছে অন্তর রোগের আলামত। এ বর্ণনা থেকে জানা গেল, সকল অন্তর রুগ্ন। তবে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেছেন, তার কথা ভিন্ন। কতক রোগ এমন হয়, যা রোগী জানতে পারে না। অন্তর রোগের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়ে থাকে। তাই মানুষ গাফেল থাকে। যদি জেনেও নেয়, তবে চিকিৎসার তিক্ততায় সবর করা কঠিন হয়। কেননা, এর চিকিৎসা হচ্ছে খাহেশের বিরোধিতা করা। নফসের মধ্যে সবর করার সামর্থ্য থাকলেও কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক পায় না। কেননা, এ রোগের চিকিৎসক আলেম সম্প্রদায়। তারা স্বয়ং এ রোগে আক্রান্ত। সুতরাং তারা যখন নিজেদেরই চিকিৎসা করে না, তখন অপরের চিকিৎসা কিরূপে করবে? এদিক দিয়ে অন্তরের রোগ দূরারোগ্য।

এখন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভের আলামত শুনা উচিত। যদি চিকিৎসাধীন রোগটি কৃপণতা হয়, যা ধ্বংস ও আল্লাহ্ থেকে দূরত্বের কারণ, তবে এর চিকিৎসা ধন–সম্পদ দান ও ব্যয় দ্বারা করতে হবে। কিন্তু ধন-সম্পদ এই পরিমাণ ব্যয় করবে যেন, অপব্যয় না হয়ে যায়। নতুবা অন্য এক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে। বরং মধ্যবর্তী স্তর অবলম্বন করতে হবে, যা কৃপণতা ও অপব্যয়ের প্রান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। উদাহরণতঃ যদি ধন-সম্পদ হকদারদেরকে দেয়ার তুলনায় আটকে রাখা এবং সঞ্চয় করা সহজ ও মিষ্ট মনে হয়, তবে জানতে হবে যে, কৃপণতার প্রাধান্য রয়েছে। তখন দান-খয়রাত অধিক করা দরকার। পক্ষান্তরে যদি হকদার নয়, এমন লোকদেরকে দেয়া আটকে রাখার তুলনায় সহজ ও মিষ্ট মনে হয় তবে অপব্যয় প্রবল বলে মনে করে নেবে। এমতাবস্থায় ধন-সম্পদ আটকে রাখার প্রতি মনোনিবেশ করবে। এভাবে নফসের ক্রিয়াকর্ম দেখে বুঝে নিতে থাকবে। যে পর্যন্ত অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ থেকে অন্তর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং ব্যয় করা ও আটকে রাখা এতদুভয়ের কোনটি না করে; বরং ধনসম্পদের অবস্থা পানির মত হয়ে যায় যে, আটকে রাখলেও কোন অভাবগ্রস্তের জন্যে এবং ব্যয় করলেও অভাবগ্রস্তের জন্যেই ব্যয় করা হয়। যে অন্তর এরূপ হয়ে যাবে, সে নিশ্চিন্তে তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরওয়ারদেগারের সামনে যাবে। আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সেও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। সে নৈকট্যশীল বান্দা অর্থাৎ পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের দলে শামিল হবে।

নিজের দোষ কিরূপে চিনা যায়?

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারও মঙ্গল করতে চান, তখন নিজেই তার দৃষ্টিকে তার দোষত্রুটির দিকে ফিরিয়ে দেন। সুতরাং যার বোধশক্তি প্রখর হয়, তার সামনে তার দোষ গোপন থাকে না। দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিকিৎসাও সম্ভবপর হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয়, মানুষ নিজেদের বড় বড় দোষ সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও অপরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোষও জানে।

অতএব যে কেউ নিজের দোষ জানতে চায়, তার উপায় চারটি। প্রথম, যে মুর্শিদ নফসের দোষ ও গোপন বিপদ জানতে পারে, তার সামনে বসা এবং নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দেয়া। এর পর যে সাধনা সে বলে দেয়, তদনুযায়ী আমল করা । মুরীদ ও মুর্শিদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে, মুর্শিদ মুরীদের দোষ ও প্রতিকার উভয়টি বলে দেয়। কিন্তু আজ-কাল এরূপ মুর্শিদ খুবই বিরল।

দ্বিতীয় উপায়, নিজের কোন ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জ্ঞানী বন্ধুকে বলে দেবে যে, আমার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং আমার চরিত্র, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ-কর্মের মধ্যে যে দোষ দেখ, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। প্রধান প্রধান মুসলিম মনীষীগণ তাই করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহর রহমত হোক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে আমাকে আমার দোষ সম্পর্কে অবগত করে। তিনি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে নিজের দোষ জিজ্ঞেস করতেন। একবার হযরত সালমান তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি বললেন ঃ আমার সম্পর্কে এমন কোন কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কি, যা তোমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে? তিনি আরজ করলেন ঃ আমাকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করুন। এর পর হযরত ওমর পীড়াপীড়ি সহকারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আপনি দস্তরখানে দু'প্রকার ব্যঞ্জন একত্রিত করেন এবং আপনার কাছে দু'প্রকার পোশাক আছে– এক প্রকার দিনের এবং এক প্রকার রাত্রের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আরও কিছু শুনেছ? সালমান জওয়াব দিলেন ঃ না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এ দুটি দোষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাক। এগুলোর যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)- কে জিজ্ঞেস করতেন ঃ আপনি মোনাফেকদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনেক কিছু জানেন। বলুন, আমার মধ্যে মোনাফেকীর কোন আলামত আছে কি না? সোবহানাল্লাহ, এত উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি নিজের নফসকে কতটুকু দোষী মনে করতেন! সুতরাং যে কেউ অধিক বোধশক্তি ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবে, সে দোষ কম করবে এবং নিজেকে অধিক দোষী মনে করবে। আজ-কাল এমন বন্ধু পাওয়া দুষ্কর, যে চক্ষুলজ্জা দুরে রেখে দোষ বলে দিবে। আজ-কালকার বন্ধু হিংসুটে ও স্বার্থপর। ফলে যেটা দোষ নয়, সেটাকেও দোষ মনে করে অথবা খোশামোদের কারণে দোষ গোপন করে। এ কারণেই দাঊদ তায়ী মানুষের সাথে উঠাবসা বর্জন করেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করলে আমার লাভ কি, যারা আমার দোষ গোপন রাখে। মোট কথা, ধার্মিক লোকদের বাসনা এটাই থাকে যে, অপরের বলে দেয়ার কারণে তারা নিজেদের দোষ সম্পর্কে অবহিত হবেন। কিন্তু এখন যমানা এমন হয়ে গেছে যে, কেউ উপদেশের কথা বললে এবং দোষ প্রকাশ করলে তাকে বড় দুশমন গণ্য করা হয়। এটা ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, অসচ্চরিত্রতা সর্প ও বিচ্ছুর মত। যদি কেউ আমাদেরকে বলে, তোমার কাপড়ে বিচ্ছু রয়েছে, তবে আমাদের তার কাছে ঋণী হওয়া এবং খুশী হয়ে বিচ্ছুকে আলাদা করতে ও মেরে ফেলতে সচেষ্ট হওয়া উচিত! অথচ বিচ্ছুর বিষ মাত্র একদিন অথবা আরও কম সময় থাকে। আর অসচ্চরিত্রতার শাস্তি মৃত্যুর পরও হাজারো বছর পর্যন্ত থাকে! কিন্তু অসচ্চরিত্রতার কথা কেউ বললে আমরা তার প্রতি খুশী এবং তা দূর করতে সচেষ্ট হই না; বরং এর বিপরীতে উপদেশদাতার কোন দোষ বলতে শুরু করে দেই যে, তোমার মধ্যেও অমুক দোষ আছে। এটা অধিক গোনাহের কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার চিহ্ন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন সঠিক পথ দেখান এবং আমাদের দোষ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে তার চিকিৎসায় ব্যাপৃত করে দেন। কেউ কোন দোষ বলে দিলে আমরা যেন তার কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ হই।

তৃতীয় উপায় হচ্ছে, নিজের দোষ শত্রুর মুখ থেকে জেনে নেয়া। কেননা, শত্রুরা ছিদ্রান্বেষী হয়ে থাকে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষ এ ব্যাপারে বন্ধুর তুলনায় ছিদ্রান্বেষী শত্রু দ্বারা অধিক উপকৃত হতে পারে। কেননা, বন্ধু খোশামোদের কারণে দোষ প্রকাশ করে না। কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুশকিল হচ্ছে, মানুষ জন্মগতভাবে শত্রুর উক্তিকে মিথ্যা ও হিংসা-প্রণোদিত জানে। তবে অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী ব্যক্তিগণ শত্রুর কথা দ্বারাও উপকৃত হন।

চতুর্থ উপায় হচ্ছে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে খারাপ যা দেখবে, নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, মুমিনগণ একজন অপরজনের আয়না। অপরের দোষ দেখে তারা নিজেদের দোষ জেনে নেয়। তারা জানে যে, প্রকৃতি সব মানুষের কাছাকাছি হয়ে থাকে। যে দোষ একজনের মধ্যে থাকে, তার মূল অপরের মধ্যে থাকবে কিংবা আরও বেশী থাকবে। এই শাসনপদ্ধতি খুবই উত্তম। একে কার্যকর করলে মুর্শিদ ও আদব শিক্ষাদাতার কোন প্রয়োজন থাকে না। হযরত ঈসা (আঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাকে কে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল? তিনি বললেন ঃ আমাকে কেউ শিষ্টাচার শেখায়নি। মূর্খের মূর্খতা আমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে। তাই আমি একে পরিহার করেছি।

কামবর্জন আন্তরিক রোগের চিকিৎসা

উপরোক্ত বর্ণনা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মানুষের অন্তশ্চক্ষু খুলে যাবে এবং অন্তরের যাবতীয় রোগ তার চিকিৎসাসহ এলেম ও একীনের নূর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। যদি কেউ এতে অক্ষম হয়, তবে তার উচিত তাকলীদ তথা অনুসরণের পন্থায় ঈমান আনা। কেননা, ঈমান এবং এলেমের স্তর আলাদা। এলেম ঈমানের পরে অর্জিত হয় এবং তার মর্তবাও ঈমানের উপরে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

–তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন এবং যারা এলেমপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্তবা উঁচু করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কামপ্রবৃত্তির বিরোধিতা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সিঁড়ি, কিন্তু এর কারণ ও রহস্য জানে না, সে মুমিন। আর যখন সে কারণ ও রহস্যও অবগত হয়ে যায়, তখন সে আলেম। وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আল্লাহ তাদের প্রত্যেককেই পুণ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কামপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের এই উপকারিতা বিশ্বাস করা কোরআন ও বিজ্ঞজনদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনে বলা হয়েছে–

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–এবং যে নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَمْسِ شَدَائِدَ مُؤْمِنٌ يَحْسُدُهُ وَمُنَافِقٌ يَبْغِضُهُ وَكَافِرٌ يُقَاتِلُهُ وَشَيْطَانٌ يُضِلُّهُ وَنَفْسٌ تُنَازِعُهُ .

–মুমিন ব্যক্তি পাঁচটি সংকটের মধ্যে থাকে– এক, মুমিন, যে তার প্রতি হিংসা রাখে। দুই, মোনাফেক, যে তার সাথে শত্রুতা করে। তিন, কাফের, যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। চার, শয়তান, যে তাকে বিভ্রান্ত রাখে। পাঁচ, নফস, যে তার সাথে তর্ক করে।'

এতে বর্ণিত হয়েছে, মানুষের নফস তার সাথে তর্ক করে বিধায় সাধনা করা জরুরী। এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন– হে দাঊদ, তোমার অনুচরবর্গকে খাহেশের খাদ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, যে সকল অন্তর জাগতিক খাহেশের সাথে জড়িত, তারা আমা থেকে আড়ালে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্যে, যে বর্তমানের খাহেশকে ভবিষ্যত অদেখা ওয়াদার জন্যে ছেড়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে বলেছিলেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ .

–তোমাদেরকে মারহাবা, তোমরা ক্ষুদ্র জেহাদ থেকে বৃহৎ জেহাদের দিকে ফিরে এসেছ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ বৃহৎ জেহাদ কি? তিনি বললেন, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। তিনি আরও বলেন ঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ .

–মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যে আপন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে।

হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ নফসের চিকিৎসা অপেক্ষা কঠিনতর চিকিৎসা আমি দেখিনি। এটা কখনও উপকারী হয় এবং কখনও ক্ষতিকর। আবুল আব্বাস মুসেলী আপন নফসকে বলতেন ঃ তুমি তো শাহজাদাদের সাথে দুনিয়ার আনন্দ পাও না এবং আখেরাতের অন্বেষণে এবাদতকারীদের সাথে কষ্ট সহ্য কর না। তুমি কি আমাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যস্থলে বন্দী করবে? তোমার লজ্জা হয় না? হাসান বসরী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ অবাধ্য ঘোড়াকেও নফসের চেয়ে অধিক শক্ত ল্যাগামের প্রয়োজন হয় না। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ নফসের বিরুদ্ধে সাধনার তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। সাধনা চার প্রকার –অল্প আহার করা, অল্প নিদ্রা যাওয়া, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কথা বলা এবং সকল মানুষের পীড়ন সহ্য করা। অল্প আহার করলে খাহেশের মৃত্যু ঘটে। অল্প নিদ্রায় নিয়ত পরিষ্কার হয়। কম কথা বললে বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। পীড়ন সহ্য করলে চূড়ান্ত মর্তবায় পৌঁছা যায়। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের দুশমন তিনটি– দুনিয়া, শয়তান ও নফস। সংসার নির্লিপ্ততার দ্বারা দুনিয়া থেকে শয়তান থেকে তার বিরোধিতা দ্বারা এবং নফ্স থেকে খাহেশ বর্জন দ্বারা আত্মরক্ষা করা উচিত। ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) বলেন ঃ আলেম ও দার্শনিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়েশ পরিত্যাগ না করে চিরন্তন আয়েশ লাভ করা যায় না। আবু ইয়াহইয়া ওয়াররাক বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাহেশের কাজ করে অঙ্গকে খুশী করে, সে অন্তরের কৃষিক্ষেত্রে পরিতাপের বীজ বপন করে। ওহায়ব ইবনে ওরদ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার খাহেশকে মহব্বত করে, সে যেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জন্যে প্রস্তুত থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের শাসনকর্তা হন, তখন একদিন যুলায়খা আরজ করল ঃ হে ইউসুফ, লালসা ও কামনা বাদশাহকে গোলামে পরিণত করেছে। আর সবর ও তাকওয়া গোলামকে বাদশাহ করেছে। হযরত ইউসুফ বললেন ঃ এটা তো আল্লাহ তা'আলারই উক্তি। তিনি বলেন ঃ

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ -

–নিশ্চয় যে তাকওয়া করে ও সবর করে, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

হযরত জুনায়েদ বলেন ঃ একবার আমি রাত্রে জাগ্রত হয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। কিন্তু সব সময় যে আনন্দ পেতাম, তা পেলাম না। এর পর ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছা করলাম। তাও সম্ভব হল না। এর পর বসে থাকতে চাইলাম। তাও সম্ভব হল না। অবশেষে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লাম। পথিমধ্যে দেখলাম, এক ব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। সে আমার পদশব্দ শুনে বলল ঃ হে আবুল কাসেম, আমার কাছে একটু আসুন। আমি বললাম ঃ মিয়া, তুমি পূর্বে তো আমাকে সংবাদ দাওনি। সে বলল ঃ ঠিক, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম আপনার মনকে আমার দিকে গতিশীল করার জন্যে। আমি বললাম ঃ এটা আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা করেছেন। এখন বল, তোমার উদ্দেশ্য কি ? সে বলল ঃ নফ্স ব্যাধিগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসা কিভাবে হয় ? আমি জওয়াব দিলাম ঃ মানুষ যখন নফসের খাহেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন কষ্ট হয় বটে; কিন্তু এটাই তার চিকিৎসা। অতঃপর লোকটি তার নফসকে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ শুন, আমি তোকে সাতবার এ জওয়াবই দিয়েছিলাম। তুই মানলি না এবং বললি যে, জুনায়দের মুখে শুনবি। এখন শুনলি তো? এর পর লোকটি সেখান থেকে প্রস্থান করল। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। ইয়াযীদ রাক্কাশী বলতেন ঃ তোমরা আমাকে ঠান্ডা পানি দিয়ো না। আখেরাতে আবার কোথাও এ থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই। এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কখন কথা বলব ? তিনি বললেন ঃ যখন তোমার নফস চুপ থাকতে চায়। লোকটি আবার প্রশ্ন করল ঃ কখন চুপ থাকব? জওয়াব হল ঃ যখন সে কথা বলতে চায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে জান্নাতের জন্যে উৎসুক, সে যেন দুনিয়াতে খাহেশ থেকে আলাদা থাকে। এসব রেওয়ায়াতদৃষ্টে আলেম ও দার্শনিকগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য বুঝা যায় যে, পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের পথ খেয়ালখুশী বর্জন ও খাহেশের বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

যে বস্তু কবরে সঙ্গে যায় না, তা দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হওয়াই মূল সাধনা। অর্থাৎ আহার্য, পোশাক, বিবাহ, বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী বস্তু দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হবে। এর বেশী যতটুকু হবে, ততটুকুর সাথেই মহব্বত ও মনের টান হবে। মৃত্যুর পর এর কারণেই পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা প্রকাশ করবে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে। তা হচ্ছে, অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত, মহব্বত ও চিন্তায় মশগুল থাকবে এবং একমাত্র তাঁরই হয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ চার প্রকার। প্রথম তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত থাকে এবং জীবিকার প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপই করে না। এরা হলেন সিদ্দীকীন। এই মর্তবা দীর্ঘ দিনের সাধনা ও খাহেশ বর্জনের পর অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সেই ব্যক্তি, যার অন্তর দুনিয়াতে নিমজ্জিত এবং আল্লাহর যিকির কেবল মুখে হয়, অন্তর দ্বারা নয়। এরূপ ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রকার সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া আখেরাত উভয়ের কাজে মশগুল, কিন্তু অন্তরের উপর আখেরাত প্রবল। এরূপ ব্যক্তি অগ্নিতে অবশ্য প্রবেশ করবে; কিন্তু অন্তরের উপর আল্লাহর যিকির যত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জোরদার হবে, তত শীঘ্রই মুক্তি পাবে। চতুর্থ প্রকার সেই ব্যক্তি, যে উভয়ের কাজে মশগুল; কিন্তু অন্তরের উপর দুনিয়া প্রবল। এ ব্যক্তি বেশী দিন দোযখে থাকবে এবং একদিন না একদিন মুক্তি পাবে। কেননা, তার অন্তরে দুনিয়া প্রবল হলেও সে আল্লাহর যিকির অন্তরের অন্তস্তল থেকে করত। এর ফলেই সে মুক্তি পাবে। ইলাহী, আমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান। আমীন।

কতক লোক বলে, বৈধ বস্তু দ্বারা আনন্দ লাভ করা বৈধ। সুতরাং এর কারণে আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হবে কেন? কিন্তু এটা তাদের খামখেয়ালী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ –দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক গোনাহের মূল। বৈধ বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা দুনিয়া ছাড়া কিছু নয় । এটাই দূরত্বের কারণ। "দুনিয়ার নিন্দা" অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার লাকাম পাহাড়ে ছিলাম। একটি ডালিম দেখে তা খেতে মন চাইল। সেমতে ডালিমটি ছিঁড়ে মুখে দিতেই টক মনে হল। আমি ডালিমটি ফেলে দিয়ে চলতে লাগলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখলাম। তার উপর বোলতা ভনভন করছিল। সে আমাকে দেখে বলল ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া ইবরাহীম– হে ইবরাহীম তোমাকে সালাম। আমি বললাম ঃ তুমি আমাকে চিনলে কিরূপে? সে বলল ঃ যে আল্লাহকে চেনে, তার সামনে কোন কিছু গোপন থাকে না। আমি বললাম ঃ তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ। আল্লাহর কাছে দোয়া কর না কেন, যাতে তোমাকে এই বোলতার কবল থেকে রক্ষা করেন ? সে বলল ঃ আপনিও তো কামেল পুরুষ। ডালিমের খাহেশ থেকে আপনার অন্তরকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না কেন? বোলতার কষ্ট তো দুনিয়া পর্যন্তই। কিন্তু খাহেশের দুঃখ আখেরাত পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর আমি নিরুত্তর হয়ে সেখান থেকে চলে গেলাম। সিররী সকতী বলেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে আমার মন চাইছে যে, রুটি কিশমিশের ঘন রসে ভিজিয়ে খাই। কিন্তু আমি খাইনি।

এ থেকে জানা গেল, আখেরাতের পথে চলার জন্যে অন্তরের সংশোধন ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ নফসকে খাহেশ এবং বৈধ বস্তুর আনন্দ থেকে ফিরিয়ে না রাখা যায়। কেননা, বৈধ বস্তুর আনন্দের কারণে মানুষ নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে পড়ে যায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ গীবত ও অনর্থক কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করতে না চায়, তবে তার উচিত আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যিকির ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোন কথা উচ্চারণ না করা এবং চুপ থাকা। এতে তার কথা বলার খাহেশ ফানা হয়ে যাবে। এর পর যে কথা বলবে, তা হক এবং কথা বলা ও চুপ থাকা উভয়টি এবাদত হবে। এমনিভাবে যদি চোখের এই অভ্যাস প্রকাশ পায় যে, সে প্রত্যেক ভাল বস্তুর উপর পতিত হয়, তবে হারাম বস্তুর উপরও পতিত হবে। অন্যান্য খাহেশের বেলায়ও এরূপ বুঝতে হবে। কেননা, হারাম হালাল উভয়ের খাহেশ একটিই। তবে হারাম থেকে খাহেশকে আটকে রাখার আদেশ আছে। সুতরাং যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুকে যথেষ্ট মনে করার অভ্যাস গড়ে না তুললে খাহেশ প্রবল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বৈধ বিষয়াদির সামান্যতম বিপদ। এ ছাড়া আরও বড় বড় বিপদ হচ্ছে, দুনিয়ার আনন্দ পেয়ে নফস খুশী হয়, তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং মাতালের মত হয়ে যায়। অথচ এই খুশী তার জন্যে বিষতুল্য। এটা শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম অন্তরের মৃত্যু। কোরআন পাকের অনেক জায়গায় দুনিয়া ও দুনিয়ার কারণে আনন্দিত হওয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا

–তারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এর দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করেছে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

–আখেরাতের হিসাবে পার্থিব জীবন কিছুই নয়; কিন্তু সামান্য সম্ভোগ।

اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ـ

–জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য বৈ কিছু নয়।

এছাড়া সাবধানী অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করে পার্থিব আনন্দের অবস্থায় অন্তরকে কঠোর, অবাধ্য এবং যিকির দ্বারা কম প্রভাবিত পেয়েছেন, বিষণ্ন অবস্থায় নম্র, পরিষ্কার ও প্রভাবিত দেখেছেন। তারা জেনে নিয়েছেন যে, মানুষের মুক্তি এতেই নিহিত রয়েছে যে, তারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সদা-সর্বদা বিষণ্ন এবং আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কারণাদি থেকে বহু দূরে থাকবে। এ কারণেই তারা হালাল-হারাম নির্বিশেষে সকল প্রকার খাহেশ থেকে সবর করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। তারা আরও জেনেছেন, হালাল খাহেশেরও হিসাব হবে, যা এক প্রকার আযাব। এসব কারণে তারা নিজেদেরকে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন এবং খাহেশের গোলামী ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উভয় জাহানের স্বাধীনতা এবং বাদশাহী গ্রহণ করেছেন। তারা নিজেদের নফসের সাথে এমন ব্যবহার করেছেন, যা বাজপাখীর সাথে পোষ মানানোর সময় করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে বাজপাখীকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয় এবং তার চক্ষু সেলাই করে দেয়া হয়, যাতে শূন্যে উড়া পরিত্যাগ করে, যার অভ্যাস পূর্বে ছিল। এর পর তাকে গোশ্‌ত খাওয়ানো হয়, যাতে মালিককে চেনে এবং তার ডাক শুনে তার কাছে চলে আসে। এমনিভাবে নফসও তার পরওয়ারদেগারকে চেনে না। তাই প্রথমে নির্জনবাস দ্বারা তার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়ে পরিচিত বিষয়সমূহ থেকে চক্ষু ও কর্ণের হেফাযত করা হয় । এর পর আল্লাহ্‌র যিকির ও প্রশংসার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। অবশেষে এর সাথেই অন্তরের ভালবাসা স্থাপিত হয়ে যায় এবং পার্থিব ভালবাসা যাবতীয় খাহেশসহ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এটা মুরীদের কাছে প্রথমে কঠিন মনে হয়; কিন্তু পরিণামে স্বাদ পেয়ে যায়। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দিলে প্রথমে কেমন ক্রন্দন করে। দুধের পরিবর্তে যে খাদ্য তার সামনে আনা হয়, তাকেও ঘৃণা করে; কিন্তু পরিণামে সে একেই ভাল মনে করে।

সচ্চরিত্রতার আলামত

মানুষ নিজের দোষ-ক্রটির খবর রাখে না। তাই যখন সামান্য সাধনা করে বড় বড় পাপকর্ম ছেড়ে দেয়, তখন মনে করতে থাকে যে, সে সংস্কৃতিবান, ভদ্র ও চরিত্রবান হয়ে গেছে। এখন সাধনার প্রয়োজন নেই। তাই সচ্চরিত্রতার আলামত বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা, সচ্চরিত্রতা সাক্ষাৎ ঈমান এবং অসচ্চরিত্রতা সাক্ষাৎ মোনাফেকী। কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের গুণাবলী এবং মোনাফেকদের স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করে দিয়েছেন। এগুলো সব সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতার ফল। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যাতে সচ্চরিত্রতার আলামত জানা হয়ে যায় । বলা হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -------- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ـ

–মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নামাযে বিনম্র হয়, যারা বাজে বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাকাত প্রদান করে, লজ্জাস্থানকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু আপন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নয়।

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ -------- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

–তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী,........ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ـ الى اخر السورة ـ

–রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। তাদের সাথে যখন মূর্খরা তর্ক করতে চায় ,তখন তারা বলে, সালাম। যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা,আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাসস্থল হিসেবে এটা কত নিকৃষ্ট! তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। তারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অতএব নিজের অবস্থা সম্পর্কে যার মনে সংশয় দেখা দেয়, সে এসব আয়াতের আয়নায় নিজেকে পরখ করে দেখুক। যদি তার সকল অবস্থা আয়াতগুলোর সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, তবে তার সচ্চরিত্রতা অর্জিত হয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি কোন সঙ্গতি না থাকে, তবে এটা অসচ্চরিত্রতার আলামত হবে। পক্ষান্তরে যদি কিছু অবস্থা সঙ্গতিসম্পন্ন হয় এবং কিছু না হয়, তবে সেই পরিমাণ ত্রুটি আছে বুঝতে হবে। এমতাবস্থায় যা অর্জিত হয়েছে, তার হেফাযত করা এবং যা অর্জিত হয়নি, তা অর্জন করার জন্যে সচেষ্ট হবে। রসূলে করীম (সাঃ) মুমিনের অনেক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গুণ বর্ণনা করে সচ্চরিত্রতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদাহরণতঃ কয়েকটি রেওয়ায়াত এই ঃ

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ـ

–মুমিন সেই, যে তার ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ـ

–যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।

এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ

–সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে– فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَصْمُتْ

–সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ اَخْلَاقًا اِذَا رَاَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوْتًا وَقُوْرًا فَادْنُوْا مِنْهُ فَاِنَّهٗ يُلَقَّنُ الْحِكْمَةَ

–মুমিনের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর, তার ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ। তোমরা যখন মুমিনকে চুপচাপ গাম্ভীর্যপূর্ণ দেখ, তখন তার নিকটবর্তী হও। কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়।

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهٗ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهٗ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

–যাকে পুণ্য কাজ আনন্দিত করে এবং কুকর্ম দুঃখিত করে, সে মুমিন।

لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّرَوِّعَ مُسْلِمًا

–মুমিনের জন্যে কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা জায়েয নয়।

اِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَحِلُّ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يُّفْشِيَ عَلٰى اَخِيْهِ مَا يَكْرَهُهٗ ـ

–দু'ব্যক্তি আল্লাহর আমানতের উপর একত্রে উপবেশন করে। অতএব একজনের জন্যে হালাল হবে না যে, সে এমন কথা বলে যা অপরের জন্যে অপছন্দনীয় হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ কেউ সচ্চরিত্রতার সকল আলামত একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ সচ্চরিত্র সেই ব্যক্তি, যে অধিক লজ্জাশীল, অধিক উপদেশদাতা, কম কষ্টদাতা, স্বল্পভাষী, অধিক কর্মী, সত্যবাদী, সাধু, গম্ভীর, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, সন্তুষ্ট, সহনশীল, উত্তম সঙ্গী, পুণ্যবান, স্নেহশীল, প্রফুল্ল এবং যে কুভাষী, অপবাদদাতা, হিংসুটে, বিদ্বেষ পোষণকারী ও কৃপণ নয়, হিংসা ও শত্রুতা আল্লাহর নিমিত্তই করে, সন্তুষ্টি এবং মহব্বতও আল্লাহর ওয়াস্তেই পোষণ করে। এতটুকু বিশেষণ দ্বারা সচ্চরিত্র হওয়া যায়। রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে মুমিন ও মোনাফেকের আলামাত জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ هِمَّتُهُ فِى الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْمُنَافِقُ هِمَّتُهُ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْبَهَائِمِ

–মুমিনের সাহসিকতা নামায, রোযা ও এবাদতে এবং মোনাফেকের সাহসিকতা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায় পানাহারে হয়ে থাকে।

হযরত হাতেম আসাম (রহঃ) বলেন, মুমিন শিক্ষা গ্রহণের চিন্তায় আর মোনাফেক লোভ ও লালসায় মশগুল থাকে। মুমিন আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে কিছু আশা করে না, আর মোনাফেক আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের কাছে আশা করে। মুমিন আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের তরফ থেকে নিরাপদ ও নির্ভীক থাকে, আর মোনাফেক আল্লাহ্ ব্যতীত সকলকে ভয় করে। মুমিন ধন-সম্পদ দেয়– ধার্মিকতা দেয় না, আর মোনাফেক ধার্মিকতা দেয়– ধন সম্পদ দেয় না। মুমিন পুণ্য কাজ করে কাঁদে, আর মোনাফেক গোনাহ করে হাসে। মুমিনের কাছে নির্জনবাস ভাল মনে হয়, আর মোনাফেকের কাছে জমজমাট অবস্থা উত্তম বিবেচিত হয়। মুমিন চাষাবাদ করে এবং তা নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শংকিত থাকে, আর মোনাফেক মূলোৎপাটন করে ও শস্যের গোলা আশা করে। মুমিন জনশাসনে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে সংস্কার করে, আর মোনাফেক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে গোলযোগ সৃষ্টি করে। সচ্চরিত্রতার প্রথম পরীক্ষা নিপীড়নে সবর দ্বারা হয়। সুতরং যে অপরের অসচ্চরিত্রতার অভিযোগ করে, এটা তার নিজেরই অসচ্চরিত্রতার প্রমাণ। কেননা, সচ্চরিত্রতা যুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করার নাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন মোটা পাড়ের নাজরানী চাদর পরিধান করে পথ চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আনাস (রাঃ)। জনৈক বেদুঈন পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাদর ধরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমন সজোরে টান মারল যে, চাদরের পাড় তাঁর ঘাড়ে বিদ্ধ হয়ে গেল। বেদুঈন বলল ঃ হে মুহাম্মদ, তোমার কাছে আল্লাহর যে ধন-সম্পদ রয়েছে, তা থেকে আমাকেও দাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেদুঈনের দিকে তাকালেন এবং হেসে কিছু দিয়ে দিলেন। তাঁর প্রতি কোরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা যখন চরমে পৌঁছে, তখন তিনি এই বলে দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ

–হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না।

কেউ কেউ বলেন, এ দোয়াটি তিনি ওহুদ যুদ্ধে করেছিলেন। মোট কথা, এসব কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর শানে এরশাদ করেন ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ –নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

বর্ণিত আছে, একদিন ইবরাহীম আদহাম কোন জঙ্গলে চলার সময় জনৈক সিপাহীর সাক্ষাৎ পান। সিপাহী জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি বান্দা (দাস)? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সিপাহী প্রশ্ন করল ঃ জনবসতি কোন্ দিকে? তিনি গোরস্থানের দিকে ইশারা করলে সিপাহী রেগে বলল ঃ আমি আবাদীর কথা জিজ্ঞেস করছি। তিনি বললেন ঃ গোরস্থানই আবাদী। এতে সিপাহী গোসসার আতিশয্যে তাঁর মস্তকে এমন বেত্রাঘাত করল যে, মস্তক ফেটে গেল। এর পর সিপাহী তাঁকে গ্রেফতার করে শহরে নিয়ে এল। পরিচিতরা এসে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলে সিপাহী সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। পরিচিতরা বলল ঃ সর্বনাশ করেছ। ইনি তো ইবরাহীম আদহাম। সিপাহী একথা শুনতেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ইবরাহীম আদহামের হস্তপদ চুম্বন করতে লাগল। এর পর লোকেরা ইবরাহীম আদহামকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কেন বললেন, আপনি বান্দা? তিনি বললেন ঃ সিপাহী আমাকে একথা জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি কার বান্দা? বরং সে শুধু বলেছে, তুমি কি বান্দা? আমি যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই বলে দিয়েছি, হাঁ, আমি বান্দা। এর পর সে যখন আমাকে বেত্রাঘাত করল, তখন আমি তার জন্যে জান্নাতের দোয়া করেছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে তো আপনার উপর যুলুম করেছে। তিনি বললেন ঃ আমার বিশ্বাস ছিল, তার এ যুলুমের কারণে আমি সওয়াব পাব । তাই আমি ভাল মনে করিনি যে, যার কারণে আমি সওয়াব পাব, আমার কারণে তার আযাব হোক।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবু ওসমান হিরীকে এক ব্যক্তি পরীক্ষার উদ্দেশে দাওয়াতের বাহানায় আপন গৃহে ডেকে আনল। তিনি যখন তার গৃহে পৌঁছলেন, তখন লোকটি বলল ঃ এক্ষণে কিছু আহার্য যোগাড় করা সম্ভব হল না। তিনি ফিরে গেলেন। অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর লোকটি এসে বলল ঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে যা মওজুদ আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি যখন পুনরায় গৃহের দরজায় পৌঁছলেন, তখন লোকটি পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি আবার ফিরে গেলেন। লোকটি এমনিভাবে কয়েকবার ডেকে আনল এবং ফিরিয়ে দিল। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও মনঃক্ষুণ্ন হলেন না। এর পর লোকটি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল ঃ মাফ করবেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। সোবহানাল্লাহ, কি চরিত্র আপনার! তিনি বললেন ঃ তুমি আমার যে বিষয়টি দেখেছ, সেটি হচ্ছে কুকুরের স্বভাব। যখন ডাক, চলে আসে। যখন তাড়িয়ে দাও, চলে যায়।

আবু ওসমান হিরীরই আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদিন তিনি সওয়ার হয়ে এক গলিপথে গমন করছিলেন। উপর থেকে কেউ তাঁর উপর ছাই নিক্ষেপ করল। তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন এবং আল্লাহর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার সেজদা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি ছাই নিক্ষেপকারীকে ধমক দিলেন না কেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আগুনের যোগ্য তার উপর ছাই পড়লে গোসসা করা শোভা পায় না।

বর্ণিত আছে, হযরত আলী ইবনে মূসা (রঃ)-এর গায়ের রঙ শ্যামল ছিল। কারণ, তাঁর জননী ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত। নিশাপুরে তাঁর গৃহের কাছে একটি হাম্মাম ছিল। তিনি হাম্মামে যেতে চাইলে পরিচালক তাঁর জন্যে হাম্মাম খালি করে দিত। একদিন তিনি যখন হাম্মামে গেলেন, তখন পরিচালক দরজা ভিড়িয়ে কোন কাজে চলে গেল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে দরজা খুলে হাম্মামের ভিতরে গেল। সে হযরত আলী ইবনে মূসাকে দেখে মনে করল, হাম্মামের কোন খাদেম হবে। সে বলল ঃ উঠ, আমার জন্যে পানি আন। তিনি তার আদেশ পালন করলেন এবং আরও যা যা আদেশ হল সবই আনজাম দিলেন। হাম্মামের পরিচালক ফিরে এসে আগন্তুকের কাপড় দেখতে পেল এবং আলী ইবনে মূসার সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনল। অমনি সে ভয়ে পালিয়ে গেল। তিনি হাম্মাম থেকে বের হয়ে পরিচালকের নিকট খোঁজ নিয়ে জানলেন, সে ভয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ সে পালিয়ে গেল কেন? দোষ তো সে ব্যক্তির, যে তার বীর্য হাবশী মহিলার কাছে সমর্পণ করেছিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবু আবদুল্লাহ্ খাইয়াত (দর্জি) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি দোকানে বসে কাপড় সেলাই করতেন। জনৈক অগ্নিপূজারী তাঁর কাছ থেকে কাপড় সেলাই করিয়ে নিত এবং শত্রুতাবশত মজুরি বাবদ অচল মুদ্রা দিয়ে যেত। তিনি এ মুদ্রা ফেরত দিতেন না এবং তাকে কিছু বলতেনও না। একদিন অগ্নিপূজারী মজুরি দিতে এসে তাঁকে পেল না। তাঁর শাগরেদ দোকানে বসা ছিল। তাকে মজুরি দিয়ে কাপড় চাইলে শাগরেদ অচল মুদ্রা দেখে ফিরিয়ে দিল। আবু আবদুল্লাহ এসে জানতে পেরে বললেন, তুমি ভাল করনি। এই অগ্নিপূজারী এক বছর ধরে এ কাজ করে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ মজুরি নিয়ে কূপে ফেলে দেই, যাতে সে কোন মুসলমানকে ধোঁকা দিতে না পারে।

সহল তস্তরীকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সচ্চরিত্রতা কি? তিনি বললেন ঃ সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রতিশোধ না নেয়া, নিপীড়ন সহ্য করা এবং যালেমের প্রতি অনুকম্পা করে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা। আহনাফ ইবনে কায়সকে প্রশ্ন করা হল, আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখলেন? তিনি বললেন ঃ কায়স ইবনে আসেমের কাছে। লোকেরা বলল ঃ তার সহনশীলতা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ একদিন তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। বাঁদী একটি কাবাবপূর্ণ শিক তাঁর কাছে নিয়ে এল। ঘটনাক্রমে শিকটি বাঁদীর হাত থেকে খসে গিয়ে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলের উপর পতিত হল। আঘাতের চোটে ছেলেটি মারা গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাঁদী ভয়ে কাপতে লাগল। তিনি বললেন ঃ ভয় করিস না। আমি তোকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

হযরত ওয়ায়েস কারনী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁকে যখন ডানপিটে ছেলেরা দেখত, তখন পাথর ছুঁড়ে মারতো। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ করে বলতেন ঃ ভাই সকল, যদি মারতেই হয়, তবে ছোট ছোট পাথর মার, যাতে আমার পা থেকে রক্ত বের না হয় এবং নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। একবার আহনাফ ইবনে কায়সকে জনৈক ব্যক্তি গালি দিতে শুরু করে। তিনি চুপচাপ চলে গেলেন এবং মহল্লার নিকটে পৌঁছে বললেন ঃ যদি মনে আরও কিছু গালি থেকে থাকে, তবে তাও বলে ফেল। কোথাও মহল্লার কোন বেওকুফ তোমার গালি শুনে তোমার উপর চড়াও না হয়।

হযরত আলী (রাঃ) একবার তাঁর গোলামকে ডাকলেন। সে জওয়াব দিল না। এর পর তিনি দ্বিতীয় বার ও তৃততীয় বার ডাকলেন, কিন্তু গোলামের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি স্বয়ং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোলামের কাছে গিয়ে দেখলেন, সে দিব্যি শুয়ে আছে। তিনি বললেনঃ তুমি আমার ডাক শুননি? গোলাম বলল ঃ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ তা হলে জওয়াব দিলে না কেন? গোলাম আরজ করল ঃ আপনি মারবেন- এরূপ ভয় আমার মোটেই ছিল না। তাই অবহেলাবশত জওয়াব দেইনি। হযরত আলী বললেন ঃ যাও, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

মালেক ইবনে দীনারকে লক্ষ্য করে জনৈকা মহিলা বলল, হে রিয়াকার। তিনি বললেন ঃ তুমি চমৎকার এ নামটি বের করেছ, যা বসরার লোকেরা ভুলে গিয়েছিল।

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, সাধনার ফলে এসব পুণ্যাত্মাদের নফস শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং চরিত্র সমতার পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। এর ফলে তাঁরা আল্লাহর তকদীরে সন্তুষ্ট ছিলেন, যা সচ্চরিত্রতার চূড়ান্ত সীমা। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজকে ভাল মনে করে না এবং তাতে সন্তুষ্ট হয় না, তার চরিত্র নিঃসন্দেহে অসৎ।

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সচ্চরিত্রতা

শিশুদের চরিত্র গঠন একটি নেহায়েত জরুরী বিষয়। শিশুরা পিতামাতার কাছে একটি আমানত। শিশুর অন্তর একটি উৎকৃষ্ট মুক্তা, সরল, অকৃত্রিম, সকল চিত্র থেকে মুক্ত এবং প্রত্যেক চিত্র গ্রহণের যোগ্য হয়ে থাকে। এই অন্তরকে যেদিকে ঝুঁকানো যায়– উদাহরণতঃ যদি তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়া হয় এবং সততায় অভ্যস্ত করা হয়, তবে বড় হয়েও তাই করবে এবং উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এই সওয়াবে পিতামাতা, ওস্তাদ, আদব শিক্ষাদাতা সকলেই অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে কুশিক্ষায় অভ্যস্ত করা হয় এবং জানোয়ারদের মত বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শিশু নিশ্চিতই বরবাদ হয়ে যাবে এবং এর দায়-দায়িত্ব শিশুর মুরব্বির উপর বর্তাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

–মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।

পিতা যখন দুনিয়ার অগ্নি থেকে তার সন্তানদেরকে রক্ষা করে, তখন আখেরাতের অগ্নি থেকে রক্ষা করা আরও বেশী জরুরী হয়ে পড়ে। আখেরাতের অগ্নি থেকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে সন্তানকে শিষ্টাচার,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দেয়া, কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখা এবং সাজসজ্জা, বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তাকে তার দৃষ্টিতে হেয় করা, যাতে বড় হয়ে এগুলোর অন্বেষণ না করে। শুরু থেকেই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরী। সেমতে তাকে কোন পুণ্যবতী, ধর্মপরায়ণা ও হালালখোর মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা, হারামের দুধে বরকত হয় না। শৈশবে হারামের দুধ পান করলে তা বিবেকের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বড় হয়ে সে দুশ্চরিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শিশুর মধ্যে যখন কিছু সদ্বিবেচনা শুরু হয়, তখন তার অধিক দেখাশুনা করা জরুরী। লজ্জা-শরমের বিকাশ দ্বারা সদ্বিবেচনার সূচনা হয়। ফলে শিশু কতক কাজ-কর্ম লজ্জাবশত ছেড়ে দেয়। এটা এ কারণে হয় যে, তখন তার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধিরূপী নূরের ঝলক এসে যায় এবং সে কতক বিষয়কে কতক বিষয়ের তুলনায় খারাপ মনে করে। ফলে কুকর্ম করতে লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ তাআলার এ দানটি চরিত্রের সমতা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা জ্ঞাপন করে। এতে বুঝা যায়, বড় হয়ে সে পূর্ণ বুদ্ধিমান হবে। এমন লজ্জাশীল শিশুকে অযত্নে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং লজ্জা ও শিষ্টাচার আয়ত্তের কাজে তাকে সাহায্য করা দরকার।

শুরুতে শিশুর মধ্যে যে স্বভাব প্রবল হয়, তা হচ্ছে খাওয়ার বাসনা। অতএব এরই শিষ্টাচার তাকে শেখানো উচিত। অর্থাৎ সে ডান হাতে খাবে। খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলবে। সম্মুখভাগ থেকে খাবে। অন্যের আগে খাওয়া শুরু করবে না। খাদ্যের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকাবে না। তড়িঘড়ি করে খাবে না। উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবে। মুখে উপর্যুপরি লোকমা দেবে না। মাঝে মাঝে তরকারি ছাড়া শুধু রুটি খাওয়ার অভ্যাস করবে, যাতে সে বুঝে, তরকারি দিয়ে রুটি খাওয়া জরুরী নয়।

শিশুর সামনে অধিক ভোজনের নিন্দা করা উচিত। যারা অল্প ভোজন করে তার সামনে তাদের প্রশংসা করবে। অপরকে খানা দেয়া যে ভাল, এ বিষয়টিও তার দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলবে। পোশাকের মধ্যে সাদা পোশাক শিশুকে পছন্দ করানো উচিত। রঙীন ও রেশমী পোশাক সম্বন্ধে বলে দেবে, এগুলো নারীদের পোশাক। পুরুষেরা এগুলোকে খারাপ মনে করে।

এরপর শিশুকে মক্তবে পাঠিয়ে কোরআন হাদীস ও সৎকর্মপরায়ণদের গল্প শেখানো উচিত, যাতে তার মনে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুকে এশক ও প্রেমের কবিতা পাঠ করতে দেবে না। কেননা, এতে অন্তরে অনর্থের বীজ বপন করা হয়। শিশু কোন উত্তম কাজ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলে তাকে পুরস্কৃত করবে। এতে সে খুশী হবে। এক, দু'বার খেলাফ কাজ করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, পর্দা উন্মোচন করবে না। বিশেষভাবে এমন কাজে যা শিশু নিজেই গোপন করে। কেননা, সে যদি জেনে নেয় যে, এ কাজটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় কিছু হয়নি, তবে ভবিষ্যতে আরও দুঃসাহসী হয়ে যাবে। পুনরায় এ খারাপ কাজটি করলে তাকে গোপনে শাসাবে। শিশুকে সদাসর্বদা শাসানো উচিত নয়। এতে সে তিরস্কারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ করার সাহস বেড়ে যায়। পিতার ন্যায় মাতাও শিশুকে মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং পিতার ভয় দেখাবে।

শিশুকে নরম বিছানা দেবে না, এতে তার দেহ শক্ত হয় এবং সে আরামপ্রিয় হয় না। এমনিভাবে পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারেও শিশুকে আরামপ্রিয় হতে দেয়া উচিত নয়।

মক্তব থেকে ফিরে আসার পর শিশুকে কোন ভাল খেলার অনুমতি দেয়া উচিত, যাতে মক্তবের শ্রম লাঘব হয়। কিন্তু এত বেশী খেলবে না যাতে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতটুকু খেলার অনুমতি না দিলে এবং শিক্ষায় সব সময় কঠোরতা করলে শিশুর মন মরে যায়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ফলে সে শিক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে। শিশু সদ্বিবেচনার বয়সে পৌঁছলে তাকে ওযু ও নামায শিক্ষা দেবে। রমযান মাসে কিছু কিছু রোযা রাখাবে।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী বলেন ঃ আমি তিন বছর বয়সে রাত্রে জাগ্রত হতাম এবং আমার মামা মুহাম্মদ ইবনে সেওয়ারকে নামায পড়তে দেখতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর যিকির কর না কেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমি বললাম ঃ কিভাবে যিকির করব? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন শয়ন কর, তখন তিনবার এ শব্দগুলো মনে মনে বলে নিবে– জিহ্বা নড়াচড়া করবে না; اَللّٰهُ مَعِىْ اَللّٰهُ نَاظِرِىْ اَللّٰهُ شَاهِدِىْ (আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ আমাকে দেখেন, আল্লাহ আমার সাক্ষ্যদাতা।) আমি কয়েক রাত্রি পর্যন্ত তাই করলাম এবং তাঁকে জানালাম। মামা বললেন ঃ এখন থেকে সাত বার বল। আমি তাই করলাম। এর পর তিনি আমাকে এগার বার বলতে আদেশ করলেন। আমি প্রত্যহ এগার বার বলতে শুরু করলে অন্তরে এর স্বাদ অনুভব করলাম। এক বছর পর মামা বললেন ঃ আমি তোমাকে যা শেখালাম, তা মনে রাখবে এবং সদাসর্বদা কবরে যাওয়া পর্যন্ত বলে যাবে। এটা উভয় জাহানে তোমার উপকারে আসবে। আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কয়েক বছর পর্যন্ত এই ওযীফা পাঠ করে অন্তরে আরও বেশী মিষ্টতা অনুভব করলাম। একদিন মামা বললেন– সহল, যার সাথে আল্লাহ থাকেন, যাকে তিনি দেখেন এবং যার তিনি সাক্ষী হন, সে কি তার নাফরমানী করতে পারে? খবরদার, আল্লাহর নাফরমানী করো না। অতঃপর আমি একান্তে এই যিকিরই করতাম। যখন আমাকে মক্তবে প্রেরণ করা হল, তখন এই যিকিরে ক্রটির আশংকা করে আমি ওস্তাদের সাথে শর্ত করলাম, এক ঘন্টা পড়াশুনা করে চলে আসব। মক্তবে গিয়ে ছয় অথবা সাত বছর বয়সে আমি কোরআন শরীফ হেফয করে নিলাম। আমি সর্বদা রোযা রাখতাম এবং বার বছর বয়স পর্যন্ত যবের রুটি খেলাম। তের বছর বয়সে আমার মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিল, যার উত্তর পাওয়ার জন্যে আমি মুরব্বীদের অনুমতি নিয়ে বসরায় গেলাম এবং সেখানকার আলেমদের সামনে প্রশ্নটি রাখলাম। কিন্তু কেউ আমাকে সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারল না। অতঃপর আমি আবাদানে চলে গেলাম। সেখানে একজন আবু হাবীব নামক বুযুগ বসবাস করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সন্তোষজনক জওয়াব দিলেন। আমি তাঁর কাছে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে তাঁর কালাম দ্বারা উপকৃত হলাম। এর পর তস্তরে চলে এলাম। এখানে এসে খাদ্য এই নির্ধারণ করলাম যে, এক দেরহামের যব ক্রয় করে তা পিষিয়ে সেহরীর সময় লবণবিহীন শুধু রুটি এক ছটাক পরিমাণে খেতাম। ফলে এক দেরহামই সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। এর পর আমি তিন দিন উপর্যুপরি রোযা রাখতাম এবং একদিন রোযা রাখতাম না। অতঃপর পাঁচ দিন ও সাত দিন উপর্যুপরি রোযা রেখেছি। বিশ বছর এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পর আমি কয়েক বছর বিভিন্ন দেশ সফর করেছি এবং তস্তরে ফিরে এসে সমগ্র রাত্রি জাগরণ অবলম্বন করেছি।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একাদশ অধ্যায়

উদর ও লজ্জাস্থানের খাহেশের প্রতিকার

জানা উচিত, উদরের খাহেশ আদম সন্তানের জন্যে বড় মারাত্মক, যার কারণে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) চিরস্থায়ী জান্নাত থেকে এই ধ্বংসশীল পৃথিবীতে বহিষ্কৃত হন। তাঁদেরকে এক বিশেষ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের খাহেশ প্রবল হওয়ায় তাঁরা তা খেয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে উদর খাহেশের ঝরণা এবং আপদের খনি। কারণ, উদরের জন্যে নারী সম্ভোগের খাহেশ অপরিহার্য। পেটপূর্তি হলে একাধিক স্ত্রী ও অত্যাধিক সহবাসের বাসনা জাগ্রত হয়। এর পর ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে। কেননা, এগুলো দ্বারা এই মতলব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়। ধন-সম্পদের আধিক্য থেকে নানা রকমের ঔদ্ধত্য ও হিংসার সৃষ্টি হয় এবং এরই বদৌলতে রিয়া, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার জন্মলাভ করে, ফলে বিদ্বেষ ও শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অবশেষে মানুষ অবাধ্যতা, নাফরমানী ও নিষিদ্ধ কাজ করতে শুরু করে। এগুলো সব এ বিষয়েরই ফল যে, উদরকে খালি না রেখে আকণ্ঠ ভরে নেয়া হয়। যদি মানুষ তার নফসকে ক্ষুধার্ত রেখে শয়তানের পথ সংকীর্ণ করে দেয়, তবে অবশ্যই সে আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে পা উঠাবে না, অবাধ্যতা ও আস্ফালনের কাছেও ঘেঁষবে না, আখেরাত ছেড়ে দুনিয়াদার হয়ে থাকবে না এবং বাদানুবাদ ও কলহ কিনে নেবে না। এসব কারণে উদরের বিপদাপদ ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করা এবং এ সম্পর্কিত মোজাহাদার পদ্ধতি ও ফযীলত ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক, যাতে মানুষ এ থেকে বেঁচে থাকে এবং মোজাহাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লজ্জাস্থানের খাহেশও এমনি ধরনের, যা এর পরে আসে। তাই এর বর্ণনাও জরুরী। সেমতে আমরা এ বিষয়গুলোকে আটটি শিরোনামে বর্ণনা করব।

১॥ ক্ষুধার ফযীলত ও উদরপূর্তির নিন্দা

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

جَاهِدُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ وَالْعَطَشِ فَاِنَّ الْاَجْرَ فِىْ ذٰلِكَ كَاَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ جُوْعٍ وَ عَطَشٍ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

–তোমরা নফসের বিরুদ্ধে ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা জেহাদ কর। এতে এমন সওয়াব, যেমন আল্লাহর পথে জেহাদকারীর সওয়াব। আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষুধা পিপাসার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন আমল নেই।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আকাশের ফেরেশতা সেই ব্যক্তির কাছে আসে না, যে তার পেট ভরে নেয়। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন ঃ مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ وَضَحِكُهُ وَرَضِيَ بِمَا يَسْتُرُبِهِ عَوْرَتَهُ –যে কম খায়, কম হাসে এবং এমন পোশাকে সন্তুষ্ট থাকে, যা দ্বারা তার গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করতে পারে। আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 'পশমী বস্ত্র পরিধান কর এবং আধাপেট খাও। এটা নবুওয়তের একাংশ।' হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

اَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُكُمْ جُوْعًا وَتَفَكُّرًا فِى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَاَبْغَضُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَوَّامٍ اَكُوْلٍ شَرُوْبٍ ـ

–কেয়ামতে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ মর্তবাশালী সেই ব্যক্তি হবে, যে অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে এবং যিকির বেশী করবে। কেয়ামতে আল্লাহর কাছে অধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি হবে, যে অধিক নিদ্রা যায়, অধিক খায় এবং অধিক পান করে।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) প্রয়োজনেও ক্ষুধার্ত থাকতেন, অর্থাৎ এটা তাঁর পছন্দনীয় ছিল। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির পানাহার দুনিয়াতে কম, আল্লাহ তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন ঃ আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে দুনিয়াতে পানাহার কম দিয়েছি। সে সবর করেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, যে লোকমা সে ছেড়ে দেবে, তার বিনিময়ে জান্নাতে তাকে উচ্চ মর্তবা দান করব। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لَاتُمِيْتُوا الْقَلْبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَاِنَّ الْقَلْبَ كَالزَّرْعِ يَمُوْتُ اِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ـ

–তোমরা অন্তরকে অধিক পানাহার দ্বারা মেরে ফেলো না। অন্তর কৃষিক্ষেত্রের মত। তাতে পানি বেশী হলে ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়।'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উসামা ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের অধিক নিকটবর্তী সে ব্যক্তিই হবে, যে দুনিয়াতে অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও চিন্তান্বিত থাকবে। এ ধরনের লোকেরা হচ্ছে গোপন মুত্তাকী। এরা আত্মপ্রকাশ করলে কেউ তাদেরকে চেনে না এবং অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ খোঁজে না। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। তারাই ভাল লোক। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যও উত্তমরূপে তারাই করে। লোকেরা নরম নরম শয্যায় শয়ন করে। আর তারা নিজেদের মস্তক ও হাঁটু বিছিয়ে দেয়। পয়গম্বরগণের চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম তাদের মুখস্থ। যে জায়গা থেকে তারা চলে যায়, সেই জায়গা কাঁদে। যে শহরে তাদের কেউ না থাকে, সেই শহরের উপর গযব নাযিল হয়। তারা দুনিয়ার জন্যে মৃতের উপর কুকুরের মত লড়াই করে না। যে পরিমাণ খেলে নিঃশ্বাস বাকী থাকে, তারা সেই পরিমাণই খায় এবং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে। মলিন অবস্থার কারণে লোকে তাদেরকে রোগগ্রস্ত মনে করে ; অথচ তাদের কোন রোগ নেই। কেউ কেউ মনে করে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত; অথচ এটাও নয়। পরকালের গৌরব তাদের জন্যেই। হে উসামা, যে শহরে এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয়, জেনে নেবে, সেই শহরের শান্তির কারণ তারাই। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা থাকে, আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে আযাব দেন না। ভূপৃষ্ঠও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি রাযী। মানুষের মধ্যে তাদেরকে রাখার কারণ তাদের দ্বারা যথাসম্ভব মানুষকে মুক্তি দেয়া। তুমি যদি আমৃত্যু ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করতে পার, তবে কর। এর কারণে তুমি উচ্চ মর্যাদা পাবে এবং নবীগণের কাতারে দাখিল হবে। তোমার আত্মা যখন ফেরেশতাদের কাছে যাবে, তখন তারা আনন্দিত হবে এবং আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করবেন। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اِلْبَسُوا الصُّوفَ وَشَمِّرُوا وَكُلُوا فِى اَنْصَافِ الْبُطُوْنِ تَدْخُلُوا فِى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ .

'পশম পরিধান কর এবং কর্মতৎপর থাক। আধাপেট আহার কর। তাহলে আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে।'

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ, তোমাদের পাকস্থলীকে ক্ষুধাতুর এবং দেহ উলঙ্গ রাখ, যাতে তোমাদের অন্তর আল্লাহকে দেখে। তওরাতে লিখিত আছে– আল্লাহ কোন স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। কেননা, দৈহিক স্থুলতা অনবধানতা ও অধিক আহার জ্ঞাপন করে। এটা আলেমের জন্যে ভাল নয়। তাই হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেনঃ

যে আলেম পেট ভরে খেয়ে মোটা হয়েছে, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না। এক হাদীসে আছে, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত বিচরণ করে। তোমরা ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা তার চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দাও।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اَلْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِىْ مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

–মুমিন এক নাড়ি-ভুঁড়িতে এবং কাফের সাত নাড়ি-ভুঁড়িতে খায়।

অর্থাৎ মুমিনের তুলনায় কাফের সাত গুণ বেশী খায় কিংবা তার খাহেশ মুমিনের চেয়ে সাত গুণ বেশী হয়। রূপক অর্থে খাহেশের স্থলে নাড়ি-ভুঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের অর্থ এরূপ নয় যে, কাফেরের নাড়ি-ভুঁড়ি বাস্তবে মুমিনের তুলনায় বেশী হয়। হযরত হাসানের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছেন ঃ

اَدِيْمُوْا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ يُفْتَحْ لَكُمْ

–তোমরা সর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়। তোমাদের জন্যে তা খুলে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ জান্নাতের দরজার কড়া কিরূপে নাড়া দেব ? তিনি বললেন ঃ بِالْجُوْعِ وَالظَّمَاِ অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা। হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে ঢেকুর তুললে তিনি বললেন ঃ অধিক ঢেকুর তুলো না। কেননা, কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই অধিক ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে বেশী পেট ভরে খায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও পেটভরে আহার করেননি। মাঝে মাঝে তাঁর ক্ষুধা দেখে হযরত আয়েশার করুণা হত এবং তিনি কেঁদে দিতেন। তিনি তাঁর পেটে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ আপনার প্রতি আমি উৎসর্গ। দুনিয়া থেকে এতটুকু অংশ তো নিন, যদ্দ্বারা শক্তি বহাল থাকে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে যায়। জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ আয়েশা, আমার ভাইগণ অর্থাৎ প্রধান প্রধান পয়গম্বরগণ আমার চেয়েও অধিক কষ্ট সহ্য করেছেন। এসব কষ্টে সবর করে তাঁরা যখন পরওয়ারদেগারের কাছে গেছেন, তখন অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছেন এবং অপরিসীম সওয়াব লাভ করেছেন। আমি লজ্জাবোধ করি,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোথাও জীবনে কিছু আরাম ভোগ করার কারণে আখেরাতে তাঁদের চেয়ে কম মর্তবা লাভ করি। আখেরাতে কম মর্তবা পাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে কয়েক দিন সবর করা সহজ। আপন ভাইদের সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু ভাল মনে হয় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, এই কথাবার্তার পর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ) একখন্ড রুটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি ? হযরত ফাতেমা বললেন ঃ আমি একটি রুটি তৈরী করেছিলাম। আমার মনে চাইল, তাই এ খন্ডটি আপনার জন্যে এনেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রুটির টুকরাটি খেয়ে বললেন ঃ তিন দিন পর তোমার পিতার মুখে এই প্রথম খাদ্য পৌঁছল। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সারা জীবনে কখনও পরিবার-পরিজনকে লাগাতার তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি দেননি। তিনি বলতেন ঃ

اِنَّ اَهلَ الجُوعِ فِی الدُّنیا هُمْ اَهلُ الشِّبعِ فِی الاٰخِرَةِ وَاِنَّ اَبغَضَ النَّاسِ اِلَی اللّٰهِ المُتَخِمُونَ المَلأَ وَمَا تَرَكَ عَبدٌ لُقمَةً یَشتَهِیهَا اِلَّا كَانَت لَهٗ دَرَجَةٌ فِی الجَنَّةِ ـ

–দুনিয়াতে যারা ক্ষুধার্ত, আখেরাতে তারা তৃপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ব্যক্তি অধিক ঘৃণিত, যার বদহজম লেগে থাকে এবং পেট ভরে আহার করে। বান্দা খাহেশ সত্ত্বেও যে লোকমাটি ছেড়ে দেয়, তার বিনিময়ে সে জান্নাতে একটি স্তর লাভ করে।

ক্ষুধার ফযীলত সম্পর্কে মহাজন উক্তিও অনেক। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উদরপূর্তি থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, এটা জীবদ্দশায় দুর্মূল্যের এবং মৃত্যুর পর দুর্গন্ধের কারণ। হযরত শাকীক বলখী (রঃ) বলেন ঃ এবাদত একটি পেশা, যার দোকান হচ্ছে নির্জনতা এবং হাতিয়ার ক্ষুধা। হযরত লোকমান (রঃ) আপন পুত্রকে বলেন ঃ বৎস, যখন পাকস্থলী পূর্ণ থাকে, তখন চিন্তা ঝিমিয়ে পড়ে এবং এবাদতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেকার বসে থাকে। হযরত ফযল ইবনে আয়ায নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ তোমার কিসের ভয়? ক্ষুধার ? ক্ষুধাকে ভয় করা উচিত নয়। কেননা, এর কারণেই তুমি আল্লাহ তা'আলার সামনে হালকা-পাতলা থাক। আল্লাহর রসূল ও তাঁর সকল সাহাবী ক্ষুধার্ত থাকতেন। কাহমস (রঃ) বলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত রেখেছ, উলঙ্গ রেখেছ এবং অন্ধকার রাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রদীপহীন রেখেছ। কেমন কেমন ওসীলা দ্বারা আমাকে এই মর্তবায় পৌঁছিয়েছ। তওরাতে উল্লিখিত আছে– আল্লাহকে ভয় কর এবং যখন পেট ভরে আহার কর, তখন ক্ষুধার্তকে স্মরণ কর। আবু সোলায়মান (রঃ) বলেন ঃ রাতের খাদ্য থেকে এক লোকমা কম খাওয়া আমার কাছে সারারাত জেগে এবাদত করার চেয়ে ভাল মনে হয়। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহর ভান্ডার থেকে ক্ষুধা তাকেই দান করা হয়, যাকে তিনি পছন্দ করেন। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (রঃ) পঁচিশ দিন পর্যন্ত খেতেন না এবং এক দেরহামের আটা দিয়ে এক বছর চালিয়ে দিতেন। তিনি ক্ষুধার উচ্চ মর্তবা বিশ্বাস করতেন এবং এ সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করে বলতেন ঃ কেয়ামতের দিন কোন নেক আমলের এতটুকু সওয়াব হবে না, যতটুকু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে বাড়তি খাদ্য ত্যাগ করলে হবে। তিনি আরও বলেন ঃ যারা আখেরাত তলব করে, তাদের জন্যে খাওয়ার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ক্ষুধার মধ্যে এবং গোনাহ ও মূর্খতা তৃপ্তির মধ্যে নিহিত। যে হাদীসে বলা হয়েছে, পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই পরিমাণের চেয়ে বেশী খায়, সে তার পুণ্য খায়। এর চেয়ে উচ্চ মর্তবার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ খাদ্য খাওয়ার তুলনায় না খাওয়া অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত কারও ফযীলত লাভ হবে না। এক রাত ক্ষুধার্ত থাকলে আল্লাহর কাছে দু'রাত ক্ষুধার্ত থাকার জন্যে দোয়া করবে। এই অবস্থা অর্জিত হলে সে খাদ্য না খাওয়া প্রিয় মনে করবে। তিনি আরও বলেন ঃ যারা আবদাল হয়েছেন, তারা পেটকে ক্ষুধার্ত রাখা, রাত্রি জাগরণ ও একান্তবাস দ্বারা আবদাল হয়েছেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর মহব্বত পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্ষুধা দ্বারা। ওলীগণ পানির উপর দিয়ে হেঁটে যান না, কিন্তু ক্ষুধার বদৌলত। তারা নিমেষের মধ্যে পথের দূরত্ব অতিক্রম করেন না, কিন্তু ক্ষুধার কারণে।

২ ॥ ক্ষুধার উপকারিতা ও তৃপ্তির বিপদাপদ

এক্ষণে প্রশ্ন হয়, ক্ষুধার এত ফযীলত কোত্থেকে এল এবং এর কারণ কি? ক্ষুধা দ্বারা কেবল পাকস্থলী দুঃখ ও কষ্টই ভোগ করে। যদি কষ্টের মধ্যেই ফযীলত নিহিত থাকে, তবে যারা আত্মহত্যা করে অথবা আপন দেহের মাংস কাটে অথবা এমনি ধরনের কোন কান্ড করে, তাদের অধিক সওয়াব হওয়া উচিত। এর জওয়াব হচ্ছে,এটা এমন, যেমন কেউ ওষুধ সেবন করে সুস্থ হওয়ার পর মনে করতে থাকে যে, ওষুধের মধ্যে যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিক্ততা ছিল, তাতেই আমি সুস্থ হয়েছি। এর পর আরও অধিক তিক্ত ওষুধ খেতে শুরু করে। অথচ এটা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। ওষুধের উপকারিতা তিক্ততার কারণে নয়। বরং ওষুধের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা চিকিৎসকরা জানে। এমনিভাবে ক্ষুধার মধ্যে যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো আলেমগণ জানেন। যে কেউ এর উপকারিতা বিশ্বাস করে নিজের জন্যে অবলম্বন করবে, সে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে, যদিও উপকারের কারণ তার অজানা থাকে। যেমন ঔষধ সেবনকারী কারণ না জানলেও ওষুধের উপকার পায়। কিন্তু যারা আপন জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে চায়, তাদের জন্য নিম্নে আমরা ক্ষুধার দশটি উপকারিতা লিখে দিচ্ছি।

প্রথম উপকারিতা, ক্ষুধা দ্বারা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবের তীক্ষ্ণতা এবং অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতা অর্জিত হয়। এর বিপরীতে তৃপ্তি স্থূলবুদ্ধিতা জন্ম দেয়, মেধা বিনষ্ট করে এবং মস্তিষ্কে নেশার মত পৌঁছে চিন্তা-ভাবনার জায়গাকে ঘিরে ফেলে। ফলে অন্তর ভারী হয়ে চিন্তার দিকে ধাবিত হয় না এবং দ্রুত অনুভব করতে পারে না। শিশুরা বেশী খেলে তাদের স্মরণশক্তিতে ক্রটি দেখা দেয়। হযরত আবু সোলায়মান (রহঃ) বলেন ঃ ক্ষুধা অবলম্বন করা উচিত। এতে নফস লাঞ্ছিত এবং অন্তর সূক্ষ্ম হয়ে আসমানী জ্ঞান লাভের যোগ্য হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

أَحْيُوا قُلُوبَكُمْ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ وَقِلَّةِ الشَّبْعِ وَطَهِّرُوهَا بِالْجُوعِ تَصْفُو وَتَرِقُّ -

—তোমাদের অন্তরকে কম হাসি ও কম তৃপ্তি দ্বারা পুনরুজ্জীবিত কর এবং পবিত্র কর ক্ষুধা দ্বারা। এতে তোমাদের অন্তর সাফ ও নরম হবে।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে পেট ভরে আহার করে ও নিদ্রা যায়, তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْبَدَنِ الْجُوعُ প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে। দেহের যাকাত ক্ষুধা।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষুধার্ত থেকেছি, তখনই অন্তরে প্রজ্ঞা ও শিক্ষার একটি দরজা খোলা পেয়েছি, যা পূর্বে পাইনি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (রহ) বলেন ঃ ক্ষুধা একটি মেঘ । এর কারণে বান্দার অন্তরে হেকমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ প্রজ্ঞার নূর হচ্ছে ক্ষুধা, আল্লাহ থেকে দূরত্ব হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য হচ্ছে মিসকীনদের ভালবাসা ও তাদের কাছে থাকা। তোমরা পেট ভরে খেয়ো না। খেলে অন্তর থেকে প্রজ্ঞার নূর নিভে যাবে। যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় সামান্য আহার করে নামায পড়ে, তার আশেপাশে সকাল পর্যন্ত বেহেশতের হুর থাকে।

দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, অন্তরের নম্রতা, যা দ্বারা অন্তরের যিকিরের ক্রুটি অনুভব করা যায়। প্রায়ই এমন হয় যে, অন্তরের উপস্থিতিসহ মুখে যিকির চালু থাকে; কিন্তু অন্তর তাতে প্রভাবিত হয় না। অন্তর ও প্রভাবের মধ্যে যেন আন্তরিক কঠোরতা আড়াল হয়ে যায়। আবার কোন সময় অন্তরে যিকিরের খুব প্রভাব পড়ে এবং মোনাজাতে আনন্দ পাওয়া যায়। এর বাহ্যিক কারণ পাকস্থলী খালি হওয়া। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি এবাদতে তখনই অধিক মিষ্টতা পাই, যখন আমার পিঠ পেটের সাথে লেগে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ অন্তর যখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে, তখন পরিষ্কার ও পাতলা থাকে। পক্ষান্তরে যখন পেট ভর্তি থাকে, অন্ধ ও স্থুল হয়ে যায়।

তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে, বিনয় ও বশ্যতা অর্জিত হওয়া এবং দর্প ও অহংকার দূর হওয়া । ক্ষুধা দ্বারা নফস যতটুকু নম্র ও লাঞ্ছিত হয়, অন্য কোন কিছু দ্বারা ততটুকু হয় না। ক্ষুধার অবস্থায় নফস দুর্বল হয়ে যখন এক খন্ড রুটি ও এক চুমুক পানি পায় না, তখন মালিকের আনুগত্য করে ও অক্ষম হয়ে থাকে। নিজেকে অক্ষম অপারগ মনে করা এবং আল্লাহ ত'আলাকে পরাক্রমশালী মনে করার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। তাই সর্বক্ষণ ক্ষুধার্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাশী থাকা নেহায়েত জরুরী। এ কারণেই যখন দুনিয়া ও তার সমস্ত ভান্ডার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিল, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন–

لَابَلْ اَجُوعُ يَوْمًا وَاَشْبَعُ يَوْمًا فَاِذَا جِعْتُ صَبَرْتُ وَتَضَرَّعْتُ وَاِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ .

–না, বরং আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকব ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খাব। যখন ভুখা থাকব, তখন সবর করব ও আনুগত্য করব। আর যখন পেট ভরে খাব, তখন শোকর করব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, খোদায়ী আযাব ও বিপদগ্রস্তদের কষ্ট বিস্মৃত না হওয়া। কেননা, যারা পেট ভরে খায়, তারা ক্ষুধার্ত ও ক্ষুধা উভয়টি ভুলে যায়। হুশিয়ার ব্যক্তি কোন বিপদ দেখেই আখেরাতের বিপদ স্মরণ করে। সে পিপাসা দেখে কেয়ামতের মাঠে পরকালে পিপাসা স্মরণ করে এবং ক্ষুধা দেখে দোযখীদের ক্ষুধা স্মরণ করে। দোযখীরা ভুখা অবস্থায় কন্টকযুক্ত বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে পাবে এবং পিপাসার সময় পুঁজ পাবে। যে ব্যক্তি কখনও ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট না করে, সে আখেরাতের আযাব ভুলে যায়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি ভুখা থাকেন কেন, আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডার তো আপনার করায়ত্ত? তিনি বললেন ঃ আমি আশংকা করি, পেট ভরে আহার করলে ভুখাদেরকে ভুলে যাব। এ থেকে বুঝা গেল, ভুখা ও অভাবগ্রস্তদেরকে স্মরণ করাও ক্ষুধার অন্যতম উপকারিতা। কারণ, ক্ষুধা থেকে দয়া, অন্নদান ও মানুষের প্রতি অনুকম্পা জন্ম লাভ করে।

পঞ্চম উপকারিতা হচ্ছে, খাহেশ চূর্ণ করা এবং "নফসে আম্মারা" তথা কুকর্মের আদেশদাতা নফসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। এ উপকারিতাটি সর্ববৃহৎ। বলা বাহুল্য, সকল গোনাহের মূল কারণ হচ্ছে খাহেশ ও শক্তি, যার উপাদান খাদ্য ও আহার্য। খাদ্য হ্রাস করলে যাবতীয় খাহেশ ও শক্তি দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মানুষের সৌভাগ্য সবটুকুই নফসকে কাবু করে রাখার মধ্যে এবং দুর্ভাগ্য সবটুকুই নফসের কাবুতে চলে যাওয়ার মধ্যে নিহিত। সেমতে অবাধ্য ঘোড়া যেমন দানাপানি না দিলে কাবুতে থাকে, তেমনি নফসকে ভুখা রাখলে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা বলল ঃ আপনি তো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এখন নফসের খেদমত করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ নফস দ্রুত আস্ফালন করতে থাকে এবং খুব দুষ্টামি করে। সে অবাধ্য হয়ে কোথাও আমাকে বিপদে না ফেলে দেয়, তাই তার খেদমত করি না। কোন গোনাহ করার চেয়ে নফসের সাথে কঠোরতা করাকেই আমি উত্তম মনে করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে সর্বপ্রথম যে বেদআতটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা ছিল, মানুষ তৃপ্ত হয়ে আহার করতে শুরু করল। পেট ভরে খেলে অবশ্যই তাদের নফস দুনিয়ার দিকে জোর দেখাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ক্ষুধা আল্লাহ্ তা'আলার একটি ভাণ্ডার। এর সামান্যতম কাজ হচ্ছে লজ্জাস্থানের খাহেশ ও কথা বলার খাহেশ বিলোপ করা। কারণ, ভুখার মন বেশী কথা বলতে চায় না। ফলে সে মুখের আপদ তথা গীবত,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অশ্লীলতা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকে। যিনার ক্ষতি কারও কাছে গোপন নয়; কিন্তু ক্ষুধা দ্বারা মানুষ এর অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকে। পেট ভরে আহার করলে এই খাহেশ জোরদার হয়। আল্লাহর ভয়ে এ থেকে বিরত থাকলেও দৃষ্টিকে ফেরানো যায় না। এটাও যিনার মধ্যে দাখিল। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে মুরীদ পানাহারের শাসনে সবর করে, এক বছরকাল আধা পেট রুটি খায় এবং তাতে কোন দিলপছন্দ বস্তু মিশ্রিত না করে,আল্লাহ তা'আলা তার মন থেকে নারীর চিন্তা দূর করে দেন।

ষষ্ঠ উপকারিতা হচ্ছে, নিদ্রা দূর হওয়া এবং অধিক সময় জাগ্রত থাকা। কেননা, যে পেট ভরে খায়, সে অনেক পানি পান করে। অধিক পানি পান করার কারণে নিদ্রা বেশী আসে। কোন কোন বুযুর্গ এ কারণেই আহারের সময় মুরীদকে বলতেন ঃ বেশী আহার করো না। বেশী আহার করলে পানি বেশী পান করবে এবং নিদ্রা বেশী হবে।

সপ্তম উপকারিতা হচ্ছে, ক্ষুধা দ্বারা এবাদত অব্যাহত রাখা সহজ হয়। কেননা, স্বয়ং আহার করা অধিক এবাদতের পথে এ কারণে বাধা যে, এর জন্যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। আটা ইত্যাদি ক্রয় করা ও রুটি তৈরী করার মধ্যেও বেশ সময় লেগে যায়। এ সময়কে যিকির, মোনাজাত ইত্যাদিতে ব্যয় করলে উপকার বেশী হত। হযরত সিররী (রহঃ) বলেন ঃ আমি জুরজানীর কাছে ছাতু দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনার ছাতু খাওয়া ও রুটি না খাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, হিসাব করে দেখেছি, রুটি তৈরী করতে যে অতিরিক্ত সময় লাগবে তাতে সত্তর বার সোবহানাল্লাহ বলা যায়। তাই চল্লিশ বছর ধরে আমি রুটি খাওয়া ত্যাগ করেছি। চিন্তার বিষয়, তিনি সময় নষ্ট হওয়ার কথা কোথায় চিন্তা করেছেন এবং সময় নষ্ট হতে দেননি। এমনিভাবে মানুষের প্রত্যেকটি শ্বাস একটি অমূল্য সম্পদ। এর দ্বারা আখেরাতের অক্ষয় ভাণ্ডার অর্জন করা উচিত। এটা সময়কে আল্লাহর যিকর ও আনুগত্যে ব্যয় করার মাধ্যমে হয়। এছাড়া অধিক খাদ্য গ্রহণ করলে সব সময় পাকসাফ থাকা যায় না এবং মসজিদে অবস্থান করা যায় না। কেননা, বার বার পেশাব করার জন্যে যেতে হয়।

অষ্টম উপকারিতা হচ্ছে, দৈহিক সুস্থতা ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা। কেননা, রোগব্যাধির কারণ হচ্ছে, অধিক ভোজন, যে কারণে অকর্মণ্য পিত্তাদি পাকস্থলী ও শিরায় একত্রিত থাকে। এর পর রোগী এবাদত করতে সক্ষম হয় না। মন সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে এবং জীবন তিক্ত হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায়। বর্ণিত আছে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার ভারত, রোম, ইরাক ও আবিসিনিয়া– এই চার দেশ থেকে চার জন খ্যাতনামা চিকিৎসককে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এমন ওষুধের কথা বলুন যদ্দ্বারা কোন রোগ হয় না। ভারতীয় চিকিৎসক বলল ঃ আমার মতে এরূপ ওষুধ হচ্ছে কাল হরীতকী। ইরাকী চিকিৎসক বলল ঃ আমার মতে এটা হচ্ছে তেরাতীযক। রোমীয় চিকিৎসক গরম পানির কথা বলল। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ছিল আবিসিনীয় চিকিৎসক। সে বলল ঃ হরীতকী খেলে পাকস্থলী সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটাও একটা রোগ। তেরাতীযকের ফলে পাকস্থলী নরম হয়। এটা আলাদা ব্যাধি। গরম পানিতে পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ে, যা রোগ ছাড়া কিছু নয়। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা হলে আপনার মতে এরূপ ওষুধ কোন্‌টি? সে জওয়াবে বলল ঃ আমার মতে যে ব্যবস্থার ফলে রোগ হয় না, তা হচ্ছে, আহার তখন করবে যখন খাহেশ হয় এবং খতম তখন করবে, যখন খাহেশ বাকী থাকে। সকলেই তার কথা মেনে নিল।

জনৈক আহলে কিতাব আলেমের সামনে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয় ঃ ثُلُثٌ لِطَعَامٍ ثُلُثٌ لِشَرَابٍ وَثُلُثٌ لِنَفَسٍ –পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসের জন্যে।

আলেম আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ স্বল্পভোজন সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক মযবুত উক্তি আমি আর শুনিনি। এ উক্তি নিশ্চয়ই কোন দার্শনিকের মনে হয়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْبِطْنَةُ اَصْلُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ اَصْلُ الدَّوَاءِ وَعَوِّدُوْا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ

–'উদরপূর্তি মূল রোগ, পরহেয করা মূল ওষুধ। দেহ যে যে বিষয়ে অভ্যস্ত হয়, তারই অভ্যাস গড়ে তোল।'

আমাদের মতে এ হাদীসটি চিকিৎসকের নিকট অধিক আশ্চর্য মনে হওয়ার যোগ্য।

নবম উপকারিতা হচ্ছে, ব্যয় কম হওয়া। কেননা, যে অল্প ভোজন করবে, তার জন্যে অল্প সামগ্রী যথেষ্ট হবে। মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য খরচ কম করা। জনৈক আলেম বলেন ঃ আমি আমার অধিকাংশ প্রয়োজন এভাবে পূর্ণ করি যে, সেগুলো বাদ দিয়ে দেই। এতে অন্তর খুবই স্বস্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পায়। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) আপন সহচরদের কাছে খাদ্যদ্রব্যের দর জিজ্ঞেস করতেন। তারা দুর্মূল্যের কথা বললে তিনি বলতেন ঃ খাওয়া বর্জন করে সস্তা করে নাও।

দশম উপকারিতা হচ্ছে, কম আহারের কারণে যে খাদ্য বেঁচে যাবে, তা সদকা-খয়রাতে ব্যয় করা যাবে। মানুষ যে পরিমাণ খাদ্য খেয়ে নেয়, তা মাটি ও পায়খানা হয়ে যায়। আর যে পরিমাণ সদকা করে, তা আল্লাহর রহমত লাভের জন্যে ভাণ্ডার হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তির ভুঁড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যদি এই পরিমাণ অন্যের পেটে যেত, তবে তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হত। অর্থাৎ, তুমি যদি আপন খাদ্য হ্রাস করে অন্যকে খাওয়াতে, তবে তা আখেরাতের জন্য ভাণ্ডার হত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা এমন লোক দেখেছি, যাদের কাছে সামান্যই খাদ্য ছিল। ইচ্ছা করলে তারা সবটুকু খেতে পারতেন; কিন্তু তারা বলতেন ঃ আমরা সবটুকু নিজেদের পেটে দেব না। কিছু আল্লাহর জন্যেও রেখে দেব।

৩ ॥ উদরের খাহেশ চূর্ণকারী সাধনা

উদর ও খাদ্যের ব্যাপারে মুরীদের উচিত চারটি বিষয় নির্দিষ্ট করে নেয়া ঃ (১) খাদ্যের পরিমাণ, (২) খাদ্যের সময়, (৩) খাদ্যের শ্রেণী এবং (৪) পরহেযের স্তর। শেষোক্ত বিষয়টি আমরা হালাল ও হারাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এখানে প্রথমোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম কথা, খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে এবং এতে ধাপে ধাপে সাধনা করতে হবে, যাতে একটি অনুমানে পৌঁছা যায়। কারণ, অতিভোজনে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ খাদ্য হ্রাস করে দেয়, তবে কষ্টও বেশী হবে এবং দুর্বলতা হেতু সাধনা সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং অল্প অল্প করে খাদ্য হ্রাস করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কেউ দু'রুটি খায় এবং তা হ্রাস করে এক রুটিতে আনতে চায়, তবে পূর্ণ এক মাস সময়ের মধ্যে তা হ্রাস করা যায়। প্রথমে দু'রুটির পরিমাণ ওযন করবে। এর পর প্রত্যহ এক রুটির ওযনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ হ্রাস করবে। অথবা লোকমার গণনার মাধ্যমেও এটা করা যায়। এভাবে কোন ক্ষতি অথবা বিরূপ প্রভাবের আশংকা নেই। খাদ্যের পরিমাণের চারটি স্তর আছে। এক, এতটুকু কম, যাতে জীবনটা কোন রকমে বেঁচে যায়। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। সহল তস্তরী (রহঃ)ও একেই পছন্দ করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জীবন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও শক্তি– এই তিনটি বিষয় দ্বারা এবাদাত করান। যদি বান্দা জীবন ও বুদ্ধি-বিবেচনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা করে, তবে আহার করবে- রোযা রাখবে, মাঝে মাঝে রোযা ছাড়াও থাকবে। খাদ্য নিজের কাছে না থাকলে তালাশ করবে। আর যদি এ দু'টি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা না হয়– কেবল শক্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তবে খাদ্যের কোন পরওয়া করবে না, যদিও দুর্বলতার কারণে বসে বসে নামায পড়তে হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে হবে যে, উপবাসের দুর্বলতার কারণে বসে নামায পড়া খাদ্যের শক্তি দ্বারা দাঁড়িয়ে নামায পড়ার তুলনায় উত্তম। কেউ তার খাদ্যের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি সারা বছরে তিন দেরহামের খাদ্য খাই। এক দেরহামের বিনিময়ে আঙ্গুরের ঘন রস ক্রয় করি, এক দেরহাম দিয়ে চাউলের আটা এবং এক দেরহাম দিয়ে ঘি কিনে নেই। এর পর সবগুলো মিলিয়ে তিনশ' ষাটটি বড়ি তৈরি করে নেই। প্রতি রাতে এক বড়ি দিয়ে ইফতার করি। তবে আজকাল সময়ের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। জনৈক সংসারত্যাগী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আপন খাদ্য সাড়ে তিন মাশা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, দিনে-রাতে পাঁচ ছটাক পরিমাণে খাদ্য খাবে। সম্ভবত এটা অধিকাংশ লোকের এক-তৃতীয়াংশ পেটের সমান হবে, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর অভ্যাস তাই ছিল। তিনি সাত লোকমা অথবা নয় লোকমা খেতেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, সারা দিনে আড়াই পোয়া পরিমাণে আহার করবে। এটা পেটের এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং খুব সম্ভব দু-তৃতীয়াংশের সমান। এমতাবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ পেট পানীয়ের জন্য থেকে যাবে।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, আরও বাড়িয়ে এক সের পর্যন্ত আহার করবে। এর বেশী খাওয়া অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল এবং (ولا تسرفوا) এই খোদায়ী আদেশের বিপরীত। এখানে বুঝা দরকার, অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত স্তরসমূহ বর্ণিত হয়েছে। নতুবা খাদ্যের পরিমাণ ব্যক্তি, বয়স ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা।

পঞ্চম স্তর হচ্ছে, সত্যিকার খাহেশ হলে আহার করবে এবং সত্যিকার খাহেশ বাকী থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নেবে; কিন্তু এক রুটি অথবা দু'রুটির পরিমাণ নির্দিষ্ট না করলে সত্যিকার খাহেশের শেষ সীমা প্রকাশ পাবে না। তবে সত্যিকার খাহেশের আলামত এই লিখিত আছে যে, যে কোন রুটি পেলে তা খেয়ে নেয়া। যদি নির্দিষ্ট রুটি মনে চায় কিংবা তরকারিও কামনা করে, তবে খাহেশ সত্যিকার হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরেকটি আলামত হচ্ছে, থুথু ফেললে তাতে মাছি বসবে না। অর্থাৎ থুথুর মধ্যে তৈলাক্ততা না থাকায় বুঝা যায়, পাকস্থলী শূন্য। সুতরাং সত্যিকার খাহেশের পরিচয় কঠিন। সুতরাং মুরীদের জন্যে এটাই উত্তম যে, খাদ্যের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে যে এবাদত সে করে, তা সুন্দররূপে আনজাম দিতে পারে– তাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে। এ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর খাহেশ বাকী থাকলেও থেমে যাবে এবং পরিমাণ বাড়াবে না।

সারকথা, খাদ্যের বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। কেননা, অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা সীমা রয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক দলের অভ্যাস ছিল, তাঁরা সপ্তাহে এক ছা' গম আহার করতেন এবং খেজুর খেলে সপ্তাহে দেড় ছা' খেতেন। চার মুদে এক ছা' হয়। প্রতি মুদ আড়াই পোয়ার সমান। এভাবে এক দিনের খাদ্য হয় গম আধা মুদের কিছু বেশী। খেজুর বেশী হওয়ার কারণ এ থেকে বীচি বের হয়ে যায়। এ পরিমাণটি পেটের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রতি সপ্তাহে তিন সের যব খেতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও তাই আহার করতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন এই পরিমাণ বৃদ্ধি করব না। আমি প্রিয় হাবীব (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটে থাকবে, যে আমৃত্যু বর্তমান অবস্থার উপর কায়েম থাকবে। তিনি কতক সাহাবীর সমালোচনা করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতিনীতি বদলে ফেলেছ। এখন যব শোধন করে খাও, চাপাতি রুটি তৈরী কর এবং দুধ, তরকারি ও নানা রকম খাদ্য খাও। পোশাক সকালে এক প্রকার ও বিকালে এক প্রকার পরিধান কর। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে কোথায় ছিল? সুফফাবাসীদের খাদ্য ছিল প্রত্যহ দু'জনের জন্যে তিন পোয়া খোরমা। এতে বীচিও রয়েছে, যা বাদ দেয়ার পর পরিমাণ খুব কম থেকে যেত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, খাদ্যের সময় নির্দিষ্ট করা; অর্থাৎ একবার খাওয়ার পর কতক্ষণ পর পুনরায় খাবে। এতে তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর, তিন দিন অথবা আরও বেশী সময় খাবে না। কোন কোন সাধক এ ক্ষেত্রে এত সাধনা করেছেন যে, এই মেয়াদ ত্রিশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আলেমগণের মধ্যে অনেকের অবস্থা এরূপ। উদাহরণতঃ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওরফী, আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তায়মী, সোলায়মান খাওয়াস, সহল তস্তরী, ইবরাহীম ইবনে আহমদ খাওয়াস প্রমুখ। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছয় দিন নির্দিষ্ট করতেন। সুফিয়ান সওরী ও ইবরাহীম ইবনে আদহাম তিন দিন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁরা সকলেই উপদেশ দ্বারা আখেরাতে সাহায্য চাইতেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চল্লিশ দিন কিছু না খায়, তার কাছে কতক খোদায়ী রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, দু' থেকে তিন দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা। এটা অভ্যাস বহির্ভূত নয়; বরং সম্ভবপর। সামান্য চেষ্টা সাধনা করলেই এই স্তর অর্জন করা যায়। তৃতীয় স্তর হচ্ছে, দিন ও রাতের মধ্যে একবার খাবে। এর বেশী হলে তা অপব্যয় হবে। সর্বদা তৃপ্ত অবস্থায় থাকা এবং ক্ষুধা অনুভব না করা বিলাসীদের কাজ, সুন্নত বিরোধী। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকালে খেলে সন্ধ্যায় খেতেন না এবং সন্ধ্যায় খেলে সকালে খেতেন না। বড় বড় বুযুর্গগণও এ নিয়ম পালন করতেন। তারা দিনে একবার খাদ্য গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِيَّاكِ وَالسَّرَفَ فَإِنَّ أَكْلَتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ سَرَفٍ وَأَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ اَقْتَلُ وَاَكْلَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ قِوَامٌ بَيْنَ ذَالِكَ وَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

–'তুমি অপব্যয় থেকে বেঁচে থাক। প্রত্যহ দু'বার খাওয়া অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। প্রত্যেক দু'দিনে একবার খাওয়া মারাত্মক; কিন্তু প্রত্যহ একবার খাওয়া উভয়ের ঠিক মধ্যবর্তী স্তর। আল্লাহর কিতাবে এটা প্রশংসিত।'

অতএব, যে ব্যক্তি দিবারাত্রির মধ্যে একবার খেতে চায়, তার জন্যে তাহাজ্জুদের পর সোবহে সাদেকের পূর্বে অর্থাৎ সেহরীর সময়ে খাওয়া মোস্তাহাব। এতে দিনের বেলায় উপবাস করার কারণে রোযা হয়ে যাবে। এছাড়া রাতেও তাহাজ্জুদের জন্যে উঠা সহজ হবে।

তৃতীয় যে বিষয়টি নির্দিষ্ট করা দরকার, তা হচ্ছে খাদ্যের প্রসার। জানা দরকার, সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে গমের আটা। এটা শোধিত অবস্থায় পাওয়া গেলে তা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। মধ্যম খাদ্য হচ্ছে যবের শোধিত আটা এবং নিম্নস্তরের খাদ্য যবের অশোধিত আটা। উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন হচ্ছে গোশ্ত ও মিষ্টি, মধ্যম গোশতবিহীন শুরবা এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিম্নস্তরের হচ্ছে লবণ ও সিরকা। অধ্যাত্ম পথের পথিকদের অভ্যাস, তারা কখনও ব্যঞ্জন খান না; মনোলোভা সুস্বাদু খাদ্য থেকেও তারা বিরত থাকেন। কেননা, এতে নফসের আস্ফালন ও কঠোরতা বাড়ে এবং মনে দুনিয়ার আনন্দ ও বিলাস আসন পেতে নেয়। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ হে সাধকবৃন্দ! যদি জান্নাতের ওলীমা খেতে চাও, তবে দুনিয়াতে নফসকে যত বেশী সম্ভব অনাহারে রাখ। এখানে ক্ষুধা যত বেশী হবে, ততই সেখানকার খাদ্য খাওয়ার খাহেশ বৃদ্ধি পাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

شِرَارُ اُمَّتِى الَّذِيْنَ غَذُوْا بِالنَّعِيْمِ وَهُيِّئَتْ عَلَيْهِ اَجْسَامُهُمْ وَاِنَّمَا هِمَّتُهُمْ اَلْوَانُ الطَّعَامِ وَاَنْوَاعُ اللِّبَاسِ يَتَشَدَّقُوْنَ فِى الْكَلَامِ ـ

–আমার উম্মতের মধ্যে অসৎ তারা, যারা ধনৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত এবং এর উপরই বড় হয়। তাদের সাহসিকতা কেবল নানা রকম খাদ্য এবং বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ। তারা গলা ফাটিয়ে কথাবার্তা বলে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ স্মরণ রাখ, তোমাকে কবরে থাকতে হবে। সেখানে অনেক খাহেশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সুস্বাদু খাদ্যকে খুব ভয় করতেন এবং একে দুর্ভাগ্যের আলামত মনে করতেন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) ঠাণ্ডা পানির শরবত পান করেননি এবং বলতেন ঃ আমাকে এর হিসাবের সাথে জড়িত করো না। হযরত নাফে' (রঃ) বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে টাটকা মাছ খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। মদীনায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তা পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর যখন পাওয়া গেল, তখন দেড় দেরহাম দিয়ে কিনে এনে রান্না করা হয়। অতঃপর একটি রুটির উপর মাছটি রেখে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করা হয়। ইতিমধ্যে জনৈক ভিক্ষুক দরজায় এসে হাঁক দিল। হযরত ইবনে ওমর খাদেমকে বললেন ঃ মাছটি রুটিতে জড়িয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। খাদেম আরজ করল ঃ জনাব, অনেক দিন থেকে যখন মাছ খেতে আপনার মন চাইছিল, তখন পাওয়া যায়নি। এখন পাওয়ার পর দেড় দেরহাম দিয়ে কিনে আপনার জন্যে রান্না করেছি। আপনি বললে ভিক্ষুককে এর মূল্য দিয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ না, এ মাছটি রুটিতে জড়িয়ে তাকে দিয়ে দাও। অতঃপর খাদেম গিয়ে ভিক্ষুককে বলল ঃ তুমি এটি এক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করবে? ভিক্ষুক সম্মতি দিলে খাদেম এক দেরহাম তাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিয়ে মাছটি আবার তাঁর সামনে হাযির করল এবং বলল ঃ এ মাছটি এক দেরহাম দিয়ে কিনে এনেছি। তিনি বললেন ঃ ভিক্ষুকের কাছ থেকে দেরহাম ফেরত না নিয়ে মাছটি রুটিসহ তাকে দিয়ে এস। আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اَيُّمَا امْرِءٍ اِشْتَهٰى شَهْوَةً فَرَدَّ شَهْوَةً وَاٰثَرَ بِهَا عَلٰى نَفْسِهٖ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ـ

–যে ব্যক্তির কোন খাহেশ হয়, অতঃপর তাকে বাধা দেয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকে সমর্পণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার সংবাদ পান যে, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান নানা রকম খাদ্য আহার করেন। সেমতে তিনি ইয়াযীদের খাদেমকে বললেন ঃ তার রাতের খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে আমাকে সংবাদ দিও। খাদেম তাই করল। হযরত ওমর (রাঃ) ইয়াযীদের গৃহে চলে গেলেন। যখন খাদ্য এল, তখন প্রথমে "ছরীদ" (গোশতের শুরুয়া) আনা হল। হযতর ওমরও তার সাথে আহার করলেন। এরপর ভাজা করা গোশত আনা হলে ইয়াযীদ হাত বাড়ালেন; কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান! তোমার এখানে এক খাদ্যের পর আরেক খাদ্য হয় নাকি? আল্লাহর কসম, যদি তুমি পূর্ববর্তীদের সুন্নত ছেড়ে দাও, তবে তাদের গোটা তরীকা থেকে তুমি আলাদা হয়ে যাবে। ইয়াসার ইবনে ওমায়র (রঃ) বলেন ঃ আমি কোন দিন হযরত ওমরের জন্যে আটা শোধন করিনি। কখনও করে থাকলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছি। ওতবা (রাঃ) আটাগুলো রৌদ্রে রেখে দিতেন। শুকিয়ে গেলে খেয়ে নিতেন এবং বলতেন ঃ একখন্ড রুটি ও নিমক খেয়ে থাকা উচিত, যাতে আখেরাতে ভাজা করা গোশত ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায়। তিনি একটি মাটির কলসী থেকে পানি পান করতেন, যা সারাদিন রৌদ্রে পড়ে থাকত। তাঁর বাঁদী বলত ঃ আটা দিয়ে দিলে আমি রুটি তৈরী করে এবং পানি ঠাণ্ডা করে দেব। ওতবা জওয়াবে বলতেন ঃ ক্ষুধার কুকুরকে দমন করা উদ্দেশ্য। সে এভাবেও দমিত হয়ে যায়।

শাকীক ইবনে ইবরাহীম বলেন ঃ একদিন আমি যখন মক্কায় রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্মস্থানের নিকটে অবস্থিত আলইয়াল বাজার দিয়ে গমন করছিলাম, তখন ইবরাহীম ইবনে আদহামকে রাস্তার ধারে বসে ক্রন্দন করতে দেখলাম। আমিও পথ ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ভাল আছি, যাও। অবশেষে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কারও কাছে না বললে বলতে পারি। আমি বললাম ঃ ঠিক আছে, বলব না, আপনি বলুন। তিনি বললেন ঃ তিরিশ বছর ধরে আমার মনে "হারীরা" খাওয়ার সাধ ছিল। কিন্তু আমি সর্বপ্রযত্নে মনকে তা থেকে বিরত রেখেছি। গতকাল রাতে যখন আমি বসে বসে ঝিমুচ্ছিলাম, তখন সবুজ পেয়ালা হাতে এক ব্যক্তি আগমন করল। পেয়ালা থেকে হারীরার সুগন্ধি বের হয়ে এল। আমি সাহস করে নফসকে বাধা দিলাম। লোকটি পেয়ালা আমার নিকটে রেখে বলল ঃ ইবরাহীম, খাও। আমি বললাম ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এটা ছেড়ে দিয়েছি। খাব না। সে বলল ঃ যদি আল্লাহ তাআলাই খাওয়ান, তবে খাওয়া উচিত। আমি এর কোন জওয়াব দিতে পারলাম না এবং কাঁদতে লাগলাম। লোকটি আবার বলল ঃ নাও, খাও। আমি বললাম ঃ খানা কোত্থেকে এল, এ কথা না জানা পর্যন্ত খেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সে বলল ঃ খাও, এটা তোমার জন্যে প্রদত্ত হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, হে ইসফের, এ পেয়ালাটি নিয়ে যাও এবং ইবরাহীমের নফসকে খাইয়ে দাও। সে অনেক দিন ধরে নফসকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। এখন আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেছেন। হে ইবরাহীম, স্মরণ রাখ, আমি ফেরেশতাদের মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে না, সে পরে তা তালাশ করেও পায় না। আমি বললাম ঃ যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার সম্মুখে আছি। এর সমাধান আল্লাহ তাআলাই দেবেন। এরপর আর এক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হল। সে প্রথম ব্যক্তিকে কিছু দিয়ে বলল ঃ তুমিই আপন হাতে খাইয়ে দাও। সেমতে সে আমার মুখে লোকমা দিতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জাগ্রত হয়ে আমি মুখে হারীরার স্বাদ অনুভব করলাম।

শাকীক বলেন ঃ ইবরাহীম এ কথা শেষ করতেই আমি বললাম ঃ আপনার হাতটি দেখান তো। আমি তাঁর হাত ধরে চুম্বন করলাম এবং বললাম ঃ হে আল্লাহ্! যাঁরা আপন খাহেশকে পূর্ণরূপে দাবিয়ে রাখে, তুমি তাদের সাধ পূর্ণ করে দাও। তুমিই অন্তরে বিশ্বাস দান কর এবং অন্তরকে প্রশান্ত রাখ। অধম বান্দা শাকীকের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি দাও। এরপর শাকীক হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললেন ঃ ইলাহী, এই হাত ও এই হাতের মালিকের বরকতে এবং ইবরাহীমকে প্রদত্ত অনুগ্রহের বরকতে এই মিসকীন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ কর। সে তোমারই কৃপা, অনুগ্রহ ও রহমতের মুখাপেক্ষী, যদিও এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যোগ্য নয়। এরপর তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে হরম শরীফে প্রবেশ করলেন।

কথিত আছে, মালেক ইবনে দীনার (রঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত অন্তরে দুধের স্পৃহা নিয়েও দুধ পান করেননি। একদিন তাঁর কাছে খোরমা হাদিয়াস্বরূপ এলে লোকেরা তা খাওয়ার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করল। তিনি বললেন ঃ তোমরাই খেয়ে নাও। আমি চল্লিশ বছর এর স্বাদ গ্রহণ করিনি। তিনি বলেন ঃ আমি পঞ্চাশ বছর ধরে দুনিয়া ত্যাগ করেছি। আমার অন্তর চল্লিশ বছর ধরে দুধ পান করার সাধ পোষণ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন তা পান করব না। ক্রীতদাস ওতবা বলেন ঃ সাত বছর পর্যন্ত আমার মন গোশত খাওয়ার খাহেশ করতে থাকে। অবশেষে আমি এই ভেবে লজ্জাবোধ করলাম যে, মনের খাহেশ আর কত মুলতবী রাখব। সাত বছর তো হয়ে গেছে। অতঃপর একদিন একখন্ড গোশ্‌ত নিয়ে ভাজা করলাম এবং তা রুটিতে জড়িয়ে নিলাম। মুখে দেয়ার আগে একটি বালককে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি অমুকের পুত্র নও, যে মারা গেছে? সে বলল ঃ হাঁ। অতঃপর আমি গোশ্‌ত জড়ানো রুটিটি তাকে দিয়ে দিলাম। বর্ণিত আছে, বালকের হাতে রুটি সঁপে দিয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে এই আয়াত পাঠ করতে থাকেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّأَسِيرًا ۔

—তারা খাদ্যের মহব্বত সত্ত্বেও মিসকীন, পিতৃহীন এতীম ও বন্দীকে খাদ্য খাওয়ায়।

এরপর তিনি কখনও গোশ্‌ত খাননি।

জাফর ইবনে নসর বলেন ঃ হযরত জুনায়েদ আমাকে কিছু আঞ্জীর ফল কিনে আনতে বললেন। আমি কিনে আনলে তিনি ইফতারের সময় তা মুখে দিলেন এবং সাথে সাথে ফেলে দিলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ অন্তরের কানে গায়েব থেকে আওয়াজ এসেছে, তুমি আমার খাতিরে এটি ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার খাবে?

সালেহ্ বলেন ঃ আমি আতা সলমীর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমি আপনার জন্যে একটি বস্তু প্রেরণ করতে চাই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, আপনি ফেরত দিতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা। আমি আমার পুত্রের হাতে ঘি ও মধুর সাথে ছাতু মিশ্রিত করে পাঠিয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম, যতক্ষণ তিনি না খান, সেখানেই থাকবে। তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খেলেন। এর পরের দিন আমি আবার প্রেরণ করলাম। কিন্তু তিনি না খেয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সেমতে আমি রাগতস্বরে তাঁকে বললাম ঃ সোবহানাল্লাহ! আপনি আমার হাদিয়া ফেরত দিয়েছেন। তিনি আমাকে রাগ করতে দেখে বললেন ঃ রাগের কোন কথা নেই। একবার তো আমি তোমার আবদার রেখেছি। দ্বিতীয় বার যখন তুমি প্রেরণ করলে তখন আমি অনেক খেতে চেয়েছি. কিন্তু সম্ভব হয়নি। যখনই আমি খাওয়ার ইচ্ছা করতাম তখনই এ আয়াত মনে পড়ে যেত– يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ চুমুক দেয় এবং গলাধঃকরণ করতে পারে না। সালেহ্ বলেন ঃ আমি কেঁদে কেঁদে বললাম ঃ হায়! আমি এক জায়গায় এবং আপনি অন্য জায়গায় আছেন।.

জনৈক আবেদ তাঁর এক আপনজনকে দাওয়াত করে এনে কয়েকটি রুটি সামনে রেখে দিলেন। লোকটি রুটিগুলো ওলট-পালট করে খাওয়ার জন্যে ভাল রুটি বেছে নিতে লাগল। আবেদ বললেন ঃ এ কি করছ? তুমি জান না, যে রুটিটি তুমি বাদ দিয়েছ, সেটি কতজন কারিগরের হাত হয়ে তোমার কাছে এসেছে। প্রথমে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। বৃষ্টি দ্বারা মৃত্তিকা ও চতুষ্পদ জন্তু সতেজ হয়েছে। অনেক মানুষে কাজ করেছে। এরপর এ রুটি তোমার কাছে এসেছে। এখন তুমি ওলট-পালট করছ এবং খাওয়ায় আগ্রহ দেখাচ্ছ না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَايَسْتَدِيرُ الرَّغِيفُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتّٰى يَعْمَلَ فِيهِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَّسِتُّونَ صَانِعًا اَوَّلُهُمْ مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي يَكِيلُ الْمَاءَ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمَةِ ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ الَّتِي تُزْجِي السَّحَابَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْاَفْلَاكُ وَمَلَائِكَةٌ .

–রুটি গোলাকার হয়ে তোমার সামনে আসে না যে পর্যন্ত তাতে তিন'শ ষাট জন কারিগর কাজ না করে। প্রথম কারিগর হচ্ছে মীকাঈল (আঃ), যে পানিকে রহমতের ভাণ্ডার থেকে মেপে দেয়। এরপর সেই সকল ফেরেশতা, যারা মেঘমালা হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এরপর রয়েছে সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের ফেরেশতাকুল। সর্বশেষ কারিগর হচ্ছে রুটি প্রস্তুতকারী। যদি তুমি আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ গণনা কর, তবে শেষ করতে পারবে না।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি কাসেম জাওরীর কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বৈরাগ্য কি? তিনি বললেন ঃ তুমি এ সম্পর্কে কি শুনেছ? আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি বললাম ঃ এ সম্পর্কে আপনার উক্তি কি? তিনি বললেন ঃ উদর হচ্ছে মানুষের দুনিয়া। একে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে ততটুকু বৈরাগ্য অর্জিত হবে এবং যে পরিমাণ একে বাধা না দেবে, সেই পরিমাণ তুমি দুনিয়ার করায়ত্ত হয়ে যাবে।

এসব গল্প থেকে জানা গেল, আমাদের বর্ণিত উপকারিতাসমূহ অর্জনের উদ্দেশেই বুযুর্গগণ খাহেশ থেকে বিরত রয়েছেন এবং উদরপূর্তি করে আহার বর্জন করেছেন। মাঝে মাঝে এর কারণ এটাও ছিল যে, তাঁরা খাদ্যদাতার রুযী হালাল ও স্বচ্ছ মনে করতেন না। জানা উচিত, মন যা চায় তাই প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ লবণও খাহেশ বা কামনার বস্তু। কারণ, এটা রুটির অতিরিক্ত। রুটির অতিরিক্ত সবকিছুই বাড়তি এবং খাহেশের মধ্যে দাখিল। এটা চূড়ান্ত নীতি। কেউ এতে সক্ষম না হলে তার উচিত কমপক্ষে আপন নফস সম্পর্কে গাফেল এবং খাহেশের মধ্যে নিমজ্জিত না হওয়া। যা মনে চায়, তাই খাওয়া এবং যা খুশী তাই করা অপব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট। তাই বিরতিহীনভাবে গোশত ভক্ষণ ত্যাগ করা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশত বর্জন করে, সে বদস্বভাব হয় এবং যে চল্লিশ দিন অবিরত গোশত খায়, সে কঠোর প্রাণ হয়ে যায়। সার কথা, নফসকে বৈধ খাদ্যসামগ্রীর খাহেশের মধ্যেও ফেলা উচিত নয়। যদি কেউ দুনিয়াতে সকল খাহেশ পূর্ণ করে নেয়, তবে কেয়ামতে তাকে বলা হবে أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ পার্থিব জীবনেই তোমরা তোমাদের মজা নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং ভোগ করে নিয়েছ। (এখন কি চাও?)

দুনিয়াতে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যে পরিমাণ খাহেশ বর্জন করা হবে, আখেরাতে সেই পরিমাণ লোভনীয় সামগ্রী পাওয়া যাবে। বসরার জনৈক বুযুর্গ বিশ বছর পর্যন্ত চাউলের রুটি ও মাছ খাওয়ার সাধ পোষণ করতে থাকেন; কিন্তু নফসের উপর মোজাহাদা করে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখেন। ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ যেসকল নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলো বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। সর্বপ্রথম আমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছিল চাউলের রুটি ও মাছ। আমাকে বলা হয়েছে– আজ যে পরিমাণ ইচ্ছা বেহিসাব খেয়ে নাও। আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ .

–স্বচ্ছন্দে খাও ও পান কর, বিগত দিনে যা পাঠিয়েছিলে তার কারণে।

এ কারণেই আবু সালমান (রহঃ) বলেন ঃ একটি খাহেশ ত্যাগ করা এক বছর রোযা রাখা ও রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা অধিক উপকারী। আল্লাহ আমাদেরকেও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওসিলায় স্বীয় সন্তুষ্টির তওফীক দান করুন।

৪ ॥ ক্ষুধা ও তার ফযীলতে মিতাচার

জানা উচিত, সকল অবস্থা ও চরিত্রের মধ্যে মধ্যবর্তিতাই চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং স্বল্পতা ও বাহুল্য নিন্দনীয়। ক্ষুধার ফযীলত সম্পর্কে আমরা যা কিছু লিখে এসেছি, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, এর বাহুল্যই উদ্দেশ্য। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের মন যে সকল বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে কামনা করে এবং তাতে কিছু অনিষ্ট থাকে, সেখানে শরীয়ত অতিমাত্রায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করে, যাতে মূর্খরা বুঝে নেয় যে, সর্বাবস্থায় বিষয়টি থেকে বেঁচে থাকাই উদ্দেশ্য এবং যথাসম্ভব মনের চাহিদার বিপরীত আমল করা লক্ষ্য। কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে নেয়, মিতাচারের স্তরই কাম্য। উদাহরণতঃ অত্যধিক উদরপূর্তি কোন মনের চাহিদা হলে শরীয়ত তার সামনে পূর্ণমাত্রায় ক্ষুধার গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করে, যাতে মন কোনরূপে তার চাহিদা থেকে বিরত থেকে মিতাচারের স্তর অর্জন করে নেয়। কেননা, মনের চাহিদার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভবপর নয়। অতএব এমন কোন সীমা অবশ্যই থাকা দরকার, যার আমল শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হবে। উদাহরণতঃ রাত্রি জাগরণ ও রোযা সম্পর্কে শরীয়তে অতিমাত্রায় গুণকীর্তন করা হয়েছে। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানলেন, কিছু সংখ্যক লোক সদাসর্বদা রোযা রাখে এবং সারারাত জেগে নামায পড়ে, তখন তিনি তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন। এ থেকে জানা গেল, উদ্দেশ্য কেবল সমতার স্তর। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে উত্তম ও মিতাচার হচ্ছে, এতটুকু খাবে, যদ্দ্বারা পাকস্থলী ভারী না হয় এবং ক্ষুধার কষ্ট অনুভূত না হয়। কেননা, খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন রক্ষা করা এবং এবাদতের শক্তি অর্জন করা। পাকস্থলী ভারী হয়ে গেলে যেমন এবাদত হতে পারে না, তেমনি ক্ষুধার কষ্টও অন্তরের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এমনভাবে খাবে যাতে খাদ্যের বোঝা অনুভূত না হয়, যাতে ফেরেশতাদের অনুরূপ হওয়া যায়। ফেরেশতাদেরও খাদ্যের বোঝা ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্ষুধার কষ্ট মালুম। তাদের অনুসরণ করাই মানুষের জন্যে পূর্ণতার স্তর। ভোজনে তৃপ্তি ও ক্ষুধা থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাই উভয় অবস্থা থেকে অধিকতর দূরবর্তী স্তরটিই মধ্যবর্তী স্তর, যাকে সমতা বলা হয়। স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মধ্যবর্তী স্তরে ফিরে যাওয়া এমন, যেমন লোহার একটি উত্তপ্ত বৃত্তকে মাটিতে রেখে একটি পিঁপড়াকে তার মধ্যস্থলে ছেড়ে দিলে পিঁপড়াটি বৃত্তের উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে চতুর্দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সকল দিকেই উত্তাপ বিদ্যমান। সে কোন দিক দিয়ে বের হতে পারবে না এবং ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকবে। অবশেষে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধে পৌঁছে থেমে সে সকল দিকের উত্তাপ থেকে অধিকতর দূরত্বে থাকবে। এমনিভাবে খাহেশও মানুষকে চতুর্দিক বেষ্টন করে রয়েছে। মানুষ পিঁপড়ার মত তার বৃত্তের মধ্যে পড়ে আছে। এই বৃত্ত অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অথচ মানুষ ফেরেশতাদের অনুরূপ হতে চায়। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষ খাহেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে। সমতা সকল দিক থেকে সমান দূরে বিধায় সকল অবস্থা ও চরিত্রে সমতাই কাম্য হওয়া উচিত। নিম্নোক্ত হাদীসে এই সমতাই উদ্দেশ্য خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا মধ্যবর্তী বিষয়ই সর্বোত্তম। নিম্নোক্ত আয়াতেও এই সমতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا

—খাও, পান কর এবং অপচয় করো না।'

সুতরাং মানুষ যখন ক্ষুধা ও তৃপ্তি উভয়টি অনুভব করবে, তখন নফস হালকা থাকবে, এবাদত ও চিন্তা ভাবনা সহজ মনে হবে এবং আমল করতে সক্ষম হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নফস অবাধ্য, খাহেশের প্রতি আগ্রহী এবং বাহুল্যের প্রতি ঝুঁকে থাকে বিধায় সমতা অর্জন করা সহজ হয় না এবং এতে কোন উপকারও হয় না। তখন বরং ক্ষুধা দ্বারা তাকে অধিক মাত্রায় পীড়িত করা উচিত; যেমন ঘোড়াকে পোষ মানানোর জন্যে প্রথম তাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা হয় এবং খুব কষাঘাত করা হয়। এরপর ঘোড়া পোষ মানে এবং প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। পোষ মানার পর ঘোড়াকে সকল কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে সমতার পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এই রহস্যের ভিত্তিতেই মুরশিদ মুরীদকে এমন কাজ করতে বলে, যা সে নিজে করে না। উদাহরণতঃ সে মুরীদকে ক্ষুধার্ত থাকতে অথবা খাহেশ বর্জন করতে আদেশ করে; অথচ সে নিজে ক্ষুধার্ত এবং খাহেশ থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। কেননা, সে আপন নফসের সংশোধন সমাপ্ত করেছে। এখন নফসকে কষ্ট দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ অবস্থায় নফস খাহেশের পূজারী, দুষ্ট, অবাধ্য ও এবাদতবিমুখ হয় বিধায় তাকে ক্ষুধার্ত রাখাই সমীচীন। দুব্যক্তিই সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা হতে বিরত থাকে। এক, সিদ্দীক; তার ক্ষুধার্ত থাকার প্রয়োজন নেই; কারণ তার নফস সৎপথে প্রতিষ্ঠিত । দুই, নির্বোধ; সে নিজেকে সিদ্দীক মনে করে সংশোধনের উপযুক্ত মনে করে না। এটা একটা বড় ধোঁকা বৈ কিছু নয়। সে প্রায়ই কোন সিদ্দীককে এ ব্যাপারে পরওয়া না করতে দেখে নিজেও তেমনি করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন রুগ্ন ব্যক্তি জনৈক রোগমুক্ত সুস্থ ব্যক্তিকে কোন বস্তু খেতে দেখে। এরপর সেও নিজেকে সুস্থ মনে করে সেই বস্তু খেয়ে ফেলে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্যেও খাদ্যের পরিমাণ এবং সময় নির্দিষ্ট ছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি এত বেশী রোযা রাখতেন যে, আমরা মনে করতাম, বোধ হয় আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও রোযাবিহীন দিন এত বেশী হত যে, আমরা ধারণা করতাম, বোধ হয় আর কোন দিন রোযা রাখবেন না। তিনি গৃহে পৌঁছে খাবার আছে কি না জিজ্ঞেস করলে যদি "হাঁ" বলা হত, তবে খেয়ে নিতেন। নতুবা বলতেন ঃ আজ তো আমি রোযা রেখেছি। এমনিভাবে তাঁর সামনে কোন খাদ্য পেশ করা হলে তিনি বলতেন ঃ আমি তো রোযা রাখতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, নিয়ে এস। সহল তস্তরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ শুরুতে আপনার অবস্থা কিরূপ ছিল? জওয়াবে তিনি অভাবনীয় কষ্ট করার কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি, তিনি বললেন ঃ দীর্ঘ দিন আমি বড়ই গাছের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করেছি। তিন বছর ডুমুর ফল চূর্ণ করে খেয়েছি এবং তিন বছরে তিন দেরহামের খাদ্য খেয়েছি। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হল ঃ বর্তমানে আপনার খাদ্য কি? তিনি বললেন ঃ এখন কোন সীমা ও সময় নির্দিষ্ট নেই। এর অর্থ এই নয় যে, এখন অনেক খাই। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাওয়ার কোন পরিমাণ ও সময় নির্দিষ্ট নেই। যে সময় যে পরিমাণ জরুরী এবং সমীচীন মনে করি, খেয়ে নেই।

হযরত মারুফ কারখীর কাছে লোকেরা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রেরণ করত। তিনি খেয়ে নিতেন। লোকেরা বলল ঃ আপনার ভাই বশীর এরূপ খাদ্য খান না। তিনি বললেন ঃ বশীরকে পরহেযগারী বাধা দেয়। আমাকে মারেফত প্রশস্ত করে রেখেছে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মেহমান। তিনি যখন খাওয়ান, খেয়ে নেই। যখন উপবাস রাখেন, সবর করি। আমার ওযর আপত্তি করার প্রয়োজন কি?

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম একদিন অনেক প্রকারের খাদ্য তৈরী করিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত করেন। তাঁদের মধ্যে আওযায়ী এবং সুফিয়ান সওরীও ছিলেন। খাদ্য সামগ্রীর আড়ম্বর দেখে সুফিয়ান সওরী বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, আপনি কি অপব্যয়ের আশংকা করেন না? ইবরাহীম বললেন ঃ খাদ্যের মধ্যে অপব্যয় হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে অপব্যয় হয়।

অতএব যে ব্যক্তি শুনে ও অনুকরণ করে জ্ঞান অর্জন করে, সে প্রকৃত কারণ বুঝে না। সে ইবরাহীম ইবনে আদহামের এই অবস্থা শুনে; আবার মালেক ইবনে দীনারের এই অবস্থা দেখে যে, তাঁর গৃহে বিশ বছর পর্যন্ত নিমক আসেনি। আবার সিররী সকতী সম্পর্কে সে পাঠ করে যে, তাঁর নফস চল্লিশ বছর পর্যন্ত আঙ্গুরের নির্যাস খাওয়ার সাধ পোষণ করে; কিন্তু তিনি তা খাননি। এসব শুনে ও পাঠ করে এ ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পায়। সে হয়রান হয়ে বিশ্বাস করতে থাকে, এই বুযুর্গগণের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চিতই ভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সামনে জ্ঞানের সকল রহস্য উন্মোচিত, সে জানে, সকলেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে অবস্থা ও সময়ভেদে তাঁদের আমল বিভিন্নরূপ ছিল। এসব বিভিন্ন অবস্থা শুনে সাবধানী ব্যক্তি বুঝে নেয়, সে মারেফতের স্তরে পৌঁছেনি। তাই এই বুযুর্গানের মত বেপরওয়া হওয়া তার উচিত নয়। তার নফস মালেক ইবনে দীনার অথবা সিররী সকতীর নফসের মত আনুগত্যশীল নয়, যাঁরা পার্থিব আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফলে সে তাঁদেরই অনুসরণ করতে থাকে। পক্ষান্তরে দাম্ভিক অহংকারী ব্যক্তি এভাবে চিন্তা করে– আমার নফস ইবরাহীম ইবনে আদহাম ও মারুফ কারখীর নফস অপেক্ষা অধিক নাফরমান নয়। অতএব আমিও তাঁদের অনুসরণ করে খাদ্যের নিয়মনীতি শিকায় তুলে রাখব। আমিও আল্লাহর মেহমান। সুতরাং বাছবিচারের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে নির্বোধদের সাথে সাথে শয়তানেরও অনেক দখল আছে। খাদ্য গ্রহণ করা না করা এবং শখের বস্তু খাওয়া না খাওয়া কেবল এমন ব্যক্তির জন্যেই শোভনীয়, যে বেলায়েত ও নবুওয়তের নূর দ্বারা দেখে। এই নূর তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ নফসের খাহেশ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং অভ্যাসের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সে যখন খায়, তখনও তাতে কোন মহৎ নিয়ত থাকে এবং যখন না খায়,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখনও তা নিয়ত থেকে খালি হয় না। এমতাবস্থায় খাওয়া না খাওয়া উভয়টি আল্লাহর ওয়াস্তে হবে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাবধানতা দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত। তাঁর জানা ছিল, রসূলে আকরাম (সাঃ) মধু পছন্দ করতেন এবং তা সাগ্রহে খেতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) আপন নফসকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নফসের অনুরূপ মনে করেননি। ফলে লোকেরা যখন তাঁর সামনে মধুর ঠাণ্ডা শরবত পেশ করল, তখন তিনি পাত্রটি আপন হাতের মধ্যে ঘুরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ এটা পান করলে এর স্বাদ কিছুক্ষণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে; কিন্তু এর হিসাব নিকাশ বাকী থেকে যাবে। এরপর 'আমি পান করব না' বলে পাত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। মুরীদকে এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত না করাই মুরশিদের উচিত। তাকে কেবল ক্ষুধার্ত থাকতে বলবে এবং সমতার কথাও বলবে না। কারণ, সে সমতা অর্জন করতে কিছু ত্রুটি করবে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষুধার কথা বললে কমপক্ষে সমতা অর্জিত হয়ে যাবে। এ কথাও মুরীদকে বলবে না যে, কামেল সাধক সাধনা থেকে মুক্ত ও বেপরওয়া হয়ে যায়। এতে শয়তান সর্বক্ষণ তাকে কুমন্ত্রণা দেবে– তুমি তো কামেল হয়ে গেছ। এতে কোন ত্রুটি নেই। সবই অর্জিত হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস মুরীদকে সাধনা করতে বললে নিজেও তার সাথে সাধনা করতেন, যাতে সে মনে না করে যে, নিজে তো কিছু করেন না, আমাকে করতে বলেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সমতা কোন্‌টি, তা এক গোপন বিষয়। তাই কোন অবস্থাতেই যেন সাবধানতা হাতছাড়া না হয়। হযরত ওমর (রাঃ) একবার আপন পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে দেখলেন, সে গোশত ও ঘি রুটির সাথে খাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দোররা দিয়ে মারলেন এবং বললেন ঃ কোন দিন দুধ দিয়ে, কোন দিন ঘি দিয়ে, কোন্‌দিন তেল দিয়ে, কোন্‌দিন লবণ দিয়ে এবং কোন দিন কোন কিছু ছাড়াই শুকনো রুটি খাবে। এ থেকে সমতা কাকে বলে জানা গেল। সব সময় গোশত এবং খাহেশের বস্তু খাওয়া বাহুল্য ও অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। পক্ষান্তরে গোশত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা স্বল্পতা ও দীনতার মধ্যে গণ্য। মাঝে মাঝে খেয়ে নেয়া মধ্যবর্তী স্তর ও সমতা।

রিয়ার বিপদাপদ

জানা উচিত, খাহেশ বর্জনকারী ব্যক্তি এমন দু'টি বিপদের সম্মুখীন হয়, যা সাধের বস্তু খাওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। প্রথম হচ্ছে, নফস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন কোন খাহেশ ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু কেউ জানুক, এটাও চায় না। তাই নির্জনে সে বস্তুটি খেয়ে নেয়– জনসমাবেশে খায় না। একে বলা হয় "শেরকে খফী" তথা গোপন শেরক। জনৈক আলেমকে কোন দরবেশের হাল জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকেরা বলল ঃ তার কোন দোষ আপনি জানেন? তিনি বললেন ঃ সে একান্তে এমন বস্তু খায়, যা প্রকাশ্যে খায় না। মোট কথা, এটা খুব বড় বিপদ। কেউ খাহেশের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে গেলে তার উচিত তা প্রকাশ করে দেয়া। 'সাচ্চা হাল' একেই বলা হয়। এতে শুধু এটাই জানা যাবে যে, আমলের দোষে সাধনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোন দোষ গোপন করে তার বিপরীতে জনসমক্ষে পূর্ণতা প্রকাশ করলে দু'টি ক্ষতি হবে; যেমন মিথ্যা বলে তা গোপন করলে দু'টি মিথ্যা হয়ে যায়। দু'টি সত্যিকার তওবা না করা পর্যন্ত কেউ এরূপ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয় না। এ কারণেই আল্লাহ পাক মোনাফেকদের আযাব বেশী বলে এরশাদ করেছেন। কেননা, কাফের প্রকাশ্যে কুফর করে; কিন্তু মোনাফেক কুফর করে তা গোপন করে। অতএব গোপন করা দ্বিতীয় কুফর হল। সে মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহর দৃষ্টির চেয়ে অধিক প্রখর বলে বিশ্বাস করে আপন কুফর গোপন করে। তাই সে দ্বিগুণ আযাবের যোগ্য হয়। বিভুজ্ঞানীগণ খাহেশ এমনকি, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যান; কিন্তু রিয়ায় গ্রেফতার হন না। তাঁরা আপন দোষক্রটি গোপন করেন না; বরং পূর্ণ বিভুজ্ঞান হচ্ছে, খাহেশকে আপন নফস থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে দূর করবে এবং বাহ্যতঃ মানুষের বিশ্বাস হ্রাস করার জন্যে খাহেশ প্রকাশ করবে। জনৈক বুযুর্গ সাধের মামুলী বস্তু এনে গৃহে লটকিয়ে রাখতেন; অথচ খেতেন না, যাতে গাফেল লোক তাঁর কাছে এসে ভিড় না জমায় এবং তাঁকেও খাহেশ পূজারী মনে করে। দরবেশের বড় কৃতিত্ব হচ্ছে দরবেশীতে দরবেশী করা; অর্থাৎ দরবেশীর বিপরীত প্রকাশ করা। এটা সিদ্দীকগণের কাজ। এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মত, যাকে কেউ কিছু দিলে প্রকাশ্যে তা গ্রহণ করে; কিন্তু পরে গোপনে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, তার অন্তর দু'বার বিনয়ী হয়। এক, বাহ্যতঃ গ্রহণ করার লাঞ্ছনা মেনে নেয়ার সময় এবং দুই, গোপনে ফেরত দেয়ার কালে আপন অভাব অব্যাহত রাখার সময়। এই স্তর অর্জিত হওয়া পর্যন্ত নিজেকে অপূর্ণ জ্ঞান করা এবং খাহেশ প্রকাশ করা উচিত। শয়তান তাকে এই বলে ধোকা দিতে চাইবে যে, এ খাহেশ প্রকাশ করলে অন্যেরাও তোমার অনুসরণ করবে। সুতরাং গোপন করার মধ্যেই অপরের সংশোধন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিহিত। অথচ বাস্তবে অপরের সংশোধন লক্ষ্য হলে আপন নফসের সংশোধন অগ্রে এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হত। এতে বুঝা গেল, উদ্দেশ্য রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, খাহেশ বর্জনে সক্ষম; কিন্তু সাধু বলে পরিচিতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। এমতাবস্থায় খাদ্যের খাহেশ, যা আসলে দুর্বল, তা তো বর্জন করা হল; কিন্তু সুখ্যাতির খাহেশ, যা অধিক অনিষ্টকর– তার খপ্পরে পড়া হল। একে বলা হয় গোপন খাহেশ। এটা খাদ্যের খাহেশ অপেক্ষা অধিক জোরালো। কেউ নিজের মধ্যে এ ধারার খাহেশ অনুভব করার পর যদি একে অধিক জোরালো মনে করে খাদ্যের খাহেশ মিটিয়ে নেয় এবং খেয়ে ফেলে, তবে এটা তার জন্যে উত্তম। হযরত আবু সোলায়মান বলেন ঃ তোমার সামনে যখন বর্জন করা সাধের খাদ্য আসে, তখন তা থেকে সামান্য খেয়ে নাও, নফসের চাহিদা মোতাবেক খেয়ো না। এতে দু'টি উপকারিতা আছে। এক, খাহেশ থাকবে না এবং দুই, নফস আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে যাবে। হযরত ইমাম জাফর (রহঃ) বলতেন ঃ আমার সামনে কোন খাহেশের বস্তু এলে আমি আপন নফসকে দেখি। যদি প্রকাশ্যে আকাঙ্ক্ষা করতে দেখি, তবে খাইয়ে দেই। বাধা দেয়ার চেয়ে এটা ভাল। আর যদি দেখি, গোপনে আকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রকাশ্যে বর্জনকারী হতে চায়, তবে খাওয়া বর্জন করি– কখনও খাই না। এ থেকে গোপন খাহেশের জন্যে নফসকে সাজা দেয়ার পদ্ধতি জানা গেল। মোট কথা, খাদ্যের খাহেশ ত্যাগ করে গোপন খাহেশে লিপ্ত হওয়া এমন, যেমন কেউ বিচ্ছুকে ভয় করতঃ সাপের কাছে চলে যায়। কেননা, রিয়ার ক্ষতি খাদ্যের খাহেশের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

লজ্জাস্থানের খাহেশ

প্রকাশ থাকে যে, দুটি উপকারিতা অর্জনের জন্যে মানুষকে স্ত্রী সহবাসের খাহেশে লিপ্ত করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এর দ্বারা আনন্দ ও সুখ লাভ করে মানুষ পরকালের আনন্দ এবং সুখ স্মরণ করবে। কেননা, এই আনন্দ ও সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেহের আনন্দসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হত; যেমন অগ্নি সর্বাধিক কষ্ট দায়ক। ফলে এই আনন্দ মানুষকে জান্নাতের জন্যে আগ্রহান্বিত করত। জান্নাতের আগ্রহ দোযখের ভয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কষ্ট ছাড়া সম্ভবপর নয়। অতএব দুনিয়াতে যখন কেউ স্ত্রী সহবাসের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করবে, তখন জেনে নেবে যে, জান্নাতের সুখও এমনি ধরনের অথবা এর চেয়েও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের বংশ পরম্পরা অব্যাহত রাখা। এ দু'টি উপকারিতা ছাড়া এই খাহেশের মধ্যে বিপদাপদ ও অপকারিতা এত বেশী যে, মানুষ একে নিয়ন্ত্রণ করে সমতার পর্যায়ে না রাখলে তার দ্বীন দুনিয়া উভয় বরবাদ হয়ে যায়।

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ـ

–পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে এমন বোঝা দিয়ো না, যার শক্তি আমাদের নেই।

এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ লেখেন, এখানে "শক্তির অধিক বস্তু" বলে সহবাসের তীব্র খাহেশ বুঝানো হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষের এই খাহেশ যখন উত্তেজিত হয়ে উঠে, তখন তার দুই তৃতীয়াংশ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَقَلْبِىْ وَمَنِيِّىْ

–আল্লাহ, তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কান, চক্ষু অন্তর ও বীর্যের অনিষ্ট থেকে।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَلَوْ لَا هٰذِهِ الشَّهْوَةُ لَمَا كَانَتِ النِّسَاءُ سُلْطَنَةٌ عَلَى الرِّجَالِ ـ

–নারী শয়তানের জাল। এই খাহেশ না থাকলে নারীরা পুরুষদের উপর রাজত্ব করতে পারত না।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় ইবলীস আগমন করল। তার মস্তকে বহুরঙ্গের চাকচিক্যময় টুপি। মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী হয়ে সে টুপি খুলে রেখে দিল। অতঃপর সালাম করল। মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? সে আরজ করল ঃ আমি ইবলীস। তিনি বললেন ঃ তোমার মৃত্যু হোক, এখানে আসার কারণ কি? ইবলীস বলল ঃ আল্লাহর কাছে আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তাই আপনাকে সালাম করতে এসেছি। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো, মানুষ কি কাজ করলে তুমি তার উপর প্রবল হয়ে যাও? ইবলীস আরজ করল ঃ যখন মানুষ নিজেকে বড় এবং গোনাহ ভুলে গিয়ে নিজের আমলকে বেশী মনে করতে থাকে, তখন সে আমার করায়ত্ত হয়ে যায়। আমি আপনাকে দুইটি বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রথম, বেগানা নারীর সাথে নির্জনে যাবেন না। কেননা, যে পুরুষ বেগানা নারীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাথে একান্তে থাকে, আমি স্বয়ং সেখানে যাই, চেলাদেরকে পাঠাই না। এরপর এই পুরুষকে কুকর্মে লিপ্ত করে দেই। দ্বিতীয়, আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেন তা পূর্ণ করুন এবং যাকাত ও সদকার জন্যে নির্দিষ্ট মাল বণ্টন করে দিন। কারণ, মানুষ খয়রাতের জন্যে যে অর্থ আলাদা করে, আমি তাতেও নানা জটিলতা সৃষ্টি করি, যাতে সে তার নিয়ত পূর্ণ করতে না পারে। এরপর ইবলীস চলে গেল। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, পূর্বকালে প্রেরিত সকল নবী সম্পর্কেই শয়তান আশা করত যে, নারীর ফাঁদে ফেলে তাঁদেরকে ধ্বংস করে দেবে। আমার কাছেও নারীর চেয়ে অধিক বিপজ্জনক কোন কিছু নেই। তাই আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আপন গৃহ ছাড়া কারও গৃহে যাই না অথবা আপন কন্যার গৃহে জুমুআর দিন কেবল গোসল করতে যাই। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শয়তান নারীকে বলে, তুমি আমার অর্ধেক বাহিনী। তুমি আমার তীর, যা কখনও লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয় না। তুমি আমার রহস্য। তুমি আমার দারোয়ান ও দূত। অর্থাৎ শয়তানের অর্ধেক বাহিনী হচ্ছে খাহেশ এবং অর্ধেক বাহিনী ক্রোধ। কিন্তু নারীর খাহেশ হচ্ছে সর্ববৃহৎ। এই খাহেশের তিনটি স্তর আছে- স্বল্পতা, বাহুল্য ও সমতার স্তর। বাহুল্য হচ্ছে, নারীর প্রতি এমন খাহেশ হওয়া যে, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়, সাধনা ও আখেরাতের পথ থেকে বঞ্চিত করে দেয় অথবা দ্বীনদার পশ্চাতে ফেলে কুকর্মে লিপ্ত করে দেয়। এই পর্যায়ের খাহেশ অত্যন্ত নিন্দনীয়। স্বল্পতার স্তর হচ্ছে পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়া। এটাই নিন্দাযোগ্য ও খারাপ। সমতার স্তর হচ্ছে প্রশংসনীয়। তা হল, নারীর খাহেশ সর্বদা জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের আইনের অধীনে থাকবে। এতে বাড়াবাড়ি দেখা দিলে ক্ষুধা ও বিবাহের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে হবে। হাদীসে আছে–

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

যুবকগণ, অবশ্যই বিবাহ কর। যে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার জন্যে খাসী হওয়ার মত।

মুরীদের বিবাহ করা না করা

প্রথম অবস্থায় মুরীদের বিবাহের ঝামেলায় পড়া উচিত নয়। কারণ, এটা আখেরাতের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। মুরীদ স্ত্রীর মহব্বতে আটকা পড়ে যাবে। এ বিষয় থেকে ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনেক বিবাহ করেছিলেন। কেননা, স্ত্রীর মহব্বত দূরের কথা, দুনিয়ার সকল বস্তু মিলেও তাঁর অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিক থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর মহব্বতে তাঁর মগ্নতা এতদূর ছিল যে, মাঝে মাঝে যখন মহব্বতের উত্তাপ অন্তরে উথলে উঠত, তখন অন্তর বিস্ফারিত হওয়ার আশংকা দেখা দিত। তিনি তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঊরুতে করাঘাত করে বলতেন, কিছু কথাবার্তা বল। তাঁর কথাবার্তার ফলে উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হত। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে তুলনা করতে পারে না। করলে সে ধোকা খাবে।

মোট কথা, প্রাথমিক পর্যায়ে অবিবাহিত থাকাই মুরীদের জন্যে উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বলেন ঃ যে বিবাহ করে, সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমি এমন কোন মুরীদ দেখিনি যে বিবাহ করে পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। যে কোন বস্তু আল্লাহ্ থেকে বিরত রাখে– স্ত্রী হোক, অর্থ হোক অথবা সন্তান-সন্ততি হোক, তাকেই অলক্ষুণে মনে করা উচিত। তবে মুরীদের অবিবাহিত থাকা তখন পর্যন্তই শোভনীয়, যে পর্যন্ত খাহেশ জোরালো না হয়। খাহেশ প্রবল হতে দেখলে প্রথমে ক্ষুধা ও সার্বক্ষণিক রোযা দ্বারা তা দমন করবে। এতেও দমিত না হলে খাহেশকে শান্ত করার জন্যে বিবাহ করবে। নতুবা দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এবং উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে। দৃষ্টির গোনাহ সগীরা গোনাহসমূহের মধ্যে অনেক বড়। এ থেকে কবীরা গোনাহ্ও হয়ে থাকে। যে তার দৃষ্টি আয়ত্তে রাখতে পারে না, সে তার দ্বীনদারীরও হেফাযত করতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ তাকানো থেকে বেঁচে থাক। এর কারণে অন্তরে খাহেশের বীজ পড়ে এবং এতটুকু অনর্থই যথেষ্ট। হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র বলেন ঃ কেবল দৃষ্টির কারণে হযরত দাউদ (আঃ) অনর্থে লিপ্ত হন। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) এরশাদ করেন ঃ সিংহ ও সর্পের পেছনে যেয়ো; কিন্তু নারীর পেছনে যেয়ো না। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ যিনার সূচনা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ দেখা ও বাসনা করার মাধ্যমে। হযরত ফোযায়ল এরশাদ করেন, ইবলীস বলে ঃ দৃষ্টি আমার প্রাচীন তীর ধনুক, যা কখনও ভুল করে না। দৃষ্টি সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উক্তিসমূহ নিম্নরূপ–

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِيْمَانًا سَيَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهٖ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর। যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এটি পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন ঈমান দেবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

–আমি আমার পরে পুরুষদের জন্যে নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা ছেড়ে যাইনি।

اِتَّقُوْا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ـ

–তোমরা দুনিয়ার ফেতনা ও নারীদের ফেতনা থেকে বেঁচে থাক। বনী ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা নারীদের পক্ষ থেকেই ছিল।

لِكُلِّ بَنِىْ اٰدَمَ حَظٌّ مِّنَ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ الحديث ـ

–প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিনার কিছু অংশ আছে। কেননা, চক্ষুদ্বয় যিনা করে। তাদের যিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। হস্তদ্বয় যিনা করে। তাদের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। পদদ্বয় যিনা করে, তাদের যিনা হচ্ছে হাঁটা। মুখ যিনা করে। তার যিনা হচ্ছে বলা। অন্তর ইচ্ছা ও বাসনা করে। লজ্জাস্থান তাকে সত্যে পরিণত অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ الاية মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন ঃ একবার অন্ধ ইবনে মকতুম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসতে চাইলেন। তখন আমি ও মায়মুনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে পর্দা করতে বললেন। আমরা বললাম, সে তো অন্ধ। পর্দা করার প্রয়োজন কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো তাকে দেখ।

এ থেকে জানা গেল, নারীদের অন্ধের কাছে বসা এবং বিনা প্রয়োজনে তার সাথে কথা বলা জায়েয নয়। আজকাল এটা প্রচলিত আছে। হাঁ, প্রয়োজনের সময় নারী পুরুষের সাথে কথা বলতে অথবা দেখতে পারে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি মুরীদের অবস্থা এমন হয় যে, সে নারীদের থেকে তো দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু বালকদের থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না; তবুও বিবাহ করা উত্তম। কেননা, বালকদের সৌন্দর্যপ্রীতির মধ্যে অনিষ্ট বেশী। কোন নারীর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করে মনের আশা পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু বালকদের দ্বারা এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই বালককে কুদৃষ্টিতে দেখা হারাম। এক্ষেত্রে মানুষ খুব শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং পরিণামে ধ্বংসের মুখে পড়ে। জনৈক তাবেয়ী বলেন ঃ যুবক সাধকের সাথে শ্মশ্রুবিহীন বালকের উঠাবসা আমি হিংস্র জন্তুর চেয়েও অধিক ভয় করি। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি খাহেশবশতঃ কোন বালকের পায়ের অঙ্গুলিতেও সুড়সুড়ি দেয়, তবুও সে সমকামী হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এই উম্মতে তিন প্রকার সমকামী হবে। কেউ তো কেবল দেখবে, কেউ করমর্দন করবে এবং কেউ কুকর্মই করবে। এ থেকে বুঝা গেল, দৃষ্টির কারণে বড় বড় বিপদের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং যখন আপন দৃষ্টি ফেরাতে এবং চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে না, তখন বিবাহ করাই তার জন্যে শ্রেয়ঃ। অধিকাংশ মানুষের যৌন উত্তেজনা ক্ষুধার কারণে হ্রাস পায় না। সেমতে জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, সাধনার প্রথম পর্যায়ে একবার আমার উপর খাহেশ প্রবল হয়ে গেলে আমি আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি করলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? আমি ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এগিয়ে এস। আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি আপন হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি এর শীতলতা অন্তরে ও দেহে অনুভব করলাম। সকালে ঘুম থেকে জেগে নিজের মধ্যে সেই যৌন উত্তেজনা পেলাম না। এক বছর কাল এ অবস্থা বহাল রইল। এরপর আবার প্রাবল্য দেখা দিল। আমি আবার হাহুতাশ করলে স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে বলল ঃ যদি তুমি তোমার ঘাড় কাটাতে সম্মত হও, তবে আমি তোমার চিকিৎসা করি। আমি বললাম ঃ উত্তম। সে বলল ঃ ঘাড় নত কর। আমি ঘাড় নত করলে সে একটি নূরের তরবারি দিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করল। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল। এক বছর কাল আবার সুস্থ থাকার পর পুনরায় সেই রোগ দ্বিগুণ বেগে দেখা দিল। এ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম, সে আমার বক্ষ ও পাঁজরের মাঝখানে বসে আমাকে বলছে ঃ যে বিষয়টি দূর করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, তা দূর করার জন্য আর কতদিন কাকুতি মিনতি করবে? এরপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি জাগ্রত হয়ে বিবাহ করলাম এবং সন্তানাদি হল। এখন সেই খাহেশের জোর আর নেই।

সুতরাং মুরীদের বিবাহ করার প্রয়োজন দেখা দিলে বিবাহের শুরুতে নিয়ত ভাল রাখবে এবং পরিণামে জরুরী হক আদায় করবে। নিয়ত ভাল রাখার আলামত হচ্ছে, কোন সম্বলহীন ধর্মপরায়ণা মহিলাকে বিবাহ করবে, বিত্তশালিনী তালাশ করবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বিত্তশালিনী মহিলাকে বিবাহ করার অনিষ্ট পাঁচটি, (১) মোহরানা বেশী হওয়া, (২) স্বামী গৃহে গমনে ইতস্ততঃ করা, (৩) সেবা না করা, (৪) অধিক ব্যয়ভার বহন করা এবং (৫) ত্যাগ করতে মনে চাইলে বিত্তের লোভে তা না পারা। পক্ষান্তরে সম্বলহীনাকে বিবাহ করার মধ্যে এরূপ কোন অনিষ্ট নেই। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ চারটি বিষয়ে নারীর পুরুষের চেয়ে কম হওয়া চাই। নতুবা সে পুরুষকে হেয় মনে করবে। চারটি বিষয় এই ঃ বয়সে, দৈহিক গড়নে, অর্থকড়িতে এবং বংশ মর্যাদায়। পক্ষান্তরে চারটি বিষয়ে নারীর পুরুষের চেয়ে বেশী হওয়া দরকার– সৌন্দর্যে, শিষ্টাচারে, সংযমে এবং চরিত্রে। পরিণামে জরুরী হক আদায়ের আলামত হচ্ছে সদা সদাচার প্রদর্শন করা। জনৈক মুরীদ বিবাহ করে সদা সর্বদা স্ত্রীর সেবাযত্ন করতে থাকে। অবশেষে স্ত্রী লজ্জিত হয়ে তার পিতা-মাতাকে বলল ঃ আমি আমার স্বামীর সদাচারে বিস্মিত হয়েছি। এত বছর ধরে তার গৃহে যখনই পায়খানা করতে যাই তখনই সে বদনা আমার পূর্বে সেখানে রেখে দেয়। অন্য একজন বুযুর্গ জনৈকা রূপসী মহিলাকে বিবাহ করেন। স্বামী গৃহে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে স্ত্রী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল। তার পরিবারের লোকজন মহাচিন্তায় পড়ল, এখন স্বামী তাকে পছন্দ করবে না। বুযুর্গ ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে প্রথমে চক্ষু রোগের বাহানা করলেন, এরপর অন্ধ সেজে গেলেন। স্ত্রী স্বামী গৃহে এসে বিশ বছর সদ্ভাবে সংসার করার পর মারা গেল। এরপর বুযুর্গ ব্যক্তি চক্ষু খুললেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেই অন্ধ সেজেছিলাম যাতে শ্বশুরালয়ের লোকেরা দুঃখ না করেন। এতে সকলেই পরম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ এমন সদাচারী লোক দুনিয়াতে দ্বিতীয়জন আর নেই। জনৈক সুফী এক বদমেযাজ মহিলাকে বিবাহ করে সর্বদাই তার কটূক্তি সহ্য করতে থাকেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি এই মহিলাকে তালাক দেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আশংকা হয়, অন্য কোন ব্যক্তি তার হাতে নিপীড়িত হবে। অতএব মুরীদ বিবাহ করলে এরূপই হওয়া উচিত। আর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি বিবাহ ছাড়া থাকতে পারে এবং বিবাহের কারণে আখেরাতের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে মনে করে, তবে বিবাহ না করাই উত্তম।

বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান হাশেমীর দৈনিক আমদানী ছিল আশি হাজার দেরহাম। তিনি বসরার আলেমগণের কাছে এ মর্মে পত্র লেখলেন ঃ আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাই। আপনারা পছন্দ করে দিন। সকলেই একমত হয়ে তাঁকে জওয়াব দিলেন, রাবেয়া বসরীয়াকে বিবাহ করাই আপনার জন্যে উপযুক্ত। সেমতে তিনি রাবেয়া বসরীয়াকে এভাবে পত্র লেখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। হামদ ও সালাতের পর আবেদন হল, আল্লাহ তাআলা আমাকে আজ দৈনিক আশি হাজার দেরহাম আমদানী দিয়েছেন। আশা করা যায়, কিছু দিন পরেই আমদানী বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক এক লাখ দেরহাম হয়ে যাবে। যদি তুমি আমাকে মঞ্জুর কর, তবে এই ধন-সম্পদ সমস্তই তোমার হবে। –ইতি

হযরত রাবেয়া বসরীয়া এই পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হামদ ও না'তের পর জানাচ্ছি, সংসার নির্লিপ্ততার মধ্যেই অন্তরের শান্তি ও দেহের সুখ নিহিত এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ দুঃখ ও অশান্তির কারণ। পত্র পাওয়ার সাথে সাথে আপনার উচিত পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা এবং পরকালের চিন্তায় মগ্ন হওয়া। আপনি নিজেই নিজের ওছি হয়ে যান, যাতে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের জন্যে অন্যকে ওছি নিযুক্ত করার প্রয়োজন না থাকে। সারা জীবন রোযা রাখুন এবং মৃত্যুর সময় ইফতার করুন। আমার অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আপনার সমপরিমাণ অথবা আরও কয়েকগুণ বেশী ধন-সম্পদ দিয়ে দেন, তবুও এক মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ না করে থাকতে পারব না। –ইতি

এ থেকে জানা যায়, যে বিষয় আল্লাহর স্মরণে অন্তরায় হয়, তা ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং মুরীদ তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করবে। অবিবাহিত থাকা সম্ভব না হলে বিবাহ করা উত্তম। এ রোগের তিনটি প্রতিকার রয়েছে– প্রথম অনাহারে থাকা দ্বিতীয়, দৃষ্টি সংযত রাখা এবং তৃতীয়, অন্তরকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখা, যাতে আচ্ছন্ন রাখে। এ তিনটি তদবীরে কোন উপকার না হলে সর্বশেষে বিবাহ করতে হবে। এতে এ রোগের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাড়াহুড়া করে কন্যাদের বিবাহ দিতেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শয়তান কারও তরফ থেকে নিরাশ হয় না। সে নারীদের দ্বারা অবশ্যই ফাঁদ পাতে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িবের বয়স যখন চৌরাশি বছরে পৌঁছে, তখন তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় এবং অপর চক্ষু থেকেও পানি ঝরতে থাকে। তখনও তিনি বলতেন ঃ আমি নারীদের চেয়ে অধিক অন্য কিছুকে ভয় করি না। আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়া বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। কয়েক দিন যাইনি। এরপর একদিন গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কয়দিন কোথায় ছিলে? আমি বললাম ঃ আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিল। তাই হাযির হতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে খবর দিলে না কেন? এরপর আমি প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি বললেন ঃ খুব তো চলে যাচ্ছ; কিন্তু জিজ্ঞেস করি, পরে বিয়ে শাদী করলে কি না? আমি আরজ করলাম ঃ হুযুর, আমি গরীব মানুষ। আমাকে কে কন্যা দান করবে। তিনি বললেন ঃ আমি দিচ্ছি। আমি সবিস্ময়ে বললাম ঃ আপনি ! তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর খোতবা পাঠ করে সামান্য মোহরানার বিনিময়ে আপন কন্যার বিবাহ আমার সাথে সম্পন্ন করে দিলেন। আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম এবং কারও কাছ থেকে কিছু কর্জ নেয়ার কথা ভাবছিলাম। ইতিমধ্যে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। আমি নামায পড়ে গৃহে ফিরে এলাম। বাতি জ্বালিয়ে রুটি ও তেল নিয়ে ইফতার করতে বসলাম। এমন সময় দরজা থেকে করাঘাতের শব্দ কানে ভেসে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে? জওয়াব এল ঃ সায়ীদ। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম, কোন্ সায়ীদ হতে পারে! সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব হবেন, তা কল্পনায়ও ছিল না। কারণ, তিনি চল্লিশ বছর ধরে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দরজা খুলেই দেখি, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব দণ্ডায়মান। আমি ধারণা করলাম, বোধ হয় কোন সাংঘাতিক প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন। আমি আরজ করলাম ঃ আমাকে ডেকে নিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে আসাই সমীচীন মনে হল। আমি বললাম ঃ আদেশ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি বিবাহ করেছ। এখন একাকী শয়ন করবে– এটা আমার কাছে ভাল মনে হয়নি। তাই তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। আমি ভাল করে দেখতেই দেখি, বাস্তবে সেই ভাগ্যবতী কন্যা সলজ্জ ভঙ্গিতে তাঁর পেছনেই দণ্ডায়মান রয়েছে। তিনি তার হাত ধরে ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। এদিকে কন্যাটি লজ্জা শরমের আতিশয্যে মাটিতে পড়ে গেল। আমি দরজা খুব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভাল করে বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর যে পেয়ালায় রুটি ও তেল রাখা ছিল, তা বাতির কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম, যাতে স্ত্রীর দৃষ্টিগোচর না হয়। এরপর গৃহের ছাদে উঠে প্রতিবেশীদেরকে ডাক দিলাম। সকলেই একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি? আমি বললাম ঃ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব আজ দিনের বেলায় তাঁর কন্যার বিবাহ আমার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এখন রাতের বেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তাঁর কন্যাকে এখানে রেখে গেছেন। লোকেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল ঃ সায়ীদ তোমাকে বিবাহ করিয়েছেন? আমি বললাম ঃ হাঁ। তারা বলল ঃ তাঁর কন্যা এখন তোমার গৃহে? আমি বললাম ঃ হাঁ। অতঃপর তারা সকলেই তার কাছে গেল। আমার মা সংবাদ পেয়ে এলেন এবং বললেন ঃ তিন দিন পর্যন্ত তুই বউ মাকে স্পর্শ করতে পারবি না। যদি করিস কখনও তোর মুখ দেখব না। এই তিন দিনে আমরা তাকে ঠিক করে নেব। মায়ের আদেশমত আমি তিন দিন আলাদা রইলাম। এরপর যখন তাকে দেখলাম, তখন পরমাসুন্দরী, কালামুল্লাহর হাফেয, সুন্নতের আলেম এবং স্বামীর হক সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল পেলাম। একমাস পর্যন্ত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব আমার গৃহে এলেন না এবং আমিও তাঁর কাছে গেলাম না। একমাস পর যখন গেলাম, তখন তিনি ভক্তদের বৃত্তের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সালাম করলে তিনি শুধু জওয়াব দিলেন এবং কিছু বললেন না। ভক্তদের প্রস্থানের পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি? আমি বললাম ঃ খুব ভাল। তিনি বললেন ঃ মর্জির খেলাফ কোন কিছু পেলে লাঠি দিয়ে খবর নেবে। আমি গৃহে চলে এলাম। এরপর তিনি বিশ হাজার দেরহাম আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এ ছিল সেই কন্যা, যাকে খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার খেলাফত কালে আপন পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব অস্বীকৃত হন। এরপর খলীফা মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে একশ' বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং কনকনে শীতের মধ্যে এক কলসী ঠাণ্ডা পানি তাঁর গায়ে ঢেলে দেন। এছাড়া কম্বলের কোর্তাও পরিধান করান। এসব কারণে কন্যাকে রাতেই স্বামী গৃহে বিদায় দেয়া পূর্ণ ধার্মিকতা ও সাবধানতার পরিচায়ক ছিল। (আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।)

যিনা ও কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা

জানা উচিত, লজ্জাস্থানের খাহেশ সর্বাধিক প্রবল এবং উত্তেজনার মুহূর্তে জ্ঞান-বুদ্ধির সর্বাধিক অবাধ্য। এর ফলাফল খুবই লজ্জাজনক।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষ যে এ খাহেশ থেকে বেঁচে থাকে, তার কারণ হয় অক্ষমতা, না হয় লোকনিন্দার ভয়, না হয় লজ্জা শরম, না হয় মান-ইযযত রক্ষা করা। এগুলোর মধ্যে কোনটিতেই সওয়াব নেই। কারণ, এতে মনের এক আনন্দকে অন্য আনন্দের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয় মাত্র। হাঁ, এসব বাধার মধ্যেও একটি ফায়দা আছে। তা হচ্ছে, মানুষ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তা যে কোন কারণেই বেঁচে থাকুক। কিন্তু উচ্চ মর্তব্য ও সওয়াব তখন অর্জিত হবে, যখন সকল প্রকার সামর্থ্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ শুধু আল্লাহর ভয়ে যিনা থেকে বিরত থাকে, বিশেষতঃ যখন সত্যিকার খাহেশ বিদ্যমান। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَهُوَ شَهِيْدٌ -যে আশেক হয়ে সাধু থাকে এবং এশক গোপন রাখে, অতঃপর মারা যায়, সে শহীদ। তিনি আরও বলেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপবতী নারী নিজের দিকে আহ্বান করে, সে জওয়াবে বলেঃ

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -আমি বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি। সামর্থ্য এবং আগ্রহ সত্ত্বেও যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কিস্সা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আল্লাহ তা'আলা পাক কালামে এ জন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আঃ) সকল সৎ ও সাধু পুরুষের ইমাম। সাহাবী হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) অসাধারণ সুশ্রী যুবক ছিলেন। তাঁর গৃহে জনৈকা মহিলা আগমন করে তাঁর সাথে কুকর্ম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি অস্বীকার করেন এবং গৃহ থেকে পালিয়ে যান। তিনি রাত্রে স্বপ্নে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে আরজ করলেনঃ আপনি ইউসুফ? উত্তর হলঃ হাঁ, আমি সেই ইউসুফ, যে ইচ্ছা করেছিল, আর তুমি সেই সোলায়মান, যে ইচ্ছাও করেনি। এই সাহাবীরই আর একটি আশ্চর্যজনক কাহিনী বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে, একবার একজন সঙ্গীসহ তিনি মদীনা থেকে হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁর সঙ্গী কিছু কেনাকাটা করার জন্যে বাজারে চলে গেল। তিনি তাঁবুতে একাকী বসে রইলেন। জনৈকা বেদুঈন মহিলার দৃষ্টি তাঁর অনন্য রূপ সৌন্দর্যের উপর পতিত হতেই সে মনে প্রাণে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং পাহাড়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে নেমে একেবারে তাঁর সামনে এসে দণ্ডায়মান হল। মহিলা নিজেও রূপ-সৌন্দর্যে ছিল চন্দ্র-সূর্যবৎ অপরূপা। সে বোরকা উত্তোলন করে চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ ঘটাতে বিলম্ব করল না। অতঃপর সে বলল ঃ আমাকে কিছু দিন। সোলায়মান মনে করলেন, খাবার চাইছে, তাই রুটি দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। সে বলল ঃ আমি এটা চাই না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয়, আমি তাই কামনা করি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে শয়তান আমার কাছে পাঠিয়েছে। অতঃপর তিনি আপন মস্তক দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে সজোরে ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। মহিলা তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে আপন গৃহে চলে গেল। সঙ্গী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখল, কাঁদতে কাঁদতে সোলায়মানের চক্ষুদ্বয় ফুলে গেছে এবং কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বললেন ঃ কিছুই নয়। আমার কন্যার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গী বলল ঃ না, ব্যাপার অন্যকিছু। তিন মনযিল পথ অতিক্রম করার সময় তো আপনার কন্যার কথা একবারও মনে পড়ল না। আজ হঠাৎ মনে পড়বে কেন? মোট কথা, অনেক পীড়াপীড়ি করে জিজ্ঞেস করার পর সোলায়মান বেদুঈন মহিলার ঘটনা বলে দিলেন। সঙ্গী বাজার সওদার থলে রেখে অঝোরে কান্না শুরু করে দিল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমার কান্নার কারণ হচ্ছে, যদি আপনার স্থলে আমি থাকতাম তবে সবর করতে পারতাম না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই কাঁদলেন। অতঃপর তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। তওয়াফ ও সায়ীর পর যখন তাঁরা হাজারে আসওয়াদের কাছে এলেন, তখন সোলায়মান ইবনে ইয়াসার উপবিষ্ট অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে জনৈক দীর্ঘদেহী, সুশ্রী, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত, আতরমাখা ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি ইউসুফ। সোলায়মান আরজ করলেন ঃ যুলায়খার সাথে আপনার আচরণ খুবই বিস্ময়কর। ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ আবওয়ার মহিলার সাথে তোমার আচরণ আরও বেশী আশ্চর্যজনক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি, প্রাচীনকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়েছিল। তারা রাতের বেলায় একটি গুহায় অবস্থান গ্রহণ করে। ঘটনাক্রমে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। তারা একে অপরকে বলল ঃ আপন আপন সৎকর্ম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর। সৎকর্মের বরকতে এই পাথর সরে যেতে পারে। সেমতে তাদের একজন হাত তুলে বলল ঃ ইলাহী, তুমি জান, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি সন্ধ্যায় প্রথমে তাদেরকে আহার করিয়ে দিতাম, এরপর সন্তান-সন্ততি ও গৃহপালিত গবাদিপশুকে আহার দিতাম। একদিন গবাদিপশুর খাদ্য যোগাড় করতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দেরীতে বাড়ী পৌঁছলাম। অতঃপর গাভীর দুধ দোহন করে তা পিতামাতার কাছে নিয়ে দেখি, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডেকে জাগানো আমি ভাল মনে করলাম না। তাই দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি পর্যন্ত তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্তানরা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি পিতামাতার পূর্বে তাদেরকে খাবার দেয়া ভাল মনে করিনি। সকালে যখন তারা পান করলেন, তখন অন্যদেরকে দিলাম। ইলাহী, যদি তুমি জান, এ কাজ আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করেছি, তবে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। এ দোয়ার বরকতে পাথরটি এই পরিমাণ সরে গেল যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হল। দ্বিতীয় জন দোয়ায় বলল ঃ ইলাহী, তুমি জান, আমি আমার পিতৃব্য-কন্যার প্রতি আশেক ছিলাম। আমি তার কাছে মিলনের বাসনা প্রকাশ করলে সে অস্বীকৃতি জানাল। এরপর দুর্ভিক্ষের সময় নিদারুণ কষ্টে পড়ে সে আমার কাছে আগমন করল। সে অস্বীকার করবে না। আমি তাকে এই শর্তে একশ' বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। সে আমার কথা মেনে নিল; কিন্তু আমি যখন তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে চাইলাম, তখন বলল ঃ আল্লাহকে ভয় কর। আমার বেইজ্জতী করো না। এতে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। তাকে যা দিয়েছিলাম, তাও ফেরত নিলাম না। ভালবাসাও যথারীতি কায়েম রাখলাম। ইলাহী, যদি আমি কেবল তোমার ভয়ে এ কাজ করে থাকি, তবে এর বরকতে এ বিপদ দূর করে দাও। এরপর পাথরটি আরও সামান্য সরে গেল। কিন্তু বের হওয়ার পথ হল না তৃতীয় জন বলল ঃ ইলাহী, আমি একবার কয়েকজন মজুরকে কাজে নিয়োগ করেছিলাম এবং সকলের মজুরিই শোধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু জনৈক মজুর তার মজুরি রেখেই চলে গেল। তার অনুপস্থিতিতে আমি তার অর্থ কারবারে নিয়োগ করায় তা বেড়ে অনেক হয়ে গেল। অনেক দিন পর যখন সে মজুরি চাইতে এল, তখন আমি অনেকগুলো উট, গরু ও ছাগল দেখিয়ে বললাম ঃ এগুলো সব তোমার। সে বলল ঃ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা মস্করা করছেন? আমি বললাম ঃ ঠাট্টা নয়। এগুলো তোমার মজুরির অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে অর্জিত হয়েছে। এগুলো নিয়ে
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাও। সে জন্তুগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। ইলাহী, যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তার এই দোয়ার পর পাথরটি সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারাও গন্তব্য পথে রওয়ানা হয়ে গেল। যে নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে রাখে তার হচ্ছে এই ফযীলত। তারই নিকটবর্তী সে ব্যক্তি, যে চোখের যিনা থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা, যিনার সূচনা চোখ দ্বারাই হয়। তাই চোখ সংযত রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ কাজ। কিন্তু একে হালকা মনে করা হয়, তেমন ভয় করা হয় না। অথচ সব বিপদের উৎসমূল হচ্ছে চোখ। যদি ইচ্ছা ব্যতিরেকে একবার দেখা হয়, তবে তার জন্যে শাস্তি নেই; কিন্তু পুনর্বার দেখার মধ্যে শাস্তি আছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ-

لَكَ الْاُوْلٰى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ –প্রথম বার দেখা তোমার জন্যে জায়েয এবং দ্বিতীয় বার দেখা বিপদ।

এখানে চোখের দেখাই উদ্দেশ্য। আলা ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ নারীর চাদরের উপরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে খাহেশের বীজ বপন করে। মানুষ যখন কোন নারীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন দ্বিতীয় বার না তাকানোটা খুবই বিরল। রূপের ধারণা দৃষ্টিতে থাকলে দ্বিতীয় বার দেখতে মন চাইবে। তখন নিজের মনে সাব্যস্ত করে নেবে যে, পুনর্বার দেখা নিছক বোকামি। কেননা, দ্বিতীয় বার দেখলে যদি মুখমণ্ডল ভাল মনে হয়, তবে নফসে খাহেশ হবে, অথচ সে পাওয়ার নয়। অতএব পরিতাপ ছাড়া আর কি হাতে আসবে। আর যদি মুখমন্ডল বিশ্রী মনে হয় তবে যে উদ্দেশে দেখা; অর্থাৎ আনন্দ লাভ, তা অর্জিত হবে না। কেবল মজাবিহীন গোনাহে লিপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়া হয় তবে মনের উপর থেকে অনেক বিপদ টলে যায়। চোখের ত্রুটির পর যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে নেয়, তবে এটা বড় শক্তিমত্তা ও অসাধারণ তওফীকের কাজ হবে। আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানী রেওয়ায়াত করেন, জনৈক কসাই তার প্রতিবেশীর বাঁদীর প্রতি আশেক হয়ে যায়। বাঁদীর মালিক তাকে কার্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে প্রেরণ করলে কসাই তার পিছু নেয় এবং আপন কুমতলব প্রকাশ করে। বাঁদী বলল ঃ যতটুকু তুমি আমাকে চাও আমি তার চেয়ে বেশী তোমাকে চাই। কিন্তু অপকর্ম থেকে আমাকে মাফ কর। কারণ, আমি আল্লাহকে ভয় করি। কসাই বলল ঃ তুমি আল্লাহকে ভয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলে আমি করব না কেন? অতঃপর সে তওবাকারী হয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে সে দারুণ পিপাসায় মরণোন্মুখ হয়ে পড়ল। এমন সময় বনী ইসরাঈলের একজন পয়গম্বরের দূতের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। দূত অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে পিপাসার কথা জানাল। দূত বলল ঃ আমি তুমি মিলে দোয়া করি, যাতে গ্রামে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা দ্বারা আমাদেরকে ছায়া দান করেন। কসাই বলল ঃ দোয়া করার মত কোন নেক কাজ আমি করিনি। তুমিই দোয়া কর। দূত বলল ঃ আচ্ছা, আমিই দোয়া করি। তুমি কেবল 'আমীন' বলবে। অতঃপর দূত দোয়া আরম্ভ করল এবং কসাই আমীন বলে গেল। অবশেষে এক খণ্ড মেঘ তাদের মাথার উপর চলতে লাগল এবং তার গ্রামে পৌছে গেল। কসাই যখন আলাদা হয়ে তার গৃহের দিকে চলতে লাগল, তখন মেঘখণ্ডটিও তার সাথে যেতে লাগল। দূত বলল ঃ তুমি তো বলছিলে, তোমার কোন নেক আমল নেই। তাই আমি দোয়া করেছিলাম। এখন মেঘখণ্ড তোমার সাথে চলল কিরূপে? তোমার অবস্থা আমাকে খুলে বল। কসাই তওবার ঘটনা বর্ণনা করলে দূত বলল ঃ আল্লাহর কাছে তওবাকারীর এমন মর্তবা, যা অন্য কারও নেই।

আহমদ ইবনে সায়ীদ তাঁর পিতার বাচনিক বর্ণনা করেন– কুফায় আমাদের কাছে একজন সুগঠন, সুশ্রী ও সৎস্বভাবের আবেদ বসবাস করত। তিনি বেশীর ভাগ সময় মসজিদেই অতিবাহিত করতেন। জনৈকা রূপসী বুদ্ধিমতী মহিলা তাঁকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত প্রেম অন্তরে গোপন রাখল। একদিন আবেদ যখন মসজিদে গমন করছিলেন, তখন মহিলা তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল ঃ আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই, প্রথমে তা শুনে নিন, এরপর মনে যা চায় করুন। কিন্তু আবেদ কিছুই না বলে সোজা চলে গেলেন। ঘরে ফেরার পথে মহিলা আবার তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমার কথা শুনে যান। আবেদ মথা নত করল এবং অনেকক্ষণ পর বলল ঃ এটা অপবাদের জায়গা। কেউ আমাকে অপবাদ দিক, আমি তা ভাল মনে করি না। মহিলা বলল ঃ আমি আপনার অবস্থা না জেনে এখানে দাঁড়াইনি। খোদা না করুন, কেউ আমার পক্ষ থেকে খারাপ কিছু জানুক। কিন্তু এহেন কাজে আমার নিজেরই আসতে হল। আমি জানি, মানুষ তিলকে তাল বানায়। আপনারা আবেদ সম্প্রদায় আয়নার মত। সামান্য বিষয়েই আপনাদের গায়ে দোষ লেগে যায়। আমার একশ' কথার এক কথা হল, আমি আপনার প্রতি প্রেমাসক্ত। এখন আমার আপনার ব্যাপারটি আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

তা'আলাই নিষ্পত্তি করুন। যুবক আবেদ এ কথা শুনে গৃহে চলে গেলে। তিনি দিশেহারা অবস্থায় নামায পড়তে চাইলেন; কিন্তু পারলেন না। অবশেষে এক চিরকুট লেখে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লেন। দেখলেন, মহিলা পথিমধ্যে পূর্বের জায়গায়ই দণ্ডায়মান আছেন। তিনি চিরকুটটি মহিলার দিকে নিক্ষেপ করে আপন গৃহে ফিরে এলেন– চিরকুটের বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হে নারী! জেনে রাখ, যখন বান্দা আল্লাহর নাফরমানী করে, তখন আল্লাহ সহ্য করেন। যখন পুনর্বার করে তখনও দোষ গোপন রাখেন। কিন্তু যখন গোনাহে গা ভাসিয়ে দেয় তখন এমন গযব নাযিল করেন, যা পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় ও বৃক্ষলতা কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। সুতরাং এমন গযব সহ্য করার ক্ষমতা কার? তুমি যে কথা বলেছিলে, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে সেদিনকে স্মরণ কর যখন আকাশমণ্ডলী গলিত তামার আকার ধারণ করবে, পাহাড়-পর্বত ধুনা তুলার মত হবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতাপ এমন প্রচণ্ড হবে যে, সকল মানুষ হাঁটু গেড়ে পড়ে থাকবে। আমার অবস্থা হচ্ছে, আমি নিজেকে সংশোধন করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে যদি আমার উক্তি সত্য হয়, তবে এমন চিকিৎসকের সন্ধান দিচ্ছি, যিনি সকল ব্যথা নিরাময় এবং মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা করবেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু। খাঁটি মনে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্যে এ আয়াতটিই যথেষ্ট ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ـ

–তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন কষ্টের কারণে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। জালেমদের জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং সুপারিশ গ্রাহ্য হয় এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। চোখের অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বিষয় আল্লাহ জানেন।

এ আয়াত থেকে পলায়নের উপায় নেই। ইতি-

কয়েকদিন পরে এই মহিলা আবার এসে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হল। আবেদ তাকে দূর থেকে দেখেই গৃহপানে ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মহিলা বলল ঃ চলে যান কেন? আজই শেষ সাক্ষাৎ। এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছেই দেখা হবে। এরপর সে খুব কান্নাকাটি করল এবং বলল ঃ যে আল্লাহর হাতে আপনার প্রাণ, আমি তাঁর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার সমস্যাটি আমার জন্যে সহজ করে দেন। কিন্তু আমাকে কোন উপদেশ দিন। আবেদ বললেন ঃ নিজেকে নফসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং এ আয়াতটি মনে রেখ ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ -

তিনিই তোমাদেরকে রাতের বেলায় ওফাত দেন এবং দিনে যা কর, তা জানেন।

মহিলা আঁচলে মুখ লুকিয়ে প্রথম বারের চেয়েও অধিক কান্না শুরু করল। এরপর আপন গৃহে চলে গেল। কয়েকদিন আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকার পর সে দুঃখেই ইন্তেকাল করল। আবেদ তাকে স্মরণ করে কাঁদত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত ঃ আপনিই তো তাকে নিরাশ করেছেন। এখন কাঁদেন কেন? আবেদ বলতেন, সূচনাতেই তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর কাছে নিজের জন্যে ভাণ্ডার করেছি। এখন তা বিনষ্ট হয় কি না, তাই ভেবে কাঁদি।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বাদশ অধ্যায়

জিহ্বার বিপদাপদ

প্রকাশ থাকে যে, জিহ্বা একটি মাংসখণ্ড হলেও এটি আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নেয়ামতসমূহ এবং সূক্ষ্ম কারিগরিসমূহের অন্যতম। এর গোনাহ যেমন সর্বাধিক বেশী, তেমনি এর আনুগত্যও সর্বোপরি। কেননা, হীনতম ঔদ্ধত্য তথা কুফর এবং শ্রেষ্ঠতম আনুগত্য তথা ঈমান এই জিহ্বার সাক্ষ্য দ্বারাই বিকশিত হয়। এছাড়া প্রত্যেক বস্তু– তা অনুপস্থিত হোক অথবা উপস্থিত, স্রষ্টা হোক অথবা সৃষ্টি, জানা হোক অথবা অজানা, বাহ্যিক হোক অথবা আভ্যন্তরীণ, সমস্তই জিহ্বায় উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ জ্ঞান যে বস্তুকে বেষ্টন করে, জিহ্বাই তা বর্ণনা করে– সত্য হোক অথবা মিথ্যা। জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই নেই। এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা জিহ্বা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। উদাহরণতঃ চক্ষু রঙ্গিন বস্তুর আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পারে না। কান আওয়াজ ব্যতীত অন্য কিছু শুনে না। অন্যান্য অঙ্গের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু জিহ্বার কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে বশে রাখে না, শয়তান তাকে দিয়ে অনেক কিছু বলাতে পারে এবং তাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

وَلَا يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ ـ

-জিহ্বার ফসলই মানুষকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করে।

হাঁ, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে সে ব্যক্তিই বেঁচে থাকবে, যে তাকে শরীয়তের লাগাম পরাবে এবং মুখ দিয়ে সেই কথাই বের করবে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার নিহিত থাকে। কোন্ কথা বলা ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ, তা জানা খুবই দুষ্কর এবং তা আমলে আনা আরও কঠিন। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে জিহ্বাই মানুষের জন্যে অধিক নাফরমান। কেননা, এটি সঞ্চালন করা খুবই সহজ। জিহ্বার বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং তার ক্ষতিকে ভয় করার ব্যাপারে মানুষ মোটেই তৎপরতা প্রদর্শন করে না। অথচ এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। তাই নিম্নে আমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে ও তওফীকে জিহ্বার সমস্ত বিপদাপদ একটি একটি করে সংজ্ঞা, কারণ ও আত্মরক্ষার উপায়সহ সবিস্তার উল্লেখ করব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিহ্বার বিপদাশংকা ও চুপ থাকার ফযীলত

জানা উচিত, জিহ্বার কারণে বিপদাশংকা অনেক বড় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে চুপ থাকা। এ কারণেই শরীয়তে চুপ থাকার প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান লক্ষ্য করা যায়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ صَمَتَ نَجَا -যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়। তিনি আরও বলেন- اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهٗ -চুপ থাকা প্রজ্ঞা ও সাবধানতা। কিন্তু কম লোকই চুপ থাকে। আবদুল্লাহ্ ইবনে সুফিয়ানের পিতা রেওয়ায়াত করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন, যেন আপনার পরে কারও কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন ঃ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -বল, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; এরপর সরল পথে কায়েম থাক। আমি আরজ করলাম ঃ আমি কি বিষয় থেকে বেঁচে থাকব? তিনি জিহ্বার দিকে হাতে ইশারা করে বললেন ঃ এ থেকে বেঁচে থাক। ওকবা ইবনে আমের বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ

اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ .

-জিহ্বাকে সংযত রাখ, গৃহে থাক এবং গোনাহের জন্যে ক্রন্দন কর।

তিনি আরও বলেন ঃ যে আমাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব। অন্য এক হাদীসে আছে- যে ব্যক্তি উদর, লজ্জাস্থান ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকে, সে সকল অনিষ্ট থেকেই নিরাপদ থাকে। কেননা, অধিকাংশ লোক এ তিনটি খাহেশ দ্বারাই বিপন্ন হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বিষয়ের কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতার কারণে। আবার প্রশ্ন করা হল, কোন বিষয়ের কারণে বেশীর ভাগ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন ঃ

اَلْاَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

-দুটি খালি বস্তুর কারণে- মুখ ও লজ্জাস্থান।

এখানে মুখের অর্থ জিহ্বার বিপদাপদও হতে পারে। কেননা মুখ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিহ্বার পাত্র এবং মুখের অর্থ পেটও হতে পারে। কেননা, পেট ভরার পথ মুখই। হযরত মুয়ায (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি আপন জিহ্বা বের করে তার উপর অঙ্গুলি রাখলেন; অর্থাৎ চুপ থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সায়ীদ ইবনে জোবায়রের রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন সকাল হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তুমি সোজা থাকলে আমরাও সোজা থাকব। আর তুমি বক্র হলে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে আপন জিহ্বা ধরে টানতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে নায়েবে রসূল, আপনি এ কি করছেন? তিনি বললেন ঃ সে আমাকে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দেহের মধ্যে এমন কোন অঙ্গ নেই, যে আল্লাহর কাছে জিহ্বার ক্ষিপ্রতার অভিযোগ করে না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বলতেন ঃ

يَا لِسَانُ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ ـ

—হে জিহ্বা, ভাল কথা বল, গনীমত পাবে এবং অনিষ্ট থেকে অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বে চুপ কর, বিপদমুক্ত থাকবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন? তিনি বললেন ঃ না। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— বনী আদমের অধিকাংশ গোনাহ্ তার জিহ্বার মধ্যে। হযরত ওমর (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন—

مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللّٰهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ ـ

—যে জিহ্বা সংযত রাখে আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন, যে ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করেন; যে আল্লাহর সামনে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন।

হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ ـ

—যে আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে লোকেরা আরয করল ঃ এমন আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। তিনি বললেন ঃ কখনও কথা বলো না। লোকেরা বলল ঃ

এটা তো অসম্ভব। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা ছাড়া মুখ থেকে কিছু বের করো না। হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেন ঃ যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে কথা বলা রূপা হয়, তবে চুপ থাকা স্বর্ণ হবে। এক হাদীসে আছে, মুমিনের জিহ্বা অন্তরের পেছনে থাকে। কথা বলার আগে অন্তরে চিন্তা করে, এর পর কথা বলে। মোনাফেকের জিহ্বা অন্তরের অগ্রে থাকে। সে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যা মনে চায় বলে দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা থেকে বিরত থাকার জন্যে মুখে কংকর রাখতেন। তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলতেন, সে আমাকে অনেক অধঃপতিত করেছে। হযরত তাউস (রঃ) বলেন ঃ আমার জিহ্বা হিংস্র জন্তু। ছেড়ে দিলে আমাকে গিলে ফেলবে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর দরবারে লোকজন কথা বলছিল; কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ) চুপচাপ বসেছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনি কিছুই বলছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ যদি মিথ্যা বলি, আল্লাহর ভয় লাগে, আর যদি সত্য বলি, তবে তোমার ভয় লাগে। এগুলো হচ্ছে চুপ থাকার ফযীলত।

চুপ থাকা যে শ্রেষ্ঠ এর কারণ, কথা বলার মধ্যে শত শত বিপদাশংকা থাকে। ভুল, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, রিয়া, কপটতা, নির্লজ্জতা, কথা কাটাকাটি, আত্মপ্রশংসা, বাড়িয়ে বলা, হ্রাস করা, অপরকে কষ্ট দেয়া, গোপন বিষয় ফাঁস করা ইত্যাদি সব গর্হিত কর্ম জিহ্বার কারণেই হয়ে থাকে। জিহ্বা সঞ্চালন কঠিন মনে হয় না; এর অন্তরে স্বাদ অনুভূত হয়। কথা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি জিহ্বা বশে রাখবে, যেখানে বলা দরকার সেখানেই বলবে এবং যে কথা বলা উচিত নয়, তা থেকে বিরত থাকবে এটা খুবই বিরল। কেননা, কোন্ কথা বলার যোগ্য এবং কোন্‌টি যোগ্য নয়, তা জানা খুবই কঠিন। তাই কথা বলার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া চুপ থাকার আরও কিছু ফায়দা আছে। তা হচ্ছে, এতে সাহস সংহত থাকে, ভয়ভীতি কায়েম থাকে এবং যিকির ও এবাদতের জন্যে অবসর হাতে আসে। চুপ থাকলে কথা বলার বিপদ থেকে দুনিয়াতে মুক্তি অর্জিত হয় এবং পরকালে হিসাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

–মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লেখার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।

চুপ থাকা যে উত্তম, এর যৌক্তিক প্রমাণ হচ্ছে, কথা চার প্রকার। এক, যার মধ্যে ক্ষতিই ক্ষতি নিহিত। দুই, যার মধ্যে উপকারই উপকার নিহিত। তিন, যার মধ্যে ক্ষতি ও উপকার উভয়টি নিহিত। চার, যার মধ্যে ক্ষতিও নেই উপকারও নেই। প্রথম প্রকার কথার ক্ষেত্রে চুপ থাকা জরুরী। তৃতীয় প্রকারে যদি উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়, তবে তাতেও চুপ থাকা জরুরী। চতুর্থ প্রকার কথা বলা অযথা সময় নষ্ট করার নামান্তর। সুতরাং বলার যোগ্য একমাত্র দ্বিতীয় প্রকার কথাই রয়ে গেল। শব্দান্তরে কথার এক চতুর্থাংশ কথা বলাও বিপন্মুক্ত নয়। কেননা এতে কতক গোপন বিপদ যেমন রিয়া, লৌকিকতা, আত্মপ্রীতি, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে যায়। বক্তা টেরও পায় না। তাই কথা বলার মধ্যে সর্বদা বিপদাশংকা লেগেই থাকে। যে ব্যক্তি আমাদের বিশদ বর্ণনা অনুযায়ী কথা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে যাবে, সে নিশ্চিতরূপেই হৃদয়ঙ্গম করবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়' উক্তিটি কতদূর সঠিক। এক্ষণে আমরা কথা সংশ্লিষ্ট বিপদের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু করছি।

অনর্থক কথাবার্তা ঃ যে কথা না বললে কোন গোনাহ্ হয় না এবং জান-মালেরও কোন ক্ষতি হয় না, তাই অনর্থক কথা। মানুষের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে, সে কথা বলার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন তার সবগুলো কথা গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। সে কেবল এমন কথাই মুখে উচ্চারণ করবে, যা শরীয়ত অনুমোদিত এবং যাতে তার নিজের ও কোন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অনাবশ্যক কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায়। এতে একদিকে সময় নষ্ট হয়, অপর দিকে জিহ্বার হিসাব ঘাড়ে চাপে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা, কথা বলার সময় যদি কেউ চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত হয় তবে অদৃশ্য জগত থেকে এমন বিষয়ও প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার উপকার বেশী অথবা তসবীহ্ কিংবা অন্য কোন যিকিরেও মশগুল হওয়া যায়। অবশ্যই বহু কথা এমন আছে, যেগুলোর কারণে জান্নাতে গৃহ নির্মিত হয়। সুতরাং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করার ক্ষমতা যার আছে, সে যদি এর বিনিময়ে ঢিলা সঞ্চয় করে, তবে একে ক্ষতি ছাড়া আর কি বলা হবে ? অতএব আল্লাহর যিকির, যা উৎকৃষ্ট ধনভান্ডার, তা ছেড়ে অনাবশ্যক কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করাও তেমনি ক্ষতির কাজ, যদিও তা উচ্চারণ করা মোবাহ্ তথা অনুমোদিত হয়। ঈমানদারের চুপ থাকা চিন্তাভাবনা, কথা বলা যিকির এবং দেখা শিক্ষা গ্রহণ হয়ে থাকে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ মানুষের পুঁজি হচ্ছে সময়। এ সময় অনাবশ্যক কথায় ব্যয় করলে এবং সওয়াব ও আখেরাতে সম্বল অর্জন না করলে পুঁজি বিনষ্ট হতে বাধ্য। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

–ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে এমন বিষয় বর্জন করা, যা উপকারী নয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে এ বিষয়টি আরও কঠোর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধে জনৈক যুবক শহীদ হলে আমরা দেখলাম, ক্ষুধার কারণে তার পেটে পাথর বাঁধা রয়েছে। তাঁর মাতা মুখ থেকে মাটি মুছে দিয়ে বলল ঃ বৎস! জান্নাত মোবারক হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কিরূপে জানা গেল, সে জান্নাতে যাবে ? সম্ভবতঃ সে অনর্থক কথাবার্তা বলত। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত কা'বকে কয়েকদিন না দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কা'ব কোথায় ? লোকেরা বলল ঃ অসুস্থ। তিনি তাঁকে দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ হে কা'ব। কা'বের মাতা বললেন ঃ তোমাকে বেহিসাব জান্নাত মোবারক হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র উপর আদেশ জারি করে কে এই মহিলা ? কা'ব আরজ করলেন, আমার জননী । তিনি বললেন ঃ তুমি কিরূপে জানলে ? তোমার পুত্র হয় তো কখনও অনর্থক কথাবার্তা বলেছে। এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যার যিম্মায় কোন হিসাব নেই সে-ই বেহিসাব জান্নাতে যেতে পারে। যে অনাবশ্যক কথা বলে, তার যিম্মায় হিসাব থেকে যায়, যদিও সে কথা মোবাহ্ হয়।

অধিক কথা বলা ঃ এতে অনর্থক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও শামিল। উদাহরণতঃ যেখানে প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপেও বলা যায়, সেখানে এক বাক্যের স্থলে দু'বাক্য বললে দ্বিতীয় বাক্য অতিরিক্ত হবে। গোনাহ্ অথবা ক্ষতি না হলেও এটা খারাপ। আতা ইবনে আবী রাবাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অতিরিক্ত কথা খারাপ মনে করতেন। মুতরিফ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অস্থানে তাঁর উল্লেখ করো না। উদাহরণতঃ কুকুর অথবা গাধা দেখে বলো না, আল্লাহ্, একে সরিয়ে দাও।

জানা উচিত, অতিরিক্ত কথার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তবে কোরআন পাকে জরুরী কথার সীমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

–তাদেরকে অনেক পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে খয়রাত করার আদেশ করে অথবা সৎকাজ করতে বলে অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কথা বলে, তার কথা ভিন্ন।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সেই ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যে জিহ্বাকে বাড়তি কথা থেকে সংযত রাখে এবং বাড়তি অর্থ ব্যয় করে দেয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ এ বিষয়টিকে উল্টে দিয়েছে। তারা অতিরিক্ত অর্থ আগলে রাখে এবং জিহ্বাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়। মুতরিফের পিতার বর্ণনা, তিনি আমের গোত্রের লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশংসা করে বলতে থাকে– আপনি আমাদের পিতা, সরদার, শ্রেষ্ঠতম এবং অনুগ্রহদাতা, আপনি এমন, আপনি এমন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

–তোমরা তোমাদের কথা বল, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

এ হাদীস থেকে জানা গেল, যখন কারও সত্য প্রশংসাও করা হয় তখন শয়তান অতিরিক্ত কথা মুখ দিয়ে বের করে দিতে পারে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত কথার ব্যাপারে সতর্ক করছি। কথা ততটুকুই বলা উচিত, যতটুকুতে প্রয়োজন মিটে যায়। হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ মানুষের সব কথা লেখা হয়। কেউ যদি শিশুকে চুপ করানোর জন্যে কোন কিছু দেয়ার কথা বলে এরপর না দেয়, তবে তাকে মিথ্যাবাদী লেখা হয়। হযরত হাসান বলেন ঃ হে মানুষ! আমলনামা খোলা রয়েছে। দু'জন ফেরেশতা তোমার আমল লেখার জন্যে নিয়োজিত আছেন। এখন ইচ্ছা হয় কম কথা বল, ইচ্ছা হয় বেশী কথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বল। বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) জনৈক জ্বিনকে এক জায়গায় প্রেরণ করে কয়েকজন জ্বিনকে এই বলে তার পেছনে লাগিয়ে দিলেন, তার যা অবস্থা দেখ এবং সে যা বলে, তা এসে আমাকে বলবে। তারা ফিরে এসে বলল ঃ সে বাজারে গিয়ে আপন মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করে, এরপর মানুষের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে থাকে। হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই জ্বিনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন করছিলে কেন? জ্বিন আরজ করল, আকাশের ফেরেশতাদেরকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, তারা মানুষের মাথার উপর বসে কত দ্রুত তাদের আমল লিপিবদ্ধ করছে। আর মানুষকে দেখেও অবাক হচ্ছিলাম, তারা কত তাড়াতাড়ি বিপথগামী হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম তায়মী (রঃ) বলেন ঃ মুমিনের কথা বলা চিন্তাভাবনা সহকারে হয়। কিছু ফায়দা দেখলে বলে ঃ নতুবা চুপ থাকে। পক্ষান্তরে পাপাচারীর জিহ্বা দর্জির কাঁচির মত চলে। চিন্তাভাবনা ছাড়াই অনর্গল বকতে থাকে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন ঃ যার কথা বেশী, সে বেশী মিথ্যাবাদী। যার কাছে অর্থসম্পদ বেশী, তার গোনাহ বেশী। চরিত্রহীন ব্যক্তি নিজের জন্যে আযাব টেনে আনে। ওমর ইবনে দীনার বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বললে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার জিহ্বার ওপাশে কয়টি দরজা আছে? লোকটি বলল ঃ দাঁত আছে, আর আছে ঠোঁট। তিনি বললেন ঃ এদের একটিও কি তোমার কথায় বাধা দিল না? ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন ঃ আলেমের জন্যে কথা বলার চেয়ে কথা শুনাও একটি পরীক্ষা। তাই যতক্ষণ অন্য ব্যক্তি কথা বলে, ততক্ষণ চুপ থাকা উচিত। কেননা, কথা শুনার মধ্যে নিরাপত্তা আছে– বলার মধ্যে নেই।

অবৈধ বিষয়াদি বলা ঃ অবৈধ বিষয়াদি বলাও অনর্থক কথাবার্তার মধ্যে দাখিল। পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমোক্ত দু'টি বিষয় ছিল মোবাহ্। যে কথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ছাড়া হারামও, এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ গোনাহের কথাবার্তা বলা, নারীর কথা বলা, শরাবের আসর ও খারাপ লোকের মজলিসের কথা বর্ণনা করা। এগুলো সব তৃতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল এবং নিশ্চিত রূপ নাজায়েয ও হারাম। এ বিপদটির সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে অনর্থক ও অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে। এরপর আস্তে আস্তে তা হারাম আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্যে আলাপ-আলোচনায় বসে, কিন্তু তাতে কারও ইযযতের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়, অথবা উপরোক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়াদি নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে। বেলাল ইবনে হারেস বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বললেন, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির একটি কথা বলে। সে জানে না, এতে কোন বড় সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, কিন্তু একারণে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আপন সন্তুষ্টি লেখে নেন। কখনও মানুষের মুখ দিয়ে অসন্তুষ্টির একটি কথা বের হয়ে পড়ে। সে জানে না, এতে বিরাট অসন্তুষ্টি হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আপন অসন্তুষ্টি লেখে নেন। হযরত আলকামা বলেন ঃ বেলাল ইবনে হারেসের এই হাদীস আমাকে অনেক কথা বলতে বাধা দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ -

–তাদের সাথে বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় না যায়। নতুবা তোমরাও তাদের সমান হয়ে যাবে।

অপরের কথার মধ্যে কথা বলা এবং বিবাদ করা ঃ হাদীস শরীফে কথার মধ্যে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঝগড়া করো না। তাকে এমন ওয়াদা দিয়ো না, যা পালন করবে না। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

لَا يَتَكَمَّلُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ حَقًّا

কথার মধ্যে কথা বলা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন বান্দা ঈমানের স্বরূপ পূর্ণ করে না, যদিও তা সত্য হয়। আরও বলা হয়েছে– যার মধ্যে ছয়টি অভ্যাস থাকে, সে ঈমানের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়– (১) গরমের দিনে রোযা রাখা, (২) খোদাদ্রোহীদেরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা, (৩) বৃষ্টি-বাদলের দিনে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া; (৪) বিপদে সবর করা; (৫) অধিক শীতেও ওযু পূর্ণরূপে করা এবং (৬) সত্যের দিকে থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ না করা। হযরত মালেক ইবনে আনাস বলেন, ঝগড়া বিবাদ ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। তিনি আরও বলেন ঃ ঝগড়া করলে অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং তাতে হিংসা-বিদ্বেষের বীজ পড়ে।

মোট কথা, কথার মধ্যে কথা বলার অনিষ্ট অনেক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে অপরের কথায় আপত্তির ছলে দোষত্রুটি বের করা। এটাই বর্জনীয়। কেউ কোন কথা বললে তা যদি সত্য হয়, তবে মেনে নেয়া উচিত। আর ধর্ম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কিত মিথ্যা না হলে চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। দোষ তালাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসে এই স্বভাব مراء বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'খুসুমত' তথা বিবাদ ঃ এর মধ্যে এবং পূর্ববর্তী مراء-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, অপরকে হেয় ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার মতলবে কারও কথার মধ্যে দোষক্রটি বের করাকে বলা হয় مراء এবং অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে যে বিবাদ করা হয়, তাকে বলে 'খুসুমত'। এটা কখনও আপত্তি ছাড়াই এবং কখনও আপত্তি সহকারে হয়, কিন্তু مراء আপত্তি ছাড়া হয় না। এই খুসুমতও নিন্দনীয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

ان ابغض الرجال الى الله الد الخصم –অধিক বিবাদকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছে অধিক অপছন্দনীয়।

ইবনে কোতায়বা বলেন ঃ একদিন আমি বসা আছি, এমন সময় বশীর ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছ দিয়ে গমন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে বসে আছ কেন? আমি বললাম ঃ আমার মধ্যে ও আমার চাচাত ভাইয়ের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে বিবাদ আছে। তিনি বললেন ঃ আমার উপর তোমার পিতার অনুগ্রহ আছে। আমি এর প্রতিদান তোমাকে দিতে চাই। শুন, বিবাদ করার চেয়ে মন্দ কোন কিছু নেই। এতে ধর্মকর্ম বরবাদ হয়, ভদ্রতা বিনষ্ট হয় এবং জীবনের আনন্দ উধাও হয়ে যায়। অন্তর এতেই জড়িত থাকে। একথা শুনে আমি গৃহে চলে যাওয়ার জন্যে উঠলাম। আমার প্রতিপক্ষ বলল ঃ কোথায় যাও? আমি বললাম ঃ না– আর বিবাদ নয়। সে বলল ঃ বোধ হয় জেনে নিয়েছ যে, আমিই সত্যপথে আছি। বললাম ঃ না, তা নয়, কিন্তু আমি বিবাদ দূরে ঠেলে দিয়ে নিজে মহৎ হতে চাই। সে বলল ঃ যদি তাই হয় তবে আমিও আর কোন দাবী রাখছি না। সে বস্তুটি এখন তুমিই নিয়ে নাও।

এখানে প্রশ্ন হয়, যখন কারও হক কোন জালেম ব্যক্তি আত্মসাৎ করে, তখন তা উদ্ধার করার জন্যে মামলা মোকদ্দমা করা জরুরী হয়। সুতরাং এটা নিন্দনীয় হবে কেন? জওয়াব হচ্ছে, মামলা-মোকদ্দমা সব সময় এক রকমই হয় না। কখনও মিথ্যা হয় এবং কখনও না জেনে না শুনেও হয়; যেমন উকিল সত্য কোন্ পক্ষে তা না জেনেও যুক্তি প্রমাণ পেশ করে। আবার কখনও হকের পরিমাণের চেয়ে বেশী হকের জন্যেও মামলা-মোকদ্দমা করা হয়। মাঝে মাঝে কেবল প্রতিপক্ষকে হেয় ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নির্যাতিত করার উদ্দেশে মোকদ্দমা করা হয়। এছাড়া শত্রুতার ভিত্তিতে সামান্য বিষয়ের জন্যেও এটা করা হয়। এ ধরনের মামলা-মোকদ্দমা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যদি মযলুম ব্যক্তি আপন হক পাওয়ার জন্যে শরীয়ত অনুযায়ী মামলা করে, নীচতা, অপব্যয় ও প্রয়োজনের অধিক হাঙ্গামা না করে এবং শত্রুতা ও নির্যাতনের ইচ্ছা মাঝখানে না থাকে, তবে এরূপ মামলা মোকদ্দমা হারাম নয়, কিন্তু যে পর্যন্ত মোকদ্দমা ছাড়াই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায় সেই পর্যন্ত নালিশ না করাই উত্তম। কেননা, মামলা মোকদ্দমা ও ঝগড়ার মধ্যে জিহ্বাকে সীমার মধ্যে রাখা খুবই কঠিন। ঝগড়ার কারণে বুকের মধ্যে ক্রোধের শিখা উত্থিত হয়। এর কারণে হক-নাহকের বিবেচনা শিকায় উঠে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল হিংসা বিদ্বেষই বাকী থেকে যায়। এমনকি, এক পক্ষের দুঃখে অপর পক্ষ আনন্দিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে ঝগড়া ও মামলা মোকদ্দমা করে, সে উপরোক্ত অনিষ্টসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কমপক্ষে তার মনে উদ্বেগ প্রবল থাকে। এমনকি, কিভাবে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা যায়, নামাযের মধ্যেও এই চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে।

কথার প্রাঞ্জলতার জন্যে লৌকিকতা ঃ অধিকাংশ বক্তার অভ্যাস হচ্ছে, তারা মূল বিষয়বস্তু বর্ণনার পূর্বে ভূমিকা সাজায়। এ ধরনের লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা নিন্দনীয়।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ انا واتقياء امتى براء من التكلف

–আমি এবং আমার উম্মতের পরহেযগার ব্যক্তিগণ লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

شرار امتى الذين غدوا بالنعيم ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب يتشدقون فى الكلام -

–আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা ধন-দৌলতের মধ্যে লালিত পালিত হয়, নানাবিধ খাদ্য ভক্ষণ করে, বৈচিত্র্যময় পোশাক পরিধান করে এবং কথা বলার মধ্যে লৌকিকতা করে।

ওমর ইবনে সা'দ একদিন তাঁর পিতার কাছে কিছু অভাব অনটনের কথা বলতে এসে দীর্ঘ ভূমিকা পেশ করলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, অভাবের কথা বলতে গিয়ে আজ যে দীর্ঘ ভূমিকা তুমি বর্ণনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলে, তা কখনও করনি। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন এক যমানা আসবে যখন মানুষ কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে, যেমন গাভী ঘাস চিবায়। এ থেকে জানা গেল, হযরত সা'দ (রাঃ) অভাব ব্যক্ত করার পূর্বে পুত্রের ভূমিকা বর্ণনাকে দূষণীয় মনে করেছেন। তিনি একে নিছক লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা আখ্যা দিয়েছেন। কথার মধ্যে অভ্যাস বহির্ভূত ছন্দের মিলও এর মধ্যে দাখিল। অতএব কথা এমনভাবে বলতে হবে, যাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। উদ্দেশ্য কেবল অন্যকে বুঝানো । এছাড়া যা কিছু করা হবে, সবই লৌকিকতা। হাঁ, খোতবা ও ওয়াযে উৎকৃষ্ট শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তাই এতে উৎকৃষ্ট ভাষা থাকা ভাল।

অশ্লীল কথন ও গালিগালাজ ঃ এটাও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। আভ্যন্তরীণ নষ্টামি ও বিদ্বেষ থেকেই এর উৎপত্তি। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ایاکم والفحش فان الله لایحب الفحش والتفحیش -

–তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও সীমাতিরিক্ত অনর্থক বকাবকি পছন্দ করেন না।

বদর যুদ্ধে যেসকল মুশরিক নিহত হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকেও গালি দিতে নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা তোমরা যা বল তাতে তাদের তো কিছুই হয় না, কেবল জীবিতদেরই কষ্ট হয়ে থাকে। আর সাবধান, মন্দ বলা নীচতা।

অশ্লীলতার সংজ্ঞা হচ্ছে, লজ্জাজনক বিষয়সমূহ পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা– যেমন লজ্জাস্থানের নাম মুখে উচ্চারণ করা। অধিকাংশ ভাঁড় দিবারাত্র এরূপ শব্দ উচ্চারণ করে ফিরে, কিন্তু সৎ সাধু ব্যক্তিরা এসব শব্দ মুখে আনতে লজ্জাবোধ করে এবং প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে উল্লেখ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু লজ্জাশীল। তিনি গোনাহ মাফ করেন এবং ইশারায় বর্ণনা করেন। দেখ, তিনি সহবাসকে "লমস" তথা স্পর্শ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু এর জন্যে কতক এমন শব্দ মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত আছে, যা না বলাই ভাল এবং প্রায়ই গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর কতক শব্দের মধ্যেও অশ্লীলতা বেশী এবং কতক শব্দের মধ্যে কম। দেশ ও জাতির অভ্যাসভেদে এগুলোর মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। কেবল স্ত্রী সঙ্গমের মধ্যেই অশ্লীলতা সীমিত নয়; বরং প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয়কেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরূপ মনে করা উচিত। উদাহরণতঃ মলত্যাগের জন্য পায়খানা ও প্রস্রাব শব্দ ব্যবহার করলে এটা অন্যান্য শব্দের তুলনায় ভাল। মোট কথা, যেসব শব্দ সাধারণভাবে পছন্দীয় নয় সেগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা অনুচিত। করলে অশ্লীলতার মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নারীদের উল্লেখও ইশারায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণতঃ 'আমার স্ত্রী একথা বলেছে' না বলে 'ঘরে একথা বলা হয়েছে', 'পর্দার আড়াল থেকে বলা হয়েছে', অথবা 'বাচ্চাদের মা একথা বলেছে' বলা উচিত। এমনিভাবে কারও ধবলকুষ্ঠ, কুষ্ঠ, অর্শ ইত্যাদি ঘৃণা উদ্রেককারী রোগ থাকলে এগুলো উল্লেখ করা ঠিক নয়, বরং 'দুরারোগ্য ব্যাধি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবে। আলা ইবনে হারূন বলেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের একবার বগলে ফোঁড়া বের হয়। তিনি জিহ্বার খুব হেফাযত করতেন। তাই আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম, দেখি, এ ব্যাপারে তিনি কি বলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ফোঁড়া কোথায় বের হয়েছে? তিনি বললেন ঃ বাহুর ভিতরের দিকে ।

অশ্লীলতার কারণে অপরকে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে অথবা মন্দ লোকের সংসর্গে এই বদভ্যাস গড়ে উঠে। জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর। তোমার মধ্যে কোন বিষয় দেখে যদি কেউ তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমিও তার বিষয় দেখে তাকে লজ্জা দিয়ো না। অর্থাৎ কেউ মন্দ বললে জওয়াবে তুমি তেমনি মন্দ বলো না। এতে সে শাস্তি ভোগ করবে এবং তুমি সওয়াব পাবে। কোন কিছুকে গালি দেবে না। বেদুঈন বলে, এরপর আমি কখনও গালি দেইনি। আয়ায ইবনে হেমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়। সে মর্তবায় আমার চেয়ে কম। আমিও তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নিলে ক্ষতি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ গালিগালাজকারী উভয়ই শয়তান হয়ে থাকে। তারা একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং অপবাদ আরোপ করে।

এক হাদীসে আছে– سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر

–মুমিনকে গালি দেয়া পাপাচার এবং লড়াই করা কুফর।

এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে– সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ হচ্ছে পিতামাতাকে গালি দেয়া। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ মানুষ পিতামাতাকে কিরূপে গালি দেবে? তিনি বললেন ঃ অন্যের পিতামাতাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গালি দেয় এবং জওয়াবে সে তার পিতামাতাকে গালি দেয়। এভাবে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়ার কারণ সে নিজেই হয়।

অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা ঃ এটা জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও জড় পদার্থ সকলের জন্যে সমান। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন-

لَاتَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَابِغَضَبِهٖ وَلَا بِجَهَنَّمَ

–তোমরা একে অপরকে আল্লাহর লানত, আল্লাহর গযব বা জাহান্নাম দ্বারা অভিসম্পাত করো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন- একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে তার এক গোলামের প্রতি অভিসম্পাত করতে শুনলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আবু বকর, সিদ্দীকও অভিসম্পাত করে? কাবার পালনকর্তার কসম! এ বাক্যটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেদিনই গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন ঃ এখন থেকে আমি কখনও এরূপ ভুল করব না।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اِنَّ اللَّاعِنِيْنَ لَايَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

–অভিসম্পাতকারীরা কেয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হবে না, সাক্ষ্যদাতাও হবে না।'

লানত তথা অভিসম্পাতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। সুতরাং এ শব্দটি তার ক্ষেত্রেই বলা দুরস্ত হবে, যার মধ্যে রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিশেষণ পাওয়া যায়। এরূপ বিশেষণ হচ্ছে কুফর ও জুলুম। অতএব কাফের উপর অথবা জালেমের উপর অভিসম্পাত হোক, একথা বলা জায়েয। মোট কথা, শরীয়তে যেমন বর্ণিত আছে, সেসব শব্দ দ্বারা অভিসম্পাত করা উচিত। কেননা, এতে বিপদও আছে। কারণ এটা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যে, তার অভিশপ্তকে আল্লাহ তাআলা রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না অথবা আল্লাহ আপন রসূলকে বলে দিলে তিনি জানতে পারেন।

জানা উচিত, তিনটি বিশেষণ লানতের দাবী রাখে– কুফর, বেদআত ও পাপাচার। এসব বিশেষণে লানত করার পন্থা তিনটি। প্রথম, ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করা; যেমন 'কাফের, বেদআতী ও ফাসেকদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপর আল্লাহর লানত হোক' বলা; অথবা 'ইহুদী, খৃষ্টান, যিনাকার, জালেম ও সুদখোরের উপর লানত হোক বলা। এই উভয়বিধ পন্থায় লানত করা জায়েয। তবে বেদআতীদের উপর লানত করতে সর্বসাধারণকে নিষেধ করা উচিত। কেননা, কোন্টি বেদআত, তা চেনা কঠিন। হাদীসে এর জন্যে কোন শব্দ বর্ণিত নেই। তৃতীয় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করা। উদাহরণতঃ যায়দ কাফের, ফাসেক অথবা বেদআতী হলেও যায়দের উপর অভিসম্পাত হোক বলা যাবে না, কিন্তু শরীয়তে যার উপর লানত প্রমাণিত আছে, তার উপর লানত হোক বলায় দোষ নেই; যেমন 'ফেরাউন ও আবু জাহলের উপর লানত হোক' বলা, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট জীবিত ব্যক্তি কট্টর কাফের হলেও তার উপর লানত করা ঠিক নয়; সম্ভবতঃ সে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতঃ মুমিন হয়ে যাবে।

ইয়াযীদ হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল অথবা হত্যার অনুমতি দিয়েছিল। তাকে লানত বলা জায়েয কিনা? এ প্রশ্নের জওয়াব হচ্ছে, হত্যা ও হত্যার অনুমতি উভয়টি যথার্থ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। হত্যা ও হত্যার অনুমতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঘাতক বলা যায় না। কেননা, হত্যা কবীরা গোনাহ্। কোন মুসলমানকে বিনা প্রমাণে হত্যাকারী বলা যায় না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ কাউকে কাফের অথবা ফাসেক বলে, বাস্তবে সে এরূপ না হলে যে বলে তার প্রতিই ফিরে আসে। যদি কেউ বলে, "ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীর উপর লানত হোক"– তবে এটা জায়েয কিনা? জওয়াব হল– এর সাথে একথাও বলা উত্তম, যদি সে তওবা না করে মরে থাকে, তবে তার উপর লানত হোক। কেননা, তওবার পর মৃত্যুবরণ করারও সম্ভাবনা আছে। দেখ, ওয়াহশী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ)-কে কাফের অবস্থায় শহীদ করেছিলেন। এরপর মুসলমান হয়ে কুফর ও হত্যা সবকিছু থেকে তওবা করেছিলেন। এখন কেউ তার উপর লানত করতে পারবে না। এখানে ইয়াযীদকে লানত করার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার কারণ, আজকাল মানুষ লানত করার ব্যাপারে তড়িঘড়ি মুখ খোলে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে– মুমিন লানতকারী হয় না। সুতরাং যে কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাকে ছাড়া কাউকে লানত করা ঠিক নয়। যদি একান্তই মনে চায়, তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ না করে ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করবে। লানত করার চেয়ে আল্লাহ্র যিকির করা উত্তম। এটা না হলে চুপ থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা।

গান ও কবিতা আবৃত্তি ঃ গানের মধ্যে কোন্টি হারাম ও কোন্টি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হালাল সেমা অধ্যায়ে আমরা তা লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতা ভালও আছে মন্দও আছে, অবশ্য একেবারে কবিতার মধ্যেই ডুবে যাওয়া নিন্দনীয়। অযথা কথাবার্তা না হলে কবিতা আবৃত্তি করা ও রচনা করা হারাম নয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, কবিতার মধ্যে প্রায়ই প্রশংসা, দুর্নাম রটনা ও নারীদের উল্লেখ থাকে। এতে মিথ্যারও অবকাশ আছে। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) হযরত হাসসান ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-কে কবিতায় কাফেরদের দুর্নাম বর্ণনা করার আদেশ করেছিলেন। কারও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করলে যদিও কিছুটা মিথ্যা হয়, কিন্তু হারাম হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেও এমন কবিতা পাঠ করা হয়েছে, যাতে তালাশ করলে বাড়াবাড়ির বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি কখনও নিষেধ করেননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি সূতা কাটছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুতা সেলাই করছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত এবং ঘর্মবিন্দু আলোর মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের অপরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করছে। আমি দেখামাত্রই এই অলৌকিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার হতবুদ্ধিতা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন বিস্ময়াবিষ্ট হচ্ছ কেন? আমি আরজ করলাম ঃ আপনার ললাটের ঘর্মবিন্দু থেকে সৌন্দর্যের যে তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, তাতেই আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। যদি আবু বকর হুযলী আপনাকে এই মুহূর্তে দেখতে পেত, তবে অবশ্যই জেনে নিত, তার কবিতার মূর্ত প্রতীক আপনিই। তিনি বললেন ঃ তার কবিতা কি ? আমি আরজ করলাম ঃ এ দু'টি পংক্তি –

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

واذا نظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

–সে মুক্ত ঋতুস্রাবের মলিনতা থেকে, দুধমাতার ভ্রষ্টতা থেকে এবং শয়তানের ব্যায়াম থেকে। তুমি যখন তার মুখমণ্ডলের পানে তাকাবে, তখন মনে হবে যেন তা বিদ্যুৎ উজ্জ্বল মেঘমালার ন্যায় ঝলমল করছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন কাজ ছেড়ে আমার ললাটে চুম্বন এঁকে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

جزاك الله خيرا يا عائشة –আয়েশা, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আমার প্রতি সম্ভবতঃ এতটুকু খুশী হওনি, যতটুকু আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হোনায়ন যুদ্ধের পর রসূলে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করলেন এবং আব্বাস ইবনে মেরদাসকে চারটি উট দান করলেন। সে উট নিয়ে চলে গেল এবং তার হক আরও বেশী বলে অভিযোগ করে একটি কবিতা রচনা করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করলেন ঃ তার অভিযোগ মিটিয়ে দাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং এত বেশী দিলেন যে, সে ওযর পেশ করতে শুরু করল এবং বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। কবিতা যখন আমার জিহ্বায় পিঁপড়ার মত দংশন করতে থাকে, তখন কিছু না বলে উপায় থাকে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাসলেন এবং বললেন ঃ যতদিন উট উচ্চ কণ্ঠে চেঁচাবে, ততদিন আরবরা কবিতা বলা ত্যাগ করবে না।

হাসিঠাট্টা ঃ আসলে এটাও খারাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু অল্প হলে দোষ নেই। হাদীসে আছে ঃ لاتمار اخاك ولاتمارخه –আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঠাট্টা করো না। কথার মধ্যে কথা বললে অপরের মনে কষ্ট হয়; তাকে মিথ্যুক ও মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়। হাসিঠাট্টার মধ্যে এটা নেই। তবুও হাসিঠাট্টা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে বাড়াবাড়ির করা। এতে মন সর্বক্ষণ খেলাধুলা ও কৌতুকে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। খেলাধুলা যদিও মোবাহ, কিন্তু সর্বক্ষণ এতে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ। অধিক হাসির কারণে অট্টহাসির পথ খুলে যায়, যদ্দরুন অন্তর মরে যায় এবং অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ভাবমুর্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। হাসি এসব দোষ থেকে মুক্ত হলে নিন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– انى لامازح ولا اقول الاحقا – আমি হাসিঠাট্টা করি, কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। অন্যদের উদ্দেশ্য তো হয়ে থাকে যেভাবেই হোক কেবল অপরকে হাসানো। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে বেশী হাসে, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব হ্রাস পায়। যে আনন্দ গীত গায়, সে মানুষের দৃষ্টিতে পাতলা হয়ে যায়। যে এ কাজ বেশী করে, সে এ নামেই খ্যাত হয়ে যায়। যে বেশী কথা বলে, সে বেশী ভুল করে। যে বেশী ভুল করে তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কম, তার পরহেযগারীও কম। যার পরহেযগারী কম, তার অন্তর মরে যায়। আর একটি কারণ হচ্ছে, হাসির কারণে মানুষ আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا –যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্রন্দন করতে বেশী এবং হাসতে কম। ওহায়ব ইবনে ওয়ারদ কিছু লোককে ঈদুল ফিতরের দিন হাসাহাসি করতে দেখে বললেন ঃ যদি এদের মাগফেরাত হয়ে থাকে, তবে এটা শোকরকারীদের কাজ নয়। আর মাগফেরাত না হয়ে থাকলে এটা ভীতদেরও কাজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোনাহ করে হাসে, সে কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যাবে।

যে হাসি সরবে হয় তাই খারাপ। অর্থাৎ যা মুচকি হাসির চেয়ে বেশী তা নিষিদ্ধ। নীরব হাসি, যাকে আরবীতে 'তাবাস্সুম' বলা হয়, তা ভাল। রসূলে করীম (সাঃ)ও মুচকি হাসতেন।

এক্ষণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাসি ঠাট্টা কিরূপ ছিল, তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। হযরত হাসান (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, এক বৃদ্ধা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে বললেন ঃ কোন বৃদ্ধ জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিল। তিনি বললেন, আরে, কাঁদ কেন? তুমি যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধ থাকবে না, ষোড়শী হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا –আমি তাদেরকে আবার সৃষ্টি করব এবং কুমারী যুবতীতে পরিণত করব। যায়দ ইবনে আসলাম রেওয়ায়াত করেন, উম্মে আয়মন নাম্নী জনৈকা মহিলা রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ তোমার স্বামী কি সেই ব্যক্তি নয়, যার চোখে শুভ্রতা আছে? মহিলা বলল, তার চোখ তো ভাল। তাতে শুভ্রতা নেই। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আছে। মহিলা কসম খেয়ে বলল ঃ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার চোখে শুভ্রতা নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের চক্ষু কোটর সাদা ও কাল হয়ে থাকে। অন্য একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে সওয়ারীর জন্যে একটি উট প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে সওয়ারীর জন্যে একটি উটের বাচ্চা দেব। মহিলা বলল ঃ বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ উট তো উটের বাচ্চাই হয়ে থাকে। যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী যারপরনাই কুশ্রী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন বয়াত করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান ছিল না। বয়াতের পর যাহ্হাক আরজ করলেন ঃ আমার দু'জন স্ত্রী আছে, যারা এই গোরা মহিলা অর্থাৎ হযরত আয়েশা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ)-এর চেয়েও ভাল। আপনি বিবাহ করলে তাদের একজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা সুশ্রী, না তুমি সুশ্রী? সে বলল ঃ আমি তাদের চেয়ে অনেক ভাল। এই সওয়াল জওয়াব শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ভেবে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না যে, এমন সুরত নিয়েও সে নিজেকে সুশ্রী মনে করে নায়ীমান আনসারী একজন হাস্যকারী ব্যক্তি ছিল, কিন্তু খুব মদ্যপান করত। মদ্যপানের পর তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হলে তিনি আপন জুতা দিয়ে তাকে খুব প্রহার করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও আদেশ করতেন, তাঁরাও জুতা মারতেন। অনেকবার এরূপ প্রহৃত হওয়ার পর একদিন জনৈক সাহাবী বললেন ঃ তোমার প্রতি আল্লাহর লানত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীকে বললেন ঃ এরূপ বলো না। এ ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মহব্বত রাখে। এই নায়ীমানের অবস্থা ছিল, মদীনায় কখনও দুধ অথবা অন্য কোন খাদ্যবস্তু এলে সে তা ক্রয় করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করত এবং বলত, হুযুর, এ বস্তুটি আমি আপনার জন্যেই ক্রয় করেছি এবং হাদিয়া এনেছি। যখন সেই বস্তুর মালিক দাম চাইতে আসত, তখন তাকেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করে বলত, হুযুর অমুক বস্তুর দামটি দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ তুমি তো আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলে। সে আরজ করত, আমার কাছে দাম ছিল না, কিন্তু মন চাচ্ছিল, আপনি এ বস্তুটি খান। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে দাম দিয়ে দিতেন। অতএব এ ধরনের হাসিঠাট্টা কখনও কখনও করা জায়েয।

উপহাস ও কৌতুক ঃ যদি এর দ্বারা অপরের কষ্ট হয়, তবে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يٰايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ـ

মুমিনগণ! তোমাদের একদল অপর দলের সাথে যেন উপহাস না করে। সম্ভবতঃ তারা তাদের চেয়ে উত্তম হবে। মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের সাথে উপহাস না করে। সম্ভবতঃ তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

উপহাসের অর্থ হচ্ছে অপরের হেয়তা প্রকাশ করা এবং তার দোষত্রুটি হাস্যকর পন্থায় বর্ণনা করা। এটা তার কথা ও কাজের অনুকরণ অথবা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা হতে পারে। অনুপস্থিতিতে হলে এটা গীবত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং উপস্থিতিতে হলে উপহাস, কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তির অনুকরণ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنِّىْ حَاكَيْتُ اِنْسَانًا وَلِىْ كَذَا وَكَذَا

–আল্লাহর কসম. অনেক কিছু পাওয়ার বিনিময়েও আমি পছন্দ করি না যে, কোন মানুষের অনুকরণ করি।

যদি কোন ব্যক্তি উপহাসে খুশী হয়, তবে একে উপহাস না বলে ঠাট্টা বলা হবে, যার বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

গোপন কথা ফাঁস করা ঃ এটাও নিষিদ্ধ। কারণ এতেও কষ্ট হয় এবং বন্ধুত্বের হক বিনষ্ট হয়।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ

–যখন কোন ব্যক্তি কথা বলার পর আড় চোখে তাকায় তখন এটা আমানত হয়ে যায়।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ কোন ভাইয়ের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়াও খেয়ানতের মধ্যে দাখিল।

বর্ণিত আছে, আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ওলীদ ইবনে ওতবাকে কোন গোপন তথ্য বললেন। তিনি আপন পিতা ওতবাকে গিয়ে বললেন ঃ আজ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) একটি গোপন কথা বলেছেন। আমাকে যখন বলেছেন, তখন আপনার কাছে আর গোপন থাকবে কেন? ওতবা বললেন, ব্যাপারটি আমাকে বলো না। কারণ, যতক্ষণ মানুষ গোপন তথ্য গোপন রাখে, ততক্ষণ তার থাকে, কিন্তু বলে দিলে অপরের এখতিয়ারে চলে যায়। ওলীদ বললেন ঃ পিতা পুত্রের মধ্যেও এরূপ হয় নাকি? তিনি বললেন ঃ পিতা পুত্রের মধ্যে হয় না ঠিক, কিন্তু আমি চাই, গোপন তথ্য ফাঁস করার অভ্যাস যেন তোমার না হয়। এরপর ওলীদ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেদমতে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা তোমাকে ভুলের গোলামী থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সারকথা, গোপন তথ্য ফাঁস করা খেয়ানত। এতে কারও ক্ষতি হলে হারাম। ক্ষতি না হলেও নীচতা।

মিথ্যা ওয়াদা ঃ ওয়াদা করার ক্ষেত্রে জিহ্বা অগ্রে থাকে, কিন্তু তা পূর্ণ করা মনের জন্যে অপ্রিয় হয়ে থাকে। ফলে ওয়াদা মিথ্যা কথায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পর্যবসিত হয়। এটা মোনাফেকীর আলামত।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

—মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ওয়াদা করা দানের মধ্যে গণ্য। তিনি আরও বলেন ঃ ওয়াদাও এক প্রকার কর্জ। আল্লাহ্ পাক নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রশংসায় বলেন ঃ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ—সে ছিল ওয়াদায় সাচ্চা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন ঃ জনৈক কোরায়শী ব্যক্তি আমার কাছে আমার কন্যা বিবাহ চেয়েছিল। আমি কিছুটা দোদুল্যমান ওয়াদা করেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর কাছে এক তৃতীয়াংশ মোনাফেকী নিয়ে যাব না। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সে ব্যক্তিকেই কন্যা দান করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হাসান রেওয়ায়াত করেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নবুওয়তের পূর্বে একটি লেনদেন করেছিলাম। তাঁর কিছু প্রাপ্য আমার কাছে বাকী ছিল। আমি আরজ করলাম ঃ এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, কিন্তু আমি সেদিন এবং পরের দিন সম্পূর্ণ ভুলে রইলাম। তৃতীয় দিন এসে তাঁকে সেই জায়গাতেই পেলাম। তিনি বললেন ঃ মিয়া, তুমি বড় বিপদে ফেলে দিলে। এখানে তিন দিন ধরে তোমার অপেক্ষা করছি।

ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ যদি কেউ আসার ওয়াদা করে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে, তবে তার জন্যে কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তিনি বললেন; পরবর্তী নামাযের সময় আসা পর্যন্ত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রত্যেক ওয়াদার সাথে "ইনশাআল্লাহ্" বলতেন। এতে ওয়াদা পূর্ণ করা না হলেও কোন দোষ থাকে না। এর সাথে পাকাপোক্ত ইচ্ছা থাকলে তা পূর্ণ করা উচিত। যদি কেউ ওয়াদা করার সময়ই পাকা ইচ্ছা রাখে যে, পূর্ণ করবে না, তবে এরই নাম 'নেফাক'। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস পাওয়া যাবে, সে পাকা মোনাফেক, যদিও সে নামায রোযা আদায় করে এবং মুসলমান বলে দাবী করতে থাকে। অভ্যাস তিনটি এই ঃ (১) কথা বললে মিথ্যা বলা (২) ওয়াদা করলে তা পূর্ণ না করা এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করা। এটা তারই অবস্থা, যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার নিয়ত রাখে না, অথবা ওযর ছাড়াই ওয়াদার খেলাফ করে, কিন্তু যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার ইচ্ছা রাখে, অতঃপর কোন ওযরের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণে পূর্ণ না করে, সে মোনাফেক হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) আবুল হায়সামকে একটি গোলাম দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এরপর গনীমতের মালে তিনটি গোলাম আসে। দুটি গোলাম বন্টন করে দেয়া হল। একটি রয়ে গেল। আদরের দুহিতা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে বললেন ঃ দেখুন, যাঁতাকল চালাতে চালাতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। এ গোলামটি আমাকে দান করুন, কিন্তু আবুল হায়সামের সাথে কৃত ওয়াদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে পড়ে গেল। তিনি কন্যাকে বললেন ঃ তোমাকে গোলাম দিয়ে দিলে আমার ওয়াদা বিপন্ন হবে। এরপর তিনি গোলামটি আবুল হায়সামকেই দান করেন।

মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া ঃ এটা জঘন্য অপরাধ ও মহাপাপ। ইসমাঈল ইবনে ওয়াসেতা বলেন ঃ রসূলল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খোতবায় এ কথা বলতে শুনলাম— আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, হিজরতের প্রথম বছরে রসূলে আকরাম (সাঃ) এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন -এতটুকু বলেই হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। এরপর কান্না থামিয়ে এই হাদীস বর্ণনা করলেন—

إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ .

—তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের সঙ্গী, তাদের উভয়ের স্থান জাহান্নাম। তোমরা সততা আঁকড়ে থাক। সততা পুণ্য কাজের সঙ্গী। তারা উভয়েই জান্নাতে স্থান পাবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ব্যবসায়ীরা পাপাচারী হয়ে থাকে। সাহারায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ হুযুর, আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব ব্যবসায়ীদের পাপাচারী হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ কারণ, তারা কসম খেয়ে খেয়ে গোহাহগার হয় এবং কিছু বললে মিথ্যা বলে। তিনি আরও বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন না। প্রথম, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়, যে মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। তৃতীয়, যে গিঁটের নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিধান করে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের কাছে মিথ্যার চেয়ে অধিক কোন বদভ্যাস অপ্রিয় ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাহাবীর মিথ্যা জেনে নিতেন, তখন সে ব্যক্তির নতুনভাবে আল্লাহর সামনে তওবা না করা পর্যন্ত তিনি তার প্রতি মন থেকে মলিনতা দূর করতে পারতেন না। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরজ করলেন ঃ তোমার বান্দাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে ভাল? এরশাদ হল ঃ যার জিহ্বা মিথ্যা বলে না, অন্তর পাপাচারে লিপ্ত হয় না এবং লজ্জাস্থান যিনা করে না। হযরত লোকমান আপন পুত্রকে বললেন ঃ মিথ্যা বলো না, যদিও তা পাখীর মাংসের মত সুস্বাদু মনে হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম মনে হয় যার নাম উত্তম। যখন সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তখন সে ব্যক্তি ভাল মনে হয়, যার অভ্যাস ভাল। লেনদেন করার পর সে ব্যক্তি ভাল মনে হয়, যে কথায় সাচ্চা এবং ওয়াদায় পাক্কা। খালেদ ইবনে সবীহ্কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ একবার মিথ্যা বললেও কি কাউকে মিথ্যাবাদী বলা হবে? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই।

যে যে স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয ঃ প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা সত্তাগতভাবে হারাম নয়; বরং এদিক দিয়ে হারাম যে, এর দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধিত হয়। এ ক্ষতির সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আসল সত্য সম্পর্কে মূর্খ থাকা। সুতরাং যদি কোথাও আসল সত্য সম্পর্কে মূর্খ থাকার মধ্যে উপকারিতা থাকে, তবে মিথ্যা বলার অনুমতি হওয়া উচিত; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব হওয়া দরকার। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ মিথ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি পলায়ন করে তোমার মাধ্যমে এক গৃহে আত্মগোপন করে এবং অন্য এক ব্যক্তি তরবারি নিয়ে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্যে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তবে এ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

সারকথা, যেখানে একটি উৎকৃষ্ট লক্ষ্য মিথ্যা ও সত্য উভয়টি দ্বারা অর্জিত হতে পারে, সেখানে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি কেবল মিথ্যা দ্বারাই সেই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, তবে লক্ষ্য বৈধ হলে মিথ্যা বলাও বৈধ এবং লক্ষ্য ওয়াজিব হলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব; যেমন বর্ণিত উদাহরণ দ্বারা বুঝা যায়। যেখানে পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন মিথ্যা ছাড়া সম্ভবপর হয় না, সেখানে মিথ্যা বলা বৈধ; কিন্তু যথাসম্ভব বৈধ মিথ্যা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস হয়ে গেলে অনাবশ্যক মিথ্যাও মুখে উচ্চারিত হওয়ার অথবা প্রয়োজনের বেশী মিথ্যা বলে ফেলার আশংকা থাকে। এ থেকে জানা গেল, মিথ্যা আসলে হারাম,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিন্তু প্রয়োজনে জায়েয হতে পারে। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি কখনও শুনিনি যে, রসূলে করীম (সাঃ) তিনটি জায়গা ছাড়া কোথাও মিথ্যার অনুমতি দিয়েছেন। (১) দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর করার ক্ষেত্রে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمَّى خَيْرًا

–যে দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে ভাল কথা বলে এবং ভাল বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদী নয়।

হযরত আবু কাহেল বর্ণনা করেন ঃ দু'জন সাহাবীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। অবশেষে তারা খুন খারাবী করতে প্রস্তত হয়ে গেল। আমার সাথে তাদের একজনের দেখা হলে আমি তাকে বললাম ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে লড়তে চাও কেন? সে-তো তোমার প্রশংসা করছিল। এরপর অপরজনের সাথেও সাক্ষাৎ করে এ কথাই বললাম। অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। এরপর আমি ভাবতে লাগলাম, তাদের মধ্যে সন্ধি তো হয়ে গেছে, কিন্তু মিথ্যা বলার কারণে আমার কি দশা হবে? তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু কাহেল! পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা দরকার, যদিও মিথ্যা বলেই হয়। আতা ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আমার স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলব? তিনি বললেন ঃ মিথ্যার মধ্যে কল্যাণ নেই। সে আরজ করল ঃ আমি তার সাথে ওয়াদা করব? তিনি বললেন ঃ এতে দোষ নেই।

মিথ্যা বলার ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটি স্থানের ব্যতিক্রম হাদীস দ্বারা জানা গেল। যদি আরও কোন স্থান এমন হয়, যেখানে বিশুদ্ধ লক্ষ্য সামনে রেখে মিথ্যা বলা হয়, তবে সেই স্থানও এতে দাখিল হবে। উদাহরণ ঃ কোন ডাকাত ও জালেম যদি কাউকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করে ঃ বল, তোর ধনসম্পদ কোথায়? তবে ধন-সম্পদ নেই বলা তার জন্যে জায়েয।

ইঙ্গিতেও মিথ্যা বলা ঠিক নয় ঃ পূর্ববর্তীদের উক্তি হচ্ছে, ইঙ্গিতে মিথ্যা বললে তা মিথ্যা হয় না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ ইঙ্গিতে কিছু মিথ্যা বলে তবে সে মিথ্যা থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য, যখন কেউ মিথ্যা কথা বলার জন্যে বাধ্য হয়, তখন যেন ইঙ্গিতে বলে দেয়। নতুবা বিনা বাধ্যবাধকতায় মিথ্যা বলা প্রকাশ্যেও জায়েয নয়–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইঙ্গিতেও নয়। ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা হচ্ছে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, যার এক অর্থ বক্তার উদ্দেশ্য হয় এবং অন্য অর্থ শ্রোতা বুঝে। উদাহরণতঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক জায়গার গভর্নর ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর পত্নী তাঁকে বলল ঃ অন্য গভর্নররা যেমন গৃহে এলে কিছু নিয়ে আসে, তুমিও কিছু এনেছ কি না? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ না। কারণ আমার সাথে একজন গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। এ কথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলা, কিন্তু তাঁর পত্নী বুঝলেন, সম্ভবতঃ হযরত ওমর তাঁর পেছনে কোন গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন। তাই বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ্! তুমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলে। আর হযরত ওমর (রাঃ) কি না তোমার পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। মহিলাদের মধ্যে এ বিষয়টির খুব চর্চা হল। অবশেষে হযরত ওমরের কাছেও অভিযোগ পৌঁছল। তিনি হযরত মুয়াযকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কবে তোমার পেছনে গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলাম? তিনি বললেন ঃ আমি একথা তো বলিনি যে, আপনি গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। আমি কেবল বলেছিলাম, আমার সাথে গুপ্তচর ছিল। পত্নীর আবদারের সামনে এছাড়া আমার কোন ওযর ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) হাসলেন এবং তাকে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বললেন ঃ নাও, এ দিয়ে পত্নীকে খুশী কর গে।

মোটকথা, প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা যায়। বিনা প্রয়োজনে এটা করা উচিত নয়। কেননা, এটা একটা কৌশল। এতে প্রতিপক্ষ বাস্তবের বিপরীত বুঝে। সুতরাং মাকরূহ। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওতবা বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের খেদমতে গেলাম। তখন আমার পরনে ছিল উৎকৃষ্ট দামী পোশাক। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন আমার উৎকৃষ্ট পোশাক দেখে লোকেরা বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন তোমাকে এই পোশাক দিয়েছেন? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। এতে আমার পিতা আমাকে শাসিয়ে বললেন ঃ খবরদার, মিথ্যা কথা বলো না। আবদুল্লাহর এ বাক্যটি মিথ্যা ছিল না, কিন্তু সাধারণত শাসনকর্তার জন্যে ওয়াদা কোন পুরস্কারের বিনিময়ে হয়ে থাকে বিধায় লোকেরা এ থেকে এটাই বুঝে থাকবে যে, খলীফা দান করেছেন। এতে যেন একটি মিথ্যা ভিত্তিহীন কথার উপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাই তিনি এ দোয়া করতে নিষেধ করলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর একটি মিথ্যা আছে, যদ্দ্বারা কেউ ফাসেক হয় না। তা হচ্ছে, অভ্যাসগতভাবে অতিরঞ্জিত বলা; যেমন কেউ বলে, তোমাকে এটা করতে একশ' বার নিষেধ করেছি। এতে সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না; বরং অতিরঞ্জন সহকারে আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য, কিন্তু যে জিহ্বা অতিরঞ্জিত কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে মিথ্যার আশংকা থেকে মুক্ত হয় না।

আর একটি মিথ্যার অভ্যাস মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে, যখন কাউকে বলা হয়– এস, খানা খাও। তখন সে জওয়াব দেয়, আমার ক্ষুধা নেই। কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য এর সাথে জড়িত না থাকলে এটাও মিথ্যা ও হারাম। আসমা বিনতে ওমায়েস বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) বাসর রাত্রিতে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং আমিই তাকে সাজিয়ে ছিলাম। আমার সাথে আরও কয়েকজন মহিলা ছিল। আমরা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুযুরের কাছে নিয়ে গেলাম তখন তার গৃহে এক পেয়ালা দুধ ছাড়া কিছুই ছিল না। তা থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন এবং বাকীটুকু হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিলেন। লজ্জায় তিনি হাত বাড়ালেন না। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত সরিয়ে দিয়ো না, নিয়ে নাও। তিনি লজ্জাভরেই তা নিলেন এবং পান করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সঙ্গিনীদেরকে দিয়ে দাও। মহিলারা আরজ করল ঃ আমাদের ক্ষুধা নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ পেটে ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করো না। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি কোন বস্তু আমাদের মনে চায় এবং আমরা বলে দেই, ক্ষুধা নেই, তবে এটাও কি মিথ্যার মধ্যে দাখিল? তিনি বললেন ঃ মিথ্যা মিথ্যাই লেখা হয়। অল্প হলে অল্পই লেখা হয়।

গীবত

গীবতের নিন্দা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন, যারা গীবত করে তারা যেন মৃতের গোশত ভক্ষণ করে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

–তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তা অপছন্দ কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

—মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও ইযযত সবটুকুই মুসলমানের উপর হারাম।

ইযযত কথাটির মধ্যে গীবতও এসে গেছে। ধনসম্পদ ও রক্তের সাথে একেও একত্রিত করা হয়েছে। হযরত জাবের ও আবু সায়ীদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

—তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত যিনার চেয়েও জঘন্যতম।

এর কারণ, যিনা করে মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে নেন, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ যার গীবত করা হয় সে ক্ষমা না করে। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মেরাজ রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছেও গমন করেছি, যারা আপন মুখমণ্ডল নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা মানুষের গীবত করত এবং তাদের ইযযত নিয়ে কথাবার্তা বলত। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন— যে ব্যক্তি গীবত থেকে তওবা করে মরবে, সে সকলের পেছনে জান্নাতে যাবে। আর যে তওবা না করে মরবে, সে সকলের অগ্রে দোযখে যাবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন নবী করীম (সাঃ) রোযা রাখার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ যে পর্যন্ত আমি অনুমতি না দেই কেউ ইফতার করবে না। সাহাবায়ে কেরাম রোযা রাখলেন। যখন সন্ধ্যা হল তখন এক একজন এসে ইফতারের অনুমতি নিতে লাগল। এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলাও রোযা রেখেছিল। আপনি অনুমতি দিলে তারাও ইফতার করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় আরয করল। তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় বার আরজ করার পর তিনি বললেন ঃ তারা রোযা রাখেনি। যারা সারাদিন মানুষের মাংস ভক্ষণ করে, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি যেয়ে তাদেরকে বল ঃ তোমরা রোযা রেখে থাকলে বমি কর, সে মহিলাদ্বয়কে এ নির্দেশ শুনিয়ে দিল। তারা বমি করলে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে জমাট রক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নির্গত হল। লোকটি এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, যদি এ জমাট মাংসপিণ্ড তাদের পেটে থেকে যেত তবে তাদেরকে দোযখ খেয়ে নিত।

গীবতের সংজ্ঞা ঃ গীবত বলা হয় অপরের এমন আলোচনা করা– যা সে শুনলে খারাপ মনে করে। এ আলোচনা অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি অথবা কথা, কর্ম, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ, সওয়ারীর দোষ সম্পর্কিত হলেও গীবত।

কেউ কেউ বলেন ঃ কারও দ্বীনদারী সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা, এতে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়কে মন্দ বলেছেন, তার নিন্দা করা হয়। দেখ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে যখন জনৈকা মহিলার আলোচনা করা হয় যে, সে অনেক নামায রোযা করে, কিন্তু সাথে সাথে প্রতিবেশীদেরকে জিহ্বা দ্বারা জ্বালাতন করে, তখন তিনি বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। অতএব এ ধরনের সমালোচনা নিষিদ্ধ হলে তিনি অবশ্যই নিষেধ করে দিতেন যে, এরূপ আলোচনা করো না, কিন্তু আমরা বলি, এ উক্তি ও তার দলীল ঠিক নয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম যে আলোচনা করতেন, তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য কাউকে অপমানিত কিংবা নিন্দা করা ছিল না; বরং মাসআলার সত্যাসত্য জেনে নেয়া লক্ষ্য ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া এসব বিষয়ও যে অন্য স্থানে গীবতের মধ্যে দাখিল, এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গীবতের সংজ্ঞা এরূপই বর্ণনা করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ তোমরা জান গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ –তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়, তা যদি তার মধ্যে থাকে? তিনি বললেন ঃ সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। না থাকলে তা আরও বড় অন্যায়; অর্থাৎ অপবাদ হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈকা মহিলা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে বেঁটে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তুমি তার গীবত করেছ।

জানা উচিত, গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যে পন্থায় কেউ অপরের দোষ জেনে নিতে পারে, তা-ই গীবতের মধ্যে দাখিল হবে– ইঙ্গিতে অথবা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের মাধ্যমে হোক। হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একবার এক মহিলা আগমন করল। সে যখন চলে গেল, তখন আমি হাতে ইশারা করে প্রকাশ করলাম, সে বেঁটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি তার গীবত করেছ। যদি কেউ খোঁড়া ব্যক্তির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করে, তবে এটাও গীবত; বরং গীবতের চেয়েও বেশী। কেননা, এতে আসল আকারের চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়। যদি কোন লেখক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু লেখে কিংবা তার বাক্য পুস্তকে উদ্ধৃত করে, তবে এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন কারণ অথবা ওযর লেখে দিলে গীবত হবে না। নাম নির্দিষ্ট না করে যদি "কিছু লোকে বলে" লেখা হয়, তবে গীবত হবে না। যদি বলা হয়, "যার সাথে আজ দেখা হয়েছিল" অথবা "যে আমার কাছে এসেছিল" তবে গীবত হবে। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি এতেই লোকটিকে চিনে নেবে, কিন্তু নির্দিষ্ট হয় না, এমনভাবে বললে তাতে গীবত হবে না। যেমন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন ব্যক্তির কাজ খারাপ মনে করতেন, তখন এভাবে বলতেন ঃ মানুষের কি হল, তারা এমন এমন কাজ করে?

গীবত শুনার পর বিস্ময় প্রকাশ করাও গীবত। কেননা, বিস্ময় প্রকাশ করলে গীবতকারী আনন্দিত হয় এবং আরও বেশী বলতে উদ্যত হয়। বরং চুপচাপ শ্রবণ করাও গীবতের মধ্যে দাখিল।

হাদীসে আছে ঃ اَلْمُسْتَمِعُ اَحَدُ الْمُغْتَابِيْنَ

–শ্রোতাও গীবতকারীদের একজন।

শ্রোতার উচিত মুখে গীবত করতে নিষেধ করা। এতে সক্ষম না হলে অন্তরে খারাপ মনে করা। নিষেধ করা সম্পর্কে হাদীসে আছে-

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ اَذَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ ـ

–যার নিকটে কোন মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে সাহায্য না করে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

হযরত আবু যরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন-

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَذُبَّهُ عَنْ عِرْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

–যে তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইযযতের উপর হামলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতিহত করে, কেয়ামতের দিন তার ইযযত রক্ষা করা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে।

গীবতের কারণ ঃ গীবতের কারণ মোটামুটি এগারটি। তন্মধ্যে আটটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং তিনটি ধর্মপরায়ণ লোকদের মধ্যে বিদ্যমান। আটটির মধ্যে–

প্রথমতঃ, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্যে অপরের গীবত করা হয়। এর কারণে কখনও বাহ্যতঃ মন্দ বলা হয় না, কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ থেকে যায়; ফলে ভবিষ্যতে সদাসর্বদা মন্দ বলার ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ অপরের দেখাদেখি এবং তার হাঁ-র সাথে হাঁ মেলানোর জন্যে গীবত করা হয়। উদাহরণতঃ আপন সঙ্গী কারও সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করলে মনে করা হয়, তার মত না বললে সে নারাজ হয়ে যাবে কিংবা সঙ্গ ত্যাগ করবে। তখন তার কথার মত কথা বলা হয় এবং একে উত্তম সামাজিকতা ও মিশুকতা গণ্য করা হয়।

তৃতীয়তঃ পূর্ব সতর্কতার কারণে গীবত করা হয়। অর্থাৎ যখন কেউ বুঝতে পারে, অমুক ব্যক্তি কোন বড়লোকের সামনে তার দোষ বর্ণনা করবে কিংবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন পূর্ব থেকেই সে তার দোষ বর্ণনা করতে শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা শ্রবণযোগ্য না হয়।

চতুর্থতঃ কোন দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার লক্ষ্যে গীবত করা হয়। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়, সেও তো এরূপই করেছে কিংবা এ কাজে সে আমার সহযোগী ছিল।

পঞ্চমতঃ গর্ব ও আস্ফালনের ইচ্ছায় গীবত করা হয়, যাতে অপরকে হেয় বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়; যেমন কারও সম্পর্কে বলা, সে তো মূর্খ, কিছুই বুঝে না। এর উদ্দেশ্য থাকে, তার তুলনায় আমি বেশী জানি।

ষষ্ঠতঃ হিংসার কারণে গীবত করা হয়; অর্থাৎ যখন কাউকে দেখে, মানুষ তার প্রশংসা ও সম্মান করে, তখন হিংসার অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং অন্য কিছু করার ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ প্রকাশ করতে শুরু করে, যাতে মানুষ তার সম্মান ও প্রশংসা থেকে বিরত থাকে।

সপ্তমতঃ ক্রীড়া কৌতুকের বশবর্তী হয়ে গীবত করা হয়। এতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপরের দোষ বর্ণনা করে নিজে হাসা, অপরকে হাসানো এবং সময় ক্ষেপণ করা লক্ষ্য থাকে।

অষ্টমতঃ অপরকে ঘৃণার পাত্র করার লক্ষ্যে গীবত করা। এটা সামনে এবং পশ্চাতে উভয়ভাবে হয়।

যে তিনটি বিষয় বিশেষ দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে গীবতের হয়, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বাহ্যতঃ কল্যাণমূলক কথা, কিন্তু শয়তান তাতে অনিষ্টও মিশ্রিত করে দেয়।

প্রথম, কারও দ্বীনদারীর ত্রুটি অবগত হয়ে বিস্মিত হওয়া এবং এরূপ বলা যে, অমুকের ব্যাপার আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। যদিও ধার্মিক ব্যক্তির ত্রুটি বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু অপর ব্যক্তির উচিত ছিল তার নাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করা। এখানে নাম বলাটা শয়তানের কাজ।

দ্বিতীয়, কারও ত্রুটি দেখে দয়াপরবশ হওয়া এবং দুঃখ করা। উদাহরণতঃ কাউকে দূষণীয় কাজে লিপ্ত দেখে দয়ার ছলে বলা– তার অবস্থার প্রতি আমার খুব দুঃখ হয়। এখানে দুঃখের দাবী করা তার জন্যে শুদ্ধ হলেও তার নাম উচ্চারণ করার কারণে গীবতের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে।

তৃতীয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা; অর্থাৎ কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখার পর ধর্মের কারণেই ক্রোধ দেখা দেয়। এতে তার নাম উচ্চারণ করে ক্রোধ প্রকাশ করলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে "সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ" নীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং অন্যকে জানতে না দেয়া। এ তিনটি কারণ এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়; এমনকি, আলেমদের পক্ষেও সুকঠিন।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায় ঃ সচ্চরিত্রতার চিকিৎসা এলেম ও আমলের ওষুধ দ্বারা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক রোগের ওষুধ তার কারণের খেলাফ হয়; অর্থাৎ কারণ শৈত্য হলে চিকিৎসা উত্তাপ দ্বারা হবে। উপরে গীবতের কারণ সমূহ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখন জানা উচিত, গীবত থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখার উপায় দু'টি– একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত উপায় হচ্ছে, মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে নেবে যে, সে গীবতের কারণে আল্লাহর গযবে পতিত হবে; যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও মহাজন উক্তিসমূহ থেকে জানা যায়। আরও বিশ্বাস করবে, কেয়ামতের দিন গীবতকারীর কাছে পুণ্য না থাকলে বদলাস্বরূপ অপর ব্যক্তির গোনাহ তার আমলনামায় লেখে দেয়া হবে। ফলে সে দোযখীই হবে। এক রেওয়ায়াতে আছে– কেউ হযরত হাসান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি শুনেছি, আপনি নাকি আমার গীবত করেন? তিনি বললেন ঃ আমার দৃষ্টিতে তোমার এত মূল্য নেই যে, নিজের পুণ্যসমূহ তোমাকে সমর্পন করব। মোট কথা, মানুষ যখন গীবত সম্পর্কিত হাদীসগুলো বিশ্বাস করে নেবে, তখন ভয়ে গীবত করার জন্যে মুখ খুলবে না।

আর একটি তদবীর হচ্ছে, যখন গীবত করার খেয়াল হয়, তখন মনে মনে ভাববে, নিজের মধ্যেও কোন দোষ আছে কি না? যদি কোন দোষ পায়, তবে তা দূর করার চেষ্টায় মশগুল হয়ে যাবে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি স্মরণ করবে طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهٗ عَيْبُهٗ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ। –সে ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যার নিজের দোষ তাকে অপরের দোষ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যখন নিজের মধ্যে দোষ থাকে, তখন নিজের দোষকে খারাপ না বলে অপরের দোষকে খারাপ বলতে তার লজ্জা করা উচিত। কারও ইচ্ছাধীন দোষের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। নতুবা কোন সৃষ্টিগত আঙ্গিক ক্রুটির কারণে কাউকে মন্দ বলা স্রষ্টাকে মন্দ বলারই নামান্তর।

আর একটি পন্থা হচ্ছে, একথা চিন্তা করা যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার গীবত করে, তবে আমার কাছে তা কতটুকু খারাপ মনে হবে। সুতরাং আমি যদি অন্যের গীবত করি, তবে তার কাছেও ব্যাপারটি তেমনি দুঃখজনক হবে। অতএব নিজের গীবত অন্যে করলে যেমন তাকে পছন্দ করা হয় না, তেমনি অপরের গীবত করাও অপছন্দ করা দরকার।

বিস্তারিত উপায় হচ্ছে, যে কারণে গীবত করা হয়, সে কারণই দূর করতে হবে। কেননা, কারণ দূর হয়ে গেলেই ব্যাধি দূর হয়ে যায়। অতএব গীবতের কারণ যদি ক্রোধ হয়, তবে তা থেকে বাঁচার জন্যে মনে মনে এরূপ চিন্তা করবে– যদি আমি তার উপর রাগ ঝাড়ি, তবে আল্লাহ তাআলা গীবতের কারণে আমার উপর রাগ ঝাড়বেন। কেননা, তিনি গীবত না করার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার আদেশ অমান্য করেছি। কোন এক নবীর সহীফায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, যখন তোমার ক্রোধ হয়, তখন আমাকে স্মরণ কর। আমি আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গীবতের কারণ যদি দেখাদেখি ও বন্ধুদের মন রক্ষা করা হয়, তবে জানা উচিত, যে বিষয়ে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট হয়, তবে লাভ কি? বান্দা অপরের কারণে আপন প্রভুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবে, এটা কিরূপে সম্ভব? এরূপ করলে তার মত নির্বোধ ও নিমকহারাম কেউ হবে না।

গীবতের কারণ যদি নিজেকে পবিত্র ও নির্দোষ করা হয়, তবে চিন্তা করবে, মানুষের অসন্তুষ্টির তুলনায় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি অনেক বেশী কঠোর। গীবতের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তো নিশ্চিত, কিন্তু গীবতের পর মানুষ তাকে নির্দোষ মনে করবে কি না, তা অনিশ্চিত। অতএব আমি হারাম খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে; অমুক ব্যক্তিও তো হারাম খায়– এ কথা বলার কোন ফায়দা নেই। কেননা, সে ব্যক্তির অনুসরণই উপকারী হয়, যে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাজ করে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করে, তার অনুসরণ কখনও করা উচিত নয়- সে যে কেউ হোক না কেন। মনে কর, কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত আগুনে ঝাঁপ দেয়। তোমার এ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা থাকলেও কি তুমি তাতে ঝাঁপ দেবে? যদি দাও, তবে নির্বোধ কথিত হবে। চিন্তার বিষয়, নিজের ওজর বর্ণনা করার জন্যে যে ব্যক্তি অপরের নাম নেয়, সে দ্বিগুণ গোনাহ করে– একটি গীবত, অপরটি তার ওযর। কেননা, কথায় বলে عذرِ گناه بدتراز گناه –গোনাহের ওযর আরও বড় গোনাহ।

গীবতের কারণ যদি অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা হয়, তবে চিন্তা করবে, গীবতের কারণে আল্লাহর কাছে যে মর্তবা ছিল, তা তো বিনষ্ট হল। এখন মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়া একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। বরং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়াও সম্ভবপর। কারণ, তারা দেখবে, সে অপরের দোষ বের করার কাজে লিপ্ত থাকে।

গীবতের কারণ যদি হিংসা হয়, তবে ভাবতে হবে, এর ফলে দুটি আযাব নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে– এক, দুনিয়াতে হিংসার অনলে দগ্ধ হওয়া এবং দুই, আখেরাতে গীবতের আযাবও ঘাড়ে চাপানো হবে।

আন্তরিক গীবতও হারাম ঃ প্রকাশ থাকে যে, মুখে খারাপ বলা যেমন হারাম, তেমনি অন্তরে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। কুধারণার অর্থ হচ্ছে অন্তরে ইচ্ছাপূর্বক অপরকে মন্দ মনে করে নেয়া। যদি মনের সংলাপস্বরূপ কাউকে মন্দ মনে করা হয়, তবে তা মাফ; বরং সন্দেহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করাও মাফ। যা নিষিদ্ধ, তা হচ্ছে ظَنٌّ অর্থাৎ মন্দ বলে ধারণা করার প্রতি মনের ঝুঁকে পড়া।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

—হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্।

কুধারণা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরের রহস্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতএব অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়ার অধিকার বান্দার নেই। হাঁ, যখন কারও মধ্যে কুবস্তু এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, তাতে দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ থাকে না, তখন অবশ্য কুধারণা করা যায়, কিন্তু এর আগে কারও সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা শয়তানের কাজ। তাই একে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। মনে কর, এক ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। এতেই সে মদ খেয়েছে বলা যায় না। হতে পারে সে মদ দিয়ে কুলি করেছে অথবা কেউ জোরেজবরে তার মুখে লাগিয়ে দিয়েছে, সে পান করেনি। এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও আন্তরিক বিশ্বাস করা এবং মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা অনুচিত।

হাদীসে আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَاَنْ يُّظَنَّ بِهٖ ظَنَّ السَّوْءِ

—আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন মুসলমানের রক্ত, তার ধনসম্পদ এবং তার প্রতি কুধারণা পোষণ।

এ থেকে জানা গেল, যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানের ধনসম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়, কুধারণাও সেগুলো দ্বারাই বৈধ হয়। অর্থাৎ যখন চোখে দেখে নেয় অথবা আদেল সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া মনে কুধারণা এলে তা দূর করা উচিত এবং মনকে বুঝানো দরকার, এ ব্যক্তির অবস্থা আজ পর্যন্ত তোর কাছে গোপন রয়েছে। যে কারণে এখন তুই কুধারণা করছিস, এতেও ভাল-মন্দ উভয় প্রকার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অযথা মন্দের দিকে যাওয়া এবং অন্তরে তাই বিশ্বাস করার প্রয়োজন কি? প্রশ্ন হয়, সন্দেহ তো মানুষের মনে ঘোরাফেরা করতেই থাকে এবং অন্তরের সংলাপও চলে। এমতাবস্থায় কোন্‌টি "যন" তথা ধারণা, তা কিরূপে জানব? এর কিছু আলামত বলা দরকার। জওয়াব হচ্ছে, ধারণা শক্তিশালী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হওয়ার আলামত হচ্ছে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্বেকার বিশ্বাস দূর হয়ে যাওয়া, অন্তরে তার প্রতি কিছুটা ঘৃণাভাব উদ্রেক হওয়া, কাছে বসলে অসহনীয় মনে হওয়া, সম্মান ও খাতির হ্রাস পাওয়া এবং সে কোন গোনাহ করলে দুঃখিত না হওয়া। এসব আলামত পাওয়া গেলে বুঝে নেবে, অপরের প্রতি তুমি কুধারণার বশবর্তী হয়েছ। কুধারণা দূর করার উপায়, কোন মুসলমানের প্রতি কুধারণা হলে পূর্বের তুলনায় তার সম্মান ও খাতির বেশী করবে এবং তার জন্যে উত্তম দোয়া করবে। এতে কুধারণা লোপ পাবে।

গীবত জায়েয হওয়ার কারণাদি ঃ জানা উচিত, অপরের নিন্দা করার পেছনে যদি কোন বিশুদ্ধ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য থাকে, তবে সেই গীবতে গোনাহ হয় না– এরূপ উদ্দেশ্য ছয়টি হতে পারে।

প্রথম, জুলুমের বিচারপ্রাপ্তির জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ মজলুম ব্যক্তি যদি উচ্চতম শাসনকর্তাকে বলে যে, অমুক নিম্ন পর্যায়ের শাসক আমার উপর জুলুম করেছে, খেয়ানত করেছে অথবা আমার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে, তবে এটা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা, এটা না করলে বিচার পাওয়া যাবে না, কিন্তু মজলুম ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বললে গীবত হবে। মজলুমের জন্যে জালেমের নিন্দা করা দুরস্ত।

হাদীসে আছে- اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا –হকদারের জন্যে কথা বলার অধিকার আছে।

দ্বিতীয়, মন্দ বিষয় দূর করা অথবা গোনাহগারকে সৎপথে আসার জন্যে গীবত করা; যেমন একবার হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত ওসমান কিংবা তালহার কাছ দিয়ে গমন করেন এবং তাঁকে "আসসালামু আলাইকুম" বলেন, তখন তিনি জওয়াব দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে হযরত আবু বকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি নিজে তাঁদের কাছে গিয়ে মাঝে উভয়ের সন্ধি করে দেন। এ অভিযোগ সাহাবায়ে কেরামের মতে গীবত ছিল না। কেননা, এর উদ্দেশ্য ছিল সন্ধি স্থাপন করা।

তৃতীয়, কোন মাসআলায় শরীয়তের বিধান জানার জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ কেউ মুফতীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার পিতা, ভ্রাতা অথবা পত্নী আমার উপর জুলুম করেছে। এখন শরীয়তের আইনে আমার কি করা উচিত? এক্ষেত্রেও সাবধনতা এটাই যে, ইঙ্গিতে প্রশ্ন করবে; যেমন বলবে– আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন, এক ব্যক্তির উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার কোন আত্মীয় জুলুম করেছে, এখন তার কি করা উচিত। যদি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলে তবুও জায়েয। বর্ণিত আছে, ওতবার কন্যা হিন্দা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ অর্থ সে আমাকে দেয় না। আপনি অনুমতি দিলে আমি এ পরিমাণ অর্থ তার কাছ থেকে গোপনে নিয়ে নেব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ঠিক যে পরিমাণ অর্থ তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ অর্থ তুমি নিতে পার। এখানে হিন্দা তার স্বামীর বিরুদ্ধে কৃপণতা ও জুলুমের আলোচনা করেছে। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে নিষেধ করেননি। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

চতুর্থ, কোন মুসলমানকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ একজন আলেম দ্বীনদার ব্যক্তিকে দেখা গেল, সে জনৈক ফাসেক পাপাচারীর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। এতে আশংকা হল, দ্বীনদার ব্যক্তিও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সেই পাপাচারীর পাপাচার সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিকে বলে দেয়া জায়েয, যাতে সে প্রভাবিত না হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে চাকর রাখতে চায়, কিন্তু তার কোন দোষ সম্পর্কে সে অবগত নয়। তার কোন বন্ধু চাকরের দোষ সম্পর্কে অবগত। এমতাবস্থায় বন্ধুর জন্যে জায়েয, সে চাকরের দোষ মনিব বন্ধুকে বলে দেবে। এতে যদিও চাকরের ক্ষতি, কিন্তু বন্ধুর উপকারের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও যদি কেউ কারও অবস্থা জিজ্ঞেস করে, তবে যেরূপ জানে, সেরূপই বলে দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বলেন ঃ চার ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা গীবত নয়– ১। জালেম শাসক, ২। বেদআতী, ৩। ফাসেক ও ৪। প্রকাশ্য পাপাচারী।

পঞ্চম, যে ব্যক্তি এমন পদবীতে খ্যাত হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন দোষ আছে; যেমন খোঁড়া, অন্ধ, টেকু ইত্যাদি। এসব পদবী বললে গীবত হয় না। হাদীসের রেওয়ায়াতে রাবীদের এরূপ পদবী পাওয়া যায়; যেমন رَوٰى اَبُو الزِّنَادِ এবং عَنِ الْاَعْرَجِ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব পদবীকে খারাপ মনে করে না বিধায় এতে গীবত হয় না।

ষষ্ঠ, যার দোষ প্রকাশ করা হয়, সে প্রকাশ্য পাপাচারী হলে গীবত হয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। অর্থাৎ যে সর্বসমক্ষে পাপাচার করে এবং তার পাপাচার কারও কাছে গোপন নয়; যেমন মদ্যপায়ী, নারীবৎ পুরুষ ইত্যাদি।

হাদীসে আছে- مَنْ اَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ

-যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত গীবত নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খোলাখুলি পাপাচার করে, তার কোন ইযযত-হুরমত নেই; অর্থাৎ তার দোষ প্রকাশ করলে মানহানি ও গীবত হবে না, কিন্তু যে গোপনে করে, তার ইযযতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

গীবতের কাফফারা ঃ গীবতকারীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গীবত থেকে তওবা করা; অর্থাৎ স্বীয় কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, অতঃপর যার গীবত করা হয় তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এতে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির গীবত করা হয়, তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করাই যথেষ্ট। মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রমাণ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি ঃ كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ তুমি যার গীবত করছ, তার কাফফারা হচ্ছে, তুমি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কারও মাংস খাওয়ার কাফফারা এটাই যে, তার প্রশংসা করবে এবং তার জন্যে উত্তম দোয়া করবে। আতা ইবনে আবী রাবাহকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ গীবত থেকে তওবা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ যার গীবত করা হয় তার কাছে গিয়ে বলবে, আমি যা বলেছিলাম তা প্রলাপোক্তি ছিল। আপনার উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি হয়েছে। এখন আমি উপস্থিত। ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিন। নতুবা মাফ করে দিন। এ উক্তিটিই সঠিক। আর যারা বলে, ইযযতের কোন বদলা নেই; এর জন্যে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব নয়, তাদের উক্তি ঠিক নয়। কেননা, ইযযত নষ্ট হয় এমন গালি দিলে তজ্জন্যে শাস্তি দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা অন্য এক মহিলাকে "লম্বা আঁচলওয়ালী" বললে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি তার গীবত করেছ। এখন তার কাছে ক্ষমা চাও। এ থেকে বুঝা গেল, যদি সম্ভবপর হয় ক্ষমা করিয়ে নেয়া দরকার, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ অথবা মৃত হয়, তবে অবশ্য উত্তম দোয়া করবে এবং পুণ্য কাজের সওয়াব বখশে দেবে।

চোগলখোরী ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ -পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়। আরও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেন ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ রূঢ়স্বভাব এবং তদুপরি জারজ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক বলেন ঃ زَنِيم -এর অর্থ হচ্ছে, যে জারজ কথা গোপন করে না। এ আয়াত থেকে তিনি একথাও চয়ন করেছেন যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করে না এবং চোগলখোরী করে, সে জারজ। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ –দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর জন্যে। এই আয়াতে কারও কারও মতে هُمَزَةٌ -এর অর্থ যে চোগলখোরী করে। কোরআনে আবু লাহাবের পত্নীকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (ইন্ধন বহনকারিণী) বলা হয়েছে। কথিত আছে, আবু লাহাবের স্ত্রী চোগলখোরী করত। কাজেই এর অর্থ হল "কথা বহনকারিণী।" কোরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا –অতঃপর তারা উভয়েই তাদের সাথে খেয়ানত করল এবং তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেল না। এ আয়াত হযরত লূত ও হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্নীদ্বয়ের শানে নাযিল হয়েছে। হযরত লূত (আঃ)-এর পত্নী যখনই তাদের গৃহে কোন মেহমান আসত, সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে খবর পৌঁছে দিত। তারা সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে মেহমানদের সাথে অপকর্ম করতে সচেষ্ট হত। হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্নী লোকদের কাছে গিয়ে বলত, নূহ্ উন্মাদ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বাধিক দুষ্ট সম্পর্কে বলব না? সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ আপনি এরশাদ করুন– সর্বাধিক দুষ্ট কে? তিনি বললেন ঃ যে চোগলখোরী করে করে বন্ধুদের সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং স্বচ্ছ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

চোগলখোরীর যে সংজ্ঞা মানুষের মধ্যে প্রচলিত তা হচ্ছে, এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ কথা বলছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে চোগলখোরী এতেই সীমিত নয়; বরং যে বিষয় প্রকাশ করা ভাল নয় তা প্রকাশ করা– যার পক্ষ থেকে বলা হয়, তার কাছে খারাপ লাগুক অথবা যার কাছে বলা হয়, তার কাছে খারাপ লাগুক কিংবা কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে খারাপ মনে হোক। প্রকাশ করাও কথার মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে হোক। মোট কথা, চোগলখোরী হচ্ছে গোপন তথ্য ফাঁস করা এবং অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা। সুতরাং যখন কারও দৃষ্টি মানুষের অবস্থার উপর পড়ে, তখন তার চুপ থাকা উচিত, কিন্তু যে বিষয়ে কোন মুসলমানের উপকার অথবা কারও গোনাহ্ দূর করা প্রয়োজন, তাতে অবশ্য কথা বলা উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদাহরণতঃ যখনই কাউকে কারও ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে দেখা যায়, তখন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া উচিত। এতে ধন-সম্পদের মালিকের প্রতি রেয়াত করা হবে, কিন্তু যদি দেখা যায়, কেউ আপন ধন-সম্পদ গোপন করছে, তখন তা প্রকাশ করে দিলে চোগলখোরী হবে।

মোট কথা, যে ব্যক্তির কাছে উপরোক্ত রূপ চোগলখোরী করা হয়, তার ছয়টি কাজ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে।

প্রথম ঃ তার কথা সত্য মনে করবে না। কেননা, যে চোগলখোরী করে, সে ফাসেক। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ .

—মুমিনগণ, যদি ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে খুব যাচাই করে নাও যাতে মূর্খতাবশতঃ কাউকে বিপদে না ফেলে দাও।

দ্বিতীয় ঃ তাকে চোগলখোরী করতে মানা করবে এবং বলবে, দ্বিতীয় বার আমার কাছে এরূপ কথা বলবে না। কোরআনে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

তৃতীয় ঃ তার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখবে। কারণ, আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা রাখেন। আল্লাহ যার সাথে শত্রুতা রাখেন, তার সাথে শত্রুতা রাখা ওয়াজিব।

চতুর্থ ঃ কেবল তার কথায় অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা অনেক কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক কুধারণা পাপ।

পঞ্চম ঃ তার কথার কারণে তামাশা ও খোঁজাখুঁজি শুরু করবে না। আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوْا খোঁজাখুঁজি করো না।

ষষ্ঠ ঃ চোগলখোরকে চোগলখোরী করতে নিষেধ করে নিজে তাতে লিপ্ত হবে না। উদাহরণতঃ মানুষের কাছে বলবে না যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এমন এমন বলে।

মোট কথা, চোগলখোরী পরিহার করা উচিত। এর অনিষ্ট মারাত্মক হয়ে থাকে এবং কুফল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হাম্মাদ ইবনে সালমা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি গোলাম বিক্রয় করে ক্রেতাকে বলল ঃ এর মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন দোষ নেই, কিন্তু সে চোগলখোর। খরিদ্দার বলল ঃ আমি এই দোষ মেনে নিলাম। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর গোলাম একদিন প্রভুপত্নীকে বলল ঃ আপনার স্বামী আপনাকে চান না। তিনি এখন অন্য একজন মহিলাকে গৃহে আনতে ইচ্ছুক। আমি একটি মন্ত্র জানি। আপনার স্বামী যখন নিদ্রামগ্ন থাকেন তখন ক্ষুর দিয়ে তার বিছানার কিছু অংশ কেটে আনবেন। আমি তাতে মন্ত্র পড়ে দেব। এতে আপনার স্বামী আপনারই হয়ে থাকবে। প্রভুপত্নী গোলামের এ কথা বিশ্বাস করে নিল। সে স্বামীর ঘুমের অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে ধূর্ত গোলাম প্রভুকে গোপনে বলল ঃ আপনার স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের সাথে প্রণয় রাখে এবং সুযোগমত আপনাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছে। যদি পরীক্ষা করতে চান, তবে নিদ্রার বাহানায় বিছানায় শায়িত থেকে লক্ষ্য করুন। প্রভু তার কথায় নিদ্রার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইল। পত্নী অপেক্ষায়ই ছিল। সে ক্ষুর নিয়ে স্বামীর দিকে অগ্রসর হল। যখনই সে শিয়রের দিকে নত হল, স্বামী মনে করল এই বুঝি গলা কাটতে চায়। সে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে পত্নীকে হত্যা করল। তার শ্বশুরালায়ে সংবাদ পৌছলে তারা এসে স্বামীকে হত্যা করল। এর পর এই হত্যাকাণ্ড স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সামান্য একটু চোগলখোরীর কারণে এত বড় অঘটন ঘটে গেল।

দ্বিমুখী কথা ঃ উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পরস্পরে শত্রু এমন দু'ব্যক্তির সাথে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করে প্রত্যেকের সাথে তার পছন্দসই কথা বলে। এটা সাক্ষাৎ মোনাফেকী। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন ঃ

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

–দুনিয়াতে যার দু'রকম চেহারা হবে, কেয়ামতের দিন তার দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে।

অযথা প্রশংসা ঃ এটাও কতক স্থানে নিষিদ্ধ। প্রশংসার মধ্যে ছয়টি বিপদ আছে। তন্মধ্যে চারটি যে প্রশংসা করে তার সাথে এবং দু'টি যার প্রশংসা করা হয় তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। প্রশংসাকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত চারটি বিপদের প্রথম, প্রশংসায় এত বাড়াবাড়ি করে যে, তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে যায়। খালেদ ইবনে মেদান বলেন ঃ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে কারও এমন বিষয়ে প্রশংসা করে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাআলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাকে কেয়ামতের দিন তোতলা করে উত্থিত করবেন।

দ্বিতীয় ঃ প্রশংসার মধ্যে কখনও রিয়ার দখল থাকে। উদাহরণতঃ প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে মহব্বত প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্তরে তার মহব্বত মোটেই থাকে না। ফলে সে রিয়াকার ও মোনাফেক হয়ে যায়।

তৃতীয় ঃ প্রশংসায় কতক গুণ এমন বর্ণনা করা, যেগুলো প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে আছে কিনা সে সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল নয়; যেমন কাউকে মুত্তাকী, পরহেযগার, দরবেশ ইত্যাদি বলে প্রশংসা করা। এ ধরনের গুণাবলী অপ্রকাশ্য এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে অপরের প্রশংসা করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার সাথে সফর করেছ? কখনও ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করেছ? অথবা সে কি তোমার প্রতিবেশী? লোকটি আরজ করল ঃ এসব বিষয়ের মধ্যে কোনটিই নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তার প্রশংসা করো না।

চতুর্থ ঃ প্রশংসিত ব্যক্তি জালেম ও ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও প্রশংসা করে তাকে খুশী করা হয়। এটা নাজায়েয। হাদীসে আছে, যখন ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন। হযরত হাসান বলেন ঃ যে জালেমের দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়া করে, সে যেন কামনা করে, আল্লাহর পৃথিবীতে আরও বেশী জুলুম হোক।

প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বিপদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, প্রশংসার ফলস্বরূপ তার মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়। এগুলো মারাত্মক দোষ। হযরত হাসান বর্ণনা করেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) দোররা নিয়ে বসে ছিলেন এবং সভাসদগণ তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় জারুদ ইবনে মুনযির আগমন করল। এক ব্যক্তি বলল ঃ রবীয়া গোত্রের সরদার। কথাটি সকলেরই শ্রুতিগোচর হল। জারুদ নিকটে এলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে দোররা দিয়ে আস্তে আস্তে প্রহার করলেন। সে আরজ করল ঃ ব্যাপার কি? তিনি বললেন, তুমি শুননি, তোমার সম্পর্কে লোকটি কি বলেছে? জারুদ বলল ঃ শুনেছি তো। তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হল, তুমি এতে আত্মম্ভরী হয়ে যাবে। তাই তোমার অহংকার হ্রাস করার জন্যে আমি এ কাজ করেছি।

দ্বিতীয় ঃ বিপদ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন প্রশংসা দ্বারা জানবে, সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে গেছে, তখন আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে অলসতা করবে। কেননা, উন্নতি সাধনের চেষ্টা সে-ই করে, যে নিজের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে জানে, কিন্তু যখন মানুষের মুখে প্রশংসাই শুনবে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন নিজের সম্পর্কে কামেল হওয়ার ধারণা করে নেবে এবং আমল করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। এ কারণেই এক হাদীসে প্রশংসাকারীকে বলা হয়েছে, তুমি তোমার বন্ধুর গলা কেটে দিয়েছ।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

إِذَا مَدَحْتَ اَخَاكَ فِىْ وَجْهِهِ فَكَاَنَّمَا اَمْرَرْتَ عَلٰى حَلْقِهِ مُوْسٰى رَمِيْضًا ـ

–তুমি তোমার ভাইয়ের প্রশংসা তার মুখের উপর করে তার গলায় যেন ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছ।

হাঁ, প্রশংসা যদি এসব বিপদ থেকে মুক্ত হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই; বরং এরূপ প্রশংসা মোস্তাহাব। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। হযরত আবু বকরের শানে তিনি বলেন ঃ

لَوْ وُزِنَ اِيْمَانُ اَبِىْ بَكْرٍ بِاِيْمَانِ الْعَالَمِ لَرَجَحَ

–যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে তাঁর ঈমানই ভারী হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

لَوْلَمْ اُبْعَثْ لَبُعِثْتَ يَا عُمَرُ

–যদি আমি পয়গম্বর না হতাম তবে তুমি পয়গম্বর হতে। এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে? কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্তশ্চক্ষু দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, এই প্রশংসার কোন কুফল দেখা দেবে না।

আপন প্রশংসা শুনার পর প্রশংসিত ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, জীবনের শেষ মুহূর্তটি খুব নাজুক ও বিপদসংকুল। আমলের উপর কোন ভরসা করা যায় না। রিয়া ইত্যাদি কত প্রকারের বিপদাশংকা রয়ে গেছে। এরপর নিজের দোষ সম্পর্কেও চিন্তা করবে, যা সে নিজে জানে এবং প্রশংসাকারী জানে না। নিজের রহস্য ও অন্তরের অবস্থা চিন্তা করলে সে বাধ্য হয়ে প্রশংসাকারীকে বিরত রাখবে এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে।

হাদীসে আছে ঃ اَحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ

–প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর।

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের হাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, প্রশংসা তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। জনৈক বুযুর্গ আপন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রশংসা শুনে বললেন ঃ ইলাহী, এরা আমার অবস্থা জানে না, কিন্তু তুমি জান। কেউ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ, যে বিষয় তারা জানে না এবং আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, তজ্জন্যে আমাকে পাকড়াও করো না। আমাকে ক্ষমা কর এবং তাদের ধারণার চেয়েও উত্তম কর।

কথাবার্তার সূক্ষ্ম ভুল-ভ্রান্তি ঃ সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আলেম ব্যক্তি সঠিক ভাষায় কথাবার্তা বলে, অজ্ঞ জনসাধারণ এসব ক্ষেত্রে ভুল করে বসে, কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এরূপ করা হয় বিধায় আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ ـ

–তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে– যা আল্লাহ চান ও আপনি চান; বরং এরূপ বলা উচিত, যা আল্লাহ চান, অতঃপর আপনি চান।

উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার চাওয়ার সাথে অপরকে শরীক করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ ও আপনি চাইলে এরূপ হবে। কারণ, এতে অসম্মান ও বেআদবী হয়। এরূপ বলা উচিত, আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাগ্রে, এরপর আপনার ইচ্ছা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলল, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল চান। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ? এরূপ বল ঃ যা আল্লাহ একা চান। ইবরাহীম বলেন, 'আল্লাহর আশ্রয় ও আপনার আশ্রয়' এ কথা বলাও খারাপ। বরং এরূপ বলা জায়েয, আল্লাহর আশ্রয় এরপর আপনার আশ্রয়। ইবরাহীম আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যকে গাধা বলে সম্বোধন করে, কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে– বল, আমি কি তাকে গাধা সৃষ্টি করেছিলাম? তুমি তাকে গাধা বলতে কেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কতক লোক কথায় কথায় শেরক করে বসে। তারা বলে ঃ এ কুকুরটি না থাকলে আজ রাতে সর্বস্ব চুরি হয়ে যেত। তারা সত্যিকার রক্ষকের প্রতি লক্ষ্য করে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন "আমার বান্দা" ও "আমার বাঁদী" না বলে। কেননা, বান্দা সকলেই আল্লাহর এবং বাঁদীও তাঁরই। এক্ষেত্রে "আমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোলাম" বলা উচিত। গোলামও তার প্রভুকে "রব" (পালনকর্তা) বলবে না; বরং প্রভু ও সরদার বলবে। কেননা, সকলের পালনকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও কালাম নিত্য না অনিত্য- এ জাতীয় প্রশ্ন সাধারণ মানুষের করা উচিত নয়; বরং কোরআনে যে সকল আদেশ নিষেধ রয়েছে, সেগুলো মেনে চলাই তাদের কাজ, কিন্তু এটা মনের উপর কঠিন এবং অনর্থক কথাবার্তা খুব সহজ মনে হয়। সাধারণ মানুষ অনধিকার চর্চা করে আনন্দিত হয়। কারণ, শয়তান তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, তারা আলেম ও জ্ঞানীজন। অথচ তাদের মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে কতক কুফরী কালেমাও উচ্চারিত হয়ে যায়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, কোরআন পাকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনা এবং এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। কোরআনে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো এবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও তর্ক-বিতর্ক করা বেআদবী। এতে কুফরের আশংকা থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন সূক্ষ্ম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ, সে সেই বিষয়ে মূর্খদের স্তরে পরিগণিত হবে এবং শাস্তিযোগ্য ও নিন্দনীয় হবে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে –

ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

–আমি যে বিষয়ে বলা বর্জন করেছি, তা আমার মধ্যেই সীমিত থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা অযথা প্রশ্ন করেছে এবং পয়গম্বরদের সাথে মতবিরোধ করেছে। আমি যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা থেকে বেঁচে থাক এবং যা করতে আদেশ করি, তা যথাসম্ভব পালন কর।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এতবেশী প্রশ্ন করতে লাগল যে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ যত ইচ্ছা প্রশ্ন কর। আমি জওয়াব দেব। সেমতে এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ঃ আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হোযায়ফা। এরপর আরও দু'ভাই দাঁড়িয়ে প্রশ্ন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাখল, আমাদের পিতা কে? তিনি বললেন ঃ যার সন্তান বলে তোমরা কথিত হও সে-ই তোমাদের পিতা। এরপর আরও একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি জান্নাতে যাব, না দোযখে? তিনি বললেন ঃ দোযখে। যখন সকলেই তাঁর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি টের পেল, তখন চুপ হয়ে গেল। কারও প্রশ্ন করার সাহস হল না। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ

رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ـ

—আল্লাহ আমাদের রব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের নবী— এতেই আমরা সন্তুষ্ট। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, তুমি বসে যাও। মনে হয় তুমি তওফীকপ্রাপ্ত।

অন্য এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার মনে হয় লোকেরা অধিক প্রশ্ন করতে করতে এক পর্যায়ে বলতে শুরু করবে, মানুষকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন কখনও তোলা হলে তোমরা সূরা এখলাস পাঠ করে বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কাহিনী থেকে পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়, অস্থানে প্রশ্ন করা মোটেই সঙ্গত নয় এবং যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার বোধশক্তি নেই, তা কখনও জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) খিযিরের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, স্বেচ্ছায় না বলা পর্যন্ত তিনি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। এরপর প্রথমে নৌকার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই খিযির (আঃ) ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মূসা (আঃ) ওযর পেশ করলেন, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন। আর জিজ্ঞেস করব না, কিন্তু যখন তিন বার এরূপ হল তখন খিযির (আঃ) বলতে বাধ্য হলেন— هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ —এটাই আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত।

এরপর তিনি মূসা (আঃ)-কে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সারকথা, জনসাধারণের জন্যে অধিক সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা খুবই বিপজ্জনক। এ থেকে অনেক অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অতএব তাদেরকে বাধা দেয়াই সঙ্গত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্রোধ ও হিংসা

প্রকাশ থাকে যে, ক্রোধ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যার প্রকৃতি হচ্ছে এই আয়াত ঃ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ –আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়ের উপর উঁকি মারে।' অগ্নি যেমন ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি ক্রোধের হুতাশন অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে প্রচ্ছন্ন থাকে। চকমকি পাথরে ঠোকা লাগতেই যেমন অগ্নি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি অহংকারে সামান্যতম আঘাতেই ক্রোধের অগ্নিও অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গগণ ঈমানের নূরের সাহায্যে এ কথা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের মধ্যে এমন একটি শিরা রয়েছে, যা শয়তানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা ক্রোধাগ্নির পরশ পেয়ে জ্বলে উঠে এবং সত্যের সামনে ঝুঁকে পড়ে। তার বংশগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা শয়তানের সাথে পাকাপোক্ত। শয়তান বলেছিল ঃ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ –আমাকে সৃষ্টি করেছ অগ্নি দ্বারা এবং আদমকে সৃষ্টি করেছ মৃত্তিকা দ্বারা। মৃত্তিকার স্বভাব হচ্ছে স্থির ও গম্ভীর থাকা। পক্ষান্তরে অগ্নির কাজ হচ্ছে প্রজ্বলিত এবং লেলিহান শিখা হয়ে গতিশীল হওয়া। ক্রোধের মুহূর্তে যখন মানুষও গতিশীল এবং অস্থির হয়, তখন মনে হয় যেন মৃত্তিকা দ্বারা সৃজিত নয়; বরং শয়তানের অনুরূপ তার খামিরও অগ্নি।

ক্রোধের ফল হচ্ছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ; অর্থাৎ শত্রুতা ও অপরের অমঙ্গল কামনা। ক্রোধ ও হিংসা দ্বারা অনেক মানুষ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই ধ্বংসের স্থান বলে দেয়া অত্যাবশ্যক, যাতে এগুলো থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করে এবং অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। কেননা, মন্দ বিষয় সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত মানুষ তাতে লিপ্ত থাকে। কেবল মন্দ বিষয় জানাই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত তা থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ও উপায় না জানা হয়। তাই আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমোক্ত কয়েকটি বর্ণনায় ক্রোধের অনিষ্ট, তার স্বরূপ, কারণাদি, প্রতিকার, সহনশীলতার সওয়াব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। এরপর অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসমূহে হিংসা ও বিদ্বেষের অর্থ, ফলাফল, কারণাদি ও প্রতিকার লিপিবদ্ধ করব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্রোধের অনিষ্ট ঃ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

–যখন কাফেররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করে নিল– অজ্ঞতার জেদ, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্থিরতা ও গাম্ভীর্য নাযিল করলেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এ কারণেই নিন্দা করেছেন যে, তারা অন্যায় জেদের বশবর্তী হয়ে মিথ্যার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যান্য জেদও ক্রোধেরই অপর নাম। তিনি স্থিরচিত্ততা ও গাম্ভীর্য নাযিল করার কথা বলে মুমিনদের প্রশংসা করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আমাকে সামান্য আমল বলে দিন। তিনি বললেন ঃ لَاتَغْضَبْ অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে কিসে রক্ষা করবে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি নিজে ক্রোধ করো না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা জবরদস্ত পাহলোয়ান কাকে মনে কর? সকলেই আরজ করল ঃ এমন ব্যক্তিকে মনে করি, যে কুস্তিতে কারও সাথে ধরাশায়ী হয় না। তিনি বললেন ঃ সে পাহলোয়ান নয়। জবরদস্ত পাহলোয়ান সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমিত রাখে। হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন مَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ - যে আপন ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখেন।

হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) বলেন ঃ অধিক ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, ক্রোধের আধিক্য অন্তরকে হালকা করে দেয়।

হযরত হাসান বলেন ঃ আদম সন্তান ক্রোধবশতঃ এমন লম্ফঝম্ফ করে যে, মনে হয় এবারের লম্ফে জাহান্নামে পড়ে যাবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রেওয়ায়াত করেন, জনৈক সংসারত্যাগী দরবেশ তার এবাদতখানায় ছিল। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইল, কিন্তু সে আপন কাজে অটল রইল। শয়তান একবার তার কক্ষের কাছে এসে ডেকে বলল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঃ দরজা খোল। সে জওয়াব দিল, না। শয়তান আবার বলল ঃ দরজা খুলে দাও, নতুবা আমি চলে যাব আর তুমি আফসোস করবে। দরবেশ এতে ভ্রূক্ষেপ করল না। শয়তান বলল ঃ আমি মসীহ্। দরবেশ বলল ঃ তুমি মসীহ্ হলে আমি কি করব? মসীহ্ আমাদেরকে এবাদত ও সাধনার আদেশ করেছেন এবং কেয়ামতে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছেন। ওয়াদার খেলাফ করে যদি আজই চলে আসেন, তবে আমরা মানতে রাজি নই। এরপর শয়তান বলল ঃ আমি শয়তান। তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলাম। তা হল না। এখন তুমি যা জিজ্ঞেস করবে তা বলব। দরবেশ বলল ঃ আমি কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। অতঃপর শয়তান সেখান থেকে প্রস্থানোদ্যত হলে দরবেশ বলল ঃ শুনছ না কি? সে বলল ঃ শুনছি, বল। দরবেশ বলল ঃ মানুষের কোন্ স্বভাবটি তোমাকে অধিক সাহায্য করে। শয়তান বলল ঃ ক্রোধ! মানুষ যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন আমি তাকে এমনভাবে গড়িয়ে দেই, যেমন বালকেরা বলকে গড়িয়ে দেয়। হযরত খায়সামা বর্ণনা করেন– শয়তান বলে, আদম সন্তান আমার উপর প্রবল হতে পারে না। যখন সে সন্তুষ্ট থাকে তখন আমি তার অন্তরে থাকি; আর যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন উড়ে তার মাথায় বসি।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ ক্রোধ প্রত্যেক অনিষ্টের চাবি। জনৈক আনসার বলেন ঃ প্রখরতা নির্বুদ্ধিতার শিকড়। এর কারণ ক্রোধ। যে ব্যক্তি মূর্খতায় তুষ্ট থাকে, তার সহনশীলতার প্রয়োজন নেই। কেননা, সহনশীলতা হচ্ছে সজ্জা ও উপকারী বিষয় এবং মূর্খতা দোষ ও ক্ষতির বিষয়। হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন– শয়তান বলে, আমি আদম সন্তান থেকে কখনও ক্লান্ত হইনি এবং তিনটি বিষয়ে কখনও ক্লান্ত হব না।

প্রথম ঃ যখন সে কোন নেশা পান করবে, তখন তার লাগাম আমার হাতে থাকবে। আমি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাব। সে আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ করবে।

দ্বিতীয় ঃ যখন সে ক্রোধের বশবর্তী হবে তখন এমন কথা বলবে, যা জানে না এবং এমন কাজ করবে, যার কারণে অনুতপ্ত হবে। তৃতীয় ঃ আমি সর্বদা তাকে কৃপণতায় উৎসাহিত করতে থাকি এবং এমন বস্তুর লালসা দেই, যা তার সাধ্যে নেই।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এতে পরিণামে ক্ষমা চাওয়ার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। হযরত ইবনে মসঊদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ) রেওয়ায়াত করেন– ক্রোধের সময় সহনশীলতা পরীক্ষা করা এবং লোভের সময় আমানতদারী যাচাই করা উচিত। ক্রোধ না হলে তখনকার সহনশীলতার কি মূল্য। এমনিভাবে লালসার বিষয় ছাড়া আমানতদারীর কোন মূল্য নেই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) তাঁর জনৈক বিচারককে লেখেন, ক্রোধের সময় কাউকে শাস্তি দিয়ো না। কোন অপরাধীর প্রতি ক্রোধ হলে তাকে বন্দী করে রাখবে। এরপর ক্রোধ দূর হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করার পর অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেবে এবং শাস্তিও যেন পনেরটি বেত্রদণ্ডের বেশী না হয়। আলী ইবনে যায়দ হযরত ওমর ইবনে আদুল আজীজের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একবার জনৈক কোরায়শী ব্যক্তি তাঁকে কটু কথা বললে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা নত করে রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা ছিল, আমি ক্ষমতার মোহে শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে আজ তোমার সাথে এমন কথা বলি, যা কাল তুমি আমার সাথে বলবে।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ কুফরের চারটি স্তম্ভ আছে। এক- ক্রোধ, দুই- খাহেশ, তিন - নির্বুদ্ধিতা এবং চার– লালসা।

ক্রোধের স্বরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রাণীকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণাদি দ্বারা বিলুপ্ত ও ধ্বংস হওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আপন ভাণ্ডার থেকে তাকে এমন একটি বস্তুও দান করেছেন, যদ্দ্বারা সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। আভ্যন্তরীণ কারণাদির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মানবদেহ উত্তাপ ও আর্দ্রতার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। উত্তাপ সর্বদাই আর্দ্রতাকে হজম ও শুষ্ক করতে থাকে। যদি আর্দ্রতা খাদ্যের কাছ থেকে সাহায্য না পায় এবং যে পরিমাণ শুষ্ক হয় সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ না হয়, তবে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা খাদ্যকে প্রাণীদেহের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন এবং দেহের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা নিহিত রেখেছেন, যাতে সে খাদ্য খায় এবং ক্ষতিপূরণ হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পক্ষান্তরে যে বাহ্যিক কারণাদি দ্বারা প্রাণী ধ্বংস হয়, সেগুলো হচ্ছে তরবারির মত অস্ত্র ও অন্যান্য মারণযন্ত্র। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ক্রোধশক্তি সৃষ্টি করেছেন, যা অন্তর থেকে স্ফুটিত হয় এবং ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহকে প্রতিহত করে। আল্লাহ্ তাআলা এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্রোধকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করে মানুষের মজ্জার উপাদান করে দিয়েছেন। মানুষকে যখন কোন উদ্দেশ্য থেকে বাধা দেয়া হয় অথবা তার মর্জির বিপরীত কোন ঘটনা ঘটে, তখন সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তার শিখা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে, অন্তরের অভ্যন্তরের রক্ত স্ফুটিত হয়ে শিরা উপশিরায় উপরের দিকে ধাবিত হয়; যেমন হাঁড়ির স্ফুটন উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। এ কারণেই ক্রোধের সময় মানুষের মুখমণ্ডল ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়। মুখমন্ডলের ত্বক নরম ও স্বচ্ছ বিধায় রক্তের ঝলক তাতে খুব পরিস্ফুট হয়। এ অবস্থা তখন হয়, যখন মানুষ নিজের চেয়ে অধস্তন ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যদি নিজের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির উপর ক্রোধ আসে, যেখানে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয় না, তবে রক্ত ত্বক থেকে জমাট হয়ে অন্তরের দিকে ফিরে যায় এবং মানসিক দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। ফলে মুখমন্ডল ফেকাসে হয়ে যায়। আর যদি সমকক্ষ ব্যক্তির উপর ক্রোধ আসে, তবে উপরোক্ত উভয়বিধ অবস্থা দেখা দেয়। মোট কথা, অন্তরের মধ্যেই ক্রোধের স্থান।

এই ক্রোধশক্তিতে মানুষের অবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম ঃ স্বল্পতার স্তর। এটা নিন্দনীয় এবং এরূপ ক্রোধসম্পন্ন ব্যক্তিকেই "বে-গায়রত" বলা হয়ে থাকে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যে ক্রোধের ব্যাপার দেখেও ক্রুদ্ধ হয় না সে গাধা। এ থেকে জানা যায়, ক্রোধ ও জেদ মোটেই না থাকা খুবই ত্রুটির বিষয়।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

–তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তিনি আপন রসূল (সাঃ)-কে আদেশ করেছেন–

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

–কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। বলাবাহুল্য, কঠোরতা ক্রোধের পরই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ঃ বাহুল্যের স্তর। অর্থাৎ ক্রোধ এত প্রবল হওয়া যে, জ্ঞানবুদ্ধি, ধর্মের আনুগত্য ও শাসন ডিঙ্গিয়ে যাওয়া। এই প্রাবল্যের এক কারণ জন্মগত; অর্থাৎ, জন্মের শুরু থেকেই কতক লোক স্পর্শকাতর ও ত্বরিত রাগী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ অভ্যাসগত; অর্থাৎ এমন লোকদের সাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করা, যারা ক্রোধের হাতে পরাভূত, ত্বরিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ক্রুদ্ধ হওয়াকে বীরত্ব মনে করে এবং যারা গর্বভরে বলে, আমরা কোন কিছু বরদাশত করতে পারি না, সামান্য কথাও না। অথচ তারা যেন বাস্তবে একথাই বলে, আমাদের মোটেই জ্ঞানবুদ্ধি নেই। যে ব্যক্তি এসব লোকের কাছ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে থাকে, তার অন্তরে ক্রোধ সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়। ফলে সেও তেমনি হয়ে যেতে চায়।

যখন ক্রোধের অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, তখন উপদেশ কোন কাজে আসে না; বরং উপদেশ দিলে ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। বুদ্ধি দ্বারা যে কিছু উপকৃত হবে– এটাও হতে পারে না। কেননা এ সময় বুদ্ধির নূর নির্বাপিত হয়ে যায় অথবা ক্রোধের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থায় মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করে, কিন্তু যখন ক্রোধের আতিশয্যে অন্তরে রক্ত টগবগ করে উঠে, তখন তা থেকে একটি কালো ধোঁয়া মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়ে চিন্তার জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে; রবং মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ের জায়গাকেও ঘিরে নেয়। ফলে চোখে কিছু দেখে না এবং কানে কিছু শুনে না। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

মাঝে মাঝে ক্রোধের অগ্নি এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, দেহের আর্দ্রতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। সত্যি বলতে কি, ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে নৌকার যে অবস্থা হয়, তা অন্তরের সেই অবস্থার তুলনায় অনেক ভাল, যা ক্রোধের সময় হয়ে থাকে। কেননা নৌকার বেঁচে যাওয়ার আশা থাকে। নৌকারোহীরা নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যে নৌকা থামিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে তো নৌকার মাঝি অন্তর, যা ক্রোধের আতিশয্যে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় চেষ্টা তদবীর করবে কে?

এখন জানা উচিত, ক্রোধাতিশয্যের বাহ্যিক আলামত হচ্ছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপতে থাকা, অসংলগ্ন কাজকর্ম করা, অসমাপ্ত কথা বলা, মুখে শ্লেষ্মা আসা, চুক্ষ রক্তবর্ণ ধারণ করা এবং নাক মুখ স্ফীত হয়ে মুখাকৃতি বদলে যাওয়া। যদি ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ক্রোধের সময় আপন মুখমন্ডল দেখত, তবে লজ্জায় ক্রোধ বর্জন করতে বাধ্য হত। বাহ্যিক অবয়ব যেহেতু আন্তরিক অবয়বের শিরোনাম হয়ে থাকে, তাই বুঝা যায়, অন্তরের অবস্থা আরও বিশ্রী হবে। কেননা, প্রথমে অন্তরের অবয়বই বিগড়ে যায়, যা পরে বাহ্যিক অবয়বেও বিস্তৃত হয়। ক্রোধের প্রভাবে জিহ্বার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনর্গল অকথ্য ও অশ্লীল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গালিগালাজ করতে থাকে, যা শুনে বুদ্ধিমানরা লজ্জাবোধ করে; এমনকি ক্রোধ থেমে গেলে স্বয়ং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও লজ্জিত হয়। ক্রোধের প্রভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং দ্বিধাহীনভাবে মারপিট, নখে আঁচড়ানো, হত্যা, জখম ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। যার উপর ক্রোধ আসে, সে সামনে থাকলে তো তার উপর এসব নিপীড়ন নির্বিচারে চলে। পক্ষান্তরে যদি সে পালিয়ে যায় তবে নিজের উপরই ঝাল মেটাতে থাকে এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে, আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে, মাটিতে হাত মারতে থাকে অথবা নেশাখোর মাতালের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কখনও রাগের কারণে দৌড়াদৌড়ি করার শক্তি থাকে না, ফলে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। কখনও জীবজন্তুকে মারতে থাকে এবং গৃহের থালা-বাসন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

অন্তরের উপর ক্রোধের প্রভাব হল, যার উপর ক্রোধ হয়, তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তার অনিষ্ট কামনা করা হয়, তার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়া হয় এবং তার মানহানির চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় ঃ ক্রোধের মধ্যবর্তী স্তর। এটা ভাল ও প্রশংসনীয়। এই ক্রোধ জ্ঞান-বুদ্ধির ইশারায় পরিচালিত এবং ধর্মীয় নীতির অনুগত হয়। শরীয়তের আইনানুযায়ী যেখানে ক্রোধ হওয়া ওয়াজিব, সেখানেই এই ক্রোধ প্রকাশ পায়। এরূপ ক্রোধ অবলম্বন করতেই আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। বলাবাহুল্য, ক্রোধের এই স্তরই নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্তরই উত্তম। এ থেকে জানা গেল, ক্রোধের স্বল্পতা ও বাহুল্য উভয়টি নিন্দনীয় এবং মধ্যবর্তী স্তরটি কাম্য। যার ক্রোধশক্তি এত দুর্বল যে, আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্তপ্রায় এবং অন্যায়, জুলুম অসহনীয় নয়। তার উচিত আপন নফসের চিকিৎসা করা, যাতে ক্রোধ শক্তিশালী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ বিদ্যমান, তারও নফসের চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া দরকার, যাতে ক্রোধ উত্তম ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে নেমে আসে। এ পর্যায়কেই বলা হয় "সিরাতে মুস্তাকীম" তথা সরল পথ। এই সরল পথ নিঃসন্দেহে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করে, তার কর্তব্য হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

—তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, যদিও আগ্রহ থাকে। অতএব একজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না যে, অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে।

সুতরাং এটা জরুরী নয় যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রযত্নে সৎকাজ করতে সক্ষম হয় না, সে সর্বপ্রযত্নে অসৎ কাজই করবে; বরং কতক অনিষ্ট কতকের তুলনায় হাল্কা এবং কতক সৎকাজ কতকের তুলনায় অধিক মর্তবার অধিকারী। অতএব যে বড় সৎকাজ করতে পারে না, সে ছোট সৎকাজ করবে এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না, সে কম ক্ষতিকর অনিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকবে।

সাধনা দ্বারা ক্রোধ দূর হয় কিনা ঃ কিছু লোকের ধারণ, সাধনা দ্বারা ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভবপর। সাধনার উদ্দেশ্যও তা-ই হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্রোধের কোন চিকিৎসাই নেই। এটা তাদের উক্তি, যারা মনে করে অভ্যাসও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিগত ত্রুটি যেমন মানুষ ঠিক করতে পারে না, তেমনি অভ্যাসও চিকিৎসাযোগ্য নয়। এই উভয় উক্তি দুর্বল। এ সম্পর্কে আসল কথা হচ্ছে, মানুষ এক বস্তু ভালবাসে এবং এক বস্তু ঘৃণা করে। এমনিভাবে কতক বস্তু তার মেযাজের অনুকূলে এবং কতক প্রতিকূলে। সুতরাং যে বস্তু তার মেযাজের প্রতিকূলে, তার উপর ক্রোধ না হয়ে পারে না। মনে কর, কেউ তার প্রিয়তম বস্তুটি ছিনিয়ে নিল অথবা কেউ ক্ষতি করতে চাইল; এমতাবস্থায় অবশ্যই ক্রোধ হবে, কিন্তু যে বস্তুকে মানুষ ভালবাসে, তা তিন প্রকার। এক, এমন বস্তু, যা সকলের জন্যে জরুরী; যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য। সুতরাং কেউ যদি তার অন্ন ছিনিয়ে নেয় অথবা বস্ত্র কেড়ে নেয় অথবা বাসগৃহ থেকে বের করে দেয়, তবে তার উপর অবশ্যই ক্রোধ হবে।

দুই, এমন বস্তু, যা কারও জন্যে জরুরী নয়; যেমন অনেক ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রয়োজনের অধিক চাকর-নওকর ইত্যাদি। এসব বস্তু অভ্যাসের কারণে প্রিয়; তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে দাখিল নয়। কেউ যদি এসব বস্তুর অপচয় করে, তবে তার উপর ক্রোধ হয়। এ ধরনের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হতে পারে। উদাহরণতঃ যদি কারও কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি গৃহ থাকে এবং কোন জালেম এসে তা ভূমিসাৎ করে দেয়, তবে এজন্যে ক্রোধ না-ও হতে পারে; যেমন ধর, গৃহস্বামী জ্ঞানীগুণী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহের প্রতি তার কোন মহব্বতই নেই। সুতরাং মহব্বত না থাকার কারণে সে ক্রুদ্ধ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে না, কিন্তু মহব্বত থাকলে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষের ক্রোধ এমন বিষয়ের জন্যে হয়ে থাকে, যা জরুরী নয়। উদাহরণতঃ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করা, মজলিসে স্বতন্ত্র হয়ে বসতে না দেয়া ইত্যাদি কারণে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে যার সভাপতির আসনে বসার শখ নেই, সে জুতার উপর বসলেও ক্রুদ্ধ হয় না।

মোট কথা, অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনীয় মহব্বতের কারণে কথায় কথায় রাগ করে। তারা বুঝে না যে, খাহেশ ও শখ যত বেশী হয়, মানুষের মধ্যে ত্রুটিও তত বেশী হয়। কেননা যার শখ বেশী, তার অভাব বেশী। অভাব পূর্ণতার গুণ নয়– বরং অপূর্ণতার গুণ। মূর্খ ব্যক্তি সর্বদাই চেষ্টা করে যাতে তার অধিকতর অভাব মিটে যায়। অথচ এটাই দুঃখ ও বিষাদের ভাণ্ডার। কেউ কেউ তো মূর্খতার সমুদ্রে এমন নিমজ্জিত থাকে যে, তাদেরকে মন্দ কাজের দোষ বললেও তারা ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কেউ যদি বলে, তুমি তো ভাল দাবা খেলতে পার না অথবা অনেক মদ পান করতে পার না, তবে তাদের মেযাজ বিগড়ে যায়। অথচ এসব বিষয় মানুষের মধ্যে না থাকাই উত্তম।

তিন, এমন বস্তু, যা কতক মানুষের জন্য জরুরী এবং কতক মানুষের জন্যে জরুরী নয়; যেমন বই-পুস্তক শিক্ষিত ব্যক্তির জন্যে জরুরী। সে বই পুস্তককে মহব্বত করে। কেউ যদি তার বই পুস্তক জ্বালিয়ে অথবা বিনষ্ট করে দেয়, তবে সে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক পেশাজীবী তার যন্ত্রপাতিকে মহব্বত করে। কেননা এর উপর তার জীবিকা নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত মহব্বতের তিন প্রকার বর্ণিত হল। এখন প্রত্যক প্রকারের মধ্যে সাধনার ফল কি হতে পারে তা দেখা দরকার। প্রথম প্রকারের মধ্যে সাধনা দ্বারা অন্তরের ক্রোধ ষোল আনা বিলুপ্ত করা যায় না। এতে সাধনা এ উদ্দেশে করা হয়, যাতে অন্তর ক্রোধের অনুগত হয়ে না থাকে এবং ক্রোধের ব্যবহার ততটুকুই করে, যতটুকু শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে উত্তম। চেষ্টা সাধনা দ্বারা এই স্তর অর্জন করা সম্ভব। প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে সহ্য করবে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সহ্য করতে থাকবে। অবশেষে সহ্য করা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এতে অবশ্য ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হবে না, কিন্তু তার প্রখরতা হ্রাস পাবে এবং দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে তার প্রভাব মুখে অনুভূত হবে না। তৃতীয় প্রকার সাধনার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, এতে কতক লোকের জন্যে তো সেসব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বস্তু জরুরী। সাধনা দ্বারা তাদেরও এই উপকার হবে যে, অন্তরে ক্রোধের তীব্রতা থাকবে না এবং সবরের কষ্ট অধিক অনুভূত হবে না। দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর মধ্যে যে ক্রোধ হয়, সাধনা দ্বারা তার মূলোৎপাটন সম্ভবপর। অর্থাৎ জরুরী নয় এমন বস্তুর মহব্বত যখন অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে সাধনার পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ এভাবে ধ্যান করবে– আমার দেশ অন্ধকার কবর এবং অবস্থানের জায়গা আখেরাত। দুনিয়া কেবল একটি মধ্যবর্তী পথ। এ পথ অতিক্রম করে যাওয়া সুনিশ্চিত। এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা। এরপর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া সবগুলোকে মনে করবে, আসল বাসস্থান তথা আখেরাতে এসব বস্তু দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। এসব চিন্তা-ভাবনার পর দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে মুছে ফেললে নিশ্চিতই আশা করা যায়, ক্রোধ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিছু না হলে এটা তো অবশ্যই হবে যে, ক্রোধ প্রকাশ করবে না এবং তদনুযায়ী আমল করবে না। কেননা, ক্রোধ মহব্বতের অনুসারী। মহব্বত বিলুপ্ত হয়ে গেলে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির কাছে কুকুর আছে, যার প্রতি তার মহব্বত নেই। যদি অন্য কোন ব্যক্তি কুকুরটি মেরে ফেলে তবে সে ক্রুদ্ধ হবে না।

মোট কথা, ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হওয়া তো খুবই কঠিন, কিন্তু দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং তদনুযায়ী আমল না হওয়া কম সাফল্য নয়। এখানে আপত্তি হতে পারে যে, প্রথম প্রকার অর্থাৎ জরুরী বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে দুঃখ বেদনা হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ক্রোধ হওয়া জরুরী নয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি ছাগল গোশ্ত খাওয়ার উদ্দেশে পালন করল। এখন সেই ছাগলটি মারা গেলে তজ্জন্যে তার দুঃখ অবশ্যই হবে, কিন্তু কারও প্রতি ক্রোধ হবে না। এছাড়া প্রত্যেক দুঃখের সাথে ক্রোধ হওয়া জরুরীও নয়। দেখ, দেহে অস্ত্রোপচার করলে কষ্ট ও ব্যথা তো হয়, কিন্তু যে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করে, তার প্রতি ক্রোধ হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর তওহীদ প্রবল এবং যে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার কুদরতে দাখিল ও তাঁর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে, সে ক্রুদ্ধ হবে না। কারণ, সে মানুষকে লেখকের হাতে কলমের মত নিছক একটি মাধ্যম মনে করবে। বাদশাহ কলম দ্বারা কারও মৃত্যুদণ্ড লেখে দিলে যেমন সে কলমের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না, তেমনি কেউ তার ছাগল যবেহ করে খেয়ে ফেললে সে সেই ব্যক্তির প্রতিও ক্রুদ্ধ হবে না। কেননা, যবেহ ও মৃত্যু সে আল্লাহর পক্ষ থেকেই বিশ্বাস করে। অতএব তওহীদ প্রবল হওয়ার অবস্থায় ক্রোধ না হওয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উচিত। এছাড়া আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখার দাবীও তা-ই: অর্থাৎ কেউ যখন ধারণা করবে– আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে যা উত্তম তাই করেন, তখন সে বুঝে নেবে, ক্ষুধার্ত থাকা কিংবা রুগ্ন থাকাই সম্ভবতঃ আল্লাহর কাছে আমার জন্যে উত্তম। সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্রোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই আপত্তির জওয়াব হচ্ছে, বাস্তবে তওহীদ প্রবল হলে এটা সম্ভবপর, কিন্তু তওহীদের এই স্তরের প্রবলতা সব সময় থাকে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না; বিদ্যুতের মত আসে এবং চলে যায়। ফলে পরিণামে অন্তরকে ওসিলার উপর ভরসা করতে হয়। যদি তওহীদ দ্বারা এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হত, তবে সৃষ্টির সেরা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই তা অর্জন করতে পারতেন। অথচ তিনিও ক্রুদ্ধ হতেন; এমন কি, ক্রোধে তাঁর গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ ধারণ করত। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ইলাহী, আমি মানুষ, মানুষের মত আমারও ক্রোধ হয়। অতএব আমি কোন মুসলমানকে গালি দিয়ে থাকলে অভিসম্পাত করে থাকলে অথবা প্রহার করে থাকলে তুমি আমার পক্ষ থেকে এসব বিষয়কে তার জন্যে রহমত ও নৈকট্যের কারণ করে দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যে সমস্ত কথা ক্রোধ ও খুশীর অবস্থায় বলেন, সেগুলো আমি লেখব কি? তিনি বললেন ঃ লেখ। যে আল্লাহ আমাকে সত্য নবী করেছেন তাঁর কসম– এ থেকে অর্থাৎ এ মুখ থেকে সত্য ছাড়া আর কিছু বের হবে না। তিনি এ কথা বলেননি, আমি ক্রুদ্ধ হই না; বরং বলেছেন, ক্রোধ আমাকে সত্যের সীমা অতিক্রম করতে দেয় না; অর্থাৎ আমি ক্রোধের দাবী অনুযায়ী আমল করি না। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার ক্রুদ্ধ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তোমার কি হয়েছে? তোমার শয়তান তোমার কাছে এসেছে? হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার শয়তান নেই? তিনি বললেন ঃ কেন থাকবে না, কিন্তু আমার দোয়ায় সে মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে একথা বলেননি যে, আমার শয়তান নেই; বরং বলেছেন, সে আমাকে অনিষ্টের আদেশ করে না। এখানে শয়তান বলে ক্রোধ বুঝানো হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও দুনিয়ার জন্যে ক্রোধ প্রদর্শন করতেন না। সত্যের ব্যাপারে ক্রোধ হলে তা কেউ টের পেত না এবং তাঁর ক্রোধের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো থাকত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্রোধ যদিও আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য বিষয় ছিল, কিন্তু তাতে মোটামুটিভাবে ওসিলারও দখল ছিল।

হাঁ, মাঝে মাঝে যখন কোন ব্যক্তি কোন অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মশগুল থাকে, তখন প্রয়োজনীয় বস্তু বেহাত হয়ে গেলেও সে ক্রুদ্ধ হয় না। কেননা অন্তর অন্য বিষয়ে মশগুল থাকে। এতে ক্রোধের অবকাশ থাকে না এবং মগ্নতার কারণে অন্য কিছু কল্পনায়ও আনে না। সেমতে হযরত সালমান (রাঃ)-কে যখন কেউ গালি দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমলের দাঁড়িপাল্লায় আমার নেকী কম হলে তুমি যা বলছ, আমি তদপেক্ষাও অধম। আর নেকী ভারী হলে তোমার কথায় আমার কোন ক্ষতি হবে না। এখানে তাঁর অন্তর আখেরাতে মশগুল ছিল বিধায় গালি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এমনিভাবে রবী ইবনে খায়সামকে কেউ গালি দিলে তিনি বললেন ঃ তোমার কথা আল্লাহ্ শুনেন। জান্নাতের এদিকে একটি উপত্যকা আছে। যদি আমি সেটি অতিক্রম করতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কিছু যায় আসে না। আর যদি অতিক্রম না করতে পারি, তবে তুমি যা বলছ, আমি তার চেয়েও অধম। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দিলে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোর যে সকল দোষ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন, সেগুলো অনেক। তিনি যেন নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার মধ্যে মশগুল ছিলেন। জনৈকা মহিলা মালেক ইবনে দীনারকে 'হে রিয়াকার' বললে তিনি রাগ করলেন না। কেননা, তিনি পূর্ব থেকেই নিজেকে রিয়াকার ভাবছিলেন। হযরত শা'বীকে কেউ মন্দ বললে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন, আর তুমি মিথ্যাবাদী হলে তোমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। এসব কাহিনী থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়, এই বুযুর্গগণের ক্রোধ না করার কারণ এটাই ছিল যে, তাঁদের অন্তর ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল ছিল। এটাও সম্ভবপর যে, গালি তাদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু তাঁরা এদিকে মনোযোগ দেননি। অন্তরে যা প্রবল ছিল, তার প্রতিই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং ক্রোধ না হওয়ার এ পর্যন্ত দুটি কারণ বর্ণিত হল, অন্তরের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল থাকা এবং তওহীদের বিশ্বাস প্রবল হওয়া। তৃতীয় আর একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে, এরূপ বিশ্বাস করা যে, ক্রোধ আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বতের কারণে ক্রোধ দমিত হয়ে যাবে। এটাও অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এরূপ হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে। আল্লাহ তাআলা আপন কৃপায় আমাদেরকে ক্রোধ দমন করার তওফীক দান করুন। আমীন

ক্রোধের কারণ ও তা দূর হওয়ার উপায় ঃ যেহেতু রোগ ব্যাধি দূর হওয়াও তার কারণ হওয়ার মধ্যে সীমিত। এ কারণে ক্রোধের কারণাদি এবং তা দূর করার উপায়সমূহ জানা উচিত। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, সর্বাধিক কঠোর বস্তু কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ক্রোধ অত্যন্ত কঠোর। এরপর প্রশ্ন করা হয়, এর কাছাকাছি কঠোর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মানুষের ক্রোধ। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ ক্রোধ কিসের দ্বারা প্রকাশিত ও লালিত হয়? তিনি বললেন ঃ অহংকার, গর্ব, সম্মান কামনা ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এ থেকে বুঝা গেল, ক্রোধ তীব্র হওয়ার কারণ এগুলো ঃ অহংকার, আত্মগর্ব, পরিহাস, অনর্থক হাসি-ঠাট্টা, অপরকে দোষারোপ করা, জেদ করা, প্রতারণা করা, অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভ করা ইত্যাদি। শরীয়তে নিন্দনীয় এসব অভ্যাস থাকা অবস্থায় ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই বিপরীত গুণ দ্বারা এসব দোষ বিদূরিত করা জরুরী; অর্থাৎ বিনয় দ্বারা অহংকার এবং নিজেকে সঠিকভাবে চেনা দ্বারা আত্মপ্রীতি দূর করবে। অহংকার ও আত্মপ্রীতি অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হবে।

গর্বকে এভাবে চিন্তা করে দূর করবে যে, আমিও তো মানুষই। আমার যেসকল বাঁদী গোলাম রয়েছে, সকলেরই আদি পিতা একজনই। পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। আদম সন্তান হওয়ার বেলায় সকলেই সমান। গর্ব উত্তম বিষয়ে করা উচিত। অহংকার, আত্মপ্রীতি ও আস্ফালন তো হীন অভ্যাস। এগুলো নিয়ে কিসের গর্ব? পরিহাস দূর করার উপায় হচ্ছে, এমন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত হওয়া, যেন সারাজীবন পরিহাস করার ফুরসতই না পাওয়া যায়। অনর্থক হাসি-ঠাট্টা থেকে বাঁচার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক সদগুণাবলীর অন্বেষণে এবং ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনে সচেষ্ট হবে, যদ্দ্বারা পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হবে। উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি দোষের প্রতিকারে অনেক সাধনা, ধৈর্য ও পরিশ্রম প্রয়োজন।

মূর্খদের মধ্যে ক্রোধের একটি বড় কারণ হচ্ছে, তারা ক্রোধের নাম রেখেছে বীরত্ব, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, শৌর্য ইত্যাদি। ফলে তাদের নফস এদিকে আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধির দৈন্যও এ রোগের একটি কারণ। এ কারণেই যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল অথবা ত্রুটিযুক্ত, তারা দ্রুত এ রোগে আক্রান্ত হয়। দেখ, সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় রুগ্ন ব্যক্তির ক্রোধ তাড়াতাড়ি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর, প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় বৃদ্ধের ক্রোধ দ্রুত হয়। শক্তিশালী সে, যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب .

–ভূতলশায়ী করে শক্তিশালী হওয়া যায় না। শক্তিশালী সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজের মালিক থাকে। যার অবস্থা এরূপ নয়, তার সামনে ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীলদের কাহিনী বর্ণনা করা উচিত, যাতে সে নিজের চিকিৎসা করে।

জোশের সময় ক্রোধের প্রতিকার ঃ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রোধের কারণসমূহ দূর করা উচিত, যাতে ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ না করে। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি কোন কারণে ক্রোধ তীব্র হয়ে যায়, তবে এমন দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার যেন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অস্থির হয়ে তদনুযায়ী অশালীন পন্থায় কাজ না করে বসে। এলেম ও আমলের প্রতিষেধক দ্বারা এই দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এলেম সম্পর্কিত বিষয় ছয়টি। (১) ক্রোধ হজম ও সহনশীল হওয়ার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে সওয়াব লাভের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এতে আশ্চর্য নয় যে, সওয়াবের লোভে ক্রোধের তীব্রতা দূর হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকবে। হযরত মালেক ইবনে আউস বলেন ঃ একবার হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে প্রহার করার আদেশ দেন। তখন আমি এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ

خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجهلين .

‘ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাক।’

হযরত ওমর (রাঃ) আয়াতটি বার বার পাঠ করছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন আয়াত তাঁর সামনে পাঠ করা হলে তিনি অনেকক্ষণ তার মর্ম বুঝার জন্যে চিন্তা ভাবনা করতেন। তদনুযায়ী চিন্তা করে তিনি লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রহার করার আদেশ দেয়ার পর নিজেই এই আয়াত পাঠ করতে লাগলেন ঃ

والكظمين الغيظ والعافين عن الناس .

–ক্রোধ হজমকারী ও মানুষকে মার্জনাকারী।

এরপর অবিলম্বে লোকটিকে মার্জনা করে দিলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(২) নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করবে এবং এভাবে চিন্তা করবে- এ ব্যক্তির উপর আমার যে ক্ষমতা, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার আমার উপর রয়েছে। আজ তার উপর যদি আমি ক্রোধ কার্যকর করি, তবে কাল কেয়ামতে আল্লাহর ক্রোধ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তখন আমারও ক্ষমার প্রয়োজন হবে। সুতরাং অপরকে ক্ষমা করলে সম্ভবতঃ আমি ক্ষমা পেয়ে যাব। এক সহীফায় আল্লাহ তাআলার এই উক্তি বর্ণিত আছে- হে আদম সন্তান! তোমার ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ কর, আমার ক্রোধের সময় আমি তোমাকে স্মরণ করব। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক খাদেমকে কাজের জন্যে প্রেরণ করেন। সে অনেক বিলম্ব করে ফিরে আসে। তিনি বললেন ঃ

لَوْلَا الْقِصَاصُ لَاَوْجَعْتُكَ অর্থাৎ, কেয়ামতের প্রতিশোধ না থাকলে আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতাম।

কথিত আছে, বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক বাদশাহর সাথে একজন করে পণ্ডিত ব্যক্তি থাকত। বাদশাহ যখন ক্রুদ্ধ হত, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি তার হাতে একটি চিরকুট দিত। তাতে লেখা থাকত ঃ মিসকীনের প্রতি সদয় হও, মৃত্যুকে ভয় কর এবং কেয়ামতের কথা স্মরণ কর। চিরকুট দেখেই বাদশাহের ক্রোধ দমিত হয়ে যেত।

(৩) যদি পরকালীন আযাবের ভয় না থাকে, তবে ক্রোধের কারণে উদ্ভূত ইহকালীন দুঃখ বিপদাপদের কথাই চিন্তা করবে। অর্থাৎ এভাবে ভাববে- যার প্রতি ক্রুদ্ধ হব, সে আমার শত্রু হয়ে যাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নাশকতা, নিপীড়ন ও মানহানি করতে সচেষ্ট হবে। এ চিন্তার সারমর্ম হচ্ছে, দুনিয়ার একটি অনিষ্ট অন্য একটি অনিষ্টের চিন্তা দ্বারা হটিয়ে দেয়া। তাই এটা আখেরাতের আমলের মধ্যে গণ্য হবে না এবং এজন্যে সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

(৪) ক্রোধের সময় অন্য লোকের চেহারা যেমন বীভৎস হয়ে যায়, নিজের চেহারাকে ক্রোধের বেলায় সেরূপ কল্পনা করবে এবং ধ্যান করবে, ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চেহারা ও আকার-আকৃতি ক্ষেপা কুকুর অথবা হিংস্র প্রাণীর মত হয়ে যায়। এর বিপরীতে সহনশীল, গম্ভীর ও ক্রোধ বর্জনকারী ব্যক্তির চেহারা পয়গম্বর, ওলী, আলেম ও দার্শনিকের চেহারার মত থাকে। এখন কোন্ চেহারা সে অবলম্বন করবে, তা নিজেই বেছে নেবে। বুদ্ধিমান হলে মহাপুরুষদের চেহারাই বেছে নিতে বাধ্য হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৫) যে কারণে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং ক্রোধ হজম করতে পারে না, সেই কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, সেটা কি? উদাহরণতঃ শয়তান প্ররোচনা দেয়, তুমি প্রতিশোধ না নিলে প্রতিপক্ষ তোমাকে দুর্বল মনে করবে এবং মানুষের কাছেও তুমি লাঞ্ছিত অপমানিত হবে। যদি কারণ এটাই হয়, তবে আপন নফসকে বুঝাবে– আশ্চর্যের বিষয়, সহনশীলতা তোমার কাছে মন্দ মনে হয়। অপরপক্ষে মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়ার খুব আশংকা কর, কিন্তু আল্লাহ, ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণের দৃষ্টিতে হেয় হওয়ার ভয় মোটেই কর না। আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ হজম করে ফেললেই মর্তবা বেশী হবে।

(৬) একথা ভাববে যে, আমার ক্রোধের কারণ হচ্ছে আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ না হওয়া। বলাবাহুল্য, আল্লাহর মর্জির উপর নিজের মর্জিকে অগ্রাধিকার দেয়া নেহায়েত নির্বুদ্ধিতা। সম্ভবতঃ এ কারণে আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ আমার ক্রোধের চেয়েও বেশী হবে।

ক্রোধের আমল সম্পর্কিত প্রতিষেধক হচ্ছে, মুখে বলবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ –আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

–ক্রোধের সময় এটাই বলার আদেশ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন ক্রুদ্ধ হতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নাক ধরে বলতেন– হে আয়েশা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ ـ

–হে আল্লাহ, পয়গম্বর মুহাম্মদের পালনকর্তা, আমার গোনাহ মাফ কর, আমার মনের ক্রোধ দূর কর এবং আমাকে বিভ্রান্তকারী ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও।

অতএব এ দোয়াটি বলাও মোস্তাহাব। যদি এই দোয়ায় ক্রোধ দূর না হয়, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। উদ্দেশ্য, নিজেকে মাটির নিকটবর্তী করে দেবে– যাতে জানতে পার যে, তুমি এই মাটি দ্বারা সৃজিত এবং পরিণামে এই মাটিতেই যেতে হবে। এই আমলের বদৌলতে নফসের হীনতা বোধগম্য হয়ে যাবে। কেননা ক্রোধ উত্তাপের কারণে হয় এবং উত্তাপ গতিশীলতার কারণে। বসা অথবা শয়ন দ্বারা যখন গতিশীলতা দূর হয়ে যাবে, তখন আশা করা যায়,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্রোধও দূর হয়ে যাবে। এ আমলটিও হাদীসে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে–

اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِى الْقَلْبِ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى اِنْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ مِّنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ ـ

–ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তোমরা দেখ না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে যায়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়? তোমাদের কেউ যদি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে এবং বসা থাকলে যেন শুয়ে পড়ে।

যদি এরপরও ক্রোধ দূর না হয়, তবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু অথবা গোসল করে নেবে। কারণ, পানি ছাড়া অগ্নি নির্বাপিত হয় না।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اِذَا غَضَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ بِالْمَاءِ فَاِنَّمَا الْغَضَبُ مِنَ النَّارِ

–যখন তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হয়, তখন যেন পানি দিয়ে ওযু করে। কারণ ক্রোধ অগ্নি থেকে উৎপন্ন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

–নিশ্চয় ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে, শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃজিত আর পানি দ্বারা অগ্নি নিভে যায়। অতএব তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন ওযু করে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে–

اَلَا اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِىْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى جَمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْاَرْضِ ـ

–সাবধান, ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ, যা আদম সন্তানের অন্তরে থাকে। দেখ না, তার চক্ষুদ্বয়ের রক্তিম বর্ণ এবং ঘাড়ের শিরাসমূহের স্ফীতি? যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, সে যেন আপন গণ্ডদেশকে মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়।

এ হাদীসে সেজদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহের সেরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অঙ্গটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটিতে রাখা উচিত, যাতে নফস তার হীনতা বুঝতে পেরে ক্রোধের কারণ অহংকার থেকে বিরত থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে নাকে পানি দিতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে হয় এবং এই আমল দ্বারা শয়তান দূর হয়ে যায়। ওরওয়া ইবনে মুহাম্মদ বলেন ঃ আমি যখন মাদইয়ানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলাম, তখন আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ তুমি শাসনকর্তা হয়েছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ যখন তোমার ক্রোধ হয় তখন আকাশ ও পৃথিবীকে দেখে এদের স্রষ্টার মাহাত্ম্য স্বীকার করবে, অর্থাৎ সেজদা করবে।

ক্রোধ হজম করার ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থানে এরশাদ করেন وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ এবং যারা ক্রোধকে হজম করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى رَبِّهٖ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ وَمَنْ خَذَلَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ ـ

–যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে বাধা দেয়, আল্লাহ তার আযাবকে বাধা দেবেন। যে তার পালনকর্তার কাছে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন। যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন। তিনি আরও বলেন ঃ

اَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَاَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ ـ

–তোমাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় আপন নফসের উপর প্রবল হয় এবং তোমাদের মধ্যে অধিক সহনশীল সে ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে।

আরও বলা হয়েছে–

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ اَنْ يُمْضِيَهُ اَمْضَاهُ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

–যে ব্যক্তি এমন সময়ে ক্রোধ দমন করে যে, ইচ্ছা করলে তা অব্যাহত রাখতে পারে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা তার অন্তর পূর্ণ করে দেবেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে–

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً اَعْظَمَ اَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

–আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ক্রোধ গিলে ফেলার সমান সওয়াব কোন কিছুর মধ্যে নেই, যা বান্দা গলাধঃকরণ করে।

আইউব (রহঃ) বলেন ঃ এক মুহূর্ত সহ্য করা অনেক অনিষ্ট দূর করে দেয়। একবার হযরত সুফিয়ান সওরী, আবু খুযায়মা ও ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) এক জায়গায় একত্রিত হন এবং সংসার নির্লিপ্ততা সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন অবশেষে সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ক্রোধের সময় সহ্য করা এবং লোভের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলল ঃ আপনি ইনসাফ সহকারে বিচার করেন না এবং বেশী দান করেন না। এতে তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, মুখমন্ডলে তার প্রভাব ফুটে উঠল। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আপনি কি করতে চান? এ ব্যক্তি মূর্খ, যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ –ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাক।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর যেন একটি অগ্নি দফ করে নিভে গেল।

মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন ঃ তিনটি বিষয় কারও মধ্যে একত্রিত হলে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এক, যখন খুশীর অবস্থায় থাকে, তখন যেন বাতিল বিষয়াদিতে প্রবেশ না করে। দুই, যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন যেন সত্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে না যায়। তিন, যখন ক্ষমতা থাকে, তখন যে বস্তু নিজের নয়, তা যেন না নেয়।

সহনশীলতার ফযীলত ঃ ক্রোধেরই একটি বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সহনশীলতা। তা হচ্ছে ক্রোধের মধ্যে স্ফুটন না হওয়া; যদি হয়ও তবে দমন করতে কষ্ট না হওয়া। এ অবস্থা ক্রোধ হজম করার চেয়ে উত্তম। কেননা, ক্রোধ হজম করার মানে হচ্ছে জোরে জবরে সহনশীল হওয়া। সুতরাং এটা বানোয়াট। আর সহনশীলতা বলা হয় একটি মজ্জাগত স্বভাবকে, যদ্দারা বুদ্ধির পূর্ণতা প্রমাণিত হয় এবং ক্রোধশক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুগত ও পরাভূত থাকে, কিন্তু শুরুতে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে এ স্বভাবটি অর্জিত হয়।

সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَمَنْ يَتَخَيَّرِ الْخَيْرَ يُعْطِهِ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقِيْهِ ـ

-এলেম আসে শিক্ষার মাধ্যমে এবং সহনশীলতা আসে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি কল্যাণের ইচ্ছা করে, তা প্রাপ্ত হয় এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচে সে নিরাপদ থাকে।

এ থেকে জানা গেল, সহনশীলতা অর্জনের উপায় হচ্ছে প্রথমে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়া; যেমন এলেম অর্জন করার ওসিলা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْحِلْمَ وَلِيْنُوْا لِمَنْ تُعَلِّمُوْنَ وَلِمَنْ تَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبُ جَهْلُكُمْ عَلٰى عِلْمِكُمْ ـ

এলেম অন্বেষণ কর এবং এলেমের সাথে গাম্ভীর্য ও সহশীলতা অন্বেষণ কর। তোমরা নম্র হও তার জন্যে, যাকে শেখাও এবং যার কাছ থেকে শেখ। স্বেচ্ছাচারী আলেম হয়ো না। তাহলে তোমাদের মূর্খতা এলেমের উপর প্রবল হয়ে যাবে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্রোধে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এটাই নম্রতা ও সহনশীলতার অন্তরায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِىْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِىْ بِالْعَافِيَةِ ـ

-হে আল্লাহ, আমাকে এলেম দ্বারা ধনী কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الرحى الْغَنِىَّ الْمُتَعَفِّفَ التَّقِىَّ وَيَبْغِضُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَلْفَاحِشَ الْبَذِىَّ سَائِلَ الْمُلْحِفَ ـ

–আল্লাহ তা'আলা পছন্দ কলেন সহনশীল, লজ্জাশীল, ধনী, পবিত্র মুত্তাকীকে এবং ঘৃণা করেন নির্লজ্জ, বকবককারী নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়ালকারীকে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রীত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে- গুণী ব্যক্তিরা কোথায়? এতে অল্প সংখ্যক লোক দাঁড়াবে এবং জান্নাতের দিকে দৌড় দেবে। ফেরেশতা তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করবে– তোমরা দৌড়ে যাচ্ছ? তারা বলবে হাঁ, আমরা গুণীজন। ফেরেশতারা শুধাবে- তোমাদের মধ্যে কি গুণ ছিল? তারা জওয়াব দেবে, আমাদের উপর জুলুম করা হলে আমরা সবর করতাম। কেউ আমাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে আমরা ক্ষমা করে দিতাম। কেউ মূর্খতা করলে আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম। ফেরেশতা বলবে ঃ তা হলে এখন জান্নাতে চলে যাও।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ অর্থ সম্পদ বেড়ে যাবে এবং সন্তান সন্ততি অনেক হবে বরকত এর নাম নয়। বরকত হচ্ছে এলেম ও সহনশীলতা অধিক হওয়া। আকসাম ইবনে সায়ফী বলেন ঃ বুদ্ধির স্তম্ভ হচ্ছে সহনশীলতা এবং সব কথার মূল হচ্ছে সবর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সহনশীল ব্যক্তি সহনশীলতার কারণে প্রথম পুরস্কার এটাই পায় যে, সকল মানুষ তার সপক্ষে থেকে তার অনিষ্টকারীর পেছনে লাগে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আমর ইবনে আসামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বীরপুরুষ কে? তিনি বললেন ঃ যে আপন সহনশীলতা দ্বারা মূর্খতাকে হটিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন হল ঃ দানবীর কে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ যে দুনিয়াতে দ্বীনের কল্যাণার্থে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন -

فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ـ

–অতঃপর তুমি দেখবে, তোমার মধ্যে ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এটা তারাই পায়, যারা সবর করে এবং এটা সে-ই লাভ করে, যে মহাভাগ্যবান।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখানে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যাকে তার কোন ভাই গালি দিলে সে প্রত্যুত্তরে বলে- তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আর তুমি সত্যাবাদী হলে আল্লাহ্ আমাকে মার্জনা করুন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একবার এরাবা ইবনে আউস আনসারীকে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সরদার হলে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যারা মূর্খ, আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি। আর যারা সওয়াল করে, তাদেরকে দান করি এবং অভাব মোচনে চেষ্টা করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার মত কাজ করবে, সে আমার মত হবে, যে আমার চেয়ে বেশী কাজ করবে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি কম কাজ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম হব। এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমারও কিছু লোকের মধ্যে বিবাদ আছে । আমার ইচ্ছা বিবাদ মিটিয়ে ফেলি, কিন্তু লোকে বলে, এতে যিল্লতী আছে। ইমাম জাফর সাদেক বললেন ঃ যিল্লতী জালেমেরই হয়। তোমার কোন যিল্লতী নেই।

প্রতিশোধের জন্য যে পরিমাণ কথা বলা দুরস্ত ঃ জুলুমের বদলে জুলুম করা এবং অন্যায়ের মোকাবিলায় অন্যায় করা তো সম্পূর্ণ নাজায়েয। উদাহরণতঃ গীবতের বিনিময়ে গীবত করা এবং গালির জওয়াবে গালি দেয়া জায়েয নয়। হাঁ, প্রতিশোধের নিমিত্ত শরীয়তে যতটুকু করা বর্ণিত আছে, সে পরিমাণই জায়েয। গালির বদলে গালি দেয়া কিছুতেই উচিত নয়। কেননা, হাদীসে আছে−

إِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِمَا فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا فِيهِ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ -

−যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার বাস্তব দোষ ধরে লজ্জা দেয়, তবে তুমি তাকে তার দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না। যারা একে অপরকে গালি দেয়, তারা উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরে মিথ্যা বলে।

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে গালি দিল। তিনি চুপচাপ শুনলেন। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কিছু বলা শুরু করলেন, তখনই রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্থানোদ্যত হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, যখন লোকটি আমাকে মন্দ বলছিল, তখন আপনি নির্বিকার রইলেন। এখন আমি প্রতিশোধ নিতে চাইলে আপনি প্রস্থানোদ্যত হলেন। এর কারণ কি? রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে.

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেরেশতারা তোমার পক্ষ থেকে জওয়াব দিচ্ছিল, যখনই তুমি মুখ খুললে ফেরেশতা চলে গেল এবং শয়তান আগমন করল। যে মজলিসে শয়তান থাকে, আমি সেখানে থাকতে চাই না।

কেউ কেউ বলেন, মোকাবিলায় এমন কথা বলা জায়েয, যাতে মিথ্যা নেই। হাদীসে সাবধানতার কারণে নিষেধ করা হয়েছে; অর্থাৎ এমন কথাও বর্জন করা উত্তম, কিন্তু বললে গোনাহগার হবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ বলা ঃ তুমি কে? তুমি অমুকের সন্তান না? যেমন সা'দ (রাঃ) হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি কি বনী হুযায়লেরই একজন না? জওয়াবে ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ তুমি কি বনী উমাইয়ারই একজন না? অথবা কাউকে নির্বোধ বলাও জায়েয। কেননা, মুতরিফ (রঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সকল মানুষই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে নির্বোধ। তবে কেউ কম এবং কেউ বেশী। হাদীস শরীফে এরূপই বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে কাউকে মূর্খ বলে দেয়াও জায়েয। কেননা, কোন না কোন প্রকার মূর্খতা সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। মোট কথা, এ ধরনের কথা দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে ঠিক, কিন্তু তা মিথ্যা হয় না। তবে চোগলখোরী, গীবত ও পিতামাতাকে গালি দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

যে কথা মিথ্যা নয়, তা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে বলা জায়েয। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন- একবার পত্নীগণ সকলে মিলে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে পিতার কাছে আরজ করলেন ঃ আপনার পত্নীগণ আমাকে এই উদ্দেশে পাঠিয়েছেন যে, আপনি আয়েশাকেও তাদের সমান মনে করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শায়িত ছিলেন।

তিনি বললেন ঃ ফাতেমা! আমি যাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসবে? তিনি আরজ করলেন ঃ অবশ্যই। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তুমি আয়েশাকে ভালবাস। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফিরে গিয়ে পত্নীদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন ঃ তুমি তো কিছুই করতে পারলে না। খালি হাতেই ফিরে এসেছ। অতঃপর তাঁরা যয়নব বিনতে জাহাশকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ যয়নব আমার সমান মহব্বত দাবী করতেন। তিনি এসে বলতে শুরু করলেন ঃ আবু বকরের কন্যা এমন, আবু বকরের কন্যা অমন; এভাবে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে গেলেন। আমি চুপচাপ শুনলাম; কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিন। তিনি যখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমাকে অনুমতি দিলেন, তখন আমি এত বললাম যে, বলতে বলতে মুখ শুকিয়ে গেল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) হযরত যয়নবকে বললেন ঃ আবু বকরের কন্যাকে দেখলে? তার মোকাবিলা করার সাধ্য তোমার নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) যয়নব (রাঃ)-কে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাতে অশ্লীলতা ছিল না– কেবল তাঁর কথার ঠিক ঠিক জওয়াব ছিল। এক হাদীসে আছে–

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْمُبَادِي مِنْهُمَا حَتّٰى يَعْتَدِي الْمَظْلُوْمُ -

–দুগালিগালাজকারী যা কিছু বলে তা যে শুরু করে, তার উপর বর্তায়, যে পর্যন্ত মজলুম সীমালজ্ঘন না করে।

এ থেকে জানা গেল, মজলুম প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রাখে, যদি সীমালজ্ঘন না করে।

সুতরাং পূর্ববর্তীগণ যে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন তা যে পরিমাণ কষ্ট হয়, সেই পরিমাণ শোধ নেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু এটাও বর্জন করা উত্তম। কেননা, এতে বাড়াবাড়ি হওয়ার আশংকা থাকে এবং ওয়াজিব পরিমাণ শোধ নিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

এখন জানা দরকার, কতক মানুষ ক্রোধের তীব্রতায় আত্মসংবরণ করতে পারে না। আবার কেউ কেউ শুরুতে ক্রোধ করে নেয়; কিন্তু চিরকালের জন্যে অন্তরে বিদ্বেষ ও শক্রতা পোষণ করতে থাকে। এ দিক দিয়ে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা ঘাসের ন্যায় দ্রুত জ্বলে উঠে এবং দ্রুত নিভে যায়। দুই, যারা পাথরের কয়লার মত বিলম্বে প্রজ্বলিত হয় এবং বিলম্বেই নেভে। তিন, যারা ভেজা লাকড়ির মত বিলম্বে জ্বলে কিন্তু দ্রুত নিভে যায়। এ অবস্থা খুব ভাল, যদি নম্রতা অসম্মান না হয়। চার, যারা দ্রুত জ্বলে উঠে এবং বিলম্বে নির্বাপিত হয়। এটা সবগুলোর মধ্যে মন্দ। হাদীসে বলা হয়েছে– ঈমানদার দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত শান্ত হয়ে যায়। এভাবে অভ্যাসের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ যাকে ক্রোধের কথা বললেও ক্রুদ্ধ হয় না, সে গাধা। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ বিভিন্ন প্রকার। কতক বিলম্বে ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কতক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত ক্রোধ ফানা হয়ে যায়। এক বিষয়ের ক্ষতি অন্য বিষয় দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। আবার কতক লোক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং বিলম্বে ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু সকলের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তম সে, যার ক্রোধ হয় বিলম্বে এবং থেমে যায় দ্রুত। পক্ষান্তরে সকলের মধ্যে মন্দ সে-ই, যার ক্রোধ হয় দ্রুত এবং থামে অনেক বিলম্বে। ক্রোধের তীব্রতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিধায় যারা শাসক, তাদের জন্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায় কাউকে সাজা না দেয়া জরুরী; নতুবা সাজা ওয়াজিব পরিমাণের বেশী হয়ে যাওয়া অবান্তর নয়। এ কারণেই সাজা কেবল আল্লাহর কাছে অপরাধের কারণে দেবে- আপন স্বার্থের জন্যে দেবে না। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক মাতালকে দেখে শাস্তি দিতে চাইলেন। ইত্যবসরে মাতাল তাকে গালি দিল। তিনি ফিরে এলেন। লোকেরা আরজ করল ঃ গালি দেয়ার কারণে আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ তার গালির কারণে আমার রাগ ধরেছিল। এমতাবস্থায় তাকে প্রহার করলে তাতে আমার নিজের ক্রোধেরও সম্পর্ক থাকত। অথচ আমি চাই যেন আমার নিজের জেদের কারণে কোন মুসলমানকে প্রহার না করি।

বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল ঃ যখন মানুষ ক্রোধের প্রতিশোধ নিতে অসমর্থ হয়, তখন ক্রোধ হজম করে নিতে হয়, ফলে তা অন্তরে পতিত হয়ে বিদ্বেষ হয়ে যায়। বিদ্বেষের অর্থ হচ্ছে কাউকে অসহ্য মনে করা এবং তার প্রতি অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা। এটা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحُقُوْدٍ –মুমিন বিদ্বেষপরায়ণ নয়। বিদ্বেষ ক্রোধের ফল এবং এ থেকে আটটি বিষয় উৎপন্ন হয়।

প্রথম, হিংসা অর্থাৎ অপরের কাছ থেকে নেয়ামতের অবসান কামনা করা, তার নেয়ামতপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হওয়া এবং তার বিপদে পতিত হওয়ায় আনন্দ করা।

দ্বিতীয়, অন্তরে হিংসা এমন বেড়ে যাওয়া যে, অপরের বিপদে শত্রুর ন্যায় হাসতে প্রস্তুত থাকা।

তৃতীয়, অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যদিও সে সম্পর্ক বজায় রাখতে ও কাছে আসতে চায়।

চতুর্থ, অপরকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করা।

পঞ্চম, তার সম্পর্কে অবৈধ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা; যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, গোপন তথ্য ফাঁস করা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ, কথাবার্তায় তার সাথে কৌতুক ও পরিহাস করা।

সপ্তম, তাকে প্রহার করে দৈহিক কষ্ট দেয়া।

অষ্টম, তার কিছু প্রাপ্য থাকলে তা শোধ না করা। এ আটটি বিষয়ই হারাম। বিদ্বেষের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে উপরোক্ত আটটি বিষয় থেকে বেঁচে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকা এবং কেবল অন্তরে অপরকে মন্দ জানা; এমনকি পূর্বে তার সাথে যা যা করত, তা না করা; যেমন তাকে দেখে খুশী না হওয়া, নম্রতা ও দান খয়রাত না করা, তার অভাব মোচনে সাহায্য না করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ের কারণে দ্বীনদারীতে মানুষের মর্তবা হ্রাস পায়, যদিও সে শাস্তির যোগ্য হয় না। দেখ, হযরত আবু বকর (রাঃ) মেসতাহকে কিছু দেবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। মেসতাহ্ ছিলেন তাঁর আত্মীয়, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপে তাঁরও কিছু ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

–তোমারদের মধ্যে যারা গুণী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল, তারা যেন আত্মীয়, মিসকীন ও মুহাজিরদেরকে দান করার ব্যাপারে কসম না খায়। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।

এই আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, আমরা আল্লাহর মাগফেরাত পছন্দ করি। এরপর পূর্বে যা দিতেন, তা পুনর্বহাল করে দিলেন। এ থেকে জানা গেল, পূর্ববৎ ব্যবহার অব্যাহত রাখাই উত্তম। যদি মনের উপর জোর দিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণহেতু কিছু বেশী দান করে, তবে এটা সিদ্দীকগণের স্তর।

ক্ষমার ফযীলত ঃ ক্ষমার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছে যা প্রাপ্য থাকে, তা ছেড়ে দেয়া; যেমন কেসাস ও কর্জ ইত্যাদি কারও যিম্মায় থাকলে তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর অনেক প্রশংসা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ـ

ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মুর্খদের থেকে বিরত থাক।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى –আর ক্ষমা করা খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ তিনটি বিষয় আমি কসম খেয়ে বলতে পারি - এক, দান খয়রাত দ্বারা ধন-সম্পদ হ্রাস পায় না। দান খয়রাত করা উচিত। দুই, যদি কোন ব্যক্তি নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে আপন প্রাপ্য ছেড়ে দেয়, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তিন, যে ব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের দরজা উন্মোচন করে, আল্লাহ তাআলা তার সামনে দারিদ্র্যের দরজা প্রশস্ত করে দেন। এক হাদীসে আছে-

اَلتَّوَاضُعُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوْا يَرْفَعْكُمُ اللّٰهُ وَالْعَفْوُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزَّكُمُ اللّٰهُ وَالصَّدَقَةُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوْا يَرْحَمْكُمُ اللّٰهُ ـ

–বিনয় বান্দার কেবল উচ্চতাই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা বিনয় প্রদর্শন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে উচ্চতা দেবেন। ক্ষমা বান্দার কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দেবেন। দান-খয়রাত কেবল প্রাচুর্যই বাড়ায়। অতএব তোমরা দান খয়রাত কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন।

হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। এরপর সঠিক বলতে পারব না, আমি প্রথমে তাঁর হাত ধরলাম না তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি বললেন ঃ হে ওকবা, দুনিয়া ও আখেরাতে লোকদের চরিত্রের যে বিষয়টি উত্তম তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি– যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, বান্দাদের মধ্যে তোমার কাছে কে অধিক প্রিয়। এরশাদ হল ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রাপ্যের নালিশ পেশ করল। তিনি তার পক্ষে রায় দেয়ার ইচ্ছায় তাকে বসতে বললেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন ঃ اِنَّ الْمَظْلُوْمِيْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –কেয়ামতের দিন মজলুমরাই সফলকাম হবে। লোকটি এ কথা শুনে তার প্রাপ্য মাফ করে দিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা গৃহের তওয়াফ করেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করে কাবায় তশরীফ আনেন। এরপর কাবার চৌকাঠ ধরে সমবেত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? লোকেরা আরজ করল ঃ আপনি আমাদের ভাই এবং মেহেরবান পিতৃব্য পুত্র। তারা একই কথা তিন বার উচ্চারণ করল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি সেই কথাই বলছি যা আমার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন–

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ

–আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সবার উপরে দয়াশীল।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ লোকেরা একথা শুনে আপন আপন গৃহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে এল, যেমন কবর থেকে বের হয়। অতঃপর সকলেই মুসলমান হয়ে গেল।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি সহনশীল নয়, যে জুলুমের সময় চুপ থাকে, এরপর সক্ষম হলে প্রতিশোধ নেয়; বরং সহনশীল তাকে বলা হয়, যে জুলুমের সময় সহ্য করে এবং সক্ষম হলে মাফ করে। একবার হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বাজারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিছু সওদা ক্রয় করে মূল্য দেয়ার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, পকেটের দেরহামগুলো চুরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত এখানে বসা আছি, দেরহামগুলো পকেটে ছিল। লোকেরা চোরকে বদদোয়া দিতে লাগল, তার হাত কাটা যাক, তার অমঙ্গল হোক, কিন্তু হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, যদি সে অভাবে পড়ে নিয়ে থাকে, তবে তাকে বরকত দাও, যাতে অভাব দূর হয়ে যায়। আর যদি গোনাহের প্রতি বেপরওয়া হয়ে নিয়ে থাকে, তবে এ গোনাহ্‌কেই তার শেষ গোনাহ্ করে দাও।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে ইবনে আশআসের বন্দীরা আগমন করলে তিনি তাদের সম্পর্কে রেজা ইবনে হায়াতের সাথে সলাপরামর্শ করলেন। রেজা আরজ করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার পছন্দসই বিষয় অর্থাৎ বিজয় দান করেছেন। এর বিনিময়ে আপনি তা করুন যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দসই অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমা পছন্দ করেন। আপনিও ক্ষমা করুন। এ কথা শুনে খলীফা সকল বন্দীকে ক্ষমা করলেন।

নম্রতার ফযীলত ঃ নম্রতা একটি উত্তম গুণ, যা সচ্চরিত্রতার ফল। এর বিপরীতে কঠোরতা হচ্ছে ক্রোধের ফল। কঠোরতা কখনও ক্রোধ থেকে এবং কখনও তীব্র লালসা থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু নম্রতা সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্রতারই ফল। সচ্চরিত্রতা তখনই অর্জিত হয়, যখন ক্রোধশক্তি ও খাহেশ শক্তিকে সমতার পর্যায়ে রাখা হয়। এ কারণেই 'রিফক' তথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নম্রতা হাদীস শরীফে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ حَظَّ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

–হে আয়েশা, যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ পেয়েছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের অংশ পেয়েছে। আরও বলা হয়েছে–

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

–যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন পরিবারের লোকজনকে মহব্বত করেন, তখন তাদের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করে দেন। আর এক হাদীসে আছে– مَنْ يُّحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ

–যে নম্রতা পেল না, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে শাসক নম্রতা প্রদর্শন করে, তার সাথে কেয়ামতে নম্রতা করা হবে। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সকল মুসলমানই আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আপনার কাছ থেকে উপকার লাভ করে। কোন উত্তম কথা আমার জন্যেও নির্দিষ্ট করে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই অথবা তিন বার আলহামদু লিল্লাহ বললেন এবং লোকটির প্রতি মনোযোগী হয়ে দুই অথবা তিন বার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমিই উপদেশ চাও? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি কোন কাজ করার ইচ্ছা কর, তখন পরিণাম চিন্তা করে নাও। যদি ভাল দেখ, কর; নতুবা বিরত থাক।

হযরত সুফিয়ান সওরী তাঁর সহচরগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'রিফক' কাকে বলে তোমরা জান? তারা আরজ করল ঃ আপনিই বলে দিন। তিনি বললেন ঃ কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা এবং নম্রতার জায়গায় নম্রতা প্রদর্শন করা। এ থেকে জানা গেল, নম্রতার সাথে কঠোরতার মিশ্রণও দরকার, কিন্তু মানুষের স্বভাব অধিক কঠোরতাপ্রবণ বিধায় নম্রতার প্রতি অধিক মাত্রায় উৎসাহ প্রদান জরুরী। এ কারণেই শরীয়তে নম্রতার প্রশংসা অনেক করা হয়েছে এবং কঠোরতার প্রশংসাই পাওয়া যায় না, কিন্তু স্ব স্ব স্থানে উপযোগিতা অনুসারে উভয়টি ভাল। তবে যে স্থানে কঠোরতা জরুরী, সেখানে সত্য মানসিক প্রবৃত্তির সাথে মিশে যায় এবং ঘি চিনির চেয়েও অধিক সুস্বাদু মনে হয়।

হিংসার নিন্দা ঃ হিংসাও বিদ্বেষের একটি শাখা এবং বিদ্বেষ ক্রোধের শাখা। অতএব হিংসা ক্রোধের শাখা এবং ক্রোধ হল মূল কাণ্ড। এরপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হিংসার এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা বিস্তৃত হয়, যেগুলো গণনাও করা যায় না। হিংসার নিন্দায় বহু হাদীস বর্ণিত আছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْحَسَدُ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ –অগ্নি যেমন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসা নেককাজসমূহ খতম করে দেয়।

অন্য এক হাদীসে হিংসা, তার ফলাফল ও কারণসমূহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ

لَاتَحَاسَدُوا وَلَاتَقَاطَعُوا وَلَاتَبَاغَضُوا وَلَاتَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

–পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা করো না এবং আত্মীয়তা ভঙ্গ করো না। তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ এখন এ পথে একজন জান্নাতী ব্যক্তি তোমাদের সামনে আসবে। এমন সময় জনৈক আনসারী বাম হাতে জুতা নিয়ে আবির্ভূত হল। তার দাড়ি থেকে ওযুর পানি টপকে পড়ছিল। সে এসেই "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলল। দ্বিতীয় দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার পূর্ববৎ উক্তি করলেন। সেদিনও সে ব্যক্তিই আগমন করল। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা সংঘটিত হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে চলে গেলে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস আনসারী ব্যক্তির পেছনে পেছনে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ আমার পিতার সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এতে আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন তাঁর কাছে যাব না। আপনি অনুমতি দিলে তিন দিন আপনার গৃহেই রাত কাটাব। লোকটি বলল ঃ কোন অসুবিধা নেই। আপনি থাকুন। হযরত আবদুল্লাহ তিন রাত্রি পর্যন্ত তার গৃহে শয়ন করে দেখলেন, সে রাতে গাত্রোত্থান করে না, তবে প্রত্যেক পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় আল্লাহর যিকির করে নেয়। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় শয্যাত্যাগ করে না। অবশ্য এতটুকু জানা গেল, সে যখন কোন কথা বলেছে, ভাই বলেছে। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত আদুল্লাহ তার আমলের কোন ওজনই বুঝতে পারলেন না। অগত্যা তিনি লোকটিকে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিতার সাথে আমার কোন বাদানুবাদ হয়নি; কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে আপনার শানে একথা শুনেছিলাম। তাই আপনি কি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমল করেন, তা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আপনাকে তো খুব বেশী আমল করতে দেখলাম না। বলুন তো, কিভাবে আপনি জান্নাতী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন? লোকটি বলল ঃ আমার আমল তো তাই, যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আমি তার কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিছু দূর অগ্রসর হতেই সে আমাকে ডেকে নিল এবং বলল ঃ ভাই, আমল তো তাই, যা আপনি দেখেছেন, কিন্তু ব্যাপার এতটুকু, যে নেয়ামত আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে দান করেন, তাতে আমার মনে কোনরূপ মলিনতা ও হিংসা আসে না। আমি বললাম ঃ ব্যস, এ কারণেই আপনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন। আমাদের দ্বারা এটা সম্ভবপর নয়।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিষয় থেকে কেউ মুক্ত নয়। এক– ধারণা, দুই– কুলক্ষণ, তিন– হিংসা, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এগুলো থেকে মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছি। যখন মনে কোন ধারণা আসে, তখন তা ঠিক মনে করবে না। যখন কুলক্ষণ দেখ, তখনও নিজের কাজ করে যাও। আর হিংসার উদ্রেক হলে খাহেশ করো না। এ হাদীস হতে হিংসা থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা বুঝা যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন পরওয়ারদেগারের সাথে কথা বলার জন্য গমন করেন, তখন এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় দেখে ঈর্ষা করতে থাকেন যে, এহেন উচ্চ মর্যাদা যদি আমারও নসীব হত! সেমতে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে লোকটির নাম বলে দেয়ার আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন ঃ তার নাম দিয়ে কি করবে, কাম শুনে নাও। সে তিনটি কাজ করত– এক, মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দেখে হিংসা করত না। দুই, পিতা-মাতার নাফরমানী করত না। তিন– চোগলখোরী করত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে এ বিষয়ের আশংকা বেশী করি যে, তাদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং তারা পরস্পরে হিংসা করে খুনাখুনি করবে।

বর্ণিত আছে, ফযল ইবনে মুহাল্লাব যখন ওয়াসেতের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন আউন ইবনে আবদুল্লাহ তার কাছে যান এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই। ফযল বললেন ঃ বলুন। তিনি বললেন ঃ

প্রথমঃ অহংকার থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার প্রথম নাফরমানী এর কারণেই হয়েছে। সেমতে কোরআন পাকে এর সত্যায়ন বিদ্যমান–

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

—স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন তারা সেজদা করল; কিন্তু ইবলীস করল না। সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেরেদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঃ লালসা থেকে বেঁচে থাকবে। এটা বড় বিপদ, যার কারণে হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জান্নাতে স্থান দেন, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সেখানে তাঁকে সকল বস্তু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়; কেবল একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু তিনি লালসার বদৌলতে সেই ফল খান এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁকে আদেশ করা হয়- اِهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ —তোমরা সকলেই জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু।'

তৃতীয় ঃ হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। এ হিংসার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কাবিল তার ভাই হাবিলকে খুন করেছিল। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ـ

—তাদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনান, যখন তারা উভয়েই কোরবানী করল, অতঃপর একজনের কোরবানী কবুল হল এবং অপরজনের হল না, তখন সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে খুন করব।

আরেকটি বিষয়, যখন সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, জ্যোতির্বিদ্যার কথা আলোচনা করা হয় তখন তুমি চুপ থাকবে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসানকে প্রশ্ন করল ঃ ঈমানদার হিংসা করে? তিনি বললেন ঃ তুমি কি ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্রদের কথা ভুলে গেছ? তারা ঈমানদার ছিল। সুতরাং ঈমানদার হিংসা করে, কিন্তু তার উচিত বুকের মধ্যেই তা গোপন রাখা। কেননা হাতে ও মুখে বাড়াবাড়ি না করা পর্যন্ত হিংসা দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করবে, তার হাসি ও হিংসা উভয়টি হ্রাস পাবে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখি; কিন্তু নেয়ামতের কারণে যে হিংসা করে, তাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সন্তুষ্ট করতে পারি না। সে নেয়ামতের বিলুপ্তি ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ হিংসা একটি ক্ষত, যা কখনও শুকায় না।

হিংসার স্বরূপ, প্রকার ও বিধান ঃ বলাবাহুল্য, নেয়ামতের উপর ভিত্তি করেই হিংসা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করেন, তখন অপর ব্যক্তির দু'রকম অবস্থা হতে পারে।

প্রথম হচ্ছে, সেই নেয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে এবং সে তার বিলুপ্তি কামনা করবে। তার এই অবস্থার নামই হিংসা। এ থেকে জানা গেল, হিংসার সংজ্ঞা হচ্ছে, অপরের নেয়ামত দেখে দুঃখিত হওয়া এবং তার কাছ থেকে তার বিলুপ্তি কামনা করা।

দ্বিতীয় হচ্ছে, অপরের সেই নেয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে না এবং সে তার বিলুপ্তিও কামনা করবে না; বরং তার মন চাইবে, এই নেয়ামত আমিও পাই। এই অবস্থাকে বলা হয় "গিবতা" তথা ঈর্ষা। কখনও হিংসাকে ঈর্ষার জায়গায় এবং ঈর্ষাকে হিংসার জায়গায় ব্যবহার করা হয়। অর্থ জানা থাকলে এতে কোন অসুবিধা হয় না।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

المؤمن يغبط والمنافق يحسد

–মুমিন ঈর্ষা করে এবং মোনাফেক হিংসা করে।

অতএব হিংসা সর্বাবস্থায় হারাম, কিন্তু যে নেয়ামত কোন পাপাচারী অথবা কাফেরের হাতে পড়ে এবং তদ্দ্বারা সে ফেতনা ফাসাদ ও উৎপীড়ন করে, সেই নেয়ামতকে ঐ ব্যক্তির হাতে খারাপ মনে করা এবং তার বিলুপ্তি কামনা করা গোনাহ্ নয়। কেননা, এখানে স্বয়ং নেয়ামতের উপর হিংসা হয় না; বরং সেটা ফেতনা ফাসাদের সামগ্রী বিধায় হিংসা করা হয়। হিংসা যে হারাম, এ বিষয়ে হাদীসসমূহ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া অপরের নেয়ামতকে খারাপ মনে করা আল্লাহ্ তাআলার বিধানে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার নামান্তর যে, তিনি এক বান্দাকে অপর বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন কেন?

আল্লাহ্ তা'আলাও বহু জায়গায় হিংসার নিন্দা করেছেন। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ-

ان مستكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها

–যদি তোমরা কিছু কল্যাণ প্রাপ্ত হও তবে তাদের খারাপ লাগে। আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ ঘটে তবে তারা তজ্জন্যে উলসিত হয়ে উঠে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ود كثير من اهل الكتب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم -

গ্রন্থধারীদের অনেকেই কামনা করে, তোমাদেরকে মুমিন হওয়ার পরে কাফেরে পরিণত করে দেয়– নিজেদের পক্ষ থেকে হিংসার কারণে। এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যে ঈমানরূপী নেয়ামতের অবসান চায়, তা হিংসার কারণে।

لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء যদি তোমরাও কাফের হয়ে যাও যেমন তারা কাফের হয়েছে, অতঃপর সকলেই সমান হয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদের হিংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের মনের কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে–

اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفى ضلل مبين اقتلوا يوسف اواطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم -

–যখন তারা বলল ঃ অবশ্য ইউসুফ ও তার ভ্রাতা আমাদের পিতার অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি বড় দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছেন। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন দেশে পাঠিয়ে দাও। এতে তোমরা তোমাদের পিতার মনোযোগ একান্তভাবে পাবে। অর্থাৎ হযরত ইউসুফের প্রতি পিতার মহব্বত যখন ভ্রাতাদের কাছে দুর্বিষহ ঠেকল, তখন তার অবসানের কথা চিন্তা করে তাকে পিতার দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিল।

ولا يجدون فى صدورهم حرجا مما اوتوا

–তারা আপন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে না অন্যেরা যা প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে।

এতে যারা হিংসা করে না, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

ايحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله –আল্লাহ্ মুমিনদেরকে যে কৃপা দান করেছেন, তজ্জন্যে তারা হিংসা করে কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে ইহুদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হত, তখন এই বলে দোয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করত, ইলাহী! সেই পয়গম্বরের ওসিলায়, যাঁকে প্রেরণ করার ওয়াদা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ এবং সেই কিতাবের ওসিলায়, যা তাঁর প্রতি নাযিল করবে, আমাদেরকে বিজয় দান কর। এই দোয়ার বরকতে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত, কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হয়ে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন পরিচয় পেয়ে তারা মানতে অস্বীকার করল। সেমতে আল্লাহ বলেন–

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .

–ইতিপূর্বে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। অতঃপর যখন পরিচিতিজন আগমন করল, তখন তারা তাকে মানতে অস্বীকার করল।'

উম্মুল মুমেনীন সফিয়্যা বিনতে হুয়াই একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন ঃ একদিন আমার পিতা ও চাচা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহে গেলেন। আমার পিতা চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি হযরতের শানে কি বল? চাচা জওয়াব দিলেন ঃ আমার জানামতে তিনি সেই পয়গম্বর, যাঁর সুসংবাদ হযরত মূসা (আঃ) দিয়েছিলেন। এরপর চাচা পিতাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি বিশ্বাস ? পিতা বললেন ঃ আমি তো সারাজীবন তার শত্রুই থাকব।

এখন ঈর্ষার বিধান জানা উচিত। ঈর্ষা হারাম নয়। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে– وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ এ বিষয়ে ঈর্ষাকারীদের ঈর্ষা করা উচিত। হাদীস শরীফে এ কথা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لَاحَسَدَ اِلَّا فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ النَّاسَ .

'দু'ব্যক্তির ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায় –প্রথম, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দ্বিতীয়, যাকে আল্লাহ এলেম দিয়েছেন। অতঃপর সে তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।'

এই হাদীসে حسد (হিংসা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ আলোচনা ছিল ঈর্ষার। এর জওয়াব পূর্বেই লেখা হয়েছে, غبطه ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

حسد একে অপরের জায়গায় ব্যবহৃত হয় এবং স্থানের ইঙ্গিতে অর্থ নেয়া হয়।

জানা উচিত, যে নেয়ামতের উপর ঈর্ষা করা হয়, তা যদি ধর্মীয় ও ফরয নেয়ামত হয়; যেমন ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদি, তবে ঈর্ষা করা ওয়াজিব; অর্থাৎ এরূপ কামনা করা ওয়াজিব যে, এ নেয়ামত আমারও নসীব হোক। আর যদি ফযীলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত নেয়ামত হয়; যেমন নফল দান-খয়রাতে অর্থকড়ি ব্যয় করা, তবে ঈর্ষা করা মোস্তাহাব।

হিংসার কারণ ঃ হিংসার কারণ সাধারণতঃ সাতটি ঃ (১) শত্রুতা। এটি হিংসার সর্বাধিক শক্তিশালী কারণ। কেননা, যাকে কেউ কোন কারণে জ্বালাতন করে, সে জ্বালাতনকারীর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক থাকে। যদি নিজেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম পায়, তবে কমপক্ষে এটা করে যে, প্রতিপক্ষ কোন বালামসিবতের সম্মুখীন হলে সে মনে করে, এটা কেবল আমার উপর জুলুম করার করণে হয়েছে। সে তখন বলতে থাকে, আল্লাহ্ আমার ফরিয়াদ শুনেছেন। পক্ষান্তরে যদি প্রতিপক্ষ কোন নেয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়, তবে সে খারাপ মনে করে এবং বলতে থাকে, আল্লাহ আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন না এবং আমার শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন না; বরং আরও নেয়ামত দান করেছেন। সার কথা, যেখানে বিদ্বেষ ও শত্রুতা, সেখানে হিংসা অপরিহার্য। এ হিংসা কেবল সমকক্ষের সাথেই হয় না; বরং নীচতম ব্যক্তিও রাজা-বাদশাহদের সাথে করতে থাকে; অর্থাৎ শত্রুতার কারণে সে চায়, তার ধনৈশ্বর্য বিলীন হয়ে যাক। পরহেযগার সাবধানী ব্যক্তির উচিত এ ধরনের হিংসা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা। এ হিংসার কারণেই কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۔

–তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা মুসলমান। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে রাগে অঙ্গুলি কাটে। বলে দিন– তোমরা তোমাদের শত্রুতা নিয়ে মর। আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন।

এই শত্রুতাজনিত হিংসার ফলে কখনও মারামারি ও খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়, কখনও নেয়ামত দূর করার উপায় চিন্তা করতে করতে সারাজীবন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিংবা সর্বদা চোগলখোরী ও মানহানিকর কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(২) সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া। উদাহরণতঃ যদি কোন সমকক্ষ ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা, ধন-সম্পদ অথবা বিদ্যার অধিকারী হয়ে যায়, তবে হিংসাকারী আশংকা করে সে যেন তার সাথে অহংকার ও গর্ব করতে পারে। সে নিজে তো অহংকার করতে চায় না; কিন্তু অপরের অহংকার ও আস্ফালন সহ্য করতে পারে না। তাই হিংসা করতে থাকে, অপর ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীগুণী কেন হবে?

(৩) অপরকে হেয় জ্ঞান করা। উদারণতঃ এক ব্যক্তি অপরকে হেয় ও নগণ্য জ্ঞান করে তার কাছ থেকে খেদমত এবং আনুগত্য আশা করে। এখন সে যদি নেয়ামত ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তবে হিংসাকারী আশংকা করে, এখন সে হয় তো তার আনুগত্য করবে না এবং সমকক্ষ হওয়ার দাবী করবে, ফলে তার সরদারী মাঠে মারা যাবে।

এ ধারণার বশবর্তী হয়েই কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হিংসা করত। যেমন কোরআন পাক সাক্ষ্য দেয়-

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

-কাফেররা বলত, এই কোরআন দুজনপদের (মক্কা ও তায়েফের) এক মহান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) মহান ব্যক্তি হলে তার আনুগত্য আমাদের জন্যে কঠিন হত না। একজন এতীম বালকের সামনে মাথানত করা কিরূপে সম্ভবপর? এমনিভাবে কোরায়শ কাফেররা আরও বলত-

اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ـ

-আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে জানেন না?'

মুসলমানদেরকে হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করার কারণে তারা এ উক্তি করত।

(৪) হিংসার চতুর্থ কারণ আশ্চর্যবোধ করা; অর্থাৎ হিংসাকারী যখন কোন ব্যক্তির কাছে কোন বড় নেয়ামত অথবা বড় পদমর্যাদা দেখে, তখন এই ভেবে আশ্চর্যবোধ করে যে, আমিও তো তারই মত একজন, অথচ আমি পাইনি, সে এই মর্যাদা পেয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন- مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

-তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا –তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই একজন মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব!

لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ –যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের কথা মেনে চল, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এসব আয়াতে কাফেরদের বিস্ময়ই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদেরই মত মানুষ, সে রেসালত, ওহী ও নৈকট্যের মর্তবায় কিরূপে পৌঁছে গেল। এর ভিত্তিতেই তারা রসূলগণের সাথে হিংসা করেছে। এখানে অন্য কোন কারণ, যেমন শত্রুতা, অহংকার, ক্ষমতা অন্বেষণ ইত্যাদি ছিল না।

(৫) প্রার্থিত লক্ষ্য হাতছাড়া হওয়ার ভয়; অর্থাৎ অপরের নেয়ামতের কারণে আপন লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যাবে – এরূপ আশংকা করার কারণে হিংসা করা। এই প্রকার হিংসা এমন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যার দাবীদার দু'জন। তাদের মধ্যে কেউ যখন এমন বস্তু পেয়ে যায়, যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। তখন অপরজন অহেতুক তার সাথে হিংসা করতে থাকে। দু'ভাইয়ের মধ্যেও এরূপ হিংসা হয় যখন প্রত্যেকেই পিতামাতার অন্তরে আসন করে নিতে আগ্রহী হয়, যাতে তাদের কাছে যোগ্য প্রতিপন্ন হয়ে ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায়।

(৬) ক্ষমতার মোহ; অর্থাৎ এরূপ কামনা করা যে, আমি যেমন কবি, সাহিত্যিক, কারিগর অথবা বীর, তেমনটি আর কেউ না হোক। আমার শাস্ত্রে আর কোন সমতুল্য ব্যক্তি না থাকলে মানুষ আমার প্রশংসা করবে এবং আমাকে অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলবে। এ ব্যক্তি যদি তার আশেপাশে প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা শুনে, তবে অবশ্যই খারাপ মনে করবে এবং হয় মৃত্যু কামনা করবে, না হয় সেই শাস্ত্রের বিলুপ্তি কামনা করবে, যার কারণে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও অংশীদার হয়েছে। এই হিংসা বীরত্ব, বিদ্যা, এবাদত, পেশা, দৈহিক সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ ইত্যাদি যেকোন শাস্ত্রে ও ক্ষেত্রে হতে পারে। একেই বলা হয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহ। ইহুদী আলেমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিনতে পেরেও ও তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকার করত, তার কারণ এটাই ছিল। তারা আশংকা করত, যখন তাদের এলেম রহিত সাব্যস্ত হবে, তখন তাদের প্রতিপত্তির বড়াই চূর্ণ হয়ে যাবে। কেউ তাদের অনুসরণ করবে না।

(৭) অন্তরের ভ্রষ্টতা ও হীনমন্যতার কারণে হিংসা করা হবে; অর্থাৎ হিংসার কারণ উপরে বর্ণিত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে একটিও হবে না;

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বরং নিছক হীনমন্যতা ও নীচাশয়তাই হবে হিংসার কারণ। বলাবাহুল্য এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি মোহ নেই, অহংকার নেই এবং অর্থলোভও নেই; কিন্তু যখন তাদের সামনে আলোচনা করা হয়, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত দান করেছেন, তখন এটা তাদের কাছে দুঃসহ ঠেকে। পক্ষান্তরে তাদের সামনে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলা হলে তারা আনন্দিত হয়। এ ধরনের মানুষ সর্বদাই অপরের বিপযর্য় কামনা করে। মানুষের প্রতি আল্লাহর দান তারা দেখতে পারে না। মানুষকে যা দেয়া হয় তা যেন তাদেরই ধনভাণ্ডার থেকে দেয়া হয়। এরূপ লোককে বলা হয় "শাহীহ্" অর্থাৎ কৃপণ থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ কৃপণ তাকে বলা হয়, যে নিজের মাল কাউকে দেয় না। আর শাহীহ্ ঐ ব্যক্তি যে অপরের মালে কৃপণতা করে। এই হিংসাকারীরাও অহেতুক আল্লাহ্ তাআলার দানে নাখোশ হয়; অথচ দান যারা পায় তাদের সাথে এই হিংসাকারীদের কোন শত্রুতা থাকে না। হীনমন্যতা ছাড়া তাদের হিংসার কোন বাহ্যিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ধরনের হিংসার প্রতিকার খুবই কঠিন। কেননা, অন্যান্য কারণের বেলায় ধরে নেয়া যায় যে, কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে হিংসাও দূরীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু এটা হচ্ছে সৃষ্টিগত ভ্রষ্টতা। এটা দূর করা অত্যন্ত দুরূহ।

উল্লিখিত সাতটি কারণের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে কতক কিংবা অধিকাংশ কারণ একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়। তখন তার হিংসার মাত্রাও বেড়ে যায়, যা সে গোপন করতে পারে মা। আমাদের যুগে প্রচলিত অধিকাংশ হিংসার মধ্যে একাধিক কারণই একত্রিত থাকে– একা এক কারণ থাকে না।

আপনজনের সাথে হিংসা বেশী হয় কেন? প্রকাশ থাকে যে, হিংসার উপরোক্ত কারণসমূহ তাদের মধ্যেই বেশী থাকে, যারা পরস্পর বেশী সম্পর্কশীল। ফলে তারা মজলিসে বসে পরস্পরে কথাবার্তা বলে এবং আপন আপন মতলব বর্ণনা করে। তখন যদি কেউ কারও মতলবের বিপক্ষে বলে তবে মতলবওয়ালা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে এবং কোন না কোনরূপে এর শোধ নিতে চায়। মোট কথা, কাছে বসা এবং মতলবের কথা বলা থেকে হিংসার উৎপত্তি। এ কারণেই এক ব্যক্তি এক শহরে এবং অন্য ব্যক্তি অন্য শহরে বাস করলে তাদের মধ্যে হিংসা হয় না। এমনকি, দূরবর্তী দু'মহল্লায় বাস করলেও হিংসা হয় না। তবে এক মজলিস, এক মাদ্রাসা, এক মসজিদ অথবা এক বাজারে একত্রিত থাকলে এবং একই মতলবের দাবীদার হলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হিংসা হয়। এ জন্যেই আলেম ব্যক্তি আলেমের সাথে হিংসা করে– মুজাহিদের সাথে করে না। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর সাথে হিংসা করে– মুচির সাথে করে না। কেননা, তারা এক পেশায় একত্রিত নয়। এই একই কারণে মানুষ তার ভাই ও চাচাত ভাইয়ের সাথে অন্যের তুলনায় বেশী হিংসা করে। দুই সতীন পরস্পরে শাশুড়ী ও ননদের তুলনায় বেশী হিংসা করে। মোট কথা, যেখানেই দু'ব্যক্তির মতলব এক হবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমাবেশ ও উঠাবসা হবে, সেখানেই হিংসা বেশী হবে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, হিংসার যত কারণ রয়েছে, সবগুলোর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। কেননা, দুনিয়ার বস্তুসমূহ অংশীদারদের জন্যে যথেষ্ট হয় না। একজনের কাছে গেলে অন্যজনের হাত খালি থেকে যায়, কিন্তু আখেরাতের বস্তুসমূহের মধ্যে কোন অভাব অনটন নেই। সেগুলোর ধারণ ক্ষমতা অপরিসীম। অংশীদার যতই হোক, বস্তুর কমতি নেই; বরং বিদ্যার মত "যতই করবে দান ততই যাবে বেড়ে।" সুতরাং যে কেউ আল্লাহর মারেফত অর্জন করে, সে তাতে অন্যের সাথে হিংসা করে না। কারণ, মারেফতে কোন কমতি নেই যে, একজন সাধক যে হাল জেনে নেয়, অন্যজন তা জানতে পারবে না; বরং লাখো সাধক একটি হাল জেনেই আনন্দিত হয় এবং স্বাদ গ্রহণ করে। একজনের আনন্দে অন্যজন অন্তরায় হয় না; বরং তাদের সংখ্যা যত বেশী হয়, স্বাদও তত বেশী হয়। এ কারণেই যাঁরা হক্কানী আলেম, তাঁদের মধ্যে হিংসা নেই। কারণ, তাঁদের মতলব হচ্ছে আল্লাহর মারেফত ও নৈকট্যলাভ। এগুলো হচ্ছে অতল সমুদ্র। হাঁ, এলেম দ্বারা আলেমদের উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে হিংসা দেখা দেবে। কেননা, ধন-সম্পদ এমন শরীরী বস্তু, যা একজনের থাকলে অন্যজনের থাকে না। আর প্রভাব প্রতিপত্তির মানে হচ্ছে অন্তরে স্থান করে নেয়া। যখন কারও অন্তরে একজন আলেমের স্থান হয়ে যাবে, তখন অপরের জন্যে স্থান থাকবে না অথবা হ্রাস পাবে। এটাই হবে শত্রুতা ও হিংসার কারণ।

হিংসার চিকিৎসা ঃ হিংসা অন্তরের বড় রোগসমূহের অন্যতম। প্রত্যেক আন্তরিক রোগের চিকিৎসা এলেম ও আমল দ্বারা হয়ে থাকে। হিংসা রোগের জন্যে যে এলেম উপকারী, তা একথা নিশ্চিতরূপে জানা যে, হিংসা হিংসাকারীর জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে আদি অন্ত ক্ষতিকর এবং যার সাথে সাথে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়া ও আখেরাতের কিছুই ক্ষতি হয় না; বরং উপকারই উপকার হয়। একথা জানার পর যদি কেউ নিজের দুশমন না হয়, তবে অবশ্যই হিংসা ত্যাগ করবে। হিংসার কারণে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হিংসাকারীর যে ধর্মীয় ক্ষতি হয়, তা হল, সে আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে না এবং যে নেয়ামত তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে বন্টন করেছেন তাকে খারাপ মনে করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহর তকদীরে রাযী না থাকার চেয়ে বড় গোনাহ্ ধর্মে আর কি হবে? তদুপরিহিংসার কারণে হিংসাকারী একজন মুসলমানের সাথে শুভেচ্ছামূলক ব্যবহার করে না। ফলে সে নবী ওলীগণের কাতার থেকে খারিজ হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। শয়তান, ইবলীস ও কাফেররা মুমিনদের অকল্যাণ কামনা করে। হিংসাকারী ব্যক্তিও অনুরূপ কাজ করার কারণে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। এসকল বিষয় হচ্ছে অন্তরের নষ্টামি, যা পুণ্য কর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন অগ্নি লাকড়ি খেয়ে ফেলে এবং পুণ্য কর্মের চিহ্ন এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন রাত দিনের চিহ্ন মুছে দেয়।

দুনিয়াতে হিংসাকারীর ক্ষতি হচ্ছে, সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও যন্ত্রণার মধ্যে থাকে। তার শত্রুদের প্রতি যতই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে, ততই তার অন্তর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শত্রুদের বিপদ যতই চলতে থাকে, ততই উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা তাকে গ্রাস করতে থাকে। সে বিমর্ষ ও বঞ্চিত সেজে চলাফেরা করে। সে তার শত্রুর জন্যে যে বিষয়টি কামনা করে, তাতে নিজেই পতিত হয়। তার বাসনা ছিল, শত্রু দুঃখ-কষ্টে পড়ুক; কিন্তু নিজেই দুঃখ যন্ত্রণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ যার সাথে হিংসা, তার নেয়ামতও বিনষ্ট হয় না। যদি কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের প্রতিও মানুষের ঈমান না থাকে, তবুও বুদ্ধিমানের জন্যে বুদ্ধিমত্তার দাবী এটাই যে, সে হিংসা থেকে বেঁচে থাকুক। আখেরাতের আযাবের প্রতি বিশ্বাস থাকলে তো হিংসা থেকে বেঁচে থাকা আরও উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তির সাথে হিংসা করা হয়, তার দ্বীন ও দুনিয়াতে হিংসার কারণে কোন ক্ষতি হয় না, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, হিংসার কারণে তার নেয়ামত বিলুপ্ত হয় না, হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা কারও জন্যে যে নেয়ামত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে। একে প্রতিহত করার উপায় নেই। এ কারণেই জনৈকা মহিলাকে শাসক হয়ে প্রজাদের উপর জুলুম করতে দেখে যখন একজন পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলেন, তখন এরশাদ হয় ঃ আমি আদিকালে যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছি, তাতে পরিবর্তন হতে পারে না। যে পরিমাণ সৌভাগ্য ও পদমর্যাদা এই মহিলার জন্য লেখা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার যদি খারাপ লাগে, তবে তার সম্মুখ থেকে চলে যাও। মোট কথা, যখন হিংসার কারণে নেয়ামত দূর হয় না,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন যার হিংসা করা হয়, তার দুনিয়াতে আর কি ক্ষতি হবে এবং আখেরাতেই তার কি গোনাহ্ হবে! যদি হিংসার কারণেই নেয়ামত দূর হয়ে যেত, তবে দুনিয়াতে কারও কাছে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত থাকত না; ঈমানের নেয়ামতও কেউ লাভ করতে পারত না। কেননা, কাফেররা তো ঈমানের উপরই মুসলমানদের সাথে হিংসা করে যেমন কোরআন বলে ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم -

গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেরই বাসনা, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমানের পরে কাফের বানিয়ে দিতে পারে! এটা তাদের তরফ থেকে হিংসার কারণে।

সুতরাং যদি কেউ কামনা করে, তার হিংসার কারণে অপরের নেয়ামত বিলুপ্ত হোক, তবে সে যেন এটা চায়, কাফেরদের হিংসার কারণে তার ঈমানরূপী নেয়ামত বিলুপ্ত হোক। অন্যান্য নেয়ামতের বেলায়ও এরূপ বুঝা দরকার।

এ পর্যন্ত এলেম দ্বারা হিংসা রোগের চিকিৎসার কথা বলা হল। এখন আমল দ্বারা চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে।

হিংসা যা দাবী করে কথায় কাজে তার খেলাফ করতে হবে। উদাহরণতঃ হিংসা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বর্ণনা করার দাবী করে, তবে মনের উপর জোর দিয়ে মুখে তার প্রশংসা করবে। আর যদি হিংসার কারণে অহংকার করতে মনে চায়, তবে জোরপূর্বক বিনীত ও নম্র ব্যবহার করবে। যদি হিংসা দান না করতে প্ররোচিত করে, তবে পূর্বে যেরূপ দান করা হত তার চেয়ে বেশী পরিমাণে দেয়ার অভ্যাস করবে। যখন মনের উপর জোর দিয়ে চেষ্টা সহকারে এসব কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানবে, তখন সে খুশী হয়ে যাবে এবং মহব্বত করতে শুরু করবে। তার পক্ষ থেকে মহব্বত হলে হিংসাকারীও মহব্বত করতে বাধ্য হবে। পারস্পরিক এই ঐক্য ও মহব্বতের কারণে হিংসার বীজ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শয়তান হিংসাকারীকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তুমি বিনয় ও প্রশংসা করলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে, বিপজ্জনক অথবা কপট প্রতিপন্ন হবে। মানুষের উচিত শয়তানের এহেন প্রতারণায় না পড়া; বরং জানা দরকার, সদ্ব্যবহার জোরপূর্বক হোক কিংবা স্বভাবগতভাবে হোক– উভয়পক্ষের শত্রুতা নির্মূল করে দেয়, হিংসার দাঁত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভেঙ্গে যায় এবং অন্তর সম্প্রীতি ও মহব্বতের দিকে ফিরে আসে। হিংসার এই চিকিৎসাটি খুবই উপকারী। কারণ, এটা অত্যধিক তিক্ত। যে ব্যক্তি ওষুধের তিক্ততায় সবর করে না, সে আরোগ্য লাভের মিষ্টতা আস্বাদন করে না।

যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব ঃ জানা উচিত, কষ্টদাতার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্রোধ হয়। উদাহণতঃ যদি তোমাকে কেউ কষ্ট দেয়, তবে তুমি তার প্রতি শত্রুতা না রাখ, অথবা সে কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে তুমি তা খারাপ মনে না করা সম্ভব হবে না। তার ভাল-মন্দ উভয় অবস্থায় তোমার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই হবে। এদিকে শয়তানও তোমাকে সর্বদা হিংসার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকবে। যদি হিংসার প্রেরণা প্রবল হয়ে যায় এবং তোমার ইচ্ছাকৃত কথা ও কাজে তা প্রকাশ পেতে থাকে, তবে তুমি হিংসাকারী ও পাপী সাব্যস্ত হবে। আর যদি তুমি তোমার বাহ্যিক অবস্থাকে এসব বিষয় থেকে বিরত রাখ, কিন্তু অন্তরে তার নেয়ামর বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর এবং একে খারাপও মনে না কর, তবুও তুমি হিংসাকারী ও গোনাহগার হবে। কেননা, হিংসা অন্তরের একটি অবস্থাকে বলা হয়। হিংসার কারণে যেসকল কাজ প্রকাশ পায়, যেমন গীবত, মিথ্যাচার ইত্যাদি, সেগুলো সাক্ষাৎ হিংসা নয়। হিংসার স্থান অন্তরই- বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গে নয়। হাঁ পার্থক্য হচ্ছে, যে হিংসা কেবল অন্তরেই থাকে এবং বাহ্যিক কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মে প্রকাশ পায় না, তাতে বান্দার কোন হক থাকে না যে, ক্ষমা করিয়ে নেয়া ওয়াজিব হবে; বরং এই প্রকার হিংসার কারণে হিংসাকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কাছে গোনাহ্গার সাব্যস্ত হয়। হিংসার কারণাদি যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠে, সেখানেই কেবল মাফ করিয়ে নেয়া ওয়াজিব হয়।

এখন যদি কেউ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার পর অন্তর দিয়ে নেয়ামতের বিলুপ্তি কামনাও খারাপ মনে করে, তবে এটা বিবেকের পক্ষ থেকে হবে; অর্থাৎ স্বভাবের দিক থেকে নেয়ামত বিলুপ্তির যে খাহেশ পাওয়া যাবে, বিবেক তা বদলে দেবে। মানুষ দুনিয়ার আনন্দ জালে জড়িত থাকলে স্বভাবকে এভাবে বদলে দেয়া অসম্ভব। হাঁ, যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত থাকে এবং তাঁর এশকের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যায়, তবে এটা সম্ভব। এমতাবস্থায় সে মানুষের পৃথক পৃথক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। সকলকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের ক্রিয়াকর্মকে আল্লাহর ক্রিয়াকর্ম মনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে। এ অবস্থা কারও অর্জিত হলেও সার্বক্ষণিক হয় না। বিদ্যুতের মত এসে মুহূর্তের মধ্যে উবে যায়। এরপর অন্তর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অভিশপ্ত শয়তান পুনরায় তার মনে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করতে থাকে। যদি কেউ এই বিতাড়িত শয়তানের মোকাবিলায় বিবেকের জোরে তার কথা অপছন্দ করে, তবে সে নিজের উপর ওয়াজিব কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলে।

কেউ কেউ বলেন ঃ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিংসা প্রকাশ না পেলে গোনাহ্ হয় না। হযরত হাসানকে কেউ হিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ হিংসা গোপন রাখা উচিত। এতে কোন ক্ষতি হবে না। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত হাসান থেকে 'মওকুফ' (তাঁর উক্তি) এবং 'মরফু' (রসূলুল্লাহর উক্তি) উভয় প্রকারে বর্ণিত আছে-

ثَلَاثَةٌ لَايَخْلُو مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدِ اَنْ لَّايَبْتَغِيْ -

তিনটি বিষয় থেকে কোন মুমিন মুক্ত হয় না; কিন্তু তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ আছে। হিংসা থেকে নিষ্কৃতির পথ হচ্ছে সীমালঙ্ঘন না করা।

কিন্তু এর অর্থ তাই নেয়া উত্তম যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি; অর্থাৎ অন্তরে হিংসা থাকা অবস্থায় তা খারাপ মনে করতে হবে এবং এ কারণেই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সারকথা, মানুষ যদি কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করে এবং বাইরে তার কোন প্রভাব না থাকে, তবে এ ধরনের হিংসা যে গোনাহ তাতে মতভেদ আছে। আয়াত ও হাদীস দ্বারা তাই জানা যায়, যা আমরা লিপিবদ্ধ করেছি।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল- শত্রুর সাথে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়ে থাকে- (১) স্বভাবের দাবী অনুযায়ী শত্রুর অমঙ্গল চাওয়া; কিন্তু বিবেক দ্বারা এই অমঙ্গল চাওয়াকে খারাপ মনে করা এবং নিজের প্রতি রাগ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই মাফ। কেননা মানুষের ক্ষমতায় এর বেশী কিছু নেই। (২) অন্তরে শত্রুর নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার বাসনা রাখা এবং তার অমঙ্গলের মুখে অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই নিষিদ্ধ। (৩) কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করা, বাহ্যিক অঙ্গে তা প্রকাশ না পাওয়া; কিন্তু একে খারাপ মনে না করা। এই প্রকার হিংসার বৈধতায় মতভেদ আছে।

॥ সমাপ্ত ॥

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com
www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল ঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদকঃ মাসিক মদীনা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা আবদুল আজীজ (রহঃ)

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা : ৫৫/বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন–(চতুর্থ খণ্ড)

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

প্রকাশক :

মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে

মোর্তজা বশীর উদ্দীন খান

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ :

রবিউল আওয়াল : ১৪১১ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ :

সফর ঃ ১৪২০ হিজরী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ

রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২৩ হিজরী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ

জমাদিউস্‌সানী ঃ ১৪২৫ হিজরী

ভাদ্র ঃ ১৪১১ বাংলা

আগষ্ট ঃ ২০০৪ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ :

অরণি কম্পিউটার্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :

মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস্‌

৫৫/বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই :

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা

ISBN- 984-8367- 77-0

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালীর (রহঃ) (৪৫০হিঃ—৫০৫ হিঃ) রচিত অমর গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। প্রায় নয় শ' বছর আগে এ মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে সমভাবে পঠিত ও সমাদৃত। মানব রচিত দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হওয়ার নযীর আছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রাঃ) মহান আল্লাহর নিকট কতটুকু মকবুলিয়ত অর্জন করেছিলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোই তা প্রমাণ করে। এ মহান সাধক সম্পর্কে অনেক মনীষীরই মন্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি আশ্চর্য মু'জেযা বিশেষ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের উম্মত যাতে গোমরাহ না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন যেসব লোক সৃষ্টি করবেন বলে হাদীস শরীফে সুসংবাদ রয়েছে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন তারই অন্যতম বাস্তব নমুনা।

'এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন' অর্থ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের নবজীবন দান। কিতাবখানি তার নামের কতটুকু সার্থকতা দান করেছে, সেকথা ব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন করে না।

'এহইয়ার' অনেকগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ-টীকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোক অবশ্য এ মহান গ্রন্থের সমালোচনাও করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ইমাম সাহেব এ গ্রন্থে যে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো কোন্

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিতাব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা যেমন লিখেননি, তেমনি কোন সনদ বা বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করেন নি। ফলে, হাদীসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রকাশভঙ্গী ওয়ায়েজসুলভ, তাঁর আগে কেউ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ধারা অবলম্বন করেননি। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকটা গাম্ভীর্য হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গাযযালী (রহঃ) নিজেই ছিলেন একজন স্বীকৃত ইমাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সনদসূত্র ছিল। তাঁর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আল্লামা জোয়াইনী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সে সূত্রটি ছিল এতই প্রসিদ্ধ যে, প্রতিটি হাদীসের সাথে সে বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী (রহঃ) যে অনন্য রীতিটি অবলম্বন করেছেন এটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। পূর্ববর্তী রচনাশৈলীর সাথে এর মিল না থাকাটা বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত নয় নিশ্চয়ই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম গায্যালীর (রহঃ) পুস্তক পৃথিবীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটিরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদ দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। বাংলা ভাষায় এহইয়ার অনুবাদ ইতিপূর্বেই হয়েছে। তারপরও আমি কেন পুনরায় এ মহাগ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিলাম, সে কৈফিয়ত দিতে চাই না। বিজ্ঞ পাঠকগণই তা অনুভব করতে পারবেন। তাছাড়া, মুসলিম জনগণের নিত্যপাঠ্য এ মহাগ্রন্থটির প্রচার-প্রসার যত বেশী হয়, ততই সেটা কল্যাণকর বলে আমার ধারণা।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি, সে বিচারও পাঠকগণই করবেন।

আল্লাহর রহমতে গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর কাজও চলছে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সেগুলোও পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত কারণে আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করতে পারি না। তাছাড়া, আমার শক্তিও তো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুবাদ বা মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজ্ঞজনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে দরদের সাথে জানিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। এতদসঙ্গে সকলের দোয়া চাই, আল্লাহ পাক যেন অনুগ্রহ করে অবশিষ্ট খণ্ডগুলোও দ্রুত সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
যশ ও রিয়া	১৫
রিয়ার উৎপত্তিস্থল ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	১৬
খ্যাতিহীনতার ফযীলত	১৮
যশপ্রীতির নিন্দা	২১
যশের মহব্বতে ভাল ও মন্দ বিষয়াদি	২৩
মন আপন প্রশংসায় আনন্দিত ও নিন্দায় নিস্পৃহ হয় কেন	২৬
যশখ্যাতির চিকিৎসা	২৮
প্রশংসার চিকিৎসা	৩১
নিন্দাকে ঘৃণা করার চিকিৎসা	৩৩
রিয়ার নিন্দা	৩৪
রিয়ার স্বরূপ	৩৭
রিয়ার বিভিন্ন স্তর	৩৯
পিপীলিকার চলনের চেয়েও গোপন রিয়া	৪৩
গোপন ও প্রকাশ্য রিয়ার মধ্যে যেগুলো বাতিল	৪৬
কোন কোন স্থানে এবাদত প্রকাশ করা জায়েয	৫০
রিয়ার ভয়ে সৎকর্ম বর্জন করা	৫৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
অহংকার ও আত্মপ্রীতি	৬৪
অহংকারের নিন্দা	৬৪
কাপড় ঝুলিয়ে অথবা সদর্পে চলা	৬৮
বিনয়	৭০
অহংকারের স্বরূপ ও তার লাভ-লোকসান	৭৪
যার সাথে অহংকার করা হয় তার স্তর এবং অহংকারের ফল	৭৭

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়	পৃষ্ঠা
অহংকারের কারণসমূহ	৮২
অহংকারের প্রতিকার ও বিনয় অর্জনের উপায়	৮৭
আত্মপ্রসাদ ঃ আত্মপ্রসাদের নিন্দা	৯৩
আত্মপ্রসাদের ক্ষতি	৯৬
আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ	৯৭
আত্মপ্রসাদের প্রতিকার	৯৮

তৃতীয় অধ্যায়

বিভ্রান্তি	১০২
বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ	১০৩
বিভ্রান্তদের প্রকার চতুষ্টয়	১১৫
শিক্ষিতদের বিভ্রান্তি	১১৫
সংসারত্যাগী ও এবাদতকারীদের বিভ্রান্তি	১২৩
সুফীগণের বিভ্রান্তি	১২৫
বিত্তশালীদের বিভ্রান্তি	১২৭

চতুর্থ অধ্যায়

তওবা	১৩৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

তওবার স্বরূপ	১৩৮
তওবার ফযীলত ও আবশ্যকতা	১৩৯
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তওবা অপরিহার্য	১৪৫
শর্তসহ তওবা কবুল হয়	১৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সকল গোনাহ থেকে তওবা করা হয়	১৫৯
বান্দার দোষ ও গুণের দিক দিয়ে গোনাহের প্রকারভেদ	১৫৯
জান্নাত ও দোযখের স্তর ও পুণ্যের স্তরের উপর নির্ভরশীল	১৬৯
সগীরা গোনাহ কিরূপে কবীরা হয়ে যায়	১৭৬

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
পূর্ণাঙ্গ তওবা ও তার শর্তাবলী	১৮১
তওবার ব্যাপারে মানুষের স্তরভেদ	১৯৩
তওবাকারীর গোনাহ হয়ে গেলে কি করবে	১৯৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার	২০৪
পঞ্চম অধ্যায়	
সবর ও শোকর	২২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সবর	২২৫
সবরের বিভিন্ন নাম	২৩২
সবরের প্রকারভেদ	২৩৩
সর্বাবস্তায় সবরের প্রয়োজনীয়তা	২৩৬
সবর লাভ করার উপায়	২৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
শোকর	২৫০
শোকরের সংজ্ঞা ও স্বরূপ	২৫৪
আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে শোকরের অর্থ	২৫৯
আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য	২৬২
নেয়ামতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ	২৬৫
শোকরে গাফলতির কারণ	২৬৯
যেসব বিষয়ে সবর ও শোকর পরস্পর জড়িত	২৭৪
সবর ও শোকরের মধ্যে কোনটি উত্তম	২৮৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	
খওফ ও রিজা (ভয় ও আশা)	২৯১

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়	পৃষ্ঠা
রিজা	২৯২
রিজার ফযীলত	২৯৭
রিজা লাভের উপায়	৩০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খওফ	৩১১
খওফের স্তর	৩১৩
খওফের ফযীলত	৩১৫
খওফের প্রবলতা ও রিজার প্রবলতার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম	৩২৩
খওফ অর্জন করার উপায়	৩২৬
মন্দ অন্তিম মুহূর্ত	৩২৮
পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের খওফ	৩৩৩
সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে খওফের প্রাবাল্য	৩৩৫

সপ্তম অধ্যায়

ফকর ও যুহদ (দারিদ্র্য ও সংসারবিমুখতা	৩৪৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

দারিদ্রের স্বরূপ ও ফযীলত	৩৪৯
দারিদ্রের ফযীলত	৩৫২
সত্যবাদী অল্পেতুষ্ট লোকদের দারিদ্র	৩৬২
ধনাঢ্যতার বিপরীতে দ্রারিদ্র্যতার ফযীলত	৩৬৫
ফকীরের আদব	৩৭১
অযাচিতভাবে কিছু এলে ফকির কি করবে	৩৭৩
প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করার অবৈধতা এবং অভাবী ব্যক্তির জন্যে সওয়ালের আদব	৩৮০
সওয়াল করা হারাম	৩৮৭
সত্যাশ্রয়ী ফকীরগণের অবস্থা	৩৮৯

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুহদ ৩৯২
যুহদের স্তর ৪০৫
জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে যুহদের সীমা ৪১৩
যুহদের আলামত ৪২৬

অষ্টম অধ্যায়

দুনিয়ার নিন্দা ৪২৯
হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ৪৩৭
দুনিয়ার অবস্থা ৪৪২
বান্দার জন্য দুনিয়ার অবস্থা ৪৫১
যে সকল কারণে মানুষ নিজেকে ও স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়েছে ৪৬৪

নবম অধ্যায়

কৃপণতার নিন্দা ও ধন-সম্পদের মহব্বত ৪৭২
ধন-সম্পদের নিন্দা ৪৭৩
ধন-সম্পদের সংজ্ঞা এবং তার প্রশংসা ও নিন্দা ৪৭৭
ধন-সম্পদের বিপদাপদ ও উপকারিতা ৪৭৯
লোভ-লালসার নিদা এবং অল্পে তুষ্টির প্রশংসা ৪৮২
লোভ-লালসার প্রতিকার এবং অল্পে তুষ্টি অর্জনের উপায় ৪৮৪
দানশীলতার ফযীলত ৪৮৮
কৃপণতার নিন্দা ৪৯৯
আত্মত্যাগ ও তার ফযীলত ৫০৩
দানশীলতা ও কৃপণতার স্বরূপ ৫০৮
কৃপণতার প্রতিকার কেমন করে সম্ভব ৫১২
ধন-সম্পদ সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা ৫১৫
প্রাচুর্যের নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা ৫১৭

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম অধ্যায়

যশ ও রিয়া

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَخْوَفَ عَلٰى أُمَّتِى الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ –

অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে আমি যেসব বিষয়ের আশংকা করি, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়াবহ বিষয় হল রিয়া ও গোপন খাহেশ। অন্ধকার রাত্রিতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিপীলিকা চলাচল করলে যেমন তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না, তেমনি এ গোপন খাহেশও অনুভূত হয় না। একারণেই এর বিপদ সম্পর্কে বড় বড় আলেমগণও জানতে পারেন না। যেনতেন আবেদ ও মুত্তাকীদের তো কথাই নেই। এটা নফসের বিনাশকারী শক্তি ও গোপন প্রতারণা। যেসকল আলেম ও আবেদ আখেরাতের পথ অতিক্রম করতে চায় এবং তজ্জন্যে খুব তৎপর হয়, তাদেরকে রিয়ায় লিপ্ত করা হয়। অর্থাৎ, তারা নিজের নফসকে মুজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে পরাভূত করে কামনা-বাসনা থেকে আলাদা করে নেয় এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে নেয়। এরপর নফসকে বলপূর্বক বিভিন্ন প্রকার এবাদতে মশগুল করে। ফলে, তাদের নফস বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোন বাহ্যিক গোনাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নফস যখন মুজাহাদার পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখে না, তখন এ পরিশ্রমের বিনিময়ে শান্তি, স্বস্তি ও আরামের অভিলাষী হয়। দুনিয়ার মানুষ যখন তাদেরকে মানতে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করে, তখন নফস এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে। এরপর তারা এলম, আমল ও এবাদত প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ভাল বলবেন কেবল এতেই তারা সবর করতে পারে না। তারা দেখে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে গেছে অমুক ব্যক্তি কামনা-বাসনা বর্জনকারী, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং কঠোর এবাদতের শ্রম স্বীকারকারী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা আরও দেখে, অনেক মানুষ তাদের তারীফ ও প্রশংসা করে, তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাদের সাক্ষাতকে বরকত মনে করে, তাদের থেকে দোয়া নিতে আগ্রহী হয়, দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করে, মজলিসের কেন্দ্রস্থলে আসন দেয়, সম্মুখে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং খেদমত ও অন্য কোন মতলবের কথা বললে তা করতে তৎপর হয়ে যায়। এ সব দেখে-শুনে তাদের নফস এমন আনন্দ পায়, যার উপরে কোন আনন্দ নেই। এ আনন্দের আতিশয্যে গোনাহ বর্জন করা তেমন কঠিন হয় না এবং অব্যাহতভাবে এবাদত করা খুব সহজ হয়ে যায়। তারা তো মনে করে যে, তাদের জীবন আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবাদতের জন্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন সেসব কামনা-বাসনা ও আনন্দের প্রত্যাশী হয়ে থাকে, যা সুস্থ বিবেক ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের সম্মান প্রদর্শনের কারণে যে আনন্দ তাদের অর্জিত হয়, তার দরুন এবাদত ও আমলের সমস্ত সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তাদের নাম মুনাফিকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং এটা নফসের এমন এক প্রতারণা, যা থেকে সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। রিয়া যখন এমন একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাধি এবং শয়তানের বড় ফাঁদ, তখন এর স্বরূপ, স্তর, প্রকারভেদ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি অবগত হওয়া একান্ত জরুরী। তাই নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

রিয়ার উৎপত্তিস্থল ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ঃ জানা উচিত যে, প্রকৃত পক্ষে খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় 'জাহ' তথা জাঁকজমক। এরূপ খ্যাতি শুভ নয়; বরং অখ্যাত এবং নাম-নিশানাশূন্য থাকা এরচেয়ে অনেক ভাল। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর দ্বীনকে প্রচার করার সুখ্যাতি দান করেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা-চরিত্রের কোন দখল না থাকে, তবে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত খ্যাতিতে কোন দোষ নেই। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

مِنَ الشَّرِّ اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ اَنْ يُشِيْرَ النَّاسُ
اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِىْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ-

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, 'অনিষ্টের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, মানুষ কারও দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার কথা স্বতন্ত্র।'

হযরত হাসান (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলে লোকেরা তাঁকে বলল ঃ হে আবু সায়ীদ! আপনাকে দেখে মানুষ আপনার প্রতিও অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে। তিনি বললেন ঃ এ হাদীসে এ ইশারা বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য হলো ধর্মে কোন কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করার কারণে যদি কারও দিকে ইশারা করা হয় অথবা নতুন পাপাচার আবিষ্কার করার কারণে ইশারার পাত্র হয়ে গেলে তা অনিষ্টকর। মোটকথা, তিনি হাদীসটির এমন ব্যাখ্যা দিলেন, যাতে কোন দোষ নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ব্যয় কর, খ্যাত করো না এবং নিজের অস্তিত্বকে বাড়িয়ে উপস্থিত করো না— যাতে মানুষ তোমাকে চিনে ফেলে এবং স্মরণ করে; বরং নিজেকে গোপন কর এবং চুপ থাক। এতে মুক্তি নিহিত রয়েছে। ধার্মিক লোকেরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং পাপাচারীরা জ্বলে-পুড়ে মরবে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ যে খ্যাতিকে ভাল মনে করে, সে আল্লাহকে চিনে না। হযরত আইউব সখতিয়ানী বলেন ঃ যে পর্যন্ত কেউ তার বাসগৃহ মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকাকে পছন্দ না করবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সত্যায়ন হয় না। খালেদ ইবনে মে'দানের ওয়াযের মজলিসে যখন অনেক লোক হয়ে যেত, তখন তিনি খ্যাতির ভয়ে মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন। আবুল আলিয়ার কাছে তিনজনের বেশী লোক সমাগম হলেই তিনি প্রস্থান করতেন। হযরত তালহা (রাঃ) একবার দেখলেন, তাঁর সাথে প্রায় দশজন লোক হেঁটে চলেছে। তিনি বললেন ঃ এরা লালসার মাছি এবং দোযখের ফড়িং। হযরত সোলায়মান ইবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উবাই ইবনে কা'বের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ হযরত উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হল। তিনি দোররা নিয়ে তেড়ে আসলেন। হযরত কা'ব আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি করছেন? একটু ভেবে দেখুন! তিনি বললেন ঃ যেরূপ সাড়ম্বরে তুমি গমন করছ, সেটা তাবেয়ীদের জন্যে ভ্রষ্টতার পথ এবং তোমার জন্যে পরীক্ষা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একদিন গৃহ থেকে বের হলে অনেক লোক তাঁর পেছনে চলতে লাগল। তিনি তাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা আমার পেছনে আসছ কেন? আল্লাহর কসম, যে কারণে আমি আমার গৃহের দরজা বন্ধ রাখি, তা যদি তোমাদের জানা হয়ে যায়, তবে দুটি লোকও আমার সাথে চলবে না।

হযরত হাসান একদিন বাড়ী থেকে বের হলে লোকজন তাঁর পিছনে চলতে লাগল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকলে ভাল, নতুবা আশ্চর্য নয় যে, এ পিছনে চলা ঈমানদারদের অন্তরে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না। অর্থাৎ এতে আল্লাহর মারেফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনে মাজরিযের সাথে সফরে গেল। অতঃপর তার কাছ থেকে আলাদা হওয়ার সময় আরয করল ঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ সম্ভবপর হলে এটা কর ঃ তুমি অপরকে চিনবে, কেউ যেন তোমাকে না চিনে। পথ চলার সময় কেউ যেন তোমার সাথে না থাকে। তুমি অপরকে জিজ্ঞেস করবে, কেউ যেন তোমাকে জিজ্ঞেস না করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি আবু কেলাবের সঙ্গে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি অনেক পোশাক পরিহিত হয়ে সেখানে এল। তিনি বললেন ঃ এই বাকশক্তিশীল গাধা থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ খ্যাতি অন্বেষণ করো না।

হযরত ছওরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ দুটি খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতেন— একটি উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদের খ্যাতি এবং অপরটি ছিন্ন ও পুরাতন পোশাকের খ্যাতি। কেননা, উভয় পোশাকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সমভাবে নিবদ্ধ হয়। বিশর (রহঃ) বলেন ঃ খ্যাতি পছন্দ করেছে এবং ধর্ম বরবাদ হয়নি এরূপ ব্যক্তি আমার জানা নেই। তিনি আরও বলেন ঃ যে খ্যাতি কামনা করে, সে আখেরাতের স্বাদ পায় না।

খ্যাতিহীনতার ফযীলত ঃ বারা ইবনে' মালেক ও ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ অনেক বিক্ষিপ্তকেশী ধূলিধূসরিত চাদরওয়ালা লোক রয়েছে, যাদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। অথচ যদি তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তবে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেন। যদি বলে, ইলাহী! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি, তবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতই দিবেন এবং দুনিয়াতে কিছু দেবেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জান্নাতী তারাই— যাদের কেশ এলোমেলো এবং পোশাক দুটি মাত্র চাদর। যদি তারা শাসকদের কাছে যেতে চায়, তবে কেউ যেতে দেয় না। বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে কেউ তাদের প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের অভাব-অনটন তাদের বুকের মধ্যেই ঘুরাফেরা করে। কিয়ামতে তাদের নূর বন্টন করা হলে সমস্ত মানুষের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, মুয়ায ইবনে জাবল (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাযারের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে মুয়ায বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সামান্য রিয়াও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এমন আত্মগোপনকারী মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন— যারা উধাও হয়ে গেলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, আর সম্মুখে এলে কেউ তাদেরকে চিনে না। তারা হেদায়াতের প্রদীপ।

মোহাম্মদ ইবনে সুয়ায়দ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার মদীনা মুনাওয়ারায় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনৈক সাধু ব্যক্তি মসজিদে নববীতেই থাকত এবং দোয়া করত। একদিন সকলেই দোয়ায় রত ছিল, এমন সময় জনৈক পুরাতন ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি আগমন করল। সে এসে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়ল এবং হাত তুলে দোয়া করল ঃ ইলাহী! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি– এই মুহূর্তেই বৃষ্টিবর্ষণ কর। লোকটির দোয়া শেষ করে হাত নামানোর আগেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে এত বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, মদীনার লোকজন ডুবে যাওয়ার আশংকায় ফরিয়াদ করতে লাগল। এরপর লোকটি আরয করল ঃ ইলাহী! যদি তুমি মনে কর যে, এই পরিমাণ পানি তাদের জন্যে যথেষ্ট, তবে বৃষ্টি থামিয়ে দাও। তখনি বৃষ্টি থেমে গেল। এরপর লোকটি সেই সাধু ব্যক্তির পেছনে পেছনে চলল এবং তার গৃহের সন্ধান করে ভোরেই তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খেদমতে গিয়ে বলল ঃ আমি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তা এই যে, আপনি আমার জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করুন। সাধু ব্যক্তি বলল ঃ সোবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে দোয়া করতে বলছ! তোমার অবস্থা তো কালই জানতে পেরেছি। এখন বল এই মর্তবা তুমি কিরূপে লাভ করলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেছি। তাই আমি তাঁর কাছে যে প্রার্থনা করেছি, তিনি তা কবুল করেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হে লোক সকল! জ্ঞানের ঝরণা এবং হেদায়াতের প্রদীপ হও। নিজ নিজ ঘরে বসে থাক। পুরাতন বস্ত্র পরিধান কর, যাতে আকাশের বাসিন্দারা তোমাদেরকে চিনে এবং পৃথিবীর লোক না চিনে। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِي عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْمَحَاذِ وَحَظٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاَطَاعَ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ ثُمَّ صَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ

অর্থাৎ, 'আমার ওলীদের মধ্যে সেই মুমিন ব্যক্তি অধিকতর ঈর্ষার যোগ্য, যে নিজের উপর পরিবার-পরিজনের বোঝা কম রাখে, নামাযে অংশগ্রহণ করে, পরওয়ারদেগারের এবাদত করে এবং গোপনে আনুগত্য করে। সে মানুষের মধ্যে এত সুখ্যাত নয় যে, মানুষ তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। এরপর সে এ অবস্থায় সবর করে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি এমনভাবে থাকতে পার যে, তোমাকে কেউ না চিনে, তবে তাই কর। তোমাকে কেউ না চিনলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেউ তোমার প্রশংসা না করলেও কোন দোষ নেই। যদি তুমি মানুষের কাছে মন্দ হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ভাল হও, তবে এতেও কোন অনিষ্ট নেই।

উপরোক্ত হাদীস ও মনীষীর উক্তি থেকে খ্যাতির নিন্দা এবং খ্যাতিহীনতার ফযীলত পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। খ্যাতির আসল লক্ষ্য হচ্ছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জাঁকজমক তথা মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠা করা। এটা অনর্থের মূল। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পয়গম্বরগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামগণ সর্বাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তাঁদের খ্যাতির চেয়ে অধিক খ্যাতি আর কি হবে? অতএব, তাঁরা খ্যাতিহীনতার ফযীলত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। এর জওয়াব এই যে, যে খ্যাতি অর্জন করে নেয়া হয়, তাই মন্দ। কিন্তু কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ছাড়া যে খ্যাতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, তা নিন্দনীয় নয়।

যশপ্রীতির নিন্দা ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থাৎ, 'আখেরাতের সে গৃহ আমি তাদেরকে দান করব— যারা পৃথিবীতে উচ্চ হওয়ার এবং গোলযোগ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে না।'

এই আয়াতে দুটি ইচ্ছাকে একত্রিত করা হয়েছে— একটি উচ্চ হওয়ার ইচ্ছা এবং অপরটি গোলমাল সৃষ্টি করার ইচ্ছা। এরপর বলা হয়েছে, আখেরাত তার জন্যেই, যে উভয় প্রকার ইচ্ছা থেকে মুক্ত। অন্য আয়াতে আছে—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَايُبْخَسُوْنَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি তার আমল দুনিয়াতে পুরাপুরি দিয়ে দেই এবং তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাদের জন্যে আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছুই নেই।' (সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬

এই আয়াতও তার ব্যাপকতার মধ্যে জাঁকজমকপ্রীতিকে অন্তর্ভুক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছে। কেননা, এটা পার্থিব জীবনের সকল আনন্দের চেয়ে বড় এবং সকল সাজসজ্জার চেয়ে অধিক। হাদীসে বলা হয়েছে—

حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

অর্থাৎ, 'ধনসম্পদ ও জাঁকজমকের মোহ অন্তরে এমনভাবে মোনাফেকী উৎপন্ন করে, যেমন বৃষ্টির পানি শাক-সবজিকে উৎপন্ন করে।'

আরও বলা হয়েছে, দুটি বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে এতটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু ক্ষতি করে গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ মুসলমান ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতার। হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, খেয়াল খুশী ও প্রশংসাপ্রীতির কারণেই মানুষ ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া এই, তিনি আপন কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

জানা উচিত যে, 'মাল' ও 'জাহ' হচ্ছে দুনিয়ার দুটি স্তম্ভ। 'মাল' মানে উপকারী বস্তুসমূহের মালিক হওয়া এবং 'জাহ' বলা হয় সেইসব অন্তরের মালিক হওয়াকে, যাদের কাছ থেকে সম্মান ও আনুগত্য কামনা করা হয়। মালদার ও ধনী সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে টাকা-পয়সার ক্ষমতা রাখে এবং এর মাধ্যমে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্য, খাহেশ ও মানসিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে পারে। এমনিভাবে 'যশশীল' তথা প্রভাবশালী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মানুষের অন্তরকে এমনভাবে বশীভূত করে নেয় যে, তাদের দ্বারা যে কোন মতলব যথেচ্ছ সিদ্ধ করতে পারে। অর্থসম্পদ যেমন বিভিন্ন প্রকার পেশা ও কারিগরি দ্বারা অর্জন করা হয়, তেমনি মানুষের অন্তরও বিভিন্ন প্রকার কাজ-কারবারের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়। অন্তর যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে অমুক বিষয়ের পূর্ণতাগুণ রয়েছে, তখন অন্তর তার বশীভূত হয়ে যায়। এখানে সেই গুণটি বাস্তবেও পূর্ণতাগুণ হওয়া শর্ত নয়, বরং ব্যক্তির মতে ও তার বিশ্বাসে পূর্ণতাগুণ হওয়াই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে অন্তর এমন বিষয়কেও পূর্ণতাগুণ বলে বিশ্বাস করে— যা বাস্তবে পূর্ণতাগুণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়; কিন্তু অন্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সেটাকে পূর্ণতাগুণ বলে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয়। এ কারণেই অন্তর তার অনুগত হয়ে যায়। কেননা, আনুগত্য হচ্ছে অন্তরের একটি অবস্থা— যা বিশ্বাসের অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং যেমন বিশ্বাস হবে, তেমনি অবস্থা দেখা দেবে।

যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত পোষণ করে, সে যেমন চায় যে, তার কাছে বাঁদী-গোলাম থাকুক, তেমনি যশপ্রিয় ব্যক্তিও চায়, সকল মানুষ তার গোলামী করুক এবং তাদের অন্তরের উপর তার সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক; বরং যশপ্রিয় ব্যক্তি যা চায়, তা আরও বেশী। কেননা, সম্পদশালী ব্যক্তি বলপূর্বক বাঁদী-গোলামের মালিক হয়। বাঁদী-গোলামরা মন থেকে কোন সময় কারও ক্রীতদাস হতে চায় না। কিন্তু যশপ্রিয় ব্যক্তির আনুগত্য মানুষ সানন্দে গ্রহণ করে। স্বাধীন ব্যক্তি নিজের মনের আগ্রহে তার গোলাম হয় এবং তার গোলামী ও আনুগত্যকে গর্বের বিষয় মনে করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'জাহ' শব্দের অর্থ মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া; অর্থাৎ অন্তরে কোন ব্যক্তির কোন পূর্ণতা গুণের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। সুতরাং পূর্ণতার বিশ্বাস যে পরিমাণে হবে, সে পরিমাণেই আনুগত্য হবে এবং যে পরিমাণে আনুগত্য হবে, সে পরিমাণে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হবে। ক্ষমতা যত বেশী হবে, আনন্দ ও যশপ্রীতি তত অধিক হবে। এ পর্যন্ত 'জাহ' শব্দের অর্থ বর্ণিত হল। এখন এর ফলাফল দেখা উচিত।

যশ তথা প্রভাব-প্রতিপত্তির এক ফল হচ্ছে প্রশংসা কীর্তন করা। যে ব্যক্তি কারও পূর্ণতাগুণে বিশ্বাস করে, সে তার প্রশংসা করার ব্যাপারে চুপ থাকে না। প্রতিপত্তির আরেকটি ফল হচ্ছে খেদমত করা ও সাহায্য-সহায়তা করা। বিশ্বাসী ব্যক্তি আপন বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির খেদমত ও সাহায্যে নিয়োজিত রাখে এবং গোলামের ন্যায় তার অনুগত হয়ে থাকে। এছাড়া যশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম ফলাফল হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অগ্রণী মনে করা, তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং মজলিসে উত্তম জায়গায় বসানো।

যশের মহব্বতে ভাল ও মন্দ বিষয়াদি ঃ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যশের অর্থ হচ্ছে অন্তরসমূহের মালিক হওয়া ও তাদের উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্ষমতা বিস্তার করা। সুতরাং এর বিধানও ধন-সম্পদের মালিকানার বিধানের অনুরূপ। কেননা, যশও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য, যা মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেহেতু দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, তাই দুনিয়াতে উৎপন্ন বস্তু থেকেই আখেরাতের পাথেয় অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং পানাহার ও পোশাকের জন্যে যেমন সামান্য অর্থসম্পদ জরুরী, তেমনি মানুষের সাথে জীবন যাপনের জন্যেও অল্পবিস্তর যশ-খ্যাতির প্রয়োজন। খোরাক একটি অপরিহার্য বস্তু। প্রয়োজন পরিমাণে খোরাক সংগ্রহ করা অথবা খোরাক ক্রয় করার অর্থ সংগ্রহ করা এবং এগুলোকে প্রিয় মনে করা যেমন জায়েয, তেমনি খেদমতের জন্যে একজন খাদেম, সাহায্য-সহায়তার জন্যে একজন সফরসঙ্গী, পথ প্রদর্শনের জন্যে একজন ওস্তাদ এবং দুষ্ট লোকের অনিষ্ট ও যুলুম থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একজন শাসক থাকাও জায়েয। সুতরাং মালিকের এ বিষয়কে প্রিয় মনে করা যে, খাদেমের মনে তার এমন মাহাত্ম্য ও সম্মান থাকুক, যার কারণে সে খেদমত করতে উদ্বুদ্ধ হয় অথবা সফরসঙ্গীর অন্তরে এমন মর্যাদা থাকুক, যার কারণে সে সাহায্য থেকে বিরত না থাকে অথবা ওস্তাদের মনে এমন আসন থাকুক, যার কারণে সে উত্তমরূপে পদপ্রদর্শন করে অথবা শাসকের মনে এমন সম্মান থাকুক, যার কারণে সে অনিষ্ট দূরীকরণে সম্মত হয়– এসব বিষয়কে প্রিয় মনে করা নাজায়েয ও নিন্দনীয় নয়। কেননা, যশ ধনসম্পদের ন্যায় উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায়। উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

তবে এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত এই যে, স্বয়ং ধনসম্পদ ও যশ-খ্যাতিকে প্রিয় মনে করবে না; বরং এ সবের মহব্বতকে এরূপ মনে করবে, যেমন কারও ঘরে শৌচাগার রয়েছে এবং সে মলত্যাগের জন্যে এই শৌচাগার থাকাকে প্রিয় মনে করে। সে মনে করে, যদি তার মলত্যাগের প্রয়োজন না থাকে, তবে শৌচাগারের সাথেও তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ ব্যক্তিকে বাস্তবে পায়খানাকে মহব্বতকারী মনে করা হবে না। বরং এটা আসল লক্ষ্য অর্জনের উপায়কে মহব্বত করার নামান্তর।

এখন বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা দরকার। জনৈক ব্যক্তি তার বিবাহিত স্ত্রীকে একারণে মহব্বত করে যে, প্রয়োজনের সময় সে তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাথে সহবাস করে। যেমন মলত্যাগের জন্যে পায়খানাকে ভাল মনে করা হয়। যদি এই ব্যক্তির মধ্যে কামপ্রবৃত্তির তাড়না না থাকে, তবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে; যেমন মলত্যাগের প্রয়োজন না থাকলে কেউ পায়খানায় যায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ স্বয়ং স্ত্রীকেই ভালবাসে এবং তার রূপ লাবণ্যের জন্যে পাগলপারা থাকে। এমনকি, যদি কখনও সহবাস নাও হয়, তবু তাকে তালাক দিতে চায় না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত। প্রথম প্রকার মহব্বত মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যশখ্যাতি ও অর্থসম্পদের অবস্থাও তেমনি। এগুলো দ্বারা দৈহিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয় বলে এগুলোকে মহব্বত করলে কোন অনিষ্ট নেই। আর যদি স্বয়ং এগুলোকেই মহব্বত করা হয়—উদ্দেশ্য লাভের উপায় হোক বা না হোক, অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণকে মহব্বত করা হয়, তবে তা নিন্দনীয়। তবে এরূপ মহব্বতকারী ব্যক্তি ফাসেক ও গোনাহগার হবে না– যে পর্যন্ত এই মহব্বতের কারণে কোন গোনাহ্ না করে বসে অথবা ধনসম্পদ ও জাঁকজমক অর্জন করার জন্যে প্রতারণা, চক্রান্ত, মিথ্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন না করে। এগুলো অর্জন করার জন্যে কোন এবাদতকেও ওসীলা করা যাবে না। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করা ধর্ম মতে গোনাহ ও হারাম।

এখন বুঝা দরকার, খাদেম, সফরসঙ্গী, ওস্তাদ ও শাসকের মনে আসন প্রতিষ্ঠিত করার কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে কি না কিংবা যতদূর ইচ্ছা তাদেরকে ভক্তি করতে পারবে? এর ব্যাখ্যা এই যে, তিন উপায়ে অপরকে ভক্তি করা যায়। তন্মধ্যে দুটি উপায় বৈধ ও একটি অবৈধ। অবৈধ উপায় এই যে, অপরকে এমন গুণের ভক্ত করা, যা নিজের মধ্যে নেই। যেমন তাকে বলা—আমি সাধক, পরহেযগার অথবা সৈয়দ বংশীয়; অথচ সে কিছুই না। এটা মিথ্যা ও প্রতারণা হওয়ার কারণে হারাম। বৈধ উপায় দুটির মধ্যে একটি হল নিজে যে গুণে গুণান্বিত, সে গুণের উপযোগী মর্যাদা চাওয়া। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের শাসনকর্তাকে বলেছিলেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

এতে তিনি শাসনকর্তার অন্তরে নিজের হেফাযতকারী ও বিজ্ঞ হওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গুণ কামনা করেছিলেন। শাসনকর্তার এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজনও ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই উক্তি সঠিক ও সত্য ছিল। দ্বিতীয় উপায় হল, অপরের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের কোন দোষ অথবা গোনাহ গোপন রাখা। এটাও বৈধ। কেননা, পাপকর্ম গোপন রাখা জায়েয এবং প্রকাশ্যে বলা নাজায়েয। এছাড়া এতে কোন ধোকা নেই; বরং যে বিষয় জানার মধ্যে কোন ফায়দা নেই, তা না জানানো মাত্র।

অপরের সামনে উত্তমরূপে নামায আদায় করা, যাতে সে ভক্ত হয়ে যায়– এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা সরাসরি রিয়া ও প্রতারণা। অতএব, এভাবে জাঁকজমক জাহির করা হারাম।

মন আপন প্রশংসায় আনন্দিত ও নিন্দায় নিস্পৃহ হয় কেন ঃ জানা উচিত যে, চার কারণে অন্তর প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়। প্রথম কারণটি সর্বাধিক শক্তিশালী। তা এই যে, প্রশংসার কারণে মন জানতে পারে যে, সে পূর্ণতা গুণসম্পন্ন। কেননা, যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয়, তা প্রকাশ্য অথবা সন্দিগ্ধ গুণ হতে পারে। যদি গুণটি প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তবে আনন্দ কম হয়; যেমন কারও প্রশংসায় বলা হয়, সে দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেতকায়। এটা যদিও এক প্রকার পূর্ণতা-গুণ, কিন্তু মন এ থেকে গাফেল থাকে। ফলে সে মোটেই আনন্দ পায় না। তবে অপর ব্যক্তির বলার কারণে যখন তার চৈতন্যোদয় হয়, তখন কিছু না কিছু আনন্দ পায়। আর যদি প্রশংসার বিষয়টি সন্দিগ্ধ হয়, তবে আনন্দ অনেক বেশী হয়। যেমন কারও শিক্ষাদীক্ষা, পরহেযগারী অথবা রূপলাবণ্যের প্রশংসা করা। মানুষ প্রায়ই এসব গুণের ব্যাপারে সন্দিহান থাকে এবং কোন না কোনরূপে এই সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার বাসনা করতে থাকে। এরপর যখন অপরের মুখ থেকে এই ঈপ্সিত বক্তব্য শ্রবণ করে, তখন অসাধারণ আনন্দ অর্জিত হয়। এ কারণে অধিকতর আনন্দ তখন অর্জিত হয়, যখন এসব গুণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির মুখ থেকে এই প্রশংসা উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ কোন ওস্তাদ তার শাগরিদ সম্পর্কে বলে— তুমি বড় মেধাবী, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। এতে শাগরিদের মনে আনন্দ আর ধরে না। কিংবা খারাপ লাগারও কারণ এটাই। এতে মন তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে। ত্রুটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পূর্ণতার বিপরীত। সুতরাং পূর্ণতা যেমন প্রিয়, ত্রুটি তেমনি অপ্রিয় হয়ে থাকে। অপরের মুখ থেকে যখন নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হবে, তখন অবশ্যই তা খারাপ লাগার বিষয়, বিশেষত যখন বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নিন্দা করবে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রশংসা দ্বারা জানা যায় প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসিত ব্যক্তির মালিকানাধীন, বশীভূত ও ভক্ত। অন্তরের মালিকানা লাভ করা সকলেরই প্রিয় ও পছন্দনীয়। যখন জানবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি তার ভক্ত এবং তার অন্তর তার ইচ্ছার অনুগামী, তখন নিশ্চিতরূপেই সে আনন্দিত হবে। বিশেষত যদি প্রশংসাকারী ব্যক্তি অধিক ক্ষমতাবান হয় এবং তাকে দিয়ে অধিক কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, তবে আনন্দ আরও বেশী হবে।

আনন্দের তৃতীয় কারণ এরূপ ব্যক্তির প্রশংসা করা, যার কথা সকলেই শুনে এবং মূল্য দেয়। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হল যে, প্রশংসা অথবা নিন্দা জনসমক্ষে হওয়া। সুতরাং সমাবেশ যত বেশী হবে এবং প্রশংসাকারী যত বেশী মান্যবর হবে, আনন্দ তত বেশী হবে। এর বিপরীতে নিন্দা অধিক খারাব লাগবে।

চতুর্থ কারণ, প্রশংসা দ্বারা প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া বুঝা যায়। ফলে, প্রশংসাকারী তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়—মনের আগ্রহে হোক অথবা চাপের কারণে হোক। চাপও মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। কারণ, এতে এক প্রকার প্রাবল্য পাওয়া যায়। এ কারণেই প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাসী না হলেও প্রশংসিত ব্যক্তি আনন্দিত হয়।

যদি উপরোক্ত চারটি কারণই এক প্রশংসাকারীর মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়, তবে চরম পর্যায়ের আনন্দ ও স্বাদ অর্জিত হয়।

প্রশংসা দ্বারা অন্তরের আনন্দ লাভ করার কারণ এবং নিন্দা দ্বারা দুঃখিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত এ আলোচনাটির অবতারণা এ জন্যে করা হল, যাতে প্রশংসার মহব্বত ও নিন্দার কারণে দুঃখ পাওয়ার চিকিৎসা জানা যায়। কেননা, যে রোগের কারণ জানা থাকে না, তার চিকিৎসাও সম্ভব হয় না। রোগের কারণ দূর করাই চিকিৎসা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যশখ্যাতির চিকিৎসা ঃ প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তির অন্তরকে যশ-প্রীতি আচ্ছন্ন করে নেয়, সে সর্ব প্রযত্নে এ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকে যে, মানুষের সহৃদয়তা যেন হাতছাড়া না হয় এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সে কথায় ও কাজে-কর্মে সর্বদা খেয়াল রাখে, যাতে মানুষের মধ্যে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। বাস্তবে এ বিষয়টি নিফাকের বীজ এবং অনর্থের মূল। এর ফলে ক্রমে ক্রমে এবাদতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হতে থাকে, রিয়ার প্রভাব বেড়ে যায় এবং মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্যে নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একারণেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

অর্থাৎ, 'গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ নিফাক উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক-সবজি উৎপন্ন করে।'

কেননা, নিফাক বলা হয় মানুষের বাহ্যিক অবস্থা তথা কথা ও কাজ তার অন্তরের বিপরীত হওয়াকে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তরে মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক, সে নিফাক সহকারে তাদের সম্মুখীন হবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে উত্তম স্বভাব তাদের সামনে পেশ করবে। অথচ সে এসব স্বভাব থেকে মুক্ত। এ থেকে জানা গেল যে, যশপ্রীতি বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা জরুরী। কেননা, এ রোগটি ধন-সম্পদের মহব্বতের ন্যায় একটি মজ্জাগত রোগ।

যশপ্রীতির চিকিৎসা দু'টি—একটি জ্ঞানগত ও অপরটি কর্মগত। জ্ঞানগত চিকিৎসা এই যে, যে কারণে যশলাভের মোহ সৃষ্টি হয়েছে, তা জানতে হবে। বলা বাহুল্য, এই কারণ হচ্ছে মানুষের দেহ ও মনের উপর ক্ষমতা অর্জন করা। মানুষ যদি এ বিষয়টি অর্জন করতে সক্ষমও হয়ে যায়, তবে চিন্তা করা দরকার: মৃত্যুই এর শেষ সীমা। মৃত্যুর পর এটা কোন উপকারে আসে না। এটি "বাকিয়াতে সালেহাত" তথা অক্ষয় সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, মৃত্যুর পরও এর কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে। ধরে নেয়া যাক, যদি পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ এক ব্যক্তিকে সেজদা করতে থাকে এবং পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সকলেই সেজদারত থাকে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তবু না সেজদাকারীরা থাকবে, না স্বয়ং সেই ব্যক্তি থাকবে; বরং তারা সকলেই একদিন অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় মাটির সাথে মিশে যাবে। সুতরাং এমন ক্ষয়িষ্ণু বিষয়ের জন্যে অনন্ত ও অক্ষয় জীবন লাভের মাধ্যম ধর্মকে বিসর্জন দেয়া মোটেই উচিত নয়। সত্যিকার পূর্ণতা কি– এ বিষয়টি যে বুঝে নিয়েছে, তার দৃষ্টিতে যশখ্যাতি নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু এটা বুঝতে সে-ই সক্ষম, যে আখেরাতে উপস্থিতিকে চোখের সম্মুখে দেখে, দুনিয়াকে হেয় মনে করে এবং মৃত্যুকে মনে করে যেন এসে গেছে। হযরত হাসান বসরীর অবস্থা তেমনি ছিল। তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ আপনার বিশ্বাস করা উচিত যে, আপনি মরে গেছেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযও এ ব্যাপারে পেছনে ছিলেন না। তিনি জওয়াবে লিখলেন ঃ ধারণা করা উচিত যেন আপনি দুনিয়াতে কখনও আসেননি—চিরকাল আখেরাতেই রয়েছেন।

বলা বাহুল্য, এই বুযুর্গগণের দৃষ্টি আখেরাতেই নিবদ্ধ ছিল। ফলে, তারা দুনিয়াতে যশখ্যাতি ও ধন-সম্পদকে হেয় মনে করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। তারা কেবল দুনিয়াকেই দেখে এবং পরিণতির খেয়াল করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অর্থাৎ, 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ আখেরাত হল উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।'

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ -

অর্থাৎ, 'কখনও নয়; বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস এবং আখেরাতকে পরিত্যাগ কর।'

সুতরাং যার অবস্থা এরূপ, তার উচিত যশপ্রীতির বিপদাপদকে জানা এবং দুনিয়াতে যশশালী ব্যক্তিরা যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়, সেগুলো চিন্তা করা।

দুনিয়াতে যশশালী ব্যক্তিমাত্রই হিংসার পাত্র হয়ে থাকে। মানুষ তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্ষতিসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সে-ও সর্বক্ষণ আশংকা করতে থাকে যে, কোথাও মানুষের অন্তর থেকে তার মর্যাদা বিলীন হয়ে যায়। কেননা, মানুষের অন্তর সদা পরিবর্তনশীল। কখনও একদিকে এবং কখনও অন্যদিকে থাকে। এক সময় যাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়, অন্য সময় তাকেই জুতার মালা দিতে কসুর করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের মনের উপর ভরসা করে, সে যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর গৃহ নির্মাণ করে। অতএব আপন যশখ্যাতি সংরক্ষণের চিন্তা, হিংসাকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করা এবং শত্রুদের শত্রুতা নিবারণ করা– জাগতিক এসব আপদ-বিপদের কারণে যশখ্যাতির আনন্দ সর্বদাই মলিন থাকে। দুনিয়াতে মানুষ এ থেকে যতটুকু সুখ আশা করে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদাশংকায় জড়িত থাকে। আসল উদ্দেশ্য যে আখেরাতের উপকার, তার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

যশখ্যাতির কর্মগত চিকিৎসা হল এমন কাজ করা, যাতে মানুষ তিরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং অপরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হয়ে যায়। এতে করে জনপ্রিয় হওয়ার নেশা কেটে যাবে। এছাড়া মানুষের কাছে অখ্যাত ও মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার দিকটিকে পছন্দ করে নিতে এবং কেবল আল্লাহর প্রিয় হওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকবে। এটা 'মালামতী' সম্প্রদায়ের অনুসৃত পদ্ধতি। তারা যশখ্যাতির বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এমন গোনাহ ও কুকর্ম করে থাকে, মানুষের দৃষ্টিতে পুরাপুরি অসম্মানের পাত্র হয়ে যায়। কিন্তু এ উপায় পথপ্রদর্শক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা, তাদের কীর্তিকলাপ দেখে মুসলমানদের মনে ধর্মের কাজে শৈথিল্য আসবে। এছাড়া যে ব্যক্তি অনুসৃত নেতা নয়, তার জন্যেও বিশেষ এ চিকিৎসার খাতিরে হারাম কাজ করা জায়েয নয়; বরং তার জন্যে বৈধ কাজসমূহের মধ্যে এমন কাজ করা জায়েয, যা দ্বারা মানুষের মধ্যে তার মূল্য হ্রাস পায়।

উদাহরণতঃ বর্ণিত আছে যে, জনৈক বাদশাহ এক দরবেশের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। যখন দরবেশ শুনল, বাদশাহ তার আস্তানার কাছাকাছি এসে গেছেন, তখন সে খাদ্য ও শাক আনিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। বাদশাহ তাকে এভাবে খেতে দেখে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পড়লেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। দরবেশ বলল ঃ আল্লাহ পাকের হাজার শোকর, যিনি বাদশাহকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন বুযুর্গ এমন রঙীন পিয়ালায় শরবত পান করেছেন, যা দেখে লোকেরা তাকে শরাবখোর মনে করে চলে গেছে। যদিও এরূপ করা ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে জায়েয নয়; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের সংশোধন এছাড়া অন্য কোন কাজের মধ্যে পাননি বলে বাধ্য হয়ে এরূপ করেন। পরে অবশ্য তারা এ বাড়াবাড়ির ক্ষতিপূরণ করে নেন। বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি সংসার নির্লিপ্ততায় মশগুল হলে লোকজন তার কাছে ভিড় করতে শুরু করে। তিনি এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একদিন হাম্মামে গেলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান করে বাইরে এলেন এবং প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা চুরি যাওয়া বস্ত্র চিনতে পেরে তাকে ধরল এবং চোর চোর বলে খুব মারপিট করল। এরপর থেকে কোন লোক সেই বুযুর্গের আস্তানায় গেল না।

যশখ্যাতি নির্মূল করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নির্জনবাস এবং এমন জায়গায় চলে যাওয়া, যেখানে কেউ না চিনে। যদি গৃহে বসে থাকে এবং যে শহরে খ্যাত হয়েছে, সেখানেই থাকে, তবে এ নির্জনবাস দ্বারা মানুষের মনে আরও বেশী বিশ্বাস ও মর্যাদা বেড়ে যাবে।

প্রশংসার চিকিৎসা ঃ মানুষের মন্দ বলার ভয় এবং তাদের প্রশংসা পাওয়ার মোহ অধিকাংশ লোকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এরূপ লোকেরা মানুষের মরযী অনুযায়ী সকল কাজকর্ম করার চেষ্টা অবশ্যই করে, যাতে সকলেই প্রশংসা করে এবং নিন্দার ভয় না থাকে। এটা বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। এর চিকিৎসা পদ্ধতি হলো, প্রশংসার মোহ এবং নিন্দার ঘৃণার যে সকল কারণ রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে। উদাহরণতঃ প্রথম কারণ হচ্ছে প্রশংসাকারীর কথায় নিজের পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। এতে প্রশংসিত ব্যক্তির উচিত আপন বিবেক-বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়া এবং মনে মনে চিন্তা করা যে, যে গুণের দ্বারা আমার প্রশংসা করা হয়েছে, সেটা আমার মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তবে সেটা আনন্দিত হওয়ার যোগ্য কি না? বলা বাহুল্য,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জ্ঞান-গরিমা, সংসার নির্লিপ্ততা ইত্যাদি গুণ হলে তা অবশ্যই আনন্দিত হওয়ার যোগ্য। আর ধন-দৌলত, যশখ্যাতি ইত্যাদি পার্থিব বিষয় হলে তা আনন্দিত হওয়ার যোগ্য নয়। যদি আলোচ্য গুণটি পার্থিব বিষয় হয়, তবে তার জন্যে উল্লসিত হওয়া খড়কুটার জন্যে উল্লসিত হওয়ার মতই, যা দু'দিন পরেই শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যাবে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই এ ধরনের আনন্দ হয়ে থাকে। অতএব, পার্থিব আসবাবপত্রের জন্যে আনন্দ করা অনুচিত। আর যদি আলোচ্য গুণটি জ্ঞান-গরিমা ও সংসার নির্লিপ্ততা হয়, তবু উল্লসিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, অন্তিম অবস্থা কি হবে, তা কারও জানা নেই। জ্ঞান ও সংসার নির্লিপ্ততা অবশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণাম অশুভ হওয়ার আশংকা লেগেই থাকে। যদি শুভ পরিণামের আশা সঞ্চারিত হয়, তবে জ্ঞান ও সংসার নির্লিপ্ততাকে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ মনে করে আনন্দিত হওয়া উচিত– প্রশংসাকারীর প্রশংসার জন্যে নয়। জানা দরকার যে, প্রশংসার দরুন ফযীলত বৃদ্ধি পায় না।

পক্ষান্তরে যদি গুণটি এমন হয়, যা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে নেই, তবে এরূপ গুণের জন্যে আনন্দিত হওয়া পাগলামি বৈ কিছু নয়। এর উদাহরণ এমন, যেমন কোন ব্যক্তি অপরকে হাসির ছলে বলে ঃ আপনার পেটের বিষ্ঠা কত সুবাসিত। যখন আপনি মলত্যাগ করেন, তখন সুবাসে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে যায়। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানে, তার পেটে নেহায়েত দুর্গন্ধযুক্ত নাপাকী রয়েছে। এরপরও যদি সে প্রশংসার কারণে উল্লসিত হয়, তবে সেটা পাগলামি নয় কি? সারকথা, প্রশংসাকারী যদি সত্য প্রশংসা করে, তবে প্রশংসতি ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ভেবে আনন্দ প্রকাশ করবে, আর মিছামিছি প্রশংসা করলে দুঃখ প্রকাশ করবে। প্রশংসার জন্যে কোন অবস্থাতেই উল্লাস করা উচিত নয়।

প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এতে বুঝা যায়, প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসিত ব্যক্তির বশীভূত হয়ে গেছে এবং আরও হবে। এর পরিণতি এবং যশপ্রীতির পরিণতি একই, যার চিকিৎসা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আনন্দের তৃতীয় কারণ প্রশংসিত ব্যক্তির ভয়ভীতি। যার কারণে প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এটা একটা সাময়িক ও অস্থায়ী ক্ষমতা। ফলে আনন্দ করার যোগ্য নয়। বরং এ কারণে প্রশংসা করা হলে সেজন্য দুঃখ করা, খারাপ মনে করা, রাগ করা উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রশংসায় আনন্দিত হয়, সে নিজের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করার পথ করে দেয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম প্রশংসাকে খুব ভয় করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন এক ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি রাগ করে বললেন ঃ আমাকে পাকসাফ বলার আদেশ আমি তোমাকে করিনি।

নিন্দাকে ঘৃণা করার চিকিৎসা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, নিন্দাকে ঘৃণা করার কারণ প্রশংসাপ্রীতির কারণের বিপরীত। সুতরাং চিকিৎসাও প্রশংসাপ্রীতির চিকিৎসা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে, যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয় এবং হিতাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিন্দা করে, তবে তার উপর রাগ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং মন্দ কথা বলা উচিত নয়। কেননা, এরূপ ব্যক্তি তোমার দোষ বর্ণনা করে তোমাকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে চায়। আর যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয়ার নিয়তে নিন্দা করে, তবু তার কথায় তোমার উপকারই হবে। কেননা, সে তোমার সে দোষ বলে দিয়েছে, যা তুমি জানতে না। বলা বাহুল্য, এটা সৌভাগ্যের কারণ। অবশ্য কষ্ট দেয়ার নিয়ত করে নিন্দাকারী নিজেরই অনিষ্ট করে। কিন্তু তোমার জন্যে তার উক্তি নেয়ামতস্বরূপ। আর যদি নিন্দাকারী তার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তবে এমতাবস্থায়ও খারাপ লাগা উচিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দেখা দরকার, যদিও সেই বিশেষ দোষটি তোমার মধ্যে নেই; কিন্তু এর মত দোষ আরও থাকতে পারে। অতএব, শোকর করা উচিত যে, নিন্দাকারী সেসব দোষ সম্পর্কে অবগত হয়নি এবং এমন দোষ বলেই ক্ষান্ত হয়ে গেছে, যা তোমার মধ্যে নেই। এ ছাড়া যে ব্যক্তি তোমার দোষ বলে, সে তার পুণ্যসমূহ তোমাকে উপহার দেয়, আর যে তোমার প্রশংসা করে, সে হাদীস অনুযায়ী তোমার কোমর ভেঙ্গে দেয়। অতএব, কোমর ভাঙ্গার কারণে তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আনন্দিত হবে, আর পুণ্য আসার কারণে দুঃখিত হবে, এটা কেমন কথা! পুণ্য এলে তো আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, যার জন্য তুমি আগ্রহী থাক। আরও একটি বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, নিন্দাকারী ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে নিজের ধর্ম বরবাদ করেছে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে। অতএব, তোমার রাগ করা ও তাকে বদদোয়া দেয়া উচিত নয়। বরং এরূপ দোয়া করা দরকার– ইলাহী! তাকে যোগ্যতা দাও, তার প্রতি রহম কর এবং তার তওবা কবুল কর। দেখ, উহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা রসূলে আকরাম (সাঃ) -এর দন্ত মোবারক শহীদ করেছিল, মস্তক ক্ষত-বিক্ষত করেছিল এবং তাঁর পিতৃব্য আমীর হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল, তখন তিনি এই দোয়া করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমার কওমকে সৎপথ প্রদর্শন কর। কারণ, তারা অজ্ঞ।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) এমন এক ব্যক্তির জন্যে নেক দোয়া করেছিলেন, যে তার মাথায় আঘাত করেছিল। লোকেরা বলল ঃ এ ক্ষেত্রে নেক দোয়া করার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে জানি, তার এ আচরণের কারণে আমি সওয়াব পাব। কাজেই আমি এটা ভাল মনে করি না যে, যার দিক থেকে আমি সওয়াব পাব, সে আমার দিক থেকে আযাব ভোগ করুক।

রিয়ার নিন্দা ঃ কোরআন পাকের আয়াত, হাদীস এবং বুযুর্গগণের উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, রিয়া হারাম এবং রিয়াকার আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

অর্থাৎ, 'দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামায থেকে গাফেল, যারা লোক দেখানো নামায পড়ে অর্থাৎ রিয়া করে।'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরও আছে–

اَلَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ

অর্থাৎ, 'যারা কুকর্মের চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।'

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত লোকেরা হচ্ছে রিয়াকার। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا -

অর্থাৎ, 'আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে তোমাদেরকে অন্ন দেই। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা আশা করি না।'

এতে আন্তরিকতাসম্পন্ন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু আশা করে না। রিয়া হচ্ছে এরই বিপরীত। আরও বলা হয়েছে—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ, 'অতএব, যে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর এবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

আয়াতটি এমন লোকদের শানে নাযিল হয়েছে, যারা তাদের এবাদত ও সৎকর্মের মজুরী ও প্রশংসা কামনা করত। রসূলে করীম (সাঃ)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুক্তি কিসের মধ্যে? তিনি বললেন ঃ

ان لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس -

অর্থাৎ, 'আল্লাহর আনুগত্যে এমন কাজ না করার মধ্যে, যার উদ্দেশ্য হয় মানুষ।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত শহীদ, দাতা ও কারী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে বলবেন— তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করনি। বরং এ জন্যে করেছ, যাতে মানুষ তোমাকে বীর বলে। তুমি আল্লাহর জন্যে দান-খয়রাত করনি; বরং দাতা বলে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্যে করেছ। তুমি আল্লাহর জন্যে কোরআন পাঠ করনি; বরং কারী বলে খ্যাত হওয়ার জন্যে করেছ। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তারা সওয়াব পায়নি এবং রিয়া তাদের সকল কর্ম বরবাদ করে দিয়েছে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমি তোমাদের জন্যে যেসব বিষয়ের ভয় করি, তন্মধ্যে অধিক ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে "শিরকে আসগর" তথা ক্ষুদ্র শিরক। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ক্ষুদ্র শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। এরপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ

يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ –

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন বলবেন ঃ তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানোর জন্যে আমল করতে, তাদের কাছে যাও, এরপর দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা?'

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন মাথায় ও দাড়িতে যেন তৈল লাগিয়ে নেয় এবং ঠোঁটের উপর যেন হাত বুলিয়ে নেয়, যাতে মানুষ তাকে রোযাদার মনে না করে। যখন কেউ ডান হাতে কিছু দান করে, তখন যেন বাম হাত তা জানতে না পারে। আর নামায পড়ার সময় দরজায় পর্দা ছেড়ে দেয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাও তেমনি বণ্টন করেন, যেমন রুযী বণ্টন করেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন তার উপরকার বস্তুসমূহ কাঁপতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পর্বতমালা সৃষ্টি করে সেগুলোকে পৃথিবীর জন্যে পেরেক স্বরূপ করে দিলেন। ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ আল্লাহ তা'আলা পর্বত অপেক্ষা অধিক শক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা লোহা সৃষ্টি করলেন। সে পাহাড়-পর্বতকে কেটে দিল। এরপর আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করলেন। সে লোহাকে গলিয়ে দিল। এরপর পানিকে আদেশ করা হল। সে আগুনকে নিভিয়ে দিল। অতঃপর বায়ুকে আদেশ করা হল। সে পানিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল। এসব কাণ্ড দেখে ফেরেশতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল যে, সকলের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী কোন্ বস্তুটি? তারা বলল ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সেমতে তারা আরয করল ঃ ইলাহী আপনার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ বস্তুটি সর্বাধিক শক্ত? এরশাদ হল ঃ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী শক্ত আদম সন্তানের অন্তর। সে ডান হাতে খয়রাত করে; কিন্তু বাম হাতকে তা জানতে দেয় না। তার চেয়ে অধিক শক্ত কোন বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি।

রিয়ার স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, রিয়া শব্দটি আরবী 'রুইয়ত' ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ, দেখা। এমনিভাবে খ্যাতির অর্থে ব্যবহৃত "সুমআ" শব্দটি "সেমা" ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শ্রবণ করা। রিয়ার আসল অর্থ হচ্ছে মানুষকে ভাল স্বভাব-চরিত্র দেখিয়ে তাদের কাছে মর্যাদাবান হওয়া। যেহেতু এবাদত দ্বারাও যশ ও মর্যাদা অর্জিত হতে পারে, তাই সাধারণের পরিভাষায় রিয়া বিশেষভাবে সেই অবস্থাকে বলা হয়, যাতে এবাদতের দিক দিয়ে অন্তরে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এবাদত দ্বারা নিজের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। অতএব, এখানে চারটি বিষয় একত্রিত রয়েছে। (১) রিয়াকার। সে হচ্ছে এবাদতকারী। (২) যার জন্যে রিয়া করা হয়। সে হচ্ছে মানুষ। মানুষকে দেখানোই লক্ষ্য থাকে। (৩) যা দেখানো উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, এবাদত ও অভ্যাস, যা রিয়াকার প্রকাশ করতে চায়। (৪) স্বয়ং রিয়া; অর্থাৎ, এবাদত প্রকাশ করার ইচ্ছা।

মানুষ পাঁচ প্রকার বস্তুর মধ্যে রিয়া করতে পারে—শরীর, আকার-আকৃতি, কথা, কর্ম ও সঙ্গী-সাথী। কিন্তু এবাদত নয়—এমন বস্তুতে রিয়া করা এবাদতে রিয়া করার তুলনায় হাল্‌কা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রিয়ার প্রথম প্রকার হচ্ছে শরীর প্রদর্শন করা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি শরীরে ক্ষীণতা-শীর্ণতা ও ফ্যাকাসে ভাব প্রকাশ করা, যাতে মানুষ মনে করে, এ ব্যক্তি ধর্মকর্মে খুব মেহনত করে এবং তার মধ্যে ধর্মের ভয় প্রবল। অথবা সে খাদ্য কম খায়। কিংবা ফ্যাকাসে ভাব দেখে মানুষ ধারণা করে যে, সে রাত্রি জাগরণ করে এবং এবাদত করে। এর কাছাকাছি ক্ষীণস্বরে কথা বলা, চক্ষু কোটরাগত হওয়া ও ঠোঁট শুষ্ক থাকা। এগুলো দ্বারা বুঝা যায়, লোকটি চির রোযাদার। এ কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন যেন মাথায় তৈল মালিশ করে, চিরুনি করে এবং চোখে সুরমা ব্যবহার করে, যাতে সে রিয়াপ্রবণ না হয়ে যায়। দ্বীনদার ব্যক্তিরা এভাবে শরীর প্রদর্শন করে। কিন্তু দুনিয়াদাররা এর বিপরীতে স্থূলদেহ, স্বচ্ছবর্ণ, সুঠাম দেহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে থাকে।

রিয়ার দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে আকার-আকৃতি ও পোশাক প্রদর্শন করা। উদাহরণতঃ মাথার কেশ এলোমেলো রাখা, গোঁফ মুণ্ডন করা, পথে মাথানত করে ধীরে ধীরে চলা, কপালে সেজদার চিহ্ন বাকী রাখা এবং অধৌত ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করা। এগুলো এজন্যে করা হয়, যাতে বোঝা যায় যে, লোকটি সুন্নতের অনুসারী এবং আল্লাহর নেকবান্দা। এর মধ্যে দাখিল রয়েছে তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করা এবং সুফীগণের ন্যায় নীলরঙের পোশাক পরা, আলেম না হয়ে আলেমদের বিশেষ পোশাক পরিধান করা, যাতে মানুষ তাকে আলেম মনে করে, এটাও রিয়ার মধ্যে শামিল।

রিয়ার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কথা। অর্থাৎ, লোক-দেখানোর জন্যে ওয়ায-নসীহত করা, জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞ কথাবার্তা বলা, দৈনন্দিন বাচন পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্যে হাদীস ও মহাজন-উক্তি মুখস্থ করা, মানুষের সামনে যিকরের জন্যে ঠোঁট নাড়াচাড়া করা, জনসমক্ষে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা।

রিয়ার চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, আমল। অর্থাৎ, লোক দেখানোর জন্যে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা, রুকু ও সেজদা লম্বা করা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করা। এমনিভাবে রোযা, জেহাদ, হজ্জ, সদকা ও খাদ্য খাওয়ানোর মধ্যে রিয়া হয়ে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রিয়ার পঞ্চম প্রকার হচ্ছে সঙ্গী-সাথী ও সাক্ষাতকামী ব্যক্তিবর্গ। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি কামনা করে যে, অমুক আলেম অথবা আবেদ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসুক, যাতে মানুষ জানে যে, সে খুব দ্বীনদার। তাই এমন আলেম ও আবেদ তার কাছে আসা-যাওয়া করে। অথবা কেউ কোন শাসনকর্তার আগমন প্রত্যাশা করে , যাতে মানুষ মনে করে যে, সে ধর্মে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাই শাসনকর্তাও বরকত লাভের জন্যে তার কাছে আসে।

রিয়ার বিভিন্ন স্তর ঃ জানা উচিত যে, রিয়ার চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হল, সওয়াবের ইচ্ছা মোটেই না থাকা। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি জনসমক্ষে নামায পড়ে এবং একাকী হলে পড়ে না; বরং মাঝে মাঝে উযু ছাড়াই মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা কেবল রিয়াই রিয়া। ফলে, সে আল্লাহর কাছে গযবের যোগ্য। রিয়ার এ স্তরটি কঠোরতর।

দ্বিতীয় স্তর হল, সায়াবের ইচ্ছা থাকবে, কিন্তু তা খুব দুর্বল। এমনকি, একান্তে থাকলে এ ইচ্ছা এতটুকু থাকে না যে, তার কারণে সেই আমলটি করে। এরূপ ব্যক্তিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাছাকাছি। কেননা, তার এমন ইচ্ছা নেই, যার কারণে আমলটি করতে পারে। এরূপ ইচ্ছা থাকা-না থাকা সমান।

তৃতীয় স্তর হল, সওয়াবের ইচ্ছা এবং রিয়ার ইচ্ছা উভয়টি সমান থাকা। ফলে, উভয় ইচ্ছা একত্রিত হলে সে আমল করে এবং একটি অনুপস্থিত থাকলে আমল করে না। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা এই যে, সে যতটুকু নষ্ট করে, ততটুকুই গড়ে। ফলে, আশা করা যায় যে, তার সওয়াবও হবে না এবং আযাবও হবে না অথবা যে পরিমাণ আযাব হবে, সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, এরূপ ব্যক্তিও আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

চতুর্থ স্তর হল, রিয়ার ইচ্ছা দুর্বল এবং সওয়াবের ইচ্ছা প্রবল হওয়া। অর্থাৎ, মানুষ তার আমল জানতে পারলে তার স্ফূর্তি ও আনন্দ বেড়ে যায়; কিন্তু একাকী অবস্থায়ও এবাদত বর্জন করে না। আমাদের ধারণায় এরূপ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তির মূল সওয়াব বাতিল হবে না; বরং কিছুটা হ্রাস পাবে অথবা রিয়া পরিমাণে আযাব হবে এবং সওয়াবের ইচ্ছা পরিমাণে সওয়াব হবে।

আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা রিয়া করা হলে সেদিকে লক্ষ্য করে রিয়ার দু'টি স্তর রয়েছে—মূল এবাদত দ্বারা রিয়া করা ও এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা। প্রথম স্তরের রিয়া অত্যন্ত মন্দ। এর তিনটি সোপান রয়েছে। প্রথম সোপান হচ্ছে মূল ঈমান দ্বারাই রিয়া করা। এরূপ রিয়াকার অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। এ রিয়াকার সে ব্যক্তি, যে মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে; কিন্তু অন্তরে তাকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে। নিছক লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানী প্রকাশ করে। কোরআন পাকের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা এ রিয়াকারদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ –

অর্থাৎ, '(হে রসূল!) যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

অর্থাৎ, তাদের উক্তি তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ –

অর্থাৎ, 'কোন কোন লোকের কথা পার্থিব জীবনে আপনাকে অবাক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করবে। সে তার মনের কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষী করে; অথচ সে কঠোর তার্কিক। যখন সে প্রস্থান করে, তখন চেষ্টা করে পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করতে, শস্যক্ষেত্র বিনাশ করতে এবং প্রাণহানি ঘটাতে। আল্লাহ গোলযোগ পছন্দ করেন না।'

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন ওরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের উপর ক্রোধে অঙ্গুলি চর্বণ করে।'

আরও বলা হয়েছে ঃ

يُرَاءُونَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ -

অর্থাৎ, 'তারা লোক-দেখানো আমল করে। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। তারা মানুষের মধ্যে দোদুল্যমান– না এই দলে, না ঐ দলে।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিফাক অনেক বেশী ছিল। তখন কিছু লোক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে বাহ্যত মুসলমান হয়ে যেত। বর্তমানে এটা কম হলেও এর ধরন ও নমুনা অনেক রয়েছে। উদাহরণতঃ কিছু লোক ধর্মদ্রোহীদের উক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে মনে মনে দোযখ, জান্নাত ও কিয়ামত অস্বীকার করে অথবা শরীয়ত ও শরীয়তের বিধানাবলীকে বিধর্মীদের উক্তি অনুযায়ী অবশ্যপালনীয় মনে করে না। অথচ মুখে এর বিপরীত বর্ণনা করে। এ শ্রেণীর লোকও মুনাফিক ও রিয়াকার। এরা অনন্তকাল দোযখে থাকবে। কেননা, এর চেয়ে বড় কোন নিফাক নেই। এরা প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়েও মন্দ। কারণ, কাফের বাইরেও শত্রু এবং ভিতরেও বেঈমান। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে, এরা মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলে এবং বগলে ছুরি লুকিয়ে রাখে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে মূল ঈমান স্বীকার করে মৌলিক এবাদত দ্বারা রিয়া করা। এ স্তরটিও আল্লাহ তা'আলার খুবই অপছন্দনীয়। এর দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি জনসমাবেশে উপস্থিত রয়েছে, এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। সকলেই যখন নামায পড়ল, তখন সে-ও পড়ে নিল। অথচ একাকীত্বে নামায না পড়াই তার অভ্যাস। অথবা রমযান মাসে রোযা রাখল। কিন্তু যাতে রোযা রাখতে না হয়, সেজন্যে মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে। অথবা জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যায়; কিন্তু লোকের নিন্দার আশংকা না থাকলে কখনও যেত না। অথবা জেহাদ কিংবা হজ্জ কেবল মানুষের ভয়ে করে– মনের আগ্রহে নয়। এ ধরনের রিয়াকারের মধ্যে মূল ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে না। কেউ অন্য কিছুকে সেজদা করতে বললে সে করবে না। কিন্তু অলসতার কারণে আল্লাহর এবাদত করে না এবং জনসমাবেশে করলে খুশী হয়। অতএব, আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের তুলনায় মানুষের কাছে মর্যাদা লাভ তার কাছে ভাল মনে হয়। তার কাছে মানুষের মন্দ বলার ভয় আল্লাহর আযাবের ভয়ের চেয়ে বেশী। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার আগ্রহ আল্লাহর সওয়াবের প্রতি আগ্রহের তুলনায় বেশী। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বিশ্বাস চরম মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এরূপ ব্যক্তি মূল ঈমানে বিশ্বাসী হলেও আল্লাহর গযবে পতিত হওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় সোপান হচ্ছে নফল ও মুস্তাহাব এবাদত দ্বারা রিয়া করা, যেগুলো বর্জন করলে কেউ গোনাহগার হয় না। কিন্তু একাকী থাকলে এর সওয়াব লাভ করতে সচেষ্ট হয় না এবং রিয়ার কারণে পালন করে। উদাহরণতঃ নামাযের জমাতে শরীক হওয়া, রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া, আশূরার রোযা রাখা অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা। রিয়াকাররা এসব এবাদত মানুষের নিন্দার ভয়ে এবং তাদের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, একাকী হলে তারা ফরযসমূহের বেশী কিছু করত না। এ ধরনের রিয়াকার মন্দ হলেও পূর্ববর্তী সোপানসমূহের তুলনায় কম মন্দ।

এবাদতের গুণাবলীতে রিয়া করা হলে তারও তিনটি স্তর রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম স্তর হল এমন কাজে রিয়া করা, যা বর্জন করলে এবাদতে ত্রুটি দেখা দেয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একাকী অবস্থায় নামায পড়লে দ্রুতগতিতে এবং কম সময়ে নামায সমাপ্ত করে নেয়; কিন্তু জনসমক্ষে নামায পড়লে রুকু-সেজদা উত্তমরূপে করে এবং সর্বাঙ্গীণ সুন্দর রূপে নামায আদায় করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে তার পরওয়ারদেগারকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ, নির্জন অবস্থায়ও যে আল্লাহ তা'আলা তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন, সে বিষয়ে পরওয়া করে না।

পিপীলিকার চলনের চেয়েও গোপন রিয়া ঃ রিয়া দু' প্রকার— 'জলী' (প্রকাশ্য) ও 'খফী' (গোপন)। যে রিয়া সওয়াবের নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে, এটাই প্রকাশ্য রিয়া। এ প্রকার রিয়া দ্রুত বুঝা যায় এবং রিয়াকারও জেনে নেয় যে, সে রিয়া করছে। এর চেয়ে সামান্য গোপন সেই রিয়া, যা আমল করার কারণ তো হয় না; কিন্তু সওয়াবের নিয়তে যে আমলটি করা হয়, তা এই রিয়ার কারণে সহজ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি প্রত্যহ তাহাজ্জুদ পড়ে; কিন্তু কিছুটা কষ্ট ও অবহেলার সাথে পড়ে। তবে বাড়ীতে কোন মেহমান আগমন করলে তাহাজ্জুদ পড়া তার জন্যে সহজ ও আনন্দের কাজ হয়ে যায়। সে এটাও জানে যে, সওয়াবের আশা না থাকলে কেবল এই মেহমানকে দেখানোর জন্যে সে তাহাজ্জুদ পড়ত না।

এরচেয়েও অধিক গোপন সেই রিয়া, যা আমলের কারণও হয় না এবং আমলকে সহজও করে না। এতদসত্ত্বেও তা অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। আমলের উপর এর কোন প্রভাব নেই বিধায় আলামত ছাড়া একে জানাও সম্ভবপর নয়। এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত এই যে, এই রিয়াকারের আমল সম্পর্কে মানুষ অবগত হলে সে খুশী হয়। যেমন, অনেক আবেদ রয়েছে, যারা নিষ্ঠা সহকারে এবাদত করে এবং রিয়ায় বিশ্বাস করে না; বরং একে খারাপ মনে করে। কিন্তু যখন তাদের এবাদত সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়, তখন তারা আনন্দ অনুভব করে— যেন এবাদতে পরিশ্রম করার একটি বোঝা অন্তর থেকে নেমে গেল। বলা বাহুল্য, একটি গোপন রিয়া থেকেই এই আনন্দের উৎপত্তি। কারণ, অন্তর যদি মানুষের দিকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভ্রূক্ষেপ না করত, তবে মানুষের অবগত হওয়ার কারণে এই আনন্দ কখনও হত না। অতএব জানা গেল যে, পাথরে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, তেমনি এই রিয়াও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, যার মধ্যে মানুষের অবগতি চকমকি পাথরের কাজ করেছে এবং আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলেছে। এরপর এই অবগতি থেকে উদ্ভূত আনন্দের স্বাদ যদি আবেদ গ্রহণ করে এবং ঘৃণা দ্বারা ক্ষতিপূরণ না করে, তবে এ আনন্দই গোপন রিয়ার শক্তি ও খাদ্য হয়ে যায়।

এরচেয়েও অধিক গোপন সেই রিয়া, যাতে মানুষের অবগতির খাহেশও থাকে না এবং এবাদত প্রকাশ পেলে আনন্দও হয় না; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা ভাল মনে হয় যে, মানুষ তাকে দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করুক, সসম্ভ্রম ব্যবহার করুক, তার কাজে সন্তুষ্ট থাকুক এবং কেনাবেচায় তার খাতির করুক। এসব ব্যাপারে কেউ ত্রুটি করলে সেটা তার কাছে দুঃসহ কষ্টের কারণ ও অবাস্তব মনে হয়। এমতাবস্থায় সে যেন এই সম্মান ও সম্ভ্রম সেই এবাদতের কারণেই চায়, যা সে গোপনে করে এবং কাউকে জানায় না। পূর্বে এই এবাদত না করলে সম্মান প্রদর্শনে মানুষের ত্রুটি তার কাছে অবাস্তব মনে হত না। সুতরাং এ ধরনের এবাদতে আবেদ কেবল আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে সন্তুষ্ট থাকে না বিধায় তার সাথে গোপন রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, যা পিপীলিকার চলন থেকেও অধিক গোপন। এই রিয়া যদি সওয়াব বরবাদ করে দেয়, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না। সওয়াব বরবাদ করার দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর এই উক্তি– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ক্বারীগণকে বলবেন ঃ তোমাদের জন্যে লোকেরা কি পণ্যদ্রব্যের দাম সস্তা করত না? তোমাদেরকে কি প্রথমে সালাম করত না? তোমাদের অভাব-অনটন কি দূর করত না? অতএব, আজ তোমাদের জন্যে কোন পুরস্কার নেই। তোমাদের পুরস্কার তোমরা দুনিয়াতেই আদায় করে নিয়েছ।

এখন প্রশ্ন হয়, এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়লে আনন্দিত হয় না– এমন লোক আমরা দেখি না; বরং এ ব্যাপারে প্রত্যেক এবাদতকারীই কিছু না কিছু আনন্দ অনুভব করে। অতএব, সকল প্রকার আনন্দই কি নিন্দনীয়, না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিছু নিন্দনীয় ও কিছু প্রশংসনীয় আছে? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, সকল প্রকার আনন্দই নিন্দনীয় নয়; বরং এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার আনন্দ পাঁচ প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে চার প্রকার ভাল এবং এক প্রকার মন্দ। ভাল চার প্রকারের প্রথম প্রকার এই যে, এবাদত গোপন ও একনিষ্ঠ থাকুক– এটাই আবেদের কাম্য। কিন্তু প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আবেদ এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি কৃপা ও সদয় ব্যবহার করতে চান। তাই আমার গোনাহসমূহ গোপন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে দেন। আমার ইচ্ছা ছিল গোনাহ ও আনুগত্য উভয়টি গোপন থাকুক। অতএব এরচেয়ে বড় কৃপা আর কি হবে যে, তিনি গোনাহকে ঢেকে রেখেছেন এবং এবাদতকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের কথা ভেবে আবেদের এহেন আনন্দ খারাপ নয়; বরং উত্তম। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

অর্থাৎ, 'বলুন, আল্লাহর কৃপায় ও রহমতে। অতএব এতেই আনন্দিত হওয়া উচিত।'

এ আনন্দের কারণ এই হল যে, আবেদ জানতে পারল সে আল্লাহ তা'আলার একজন প্রিয় বান্দা।

দ্বিতীয় প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যেমন আমার গোনাহ ঢেকে রেখেছেন এবং এবাদত প্রকাশ করে দিয়েছেন, তেমনি আখেরাতেও করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

مَاسَتَرَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا اِلَّاسَتَرَهُ عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যে গোনাহ গোপন রাখেন, আখেরাতেও তাই গোপন রাখেন।'

অতএব, এ আনন্দের কারণ হচ্ছে ভবিষ্যতে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আশা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, এই আনুগত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে মানুষ আমার অনুসরণ করবে এবং এমনি ধরনের আনুগত্য করবে। ফলে আমার সওয়াব আরও বেড়ে যাবে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি কোন সওয়াবের কাজ করে এবং মানুষ তার অনুসরণ করে, সে অনুসারীদের সমান সওয়াব পেতে থাকে এবং তাদের সওয়াব হ্রাস করা হয় না। বলা বাহুল্য, সওয়াব বৃদ্ধির আশা করা আনন্দদায়ক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবাদতকে গোপন করার সওয়াবও পাবে এবং পরে প্রকাশ হয়ে পড়ার কারণেও সওয়াব পাবে।

চতুর্থ প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, যারা তার এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়ে তার প্রশংসা করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার মরযী ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করেছে। কারণ, তারা তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রিয়পাত্র মনে করেছে। এতে বুঝা যায়, তাদের মন-মেজায আনুগত্যপ্রবণ। নতুবা কতক ঈমানদার এমনও রয়েছে, যারা এবাদতকারীদেরকে দেখলে হিংসা করে, নিন্দা করে এবং রিয়াকার আখ্যা দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সুতরাং প্রশংসা দ্বারা জানা গেল যে, প্রশংসাকারীদের ঈমান সঠিক। এক্ষেত্রে এবাদতকারীর আন্তরিকতার আলামত এই যে, মানুষ অন্য কোন এবাদতকারীর প্রশংসা করলেও সে ততটুকুই আনন্দিত হয়, যতটুকু নিজের প্রশংসার কারণে হয়।

পঞ্চম প্রকার আনন্দ যা মন্দ, তা হচ্ছে এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, এবাদতের কারণে মানুষের মনে আমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ফলে, তারা আমার তারীফ ও তাযীম করতে শুরু করেছে, উঠাবসায় আমাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং আমার প্রয়োজনে সহায়তা করছে। এবাদতকারীর এই প্রকার আনন্দ নিঃসন্দেহে গর্হিত।

গোপন ও প্রকাশ্য রিয়ার মধ্যে যেগুলো বাতিল ঃ জানা উচিত যে, বান্দা যখন কোন এবাদতকে এখলাস তথা আন্তরিকতা সহকারে সম্পন্ন করে, এরপর তার মধ্যে রিয়া আসে, তখন এই রিয়া হয় এবাদত শেষ করার পরে, না হয় আগে, না হয় এবাদতের সাথে সাথে আসবে। যদি এবাদত শেষ করার পর কেবল তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আনন্দ হয় এবং নিজে প্রকাশ না করে, তবে এই আনন্দ এবাদতকে বাতিল করবে না। কেননা, এবাদত তো রিয়া ছাড়াই এখলাস সহকারে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরবর্তীতে যে রিয়া হবে, তার প্রভাব আশা করা যায় এবাদত পর্যন্ত পৌঁছবে না। বিশেষত যখন এবাদতকারী নিজে তা প্রকাশ করেনি; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ করার কারণে প্রকাশ হয়ে গেছে। হাঁ, যদি রিয়া ছাড়াই এবাদত সম্পন্ন হয়, কিন্তু এবাদতকারী পরে তা সাগ্রহে প্রকাশ করে দেয়, তবে এতে ভয়ের কারণ আছে এবং হাদীস ও মনীষীদের উক্তি থেকে জানা যায় যে, এটা এবাদতকে বাতিলও করে দেবে। সেমতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ আমি কাল রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন ঃ এই এবাদতে এই ব্যক্তির অংশ এতটুকুই।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আরয করল ঃ আমি সারা জীবন রোযা রেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি রোযাও রাখনি এবং রোযাহীন অবস্থায়ও জীবন অতিবাহিত করনি। কেউ কেউ এই উক্তির কারণ এটাই বর্ণনা করেন যে, লোকটি তার এবাদত প্রকাশ করে দিয়েছিল। কারও মতে এর কারণ এই ছিল যে, সারা জীবন রোযা রাখা অপছন্দনীয়।

মোটকথা, রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর উক্তি একথা জ্ঞাপন করে যে, এবাদত করার সময় লোকটির অন্তর রিয়া থেকে মুক্ত ছিল না। তাই সে নিজে বলে তা প্রকাশ করে দিয়েছে। যে রিয়া এবাদতের পরে প্রকাশ পায়, তা এবাদতের সওয়াব বাতিল করে দেবে—এটা অবশ্য কিয়াস তথা অনুমানের খেলাফ। কিয়াস বলে, রিয়ার পূর্বে সম্পন্ন আমলের সওয়াব সে পাবে এবং আমলের পরে যে রিয়া অস্তিত্ব লাভ করে, তার কারণে শাস্তি পাবে।

যদি কেউ এখলাস সহকারে নামায আদায় করে; কিন্তু আদায় করার সময় কিছু রিয়াও হয়ে যায়, তবে নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যখন নফল নামায পড়ছিল, তখন তার কাছে কিছু দর্শক আগমন করল অথবা কোন বাদশাহ আগমন করল। ফলে তার মনে বাসনা দেখা দিল যে, আগন্তুকরা তাকে দেখুক। অথবা নামাযের মধ্যে কোন বিস্মৃত বস্তু স্মরণ হল এবং তা তালাশ করার বাসনা জাগ্রত হল। এমনকি, লোকজন না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়েই তা তালাশ করতে প্রবৃত্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হত। কেবল লোকনিন্দার ভয়েই নামায পূর্ণ করল। এমতাবস্থায় তার নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। ফরয নামাযে এরূপ হলে সেই ফরয নামায পুনরায় আদায় করা উচিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে—

اَلْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ اِذَا طَابَ اٰخِرُهُ طَابَ اَوَّلُهُ

অর্থাৎ, 'আমল পাত্রের মত। তার শেষ ভাল হলে শুরুও ভাল হবে।'

এতে বুঝা গেল যে, সমাপ্তি পর্যন্ত ভাল করা জরুরী। এক রেওয়ায়েতে আছে— যে ব্যক্তি তার আমলে এক মুহূর্ত রিয়া করবে, তাঁর পূর্ব আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ রেওয়ায়েতটি কেবল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– সদকা ও তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, সদকা ও তেলাওয়াতের প্রত্যেকটি অংশ আলাদা। সুতরাং যে অংশে রিয়া হবে, তা এবং তার পরবর্তী অংশ বাতিল হবে—পূর্ববর্তী অংশ বাতিল হবে না।

যদি কেউ নামাযের নিয়ত করার সাথে সাথে রিয়ার ইচ্ছা করে এবং তা সালাম ফিরানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে তার নামায মূল্যহীন। সর্ব সম্মতিক্রমে এরূপ নামায মূল্যহীন। এ নামাযের কাযা করা উচিত। আর যদি নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই নামাযের মধ্যে অনুতপ্ত হয়ে এস্তেগফার করে এবং রিয়া বর্জন করে, তবে তার নামায সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। (১) কেউ কেউ বলেন ঃ সে রিয়ার ইচ্ছা সহকারে নামায শুরু করেছিল বিধায় তার নামাযই হয়নি। তাই নতুনভাবে নিয়ত করা দরকার। (২) কারও মতে এরূপ ব্যক্তির নিয়ত ঠিক থাকবে এবং রুকূ, সেজদা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম শুদ্ধ হবে না। তাই রুকূ-সেজদা পুনরায় করতে হবে। (৩) আবার অনেকে বলেন, এরূপ ব্যক্তির পুনরায় কোন কিছু করতে হবে না; বরং সে মনে মনে এস্তেগফার করে এখলাস সহকারে নামায খতম করবে। কেননা, শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য। যদি এখলাস সহকারে নামায শুরু করত এবং রিয়ার উপর শেষ করত, তবে নামায বাতিল হয়ে যেত। এখানে এর বিপরীত হয়েছে; অর্থাৎ রিয়া দ্বারা শুরু করে এখলাসের উপর শেষ করা হয়েছে। সুতরাং নামায বাতিল না হওয়া উচিত। এটা এমন, যেমন কোন পাক-সাফ কাপড়ে নাপাকী লেগে গেল। এরপর সেই নাপাকী দূর করা হল। এমতাবস্থায় কাপড়টি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমাদের মতে পূর্বোক্ত দুটি উক্তিই কেফাহর দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল। বিশেষত যারা বলে যে, শুধু রুকূ-সেজদা পনুরায় করে নেবে--তাকবীরে তাহরীমার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কেননা, রুকূ-সেজদা শুদ্ধ না হলে এগুলোকে নামাযে অতিরিক্ত কাজ বলে গণ্য করতে হবে, যা নামাযকে ফাসেদ করে দেয়। তৃতীয় উক্তিটিও অগ্রাহ্য। কেননা, শুরুতে রিয়া থাকার কারণে নিয়ত ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।

অতএব, ফেকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি শুদ্ধ, তা এই যে, যদি এই নামাযের প্রেরণাদাতা শুধু রিয়া হয়—সওয়াব অন্বেষণ না হয়, তবে তাহরীমাই শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এর পরে যা যা করবে, তার কোনটিই শুদ্ধ হবে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি একা থাকলে নামায পড়ত না; কিন্তু জনসমাবেশ দেখে নিয়ত বেঁধে নিল। তার এই নামাযে নিয়তই নেই। কেননা, নিয়ত সেই ইচ্ছাকে বলা হয়, যার প্রেরণাদাতা হয় ধর্মের আদেশ পালন। এখানে এই প্রেরণাদাতা নেই। হাঁ, যদি অবস্থা এমন হত যে, জনসমাবেশ না থাকলেও নামায পড়ত; কিন্তু জনসমাবেশ থাকার কারণে তাদের ভাল বলারও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তবে এক্ষেত্রে দুটি প্রেরণাদাতা একত্রিত হয়—ধর্মের আদেশ পালন এবং মানুষের ভাল বলার আকাঙ্ক্ষা। এখানে যে পরিমাণে নিয়ত শুদ্ধ হবে, সে পরিমাণে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং যে পরিমাণে নিয়ত ফাসেদ হবে, সেই পরিমাণে আযাব। একটির উপস্থিতিতে অপরটি নিষ্ফল হবে না।

নিয়তে ত্রুটির কারণে যে নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তা যদি নফল নামায হয়, তবে তার বিধান সদকার অনুরূপ। অর্থাৎ, এটা একদিক দিয়ে আনুগত্য এবং একদিক দিয়ে নাফরমানী। কেননা, এরূপ নামাযীর অন্তরে ভাল ও মন্দ দুটি প্রেরণাদাতা বিদ্যমান। সুতরাং এরূপ বলা যায় না যে, তার নামায শুদ্ধ নয় এবং তার এক্তেদাও শুদ্ধ নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি তারাবীহর নামায আদায় করল এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা জানা গেল যে, তার ইচ্ছা কেবল সুন্দর কেরাআত যাহির করাই ছিল। যদি জামাত না হত এবং সে তার গৃহে একা থাকত, তবে তারাবীহ পড়ত না। এখানে এটা বলা যায় না যে, এই ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া দুরস্ত নয়। তার সম্পর্কে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরূপ ধারণা করা অবান্তর; বরং মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই করতে হবে যে, সে নফল নামায দ্বারা সওয়াবের ইচ্ছা রাখে। এই ইচ্ছার দিক দিয়ে তার নামাযও শুদ্ধ এবং তার পিছনে নামায পড়াও জায়েয, যদিও সওয়াবের ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছাও যুক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি ফরয নামাযে দুই প্রেরণাদাতা একত্রিত হয় এবং উভয়টি মিলে নামায আদায় করার কারণ হয়, তবে নামাযী ফরয থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, ফরযের প্রেরণাদাতাটি তার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়নি।

কোন্ কোন্ স্থানে এবাদত প্রকাশ করা জায়েয ঃ প্রকাশ থাকে যে, এবাদত গোপন রাখার মধ্যে যেমন এখলাস অবলম্বন এবং রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপকারিতা রয়েছে, তেমনি প্রকাশ করার মধ্যেও উপকারিতা নিহিত আছে। তা হচ্ছে মানুষের অনুসরণ করা এবং তাদের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু এতে রিয়ারও বিপদ আছে। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ সকল মুসলমান জানে যে, এবাদত গোপন রাখার মধ্যে অনেক সাবধানতা কিন্তু প্রকাশ করার মধ্যেও ফায়দা আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা গোপন এবাদত ও প্রকাশ্য এবাদত উভয়ের প্রশংসা করে বলেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা খুব ভাল কথা। আর যদি গোপনে ফকীরদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম।'

এবাদত প্রকাশ করা দ্বিবিধ উপায়ে হয়ে থাকে। এক, আসল এবাদতকে প্রকাশ করা এবং দুই, এবাদত করার পর তা মানুষের কাছে বলে দেয়া। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত যেমন জনসমক্ষে খয়রাত করা, যাতে মানুষও খয়রাত করতে উৎসাহিত হয়। বর্ণিত আছে যে, জনৈক আনসারী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সর্বাগ্রে একটি টাকার থলে দান করেন। এরপর অন্যরা তার দেখাদেখি দান করতে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنِ اتَّبَعَهُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রচলন করে, এরপর মানুষ তা করে, সে সেই সৎকর্মের সওয়াব এবং যারা এর অনুসরণ করে তাদের সওয়াব পাবে।'

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবাদতের অবস্থাও তাই। কিন্তু দান-খয়রাতে মানুষ একে অপরের অধিক অনুসরণ করে থাকে। গাযী যখন জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সর্বপ্রথম সওয়ারী প্রস্তুত করবে, যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়। এটা উত্তম। কেননা, জেহাদে যাওয়া মূলত বাহ্যিক ও প্রকাশ্য এবাদত। এটা গোপনে করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে মানুষ মাঝে মাঝে সজোরে তাহাজ্জুদ পড়ে, যাতে গৃহের অন্যরা জেগে উঠে এবং তার অনুসরণ করে। মোটকথা, হজ্জ, জেহাদ, জুমআ ইত্যাদির মত যে সকল এবাদত গোপনে পালন করা সম্ভব নয়, সেগুলো রিয়ার মিশ্রণ না থাকার শর্তে প্রকাশ্যে পালন করা উত্তম। পক্ষান্তরে যে সকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব যেমন দান-খয়রাত, সেগুলো প্রকাশ্যে পালন করলে যদিও অপরকে উৎসাহিত করা হয় কিন্তু মিসকীন ব্যথা পায়, তাই গোপনে দান-খয়রাত করাই উত্তম। কেননা, মিসকীনকে ব্যথা দেয়া হারাম। যদি মিসকীন ব্যথা না পায়, তবু কারও কারও মতে গোপনে দেয়াই উত্তম এবং কারও মতে গোপনে দেয়া সেই প্রকাশ্যে দেয়ার চেয়ে উত্তম, যার মধ্যে অপরের অনুসরণ নেই। কিন্তু যে প্রকাশ্যে দেয়ার মধ্যে অপরের অনুসরণ আছে, তা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম। কেননা, আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণকে প্রকাশ্যে আমল করারই আদেশ করেছেন, যাতে অন্যরা তাঁদের অনুসরণ করে। এছাড়া لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (সে তার নেকীর সওয়াব এবং যে অনুসরণ করে, তার সওয়াব পাবে)—এই হাদীস দ্বারাও প্রকাশ্যে আমল করার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক হাদীসে বলা হয়েছে—গোপন আমলের সওয়াব প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। কিন্তু যে প্রকাশ্য আমলের অন্যরা অনুসরণ করে, তার সওয়াব গোপন আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। এই হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কেননা, অন্তর রিয়ার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হলে এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থায় আমল এখলাস সহকারে সম্পন্ন হলে প্রকাশ্য আমলই নিঃসন্দেহে উত্তম হবে। কারণ, এতে অপরের অনুসরণ অর্জিত হবে। প্রকাশ্যে আমল করার একমাত্র ভয় হচ্ছে রিয়া। যদি রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তবে নিজে ধ্বংস হয়ে অপরের অনুসরণে কোন ফায়দা নেই। এমতাবস্থায় প্রকাশ্যে আমল করার তুলনায় গোপনে আমল করা সকলের মতে উত্তম।

কিন্তু যে ব্যক্তি আমলকে প্রকাশ করতে চায়, তার দুটি বিষয় ভেবে নেয়া উচিত। প্রথম, এমন জায়গায় প্রকাশ করতে হবে, যেখানে অপরের অনুসরণের নিশ্চিত অথবা প্রবল বিশ্বাস থাকে। দ্বিতীয়, অন্তরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তাতে গোপন রিয়ার প্রতি মহব্বত না থাকে এবং এরই কারণে অনুসরণের ছলে আমল প্রকাশ না করে।

মোটকথা, নফসের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। প্রকাশ্য আমল খুব কম বিপদমুক্ত হয়ে থাকে। আমল গোপনে করার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। আমল প্রকাশ করার মধ্যে এমন বিপদাশংকা রয়েছে, যা অতিক্রম করার ক্ষমতা আমাদের মত লোকদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমাদের এবং সকল দুর্বলমনাদের উচিত প্রকাশ্যে আমল করাকে ভয় করা।

গোপনে আমল সম্পন্ন করার পর তা মানুষের কাছে বলে দেয়াও কম বিপজ্জনক নয়, এর বিধানও প্রকাশ্যে আমল করার অনুরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মযবুত মন ও পূর্ণ এখলাসের অধিকারী এবং মানুষের নিন্দা ও প্রশংসা যার কাছে সমান, সে এমন লোকদের কাছে আপন আমলের কথা ব্যক্ত করতে পারে, যাদের দিক থেকে অনুসরণ আশা করা যায় এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ জানা যায়। নিয়ত পরিষ্কার এবং মন বিপদমুক্ত হলে এরূপ প্রকাশ করা জায়েয; বরং মোস্তাহাব। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধরনের প্রকাশ করার কথা বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত সাদ ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে নামায ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আমার মনে উদিত হয়েছে এবং এমন কোন জানাযার পিছনে যাইনি, যাতে তার সওয়াল-জওয়াব ছাড়া অন্য কিছু মনে মনে ভেবেছি। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে যখনই কোন কথা শুনেছি, তাকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছি।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি কখনও এ বিষয়ের পরওয়া করি না যে, আমি ধনী না গরীব। কেননা, ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতার মধ্যে কোন্‌টি আমার জন্যে মঙ্গলজনক, তা আমার জানা নেই। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার পর থেকে আমি কখনও যিনা করিনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। নিঃসন্দেহে এসব রেওয়ায়েত নিজের উত্তম অবস্থা প্রকাশ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশকারী অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হওয়ার শর্তে এরূপ প্রকাশ করা উত্তম। পক্ষান্তরে রিয়াকারের মুখ থেকে এসব কথা ঘৃণ্য রিয়াকারী ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, আমল প্রকাশ করার দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা সমীচীন নয়। কেননা, মানুষের মন দেখাদেখি কাজ করা ও অনুসরণ করা পছন্দ করে। এটা তার মজ্জার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, রিয়াকারও যদি তার এবাদত প্রকাশ করে এবং মানুষ তার রিয়া না জানে, তবে এতেও মানুষের অনেক উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু এটা বিশেষ করে তার নিজের জন্যে ক্ষতিকর। অনেক এখলাস সম্পন্ন ব্যক্তির এখলাসের কারণ রিয়াকারের অনুসরণ হয়ে থাকে। যদিও সে আল্লাহর কাছে রিয়াকার; কিন্তু তার অনুসরণ দ্বারা অপরের উপকার হয়ে যায়।

এক সময় বসরার অলিগলি দিয়ে ফজরের নামাযের পর কেউ গমন করলে সে চতুর্দিক থেকে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেত। কিন্তু যখন জনৈক আলেম রিয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে একটি পুস্তক রচনা করলেন, তখন সকলেই তেলাওয়াত বর্জন করল এবং তারা বলতে লাগল ঃ এ গ্রন্থটি রচিত না হলেই ভাল হত। মোটকথা, রিয়াকারের প্রকাশ করা দ্বারাও উপকার হয় যদি মানুষ না জানে যে, সে রিয়ার কারণে আমল করছে। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِاَقْوَامٍ لَّاخَلَاقَ لَهُمْ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তি এবং ভূমিকাহীন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ইসলামকে শক্তি যোগান।'

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত রিয়াকারও এই হাদীসের প্রতীক।

রিয়ার **ভয়ে সৎকর্ম বর্জন করা** ঃ কোন কোন লোক রিয়াকার হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমলই বর্জন করে বসে। এটা তাদের ভ্রান্তি এবং শয়তানের সাথে সহযোগিতা। জানা দরকার যে, আমল দু'প্রকার। প্রথম, যার মধ্যে কোন আনন্দ নেই; বরং আছে শুধু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও জেহাদ। এসব আমল এদিক দিয়ে আনন্দদায়ক হয় যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার সেসব আমল, যেগুলো স্বয়ং আনন্দদায়ক। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই দেহের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত; যেমন খলীফা হওয়া, বিচারপতি হওয়া, শাসক হওয়া, নামাযের ইমাম হওয়া, উপদেশদাতা ও শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এসব আমলের মধ্যে বিপদাপদ বেশী।

প্রথম প্রকার আমল অর্থাৎ নামায, রোযা ও জেহাদের মধ্যে ত্রিবিধ উপায়ে রিয়ার আশংকা থাকে। প্রথম, রিয়া আমলের পূর্বে আসে এবং মানুষকে দেখানোর জন্যে আমল শুরু করা হয়। কোন ধর্মীয় কারণ এর সাথে থাকে না। রিয়ার ভয়ে এরূপ আমল বর্জন করা উচিত। কেননা, এটা পরিষ্কার গোনাহ। এতে এবাদত নেই; বরং এটা এবাদতের ছদ্মাবরণে মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের অপচেষ্টা। দ্বিতীয়, আমল আল্লাহর জন্যেই করতে প্রস্তুত থাকার পর মাঝখানে অথবা শুরুতে রিয়া আসা। এমতাবস্থায় আমল বর্জন করা উচিত নয়। কেননা, এতে ধর্মীয় কারণ পাওয়া যায়। এখানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে রিয়া দূর করা দরকার। তৃতীয়, এখলাস সহকারে আমলের নিয়ত করা, অতঃপর রিয়া ও রিয়ার কারণসমূহ আমল সম্পাদন করার সময় আত্মপ্রকাশ করা। এমতাবস্থায়ও রিয়া দূর করার জন্যে অধ্যবসায় জরুরী এবং আমল বর্জন করা অসমীচীন। কেননা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শয়তান প্রথমে এটাই চায় যে, মানুষ আমল না করুক। যদি কেউ শয়তানকে অমান্য করে আমল শুরু করে দেয়, তবে শয়তান তাকে রিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। কেউ এটাও উপেক্ষা করলে শয়তান বলে ঃ তোর আমলে এখলাস নেই। তুই রিয়াকার। এখলাসহীন আমল দ্বারা তোর কোন উপকার হবে না। শয়তান এ কথাটি উপর্যুপরি বলে যেতে থাকে যে পর্যন্ত সে আমল বর্জন না করে।

সারকথা, যে পর্যন্ত আমলের প্রেরণাদাতা ধর্ম হয়, সে পর্যন্ত আমল বর্জন করবে না; বরং যথাসম্ভব রিয়ার কুমন্ত্রণাকে দূর করবে এবং মনে মনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লজ্জিত হবে।

মানুষের কাছে খ্যাত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমল বর্জন করার নযীর পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইবরাহীম নখয়ী একবার তেলাওয়াতে রত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তার খেদমতে আগমন করল। তিনি কোরআন বন্ধ করে তেলাওয়াত মওকুফ করে বললেন ঃ আগন্তুক যেন না জানে যে, আমি প্রতিনিয়ত তেলাওয়াত করি। ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ যখন কথা বলা তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়, তখন চুপ করে থাকবে এবং যখন চুপ থাকা সুখকর মনে হয়, তখন কথা বলবে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ কোন কোন বুযুর্গ পথিমধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকতে দেখেও খ্যাতির ভয়ে সেটি সরাতেন না। কেউ কেউ ভাবাবেগে কান্না এলে সেটিকে হাসিতে রূপান্তরিত করে দিতেন। এ সম্পর্কে এমনি ধরনের আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলোর জওয়াব এই যে, আমল বর্জনের রেওয়ায়েতসমূহের মোকাবিলায় আমল অব্যাহত রাখার রেওয়ায়েত অসংখ্য বুযুর্গ থেকে বিদ্যমান আছে। এছাড়া নফল আমল হলে তা বর্জন করা জায়েয।

দ্বিতীয় প্রকার আমল যা সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তাতে রিয়ার বিপদাশংকা অধিক। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বিপদাশংকা খেলাফতের মধ্যে, এরপর শাসক হওয়ার মধ্যে, এরপর উপদেশ, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের মধ্যে। অতএব, প্রত্যেকটি বিশদভাবে জানা দরকার।

খেলাফতের অর্থ হচ্ছে মুসলমান জনগণের নেতা হওয়া। এটা ইনসাফ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও এখলাস সহকারে হলে উত্তম এবাদত। হাদীসে বলা হয়েছে—

عِبَادَةُ الْيَوْمِ مِنْ اِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سِتِّيْنَ عَامًا

অর্থাৎ, 'ন্যায়পরায়ণ খলীফার একদিনের এবাদত এক ব্যক্তির একাকী ষাট বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম।'

অতএব এরচেয়ে বেশী এবাদত আর কি হবে, যার একদিন ষাট বছরের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। অন্য হাদীসে আছে—

اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةٌ الْاِمَامُ الْمُقْسِطُ اَحَدُهُمْ

অর্থাৎ, 'সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ খলীফা তাদের একজন।

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে আছে—

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ اَحَدُهُمْ

অর্থাৎ, 'তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক তাদের একজন।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন—

اَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটে বসবে ন্যায়পরায়ণ শাসক।'

মোটকথা, খেলাফত একটি মহান এবাদত। এতে বিপদাশংকা অধিক বিধায় খোদাভীরু ব্যক্তিগণ সর্বকালেই এ থেকে দূরে রয়েছেন। কেননা, এর কারণে মনের মধ্যে যশপ্রীতি এবং জয়ী হওয়ার আনন্দ প্রবল হয়ে যায়, যা জাগতিক আনন্দসমূহের অন্যতম। শাসক ব্যক্তি সাধারণত তার মানসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে, আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে সত্য বিষয়কেও বর্জন করতে পারে— যদি তা তার যশপ্রীতির প্রতিকূল হয়। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে যশ বেশী, তা বাতিল হলেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাস্তবায়িত করতে পারে এবং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এহেন বিপদাশংকার কারণেই হযরত উমর (রাঃ) বলতেন ঃ এই পদে যখন এত বিপদ, তখন এটি কে গ্রহণ করতে পারে? রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَا مِنْ وَالِي عَشَرَةٍ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلَةً يَدُهُ اِلٰى عُنُقِهِ اَطْلَقَهُ عَدْلُهُ اَوْ اَوْبَقَهُ جَوْرُهُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি দশজনেরও শাসক, সেও কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় আসবে যে, তার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা থাকবে। তার ন্যায়পরায়ণতা তাকে মুক্ত করবে অথবা তার যুলুম তাকে ধ্বংস করবে।'

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মা'কাল ইবনে ইয়াসারকে কোন প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন আমার এ পদ কবুল করা উচিত কি না? খলীফা বললেন ঃ যদি আমার পরামর্শের উপরই নির্ভর কর, তবে আমার মতে কবুল না করাই ভাল। কিন্তু আমার এ পরামর্শের কথা অন্য কাউকে বলবে না।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! শাসক পদের জন্য আবেদন করো না। যদি আবেদন ছাড়াই পেয়ে যাও, তবে এর জন্যে তুমি অদৃশ্য জগত থেকে সাহায্য পাবে। আর আবেদন করে পেলে সাহায্য পাবে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার রাফে' ইবনে উমরকে বললেন ঃ দু'ব্যক্তির উপরও শাসক হয়ো না। কিন্তু পরে যখন হযরত আবূ বকর নিজে খলীফা হলেন, তখন রাফে দাঁড়িয়ে তাঁর খেদমতে আরয করলেন ঃ আপনি কি আমাকে বলেননি যে, দু'ব্যক্তির উপরও শাসক হয়ো না? এখন তো আপনাকে সমগ্র উম্মতের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর বললেন ঃ আমি এখনও সেকথাই বলি। যে ব্যক্তি শাসক হয়ে ন্যায়বিচার করে না, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

যে সকল হাদীসের মধ্যে শাসক হওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে সকল হাদীসে শাসক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোন স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তি সেগুলোকে হয়তো পরস্পরবিরোধী মনে করবে। অথচ এরূপ নয়। এ সম্পর্কে সত্য কথা এই যে, যারা শক্তিশালী ধার্মিক, তাদের শাসক হতে অস্বীকার করা উচিত নয়। আর যারা দুর্বল, তাদের অবশ্যই এর ধারে-কাছে না যাওয়া উচিত। গেলে নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে। শক্তিশালী ধার্মিক তারাই, যারা আল্লাহর কাজে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না এবং দুনিয়া যেদিকেই যাক, তারা লোভ ও লালসার জালে আবদ্ধ হয় না। এ ধরনের ব্যক্তিদের প্রতিটি নড়াচড়া ও উঠাবসা ন্যায়ানুগ হয়ে থাকে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রাণনাশের আশংকা থাকলেও তারা পরওয়া করে না। সুতরাং শাসক হওয়া এরূপ ব্যক্তিদেরই কাজ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানে যে, এসব গুণ তার মধ্যে নেই, শাসক হওয়া তার জন্যে হারাম।

শক্তিশালী ও দুর্বলের উপরোক্ত পার্থক্য জানার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আবূ বকরের রাফে'কে শাসক হতে নিষেধ করা এবং নিজের শাসক হয়ে যাওয়া পরস্পর বিরোধী নয়।

বিচারকের পদ শাসনকর্তার নিম্নে হলেও এর বিধানও শাসনকর্তার পদের অনুরূপ। এতেও শাসনক্ষমতা আছে, যা স্বভাবতই প্রিয়। বিচারকের পদে যদি ন্যায়ের অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক সওয়াব, আর যদি ন্যায় থেকে বিচ্যুতি ঘটে, তবে আযাবও অনেক। হাদীসে বর্ণিত আছে, বিচারক তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে এবং দু'প্রকার জাহান্নামে যাবে। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নিজে বিচারক হওয়ার আবেদন করে, সে ছুরি ছাড়াই যবেহ হয়ে যায়। সারকথা, যারা দুর্বল ধার্মিক এবং যাদের দৃষ্টিতে জাগতিক সামগ্রীর কদর আছে, তারা বিচারকের পদ থেকে দূরে থাকবে। আর যারা শক্তিশালী, কেবল তারাই এ পদ গ্রহণ করবে। যদি শাসনকর্তা যালেম হয় এবং জানা থাকে যে, বিচারককে তার মরযী মেনে চলতে হবে, তবে কোনক্রমেই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ হয়ে যায়, তবে তার কর্তব্য হবে বিচারকার্যে শাসনকর্তাকে সর্বসাধারণের মত গণ্য করা। এক্ষেত্রে পদচ্যুতির অজুহাত মোটেই কল্যাণকর নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ন্যায়ানুগ বিচারকার্যের কারণে যদি বিচারক পদচ্যুতও হয়ে যায়, তবে এজন্যে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বিপদ টলিয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি পদচ্যুতিকে অসহনীয় মনে করে শাসনকর্তার মরযী অনুযায়ী ন্যায়বিচার বিসর্জন দেয় এবং এতে কোন দোষ না দেখে, তবে এরূপ বিচারক খেয়াল-খুশীর অনুসারী ও শয়তানের চেলা বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সওয়াবের আশা করা দূরের কথা, সে যালেমদের তালিকাভুক্ত হয়ে দোযখের নিম্নস্তরে স্থান পাবে।

ওয়ায, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের অবস্থাও তদ্রূপ। অর্থাৎ, এগুলোর মাধ্যমেও প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ ও সম্মান বৃদ্ধি পায় বিধায় বিপদাশংকাও বেশী। পূর্ববর্তী মনীষীগণ যতটা সম্ভব ফতোয়াদান থেকে বিরত থাকতেন। ওয়ায়েয যখন ওয়ায দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত, ক্রন্দনরত ও তার প্রতি আকৃষ্ট দেখতে পায়, তখন তার মনে এমন অনাবিল আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, যার সমান কোন আনন্দ নেই। তখন তার মনে চায়, এমন ওয়াযই করা উচিত, যা মানুষের কাছে ভাল লাগে যদিও তা ভ্রান্ত হয়। আর যে কথা সত্য হলেও মানুষের কাছে ভাল লাগে না, তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এরপর মানুষের মনে সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ওয়ায়েয কেবল এমন ওয়ায করে, যাতে শ্রোতাদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সে কোথাও হাদীস ও জ্ঞানের কথা শুনলে এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, এবারের ওয়ায়ে এটি বর্ণনা করব এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে ধন্যবাদ কুড়াব। অথচ এই ভেবে আনন্দিত হওয়া সমীচীন ছিল যে, আমার সৌভাগ্য যে, হাদীসটি পেয়েছি। সুতরাং প্রথমে আমি আমল করব, অতঃপর অন্যদের কাছে পৌঁছাব, যাতে তারাও আমল করে উপকৃত হয়। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) নিজে খোতবা দিতেন এবং ওয়ায করতেন। কিন্তু যখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইল, তখন তাকে নিষেধ করলেন। এতে লোকটি বলল ঃ আপনি কি মানুষকে উপদেশ দিতে নিষেধ করেন? তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হয়, তুমি ভুলক্রমে আকাশে পৌঁছে যাবে। এরূপ বলার কারণ এই, তিনি লোকটির মধ্যে যশ ও মর্যাদার মোহ আঁচ করতে পেরেছিলেন।

এবাদতের আগে-পরে ও মাঝে মুরীদের কি করা উচিত ঃ প্রকাশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে যে, আপন এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জানা নিয়েই মুরীদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার জানা নিয়ে সে-ই সন্তুষ্ট থাকে, যে আল্লাহকেই ভয় করে এবং তাঁর কাছেই প্রতিদান আশা করে। যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে ভয় করে এবং তার কাছে আশা করে, সে তাকে নিজের এবাদত সম্পর্কে জানাতেও আগ্রহী হয়। সুতরাং কারও অবস্থা এরূপ হলে তার উচিত জ্ঞান ও ঈমানের কারণে মনে মনে এর নিন্দা করা। কেননা, এ কারণে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির আশংকা আছে। যখন কেউ কোন কঠিন ও দুরূহ এবাদত করে, যা অপরের দ্বারা সচরাচর হয় না, তখন আপন নফসের হেফাযত করা জরুরী। কারণ, নফস এ ধরনের এবাদত অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিতে পুরাপুরি আগ্রহী থাকে। নফস বলে ঃ তোমার এই বড় এবাদত ও মহান খোদাভীতি সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত হলে তারা ভক্তির আতিশয্যে তোমাকে সেজদা করতে শুরু করবে। কারণ, তাদের মধ্যে কে আছে, যে এরূপ এবাদত করতে পারে? মোটকথা, কেউ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার কর্তব্য হবে দৃঢ়পদ থাকা এবং নিজের এবাদতের মোকাবিলায় পরকালের মাহাত্ম্য ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে স্মরণ করা। তার আরও চিন্তা করা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার এবাদত দ্বারা বান্দার কাছ থেকে প্রশংসা কুড়ানোর মধ্যে খোদায়ী গযব ও ক্রোধ নিহিত রয়েছে। সুতরাং এবাদত প্রকাশ করা অন্যের কাছে ভাল মনে হলেও আল্লাহ তাআলার কাছে অবনতি ও আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ। তার এই মনে করে নিরাশ হওয়া উচিত নয় যে, এখলাস তথা আন্তরিকতা তো বড়দের কাজ। যারা মিশ্র আমল করে, তারা এই মর্তবা কোথায় পাবে! বরং তার জানা উচিত যে, যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু, তাদের তুলনায় যারা মুত্তাকী নয়, এখলাসের প্রয়োজনীয়তা তাদের বেশী। কেননা, মুত্তাকীদের যদি নফল এবাদত বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে ফরয এবাদত পূর্ণই থেকে যাবে। কিন্তু যারা মুত্তাকী নয়, তাদের তো ফরয এবাদতও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের এই ত্রুটি নফল এবাদত দ্বারা পূর্ণ করা হবে। যদি নফল এবাদত সঠিক না হয়, তবে ফরয এবাদত ত্রুটিপূর্ণই থেকে যাবে। তামীম দারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের সময় যদি ফরযে ত্রুটি দেখা যায়, তবে আদেশ হবে, দেখ, তার কোন নফল এবাদত আছে কি না। থাকলে তা দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূরণ করা হবে। অন্যথায় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, কিয়ামতে মিশ্র আমলকারীর ফরয এবাদত ত্রুটিযুক্ত হবে এবং গোনাহ প্রচুর হবে। ফরযের ত্রুটি দূর করা এবং গোনাহের কাফফারা নফল এবাদতে এখলাস ছাড়া সম্ভবপর নয়। এ থেকে জানা গেল যে, এবাদত করার সময় এবং এবাদত সমাপ্ত করার পরও অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকা উচিত, যাতে এবাদতকে মানুষের কাছে প্রকাশ না করে। এজন্যে এবাদত কবুল হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান থাকা জরুরী। এই সন্দেহ ও ভয় এবাদতের সময় ও এবাদতের পর করা উচিত—নিয়তের শুরুতে নয়। বরং শুরুতে নিজের এখলাস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হবে, যাতে এবাদত সঠিক হয়। শুরু করার পর যখন এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে অনবধান ও ভুল হতে পারে, তখন আশংকা করা সমীচীন যে, এই অনবধানতার মধ্যে সম্ভবত কোন রিয়া অথবা আত্মপ্রীতি এসে গেছে, যাতে এবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে। তবে এবাদত কবুল হওয়ার আশা প্রবল থাকা উচিত। কেননা, এবাদতের মধ্যে এখলাস নিশ্চিতরূপেই রয়েছে। তবে রিয়ার কারণে তা বাতিল হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ের আশা প্রবল থাকা দরকার। এ বিষয়টি জানার কারণে মোনাজাত ও এবাদতে খুব আনন্দ পাওয়া যায়। কেননা, এখলাস তো নিশ্চিত এবং রিয়ার মধ্যে সন্দেহ। যে ব্যক্তি এই সন্দেহকেও ভয় করে, তার ভয় তাকে সংশোধনে উৎসাহিত করে।

যে ব্যক্তি পরোপকার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, তারও নিজের জন্যে সওয়াবের আশা করা উচিত। কেননা, যার উপকার করা হবে, তার মন তুষ্ট হবে এবং যাকে শিক্ষাদান করা হবে, সে শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে। এগুলো সওয়াবেরই বিষয়। কিন্তু শুধু সওয়াবেরই আশা করা উচিত—কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান ও প্রশংসা কীর্তনের আশা করা উচিত নয়—যাকে শিক্ষাদান করা হয়, তার কাছ থেকেও নয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং যার উপকার হয়, তার কাছ থেকেও নয়। অন্যথায় আমল বরবাদ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ যদি শিক্ষার্থীদের কাছে আশা করা হয় যে, শিক্ষাদানের বিনিময়ে সে আমার কাজকর্ম ও খেদমত করবে অথবা দল ভারী হওয়ার জন্যে পথে আমার সঙ্গে চলবে, তবে বুঝতে হবে যে, সে তার মজুরী আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া সে কোন সওয়াব পাবে না। কিন্তু শিক্ষক যদি কোন আশা না করে এবং শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খেদমত করে, তবে আশা করা যায়, শিক্ষকের সওয়াব বাতিল হবে না। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণ এ ধরনের খেদমত এরূপ করতেও আপত্তি করতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক আলেম কূপে পড়ে যান। তাকে কূপ থেকে উপরে তোলার জন্যে লোকজন দৌড়ে এল এবং কূপের ভেতরে রশি ফেলল। কিন্তু তিনি কূপের মধ্য থেকে কসম দিলেন যে, যে ব্যক্তি তার কাছে কোরআন পাকের একটি আয়াতও পাঠ করেছে অথবা একটি হাদীসও শুনেছে, সে যেন এই রশি স্পর্শ না করে। তিনি আশংকা করছিলেন যে, এতটুকু খেদমত গ্রহণ করার কারণেও আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে।

হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি একটি বস্ত্র হযরত সুফিয়ান ছওরীর কাছে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ হুযুর, আমি তো আপনার কাছে হাদীস পড়িনি। আপনি উপহারটি ফেরত পাঠালেন কেন? হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ তুমি পড় না ঠিক; কিন্তু তোমার ভাই তো পড়ে। আমি আশংকা করি যে, এই উপহারের কারণে তার প্রতি আমার অন্তর অন্যের তুলনায় অধিক না ঝুঁকে পড়ে।

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ানের খেদমতে একটি মুদ্রার থলে নিয়ে আগমন করল। লোকটির পিতা তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তিনি প্রায়ই তার কাছে চলে যেতেন। লোকটি আরয করল ঃ আমার পিতা সম্পর্কে আপনার অন্তরে কোন খটকা আছে কি? তিনি বললেন ঃ না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। সে তো অত্যন্ত সাধু ব্যক্তি ছিল। লোকটি আরয করল ঃ আপনি জানেন যে, এই থলেটি তারই ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার অধিকারে এসেছে। অতএব আপনিও এর দ্বারা আপনার পরিবারের কিছুটা ভরণ-পোষণ করুন। একথা শুনে হযরত সুফিয়ান থলেটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু লোকটি চলে যাওয়ার পর তিনি নিজের পুত্র মোবারককে বললেন ঃ শীঘ্র যাও এবং লোকটিকে আমার কাছে ডেকে আন। লোকটি পুনরায় আগমন করলে তিনি বললেন ঃ এখন আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার থলেটি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি খুব পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, লোকটির পিতার সাথে তাঁর আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ছিল। কাজেই তার সম্পত্তি থেকে কিছু নেয়া পছন্দ করেননি। তাঁর পুত্র মোবারক বলেন ঃ লোকটি তার অর্থ নিয়ে চলে গেলে আমি থাকতে পারলাম না এবং পিতার খেদমতে এসে আরয করলাম ঃ আপনার কি হল? এই সামান্য মুদ্রা আপনি ফিরিয়ে দিলেন কেন? আমাদের এখানে পরিবার-পরিজন রয়েছে। আপনার ভ্রাতারা আছেন। আপনার কি আমাদের প্রতি দয়া হয় না? তিনি বললেন ঃ মোবারক, আল্লাহকে ভয় কর। মজা করে খাবে তোমরা, আর এর জওয়াবদিহি করব আমি, এটা হতে পারে না। এ থেকে জানা গেল, আলেমের কাছ থেকে কেউ কোন ফয়েয পেলে আলেম তার সওয়াব কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছেই আশা করবে। শিষ্যও সর্বদা আল্লাহর কাছেই সওয়াব ও মর্যাদা অন্বেষণ করবে। মাঝে মাঝে শিষ্য মনে করে যে, প্রকাশ্যে আল্লাহর এবাদত করলে ওস্তাদের অন্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং লেখাপড়া ভাল হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা, অন্যকে তুষ্ট করার নিয়তে আল্লাহর এবাদত করার ক্ষতি নগদ এবং লেখাপড়ার উপকার হওয়া-না হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। সুতরাং নগদ আমলকে সন্দিগ্ধ উপকারের বিনিময়ে নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। বরং শিষ্যের উচিত আল্লাহর জন্যেই লেখাপড়া করা, তাঁরই জন্যে এবাদত করা এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে ওস্তাদের খেদমত করা। এরূপ হলে লেখাপড়াও এবাদত বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে পিতামাতার সেবাও এই মনে করে করবে যে, পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। এই মনে করে নয় যে, সেবা করলে তাদের অন্তরে আমার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় অধ্যায়

অহংকার ও আত্মপ্রীতি

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ الحديث

অর্থাৎ, 'অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয়ে আমার সাথে বিরোধ করে, আমি তাকে চুরমার করে দেব।'

অন্য এক হাদীসে আছে—

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

অর্থাৎ, 'তিনটি বিষয় বিনাশকারী। এক, কৃপণতা, মানুষ যার অনুগত হয়। দুই, মানসিক প্রবৃত্তি, মানুষ যার অনুগামী হয়। তিন, আত্মপ্রীতি।'

অতএব, অহংকার ও আত্মপ্রীতি মারাত্মক ব্যাধি। অহংকারী ও আত্মপ্রিয় ব্যক্তি রুগ্ন এবং আল্লাহর দুশমন। এ খণ্ডে বিনাশকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য বিধায় অহংকার ও আত্মপ্রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা নেহায়েত জরুরী। নিম্নে দুটি বিষয়কে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হচ্ছে।

অহংকারের নিন্দা ঃ কোরআন পাকে বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা অহংকার ও অহংকারীদের নিন্দা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ এরশাদ হয়েছে ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, 'যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দাম্ভিকতা করে, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে হটিয়ে দিব।' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

অর্থাৎ, 'এমনিভাবে আল্লাহ মোহর এঁটে দেন প্রত্যেক দাম্ভিক অবাধ্যের অন্তরে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

অর্থাৎ, তারা ফয়সালা চাইতে লাগল এবং ব্যর্থ হল প্রত্যেক অবাধ্য হটকারী।

لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না।

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا

অর্থাৎ, তারা মনে মনে খুব অহংকার করে এবং মারাত্মক সীমালঙ্ঘন করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার এবাদতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

মোটকথা, অহংকারের নিন্দা কোরআন মজীদে বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ ،

অর্থাৎ,' যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না এবং যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না।'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন—একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর মারওয়ায় একত্রিত হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর প্রথমোক্ত জন চলে গেলেন এবং শেষোক্ত জন দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে গেলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—মানুষ নিজেকে এত উঁচুতে নিয়ে যায় যে, পরিণামে সে অহংকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। ফলে যে শাস্তি অহংকারীরা পায়, তা সে-ও পায়।

হযরত সোলায়মান (আঃ) একদিন মানুষ, জিন ও পশুপক্ষীদেরকে ময়দানে সমবেত হতে আদেশ করলেন। সেমতে দু'লাখ মানুষ, জিন ইত্যাদি সমবেত হল। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আঃ) এত উঁচুতে উঠলেন যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ্ তাঁর শ্রুতিগোচর হল। এরপর তাঁকে নিম্নে নামানো হল, এমনকি তাঁর পদযুগল সমুদ্র স্পর্শ করল। সেখানে তিনি এই আওয়াজ শুনতে পেলেন— যদি তোমাদের প্রভু অর্থাৎ সোলায়মানের অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার থাকে, তবে তাকে যতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে, তার চেয়েও বেশী পাতালে নামিয়ে দেব।

বর্ণিত আছে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যে কথোপকথন হল। দোযখ বলল ঃ আমি অহংকারী ও শক্তিধরদেরকে পাব। জান্নাত বলল ঃ তা হলে আমি কি অপরাধ করলাম যে, দুর্বল ও অক্ষমরাই আমার মধ্যে স্থান পাবে? আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন ঃ তুমি আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে রহমত দেব। অতঃপর দোযখকে বললেন ঃ তুই আমার আযাব। আমি যাকে ইচ্ছা, তোর মাধ্যমে আযাব দেব এবং জান্নাত ও দোযখ উভয়কে পরিপূর্ণ করে দেব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—দুষ্ট বান্দা সে-ই, যে জবরদস্তি ও সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশক্তিমানকে ভুলে যায়। দুষ্ট বান্দা সেই, যে যুলুম করে ও অহংকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দেয় না। মন্দ বান্দা সেই, যে ভ্রান্তি ও ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকে এবং কবরে মাটি হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করে না। অধম বান্দা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সেই, যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সূচনা ও পরিণতির কথা একবারও ভেবে দেখে না। হযরত ছাবেত (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল—অমুক ব্যক্তি সাংঘাতিক অহংকারী। তিনি বললেন ঃ তার কি মৃত্যু নেই?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি আপন পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি এবং দুটি বিষয়ের আদেশ করছি। শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি এবং কালেমায়ে তাইয়েবার আদেশ করছি। কেননা, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কালেমায়ে তাইয়েবা অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমায়ে তাইয়েবার পাল্লাই ভারী হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ের আদেশ করছি, তা হচ্ছে "সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী"। কেননা, এরই মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক দেয়া হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন, মোবারক সেই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব শিক্ষা দেন এবং সে নিরহংকার হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। অন্য এক হাদীসে আছে—কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিপীলিকার আকৃতিতে পুনরুত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে চলবে। সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোযখীদের পুঁজ ও কাদা তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রতাপশালী ও অহংকারী লোক কিয়ামতে পিঁপড়ার আকারে উত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পায়ের নিচে পিষ্ট করবে। কেননা, তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে হেয় মনে করেছিল।

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বলেন ঃ আমি বেলাল ইবনে আবী বুরদার কাছে গিয়ে বললাম, তোমার পিতা আমার কাছে তার পিতার বাচনিক রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন— দোযখে "মুহিব" নামক একটি জঙ্গল আছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অহংকারীরা তাতে বাস করুক। সুতরাং হে বেলাল, তুমি নিজেকে অহংকারমুক্ত রাখ। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে– এক, অহংকার, দুই, ফরয এবং তিন, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গকরণ।

অহংকারের নিন্দায় অনেক মনীষীর উক্তিও বর্ণিত আছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ এক মুসলমান যেন অন্য মুসলমানকে হেয় জ্ঞান না করে। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র, সে আল্লাহর কাছে বড়। ওয়াহাব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা "জান্নাতে আদম"-কে সৃষ্টি করার পর তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ অহংকারী ব্যক্তির জন্যে তুমি হারাম। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ প্রত্যহ একবার অথবা দু'বার আপন হাতে পায়খানা ধৌত করে, এরপরও অহংকার করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যিনি প্রতাপশালী তাঁর মোকাবিলা করে। হযরত মোহাম্মদ ইবনে হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষের অন্তরে যে পরিমাণে অহংকার আসে, সেই পরিমাণের জ্ঞানবুদ্ধি হ্রাস পায়। অহংকার কম হলে বুদ্ধির ক্ষতিও কম হবে এবং বেশী হলে বেশী। হযরত সালমান (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ সেই কুকর্ম কোন্‌টি যার উপস্থিতিতে সৎকর্ম উপকারী হয় না? তিনি বললেন ঃ অহংকার। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানের অনেক ফাঁদ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে অহংকার করা এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন।

কাপড় ঝুলিয়ে অথবা সদর্পে চলা ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهُ بَطَرًا

অর্থাৎ, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যে লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে সদর্পে চলে।'

যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর খেদমতে গেলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ নতুন পোশাক পরিধান করে তার কাছ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বললেন ঃ বৎস! লুঙ্গি আরও উঁচুতে পরিধান কর। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে কেউ সদর্পে লুঙ্গি টেনে চলবে কিয়ামতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। বর্ণিত আছে, একদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) নিজের হাতের তালুতে থুথু নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তাতে অঙ্গুলি রেখে বললেন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার কবল থেকে বেঁচে যাবে? আমি তোমাকে এরই মত বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন তোমাকে সবল ও বলিষ্ঠ করেছি, তখন পোশাক পরে এমন সদর্পে চল যে, পৃথিবী পর্যন্ত আর্তনাদ করে। তুমি ধন সঞ্চয় কর এবং কাউকে কিছু দাও না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন বলতে শুরু কর, আমি দান-খয়রাত করব। সেটা কি দান-খয়রাতের সময়? এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মত অহংকার করে চলতে শুরু করবে এবং পারস্য ও রোমবাসীরা তাদের খেদমত করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এককে অপরের উপর চাপিয়ে দেবেন। এক হাদীসে আরও এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আপন মনে মনে বড় সাজে এবং দর্প ভরে চলে, সে যখন আল্লাহর কাছে যাবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন।

আবূ বকর হুযালী বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন হযরত হাসান বসরীর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় শাসক ইবনে আহতাম সেখান দিয়ে পায়খানায় যাচ্ছিল। সে কয়েকটি রেশমী কোর্তা পরিধান করেছিল, যা পায়ের গোছার উপর ভাঁজে ভাঁজে রাখা ছিল। তার চলনভঙ্গিতে দর্প ও অহংকার পরিস্ফুট ছিল। হযরত হাসান বসরী একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এই নাক বাড়ানো, কোমর বাঁকানো এবং গ্রীবা ঘুরানোর জন্যে আফসোস। হে নির্বোধ! তুমি ডানে-বামে ঘুরে ঘুরে কি দেখছ? তোমার ডানে-বামে আল্লাহর নেয়ামতরাজি রয়েছে, সেগুলোর তুমি শোকর আদায় করনি। ইবনে আহতাম একথা শুনে ফিরে এল এবং তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না। আল্লাহর সামনে তওবা কর। তুমি কি আল্লাহ পাকের এই উক্তি পাঠ করনি—

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, 'গর্বভরে পদচারণা করো না। কেননা, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং লম্বা হয়ে পর্বতশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।'

একবার জনৈক উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত যুবক হযরত হাসানের সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ মানুষ তার যৌবন ও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে। মনে করা উচিত যে, কবর দেহকে আবৃত করেছে এবং কৃতকর্ম সামনে এসেছে। যাও, অন্তরের চিকিৎসা কর। বান্দার অন্তর সংশোধিত হোক—এটাই আল্লাহ তা'আলার কাম্য।

বর্ণিত আছে, একবার খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) হজ্জ করেন। হযরত তাউস (রহঃ) তাঁর চালচলনে কিছুটা অহংকার লক্ষ্য করলেন। তিনি তার পেটের এক পার্শ্বে অঙ্গুলি দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন ঃ যার পেট বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, তার চালচলন এমন হয় না। হযরত উমর ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললেন ঃ চাচা, এ চালচলন শিক্ষা দেয়ার জন্যে আমার বড়রা আমার প্রতিটি অঙ্গে প্রহার করেছে। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে আপন পুত্রকে অহংকার করতে দেখে কাছে ডেকে বললেন ঃ তুমি কে জান? তোমার মাকে আমি দু'শ' দেরহাম দিয়ে ক্রয় করেছিলাম। আর তোমার পিতা এমন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে এরূপ লোক বেশী সৃষ্টি না করলেই ভাল হয়।

বর্ণিত আছে, মুতারিক ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) মুহাল্লাবকে রেশমী জুব্বা পরিধান করে গর্ব করতে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, তোমার এই চলনকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন না। মুহাল্লাব বলল ঃ আপনি জানেন, আমি কে? মুতারিক বললেন ঃ হাঁ, জানি। প্রথমে তুমি নাপাক বীর্য ছিলে এবং পরিণামে নাপাক মাটি হয়ে যাবে। বর্তমানে ময়লা বহন করে ফিরছ। মুহাল্লাব একথা শুনে চলে গেল এবং গর্ব পরিত্যাগ করল।

আমরা যেখানে অহংকার ও গর্বের নিন্দা লিপিবদ্ধ করেছি, সেখানে কিছুটা বিনয়ের ফযীলত লেখাও সমীচীন মনে হয়।

বিনয় ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

مَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِالْعَفْوِ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, 'ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'আলা কেবল বান্দার ইযযতই বৃদ্ধি করেন এবং আল্লাহর জন্যে যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উঁচুতে তুলে দেন।'

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে। তারা বলগার সাহায্যে তাকে নিমন্ত্রণ করে। যদি সে ব্যক্তি নিজেকে উঁচু করে, তবে ফেরেশতারা বলগা টেনে ধরে এবং বলে ইলাহী, তুমি এই ব্যক্তিকে নিচু করে দাও। আর যদি বিনয় ও আনুগত্য করে, তবে ফেরেশতারা দোয়া দেয় এবং বলে, ইলাহী, একে উঁচু কর। আরও বলা হয়েছে—সে ব্যক্তি সুখী, যে দরিদ্র না হয়েও বিনয় করে, সৎপথে উপার্জিত ধন ব্যয় করে, অবহেলিত ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

আবূ সালমা মুদায়নী তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রেখে মসজিদে কুবায় অবস্থান করছিলেন। ইফতারের সময় আমরা এক পিয়ালা দুধের সাথে সামান্য মধু মিশ্রিত করে পেশ করলাম। তিনি তা মুখে দিয়ে যখন মধুর স্বাদ আস্বাদন করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? আমরা বললাম ঃ দুধের সাথে সামান্য মধু মিশ্রিত করেছি। তিনি পিয়ালা রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি একে হারাম করি না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত বাক্যাবলী উচ্চারণ করলেন—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ

اِقْتَصَرَ اَغْنَاهُ وَمَنْ بَذَّرَ اَفْقَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ-

অর্থাৎ, 'যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ তাকে উঁচু করেন। যে অহংকার করে আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন। যে মধ্যপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ফকীর করেন, আর যে আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাকে বন্ধু করে নেন।'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিলেন—হয় আমি দাস ও রসূল হব, না হয় বাদশাহ ও নবী হব। কিন্তু কোন্‌টি বেছে নিব, তা আমার জানা ছিল না। ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু জিবরাঈল উপস্থিত ছিলেন। আমি তার দিকে মাথা তুলে তাকালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সামনে বিনয় করুন। সেমতে আমি আরয করলাম ঃ আমি দাস ও রসূল হতে চাই। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে ওহী করেন যে, আমি এমন ব্যক্তির নামায কবুল করি, যে আমার মাহাত্ম্যের সামনে বিনয়ী হয়, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার করে না, অন্তরে আমার ভয় রাখে, অষ্টপ্রহর আমাকে স্মরণ করে এবং আমার খাতিরে নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

অর্থাৎ, 'মহত্ত্ব হচ্ছে খোদাভীতি, গৌরব হচ্ছে বিনয় এবং বিশ্বাস হচ্ছে ধনাঢ্যতা। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে বিনয়ী হয়। তারা কিয়ামতে মিম্বরের উপর উপবেশন করবে। সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। কিয়ামতে তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হবে। সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে আপন অন্তরকে পাক রাখে। কিয়ামতে তাদের আল্লাহর দীদার নসীব হবে। অন্য এক হাদীসে আছে—চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যা কেবল সে ব্যক্তি পায়, যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নেন—(১) চুপ থাকা, যা এবাদতের সূচনা, (২) আল্লাহর উপর ভরসা করা, (৩) বিনয় এবং (৪) সংসারবিমুখতা।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উচ্চতা দান করেন। রসূলে করীম (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মধ্যে এবাদতের মিষ্টতা পাই না কেন? তারা আরয করলেনঃ এবাদতের মিষ্টতা কি? তিনি বললেন ঃ বিনয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তার জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দেন। আর যখন অহংকার ও যুলুম করে, তখন তাকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেন এবং আদেশ করেন—দূর হ! আল্লাহ তোকে দূর করেছেন। এরূপ ব্যক্তি স্বজ্ঞানে বড় হলেও মানুষের দৃষ্টিতে ছোট।

হযরত ফুযায়ল (রহঃ)-কে কেউ বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ বিনয় হচ্ছে সত্যের সামনে বিনম্র ও অনুগত হওয়া যদিও সেই সত্য কোন বালক অথবা মূর্খের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ বিনয় হচ্ছে নিজেকে সে ব্যক্তির চেয়ে কম মনে করা, যে পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে কম এবং নিজেকে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক মনে করা, যে পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে বেশী। কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধন, রূপ অথবা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তাতে বিনয় করে না, কিয়ামতে এসব বিষয় তার জন্য শাস্তির কারণ হয়ে যাবে। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতে যে নেয়ামত দান করেন, সে যদি তার শোকর করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই নেয়ামতের উপকার তাকে দুনিয়াতেও দান করেন এবং আখেরাতেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে যদি বান্দা সেই নেয়ামতের শোকর এবং বিনয় প্রদর্শন না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও তার উপকার মওকুফ রাখেন এবং আখেরাতে তার জন্যে জাহান্নামের স্তর খুলে দেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রীতি ছিল যে, তিনি সকালে বড়লোক, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে মনোযোগ দিতেন, এরপর ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে আসতেন এবং তাদের কাছে এই বলে বসে যেতেন যে, মিসকীন মিসকীনদের মধ্যেই এসেছে।

বর্ণিত আছে, একবার ইউসুফ, আইয়ুব ও হাসান (রহঃ) পথে বের হলেন। চলতে চলতে বিনয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। হযরত হাসান জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিনয় কি জান? বিনয় হল গৃহ থেকে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে যে মুসলমানের সাথে দেখা হয়, তাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করা। হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ যখন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিমজ্জিত হল, তখন প্রত্যেক পাহাড় একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হতে লাগল। কিন্তু জুদী পাহাড় বিনয় অবলম্বন করল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন এবং নূহ (আঃ)-এর নৌকা তার উপর অবস্থান নিল। যিয়াদ নুমায়রী বলেন ঃ যে দরবেশের মধ্যে বিনয় নেই, সে ফলহীন বৃক্ষসদৃশ। হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ) বলেন ঃ ব্যক্তি যতক্ষণ মনে করে যে, মানুষের মধ্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট কেউ আছে, ততক্ষণ সে অহংকারী। লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ তা হলে বিনয়ী কখন হবে? তিনি বললেন ঃ যখন নিজের জন্যে কোন স্থান ও মর্যাদা চিন্তা না করে। মানুষ যে পরিমাণে আল্লাহকে ও নিজেকে চিনে, সে পরিমাণে বিনয়ী হয়। ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী (রহঃ) বলেন ঃ ভদ্রলোক এবাদতকারী হলে বিনয়ী হয় এবং নির্বোধ ও অভদ্র ব্যক্তি এবাদতকারী হলে নিজেকে বুযুর্গ মনে করতে থাকে। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেনঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের কারণে তোমার সাথে অহংকার করে, তার সাথে তোমার অহংকার করাই বিনয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিনয় দান করুন।

অহংকারের স্বরূপ ও তার লাভ-লোকসান ঃ অহংকার দু'প্রকার। একটি বাহ্যিক, অপরটি অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ অহংকার হচ্ছে মনের অভ্যাস এবং বাহ্যিক অহংকার হচ্ছে ক্রিয়াকর্ম, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাস্তবে অভ্যন্তরীণ অভ্যাসকেই অহংকার বলা সঙ্গত। ক্রিয়াকর্ম এই অভ্যাসেরই ফলাফল। অভ্যাসই ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। অঙ্গের উপর যখন অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠে, তখন 'অহংকার করেছে' বলা হয়। মোটকথা, মানসিক চরিত্রসমূহের মধ্যে একটি চরিত্রকে বলা হয় অহংকার। তা হচ্ছে নিজেকে অন্যের উপর সেরা দেখে আনন্দ পাওয়া এবং তাতেই আকৃষ্ট হওয়া।

বলা বাহুল্য, অহংকার একটি আপেক্ষিক বিষয়। এতে একাধিক বিষয়ের উপস্থিতি দরকার—(১) অহংকারী, (২) যার সাথে অহংকার করা হয়, (৩) যে বিষয় নিয়ে অহংকার করা হয়। অহংকার ও আত্মপ্রীতির মধ্যে তফাৎ এখানেই। আত্মপ্রীতিতে কেবল কর্তার উপস্থিতিই যথেষ্ট। মানুষ যদি একাই সৃজিত হয় এবং তার সাথে অন্য কোন কিছু না থাকে, তবে সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত হতে পারবে—অহংকার করতে পারবে না। এ থেকে বুঝা গেল, অহংকারে কেবল নিজেকে বড় মনে করা যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু অপরকে নিজের চেয়েও বড় অথবা সমান জ্ঞান করে। এতে অহংকার হয় না। অনুরূপভাবে অপরকে হেয় মনে করাও অহংকারের জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ অপরকে হেয় মনে করে; কিন্তু নিজেকে তার চেয়েও অধিক হেয় মনে করে। এমতাবস্থায় সে অহংকারী হয় না। অপরকে নিজের অনুরূপ মনে করলেও অহংকার হয় না। অহংকারের জরুরী বিষয় হচ্ছে নিজের একটি মর্যাদা জানা এবং অপরের একটি মর্যাদা জানা। অতঃপর নিজের মর্যাদাকে অপরের মর্যাদার চেয়ে সেরা মনে করা। বিশ্বাসের মধ্যে এ তিনটি বিষয় একত্রিত হলে অহংকার হবে। কেবল নিজের মর্যাদা জানার নাম অহংকার নয়; বরং এই জানার কারণে ও বিশ্বাসের ফলে মনের মধ্যে একটি ফুৎকার পড়ে এবং মান-সম্মান ও আনন্দের দিকে গতিশীল হয়। সম্মান ও আনন্দের দিকে এই গতিশীলতাকেই অহংকার বলা হয়। হাদীস শরীফেও উপরোক্ত ফুৎকার উল্লিখিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

অর্থাৎ, '(হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অহংকারের ফুৎকার থেকে।'

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফজরের নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি এমনিভাবে তাকে বলেছিলেন ঃ আমার আশংকা হয় যে, তুমি ফুলে-ফেঁপে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষ যখন অহংকার করে, তখন ফুলে উঠে। এই ফুলে উঠাকে মাহাত্ম্যবোধও বলা হয়। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাই বলেছেন—

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ

অর্থাৎ, 'তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই রয়েছে, যে পর্যন্ত তারা পৌঁছতে সক্ষম হবে না।'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ এমন মাহাত্ম্যবোধ যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ক্রিয়াকর্মকে অহংকার বলা হয়। অর্থাৎ, যখন কারও কাছে তার নিজের মর্যাদা অপরের চেয়ে বড় সাব্যস্ত হয়, তখন সে অপরকে হেয় জ্ঞান করে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবে। তার কাছে বসা, তার সাথে আহারে শরীক হওয়া অপছন্দ করবে। অহংকারের মাত্রা বেশী হলে মনে করবে, এ লোকটির উচিত আমার সামনে গোলামের মত নত হয়ে দাঁড়ানো।

অহংকারের অনিষ্ট খুব মারাত্মক। এর কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আবেদ, সংসারত্যাগী এবং শিক্ষিত লোকগণ কমই এ থেকে মুক্ত থাকে, জনসাধারণের তো কথাই নেই। অহংকার যে ধ্বংসাত্মক, তার বড় প্রমাণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থাৎ, 'যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না।'

এর কারণ এই যে, অহংকারের কারণে বান্দা ঈমানের কোন চরিত্র অর্জন করতে পারে না। উদাহরণতঃ মানুষ যে পর্যন্ত অহংকারী থাকে, সে নিজের জন্যে যা প্রিয়, তা অন্য মুমিনের জন্যে প্রিয় মনে করবে না। বিনয় হল পরহেযগারদের চরিত্রের মূল বিষয়, অহংকারী ব্যক্তি তা করতে পারবে না। অহংকারে থাকা অবস্থায় কেউ হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করতে পারবে না। সদা সত্য কথা বলতে পারবে না। ক্রোধ ও রাগ দমন করতে সক্ষম হবে না। নিজে নম্রতা সহকারে কাউকে উপদেশ দেবে না এবং অন্যের উপদেশে কান লাগাবে না। মোটকথা, এমন কোন মন্দ অভ্যাস নেই, যা অহংকারী ব্যক্তি নিজের অহংকার রক্ষার খাতিরে করতে বাধ্য না হবে। পক্ষান্তরে এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নেই, যা সে নিজের মানহানির ভয়ে বর্জন না করবে। এ কারণেই বলা হয়েছে, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না। আর মন্দ চরিত্র কখনও একা বিদ্যমান থাকে না। কারও মধ্যে একটি মন্দ চরিত্র থাকলে সে অপরটিকে টেনে আনে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সে অহংকার সর্বনিকৃষ্ট, যা কারও কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্যকে মেনে নিতে ও তার অনুগত হতে দেয় না। এমনি ধরনের অহংকার সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ -

অর্থাৎ, 'ফেরেশতারা হাত প্রসারিত করে বলবে—বের কর তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে অপমানজনক শাস্তি। কারণ, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।'

وَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ, 'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম।'

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ নরম মাটিতে ফসল উৎপন্ন হয়, পাথরে হয় না। এমনিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনম্র অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে; অহংকারীর অন্তরে করে না। লক্ষণীয়, যদি মানুষ তার মাথা অতিমাত্রায় উঁচু করে এবং ছাদ পর্যন্ত নিয়ে যায়, তবে ছাদে টক্কর লেগে তার মাথাই চূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি নুয়ে থাকবে, সে ছাদ দ্বারা আরাম ও ছায়া সবই পাবে।

যার সাথে অহংকার করা হয়, তার স্তর এবং অহংকারের ফল ঃ

মানুষ মজ্জাগতভাবে যালেম ও মূর্খ বিধায় সে কখনও স্রষ্টার সাথে এবং কখনও সৃষ্টির সাথে অহংকার করে। এদিক দিয়ে অহংকার তিন প্রকার। প্রথম, আল্লাহর সাথে অহংকার। এটা সর্বনিকৃষ্ট অহংকার। এর কারণ কেবল মূর্খতা ও অবাধ্যতাই হয়ে থাকে। যেমন নমরূদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অহংকারবশত স্থির করেছিল যে, সে আল্লাহর সাথে লড়াই করবে অথবা যেমন অভিশপ্ত ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিল। সে আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেছিল। এই প্রকার অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

অর্থাৎ, 'ঈসা মসীহ এবং নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে অপছন্দ করে না। যে কেউ তাঁর বান্দা হওয়াকে অপছন্দ করবে এবং যারাই আমার এবাদত করতে অহংকার করবে, তারা জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।'

দ্বিতীয়, রসূলগণের সাথে অহংকার করা। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞান করে তাদের মতই কোন ব্যক্তির অনুসারী হতে অস্বীকার করে। এই অহংকার কখনও চিন্তাভাবনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, রেসালত কি, তা চিন্তাই করা হয় না। এ কারণেই সর্বক্ষণ অহংকারের দরুন মূর্খতার মধ্যে থেকে আনুগত্য করে না এবং নিজেকে সত্যপন্থী বলে ধারণা করতে থাকে। কখনও চিন্তা-ভাবনা করে; কিন্তু মন রসূলগণের আনুগত্য করে না। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে কাফেরদের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারা বলত ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا -

অর্থাৎ, 'আমরা কি আমাদের মতই মানুষকে মেনে নেব?'

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থাৎ, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।'

لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের অনুগত হয়ে যাও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, 'যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, আমাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হল না কেন অথবা আমরা পরওয়ারদেগারকে দেখে নিতাম। তারা মনের মধ্যে খুব অহংকার পোষণ করে।'

ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, 'সে নিজে এবং তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছে।'

ফেরাউন আল্লাহ ও রসূল উভয়ের সাথে অহংকার করেছিল। সেমতে হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে বলেছিলেন ঃ তুমি ঈমান আন। তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে। ফেরাউন বলল ঃ আমি হামানের সাথে পরামর্শ করে নিই। হামানকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ এখন তো আপনি উপাস্য। লোকজন আপনার উপাসনা করে। ঈমান আনলে আপনি দাস হয়ে যাবেন এবং অন্যের উপাসনা করবেন। অতঃপর ফেরাউন আল্লাহ তা'আলার দাস হতে এবং মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করতে অস্বীকার করল। মক্কার কোরায়শদের উক্তি কোরআন পাক এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ, 'এই কোরআন মক্কা ও তায়েফ এ দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হল না কেন?'

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ এটা ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবূ মসঊদ ছাকাফীর উক্তি। তারা বলত, মোহাম্মদ তো একজন এতীম বালক। তাকে আল্লাহ্ কিরূপে আমাদের নবী করলেন? কোন বড় সরদার ব্যক্তিকে নবী করলেন না কেন? আল্লাহ তাদের জওয়াবে বলেন ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

অর্থাৎ, 'তারাই কি আপনার প্রভুর রহমত বন্টন করে?'

কোরায়শরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে আরও বলেছিল, আমরা আপনার দরবারে কিরূপে বসতে পারি? এখানে তো দরিদ্র মুসলমানরা সব সময় আনাগোনা করে। তাদের এই হেয় জ্ঞান করার জওয়াবে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

অর্থাৎ, 'আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।'

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

অর্থাৎ, 'আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। আপনার চক্ষু যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র না যায়।'

মোটকথা, কতক কোরায়শ কাফের এমন ছিল, যারা অহংকারের কারণে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত ছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সত্য নবী ছিলেন, এ বিষয়ে মূর্খ ছিল। আবার কতক এমন ছিল, যারা জানত তিনি সত্য নবী; কিন্তু অহংকারের কারণে মুখে তা স্বীকার করত না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, 'যখন তাদের কাছে তাদের জানা বিষয় আগমন করল, তখন তারা অস্বীকার করে বসল।' এই দ্বিতীয় প্রকার অহংকার প্রথম প্রকারের চেয়ে কম হলেও তার কাছাকাছি।

তৃতীয়, বান্দার সাথে অহংকার করা, অর্থাৎ নিজেকে বড় ও অপরকে হেয় জ্ঞান করার কারণে কারও আনুগত্য না করা। এটা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহংকারের তুলনায় কম হলেও দু'কারণে খুবই মারাত্মক। প্রথম কারণ, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও ইযযত সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যেই শোভনীয়। বান্দা দুর্বল ও অক্ষম বিধায় তার অহংকার করা উচিত নয়। অতএব, বান্দা যখন অহংকার করে, তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর অংশীদার হতে চায়। এটা মাথায় বাদশাহের মুকুট পরিধান করে কোন গোলামের সিংহাসনে বসে পড়ার মত। এখানে চিন্তা করা দরকার যে, বাদশাহ এরূপ গোলামের প্রতি কতটুকু ক্রুদ্ধ হবেন। কেননা, গোলামের কাজটি নিরতিশয় ধৃষ্টতাপূর্ণ। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং অহম আমার চাদর। এতে যে আমার সাথে বিরোধ করবে, আমি তাকে চুরমার করে দেব। বান্দার সাথে অহংকার করা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য বিধায় যে ব্যক্তি বান্দার সাথে অহংকার করবে, সে আল্লাহর সাথে বিরোধকারী সাব্যস্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, অহংকারের কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের বিরোধিতা করতে বাধ্য। কেননা, অহংকারী ব্যক্তি যখন কারও মুখ থেকে সত্য কথা শুনে, তখন অহংকারবশত তা মেনে নেয় না; বরং অস্বীকার করতে তৎপর হয়ে উঠে। এ কারণেই যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে মোনাযারা তথা বিতর্ক করে, তারা দাবী এটাই করে যে, নিছক সত্য আবিষ্কার করা ও তা প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এরপর তারা সত্যকে মেনে নিতে অহংকারীদের ন্যায় অস্বীকার করে। এক পক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেলে অপরপক্ষ তা মানে না এবং মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে ও তা খন্ডন করার জন্যে সচেষ্ট থাকে। এটা কাফের ও মোনাফিকদের অভ্যাস। কোরআন পাকে আছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ, 'কাফেররা বলল ঃ তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করো না এবং এতে গোলমাল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা প্রবল থাক।'

যারা প্রবল হওয়ার জন্যে এবং অপরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্যে বাহাস করে—সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, তারা এই অভ্যাসে মোনাফিকদের সাথে শরীক।

মোটকথা, মানুষের সাথে অহংকার অত্যন্ত মন্দ অভ্যাস। এর কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীর সাথে অহংকার হয়ে যায়। অহংকারে বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ইবলীশের কথা কোরআন মজীদে এ কারণেই উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। সে বলেছিল ঃ আমি মানুষের চেয়ে উত্তম। আমি আগুন দ্বারা সৃজিত, আর মানুষ মাটির দ্বারা। ইবলীশের এই অহংকারের পরিণতিতে সে সেজদার আদেশ মানতে অস্বীকার করেছে। অতএব, তার অহংকার সূচনাতে ছিল আদম (আঃ) -এর সাথে এবং পরিণামে আল্লাহর সাথে হয়ে গেল। ফলে, সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি জানেন, আমি অত্যধিক পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। এটা কি অহংকারে গণ্য হবে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ না, এটা অহংকার নয়; বরং অহংকার হচ্ছে সত্য বিষয়ের অবাধ্য হওয়া, মানুষের দোষ অন্বেষণ করে তাদেরকে হেয় করা। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, অন্য মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাখ্যান করে, সে বান্দার ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করতে লজ্জাবোধ করে এবং রসূলের অনুসরণ করে বিনম্র হতে কুণ্ঠিত হয়, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে।

অহংকারের কারণসমূহ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এমন লোকই অহংকার করে, যে নিজেকে বড় মনে করে। আর নিজেকে সে-ই বড় মনে করে, যে জানে তার মধ্যে কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক পূর্ণতার গুণ বিদ্যমান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রয়েছে। পারলৌকিক পূর্ণতা দু'টি— এলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম)। অপরপক্ষে পার্থিব পূর্ণতা পাঁচটি—বংশ, সৌন্দর্য, শক্তি, ধনসম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের প্রাচুর্য। অতএব, এ সাতটি বিষয়ই হচ্ছে অহংকারের কারণ। নিম্নে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

অহংকারের প্রথম কারণ এলম তথা জ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তিরা দ্রুত অহংকারী হয়ে পড়ে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে—

آفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ

অর্থাৎ, 'জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে অহংকার।'

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে মূর্খ ও তুচ্ছ মনে করতে থাকে। ফলে, পার্থিব কাজ-কারবারে সে নিজেকে অগ্রগণ্য মনে করে। অপরের কাছ থেকে প্রথমে সালাম পাওয়ার আশা করে। অন্যরা তার সাথে সদাচরণ করে, কিন্তু সে কারও সাথে সদাচরণ করে না। করলেও এটাকে তার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং কৃতজ্ঞতা আশা করে। আর ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের সাথে এভাবে অহংকার করে যে, সে নিজেকে আল্লাহর কাছে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে। ফলে অন্যের জন্যে সে যতটুকু ভয় করে, নিজের জন্যে ততটুকু করে না; বরং নিজের মুক্তির ব্যাপারে অন্যের চেয়ে বেশী আশাবাদী হয়।

বলা বাহুল্য, এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকে মূর্খ বলাই অধিক সঙ্গত। তাকে জ্ঞানী কে করেছে? সত্যিকার জ্ঞান তো তাকে বলে, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহকে, নিজেকে এবং পরিণামের বিপদকে চিনে ও বুঝে। জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি, বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন হয়, জ্ঞানের কারণে কিছুসংখ্যক লোকের অহংকার ও নির্ভীকতা বেড়ে যায় কেন? এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত এ সকল লোক এমন জ্ঞান চর্চায় মশগুল হয়, যা কেবল নামে মাত্রই জ্ঞান— সত্যিকার জ্ঞান নয়। সত্যিকার জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি বৃদ্ধি পাবেই। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ 'জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে।'

দ্বিতীয়ত এ সকল লোক যখন জ্ঞান চর্চা করে, তখন তাদের বাতেন অর্থাৎ অন্তরদেশ সংশোধিত থাকে না; বরং কুচরিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ফলে যে শিক্ষাই লাভ করুক না কেন, তা তাদের অন্তরে ভাল আসন পায় না। পরিণামে জ্ঞানের ফলও ভাল হয় না।

হযরত ওয়াহাব (রহঃ) এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে আকাশের পানির মত, যা পরিষ্কার ও মিষ্ট থাকে। কিন্তু বৃক্ষসমূহ আপন শিরা-উপশিরা দ্বারা যখন সেই পানিকে নিজেদের মধ্যে টেনে নেয়, তখন মূলত যে বৃক্ষের যে স্বাদ, সে পানিকে সেইভাবে বদলে নেয়। পানি পেয়ে তিক্ত বৃক্ষের তিক্ততা আরও বেড়ে যায় এবং মিষ্ট বৃক্ষের মিষ্টতাও তেমনি বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। যে জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ সাহসিকতা ও খাহেশ থাকে, সে জ্ঞান তার জন্যে তেমনি হয়ে যায়। ফলে এর কারণে অহংকারীর অহংকার এবং বিনয়ীর বিনয় বেড়ে যায়।

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমল অর্থাৎ, এবাদত। অনেক সংসারত্যাগী এবাদতকারী অহংকার, ইযযত ও মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকে না। তাদের আচরণ থেকেও পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কাজকর্মে অহংকার বুঝা যায়। পার্থিব কাজকর্মে যেমন তাদের কাছে মানুষের আসা, মানুষের কাছে তাদের যাওয়ার তুলনায় উত্তম বিবেচিত হয়। তারা মানুষের কাছে আশা করে যে, মানুষ তাদের অভাব-অনটন পূর্ণ করুক, সম্মান করুক, মজলিসে সবার আগে বসাক এবং পরহেযগার ও মুত্তাকীরূপে স্মরণ করুক। পারলৌকিক ব্যাপারে তাদের অহংকার এই যে, তারা নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অন্য সকলকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করে। অথচ বাস্তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত তারাই?

রসূলে আকরাম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ সব মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে— যখন তোমরা কাউকে একথা বলতে শুন, তখন মনে কর, সর্বাধিক বরবাদ সেই হবে। যে ব্যক্তি এবাদতকারীকে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রিয় মনে করে এবং আল্লাহর এবাদতের কারণে তার সম্মান করে, তার মধ্যে ও এবাদতকারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল হবে। কিন্তু এবাদতকারী যেহেতু মানুষকে হেয় জ্ঞান করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের কাছে উঠাবসা করতে ঘৃণা পোষণ করত, তাই সে আল্লাহর গযবের যোগ্য হবে। আশ্চর্যের বিষয় বটে, মানুষ তো তাকে ভালবাসার কারণে তার এবাদতের মর্তবা পাবে, আর সে নিজে কি না মানুষকে হেয় জ্ঞান করার কারণে আল্লাহর অসন্তোষের পাত্র হবে। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি অধিক গুণ্ডামির কারণে "গুণ্ডা" নামে খ্যাত ছিল। অপরদিকে অন্য এক ব্যক্তি অধিক এবাদতের কারণে, "আবেদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তার অধিক এবাদতের ফলস্বরূপ একখণ্ড মেঘ তাকে সর্বক্ষণ ছায়া দান করত। একদিন গুণ্ডা লোকটি আবেদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করল— এই আবেদ এবাদতে অনেক নাম করেছেন। আমি একজন গুণ্ডা। তার কাছে বসলে আল্লাহ্ আমার প্রতি রহম করতে পারেন। অতঃপর সে ভক্তি সহকারে আবেদের কাছে গিয়ে বসল। এদিকে আবেদ ভাবল— আমি তো একজন আবেদ। এই গুণ্ডা লোকটি এখানে বসল কেন? এই ভেবে সে গুণ্ডাকে সরোষে বলল ঃ চলে যা এখান থেকে! আল্লাহ্ তা'আলা সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ তাদের উভয়কে নতুন করে আমল করতে বল। আমি গুণ্ডাকে ক্ষমা করেছি এবং আবেদের সকল এবাদত বাতিল করে দিয়েছি। অতঃপর মেঘখন্ডের ছায়াও গুণ্ডার উপর চলে গেল।

অহংকারের তৃতীয় কারণ বংশ-মর্যাদা। যার বংশ সম্ভ্রান্ত, সে নীচ বংশের লোকদেরকে হেয় মনে করে, যদিও তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মে বেশী হয়। কেউ কেউ বংশগত অহমিকায় এত বেশী ক্ষিপ্ত যে, তারা অন্যদেরকে গোলাম মনে করে এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করতে ঘৃণা করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ধার্মিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণও এ ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এটা তাদের মধ্যে গোপন থাকে—মুখে ফুটে উঠে না। তবে ক্রোধ প্রবল হলে জ্ঞানবুদ্ধির নূর বিলীন হয়ে যায়। তখন অহংকার কথাবার্তায়ও ফুটে উঠে।

এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। ক্রোধের আতিশয্যে আমি তাকে বলে বসলাম—হে কৃষ্ণকায় নারীর সন্তান! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যর!

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

طَفُّ الصَّاعِ طَفُّ الصَّاعِ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلٰى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ

অর্থাৎ, 'উভয় পাল্লা সমান। কৃষ্ণকায় নারীর সন্তানের উপর শ্বেতকায় নারীর সন্তানের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

আবূ যর বলেন ঃ একথা শুনে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে বললাম ঃ তুমি আমার গণ্ডদেশকে পদতলে পিষ্ট কর। এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত আবূ যর যখন নিজেকে শ্বেতকায় মহিলার সন্তান বলে গর্ব করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কিভাবে সতর্ক করে দিলেন। আরও লক্ষণীয়, তিনি কিভাবে তওবা করলেন এবং মন থেকে অহংকার মূলোৎপাটন করে দিলেন। তিনি বুঝে নিলেন, ইযযতের শিকড় যিললত ছাড়া উৎপাটিত হয় না। তাই যার সাথে অহংকার করেছিলেন, তারই পদতলে আপন গণ্ডদেশ স্থাপন করলেন।

অহংকারের চতুর্থ কারণ রূপ-লাবণ্য। এ কারণটি মহিলাদের মধ্যে অধিক পাওয়া যায়। এই অহংকারের ফলে অপরের দোষ-ত্রুটি ও গীবত মুখে উচ্চারিত হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার এক মহিলা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে আমি হাতের ইশারায় বললাম ঃ "বেঁটে"। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তুমি তার গীবত করেছ। বলা বাহুল্য, গোপন অহংকারই ছিল এর কারণ। হযরত আয়েশা নিজে যদি বেঁটে হতেন, তবে মহিলাকে বেঁটে বলতেন না। অতএব, তিনি যেন নিজের দেহাবয়বকে উত্তম জ্ঞান করেছেন। এর বিপরীতে মহিলাকে খর্বাকৃতির মনে করে বেঁটে বলে দিয়েছেন।

পঞ্চম কারণ ধন-সম্পদ। এ ধরনের অহংকার রাজা-বাদশাহরা তাদের ধন-ভাণ্ডার নিয়ে, ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে, গ্রামীণ লোকেরা তাদের ভূ-সম্পত্তি নিয়ে এবং সাজ-সজ্জাকারীরা তাদের পোশাক ও যানবাহন নিয়ে করে থাকে। সুতরাং ধনাঢ্য ব্যক্তি নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাথে অহংকার করে বলে ঃ মিয়া, তুমি তো ভিখারী-মিসকীন। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে কিনে নিতে পারি। ধনাঢ্যতার বিপদ ও দারিদ্র্যের ফযীলত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ধনীরা এসব কথা বলে। কোরআন পাকে এই ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا

অর্থাৎ, 'অতঃপর কথাবার্তায় সে তার সঙ্গীকে বলল ঃ আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ এবং অধিক জনশক্তি আছে।'

সঙ্গী জওয়াব দিল ঃ

اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا فَعَسٰى رَبِّىْ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاۤءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاۤؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا

অর্থাৎ, 'যদি তুমি আমার ধন ও জন কম দেখ, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে কল্যাণ দান করবেন, যা তোমার বাগ-বাগিচার চেয়ে উত্তম হবে এবং তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করবেন, ফলে তা হয়ে যাবে বৃক্ষহীন ময়দান অথবা তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তা খোঁজাখুঁজি করেও পাবে না।

কারূনের অহংকারও তেমনি ছিল। সে যখন খুব সাজগোছ করে সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হাযির হত, তখন তারাও তার মত ধন-সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে লাগল।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ দৈহিক শক্তি-বল, যা নিয়ে দুর্বল ও অসমর্থদের সাথে অহংকার করা হয়।

সপ্তম কারণ অনুগামী, সাহায্যকারী, মুরীদ, চাকর-নওকর, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের সংখ্যাধিক্য। রাজা-বাদশাহরা অধিক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এবং শিক্ষিতরা অধিক শিষ্য নিয়ে অহংকার করে– যদিও তাদের সৈন্য সামন্ত ও শিষ্যবর্গ ধ্বংস ও আযাবের কারণ হয়।

অহংকারের প্রতিকার ও বিনয় অর্জনের উপায় ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, অহংকার একটি ধ্বংসমূলক বিষয়। খুব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কম মানুষই এ থেকে মুক্ত । এই অহংকার দূর করা ফরযে আইন। কেবল বাসনা করলেই এটা দূর হবে না; বরং এমন ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, যা তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। দ্বিবিধ উপায়ে এর প্রতিকার সম্ভব। এক, অন্তরে নিহিত এর মূল শিকড় উপড়ে ফেলে এবং দুই, যে সকল কারণে মানুষ অহংকার করে, সেগুলোকে দূর করে। মূল শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে দু'রকম চিকিৎসা দরকার— একটি শিক্ষাগত ও অপরটি কর্মগত। শিক্ষাগত চিকিৎসা এই যে, মানুষ নিজেকে চিনবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে। এতেই ইনশাআল্লাহ অহংকার দূর হয়ে যাবে। কেননা, মানুষ যখন নিজেকে যথাযথরূপে চিনবে, তখন বিশ্বাস করবে যে, সে নিজে সকল হেয় বস্তুর চেয়েও হেয়তম এবং সকল সামান্য বস্তুর চেয়েও সামান্যতম। অনুনয়, বিনয় ও লাঞ্ছনা ছাড়া কোন কিছুই তার প্রাপ্য নয়। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে, তখন জানতে পারবে বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্যে শোভনীয় নয়।

আল্লাহকে চিনা ও তার মাহাত্ম্য অনুধাবন করার বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, এটাই এলমে মুকাশাফার চূড়ান্ত সীমা। যদিও আত্মজ্ঞান অর্জন করাও দীর্ঘ ব্যাপার। কিন্তু আমরা এখানে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করব, যতটুকু বিনয় অর্জনের ক্ষেত্রে উপকারী। বলা বাহুল্য, এর জন্যে কোরআন পাকের একটি আয়াতের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নেয়াই যথেষ্ট। আয়াতটি এই ঃ

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ -

অর্থাৎ, 'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত যে অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? বীর্য দ্বারা তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার বিকাশ সাধন করেছেন, অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

এ আয়াতে মানুষের প্রথম সৃষ্টি, পরিণতি ও মধ্যবর্তী অবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। মানুষ এসব অবস্থা চিন্তা করলে আয়াতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদাহরণতঃ প্রথম অবস্থায় মানুষের কোন উল্লেখও ছিল না। সে ছিল নাস্তির পর্দায় আবৃত। দীর্ঘকাল এ অবস্থাই অব্যাহত থাকে। নাস্তির সূচনা কখন হয়েছে, তাও জানা নেই। যে বস্তু অস্তিত্বহীন, তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত আর কি হবে? জন্মের পূর্বে মানুষ এরূপই ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হীন বস্তু অর্থাৎ মৃত্তিকা দিয়ে গড়ে তুলেন এবং অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেন। অতঃপর বীর্য থেকে জমাট রক্ত এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। এরপর অস্থি গঠন করেন এবং অস্থিকে মাংস ও ত্বকের আবরণ দান করেন। এ সব স্তর অতিক্রম করার পর মানুষ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। এরপরও জন্মের সাথে সাথে তার মধ্যে অনেক নিচ স্বভাব বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে পাথরের ন্যায় জড় অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়। সে কোন কিছু শুনত না, দেখত না, হৃদয়ঙ্গম করত না, নড়াচড়া করত না, কথা বলত না এবং কোন কিছু ধরত না। এক কথায়, সে যেন জীবন্ত ছিল না। সে ছিল শক্তিশালী হওয়ার পূর্বে নিঃশক্তি, জ্ঞানী হওয়ার পূর্বে অজ্ঞান, চক্ষুষ্মান হওয়ার পূর্বে অন্ধ, শ্রবণকারী হওয়ার পূর্বে বধির, বক্তা হওয়ার পূর্বে মূক, পথপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে পথভ্রষ্ট এবং সমর্থ হওয়ার পূর্বে অসমর্থ।

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

পর্যন্ত আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ -

অর্থাৎ, জীবন লাভের পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। বলা বাহুল্য, এখানেও পূর্বোক্ত বক্তব্য বিধৃত হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা মানুষের পথ সহজ করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যা ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে। এতে মানুষ আমৃত্যু যা কিছু অর্জন করে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا-

অর্থাৎ, 'তাকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।'

সুতরাং যে মানুষের জন্ম ও জন্ম পরবর্তী অবস্থা এই, তার জন্যে গর্ব ও অহংকার করা কেমন করে বৈধ হবে? সে তো বাস্তবে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং দুর্বল থেকে দুর্বলতম সত্তা। হাঁ, মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গ সৃজিত হত, তার সব কাজ তারই এখতিয়ারভুক্ত থাকত এবং সে আপন ক্ষমতায় চিরঞ্জীব হত, তবে আপন সূচনা ও পরিণতি বিস্মৃত হয়ে অবাধ্য ও অহংকারী হওয়া তার জন্যে শোভা পেত। কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম। তার স্বল্পকালীন জীবনে মারাত্মক রোগ-ব্যাধি এবং বিভিন্ন বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। ক্ষুধা, পিপাসা, জরামৃত্যু আরও কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে দিন অতিবাহিত করতে হয়। নিজের লাভ-লোকসান, ইষ্ট ও অনিষ্টের এখতিয়ার তার নেই। সে অনেক কিছু জানতে চায়; কিন্তু অজ্ঞ থাকে। অনেক কিছু বিস্মৃত হতে চায়, কিন্তু পারে না। সার কথা, মানুষের অন্তর ও মন তার আয়ত্তের বাইরে। সে এমন বস্তু কামনা করে, যাতে তার ধ্বংস নিহিত এবং এমন বস্তুকে বর্জন করতে চায়, যাতে তার জীবন লুক্কায়িত। সে এমন খাদ্যকে সুস্বাদু মনে করে, যা খেয়ে বদহজমিতে ভোগে, মৃত্যুবরণ করে এবং তিক্ত ঔষধ, যা উপকারী ও জীবনদানকারী, তা খেতে চায় না। এমতাবস্থায় সে যদি নিজেকে চিনে, তবে অবশ্যই জানতে পারবে যে, তার চেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। সুতরাং অহংকার করা মূর্খতা বৈ নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরপর যখন মানুষের মৃত্যু হবে, তখন সে পূর্বে যেরূপ জড় পদার্থ ছিল, তেমনি জড় পদার্থে পরিণত হবে। সে হবে একটি চেতনা ও অনুভূতিহীন কাঠামো। তাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গলে যাবে, অস্থিসমূহ পচে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বিভিন্ন কীট কিলবিল করে তার দেহকে খেয়ে ফেলবে। তখন কোন প্রাণী তার কাছে ভিড়বে না। মানুষ তাকে নাপাক মনে করবে এবং তীব্র দুর্গন্ধের কারণে তার কাছ থেকে দূরে পালাবে। কত ভাল হত যদি এই অবস্থায় মাটি হয়ে যাওয়ার পর সে মুক্তি পেত। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। সে পুনরুজ্জীবিত হবে। দেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ পুনরেকত্রিত হয়ে সে কবর থেকে উঠবে এবং কিয়ামতকে উপস্থিত দেখতে পাবে। সে দেখবে, আকাশ বিদীর্ণ, পৃথিবী পরিবর্তিত, পর্বতমালা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তারকারাজি নিষ্প্রভ এবং সূর্য গ্রহণে আবৃত। সর্বত্র অন্ধকারই অন্ধকার। তার সামনে আমলনামা রাখা হবে এবং বলা হবে এটা পাঠ কর। সে বলবে ঃ এটা কিসের আমলনামা? উত্তর হবে—তোমার জীবদ্দশায় তোমার কাঁধে দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত ছিল। তুমি যা বলতে এবং যে কাজ করতে, তা তারা লিখে রাখত। তোমার ছোট-বড় সকল আমল এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তুমি ভুলে গেলে কি হবে, আল্লাহ্ ভুলে যাননি। এখন চল এবং হিসাব-নিকাশ দাও। একথা শুনতেই সে ব্যাকুল হয়ে পড়বে। এরপর আমলনামা পাঠ করে বলবে— হায় হায়! এতে তো ছোট-বড় সকল গোনাহই বিদ্যমান। এ হচ্ছে সকল মানুষের শেষ পরিণতি, যা ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, যে মানুষের এই অবস্থা, অহংকারের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আস্ফালন করা ও বড়াই করা তো দূরের কথা, তার তো এক মুহূর্তও আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। এ হচ্ছে অহংকারের শিক্ষাগত চিকিৎসার বর্ণনা।

এখন কর্মগত চিকিৎসা হল, প্রকাশ্যে বিনয় অবলম্বন করা এবং সকল মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার ও সদাচরণ করা। যেমন আমরা ইতিপূর্বে সৎকর্মপরায়ণদের অবস্থা বর্ণনা করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত ও রীতিনীতির অনুসরণ করবে। বর্ণিত আছে, তিনি মাটিতে বসে আহার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতেন এবং বলতেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা। তাই বান্দার মতই আহার করি। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি নতুন বস্ত্র পরিধান করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি গোলাম; যেদিন মুক্তি পাব, সেদিন নতুন পোশাক পরিধান করব। এখানে মুক্তি বলে তিনি কিয়ামতের মুক্তি বুঝিয়েছেন।

বিনয় কর্মের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। তাই আরব জাতিকে ঈমান ও নামাযের আদেশ করা হয়েছিল। কেননা, বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাবের বিপরীত ছিল। এমনকি, কারও হাত থেকে বেত পড়ে গেলে তা উঠানোর জন্যে তারা নত হত না। জুতার ফিতা খুলে গেলে তা নুয়ে বেঁধে নিত না। সেমতে হাকীম ইবনে হেযাম যখন প্রথম বায়আত হয়েছিল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শর্ত করেছিল যে, সে রুকু-সেজদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে। তিনি এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য হাকীম বুঝতে পারে এবং পাক্কা নামাযী হয়ে কামালাতের শীর্ষে পৌঁছান। মোটকথা, আরব জাতির কাছে সেজদা করা ও নত হওয়া ছিল চরম অপমানজনক। তাই নামাযের আদেশ হয়, যাতে তাদের অহংকার চূর্ণ হয় এবং অন্তরে বিনয় আসন গাড়ে। বলা বাহুল্য, নামাযের রুকূ, সেজদা ও দণ্ডায়মান থাকার মধ্যে পুরোপুরি বিনয়ভাব বিদ্যমান রয়েছে। এদিক দিয়েই নামাযকে "ধর্মের স্তম্ভ" আখ্যা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে অহংকারের কারণসমূহ দূর করার মাধ্যমে অহংকারের প্রতিকার করা। প্রথমত বংশ মর্যাদার কারণে যে ব্যক্তি অহংকার করে, তার দুটি বিষয় জানা উচিত। এক, বংশ নিয়ে গর্ব করা নিছক মূর্খতা। কেননা, অন্যের গুণ-গরিমা দ্বারা নিজের সম্মান হওয়া অর্থহীন। সুতরাং যে বংশের গর্ব করে, সে যদি নীচ স্বভাবের হয়, তবে অন্যের গুণ-গরিমা তার নীচ স্বভাবকে ঢেকে রাখবে কিরূপে। বরং যে ব্যক্তির বংশ নিয়ে গর্ব করে, সে জীবিত থাকলে একথাই বলত যে, শ্রেষ্ঠত্ব আমার মধ্যে রয়েছে। তুই তো আমার প্রস্রাবের কীট। তোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কোত্থেকে এল? দ্বিতীয় বিষয় এই যে, সে তার সত্যিকার বংশ চেনার চেষ্টা করবে এবং বাপ-দাদার কথা চিন্তা করবে। তার বাপ তো এক ফোঁটা নাপাক বীর্য এবং দাদা নিকৃষ্ট মৃত্তিকা। অতএব, যার মূল হচ্ছে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা, যা পদতলে পিষ্ট হতে থাকে, সে অহংকার কিরূপে করতে পারে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অহংকারের অপর কারণ রূপ-লাবণ্য। এর চিকিৎসা এই যে, মানুষ তার অভ্যন্তর ভাগকে বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখবে— জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় কেবল বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে না। অভ্যন্তর ভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে এমন ঘৃণ্য বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হবে, যা দ্বারা রূপের অহংকার নিমেষে বিলীন হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ মানুষের সর্বাঙ্গ নোংরামিতে পূর্ণ। তার পেটে রয়েছে মল, মূত্রাশয়ে মূত্র, নাকে শ্লেষ্মা, মুখে থুথু, কানে ময়লা, ধমনীতে রক্ত, ত্বকে পুঁজ এবং বগলে দুর্গন্ধ। এ ছাড়া সে দিনে একবার অথবা দু'বার নিজের হাতে পায়খানা ধৌত করে এবং প্রত্যহ একবার অথবা দু'বার পেটের জঞ্জাল দূর করার জন্যে পায়খানায় যায়। পায়খানা তো দেখলেও ঘৃণা লাগে, স্পর্শ করা অথবা নাকে ঘ্রাণ নেয়া তো দূরের কথা। এ সব বিষয় মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, যাতে সে সর্বদা আপন নাপাকী ও নীচতা ধ্যান করতে থাকে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমাদেরকে আমাদের নীচতা ও অপবিত্রতা স্মরণ করাতে যেয়ে বলতেন, মনে রেখ, তোমরা প্রস্রাবের পথ দিয়ে দু'বার নির্গত হয়েছ। সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করবে যে, সে নোংরা বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে, নোংরা বস্তুর মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে এবং মৃত্যুর পরও নোংরা বস্তুই হয়ে যাবে, তখন নিজের রূপ-লাবণ্যকে গর্বের বস্তু মনে করবে না।

অহংকারের আরও একটি কারণ হচ্ছে দৈহিক শক্তি ও বল। এর প্রতিকার এই যে, মানুষ সাধারণত যে সকল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেগুলোর কথা চিন্তা করবে। উদাহরণতঃ যদি একটি শিরায়ও ব্যথা দেখা দেয়, তবে মানুষ অক্ষমদের চেয়েও হীনতম হয়ে যায়। আরও চিন্তা করা উচিত যে, যদি কোন মশা নাকে ঢুকে যায় অথবা পিঁপড়া কানে প্রবেশ করে, তবে এটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পায়ে কাঁটা ফুটলেও মানুষ শক্তিহীন হয়ে যায়। একদিনের জ্বরে অনেক দিনের শক্তি-সামর্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি একটি কাঁটাও সহ্য করতে পারে না এবং মশা ও পিঁপড়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, শক্তি নিয়ে গর্ব করা তার পক্ষে শোভা পায় না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মপ্রসাদ

আত্মপ্রসাদের নিন্দা ঃ আত্মপ্রসাদের নিন্দা কোরআন পাক ও হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ, হুনায়ন যুদ্ধে তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হলে বটে, কিন্তু তা তোমাদের কোনই উপকার করেনি।

এখানে আত্মপ্রসাদ নিন্দার ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا -

অর্থাৎ, তারা ধারণা করল, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি এমন জায়গা থেকে তাদের কাছে আসল যার কল্পনাও তারা করেনি।

এ আয়াতে কাফেরদের দুর্গ নিয়ে আত্মপ্রসাদের নিন্দা 'করা হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনটি বিষয়কে বিনাশকারী বলে অভিহিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মপ্রসাদ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ দুটি বিষয় ধ্বংসাত্মক-একটি নৈরাশ্য, অপরটি আত্মপ্রসাদ। এরূপ বলার কারণ এই যে, সৌভাগ্য দুটি বিষয় দ্বারাই অর্জিত হয়– একটি চেষ্টা ও অধ্যবসায়, অপরটি কর্মতৎপরতা। নিরাশ ব্যক্তি চেষ্টা করে না, আর যে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত, সে নিজেকে সৌভাগ্যশালী বলে বিশ্বাস করে। তাই অর্জন করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ –ইবনে জুরায়জের মতে এর অর্থ কেউ যেন কোন সৎকাজ করে এ কথা না বলে যে, সে করেছে। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ নিজেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সৎকর্মপরায়ণ বলে বিশ্বাস করো না। এটা আত্মপ্রসাদ। উহুদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শত্রুর আঘাত থেকে মুক্ত রাখার জন্যে তাঁর উপর পড়ে গিয়েছিলেন, যাতে শত্রুর আঘাত তাঁর নিজের গায়েই লাগে। ফলে, তাঁর হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) অক্ষত ছিলেন। এটা একটা মহৎ প্রচেষ্টা ছিল বিধায় তাঁর দৃষ্টিতেও পরবর্তী সময়ে এর যথেষ্ট মাহাত্ম্য ছিল। হযরত উমর (রাঃ) নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁর এই আত্মপ্রসাদ জেনে নেন এবং বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে তালহার হাত ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে আত্মপ্রসাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন পুণ্যবান সাহাবীও যখন আত্মপ্রসাদ থেকে বাঁচতে পারলেন না, তখন দুর্বলচেতা মানুষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে তাদের কি দশা হবে! হযরত মুতরিফ (রহঃ) বলেন ঃ আমি যদি সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমাই এবং সকালে এই গাফলতির জন্যে অনুতাপ করি, তবে এটা সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ে সকাল বেলায় আত্মপ্রসাদ বা আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ঢের উত্তম। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

لَوْ لَمْ تَذْنِبُوْا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ الْعُجْبُ الْعُجْبُ -

অর্থাৎ, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে আমি তোমাদের জন্যে এর চেয়েও মারাত্মক বিষয়ের আশংকা করি। সেটা হচ্ছে আত্মপ্রসাদ।

এখানে আত্মপ্রসাদকে সকল গোনাহের চেয়ে বড় বলা হয়েছে। বিশর ইবনে মনসুর (রহঃ) সদা এবাদতে মগ্ন থাকতেন। ফলে তাকে দেখলে আল্লাহ ও কিয়ামতের কথা স্মরণ হত। একদিন তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লেন। জনৈক ব্যক্তি পিছন থেকে তাকে দেখল। সালাম ফিরানোর পর তিনি লোকটিকে বললেন ঃ তুমি আমার যে অবস্থা দেখেছ, তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। অভিশপ্ত ইবলীসও ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এবাদত করেছিল। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে, তাতো তোমার অজানা নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মানুষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কখন খারাপ হয়? তিনি বললেন ঃ যখন সে নিজেকে ভাল মনে করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

অর্থাৎ, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে আপন সৎকর্ম বাতিল করো না।

অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে দানকে বড় মনে করার ফল। বলা বাহুল্য, কোন আমলকে বড় মনে করাই আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রীতি। অতএব জানা গেল যে, আত্মপ্রীতি নিশ্চিতই মন্দ কাজ।

আত্মপ্রসাদের ক্ষতি ঃ আত্মপ্রসাদ অহংকারের অন্যতম কারণ বিধায় আত্মপ্রসাদ যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে এর কারণে মানুষ কোন কোন গোনাহকে স্মরণই করে না। যদি স্মরণ করে, তবে তাকে সাগীরা তথা ক্ষুদ্র গোনাহ জেনে তা পূরণে সচেষ্ট হয় না; বরং মনে করে নেয় যে, এতো মাফই হয়ে যাবে। এছাড়া মানুষ নিজের এবাদত ও আমলকে বড় মনে করে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং আল্লাহর নেয়ামত বিস্মৃত হয়। যখন কেউ নিজের আমলের কারণে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়, তখন সে সেই আমলের বিপদ সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আমলের বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার অধিকাংশ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, বাহ্যিক আমল পাক-সাফ ও সংমিশ্রণমুক্ত না হলে তা খুবই কম উপকারী হয়ে থাকে। যার উপর ভয় প্রবল থাকে, সেই আমলের বিপদ খোঁজ করে। যে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত, সে অহেতুক নির্ভীক হয়ে থাকে। সে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে। এ কারণেই সে নিজের প্রশংসা নিজেই করতে থাকে। যে ব্যক্তি আপন মতামত ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আত্মপ্রীত, সে পরামর্শ গ্রহণ ও জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। সে নিজের চেয়ে বড় পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাকে দূষণীয় জ্ঞান করে এবং কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করে না; বরং অপরকে মূর্খতুল্য মনে করে। তার নিজস্ব মতামতটি যদি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত হয়, তবে এর কারণে সে চিরতরে বরবাদ হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোন না কোন পূর্ণতার গুণের মধ্যেই আত্মপ্রসাদ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে কোন পূর্ণতার গুণ আছে বলে বিশ্বাস করে, তার অবস্থা ত্রিবিধ হতে পারে। এক, সেই পূর্ণতার গুণটি বিলুপ্ত হওয়ার অথবা বিকৃত হওয়ার ভয় লেগে থাকবে। এরূপ হলে তা আত্মপ্রসাদ হবে না। দুই, বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকবে না; কিন্তু সেটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বলে বিশ্বাস করবে। এরূপ হলেও তাকে আত্মপ্রসাদ বলা হবে না। তিন, বিলুপ্ত হওয়ারও ভয় থাকবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বলেও বিশ্বাস করবে না; বরং সেটিকে নিজস্ব কৃতিত্ব ও গুণ মনে করেই আনন্দিত হবে। একেই বলা হবে আত্মপ্রসাদ। অতএব, আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা এই দাঁড়াল যে, কোন পূর্ণতার গুণকে বড় মনে করে প্রসন্ন হওয়া এবং সেটি যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি দান, একথা বেমালুম ভুলে যাওয়া। এর সাথে যদি আল্লাহর উপর প্রতিদান দেয়া হক হয়ে গেছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তবে তাকে বলা হবে গর্ব, যা আত্মপ্রসাদের উপরের স্তর। দুনিয়াতেও এমনটি হয় যে, এক ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দিয়ে সেটাকে বড় কাজ মনে করে। এতটুকুতে কেবল আত্মপ্রসাদ হয়। কিন্তু যদি সে এই দেয়ার বদলে তার কাছে কোন খেদমত আশা করে, তবে একে বলা হয় গর্ব। আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ – কারও প্রতি বেশী পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ করো না।

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ আপন কর্ম দ্বারা গর্ব করো না। হাদীসে আছে—গর্বকারীর নামায তার মাথা অতিক্রম করে না; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। মোটকথা, যে গর্ব করে, সে আত্মপ্রদাসও অনুভব করে। কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, তার জন্যে গর্ব করা জরুরী নয়। কেননা, আত্মপ্রসাদ হয় কেবল নেয়ামতকে বড় জানা এবং নেয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া দ্বারা। এতে প্রতিদান আশা করার শর্ত নেই। অপরপক্ষে প্রতিদান আশা করা ছাড়া গর্ব হয় না। সুতরাং কেউ যদি কবুল হওয়ার আশায় দোয়া করে, অতঃপর কবুল না হওয়াকে মনে মনে খারাপ বিশ্বাস করে, তবে সে গর্বকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মপ্রসাদের প্রতিকার ঃ জানা উচিত যে, প্রত্যেক রোগের প্রতিকার হবে তার কারণের বিপরীত কারণকে সম্মুখে আনা। আত্মপ্রসাদের কারণ যেহেতু অজ্ঞতা, তাই তার প্রতিকার হবে সেই জ্ঞান, যা অজ্ঞতার বিপরীত। অজ্ঞতাবশত যে সকল বিষয় নিয়ে মানুষ আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়, সেগুলো মোটামুটি আট প্রকার।

প্রথম, রূপ, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এর চিকিৎসা তাই, যা আমরা রূপলাবণ্য নিয়ে অহংকার করার বেলায় উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, নিজের আদি-অন্ত অপবিত্রতার কথা চিন্তা করবে এবং অনুধাবন করবে যে, এর আগে কত অপরূপ সৌন্দর্যশালীরা মাটিতে মিশে গেছে এবং কবরে তাদের দেহ কেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়, শক্তিসামর্থ্য নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা ; যেমন কোরআনে উল্লিখিত আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল ঃ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর আর কে?' এর চিকিৎসা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা যে, একদিনের জ্বরে শক্তিশালী মানুষ নিঃশক্তি হয়ে যায়।

তৃতীয়, আপন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এর ফলে মানুষ নিজের মতামতকে বহাল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং যে তার বিরুদ্ধে বলে, তাকে মূর্খ জ্ঞান করে। এর চিকিৎসা হল, স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে বুদ্ধিমত্তা দান করা হয়েছে, তজ্জন্যে তাঁর শোকর করবে এবং চিন্তা করবে যে, তার মস্তিষ্কে সামান্য রোগ দেখা দিলে এমন পাগল হয়ে যেতে পারে, যার পেছনে বালকেরা হাসি-তামাশা করবে। এছাড়া নিজের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমাকে কম মনে করবে। মনে রাখবে, যার বুদ্ধিমত্তায় ত্রুটি থাকে, সে নিজে কখনও সেই ত্রুটি জানতে পারে না।

চতুর্থ, বংশমর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। যেমন কতক সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তি আত্মপ্রসাদবশত মনে করে, বংশ-গরিমা এবং পূর্বপুরুষদের দৌলতে তাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ মনে করে, সকল মানুষ তাদের বাঁদী-গোলাম। এর চিকিৎসা একথা চিন্তা করা যে, আমি কর্ম ও চরিত্রে বংশের কৃতী পুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। এ সত্ত্বেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধারণা করি যে, তাদের স্তরে পৌঁছে গেছি। এটা নিছক মূর্খতা। আমার গুরুজনদের মধ্যে তো আত্মপ্রসাদ ছিল না; বরং তারা নিজেদেরকে তুচ্ছ এবং সকল মানুষকে বড় মনে করতেন। আল্লাহর আনুগত্য ও উত্তম অভ্যাস দ্বারাই তো তারা গৌরব অর্জন করেছিলেন— বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। অতএব, আমাকেও সেই গৌরব অর্জন করতে হবে। গৌরব খোদাভীতি দ্বারা অর্জিত হয়। বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী, যে অধিক খোদাভীরু।

এ আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলে হারেছ ইবনে হেশাম, সোহায়ল ইবনে উমর ও খালেদ ইবনে উসায়দ সবিস্ময়ে বলল ঃ এই কাফ্রী ক্রীতদাস আযান দেয়! কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নিকট-আত্মীয়দেরকে সতর্ক করার আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি একজন একজন করে সকলকে নাম ধরে ডাকলেন। এমনকি বললেন ঃ হে মোহাম্মদ তনয়া ফাতেমা এবং সফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, তোমরা নিজের জন্যে নিজেই আমল কর। এটা মনে করো না যে, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব। যে ব্যক্তি এসব বিষয় অনুধাবন করবে, সে কখনও বংশমর্যাদার অহমিকায় লিপ্ত হবে না।

পঞ্চম, যালেম রাজা-বাদশাহের বংশধর প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এটাও চরম মূর্খতা এবং এর চিকিৎসা এই যে, সেই রাজা-বাদশাহদের যুলুম ও অত্যাচারের কথা চিন্তা করবে এবং এর কারণে তারা যে আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে দোযখের ইন্ধন হয়ে গেছে একথাও চিন্তা করবে। কিয়ামতে তাদের দুরবস্থার একটি চিত্রও কল্পনা করবে যে, তারা যে সব লোকের উপর যুলুম করেছিল, তারা তাদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং মাথার চুল ধরে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এটা কল্পনা করলে নিজেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং বলবে—শূকর ও কুকুরের সাথে আত্মীয়তা ভাল— এদের সাথে নয়। মোটকথা, যালেম রাজা-বাদশাহদের বংশধরকে যদি আল্লাহ যুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা তজ্জন্যে শোকর করবে। তাদের পিতৃপুরুষ মুসলমান হলে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ষষ্ঠ, অধিক সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা; যেমন হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বলেছিল, আজ আমরা পরাজিত হব না। এর প্রতিকার এটা ধ্যান করা যে, সকলেই আল্লাহর অক্ষম বান্দা। কেউ নিজের লাভ-লোকসানের মালিক নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অনেক ক্ষুদ্র দল আল্লাহর আদেশে বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে।

সপ্তম, ধন-সম্পদ নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার দেখলেন, জনৈক ধনী ব্যক্তির কাছে এক ফকীর এসে বসতেই সে তার কাপড় টেনে সংকুচিত হয়ে বসল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধনী ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি আশংকা কর যে, তার দরিদ্রতা তোমার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে যাবে? বলা বাহুল্য, এটা ছিল ধনের আত্মপ্রসাদ। এর চিকিৎসা এই যে, ধন-সম্পদের বিপদাপদ, এতে অপরের হকের আধিক্য, ফকীরদের ফযীলত এবং জান্নাতে তাদের অগ্রগামিতার কথা চিন্তা করবে। আরও চিন্তা করবে যে, ধন-দৌলত সকালে আসে, বিকালে চলে যায়। এর কোন মৌলিকতা নেই। অনেক কাফেরও অগাধ ধন-সম্পদের মালিক।

অষ্টম, আপন ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا

অর্থাৎ, যার জন্যে তার কুকর্মকে সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর সে তাকে সৎকর্ম দেখে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, 'তারা ধারণা করে যে, তারা খুব সৎকর্ম করছে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদ এ উম্মতের শেষ যুগে হবে। এ সর্বনাশা বদ অভ্যাসের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, এর কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে, সেই খুব জ্ঞানী। অতঃপর সে তার মত ও পথ নিয়েই খুশী থাকে। দুনিয়াতে অনেক বেদআতী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি আপন আপন বেদআত ও পথভ্রষ্টতাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে। এর কারণ এটাই যে, তারা আপন ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত।

বেদআত নিয়ে আত্মপ্রসাদ অর্থ এই, যে বিষয়ের প্রতি খাহেশ ও মন ধাবিত হয়, তাকে ভাল ও সত্য বলে ধারণা করা। এ প্রকার আত্মপ্রসাদের চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে কঠিন। কেননা, যার মতামত ভ্রান্ত, সে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। সুতরাং যাকে রোগই মনে করে না, তার চিকিৎসা কিরূপে করবে? কিন্তু যারা সাধক ও বিভুজ্ঞানী তারা মূর্খতা সম্পর্কে অবগত করতে পারে এবং তা দূর করতে পারে। যদি সে মূর্খতা নিয়েও আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকে, তবে সাধকের কথায়ও কর্ণপাত করবে না; বরং সাধককেও দোষী মনে করবে। এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা কিরূপে হবে? তবে একটি মোটামুটি চিকিৎসা আছে। তা এই যে, প্রত্যেকেই আপন মতকে অভ্রান্ত মনে করবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, তার মতও ভ্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া বিরোধপূর্ণ মাযহাবসমূহ নিয়ে মাথা ঘামাবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি দেখেন ও শুনেন। তাঁর রসূল সত্য। যা কিছু তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে যাবতীয় পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় অধ্যায়

বিভ্রান্তি

প্রকাশ থাকে যে, সাবধানতা ও সতর্কতা মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি আর বিভ্রান্তি ও অসাবধানতা দুর্ভাগ্যের সেতুবন্ধ। মানুষের প্রতি ঈমান ও মাগফেরাতের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার বড় কোন নেয়ামত নেই এবং বক্ষের উন্মুক্ততা ছাড়া ঈমান ও মাগফেরাত লাভের কোন উপায় নেই। এমনিভাবে কুফর ও গোনাহের চেয়ে বড় কোন অনিষ্ট নেই এবং আন্তরিক অন্ধত্ব ও মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু এই অনিষ্টের কারণ হয় না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অন্তর দান করা হয়েছে, তার শানে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ - اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَاغَرْبِيَّةٍ - يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ -

অর্থাৎ, কুলঙ্গির মত, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রক্ষিত। কাঁচের আবরণটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, যা প্রজ্বলিত হয় পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল থেকে, যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিমমুখীও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তৈল আলো দিচ্ছে। নূরের উপর নূর।

পক্ষান্তরে গাফেলদের অন্তরের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, অতল সমুদ্রের মত, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার উপরে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, যখন সে হাত বের করে, তখন তা দেখে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা সাবধানী লোকদের অন্তর ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং গাফেল ও বিভ্রান্তদেরকে অন্তশ্চক্ষু দান করেন না। তারা খেয়াল-খুশীকেই নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করে। মোটকথা, বিভ্রান্তি সকল দুর্ভাগ্যের মূল এবং সমস্ত বিনাশের উৎস বিধায় এর সেসব পথ বর্ণনা করা অত্যন্ত জরুরী, যেগুলো দিয়ে এই বিভ্রান্তি অধিক পরিমাণে আগমন করে।

গাফেল ও বিভ্রান্তদের শ্রেণী যদিও অনেক। কিন্তু চারটি শ্রেণীতে সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রথম, আলেম, দ্বিতীয়, আবেদ, তৃতীয়, সূফী এবং চতুর্থ, ধনাঢ্য ব্যক্তি। এসব দলেরও অনেক উপদল রয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তির কারণসমূহও বিভিন্নরূপ। উদাহরণতঃ কোন কোন লোক শরীয়তের অস্বীকৃত কর্মকে সৎকর্ম বলে মনে করে। যেমন, অবৈধ ধন-সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে তাতে কারুকার্য করে এবং একে সওয়াবের কাজ মনে করে। কেউ এ ব্যাপারে পার্থক্য করে না যে, নিজের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করে, না আল্লাহর জন্যে করে। কেউ জরুরী কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার কেউ ফরয কাজ বর্জন করে নফল কাজে মশগুল থাকে।

নিম্নে আমরা বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ উদাহরণসহ বর্ণনা করার পর সর্বপ্রথম আলেম তথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ ঃ বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতই যথেষ্ট।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে এবং বিভ্রান্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না করে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্তকারী শয়তান।

وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

অর্থাৎ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করেছ। মোহ তোমাদেরকে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ মৃত্যু) আসা পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং বিভ্রান্তকারী শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্ত করেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সাবধানী ব্যক্তিদের নিদ্রা কতই না চমৎকার।

মোটকথা, শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মূর্খতার নিন্দায় কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বর্ণিত আছে, সবই বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে দলীল। কেননা, বিভ্রান্তিও এক প্রকার মূর্খতা।

বিভ্রান্তির স্বরূপ হল শয়তানের ধোকার কারণে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, যা মনের খেয়ালখুশী ও খাহেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন অসার ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোন কল্যাণে বিশ্বাসী হয়, সে বিভ্রান্ত। অধিকাংশ মানুষই আপন কল্যাণের ধারণা রাখে। অথচ তাদের এ ধারণা ভুল। এ থেকে জানা গেল যে, অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্ত। তবে কোন কোন মানুষের বিভ্রান্তি অপরের তুলনায় স্পষ্টতর ও কঠোরতর হয়ে থাকে। কঠোরতর বিভ্রান্তি দু'প্রকার—কাফেরদের বিভ্রান্তি ও গোনাহগারদের বিভ্রান্তি। কোন কোন কাফেরকে পার্থিব জীবন বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং কতককে শয়তান। যারা পার্থিব জীবন দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা বলে—নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। সুতরাং পার্থিব জীবনই উত্তম এবং একেই অবলম্বন করা উচিত। তারা আরও বলে—ইহকাল নিশ্চিত এবং পরকাল সংশয়িত। নিশ্চিত বিষয় সংশয়িত বিষয়ের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকে। সংশয়ের কারণে নিশ্চিতকে বর্জন করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঠিক নয়। এ ধরনের প্রমাণাদি সম্পূর্ণ অসার এবং শয়তানের প্রমাণাদির অনুরূপ। সে বলেছিল—

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

অর্থাৎ, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। কারণ, তুমি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটির দ্বারা।

এ ধরনের বিভ্রান্তির প্রতিকার দু'প্রকারে সম্ভব। সত্যিকার ঈমান দ্বারা চিকিৎসা হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তিসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা—

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা অক্ষয় থাকবে।

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

– এবং পরকাল উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

–পার্থিব জীবন তো বিভ্রান্তির সামগ্রী বৈ নয়।

فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

–পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) যখন এসব আয়াতের বিষয়বস্তু অনেক কাফের দলের গোচরীভূত করেন, তখন তারা কালবিলম্ব না করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায় এবং কোন দলীলের অপেক্ষা করেনি। কেউ কেউ এসে আরয করত—আমরা আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্যিই কি আল্লাহ্ আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ হাঁ। এরপরই তারা মুসলমান হয়ে যেত। সাধারণের এই ঈমান ছিল বিভ্রান্তির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গণ্ডির বাইরে। এটা এমন, যেমন কোন বালক তার পিতার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, যদিও কারণ জানা থাকে না।

যুক্তি, প্রমাণের মাধ্যমে চিকিৎসা হল যেসব যুক্তির ভিত্তিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে যুক্তির মাধ্যমেই খণ্ডন করা। উদাহরণতঃ উপরে কাফেরদের একটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি উল্লিখিত হয়েছে যে, পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। আর নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। সুতরাং পার্থিব জীবনই অবলম্বন করা উচিত। এই যুক্তিতে দুটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য হচ্ছে পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। এ বাক্যটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি (অর্থাৎ নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম) সর্বাবস্থায় সত্য নয়। এর মধ্যেই ধোকা নিহিত। কেননা, নগদ ও বাকীর পরিমাণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমান সমান হলে তো বাক্যটি সত্য; কিন্তু যদি নগদ বাকীর তুলনায় পরিমাণে কম হয়, তবে বাকীই উত্তম। দেখ, যে কাফেররা উপরোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করে, তারাই ব্যবসায়ে এক টাকা নগদ এজন্যে বিনিয়োগ করে, যাতে দশ টাকা বাকী অর্জন করতে পারে। তখন তারা বলে না যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। সুতরাং বাকীর আশায় নগদ এক টাকা বিনষ্ট করা উচিত নয়। এমনিভাবে চিকিৎসক যদি রোগীকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ফলমূল খেতে নিষেধ করে, তবে রোগের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে তা পরিত্যাগ করে। অথচ এসব খাদ্যের স্বাদ নগদ এবং রোগ-যন্ত্রণা ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যত সুখের আশায় জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে এবং কারও কল্পনায় একথা আসে না যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম।

সারকথা এই যে, পরবর্তী সময়ে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তবে তা এক টাকা নগদের চেয়ে উত্তম। এখন দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনকে তুলনা করলে দুনিয়ার জীবন 'কিছুই না' বলা যায়। উদাহরণতঃ মানুষ বেশীর চেয়ে বেশী একশ' বছর বাঁচে। এ বয়সকে আখেরাতের বয়সের সাথে তুলনা করলে তা তার এক কোটি ভাগের একের সমানও হয় না। সুতরাং দুনিয়াতে কেউ এক ছেড়ে দিলে আখেরাতে লাখ লাখ; বরং অগণিত পাবে। আর যদি প্রকারের দিকে লক্ষ্য করা যায়, তবে দুনিয়ার আনন্দে সর্বপ্রকার মালিন্য, কষ্ট ও বিপদ নিহিত থাকে। কিন্তু আখেরাতের আনন্দ, নির্ঝঞ্ঝাট, স্বচ্ছ ও পাক-পবিত্র। মোটকথা, নগদ বাকীর চেয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তম—একথাটিই ভ্রান্ত ও ধোকা। এ ভ্রান্তির কারণ হচ্ছে শুনা কথায় বিশ্বাস করে নেয়া এবং এটা চিন্তা না করা যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম তখন, যখন উভয়ের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য সমান হয়।

কাফেরদের আরও একটি যুক্তি হল নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ ইহকাল সন্দিগ্ধ বিষয় অর্থাৎ আখেরাতের চেয়ে উত্তম। এ যুক্তিটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর ঠুনকো। কেননা, এর উভয় বাক্যই ভিত্তিহীন। উদাহরণতঃ নিশ্চিত বিষয় সন্দেহযুক্ত বিষয়ের চেয়ে উত্তম—এটা তখন সত্য, যখন উভয়টি সমান হয়— অন্যথায় নয়। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ী ব্যক্তি কষ্ট নিশ্চিতরূপেই করে এবং তার লাভ সন্দেহযুক্ত থাকে। বিদ্যার্থী বিদ্যান্বেষণে নিশ্চিতই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করে এবং তার ইপ্সিত ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি সন্দিগ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে রোগী ঔষধের তিক্ততা অবশ্যই অনুভব করে। এতদসত্ত্বেও তার আরোগ্য লাভের বিষয়টি থাকে অনিশ্চিত। এসমস্ত ক্ষেত্রে সকলেই সন্দেহযুক্ত বিষয়ের জন্যে নিশ্চিত বিষয়কে বর্জন করে। ব্যবসায়ী বলে, যদি আমি ব্যবসা না করি, তবে কষ্ট করব এবং ভুখা থাকব। ব্যবসায়ে পরিশ্রম কম এবং মুনাফা বেশী। রোগী বলে, ঔষধের তিক্ততা রোগের পরিণাম অর্থাৎ মৃত্যু ভয়ের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহই করে, তার বলা উচিত— জীবনের গোণাগুণতি কয়েকটি দিন সবর করা আমার জন্যে সেসব বিষয়ের তুলনায় উত্তম, যা আখেরাত সম্পর্কে মানুষ বলে থাকে। কেননা, ধরে নেয়া যাক, যদি আখেরাত মিথ্যাই হয়, তবে তাতে আমার ক্ষতি কি? জীবনের কয়েক দিনের বিলাসই তো নষ্ট হবে। জীবন লাভের পূর্বেও তো কতকাল অতিবাহিত হয়েছে, তখন আমি বিলাস করিনি। সুতরাং ধরে নেব, আমি অস্তিত্বই লাভ করিনি। পক্ষান্তরে যদি আখেরাত সত্য হয়ে যায়, তবে অনন্তকাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, যা আমি সহ্য করতে পারব না।

হযরত আলী (রাঃ) জনৈক খোদাদ্রোহীকে বলেছিলেন ঃ তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে আমাদের উভয়ের কোন ক্ষতি নেই। আর যদি আমার কথা সত্য হয়ে যায়, তবে আমি মুক্তি পাব, আর তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ) এরূপ বলার কারণ এটা ছিল না যে, معاذ الله তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আখেরাত সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; বরং খোদাদ্রোহীর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার আখেরাত অস্বীকার করা নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

কাফেরদের যুক্তির দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে আখেরাত সন্দিগ্ধতা। মূলত এটাও ভুল; বরং আখেরাত ঈমানদারদের মতে সুনিশ্চিত। এর দলীল দ্বিবিধ। এক, ঈমান, বিশ্বাস এবং পয়গম্বর ও সুধীজনের অনুকরণ। পয়গম্বর ও সুধীজনদের অনুসরণ করলে আখেরাত সম্পর্কিত সকল বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের। এটা এমন, যেমন কোন রোগী তার রোগের ঔষধ কি, জানে না। এরপর সকল চিকিৎসক ও কবিরাজ এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল যে, এ রোগের ঔষধ অমুক গাছের মূল। এখন রোগী চিকিৎসকদের মুখে একথা শুনামাত্রই নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেবে এবং তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ চাইবে না। আখেরাত নিশ্চিত হওয়ার দ্বিতীয় দলীল পয়গম্বরগণের জন্যে ওহী এবং ওলীগণের জন্য ইলহাম। এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, নবী করীম (সাঃ) কেবল জিবরাঈলের কাছ থেকে শুনে আখেরাতের বিশ্বাসী হয়েছিলেন। বরং পয়গম্বরগণের জন্যে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ হুবহু খুলে দেয়া হয় এবং তাঁরা সেই স্বরূপকে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা এমনভাবে দেখে নেন, যেমন আমরা চর্মচক্ষু দ্বারা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে দেখি। অতএব, তাঁরা যেসব সংবাদ দেন, স্বচক্ষে দেখে সংবাদ দেন— কেবল শুনে দেন না। সুতরাং আখেরাত সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর বিশ্বাস ও আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন নিজের কথাবার্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানাবলী অমান্য করে এবং কামনা-বাসনা ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে সৎকর্ম বর্জন করে, তখন তারাও আখেরাত সম্পর্কিত উপরোক্ত বিভ্রান্তিতে কাফেরদের সাথে শরীক হয়ে যায়। কেননা, তারাও পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়। অবশ্য মূল ঈমানের কারণে তারা চিরন্তন আযাব থেকে বেঁচে যাবে এবং কিছুকাল দোযখ ভোগ করার পর মুক্তি পাবে। তবে তারা যে বিভ্রান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা স্বীকার করে যে, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক থাকা এবং দুনিয়াকে অবলম্বন করার কারণে কেবল ঈমান চিরন্তন সাফল্য লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোরআন শরীফ এর সাক্ষী। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির জন্যে, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, অতঃপর সৎপথে থাকে।

মোটকথা, যারা দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট, এর আনন্দ-উল্লাসে নিমজ্জিত এবং মৃত্যুকে খারাপ মনে করে, তারাই বিভ্রান্ত, কাফের হোক কিংবা মুসলমান। এ পর্যন্ত কাফেরদের বিভ্রান্তি ও তার প্রতিকার বর্ণিত হল।

এখন গোনাহগারদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বলে—আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। আমরা তাঁর ক্ষমা আশা করি। অতঃপর এই আশার উপর ভিত্তি করে তারা সৎকর্মও বর্জন করে। তারা এর নাম রাখে "রাজা" অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আশাবাদ। কারণ তারা জানে "রাজা" ধর্মের একটি প্রশংসনীয় বিষয়। মাঝে মাঝে তাদের এই আশাবাদের একটি দলীল হয়ে থাকে তাদের পিতৃপুরুষদের সৎকর্মপরায়ণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া; যেমন সৈয়দ হওয়া। খোদাভীতি ও পরহেযগারীতে পূর্বপুরুষদের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, আল্লাহর কাছে তারা বাপ-দাদার চেয়েও বুযুর্গ। কেননা, বাপ-দাদারা খোদাভীতি ও পরহেযগারী সত্ত্বেও ভয়ে কম্পমান থাকতেন; কিন্তু তারা সকল প্রকার পাপাচার সত্ত্বেও নির্ভীক হয়ে থাকে। এটা চরম বিভ্রান্তি। তাদের মনে শয়তান এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, যে কাউকে মহব্বত করে, সে তার বংশধরকেও মহব্বত করে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাদের বাপ-দাদাকে প্রিয় জানতেন, তাই তোমাদেরকেও প্রিয় জানবেন। অতএব, তোমাদের সৎকর্ম করার প্রয়োজন কি? অথচ তারা একথা স্মরণ করে না যে, হযরত নূহ (আঃ) নিজের পুত্রকে নৌকায় নিজের সঙ্গে তুলতে চেয়েছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন—

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, 'পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত।'

কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর হল—

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

অর্থাৎ, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের পিতার জন্যে দোয়া করেন; কিন্তু তা না-মনযুর হয়। আমাদের নবী করীম (সাঃ) আপন জননীর কবর যিয়ারত এবং তার জন্যে এস্তেগফারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়; কিন্তু মাগফেরাত চাওয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সেমতে তিনি জননীর কবরের কাছে পৌঁছে শুধু অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। মোটকথা, উপরোক্ত ধারণা ধোকা ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা কেবল অনুগতদেরকেই ভালবাসেন এবং গোনাহগারকে অপছন্দ করেন। যেমন, পিতা অনুগত হলে তার সন্তানরা গোনাহগার হলেও আল্লাহ পিতাকে অপছন্দ করেন না। তেমনি পিতাকে মহব্বত করার কারণে তার গোনাহগার পুত্রকেও মহব্বত করেন না। এ ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে—

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

অর্থাৎ, একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, পিতার তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে সেও মুক্তি পেয়ে যাবে, সে এমন, যেমন কেউ মনে করে যে, পিতা পেট ভরে খেলে তারও পেট ভরে যাবে এবং সে পানি পান করলে তারও তৃষ্ণা মিটে যাবে। অথচ এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অবান্তর। এ থেকে জানা গেল যে, তাকওয়া ফরযে আইন। এতে পিতার তাকওয়া পুত্রের জন্যে যথেষ্ট হবে না। কিয়ামতের দিন তাকওয়ার ভিত্তিতেই বিচার হবে। তবে যে ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ অধিক হবে না, তার জন্যে সুপারিশের অনুমতি হবে এবং সুপারিশ তার জন্যে লাভজনক হবে।

এখন প্রশ্ন হয়, গোনাহগার ব্যক্তি বলে থাকে, আল্লাহ ক্ষমাশীল। আমি তার ক্ষমা আশা করি। তার এ দুটি বাক্যই তো নির্ভুল এবং মনে লাগে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতে বিভ্রান্তি কিসের? জওয়াব এই যে, শয়তান মানুষকে এমনি ধরনের বাক্য দ্বারা বিভ্রান্ত করে, যা বাহ্যত গ্রহণযোগ্য এবং ভেতরে প্রত্যাখ্যাত। বলা বাহুল্য, বাহ্যিক কথা সুন্দর না হলে মন বিভ্রান্ত হবে কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই উক্তির রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে অনুগত করে, মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে আমল করে এবং নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয় এবং আল্লাহর কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। সুতরাং বাস্তবে এই হচ্ছে আমলহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, শয়তান যার নাম পাল্টে "রাজা" দিয়েছে। মূর্খরা এতেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। অথচ "রাজা" শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা এভাবে করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করে। অর্থাৎ তারাই আশা করার যোগ্য।

হযরত হাসান (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন কোন লোক বলে- আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি এবং আমল করি না। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের খামখেয়ালী। যে ব্যক্তি কোন বস্তু আশা করে, সে তার অন্বেষণ করে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভয় করে, সে তার কাছ থেকে দূরে পালায়। মুসলিম ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ আমি একদিন এত জোরেশোরে সেজদায় গেলাম যে, আমার সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। এটা দেখে কেউ বলল ঃ আমরা তো আল্লাহর কাছে মাগফেরাত আশা করি। এজন্যে আমল করি না। মুসলিম জওয়াব দিলেন ঃ এটা কস্মিনকালেও "রাজা" তথা আশা নয়। মানুষ যে বিষয় আশা করে, তা তালাশ করে।

এর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি আশা করে যে, সে সন্তানের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পিতা হবে; অথচ সে এখনও বিবাহই করেনি কিংবা বিবাহ্ করে থাকলেও স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। এরূপ ব্যক্তির সন্তানের পিতা হওয়ার আশা খামখেয়ালী নয় তো কি? এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও রহমত আশা করে এবং তার ঈমানই নেই কিংবা ঈমান থাকলেও সৎকর্ম করেনি কিংবা সৎকর্মের সাথে সাথে অসৎকর্মও ছাড়েনি, সেও খামখেয়ালীতে লিপ্ত।

জানা উচিত যে, আশা দু'জায়গায় করা ভাল। এক, আপাদমস্তক গোনাহগার ব্যক্তি। তার মনে যখন তওবা করার কল্পনা জাগে, তখন শয়তান তাকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তোর তওবা কবুল হবে না। এতে শয়তানের উদ্দেশ্য থাকে, তাকে নিরাশ করে দেয়া। এমতাবস্থায় নৈরাশ্য দূর করে আশা করা ওয়াজিব। সে স্মরণ করবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী এবং তওবা একটি এবাদত, যা দ্বারা গোনাহ্ দূর হয়ে যায়। কোরআন শরীফে এর সমর্থন রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ -

অর্থাৎ, বলে দিন, হে আমার বান্দা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এস।

অতএব, মানুষ যখন তওবা সহকারে ক্ষমার আশা করবে, তখন তাকে আশাবাদী বলা উচিত হবে। নতুবা গোনাহ অব্যাহত রেখে মাগফেরাতের আশা করা খামখেয়ালী। দুই, যে ব্যক্তি নফল এবাদতে ক্রটি করে এবং কেবল ফরয এবাদত করেই ক্ষান্ত থাকে, সে যদি নিজের জন্যে আল্লাহর সেই সমস্ত নেয়ামত ও ওয়াদা আশা করে, যা তিনি সৎকর্মপরায়ণদেরকে দিয়েছেন এবং এই আশার আনন্দে নফল এবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করে, তবে তার এই আশা উত্তম। আল্লাহ বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ
الْعَادُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝

অর্থাৎ, অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা আপন নামাযে বিনয় নম্র, যারা অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা আপন যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী ফেরদাউসের, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।

সুতরাং প্রথমোক্ত আশা দ্বারা তওবার প্রতিবন্ধক নৈরাশ্য খতম হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় আশা দ্বারা এবাদতে স্ফূর্তির অন্তরায় অলসতা দূর হয়ে যায়। সারকথা, যে আশা তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে বলা হয় "রাজা"। আর যে আশা এবাদতে অলসতার কারণ হয়, তাকে বলা হয় বিভ্রান্তি ও খামখেয়ালী। আজকাল অধিকাংশ লোক আমলে অলসতা করে। তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করে না। এর কারণ এটাই যে, তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে, যাকে "রাজা" মনে করে নিয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—এই উম্মতের শেষ যুগে বিভ্রান্তি প্রবল হবে। বাস্তবে তাই দেখা যায়। প্রথম যুগের লোকেরা অব্যাহতভাবে এবাদত করতেন। তারা যা-ই আমল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতেন, তাদের অন্তর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকত; অথচ তারা সারারাত আল্লাহর এবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এতদসত্ত্বেও নির্জনে নিজের জন্য কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা এর বিপরীত। এখন মানুষ গোনাহে ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি বিমুখ থাকে। এরপরও তারা শংকাহীন ও প্রশান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তারা বলে— আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার উপর আস্থা রাখি এবং তাঁর রহমত ও মাগফেরাত আশা করি। তারা যেন দাবী করে আমরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ এতটুকু জানি, যতটুকু পয়গম্বর ও সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না।

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এক সময় আসবে, যখন পরনের বস্ত্রের ন্যায় কোরআন মানুষের অন্তরে পুরাতন হয়ে যাবে। মানুষের কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষাই থেকে যাবে এবং এর সাথে ভয় মোটেই থাকবে না। কোন সৎকাজ করলে তারা বলবে, এটা কবুল হবে এবং কোন অসৎকাজ করলে বলবে এটা ক্ষমা পেয়ে যাব। এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মানুষ ভয়ের জায়গায় লালসাকে ব্যবহার করবে এবং কোরআনে উল্লিখিত ভয়ের আয়াত সম্পর্কে মূর্খ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা খৃস্টানদের এ অবস্থাই বর্ণনা করে বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا -

অর্থাৎ, তাদের পেছনে আগমন করল কিতাবের উত্তরাধিকারীগণ, যারা তুচ্ছ জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিভ্রান্তদের প্রকার চতুষ্টয়

(১) শিক্ষিতদের বিভ্রান্তি ঃ একদল শিক্ষিত লোক প্রচুর ধর্মীয় ও যৌক্তিক বিদ্যা শিক্ষা করে এবং তা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ থেকে বিরত রাখে না এবং এবাদত পালন করে না। তারা আরও ধারণা করে– আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মর্যাদাশীল। আল্লাহ্ আমাদের মত শিক্ষিতদেরকে আযাব দেবেন না; বরং সাধারণ লোকের পক্ষে আমাদের সুপারিশ কবুল করবেন। বাস্তবে এটা তাদের বিভ্রান্তি। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জানা যাবে, বিদ্যা দু' প্রকার। এক, মোকাশাফা; অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলীকে জানা, যাকে পরিভাষায় 'মারেফত' বলা হয়। দুই, মোয়ামালা; অর্থাৎ, হালাল-হারাম, ভাল ও মন্দ চরিত্র, তার প্রতিকার এবং মন্দ চরিত্র থেকে আত্মরক্ষার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। আমল তথা কর্ম করার উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যা অর্জন করা হয়। আমল উদ্দেশ্য না হলে বিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। যে বিদ্যার উদ্দেশ্য হয় আমল, সেই আমলই সেই বিদ্যার মূল্য হয়ে থাকে।

উদাহরণতঃ জনৈক রোগী একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক তাকে কতগুলো বনজ ঔষধ, সেগুলোর প্রাপ্তিস্থান, চূর্ণকরণ, মিশ্রিতকরণ, প্রস্তুত প্রণালী, সেবনবিধি ইত্যাদি বিস্তারিত বলে দিল। রোগী সেগুলো শুনে সুন্দর হস্তাক্ষরে একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে নিল। অতঃপর বাড়ী ফিরে সে প্রত্যেহ সে ব্যবস্থাপত্র পাঠ করতে শুরু করল। তা পাঠ করে শুনাল। কিন্তু ব্যবস্থা অনুযায়ী বাজার থেকে সেগুলো কিনে ঔষধ তৈরি করল না এবং সেবনও করল না। অথচ তার কাছ থেকে শুনে অনেকেই সেই ঔষধ তৈরি করে সেবন করল এবং রোগের হাত থেকে মুক্তি পেল। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির রোগমুক্তি আশা করা যায় কি? তার বিদ্যা তার কোন উপকারে আসবে কি? হাঁ, সে যদি পয়সা খরচ করে উপাদানগুলো বাজার থেকে কিনে ঔষধ তৈরি করে এবং যেভাবে সেবন করা দরকার, সেভাবে সেবন করে, সাথে সাথে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বস্তু আহার করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে বিরত থাকে, তবে তার রোগমুক্তি আশা করা যায়। এতেও আরোগ্য লাভ না করার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু মোটেই ঔষধ সেবন না করে আরোগ্য আশা করা খামখেয়ালী বৈ কিছু নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ফেকাহ, এবাদতের বিধিবিধান ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু নিজে আমল করে না, গোনাহসমূহ জেনেও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে না, মন্দ চরিত্র অধ্যয়ন করে এবং নিজেকে পরিশোধিত করে না এবং সচ্চরিত্রতার জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু নিজে তা দ্বারা ভূষিত হয় না, সে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত। আল্লাহ পাক বলেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

অর্থাৎ, যে নিজেকে পরিশোধিত করবে, সেই সফল হবে।

এখানে একথা বলা হয়নি যে, যে পরিশোধনের জ্ঞান অর্জন করবে, সে সফল হবে। এক্ষেত্রে শয়তান আরও একটি ধোকা উপস্থিত করে। তা এই যে, জ্ঞানার্জনের সাথে ঔষধের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, ঔষধের জ্ঞান রোগ দূর করে না ঠিক; কিন্তু জ্ঞানার্জন খোদায়ী নৈকট্য ও সওয়াব লাভের কারণ হয়ে থাকে। সেমতে বিদ্যার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীসে আমল ছাড়াই বিদ্যা অর্জনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শয়তানের এই ধোকায় পড়ে যায়। কেননা, এটা মানসিক প্রবণতার অনুকূল। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানকে এই জওয়াব দেয় যে, তুই আমাকে বিদ্যার ফযীলত মনে করিয়ে দিচ্ছিস এবং অসৎ আমলহীন বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেসব শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলো বেমালুম ভুলিয়ে দিচ্ছিস। দেখ, আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

অর্থাৎ, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত।

অন্য আয়াতে আছে—

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا –

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা পালন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত গাধার মত, যে রাশি রাশি কিতাবের বোঝা বহন করে।

কুকুর ও গাধার সমতুল্য হওয়ার চেয়ে বড় অপমান আর কি হবে? হাদীসে আছে, যার বিদ্যা বেশী এবং সুপথপ্রাপ্তি কম, সে আল্লাহ থেকে দূরেই চলে যায়। আরও আছে, আমলহীন আলেমকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার অন্ত্রসমূহ বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন ঘানি ঘুরায়, তেমনি সে অগ্নিতে ঘুরবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মূর্খের দুর্ভোগ একবার। সে লেখাপড়া করেনি। আল্লাহর মরযী হলে সে লেখাপড়া করত। কিন্তু বিদ্বানের দুর্ভোগ সাতবার। অর্থাৎ তার বিদ্যা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে এবং তাকে বলা হবে— বিদ্যা অর্জন করে তুমি কি আমল করেছ? আল্লাহর নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করেছ? রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব সেই শিক্ষিত ব্যক্তির হবে, যার শিক্ষা তার কোন উপকারে আসেনি; অর্থাৎ, সে আমল করেনি। এ ধরনের আরও অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো অসৎ বিদ্বান ব্যক্তির মরযীর অনুকূল নয়। তাই শয়তান এগুলো স্মরণ করায় না।

আরও একদল শিক্ষিত লোক আমল করে; কিন্তু কেবল বাহ্যিক এবাদত পালন করে এবং গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে। তারা অন্তরের নিন্দনীয় দোষসমূহের প্রতি মোটেই নজর দেয় না। উদাহরণতঃ অহংকার, হিংসা, রিয়া, জাঁকজমকপ্রীতি, সুখ্যাতি অন্বেষণ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে না। কেউ কেউ তো এগুলোকে দোষ বলেও মনে করে না। তারা এসব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, সামান্যতম রিয়াও শিরক। যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না। হিংসা পুণ্য কাজকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে। এগুলো ছাড়াও মন্দ চরিত্রের অধ্যায়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ শ্রেণীর শিক্ষিত লোক নিজের বাহ্যিক আকৃতি খুব সুন্দর করে, কিন্তু অন্তরের আকৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। অথচ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাইরের আকৃতি ও অর্থ-সম্পদ দেখেন না; বরং অন্তর ও আমল দেখেন। অন্তরই মূল এবং মুক্তি এর নিরাপত্তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থাৎ, কিন্তু যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ অন্তর নিয়ে।

এই প্রকার শিক্ষিতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃতদের কবর, যা বাহ্যত খুব সুসজ্জিত; কিন্তু অভ্যন্তরে গলিত লাশ অথবা অন্ধকার কক্ষ। গোনাহের মূল শিকড় হচ্ছে মন্দ স্বভাব, যা অন্তরের অভ্যন্তরে প্রোথিত। অন্তর থেকে এগুলো সাফ না করলে বাহ্যিক এবাদত দ্বারা কি ফল পাওয়া যাবে? উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির গায়ে খোস-পাঁচড়া দেখা দিল। চিকিৎসক তাকে মালিশ করার এবং পান করার ঔষধ বলে দিল, যাতে মালিশের ঔষধ দ্বারা ত্বকের উপকার হয় এবং সেবনের ঔষধ দ্বারা মূল শিকড় বিনষ্ট হয়। কিন্তু রোগী কেবল মালিশের ঔষধ লাগিয়েই ক্ষান্ত রইল এবং সেবনের ঔষধ ব্যবহার করল না; বরং এমন নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করল, যা দ্বারা খোস-পাঁচড়া আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় এই রোগীর খোস-পাঁচড়া কোনদিন দূর হবে না যদি হাজারো বারও গায়ে ঔষধ মালিশ করে। কেননা, শিকড় তো ভিতরে অবস্থিত। সেটা দূর হলে এটাও দূর হবে।

আরেক দল শিক্ষিত লোক এসব অভ্যন্তরীণ দোষ সম্পর্কে জানে এবং এগুলো যে শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্জনীয়, তাও জানে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে যেহেতু বড় মনে করে, তাই মনে করে যে, এসব দোষ তাদের মধ্যে নেই। তাদের স্তর আল্লাহর কাছে এমন নয় যে, এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা নেবেন। এগুলো হল সাধারণ মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়– তাদের মত শিক্ষিতদেরকে নয়। এরপর যখন তাদের কাছ থেকে অহংকার, জাঁকজমক, আস্ফালন ও গর্বের চিহ্ন ফুটে উঠে, তখন বলে— এটা অহংকার নয়; বরং ধর্মের ইযযত রক্ষার স্পৃহা এবং বিদ্যার মহিমা প্রকাশ। কারণ, আমরা যদি নিকৃষ্ট পোশাক পরি এবং মজলিসে নিচে বসি, তবে ধর্মের শত্রুরা উপহাস করবে, এতে আমাদের অপমান তথা ধর্মের অপমান হবে। এই বিভ্রান্তরা জানে না যে, তাদের শত্রু তো বাস্তবে শয়তান, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। শয়তান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের কার্যকলাপ দেখে খুব হাস্য ও উপহাস করে। তারা একথাও জানে না যে, রসূলে করীম (সাঃ) ধর্মের মদদ কিভাবে করেছিলেন এবং কাফেরদেরকে কিভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন! তাঁর সাহাবীগণ কতটুকু বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন! দারিদ্র্য ও অসহায়তাকে কিভাবে অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিলেন। সিরিয়ায় হযরত উমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট পোশাক পরিধানের আপত্তি উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ইযযত দান করেছেন। অতএব, আমরা অন্য কোন বস্তুতে ইযযতের আকাঙ্ক্ষা করি না।

কখনও শিক্ষিত ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থ রচনা করে। সে মনে করে আমি আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা প্রচার করছি যাতে সাধারণ মানুষের উপকার হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য থাকে উৎকৃষ্ট রচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নাম-যশ ও সুখ্যাতি অর্জন করা। এটা লক্ষ্য না হলে অন্য কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থ থেকে আসল গ্রন্থকারের নাম মিটিয়ে তদস্থলে নিজের নাম লিখে দেয়, তবে আসল গ্রন্থকার এটা অপছন্দ করে কেন? সে তো জানে যে, এই গ্রন্থ দ্বারা মানুষের যে উপকার হবে, তার সওয়াব সে-ই পাবে। আল্লাহর কাছেও সে-ই গ্রন্থকার– দাবীদার ব্যক্তি নয়।

আরেক দল শিক্ষিত লোক বেদআতীদের সাথে ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকার জন্য কালাম শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তারা বিরোধী দলের আপত্তিসমূহ অন্বেষণ করার কাজে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজে সর্বপ্রযত্নে নিয়োজিত থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন উক্তি মুখস্থ করে নেয়। তাদের বিশ্বাস, মানুষের কোন আমল ঈমান ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ আমাদের বিতর্ক না শিখে এবং কালাম শাস্ত্রের দলীলসমূহ না জানে, সে পর্যন্ত ঈমান শুদ্ধ হয় না। তারা আরও মনে করে, আল্লাহকে কেউ আমাদের চেয়ে বেশী চিনে না। যে আমাদের মাযহাবে বিশ্বাসী নয় এবং আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে বেঈমান। এই প্রকার তর্কবিদ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত— এক শ্রেণী পথভ্রষ্ট এবং অপর শ্রেণী সত্যপন্থী। পথভ্রষ্ট তারা, যারা হাদীসের বিপরীত দিকে আহ্বান করে। আর সত্যপন্থী তারা, যারা হাদীস ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু বিভ্রান্তি উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পথভ্রষ্ট দলের বিভ্রান্তি এই যে, তারা তাদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে গাফেল এবং এতেই নিজেদের মুক্তি মনে করে। এদের মধ্যেও অনেক দল আছে, যারা একে অপরকে কাফের বলে। সত্যপন্থী শ্রেণীর বিভ্রান্তি এই যে, তারা বিতর্ক ও মোনাযারাকে নেহায়েত জরুরী ও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ মনে করে। তারা এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, তাদের মত বিতর্ক ও তালাশ না করা পর্যন্ত কারও ধর্ম পূর্ণতা লাভ করবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলকে বাহাস ও প্রমাণ ব্যতিরেকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে পূর্ণ ঈমানদার নয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা সমগ্র জীবন বিতর্কানুষ্ঠান, চিত্তাকর্ষক বাক্যাবলী আয়ত্তকরণ এবং বেদআতীদের আপত্তি খণ্ডনে অতিবাহিত করে দেয় এবং নিজের অন্তরের কোন খোঁজ-খবর নেয় না। ফলে বাহ্যিক গোনাহ ও অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পায় না। তাদের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তবে অবশ্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা দেখতে পেত, যে যুগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা অনেক বেদআতী ও প্রবৃত্তির পূজারী দেখেছেন; কিন্তু আপন জীবন ও ধর্মকে বিতর্কবাণের লক্ষ্যস্থল করেননি; বরং কখনও এ সম্পর্কে আলোচনা পর্যন্ত করেননি। নেহায়েত প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ীই কথা বলেছেন, যাতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা জেনে যায়। তারা যখন কোন গোমরাহকে তার গোমরাহীতে পীড়াপীড়ি করতে দেখেছেন, তখন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তার সাথে শত্রুতা রেখেছেন— জীবনভর কথা কাটাকাটি করেননি।

পূর্ববর্তী মনীষীরা বলেছেন— সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়া সুন্নত এবং দাওয়াতের মধ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হওয়াও সুন্নত। আবূ ওসামা বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে জাতিকে হেদায়াত দান করা হয়, তারা পথভ্রষ্ট হয় না যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে এসে দেখলেন, তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ক্রোধের আতিশয্যে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধারণ করল। তিনি বললেন ঃ

اَبِهٰذَا بُعِثْتُمْ اُمِرْتُمْ اَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَا اُمِرْتُمْ بِهٖ فَاعْمَلُوْا اَوْ مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

অর্থাৎ, তোমরা কি এ জন্যেই প্রেরিত হয়েছ? তোমরা আদিষ্ট হয়েছ যে, আল্লাহর কিতাবের কতক অংশকে কতক অংশের দ্বারা প্রহার কর? দেখ, তোমরা যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা কর আর যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত হও।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্ক সভায় বসেননি তাদেরকে অভিযুক্ত করার জন্যে অথবা নিশ্চুপ করার জন্যে অথবা কোন আপত্তির জওয়াব দেয়ার জন্যে অথবা নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করার জন্যে। তিনি কেবল কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। এর বেশী বাহাস করেননি। কেননা, বেশী কথাবার্তার কারণে তাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত হত এবং নানা রকমের আপত্তি ও সন্দেহ দেখা দিত, যা অন্তর থেকে মুছত না। আল্লাহ না করুন, তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করতে অক্ষম ছিলেন না। বরং বিজ্ঞ ও সাবধানী ব্যক্তিমাত্রই বিতর্ককে পছন্দ করে না। সুতরাং আমাদের ততটুকু বিতর্কই করা উচিত, যতটুকু সাহাবায়ে কেরাম ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে করেছেন। তাঁরা সমগ্র জীবন এসব বিতর্কে ব্যয় করে দেননি। এছাড়া যে বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাতে আমরা এতটুকু মনোনিবেশ করব কেন? কোন বেদআতীর সাথে বিতর্ক করলে দেখা যায় যে, সে বিতর্কের ফলস্বরূপ বেদআত পরিত্যাগ করে না; বরং বিদ্বেষবশত তার বেদআত আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় এসব বিরুদ্ধবাদীর সাথে বিতর্ক করার তুলনায় আত্মসংশোধনে জোর দেয়াই উত্তম। এটা তখন, যখন ধরে নেয়া যায় যে, আমাদেরকে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু যেখানে নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান আছে, সেখানে কাউকে বিতর্কের মাধ্যমে সুন্নতের দিকে দাওয়াত দেয়া যেন এক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সুন্নত বর্জন করে অন্য সুন্নত পালন করার নামান্তর।

আরেক দল শিক্ষিত লোক ওয়ায-নসীহতে ব্যস্ত থাকে। তাদের মধ্যে উচ্চমর্যাদাশীল তারা, যারা অন্তরের গুণাবলী অর্থাৎ, খোদাভীতি, আশা, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, বিশ্বাস, আন্তরিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়বস্তু মানুষকে শুনায়। তারা এই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, তারা যেহেতু এসব গুণ বর্ণনা করে, তাই তারা নিজেরা প্রথমে এসব গুণে গুণান্বিত। অথচ আল্লাহর কাছে তারা এসব গুণে গুণান্বিত নয়। যদি অল্প বিস্তর কিছু গুণ তাদের মধ্যে থাকেও, তবে প্রতিটি সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও কিছু না কিছু থাকে। সুতরাং তার ফযীলত কোথায়? তারা যখন এখলাসের গুণ বর্ণনা করে, তখন বর্ণনার মধ্যেও এখলাস করে না। যখন রিয়ার উল্লেখ করে, তখন তারাও রিয়ামুক্ত হয় না। সংসার অনাসক্তির বর্ণনাও এজন্যে করে যে, তারা নিজেরা সংসারের প্রতি গভীর আসক্ত। মোটকথা, তারা বাহ্যত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অপরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে; কিন্তু নিজেরা দূরে সরে যায়। এ অবস্থা হচ্ছে সেসব ওয়াযকারীর, যাদের ওয়ায নিষ্কলঙ্ক এবং বর্ণনা নির্ভুল অর্থাৎ, যারা কোরআন-হাদীস ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের তরীকা অনুযায়ী ওয়ায করে।

কিন্তু আরেক শ্রেণীর ওয়াযকারী ওয়াযের অপরিহার্য নিয়ম-পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত। আজকালকার সকল ওয়াযকারীই এমনি ধরনের। আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এমন বিরল কেউ থাকতে পারে। কিন্তু আমি এমন কাউকে জানি না। এ ধরনের ওয়ায়েয মানুষকে নতুন কথা শুনানোর জন্যে অনেক মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বিবেক ও আইন বহির্ভূত কথাবার্তা বর্ণনা করে। কেউ কেউ সাজানো-গুছানো ও ছন্দময় বাক্য ব্যবহার করে এবং প্রমাণস্বরূপ বিরহ ও মিলনের কবিতা আবৃত্তি করে, যাতে মানুষ ভাবাতিশয্যে চীৎকার করে উঠে। এরা মানুষরূপী শয়তান। নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ করে। আরেক দল ওয়ায়েয দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের উক্তি হুবহু মুখস্থ করে নেয় এবং এসব উক্তির সঠিক অর্থ না বুঝে মজলিসে বর্ণনা করে। আর মনে করে যে, আল্লাহ থেকে আত্মরক্ষা না করলেও আল্লাহর মাগফেরাত তাদের সাথে রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটকথা, এই শেষ যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি গণনার বাইরে। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি বিভ্রান্তি উল্লেখ করা হল।

(২) সংসারত্যাগী ও এবাদতকারীদের বিভ্রান্তি ঃ এরাও কয়েকটি দলে বিভক্ত। কারও নামাযে, কারও তেলাওয়াতে, কারও হজ্জে, কারও জেহাদে এবং কারও সংসার অনাসক্তিতে বিভ্রান্তি হয়। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও বিভ্রান্ত হয় না। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ফরয ছেড়ে নফল ও মোস্তাহাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। উদাহরণতঃ কেউ উযু করতে গেলে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয়বশত সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। এমনকি, যে পানি শরীয়তের দৃষ্টিতে পাক, তাতেও তাদের খটকা থাকে এবং নাপাকীর দূরবর্তী সম্ভাবনাকেও তারা নিকটবর্তী মনে করতে থাকে। অথচ হালাল ভক্ষণের ক্ষেত্রে তারাই নিকটবর্তী সম্ভাবনাকে দূরবর্তী জ্ঞান করে। বরং মাঝে মাঝে অকৃত্রিম হারামও খেয়ে ফেলে। যদি তারা পানির সাবধানতাকে খাওয়ার মধ্যে ব্যবহার করত, তবে এটা সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারার অনুরূপ হত। হযরত উমর (রাঃ) একবার জনৈক খৃস্টান মহিলার ঘটি থেকে পানি নিয়ে উযু করে নেন; অথচ নাপাকীর সম্ভাবনা প্রকট ছিল। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর এতদূর সাবধানতা ছিল যে, অনেক হালাল বস্তুও হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে বর্জন করতেন। এই বিভ্রান্তদের কেউ কেউ উযু-গোসলে পানির অপচয় করে; অথচ এব্যাপারে অকাট্য নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ এতই সন্দেহপ্রবণ যে, উযু করতে করতে জামাআত খতম হয়ে যায় অথবা নামাযের সময়ই চলে যায়। সময় থাকলেও তারা ভ্রান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আসলে শয়তান মানুষকে খুব উত্তম পন্থায় এবাদত থেকে বিরত রাখে। এধরনের ধারণা সৃষ্টি করে যে, মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোন কোন এবাদতকারীর উপর নামাযের নিয়ত করার সময় সন্দেহ প্রবল হয়ে যায়। শয়তান তাদেরকে নিয়ত ঠিক করে নেয়ার সময় দেয় না; বরং এত পেরেশান করে যে, হয় জামাআত খতম হয়ে যায়, না হয় নামাযের সময় চলে যায়। যদি তারা তাকবীর বলে তাহরীমা বেঁধে নেয়, তবে নামাযের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। কখনও "আল্লাহু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আকবার” বলার মধ্যে এত সন্দেহ করে যে, সাবধানতার আতিশয্যে তাকবীরের শব্দ বদলে যায়। নামাযের শুরুতে এ অবস্থা হয়, এরপর সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে এবং মনকে উপস্থিত করে না। তারা বিভ্রান্তির কারণে মনে করে যে, এসব কাণ্ড আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। কতক লোকের উপর “আলহামদু” ও অন্যান্য সকল ওযীফার মাখরাজসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সন্দেহ প্রবল থাকে। তারা সর্বদাই এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে এবং একেই অত্যাবশ্যক মনে করে অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাই করে না। তারা আয়াতের অর্থ, তার উপদেশ ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না। এটা বড় বিভ্রান্তি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার আদেশ দিয়েছেন, যেমন তারা দৈনন্দিন কথাবার্তা বলে। অতএব, এতে এহেন বানোয়াট কোত্থেকে এল? তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তিকে একটি বার্তা বাদশাহের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হল। সে বাদশাহের দরবারে পৌঁছে বার্তার শব্দসমূহের সঠিক উচ্চারণে সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট করল এবং এক এক শব্দকে ঠিক করতে গিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করল। কিন্তু বার্তার বিষয়বস্তু কি ছিল এবং বাদশাহের দরবারের শিষ্টাচার কি কি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। এরূপ ব্যক্তির শাস্তি পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক ঘাস কাটার ন্যায় কোরআন পাঠ করে। তারা মাঝে মাঝে একদিনে এক খতম করে। তারা মুখে কোরআন পাঠ করে; কিন্তু অন্তরে নানা প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচরণ করতে থাকে। অর্থের দিকে তো কোন মনোযোগই থাকে না যে শাস্তিবাণী ও উপদেশবাণী দ্বারা অন্তর কিছুটা প্রভাবিত হবে।

একদল লোক রোযা রাখার জন্যে পাগল থাকে। তারা সর্বদা অথবা পবিত্র দিনগুলোতে রোযা রাখে। কিন্তু নিজের জিহ্বাকে গীবত থেকে, অন্তরকে রিয়া থেকে, পেটকে হারাম থেকে এবং কথাবার্তাকে বাজে বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে রাখে না। সারাদিন অনর্থক বকবক করতে থাকে। এতদসত্ত্বেও নিজেকে উত্তম মনে করে। যা ফরয তা করে না এবং নফল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাও আবার যেমন করা উচিত, তেমন করে না। এটা প্রকাশ্য ধোকা।

কিছু লোক হজ্জকর্মে বিভ্রান্ত। তারা অপরের হক ও ঋণ আদায় না করে, পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই এবং হালাল পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই হজ্জ করতে বের হয়ে পড়ে। পথিমধ্যে নামায ও অন্যান্য ফরয কর্ম বিনষ্ট করে এবং অশ্লীলতা ও কলহ-বিবাদ থেকে বিরত থাকে না। এরপর যখন বাড়ী ফিরে আসে, তখন অন্তরে কুচরিত্রতা ও বদস্বভাবের ভাণ্ডার থাকে। এতদসত্ত্বেও তারা হজ্জ করাকে উত্তম মনে করে।

(৩) সূফীগণের বিভ্রান্তি ঃ সূফীগণের মধ্যেও অনেক শ্রেণী রয়েছে। তাদের উপর বিভ্রান্তি প্রবল থাকে। এক শ্রেণীর সূফীর রীতি এই যে, তারা সাচ্চা সূফীগণের ন্যায় পোশাক, আকার-আকৃতি, ভাষা, আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও পরিভাষা তৈরি করে এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে তাদের অনুরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ তারা রাগরাগিণী শ্রবণ করে, ভাবাতিশয্যে নর্তন-কুর্দন করে, জায়নামাযে মাথানত করে চিন্তাশীলদের ন্যায় বসে, দীর্ঘশ্বাস নেয় এবং ক্ষীণস্বরে কথা বলে। এতেই তারা বিভ্রান্তিবশত মনে করে যে, সূফী হয়ে গেছে। অথচ তারা নিজেদেরকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত করে না এবং অন্তরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গোনাহ থেকে পবিত্র করে না, যা সাচ্চা সূফীগণের মধ্যে মামুলী বিষয় বলে পরিগণিত হয়। কেউ এসব বিষয় আয়ত্ত করে নিলেও নিজেকে সূফী বলে গণ্য করতে পারে না এবং বড় বড় কথা বলতে পারে না। এমতাবস্থায় যারা হারাম ও সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের বাছ-বিচার করে না, টাকা-পয়সা দেখলেই লাফিয়ে পড়ে, সামান্য বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কেউ সামান্য বিপরীত কথা বললেই তার মানহানি করতে উদ্যত হয়, তারা কিরূপে সূফী হতে পারে? কিয়ামতের দিন যখন এই মেকী সূফীর দল আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, যিনি বাহ্যিক ছেড়াবাস নয়; বরং অন্তরের অবস্থা দেখেন, তখন তাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

আরেক শ্রেণীর সূফীর আবার যেনতেন পোশাক পরতে রুচিতে বাধে; কিন্তু সূফী হওয়ার বাসনাও প্রবল। সূফীগণের পোশাক ছাড়া যেহেতু সূফী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হওয়া যায় না, তাই তারা উৎকৃষ্ট বস্ত্রের খন্ড খন্ড জোড়া দিয়ে বিচিত্র ধরনের পোশাক তৈরি করে, যা রেশমী বস্ত্রের চেয়েও মূল্যবান বেশী। তারা মনে করে যে, পোশাকে তালি লাগিয়েই তারা সূফী হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সূফীগণ তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। তাই তারাও উৎকৃষ্ট বস্ত্রকে টুকরা টুকরা করে তালির মত করে নেয়। অথচ এটা বুঝা কঠিন যে, মূল্যবান বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেলাই করে নিয়েই তারা পূর্ববর্তী সূফীগণের অনুরূপ হয়ে গেল কিরূপে? বলা বাহুল্য, তাদের এই খামখেয়ালী সকল বিভ্রান্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, তারা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করে, সুস্বাদু খাবার খায়, যালেম ও পাপাসক্তদের অর্থ দু'হাতে গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে না; আন্তরিক গোনাহের কথা নাই বা বলা হল। এরপরও তারা সূফী বলে থাকে এবং নিজেদেরকে উত্তম মনে করতে থাকে। তাদের অনিষ্ট সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। কেননা, যারা তাদের অনুসরণ করে, তারা তাদের মতই বরবাদ হয়ে যায়। আর যারা অনুসরণ করে না, তাদের বিশ্বাস সূফী সম্প্রদায়ের প্রতিই শিথিল হয়ে যায়। সকলকেই তারা এরূপ মনে করে। ফলে, সত্যিকার সূফীগণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে তারা দ্বিধা করে না। বলা বাহুল্য, এটা এই তথাকথিত সূফীদের কুকর্মেরই ফল।

আরেক শ্রেণীর সূফী মারেফত জ্ঞানের দাবী করে। তারা বলে, আমরা সকল মকাম ও হাল অতিক্রম করেছি, সর্বদা হকের মোশাহাদা করি এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। অথচ তারা কেবল এসব বিষয়ের নাম ও শব্দই শুনেছে—এগুলোর স্বরূপ, শর্ত, আলামত ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা মারেফতওয়ালাদের কিছু বিপরীতধর্মী কথাবার্তা শিখে নেয় এবং সেগুলোই গেয়ে ফিরে। তাদের মতে এগুলো অত্যধিক উচ্চস্তরের কথা। ফলে, তারা আবেদ ও আলেমদেরকে মোটেই যোগ্য মনে করে না। আবেদদের সম্পর্কে বলে, এরা পরিশ্রমী শ্রমিক। আর আলেমদের সম্পর্কে বলে, এরা আল্লাহ থেকে আড়ালে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ধরনের সূফীরাই মুনাফিক, বদকার, নির্বোধ ও মূর্খ। এরা না শিক্ষা গ্রহণ করে, না চরিত্র সংশোধন করে এবং না অন্তরের হেফাযত করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ কেউ বলে, বাহ্যিক আমল ধর্তব্য নয়। আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে দেখেন। আমাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বতে পাগলপারা। দুনিয়াতে আমরা দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ আর অন্তর অসীমের আস্তানা প্রদক্ষিণরত। আমরা সর্বসাধারণের স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি। সুতরাং দৈহিক আমল দ্বারা আত্মসংশোধনের প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমরা মারেফতে শক্তিশালী, তাই কামনা ও খায়েশ আমাদেরকে আধ্যাত্মপথে বাধা দিতে পারে না। তাদের এসব কথাবার্তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা পয়গম্বরগণের স্তরও অতিক্রম করে গেছে।

কতক সূফী দাবী করে যে, তারা আল্লাহর আশেক ও তাঁর মহব্বতের জালে আটকা পড়েছে। সম্ভবত তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করে, যেগুলো বেদআত অথবা কুফর হওয়া বিচিত্র নয়। তারা মারেফতের পূর্বেই মহব্বতের দাবী করে। অথচ কতক কাজ এমন করে, যা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। যেমন আল্লাহর কাজের উপর নিজের খাহেশকে অগ্রাধিকার দেয়া, লোকলজ্জার কারণে কোন কোন কাজ না করা ইত্যাদি। এগুলো যে মহব্বতের পরিপন্থী, সেকথা তারা জানেই না। কতক লোক আহার, পোশাক ও বাসস্থানের বেলায় হালাল তালাশ করে না, অন্যান্য ক্ষেত্রে হালালের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি না কেবল হালাল অন্নের জন্যে সন্তুষ্ট হবেন এবং না কেবল সকল আমল করে হালাল অন্ন না খাওয়ার জন্যে সন্তুষ্ট হবেন; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হালাল অন্ন খাওয়াসহ সকল এবাদত পালন করা জরুরী এবং সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যে মনে করে, সামান্য বিষয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হবে, সে বিভ্রান্ত।

আধ্যাত্ম পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যত প্রকার বিভ্রান্তি হতে পারে, সেগুলো পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্যে বিরাট পুস্তক দরকার। এলমে মোকাশাফার বিশদ বর্ণনা ছাড়া সবগুলো বিভ্রান্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ এলমে মোকাশাফা বর্ণনা করার অনুমতি নেই।

(৪) বিত্তশালীদের বিভ্রান্তি ঃ একদল বিত্তশালী লোক মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল ইত্যাদি দর্শনীয় কীর্তি নির্মাণে তৎপর থাকে। তারা এগুলোর মধ্যে নিজেদের নাম খোদাই করে লিখে দেয়, যাতে মৃত্যুর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরও তাদের স্মৃতি অম্লান থাকে। এ কাজ করার পর তারা মনে করে এর মাধ্যমে তারা মাগফেরাতের উপযুক্ত হয়ে গেছে। অথচ দু'কারণে তারা বিভ্রান্ত। এক, তারা যুলুম, ঘুষ, সূদ ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা-পয়সা দ্বারা এসব তৈরি করে। সুতরাং হারাম ভক্ষণের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য। দুই, তারা রিয়া ও সুখ্যাতির জন্যে অর্থ ব্যয় করে। তাদের উচিত ছিল এই অর্থ উপার্জন না করা। উপার্জন করে যখন তারা গোনাহগার হল, তখন তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং যে অর্থ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া দরকার ছিল, মালিক পাওয়া না গেলে তার ওয়ারিসকে, ওয়ারিস না থাকলে মুসলমানদের জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় করা দরকার ছিল। এ ব্যাপারে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করাই অধিক জরুরী মনে হয়। কিন্তু তারা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে না; বরং সুখ্যাতি কুড়ানোর জন্যে দালান-কোঠা নির্মাণে তৎপর হয়ে যায়। সুতরাং জনকল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং রিয়া, সুখ্যাতি এবং প্রশংসা কুড়ানোই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, দালান-কোঠা তৈরি কর, কিন্তু তাতে নিজের নাম খোদাই করো না, তবে কখনও তা মেনে নেবে না এবং দালান-কোঠা নির্মাণে সম্মত হবে না। যদি মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হত এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই হত, তবে নাম খোদাই করার কি প্রয়োজন ছিল?

আরেক দল ধনী লোক হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করে মসজিদে ব্যয় করে দেয়। অথচ তার আশেপাশে কিংবা শহরে এমন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোক বাস করে, যাদেরকে দেয়া মসজিদে দেয়ার চেয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেক ভাল। কিন্তু তারা মসজিদেই দেয়। কারণ, এতে মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি হয়। এধরনের বিত্তশালী দাতা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। এছাড়া মসজিদে চিত্রাংকন ও কারুকার্য করা নিষিদ্ধ। নামাযীদের ধ্যান সেদিকে বিভক্ত হয়। দৃষ্টি সেদিকেই পড়ে। অথচ নামাযের উদ্দেশ্য অনুনয়-বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতি। অন্তর কারুকার্যে মশগুল থাকলে সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে এবং এর শাস্তি যে কারুকার্য করে, তার উপর বর্তাবে। অথচ সে ধারণা করে থাকে যে, সৎকাজ করেছে, যা ওসীলা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির। কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহর ক্রোধের যোগ্য হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যগণ তাঁর খেদমতে আরয করল ঃ দেখুন, এই মসজিদটি কি চমৎকার! তিনি বললেন ঃ হে আমার উম্মত, আমি সত্য বলছি, আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদের ইটের উপর ইট কায়েম রাখবেন না। এই মসজিদ নির্মাণকারীদের গোনাহের কারণে সকলকে বরবাদ করে দেবেন। আল্লাহর কাছে না সোনা-রূপার মূল্য আছে, না এসব ইটের, যেগুলোকে তোমরা চমৎকার বলছ। বরং তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে সৎ অন্তর, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীকে আবাদ রাখেন। যখন সৎ অন্তর থাকবে না, তখন পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করে দেবেন।

হযরত আবু দারদার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা মসজিদকে চাকচিক্যময় করবে এবং কোরআনকে সোনা-রূপা পরিধান করাবে, তখন তোমাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল এসে বললেন ঃ সাত হাত উঁচু করবেন এবং কারুকার্য ও চিত্রাংকন করবেন না। মোটকথা, এই ধনীরা একটি মন্দ কাজকে ভাল মনে করে এবং তারই উপর ভরসা করে। এটা তাদের বিভ্রান্তি।

আরেক দল ধনী টাকা-পয়সা ব্যয় করে এবং ফকীর-মিসকীনকে দান করে। কিন্তু এই দানের জন্যে এমন জায়গা তালাশ করে, যেখানে অধিক পরিমাণে লোক উপস্থিত থাকে। এছাড়া এমন ফকীর খোঁজে, যে কৃতজ্ঞ হয় এবং জনসমক্ষে দাতার স্তুতি কীর্তন করে। তারা গোপনে দান করাকে ভাল মনে করে না। কোন ফকীর তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে গোপন করলে তাকে তারা অপরাধী ও অকৃতজ্ঞ মনে করে। তারা কখনও হজ্জের পর হজ্জ করে; কিন্তু দরিদ্র প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রাখে। একারণেই হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ শেষ যুগে এমন লোক হবে, যারা বিনা কারণেও হজ্জ করবে। ধনী হওয়ার কারণে তারা সফরকে কষ্টকর মনে করবে না। তারা বঞ্চিত অবস্থায় গৃহে ফিরবে। অর্থাৎ, সওয়াব কিছুই পাবে না। নিজেরা তো আরামদায়ক যানবাহনে বসে সফর করবে, প্রতিবেশীর খবরও নেবে না।

আবূ নছর (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত বিশর ইবনে হারেছের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছে বসে বলল ঃ আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের জন্যে তোমার কাছে কি পরিমাণ অর্থ আছে? সে জওয়াব দিল ঃ দু'হাজার দেরহাম। বিশর জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি— দেশভ্রমণ, কাবাগৃহের আগ্রহ, না আল্লাহর সন্তুষ্টি? লোকটি আরয করল ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি বললেন ঃ যদি গৃহে বসে এ দু'হাজার দেরহাম ব্যয় করে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে যাও এবং সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির ব্যাপারে তোমার দৃঢ় বিশ্বাসও অর্জিত হয়ে যায়, তবে তুমি কি করবে? লোকটি বলল ঃ তবে এভাবেই সন্তুষ্টি অর্জন করব। তিনি বললেন ঃ তাহলে যাও, এই দেরহামগুলো দশ প্রকার ব্যক্তিকে দিয়ে দাও— ঋণগ্রস্তকে দাও, যে তার ঋণ পরিশোধ করবে, অভাবগ্রস্তকে দাও, যে তার অভাব মোচন করবে, বাল-বাচ্চাদারকে দাও, যে তার বাল-বাচ্চাদেরকে পালন করবে, অনাথ শিশুদের দেখাশোনাকারীকে দাও, যে তাদেরকে খুশী করবে। যদি মনে চায়, তবে এসব প্রকারের এক এক ব্যক্তিকে দাও। আমার এরূপ বলার কারণ এই যে, কোন মুসলমানের মন খুশী করা, মযলুমের ডাকে সাড়া দেয়া এবং দুর্বলের সাহায্য করা ফরয হজ্জের পর একশ' হজ্জের চেয়েও উত্তম। কাজেই এখন যাও এবং আমি যা বললাম– তাই কর। নতুবা মনের কথা বলে দাও। লোকটি বলল ঃ আমার মন তো ভ্রমণ করতেই ইচ্ছুক। অগত্যা হযরত বিশর মুচকি হেসে বললেনঃ যখন টাকা-পয়সা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সন্দেহযুক্ত পথে সঞ্চিত হয়ে যায়, তখন মন চায় কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কসম করেছেন যে, তিনি মুত্তাকীদের আমল ছাড়া কারও আমল কবুল করবেন না।

আরেক দল লোক কৃপণতাবশত অর্থকড়ি সঞ্চয় করে এবং সৎকর্ম ও এবাদত এমন করে, যাতে মোটেই অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যেমন দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত্রিতে জাগরণ করে কিংবা কোরআন খতম করে, এরাও বিভ্রান্ত। কেননা, মারাত্মক কৃপণতা তাদের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থ ব্যয় করে প্রথমে এরই মূলোৎপাটন করা উচিত ছিল। এর পরিবর্তে যা তারা করে, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও পরনের কাপড়ে সাপ ঢুকে গেছে। ফলে, সে মৃত্যুর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সর্দির ঔষধ প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত। বল, যাকে সাপে দংশন করবে, সর্দির ঔষধ দ্বারা তার কি উপকার হবে? এ কারণেই হযরত বিশরের কাছে কেউ বলেন ঃ অমুক ধনী ব্যক্তি নামায, রোযা খুব করে। তিনি বললেন ঃ তার অবস্থার সাথে যে কাজের মিল ছিল, তা তো সে ছেড়ে দিয়েছে এবং যে কাজ অন্যের জন্যে উপযুক্ত ছিল, তা অবলম্বন করেছে। তার কর্তব্য ছিল নিরন্নকে অন্ন দেয়া এবং ফকীর-মিসকীনকে খয়রাত দেয়া। নিজে ক্ষুধার্ত থাকার চেয়ে দান-খয়রাত তার জন্যে উত্তম ছিল।

আরেক দল ধনী এত বেশী কৃপণ যে, ধন-সম্পদের মধ্য থেকে যাকাত ছাড়া অন্য কিছু দান করে না। যাকাতেও এমন নিকৃষ্ট মাল দেয়, যা নিজের কাছে রাখতে ঘৃণা করে। তারা যাকাত দিতে গিয়ে এমন ফকীর বেছে নেয়, যে তাদের খেদমত করে অথবা ভবিষ্যতে যার কাছ থেকে খেদমত আশা করে কিংবা যে কোন বড় লোকের সুপারিশ নিয়ে আসে। তাকে দান করার উদ্দেশ্য থাকে সেই বড় লোকের প্রিয়ভাজন হওয়া। এসব বিষয় নিঃসন্দেহে খারাপ নিয়তের পরিচায়ক। যারা এরূপ করে, তারা বিভ্রান্ত। কারণ, এরূপ করেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ফরমাবরদার বলে ধারণা করে; অথচ তারা বদকার, গোনাহগার। আল্লাহর এবাদত করে অপরের কাছে বিনিময় চায়।

এগুলো ছাড়া বিত্তশালীদের মধ্যে আরও অসংখ্য বিভ্রান্তি দেখা যায়। নমুনা স্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল। আরও একদল লোক আছে, যারা কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই নয়; বরং জনসাধারণের এমনকি ফকীরদের মধ্যেও বিস্তৃত। তারা ওয়াযের মজলিসে উপস্থিত থাকাকেই মুক্তির জন্যে যথেষ্ট মনে করে। ওয়াযের মজলিসে যাওয়াকে তারা একটি প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, ওয়ায শুনলেই সওয়াব পাওয়া যাবে এবং তদনুযায়ী আমল করা জরুরী নয়। এটা তাদের খামখেয়ালী। কেননা, ওয়ায মাহফিলের মাহাত্ম্য এ কারণেই যে, এর মাধ্যমে সৎকর্মের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ এ কারণেই ভাল যে, এতে মানুষ আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যদি ওয়ায দ্বারা দুর্বল আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা আমলে উদ্বুদ্ধ করে না, তবে এরূপ ওয়াযের কোন উপকারিতা নেই। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধরনের শ্রোতা যখন ওয়ায়েযের মুখে ওয়ায মাহফিলের ফযীলত এবং কান্নাকাটি করার সওয়াব শুনে, তখন নারীদের ন্যায় কান্না শুরু করে দেয়। আবার কোন সময় কোন ভয়ংকর কথা শুনে হাতের উপর হাত মেরে হায় আল্লাহ! মায়াযাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ! ইত্যাদি বলা ছাড়া আর কিছুই করে না। তাদের ধারণা, তারা যা কিছু করে সবই ভাল। অথচ এটা প্রকাশ্য বিভ্রান্তি। তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন রোগী ব্যক্তি ঔষধালয়ে যাতায়াত করে এবং সেখানে ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা শোনে অথবা কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি এমন মজলিসে যায়— যেখানে সুস্বাদু খাদ্যের আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, এতে না রোগীর রোগ দূর হবে, না ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। এমনিভাবে ওয়ায-মাহফিলে এবাদত ও সৎকর্মের বর্ণনা শুনলে এবং আমল না করলে আল্লাহর কাছে কোন উপকার পাওয়া যাবে না।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরে যে সকল বিভ্রান্তি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো থেকে কেউই মুক্ত নয় এবং এ সকল বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব। সুতরাং বিভ্রান্তির এ বর্ণনা থেকে মানুষের মধ্যে এক প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সে আমল করতে উৎসাহ পায় না এবং হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এর জওয়াব এই যে, মানুষ যখন সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন সে নিরাশও হয় এবং সম্ভবপর কাজকেও অসম্ভব মনে করতে থাকে। কিন্তু যখন সে সত্যিকার সাহস ও ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়, তখন অভীষ্ট পর্যন্ত পৌঁছার জন্য স্বীয় সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে গোপন পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। উদাহরণতঃ উড়ন্ত পাখীকে ইচ্ছা করলে দূরত্ব সত্ত্বেও নিচে নামিয়ে আনা যায় অথবা সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থানকারী মৎস্যকে উপরে তুলে আনতে চাইলে আনা যায় অথবা পাহাড় ও পর্বতের ভিতর থেকে সোনা ও রূপা আহরণ করতে চাইলে খনন করে আহরণ করা যায় অথবা বনের স্বাধীন ও মুক্ত হাতীকে ধরে পোষ মানাতে চাইলে মানানো যায়, বিষধর সাপ ও অজগরকে ধরে খেলা দেখাতে চাইলে দেখানো যায়, যদি কেউ গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও দৈর্ঘ-প্রস্থ জানতে চায়, তবে জ্যামিতি শাস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা জানতে পারে। মোটকথা, মানুষ দুঃসাধ্য কর্মসমূহের উপায় বের করার ব্যাপারে ওস্তাদ। সে প্রত্যেক কাজের পদ্ধতি ও তার সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্জন করতে পারে। এসব উপায় ও পদ্ধতি মানুষ কেবল পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আবিষ্কার করে। সুতরাং সে যদি পারলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় এবং তার সামনে একটি মাত্র কাজ থাকে অর্থাৎ অন্তরকে সোজা করা, তবে এ কাজে সে অক্ষম হবে কেন এবং এটা অসম্ভব হবে কেন? না, মানুষের সাহস ও হিম্মতের সামনে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো এ কাজে অক্ষম হননি। যারা তাদের উত্তমরূপে অনুসরণ করেছে, তারাও এ কাজে হার মানেনি। এখনও যে ব্যক্তি সত্যিকার ইচ্ছা ও অটল সাহসের অধিকারী হবে, সে কখনও অপারগ হবে না; বরং পার্থিব উপায়সমূহ আবিষ্কার করার কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে হয়, তার এক-দশমাংশও এতে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি বিষয় মানুষের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়— বুদ্ধি, শিক্ষা ও মারেফত। বুদ্ধি এমন একটি জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মৌলিক নূর বা আলো— যা দ্বারা মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ উদঘাটন করতে সক্ষম। মানুষের মূল সৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তাও থাকে এবং নির্বুদ্ধিতাও থাকে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বিভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই মূল সৃষ্টিতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা থাকা জরুরী। জন্মগতভাবে এরূপ না হলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে মূল বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান থাকলে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা তাকে শানিত করা যায়। এ থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই হাদীসে বলা হয়েছে—

تبارك الذى قسم العقل بين عباده اشتاتا - ان الرجلين ليستوى عملهما وبرهما وصومهما وصلوتهما ولكنهما يتفاوتان فى العقل كالذرة فى جنب احد ما قسم الله بخلقه حظا افضل -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, মহিমান্বিত সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে বুদ্ধিমত্তা বণ্টন করেছেন। নিশ্চয় দু'ব্যক্তির আমল তথা নামায, রোযা ইত্যাদি সমান সমান হয়। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তার একটি কণাতেও উহুদ পাহাড়সম ব্যবধান থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেননি।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করল— যদি কেউ দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, হজ্জ ও উমরা পালন করে এবং দান-খয়রাত, জেহাদ ইত্যাদি পুণ্য কাজ যথারীতি সম্পাদন করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কি মর্তবা হবে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ সে বুদ্ধিমত্তার মাপ অনুযায়ী সওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি শুধালেন ঃ তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত, চরিত্র ও গুণ-গরিমার কথা বলছি। তিনি বললেন ঃ আগে বল তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতার কারণে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য ভুল করে বসে। কিয়ামতের দিন মানুষ বুদ্ধি পরিমাণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় বিষয় মারেফতের অর্থ হচ্ছে চারটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। প্রথমত, নিজের সম্পর্কে জানতে হবে যে, সে এই পৃথিবীতে একজন অচেনা মুসাফির এবং আল্লাহর মারেফত ও দীদারই তার জন্যে উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তৃতীয়ত, দুনিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। চতুর্থত, আখেরাত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করতে হবে। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের কারণে বান্দার অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। আখেরাতের জ্ঞান অর্জিত হলে তৎপ্রতি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিমুখতা হাসিল হবে এবং তার কাছে সর্বাধিক জরুরী কাজ তাই হবে, যা আখেরাতে উপকারী। যখন আখেরাতের কাজ করার ইচ্ছা প্রবল হবে, তখন সকল বিষয়ে তার নিয়ত সঠিক হবে। ফলে, বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহর মারেফত ও নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ফলস্বরূপ যখন খোদায়ী মহব্বত প্রবল হবে, তখন তৃতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন হবে; অর্থাৎ আল্লাহর পথ কিভাবে অতিক্রম করা উচিত, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহর নিকটবর্তী করে, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এছাড়া পথের বিপদাপদ ও বিনাশকারী বাধাসমূহ জানা। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা এসব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করছি। যেমন প্রথম খণ্ডে এবাদতের শর্ত ও বাধাবিপত্তি লিপিবদ্ধ করেছি। এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বাধাবিপত্তিগুলো অতিক্রম করতে হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্পরিক আদান-প্রদানের রহস্য এবং যেসব আদান-প্রদান অপরিহার্য, সেগুলো বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী আমল করতে হবে। আলোচ্য খণ্ডে আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে অর্থাৎ, নিন্দনীয় স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিন্দনীয় স্বভাবগুলো জানতে হবে এবং প্রতিকারের পন্থাও আয়ত্ত করতে হবে। এসব বিষয় জেনে নিলে বর্ণিত সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ অধ্যায়

তওবা

প্রকাশ থাকে যে, গোনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আধ্যাত্ম পথের সূচনা এবং ওলীগণের অমূল্য সম্পদ। সাধকগণ প্রথমে এ পথেই পা বাড়ান। যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত, তাদের জন্যে এ প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে সৎপথে অটল থাকার চাবিকাঠি। নৈকট্যশীলদের জন্যে এটাই আল্লাহর মনোনয়ন লাভের দিকচক্রবাল। পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষত আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর জন্যে এটাই সৌভাগ্য লাভের উৎস।

মানুষ আদম সন্তান বিধায় তার তরফ থেকে গোনাহ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যদি পিতা ক্ষতিপূরণ করে থাকে এবং দোষ সংশোধনে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তবে পুত্রেরও উচিত উভয় বিষয়ে পিতার অনুরূপ হওয়া।

এখন হযরত আদম (আঃ)-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায়, তিনি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর পর অনুশোচনার দাবানলে দগ্ধীভূত হয়েছেন এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত লজ্জাশ্রু প্রবাহিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কেবল নাফরমানী করার ব্যাপারে তাঁকে আপন পথপ্রদর্শক ও অনুসৃত মনে করে এবং তওবার ধারে-কাছেও না যায়, তবে সে নিতান্তই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। বরং মূল কথা হচ্ছে কেবল কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণের বৈশিষ্ট্য আর শুধু অকল্যাণের দাস হয়ে থাকা শয়তানের স্বভাব। বস্তুত অকল্যাণে জড়িয়ে পড়ার পর কল্যাণের দিকে ফিরে আসা মানুষের ধর্ম। কারণ, মানুষের মজ্জায় কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে ফিরে এসে অকল্যাণের ক্ষতিপূরণ করে নেয়, বাস্তবে সে-ই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষ। যদি সে গোনাহ্ করার পর তওবা করে, তবে তার আদম সন্তান হওয়ার প্রমাণ শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে যদি সে গোনাহ্ ও নাফরমানীর উপর অটল থাকে, তবে সে শয়তানের সাথে আপন বংশগত সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। আর শুধু সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ফেরেশতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয়। কেননা, তার খমীর তথা মৌলিক উপাদানের মধ্যে পাপ-পুণ্য এমন শক্তভাবে মিশ্রিত রয়েছে যে, তার আলাদা হওয়া দু'উপায়েই সম্ভবপর— অনুতাপের উত্তাপ দ্বারা অথবা দোযখের আগুন দ্বারা। বলা বাহুল্য, দোযখের আগুন সহ্য করার তুলনায় দুনিয়াতে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হওয়া মানুষের জন্যে সহজতর। সুতরাং গোনাহ্ করার পর মানুষের উচিত দ্রুত তওবার দ্বারস্থ হওয়া। নতুবা মৃত্যুর পর এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শরীয়তে তওবার এই গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এর স্বরূপ, সময়কাল, শর্ত, কারণ, লক্ষণ, ফলাফল, বাধাবিপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা জরুরী। নিম্নে চারটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

তওবার স্বরূপ

জানা উচিত যে, তিনটি ধারাবাহিক বিষয়ের সমন্বয়ে তওবা অস্তিত্ব লাভ করে। এক— জ্ঞান, দুই— অনুশোচনা এবং তিন— বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করা এবং অতীত দিনসমূহের ক্ষতিপূরণ করে নেয়া। এই তিন বিষয়ের সমষ্টিকে পরিভাষায় তওবা বলা হয়। প্রায়শ কেবল অনুশোচনাকেই তওবা বলা হয়। আর জ্ঞানকে তার ভূমিকা এবং গোনাহ বর্জনকে ফলাফল আখ্যা দেয়া হয়। এদিক দিয়েই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন اَلنَّدَامَةُ تَوْبَةٌ — অনুশোচনা হচ্ছে তওবা। কেননা, অনুশোচনার অবশ্যই কোন কারণ থাকবে এবং পরবর্তীতে এর কিছু ফলাফলও প্রকাশ পাবে। সুতরাং অনুশোচনা যা মধ্যবর্তী বিষয় ছিল, তাই আপন কারণ ও ঘটনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। এদিক দিয়েই জনৈক বুযুর্গ তওবার সংজ্ঞায় বলেন ঃ তওবা হচ্ছে সাবেক গোনাহের জন্যে অনুশোচনার অনলে অন্তরের বিগলিত হওয়া। এ সংজ্ঞায় কেবল মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই মর্মবেদনার পরিষ্কার উল্লেখ করে বলেছেন যে, তওবা একটি অগ্নি, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয় এবং একটি বেদনা, যা অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কেউ কেউ গোনাহ বর্জনের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তওবা হচ্ছে অনাচারের পোশাক খুলে ফেলে সরলতা ও হৃদ্যতার শয্যা পাতা। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে বদলে দেয়ার নাম তওবা। এটা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নয়। সম্ভবত এ সংজ্ঞায় তৃতীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তওবার প্রথম বিষয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানা যে, গোনাহের ক্ষতি অসামান্য এবং অনেক গোনাহ মানুষ ও তার প্রেমাস্পদ আল্লাহর মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের ফলস্বরূপ অন্তরে অনুশোচনার উৎপত্তি হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তওবার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্যক জেনে নেয়ার পর এটা কঠিন হবে না যে, অন্যরা তওবার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছে, তার কোনটিতেই উপরোক্ত তিনটি বিষয় এক সাথে পাওয়া যায় না। অথচ তওবার বাস্তব স্বরূপ জানাই উদ্দেশ্য— শব্দ নয়।

তওবার ফযীলত ও আবশ্যকতা ঃ কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা তওবার আবশ্যকতা প্রমাণিত। যার অন্তশ্চক্ষু উন্মুক্ত এবং যার বক্ষ ঈমানের আলোকে আলোকিত, তার কাছেও এর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। এরূপ ব্যক্তি অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোকের সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকা তার জন্য জরুরী নয়। যারা আল্লাহর পথে চলে, তাদের কেউ কেউ অন্ধ হয়ে থাকে। কারও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মুখে পা বাড়াতে পারে না। আবার কেউ কেউ চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। একবার পথে পা রাখলে আপনা-আপনিই অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম প্রকার লোক ধর্মের পথে প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের আয়াত অথবা হাদীস শুনার মুখাপেক্ষী হয়। পরিষ্কার আয়াত অথবা হাদীস পাওয়া কঠিন হলে মাঝে মাঝে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কঠোর পরিশ্রম করা এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা সত্ত্বেও তাদের ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং পদক্ষেপও ছোট হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার লোকের বক্ষ আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের জন্য উন্মুক্ত করে দেন বিধায় তারা সামান্য ইঙ্গিত পেয়েই কঠিন কঠিন পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। তারা কোরআন পাকের এই আয়াতের অনুরূপ—

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

অর্থাৎ, আগুনের ছোঁয়া না পেয়েও তার তৈল যেন জ্বলতে থাকে।

অর্থাৎ, সামান্য ইঙ্গিতই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়। আর পূর্ণরূপে বলে দেয়ার পর তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায়—

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, তাঁর আলোর পথ দেখান।

এরূপ লোকদের জন্যে প্রতিক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের প্রয়োজন নেই। তারা তওবার আবশ্যকতা জানতে চাইলে প্রথমে অন্তশ্চক্ষুর আলোকে তওবা কি তা দেখে, অতঃপর আবশ্যকতার অর্থ বুঝে, এরপর উভয়টিকে মিলিয়ে জেনে নেয় যে, তওবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত। উদাহরণতঃ তারা প্রথমে জানে যে, ওয়াজিব ও জরুরী তাই, যা চিরন্তন সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছা এবং চিরন্তন ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জরুরী। এরপর তারা বুঝে যে, কিয়ামতে আল্লাহর দীদার ব্যতীত কোন সৌভাগ্য নেই। যে এ থেকে বঞ্চিত হয়, সে হতভাগ্য। এতটুকু জানার পর তাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্যে সেই পথ থেকে ফিরে আসতে হবে, যে পথ আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই পথ থেকে ফিরে আসা তিনটি বিষয় দ্বারা অর্জিত হবে— জ্ঞান, অনুশোচনা ও সংকল্প। কেননা, যে পর্যন্ত এ বিষয়ের জ্ঞান না হবে যে, গোনাহ আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণ, সে পর্যন্ত অনুশোচনা হবে না। আর অনুশোচনা না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসার প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি ঈমানের আলোকে আলোকিত, তার তওবা এভাবেই হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত নয়, তার জন্য তাকলীদ ও অনুসরণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সে অনুসরণের মাধ্যমে ধ্বংসের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এখন এই তওবা সম্পর্কে আল্লাহ পাক, রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর সামনে তওবা কর—যাতে সফলকাম হও।

এখানে সকল ঈমানদারকে তওবা করার ব্যাপক আদেশ করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো শুন, তোমরা আল্লাহর সামনে পরিষ্কার মনে তওবা কর।

এ আয়াতে "নাসূহ" শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে খাঁটি ও অবিমিশ্র তওবা কর।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ ভালবাসেন তওবাকারীকে এবং ভালবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে।

এ আয়াতটি তওবার ফযীলত জ্ঞাপন করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ অর্থাৎ, তওবাকারী আল্লাহর প্রিয়জন। اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّاذَنْبَ لَهُ অর্থাৎ, যে গোনাহ থেকে তওবা করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই।

এক হাদীসে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে—এক ব্যক্তি সফর করতে করতে এক প্রতিকূল জায়গায় বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করল। সঙ্গে তার পাথেয় বহনকারী উট। লোকটি মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে দেখল তার উটটি নেই। সে ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে উটটিকে খুঁজতে লাগল। অবশেষে যখন রৌদ্রতাপ, পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল, তখন মনে মনে বলল ঃ আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই চলে যাব এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় শুয়ে থাকব। সেমতে সেখানে পৌঁছে মাথার উপর হাত রেখে শুয়ে পড়ল এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলতেই দেখল পাথেয় বহনকারী উটটি শিয়রের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। উটটি ফিরে পাওয়ার কারণে এই ব্যক্তির যে আনন্দ হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার তওবার কারণে আনন্দিত হন।

হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করলে পর ফেরেশতারা তাকে মোবারকবাদ দিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ হে আদম, আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা আপনার তওবা কবুল করায় আপনার কলিজা ঠাণ্ডা হয়েছে নিশ্চয়? হযরত আদম (আঃ) জওয়াব দিলেন ঃ জিবরাঈল, যদি তওবা কবুল করার পরও আমাকে সওয়াল করা হয়, তবে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? তখনই তাঁর প্রতি ওহী আগমন করল— হে আদম, তুমি তোমার সন্তানদের জন্যে দুঃখকষ্টও রেখে গেলে এবং তওবাও। অতএব, তাদের মধ্যে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব, যেমন তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আর যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি কৃপণতা করব না। কেননা, আমার নাম "করীব" (নিকটবর্তী) এবং "মুজীব" (সাড়া দানকারী)। হে আদম, আমি তওবাকারীদেরকে কবর থেকে যখন উত্থিত করব, তখন তারা আসতে থাকবে এবং সুসংবাদ শুনতে থাকবে। তারা যে দোয়া করবে, তা কবুল হবে।

মোটকথা, তওবার সংজ্ঞা হচ্ছে বর্তমানে গোনাহ পরিত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে তা না করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, সাথে সাথে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণ করে নেয়া। এই তওবা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব। কেননা, গোনাহকে ক্ষতিকর মনে করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি গোনাহ পরিত্যাগ করে না, তার মধ্যে ঈমানের এই অংশটি অনুপস্থিত। নিম্নোক্ত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে—

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ, যিনাকার ব্যক্তি যখন যিনা করতে থাকে, তখন সে ঈমানদার থাকে না।

অর্থাৎ যিনা যে আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী একটি গোনাহ, এ বিষয়ের ঈমান যিনাকারের মধ্যে থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে মূল ঈমানই থাকে না; অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা। অতএব বুঝা গেল, আল্লাহকে জানা, তাঁর একত্ব স্বীকার করা, তাঁর গুণাবলী, ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যিনার পরিপন্থী নয়। তাই যিনার কারণে এই ঈমান বিনষ্ট হবে না। উদাহরণতঃ কোন চিকিৎসক রোগীকে বলল ঃ এটা বিষ। এটা খেয়ো না। যদি রোগী সেই বস্তু খেয়ে ফেলে, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলা হবে যে, সে চিকিৎসকের এ কথাটির সত্যতা স্বীকার করে না এবং এর অর্থ এই হবে না যে, সে চিকিৎসকের অস্তিত্ব এবং তার চিকিৎসক হওয়া বিশ্বাস করে না। এ থেকে জানা গেল যে, গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হয় না এবং ঈমান একই বস্তু বিশ্বাস করার নাম হয় না; বরং এর সত্তরের উপর শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দেয়া এবং নিম্নতম শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেয়া।

ঈমানের সঠিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে মানুষ। আত্মার অনুপস্থিতিতে যেমন মানুষ মানুষ হয় না, তেমনি একত্ববাদ স্বীকার না করলে ঈমান ঈমান হয় না। যে ব্যক্তি কেবল তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেয় এবং আমলে ত্রুটি করে, সে এমন মানুষের মত, যার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। এরূপ মানুষের মৃত্যু যেমন অতি নিকটে, তেমনি যে ব্যক্তি কেবল কালেমা তাইয়েবা ও রেসালতের সাক্ষ্য দেয়, সেও এই অবস্থার কাছাকাছি। সামান্য ঝড়ো হাওয়ায় তার ঈমানের বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুদূতের আগমনের সময় যে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার কারণে ঈমান উধাও হয়ে যায়। দুর্বল ঈমান এই পরিস্থিতি বরদাশত করতে পারে না। এরূপ মুমিনের "খাতেমা" তথা জীবনাবসান শুভ না হওয়ার আশংকা থাকে। খাতেমার সময় সেই ঈমানই বাকী থাকে, যার ভিত্তি সার্বক্ষণিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন কোন গোনাহগার ব্যক্তি আনুগত্যশীল ব্যক্তিকে বলে, আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে পার্থক্য কি? তুমিও ঈমানদার, আমিও ঈমানদার। যেমন লাউগাছ দেবদারু গাছকে বলেছিল, আমিও বৃক্ষ, তুমিও বৃক্ষ। কাজেই আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু জওয়াবে দেবদারু গাছ বলেছিল, নামের অভিন্নতার এই বিভ্রান্তি তোমার তখন দূর হবে, যখন কালবৈশাখীর ঝড় আসবে। তখন তোমার শিকড় উপড়ে যাবে এবং পাতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আমি পূর্ববৎ সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকব।

সুতরাং গোনাহগার ব্যক্তি যদি দোযখ বাসকে ভয় না করে এবং মৃত্যুর পরওয়া না করে, তবে তাকে বলা হবে দেখ, সুস্থ-সবল ব্যক্তি অসুখ-বিসুখের আশংকা করে এবং যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন মৃত্যুকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভয় করে। এমনিভাবে গোনাহগারেরও উচিত অশুভ খাতেমাকে ভয় করা। যদি খোদা না করুন, খাতেমা খারাপ হয়, তবে দোযখের অগ্নিতে থাকা জরুরী। কেননা, ঈমানের জন্যে গোনাহ তেমনি, যেমন দেহের জন্যে ক্ষতিকর খাদ্য। ক্ষতিকর খাদ্য পাকস্থলীতে একত্রিত হয়ে আস্তে আস্তে পিত্তাদির মেযাজ বিগড়াতে থাকে, যা মানুষ টের পায় না। এরপর হঠাৎ সে রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে। গোনাহ ঈমানের মধ্যে এমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং একদিন ঈমানকেই ডুবিয়ে দেয়। সুতরাং ধ্বংসশীল দুনিয়াতে মৃত্যুর ভয়ে যখন বিষাক্ত ও ক্ষতিকর খাদ্য না খাওয়া তাৎক্ষণিক ওয়াজিব, তখন চিরন্তন ধ্বংসের ভয়ে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম না করা আরও উত্তমরূপে তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হবে। বিষপানকারী স্বীয় ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে যেমন তৎক্ষণাৎ উদরকে বিষমুক্ত করার জন্যে বমি করতে অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়, তেমনিভাবে যে গোনাহ করে, তার জন্যে গোনাহ থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসা ওয়াজিব। এরপর যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন এই ক্ষতিপূরণ করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং গোনাহগারের উচিত দ্রুত তওবার প্রতি মনোনিবেশ করা। নতুবা গোনাহের বিষক্রিয়ার ফলে ঈমানের আত্মা প্রভাবিত হয়ে যাবে। এরপর ওয়ায-নসীহত কোন উপকারে আসবে না এবং গোনাহগার ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত হয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতীক হয়ে যাবে—

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ০

অর্থাৎ, আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। ফলে, তারা দেখতে পায় না। আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ আয়াতগুলো কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— এরূপ মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। কেননা, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমানের শাখা সত্তরেরও বেশী এবং যিনাকার মুমিন অবস্থায় যিনা করে না। এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি শাখার অনুরূপ ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে, সে খাতেমার সময় মূল ঈমান থেকেও বঞ্চিত হবে, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা আত্মার শাখা, তা না থাকলে মানুষের মূল আত্মাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা, শাখা ব্যতীত মূল কায়েম থাকতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তওবা অপরিহার্য ঃ সকলের জন্যে তওবার অপরিহার্যতা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে সফলকাম হও।

এ আয়াতে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। বুদ্ধি-বিবেকের আলোকেও এই অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কেননা, তওবার অর্থ হচ্ছে, যে পথ আল্লাহ থেকে দূরে এবং শয়তানের কাছে, সে পথ থেকে ফিরে আসা উচিত। এই ফিরে আসার কাজটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভবপর। কাম, ক্রোধ ও অন্যান্য নিন্দনীয় স্বভাব হচ্ছে মানুষকে বিপথগামী করার জন্যে শয়তানের হাতিয়ার। এগুলো যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন মানুষের বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে। সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে এবং তার ভিত্তি যৌবনে পা রাখার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যায়। এ ভিত্তির সূচনা হয় সাত বছর বয়স থেকে। কিন্তু কাম ও ক্রোধ পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বাহিনী এবং বুদ্ধি ফেরেশতাদের বাহিনী। যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যই সংঘটিত হয়। কেননা, এরা পরস্পর বিরোধী শক্তি। একের উপস্থিতিতে অন্যের কায়েম থাকা সম্ভব নয়। যেমন রাত ও দিন এবং অন্ধকার ও আলো একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এ যুদ্ধে যে পক্ষ বিজয়ী হয়, সে অপর পক্ষের মূলোচ্ছেদ করে। কাম ও ক্রোধ শৈশবেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় বিধায় শয়তানের ব্যূহ বুদ্ধির পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাই স্বভাবতই কামনার দাবীর প্রতি মানুষের টান ও মোহ প্রবল হয়ে উঠে এবং এ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরপর যখন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তখন যদি তা শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ না হয়, তবে যুদ্ধের ময়দান শয়তানের হাতেই থাকে এবং সে কোরআনে উল্লিখিত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে নেয় ঃ

لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ, আমি আদম সন্তানদেরকে অল্পসংখ্যক বাদে অবশ্যই বিপথগামী করব।

পক্ষান্তরে যদি বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হয়, তবে প্রথমে সে শয়তান বাহিনীর মূলোচ্ছেদ করতে শুরু করে। এ জন্যে কামনাকে চূর্ণ করে, অভ্যাস ত্যাগ করে এবং মনকে বলপূর্বক এবাদতে ফিরিয়ে আনে। বলা বাহুল্য, তওবার উদ্দেশ্য তাই। অর্থাৎ, ফিরে আসার কাজটি এখানেও পাওয়া যায়। যেহেতু কাম বুদ্ধির পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করে, তাই যে কাজ বুদ্ধির পূর্বে করা হয়, তা থেকে ফিরে আসা অর্থাৎ তওবা করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যক— সে নবী-রসূল কিংবা সাধারণ মানুষ যেই হোক। কাজেই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তওবার প্রয়োজন বিশেষভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর জন্যেই ছিল; বরং এটা একটা আদি বিধান; যা মানুষ মাত্রের জন্যেই জরুরী। এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি বালেগ হয়, সে যদি কুফর ও মূর্খতার উপর থাকে, তবে এসব বিষয় থেকে তওবা করা তার উপর ওয়াজিব। যদি সে পিতামাতার অনুগামী হয়ে মুসলমান হয়, তবে ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবশ্যই গাফেল ও অজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে এই গাফলতি ও অজ্ঞতা থেকে তওবা করা ওয়াজিব। তাকে ইসলামের সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। কেননা, তার পিতামাতার ইসলাম তার জন্যে উপকারী হবে না যে পর্যন্ত নিজে মুসলমান না হবে। ইসলামকে বুঝার পর নিজের অভ্যাস ও কামনা চরিতার্থ করার জন্যে অহেতুক স্বেচ্ছাচারপ্রীতি থেকে ফিরে আসা অপরিহার্য অর্থাৎ, প্রত্যেক করণীয় ও বর্জনীয় কাজে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা মেনে চলতে হবে— সীমার বাইরে এক পাও রাখা যাবে না। এ প্রকার তওবা সর্বাধিক কঠিন। অধিকাংশ লোক এতে অক্ষম হয়ে বরবাদ হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, তওবা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ফরযে আইন। এরূপ কোন ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না, যার তওবার প্রয়োজন নেই। হযরত আদম (আঃ) তওবা থেকে বেপরওয়া হতে পারেননি। তেমনি তাঁর সন্তানরাও এ থেকে বেপরওয়া নয়।

এখন জানা দরকার যে, তওবা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। কেননা, কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। পয়গম্বরগণও এ থেকে বাঁচতে পারেননি। কোরআন ও হাদীসে পয়গম্বরগণের ত্রুটি, তাঁদের তওবা ও কান্নাকাটি উল্লেখ রয়েছে। কদাচিৎ মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলেও মনে মনে গোনাহের কল্পনা থেকে বাঁচতে পারে না। যদি অন্তরেও গোনাহের কল্পনা না থাকে, তবে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় না। সে অন্তরে বিক্ষিপ্ত কল্পনা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে আল্লাহর এবাদতে গাফলতি দেখা দেয়। যদি কেউ কুমন্ত্রণা থেকেও মুক্ত থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকিফহাল হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি থেকেই যায়। মোটকথা, ত্রুটিমুক্ততা মানুষের জন্যে কল্পনা করা যায় না। তবে ত্রুটির পরিমাণে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হতে পারে। মূল ত্রুটি প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

إِنَّهُ لَيُرَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً -

অর্থাৎ, আমার অন্তরে মরিচা ধরে যায়। এমনকি, আমি দিবা-রাত্রিতে সত্তর বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বলা বাহুল্য, এই ক্ষমা প্রার্থনার কারণেই আল্লাহ তাঁকে মাহাত্ম্য দান করেছেন। আল্লাহ বলেন—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ -

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যদের কি দশা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই ক্রুটির কারণ পরিত্যাগ করা এবং তার বিপরীত কারণ অবলম্বন করাই তওবার সারকথা।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, অন্তরে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা আসা নিঃসন্দেহে ক্রুটি এবং অন্তর এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া পূর্ণতা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্রুটির কারণ থেকে পূর্ণতার দিকে উন্নতি করাকে তওবা বলা হবে। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তওবা ওয়াজিব। অথচ ক্রুটি থেকে পূর্ণতার উন্নতি করা ফযীলত তথা বাড়তি গুণের কাজ, ওয়াজিব নয়। কারণ, পূর্ণতা অর্জন করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় সর্বাবস্থায় তওবা ওয়াজিব হওয়ার মানে কি? এর জওয়াব এই যে, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, মানুষ জন্মলগ্ন থেকে কখনও কামনার অনুসরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না এবং কামনা থেকে তওবা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কামনার অনুসরণ কেবল ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করবে; বরং পূর্ণ তওবা হচ্ছে অতীতকালের ক্ষতিও পূরণ করা। মানুষ যখনই কামনার অনুসরণ করে, তখনই তার অন্তরে এক প্রকার অন্ধকার ছায়াপাত করে; যেমন আয়নায় মুখের বাষ্প লাগলে আয়না মলিন হয়ে যায়। যদি এই কামনার অনুসরণ একের পর এক অব্যাহত থাকে, তবে অন্তরের অন্ধকার মরিচায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন, মুখের বাষ্প অব্যাহতভাবে আয়নায় পড়তে থাকলে কালক্রমে আয়নায় মরিচা ধরে যায়। কামনার কারণে অন্তরে মরিচা ধরার কথা কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

মরিচা যদি অনেক বেশী হয়, তবে অন্তরে মোহর লেগে যায়। যেমন আয়নার মরিচা অনেকদিন পরিষ্কার না করলে তা আর পরিষ্কার করার যোগ্য থাকে না। তখন মনে হয় যেন আয়নাটি মরিচা দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। সুতরাং আয়না পরিষ্কার করার জন্যে যেমন ভবিষ্যতে বাষ্প ও ময়লা পড়তে না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং চেহারা দেখার জন্যে পূর্বের বাষ্প ও ময়লা দূর করা জরুরী; তেমনিভাবে অন্তর পরিষ্কার করার জন্যেও ভবিষ্যতে কামনার অনুসরণ ত্যাগ করা যথেষ্ট নয়; বরং অতীত গোনাহের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণে অন্তরে যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে, তাও দূর করা জরুরী। গোনাহের কারণে যেমন অন্তরে অন্ধকার নেমে আসে, তেমনি এবাদত ও কামনা বর্জনের কারণে নূর সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এক হাদীসে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

اتبع السيئة بالحسنة تمحها

অর্থাৎ, অসৎ কর্মের পেছনে সৎকর্ম কর। সৎকর্ম অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়।

এ থেকে জানা গেল যে, সর্বাবস্থায় অন্তর থেকে গোনাহের চিহ্ন মিটিয়ে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে। এখন সর্বাবস্থায় তওবা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি, তা জানা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, ওয়াজিবের অর্থ দ্বিবিধ। এক ওয়াজিব শরীয়তের বিধিবিধানে সুবিদিত। এতে সকলেই শরীক। যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। পূর্ণতার স্তর এই ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয় ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার জন্যে জরুরী। আমরা এতক্ষণ যে সব বিষয় থেকে তওবা করার কথা লিখেছি, সেগুলো সমস্তই এই নৈকট্যের স্তরে পৌঁছার জন্যে জরুরী। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা দরকার। আমরা বলি, নফল নামাযের জন্যে উযু ওয়াজিব। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি নফল নামায পড়তে চায়, তার জন্যে উযু জরুরী। কিন্তু যে ব্যক্তি নফলই পড়তে চায় না, তার জন্যে নফলের কারণে উযু ওয়াজিব নয়। অথবা আমরা বলি, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা মানুষের অস্তিত্বের জন্যে শর্ত ও জরুরী। অর্থাৎ, যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চায়, তবে তার জন্যে এসব অঙ্গ থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল মাংসপিণ্ডের জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে এরূপ জীবনের এসব অঙ্গ থাকা জরুরী নয়। সুতরাং শরীয়তের যেসব মূল ওয়াজিব সকলের উপর ওয়াজিব, তা দ্বারা কেবল নাজাত তথা মুক্তি পাওয়া যায়। নিরেট মুক্তিকে কেবল মাংসপিন্ডের জীবন মনে করা উচিত। এটি ছাড়া অন্য আরও যেসকল সৌভাগ্য রয়েছে, সেগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ জ্ঞান করা দরকার। মুক্তির অলংকার ও সাজসজ্জা সেগুলোই। এগুলোর জন্যেই পয়গম্বর, ওলী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও আলেমগণ আজীবন সাধনা করেছেন এবং পার্থিব সুখ-শান্তি ও আনন্দ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছেন।

সেমতে হযরত ঈসা (আঃ) একবার মাথার নিচে পাথর রেখে শয়ন করেছিলেন। শয়তান হাযির হয়ে আরয করল ঃ আপনি তো দুনিয়া বর্জন করেছিলেন। এখন এ কি করলেন? তিনি বললেন ঃ তুই দুনিয়া বর্জনের খেলাফ কি দেখলি? শয়তান বলল ঃ পাথরকে বালিশ করা দুনিয়ার সুখ। মাটিতে মাথা রাখেন না কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ মাথার নিচ থেকে পাথরটি বের করে ফেলে দিলেন এবং মাটিতে মাথা রেখে শয়ন করলেন। হযরত ঈসা (আঃ) -এর এ কাজটি ছিল দুনিয়ার এ সুখ থেকে তওবা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কি জানতেন না যে, মাটিতে মাথা রাখা শরীয়তের সাধারণ বিধানে ওয়াজিব নয়? এমনিভাবে রসূলে করীম (সাঃ) নকশাযুক্ত চাদরকে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টিকরী পেয়ে খুলে ফেলেছিলেন এবং জুতার নতুন ফিতাকে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে দেখে তার স্থলে পুরাতন ফিতা লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তার কি জানা ছিল না যে, এসব বিষয় শরীয়তে ওয়াজিব নয়? জানা থাকলে এগুলো বর্জন করলেন কেন? এ থেকে বুঝা গেল যে, তিনি এসব বিষয়কে অন্তরে প্রতিশ্রুত "মকামে মাহমুদ" (প্রশংসিত মর্তবা) পর্যন্ত পৌঁছার পথে কার্যকর অন্তরায় অনুভব করার কারণে বর্জন করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দুধ পান করার পর যখন জানতে পারলেন, তা অবৈধ উপায়ে অর্জিত ছিল, তখন কণ্ঠনালীতে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে খুব বমি করলেন। ফলে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি কি ফেকাহ শাস্ত্রের এই বিধান জানতেন না যে, ভুলক্রমে পান করার মধ্যে গোনাহ নেই এবং পান করা বস্তু পেট থেকে বের করা ওয়াজিব নয়? তা হলে তিনি এই পান করা থেকে রুজু করলেন কেন এবং পেটকে যথাসম্ভব খালি করতে চাইলেন কেন? এর কারণ এটাই ছিল যে, তিনি জানতেন জনসাধারণের বিধান এবং আখেরাত পথের বিপদ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব, এ সকল মহাপুরুষের অবস্থা চিন্তা করা দরকার। তাঁরা আল্লাহ, তাঁর পথ, তাঁর শাস্তি এবং গোপন বিভ্রান্তি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন।

মোটকথা, এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানে, আধ্যাত্ম পথে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চলার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রতি মুহূর্তে নির্ভেজাল তওবা করা ওয়াজিব। নূহ (আঃ)-এর মত দীর্ঘজীবী হলেও তৎক্ষণাৎ ও অবিলম্বে তওবা করবে। আবূ সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশিষ্ট জীবন কেবল এজন্যে দুঃখ করে যে, তার অতীত জীবন এবাদত ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে গেছে, তবে আমৃত্যু এ দুঃখ তার জন্যে সমীচীন হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অবশিষ্ট জীবনও অতীত জীবনের ন্যায় কুকর্মে অতিবাহিত করে, তবে তার কি অবস্থা হবে? বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি কোন সুবর্ণ সুযোগ পায়, এরপর তা অহেতুক বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এজন্যে সে অবশ্যই দুঃখ করে। আর যদি সেই সুযোগ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ং ব্যক্তিরও ধ্বংস অনিবার্য হয়, তবে দুঃখ আরও বেশী হবে।

মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ, যার কোন বিকল্প নেই। কারণ, এতে মানুষ নিজের চিরন্তন সৌভাগ্য গড়ে নিতে পারে এবং সার্বক্ষণিক দুর্ভাগ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এরপর মানুষ যদি এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করে দেয়, তবে সেটা খুবই ক্ষতির বিষয় হবে। আর যদি এই সুযোগকে আল্লাহর নাফরমানীতে বিনষ্ট করে, তবে সরাসরি নিজের ধ্বংসই ডেকে আনে। এরপরও যদি মানুষ এই বিপদের জন্যে দুঃখ না করে, তবে এটা হবে মূর্খতা, যা সকল বিপদের মধ্যে বৃহত্তম বিপদ। কিন্তু মূর্খতার বিপদ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানতে পারে না। কেননা, গাফলতির স্বপ্ন তার মধ্যে ও তার জ্ঞানের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয়, সকল মানুষই এই গাফলতির স্বপ্নে বিভোর। যখন মৃত্যু আসবে, তখন স্বপ্নভঙ্গ হবে। তখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপদ টের পাবে। কিন্তু তখন ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। বেদনা ও নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।

জনৈক সাধক বলেন ঃ মালাকুল মওত যখন কোন মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলে দেয়, তোমার জীবন আর মাত্র এক মুহূর্ত বাকী, এতে এক নিমেষেরও বিলম্ব হবে না, তখন সে এত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয় যে, এক মুহূর্ত সময় পাওয়ার জন্যে যদি সে সমগ্র পৃথিবীর মালিক হত, তবে তাও অকাতরে দিয়ে দিত, যাতে সে সেই বাড়তি মুহূর্তের মধ্যে নিজের দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে নেয়। কিন্তু তখন অবকাশ কোথায়। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا -

অর্থাৎ, তোমাদের কারও কাছে মৃত্যু আসার পূর্বে সে বলে, পরওয়ারদেগার! আমাকে সামান্য সময় অবকাশ দিলে না কেন, যাতে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মীদের একজন হতাম। আল্লাহ কখনও অবকাশ দিবেন না কাউকে যখন তার মৃত্যু এসে পড়বে।

সামান্য সময়ের অর্থ হল মানুষের সামনে মালাকুল মওতের আবির্ভাব। তখন মানুষ বলে ঃ হে মালাকুল মওত, আমাকে একদিনের সময় দাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। মালাকুল মওত জওয়াব দেয়, তুই এতগুলো দিন অকারণে বরবাদ করেছিস, এখন একদিন কোথায় পাবে? এরপর মানুষ বলে, এক মুহূর্তেরই অবকাশ দাও। মালাকুল মওত বলে ঃ তুই অনেক মুহূর্ত বিনষ্ট করেছিস। এখন এক মুহূর্তও দেয়া হবে না। এরপর মানুষের সামনে তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং প্রাণবায়ু কণ্ঠনালীতে এসে পড়ে। বুকে গড়গড় শব্দ হয়। এসব আতঙ্কের কারণে আসল ঈমান টলমল করতে থাকে। এরপর তাকদীর ভাল হলে আত্মা তাওহীদের উপর নির্গত হয়। একেই বলে "শুভ খাতেমা"। পক্ষান্তরে তাকদীর মন্দ হলে সন্দেহ ও অস্থিরতার উপর আত্মা নির্গত হয়। এটা হচ্ছে "অশুভ খাতেমা"। এই অশুভ খাতেমা সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন —

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তওবা নেই, যারা আমৃত্যু মন্দ কাজ করে যায়। এমনকি, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তাদের তওবা কবুল হবে, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর অনতিবিলম্বে তওবা করে।

এর অর্থ এই যে, তওবার সময় ও গোনাহের সময় লাগালাগি হতে হবে। অর্থাৎ, গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তজ্জন্যে অনুতাপ করবে এবং সাথে সাথে সৎকর্ম করবে। বেশী দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ধরে যেতে পারে, যা মিটানো সম্ভব না-ও হতে পারে। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا

অর্থাৎ, মন্দকাজের পশ্চাতেই সৎকাজ কর। সৎকাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ প্রিয় বৎস, তওবায় বিলম্ব করো না। কেননা, মৃত্যু হঠাৎ এসে যায়। যে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে তওবা করে না, সে দুটি বিপদে জড়িত থাকে। এক, গোনাহের কাল দাগ যদি একের পর এক অন্তরে পড়তে থাকে, তবে মরিচা ও মোহর লেগে যাবে এবং তা মিটানোর যোগ্য থাকবে না। দুই, যদি এ সময়ের মধ্যে রোগ অথবা মৃত্যুর কবলে পড়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণের অবকাশ থাকবে না। এছাড়া অন্তর মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার আমানত। এমনিভাবে জীবনও তাঁরই আমানত। অতএব, যে ব্যক্তি আমানতে খেয়ানত করবে, তার পরিণাম ভয়াবহ।

জনৈক দরবেশ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুটি রহস্যের কথা এলহামের মাধ্যমে শুনিয়ে দেন। এক, যখন মানুষ জননীর গর্ভ থেকে নির্গত হয়, তখন তাকে বলা হয় ঃ হে বান্দা! আমি তোমাকে পাকসাফ অবস্থায় দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। তোমার আয়ুষ্কাল তোমার কাছে আমানত। এখন আমি দেখব তুমি কিভাবে এই আমানতের হেফাযত কর এবং আমার সাথে কি অবস্থায় সাক্ষাৎ কর। দুই, যখন মানুষের আত্মা নির্গত হয়, তখন বলা হয়, হে বান্দা! আমি যে আমানত তোমার কাছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রেখেছিলাম, তুমি এ সময় পর্যন্ত তার হেফাযত করেছ কি? তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করে থাকলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকলে আমি শাস্তি দেব। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে— أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ। অর্থাৎ, তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।

শর্তসহ তওবা কবুল হয় ঃ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিশুদ্ধ তওবা কবুল হয়। যারা অন্তশ্চক্ষুর আলোকে দেখে, তারা জানে যে, সুস্থ ও নীরোগ অন্তর আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে থাকে এবং প্রকৃতিগতভাবে অন্তর নীরোগ সৃজিত হয়। এর সুস্থতা কেবল গোনাহের অন্ধকার ও মালিন্য আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়। অনুশোচনার অনল এ মালিন্যকে ভস্মীভূত করে দেয় এবং সৎকর্মের নূর অন্তরের চেহারা থেকে গোনাহের তিমির দূর করে দেয়। গরম পানি ও সাবান ব্যবহার করলে যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি তওবা ও অনুতাপের ফলে অন্তরের নাপাকী দূর হয়ে অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব মানুষের উচিত, কেবল অন্তরকে পাক ও সাফ রাখা, যাতে আল্লাহর কাছে মকবুল হয়। কোরআনের ভাষায় এই কবুল হওয়ার নাম সাফল্য। বলা হয়েছে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

অর্থাৎ, যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রেখেছে, সে সফলতা অর্জন করেছে।

কারও কারও ধারণা, তওবা বিশুদ্ধ হলেও তা কবুল হয় না। তাদের এই ধারণা এরূপ ধারণার অনুরূপ যে, সূর্য উদিত হলেও অন্ধকার দূর হয় না অথবা সাবান দিয়ে ধৌত করলেও কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয় না। হাঁ, যদি ময়লার স্তর কাপড়ের কলিজার মধ্যে প্রবেশ করে যায়, তবে সাবান দিয়ে তা দূর করা যাবে না। এমনিভাবে উপর্যুপরি গোনাহের কারণে যে অন্তরে মরিচা ও মোহর লেগে যায়, তার তওবা নিষ্ফল। কেউ কেউ মাঝে মাঝে কেবল "তওবা তওবা" বলে থাকে। এরূপ তওবার কোন মূল্য নেই। এটা এমন, যেমন ধোপা মুখে বলে, আমি কাপড় ধোলাই করেছি। তার এই মৌখিক কথায়ই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে কি, যে পর্যন্ত কাপড়ের ময়লা ছাড়ানোর কৌশল ব্যবহার না করবে? প্রকৃত তওবা থেকে যারা গা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাঁচাতে চায়, এটা তাদেরই অবস্থা। দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ব্যক্তিদের উপর এ অবস্থাই প্রবল।

এখন তওবা কবুল হওয়ার পক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ্, যিনি আপন বান্দাদের তরফ থেকে তওবা কবুল করেন এবং গোনাহসমূহ মার্জনা করেন।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ গোনাহ্ মার্জনাকারী এবং তওবা কবুলকারী।

তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবার কারণে অধিক সন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য, সন্তুষ্ট হওয়ার মর্তবা কবুল করার উর্ধ্বে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সকাল পর্যন্ত এবং দিনের বেলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত গোনাহ্ করে, তার তওবা কবুল করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বাহু প্রসারিত করেন। এটা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এখানে বাহু প্রসারিত করার অর্থ তওবা তলব বা কামনা করা বুঝা যায়। যে তলব করে, সে কবুলকারীর উর্ধ্বে। কেননা, কোন কোন কবুলকারী তলব করে না; কিন্তু তলবকারীর জন্য কবুলকারী হওয়া অপরিহার্য। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

لَوْ عَمِلْتُمُ الْخَطَايَا حَتَّى تَبْلُغَ السَّمَاءَ ثُمَّ نَدِمْتُمْ لَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত গোনাহ্ কর, এরপর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করবেন।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে—মানুষ কোন গোনাহ্ করে, এরপর এর কারণে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন— এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ গোনাহ্ থেকে তওবা করে তাকেই দৃষ্টিতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাখে এবং সেই গোনাহ থেকে বিরত থাকে। অবশেষে এর দৌলতে জান্নাতে দাখিল হয়। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّذَنْبَ لَهٗ

অর্থাৎ, যে গোনাহ থেকে তওবা করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই।

বর্ণিত আছে, জনৈক হাবশী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি গোনাহ করতাম। বলুন, আমার তওবা কবুল হবে কি না? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তওবা কবুল হবে। লোকটি চলে গেল, এরপর আবার ফিরে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যখন গোনাহ করতাম, তখন আল্লাহ আমাকে দেখতেন কি না? তিনি বললেন ঃ হাঁ, দেখতেন। একথা শুনেই হাবশী এমন সজোরে চীৎকার করে উঠল যে, সাথে সাথে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে নিজের দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন শয়তান অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। শয়তান বলল ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। এরশাদ হল ঃ আমিও আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম খেয়ে বলছি- যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে, সে পর্যন্ত তাদের তওবা প্রত্যাখ্যান করব না। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الْوَسَخَ

অর্থাৎ, পুণ্যকাজ মন্দকাজকে বিদূরিত করে। যেমন পানি ময়লাকে বিদূরিত করে।

তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে এমনি ধরনের আরও অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তিও কম নয়। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) বলেন ঃ

فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কেউ গোনাহ করার পর তওবা করে এবং এরপরও গোনাহ করে এবং এরপর তওবা করে, তবে আমি তার তওবা কবুল করব। তালেক ইবনে হাবীব বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু সে সকালে তওবা করে এবং সন্ধ্যায় তওবা করে, তাই ক্ষমার আশা করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, সে যদি সেই অপরাধ স্মরণ করে মনে মনে ভীত হয়, তবে সে অপরাধ তার আমলনামা থেকে মিটে যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মানুষ মাঝে মাঝে গোনাহ করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনুতাপ করতে থাকে। অবশেষে সে এর দৌলতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়। তখন শয়তান বলে, চমৎকার হত যদি আমি তাকে গোনাহে লিপ্ত না করতাম। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আমি একটি গোনাহ করেছি, আমার তওবা কবুল হবে কি না? তিনি প্রথমে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তাকিয়ে লোকটিকে অশ্রুসজল দেখতে পেয়ে বললেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা আছে, সবগুলো খুলে এবং বন্ধ হয়; কিন্তু তওবার দরজা কখনও বন্ধ হয় না। সেখানে একজন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। তুমি নিরাশ না হয়ে আমল করে যাও।

আবদুর রহমান ইবনে আবুল কাসেমের দরবারে একবার কাফেরের তওবা এবং এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল ঃ

إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ, যদি তারা বিরত হয়, তবে অতীতে যা হয়েছে, ক্ষমা করা হবে।

আবদুর রহমান বললেন ঃ আমি আশা করি আল্লাহর কাছে মুসলমানের অবস্থা কাফেরের তুলনায় ভাল হবে। আমি এই রেওয়ায়েতপ্রাপ্ত হয়েছি যে, মুসলমানের তওবা করা যেন ইসলাম গ্রহণের পর আবার ইসলাম গ্রহণ করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করি, তা নবী (সাঃ) থেকে শুনে অথবা ঐশীগ্রন্থ থেকে দেখে বর্ণনা করি। বান্দা গোনাহ করার পর যদি এক মুহূর্ত অনুতাপ করে, তবে পলক মারারও পূর্বে সেই গোনাহ দূর হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায়। হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ তওবাকারীদের কাছে বস। কারণ, তাদের অন্তর অধিক নম্র থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি আমি তওবা থেকে বঞ্চিত থাকি, তবে এটা আমার জন্যে মাগফেরাত থেকে বঞ্চিত থাকার তুলনায় অধিক ভয়ের কারণ। এরূপ বলার কারণ এই যে, তওবার জন্যে মাগফেরাত অপরিহার্য। তওবা কবুল হলে মাগফেরাত হয়েই যাবে।

তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে এতটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট। এখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এটা তো মুতাযেলা সম্প্রদায়ের কথা– যারা বলে যে, তওবা কবুল করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এর জওয়াব এই যে, আমরা যে "ওয়াজিব" বলি, তার অর্থ "জরুরী"। যেমন কেউ বলে—সাবান দিয়ে কাপড় ধৌত করলে ময়লা দূর হওয়া ওয়াজিব অথবা পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পান করলে পিপাসা দূর হওয়া ওয়াজিব অথবা কাউকে দীর্ঘ সময় পানি পান করতে না দিলে পিপাসা লাগা ওয়াজিব অথবা কেউ সদাসর্বদা পিপাসার্ত থাকলে তার মরে যাওয়া ওয়াজিব। মুতাযেলা সম্প্রদায় যে অর্থে ওয়াজিব বলে, সে অর্থে এসব বিষয়ের মধ্যে কোনটিই ওয়াজিব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এতটুকু যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবাদতকে গোনাহের কাফফারা করেছেন এবং পাপকে মিটানোর জন্যে পুণ্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন পানিকে পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কুদরতে এর বিপরীত হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। সারকথা, আল্লাহর উপর কোনকিছুই ওয়াজিব নয়। কিন্তু তিনি যে বিষয়ের ইচ্ছা করেছেন, তা হওয়া অবশ্যই ওয়াজিব।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তওবাকারীদের প্রত্যেকেই তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে; অথচ যে পানি পান করে, সে পিপাসা নিবৃত্তির ব্যাপারে সন্দেহ করে না। অতএব, তওবাকারী সন্দেহ করবে কেন? জওয়াব এই যে, তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে সকল জরুরী শর্ত রয়েছে, সেগুলো পাওয়া গেল কি না, সন্দেহ সে বিষয়েই হয়ে থাকে। পানি পান করার ক্ষেত্রে এরূপ কোন শর্ত নেই। তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ইনশাআল্লাহ্ পরে বর্ণনা করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করা হয়

উল্লেখ্য, তওবার অর্থ হল গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। কোন কিছু পরিত্যাগ করা তখনই সম্ভব, যখন তাকে জেনে নেয়া যায়। তওবা ওয়াজিব বিধায় গোনাহসমূহ চেনাও ওয়াজিব। যে কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই গোনাহ্। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে খোদায়ী বিধি-বিধানাবলী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করতে হবে। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। তাই নিম্নে সংক্ষেপে গোনাহসমূহের প্রকারভেদ তিনটি শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

বান্দার দোষ ও গুণের দিক দিয়ে গোনাহের প্রকারভেদ ঃ মানুষের স্বভাব ও চরিত্র অনেক। কিন্তু যেগুলো দ্বারা গোনাহ্ অস্তিত্ব লাভ করে, সেগুলো চার প্রকারে সীমিত— প্রতিপালকসুলভ স্বভাব, শয়তানসুলভ স্বভাব, পশুসুলভ স্বভাব এবং হিংস্র স্বভাব। প্রতিপালকসুলভ স্বভাব অহংকার, গর্ব, স্বৈরাচার, প্রশংসাপ্রীতি, সম্মান ও বিত্তপ্রীতি ইত্যাদি জন্ম দেয়। এ স্বভাব থেকে এমন সব কবীরা গোনাহ্ উৎপন্ন হয়, যেগুলোকে মানুষ গোনাহ্ গণ্য করে না। অথচ সেগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ও অধিকাংশ গোনাহের মূল হয়ে থাকে। শয়তানসুলভ স্বভাব থেকে হিংসা, অবাধ্যতা, কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি বিষয় গজিয়ে উঠে। নিফাক, বেদআত ও পথভ্রষ্টতাও এর অন্তর্ভুক্ত। পশুসুলভ স্বভাব থেকে যেসব বিষয় অংকুরিত হয়, সেগুলো হচ্ছে তীব্র লোভ ও লালসা, উদর ও যৌনাঙ্গের স্পৃহা, ব্যভিচার ও সমকামিতা, চুরি, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, হারাম অর্থ সঞ্চয় ইত্যাদি। হিংস্র স্বভাবের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে ক্রোধ, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মারপিট, গালিগালাজ, হত্যা ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে এ চারটি স্বভাব জন্মগতভাবে একের পর এক আগমন করে। সর্বপ্রথম পশুসুলভ স্বভাব প্রবল হয়। এরপর হিংস্রস্বভাব প্রকাশ পায়। এ স্বভাবদ্বয় একত্রিত হয়ে বুদ্ধি-বিবেককে প্রতারিত করে এবং এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকেই শয়তানী স্বভাব জোরদার হয়। সবশেষে প্রতিপালকসুলভ স্বভাব অর্থাৎ, গর্ব, অহংকার, ইযযত ও বড়ত্বের স্পৃহা এবং সকলের উপর সরদারী করার ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মোটকথা, এই স্বভাব চতুষ্টয়ই হচ্ছে গোনাহ ও নাফরমানীর উৎস। এরপর এগুলো থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গোনাহ ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে কিছু গোনাহ বিশেষভাবে অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন কুফর, নিফাক, বেদআত ইত্যাদি। কিছু গোনাহ চক্ষু ও কর্ণের সাথে, কিছু উদর ও যৌনাঙ্গের সাথে এবং কিছু হাত ও পায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সব সুস্পষ্ট বিধায় বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত গোনাহ দু'প্রকার। এক, যা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে; যেমন নামায, রোযা ও অন্যান্য বিশেষ ফরযসমূহ পালন না করা। দুই, যা মানুষের পারস্পরিক হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন যাকাত না দেয়া, কাউকে হত্যা করা, কারও ধন-সম্পদ ছিনতাই করা, গালি দেয়া ইত্যাদি। যে সকল গোনাহ মানুষের পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই কঠিন। পক্ষান্তরে যে সকল গোনাহ আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে ক্ষমা পাওয়ার আশা প্রবল— যদি তা শিরক না হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

الدواوين ثلثة ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك

অর্থাৎ, আমলনামা তিন প্রকার। এক প্রকার ক্ষমা করা হবে, এক প্রকার ক্ষমা করা হবে না এবং এক প্রকার ছেড়ে দেয়া হবে না।

প্রথম প্রকার আমলনামা যা ক্ষমা করা হবে, সেসব গোনাহ, যা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার আমলনামার অর্থ শিরক। এটা ক্ষমা করা হবে না। তৃতীয় প্রকার আমলনামার মানে মানুষের পারস্পরিক গোনাহ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা না করা পর্যন্ত এসব গোনাহের চুলচেরা হিসাব হবে।

গোনাহের তৃতীয় বিভাজন এই যে, গোনাহ হয় সগীরা হবে, না হয় কবীরা। এগুলোর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ কেউ বলেন ঃ সগীরা বলতে কোন গোনাহ নেই; বরং যে বিষয়ে খোদায়ী আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হবে, তা কবীরাই হবে। এই উক্তি অগ্রাহ্য। কেননা, সগীরা গোনাহের অস্তিত্ব কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়, তার মধ্য থেকে যদি কবীরাগুলো থেকে বেঁচে থাক, তবে আমি তোমাদের মন্দ কাজসমূহকে সরিয়ে দেব এবং তোমাদের সম্মানের স্থানে দাখিল করব।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

تَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ

অর্থাৎ, তোমরা বেঁচে থাক কবীরা তথা বড় গোনাহ থেকে এবং নির্লজ্জতা থেকে— ছোট ছোট মলিনতা বাদে।

হাদীস শরীফে আছে—

اَلصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ اِنِ اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ -

অর্থাৎ, পাঞ্জেগানা নামায এবং এক জুমআ অন্য জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গোনাহ দূর করে দেয়— যদি বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ -

অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কবীরা গোনাহের সংখ্যা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এর সংখ্যা চার এবং হযরত উমর (রাঃ) সাত বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতে নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) কবীরা গোনাহের সংখ্যা সাত বলেন, তখন তিনি বললেন ঃ সাত বলার চেয়ে সত্তর বলাই অধিক সঙ্গত। হযরত ইবনে আব্বাস একথাও বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তাই কবীরা। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে গোনাহের কারণে দোযখের ওয়াদা করেছেন, তা কবীরা। কারও মতে যে গোনাহের কারণে দুনিয়াতে "হদ" অর্থাৎ, শাস্তি ওয়াজিব হয়, তা কবীরা। কেউ কেউ বলেন ঃ কবীরা গোনাহের সংখ্যা অজানা, যেমন শবে কদরের বিশেষ মুহূর্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে এর সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সূরা নেসার শুরু থেকে إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ পর্যন্ত যতগুলো গোনাহ আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, সে সবগুলোই কবীরা। আবূ তালেব মক্কী বলেন ঃ কবীরা গোনাহ সত্তরটি। হাদীস থেকে এবং হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মসউদ ও ইবনে উমর প্রমুখের উক্তি থেকে এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে চারটি অন্তরে অর্থাৎ শিরক, গোনাহ উপর্যুপরি করে যাওয়া, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় না করা। আর চারটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সৎপুরুষকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, অসত্যকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং জাদু করা। তিনটি উদর সম্পর্কিত— মদ্য পান করা, এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা এবং জেনেশুনে সুদ খাওয়া। দুটি যৌনাঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ব্যভিচার ও সমকামিতা। দু'টি হাতের সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ হত্যা ও চুরি। একটি পায়ের সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা। একটি সমস্ত দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পিতামাতার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাফরমানী করা। এই উক্তি যদিও কাছাকাছি; কিন্তু এতেও পূর্ণতা হয় না। কেননা, বাস্তবে কমবেশী হতে পারে। উদাহরণতঃ এ উক্তি অনুযায়ী সুদ খাওয়া ও এতীমের অর্থ আত্মসাৎ করা কবীরা গোনাহ। এটা ধন সম্পর্কিত গোনাহ। প্রাণ সম্পর্কিত গোনাহ হত্যা লেখা হয়েছে। চক্ষু উৎপাটিত করা, হাত কাটা ইত্যাদি লেখা হয়নি। এমনিভাবে এতীমকে মারা ও তার অঙ্গ কর্তন করা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ। এ ছাড়া হাদীসে একটি গালির পরিবর্তে দু'গালি দেয়া এবং মুসলমানের মানহানি করাকেও কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের মতে চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম; কিন্তু আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে এসব আমলকে কবীরা গোনাহ মনে করতাম।

কিন্তু এতগুলো উক্তি সত্ত্বেও কেউ যদি চুরি সম্পর্কে জানতে চায় যে, এটা কবীরা কি না, তবে কবীরার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত এটা যথাযথরূপে জানা সম্ভবপর নয়। কেননা, কবীরা শব্দটি শাব্দিক দিক দিয়ে অস্পষ্ট। অভিধানে অথবা শরীয়তে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। কবীরা ও সগীরা আপেক্ষিক বিষয়াদির অন্যতম। যা গোনাহ তা কতক গোনাহের তুলনায় বড় এবং কতক গোনাহের তুলনায় ছোট হতে পারে। অর্থাৎ, উপরের দিকে দেখলে ছোট এবং নিচের দিকে দেখলে বড় মনে হবে। উদাহরণতঃ পর-নারীর সাথে শয়ন করা যিনার তুলনায় কম এবং কেবল চোখে দেখার তুলনায় বেশী গোনাহ।

কিন্তু যেহেতু কোরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার আদেশ রয়েছে, তাই কবীরা অর্থ জানা একান্ত জরুরী। নতুবা আদেশ পালিত হবে কিরূপে?

অতএব, এ সম্পর্কে সুচিন্তিত বিষয় এই যে, শরীয়তে গোনাহ তিন প্রকার। এক, যার বড় হওয়া সকলেরই জানা। দুই, যা ছোট গোনাহ বলে গণ্য। তিন, যার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কিছুই জানা নেই। এরূপ সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট গোনাহ জানার জন্যে কোন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাওয়ার আশা করা বৃথা। কেননা, এটা তখনই সম্ভব হত, যখন রসূলে করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলে দিতেন যে, দশটি অথবা পাঁচটি গোনাহ কবীরা। এরপর স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিতেন যে, এই এই দশটি অথবা এই এই পাঁচটি। কিন্তু বাস্তবে এরূপ হয়নি; বরং কতক রেওয়ায়েতে কবীরার সংখ্যা তিন এবং কতক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে সাত। এরপর আরও বর্ণিত আছে যে, এক গালির বিনিময়ে দু'গালি দেয়া অন্যতম কবীরা। অথচ এটা পূর্বোক্ত তিনের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাতের মধ্যেও নয়। এ থেকে জানা গেল যে, কবীরাকে কোন বিশেষ সংখ্যায় সীমিত করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব, শরীয়ত প্রবর্তক নিজেই যখন কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি, তখন অন্যারা তা গণনা করার আশা কিরূপে করতে পারে? সংখ্যা নির্দিষ্ট না করার কারণ সম্ভবত এই ছিল, যাতে মানুষ কবীরা গোনাহকে ভয় করতে থাকে এবং এই ভয়ের কারণে সগীরা গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে; যেমন শবে বরাতকে এ জন্যে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ এর জন্যে মেহনত অব্যাহত রাখে।

অবশ্য আমাদের দ্বারা কবীরার প্রকারভেদ সঠিকভাবে বলে দেয়া এবং এর খুঁটিনাটি বিষয়াদি প্রবল ধারণা ও অনুমানের উপর ছেড়ে দেয়া সম্ভব। এছাড়া, যে গোনাহটি সর্ববৃহৎ কবীরা, তারও সংজ্ঞা বলে দিতে পারি; কিন্তু যেটি সর্বকনিষ্ঠ সগীরা গোনাহ, তার সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়।

শরীয়তের প্রমাণাদি ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আমরা জানি সকল শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করুক এবং দীদারে ইলাহীর সৌভাগ্য অর্জন করুক। কিন্তু যে পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, ঐশীগ্রন্থ ও রসূলগণকে না চিনবে এ সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। এ আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ, মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা আমার বান্দা হয়ে যায়।

বান্দা তখন বান্দা হয়, যখন নিজের মালিকের প্রতিপালকত্ব ও নিজের দাসত্বকে চিনে। এটাই রসূল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থিব জীবন ছাড়া এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। তাই দুনিয়াকে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র বলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, আখেরাতের খাতিরে দুনিয়ার হেফাযতও জরুরী। আখেরাতের খাতিরে দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয় দুটি। একটি প্রাণ, অপরটি ধন-সম্পদ। অতএব, যে গোনাহ দ্বারা খোদায়ী মারেফতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তা সর্ববৃহৎ কবীরা। এরপর সেই কবীরার পালা আসে, যা দ্বারা জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়। কেননা, জীবিকা দ্বারাই প্রাণীর জীবন।

সুতরাং আসল উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্যে যথাক্রমে তিনটি বিষয়ের হেফাযত জরুরী হল। প্রথম, অন্তরে খোদায়ী মারেফতের হেফাযত। দ্বিতীয়, দেহে প্রাণের হেফাযত। তৃতীয়, ধন-সম্পদের হেফাযত। এ বিষয়ত্রয়ের উপর ভিত্তি করেই গোনাহের বিভক্তি হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্ববৃহৎ গোনাহ সেটি, যা খোদায়ী মারেফতের অন্তরায় হয়। এর নিচে সে গোনাহ, যা মানুষের প্রাণরক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরপর সেই গোনাহ— যা দ্বারা জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়। এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে কোন ধর্মেই মতভেদ হতে পারে না।

অতএব, কবীরা গোনাহের তিনটি স্তর রয়েছে। এক, যা আল্লাহ ও রসূলের মারেফতের পরিপন্থী। একে বলা হয় কুফর। এর উর্ধ্বে কোন কবীরা নেই। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আযাবকে ভয় না করা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার বেদআতও এর কাছাকাছি। দুই, প্রাণ সম্পর্কিত কবীরা। সুতরাং কাউকে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। তবে কুফরের তুলনায় কম। কেননা, কুফরের কারণে মূল উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায়। আর হত্যার কারণে উদ্দেশ্যের উপায় বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, পার্থিব জীবন খোদায়ী মারেফতের ওসীলা। হত্যা করলে এই ওসীলা লোপ পায়। হাত-পা কর্তন করা এবং মারপিট করা, যা মৃত্যুর কারণ হয়, তাও কবীরা গোনাহের মধ্যে গণ্য। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যা অধিক কঠোর কবীরা। যিনা ও সমকামিতাও এই স্তরের মধ্যে দাখিল। সমকামিতা এ জন্যে দাখিল যে, যখন ধরে নেয়ার পর্যায়ে সকলেই পুরুষদের সাথে যৌনকর্ম সম্পাদন করতে শুরু করবে, তখন মানুষের বংশ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং হত্যার মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা যেমন কবীরা গুনাই, তেমনি যিনা ও ব্যভিচারও কবীরা গুনাহ। কেননা, তার দ্বারা যদিও বংশ বিস্তার বন্ধ হয় না;

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিন্তু বংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক উত্তরাধিকার খতম হয়ে যায়। ফলে, জীবনের শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে যিনা হত্যার তুলনায় কম কবীরা।

তিন, ধন-সম্পদ সম্পর্কিত কবীরা। সুতরাং একে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে, ছিনতাই করে অথবা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে হস্তগত করা জায়েয নয়। তবে একের ধন-সম্পদ অন্যে নিয়ে নিলে তা ফেরত দেয়া সম্ভব। খেয়ে ফেললে বা ব্যয় করে ফেললে মূল্য অথবা বিনিময় দিতে পারে। এ দিক দিয়ে ধন-সম্পদ নেয়া তেমন গুরুতর নয়। হাঁ, যদি এভাবে নেয় যে, ক্ষতিপূরণ অসম্ভব হয়ে যায়, তখন এটা কবীরা গোনাহ হওয়া উচিত। এভাবে নেয়ার সম্ভাব্য পন্থা চারটি। এক, গোপনে নেয়া, যাকে চুরি বলা হয়। এতে কেন নিল, তা অজানা থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। দুই, এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। বয়সের স্বল্পতা হেতু এতীম নালিশ করতে অক্ষম বিধায় এটাও গোপন পন্থার অন্তর্ভুক্ত। তিন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে কারও আর্থিক ক্ষতি করা। চার, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গচ্ছিত সামগ্রীর মালিক হয়ে যাওয়া।

এ চারটি পন্থা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তসমূহের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। যদিও এগুলোর কোন কোনটিতে শরীয়ত কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি। কিন্তু পর্যাপ্ত নিন্দাবাণী উচ্চারণ করেছে এবং পার্থিব শৃঙ্খলা বিধানে এগুলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাই এগুলো কবীরা হওয়াই সঙ্গত। সূদ খাওয়ার মধ্যে কেবল এতটুকুই রয়েছে যে, অপরের ধন-সম্পদ তার সন্তুষ্টিক্রমে খাওয়া হয়। কিন্তু এতে শরীয়তের সন্তুষ্টি নেই। আর ধন ছিনতাইয়ের মধ্যে কারও সন্তুষ্টি থাকে না। এতদসত্ত্বেও ছিনতাই কবীরা গোনাহ নয়। কাজেই সূদ খাওয়া কবীরা না হওয়া দরকার। কারণ, এতে ধনের মালিকের সম্মতি থাকে এবং কেবল শরীয়তের সম্মতি অনুপস্থিত থাকে। যদি বলা হয় যে, শরীয়তে সূদ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এতে কবীরা হওয়াই বুঝা যায়, তবে ছিনতাই ইত্যাদি যুলুমের ব্যাপারেও তো এরূপই বলা হয়েছে। এগুলোরও কবীরা হওয়া উচিত। অথচ এগুলো কবীরার তালিকায় দাখিল না হওয়াই প্রবল ধারণা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন আবু তালেব মক্কী বর্ণিত কবীরাসমূহের মধ্যে গালি দেয়া, মদ্যপান করা, জাদু করা, জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। এগুলোর মধ্যে মদ্যপান কবীরা গোনাহ হওয়া উপযুক্ত। প্রথমত, এ কারণে যে, শরীয়ত এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছে। দ্বিতীয়ত, যুক্তির নিরিখেও এরূপ হওয়া উচিত। যুক্তি এই যে, প্রাণের হেফাযত করা যেমন জরুরী, বুদ্ধির হেফাযত করাও তেমনি জরুরী। কারণ, বুদ্ধি ছাড়া প্রাণ বেকার। এতে বুঝা গেল যে, মদ্যপান করে বুদ্ধি লুপ্ত করাও কবীরা গোনাহ। কিন্তু এই যুক্তি এক ফোঁটা মদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, এতে বুদ্ধি লোপ পায় না। সুতরাং এক ফোঁটা মদমিশ্রিত পানি পান করলে তা কবীরা না হওয়া উচিত; বরং একে নাপাক পানি বলা উচিত। কিন্তু শরীয়ত মদের জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে বিধায় একে কবীরা গণ্য করা হয়। শরীয়তের সকল রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া মানুষের সাধ্যে নেই। সুতরাং এর কবীরা হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রমাণিত হলে তা মেনে নেয়া ওয়াজিব।

অপবাদ আরোপের অবস্থা এই যে, এতে কেবল মানহানি হয়। মানের মর্যাদা ধন-সম্পদের তুলনায় কম। অপবাদের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। সর্ববৃহৎ স্তর হচ্ছে যিনার অপবাদ আরোপ করা। শরীয়তে এটা খুব গুরুতর ব্যাপার। তাই এর জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার প্রবল ধারণা, শরীয়তে যেসব গোনাহের কারণে "হদ" তথা শাস্তি ওয়াজিব হয়, সাহাবায়ে কেরাম সেগুলোকে কবীরা গণ্য করতেন। এদিক দিয়ে অপবাদ আরোপও কবীরা।

জাদুর অবস্থা এই যে, যদি তাতে কুফরী কথাবার্তা না থাকে, তবে কবীরা গোনাহ। নতুবা এর গুরুত্ব ততটুকুই হবে, যতটুকু ক্ষতি এর দ্বারা হবে; যেমন জীবন নাশ করা, রুগ্ন হওয়া ইত্যাদি। যুদ্ধের সারি থেকে পলায়ন করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানীও কিয়াস অনুযায়ী এমন যে, এ সম্পর্কে মত প্রকাশে বিরত থাকাই উপযুক্ত। এ ছাড়া এটা অকাট্যরূপে জানা আছে যে, যিনা ছাড়া মানুষকে অন্য কোন গালি দেয়া, মারা, যুলুম করা অর্থাৎ ধন ছিনিয়ে নেয়া, গৃহ থেকে উৎখাত করে দেয়া কবীরার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, কবীরা গোনাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা সতের বর্ণিত আছে। এগুলো সেই সতেরোর মধ্যে উল্লিখিত নেই। এমতাবস্থায় যদি পলায়ন করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করাকেও কবীরা বলা থেকে বিরত থাকা যায়, তবে তা অবান্তর হবে না। কিন্তু হাদীসে পলায়ন ও পিতামাতার নাফরমানীকে কবীরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে এগুলোকে কবীরার তালিকায় দাখিল করা উচিত।

পূর্বোল্লিখিত এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেব। এ থেকে জানা যায়, কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকলে তা সগীরা গোনাহের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এটা সর্বাবস্থায় নয়; বরং তখন কাফ্ফারা হবে, যখন সামর্থ ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যিনা করতে সক্ষম হয় এবং মনে আগ্রহও থাকে, এরপর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং শুধু দেখে ও স্পর্শ করেই ক্ষান্ত থাকে, তবে যে অন্ধকার দেখা অথবা স্পর্শ করার কারণে তার অন্তরে সৃষ্টি হবে, তার তুলনায় নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে রাখার কারণে নূর বেশী হবে। কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ এটাই। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়, অথবা কোন কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তবে তার বিরত থাকা কাফ্ফারা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মদ্যপানে মোটেই আগ্রহী নয়, এমনকি তা হালাল হলেও পান করত না, তার মদ্যপান থেকে বিরত থাকা সেসব ছোট গোনাহের জন্যে কাফফারা হবে, যা মদ্যপানের সূচনাতে হয়ে থাকে।

কবীরা যেহেতু আখেরাত সম্পর্কিত বিধানাবলীর অন্যতম, তাই শরীয়তে এর সঠিক সংখ্যা ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। উদ্দেশ্য, মানুষ যাতে নির্ভীক ও শংকামুক্ত হয়ে সগীরা গোনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এক নামায অন্য নামাযের সময় পর্যন্ত কাফফারা হয় এবং এক রমযান অন্য রমযান পর্যন্ত কাফফারা হয় তিনটি গোনাহ ছাড়া— শিরক, সুন্নত বর্জন ও চুক্তি ভঙ্গকরণ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ সুন্নত বর্জন ও চুক্তি ভঙ্গ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলতে উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন ঃ দল থেকে বের হয়ে যাওয়া সুন্নত বর্জন এবং কারও সাথে চুক্তি করার পর তলোয়ার নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বের হয়ে পড়া চুক্তি ভঙ্গকরণ।

জান্নাত ও দোযখের স্তর পাপ ও পুণ্যের স্তরের উপর নির্ভরশীল ঃ

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের মোকাবিলায় জাগরণের মোকাবিলায় স্বপ্নের মত। হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত । বলা হয়েছে—

اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا

অর্থাৎ, মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, জাগ্রত হবে।

জাগরণের বিষয় যখন স্বপ্নে আসে, তখন তা দৃষ্টান্তের মত মনে হয়। ফলে, তা'বীর তথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এমনিভাবে আখেরাতের জাগরণে যে অবস্থা হবে, তা দুনিয়ার স্বপ্নে দৃষ্টান্তস্বরূপই প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ, স্বপ্নের মত এ অবস্থাও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে। এখানে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তিনটি কাহিনী নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করছি।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সীরীনের খেদমতে এসে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে একটি নামাঙ্কিত মোহর রয়েছে। তা দ্বারা আমি মানুষের মুখে এবং যৌনাঙ্গে মোহর করছি। তিনি বললেন ঃ মনে হয় তুমি মুয়াযযিন, রমযানে সোবহে সাদেক হওয়ার পূর্বে আযান দাও। লোকটি বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি তৈলকে তৈলবীজের মধ্যে ঢালছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কোন বাঁদী ক্রয় করে থাকলে তার অবস্থা তদন্ত করে দেখ। মনে হয় সে তোমার জননী। কেননা, তৈলের মূল হচ্ছে তৈলবীজ। এ থেকে বুঝা যায় যে, লোকটি তার মূল অর্থাৎ জননীর কাছে যায়। এরপর লোকটি তদন্ত করে জানতে পারল যে, তার বাঁদী বাস্তবিকই তার জননী ছিল। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মোতির হার শূকরের গলায় পরিধান করাচ্ছি। হযরত ইবনে সীরীন বললেন ঃ মনে হয় তুমি জ্ঞানের বিষয়াদি অযোগ্য লোকদেরকে শিখিয়ে যাচ্ছ। বাস্তবে তাই ছিল। এসব ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল রূপক বিষয়বস্তুকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়। রূপক বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতীক হিসেবে দেখলে শুদ্ধ ও সঠিক মনে হয়, আর বাহ্যিক আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে মিথ্যা মনে হয়।

উদাহরণতঃ প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যদি মুয়াযযিন কেবল বাহ্যিক আংটির প্রতি দেখত এবং তা দ্বারা মোহর করা বুঝত, তবে এ স্বপ্নকে মিথ্যা মনে করতে বাধ্য হত। কেননা, এ কাজ সে কখনও করেনি। কিন্তু মর্ম ও প্রতীকের প্রতি লক্ষ্য করার ফলে স্বপ্নটি সত্য হয়ে গেল। কারণ, মোহর করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধা দেয়া। মুয়াযযিন রমযান মাসে সোবহে সাদেকের পূর্বে আযান দিয়ে মানুষকে পানাহারে বাধা দিত। পয়গম্বরগণকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী কথাবার্তা বলেন। মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ এই যে, তারা নিদ্রিত। নিদ্রিত ব্যক্তির কাছে বস্তুর স্বরূপ রূপক আকারেই উদঘাটিত হয়। তাই পয়গম্বরগণও মানুষের সাথে রূপক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেন, যাতে তারা মূল উদ্দেশ্য বুঝে নেয়, যদিও বাহ্যিক শব্দ দ্বারা অন্য কিছু অর্থ হয়। মৃত্যুর পর মানুষ যখন জাগ্রত হবে, তখন বুঝবে, পয়গম্বরগণের কথা ঠিকই ছিল। উদাহরণতঃ হাদীসে বলা হয়েছে—

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ

অর্থাৎ, মুমিনের অন্তর আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত

আলেমগণ ব্যতীত কেউ এ হাদীসের মর্ম বুঝে না। মূর্খদের দৃষ্টি কেবল এর শাব্দিক অর্থের উপর থাকে। কেননা, তারা "তাভীল" নামক তাফসীর সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে, তারা শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার হাত ও অঙ্গুলি সপ্রমাণ করে। (নাউযুবিল্লাহ)

এমনিভাবে অপর এক হাদীসে আছে اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ (আল্লাহ আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।)

এতে মূর্খরা কেবল বাহ্যিক আকৃতি ও রং বুঝে নিয়ে আল্লাহ তা'আলাকেও এমনি মনে করে। অথচ তিনি এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র। এসব কারণেই কতক লোক আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপারে দারুণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হোঁচট খেয়েছে। এমনকি, তারা আল্লাহর কালামকে অক্ষর ও শব্দভুক্ত মনে করে নিয়েছে। আখেরাতের বিষয় সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে কেউ কেউ সেগুলোকে অস্বীকার করে একারণে যে, তাদের কাছে বাহ্যিক শব্দই উদ্দেশ্য। আর বাহ্যিক শব্দের মাঝে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ হাদীসে আছে—

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى صُوْرَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُذْبَحُ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা ভেড়ার আকারে উপস্থিত করে যবাহ করা হবে।

ধর্মদ্রোহী বোকারা এটা মানে না এবং পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে। প্রমাণ এই যে, মৃত্যু একটি অশরীরী বস্তু, আর ভেড়া শরীরী। অতএব, অশরীরী বস্তুর শরীরী হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব নির্বোধকে আপন রহস্যাবলীর মারেফত থেকে অনেক ক্রোশ দূরে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

অর্থাৎ, কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসব রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

মূর্খরা একথাও জানে না যে, কেউ যদি কাউকে বলে ঃ আমি স্বপ্নে একটি ভেড়া দেখেছি, যাকে মানুষ মহামারী বলে। ভেড়াটি পরে যবাহ হয়ে গেছে। একথা শুনে শ্রোতা জওয়াব দিল ঃ তুমি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছ। মনে হয়, মহামারী খতম হয়ে যাবে। কেননা, যবাহ করা জন্তুর ফিরে আসা কল্পনাতীত। এখানে ব্যাখ্যাতাও সত্যবাদী এবং যে স্বপ্ন দেখেছে, সে-ও সত্যবাদী। আসলে স্বপ্ন দেখানো যে ফেরেশতার কাজ, সে নিদ্রিত ব্যক্তিকে "লওহে মাহফুযের" বিষয়টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ বুঝিয়ে দিয়েছে। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝা সম্ভব ছিল না। এখন আমরা আসল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে আসছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতে জান্নাত ও দোযখের স্তরসমূহের বিভাজন দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝা অসম্ভব। সুতরাং আমরা যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব, তা দ্বারা অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে নিতে হবে, আকার ও শব্দের পেছনে পড়া যাবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আখেরাতে মানুষের অনেক প্রকার হবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যে তাদের স্তর ও উপলব্ধির সীমাহীন তফাৎ হবে। যেমন, দুনিয়ার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে তাদের তফাতের অন্ত নেই। এ ব্যাপারে দুনিয়া ও আখেরাতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, উভয় জগতের পরিচালক একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ। তার চিরন্তন তরীকা ও পদ্ধতিও একই রকম। যেহেতু আমরা স্তরসমূহ গণনা করতে অক্ষম, তাই এগুলোর শ্রেণী সীমিত করে বর্ণনা করছি।

কিয়ামতের দিন মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় শাস্তিপ্রাপ্ত, তৃতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত এবং চতুর্থ সফলকাম। দুনিয়াতে এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন বাদশাহ যুদ্ধ করে কোন দেশ জয় করলে তার অধিবাসীদের কতককে হত্যা করে— এরা প্রথম শ্রেণী, কতককে দীর্ঘকাল জেলে আটকে রাখে— এরা দ্বিতীয় শ্রেণী, কতককে ছেড়ে দেয়—এরা তৃতীয় শ্রেণী এবং কতককে পুরস্কৃত করে—এরা চতুর্থ শ্রেণী। বাদশাহ ন্যায়পরায়ণ হলে এসব আচরণ বিনা কারণে হবে না। হত্যা তাদেরকেই করবে, যারা তার অধিকারকে অস্বীকার করবে এবং তার বন্ধুর শত্রু হবে। জেলে তাদেরকে পাঠাবে— যারা তার আধিপত্য স্বীকার করবে; কিন্তু আনুগত্য ও খেদমতে ত্রুটি করবে। মুক্তি তাদেরকে দেবে, যারা কেবল তার বশ্যতা মেনে নেবে। পুরস্কৃত তাদেরকে করবে, যারা আজীবন তার খেদমত ও সহযোগিতায় দিনাতিপাত করবে। এরপর এটাও জরুরী যে, যে যেরূপ খেদমত করবে, সে অনুপাতেই সে পুরস্কার পাবে। হত্যাও বিভিন্ন প্রকার বের হবে। কারও শুধু গর্দান নেয়া হবে এবং কাউকে নাক, কান ও হাত-পা কেটে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ অস্বীকারের স্তর অনুযায়ী হত্যাও বিভিন্ন স্তর হবে। অনুরূপভাবে যাদেরকে জেল দেয়া হবে, তাদেরও বিভিন্ন স্তর হবে— কাউকে কম সময়ের এবং কাউকে বেশী সময়ের। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর অসংখ্যা ও অগণিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে কিয়ামতে এই চার শ্রেণীর স্তর অসংখ্য হবে। উদাহরণতঃ চতুর্থ শ্রেণী যারা সফলকাম হবে, তাদের কেউ জান্নাতে আদনে, কেউ জান্নাতে মাওয়ায় এবং কেউ জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শ্রেণীর মধ্যে কেউ অল্পদিন, কেউ হাজার বছর এবং কেউ সাত হাজার বছর শাস্তি ভোগ করবে। এরা সকলের পেছনে দোযখ থেকে বের হবে।

এখন আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর বিভাজন বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। প্রথম শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্তদের। তারা সে লোক, যারা আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে না। কেননা, উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বাদশাহর কাছে তারাই হত্যাযোগ্য ছিল, যারা বাদশাহের সন্তুষ্টি, সম্মান ও পুরস্কার প্রার্থনা করত না। বলা বাহুল্য, এটা হচ্ছে কাফেরদের শ্রেণী। তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল দুনিয়ার পূজারী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও ঐশী গ্রন্থসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা, আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়া এবং তাঁর দীদারের গৌরব অর্জন করাই হচ্ছে পারলৌকিক সৌভাগ্য। ঈমান ব্যতীত এই নেয়ামত অর্জন করা সম্ভব নয়। কাফেররা এটা অস্বীকার করে। তাই তারা এই নেয়ামত থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী শাস্তিপ্রাপ্তদের। তারা সেই লোক, যারা মূলত ঈমানদার; কিন্তু ঈমান অনুযায়ী আমলে ত্রুটি করে। উদাহরণতঃ তারা ঈমান রাখে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করা যাবে না। এখন যদি কেউ আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তবে তার উপাস্য সেই প্রবৃত্তিই হবে। সে কেবল মুখে মুখে তাওহীদ বলে। সত্যিকার তাওহীদ তার মধ্যে নেই। সত্যিকার তাওহীদ তখন হবে, যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার পর আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু পরিত্যাগ করে এবং সরল পথে কায়েম থাকে, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, এরপর সুদৃঢ় থাকে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সরলপথ থেকে কিছু না কিছু বিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেই প্রবৃত্তির অনুসরণ অবশ্যই করে— যদিও তা সামান্য ব্যাপারে হয়। ফলে, নৈকট্যের স্তরেও ত্রুটি দেখা দেয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই শাস্তি হবে। কিন্তু এই শাস্তির তীব্রতা ও স্বল্পতা ঈমানের শক্তি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কমবেশী হওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই সেটা অতিক্রম করবে। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। এরপর আমি খোদাভীরুদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

এ কারণেই আগেকার দিনের বুযুর্গগণ ভয় করতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী দোযখভোগ নিশ্চিত এবং রক্ষা পাওয়া সন্দেহযুক্ত। এটাই আমাদের ভয়ের কারণ। হাদীসদৃষ্টে জানা যায়, সকলের শেষে যে ব্যক্তি দোযখ থেকে বের হবে, সে সাত হাজার বছর পরে বের হবে। কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে দোযখের ওপারে চলে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে চলে যাবে। তাদের এক দণ্ডও দোযখে অবস্থান করতে হবে না। এক দণ্ড এবং সাত হাজার বছরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক স্তর রয়েছে।

এখন আমরা বলছি, যে ব্যক্তি মূল ঈমানকে শক্তিশালী করে সকল কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সকল ফরয কর্ম অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামায উত্তমরূপে আদায় করবে এবং মাত্র কয়েকটি সগীরা গোনাহই তার যিম্মায় থাকবে, যা সে উপর্যুপরি করেনি, মনে হয় তার কেবল হিসাবই নেয়া হবে— কোন প্রকার আযাব হবে না। হিসাবের সময় তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আছে, পাঞ্জেগানা নামায, জুমআ এবং রমযানের রোযা মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যে সগীরা গোনাহের জন্যে কাফফারা হয়ে যায়, একথা কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। কাফফারা হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে হিসাব রোধ করতে না পারলেও আযাব রোধ করা। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি হিসাব শেষ হওয়ার পর সুখে থাকবে।

যে ব্যক্তি একটি অথবা বেশী কবীরা গোনাহ করে এবং ফরয কর্মও কতক বর্জন করে, সে মৃত্যুর পূর্বে খাঁটি তওবা করলে এমন হয়ে যাবে, যেমন সে কোন গোনাহই করেনি। আর যদি তওবার পূর্বে মারা যায়, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃত্যুর সময় তার অবস্থা আশংকাজনক হবে। উপর্যুপরি গোনাহ করা অবস্থায় মারা গেলে তার ঈমান না থাকা বিচিত্র নয়।

তৃতীয় শ্রেণী মুক্তিপ্রাপ্তদের। তারা সেই লোক, যারা কেবল আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তারা কোন খেদমত করেনি তাই পুরস্কার পাবে না এবং কোন দোষও করেনি তাই আযাবও হবে না। এ অবস্থা কাফেরদের মধ্য থেকে উন্মাদ, বালক ও অজ্ঞানদের হবে এবং সেসব লোকের হবে, যাদের কাছে জনপদ থেকে আলাদা থাকার কারণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। এরূপ লোকেরা না আল্লাহকে জানে, না তাঁকে অস্বীকার করে। ফলে, এবাদত ও গোনাহ কিছুই করে না। একারণেই তারা জান্নাতেও থাকবে না এবং দোযখেও যাবে না; বরং জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক জায়গায় অবস্থান করবে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় "আ'রাফ" বলা হয়। এটা কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত। তবে বিশেষ কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় যে, তারাও অকাট্যরূপে আ'রাফে থাকবে—এটা অনিশ্চিত; যেমন কাফেরদের বালকদের আ'রাফে থাকা অকাট্য নয়। কারণ বালকদের ব্যাপারে হাদীসও বিভিন্নরূপ বর্ণিত রয়েছে। একবার জনৈক বালক মারা গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সে জান্নাতের পাখীদের অন্যতম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে জানলে? এতে ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ শ্রেণী সফলকামদের। তারা সে লোক, যারা অনুকরণ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলাকে চিনে নেয়। তারাই নৈকট্যশীল ও অগ্রগামী। তারা বর্ণনাতীত নেয়ামত ও সম্ভোগপ্রাপ্ত হবে। এ সম্পর্কে কোরআনে যা উল্লিখিত হয়েছে, তাই বর্ণনা করা যায়। আল্লাহর বর্ণনার অধিক কে কি বলবে? যেহেতু এ জগতে এর বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব, তাই আল্লাহ তা'আলা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, তাদের চক্ষু শীতল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাদের জন্যে যা যা গোপন রেখেছেন, তা কেউ জানে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اعددت لعبادى الصالحين مالاعين رات ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر -

অর্থাৎ, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্যে এমন বস্তু প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায় উদয় হয়নি।

খোদাপ্রেমিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে অবস্থাই হয়, যা এ জগতে কোন মানুষের কল্পনায় আসতে পারে না। জান্নাতের হুর, প্রাসাদ, ফলমূল, দুধ, মধু, পানীয়, কংকন ও অলংকারের প্রতি তাদের আদৌ কোন মোহ থাকে না। তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া হলে তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকবে না; বরং দীদার তথা আল্লাহকে দেখার আনন্দ লাভ করার জন্যে তারা উদগ্রীব থাকবে, যা হবে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও অপার আনন্দ। একারণেই হযরত রাবেয়া বসরীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাতে আপনার ঔৎসুক্য কি হবে? তখন তিনি বললেন ঃ প্রথমে গৃহকর্তা, এরপর গৃহ। মোটকথা, খোদাপ্রেমিকদের অন্তর গৃহকর্তা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহব্বতেই ডুবে থাকে। গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের সাজ-সজ্জার প্রতি তাদের মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি, এই মহব্বতের কারণে তারা নিজেদের সম্পর্কেও বেখবর থাকে। ফলে, দৈহিক কষ্ট অনুভব করে না। এ অবস্থাকে বলা হয় "ফানা ফিল মাহবুব" (প্রেমাস্পদে লীন)।

সগীরা গোনাহ কিরূপে কবীরা হয়ে যায় ঃ জানা উচিত যে, সগীরা গোনাহ কয়েকটি কারণে কবীরা হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অব্যাহতভাবে করে যাওয়া। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, কোন গোনাহ অব্যাহতভাবে করা হলে তা সগীরা নয় এবং যে কোন গোনাহ এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) সহকারে করা হলে তা কবীরা নয়। এর সারমর্ম এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি কবীরা গোনাহ করে বিরত থাকে এবং অন্য কবীরা গোনাহ না করে, তবে এতে ক্ষমা পাওয়ার আশা অধিক সেই সগীরা গোনাহের তুলনায়— যা অব্যাহতভাবে করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি শক্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পাথরের উপর এক এক ফোঁটা পানি অব্যাহতভাবে পতিত হতে থাকে, তবে এক সময়ে পাথরে চিহ্ন দেখা দেবে। পক্ষান্তরে যদি সকল ফোঁটার পানি একত্রিত করে এক সাথে সেই পাথরের উপর ঢেলে দেয়া হয়, তবে কোন চিহ্ন দেখা দেবে না। অব্যাহতভাবে করার এই প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন।

خَيْرُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ

অর্থাৎ, সর্বোত্তম আমল তাই, যা অব্যাহতভাবে করা হয়— যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, স্থায়ী আমল কম হলেও উপকারী। এর বিপরীতে আরও জানা গেল যে, অনেক আমল যা মানুষ একবারে করে নেয়, তা অন্তরের পবিত্রতায় কম উপকারী হয়ে থাকে। এমনিভাবে সগীরা গোনাহ যদি অব্যাহতভাবে করা হয়, তবে তা অন্তরকে মলিন ও তমসাচ্ছন্ন করার ব্যাপারে অধিক প্রভাবশালী হবে। তবে একথা ঠিক যে, অগ্রে ও পশ্চাতে সগীরা গোনাহ না করে সহসাই কবীরা গোনাহ করার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। উদাহরণতঃ হত্যাকারী সহসাই কাউকে হত্যা করে না যে পর্যন্ত পূর্ব থেকে শত্রুতা না হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক কবীরা গোনাহ করার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে শুরুতে ও শেষে সগীরাও করা হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে সগীরা ব্যতিরেকেই সহসা কবীরা গোনাহ হয়ে যায় এবং পুনর্বার তা না করা হয়, তবে সম্ভবত এই কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার আশা সেই সগীরার তুলনায় বেশী, যা আজীবন করা হয়।

সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে গোনাহকে ছোট মনে করা। কেননা, এটাই নিয়ম যে, মানুষ নিজের গোনাহকে যত বড় মনে করবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা ততই ছোট হবে এবং গোনাহকে যত সগীরা মনে করবে, তা ততই কবীরা হবে। কারণ, গোনাহকে বড় মনে করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, অন্তরে গোনাহের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে, অন্তরে এর প্রভাব বেশী হয় না। পক্ষান্তরে গোনাহকে ছোট মনে করলে বুঝা যায়, অন্তরে এর প্রতি টান রয়েছে। এ কারণেই অন্তরে এর প্রভাব বেশী হয়। আর এ কারণেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষ অসাবধানতায় কোন পাপ করে ফেললে তজ্জন্য পাকড়াও করা হয় না। কেননা, এ অবস্থায় অন্তর প্রভাবিত হয় না।

হাদীস শরীফে আছে, ঈমানদার ব্যক্তি তার গোনাহকে এমন মনে করে— যেন মাথার উপর একটি পাহাড় এসে গেছে এবং এক্ষণি তা মাথার উপর পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুনাফিক তার গোনাহকে এমন মনে করে— যেন নাকের ডগায় মাছি বসেছে এবং তাকে উড়িয়ে দিয়েছে। ঈমানদারের অন্তরে গোনাহের এই গুরুত্বের কারণ এই যে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন সে চিন্তা করে যে, এই গোনাহের মাধ্যমে সে কার অবাধ্যতা করেছে, তখন সগীরা গোনাহও তার দৃষ্টিতে কবীরা প্রতিভাত হয়। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন এক নবীকে এই ওহী প্রেরণ করেন যে, উপঢৌকন কম—এদিকে লক্ষ্য করো না, বরং দেখ, যে প্রেরণ করেছে, সে কতটুকু মহান। তোমার পাপ ছোট—এদিকে দেখো না, বরং ভেবে দেখ, এ পাপ করে তুমি কার মোকাবিলা করেছ? এদিক দিয়েই জনৈক সাধক বলেন ঃ সগীরা গোনাহের কোন অস্তিত্বই নেই। যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা হয়, তা কবীরা-ই বটে।

সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গোনাহ করে উল্লসিত হওয়া এবং গর্ব করা। অতএব, মানুষ সগীরা গোনাহের যত বেশী স্বাদ পাবে, ততই তা কবীরা হবে। অন্তরকে তমসাচ্ছন্ন করার ব্যাপারে তার প্রভাবও বেশী হবে। এমনকি, কতক গোনাহগার তাদের গোনাহের জন্যে বাহবা পেতে চায় এবং গোনাহ করে খুব আস্ফালন করে। উদাহরণতঃ কোন কোন ব্যবসায়ী বলে— দেখ, আমি খারাপ মাল কিভাবে চালিয়ে দিলাম এবং ক্রেতাকে ধোকা দিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, এসব কারণে সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সময় দেয়া ও সহ্য করাকে তাঁর অনুগ্রহ মনে করে নিলেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। এই অনুগ্রহ মনে করার কারণে গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ বর্জন করতে অলসতা করে। সে জানে না যে, এই সময় দেয়ার পেছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও বেশী গোনাহ করে নিক। সুতরাং বাস্তবে যা ক্রোধের কারণ, তাকেই অনুগ্রহের কারণ মনে করে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

অর্থাৎ, তারা মনে মনে বলে ঃ আমাদের কথার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্যে জাহান্নাম যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। এটা অত্যন্ত মন্দ জায়গা।

গোনাহ্ করে তা বলে বেড়ানো অথবা অপরের সামনে গোনাহ করার কারণেও সগীরা গোনাহ্ কবীরা হয়ে যায়। কেননা, এতে প্রথমত, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে গোপন রাখা হয়, তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, অপরকে এ গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। ফলে, এক গোনাহের মধ্যে যেন দু'গোনাহ হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে, সকল মানুষের দোষ মার্জনা করা হবে; কিন্তু যারা গোনাহ্ করে ফাঁস করে দেয়, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। অর্থাৎ কেউ রাতের বেলায় দোষ করল, যা আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে গাত্রোত্থান করে সে আল্লাহর পর্দাকে ছিন্ন করল এবং আপন গোনাহ্ প্রকাশ করে দিল। এরূপ ব্যক্তির দোষ মার্জনা করা হবে না। গুণ প্রকাশ করা, দোষ গোপন করা এবং গোপন বিষয় ফাঁস না করা বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নেয়ামত। যে ব্যক্তি নিজের দোষ প্রকাশ করে দেয়, সে এই নেয়ামতের নাশোকরী করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ প্রথমত, মানুষের কোন গোনাহ্ না করা উচিত। যদি করেও, তবে অপরকে উৎসাহিত না করা উচিত।

গোনাহগার ব্যক্তি আলেম ও অনুসৃত হলেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। আলেম ব্যক্তি যখন কোন সগীরা গোনাহ্ করে এবং তার অনুসরণে অন্যরাও তা করতে থাকে, তখন এ গোনাহ্ আলেম ব্যক্তির জন্যে কবীরা হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা, সন্দেহযুক্ত ধনসম্পদ গ্রহণ করা, শাসকবর্গের কাছে আসা-যাওয়া করা, তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এবং মুসলমানের মর্যাদাহানি করা ইত্যাদি। মানুষ আলেমের এ ধরনের দোষের সনদ পেশ করে থাকে। আলেম মরে যায়। কিন্তু তার অনিষ্ট অব্যাহত থাকে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সাথে সাথে তার পাপও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মরে যায়, সে চমৎকার ব্যক্তি। হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি কুপ্রথা চালু করে, সে নিজে সেই কাজ করার জন্যে গোনাহগার হবে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের পাপও তার উপর বর্তাবে এমতাবস্থায় যে, তাদের পাপ হ্রাস করা হবে না। অর্থাৎ যারা করবে তাদের পাপ আলাদা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

অর্থাৎ, আমি সেই আমল লিখি, যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং সেই আমল, যার চিহ্ন তাদের পেছনে থাকে।

এখানে "পেছনের চিহ্ন" বলে সেই আমলকে বুঝানো হয়েছে, যা আমলকারীর মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আলেমের দুর্ভোগ অপরের অনুসরণের কারণে হয়ে থাকে। সে ভুল করলে তওবা করে নেয়; কিন্তু মানুষ এরপরও তার অনুসরণ করতে থাকে এবং কাজটিকে ছড়াতে থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেমের দোষ নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ার মত। এতে নৌকা নিজেও নিমজ্জিত হয় এবং যাত্রীদেরকেও ডুবিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেম মানুষকে বেদআত শিক্ষা দিয়ে গোমরাহ করত। পরবর্তীতে তার তওবা নসীব হয় এবং সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের সংস্কারে নিয়োজিত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা সমসাময়িক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তাকে বলে দাও, যদি তুমি কেবল আমারই দোষ করতে, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দিতাম। কিন্তু তুমি তো বহু মানুষকে গোমরাহ করেছ, যে কারণে আমি তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করেছি।

এ থেকে বুঝা গেল, আলেমদের দুটি বিষয় করা উচিত। প্রথমত, তারা মূলতই গোনাহ বর্জন করবে। দ্বিতীয়ত, যদি গোনাহ হয়ে যায়, তবে তা প্রকাশ করবে না। আলেমদের গোনাহের শাস্তি যেমন বেশী হয়, তেমনি তাদের পুণ্যকর্মের সওয়াবও অন্যদের অনুসরণের কারণে বেশী হয়। উদাহরণতঃ যদি আলেম বাহ্যিক সাজসজ্জা ও দুনিয়ার মোহ বর্জন করে এবং অল্প দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তার এই রীতি অন্যরাও অবলম্বন করে, তবে অন্যরা যে পরিমাণ সওয়াব পাবে, তার সমস্তই সে-ও পাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণাঙ্গ তওবা ও তার শর্তাবলী

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তওবা সেই অনুশোচনাকে বলা হয়, যার ফলস্বরূপ সংকল্প অস্তিত্ব লাভ করে। নিজের এবং প্রেমাস্পদের মাঝে গোনাহের প্রাচীর খাড়া হওয়ার জ্ঞান হচ্ছে এই অনুশোচনার কারণ। সুতরাং তওবার অংশ হচ্ছে জ্ঞান, অনুশোচনা ও সংকল্প। এই অংশত্রয়ের প্রত্যেকটির জন্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গতার পরিচয় ও স্থায়িত্বের শর্তাবলী। এগুলো বর্ণনা করা জরুরী। জ্ঞানের বর্ণনা হচ্ছে তওবার কারণ বর্ণনার নামান্তর, যা পরে উল্লিখিত হবে। এখানে প্রথমে অনুশোচনা বলা হয় অন্তরের ব্যথাকে, যা প্রেমাস্পদকে হারানোর সংবাদ শুনে সৃষ্টি হয়। এর পরিচয় হচ্ছে অত্যধিক দুঃখ ও বেদনা হওয়া, অশ্রু বিসর্জন করা এবং প্রচুর কান্নাকাটি করা; যেমন কেউ আপন সন্তান অথবা কোন প্রিয়জনের বিপদ সম্পর্কে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে এবং প্রচুর কান্নাকাটি করে।

এখন প্রশ্ন হল নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কি, জাহান্নামের অগ্নির চেয়ে বড় বিপদ আর কি এবং গোনাহের চেয়ে বেশী আযাব নাযিল হওয়ার প্রমাণ কোন্‌টি? বরং একজন মানুষ যাকে চিকিৎসক বলা হয়, সে যদি কোন ব্যক্তিকে বলে দেয়, তোমার পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে অতিসত্বর মারা যাবে, তবে তৎক্ষণাৎ সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পরে এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অথচ পুত্র প্রাণাধিক প্রিয় নয় এবং ডাক্তারও আল্লাহ ও রসূলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও সত্যবাদী নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের উচিত নিজের দুরবস্থার জন্যে অধিক দুশ্চিন্তা ও দুঃখ করা। দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অনুতাপ যত বেশী হবে, সে পরিমাণে গোনাহ দূর হওয়ার আশা করা যাবে। মোটকথা, অন্তরের বিনম্রতা এবং অশ্রুপাত হল বিশুদ্ধ অনুশোচনার লক্ষণ। হাদীসে বর্ণিত আছে, তওবাকারীদের সংসর্গ অবলম্বন কর। তাদের অন্তর খুব নরম থাকে।

অন্তরে গোনাহের স্বাদের পরিবর্তে তিক্ততা প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অনুশোচনার একটি লক্ষণ। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহ করার পর অনেক বছর পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকে। কিন্তু তওবা কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। অগত্যা সে সমসাময়িক পয়গম্বরের কাছে সুপারিশ প্রার্থী হল। পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যদি ভূ-পৃষ্ঠের সকলেই তার জন্যে সুপারিশ করে, ত ু আমি তার তওবা কবুল করব না— যতক্ষণ পর্যন্ত যে নাহ থেকে সে তওবা করেছে, তার স্বাদ তার অন্তরে থাকবে।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, গোনাহ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কাছে সুস্বাদু হয়ে থাকে। সুতরাং এর তিক্ততা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে কিরূপে? জওয়াব এই যে, মনে কর কেউ বিষ মিশ্রিত মধু পান করল। অধিক মিষ্ট হওয়ার কারণে সে পান করার সময় বিষ টের পেল না। এরপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে গেল। এখন যদি কেউ তার সামনে পূর্ববৎ বিষ মিশ্রিত মধু পেশ করে এবং সেও চরম ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়, তবে সে এই মধুকে ঘৃণা করবে কি না? যদি বল করবে না তবে এটা অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। নিয়ম এই যে, এহেন কষ্ট ভোগ করার পর যদি কেউ খাঁটি মধুও পেশ করে, তবে একরূপ রঙ দেখে তা-ও প্রত্যাখ্যান করবে। কথায় বলে চুন খেয়ে মুখ পুড়লে দৈ দেখলেও ভয় লাগে। অতএব, তওবাকারী ব্যক্তি অন্তরে গোনাহের যে তিক্ততা অনুভব করে, তাও এমনিভাবে বুঝা দরকার। প্রথমে সে জানে, প্রত্যেক গোনাহের স্বাদ মধুর মত মিষ্ট। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বিষের অনুরূপ। এরূপ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তওবা খাঁটি ও সাচ্চা হয় না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস খুব বিরল। তাই তওবা এবং তওবাকারীও বিরল। সকলেরই এক অবস্থা। তারা আল্লাহর প্রতি বিমুখ এবং গোনাহে অবিচল।

এখন সংকল্প সম্পর্কে বলা যাক। এটা অনুশোচনা থেকে উৎপন্ন হয় এবং তিনটি কালের সাথেই এর সম্পর্ক। বর্তমানকালে সংকল্পের অর্থ এই যে, যে নিষিদ্ধ কাজ করে যাচ্ছে, তা বর্জন করবে এবং যে ফরয কর্ম করার উদ্যোগ নিয়েছে, তা তখনই আদায় করে নেবে। অতীতকালে সংকল্পের মানে এই যে, পূর্বে যে ক্রুটি হয়ে গেছে, তা পূরণ করবে। ভবিষ্যতকালে সংকল্পের উদ্দেশ্য হল মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত-বন্দেগী অব্যাহত রাখবে এবং গোনাহ বর্জন করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতীতকালের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত এই যে, চিন্তা করে বের করবে কোন্ দিন সে বালেগ হয়েছিল। এটা জানা হয়ে গেলে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যতুটুকু বয়স হয়েছে, তার এক এক বছর, মাস ও দিনের মধ্যে খোঁজ করে দেখবে কোন্ এবাদতে সে ত্রুটি করেছে অথবা কি পরিমাণ গোনাহ করেছে। যদি জানা যায় যে, কতক নামায সে পড়েনি, তবে সেই নামাযের কাযা পড়বে। এরূপ নামাযের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলে বালেগ হওয়ার দিন থেকে হিসাব করে যে পরিমাণ নামায নিশ্চিতরূপে আদায় করা হয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নামাযের কাযা পড়বে। এরূপ নামাযের সংখ্যা আন্দাজ করে নেয়াও জায়েয। রোযার ক্ষেত্রেও এভাবে আন্দাজ করে নেবে, কয়টি রোযা রাখা হয়নি। এরপর সেগুলোর কাযা করে নেবে। যাকাত না দিয়ে থাকলে নিজের সমস্ত ধন -সম্পদকে দেখবে, কবে থেকে তার মালিকানায় এসেছে। তবে এতে বালেগ হওয়ার শর্ত নেই। কেননা, নাবালেগের মালেও যাকাত ফরয হয়। অতঃপর হিসাব করে প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে, তা আদায় করে দেবে। এ হচ্ছে এবাদতে খোঁজাখুঁজি করে ত্রুটি জানা ও তা পূরণ করার পদ্ধতি।

গোনাহের ক্ষেত্রে উপায় এই যে, বালেগ হওয়ার শুরু থেকে তওবার দিন পর্যন্ত নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ দিন ও ঘন্টায় চিন্তা করবে এবং পৃথক পৃথক গোনাহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে। এরপর দেখবে এসব গোনাহের কোন্ কোন্টি আল্লাহর হক সম্পর্কিত এবং কোন্ কোন্টি বান্দার হক সম্পর্কিত। যে সকল গোনাহ্ আল্লাহর হক সম্পর্কিত, সেগুলো থেকে তওবার উপায় হচ্ছে দুঃখ ও অনুতাপ করা এবং প্রত্যেক গোনাহের বিনিময়ে সৎকর্ম করা। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ গোনাহ হবে, সে পরিমাণে সৎকর্ম করতে হবে। কারণ, হাদীসে আছে—তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং গোনাহের পশ্চাতে সৎকর্ম সম্পাদন কর; বরং কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ, সৎকর্ম পাপকে মিটিয়ে দেয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেউ বাদ্যযন্ত্র শুনে থাকে, তবে তার বিনিময়ে ততক্ষণ কোরআন, ওয়ায অথবা যিকর শুনবে। মসজিদে নাপাক অবস্থায় বসে থাকলে, ততক্ষণ এতেকাফের নিয়তে বসে এবাদতে মশগুল হবে। উযু ছাড়া কোরআন মজীদ স্পর্শ করে থাকলে তার সম্মান করবে, অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করবে এবং চুম্বন করবে। মদ্যপান করে থাকলে হালাল উপার্জনের শরবত সদকা করবে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক গোনাহের বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা সেই গোনাহের বিপরীত সৎকর্মের আলো ছাড়া দূর হবে না। উদাহরণতঃ কাল রঙ দূর করতে হলে সাদা রঙ প্রয়োগ করতে হবে। উত্তাপ ও শৈত্য দ্বারা তা দূর হবে না। গোনাহ দূর করার জন্যে এ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ ও সহজ– যদিও এক প্রকার এবাদত অব্যাহতভাবে করতে থাকলেও কিছুটা ফল লাভের আশা আছে। বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা গোনাহ দূর হওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল শিকড়। দুনিয়ার অনুগামী হওয়ার প্রভাবে অন্তর দুনিয়ার প্রতি তুষ্ট থাকে এবং তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হয়। অতএব, মুসলমান ব্যক্তির উপর এমন বিপদ আসা জরুরী, যা দ্বারা তার অন্তর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, দুঃখ ও বেদনার কারণে অন্তর দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। এটাও তার জন্যে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

হাদীসে আছে, কতক গোনাহের জন্য কেবল দুঃখ ও বেদনাই হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে—যখন বান্দার গোনাহ বেশী হয়ে যায় এবং কাফফারার জন্যে আমল থাকে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দুঃখ ও কষ্টে ফেলে দেন এবং এ দুঃখ-কষ্টই তার গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট অধিকাংশ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জাঁকজমকের কারণে হয়ে থাকে। এটা গোনাহ। সুতরাং গোনাহের কাফফারা গোনাহ কিরূপে হবে? এর জওয়াব এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত গোনাহ এবং এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকা এ গোনাহের বিনিময়। মহব্বতের চাহিদা অনুযায়ী ভোগ করলে পূর্ণ দোষী হত। বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল বন্দীশালায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে গমন করলে তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দরদী বৃদ্ধ অর্থাৎ হযরত এয়াকুব (আঃ)-কে কি অবস্থায় রেখে এসেছেন? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ তিনি আপনার জন্যে যে দুঃখ সয়েছেন, তা এমন একশ' জন মহিলার দুঃখের সমান, যাদের সন্তান মারা গেছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি আল্লাহর কাছে এই দুঃখ-কষ্টের সওয়াব কি পরিমাণে পাবেন? উত্তর হল ঃ তিনি শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবেন। এ থেকে বুঝা গেল, দুঃখ-কষ্টও আল্লাহর হকের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যে সকল গোনাহ বান্দার হক সম্পর্কিত, সেগুলোতেও আল্লাহ তা'আলার হক থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যুলুম তথা অন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি অপরের প্রতি যুলুম করে, সে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করে। এ ধরনের গোনাহে আল্লাহর হক পূরণ করার উপায় হচ্ছে অনুতাপ ও দুঃখ করা এবং ভবিষ্যতে এরূপ গোনাহ না করা। এ ছাড়া, এ ধরনের গোনাহের বিপরীত পুণ্যকাজ করা। উদাহরণতঃ কারও মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার প্রতি অনুগ্রহ করা। কারও ধন-সম্পদ ছিনিয়ে থাকলে তার কাফফারা স্বরূপ নিজের হালাল ধন-সম্পদ খয়রাত করা। কারও গীবত ও তিরস্কার করে থাকলে তার প্রশংসা কীর্তন করা। কোন মানুষকে হত্যা করে থাকলে ক্রীতদাস মুক্ত করা। কেননা, এটাও এক ধরনের জীবন দান।

তবে বান্দার হক সম্পর্কিত গোনাহসমূহে কেবল অনুতাপ করা এবং বিপরীত সৎকর্ম করাই যথেষ্ট নয়; বরং এ ক্ষেত্রে বান্দার হক আদায় করাও জরুরী। যদি বান্দার হক প্রাণনাশের সাথে সম্পর্ক হয়, যেমন কাউকে ভুলক্রমে খুন করে থাকলে তার তওবা হচ্ছে রক্ত বিনিময় আদায় করা। প্রাপক ব্যক্তিবর্গকে রক্তবিনিময় না দেয়া পর্যন্ত খুনী ব্যক্তি অপরাধমুক্ত হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে থাকে, তবে এর তওবা "কেসাস" তথা খুনের বদলে খুন দ্বারাই গ্রহণীয় হবে। যদি হত্যার ব্যাপারটি অজানা থাকে, তবে হত্যাকারীর জন্যে ওয়াজিব নিহত ব্যক্তির ওলীর কাছে হত্যার কথা স্বীকার করা এবং আত্মসমর্পণ করা। এরপর সে ক্ষমা করুক অথবা হত্যার বদলে হত্যা করুক। এ ছাড়া, হত্যাকারী কিছুতেই পাপমুক্ত হবে না। এখানে হত্যার বিষয় গোপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কিন্তু যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি আল্লাহর হক সম্পর্কিত গোনাহের ক্ষেত্রে তওবার জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং শাস্তির জন্যে ওলীর কাছে আত্মসমর্পণ করা জরুরী নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহ যেমন গোপন রেখেছেন, তেমনি গোপন থাকতে দেয়া এবং নিজের শাস্তি নিজেই সাব্যস্ত করা। যেমন, পাপমোচনের জন্যে নানা রকম সাধনায় রত হওয়া। কেননা, আল্লাহর হক কেবল তওবা ও অনুতাপ দ্বারা মাফ হতে পরে। যদি এসব ক্ষেত্রে তওবাকারী আপন গোনাহ আদালতে পেশ করে শাস্তি গ্রহণ করে, তবে তওবা সঠিক ও যথার্থ হবে এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মায়েয ইবনে মালেক (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আমি নিজের উপর ভয়ানক যুলুম করেছি। আমি যিনা করেছি। হুযুর, আমাকে পাপমুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। দ্বিতীয় দিন তিনি এসে আবারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবারও তার কথা কানে তুললেন না। যখন তৃতীয় দিন এসে একই কথা আরয করলেন, তখন রসূলে করীম (সাঃ) তার জন্যে গর্ত খনন করালেন এবং পাথর মেরে মেরে তার জীবনের অবসান ঘটালেন। তার সম্পর্কে মুসলমানরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল বলছিল ঃ মায়েযের মৃত্যু পাপে পরিবেষ্টিত অবস্থায় হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর দলের অভিমত ছিল মায়েযের তওবার মত খাঁটি কোন তওবা নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় দলের সমর্থন করে বললেন ঃ মায়েয এমন তওবা করেছে, যা সমগ্র উম্মতের মধ্যে বিভাজ্য হতে পারে।

অনুরূপভাবে খামেদিয়া মহিলার ঘটনাও সুবিদিত। সে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ আমি যিনা করেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তার কথা শুনেও শুনলেন না। পরদিন সে আবার আরয করল ঃ আপনি আমাকে পবিত্র করেন না কেন? আপনি কি আমাকে মায়েযের মত মনে করেন? আল্লাহর কসম, আমার তো গর্ভও হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে "হদ" তথা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দেয়া যাবে না। এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে উপস্থিত করল এবং আরয করল ঃ হুযুর! আমার সন্তান হয়ে গেছে। এবার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমাকে শাস্তি দিয়ে পবিত্র করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যাও, তোমার সন্তান যখন দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে, তখন দেখা যাবে। অতঃপর শিশুটি যখন দুধ খাওয়া ছেড়ে খাদ্য খেতে শুরু করল, তখন খামেদিয়া তাকে নিয়ে আবার উপস্থিত হল। শিশুর হাতে তখন একখণ্ড রুটি ছিল। খামেদিয়া আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং রুটি খেতে শুরু করেছে। রসূলে করীম (সাঃ) শিশুটিকে একজন মুসলমানের হাতে সমর্পণ করলেন এবং খামেদিয়ার জন্য গর্ত খনন করালেন। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন। খালেদ ইবনে ওলীদ এসে যখন তার মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, তখন রক্তের ছিটা এসে তার মুখমণ্ডলে পতিত হল। তিনি উত্তেজিত হয়ে খামেদিয়াকে গালি দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার গালি শুনে বললেন ঃ খালেদ গালি দিয়ো না। সেই আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, জরিমানা আদায়কারীর মত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এরূপ তওবা করলে তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। (হাদীসে "মক্স" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সেই জরিমানা, যা উশর আদায়কারী মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করত। এরূপ জরিমানা আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতী হবে না।)

বান্দার হকসমূহের মধ্যে যদি কারও ধনসম্পদ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, আত্মসাৎ, ঠকানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে, তবে এ থেকে তওবা করার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। এতে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলেই সমান। অর্থাৎ সকলকেই তওবা করতে হবে। সুতরাং জীবনের শুরু থেকে তওবার দিন পর্যন্ত পাই পাই করে হিসাব করবে এবং দেখবে তার যিম্মায় কার কত পাওনা হয়েছে। এরপর এসব পাওনা নামে নামে লিপিবদ্ধ করবে এবং পাওনাদারদের খোঁজে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেবে। অথবা যার যা পাওনা, তা শোধ করে দেবে। যদি যথাসাধ্য চেষ্টার পর সকল পাওনাদার অথবা তাদের ওয়ারিসদেরকে তালাশ করা সম্ভব না হয়, তবে বিপুল পরিমাণে সৎকর্ম করবে, যাতে কিয়ামতের দিন এসব সৎকর্মের সওয়াব দিয়ে পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা যায়। সুতরাং মানুষের পাওনার পরিমাণ অনুযায়ী সৎকর্ম করা চাই। যদি সৎকর্ম দ্বারা সকল পাওনা শোধ না হয়, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পাওনাদারদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে, সে অপরের গোনাহের বদলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। যদি কারও ধনসম্পদে হালাল ও হারাম মিশে যায়, তবে আন্দাজ করে হারাম মাল বের করে খয়রাত করে দেবে।

কুৎসা রটনা, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের মনে কষ্ট দিলে তার তওবা হল যাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকবে, তাদের প্রত্যেককে তালাশ করে মাফ করিয়ে নেয়া। যদি তাদের কেউ মারা গিয়ে থাকে অথবা নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার তওবা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, পুণ্যকর্ম অনেক করবে, যাতে কিয়ামতে বিনিময়ে দিতে পারে। যাকে তালাশ করে পাওয়া যায়, সে যদি মনের খুশীতে মাফ করে দেয়, তবে এটা তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যাবে। কিন্তু যে অপরাধ করেছে এবং মুখে যা যা বলেছে, তা মাফ চাওয়ার সময় বর্ণনা করা ওয়াজিব। অস্পষ্ট মাফ করানো যথেষ্ট হবে না। কেননা, এমনও হয় যে, নিজের উপর অপরের বাড়াবাড়ির কথা জানার পর মাফ করতে মন চায় না এবং কিয়ামতেই বিনিময় নেয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তবে যদি এমন কোন অপরাধ করে থাকে, যা বর্ণনা করলে প্রতিপক্ষ মনে ব্যথা পাবে, তবে বুঝতে হবে মাফ করানোর পথ রুদ্ধ। তবে এটা সম্ভব যে, অস্পষ্ট মাফ করিয়ে নিবে এবং পরে যে ক্রুটি থেকে যাবে,তা পুণ্য কর্মের দ্বারা পূরণ করে নেবে। অপরাধ উল্লেখ করার পর প্রতিপক্ষ যদি মাফ করতে সম্মত না হয়, তবে শাস্তি অপরাধীর ঘাড়ে থেকে যাবে। কেননা, প্রতিপক্ষের হক এখনও বহাল রয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধীর উচিত তার সাথে নম্র ব্যবহার করা, তার খেদমত করা এবং তার প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ প্রকাশ করা। এতে প্রতিপক্ষের মন তার প্রতি নরম হবে। কেননা, কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। ফলে, শেষ পর্যন্ত সে মাফ করতে সম্মত হয়ে যাবে। যদি এরপরও মাফ না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, তবে তার নম্রতা ও সদ্ব্যবহার মাঠে মারা যাবে না; বরং এগুলো পুণ্যকর্ম হয়ে যাবে, যা দ্বারা কিয়ামতে বিনিময় দেয়া যাবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

৯৯টি খুন করেছিল। অতঃপর সে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ বর্তমান যুগে সর্ববৃহৎ আলেম কে? লোকেরা বলল ঃ অমুক সন্ন্যাসী। সে তার কাছে গেল এবং বলল ঃ আমি ৯৯টি খুন করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি? সন্ন্যাসী জওয়াব দিল ঃ না। সে সন্ন্যাসীকেও হত্যা করে খুনের সংখ্যা একশতে উন্নীত করে নিল। সে পুনরায় লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ এখন সেরা আলেম কে? লোকেরা জনৈক আলেমের নাম বললে সে তার কাছে গেল এবং বলল ঃ আমি একশ' জনকে হত্যা করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি না? আলেম বলল ঃ তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। যখনই তওবা করবে, কবুল হবে। তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত রয়েছে। তুমিও তাদের সাথে এবাদতে মগ্ন থাক এবং কখনও দেশে ফিরে যেয়ো না। লোকটি অর্ধেক পথ অতিক্রম করতেই মৃত্যু এসে তার সামনে উপস্থিত হল। তখন রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা আগমন করল! তাদের মধ্যে বিতর্ক হল। রহমতের ফেরেশতারা বলল ঃ এ ব্যক্তি তওবা করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে এসেছে। সুতরাং তার রূহ কবয করার অধিকার আমাদের। আযাবের ফেরেশতারা বলল ঃ সে কোন দিন কোন ভাল কাজ করেনি। তাই আমরাই তার রূহের হকদার। ইতিমধ্যে জনৈক ফেরেশতা মানুষের বেশে সেখানে উপস্থিত হল। ফেরেশতাদের উভয় পক্ষ তাকে তাদের ব্যাপারে সালিস করে নিল। সে বলল ঃ এই ব্যক্তির উভয় দিকের দূরত্ব মেপে নেয়া উচিত। যেদিকের দূরত্ব কম হবে, তাকে সেই দিকের গণ্য করতে হবে। দূরত্ব মেপে দেখা গেল, যেদিকে সে যেতে চেয়েছিল, সেদিকের দূরত্ব অর্ধ হাত কম। ফলে, রহমতের ফেরেশতারাই তার রূহ কবয করে নিল। এ থেকে জানা গেল, মুক্তি তখনই পাওয়া যাবে, যখন সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে যদিও তা সামান্যই হয়। এ কারণেই তওবাকারীর জন্যে অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করা জরুরী।

ভবিষ্যতকালের জন্যে তওবাকারীর উচিত আল্লাহ তা'আলার সাথে সেই গোনাহ না করার পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করা। উদাহরণতঃ রোগী রুগ্নাবস্থায় জানতে পারল যে, অমুক ফল তার জন্যে ক্ষতিকর। অতঃপর সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দৃঢ় সংকল্প করল যে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কখনও সেই ফল খাবে না। তার এই সংকল্প তখন তো পাকাপোক্তই হয়ে থাকে– যদিও অন্য সময় খাহেশ প্রবল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, তওবা করার সময় তওবাকারী পাকাপোক্ত সংকল্প করবে। নতুবা তাকে তওবাকারী বলা হবে না। তার এই সংকল্প শুরুতে তখন পূর্ণ হবে, যখন সে নির্জনবাস, নীরবতা, স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও হালাল খাদ্য অবলম্বন করবে। যদি তার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে হালাল উপার্জন বিদ্যমান থাকে অথবা সে জীবন যাপন উপযোগী কোন পেশা করে, তবে এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কেননা, হারাম খাদ্য সকল গোনাহের মূল। হারাম ভক্ষণে অবিচল থাকলে তওবাকারী হবে কিরূপে? যদি তওবাকারী নির্জনবাস অবলম্বন না করে, তবে তওবায় "ইস্তেকামাত" তথা দৃঢ়তা পূর্ণাঙ্গ হবে। কেবল কিছুসংখ্যক গোনাহ যথা মদ, যিনা ও ছিনতাই থেকে তওবা করবে। এটা সর্বাবস্থায় তওবা নয়; বরং কারও কারও মতে এরূপ তওবা জায়েযই নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কতক গোনাহ পরিত্যাগ করা মোটেই উপকারী নয়। কেননা, আমরা জানি, গোনাহ বেশী হলে আযাব বেশী এবং কম হলে আযাব কম হবে। পক্ষান্তরে একদল উপরোক্ত তওবাকে জায়েয বলে থাকে। এর অর্থ এরূপ যে, কতক গোনাহ থেকে তওবা করেই মুক্তি ও সাফল্য অর্জন করা যায়। কেননা, মুক্তি ও সাফল্য বাহ্যত দু'-তিনটি গোনাহ ত্যাগ করলেই অর্জিত হয় না। তবে আল্লাহ তা'আলার গোপন ক্ষমা-রহস্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

কতক গোনাহ থেকে তওবা করার তিনটি সম্ভাব্য প্রকার রয়েছে। প্রথম প্রকার হল শুধু কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা এবং সগীরা গোনাহ থেকে না করা। এটা সম্ভব। কেননা, তওবাকারী জানে, কবীরা গোনাহ আল্লাহর কাছে গুরুতর। এ কারণে তিনি দ্রুত ক্রুদ্ধ হন। পক্ষান্তরে সগীরা গোনাহে ক্ষমা পাওয়ার আশা প্রবল। এই জানার কারণে এটা সম্ভব যে, সে কেবল বড় গোনাহ থেকে তওবা করবে এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। পূর্ববর্তী যুগে অনেক তওবাকারী অতিক্রান্ত হয়েছে; অথচ তাদের মধ্যে কেউ নিষ্পাপ ছিল না। এ থেকে বুঝা যায়, তওবার জন্যে নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় প্রকার হল কতক কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা এবং কতক থেকে না করা। এটাও বাস্তবসম্মত। কেননা, মানুষ বিশ্বাস করে, কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। কিছু কবীরা গোনাহ তীব্র এবং কিছু অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। উদাহরণতঃ কেউ হত্যা, লুণ্ঠন, যুলুম ও অপরের অধিকার হরণ থেকে এই মনে করে তওবা করে যে, এগুলো বান্দার হক, যা কখনও মাফ হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর হক থেকে তওবা করে না এই বিশ্বাসের কারণে যে, এটা ক্ষমাযোগ্য।

তৃতীয় প্রকার হল, একাধিক সগীরা গোনাহ থেকে তওবা করা। কিন্তু কবীরা গোনাহ থেকে জানা সত্ত্বেও তওবা না করা এবং অবিচল থাকা। যেমন, কেউ মাহরাম নয়— এমন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত অথবা গীবত থেকে তওবা করে, কিন্তু মদ্যপান থেকে তওবা করে না। এটাও সম্ভবপর। কেননা, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহকে ভয় করে এবং স্বীয় কার্যকলাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়। কেউ কম, কেউ বেশী। গোনাহে যে পরিমাণে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই পরিমাণে ভয় কম হয়। ফলে, অধিক আনন্দদায়ক গোনাহে আনন্দ প্রবল এবং ভয় দুর্বল হয়ে থাকে। পাপাচারী ব্যক্তি কখনও এমন মাদকাসক্ত হয় যে, সবর করতে পারে না; কিন্তু গীবত, পরনিন্দা ও পরনারীর প্রতি তাকানোর খাহেশ তার মধ্যে মোটেই থাকে না। তার মধ্যে খোদাভীতি এমন থাকে, যা দ্বারা দুর্বল আগ্রহের মূলোৎপাটন করতে পারে কিন্তু প্রবল আগ্রহে পারে না। এই ভয়ের কারণে সে এমন কাজকর্ম বর্জন করে, যার প্রতি আগ্রহ কম। সে মনে মনে বলে, যদি শয়তান কতক গোনাহে আমাকে কাবু করে ফেলে, তবে তারই কাবুতে থাকা আমার জন্যে উচিত হবে না; বরং কতক গোনাহে তার সাথে জেহাদ করে আমাকে বিজয়ী হতে হবে। হয়তো এই বিজয় আমার অন্য গোনাহের জন্যে কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। পাপাচারীর মনে এই ধারণা না থাকলে তার নামায পড়া ও রোযা রাখার কারণ বোধগম্য হয় না। যদি তাকে বলা হয় ঃ তুমি যে নামায পড়, তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হলে নাজায়েয, আর আল্লাহর জন্যে হলে পাপাচারকে আল্লাহর জন্যে বর্জন কর, তবে সে এর জবাবে একথাই বলবে যে, আল্লাহ আমাকে দুটি আদেশ দিয়েছেন। যদি আমি উভয়টি অমান্য করি, তবে দুটি আযাব ভোগ করতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে। আমি একটি আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শয়তানকে পরাভূত করার শক্তি রাখি এবং অপরটি পালনে শয়তানকে পরাস্ত করতে অক্ষম। তাই যে বিষয়ে শক্তি আছে, সে জেহাদ করে আমি শয়তানকে ব্যর্থ করে দেই। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা এই জেহাদকে সে গোনাহের কাফফারা করে দেবেন, যাতে আমি অক্ষম। মোটকথা, এটা নিঃসন্দেহে সম্ভবপর; বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবস্থা তাই। এমন মুসলমান কে, যার মধ্যে এবাদত ও গোনাহের সহ-অবস্থান নেই? এর কারণ উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে প্রশ্ন হয়, যদি কোন ব্যক্তি যিনা করে, এরপর সে পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে এবং তদবস্থায় যিনা থেকে তওবা করে, তবে তার তওবা দুরস্ত হবে কি না? এর জওয়াব এই যে, তওবা দুরস্ত হবে না। কেননা, তওবা এমন অনুতাপকে বলা হয়, যা থেকে এমন কাজ বর্জন করার সংকল্প উৎপন্ন হয়, যা করার ক্ষমতা তওবাকারীর রয়েছে। আর যে কাজ করার ক্ষমতাই নেই, তা তো আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হয়ে যায়, বর্জন করার কারণে অন্তর্হিত হয় না। হ্যাঁ, পুরুষত্ব হারানোর পর যদি সে যিনার ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে এবং তজ্জন্যে তার মধ্যে এমন দুঃখ ও অনুতাপ উথলে উঠে যে, তার মধ্যে পুরুষত্ব থাকলেও তা এই অনুতাপের সামনে পরাভূত হয়ে যেত, তবে এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং এই অনুতাপ তার কাফফারা হয়ে যাবে। সারকথা এই যে, অন্তর থেকে গোনাহের অন্ধকার দূর হওয়ার জন্যে দুটি বিষয় দরকার— এক, অনুতাপের জ্বালা এবং দুই, গোনাহ বর্জনের জন্যে ভবিষ্যতে কঠোর সাধনা। বর্ণিত ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতার কারণে সাধনা হতে পারে না। কিন্তু যদি অনুতাপই এমন শক্তিশালী হয় যে, সাধনা ছাড়াই গোনাহের অন্ধকার দূর করে দেয়, তবে এটা অসম্ভব নয়। অন্যথায় বলতে হবে, তওবাকারীর তওবা তখন কবুল হয়, যখন সে তওবার পর কিছুদিন জীবিত থাকে এবং এই দিনগুলোতে কয়েকবার সেই গোনাহের ব্যাপারে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে নেয়। কিন্তু শরীয়তের কোথাও এরূপ শর্ত বুঝা যায় না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তওবার ব্যাপারে মানুষের স্তরভেদ ঃ জানা উচিত যে, তওবার ব্যাপারে তওবাকারীদের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। পূর্বে যে সকল ত্রুটি করেছিল, সেগুলো পূরণ করবে এবং পুনরায় সেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া গোনাহ করার কথা কল্পনাও করবে না, যেগুলো থেকে মানুষ নবী না হলে অভ্যাসগত ভাবে মুক্ত হয় না। একেই বলা হয় তওবায় অবিচল থাকা এবং এরই নাম "তাওবাতুন্নাসূহ" (খাঁটি তওবা)। এরূপ মনকেই কোরআন পাকে "নাফসে মুতমায়িন্নাহ" (প্রশান্ত মন) বলা হয়েছে, যে তার পরওয়ারদেগারের সামনে সন্তুষ্টচিত্তে উপস্থিত হবে এবং পরওয়ারদেগারও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। নিম্নোক্ত হাদীসে এরূপ তওবাকারীদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ الْمُسْتَهْتِرُوْنَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَوْزَارَهُمْ فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِفَافًا

অর্থাৎ., আল্লাহর যিকিরের প্রতি লোভী ব্যক্তিরা অগ্রগামী হয়েছে। যিকির তাদের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। ফলে, তারা কিয়ামতের ময়দানে হালকা-পাতলা হয়ে পৌঁছেছে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের উপর বোঝা ছিল; কিন্তু যিকিরের ফলে তাদের বোঝা নেমে গেছে।

দ্বিতীয় স্তর এমন তওবাকারীর, যে মৌলিক এবাদত পালনে এবং সকল কবীরা গোনাহ বর্জনে সুদৃঢ় থাকে। এতদসত্ত্বেও এমন গোনাহ্ থেকে মুক্ত নয়, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপন কাজকর্মে এরূপ গোনাহ্ করে ফেলে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপন কাজকর্মে এরূপ গোনাহ্ করে ফেলে, পূর্ব থেকে যায় ইচ্ছা থাকে না। যখন সে এ ধরনের গোনাহ্ করে ফেলে, তখন নিজেকে তিরস্কার করে, লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে এরূপ গোনাহের ধারে-কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। এরূপ মনকে 'নাফসে লাওয়ামা' (তিরস্কারকারী মন) বলা সমীচীন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেননা, অনিচ্ছাকৃত কুকর্মের কারণে এই মন নিজেকে ধিক্কার দেয়। যদিও প্রথম স্তরটি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই স্তরও যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অধিকাংশ তওবাকারীর অবস্থা এমনি হয়ে থাকে। কেননা, কুপ্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত একটি উপাদান। এ থেকে মুক্ত থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে পাপের তুলনায় পুণ্য বেশী করতে পারে, যাতে তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়।

এরূপ তওবাকারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন—

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ـ

অর্থাৎ, যারা ছোটখাটো বিষয় ছাড়া বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকে, তারা ক্ষমা পাবে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার ক্ষমা বিস্তৃত।

মানুষ ইচ্ছা ছাড়াই যে সব সগীরা গোনাহ করে ফেলে, সেগুলো "লামাম" তথা ছোটখাটো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ, আর তারা, যারা কোন অশ্লীল কর্ম করলে অথবা নিজেদের প্রতি অন্যায় করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এখানে নিজেদের প্রতি অন্যায় করা সত্ত্বেও যে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তা এজন্যেই যে, তারা পরবর্তী সময়ে অনুতাপ করেছে এবং নিজেদের তিরস্কৃত করেছে। এরই অনুরূপ স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই হাদীসে—

خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি, যে গোনাহে লিপ্ত হলে তওবা করে।

অন্য হাদীসে আছে—

الْمُؤْمِنُ كَالسُّنْبُلَةِ يَفِيْئُ اَحْيَانًا وَيَمِيْلُ اَحْيَانًا

অর্থাৎ, মুমিন গমের শীষের মত— কখনও গোনাহ থেকে ফিরে আসে আবার কখনও তৎপ্রতি ঝুঁকে পড়ে।

এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ কখনও কখনও গোনাহ করা ঈমানদারের জন্যে জরুরী। এসব রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই পরিমাণ অপরাধের কারণে তওবা ভঙ্গ হয় না এবং এরূপ অপরাধ গোনাহে অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এরূপ তওবাকারীদেরকে নিরাশ করা ফেকাহ্‌বিদদের উচিত নয়। ফেকাহবিদ তো তাকেই বলা হয়, যে মানুষকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহ করার কারণে সৌভাগ্যের স্তরে পৌঁছার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত করে না। হাদীসে বর্ণিত আছে—

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاؤُوْنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ الْمُسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থাৎ, সকল আদম সন্তান গোনাহগার। তবে উত্তম গোনাহ্‌গার তারা, যারা তওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ -

অর্থাৎ, এসব লোকেরা তাদের পুরস্কার দ্বিগুণ পাবে। কারণ, তারা সবর করে এবং পাপকর্মকে সৎকর্মের দ্বারা প্রতিহত করে।

এখানে বলা হয়েছে যে, তারা পাপের পরে পুণ্য করে। এরূপ বলা হয়নি যে, তারা পাপ মোটেই করে না।

তৃতীয় স্তর হল তাদের, যারা তওবা করে কিছুকাল তাতে অটল থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরপর কোন গোনাহের খাহেশ প্রবল হয়ে যায় এবং তা ইচ্ছাকৃতভাবে করে ফেলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যথারীতি এবাদত পালনে সর্বদা তৎপর থাকে এবং খায়েশ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য গোনাহ বর্জন করে। কেবল এক অথবা দু' গোনাহের ব্যাপারে তারা অক্ষম থাকে এবং এগুলো থেকেও তওবা করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে। কিন্তু আজ-কাল করে তা পিছিয়ে দেয়। এরূপ লোকদের শানে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ـ

অর্থাৎ, কিছু লোক তাদের গোনাহ স্বীকার করে। তারা একটি পুণ্যকাজ করে এবং অপরটি পাপকাজ।

আশা করা যায়, এরূপ লোকদের তওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। কিন্তু যেহেতু তারা টালবাহানা করে তওবাকে পিছিয়ে দেয়, এ কারণে তাদের পরিণতি বিপজ্জনকও হতে পারে। কে জানে, তওবার আগেই তাদের মৃত্যু এসে যায় কিনা! এরপর আল্লাহর যা ইচ্ছা, তাই প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপায় তাদের ক্ষতিপূরণ করে নেবেন অথবা তাদের দুর্ভাগ্যই প্রবল হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেনঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

অর্থাৎ, কসম মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।

সুতরাং বান্দা যখন কোন গোনাহে লিপ্ত হয় এবং গোনাহ থাকে নগদ আর তওবা থাকে বাকীর খাতায়, তখন এটা তার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে— বান্দা সত্তর বছর পর্যন্ত জান্নাতীদের অনুরূপ আমল করে। ফলে, মানুষ তাকে জান্নাতী বলতে শুরু করে এবং তার মধ্যে ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জান্নাতের মধ্যে মাত্র অর্ধ হাত ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু ভাগ্যলিপি প্রবল হয় এবং সে দোযখীদের মত আমল করতে থাকে এবং অবশেষে দোযখে পতিত হয়।

চতুর্থ স্তর এমন তওবাকারীর, যারা তওবার পর কিছুদিন তাতে অটল থাকে, এরপর এক গোনাহ অথবা অনেক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অন্তরে তওবা করার ইচ্ছা থাকে না অথবা গোনাহের জন্যে আফসোস করে না। এরূপ ব্যক্তি গোনাহে অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ নফসকে বলা হয় "নাফসে আম্মারা বিসসু" (কুকর্মের আদেশদাতা নফস)। তার পরিণাম মন্দ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। খোদা না করুন, পাপকর্মেই তার জীবনের অবসান ঘটলে সে হবে চরম হতভাগা। পক্ষান্তরে অন্তিম অবস্থা ভাল হলে দোযখ থেকে মুক্তির আশা করা যাবে— যদিও তা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর হয়।

তওবাকারীর গোনাহ হয়ে গেলে কি করবে?

যদি তওবাকারী কোন গোনাহ্ করে ফেলে, তবে তার উপর দুটি বিষয় ওয়াজিব। প্রথমত, সে তওবা ও অনুতাপ করবে। দ্বিতীয়ত, এ গোনাহকে মিটিয়ে ফেলার জন্যে তার বিপরীত কোন পুণ্যকাজ করবে। উপরে এর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যদি খাহেশের প্রাবল্যের কারণে মন ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করার সংকল্প না করে, তবে সে যেন প্রথম ওয়াজিবটি পালনে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ওয়াজিবটিও বর্জন করা সমীচীন হবে না। বরং পুণ্যকাজ সম্পন্ন করে পাপমোচন করার উপায় করতে হবে। এতে কমপক্ষে এটা তো হবে যে, সে পাককাজের সাথে পুণ্যকাজেরও সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হবে। যে সকল পুণ্যকাজ দ্বারা পাপমোচন হয়ে থাকে, সেগুলো অন্তর অথবা জিহ্বা অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং যা দ্বারা পাপ কাজ করা হয়, পুণ্যকাজও তা দ্বারাই সম্পাদন করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি পাপকাজ অন্তর থেকে প্রকাশ পায়, তবে তা মোচন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং পলাতক গোলামের ন্যায় নিজেকে লাঞ্ছিত করতে হবে, যাতে সকলের কাছে স্বীয় লাঞ্ছনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া, অন্তরে এবাদত ও মুসলমানদের শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জিহ্বা দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারার উপায় এই যে, স্বীয় অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করবে এবং বলবে—

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَعَمِلْتُ سُوْءً فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ -

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি এবং কুকর্ম করেছি। অতএব আমার পাপকর্মসমূহ মার্জনা কর।

এছাড়া সওয়াব অধ্যায়ে লিখিত সকল প্রকার এস্তেগফার বলতে থাকবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি এই যে, এগুলো দ্বারা সদকাসহ অন্যান্য সকল প্রকার এবাদত পালন করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে— মানুষ যখন পাপ কাজের পশ্চাতে আটটি কাজ করে, তখন আশা করা যায়, তার সেই পাপ মাফ হয়ে যাবে। এগুলোর মধ্যে চারটি কাজ অন্তর দ্বারা সম্পাদিত হয়। (১) তওবা করা অথবা তওবার সংকল্প করা, (২) গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ভাল মনে হওয়া, (৩) গোনাহের শাস্তিকে ভয় করতে থাকা এবং (৪) গোনাহ মার্জিত হওয়ার আশা করা। অবশিষ্ট চারটি কাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়— (১) গোনাহের পর দু'রাকআত নামায পড়া, (২) এই নামাযের পর সত্তর বার এস্তেগফার এবং একশ' বার "সোবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করা, (৩) কিছু দান-খয়রাত করা এবং (৪) একটি রোযা রাখা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে। পূর্ণাঙ্গ উযু করে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায পড়বে। কতক রেওয়ায়েতে চার রাকআতের উল্লেখ আছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে— যখন কেউ পাপ কাজ করে, তখন তার উচিত এরূপ পুণ্যকাজ করা, যাতে কাটাকাটি হয়ে যায়। গোপন পাপের বিনিময়ে গোপন পুণ্যকাজ করবে এবং প্রকাশ্য পাপের বদলে প্রকাশ্য পুণ্য কাজ করবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, গোপনে দান-খয়রাত করলে রাতের গোনাহ মাফ হয় এবং প্রকাশ্য দান-খয়রাত দ্বারা দিনের গোনাহ মিটে যায়। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি একজন মহিলার সাথে কিছু করেছি— তবে যিনা করিনি। এখন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিধান, তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমার সাথে ফজরের নামায পড়নি? সে বলল ঃ হাঁ পড়েছি। তিনি বললেন ঃ পুণ্য কাজ পাপ কাজকে খেয়ে ফেলে। এ থেকে জানা গেল যে, মহিলাদের সাথে যিনার নিচে যা কিছু করা হয়, তা সগীরা গোনাহ। কারণ, এটা নামায দ্বারা মিটে যায়। কবীরা গোনাহ নামায দ্বারা মিটে না।

মোট কথা, মানুষের উচিত প্রত্যহ আপন ত্রুটিসমূহ একত্রিত করে নফসের কাছ থেকে হিসাব নেয়া এবং এগুলোকে মিটানোর জন্যে পরিশ্রম সহকারে সমপরিমাণ পুণ্য কাজ করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অব্যাহতভাবে গোনাহ করে যায়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে রং-তামাশা করে। সুতরাং অব্যাহত গোনাহ সত্ত্বেও এস্তেগফার কিরূপে উপকারী হবে? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি আমার মৌখিক এস্তেগফার থেকেও এস্তেগফার করি। কেউ কেউ বলেন ঃ শুধু মুখে এস্তেগফার পড়া মিথ্যুকদের তওবা। হযরত রাবেয়া বলেন ঃ আমাদের এস্তেগফারের জন্যে অনেক এস্তেগফার দরকার। এখন প্রশ্ন হল, এসব রেওয়ায়েতে কোন্ এস্তেগফার বুঝানো হয়েছে? এর জওয়াব এই যে, এস্তেগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আল্লাহ পাক রসূলে করীম (সাঃ)-এর শারীরিক উপস্থিতির যে প্রভাব বর্ণনা করেছেন, এস্তেগফারের প্রভাবও তাই ব্যক্ত করেছেন। এস্তেগফারের এর চেয়ে বড় মাহাত্ম্য আর কি হবে? এরশাদ হয়েছে—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থাৎ, আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না এবং আল্লাহ তাদের শাস্তিদাতা নন যে পর্যন্ত তারা এস্তেগফার করে।

এ কারণেই কোন কোন সাহাবী বলতেন ঃ আমাদের জন্যে দুটি আশ্রয় ছিল। তন্মধ্যে একটি আশ্রয় উঠে গেছে; অর্থাৎ জনাব সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ)-এর উপস্থিতি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। আর দ্বিতীয় আশ্রয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, এস্তেগফার এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যদি এটাও বিদায় নেয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এখন শুনুন, যে এস্তেগফার মিথ্যুকদের তওবা, তা কেবল মৌখিক এস্তেগফার; অর্থাৎ যার মধ্যে অন্তরের সংযোগ মোটেই নেই। যেমন, মানুষ অভ্যাসগতভাবে অনবধানতার ছলে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলে দেয় অথবা দোযখের বর্ণনা শুনে "নাউযুবিল্লাহ" উচ্চারণ করে, অথচ অন্তরে এর কোন প্রভাব থাকে না। এই এস্তেগফারে কেবল জিহ্বা নড়াচড়া করে। এতে কোন উপকার নেই। হাঁ, যদি এর সাথে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ভাব যোগ হয় এবং সত্যিকার ইচ্ছা, খাঁটি নিয়ত ও পূর্ণ আগ্রহ সহকারে মাগফেরাত কামনা করা হয়, তবে এটা নিঃসন্দেহে একটি পুণ্য কাজ। এস্তেগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে এই এস্তেগফারই উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে—

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করে, সে অব্যাহতভাবে গোনাহকারী নয়— যদি দিনে সত্তর বারও গোনাহ করে।

এ হাদীসে এস্তেগফারের অর্থ আন্তরিক এস্তেগফার। তওবা ও এস্তেগফারের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। প্রাথমিক স্তরগুলোও উপকার থেকে খালি নয়— যদিও শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছা নসীব না হয়। এ কারণেই হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ বান্দার সর্বাবস্থায় তার প্রভুর প্রয়োজন। তাই সকল বিষয়ে প্রভুর দিকে রুজু করা তার জন্যে উত্তম। উদাহরণতঃ সে যদি গোনাহে লিপ্ত হয়, তবে এরূপ প্রার্থনা করবে ঃ ইলাহী, আমার রহস্য ফাঁস করো না। গোনাহ সমাপ্ত হওয়ার পর এরূপ দোয়া করবে ঃ প্রভু, আমার তওবা কবুল কর এবং তওবার পর আরয করবে ঃ ইলাহী, আমাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রভূত শক্তি দান কর। এমনিভাবে বান্দা যখন কোন উত্তম কাজ করবে, তখন অনুনয় করে বলবে, আল্লাহ, আমার এ আমলটি কবুল কর। জনৈক ব্যক্তি হযরত সহলকে জিজ্ঞেস করল ঃ যে এস্তেগফার গোনাহকে বিলীন করে দেয়, সেটি কোনটি? তিনি বললেন ঃ প্রথমে এস্তেজাবত; এরপর এনাবত, এরপর তওবা। এস্তেজাবতের অর্থ হচ্ছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহ; যেমন দু'রাকআত নামায ও দোয়া। এনাবতের মানে হচ্ছে অন্তরের আমলসমূহ; যেমন সত্যিকার ইচ্ছা, খাঁটি নিয়ত ইত্যাদি। আর তওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা।

তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু— এই হাদীস সম্পর্কে হযরত সহলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ বন্ধু তখন হয়, যখন এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ তার মধ্যে পাওয়া যায়—

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ, তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরকারী ....।

তিনি আরও বললেন ঃ বন্ধু তাকে বলা হয়, যে বন্ধুর অপ্রিয় বিষয়সমূহের ধারে-কাছেও যায় না। সারকথা এই যে, তওবার ফলাফল দুটি— এক, গোনাহকে এমনভাবে বিলুপ্ত করা যেন সে গোনাহ করেইনি এবং দুই, বন্ধু হয়ে যাওয়ার জন্যে মর্তবা লাভ করা। অন্তর দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুণ্যকাজ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যদিও প্রাথমিক স্তরে অব্যাহত গোনাহের সমস্যার সমাধান করে না, তথাপি উপকার থেকে খালি নয়। সুতরাং এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এরূপ এস্তেগফার ও পুণ্যকাজ করা-না করা উভয় সমান। বরং অধ্যাত্মবিদগণ নিশ্চিতরূপে জানেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি যথার্থ—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

অর্থাৎ, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।

সৎকর্মের প্রত্যেক অণুতে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই থাকে, যেমন নিক্তির একদিকে একটি চাউল রেখে দিলে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়বে। একটি চাউলের কোন প্রভাব না থাকলে দ্বিতীয় চাউল রেখে দিলেও কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রভাব না হওয়া উচিত। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, বেশী পরিমাণ চাউল রাখলেও পাল্লা ঝুঁকবে না। অথচ এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অণু পরিমাণ সৎকর্মের অবস্থাও তদ্রূপ। এর দ্বারাও আমলের দাঁড়িপাল্লা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। অতএব, সামান্য পরিমাণ সৎকর্ম ও অণু পরিমাণ এবাদতকে হেয় মনে করে বর্জন করা উচিত নয় এবং কোন সামান্য গোনাহকে সামান্য মনে করে তা করে ফেলা সমীচীন নয়। কেননা, বলা হয়, "কণা কণা বালুকায় সাহারা সৃজন।" আমাদের মতে মুখে এস্তেগফার বলাও পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কোন মুসলমানের গীবত অথবা অনর্থক কথা বলার জন্যে জিহ্বাকে নাড়াচাড়া করার তুলনায় সে সময় অনবধানতার সাথে এস্তেগফার উচ্চারণ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। আর চুপ থাকার তুলনায়ও উত্তম।

জনৈক মুরীদ তার মুরশিদ আবু উসমান মাগরেবীর খেদমতে আরয করল ঃ আমার জিহ্বা মাঝে মাঝে যিকির ও কোরআন পাঠ করতে শুরু করে; অথচ আমার অন্তর গাফেল থাকে। মুরশিদ বললেন ঃ আল্লাহর শোকর কর। তিনি তোমার একটি অঙ্গকে পুণ্য কাজে নিয়োজিত করে দেন— কুকর্ম ও অনর্থক কাজে অভ্যস্ত করেন না। নিঃসন্দেহে এই বুযুর্গের উক্তি সত্য। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি স্বাভাবিক বিষয়াদির মত পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে এটা অনেক গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার কারণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ এস্তেগফারে অভ্যস্ত ব্যক্তি যখন কারও মুখে মিথ্যা কথা শুনবে, তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে— 'আস্তাগফিরুল্লাহ।" আর অনর্থক কথায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মিথ্যা শুনে মন্তব্য করবে— তুমি বড় মিথ্যাবাদী। অথবা এক ব্যক্তি "নাউযুবিল্লাহ" বলায় অভ্যস্ত। সে কোন দুষ্টের দুষ্টামি শুনে অভ্যাসবশত বলে উঠবে— "নাউযুবিল্লাহ"। যদি সে অনর্থক ভাষণে অভ্যস্ত হত, তবে বলত— তোমার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। এখানে একটি কথা বলার কারণে সে গোনাহগার হবে এবং অপর কথাটি বলার কারণে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকা জিহ্বার পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হওয়ারই প্রভাব।

"আমাদের এস্তেগফারের জন্য অনেক এস্তেগফার দরকার"— হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাবেয়ার এ উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের এস্তেগফারে অন্তর গাফেল থাকে এবং শুধু জিহ্বা নড়াচড়া করে। অন্তরের এই গাফলতির কারণে এ ধরনের এস্তেগফার দরকার। জিহ্বার নড়াচড়ার নিন্দা করা এ উক্তির উদ্দেশ্য নয়; বরং আন্তরিক গাফলতিকে তিরস্কার করা লক্ষ্য। এর কারণেই এস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, কণা পরিমাণ পুণ্যকাজ এবং সামান্যতম গোনাহকেও হেয় ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের ভিতর লুক্কায়িত রেখেছেন। (১) তিনি নিজের সন্তুষ্টিকে এবাদতের ভেতর গোপন রেখেছেন। সুতরাং কোন এবাদতকে তুচ্ছ মনে করো না। তুমি যাকে তুচ্ছ মনে করবে, হয়তো তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লুক্কায়িত রয়েছে। (২) তিনি আপন গযবকে গোনাহের ভেতরে গোপন রেখেছেন। সুতরাং কোন গোনাহকে ক্ষুদ্র মনে করো না। হয়তো এর মধ্যেই আল্লাহর গযব লুক্কায়িত রয়েছে। (৩) তিনি আপন বন্ধুত্বকে বান্দাদের ভেতরে গোপন রখেছেন। অতএব, কোন বান্দাকে অবজ্ঞা করো না। হয়তো আল্লাহর বন্ধু সে-ই।

হযরত জাফর সাদেক অতঃপর আরও বলেন ঃ "এজাবত" তথা সাড়াদানকেও আল্লাহ তা'আলা দোয়ার ভেতরে গুপ্ত রেখেছেন। সুতরাং কোন দোয়া বর্জন করো না। হয়তো সাড়াদান তার মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ দুই প্রকার। (১) এমন মানুষ, যাদের মন্দ কাজ-কর্মের প্রতি প্রবণতা নেই এবং যারা অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যের উপরই লালিত-পালিত হয়। এরূপ মানুষ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে—

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَ لَهُ صَبْوَةٌ اِلَى الْجَهْلِ وَاللَّهْوِ

অর্থাৎ, তোমার পরওয়ারদেগার এমন যুবককে পছন্দ করেন, যার মূর্খতা ও হাস্য-কৌতুকের প্রবণতা নেই।

কিন্তু এ ধরনের মানুষ বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। (২) দ্বিতীয় প্রকার এমন মানুষ, যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। এদের এক প্রকার অব্যাহতভাবে গোনাহকারী এবং দ্বিতীয় প্রকার তওবাকারী। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার ও চিকিৎসার বর্ণনা করা।

বলা বাহুল্য, চিকিৎসা ছাড়া আরোগ্যলাভ সম্ভব হয় না। যেহেতু রোগের কারণসমূহের বিপরীত কাজ করার নাম চিকিৎসা, তাই যে ব্যক্তি রোগের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে না, সে চিকিৎসার ব্যাপারেও অজ্ঞাত থাকবে। কারণজনিত রোগের চিকিৎসা হচ্ছে সেই কারণকে নির্মূল ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়। এখন অব্যাহত গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যাবে. এর কারণ হচ্ছে গাফলতি তথা অনবধানতা ও খাহেশ। তন্মধ্যে গাফলতি সকল অনিষ্টের মূল। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, এরাই গাফেল। বস্তুত আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব গাফলতি ও খাহেশের বিপরীত বিষয় দ্বারাই অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার করতে হবে। গাফলতির বিপরীত বিষয় হচ্ছে সচেতনতা এবং খাহেশের বিপরীত বিষয় খাহেশ-উদ্দীপক বিষয়াদি বর্জনে সবর করা। সুতরাং অব্যাহত গোনাহের চিকিৎসা এমন ঔষধ দ্বারা করতে হবে, যার মধ্যে সচেতনতার মিষ্টতা ও সবরের তিক্ততা উভয়টি বিদ্যমান। জানা উচিত যে, সকল জ্ঞান ও সচেতনতাই আন্তরিক রোগের চিকিৎসা। কিন্তু প্রত্যেক রোগের জন্যে এক বিশেষ জ্ঞান নির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা এখানে অব্যাহত গোনাহের সেই বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করব, যা এ রোগে ফলপ্রদ। তবে সহজে বুঝার জন্যে দৈহিক রোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব।

প্রথমেই জানা দরকার যে, রোগীকে কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বাসী হতে হয়। প্রথমত, মানতে হবে যে, রোগ ও সুস্থতা উভয়টির জন্যে কিছু কিছু কারণ রয়েছে, যা আল্লাহ পাক আমাদের এখতিয়ারে রেখে দিয়েছেন। এতে মূল চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস জন্মে। যার এই বিশ্বাস নেই, সে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাও করায় না এবং মৃত্যুর উপযুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অব্যাহত গোনাহ রোগে প্রথমে মূল শরীয়তের প্রতি ঈমান থাকা চাই। অর্থাৎ, বিশ্বাস থাকতে হবে যে, পারলৌকিক সৌভাগ্যেরও একটি কারণ আছে, যাকে এবাদত বলা হয় আর পারলৌকিক দুর্ভাগ্যেরও একটি কারণ আছে, যাকে পাপ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ চিকিৎসকের প্রতি রোগীর এরূপ আস্থা থাকা দরকার যে, সে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিচক্ষণ। তার দেয়া ঔষধ সঠিক কাজ করে। সে কখনও ভুল চিকিৎসা করে না। এমনিভাবে যারা অব্যাহত গোনাহে লিপ্ত, তাদের ঈমান থাকতে হবে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সত্যবাদী। তিনি যা বলেছেন, বাস্তবে তাই হবে। চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হবে না।

তৃতীয়ত, রোগীর উচিত চিকিৎসক যেসব ফল খেতে নিষেধ করে, সেগুলো না খাওয়া এবং যেসব ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকা, যাতে পরহেয না করার ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে যায়। এমনিভাবে অব্যাহত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সে সমস্ত আয়াত ও হাদীস শ্রবণ ও মান্য করা উচিত, যেগুলোতে "তাকওয়া" তথা পরহেযগারীর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এতে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে এবং সবর শক্তিশালী হবে, যা এই চিকিৎসার পরবর্তী স্তম্ভ।

চতুর্থত, রোগীর উচিত চিকিৎসক তার বিশেষ রোগের জন্য যা বলে দেয় এবং যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ করে দেয়, সেগুলোর প্রতি খুব মনোযোগী হওয়া। অর্থাৎ, প্রথমে সে নিজের অবস্থা, ক্রিয়াকর্ম ও পানাহারের বিবরণ চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেবে যে, কোন্ বস্তু তার বিশেষ রোগের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, প্রত্যেক রোগীর প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ করা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক বিশেষ রোগের জন্যে বিশেষ চিকিৎসা রয়েছে। এমনিভাবে প্রত্যেক মানুষ সকল খাহেশ ও সকল গোনাহে লিপ্ত হয় না। প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি বিশেষ এক গোনাহ্ অথবা বিশেষ কিছু গোনাহে লিপ্ত থাকে। তার প্রথমে জানতে হবে এর দ্বারা ধর্মের কতটুকু ক্ষতি হয়। এরপর জানা দরকার এ থেকে সবর কিভাবে করা যায় এবং যে গোনাহ হয়েছে, তা কিভাবে মিটানো যায়!

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিশেষভাবে আলেমদের কাছ থেকেই লাভ করা যায়, যারা পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। সুতরাং গোনাহগার ব্যক্তি যখন নিজের গোনাহ জেনে নেয়, তখন তার এই রোগের চিকিৎসা কোন চিকিৎসক অর্থাৎ আলেমে দ্বীন দ্বারা শুরু করা উচিত। রোগী যদি নিজের রোগ জানতে না পারে, তবে আলেমের উচিত তাকে তার রোগের কথা বলে দেয়া। এর উপায় এই যে, প্রত্যেক আলেম এক একটি মহল্লা অথবা গ্রামের দায়িত্ব নেবে এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করবে। তাদের জন্যে যেসব বিষয় উপকারী এবং যেসব বিষয় ক্ষতিকর, তা পৃথক পৃথক ভাবে বলে দেবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে। সে এই অপেক্ষায় থাকবে না যে, কেউ এসে নিজের রোগের কথা তাকে বলবে; বরং স্বয়ং মানুষকে ডেকে এনে উপদেশ দেবে। কেননা, আলেম সমাজ পয়গম্বরগণের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। পয়গম্বরগণ মানুষকে মূর্খতার উপর ছেড়ে দেননি; বরং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদেরকে সমাবেশে একত্রিত করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন। শুরুতে তাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়েছেন এবং এক একজনকে তালাশ করে হেদায়াত করেছেন। কেননা, যারা অন্তরের রোগী, তারা তাদের রোগের অবস্থা জানে না। যেমন, কারও মুখমন্ডলে যদি ধবলকুষ্ঠের দাগ থাকে এবং তার কাছে আয়না না থাকে, তবে সে তার রোগের অবস্থা জানতে পারবে না যে পর্যন্ত অন্য কেউ তাকে বলে না দেয়। এটা সকল আলেমের উপর ফরযে আইন। শাসকবর্গের কর্তব্য প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় একজন করে দ্বীনদার ফেকাহবিদ আলেম নিযুক্ত করা। যদি কোন ব্যক্তি আলেমের বর্ণিত চিকিৎসা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে শাসকদের হাতে সোপর্দ করা উচিত, যাতে তারা তার অনিষ্ট থেকে জনগণকে রক্ষা করে। যেমন কেউ বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে তার উৎপাত থেকে জনসাধারণ রক্ষা পায়।

আন্তরিক রোগ দৈহিক রোগের তুলনায় অনেক বেশী। এর কারণ তিনটি। প্রথমত, অন্তরের রোগী জানে না যে, সে রোগী। দ্বিতীয়ত, এ রোগের পরিণতি দুনিয়াতে প্রত্যক্ষ হয় না। দৈহিক রোগের পরিণতি মৃত্যু তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে। গোনাহের পরিণতি অন্তরের মৃত্যু, যা দুনিয়াতে জানা যায় না। তাই গোনাহের প্রতি ঘৃণা কম হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এ রোগের চিকিৎসক দুর্লভ। কারণ, এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে আলেম সম্প্রদায়। বর্তমান যুগে তারা নিজেরাই কঠিন রোগে আক্রান্ত। যেহেতু প্রায় সকলেই রোগাক্রান্ত, তাই তাদের রোগের ক্ষতি ও কুফল প্রকাশমান নয়। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং এমন কথা বলে, যা দ্বারা তাদের রোগ আরও বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, সর্বনাশা রোগ হচ্ছে দুনিয়ার মোহ। আর এ রোগটিই চিকিৎসক তথা আলেমদের ভেতরে প্রবল। তারা মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে সতর্ক করে না এই ভয়ে যে, কেউ যদি বলে দেয় অপরকে উপদেশ না দিয়ে নিজে আত্মরক্ষা করুন! এ কারণেই রোগটি ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। না আছে ঔষধ, না আছে চিকিৎসকের নাম-নিশানা। তারা যখন ওয়ায করে, তখন বেশীর ভাগ উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, কোনরূপে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হোক। এটা মানুষকে মাগফেরাতের আশায় আশান্বিত করা ছাড়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হতে পারে না। তাই ওয়াযের মধ্যে আশার কারণসমূহ ও রহমতের প্রমাণসমূহ অধিক বর্ণনা করা হয়। এরূপ ওয়ায শুনে যখন মানুষ ঘরে ফিরে, তখন গোনাহের সাহস আরও বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অনুকম্পার উপর ভরসা বেড়ে যায়। যদিও আশা ও ভয় উভয়টিই প্রতিকার; কিন্তু দু'ব্যক্তির জন্যে, যারা পৃথক পৃথক রোগে আক্রান্ত। যে ব্যক্তির মধ্যে ভয় এত প্রবল যে, সংসারধর্ম বিসর্জন দিতে চায় এবং যে কাজ করতে অক্ষম, তার সাথে নিজেকে জড়িত করে ফেলে, এরূপ ব্যক্তির অধিক ভয়কে আশার কারণসমূহ বর্ণনা করে হ্রাস করা উচিত, যাতে তার ভয় ভারসাম্যের পর্যায়ে চলে আসে। কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কৃপার উপর গর্বিত, তার চিকিৎসা ভয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মোটকথা, চিকিৎসকদের নষ্টামির কারণে রোগ দুরারোগ্য হয়ে গেছে।

এখন আমরা ওয়াযের উপকারী পদ্ধতি বর্ণনা করব। যদিও এটা নাতিদীর্ঘ, কিন্তু আমরা কয়েক প্রকার বিষয়বস্তু উল্লেখ করব, যাতে মানুষ অব্যাহত গোনাহ বর্জন করতে সক্ষম হবে। ওয়াযে চার প্রকার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা জরুরী। প্রথমত, কোরআন মজীদে গোনাহগারদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যে যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করবে। এমনিভাবে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ উল্লেখ করবে। উদাহরণতঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন— প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় দু'জন ফেরেশতা একে অপরের কথার জওয়াব দেয়। এক ফেরেশতা বলে ঃ মানবকুল সৃজিত না হলেই ভাল হত! অন্য ফেরেশতা বলে ঃ চমৎকার হত যদি মানবকুল তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে পারত! প্রথম ফেরেশতা বলে ঃ তারা যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানল না, তখন যদি নিজেদের জ্ঞান দ্বারাই আমল করে নিত! এক রেওয়ায়েতে আছে, ভাল হত যদি তারা পরস্পর বসে জানা বিষয়গুলোর চর্চা করত! অন্য ফেরেশতা বলে ঃ তারা যদি আপন কুকর্ম থেকে তওবা করে নিত!

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ ছয় ঘন্টা পর্যন্ত এই গোনাহটি লিপিবদ্ধ করো না। যদি এ সময়ের মধ্যে সে তওবা ও এস্তেগফার করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নেয়, তবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। নতুবা আমলনামায় লিখে নেয়া হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ করার সময় বান্দা যে জায়গায় থাকে, সেই জায়গার মাটি আল্লাহর দরবারে আরয করে– আদেশ হলে আমি তাকে গিলে ফেলি। তার মাথার উপরের আকাশ আল্লাহর কাছে বলে- আদেশ হলে আমি তার উপর ভেঙ্গে পড়ি! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে বলেন, আমার বান্দা থেকে বিরত থাক। তোমরা তাকে সৃষ্টি করনি। তোমরা সৃষ্টি করলে তার প্রতি তোমাদের দয়া হত। হয়তো সে তওবা করবে এবং আমি ক্ষমা করে দেব, অথবা এই গোনাহের বিনিময়ে কোন সৎকর্ম করবে এবং আমি এ গোনাহকেও পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেব। নিম্নোক্ত আয়াতে এটাই বুঝানো হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اَنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ .

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ধারণ করে রাখেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কেউ এগুলোকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— মোহরকারী ফেরেশতা আরশের সন্নিকটে অপেক্ষমাণ রয়েছে। যখন কোন বড় ধরনের দুষ্কর্ম সংঘটিত হয় এবং হারাম বস্তুসমূহকে হালাল মনে করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। সে মানুষের অন্তরে মোহর লাগিয়ে যায়। ফলে, অন্তরের অভ্যন্তরস্থ বিষয়সমূহ সেখানেই থেকে যায়— প্রকাশের পথ পায় না। হযরত মুজাহিদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— অন্তর হাতের খোলা তালুর মত। যখন মানুষ গোনাহ করে, তখন একটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে একে একে সবগুলো আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এটা অন্তরের তালা। গোনাহের নিন্দা ও তওবাকারীদের প্রশংসায় এমনি ধরনের রেওয়ায়েত বহুল পরিমাণে বর্ণনা করা উচিত।

দ্বিতীয় বর্ণনাযোগ্য বিষয় হচ্ছে পয়গম্বর ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কাহিনী যে, ভুলভ্রান্তির কারণেই তাদের উপর কেমন বিপদাপদ এসেছে! এ ধরনের কাহিনী অন্তরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং উপকার অনুভূত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদাহরণতঃ হযরত আদম (আঃ) ভুলের কারণে কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন! জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বর্ণিত আছে, তিনি যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন, তখন দেহ থেকে জান্নাতী পোশাক উড়ে গেল এবং তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আরশের উপর থেকে আওয়াজ এল ঃ তোমরা উভয়ে আমার কাছ থেকে নেমে যাও। যে আমার অবাধ্য, তার ঠিকানা আমার কাছে হতে পারে না। হযরত আদম (আঃ) কেঁদে বিবি হাওয়াকে বললেন ঃ একটি মাত্র ভ্রান্তির প্রথম পরিণতিতে আমরা প্রেমাস্পদের কাছ থেকে বিতাড়িত হলাম। বর্ণিত আছে, সোলায়মান ইবনে দাঊদ (আঃ)-ও আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছিলেন। এর কারণ ছিল সেই চিত্র, যার পূজা তাঁর গৃহে চল্লিশ দিন পর্যন্ত করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তার একটি ছিল এই যে, জনৈকা মহিলা তার পিতার অনুকূলে মোকদ্দমায় রায় দেয়ার জন্যে তাঁকে বলেছিল এবং তিনি তাই করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু পরে সেরূপ করেননি। কারও মতে অপরাধ ছিল এই যে, সেই মহিলার খাতিরে তার পিতাকে মামলায় জিতিয়ে দেয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল।

মোটকথা, এরূপ একটি ভ্রান্তির বিনিময়ে চল্লিশ দিনের জন্যে তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। খাওয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করলে খাদ্যবস্তু উধাও হয়ে যেত। তিনি মানুষকে বলতেন ঃ আমাকে খাবার দাও। আমি সোলায়মান ইবনে দাঊদ। জওয়াবে মানুষ তাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিত। রেওয়ায়েতে আছে, এক বৃদ্ধার কাছে খাদ্য চাইলে সে তাকে শাসিয়ে দিল এবং মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে,এক বৃদ্ধা নোংরা পানির একটি পাত্র তাঁর মাথায় ঢেলে দিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আংটি মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এল এবং চল্লিশ দিন পর তিনি আংটি পরিধান করলেন। তখন পক্ষীকুল পুনরায় তাঁর মাথার উপর ছায়া করে দাঁড়িয়ে গেল এবং জিন, শয়তান বন্য জন্তুরা কাছে এসে গেল। তাদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি বললেন ঃ অতীত কৃতকর্মের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এটা ছিল একটি অবশ্যম্ভাবী ঐশী বিষয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলতে পার, আমি তোমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে তোমার কাছ থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করেছি? তিনি আরয করলেন ঃ জানি না। এরশাদ হল ঃ কারণ, তুমি তার ভাইদেরকে বলেছিলে-

اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ

অর্থাৎ, আমার ভয় হয় বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে অথচ তোমরা থাকবে অসতর্ক।

তুমি বাঘের ভয় করেছ, আমার আশা করনি। তুমি ভাইদের গাফলতির কথা চিন্তা করেছ, আমার হেফাযতের প্রতি লক্ষ্য করনি। আল্লাহ পাক আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি জান, আমি ইউসুফকে কেন ফেরত দিয়েছি? তিনি আরয করলেন ঃ না, জানি না। এরশাদ হল ঃ তুমি বলেছিলে—

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ, হয়তো আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

তুমি আরও বলেছিলে—

اِذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَيْاَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর। তোমরা আল্লাহর কৃপা থেকে নিরাশ হয়ো না।

এতে করে তুমি আমার আশা করেছিলে। তাই আমি তোমাদের মিলন ঘটিয়েছি। অনুরূপভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় শাহী মুসাহিবকে বলেছিলেন ঃ তোমার প্রভুকে আমার আটকে থাকার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তিনি হয়তো আমাকে মুক্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন—

فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

অর্থাৎ, অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে উল্লেখ করার বিষয়টি বিস্মৃত করে দিল। ফলে, ইউসুফকে আরও কয়েক বছর জেলে থাকতে হল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত এ ধরনের অসংখ্য গল্প কেবল কিসসা-কাহিনীর জন্যে নয়; বরং এগুলোতে সচেতন ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। তারা এগুলো দেখে অনুধাবন করতে পারবে যে, পয়গম্বরগণের ছোট ছোট পদস্খলন যখন মার্জিত হয়নি, তখন অন্যদের কবীরা গোনাহ কিরূপে মাফ হবে? তবে পয়গম্বরগণের সাজা দুনিয়াতে হয়ে গেছে— আখেরাতে কোন পাকড়াও হবে না। এটা তাঁদের বৈশিষ্ট্য। যারা হতভাগ্য, দুনিয়াতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়, যাতে পুরামাত্রায় গোনাহ করে নেয়। দুনিয়ার শাস্তি হাল্কা এবং আখেরাতের শাস্তি কঠোরতর। হতভাগাদের কুকর্ম এমনি কঠোর আযাবের যোগ্য। এ কারণেও তাদেরকে দুনিয়াতে অবকাশ দেয়া হয়।

এ ধরনের কথাবার্তা অব্যাহত গোনাহকারীদের সামনে অধিক পরিমাণে বলা উচিত। তওবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এটা প্রায়শ উপকারী হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রকার বিষয়বস্তু একথা বর্ণনা করা যে, দুনিয়াতে বান্দা যে সকল বিপদাপদে পতিত হয়, সেগুলো গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। মানুষ প্রায়ই আখেরাতের ব্যাপারে অলসতা করে; কিন্তু মূর্খতাবশত পার্থিব শাস্তিকে অধিক ভয় করে। অতএব, এ ধরনের মানুষকে এ ধরনের বিষয়বস্তুর দ্বারা হেদায়াতের পথে আনা জরুরী। কেননা, অধিকাংশ সময় গোনাহের অমঙ্গল দুনিয়াতেই মানুষের উপর আপতিত হয়; যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। এমনকি, মাঝে মাঝে গোনাহের দরুন মানুষের রুযী-রোযগার সংকীর্ণ হয়ে যায়। কখনও মানুষের মনে সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ফলে শত্রু প্রবল হয়ে যায়। হাদীসে আছে, গোনাহ করার কারণে বান্দা রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার জানা মতে গোনাহের কারণে মানুষ বিদ্যাশিক্ষা ভুলে যায়। এক হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—যে ব্যক্তি গোনাহ করে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনও ফিরে আসে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মুখমণ্ডল বিশ্রী হওয়া এবং ধনসম্পদ হ্রাস পাওয়ার নাম লা'নত তথা অভিসম্পাত নয়; বরং অভিসম্পাত হল এক গোনাহ থেকে বের হয়ে তারই অনুরূপ অথবা তদপেক্ষা বড় গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়া। বাস্তবে তিনি ঠিকই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলেছেন। কারণ, লা'নতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বঞ্চিত করা এবং রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া। মানুষ যখন সৎকাজের তাওফীক পায় না, তখন রহমত থেকে দূরেই সরে পড়ে। এছাড়া প্রত্যেক গোনাহ অন্য গোনাহের দিকে আহ্বান করে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মানুষ তার আত্মিক খাদ্যরূপী রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ, আলেমদের কাছে বসা এবং সৎকর্মীদের সাথে চলাফেরা করা। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যাতে সৎকর্মীগণও তার প্রতি নারাজ থাকে।

জনৈক অধ্যাত্মবিদের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি পরনের কাপড় উপরে তুলে কর্দমাক্ত পথে চলে যাচ্ছিলেন এবং পদযুগল শক্ত করে মাটিতে রাখছিলেন, যাতে পিছলে না যান। কিন্তু তার পা পিছলে গেল এবং তিনি কাদায় পড়ে গেলেন। এরপর তিনি উঠে কাদার মধ্যেই কেঁদে কেঁদে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ বান্দার অবস্থা হুবহু তাই। সে সর্বদা গোনাহ থেকে বেঁচে চলে। অবশেষে একাধিক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর গোনাহের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, এক গোনাহ থেকে অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়াও গোনাহের অন্যতম শাস্তি।

মোটকথা, আল্লাহওয়ালাদের মতে দুনিয়ার বিপদাপদ গোনাহের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সেমতে হযরত ফুযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন দুনিয়ার দুর্বিপাকে পড়ে, তখন তার জানা উচিত যে, এটা তার গোনাহেরই কারণে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি আমার গাধার অভ্যাসও বিগড়ে যায়, তবে আমি এটাই মনে করব যে, এটা আমারই ত্রুটি-বিচ্যুতির ফল। জনৈক আল্লাহ-ওয়ালা বলেন ঃ আমি আমার গোনাহের শাস্তি গৃহের ইঁদুরের মধ্যেও আছে বলে জানি।

জনৈক সূফী বর্ণনা করেন— আমি সিরিয়ায় একজন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী খৃস্টান বালককে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং অপলক দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য সুধা পান করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমার কাছে ইবনে জালা দামেশকী আগমন করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমি এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় ভীষণ লজ্জিত হলাম। অতঃপর কথা বানিয়ে বললাম ঃ এই বালকের মুখাবয়ব দেখে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, এমন অনিন্দ্য সুন্দর মুখও জাহান্নামের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে? জানি না, এর পেছনে আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কি হেকমত। একথা শুনে ইবনে জালা আমার হাতে চিমটি কেটে বললেন ঃ কয়েক দিন পর তুমি এর শাস্তি পেয়ে যাবে। সূফী বলেন ঃ ত্রিশ বছর পর আমি এর শাস্তি পেয়েছি। আবূ সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ স্বপ্নদোষ হওয়াও গোনাহের একটি শাস্তি। তিনি আরও বলেন ঃ নামাযে জামাত না পাওয়ার বিষয়টিও কোন গোনাহ করার কারণে প্রকাশ পায়। এক হাদীসে আছে—

مَا اَنْكَرْتُمْ مِّنْ زَمَانِكُمْ فَبِمَا غَيَّرْتُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ, যামানার যে বিষয় তোমাদের খারাপ লাগে, তাকে তোমাদের আমল বিকৃত করারই ফল মনে কর।

আবু আমর ইবনে হুলওয়ান তার কাহিনীতে লিখেনঃ একদিন আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময় আমার অন্তরে কামভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমি এ সম্পর্কে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত তা সমকামিতার খাহেশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমার সমস্ত শরীর কাল হয়ে গেল। লোকলজ্জার ভয়ে আমি তিনদিন পর্যন্ত ভেতরে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম এবং হাম্মামে গিয়ে সাবান দিয়ে শরীর ধৌত করলাম। কিন্তু কালো রঙ বাড়তেই থাকল। তিনদিন পর রঙ পরিষ্কার হল এবং আমি তলব পেয়ে রিক্কা থেকে হযরত জুনায়দ বাগদাদীর খেদমতে বাগদাদ গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন ঃ ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা হল না। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কামভাবে মত্ত হলে, যা তোমাকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। যদি আমি দোয়া না করতাম এবং তোমার পক্ষ থেকে তওবা না করতাম, তবে এই কালো রঙ নিয়েই তুমি আল্লাহর কাছে যেতে। আমি বিস্মিত হলাম যে, হযরত জুনায়দ আমার অবস্থা কিরূপে জানলেন! আমি তো রিক্কায় ছিলাম আর তিনি ছিলেন বাগদাদে।

এখানে জানা দরকার যে, মানুষ যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরের চেহারা কালো হয়ে যায়। যদি সে ভাগ্যবান হয়, তবে কালো রঙ বাইরের দেহেও ফুটে উঠে, যাতে সে গোনাহ থেকে বিরত হতে পারে। পক্ষান্তরে হতভাগ্য হলে কালো রঙ ভেতরেই থেকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র অন্তর্ভাগ কালো হয়ে সে দোযখের উপযুক্ত হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহের ফলস্বরূপ দুনিয়াতে যে দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যাধি আসে, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগত বান্দার অবস্থা ভিন্ন। তার উপর কোন বিপদাপদ এলে, তা তার গোনাহের কাফফারা হয় এবং এ জন্যে সবর করলে তার মর্তবা বেড়ে যায়।

চতুর্থ বর্ণনাযোগ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাদা আলাদা গোনাহের জন্যে শরীয়তে যে শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, ওয়াযে তা বর্ণনা করা। উদাহরণতঃ মদ্যপানের অনিষ্ট, যিনা, চুরি, হত্যা, গীবত, অহমিকা এবং হিংসার কুফল আলাদা আলাদা বর্ণনা করবে। এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ের উপযুক্ত, তার কাছে সেই বিষয়ই বর্ণনা করতে হবে। বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন প্রথমে নাড়ী, বর্ণ, গতিবিধি ইত্যাদি পরীক্ষা করে রোগের অভ্যন্তরীণ কারণ জেনে নেয়, এরপর চিকিৎসা করে, আলেমকেও তেমনি অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা মানুষের গোপন দোষগুণ জেনে তাই বর্ণনা করতে হবে, যাতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ হয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْيَاسِ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْغَنِيُّ وَاِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَاِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ وَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَاِيَّاكَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ.

অর্থাৎ, তোমার কর্তব্য অপরের ধনসম্পদ থেকে নিরাশ হওয়া। এটাই ধনাঢ্যতা। তুমি লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, এটা উপস্থিত দারিদ্র্য। বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়। আর এমন কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাক, যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হয়।

অন্য এক ব্যক্তি উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ মিথ্যা কথা বলো না। আরও এক ব্যক্তি উপদেশ চাইলে তিনি বললেন ঃ ক্রুদ্ধ হয়ো না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক ব্যক্তি মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমার উপদেশ হল, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে বাদশাহ হয়ে থেকো। লোকটি বলল ঃ এটা আমার জন্যে কিরূপ সম্ভবপর হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসার অনাসক্তিকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও।

এখানে রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম ব্যক্তির মধ্যে অপরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার আলামত প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাকে তেমনি আদেশ করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি কথাবার্তার হেরফের লক্ষ্য করেছেন। তাই তাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি ক্রোধের আলামত জানতে পেরেছেন। তাই তাকে ক্রোধ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'ও তার উপদেশপ্রার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে লালসার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন এবং তদনুযায়ী উপদেশ দিয়েছেন। মোটকথা, প্রার্থীর অবস্থা অনুযায়ী কথাবার্তা হওয়া উচিত—বক্তার যোগ্যতা অনুযায়ী নয়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লিখলেন ঃ আমার জন্যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিপিবদ্ধ করুন। হযরত আয়েশা পত্রে লিখলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির পরওয়া না করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের কোপানল থেকে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরওয়া না করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছেই সঁপে দেন। এ পত্রে হযরত আয়েশার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষণীয় যে, তিনি কিভাবে সে বিপদটিই উল্লেখ করেছেন, যাতে শাসকবর্গ ও আমীর-উমারা লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ, মানুষের পক্ষপাতিত্ব করা ও তাদের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়া। একবার তিনি আমীর মোয়াবিয়াকে লিখেছিলেন— আল্লাহকে ভয় করতে থাক। কেননা, আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু মানুষকে ভয় করলে আল্লাহর সামনে তোমার কোন জারিজুরি চলবে না। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে গোপন দোষ-গুণ জেনে নেয়া ওয়ায়েযের জন্যে অত্যাবশ্যক, যাতে উপযুক্ত অবস্থা ও সময়ের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চাহিদা অনুযায়ী জরুরী বিষয়টি বর্ণনা করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাবতীয় উপদেশ বলে দেয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া যে বিষয় বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, তাতে মশগুল হওয়ার অর্থ সময় নষ্ট করা।

এখানে প্রশ্ন হল, যে ব্যক্তি জনসমাবেশে ওয়ায করে, তার কি করা উচিত? জওয়াব এই যে, এমতাবস্থায় এমন বিষয়বস্তু বর্ণনা করবে যাতে সকল মানুষ শরীক; অর্থাৎ, এমন প্রয়োজনীয় বিষয়, যা জানা সবারই জন্যে উপকারী। শরীয়তের বিষয়াদিতে এটা সম্ভব। কেননা, শরীয়তের বিষয়সমূহ একদিকে যেমন খাদ্য, অপরদিকে তেমনি ঔষধি। খাদ্য সকলের জন্যে এবং ঔষধি রোগগ্রস্তদের জন্যে। এরূপ ওয়াযের দৃষ্টান্ত এই— এক ব্যক্তি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ভয়কে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। সকল কল্যাণের মূল এটাই। জেহাদকে নিজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। ইসলামে একেই বৈরাগ্য বলা হয়। সদাসর্বদা কোরআন মজীদ পাঠ কর। এটা তোমার জন্যে পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা হবে এবং ঊর্ধ্বজগতের স্মারক হবে। ভাল কথা না হলে চুপ করে থাক। এর মাধ্যমে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হবে।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ আলেমদের সামনে বিনয়াবনত হয়ে বস, তাদের সাথে তর্ক করো না। করলে তারা তোমাকে খারাপ মনে করবে। দুনিয়াতে জীবন ধারণ করা যায় এই পরিমাণ সম্পদ রেখে অবশিষ্ট উপার্জন আখেরাতের জন্যে ব্যয় কর। সংসার-ধর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করো না। তাহলে নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে হবে এবং অপরের গলগ্রহ হতে হবে। রোযা এমনভাবে রাখ, যা দ্বারা কামশক্তি দমিত হয়— এমন ভাবে রেখো না, যা দ্বারা নামাযে বিঘ্ন দেখা দেয়। কেননা, নামায রোযা অপেক্ষা উত্তম। নির্বোধের কাছে বসো না এবং দ্বিমুখী মানুষের সাথে মেলামেশা করো না। নিজের ধন হারিয়ে অপরের ধনের হেফাযত করো না। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর পূর্বে যে ধন দান করা হয়, তা নিজের ধন এবং মৃত্যুর সময় যে ধন রেখে যাওয়া হয়, তা অপরের ধন। প্রিয় বৎস, যে দয়া করে, তার প্রতি দয়া করা হয়। যে চুপ থাকে, সে নিরাপদ থাকে। যে ভাল কথা বলে, সে সওয়াব পায়। যে মন্দ কথা বলে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সে গোনাহগার হয়। যে রসনা সংযত করে না, সে অনুতাপ করে।

অব্যাহত গোনাহের চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সবর। এর প্রয়োজন এ কারণে হয় যে, রোগীর রোগ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হচ্ছে ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবহার। এই ব্যবহার দু'কারণে হয়ে থাকে—(১) ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং (২) খাহেশের আতিশয্যে ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও গাফলতির প্রতিকার উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন শুধু খাহেশের প্রতিকার বাকী।

রোগী যখন কোন ক্ষতিকর বস্তুর প্রতি অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়, তখন প্রথমে সে সেই বস্তুর ক্ষতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। এরপর সেই বস্তুটিকে তার দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিতে হবে। এর পরিবর্তে রোগী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কোন বস্তু ব্যবহার করবে, যা আকারে প্রথম বস্তুর অনুরূপ হবে। এরপর দ্বিতীয় বস্তুটিও বর্জন করবে এবং এ বর্জনে সবর করবে। মোটকথা, সবরের তিক্ততা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। গোনাহের প্রতি খাহেশের চিকিৎসাও এমনি ভাবে হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ যদি কোন যুবকের কামোত্তেজনা থাকে এবং সে তার চক্ষু, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম না হয়, তবে প্রথমে তার এই গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে যে শাস্তিবাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো জেনে নেবে। যখন ভয় বেড়ে যাবে, তখন যে সব কারণে কামভাব উত্তেজিত হয়, সেগুলো থেকে সরে যাবে। যদি কোন কিছু দেখা অথবা সম্মুখে পাওয়ার কারণে কামভাব উত্তেজিত হয়, তবে তার চিকিৎসা সেই বস্তু থেকে পালিয়ে একান্তবাস অবলম্বন করা। আর যদি কামোত্তেজনা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যের কারণে হয়, তবে তার চিকিৎসা ক্ষুধার্ত থাকা ও সর্বদা রোযা রাখা।

বলা বাহুল্য, উভয় চিকিৎসা সবরের মুখাপেক্ষী। সবর ভয় ছাড়া, ভয় জ্ঞান ছাড়া এবং জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং প্রথমে ওয়াযের মজলিসে হাযির হয়ে একাগ্রচিত্তে ওয়ায শ্রবণ করা উচিত। এরপর যা শুনবে, তা বুঝার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে নিঃসন্দেহে ভয় সৃষ্টি হবে। ভয় প্রবল হলে তার সাহায্যে সবর অর্জিত হবে। ফলে, চিকিৎসার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে সংযুক্ত হবে আল্লাহর তাওফীক।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব, যে ব্যক্তি মনোযোগসহ শ্রবণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার কাজ সহজ করে দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনোনিবেশ করবে না এবং ভাল কথাকে মিথ্যা মনে করবে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার কাজ কঠিন করে দেবেন।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম ঈমানে গিয়ে ঠেকে। কেননা, সবর ব্যতীত গোনাহ্ বর্জন করা সম্ভব নয়। সবর ভয় ছাড়া এবং ভয় জ্ঞান ছাড়া অর্জিত হয় না। জ্ঞান তখন অর্জিত হয়, যখন গোনাহের ক্ষতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। গোনাহের ক্ষতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হুবহু আল্লাহ ও রসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এরই নাম ঈমান। অতএব সারকথা হল, যে ব্যক্তি অব্যাহত গোনাহ্ করে, সে এজন্যে করে যে, তার ঈমান নেই। এর জওয়াব এই যে, অব্যাহতভাবে গোনাহ্ করার ফলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায় না; বরং ঈমানের দুর্বলতার কারণে এ গোনাহ্ হয়ে থাকে। কারণ, ঈমানদার মাত্রই একথা স্বীকার করে যে, গোনাহ্ আল্লাহ থেকে দূরত্বের এবং পারলৌকিক শাস্তির কারণ। এরপরেও একাধিক কারণে মানুষ গোনাহ্ করে থাকে। প্রথম কারণ, যে শাস্তির কথা বলা হয়, তা অনুপস্থিত এবং অদৃশ্য। মানুষ মজ্জাগতভাবে উপস্থিত বস্তু দ্বারা যতটুকু প্রভাবিত হয়, ততটুকু অনুপস্থিত বস্তু দ্বারা হয় না। তাই প্রতিশ্রুত বিষয়ের প্রভাব মানুষের উপর উপস্থিত বিষয়ের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ, যে খাহেশ তথা কামভাব গোনাহের কারণ, তার আনন্দ ও স্বাদ নগদ হয়ে থাকে। নগদ আনন্দ অনাগত ভয়ের কারণে ত্যাগ করা স্বভাবতই কঠিন হয়ে থাকে। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

অর্থাৎ, তোমরা আসলে পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।

এ বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত । বলা হয়েছে—

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, অপ্রিয় বিষয়সমূহ দ্বারা জান্নাতকে এবং কামনা-বাসনা দ্বারা জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে ফেরেশতা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন, গিয়ে দেখে আস। জিবরাঈল জাহান্নাম পরিদর্শন করে আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে কখনও এতে প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা আবৃত করে দিলেন এবং জিবরাঈলকে আদেশ করলেন ঃ এবার গিয়ে দেখে আস। তিনি দেখার পর আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, এখন আমার আশংকা হয়, কেউ এতে প্রবেশ না করে ক্ষান্ত হবে না। এরপর জান্নাত সৃষ্টি করে জিবরাঈলকে তা দেখতে বলা হল। তিনি দেখার পর আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে অপ্রিয় বিষয়াদির দ্বারা আবৃত করে জিবরাঈলকে দেখতে বললেন। তিনি দেখে আরয করলেন ঃ এখন আমি আশংকা করি, কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ থেকে বুঝা গেল, কামনা-বাসনার উপস্থিতি এবং আযাব বিলম্বিত হওয়া এ দুটিই অব্যাহত গোনাহের উন্মুক্ত কারণ; যদিও মূল ঈমান বিদ্যমান থাকে। যে রোগী তীব্র পিপাসার কারণে বরফের পানি পান করে, সে মূল চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না এবং পানি তার জন্যে ক্ষতিকর—এ বিষয়টিও অস্বীকার করে না। কিন্তু কামনা-বাসনা প্রবল থাকার কারণে ভবিষ্যত কষ্ট ও ক্ষতি মেনে নেয়া সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় কারণ, গোনাহগার মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তওবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং নিজের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা মিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মনে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশা প্রবল থাকার কারণে সে সর্বক্ষণ তওবা বিলম্বিত করে।

চতুর্থ কারণ, মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করে যে, গোনাহ এমন শাস্তির কারণ হয় না, যা মাফ হওয়া অসম্ভব। তাই সে গোনাহ করে এবং আল্লাহর কৃপার উপর ভরসা করে তা মাফ হওয়ার প্রত্যাশা রাখে।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ই মূল ঈমান থাকা সত্ত্বেও গোনাহের কারণ হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে। হাঁ, মাঝে মাঝে পঞ্চম একটি কারণেও মানুষ গোনাহ করে থাকে, যদ্দরুন মূল ঈমানেই ত্রুটি দেখা দেয়। তা এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি মূলত রসূল (সাঃ)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ পোষণ করে। এরই নাম কুফর।

এখন বর্ণিত পাঁচটি কারণের প্রতিকার জানা দরকার। প্রথম কারণ অর্থাৎ শাস্তি অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে চিন্তা করবে যে, যা হওয়ার তা অবশ্যই হবে। যা ভবিষ্যত তা অতীত হয়ে যায়। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী। আরও চিন্তা করবে যে, আমরা দুনিয়াতে অনাগত আশংকার কারণে বর্তমানে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করি। উদাহরণতঃ কখনও দরিদ্র হয়ে যাব— এই ভয়ে জল ও স্থলে সফর করি এবং অর্থ উপার্জন করি। যদি কোন বিধর্মী চিকিৎসক কোন রোগীকে বলে দেয় ঠাণ্ডা পানি তোমার জন্যে ক্ষতিকর— এতে তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে, তবে রোগীর কাছে ঠাণ্ডা পানি সর্বাধিক সুস্বাদু হলেও মৃত্যুর ভয়ে সে তা পরিত্যাগ করবে। অথচ মৃত্যুকষ্ট এক মুহূর্তের বেশী নয়। এখন চিন্তার বিষয় একজন বিধর্মীর কথায় কিভাবে রোগী সুস্বাদু বস্তু ত্যাগ করে অথচ তার চিকিৎসা যে সত্য ও অব্যর্থ, তার উপর কোন মো'জেযা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং সে মনে মনে বলবে—পয়গম্বরগণের উক্তি, যা মো'জেযা দ্বারা সমর্থিত, একজন বিধর্মীর উক্তির চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য হবে—এটা আমার বিবেকের কাছে গ্রহণীয় নয় অথবা আমার কাছে দোযখের আযাব মৃত্যুযন্ত্রণার তুলনায় হালকা হবে—এটাও মেনে নেয়া যায় না। কিয়ামতের প্রতিটি দিন দুনিয়ার দিনসমূহের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

এমনি ধরনের চিন্তাভাবনা দ্বারা দ্বিতীয় কারণেরও চিকিৎসা হতে পারে। অর্থাৎ, গোনাহ করার কারণ যদি আনন্দ উপভোগের প্রাবল্য হয়, তবে জোরপূর্বক তা পরিত্যাগ করবে এবং মনে মনে বলবে—ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দকে যখন আমি ত্যাগ করতে পারি না, তখন অনন্তকালীন আনন্দ কিরূপে বিসর্জন দেব? যদি সবরের সামান্য কষ্ট সহ্য করতে না পারি, তবে দোযখের অচিন্তনীয় কষ্ট কিরূপে সহ্য করব?

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ তওবায় গড়িমসি করার চিকিৎসা হচ্ছে একথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিন্তা করা যে, দোযখীরা বেশীর ভাগ এ ফরিয়াদই করবে যে, তারা তওবার সময়কে কেন বিলম্বিত করেছে? এ ছাড়া যে ব্যক্তি গড়িমসি করে, সে তার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এটা করে যাবে। অর্থাৎ, সে মনে করে নেয় যে, আরও অনেক দিন বাঁচবে। তখন তওবা করে নেবে। প্রশ্ন এই যে, সে জীবিত থাকবে—এটা কিরূপে জানল? তার মরে যাওয়ারও তো সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি জীবিতও থাকে, তবে গোনাহ্ ত্যাগ না করারও তো সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন এ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেনি। কারণ, কামনা-বাসনার প্রাবল্য তখনও থেকে যেতে পারে; বরং বেশী দিন অভ্যাসের কারণে তা আরও মযবুত হয়ে যাবে। এসব কারণে যারা গড়িমসি করে, তারা পরিণামে ধ্বংস হয়ে যায়।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে গিয়ে দেখল যে, বৃক্ষটি বেশ মযবুত। কঠিন পরিশ্রম ছাড়া উৎপাটিত করা যাবে না। সে মনে মনে বলল, একে আরও বছর খানেক এমনিতেই রেখে দেই। এরপর উপড়ে ফেলব। সে ভাবেনি যে, যতই দিন যাবে, বৃক্ষের মূল ততই মযবুত হবে এবং সে নিজে যতই বড় হবে, ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। দুনিয়াতে এরূপ ব্যক্তির সমান নির্বোধ কেউ হবে না। যখন তার দেহে শক্তি ছিল এবং বৃক্ষ দুর্বল ছিল, তখন সে বৃক্ষটি উপড়ায়নি; বরং এমন সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে, যখন বৃক্ষ হবে ইস্পাতকঠিন এবং সে হবে দুর্বল।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতের ভরসায় গোনাহ্ করা— এর চিকিৎসা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়েরই অনুরূপ যে, কেউ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে নিঃস্ব করে দেয় এবং আশা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন কৃপায় কোন নির্জন জায়গায় ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলে দেবেন। এরূপ ধনভান্ডার পাওয়া যদিও সম্ভব, মাঝে মাঝে এরূপ হয়ও, কিন্তু এর উপর ভরসা করে যে নিজের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে, সে নিরেট বোকা। এমনিভাবে গোনাহ্ মাফ হওয়াও সম্ভব। কিন্তু এর উপর ভরসা করা মূর্খতা।

পঞ্চম কারণ অর্থাৎ রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করে গোনাহ্ করা, এর চিকিৎসা সম্ভব। উদাহরণতঃ সন্দেহকারীকে বলা হবে— আখেরাত সম্পর্কিত যেসব বিষয়কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলো তোমার মতে সম্ভবপর না, অসম্ভব? যদি সে উত্তরে সন্দেহের কথা জানায়, তবে তাকে বলা উচিত— যদি তুমি আপন গৃহে খাদ্যবস্তু রেখে যাও এবং কোন অচেনা ব্যক্তি এসে তোমাকে বলে ঃ তোমার চলে যাওয়ার পর এ খাদ্যে বিষধর সর্প বিষ ছেড়ে দিয়েছে, তবে তুমি তার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করে সেই খাদ্য খাবে, না সুস্বাদু হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগ করবে? সে এ জবাবই দিবে যে, আমি এই খাদ্য খাব না। কারণ, আমি চিন্তা করব যদি সে মিথ্যা বলে থাকে, তবে ক্ষতি এতটুকুই হবে যে, খাদ্য খাওয়া হল না। এ ব্যাপারে সবর করা কঠিন হলেও সম্ভবপর। পক্ষান্তরে যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে নির্ঘাত আমার মৃত্যু হবে, যা না খেয়ে সবর করার তুলনায় অত্যন্ত কঠিন।

এরপর সন্দেহকারীকে বলা হবে— সোবহানাল্লাহ, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কথা তুমি মেনে নিতে পার, যা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে বলারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মো'জেযা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও পয়গম্বরের উক্তি এবং ওলী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সকল সুধী ব্যক্তির বাণী মেনে নিতে তোমার আপত্তি। মূর্খদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই। যারা বুদ্ধিমান, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং সওয়াব ও আযাবকে সঠিক মনে করে না— যদিও এগুলোর অবস্থা ও প্রকারভেদে মতানৈক্য রয়েছে। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে তুমি অনন্তকাল আযাব ভোগ করবে। আর যদি তাদের কথা মিথ্যা হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; কেবল কতিপয় কামনা-বাসনা থেকে তুমি এ দুনিয়াতে বঞ্চিত থাকবে।

আমাদের এই আলোচনা হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তির অনুরূপ। তিনি আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহকারী জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন ঃ যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তবে আমরা ও তুমি সকলেই বেঁচে যাব। পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বাস সঠিক হলে আমরা রক্ষা পাব এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম অধ্যায়

সবর ও শোকর

হাদীস ও মনীষীদের বাণীর দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ঈমানের দুটি অংশ— একটি সবর, অপরটি শোকর। আল্লাহ্ তা'আলার "আসমায়ে হুসনা" তথা সুন্দর নামসমূহের মধ্যে সাবূর ও শাকূর উভয়টি রয়েছে। তাই সবর ও শোকর যে খোদায়ী গুণাবলী ও আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত, তা প্রমাণিত। অতএব, এ দুটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা যেন ঈমানের দুটি অংশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অথবা আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণ সম্পর্কে গাফেল থাকার নামান্তর।

ঈমান ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন্ বিষয়ের প্রতি এবং কোন্ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনতে হবে, তা জানা ছাড়া ঈমানের পথে চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি এটা জানার ব্যাপারে শৈথিল্য করবে, সে সবর ও শোকরের সম্যক পরিচয় লাভেও ব্যর্থ হবে। এ থেকে বুঝা গেল, ঈমানের উভয় অংশের যথাযথ বর্ণনা একান্ত জরুরী। তাই আমরা এ অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সবর ও শোকর একত্রে বর্ণনা করেছি। কারণ, উভয়ের মধ্যে মিল ও যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর।

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবর

আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদেরকে অনেক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং কোরআন পাকে সত্তরেরও বেশী জায়গায় সবরের উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক মর্যাদা ও পুণ্যকর্মকে সবরের ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, তারা যখন সবর করল, তখন আমি তাদের মধ্য থেকে পথ প্রদর্শক করলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তার কল্যাণের ওয়াদা বনী ইসরাঈলের প্রতি পূর্ণতা লাভ করল এ কারণে যে, তারা সবর করেছিল।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম কর্মের বিনিময়ে।

اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, তারা তাদের পুরস্কার দু'বার পাবে। কারণ, তারা সবর করেছে।

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার বে-হিসাব প্রদান করা হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শেষোক্ত এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, সবর ব্যতীত অন্যান্য পুণ্যকর্মের সওয়াব বিশেষ পরিমাণ ও হিসাব অনুযায়ী প্রদান করা হবে এবং সবরের সওয়াব বেহিসাব দেয়া হবে। রোযা অর্ধেক সবর হওয়ার কারণে এটি সবরেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

অর্থাৎ, রোযা হল আমার জন্যে এবং আমি এর প্রতিদান দেব।

সবরের সওয়াব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

অন্যত্র তিনি স্বীয় সাহায্যকে সবরের সাথে শর্তযুক্ত করে বলেছেন ঃ

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ ـ

অর্থাৎ, হাঁ, যদি তোমরা সবর কর, সংযমী হও এবং শত্রু এ মুহূর্তে অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের মদদ করবেন।

আরও এক জায়গায় সবরকারীদের জন্যে এমন সব নেয়ামতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যেগুলো অন্যদের জন্যে নয়। এরশাদ হয়েছে—

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, এই লোকদের প্রতিই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অনুকম্পা এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

এ আয়াতে সৎপথ, অনুকম্পা ও ধন্যবাদ সবরকারীদের জন্যে একত্রিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আছে। মোটকথা, সবরের ফযীলত সম্পর্কে আরও অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের সংখ্যাও অনেক। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ, সবর ঈমানের অর্ধেক।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যেসব বিষয় তোমাদেরকে কম দেয়া হয়েছে, একীন ও সবর সেগুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাপ্ত হয়, সে তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা না করলেও পরওয়া করবে না। তোমরা যদি বর্তমান অবস্থার উপর সবর কর, তবে এটা আমার কাছে এক এক ব্যক্তির সকলের সমপরিমাণ আমল নিয়ে আসার তুলনায় অধিক প্রিয়। কিন্তু আমি আশংকা করি আমার পর তোমাদের সামনে দুনিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তোমরা একে অপরকে খারাপ মনে করবে। তখন আকাশের অধিবাসীরা তোমাদেরকে খারাপ মনে করবে। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে সবর করবে, সে তার সওয়াব পুরাপুরি পাবে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যা তোমাদের কাছে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহর কাছে আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম আমলের বিনিময়ে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সবর করা ও দান করা। এক হাদীসে আছে—

اَلصَّبْرُ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, সবর জান্নাতের অন্যতম ভাণ্ডার।

একবার এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ঈমান হচ্ছে সবর করা। এর অর্থ, ঈমানের বড় রোকন হচ্ছে সবর করা। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-কে ওহী প্রেরণ করেন যে, আমার চরিত্রের মত তুমিও তোমার চরিত্র গঠন কর। আমার চরিত্র এই যে, আমি সাবূর (অধিক সবরকারী)। আতা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন—রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি ঈমানদার? সকলেই চুপ করে রইল। হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমরা ঈমানদার। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ঈমানের পরিচয় কি? আনসারগণ আরয করলেন ঃ আমরা সুখে শোকর করি, কষ্টে সবর করি এবং আল্লাহর আদেশের উপর সন্তুষ্ট থাকি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। এক হাদীসে আছে—

اَلصَّبْرُ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ অর্থাৎ, অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—অপ্রিয় বস্তুর ব্যাপারে সবর করলেই তুমি তোমার প্রিয় বস্তু লাভ করতে পারবে।

বহু মনীষীগণের উক্তি দ্বারাও সবরের ফযীলত প্রমাণিত হয়। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) আবু মূসা আশআরীকে যে পত্র লিখেন, তাতে একথাও লিখিত ছিল— সবরকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। মনে রেখ, সবর দু'প্রকার এবং একটি অপরটির চেয়ে উত্তম। বিপদে সবর করা ভাল কিন্তু তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ তা'আলার বণ্টনে সবর করা। মনে রেখ, সবর ঈমানের মূল। কেননা, সর্বোত্তম নেকী হচ্ছে তাকওয়া, যা সবর দ্বারা অর্জিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চারটি স্তম্ভের উপর ঈমানের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল—একীন, সবর, জেহাদ ও ইনসাফ। তিনি আরও বলেন ঃ ঈমানের সাথে সবরের সম্পর্ক দেহের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্কের অনুরূপ। সুতরাং মস্তিষ্ক ছাড়া যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, তেমনি যার সবর নেই, তার ঈমান আছে বলা যায় না।

সবরের স্বরূপ ঃ উপরে কোরআন-হাদীসের আলোকে সবরের ফযীলত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণিত হয়েছে। এখন যুক্তির নিরিখে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে হলে তার স্বরূপ ও মর্ম জানা একান্ত আবশ্যক। তাই এক্ষণে সবরের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, ধর্মের একটি মকাম (অবস্থান) এবং অধ্যাত্ম পথের একটি মনযিলের নাম সবর। ধর্মের সমস্ত মকাম তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়— (১) মারেফত তথা তত্ত্বজ্ঞান, (২) হাল এবং (৩) আমল। মারেফত সবকিছুর মূল এবং এ থেকেই হালের উদ্ভব হয়। হাল থেকে আমলের বিকাশ ঘটে। সুতরাং মারেফত যেন বৃক্ষসদৃশ, হাল শাখা-প্রশাখা এবং আমল যেন ফলের অনুরূপ। এ বিষয়টি সাধকদের সকল মনযিলেই বিদ্যমান। ঈমান শব্দটি কখনও মারেফতের অর্থে এবং কখনও এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টির অর্থে প্রয়োগ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ সবর তখনই হয়, যখন প্রথমে মারেফত অর্জিত হয়, এরপর একটি হাল কায়েম হয়। বাস্তবে এ দুটির নামই সবর। আমল হল ফলসদৃশ, যা এ দুটি বিষয় থেকে প্রকাশ পায়। ফেরেশতা, মানুষ ও পশুর পারস্পরিক ক্রম জানা ছাড়া এটা জানা যায় না। কেননা, সবর মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা ফেরেশতা ও পশুর হতে পারে না— ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের পূর্ণতার কারণে এবং পশুর মধ্যে অপূর্ণতার কারণে। পশুদের উপর কামনা-বাসনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে, তারা কামনা-বাসনারই অধীন। তাদের চলা-ফেরা ও গতিবিধির কারণ কামনা-বাসনা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই, যা কামনা-বাসনার প্রতিবন্ধক হয় এবং তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখে। কামনা-বাসনার মোকাবিলায় এরূপ শক্তিকে বলা হবে সবর। পক্ষান্তরে ফেরেশতা সৃজিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে নিয়োজিত থাকার জন্য এবং তাঁর নৈকট্যলাভে সন্তুষ্ট থাকার জন্য। তাদের মধ্যে কামনা-বাসনা রাখা হয়নি, যা তাদেরকে এবাদতের আগ্রহ ও নৈকট্য অর্জনে বাধা দেবে। অপরদিকে মানুষের অবস্থা এই যে, সে শৈশবের শুরুতে পশুর ন্যায় অপূর্ণ সৃজিত হয়েছে। তখন খাদ্যস্পৃহা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনা তার মধ্যে থাকে না। কিছুদিন পর তার মধ্যে খেলাধুলা ও সাজসজ্জার কামনা-বাসনা জেগে উঠে। এরপর বিবাহের কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়। এসব কামনা তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় এবং শুরুতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সবর থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় মানুষকে সৃষ্টির সেরারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মর্যাদা পশুর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। তাই যখন তার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং সে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন তার মধ্যে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন তাকে সৎপথ প্রদর্শন করে এবং অপরজন এ কাজে তাকে সাহায্য করতে থাকে। এ ফেরেশতাদ্বয়ের সাহায্যে মানুষ পশু থেকে স্বতন্ত্র হয়।

এ ছাড়া এই ফেরেশতাদ্বয়ের কারণেই মানুষের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণের বিকাশ ঘটে—(১) আল্লাহ ও রসূলের মারেফত এবং (২) শুভ-অশুভ পরিণামের জ্ঞান। পশুরা না আল্লাহ ও রসূলকে চিনে, না শুভ পরিণামের চিন্তা করতে পারে। বরং তারা শুধু তাই দেখে, যা কার্যত তাদের কামনা-বাসনার অনুকূলে। এ কারণে সুস্বাদু খাদ্য ছাড়া অন্য কোন বস্তু তারা অন্বেষণ করে না। পক্ষান্তরে মানুষ হেদায়াতের নূরের মাধ্যমে জানে যে, কামনা-বাসনার অনুসরণ করার পরিণতি তার জন্যে অশুভ। কিন্তু কেবল এ হেদায়াতই যথেষ্ট নয়, বরং ক্ষতিকর বস্তু পরিত্যাগ করার ক্ষমতাও তার থাকতে হবে। কারণ, অনেক ক্ষতিকর বস্তু মানুষের জানা আছে, কিন্তু সে সেগুলোকে প্রতিহত করতে পারে না। এমতাবস্থায় কামনা-বাসনাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আরও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সে মানুষকে কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং অদৃশ্য বাহিনীর মাধ্যমে তাকে শক্তি ও সমর্থন যোগায়। এ বাহিনীকে কামনা-বাসনার বাহিনীর সাথে সদা লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধে কখনও সে দুর্বল এবং কখনও প্রবল হয়। এ দুর্বলতা ও প্রবলতা ততটুকুই হয়ে থাকে, যতটুকু সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অদৃশ্য সমর্থনপ্রাপ্ত হয়।

এখন যে বাহিনীর দ্বারা মানুষ কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে পশুর স্তর থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, আমরা তার নাম রাখব ধর্মীয় প্রেরণা। আর কামনার বাহিনীকে বলব শয়তানী প্রেরণা। কল্পনা করা উচিত যে, উভয় প্রেরণার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কখনও ধর্মীয় প্রেরণা প্রবল হয় এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা শক্তিশালী হয়। এ যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের অন্তর। ধর্মীয় প্রেরণা ফেরেশতাদের কাছ থেকে এবং শয়তানী প্রেরণা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শয়তানদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। এ যুদ্ধে শয়তানী প্রেরণার মোকাবিলায় ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড় থাকাই হচ্ছে সবরের স্বরূপ। অটল থাকার পর যদি সে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে এবং কামনার বিরোধিতায় সদা প্রস্তুত থাকে, তবে সে সবরকারীদের তালিকায় স্থান পাবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল হয় এবং কামনার কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে শয়তানের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, কামনাজনিত ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করা এমন একটি আমল, যা সবর থেকে উৎপন্ন হয়।

কামনা-বাসনা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের দুশমন—এ বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড় থাকার মূল উৎপত্তি স্থল। বলা বাহুল্য, এ জ্ঞানকেই বলা হয় ঈমান। যখন এ জ্ঞান শক্তিশালী হয়, তখন ধর্মীয় প্রেরণাও শক্তিশালী হয়। ফলে মানুষের কাজকর্ম কামনা-বাসনার বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা উপরে বর্ণিত দু'জন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা মানুষের ধর্মীয় প্রেরণা ও শয়তানী প্রেরণার প্রতি নযর রাখে। তাদেরকে বলা হয় "কেরামান কাতেবীন"। যে ফেরেশতা হেদায়াত করে, সে ডানদিকে এবং যে ফেরেশতা শক্তি যোগায়, সে বামদিকে থাকে। মানুষ যখন গাফেল ও অমনোযোগী হয়, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাথে অসদাচরণ করে। তাই এ অসদাচরণকে সে গোনাহ হিসাবে লিখে নেয়। আর যখন মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে এবং সৎকাজে তৎপরতা প্রদর্শন করে, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতার সাথে সদাচরণ করে। তাই এ মনোযোগকে পুণ্য হিসাবে লিখে নেয়া হয়। এমনিভাবে মানুষ যখন অকাতরে গোনাহ করতে থাকে, তখন যেন সে বামদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যাশা করে না। এ কারণে সে গোনাহ লিখে নেয়। আর যখন মানুষ নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে, তখন যেন সে এ ফেরেশতার কাছে সাহায্য ও শক্তি প্রত্যাশা করে। ফলে, সে এ কাজকে পুণ্য হিসাবে লিখে নেয়।

কেরামান কাতেবীন রচিত মানুষের গোপন আমলনামা দু'বার খোলা হবে। একবার ক্ষুদ্র কিয়ামতে এবং একবার বৃহৎ কিয়ামতে। ক্ষুদ্র কিয়ামত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলে আমাদের উদ্দেশ্য মৃত্যু। হাদীসে বলা হয়েছে—

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

অর্থাৎ, যে মৃত্যুবরণ করে, তার কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়।

এই কিয়ামতে মানুষ একা থাকে এবং তাকে বলা হয়—

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ, তোমরা একজন একজন করে আমার কাছে আগমন করেছ, যেমন আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।

আল্লাহ আরও বলবেন ঃ

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

অর্থাৎ, আজ নিজের জন্যে তুমিই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী।

কিন্তু বৃহৎ কিয়ামতে মানুষ একা থাকবে না; বরং জনসমাবেশের সামনে হিসাব গ্রহণ করা হবে। এ কিয়ামতে সৎলোক জান্নাতে এবং অপরাধী দোযখে দলে দলে প্রবেশ করবে। একজন একজন করে নয়।

সবরের বিভিন্ন নাম ঃ সবর দু'প্রকার— (১) দৈহিক সবর; যেমন দৈহিক কষ্ট সহ্য করা এবং তাতে সুদৃঢ় থাকা এবং (২) মানসিক সবর; যেমন মনকে কুপ্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা। প্রথম প্রকার সবর আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম যেমন নিজে কোন কঠিন কাজ কিংবা এবাদত পালন করা এবং দ্বিতীয়, যেমন অপরের কঠিন প্রহার অথবা মারাত্মক যখম বরদাশত করা। এ ধরনের সবর শরীয়ত অনুযায়ী হলে উত্তম —নতুবা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবর সর্বাবস্থায় উত্তম। এ সবর যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ ও যৌনাঙ্গের বাসনা থেকে করা হয়, তবে এর নাম হয় "ইফফত" (সাধুতা)। যদি কোন বিপদাপদে এ সবর করা হয়, তবে একে সবরই বলা হয় এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় হা-হুতাশ করা। যদি বিত্ত-বৈভবের তাড়না সহ্য করার ক্ষেত্রে এ সবর করা হয়, তবে একে বলা হয়, "যবতে নফস" (আত্মসংযম)। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয় আস্ফালন । যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে একে বলা হয় বীরত্ব ও শৌর্য। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় কাপুরুষতা। যদি ক্রোধ হযম ব্যাপারে সবর হয়, তবে এর নাম সহনশীলতা, যার বিপরীত হচ্ছে ক্রোধান্ধতা। যদি যামানার কোন আপদে সবর করা হয়, তবে এর নাম অসম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হচ্ছে স্বল্প সাহসিকতা। প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনোপকরণের বেলায় সবর করা হলে তার নাম সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত সংসারাসক্তি। সারকথা, ঈমানের অধিকাংশ গুণাবলীই সবরের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই একবার জনৈক ব্যক্তি ঈমান কি প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সবর। এরূপ বলার কারণ এই যে, ঈমানের কর্মসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও ভারী কর্ম হচ্ছে সবর। আল্লাহ তা'আলা সবরের প্রকারসমূহকে একত্রে উল্লেখ করে সবগুলোর নাম রেখেছেন সবর। এরশাদ হয়েছে—

وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা কষ্টে, দুর্ভিক্ষে এবং যুদ্ধের সময় সবর করে, তারাই সাচ্চা এবং তারাই খোদাভীরু।

সবরের প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, শয়তানী প্রেরণার সাথে সংঘর্ষের দিক দিয়ে ধর্মীয় প্রেরণার তিন প্রকার অবস্থা হয়ে থাকে। (১) শয়তানী প্রেরণাকে এমনভাবে পরাভূত করে দেয়া যাতে তার মধ্যে মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা অবশিষ্ট না থাকে। সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা এই অবস্থা অর্জিত হয়। এরূপ অবস্থায়ই বলা হয় مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ যে সবর করে, সে সফলকাম হয়। খুব কম লোকই এ অবস্থায় পৌঁছতে পারে। যারা পৌঁছতে সক্ষম হয়, তারা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল। তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে নিজের পালনকর্তা জেনে তাঁর উপরই সদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং কখনও সরল পথ বর্জন করেন না। (২) শয়তানী প্রেরণায় বিজয়ী হওয়া এবং ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে মোকাবিলা করার শক্তি অবশিষ্ট না থাকা। এ অবস্থায়ই মানুষ নৈরাশ্যের শিকার হয়ে সর্বপ্রকার মোজাহাদা ও চেষ্টা-চরিত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে বিরত থাকে এবং গাফেলদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। বাস্তবে এরূপ লোকদের সংখ্যাই অধিক। এরাই রিপু ও খেয়াল-খুশীর পূজারী। এদের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সরল পথের দিশা দিতে পারতাম; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছে যে, আমি মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করে দেব।

এরূপ লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে এবং চরমভাবে মার খায়। কেউ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাইলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয় ঃ

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰي عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ـ

অর্থাৎ, তুমি সে ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যে আমার উপদেশের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে না। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।

এ অবস্থার পরিচয় হচ্ছে চেষ্টা-চরিত্র থেকে নিরাশ হওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। এটা চরম নির্বুদ্ধিতা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهَا وَتَمَنّٰي عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, বিজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার জন্যে আমল করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে বাসনা করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, কেউ তাকে উপদেশ দিলে সে বলে, আমি তওবা করার খুব ইচ্ছা রাখি; কিন্তু তা হয়ে উঠে না। তাই এর আশাও করি না। আর তওবার প্রতি আগ্রহ না থাকলে বলে, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। অতএব, তওবার প্রয়োজন কি?

(৩) তৃতীয় অবস্থা হল, মোকাবিলা সমান সমান হওয়া। কখনও ধর্মীয় প্রেরণা বিজয়ী হবে এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা। এরূপ ব্যক্তি জেহাদকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য নয়। তার অবস্থা নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে—

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا

অর্থাৎ, তারা একটি সৎকাজ ও অপরটি অসৎকাজ মিশ্রিত করেছে।

আর যারা কামনা-বাসনার সাথে জেহাদ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধম। কেননা, চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে মারেফত ও ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি যা দ্বারা তারা জেহাদ করবে। কিন্তু মানুষকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে, যা সে কাজে লাগায় না।

সহজ ও কঠিন হওয়ার দিক দিয়েও সবর দু'প্রকার। এক, এমন সবর, যা সহজলভ্য নয়, কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ। এর নাম জোরপূর্বক সবর। দুই, যা পরিশ্রম ছাড়াই অর্জিত হয়ে যায়। মানুষ যখন সদাসর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং শুভ পরিণামের দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন সবর সহজলভ্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى

অর্থাৎ, অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং পুণ্যকর্মকে সত্য জ্ঞান করে, আমি তাকে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।

মোটকথা, দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে যখন সবর সহজ হয়ে যায়, তখন "রেযা" অর্থাৎ সন্তুষ্টির মকাম হাসিল হয়। কারণ রেযার মর্তবা সবরের উর্ধ্বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اُعْبُدُوا اللّٰهَ عَلَى الرِّضَاءِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَفِى الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ۔

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

জনৈক সাধক বলেন ঃ সবরকারীদের তিনটি স্তর রয়েছে। এক, খাহেশ বর্জন করা। এটা তওবাকারীদের স্তর। দুই, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা। এটা সংসারত্যাগীদের স্তর। বলা বাহুল্য, মহব্বতের মর্তবা রেযার মর্তবারও ঊর্ধ্বে। এসব মর্তবা বিশেষ এক প্রকার সবরে সম্ভবপর আর তা হচ্ছে বালা-মুসীবতে সবর করা।

এখন জানা দরকার যে, কতক সবর ফরয, কতক নফল, কতক মাকরূহ এবং কতক হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ কর্মসমূহে সবর করা ফরয। মাকরূহ বিষয়াদিতে সবর করা নফল। যে পীড়ন শরীয়তে নিষিদ্ধ তাতে সবর করা হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার সংকল্প করল। এতে তার আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে সবর করল এবং চুপচাপ দেখে গেল। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। যে পীড়ন শরীয়তে মাকরূহ—হারাম নয়, তাতে সবর করা মাকরূহ। মোটকথা, সবরের কষ্টিপাথর জানা দরকার। সবর ঈমানের অর্ধেক কেবল একথা জেনে মনে করা উচিত নয় যে, সকল সবরই উত্তম।

সর্বাবস্থায় সবরের প্রয়োজনীয়তা ঃ মানুষ জীবনে যেসকল অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলো হয় তার ইচ্ছা ও বাসনার অনুকূলে, না হয় প্রতিকূলে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতে সবরের প্রয়োজন রয়েছে। যে সকল অবস্থা মানুষের খাহেশের অনুকূল হয়ে থাকে, সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, ধন-সম্পদ, জাঁকজমক, জনবল, ধনবল, বেশী সংখ্যক চাকর-নওকর ও বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী মওজুদ থাকা। এ সকল অবস্থায় সবর করার প্রয়োজন অত্যধিক। কেননা, মানুষ যদি পার্থিব আনন্দ-উল্লাসে মেতে নিজেকে সংযত না করে এবং এগুলোতে আকণ্ঠ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিমজ্জিত থাকে, তবে সে আনন্দ-উল্লাস বৈধ হলেও অবশেষে সে নাফরমানী ও ধৃষ্টতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কারণ, সাধারণ রীতি অনুযায়ী মানুষ যখন ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তখনই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰي

অর্থাৎ, মানুষ সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী মনে করে।

জনৈক সাধক বলেন ঃ বালা-মুসীবতে ঈমানদার সবর করে; কিন্তু নিরাপত্তায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ বালা-মুসীবতে সবর করার তুলনায় সচ্ছলতায় সবর করা অত্যন্ত কঠিন। যখন দুনিয়ার ধনসম্পদ সাহাবায়ে কেরামের হাতে আসতে থাকে, তখন তারা বললেন ঃ বিপদাপদ ও দারিদ্র্যে আমাদের পরীক্ষা নেয়া হলে আমরা সবর করলাম, কিন্তু যখন আমরা সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম, তখন আমরা সবর করতে পারলাম না। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফেতনা সম্পর্কে আমাদেরকে হুশিয়ার করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ,হে মুমিনগণ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে।

আরও বলা হয়েছে—

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের কিছু কিছু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَلْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ

অর্থাৎ, সন্তান মানুষকে কৃপণতা, ভীরুতা ও দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত করে দেয়।

একবার তিনি নিজের কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হাসানকে যখন জামায় জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যেতে দেখলেন, তখন মিম্বর থেকে নেমে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ ঠিকই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেতনা স্বরূপ।

আমি আমার সন্তানকে টলমল করতে দেখে স্থির থাকতে পারলাম না এবং তাকে তুলে নিলাম। হে বুদ্ধিমানগণ! এর ফলাফল চিন্তা করুন। অতএব, জানা গেল, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা সত্যিকার সাহসিকতার কাজ। সচ্ছলতায় সবর করার অর্থ হচ্ছে তৎপ্রতি আগ্রহ না করা এবং মনে করা যে, এটা ক্ষণস্থায়ী আমানত মাত্র, যা অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ধনৈশ্বর্যে তুষ্ট হওয়া এবং বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের দ্বারা আল্লাহ্র হক আদায় করা দরকার। উদাহরণতঃ ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, অপরের দৈহিক সাহায্য করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তাঁর হক আদায় করতে হবে। এ ধরনের সবর শোকরের সাথে সংলগ্ন। শোকরে সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত এই সবর পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা যে অধিক কঠিন, তার অন্যতম কারণ এই যে, এতে ক্ষমতা থাকে। নতুবা যার ক্ষমতাই নেই, সে সবর না করে কি করবে? উদাহরণত ঃ যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে খাদ্য না থাকে, তবে সে সহজেই সবর করতে পারে। কিন্তু যদি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আহার্য উপস্থিত থাকে, তবে সবর করা নিঃসন্দেহে কঠিন।

পক্ষান্তরে যে সব অবস্থা মানুষের খাহেশের প্রতিকূল হয়ে থাকে, সেগুলো তিন প্রকার। প্রথম, যে সব অবস্থা মানুষের এখতিয়ারাধীন; যেমন এবাদত ও নাফরমানী। দ্বিতীয়, যা এখতিয়ারাধীন নয়; যেমন বিপদাপদ ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুর্ঘটনা। তৃতীয়, শুরুতে এখতিয়ারাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা এখতিয়ারাধীন; যেমন পীড়নকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। বলা বাহুল্য, এই তিন অবস্থাতেই সবর করা প্রয়োজন।

এবাদতে সবর করা কঠিন। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করে এবং প্রভুত্বের অভিলাষ পোষণ করে। জনৈক সাধু ব্যক্তি বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সে অভিলাষ আত্মগোপন করে আছে, যা ফেরাউন أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى অর্থাৎ, 'আমি তোমাদের সুমহান প্রভু' বলে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ফেরাউন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। কারণ,তার সম্প্রদায় তার কথা মেনে নিয়েছিল। অন্যরা এই অভিলাষ প্রকাশ করার সুযোগ না পেলেও অন্তরে গোপন রাখে। তাই চাকর-বাকর ও অনুগতরা কাজে ত্রুটি করলে মানুষ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং তাদের ত্রুটিকে অসম্ভব মনে করে। এর কারণ অভ্যন্তরীণ অহংকার এবং প্রভুত্বের দাবী ছাড়া আর কি হতে পারে? এ থেকে জানা যায়, দাসত্ব সর্বাবস্থায় কঠিন। এছাড়া কতক এবাদত অলসতার কারণে অপ্রিয় মনে হয়. যেমন নামায। কতক কৃপণতার কারণে দুঃসাধ্য মনে হয়, যেমন যাকাত। কতক এবাদত অলসতা ও কৃপণতা উভয়ের কারণে দুরূহ ঠেকে; যেমন হজ্জ ও জেহাদ। সুতরাং এবাদতে সবর করার মানে অনেকগুলো কঠিন কাজে সবর করা।

এবাদত দু'প্রকার ঃ ফরয ও নফল। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উভয়টি একত্রে উল্লেখ করেছেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ, আল্লাহ ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়কে দান করার আদেশ করেন। এখানে ইনসাফ ফরয, অনুগ্রহ নফল এবং আত্মীয়কে দান করা মানবতা। এদের প্রত্যেকটিতেই সবর করার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, গোনাহেও সবর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সকল প্রকার গোনাহ একত্রিত করেছেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

অর্থাৎ, নির্লজ্জতা, মন্দকাজ ও অবাধ্যতার কাজ করতে নিষেধ করে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ

অর্থাৎ, মোহাজির সে ব্যক্তি, যে মন্দকাজ পরিহার করে এবং মোজাহিদ তাকে বলা হয়, যে আপন খেয়াল-খুশীর সাথে জেহাদ করে।

যে সব গোনাহে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেগুলোতে সবর করা অধিক কঠিন হয়ে থাকে। কেননা, মনের খাহেশের সাথে যখন অভ্যাস যোগ হয়, তখন শয়তানের দুটি বাহিনী পরস্পরে মিলেমিশে একে অপরকে সাহায্য করে এবং ধর্মীয় প্রেরণার মোকাবিলা করে। এরপর যদি সে গোনাহ সহজসাধ্য হয়, তবে তাতে সবর করা মুশকিল। উদাহরণতঃ গীবত, মিথ্যা, কলহ-বিবাদ, আত্মপ্রশংসা ইত্যাদিতে সবর করা খুবই কঠিন।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, যে সকল অবস্থা শুরুতে এখতিয়ারাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা এখতিয়ারাধীন; যেমন কেউ কাউকে কথা অথবা কাজের মাধ্যমে পীড়ন করল। এতে সবর করা এবং প্রতিশোধ না নেয়া কখনও ওয়াজিব এবং কখনও মোস্তাহাব। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ পীড়নে সবর না করা পর্যন্ত আমরা কারও ঈমান সম্পর্কে জানতাম না। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের জওয়াবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۔

অর্থাৎ, তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন কর, তাতে আমরা সবর করব। ভরসাকারীদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কিছু অর্থ বণ্টন করলে কিছু সংখ্যক বেদুইন মুসলমান বলাবলি করল ঃ এ বণ্টনে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমার ভাই মূসা (আঃ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে রসূলে করীম (সাঃ)-কে সবর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَدَعْ اَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ

অর্থাৎ, প্রত্যাখ্যান করুন তাদের পীড়ন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

অর্থাৎ, তাদের বলাবলিতে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করুন।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ

অর্থাৎ, আমি জানি তাদের কথাবার্তায় আপনার মন সংকুচিত হয়। অতএব, আপনি নিজের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁকে সেজদা করুন।

لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

অর্থাৎ, আপনি পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক মন্দকথা শুনবেন। অতঃপর যদি আপনি সবর করেন ও তাকওয়া অবলম্বন করেন, তবে এটা হবে সাহসিকতার কাজ।

এখানে বদলা নেয়ার ব্যাপারে সবর করাই উদ্দেশ্য। এ কারণে এ সবরের মর্যাদা অনেক। আল্লাহ তা'আলা কেসাস ইত্যাদি ব্যাপারে ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ۔

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই নাও, যতটুকু কষ্ট তোমরা পেয়েছ। আর যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

অর্থাৎ, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যে তোমার উপর যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।

ইনজীলে হযরত ঈসা (আঃ) -এর এই উক্তি বর্ণিত রয়েছে— পূর্ব থেকে তোমাদের প্রতি নির্দেশ আছে যে, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক অর্থাৎ, যতটুকু অনিষ্ট তোমার করা হয়, তুমি প্রতিপক্ষের ততটুকু অনিষ্টই কর। কিন্তু আমি বলি অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট করো না। কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তুমি তার সামনে বাম গাল পেতে দাও। কেউ তোমার চাদর নিয়ে গেলে তুমি তাকে লুঙ্গিও দিয়ে দাও। কেউ তোমাকে এক মাইল অনর্থক নিয়ে গেলে তুমি তার সাথে দু'মাইল যাও। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পীড়নে সবর করা সবরের সর্বোচ্চ স্তর।

এ ছাড়া আরও কতিপয় বিষয়ে সবর করা দরকার, সেগুলোর আদি-অন্ত কোনটিই বান্দার এখতিয়ারাধীন নয়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, স্বাস্থ্যহানি হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া ইত্যাদি। এগুলোতে সবর করাও উচ্চস্তরের সবর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন মজীদে তিন বিষয়ে সবরের কথা আছে। (১) ফরয আদায়ে সবর করা। এর সওয়াব তিনশ' মাত্রা পর্যন্ত। (২) আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বস্তুসমূহে এর মাত্রা ছয়শ'। (৩) বিপদাপদে সবর করা। এর জন্য সওয়াব রয়েছে নয়শ'। এই ধরনের সবর যদিও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোস্তাহাব, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবরের চেয়ে উত্তম যদিও তা ফরয। কেননা, হারাম বিষয়ে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি সবর করতে পারে। কিন্তু বিপদে সবর সেই করবে, যার সিদ্দীকগণের মর্তবা অর্জিত হবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন ঃ

اَسْئَلُكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَاتَهُوْنُ عَلَىَّ بِهٖ مَصَائِبُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এমন বিশ্বাস চাই, যা দ্বারা দুনিয়ার বিপদাপদ আমার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

হযরত সোলায়মান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা প্রিয় বস্তুতে সবর করতে না পারলে অপ্রিয় বস্তুতে কিরূপে সবর করতে পারব? এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ যখন আমি বান্দার দেহ, ধন-সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত প্রেরণ করি এবং সে তা উত্তম সবর দ্বারা বরদাশত করে নেয়, তখন কিয়ামতে তার জন্যে দাঁড়িপাল্লা নিযুক্ত করতে অথবা আমলনামা খুলে দিতে আমি লজ্জাবোধ করি। হাদীসে আছে—

اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ .

অর্থাৎ, সবর সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা এবাদত।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—বান্দার উপর যখন মুসীবত আসে এবং সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে এরপর বলে—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ মুসীবতে আমাকে পুরস্কৃত কর এবং এর পেছনে উত্তম বস্তু দান কর,

তখন আল্লাহ তা'আলা তাই করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে বললেন, হে জিবরাঈল, আমি যার উভয় চক্ষু নিয়ে নেই, তার প্রতিদান কি? জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি আমাদেরকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তা ছাড়া আমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিছুই জানি না। এরশাদ হল, তার প্রতিদান এই যে, সে সর্বদা আমার গৃহে থাকবে এবং আমার দীদার লাভ করে ধন্য হবে।

এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে—আল্লাহ্ বলেন ঃ যখন আমি কোন বান্দাকে বিপদে ফেলি এবং সে সবর করে এবং যারা তার খবর নিতে আসে, তাদের কাছে কোন অভিযোগ করে না, আমি তার মাংসের চেয়ে প্রতিদানে উত্তম মাংস দেই এবং তাকে তার রক্তের চেয়ে উত্তম রক্ত দান করি। যখন তাকে রোগমুক্তি দান করি, তখন তার কোন গোনাহ্ থাকে না, আর যখন মৃত্যু দেই, তখন আমার রহমতের ছায়াতলে নিয়ে আসি।

হযরত দাঊদ (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! যে দুঃখী ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টির আশায় বিপদে সবর করে, তার প্রতিদান কি? এরশাদ হল ঃ তার প্রতিদান এই যে, তাকে ঈমানের পোশাক পরিয়ে কখনও তা খুলব না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন এবং পরে তা নিয়ে যান, তখন যদি সে সবর করে, তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ এমন নেয়ামত দান করেন, যা পূর্বের নেয়ামতের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীরাই তাদের পুরস্কার বেহিসাব পায়।

বর্ণিত আছে, হযরত শিবলী (রহঃ) জেলে আবদ্ধ হলে কিছু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কারা? লোকেরা বলল ঃ আমরা আপনার সুহৃদ। আপনাকে দেখতে এসেছি। তিনি তাদের প্রতি ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। ফলে, তারা সকলেই পালিয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা আমার সুহৃদ হতে, তবে আমার বিপদে সবর করতে। জনৈক সাধু ব্যক্তির পকেটে একটি কাগজের টকুরা ছিল। তিনি কিছুক্ষণ পরপর সেটি বের করে দেখে নিতেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তুমি তোমার পালনকর্তার নির্দেশের জন্যে সবর কর। তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই রয়েছ।

বর্ণিত আছে, ফাতাহ মুসেলীর পত্নী একবার পা পিছলে পড়ে যান। এতে তার নখ উঠে যায়। তিনি হেসে উঠলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার কষ্ট হচ্ছে না? তিনি বললেন ঃ এর সওয়াবের আনন্দে ব্যথার তিক্ততা অনুভব করতে পারছি না।

হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর পুত্র সোলায়মান (আঃ)-কে বললেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা মুমিনের তাকওয়া প্রমাণিত হয়—(১) সে যা পায় না, তাতে উত্তম তাওয়াক্কুল করা, (২) যা পায়, তাতে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট থাকা এবং (৩) যে বস্তু পাওয়ার পর হাতছাড়া হয়ে যায়, তাতে উত্তম সবর করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهٖ اَنْ لَّا تَشْكُوْا وَجْعَكَ وَلَا تَذْكُرَ مُصِيْبَتَكَ

অর্থাৎ,তুমি তোমার ব্যথার অভিযোগ করবে না এবং বিপদাপদের আলোচনা করবে না—এটাই আল্লাহর সম্মান ও তাঁর হকের পরিচয়।

উপরে যা বর্ণিত হল, তা হচ্ছে আল্লাহর পথের পথিকগণের সবর।

এখন প্রশ্ন হয় যে, বিপদাপদে মানুষ সবরের মর্তবা কিরূপে লাভ করবে? কারণ, এটা এখতিয়ারাধীন ব্যাপার নয়। অন্তরে বিপদাপদের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকার নাম যদি সবর হয়, তবে এটা মানুষের এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত নয়। জওয়াব এই যে, সবরকারীর তালিকা থেকে মানুষ তখনই বাদ পড়বে, যখন সে বিপদে হা-হুতাশ করবে, মুখমন্ডলে আঘাত করবে এবং পরিধানের জামা ছিঁড়ে ফেলবে। এছাড়া উঠতে-বসতে অভিযোগ করবে, দুঃখ প্রকাশ করবে এবং খাওয়া-পরার অভ্যাস পাল্টে দেবে। এসব কাজ মানুষের এখতিয়ারাধীন। সবর করার জন্যে এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব। এছাড়া আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি ছাড়া মুখে অন্য কিছু প্রকাশ করবে না এবং খাওয়া-পরার অভ্যাসে কোন পরিবর্তন করবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না। মনে করতে হবে, হারানো বস্তুটি তার কাছে আমানত ছিল, যা মালিক ফেরত নিয়ে গেছেন।

রমিছা উম্মে সুলায়মান বর্ণনা করেন ঃ আমার অসুস্থ শিশুপুত্র যখন মারা গেল, তখন আমার স্বামী হযরত আবু তালহা (রাঃ) বাড়ী ছিলেন না। আমি ঘরের এক কোণে মৃতদেহ রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম। এরপর আবু তালহা বাড়ী ফিরলে আমি যথারীতি তার সামনে খাবার পেশ করলাম। তিনি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছেলের অবস্থা কেমন? আমি বললাম ঃ আলহামদু লিল্লাহ, ভাল। এরূপ বলার কারণ এই যে, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কোন রাত্রি এত শান্তিতে কাটেনি, যেমন সেই রাত্রিটি কেটেছিল। এরপর আমি অন্য দিনের তুলনায় অধিক সাজসজ্জা করলাম এবং আমার স্বামী আমার সাথে সহবাস করলেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম ঃ আমাদের প্রতিবেশীর কাণ্ড দেখ, সে একটি বস্তু চেয়ে এনেছিল। এখন মালিক সেটি ফেরত নিয়ে গেলে সে হৈচৈ শুরু করে দিল। আবু তালহা বললেন ঃ প্রতিবেশী এরূপ করে থাকলে খুবই খারাপ করেছে। আমি বললাম ঃ তোমার পুত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার ছিল। আল্লাহ এখন তা নিয়ে গেছেন। একথা শুনে আবু তালহা আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করলেন। পরের দিন সকালে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী! এই রাত্রির ব্যাপারে বরকত দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই দোয়ার পর আমি মসজিদে আবু তালহার সাতটি পুত্র সন্তানকে কোরআন পাঠ করতে দেখেছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে বেহেশতে প্রবেশ করেছি এবং আবু তালহার পত্নী রমিছাকে সেখানে দেখেছি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ "সবরে জমীল" (সুন্দর সবর) হচ্ছে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে না পারা। মৃতের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করলে কেউ সবরকারীদের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যায় না। কেননা, এটা মানবতার অন্যতম দাবী। মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ এ থেকে বাঁচতে পারে না। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আপনি তো আমাদেরকে এরূপ করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

অর্থাৎ, এটা করুণা। যারা করুণা করে, তারাই আল্লাহ তা'আলার করুণা পায়।

হাঁ, পূর্ণাঙ্গ সবর হচ্ছে রোগ, দারিদ্র্য ও সকল বিপদাপদকে গোপন রাখা।

সবর লাভ করার উপায় ঃ প্রকাশ থাকে যে, যিনি রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করেছেন, তিনি এর ঔষধও নাযিল করেছেন এবং আরোগ্য দানের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং সবর যদিও অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু এলম ও আমলের মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। সবরের প্রকার বিভিন্ন বিধায় তার প্রতিবন্ধকও বিভিন্ন এবং চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্নরূপ। বিষয়টি দীর্ঘ বর্ণনার দাবী রাখে। কিন্তু নিম্নে আমরা কতিপয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর চিকিৎসা পদ্ধতি বলে দিচ্ছি।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যিনার কামভাব থেকে সবর অর্জন করতে চায়। এই কামভাব তার উপর এত প্রবল যে, সে যৌন অঙ্গকে বিরত রাখতে সক্ষম হলেও দৃষ্টিকে বিরত রাখতে সক্ষম নয়। কিংবা এতে সক্ষম হলেও মনকে বশ করতে পারে না। মন সব সময় তাকে কামভাবে জড়িয়ে রাখে। এ জন্যে অব্যাহতভাবে যিকর, এবাদত ও সৎকর্ম সম্পাদন তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এখন এর প্রতিকার শুনুন ঃ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধর্মীয় প্রেরণা এবং শয়তানী প্রেরণার মধ্যে সংঘর্ষ হতে থাকে। আমরা যদি এদের এক পক্ষের বিজয় এবং অপরপক্ষের পরাজয় কামনা করি, তবে যাকে বিজয়ী করা উদ্দেশ্য হয়, তাকে শক্তি যোগানো এবং অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। সেমতে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে ধার্মিক প্রেরণাকে শক্তি যোগানো এবং তার প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা জরুরী। কামপ্রেরণাকে দুর্বল করার উপায় তিনটি। প্রথমত, কামপ্রেরণার আসল উৎসকে দেখতে হবে, সে কোথা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। এতে জানা যাবে, তার শক্তির আসল উৎস হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও পর্যাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাদ্য গ্রহণ। সুতরাং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বদা রোযা রাখতে হবে। সে কেবল ইফতারের সময় সামান্য লঘু খাদ্য গ্রহণ করবে। মাংস ইত্যাদি কামোত্তেজক খাদ্য সামগ্রী বর্জন করবে।

দ্বিতীয়ত, কামভাবের সামগ্রী মওজুদ থাকলে তা দূর করতে হবে। কামোত্তেজনার মূল কারণ হচ্ছে দৃষ্টি। এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করা জরুরী। হাদীসে আছে –

اَلنَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

অর্থাৎ, দৃষ্টি ইবলীসের অন্যতম তীর।

সে এই তীর এমনভাবে নিক্ষেপ করে যে, চক্ষু বন্ধ রাখা ছাড়া একে প্রতিহত করার অন্য কোন ঢাল নেই। সুতরাং মানুষ যখন রূপসীদের আনাগোনার স্থান থেকে অন্যত্র সরে যাবে, তখন ইবলীসের এই তীর তার গায়ে লাগবে না।

তৃতীয়ত মানুষ যে বস্তুর খাহেশ করে, সে জাতীয় বৈধ বস্তুর দ্বারাই মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে। উদাহরণতঃ বর্ণিত দৃষ্টান্তে বিবাহ দ্বারা মনকে সান্ত্বনা দেবে। কেননা, তার মন যা চায়, বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে তা বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, নিষিদ্ধ পাত্রে যাওয়ার প্রয়োজন কি? অধিকাংশ লোকের জন্যে এই চিকিৎসা উপকারী। তবে কিছু সংখ্যক মানুষের কামভাব এতে প্রশমিত হয় না।

এখানে প্রথমোক্ত চিকিৎসাটি (খাদ্য মওকুফ করা) হচ্ছে, যেমন অবাধ্য জন্তু অথবা পাগলা কুকুরকে খাদ্য না দেয়া, যাতে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুকুরের সম্মুখ থেকে মাংস লুকিয়ে ফেলা, যাতে না দেখে এবং খাহেশ না করে। তৃতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, কুকুরের পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্য থেকে সামান্য তাকে দেয়া, যাতে শাসনে সবর করার মত শক্তি তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে।

অপরপক্ষে ধর্মীয় প্রেরণাকে দু'ভাবে শক্তি যোগানো যায়। প্রথমত মনকে সাধনার উপকারিতা এবং দ্বীন ও দুনিয়াতে তার শুভ ফলাফলেরও লোভ দেখানো। এ উদ্দেশ্যে সবরের ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার শুভ পরিণতি সম্পর্কে যে সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সেগুলোতে অধিক পরিমাণে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এর ফলে ধর্মীয় প্রেরণা শক্তিশালী হয় এবং তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে শয়তানী প্রেরণাকে ভূলুণ্ঠিত করার অভ্যাস ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা। কেননা, অভ্যাস ও দক্ষতা আমলের শক্তিকে মযবুত করে দেয়। এ কারণেই যারা পরিশ্রমের কাজ করে, যেমন কৃষক ও সিপাহী, তারা আতর বিক্রেতা, ফেকাহবিদ ও সাধু ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক শক্তিধর হয়ে থাকে। কারণ, শেষোক্ত ব্যক্তিদের শক্তি অভ্যাস ও দক্ষতা দ্বারা মযবুত হয় না।

এ দুটি চিকিৎসার মধ্যে প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুস্তিগীরকে ওয়াদা দেয়া যে, যদি প্রতিপক্ষকে ভূমিসাৎ করে দাও, তবে অনেক পুরস্কার পাবে। উদাহরণতঃ ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবিলায় জাদুকরদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা জয়ী হলে আমি তোমাদেরকে নৈকট্যশালী করে নেব। দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কোন বালককে কুস্তি শেখানোর উদ্দেশ্য হলে শৈশব থেকেই তাকে এ শাস্ত্রের জরুরী বিষয়াদিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, যাতে কুস্তির প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে এবং শক্তি ও সাহসিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি সবর সহকারে সাধনাই পরিত্যাগ করবে, তার মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সে কামভাবে প্রবল হতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে খাহেশের খেলাফ কাজে অভ্যস্ত করবে, সে যখন ইচ্ছা কামভাবের উপর জয়ী হতে পারবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সবরের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোকর

জানা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে শোকরকে যিকরের সাথে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি একথাও বলেছেন যে,

ولذكر الله اكبر অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর অত্যন্ত মহান।

এরশাদ হয়েছে—

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِي وَلَاتَكْفُرُوْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার কর— নাশোকরী করো না।

এমন মহান বস্তুর সাথে শোকরের উল্লেখ এর পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যদি অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং ঈমান রাখ, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কি করবেন?

এক আয়াতে আছে—

وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِيْنَ অর্থাৎ, আমি শোকরকারীদেরকে প্রতিদান দেব।

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তোমার সরল পথে বসে থাকব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এখানে সরল পথের অর্থ শোকরকারীদের পথ।

শোকর উচ্চ মর্তবার অধিকারী বিধায় অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের শোকর না করার দোষটিই উল্লেখ করে বলেছে—

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ অর্থাৎ, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকরকারী পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ অর্থাৎ, আমার কম বান্দাই শোকরকারী।

তিনি শোকরের সাথে নেয়ামত বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এতে কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করেননি। যেমন এরশাদ হয়েছে—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা শোকর করলে আমি অবশ্যই নেয়ামত বৃদ্ধি করব।

অথচ অন্য পাঁচটি নেয়ামত অর্থাৎ, ধনাঢ্য করা, দোয়া কবুল করা, রুযী দেয়া, ক্ষমা করা এবং তওবা কবুল করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে নিজ কৃপায় তোমাদেরকে ধনাঢ্য করবেন।

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ অর্থাৎ, অতঃপর যদি ইচ্ছা করেন, তিনি উন্মুক্ত করে দেন যার জন্যে তোমরা দোয়া কর।

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বেহিসাব রিযক দান করেন। وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি শিরক ব্যতীত অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা তওবা দেন।

এ থেকে জানা যায় যে, শোকর একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়। আল্লাহ এতে নিজের ইচ্ছার শর্ত আরোপ করেননি। বরং নেয়ামত বৃদ্ধির অকাট্য ওয়াদা করেছেন।

এছাড়া জান্নাতবাসীদের প্রথম বাক্যও শোকরই হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ অর্থাৎ, জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ, তাদের শেষ দোয়া হবে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বের পালনকর্তা।

হাদীসেও শোকরের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ অর্থাৎ, যে খায় ও শোকর করে, সে সবরকারী রোযাদারের অনুরূপ।

হযরত আতা (রঃ) বর্ণনা করেন— আমি একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বাধিক আশ্চর্যজনক যে অবস্থাটি স্বচক্ষে দেখেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ তাঁর কোন্ অবস্থাটি আশ্চর্যজনক ছিল না? এক রাতে তিনি আমার কাছে এলেন এবং বিছানায় অথবা লেপের নিচে আমার সাথে শয়ন করলেন। এক সময় তাঁর দেহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার দেহকে স্পর্শ করল। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আবু বকর-তনয়া! পরওয়ারদেগারের এবাদতের জন্যে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আরয করলাম ঃ আমি তো আপনার সাথেই থাকতে চাই। তবে আমি আপনার মরযীর অনুগামী। আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম। তিনি গাত্রোত্থান করলেন এবং পানির জালার কাছে চলে গেলেন। সেখানে অল্প পানিতে উযু করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং অনবরত অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। অশ্রু তাঁর বুকে প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর রুকুতে, সেজদায় এবং উভয় সেজদার মাঝখানে অশ্রু বিসর্জন করলেন। তিনি এমনিভাবে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের কথা জানালেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি কি আল্লাহর শোকরগোযার বান্দা হব না? আমি কাঁদব না কেন যেখানে আল্লাহ আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَلْاٰيَة

অর্থাৎ, এ থেকে জানা যায়, ক্রন্দন কখনও সমাপ্ত না হওয়া উচিত। এ রহস্যের প্রতিই নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ একবার জনৈক পয়গম্বর পথ চলার সময় পথিমধ্যে একটি ছোট পাথর দেখতে পান। পাথরটি থেকে অনেক পানি বের হতে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা পাথরকে বাকশক্তি দান করলেন। সে আরয করল— যেদিন থেকে আমি আল্লাহর উক্তি শুনেছি যে, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেদিন থেকেই আমি ভয়ে কাঁদছি। পয়গম্বর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন— ইলাহী! এই পাথরকে তুমি আগুন থেকে রক্ষা কর। তাঁর দোয়া কবুল হল। তিনি পাথরকে একথা জানিয়ে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পর তিনি সে পথে এসে পাথরকে পূর্ববৎ কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবার কাঁদছ কেন? সে আরয করল ঃ পূর্বের কান্নার কারণ ছিল ভয়। আর এখন কাঁদছি শোকর ও আনন্দে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলা বাহুল্য, মানুষের অন্তরও পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত। তাই এর কঠোরতা ভয় ও শোকর অবস্থায় কান্না ছাড়া দূর হবে না। এক হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—যারা আল্লাহ তা'আলার অধিক হামদ করে, তারা উঠ। এরপর একটি দল উঠে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ অধিক হামদকারী কারা? উত্তর হল—যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, যারা সুখে ও কষ্টে আল্লাহর শোকর করে।

শোকরের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ যে আল্লাহর পথে চলে, তার মনযিলসমূহের মধ্যে একটির নাম শোকর। এই শোকর তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত- এলম, হাল ও আমল। এলম থেকে হাল এবং হাল থেকে আমল সৃষ্টি হয়। এলম হচ্ছে সকল নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। হাল হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আমলের অর্থ যা আল্লাহর উদ্দেশ্য ও প্রিয়, তাতে কায়েম থাকা। আমল অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জিহ্বার সাথেও সম্পৃক্ত। শোকরের স্বরূপ পূর্ণরূপে জানার জন্যে সবগুলো বর্ণনা করা জরুরী।

শোকরের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তার কোনটির মধ্যে শোকরের পূর্ণ অর্থ নেই। এলম সম্পর্কে বলতে গেলে তিনটি বিষয় জানা দরকার। এক, স্বয়ং নেয়ামতকে জানতে হবে। দুই, এই নেয়ামত যে তার জন্যে নেয়ামত, তা জানতে হবে। তিন, নেয়ামতদাতার সত্তা ও সিফাতসমূহ জানা দরকার। এটা আল্লাহ ছাড়া শুধু অন্যের বেলায়। আল্লাহর বেলায় এই এলম দরকার যে, সকল নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনিই প্রকৃত নেয়ামতদাতা। মধ্যবর্তী সকলেই তাঁর পক্ষ থেকে কর্মী মাত্র, যারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। এখন জানা উচিত যে, এই এলম তখন পূর্ণ হবে, যখন ক্রিয়াকর্মে শিরক না থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে কোন বাদশাহ কোন নেয়ামত দান করল। এই নেয়ামত পাওয়া অথবা তার হাতে পৌঁছার ব্যাপারে সে যদি বাদশাহের উকিল অথবা উযীরেরও দখল আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সে এই নেয়ামতে বাদশাহের সাথে অপরকেও শরীক করল এবং এই নেয়ামত যে সর্বতোভাবে বাদশাহের তরফ থেকে প্রদত্ত, তা মানল না; বরং কিছু বাদশাহের পক্ষ থেকে এবং কিছু উযীরের পক্ষ থেকে মনে করল। ফলে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার খুশীও উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সে বিশ্বাস করে, যে নেয়ামত সে পেয়েছে, তা বাদশাহের ফরমানের কারণে, যা তিনি নিজের কলম দ্বারা কাগজে লিখেছেন, তবে এতে শিরক হবে না এবং পূর্ণ শোকরে ত্রুটি থাকবে না। কেননা, সে কলম ও কাগজের তো শোকর করে না। এমনিভাবে যদি সে বাদশাহের উযীরকেও মনে করে যে, সে বাদশাহের চাপ ও আদেশের কারণে দেয়— নিজের ক্ষমতা থাকলে কিছুই দিত না, তবে এতে শিরক হবে না। এখানে উযীর কাগজ ও কলমের মতই গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে জানবে এবং তাঁর কর্মকে চিনবে, সে জানতে পারবে, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সবই তাঁর আদেশের অনুসারী। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত যদি কারও কাছে অন্যের হাতে পৌঁছে, তবে বুঝতে হবে, সে তা পৌঁছাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যে, এই নেয়ামতটি অমুকের কাছে পৌঁছানোর মধ্যেই তার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত। এরপর তার এ কাজটি না করার কোন কারণ থাকে না।

জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত নেয়ামতদাতা। এ বিষয়টি জেনে নেয়ার পর নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই শোকর করতে সক্ষম হবে! বরং শুধু এই জানার কারণেই সে শোকরকারী হয়ে যাবে। সেমতে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে আরয করেন—ইলাহী! তুমি আদমকে স্বহস্তে সৃষ্টি করে কত নেয়ামত দান করেছ। সে তোমার শোকর কিভাবে আদায় করল? এরশাদ হল ঃ আদম এ সকল নেয়ামতকে আমারই পক্ষ থেকে বিশ্বাস করেছে। এ বিশ্বাসই ছিল তার শোকরগোযারী। অতএব বাহ্যিক নেয়ামতদাতাকে নিয়ে মেতে থাকা মানুষের উচিত নয়; বরং প্রকৃত নেয়ামতদাতারও ধ্যান করা উচিত। নতুবা এলমের ত্রুটির কারণে হালও ত্রুটিযুক্ত হবে এবং হাল ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে আমলও ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যা এলম থেকে অর্জিত হয়। এর অর্থ নেয়ামতদাতার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা। এলমের ন্যায় এটাও স্বতন্ত্র শোকর। এই শোকর তখনই হয়, যখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয়। শর্ত এই যে, সন্তুষ্ট কেবল নেয়ামতদাতার প্রতি হতে হবে— নেয়ামত ও নেয়ামত দানের প্রতি নয়। সম্ভবত এ বিষয়টি কারও হৃদয়ঙ্গম হবে না। তাই একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছি।

উদাহরণতঃ জনৈক বাদশাহ্ সফরে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করল। সে ব্যক্তি এই ঘোড়া পাওয়ায় তিন প্রকারে সন্তুষ্ট হতে পারে। প্রথমত, কেবল ঘোড়ার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যে, এটা উপকারী সম্পদ, সওয়ারীর যোগ্য, উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক এবং উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত। এ ধরনের সন্তুষ্ট সেই হবে, যার বাদশাহের প্রতি কোন কৌতূহল নেই— কেবল ঘোড়ার প্রতিই কৌতূহল। এমনকি, যদি সে এই ঘোড়া জঙ্গলেও পেত, তবু এতটুকুই সন্তুষ্ট হত। দ্বিতীয়ত, কেবল বাদশাহের দানের কারণে সন্তুষ্ট হওয়া। কারণ, এতে বুঝা যায়, এই ব্যক্তির প্রতি বাদশাহের সুদৃষ্টি ও অনুগ্রহের মনোভাব রয়েছে। সে যদি এই ঘোড়াটি জঙ্গলে ঘুরাফেরা অবস্থায় পেয়ে যেত, তবে কখনও সন্তুষ্ট হত না। কারণ, এতে বাদশাহের অন্তরে আসন পাওয়ার উদ্দেশ্যটি হাসিল হত না। তৃতীয়ত, সন্তুষ্টির কারণ এই যে, সে সওয়ার হয়ে সফরের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে এবং বাদশাহের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমত করবে। এমনকি, বাদশাহের মন্ত্রী হয়ে যা য়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরোক্ত তিন প্রকারের প্রথমটিতে শোকরের অর্থ পাওয়াই যায় না। কারণ, এতে দৃষ্টি কেবল ঘোড়ার প্রতি এবং সন্তুষ্টিও ঘোড়া পর্যন্তই সীমিত। দাতার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা সেসব লোকের অবস্থা, যারা কেবল নেয়ামতটি সুস্বাদু ও উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হওয়ার কারণে সন্তুষ্ট হয়। তারা শোকরের স্তর থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। দ্বিতীয় প্রকার শোকরের অর্থে অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এতে নেয়ামতদাতার সত্তার দিক দিয়ে সন্তুষ্টি নেই; বরং একারণে যে, শাহী কৃপাদৃষ্টি নিশ্চিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও নেয়ামত লাভের কারণ হবে। এটা সেই সৎকর্মীদের অবস্থা, যারা শাস্তির ভয়ে ও সওয়াবের আশায় আল্লাহ তা'আলার শোকর ও এবাদত করে। তৃতীয় প্রকারে পূর্ণাঙ্গ শোকরের অর্থ পাওয়া যায়। এতে নেয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও দীদার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লাভ করে ধন্য হওয়া। এটা অত্যন্ত উচ্চ মর্তবা। এর পরিচয় এই যে, মানুষ আখেরাত অর্জনে সহায়ক বিষয়াদি ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না এবং যে বিষয় আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এবং তাঁর পথে অন্তরায় হয়, তাতে দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ শোকরের উদ্দেশ্য হচ্ছে নেয়ামতদাতা, আল্লাহর দীদার নয়। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রাঃ) বলেন ঃ সাধারণ মানুষ পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে শোকর আদায় করে; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের হালে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। এই মর্তবা এমন লোকদের বোধগম্য নয়, যারা আনন্দ ও খুশীকে কেবল উদরপূর্তি, যৌনতৃপ্তি, রঙ-তামাশা, সুর ইত্যাদিতে সীমিত মনে করে। কেউ এই মর্তবা লাভে অক্ষম হলে তার উচিত দ্বিতীয় মর্তবা লাভে সচেষ্ট হওয়া। প্রথম মর্তবা তো গণনার মধ্যেই পড়ে না।

তৃতীয় বিষয় আমল। অর্থাৎ, নেয়ামতদাতাকে জানার কারণে যে খুশী অর্জিত হয়, তদনুসারে কাজ করা। এই আমল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। অন্তরের আমল হচ্ছে কল্যাণকামিতা এবং সকল মানুষের জন্যে সৎ কামনা ও সদাচারের মনোভাব পোষণ করা। জিহ্বার আমল হচ্ছে শোকর জ্ঞাপন করে উৎকৃষ্ট প্রশংসাসূচক ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং এগুলোকে তাঁর নাফরমানীর কাজে সহায়ক না করা। উদাহরণতঃ চোখের আমল হল কোন মুসলমানের কোন দোষ দেখলে তা গোপন করা। কানের আমল কোন মুসলমানের কোন দোষ শ্রবণ করলে তা ফাঁস না করা। মুখের আমল, মুখে এমন ভাষা উচ্চারণ করা, যা দ্বারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন করলে আল্লাহ তা'আলার এসব নেয়ামতের শোকর আদায় হয়। এরূপ করার নির্দেশও রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ কেমন আছ? সে আরয করল ঃ ভাল। আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস শোকর করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কাছে আমি একথাই আশা করছিলাম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ পরস্পর যে কুশল বিনিময় করতেন, তার উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে, কোনরূপে মুখ দিয়ে আল্লাহর শোকর উচ্চারিত হোক।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটকথা, মুখে শোকর বলাও শোকরগোযারীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, কিছু লোক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের একজন যুবক কিছু আরয করার জন্যে দণ্ডায়মান হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক প্রথমে সে কথা বলবে। এরপর তার চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তি বক্তব্য রাখবে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কথা বলা উচিত। যুবক আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন! যদি সবকিছু বয়সের উপরই নির্ভরশীল হত, তবে মুসলমানদের শাসক এমন কোন ব্যক্তি হত, যে আপনার চেয়ে অধিক বয়স্ক। খলীফা বললেন ঃ আচ্ছা, যা বলতে চাও, বল। যুবক বলল ঃ আমরা আপনার কাছে চাইতে অথবা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে এখানে আসিনি। কেননা, আপনার দানশীলতা আমরা ঘরে বসেই পেয়ে গেছি। সুতরাং চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আপনার ন্যায়পরায়ণতাকে ভয় করারও কোন হেতু নেই। আমরা কেবল আপনার শোকর আদায় করতে এসেছি। মৌখিক শোকর আদায় করেই আমরা চলে যাব।

সারকথা, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই শোকরের মূল। এগুলোর মাধ্যমে শোকরের স্বরূপ উদঘাটিত হয়। শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন ঃ

নেয়ামতদাতার নেয়ামত বিনীতভাবে স্বীকার করার নাম শোকর। এ সংজ্ঞায় মৌখিক উক্তি এবং অন্তরের কতক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ শোকর হচ্ছে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ উল্লেখ করে তার প্রশংসা করা। এতে কেবল মৌখিক আমলের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারও কারও মতে শোকর হচ্ছে তত্ত্বে মগ্ন হওয়া এবং সদাসর্বদা নেয়ামতদাতার মহত্ত্ব স্মরণ রাখা। এই সংজ্ঞা শোকরের অধিকাংশ বিষয়কে শামিল করে; কিন্তু জিহ্বার আমল শোকরের বাইরে থেকে যায়।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোকরকারী নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য মনে করবে না। এতে কেবল অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থা পাওয়া যায়। মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেকের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল বিধায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে একই বুযুর্গের উক্তি দু'অবস্থার মধ্যে দু'রকম হয়েছে। কেননা, তাদের মধ্যে যখন যে হাল প্রবল হত, সে হাল অনুযায়ীই তারা বক্তব্য রাখতেন। তারা যতটুকু বলা প্রশ্নকারীর জন্যে উপযোগী মনে করতেন, ততটুকুই বলতেন, অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। এখানে পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে, আমরা এসব কথা তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলছি অথবা আমাদের সুচিন্তিত বক্তব্য তাদের মনঃপূত নয়। বরং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমাদের বক্তব্য অস্বীকার করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে শোকরের অর্থ ঃ কেউ মনে করতে পারে যে, শোকর এমন ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়, যেখানে নেয়ামতদাতা থাকে এবং শোকর দ্বারা তার কিছু না কিছু উপকার হয়। উদাহরণতঃ আমরা বাদশাহ্দের শোকর কয়েক প্রকারের করতে পারি এবং প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে বাদশাহ্দের কিছু না কিছু স্বার্থ হাসিল হয়। প্রথমত, প্রশংসার মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতে বাদশাহ্দের উপকার এই যে, জনগণের মনে তাদের আসন মযবুত হয় এবং তাদের দানশীলতা সুখ্যাত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সেবা ও খেদমতের মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতেও তাদের কোন কোন উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা হয়। তৃতীয়ত, চাকর-বাকরের আকৃতিতে বাদশাহদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে শোকর করতে পারি। এতে তাদের দল ও নামযশ বৃদ্ধি পায়।

মোটকথা, শোকরের কারণে নেয়ামতদাতার এ ধরনের কোন না কোন উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া দু'কারণে অসম্ভব। প্রথম কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সকল স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সেবাযত্ন, সাহায্য, জাঁকজমক বৃদ্ধি এবং নওকর-চাকরের আধিক্যের প্রয়োজন নেই।

আমরা তাঁর সামনে রুকু-সেজদা করলে তাঁর কোন উপকার হয় না। সুতরাং তাঁর জন্যে শোকরও না থাকা উচিত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা আপন এখতিয়ার দ্বারা যত কাজ করি, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নেয়ামত। কেননা, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ, ইচ্ছা-প্রয়াস এবং নড়াচড়ার উপকরণাদি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সুতরাং তাঁর নেয়ামতের শোকর তাঁরই নেয়ামত দ্বারা কেমন করে হতে পারে? অতএব বুঝা গেল, উপরোক্ত দু'কারণে আল্লাহ তা'আলার জন্যে শোকর অসম্ভব। এখন এমন উপায় দরকার, যাতে এই অসম্ভাব্যতা না থাকে এবং শোকরও আদায় হয়।

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-ও এমনি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেন ঃ ইলাহী! আমরা তোমার নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করব? কেননা, যখন শোকর করব, তখন তোমার কোন নেয়ামত দ্বারাই করব; অর্থাৎ, আমাদের শোকর তোমার অপর একটি নেয়ামত হবে, যার শোকর করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলা জওয়াবে এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তোমরা যখন এটা জেনে নিয়েছ, তখন আমিও ধরে নিলাম, আমার শোকর করেছ। এই ওহীর বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা এলমে মোকাশাফার উপর নির্ভরশীল। তাই আমরা এ পর্যন্তই কলম গুটিয়ে নিচ্ছি এবং এলমে মোয়াসালায় বোধগম্য একটি বিষয় উল্লেখ করছি।

পয়গম্বরগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্য মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা। এই তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছার পথে রয়েছে অনেক দুরতিক্রম্য বাধা। শরীয়ত পুরাপুরিভাবে এসব বাধা অতিক্রম করার পন্থা বর্ণনা করে। এতে শোকর, শাকের ও যার শোকর করা হয়—পৃথক পৃথক মনে হয়। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝা যাক। মনে কর, জনৈক বাদশাহ তাঁর কাছ থেকে দূরে অবস্থানকারী এক গোলামের কাছে সওয়ারী, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পাথেয় হিসেবে নগদ টাকা-পয়সা প্রেরণ করল, যাতে সে পথের দূরত্ব অতিক্রম করে শাহী দরবারের নিকটে চলে আসে। এ নৈকট্যের সম্ভাব্য কারণ দুটি। (১) বাদশাহের উদ্দেশ্য দরবারে এসে গেলে কিছু কিছু শাহী দায়িত্ব পালন করবে। ফলে, রাজকার্যে সুবিধা হবে। (২) তার নিকটে আসার মধ্যে বাদশাহের কোন ফায়দা নেই এবং তাতে সাম্রাজ্যের কোন শ্রীবৃদ্ধিও হবে না। বরং এতে স্বয়ং গোলামের উপকার রয়েছে। সে বাদশাহের নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও তাঁর নৈকট্য লাভের ব্যাপারটিকেও এই দ্বিতীয় পর্যায়ে মনে করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে গোলাম কেবল সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাদশাহের কাছে চলে আসলেই শোকরকারী হবে না, যে পর্যন্ত বাদশাহের উদ্দিষ্ট রাজকার্যের দায়-দায়িত্ব পালন না করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যদিও কোন উপকার বাদশাহের কাম্য নয়, তবু গোলাম শাকের (শোকরকারী) ও কাফের (অস্বীকারকারী) হতে পারে। যদি সে বাদশাহের প্রদত্ত সামগ্রী যথাযথ খাতে ব্যয় করে, তবে সে শাকের হবে; অন্যথায় কাফের। সুতরাং সে যদি বাদশাহের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, তবে সে প্রভুর শোকরকারী হবে। কেননা, প্রভুর নেয়ামতকে সে তারই অভীষ্ট কাজে ব্যয় করেছে। পক্ষান্তরে যদি গোলাম বাদশাহের সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে বাদশাহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বিপরীত দিকে চলে এবং দূরে চলে যায়, তবে সে নেয়ামত অস্বীকারকারী হবে। আর যদি সওয়ার না হয় এবং নিকটে অথবা দূরে না যায়, তবু সে নেয়ামতের কাফের বলে গণ্য হবে। কেননা, সে প্রভুর নেয়ামতকে অকার্যকর করে রেখেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর নিকটে থাকার মধ্যেই তার সৌভাগ্য নিহিত রেখেছেন। এরপর নৈকট্যের স্তর লাভের জন্যে এমন সব নেয়ামত সরবরাহ করেছেন, যেগুলো ব্যবহার করতে সে সক্ষম। কিন্তু মানুষ কামনা-বাসনার কারণে মহান দরবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের এই দূরত্ব ও নৈকট্যকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ـ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে হীনতম করে দেই; কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মাধ্যমে মানুষ হীনতম স্তর থেকে উন্নতি করে নৈকট্যের তথা সৌভাগ্যের স্তরে পৌঁছতে পারে। এতে উপকার মানুষেরই হবে। মানুষ নৈকট্যশীল হোক কিংবা দূরবর্তী, তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন ফায়দা নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন মানুষের ইচ্ছা। সে যদি নেয়ামতকে আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করে, তবে শোকরকারী হবে। কারণ, সে প্রভুর মরযী অনুযায়ী কাজ করেছে। আর যদি নাফরমানীতে ব্যবহার করে, তবে নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে প্রভুর মরযীর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর যদি নেয়ামতকে অকার্যকর করে রাখে এবং আনুগত্য ও নাফরমানী কোন কিছুতে ব্যবহার না করে, তবে এতেও সে নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে নেয়ামতকে বিনষ্ট করে।

আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানা ব্যতীত শোকর অর্জন ও নাশোকরী বর্জন পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, শোকরের অর্থ হচ্ছে খোদায়ী নেয়ামতসমূহকে তাঁর পছন্দনীয় বিষয়ে ব্যবহার করা এবং নাশোকরীর মানে হচ্ছে নেয়ামতসমুহকে মোটেই ব্যবহার না করা অথবা অপছন্দনীয় বিষয়ে ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানার উপায় দুটি। এক, কোরআনী আয়াত ও হাদীস শ্রবণ করা এবং দুই, অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা। শেষোক্ত উপায়টি কঠিন বিধায় বিরল। আল্লাহ তাআলা রসূলগণকে প্রেরণ করে মানুষের জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন। মানুষের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত শরীয়তের বিধি-বিধান জানার উপর এই পথের পরিচয় নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সকল ক্রিয়াকর্মে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হবে না, সে কখনও শোকরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

দ্বিতীয় উপায় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যে সকল সৃষ্টবস্তু দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য জানা। কেননা, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে কোন রহস্য নেই এবং সেই রহস্যের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নেই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তু দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তাই আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়। রহস্য দু'প্রকার—প্রকাশ্য ও গোপন। প্রকাশ্য ও বোধগম্য রহস্যসমূহ আল্লাহ তা'আলাও কোরআন মজীদে বর্ণনা করে দিয়েছেন, গোপন ও দুর্বোধ্য রহস্যসমূহ বর্ণনা করেননি। উদাহরণতঃ সূর্য সৃষ্টির মধ্যে এই রহস্য নিহিত যে, এর মাধ্যমে দিন ও রাত অস্তিত্ব লাভ করে। দিনের উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জন এবং রাত্রির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উদ্দেশ্য বিশ্রাম ও স্বস্তি অর্জন। এ হচ্ছে সূর্য সৃষ্টির প্রকাশ্য রহস্য। এ ছাড়া এর অনেক গোপন রহস্যও রয়েছে, যা বর্ণিত হয়নি। এমনিভাবে মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের রহস্যও কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ـ

অর্থাৎ, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি ভূমি বিদারিত করি এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। এটা তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তুদের ভোগের জন্যে।

নক্ষত্র ও তারকারাজির অন্তর্নিহিত রহস্য গোপন এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তারা যতটুকু জানে, তা এই যে, এগুলো আকাশের সাজসজ্জা, যা দেখে মানুষের চক্ষু পুলকিত হয়। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলাও এদিকে ইশারা করেছেন—

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِالْكَوَاكِبِ

অর্থাৎ, আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি।

মোটকথা, আকাশ, নক্ষত্ররাজি, বায়ু, সমুদ্র, পাহাড়, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের প্রতিটি কণায় অসংখ্য রহস্য নিহিত। এক থেকে হাজার, দশ হাজার পর্যন্ত রহস্য প্রতিটি কণার ভেতরে পাওয়া যায়। প্রাণীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু কিছু রহস্য সুবিদিত, যেমন সকলেই জানে যে, চক্ষু দেখার জন্যে—ধরার জন্যে নয়। হাত ধরার জন্যে —চলার জন্যে নয়। পা চলার জন্যে—ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে নয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ত্র, পিত্ত, যকৃৎ, মূত্রাশয়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদির রহস্য সবাই জানে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি কোন নেয়ামতকে এমন কাজে ব্যবহার না করে, যার জন্যে সে নেয়ামত সৃজিত হয়েছে, সে সে নেয়ামতে আল্লাহ তা'আলার নাশোকরী করবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হাত দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে প্রহার করল। এখানে প্রহারকারী হাতের নেয়ামতে নাশোকর হবে। কেননা, হাত সৃষ্টি হয়েছে ক্ষতিকর বস্তুকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে এবং উপকারী বস্তুকে গ্রহণ করার জন্যে। অপরকে প্রহার করার জন্যে নয়।

এখন আমরা গোপন রহস্যসমূহের একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করছি, যাতে মানুষ এর সাহায্যে অন্যান্য বিষয়েও শোকর ও নাশোকরী সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। এ দুটি বস্তুর উপরই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। যদিও এগুলো পাথর মাত্র—পানাহার ও পরিধানের উপকারে আসে না, তথাপি এগুলোর প্রতি মানুষ চরম মাত্রায় মুখাপেক্ষী। কেননা, প্রত্যেক মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে অনেক বস্তুর প্রয়োজন থাকে। এগুলো বিনিময় ছাড়া লাভ করার উপায় নেই। এই বিনিময়ের জন্যে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান হওয়া জরুরী। কেননা, এটা জানা কথা যে, কেউ বস্ত্রের বিনিময়ে গৃহ অথবা ঘোড়ার বিনিময়ে আটা অথবা মোজার বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করতে চাইলে তা পারবে না। কেননা, এখানে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান নয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সৃষ্টি করেছেন, যাতে এগুলোর দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণতঃ বলা যায় যে, এই উট একশ' স্বর্ণমুদ্রার এবং এই পরিমাণ জাফরান একশ' স্বর্ণমুদ্রার। কাজেই উভয়টি সমান। অতএব বিনিময়যোগ্য। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা সমকক্ষতা সম্ভব হওয়ার কারণ এই যে, এগুলোর সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই এবং এগুলোকে খাওয়াও হয় না, পানও করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়ার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং এতে এই রহস্যও নিহিত রেখেছেন যে, এগুলো দ্বারা সকল বস্তু লাভ করা যায়। সুতরাং এগুলোর মালিক হওয়া যাবতীয় বস্তুর মালিক হওয়ার নামান্তর। এছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আরও অনেক রহস্য রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন যদি কেউ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যা এই রহস্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিংবা উদ্দেশ্যের বিপরীতে ব্যবহার করে, তবে সে এই নেয়ামতদ্বয়ে আল্লাহর নাশোকর হবে। উদাহরণতঃ কেউ এগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখলে সে এ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে। সেমতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ, যারা সোনা ও রূপা মাটিতে পুঁতে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা শুনিয়ে দিন।

আর যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র নির্মাণ করায়, সে-ও নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে এবং তার এ কাজ পুঁতে রাখার চেয়েও অধিক নিন্দনীয়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَكَاَنَّمَا يَتَجَرَّعُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রূপার গ্লাসে পানি পান করে, সে যেন তার পেটে গটগট করে জাহান্নামের আগুন ঢালে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার মাধ্যমে সুদের কারবার করবে, সেও নেয়ামতের অস্বীকারকারী ও যালেম হবে। কেননা, এ দুটি বস্তু অন্য বস্তু হাসিল করার উপায় হিসাবে সৃজিত হয়েছে—নিজের বিশেষ সত্তার দ্বারা উপকার দেয়ার জন্যে সৃজিত হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং এগুলোর মধ্যেই ব্যবসা করবে, সে রহস্যের বিপরীত কাজ করবে।

নেয়ামতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ গণনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ নিজেই বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

আমরা এখানে প্রথমে কয়েকটি সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করব, যা নেয়ামতসমূহ চেনার মূলনীতি হিসাবে কাজ করবে। এরপর পৃথক পৃথক নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করব।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক কল্যাণ, আনন্দ, সৌভাগ্য বরং প্রত্যেক প্রার্থিত বিষয়কে নেয়ামত বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে পারলৌকিক সৌভাগ্যের নামই নেয়ামত। এ ছাড়া অন্যগুলোকে নেয়ামত বলা হয় ভ্রান্ত, না হয় রূপক। উদাহরণতঃ যে পার্থিব সৌভাগ্যের দ্বারা আখেরাতে সহায়তা হয় না, তাকে নেয়ামত বলা নিতান্ত ভুল। অতএব, যে বিষয় পারলৌকিক সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কিংবা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাতে সহায়ক হয়, তার নাম নেয়ামত রাখা সঠিক। কেননা, এর কারণে সত্যিকার নেয়ামত লাভ করা যায়। আমরা এসব বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে উপকারী; যেমন, এলম ও সচ্চরিত্রতা। (২) যা উভয় জগতে অপকারী; যেমন, মূর্খতা ও অসচ্চরিত্রতা। (৩) যা দুনিয়াতে উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর; যেমন কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আনন্দ পাওয়া। (৪) যা দুনিয়াতে ক্ষতিকর এবং আখেরাতে উপকারী; যেমন কামপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন ও তার বিরুদ্ধাচরণ।

এগুলোর মধ্যে প্রথম প্রকারই হচ্ছে সত্যিকার নেয়ামত। কারণ, এটা ইহকাল ও পরকালে উপকারী। আর দ্বিতীয় প্রকার, যা উভয়কালে অপকারী, তা সত্যিকার বিপদ। যা দুনিয়াতে উপকারী ও পরকালে অপকারী, তা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের মতে একান্ত বিপদ। কিন্তু মূর্খরা একে নেয়ামত মনে করে। এটা এমন, যেমন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি বিষ বিশ্রিত মধু পেল। সে বিষ সম্পর্কে অজ্ঞ হলে এই মধুকে নেয়ামত মনে করবে। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর জানতে পারবে, এটা ছিল তার জন্যে বিপদ। যে বিষয় দুনিয়াতে অপকারী এবং আখেরাতে উপকারী, তা বুদ্ধিমানদের মতে নেয়ামত এবং মূর্খদের মতে বিপদ। এটা তিক্ত ঔষধের মত, যা বর্তমানে বিস্বাদ; কিন্তু পরিণামে উপকারী। অবুঝ বালককে এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঔষধ পান করানো হলে সে একে আপদ মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি একে নেয়ামত মনে করে এবং যে এই ঔষধ দেয়, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকে।

এছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর ভেতরে ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। এমন ভাল বিষয় খুব কম, যা সর্বতোভাবে পূত-পবিত্র। উদাহরণতঃ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় -স্বজন। এমন কিছু বিষয়ও আছে, যার ক্ষতি অধিকাংশ লোকের জন্যে উপকারের তুলনায় বেশী; যেমন ধনাঢ্যতা। আবার কিছু বিষয়ের উপকার ও ক্ষতি সমান সমান। এগুলো বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অনেক সৎলোক ধন-সম্পদ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় ও খয়রাত করে। এরূপ তাওফীকসহ কেউ এরূপ ধন প্রাপ্ত হলে তা তার জন্যে নেয়ামত বটে। অনেক লোক অল্প ধনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অর্থাৎ সর্বদা তাকে কম মনে করে, আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে এবং অধিক ধন অনুসন্ধান করে। এ ধরনের ধন তার জন্যে মুসীবত ছাড়া কিছু নয়।

উত্তম বিষয়সমূহের কোন কোনটি সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও পছন্দনীয় হয়ে থাকে; যেমন খোদায়ী দীদারের আনন্দ ও সৌভাগ্য। এরূপ পারলৌকিক সৌভাগ্য কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। এ সৌভাগ্যকে অন্য কোন সৌভাগ্য লাভের উপায় হিসেবে অনুসন্ধান করা হয় না; বরং এটাই সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি প্রার্থিত হয়ে থাকে। কোন কোন উত্তম বিষয় অন্য বিষয় সৃষ্টি করার জন্যে উদ্দিষ্ট হয়, যেমন সোনা-রূপা। সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে সোনা-রূপা ও কংকরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেহেতু এগুলো অনেক আনন্দ লাভের উপায়, তাই মানুষের কাছে এগুলো প্রিয়। তারা এগুলো সঞ্চয় করে পুঁতে রাখে এবং রিয়া সহকারে ব্যয় করে। তারা ক্রমান্বয়ে এগুলোর বেড়াজালে আটকে পড়ে আসল নেয়ামতদাতাকেই ভুলে যায় এবং এগুলোকে মূল উদ্দেশ্য মনে করতে থাকে। এটা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।

কোন কোন উত্তম বিষয় সত্তা এবং অপরের উপায় উভয় দিক দিয়ে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে; যেমন সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। মানুষ আল্লাহর যিকর ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফিকরে মশগুল হওয়ার জন্যে এগুলো কামনা করে অথবা পার্থিব আনন্দ পুরাপুরি হাসিল করার উপায় হিসেবে কামনা করে। আবার মাঝে মাঝে সুস্বাস্থ্য সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি কাম্য হয়ে থাকে; যেমন কোন ব্যক্তির পদব্রজে চলার প্রয়োজন না থাকলেও সে পদযুগলের নিরাপত্তা কামনা করে। বর্ণিত তিন প্রকার উত্তম বিষয়ের মধ্যে সত্যিকার নেয়ামত হচ্ছে প্রথম প্রকার; অর্থাৎ, যা সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও প্রিয়। তৃতীয় প্রকারও নেয়ামত কিন্তু প্রথম প্রকারের তুলনায় কম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার যা কেবল অন্য বিষয়ের উপায় হিসেবেই প্রার্থিত হয়; যেমন সোনা-রূপা, একে খনিজ পদার্থ হওয়ার দিক দিয়ে নেয়ামত বলা যায় না; উপায় ও মাধ্যম হওয়ার দিক দিয়ে বলা যায়। এমতাবস্থায় সোনা-রূপা এমন ব্যক্তির জন্যেই নেয়ামত হবে, যে এগুলো ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। যদি তার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও এবাদত হয় এবং জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তার কাছে থাকে, তবে তার নিকট সোনা ও মাটির ঢেলার মধ্যে পার্থক্য নেই। সোনা-রূপা থাকার কারণে যদি এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে এবাদতকারীর জন্যে এগুলো নেয়ামত নয়— আপদ।

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত যেমন অসংখ্য ও অগণিত, তেমনি বিরামহীন। তন্মধ্যে সুস্থতা দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি নেয়ামত। কিন্তু যেসমস্ত বিষয় দ্বারা এই নেয়ামত পূর্ণ হয়, সেগুলো এখানে পুরাপুরি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে এর পরিপূরক বিষয়সমূহের মধ্যে আহারও একটি। আহারের নেয়ামত পূর্ণ হওয়ার জন্যে যা যা অত্যাবশ্যক, তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এটা জানা কথা যে, আহার একটি কাজ। এর জন্যে ইচ্ছা এবং ইচ্ছাকৃত বস্তুর জ্ঞান জরুরী। এছাড়া আহারের জন্যে খাদ্য জরুরী এবং খাদ্যের জন্যে খাদ্য অর্জিত হওয়ার স্থান এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী দরকার। আমরা এখানে এসব বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

প্রকাশ থাকে যে, উদ্ভিদ তার মূল শিকড় ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে খাদ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। খাদ্য শিকড়ে না পৌঁছলে কিংবা শিকড়ের সাথে মিলিত না থাকলে উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। অন্য স্থান থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাদ্য আহরণের ক্ষমতা তার নেই। কারণ, সে খাদ্যের জ্ঞানও রাখে না এবং খাদ্য পর্যন্ত পৌঁছতেও পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ক্ষমতা দান করেছেন। সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য ও খাদ্যের অবস্থান জেনে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ছাড়া মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা দ্বারা সে খাদ্যের উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। খাদ্য রন্ধন করা ও তার আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজেও জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগে। আহারের প্রতি আগ্রহও একটি বড় নেয়ামত। কেননা, অনেক রোগী খাদ্য দেখে, কিন্তু খায় না। কারণ, তাদের মনে খাদ্যের প্রতি আগ্রহ থাকে না।

এমনিভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক আহারের ক্ষেত্রেই মানুষকে হাজারো নেয়ামত দান করা হয়েছে। স্বয়ং খাদ্য ও ফল-মূলের সংখ্যা এত বেশী, যা লিখে শেষ করা যায় না।

শোকরে গাফলতির কারণ ঃ মূর্খতা ও গাফলতির কারণে মানুষ নেয়ামতের শোকর করে না। কারণ, সে মূর্খতার কারণে নেয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এটা জানা কথা যে, শোকর আদায় করতে হলে নেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা দরকার। যারা নেয়ামত সম্পর্কে জানে, তাদেরও অনেকের ধারণা, মুখে "আলহামদু লিল্লাহ" অথবা "আল্লাহর শোকর" বলাই হচ্ছে নেয়ামতের শোকর। যে নেয়ামত যে রহস্যের জন্যে সৃজিত হয়েছে, তাকে সেই নেয়ামত পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করাই নেয়ামতের অর্থ সেকথাই তারা জানে না। আর নেয়ামতের প্রার্থিত রহস্য হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আনুগত্য। এ দুটি বিষয় জানার পর শোকরের বাধা কামনা-বাসনার প্রাবল্য এবং শয়তানের আধিপত্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এখন নেয়ামত জানা থেকে গাফিল থাকার কারণ কয়েকটি। এক, মানুষ মূর্খতাবশত যে বস্তু সকলের কাছে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে নেয়ামত মনে করে না। ফলে, কেউ এর শোকর আদায় করে না। উদাহরণতঃ আহার ও খাদ্য সম্পর্কিত যে সকল নেয়ামত উপরে বর্ণিত হয়েছে, কেউ এগুলোর শোকর করে না। কেননা, এগুলো ব্যাপক নেয়ামত। কারও সাথে এগুলোর বিশেষত্ব নেই। অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে কেউ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শোকর করে না। অথচ মুহূর্তের জন্যে গলা চেপে ধরলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। অথবা যদি কাউকে এমন কক্ষে আটকে রাখা হয়, যার বায়ু উত্তপ্ত কিংবা এমন কূপে আটকে রাখা হয়, যার বায়ু হিমশীতল, তবে দমবন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। হাঁ, যদি আটকে রাখার পর পুনরায় মৃতপ্রায় অবস্থায় বের করা হয়, তবে সে বুঝবে বায়ু একটি বড় নেয়ামত। তাই কথায় বলে— قَدْرُ نِعْمَتٍ بَعْدِ زَوَالْ অর্থাৎ, 'হাতছাড়া হওয়ার পরই নেয়ামতের কদর হয়।' কিন্তু এটা মূর্খতা। কারণ, এতে নেয়ামত হাতছাড়া হওয়ার পর পুনরায় হস্তগত হওয়ার উপর শোকর নির্ভরশীল হবে। অথচ নেয়ামতের শোকর সার্বক্ষণিক হওয়া উচিত। আমরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কখনও চোখের শোকর করতে দেখি না। অন্ধ হওয়ার পর সে চোখের মর্যাদা বুঝে। এরপর যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে, তবে সে একে নেয়ামত মনে করে শোকর করে।

মানুষের বর্তমান অবস্থা এই যে, তারা কেবল ধন-সম্পদেরই শোকর করে— যদি তাতে তাদের কিছু বিশেষত্ব হয়ে যায়। এ ছাড়া অন্য সব নেয়ামত তারা বিস্মৃত হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি কোন এক বুযুর্গের কাছে তার দারিদ্র্যের অভিযোগ পেশ করে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করল। বুযুর্গ বললেন ঃ তুমি কি দশ হাজার দিরহাম পাওয়ার বিনিময়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া পছন্দ করবে? লোকটি বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ তুমি কি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বোবা হয়ে যাওয়া মঞ্জুর করবে? লোকটি আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি কি খোঁড়া হতে সম্মত হবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি পাগল হওয়া পছন্দ করবে কি? সে বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ তা হলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তোমার লজ্জা হয় না? তিনি পঞ্চাশ হাজার দিরহামেরও অধিক পরিমাণ সম্পদ তোমাকে দিয়ে রেখেছেন। এরপরও তুমি অভিযোগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছ?

একবার হযরত ইবনে সাম্মাক (রহঃ) সমকালীন খলীফার কাছে গেলেন। খলীফা গ্লাস হতে পানি পান করতে করতে বললেন ঃ আমাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ মনে করুন আপনি তৃষ্ণার্ত। সঙ্গের যাবতীয় নগদ অর্থকড়ি দিয়েই আপনি এক গ্লাস পানি পেতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন? সকল অর্থ দিয়ে পানি সংগ্রহ করবেন কি না? খলীফা আরয করলেন ঃ অবশ্যই পানির জন্যে সকল অর্থ দিয়ে দেব। ইবনে সাম্মাক বললেন ঃ যদি এরই বিনিময়ে গোটা রাজত্ব দিতে হয়, তবে তা-ও দিয়ে দেবেন। খলীফা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। ইবনে সাম্মাক বললেন ঃ তা হলে এরূপ রাজত্বের জন্যে আনন্দিত হওয়া ঠিক নয়, যার মূল্য এক গ্লাস পানির সমান। এ থেকে জানা গেল যে, পিপাসার সময় এক গ্লাস পানির মূল্য সারা বিশ্বের রাজত্বের চেয়েও বেশী।

সাধারণ মানুষ বিশেষ নেয়ামতকেই কেবল নেয়ামত মনে করে, ব্যাপক নেয়ামতকে নয়। এ পর্যন্ত আমরা কেবল ব্যাপক নেয়ামত বর্ণনা করেছি। তাই সংক্ষেপে কিছু বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রত্যক মানুষ যদি নিজের অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে একটি অথবা কয়েকটি নেয়ামত এমন পাবে, যা বিশেষভাবে তারই জন্যে নির্ধারিত। সকল মানুষ অথবা কোন মানুষ এতে তার সাথে শরীক নয়। তিনটি বিষয়ে যে কেউ একথা স্বীকার করে। প্রথম বুদ্ধিমত্তা, দ্বিতীয় চরিত্র এবং তৃতীয় জ্ঞান। বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তো এটা প্রসিদ্ধ যে, هَرکَسْ رَاعَقِل خُودْ بکَمَالْ نُمَایَدْ

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিমত্তাকে পরিপূর্ণ মনে করে। এমন কোন মানুষ নেই, যে নিজের বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট নয় এবং নিজেকে অন্যের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান মনে না করে। একারণেই কেউ আল্লাহ তাআলার কাছে বুদ্ধিমত্তার জন্যে দোয়া করে না। এটাও বুদ্ধিমত্তার অন্যতম গৌরব যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে মুক্ত, সে-ও এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং যে এ গুণে গুণান্বিত, সেও উল্লসিত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যখন আপন বিশ্বাসে অপরের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, তখন বাস্তবে তাই হলে এ নেয়ামতের শোকর করা তার উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বাস্তবে এরূপ না হলেও শোকর ওয়াজিব। কারণ, তার পক্ষে তো নেয়ামত বিদ্যমান আছে।

চরিত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের মধ্যে কিছু দোষ থাকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পছন্দ করে এবং অপরের কিছু অভ্যাসকে খারাপ মনে করে। কিন্তু নিজেকে এগুলো থেকে মুক্ত মনে করে। সুতরাং তার শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অভ্যাসসমূহকে সুন্দর করেছেন এবং অপরকে মন্দ অভ্যাস দিয়েছেন।

জ্ঞান-গরিমার অবস্থা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে এমন কিছু গোপন বিষয় জানে, যা অন্য কেউ জানে না। যদি জেনে ফেলে, তবে সে অপমানিত ও হেয় হয়ে যায়। তাই বিষয়গুলো জানার ব্যাপারে অন্য কেউ তার সাথে শরীক থাকে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা যে তার বিষয়গুলো গোপন রেখেছেন, সেজন্যে আল্লাহর শোকর করা উচিত। কারণ, আল্লাহ্ তার গোপন দোষগুলো মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, ভাল বিষয়গুলো প্রকাশ করেছেন এবং দোষসমূহের জ্ঞান তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেননি। উপরোক্ত তিনটি বিশেষ নেয়ামত প্রত্যেকেই স্বীকার করে।

সারকথা, মানবকুলের সামনে শোকরের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ এটাই যে, তারা যাহেরী, বাতেনী, বিশেষ ও ব্যাপক নেয়ামত সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নয়। এক্ষণে গাফেল অন্তরসমূহের চিকিৎসা বর্ণনা করা হচ্ছে এই আশায় যে, হয়তো তারা গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগ্রত এবং শোকর আদায়ে তৎপর হবে। হুশিয়ার ও বিজ্ঞ অন্তরসমূহের চিকিৎসা এই যে, আমরা ব্যাপক নেয়ামতসমূহের যে সকল প্রকার ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছি, সেগুলো সম্পর্কে তারা গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে। আর যারা বিশেষ নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছুকে নেয়ামতই মনে করে না অথবা বিপদে পড়ে নেয়ামতকে চিনে, তাদের চিকিৎসা এই যে, তারা নিজের চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং জনৈক সূফী যা করতেন, তা করবে। তিনি প্রত্যহ একবার হাসপাতালে ও একবার গোরস্তানে গমন করতেন। হাসপাতালে গিয়ে অনেক মানুষকে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত দেখে নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তার কথা ধ্যান করতেন, যাতে সুস্বাস্থ্য যে একটি বড় নেয়ামত, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শোকর আদায় করা যায়। বুযুর্গ ব্যক্তি গোরস্তানে গিয়ে কল্পনা করতেন যে, মৃতরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একদিনের জন্যে হলেও পৃথিবীতে ফিরে আসাকে সর্বাধিক পছন্দ করে। গোনাহগার অতীত দিনের ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আর নেককার আরও বেশী নেকী করার জন্যে এটা পছন্দ করে। এরপর তিনি ভাবতেন যে, যার জন্যে তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়, তা তো আমার অর্জিত আছে। অর্থাৎ, আমি অতীত দিনের ক্ষতিপূরণ এবং অধিক নেকী অর্জন এই মুহূর্তে করতে পারি। সুতরাং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো আমি এ কাজেই ব্যয় করি না কেন? এ দিনগুলোকেই আমি আল্লাহর নেয়ামত মনে করে নেই না কেন? এ চিকিৎসায় আশা করা যায়, গাফেল ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে অবগত হয়ে শোকরে তৎপর হবে।

হযরত রবী ইবনে খায়ছাম (রহঃ) পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজের ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন। প্রত্যহ গলায় বেড়ী পরে তিনি এই কবরে শয়ন করতেন এবং বলতেন—

رَبِّ ارْجِعْنِي لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করি।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন ঃ হে রবী, তোর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। তুই সেই সময়ের পূর্বে কিছু করে নে, যখন পুনরায় প্রেরণের আবেদন করবে কিন্তু তোকে প্রেরণ করা হবে না।

যে সকল অন্তর শোকর থেকে দূরে থাকে, একথা জেনে নেয়াও তাদের এক চিকিৎসা যে, যে নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয় না, সে নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা পুনর্বার পাওয়া যায় না। এ কারণেই হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ লোকসকল, তোমরা নেয়ামতসমূহের শোকর অবশ্যই কর। এটা বিরল যে, নেয়ামত একবার চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ নেয়ামতসমূহ বন্য পশুসদৃশ। এগুলোকে শোকর দ্বারা বন্দী করে রাখ। হাদীসে আছে—যখন কারও প্রতি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বেশী হয়, তখন তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বেড়ে যায়। সে যদি এসব প্রয়োজন পূরণে অলসতা করে, তবে প্রকারান্তরে নেয়ামত হারিয়ে ফেলার প্রয়াস চালায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

যেসব বিষয়ে সবর ও শোকর পরস্পর জড়িত ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুতেই আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত পাওয়া যায়। এতে মুসীবতের অস্তিত্ব না থাকাই জরুরী হয়ে পড়ে। মুসীবত না থাকলে সবর কিসের উপর হবে? আর মুসীবত থাকলে শোকর কিরূপে হবে? কেননা, মুসীবতে সবর করার মধ্যে ব্যথা ও কষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। আর শোকর হল আনন্দজ্ঞাপক। অতএব, সবর ও শোকর পরস্পরবিরোধী। এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, নেয়ামত যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুসীবতও বিদ্যমান। মুসীবত দূর হওয়াকে নেয়ামত এবং নেয়ামত দূর হওয়াকে মুসীবত বলা হয়। অতএব, উভয়টির অস্তিত্ব জরুরী।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নেয়ামত দু'প্রকার। একটি সর্বাবস্থায় নেয়ামত; যেমন খোদায়ী নৈকট্যের সৌভাগ্য, ঈমান ও সচ্চরিত্রতা। দ্বিতীয় প্রকার যা একদিক দিয়ে নেয়ামত ও অন্যদিক দিয়ে মুসীবত। যেমন অর্থসম্পদ। ধর্মীয় কল্যাণ লাভের দিক দিয়ে এটি নেয়ামত এবং ধর্মের অনিষ্ট হলে এটি মুসীবত। এমনিভাবে মুসীবতও দু'প্রকার। এক, যা সবদিক দিয়ে মুসীবত, যেমন আখেরাতে আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকা দুনিয়াতে কুফর ও অসচ্চরিত্রতা। এগুলোর পরিণতি সর্বাবস্থায় মুসীবত। দুই, যা একদিক দিয়ে মুসীবত ও অন্যদিক দিয়ে মুসীবত নয়; যেমন দারিদ্র্য, রোগব্যাধি ও ভয়ভীতি।

অতএব, যা সর্বাবস্থায় নেয়ামত, তার জন্যে সর্বাবস্থায় শোকর করা উচিত। যা দুনিয়াতে সবদিক দিয়ে মুসীবত, তার জন্যে সবর করার আদেশ নেই; যেমন কুফরের জন্যে সবর করার কোন অর্থ হয় না। বরং কুফর পরিত্যাগ করা কাফেরের জন্যে অপরিহার্য। এ থেকে জানা গেল যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুনিয়াতে যা সবদিক দিয়ে মুসীবত, তা সবর করার জায়গা নয়। অতএব, একই জায়গায় সবর ও শোকর একত্রিত হতে পারে যদি সেটা এমন মুসীবত হয়, যা একদিক দিয়ে মুসীবত কিন্তু অন্যদিক দিয়ে নেয়ামত হয়। উদাহরণতঃ ধনাঢ্যতা নেয়ামত হলেও মাঝে মাঝে এর কারণে ধনী ব্যক্তি ও তার সন্তান-সন্ততি প্রাণ হারায়। এমনিভাবে অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতও নেয়ামতওয়ালার জন্যে মুসীবত হতে পারে এবং পার্থিব মুসীবতও মুসীবতওয়ালার জন্যে নেয়ামত হতে পারে; যেমন অনেক মানুষ দারিদ্র্য ও রোগব্যাধিকেই পছন্দ করে। অতএব, এগুলো মুসীবত হলেও তাদের জন্যে নেয়ামত। কারণ, ধন-সম্পদ বেশী থাকলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে মানুষ অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে। সেমতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে রিযকে স্বাচ্ছন্দ্য দেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ ঔদ্ধত্য করে এ কারণে যে, সে নিজেকে ধনাঢ্য দেখতে পায়।

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন কেউ নিজের রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থাও তদ্রূপ।

জ্ঞান নিঃসন্দেহে একটি নেয়ামত। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এটাই দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। তখন অজ্ঞতাকেই নেয়ামত বলতে হয়। উদাহরণতঃ মানুষ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান যদিও নেয়ামত, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে না জানাই নেয়ামত। কারণ, মৃত্যুর সময় জানা হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন তিক্ত হয়ে যাবে এবং সে কোন কাজই করতে সক্ষম হবে না। এমনিভাবে নিজের সম্পর্কে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মীয়দের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের বিশ্বাস না জানা নেয়ামত। কেননা, এই বিশ্বাস জানা হয়ে গেলে দুঃখ পেতে হত এবং হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনক্ষণ, শবেকদর ও জুমআর মকবুল মুহূর্তটি গোপন রেখেছেন। এটাও নেয়ামত। কেননা,এটা গোপন থাকার কারণে অন্বেষণে ইচ্ছা ও চেষ্টা অধিক করতে হয়। ফলে, সওয়াব বেশী হয়।

অতএব, যে অবস্থাকে সর্বদিক দিয়ে মুসীবত এবং সর্বাবস্থায় নেয়ামত বলা যায় না, তাতে সবর ও শোকর উভয়টি করতে হবে। প্রশ্ন হয় যে, সবর ও শোকর তো একটি অপরটির বিপরীত। এগুলো একত্রিত হবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, মানুষ একই কারণে কখনও দুঃখ করে এবং কখনও আনন্দিত হয়। সুতরাং দুঃখের জন্যে সবর করবে এবং আনন্দের জন্যে শোকর। উদাহরণতঃ পার্থিব বিপদ ও রোগব্যাধিতে যদিও দুঃখ হয়, যা সবর দাবী করে; কিন্তু পাঁচটি কারণে বুদ্ধিমানের উচিত এগুলোতে আনন্দিত হওয়া ও শোকর করা। এক, যে বিপদ ও রোগব্যাধি এখন রয়েছে, এরচেয়ে ভয়ংকর কোন রোগ ও বিপদ সম্ভব। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এই রোগ ও বিপদকে দ্বিগুণ করে দেন, তবে বাধা দেয়ার সাধ্য কার? সুতরাং প্রত্যেক অসুখ-বিসুখ ও বিপদে মানুষের শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা এর চেয়ে বড় অসুখ ও বিপদ দেননি। দুই, বিপদ পার্থিব ব্যাপারে হয়েছে দ্বীনদারীতে হয়নি— এটাও শোকরের অন্যতম কারণ।

সেমতে কোন এক ব্যক্তি হযরত সহল তস্তরীর কাছে অভিযোগ করল ঃ আমার ঘরে এক চোর ঢুকে সকল আসবাব নিয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শোকর কর যে, শয়তান তোমার অন্তরে প্রবেশ করে তোমার ঈমানকে পন্ড করে দেয়নি। হযরত আবু এয়াযীদ বুস্তামী এক গলিপথে গমন করছিলেন। উপর থেকে কেউ ছাইয়ের ঝুড়ি তার উপর ঢেলে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে শোকরের সেজদা আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, এই পরিস্থিতিতে সেজদা কেন? তিনি বললেন ঃ আমি নিজের উপর আগুন পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। সুতরাং কেবল ছাই পতিত হওয়া আমার জন্যে নেয়ামত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রশ্ন হল, মুসীবতে আমরা কেমন করে আনন্দিত হব, অথচ দেখা যায়, কোন কোন লোক আমাদের চেয়ে বেশী গোনাহ করে; কিন্তু তাদের উপর আমাদের মত মুসীবত আসে না। কাফেররা হরহামেশা কুফর করেও আমাদের মত মুসীবতে পতিত হয় না। জওয়াব এই যে, কাফেরের উপর অনেক বেশী মুসীবত আসবে—আজ না হয় মৃত্যুর পরে আসবে। দুনিয়াতে তাকে সময় দেয়া হয়, যাতে অনেক গোনাহ করে নেয় এবং আযাব দীর্ঘ হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا

অর্থাৎ, আমি কাফেরদেরকে এ কারণেই অবকাশ দেই, যাতে তাদের গোনাহ বেড়ে যায়।

গোনাহগার সম্পর্কে কথা হল, কেউ যে আমাদের চেয়েও বেশী গোনাহগার, তা কেমন করে জানা গেল? আল্লাহর সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে অনেকের অন্তরের ধৃষ্টতা এত জঘন্য থাকে যে, এর সামনে বাহ্যিক মদ্যপান ও যিনা কিছুই নয়। এরূপ গোনাহ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ, তোমরা একে সহজ মনে কর, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ।

যদি বাস্তবে কারও গোনাহ বেশীও হয়, তবে এটা সম্ভব যে, তার শাস্তি আখেরাতে বেশী হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসীবতে রয়েছে, তার তো শোকর করা দরকার যে, তাকে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, দুনিয়াতে যার শাস্তি হয়ে যায়, তাকে আখেরাতে পুনরায় শাস্তি দেয়া হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেউ গোনাহ করে এবং দুনিয়াতে তার উপর কোন বিপদ এসে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে যান। মুসীবতে আনন্দিত হওয়া ও শোকর করার এ হচ্ছে তৃতীয় কারণ।

চতুর্থ কারণ এই যে, এই মুসীবত লওহে মাহফুযে লিখিত ছিল যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অমুক ব্যক্তির উপর আসবে। এটা ঘটা অপরিহার্য ছিল। এখন যখন অল্প কিংবা সবটুকু ঘটে গেল, তখন এটাই নেয়ামত।

পঞ্চম কারণ এই যে, মুসীবতের সওয়াব মুসীবতের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। কেননা, দুনিয়ার মুসীবত দু'কারণে আখেরাতের পথ। প্রথম, সে কারণে বিস্বাদ ও তিক্ত ঔষধ রোগীর জন্যে নেয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের দিন বান্দা যখন দেখবে, মুসীবতের কারণে সওয়াব পাওয়া যায়, তখন সে এই নেয়ামতের শোকর করবে। যেমন শিশুরা বড় হওয়ার পর এবং বুদ্ধিমান হওয়ার পর পিতা ও শিক্ষকের প্রহারের শোকর আদায় করে। দ্বিতীয়, সকল পাপের মূল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। পক্ষান্তরে নাজাতের মূলকথা হচ্ছে দুনিয়া থেকে অন্তরের বিচ্ছিন্নতা। বলা বাহুল্য, যদি পার্থিব উদ্দেশ্য অনুযায়ী নেয়ামতসমূহ মুসীবত ছাড়াই পাওয়া যায়, তবে এতে দুনিয়ার প্রতি অন্তরের টান আরও বেড়ে যায়। এমনকি, মানুষের জন্যে দুনিয়া জান্নাতের অনুরূপ হয়ে যায়। আর যদি মুসীবত ও আপদ আসতে থাকে, তবে দুনিয়ার প্রতি অন্তর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়; বরং দুনিয়া কারাগারের মত হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ অর্থাৎ, 'দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফেরের জান্নাত। কাফের তাকে বলা হয়, যে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর মুমিন তাকে বলা হয়, যে আন্তরিকভাবে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং এখান থেকে পলায়ন করতে আগ্রহী।

মোটকথা, বর্ণিত পাঁচটি কারণে মুসীবতে নেয়ামতও থাকে। তাই মুসীবতের জন্যে আনন্দিতও হতে হয়। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, সে মুসীবতেও শোকর করবে। আর যে এ সম্পর্কে অজ্ঞ, তার পক্ষে শোকর করা অসম্ভব। মুসীবতেও সবর করা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে—

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার কল্যাণ করতে চান, তাকে মুসীবত দেন।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন— আমি আমার বান্দার দেহের, অর্থ-সম্পদের অথবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত প্রেরণ করি। সে যদি "সবরে জামীল" সহকারে সেই মুসীবত সহ্য করে, তবে কিয়ামতে তার আমলের জন্যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করতে অথবা আমলনামা খুলতে আমি লজ্জাবোধ করি। এক হাদীসে বলা হয়েছে— বান্দার উপর কোন মুসীবত এলে সে যদি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ, 'ইলাহী! আমাকে আমার মুসীবতের প্রতিদান দাও এবং এর পরে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর,'

তবে আল্লাহ তা'আলা তাই করেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি রুগ্ন। তিনি বললেন ঃ যে বান্দার ধন বিনষ্ট হয় না এবং অসুখ-বিসুখ হয় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে প্রিয় করে নেন, তখন তাকে মুসীবতে ফেলেন এবং যখন মুসীবতে ফেলেন, তখন সবর দান করেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন একটি মর্তবা থাকে, যাতে সে আমলের মাধ্যমে পৌঁছতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তার দেহের উপর কোন মুসীবত প্রেরণ করেন, যার কারণে সে সেই মর্তবা পেয়ে যায়। খাববাব ইবনে ইরত (রাঃ) বর্ণনা করেন—একবার আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম, তখন তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে ছিলেন। আমি অভিযোগের সুরে তাঁকে বল্লাম ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের সাহায্যের জন্যে দোয়া করেন না কেন? কাফেররা আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে মাটি খনন করে গোর দেয়া হত এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করাত দিয়ে তাদের মস্তক চিরে দেয়া হত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করত না। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তিকে শাসনকর্তা অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এরপর সেখানেই সে মারা যায়, সে শহীদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রহার করতে করতে মেরে ফেলে, তবু শহীদ হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান এবং তাকে প্রিয় করে নিতে চান, তখন তার উপর মুসীবত ঢেলে দেন এবং বৃষ্টির ন্যায় বিপর্যয় বর্ষণ করেন। যখন সেই বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ এই কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হয়। যখন পুনরায় ডাকে এবং "ইয়া রব" বলে, তখন আল্লাহ এরশাদ করেন—বান্দা! কি বলতে চাও, বল। আমি হাযির। তুমি যা চাইবে তাই দেব। যদি দুনিয়াতে কোন উত্তম বস্তু তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দেই, তবে তোমার জন্যে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু আমার কাছে রেখে দেই। যখন কিয়ামত হবে, তখন আমলকারীরা হাযির হবে। তাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমল দাঁড়িপাল্লায় ওযন করা হবে এবং পুরাপুরি সওয়াব প্রদান করা হবে। কিন্তু যখন মুসীবতওয়ালা হাযির হবে, তখন তার জন্যে দাঁড়িপাল্লাও স্থাপন করা হবে না এবং আমলনামাও খোলা হবে না। তাদের উপর সওয়াব এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে, যেমন মুসীবত ঢেলে দেয়া হয়েছিল। তখন দুনিয়াতে যারা বিপদমুক্ত ছিল, তারা বাসনা করবে—কি চমৎকার হত যদি আমাদের দেহও কাঁচি দিয়ে কাটা হত এবং মুসীবতওয়ালাদের অনুরূপ সওয়াব আমরাও পেতাম। এ কারণেই কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীরা তো তাদের পুরস্কার বেহিসাব পাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কোন এক পয়গম্বর আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করলেন— ইলাহী! মুমিন বান্দা তোমার আনুগত্য করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুনিয়াকে তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখ এবং মুসীবত প্রেরণ কর। অপরপক্ষে কাফের তোমার আনুগত্য করে না এবং গোনাহে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তুমি তার কাছ থেকে মুসীবতকে সরিয়ে রাখ। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান কর। ব্যাপার কি? এরূপ কেন? আল্লাহ পাক পয়গম্বরের কাছে ওহী পাঠালেন ঃ বান্দাও আমার, মুসীবতও আমার। প্রত্যেকেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসল ব্যাপার এই যে, মুমিন বান্দার গোনাহ হয়ে যায়। তাই তার কাছ থেকে দুনিয়াকে আলাদা রাখি এবং মুসীবত পাঠিয়ে দেই, যাতে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। সে যখন আমার কাছে আসবে, তখন আমি তার পুণ্যের প্রতিদান দেব। পক্ষান্তরে কাফেরের কিছু পুণ্য থাকে। তাই আমি তাকে রিযক বেশী দেই এবং মুসীবতকে দূরে রাখি, যাতে সে তার পুণ্যের বদলা দুনিয়াতে পেয়ে যায় এবং যখন আমার কাছে আসে, তখন পাপকর্মের শাস্তি দেই। কথিত আছে, যখন مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ (অর্থাৎ, যে মন্দকাজ করবে, তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে) আয়াতখানি নাযিল হল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতের পর আনন্দ কেমন করে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি কি অসুস্থ হও না, যদ্দরুন দুঃখ কর? এটাই তোমার মন্দকর্মের প্রতিদান। অর্থাৎ, সকল মুসীবত তোমার গোনাহের কাফফারা হয়ে থাকে।

হযরত উকবা ইবনে আমেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করে যাচ্ছেন এবং সে নিজের গোনাহে বাড়াবাড়ি করে যাচ্ছে, তখন জেনে নাও যে, এটা তাকে অবকাশ দেয়ার জন্যে করা হচ্ছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যখন তারা নির্দেশিত কাজ পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সামনে যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা এসব কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে খুব উল্লসিত হয়ে গেল, তখন হঠাৎ করে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ কোন এক সাহাবী পথিমধ্যে জাহেলিয়াত যুগের পরিচিতা এক মহিলাকে দেখলেন। তিনি তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু চলতে চলতে পেছন ফিরে মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্রাচীরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেলেন। ফলে, তার চেহারা যখম হয়ে গেল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোরআন মজীদের এমন একটি আয়াত বলে দিচ্ছি, যা সকল আয়াতের তুলনায় অধিক আশাব্যঞ্জক। শ্রোতারা আরয করল ঃ বলুন। তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে মুসীবত আসে, তা তোমাদের হাতেরই অর্জিত। আল্লাহ অনেক কিছু মাফ করে দেন।

মোটকথা, পার্থিব যাবতীয় মুসীবত গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন, তখন পুনরায় শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই। আর যদি দুনিয়াতে মাফ করে দেন, তবে তাঁর কৃপা চায় না যে, কিয়ামতে শাস্তি দেয়া হোক।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ বান্দার দুটি ঢোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়—এক, ক্রোধের ঢোক, যা সহনশীলতার কারণে বান্দা গিলে ফেলে। দুই, মুসীবতের ঢোক, যা সবরের কারণে গিলে ফেলে। বান্দার দুটি বিন্দুও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়—এক, রক্তবিন্দু, যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাঁর পথে জেহাদে প্রবাহিত হয়। দুই, অশ্রুবিন্দু, যা অন্ধকার রাতে বান্দার চোখ থেকে সেজদারত অবস্থায় পতিত হয়। আল্লাহ ছাড়া কেউ একে দেখে না। বান্দার দুটি পদক্ষেপও আল্লাহর কাছে অত্যধিক পছন্দনীয়। এক, ফরয নামাযের জন্যে পদক্ষেপ এবং দুই, আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের পদক্ষেপ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, পয়গম্বর হযরত সোলায়মান (আঃ) -এর দুই পুত্রের ইন্তেকালে তিনি নিরতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। যেন তারা বাদী ও বিবাদী। তাদের একজন আরয করল ঃ আমি শস্যক্ষেত বপন করেছিলাম। যখন শস্য তৈরী হয়ে গেল, তখন এই ব্যক্তি ক্ষেতটি দলিত-মথিত করে দিয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার বক্তব্য কি? সে আরয করল ঃ আমি পথ ধরে যেতে যেতে এক ক্ষেতের ধারে পৌঁছলাম। ডানে-বামে লক্ষ্য করে দেখলাম, পথ ক্ষেতের মধ্য দিয়েই ছিল। তাই আমি সেখান দিয়েই গমন করেছি। হযরত সোলায়মান বাদীকে বললেন ঃ তুমি পথের উপর বীজ বপন করলে কেন? তোমার জানা নেই যে, মানুষের চলার পথ অবশ্যই রাখতে হবে? সে আরয করল ঃ তাহলে আপনি পুত্রদের জন্যে এত ভেঙ্গে পড়েছেন কেন? আপনি জানেন না যে, মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের সড়ক? অতঃপর হযরত সোলায়মান তওবা করলেন। পুত্রদের জন্যে পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করলেন না।

হযরত ইবনে মসউদ বলখী (রহঃ) বলেন ঃ মুসীবত এলে যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে অথবা মুষ্টি দ্বারা বুকে আঘাত করে, সে যেন বল্লম দ্বারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়। হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ আগুন দ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষা করা হয়। আর ঈমানদার বান্দার পরীক্ষা হয় মুসীবত দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তখন তাদেরকে মুসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে নাখোশ থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি নাখোশ থাকেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন ঃ একদিন আমার চোয়ালে তীব্র ব্যথা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছিল। আমি আমার পিতৃব্যকে বললাম ঃ চোয়ালের ব্যথার কারণে সারারাত আমার ঘুম হয়নি। এ কথাটি আমি তিন বার তার কাছে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এক রাতের ব্যথায় এত অভিযোগ করছ। আমি ত্রিশ বছর ধরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি। কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি।

উপরোক্ত হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে মুসীবতের ফযীলত জানা যায়। এগুলো শুনে কেউ বলতে পারে যে, তা হলে তো দুনিয়াতে নেয়ামতের তুলনায় মুসীবত আসাই উত্তম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে মুসীবতের প্রার্থনা করা জায়েয হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে, মুসীবতের আবেদন করা না-জায়েয এবং এর জায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং মুসীবত থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শরীয়তসিদ্ধ। হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁর এবং অন্যান্য পয়গম্বরগণের উক্তি এটাই ছিল—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

অর্থাৎ, হে পালনকর্তা! আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ার সৌন্দর্য এবং আখেরাতের সৌন্দর্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। কেননা, নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু একীন ছাড়া কেউ পায়নি। এখানে একীন অর্থ অন্তরের সুস্থতা, যাতে সন্দেহ ও অজ্ঞতার রোগ নেই। কেননা, অন্তরের সুস্থতা দৈহিক সুস্থতার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ বলেন ঃ সবর শোকরের চেয়ে উত্তম। কারও মতে শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ উভয়টি সমান। কয়েক জনের অভিমত এই যে, কোন কোন অবস্থায় সবর শ্রেষ্ঠ এবং কোন কোন অবস্থায় শোকর শ্রেষ্ঠ। এ সকল উক্তির প্রবক্তারা নিজ নিজ উক্তির পক্ষে অত্যন্ত অবিন্যস্ত দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয় না। তাই এগুলোর অবতারণা না করে আসল সত্য প্রকাশ করাই উত্তম।

এ প্রসঙ্গে দু'প্রকার বক্তব্য পেশ করা যায়। এক, কেবল বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করা এবং অধিক ঘাঁটাঘাঁটিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। এ ধরনের বক্তব্যই সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্যে উত্তম। কেননা, তাদের বোধশক্তি সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, সবর উত্তম। যদিও শোকরের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস অনেক। কিন্তু সবরের ফযীলত তদপেক্ষাও বেশী পরিলক্ষিত হয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, যে পৃথিবীতে সর্বাধিক শোকরকারী ছিল। অতঃপর তাকে শোকরকারীদের সওয়াব প্রদান করা হবে। এরপর সর্বাধিক সবরকারীকে আহ্বান করে তাকে বলা হবে—আমি এই শোকরকারীকে যতটুকু সওয়াব দিয়েছি, ততটুকু তোমাকে দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে কি? সে বলবে ঃ অবশ্যই সন্তুষ্ট হব। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করবেন— তা হবে না। আমি তোমাকে নেয়ামত দিয়েছি। তুমি শোকর করেছ। তোমাকে মুসীবতে ফেলেছি। তুমি সবর করেছ। কাজেই আমি আজ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেব। কোরআন পাকে আছে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

অর্থাৎ, যে খাদ্য খেয়ে শোকর করে, সে সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে রোযা রাখে এবং সবর করে।

এতেও সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কেননা, শোকরের মাত্রা বৃদ্ধিকে সবরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবর শ্রেষ্ঠ না হলে এর সাথে শোকরের তুলনা করা হত না। অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) রাজত্বের কারণে সকলের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর আমার সাহাবীগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ ধনাঢ্যতার কারণে সকলের পেছনে জান্নাতে যাবেন। এর বিপরীতে ফকীর ও মুসীবতগ্রস্তদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, জান্নাতের সকল দরজারই দুটি করে কপাট। কিন্তু সবর-দরজার কপাট একটিই। সর্বপ্রথম যে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে হবে মুসীবতওয়ালা। তাদের নেতা হবেন হযরত আইউব (আঃ)। এটা এমন বক্তব্য, যাতে সাধারণ মানুষ তুষ্ট হয়ে যায় এবং এতেই তাদের ধর্মীয় উপযোগিতা নিহিত।

দ্বিতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলেম ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিষয়সমূহের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা। সুতরাং আমরা বলি, দুটি অস্পষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোনরূপ তুলনা চলে না যে পর্যন্ত প্রত্যেকটির স্বরূপ স্পষ্ট না হয়ে যায়। স্পষ্ট হওয়ার পর যদি সে বিষয়দ্বয়ের বিভিন্ন প্রকার থাকে, তবে তাদের মধ্যেও সমষ্টিগতভাবে তুলনা চলে না; বরং প্রত্যেকটি প্রকারকে আলাদা আলাদা করে তুলনা করা অত্যাবশ্যক। সবর ও শোকরেরও অনেক প্রকার ও শাখা রয়েছে। তাই অস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হতে পারে না; বরং উভয়ের প্রত্যেকটি প্রকারকে পরস্পরে তুলনা করতে হবে।

সবর ও শোকর প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত—মারেফত (জ্ঞান), হাল ও আমল। এখন একটির মারেফতকে অপরটির হাল ও আমলের সাথে তুলনা করা যাবে না; বরং একটির হালকে অপরটির হালের সাথে, একটির মারেফতকে অপরটির মারেফতের সাথে এবং একটির আমলকে অপরটির আমলের সাথে তুলনা করা চলে। এতে পারস্পরিক মিল প্রকাশ পাবে এবং একারণে একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির উপর জানা যাবে। উদাহরণতঃ চক্ষু সম্পর্কে শোকরকারীর মারেফত হল চোখের নেয়ামতটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা এবং সবরকারীর মারেফত হল অন্ধত্বকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। সুতরাং এখানে শোকরের মারেফত ও সবরের মারেফত সমান সমান। একটির উপর অপরটির কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এটা তখন, যখন সবরের অর্থ বালা-মুসীবতে সবর নেয়া হয়। কিন্তু সবর কখনও এবাদতেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে সবর ও শোকর একই হবে। কেননা, এবাদতে সবর করা হুবহু এবাদতে শোকরগুযারী করা। সুতরাং এখানেও একটির উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। বালা-মুসীবতে সবরের বিধান এই যে, মুসীবত বলা হয় নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়াকে। চক্ষু একটি জরুরী নেয়ামত। এর বিলুপ্তিতে সবরের উদ্দেশ্য এজন্য অভিযোগ না করে আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং অন্ধত্বের কারণে কতক গোনাহের অনুমতি না চওয়া। অপরদিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির শোকর আমলের দিক দিয়ে এই যে, একে গোনাহের কাজে ব্যবহার করবে না বরং আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে। এই উভয় প্রকার শোকর সবর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উদাহরণতঃ অন্ধ ব্যক্তির সুন্দরী মহিলাদের থেকে সবর করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার উপর পতিত হলে সে যদি সবর করে, তবে সে চোখের নেয়ামতের শোকরকারী হবে। আর দ্বিতীয় বার দেখলে এই নেয়ামতের নাশোকরী হবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, সবর শোকরের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে আনুগত্যের কাজে চক্ষু ব্যবহার করলে আনুগত্যে সবর করা হবে।

মানুষ কখনও চোখের নেয়ামতের শোকর এভাবে আদায় করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার অদ্ভুত কারিগরী দেখে, যাতে এর মাধ্যমে মারেফত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ধরনের শোকর সবর অপেক্ষা উত্তম। নতুবা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) যিনি পয়গম্বরগণের মধ্যে চক্ষুষ্মান ছিলেন না, তাঁর মর্তব হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের মর্তবার চেয়ে বেশী হওয়া জরুরী হবে। কারণ, তিনি দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে সবর করেছিলেন, যা মূসা ও অন্য পয়গম্বরগণ করেননি, অথচ হযরত শোয়ায়ব (আঃ) -এর মর্তবা বেশী নয়।

মানুষ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তবে অতিরিক্তকে নেয়ামত বলা হবে। এর শোকর হল, তা দান-খয়রাতে ব্যয় করা— অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। এই শোকরকে সবরের সাথে তুলনা করলে শোকর হবে উত্তম। কেননা, এই শোকর সবরকেও নিজের মধ্যে শামিল রাখে। কারণ, এখানে সবরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতে সন্তুষ্ট হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফকীরদের উপর ব্যয় করার কষ্ট সহ্য করা এবং বিলাসিতায় ব্যয় না করা। এরূপ শোকরের মধ্যে দুটি বিষয় বিদ্যমান। তার একটি হচ্ছে সবর। অতএব, সবর হচ্ছে শোকরের অংশ। সুতরাং শোকর বড় এবং সবর তার ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু যদি এই নেয়ামতকে গোনাহের কাজে ব্যয় না করে বৈধ ভোগবিলাসে ব্যয় করে শোকর করা হয়, তবে সবর শোকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে এবং সবরকারী ফকীর এই ধনবানের তুলনায় উত্তম হবে। কোরআন ও হাদীসসমূহে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় এই বিশেষ স্তরের সবরই উদ্দেশ্য। কেননা, মানুষ নেয়ামতের অর্থ ধন-সম্পদ ভোগ করা, শোকরের অর্থ মুখে আলহামদু লিল্লাহ বলা এবং নেয়ামত দ্বারা গোনাহে সাহায্য না নেয়াকেই বুঝে। এটা কেউ বুঝে না যে, নেয়ামতকে কেবল এবাদতের কাজেই ব্যয় করতে হবে।

সারকথা, সাধারণ মানুষ যাকে সবর বলে, তা সেই শোকর অপেক্ষা উত্তম। হযরত জুনায়দ (রহঃ) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ ধনশালীর প্রশংসা ধনের কারণে নয়, তেমনি ফকীরের তারীফ ধন না থাকার কারণে নয়; বরং তাদের নিজ নিজ অবস্থার জন্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো যথাযথ পালন করলেই তারা প্রশংসার যোগ্য হয়। কিন্তু ধনী অবস্থার শর্তসমূহ মনের অনুকূলে। এতে ভোগ, আনন্দ ইত্যাদি বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ফকীর অবস্থার শর্তসমূহ ফকীরের মনকে কষ্ট দেয়, তাকে আবদ্ধ ও ভগ্নোৎসাহ রাখে। বলা বাহুল্য, যখন তারা উভয়েই আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ নিজ অবস্থার শর্ত পালন করবে, তখন যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে রাখবে এবং ভগ্নোৎসাহ থাকবে, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, যে নিজেকে ভোগ-বিলাসে রাখবে। হযরত জুনায়দের এই বর্ণনাই বাস্তব সম্মত।

কথিত আছে, আবুল আত্তাস ইবনে আতা এ প্রশ্নে তাঁর বিপরীত বলতেন। তাঁর উক্তি ছিল, যে ধনী শোকর করে, সে সবরকারী ফকীরের চেয়ে উত্তম। এতে হযরত জুনায়দ তাকে বদদোয়া করেন। ফলে তিনি অনেক অনিষ্টের সম্মুখীন হন। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পুত্ররা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিহত হয়। চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তিনি পাগলের মত জীবন যাপন করেন। নিজেই বলতেন ঃ জুনায়দের বদদোয়া আমার উপর লেগে গেছে। এরপর তিনি নিজ উক্তি প্রত্যাহার করে নেন এবং সবরকারী ফকীরকে ধনী শোকরকারীর উপর অগ্রাধিকার দিতে থাকেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন কোন অবস্থায় উভয় উক্তিই ঠিক। অর্থাৎ, অনেক সবরকারী ফকীর শোকরকারী ধনী অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু কখনও এর বিপরীত হয়। তবে সেই শোকরকারী ধনী উত্তম হয়, যে নিজেকে ফকীরের মত মনে করে এবং নিজের জন্যে যতটুকু ধন-সম্পদ প্রয়োজন, ততটুকু রেখে অবশিষ্ট ধন হয় খয়রাত করে দেয়, না হয় অভাবগ্রস্ত ও মিসকীনদের জন্যে রেখে দেয়। অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে এবং যখনই সুযোগ পায়, ব্যয় করে দেয়। এতে সে প্রতিপত্তি ও খ্যাতির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং আল্লাহর ওয়াস্তে গরীব-মিসকীনের হক আদায় করাই তার লক্ষ্য থাকে। এরূপ ধনী নিঃসন্দেহে সবরকারী ফকীর অপেক্ষা উত্তম।

সবর ও শোকর শব্দদ্বয়ের মধ্যে অসংখ্য আমল ও হাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদাহরণতঃ আল্লাহর নেয়ামতসমূহ উপর্যুপরি আসার কারণে বান্দার লজ্জিত হওয়া, নিজেকে শোকর আদায়ে অসমর্থ মনে করা, আল্লাহর সহনশীলতাকে উপলব্ধি করা, এ কথা স্বীকার করা যে, কোনরূপ অধিকার ছাড়াই নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি আসে, নেয়ামত পেয়ে বিনয় ও নম্রতা করা—এ সমস্ত বিষয় পৃথক পৃথক শোকর। যে ব্যক্তি নেয়ামতের মাধ্যম হয়, তার শোকর করাও আল্লাহর শোকরের নামান্তর। যেমন হাদীসে আছে— مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ অর্থাৎ, যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহর শোকর করে না।

অনুরূপভাবে নেয়ামতদাতার সামনে আদবসহকারে থাকাও শোকর এবং নেয়ামতকে উত্তমরূপে গ্রহণ করাও শোকরের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শোকর। অতএব, বিশেষ প্রকারের শোকর ও সবর উদ্দেশ্য না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর একটিকে অপরটির উপর মোটামুটিভাবে কেমন করে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন—আমি এক সফরে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ যৌবনের শুরুতে আমি আমার চাচাত বোনের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ছিলাম। সেও আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। অবশেষে তার বিবাহ আমার সাথেই সম্পন্ন হল। বাসর রাতে আমি তাকে বললাম ঃ এসো, এ রাত্রি আমরা শোকরানার নফল নামায পড়ে কাটিয়ে দেই। আল্লাহ্ আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন, এজন্যে তাঁর শোকর করা দরকার। সেমতে আমরা উভয়েই সে রাত্রি নামাযে কাটিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় রাত্রিতেও আমরা আগের রাত্রির মত কথাবার্তা বললাম এবং সারারাত শোকরগুযারীতে কাটিয়ে দিলাম। এরপর আমার বয়সের আশি বছর পার হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা অদ্যাবধি সেই শোকরগুযারীর হালেই আছি। আমাদের মধুমিলন সম্ভব হয়নি। আমি ঘটনা সত্য কি না, বৃদ্ধাকেও জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা বলল ঃ বাস্তব ঘটনা তাই, যা আমার স্বামী বলেছে।

এখন লক্ষণীয় যে, যদি তাদের বিবাহ না হত এবং বিরহে সবর করতে হত, তবে তাদের সবরকে তাদের এই শোকরের সাথে তুলনা করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে, এই শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। মোটকথা, জটিল বিষয়াদির স্বরূপ সবিস্তার বর্ণনা ছাড়া উদঘাটিত হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ অধ্যায়

খওফ ও রিজা

(ভয় ও আশা)

জানা উচিত যে, খওফ ও রিজা দুটি পাখা, যাতে ভর করে নৈকট্যশীল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মকাম পর্যন্ত উড্ডয়ন করে, অথবা এগুলোকে সওয়ারী বলা যায়, যাতে সওয়ার হলে আখেরাতের প্রতিটি দুর্গম পথ অবিক্রান্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আল্লার নৈকট্য, চিরন্তন সুখ-শান্তি এবং খোদায়ী সন্তুষ্টির সুশোভিত উদ্যান অনেক দূর-দূরান্তে অবস্থিত এবং অপ্রিয় কর্ম ও শারীরিক মেহনত দ্বারা আবৃত। "রিজা" তথা আশার আলোকবর্তিকা ছাড়া কারও পক্ষে সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে জাহান্নামের অগ্নিশিখা সূক্ষ্ম কাম-প্রবৃত্তি এবং অদ্ভুত আনন্দ ও ভোগের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। "খওফ" তথা ভয়ের চাবুক ছাড়া কেউ এ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নয়। তাই খওফ ও রিজার স্বরূপ এবং পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর সমন্বয়ের পন্থা বর্ণনা করা নেহায়েত জরুরী। নিম্নে দুটি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

রিজা

রিজা হচ্ছে অধ্যাত্মপথের পথিক ও সাধকগণের অন্যতম মকাম ও হাল। মকাম ও হালের পার্থক্য এই, যখন কোন গুণ সাধকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কায়েম ও স্থায়ী হয়ে যায়, তখন তাকে মকাম বলা হয়। আর যদি কোন গুণ অর্জিত হওয়ার পর স্থায়ী না হয় এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, তবে তাকে হাল বলা হয়। অন্তরের এ অবস্থাটি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান।

রিজার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে—এলম, হাল ও আমল। এলম থেকে হাল এবং হাল থেকে আমল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কেবল হালকেই রিজা বলা হয়। এর ব্যাখ্যা এই, মানুষের প্রিয় অথবা অপ্রিয়বস্তু অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যত— এই তিন কালের মধ্য থেকে কোন না কোন এক কালে অস্তিত্ব লাভ করবে। যদি অতীত কালে অস্তিত্বপ্রাপ্ত কোন বস্তুর ধ্যান অন্তরে আসে, তবে তাকে "যিকর ও তাযাক্কুর" (স্মরণ করা) বলা হয়। অন্তরে আসা বস্তু যদি বর্তমান কালে বিদ্যমান থাকে, তবে তাকে "ওজদ" (বিভুচিন্তায় মূর্ছাগত হওয়া) ও "খওফ" ভয় বলা হয়। আর যদি অন্তরে কোন বস্তুর শংকা ভবিষ্যত কালে হয় এবং তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তার নাম হয় "ইন্তেযার" ও "তাওয়াক্কু" (অপেক্ষা ও আশা)। যে বস্তুর অপেক্ষা করা হয়, তা যদি অশুভ হয় এবং মানসিক ব্যথার কারণ হয়, তবে তাকে বলা হয় "খওফ" (ভয়)। পক্ষান্তরে যদি সেই বস্তু প্রিয়, সুখকর ও আনন্দদায়ক হয়, তবে এই সুখ অর্জন করাকে বলা হয় "রিজা"। অতএব, রিজার সংজ্ঞা হচ্ছে, যে বস্তু আন্তরিকভাবে প্রিয়, তার অপেক্ষায় অন্তরের আনন্দিত হওয়া।

বলা বাহুল্য, প্রিয় বস্তুর আশা করার কিছু কারণও থাকবে। যদি এ কারণে আশা করে যে, তার কাছে তার অধিকাংশ উপকরণ মওজুদ আছে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তবে এরূপ আশা করাকে রিজা বলা সঠিক। আর যদি উপকরণ কিছু না থাকে অথবা অকেজো উপকরণ থাকে, তবে এ আশাকে ধোকা ও বোকামি বলাই উচিত। যদি উপকরণের অস্তিত্ব জানা না থাকে এবং উপকরণ না থাকার বিষয়টিও জানা না থাকে, তবে এরূপ আশা ও অপেক্ষাকে "তামান্না" বলা হয়। মোটকথা, যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয়, এমন বিষয়ের জন্যে রিজা প্রযোজ্য হয়। আর যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত, তার বেলায় রিজা প্রয়োগ করা হয় না। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের সময় আমরা বলি না যে, আমরা সূর্যোদয়ের রিজা তথা আশা করছি এবং সূর্যাস্তের সময় বলি না যে, আমরা সূর্য ডুবে যাবে বলে খওফ তথা আশংকা করছি। কেননা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নিশ্চিত বিষয়। হাঁ, এটা বলা যায় যে, বৃষ্টি বর্ষণের আশা করা যায় এবং খরার আশংকা আছে।

অধ্যাত্মবিদদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, অন্তর মৃত্তিকাসদৃশ, ঈমান যেন বীজ এবং ইবাদত ও সৎকর্ম হালচাষ করা ও খাল কেটে পানি সেচনের ব্যবস্থা করার ন্যায়। লোভী ও দুনিয়ায় নিমজ্জিত অন্তর লবণাক্ত ভূমির ন্যায়, যাতে বীজ গজায় না। আখেরাত হচ্ছে শস্য কাটার দিন। দুনিয়াতে যে যা কিছু বপন করবে, আখেরাতে সে তাই কাটবে। লবণাক্ত ভূমিতে যেমন বীজের ফলন হয় না, তেমনি অন্তরে ভ্রষ্টতা ও অসচ্চরিত্রতার উপস্থিতিতে ঈমানরূপী বীজ কমই ফলপ্রসূ হয়। যে বান্দা মাগফেরাতের আশা করে, তার অবস্থা ক্ষেতের মালিকের মতই মনে করা উচিত। যদি কোন কৃষক উর্বর ভূমি বেছে নেয়, তাতে পয়লা নম্বরের বীজ বপন করে, সময়মত পানি দেয় এবং আগাছা, কাঁটা ইত্যাদি বেছে দেয়, এরপর আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর আশা করে, তবে তার এই আশাকে রিজা বলা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করার পর তার কোন খবর না নেয় এবং ঘরে বসে শস্য পাওয়ার অপেক্ষা করে, তবে তার এই অপেক্ষাকে রিজা বলা হবে না; বরং নির্বুদ্ধিতাই বলা হবে। এ থেকে জানা গেল যে, রিজা কেবল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপেক্ষাকে বলা হয়, যাতে বান্দার এখতিয়ারাধীন সকল উপায়-উপকরণ বান্দার পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়ে যায়, কেবল তাই বাকী থাকে, যা তার এখতিয়ারাধীন নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুরূপভাবে বান্দা যদি অন্তরের শস্যক্ষেত্রে ঈমানের বীজ বপন করে, একে ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সিঞ্চন করে, অসচ্চরিত্রতার আগাছা ও কাঁটা থেকে পরিষ্কার রাখে, এরপর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মঙ্গলজনক জীবনাবসানের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষাকে সত্যিকার রিজা বলা হবে। এ রিজার জন্যে ঈমানের যে সকল উপায়-উপকরণ দ্বারা মাগফেরাত পূর্ণতা লাভ করে, সেগুলো আমৃত্যু পালন করে যাওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ঈমানের বীজ বপন করার পর কোন খবর না নেয়, ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সিঞ্চন না করে, অন্তর কুস্বভাব দ্বারা পরিপূর্ণ রাখে, পার্থিব আনন্দ-উল্লাসের অন্বেষণে নিমজ্জিত থাকে, এরপর মাগফেরাতের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষা বোকামি ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمني على الله

অর্থাৎ, বোকা সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে আপন খেয়াল-খুশীর অনুগামী করে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের বাসনা করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ـ

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের স্থলে এমন অপদার্থরা আগমন করল, যারা নামাযকে বরবাদ করে দিল এবং কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তারা লাভ করবে পথভ্রষ্টতা।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের স্থলে আল্লাহর কিতাবের নালায়েক উত্তরাধিকারীরা আসল। তারা এই হীন জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করত এবং বলত, আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

কোরআন পাকে উদ্যানের মালিকের নিন্দায় বলা হয়েছে যে, সে যখন উদ্যানে গমন করল, তখন বলল ঃ

مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا -

অর্থাৎ, আমার মনে হয় না যে, এই উদ্যান কোনদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত কায়েম হবে। যদি আমি রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে আমি সেখানে এর চেয়ে উত্তম বস্তু পাব।

মোটকথা, যে বান্দা এবাদত ও আনুগত্যে সচেষ্ট হয় এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে, সে আল্লাহর কাছে নেয়ামত পূর্ণ হওয়ার আশা করার যোগ্য। কিন্তু গোনাহগার যদি তওবা করে এবং কৃত ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নেয়, তবে তওবা কবুল হওয়ার আশা করা তার জন্যে শোভনীয়। কারণাদি পোক্তা হলেই রিজা তথা আশা হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করতে পারে।

এর অর্থ এই, তারাই রহমত আশা করার যোগ্য। এই অর্থ নয় যে, আশা কেবল তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। কেননা, আশা অন্যরাও করে, যাদের মধ্যে বর্ণিত গুণাবলী নেই।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আমার মতে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হচ্ছে মাফ হওয়ার আশায় অনুতাপ ছাড়াই একের পর এক গোনাহ্ করে যাওয়া, এবাদত না করেই খোদায়ী নৈকট্য আশা করা, অগ্নির বীজ বপন করে জান্নাতের প্রতীক্ষা করা, গোনাহের বিনিময়ে আনুগত্যশীলদের মকাম অন্বেষণ করা এবং আমল ছাড়াই সওয়াবের প্রত্যাশা করা।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, রিজা এলমের এমন একটি অবস্থা, যা অধিকাংশ উপকরণ অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা দাবী করে যে, অবশিষ্ট উপকরণগুলো অর্জন করার ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণতঃ উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যার বীজ ভাল হবে, ভূমিও উর্বর হবে এবং পানিও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে, তার রিজা সাচ্চা হবে। এই রিজা তাকে ক্ষেতের খবরদারী করতে, আগাছা পরিষ্কার করতে, পরিচর্যায় অলসতা না করতে এবং শস্য কাটার সময় পর্যন্ত দেখা-শুনা অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর কারণ এই যে, রিজার বিপরীত হচ্ছে নৈরাশ্য। নৈরাশ্যে এই দেখা-শুনা হতে পারে না। উদাহরণতঃ যে জানে যে, তার ভূমি লবণাক্ত, পানি পৌঁছানোও সুকঠিন এবং বীজ কখনও অংকুরিত হবে না, সে কখনও চাষাবাদে সম্মত হবে না এবং দেখা-শুনার কষ্টও সহ্য করবে না। নৈরাশ্য আমল থেকে বিরত রাখে এবং রিজা আমলে উৎসাহিত করে। রিজাকারী রিজার ফলশ্রুতিতে সর্বদা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকার মধ্যে আনন্দ পায়, মোনাজাতে স্বস্তি পায় এবং নম্রতা সহকারে আল্লাহর খোশামোদ করতে থাকে। এসব বিষয় সেই ব্যক্তির মধ্যেও প্রকাশ পায়, যে দুনিয়াতে কোন বাদশাহের কাছে রিজা করে। অতএব, সত্যিকার বাদশাহ্ আল্লাহর কাছে রিজা রাখার মধ্যে প্রকাশ পাবে না কেন? যদি প্রকাশ না পায়, তবে বুঝতে হবে যে, এই ব্যক্তি রিজার মকাম থেকে এখনও বঞ্চিত এবং প্রতারণার গর্তে পতিত।

হযরত যায়দ খায়ল বর্ণনা করেন; আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম— আমি জানতে চাই যে, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তার মধ্যে এর কি পরিচয় রাখেন এবং যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আলামত কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার অবস্থা কি? আমি আরয করলাম ঃ আমার অবস্থা এই যে, আমি সৎকর্ম-পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসি। যখন কোন সৎকর্ম করতে সক্ষম হই,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন যথাশীঘ্র তা সম্পাদন করে ফেলি এবং এর সওয়াবের বিশ্বাস রাখি। কোন সৎকাজের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলে তজ্জন্যে দুঃখ করি এবং তার আগ্রহ রাখি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ এটাই সেই ব্যক্তির পরিচয়, যার কল্যাণ আল্লাহ্ তা'আলা করতে চান। আল্লাহ্ তোমার জন্যে অন্য কিছু চাইলে তার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত করতেন এবং তুমি কোন্ বনে হারিয়ে গেছ, তার কোন পরওয়া করতেন না। এই হাদীসে সৎলোকদের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করে, অথচ তার মধ্যে এসব আলামত নেই, সে প্রতারিত।

রিজার ফযীলত ঃ রিজা সহকারে আমল করা খওফ সহকারে আমল করার চেয়ে উত্তম ও শ্রেয়। কেননা, সেই বান্দাই আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়, যে আল্লাহর সাথে সর্বাধিক মহব্বত রাখে। বলা বাহুল্য, রিজা দ্বারা মহব্বত বেশী হয়। উদাহরণতঃ দু'জন বাদশাহের মধ্যে মানুষ একজনের সেবা তার ভয়ে করে এবং অপরজনের সেবা তার অনুগ্রহ লাভের আশায় করে। এমতাবস্থায় শেষোক্ত বাদশাহের প্রতিই মহব্বত বেশী হবে। এ কারণেই শরীয়তে রিজা সম্পর্কে বিশেষত মৃত্যুর সময় অনেক উৎসাহবাণী বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

এখানে নৈরাশ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর হযরত এয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন—তুমি জান আমি তোমার মধ্যে ও ইউসুফের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর কেন খাড়া করেছি? এর কারণ এই যে, তুমি বলেছিলে—

وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ

অর্থাৎ, আমার ভয় হয় যে, তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলবে।

তুমি বাঘের ভয় করলে কেন? আমার কাছে রিজা করলে না কেন?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুমি ইউসুফ ভ্রাতাদের অসাবধানতার প্রতি নযর দিয়েছ এবং আমার হেফাযতের কথা ভেবে দেখনি।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ, তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, সে যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণাই রাখে।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَلْيَظُنَّ بِيْ مَاشَاءَ

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার ধারণার সাথে থাকি। অতএব, সে আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ধারণা রাখুক।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির কাছে তার অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় গমন করলেন এবং বললেন ঃ এখন তোমার অবস্থা কি? সে আরয করল ঃ আপন গোনাহের জন্যে ভয় করি এবং আল্লাহর রহমতের আশা করি। তিনি বললেন ঃ এ সময়ে যে বান্দার অন্তরে এ দুটি বিষয় (আশা ও ভয়) একত্রিত থাকে, আল্লাহ তাকে তার ঈপ্সিত বস্তু দান করেন এবং যে বিষয়কে সে ভয় করে, তা থেকে নিরাপদে রাখেন।

জনৈক ব্যক্তি অনেক গোনাহের ভয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তোমার এই নিরাশ হওয়াটা তোমার সকল গোনাহের চেয়ে বড় গোনাহ।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর ক্ষমতা দিয়েছেন, অতঃপর সে মার্জনার আশা রাখে, আল্লাহ তাকে মার্জনা করবেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের দোষ এভাবে বর্ণনা করেছেন—

ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি যে ধারণা রাখতে, সেই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরও বলা হয়েছে—

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

অর্থাৎ, তোমরা খারাপ ধারণা করলে। বস্তুত তোমরা ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায় ছিলে।

হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন ঃ এর কি কারণ ছিল যে, তুমি মন্দ কাজ দেখে নিষেধ করনি? তখন যদি আল্লাহ তাকে সঠিক জওয়াবের তাওফীক দেন, তবে সে বলবে—ইলাহী! আমি তোমার কাছে রিজা এবং মানুষকে খওফ করেছিলাম। আল্লাহ পাক বলবেন ঃ আমি তোমার অপরাধ মাফ করলাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে— যা কখনও বিপর্যস্ত হবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বললেন ঃ আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, ক্রন্দন করতে বেশী, বনে-জঙ্গলে বুকে করাঘাত করে ফিরতে এবং আপন রবের দরবারে চীৎকার করতে। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন যে, তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে কেন? অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে রিজা ও আগ্রহের কথাবার্তা বললেন।

আব্বান ইবনে আবী আইয়াশ অধিকাংশ সময় মানুষকে আশার বাণী শুনাতেন। তাকে মৃত্যুর পর লোকেরা স্বপ্নে দেখল যে, তিনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে নিজের সাথে খাড়া করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এ ধরনের কথাবার্তা কেন বলতে? আমি আরয করলাম ঃ আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে দেই। তখন আল্লাহ বললেন ঃ যাও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এক হাদীসে আছে—বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মানুষকে নিরাশ করত এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন—তুই যেমন আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করেছিস, তেমনি আমি তোকে আজ আমার রহমত থেকে নিরাশ করব।

রিজা লাভের উপায় ঃ রিজার প্রয়োজন দু'ব্যক্তির। এক, যার উপর নৈরাশ্য প্রবল, ফলে সে এবাদত বর্জন করে বসে আছে। দ্বিতীয়, যার উপর খওফ তথা ভয় প্রবল, ফলে, সে এবাদতে বাড়াবাড়ি করে নিজের ও গৃহবাসীদের ক্ষতি করে। এই উভয় ব্যক্তি সমতার সীমা অতিক্রম করে স্বল্পতা ও বাহুল্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাদের এমন চিকিৎসার প্রয়োজন, যা দ্বারা তারা সমতার সীমায় ফিরে আসে।

কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহে প্রতারিত হয়ে আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয়ে গোনাহেই ডুবে থাকে, তার জন্যে রিজা বিষতুল্য। এরূপ প্রতারিত ব্যক্তির জন্যে ভয় ও ভয় উৎপাদনকারী বিষয়সমূহ ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই। অতএব, যারা মানুষের মধ্যে ওয়ায-নসীহত করে, তাদের উচিত রোগের কারণ জেনেশুনে উপযুক্ত চিকিৎসা করা। তারা যেন এরূপ চিকিৎসা না করে, যা দ্বারা রোগ আরও বেড়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আলেম সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না করে এবং আযাব থেকে নির্ভীক না বানায়। আমরা রিজার যে সকল উপকরণাদি বর্ণনা করি, সেগুলো নিরাশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্যে বর্ণনা করি অথবা এমন ব্যক্তির জন্যে, যার উপর ভয় প্রবল। কোরআন পাক ও হাদীস শরীফও তাই দাবী করে। কেননা, উভয়ের মধ্যে খওফ ও রিজা পাশাপাশি দেখা যায়। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীসে সকল প্রকার রোগীদের আরোগ্য লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে, যাতে পয়গম্বরগণের ওয়ারিস আলেমগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করে, যেমন বিচক্ষণ চিকিৎসক করে থাকে এবং বোকাদের মত চিকিৎসা না করে। বোকারা এই ধারণায় লিপ্ত যে, প্রত্যেক ঔষধই প্রত্যেক রোগের উপযোগী।

রিজা প্রবল করার উপায়সমূহের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে এরূপ—চিন্তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা যে, দুনিয়াতে মানুষের টিকে থাকার জন্যে যে সকল বস্তু জরুরী ছিল, সেগুলো সব আল্লাহ তা'আলা সরবরাহ করেছেন, যেমন খাওয়ার যন্ত্রপাতি, কাজ করার হাতিয়ার, যেমন অঙ্গুলি, নখ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি সাজসজ্জার সামগ্রীও দান করেছেন, যেমন ভ্রূ বক্র করেছেন, চোখে কয়েক প্রকার রঙ দিয়েছেন এবং ওষ্ঠ লাল করেছেন। এসব বস্তু না থাকলেও মানবিক উদ্দেশ্যে কোন ত্রুটি দেখ দিত না— কেবল সৌন্দর্য বিনষ্ট হত। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে মানুষ এগুলোও লাভ করেছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদের প্রতি এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুগ্রহ দানেও ত্রুটি করেননি এবং বাড়তি সাজসজ্জা, প্রয়োজন ও স্থায়িত্বের বস্তুসমূহ তাদের হাতছাড়া হতে দেননি, তখন তিনি তাদেরকে চিরন্তন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে সম্মত হবেন কেমন করে?

রিজা প্রবল করার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে রিজা সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস ও বুযুর্গদের উক্তিসমূহ তালাশ করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে অনেক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

অর্থাৎ, বলে দিন হে আমার সে সকল বান্দা, যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে রয়েছে, তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, তিনি দোযখকে দুশমনদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং এর মাধ্যমে নিজের প্রিয় বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন। সেমতে বলা হয়েছে—

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ .

অর্থাৎ, তাদের জন্যে রয়েছে উপরের দিক থেকে আগুনের ছায়া এবং নিচের দিক থেকে আগুনের তাপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন।

আরও বলা হয়েছে—

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ, সে আগুনকে ভয় কর, যা তৈরি হয়েছে কাফেরদের জন্যে।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَايَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى .

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে একটি জ্বলন্ত আগুনের খবর শুনিয়ে দিলাম। এতে চরম হতভাগ্যই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

فَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাদের জন্যে ক্ষমাশীল।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) সর্বদা উম্মতের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতেন। অবশেষে তাঁর প্রতি উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় এখনও কি আপনি সন্তুষ্ট নন?

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হবেন। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও দোযখে থাকে, তবে আমি সন্তুষ্ট হব না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেন ঃ তোমরা ইরাকবাসীরা

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

আয়াতখানিকে কোরআন মজীদের সর্ববৃহৎ আশার আয়াত বলে থাক, আর আমরা নবী পরিবারের লোকজন এ আয়াতকে সর্বাধিক আশার আয়াত বলে থাকি— وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ الخ

রিজা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু মূসার বর্ণনায় রসূলে করীম (সাঃ) বলেন—আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। আখেরাতে এই উম্মতকে আযাব দেয়া হবে না। তাদের কুকর্মের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই ভূমিকম্প ও অন্যান্য আপদ দ্বারা দিয়ে দেন। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি কিতাবধারীদের মধ্য থেকে একজনকে পাবে। বলা হবে, তোমার জন্যে দোযখের অগ্নির "ফেদিয়া" (বিনিময়) এই ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে এভাবে বলা হয়েছে—এই উম্মতের প্রত্যেকেই ইহুদী ও খৃস্টানকে আনবে এবং বলবে দোযখের অগ্নির জন্যে এই ব্যক্তি আমার বিনিময়। এরপর সে ইহুদী ও খৃস্টানকে দোযখে নিক্ষেপ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

وَالْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَهِيَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ বিশেষ। এটা জাহান্নাম থেকে মুমিনের অংশ।

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অর্থাৎ, কিয়ামতে আল্লাহ নবী ও তাঁর সাথে মুমিনদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন যে, এই উম্মতের হিসাব আমি আপনার হাতে সোপর্দ করছি। নবী (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, এরূপ করবেন না। আমার তুলনায় আপনিই তাদের জন্যে উত্তম। আদেশ হল ঃ এখন আমি তাদের ব্যাপারে আপনাকে লাঞ্ছিত করব না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানালেন যে, আমার উম্মতের গোনাহসমূহের হিসাব আমার কাছে সোপর্দ করুন, যাতে তাদের গোনাহ সম্পর্কে আমাকে ছাড়া কেউ অবহিত না হয়। প্রত্যুত্তরে বলা হল ঃ তারা আপনার তো কেবল উম্মত, কিন্তু আমার বান্দা। আমি তাদের প্রতি আপনার তুলনায় অধিক মেহেরবান। অতএব, তাদের হিসাব আমার ছাড়া কারও হাতে দেব না, যাতে তাদের গোনাহ সম্পর্কে আপনিও অবগত না হোন এবং অন্য কোন ব্যক্তি জানতে না পারে। সোবহানাল্লাহ।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের জন্য উত্তম। জীবদ্দশায় আমি তোমাদের জন্যে শরীয়তের পথ উদঘাটিত করি, আর আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হবে। তখন তোমাদের উত্তম আমলসমূহের জন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করব এবং মন্দ আমলসমূহের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব।

এক হাদীসে আছে— যখন বান্দা কোন গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ দেখ আমার বান্দা গোনাহ করেছে, এরপর ভেবেছে, তার একজন প্রভু আছে, যিনি গোনাহ মাফ করেন এবং শাস্তিও দেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

এক হাদীসে কুদসীতে আছে—বান্দার গোনাহ যদি আকাশচুম্বীও হয়, তবে যতক্ষণ সে ক্ষমা চাইবে এবং আমার কাছে রিজা রাখবে, আমি ক্ষমা করে দেব। এক হাদীসে আছে, যখন মানুষ গোনাহ করে, তখন ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত ফেরেশতা তা আমলনামায় লেখে না। এই সময়ের মধ্যে যদি সে তওবা ও এস্তেগফার করে নেয়, তবে সে গোনাহ লেখাই হয় না। নতুবা একটি পাপ লিখে নেয়া হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন —যখন বান্দা গোনাহ করে, তখন তা তার আমলনামায় লেখা হয়। জনৈক বেদুইন বলল ঃ যদি সে তওবা করে? তিনি বললেন ঃ তবে মিটিয়ে ফেলা হয়। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ যদি পুনরায় গোনাহ্ করে? তিনি বললেন ঃ তবে তার আমলনামায় লিখে নেয়া হয়। বেদুইন আরয করল ঃ যদি সে তওবা করে নেয়? তিনি বললেন ঃ তবে আমলনামা থেকে আবার মিটিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেলা হয়। বেদুইন বলল ঃ এটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ সে তওবা করতে থাকবে। বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনায় ক্লান্ত না হয়, আল্লাহ সে পর্যন্ত ক্ষমা করার কাজে অস্থির হন না। এরপর যখন বান্দা পুণ্যকাজের ইচ্ছা করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা তা বাস্তবায়নের পূর্বেই একটি পুণ্য লিখে নেয়। যদি সে ইচ্ছার পর তা বাস্তবায়নও করে, তবে সেই ফেরেশতা দশটি পুণ্য লিখে নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন মানুষ গোনাহ করার ইচ্ছা করে, তখন বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত কিছুই লেখা হয় না। বাস্তবায়ন করলে একটি পাপই লেখা হয়। অতঃপর আল্লাহর কৃপায় তা মাফও হয়ে যেতে পারে।

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলতে লাগল ঃ আমি এক মাসের বেশী রোযা রাখি না এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত নামায পড়ি না। আমার ধন-সম্পদে সদকা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কিছুই ফরয নয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পর আমি কোথায় থাকব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জান্নাতে। লোকটি আরয করল ঃ আপনার সাথে? তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ হাঁ, আমার সাথে এই শর্তে যে, তুমি অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে হেফাযতে রাখবে, জিহ্বাকে গীবত ও মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং চক্ষুকেও দুটি বিষয় থেকে বিরত রাখবে। এক, আল্লাহর হারাম করা বস্তুসমূহ দর্শন এবং দুই, কোন মুসলমানকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা। যদি এ সব বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, তবে আমার সাথে একত্রে এবং আমার এই দু' হাতের তালুতে তুমি জান্নাতে যাবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে গৌরব ও মাহাত্ম্য দান করেছেন। যদি কেউ এর এক একটি পাথর আলাদা করে দেয়, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেয়, তবে ততটুকু গোনাহ হবে না, যতটুকু আল্লাহর একজন ওলীকে হেয় করার কারণে হয়। প্রশ্ন হল—আল্লাহর ওলী কারা? তিনি বললেন ঃ ঈমানদার সকলেই আল্লাহর ওলী। তুমি কি আল্লাহর এই উক্তি শুননি?

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ, আল্লাহ ঈমানদারদের ওলী। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় কিয়ামতের ভূকম্পন একটি মহা ঘটনা।

অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান এটা কোন্ দিন? এটা সেই দিন, যখন আদম (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হবে—দাঁড়াও এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে দোযখের রসদ বের কর। তিনি আরয করবেন ঃ কি পরিমাণ বের করব? নির্দেশ হবে—এক হাজারের মধ্য থেকে একজনকে জান্নাতের জন্যে এবং অবশিষ্ট নয়শ' নিরানব্বই জনকে দোযখের জন্যে বের কর। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে গেলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করলেন। সেদিন কোন কাজেই তাদের মন বসল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা কাজ করছ না কেন? তারা বললেন ঃ আপনার মুখে সেই হাদীস শোনার পর কাজ করার সাধ্য কারও নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অন্যান্য কওমের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা কত, তা বোধ হয় তোমাদের জানা নেই। কওম তো এত বেশী, যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাদের সামনে তোমাদের কোন গণনাই হতে পারে না। তাদের সকলের তুলনায় তোমরা যেন কাল বলদের চামড়ায় একটি সাদা চুল কিংবা ঘোড়ার পায়ে অন্য রঙের চিহ্ন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে খওফের চাবুক দিয়ে কিভাবে হাঁকাতেন এবং তারপর রিজার লাগাম টেনে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে নিয়ে আসতেন। তিনি প্রথমে ভয়ের চাবুক দিয়ে হাঁকিয়েছেন; কিন্তু যখন জানতে পারলেন, ভয়ের আতিশয্য তাদেরকে সীমার বাইরে নিয়ে গেছে এবং তারা নৈরাশ্যের গহ্বরে পড়ে গেছেন, তখন অনতিবিলম্বে আশার ঔষধি প্রয়োগ করে তাদের চিকিৎসা করলেন।

এক হাদীসে আছে, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা অন্য লোক সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহ করবে এবং ক্ষমা পাবে। কেননা, তাঁর সত্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। এক হাদীসে আছে, যদি তোমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহ না কর, তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি এমন বিষয়ের আশংকা করি, যা গোনাহের চেয়েও মারাত্মক। প্রশ্ন হল ঃ সে বিষয়টি কি? তিনি বললেন ঃ আত্মম্ভরিতা। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা তাঁর একশ' রহমতের মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখেছেন এবং একটি মাত্র রহমত দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন। এই এক রহমতের কারণেই সমগ্র মানবজাতি একে অপরের প্রতি রহম করে। জননী তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্তু তাদের বাচ্চাদের আদর করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এই এক রহমতকে সেই নিরানব্বই রহমতের সাথে যোগ করে সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক রহমত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমপরিমাণ হবে। এহেন রহমতের উপস্থিতিতে সেদিন নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন— তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে অথবা দোযখ থেকে পরিত্রাণ দেবে। (অর্থাৎ রহমত ছাড়া আমল কোন উপকারী হবে না।) লোকেরা আরয করল ঃ আপনিও কি তেমনি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমার অবস্থাও তদ্রূপ যে পর্যন্ত আল্লাহর রহমত আমাকে আবৃত করে না নেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আমি আমার শাফায়াত উম্মতের গোনাহের জন্যে গোপন রেখেছি। শাফায়াত কেবল মুত্তাকী ও আনুগত্যশীলদের জন্যেই নয়; বরং গোনাহগারদের জন্যেও।

এখন রিজা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি শোনা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির গোনাহ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে গোপন রাখেন, তাঁর কৃপা এটা চায় না যে, তার গোনাহের পর্দা আখেরাতে খুলে দেবেন। আর যে ব্যক্তি গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যায়, আল্লাহর সুবিচার এটা চায় না যে, আখেরাতে পুনরায় সে শাস্তি ভোগ করুক। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ আমার হিসাব যদি আমার পিতা-মাতার হাতেই সমর্পণ করা হয়, তবু আমি ভাল মনে করি না। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি পিতামাতার চেয়েও অধিক মেহেরবান। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ঈমানদার যখন অবাধ্যতা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ ফেরেশতাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দেন, যাতে তারা অপরাধ দেখে সাক্ষী না হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোহাম্মদ ইবনে মুসয়িব এক পত্রে আসওয়াদ ইবনে সালেমকে লিখেন—যখন বান্দা নিজের প্রতি যুলুম করে, এরপর "ইয়া রব" বলে হাত উঠায়, তখন ফেরেশতারা তার আওয়াজ ফিরিয়ে রাখে। দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার তাই করে। এরপর বান্দা যখন চতুর্থ বার "ইয়া রব" বলে ডাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে ফেরেশতাগণ, আমার বান্দার আওয়াজ আমার কাছে কতক্ষণ গোপন রাখবে? আমার বান্দা জেনে নিয়েছে যে, তার জন্যে আমার ছাড়া কোন পরওয়ারদেগার নেই, যে গোনাহ্ মাফ করতে পারে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ এক রাত্রিতে একা একা কা'বা গৃহের তওয়াফ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রাত্রিটি ছিল অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন। আমি মুলতাযামে কা'বার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বললাম ঃ ইলাহী, আমাকে গোনাহ থেকে হেফাযতে রাখ। আমি কখনও যেন তোমার নাফরমানী না করি। তৎক্ষণাৎ এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—হে ইবরাহীম, তুমি আমার কাছে নিষ্পাপতার প্রার্থনা করছ। ঈমানদার মাত্রই এটা চায়। কিন্তু আমি যদি সবাইকে নিষ্পাপ করে দেই, তবে আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা কার জন্যে থাকবে? হযরত হাসান বসরী বলতেন ঃ ঈমানদার যদি গোনাহ না করে, তবে অদৃশ্য জগত ও আসমানী রহস্যসমূহের মধ্যে উড়ে ফিরবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহের কারণে তার পাখা ছিঁড়ে দিয়েছেন।

হাদীসে এয়ামনে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে ভাই ভাই ছিল। তাদের একজন গোনাহগার, অপরজন আবেদ। আবেদ সর্বদা গোনাহ্গার ভাইকে উপদেশ দিত ও তিরস্কার করত। সে উত্তরে বলত—আমি জানি আর আমার পরওয়ারদেগার জানে। তুমি আমার উপর দারোগা নিযুক্ত হওনি। একদিন আবেদ তাকে কবীরা গোনাহ করতে দেখে ফেলল। আবেদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ আল্লাহ্ তোকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এই গোনাহ্গারকে কিয়ামতের দিন বলবেন— কারও সাধ্য নেই যে, আমার রহমত আমার বান্দা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যা, আমি তোকে ক্ষমা করলাম। আর আবেদকে বলবেন—তোর জন্যে আমি দোযখ অপরিহার্য করে দিলাম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এই আবেদ এমন কথা বলল, যা দ্বারা তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হয়ে গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে মুশরিকদের জন্যে বদদোয়া করতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আপনার কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তাদেরকে তওবার ক্ষমতা দেবেন,অথবা শাস্তি দেবেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদদোয়া পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তাদের অধিকাংশকে ইসলাম গ্রহণে ধন্য করলেন।

বর্ণিত আছে, দুই আবেদ ব্যক্তি এবাদতে সমান সমান ছিল। যখন তারা জান্নাতে গেল, তখন একজন অপরজনের চেয়ে উচ্চ মর্তবা পেল। যার মর্তবা কম ছিল, সে আরয করল ঃ ইলাহী, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী এবাদত করত না। কিন্তু তুমি তাকে উচ্চ মর্তবা দান করেছ। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ দুনিয়াতে থাকাকালে সে আমার কাছে উচ্চ মর্তবার আবেদন করত। আর তুমি কেবল জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দোয়া করতে। আমি প্রত্যেককে তার আবেদন অনুযায়ী দান করেছি।

এ থেকে জানা গেল যে, রিজা সহকারে এবাদত করা উত্তম। কেননা, যে রিজা করে, তার মধ্যে মহব্বত প্রবল থাকে। এদিকে লক্ষ্য করেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় বড় মর্তবা তলব কর। তোমরা এমন দাতার কাছে যাও, যার জন্যে দান করা মোটেই কঠিন নয়। তিনি আরও বলেন ঃ যখন আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাও, তখন সাগ্রহে চাও এবং উচ্চতম ফেরদাউসের দরখাস্ত কর। কেননা, তার কাছে কোন বস্তুই বড় নয়, যা তিনি দিতে পারেন না।

বর্ণিত আছে, জনৈক উগ্নি-উপাসক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে আতিথেয়তা চাইলে তিনি বললেন ঃ তুমি মুসলমান হয়ে গেলে আমি তোমার আতিথেয়তা করব। এতে অগ্নি-উপাসক চলে গেল। আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা তৎক্ষণাৎ হযরত ইবরাহীমের প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন—তুমি ধর্মের বিভিন্নতার কারণে তাকে খেতে দাওনি। আমি সত্তর বছর ধরে কুফর সত্ত্বেও তাকে খাদ্য দিয়ে আসছি। তুমি এক বেলা খাইয়ে দিলে তেমন কি হয়ে যেত? হযরত ইবরাহীম কালবিলম্ব না করে অগ্নিউপাসকের পিছনে ছুটলেন এবং তাকে ফিরিয়ে এনে খাইয়ে দিলেন। অগ্নি-উপাসক জিজ্ঞেস করল ঃ এখন আতিথেয়তার কারণ কি? প্রথমে তো আপনি অস্বীকারই করেছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললে অগ্নি-উপাসক বলল ঃ আচ্ছা, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে এমন ব্যবহার করেন! এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল।

ইবরাহীম আতরোশ বর্ণনা করেন, আমরা কয়েকজন বাগদাদের দজলা নদীর তীরে হযরত মারূফ কারখী (রহঃ) -এর সাথে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি ডিঙ্গি নৌকায় কয়েকজন যুবক মদ্যপান করে, ঢোল বাজিয়ে নদী বিহারে বের হল। আমরা হযরত মারূফকে বললাম ঃ দেখুন, এরা প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করছে। এদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন, ইলাহী! তুমি তাদেরকে দুনিয়াতে যেমন প্রফুল্ল রেখেছ, আখেরাতে তেমনি প্রফুল্লতা দান কর। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আমাদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। আপনি তাদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতে প্রফুল্ল রাখেন, তবে প্রথমে দুনিয়াতে তওবা করার শক্তি দেবেন। অর্থাৎ, তাঁর দোয়ার সারমর্ম এই ছিল যে, আল্লাহ তাদেরকে এসব কুকর্ম থেকে তওবা নসীব করুন।

উপরোক্ত বিষয়বস্তুগুলোর দ্বারা ভীত ও নিরাশ ব্যক্তিদের অন্তরে রিজা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু নির্বোধ ও আত্মপ্রতারিতদেরকে কখনও এসব কথা শুনাতে নেই। তাদের জন্যে উপযুক্ত বিষয়বস্তু হচ্ছে খওফ, যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। কেননা, অধিকাংশ লোক কেবল খওফ দ্বারাই সংশোধনপ্রাপ্ত হয়; যেমন দুষ্ট বালক বেত্রাঘাত ও কঠোর ভাষা ছাড়া ঠিক পথে আসে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খওফ

খওফ বলা হয় অন্তরের ব্যথা ও অভ্যন্তরীণ জ্বালা-যন্ত্রণাকে, যা ভবিষ্যতের কোন খারাপ আশংকার কারণে সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং যে সর্বদা আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করে, তার ভবিষ্যতের প্রতি মোটেই মনোযোগ থাকে না। ফলে তার ভয় ও আশা কোন কিছুই হয় না। তার অবস্থা এসব বিষয়ের উর্ধ্বে। কেননা, ভয় ও আশা হচ্ছে দুটি লাগাম, যা মনকে তার অহমিকায় যেতে দেয় না। ওয়াসেতী (রহঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন— খওফ আল্লাহ তা'আলার ও বান্দার মাঝখানের একটি যবনিকা। তিনি আরও বলেন ঃ যখন অন্তরে হক প্রবল হয়, তখন তাতে খওফ ও রিজার অবকাশ থাকে না। প্রেমিকের অন্তর যদি প্রেমাস্পদকে দর্শন করার সময় বিরহের ভয়ে মশগুল থাকে, তবে দর্শনে ত্রুটি দেখা দেবে। বরং দর্শন সর্বদা অব্যাহত থাকা চূড়ান্ত মকাম। কিন্তু আমরা এখানে প্রাথমিক মকাম সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে ভয়ও থাকে।

খওফও তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত—এলম, হাল ও আমল। এলম অর্থ সেই কারণের জ্ঞান, যা অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অপরাধ করে বাদশাহের লোকজনের হাতে বন্দী হল। সে অবশ্যই মৃত্যুদন্ডের খওফ করবে। যদিও ক্ষমা পাওয়া ও পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর, কিন্তু তার অন্তরে খওফ সে পরিমাণে হবে, হত্যার কারণ সম্পর্কে যে পরিমাণ জ্ঞান জোরদার হবে। সে যদি জানে যে, তার অপরাধ গুরুতর কিংবা বাদশাহ অত্যধিক প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্রুদ্ধ এবং তার নিজের কাছেও মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, তবে নিঃসন্দেহে তার খওফ অধিক জোরদার হবে। পক্ষান্তরে এসব কারণ দুর্বল হলে খওফও দুর্বল হবে। কখনও অপরাধ ছাড়াই খওফ হয়ে থাকে। যেমন, আমরা বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুকে খওফ (ভয়) করি। এমনিভাবে আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলাকে খওফ করা কখনও গোনাহের কারণে এবং কখনও তাঁর মারেফত ও ক্ষমতা জানার কারণে হয়ে থাকে। তিনি ইচ্ছা করলে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। এতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। আল্লাহ যা করেন, তার কোন জওয়াবদিহী নেই এবং বান্দাকে তার প্রত্যেকটি কাজের জওয়াবদিহী করতে হবে। এসব বিষয় মানুষ যত বেশী জানবে, তার খওফও তত বেশী হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে সে-ই বেশী ভয় করবে, যে নিজেকে বেশী জানবে। একারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহর খওফ বেশী করি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।

এই জ্ঞান পূর্ণ হলে খওফ ও অন্তর্দাহের কারণ হয়। অতঃপর এর প্রভাব অন্তর থেকে দেহে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ফলে, দেহ দুর্বল ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মানুষ ক্রন্দন ও আহাজারি করে এবং কখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। খওফ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আনুগত্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে অতীতের ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে কর্মক্ষমতা অর্জিত হয়। এ কারণেই বলা হয়, সে ব্যক্তি খওফকারী নয়, যে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে চোখ মুছে ফেলে। বরং খওফকারী তাকেই বলা হবে, যে ভয়ের কাজ ত্যাগ করে।

আবুল কাসেম হাকীম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ভয় করে, সে তা থেকে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তাঁর দিকেই ছুটে পালায়।

যুন্নুন মিসরীকে প্রশ্ন করা হল ঃ বান্দা কখন খওফকারী হয়? তিনি বললেন ঃ যখন নিজেকে রোগীর মত করে নেয়। রোগী রোগ বৃদ্ধির ভয়ে পরহেয করে।

খওফের এক প্রভাব এই যে, এতে খাহেশের মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং যাবতীয় আনন্দ বিস্বাদে পরিণত হয়। ফলে, যে গোনাহ প্রিয় ছিল, তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপ্রিয় মনে হয়। যেমন মধু পানে আগ্রহী ব্যক্তি যখন শুনে যে, মধুর মধ্যে বিষ রয়েছে, তখন খওফের কারণে আগ্রহ উধাও হয়ে যায়। খওফের কারণে যাবতীয় খাহেশও এমনিভাবে বিলীন হয়ে যায়। অন্তরে বিনয়, নম্রতা ও অসহায়ত্ব সৃষ্টি হয়। অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। আল্লাহর চিন্তা, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকে না। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে কিছু লোকের অবস্থা এমনি ছিল। আল্লাহর মহিমা, গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং নিজের দোষত্রুটির মারেফত শক্তিশালী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ততটুকুই শক্তিশালী হয়, যতটুকু খওফ শক্তিশালী হয়।

খওফের প্রভাব প্রকাশ হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শরীয়তের হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা। যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে হারাম নয় কিন্তু হারাম হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, সেগুলো থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়া এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের নাম "তাকওয়া"। যদি কেউ শুধু প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করে এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করে। যেমন যে ঘরে থাকে না, সে ঘর নির্মাণও করে না, যে বস্তু খাওয়ার নয়, তা সঞ্চয় করে না এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, তবে এই স্তরকে বলা হয় "সিদক" এবং এরূপ ব্যক্তিকে "সিদ্দীক" বলাই শোভনীয়।

কিছু কিছু কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরত থাকা এবং কোন কোন কর্মে তৎপর হওয়ার মাধ্যমেও খওফের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তবে বিশেষ কর্ম থেকে বিরত হওয়াকে শরীয়তে বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণতঃ কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকাকে বলা হয় "ইফফত"। এর উপরের স্তরের নাম 'ওরা', যা প্রত্যেক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়। এর উপরের স্তর হচ্ছে তাকওয়া, যা নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত উভয় প্রকার বিষয় থেকে বিরত থাকার নাম। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে "সিদক ও কুরব"। অর্থাৎ সন্দেহের কারণে বৈধ বিষয় থেকেও বিরত থাকা। এসব স্তর যেহেতু একটি অপরটির উপরে, তাই সর্বোচ্চ স্তরে নিম্নের সবগুলো স্তরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং এগুলোর শাব্দিক নাম পৃথক পৃথক হলেও অর্থ পৃথক নয়।

খওফের স্তর ঃ খওফ একটি উত্তম বিষয় বিধায় কেউ ধারণা করতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পারে যে, এটি যত শক্তিশালী ও অধিক হবে, ততই মঙ্গলজনক হবে। এ ধারণা সঠিক নয়। আসলে খওফ একটি চাবুক বিশেষ, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এলম ও আমলের দিকে হাঁকান, যাতে সে নৈকট্যের স্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, খওফের কম-বেশী মাত্রা রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী মাত্রাই উত্তম। কম মাত্রার খওফকে মহিলাদের কান্নার মত মনে করা উচিত। তারা যখন কোন কোরআনের আয়াত শুনে অথবা অন্য কোন ভয়াবহ বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন ভয়ে কান্না জুড়ে দেয় এবং অশ্রু মুছতে থাকে। কিন্তু যখনই ভয়ের বিষয়টি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়, তখনই মন পূর্ববৎ গাফেল হয়ে যায়। এ ধরনের খওফ মধ্যবর্তী মাত্রার চেয়ে কম এবং এর উপকারিতাও সামান্য। আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ও আলেমগণ ছাড়া সকল মানুষের খওফ এমনি ধরনের। এখানে আলেম অর্থ তারা নয়, যারা আলেমদের পোশাক পরিধান করে নামসর্বস্ব পণ্ডিত হয়ে যায়। তারা তো সবার চেয়ে বেশী খওফবিহীন। বরং আলেম বলে আমাদের উদ্দেশ্য তারা, যারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নেয়ামতসমূহ এবং তাঁর ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। এরূপ আলেম বিরল বটে। এ দিক দিয়েই হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহকে ভয় কর, তখন জওয়াবে নিশ্চুপ থাক। কেননা, যদি ভয় করি বল, তবে মিথ্যাবাদী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খওফ তাই, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং এবাদত ও আনুগত্যের পাবন্দ করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খওফের এই প্রভাব ফুটে না উঠা পর্যন্ত তাকে খওফ না বলে মনের কল্পনা বলাই অধিক সঙ্গত।

মধ্যবর্তী সীমার বেশী খওফ হচ্ছে, খওফ করতে করতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিপতিত হওয়া। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা আমলের পথে প্রতিবন্ধক। মোটকথা, যে খওফ নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, তা নিন্দনীয়। খওফ কোন সময় রোগ, দুর্বলতা, সংজ্ঞাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়। এধরনের খওফও নিন্দনীয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিজার উপায়-উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্য মাত্রাতিরিক্ত খওফের প্রতিকার করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটকথা, খওফ যদি আমলে প্রভাব বিস্তার না করে, তবে তার থাকা না থাকা সমান। আর যদি প্রভাব বিস্তার করে, তবে যে পরিমাণে তার প্রভাব প্রকাশ পাবে, সে পরিমাণেই মর্তবা বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণতঃ যদি খওফের কারণে কু-প্রবৃত্তি থেকেই বিরত থাকে, তবে শুধু ইফফতের স্তর অর্জিত হবে। আর যদি খওফ 'ওরা' তথা পরহেযগারীর কারণ হয়, তবে পূর্বের তুলনায় স্তর কিছু বেড়ে যাবে। সর্ববৃহৎ স্তর হচ্ছে সিদ্দীকগণের স্তর। অর্থাৎ, নিজের বাহির ও ভিতরকে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া এবং তাতে অন্যের কোন অবকাশ না থাকা। খওফের এ স্তরটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটা শারীরিক সুস্থতা ও মস্তিষ্কের নিরাপত্তা সহকারে অর্জিত হতে পারে। যদি খওফ এই স্তরকে অতিক্রম করে যায় এবং বুদ্ধি ও সুস্থতা বিনষ্ট করে দেয়, তবে একে রোগ মনে করে জরুরী পর্যায়ে চিকিৎসা করতে হবে। হযরত সহল তস্তরীর কিছু সংখ্যক মুরীদ দীর্ঘদিন উপবাস করত। তিনি তাদেরকে বলতেন ঃ নিজের মস্তিষ্কের হেফাযত করতে থাকবে। কেননা, আল্লাহর ওলীদের মধ্যে কেউ বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিল না।

খওফের ফযীলত ঃ বলা বাহুল্য, খওফের ফযীলত প্রথমত যৌক্তিক উপায়ে এবং দ্বিতীয়ত কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। যৌক্তিক উপায় এই যে, কোন বস্তুর ফযীলত ততটুকুই হয়, যতটুকু সে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে সহায়ক হয়। কেননা, পারলৌকিক সৌভাগ্য ছাড়া মানুষের আর কোন অভীষ্ট নেই। এ সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর দীদার ও তাঁর নৈকট্য অর্জন। অতএব, এই সৌভাগ্য অর্জনে যে বস্তু যে পরিমাণে সাহায্য করবে, সে পরিমাণে তার ফযীলত হবে। এটা জানা কথা যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অর্জন করা ছাড়া আখেরাতে তাঁর দীদারের সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। মারেফত ছাড়া মহব্বত অর্জিত হয় না এবং মারেফতের জন্যে সার্বক্ষণিক যিকির ও ফিকির অত্যাবশ্যক। আর তা দুনিয়ার মহব্বত মন থেকে আলাদা করা ছাড়া লাভ করা যায় না। পার্থিব মহব্বত মন থেকে আলাদা করতে হলে পার্থিব আনন্দ ও কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতেই হবে। পার্থিব আনন্দ ও কামনা-বাসনা বর্জন যতটুকু খওফের অনল দ্বারা হতে পারে, অন্য কোন কিছুর দ্বারা ততটুকু হতে পারে না। এতে জানা গেল যে, খওফ এমন একটি অনল, যা দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুতরাং কাম-প্রবৃত্তি খতম করা, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এবাদত ও আনুগত্যে উৎসাহিত করা যতটুকু কাম্য হবে, ততটুকুই খওফের ফযীলত লাভ হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটা খওফের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভিন্নরূপ হতে পারে।

এ ছাড়া খওফ দ্বারা ইফফত, ওরা, তাকওয়া ও মোজাহাদা অর্জিত হয়। এসবগুলোই ফযীলত ও নৈকট্য অর্জনকারী বিষয়। সুতরাং যে খওফ এমন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ অর্জনের কারণ হয়, তার ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত।

খওফের ফযীলত সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত, রহমত, এলম ও রিজা— জান্নাতীদের এই মকাম চতুষ্টয়কে তিনটি আয়াতে খওফকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। খওফের ফযীলতের জন্যে এটাই যথেষ্ট। হেদায়াত ও রহমত এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে—

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

অর্থাৎ, হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্যে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে।

এলম সম্বন্ধে এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ, বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

নিম্নোক্ত আয়াতে খওফকারীদের জন্যে রিযার কথা উল্লিখিত হয়েছে—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা সেই ব্যক্তির জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

এ ছাড়া এলমের ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে, তা দ্বারা খওফের ফযীলতও বুঝা যায়। কেননা, খওফ এলমের ফল। এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, খওফকারীরা "রফীকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আ'লার" (মহান সঙ্গীর) সাহচর্য লাভ করবে। এতে অন্য কেউ তাদের সাথে শরীক হবে না। এই সাহচর্য বিশেষ ভাবে তাদের জন্যেই নির্ধারিত হওয়ার কারণ এই যে, খওফকারী আলেম হয়ে থাকে। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস বিধায় নবীগণের সাহচর্য আলেমগণই লাভ করবেন। আর নবীগণ ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মহান স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করবেন। এ কারণেই ওফাতের পূর্বে রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখন দুনিয়াতে থাকার অথবা আল্লাহ তা'আলার কাছে চলে যাওয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়, তখন তিনি এ কথাই বলতে থাকেন —

اَسْئَلُكَ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

আমি "রফীকে আ'লা" তথা মহান সঙ্গীকে চাই।

মূল খওফের দিকে লক্ষ্য করলে এ হালটি হচ্ছে এলম এবং খওফের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে এটি হচ্ছে ওরা ও তাকওয়া। তাকওয়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। এমনকি, "আকেবাত" তথা পরিণাম তাকওয়ার জন্যেই নির্দিষ্ট। যেমন "হামদ" আল্লাহর জন্যে এবং দুরূদ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট। এমনিভাবে পরিণামও তাকওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, পরিণাম তাকওয়াওয়ালাদের জন্যে এবং দুরূদ মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি।

তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, তাদের গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাকওয়ার অর্থ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, খওফের ফলে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এর মাহাত্ম্য এ কারণেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে গোনাহ থেকে বেশী বেঁচে থাকে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ۔

অর্থাৎ, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবপ্রাপ্তদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

আরও বলা হয়েছে—

وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ভয় কর— যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

এ আয়াতে নির্দেশসূচক পদ ব্যবহার করে খওফকে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং ঈমানের জন্য এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মুমিনকে খওফ থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কমবেশী খওফ অবশ্যই থাকবে। খওফ ততটুকুই দুর্বল হবে, ঈমানে যতটুকু দুর্বলতা থাকবে।

এক হাদীসে আছে اَلْحِكْمَةُ مَخَافَةُ اللّٰهِ অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন — তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে আমার পরে আল্লাহকে খুব ভয় করবে। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে ভয় তার সামনে সর্বপ্রকার কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। হযরত শিবলী বলেন ঃ যখন আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি, তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার সামনে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভের এক অভূতপূর্ব দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে মুমিন কোন ভুল করে, তার পেছনে দুটি নেকী থাকে। এক, আযাবের খওফ এবং দুই, মাফ হওয়ার আশা। তার ভুলটি খওফ ও রিজার মাঝখানে পড়ে যায়; যেমন দুটো বাঘের মাঝখানে শৃগাল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে আছে—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এরশাদ করবেন, কোন ব্যক্তি হিসাব ছাড়া থাকবে না। তবে যারা ওরা ও তাকওয়াওয়ালা, তাদেরকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করাতে আমি লজ্জাবোধ করি। কারণ, তাদের সম্মান এর চেয়ে উর্ধ্বে। বলা বাহুল্য, ওরা ও তাকওয়া শব্দদ্বয়ের অর্থে খওফের শর্ত রয়েছে। খওফ না থাকলে ওরা ও তাকওয়া হবে না।

এমনিভাবে ফযীলতের কতিপয় আয়াতকেও আল্লাহ তা'আলা খওফের সাথে খাস করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ, যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

আরও বলা হয়েছে—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্যে রয়েছে দুটি জান্নাত।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি আমার বান্দার উপর দু'খওফ ও দু'শান্তি একত্রিত করব না। যদি সে দুনিয়াতে আমা থেকে নির্ভয় থাকে তবে কিয়ামতে তাকে ভীত করব। আর যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, তবে কিয়ামতে তাকে অভয় দান করব।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ خَافَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَافَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ خَوَّفَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ـ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে প্রত্যেক বস্তু ভয় করে। আর যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে, আল্লাহ্ তাকে প্রত্যেক বস্তু থেকে ভীত করেন।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ অসহায় মানুষ দারিদ্র্যকে যতটুকু ভয় করে, ততটুকু যদি জাহান্নামের আগুনকে ভয় করতো, তবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যেত। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ যতক্ষণ মানুষ হালাল না খাবে, ততক্ষণ খওফ অর্জিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নির্ভীকতা প্রসঙ্গে যেসকল শাস্তি ও নিন্দাবাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোও খওফের ফযীলত জ্ঞাপন করে। কেননা, কোন বিষয়ের নিন্দা করা হলে তার বিপরীত বিষয়ের প্রশংসা হয়ে যায়। নৈরাশ্যের নিন্দা দ্বারা যেমন আশার ফযীলত জানা যায়, তেমনি ভয়শূন্যতার নিন্দা দ্বারা ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। বরং আমরা বলি, রিজার ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও খওফের ফযীলত-জ্ঞাপক। কেননা, রিজা ও খওফ একটি অপরটির সাথে থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন প্রিয় বস্তু আশা করে, তা না পাওয়ার ভয়ও অবশ্যই তার থাকবে। যদি এ ভয় না থাকে, তবে সে বস্তু তার প্রিয় হবে না এবং তার অপেক্ষা করবে না।

মোটকথা, খওফ ও রিজা পরস্পর জড়িত। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। উভয়টি একত্রিত হয়ে একটি অপরটির উপর প্রবল হতে পারে। এটাও সম্ভব যে, অন্তর একটির সাথে মশগুল হবে এবং অপরটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। খওফ ও রিজা পরস্পর জড়িত বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা উভয়টি এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا

অর্থাৎ, তারা আমাকে আশা ও ভয় সহকারে ডাকে।

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে।

কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় রিজা খওফ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এরা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কান্না খওফের ফল বিধায় কান্নার ফযীলত দ্বারাও খওফের ফযীলত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

অর্থাৎ, তাদের উচিত কম হাসা এবং বেশী কাঁদা।

কান্নার ফযীলত দ্বারা হাদীসসমূহ পরিপূর্ণ। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এমন কোন ঈমানদার বান্দা নেই, যার চোখ থেকে সামান্য পরিমাণ অশ্রুও নির্গত হয়ে কপালে প্রবাহিত হয়, এরপর আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন না।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন আল্লাহর ভয়ে ঈমানদারের অন্তর কেঁপে উঠে, তখন তার গোনাহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে। আরও বলা হয়েছে ঃ

لَا يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না, যে পর্যন্ত স্তন থেকে নির্গত দুধ স্তনে ফিরে না যাবে।

হযরত ওকবা ইবনে আমের একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ নিজের বাসনাকে সংযত রাখ, ঘর থেকে বের হয়ো না এবং গোনাহের জন্যে ক্রন্দন কর।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের কেউ কি বে-হিসাব জান্নাতে দাখিল হবে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গোনাহ স্মরণ করে ক্রন্দন করবে, সে বে-হিসাব জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলার কাছে দুটি বিন্দুর চেয়ে উত্তম কোন বিন্দু নেই। একটি অশ্রুবিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয় এবং দ্বিতীয়টি রক্তবিন্দু, যা জেহাদে শরীর থেকে নির্গত হয়।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَشْفِيَانِ بِتَزْرِفَةِ الدَّمْعِ قَبْلَ اَنْ تَصِيْرَ الدُّمُوْعُ دِمَاءً وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا ـ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে দুটি অশ্রু বিসর্জনকারী ক্রন্দনকারী চক্ষু দান কর, যা অশ্রু বিসর্জন করে শান্তি দিবে সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন অশ্রু রক্ত হয়ে যাবে এবং চোয়াল হয়ে যাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে ছায়ার মধ্যে রাখবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তিনি বলেন ঃ তাদের মধ্যে একজন হবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে স্মরণ করে নির্জনে কাঁদে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ যে কাঁদতে পারে, সে কাঁদুক এবং যে পারে না, সে কান্নার ভান করুক। হযরত মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির যখন ক্রন্দন করতেন, তখন চোখের পানি মুখমণ্ডলে এবং দাড়িতে মালিশ করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, যে জায়গায় অশ্রু লাগবে, সেখানে দোযখের আগুন পৌঁছবে না।

হযরত হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশে এমন ওয়ায করলেন, যার ফলে আমাদের অন্তর নরম হয়ে গেল এবং চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর আমি যখন বাড়ী ফিরে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হলাম এবং সাংসারিক কথাবার্তায় মশগুল হলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আমার যে অবস্থা ছিল, তা মন থেকে উধাও হয়ে গেল এবং আমি দুনিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়লাম। এরপর পুনরায় মনে পড়ল। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। কেননা, যে ভয় ও নম্রতা আমার মধ্যে ছিল, তা রইল না। এই চিন্তা মনে আসতেই আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং চিৎকার করে বলতে লাগলাম ঃ হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন ঃ হানযালা কিছুতেই মুনাফিক হয়নি। অতঃপর আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে একথা বলতে উপস্থিত হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি মোটেই মুনাফিক হওনি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে ছিলাম। আপনি ওয়ায করলেন । তখন আমার অন্তরে যে ভয় এবং চোখে যে অশ্রু ছিল বাড়ী গিয়ে সংসারকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। এটা কি মুনাফেকী নয়? রসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ হানযালা, এখন তুমি খওফের যে স্তরে অবস্থান করছ, যদি তা অব্যাহত থাকে, তবে ফেরেশতারা তোমার সাথে পথিমধ্যে এবং শয্যায় মোসাফাহা করবে। তবে প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সময় আছে।

মোটকথা, রিজা ও কান্নার ফযীলত সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে, তাতে খওফ ও ভয়ের ফযীলতও বুঝা যায়। কারণ, এগুলো খওফের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন বিষয় খওফের কারণ এবং কোন কোন বিষয়ের কারণ স্বয়ং খওফ।

খওফের প্রবলতা ও রিজার প্রবলতার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ঃ খওফ ও রিজার ফযীলত সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তাই পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? খওফ উত্তম, না রিজা। মোটামুটিভাবে এ প্রশ্ন করা অর্থহীন। এটা এমন, যেমন কেউ প্রশ্ন করে যে, রুটি উত্তম, না পানি? বলা বাহুল্য, এর উত্তর এটাই হবে যে, ক্ষুধার্তের জন্যে রুটি উত্তম এবং তৃষ্ণার্তের জন্যে পানি উত্তম। যদি কারও ক্ষুধা ও পিপাসা দুটিই হয়, তবে উভয়ের মধ্যে যেটি প্রবল হবে, সেটিই ধরতে হবে। অর্থাৎ, ক্ষুধা প্রবল হলে রুটি উত্তম হবে এবং তৃষ্ণা প্রবল হলে পানি উত্তম। উভয়টি সমান হলে রুটি ও পানি সমান হবে।

রিজা ও খওফ অন্তরের চিকিৎসার জন্যে ঔষধি বিশেষ। তাই এদের ফযীলত ততটুকুই হবে, অন্তরে যতটুকু ব্যাধি থাকবে। যদি অন্তরে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়ার রোগ থাকে, তবে খওফ তার জন্যে উত্তম। আর যদি অন্তরে নৈরাশ্য প্রবল থাকে, তবে রিজা উত্তম। এমনিভাবে যদি কারও উপর গোনাহ প্রবল হয়, তাহলেও খওফ উত্তম। এমনও বলা যায় যে, খওফ সর্বাবস্থায় উত্তম। কেননা, গোনাহ ও বিভ্রান্ত হওয়ার রোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশী। হাঁ, খওফ ও রিজার উৎসের প্রতি লক্ষ্য করলে রিজা উত্তম। কেননা, রিজার উৎস হচ্ছে রহমতের দরিয়া এবং খওফের উৎস গযব ও ক্রোধের দরিয়া। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে কৃপা ও রহমতসূচক গুণাবলীর প্রতি যার লক্ষ্য থাকবে, তার মধ্যে মহব্বত প্রবল হবে, যার পরে আর কোন মকাম নেই। খওফের মধ্যে কঠোরতাসূচক গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য থাকে বিধায় এই মনোযোগে মহব্বত ততটুকু থাকে না, যতটুকু রিজাতে থাকে। এ কারণে রিজা উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে পরহেযগার ব্যক্তি যাহেরী ও বাতেনী গোনাহ ছেড়ে দিয়েছে, তার জন্যে উত্তম হচ্ছে খওফ ও রিজা সমান সমান থাকা। এ কারণেই প্রসিদ্ধ একটি উক্তি বর্ণিত আছে যে, যদি মুমিনের খওফ ও রিজা পরিমাপ করা হয়, তবে উভয়টি সমান হবে। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বৎস! আল্লাহকে এত ভয় কর যে, যদি তুমি তাঁর কাছে ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষের পুণ্য নিয়ে যাও, তবু তিনি সেগুলো কবুল করবেন না। পক্ষান্তরে আশাও এই পরিমাণ কর যে, যদি তুমি তাঁর কাছে সকল মানুষের গোনাহ নিয়ে যাও, তবু তিনি তোমাকে মাফ করে দিবেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা হয় যে, একজন ব্যতীত সকল মানুষ দোযখে যাবে, তবে আমি বলব সেই এক ব্যক্তি আমি হব। পক্ষান্তরে যদি প্রচার করা হয় যে, সকল মানুষ জান্নাতে যাবে কিন্তু শুধু এক ব্যক্তি যাবে না, তবে আমি ভয় করব যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হতে পারি। এটা হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের খওফ ও রিজা।

কিন্তু যদি কোন গোনাহগার ব্যক্তি ধারণা করে যে, যারা দোযখে যাবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে , তবে এটা রিজা নয় বরং তার বিভ্রান্তি। অধিকাংশ লোকের মধ্যে রিজার প্রাবল্য বিভ্রান্তিতে পড়া এবং মারেফত কম হওয়ার পরিচায়ক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে খওফ ও রিজাকে এক সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন ঃ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে।

يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا অর্থাৎ, তারা আমাকে উৎসাহ ও ভীতি সহকারে ডাকে।

কিন্তু হযরত উমরের মত লোক কোথায়, যার খওফ ও রিজা সমান সমান হবে? তাই বর্তমানে যারা আছে, তাদের জন্যে খওফের প্রবলতাই উত্তম— যদি খওফের কারণে নৈরাশ্যে ডুবে না যায়। বলা বাহুল্য, যে খওফ নৈরাশ্যের জন্ম দেয় এবং মানুষ আমল বর্জন করে গোনাহে ডুবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায়, তা খওফ নয়। খওফ তাই, যা আমলে উৎসাহিত করে এবং যাবতীয় কামনা-বাসনা মলিন মনে হতে থাকে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত নিছক খওফের দরুন করে, সে ফিকর ও ভাবনার সমুদ্রে ডুবে যায়। আর যে নিছক রিজার দরুন এবাদত করে, সে বিভ্রান্তির প্রান্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। যদি খওফ, রিজা ও মহব্বত এই তিনটির অধীনে কেউ এবাদত করে, তবে সে সরল ও সঠিক পথে অবস্থান করে। এতে বুঝা যায় যে, এবাদতে এই তিন বিষয়ে সমন্বয় জরুরী। কিন্তু খওফ প্রবল থাকা মৃত্যুর সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত অধিক সঙ্গত। মৃত্যুর সময় অবশ্য রিজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, খওফ আমলে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বেত্রদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত। মৃত্যুর সময় কোন আমল করা মানুষের জন্যে সম্ভব নয়। এ সময় খওফের জরুরী কার্যকলাপ বরদাশত করাও অসম্ভব। এতে আগামী কালের মৃত্যু আজই হয়ে যায়। হাঁ, রিজার দ্বারা অন্তরে শক্তি আসে এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে আসন পাতে। আল্লাহর মহব্বত নিয়ে দুনিয়া থেকে সফর করাই মানুষের জন্যে উপযুক্ত। তাই আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর মহব্বত সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করেন। এ প্রসঙ্গে রসূলে আকরাম (সাঃ) যে দোয়া করতেন, তা করাই আমাদের জন্যে শ্রেয়। তিনি এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে দান কর তোমার মহব্বত এবং তার মহব্বত, যে তোমাকে মহব্বত করে এবং সে আমলের মহব্বত, যা আমাকে তোমার নিকটবর্তী করে। তোমার মহব্বতকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির চেয়েও প্রিয় করে দাও।

সারকথা, মৃত্যুর সময় রিজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, এতে মহব্বত থাকে। মৃত্যুর পূর্বে খওফ উপযুক্ত। কেননা, এর দ্বারা কামনা-বাসনার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আগুন চমৎকাররূপে নির্বাপিত হয় এবং দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। তাই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ

অর্থাৎ, নিজের পালনকর্তা সম্পর্কে সুধারণা ছাড়া তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ আমার কাছে আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বল এবং ওফাত পর্যন্ত অব্যাহত রাখ। আমি আল্লাহর সাথে সুধারণা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই। হযরত সুফিয়ান ছওরী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে নিজের মধ্যে খওফ অনুভব করলে আশার কথা শুনার জন্যে আলেমগণকে চারপাশে একত্রিত করেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা প্রিয় হোক— এটাই এর উদ্দেশ্য। এজন্যেই হযরত দাঊদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী আসে—আমাকে আমার বান্দাদের প্রিয়জন করে দাও। তিনি আরয করলেন ঃ ইলাহী, তা কেমন করে। এরশাদ হল, তাদের কাছে আমার নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণনা কর।

খওফ অর্জন করার উপায় ঃ খওফ তথা ভয়ের দু'টি মকাম রয়েছে— (১) আল্লাহ তা'আলার আযাবকে ভয় করা এবং (২) তাঁর সত্তাকে ভয় করা। দ্বিতীয় প্রকার খওফ তাদের হয়, যারা এলম ও কাশফ তথা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। প্রথম প্রকার খওফ সাধারণ মানুষের হয়, যা কেবল জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস স্থাপন এবং এগুলোকে এবাদত ও নাফরমানীর প্রতিফল বিশ্বাস করার কারণে সৃষ্টি হয়। এই খওফ অনবধানতা ও ঈমানের দুর্বলতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিয়ামতের আতঙ্ক চিন্তা করলে এবং আখেরাতের বিভিন্ন কথা স্মরণ করলে এই অনবধানতা দূরীভূত হয়ে যায়। এছাড়া খওফকারীদেরকে দেখলে এবং তাদের কাছে বসলেও এ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার খওফ অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তাকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে পড়া এবং তাঁর ও বান্দার মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টির আশংকা করা। হযরত যুন্নুন বলেন ঃ বিচ্ছেদের ভয়ের তুলনায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দোযখের ভয় সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতই। এই খওফ আলেমগণের হয়। সেমতে আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহকে তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই ভয় করে।

সাধারণ মুমিনরাও এই ভয়ের কিছু অংশ পায়; কিন্তু তাদের ভয় নিছক তাকলীদ তথা অনুকরণ হয়ে থাকে। যেমন অবুঝ শিশু তার পিতার অনুকরণে সাপকে ভয় করে। এই ভয়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকে না বিধায় এটা দুর্বল হয়ে থাকে এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। তবে যদি ভয়ের কারণসমূহ সর্বদা অনুধাবন করা যায় এবং তদনুযায়ী দীর্ঘদিন এবাদত ও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা হলে খওফ শক্তিশালী হয়।

মোটকথা, যে ব্যক্তি মারেফতে উন্নীত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথ চিনতে সক্ষম হয়, সে আপনা-আপনিই খওফ করতে থাকে। তার জন্যে কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। যেমন কোন ব্যক্তি হিংস্র জন্তুর স্বরূপ জেনে নেয়, এরপর নিজেকে তার নাগালের মধ্যে দেখতে পায়, সে আপনা-আপনিই হিংস্র জন্তুকে ভয় করতে থাকবে। এজন্যে তার কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে না। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন — আমাকে ভয় কর যেমন হিংস্র জন্তুকে ভয় করে থাক। বলা বাহুল্য, হিংস্র জন্তুকে ভয় করার জন্যে তার স্বরূপ জানা এবং তার থাবায় পড়ার অবস্থাটি জানাই যথেষ্ট। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানবে ও চিনবে, সে একথাও জানবে যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। যা ইচ্ছা আদেশ করেন। কোন কিছুর পরওয়া করেন না। তিনি কাউকে ভয় করেন না। এরপর আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকবে না।

যারা আরেফ তথা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী তাদের সবসময় খাতেমা অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়ার ভয় লেগে থাকে। এর কারণ একাধিক, যা অন্তিম মুহূর্তের পূর্বে সংঘটিত হয়। বেদআত, গোনাহ ও নিফাকও এসব কারণের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এসব থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজেকে নিফাক থেকে মুক্ত বলে ধারণা করে, তবে তাও নিফাক। কেননা, প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে— যে নিফাকের ভয় করে না, সে মুনাফিক। জনৈক বুযুর্গ এক আরেফকে বললেন ঃ আমি নিজের জন্যে নিফাকের ভয় করি। আরেফ বললেন ঃ যদি তুমি মুনাফিক হতে, তবে নিফাকের ভয় করতে না। মোটকথা, আরেফের দৃষ্টি সর্বদা অন্তিম মুহূর্তের প্রতি থাকে— তা শুভ হবে, না অশুভ। হাদীস শরীফে আছে—

اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَايَدْرِىْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ فِيْهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقٰى لَايَدْرِىْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَابَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُّسْتَعْتِبٍ وَلَابَعْدَ الدُّنْيَادَارٌ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ۔

অর্থাৎ, মুমিন বান্দা দুটি ভয়ের মাঝখানে অবস্থান করে। এক, অতীত সময়। আল্লাহ তাতে কি করবেন, তা সে জানে না। দুই, অনাগত সময়, যাতে আল্লাহ কি ফয়সালা দেবেন, তা তার জানা নেই। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পর সন্তুষ্টি অর্জনের কোন উপায় নেই এবং দুনিয়ার পরে জান্নাত অথবা দোযখ ছাড়া কোন গৃহ নেই।

মন্দ অন্তিম মুহূর্ত ঃ এখন মন্দ অন্তিম মুহূর্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে। কেননা, যারা আরেফ, তারা অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়ার ভয় বেশী করে থাকে। জানা উচিত যে, অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়া দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ। তা এই যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রকাশ পাওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ অথবা অস্বীকৃতি প্রবল হয়ে যাওয়া এবং তদবস্থায়ই আত্মা নির্গত হওয়া। এ সন্দেহ ও অস্বীকৃতি আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে অন্তরায় ও দূরত্বের কারণ হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকার যা এরচেয়ে লঘু, তা এই যে, মৃত্যুর সময় বান্দার মনে কোন পার্থিব বস্তুর মহব্বত প্রবল হয়ে যাওয়া অথবা কোন পার্থিব কামনা-বাসনা অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলা, যাতে অন্য কোন কিছুর অবকাশ না থাকে। এই আচ্ছন্নতার ফলে বান্দার মুখমন্ডল ও মস্তক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুনিয়ার দিকে ফিরানো থাকবে। যখন মুখমণ্ডল আল্লাহর দিক থেকে ফিরে যাবে, তখন অন্তরায় সৃষ্টি হবে এবং আযাব নাযিল হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার প্রজ্বলিত আগুন কেবল আল্লাহর অন্তরালে অবস্থানকারীদেরকে স্পর্শ করবে। যে ঈমানদারের অন্তর দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত, আগুন তাকে বলবে ঃ হে ঈমানদার! এগিয়ে চল। তোমার নূর আমার শিখাকে নির্বাপিত করে দিয়েছে। মোটকথা, দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হওয়ার সময় আত্মা নির্গত হলে তা আশংকার বিষয়। তবে মূল ঈমান ও খোদায়ী মহব্বত দীর্ঘকাল পর্যন্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় এই দুঃখজনক অবস্থা স্থায়ী হবে না। যদি তার ঈমানের শক্তি মেছকাল পরিমাণও হয়, তবে সত্বরই সে দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। যদি আরও কম হয়, তবে অনেক দিন দোযখে থাকতে হবে। আর যদি ঈমানের শক্তি রতি পরিমাণ হয়, তবে হাজারো বছর পরে হলেও দোযখ থেকে রেহাই পাবে।

যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা প্রশ্ন করতে পারে যে, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, মৃত্যুর পরেই অপরাধীকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে। তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা বিলম্বিত হয় কেন? জওয়াব এই যে, যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা বেদআতী এবং আল্লাহর নূর, কোরআনের নূর ও ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মতে এটাই অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ যে, কবর দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। সহীহ হাদীস থেকেও তাই জানা যায়। সুতরাং যদি মানুষের অন্তিম মুহূর্ত শুভ না হয় এবং হতভাগ্য হয়ে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে, তবে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সে আযাবের পাত্র হয়ে যায় এবং কবর থেকেই আযাব শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সময়ভেদে তার কবরে দোযখের সত্তরটি দরজা খুলে যায়। আযাবের প্রকারও সময়ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কবরে রাখার পর মুনকির-নকীরের সওয়াল হয়, এরপর শাস্তি হয়, এরপর হিসাব-নিকাশের জটিলতা এবং কিয়ামতে সকলের সমক্ষে অপমান ও লাঞ্ছনা হয়।

জানা উচিত যে, অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়ার কারণ দুটি বিষয়ে সীমিত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম এই যে, পূর্ণ সংসার নির্লিপ্ততা ও যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন সত্ত্বেও বেদআতী হওয়া। বেদআতের অর্থ কোন নির্দিষ্ট মাযহাব ও ধর্মমত অনুসরণ করা নয়; বরং বেদআতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সিফাত ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করা নিজের খেয়ালখুশী, অনুমান ও বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে অথবা এমনি ধরনের অন্য কোন ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমে। এরূপ বেদআতী ব্যক্তির যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখন তার সামনে এ সত্য আপনিই উদঘাটিত হয়ে যায় যে, তার পূর্ববর্তী বিশ্বাস নিছক মূর্খতাপ্রসূত ও ভ্রান্ত ছিল। এমতাবস্থায় সে কেবল এই বিশ্বাসটিকেই মিথ্যা মনে করে না, বরং অন্যান্য বাস্তব ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহকেও বাতিল মনে করতে থাকে অথবা সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ করতে থাকে। যদি এ অবস্থায় তার আত্মা নির্গত হয়ে যায়, তবে তার অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হয় এবং সে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপ লোককেই বুঝানো হয়েছে—

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় উদঘাটিত হল, যা তারা ধারণাও করত না।

নিম্নোক্ত আয়াতেও এরূপ লোকদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, আমি কি তোমাদেরকে আমলে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে বলব? আমলে ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করছে।

মোটকথা, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সিফাত ও কর্ম সম্পর্কে নিজের মতামত দ্বারা অথবা অন্যের অনুকরণ দ্বারা কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করে, তারা বেদআতী এবং তাদের জন্যে উপরোক্ত বিপদাশংকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিদ্যমান। এই বিপদাশংকা দূর করার জন্যে সংসার অনাসক্তি ও সৎকর্ম যথেষ্ট নয়; বরং সত্য বিশ্বাস ছাড়া এ থেকে নাজাতের কোন উপায় নেই। সরল ও সাদাসিধে মানুষ, যারা আল্লাহ , রসূল ও আখেরাতে সংক্ষেপে ঈমান রাখে এবং এর উপরই পাকাপোক্ত থাকে— কোনরূপ তর্ক-বিতর্কের ধারে-কাছে যায় না, তারা এই বিপদাশংকা থেকে দূরে রয়েছে। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

অর্থাৎ, অধিকাংশ জান্নাতী সরল ও আত্মভোলা।

এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ আকায়েদ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও খোঁজাখুঁজি করতে নিষেধ করেছেন। তারা সাধারণ মানুষকে একথাই বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব বিষয় নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে যা বুঝে আসে, তাকে সঠিক মনে করতে হবে। কেননা, সিফাত সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ এবং এ পথ খুবই দুর্গম।

অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা এবং সংসার আসক্তির প্রবলতা। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর মহব্বতও দুর্বল হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হয়। এই প্রবলতা এতদূর পৌঁছে যে, অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের জন্যে কোন স্থান থাকে না— মহব্বতের জল্পনা থেকে যায় মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ফলে, অন্তর কাল ও কঠিন হয়ে যায়। এরপর উপর্যুপরি গোনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ও মোহরের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। এই অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে আল্লাহর মহব্বত আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ, তখন মনে হতে থাকে, সর্বাধিক প্রিয় বস্তুর বিরহের সময় বুঝি এসে পড়েছে। এই বিরহের কারণে অন্তর দারুণভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে ধারণা আসে যে, আল্লাহ তা'আলা কেন এই মৃত্যুকে প্রেরণ করলেন? মৃত্যুর আগমন ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যদি ঘটনাক্রমে এই বিদ্বেষ থাকাকালে আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যায়, তবে অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়া নিশ্চিত। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল দেখে, সে এই বিপদাশংকা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক গোনাহের মূল শিকড়। এটাই দুরারোগ্য ব্যাধি। সকল মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। কারণ, তারা আল্লাহকে কম চিনে। চিনলে অবশ্যই মহব্বত করত। যে চিনে, সে তাকে মহব্বত করে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ -

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, উপার্জিত ধন-সম্পদ,ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পছন্দসই বাসভবন আল্লাহ, রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা কর।

মোটকথা, স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের মত প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দেয়া মৃত্যু খারাপ মনে হতে থাকে এবং তদবস্থায় তার আত্মা নির্গত হয়ে যায়, সে সেই পলাতক গোলামের মত, যে তার প্রভুর প্রতি বিদ্বেষবশত পলায়ন করে, এরপর জোরজবর দস্তি গ্রেফতার হয়ে প্রভুর সামনে আনীত হয়। প্রভুর হাতে এই গোলামের যে ভীষণ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে,তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মৃত্যু আল্লাহর মহব্বতের উপর হয়, সে সেই অনুগত গোলামের মত আল্লাহর সামনে আসে, যে পরম আগ্রহ সহকারে প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও সফরের বিপদাপদ সহ্য করে প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়। এই গোলাম দরবারে পৌঁছা মাত্রই যে আদর-যত্ন ও আপ্যায়ন লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের খওফ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি দাঁড়িয়ে কক্ষের মধ্যে সূরা-কেরাত পাঠ করতে শুরু করতেন এবং ভেতরে ও বাইরে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়েই তা করতেন। একবার সূরা হাক্কার একটি আয়াত পাঠ করে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আরেক বার জিবরাঈলের আকৃতি দেখার পর তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায়। বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর বক্ষে ডেগচির স্ফুটনের ন্যায় শব্দ শুনা যেত। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—আমার কাছে জিবরাঈল যখনই আগমন করতেন, প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন। বর্ণিত আছে, যখন শয়তান বিতাড়িত হল, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল ও মীকাঈল ক্রন্দন শুরু করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা কাঁদছ কেন? তারা আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমরা আপনার পাকড়াও থেকে শংকামুক্ত নই। আদেশ হল ঃ তোমরা এমনিই থাক। অর্থাৎ আমার পাকড়াও থেকে শংকামুক্ত থেকো না।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রেওয়ায়েত করেন—যখন দোযখ সৃষ্টি হল, তখন ভয়ে ফেরেশতাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বনী আদম সৃজিত হলে তাদের মন স্থির হল। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, আমি মীকাঈল (আঃ)-কে কখনও হাসতে দেখি না কেন! তিনি বললেন ঃ দোযখ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তিনি হাসেন না। আরও বর্ণিত আছে—আল্লাহ তা'আলার কিছুসংখ্যক ফেরেশতা আগুন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই ভয়ে হাসেন না যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হয়ে আগুনের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বাইরে বের হলে তিনি জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন এবং খোরমা খেতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি খাচ্ছ না কেন? আমি আরয করলাম ঃ আমার খোরমা খাওয়ার ক্ষুধা নেই। তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ আমার ক্ষুধা আছে। আমার খাদ্য গ্রহণ না করার আজ চতুর্থ দিন। এ কয়দিন আমি খাদ্য পাইনি। আমি পরওয়ারদেগারের কাছে চাইলে তিনি আমাকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দান করে দিতেন। হে ইবনে উমর, যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে থাকবে, যারা বছরের খোরাক সঞ্চয় করে রাখবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? তাদের একীন খুব দুর্বল হবে। ইবনে উমর বলেন ঃ আমরা বাগানেই ছিলাম, এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

অর্থাৎ, অনেক জন্তু রয়েছে, যারা তাদের রুযী সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রুযী দান করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ শোষণ করার এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করার হুকুম দেননি। যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী জীবনের উদ্দেশ্যে দীনার সঞ্চিত রাখে, তার জীবন আল্লাহর হাতেই। সাবধান, দীনার ও দেরহাম জমা করে রেখো না এবং আগামীকালের জন্যে জীবনোপকরণ সঞ্চয় করো না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর অন্তরের স্ফুটন এক ক্রোশ দূর থেকে শুনা যেত। হযরত মোজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ হযরত দাঊদ (আঃ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেজদায় পড়ে ক্রন্দন করলেন এবং মাথা তুললেন না। ফলে, তার চোখের পানিতে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠল এবং তাতে তার মস্তক আবৃত হয়ে গেল। গায়েবী আওয়াজ হল, হে দাঊদ, তুমি ক্ষুধার্ত হলে খাওয়া দরকার এবং তৃষ্ণার্ত হলে পানি পান করা উচিত। বস্ত্রহীন হলে বস্ত্রপ্রাপ্ত হবে। হযরত দাঊদ সজোরে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ভয়ের উত্তাপে কাঠ জ্বলে গেল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে তওবা ও মাগফেরাত নাযিল করলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমার গোনাহ আমার হাতে সমর্পণ কর। তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের তালুতে তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহ লিখে দেয়া হল। তিনি যখন পানাহার করতেন অথবা কোন উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেন, তখন এ গোনাহ দেখে ক্রন্দন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তার সামনে পানির পেয়ালা এক-তৃতীয়াংশ খালি পেশ করা হত। তিনি যখন নিজের গোনাহ দেখতেন, তখন পেয়ালা ঠোঁটের সাথে মিলানো পর্যন্ত অশ্রুতে তা ভরে যেত।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে খওফের প্রাবল্য ঃ বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন একটি পাখী দেখে তাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ হায়, আমিও যদি তোমার মত পাখী হতাম। মানুষ না হতাম! হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম এবং কেউ তা কেটে ফেলত! হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত না হওয়া আমার কাছে খুব ভাল মনে হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া আমার কাছে ভাল মনে হয়।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) যখন কোরআন পাকের কোন আয়াত শুনতেন, তখন ভয়ের আতিশয্যে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁকে দেখার জন্যে লোকজন আসা-যাওয়া করত। একদিন তিনি মাটি থেকে একটি কুটা হাতে তুলে বললেন। চমৎকার হত যদি আমি কুটা হতাম এবং কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু না হতাম। হায়, আমি যদি বিস্মৃত হয়ে যেতাম! হায়, আমার জননী যদি আমাকে প্রসব না করতেন। তাঁর মুখমন্ডলে অশ্রুর দুটি কাল রেখা ছিল। তিনি বলতেন, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করে না। যে তাকওয়া অবলম্বন করে, সে খেয়ালখুশী অনুযায়ী কথা বলে না। কিয়ামত না হলে আমরা অন্য কিছুর নমুনা দেখতাম। একদিন তিনি এক ব্যক্তির ঘরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। সে নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিল। তিনি দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। যখন সে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (আল্লাহর আযাব অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তাকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।) পাঠ করল, তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর বাড়ী চলে এলেন এবং মাসাধিক কাল অসুস্থ রইলেন। লোকজন তাকে দেখতে আসত কিন্তু কেউ জানত না, তার অসুখটা কি?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আলী (রাঃ) একদিন ফজরের নামাযের পর বিষণ্ণ মনে বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহচরগণকে দেখেছি। কিন্তু আজ তাদের মত কোনকিছু দেখি না। বিক্ষিপ্ত কেশ ও ধূলি-ধূসরিত থাকাই তাদের নিয়ম ছিল। তাদের দু'চোখের মাঝখানে সেজদার দাগ পড়ে গিয়েছিল। তারা রাতের বেলায় সেজদা করতেন। নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন পাঠ করতেন এবং এবাদতে কপাল ও পদযুগলের উপর পালাক্রমে ভর দিতেন। যখন সকাল হত, তখন প্রবল বাতাসে যেমন বৃক্ষ নড়াচড়া করে, তেমনি তারা কাঁপতেন। চোখের পানিতে তাদের পরিধেয় বস্ত্র ভিজে যেত। কিন্তু আজকাল আমি এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করছি, যারা রাতের বেলায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন থাকে।

এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ ছাইভস্ম হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাওয়াকে আমি ভাল মনে করি। হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ বলেন ঃ আমি যদি ভেড়া হতাম এবং আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে যবাহ করে খেয়ে ফেলত, তবে তাই ভাল ছিল। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন যখন উযু করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হয়ে যেত। পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করত, উযু করার সময় আপনার এ অবস্থা হয় কেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা জান আমি কার সামনে দাঁড়াতে চাই?

মূসা ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমরা যখন সুফিয়ান ছওরীর কাছে বসতাম, তখন তাঁর ভয় দেখে মনে হত আগুন যেন চারদিক থেকে আমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। মেসওয়ার ইবনে মাখরামা ভয়ের আতিশয্যে কোরআন পাক মোটেই শুনতে পারতেন না। কেউ এক হরফ অথবা এক আয়াত পাঠ করলে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠতেন এবং কয়েক দিন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত না। একদিন খশম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি আয়াত পাঠ করল—

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ
اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا .

অর্থাৎ, যে দিন আমি মুত্তাকীদেরকে রহমানের কাছে সমবেত করব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং হাঁকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায়।

আয়াতটি শুনে মেসওয়ার বললেন ঃ আমি তো অপরাধীদের একজন—মুত্তাকী নই কারী সাহেব, আবার পড়ুন তো! পুনরায় পাঠ করা হলে তিনি সজোরে চিৎকার করে আখেরাতের পথিক হয়ে গেলেন (মৃত্যুবরণ করলেন)। ক্রন্দনকারী এয়াহইয়ার সামনে কেউ এ আয়াতটি পাঠ করল—

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, তাদের পালনকর্তার সামনে তাদের দণ্ডায়মান করানোর দৃশ্যটি যদি আপনি দেখতেন!

আয়াতটি পাঠ করলে তিনি এমন এক চিৎকার দিলেন, যার ফলে দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। বসরার আশপাশ থেকেও লোকজন এসে তাঁকে দেখে গেল।

মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি কা'বা গৃহের তওয়াফ করছিলাম, এমন সময় দেখি এক যুবতী কা'বার গেলাফ ধরে বলে যাচ্ছে—ইলাহী! অনেক কামনার আনন্দ বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু আযাব বাকী রয়ে গেছে। ইলাহী! তোমার কাছে দোযখ ছাড়া কি অন্য কোন শাস্তি নেই? মহিলাটি একথা বলে কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। আমি এ অবস্থা দেখে নিজের কথা ভেবে চিৎকার করে উঠলাম।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খওফকারীর স্বরূপ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ যার অন্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন এবং চক্ষু কান্নারত, সেই খওফকারী।

হযরত হাসান বসরী এক হাসিতে নিমজ্জিত যুবকের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাকে বললেন ঃ তুমি পুলসিরাত অতিক্রম করেছ? যুবক বলল ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি জান্নাতে যাবে, না দোযখে— এটা তোমার জানা আছে কি? সে আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে এ হাসি কেন? রাবী বলেন ঃ এরপর থেকে এ যুবককে কেউ হাসতে দেখেনি।

হাম্মাদ যখনই বসতেন, এমনভাবে বসতেন যেন অর্ধেক দাঁড়ানো।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেউ তাকে শান্তভাবে বসতে বললে তিনি বলতেন ঃ ভয়শূন্য ব্যক্তি শান্তভাবে বসে। আমি ভয়শূন্য নই। কারণ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছি।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে গাফলতে ফেলে রেখেছেন। এটাও রহমত বটে। নতুবা আল্লাহর ভয়ে সকলেই মারা যেত।

মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছি মৃত্যুর সময় মানুষকে বলব— তোমরা আমাকে বেড়ী পরিয়ে শৃঙ্খলিত করে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে, যেমন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাতেম আসাম বলেন ঃ কোন মনোরম বাসগৃহের জন্যে পাগল হয়ো না। কেননা, জান্নাতের চেয়ে অধিক মনোরম কোন স্থান নেই। কিন্তু আদমের অবস্থা তাতে যা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধিক এবাদতের জন্যে উতালা হয়ো না। কারণ, অধিক এবাদতের পর ইবলীসের অবস্থা সকলেরই জানা। অধিক জ্ঞানের জন্যে গর্বিত হয়ো না। কারণ, বালআম ইসমে আযমের জ্ঞান রাখত। কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছে? সৎকর্মপরায়ণদের সাথে সাক্ষাতের জন্যেও অধীর হয়ো না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর চেয়ে বেশী সৎকর্মপরায়ণ কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ কোন কোন আত্মীয় ও শত্রুর জন্যে মোটেই কল্যাণকর হয়নি।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযীর জননী তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে জানি। তুমি শৈশবেও পূত-পবিত্র ছিলে এবং বড় হয়েও ভালই আছ। কিন্তু তুমি দিবারাত্র এবাদতই করে যাচ্ছ। এ কাজটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর হতে পারে। এত পরিশ্রম করার তোমার দরকার কি? তিনি বললেন ঃ হে স্নেহময়ী জননী, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কোন গোনাহ করতে দেখে নেন, অতঃপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলেন— আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, তবে এ আশংকা থেকে নির্ভয় হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ কোন প্রেরিত পয়গম্বর, নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং সাধু ব্যক্তির প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নেই। কেননা, কিয়ামতের দিন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের কোন শাস্তি হবে না। আমার ঈর্ষা কেবল সে ব্যক্তির প্রতি, যে জন্মগ্রহণই করেনি।

বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারী যুবক দোযখের ভয়ে সর্বক্ষণ কাঁদত। এমনকি কান্নার কারণে সে ঘর থেকেও বের হত না! রসূলে করীম (সাঃ) একদিন তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরলেন! আনসারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে মাটিতে পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। দোযখের ভয় তাঁর কলিজাকে খন্ড-বিখন্ড করে দিয়েছে।

ইবনে আবী মায়সারা শয্যা গ্রহণের পূর্বক্ষণে বলতেন ঃ হায়, আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করত। তার মা একদিন বললেন ঃ হে মায়সারা, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তুমি মুসলমান। অতএব, এত ভয় করছ কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমরা সবাই দোযখে যাব। দোযখ থেকে বের হওয়ার কথা তিনি বলেননি। এটাই ভয়ের কারণ।

হযরত আতায়ে সলমীও খওফকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কখনও জান্নাতের প্রার্থনা করতেন না—কেবল ক্ষমার আবেদন করতেন। রুগ্নাবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনার মন কি চায়? তিনি বললেন ঃ দোযখের ভয় আমার মনে কোন কিছু চাওয়ার জায়গা রাখেনি। কথিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর যাবত কখনও আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাননি এবং এ সময়ে কখনও হাসেননি। একদিন আকাশের দিকে মাথা তুললে ভয়ে ভূতলশায়ী হলেন এবং তাঁর নাড়িভুঁড়ি ফেটে গেল। তিনি রাতের বেলায় নিয়মিত নিজ দেহে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিতেন, কোথাও বিকৃত হয়ে যায়নি তো! যখন ধূলিঝড় শুরু হত অথবা বজ্রপাত হত অথবা খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে যেত, তখন বলতেন ঃ এসব বিপদাপদ আমারই কারণে। আমি মারা গেলে মানুষ সুখ পাবে। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন—একদিন আমরা উতবা নামক গোলামের সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন যুবক ও প্রৌঢ় ছিল, যারা এশার উযু দ্বারা ফজরের নামায পড়ত। অধিক নামাযের কারণে তাদের পা ফুলে গিয়েছিল, চক্ষু কোটরাগত ছিল এবং ত্বক হাতের সাথে লেগে গিয়েছিল। তাদেরকে দেখলে মনে হত যেন কবর থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা বলত ঃ আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা এবাদতকারীদেরকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং নাফরমানদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা এসব কথা বলাবলি করতে করতে এগুচ্ছিল এমন সময় এক জায়গায় পৌছে তাদের একজন বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তাঁর চারপাশে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল। কন্‌কনে শীত ছিল। কিন্তু তাঁর কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল। তাঁর চোখে-মুখে পানির ছিটা দেয়া হলে জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গীরা ব্যাপার জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এখানে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছিলাম। এ জায়গা দেখতেই স্মৃতি জাগ্রত হয়ে গেল এবং আমি ভয়ে সংজ্ঞা হারালাম।

সালেহ মুররী বলেন ঃ আমি জনৈক দরবেশের সামনে এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَ -

অর্থাৎ, যেদিন আমি তাদের মুখমণ্ডলকে জাহান্নামে ওলট-পালট করব, তারা বলবে, হায় আমাদের আফসোস! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম!

এতটুকু শুনেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে বলল ঃ হে সালেহ, আর কিছু পাঠ কর। আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি পাঠ করলাম ঃ

إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيْدُوا فِيْهَا

অর্থাৎ, যখন তারা দোযখ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এতটুকু শুনে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যুরারা ইবনে আবী আওফা ফজরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ (অর্থাৎ, যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে) পাঠ করলেন, তখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইয়াযীদ রাককাশী হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ ইয়াযীদ, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, মৃত্যুবরণকারী খলীফাগণের মধ্যে আপনি প্রথম খলীফা হবেন না। অর্থাৎ, আপনার পূর্বে অনেক খলীফা মৃত্যুবরণ করেছেন। খলীফা কেঁদে বললেন ঃ আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনার ও হযরত আদম (আঃ)-এর মাঝখানে এমন কোন মহৎ ব্যক্তি নেই, যে মৃত্যুবরণ করেনি। খলীফা কাঁদলেন এবং বললেনঃ আরও বলুন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনার এবং জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে কোন মনযিল নেই। একথা শুনে খলীফা সংজ্ঞা হারালেন।

মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন ঃ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলেরই প্রতিশ্রুতি।

এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) চিৎকার করে উঠেন এবং মাথায় হাত রেখে বাইরে বের হয়ে যান। এরপর তিন দিন পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

হযরত দাউদ তায়ী জনৈকা মহিলাকে দেখলেন, সে তার পুত্রের কবরে বসে কেঁদে বলছিল, বৎস, জানি না তোমার কোন্ গালকে সর্ব প্রথম পোকা খেয়েছে। দাউদ একথা শুনেই সেই স্থানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

আম্বরী বর্ণনা করেন, একবার হাদীসবিদগণ হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়াসের দরজায় সমবেত হলেন। তিনি এক জানালা পথে তাদের দিকে মাথা বের করলেন। কাঁদার দরুন তাঁর দাড়ি নড়াচড়া করছিল। তিনি বললেন ঃ ভাইসব, কোরআনের উপর সর্বক্ষণ আমল কর এবং নামায যথারীতি কায়েম কর। এটা হাদীসের সময় নয়; বরং মিনতি, অসহায়তা ও ডুবন্ত ব্যক্তির অনুরূপ দোয়া করার সময়। এ যুগে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জিহ্বার হেফাযত করা, নিজের ভেদ প্রকাশ না করা এবং অন্তরের চিকিৎসা করা। জানা বিষয়কে কর্মপন্থা করবে এবং অজানা বিষয়কে বর্জন করবে। একবার তিনি খওফের কারণে উদভ্রান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ জানি না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যুর ইবনে উমর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, অন্যরা কিছু বললে কেউ কাঁদে না; কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন, তখন চারদিক থেকে কান্নার আওয়াজ শুনি! পিতা বললেন ঃ যে মহিলার সন্তান মারা যায়, তার কান্না এবং যে মহিলা পারিশ্রমিক নিয়ে কাঁদে—উভয়ের কান্নায় তফাৎ অবশ্যই হবে। উদ্দেশ্য এই যে, খওফের কান্না অন্তরে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

সালেহ মুররী বলেন ঃ একবার ইবনুস সাম্মাক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে আপনার সম্প্রদায়ের আবেদদের কিছু অবস্থা দেখান। আমি তাকে এক মহল্লায় কুঁড়েঘরে বসবাসকারী এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা তার কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে তখন মাদুর তৈরীতে ব্যস্ত ছিল। আমি তার সামনে এ আয়াতটি পাঠ করলাম —

اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ -

অর্থাৎ, যখন তাদের ঘাড়ে থাকবে বেড়ী এবং তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

আয়াতখানি শুনে লোকটি চিৎকার করে বেহুশ হয়ে গেল। আমরা তাকে তদবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমরা দ্বিতীয় এক ব্যক্তির বাড়ীতে গেলাম এবং তার সামনে একই আয়াত পাঠ করলাম। সেও চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেখান থেকে আমরা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে বললঃ চলে আসুন; কিন্তু আমাকে আমার পরওয়ারদেগার থেকে ফিরাতে পারবেন না। আমি পাঠ করলাম ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ

অর্থাৎ, এটা তার জন্যে, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার শাস্তিবাণীকে!

সে এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল যে, তার নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লাগল। এ রক্তের মধ্যেই সে ছটফট করছিল। অবশেষে রক্ত শুকিয়ে গেল। আমরা তাকেও এমনি অবস্থায় রেখে চলে এলাম।

এভাবে আমি ইবনুস সাম্মাককে ছয় ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুরিয়ে আনলাম এবং প্রত্যেককেই বেহুশ অবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে সপ্তম ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে অনুমতি দিল। আমরা দেখলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধ জায়নামাযে বসে আছে। আমরা সালাম বললে সে টের পেল না। আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম ঃ খবরদার, আগামীকাল মানুষকে দাঁড়াতে হবে। বৃদ্ধ বলল ঃ হতভাগা, কার সামনে? একথা বলার পর সে হতভম্ব হয়ে রইল। তার মুখ খোলা এবং দৃষ্টি উপরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সে নিচু স্বরে "উহ্" "উহ্" বলতে শুরু করল। অবশেষে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তার স্ত্রী বলল ঃ এখন আপনারা তার কাছ থেকে চলে যান। কেননা, এখন তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যাবে না। তার অবস্থা বদলে গেছে। কিছুদিন পর আমি সেখানকার লোকদের কাছে এ সাত ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তাদের তিনজন সুস্থ হয়ে গেছে এবং তিনজন মারা গেছে। আর বৃদ্ধ তিন দিন পর্যন্ত তেমনি হতভম্ব ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রয়েছে। এ সময়ে সে ফরয নামাযও পড়ত না। তিন দিন পর সে জ্ঞান ফিরে পেল।

বর্ণিত আছে, ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদকে মানুষ আবদালের মধ্যে গণ্য করত। তিনি এ মর্মে কসম খান যে, জীবনে কখনও হাসবেন না এবং কখনও বিছানায় শুয়ে ঘুমাবেন না। কখনও ঘৃতপক্ক খাদ্য খাবেন না। তিনি আমৃত্যু এ কসম পূর্ণ করেন। একবার হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জুবায়েরকে প্রশ্ন করলেন ঃ আমি শুনেছি আপনি কখনও হাসেন না। এটা কি ঠিক? তিনি বললেন ঃ দোযখ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ী তৈরি আছে এবং দোযখের ফেরেশতারাও তৎপর রয়েছে। এমতাবস্থায় হাসার কোন উপায় আছে কি?

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবু সাঈদ! আপনার সকাল কেমন কেটেছে? তিনি বললেনঃ ভালই। লোকটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলল ঃ আপনার অবস্থা কি? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার অবস্থা জানতে চাও? আচ্ছা বলত, যদি কিছু লোক নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রের মাঝে পৌঁছায়। এরপর নৌকা ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়ে যায় এবং আরোহীদের প্রত্যেকেই এক একটি তক্তা জড়িয়ে ধরে ভাসতে থাকে, তবে তোমার চিন্তায় তাদের অবস্থা কেমন হবে? লোকটি বলল ঃ তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে সংকটাপন্ন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তাদের চেয়েও ভয়ানক।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের এক বাঁদী তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করল। অতঃপর গৃহ সংলগ্ন মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ে নিদ্রা প্রবল হওয়ায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে স্বপ্নে কান্নাকাটি করল। নিদ্রাভঙ্গের পর হযরত উমরের খেদমতে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? বাঁদী বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমি দেখলাম, দোযখ দোযখীদের জন্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরপর পুলসিরাত এনে তার পৃষ্ঠে স্থাপন করা হল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি হল? সে বলল ঃ এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে আনা হল এবং পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হল। সে কিছুদূর এগুতেই পুল উল্টে গেল এবং আবদুল মালেক দোযখে পড়ে গেল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি দেখলে? বাঁদী বলল ঃ এরপর আবদুল মালেকের পুত্র ওলীদকে আনা হল। সেও কিছুদূর এগুতেই পুল কাত হয়ে গেল এবং সে দোযখে পতিত হল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি হল? সে বলল ঃ ওলীদের পর সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেককে এনে পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হল। সে-ও কিছুদূর যেতেই পুল আড়াআড়ি হয়ে গেল এবং সে দোযখে পড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরপর কি দেখলে? বাঁদী বলল ঃ এরপর আপনাকে আনা হল। এতটুকু বলতেই খলীফা সজোরে এক চিৎকার মেরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাঁদী উঠল এবং তাঁর কানে জোরে জোরে বলতে লাগল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি আপনি বেঁচে গেছেন। আপনি মুক্তি পেয়েছেন। বাঁদী যতই তাঁর কানে চিৎকার করে বলে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি বরাবর হাত-পা ছুঁড়ে মারছিলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনের খওফ ততক্ষণ দূর হয় না, যতক্ষণ সে দোযখের পুলকে পেছনে না ফেলে দেয়।

হযরত তাউস (রহঃ)-এর জন্যে বিছানা পাতা হলে তিনি তাতে উত্তপ্ত কড়াইয়ের দানার মত এদিক-ওদিক গড়াগড়ি করতেন। এরপর লাফিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং সকাল পর্যন্ত কেবলার দিকে মুখ করে থাকতেন। তিনি বলতেন ঃ দোযখের বর্ণনা খওফকারীদের নিদ্রা ছিনিয়ে নিয়েছে।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ দোযখ থেকে এক ব্যক্তি এক হাজার বছর পরে মুক্তি পাবে। আমিই সে ব্যক্তি হলে তা হবে আমার সৌভাগ্য। এরূপ বলার কারণ, তিনি অনন্তকাল দোযখবাসের এবং অন্তিমকাল মন্দ হওয়ার ভয় করতেন। কথিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর হাসেননি। রাবী বলেন ঃ আমি যখন তাকে উপবিষ্ট দেখতাম, তখন মনে হত যেন তিনি কয়েদী এবং ঘাড় মটকে দেয়ার জন্যে ধরা পড়েছেন। তিনি ওয়ায করলে মনে হত যেন আখেরাতকে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মত তার অবস্থা বর্ণনা করছেন।

ইউনুস সাম্মাক বর্ণনা করেন—আমি এক মজলিসে ওয়ায করলাম। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল ঃ আজ আপনি ওয়াযে এমন একটি বাক্য বলেছেন, যার পর অন্য কিছু না শুনলেও আমাদের পরওয়া ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ বাক্যটি কি? সে বলল ঃ আপনি বলেছেন, অনন্তকাল জান্নাতবাস অথবা অনন্তকাল দোযখবাস খওফকারীদের অন্তর দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। ইউনুস সাম্মাক বলেন ঃ অতঃপর যুবক চলে গেল। দ্বিতীয় ওয়াযে আমি তাকে অনুপস্থিত দেখে লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। জানা গেল, সে অসুস্থ। আমি তাকে দেখতে গেলাম এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে জওয়াব দিল ঃ হে আবুল আব্বাস, আপনার সে বাক্যের প্রতিক্রিয়াতেই এ অসুস্থতা। এরপর যুবক এ রোগেই মারা গেল। আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? সে বলল ঃ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আপনার বাক্যের দৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সারকথা, পয়গম্বর, ওলী, আলেম ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যখন এতটা খওফ করেছেন, তখন আমাদের খওফ করা আরও বেশী উচিত। এটা জরুরী নয় যে, গোনাহ বেশী হলেই কেবল খওফ করতে হবে; বরং অন্তর পরিষ্কার এবং মারেফত পুরোপুরি হলেও খওফ করাই বাঞ্ছনীয়। অধিক এবাদত ও গোনাহের স্বল্পতা ভয়হীনতা দাবী করে না; বরং ভয়হীনতার কারণ হচ্ছে কামনা-বাসনার আনুগত্য, দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য এবং অন্তর গাফেল ও কঠোর হওয়ার কারণে নিজের অবস্থা দেখার ব্যাপারে অক্ষমতা। এমন ভয়হীন ব্যক্তি মৃত্যু কাছে এলেও জাগ্রত হয় না, অধিক গোনাহ করেও কম্পিত হয় না এবং মন্দ পরিণামের আশংকাকেও অন্তরে স্থান দেয় না। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলাই নিজ কৃপায় তার অবস্থা শুধরে দেন, তবেই তা সম্ভব। তাই এর জন্যে দোয়া ও কর্মতৎপরতা আবশ্যক। কারণ, শুধু মৌখিক দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যখন দুনিয়াতে ধনী হওয়ার অভিলাষী হই, তখন এর জন্যে কত জরুরী কাজকর্ম সম্পন্ন করি, ক্ষেতে হাল চাষ করি, বীজ বপন করি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের মোকাবিলা করি। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন উচ্চ ডিগ্রী লাভ করতে চাইলে এর জন্যে কত কঠোর সাধনা করি। পড়াশুনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেই। জীবিকার অন্বেষণে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্টই না স্বীকার করি। আল্লাহ তা'আলা রুযীর ওয়াদা দিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকি না। বসে বসে আল্লাহর কাছে আরয করি না যে— ইলাহী! আমাকে রুযী দাও। কিন্তু যখন অনন্ত, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করি, তখন তার জন্যে কেবল মুখে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, ইলাহী! ক্ষমা কর—ইলাহী রহম কর। এর জন্যে যে কঠোর সাধনা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন, সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করি না। অথচ যে সত্তার কাছে আমরা আশাবাদী এবং যার নামে আমরা ধোকায় পড়ে আছি, তিনি নিজে এরশাদ করেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى

অর্থাৎ, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রতারক শয়তান যেন আল্লাহর নামে ধোকা না দেয়।

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ, হে মানব, তোমাকে তোমার করুণাময় প্রভুর ব্যাপারে কিসে ধোকায় ফেলে রেখেছে?

এসব উক্তির যে কোন একটি আমাদেরকে আমাদের বিভ্রান্তি ও মিথ্যা আশা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের তওবা কবুল করেন এবং তওবার আগ্রহ আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রোথিত করে দেন। আমরা যেন কেবল মৌখিক তওবা করে ক্ষান্ত না হই। অন্যথায় আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা কথা বলে—কাজ করে না, কানে শুনে—মেনে চলে না এবং ওয়ায শুনে কাঁদে, কাজের সময় গা বাঁচিয়ে চলে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম অধ্যায়

ফক্‌র ও যুহ্‌দ

(দারিদ্র্য ও সংসারবিমুখতা)

দুনিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দুশমন। এর ছলনায় অনেক মানুষ বিপথগামী হয়েছে এবং এর প্রবঞ্চনায় অনেক সাধক সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। দুনিয়ার মোহ যাবতীয় পাপ ও মন্দ কর্মের মূল এবং এর প্রতি বিমুখতা যাবতীয় এবাদত ও আনুগত্যের ভিত্তি। আমরা দুনিয়াপ্রীতির নিন্দা সম্পর্কে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে দুনিয়া থেকে বিরত থাকা এবং তার প্রতি বিমুখতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কেননা, উদ্ধারকারী বিষয়সমূহের মধ্যে এটাই মূল।

দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে মুক্তির আশা করা যায় না। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় দুটি। এক, দুনিয়ার স্বয়ং মানুষের কাছ থেকে আলাদা থাকা, যার নাম "ফক্‌র" তথা দারিদ্র্য এবং দুই, মানুষের দুনিয়া থেকে দূরে অবস্থান করা, যাকে বলা হয় "যুহ্‌দ" তথা সংসারবিমুখতা।

সৌভাগ্য অর্জন এবং সাফল্য ও মুক্তি লাভে সহায়তার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের প্রভাব রয়েছে। তাই আমরা এতদুভয়ের স্বরূপ, স্তর, শর্ত ও বিধি-বিধান দুটি পৃথক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্যের স্বরূপ ও ফযীলত

প্রয়োজনীয় বস্তু না থাকার নাম দারিদ্র্য। অপ্রয়োজনীয় বস্তু না থাকাকে দারিদ্র্য বলা হয় না। প্রয়োজনীয় বস্তু বিদ্যমান থাকলে এবং তা মানুষের আয়ত্তে থাকলে সে মানুষকে "ফকীর" তথা দরিদ্র বলা হবে না। একথা জানার পর সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছু বিদ্যমান সবই দরিদ্র। কেননা, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যমান বস্তুর নিরন্তর বিদ্যমানতা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার ফল। এই অনুগ্রহ না হলে সে পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হতে পারে না। অতএব, অস্তিত্বের যবনিকায় যদি এমন কেউ থাকে, যার পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হওয়া কারও অনুগ্রহ ও কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে সে হবে সর্বাবস্থায় ধনী। বলা বাহুল্য, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া এরূপ কোন বিদ্যমান বস্তু নেই— হতে পারে না। সুতরাং অস্তিত্বে ধনী একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত যা কিছু রয়েছে, সবই ফকীর। এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ পাকের এই উক্তিতে وَاللّٰهُ غَنِيٌّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহই সকল সম্পদের মালিক আর তোমরা তার মুখাপেক্ষী। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ ও সম্যক ফক্‌রের তাৎপর্য।

কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্য মানুষের ধন-সম্পদের "ফক্‌র" ও দারিদ্র্য বর্ণনা করা। কারণ, মানুষের প্রয়োজন অসংখ্য ও অগণিত। তন্মধ্যে কতক প্রয়োজন ধন-সম্পদ দ্বারা পূরণ হতে পারে। তাই আমরা এটা বিবৃত করতে চাই। বলা বাহুল্য, যার কাছে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ নেই, তাকে এই ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করে ফকীর ও দরিদ্র বলা হয়। ফকীরের অবস্থা পাঁচ প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম অবস্থা, কারও কাছে ধন-সম্পদ এলে সে তাকে মন্দ বিবেচনায় মনে যন্ত্রণা অনুভব করে, গ্রহণ করা থেকে পলায়ন করে এবং তার অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এরূপ ব্যক্তিকে "যাহেদ" তথা সংসারবিমুখ বলা হয়। এ অবস্থাটি সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় অবস্থা ধন-সম্পদের বাসনা এত প্রবল থাকে না যাতে অর্জিত হলে আনন্দিত হবে এবং এমন ঘৃণাও থাকে না যাতে যন্ত্রণা অনুভব করবে কিংবা পাওয়া গেলে বর্জন করবে। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা "রাযী" তথা তুষ্ট বলে থাকি।

তৃতীয় অবস্থা, ধন-সম্পদ থাকা না থাকার তুলনায় পছন্দনীয়। তাই ধন-সম্পদের বাসনা থাকে। কিন্তু এমন নয় যে, তা লাভ করার জন্য কর্মতৎপর হবে এবং বিনা কায়ক্লেশে পাওয়া গেলে আনন্দিত হয়। এরূপ ব্যক্তিকে "কানে" তথা অল্পে তুষ্ট বলা হয়। কেননা, সে যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে অর্জন থেকে বিরত থাকে।

চতুর্থ অবস্থা, অক্ষমতার কারণে ধন উপার্জন থেকে বিরত থাকে; নতুবা বাসনা এত বেশী যে, উপার্জনের পথ পেলে পরিশ্রম সহকারে হলেও উপার্জনে মত্ত হবে। এরূপ ব্যক্তিকে "হারীছ" তথা লোভী বলা হয়।

পঞ্চম অবস্থা, যে ধন তার কাছে নেই, সেই ধনের ব্যাপারে নিঃসহায় হওয়া; যেমন ক্ষুধাতুরের কাছে অন্ন না থাকা এবং বস্ত্রহীনদের কাছে বস্ত্র না থাকা। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা 'মুযতর' তথা নিঃসহায় বলে থাকি, উপার্জনের ক্ষেত্রে তার আগ্রহ দুর্বল হোক অথবা প্রবল। এ অবস্থাটি খুব কম দোষমুক্ত।

উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থার মধ্যে যুহ্দ উত্তম। এগুলোর উপরে আরও একটি অবস্থা আছে, যা যুহ্দের চেয়েও উত্তম। তাতে ধন-সম্পদ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান হয়। ফলে, ধন এলেও আনন্দ হয় না এবং গেলেও দুঃখ হয় না। হযরত আয়েশার (রাঃ) অবস্থা এমনি ছিল। তাঁর কাছে দান ও উপঢৌকনের কোন দেরহাম আগমন করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং সেদিনই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর পরিচারিকা আরয করল ঃ আজকের দেরহাম থেকে যদি আপনি এক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেরহামের গোশত আনিয়ে নিতেন, তবে তা দ্বারা ইফতার করা যেত। তিনি বললেন ঃ আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তাই করতাম। সুতরাং যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ, জগত সংসারের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তার হাতে থাকলেও তাতে তার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, সে সমস্ত ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার মনে করে—নিজের নয়। এ জন্যেই ধন-সম্পদ তার হাতে থাকুক অথবা অন্যের হাতে—উভয়টি তার কাছে সমান। এরূপ ব্যক্তিকে আমাদের মতে "মুস্তাগনী" তথা বেপরওয়া বলা সমীচীন। কেননা, সে অর্থ থাকা ও না থাকা উভয়টির উর্ধ্বে। যে বিত্তশালী, সে বিত্ত আগমনের উর্ধ্বে; কিন্তু বিত্ত তার কাছে থাকুক, এর উর্ধ্বে নয়; বরং এর মুখাপেক্ষী। সুতরাং এদিক দিয়ে বিত্তশালী ফকীর বটে। কিন্তু যে বেপরওয়া, সে অর্থের আগমন, তার কাছে থাকা এবং তার হাত থেকে চলে যাওয়া ইত্যাদি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। এ কারণেই সে আল্লাহ তা'আলার "গনী" গুণের অধিক নিকটবর্তী।

এ ধরনের বান্দা ধন-সম্পদ থাকা না থাকার ব্যাপারে বেপরওয়া হলেও অন্য কোন ব্যাপারে বেপরওয়া নয়। সে আল্লাহ তা'আলার তাওফীকের ব্যাপারে বেপরওয়া নয়, যার ফলে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেপরওয়া হতে পেরেছে। এই বেপরওয়া অবস্থাটি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নেয়ামত। কারণ, যে অন্তর ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন, সে গোলাম এবং যে এ থেকে বেপরওয়া সে মুক্ত, আযাদ। আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ গোলামী থেকে মুক্ত করেন।

সারকথা, দারিদ্র্যের অবস্থা ও স্তর ছয়টি। তন্মধ্যে মুস্তাগনীর স্তর সর্বোচ্চ, এরপর যাহেদ, এরপর রাযী, এরপর কানে এবং এরপর হারীছ। মুযতর যাহেদ, রাযী ও কানে হতে পারে। সুতরাং অবস্থাভেদে তার স্তর বিভিন্নরূপ হতে পারে। কিন্তু মুস্তাগনী ছাড়া সকলকে ফকীর বলা যায়। মুস্তাগনী ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। তবে নিজের বেপরওয়া অবস্থার জন্যে সে আল্লাহর তাওফীকের মুখাপেক্ষী বিধায় তাকে ফকীর বলা হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে اعوذبك من الفقر বলে দারিদ্র্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং অন্য এক হাদীসে বলেছেন—

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

এ উক্তির মধ্যেও দারিদ্র্যের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর দরবারে এই বলে মোনাজাত করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ এবং মিসকীনরূপে মৃত্যু দান কর।

এই দোয়ায় দারিদ্র্যের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা উপরে দারিদ্র্যের যে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পেশ করেছি, সেমতে হাদীসের উভয় প্রকার বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, যে দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে মুযতর তথা নিঃসহায় ব্যক্তির দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্য পর্যায়ক্রমে কুফরে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। পক্ষান্তরে যে দারিদ্র্যের তিনি প্রার্থনা করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে আপন অসহায়ত্ব, অপমান ও মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করা। অতএব, হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার স্ববিরোধিতা নেই।

দারিদ্র্যের ফযীলত ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه

অর্থাৎ, সে সব ফকীর ও দেশত্যাগীদের জন্যে, যারা নিজের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করে। আরও এরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

অর্থাৎ, সে ফকীরদেরকে দেবে, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ। তারা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করতে সক্ষম নয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশংসার স্থলে ফকীরকে মোহাজির গুণের পূর্বে এবং দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর পথে আবদ্ধ গুণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্রগণ্যতার মাধ্যমে ফক্রের প্রশংসা বুঝা যায়।

হাদীস দ্বারাও ফক্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন- সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তারা আরয করলেন ঃ যে ধনী এবং নিজের ধন থেকে আল্লাহর হক আদায়কারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এ ব্যক্তি উত্তম! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সে নয়। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ তা হলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম! তিনি বললেন ঃ فَقِيْرٌ يُعْطِىْ جُهْدَهٗ যে ফকীর তার আয়াসলব্ধ বস্তু দান করে।

রসূলে করীম (সাঃ) একবার হযরত বেলালকে বললেন ঃ

اِلْقَ اللّٰهَ فَقِيْرًا وَلَا تَلْقَهٗ غَنِيًّا

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে ফকীর হয়ে সাক্ষাৎ কর—ধনী হয়ে নয়।

এক হাদীসে আছে—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এমন ছা-পোষা ফকীরকে পছন্দ করেন, যে সওয়াল করে না।

আরও এরশাদ হয়েছে—

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةٍ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমার উম্মতের ফকীররা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ বছর পূর্বে বর্ণিত রয়েছে। এতে মনে হয়, লোভী ফকীর লোভী ধনীর চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংসারবিমুখ ফকীর সংসারাসক্ত ধনীর তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ থেকে বুঝা যায়, লোভী ফকীর এবং যাহেদ ফকীরের মাঝে স্তরের পার্থক্য সাড়ে বার গুণ। কেননা, পাঁচশ' চল্লিশের সাড়ে বার গুণ বেশী। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, তা অর্থহীন কথার ন্যায় এমনিতেই মুখে উচ্চারিত হয়ে গেছে। বরং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে প্রকৃত সত্যই বর্ণনা করেছেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فُقَرَاءُ هَا وَاَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِى الْجَنَّةِ ضُعَفَاءُ هَا

অর্থাৎ, ফকীর হচ্ছে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর এই উম্মতের দুর্বলরা দ্রুত-জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اِنَّ لِىْ حِرْفَتَيْنِ اِثْنَتَيْنِ فَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ اَلْفَقْرُ وَالْجِهَادُ -

অর্থাৎ, আমার দুটি পেশা—ফকীরী ও জেহাদ। যে এ দুটিকে পছন্দ করবে, সে আমাকে পছন্দ করবে, আর যে এ দুটিকে অপছন্দ করবে, সে আমাকে অপছন্দ করবে।

একবার জিবরাঈল (আঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বললেন ঃ হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি যদি এই পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে আপনার অধিকারভুক্ত করে দেন, তবে আপনি তা পছন্দ করবেন কি না? রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছুক্ষণ নতমস্তকে চুপ করে থেকে বললেন ঃ হে জিবরাঈল!

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اِنَّ الدُّنْيَا دَارُ لِمَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالٌ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

অর্থাৎ, যার ঘর নেই দুনিয়া তার ঘর, যার অর্থ-সম্পদ নেই, দুনিয়া তার অর্থ-সম্পদ আর যার বোধশক্তি নেই, সে দুনিয়া সঞ্চয় করে।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) জনৈক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করেন। সে চাদর জড়িয়ে ঘুমুচ্ছিল। তিনি তাকে জাগিয়ে বললেন ঃ হে ঘুমন্ত ব্যক্তি, উঠ এবং আল্লাহকে স্মরণ কর। সে বলল ঃ আপনি আমার কাছে কি চান? আমি দুনিয়া বিসর্জন দিয়েছি। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ হে বন্ধু, তা হলে ঘুমো।

আবু রাফে (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ)-এর ঘরে মেহমান আগমন করল। তখন তাঁর কাছে মেহমানের আতিথেয়তার জন্যে কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে খয়বরের এক ইহুদীর কাছে পাঠিয়ে বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন রজব মাসের মেয়াদে আমাকে আটা কর্জ দেয় অথবা বিক্রি করে তার মূল্য। নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ করব। আমি ইহুদীকে এ কথা বললে সে বলল ঃ আমি বন্ধক ছাড়া দেব না। আমি ফিরে এসে এ কথা আরয করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জেনে রাখ, আমি আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ত। সে আমাকে কর্জ দিলে অথবা বিক্রি করে তার মূল্য দিলে আমি অবশ্যই তা শোধ করতাম। যাও, আমার লৌহবর্ম তার কাছে বন্ধক রেখে এস। আমি বের হতেই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

অর্থাৎ, আপনি দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না সে সম্পদের প্রতি, যা আমি নানা প্রকার লোকদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি। আপনার পালনকর্তার রিযিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনকে দুনিয়ার ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

আতা খোরাসানী বলেন ঃ কোন এক পয়গম্বর নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে মৎস্য শিকার করতে দেখলেন। সে "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নামে) বলে জাল নিক্ষেপ করল। কিন্তু একটি মাছও ধরা পড়ল না। অতঃপর তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে "বিসমিশ্ শয়তান" (শয়তানের নামে) বলে জাল নিক্ষেপ করল। তার জালে এত মাছ এল যে, সে ধরে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। পয়গম্বর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! ব্যাপার কি? আমি জানি, সবকিছুই আপনার কুদরতের অধীন। কিন্তু এ কি দেখলাম? আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন আমার বান্দাকে এই দুই শিকারীর মর্তবা দেখিয়ে দাও। পয়গম্বর যখন প্রথম শিকারীর বুযুর্গী ও মাহাত্ম্য এবং দ্বিতীয় শিকারীর লাঞ্ছনা ও অবমাননা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন ঃ ইলাহী! আমি বুঝে ফেলেছি।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে ফকীর দেখেছি এবং দোযখে উঁকি দিয়ে সেখানকার অধিকাংশ লোককে ধনী ও মহিলা দেখেছি। হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে— পয়গম্বরগণের মধ্যে সবার পেছনে হযরত সোলায়মান (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এর কারণ তাঁর সাম্রাজ্য। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ধনাঢ্যতার কারণে সকলের পরে জান্নাতে যাবেন। হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—ধনী ব্যক্তি খুব পরিশ্রম সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, ইলাহী! তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার বন্ধু কারা? আমিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। উত্তর হল ঃ প্রত্যেক ফকীর ও অভাবগ্রস্ত লোক আমার বন্ধু।

একবার আরবের গোত্রপতি ও ধনী ব্যক্তিরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আমাদের জন্যে একদিন এবং ফকীরদের জন্যে একদিন নির্দিষ্ট করে দিন। যেদিন তারা আপনার কাছে আসবে, সেদিন আমরা আসব না। আর যেদিন আমরা আসব, সেদিন তারা আসতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পারবে না। বলা বাহুল্য, ফকীর বলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত বেলাল, সালমান ফারেসী, সোহায়ব রূমী, আবুযর গেফারী, খাব্বাব ইবনে ইরত, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু হুরায়রা প্রমুখ নিঃস্ব ব্যক্তিবর্গ। দারিদ্র্যের কারণে তারা পশমের পোশাক পরতেন। তীব্র গরমের দিনে তাদের ঘর্মাক্ত পোশাক থেকে দুর্গন্ধ বের হত। এটাই ছিল উদ্ধত ধনীদের নাক ছিটকানোর প্রধান কারণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলে দিলেন ঃ আচ্ছা, আমি তাই করব। একই মজলিসে তোমাদেরকে একত্রিত করব না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ অবতীর্ণ হল ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ফকীরদের সাথে থাকুন— ধনীদের আনুগত্য করবেন না।

অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে জনৈক কোরায়শ সরদার উপস্থিত ছিল। এমন সময়ে ইবনে উম্মে মাকতুমের সেখানে আসা এবং প্রবেশের অনুমতি চাওয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অপ্রিয় মনে হয়। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى -

অর্থাৎ, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। কে আপনাকে তার সম্পর্কে অবগত করল। সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর এ উপদেশ তাকে উপকৃত করত। আর যে বিত্তশালী, আপনি তার প্রতি মনোযোগী।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ফকীরকে ডেকে এমনভাবে উযরখাহী করবেন, যেমন মানুষ একে অপরের সাথে উযরখাহী করে। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি দুনিয়াকে তোমার কাছ থেকে এজন্যে বিচ্ছিন্ন রাখিনি যে, তুমি আমার কাছে হেয় ছিলে; বরং এর কারণ ছিল এই যে, এখানে তোমার জন্যে সম্মান ও মাহাত্ম্য মওজুদ রেখেছিলাম। এখন তুমি এই কাতারগুলোতে যাও এবং সে ব্যক্তিকে চিনে নাও, যে দুনিয়াতে একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাকে অন্ন দিয়েছে এবং বস্ত্র দিয়েছে। তুমি তার হাত ধরে নাও। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমি তোমাকে দিলাম। তখন মানুষ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকবে। এই ব্যক্তি কাতার চিরে চিরে দেখবে, তার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে। যাকে এরূপ পাবে, তার হাত ধরে সে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— ফকীরদেরকে ভাল করে চিনে নিও এবং তাদের কাছ থেকে নেয়ামত হাসিল করো। কেননা, তাদের কাছে ধন আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তাদের কাছে কি ধন আছে? উত্তর হল— কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে—দেখ, যে তোমাদেরকে এক মুঠো খাদ্য দিয়েছে অথবা এক চুমুক পানি দিয়েছে অথবা বস্ত্র দিয়েছে, তার হাত ধর এবং জান্নাতে পৌঁছিয়ে দাও।

হযরত এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আমার যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। একদিন তিনি বললেন ঃ আমি তোমার ইযযত করি। আমি আমার কলিজার টুকরা ফাতেমাকে দেখতে যাব। সে অসুস্থ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি আরয করলাম। ভাল কথা চলুন। তিনি রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। হযরত ফাতেমার ঘরের দরজায় পৌঁছে তিনি দরজায় টোকা দিয়ে বললেন ঃ আসসালামু আলাইকুম, আমি ভেতরে আসতে পারি কি? হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আব্বাজান, আপনি আসুন। তিনি বললেন ঃ আমি এবং আমার সাথী উভয়েই আসব কি? প্রশ্ন হল ঃ আপনার সাথী কে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ এমরান। হযরত ফাতেমা আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন—এখন আমার গায়ে একটি কম্বল ছাড়া কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতে ইশারা করে বললেন ঃ কম্বলটি এভাবে জড়িয়ে নাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন ঃ আমি দেহ আবৃত করেছি; কিন্তু মাথা কি দ্বারা আবৃত করব? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গায়ে একটি পুরাতন চাদর ছিল। তিনি তা কন্যার দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি দিয়ে মাথা বেঁধে নাও। এভাবে তিনি গা ও মাথা আবৃত করার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসসালমু আলাইকুম বলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাছা, সকালে তোমার অবস্থা কেমন ছিল? উত্তর হল ঃ আমি ব্যথায় আক্রান্ত ছিলাম। দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, আমার কাছে খাওয়ারও কিছু নেই। আমি ক্ষুধায় কষ্ট করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ বাছা, উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম, আমিও তিন দিন ধরে কিছু খেতে পাইনি। আল্লাহ আমার ইযযত তোমার চেয়ে বেশী দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করলে তিনি আমাকে খাওয়াতেন, কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এরপর তিনি নিজের হাত হযরত ফাতেমার (রাঃ) কাঁধে রেখে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ, তুমি জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী। তিনি আরয করলেন ঃ ফেরাউন-পত্নী আসিয়া এবং এমরান-তনয়া মরিয়মের মর্তবা কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আসিয়া তার সময়কার মহিলাদের নেত্রী, মরিয়ম তার সময়কার, খাদীজা তার সময়কার এবং তুমি তোমার সময়কার মহিলাদের নেত্রী। তোমরা সকলেই এমন ঘরে থাকবে, যা পান্না নির্মিত অথবা পদ্মরাগ মণি খচিত হবে। এতে কোন প্রকার কষ্ট, শোরগোল ও ক্লান্তি নেই। তিনি আরও বললেন ঃ আমার পিতৃব্য পুত্র আলীকে নিয়েই তুষ্ট থাক। আমি তোমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিবাহ এমন ব্যক্তির সাথে দিয়েছি, যে দুনিয়াতেও সরদার এবং আখেরাতেও সরদার।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন মানুষ তাদের ফকীরদের খারাপ মনে করতে থাকবে, নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করতে থাকবে এবং অর্থ সঞ্চয়ে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চারটি বিপদের লক্ষ্যস্থল করে দেবেন—প্রথম দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় যুলুম ও অবিচার, তৃতীয় শাসকবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চতুর্থ শত্রুদের জোর।

ফকীর শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মহাজ্ঞানীদের উক্তিও অনেক বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ এক দেরহামওয়ালার তুলনায় দু' দেরহামওয়ালা কঠিনতম হিসাবের সম্মুখীন হবে।

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) একবার সাঈদ ইবনে আমরের কাছে এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত বিষণ্ন মনে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, নতুন কোন ঘটনা ঘটল নাকি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা ভাবছ, তার চেয়েও গুরুতর ঘটনা। তোমার পুরাতন ওড়নাটি আমাকে দাও। ওড়না আনা হলে তিনি সেটি ছিঁড়ে থলে তৈরি করলেন এবং তাতে দীনারগুলো ভরে বন্টন করে দিলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং ভোর পর্যন্ত ক্রন্দন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— আমার উম্মতের ফকীররা ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমনকি, যদি কোন ধনী তাদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায়, তাকে হাত ধরে বের করে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে বেহিসাব প্রবেশ করবে—এক, যে ব্যক্তি আপন কাপড় ধুতে চাইলে পরার জন্যে অন্য কাপড় থাকে না। দুই, যার চুলায় দু' পাতিল চড়ে না এবং তিন, কেউ পানি চাইলে জিজ্ঞেস করা হয় না যে, কোন্ পানি চাও? অর্থাৎ, যাদের পানাহার ও পোশাকে প্রাচুর্য ও লৌকিকতা নেই।

বর্ণিত আছে, জনৈক ফকীর হযরত সুফিয়ান ছওরীর মজলিসে আগমন করলে তিনি তাকে বললেন ঃ এস, আমার কাছে এস। তুমি ধনী হলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি কাছে ডাকতাম না। তাঁর ভক্তদের মধ্যে যারা ধনী ছিল, তারা কামনা করত, হায়! আমরাও যদি ফকীর হতাম! কারণ, তিনি ফকীরদেরকে অধিক পরিমাণে কাছে বসাতেন এবং ধনীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

মুসেল (রহঃ) বলেন ঃ আমি ধনীকে তাঁর মজলিসে যতটা হেয় দেখেছি, ততটা কোথাও দেখিনি। তাঁর দরবারে ফকীরের যে সম্মান ও ইযযত দেখেছি, তা আর কোথাও নজরে পড়েনি।

জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ বেচারী মানুষ যদি দোযখকে ততটুকু ভয় করত, যতটুকু ফকীরীকে ভয় করে, তবে উভয়টি থেকেই মুক্তি পেয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি জান্নাতের আগ্রহ সেই পরিমাণে করত, যে পরিমাণে ধনাঢ্যতার আগ্রহ করে, তবে উভয়টিই হাসিল হয়ে যেত। আর যদি অন্তরে আল্লাহকে ততটুকু ভয় করত, যতটুকু দৃশ্যত মানুষকে ভয় করে, তবে উভয় জাহানে সৌভাগ্যশালী হয়ে যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধনীত্বের কারণে কারও সম্মান করে এবং ফকীরীর কারণে কাউকে হেয় মনে করে, সে অভিশপ্ত।

হযরত লোকমান একদিন তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বাছা, পুরাতন ছেঁড়া পোশাক দেখে কাউকে হেয়জ্ঞান করো না। কেননা, তোমার ও তার পালনকর্তা একজন-ই।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ ফকীরদের মহববত পয়গম্বরগণের অন্যতম অভ্যাস এবং তাদের সাথে উঠাবসা সৎকর্মশীল হওয়ার পরিচায়ক। আর তাদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা মোনাফেকির অন্যতম লক্ষণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি একদিনে লাখ লাখ দেরহাম বন্টন করে দিতেন। এসব দেরহাম তিনি হযরত মোয়াবিয়া, ইবনে আমের প্রমুখের কাছ থেকে পেতেন। অর্থকড়ির এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর ওড়না ছিল তালিযুক্ত। তাঁর পরিচারিকা বলতো, আপনি এক দেরহামের গোশ্‌ত আনিয়ে নিলে তা দ্বারা ইফতার করা যেত। তিনি এর জওয়াবে বলতেন— আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তাই করতাম। ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর এই বিমুখতার কারণ ছিল এই যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে ওসিয়ত করেছিলেন, আয়েশা! যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফকীরের মত জীবন নির্বাহ করবে এবং ধনীদের কাছে বসবে না। তালি না লাগা পর্যন্ত নিজের ওড়না বাদ দেবে না।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খেদমতে এক হাজার দেরহাম পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। লোকটি অনেক পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও, দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে আমার নাম ফকীরদের তালিকা থেকে বাদ পড়ুক। আমি কখনও তা হতে দেব না।

সত্যবাদী ও অল্পে তুষ্ট লোকদের দারিদ্র্য ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كِفَافًا وَّقَنَعَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি সুখী, যে ইসলামের পথপ্রাপ্ত হয়েছে, যার জীবন যাপন প্রয়োজন মাফিক এবং সে এতে সন্তুষ্ট।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

يَامَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللّٰهَ الرِّضٰى مِنْ قُلُوْبِكُمْ تَظْفَرُوْا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَاِلَّا فَلَا

অর্থাৎ, হে ফকীর সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন কর। এতে তোমরা তোমাদের দারিদ্র্যে সওয়াব লাভে সাফল্যমণ্ডিত হবে— নতুবা নয়।

প্রথম হাদীস দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা নিয়ে সন্তুষ্ট ব্যক্তির ফযীলত জানা যায় এবং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা দারিদ্র্যে সম্মত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। দ্বিতীয় হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয়, লোভী ব্যক্তি দারিদ্র্যের সওয়াব পায় না। সম্ভবত এখানে লোভীর অর্থ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়া না দেয়ার কাজকে মন্দ মনে করে। এই মন্দ মনে করার কারণে সে দারিদ্র্যের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত উমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর একটি চাবি আছে। জান্নাতের চাবি হচ্ছে মিসকীনদের মহব্বত। ধৈর্যশীল ফকীর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সহচর হবে। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম বান্দা, যে আল্লাহর দেয়া রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে। এক হাদীসে বলা হয়েছে।

مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِىٍّ اَوْ فَقِيْرٍ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهُ كَانَ اُوْتِىَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, প্রত্যেক ধনী ও ফকীর কিয়ামতের দিন বাসনা করবে যে, দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণে ধন-সম্পদ পেলেই ভাল হত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার মনোনীত বান্দারা কোথায়? ফেরেশতারা আরয করবে, ইলাহী! আপনার মনোনীত বান্দা কারা? উত্তর হবে—মুসলমান ফকীর, যারা আমার দানে তুষ্ট এবং আদেশে সম্মত। তাদেরকে জান্নাতে দাখিল কর। সুতরাং তারা জান্নাতে খাওয়া-পরা করবে, আর অন্যরা হিসাব-নিকাশে আটকে থাকবে।

অল্পে তুষ্টির বিপরীত হচ্ছে লালসা। হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ লালসা হচ্ছে অভাবগ্রস্ততা এবং মানুষের কাছ থেকে নৈরাশ্য হচ্ছে ধনাঢ্যতা। যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পত্তি আশা করে না, সে ধনী হয়ে যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। কারণ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়। অথচ দিবারাত্রির চক্র তার আয়ুকে অনবরত করাত দিয়ে কাটতে থাকে, সে জন্য সে দুঃখিত হয় না। আরে হতভাগা! আয়ুষ্কাল কমে গেলে ধন-সম্পদের বৃদ্ধি কি কাজে আসবে?

বর্ণিত আছে, ইবরাহীম ইবনে আদহাম খোরাসানের ধনকুবের ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি নিজ প্রাসাদের জানালা পথে নিচে তাকিয়ে দেখলেন প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি একটি রুটি খাচ্ছে। খাওয়া শেষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়ে গেলে লোকটি সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ইবরাহীম তাঁর চাকরকে বললেন ঃ এই ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। চাকর তাই করল। লোকটি সামনে এলে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সেই রুটিটি খেয়েছিলে? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এতেই তৃপ্ত হয়ে গেছ? এরপর পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়েছ? লোকটি উত্তর দিল ঃ হাঁ। ইবরাহীম মনে মনে বললেন ঃ মন যখন এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করে আমি কি করব?

জনৈক ব্যক্তি আমের ইবনে আবদুল কায়েসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন লবণ ও শাক খাচ্ছিলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে এতটুকু নিয়েই কি তুষ্ট হয়ে গেছেন? আমের বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে এর চেয়ে নগণ্য বস্তু নিয়ে রাযী হয়েছে। সে সেই ব্যক্তি, যে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া নিয়ে তুষ্ট হয়।

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' শুকনা রুটি বের করতেন এবং পানিতে ভিজিয়ে লবণ দিয়ে খেয়ে নিতেন। তিনি বলতেন— যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে এতটুকুতে রাযী হয়ে যায়, সে কারও মুখাপেক্ষী হয় না।

হযরত হাসান বসরী বলতেন—আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করুন, যাদের জন্যে তিনি কসম খেয়েছেন; কিন্তু তারা তাঁর উক্তিকে সত্য জ্ঞান করে না। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ -

অর্থাৎ, আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা কিছু প্রতিশ্রুত। অতএব, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভুর শপথ, এটা অবশ্যই সত্য।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) একদিন জনসমাবেশে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে বললেন— আপনি এখানে লোকজনের মধ্যে বসে আছেন, অথচ ঘরে যে খাবার বলতে কিছু নেই! তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আমাদের সামনে একটি দুর্গম উপত্যকা রয়েছে। সেখানে সেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আত্মরক্ষা করতে পারবে, যে হালকা হবে। তাঁর পত্নী একথা শুনে খুশী হয়ে চলে গেলেন।

হযরত উসমান যুন্নূরাইন (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপবাসে সবর করে না, সে কুফরের অধিক নিকটবর্তী।

ধনাঢ্যতার বিপরীতে দরিদ্রতার ফযীলত ঃ এ সম্পর্কে নানা মনীষীর নানা মত। হযরত জুনায়দ, খাওয়াস প্রমুখসহ অধিকাংশ বুযুর্গ দরিদ্রতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেন। কিন্তু ইবনে আতা বলেন, যে শোকরকারী ধনী সব রকম হক আদায় করে, সে সবরকারী দরিদ্র অপেক্ষা উত্তম। এই বিরুদ্ধ মত পোষণ করার কারণে হযরত জুনায়দ তাকে বদদোয়া দেন।

কিন্তু ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও মহাজ্ঞানীদের উক্তি থেকে তাই জানা যায়। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, দুটি জায়গায় সন্দেহ থেকে যায়। প্রথমত, যে সবরকারী ফকীর অর্থোপার্জনের লোভ করে না, তাকে অর্থ খয়রাতকারী ও অর্থ আটকে রাখার ব্যাপারে নির্লোভ ধনীর বিপরীতে দেখলে ধারণা হয়, ধনী ফকীরের তুলনায় উত্তম। কেননা, অর্থের লোভ উভয়ের মধ্যে কম। এতে তারা সমান সমান; কিন্তু ধনী সদকা-খয়রাত করে সওয়াব হাসিল করে, যা ফকীরের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, লোভী ফকীরকে লোভী ধনীর বিপরীতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, ধনী উত্তম।

আমাদের মতে এ দুটি জায়গায়ই ইবনে আতার বক্তব্য লক্ষণীয়। কিন্তু যে ধনী ধন-সম্পদ উপভোগ করে, তা বৈধ পন্থায় করলেও সে নির্লোভ ফকীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এর দলীল হাদীসে বর্ণিত এই রেওয়ায়েত যে, একবার ফকীররা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করল— ধনীরা দান-খয়রাত, সাদাকাত, হজ্জ ও জেহাদে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ওযীফা হিসাবে কয়েকটি কলেমা শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এসব কালেমা পাঠ করলে তোমরা ধনীদের তুলনায় বেশী সওয়াব পাবে। এরপর ধনীরাও টের পেয়ে এসব কালেমা শিখে নিল এবং পড়তে শুরু করল। ফকীররা পুনরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ এখন তো ধনীরাও এসব কালেমা পড়তে শুরু করেছে। এখন কি করা যায়? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ, এটি হল আল্লাহর কৃপা। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এ থেকে বাহ্যত ধনীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কিন্তু এই হাদীসের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও বর্ণিত আছে। তা এই যে, তাসবীহ পাঠে ফকীরের সওয়াব ধনীর সওয়াবের চেয়ে বেশী এবং এটা আল্লাহ তা'আলার কৃপা, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। অর্থাৎ, হাদীসে ذلى (এটা) বলে ফকীরের সওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—ধনীর সওয়াবের দিকে নয়।

এই ব্যাখ্যার সপক্ষে যায়েদ ইবনে আসলামের একটি রেওয়ায়েত, যা তিনি আনাস ইবনে মালেকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন— তা পেশ করা হল। সে হাদীসে আছে যে, ফকীররা এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠাল। সে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ফকীরদের প্রেরিত দূত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাকেও মারহাবা এবং যাদের কাছ থেকে এসেছ, তাদেরকেও মারহাবা। তাদেরকে আমি পছন্দ করি। দূত আরয করল ঃ ধনী হজ্জ করে—আমরা করতে পারি না। তারা ওমরা করে —আমাদের ক্ষমতা নেই। তারা অসুস্থ হলে তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করে। এভাবে সমস্ত সওয়াবই তারা নিয়ে যায়। ফকীররা সওয়াব হাসিল করতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ ফকীরদেরকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও—তোমাদের যে কেউ সবর করবে এবং সওয়াবের প্রত্যাশী হবে, তার জন্যে তিনটি বিষয় অর্জিত হবে, যা ধনীদের অর্জিত হবে না। প্রথম এই যে, জান্নাতে অনেক খিড়কী হবে, যেগুলো জান্নাতবাসীরা এমনভাবে দেখবে, যেমন পৃথিবীর লোক আকাশের তারকাকে দেখে। এই খিড়কীদার জান্নাতে পয়গম্বর ফকীর, শহীদ ফকীর এবং ঈমানদার ফকীর ছাড়া কেউ যাবে না। দ্বিতীয়ত, ফকীররা ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। তৃতীয়ত, ধনী যখন বলে সোবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর এবং ফকীরও তাই বলে, তখন ধনী ফকীরদের সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যদিও দশ হাজার দেরহাম খয়রাত করে। অন্যান্য সৎকর্মকেও এমনি মনে করা উচিত। দূত একথা শুনে ফিরে এল এবং ফকীরদেরকে অবহিত করল। তারা সমস্বরে বলে উঠল ঃ আমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাযী, আমরা নিরুদ্বেগ। এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ বলে ফকীরদের সওয়াব বেশী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করলেও ফকীর বিপদাশংকা থেকে অধিকতর দূরে থাকে। কেননা, ধনাঢ্যতার ফেতনা নিঃস্বতার ফেতনা থেকে অধিক তীব্র হয়ে থাকে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ আমরা নিঃস্বতার ফেতনায় সবর করে বেঁচে গেলাম। কিন্তু ধনাঢ্যতার ফেতনায় সবর করতে পারলাম না। এটা প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। খুব কম লোকই এ থেকে মুক্ত। শরীয়তের বিধান বিরল ব্যক্তিদের জন্যে নয়; বরং সকলের জন্যে। নিঃস্বতা সকলের জন্যে উপযোগী— যদিও বিরল ব্যক্তির জন্যে নয়; তাই শরীয়ত ধনাঢ্যতার নিন্দা করেছে এবং দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করেছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—দুনিয়াদারদের ধন-দৌলতের দিকে তাকিও না। তাদের ধন-দৌলতের চাকচিক্য তোমার ঈমানের নূরকে বিলীন করে দেবে। জনৈক আলেম বলেন ঃ ধন-দৌলতের আগমন ঈমানের মিষ্টতা হরণ করে। হাদীসে আছে— প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি গোবৎস আছে। আমার উম্মতের গোবৎস হচ্ছে দেরহাম ও দীনার। ইহুদীদের গোবৎসও স্বর্ণ ও রূপার অলংকার দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

সারকথা, অর্থ ও পানি এবং স্বর্ণ ও পাথর সমান হওয়া ওলী ও পয়গম্বরগণের বেলায় সম্ভব। তারাও এটা পূর্ণরূপে তখন অর্জন করেন, যখন আল্লাহর অনুগ্রহে বিস্তর মোজাহাদা ও সাধনা করে নেন। সেমতে দুনিয়া যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সুসজ্জিত ও কামনার মূর্তি হয়ে ধরা দিত, তখন তিনি দুনিয়াকে বলতেন ঃ আমার কাছ থেকে দূরে থাক। হযরত আলী (রাঃ) বলতেন ঃ হে চকচকে সোনা, যা অন্য কাউকে ধোকা দে এবং হে ধবধবে রূপা, যা অন্য কারও সাথে ছলনা কর। তিনি যখন মনে দুনিয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার প্ররোচনা অনুভব করতেন, তখন উপরোক্ত বাক্য বলতেন। অন্তরে ধন ও পানির মূল্য সমান হওয়াকে বলা হয় "গিনায়ে মুতলক" তথা ধনাঢ্যতা। হাদীসে আছে—অন্তরের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা—সম্পদের ধনাঢ্যতা নয়। শেখ সা'দী এর তরজমা করে বলেন—তাওয়াঙ্গরী বদিল আস্ত, না বমাল। যেহেতু এটা সুকঠিন, তাই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধন-সম্পদ না থাকার মধ্যেই সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকা উচিত, যদিও ধন-সম্পদ থাকে তা কেবল দান-খয়রাতের মধ্যেই ব্যয় করে। কেননা, ধন-সম্পদ হাতে এলে তার প্রতি টান সৃষ্টি হওয়া এবং তা সুখের জন্যে ব্যয় করার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে, ইহজগতের মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং পরজগতের প্রতি অনীহা আত্মপ্রকাশ করে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের কারণসমূহ অপসারিত হয়ে গেলে অন্তরও দুনিয়া ও দুনিয়ার সাজসজ্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্তর আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। কেননা, অন্তর কোন সময় খালি থাকে না। যে অন্তর গায়রুল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, সে অন্তর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর যে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, সে গায়রুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। অন্তর যে পরিমাণে একদিকে ধাবিত হবে, সে পরিমাণে অপরদিক থেকে দূরবর্তী হবে এবং যতটুকু একদিকের নিকটবর্তী হবে, ততটুকু অপরদিক থেকে দূরবর্তী হবে। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি তার অন্তরের দিকেই থাকা উচিত যে, সে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয় কিনা? তার প্রতি আসক্ত হয় কিনা? মোটকথা,অর্থ-সম্পদের সাথে অন্তরের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই ধনী ও দরিদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়।

সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ধনাঢ্যতা অর্জিত হওয়া যখন অসম্ভব অথবা অত্যন্ত দুরূহ, তখন একথা বলাই সঙ্গত যে, সাধারণ মানুষের জন্যে দারিদ্র্যই উত্তম। কেননা, দুনিয়ার সাথে ফকীরের সম্পর্ক ও টান কম থাকে। এ সম্পর্ক যত দুর্বল হয়, ততই তাসবীহ ও এবাদতের সওয়াব বেশী হয়। কেননা, তাসবীহের উদ্দেশ্য শুধু জিহ্বার নড়াচড়া নয়; বরং যার তাসবীহ পাঠ করা হয়, তার সাথে সম্পর্ক গাঢ় হওয়াই উদ্দেশ্য। এ কারণেই জনৈক মনীষী বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়া অন্বেষণে রত অবস্থায় বৈরাগ্য ও এবাদত করে, সে এমন, যেমন কেউ খড়-কুটা দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করতে চায়। হযরত সোলায়মান দারানী বলেন ঃ কামনা-বাসনামুক্ত অবস্থায় ফকীরের শ্বাসগ্রহণ ধনীর হাজার বৎসরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে পছন্দের বস্তু দেখে, অতঃপর সবর করে ও সওয়াবের প্রত্যাশা করে, এটা তার জন্যে আল্লাহর পথে হাজার দীনার ব্যয় করা অপেক্ষা শ্রেয়!

জনৈক ব্যক্তি বশীর ইবনে হারেসকে বলল ঃ আপনি আমার জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দোয়া করুন, পরিবারের লোকজন আমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তোমার পরিবারের লোকজন আটার রুটি নেই বলে অভিযোগ করতে থাকে, তখন তুমি আমার জন্যে দোয়া করো। কেননা, তোমার সেই সময়কার দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধনীদের মুখ থেকে মারেফাতের কথা শুনা পছন্দ করতেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এরূপ দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الذُّلَّ عِنْدَ الْمُتَعَنِّفِ مِنْ نَفْسِىْ وَالزُّهْدَ فِيْمَا جَاوَزَ الْكِفَافَ -

অর্থাৎ, ইলাহী! আমার নফস যখন পূর্ণ হক চায়, তখন আমি তোমার কাছে অপমান প্রার্থনা করি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে তোমার কাছে বৈরাগ্য প্রার্থনা করি।

হযরত আবু বকর ছিলেন কামেল ও পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ। তিনিই যখন দুনিয়াকে ভয় করেছেন, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ধন-সম্পদ না থাকা. থাকার চেয়ে শ্রেয়।

এছাড়া ধনীর অবস্থাসমূহের মধ্যে উত্তম অবস্থা হালাল উপার্জন করা এবং সৎকাজে ব্যয় করা। এ সত্ত্বেও কিয়ামতের মাঠে তার হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হবে এবং অনেক সময় আটকে থাকতে হবে। হাদীস অনুযায়ী সে হিসাবের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে পড়বে, সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। এ কারণেই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমার দোকান মসজিদের দরজায় অবস্থিত হয়, ফলে কোন নামায ফওত না হয় এবং প্রত্যহ পঞ্চাশ দীনার করে লাভ হয়, যা আমি আল্লাহর পথেই ব্যয় করি, তবু আমি এটাকে পছন্দ করব না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এতে খারাপ কি দেখলেন ঃ তিনি বললেন ঃ হিসাব-নিকাশের দীর্ঘসূত্রতা।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ ফকীররা তিনটি বিষয় এবং ধনীরা তিনটি বিষয় পছন্দ করেছে। ফকীরদের পছন্দ করা বিষয়গুলো হচ্ছে— মনের প্রশান্তি, অন্তরের ঝামেলামুক্ততা এবং হিসাব-নিকাশের দ্রুততা। পক্ষান্তরে ধনীদের পছন্দ করা তিনটি বিষয় হচ্ছে— মানসিক কষ্ট, অন্তরের ব্যাপৃত থাকা এবং হিসাব-নিকাশ কঠোর হওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ পর্যন্ত অল্পেতুষ্ট ফকীর ও শোকরকারী ধনী সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন লোভী ফকীর ও লোভী ধনী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, তাদের মধ্যে উত্তম কে?

মনে কর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের অভিলাষী এবং সেজন্য চেষ্টাচরিত্রও করে, কিন্তু ধন-সম্পদ পায় না। এরপর ঘটনাচক্রে সে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে গেল। এ ব্যক্তি লোভী ফকীর এবং লোভী ধনী উভয় বিশেষণে বিশেষিত। তার এ দুটি বিশেষণের মধ্যে কোন্ বিশেষণটি উত্তম, তাই দেখতে হবে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এ ব্যক্তি যদি এতটুকু ধন-সম্পদের অভিলাষী হয়, যতটুকু জীবিকা ও জীবনের জন্যে জরুরী এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে ধর্মের পথ অতিক্রম করা ও তাতে সাহায্য নেয়া, তবে তার জন্যে ধন-সম্পদ থাকা উত্তম। কেননা, দারিদ্র্য জীবিকা অন্বেষণে ব্যাপৃত রাখে, ফলে যিকির ও এবাদত ঠিকমত হতে পারে না। তাই রসূলে করীম (সাঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ পরিবারের খাদ্য ততটুকু কর, যতটুকু জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন— كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا

অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরের নিকটবর্তী।

এখানে দারিদ্র্য অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুপস্থিতি।

পক্ষান্তরে যদি প্রার্থিত ধন-সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় অথবা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হয় কিন্তু উদ্দেশ্য ধর্মের কাজে সাহায্য নেয়া না হয়, তবে দারিদ্র্যাবস্থাই উত্তম ও শ্রেয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে অর্থের লোভ ও ধন-সম্পদের মোহে ফকীর ও ধনী উভয়েই সমান এবং ধর্মের কাজে সাহায্য না নেয়ার মধ্যেও সমান। কিন্তু পার্থক্য এই, যার কাছে ধন-সম্পদ থাকবে, তার মনে ধনের মহব্বত থাকবে আর যার কাছে থাকবে না, তার মন এই মহব্বত থেকে মুক্ত থাকবে। দুনিয়া তার কাছে কয়েদখানার মত মনে হবে, যা থেকে সে নিষ্কৃতি চাইবে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর সময় যার মন দুনিয়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকবে, তার অবস্থা অপরের চেয়ে খারাপ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে। হাদীস শরীফে আছে, পবিত্রাত্মা আমার মনে একথা বদ্ধমূল করেছেন যে, اَحْبِبْ مَنْ اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ অর্থাৎ, যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করে নাও। তোমাকে তার কাছ থেকে অবশ্যই পৃথক হতে হবে।

এতে বুঝানো হয়েছে যে, প্রিয়জনের বিরহ অত্যন্ত কঠিন। অতএব এমন ব্যক্তিকে বন্ধু করা উচিত, যে কখনও পৃথক হয় না। বলা বাহুল্য, সে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা।

ফকীরের আদব ঃ ফকীরের জন্যে অন্তরে, বাইরে, লোকের সাথে মেলামেশায় এবং স্বীয় কাজেকর্মে কয়েকটি আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। অন্তরের আদব হল আল্লাহ তা'আলা তাকে যে অবস্থায় ফেলেছেন, তার প্রতি অনীহা না থাকা। অর্থাৎ, অন্তরে ফকীরীকে খারাপ মনে করবে না এবং ভাববে না যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নি। এটা সর্বনিম্ন স্তর এবং ফকীরের জন্যে এটা ওয়াজিব। এর খেলাফ হারাম। রসূলে করীম (সাঃ)-এর উক্তির উদ্দেশ্যও তাই। তিনি বলেন ঃ হে ফকীর সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন কর, যাতে তোমরা তোমাদের ফকীরীর সওয়াব পাও, অন্যথায় সওয়াব পাবে না। এর উপরের স্তর হচ্ছে ফকীরীতে খুশী থাকা। আরও উপরের স্তর হচ্ছে ফকীরী প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা যে, প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ তিনি অবশ্যই দেবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ফকীরী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিও দেন, সওয়াবও দেন। সওয়াব দেয়ার পরিচয় এই, তিনি বান্দার অভ্যাস ভাল করে দেন। ফলে, সে পরওয়ারদেগারের আনুগত্য করে এবং কারও কাছে নিজের দারিদ্র্যের অভিযোগ করে না; বরং সে জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে শাস্তি দেয়ার আলামত এই, ফকীর চরিত্রহীন হয়, আল্লাহর নাফরমানী করে এবং ঘনঘন অভিযোগ করে। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ফকীরী ভাল নয়; বরং যে ফকীরীতে অসন্তুষ্টি ও অভিযোগ নেই, তাই ভাল।

ফকীরের বাহ্যিক আদব হল, কারও কাছে না চাওয়া, নিজের সুখ ও সচ্ছলতা প্রকাশ করা, কারও কাছে অভিযোগ না করা এবং দারিদ্র্যকে গোপন রাখা বরং এই গোপন রাখাকেও গোপন রাখা। হাদীস শরীফে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা অভাবগ্রস্ত ফকীরকে ভালবাসেন— যে সওয়াল করা থেকে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন —

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

অর্থাৎ, সওয়াল না করার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তি তাদেরকে ধনী মনে করে।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় সহনশীলতা উত্তম আমল। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ দারিদ্র্য গোপন করা পুণ্যের অন্যতম ভান্ডার।

অন্যের সাথে ফকীরের মেলামেশার আদব হল এই, কোন ধনীর সামনে তার ধনাঢ্যতার কারণে বিনয়ী হবে না, বরং অহংকার করবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সওয়াব লাভের আশায় ফকীরের সামনে ধনীর বিনয়ী হওয়া খুবই উত্তম। এর চেয়েও উত্তম হচ্ছে ধনীর সামনে ফকীরের অহংকার করা। আল্লাহর উপর ভরসা করে ফকীরের এ অবস্থাটি হচ্ছে একটি উচ্চ মর্তবা। কিন্তু নিম্ন মর্তবা হল, ফকীরের ধনীদের কাছে না বসা এবং ধনীদেরকে নিজের কাছে বসাতে আগ্রহী না হওয়া। কেননা, এগুলোই হচ্ছে লোভ ও লালসার উৎস।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ ফকীর ধনীদের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে জানবে, সে রিয়াকার আর বাদশাহের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে মনে করবে, সে চোর। জনৈক সাধক বলেন ঃ ফকীর যখন ধনীদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তার আস্থা ঢিলে হয়ে যায়। যখন তাদের কাছে প্রত্যাশা করে, তখন পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর যখন তাদের মধ্যে বসবাস করতে থাকে, তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ফকীরের উচিত, ধনীদের খাতিরে ও তাদের দান পাওয়ার লোভে সত্যপ্রকাশে দ্বিধা না করা। বরং সে যা সত্য ও সঠিক মনে করবে, তা বলে দেবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফকীরের নিজের ক্রিয়াকর্মে আদব হল ফকীরীর কারণে কোন এবাদতে অলসতা না করা এবং খরচ বাদে কিছু অর্থ বেঁচে গেলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে দ্বিধা না করা। কেননা, স্বল্প পুঁজিওয়ালার চেষ্টা ও সাধনা এটাই। এর সওয়াব ধনীর দেয়া অনেক ধনের সওয়াবের চেয়ে বেশী। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, খয়রাতের এক দেরহাম আল্লাহ তা'আলার কাছে লক্ষ দেরহামের চেয়ে উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ এটা কিরূপে হতে পারে? তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি তার অগাধ ধন-সম্পদ থেকে এক লক্ষ দেরহাম বের করে খয়রাত করল। অপরদিকে এক ব্যক্তির কাছে দু'দেরহাম ছাড়া কিছুই ছিল না। সে তা থেকে মনের খুশীতে এক দেরহাম দান করে দিল। এখানে এক দেরহামওয়ালা লক্ষ দেরহামওয়ালার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

ফকীরের উচিত অর্থ সঞ্চয় না করা বরং প্রয়োজন পরিমাণে রেখে বাকীটা দান করে দেয়া। সঞ্চয় করার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, শুধুমাত্র একদিন ও একরাত্রির সামগ্রী রাখবে। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। দুই, চল্লিশ দিনের সামগ্রী রাখবে। আলেমগণ এটা হযরত মূসা (আঃ)-এর মেয়াদ থেকে চয়ন করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। এ থেকে মনে করে নেয়া হয়েছে যে, জীবনের আশা চল্লিশ দিন পর্যন্ত করা জায়েয। এটা মুত্তাকীদের স্তর। তিন, এক বছরের সামগ্রী সঞ্চিত রাখা। এটা সর্বনিম্ন ও সৎকর্মপরায়ণদের স্তর। যে ব্যক্তি এক বছরেরও বেশী সময়ের জন্যে সামগ্রীর ভাণ্ডার গড়ে তুলে, সে লোভীদের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবিগণের খাদ্যসামগ্রী এমনিভাবে বণ্টন করতেন। অর্থাৎ, কোনোখান থেকে কিছু এলে তিনি তা থেকে কোন কোন পত্নীকে এক বছরের, কাউকে চল্লিশ দিনের এবং কাউকে এক দিন এক রাত্রির খাদ্যসামগ্রী দিতেন। তিনি একদিন একরাত্রির খাদ্য হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে দিতেন।

অযাচিতভাবে কিছু এলে ফকীর কি করবে ঃ ফকীরের কাছে কিছু এলে তার তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত— স্বয়ং অর্থের দিকে, দাতার উদ্দেশ্যের দিকে এবং নিজের উদ্দেশ্যের দিকে। অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখার অর্থ, তা হলো হালাল ও সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হলে তবে তা গ্রহণ করা, নতুবা হাত গুটিয়ে নেয়া। দাতা যদি মন জয় করা ও মহব্বত লাভের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে সেটাকে বলা হয় "হাদিয়া"। আর যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে তার নাম সদকা ও খয়রাত। হাদিয়া গ্রহণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতে কোন দোষ নেই। বরং এটা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি কোন কোন হাদিয়া কবুল করতেন এবং কারও কারও হাদিয়া ফিরিয়ে দিতেন এবং বলতেন— আমি মনস্থ করেছি, কোরেশী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী ছাড়া কারও হাদিয়া গ্রহণ করব না। কোন কোন তাবেঈও এমনটা করেছেন। সেমতে কাতাহ মুসেলীর কাছে একবার পঞ্চাশ দেরহামের একটি থলে এলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে আত্তার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যার কাছে অযাচিতভাবে কোন রুযী আসে এবং সে তা ফিরিয়ে দেয়, সে যেন আল্লাহর কাছেই তা ফেরত দেয়। অতঃপর তিনি থলেটি খুলে তা থেকে একটি দেরহাম গ্রহণ করলেন এবং অবশিষ্টগুলো ফিরিয়ে দিলেন। হযরত হাসান বসরীও এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাঁর কাছে কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ও খোরাসানের চিকন বস্ত্রের একটি থান প্রেরণ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মানুষের কাছ থেকে এ প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর কাছে সওয়াবের কোন অংশ পাবে না।

এ থেকে বুঝা যায়, যারা আলেম ও ওয়ায়েয, তাদের দান গ্রহণ করা খুবই খারাপ। হযরত হাসান বন্ধু-বান্ধবের হাদিয়া গ্রহণ করতেন। হযরত ইবরাহীম তায়মী বন্ধুদের কাছ থেকে এক-দু'দেরহাম চেয়ে নিতেন। কিন্তু অন্য কেউ শত শত দেরহাম পেশ করলেও তা গ্রহণ করতেন না। আবার কারও কারও নিয়ম ছিল কোন বন্ধু তাদেরকে কিছু দিলে তারা বলত এটা নিজের কাছেই রেখে দাও এবং ভেবে দেখ এটা নেয়ার পর যদি আমি তোমার মনে নেয়ার পূর্বের তুলনায় উত্তম হই, তবে আমাকে জানিও। আমি নিয়ে নেব। নতুবা নেব না। এ অবস্থাটির পরিচয় এই, যদি গ্রহীতা প্রত্যাখ্যান করে, তবে দাতার কাছে অপ্রিয় মনে হয় আর গ্রহণ করলে সে খুশী হয় এবং গ্রহণ করাকে নিজের প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। গ্রহীতা যদি জানে যে, এ হাদিয়ার মধ্যে কিছুটা করুণাও মিশ্রিত রয়েছে, তবে হাদিয়া গ্রহণ করা মোবাহ। কিন্তু সাচ্চা ফকীরদের মতে মাকরূহ।

হযরত বিশর বলেন ঃ আমি কারও কাছে কখনও কিছু চাইনি সিররী সিকতি ছাড়া। কেননা, আমার কাছে তার সংসার অনাসক্তি প্রমাণিত। তার হাত থেকে কোন বস্তু বের হয়ে গেলে তিনি খুশী হন। কাজেই তার বস্তু গ্রহণ করা আমি তাকে খুশী হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করি।

জনৈক খোরাসানী হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর কাছে কিছু অর্থ নিয়ে আগমন করল এবং বলল ঃ আপনি এগুলো ভোগ করুন। তিনি বললেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এগুলো ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। খোরাসানী বলল ঃ ফকীরদেরকে দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি এতদিন কোথায় বাঁচব যে, তোমার অর্থ ভোগ করব? খোরাসানী আরয করল ঃ আমার উদ্দেশ্য তা নয় যে, আপনি এ অর্থ চাটনী ও ব্যঞ্জনে ব্যয় করবেন, বরং আমি চাই যে, শিরনী, ফল-মূল ইত্যাদিতে ব্যয় করুন। হযরত জুনায়েদ কবুল করে নিলেন। খোরাসানী আরয করল ঃ বাগদাদ শহরে এমন কেউ নেই, যার অনুগ্রহ আমার প্রতি আপনার চেয়ে বেশী। হযরত জুনায়েদ বললেন ঃ তোমার মত লোক ছাড়া অন্য কারও হাদিয়া কবুলও করা উচিত নয়।

যদি দাতা কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে, তবে এই দান যাকাত হলে ফকীর নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে, সে যাকাত পাওয়ার যোগ্য কি না। যদি বিষয়টি সন্দিগ্ধ হয়, তবে কবুল করাও সন্দেহজনক হবে। আর যদি দান-খয়রাত হয়, তবে ফকীর মনে মনে চিন্তা করবে, যদি সে এমন কোন গোনাহ করে থাকে, যা দাতা জানলে খয়রাত দেবে না, তবে গ্রহণ করা হারাম। উদাহরণতঃ কেউ এ ধারণার বশবর্তী হয়ে খয়রাত দিল যে, লোকটি আলেম। কিন্তু বাস্তবে ফকীর এগুণে গুণান্বিত নয়। এমতাবস্থায় দান গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে হারাম।

যদি দাতা লোক-দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে দান করে, তবে ফকীরের উচিত তার দান গ্রহণ না করা এবং তার কুউদ্দেশ্যে সাহায্যকারী না হওয়া। হযরত সুফিয়ান ছওরীকে কেউ কিছু দিলে তিনি তা ফেরত দিতেন এবং বলতেন ঃ আমি যদি জানতাম, এ দানকে মানুষ গর্বভরে উল্লেখ করে না, তবে গ্রহণ করে নিতাম। জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু পাঠালে আপনি তা ফিরিয়ে দেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি মমতা ও উপদেশের ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দেই। কেননা, তারা দান করে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে এবং এ প্রকাশ হওয়াকে ভাল মনে করে। ফলে, তাদের মাল হাতছাড়া হয় অথচ সওয়াব পায় না। তাই আমি ফিরিয়ে দেই।

ফকীর দান গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি সে প্রয়োজন পরিমাণ বস্তুর অভাবগ্রস্ত হয়, তবে গ্রহণ করা উত্তম। হাদীসে আছে —

مَا الْمُعْطِي مِنْ سَعَةٍ بِأَعْظَمَ اَجْرًا مِنَ الْاٰخِذِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ‐

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হলে সচ্ছল দাতা সওয়াবে তার চেয়ে বড় নয়।

অন্য এক হাদীসে আছে—

مَنْ اَتَاهُ شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَّ لَااِسْتِشْرَافٍ فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ -

অর্থাৎ, যার কাছে এ ধন-সম্পদের কিছু অংশ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আসে, সে যেন একে আল্লাহর দেয়া রিযিক মনে করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, সে যেন একে ফিরিয়ে না দেয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে কিছু পায় এবং গ্রহণ না করে, সে একদিন চাইবে, কিন্তু পাবে না। সিররী সিকতী (রহঃ) হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে কিছু প্রেরণ করতেন। একবার তিনি ফিরিয়ে দিলেন। সিররী বললেন ঃ হে আহমদ, ফিরিয়ে দেয়ার বিপদকে ভয় কর। ইমাম আহমদ বললেন ঃ ফিরিয়ে দেয়ার কারণ এই, আমার কাছে এক মাসের খাদ্য মওজুদ আছে। তাই এটি আপনি নিজের কাছেই রাখুন। এক মাস পর আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এখন দরকার নেই। কোন কোন আলেম বলেছেন, ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য এই আশংকা আছে, হতে পারে আল্লাহ তাকে শাস্তিস্বরূপ লোভাক্রান্ত করবেন। তাই আগত সম্পদ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়, তাহলে তা নিজের ধ্যানে মশগুলও থাকতে পারে অথবা তা দ্বারা অন্যান্য অসহায় ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য করে বদান্যতার পরিচয়ও দিতে পারে। যদি সে পরকালপন্থী সাধক হয় আর ভাবে, এ সম্পদ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রয়োজনের বেশী সম্পদ সঞ্চয় প্রবৃত্তির আনুগত্য ছাড়া কিছুই নয়। আর যে কাজ আল্লাহর জন্যে নিবেদিত নয়, তা শয়তানের জন্যে। সেদিকে পদার্পণ মানেই কলংকিত হওয়া।

সম্পদ গ্রহণের পদ্ধতিও দুটি। এক, প্রকাশ্যে গ্রহণ করে গোপনে সরিয়ে দেয়া অথবা অসহায়দের মাঝে বিলিয়ে দেয়া। এটা 'সিদ্দীক'দের স্তর। প্রবৃত্তির জন্যে খুবই কঠিন—যদি সাধনার উত্তাপে তা পরিশুদ্ধ না হয়ে থাকে। দুই, সম্পদ গ্রহণই না করা; বরং মালিক তার পছন্দ মোতাবেক তার চেয়ে অধিক অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে অথবা তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে প্রদান করবে। এখানে প্রকাশ্যে লেনদেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তম, না গোপনে এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা "যাকাতের তত্ত্ব ও রহস্য' অধ্যায়ে করেছি। কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) সিররী সিকতীর হাদিয়া কবুল করেননি তাঁর প্রয়োজন ছিল না বিধায়। কারণ তখনও তাঁর কাছে এক মাসের খাবার মওজুদ ছিল। তাছাড়া হাদিয়া গ্রহণপূর্বক অন্যদেরকে দিয়ে দেয়ার পথও ধরেননি। কারণ, ওতেও রয়েছে হাজার ঝামেলা। পরহেযগারী হলো, সংশয় ও ফিতনার জায়গা থেকে দূরে থাকা। মক্কার কিছু পড়শী আছে— তারা বলে, আমার কাছে কিছু পয়সা ছিল, আমি তা আল্লাহর পথে খরচ করার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। একবার এক ফকীরকে দেখলাম খোদার ঘর তওয়াফপূর্বক বিড়বিড় করে বলছে—

প্রভু হে, তুমি জান আমি ক্ষুধার্ত—
পরনে আমার বস্ত্র নেই,
ক্ষুধার্ত-উলঙ্গ আমি—
সর্বাবস্থায় তুমিই সহায়॥

আমি দেখলাম, তার গায়ের দুটো কাপড়ই ছেঁড়া। আবরূও ঢাকা যায় না। ভাবলাম, আমার পয়সাগুলো দিয়ে একে কাপড় কিনে দেয়ার চাইতে আর উত্তম দান হতে পারে না। আমি পয়সাগুলো তার কাছে নিয়ে এলাম। সামনে ধরলাম। সে তার মধ্য থেকে পাঁচটি দেরহাম তুলে নিল। বলল, চার দেরহাম দিয়ে দুটি চাদর কিনে নেব আর এক দেরহাম তিন দিনের খরচ হয়ে যাবে। এরচে' বেশী আমার দরকার নেই। আমি দ্বিতীয় রাতে তাকে দেখলাম। তার গায়ে দুটি নতুন চাদর। তার মধ্যে তখন শয়তানী সংশয়ের সৃষ্টি হলো। সে তখন আমার দিকে তাকাল। আমার হাত ধরল। আমাকে নিয়ে সাতবার বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করল। প্রতিবারের তওয়াফেই আমরা মূল্যবান খনিজ পদার্থ দেখতে পাচ্ছিলাম। কখনো স্বর্ণ, কখনো রূপা, কখনো ইয়াকূত, কখনো মোতি, কখনো ভিন্ন জওহর। দেখছিলাম আমাদের হাঁটু পর্যন্ত বেড়ে উঠছিল এগুলো। সে বলল, আল্লাহ তাআলা আমাকে এসবই দিয়েছেন; কিন্তু আমি ধরেছি যুহ্দ ও বৈরাগ্যের পথ। কারণ, এ সবই বোঝা আর বিপদ। এগুলো থেকে যৎসামান্য গ্রহণ করাটা বান্দার জন্যে রহমত ও নেয়ামত।

অর্থাৎ প্রয়োজনের বাইরে বান্দার কাছে যা থাকে, তা তার পরীক্ষাস্বরূপ। আর প্রয়োজনমাফিক যতটুকু প্রদত্ত হয়, তা দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ। এরশাদ হচ্ছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, আমি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে—তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম (তা দেখার জন্যে) এই মর্তলোকের সকল কিছু সৃষ্টি করেছি তারই শোভাস্বরূপ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَاحَقَّ لِابْنِ آدَمَ إِلَّا فِي ثَلٰثٍ طَعَامٍ يُقِيمُ صُلْبَهُ وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهُ فَمَا زَادَ فَهُوَ حِسَابُهُ -

অর্থাৎ, তিনটি জিনিসের মধ্যে মানুষের হক রয়েছে। তাকে পিঠ সোজা রাখার মত খাদ্য, তার আবরু ঢাকবার মত পোশাক ও তাকে আশ্রয় দেয়ার মত ঘর। এরচে' বেশী যা হবে, তা হিসাবের বিষয়।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনমাফিক এই তিনটি থেকে গ্রহণ করে, তাহলে সে প্রতিদান পাবে। যদি প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করে, তাহলে এর জন্যে আল্লাহর দরবারে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। যদি নাফরমানী করে, তাহলে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। মানুষকে সম্পদের দ্বারা পরীক্ষা করার অর্থ হলো, আল্লাহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে কিংবা রিপুর তাড়নাকে দুর্বল করার মানসে কোন সম্পদ বর্জনের অঙ্গীকার করল। এ ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকার পূরণ করাই উত্তম। কারণ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অভ্যাস একবার হয়ে গেলে বারবার তাই করতে চাইবে। তখন আর তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বর্জনই উত্তম। দাতাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে যুহ্দ। যারা 'সিদ্দীকীন', তারাই শুধু এই সাধনায় বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দরাজহস্ত হয়, অসহায় লোকদের দেখা-শোনার অভ্যাস থাকে, তাহলে সে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী গ্রহণ করতে পারে এবং অসহায়দের উদ্দেশ্যে গৃহীত সম্পদ যথাশীঘ্র খরচ করে ফেলাই উত্তম। রাখলেই আবার নতুন করে পরীক্ষায় পড়ার আশংকা। ওর সাথে মনও লেগে যেতে পারে। অনেকে আবার অসহায় মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে অবশেষে সম্পদের প্রেমে পড়ে ধ্বংস হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ দ্বারা আদায় করার নিয়তে ঋণ করে এবং ঋণ আদায়ের পূর্বেই মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দিবেন।

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, আল্লাহর প্রতি তাদের উত্তম ধারণা অনুযায়ী তারা খরচ করেন। কথিত আছে, এক বুযুর্গ মারা যাওয়ার সময় ওসিয়ত করে যান, আমার সম্পদ তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিবে। এক, শক্তিশালী। দুই, দানশীল। তিন, ধনী। কেউ জিজ্ঞেস করলো, এর উদ্দেশ্য কি?

তিনি বললেন ঃ শক্তিশালী অর্থ— যারা আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে। দানশীল অর্থ— যারা আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখে। আর ধনী অর্থ— যারা আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। অর্থাৎ যদি ফকীর, সম্পদ ও দাতার মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে ফকীর সেই সম্পদ গ্রহণ করতে পারে। তবে নেয়ার সময় অবশ্যই মনে রাখবে, যা কিছু নিলাম, তা আল্লাহর কাছ থেকেই নিলাম, দাতা কেবলমাত্র মাধ্যম। তাকে আল্লাহ তাআলা দেয়ার জন্যেই পাঠিয়েছেন। সে দিতে বাধ্য।

এক ব্যক্তি হযরত শফীক বলখী (রহঃ), তাঁর মুরীদগণসহ আরও পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে দাওয়াত করল। খুব ভালো মানের খাবার তৈরী করল। তিনি যখন উপবেশন করলেন, তখন মুরীদদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ দাওয়াতকারী বলছে, যে ব্যক্তি একথা মনে না করে যে, এই খাবার আমি তৈরী করেছি, আমিই এই খানা পরিবেশন করেছি, তার জন্যে এই খানা হারাম। একথা শুনে সকলেই উঠে চলে গেল। তবে একজন লোক বসে রইল। তিনি অতবড় মাপের ছিলেন না। দাওয়াতকারী হযরত বলখীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযুর! আপনার কথা আমি বুঝিনি। তিনি বললেন ঃ আমি তাদের তাওহীদের পরীক্ষা নিতে চেয়েছি। হযরত মূসা (আঃ) একবার আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! তুমি বনী ইসরাঈলের হাতে আমার রিযিক প্রেরণ করেছ। সকালে একজনে খাওয়ায়, বিকালে অন্যজন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন, আমি আমার বন্ধুদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। আমি তাঁদের রিযিক আমার বান্দাদের মধ্যে বড়দের দ্বারা বন্টন করে দেই। যেন এই ওসীলায় তারা সওয়াব লাভ করতে পারে। সুতরাং কেউ যদি কারও কাছ থেকে কিছু পায়, তাহলে সে যেন মনে করে এটা আল্লাহর দান। তিনি এই দাতাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করার অবৈধতা এবং অভাবী ব্যক্তির জন্যে সওয়ালের আদব ঃ জেনে রাখতে হবে, সওয়ালের ব্যাপারে অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর বাণী রয়েছে। আবার কিছু কিছু রেওয়ায়েতে সওয়ালের ব্যাপারে অনুমতিও রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সওয়ালকারী যদি ঘোড়ার উপরে আরোহণ করে আসে তবু তার একটি প্রাপ্য রয়েছে। তিনি আরও এরশাদ করেন, 'ভস্মীভূত খুরের অংশ দিয়ে হলেও ফকীরকে বিদায় কর। এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে, কারণ, সওয়াল করা একেবারেই হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম হলে হাদীসের মাধ্যমে এমন একটি নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হত না। সারকথা হল, মৌলিকভাবে সওয়াল করা হারাম, তবে একান্ত প্রয়োজনে সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে।

সওয়াল করা বা অন্যের কাছে হাত পাতা এ জন্যে হারাম যে, এতে আর তিনটি হারাম কর্ম সংঘটিত হয়ে যায়। এক, আল্লাহর প্রতি অভিযোগ। কারণ, সওয়াল করার অর্থই হল নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করা এবং নিজের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করা। আর এটা নিঃসন্দেহে অভিযোগ। বিষয়টিকে এ ভাবে বুঝা যেতে পারে যে, কারো ভৃত্য যদি অন্যের কাছে সওয়াল করে, তাহলে এতে মনিবের অসম্মান হয় এবং প্রকারান্তরে মনিবের প্রতিই শেকায়েত করা হয়। ঠিক তেমনি ভাবেই বান্দার জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট হাত পাতার অর্থই হল আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আর এ জন্যেই সওয়াল করা হারাম হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে প্রয়োজনের সময় হালাল হতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময়ও মৃত বস্তুও হালাল হয়ে যায়।

দুই, সওয়ালকারী সওয়ালের মাধ্যমে নিজকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে অপমানিত করে। আর কোন ঈমানদারের জন্যেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট নিজকে অপমানিত করার অনুমতি নেই। সে নিজকে একমাত্র প্রভুর কাছেই ছোট করবে, এর মধ্যেই রয়েছে তার জন্যে সীমাহীন ইযযত। অন্যান্য মানুষ সকলেই তার মত। সুতরাং এমনিতেই প্রয়োজন ছাড়া সম পর্যায়ের কারও কাছে নিজকে ছোট করা উচিত নয়।

তিন, সওয়ালের মাধ্যমে অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া হয়। কেননা, অনেক সময় যার কাছে হাত পাতা হয়, সে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে রাযী থাকে না, বরং লজ্জা পাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে অথবা লোক-দেখানোর জন্যে সওয়ালকারীর দাবী পূরণ করে থাকে । কিন্তু মনে মনে ঠিকই কষ্ট পায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবার অনেক সময় দাবী পূরণ করতে না পারার কারণেও লজ্জা পেতে হয়। কারণ, মানুষ তাকে কৃপণ মনে করতে থাকে। মোটকথা, প্রথম অবস্থায় তার সম্পদের ক্ষতি হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তার মানের ক্ষতি হয়। আর এ উভয় অবস্থার ক্ষতিই তার জন্যে কষ্টের কারণ এবং এ কষ্ট তাকে সওয়ালকারীর কারণেই পেতে হয়। সুতরাং সওয়াল করা হারাম। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষের কাছে হাত পাতা একটি ঘৃণিত কাজ এবং এর চাইতে বড় বৈধ কোন ঘৃণিত কাজ নেই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, রসূল (সাঃ) সওয়ালকে একটি ঘৃণিত কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এ ঘৃণিত কাজটি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বৈধ হতে পারে না। যেমন খাওয়ার সময় যদি কারও কণ্ঠনালীতে লোকমা আটকে যায় এবং পানি না থাকে, তাহলে প্রয়োজন মাফিক মদ পান করে গলার বিষম ছুটানোর অনুমতি রয়েছে।

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে সওয়াল করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামে নিজের জন্যে আগুনের পরিধি বৃদ্ধি করে। হাদীসে আরও এসেছে, সচ্ছল ব্যক্তি সওয়াল করার কারণে কিয়ামতের দিন সে এমন ভাবে আগমন করবে যে, তার মুখমন্ডল থাকবে অস্থিসার, তাতে মাংসের কোন উপস্থিতি থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সওয়ালকারীর সওয়াল তার মুখমন্ডলে দাগ হয়ে থাকবে। হাদীসের এ সমস্ত শব্দমালা দ্বারা সওয়ালের ব্যাপারে অবৈধতাই প্রমাণ হয়।

রসূল (সাঃ) একবার কিছু লোকের নিকট থেকে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর আনুগত্যের অঙ্গীকার নিলেন, এরপর ছোট একটি বাক্য বললেন যে, তোমরা কখনো কারও নিকট হাত পাতবে না।

প্রকৃতপক্ষে রসূল (সাঃ)-এর আদর্শই এমন ছিল যে, তিনি মানুষকে সওয়াল করার ব্যাপারে সর্বদা বারণ করতেন। তিনি বলতেন, যে আমাদের কাছে হাত পাতবে, তাকে তো আমরা দিব, কিন্তু যে আত্মনির্ভর থাকতে চাইবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আত্মনির্ভর রাখবেন। তিনি আরও বলেন, যে সওয়াল করবে না, সে আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। রসূল (সাঃ) আরও এরশাদ করেন, তোমরা মানুষের কাছে সওয়াল করবে না। আর সওয়াল যত কম করা যায়, ততই উত্তম। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনার কাছে কি সওয়াল করা যাবে? রসূল (সাঃ) বললেন, আমার কাছেও কম করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত উমর (রাঃ) দেখলেন, একজন ভিক্ষুক মাগরিবের পর ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। তিনি তার গোত্রের একজন লোককে বললেন, তাকে খাবার দিয়ে দাও। সে খাবার দিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর আবার তাকে ভিক্ষা করতে শুনলেন। তিনি গোত্রের লোকটিকে বললেন, আমি কি তোমাকে ভিক্ষুকটিকে খাবার দিতে বলিনি? লোকটি বলল, আমি তো তাকে খাবার দিয়ে দিয়েছি। হযরত উমর এবার ভিক্ষুকের ঝুলি পরীক্ষা করলেন, দেখলেন তাতে রুটির স্তূপ রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তো ভিক্ষুক নও, ব্যবসায়ী। অতঃপর তিনি ঝুলিটি নিয়ে যাকাতের উটের সামনে ঢেলে দিলেন এবং ভিক্ষুকটিকে দোররা মারলেন, আর বললেন, ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো এরূপ করবে না।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, সওয়াল করা যদি হারামই না হত, তাহলে তিনি ভিক্ষুককে দোররা মারলেন কেন এবং তার ঝুলিই বা ছিনিয়ে নিলেন কেন। এখানে কিছু সংখ্যক ফেকাহবিদ হযরত উমর (রাঃ)-এর এ কাজটিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। তারা মনে করেন যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর এ কাজটি ঠিক ছিল না। কারণ, ভিক্ষুককে তিনি আদবের জন্যে প্রহার করে থাকলেও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ঠিক হয়নি। কেননা, ইসলামে সম্পদ বাজেয়াপ্ত বা শাস্তি স্বরূপ জরিমানার কোন বিধান নেই।

আমি বলতে চাই, হযরত উমরের উপর ঐ সকল লোকদের আপত্তি উঠেছে তাদের অজ্ঞতার কারণে। হযরত উমর (রাঃ) ঐ সকল ফেকাহবিদের তুলনায় অনেক বড় ফকীহ। তিনি যতটুকু পরিমাণ ধর্মের রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, ততটুকু আর কেউ ছিল না। তেমনি প্রজাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি সবার চেয়ে ভাল জানতেন। হযরত উমরের কি এ কথা জানা ছিল না যে, সম্পদ গ্রহণ করে জরিমানা আদায় করা ইসলামে বৈধ নয়? অথবা এমনটা কি হতে পারে যে, তিনি জানতেন ঠিকই কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হয়ে আল্লাহর নাফরমানী করে ফেলেছেন। অথবা শাস্তি দিতে যেয়ে তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন, যা রসূল (সাঃ)-এর আনীত শরিয়তে বৈধ নয়? কখনও না। এমনটা হতেই পারে না। মূলত হযরত উমর (রাঃ) যে কারণে এ কাজটি করেছিলেন সেটি হল, তিনি লোকটিকে সওয়াল করার অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন এবং অন্যদেরকে তিনি এ বিষয়টি জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসে তাকে দান করেছ, তা ভুল। কেননা, সে মূলত অভাবী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নয়, বরং মিথ্যুক ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়ত, সে যে খাদ্যবস্তুগুলো মানুষের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে, সেগুলোর মালিক সে হয়নি। কারণ, প্রতারণার মাধ্যমে গ্রহণ করার কারণে রুটিগুলোর উপর তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপরদিকে রুটিগুলোর মালিকের সন্ধান না থাকার কারণে সেগুলো মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়াও মুশকিল ছিল। ফলে, এ লাওয়ারিস সম্পদগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কোন কাজে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। আর এ জন্যেই হযরত উমর (রাঃ) এগুলো বায়তুল মালের যাকাতের উটের খাদ্যের তালিকায় নির্ধারিত করে দিলেন। কেননা, যাকাতের উটের খাদ্যের ব্যবস্থাও বায়তুল মালের পক্ষ থেকেই করতে হয়। মোটকথা হল, প্রতারণার মাধ্যমে বা মিথ্যা কথা বলে ভিক্ষুকরা যে সম্পদ গ্রহণ করে থাকে, এগুলোর তারা মূলত মালিক হয় না এবং এগুলোর ব্যবহার তাদের জন্যে হারাম। তাদের উচিত এ ধরনের সম্পদ মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। হযরত উমরের কর্ম থেকে আমরা এ ধরনেরই শিক্ষা পাই।

যখন জানা গেল যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে সওয়াল করা যায়, তখন এ কথাও জানতে হবে যে, 'প্রয়োজন' মূলত চার প্রকার। এক, একান্ত প্রয়োজন। দুই, বড় ধরনের প্রয়োজন। তিন, হালকা প্রয়োজন। চার, নিষ্প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজনওয়ালা ব্যক্তিকে চরম অভাবী বলা হয়। চরম অভাবীর অবস্থা হল— যেমন কেউ এমন ক্ষুধার্ত যে, সে নিজের উপর মৃত্যু বা অসুস্থতার আশংকা করে। অথবা সে এ পর্যায়ের দরিদ্র যে, নিজের সতর ঢাকার মত বস্ত্রও তার নিকট নেই। এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্যে সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে। তবে সওয়াল করার জন্যে অন্যান্য শর্তগুলোও বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন- যার নিকট সওয়াল করা হচ্ছে, তার আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততা। সওয়ালকারী ব্যক্তির উপার্জনের অক্ষমতা, ইত্যাদি। । কারণ, যার উপার্জন ক্ষমতা রয়েছে, তার জন্যে সওয়াল করা নাজায়েয।

প্রয়োজনের চতুর্থ নম্বরটি হল-নিষ্প্রয়োজন। নিষ্প্রয়োজনীয়তা হল সচ্ছল ব্যক্তির অবস্থা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কোন কিছুর জন্যে অন্যের নিকট হাত পাততে হয় না। বরং যে বস্তুর জন্যে সে অন্যের নিকট হাত পাতবে এর সম পরিমাণ বা দ্বিগুণ তার নিজের কাছেই রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্যে সওয়াল করা হারাম। অথচ যদি তার কাছে এক বা একাধিকটি মওজুদ থাকে, তাহলে সওয়াল করা হারাম। পক্ষান্তরে যদি কারও কাছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরার মত কাপড় তো আছে, কিন্তু শীতের কাপড় নেই এবং শীত তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে অনুরূপ কোন ব্যক্তি সফরে আছে গন্তব্যে পর্যন্ত পৌঁছার ভাড়া তার কাছে নেই। অবশ্য খুব কষ্টে পায়ে হেঁটেও গন্তব্যে পৌঁছতে পারে এমন ব্যক্তির জন্যে সওয়াল করা মোবাহ্—বৈধ। কারণ, তার প্রয়োজন তো স্পষ্ট। অবশ্য এক্ষেত্রেও ধৈর্যধারণ সওয়াল অপেক্ষা অনেক উত্তম। তবে সওয়াল করা মাকরূহ নয়। তবে শর্ত হলো, সত্য বলতে হবে। প্রয়োজনের বাস্তবতাটাও তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে যদি হেরফের করে যেমন—জামা আছে কিন্তু ছেঁড়া, বাইরে যেতে একটি ভাল কাপড় দরকার। গাধা ভাড়া করার পয়সা আছে কিন্তু সে ঘোড়া ভাড়া করার পয়সা চায়। এখানে সে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে শুধু প্রয়োজন বলে সওয়াল করল, তাহলে জায়েয হবে না। কারণ, এতেও এক রকমের ধোকা আছে। কিন্তু ধোকা না দিলে সমস্যা নেই। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি অভিযোগ, নিজেকে লাঞ্ছিত করে কিংবা অন্যকে কষ্ট দিয়ে সওয়াল করলেও সেটা হারাম।

কেউ যদি বলে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে সওয়াল কিভাবে করা যাবে? তার জবাব হল, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, মাখলুকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করবে এবং ভিক্ষুকদের মত সওয়াল করবে না। বরং এভাবে বলবে, আমার যা কিছু আছে, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার নফস চাচ্ছে উপরে পরার জন্যে আরেকটি কাপড়। অথচ এটা না হলেও চলে যায়। এভাবে বললে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করা হলো না। আর লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচার উপায় হল, প্রয়োজনে নিজের বাপ, আত্মীয় কিংবা এমন কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে চাইবে, যারা সওয়ালের কারণে তাকে ছোট মনে করবে না। অথবা এমন ব্যক্তির কাছে চাইবে, যিনি দানশীল এবং দান করার জন্যে টাকা জমা করে রেখেছে এবং কোন সওয়ালকারী আসলে সে খুশী হয়। কেউ তার দান কবুল করলে সে খুশী হয়, মনে করে তার উপর অনুগ্রহ করা হলো। এ ধরনের লোকের কাছে সওয়াল করাটা লাঞ্ছনা নয়।

কষ্টদান থেকে বেঁচে থাকার উপায় হল, সওয়াল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে না করে বরং ইশারা-ইংগিতে অবস্থার বর্ণনা দেয়া, যার দেয়ার আগ্রহ আছে সে যেন দিতে পারে। কিন্তু কোন মজলিস যদি এমন হয়, যেখানে সওয়াল করলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্যদের নজর পড়ে এবং সে দান না করলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্যরা তাকে ভর্ৎসনা করে আর সেই ভর্ৎসনার ভয়েই সে বাধ্য হয়ে দান করে। তাছাড়া ব্যক্তি বিশেষের কাছে সওয়াল করার সময়ও নাম না নিয়েই সওয়াল করা উত্তম। যাতে সে ইচ্ছা করলে কাটিয়ে যেতে পারে। আর আন্তরিকভাবে দিতে চাইলে দিতে পারে। এমতাবস্থায় দিলে বুঝা যাবে খুশী হয়ে দিয়েছে। অনুরূপ দেয়ার সময় যদি সওয়ালকারী মনে করে দাতা লজ্জায় পড়ে দিয়েছে, উপস্থিতি কিংবা 'আমার' প্রতি লজ্জার আশংকা না থাকলে সে আদৌ দিত না, তাহলে এই অর্থ গ্রহণ হারাম। এটা কাউকে রাস্তায় ধরে মারপিট করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়ার মতোই। কেননা, বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে কারও মনে আঘাত দেয়া শরীরে আঘাত দেয়ার চাইতেও কঠিন। কিন্তু কেউ যদি বলে, বাহ্যত তো সে লোক হাসিমুখেই দিয়েছে। সুতরাং তার মনে সওয়ালের কারণে কষ্ট হচ্ছে কি-না তা আমরা কিভাবে বুঝব? অথচ হাদীস শরীফে আছে—

إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক বিষয়ের আলোকে ফয়সালা করি, আর গোপন বিষয়ের অধিপতি আল্লাহ তাআলা।

এর জবাব হল, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে শাসক যখন ফয়সালা করে ভেতরগত অবস্থা তার জানা থাকে না, তাই সে বাধ্য হয় বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়সালা করতে। অথচ মানুষের রসনা অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলে থাকে। এটা তো হল একটা প্রয়োজনের ব্যাপার। কিন্তু এখানে আমরা যাদের আলোচনা করছি, সেতো হলো আল্লাহ ও তাঁর বিশেষ বান্দার কথা। আল্লাহ তো মানুষের ভেতর-বাহির সব জানেন। সমান ভাবে জানেন।

সুতরাং এক্ষেত্রে মালিক যদি লজ্জাবোধের খাতিরে দান করে, তাহলে ফেরত দেয়া চাই। আর যদি লজ্জাবোধের কারণে গ্রহণ করতে না চায়, তাহলে আপাতত রেখে দিয়ে পরবর্তীতে হাদিয়া হিসাবে দিয়ে দেয়া উচিত। যদি সে হাদিয়াও কবুল করতে না চায়, তাহলে তার ওয়ারিসদের কাউকে দিয়ে দিলেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে গ্রহীতা মনে করছে দাতা সন্তুষ্ট চিত্তেই দিচ্ছে অথচ প্রকৃত অবস্থা হল সে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট নয়। আর এটা উদ্ধার করাও কঠিন। তাই মুত্তাকীগণের অনেকেই সওয়াল করাটাকেই সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলেছেন। হযরত বিশরী (রহঃ) একারণেই হযরত সিররী (রহঃ) ছাড়া অন্য কারও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। বলতেন, আমি জানি, সিররী কোন জিনিস দিতে পারলে খুশীই হয়। আর আমি তার পছন্দের বিষয়ে তাকে সাহায্যও করতাম। সওয়াল করতামও না। করতে জোর নিষেধ করতাম। কারণ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করা জায়েয নেই। আর প্রয়োজন তো হলো, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া। সওয়াল ভিন্ন যখন আর জীবন রক্ষার গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া চাওয়া ছাড়া কেউ কিছু দিচ্ছেও না। তখনই মাত্র সওয়াল করা যায়।

কোন কোন বুযুর্গের আমল ছিল, তাদেরকে কোন জিনিস দিলে তারা তার কিছু অংশ রেখে কিছু অংশ ফেরত দিতেন। যেমন রসূল (সাঃ)-এর দরবারে একবার কিছু ভেড়া, ঘি ও পনীর হাদিয়া নিবেদিত হল। রসূল (সাঃ) সেখান থেকে ঘি ও পনীর রেখে ভেড়া ফিরিয়ে দেন।

এটা ছিল তাঁদের অবস্থা যাঁদের কাছে চাওয়া ছাড়াই সম্পদ আসতো। অধিকন্তু মর্যাদা লাভের স্বার্থে যারা হাদিয়া দিত, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারা দুই অবস্থায় সওয়াল করতেন। এক, একান্ত প্রয়োজনের সময়। যেমন হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। আর তাঁরা জানতেন, যাদের কাছে চাচ্ছেন, তারা আন্তরিকভাবে দিবেন।

দুই, ভাই-বন্ধুদের কাছে সওয়াল করা। প্রথম যুগের বুযুর্গগণ নিজেদের ভাইদের সম্পদ চাওয়া ছাড়াই ব্যবহার করতেন। কারণ, তারা জানতেন. এতে তারা খুশী হবে। মুখে উচ্চারণ কোন বড় বিষয় নয়। তাদের ক্ষেত্রে সওয়ালের দরকারই হত না। তারা সওয়াল বৈধ মনে করতেন এমন ক্ষেত্রে যে, যার কাছে চাচ্ছি, সে আমার প্রয়োজনের কথা জানলে নিজ থেকেই তা দিয়ে দিত। এক্ষেত্রে কোন হিল্লা বাহির করার দরকার হয় না। তাহলে সওয়ালকারীর তিন অবস্থা হলো—

এক— সওয়ালকারীর একীন আছে যে, দাতা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে।

দুই— সওয়ালকারী নিশ্চিত, দাতা আন্তরিকভাবে অসন্তুষ্ট।

এই দুই অবস্থার প্রথম অবস্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হালাল। দ্বিতীয় অবস্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

তিন— সওয়ালকারী ঠিক বুঝতে পারছে না দাতা কি সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে, না নারায হয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় সে তার মনকেই ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে—মনে যে বিষয়ে সন্দেহ থাকবে ওটা বর্জন করবে আর যে বিষয়ে তৃপ্তি ও মনের সমর্থন পাবে, সেটাই গ্রহণ করবে। অনেক ক্ষেত্রে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমনও হয় যে, দাতার সূক্ষ্ম স্বভাবের কারণে তার মনের অবস্থা কিছুতেই নিরূপণ করা যায় না। একারণেই রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

অর্থাৎ, হাতের কামাই-ই হলো সর্বাধিক পবিত্র খাবার।

সওয়াল করা হারাম। রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ يَسْتَكْثِرْ

অর্থাৎ, সচ্ছলতা সত্ত্বেও সওয়াল করা মানে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা কামনা করা। চাই বেশীর সওয়াল করুক বা কমের সওয়াল করুক।"

কিন্তু এই সচ্ছলতার সীমারেখা কি? এটা নির্ধারণ করা মুশকিল। তাছাড়া আমরা এটা করতেও পারি না। এটা শুধু নবীই (সাঃ) জানেন। হাদীস শরীফে আছে—

اِسْتَغْنُوْا بِغِنَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْ غَيْرِهِ قَالُوْا وَمَاهُوَ؟ قَالَ غَدَاءُ يَوْمٍ وَعَشَاءُ لَيْلَةٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহর ধনে ধনাঢ্যতা কামনা কর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ তা আবার কি? রসূল (সাঃ) বললেন ঃ একদিন ও একরাতের খাবার!

অন্য একটি হাদীসে আছে—

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا

'যার কাছে পঞ্চাশ দেরহাম কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে সওয়াল করল, সে উপরি সওয়াল করল।

অন্য একটি বর্ণনায় চল্লিশ দেরহামের কথা আছে। হাদীস সবগুলোই বিশুদ্ধ। ধনী হওয়ার সীমারেখাও ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের শ্রেণী-বিভেদের কারণে সচ্ছলতার ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে আছে—

لَاحَقَّ لِابْنِ اٰدَمَ اِلَّا فِى ثَلٰثٍ طَعَامٍ يُقِيْمُ بِهٖ صُلْبَهٗ وَثَوْبٍ يُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتَهٗ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهٗ فَمَا زَادَ فَهُوَ حِسَابٌ -

অর্থাৎ, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে মানুষের হক আছে। পিঠ সোজা রাখতে পারে পরিমাণ খাবার, আবরূ ঢাকার মত কাপড় ও আশ্রয় গ্রহণ করার মত ঘর। এরচে' বেশী যা হবে, তার হিসাব দিতে হবে।

অর্থাৎ খাবার, পোশাক ও ঠিকানা— এ তিনটিই হল মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজনের তিনটি মৌলিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি হলো মৌলিক প্রয়োজন বা এ জাতীয় যা আছে। যেমন এক ব্যক্তি মুসাফির। তার জন্যে ভাড়ারও প্রয়োজন হবে যদি সে পায়ে হাঁটতে না পারে। এই ভাড়াও তখন ঐ তিনটির মধ্যে গণ্য হবে। অনুরূপ যাদের ভরণ-পোষণ তার উপর জরুরী, সেগুলোও এরই মধ্যে শামিল। তবে এ ক্ষেত্রে একজন দ্বীনদারের প্রয়োজনই তার প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে। একান্ত স্বাভাবিক দিন গুজরানই হবে তার প্রয়োজন—যদি তা একান্ত স্বভাব বিরোধী না হয়।

খাদ্যের মধ্যে সারা দিন-রাত এক মুদ্ অর্থাৎ, প্রায় দেড় পোয়া ধর্তব্য। এই পরিমাণ প্রচলিত খাদ্যের মধ্যে হবে যদিও তা সবই হয়। সব সময় ব্যঞ্জন থাকা প্রয়োজনের বাইরে। এটা সম্পূর্ণ বর্জন করাও কষ্টকর। তাই মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করার অনুমতি রয়েছে।

বাসস্থানের পরিমাণ কমপক্ষে ততটুকু হওয়া দরকার, যতটুকুতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এতে সাজ-সজ্জার কোন কথা নেই। অতএব, সাজ-সজ্জা অথবা ঘর প্রশস্ত করার জন্যে সওয়াল করা অপ্রয়োজনীয় সওয়ালরূপে গণ্য হবে। এটা উপরোক্ত হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সময়ের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষ একদিন ও এক রাত্রির খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়। বস্ত্র ও বাসস্থান জরুরী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে সওয়াল করলে তার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, এমন বস্তু, যার প্রয়োজন পরবর্তী দিন হবে। দুই, এমন বস্তু, যার প্রয়োজন চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিনে হবে। তিন, যার প্রয়োজন এক বছরে হবে। এখন আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বলা যায়, যার কাছে এ পরিমাণ আসবাবপত্র আছে যে, তার এবং তার পরিবারের এক বছরের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে যথেষ্ট, তার সওয়াল করা হারাম। কেননা, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের ধনাঢ্যতা। হাদীসে বর্ণিত পঞ্চাশ দেরহাম এ ধনাঢ্যতারই সীমা। যদি এমন বস্তু হয় যে, এক বছরের মধ্যে প্রয়োজন হবে, তবে দেখা উচিত, সওয়ালকারী প্রয়োজনের সময়ও সওয়াল করতে সক্ষম কিনা এবং তখন সওয়াল করার সুযোগ থাকবে কিনা? যদি সক্ষম হয় এবং সুযোগও থাকে, তবে এই মুহূর্তে সওয়াল করা জায়েয হবে না। কেননা, যখন প্রয়োজন হবে, তখন সে জীবিত না-ও থাকতে পারে। জীবিত না থাকলে তো প্রয়োজনই হবে না। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, প্রয়োজনের সময় সওয়ালের সুযোগ থাকবে না এবং কোন দাতা পাওয়া যাবে না, তবে এ মুহূর্তে সওয়াল করা বৈধ। কেননা, এক বছর বেঁচে থাকার আশা করা অবান্তর নয়।

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতে রিযক আসার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থার অধিকারী, সে একদিনের খাদ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে তার মর্তবা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক বড়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন তার ও তার পরিবারের আজকের রিযক দিয়েছেন, তখন কালকের জন্য ভয় করা বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া অন্য কোন কারণে হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا –

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং তোমাদেরকে নির্লজ্জ কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ ওয়াদা দেন আপন ক্ষমা ও অনুগ্রহের।

সওয়ালও মন্দ বিষয়, যা কেবল প্রয়োজনের জন্যেই বৈধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর সওয়াল করে, যার প্রয়োজন বছরের মধ্যে দেখা দেবে, তার অবস্থা সে ব্যক্তির তুলনায় বেশী খারাপ, যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এক বছর পরেও প্রয়োজনের জন্যে রেখে দেয়। শরীয়তের বাহ্যিক ফতোয়ার দিক দিয়ে এতদুভয় কাজই বৈধ। কিন্তু উভয় কাজের কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত, উচ্চাশা এবং আল্লাহর অনুগ্রহের উপর অনাস্থা, যা মূলত বিনাশকারী বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে সঠিক পথ অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সত্যাশ্রয়ী ফকীরগণের কিছু অবস্থা ঃ হযরত বিশর (রহঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফকীরগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা সওয়াল করে না এবং কেউ দিলে গ্রহণ করে না। এরূপ ফকীর ইল্লিয়্যীনে আধ্যাত্মিক লোকদের সাথে থাকবে। দুই, যারা সওয়াল করে না কিন্তু কেউ কিছু দিলে গ্রহণ করে। তারা নৈকট্যশীলদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে থাকবে। তিন, যারা প্রয়োজনের সময় সওয়াল করে। তারা আসহাবে ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, সওয়ালের নিন্দায় সকলেই একমত। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে হযরত শাকীক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ খোরাসানে আপনার বন্ধুদের মধ্যে যারা ফকীর, তাদেরকে আপনি কি অবস্থায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এই অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদেরকে কেউ কিছু দিলে তারা শোকর করে, আর না দিলে সবর করে। হযরত শাকীক বললেন ঃ বলখের কুকুররাও তাই করে। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে আপনার মতে ফকীর কারা? তিনি বললেন ঃ ফকীর তারা, যাদেরকে কিছু না দিলে শোকর করে, আর দিলে নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দেয়া বস্তু তারই হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ থেকে জানা গেল যে, সবর, শোকর ও সওয়ালের ক্ষেত্রে বুযুর্গগণের স্তর অনেক। এগুলোর পার্থক্য জানা অধ্যাত্ম পথের পথিকদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। কেননা, এগুলো না জানলে তারা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারবে না।

আল্লাহ পাক মানুষকে সুন্দরতম কাঠামোতে সৃষ্টি করে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর "আলা ইল্লিয়্যীন" তথা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা যে ব্যক্তি উন্নতি ও অধঃপতনের মধ্যে পার্থক্য জানবে না, সে নিশ্চিতই উন্নতি করতে পারবে না।

সওয়াল করার কারণে মর্তবা উন্নত হওয়ার মত অবস্থাও কোন কোন সময় বুযুর্গগণের উপর প্রবল হয়ে যায়। সেমতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুযুর্গ হযরত আবুল হাসান নূরী (রহঃ)-কে মানুষের কাছে সওয়ালের হাত পাততে দেখে মনে মনে বললেন ঃ এরূপ বুযুর্গের সওয়াল করা মোটেই সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। জুনায়েদ বললেন ঃ নূরীর এ কাজকে খারাপ মনে করো না। তিনি মানুষকে কিছু দেবার জন্যেই মানুষের কাছে সওয়াল করেন— নেয়ার জন্যে নয়। অর্থাৎ, সওয়াল এ জন্যে করেছেন, যাতে দাতা আখেরাতে সওয়াব পায় এবং তার কোন ক্ষতি না হয়। বলা বাহুল্য, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সে উক্তির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাতে তিনি বলেন ঃ يَدُ الْمُعْطِي هِيَ الْعُلْيَا দাতার হাত উপরে। এরপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত জুনায়েদ বললেন ঃ দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এসো। দাঁড়িপাল্লা আনা হলে তিনি একশ' দেরহাম ওযন করলেন, অতঃপর আরও এক মুষ্টি দেরহাম এই একশ' দেরহামের সাথে মিলিয়ে বললেন ঃ এগুলো নূরীর কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে দান কর। বর্ণনাকারী বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে বললাম, ওযন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা। কিন্তু তিনি এক শ' দেরহাম ওযন করলেন এবং এর সাথে অগুনতি এক মুষ্টি মিলিয়ে দিলেন। এতে তো পরিমাণ নির্দিষ্ট হল না। এর মর্ম কি? তিনি তো বিজ্ঞ ব্যক্তি! কিন্তু প্রশ্ন করতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। অতঃপর দেরহামের থলেটি আমি হযরত নূরীর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন ঃ দাঁড়িপাল্লা আন। অতঃপর তিনি দাঁড়িপাল্লা দিয়ে একশ' দেরহাম ওযন করে বললেন ঃ এগুলো জুনায়েদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং বলো, আমি তার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করিনি। একশ' দেরহামের বেশী যা আছে, তা নিয়ে নিলাম। তার একথা শুনে আমার বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ জুনায়েদ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সে রশির উভয় মাথা নিজেই ধরতে চায়। সে একশ' দেরহাম মেপে সেটাকে নিজের মনে করে আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার জন্যে দিয়েছে। এর সাথে এক মুষ্টি বিনা ওযনে যা দিয়েছে, সেটা আল্লাহর নিয়তে দিয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহর ওয়াস্তে যা ছিল, তা গ্রহণ করেছি, আর যা তার নিজের ছিল, তা ফেরত দিয়েছি। অতঃপর আমি এই মুদ্রাগুলো হযরত জুনায়েদের কাছে নিয়ে এলে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ নূরী নিজের মাল গ্রহণ করেছেন এবং আমার মাল ফিরিয়ে দিয়েছেন। যাক, আল্লাহ্ মালিক।

এখানে দেখা উচিত যে, এই বুযুর্গগণের অন্তর কেমন স্বচ্ছ ছিল এবং তাদের অবস্থা কেমন একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে ছিল। তারা একে অপরের মনের খবর মৌখিক কথাবার্তা ছাড়াই জেনে নিতেন। এটা ছিল হালাল খাদ্য, সংসারবিমুখতা এবং সর্বতোভাবে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়ারই ফল। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ সব বিষয় অস্বীকার করে; সে মূর্খ। যেমন কেউ ঔষধ পান না করেই সেটা যে বিরেচক তা অস্বীকার করে। অনেক দিন সাধনা করার পরও যদি এটা কেউ অর্জন করতে না পারে এবং সে অন্যের জন্যেও এটা অস্বীকার করে, তবে সে সেই ব্যক্তির মত, যে বিরেচক ঔষধ পান করে কিন্তু তার কোন অভ্যন্তরীণ রোগের কারণে দাস্ত হয় না। ফলে, যে ঔষধটি বিরেচক, সে তা অস্বীকার করে বসে। এ ব্যক্তি মূর্খতায় যদিও প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম, কিন্তু সে-ও যে পূর্ণ মূর্খ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুহদ

যুহদ তথা সংসার অনাসক্তি অধ্যাত্ম পথের পথিকগণের একটি উৎকৃষ্ট মকাম। এটা এলম, হাল ও আমলের মাধ্যমে গঠিত হয়। আমাদের মতে যুহ্দের মানে হচ্ছে এক বস্তু থেকে অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আগ্রহ পোষণ করা। যে ব্যক্তি কোন বস্তু থেকে অন্য বস্তুর প্রতি আগ্রহ করে, সে প্রথম বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ থেকে বুঝা গেল, যুহদের জন্যে দুটি বস্তু প্রয়োজন। এক, যার দিক থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়া হয় এবং দুই, যার প্রতি আগ্রহ পোষণ করা হয়। এই দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুর তুলনায় উত্তম হওয়া শর্ত। প্রথম বস্তুর জন্যেও এমন হওয়া শর্ত যে, তার প্রতি কোন না কোন কারণে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমন বস্তু থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়াকে যুহদ হলা হবে না, যা স্বয়ং কাম্য নয়। যেমন, পাথর ও মাটি থেকে যে আগ্রহ সরিয়ে নেয়, সে যাহেদ তথা দরবেশ হবে না। কেননা, এগুলোর প্রতি আগ্রহই হয় না। দরবেশ হবে সে লোক, যে টাকা-পয়সা বর্জন করে। দ্বিতীয় বস্তুর জন্যেও শর্ত এই যে, তা দরবেশের মতে প্রথম বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে হবে, যাতে সে তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হয়। যেমন বিক্রেতা নিজের পণ্য সামগ্রী ততক্ষণ বিক্রি করে না, যতক্ষণ তার মতে বিনিময় উৎকৃষ্ট না হয়। এ কারণেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে —

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

অর্থাৎ, তারা ইউসুফকে বিক্রি করে দিল সামান্য দামে— গোনাগুনতি কয়েক দেরহামের বিনিময়ে। এ ব্যাপারে তারা দরবেশ হয়ে গিয়েছিল।

আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইউসুফের ব্যাপারে দরবেশী প্রদর্শন করেছে। অর্থাৎ, তারা লোভ করেছে যেন, পিতার মনোযোগ কেবল তাদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। এটা তাদের কাছে ইউসুফের তুলনায় অধিক প্রিয় ছিল। এই বিনিময় পাওয়ার আশায়ই তারা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এই বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দুনিয়াতে যাহেদ তথা দরবেশ তাকেই বলা হবে, যে দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করবে, অর্থাৎ, আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে, সে আখেরাতের পক্ষে দরবেশ হবে। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যে বিশেষভাবে দুনিয়াকেই বিক্রি করে, তাকেই দরবেশ বলা হয়। যেমন "এলহাদ" বিশেষভাবে সেই প্রবণতাকেই বলা হয়, যা বাতিলের প্রতি হয়। নতুবা অভিধানে কেবল প্রবণতাকেই এলহাদ বলা হয়—বাতিলের প্রতি হোক অথবা সত্যের প্রতি।

যুহদের জন্যে এটাও শর্ত যে, যে বস্তু থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়া হবে, তা কোন না কোনরূপে কাম্য হতে হবে। এ কারণেই যুহদ তখনই হবে, যখন এই বস্তুর তুলনায় দ্বিতীয় বস্তুটি অধিকতর কাম্য ও প্রিয় হবে। নতুবা প্রথম কাম্য বস্তুটি ত্যাগ করা অসম্ভব হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যসব বস্তুর প্রতি বিমুখ হয়, এমনকি বেহেশতের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য না রাখে— কেবল আল্লাহর প্রতি আগ্রহ রাখে, সে সর্বাবস্থায় দরবেশ। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভোগসামগ্রীর প্রতি বিমুখ হয়, কিন্তু আখেরাতের ভোগসামগ্রী পাওয়ার বাসনা রাখে এবং বেহেশতের হূর, প্রাসাদ, নহর ও ফলমূলের লোভ পোষণ করে, সেও কতক দরবেশ হবে, কিন্তু প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কতক ভোগসামগ্রী ত্যাগ করে এবং কতক ত্যাগ করে না; যেমন ধন-সম্পদ বর্জন করে এবং যশ-প্রতিপত্তি বর্জন করে না, এরূপ ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই দরবেশ বলা যাবে না। দরবেশদের মধ্যে তার মর্তবা তওবাকারীদের মধ্যে সেই তওবাকারীর অনুরূপ হবে, যে কোন কোন গোনাহ থেকে তওবা করে এবং কোন কোন গোনাহ থেকে করে না। তবে তার দরবেশী জায়েয হবে, যেমন কোন কোন গোনাহ্ থেকে তওবা করা জায়েয। কেননা, তওবা হচ্ছে নিষিদ্ধ ও হারামকে ত্যাগ করার নাম আর দরবেশী হচ্ছে বৈধ বিষয়াদি ত্যাগ করার নাম।

মানুষ কিছু কিছু নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং কিছু কিছু ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি শুধু নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করে, সে দরবেশ নয়। দরবেশ যে বৈধ বিষয়টি ত্যাগ করবে, তা তার ক্ষমতাধীন হওয়াও শর্ত। কেননা, যে বস্তু অর্জন করার ক্ষমতা নেই, তা ত্যাগ করার কোন অর্থ হয় না। এ কারণেই হযরত ইবনে মোবারককে কেউ "হে দরবেশ" বললে তিনি বললেন ঃ দরবেশ হলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয (উমাইয়া খলীফা)। কেননা, দুনিয়া তাঁর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আগমন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছে। তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি কি বস্তু ত্যাগ করেছি যে, দরবেশ হব?

যুহদের জন্য এলম দরকার, যা থেকে হাল উৎপন্ন হয়। আর এই এলম হল একথা জানা যে, যা ত্যাগ করা হবে, তার তুলনায় প্রার্থিত বস্তু উৎকৃষ্ট। যেমন ব্যবসায়ী যখন জেনে নেয় পণ্যের তুলনায় বিনিময় উত্তম, তখনই সে পণ্য ত্যাগ করতে আগ্রহী হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জেনে নেয় যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম এবং আখেরাত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, সে আখেরাত ও আল্লাহর প্রতিই উৎসাহী হয়। অতএব, দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্যের এলম যত বেশী হবে, যুহদের আগ্রহ তত বেশী হবে। যুহদে যতটুকু এলম দরকার, তা হচ্ছে আখেরাতকে উত্তম ও অক্ষয় জানা। এটা অনেক মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা দুনিয়া ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণ বিশ্বাসের দুর্বলতা অথবা কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ থাকা অথবা শয়তানের অনুসরণ ছাড়া কিছু নয়। তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকে এবং তদবস্থায় মৃত্যু এসে তাদেরকে চেপে ধরে। তখন অনুতাপ ও অনুশোচনা ছাড়া কিছুই সঙ্গে যায় না। দুনিয়ার নিকৃষ্টতার প্রমাণ এই আয়াত قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ অর্থাৎ, বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার খুবই নগণ্য।

আর আখেরাতের উৎকৃষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ

অর্থাৎ, আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা বললেন ঃ সর্বনাশ হোক তোমাদের, ঈমানদারের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব উত্তম।

যুহদের হাল থেকে উদ্ভূত আমল হচ্ছে বর্জন করা ও অর্জন করা। অর্থাৎ, দুনিয়াকে তার সমস্ত উপকরণ ও সম্পর্কসহ এমনভাবে বর্জন করা যাতে তার মহব্বত অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে যায় এবং এবাদত ও আনুগত্যের মহব্বত অন্তরে আসন পাতে। যে বস্তু অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তা চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ থেকেও দূর হতে হবে এবং এগুলো আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যে নিয়োজিত থাকতে হবে। নতুবা শুধু দুনিয়া বর্জন করলে এমন হবে, যেমন কেউ পণ্যদ্রব্য ক্রেতার হাতে দিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যুহদের ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ -

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে উপস্থিত হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ আহা, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে, তা যদি আমাদেরকেও দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল , তারা বলল ঃ ধিক তোমাদেরকে, যে ঈমানদার, তার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াবই শ্রেষ্ঠ।

এ আয়াতে যুহদকে আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা যুহদের চূড়ান্ত প্রশংসা। আরও বলা হয়েছে—

اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, সবর করার কারণে তারা তাদের পুরস্কার দু'বার পাবে।

তাফসীরকারগণ বলেন ঃ যারা দুনিয়াতে যুহদ করতে গিয়ে সবর করেছে, আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার ফসল চায়, তাকেও দুনিয়ার কিছু অংশ দেই এবং সে আখেরাতে কিছুই পাবে না।

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

অর্থাৎ, আমি কাফেরদের কতককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জীবনের যে চাকচিক্য ভোগ করতে দিয়েছি, সেদিকে আপনি কখনও লক্ষ্য করবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযক শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী।

অন্য আয়াতে আছে ঃ

يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ, তারা আখেরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে।

এটা কাফেরদের বিশেষণ। এ থেকে জানা যায়, মুমিন সেই, যে এর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত হয়। অর্থাৎ, আখেরাতকে পছন্দ করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ বিশৃঙ্খল ও রুযী অনিশ্চিত করে দেন। সে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। তার দুনিয়া ততটুকু অর্জিত হয়, যতটুকু লিখিত আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল আখেরাতের চিন্তা করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রচেষ্টাকে সংহত এবং জীবিকাকে সুরক্ষিত রাখেন। তার অন্তর ধনী হয়ে যায় এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে তার কাছে ধরা দেয়।

এক হাদীসে আছে, যখন তোমরা কাউকে চুপ থাকতে ও দুনিয়াতে যুহদ করতে দেখ, তখন তার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর। কেননা, তাকে প্রজ্ঞা শিখানো হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ, যে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, সে অশেষ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ اَرَدْتَّ اَنْ يُحِبَّكَ اللّٰهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا

অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহর মহব্বত চাও, তবে দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন কর।

এতে যুহদকে মহব্বতের কারণ বলা হয়েছে।

আহ্‌লে বায়ত থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلزُّهْدُ وَالْوَرَعُ يَجُوْلَانِ فِي الْقُلُوْبِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَاِنْ صَادَفَا قَلْبًا فِيْهِ الْاِيْمَانُ وَالْحَيَاءُ اَقَامَا فِيْهِ وَاِلَّا ارْتَحَلَا -

অর্থাৎ, যুহদ ও পরহেযগারী মানুষের অন্তরসমূহে ঘুরাফেরা করে। যদি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঈমান ও লজ্জাশীল কোন অন্তর পায়, তবে সেখানে থেকে যায়। অন্যথায় চলে যায়।

হযরত হারেসা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ আমি নিশ্চিতই ঈমানদার। তিনি বললেন ঃ তোমার ঈমানের স্বরূপ কি? হারেসা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমি নিজেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। দুনিয়ার পাথর ও সোনা আমার কাছে সমান। আমি যেন জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে আমার রবের আরশের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই চিনেছ! এখন এর উপর কায়েম থেকো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর এই বান্দার অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত হারেসা (রাঃ) ঈমানের স্বরূপ যুহদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

এক আয়াতে অছে—

فَمَن يُرِدِ اللّٰهُ اَن يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দেন।

এই অন্তর উন্মোচনের অর্থ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ যখন নূর প্রবেশ করে, তখন তার জন্যে বক্ষ খুলে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ এর কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এর লক্ষণ হচ্ছে ধ্বংসশীল দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং মৃত্যুর পূর্বে তার প্রস্তুতি নেয়া। এখানে যুহদকে ইসলামের লক্ষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহর কাছে যথার্থ লজ্জা কর। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমরা তো আল্লাহর কাছে লজ্জা করি। তিনি বললেন ঃ না, কর না। কারণ, তোমরা এমন ঘর নির্মাণ কর, যাতে বসবাস কর না এবং এমন সামগ্রী সঞ্চয় কর, যা ভোগ কর না। এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই উভয় বিষয় আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ করার পরিপন্থী।

একবার এক স্থান থেকে একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমরা মুমিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মুমিন হওয়ার পরিচয় কি? তারা বলল ঃ বিপদে সবর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করা, আল্লাহর নির্দেশে সন্তুষ্ট থাকা এবং শত্রুর উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিপদ এলে আনন্দিত না হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ যদি তোমরা এমনি হও, তবে যা খাওয়ার নয়, তা সঞ্চয় করবে না, যে ঘর বসবাস করার নয়, তা নির্মাণ করবে না এবং যে বস্তু ত্যাগ কর, তার আগ্রহ করবে না। এই হাদীসে যুদহকে ঈমানের পরিশিষ্ট বলা হয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) খোতবায় এরশাদ করলেন ঃ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এর সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করবে না, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অন্য কিছু মিশ্রিত না করার মানে কি? এর ব্যাখ্যা করে দিন। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়াকে প্রিয় মনে করা। কিছু লোক রসূলগণের মত কথাবার্তা বলে, কিন্তু কাজ যালেম শাসকবর্গের মত। অতএব, যার মধ্যে এসব বিষয়ের কোন কিছু নেই, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্ষুধার অবস্থা দেখে আমি কান্না সামলাতে পারিনি। আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, যদি আমি আমার পরওয়ারদেগারের কাছে স্বর্ণের পাহাড় প্রার্থনা করতাম, তবে আল্লাহ আমার ইচ্ছামত স্বর্ণের পাহাড় বশীভূত করে দিতেন এবং সে আমার সাথে সাথে চলত। কিন্তু আমি দুনিয়ার ক্ষুধাকে তৃপ্তির উপর, দারিদ্র্যকে ধনাঢ্যতার উপর এবং দুঃখকে খুশীর উপর অবলম্বন করে নিয়েছি। হে আয়েশা! দুনিয়া মোহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গের জন্যে উপযুক্ত নয়। আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা বড় বড় পয়গম্বরগণের জন্যে যা পছন্দ করেছেন, আমার জন্যেও তাই পছন্দ করেছেন। যে আদেশ তাদেরকে দিয়েছেন, আমার জন্যে তাই মনোনীত করেছেন। কোরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অর্থাৎ, বড় বড় পয়গম্বরগণ যেমন সবর করেছেন, আপনিও তেমনি সবর করুন।

আল্লাহর কসম, আমি তাঁর আনুগত্য থেকে পালাতে পারি না। তাদের মত আমিও যথাসাধ্য সবর করব। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সবর করার শক্তিও নেই।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন অনেক দেশ বিজিত হল,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) পিতার খেদমতে আরয করলেন ঃ যখন দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিনিধিদল আপনার কাছে আসে তখন আপনি মিহিন বস্ত্র পরিধান করুন এবং আপনি নিজেও খান এবং অপরকেও খেতে দিন। হযরত উমর বললেন ঃ হে হাফসা, তোমার তো জানা আছে যে, স্বামীর অবস্থা তার পত্নী অধিক জানে। হযরত হাফসা বললেন ঃ হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি— তুমি কি জান না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত বছর নবী রইলেন কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ কখনও দিনের খাদ্য তৃপ্ত হয়ে খেতে পারেননি। তারা দিনে খেলে রাতে অভুক্ত থাকতেন এবং রাতে খেলে দিনে অভুক্ত থাকতেন। তুমি জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত বছর পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু খয়বর বিজিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ পেট ভরে খোরমাও খেতে পারেননি। তুমি জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কম্বল দু'ভাঁজ করে তার উপর শয়ন করতেন। এক রাত্রিতে কেউ সেটাকে চার ভাঁজ করে দিল। তিনি তার উপর খুব সুখে নিদ্রা গেলেন। অতঃপর জেগে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমাকে রাত্রি জাগরণে বাধা দিয়েছ। এখন থেকে কম্বলকে আগের মত দু'ভাঁজ করে বিছাবে। তুমি আরও জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরার কাপড় ধোয়ার জন্যে খুলতেন এবং ধুয়ে রৌদ্রে দিতেন। ইতিমধ্যে বেলাল এসে নামাযের কথা জানাত। নামাযে যাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে অন্য কাপড় থাকত না। তাই সে কাপড় শুকালেই তিনি নামাযে যেতেন। তুমি জান, বনী কুফরের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্যে দুটি চাদর, একটি লুঙ্গি ও একটি উত্তরীয় তৈরি করেছিল এবং এগুলোর মধ্যে প্রথমে একটি চাদর পাঠিয়ে দিয়েছিল। কারণ, অন্যগুলো তখনও তৈরি হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই একটি মাত্র চাদরই গায়ে জড়িয়ে নামাযে বের হলেন। চাদরের দুই প্রান্ত ঘাড়ের কাছে বেঁধে নিয়েছিলেন। কারণ, তখন তাঁর দেহে অন্য কোন কাপড় ছিল না। এভাবেই তিনি নামায পড়লেন।

মোটকথা, হযরত উমর কন্যার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুহদের অবস্থা এত বেশী বর্ণনা করলেন যে, হযরত হাফসা কাঁদতে লাগলেন এবং তিনিও সজোরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। মনে হচ্ছিল যেন এখনই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত উমরের আরও কথা বর্ণিত আছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি আরও বললেন ঃ আমার দু'জন সঙ্গী ছিলেন, যারা একই পথে গমন করেছেন। এখন যদি আমি অন্য পথে চলি, তবে অচিরেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। আল্লাহর কসম, আমি তাদের মত জীবন নিয়েই সবর করব, যাতে তাদের সাথে তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পূর্বের পয়গম্বরগণ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। তাঁরা কম্বল ছাড়া অন্য কিছু পরতেন না। উকুন দ্বারা তাদের পরীক্ষা হত। এত বেশী উকুন হত যে, তারা উকুনের জ্বালায় মরোণোন্মুখ হয়ে পড়তেন। কিন্তু এ অবস্থাই তাঁদের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। মোটকথা, আল্লাহর নবী ও রসূলগণ সাধারণ মানুষের তুলনায় আল্লাহ তা'আলাকে অধিক জানতেন এবং আখেরাতের সাফল্য সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের যুহদের অবস্থা ছিল এই, যা বর্ণিত হল।

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে— কোরআনের এই আয়াত—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا ... الخ

যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ধিক দুনিয়ার প্রতি এবং ধিক দীনার ও দেরহামের প্রতি। অর্থাৎ, টাকা-পয়সা ও আশরফীর প্রতি। এতে আমরা সবাই আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সোনা-রূপার ভাণ্ডার গড়ে তুলতে নিষেধ করেছেন। এখন আমরা কোন্ বস্তুর ভাণ্ডার গড়ে তুলব? তিনি বললেন ঃ তোমাদের এই বিষয়গুলো হাসিল করা উচিত— যিকরকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং সৎস্বভাবা স্ত্রী, যে আখেরাতের কাজে স্বামীর সহায়তা করে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—

مَنْ اٰثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ بِثَلَاثٍ هَمًّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ اَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَسْتَغْنِىْ اَبَدًا وَحِرْصًا لَا يَشْبَعُ اَبَدًا -

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বিষয়ের সাথে জড়িত করে দেন। এক, এমন চিন্তা,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যা তাঁর অন্তর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। দুই, এমন দারিদ্র্য, যা তাকে কখনও ধনী হতে দেয় না। তিন, এমন লোভ, যা তাকে কখনও পরিতৃপ্ত হতে দেয় না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ দুনিয়া একটি পুল। এটি পার হয়ে যাও। এর উপর প্রাসাদ নির্মাণ করো না। লোকেরা আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী, আপনি অনুমতি দিলে আমরা একটি গৃহ নির্মাণ করে দেই, যাতে আপনি এবাদত করবেন। তিনি বললেন ঃ যাও, পানির উপর দালান কেমন করে টিকে থাকবে?

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার আমার সামনে এই প্রস্তাব রাখেন— আপনি চাইলে মক্কার সমস্ত কংকরময় ভূমিকে আপনার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়া হবে। আমি আরয করলাম ঃ আমি চাই না; বরং আমি একদিন অভুক্ত থাকতে চাই এবং একদিন পেট পুরে খেতে চাই, যাতে যেদিন অভুক্ত থাকি, সেদিন আপনার দরবারে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করি এবং যেদিন খাই, সেদিন আপনার প্রশংসা ও হামদ করি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলের সাথে বাইরে যান। সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে জিবরাঈল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় আমার পরিবারের লোকজন এক মুঠো ছাতুও পায়নি এবং এক মুঠো আটাও পায়নি। এ কথাটি শেষ করতে না করতেই তিনি হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি বজ্রনাদ শুনতে পেলেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামতের আদেশ হয়ে গেল নাকি? জিবরাঈল আরয করলেন ঃ না! বরং আপনার কথা শুনামাত্রই ইসরাফীল (আঃ) নীচে অবতরণ করেছেন। অতঃপর ইসরাফীল খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ আপনার কথা আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন। এখন আমাকে পৃথিবীর চাবি দিয়ে পঠিয়েছেন এবং একথা আরয করতে আদেশ করেছেন যে, আপনার মরযী হলে আমি মক্কার পাহাড়সমূহকে পান্না, চুনি ও সোনা-রূপায় পরিণত করে আপনার সাথে সাথে ঘুরার ব্যবস্থা করব। আর আপনি ইচ্ছা করলে পয়গম্বর ও বাদশাহ হবেন এবং ইচ্ছা করলে পয়গম্বর ও বান্দা হবেন। জিবরাঈল ইশারা করলেন, আপনি আল্লাহর জন্যে বিনয় করুন। সেমতে রসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(সাঃ) তিনবার বললেন ঃ আমি রসূল ও বান্দা থাকব।

এক হাদীসে আছে —

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ وَّهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ فَلْيَزْهَدْ فِى الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ তাকে শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞান দান করুন এবং পথ প্রদর্শন ব্যতিরেকে সুপথ দান করুন, তার উচিত দুনিয়াতে যুহদ করা।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

مَنِ اشْتَاقَ اِلَى الْجَنَّةِ يُسَارِعُ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ لَهِىَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ تَرَكَ اللَّذَّاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِى الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيْبَاتُ -

অর্থাৎ, যে জান্নাতের আগ্রহী হয়, সে সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হয়। যে জাহান্নামকে ভয় করে, সে কুপ্রবৃত্তিসমূহ ভুলে যায়। যে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করে। আর যে দুনিয়াতে যুহদ করে, বিপদাপদ তার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, মানুষকে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ করে আখেরাতের প্রতি আগ্রহী করার জন্যেই পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা মানুষের সাথে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তার অধিকাংশই দুনিয়ার অনিষ্ট ও নিন্দা সম্বলিত ছিল। এখানে তাদের সকল হাদীস ও বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। যতটুকু বর্ণিত হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্যে তাই যথেষ্ট।

এ সম্পর্কে মনীষী জনদের উক্তিও অসংখ্য ও অগণিত। সেমতে বর্ণিত আছে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সর্বদা মানুষের উপর থেকে আল্লাহর ক্রোধকে দূরে সরিয়ে রাখে— যে পর্যন্ত মানুষ তাদের হ্রাসপ্রাপ্ত দুনিয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে পর্যন্ত দুনিয়ার বিষয়াদিকে আখেরাতের বিষয়াদির উপর প্রাধান্য না দেয়। আর যদি প্রাধান্য দেয়, এরপর মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তবে আল্লাহ বলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেবেন—তুমি মিথ্যাবাদী। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমরা সকল আমলই করেছি; কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়া থেকে যুহদ করার চেয়ে বড় আমল কোনটি পাইনি।

জনৈক সাহাবী এক তাবেঈকে বললেন ঃ তোমরা সাহাবীগণের তুলনায় আমল ও চেষ্টা বেশী কর। এতদসত্ত্বেও তারা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেউ প্রশ্ন করল ঃ এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তারা তোমাদের তুলনায় দুনিয়াতে যুহদ বেশী করতেন। বেলাল ইবনে সা'দ বলেন, আমাদের এ গোনাহ্ই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে যুহদ করতে বলেন, আর আমরা দুনিয়ার প্রতিই ঔৎসুক্য পোষণ করি।

এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান ছওরীর খেদমতে আরয করল ঃ আমি একজন আলেম ও যাহেদকে দেখার বাসনা রাখি। তিনি বললেন ঃ হতভাগা, এটা তো হৃত বস্তু, যা পাওয়া যায় না। ওয়াহব ইবনে মুনাব্বেহ্ বলেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। যখন জান্নাতীরা এসব দরজার দিকে ধাবিত হবে, তখন দারোয়ানরা বলবে— পরওয়ারদেগারের ইযযতের কসম, এসব দরজা দিয়ে যাহেদদের পূর্বে কেউ যাবে না। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনটি বিষয় কামনা করি—যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন (১) যেন আমার কাছে একটি দেরহামও না থাকে, (২) আমার উপর কোন ঋণ না থাকে এবং (৩) আমার হাড়ে যেন মাংস না থাকে। কথিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই তিনটি বাসনাই পূর্ণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, বাদশাহ একবার ফেকাহবিদ আলেমগণের কাছে কিছু পুরস্কার প্রেরণ করেন। তারা সেই পুরস্কার কবুল করে নেন; কিন্তু ফুযায়ল ইবনে আয়াযের কাছে প্রেরিত দশ হাজার দেরহাম তিনি কবুল করলেন না। এতে তার পুত্ররা আরয করল ঃ সকলেই কবুল করেছেন, আর আপনি দরিদ্রতা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এটা কেন? জওয়াবে হযরত ফুযায়ল কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক এমন, যেমন কিছু লোকের একটি বলদ ছিল, যা দ্বারা তারা হালচাষ করত। বলদটি যখন বুড়ো হয়ে হালচাষের অযোগ্য হয়ে পড়ল, তখন একদিন তারা সেটিকে যবাহ করে ফেলল। এখন দেখা যাচ্ছে, তোমরাও আমাকে যবাহ্ করতে চাও। কারণ, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বৎসগণ, বুড়ো পিতাকে যবাহ করার তুলনায় তোমাদের ক্ষুধায় মরে যাওয়া উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) পশম পরিধান করতেন এবং গাছের পাতা খেতেন। তাঁর মরে যাওয়ার মত কোন পুত্রও ছিল না এবং নষ্ট হওয়ার মত কোন গৃহও ছিল না। তিনি আগামীকালের জন্যে কিছুই রাখতেন না। যেখানে রাত হত, সেখানেই শুয়ে পড়তেন। হযরত আবু হাযেমের স্ত্রী একদিন স্বামীকে বলল ঃ এখন শীত সমাগত। তাই খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও লাকড়ী সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া উপায় নেই। তিনি বললেন ঃ এসব বস্তু ছাড়াও উপায় আছে। উপায় নেই কেবল এটি ছাড়া যে, আমরা মরব, এরপর পুনরুত্থিত হয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হব। এরপর হয় জান্নাত, না হয় দোযখ।

হযরত ইবরাহীম বলেন ঃ আমাদের অন্তরের উপর তিনটি পর্দা পড়ে রয়েছে। এগুলো দূর না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস স্পষ্ট হয় না। এক— উপস্থিত বস্তুতে তুষ্ট হওয়া, দুই— হারানো বস্তুর জন্যে দুঃখ করা এবং তিন— প্রশংসা শুনে আনন্দিত হওয়া। যে উপস্থিত বস্তুতে তুষ্ট হয়, সে লোভী। যে হারানো বস্তুর জন্যে দুঃখ করে, সে রাগী। রাগী মাত্রই শাস্তিযোগ্য। আর যে প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়, সে অহমিকা করে। অহমিকা আমলকে বাতিল করে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু আমাদেরকে দেননি, সেগুলোর অনুগ্রহ দেয়া বস্তুসমূহের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ, দেয়ার চেয়ে না দিয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন। এই উক্তিটিতে যেন নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, অথচ সে তা পছন্দ করে। যেমন তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে ক্ষতির ভয়ে পানাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

রোগীকে কুখাদ্য না দেয়ার পরিণতি হচ্ছে স্বাস্থ্য উদ্ধার, যা রোগীর কাম্য আর রোগীকে কুখাদ্য দেয়ার পরিণতি হচ্ছে রোগবৃদ্ধি, যা কারও কাম্য নয়। রোগী যদি এ বিষয়টি বুঝে, তবে সে বুঝতে পারবে, কুখাদ্য দেয়ার তুলনায় কুখাদ্য না দেয়ার আচরণটিই উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ দুনিয়া ক্ষয়শীল— অক্ষয় নয়; বিপদের আবাসস্থল— সুখের আবাসস্থল নয়। যে একে চিনে নেয়, সে এর বিস্তৃতি দেখে আনন্দিত হয় না এবং সংকোচন দেখে দুঃখিত হয় না। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ চারটি বস্তু তথা ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন এবাদতকারীর এবাদত খাঁটি হয় না।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোকদেরকে দেখেছি এবং এমন লোকদের সঙ্গ লাভ করেছি, যারা দুনিয়ার কোন কিছু লাভ করে তুষ্ট হত না এবং কোন কিছু হারিয়ে দুঃখিত হত না। দুনিয়া তাদের দৃষ্টিতে মাটির চেয়েও নিকৃষ্টতম ছিল। তাদের কেউ পঞ্চাশ ও ষাট বছর জীবন অতিবাহিত করত এভাবে যে, তাদের কোন কাপড় ভাঁজ করা হত না এবং তাদের জন্যে উনানে হাঁড়ি চড়ানো হত না, মাটিতে বিছানা করা হতো না এবং নিজ গৃহে আহার করা হতো না। রাত হলে তারা দাঁড়িয়ে যেত সেজদা করার জন্যে, অশ্রু প্রবাহিত করার জন্যে এবং মুক্তির জন্যে, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করার জন্যে। কোন পুণ্য কাজ করলে তার শোকর আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তা কবুল করার জন্যে আবেদন করত।

যুহদের স্তর ঃ যুহদের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম ও সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দুনিয়াতে যুহদ করা এবং দুনিয়ার খাহেশ ও তার প্রতি টানও রাখা; কিন্তু মোযাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে সেই টানকে দমিত রাখা। এরূপ যুহদকারীকে "মুতাযাহ্হিদ" (যুহদের ভানকারী) বলা হয়। এটা যুহদের সূচনা। এরূপ ব্যক্তি আশংকার মধ্যে থাকে। কেননা, তার খাহেশ যে কোন সময় প্রবল হয়ে যেতে পারে। ফলে, সে দুনিয়ার দিকে ফিরে যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর হল দুনিয়াকে নিজের আগ্রহে বর্জন করা। যে বস্তুর আশা করেছে, তার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করার কারণে। যেমন কেউ দু' দেরহাম পাওয়ার আশায় এক দেরহাম ছেড়ে দেয়। এরূপ ব্যক্তি নিজের যুহদকে বুঝে এবং লক্ষ্য রাখে। ফলে, সে অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ কারণে যুহদের এ স্তরটিও ক্রটিমুক্ত নয়।

তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নিজের খুশীতে যুহদ করা এবং যুহদের মধ্যেও যুহদ করা। অর্থাৎ, নিজের যুহদকে কিছুই মনে না করা। কেননা, সে দুনিয়াকে নিছক একটি অবস্তু মনে করে; যেমন কেউ মৃৎপাত্রের ভাঙা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

টুকরা দিয়ে মোতি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সে মনে করবে না যে, সে এই মোতিটি কিছু দিয়ে গ্রহণ করেছে। সে মাটির এই ভাঙ্গা টুকরার কথা কোনদিন চিন্তাও করবে না। মোতির তুলনায় মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা যেমন নগণ্য ও হেয়, আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় দুনিয়া আরও বেশী তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। সুতরাং যুহদের পরাকাষ্ঠা এই স্তরেই নিহিত। এরূপ যাহেদ কখনও দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে- এরূপ আশংকা নেই।

যুহদে যে বস্তু কাম্য হয়ে থাকে, তারও তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দোযখের আগুন, কবরের আযাব, হিসাব-নিকাশের বিপদ, পুলসিরাতের বিপদ ইত্যাদি থেকে মুক্তি কাম্য হওয়া। এরূপ কামনা নিয়ে তারা যুহদ করে, যাদের মধ্যে খওফ অর্থাৎ, ভয় প্রবল।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে যুহদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সওয়াব, পুরস্কার ও জান্নাতের অনাবিল সুখ কাম্য হওয়া। এরূপ কামনা নিয়ে তারা যুহদ করে, যাদের মধ্যে রিজা অর্থাৎ, আশা প্রবল।

তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে যুহদে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর দীদার কাম্য হওয়া এবং দোযখের কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করা, জান্নাতের হূর, প্রাসাদ ইত্যাদি সুখ-সম্ভোগের প্রতিও লক্ষ্য না থাকা। আপাদমস্তক আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমজ্জিত থাকা। সত্য বলতে কি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু কামনা না করাই হচ্ছে সত্যিকার তাওহীদ-বিশ্বাস। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু কামনা করা "শিরকে খফী" তথা গোপন শিরক। এই রকম যুহদ তারাই করে, যারা আল্লাহর আশেক ও দোস্ত। আর তারাই হচ্ছে আরেফ। কেননা, যে আল্লাহকে চিনে, সেই তাঁকে মহব্বত করে। যে ব্যক্তি দীনার ও দেরহামকে চিনে এবং একথাও যানে যে, উভয়টি এক সাথে রাখতে পারবে না, সে দীনারকেই রাখবে এবং তাকে মহব্বত করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দীনার ও দেরহামকে চিনে এবং একথাও জানে যে, আল্লাহর দীদার এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি, হূর-গেলমান, প্রাসাদ এক সাথে দেখা সম্ভবপর নয়, সে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর দীদারই কামনা করবে।

যে বস্তু থেকে যুহদ করা হয়, তার দিক দিয়েও যুহদের অনেক স্তর রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে যুহদ করা উচিত, এমনকি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজ সত্তা থেকেও যুহ্দ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নফসের উপকারী বিষয় থেকে যুহদ করা; যেমন খাহেশ, ক্রোধ, অহংকার, ক্ষমতালিপ্সা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, জাঁকজমক ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি থেকে যুহ্দ করা। চতুর্থত, জ্ঞান, সক্ষমতা, দীনার ও দেরহাম থেকে যুহদ করা। যে জ্ঞান ও সক্ষমতার দ্বারা মানুষের অন্তরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে তাই উদ্দেশ্য। বর্ণিত বিষয়সমূহ এভাবে সম্প্রসারিত করা হলে যেসব বিষয় থেকে যুহদ করতে হবে, সেগুলোর সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে এগুলোর মধ্য থেকে সাতটি উল্লেখ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী।

অন্য এক আয়াতে এগুলোকে পাঁচ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِعْلَمُوْا اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ -

অর্থাৎ, জেনে রাখ, পার্থিব জীবন হচ্ছে তামাশা, ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন ও জনের মধ্যে প্রাচুর্যের বিকাশ।

এরপর আরও এক আয়াতে এগুলোকে দু'য়ে সীমিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো কেবল তামাশা ও ক্রীড়াকৌতুক।

এরপর সবগুলোকে একের মধ্যে শামিল করে ব্যক্ত করা হয়েছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ, এবং যে নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

এখানে هوى তথা খেয়ালখুশী শব্দটি যাবতীয় জৈবিক কামনা বাসনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব, এ থেকেই যুহদ করা উচিত। বলা বাহুল্য, আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পার্থক্য শুধু এই যে, এক আয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে সংক্ষেপে। সারকথা, যুহদ হচ্ছে যাবতীয় জৈবিক কামনা-বাসনা থেকে মন তুলে নেয়া। জৈবিক বাসনা থেকে মন তুলে নিলে দুনিয়া থেকেও তুলে নেয়া হবে এবং অবশ্যই আশা-নেশাও খাটো হবে। কারণ, ভোগ-বিলাসের জন্যেই জীবন কাম্য হয়ে থাকে এবং এর জন্যেই মানুষ স্থায়িত্ব কামনা করে। যখন ভোগ-বিলাস থেকেই মন তুলে নেয়া হবে, তখন জীবনও কাম্য থাকবে না। এ কারণেই যখন প্রথম প্রথম জেহাদ ফরয করা হয়, তখন অনেকেই বলতে থাকে—

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর জেহাদ ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে আরও কিছুকাল বাঁচতে দিলেন না কেন?

জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

অর্থাৎ, হে নবী, বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অল্প দিনের।

অর্থাৎ, তোমরা তো ভোগের জন্যেই বেঁচে থাকতে চাও। জেনে রাখ, সেটা সামান্যই। এরপর যুহদকারী ও মুনাফিকদের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গেল। যারা আল্লাহর মহব্বত রাখত এবং যুহদ করত, তারা আল্লাহর পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে যুদ্ধ করল। জেহাদের ডাক এলেই তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জান্নাতের সুবাস ছড়িয়ে পড়ত এবং তারা আগুনে পতঙ্গের মত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যাতে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখতে এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তাদের কেউ বিছানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হলে শাহাদতের মর্যাদা না পাওয়ার কারণে দুঃখ ও পরিতাপের অন্ত থাকত না। ইসলামের বীর সেনানী হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ শেষ বয়সে যখন বিছানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে থাকেনঃ আমি শাহাদতপ্রাপ্তির আশায় অনেক রণাঙ্গনে কাফেরদের দুর্ভেদ্য সারিতে ঢুকে গেছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে মর্যাদা পাইনি। আজ বৃদ্ধদের মত মৃত্যুবরণ করছি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর দেহে আটশ' ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এটা ছিল সত্যিকার ঈমানদারদের অবস্থা। অপরদিকে মুনাফিকদের অবস্থা কি ছিল? তারা মৃত্যুর ভয়ে কাপুরুষের মত দল ত্যাগ করে চলে যেত। তাদেরকে বলা হত—

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

অর্থাৎ, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা তোমাদেরকে ধরবেই।

তারা জীবিত থাকাকে শাহাদতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের অবস্থা এই হল যে,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ -

অর্থাৎ, তারা ক্রয় করেছে পথভ্রষ্টতাকে হেদায়েতের বিনিময়ে। ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়নি।

খাঁটি বান্দারা তো জান্নাতপ্রাপ্তির অঙ্গীকারে নিজেদের জান ও মাল আল্লাহ তা'আলার হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা যখন দেখবে, বিশ-বাইশ বছর ভোগের বিনিময়ে অনন্ত সুখ অর্জিত হয়েছে, তখন তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না।

যুহদের সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের যে সব উক্তি বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোতে কেবল যুহদের কয়েক প্রকারই বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকেই এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রসঙ্গে হয় সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল কিছু লিখেছেন, না হয় নিজের মধ্যে যা প্রবল দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ হযরত বিশর বলেনঃ দুনিয়া থেকে যুহদ করা অর্থ হচ্ছে লোকজন থেকে যুহদ করা। এ উক্তিতে কেবল জাঁকজমক থেকে যুহদ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত কাসেম জওয়ী বলেন ঃ দুনিয়া থেকে যুহদ কেবল উদর থেকে যুহদকে বলা হয়। মানুষ যতই উদরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, ততই তার যুহদ হবে। এতে একটি খাহেশের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা অন্যান্য খাহেশ অপেক্ষা গুরুতর।

হযরত ফুযায়ল বলেনঃ দুনিয়া থেকে যুহদের উদ্দেশ্য অল্পে তুষ্ট থাকা। এতে কেবল ধন-সম্পদ থেকে যুহদ বুঝানো হয়েছে। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেনঃ যুহদ আশা ও নেশাকে খাটো করার নাম। এ উক্তিতে যাবতীয় খাহেশ অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যার আশা খাটো হয়, সে যেন সকল খাহেশ থেকে মন তুলে নেয়। হযরত ওয়ায়স বলেনঃ যুহদকারী যখন জীবিকার অন্বেষণে বের হয়, তখন তার যুহদ পণ্ড হয়ে যায়। এ উক্তিতে যুহদের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়নি; বরং তাতে তাওয়াক্কুলের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

হাদীসবিদগণ বলেনঃ দুনিয়া হচ্ছে বুদ্ধির মাধ্যমে আমল করা। আর যুহদ হচ্ছে এলেমের অনুসরণ করা এবং সুন্নতের অনুসরণকে অপরিহার্য করে নেয়া। এতে কেবল জাঁকজমকের কিছু সামগ্রীর প্রতি অথবা নিরর্থক খাহেশের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উদাহরণতঃ এমন কিছু শাস্ত্র রয়েছে, যার কোন উপকারিতা নেই। কিন্তু মানুষ সেগুলোকে এত বিস্তৃতি দিয়েছে যে, কেউ সারা জীবন তাতে ব্যাপৃত থাকলেও পূর্ণরূপে অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যুহদকারীর জন্যে প্রথমে অনর্থক বিষয় থেকে যুহদ করা প্রয়োজন।

হযরত হাসান বলেনঃ যুহদকারী সে ব্যক্তি, যে কাউকে দেখে বলে উঠে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, তাঁর মতে বিনয়ের অপর নামই যুহদ। এতে জাঁকজমক ও আত্মম্ভরিতা না থাকার প্রতি ইশারা আছে, যা যুহদের একটি প্রকার মাত্র। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেনঃ যে ব্যক্তি কষ্টে সবর করে, খাহেশ পরিত্যগ করে এবং হালাল পথে রুযী-রোযগার করে, মৌলিক যুহদ সে-ই অর্জন করতে পেরেছে।

যুহদ সম্পর্কে এমনি ধরনের আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। মনীষীগণের এরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করার কারণ এটা নয় যে, এ বিষয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল; বরং কারণ এই যে, তারা যা বর্ণনা করেছেন, প্রয়োজনের মুহূর্তেই বর্ণনা করেছেন। ফলে যে পরিমাণ প্রয়োজন দেখেছেন, সে পরিমাণই বর্ণনা করেছেন। প্রয়োজন বিভিন্নরূপ হয় বিধায় তাদের জওয়াবও বিভিন্নরূপ হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আবু সোলায়মান দারানী যা বলেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও পূর্ণাঙ্গ ও স্বরূপ প্রকাশক। তিনি বলেনঃ যুহদ সম্পর্কে আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি। আমাদের মতে যুহদ হচ্ছে আল্লাহর পথে যা কিছু অন্তরায়, তা বর্জন করা। তাঁর আরও একটি উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে অথবা হাদীস লিপিবদ্ধ করে, সে দুনিয়াপ্রবণ। এতে তিনি এসব বিষয়কে যুহদের খেলাফ ব্যক্ত করেছেন। একবার তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন—

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

অর্থাৎ, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসে।

তিনি বলেনঃ এখানে সুস্থ অন্তর অর্থ সে অন্তর যাতে আল্লাহ ছাড়া কোনকিছু নেই।

বিধানের দিক দিয়ে যুহদ তিন স্তরে বিভক্ত— ফরয, নফল ও মোস্তাহাব। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম তাই বলেন। হারাম বিষয় থেকে যুহদ করা ফরয।

অন্তরের গোপন বিষয়াদি ত্যাগ করার দিকে লক্ষ্য করলে যুহদের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কেননা, অন্তরের গোপন বিষয়াদি যেমন— কুচিন্তা, জল্পনা-কল্পনা এবং গোপন রিয়া ইত্যাদির কোন শেষ নেই; বরং বাহ্যিক বিষয়াদির মধ্যেও যুহদের স্তর অসীম। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সেই যুহদ, যা হযরত ঈসা (আঃ) অর্জন করেছিলেন। তিনি একবার মাথার নিচে পাথর রেখে শুয়েছিলেন। শয়তান এসে বললঃ আপনি তো দুনিয়া বর্জন করেছিলেন। এখন একি দেখছি? তিনি বললেনঃ তুমি আমার মধ্যে দুনিয়ার কি দেখলে? শয়তান বললঃ আপনি মাথার নিচে পাথর রেখেছেন, যাতে মাথা উঁচু থাকে এবং আপনি আরাম পান। তিনি মাথার নিচ থেকে পাথরটি বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ নিয়ে যা, এই পাথর এবং দুনিয়া উভয়টিই নিয়ে যা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সদাসর্বদা চট পরতেন। ফলে তাঁর দেহে চটের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। ত্বক আরাম পাবে—এই ভয়ে তিনি নরম পোশাক পরতেন না। তার স্নেহময়ী জননী বললেনঃ চটের পরিবর্তে পশমের জামা পর। তিনি তাই করলেন। পরক্ষণেই ওহী আগমন করলঃ হে ইয়াহইয়া, আমার উপর দুনিয়াকে পছন্দ করে নিলে? তিনি কাঁদতে কাঁদতে জামা খুলে ফেলে পূর্বের মত চটের পোশাক পরে নিলেন।

হযরত ইমাম আহমদ বলেনঃ হযরত ওয়ায়সের যুহদই ছিল যুহদ। তার উলঙ্গতার সীমা এতদূর পৌঁছেছিল যে, তিনি একটি চাটাইয়ের থলে বানিয়ে তাতে বসে থাকতেন। হযরত ঈসা (আঃ) একটি দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন। দেয়ালের মালিক তাঁকে সেখান থেকে তুলে দিল। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে তুলে দাওনি; বরং আমার জন্যে ছায়ার সুখ যার অভিপ্রেত নয়, তিনিই তুলে দিয়েছেন।

মোটকথা, ভেতর ও বাইর উভয় দিক দিয়ে যুহদের স্তর অসংখ্য। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রত্যেক সন্দেহযুক্ত ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যুহদ করা। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ হালাল বস্তু থেকে যুহদ করলেই সেটাকে যুহদ বলা হবে। সন্দিগ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যুহদ করলে সেটা যুহদের কোন স্তরে পড়ে না। বর্তমান যুগে হালালের অস্তিত্ব নেই বিধায় এখন তার মতে যুহদ অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করাই যখন যুহদ, তখন পানাহার করা, পোশাক পরা, মানুষের সাথে মেলামেশা করা ও কথাবার্তা বলার পরও যুহ্‌দ কিরূপে হবে? কেননা, এসব বিষয়ে মশগুল হওয়া তো আল্লাহ ছাড়া অন্য বিষয়ে মশগুল হওয়া। জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলাতে মশগুল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দিকে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বপ্রযত্নে মনোযোগী হওয়া। এটা জীবন ধারণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। জীবন ধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং মানুষ যদি এবাদতে দেহ দ্বারা সাহায্য নেয়ার উদ্দেশে দেহের জন্যে ক্ষতিকারক বিষয়াদিকে প্রতিহত করে, তবে একাজ দ্বারা সে গায়রুল্লাহর মধ্যে মশগুল হবে না। কেননা, যে কাজ ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয় না, সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাজও উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয়। এমনিভাবে এবাদতের উদ্দেশ্যে দেহকে ক্ষুধা, পিপাসা, উত্তাপ ও শৈত্য থেকে পানাহার, পোশাক ও বাসস্থান দ্বারা হেফাযত করাও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হবে, যদি তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। সুতরাং এসব বিষয় যুহদের পরিপন্থী নয় বরং এগুলো জরুরী।

জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে যুহদের সীমা ঃ মানুষ দু'রকম বিষয়ে মশগুল রয়েছে—প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় বিষয় যেমন পালিত ঘোড়া। মানুষ অধিকাংশ সময় আরামে সওয়ার করার জন্যে ঘোড়া রাখে, অথচ পায়ে হেঁটেও চলতে পারে। প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন আহার করা, পান করা ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিমাণ, প্রকার ও সময়ের দিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে যুহদের সীমা বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় বিষয় মোটামুটি ছয়টি—(১) অন্ন, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪), আসবাবপত্র, (৫) পরিবার-পরিজন ও (৬) ধন-সম্পদ। নিম্নে এসব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) অন্ন মানুষের জন্যে এই পরিমাণ জরুরী, যা তাকে সুস্থ ও সবল রাখে। কিন্তু এতে যুহদ অর্জন করার জন্যে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কিছুটা হ্রাস করতে হবে। দৈর্ঘ্য হচ্ছে সারা জীবনের দিক দিয়ে। কেননা, কেউ একদিনের অন্ন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। আর প্রস্থ হয় অন্নের পরিমাণ, প্রকার ও সময়ের মধ্যে। অতএব দৈর্ঘ্য হ্রাস করার উপায় হচ্ছে আশাকে খাটো করা। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে যখন তীব্র ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির আশংকা দেখা দেয়, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিমাণে আহার্য গ্রহণ করা। যে এরূপ করবে, সে দিনের খাদ্য থেকে কিছু রাতের জন্য রেখে দেবে না। এটা যুহদের সর্বোচ্চ স্তর। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে একমাস অথবা চল্লিশ দিনের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত করে রাখা। তৃতীয় স্তর হচ্ছে এক বছরের জন্যে সঞ্চিত করা। এটা দুর্বল যুহদকারীদের অবস্থা। যে ব্যক্তি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে, তাকে যুহদকারী বলা অসম্ভব। সে নিশ্চিতই দীর্ঘ আশাবাদী। হাঁ, যদি কোন পেশা না থাকে এবং মানুষের কাছে সওয়াল করতে মন না চায়, তবে এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করায় দোষ নেই; যেমন, হযরত দাউদ তায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দীনার প্রাপ্ত হয়ে তা সঞ্চয় করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাখেন এবং বিশ বছরে ব্যয় করেন। এটা তার যুহদের খেলাফ ছিল না। তবে যাদের মতে যুহদে তাওয়াক্কুল শর্ত, এটা তাদের খেলাফ।

পরিমাণের দিক দিয়ে প্রস্থ হ্রাস করার মাত্রা হচ্ছে একদিন ও একরাতের জন্যে নিম্নে এক পোয়া, মাঝারি আধাসের এবং সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ আহার করা, যা কাফ্ফারায় মিসকীনদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি এর বেশী আহার করবে, সে অতিভোজী ও উদরসেবী বলে গণ্য হবে।

প্রকারের দিক দিয়ে হ্রাসের মাত্রা হচ্ছে যে খাদ্য সুলভ, তাই আহার করা, তা ভুষির রুটি হোক না কেন। মাঝারি স্তরে যব ও বুটের রুটি আহার করা এবং সর্বোচ্চ স্তরে চালা হয়নি এমন গমের রুটি আহার করা। যে ব্যক্তি চালা গমের রুটি আহার করবে, সে যুহদের সর্বনিম্ন স্তর থেকেও খারিজ হয়ে যাবে। ব্যঞ্জনের মধ্যে নিম্নে লবণ, অথবা শাক অথবা সিরকা, মাঝারি স্তরে যয়তূনের তৈল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত বস্তু এবং উচ্চস্তরে যে কোন প্রকার গোশ্ত। এটা সপ্তাহে এক দু'বার হবে। দু'বারের বেশী হলে যুহদের কোন প্রকারেই দাখিল থাকবে না।

সময়ের দিক দিয়ে হ্রাসের মাত্রা নিম্নে রাতে ও দিনে একবার আহার করা অর্থাৎ রোযা রাখা। মাঝারি স্তরে একদিন রোযা রাখা ও রাতে না খেয়ে শুধু পানি পান করা, দ্বিতীয় দিন রোযা রেখে রাতে খাওয়া পানি পান করবে না এবং উচ্চস্তরে তিন দিন অথবা সপ্তাহের রোযা রাখা। এসব ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁরা খাদ্য ও ব্যঞ্জন হ্রাস করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যেত, যখন প্রদীপও জ্বলত না এবং আগুনও জ্বালানো হত না। কেউ প্রশ্ন করলঃ তা হলে পানাহার কেমন করে চলত? তিনি বললেনঃ দু'টি কাল বস্তু— খোরমা ও পানি দিয়ে। এখানে গোশ্ত, শোরবা, ব্যঞ্জন ইত্যাদি সবকিছুর বর্জন পাওয়া যায়। হযরত হাসান বলেনঃ রসূলে খোদা (সাঃ) গাধায় আরোহণ করতেন, পশমের বস্ত্র পরিধান করতেন, ছেঁড়া জুতা ব্যবহার করতেন এবং আহারের পর অঙ্গুলি লেহন করতেন। তিনি মাটিতে বসে আহার করতেন এবং বলতেনঃ আমি দাস এবং দাসের মতই আহার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করি এবং বসি। হযরত ফুযায়ল বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর কখনও তিন দিন পেট ভরে রুটি খাননি। হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ হে বনী ইসরাঈল, খাঁটি পানি পান কর এবং জঙ্গলের শাক ও যবের রুটি খাও—গমের রুটি থেকে বিরত থাক। তোমরা এর শোকর আদায় করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কুবাবাসীদের কাছে আগমন করেন, তখন তারা দুধে মধু মিশিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করে। তিনি পিয়ালা রেখে দেন এবং বলেনঃ আমি এটা হারাম করি না; কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ের জন্যে বর্জন করছি।

(২) বস্ত্রের মধ্যে নিম্নস্তর হল এমন পোশাক, যা উত্তাপ ও শৈত্য দূর করে এবং উলঙ্গতা নিবারণ করে। এরূপ পোশাক হচ্ছে একটি চাদর ও একটি পায়জামা। এর বেশী বস্ত্র হলে, সেটা যুহদের সীমার বাইরে। যুহদের জন্যে শর্ত এই যে, যখন কাপড় ধৌত করে, তখন দ্বিতীয় কাপড় পরিধানের জন্যে না থাকা। তখন যুহদকারী ঘরে বসে থাকবে। জামা, পায়জামা ও পাগড়ী দু'টি করে থাকলে, সেটা যুহদের সকল প্রকারের বাইরে।

পোশাকের প্রকারের মধ্যে নিম্নস্তর হচ্ছে মোটা চট, মাঝারি স্তর কম্বল এবং উচ্চস্তর মোটা সূতী বস্ত্র। এ ব্যাপারে সর্বাধিক সময় হচ্ছে এক বছর পরিধান করা যায় এমন পোশাক এবং সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে এক দিন পরিধান করা যায় এমন কাপড়। মাঝারি সময় এমন পোশাক, যা এক মাস অথবা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পরা যায়। সুতরাং এক বছরের বেশী টিকে এমন কাপড় তালাশ করা যুহদের পরিপন্থী। কেউ এই পরিমাণের বেশী কাপড় পেলে সে অন্যকে দিয়ে দেবে। কেননা, রেখে দিলে যুহদ বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারেও পয়গম্বর এবং সাহাবায়ে কেরামেরও তরীকার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) বলেনঃ হযরত আয়েশা আমাকে একটি চাদর ও একটি মোটা বস্ত্র দেখিয়ে বললেনঃ এ দু'টি বস্ত্রেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়েছে।

একবার হযরত আমর ইবনে আসওয়াদ বললেনঃ আমি কখনও খ্যাতির বস্ত্র পরিধান করব না, কখনও রাতে বিছিয়ে শুব না, কখনও উৎকৃষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সওয়ারীতে সওয়ার হব না এবং কখনও পেটপুরে আহার করব না। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর তরীকা দেখতে পছন্দ করে, সে আমর ইবনে আসওয়াদকে দেখুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক বস্ত্র ক্রয় করেন, যার মূল্য ছিল চার দেরহাম। তাঁর বস্ত্র জোড়াটি ছিল দশ দেরহামের। তাঁর লুঙ্গি দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার হাত ছিল। মাঝে মাঝে তিনি দু'টি এয়ামনী মোটা চাদর পরিধান করতেন, যার নাম ছিল হুল্লা। তিনি তিন দেরহাম দিয়ে পায়জামা খরিদ করেছেন। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি হলদে রেখাবিশিষ্ট রেশমী চাদর পরিধান করেন, যার মূল্য ছিল দু'শ' দেরহাম। সাহাবায়ে কেরাম এসে চাদরটি স্পর্শ করতেন এবং অবাক হয়ে বলতেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটি আপনার কাছে জান্নাত থেকে এসেছে। অথচ সেটি আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস তাঁর জন্য হাদিয়ারূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনার্থে চাদরটি পরিধান করেন। এরপর খুলে জনৈক মুশরিকের কাছে প্রতিদানস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার পর তিনি পুরুষদের জন্যে রেশমী বস্ত্র হারাম ঘোষণা করেন। এমনিভাবে তিনি একদিন সোনার আংটি পরিধান করেন এবং পরক্ষণেই খুলে ফেলেন। অতঃপর পুরুষদের জন্যে তা হারাম ঘোষণা করেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার বললেনঃ আকাশের ফেরেশতারা আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতি দেখে বাহ্যত হাসে; কিন্তু গোপনে আযাবের ভয়ে কাঁদে। তাদের বোঝা অন্যের উপর হালকা এবং নিজেদের উপর ভারী। তারা ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করে এবং দুনিয়াত্যাগী দরবেশদের অনুসরণ করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে থাকলেও অন্তর আরশের নিকটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন—যদি তুমি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে ধনীদের কাছে বসা থেকে বিরত থাকবে এবং তালি না লাগা পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বর্জন করবে না। হযরত ওমরের কাপড়ে বারটি তালি ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ছিল চামড়ার। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেনঃ পোশাক এমন হওয়া উচিত, যা বিজ্ঞজনদের কাছে খ্যাতি নয় এবং সাধারণ লোকের কাছে ঘৃণার নয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি সুফিয়ান ছওরীর পোশাকের মূল্য এক দেরহাম অপেক্ষা কিছু বেশী অনুমান করেছি। ইবনে শায়বা বলেন ঃ আমার কাপড়সমূহের মধ্যে সেটি উত্তম, যেটি আমার খেদমত করে, আর মন্দ কাপড় সেগুলো, যেগুলোর খেদমত আমি করি। আবু সোলায়মান দারানী বলেনঃ কাপড় তিনটি—এক, আল্লাহর ওয়াস্তে যা দ্বারা উলঙ্গতা নিবারণ হয়। দুই, নফসের জন্যে, যার কোমলতা কাম্য হয় এবং তিন, মানুষের জন্যে, যার সৌন্দর্য উদ্দেশ্য হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ যার কাপড় পাতলা, তার ধর্মও পাতলা। আরও এক বুযুর্গ বলেনঃ প্রথম যুহদ পোশাকের যুহদ।

হাদীসে আছে اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, পোশাকের পুরানত্ব ঈমানের অঙ্গ। মিসরের শাসনকর্তা ফুযালা ইবনে ওবায়দের মাথার চুল বিক্ষিপ্ত এবং মাথা খালি দেখে এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনি একজন নেতা হয়ে এমন করেন কেন? তিনি বললেনঃ রসূলে আকরাম (রাঃ) আমাদেরকে আরাম করতে নিষেধ করেছেন এবং কখনও খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুরূপ পোশাক পরে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা রঙ-বেরঙের খাদ্য ও পোশাকের চিন্তায় থাকে।

(৩) বাসস্থানে যুহদ করারও তিনটি স্তর রয়েছে। উৎকৃষ্ট স্তর হচ্ছে কোন স্থান নিজের জন্যে তালাশ না করা; বরং আসহাবে সুফফার ন্যায় মসজিদের কোণে পড়ে থেকে তুষ্ট থাকা। মাঝারি স্তর হচ্ছে খড় ও ছনের কুঁড়েঘর তৈরী করে নেয়া। নিম্নস্তর হচ্ছে কোন বিশেষ কক্ষ তৈরী করে অথবা ভাড়া করে তাতে বসবাস করা। এরূপ কক্ষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় না হলে এবং তাতে সাজসজ্জা না থাকলে যুহদ বহির্ভূত হবে না।

মোটকথা, যে বস্তু প্রয়োজনের জন্যে কাম্য হবে, তার সীমা যেন প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে না যায়। দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণই ধর্মের সহায়ক। যে পরিমাণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে, সে পরিমাণই ধর্মের খেলাফ। বাসস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে রোদ, বৃষ্টি ও শৈত্য থেকে আত্মরক্ষা। কতটুকুর দ্বারা এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তা জানা, এর বেশী অপ্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপ্রয়োজনীয় বস্তু অন্বেষণ করে, সে নিশ্চিতই যুহদ থেকে দূরে অবস্থান করে।

হযরত হাসান বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত কোন ইটের উপর ইট রাখেননি। অর্থাৎ, কোন প্রকার গৃহ নির্মাণ করেননি। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অকল্যাণ চান, তার ধন-সম্পদ চুনা, বালি ও মাটির কাদায় বরবাদ করেন। হযরত নূহ (আঃ) একটি ঘর নির্মাণ করলে কেউ এসে আরয করলঃ ঘরটি পাকা হলেই তো ভাল হত। তিনি বললেনঃ যে মারা যাবে, তার জন্যে এটাই অনেক। হযরত হাসান বলেনঃ আমরা সাফওয়ান ইবনে মুহায়রিযের খেদমতে গেলাম। তিনি একটি বাঁশ নির্মিত ঘরে ছিলেন এবং ঘরটি নুয়ে পড়েছিল। আমাদের একজন বললঃ ঘরটি মেরামত করে নিলে ভাল হত। তিনি বললেনঃ অনেক মানুষ এ ঘরে থেকে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি।

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক খরচের জন্যে মানুষ সওয়াব পায়; কিন্তু পানি ও কাদাতে যা খরচ করা হয়, তাতে কোন সওয়াব হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে—

كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَا اَمْكَنَ مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে; কিন্তু যা উত্তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে (তা নয়)।

সিরিয়া যাবার পথে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) চুনা ও ইট নির্মিত একটি প্রাসাদ দেখেন। তিনি বলে উঠেনঃ আল্লাহু আকবার। আমার ধারণা ছিল না যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি হবে, যে হামানের মত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করবে। কথিত আছে, সর্বপ্রথম যার জন্যে চুনা ও ইটের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়, সে ছিল ফেরাউন। তার হুকুমেই হামান এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। এরপর তারই অনুসরণ করে অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করে।

জনৈক বুযুর্গ এক শহরে একটি জামে মসজিদ দেখে বললেন, আমি এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মসজিদটি খেজুরের শাখা দিয়ে নির্মিত দেখেছি, এরপর কাঁচা মাটির চাঁই দ্বারা নির্মিত দেখেছি। আর এখন পাকা ইট দ্বারা নির্মিত দেখছি। যারা প্রথমে এটি নির্মাণ করেছিল, তারা দ্বিতীয় নির্মাণকারীদের তুলনায় উত্তম ছিল। আর দ্বিতীয়বার যারা নির্মাণ করেছে, তারা তৃতীয়বার নির্মাণকারীদের তুলনায় ভাল ছিল। পূর্ববর্তীদের মধ্যে কিছু লোক তাদের বাসগৃহ জীবনে কয়েক বার তৈরী করতেন। কারণ, তাদের বাসগৃহ খুব দুর্বল হত এবং তারা নিজেরা আশা খাটো রাখতেন। কেউ কেউ হজ্জ অথবা জেহাদে চলে যাওয়ার সময় ঘর ভেঙ্গে রেখে যেতেন অথবা কাউকে দান করে যেতেন। আবার ফিরে এলে নতুন ঘর তৈরী করে নিতেন। তাদের ঘর ছিল ঘাস ও চর্ম নির্মিত। আজ পর্যন্ত আরবদের মধ্যে এ অভ্যাস বিদ্যমান আছে। তাদের ঘরের উচ্চতা ছিল একজন মানুষের মাথার উপর অর্ধ হাত। হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করতাম, তখন হাত দিয়ে ছাদ স্পর্শ করতাম।

আমর ইবনে দীনার বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি ছয় হাতের উপরে উঁচু করে ঘর নির্মাণ করে, তখন এক ফেরেশতা তাকে ডেকে বলে ঃ হে নরাধম, আর কত উঁচু করবি? হযরত সুফিয়ান ছওরী মযবুত দালান দেখতে নিষেধ করেছেন। কারণ, কেউ না দেখলে এরূপ দালান নির্মিত হত না। সুতরাং যে তাকিয়ে থাকে, সে যেন নির্মাণকারীর সাহায্য করে। হযরত ফুযায়ল বলেনঃ আমি সে ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত হই না, যে দালান তৈরী করে এবং তা রেখে মারা যায়। বরং আমার বিস্ময় তাদের জন্যে, যারা এ দালানটি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। হযরত ইবনে মসঊদ বলেনঃ এক সম্প্রদায় আসবে, যারা দালানকে উঁচু করবে এবং ধর্মকে নীচু।

(৪) আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও যুহদের অনেক স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল একটি চিরুনি ও পানি রাখার একটি মৃৎপাত্র সঙ্গে রাখতেন। একদিন এক ব্যক্তিকে নদীতে পানি পান করতে দেখে তিনি মৃৎপাত্রটিরও প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং সেটি ফেলে দেন।

মাঝারি স্তর হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণে আসবাবপত্র থাকা। কিন্তু এক বস্তু দ্বারা একাধিক কাজ নিতে হবে। উদাহরণতঃ পিয়ালা থাকলে তাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খাবে এবং তা দিয়ে পানি পান করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ একই পাত্রকে কয়েক কাজে ব্যবহার করাকে উত্তম মনে করতেন। যদি গণনায় আসবাবপত্রের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়, তবে তা যুহদের সকল স্তর থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও রসূলে আকরাম (আঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ করা দরকার। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার গদী। ভেতরে খেজুর গাছের ছোবড়া ভর্তি ছিল। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিছানা হয় দু'ভাঁজ করা কম্বল হত, না হয় খেজুরের ছোবড়া ভর্তি চামড়ার গদী।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। তিনি তখন খেজুরের ছোবড়ার রশি দিয়ে তৈরী খাটে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসলে ওমর (রাঃ) তাঁর পিঠে রশির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে খাত্তাব পুত্র, তোমার চোখে পানি কেন? হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমি রোম ও পারস্য সম্রাটদের কথা ভাবছি, তাদের কাছে অগণিত ধন-দৌলত স্তূপীকৃত রয়েছে। আর আপনার কথাও ভাবছি। আপনি আল্লাহর হাবীব ও মনোনীত রসূল। আপনি কিনা এই মোটা রশির খাটে শয়ন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর না যে, তাদের জন্যে দুনিয়া হোক আর আমাদের জন্যে আখেরাত?

এক ব্যক্তি হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। এরপর আরয করল ঃ আপনার ঘরে তো কোন আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন ঃ আরও একটি ঘর আছে। ভাল আসবাবপত্র আমি সেখানে পাঠিয়ে দেই। লোকটি বলল ঃ আপনি যতদিন এখানে থাকেন, ততদিন এখানেও কিছু আসবাবপত্র থাকা দরকার। আবু যর বললেন ঃ ঘরের মালিক আমাকে এ ঘরে থাকতে দেবেন না।

রসূলে আকরাম (রাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে আদরের দুলালী হযরত ফাতেমার ঘরে যেতে চাইলেন। তাঁর ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানো ছিল এবং তাঁর হাতে রুপার চুড়ি ছিল। তিনি এসব দেখে সেখান থেকেই ফিরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এলেন। তখন আবু রাফে হযরত ফাতেমার কাছে গেলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফিরে যাওয়ার কথা বললেন। অতঃপর আবু রাফে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ পর্দা এবং চুড়ি দেখে ফিরে এসেছি। অতঃপর হযরত ফাতেমা চুড়ি জোড়াটি হযরত বেলালের হাতে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলো বিক্রি করে তার মূল্য আসহাবে সুফ্‌ফাকে দিয়ে দাও। হযরত বেলাল আড়াই দেরহামে সেগুলো বিক্রয় করে মূল্য সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কন্যার ঘরে গমন করলেন।

একরাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে নতুন বিছানা পাতেন। এর আগে তিনি কম্বল দু'ভাঁজ করে তার উপর শয়ন করতেন। সে রাতে তিনি সকাল পর্যন্ত বিনিদ্র অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করে কাটান। ভোর হলে হযরত আয়েশাকে বললেন ঃ এ শয্যা সরিয়ে নাও এবং পুরনো কম্বল বিছিয়ে দাও। এটি সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয়নি।

এমনিভাবে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রাতের বেলায় পাঁচটি অথবা ছয়টি দেরহাম আগমন করল। তিনি সেগুলো থাকতে দিলেন; কিন্তু তাঁর ঘুম এল না। অবশেষে তিনি সেগুলো বিলিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা বলেন ঃ তখন তিনি ঘুমালেন এবং আমি তাঁর নাসিকাধ্বনি শুনতে পেলাম। নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি বললেন ঃ যদি এই দেরহামগুলো আমার কাছে থেকে যেত এবং আমার ওফাত হয়ে যেত, তবে আমার প্রতি আল্লাহর কি ধারণা হত? হযরত হাসান বলেন, আমি সত্তরজন দরবেশকে দেখেছি, যাদের কাছে একটি কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের কেউ মাটিতে কোন কাপড় বিছায়নি। যখন ঘুমুতে চেয়েছে, মাটিতে দেহ লাগিয়ে উপরে কাপড় রেখে নিজেকে আবৃত করে নিয়েছে।

(৫) পঞ্চম প্রয়োজন বিবাহ সম্পর্কে কিছু লোকের মত এই যে, মূল বিবাহ এবং বহু বিবাহের মধ্যে যুহদ বলতে কিছু নেই। এটাই সহল তস্তরীর উক্তি। তিনি বলেন ঃ যাহেদকুল শিরমণি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যখন মহিলাদের পছন্দ করতেন, তখন তাদের ব্যাপারে আমরা কেমন করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যুহদ করতে পারি। এ মতের সপক্ষে হযরত ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে অধিকতর যুহদকারী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর চার স্ত্রী এবং দশজনের অধিক বাঁদী ছিল। এ প্রসঙ্গে সোলায়মান দারানীর উক্তি বিশুদ্ধ। তিনি বলেন ঃ যা কিছু আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে— স্ত্রী হোক অথবা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি—সবই মানুষের জন্যে খারাপ। মাঝে মাঝে মহিলাও আল্লাহ থেকে বাধা দেয়। সেজন্যেই কোন কোন অবস্থায় অবিবাহিত থাকাই উত্তম। তখন বিবাহ না করা যুহদের মধ্যে গণ্য। যে ক্ষেত্রে কাম-প্রবৃত্তি দমন করার জন্যে বিবাহ উত্তম, সেখানে তো বিবাহ ওয়াজিব। সেখানে বিবাহ বর্জন করা কেমন যুহদ হতে পারে? হাঁ, যদি বিবাহ না করার মধ্যে কোন বিপদ না থাকে এবং করলেও কোন দোষ হয় না, তবে আল্লাহর মহব্বতকে ক্রুটি থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ বর্জন করা যুহদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব যদি জানা যায়, মহিলা আল্লাহ্র পথে বাধা নয়, এরপরও কেবল দৃষ্টির স্বাদ ও সহবাসের আনন্দ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যদি কেউ বিবাহ বর্জন করে, তবে তা যুহদ নয়। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ, যা প্রজন্ম রক্ষা ও উম্মতে মোহাম্মদী বৃদ্ধি করায় সহায়ক ও সওয়াবের কারণ। এতে যে আনন্দ অর্জিত হয়, তা অপরিহার্য ও জরুরী। এটা যদি আসল উদ্দেশ্য না হয়, তবে ক্ষতিকর নয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ স্বাদ ও আনন্দ লাভ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রুটি খাওয়া ও পানি পান করা বর্জন করে, তবে তা যুহদ নয়। কেননা, এটা আত্মহত্যার শামিল। এমনিভাবে বিবাহ বর্জন করলে নিজের প্রজন্ম কর্তন করা হয়। সুতরাং কেবল আনন্দ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিবাহ বর্জন করা অনুচিত যে পর্যন্ত অন্য কোন বিপদের আশংকা না থাকে। সহল তস্তরীর উদ্দেশ্য তাই এবং একারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবাহ করেছিলেন। বহু বিবাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করত না। এখন কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এরূপ হয়, তবে তার কেবল সহবাসের আনন্দ থেকে বাঁচার জন্যে বিবাহ বর্জন করা কোন ফলপ্রসূ যুহদ নয়। কিন্তু পয়গম্বর ও ওলীগণ ছাড়া এরূপ অবস্থা কার হতে পারে? এখন তো অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, রমণীদের আধিক্য তাদের মনকে বিমুখ করে দেয়। কাজেই এখন বিবাহ না করাই সমীচীন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে মহিলা মর্যাদাহীন অথবা এতীম, তাকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বিবাহ করবে। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ আমার পছন্দ মতে মুরীদ প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিষয়ে মন লাগাবে না। নতুবা তার হাল বদলে যাবে। প্রথম পেশা, দ্বিতীয় হাদীস সংগ্রহ এবং তৃতীয় বিবাহ।

(৬) ষষ্ঠ প্রয়োজন ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি, যা উপরোক্ত পাঁচটি প্রয়োজন পূরণ করার উপায়। প্রতিপত্তির অর্থ হচ্ছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া, যাতে এর মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কর্মে ব্যবহার করা যায়। যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করতে পারে না এবং অপরের খেদমতের মুখাপেক্ষী, তার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি খেদমতকারীর অন্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রতিপত্তির সূচনা নিঃসন্দেহে সৎ ও সাধু। কিন্তু পরিণামে এটা মানুষকে বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, কাজলের কক্ষে প্রবেশ করলে দাগ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মানুষের অন্তরে স্থান করা কোন উপকার লাভের উদ্দেশে হবে, অথবা ক্ষতি দূরীকরণের উদ্দেশে অথবা কারও যুলুম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে হবে। ধন-সম্পদের উপস্থিতিতে উপকার লাভের প্রয়োজন নেই। কেননা, পারিশ্রমিক নিয়ে যে খেদমত করে, সে খেদমত করবেই অন্তরে প্রভুর মান-মর্যাদা থাক বা না থাক। হাঁ, যে ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে খেদমত করে, তার অন্তরে স্থান করার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষতি দূরীকরণের উদ্দেশে প্রতিপত্তির প্রয়োজন এমন শহরে হয়, যেখানে ন্যায় বিচারের অভাব থাকে অথবা এমন প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস করে, যারা তাকে জ্বালাতন করে এবং সে তাদের অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম হয় না।

প্রতিপত্তির পথে যারা চলে, তারা ধ্বংসের পথের পথিক। যুহদকারীর উচিত কখনও অন্তরে স্থান করার প্রয়াসী না হওয়া। কারণ, তার অন্তর এবাদত ও ধর্মকর্মে নিয়োজিত থাকে। এতেই মানুষের অন্তরে কষ্ট না পাওয়ার মত স্থান হয়ে যাবে— যদিও সে কাফেরদের মধ্যে অবস্থান করে।

সারকথা, অন্তরে স্থান করার প্রয়াস চালানোর অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। এর অল্প পরিমাণ অধিক পরিমাণের দিকে টেনে নেয় এবং তার অভ্যাস মদের অভ্যাসের চেয়েও কঠোরতর। অতএব, এর অল্প ও বেশী সবকিছু থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধন-সম্পদ জীবনের জন্যে জরুরী। কিন্তু সামান্য ধন-সম্পদই যথেষ্ট। যদি কোন ব্যক্তি পেশাদার হয়, হবে একদিনের প্রয়োজন পরিমাণে ধন অর্জিত হয়ে গেলে কাজ না করা উচিত। এটা যুহদের জন্যে শর্ত। যদি কেউ এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে ধন উপার্জন করে, তবে যুহদকারীদের ছোট-বড় কোন কাতারেই থাকবে না। যদি কারও কাছে ভূখণ্ড থাকে এবং সে তাওয়াক্কুলে অধিক বিশ্বাসী না হয়, তবে উৎপন্ন ফসল এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে রাখা যুহদ বহির্ভূত হবে না— যদি সে অতিরিক্ত ফসল সদকা করে দেয়। তবে এরূপ ব্যক্তি দুর্বল যুহদকারী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে রেশমের পোকার মত। রেশমের পোকা প্রথমে নিজের উপর রেশমের জাল বুনে, এরপর জালের ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে চায়; কিন্তু কোন পথ খুঁজে পায় না। ফলে সেখানেই মরে যায়। এভাবে সে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়। এমনি ভাবে যে দুনিয়ার কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, সে নিজের অন্তরকে শৃঙ্খল পরায়। অর্থ, যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন প্রভৃতি হচ্ছে আলাদা আলাদা শৃঙ্খল। এরপর যদি সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং এগুলোর বেড়াজাল থেকে বের হতে চায়, তবে বের হতে পারে না। কেননা, এসব শৃঙ্খল ছিন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এমনি অবস্থায় মালাকুল মওত এসে তাকে যাবতীয় প্রিয় বস্তু থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখন তার অবস্থা হয় অত্যন্ত করুণ। একদিকে তার অন্তর থাকে দুনিয়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আর মালাকুল মওতের থাবা তার অন্তরের শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়ে আখেরাতের দিকে টানতে থাকে এবং অপরদিকে দুনিয়ার শিকলগুলো তাকে দুনিয়ার দিকে সজোরে টানতে থাকে। মাঝখানে পড়ে তার অবস্থা এমন হয়, যেমন কোন ব্যক্তির দেহের অর্ধাংশকে করাত দিয়ে চিরার পর দু'দিক থেকে দু'ব্যক্তি ধরে সজোরে টান দেয় এবং পৃথক করে ফেলে।

আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে সে বিষয়টিই ঢুকিয়ে দেন, যা রসূলে করীম (সাঃ)-এর অন্তরে অবস্থান করেছিল। অর্থাৎ, তাঁকে বলা হয়েছিল—

أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আপনি যাকে ইচ্ছা মহব্বত করুন, তবে জেনে রাখুন, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহর ওলীগণ জানতে পেরেছেন যে, মানুষ নিজের খাহেশ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজেকে রেশমের পোকার মত ধ্বংস করে। সে কারণেই তারা দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি বদর যোদ্ধাদের সত্তরজনকে এমন দেখেছি, যারা হালাল বস্তুসমূহে এতটুকু যুহদ করতেন, যতটুকু তোমরা হারাম বস্তুতেও কর না। তোমরা তাদেরকে দেখলে পাগল মনে করতে, আর তারা তোমাদের কোন সাধু ব্যক্তিকে দেখলে বলতেন, ধর্ম-কর্মে তার কোন অংশ নেই। তোমাদের কোন অসৎ লোককে দেখলে বলতেন যে, সে কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না। তাদের সামনে হালাল ধন-সম্পদ পেশ করা হলেও তারা তা গ্রহণ করতেন না। বলতেন ঃ এটা গ্রহণ করলে আমার অন্তর বিগড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

দুনিয়ার মহব্বত যাদের অন্তরকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غَافِلُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রশান্ত, আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফেল।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا -

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। সীমালঙ্ঘনই হচ্ছে তার কাজ।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -

অর্থাৎ, অতএব মুখ ফিরিয়ে নিন সে ব্যক্তি থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই চায় না। এটাই তার বিদ্যার দৌড়।

এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের এই পার্থিব জীবনে ডুবে থাকার কারণ হচ্ছে গাফলতি ও অজ্ঞতা।

যুহদের আলামত ঃ কখনও এরূপ ধারণা হয় যে, ধন-দৌলত বর্জন করলেই যুহদ হবে অথচ বাস্তবে তা নয়। কেননা, যে ব্যক্তি যুহদের উপর মানুষের প্রশংসাকে ভাল মনে করে, তার পক্ষে ধন-সম্পদ বর্জন করা খুবই সহজ। সুতরাং শুধু ধন-দৌলত বর্জন যুহদের অকাট্য প্রমাণ নয়। বরং এর জন্যে ধন ও লোক-প্রশংসা উভয়টি বর্জন করা জরুরী।

সত্য বলতে কি, যুহদ চেনা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং যুহদকারীর কাছেও তার যুহদ সন্দিগ্ধ থাকে। অতএব, যুহদকারীর উচিত নিজের মধ্যে তিনটি আলামতের উপর ভরসা করা। যুহদের প্রথম লক্ষণ হল উপস্থিত বস্তুর জন্যে আনন্দিত না হওয়া এবং যা হাতছাড়া হয়ে যায় তার জন্যে দুঃখ না করা।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ -

অর্থাৎ, তোমাদের হাতে যা আসেনি, তার জন্যে দুঃখ করো না এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লসিত হয়ো না; বরং এর বিপরীত হওয়া উচিত অর্থাৎ, হাতে ধন এলে দুঃখিত হওয়া এবং ধন না এলে আনন্দিত হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় পরিচয় এই যে, যুহদকারীর কাছে নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারী উভয়ই সমান হবে। এটা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যুহদ করার আলামত— যেমন, প্রথমটি ধন-দৌলতে যুহদ করার লক্ষণ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় আলামত হল, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকর্ষণ থাকা। অন্তরে তাঁর আনুগত্যের মিষ্টতা প্রবল থাকা। কেননা, অন্তর মহব্বতশূন্য থাকে না, তা দুনিয়ার মহব্বত হোক অথবা আল্লাহ তা'আলার মহব্বত। অন্তরে এই উভয় প্রকার মহব্বতের অবস্থা গ্লাসে পানি ও বায়ুর অবস্থার মত। গ্লাসে যখন পানি ঢেলে দেয়া হয়, তখন তার ভেতর থেকে বায়ু বের হয়ে যায়। পানি ও বায়ু একত্রে গ্লাসে থাকে না। যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী, সে তাতেই নিমগ্ন থাকে—অন্য কিছুতে মশগুল হয় না। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গকে যখন প্রশ্ন করা হল, যুহদ যুহদকারীকে কোথায় পৌঁছায়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে নিমগ্নতায়। আল্লাহর প্রতি টান ও দুনিয়ার প্রতি টান উভয়টি একত্রিত হতে পারে না। সেমতে মারেফতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বলেন, যখন ঈমান বাহ্যিক অন্তরে থাকে, তখন মুমিন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে মহব্বত করে এবং উভয়ের জন্যে কাজ করে। আর যখন ঈমান অন্তরের কাল বিন্দুতে থাকতে শুরু করে, তখন সে দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তার কাজও করে না।

যুহদকারীর জন্যে দু'টি মকামের মধ্য থেকে একটিতে থাকা জরুরী। প্রথম মকাম এই যে, সে নিজের মধ্যে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকবে যে, তার কাছে প্রশংসা ও নিন্দা, ধনাঢ্যতা ও নিঃস্বতা সমান হবে। এই অবস্থায় সামান্য ধন-সম্পদ রাখার কারণে তার যুহদ বিনষ্ট হবে না। ইবনে আবুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মানকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত দাউদ তায়ী যাহেদ ছিলেন কিনা? তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দীনার পেয়ে তা বিশ বছরে ব্যয় করেছিলেন। আবু সোলায়মান বললেন ঃ তিনি অবশ্যই যাহেদ ছিলেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন বস্তু সক্ষমতা সত্ত্বেও কেবল মন ও ধর্মের ভয়ে বর্জন করবে, সে যুহদের সে পরিমাণ অংশই পাবে। আর যুহদের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করা, এমনকি পাথরের উপরও মাথা না রাখা, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) করেছিলেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদেরকে অন্তত যুহদের প্রাথমিক স্তর নসীব করেন। চূড়ান্ত স্তরসমূহের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লোভ করা আমদের মত লোকদের জন্যে কেমন করে সম্ভবপর?

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, যুহদের আলামত হচ্ছে দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, সম্মান, অপমান এবং প্রশংসা ও নিন্দা সমান হওয়া। এখন জানা দরকার এর আরও অনেক প্রাসঙ্গিক লক্ষণও রয়েছে; যেমন দুনিয়াকে এমনভাবে বর্জন করা যে, সেটা কোথায় গেল, কার কাছে গেল, তার কোন পরওয়া না করা। কারও কারও মতে যুহদের আলামত হচ্ছে দুনিয়াকে যেমন-তেমনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং এরূপ না বলা যে, সরাইখানা তৈরী করা হবে অথবা মসজিদ নির্মাণ করা হবে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যুহদের আলামত উপস্থিত বস্তু দান করে দেয়া। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সকল মন্দকে এক কক্ষে বন্ধ করেছেন এবং দুনিয়ার মহব্বতকে এর চাবি করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি সকল কল্যাণকে এক কক্ষে বন্ধ করে যুহদকে তার চাবি করেছেন।

তাওয়াক্কুল ব্যতিরেকে যুহদ পূর্ণতা লাভ করে না। তাই অতঃপর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম অধ্যায়

দুনিয়ার নিন্দা

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়া আল্লাহর শত্রু, তাঁর ওলীগণের শত্রু এবং তাঁর শত্রুদেরও শত্রু। আল্লাহর শত্রু এ কারণে যে, সে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে চলতে দেয় না; রাহাজানি করে। এ কারণেই যখন থেকে আল্লাহ দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, তার দিকে কখনও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেননি।

দুনিয়া আল্লাহর ওলীগণের শত্রু এ কারণে যে, সে তাদের সামনে খুব সজ্জিত ও চাকচিক্যময় হয়ে আসে এবং নিজের আলেয়া প্রদর্শন করে, যাতে তারা কোনরূপে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তাদেরকে প্রাণান্তকর সাধনা করতে হয়।

দুনিয়া আল্লাহর শত্রুদের শত্রু এ কারণে যে, সে তাদেরকে ধাপে ধাপে নিজের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে নেয়। অবশেষে তারা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে তাদেরকে এমন কাঙ্গাল করে ছাড়ে যে, দুঃখ ও অনুতাপ ছাড়া কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারে না। তারা চিরস্থায়ী সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। দুনিয়ার বিরহ জ্বালার সাথে সাথে আখেরাতের নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ফরিয়াদ করলে এই জওয়াব শুনবে اِخْسَؤُا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ অর্থাৎ, জাহান্নামে থেকে লাঞ্ছিত হও এবং কোন কথা বলো না।

তারা হবে এই আয়াতের প্রতীক—

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

অর্থাৎ, তারাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

দুনিয়ার আপদ-বিপদ ও নষ্টামির যখন এই অবস্থা, তখন প্রথমে দুনিয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাকে বলে, তা চিনা নেহায়েত জরুরী। এ ছাড়া দুনিয়াকে সৃষ্টি করার রহস্য, তার প্রতারণা ও অনিষ্টের পথগুলো জানা অত্যাবশ্যক। নিম্নে আমরা এসব বিষয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে সচেষ্ট হব।

কোরআন মজীদে দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত আয়াত অনেক। অধিকাংশ আয়াতে মানুষকে দুনিয়ার দিক থেকে চোখ বন্ধ করে আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যও কেবল এটাই। এদিক দিয়ে আল্লাহর কালাম থেকে সনদ পেশ করার প্রয়োজন নেই। নিম্নে কেবল এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার একটি মৃত ছাগলের কাছ দিয়ে যাবার সময় সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ এই ছাগল তার মালিকের কাছে ঘৃণিত নয় কি? তারা আরয করলেন ঃ ঘৃণিত না হলে কি এখানে ফেলে দিয়েছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, দুনিয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ছাগলের চেয়েও অধিক ঘৃণিত। যদি দুনিয়া আল্লাহর কাছে একটি মাছির পালকের মত হতও তাহলেও ভাল হত, তবে কাফের এ থেকে এক চুমুক পানিও পেত না।

অন্য হাদীসে আছে— اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ لِلْكَافِرِ অর্থাৎ, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত।

আরও বলা হয়েছে—

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَافِيْهَا اِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ مِنْهَا -

অর্থাৎ, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে, সেগুলোও অভিশপ্ত; কিন্তু যা আল্লাহর জন্যে, তা স্বতন্ত্র।

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের দুনিয়াকে মহব্বত করে, সে তার আখেরাতের ক্ষতি করে এবং যে আখেরাতকে ভালবাসে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপর অক্ষয় বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বত যাবতীয় পাপের মূল।

যায়দ ইবনে আকরাম বলেন ঃ আমরা হযরত আবু বকরের সাথে ছিলাম, এমন সময় তিনি পানি চাইলেন। লোকেরা মধুমিশ্রিত পানি এনে উপস্থিত করল। তিনি পানি মুখের কাছে নিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে সঙ্গীরা সকলেই কান্না শুরু করে দিল এবং কেঁদে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু হযরত আবু বকরের কান্না থামল না। অবশেষে সবাই মনে করল, তারা কান্নার কারণও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। অতঃপর তিনি চোখ মুছে ফেললেন। লোকেরা আরয করল ঃ হে নায়েবে রসূল (সাঃ), আপনার কাঁদার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় দেখলাম যে, তিনি কাউকে বলছেন—আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যা। অথচ সেখানে কেউ ছিল না। আমি আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনি কাকে দূর হতে বলছেন? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে দুনিয়া দেহ ধারণ করে আমার সামনে আসে। আমি তাকে বললাম ঃ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যা। এরপর সে আবার আসল এবং বলল ঃ আপনি আমার কাছ থেকে বেঁচে থাকলেও আপনার পরবর্তী লোকেরা বেঁচে থাকবে না।

এক রেওয়ায়েতে আছে—রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার একটি ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ এস, দুনিয়া দেখে যাও। অতঃপর তিনি ঘোড়ার উপর থেকে একটি পচা বস্ত্র ও গলিত অস্থি হাতে নিয়ে বললেন ঃ এটা দুনিয়া। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়ার সাজসজ্জাও এই বস্ত্রের মত দ্রুত পুরাতন হয়ে যাবে এবং যে সব দেহ দুনিয়াতে লালিত হয়, সেগুলোও এই অস্থির মত গলে যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ দুনিয়াকে প্রভু বানিয়ো না। সে তোমাকে গোলাম বানিয়ে নেবে। নিজের ভাণ্ডার এমন লোকের কাছে গচ্ছিত রাখ, যে আত্মসাৎ না করে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যার ধন-ভাণ্ডার আছে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার উপর বিপদ আসার আশংকা থাকে। যার ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর কাছে থাকে, তার কোন বিপদের ভয় নেই। তিনি আরও বলেন ঃ হে আমার অনুচরবৃন্দ, আমি দুনিয়াকে তোমাদের জন্যে উপুড় তথা অধোমুখী করে দিয়েছি। তোমরা যেন আমার পরে একে আবার সোজা করে দাঁড় না করাও। এটা দুনিয়ার একটি নষ্টামি যে, মানুষ এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। অথচ দুনিয়ার মোহ না কাটা পর্যন্ত আখেরাত পাওয়া যায় না। অতএব, দুনিয়াকে সরাইখানা মনে কর এবং মুসাফিরের ন্যায় এতে দিনাতিপাত কর। দালানকোঠা নির্মাণ করো না। মনে রেখ, সকল অনিষ্টের মূল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। প্রায়ই এক মুহূর্তের কামনা দীর্ঘকালীন দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। এটাও তাঁরই উক্তি যে, তোমাদের জন্যে দুনিয়া অধোমুখী হয়ে পড়ে আছে। তোমরা তার পিঠে বসে আছ। অতএব, দুনিয়ার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও মহিলারা যেন তোমাদের মোকাবিলা না করে। অর্থাৎ রাজা-বাদশাহদের সাথে দুনিয়ার জন্যে কলহ করো না। কেননা, তাদের প্রতি এবং তাদের দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মোহ না থাকলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করবে না। মহিলাদের কাছ, থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে নামায-রোযা।

হযরত ঈসা (আঃ) আরো বলেন ঃ দুনিয়া স্বয়ং কিছু লোকের অন্বেষণ করে এবং কোন কোন লোক দুনিয়াকে অন্বেষণ করে। যারা আখেরাতের জন্যে কাজ করে, দুনিয়া সারাজীবন তাদের অন্বেষণ করে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার অন্বেষণ করে; আখেরাত মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে আহ্বান করে।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক আবেদের কাছে যান। তাঁর সাথে ছিল সৈন্যসামন্ত। ডানে ও বামে মানুষ ও জিনের সারি ছিল। এ দৃশ্য দেখে আবেদ আরয করলঃ হে সোলায়মান. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। সোলায়মান (আঃ) বললেনঃ একবার "সোবহানাল্লাহ" উচ্চারণ করা মুমিনের আমলনামায় এসকল জাঁকজমক অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এই জাঁকজমক ধ্বংসশীল; কিন্তু আল্লাহর যিকর সর্বক্ষণ সাথে থাকবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থাৎ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ বলে, এটা আমার, ওটা আমার। অথচ তার ততটুকুই যতটুকু সে খেয়ে শেষ করে দেয়, পরে উড়িয়ে দেয় অথবা খয়রাত করে সঞ্চিত করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) একদিন আমাকে বললেনঃ আমি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত বস্তুসমূহ দেখাব। আমি আরয করলামঃ খুব ভাল কথা। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মদীনার একটি জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় মৃত মানুষের মাথার খুলি, পায়খানা, হাড়গোড় ও ছিন্নবস্ত্র ছিল। তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা, এসব খুলি তেমনি আকাঙ্ক্ষা করত, যেমন তুমি কর এবং তেমনি আশা করত, যেমন তুমি কর; কিন্তু আজ এমন হয়ে গেছে যে, এগুলোর উপর চামড়া পর্যন্ত নেই। কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো ভস্ম হয়ে যাবে। এই যে পায়খানা দেখছ, এগুলো তাদের খাদ্য ছিল। খোদা জানে কোথা থেকে উপার্জন করে খেয়েছিল। আজ এমন হয়ে গেছে যে, তোমার ঘৃণা হয়। আর এই ছিন্নবস্ত্র ছিল তাদের পোশাক। বায়ু একে এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে ফিরে। আর এই পায়ের হাড়গুলো তাদের চতুষ্পদ জন্তুর, যেগুলোর পিঠে চড়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে যেত। ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়ার যখন এই পরিণতি, তখন এটা শিক্ষা গ্রহণেরই স্থান।

হযরত দাঊদ ইবনে হেলাল বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফায় লিখিত আছে— হে দুনিয়া, তুই সৎকর্মপরায়ণদের কাছে অত্যন্ত লাঞ্ছিত, যাদের সামনে তুই সেজেগুঁজে গমন করিস। আমি তাদের অন্তরে তোর প্রতি শত্রুতা স্থাপন করেছি। তোর চেয়ে অধিক বিকৃত আমি কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। তোর প্রতিটি অবস্থা ঘৃণ্য যোগ্য। শেষ পর্যন্ত তুই ফানা হয়ে যাবি। যেদিন আমি তোকে সৃষ্টি করেছি, সেদিনই নির্দেশ দিয়েছি যে, তুই কারও কাছে থাকবি না এবং কেউ তোর কাছে থাকবে না। সুসংবাদ সেই সৎলোকদের জন্যে, যাদের অন্তরে সন্তুষ্টি এবং মনে সততা ও দৃঢ়তা বিদ্যমান। আমার কাছে তাদের প্রতিদান ও সওয়াব এই যে, তারা কবর থেকে উঠে যখন আমার দিকে ধাবিত হবে, তখন তাঁদের আগে আগে নূর থাকবে। তাদের আশেপাশে ফেরেশতারা থাকবে। আমার কাছে তারা যে পরিমাণ রহমত আশা করবে, আমি সে পরিমাণ দেব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনীতে বর্ণিত আছে, যখন তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন, তখন তাঁর পেটে গোলমাল দেখা দিল এবং পায়খানার প্রয়োজন হল। এমন প্রতিক্রিয়া জান্নাতের অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ছিল না। কেবল এই বৃক্ষের মধ্যেই এই প্রতিক্রিয়া নিহিত ছিল এবং একারণেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি পায়খানার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। জনৈক ফেরেশতাকে আদেশ করা হল— আদমকে জিজ্ঞাসা কর সে কি চায়? আদম বললেন ঃ আমার পেটে যে বিপদ দেখা দিয়েছে, তা কোথাও ফেলে দিতে চাই। ফেরেশতা খোদায়ী ইঙ্গিত অনুযায়ী বলল ঃ এখানে কোন্ জায়গাটি এর উপযুক্ত? এখানে তো কেবল ফরশ, সিংহাসন, নির্ঝরিণী এবং বৃক্ষসমূহের মনোরম ছায়া। এগুলোর মধ্যে কোনটিই একাজের উপযুক্ত নয়। এজন্যে দুনিয়াতে যাও।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন কিছু লোক মক্কার পাহাড়সমূহের সমান আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কি নামাযীও হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ, তারা নামাযী হবে, রোযাদার হবে এবং রাতের কিছু অংশ জেগে এবাদতও করবে। কিন্তু তাদের অপরাধ এই যে, যখন দুনিয়ার কোন বস্তু তাদের সামনে আসত, তখন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—মুমিনের অন্তরে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মহব্বত একত্রিত হতে পারে না; যেমন এক পাত্রে আগুন ও পানি একত্রিত হতে পারে না। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে বললেনঃ আপনি পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বাধিক বয়স পেয়েছেন। বলুন তো, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপনি দুনিয়াকে কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেনঃ আমার মনে হয়েছে একটি ঘরের দু'টি দরজা। আমি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে এসেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ তোমরা দুনিয়া থেকে সাবধান থাক। কেননা, দুনিয়া হারূত ও মারূতের চেয়েও বড় জাদুকর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে এসে বলতে লাগলেনঃ তোমাদের কেউ কি কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চক্ষুষ্মান করে দেবেন এবং অন্ধত্ব দূর করে দেবেন? জেনে রাখ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে এবং তাতে দীর্ঘ আশা করবে, আল্লাহ্ সে পরিমাণে তাকে অন্ধ করবেন। পক্ষান্তরে যে নিজের আমল সংক্ষিপ্ত করবে এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকেই জ্ঞান দান করবেন এবং কারও নির্দেশনা ছাড়াই হেদায়েত দান করবেন। স্মরণ রেখো, তোমাদের পরে সত্বরই এমন লোক সৃষ্টি হবে, যাদের কাছে খুন-খারাবী ছাড়া রাজত্ব থাকবে না, গর্ব ও ঔদ্ধত্য ছাড়া ধনাঢ্যতা থাকবে না এবং স্বার্থ ছাড়া মহব্বত থাকবে না। অতএব, তোমাদের যে ব্যক্তি সে সময়টি পাবে এবং ধনাঢ্যতায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যে সবর করবে, প্রতিশোধ গ্রহণ ও সম্মান লাভের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুতা ও লাঞ্ছনা সহ্য করবে এবং সবর ও সহনশীলতা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে পঞ্চাশ জন সিদ্দীকের সওয়াব দান করবেন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)- কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। আনসাররা তার আগমনের সংবাদ শুনে সবাই ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শরীক হন। নামাযান্তে তিনি যখন ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আনসাররা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ আবু ওবায়দা কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছে। তারা আরয করল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা সুখী হও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কষ্ট দূর করেছেন। আমি এটা আশংকা করি না যে, তোমরা নিঃস্ব হয়ে যাবে ; বরং ভয় এই যে, কোথাও তোমাদের উপর দুনিয়ার প্রাচুর্য এমন না হয়ে যায়, যেমন পূর্ববর্তীদের উপর হয়েছিল। তোমরাও না তাদের মত দুনিয়াতে ডুবে যাও। এরপর দুনিয়া তাদের মত তোমাদেরকেও না ধ্বংস করে দেয়!

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَّا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উপর যে বিষয়ের বেশী ভয় করি, তা সেই বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বের করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বরকত।

লোকেরা আরয করল ঃ পৃথিবীর বরকত কি? তিনি বললেন ঃ

زُبْدَةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, দুনিয়ার নির্যাস।

আম্মার ইবনে সায়ীদ রেওয়ায়েত করেন—হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক গ্রামের উপর দিয়ে যাবার সময় গ্রামের অধিবাসীদেরকে বারান্দায় ও রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি অনুচরবর্গকে বললেনঃ নিশ্চয় এরা আল্লাহ তা'আলার গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তা নাহলে একে অপরকে দাফন করত। অনুচররা বললঃ এরা কেন মারা গেল তা জানতে পারলে আমাদের খুব উপকার হত। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে এ তথ্য জানতে চাইলে এরশাদ হল ঃ রাতের বেলায় এদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো। জওয়াব পাবে। সে মতে রাত হলে হযরত ঈসা (আঃ) টিলার উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিলেনঃ গ্রামবাসীগণ! তাদের একজন জওয়াব দিল ঃ কি বলেন, হে রূহুল্লাহ। তিনি বললেনঃ তোমাদের এই অবস্থা কেন? সে জওয়াব দিল ঃ সন্ধ্যায় সুস্থ অবস্থায় শুয়েছিলাম। ভোরে দোযখে পতিত হলাম। আমরা দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত ছিলাম এবং পাপীদের আনুগত্য করতাম। ঈসা (আঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা দুনিয়াকে কতটুকু মহব্বত করতে? উত্তর হল ঃ যতটুকু শিশু তার জননীকে মহব্বত করে। জননী সামনে থাকলে সে আনন্দিত হয় এবং আড়ালে চলে গেলে দুঃখিত হয়ে কাঁদতে থাকে। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তোমার সঙ্গীরা জওয়াব দেয় না কেন? জওয়াব এল ঃ কারণ, তাদের মুখে আগুনের লাগাম রয়েছে। সে লাগাম কড়া মেযাজের ফেরেশতারা ধরে রেখেছে। তিনি জিজ্ঞেস

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলেন ঃ তবে তুমি কিরূপে কথা বলছ? উত্তর হল ঃ আমি তাদের মত কাজ করতাম না। কিন্তু তাদের সাথে বসবাস করার কারণে আযাব আমাকেও ছাড়েনি। এখন আমি দোযখের কিনারায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছি। জানি না, দোযখ থেকে রক্ষা পাব, না তাতে নিক্ষিপ্ত হব। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) অনুচরবর্গকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হতে পারলে যবের রুটি মোটা লবণ দিয়ে খাওয়া, চট পরিধান করা এবং ময়লা-আবর্জনার উপর ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভাল।

কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যাতে আমি আল্লাহকে মহব্বত করতে শুরু করি। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে শত্রুতা কর, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন। হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا اَوْلَهَانَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا وَلَاثَرْتُمُ الْاٰخِرَةَ -

অর্থাৎ, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। দুনিয়া তোমাদের কাছে লাঞ্ছিত হত এবং তোমরা আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যার মধ্যে ছয়টি বিষয় বিদ্যমান থাকে, সে জান্নাত লাভের জন্যে কোন কাজ বাকী রাখেনি এবং জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন ত্রুটি অবশিষ্ট রাখেনি। এক, আল্লাহকে চিনে তার আনুগত্য করা। দুই, শয়তানকে চিনে তার অবাধ্যতা করা। তিন, সত্যকে চিনে তার অনুসরণ করা। চার, বাতিলকে জেনে তার থেকে বেঁচে থাকা। পাঁচ,দুনিয়া সম্পর্কে জেনেশুনে তাকে বর্জন করা। ছয়, আখেরাতের যথার্থতা বুঝে তা অন্বেষণ করা।

হযরত লোকমান তার পুত্রকে বলেন ঃ দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। এতে অনেক মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে। তুমি দুনিয়াতে খোদাভীতিকে নিজের নৌকা বানাও। তাতে ঈমানকে রাখ এবং তাওয়াক্কুলের পাল তুল,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যাতে ঢেউ থেকে মুক্তি পেতে পার। তবে মুক্তি যে পাবেই তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

এক ব্যক্তি আবু হাশেমের কাছে এই বলে দুনিয়ার মহব্বতের অভিযোগ করল যে, আমি দুনিয়াতে থাকব না— এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত আমার ভেতরে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দেন, তা হালাল পথে আসে কি না, তা দেখে নেবে। এরপর সেটা উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করবে। এরূপ করলে দুনিয়ার মহব্বত ক্ষতি করবে না। একথা বলার কারণ এই যে, কেবল মহব্বতের কারণেই শাস্তি হলে মহাবিপদ হবে এবং মানুষ অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি দুনিয়া সোনার তৈরী হত এবং ধ্বংস হয়ে যেত, আখেরাত মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা হতো এবং অক্ষয় থাকতো, তবে বুদ্ধিমানদের জন্যে অক্ষয়কেই পছন্দ করা সমীচীন হত; যদিও এখন ধ্বংসশীল দুনিয়াই মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা আর অক্ষয় আখেরাত স্বর্ণের।

হযরত ইবনে মসঊদ বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ মেহমান এবং তার ধন-সম্পদ আমানত। মেহমান একদিন বিদায় হয়ে যাবে এবং আমানত মালিকের হাতে ফিরে যাবে।

হযরত রাবেয়ার কাছে তাঁর জনৈক মুরীদ সার্বক্ষণিক থাকার উদ্দেশ্যে, হাযির হল এবং দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে তার নিন্দা করতে লাগল। তিনি বললেন ঃ চুপ কর। দুনিয়ার আলোচনা করো না। তোমার অন্তরে তার জায়গা না থাকলে তুমি এত বেশী আলোচনা করতে না। বলা বাহুল্য, মানুষ যে বস্তুকে মহব্বত করে, তার আলোচনাই বেশী করে।

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ যদি তুমি দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে দিয়ে দাও, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহান লাভ হবে। আর আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে দিয়ে দিলে উভয় জাহানে লোকসান হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। একভাগ মুমিনের জন্যে, একভাগ মুনাফিকের জন্যে এবং একভাগ কাফেরের জন্যে। মুমিন তার অংশকে আখেরাতের সম্বল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে। মুনাফিক বাহ্যিক সাজ-সজ্জা করে। কাফের তার দ্বারা কামিয়াব হয়।

হযরত আবু ওসামা বাহেলী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন প্রেরিত হন, তখন শয়তানের বাহিনী শয়তানের কাছে এসে বলল ঃ নবী প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর উম্মত আত্মপ্রকাশ করেছে। শয়তান জিজ্ঞেস করল ঃ তাঁর উম্মতের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত আছে কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, দুনিয়ার মহব্বত আছে! সে বলল ঃ দুনিয়ার মহব্বত থাকলে মূর্তিপূজা না করলে কি হবে? এখনও তিন পন্থায় তাদের কাছে আমার সকাল-সন্ধ্যায় আনাগোনা হবে। প্রথম, অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়, অস্থানে তা ব্যয় করা। তৃতীয়, ব্যয় করার প্রকৃত স্থান থেকে ফিরিয়ে রাখা। এগুলো এমন বিষয় যে, সমস্ত কুকর্ম এরই পেছনে চলে।

হযরত আলী (রাঃ)-কে কেউ দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সুদীর্ঘ বর্ণনা করব, না সংক্ষেপে? প্রশ্নকারী বলল ঃ সংক্ষেপে। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ায় যা হালাল, তার হিসাব দিতে হবে এবং যা হারাম, তার আযাব সহ্য করতে হবে।

হযরত আবু মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ এই জাদুকর অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বেঁচে থেকো। সে আলেমদের অন্তরে জাদু করে। কিন্তু এটা অন্তরে থাকলে আখেরাত তাতে থাকে না। কারণ, আখেরাত সম্ভ্রান্ত আর দুনিয়া নীচ। নীচের সাথে সম্ভ্রান্ত থাকতে পারে না। এ উক্তিটি অত্যন্ত কঠোর। আমাদের মনে হয় এ সম্পর্কে হযরত ইয়াসার ইবনে হাকামের উক্তি অধিক বিশুদ্ধ। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি একত্রে থাকে। একটি প্রবল হলে অপরটি তার অনুসারী হয়ে যায়।

হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ যতই দুনিয়া লাভের জন্যে চিন্তা করবে, ততই আখেরাতের চিন্তা অন্তর্হিত হয়ে যাবে এবং যতই আখেরাতের চিন্তা করবে, ততই দুনিয়ার চিন্তা মন থেকে সরে যাবে। এ উক্তিটি হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি থেকে নির্গত। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া এবং আখেরাত হল দুই সতীন। একজন যে পরিমাণে তুষ্ট হবে, অপরজন সে পরিমাণে রুষ্ট হবে।

হযরত হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা এমন সব মনীষী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পেয়েছি, যাদের কাছে দুনিয়া পায়ের ধুলোর চেয়েও ঘৃণিত ছিল। দুনিয়া কোন্ দিক থেকে এল এবং কোন্ দিকে চলে গেল, কার কাছে রইল এবং কার কাছে চলে গেল— এসব বিষয় তারা আদৌ পরোয়া করতেন না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেন, সে যদি সেই ধন-সম্পদ খয়রাত, আত্মীয় এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে ব্যয় করার পর নিজের ভোগ-বিলাসেও ব্যয় করে, তবে তা জায়েয হবে কি না? তিনি বললেন ঃ না। যদি সমগ্র দুনিয়াও তার হয়ে যায়, তবু নিজের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণই ব্যয় করবে। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ তার অভাবের দিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের জন্যে রেখে দেবে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি সমস্ত দুনিয়া হালাল উপায়ে আমার কবযায় চলে আসে এবং তার হিসাব-কিতাবও আখেরাতে আমার কাছ থেকে না নেয়া হয়, তবু আমি তাকে অপবিত্রই মনে করব; যেমন তোমরা মৃতকে অপবিত্র মনে কর এবং তা থেকে আঁচল বাঁচিয়ে চল।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গমন করেন, তখন হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে আসেন, যার লাগাম ছিল দড়ির। হযরত ওমর তাঁর ঘরে চলে যান। তিনি সেখানে ঢাল, তরবারি ও উষ্ট্রীর গদি ছাড়া আর কিছুই না দেখে বললেন ঃ ঘরের আসবাবপত্র তৈরী করে নিলে ভাল হয় না? হযরত আবু ওয়ায়দা আরয করলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এই আসবাবপত্র আমাকে চির নিদ্রার কক্ষে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট।

এ ঘটনা তখনকার, যখন আবু ওবায়দা সিরিয়ার উদ্দেশে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সিরীয় খৃষ্টানদের আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত ওমর সন্ধির কথাবার্তা চূড়ান্ত করার জন্যে সেখানে গমন করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে— মুসলিম বাহিনীর সকল অধিনায়কই হযরত ওমরের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আবু ওবায়দা তা করেননি। হযরত ওমর তাকে বললেন ঃ আমি আপনার বাসস্থান দেখতে চাই। তিনি আরয করলেন ঃ আপনি আমার ঘরে গিয়ে কাঁদবেন। খলীফা বললেন, কোন অসুবিধা নেই। সেমতে ঘরে পৌঁছে তিনি কেবল তরবারি, ঢাল ও বসার জন্য একটি মাত্র চাটাই দেখতে পান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এছাড়া ছিল পানির একটি মৃৎপাত্র। এই বৈরাগ্য দেখে খলীফার কান্না এসে গেল। আবু ওবায়দা আরয করলেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আমার ঘরে গিয়ে আপনি কাঁদবেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার সহচরদের মধ্যে তুমিই পূর্ববর্তী তরীকায় কায়েম রয়েছ। অন্যান্য সকলের কাছ থেকে দুনিয়া কিছু না কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

মোটকথা, এই মনীষীগণই দুনিয়াকে কিছু চিনতে পেরেছিলেন। তাঁরা খোদায়ী বিধানাবলীকে অন্তর দিয়ে সত্য জ্ঞান করতেন এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর অনুসরণে পাগলপারা ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ দুনিয়াকে দেহের জরুরী সুখ ও আরামের জন্যে এবং আখেরাতকে অন্তরের শান্তির জন্যে গ্রহণ করা উচিত।

হযরত হাসান বলেন ঃ বনী ইসরাঈল আল্লাহ-পূজার পর মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মহব্বত।

হযরত ওয়াহহাব বলেন ঃ আমি এক কিতাবে পাঠ করেছি, দুনিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে সুবর্ণ সুযোগ এবং মূর্খের জন্যে গাফলতির কারণ। অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়াকে সৎকর্ম করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে আর মূর্খ তা বুঝে না। সে যখন এখান থেকে ইন্তেকাল করে, তখন ফিরে আসার বাসনা করে। কিন্তু ফিরে আসা সম্ভব কোথায়!

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণের পর থেকেই সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে এবং আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। সুতরাং নিজেকে নিকটবর্তী ও সম্মুখবর্তী জায়গায় পৌঁছানো উচিত। দূরবর্তী জায়গায় লাভ কি?

হযরত আমর ইবনে আস একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন ঃ যে বস্তুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনাসক্তি প্রকাশ করতেন, আমি তাতে তোমাদেরকে অধিক আগ্রহী দেখতে পাই। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর দিয়ে কখনও এমন তিন দিন অতিবাহিত হয়নি, যাতে তাঁর আমদানী দেনার চেয়ে বেশী থাকত।

হযরত হাসান (রাঃ) একবার এই আয়াতখানি পাঠ করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

অতঃপর বললেন ঃ জান, এটা কার উক্তি? এ হল তাঁর উক্তি যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। অতএব দুনিয়ার অবস্থা তিনিই ভাল জানেন। তোমাদের উচিত দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এতে অনেক কাজ-কারবার থাকে। এক কাজের মুখোমুখি হলে আরও দশটি কাজ সামনে এসে যায়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর কাছে একবার নাজরান থেকে একজন লোক এল। তার বয়স ছিল দুশ' বছর। তিনি লোকটিকে দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলল ঃ কয়েক বছর বিপদে কেটেছে এবং কয়েক বছর আরামে। দিবারাত্র এভাবেই অতিবাহিত হয়। যারা জন্মগ্রহণ করার, তারা জন্মগ্রহণ করে এবং যারা মরার, তারা মরে যায়। যদি কেউ জন্মগ্রহণ না করে, তবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ না মরলে দুনিয়াতে স্থান সংকুলান হবে না। হযরত মোয়াবিয়া বললেন ঃ তোমার যা মনে চায়, আমার কাছে প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে। লোকটি আরয করল ঃ আপনি আমার অতীত জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন অথবা ভবিষ্যত মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারেন? খলীফা বললেন ঃ এ দুটির কোনটিই সম্ভব নয়। সে আরয করল ঃ তা হলে আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

দাউদ তায়ী বলেন ঃ হে মানুষ, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে আনন্দিত হও; অথচ জান না, আয়ু বিনষ্ট করে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। তুমি আমল করার ব্যাপারে আজ কাল কর। মনে হয় উপকার অন্য কেউ পাবে।

আবু হাশেম বলেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন খুশী নেই, যার সাথে দুঃখ নেই।

হযরত হাসান বলেন ঃ মানুষের প্রাণবায়ু দুনিয়ার তিনটি বেদনা নিয়ে বের হয়। এক, যা সঞ্চয় করেছিল, তাতে অতৃপ্তির বেদনা। দুই, বাসনা অপূর্ণ থাকার বেদনা। তিন, আখেরাতের সম্বল পুরোপুরি না থাকার বেদনা।

দুনিয়ার অবস্থা ঃ জানা উচিত যে, দুনিয়া অত্যন্ত দ্রুতগামী। সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রত্যেককে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ প্রত্যেকের মুখে মুখে। বাহ্যত স্থির মনে হয়; অথচ দ্রুতগতিতে তাড়াহুড়া করে পালিয়ে যাচ্ছে। তার গতিশীলতা দেখে বুঝা যায় না; কিন্তু বছর ও মাসের সমাপ্তি দ্বারা অনুভূত হয়। দুনিয়া ছায়ার মত। ছায়াকেও দৃশ্যত গতিশীল মনে হয় না; কিন্তু বাস্তবে গতিশীল থাকে। বুযুর্গগণও দুনিয়াকে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সামনে দুনিয়ার আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ দুনিয়া পড়ন্ত ছায়া অথবা বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন। দুনিয়া তার কল্পনা দ্বারা মানুষকে ধোকা দেয় এবং দুনিয়া থেকে বের হওয়ার পর সঙ্গে কিছুই থাকে না। তাই দুনিয়াকে স্বাপ্নিক কল্পনার সাথে তুলনা করা হয়। হাদীসে আছে—

اَلدُّنْيَا حُلْمٌ وَاَهْلُهَا عَلَيْهَا مُجَازُوْنَ وَمُعَاتَبُوْنَ

অর্থাৎ, দুনিয়া একটি স্বপ্ন। দুনিয়াবাসীদেরকে প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

ইউনুস ইবনে ওবায়দ বলেন ঃ আমার মতে দুনিয়া এমন, যেমন কোন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন খারাপ অথবা সুখবর বিষয় দেখে দুঃখিত অথবা আনন্দিত হয়। মানুষও এমনিভাবে যেন স্বপ্নে দুনিয়ার সুখ ও দুঃখ দেখে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর যখন তাদের চোখ খুলবে, তখন কিছুই পাবে না।

দুনিয়া তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের প্রাণের শত্রু এবং তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে। এদিক দিয়ে সে সেই নারীর মত, যে পুরুষদের জন্যে প্রচুর অঙ্গসজ্জা করে। এরপর যখন কারও সাথে বিবাহ হয়, তখন তাকে হত্যা করে। দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। প্রথম প্রথম তাকে খুব সুশ্রী, কোমল ও লাজুক মনে হয়; কিন্তু অবশেষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামনে দুনিয়া একজন ফোকলা বৃদ্ধার আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধার গায়ে সর্বপ্রকার অলংকার ও মূল্যবান গহনাগাটি শোভা পাচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ পর্যন্ত তোর কয়জন স্বামী হয়েছে? সে বলল ঃ সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ তারা সকলেই তোকে ছেড়ে মারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গেছে, না তোকে তালাক দিয়েছে? সে আরয করল ঃ আমি তাদের হত্যা করেছি। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তা হলে তো তোর বর্তমান স্বামীদের দুর্ভোগ বলতে হবে। তারা পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তুই এক একজনকে খতম করছিস, অথচ তারা তোকে ভয় করে না।

যেহেতু দুনিয়ার বহির্ভাগ এক রকম এবং ভিতরভাগ অন্য রকম, তাই দুনিয়াকে এমন এক কুশ্রী বৃদ্ধার সাথে তুলনা করা যায়, যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, চমকপদ্র পোশাক এবং অলংকার পরে গায়ে বোরকা জড়িয়ে মানুষকে তন্বী যুবতী বলে ধোকা দেয়। মানুষ যখন তার ভেতরের অবস্থা জানতে পারে এবং মুখের উপর থেকে ঘোমটা খুলে দেখে, তখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

আলা ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ আমি স্বপ্নে এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, যার গায়ের ত্বক বার্ধক্যের কারণে কুঞ্চিত ছিল। সে মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরেছিল। লোকজন তার চার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখে যাচ্ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম। এতে সকলই বিস্মিত হল। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ তুমি আমাকে চিন না? আমি বললাম ঃ না। সে বলল ঃ যদি আমার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে টাকা পয়সাকে অশুভ মনে করবে।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বাগদাদ পৌঁছার পূর্বে দুনিয়াকে স্বপ্নে এক অস্থি কংকালসার বৃদ্ধার আকৃতিতে দেখলাম। সে হাততালি দিচ্ছিল এবং লোকজন তার পেছনে হাততালি দিয়ে নৃত্য করছিল। বৃদ্ধা আমার সামনে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ সুযোগ পেলে আমি তোমার অবস্থাও তাদের মত করব। এ স্বপ্নটি বর্ণনা করে আবু বকর কেঁদে ফেললেন।

ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক কুশ্রী, বিবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করা হবে। তার দাঁত সামনের দিকে বের হয়ে থাকবে। তাকে মানুষের সামনে রেখে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তোমরা কি এ বৃদ্ধাকে চিন? তারা আরয করবে ঃ এর পরিচয় থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চাই। এরশাদ হবে ঃ এই হল সে দুনিয়া, যার জন্যে তোমরা গর্ব, অহংকার শত্রুতা ও প্রতারণা করতে এবং তার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলে। এরপর বৃদ্ধাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সে আরয করবে ঃ ইলাহী, আমার অনুসরণকারীরা কোথায়? আদেশ হবে ঃ তাদেরকেও তার সঙ্গী করে দাও।

মানুষ দুনিয়া অতিক্রম করে ঠিক; কিন্তু বাস্তবে তার কোন যথার্থতা নেই। কেননা, মানুষের তিন অবস্থা। প্রথম, সেই সময়কাল, যাতে সে জন্মগ্রহণ করেনি; অর্থাৎ আদিকাল থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়। দ্বিতীয়, মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত সময়। এতে সে দুনিয়াকে দেখে না। তৃতীয়, জীবদ্দশার সময়, যাকে দুনিয়া বলা হয়। যদি জীবদ্দশার এই সময়কে আদি ও অনন্তকালের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা এক দীর্ঘ সফরের সামান্য একটু স্থানের সমানও হবে না। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَالِىْ وَالدُّنْيَا وَاِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ سَارَ فِىْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَرُفِعَتْ لَهٗ شَجَرَةٌ فَقَالَ تَحْتَ ظِلِّهَا سَاعَةً ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا -

অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন অশ্বারোহী গ্রীষ্মের খরতাপে পথ অতিক্রম করে। এরপর সে একটি বৃক্ষ পেয়ে তার ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর তা পরিত্যাগ করে আবার নিজের গন্তব্য পথে রওয়ানা হয়ে যায়।

কোন ব্যক্তি দুনিয়াকে এই দৃষ্টিতে দেখলে সে কখনও তার প্রতি আগ্রহী হবে না এবং এর দিনগুলো সুখে অতিবাহিত হচ্ছে, কি দুঃখে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। সে ইটের উপর ইট রেখে গৃহ নির্মাণ করবে না। দুনিয়ার অবস্থা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্যক জানা ছিল বিধায় তিনি সারা জীবন ইটের ঘর নির্মাণ করেননি— কাঠেরও নয়। বরং কোন কোন সাহাবীকে কাঠের ঘর নির্মাণ করতে দেখে এরশাদ করেছেন—

اَرَى الْاَمْرَ اَعْجَلَ مِنْ هٰذَا

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমি জীবনটাকে দেখছি এর চেয়ে দ্রুত বিলীয়মান।

হযরত ঈসা (আঃ)-ও এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ দুনিয়া একটি পুল। একে অতিক্রম করে যাও। এতে দালান-কোঠা তৈরী করো না। এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত পরিষ্কার। কেননা, জীবন হচ্ছে আখেরাতে পৌছার একটি পুল। এর এক স্তম্ভ হচ্ছে দোলনা এবং অপর স্তম্ভ কবর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সীমিত। কোন কোন লোক এই পুলের অর্ধেক অতিক্রম করেছে। কেউ এক-তৃতীয়াংশ, কেউ দুই-তৃতীয়াংশ এবং কারও এক কদমই অতিক্রম করা বাকি আছে, কিন্তু সে তা জানে না। মোটকথা, এই পুল অতিক্রম করা জরুরী। পুলের উপর দালান নির্মাণ করা এবং নানা প্রকার সজ্জায় সজ্জিত করা এরপর তা ছেড়ে চলে যাওয়া একান্তই নির্বুদ্ধিতা।

দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা খুব সহজ ও কোমল বিধায় দুনিয়াদার মনে করে. দুনিয়া থেকে সহি-সালামতে বের হয়ে যাওয়াও তেমনি সহজ ও আনন্দদায়ক হবে। অথচ ব্যাপার তা নয়। এর জালে আবদ্ধ হওয়া খুব সহজ এবং সহি-সালামতে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এর দৃষ্টান্ত হযরত আলী (রাঃ) সালমান ফারেসীকে লিখিছেন যে, দুনিয়া সাপের মত। তাতে হাত লাগালে বাহ্যত নরম ও মসৃণ মনে হয়; কিন্তু তার বিষ মানুষের জীবন নাশ করে। অতএব, দুনিয়ার যে বস্তু তোমার ভাল লাগে, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। কারণ, তা তোমার হাতে খুব কম থাকবে। দুনিয়ার সর্বাধিক আনন্দের বিষয়টি সর্বাধিক ভয়ের কারণ। কেননা, দুনিয়াতে যখনই কেউ আনন্দ লাভ করে, তারপর তেমনি দুঃখও পায়।

দুনিয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَالْمَاشِىْ فِى الْمَاءِ هَلْ يَسْتَطِيْعُ الَّذِىْ يَمْشِىْ فِى الْمَاءِ اَنْ لَّا تَبْتَلَّ قَدَمَاهُ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ. দুনিয়াদারের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে পানিতে হাঁটে। পানিতে হাঁটলে পর পদযুগল না ভিজা কি সম্ভবপর?

এই হাদীস থেকে তাদের মূর্খতা জানা গেল, যারা বলে যে, আমাদের দেহ কেবল দুনিয়ার আনন্দের সাথে জড়িত- অন্তর এ থেকে পাক ও পবিত্র। এটা শয়তানের একটা ধোকা মাত্র। কেননা, তাদেরকে যদি দুনিয়ার আনন্দ ও বিলাসিতা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়, তবে তাদের দুঃখ ও বিষাদের অন্ত থাকে না। আন্তরিক সম্পর্ক না থাকলে এই দুঃখ ও কষ্ট কেন হয়?

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ সত্য। পানিতে হাঁটলে যেমন পদযুগল অবশ্যই ভিজে যায়, তেমনি দুনিয়ার সাথে মেলামেশার দ্বারাও অন্তরে এক প্রকার সম্পর্ক ও তামসিক ভাব সৃষ্টি হয়। বরং দুনিয়ার সাথে এই সম্পর্কের কারণে অন্তরে এবাদতের স্বাদ থাকে না। সেমতে হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ আমি সত্য বলছি, রুগ্ন ব্যক্তি যেমন রোগের তীব্রতায় খাদ্যের স্বাদ পায় না, তেমনি যে দুনিয়ার রোগী, সে এবাদতের স্বাদ পায় না।

সারকথা, যে বিষয়ের যতটুকু ভাল থাকা মনে হয়, সেই বিষয় না থাকার কারণে কষ্টও ততটুকুই হয়। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীকে বললেন ঃ তুমি কি তোমার খাদ্য লবণ-মরিচ সহকারে খেয়ে তার উপর পানি ও দুধ পান কর না? যাহ্হাক আরয করলেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এরপর এই খাদ্যের পরিণতি কি হয়, তা তো আপনারই জানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে সে বস্তুর তুল্য বলেন, যা পরিণামে খাদ্য দ্বারা তৈরী হয়ে যায়। হযরত হাসান বলেন ঃ আমি দেখি প্রথমে খাদ্যের মধ্যে খুব মসলা ও সুগন্ধি দেয়া হয়। এরপর একে কোথায় ফেলে আসে! আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ

অর্থাৎ, মানুষ লক্ষ্য করে দেখুক তার খাদ্যের প্রতি!

এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে খাদ্য বলে খাদ্যের পরিণতিকে বুঝানো হয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমরকে বলল ঃ আমি আপনাকে একটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রশ্ন করতে চাই; কিন্তু লজ্জা বোধ হয়। তিনি বললেন ঃ লজ্জা করা উচিত নয়। জিজ্ঞেস কর। লোকটি বলল ঃ মানুষ পায়খানা করার পর তার দিকে দেখবে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। ফেরেশতা তাকে বলে ঃ যে বস্তু নিয়ে কৃপণতা করতে তার পরিণাম কি হয়েছে দেখে নে।

হযরত বশীর ইবনে কা'ব বলেন ঃ হে লোকগণ! চল, তোমাদেরকে দুনিয়া দেখিয়ে দিই। এরপর তিনি তাদেরকে কোন পায়খানার স্তূপের কাছে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন ঃ এগুলো হচ্ছে, মানুষের ফলমূল, মুরগী, মধু ও ঘি।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আখেরাতে দুনিয়ার পরিমাণ এমন, যেমন কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল রাখার পর দেখে, আঙ্গুলে কতটুকু পানি এসেছে। অর্থাৎ, আখেরাতের সামনে দুনিয়া তুচ্ছ।

দুনিয়াদার মানুষ দুনিয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়। এরপর বড় বড় দুঃখ ও বেদনা সহ্য করে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত তেমনি, যেমন কিছু লোক জাহাজে সওয়ার হয়ে কোন দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছার পর নাবিক তাদেরকে বলল ঃ যার প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন, সে এখানে নেমে প্রয়োজন সেরে আসতে পারে। কিন্তু স্থানটি খুব বিপজ্জনক। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় জাহাজ ছেড়ে যাবে। সেমতে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নেমে পড়ল এবং দ্বীপের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর কেউ কেউ নাবিকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল; অর্থাৎ, প্রস্রাব-পায়খানা সেরেই কালবিলম্ব না করে জাহাজে ফিরে এল। ফলে, তারা জাহাজে পছন্দসই ও আরামের জায়গা পেয়ে গেল। কতক লোক দ্বীপে বিলম্ব করে তার লতা-পল্লব, ফুলকলি, প্রান্তর, মনমুগ্ধকর সুর লহরী, বিহঙ্গকুলের কলকাকলি, নানা প্রকার মণিমুক্তা, অভাবনীয় চিত্রকলা ও উদ্যানসমূহের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করল। কিন্তু জাহাজ না পাওয়ার আশংকায় ভ্রমণ শেষ করেই জাহাজে ফিরে এল। তারা যদিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিস্তীর্ণ জায়গা পেল না; কিন্তু সঠিকভাবে বসার মত সুযোগ পেল। তৃতীয় এক দল লোক উল্লিখিত অপরূপ সৌন্দর্যসমূহ অবলোকন করে তাতে নিমগ্ন হয়ে গেল। তারা মূল্যবান মণিমুক্তা, ঝিনুক ও সুমিষ্ট ফলমূল ছেড়ে আসতে চাইল না। ফলে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সেগুলো যে যতটুকু পারল সঙ্গে নিয়ে নিল। কিন্তু জাহাজে এসে দেখল, বসার মত জায়গা খালি নেই— জিনিসপত্রের বোঝা রাখা তো দূরের কথা। ফলে বাধ্য হয়ে বোঝাগুলো মাথায় বহন করেই জাহাজে বসতে হল। তারা নিজেদের এই কাজের জন্যে অনুতপ্ত ছিল। আরেক দল লোক জঙ্গলে প্রবেশ করে জাহাজের কথা বেমালুম ভুলেই গেল। তারা ভ্রমণে এমনভাবে মেতে রইল যে, নাবিকদের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছল না। এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ছিল হিংস্র জন্তুর ভয়। তারা বুঝত, এই উঁচুনীচু জায়গায় পদস্খলনও হবে, বিপদে পড়তে হবে, পায়ে কাঁটা বিঁধবে, জন্তু-জানোয়ারের ভয়াবহ শব্দে কলিজা কেঁপে উঠবে এবং ঝোপঝাড়ে লেগে কাপড়-চোপড় ছিন্ন হয়ে উলঙ্গ থাকতে হবে। এরপর ফিরে যেতে চাইলেও যাওয়া হবে না। এমনি সময়ে তারা জাহাজের লোকদের আওয়াজ শুনে মাথায় বোঝা বহন করে তীরে পৌঁছল। কিন্তু জাহাজে জায়গা না পেয়ে অবশেষে ক্ষুধা ও পিপাসায় সেখানে মৃত্যুবরণ করল। আরও কিছু লোক জাহাজীদের আওয়াজ শুনল না এবং জাহাজও চলে গেল। ফলে, তাদের কিছু সংখ্যক হিংস্র জন্তুদের খোরাক হয়ে গেল। কিছু সংখ্যক দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে মারা গেল। কিছু সংখ্যক পাঁকে ডুবে মরল।

যাত্রীদের মধ্যে তৃতীয় যে দলটি জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে জাহাজে সওয়ার হতে পেরেছিল, এখন সেগুলোর সংরক্ষণ তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিল। কয়েকদিন পরে ফুল শুকিয়ে গেল, পাথর ইত্যাদির রং বদলে গেল, ফলমূল পচে গলে দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। পূর্বে কেবল রাখার সমস্যা ছিল। এখন দুর্গন্ধের কারণে জাহাজে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে গেল। ফলে, অনন্যোপায় হয়ে সকল বোঝা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হল। কিন্তু এই দুর্গন্ধের প্রভাবে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময়ে ভুগল।

যারা তাদের পূর্বে জাহাজে পৌঁছেছিল, তারা মনমত জায়গা না পেলেও দেশে পৌঁছে কোন অসুখে-বিসুখে পড়েনি। আর যারা সর্বপ্রথম জাহাজে পৌঁছেছিল, তারা জাহাজেও সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করেছে এবং দেশে কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়নি।

দুনিয়ার লোকদের অবস্থাও তেমনি। তারা আসল দেশ বিস্মৃত হয়ে দুনিয়ারূপী দ্বীপের পুষ্পোদ্যান, প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যে এমন বিভোর হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পড়েছে যে, এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করারও অবকাশ নেই। এ বিপদে প্রায় সকলেই পতিত; কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার কথা ভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর বাণীর প্রতি তাদের বিশ্বাস দুর্বল। এদিক দিয়ে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ আমার, তোমাদের এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন সম্প্রদায়ের লোকজন ধুলায় অন্ধকার জঙ্গলে সফর করে। চলতে চলতে তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে এটাও জানা থাকে না যে, যতটুকু পথ অতিক্রান্ত হয়েছে, তা বেশী, না যা বাকী রয়েছে, তা বেশী। এই পর্যায়ে তাদের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা জীবনের আশা ত্যাগ করে জঙ্গলেই পড়ে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে তারা অনেক দূরে একজন সুবেশী ব্যক্তিকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। তার পোশাক থেকে পানি ঝরছিল। মনে হচ্ছিল সে কোন শস্যশ্যামল ভূখণ্ড থেকে আসছে। লোকটি তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলঃ তোমাদের একি অবস্থা? তারা বলল ঃ আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বর্ণনা করার প্রয়োজন কি। লোকটি বলল ঃ আমরা আপনার কথামত কাজ করব। এতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না। লোকটি বলল ঃ আমি যদি তোমাদেরকে পানি ও শস্যক্ষেত্রের ঠিকানা বলে দেই, তবে তোমরা কি করবে? তারা বলল ঃ এতেই কাজ হবে না। পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করতে হবে। সেমতে তারা আল্লাহর কসম খেয়ে অঙ্গীকার করল কোন ব্যাপারেই তারা নাফরমানী করবে না। এমনি কথাবার্তার পর লোকটি উৎকৃষ্ট পানি ও শস্যশ্যামল ভূখণ্ডের ঠিকানা বলে দিল। সে নিজেও কিছুদিন তাদের মধ্যে বসবাস করল। অতঃপর তাদেরকে বলল ঃ ভাইয়েরা আমার, এখানে আর থাকা যাবে না। এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাও। তারা বলল ঃ কোথায় যাব? এর চেয়ে সুন্দর ঝরণা আর উদ্যান অন্যত্র কোথায়? কেউ কেউ যুক্তি পেশ করল ঃ এ জায়গাটি অপ্রত্যাশিত নেয়ামতের মত পেয়েছি। এর চেয়ে সুন্দর জায়গা নিয়ে আমরা কি করব?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অল্প সংখ্যক লোক বলল ঃ ভাই সব, এই লোকের সাথে আমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করেছি যে, তার অবাধ্যতা করব না। সে পূর্বে যা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। এখনও তার কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সেমতে তারা লোকটির সাথে রওয়ানা হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরা সেখানেই পড়ে রইল। প্রত্যুষে শত্রুপক্ষ এসে আক্রমণ করে তাদের কতককে হত্যা করল এবং কতককে বন্দী করে নিয়ে গেল।

এই হাদীসে 'লোকটি' বলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। তিনি উম্মতকে আখেরাতের দিকে আহ্বান করেন। যে ব্যক্তি আখেরাত দুনিয়া থেকে উত্তম—একথাটি সত্য জেনে তাঁর অনুসরণ করে, সে নিরাপদ থাকে। নতুবা প্রাণের শত্রু শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুনিয়াতে মানুষ প্রথম প্রথম খুব মজা লুটে, অবশেষে তার বিরহ জ্বালায় কাতর হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি নতুন ঘর নির্মাণ করে তাকে খুব সজ্জিত করে। এরপর এক এক সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা সেই ঘরে ভোজের নিমন্ত্রণ করে। যখন এক সম্প্রদায় ঘরে আসে, তখন তার সামনে স্বর্ণের একটি আতরদানী পেশ করে, যাতে তার ঘ্রাণ নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের জন্যে রেখে দেয়। কিন্তু এই সম্প্রদায় ভোজসভার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে মনে করে বসে, পাত্রসহ আতর তাদেরকে দেয়া হয়েছে। ফলে, তারা আতরদানীর সাথে অন্তরের খুব সম্পর্ক গড়ে তুলে। কিন্তু গৃহকর্তা যখন আতরদানীটি ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা দুঃখিত হয়। অপরপক্ষে যে সম্প্রদায় রীতি-নীতি জানে, সে ঘ্রাণও নেয়, গৃহকর্তার শোকরও করে এবং হৃষ্ট-চিত্তে আতরদানীটি ফিরিয়েও দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার রীতি-নীতি জানে, সে মনে করে দুনিয়া একটি নিয়ন্ত্রণ গৃহ, যার আসবাবপত্র মেহমানদের জন্যে ওয়াকফ। তাই সে দুনিয়ার জিনিসপত্র দ্বারা মুসাফিরের ন্যায় উপকৃত হয় এবং সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়ে না। ফলে, মৃত্যুর সময়ও সে বিরহ-জ্বালা ভোগ করে না।

বান্দার জন্যে দুনিয়ার অবস্থা ঃ কেবল দুনিয়ার নিন্দা জেনে নেয়া যথেষ্ট নয়; বরং একথাও জানতে হবে যে, কোন্ দুনিয়া নিন্দার যোগ্য এবং কোন্ দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা করা অপরিহার্য। বলা হয় অন্তরের দু'টি অবস্থার নাম দুনিয়া ও আখেরাত। যে অবস্থাটি অন্তরের নিকটবর্তী; অর্থাৎ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃত্যুর পূর্বে, তাকে দুনিয়া বলা হয়। পক্ষান্তরে যে অবস্থাটি এর পরবর্তী; অর্থাৎ মৃত্যুর পরে, তার নাম আখেরাত। এ থেকে বুঝা গেল, যেসব বস্তুর দ্বারা আনন্দ, খাহেশ ও উদ্দেশ্য মৃত্যুর পূর্বে অর্জিত হয়, সেগুলো মানুষের জন্যে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এ থেকে বুঝা উচিত নয় যে, যে বস্তুর প্রতিই ঔৎসুক্য হয়, তাই মন্দ; বরং বস্তুসমূহ তিন প্রকার। প্রথম, সেইসব বিষয়, যা আখেরাতে সঙ্গে থাকে এবং যার ফলাফল মৃত্যুর পর জানা যায়। এরূপ বিষয় দু'টি—একটি এলম ও অপরটি আমল। এলম অর্থ এমন এলম, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম জানা যায় এবং ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, রসূল এবং আকাশ ও পৃথিবীর জ্ঞান অর্জিত হয়। আমল অর্থ আল্লাহ তা'আলার খাঁটি এবাদত। সুতরাং আলেম ব্যক্তি যদিও মাঝে মাঝে এলমের সাথে এমন একাত্ম হয়ে যায় যে, সকল বস্তুর চেয়ে অধিক আনন্দ এলমের মধ্যেই পায়, এমনকি এর খাতিরে যাবতীয় সংসার ধর্মও বর্জন করে, তবু একে নিন্দিত দুনিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয় না; বরং একে আখেরাতের মধ্যেই গণ্য করা উচিত। এমনিভাবে এবাদতকারী ব্যক্তিও তার এবাদতে এমন স্বাদ ও আনন্দ পায় যে, এবাদত না করাকে সে রীতিমত আযাব মনে করতে থাকে। এমনকি জনৈক আবেদ বলেন, মৃত্যুতে আর তো কোন ভয় নেই, ভয় কেবল তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার। অপর একজন আবেদ এই বলে দোয়া করতেন—ইলাহী, কবরে আমাকে নামায, রুকু ও সেজদার শক্তি দান করো। এহেন আনন্দ ও আগ্রহের কারণে এই এবাদতকে দুনিয়া বলা যায়; কিন্তু যে দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, এটা সে দুনিয়া নয়।

অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে—

حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ اَلنِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَقُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلٰوةِ -

অর্থাৎ, দুনিয়ার তিনটি বস্তুকে আমার প্রিয় করা হয়েছে—নারী, সুগন্ধি এবং নামাযে আমার চক্ষুর শীতলতা। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযকেও দুনিয়ার আনন্দসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় দুনিয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং নিন্দিত দুনিয়ার বর্ণনাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় প্রকার আনন্দের বস্তু সেই সব, যা দ্বারা কেবল জীবদ্দশায়ই উপকার পাওয়া যায় এবং আখেরাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। যেমন, পাপকর্মের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বৈধ বস্তু ভোগ করা তথা প্রচুর সোনারুপা, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, গোলাম, বাঁদী, দালান-কোঠা, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক ও উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করা। এসব বস্তুর আনন্দ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই পাওয়া যায়। তাই এগুলো নিন্দিত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি অনর্থক—এ বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু দারদাকে হেমসের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানে দুই দেরহাম ব্যয় করে একটি পায়খানা তৈরী করান। এতেই হযরত উমর তাকে লিখে পাঠান, উমর ইবনে খাত্তাব আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আবু দারদার জানা উচিত যে, পারস্য ও রোমের যে সকল দালান-কোঠা বিদ্যমান ছিল, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ পাক যে দুনিয়াকে বিধ্বস্ত করার আদেশ দিয়েছেন, তুমি তাকে আবাদ করলে কেন? এখন পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি পরিবার-পরিজনসহ দামেশকে চলে যাও। এরপর হযরত আবু দারদা সারা জীবন দামেশকেই বসবাস করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ওমর এতটুকু দুনিয়াকেও অনর্থক জ্ঞান করেছেন।

তৃতীয় প্রকার আনন্দের বস্তু হচ্ছে বর্ণিত উভয় প্রকারের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ। উদাহরণতঃ জীবন রক্ষা হয়—এই পরিমাণ খাদ্য, এক জোড়া মোটা বস্ত্র এবং অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য বস্তু; যাতে মানুষ এলম ও আমল অর্জনে সক্ষম হয়। এই প্রকার আনন্দের বস্তু দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না; বরং আখেরাতের কাজে সহায়ক হয় বিধায় এগুলো প্রথম প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এগুলোকে সহায়তা লাভের নিয়তে সংগ্রহ করবে, তাকে দুনিয়াদার বলা হবে না। আর যদি কেবল পার্থিব আনন্দ লাভের উদ্দেশে সংগ্রহ করে, তবে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দুনিয়ার বস্তুরূপে গণ্য হবে।

মৃত্যুর পর মানুষের সাথে তিনটি বিষয় থাকে— (১) দুনিয়ার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মলিনতা থেকে অন্তরের পবিত্রতা, (২) আল্লাহর যিকরের প্রতি আসক্তি এবং (৩) আল্লাহর মহব্বত। অন্তরের পবিত্রতা দুনিয়ার খাহেশ বর্জন ব্যতীত অর্জিত হয় না। যিকরের আসক্তি অধিক ও সার্বক্ষণিক যিকর ছাড়া সহজসাধ্য হয় না। আল্লাহর মহব্বত মারেফত ছাড়া হাসিল হয় না। এ তিনটি বিষয় অর্থাৎ, পবিত্রতা, আসক্তি এবং মহব্বত মৃত্যুর পরই সৌভাগ্য ও মুক্তির কারণ হয়। দুনিয়া খাহেশ থেকে অন্তরের পবিত্রতা এজন্যে মুক্তির কারণ হয় যে, এটা আযাব ও মানুষের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মানুষের আমল তার পক্ষ থেকে লড়বে। উদাহরণতঃ আযাব যখন পায়ের দিক থেকে আসবে, তখন তাহাজ্জুদ তাকে রুখে দাঁড়াবে। যখন হাতের দিক থেকে আসবে, তখন যাকাত তাকে বাধা দেবে। মহব্বত এ কারণে মুক্তিদাতা যে, এর কারণে খোদায়ী দীদারের গৌরব নসীব হয়। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষ এই গৌরবের অংশপ্রাপ্ত হয় এবং জান্নাতে দীদারের সময় পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। ফলে, মৃত্যুর পরই কবর সুখ ও শান্তির আবাসস্থল হয়ে যায়। কেন হবে না, আশেকের প্রিয়জন তো একজনই, যার মিলনে পার্থিব সম্পর্ক অন্তরায় ছিল। মৃত্যুর কারণে যখন সে অন্তরায় দূর হয়ে গেল, তখন প্রিয়জন ও প্রার্থিত দীদারের আর কি বাধা রইল? দুনিয়াদার ব্যক্তির কবরে আযাব হয়। কেননা, তার প্রেমাস্পদ কেবল দুনিয়া ছিল, যা মৃত্যুর কারণে হস্তচ্যুত হয়ে গেল এবং তাতে ফিরে আসার কোন পথই আর রইল না। যখন প্রেমাস্পদই নেই, তখন দুঃখ ও আযাব হবে না তো কি হবে!

এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি দুনিয়ার খাহেশ দমন করার জন্যে নিরন্তর যিকর, চিন্তাভাবনা ও আমল করতে থাকে, সে আখেরাতের পথিক। সুস্বাস্থ্য ছাড়া এসব বিষয় সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য, খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান ছাড়া সম্ভব নয়। এদের প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক সাজসরঞ্জাম দরকার। অতএব, যে ব্যক্তি খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান আখেরাতের প্রয়োজন পরিমাণে হাসিল করে, সে দুনিয়াদার নয়। বরং দুনিয়া হবে তার জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যে এসব বস্তু কেবল মানসিক আনন্দ ও বিলাসিতার জন্যে হাসিল করে, সে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য হবে।

কিন্তু পার্থিব আনন্দের আগ্রহও দু'প্রকার। এক, যাতে আগ্রহী ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আখেরাতে আযাবের যোগ্য হয়। একে বলা হয় হারাম। দুই, যাতে আগ্রহী ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না এবং হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হয়। এর নাম হালাল। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে, কিয়ামতের ময়দানে হিসাবের অপেক্ষায় থাকাও একটি আযাব। সেমতে হাদীসে আছে—

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَّحَرَامُهَا عَذَابٌ

অর্থাৎ, দুনিয়ার হালাল হল হিসাব এবং হারাম হল আযাব।

আরও বলা হয়েছে—

حَلَالُهَا عَذَابٌ اِلَّا اَنَّهُ اَخَفُّ مِنْ عَذَابِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ, দুনিয়ার হালালও আযাব। তবে এটা হারামের আযাবের চেয়ে হালকা।

যদি হিসাব না-ও হয়, তবে উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং মনে সে বাসনা উদয় হওয়াও আযাবের চেয়ে কম নয়। এর নযীর দুনিয়াতেই দেখা যায়, কোন সমকক্ষ ব্যক্তি পার্থিব সৌভাগ্যে অগ্রগামী হয়ে গেলে অন্তরে কেমন পরিতাপের জ্বালা অনুভূত হয়! অথচ এই পার্থিব মর্যাদা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। সুতরাং পার্থিব আনন্দেই যখন এই জ্বালা, তখন আখেরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে সে জ্বালা আরও তীব্র হবে।

অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগ করে, তা কোন প্রাণীর সুললিত কণ্ঠস্বর থেকে হলেও তার আনন্দের অংশ আখেরাতে হ্রাস পাবে। অনুরূপভাবে যদি কোন পুষ্পোদ্যান দেখে অথবা ঠাণ্ডা পানি পান করে কেউ আনন্দ লাভ করে, তাহলে কিয়ামতে তার বিনিময়ে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ আনন্দ হ্রাস পাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত এরশাদের উদ্দেশ্য তাই। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ

هٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِىْ يُسْئَلُ عَنْهُ

অর্থাৎ, এটাও সে নেয়ামত, যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

এখানে ঠাণ্ডা পানির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ কারণেই যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর পানির পিপাসা হলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লোকেরা মধুমিশ্রিত পানি উপস্থিত করে, তখন তিনি পানি হাতে ঘুরাতে-ফিরাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পান না করে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

عَنِّیْ حِسَابَهَا اَعْزِلُوْا -

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে এর হিসাব সরিয়ে নাও।

সারকথা, দুনিয়া অল্প হোক কি বেশী হোক— হারাম হোক কি হালাল— সবই দূষিত কিন্তু যে পরিমাণ দুনিয়া খোদা-ভীতির সহায়ক, সে পরিমাণ ভাল। বরং এ পরিমাণটি দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যার আল্লাহর মারেফত অধিকতর শক্তিশালী হবে, সে দুনিয়ার আনন্দ থেকে অধিকতর বেঁচে থাকবে। হযরত ঈসা (আঃ) একবার শোয়ার সময় পাথরের উপর মাথা রেখেছিলেন। কিন্তু ইবলীস মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এসে আরয করল ঃ আপনিও কি দুনিয়ার প্রতি উৎসুক? তিনি তৎক্ষণাৎ পাথরটি মাথার নীচ থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন।

একারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সাঃ) থেকে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি উপর্যুপরি কয়েকদিন খাবার গ্রহণ করতেন না। ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। ওলীগণের অবস্থাও তেমনি হয়ে থাকে। এর কারণে আখেরাতে তাদেরকে পূর্ণ অংশ দান করা হবে। স্নেহশীল পিতা তার পুত্রকে ফলমূল ইত্যাদি থেকে ফিরিয়ে রাখে; কিন্তু ইনজেকশন ও অপারেশন করে ব্যথা দেয়। এ কাজ কৃপণতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে করা হয় না; বরং এর কারণ স্নেহ ও মহব্বত।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে বস্তু বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তাই হল দুনিয়া। আর যে বস্তু বিশেষভাবে আল্লাহ্র জন্যে, তা দুনিয়া নয়। কোন্ বস্তুটি বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে—এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা হবে— বস্তু তিন প্রকার। প্রথম, এমন বস্তু, যা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। যেমন, গোনাহের কাজকর্ম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং সে সমস্ত বৈধ নেয়ামত, যেগুলো নিছক দৈহিক আরাম ও সুখের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বস্তুই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিশেষভাবে দুনিয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দনীয়। দ্বিতীয় এমন বস্তু, যা দৃশ্যত আল্লাহর জন্যে; কিন্তু গায়রুল্লাহর জন্যেও হতে পারে। এরূপ বস্তু তিনটি—চিন্তাভাবনা, যিকর ও খাহেশ থেকে বিরত থাকা। এই তিনটি কাজ যদি গোপন করা হয় এবং এর পেছনে আল্লাহর খাহেশ ও আখেরাতে ভয় ছাড়া অন্য কোন কারণ না থাকে, তবে এগুলো আল্লাহর জন্যে হবে এবং দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। কিন্তু পার্থিব স্বার্থে এগুলো করা হলে দুনিয়ার মধ্যেই গণ্য হবে। যেমন, কেউ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট হওয়ার উদ্দেশে ফিকরের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে, মানুষের মধ্যে সাধক বলে খ্যাত হওয়ার জন্যে যিকর করে এবং ধনসম্পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অথবা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্যে খাহেশ বর্জন করে।

তৃতীয় এমন বস্তু, যা বাহ্যত মানসিক আনন্দ লাভের জন্যে; কিন্তু মর্মগতভাবে আল্লাহর জন্যেও করা যায়; যেমন খাদ্য, বিবাহ ইত্যাদি। এগুলোতে নিয়ত কেবল মানসিক আনন্দ হলে এগুলো দুনিয়া। আর যদি এবাদতে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে আল্লাহর জন্যে হবে। হাদীসে আছে—

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَمَنْ طَلَبَهَا اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ও গর্ব করার জন্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দারিদ্র্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং নিজেকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে দুনিয়া অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উঠবে যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। দেখ, শুধু নিয়ত বদলে যাওয়ার কারণে অবস্থা কেমন বদলে যায়। এ থেকে জানা গেল, সেই আনন্দকেই দুনিয়া বলে, যা জীবদ্দশায় শেষ হয়ে যায় এবং আখেরাতে কোন কাজে আসে না। একেই "হাওয়ায়ে নফস" তথা রৈপিক কামনা বলা হয়। নিম্নের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ, এবং যে নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টির নাম দুনিয়া বলা হয়েছে—

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ -

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন হচ্ছে খেলাধুলা, ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্বাহংকার এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা।

এই পাঁচটি বিষয় থেকে সাতটি ফলাফল অর্জিত হয়, যা নিম্ন আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু।

অতএব, যে বস্তু আল্লাহ তা'আলার জন্যে, তা দুনিয়া নয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পরিমাণ হয়, তবে তা আল্লাহর জন্যে। আর এসব বস্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত আকর্ষণ করা বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহর জন্যে নয়। এ দু'টি স্তরের মাঝখানে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আরও একটি স্তর আছে, যাকে অভাব বলা হয়। এই অভাবেরও দু'টি প্রান্ত ও একটি মধ্যভাগ আছে। এক প্রান্ত প্রয়োজনের সীমার কাছাকাছি। এটা কিছুতেই ক্ষতিকর নয়। কেননা, মানবীয় প্রয়োজনাদি সত্ত্বেও কেবল প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ থাকা মানুষের জন্যে অসম্ভব। অভাবের অপর প্রান্ত বিলাসিতার সীমার কাছাকাছি। এ প্রান্ত থেকে নিজেকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখাই উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি রাজকীয় চারণভূমির কাছে কাছে জন্তু নিয়ে ঘুরাফেরা করে, তার জন্যে চারণভূমিতে ঢুকে পড়া আশ্চর্য নয়। প্রয়োজনের কাছাকাছি যে প্রান্তটি রয়েছে, যথাসম্ভব তার কাছেই থাকবে। কেননা, এসব বিষয়ে পয়গম্বর ও ওলীগণের অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাঁদের সবাই সদাসর্বদা নিজেদেরকে প্রয়োজনের সীমার কাছাকাছি রাখতেন।

সেমতে হযরত ওয়ায়স কারনী নিজেকে প্রয়োজনের সীমার এত কাছাকাছি রাখতেন যে, পরিবারের সবাই তাকে পাগল মনে করত। তারা তাঁর বসবাসের জন্যে বাড়ীর দরজায় একটি কক্ষ তৈরী করে দিয়েছিল। তিনি তাতেই থাকতেন। কখনও এক বছর, কখনও দু'বছর এবং কখনও তিন বছর পর বাড়ী আসতেন। এতদিন পর্যন্ত কেউ তার মুখ দেখতে পেত না। এশার শেষ সময়ের পরে কক্ষে আসতেন এবং ফজরের আযানের পূর্বে বের হয়ে যেতেন। আহার এই স্থির করেছিলেন যে, সারা দিন খোরমার বীচি কুড়াতেন। কোন শুষ্ক বড় খোরমা তাতে পাওয়া গেলে সেটি ইফতারের জন্যে রেখে দিতেন। বেশী পাওয়া গেলে নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু রেখে ফকীরদেরকে সদকা করে দিতেন। কোন বড় খোরমা না পেলে বীচি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে কোন খাবার কিনে খেয়ে নিতেন। তাঁর বস্ত্রের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা ছেঁড়াবাস কুড়িয়ে এনে ফোরাতের পানিতে ধুতেন। অতঃপর সেগুলোকে একত্রে সেলাই করে পরতেন। অধিকাংশ শিশু তাকে পাগল মনে করে নুড়ি নিক্ষেপ করত। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন ঃ ভাইয়েরা আমার, যদি আমাকে ঢিল মার, তবে ছোট ছোট ঢিল মারবে। বড় ঢিল মারলে যদি রক্ত বের হয়ে যায়, তবে পানি না পাওয়া গেলে নামাযে ব্যাঘাত হতে পারে। এগুলো ছিল হযরত ওয়ায়স কারনীর স্বভাব-চরিত্র। এ কারণেই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নিজের কালামে তাঁকে একজন মহান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করেই এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি করুণাময়ের সুগন্ধি এয়ামনের দিক থেকে পাই।

হযরত উমর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন সবাইকে সমবেত করে বললেন, তোমরা সবাই কুফায় বসে যাও। সবাই বসে গেল। এরপর খলীফা বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ইরাকের অধিবাসী, সে দাঁড়াও। এরপর বললেন ঃ তোমরাও বসে যাও। তবে মুদার গোত্রের কেউ থাকলে দাঁড়াও। অতঃপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি কারনের অধিবাসী, সে ছাড়া সকলেই বসে যাক। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রইল। খলীফা তাকে বললেন ঃ তুমি কি কারনের অধিবাসী? সে বলল ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি ওয়ায়স ইবনে আমের কারনীকে চিন? এরপর তিনি তার যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। লোকটি বলল ঃ জী হাঁ চিনি হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আল্লাহর কসম, আমাদের গোত্রে ওয়ায়স সর্বাধিক নির্বোধ ও পাগল ব্যক্তি। একথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি যা কিছু বলেছি, নিজে থেকে বলিনি; বরং এসব কথা আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি। তিনি আরও বলেছেন,

يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ مِثْلُ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ

অর্থাৎ, তাঁর শাফায়েতের মধ্যে রবীয়া ও মুযার গোত্রের সমপরিমাণ লোক অন্তর্ভুক্ত হবে।

হারম ইবনে হাব্বান (রাঃ) বলেন ঃ হযরত উমরের মুখে এসব কথা শুনে আমি কুফায় গেলাম। ওয়ায়সের সন্ধান লাভ করা ছাড়া এ সফরের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য ছিল তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা। সেমতে আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি তখন ফোরাতের তীরে বসে দুপুরের সময় উযু করছিলেন। হারম ইবনে হাব্বান বলেন ঃ আমি শুনে আসা চিহ্নসমূহের মাধ্যমে চিনে নিলাম যে, ইনিই ওয়ায়স কারনী। গৌর বর্ণের এই লোকটি অত্যন্ত শক্ত দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ মুণ্ডিত এবং দাড়ি অত্যন্ত ঘন ছিল। দেখতে বিশ্রী ছিলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি করমর্দন করতে অস্বীকার করলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত হোক আপনার প্রতি। আপনার কি অবস্থা হে ওয়ায়স কারনী। একথা শুনে তার দু'চোখ মহব্বতের অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। তখন তার যে অদ্ভুত অবস্থা দেখা গেল, তার কিছুটা আমি জানি। অবশেষে আমিও কাঁদলাম, তিনিও কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ হে হারম ইবনে হাব্বান, আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন—এখানে কেমন করে এলে? তোমার অবস্থা কি? আমার ঠিকানা কোথায় পেলে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার কাছে আসার পথপ্রদর্শন করেছেন।

ইবনে হাব্বান বলেন ঃ আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না যে, তিনি আমাকে কেমন করে চিনতে পারলেন! অথচ আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে না আমি কখনও তাঁকে দেখেছিলাম, না তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে কেমন করে চিনলেন এবং আমার পিতার নাম কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন ঃ

نَبَّأَنِى الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ

অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন।

তুমি জান না, আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে। আমার আত্মা তোমার আত্মাকে চিনে নিয়েছে। মুমিনগণ একে অপরকে চিনে। তারা পরস্পরের বন্ধু। আত্মাদের পারস্পরিক কথাবার্তা হয়; যদিও তাদের বাসস্থান দূরে দূরে থাকে এবং মাঝখানে বহু মনযিলের দূরত্ব থাকে। আমি বললাম ঃ কোন একটি হাদীস বর্ণনা করুন। আমি আপনার মুখ থেকে একটি হাদীস শুনতে আগ্রহী। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখিনি এবং কখনও তাঁর পবিত্র খেদমতে হাযির হতে পারিনি। তবে আমি তাঁদেরকে দেখেছি, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মুখ থেকে আমি হাদীস শুনেছি, যেমন তুমি শুনেছ। আমি নিজের উপর এর দরজা উন্মুক্ত করা ভাল মনে করি না। আমি মুহাদ্দিস, মুফতী অথবা কাযী হতে চাই না। ইবনে হাব্বান! আমি আত্মসংশোধনে এত অধিক ব্যস্ত যে, এসব বিষয়ে মানুষের সাথে ব্যাপৃত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকার ফুরসত নেই। অতঃপর আমি বললাম ঃ তা হলে কোরআন পাকের কোন আয়াতই পাঠ করুন আমি শুনি। আমার জন্যে দোয়া করুন এবং আমাকে উপদেশ দিন, যা আমি স্মরণ রাখব। আপনার সাথে আমার নিছক মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে। ইবনে হাব্বান বলেন ঃ এরপর তিনি উঠলেন এবং আমার হাত ধরে ফোরাতের কিনারায় পায়চারি করতে লাগলেন। এসময় বললেন ঃ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অতঃপর কাঁদলেন এবং আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এতদুভয়কে সৎ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

এ আয়াতটি তিনি اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ পর্যন্ত পাঠ করে এত জোরে চীৎকার করে উঠলেন যে, আমার মনে হল তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ হে ইবনে হাব্বান, তোমার পিতা মারা গেছেন। অতি সত্বর তুমিও মরবে। অতঃপর জান্নাতে অথবা দোযখে যাবে। শুরু থেকে দেখ, আদম ও হাওয়ার ওফাত হয়েছে। এরপর নূহ (আঃ)-এর মিলন হয়েছে। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর ইন্তেকাল হয়েছে। মূসা (আঃ) বিদায় নিয়েছেন এবং দাঊদ (আঃ) পরলোকগমন করেছেন। এরপর আসমান ও যমীন সৃষ্টির মূল কারণ, রাব্বুল আলামীনের প্রিয়জন, শাফিউল মুযনিবীন মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঊর্ধ্ব জগতের অধিপতি হয়েছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) উপরের ফেরদাউসে আস্তানা গেড়েছেন। এরপর আমার ভাই ও বন্ধু হযরত উমর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ)-ও তাঁর পশ্চাদগমন করেছেন। একথা বলে তিনি 'হায় উমর', 'হায় উমর' বলে কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন! হযরত উমর তো এখনও জীবিত আছেন—মারা যাননি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওফাতের সংবাদ আমাকে দিয়েছেন এবং আমার ওফাতের খবরও দিয়েছেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি ও তুমিও যেন মৃতদের মধ্যেই রয়েছি। এরপর হযরতের বিদেহী আত্মার প্রতি দুরূদ পাঠ করে নীরবে অনেক দোয়া করলেন।

এরপর হযরত ওয়ায়স কারনী বললেন ঃ ইবনে হাব্বান! আমার উপদেশ এই যে, আল্লাহর কিতাব ও সৎকর্মপরায়ণদের পদ্ধতিকে নিজের কর্মপদ্ধতি রাখবে। আমার ও তোমার মৃত্যুর খবর আমি পেয়ে গেছি, মৃত্যুকে সদা-সর্বদা স্মরণ রাখবে এবং এক মুহূর্তও গাফেল হবে না। যখন নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করবে, উপদেশ দেবে এবং সমস্ত উম্মতের শুভ কামনা করবে। যদি দল থেকে অর্ধ হাত পরিমাণে আলাদা হয়ে যাও, তবে ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে যাবে অথচ টেরও পাবে না। পরিণামে দোযখে পতিত হবে। নিজের জন্যে এবং আমার জন্যে দোয়া করবে। এরপর তিনি বললেন ঃ ইলাহী, এ ব্যক্তি নিজ জানা মতে আমাকে তোমার জন্যে ভালবাসে এবং তোমার জন্যেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। জান্নাতেও তার মুখমণ্ডল আমাকে দেখাবে এবং দারুস-সালামে তাকে আমার কাছে পাঠাবে। সে যতদিন জীবিত থাকে, তার প্রাণ ও ধন-সম্পদের দেখাশুনা করো এবং সামান্য দুনিয়া নিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার তৌফিক তাকে দান করো। আমার পক্ষ থেকেও তাকে প্রতিদান দিও। এরপর বললেন ঃ হে হারম ইবনে হাব্বান, এখন তোমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর আর কখনও আমার কাছে আসবে না। আমি খ্যাতি অপছন্দ করি। নির্জনতা আমার ভাল লাগে। আমি অন্তর দ্বারা তোমার কাছে আছি যদিও দেখতে দূরে। অতএব তালাশ করার প্রয়োজন নেই। আমাকে স্মরণ করে আমার জন্যে দোয়া করবে। আমিও ইনশাআল্লাহ্ তাই করব। এখন আমি এদিকে যাচ্ছি। তুমি ওদিকে যাও। আমি কিছুদূর তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাথে চলতে চাইলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না এবং আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি তাঁর অবস্থা কতভাবে জানতে চেয়েছি; কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। আল্লাহ তাঁর মাগফেরাত করুন। এ ছিল আখেরাতের লোকদের অবস্থা।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল, আকাশের নিচে ও যমীনের উপরে যা কিছু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেসব বস্তু আল্লাহর জন্যে, সেগুলো ছাড়া বাকী সবই দুনিয়া। দুনিয়া আখেরাতের বিপরীত। যে বস্তু দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য তাই আখেরাত। সুতরাং দুনিয়ার যেটুকু দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের শক্তি অর্জিত হয়, সে পরিমাণ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। এ বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো যাক। উদাহরণতঃ কোন হাজী হজ্জের পথে কসম খেল যে, সে হজ্জ ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হবে না। এরপর সে হজ্জের পথে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের হেফাযত করল, সওয়ারীকে ঘাস-পানি খাওয়াল অথবা আসবাবপত্রের থলে সেলাই করল। এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। তাকে হজ্জের মধ্যেই মশগুল বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে মানুষের দেহও আত্মার সওয়ারী, যা দ্বারা সে জীবনের দূরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাং এলম ও আমলের শক্তি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দেহের যত্ন নেয়া দুনিয়ার মধ্যে নয়; বরং আখেরাতের মধ্যে গণ্য হবে। অবশ্য যদি যত্ন নেয়া দেহের আনন্দ ও বিলাসের জন্যে হয়, তবে তা হবে বৈরী কাজ। এতে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। তানানেসী (রহঃ) বলেন ঃ আমি কা'বা মসজিদের বনী শায়বা দরজায় সাতদিন পর্যন্ত উপবাস করলাম। অষ্টম রাত্রিতে আমি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম—যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত দুনিয়া গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তশ্চক্ষুকে অন্ধ করে দেবেন। "মানুষের জন্যে দুনিয়ার অবস্থা" শীর্ষক এই বর্ণনা সম্পর্কে খুব চিন্তা কর। ইনশাআল্লাহ হেদায়াত পাবে।

যে সব কারণে মানুষ নিজেকে ও স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়েছে ঃ প্রকাশ থাকে যে, বাইরে বিদ্যমান বস্তুসমূহকে সাধারণত দুনিয়া বলে ব্যক্ত করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়। এগুলো হচ্ছে পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরিস্থিত বস্তুসমূহ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, পৃথিবীর সবকিছুকে আমি পৃথিবীর সাজসজ্জা করেছি; যাতে মানুষকে পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার আমল উত্তম।

পৃথিবী তো মানুষের শয্যা, বাসস্থান ও অবস্থানস্থল। তার উপরিস্থিত বস্তুসমূহ পানাহার, বস্ত্র ও সংসর্গে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের বস্তুসমূহ তিন প্রকার—খনিজ, উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজ। উদ্ভিদ খাদ্য ও ঔষধের জন্যে কাম্য। খনিজ পদার্থ যন্ত্রপাতি ও পাত্র নির্মাণে ব্যবহৃত। প্রাণীজ দু'প্রকার—মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু। চতুষ্পদ জন্তুকে মাংস, বোঝা বহন ও সাজসজ্জার জন্যে রাখা হয়। মানুষ দ্বারা কখনও সেবা নেয়া উদ্দেশ্য হয়। যেমন, গোলাম ও বাঁদী দ্বারা নেয়া হয়। কখনও সঙ্গম উদ্দেশ্য হয়; যেমন নারীদের মধ্যে স্ত্রী ও বাঁদীদের সাথে করা হয়। আবার কখনও সম্মান ও তাযীম পাওয়ার জন্যে অন্তরসমূহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা লক্ষ্য হয়। একে বলা হয় "জাহ" তথা মানুষের মনের মালিক হওয়া।

অতএব, এ সকল বস্তুকে বলা হয় দুনিয়া। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে এগুলোকে একত্রে উল্লেখ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ -

অর্থাৎ সুসজ্জিত করা হয়েছে মানুষের জন্যে নারী ও সন্তান-সন্ততির মোহ।

এগুলো মানুষ সম্পর্কিত।

وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অর্থাৎ, সঞ্চিত স্বর্ণরৌপ্যের মোহ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এগুলো খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত। এতে মোতি, এয়াকুত ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ

অর্থাৎ, চিহ্নিত অশ্ব ও গবাদি পশুর মোহ।

এগুলো প্রাণীজ সম্পর্কিত। وَالْحَرْثِ এবং ক্ষেত্র-খামারের মোহ।

এগুলো উদ্ভিদ সম্পর্কিত।

কিন্তু মানুষের সাথে ভূ-পৃষ্ঠের এসকল বস্তুর সম্পর্ক দু'টি। একটি তার অন্তরের সাথে এবং অপরটি দেহের সাথে। অন্তরের সাথে সম্পর্ক হল, মানুষের অন্তরে এসব বস্তুর মহব্বত। ফলে সে এগুলোর হেফাযত করে এবং এগুলোর প্রতি সর্বশক্তি নিয়োজিত করে; যেন সে দুনিয়ার দাস। এ সম্পর্কের মধ্যে দুনিয়ার সাথে জড়িত অন্তরের সকল গুণাগুণ অন্তর্ভুক্ত। যেমন, অহংকার, দ্বেষ, হিংসা, রিয়া, সুখ্যাতি, কুধারণা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি। এ সম্পর্ককে বাতেনী দুনিয়া বলা হয়। আর যাহেরী দুনিয়া হচ্ছে উল্লিখিত বস্তুসমূহ। দেহের সাথে সম্পর্ক হল দেহ এসব বস্তুকে ঠিকঠাক রাখার কাজে দেহের নিয়োজিত হওয়া, যাতে এগুলো নিজের এবং অপরের আনন্দ লাভের যোগ্য হয়ে যায়। এ সম্পর্কের মধ্যে যাবতীয় পেশা ও কারিগরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে মানুষ দিবারাত্র মশগুল ও নিমজ্জিত।

উপরোক্ত দু'টি সম্পর্কের কারণে মানুষ না নিজের খবর রাখে, না দুনিয়াতে তার পরিণাম ও সূচনা সম্পর্কে কোন চিন্তা করে। যদি সে নিজেকে এবং নিজের পালনকর্তাকে চিনত এবং দুনিয়ার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করত, তবে নিশ্চিতরূপেই জানতে পারত যে, দুনিয়ার বস্তুসমূহ অর্থাৎ, যাহেরী বা বাহ্যিক দুনিয়া সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, যে সওয়ারীতে বসে আল্লাহ তা'আলার কাছে যেতে হবে, তার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করা। এখানে সওয়ারী অর্থ মানবদেহ। পানাহার, বাসস্থান ও বস্ত্র ব্যতীত এ দেহ টিকে থাকতে পারে না। হজ্জের পথে উট যদি দানাপানি ও বিশ্রাম না পায়, তবে সে জীবিত থাকতে পারে না। যে মানুষ দুনিয়াতে নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, সে সেই হজ্জযাত্রীর মত, যে মনযিলে অবস্থান করে কেবল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উটের ঘাস-পানি, সাজসজ্জা ও খেদমতের কাজে মশগুল থাকে। কোন জায়গা থেকে ঘাস আনে আর কোন জায়গা থেকে ঠাণ্ডা পানি সংগ্রহ করে। এমনি চিন্তায় ব্যাপৃত থাকার কারণে সে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সে জানেও না যে, এরূপ করলে হজ্জ তো যাবেই, তৎসঙ্গে উটসহ সে নিজেও কীটপতঙ্গ ও পোকা-মাকড়ের খোরাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিচক্ষণ হাজীর অন্তর কা'বাগৃহ ও হজ্জের মধ্যে ব্যাপৃত থাকবে এবং সওয়ারীর সেবাযত্ন প্রয়োজন পরিমাণে করবে, যাতে তার চলার ক্ষমতা বহাল থাকে।

অনুরূপভাবে আখেরাতের সফরে যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, সে দেহের জরুরী খেদমত কর; যেমন কেউ প্রয়োজনের সময় পায়খানায় যেয়ে বসে। আহার্য গ্রহণ করা এবং তাকে মলদ্বার দিয়ে বের করায় কোন তফাৎ নেই। উভয় কাজ প্রয়োজনের জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং পায়খানার কাজে যেমন মানুষ প্রয়োজন পরিমাণেই ব্যাপৃত হয়, তেমনি উদরপূর্তির কাজেও প্রয়োজন অনুযায়ী মশগুল থাকা দরকার। যে বস্তুটি মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে অধিকতর ফিরিয়ে রাখে, সেটি হচ্ছে উদর। এর কারণেই মানুষ দুনিয়া ও তার রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার ফলেই সীমাহীন কর্মব্যস্ততা প্রয়োজন এবং এসব কর্মব্যস্ততায় পেরেশান হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য ভুলে যায়।

আমরা এখানে দুনিয়ার কাজকর্মের বিবরণ এবং তৎপ্রতি মানুষের প্রয়োজন বিশদভাবে বর্ণনা করব, যাতে জানা যায় যে, দুনিয়ার কাজকর্মের কারণে মানুষ আল্লাহর দিক থেকে কিভাবে গাফেল হয়ে যায় এবং নিজের পরিণতি কিভাবে বিস্মৃত হয়ে থাকে?

দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত রয়েছে। এসব বৃত্তির প্রাচুর্যের কারণ এই যে, মানুষ তিনটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। অন্ন জীবন ধারণের জন্যে, বস্ত্র শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং বাসস্থান উত্তাপ ও শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং পরিবার-পরিজন ও জান-মালের হেফাযতের জন্যেও প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান এরূপ করে সৃষ্টি করেননি যে, তাতে মানুষের কর্ম ও নৈপুণ্যের কোন দখল থাকবে না। অবশ্য চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের জন্যে এরূপ করেছেন। উদাহরণতঃ পশুখাদ্য ঘাস রান্না করে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে পশুদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেহের লোম পোশাকসদৃশ হওয়ার কারণে তাদের আলাদা পোশাকের প্রয়োজন নেই। তাদের মাংসই এমনভাবে গঠিত যাতে উত্তাপ ও শৈত্য প্রভাব বিস্তার করে না। তারা বনে জঙ্গলে থাকতে পারে। তাই বাসস্থানেরও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এজন্যে প্রাথমিক স্তরে এবং মূলত পাঁচটি শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কৃষি, পশুচারণ, শিকার, বুনন ও নির্মাণ। অতএব, কৃষক শস্য উৎপাদন করে। রাখাল গবাদি পশুর দেখাশুনা করে এগুলো থেকে বাচ্চা গ্রহণ করে। শিকারী এমন বস্তু সংগ্রহ করে, যার সৃষ্টিতে মানবকর্মের কোন দখল নেই— আপনা থেকে উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করার জন্যে অনেক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজন হয়। অতঃপর প্রত্যেক বিদ্যার জন্যে যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার দরকার হয়, যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতি, বুনন যন্ত্রপাতি এবং গৃহ নির্মাণ যন্ত্রপাতি। শিকারের যন্ত্রপাতি কাষ্ঠ নির্মিত, লৌহনির্মিত, অথবা জন্তু-জানোয়ারের চর্মনির্মিত হয়ে থাকে। এতে আরও তিন প্রকার কারিগর প্রয়োজন হয়— কাঠমিস্ত্রী, কামার ও চামড়া শিল্পী। কাঠমিস্ত্রী সেই, যে আমাদের উদ্দেশ্যে কাঠের কাজ করে। কামার সেই ব্যক্তি, যে খনিজ পদার্থের কাজ করে— লোহার কাজ করুক অথবা স্বর্ণের। চামড়া শিল্পীও সেই ব্যক্তি, যে চামড়ার ও জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গ ও অংশের কাজ করে। সুতরাং এগুলো হচ্ছে মৌলিক কারিগরি।

এরপর মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একা থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধতার মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, তার মত অন্য মানুষ তার কাছে থাকতে হবে। দু'কারণে সমাজবদ্ধতার প্রয়োজন। প্রথমত, মানবজাতির অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্যে। নারী ও পুরুষের একত্রে থাকা ছাড়া এটা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, একে অপরকে খাদ্য ও পোশাক তৈরীতে এবং সন্তান-সন্ততির লালন-পালনে সাহায্য করার জন্যে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একাকী কৃষি কাজ করতে পারে না। কারণ, কৃষিকাজের জন্যে যন্ত্রপাতি দরকার। যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্যে কাঠমিস্ত্রী, কামার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। খাদ্যের জন্যে আটা পিষ্টকারী, রন্ধনকারী আবশ্যক। সারকথা, মানুষের একাকী বসবাস করা কঠিন।

সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার জন্যে সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণ করে এক একটি পরিবার তাদের সাজ-সরঞ্জামসহ আলাদা আলাদা থাকা জরুরী, যাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাহ্যিক যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয় এবং চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকেও হেফাযতে থাকা যায়। এসব কারণেই শহর ও নগরসমূহের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। লোকজন যখন শহরে একত্রে বসবাস করে এবং পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তখন পারস্পরিক কলহ-বিবাদও সৃষ্টি হয়। যদি তাদেরকে কলহের ভেতর ছেড়ে দেয়া হয়, তবে লড়াই করে করে ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব কারণে অনেক শিল্পের উদ্ভব হয়। প্রথমত, জরিপ শাস্ত্র। এর দ্বারা ভূমির পরিমাণ জানা যায় এবং কলহ দেখা দিলে সঠিকভাবে সমান বন্টন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত, সামরিক বিদ্যা, যাতে তরবারির জোরে চোর-ডাকাতের কবল থেকে নগরের হেফাযত করা যায়। তৃতীয়ত, পঞ্চায়েত ও শাসনবিদ্যা, যাতে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। চতুর্থত, ফিকাহ; অর্থাৎ শরীয়তের আইন, যা দ্বারা মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম থাকে এবং পারস্পরিক লেন-দেনে সীমা লংঘন না হয়। এসবের প্রত্যেকটির জন্যে নির্দিষ্ট গুণের অধিকারী লোকের প্রয়োজন।

এখন দেখা দরকার, শুরুতে কেবল অন্ন , বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু পরিণামে কত ঝামেলা দেখা দিয়েছে। দুনিয়ার সব কাজ-কারবারের অবস্থা তাই। এক কাজ শুরু করলে দশ কাজ সামনে এসে হাযির হয়। এরপর সীমাহীন কাজ আসতেই থাকে। দুনিয়া যেন একটি তলাহীন দোযখ। মানুষ যখন এর এক গর্তে পতিত হয়, তখন সেখান থেকে অন্য গর্তে পিছলে পড়ে। মানুষের চারপাশে কেবল কাজই কাজ। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই তার সব কাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে সে নিজেকে এবং নিজের পরিণতিকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততার কারণে তাদের চক্ষু উন্মোচিত হয় না। খাদ্য অন্বেষণের চেষ্টা করাই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য। যারা কৃষি ও কারিগরি কাজে লিপ্ত, তারা দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি পায় না এবং ধর্ম-কর্মে মনোযোগ দেয় না। রাতের খাদ্যের জন্যে সারাদিন পরিশ্রম করে এবং রাতে দিনের বেলার পরিশ্রম করার জন্যে খাদ্য গ্রহণ করে। তারা আমৃত্যু এমনিভাবে কলুর বলদের মত নির্দিষ্ট কাজ করে যায়।

কিছু লোকের ধারণা, শরীয়তের উদ্দেশ্য কাজকর্ম করেই ক্ষান্ত থাকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং জীবনের আনন্দ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকা নয়; বরং উদরের খাহেশ ও যৌন বাসনা পূর্ণ করাই সৌভাগ্য। ফলে, তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে নারী সম্ভোগে ও সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা এগুলোকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে নিয়েছে।

অন্য এক দল মানুষ মনে করেছে, অর্থ-সম্পদ ও ধন-ভাণ্ডারের প্রাচুর্যই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। ফলে, তারা রাতদিন কেবল অর্থ সংগ্রহের চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। এজন্যে কঠোর পরিশ্রম করে এবং দূর-দূরান্তের সফর করে। প্রয়োজন ছাড়া কার্পণ্যবশত অর্থ ব্যয় করে না। আশি ও নিরানব্বইয়ের চক্করে পড়ে থাকে। মৃত্যুর পর তাদের উপার্জন হয় ভূ-গর্ভেই থেকে যায়, না হয় কোন "খাদক" ব্যক্তির হাতে পড়ে যায়। সে তো বিলাসিতা করে; কিন্তু যে পাই পাই করে সঞ্চয় করেছিল, সে বিপদ ও শাস্তিতে গ্রেফতার থাকে। অন্য সঞ্চয়কারীরা এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ করে না।

কিছু লোক ধারণা করে, সৌভাগ্য সুখ্যাতির মধ্যে সীমিত। মানুষ তাদের সুবেশ ও ভদ্রতার প্রশংসা করুক, তারা তাই চায়। ফলে, তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার সামান্য অংশ পানাহারে ব্যয় করে। অবশিষ্ট সকল সম্পদ পোশাক ও চিত্তাকর্ষক যানবাহনে ব্যয় করে। ঘরের দরজা এবং অন্যান্য যে সব জায়গায় মানুষের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলোকে কারুকার্য খচিত ও সুসজ্জিত করে রাখে, যাতে মানুষ তাদেরকে বিত্তশালী মনে করে।

আরও কিছু সংখ্যক লোক মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও সম্মানিত হওয়াকেই সৌভাগ্য মনে করে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাতে মানুষ তাদের আনুগত্য করে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং সরকারী দায়িত্ব পেলে প্রচুর আহলাদিত হয়। অধিকাংশ গাফেল লোকের মাঝে এই মনোভাব বিদ্যমান। জনগণের আনুগত্যের মহব্বতে তারা আল্লাহর আনুগত্য, এবাদত ও আখেরাতের চিন্তা বিসর্জন দেয়।

এসব দল ছাড়া আরও সত্তরেরও অধিক দল রয়েছে, যারা নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার কাজে লিপ্ত। এটা কেবল এ কারণে যে, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনে তারা ভুলে গেছে, এগুলো কি কারণে প্রয়োজন এবং এগুলোর কি পরিমাণ যথেষ্ট? অতএব, যে ব্যক্তি এই কারণ ও পরিমাণ জানবে, সে একথাও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জানবে যে, তার কাজ ও ব্যবসায়ের অংশ শুধু তার দেহের দেখাশুনা করা। সে যদি এই অংশও হ্রাস করে, তবে তার সকল কর্মব্যস্ততা দূর হয়ে যাবে এবং সে পূর্ণ অবসরে থেকে কায়মনোবাক্যে আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে।

এপর্যন্ত সে সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হল, যারা দুনিয়ার কাজ-কারবারে নিমজ্জিত থাকে। এখন শুনা দরকার যে, কিছু লোক এর বিপরীতে দুনিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতে বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান তাদের মনে নানাবিধ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ তাদের কেউ কেউ মনে করে, দুনিয়া পরিশ্রম ও বিপদাপদের জায়গা এবং আখেরাত সৌভাগ্যের আবাসস্থল। যে আখেরাতে পৌঁছে, সে সৌভাগ্যে প্রবেশ করে—এবাদত করুক বা না করুক। এতে তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, পার্থিব শ্রম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়া উত্তম (হিন্দু যোগীদের মধ্যে একদলের তাই বিশ্বাস)। তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মা হুতি দেয়। তারা মনে করে, এভাবে পার্থিব শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যাবে।

কেউ কেউ মনে করে, আত্মহত্যা করে মুক্তি পাওয়া যায় না। বরং প্রথমে মানবীয় গুণসমূহ বিলুপ্ত করতে হবে এবং কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে হবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। ফলে, কিছু সংখ্যক তো সাধনার সময়ই মারা যায় এবং কিছুসংখ্যক উন্মাদ ও বদ্ধপাগল হয়ে যায়। কেউ কেউ সিদ্ধি লাভে অক্ষম হয়ে শরীয়তের উপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

এগুলো ছাড়া আরও অনেক বাতিল মতবাদ ও পথভ্রষ্টতা প্রচলিত রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা সত্তরের কিছু বেশী। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একটি দল মুক্তি পাবে। এই দলটিতে তারাই রয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের তরীকা অনুসরণ করে। অর্থাৎ, যাদের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়া সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়; বরং দুনিয়া থেকে পাথেয় পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত এবং খাহেশের মূলোৎপাটন ততটুকুই করা দরকার, যতটুকু শরীয়তের নির্দেশ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নবম অধ্যায়

কৃপণতার নিন্দা ও ধন-সম্পদের মহব্বত

দুনিয়ার ফেতনা ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু সবচাইতে বড় ফেতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। এর মধ্যে দুঃখ-কষ্টও বেশী। অনিষ্টের বেশীর ভাগ কারণ এই যে, ধন-সম্পদ থেকে কেউ বেপরওয়া নয় এবং নিরাপত্তারও কোন উপায় নেই। ধন-সম্পদ না থাকলে যে দারিদ্র্য আসে, তা মানুষকে কুফরের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। অপরপক্ষে ধন-সম্পদ থাকলে তা অবাধ্যতার কারণ হয়ে যায়, যার পরিণাম ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। মোটকথা, ধন-সম্পদ উপকার ও ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। এর উপকারগুলো উদ্ধারকারী এবং অপকারগুলো ধ্বংসকারী। কোন্ ধন-সম্পদ উত্তম এবং কোন্‌গুলো মন্দ, তা চেনা সুকঠিন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না। তাই পৃথকভাবে এটিকে বর্ণনা করা নেহায়েত জরুরী।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে সাধারণ দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, ধন-সম্পদের দিক দিয়ে নয়। কেননা, দুনিয়া বলা হয় মানুষের জীবনের অনেকগুলো অংশকে। তন্মধ্যে ধন-সম্পদও একটি অংশ। এ অধ্যায়ে আমরা কেবল ধন-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করব। কারণ, এতে বিপদাপদ ও ক্ষতি অনেক বেশী। ধন-সম্পদের অভাবে মানুষ দারিদ্র্যের বিশেষণে বিশেষিত হয় এবং এর উপস্থিতিতে ধনাঢ্যতার বিশেষণ এসে যায়। এই উভয় বিশেষণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তির দুই অবস্থা— অল্পে তুষ্টি ও লোভ। প্রথম অবস্থাটি প্রশংসনীয় এবং দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়। লোভীরও দুই অবস্থা। এক, মানুষের ধন-সম্পদে লোভ করা এবং দুই, অপরের ধন-সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে কারিগরি ও পেশায় তৎপর হওয়া। উভয় অবস্থার মধ্যে অপরের ধন-সম্পদে লোভ করা মস্তবড় বিপদ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরও দুই অবস্থা—অপব্যয় ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মিতব্যয়িতা। তন্মধ্যে উত্তম মিতব্যয়িতা। এসব বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিধায় এগুলো বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী।

নিম্নে আমরা চৌদ্দটি বর্ণনায় এর বিশ্লেষণ পেশ করছি।

ধন-সম্পদের নিন্দা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَاأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল না করে দেয়। যারা তা করে অর্থাৎ গাফেল হয়ে যায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ -

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো অনিষ্টকারী বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

অর্থাৎ, মানুষ নিজেকে ধনাঢ্য দেখে বলেই ঔদ্ধত্য করে।

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

অর্থাৎ, প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে।

হাদীসে বলা হয়েছে— ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের মহব্বত অন্তরে নিফাক (কপটতা) সৃষ্টি করে। যেমন পানি দ্বারা শাক উৎপন্ন হয়। আরও বলা হয়েছে— যদি ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তারা এতটুকু ক্ষতি করবে না, যতটুকু ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের মহব্বত মুসলমানের ধর্মের ক্ষতি করে। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দুষ্ট কারা? তিনি বললেন ঃ ধনাঢ্যরা। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— তোমাদের পরে সত্বরই এমন লোক হবে, যারা মিহিন ও রকমারি খাদ্য খাবে, উৎকৃষ্ট ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হবে, সুন্দরী ও সুগঠিত নারীদেরকে বিয়ে করবে, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, সামান্য বস্তুতে তাদের উদরপূর্তি হবে না এবং অনেক পেয়েও তুষ্ট হবে না। তারা দুনিয়ারই সেবাদাস হয়ে থাকবে। সকাল-সন্ধ্যায় দুনিয়াই দৃষ্টিতে থাকবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত দুনিয়াকেই উপাস্য ও প্রতিপালক জ্ঞান করবে। তোমাদের মধ্যে অথবা তোমাদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে যে কেউ সেই যুগে থাকে, তাকে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে কসম, সে যেন এরূপ লোকদের সালাম না করে, তাদের রোগীদেরকে দেখতে না যায়, তাদের জানাযায় যোগদান না করে এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে। যে এরূপ করবে, সে ইসলামের ভিত ভূমিসাৎ করার কাজে উদ্যোক্তা ও সাহায্যকারী হবে।

আরও বলা হয়েছে— দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্যে ছেড়ে দাও। কেননা, যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় দুনিয়া অর্জন করবে, সে নিজের মৃত্যু অর্জন করবে অথচ, টেরও পাবে না। এক হাদীসে আছে—

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْلَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ

অর্থাৎ, আদম সন্তান বলে ঃ আমার ধন, আমার ধন! অথচ তোমার ধন তাই, যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করেছ অথবা পরে ছিন্ন করে দিয়েছ অথবা দান করে হস্তান্তর করেছ। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি মৃত্যু চাই না। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কি কিছু ধন-সম্পদ আছে? সে বলল ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার এই ধন-সম্পদ আখেরাতের জন্য ব্যয় করে ফেল। কেননা, ঈমানদারের অন্তর তার ধন-সম্পদের সাথে থাকে। আখেরাতের জন্যে দিয়ে দিলে সে নিজেও তার ধন-সম্পদের সাথে মিলিত হতে চাইবে। আর যদি ধন-সম্পদ পেছনে রেখে যায়, তবে সে-ও তার সাথে দুনিয়াতে থাকতে চাইবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মানুষের বন্ধু তিনটি। তন্মধ্যে এক বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত সাথে থাকে। দ্বিতীয় কবর পর্যন্ত এবং তৃতীয় কিয়ামত পর্যন্ত সাথে থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে ধন-সম্পদ। কবর পর্যন্ত পরিবারের লোকজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে তার আমলসমূহ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একবার সহচররা হযরত ঈসা(আঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি পানির উপর দিয়ে চলেন অথচ আমাদের দ্বারা তা হয় না—এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে দীনার ও আশরফীর কোন মূল্য আছে কি? তারা জওয়াব দিল ঃ হাঁ, আমরা এগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এতদুভয় বস্তু এবং মাটির ঢিলা সমান।

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হযরত আবু দারদার কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন—প্রিয় ভাই, এতটা দুনিয়া সঞ্চয় করো না, যার শুকরিয়া তুমি আদায় করতে পার না। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—যে ধনী ব্যক্তি তার ধন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করবে, কিয়ামতে তাকে ধনসহ উপস্থিত করা হবে। সে যখন পুলসিরাতের এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়বে, তখন তার ধন বলবে, চলতে থাক। তুমি তো আমার মধ্য থেকে আল্লাহর হক দিয়ে দিয়েছ। এরপর এমন ধনী ব্যক্তি পুলসিরাতে আসবে, যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ধন ব্যয় করেনি। তার ধন তার কাঁধে চাপানো থাকবে। যখন সে পুলসিরাতে হেলতে দুলতে থাকবে, তখন তার ধন বলবে, তোর জন্যে দুর্ভাগ্য! তুই আল্লাহর হক আদায় করিসনি। অবশেষে সে হায় হায় করতে থাকবে।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দারিদ্র্যের অধ্যায়ে আমরা ধনাঢ্যতার নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছি। সেগুলোর সারমর্মও ধন-সম্পদের নিন্দা। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দুনিয়ার নিন্দায় যা বর্ণিত হয়েছে, তাও ধন-সম্পদের নিন্দারই অন্তর্ভুক্ত। এ অধ্যায়টি বিশেষভাবে ধন-সম্পর্কিত। সেমতে হাদীসে আছে—

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ

অর্থাৎ, যখন বান্দা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন ফেরেশতারা বলে ঃ সে আগে কি পাঠিয়েছে? আর মানুষ বলে ঃ সে পেছনে কি রেখে গেল?

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ ইলাহী, যে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাকে সুস্থ ও মুক্ত রাখ। তার আয়ু বৃদ্ধি কর এবং তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান কর। এখানে দেখা উচিত যে, দৈহিক সুস্থতা ও আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে অত্যধিক পরীক্ষা মনে করা হয়েছে। কেননা, এতে অবাধ্যতা অবশ্যই হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) একবার হাতের তালুতে একটি দেরহাম রেখে বললেন ঃ তুই এমন বস্তু যে, আমার কাছ থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত আমার কোন কাজেই লাগবি না।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশের খেদমতে কিছু অর্থ পাঠান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই অর্থ কিসের? লোকেরা বলল ঃ খলীফা হযরত উমর আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা উমরকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি একটি পর্দা খুলে সেটাকে টুকরা টুকরা করে থলে সেলাই করলেন এবং সমস্ত অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও এতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, এ বছরের পর যেন আমার কাছে উমরের দান না আসে। তাই হল। পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইন্তেকাল করলেন।

হযরত হাসান বলেন ঃ অর্থ-কড়ি যাকে সম্মান দান করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করেন।

বর্ণিত আছে, যখন প্রথম প্রথম আশরফী তৈরী হল, তখন ইবলীস তাকে নিজের মাথায় রাখল, অতঃপর চুম্বন করে বলল ঃ যে তোমাকে মহব্বত করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার গোলাম হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ টাকা-পয়সা একটি বিচ্ছু। যে এর মন্ত্র জানে না, সে যেন এটা গ্রহণ না করে। কেননা, দংশন করলে এর বিষক্রিয়ায় প্রাণ নাশ হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এর মন্ত্র কি? তিনি বললেন ঃ হালাল পথে উপার্জন করা এবং সৎপথে ব্যয় করা।

মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেদমতে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে গমন করে বলেন ঃ আপনি এমন কাজ করেছেন, যা এর পূর্বে কেউ করেনি। আপনি নিজের সন্তানদের জন্যে কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননি। তিনি বললেন ঃ আমি তাদের কোন হক দাবিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রাখিনি এবং অন্যের হকও তাদেরকে দেইনি। এছাড়া আমার সন্তানরা দু'রকমের হতে পারে। তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল হবে অথবা নাফরমান। যদি আনুগত্যশীল হয়, তবে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ, তিনি সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবক।

আর যদি তারা গোনাহগার ও নাফরমান হয়, তবে তাদের জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই; যা হবার তাই হবে।

একবার মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী অনেক ধন-সম্পদ লাভ করেন। লোকেরা বলল ঃ এই বিপুল ধন-সম্পদ আপনার পুত্রের জন্যে রেখে দিলে ভাল হয়। তিনি বললেন ঃ না; বরং এই ধন-সম্পদ নিজের জন্যে আল্লাহর কাছে জমা রাখব এবং আল্লাহকে আমার পুত্রের জন্যে ছেড়ে যাব।

ধন-সম্পদের সংজ্ঞা এবং তার প্রশংসা ও নিন্দা ঃ আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে ধন-সম্পদকে কয়েক জায়গায় "খায়র" (কল্যাণ) শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এরশাদ হয়েছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا .. الخ — যদি খায়র অর্থাৎ ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়।

ধন-সম্পদের প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ

সৎলোকের জন্যে সৎ ধন-সম্পদ কতই না চমৎকার!

এছাড়া দান-খয়রাত ও হজ্জের যে সওয়াব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও ধন-সম্পদেরই প্রশংসা। কেননা, ধন-সম্পদ ছাড়া হজ্জও হতে পারে না, দান-খয়রাতও হতে পারে না। কোরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বান্দার প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا

অর্থাৎ, এবং তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দ্বারা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাড়িয়ে দেন এবং তৈরী করেন তোমাদের জন্যে বাগ-বাগিচা এবং তৈরী করেন নদ-নদী।

এক হাদীসে আছে— كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফর হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এটাও ধন-সম্পদেরই প্রশংসা।

আবার অন্যত্র অনেক জায়গায় ধন-সম্পদের নিন্দাও করা হয়েছে। এই প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে সমন্বয় বুঝা যাবে না, যে পর্যন্ত ধন-সম্পদের রহস্য, উদ্দেশ্য, বিপদাপদ ও প্রয়োজন জানা না যায়। এ বিষয়টিই জানলে বুঝা যায়, ধন-সম্পদ এক কারণে উত্তম এবং এক কারণে নিকৃষ্ট। উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে প্রশংসনীয় এবং নিকৃষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে নিন্দনীয়। কেননা, ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই কল্যাণ নয় এবং সম্পূর্ণই অকল্যাণ নয়। বরং এটা কল্যাণ ও অনিষ্ট উভয়ের কারণ। যে বস্তু উভয়ের কারণ হবে, তার কখনও প্রশংসা এবং কখনও নিন্দা করা হবে।

জ্ঞানী ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতের সৌভাগ্য। বাস্তবেও তা অক্ষয় সম্পদ ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ এর জন্যেই আগ্রহী। সেমতে হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন— সর্বাধিক মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তিনি বললেন ঃ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ اِسْتِعْدَادًا

অর্থাৎ, যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্যে অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তিনটি ওসীলা ছাড়া দুনিয়াতে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। এক, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন এলম ও সচ্চরিত্রতা। দুই, দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন সুস্বাস্থ্য। তিন, বাইরের শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

মোটকথা, অর্থ-সম্পদও বাইরের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অন্যতম। এর মধ্যে নিম্নতম হচ্ছে আশরফী, টাকা। এগুলো খাদেম। এদের খাদেম কেউ নেই। অন্য বস্তুর কারণে এগুলো কামনা করা হয়। স্বয়ং এগুলোর সত্তা উদ্দেশ্য নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সারকথা, ধন-সম্পদ অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় হয়ে থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য ভাল হলে ধন-সম্পদও ভাল হবে। এতে জানা গেল, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া গ্রহণ করে, সে যেন জেনে-শুনে নিজের মৃত্যুকে গ্রহণ করে। এ কারণেই পয়গম্বরগণ এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হাদীসে আছে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ পরিবারের রূযী এই পরিমাণে নির্ধারণ কর, যাতে তাদের চলে যায়।

আরও বলা হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।

ধন-সম্পদের বিপদাপদ ও উপকারিতা ঃ প্রকাশ থাকে যে, ধন-সম্পদের ভেতরে সাপের বিষও আছে এবং বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী গুণও আছে। বিষের প্রতিক্রিয়া বিনাশকারী গুণ হচ্ছে তার উপকারিতা। যে ব্যক্তি উপকারিতা ও বিপদাপদ উভয়টি জানে, তার পক্ষে ধন-সম্পদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং কল্যাণপ্রার্থী হওয়া সম্ভব।

ধন-সম্পদের পার্থিব উপকারিতা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এর উপকারিতা সুবিদিত। যদি তারা এতে উপকারিতা না দেখত, তবে এর অন্বেষণে প্রাণান্তকর চেষ্টা কেন করত? কিন্তু এর ধর্মীয় উপকারিতা তিন প্রকারে সীমিত।

প্রথম প্রকার হচ্ছে ধন-সম্পদকে নিজের জন্যে ব্যয় করা অথবা এবাদতে ব্যয় করা অথবা এবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্যে ব্যয় করা। এবাদতে ব্যয় করা যেমন হজ্জ কিংবা জেহাদে ব্যয় করা। কেননা, এদুটি মৌলিক এবাদত ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তি এসব এবাদতের সওয়াব পেতে পারে না। এবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্য ব্যয় করার অর্থ পোশাক, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ব্যয় করা। এতে এবাদতের শক্তি অর্জিত হয়। কেননা, এসব প্রয়োজন অর্জিত না থাকলে অন্তর ধর্মকর্মের সময় ও সুযোগ পায় না। যে বস্তু ছাড়া এবাদত সম্পন্ন হয় না, তা অর্জন করাও এবাদত। সুতরাং প্রয়োজন পরিমাণে ধন-সম্পদ অর্জন করা ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। একে বিলাসিতায় ব্যয় করা অবশ্য দুনিয়ার অংশ।

দ্বিতীয় প্রকার, যা অন্যান্য মানুষের জন্যে ব্যয় করা হয়। তা চার প্রকার— সদকা দেয়া, মানবিক কারণে দেয়া, ইয্যত রক্ষার্থে দেয়া এবং চাকর-বাকরকে পারিশ্রমিক দেয়া। সদকার সওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ প্রশমিত হয়। মানবিক কারণে ব্যয় করার অর্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের দাওয়াতে, উপঢৌকন ইত্যাদিতে ব্যয় করা। একে সদকা বলা হয় না। কারণ, সদকা তাই, যা অভাবগ্রস্তকে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও এ ধরনের ব্যয় ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষ এই ব্যয় দ্বারা অপরকে বন্ধু ও ভাই বানিয়ে নেয় এবং এতে দানশীলতার গুণ অর্জিত হয়। সুতরাং এ ধরনের ব্যয়েও অনেক সওয়াব। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

ইয্যত রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ অপরকে নিন্দা, গীবত ও শত্রুতা থেকে বিরত রাখার জন্যে ব্যয় করা। এর উপকারিতা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও এটা ধর্মীয় উপকারিতার অন্যতম। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَاوَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً

অর্থাৎ, মানুষ যার দ্বারা তার ইযযত রক্ষা করে, তা তার জন্যে সদকা হিসাবে লেখা হবে।

এটা সদকা হবেই না কেন? এ ব্যয়ের কারণেই গীবতকারী গীবত থেকে বিরত থাকে। শত্রুতা ও হিংসাবশত যেসব কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে, সেগুলোও এরূপ ব্যয়ের ফলে মওকুফ থাকে।

চাকর-বাকরকে পারিশ্রমিক দেয়ার অবস্থা এই যে, মানুষ তার সাজসরঞ্জাম তৈরীতে যে সকল কাজের মুখাপেক্ষী হয়, সেগুলো অনেক। এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সকল কাজ নিজে করলে অনেক সময় বিনষ্ট হয় এবং আখেরাতের চিন্তা ও যিকর করা কঠিন হয়।

তৃতীয় প্রকার, সে ব্যয় কোন নির্দিষ্ট মানুষের জন্যে নয়; বরং তাতে ব্যাপক জনগণের উপকার হয়। যেমন, মসজিদ, পুল, সরাইখানা, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, কূপ নির্মাণ করা অথবা খয়রাতের জন্যে ভূমি ও বিষয় সম্পত্তি ওয়াকফ করা। এধরনের ব্যয় দ্বারা মৃত্যুর পরও সওয়াব হয় এবং যে ব্যয় করে, তার জন্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দোয়া হতে থাকে। সুতরাং এর চেয়ে অধিক কল্যাণকর কাজ আর কি হবে?

ধন-সম্পদের বিপদাপদও দুই প্রকার- ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বিপদ তিনটি। প্রথম এই যে, ধন-সম্পদ থাকার কারণে মানুষ ক্রমশ গোনাহ করতে শুরু করে। কেননা মানুষের মধ্যে খাহেশের দাবী সবসময়ই বিদ্যমান। তবে নিঃস্বতার কারণে কিছু করতে পারে না। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা পায়, তখন আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন খাহেশ অনুযায়ী গোনাহ করতে শুরু করলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর সবর করলে দুঃখ ভোগ করে। কারণ, ক্ষমতা সত্ত্বেও সবর করা সুকঠিন। দ্বিতীয় এই যে, ধন-সম্পদ থাকলে মোবাহ বস্তু দ্বারা বিলাসিতা শুরু হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধনী, তার জন্যে যবের রুটি খাওয়া , মোটা বস্ত্র পরিধান করা এবং সুস্বাদু খাদ্য থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। অতএব, সে অবশ্যই সুখাদ্য খাবে এবং উত্তম পোশাক পরবে। তার অভ্যাস এভাবেই গড়ে উঠবে। এটা ছাড়া সে সবর করতে পারবে না। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে এক অভ্যাস থেকে অন্য অভ্যাস দেখা দিতে থাকবে। যখন সে বিলাসিতার প্রতি অধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়বে, তখন এমনও হবে যে, হালাল উপার্জন দ্বারা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। ফলে, সন্দেহযুক্ত অর্থ-সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

তৃতীয় বিপদ যা থেকে কেউ মুক্ত নয় তা এই যে, মানুষ ধন-সম্পদের সংশোধন ও গোছগাছ করার কাজে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। আল্লাহর স্মরণে যা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা ক্ষতির বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ ধন- সম্পদের মধ্যে তিনটি বিপদ। এক, হালাল উপার্জন না করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ যদি কেউ হালাল উপার্জন করে, তবে? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে দ্বিতীয় বিপদের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ সেই উপার্জন হক পথে ব্যয় না করা। লোকেরা বলল ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি হক পথে ব্যয়ও করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে তৃতীয় বিপদ সামনে আসবে; অর্থাৎ তা সামলাতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। কেননা, সকল এবাদতের মূল হচ্ছে আল্লাহর যিকর ও তাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে ফিকর। এই যিকর ও ফিকরের জন্যে অবসর মুহূর্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ধনী ব্যক্তি দিবারাত্র অসংখ্য ঝামেলার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে।

লোভ-লালসার নিন্দা এবং অল্পে তুষ্টির প্রশংসা ঃ দরিদ্র থাকা একটি উত্তম বিষয়; কিন্তু দরিদ্রের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা এবং অন্যের ধন-দৌলতের প্রতি তাকিয়ে না থাকা। ধনীদের কাছে কোন কিছুর লোভ না করা। এটা তখন অর্জিত হবে, যখন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান থেকে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু নিয়েই তুষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে নিজের আশাকে একদিন অথবা এক মাসের চেয়ে বেশী দীর্ঘ না করাও উচিত। যদি কেউ অধিক ধন ও দীর্ঘ আশায় আগ্রহী হয়, তবে সে অল্পে তুষ্টির ইয্যত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং লোভের নাপাকী দ্বারা কলুষিত হবে। মানুষের সৃষ্টি ও মজ্জায় লোভ-লালসা নিহিত আছে। সেমতে হাদীসে আছে ঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى وَرَاءَهُمَا ثَالِثًا
وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

অর্থাৎ, যদি আদম সন্তানের দুটি স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে সে এগুলোর পরও তৃতীয়টি চাইবে। মাটিই কেবল মানুষের উদরপূর্তি করে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمُ الْعِلْمِ وَمَنْهُوْمُ الْمَالِ

অর্থাৎ, দুই লোভী কখনও তৃপ্ত হয় না— জ্ঞানের লোভী ও অর্থের লোভী।

আরও বলা হয়েছে ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشُبُّ فِيْهِ اثْنَانِ الْاَمَلُ وَحُبُّ الْمَالِ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার আশা ও অর্থের মোহ যুবক হতে থাকে।

অর্থের প্রতি মানুষের এই মজ্জাগত লোভ-লালসার কারণেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) "কানায়াত" তথা অল্পে তুষ্টির প্রশংসা করেছেন। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

طُوبٰى لِمَنْ يُهْدٰى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهٖ

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির জন্যে মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করা হয়, যার জীবিকা জীবন ধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলাকে প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া ইলাহী! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে অধিক ধনী? এরশাদ হল ঃ যে আমার দানে অধিকতর তুষ্ট থাকে। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ অধিক ন্যায়পরায়ণ কে? উত্তর হল ঃ যে নিজের সাথে ইনসাফ করে। হযরত আবু হুরাইয়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে আবু হুরায়রা, যখন তুমি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হও, তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানিকে যথেষ্ট মনে কর এবং দুনিয়াকে লাথি মার। তাঁরই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পরহেযগারী অবলম্বন কর। সকলের মধ্যে অধিক এবাদতকারী হয়ে যাবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাক। সকলের মধ্যে অধিক শোকরকারী হয়ে যাবে। অন্যের জন্যে তাই কামনা কর, যা নিজের জন্যে কামনা করে থাক। এতে ঈমানদার হয়ে যাবে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) লোভ করতে নিষেধ করেছেন। সেমতে আবু আইউব আনসারী বর্ণনা করেন- জনৈক বেদুইন হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ বিদায়ী ব্যক্তির মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যার আগামীকাল ওযর পেশ করতে হয়। অন্যের হাতে যা আছে, তার প্রতি আশা করো না অর্থাৎ লোভ করো না।

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী বলেন ঃ আমরা সাত অথবা আট অথবা নয় ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে বায়াত কর না কেন?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি বায়াত করিনি? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে বায়াত করনি। অতঃপর আমরা বায়াতের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এমন সময় আমাদের একজন বলে উঠল ঃ আমরা তো পূর্বে বায়াত করেছি। এখন কোন্ বিষয়ের জন্যে এই বায়াত? তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের জন্যে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঞ্জেগানা নামায পড়বে। সাগ্রহে আনুগত্য করবে। এরপর একটি কথা আস্তে বললেন ঃ মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। বর্ণনাকারী আওফ বলেন ঃ এই লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এই বায়াতটি এমনভাবে পালন করেন যে, তাদের চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও কাউকে তুলে দিতে বলতেন না। অর্থাৎ, তারা চাওয়া থেকে এতটুকু বেঁচে থাকতেন।,

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ লোভ হচ্ছে দরিদ্রতা এবং মানুষের কাছে আশা না করা ধনাঢ্যতা। যে অপরের কাছে কোন কিছু আশা করে না, সে অমুখাপেক্ষী থাকে। জনৈক দার্শনিককে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ ধনাঢ্যতা কি? উত্তর হল ঃ আশা কম করা এবং যতটুকুতে চলে, ততটুকুতে তুষ্ট হওয়ার নাম ধনাঢ্যতা। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ তোমার জন্যে দুনিয়া তখন উত্তম, যখন তুমি তাতে লিপ্ত না হবে। আর পার্থিব ধন-সম্পদের মধ্যে তোমার জন্যে তাই উত্তম, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়; অর্থাৎ, খয়রাতে ব্যয় হয়ে যায়।

লোভ-লালসার প্রতিকার এবং অল্পে তুষ্টি অর্জনের উপায় ঃ লোভ-লালসার প্রতিকার তিনটি একক বিষয় দ্বারা গঠিত। তা হল সবর, এলম ও আমল। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এগুলো এসে যায়। প্রথমত আমল অর্থাৎ, জীবিকায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং মিতব্যয়ী হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টির গৌরব অর্জন করতে চায়, সে যেন যথা সম্ভব খরচের দ্বার রুদ্ধ রাখে। কেননা, যার ব্যয়ের মাত্রা বেশী হবে, সে অল্পে তুষ্ট হতে পারবে না। উদাহরণতঃ একা হলে একটি মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং কম রুটি ও কম তরকারি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। আর সন্তান-সন্ততি থাকলে তাদের প্রত্যেককেই এভাবে ভরণ-পোষণ দেবে। কেননা, এতটুকু জীবিকা সামান্য পরিশ্রমেই অর্জিত হতে পারে। এতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্বেষণও কম হবে এবং জীবন মধ্যবর্তী পথে অতিবাহিত হবে, যা অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে মূল বিষয়। একেই বলা হয় "রিফক ফিল ইনফাক" অর্থাৎ, অর্থ ব্যয়ে নম্রতা করা। হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন।

আরও বলা হয়েছে- مَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ, যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হয় না। আরও আছে—

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَالْعَدْلُ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ -

অর্থাৎ, উদ্ধারকারী বিষয় তিনটি— গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, ধনাঢ্যতায় ও দারিদ্র্যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও ক্রোধের অবস্থায় ন্যায় বিচার করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنِ اقْتَصَدَ اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ بَذَّرَ فَقَّرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَحَبَّهُ اللّٰهُ -

অর্থাৎ, যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ফকীর করে দেন। আর যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে প্রিয় করে নেন।

এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় সংকোচন করা একান্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ হাতে থাকলে ভবিষ্যতের জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অস্থির হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থা অর্জন করার জন্যে আকাংখা খাটো করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যে রিযিক তাকদীরে আছে, তা অবশ্যই পৌঁছবে। এতে লোভ করা-না করা সমান। লোভ করলেই রূযী পাওয়া যায় না।

লোভ মানুষের মধ্যে শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। অভিশপ্ত শয়তান অন্তরে জাগ্রত করে যে, বেশী ব্যয় করলে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সঞ্চয় না করলে অসুস্থতা ও অক্ষমতার সময়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে। সে এমনিভাবে মানুষকে অর্থ উপার্জনের কষ্টে লিপ্ত করে। এরপর নিজে তার কান্ডকীর্তি দেখে হাসে যে, দেখ, ভবিষ্যতে কষ্টের আশংকায় বর্তমানে কেমন কষ্ট করে যাচ্ছে। এটা কিরূপে জানা গেল যে, ভবিষ্যতে কষ্ট অবশ্যই হবে। কিছুই তো না হতে পারে।

বর্ণিত আছে, হযরত খালেদ (রাঃ)-এর দুই পুত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়াচড়া করে অর্থাৎ সারা জীবন রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না। দেখ, মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে রূযী দেন। একবার রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইবনে মাসউদের কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি তখন বিমর্ষ অবস্থায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দুঃখ করা অনর্থক। যা হবার তা হবেই। যে পরিমাণ রিযিক নসীবে আছে, তা আসবেই।

মানুষ যখন পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে, তার তাকদীরে অবশ্যই রিযিক আছে, তখনই সে লোভ-লালসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর সাথে একথাও বিশ্বাস করা উচিত যে, অন্বেষণে ত্রুটি করলেও তকদীরের রিযিক অবশ্যই পৌঁছবে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহকে ভয় করে, এমন কোন ব্যক্তিকে আমি অভাবগ্রস্ত দেখিনি। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ভীত ব্যক্তির প্রয়োজন অপূর্ণ রাখেন না। মুফাযযল যব্বী বলেন ঃ আমি জনৈক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি উপায়ে জীবিকা নির্বাহ কর? সে বলল ঃ হাজীগণ আসেন, এতেই আমার জীবিকা হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাজীরা চলে গেলে কি কর? এতে সে কেঁদে কেঁদে বলল ঃ অমুক জায়গা থেকে রুযী আসে বলে যদি জানাই থাকত, তবে জীবন কিসের?

তৃতীয়ত, অল্পে তুষ্টির উপকারিতা জানতে হবে যে, এর দৌলতে অমুখাপেক্ষিতার সম্মান অর্জিত হয় এবং লোভের কারণে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। এ বিষয়টি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মানুষ অল্পে তুষ্টির প্রতিই আগ্রহী হবে।

চতুর্থত, ইহুদী, খৃস্টান, নীচ জাতি, নির্বোধ ও বেদ্বীনদের বিলাসিতা ও জীবন ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করবে। এরপর পয়গম্বর, ওলী, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের অবস্থা দেখবে, শুনবে এবং পাঠ করবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে ইতর ব্যক্তিদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করবে, অথবা তাদের অনুসরণ করবে, যারা সৃষ্টিজগতে সর্বাধিক সম্মানিত। যদি কেউ মহাপুরুষগণের অনুসরণ করে, তবে সামান্য বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অল্পে সবর করা সহজ হবে। তখন তার বিষয়ে পয়গম্বর ও ওলীগণ ছাড়া কেউ তার শরীক হবে না। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত শ্রেণীতে থাকা পছন্দ করে,তবে কিছুই লাভ হবে না। উদাহরণতঃ যদি উদরপূর্তির বিলাসিতায় পড়ে, তবে এতে গাধা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি সহবাসের আনন্দ লাভে ব্যাপৃত হয়, তবে শূকর এ কাজে সবার উর্ধ্বে। যদি অঙ্গসজ্জা ও যানবাহনের বিলাসিতা লক্ষ্য হয়, তবে অধিকাংশ কাফের এতে তার তুলনায় বেশী হবে।

পঞ্চমত, অর্থ সঞ্চয় করার বিপদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, এতে কেমন চুরি, ডাকাতি ও লুটতরাজের আশংকা লেগে থাকে! হাত খালি থাকলে এসব দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সুখে ও শান্তিতে থাকা যায়। এছাড়া আমরা পূর্বে যেসব আর্থিক বিপদাপদ বর্ণনা করেছি, সেগুলোও চিন্তা করবে এবং ধ্যান করবে, ধন-সম্পদের কারণে জান্নাতের দরজা থেকে পাঁচ শ' বছর পর্যন্ত দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অল্পে সন্তুষ্ট হয় না, সে ধনীদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দলভুক্ত হবে এবং ফকীরদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে। ফকীর ধনীর তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসসমূহে তাই বর্ণিত আছে। এই চিন্তা-ভাবনার উপায় হল দুনিয়াতে সব সময় নিজের চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন লোকদের প্রতি লক্ষ্য করা— বেশী অবস্থাসম্পন্নদের প্রতি লক্ষ্য না করা। সেমতে হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ) ওসিয়ত করেছেন যে, দুনিয়াতে তোমার চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন যারা, তাদের প্রতি দেখবে। যাদের আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল, তাদের দিকে নজর করবে না।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে অল্পে তুষ্টি আসতে পারে। একশ' কথার এক কথা এই যে, সবর করবে, আশাকে খাটো করবে এবং বুঝবে যে, অনন্তকাল পর্যন্ত ভোগ-বিলাস ও মজা উড়ানোর জন্যে দুনিয়াতে কয়েক দিনই সবর করতে হবে। যেমন রোগী ঔষধের তিক্ততায় এজন্যে সবর করে যে, এরপরে সে সর্বদা সুস্থ থাকবে।

দানশীলতার ফযীলত ঃ যদি কারো কাছে ধন-সম্পদ না থাকে, তবে তার উচিত অল্পে তুষ্ট ও কম লোভী হওয়া। আর যদি ধন-সম্পদ থাকে, তবে ত্যাগ ও দানশীলতায় ত্রুটি না করা এবং কৃপণতা থেকে অনেক দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, দানশীলতা পয়গম্বরগণের চরিত্রের একটি অঙ্গ। মুক্তির মূল বিষয়বস্তুও এটাই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন— দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের একটি বৃক্ষ। এর বিভিন্ন ডালপালা আভূমি লম্বিত। যে কেউ এর একটি ডাল ধরে ফেলে, সে তাকে জান্নাতে টেনে নেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল পয়গম্বরকে দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতার উপরই সৃষ্টি করেছেন। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে, কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সবর ও দানশীলতা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দুটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং দুটি অপ্রিয়। প্রিয় অভ্যাস দুটি হচ্ছে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা এবং অপ্রিয় অভ্যাস দুটি হচ্ছে অসচ্চরিত্রতা ও কৃপণতা। আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান, তখন তাকে দিয়ে মানুষের অভাব পূরণ করান। আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার দয়ালু বান্দাদের কাছে দানের আবেদন কর এবং তাদের আশ্রয়ে জীবন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতিবাহিত কর। আমি তাদের মধ্যে স্বীয় দয়া ও রহমত ভরে দিয়েছি। আর পাষাণহৃদয় লোকদের কাছে কিছু চেয়ো না। তাদের উপর আমি গযব নাযিল করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ দানশীল ব্যক্তির ত্রুটি ক্ষমা কর। কারণ, সে যখন ভুল করে, তখন আল্লাহ তার হস্ত ধারণ করেন। হযরত ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে আছে— অন্ন দানকারীর কাছে রিযিক এত দ্রুত পৌঁছে যে, উটের গলায় ছুরিও এত দ্রুত কার্যকর হয় না। হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বেছে বেছে নেয়ামত দান করেন, যাতে তাদের হাতে অন্যদের কার্যোদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি অপরের উপকার করতে কার্পণ্য করে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে অন্যকে সমর্পণ করেন।

হালালী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বনী আম্বরের কয়েদীদেরকে উপস্থিত করা হলে তিনি সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেন; কিন্তু এক ব্যক্তিকে এই নির্দেশের বাইরে রাখেন। হযরত আলী (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ এক। তাঁর ধর্মও এক। যে গোনাহ এরা করেছে, তাও এক। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হল কিরূপে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ তাদের সকলকে হত্যা কর এবং এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। তার দানশীলতার কারণে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল। এক হাদীসে বলা হয়েছে—

طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَطَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ

অর্থাৎ, দানশীলের খাদ্য ঔষধ বিশেষ আর কৃপণের খাদ্য রোগ বিশেষ।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যখন মানুষের কাছে দুনিয়া আসে, তখন তা থেকে ব্যয় করা উচিত। কেননা, ব্যয় করলে দুনিয়া চলে যাবে না। যদি চলে যায়, তবু ব্যয় করা দরকার। আমীর মোয়াবিয়া ইমাম হুসায়ন (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ ভদ্রতা, উচ্চতা ও দানশীলতা কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ ভদ্রতা হচ্ছে নিজের ও ধর্মের হেফাযত করা এবং নিজের কাজ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উত্তমরূপে করা। উচ্চতা হচ্ছে প্রতিবেশীর বিপদ দূর করা এবং সবরের জায়গায় সবর করা। দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়াই অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা।

কোন এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে কোন উদ্দেশ্যে দরখাস্ত লিখে পেশ করল। তিনি সেটি না পড়েই বলে দিলেন ঃ তোমার অভাব পূরণ করা হবে। এতে অন্য একজন আরয করল ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র, আপনি তার আবেদনটি পাঠ করেই জওয়াব দিতেন। তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ আমি পাঠ করতাম, ততক্ষণ সে আমার সামনে হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকত। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন— তুমি সওয়ালকারীকে এতক্ষণ হীন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন?

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়ালকারীকে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, সে দানশীল নয়; বরং দানশীল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের হক চাওয়া ছাড়াই পৌঁছে দেয়। মনে তার গ্রহণের জন্যে কৃতজ্ঞতার মোহ না থাকে; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ সওয়াবপ্রাপ্তির বিশ্বাস থাকে।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দানশীলতা কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে ধন- সম্পদ দিয়ে দেয়া। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ অপব্যয় কি? তিনি বললেন ঃ ক্ষমতার মোহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। ইমাম জা'ফর সাদেক বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে অধিক কোন সাহায্যকারী ধন নেই এবং মূর্খতার চেয়ে বড় কোন বিপদ নেই। পরামর্শের চেয়ে বড় কোন সমর্থন নেই। জেনে রেখ, আল্লাহ বলেন, আমি দাতা। কোন কৃপণ আমার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কৃপণতা কুফরের অংশ। কাফেররা দোযখে যাবে। দানশীলতা ঈমানের অঙ্গ। ঈমানদার জান্নাতে যাবে।

নিম্নে খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তিবর্গের কিছু অনুসরণযোগ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সেবিকা উম্মে দাররা বর্ণনা করেন ঃ একবার হযরত ইবনে যুবায়র (রাঃ) এক লাখ আশি হাজার দেরহাম হযরত আয়েশার খেদমতে পাঠালেন। তিনি এগুলো জনসাধারণের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন ঃ আমার ইফতার আন। আমি রুটি ও যয়তুনের তৈল সামনে রেখে দিলাম এবং বললাম ঃ আপনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতগুলো দেরহাম বন্টন করলেন। আমাদের ইফতারের জন্যে এক দেরহামের গোশত কেনাও কি সম্ভব ছিল না? তিনি বললেন ঃ তুমি আগে বললে তা অবশ্য করা যেত।

আব্বান ইবনে উসমান বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিছু ক্ষতি করতে মনস্থ করল। সেমতে সে সময় কোরায়শ সরদারদের কাছে গিয়ে মিছামিছি বলে দিল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আপনাদের সবাইকে তাঁর বাড়ীতে সকালে ভোজের দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত পৌছানোর জন্যে তিনি আমাকে বলেছেন। সরদাররা তার কথামত কাজ করল এবং সকাল বেলায় সবাই তাঁর বাড়ীতে সমবেত হল। এমনকি ঘরে জায়গা পর্যন্ত রইল না। হযরত আব্দুল্লাহ তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা ঘটনা বর্ণনা করল। শুনা মাত্রই তিনি ফল-মূল কিনে এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন এবং লোকজনকে খানা পাকানোর জন্যে নিযুক্ত করলেন। ফল খাওয়া শেষ হতে না হতেই দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হল। অতঃপর আহারান্তে সবাই প্রস্থান করল। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সে পরিমাণ প্রত্যেক দিন ব্যয় হতে পারে কিনা? তারা বলল ঃ অবশ্যই হতে পারে। তিনি বললেন ঃ তা হলে এই সরদারগণ যেন প্রত্যহ সকালের খানা আমার ঘরেই খায়।

মুসএব ইবনে যুবায়র বর্ণনা করেন, এক বছর আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) হজ্জে গমন করেন এবং সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। মদীনায় প্রবেশ করলে হযরত ইমাম হুসায়ন (রাঃ) নিজ ভ্রাতা ইমাম হাসান (রাঃ)-কে বললেন ঃ তুমি তার সাথে দেখা করতে যেয়ো না এবং সালাম-কালাম করো না। এরপর আমীর মোয়াবিয়া যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন ইমাম হাসান বললেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণ। আমি অবশ্যই আমীরের সাথে দেখা করব। সেমতে উটে সওয়ার হয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে সালাম-কালামের পর তিনি ঋণের কথা বললেন। সে সময় আশি হাজার দীনার বহনকারী একটি উট আমীরের কাছে ছিল। দীনারের ভারে উট চলতে পারছিল না। তাকে জোরজবরদস্তি হাঁকিয়ে আনা হচ্ছিল। আমীর মোয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, এর পিঠে কি? লোকেরা বলল ঃ আশি হাজার দীনার। তিনি বললেন ঃ এগুলো উটসহ হযরত ইমাম হাসানের কাছে পৌছে দাও।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওয়াকেদ তার পিতা মোহাম্মদ ওয়াকেদীর অবস্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি খলীফা মামুনকে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণের বোঝা। এখন আর সহ্য করতে পারছি না। খলীফা পত্রের অপর পিঠে এই নির্দেশ লিখলেন ঃ তোমার মধ্যে দুটি চমৎকার অভ্যাস রয়েছে— দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা। দানশীলতার কারণে তুমি নিঃস্ব হয়ে গেছ এবং লজ্জাশীলতার কারণে তুমি কখনও নিজের অবস্থা আমাকে বলনি। এখন আমি এক লক্ষ দেরহাম তোমাকে দিলাম। মনোমত হলে মানুষকে খুব দান কর। মনোমত না হলে দোষ তোমারই। তুমি যে সময় খলীফা রশীদের পক্ষ থেকে বিচারপতি ছিলে, তখন আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলে যে, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে, যুহরী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে, আনাস রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইবনে আওয়ামকে বললেন ঃ হে যুবায়র, জেনে রাখ, বান্দার জন্য রিযিকের চাবি আরশের উল্টো দিকে রয়েছে। বান্দা যে পরিমাণ ব্যয় করে, আল্লাহ সে পরিমাণ তার কাছে পাঠিয়ে দেন। যে বেশী ব্যয় করে, তার জন্য বেশী এবং যে কম খরচ করে, তার জন্যে কম পাঠিয়ে দেন। ওয়াকেদী বলেন ঃ আল্লাহর কসম, খলীফা মামুনের এক লাখ দেরহাম পেয়ে আমি এমন প্রীত হলাম, যেমন এই হাদীসের বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয়ায় হলাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বসরার গভর্নর থাকাকালে একদিন সেখানকার ক্বারীগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল ঃ আমাদের এক প্রতিবেশী দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে। আপন কন্যার বিবাহ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে দিয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে কন্যাকে যৌতুক দেয়ার মত কিছুই তার কাছে নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন এবং আগন্তুকদের হাত ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি সিন্দুক খুলে তা থেকে ছয়টি থলে বের করলেন, অতঃপর বললেন ঃ এগুলো তুলে নাও। তারা তুলে নিলে তিনি বললেন ঃ একজন মুসলমানকে এমন জিনিস দেয়া ভাল নয়, যা তার রোযা ও রাত্রি জাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। চল, আমরা সবাই গিয়ে তার সাহায্যকারী হয়ে কন্যাকে তুলে দেই। অবশ্য দুনিয়ার এতটুকু সাধ্য নেই যে, একজন মুমিনকে আল্লাহর এবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখে; কিন্তু আমরাও এতটুকু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অহংকারী নই যে, আল্লাহর ওলীগণের খেদমত করব না। একথা বলে তিনি সবাইকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে চলে গেলেন এবং যথারীতি বিবাহকর্ম সম্পন্ন হল।

বর্ণিত আছে, আব্দুল হামিদ ইবনে সাদ (রহঃ)-এর আমলে মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন— আমি শয়তানকে দেখিয়ে দেব আমি তার দুশমন। সেমতে তিনি সমস্ত মানুষের অভাব পূরণ করতে থাকেন। পরে যখন তিনি পদচ্যুত হলেন, তখন তার যিম্মায় সওদাগরদের দশ হাজার দেরহাম প্রাপ্য ছিল। তিনি এর বিনিময়ে সওদাগরদের কাছে পত্নীদের পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মূল্যের অলংকার বন্ধক রেখে দিলেন। অতঃপর যখন এই অলংকার ছাড়াতে পারলেন না, তখন সওদাগরদেরকে লিখে পাঠালেন ঃ তোমরা অলংকার বিক্রি করে তা থেকে নিজেদের প্রাপ্য কেটে নাও। যা অবশিষ্ট থাকে, তা এমন লোকদেরকে দিয়ে দাও, যারা আমার কাছ থেকে কিছুই পায়নি।

আবু মুরছাদ একজন দানবীর ছিলেন। জনৈক কবি কিছু পাওয়ার আশায় তার প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি রিক্তহস্ত। তোমাকে দিতে কিছু পারছি না। তবে একটি ফন্দি করা যায়, তুমি দশ হাজার দেরহাম দাবী করে কাযীর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ কর। আমি তোমার দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নেব। এরপর অক্ষমতার কারণে তুমি আমাকে কয়েদী বানিয়ে দিয়ো। আমার পরিবারের লোক তোমাকে দশ হাজার দেরহাম দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনবে। কবি তাই করল। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আবু মুরছাদের পরিবারের লোকেরা দশ হাজার দেরহাম দিয়ে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে নিল।

আবুল হাসান মাদায়েনী বর্ণনা করেন, একবার হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) একত্রে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে তারা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এক সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। তাদের চলার পথে এক বৃদ্ধা তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসে ছিল। তারা তিনজন তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু পানি আছে? বৃদ্ধা বলল ঃ হাঁ আছে। একথা শুনে তারা উট থেকে নেমে পড়লেন। বৃদ্ধার ঘরে একটি ছোট বকরী ছিল। সে বলল ঃ এই ছাগলের দুধ বের করে পান করুন। দুধ পান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করার পর তারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু খাবারও আছে কি? বৃদ্ধা বলল ঃ এই ছাগলটি ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু নেই। আপনাদের কেউ যদি এটি যবাহ করে সাফ করে দেন, তবে আমি রান্না করে দিই। তাদের একজন একাজটি করলেন এবং বৃদ্ধা খানা তৈরী করে দিল। তারা পানাহার শেষ করে বিকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। চলার সময় বৃদ্ধাকে বললেন ঃ আমরা কোরায়শী। এখন হজ্জে যাচ্ছি। সেখান থেকে সহি-সালামতে দেশে ফিরলে তুমি আমাদের কাছে যেয়ো। আমরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব।

অনেক দিন পরের কথা। বৃদ্ধা তার স্বামীকে নিয়ে রোযগারের খোঁজে মদীনায় উপস্থিত হল। সেখানে পৌঁছে তারা উটের শুষ্ক বিষ্ঠা সংগ্রহ করে সেগুলো বিক্রয় করে কোনমতে দিন কাটাত। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধা একদিন সে গলিতে চলে গেল, যেখানে হযরত হাসান (রাঃ) নিজের ঘরের দরজায় বসে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে দেখেই চিনতে পারলেন। সেমতে খাদেমকে পাঠিয়ে তাকে আনলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাকে চিন? বৃদ্ধা আরয করল ঃ না, চিনতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ অমুক দিন তোমার ঘরে অতিথি হয়েছিলাম। বৃদ্ধা মনে করে বলল ঃ হাঁ। আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক। আপনি কি সেই মেহমান? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দীনার বৃদ্ধাকে দিয়ে নিজের খাদেমদের সাথে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ভাই তোমাকে কি দিয়েছে? সে আরয করল ঃ এক হাজার দীনার ও এক হাজার ছাগল। অতঃপর তিনিও সে পরিমাণ দীনার ও ছাগল দিয়ে বৃদ্ধাকে খাদেমের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হাসান-হুসাইন ভ্রাতৃদ্বয় তোমাকে কি দিয়েছে? সে বলল ঃ তারা দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার ছাগল দিয়েছেন। অতঃপর তিনি দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার ছাগল বৃদ্ধাকে দিয়ে বললেন ঃ যদি তুমি প্রথমে আমার কাছে আসতে, তবে আমি এই পরিমাণে দিতাম যে, হাসান-হুসাইনের জন্যে তা কঠিন হত। মোটকথা, বৃদ্ধা চার হাজার দীনার ও সম সংখ্যক ছাগল নিয়ে তার স্বামীর কাছে এসে বলল ঃ এ হল একটি ছাগলের প্রতিদান, যা কোরায়শ সরদারগণ খেয়েছিলেন।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমের একাকী মসজিদ থেকে ঘরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফিরছিলেন। পথে সকীফ গোত্রের একটি বালক তার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? বালকটি বলল ঃ না, কোন প্রয়োজন নেই। আপনি একা একা যাচ্ছিলেন, তাই সঙ্গ দিতে চলে এলাম, যাতে খোদা না করুন পথে কোন বিপদ দেখা দিলে তা নিজের উপর নিতে পারি। আব্দুল্লাহ্ তার হাত ধরে ফেললেন এবং ঘরে এনে তাকে এক হাজার দীনার দান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার মুরব্বিরা তোমাকে চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন। যাও, এই দীনারগুলো তুমি নিজের জন্যে ব্যয় করো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের নব্বই হাজার দেরহামের বিনিময়ে খালেদ ইবনে ওকবার বাড়ী কিনে নেন। বাড়ীটি বাজারে অবস্থিত ছিল। রাত হলে খালেদের বাড়ীর লোকজনদের কান্নার আওয়াজ আব্দুল্লাহর কানে ভেসে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কাঁদছে কেন? লোকেরা বলল ঃ বাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে বলে কাঁদছে। তিনি খাদেমকে ডেকে বললেন ঃ তাদের কাছে গিয়ে বলে দাও— নব্বই হাজার দীনার এবং বাড়ী সব তোমাদের।

বর্ণিত আছে, খলীফা হারূন-অর-রশীদ হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাসের খেদমতে পাঁচশ' দীনার প্রেরণ করেন। এ সংবাদ শুনে লায়ছ ইবনে সা'দ ইমাম সাহেবের খেদমতে এক হাজার দীনার পাঠিয়ে দেন। এরপর খলীফা লায়ছকে ডেকে এনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যে, তুমি আমার প্রজা হয়ে কি কারণে আমার সাথে পাল্লা দিতে গেলে? লায়ছ আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমার কাছে প্রত্যহ এক হাজার দীনারের শস্য আসে। তাই এমন সম্মানিত ব্যক্তিকে একদিনের আমদানীর চেয়ে কম দিতে আমি লজ্জাবোধ করেছি। লায়ছ ইবনে সা'দের দানশীলতা সুবিদিত ছিল। এ কারণেই প্রত্যহ হাজার দীনার আমদানী সত্ত্বেও তার উপর যাকাত ওয়াজেব হয়নি। একবার জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে সামান্য মধু চাইলে তিনি তাকে এক মশক মধু দিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করল ঃ সামান্য মধু দিলেই তার প্রয়োজন মিটে যেত। আপনি এত বেশী দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ মহিলা তার প্রয়োজন মাফিক চেয়েছিল। আমি আমার প্রতি আল্লাহর দান মাফিক দিয়েছি।

আ'মাশ বর্ণনা করেন, আমার একটি ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খায়ছামা ইবনে আবদুর রহমান প্রত্যহ তাকে দেখতে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন— ছাগলটি ঘাস-পানি ঠিকমত খেয়েছে কি না? তোমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছেলেরা দুধ ছাড়া কিরূপে সবর করে। তুমি প্রত্যহ আমার বিছানার নীচে যা পাও, নিয়ে এসো। ফলে, ছাগলের অসুস্থতার দিনগুলোতে আমার কাছে তিন শ' দীনারেরও বেশী পৌঁছে গেল। আমার মনে এই আকাংখা জন্ম নিল যে, ছাগলটি অসুস্থই থাকুক।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান একদিন আসমা বিনতে খারেজাকে বললেন ঃ তোমার কয়েকটি সদ্‌গুণের খবর আমি পেয়েছি। সেগুলো আমার কাছে বর্ণনা কর। আসমা বললেন ঃ সেগুলো অন্যের মুখে শুনলেই আমার কাছ থেকে শুনার চেয়ে উত্তম হত। খলীফা কসম দিয়ে বললেন ঃ না, তুমিই বল। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমি কখনও আমার সাথে বসা ব্যক্তির সামনে পা ছড়াইনি। যখনই আমি খাদ্য তৈরী করে মানুষকে খাইয়েছি, তখনই তাদের উপর আমার যা অনুগ্রহ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আমি তাদের অনুগ্রহ নিজের উপর মনে করেছি। যখনই কোন ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে, তখন আমি তাকে যা দিয়েছি, সেটাকে অনেক মনে করিনি।

দানবীর সা'দ ইবনে খালেদের নিয়ম ছিল, যদি দেয়ার মত তার কাছে কোন কিছু না থাকত, তবে প্রার্থীকে তমসুক অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিতেন এবং বলতেন ঃ আমি কোথাও থেকে কিছু পেলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ শোধ করে দেব। তিনি একবার সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের কাছে আগমন করলেন। খলীফা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি প্রয়োজন? তিনি বললেন ঃ আমার যিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পরিমাণ? উত্তর হল ঃ ত্রিশ হাজার দীনার। খলীফা বললেন ঃ ত্রিশ হাজার ঋণের এবং এই পরিমাণই তোমার জন্যে দেয়া হবে।

আবু সাঈদ খরকুশী নিশাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে হাফেয মোহাম্মদের কাছে শুনেছি— মিসরে এক ব্যক্তি ফকীরদের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে দিত। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সেই চাঁদা সংগ্রহকারীর কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন আমার হাতে কিছুই নেই। এ কথা শুনতেই লোকটি তার সঙ্গে চলল এবং বহু লোকের কাছে গেল। কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছুই পেল না। এরপর সে এক ব্যক্তির কবরের উপর এসে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি বেঁচে থাকতে অনেক দান

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতে। আজ আমি অনেকের কাছে গেলাম এবং এই লোকটির জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এরপর নিজের কাছ থেকে একটি দীনার বের করল এবং সে টি ভাঙ্গিয়ে অর্ধেক লোকটির হাতে দিয়ে বলল ঃ আমি তোমাকে কর্জ দিলাম। যখন পার পরিশোধ করে দিয়ো। লোকটি অর্ধেক দীনার নিয়ে বাড়ী ফিরে এল এবং সন্তান হওয়ার কারণে যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তা পূরণ করে নিল। রাতের বেলায় সে মিসরীয় চাঁদা সংগ্রহকারী লোকটি স্বপ্নে দেখল, কবরস্থ লোকটি তাকে বলছে ঃ তুমি আমার কবরের উপর বসে যা বলেছিলে, আমি সব শুনেছি। কিন্তু তখন জওয়াব দেয়ার অনুমতি ছিল না বিধায় জওয়াব দিতে পারিনি। এখন শুন, তুমি আমার ঘরে গিয়ে আমার সন্তানদেরকে চুল্লীর নীচে খনন করতে বলবে। সেখান থেকে একটি পাত্রে পাঁচশ' দীনার বের হবে। সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে সেই লোককে দিয়ে দাও, যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেমতে প্রত্যুষে সে সন্তানদের কাছে গেল এবং স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করল। তারা তাকে বসতে বলে চুল্লী খনন করল এবং পাঁচ শ' দীনার বের করে তার সামনে রেখে দিল। সে বলল ঃ এ ধন তোমাদের। আমার স্বপ্নের কি মূল্য! সন্তানরা বলল ঃ যার ধন, তিনি তো মৃত্যুর পরেও দান করেন। আমরা জীবিত অবস্থায় করব না কেন? মোটকথা, পরে লোকটি দীনার নিয়ে নিল এবং যার সন্তান হয়েছিল, তার কাছে এনে রাখল। সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলল ঃ এখন এই ধন তোমার। যা ইচ্ছা, কর। সে একটি দীনার ভাঙ্গিয়ে নিল। অর্ধেক দিয়ে কর্জ শোধ করল এবং অর্ধেক নিজে রেখে বলল ঃ আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকল দীনার তুমি ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না, এই তিনজনের মধ্যে সর্বাধিক দাতা কাকে বলা উচিত?

বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁকে গোসল দেবে। ওফাতের পর সেই ব্যক্তিকে ওসিয়তের কথা জানানো হলে সে এসে তাঁর খরচের হিসাব বহি দেখল। জানা গেল, তাঁর যিম্মায় সত্তর হাজার দেরহাম কর্জ রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ সেই কর্জ নিজের নামে স্থানান্তর করে ইমাম সাহেবকে মুক্ত করে দিল। অতঃপর বলল ঃ আমার গোসল দেয়া দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য এটাই ছিল; অর্থাৎ, আমি যেন তাঁকে কর্জের কলুষতা থেকে পাক-পবিত্র করে দিই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবু সাঈদ বলেন ঃ আমি যখন মিসরে গেলাম, তখন এই ব্যক্তির বাড়ী তালাশ করলাম। লোকদের বর্ণনা অনুযায়ী তার বাড়ী গিয়ে তার পুত্র ও পৌত্রদের কয়েক জনকে পেলাম। সকলেরই মুখমন্ডলে কল্যাণ ও বরকতের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তাদের পিতার কল্যাণ ও বরকত তাদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মোহাম্মদ ইবনে ওব্বাদ মুহাল্লেবী রেওয়ায়েত করেন, আমার পিতা খলীফা মামুনের কাছে গেলে তিনি তাকে এক লাখ দেরহাম দেন। খলীফার কাছ থেকে চলে আসার পর তিনি সমুদয় অর্থ খয়রাত করে দেন। খবর পেয়ে খলীফা তাকে ডেকে শাসালেন। আমার পিতা জওয়াবে আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! উপস্থিত অর্থ দান না করলে মাবুদের প্রতি কুধারণা করা হয়। এতে খলীফা অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং আরও দু'লাখ দেরহাম দিয়ে দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত তালহা (রাঃ)-এর যিম্মায় হযরত উসমান (রাঃ)-এর পঞ্চাশ হাজার দেরহাম প্রাপ্য ছিল। একদিন হযরত উসমান মসজিদে যাবার সময় হযরত তালহা এসে বললেন ঃ আপনার প্রাপ্য এখানে রয়েছে, নিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ আমি এই অর্থ আপনাকেই দিয়েদিলাম, যাতে আপনার আভিজাত্য রক্ষায় সহায়ক হয়।

সো'দা বিনতে আওফ বলেন ঃ আমি একদিন হযরত তালহার খেদমতে গিয়ে তাকে বিষণ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। ভাবছি, কি করা যায়। আমি বললাম ঃ ভাবনার কি আছে, আপনার সম্প্রদায়কে ডেকে বন্টন করে দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ গোলামকে পাঠিয়ে সবাইকে ডেকে আনলেন এবং সমুদয় অর্থ বিলিয়ে দিলেন। আমি গোলামকে অর্থের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ চার লাখ দেরহাম।

এক বেদুইন হযরত তালহার খেদমতে হাযির হয়ে কিছু চাইল এবং কিছু আত্মীয়তাও প্রকাশ করল। তিনি বললেন ঃ এ পর্যন্ত আত্মীয়তার কারণে কেউ আমার কাছে কিছু চায়নি। আমার এক খন্ড ভূমি আছে, যা উসমান তিন লাখ দেরহামে কিনতে চান। তুমি ইচ্ছা করলে সে জমিটি নিয়ে যাও। তা না হলে এর মূল্য তোমাকে দিয়ে দেব। বেদুইন ভূখন্ডের পরিবর্তে মূল্য নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সেমতে হযরত তালহা ভূখন্ডটি হযরত উসমানের কাছে বিক্রি করে মূল্য বেদুইনকে দিয়ে দিলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আলী (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখে লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ সাতদিন ধরে আমার ঘরে কোন মেহমান আসেনি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন বলে আশংকা হয়।

এক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল ঃ কি মনে করে? সে বলল ঃ আমার যিম্মায় চার শ' দেরহাম কর্জ রয়েছে। বন্ধু তৎক্ষণাৎ চার শ' দেরহাম গুণে তার হাতে তুলে দিল। অতঃপর সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী পৌঁছল। তার স্ত্রী বলল ঃ যদি এতগুলো দেরহাম দেয়া এতই কষ্টকর ছিল, তবে না দিলেই পারতে। সে বলল ঃ আমার কান্নার কারণ হল তার অবস্থা তার বলা ছাড়া আমি জানলাম না কেন? আমি যদি নিজেই খবর নিতাম, তবে তার চাওয়ার প্রয়োজন হত না।

কৃপণতার নিন্দা ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ, যাদেরকে মনের লোভ-লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই সফলকাম।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্যে উত্তম; বরং এটা তাদের জন্যে অনিষ্টকর। সত্বরই কিয়ামতের দিন যে বস্তুতে তারা কৃপণতা করেছিল, তার বেড়ী তাদেরকে পরানো হবে।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর কৃপাকে গোপন রাখে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ يَسْفِكُوْا دِمَاءَ هُمْ وَيَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের রক্ত প্রবাহিত করতে উত্তেজিত করেছে এবং হারামসমূহকে হালাল করতে প্ররোচিত করেছে।

আরও বলা হয়েছে—

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ وَلَاخِبٌّ وَلَاخَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

অর্থাৎ, কৃপণ, প্রতারক, খেয়ানতকারী ও চরিত্রহীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, তোমার কাছে আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে পৌঁছা থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী লেহইয়ানের দূতদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের সরদার কে? তারা বলল ঃ আমাদের সরদার জুদ ইবনে কায়স। কিন্তু সে কিছুটা কৃপণ। তিনি বললেন ঃ কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ আর কি? সে তোমাদের সরদার নয়; বরং আমর ইবনে জামু। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ দাতা গোনাহগার আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃপণ আবেদ থেকে উত্তম।

এক হাদীসে আছে, কেউ কেউ বলে, কৃপণ যালেমের তুলনায় ক্ষমার্হ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অথচ আল্লাহর কাছে কৃপণতার চেয়ে বড় কোন যুলুম নেই। আল্লাহ পাক তাঁর ইয্যতের কসম খেয়ে বলেন ঃ না কৃপণ জান্নাতে যাবে, না "শাহীহ" অর্থাৎ, যে অপরকে দান করতে দেখে গাত্রদাহ অনুভব করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কা'বার তওয়াফ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি কা'বার গেলাফ জড়িয়ে ধরে বলছে— ইলাহী, এই ঘরের ইয্যতের খাতিরে আমার গোনাহ মাফ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ কি, আমার কাছে বল। সে আরয করল ঃ আমার গোনাহ বর্ণনাতীত। তিনি বললেন ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না পৃথিবী তার সপ্ত স্তর সহ বেশী? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না পাহাড়-পর্বত বেশী? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গুনাহ বেশী, না সমুদ্র বেশী? লোকটি বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না সকল আকাশ? উত্তর হল ঃ আমার গোনাহ বেশী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ বড়, না আরশ বড়? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বড়। প্রশ্ন হল ঃ তোমার গোনাহ বড়, না করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বড়? লোকটি বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা অনেক বড়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার গোনাহ আমার কাছে বল। লোকটি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ধনী ব্যক্তি। কিন্তু যখন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চায়, তখন মনে হয় যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার সামনে রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। তোমার আগুনে আমাকে জ্বালিয়ো না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে হেদায়েত ও সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যদি তুমি রোকন ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দশ লক্ষ বছর নামায পড়, অতঃপর তত বছর ক্রন্দনের ফলে তোমার অশ্রুতে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, বৃক্ষ সিক্ত হয়, এরপর কৃপণ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ পাক তোমাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। তোমার সর্বনাশ হোক- তুমি কি জান না যে, কৃপণতা কুফরের একটি অংশ এবং কুফর দোযখে যাবে? তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ — অর্থাৎ, যে দান করে না, সে নিজেকেই দান করে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা "জান্নাতে আদন" সৃষ্টি করে তাকে বললেন ঃ তুমি সজ্জিত হও। জান্নাত সজ্জিত হল। আবার বললেন ঃ তোমার নির্ঝরিণীসমূহ প্রকাশ কর। সে "সালসাবিল", "আইনে কাফুর" ও "আবে তাসনীম" নির্গত করল। এসবের দ্বারা শরাব, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত হতে লাগল। আল্লাহ আবার এরশাদ করলেন ঃ তোমার কুরসী, অলংকার, পোশাক ও আয়তলোচনা হূর প্রকাশ কর। জান্নাত এ আদেশও পালন করল। এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত পরিদর্শন করে এরশাদ করলেন ঃ কিছু বল। জান্নাত বলল ঃ যে আমার মধ্যে থাকবে, সে চমৎকার হবে। এরশাদ হল ঃ আমার ইযযতের কসম, কৃপণকে তোমার ভিতরে স্থান দেব না।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের বোন বলেন ঃ কৃপণকে ধিক! কৃপণতা যদি কোর্তা হত, আমি তা পরিধান করতাম না। যদি পথ হত, আমি তাতে চলতাম না।

একদিন অভিশপ্ত শয়তানের সাথে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার (আঃ) সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, মানুষের মধ্যে তোমার সর্বাধিক প্রিয় এবং অপ্রিয় কে? সে আরয করল ঃ অধিক প্রিয় কৃপণ মুমিন এবং অধিক অপ্রিয় গোনাহগার দাতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল ঃ কেননা, কৃপণের জন্যে তার কৃপণতাই যথেষ্ট— আমার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে দাতা গোনাহ করে, তার ব্যাপারে আমার আশংকা থাকে, কোথাও দানশীলতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি না জানি কৃপা দৃষ্টি করেন! পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। এরপর শয়তান একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আপনি দাতা না হলে কখনও এসব কথা বলতাম না।

বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে আবু হাফসা কৃপণতাবশত গোশত খেত না। খুব মনে চাইলে সে গোলামকে একটি মস্তক কিনে আনতে বলত এবং তাই খেয়ে নিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি, তুমি শীতে ও গ্রীষ্মে সব সময় মস্তক খাও! সে বলল ঃ কারণ, মস্তকের মূল্য আমার জানা আছে। এতে গোলাম চুরি করতে পারবে না এবং আমাকে লোকসান দিতে হবে না। এছাড়া গোশত হলে সে রান্না করার সময় কিছু খেয়ে নিতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পারে। মস্তকে এটাও সম্ভবপর নয়। যদি সে মস্তকের চোখ, কান অথবা গালে হস্তক্ষেপ করে, তবে আমি জানতে পারব। এগুলো ছাড়া মস্তকে আমি কয়েক প্রকারের স্বাদ পাই। চোখের স্বাদ ভিন্ন, কান ও জিহবার স্বাদ আলাদা এবং মগজের স্বাদ পৃথক। মস্তক রান্না করাও কঠিন নয়। এখন বুঝতেই পারছ এতে লাভ কত বেশী! এই মারওয়ানই একদিন খলীফার দরবারে যাচ্ছিল। তার বাড়ীর এক মহিলা বলল ঃ যদি তুমি পুরস্কার পাও, তবে আমাকে কি দেবে? সে বলল ঃ যদি এক লাখ দেরহাম পাই, তবে এক দেরহাম তোমাকে দেব। ঘটনাক্রমে সে খলীফার কাছ থেকে ষাট হাজার দেরহাম লাভ করল। সেমতে এই হিসাব অনুযায়ী সে মহিলাকে এক দেরহামের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ দিয়ে দিল। একবার সে এক দেরহামের গোশত কিনলে এক ব্যক্তি দাওয়াতের আবদার করল। সে তৎক্ষণাৎ গোশত কসাইয়ের হাতে ফেরত দিয়ে দেরহামের এক-চতুর্থাংশ কম গ্রহণ করে বলে ঃ আমার অপব্যয় করতে খারাপ লাগে।

হযরত আ'মাশ (রহঃ)-এর জনৈক পড়শী যারপরনাই কৃপণ ছিল। সে বরাবরই তাঁকে বলত ঃ আমার বাড়ী গিয়ে আপনি এক খন্ড রুটি নিমক দিয়ে খেলে কৃতার্থ হতাম। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করতেন। একদিন পড়শী অভ্যাস অনুযায়ী একথা আরয করল। তখন তাঁর ক্ষুধাও ছিল। তাই বললেন ঃ আচ্ছা চল। পড়শী তাঁকে বাড়ী এনে সত্যি সত্যিই এক খন্ড রুটি ও নিমক সামনে রেখে দিল। এমন সময় ভিক্ষুক এসে হাঁক দিলে পড়শী তাকে বলল ঃ মাফ কর। ভিক্ষুক দ্বিতীয়বার সওয়াল করলে সে পূর্ববৎ 'মাফ কর' বলল। কিন্তু তৃতীয়বার সওয়াল করতেই সে রেগে-মেগে বলল ঃ চলে যাও। নতুবা লাঠি নিয়ে আসছি। হযরত আ'মাশ ভিক্ষুককে ডেকে বললেন ঃ শাহজী, চলে যাও। এই গৃহকর্তা ওয়াদায় বড় পাক্কা। আল্লাহর কসম, আমি তার মত সাচ্চা লোক দেখিনি। বহুদিন ধরে আমাকে রুটির টুকরা নিমকসহ খেতে বলে আসছিল। আজ এ দুটি বস্তুর বেশী সে আমার সমনে রাখেনি।

আত্মত্যাগ ও তার ফযীলত ঃ প্রকাশ থাকে যে, দানশীলতা ও কৃপণতার অনেক স্তর রয়েছে। দানশীলতার স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আত্মত্যাগ; অর্থাৎ, নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অপরকে দান করা। দানশীলতা হচ্ছে নিজের যে জিনিসের প্রয়োজন নেই, তা অভাবগ্রস্তকে অথবা অভাবগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তিকে দান করা। নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপরকে দান করা অত্যন্ত কঠিন। দানশীলতা যেমন উন্নীত হয়ে কখনও এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, মানুষ অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজের সম্পদ অপরকে দিয়ে দেয়, তেমনি কৃপণতাও কখনও এত নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায় যে, মানুষ নিজের অর্থ প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের জন্যে ব্যয় করে না। উদাহরণতঃ কোন কোন কৃপণ অর্থ-সম্পদকে এমনভাবে আগলে রাখে যে, নিজে অসুস্থ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত করে না এবং মনে কোন কিছু খাওয়ার অদম্য বাসনা থাকলে তা কিনে খায় না— বিনা পয়সায় পেলে খেয়ে নেয়। এরূপ ব্যক্তি প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের সাথে কৃপণতা করে। অপরপক্ষে আত্মত্যাগী ব্যক্তি নিজের অভাবের উপর অপরের অভাবকে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব, এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কত তফাৎ!

সচ্চরিত্র আল্লাহ তা'আলার একটি নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। দানশীলতার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের উপর কোন স্তর নেই। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এই আত্মত্যাগের কারণেই করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ, তারা ক্ষুধার্ত হলে কি হবে, তারা অপরকে নিজেদের চেয়ে অধিক হকদার মনে করে।

হাদীস শরীফে আছে—

اَيُّمَا امْرِؤٍ اِشْتَهٰى شَهْوَةً فَرَدَّ شَهْوَتَهٗ وَاٰثَرَ عَلٰى نَفْسِهٖ غُفِرَلَهٗ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কোন খায়েশ হয়, অতঃপর সে তা থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকে বাদ দিয়ে অপরকে দেয়া পছন্দ করে, তার মাগফেরাত হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) কখনও তিনদিন উপর্যুপরি পেটভরে আহার করেননি। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত এমনি অবস্থা অব্যাহত ছিল। আমরা ইচ্ছা করলে পেটভরে খেতে পারতাম। কিন্তু মোহাজিরগণকে পেটভরে খাওয়ানো আমাদের কাছে অগ্রগণ্য ছিল।

একবার আমাদের বাড়ীতে এক অতিথি আগমন করল। ঘরে তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কিছুই ছিল না। এমন সময় জনৈক আনসারী সেখানে এল এবং অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে গেল। বাড়ী পৌঁছে অতিথির সামনে সে খাবার রেখে দিল এবং স্ত্রীকে বাতি নিভিয়ে দিতে বলল। সে অন্ধকারে নিজের হাতও খানার দিকে বাড়াতে লাগল, যেন অতিথির সাথে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সে খাচ্ছিল না। অবশেষে অতিথি সম্পূর্ণ খাদ্য খেয়ে নিল। প্রত্যুষে রসূলে আকরাম (সাঃ) আনসারীকে বললেন ঃ তুমি রাতে মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করলে তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ, তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত হলেও অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

মোটকথা, দানশীলতা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম চরিত্র। এর সর্বোচ্চ স্তরের নাম আত্মত্যাগ। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিত্য দিনের অভ্যাস ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই চরিত্রকে মহান চরিত্র আখ্যায়িত করেছেন— إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

সোহায়ল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করলেন, ইয়া ইলাহী! আমাকে মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের কিছু মর্তবা দেখিয়ে দিন। এরশাদ হল ঃ হে মূসা, তুমি সহ্য করতে পারবে না। তবে একটি মহান মর্তবা দেখিয়ে দিচ্ছি, যার কারণে আমি তাকে তোমার উপর ও সমগ্র সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এরপর একবারই ঊর্ধ্বজগতের আবরণ সরিয়ে নেয়া হল। হযরত মূসা (আঃ) যখন তাদের একটি মর্তবা দেখলেন, তখন নূরের বিকিরণ ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রভাবে যেন তার প্রাণ নির্গত হওয়াই অবশিষ্ট ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদেরকে এই মাহাত্ম্য দান করা হল? এরশাদ হল ঃ একটি অভ্যাসের কারণে, যা আমি তাদের মধ্যে রেখেছি এবং অন্যকে দেইনি। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের কারণে তারা এই মর্তবা লাভ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছে। হে মূসা, যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন এই আত্মত্যাগ অবলম্বন করে এবং আমার কাছে আসে, তখন তার হিসাব নিতে আমি লজ্জাবোধ করব। সুতরাং তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতের যেখানে চাইবে, সেখানে জায়গা দেব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর নিজের কিছু জমি দেখার জন্যে বের হন। পথে এক বাগানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। বাগানে এক হাবশী গোলাম কাজ করছিল। যখন তার খাদ্য এল, ঠিক তখনি একটি কুকুর বাগানে ঢুকে গোলামের কাছে এল। গোলাম কুকুরটিকে একটি রুটি দিয়ে দিল। এটি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় রুটিটিও দিয়ে দিল। এরপর তৃতীয়টি দিয়ে দিল। এভাবে দিতে দিতে সে সবগুলো রুটিই কুকুরকে খাইয়ে দিল। হযরত আব্দুল্লাহ বসে বসে দেখছিলেন। অতঃপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ প্রতিদিন তোমার খাদ্য কতটুকু আসে? গোলাম আরয করল ঃ ততটুকুই , যতটুকু আপনি দেখেছেন। তিনি বললেন ঃ তাহলে সবটুকু খাদ্য কুকুরকে খাইয়ে দিলে কেন? নিজে খেলে না কেন? গোলাম আরয করল ঃ এখানে কোন কুকুর থাকে না। মনে হয় এ কুকুরটি মুসাফির। দূর থেকে এসেছিল এবং ক্ষুধার্ত ছিল। আমার কাছে তার ক্ষুধার্ত থাকা এবং নিজের পেটভরে খাওয়া ভাল মনে হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন সারাদিন কি খাবে? সে বলল ঃ উপবাস করব। হযরত আব্দুল্লাহ ভাবলেন, আমি তাকে দানশীলতার জন্যে তিরস্কার করছি। সে তো আমার চেয়েও অধিক দাতা। এরপর তিনি সেই বাগান, গোলাম এবং সেখানকার সমস্ত আসবাবপত্র কিনে নিয়ে গোলামকে মুক্ত করে দিলেন এবং বাগানটি তাকে দিয়ে দিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক সাহাবীর কাছে কেউ একটি মস্তক হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিল। তিনি ধারণা করলেন, আমার তুলনায় অমুক ভাই এই মস্তকের অধিক মুখাপেক্ষী। সেমতে তিনি মস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মস্তকটি সাত বাড়ী ঘুরে অবশেষে আসল মালিক অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তির হাতে পৌঁছে গেল। সোবহানাল্লাহ, কি অপূর্ব আত্মত্যাগ!

বর্ণিত আছে, যে রাত্রিতে হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছিলেন, সে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈলকে বললেন ঃ আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি এবং একজনের বয়স অপরজনের চেয়ে বেশী করেছি। এখন বল, তোমাদের মধ্যে কে কম জীবন চায় এবং অপরের জন্য অধিক জীবন পছন্দ করে? কিন্তু উভয়েই নিজের জীবন বেশী হওয়াই কামনা করলেন। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের বিষয়টি কেউ পছন্দ করলেন না। এরশাদ হল ঃ তোমরা উভয়েই কি হযরত আলীর মত হতে পারলে না? আমি তার ও আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি। আজ রাতে আলী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিছানায় তাঁর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং তার জীবিত থাকাকে নিজের জীবিত থাকার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এখন তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং শত্রুদের কবল থেকে আলীকে হেফাযত কর। অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল তাঁর শিয়রে এবং মীকাঈল পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ বাহ্ বাহ্ হে আবু তালেব-তনয়, আজ তোমার মত কেউ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করেন। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ, এমন লোক আছে, যে নিজেকে বিক্রি করে ফেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

হুযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি এয়ারমুক যুদ্ধের সময় সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলাম। আমি আমার চাচাত ভাইকে খোঁজ করছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি তার মধ্যে কিছু নিঃশ্বাস বাকী থাকে, তবে পানি পান করিয়ে দেব। তাই সামান্য পানি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে তালাশ করার পর তাকে জীবিত পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ পানি দেব? সে ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করল। যখন আমি পানি পান করাতে চাইলাম, তখন কাছ থেকে একজনের "আহ" শব্দ শুনতে পেলাম। আমার চাচাত ভাই ইশারা করল যে, প্রথমে তাকে পান করাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, হেশাম ইবনে আসা কাতরাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ পানি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেব? ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একজনের "আহ" শব্দ কানে ভেসে এল। হেশাম ইশারা করল প্রথমে সেখানে নিয়ে যাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখি লোকটি মারা গেছে। আমি সেখান থেকে আবার হেশামের কাছে এলাম। তখন সে-ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। এরপর আমি আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে এসে তাকেও জীবিত পেলাম না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।

আব্বাস ইবনে দাহকান বলেন ঃ বিশর ইবনে হারেছ ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে দুনিয়াতে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই বিদায় নিয়েছে। বিশর ইবনে হারেছ অবশ্য যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। তার অন্তিম শয্যায় এক ব্যক্তি এসে কিছু সওয়াল করলে তিনি নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দেন। এরপর তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে নেন এবং তাতেই ইন্তেকাল করেন।

দানশীলতা ও কৃপণতার স্বরূপ ঃ শরীয়তসম্মত দলীলসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত ও স্বীকৃত যে, কৃপণতা বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। কিন্তু মানুষ কিসে কৃপণ গণ্য হয় এবং কৃপণতা কাকে বলে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। কেননা, প্রত্যেক মানুষ আপন অভিমত অনুযায়ী নিজেকে দাতা মনে করে, অথচ অপরের দৃষ্টিতে সে হয় কৃপণ। অথবা এক ব্যক্তি কোন কাজ করলে তাতে মানুষের মত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ বলে এটা কৃপণতা, আবার কেউ সিদ্ধান্ত দেয় এটা কৃপণতা নয়। এছাড়া কোন মানুষের মন ধন-সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত নয়। এই মোহের কারণে সে ধন-সম্পদের হেফাযত করে এবং তা আটকে রাখে। যদি আটকে রাখার কারণেই কেউ কৃপণ হয়ে যায়, তবে এ থেকে কেউ মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যদি আটকে রাখার কারণে কৃপণ না হয়, তবে কৃপণতার অর্থ কি, তা বুঝা দরকার। কৃপণতা তো আটকে রাখারই নাম। এর কোন্‌টি বিনাশকারী? যে দানশীলতার কারণে মানুষ দাতা কথিত হয় এবং সওয়াব পায়, তার সংজ্ঞা কি?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ ওয়াজিব হক আদায় না করাকে বলা হয় কৃপণতা। এদিক দিয়ে যে ব্যক্তি তার যিম্মায় যেসব ওয়াজিব রয়েছে, সেগুলো দিতে থাকে, সে কৃপণ নয়। কিন্তু এই সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কসাইয়ের কাছ থেকে গোশত কিনে মেহমানের ভয়ে তা কিছু কম দামে ফিরিয়ে দেয়, সে সবার মতেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কৃপণ। অনুরূপভাবে যে তার পরিবারবর্গকে নির্ধারিত হারে খোরপোশ দেয়, যদি কেউ এক লোকমাও বেশী চায় অথবা তার ধন থেকে সামান্য বস্তু খেয়ে নেয়, তবে তা দিতে অস্বীকার করে, সে-ও কৃপণ বলেই গণ্য হয়। এমনিভাবে যদি কেউ রুটি খায় এবং অন্য কেউ সেখানে আসার পর রুটিতে শরীক হয়ে যাবে মনে করে রুটি লুকিয়ে রাখে, সে কৃপণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ এই তিনটি সিদ্ধান্তের কেউ এমন নয় যে, সে ওয়াজিব হক আদায় করেনি।

কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দান করাকে কঠিন মনে করে, সে-ই কৃপণ। এ সংজ্ঞাটিও অসম্পূর্ণ। কেননা, এর উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সকল প্রকার দান তার কাছে কঠিন, তবে অনেক কৃপণ এমন রয়েছে যারা অল্প দান করাকে কঠিন মনে করে না। এক-দুই পয়সা দিয়ে দেয়। বেশী পরিমাণে দেয়া অবশ্য তাদের জন্যে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, কতক দান কঠিন হয়, তবে এটা দাতার মধ্যেও বিদ্যমান আছে। উদাহরণতঃ সমস্ত ধন অথবা অধিকাংশ ধন দান করা কঠিন মনে হয়; কিন্তু এতে কেউ কৃপণ বলে কথিত হয় না।

কারও মতে বিনা দ্বিধায় অপরের অভাব পূরণ করার নাম দানশীলতা। কেউ বলেন ঃ সওয়ালকারীকে দেখে খুশী হওয়া এবং দেয়ার কারণে উল্লসিত হওয়ার নাম দানশীলতা। কিছু লোক বলেন ঃ দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়া কাউকে কিছু দেয়া এবং যা দেয়া হয়, তাকে অল্প জ্ঞান করা। কেউ বলেন ঃ এরূপ ধারণা করে ধন দেয়া যে, ধনও আল্লাহর এবং বান্দাও তাঁরই। কাজেই আল্লাহর ধন আল্লাহর বান্দাকে দেয়া হচ্ছে। এতে দারিদ্র্য ও উপবাসের ভয় কিসের? এরূপ মনে করে দান করার নাম দানশীলতা। কারও অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি কিছু অর্থ দান করে দেয় এবং কিছু নিজের জন্যে রেখে দেয়, সে দানশীল। আর যে নিজে কষ্ট করে এবং অপরের আশা পূরণ করে, সে আত্মত্যাগী। পক্ষান্তরে যে কিছুই দান করে না, সে কৃপণ।

কৃপণতা ও দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণিত এতগুলো উক্তি দ্বারা এ দুটি বিষয়ের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় না। তাই আমরা বিষয়টি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করছি।

মূলকথা, ধন-সম্পদ একটি রহস্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে সৃজিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনাদিকে সঠিক পথে রাখার জন্যে ধন-সম্পদের সৃষ্টি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়েছে। এখন ধন-সম্পদ যেখানে ব্যয় করা উচিত, সেখানে ব্যয় করতে বিরত থাকা কিংবা যেখানে ব্যয় করা উচিত নয়, সেখানে ব্যয় করা উভয়টিই সম্ভব। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এটাও সম্ভবপর যে, যেখানে ব্যয় না করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা এবং যেখানে ব্যয় করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা। সুতরাং জরুরী জায়গায় ব্যয় না করে ধন আটকে রাখা কৃপণতা এবং যেখানে আটকে রাখা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা অপব্যয়। এতদুভয়ের মাঝখানে ব্যয় করা এবং আটকে রাখা ভাল। এই মধ্যবর্তী স্তরের নাম দানশীলতা হওয়া উচিত। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেবল দান করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর এরশাদ হলঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

অর্থাৎ, আপন হাতকে গ্রীবার সাথে বাঁধা রাখবে না এবং তাকে পুরাপুরি প্রসারিতও করবে না।

আরও এরশাদ হল ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا -

অর্থাৎ, আর তারা, যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে না। এর মধ্যস্থলে রয়েছে একটি সরল ব্যয় পদ্ধতি।

এ থেকে জানা গেল যে, ব্যয় করা ও আটকে রাখাকে ওয়াজিব ও জরুরী পরিমাণের মধ্যে সীমিত করা দানশীলতা। কিন্তু এর সাথে এ শর্তটিও জুড়ে দিতে হবে যে, এ কাজটি শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত অন্তরও এতে সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিরোধ না করে। সুতরাং যদি উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করে; কিন্তু মন তাতে বিরোধ করে এবং সে বিরোধের মুখে সবর করে, তবে এরূপ ব্যক্তিকে দানশীল বলা হবে না; বরং দানশীল হওয়ার চেষ্টাকারী বলা হবে। এ বিষয়টি কোন্ ব্যয় ওয়াজিব, তা চিনার উপর নির্ভরশীল। জানা উচিত যে, ওয়াজিব ব্যয় দু'রকম। এক, যা শরীয়তের নির্দেশে ওয়াজিব। যেমন, যাকাত দেয়ার জন্যে ব্যয় করা। দুই, যা আভিজাত্য ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করে জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব দানশীল সেই হবে, যে তার ধন-সম্পদকে না শরীয়তের ওয়াজিব থেকে আটকে রাখে এবং না অভ্যাস ও ভদ্রতার জরুরী বিষয়াদি থেকে আটকে রাখে। যদি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে ত্রুটি করে, তবে সে হবে কৃপণ। কিন্তু যে শরীয়তের ওয়াজিব আদায় করবে না, সে হবে অধিক কৃপণ। উদাহরণতঃ কেউ ধন-সম্পদের যাকাত দেয় না অথবা নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ আদায় করে না, তাকে কৃপণ মনে করতে হবে। কিংবা ধন দেয়ার সময় কেউ বেছে বেছে খারাপটি দেয়। এটাও কৃপণতাই। ভদ্রতার কারণে যে ব্যয় জরুরী, তা হল সামান্য সামান্য বিষয়ে সংকোচন নীতি অবলম্বন করা। এটি অত্যন্ত খারাপ কথা। এটা অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কতক বিষয়ে ধনী ব্যক্তির সংকোচন নীতি খারাপ মনে হয়, ফকীরের নয়। কিংবা পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের সাথে সংকোচন নীতি অবলম্বন করা খারাপ মনে হয়— বেগানাদের সাথে খারাপ মনে হয় না। পড়শীর সাথে সংকোচন নীতি দূরবর্তীদের তুলনায় খারাপ মনে হয়। তদ্রূপ অতিথি সেবায় সংকোচন নীতি ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য কাজ-কারবারের তুলনায় খারাপ মনে হয়।

অতএব কৃপণ তাকে বলা হয়, যে ধনকে এমন জায়গায় ব্যয় করা থেকে আটকে রাখে, যেখানে শরীয়তের নির্দেশে অথবা ভদ্রতার দাবীর কারণে আটকে রাখা উচিত নয়।

সারকথা, যে ব্যক্তি শরীয়তের ওয়াজিব ও ভদ্রতার ওয়াজিব আদায় করে, সে কৃপণতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তবে দানশীলতার গুণে তখন গুণান্বিত হবে, যখন এই পরিমাণের চেয়ে বেশী ব্যয় করবে। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্তবা এতেই পাওয়া যায়। সুতরাং যে স্থানে শরীয়তের দৃষ্টিতে ধন ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, সেখানে যার মনে ব্যয় করার যে পরিমাণ অবকাশ থাকবে, সে সেই পরিমাণে দাতা হবে। বলা বাহুল্য, এর স্তর অসংখ্য হতে পারে। এ কারণেই অনেকে অনেকের চেয়ে অধিক দাতা হয়ে থাকে। তবে দাতা হওয়ার জন্য শর্ত হল, মনের খুশীতে দান করা। খেদমত পাওয়ার আশায় অথবা প্রতিদান, শোকর ও প্রশংসা লাভের আকাংখায় যারা দান করে, সে দাতা নয়; বরং সে ধন দিয়ে প্রশংসা ক্রয় করে নেয়। সুতরাং তাকে সওদাগর ও ব্যবসায়ী বলা উচিত। কারণ, নিঃস্বার্থ ব্যয়কেই দান বলা হয়। বাস্তবে এ ধরনের দান আল্লাহ্ পাকের সত্তা ছাড়া অন্য কারও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে সম্ভব নয়। তবে মানুষকে দাতা বলা হয় রূপক অর্থে। কারণ, তার কোন ব্যয় স্বার্থমুক্ত হয় না। কিন্তু সে স্বার্থ যদি কেবল আখেরাতের সওয়াব এবং কৃপণতার কলুষতা থেকে নিজেকে পবিত্র করা হয়, তবেই তাকে দানশীল বলা হবে।

কৃপণতার প্রতিকার কেমন করে সম্ভব ঃ পূর্বেই জানা গেছে, কৃপণতার কারণ হচ্ছে ধন-সম্পদের মহব্বত। এখন জানা দরকার যে, ধন-সম্পদের মহব্বতের কারণ দুটি। প্রথম কারণ খাহেশপ্রীতি। ধন-সম্পদ ছাড়া এটা অর্জিত হতে পারে না। এতে অনেক দিন বেঁচে থাকার আশাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষ যদি জানতে পারে, সে আগামীকাল মারা যাবে, তবে ধন-সম্পদের কৃপণতা না করার সম্ভাবনাই বেশী। যে পরিমাণ ধন মানুষের একদিন, একমাস অথবা এক বছরের জন্যে যথেষ্ট, তা স্বল্প পরিমাণই বটে। এর বেশী ধন রাখা অনর্থক। মাঝে মাঝে বেশী আশা এভাবে হয় যে, নিজের জীবনের আশা তো বেশী হয় না, কিন্তু সন্তানদের রিযিকের চিন্তা যত বেশী করে, ততই কৃপণতাও শক্তিশালী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ স্বয়ং ধন-সম্পদই ভাল মনে হওয়া। উদাহরণতঃ কোন কোন লোকের কাছে এত বেশী ধন-সম্পদ থাকে যে, নিজের নিয়মানুযায়ী ব্যয় করলে সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট হয় এবং হাজারো বেঁচে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান হয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও যাকাত দিতে মন চায় না। নিজে অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসায়ও ব্যয় করা ভাল মনে করে না। কেননা, সে টাকা-পয়সার প্রেমিক। টাকা-পয়সা হাতে থাকাটা তার কাছে অত্যন্ত প্রশস্তিকর বিবেচিত হয়। তাই একে মাটিতে পুঁতে রাখে। অথচ জানে, মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে কিংবা শত্রুর হস্তগত হবে। অন্তরের এ রোগটির প্রতিকার খুব কঠিন। বিশেষত বার্ধক্যে তো এটা দুরারোগ্যই বটে। এ রোগীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ কারও প্রেমে পড়ে এবং তার সাথে তার দূতকেও ভালবাসতে থাকে। এরপর দূতের মহব্বতে এমন মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আসল প্রেমাস্পদকে ভুলে যায়। টাকা-পয়সাও অভাব-অনটনের দূত। এর কারণে অভাব-অনটন হাসিল হয়। তাই টাকা-পয়সা প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে অভাব-অনটনের প্রতি লক্ষ্যও থাকে না; কেবল টাকা-পয়সাকেই প্রিয় মনে করা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব, খাহেশপ্রীতির চিকিৎসা হল, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এবং সবর করা। আর দীর্ঘ আশার প্রতিকার হচ্ছে হরদম মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং সমসাময়িকদের মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করা যে, তারা কেমন দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে এবং বিপদাপদ সহ্য করে অর্থকড়ি সঞ্চয় করেছে, কিন্তু শেষে খালি হাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। যদি সন্তান-সন্ততির ভাবনা অন্তরে থাকে, তবে চিন্তা করবে, যে সৃষ্টিকর্তা ছেলে দিয়েছেন, তিনি তার রিযিকও দিয়েছেন। অনেক সন্তানের কাছে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা পিতা-মাতার কাছ থেকে সম্পত্তিপ্রাপ্ত সন্তানদের চেয়ে অনেক বেশী সচ্ছল হয়ে থাকে। আর এটাও জানার কথা যে, সন্তানদের জন্যে অর্থ সঞ্চয়ের পিছনে নিয়ত এটাই থাকে যে, তাদের অবস্থা ভাল থাকুক। কিন্তু কখনও এর বিপরীত অবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সন্তান যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, তবে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট। আর যদি পাপাচারী হয়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি যা পাবে, তা গোনাহের কাজে উড়িয়ে দেবে এবং এর শাস্তি পিতাকেও ভোগ করতে হবে।

কৃপণতার এক প্রতিকার এটাও যে, কৃপণতার নিন্দায় ও দানশীলতার প্রশংসায় যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা কৃপণের জন্যে যেসব শাস্তি ও কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আরও একটি উপকারী চিকিৎসা এই যে, কৃপণদের অবস্থা চিন্তা করবে এবং তাদেরকে ঘৃণা করবে। এমন কোন কৃপণ নেই, যে অপরের কৃপণতাকে খারাপ মনে না করে। সুতরাং চিন্তা করবে যে, যদি আমি কৃপণতা করি, তবে অপরের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাব; যেমন আমার কাছে অন্য কৃপণ হেয় ও নিকৃষ্ট।

আরও একটি তদবীর এই যে, ধন-সম্পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এটা সৃষ্টি করার কারণ কি? যখন জানা যাবে, ধন-সম্পদ কেবল অভাব-অনটন পূরণের জন্যে সৃজিত হয়েছে, তখন যতটুকু অভাব পূরণে যথেষ্ট, সে পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করবে, অর্থাৎ, ব্যয় করে সওয়াবের ভান্ডার গড়ে তুলবে। এ পর্যন্ত বর্ণিত সবগুলো প্রতিকার এলম তথা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ বুদ্ধির জোরে যখন জানবে যে, ব্যয় করা আটকে রাখার তুলনায় দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গলজনক, তখন সে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহিত হবে। কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এটা অপরিহার্য যে, ব্যয় করার কল্পনা অন্তরে আসার সাথে সাথে অবিলম্বে তা বাস্তবায়িত করবে— টালবাহানা করবে না। কেননা, শয়তান সর্বক্ষণ দারিদ্র্যের ভয় দেখাতে থাকে এবং ব্যয় করতে বাধা দেয়। বর্ণিত আছে, আবুল হাসান পুশঙ্গী (রহঃ) একদিন পায়খানায় বসা ছিলেন, এমন সময় এক শিষ্যকে ডেকে বললেন ঃ আমার জামাটি শরীর থেকে খুলে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। শাগরেদ আরয করল ঃ আপনি পায়খানা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতে পারলেন না? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে জামা দিয়ে দেয়ার কথা মনে পড়েছে। আমি নফ্সের তরফ থেকে আশংকা করি যে, সে এই কল্পনা বদলে দেবে। তাই অবিলম্বে কল্পনাটি বাস্তবায়িত করছি।

কৃপণতার স্বভাবটি তখনই দূরীভূত হয়, যখন মনের উপর জোর দিয়ে ব্যয় করার অভ্যাস করা হয়। যেমন, প্রেমাস্পদ সামনে থাকা পর্যন্ত প্রেম দূরীভূত হয় না। হাঁ, যদি প্রেমাস্পদ থেকে বিছিন্ন হওয়া যায় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনের উপর জোর দিয়ে বিরহে সবর করা হয়, তবে ক্রমান্বয়ে অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কৃপণতার চিকিৎসা করতে চায়, তার উচিত, ধন-সম্পদ থেকে মনের উপর জোর দিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলা। বলা বাহুল্য, আদর করে রেখে দেয়ার চেয়ে সমুদয় ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দেয়া উত্তম।

কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি সূক্ষ্ম কৌশল রয়েছে। তা হল নফ্সকে এই বলে ধোকা দেয়া যে, লেনদেন করলে তোর সুখ্যাতি হবে এবং দাতা বলে খ্যাত হবে। এভাবে রিয়া তথা লোক-দেখানোর ইচ্ছায় ব্যয় করবে। এতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কৃপণতা দূর করে রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে রিয়া দূর করে নিতে হবে। মোটকথা, ধন-সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার পর নাম ও সুখ্যাতি মানুষের সান্ত্বনার বিষয়। উদাহরণতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ ছাড়ানোর সময় পাখী ইত্যাদির সাথে খেলা লাগিয়ে দেয়া হয়, যাতে দুধের কথা মনে না করে। এটা উদ্দেশ্য থাকে না যে, সারা জীবনই পাখী নিয়ে খেলা করবে। বরং যখন দুধের কথা ভুলে যায়, তখন এ খেলা থেকেও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়। কিন্তু এই চিকিৎসা এমন ব্যক্তির জন্যই উপকারী, যার মধ্যে রিয়ার তুলনায় কৃপণতা প্রবল। এমতাবস্থায় যেন শক্তিশালী গুণটিকে দুর্বল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গুণ দ্বারা বদলে দেয়া হবে। কিন্তু যদি রিয়া ও কৃপণতা উভয়টি সমান হয়, তবে এ চিকিৎসায় তার কোন উপকার হবে না। এর পরীক্ষা এই যে, যদি লোক-দেখানো ভাবে ব্যয় করা তার জন্যে কঠিন মনে না হয়, তবে রিয়া গুণটি প্রবল বলে জানতে হবে। আর যদি লোক-দেখানো ভাবেও ব্যয় করা তার কাছে কঠিন মনে হয়, তবে কৃপণতা প্রবল বলে জানতে হবে।

রিয়া, কৃপণতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলো যে একটি অপরটির দ্বারা দূর হয়ে যায়, এর দৃষ্টান্ত এরূপ বুঝা উচিত যে, কবরে মৃতের সমস্ত অংশ কৃমি তথা কীট হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ এটাই যে, এসব কীট একে অপরকে খেয়ে বড় হয় এবং সংখ্যা হ্রাস পায়। অবশেষে এদের মধ্যে দু'টি শক্তিশালী কীট থেকে যায়। এরপর এরাও পরস্পর লড়াই করতে থাকে এবং পরিশেষে একটি প্রবল হয়ে অপরটিকে হজম করে ফেলে। এরপর নিজেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। এমনিভাবে মন্দ স্বভাবগুলোর মধ্যেও এটা সম্ভব যে, সবল স্বভাবটি দুর্বল স্বভাবকে খেয়ে ফেলবে এবং অবশেষে একটিই থেকে যাবে। এই একটিকে খতম করার উপায় হচ্ছে তার খোরাক বন্ধ করে দেয়া। মন্দ-স্বভাবের খোরাক বন্ধ করার অর্থ সেই স্বভাবের দাবী অনুযায়ী কাজ না করা। অর্থাৎ, কোন মন্দ স্বভাব যেসব কাজ করতে চায়, তা কখনও না করা। এভাবে তার খোরাক বন্ধ করে দিলে সেই স্বভাবটি দুর্বল হয়ে মরে যাবে। উদাহরণতঃ কৃপণতার দাবী হচ্ছে ধন আটকে রাখা এবং ব্যয় না করা। কেউ যখন এর খেলাফ করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে বারবার ব্যয় করবে, তখন কৃপণতা মরে যাবে এবং ব্যয় করার স্বভাব মজ্জাগত হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত আমলের মাধ্যমে কৃপণতার প্রতিকার বর্ণিত হল।

কিন্তু কৃপণতা স্বভাবটি মাঝে মাঝে এত শক্তিশালী হয় যে, মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ফলে, মানুষ এর অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং দানশীলতার উপকারিতাও বুঝে না। যখন এ দু'টি বিষয়ের জ্ঞানই অর্জিত হয় না, তখন আগ্রহ কোথা থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় এ রোগটি চিরস্থায়ী হয়ে যায়। যেমন, কোন রোগীর মধ্যে ঔষধের যথার্থ ব্যবহার সম্ভবপর না হলে তার মৃত্যুর জন্যে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

ধন-সম্পদ সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে কল্যাণ এবং একদিক দিয়ে অনিষ্ট। এটা যেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাপের মত। যারা মন্ত্র জানে, তারা সাপকে ধরে তার মধ্য থেকে বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী পাথরটি বের করে নেয়, যা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি একে ধরলে তার মারাত্মক বিষে অঘোরে প্রাণ হারায়। নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় লক্ষ্য না রাখলে ধন-সম্পদের বিষ থেকে কেউ আত্মরক্ষা করতে পারে না।

প্রথমত, ধন-সম্পদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ জানতে হবে। এটা জানা হয়ে গেলে মানুষ যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই জীবিকা উপার্জন করবে এবং ততটুকুরই হেফাযত করবে।

দ্বিতীয়ত, উপার্জনের পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যা পুরোপুরি হারাম, তা থেকে বেঁচে থাকবে। যা বেশীর ভাগ হারাম কিংবা মকরূহ, তা থেকেও বিরত থাকবে। উদাহরণতঃ কোন ঘুষখোরের হাদিয়া গ্রহণ করা এবং মানুষের কাছে হাত পেতে কোন কিছু গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, জীবিকার পরিমাণের প্রতি খেয়াল রাখবে, যাতে প্রয়োজনের বেশীও না হয়, কমও না হয়। প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এদের প্রত্যেকটির তিনটি করে স্তর রয়েছে- নিম্ন, উচ্চ ও মধ্যবর্তী স্তর।

চতুর্থত, ব্যয়ের খাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। হালাল উপার্জনকে হালাল খাতেই ব্যয় করবে।

পঞ্চমত অর্থ অর্জন, বর্জন, ব্যয় ও আটকে রাখার ক্ষেত্রে নিয়ত ঠিক রাখবে। অর্থাৎ যে অর্থ অর্জন করবে, তাতে এবাদতে সাহায্য লাভের নিয়ত করবে এবং যে অর্থ বর্জন করবে তাতে সংসার নির্লিপ্ততা ও ধন-সম্পদের নিকৃষ্টতার নিয়ত করবে। এরূপ করলে ধন-সম্পদের উপস্থিতি ক্ষতিকর হবে না।

এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেয় এবং নিয়ত আল্লাহ তা'আলার খাতিরেই হয়, তবু সে সংসারত্যাগীই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ বর্জন করে এবং "আল্লাহর খাতিরে" নিয়ত না হয়, তবে সে সংসারত্যাগী হবে না। সুতরাং মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি ও স্থিরতা আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া উচিত। অর্থাৎ, গতি ও স্থিতি সেটাই করবে, যা এবাদত কিংবা এবাদতে সহায়ক। দেখ, এবাদতের সর্বাধিক পরিপন্থী কাজ হচ্ছে খাওয়া ও পায়খানা করা। কিন্তু এগুলোর দ্বারাও এবাদতে সহায়তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়। সুতরাং যদি কেউ সহায়তার নিয়তে আহার ও পায়খানা করে, তবে এগুলো তার জন্যে এবাদত হিসাবে লেখা হবে। এমনিভাবে জামা, পায়জামা, বিছানা, পাত্র ইত্যাদির হেফাযতেও এই নিয়ত রাখা উচিত। কেননা, ধর্মকর্মে এগুলোরও প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধন-সম্পদ থাকে, তাতে আল্লাহর কোন বান্দার উপকার করার নিয়ত করবে। সুতরাং কোন সময় কেউ এরূপ বস্তু চাইলে তাকে দিতে অস্বীকার করবে না।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলবে, ধন-সম্পদের আধিক্য তার জন্যে ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু এটা সে-ই অর্জন করতে পারে, যে ধর্মকর্মে পাকাপোক্ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তারা এই মনে করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে যে, কতক সাহাবী বিত্তশালী ছিলেন এবং তাদের কাছে অগাধ ধনরাশি ছিল। আমিও তেমনি অর্থ সঞ্চয় করি। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা সেই নির্বোধ বালকের মত, যে কোন তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকে সাপ ধরতে দেখে মনে করে, সে সুন্দর আকৃতি ও নরম ত্বকের কারণে সাপ ধরেছে। এরপর সে-ও তার দেখাদেখি সাপ ধরে এবং তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, সাপে কাটা ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে মরে গেছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ যাকে দংশন করে, সে মরে গেছে বলে জানা যায় না।

মোটকথা, পাহাড়ে চলাফেরা করা, নদীর তীরে ভ্রমণ করা এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে যেমন অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, তেমনি ধনসম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ আলেমের সমান হতে পারে না।

প্রাচুর্যের নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা ঃ জানা উচিত যে, শোকরকারী ধনীর মর্তবা উচ্চে, না সবরকারী দরিদ্রের মর্তবা উচ্চে এ বিষয়ে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে কেবল এতটুকু লিখতে চাই যে, প্রাচুর্যের তুলনায় দারিদ্র্যই মোটামুটি উত্তম। দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে আমরা হারেছ মুহাসেবী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি, যা তিনি জনৈক ধনী আলেমের বক্তব্যের জওয়াবে এক পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেছেন। ধনী আলেম তার ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রমাণ স্বরূপ সাহাবায়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেরামের প্রাচুর্য এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করে নিজেকে তাদের সাথে তুলনা করেছিলেন।

এলমে মোয়ামালায় হারেছ মুহাসেবীর জুড়ি নেই। নফসের দোষ-ত্রুটি, আমলের বিপদাপদ এবং এবাদতের স্বরূপ তিনি যতটুকু লিখেছেন অন্য কেউ ততটুকু লিখেননি। তিনি প্রথমে বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি হযরত ঈসা (আঃ) মন্দ আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন—হে মন্দ আলেমগণ, তোমরা নামায পড়, রোযা রাখ এবং দান-খয়রাত কর। কিন্তু যা করতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তা কর না। তোমরা নিজে যা কর না, তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমাদের এ কাজ খুবই মন্দ। বাহ্যত তোমরা মুখে তওবা কর, কিন্তু অন্তরে রিপুর কামনা-বাসনা অনুযায়ী আমল কর। বাহিরকে পাকসাফ রেখে অন্তরকে নাপাক রাখা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আমি সত্য বলছি, তোমরা চালনির মত হয়ো না, যার ভিতর দিয়ে উত্তম আটা বের হয়ে যায় এবং ভুষি থেকে যায়। তোমাদের মুখ দিয়েও প্রজ্ঞার কথাবার্তা বের হয় কিন্তু অন্তর আবর্জনায় পূর্ণ। হে দুনিয়ার সেবাদাসরা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে তার খাহেশ ও আগ্রহ ছিন্ন করে না, সে আখেরাত কিরূপে পাবে? আল্লাহর কসম, তোমাদের অন্তর তোমাদের আমল দেখে কাঁদে। দুনিয়াকে তোমরা জিহ্বার নিচে রেখেছ এবং আমলকে পায়ের নিচে। তোমাদের কাছে দুনিয়ার কল্যাণ আখেরাতের কল্যাণ অপেক্ষা উত্তম। তোমরা নিজেদের আখেরাত বরবাদ করেছ। তোমরা আর কতদিন অন্ধকারের পথিকদেরকে পথ বলে দেবে এবং নিজেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। মনে হয়, তোমরা দুনিয়াদারদের হাত থেকে দুনিয়াকে এজন্যে ছাড়িয়ে নাও, যাতে সবটুকু দুনিয়াই তোমাদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। যদি তোমাদের মুখ থেকে এলমের নূর বের হয় এবং অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তবে এতে লাভ কি? হে দুনিয়ার দাসরা, তোমরা পরহেযগার নও— স্বাধীনচেতা বুযুর্গগণের মতও নও। অতএব, আশ্চর্যের কি থাকতে পারে যদি দুনিয়া তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে উপুড় করে মাটিতে নিক্ষেপ করে এবং এমনি অবস্থায় হেঁচড়াতে শুরু করে। তোমাদের পাপ তোমাদের মাথার কেশ ধরে রাখবে এবং এলম পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেবে। এরপর তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবে। সেখানে না থাকবে কোন সঙ্গী, না থাকবে কোন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। অতঃপর সেখানে তোমরা নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

এরপর হারেছ মুহাসেবী বলেন ঃ এ হচ্ছে আলেমদের অবস্থা। এরাই মানুষরূপী শয়তান এবং সকল ফেতনার কারণ। এরা দুনিয়া তথা জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদার লোভে আখেরাতকে ত্যাগ করেছে এবং ধর্মকে অপমানিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা নিজের কৃপায় ক্ষমা না করলে এরা আখেরাতে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর জানা দরকার, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিমজ্জিত থাকে, আমি দেখেছি, তার আনন্দ অমলিন নয়। সে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টে জড়িত থাকে এবং তার দ্বারা বিভিন্ন পাপকর্ম সম্পাদিত হয়। পরিণামে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া সে কিছুই পায় না। সে আশায় আশায় সুখী থাকে; কিন্তু না পায় দুনিয়া, না ধর্ম ঠিক থাকে।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

অর্থাৎ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

আহা! এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হবে। ভাইসব, আল্লাহকে ধ্যান কর, শয়তানের চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ো না এবং শয়তানের বন্ধুদের ধোকায় পড়ো না। যারা মিথ্যা দলীলের ভিত্তিতে দুনিয়া অর্জন করার কাজে ডুবে রয়েছে, তারা এ জন্যে এই ওযর পেশ করে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের কাছেও বিপুল ধনরাশি ছিল। এটা এ জন্যে করে, যাতে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ে মানুষ তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে কর। অথচ এটা শয়তানের একটি কুমন্ত্রণা, যা তারা টের পাচ্ছে না। হে হতভাগারা, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পত্তির প্রমাণ পেশ করা তোমাদের জন্যে শোভা পায় না। শয়তান তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তোমাদের মুখ থেকে এই প্রমাণ বের করায়। কেননা, যখন তোমরা বল, সাহাবায়ে কেরাম অগাধ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, তখন তাদের গীবত করে এবং তাদের প্রতি দোষারোপ কর। আর যখন বল, হালাল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা তা বর্জন করার চেয়ে উত্তম, তখন তোমরা যেন রসূলে করীম (সাঃ) ও পয়গম্বরগণকে ভ্রান্ত ও অজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন কর, আর বল যে, তাঁরা অযথাই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সংসারবিমুখতা অবলম্বন করেছিলেন। ধন-সঞ্চয়ের যে তত্ত্ব তোমরা আবিষ্কার করেছ, তা তারা বুঝতে সক্ষম হননি। অন্যথায় তোমাদের মত তাঁরাও ধন-সঞ্চয় করতেন। তোমাদের বক্তব্য থেকে এ কথাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; অর্থাৎ, তিনি অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তোমাদের ধারণায় অর্থ সঞ্চয় করা উম্মতের জন্যে অধিক কল্যাণকর। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন উম্মতকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা না দিয়ে ধোকা দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, তোমাদের এ সব বক্তব্য প্রলাপোক্তি ছাড়া কিছুই নয়। রসূলে করীম (সাঃ) উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

তোমরা অর্থ সঞ্চয় করাকে উত্তম বলে থাক। এ থেকে এটাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেননি। কারণ, তিনি আমাদেরকে অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থ সঞ্চয় করার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব একথা আল্লাহ তা'আলা জানতে পারলেন না এবং না জেনেই নিষেধ করে দিয়েছেন। আর তোমরা অর্থের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব চমৎকাররূপে জেনে নিয়েছ। তাই অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছ। আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ মূর্খতা থেকে রক্ষা করুন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধনরাশিকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী নয়। কিয়ামতের দিন তিনি নিজে বাসনা প্রকাশ করবেন যে, দুনিয়াতে যদি আমি কোনরূপে জীবনধারণ করার মত জীবিকা পেতাম, তবেই ভাল হত। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, যখন আবদুর রহমান ইবনে আওফের ওফাতের পর কোন কোন সাহাবী বললেন ঃ হযরত আবদুর রহমান যে ধন-সম্পদ ছেড়ে গেছেন, সে কারণে তার জন্যে আমাদের খুব ভয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, ভয় কিসের। তিনি হালাল ধন-সম্পদ উপার্জন করেছেন, হালাল পথে ব্যয় করেছেন এবং হালাল উপার্জন ছেড়ে গেছেন। হযরত কা'বের এই উক্তি কেউ গিয়ে আবুযর গেফারী (রাঃ)-এর কাছে বলে দিল। তিনি রাগে অস্থির হয়ে গেলেন এবং একটি চুলের রশি হাতে নিয়ে কা'বের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। কা'ব এ সংবাদ অবগত হয়ে পলায়ন করলেন এবং খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু যরও তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে হযরত উসমানের ঘরে আগমন করলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই কা'ব খলীফার পেছনে গিয়ে বসলেন। হযরত আবুযর তাঁকে লক্ষ্য করে সজোরে বললেন ঃ হে ইহুদীর বাচ্চা, তুমিই বলেছিলে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যে সম্পত্তি ছেড়ে গেছে, তাতে কোন দোষ নেই! অথচ রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে গমন করেন। সেখানে তিনি আমাকে ডাক দিলেন ঃ আবুযর! আমি জওয়াব দিলাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ (অর্থাৎ, আমি হাযির আছি)। তিনি বললেন ঃ

الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا
وَهٰكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَقُدَّامِهِ وَخَلْفِهِ وَهُمْ قَلِيلٌ -

অর্থাৎ, অধিক ধনশালীই কিয়ামতের দিন স্বল্প পুঁজিবিশিষ্ট হবে, কিন্তু যে ডান হাতে ও বাম হাতে, অগ্রে ও পশ্চাতে এমন এমন করবে। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম হবে।

এরপর তিনি আবার আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি লাব্বায়েকা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড়ের সমান ধন-ভাণ্ডার থাকে, আমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করি. কিন্তু মৃত্যুর দিন তা থেকে দুটি যব পরিমাণও আমার পরে অবশিষ্ট থেকে যায়, এটাকে আমি ভাল মনে করি না। আমি আরয করলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি দুটি স্তূপের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ না, বরং দুটি যব অবশিষ্ট থাকার কথা বলছি। আমি তো কম বলি, আর তুমি বাড়িয়ে বল। এখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো একথা বলেন, আর তুমি ইহুদীর বাচ্চা হয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফের বিরাট সম্পত্তি ছেড়ে যাওয়ার ভেতরে কোন দোষ দেখতে পাও না! তুমিও মিথ্যুক এবং যে একথা মানে, সে-ও মিথ্যুক। হযরত আবুযরের এই স্পষ্টোক্তির জওয়াব কোন সাহাবী দেননি। তিনি তাঁর কথা বলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা আরও হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পণ্যবাহী উট এয়ামন থেকে ফিরে এসে মদীনায় হঠাৎ ধুমধাম ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোলমালের আওয়াজ শুনা যেতে লাগল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ গোলমাল কিসের? লোকেরা আরয করল ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের উট এসেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও রসূল সত্য বলেছেন। হযরত আবদুর রহমান এই সংবাদ পেয়ে এই হাদীসটি সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— আমি জান্নাতে মুহাজির ও মুসলমানদের মধ্যে যারা ফকীর, তাদেরকে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছি এবং ধনীদের কাউকে তাদের সাথে জান্নাতে যেতে দেখিনি। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়ে তাদের সাথে যাচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান এই হাদীস শুনে বললেন ঃ এই উটগুলো তাদের সমুদয় বোঝাসহ আল্লাহর ওয়াস্তে খয়রাত। আর যে সকল গোলাম এসব উটের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদেরকেও আমি মুক্ত করে দিলাম, যাতে ফকীরদের সাথে আমিও দৌড়ে জান্নাতে যেতে পারি।

আমরা আরও একটি রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, রসূলে করীম (সাঃ) একবার আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন ঃ আমার উম্মতের ধনীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে যাবে; কিন্তু সম্ভবত হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে।

হযরত আবদুর রহমান তাকওয়া, অনুগ্রহ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে অগ্রণী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর পবিত্র সংসর্গপ্রাপ্ত এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ধন-সম্পদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে ফকীরদের পিছনে পড়ে থাকবেন। অথচ এই ধন-সম্পদ তিনি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছিলেন, যাতে অপরের কাছে সওয়াল করতে না হয়। এই ধন-সম্পদ দ্বারা তিনি মানুষের উপকারও করেছেন। নিজের জন্যে মধ্যবর্তী পন্থায় ব্যয় করেছেন এবং আল্লাহর পথে বিস্তর লুটিয়েছেন। তবু তিনি জান্নাতে মুহাজির ফকীরদের সাথে দৌড়ে যেতে পারবেন না। তাঁরই যখন এই অবস্থা, তখন আমরা যারা দুনিয়ার ব্যস্ততায় নিমজ্জিত, আমাদের কি অবস্থা হবে?

আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সর্বদা সন্দেহযুক্ত ও হারাম ধন-সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং এই হাতের ময়লার জন্যে অন্যদের সাথে দম্ভ প্রদর্শন করতে থাক। তোমরা খাহেশ, সাজসজ্জা, আত্মগর্ব ও নানা ধরনের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবাঞ্ছিত কাজে আবদ্ধ রয়েছ। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পদের প্রমাণ কেমন করে পেশ করতে পার? এটা শয়তানী তুলনা। শয়তান তার বন্ধুদেরকে এমনি ধরনের প্রমাণাদি তালীম দিয়ে থাকে।

এখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের, সাহাবায়ে কেরামের এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা বর্ণনা করে শুনাচ্ছি, যাতে তোমরা নিজেদের নিকৃষ্টতা ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে পার। জানা উচিত যে, কোন কোন সাহাবীর কাছে অর্থ-সম্পদ থাকার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অপরের কাছে সওয়াল না করা এবং আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করা। তাঁরা হালাল উপায়ে উপার্জন করেছেন, পবিত্র ধন ভোগ করেছেন এবং মধ্যবিত্তের ন্যায় পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করেছেন। তারা দুনিয়াতে কারও হক নষ্ট করেননি এবং কার্পণ্য করেননি; বরং নিজেদের অধিকাংশ ধন-সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে দান করেছেন। কোন কোন সাহাবী তাদের সমুদয় অর্থই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরাও কি তেমনি? না, তোমরা এরূপ হতে যাবে কেন? বিশ্ব-জাহানের সাথে সামান্য মাটির কি তুলনা?

এছাড়া অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন দারিদ্র্যপ্রিয়, নিঃস্বতার ভয় থেকে মুক্ত, জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, তাকদীরে সন্তুষ্ট, বিপদাপদে সম্মত, নেয়ামতের শোকরকারী, দুঃখ-কষ্টে সবরকারী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং গর্ব ও অহংকার থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন বল, তোমরাও কি তেমনি?

তাঁদের নীতি ছিল দুনিয়ার ঐশ্বর্য তাঁদের হাতে এসে গেলে তাঁরা দুঃখ করে বলতেন— মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা কোন গোনাহের আযাব দুনিয়াতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার আগমনকে শাস্তি মনে করতেন। পক্ষান্তরে যখন দারিদ্র্যকে আসতে দেখতেন, তখন খুশী হয়ে বলতেন—ভাল হয়েছে। সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য আমরা প্রাপ্ত হয়েছি।

বর্ণিত আছে, জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ সকাল বেলায় ঘরে কিছু সামগ্রী দেখলে দুঃখিত ও বিষণ্ন হতেন, আর গৃহে কিছু না থাকলে প্রফুল্ল হতেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ তো ঘরে কিছু না থাকলে দুঃখ করে এবং থাকলে খুশী থাকে। আপনার অবস্থা এর বিপরীত কেন? তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ কারণ, আমি সকাল বেলায় উঠে যখন পরিবার-পরিজনের কাছে কিছু না দেখি, তখন এই ভেবে আনন্দিত হই যে, আজ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ নসীব হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন ঘরে কিছু থাকে, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ না হওয়ার কারণে দুঃখিত হই। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা ছিল এই। আমরা এখানে কমই লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অসংখ্য ও অগণিত। এখন তোমরা বল, তোমাদের অবস্থাও কি তেমনি? নাউযুবিল্লাহ, তোমরা এরূপ হবে কেন? তোমাদের অবস্থা তো সম্পূর্ণ তাদের বিপরীত। তোমরা প্রাচুর্যে ঔদ্ধত্য কর, সহজলভ্যতায় গর্ব কর এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বিলাসিতা কর এবং নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতায় গাফেল হয়ে যাও। বিপদ এলে তোমরা ক্রুদ্ধ হও এবং নিঃস্বতায় নিরাশ হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর বিধি-বিধানে খুশী নও। দারিদ্র্যকে খারাপ মনে কর এবং মিসকীনীর কারণে অতিষ্ঠ হয়ে যাও। অথচ মিসকীনীর কারণে পয়গম্বরগণ গর্ব করতেন। তাঁদের গর্বের বস্তু তোমাদের কাছে মন্দ। দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে থাক। এতেও আল্লাহর প্রতি কুধারণা করা হয় এবং তিনি রিযিক পৌঁছানোর যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তা বিশ্বাস না করা জরুরী হয়ে পড়ে। এতটুকু গোনাহ কি কম? আমার মনে হয়, তোমরা দুনিয়ার আনন্দ, কামনা-বাসনা এবং জাঁকজমক অর্জনের জন্যেই ধন-সম্পদ সঞ্চয় কর। অথচ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দুষ্ট লোক তারাই, যারা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং এতেই তাদের বপু ফুলে-ফেঁপে উঠে। জনৈক আলেম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু লোক তাদের পুণ্যসমূহ দেখতে চাইবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا -

অর্থাৎ, তোমরা পার্থিব জীবনেই তোমাদের পবিত্র বস্তুসমূহ বিনষ্ট করেছ এবং সেখানেই ভোগ করেছ।

অর্থাৎ তোমরা কি জান না যে, দুনিয়ার নেয়ামতের কারণে আখেরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছ? জিজ্ঞাসা করি, এর চেয়ে বেশী বিপদ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হবে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আশ্চর্য নয় যে, তোমরা গর্ব, অহংকার ও জাগতিক সাজসজ্জার জন্যে ধনৈশ্বর্য সঞ্চয় কর। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি গর্ব, অহংকার ও প্রাচুর্যের জন্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, সে আল্লাহর কাছে এমনভাবে যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। হয়তো বা আল্লাহর কাছে যাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে থাকা তোমাদের কাছে উত্তম। এ কারণেই আল্লাহর দীদারকে খারাপ মনে কর। অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ কর। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَسِفَ عَلٰى دُنْيَا فَاتَتْهُ اِقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةَ سَنَةٍ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়া ফওত হয়ে যাওয়ার কারণে অনুতাপ করে, সে এক বছরের পথ পরিমাণ দোযখের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

কিন্তু অনুতাপ করলে যে আযাব নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তোমাদের এ বিষয়ে পরওয়া নেই। বরং আশ্চর্য নয় যে, দুনিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তোমরা দ্বীন থেকেও বের হয়ে যাবে। দুনিয়ার আগমনে তোমরা আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে যাও। তোমাদের খবর নেই যে, হাদীসে বলা হয়েছে —

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسُرَّبِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ -

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে ভালবাসে এবং তাকে নিয়ে আনন্দ করে, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দুনিয়া হ্রাস পাওয়ার তুলনায় গোনাহের বিপদ তোমাদের কাছে হালকা মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা, তোমরা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ভয় বেশী কর এবং গোনাহের কম। হাতের এই ময়লা থেকে যা কিছু দীন-দুঃখীকে দান কর, তাও উচ্চ মর্যাদা ও অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিয়তেই দান কর। আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হলেও মানুষ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক এবং তোমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুক, এই থাকে তোমাদের কামনা। অর্থাৎ, কিয়ামতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেয় জ্ঞান করুন—এটা দুনিয়াতে মানুষের হেয় জ্ঞান করার তুলনায় তোমাদের কাছে সহজতর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজেদের দোষত্রুটি মানুষের কাছে গোপন রাখ; কিন্তু আল্লাহ যে জানেন, তার পরওয়া নেই। মানুষের কদর যেন তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে বেশী। নাউযুবিল্লাহ। যখন এতগুলো দোষ তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং এমন সব আর্বজনার সাথে তোমরা জড়িত, তখন জ্ঞানীদের সামনে কোন্ মুখে বল, তোমাদের ধন-সম্পদও আল্লাহর নেক বান্দাদের ধন-সম্পদের মত? অথচ তোমরা কোথায় এবং তারা কোথায়? তারা তো হালাল সম্পদের প্রতিও এতটুকু বিমুখ ছিলেন, যা তোমরা হারাম সম্পদের প্রতিও নও। তাদের দ্বারা সগীরা গোনাহ হয়ে গেলে তারা তাকে এতবড় মনে করতেন, যা তোমরা কবিরা গোনাহকেও কর না। যদি তোমাদের হালাল ও পবিত্র ধন-সম্পদ তাদের সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের মতও হত, তবে তা হত ভাগ্যের কথা। হায়, তোমরা যদি তোমাদের কুকর্মের কারণে এতটুকু ভীত হতে, যতটুকু তারা তাঁদের সৎকর্ম কবুল না হওয়ার ভয়ে ভীত হতেন। অথবা তোমাদের রোযা রাখা যদি তাঁদের রোযা না রাখার সমান হত! অথবা তোমাদের পরিশ্রম তাঁদের এবাদতের অলসতা ও ঘুমের সমতুল্য হত! অথবা তোমাদের সমস্ত নেকী তাদের একটি নেকীরই সমান হত! এক রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক সাহাবী বলেন ঃ সিদ্দীকগণ থেকে যে পরিমাণ দুনিয়া ফওত হয়ে যায় এবং আলাদা থাকে, সে পরিমাণে তাদের জন্যে সেটা আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন নয়, সে তাদের সঙ্গী দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়।

এখন দেখা উচিত যে, উভয়পক্ষের পার্থক্য কতটুকু। এক পক্ষ সাহাবায়ে কেরাম, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে উচ্চ মর্তবার অধিকারী এবং অপরপক্ষ তোমরা এবং তোমাদের মত লোক, যারা নিম্নতম মর্যাদার অধিকারী; কিন্তু যদি আল্লাহ পাক নিজের কৃপায় ক্ষমা ও মার্জনা করেন।

হে উদ্ধত, তোমরা বল, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণেই তোমরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে থাক, যাতে সওয়ালের প্রয়োজন না থাকে এবং আল্লাহর পথে দান করা যায়। তোমাদের চিন্তা করা উচিত, সাহাবায়ে কেরামের আমলে হালাল উপার্জন যতটুকু সহজলভ্য ছিল, বর্তমান যুগে তা আছে কি না। তাঁরা হালাল উপার্জনে যে পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন, তোমাদের দ্বারা তা সম্ভবপর কি না। আমি কোন এক সাহাবী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলতেন ঃ আমরা হালাল উপায়ের সত্তরটি পথ একারণে বর্জন করতাম যে, কোথাও হারামে লিপ্ত হয়ে না পড়ি! তোমরাও কি নিজেদের তরফ থেকে এ ধরনের সাবধানতার আশা কর? আল্লাহর কসম, তোমরা এমন সাবধানতা অবলম্বন করবে— তা আমি কখনও আশা করি না। নিশ্চিত জেনো, অনুগ্রহ ও সৎকর্মের জন্যে ধন সঞ্চয় করা শয়তানের একটি প্রতারণা। সে অনুগ্রহ ও দান-খয়রাতের বাহানায় তোমাদেরকে সন্দেহযুক্ত ও হারাম মিশ্রিত ধন উপার্জনে লাগিয়ে দিতে চায়। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দুঃসাহস করে সন্দেহযুক্ত কাজ করে, তার হারামে পড়ে যাওয়া খুব নিকটবর্তী।

হে গর্বিত, তোমাদের জানা দরকার যে, সন্দেহযুক্ত বস্তু উপার্জন করে আল্লাহর পথে দান করার তুলনায় সর্বক্ষণ সন্দেহে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করা উত্তম, যাতে আল্লাহ পাকের সামনে সম্মান ও মর্তবা উচ্চ হয়। সেমতে আলেমগণ বলেন ঃ যদি এক ব্যক্তি হালাল না হওয়ার আশংকায় এক টাকা ত্যাগ করে, তবে এটা তার জন্যে সন্দেহযুক্ত এক হাজার আশরফী দান করার তুলনায় উত্তম। তোমরা যদি নিজেদেরকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু মনে কর, যে কারণে শয়তান তোমাদেরকে ধোকা দিতে পারবে না, তবে আমি বলি, তোমরা মুত্তাকী হলেও কিয়ামতের হিসাব নিজেদের উপরে রাখা উচিত নয়। কেননা, শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ কিয়ামত দিবসে! জিজ্ঞাসাবাদকে ভয় করতেন। সেমতে জনৈক সাহাবী বলেন ঃ যদি আমি প্রত্যহ এক হাজার আশরফী হালাল উপায়ে উপার্জন করি এবং সমস্তই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেই— এতে আমার জামাতের নামাযও বিঘ্নিত না হয়, তবু এরূপ দান-খয়রাত আমি পছন্দ করি না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ নিঃস্ব থাকলে আমি কিয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে যাব। ধনীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে—হে বান্দা! বল, কোথা থেকে তুমি উপার্জন করলে? কোথায় ব্যয় করলে? অতএব দেখ, এরা ছিলেন মুত্তাকী। সে যুগে হালাল বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও হিসাবের ভয়ে তাঁরা ধন-সম্পদ বর্জন করেছেন। আর তোমরা যে যুগে আছ, সে যুগে তো হালালের অস্তিত্বই নেই। অতএব, তোমরা কি সঞ্চয় করছ? কোন কোন সাহাবী তো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদও এই ভয়ে গ্রহণ করতেন না যে, কোথাও অন্তরে পরিবর্তন ও ভ্রষ্টতা এসে না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায়। তোমরা কি নিজেদের অন্তরকে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক মুত্তাকী মনে কর? এরূপ মনে করলে তোমরা নফসে আম্মারার প্রতি খুব সুধারণা পোষণ করছ বলতে হবে। আমরা উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলছি, প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়েই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সৎকর্ম করার উদ্দেশ্যে ধন সঞ্চয় করে হিসাবের সম্মুখীন না হওয়া উচিত। হাদীসে আছে—যাকে হিসাবে জড়িত করা হবে, সে আযাবে পতিত হবে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে, যে হারাম উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং হারামেই ব্যয় করেছে। তাকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ হবে। অতঃপর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে হারাম উপায়ে উপার্জন করেছে এবং হালাল খাতে ব্যয় করেছে। তাকেও দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ হবে। এরপর তৃতীয় এক ব্যক্তিকে আনা হবে, সে হালাল উপায়েই উপার্জন করেছে এবং হালাল পথেই ব্যয় করেছে। তাকে বলা হবে ঃ থাম, সম্ভবত তুমি ধন-সম্পদের অন্বেষণে অন্য কোন ফরয কর্মে ত্রুটি করেছ। উদাহরণতঃ সঠিক সময়ে নামায আদায় করনি। অথবা রুকু, সেজদা ও উযু পূর্ণরূপে করনি। সে আরয করবে ঃ ইলাহী! আমি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছি এবং হালাল পথেই ব্যয় করেছি। তোমার ফরযসমূহের মধ্যে কোন ফরযেও ত্রুটি করিনি। বলা হবে সম্ভবত তুমি ধন-সম্পদের কারণে অহংকার করেছ অথবা যানবাহন ও পোশাকে গর্ব প্রকাশ করেছ। সে আরয করবে—ইলাহী! আমি অহংকারও করিনি এবং কোনরূপ গর্বও প্রকাশ করিনি। এরশাদ হবে—হয়তো যাদের হক তোমার উপর ফরয ছিল, তাদের কিছু হক আত্মসাৎ করেছ অথবা আত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে কিছু দান করনি। সে বলবে ঃ ইলাহী! আমি হালাল উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন করেছি, হালাল পথে ব্যয় করেছি, তোমার কোন ফরয নষ্ট করিনি, অহংকার ও গর্বও করিনি এবং কারও হক আত্মসাতও করিনি। এরপরও তাকে বলা হবে—আমি তোমাকে পানাহার ও আনন্দের যে সব সামগ্রী দান করেছিলাম, সবগুলোর শোকর পেশ কর।

মোটকথা, এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ হতে থাকবে। এখন আমি বলি ঃ এই তৃতীয় ব্যক্তি, যে হালাল পথে উপার্জন করেছে, হালাল পথে ব্যয় করেছে এবং সকল হক ও ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করেছে, তাকেই যখন এপরিমাণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন আমাদের মত লোকের কি অবস্থা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হবে, যারা দুনিয়ার ফেতনা, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি, খাহেশ ও সাজসজ্জায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি? হে হতভাগারা,এসব জিজ্ঞাসাবাদের কারণেই মুত্তাকীরা দুনিয়ার সাথে জড়িত হয় না এবং প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম সম্পাদন করে। তোমাদের উচিত, এহেন মুত্তাকীগণের অনুসরণ করা।

আর যদি একথাই মনে কর যে, তোমরা সর্বাধিক মুত্তাকী, ধন-সম্পদও হালাল পথে উপার্জন কর, ব্যয়ের মধ্যেও কারও হক তোমাদের যিম্মায় থাকে না, অন্তরে কোন বিরূপ পরিবর্তনও আসে না এবং সবকিছু আল্লাহর মরযী অনুযায়ী কর, তবে এমনটা হওয়া যদিও সম্ভব নয়, তবু তোমাদের উচিত প্রয়োজন পরিমাণ ধন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কিয়ামতের দিন ধনীদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মুক্ত থাকা এবং প্রথম কাফেলাতেই জান্নাতে প্রবেশ করার গৌরব অর্জন করা।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—ফকীর মুহাজিরগণ জান্নাতে ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে—ফকীর মুমিনগণ জান্নাতে ধনীদের পূর্বে প্রবেশ করবে। তারা খাবে এবং মজা করবে। আর ধনীরা হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ আমার দাবী তোমাদের কাছেই। তোমরা মানুষের শাসক ও বাদশাহ ছিলে। বল, আমি যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে তোমরা কি কি করেছ?

ভাইসব, এমন চেষ্টা কর, যাতে হালকা-পাতলা হয়ে পয়গম্বরগণের কাফেলায় শামিল হয়ে যাও এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে আলাদা হয়ে পেছনে পড়ে থাকাকে ভয় কর। আমি এমন রেওয়ায়েতও পেয়েছি যে, একজন সাহাবী তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইলে লোকেরা তাকে মধুর শরবত এনে দিল। তিনি যখন সেটি আস্বাদন করলেন, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিজেও কাঁদলেন এবং উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন। এরপর মুখ থেকে অশ্রু মুছে কিছু কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এই শরবতের কারণেই আপনি কাঁদছেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। কক্ষে আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন ঃ আমার কাছ থেকে সরে যা। আমি আরয করলাম ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি তো আপনার সামনে কাউকে দেখছি না। আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? তিনি বললেন ঃ এ সময় দুনিয়া আমার দিকে তার মাথা বাড়িয়ে বলল ঃ আমাকে গ্রহণ কর। আমি তাকে বললাম ঃ আমার কাছ থেকে সরে যা। সে জওয়াব দিল—হে মোহাম্মদ, যদি আপনি আমার মোহ থেকে বেঁচেও থাকেন, তবে আপনার পরবর্তী লোকেরা আমার মোহ থেকে বেঁচে থাকবে না। তাই আমি আশংকা করছি, এই শরবত পান করে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে না বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

ভাইসব, এরা ছিলেন সৎলোক। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকায় কেঁদে বুক ভাসাতেন। আর তোমরা তো নানাবিধ নেয়ামত ও কামনা-বাসনায় মগ্ন। তোমাদের উপার্জনও হারাম ও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তোমরা হাবীবে পাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় কর না। ধিক্কার তোমাদের প্রতি!

এক হাদীসে বলা হয়েছে—যদি এক ব্যক্তি আশরফীর থলি কোলে নিয়ে বণ্টন করে এবং অপর ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তবে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় যিকরকারী শ্রেষ্ঠ হবে। প্রথম সারির কোন এক তাবেঈকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অর্জন করল এবং তা দ্বারা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহায়তা করল। অপর ব্যক্তি এ থেকে অনেক দূরে সরে রইল। সে না দুনিয়া তলব করল, না পেল। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাবেঈ বললেন ঃ তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যে দুনিয়া থেকে দূরে সরে রইল, সে শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে এবং অপর ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের তফাৎ। অতএব হে হতভাগ্য, যদি তোমরা দুনিয়া ছেড়ে দাও, তবে তোমরাও দুনিয়াদারদের উপর এই মর্তবা পেয়ে যাবে।

দুনিয়া ছেড়ে দেয়ার মধ্যে দুনিয়াতেও অনেক উপকারিতা রয়েছে। এতে দেহ আরাম পায়। অধিক পরিশ্রম করতে হয় না। জীবন সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হয়। অতএব, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার পক্ষে আর কি যুক্তি থাকতে পারে? ধরে নাও, যদি ধন সঞ্চয় করার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকেও,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তবু তোমার উচিত উত্তম চরিত্রে রসূলে আকরাম (সাঃ) -এর অনুসরণ করা, যাঁর দৌলতে তোমরা হেদায়াত লাভ করেছ। তিনি যেমন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন, তোমরাও তেমনি কর। বিশ্বাস কর, দুনিয়া থেকে সরে থাকার মধ্যেই সৌভাগ্য ও সাফল্য নিহিত। অতএব, মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) -এর ঝাণ্ডা নিয়ে প্রথম দলে জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা কর।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ ঈমানদারদের নেতা সে ব্যক্তি, যে সকালের খাদ্য পেলে সন্ধ্যার পায় না, কর্জ চাইলে যাকে কেউ কর্জ দেয় না, যার ফরয অঙ্গ ঢাকার অতিরিক্ত পোশাক নেই এবং যে পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ খেতে সক্ষম নয়; কিন্তু এরপরও যে সকাল-সন্ধ্যায় নিজের পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا -

অর্থাৎ, এরাই সেই সমস্ত মহাপুরুষের সঙ্গী হয়ে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, অর্থাৎ পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মপরায়ণদের সঙ্গী হবে। সঙ্গী হিসাবে এরা খুবই চমৎকার।

ভাইসব, এই বিবৃতির পর যদি তোমরা অর্থ সঞ্চয় কর এবং সৎকর্ম করার দাবী কর, তবে তোমাদের দাবী নির্জলা মিথ্যা হবে। সত্য এই যে, তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে বিলাসিতা, প্রাচুর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে এবং গর্ব, আত্মম্ভরিতা, রিয়া, খ্যাতি এবং সম্মান অর্জন করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে যাচ্ছ। আর মুখে বলছ, সৎকর্ম সম্পাদন করার জন্যে সঞ্চয় করছ। আল্লাহকে ধ্যান কর এবং মিথ্যা দাবীর জন্যে লজ্জিত হও। যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদের মহব্বত তোমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে থাকে, তবে এটা মুখে স্বীকার কর। ধন সঞ্চয়ের সময় নিজেদেরকে হেয় মনে কর এবং নিজেদের ভুল স্বীকার কর। এছাড়া হাশরের দিনের হিসাবকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্যে মুক্তির কারণ হতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষে অনর্থক প্রমাণাদি খোঁজ করে লাভ কি?

ভাইসব, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় হালাল বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সর্বাধিক মুত্তাকী, খোদাভীরু ও সংসারবিমুখ ছিলেন। আজকাল হালাল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপায় বিলুপ্ত। এমনকি, রোযকার খাদ্য এবং জরুরী অঙ্গ আবৃত করার বস্তুও হালাল উপায়ে সহজলভ্য নয়। সুতরাং এমন যুগে অর্থ সঞ্চয় করা থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

এছাড়া আমাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মত তাকওয়া, পরহেযগারী, সংসারবিমুখতা ও সাবধানতা কোথায় এবং তাদের অন্তর ও নিয়তের মত অন্তর ও নিয়ত কোথায়? আল্লাহর কসম, আমাদের অন্তর নফসের বিপদাপদে তার কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ। অতিসত্বর আমাদেরকে কিয়ামতে যেতে হবে; বড় ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে সেদিন হালকা-পাতলা থাকবে। আর যারা বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক— হারাম ও হালাল একত্রে ভক্ষণকারী, সেদিন তাদের অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আমি উপদেশ স্বরূপ তোমাদেরকে এসব কথা বলে দিলাম। এখন গ্রহণ করা তোমাদের কাজ। তবে যারা গ্রহণ করবে—এমন লোকের সংখ্যা খুবই বিরল। আল্লাহ পাক বিশেষ রহমতে আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

এ পর্যন্ত হারেছ মুহাসেবী (রহঃ)-এর উক্তি সমাপ্ত হল। এ থেকে প্রাচুর্যের উপর দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুন্দর প্রতীয়মান হল। এতটুকুই যথেষ্ট। তবে এরই সমর্থক আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তা এই ঃ একবার ছা'লাবা ইবনে হাতেব আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে ছা'লাবা, অল্প ধন-সম্পদ, যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে, অনেক ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তম যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে না। ছা'লাবা আরয করলেন ঃ আপনি দোয়া করুন, যাতে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হই। এরশাদ হল ঃ ছা'লাবা, তুমি কি আমার অনুসরণ কর না? আল্লাহর কসম, যদি আমি ইচ্ছা করি যে, পাহাড় সোনা-রূপায় রূপান্তরিত হয়ে আমার সাথে সাথে চলুক, তবে তা সম্ভব। ছা'লাবা আবার আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন। যদি আপনার দোয়ায় আমি ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হই, তবে আমি সকল হকদারের হকও আদায় করব, তদুপরি এটা করব, ওটা করব। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ ইলাহী! ছা'লাবাকে ধন-সম্পদ দান কর। এরপর থেকে ছা'লাবার অল্প সংখ্যক ছাগল পিঁপড়ার ন্যায় বেড়ে যেতে লাগল। এমনকি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার পক্ষে মদীনায় থাকা সম্ভব হল না। তিনি ছাগপালসহ মাঠে-ময়দানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। কেবল যোহর ও আসরের জামাতে হাযির হতেন এবং অন্যান্য জামাত ছেড়ে দিতেন। এরপর ছাগলের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। ফলে, সেই জঙ্গলে থাকাও আর সম্ভব হল না। তিনি আরও দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন এবং কেবল জুমআর নামাযের জন্যে মদীনায় আসতেন।

এদিকে ছাগলের সংখ্যা পিঁপড়ার মত অনবরত বেড়েই চলল। অবশেষে তিনি জুমআর নামাযও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। জুমআর দিন পথিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংবাদ জিজ্ঞেস করে নিতেন। এ দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামের কাছে ছা'লাবার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তারা ছাগলের প্রাচুর্য, ছা'লাবার মদীনা ত্যাগ এবং ক্রমান্বয়ে জামাত বর্জন করার বৃত্তান্ত শুনালেন। সব কথা শুনে তিনি তিনবার বললেন ঃ وَيْحُ ثَعْلَبَةَ —ছা'লাবার দুর্ভোগ!

এ সময়েই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

অর্থাৎ, আপনি মুসলমানদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পাকসাফ করে দেবে এবং তাদেরকে দোয়া দিন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা।

এতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জুহায়না গোত্রের কাছ থেকে এবং এক ব্যক্তিকে সুলায়ম গোত্রের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে নিযুক্ত করলেন। তিনি যাকাত সম্পর্কিত ফরমান লিখে তাদের কাছে দিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা মদীনার বাইরে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় কর। ছা'লাবা ইবনে হাতেব এবং বনী সুলায়মের অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে যাকাত আদায় করবে।

সেমতে উভয় আদায়কারী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে ছা'লাবার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছে গেল এবং তার ধন-সম্পদের যাকাত চাইল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমানও ছা'লাবার সামনে পেশ করল। তিনি বললেন ঃ এটা তো জরিমানা! ভাই এটা জরিমানা! তোমরা যাও, অন্য জায়গার কাজ শেষ করে আমার কাছে এসো। সেমতে তারা উভয়েই সুলায়ম গোত্রের লোকটির কাছে গেল এবং যাকাত চাইল। সে শুনামাত্রই উঠে গেল এবং তার উটগুলোর মধ্য থেকে বেছে বেছে সর্বোত্তম উট যাকাতের জন্যে আলাদা করল। এরপর তাদের সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এগুলো যাকাতের উট। উট দেখে আদায়কারীরা বলল ঃ সর্বোৎকৃষ্ট উট যাকাতে দেয়া তোমার উপর ফরয নয়। আমরা এগুলো নেব না। লোকটি আরয করল ঃ আপনারা এগুলোই নিন। আমি মনের খুশীতে দিচ্ছি এবং এজন্যেই এখানে উপস্থিত করেছি।

মোটকথা, তারা সব জায়গা থেকে যাকাত আদায় করে পুনরায় ছা'লাবার কাছে এসে যাকাত চাইল। ছা'লাবা বলল ঃ তোমরা আমাকে লিখিত আদেশ দেখাও। আদেশ দেখার পর সে আবার বলল ঃ এটা তো জরিমানা! ভাই এটা জরিমানা! তোমরা এখন যাও। আমি চিন্তা করে দেখি।

অতঃপর আদায়কারীদ্বয় মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদের কথা বলার আগেই বললেন ঃ ছা'লাবার দুর্ভোগ! তিনি সুলায়ম গোত্রের লোকটির জন্যে নেক দোয়া করলেন। অতঃপর তারা উভয়েই বর্ণনা করল যে, ছা'লাবা এমন করেছে এবং বনী সুলায়মের লোকটি এই ব্যবহার করেছে। তখনই ছা'লাবা সম্পর্কে কোরআন পাকের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ
يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

অর্থাৎ, "তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই দান করব এবং সৎকর্মপরায়ণদের দলভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা করল এবং অঙ্গীকারের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তারা যে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করল, একারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে কপটতা স্থাপন করে দিলেন সে দিন পর্যন্ত যেদিন তারা আল্লাহর সাথে দেখা করবে।"

তখন মজলিসে ছা'লাবার এক আত্মীয় উপস্থিত ছিল। সে আয়াতটি শুনল এবং ছা'লাবার কাছে গিয়ে বলল ঃ তোমার মা মরুক, আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ নাযিল করেছেন। ছা'লাবার চৈতন্য ফিরে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি যাকাত দিচ্ছি। আপনি গ্রহণ করুন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আল্লাহ পাক আমাকে বারণ করেছেন। এ কথা শুনে ছা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন করেছিলে, তেমনি ফল পেয়েছ। আমি যা বলেছিলাম, তা তুমি মানলে না। তিনি যখন দেখলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার যাকাত কবুল করবেনই না, তখন বাড়ীতে ফিরে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকরের খেদমতে যাকাত উপস্থিত করা হলে তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমরের খেদমতে পেশ করা হলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর ছা'লাবা মৃত্যুমুখে পতিত হল।

অতএব, উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা উচিত যে, ধন-সম্পদের ঔদ্ধত্য ও দুর্ভাগ্য কতটুকু। দারিদ্র্যে বরকত এবং প্রাচুর্যে অমঙ্গল নিহিত বিধায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্যে এবং পরিবারবর্গের জন্যে দারিদ্র্যকে পছন্দ করেছেন। এমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মর্যাদাশালী মনে করতেন। একবার তিনি আমাকে বললেন— হে এমরান, তুমি আমার কাছে মর্যদাশালী ব্যক্তি। আমার আদরের দুলালী ফাতেমা অসুস্থ। তাকে দেখার জন্যে ইচ্ছা হলে তুমি আমার সাথে চল। আমি আরয করলাম ঃ খুব ভাল। অতঃপর আমরা উভয়েই হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফাতেমার ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি ভেতরে আসব? হযরত ফাতেমা জওয়াব দিলেন ঃ আসুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি এবং আমার সঙ্গী উভয়েই আসব? প্রশ্ন হল ঃ আপনার সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ এমরান ইবনে হুসায়ন। হযরত ফাতেমা আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে একটি "আবা" (আরবদেশীয় পরিচ্ছদ বিশেষ) ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতে ইশারা করে বললেন ঃ সেটি এভাবে শরীরে জড়িয়ে নাও। তিনি আরয করলেন ঃ শরীর তো ঢেকে নিয়েছি। এখন মাথা কেমন করে ঢাকব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পুরনো চাদরটি তাঁর কাছে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এর দ্বারা মাথা ঢেকে নাও। এরপর হযরত ফাতেমা আমাদেরকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্দরে গিয়ে বললেন ঃ হে কলিজার টকুরা, আসসালামু আলাইকুম, আজ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি আরয করলেন। আমার ব্যথা আছে। এই ব্যথার সাথে আরেকটি ব্যথা যোগ হয়েছে যে, আজ আমার কাছে খাওয়ার কিছুই নেই। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে কলিজার টকুরা, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম, আমি তিন দিন ধরে কিছুই খাইনি। আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে আমার মর্তবা বেশী। আমি আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি আমাকে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমার কাঁধে হাত মেরে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ। তুমি জান্নাতী মহিলাদের সরদার। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ তাহলে ফেরাউন-পত্নী আছিয়া, এমরান-তনয়া মরিয়ম ও খুয়ায়লিদ-তনয়া খাদীজা কোথায় থাকবেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা নিজ নিজ যুগের মহিলাদের সরদার ছিলেন। আর তুমি তোমার যুগের মহিলাদের সরদার। তোমরা সবাই পুষ্পরাগ-নির্মিত ও চুনি-পান্না খচিত ঘরে বসবাস করবে। তাতে কোন প্রকার কষ্ট ও শোরগোল থাকবে না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। আমি এমন ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি, যে দুনিয়াতে সরদার এবং আখেরাতেও সরদার হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখন লক্ষ্য করা উচিত, হযরত ফাতেমা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হয়েও কেমন দরিদ্র জীবন যাপন করেছেন এবং কিভাবে ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন। যে কেউ পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থা ও তাদের বাণীসমূহ অনুধাবন করবে, সে-ই নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, ধন-সম্পদ না থাকা থাকার তুলনায় উত্তম তা যদিও দান-খয়রাতেই ব্যয়িত হয়। কেননা, হক আদায় করা, কামনা-বাসনা থেকে বেঁচে থাকা এবং দান-খয়রাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও ধন-সম্পদের নিম্নতম অনিষ্ট এই যে, নিয়ত তারই সংশোধনে সদা ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহর যিকর হয় না। কারণ, মন ও মস্তিষ্ক খালি থাকলেই যিকর হতে পারে। ধন-সম্পদের ব্যস্ততায় মন খালি থাকে না।

জরীর (রহঃ) হযরত লায়ছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে রওয়ানা হল। তিনি তাকে সঙ্গে নিলেন এবং নদীর তীরে পৌঁছে নাশতা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তিনটি রুটি। দুটি খেলেন এবং একটি বাকী রইল। হযরত ঈসা (আঃ) অতঃপর নদীতে গিয়ে পানি পান করে ফিরে এলেন। এসে দেখেন বাকী রুটিটি নেই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রুটি কে নিল? সে আরয করল ঃ আমি জানি না। অতঃপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথে একটি হরিণী পাওয়া গেল। তার সঙ্গে ছিল দুটি বাচ্চা। তিনি একটিকে ডাকলে সে কাছে এল। তিনি বাচ্চাটিকে যবাহ করে ভাজা করলেন এবং উভয়ে মিলে খেলেন। এরপর বাচ্চার অবশিষ্টাংশকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও। বাচ্চাটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে জঙ্গলে চলে গেল। অতঃপর ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি তোমাকে এই মোজেযা দেখিয়েছেন। বল, রুটি কে নিয়েছে? সে জওয়াব দিল ঃ আমি জানি না। এরপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঝরনার কাছে পৌঁছলেন। তিনি তার হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে অপর পারে চলে গেলেন। অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ তোমাকে এই মোজেযা প্রদর্শনকারী আল্লাহর কসম, বল, রুটি কে খেয়েছে? সে পূর্ববৎ আরয করল ঃ আমি জানি না। এরপর তারা এক জঙ্গলে গেলেন। সেখানে বসে হযরত ঈসা (আঃ) মাটি ও বালু একত্রিত করতে লাগলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতঃপর একটি স্তূপ তৈরি করে বললেন ঃ আল্লাহর আদেশে স্বর্ণ হয়ে যা। স্তূপটি অমনি স্বর্ণ হয়ে গেল। তিনি সেটিকে তিন ভাগ করলেন এবং বললেন ঃ এক ভাগ আমার, একভাগ তোমার এবং এক ভাগ সেই ব্যক্তির, যে রুটি খেয়েছে। একথা শুনতেই লোকটি বলে উঠল ঃ রুটি আমি খেয়েছি। তিনি বললেন ঃ এগুলো সব তুমিই রাখ। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ গন্তব্য পথে চলে গেলেন। লোকটি স্বর্ণের স্তূপ নিয়ে জঙ্গলে রয়ে গেল। এমন সময় দু'ব্যক্তি তার কাছে এল এবং তাকে হত্যা করে স্বর্ণস্তূপ নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল ঃ মিছামিছি ঝগড়া করার প্রয়োজন কি? এটি আমরা সমান অংশে ভাগ করে নেব। আগে এক ব্যক্তি গ্রামে গিয়ে আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসুক। সেমতে তাদের একজন খাবার আনতে চলে গেল। পথিমধ্যে সে মনে মনে চিন্তা করল ঃ যদি খাবারে বিষ মিশ্রিত করে দেই, তবে দু'জনই মারা যাবে এবং গোটা স্বর্ণস্তূপটি আমিই পেয়ে যাব। সেমতে সে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিল। এদিকে দু'ব্যক্তি পরামর্শ করল যে, যদি তৃতীয় ব্যক্তি মারা যায়, তবে স্বর্ণস্তূপ আধা-আধি আমাদের ভাগে পড়বে। কাজেই সে খাবার নিয়ে আসতেই তাকে মেরে ফেলা উচিত। সেমতে যখন তৃতীয় ব্যক্তি খাবার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, তখন উভয়ে মিলে তাকে হত্যা করল এবং তার আনীত সব খাবার খেয়ে ফেলল। আর যায় কোথায়? বিষক্রিয়ার ফলে তারাও সেখানে মরে পড়ে রইল। স্বর্ণস্তূপ যেমন ছিল, তেমনি জঙ্গলে পড়ে রইল। তার আশে-পাশে ছিল তিন ব্যক্তির মৃতদেহ। এমনি অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) ফেরার পথে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ এ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা। তোমরা এই দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক।

বর্ণিত আছে, হযরত যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করেন। তাদের কাছে দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী যেমন অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি বলতে কিছুই ছিল না। তারা কবর খনন করে রেখেছিল। সকালে এসব কবর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখত এবং এগুলোর কাছে নামায পড়ত। জীবিকাস্বরূপ তারা জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় শাক চরে খেত। আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রকার শাক তাদের জন্যে সেখানে বিদ্যমান ছিল। হযরত যুলকারনাইন এই মর্মে তাদের সরদারের কাছে দূত পাঠালেন যে, বাদশাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যুলকারনাইন তোমাদেরকে তলব করেছেন। দূত এই বার্তা পৌঁছে দিলে সরদার বলল ঃ আমার কোন প্রয়োজন নেই। যদি তার কোন মতলব থাকে, তবে আমার কাছে আসতে বল। হযরত যুলকারনাইন এই জওয়াব অবগত হয়ে বললেন ঃ বাস্তবে সে ঠিকই বলেছে। সেমতে তিনি স্বয়ং সরদারের কাছে গিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি যেতে অস্বীকার করায় আমি নিজেই এসেছি। সরদার বলল ঃ আমার কোন প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই যেতাম। যুলকারনাইন বললেন ঃ আমি তোমাদের যে অবস্থা দেখছি, তেমনি আজ পর্যন্ত কারও দেখিনি। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাদের কাছে নেই কেন? তোমরা সোনা-রূপা উৎপন্ন কর না কেন? এতে তো তোমাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসত। সরদার উত্তর দিল ঃ আমরা সোনা রূপাকে অশুভ বস্তু মনে করি। কারণ, এগুলো যে-ই পায়, তার মন আরও উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়ার নেশায় মেতে উঠে। যুলকারনাইন বললেন ঃ তাহলে তোমরা কবর খনন করে রেখেছ কেন? সে বলল ঃ এর উদ্দেশ্য, যদি দুনিয়ার লোভ-লালসা আমাদেরকে পেয়েই বসে, তবে কবরগুলো দেখে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারব এবং দীর্ঘ আশা আমাদের মন থেকে মুছে যাবে। হযরত যুলকারনাইন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বল, তোমরা শাক খাও কেন? পশুপালন করে সেগুলোর দুধ, মাংস ইত্যাদি খাও না কেন? সরদার বলল ঃ আমরা আমাদের উদরকে পশুদের কবর বানাতে চাই না। মাটিতে উৎপন্ন শাক দিয়েই প্রয়োজন মিটে যায়। জীবন ধারণের জন্যে সামান্যতম বস্তুই যথেষ্ট। এরপর সে হাত বাড়িয়ে যুলকারনাইনের পিছন থেকে একটি খুলি তুলে নিল এবং জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি জানেন এটা কার খুলি? যুলকারনাইন বললেন ঃ আমি কেমন করে জানব? সে বলল ঃ সে ছিল পৃথিবীর একজন সম্রাট। আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথিবীর রাজত্ব দান করেছিলেন; কিন্তু তাকে সীমালজ্ঘন ও মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচার করতে দেখে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিলেন। এখন সে একটি ঢিলের মত গড়ে রয়েছে। তার সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহ জানেন। কিয়ামতের দিন সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। এরপর আরও একটি প্রাচীন খুলি তুলে নিয়ে সরদার বলল ঃ এটা কার জানেন? যুলকারনাইন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ না। সে বলল ঃ এটা আরেক সম্রাটের খুলি, যে তার পরবর্তী কালে ছিল। সে পূর্বসূরীর অত্যাচার-অবিচারের কথা জানত। সে মানুষের প্রতি বিনয় ও ন্যায় বিচার করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার আমলও গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন সে তার সওয়াব পাবে।

অতঃপর সরদার যুলকারনাইনের মস্তকের দিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে যুলকারনাইন, এই খুলিটিও পূর্বোক্ত উভয় খুলির মত হয়ে যাবে। অতএব, আপনি চিন্তাভাবনা করে কাজ করুন। হযরত যুলকারনাইন বললেন ঃ হে সরদার, যদি তুমি আমার সাথে চল, তবে আমি তোমাকে আমার উত্তরসূরী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সাম্রাজ্যের অংশীদার করব। সরদার আরয করল ঃ আমার এবং আপনার এক জায়গায় একত্রে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, আপনার কাছে অগাধ ধনৈশ্বর্য ও বিপুল বিলাস-বৈভব থাকার কারণে জনসাধারণ আপনার শত্রু। অপরপক্ষে সকল মানুষ আমার মিত্র। কেননা, শত্রুতার কারণ হচ্ছে দুনিয়া। আমি দুনিয়াকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। একথা শুনে যুলকারনাইন তার কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি সরদারের কথাবার্তাকে চরম বিস্ময়, শিক্ষা ও উপদেশ মনে করতেন।

উপরোক্ত কাহিনী থেকেও প্রাচুর্যের ক্ষতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ঃ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ঃ

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল ঃ
হুজ্জাতুল ইসলাম
ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা
সহযোগিতায় ঃ মাওলানা আবদুল আজীজ (রহঃ)

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন—পঞ্চম খণ্ড
মূল ঃ ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১৫ হিজরী
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২০ হিজরী
আষাঢ় ঃ ১৪০৬ বাংলা
জুলাই ঃ ১৯৯৯ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
অরণি কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা— ১১০০

হাদিয়া ১২০ টাকা মাত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালীর (রহঃ) (৪৫০ হিঃ— ৫০৫ হিঃ) রচিত অমর গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর পঞ্চম তথা শেষ খণ্ডের অনুবাদ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হল। প্রায় নয়শ' বছর আগে এ মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে সমভাবে পঠিত ও সমাদৃত। মানব রচিত দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হওয়ার নযীর আছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রহঃ) মহান আল্লাহর নিকট কতটুকু মকবুলিয়ত অর্জন করেছিলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোই তা প্রমাণ করে। এ মহান সাধক সম্পর্কে অনেক মনীষীরই মন্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি আশ্চর্য মু'জেযাবিশেষ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের উম্মত যাতে গোমরাহ না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন যেসব লোক সৃষ্টি করবেন বলে হাদীস শরীফে সুসংবাদ রয়েছে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন তারই অন্যতম বাস্তব নমুনা।

'এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন' অর্থ, ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের নবজীবন দান। কিতাবখানি তার নামের কতটুকু সার্থকতা দান করেছে, সেকথা ব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন করে না।

'এহইয়ার' অনেকগুলো ব্যাখ্যা-গ্রন্থ এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ, টীকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোক অবশ্য এ মহান গ্রন্থের সমালোচনাও করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ইমাম সাহেব এ গ্রন্থে যে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো কোন্ কিতাব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা যেমন লিখেননি, তেমনি কোন সনদ বা বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করেননি। ফলে, হাদীসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাঁর প্রকাশভঙ্গি ওয়ায়েয সুলভ তাঁর আগে কেউ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ধারা অবলম্বন করেননি। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকটা গাম্ভীর্য হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গাযযালী (রহঃ) নিজেই ছিলেন একজন স্বীকৃত ইমাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সনদসূত্র ছিল। তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আল্লামা জোয়াইনী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সে সূত্রটি ছিল এতই প্রসিদ্ধ যে, প্রতিটি হাদীসের সাথে সে বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) যে অনন্য রীতিটি অবলম্বন করেছেন এটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। পূর্ববর্তী রচনাশৈলীর সাথে এর মিল না থাকাটা বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত নয় কোনক্রমেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম গায্‌যালীর (রহঃ) এ পুস্তক পৃথিবীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটিরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদ দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। বাংলা ভাষায় এহইয়ার অনুবাদ ইতিপূর্বে হয়েছে। তারপরও আমি কেন পুনরায় এ মহান গ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিলাম, সে কৈফিয়ত দিতে চাই না। বিজ্ঞ পাঠকগণই তা অনুভব করতে পারবেন। তাছাড়া, মুসলিম জনগণের নিত্যপাঠ্য এ মহান গ্রন্থটির প্রচার-প্রসার যত বেশী হয়, ততই সেটা কল্যাণকর বলে আমার ধারণা।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারও পাঠকগণই করবেন।

আল্লাহর রহমতে গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সমাপ্ত হলো।

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত কারণে আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করতে পারি না। তাছাড়া আমার শক্তিও নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুবাদ বা মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজ্ঞজনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে দরদের সাথে জানিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। এতদসঙ্গে সকলের দোয়া চাই, আল্লাহ পাক যেন এ ধরনের কাজ আরো অধিক পরিমাণে করার তাওফীক দান করেন।

বিনীত

রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিঃ

মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়	
তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল	৯
ভূমিকা ঃ তাওয়াক্কুলের ফযীলত	৯
তাওহীদের মাহাত্ম্য	১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তাওয়াক্কুলের ক্রিয়াকর্ম	২২
তাওয়াক্কুল ও মাসায়েল	২৬
তাওয়াক্কুলকারীদের ক্রিয়াকর্ম	২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মহব্বত	৭১
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মহব্বতের আলোচনা	৭১
আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত	৭১
মহব্বতের স্বরূপ ও কারণাদি	৭৬
মহব্বতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহর সত্তা	৮১
খোদায়ী মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার উপায়	৮৬
মহব্বত ও মারেফতে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা	৮৯
আল্লাহর মা'রেফতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি	৯১
শওক তথা আগ্রহের স্বরূপ	৯২
বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত	৯৮
আল্লাহর প্রতি অনুরাগের অর্থ	১১৩
অনুরাগের প্রাবল্য	১১৪
আল্লাহর কাছে দোয়া রিয়ার পরিপন্থী নয়	১২৫
গোনাহের কেন্দ্র থেকে পলায়ন	১২৯
আশেকগণের কাহিনী	১৩২
সপ্তম অধ্যায়	
নিয়ত, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা	১৪০

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তের ফযীলত	১৪০
নিয়তের স্বরূপ	১৪৪
নিয়ত আমলের চেয়ে উত্তম	১৪৫
নিয়ত সম্পর্কিত আমলের বিবরণ	১৪৭
নিয়ত ইচ্ছাধীন নয়	১৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
এখলাসের ফযীলত	১৫৪
এখলাস সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি	১৬২
যে যে বিষয় এখলাসকে কলুষিত করে	১৬৪
মিশ্র আমলের ছওয়াব	১৬৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সিদকের ফযীলত	১৬৯
সিদকের স্বরূপ	১৭১
অষ্টম অধ্যায়	
মুরাকাবা ও মুহাসাবা (ধ্যানমগ্নতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ)	১৭৯
নফসের প্রতি শর্ত আরোপ করা	১৮১
মুরাকাবার ফযীলত	১৮৪
মুরাকাবার স্বরূপ ও স্তর	১৮৬
মুহাসাবার ফযীলত	১৯০
আমলের পর আত্ম-বিশ্লেষণ	১৯২
ত্রুটির পর নফসের শাসন	১৯৩
মোজাহাদা	১৯৬
নবম অধ্যায়	
ফিকর ও ইবরত (চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষা)	২১২
চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ ও ফলাফল	২১৫
ফিকরের পথ	২১৭
দশম অধ্যায়	
মৃত্যু ও মৃত্যুর পর	২৪৪
মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা	২৪৪

www.islamfind.wordpress.com

মৃত্যুকে স্মরণ করার ফযীলত	২৪৬
আশা খাটো করা	২৫০
আশার কারণ ও প্রতিকার	২৫৩
আশার ক্ষেত্রে মানুষের স্তরভেদ	২৫৫
মৃত্যু ও সে সময়কার মোস্তাহাব আমল	২৫৯
রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত	২৬৯
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত	২৮৩
হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাত	২৮৫
হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর ওফাত	২৮৯
হযরত আলী (রাঃ)-এর ওফাত	২৯১
জীবন সায়াহ্নে খলীফা ও আমীরগণের উক্তি	২৯১
জানাযা ও কবরস্তানে সাধকগণের উক্তি	২৯৭
জানাযায় অংশগ্রহণের শিষ্টাচার	২৯৯
কবরের অবস্থা সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি	৩০০
সন্তান-সন্ততির ওফাত সম্পর্কে কথিত উক্তি	৩০৩
কবর যিয়ারত	৩০৫
মৃত্যুর স্বরূপ	৩০৮
কবরের অবস্থা	৩১৩
কবরের আযাব ও মনকির-নকীরের সওয়াল	৩১৪
হাশরের ময়দান	৩২৪
কিয়ামত দিবসের বড়ত্ব	৩২৬
সওয়াল প্রসঙ্গ	৩২৮
দাঁড়ি-পাল্লা	৩৩০
পারস্পরিক হক দেওয়ানোর কথা	৩৩২
শাফায়াত	৩৩৫
হাউযে কাওছার	৩৪০
দোযখ ও তার ভয়ানক অবস্থা	৩৪১
জান্নাত ও তার অপার সুখ	৩৪৫
আল্লাহ তা'আলার রহমত	৩৫১

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পঞ্চম অধ্যায়

তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল ধর্মের মনযিলসমূহের মধ্যে একটি মনযিল এবং বিশ্বাসের মকামসমূহের মধ্যে অন্যতম মকাম। এটি জানার দিক দিয়ে যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আমলের দিক দিয়েও তেমনি কঠিন। জানার দিক দিয়ে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণ, উপায়-উপকরণ ও কারণাদির উপর ভরসা করা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকের নামান্তর। আবার এগুলো থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও শরীয়তের উপর আপত্তি উঠে। সুতরাং কারণাদির প্রতি দৃষ্টি না দেয়া এবং এগুলোর উপর ভরসাও করা— এ বিষয়টি দুর্বোধ্য। তাই তাওয়াক্কুলের অর্থ এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, যা তাওহীদেরও অনুকূল এবং বিবেক ও শরীয়তের সাথেও সামঞ্জস্যশীল হয়, নেহায়েত কঠিন ও সূক্ষ্ম ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে যে সকল আলেমের দৃষ্টিতে বস্তুনিচয়ের স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাঁদের ছাড়া এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার সাধ্য কারও নেই। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণ দেখে জেনে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দ্বারা যেভাবে বর্ণনা করিয়েছেন, তাঁরা সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আমরা এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখানে একটি ভূমিকা ও দু'টি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করব। ভূমিকায় তাওয়াক্কুলের ফযীলত এবং প্রথম পরিচ্ছেদে তাওহীদ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

তাওয়াক্কুলের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

অর্থাৎ, ভরসাকারীদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।

সুতরাং সেই মকামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়, সেখানে পৌঁছলে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হন এবং যাকে তিনি ভালবাসেন, সে অত্যন্ত সফলকাম। কেননা, যাকে ভালবাসা হয়, তার আযাব হবে না এবং সে দূরে ও অন্তরালে থাকবে না। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?

এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যথেষ্ট মনে করবে, সে তাওয়াক্কুল বর্জনকারী হবে। আরও এরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ, তিনি এমন শক্তিধর যে, কেউ তাঁর আশ্রয়ে এলে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করেন না। আর তিনি এমন কৌশলী যে, কেউ তাঁর কৌশলের উপর ভরসা করলে তিনি তাকে নিরাশ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের এবাদত কর, তারা তোমাদের মতই বান্দা।

এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত সবাই তোমাদের মত অভাবগ্রস্ত। অতএব, তাদের উপর কেমন করে ভরসা করা যায়? আরও এরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের রুযীর মালিক নয়। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে রুযী অন্বেষণ কর এবং তাঁর এবাদত কর। অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই; কিন্তু কপট বিশ্বাসীরা তা বুঝে না।

এসব আয়াত ছাড়াও কোরআন মজীদে তাওহীদ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতসমূহে একথাই বলা হয়েছে যে, অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

হাদীস গ্রন্থসমূহেও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে হজ্জের মওসুমে উম্মতসমূহ দেখানো হয়েছে। আমি আমার উম্মতকে দেখেছি, তাদের দ্বারা সকল পাহাড় -পর্বত, উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকেনি। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হল ঃ তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। অতঃপর বলা হল ঃ এদের সাথে আরও সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ যারা অঙ্গে দাগ দেয় না, ভাবী শুভাশুভ বিশ্বাস করে না এবং নিজের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। একথা শুনে ওকাশা ইবনে মুহসিন দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ আমার জন্যেও দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ এ দোয়ায় ওকাশা অগ্রগামী হয়ে গেছে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে— যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থ ভরসা কর, তবে আল্লাহ পাখিদের মত তোমাদেরকেও রিযিক দেবেন। পাখিরা ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নীড় ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من انقطع الى الله عز وجل كفاه الله تعالى كلى مؤنة ويرزقه من حيث لايحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে যাবতীয় পরিশ্রম থেকে রক্ষা করেন এবং ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার হাতেই ছেড়ে দেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি সবার চাইতে অধিক বিত্তবান হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত নিজের সামনের বস্তুর তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী বস্তুর উপর অধিক ভরসা করা। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবারের লোকজন যখন উপবাসের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তিনি আরও বলতেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার আমাকে এ নির্দেশই করেছেন। সেমতে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ, আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দিন এবং আপনি তাতে অটল থাকুন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— যে তাবীযগণ্ডা করায়, সে তাওয়াক্কুল করে না। অর্থাৎ, কোরআন মজীদ ও শরীয়তের সাধারণ নীতি অনুযায়ী তাবীযগণ্ডা করানো যদিও জায়েয; কিন্তু এদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করা তাওয়াক্কুলের দাবী।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। একথা বলার কারণ এই যে, তাঁকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য ধরা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

অর্থাৎ, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী।

এ উক্তি বাস্তবায়িত করার জন্যেই তিনি জিবরাঈলকে একথা বলেছিলেন। তাঁর এই কথা রক্ষা করার প্রতি ইঙ্গিত করেই কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى

অর্থাৎ, সেই ইবরাহীম, যে তার কথা রক্ষা করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, হে দাউদ! যে ব্যক্তি কেবল আমার মযবুত রশি ধারণ করবে, মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না, তার সাথে নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই প্রবঞ্চনা করলেও আমি তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেব।

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি এই যে, একবার হযরত ইবরাহীম খাওয়াস এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ -

অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা কর, যিনি চিরজীবী— কখনও মৃত্যুবরণ করেন না।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ এ আয়াতের পর আল্লাহ ছাড়া আর কারো

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছে ভিক্ষা চাওয়া বান্দার উচিত নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ মানবের পক্ষে নিন্দনীয় রিযিকের অন্বেষণে নিজের ফরয কর্ম থেকে গাফেল হয়ে পড়া এবং পরকালের অধঃপতন ডেকে আনা উচিত নয়। সে দুনিয়াতে রিযিক ততটুকুই পাবে, যতটুকু লিখা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যখন মানুষের কাছে অন্বেষণ ছাড়াই রিযিক আসে, তখন বুঝা যায়, রিযিকের প্রতিও মানুষ খুঁজে নেয়ার নির্দেশ রয়েছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ আমি জনৈক দুনিয়াত্যাগী দরবেশকে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি কোথা থেকে রিযিক খাও? সে বলল ঃ এটা আমার জানার বিষয় নয়। পরওয়ারদেগারকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কোথা থেকে আমাকে খাওয়ান? হরম ইবনে হাব্বান হযরত ওয়ায়েস করনীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন। হরম প্রশ্ন করলেন ঃ জীবিকা কিভাবে চলে? তিনি বললেন ঃ সে সব অন্তরের জন্যে পরিতাপ, যাতে সন্দেহ মিশ্রিত রয়েছে। উপদেশে তাদের কি উপকার হবে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাওহীদের মাহাত্ম্য

জানা থাকা দরকার যে, ঈমানের প্রকারসমূহের মধ্যে তাওয়াক্কুলও একটি। এর মূল হচ্ছে এলম তথা জ্ঞান। এর ফলাফল হচ্ছে, আমল তথা কর্ম। এরপর তাওয়াক্কুল শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে এর হাল বা অবস্থা। এখানে আমরা তাওয়াক্কুলের মূল জ্ঞান সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব। মূল অভিধানে এটাই ঈমান। কেননা, ঈমানের অর্থ তাসদীক তথা সত্যায়ন করা। যে সত্যায়ন অন্তরের অন্তস্তল থেকে হয়, তাই জ্ঞান। ঈমানের প্রকার অনেক। কিন্তু আমরা সে সব প্রকার বর্ণনা করব, যেগুলোর উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তাওহীদ, যা পবিত্র এই কলেমা থেকে বুঝা যায়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করা, যা لَهُ الْمُلْكُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্য তাঁরই। তৃতীয় প্রকার আল্লাহর দানশীলতা ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করা, যা لَهُ الْحَمْدُ বাক্য থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, তার ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়, যা তাওয়াক্কুলের মূলভিত্তি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলা বাহুল্য, তাওহীদের চারটি স্তর রয়েছে— এক, সারাংশ, দুই, সারাংশের সারাংশ, তিন, বাকল এবং চার, বাকলের উপরকার বাকল। অজ্ঞ লোকদেরকে বুঝাবার জন্যে আমরা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। তাওহীদকে একটি আখরোটের উপরকার বাকল মনে করা উচিত। আখরোটের উপরিভাগে উপর-নিচে দু'টি বাকল থাকে, একটি সারাংশ থাকে এবং সারাংশে থাকে তৈল। সুতরাং তাওহীদের প্রথম স্তর হচ্ছে আখরোটের উপরকার বাকল। তা হচ্ছে শুধু মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করা, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে গাফেল থাকা কিংবা মনে মনে তা অস্বীকার করা—এটা হচ্ছে মুনাফিক তথা কপট বিশ্বাসীদের তাওহীদ। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মুখে কলেমা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা। এটা হচ্ছে সাধারণ জনগণের তাওহীদ। তৃতীয় স্তর হচ্ছে সত্যের নূরের মাধ্যমে কলেমার অর্থ স্বর্গীয় প্রেরণায় প্রকটিত হওয়া এবং তা প্রত্যক্ষ করা। এটা নৈকট্যশীলদের তাওহীদ। চতুর্থ স্তর এই যে, অস্তিত্ব জগতে এক ও অভিন্ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু না দেখা। এটা সিদ্দীকগণের তাওহীদ। সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় এর নাম "ফানা ফিত্তাওহীদ" (তাওহীদে বিলুপ্তি)। কারণ, এই স্তরে ব্যক্তি যেখানে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া কিছুই দেখে না, সেখানে নিজের অস্তিত্বকেও দেখে না। সুতরাং তার সত্তা নিজের চোখেও বিলুপ্ত থাকে।

উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কেবল মৌখিক তাওহীদপন্থী। তার তাওহীদের উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই পাবে। অর্থাৎ সে মুজাহিদদের তরবারি থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, সে কলেমার অর্থ বুঝে এবং অন্তর দ্বারা তা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের তাওহীদ অন্তরের উপর এক গ্রন্থিবিশেষ, যাতে উন্মোচন ও উদ্দীপনা হয় না। এতদসত্ত্বেও এই তাওহীদ দ্বারা আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যদি এর উপরই জীবনাবসান হয় এবং গোনাহের কারণে তা দুর্বল না হয়। এই গ্রন্থিকে ঢিলে করার ও খুলে দেয়ারও কতকগুলো কৌশল রয়েছে। সেগুলোকে "বেদআত" বলা হয়। আরও কিছু পন্থা রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা এই গ্রন্থিকে মযবুত করা ও ঢিলেকারীদের কৌশল প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এসব পন্থাকে বলা হয় "কালাম শাস্ত্র"। যে কালাম শাস্ত্র জানে, তাকে মুতাকাল্লিম এবং তার বিপরীতকে মুবতাদে' বলা হয়। জনসাধারণের অন্তর থেকে তাওহীদের গ্রন্থি খুলে ফেলার জন্য মুবতাদে' যে অপচেষ্টা চালায়, তা ব্যর্থ করে দেয়াই মুতাকাল্লিমের লক্ষ্য থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, সে বিশ্ব-জাহানের হর্তাকর্তা একজনকেই বিশ্বাস করে। সে যদিও জানে, বস্তু সামগ্রী অনেক; কিন্তু এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেগুলোকে সে এক পরাক্রমশালী আল্লাহ থেকেই প্রকাশিত বলে জানে।

চতুর্থ ব্যক্তি এই অর্থে তাওহীদপন্থী যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে বস্তুসামগ্রীকে বহুত্বের দৃষ্টিতে নয়; বরং একত্বের দৃষ্টিতে দেখে। এটি তাওহীদের সর্বোচ্চ স্তর।

অতএব, প্রথম স্তর হচ্ছে আখরোটের উপরের ছাল, দ্বিতীয় স্তর দ্বিতীয় ছাল, তৃতীয় স্তর সারাংশ এবং চতুর্থ স্তর তৈলের ন্যায়, যা সারাংশ থেকে নির্গত হয়। উপরের ছাল কোন উপকারে আসে না। খেলে তিক্ত লাগে। আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন নিভিয়ে দেয় এবং ধোঁয়া বৃদ্ধি করে। ঘরে রাখলে অহেতুক জায়গা আবদ্ধ রাখে। মোটকথা, কয়েকদিন আখরোটের হেফাযত করা ছাড়া এটা কোন কাজে লাগে না। সারাংশ বের করে ফেললে এটা ফেলে দেয়া হয়। মৌখিক তাওহীদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। এরূপ তাওহীদে উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। স্বল্পকালীন উপকার এই যে, মন ও দেহকে রক্ষা করার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত কাজে লাগে এবং মুনাফিকের দেহকে মুজাহিদদের তরবারির গ্রাস হতে দেয় না। কারণ, তাদের প্রতি অন্তর চিরে দেখার নির্দেশ নেই। তারা কেবল বাহ্যিক ইসলামকে দেখে। কিন্তু মৃত্যুর সময় এই তাওহীদ তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাজে আসবে না।

আখরোটের দ্বিতীয় ছাল প্রথম ছালের তুলনায় বাহ্যত উপকারী। এর দ্বারা সারাংশের হেফাযত হয় এবং রেখে দিলে সারাংশকে বিগড়ে যেতে দেয় না। পৃথক করে নিলে জ্বালানি কাজেও আসে। কিন্তু এই উপকার সর্বাবস্থায় সারাংশের তুলনায় কম। এমনিভাবে অন্তরে কেবল কলেমার অর্থের বিশ্বাস রাখা মৌখিক কলেমার তুলনায় অনেক উপকারী। কিন্তু কাশফ্ ও প্রত্যক্ষকরণের তুলনায় এর মান কম। কাশফ ও প্রত্যক্ষকরণের ফলস্বরূপ যে উন্মোচন ও প্রশস্ততা অর্জিত হয়, তাই নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে—

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ আয়াতেও তাই উদ্দেশ্য—

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه –

অর্থাৎ, আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কি নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে?

সারাংশ স্বয়ং ছালের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য। তবু তৈল বের করার পর তাতে কিছু গাদের মিশ্রণ থাকে। এমনিভাবে জগতের হর্তাকর্তাকে বিশ্বাস করাও সাধকদের একটি সুউচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এতে কিছু না কিছু ভ্রূক্ষেপ গায়রুল্লাহর প্রতিও থেকে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখে না, তার তুলনায় এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি বহুত্বের দিকে থাকে।

এখানে প্রশ্ন হয়, মানুষ পৃথিবীতে এক সত্তা ছাড়া কিছুই প্রত্যক্ষ করবে না, তা কেমন করে সম্ভব? কেননা, সে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, তরুলতা ও অন্যান্য শরীরী বস্তুসমূহ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে। এসব বস্তু এক নয়— অনেক। অতএব, অনেক বস্তু এক কেমন করে হবে? এর জওয়াব এই, কোন কোন বস্তু কোন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখলে অনেক হয়; কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে দেখলে একই হয়। উদাহরণতঃ মানুষকে যদি আমরা আত্মা, দেহ, হাত-পা, শিরা-উপশিরা, অস্থি ও অন্ত্রের দিক দিয়ে দেখি, তবে তাতে বহুত্ব থাকে; কিন্তু যদি অন্যদিক দিয়ে অর্থাৎ মানবতার দিক দিয়ে দেখি, তবে সে এক। অনেকেই মানুষকে দেখে এবং তাদের অন্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহুত্ব ও পৃথক হওয়া ধারণাও থাকে না। আসলে মানুষ যখন একত্বের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকে, তখন সে একের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য দেখে না। আর যখন বহুত্বের দিকে লক্ষ্য করে, তখন এসব বস্তু যে আলাদা আলাদা, সেদিকে কল্পনা ধাবিত হয়। এমনিভাবে স্রষ্টা হোক কিংবা সৃষ্টি সকলকে দেখার আলাদা আলাদা ও বহু দৃষ্টিকোণ রয়েছে। কোন দৃষ্টিকোণে তারা এক এবং কোন দৃষ্টিকোণে অনেক। এখানে দৃষ্টান্তটি যদিও উদ্দেশ্যের সাথে পুরাপুরি খাপ খায় না, তবু এর মাধ্যমে মোটামুটিভাবে প্রত্যক্ষকরণে অনেক যে এক হতে পারে, তা বুঝা যায়।

সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়ার অবস্থাটি কখনও সার্বক্ষণিক হয়ে থাকে, আবার কখনও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। সত্য বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ীই হয়ে থাকে। এটা সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকা খুবই বিরল। বর্ণিত আছে, হুসাইন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইবনে মনসূর হাল্লাজ ইবরাহীম খাওয়াসকে সফর করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি বর্তমানে কি কাজে মশগুল আছ? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ তাওয়াক্কুল পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে আজকাল আমি সফর করছি। হুমায়ুন ইবনে মনসূর বললেন ঃ তুমি অন্তর আবাদ করার কাজে সারা জীবন বিনষ্ট করেছ। ফানা ফিত্তাওহীদ (তাওহীদে বিলুপ্তি) কোথায় গেল? সেটা অবলম্বন কর না কেন? উদ্দেশ্য এই, হযরত খাওয়াস তৃতীয় স্তরের তাওহীদ পাকাপোক্ত করার কাজে মশগুল ছিলেন, আর হুমায়ুন তাঁকে চতুর্থ স্তর অবলম্বন করতে বলেছিলেন।

এ পর্যন্ত তাওহীদপন্থীদের মকামসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। এখন সেই তাওহীদের ব্যাখ্যা শোনা দরকার, যার উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। সে মতে চতুর্থ স্তরের তাওহীদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করা উচিত নয়। তাওয়াক্কুলও এর উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং তৃতীয় প্রকার তাওহীদ থেকেই তাওয়াক্কুলের হাল অর্জিত হয়। প্রথম প্রকার তাওহীদ হল নিফাক, যার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর পাকাপোক্ত করার নিয়মপদ্ধতি কালাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। বেদআতীদের আপত্তিসমূহের জওয়াবও তাতে বর্ণিত হয়েছে। বাকী রইল তৃতীয় প্রকার তাওহীদ। বলা বাহুল্য, এর উপরই তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল। কেননা, কেবল বিশ্বাসগত তাওহীদই তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে না— এতে কিছু কাশফ ও প্রত্যক্ষণেরও দরকার। সুতরাং তৃতীয় প্রকার তাওহীদের ক্ষেত্রে যতটুকুর উপর তাওয়াক্কুল নির্ভরশীল, নিম্নে আমরা ততটুকুই বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

সংক্ষেপে কথা হল, মানুষের কাছে এটা দিবালোকের ন্যায় প্রতিপন্ন হতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া জগতের সর্বময় কর্তা আর কেউ নেই। সৃষ্টি, রিযিক, বখ্‌শিশ, জীবন, মরণ, প্রাচুর্য, দরিদ্রতা ইত্যাদি যত বিষয়াদি রয়েছে, সবগুলোর স্রষ্টা, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এতে কেউ তাঁর অংশীদার নেই। এ বিষয়টি যখন মানুষের কাছে প্রকটিত হয়ে যাবে, তখন সে অন্য কারও দিকে লক্ষ্য করবে না, অন্য কাউকে ভয় করবে না। তাঁরই কাছে আশা করবে এবং তাঁরই উপর ভরসা করবে। কেননা, সর্বাধিপতি তো কেবল তিনিই। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে, সবই তাঁর অধীন ও পদানত। মানুষের সামনে যখন কাশফের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন এটা সে চর্মচক্ষেও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

শয়তান মানুষকে এই তাওহীদ থেকে দু' উপায়ে বিরত রাখে এবং তার সাথে শিরক মিশ্রিত করে দেয়। প্রথমত, প্রাণিকুলের ক্ষমতার প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, জড় পদার্থের ক্ষমতার প্রতি মনোযোগের মাধ্যমে। জড়জগতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হল এই, মানুষ শস্য উৎপাদনের জন্যে বৃষ্টির উপর ভরসা করে এবং বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে মেঘমালার উপর ভরসা করে। নৌকা পানির উপর সঠিকভাবে ভেসে থাকা এবং চলার ব্যাপারে অনুকূল বায়ুর উপর ভরসা। এ সমস্ত বিষয় তাওহীদের ক্ষেত্রে শিরক এবং আসল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। এ কারণেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون -

অর্থাৎ, তারা যখন নৌকায় আরোহণ করে, তখন একান্তভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে উদ্ধার করে ডাঙ্গায় পৌছে দেন, তখনই তারা শিরক করতে শুরু করে।

কতক তাফসীরকারের মতে এখানে শিরক করার অর্থ এই, তারা বলতে শুরু করে— যদি বায়ু অনুকূল না হতো, তবে আমরা তীরে পৌছুতে পারতাম না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত সে জানে, অনুকূল বাতাসও স্বেচ্ছায় চলে না যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক তাকে চালান।

অতএব, নাজাতের ক্ষেত্রে বায়ুর প্রতি মানুষের মনোযোগ এমন, যেমন কোন প্রাণদণ্ডযোগ্য ব্যক্তি গ্রেফতার হয়, অতঃপর বাদশাহ তার মুক্তি ও ক্ষমার আদেশ লিখে দেন। এখন এই ব্যক্তি বাদশাহের দোয়াত, কলম ও কাগজকে স্মরণ করে বলে— যদি দোয়াত, কলম ও কাগজ না হত, তবে আমি রক্ষা পেতাম না। অর্থাৎ, সে কলম ইত্যাদিকেই নাজাতের কারণ মনে করে। যিনি কলম চালিয়েছেন, তাকে স্মরণ করে না। বলা বাহুল্য, এটা চূড়ান্ত মূর্খতা। যে ব্যক্তি জানে, কলম কোন আদেশ দিতে পারে না, বরং সে লেখকের অনুগত, সে কলমের দিকে মনোযোগ দিবে না এবং লেখক ছাড়া অন্য কোন কিছুর কাছে কৃতজ্ঞ হবে না। এমনকি, মুক্তির আনন্দ এবং বাদশাহের কৃতজ্ঞতায় কলম ও কালির কল্পনাও তার অন্তরে জাগ্রত হবে না। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, বৃষ্টি, মেঘমালা, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এমনিভাবে অনুগত, যেমন লেখকের হাতে কলম-কাগজ ইত্যাদি। এ দৃষ্টান্তটিও কেবল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বুঝানোর জন্যে, নতুবা দস্তখত বাদশাহ করলেও বাস্তবে লেখক আল্লাহ তা'আলাই। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

অর্থাৎ, আপনি যখন ধূলি নিক্ষেপ করলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।

মানুষের কাছে যখন প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত, তখন শয়তান তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় এবং তার তাওহীদে জড়পদার্থের অংশীদারিত্ব মিশ্রিত করতে পারে না। শয়তান তখন অন্য উপায় অবলম্বন করে। অর্থাৎ, প্রাণিকুলের ক্ষমতার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং বলে— সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়— এ কথা তুমি কেমন করে বিশ্বাস করতে পারলে? দেখ, অমুক ব্যক্তি তার ক্ষমতা বলে তোমাকে রুযী-রোযগার দেয়। সে ইচ্ছা করলে তা বন্ধও করে দিতে পারে। বাদশাহ ইচ্ছা করলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে। অতএব, বাদশাহকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর কাছেই আশা করা উচিত। কেননা, তুমি তাঁর অধীন। শয়তানের এই প্ররোচনায় অনেক মানুষের পা পিছলে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দার উপর শয়তানের কোন প্রভাব নেই। তারা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে, লেখক অনুগত ও বাধ্য। কিন্তু যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য আল্লাহর নূর দ্বারা উন্মোচিত হয়নি, তার অন্তর্দৃষ্টি আকাশ ও পৃথিবীর মহাপ্রভুকে দেখতে অক্ষম। সে দেখে না যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সবকিছুর উপর প্রবল। পক্ষান্তরে যারা "মোশাহাদা" তথা প্রত্যক্ষকরণের স্তরে উন্নীত, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নিজের কুদরত দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে বাকশক্তি সম্পন্ন করে দেন। এ সাধকগণ এসব অণু-পরমাণু আল্লাহর উদ্দেশে যে তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তা নিজের কানে শুনে। অবশ্য তাদের কান এরূপ কান নয়, যা ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছু শুনতে পারে না। এরূপ কান তো গাধারও থাকে। অতএব, যে বস্তুতে চতুষ্পদ জন্তুও শরীক, তার তেমন মূল্য নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাওয়াক্কুলের ক্রিয়াকর্ম

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। তাদের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাওয়াক্কুলের নিজ নিজ "মকাম" তথা অবস্থান লিপিবদ্ধ করেছেন। সূফী বুযুর্গদের এটাই রীতি। তাই সবগুলো বক্তব্য উদ্ধৃত করার মধ্যে কোন উপকার নেই দেখে আমরা এখানে বাস্তব বিষয়টি বর্ণনা করছি।

তাওয়াক্কুল শব্দটি "ওকালত" থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অপরের উপর ভরসা করে কাজ সমর্পণ করা। যাকে কাজ সমর্পণ করা হয়, তাকে উকিল এবং যে সোমর্পণ করে, তাকে "মোতাওয়াক্কেল" (মক্কেল) বলা হয়। এখন আমরা এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মামলা-মোকদ্দমার উকিলের কথাই উল্লেখ করছি। যদি কোন ব্যক্তি অপরের কাছে মিছামিছি টাকা-পয়সা দাবী করে, তবে অপরপক্ষ বাদীর সাথে লড়াই করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করবে, যাতে সে বাদীর মিথ্যা দাবী ফাঁস করে দেয়। এমতাবস্থায় মক্কেল ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে না, যে পর্যন্ত সে উকিলের মধ্যে চারটি বিষয়ের বিশ্বাস না রাখবে। এক— চূড়ান্ত বিচক্ষণতা, দুই— সত্য প্রকাশে পূর্ণ সক্ষমতা। তিন— চুড়ান্ত বাকপটুতা এবং চার— মক্কেলের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি। বিচক্ষণতার কারণে উকিল ধোকা ও প্রবঞ্চনার স্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকবে। এমনকি, নাজুক ও সূক্ষ্ম কৌশলও তার অজানা থাকবে না। সক্ষমতার প্রয়োজন এজন্যে, যাতে সে সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে দেয়, বিচারকের সামনে ভীত না হয় এবং সত্য প্রকাশে লজ্জা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় না দেয়। বাকপটুতাও এক প্রকার সক্ষমতা। কিন্তু এটা মুখের সক্ষমতা, যাতে মনের কথা উত্তমরূপে বর্ণনা করতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি ধোকার স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত, তার জন্য জরুরী নয় যে, সে নিজের বাগ্মিতার দ্বারা তার সমাধান করে দিবে। পূর্ণ সহানুভূতির প্রয়োজন এজন্যে, যাতে উকিল মক্কেলের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব, সবই করে। কেননা, মক্কেলের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি ও মনোযোগ না থাকা পর্যন্ত কেবল মামলাবাজির ক্ষমতা যথেষ্ট হয় না। যদি উকিল এমন উদাসীন হয় যে, প্রতিপক্ষ মামলায় জিতলেও কোন দোষ নেই এবং মক্কেল জিতলেও কোন পরওয়া নেই, তবে তার প্রচেষ্টা যে কতটুকু সফল হবে, তা জানা কথা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি মক্কেলের মনে উপরোক্ত চারটি বিষয় অথবা সেগুলোর কোন একটি বিষয়েও সন্দেহ থাকে, তবে সে উকিলের ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে না। সে সর্বপ্রযত্নে উকিলের এসব ত্রুটি দূর করতে সচেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে মক্কেল উকিলের এসব বৈশিষ্ট্যে যে পরিমাণ বিশ্বাস রাখবে, সে পরিমাণে তার উপর ভরসা ও প্রশান্ত হবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাস ও ধারণা শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য অপরিসীম। এ কারণেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারীদের অবস্থার বেলায়ও অনেক পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। এর সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস, যাতে কোন দুর্বলতা নেই। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে কাশফ অথবা দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে একথা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের জন্যে যথেষ্ট হওয়ার পূর্ণ সক্ষমতাও তাঁর আছে। প্রত্যেক বান্দার উপর তাঁর রহমত ও করুণাদৃষ্টি রয়েছে। তাঁর কুদরতের উপর কোন কুদরত নেই এবং তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞান নেই। এরূপ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করবে এবং অন্য কারও প্রতি মনোনিবেশ করবে না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের ভেতরে এই বিশ্বাস না পায়, তবে এর কারণ দু'টি। এক— উপরোক্ত বিষয় চতুষ্টয়ের কোন একটি সম্পর্কে দুর্বল বিশ্বাসী হওয়া অথবা দুই— অন্তরে কাপুরুষতা ও কুসংস্কারের কারণে বক্রতা প্রবল হওয়া। কেননা, মাঝে মাঝে এমন হয় যে, বিশ্বাসে কোন ত্রুটি না থাকলেও কুসংস্কারের আনুগত্য করার কারণে অন্তরে বক্রতা এসে যায়। উদাহরণতঃ যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলা হয়, মৃত লাশের কাছে বিছানায় অথবা কক্ষে শুয়ে পড়, তবে সে তাতে সম্মত হবে না। যদিও সে নিশ্চিত রূপে জানে যে, এটা মৃত লাশ এবং চেতনা ও অনুভূতিহীন জড়পদার্থ। আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশ্বাসে কোন সন্দেহ-সংশয় না আসা সত্ত্বেও সে মৃতের সাথে বিছানায় কিংবা বদ্ধকক্ষে একাকী থাকতে পছন্দ করে না। এটা মনের কাপুরুষতা ও এক প্রকার দুর্বলতা, যা থেকে কম মানুষই মুক্ত। মোটকথা, তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য মন ও বিশ্বাস উভয়টিই শক্তিশালী হওয়া দরকার। এই উভয় প্রকার শক্তি দ্বারাই অন্তরে স্থিতি ও আশ্বস্ততা আসে। অন্তরের স্থিতি ভিন্ন বিষয় এবং বিশ্বাস ভিন্ন বিষয়। অনেক বিশ্বাস এমন থাকে, যার সাথে স্থিতি ও আশ্বস্ততার সম্পর্ক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নেই। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে আমার অন্তর আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে একথা বলেছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিরূপে জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান— যাতে বিষয়টি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল হয়ে যায়। মোটকথা, কাপুরুষতা ও কুসংস্কার মানুষের মজ্জার অন্তর্গত। এগুলোর কারণে বিশ্বাস উপকারী হয় না। জানা গেল যে, এটাও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী একটি বিষয়। যখন বিশ্বাস, আশ্বস্ততা ইত্যাদি সববিষয় অর্জিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা পূর্ণ হয়ে যায়। তাওরাতে লিখিত আছে— যে ব্যক্তি নিজের মতই কোন মানুষের উপর ভরসা করে, সে অভিশপ্ত। এক হাদীসে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সম্মান ও ইযযত কামনা করে, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করেন।

তাওয়াক্কুলের অর্থ জানার পর এখন জানা দরকার যে, শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর আল্লাহ্ তা'আলার উপর এমন ভরসা করা, যেমন মক্কেল তার উকিলের উপর করে। এটা তাওয়াক্কুলের সর্বনিম্ন স্তর। দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্ তা'আলার উপর এমন ভরসা করা, যেমন শিশু তার মায়ের উপর করে। সে মা ব্যতীত অন্য কাউকে চিনে না এবং তাকে ছাড়া অন্য কারও কাছে ফরিয়াদ করে না। মায়ের উপরই ভরসা করে। মাকে দেখলে তার আঁচল জড়িয়ে ধরে এবং ছাড়ে না। মায়ের অনুপস্থিতিতে কোন কষ্টের সম্মুখীন হলে সে প্রথমে মাকেই ডাকে এবং তার কথাই প্রথমে মনে আসে। কেননা, তার ঠিকানা মা পর্যন্তই সীমিত। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যেই মনোনিবেশ করে এবং লক্ষ্য ও আস্থা তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ রাখে, সে আল্লাহর আশেক হবে, যেমন শিশু তার মায়ের আশেক হয়ে থাকে। এ স্তরের তাওয়াক্কুল প্রথম স্তরের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। উভয় স্তরের মধ্যে পার্থক্য এই, দ্বিতীয় স্তরের তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কেও বেখবর থাকে। অর্থাৎ, তার অন্তর তাওয়াক্কুলের প্রতি মনোযোগ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেয় না; বরং যার উপর তাওয়াক্কুল, তার প্রতিই মনোযোগ রাখে। তার অন্তরে অন্য কোন কিছুর অবকাশ থাকে না। কিন্তু প্রথম স্তরের তাওয়াক্কুলকারী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ও উপার্জনের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করে। তাই সে নিজের তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বেখবর থাকে না। এটা কেবল আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিপন্থী। হযরত সহল তস্তরীর উক্তিতে এই স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ নিম্নতম তাওয়াক্কুল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা। প্রশ্নকারী বলল ঃ মধ্যবর্তী স্তর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ এখতিয়ার ও অধিকার বর্জন করা। এতে দ্বিতীয় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশ্নকারী সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে শুধু বললেন ঃ এটা সে'ই জানে, যে মধ্যবর্তী স্তরে পৌঁছে যায়।

তাওয়াক্কুলের তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহর হাতে তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির নিজের গতিবিধিতে এমন হওয়া, যেমন মৃত ব্যক্তি গোসলদাতার হাতে থাকে। অর্থাৎ, নিজেকে মৃত মনে করা, যাকে কেবল খোদায়ী কুদরতই গতিশীল করে থাকে। যেমন গোসলদাতার হাত মৃতকে গতিশীল করে। এরূপ তাওয়াক্কুলকারীর সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে, গতিশীলতা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহ তা'আলাই জারি করেন। এ ধরনের লোক তার সাথে কি ঘটনা ঘটবে সে অপেক্ষায় থাকবে। সে শিশু থেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র হবে যে, শিশু মায়ের কাছে আবদার করে এবং তার আঁচল জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে তা করবে না; বরং সে এমন শিশুর মত, যে মনে করে, মায়ের কাছে আবদার না করলে মা তাকে খুঁজবে, তাকে জড়িয়ে না ধরলে সে নিজেই বুকে টেনে নেবে এবং তার কাছে দুধ না চাইলে সে নিজেই দুধ পান করাবে। এই স্তরের তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও দানে ভরসা করে সওয়াল ও দোয়া বর্জন করে এবং মনে করে, তিনি সওয়াল ছাড়াই সওয়ালের চেয়ে উত্তম দান করবেন। কেননা, তিনি সওয়াল ও দোয়ার পূর্বেই অনেক নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। এ ধরনের তাওয়াক্কুলের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়; কিন্তু খুবই বিরল। মুখমন্ডলে ভয়জনিত পাণ্ডুরতা যেমন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, এই তাওয়াক্কুলও তেমনি আসা-যাওয়া করতে থাকে। কেননা, নিজের গতি ও কুদরতকে ব্যবহার করা এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার এবং এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা একটি সাময়িক ব্যাপার। দ্বিতীয় স্তরের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাওয়াক্কুলের স্থায়িত্ব জ্বরাক্রান্ত রোগীর পাণ্ডুরতার ন্যায়, যা কখনও দু'চার দিন থেকে যায়। প্রথম স্তরের স্থায়িত্ব সেই রোগীর পাণ্ডুরতার মত, যার রোগ স্থায়ী হয়ে গেছে। এই পাণ্ডুরতা সর্বক্ষণ থাকাও কঠিন নয় এবং বিলীন হয়ে যাওয়াও অবান্তর নয়।

তাওয়াক্কুলের এ সকল স্তরে বাহ্যিক উপায়াদির সাথে অওয়াক্কুলকারীর কোন সম্পর্ক থাকে কি না, এ প্রশ্নের জওয়াব এই, তৃতীয় স্তরে কোন সম্পর্কই থাকে না। এই স্তরে তাওয়াক্কুলকারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তিদের মত থাকে। দ্বিতীয় স্তরে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া ও সওয়াল করা ছাড়া অন্য কোন তদবীর থাকে না। প্রথম স্তরে তদবীর ও এখতিয়ার কোন কিছুই বিলুপ্ত হয় না। তবে কতক তদবীর বিলুপ্ত হয়। যেমন, মক্কেল তার উকিলের উপর ভরসা করে কতক তদবীর বর্জন করে। কিন্তু উকিল যে তদবীর করতে বলে তা বর্জন করে না। উদাহরণতঃ উকিল যদি বলে যে, আপনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত থাকলে আমি কথা বলার জন্যে মুখ খুলব, তবে মক্কেল আদালতে উপস্থিতি বর্জন করে না। এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ, এর অর্থ এই হয় না যে, সে উকিলকে ত্যাগ করে শুধু নিজের চেষ্টা-তদবীরের উপর ভরসা করেছে। বরং এটা তাওয়াক্কুলের পরিপূরক বিষয়। কেননা, উকিল তার জন্যে উপযুক্ত বিবেচনা করে যা বলেছে, সে তাই করেছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সত্যিকারভাবে অনুধাবন করলে তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত অনেক আপত্তি দূরীভূত হয়ে যায় এবং বুঝা যায় যে, যাবতীয় তদবীর বর্জন করা এবং সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়। বরং তাওয়াক্কুলে কতক তদবীর বর্জন করা জায়েয এবং কতক তদবীর বর্জন করা নাজায়েয। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লিখিত হবে।

তাওয়াক্কুল ও মাশায়েল ঃ এখানে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বুযুর্গদের কিছু কিছু উক্তি উল্লেখ করা হবে, যাতে জানা যায়, এ সম্পর্কে তারা যা কিছু বলেছেন, তা সমস্তই আমাদের বর্ণিত তাওয়াক্কুলের তিন স্তরের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক উক্তির মধ্যে কতক অবস্থার প্রতি ইশারা আছে।

আবু মূসা বলেন ঃ আমি আবু এয়াযীদ বুস্তামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাওয়াক্কুল কি? তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? আমি বললাম ঃ আমাদের সঙ্গী বলেন, যদি সাপ ও বিচ্ছু কোন ব্যক্তিকে ডান ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাম দিক থেকে ঘিরে ফেলে, তবে তার অন্তরে কোনরূপ নড়চড় না হওয়া চাই। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাওয়াক্কুল এরই কাছাকাছি। কিন্তু যদি জান্নাতীরা জান্নাতে সুখভোগ করে এবং দোযখীরা দোযখে আযাব ভোগ করে, তবে তাওয়াক্কুলকারী তাদের মধ্যে পার্থক্য করলে সে সম্পূর্ণই তাওয়াক্কুলের সীমার বাইরে চলে যাবে। এখানে হযরত আবু মূসার উক্তিতে তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ, তৃতীয় স্তর বর্ণিত হয়েছে। আর আবু এয়াযীদের বক্তব্যে উত্তম প্রকার অর্থাৎ, খোদায়ী হেকমত ও প্রজ্ঞা বিধৃত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু করেছেন, তাই হওয়া উচিত। ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়টি অত্যধিক গভীর। হযরত আবু এয়াযীদ এ ধরনের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না।

তাওয়াক্কুলের প্রথম স্তরে সাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করার শর্ত নেই। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হেরা গুহায় অবস্থানকালে সাপের গর্তসমূহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা তাওয়াক্কুল বিরোধী হলে তিনি তা করতেন না।

হযরত যুন্নুন মিসরীকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং 'আসবাব' তথা উপায়াদির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নাম তাওয়াক্কুল। এখানে অন্যান্য প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বলে তিনি তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং উপায়াদির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কথা বলে তাওয়াক্কুলের করণীয় বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন।

হামদুন গাযর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ যদি কারও কাছে দশ হাজার দেরহাম থাকে এবং এক দেরহাম ঋণ থাকে, তবে এ আশংকা থেকে মুক্ত না থাকা যে, ঋণ ঘাড়ে রেখেই সে মারা যাবে। পক্ষান্তরে যদি কারও যিম্মায় দশ হাজার দেরহাম ঋণ থাকে এবং তা শোধ করার জন্যে কোন কিছুই না থাকে, তবু এ বিষয়ে নিরাশ না হওয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই ঋণ শোধ করে দিবেন। এ উক্তিতে কেবল আল্লাহর বিস্তৃত কুদরতে বিশ্বাস করা এবং কুদরতের জন্যে বাহ্যিক উপায়াদি ছাড়া গোপন উপায়াদিও রয়েছে একথা মেনে নেয়াকে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে।

হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ্ কারশীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার নাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাওয়াক্কুল। প্রশ্নকারী বলল ঃ আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ যে উপায় অন্য উপায়ের দিকে পৌঁছে, তা বর্জন করা এবং কেবল আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যনির্বাহী মনে করা। এখানে প্রথম বাক্যে তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তরই শামিল এবং দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষভাবে তৃতীয় স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাওয়াক্কুলের অনুরূপ। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। কেননা, জিবরাঈলের প্রশ্ন তাঁর হেফাযতের একটি উপায় ছিল, যা অন্য উপায়ের দিকে পৌঁছত। হযরত ইবরাহীম এটা এই ভরসায় বর্জন করলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি জিবরাঈলকে হেফাযত করতে বাধ্য করে দিবেন। এমতাবস্থায় এ কাজের কার্যনির্বাহী তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ্) হবেন।

হযরত আবু সাঈদ খারায বলেন ঃ দু'টি বিষয়ের নাম তাওয়াক্কুল— স্থিতিহীন চাঞ্চল্য এবং চাঞ্চল্যহীন স্থিতি। এতে তিনি সম্ভবত দ্বিতীয় স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, চাঞ্চল্যহীন স্থিতির মানে এই যে, উকিলের প্রতি অন্তর দ্বিধাহীনভাবে স্থিতিশীল হবে। পক্ষান্তরে স্থিতিহীন চাঞ্চল্য বলে বুঝানো হয়েছে, কাকুতি-মিনতি ও ফরিয়াদ আল্লাহর সামনে হবে; যেমন শিশু আপন দেহ দিয়ে মায়ের দিকে চঞ্চল থাকে।

তাওয়াক্কুলকারীদের ক্রিয়াকর্ম ঃ কেউ কেউ মনে করে, তাওয়াক্কুল হচ্ছে দেহ ও মন সহযোগে কোন কাজকর্ম ও কৌশল-চিন্তা না করা এবং ছিন্নবস্ত্র অথবা মাংসপিণ্ডের ন্যায় মাটিতে পড়ে থাকা। এটা মূর্খদের ধারণা, যা শরীয়তের আইন অনুযায়ী হারাম। শরীয়তে তাওয়াক্কুলকারীদের প্রশংসা বর্ণিত আছে। এমতাবস্থায় একটি হারাম কাজ করে কিরূপে প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? তাই আমরা এখানে বাস্তব ও সুচিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

মানুষের ইচ্ছাধীন চেষ্টা-চরিত্র চারটি উদ্দেশ্যের জন্যে হয়ে থাকে। এক— কোন উপকারী বস্তু অর্জন করা, যা তার কাছে নেই। যেমন, ধন উপার্জন করা। দুই— নিজের উপকারী বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করা। যেমন, ধন সঞ্চয় করা। তিন— কোন উৎপীড়নকারীকে উৎপীড়নের পূর্বেই প্রতিহত করা। উদাহরণতঃ হিংস্র জন্তু অথবা চোর-ডাকাতের উপদ্রব দূর করা। চার— যে বিপদ উপরে এসে গেছে, তা দূর করার চেষ্টা করা। যেমন, রোগের চিকিৎসা করা ইত্যাদি। মানুষের চেষ্টা-চরিত্র এই চারটি উদ্দেশ্যের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাইরে নয়। আমরা এই চার প্রকার ক্রিয়াকর্মে তাওয়াক্কুলের শর্ত ও স্তর প্রমাণসহ চারটি ভাগে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

(১) যে সকল উপায়ে মানুষ উপকারী বস্তু অর্জন করতে পারে, সেগুলো তিন প্রকার। এক— নিশ্চিত উপায়। অর্থাৎ, সদাসর্বদা যা একইভাবে হয়— এর খেলাফ হয় না। উদাহরণতঃ ক্ষুধা দূর করার জন্যে হাত বাড়িয়ে খাদ্য মুখে দেয়া, চিবানো এবং গলাধঃকরণ করা। এখন কেউ যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সামনে রাখা খাদ্যের দিকে হাত না বাড়ায় এবং বলে ঃ আমি তো তাওয়াক্কুল করেছি, আর তাওয়াক্কুলের শর্ত হচ্ছে— কোন কাজ না করা। হাত বাড়ানো, দাঁতে চিবানো এবং গলাধঃকরণ করা কাজ বৈ নয়। তাই আমি এগুলো করব না। এ ধরনের কথাবার্তা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং একে বলা হবে পাগলামি। কেননা, ক্ষুধা দূর করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এসব ক্রিয়াকর্মকে অকাট্য উপায় হিসাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। কখনও এর বিপরীত হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই তার উদরপূর্তি করে দেবেন অথবা খাদ্যকে গতিশীল করে দেবেন, ফলে সে আপনা-আপনি মুখে চলে আসবে অথবা কোন ফেরেশতাকে আদেশ করবেন, সে খাদ্য চিবিয়ে পাকস্থলীতে রেখে যাবে, তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রবর্তিত রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম বর্জনের নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুলে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা খাদ্য গ্রহণের জন্যে হাত, দাঁত, শক্তি ও নড়াচড়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং খাদ্য ও পানীয় দেয়া তাঁরই কাজ। তবে হাত ও খাদ্যের উপরই মনে স্বস্তি ও ভরসা না থাকা উচিত। বাস্তবেও হাতের উপর ভরসা করা যায় না। কেননা, মাঝে মাঝে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত অবশ হয়ে যায়। শক্তির উপরও ভরসা করা যায় না। কারণ, মানুষ প্রায়ই এমন আঘাতের সম্মুখীন হয়, যার ফলে তার বুদ্ধি-জ্ঞান ও নড়াচড়ার শক্তি রহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে খাদ্য বিদ্যমান থাকার উপরও ভরসা করা যায় না। কেননা, মাঝে মাঝে কোন শক্তিধর এসে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অথবা কোন সাপ এসে যায়, যার কারণে মানুষকে খাদ্য রেখেই পালাতে হয়। মোটকথা, এগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে এবং এর প্রতিকার আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই হয় না। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় প্রকার উপায় নিশ্চিত নয়; কিন্তু প্রায়শ এই উপায় ছাড়া উদ্দেশ সিদ্ধ হয় না কিংবা সিদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি শহর ও কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে এমন জঙ্গলে সফর করে, যেখানে মানুষের যাতায়াত খুবই বিরল। এরূপ সফরে পাথেয় না নেয়া তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়। বরং জঙ্গলের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া পূর্ববর্তীদের রীতি ও সুন্নত। এতে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হয় না। তবে ভরসা আল্লাহর অনুগ্রহের উপর থাকা কর্তব্য— পাথেয়ের উপর নয়। কিন্তু যদি কেউ পাথেয় সঙ্গে না নেয়, তবে তাও জায়েয এবং তা অনেক উচ্চস্তরের তাওয়াক্কুল। কেননা, বিশিষ্ট বুযুর্গদের এটাই ছিল রীতি। প্রশ্ন হয়, পাথেয় সঙ্গে না নেয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া, যা শরীয়তে হারাম। এর জওয়াব এই, এটা দু' কারণে হারামের বাইরে থাকতে পারে। এক, কোন ব্যক্তি সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে এক সপ্তাহ অথবা কমবেশী সময় ক্ষুধার্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এ সময়ে সে মনের সংকীর্ণতা, অস্থিরতা ও কঠিনতা ছাড়াই আল্লাহর যিকুর করতে সক্ষম হয়। দুই, ঘাস ও লতাপাতা ইত্যাদি খেয়েও মানুষ কিছুদিন জীবিত থাকতে পারে। তবে এতে মুজাহাদার দরকার হবে। মুজাহাদা তাওয়াক্কুলের মূল। বিশিষ্ট বুযুর্গগণ এর উপরই ভরসা করতেন। তারা এ ধরনের সফরে সুঁই, কাঁচি, রশি ও ছোট বালতি অবশ্যই সঙ্গে রাখতেন এবং বলতেন ঃ এতে তাওয়াক্কুলের ক্রটি হয় না। কারণ, তারা জানতেন, জঙ্গলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্যে রশি ও বালতি ছাড়া পানি উপরে উঠে আসে না। এটা আল্লাহ তা'আলার রীতি নয়। জঙ্গলে অধিকাংশ সময় বালতি ও রশি পাওয়া যায় না। ঘাস, শাক-পাতা ইত্যাদি অনেক পাওয়া যায়। সফরে প্রত্যহ কয়েকবার উযু করার জন্যে এবং পান করার জন্যে পানির প্রয়োজন পড়ে। এমনিভাবে তাদের কাছে একটিমাত্র বস্ত্র থাকত। এটা ছিঁড়ে গেলে সুঁই-সুতা কোথাও পাওয়া যায় না। সুঁই-সুতার বিকল্পও জঙ্গলে কোন কিছু থাকে না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের কারণে জঙ্গলে সফর করার সময় এসব প্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করা জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি পাহাড়ের কোন উপত্যকায় তাওয়াক্কুল করার জন্যে যায়, তবে সে গোনাহ্গার হবে এবং নিজেই নিজের প্রাণ বধ করবে। বর্ণিত আছে— জনৈক দরবেশ লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন পাহাড়ের পাদদেশে সাত দিন অবস্থান করল। সে বলল ঃ আমি কারও কাছে কিছু চাইব না, যে পর্যন্ত আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমাকে আমার রিযিক পৌঁছে না দেন। সাত দিন বসে থাকার পর সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল; কিন্তু রিযিক এল না। সে আল্লাহর দরবারে মিনতি করে বলল ঃ ইলাহী! যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখতে চাও, তবে আমার জন্যে যে রিযিক লিখে দিয়েছ, তা আমাকে দান কর। নতুবা আমার রূহ কবজ করে নাও। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হল ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যতদিন তুমি লোকালয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে না বসবে, তোমাকে রিযিক দেব না। দরবেশ লোকালয়ে চলে গেল। কেউ তার কাছে খাদ্য নিয়ে এল এবং কেউ পানি নিয়ে এল। কিছু পানাহার করে যখন সে কিছুটা সুস্থ হল, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হল ঃ তুমি দুনিয়াতে দরবেশী করে আমার প্রজ্ঞাময় নীতি বিনষ্ট করতে চাও। তুমি কি জান না যে, আমি আমার বান্দাদেরকে নিজের কুদরতের হাতে রিযিক পৌঁছানোর তুলনায় অন্য মানুষের হাত দিয়ে রিযিক পৌঁছানোকে অধিক ভাল মনে করি? এ থেকে জানা গেল, যাবতীয় উপায়াদি থেকে দূরে থাকা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞানীতির বিরোধী এবং আল্লাহর রীতি ও অভ্যাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী কাজ করলে অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল উপায়াদির উপর না করে আল্লাহর উপর করলে তা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। তবে উপায়াদি দু'প্রকার— বাহ্যিক ও গোপনীয়। তাওয়াক্কুলকারীর উচিত, বাহ্যিক উপায়াদি থেকে মুখ ফিরিয়ে গোপন উপায়াদি অবলম্বন করা।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, জীবিকার জন্যে কোন পেশা অবলম্বন না করে লোকালয়ে অবস্থান করা কিরূপ? এটা হারাম, মোবাহ্, না মোস্তাহাব? জওয়াব এই যে, এটা হারাম নয়। কেননা, পাথেয় ছাড়া জঙ্গলে সফরকারী ব্যক্তি যখন আত্মহন্তা সাব্যস্ত হল না, তখন লোকালয়ে বসবাসকারী কিছুতেই নিজেকে বিনাশকারী হতে পারে না। এখানে সে ধারণাতীত জায়গা থেকে খাদ্যপ্রাপ্ত হতে পারে, তবে তা পেতে কখনও বিলম্ব হতে পারে, যাতে সবর করা সম্ভব। তবে ঘরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে বসা, যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে— এটা হারাম। কিন্তু যদি ঘরের দরজা খোলা রেখে আল্লাহর এবাদতে মশগুল না থাকে— বেকার বসে থাকে, তবে এটা হারাম না হলেও অনাহারে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। তখন জীবিকা উপার্জনের জন্যে বের হওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে আন্তরিকভাবে এবাদতে মশগুল থাকলে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নির্ভর করে কে আসে, কে যায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করলে তা অবশ্যই তাওয়াক্কুলের অন্যতম মকাম। এরূপ ক্ষেত্রে জনৈক আলেম বলেন— বান্দা রিযিক থেকে পলায়ন করলে রিযিক তাকে তালাশ করবে, যেমন কেউ মৃত্যু থেকে পলায়ন করলে মৃত্যু তাকে খুঁজে বের করে ছাড়ে। এটাও এই আলেমেরই উক্তি যে, মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করে— ইলাহী! আমাকে রূযী দিয়ো না, তবে এ দোয়া কবুল হবে না এবং দোয়াকারী গোনাহগার হবে। আল্লাহ বলবেন ঃ ওহে মূর্খ! এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমি তোমাকে সৃষ্টি করব, আর রূযী দেব না? এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ প্রত্যেক বিষয়েই মতভেদ করে; কিন্তু রিযিক ও মৃত্যুর ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন রিযিকদাতা ও মৃত্যুদাতা নেই। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لو توكلتمٌ على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير

تغدو خماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال -

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি পক্ষীকুলের ন্যায় তোমাদেরকে রিযিক দিতেন। পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত বের হয়ে যায় এবং বিকালে উদরপূর্তি অবস্থায় নীড়ে ফিরে আসে। এছাড়া তোমাদের দোয়ায় পাহাড় পর্যন্ত টলে যেত।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ পাখীদের দেখ, তারা ফসল উৎপন্ন করে না এবং খাদ্য সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতভাবে প্রত্যহ রিযিক দান করেন। যদি তোমরা বল, আমাদের পেট বড়, তবে চতুষ্পদ জন্তুদের প্রতি তাকাও— আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিকের জন্যে মানুষকে কিভাবে নিয়োজিত করেছেন।

আবু এয়াকুব যুসী বলেন ঃ তাওয়াক্কুলকারীদের রিযিক তাঁদের শ্রম ছাড়াই মানুষের হাতে চালু থাকে এবং অবশেষে তারা বিনা দ্বিধায় পেয়ে যায়। অন্যরা দিবারাত্রি রিযিকের চিন্তায় মশগুল থাকে এবং কষ্ট স্বীকার করে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাকে রিযিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেন; কিন্তু কেউ কেউ অপমান সহকারে তা পায়। যেমন, ভিক্ষাবৃত্তি করে এবং কেউ কেউ পরিশ্রম ও অপেক্ষা করে পায়। যেমন, ব্যবসায়ী। আবার কেউ কেউ প্রাণান্ত চেষ্টা-চরিত্র করে; যেমন, কারিগর এবং কেউ কেউ ইযযত ও সম্মান সহকারে; যেমন সূফী বুযুর্গগণ।

তৃতীয় প্রকার উপায় এমন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। যেমন, ধন উপার্জনে সূক্ষ্ম কলাকৌশল অবলম্বন করা। মানুষ এক্ষেত্রে যে সব কলা-কৌশল অবলম্বন করে, তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া জরুরী নয়। এ ধরনের উপায় অবলম্বন করলে তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ মানুষ এতেই লিপ্ত রয়েছে। তারা বৈধ ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম কলাকৌশল বের করতে থাকে। অবৈধ ধন অর্জনে কলাকৌশল প্রয়োগ করার ফলে যে তাওয়াক্কুল বাতিল হয়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রকার উপায়াদির সংখ্যা এত বেশী যে, গণনা করা সম্ভবপর নয়। হযরত সহল বলেন ঃ কলাকৌশল বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ও নিজের মধ্যে আড়াল রাখেননি। মানুষের কলাকৌশলই মানুষের আড়াল। চিন্তাভাবনা করে দূরবর্তী উপায়সমূহ বের করাই সম্ভবত এখানে হযরত সহলের উদ্দেশ্য। কেননা, এ জাতীয় উপায়ের মধ্যেই কলাকৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, কোন কোন উপায়াদি অবলম্বন করার ফলে মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং কোন কোন উপায়াদি অবলম্বনের ফলে তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার উপায়াদির মধ্যে কতক এমন যে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া সুনিশ্চিত এবং কতক এমন, যা সন্দিগ্ধ তথা নিশ্চিত নয়। সুনিশ্চিত উপায়াদি অবলম্বন করলে কেউ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না— যদি ভরসা কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর হয় এবং উপায়াদির উপর না হয়। সন্দিগ্ধ উপায়াদি অবলম্বন করলেও মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না— যদি মনের শান্তি আপন শক্তি ও পুঁজির সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়। এই ধরনের উপায়াদি বর্জন করে যারা তাওয়াক্কুল করে, তা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম, বিশিষ্ট বুযুর্গগণের স্তর, যারা পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই নির্জন জঙ্গলে সফর করেন এবং আল্লাহ তা'আলার কৃপার উপর আস্থা রাখেন যে, তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এক সপ্তাহ কিংবা আরও সময় পর্যন্ত সবর করার শক্তি দেবেন অথবা বেঁচে থাকার জন্যে শাক, লতাপাতা ইত্যাদি পাওয়া যাবে। যদি কিছু পাওয়া না যায়, তবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধা নেই। কেননা, যাদের কাছে পাথেয় থাকে, তারাও মাঝে মাঝে অনাহারে মারা যায়। কারণ, তাদের পাথেয় বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা জঙ্গলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুর মুখে চলে যায়। পাথেয় থাকা এবং না থাকা উভয় অবস্থাতেই যখন মৃত্যু হতে পারে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করাই উত্তম।

দ্বিতীয় স্তর এমন তাওয়াক্কুলকারীদের, যারা নিজ গৃহে অথবা মসজিদে বসে থাকে। এই স্তরে অবস্থানকারী প্রথম স্তর থেকে কম হলেও তাকে তাওয়াক্কুলকারীই বলতে হবে। কারণ, সে উপার্জন ও বাহ্যিক উপায়াদি বর্জন করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর ভরসা করে এবং মনে করে তিনি গোপন উপায়াদির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করে দেবেন। অবশ্য শহরে থাকাও রিযিক লাভের অন্যতম উপায়। কিন্তু এতে তার তাওয়াক্কুল বাতিল হবে না যদি লক্ষ্য কেবল সেই আল্লাহর উপর থাকে, যিনি শহরবাসীদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং শহরবাসীদের উপর লক্ষ্য না থাকে।

তৃতীয় স্তর এমন তাওয়াক্কুলকারীদের, যারা চলাফেরার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করে। তবে উপার্জন করলেও কেউ তাওয়াক্কুলের মকাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। তবে এ জন্যে শর্ত এই যে, মনের স্বস্তি আপন পুঁজি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের উপর নির্ভরশীল না হওয়া চাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন। বরং আল্লাহ তা'আলার কৃপার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এই উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি আপন পরিবারবর্গের জন্যে অথবা ফকীর-মিসকীনকে দান করার জন্যে উপার্জন করে, তবে সে বাহ্যতঃ উপার্জনকারী এবং আন্তরিকভাবে উপার্জন থেকে আলাদা গণ্য হবে এবং সে গৃহে উপবেশনকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ তাওয়াক্কুলকারী বিবেচিত হবে।

শর্তসহ উপার্জন যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, তার প্রমাণ এই যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা মনোনীত হন, তখন কাপড়ের পুঁটলি বগলে দাবিয়ে বাজারে চলে যান। মুসলমানদের কাছে ব্যাপারটি খারাপ মনে হলে তারা আরয করল ঃ আপনি এরূপ করেন কেন? এখন তো আপনি পয়গাম্বর (সাঃ)-এর খলীফা। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি আমার পরিবারবর্গের জন্যে উপার্জন না করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি নিজের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিবারকেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তবে মুসলমানদেরকে রক্ষা করব কিরূপে? অতঃপর খলীফাকে ভাবনামুক্ত করার জন্যে মুসলমানরা তাঁর জন্যে একটি সাধারণ মুসলিম পরিবারের অনুরূপ ভাতা নির্ধারিত করে দেয়। তিনি যখন এর মধ্যেই মুসলমানদের মর্জি ও সন্তুষ্টি দেখতে পেলেন, তখন তাদের কাজেই তিনি নিজের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে শুরু করলেন।

এখন একথা বলা অসম্ভব যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাওয়াক্কুলের মকামে ছিলেন না। তাঁর চেয়ে বেশী তাওয়াক্কুলকারী আর কে ছিল? তিনি নিশ্চিতই তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন। তবে তাঁর তাওয়াক্কুল উপার্জন ও চেষ্টা-তদবীর না করার দিক দিয়ে ছিল না; বরং নিজের শক্তি-সামর্থের উপর ভরসা না করার দিক দিয়ে ছিল। তিনি আল্লাহ তা'আলাকেই জীবিকা সরবরাহকারী এবং উপায়াদির নিয়ন্ত্রক জ্ঞান করতেন। উপার্জনের পথে যে সকল শর্ত ছিল, সেগুলো তিনি পালন করতেন। অর্থাৎ, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উপার্জন করেই বিরত থাকতেন। অনেক উপার্জনের বাসনা করতেন না এবং সঞ্চয়ের লালসা করতেন না।

সংসারের প্রতি অনাসক্তি ছাড়া তাওয়াক্কুল ঠিক হয় না। হ্যাঁ, সংসার অনাসক্তি তাওয়াক্কুল ছাড়াও হতে পারে। কেননা, তাওয়াক্কুলের মকাম সংসার অনাসক্তির পরে। হযরত জুনায়দের পীর আবু জা'ফর হাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বিশ বছর পর্যন্ত তাওয়াক্কুলকে গোপন রেখেছি এবং বাজার থেকে আলাদা হইনি। আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এক দীনার উপার্জন করতাম; কিন্তু রাতের জন্যে একটি কানাকড়িও রাখতাম না। নিজের সুখের জন্যও তা থেকে কিছু ব্যয় করতাম না। হযরত জুনায়দ পীরের সামনে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেন না এবং বলতেন ঃ আপনি তাওয়াক্কুলের মকামে আছেন। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলতে আমি লজ্জাবোধ করি।

মানুষের হাত গুটিয়ে বসে থাকা উত্তম, না চলাফেরা করে কিছু উপার্জন করা উত্তম? এ প্রশ্নের জওয়াব এই, যদি উপার্জন ত্যাগ করলে যিকর, ফিকর ও এবাদতে সমস্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ পাওয়া যায়, মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লোভ না হয়; বরং সবর ও আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার ব্যাপারে অন্তর মযবুত থাকে, তবে ঘরে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বসে থাকাই উত্তম। আর যদি ঘরে বসে থাকলে মন চঞ্চল হয় এবং মানুষের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে কাজ-কর্ম করে উপার্জন করা উত্তম। কেননা, অন্তর দিয়ে মানুষের অপেক্ষা করা যেন অন্তর দিয়ে সওয়াল করা। এটা বর্জন করা কাজ-কর্ম বর্জন করার চেয়ে অধিক জরুরী। পূর্ববর্তী তাওয়াক্কুলকারীগণের রীতি ছিল যে, তারা মন যে বস্তুর লালসা করত, তা গ্রহণ করতেন না। সে মতে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একবার আবু বকর মরুযীকে বললেন ঃ অমুক ফকীরকে সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেবেন। তিনি বেশী মজুরি দিলে ফকীর তা ফিরিয়ে দিল এবং সেখান থেকে প্রস্থান করল। ইমাম আহমদ বললেন ঃ এখন গিয়ে তাকে দিয়ে দিন। সে গ্রহণ করবে। আবু বকর মরুযী গেলেন এবং মজুরি পেশ করতেই ফকীর তা গ্রহণ করল। অতঃপর ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ফকীর এখানে তা গ্রহণ করল না, সেখানে তা গ্রহণ করল, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ প্রথমে তার মনে বেশী পাওয়ার লালসা ছিল। তাই গ্রহণ করেনি। এখান থেকে প্রস্থান করার পর তার মন নিরাশ হয়ে গেল। তাই সে গ্রহণ করল।

মোটকথা, তাওয়াক্কুলকারী যখন বেশী পাওয়ার লোভ না করবে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ ও পুঁজির উপর ভরসা না করবে, তখন সে প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী হবে। পুঁজির উপর ভরসা না করার আলামত এই যে, যদি ধন-সম্পদ চুরি হয়ে যায় অথবা ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে যায়, তবে তাতেও সন্তুষ্ট থাকবে, মনের স্বস্তি বিনষ্ট হবে না এবং অন্তরে কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখা দেবে না। কেননা, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, মন যে বস্তুর সাথে জড়িয়ে না পড়ে, তা বিনষ্ট হয়ে গেলে মন চঞ্চল ও বিচলিত হয় না। এখন প্রশ্ন হয়, পুঁজি ছাড়া উপার্জন হয় না— একথা জানার পর পুঁজির সাথে অন্তর জড়িত না হওয়া কিরূপে সম্ভব? এর উত্তর হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে পুঁজি ছাড়া রিযিক দেন, তাদের সংখ্যা অনেক। আর যাদের কাছে পুঁজি থাকে, তাদেরও অনেকের পুঁজি চুরি হয়ে যায় অথবা অন্যভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। মনে-প্রাণে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে সে ব্যবহারই করবেন, যা আমার জন্যে মঙ্গলজনক। তিনি আমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিলে তাঁর মতে এতেই কল্যাণ নিহিত আছে। ধন-সম্পদ কাছে থাকলে তা সম্ভবত ধর্ম-কর্ম বিনষ্টের কারণ হত। ধর্ম-কর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দেয়া আল্লাহ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ। এসব বিষয়ে বিশ্বাস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গেলে পুঁজি থাকা না থাকা উভয়ই সমান হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে— কেউ রাতের বেলায় কোন একটি ব্যবসা করার ইচ্ছা করে, যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর থেকে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাকে সেই ব্যবসা থেকে বিরত রাখেন। প্রত্যুষে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বিষণ্ন মনে প্রতিবেশী অথবা অন্য কাউকে অলক্ষুণে সাব্যস্ত করে বলে ঃ আজ কার অশুভ মুখ দেখে বের হয়েছিলাম, যার ফলে আমার এই ব্যর্থতা; অথচ এটা তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার একটি অনুগ্রহ বৈ নয়। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ধনী হই কিংবা ফকীর— এতে আমার কোন পরওয়া নেই। কেননা, প্রাচুর্য ও দরিদ্রতার মধ্যে কোনটি আমার জন্যে মঙ্গলজনক, তা আমি জানি না।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী নয়, তার দ্বারা তাওয়াক্কুল সম্ভব নয়। এ কারণেই হযরত আবু সোলায়মান দারানী আহমদ ইবনে আবুল জাওয়ারীকে বললেন ঃ প্রত্যেক মকামেই আমার দখল আছে; কিন্তু তাওয়াক্কুলের গন্ধও আমি পাইনি। এতে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই, উচ্চস্তরের তাওয়াক্কুল তার হাসিল হয়নি।

সারকথা, তাওয়াক্কুলের মকাম দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু এটা মনের শক্তি ও বিশ্বাসের জোর দাবী করে। তাই হযরত সহল বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপার্জনের কারণে ভর্ৎসনা করে, সে সুন্নতকে ভর্ৎসনা করে। আর যে ব্যক্তি উপার্জন বর্জনের কারণে তিরস্কার করে, সে তাওহীদের প্রতি তিরস্কার করে।

এখন এমন প্রতিকার লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা অন্তরকে বাহ্যিক উপায়াদি থেকে ফিরিয়ে নিতে উপকারী এবং গোপন উপায়াদি সরবরাহ করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক। জানা উচিত যে, কুধারণা শয়তানের উপদেশ এবং সুধারণা আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা। সে মতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً وَّفَضْلًا -

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ করে। আর আল্লাহ্ আপন বখশিশ ও কৃপার অঙ্গীকার করেন।

কেননা, মানুষ মজ্জাগতভাবে শয়তানের ভীতি প্রদর্শনের আনুগত্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে। যখন তার মধ্যে ভীরুতা ও আন্তরিক দুর্বলতা বেড়ে যায়, তখন কুধারণা প্রবল হয়ে যায় এবং তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করতে থাকে। মসজিদের ইমাম তাকে বলল ঃ কিছু কাজ-কর্ম করে খেলে তোমার জন্যে ভাল হবে। আবেদ কোন উত্তর দিল না। ইমাম সাহেব তিনবার একই কথা বলে কোন জওয়াব পেল না। চতুর্থবার বলার পর আবেদ বলল ঃ মিয়া সাহেব, মসজিদের নিকটবর্তী জনৈক ইহুদী আমাকে প্রত্যহ দু'টি রুটি দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। ইমাম বলল ঃ যদি সে দায়িত্ব গ্রহণে সত্যবাদী হয়, তবে তোমার মসজিদে অবস্থান ভাল। আবেদ বলল ঃ আপনি কি আল্লাহ তা'আলার সামনে এবং মুসল্লীগণের সামনে এমন অসম্পূর্ণ তাওহীদ নিয়ে দণ্ডায়মান হন? ইমামতি না করাই আপনার জন্যে উত্তম। কারণ, আপনি ইহুদীর সত্য ওয়াদাকে আল্লাহ তা'আলার রিযিক সম্পর্কিত ওয়াদার উপর অগ্রাধিকার দেন।

একবার কোন এক মসজিদের ইমাম জনৈক মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথা থেকে খাওয়া-দাওয়া কর? মুসল্লী বলল ঃ একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে সে নামায পুনরায় পড়ে নেই, যা আপনার পেছনে পড়েছি। এরপর আপনার প্রশ্নের জওয়াব দেব।

গোপন উপায়াদির মাধ্যমে রিযিক প্রেরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা রাখার জন্যে সে সব কাহিনী শ্রবণ করা উপকারী, যাতে তাঁর অভূতপূর্ব কৃপা ও অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের ধন-সম্পদ বরবাদ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খাদেম ছিল হুযায়ফা মারআশী। তাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি হযরত ইবরাহীমের মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় কি দেখেছ? হুযায়ফা বলল ঃ আমরা একবার মক্কা মোয়াযযমার পথে খাদ্যাভাবে কয়েকদিন অভুক্ত থাকি। এরপর কুফায় পৌছে একটি উজাড় মসজিদে প্রবেশ করি। হযরত ইবরাহীম আমাকে দেখে বললেন ঃ মনে হয় তুমি খুব ক্ষুধার্ত। আমি বললাম ঃ আপনার ধারণা যথার্থ। তিনি বললেন ঃ কাগজ ও কালি নিয়ে এস। আমি কাগজ ও কালি নিয়ে এলে তিনি তাতে লিখলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— সর্বাবস্থায় তুমিই লক্ষ্য এবং সবকিছুতে তুমিই প্রার্থিত। অতঃপর নিজেদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুরবস্থা ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা সম্বলিত কয়েক লাইন কবিতা লিখে চিরকুটটি আমার হাতে অর্পণ করে বললেন ঃ বাইরে যাও এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারও সাথে মন লাগিও না। পথে সর্বপ্রথম যাকে পাবে, তাকেই এই চিরকুট দেবে। আমি বের হলাম এবং সর্বপ্রথম যাকে পেলাম, সে ছিল খচ্চর আরোহী। আমি তাকে চিরকুটটি দিলে সে তা পাঠ করে কান্নাকাটি করল। সে প্রশ্ন করল ঃ এই চিরকুট লেখক এখন কোথায় আছেন? আমি বললাম ঃ অমুক মসজিদে। সে আমার হাতে একটি থলে দিল, তাতে ছয়শ' দীনার ছিল। এরপর কিছুদূর এগুতেই আমি অন্য এক ব্যক্তিকে দেখলাম। আমি তার কাছে প্রথম ব্যক্তির অবস্থা জানতে চাইলে সে বলল ঃ সে একজন খৃস্টান।

অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ এখনই এসব দীনার স্পর্শ করবে না। লোকটি এক্ষণি আসবে। এরপর এক মুহূর্ত অতিবাহিত হতেই সে খৃস্টান এল এবং হযরত ইবরাহীমের মস্তক চুম্বন করতে লাগল।

আবু এয়াকুব বসরী বলেন ঃ আমি একবার হেরেম শরীফে দশদিন ক্ষুধার্ত ছিলাম। ফলে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। মনে মনে বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম এবং দুর্বলতা দূর করার জন্যে কিছু পাব ভেবে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে আমি একটি শালগম মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তা তুলে নিলাম। কিন্তু সেটা খেতে কেন জানি আমার মন প্রস্তুত হল না। অতঃপর মনে হল কে যেন আমাকে বলছে— তুমি দশদিনের ভুখা থেকে অবশেষে একটি পচা শালগম তুলে নিলে? আমি শালগমটি ফেলে দিয়ে আবার হেরেম শরীফে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, এক অনারব আমার দিকে চলে আসছে। সে এসে আমার সামনে বসে গেল এবং একটি পুঁটলি আমার সামনে রেখে বলল ঃ এটা আপনার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম— আপনি এটা বিশেষভাবে আমাকে দিলেন কেন? সে বলল ঃ আসলে ঘটনা হল, আমরা দশদিন সমুদ্রে ছিলাম। আমাদের জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আমি মানত করলাম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন, তবে আমি এই পুঁটলি কা'বার খাদেমদের মধ্য থেকে তাকেই দেব, যার উপর আমার প্রথম দৃষ্টি পড়বে। এখন আপনাকেই আমি সর্বপ্রথম দেখেছি। সুতরাং বিশেষভাবে আপনাকে দেয়ার এটাই কারণ। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, এটা খুলুন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খোলার পর দেখা গেল তাতে মিসরের ময়দা, খোসা ছাড়ানো বাদাম এবং বরফী (চিনি দুধ দ্বারা তৈরী এক প্রকার মিষ্টি) ছিল। আমি প্রত্যেক প্রকার থেকে এক এক মুষ্টি নিয়ে বললাম ঃ অবশিষ্টটুকু আমার পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গীদেরকে উপহার দেবেন। আমি আপনার মানত কবুল করলাম। এরপর আমি মনে মনে বললাম ঃ তোমার রিযিক তো দশ মনযিল দূর থেকে চলে তোমার কাছে আসে, আর তুমি জঙ্গলে তা তালাশ কর!

আবু সাঈদ সেরায বলেন ঃ আমি পাথেয় ছাড়াই এক জঙ্গলে গেলাম এবং উপোসের পর উপোস করতে লাগলাম। একদিন দূরে একটি মনযিল দেখে এই ভেবে খুশী হলাম যে, আর দেরী নয়— এই তো পৌঁছে গেলাম। পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করলাম, আমি গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করেছি। তখনই কসম খেলাম, আমি এই জনপদে যাব না, যে পর্যন্ত কেউ নিজে আমাকে না নিয়ে যায়। অতঃপর আমি নিজের জন্যে বালুর মধ্যে একটি গর্ত খনন করে তাতে নিজের দেহ বুক পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। মাঝরাতে সেখানকার লোকেরা শুনতে পেল, কে যেন উচ্চস্বরে বলছে— হে বস্তিবাসীরা! আল্লাহ্ তা'আলার একজন ওলী নিজেকে এই বালুর মধ্যে বন্দী করে নিয়েছে। তোমরা তার খবর নাও। অতঃপর কয়েকজন লোক এসে আমাকে টেনে বালু থেকে বের করল এবং বস্তিতে নিয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরজায় পড়ে থাকত। একদিন হঠাৎ সে শুনল ঃ তুমি ওমরের উদ্দেশে হিজরত করেছিলে, না আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে? যাও এবং কোরআন শিখ। কোরআন তোমাকে ওমরের দরজা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে। লোকটি তখনই সেখান থেকে প্রস্থান করল এবং নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। হযরত ওমর তার খোঁজ করালেন। জানা গেল, সে নির্বাস অবলম্বন করেছে এবং এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাকে দেখার জন্যে আমার খুব বাসনা হয়েছিল। কি কারণে তুমি আমার সাথে দেখা কর না? সে বলল ঃ আমি কোরআন শিখেছি। কোরআনই আমাকে ওমর ও ওমর পরিবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি কালামে মজীদে কি পেয়েছ? লোকটি বলল ঃ আমি পেয়েছি — وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

অর্থাৎ, 'আকাশে নিহিত রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমাদেরকে দেয়া হয়।' তখন আমি ভাবলাম, আমার রিযিক তো আকাশে। আমি এটা পৃথিবীতে খুঁজলে কোথায় পাব? হযরত ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ তোমার কথা ঠিক। এরপর থেকে তিনি লোকটির কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন।

আবু হামযা খোরাসানী বলেন ঃ এক বছর আমি হজ্জে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ এক কুয়ায় পড়ে গেলাম। আমার মন বলল ঃ সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা দরকার। কিন্তু আমি বললাম, আল্লাহর কসম, কখনও ফরিয়াদ করব না। এমন সময় দু'ব্যক্তি সে কুয়ায় এল। তাদের একজন অন্যজনকে বলল এস, এই কুয়ার মুখ বন্ধ করে দেই, যাতে কেউ এতে না পড়ে যায়। এরপর তারা বাঁশ ও চাটাই এনে কুয়ার মুখ বন্ধ করে দিল। আমি চীৎকার করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আবার ভাবলাম, যার কাছে চীৎকার করব, তিনি তো এই ব্যক্তিদ্বয়ের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই চুপ করে রইলাম। এর এক মুহূর্ত পরেই সেখানে কি যেন এল এবং কুয়ার মুখ খুলে পা ভেতরে নামিয়ে দিল। সে গুন্‌গুন্‌ শব্দে আমাকে বলল ঃ আমার পা জড়িয়ে ধর। আমি তাই করলাম। বাইরে আসার পর দেখি সেটি এক হিংস্র প্রাণী। প্রাণীটি তৎক্ষণাত সেখান থেকে চলে গেল। তখন গায়বী আওয়াজ শুনলাম, হে আবু হামযা! দেখ, আমি তোমাকে মৃত্যুর সাহায্যেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলাম।

এমনি ধরনের অসংখ্য গল্প ও কাহিনী রয়েছে। কত উল্লেখ করা যায়! যদি ঈমান মযবুত হয়, এক সপ্তাহ অনাহারে থাকার ক্ষমতা থাকে এবং এই বিশ্বাসও পাকাপোক্ত হয় যে, সাতদিন পর্যন্ত রিযিক না পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মৃত্যুই উত্তম, তবে এসব গল্প-কাহিনী শুনে তাওয়াক্কুল পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। নতুবা দুর্বল ঈমান সহকারে এসব ঘটনা মোটেই উপকারী নয়।

এখন সন্তান-সন্ততিবিশিষ্ট ও ছাপোষা ব্যক্তির তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রকাশ থাকে যে, ছাপোষা ব্যক্তির বিধান একা এক ব্যক্তির বিধান থেকে আলাদা। কেননা, একা এক ব্যক্তির তাওয়াক্কুল দু'টি বিষয় ছাড়া জায়েয নয়। এক, সপ্তাহকাল পর্যন্ত মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা না করে এবং মনেও সংকীর্ণতা অনুভব না করে কোন কিছু না খেয়ে থাকতে সক্ষম হওয়া। দুই, উপরে যে সকল বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো অর্জিত হওয়া। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, রিযিক পাওয়া না গেলে মৃত্যুর জন্যে এই ভেবে আন্তরিকভাবে সম্মত থাকা যে, এ ক্ষেত্রে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃত্যুই রিযিক। অর্থাৎ, তার জন্যে যে রিযিক উত্তম, অর্থাৎ আখেরাতের রিযিক, তাই সে পাবে। একা এক ব্যক্তির তাওয়াক্কুল এভাবেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ছাপোষা ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন। তার সন্তান-সন্ততিকে খামাখা ক্ষুধায় সবর করার জন্যে চাপ দেয়া জায়েয নয়। তাদের সামনে তাওহীদের পন্থায় বক্তৃতা দেয়াও সম্ভব নয় যে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করা একটি উত্তম ও ঈর্ষাযোগ্য রিযিক। এমনিভাবে অন্যান্য বিশ্বাসও তাদের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। অতএব, ছাপোষা ব্যক্তির জন্যে উপার্জনকারীর অনুরূপ তাওয়াক্কুল করাই সমীচীন, যা তাওয়াক্কুলের তৃতীয় স্তর। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তাওয়াক্কুল এমনি ছিল। তিনি জীবিকার জন্যে বাজারে রওয়ানা হয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাওয়া এবং তাওয়াক্কুলের বাহানায় তাদের খবরদারী না করা হারাম। কেননা, মাঝে মাঝে এটা তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, যার দায়িত্ব থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুক্তি পাবে না। হাঁ, যদি সন্তান-সন্ততিও কিছুদিন ভুখা থাকা মেনে নেয় এবং ক্ষুধায় মৃত্যুবরণকে রিযিক ও সৌভাগ্য মনে করে, তবে তার জন্যে তাওয়াক্কুল করা জায়েয।

মানুষের নফ্স তথা মনও তার সন্তান। একে বিনষ্ট করাও জায়েয নয়। যদি ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা নফসের না থাকে এবং ক্ষুধার কারণে মন অস্থির থাকে— ঠিকমত এবাদত হতে না পারে, তবে এরূপ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে, আবু তোরাব বখশী এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার পর খাওয়ার জন্যে তরমুজের ছাল তুলে নিয়েছে। তিনি তাকে বললেন ঃ তাসাওউফ তোমার জন্যে উপযুক্ত নয়। তুমি বাজারে গিয়ে কাজ-কর্ম কর। অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল ছাড়া তাসাওউফ হয় না। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী পানাহার থেকে সবর করতে পারে, তারই তাওয়াক্কুল করা সাজে। হযরত আলী রুদবারী বলেন ঃ যদি কেউ পাঁচ দিন পরেই বলতে থাকে, সে ক্ষুধার্ত, তাকে বাজারে গিয়ে কাজ-কর্ম করতে বল।

মানুষের দেহও তার সন্তান। দেহের জন্যে ক্ষতিকর বস্তুতে তাওয়াক্কুল করা সন্তানের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করার অনুরূপ। নফ্স ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে মানুষ যদি ক্ষুধায় সবর করার জন্যে নফসের উপর চাপ দেয়, তবে তা জায়েয; কিন্তু সন্তান-সন্ততিকে চাপ দেয়া নাজায়েয।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, উপায়াদি থেকে সরে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং দীর্ঘদিন ক্ষুধায় সবর করতে অভ্যস্ত হওয়া এবং ঘটনাক্রমে কোন সময় রিযিক আসতে বিলম্ব হলে মৃত্যুবরণে সম্মত থাকার নামই তাওয়াক্কুল।

যে ব্যক্তি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যাবলী নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে, সে নিশ্চিতরূপে জানে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর ভেতরে এমন ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, যাতে মানুষের কাছ থেকে তার রিযিক বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, যদি সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে। কেননা, যে মানুষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার ক্ষমতাই রাখে না, সে-ও তো রিযিক পায়। যেমন, শিশু তার মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার রিযিকের ব্যবস্থাকল্পে তার নাভি মায়ের নাভির সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন! ফলে মায়ের খাদ্য থেকে কিছু অংশ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তা নলের সাহায্যে শিশুর পেটে পৌছানো হয়। অথচ এতে শিশুর কোন কলাকৌশল নেই।

এরপর শিশু যখন মায়ের গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন মায়ের মনে এমন স্নেহ ও দয়ার্দ্রতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়, যার ফলে সে অহরহ শিশুর ভরণপোষণে নিয়োজিত থাকে। এই ভরণ-পোষণ করতে সে বাধ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই তার অন্তরে মায়া-মমতার দুর্নিবার অনল জ্বালিয়ে রাখেন। খাদ্য চিবানোর জন্যে যেহেতু শিশুর মুখে দাঁত থাকে না, তাই তার খাদ্য দুধ নির্দিষ্ট করা হয়, যা চিবানোর প্রয়োজন হয় না। শিশু তার নরম গঠন প্রকৃতির কারণে ঘন খাদ্য সহ্য করতে পারে না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে মায়ের স্তন থেকে পাতলা দুধ তার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। জিজ্ঞাসা করি, এতে শিশুর কোন চেষ্টা-তদবীর এবং মায়ের কোন কলাকৌশল থাকে কি?

এরপর যখন শিশু ঘন খাদ্য খাওয়ার বয়সে পৌছে, তখন তার মুখে চিবানোর জন্যে দাঁত, চোয়াল ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। এরপর যখন আরও বড় হয় এবং নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করতে পারে, তখন তার জন্যে জ্ঞানার্জন ও আখেরাতের দিকে চলার পথ সুগম করে দেয়া হয়। এখন সাবালক হওয়ার পর রিযিকের জন্যে ভীরুতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা চরম মূর্খতা নয় কি? কেননা, সাবালক হওয়ার পর তার জীবিকার উপায়াদি হ্রাস পায়নি; বরং অনেক বেড়ে গেছে। প্রথমে সে উপার্জন করতে সক্ষম ছিল না। এখন সে ক্ষমতা এসে গেছে। পূর্বে তার প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ ও বাৎসল্য প্রদর্শনকারী ছিল মাত্র পিতামাতা। এখন আল্লাহা তা'আলা সে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মায়া-মমতা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সমস্ত মুসলমান ও সমস্ত নগরীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে করুণায় তার হৃদয় ভরে যায়, তার প্রতি দয়ার্দ্র হয় এবং তার অভাব মোচনে আগ্রহী হয়। সুতরাং পূর্বে তার প্রতি স্নেহশীল ছিল মাত্র একজন, আর এখন হাজারো। এতীমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা এক ব্যক্তি অথবা অনেক ব্যক্তির অন্তরে তার প্রতি করুণা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে এতীমকে নিজের কাছে এনে ভরণ-পোষণ করায়। দুর্মূল্যের বাজারেও আজ পর্যন্ত শুনা যায়নি, কোন এতীম অনাহারে ও অযত্নে মারা গেছে। অথচ সে নিজের ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা বোধ করে না এবং তার কোন বিশেষ ভরণ-পোষণকারী থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ভরণ-পোষণ সেই করুণার মাধ্যমেই করেন, যা তিনি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অনেক এতীমকে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, যা পিতামাতা বর্তমান আছেন এমন শিশুদের জন্যেও সহজলভ্য নয়।

এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি কারণে মানুষ এতীমের ভরণ-পোষণ করে। তা এই যে, মানুষ তাকে বাল্যাবস্থার কারণে অক্ষমও অপারগ মনে করে। কিন্তু কর্মক্ষম সাবালক ব্যক্তির প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। তার সম্পর্কে বলা হয়, সে সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হয়েও নিজের জন্যে উপার্জন করে না কেন? ফলে সে যাবতীয় করুণা ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত থাকে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, যদি সাবালক ব্যক্তি অলস ও বেকার হয়, তবে তার জন্যে তাওয়াক্কুলের কোন অর্থ নেই, তার উচিত উপার্জন করে খাওয়া। পক্ষান্তরে যদি সে কোন মসজিদে অথবা কক্ষে আল্লাহর কাজে মশগুল থাকে, জ্ঞানচর্চা করে অথবা এবাদতে নিয়োজিত থাকে, তবে তাকে কোন ব্যক্তিই তিরস্কার করে না যে, তুমি উপার্জন কর না কেন? বরং আল্লাহর কাজে মশগুল থাকার কারণেই মানুষের অন্তরে তার প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তারাই তার প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ করতে থাকে। তার দায়িত্ব কেবল এতটুকুই থাকে যে, মানুষের সামনে তার দরজা বন্ধ রাখবে না এবং তাদের কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে জঙ্গলে ও পাহাড়ে পলায়ন করবে না। কোন আলেম ও আবেদ শহরে থেকে সর্বক্ষণ আল্লাহর কাজে মশগুল থাকার পর অনাহারে মারা গেছে আজ পর্যন্ত একথা শুনা যায়নি, বরং এ ধরনের ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আরও দশ জনকে কেবল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইশারার মাধ্যমে খাওয়াতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহও তার হয়ে যান। যে আল্লাহর কাজে মশগুল থাকে, আল্লাহও তার মহব্বত মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন এবং মানুষের অন্তরকে তার এমন বশীভূত করে দেন, যেমন মায়ের অন্তর সন্তানের জন্য। তবে আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা করেননি যে, যে ব্যক্তি তার কাজে মশগুল থাকবে, সে সুমিষ্ট হালুয়া, কোরমা, পোলাও ও আকর্ষণীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সদাসর্বদা পেতে থাকবে; যদিও মাঝে মাঝে এসব পাওয়া যায়। তবে তিনি এই ব্যবস্থা অবশ্যই রেখেছেন যে, সে প্রতি সপ্তাহে যবের রুটি অথবা শাক, তরকারি ব্যঞ্জন অবশ্যই পাবে। অধিকাংশ সময় প্রয়োজনের অতিরিক্তও মিলে। এখন যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল বর্জন করে, সে শুধু এ কারণে বর্জন করে যে, তার মন সর্বদা আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, উত্তম পোশাক ও চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যের প্রতি অনুমুখ। আখেরাতের পথে এসব বিষয়ের কোন মূল্য নেই এবং এগুলো উৎকণ্ঠা ছাড়া সহজলভ্য নয়। উৎকণ্ঠার মাধ্যমেও যৎকিঞ্চিতই অর্জিত হয়।

অতএব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে চেষ্টা ও উৎকণ্ঠার প্রভাব দুর্বল। এ কারণে এরূপ ব্যক্তি নিজের কলাকৌশল ও উৎকণ্ঠার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে না; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কৌশল দ্বারাই শান্তি লাভ করে, যিনি মানুষের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, কোন মানুষের রিযিক থেকে যায় না এবং কেউ নিজের রিযিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে কদাচিৎ রিযিক পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যায়, যা খুবই বিরল ঘটনা। কৌশল ও উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও তো মাঝে মাঝে বিলম্ব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এসব বিষয় হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করবে এবং সাথে সাথে অন্তরে বীরত্বও থাকবে, তার অবস্থা হযরত হাসান বসরীর অনুরূপ হবে। তিনি বলেন, আমার মন চায়, বসরার সমস্ত অধিবাসী আমার পরিবারভুক্ত হোক অর্থাৎ, সকলের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্বে থাকুক। হযরত ওয়াহাব ইবনে ওয়ার্দ বলেন ঃ যদি আকাশ তামা এবং পৃথিবী রাঙতা হয়ে যায়, তারপরও যদি আমি রিযিকের জন্যে যত্নবান হই, তবে আমার ধারণায় আমি মুশরিক।

এসব বিষয় অনুধাবন করার পর পাঠকবর্গের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাওয়াক্কুল একটি বোধগম্য বিষয়। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী, তার জন্যে তাওয়াক্কুলে পৌঁছা সম্ভব। আরও বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল ও তার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে, তার অস্বীকার আদ্যোপান্ত মূর্খতা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রিয় পাঠক, আপনারা তাওয়াক্কুলের অস্তিত্ব ও সম্ভাব্যতার বিশ্বাস হারিয়ে বসবেন না। প্রত্যেকের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা এবং দিনাতিপাতের জন্যে যা দরকার, তা নিয়েই রাযী থাকা। এ পরিমাণ রিযিক প্রত্যেকের কাছে আসবে, যদিও সে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কেউ এরূপ বিশ্বাস সহকারে জীবন যাপন করলে আল্লাহ্ পাক এরূপ ব্যক্তির হাতে তার রিযিক পাঠিয়ে দেবেন, যার সম্পর্কে পূর্বে ধারণাও করা যায় না। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলে মশগুল হওয়ার পর অভিজ্ঞতার দ্বারা এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করা যাবে—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং ধারণাতীত স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনায় রিযিকের যে সব গোপন উপায় রয়েছে, তা মানুষের জানা উপায়াদির তুলনায় অনেক বেশী; বরং রিযিক আসার পথ অসংখ্য। কেউ এসব পথ বর্ণনা করতে পারে না। কেননা, এগুলোর প্রকাশ পৃথিবীতে এবং কারণ আকাশে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আকাশে নিহিত আছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

আকাশের রহস্য সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। এর কারণেই এক দল লোক হযরত জুনায়দের খেদমতে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি খুঁজছ? তারা বলল ঃ আমরা রিযিক খুঁজছি। তিনি বললেন ঃ যদি এর স্থান তোমাদের জানা থাকে, তবে খোঁজ। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাইব। হযরত জুনায়দ বললেন ঃ যদি তোমরা মনে কর, তিনি তোমাদেরকে ভুলে যাবেন, তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দাও। তারা আরয করল ঃ আচ্ছা, আমরা ঘরে বসে থেকে তাওয়াক্কুল করব। এরপর কি হয় দেখব। তিনি বললেন ঃ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে তাওয়াক্কুল করা সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত। তারা আরয করল ঃ তা হলে আমরা কি করব? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ চেষ্টা-তদবীর পরিহার কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আহমদ ইবনে ঈসা খেরায বলেন ঃ একবার জঙ্গলে অবস্থানকালে আমার খুব ক্ষুধা লাগল। আমার মনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করার প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু আমি বললাম ঃ এটা তাওয়াক্কুলকারীদের কাজ নয়। তখন মন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবর প্রার্থনা করার উপর জোর দিল। আমি যখন সবরের দোয়া করার ইচ্ছা করলাম, তখন গায়েবী আওয়াজ হল— তুমি আমার নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা রাখ। যে আমার নিকটবর্তী হয়, সে ধ্বংস হতে পারে না। তুমি সংকটে পড়ে সবর প্রার্থনা করছ। মনে হয়, আমি তোমাকে দেখি না এবং তুমি আমাকে দেখ না।

সারকথা, পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল হচ্ছে বান্দার তরফ থেকে অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত রিযিক পৌঁছানো। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সাচ্চা। কেউ পরীক্ষা করতে চাইলে অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করে দেখে নিতে পারে।

প্রখ্যাত আলেম ও আবেদ ব্যক্তি যদি দিনে একবার যে কোন ধরনের খাদ্য দ্বারা এবং ধর্মপরায়ণদের জন্যে উপযুক্ত মোটা বস্ত্র দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে, তবে এই পরিমাণ বস্তু সর্বদাই তার কাছে ধারণাতীত স্থান থেকে পৌঁছে যাবে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল বর্জন করা এবং উপার্জনে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর কথা। অবশ্য কেউ যদি অন্যের হাতে খেতে না চায় বরং নিজে উপার্জন করে খেতে চায়, তবে এটা সেই আলেমের জন্যে সমীচীন, যে বাহ্যিক এলেম ও আমল অনুযায়ী চলে এবং বাতেনী জগতের খবর রাখে না। কেননা, জীবিকার চিন্তা বাতেনী জগতের পরিপন্থী। অতএব, যে বাতেনী জগতে ভ্রমণ করে, তার জন্যে আধ্যাত্মিক কাজে মশগুল হওয়া এবং নিজ আগ্রহে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণকারীদের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করা উত্তম। কেননা, এতে করে সে জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলারই হয়ে থাকবে। এছাড়া সে দাতার সওয়াব লাভে সহায়ক হবে। আল্লাহ্ তা'আলার অব্যাহত রীতির প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায়, যে পরিমাণ উপায় অবলম্বন করা হয়, সে পরিমাণ রিযিক আসে না। এ কারণেই জনৈক পারস্য সম্রাট এক দার্শনিককে প্রশ্ন করলেন, কিছু কিছু নির্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত রিযিক দেয়া হয় এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে, এর কারণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কি? দার্শনিক জওয়াব দিলেন ঃ স্রষ্টার ইচ্ছা হল, মানুষ তাঁকে চিনুক। তাই এভাবে রিযিক দেয়া হয়েছে। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রিযিক পেত এবং নির্বোধ বঞ্চিত থাকত, তবে মানুষ মনে করত, বুদ্ধি বুদ্ধিমানকে রিযিক দিয়েছে। ব্যাপার যখন উল্টো হয়েছে, তখন সকলেই জেনেছে রিযিকদাতা বুদ্ধি নয়— অন্য কেউ।

এক্ষণে তাওয়াক্কুল ও উপায়াদি সম্পর্কে একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সামনে তাঁর সৃষ্টি মানবকুল কোন রাজকীয় প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিশাল ময়দানে দাঁড়ানো অগণিত ভিক্ষুকের মত। বাদশাহ তার গোলামদের কাছে রুটি দিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ কোন কোন ভিক্ষুককে দুটি এবং কোন কোন ভিক্ষককে একটি করে রুটি দেবে। আর চেষ্টা করবে, যাতে কেউ রুটি থেকে বঞ্চিত না হয়। এরপর বাদশাহ জনৈক ঘোষককে একথা ঘোষণা করতে বললেন, তোমরা সকলেই নিজ নিজ জায়গায় সুস্থিরে দাঁড়িয়ে থাক এবং আমার গোলামদের জড়িয়ে ধরো না। তারা নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের কাছে রুটি পৌঁছে দেবে। যে ব্যক্তি গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং তাদের কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করবে, সে দু'রুটি নিয়ে চলে যাবে ঠিক, কিন্তু আমি তার পেছনে একটি গোলাম নিয়োজিত করব এবং এর শাস্তি সে দিন দেব, যে দিনকে আমি এর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি। সে দিনটি কবে আসবে, তা আমি কাউকে বলি না। আর যে ব্যক্তি গোলামদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদের কাছ থেকে এক রুটি নিয়ে চুপচাপ চলে যাবে, তাকে আমি সেই একই দিনে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করব। যে ব্যক্তি নিজ স্থানেই দণ্ডায়মান থেকে দুটি রুটি পাবে, তাকে শাস্তিও দেব না, পুরস্কারও দেব না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোলামদের কাছ থেকে কোন রুটি না পেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়বে, গোলামদের প্রতি রাগান্বিত হবে না এবং রুটি পাওয়ার বাসনাও করবে না, আমি তাকে নিজের উযীর নিযুক্ত করব এবং দূরকারী ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত করব।

উপরোক্ত ঘোষণা শোনার পর ভিক্ষুকরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে প্রতিশ্রুত শাস্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা বলল ঃ আজ থেকে কাল পর্যন্ত অনেক সময়। আমাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ক্ষুধা এ মুহূর্তেই। এই বলে তারা গোলামদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুটি করে রুটি নিয়ে গেল। ফলে তারা প্রতিশ্রুত শাস্তির যোগ্য হয়ে গেল। ভিক্ষুকদের দ্বিতীয় দলটি শাস্তির ভয়ে গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরল না; কিন্তু তীব্র ক্ষুধার কারণে রুটি দুটিই নিয়ে নিল। ফলে তারা শাস্তির কবল থেকে রক্ষা পেল এবং পুরস্কারও পেল না। তৃতীয় দল বলল ঃ গোলামদের দৃষ্টিপথে বসা উচিত, যাতে তারা আমাদেরকে ছেড়ে না যায়। কিন্তু রুটি একটিই গ্রহণ করা উচিত— দুটি নয়। হয়তো আমরা পুরস্কার পাব। সে মতে তারা ওয়াদা অনুযায়ী পুরস্কারের যোগ্য হল। ভিক্ষুকদের চতুর্থ দলটি ময়দানের কোণে কোণে আত্মগোপন করে গোলামদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ যদি আমাদেরকে খুঁজে বের করেই ফেলে, তবে একটিমাত্র রুটি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। আর যদি ধরা না পড়ি, তবে সারারাত ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করলে উযীরের পদ ও বাদশাহের নৈকট্য লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা সফল হল না। গোলামরা প্রতি কোণে কোণে তালাশ করে তাদেরকে বের করে ফেলল এবং একটি করে রুটি পৌঁছে দিল। প্রত্যহ এমনি ধারা অব্যাহত রইল। কয়েকদিন পর ঘটনাক্রমে তাদের তিন ব্যক্তি এক কোণে লুকিয়ে রইল। গোলামদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল না। ফলে তারা তীব্র ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাদের দু'ব্যক্তি বলল ঃ গোলামদের সামনে গেলেই আমাদের জন্যে ভাল হত। আমরা সবর করতে পারছি না। তৃতীয় ব্যক্তি কিছুই বলল না এবং ভোর হয়ে গেল। সে-ই উযীরের পদ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হল।

এই দৃষ্টান্তে ময়দান হচ্ছে পার্থিব জীবন, অজ্ঞাত মেয়াদ হচ্ছে কেয়ামত দিবস এবং উযীর পদের ওয়াদা হচ্ছে শাহাদতের অঙ্গীকার, যা তাওয়াক্কুলকারীর প্রাপ্য। কিন্তু শর্ত হল, ক্ষুধায় সম্মত অবস্থায় ওফাতপ্রাপ্ত হওয়া। এই অঙ্গীকারের প্রতিপালন কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত হবে না। কেননা, শহীদগণ আল্লাহ তা'আলার কাছে জীবিত থাকেন এবং রিযিক পান। বাদশাহের অনুগত গোলাম দ্বারা উপায়াদি বুঝানো হয়েছে। গোলামদেরকে জড়িয়ে ধরার অর্থ হল, উপায়াদি অবলম্বনে সীমা অতিক্রম করা। যারা ময়দানের মাঝখানে গোলামদের দৃষ্টিপথে স্থির বসে আছে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা সেসব লোক, যারা শহরের খানকা ও মসজিদে বসে থাকে। কোণে আত্মগোপনকারী তারা, যারা তাওয়াক্কুল করে লোকালয় ত্যাগ করে এবং জঙ্গলে ভ্রমণ করে। উপায়াদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তারা রিযিক পেয়ে যান। না পাওয়া খুবই বিরল। তাদের মধ্যে কেউ ক্ষুধার্ত ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মারা গেলে সে শাহাদত ও নৈকট্য লাভ করে।

মানুষের মধ্যে সম্ভবত শতকরা নব্বই জন উপায়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাত জন এমন, যারা শহরে অবস্থান করে এবং নিজের সুখ্যাতির মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে। অবশিষ্ট তিন জন জঙ্গলে ঘুরাফেরা করে। তাদের দু'জন উপায়াদি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ এবং কেবল একজন নৈকট্য লাভে সক্ষম। সম্ভবত অতীত যমানায় এই পরিসংখ্যান হবে। আজকাল তো দশ হাজারের মধ্যে একজনও উপায়াদি বর্জন করে না।

(২) দ্বিতীয় ভাগে উপকারী বস্তুসমূহ সঞ্চয় ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্র, উপার্জন অথবা অন্য কোন উপায়ে ধনপ্রাপ্ত হয়, তার জন্যে সেই ধন সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে তিনটি অবস্থা রয়েছে। এক, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত হলে খাবে, বস্ত্রহীন হলে পরবে এবং গৃহের প্রয়োজন হলে গৃহ ক্রয় করবে। অবশিষ্ট যা থাকবে, তা তৎক্ষণাৎ দান করে দেবে। প্রয়োজনের এই পরিমাণ ছাড়া গ্রহণ করবে না এবং নিজের কাছে সঞ্চিত রাখবে না। রাখলেও এ নিয়তেই রাখতে পারবে। এরূপ ব্যক্তি বাস্তবে তাওয়াক্কুলের দাবী পূরণকারী। এটা সর্বোচ্চ অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা হল, প্রাপ্ত ধন-সম্পদ এক বছর অথবা আরও বেশী সময়ের জন্যে সংরক্ষিত রাখা। এ অবস্থা তাওয়াক্কুলকে বাতিল করে দেয় এবং এরূপ ব্যক্তি কিছুতেই তাওয়াক্কুলকারী নয়। কেউ কেউ বলেন ঃ কেবল তিন প্রকার প্রাণী সঞ্চয় করে থাকে— ইঁদুর, পিঁপড়া ও মানুষ। তৃতীয় অবস্থা হল, চল্লিশ দিন অথবা তারও কম সময়ের জন্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা। এ অবস্থা মানুষকে তাওয়াক্কুলকারীদের জন্যে প্রতিশ্রুত প্রশংসনীয় মকাম থেকে বঞ্চিত করে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ এ অবস্থা মানুষকে তাওয়াক্কুলের আওতা থেকে বের করে দেয়। খাওয়াস বলেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধন-সম্পদ রেখে দিলে মানুষ তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয়ে যায় না। এর বেশী দিন রাখলে খারিজ হয়। আবু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তালেব মক্কী বলেন ঃ চল্লিশ দিনের বেশী রাখলেও তাওয়াক্কুল থেকে খারিজ হয় না। মূল সঞ্চয় যখন বৈধ, তখন এই মতভেদের কোন অর্থ নেই। হাঁ, কেউ মনে করতে পারে, সঞ্চয় করাই মূলত তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। অতএব সঞ্চয় না করাই উত্তম। যদি মনের দুর্বলতার কারণে সঞ্চয় করতেই হয়, তবে সঞ্চয় যত কম হবে, ততই উত্তম। হাদীসে জনৈক ফকীরের কিস্‌সা বর্ণিত আছে। মৃত্যুর পর তার গোসল দেয়ার জন্যে রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসামা (রাঃ)-কে নির্দেশ করেন। তাঁরা তাকে গোসল দিয়ে যখন তারই চাদর দিয়ে তাকে কাফন পরালেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন যখন উঠবে, তখন তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত আলোকোদ্ভাসিত হবে। যদি একটি অভ্যাস তার মধ্যে না থাকত, তবে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে উঠত। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ সেটি কি অভ্যাস? তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি রোযাদারও ছিল, তাহাজ্জুদও পড়ত এবং আল্লাহ তা'আলার যিকিরও খুব করত। কিন্তু যখন শীতকাল আসত, তখন গ্রীষ্মকালীন কাপড়-চোপড় পরবর্তী গ্রীষ্মকালের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখত। এরপর যখন গ্রীষ্মকাল আসত, তখন শীতকালীন বস্ত্র পরবর্তী শীতকালের জন্যে রেখে দিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন ঃ

من اقل ما اوتيتم منه اليقين وعزيمة الصبر -

অর্থাৎ, যে বস্তু তোমাদেরকে স্বল্প পরিমাণে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে একীন তথা বিশ্বাস এবং সবরের দৃঢ়তা।

লোটা-বদনা, ঘটিবাটি, দস্তরখান ইত্যাদি যেসব বস্তু সর্বক্ষণ কাজে লাগে, সেগুলো এসবের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, এগুলো রেখে দেয়া তাওয়াক্কুলের মর্তবা হ্রাস করে না। কিন্তু শীতকালীন কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন গ্রীষ্মকালে থাকে না। এ বিধান সে ব্যক্তির জন্যে, যার অন্তর সঞ্চয় বর্জন করার কারণে উদ্বিগ্ন হয় না। পক্ষান্তরে যদি সঞ্চয় না করলে মন অস্থির থাকে এবং এবাদত ও যিকির-ফিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তার পক্ষে সঞ্চয় করাই উত্তম। কেননা, অন্তরের সংশোধনই উদ্দেশ্য, যাতে সে আল্লাহর যিকিরের জন্যে প্রস্তুত থাকে। বলা বাহুল্য, রসূলে আকরাম (সাঃ) সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারিগর ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিও ছিল। তিনি ব্যবসায়ীকে ব্যবসা ত্যাগ করার হুকুম দেননি এবং কোন পেশাদারকে তার পেশা বর্জন করতে বলেননি। যারা এসব বিষয় বর্জনকারী ছিল, তাদেরকেও তিনি ব্যবসা অথবা পেশা অবলম্বন করার হুকুম দেননি। বরং তিনি সকলকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের সাফল্য ও মুক্তি অন্তরকে দুনিয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট করার মধ্যেই নিহিত।

উপরে বর্ণিত যাবতীয় বিধানই একা ব্যক্তির জন্যে। সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তির বিধান, যদি সন্তান-সন্ততির দুর্বলতা দূর করা ও তাদের মনের স্থিরতার জন্যে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রাখে, তবে তা তাওয়াক্কুলের গণ্ডির বাইরে যাবে না। এর বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করলে তা তাওয়াক্কুলকে বাতিল করে দেবে। কেননা, উপায়াদি প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে। অতএব, বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রেখেছেন এবং হযরত উম্মে আয়মন প্রমুখকে বলেছেন ঃ আগামীকালের জন্যে কিছু রেখো না। হযরত বেলাল ইফতারের জন্যে রুটির একটি টুকরা রেখে দিয়েছিলেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ হে বেলাল, আরশের অধিপতি তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন, এরূপ ভয় করো না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে যে সঞ্চয় করেছেন, তাতে তাঁর তাওয়াক্কুল হ্রাস পায়নি। কারণ, তিনি নিজের সে সঞ্চয়ের উপর ভরসা করেননি; বরং তাঁর সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের জন্যে একটি সুন্নত পন্থা রেখে যাওয়া। কারণ, উম্মতের শক্তিশালী ব্যক্তিও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শক্তির তুলনায় দুর্বল। কাজেই তারা যাতে নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যা করার ক্ষমতা আছে, তাও বর্জন না করে, সেজন্যে তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেছে, সঞ্চয় করা কিছু লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং কিছু লোকের জন্যে ক্ষতিকর নয়। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতই এর প্রমাণ। সুফ্‌ফায় বসবাসকারী জনৈক সাহাবীর ইন্তেকাল হলে তাঁর কাছে কাফনও পাওয়া গেল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তার পোশাক-পরিচ্ছদ তালাশ কর। তালাশ করার পর তা থেকে দুটি দীনার বের হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন, এ দুটি দীনার হচ্ছে তার কলংকের দাগ। অথচ অন্য মুসলমানরা আরো বেশী ধন-সম্পদ রেখে মারা গেলে তিনি তাদের বেলায় এরূপ মন্তব্য করতেন না। এ হাদীসের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, এগুলো দোযখের আগুনের দাগ। কেননা, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم -

অর্থাৎ, অতঃপর এর দ্বারা তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।

দুই, দাগ মানে পূর্ণতার স্তরে ত্রুটি। অর্থাৎ, মানুষের চেহারায় দাগ থাকার কারণে যেমন সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি এ দুটি দীনারের কারণে তার পূর্ণতার চেহারায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ছেড়ে মারা যায়, তা আখেরাতে তার জন্যে লোকসানের কারণ হয়। তাই আখেরাতে পুরোপুরি লাভবান হতে হলে দুনিয়াতে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

হযরত বিশরের শিষ্য হোসাইন মানাযেলী বলেন ঃ আমি সকাল বেলায় হযরত বিশরের খেদমতে বসে ছিলাম, এমন সময় মাঝারি বয়সের গোধূম বর্ণের জনৈক বুযুর্গ গলা খাকারি দিতে দিতে তাঁর কাছে আসলেন। হযরত বিশর তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে কারও জন্যে আমি তাঁকে দাঁড়াতে দেখিনি। অতঃপর তিনি আমার হাতে কয়েকটি দেরহাম দিয়ে বললেন ঃ ভাল খাবার নিয়ে আস এবং আমাদের জন্যে উপযুক্ত কোন সুগন্ধি আন। এর আগে এরূপ কথা তিনি কখনও আমাকে বলেননি। আমি খাবার নিয়ে এলে তিনি বুযুর্গের সাথে বসে আহার করলেন। অথচ এর আগে আমি তাঁকে কারও সাথে বসে আহার করতে দেখিনি। আহার শেষে দেখা গেল, অনেক খাবার বেঁচে গেছে। তখন সে বুযুর্গ বাড়তি খাদ্য নিজের কাপড়ে বেঁধে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। বুযুর্গের এই কাণ্ড দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। হযরত বিশর আমাকে বললেন ঃ মনে হয় তুমি মেহমানের এ আচরণ অপছন্দ করেছ। আমি আরয করলাম ঃ অবশ্যই। কারণ, তিনি অবশিষ্ট খাদ্য বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেলেন। হযরত বিশর বললেন ঃ এই বুযুর্গ আমার ভাই হযরত ফাতাহ্ মুসেলী। আজ আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে তিনি সুদূর মুসেল থেকে এসেছিলেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি আমাকে এ শিক্ষা দিতে এসেছেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যে, যখন তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সঞ্চয় কোনরূপ ক্ষতি করে না।

(৩) তৃতীয় ভাগে উপকারী বস্তু থেকে উৎপীড়ন ও ক্ষতি প্রতিহত করা সম্পর্কে বলা হবে। জানা উচিত, ক্ষতির আশংকা কখনও অন্তরে এবং কখনও ধন-সম্পদে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ক্ষতি প্রতিহতকারী উপায়সমূহ বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়। উদাহরণতঃ হিংস্র প্রাণীবহুল ভূখণ্ডে, বন্যার মুখে অথবা ভগ্ন প্রাচীরের নীচে শুয়ে থাকা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পরিষ্কার নিষিদ্ধ। এরূপ ব্যক্তি নিজেকে অহেতুক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

ক্ষতি প্রতিহত করার উপায়গুলো তিন প্রকার— নিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও কল্পনাপ্রসূত। শেষোক্ত উপায়াদি বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত। কল্পনাপ্রসূত উপায়াদি যেমন, লোহা পুড়িয়ে জন্তু-জানোয়ারকে দাগ দেয়া, মন্ত্র পড়া ইত্যাদি। এগুলো কখনও কোন ভয়ংকর রোগ দেখা দেয়ার পূর্বে এবং কখনও রোগ দেখা দেয়ার পরে করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাওয়াক্কুলকারীদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কেবল দাগ ও মন্ত্র বর্জন করাই উল্লেখ করেছেন। একথা তিনি কখনও বলেননি যে, তাওয়াক্কুলকারী যখন কোন শীতপ্রধান এলাকায় যাবে, তখন গরম জুব্বা পরিধান করবে না।

যদি কোন মানুষের পক্ষ থেকে নিপীড়ন হয় এবং তাতে সবর করতে পারে অথবা নিপীড়ন প্রতিহত করে প্রতিশোধ নিতে পারে, তবে সবর ও বরদাশত করাই তাওয়াক্কুলের শর্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا

অর্থাৎ, তাদের কটূক্তির উপর সবর করুন এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ করুন।

ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

অর্থাৎ, আমরা তোমাদের নিপীড়নে সবর করব। তাওয়াক্কুলকারীদের উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

دع اذاهم وتوكل على الله

অর্থাৎ, তাদের নিপীড়ন ছাড়ুন এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন।

نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون -

অর্থাৎ, সেই কর্মীদের পুরস্কার কি চমৎকার, যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর তাওয়াক্কুল করে।

এসব আয়াত মানব কর্তৃক নিপীড়ন সম্পর্কিত। কিন্তু সাপের দংশন, হিংস্র জন্তুদের ক্ষতি সাধন ও বিচ্ছুদের দংশনে সবর করা এবং তাদেরকে প্রতিহত না করা তাওয়াক্কুলের মধ্যে গণ্য নয়।

ধনসম্পদ রক্ষা করার উপায়াদির বেলায়ও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণতঃ কক্ষ ত্যাগ করার সময় যদি কক্ষের তালা লাগিয়ে দেয় অথবা বিশ্রামের সময় উটের পা বেঁধে ছেড়ে দেয়, তবে এতে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, এসব উপায় আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি থেকে জানা গেছে। এগুলো অবলম্বন করায় কোন দোষ নেই। একবার জনৈক বেদুঈন তার উট ছেড়ে দিল এবং বলল ঃ আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তাওয়াক্কুল কর এবং উটের পদযুগলও বেঁধে দাও। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

خذوا حذركم

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের হাতিয়ার তুলে নাও।

যুদ্ধকালীন নামায সম্পর্কে বলেন ঃ

وياخذوا اسلحتهم

অর্থাৎ, তারা যেন তাদের হাতিয়ার সঙ্গে নেয়।

واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل

অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ কর এবং অশ্ব পালন কর।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত মূসা (আঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

فاسر بعبادى ليلا

অর্থাৎ, এরপর রাতের বেলায় আমার বান্দাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়।

রাতের বেলায় যাওয়ার অর্থ শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করা। এটা ক্ষতি প্রতিহত করার অন্যতম উপায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও ক্ষতি প্রতিহত করার জন্যে গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। নামাযে হাতিয়ার সঙ্গে রাখা নিশ্চিত প্রতিরক্ষা নয়; যেমন সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেলা নিশ্চিত প্রতিরক্ষা। বরং হাতিয়ার সঙ্গে নেয়া একটি সন্দিগ্ধ উপায়। সন্দিগ্ধ উপায়ও নিশ্চিত উপায়ের মতই। সুতরাং এমন কাল্পনিক উপায়ই রয়ে গেছে, যা বর্জন করার দাবী তাওয়াক্কুল করে। বাঘ বুকের উপর থাবা মারার পরও কোন কোন ওলী সামান্যও নড়াচড়া করেননি এবং কেউ কেউ বাঘকে অনুগত বানিয়ে তার পিঠে সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করেছেন। ইত্যাকার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সেগুলো বাস্তবে সঠিক হলেও অনুসরণের জন্য শিক্ষা করা উচিত নয়। এগুলো কারামতের একটি উচ্চস্তর—তাওয়াক্কুলের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা এই স্তরে পৌঁছে না, তারা এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এই স্তরে পৌঁছার আলামত কি? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এই স্তরে পৌঁছে, সে নিজেই জেনে নেয় যে, সে এই স্তরে পৌঁছে গেছে। সে এর কোন আলামত জানতে চায় না। তবে এখানে এর কিছু পূর্বলক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বলক্ষণ হচ্ছে, মানুষের সাথে তার অনুচর হয়ে একটি কুকুর রয়েছে, যার নাম ক্রোধ। তার কাজ হচ্ছে স্বয়ং মালিককে ও অন্যদেরকে কামড়াতে থাকা। প্রথমে এ কুকুর আনুগত্যশীল হবে। যদি সে এমন অনুগত হয় যাতে ইশারা দিলেই দৌড়ায় আর ইশারা না দিলে স্থবির হয়ে থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে পশুরাজ সিংহের পক্ষেও মানুষের অনুগত ও অনুগামী হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু জঙ্গলের কুকুরের অনুগত হওয়ার তুলনায় ঘরের কুকুর অনুগত হলে, তা অধিক উত্তম। আর দেহের কুকুরের অনুগত হওয়া ঘরের কুকুরের আনুগত্যের চেয়ে অনেক উত্তম। অন্তরের কুকুর অনুগত না হলে বাইরের কুকুর অনুগত হবে বলে আশা করা উচিত নয়। যখন কেউ শত্রুর ভয়ে অস্ত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সঙ্গে রাখবে, চোরের ভয়ে তালা লাগাবে এবং পালিয়ে যাবার ভয়ে উটের পা বেঁধে দেবে, তখন তাকে কোন্ দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলকারী বলা যাবে? এ প্রশ্নের জওয়াব, সে জ্ঞান ও হালের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলকারী কথিত হবে। অর্থাৎ, তার এই জ্ঞান থাকবে যে, চোর প্রতিহত হলে তা আমার তালার কারণে নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতিহত করার দরুন প্রতিহত হয়েছে। কেননা, অধিকাংশ দরজায় তালা লাগিয়েও কোন উপকার হয় না। অনেক উট পা বাঁধার পরেও মারা যায় অথবা পালিয়ে যায়। অনেক সশস্ত্র ব্যক্তিও নিহত হয়। কাজেই এসব উপায়ের উপর ভরসা নেই। ভরসা কেবল উপায়ের স্রষ্টা আল্লাহর উপর। আর হালের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুল হচ্ছে ঘর ও নিজের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং মুখে এরূপ বলা — ইলাহী! যদি তুমি আমার ঘরের জিনিসপত্র চুরি করার জন্যে কাউকে ক্ষমতা দাও, তবে তা তোমারই পথে উৎসর্গকৃত এবং আমি তোমার ফয়সালায় সম্মত। কেননা, তুমি আমাকে যা দিয়ে রেখেছ, তা আমার রিযিক, না অন্য কারও জন্যে লিখে দিয়েছ, তা আমার জানা নেই। আমি সর্বাবস্থায় তোমার ফয়সালায় রাযী।

এই হাল ও উপরোক্ত জ্ঞান থাকা অবস্থায় উটের পা বাঁধা, অস্ত্রসজ্জিত হওয়া এবং দরজায় তালা লাগানোর কারণে কেউ তাওয়াক্কুলের গণ্ডি থেকে খারিজ হবে না।

(৪) চতুর্থ ভাগে উপস্থিত ক্ষতি দূরীকরণে চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে বর্ণিত হবে। যেমন, রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি। উপস্থিত ক্ষতি দূর করার উপায়ও তিন প্রকার— নিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও সংস্কারপ্রসূত। নিশ্চিত উপায়, যেমন পিপাসার ক্ষতি দূরার করা জন্যে পানি পান করা, ক্ষুধার ক্ষতি দূর করার জন্যে খাবার খাওয়া ইত্যাদি। সন্দিগ্ধ উপায়, যেমন রোগের ক্ষতি দূর করার জন্যে রক্তমোক্ষণ করা, বিরেচক ওষুধ প্রয়োগে অন্ত্রশুদ্ধি ও অন্যান্য ডাক্তারী চিকিৎসা। সংস্কারপ্রসূত, যেমন লোহা পুড়ে দাগ দেয়া, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি।

নিশ্চিত উপায়াদি বর্জন করা তাওয়াক্কুল নয়; বরং মৃত্যুর ঝুঁকি থাকলে তা বর্জন করা হারাম। সংস্কারপ্রসূত উপায়াদি বর্জন করা অবশ্য তাওয়াক্কুলের শর্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াক্কুলকারীদেরকে এগুলো বর্জনকারী বলেছেন। এসব উপায়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে দাগ দেয়া, এর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছাকাছি তন্ত্রমন্ত্র এবং সর্বশেষ হচ্ছে "শেগুন" তথা ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন, সন্দিগ্ধ উপায়াদি- যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা ও ওষুধপত্র সেবন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) এটা করেছেন এবং অন্যকে করতে বলেছেন। তিনি এর উপকারিতা পবিত্র মুখে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ তিনি বলেছেন ঃ

ما من داء الا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله الا الموت

অর্থাৎ, এমন কোন রোগ নেই, যার ওষুধ নেই। একে চিনে যে চিনে এবং চিনে না যে চিনে না। কিন্তু মৃত্যু রোগের কোন ওষুধ নেই।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

تداووا عباد الله فان الذى انزل الداء انزل الدواء

অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা কর। কেননা, যিনি রোগ নাযিল করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন।

জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল ঃ ওষুধ ও মন্ত্র কি আল্লাহর আদেশ প্রতিহত করতে পারে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ এগুলোও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম আদেশ। অন্য এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন— তোমরা সতের, উনিশ ও একুশ বছর বয়সে শিঙ্গা লাগিয়ে শরীর থেকে বদরক্ত বের করে দাও— যাতে রক্ত উত্তেজিত হয়ে তোমাদের মৃত্যুর কারণ না হয়। এতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে — (এক) রক্তের উত্তেজনা মৃত্যুর কারণ এবং (দুই) রক্ত বের করে দেয়া মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। কেননা, শরীর থেকে বদরক্ত রেব করা, পোশাকের ভিতর থেকে বিচ্ছু ঝেড়ে ফেলা এবং গৃহ থেকে সাপ তাড়িয়ে দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এগুলো বর্জন করা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়; বরং এগুলো ঘরে আগুন লেগে গেলে তা নিভানোর জন্যে পানি ঢালার মত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক সাহাবাকে ওষুধ প্রয়োগ ও পরহেয করার (বাছ মেনে চলার) আদেশ দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর চক্ষু থেকে পানি ঝরত। এ জন্যে তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি খোরমা খেয়ো না এবং এমন বস্তু খাও, যা তোমার মেযাজের সাথে মিল রাখে। অর্থাৎ, আটায় পাকানো

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শাক। হযরত সোহায়ব (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা সত্ত্বেও যখন খোরমা খাচ্ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি খোরমা খাও অথচ তোমার চোখে ব্যথা? সোহায়ব বললেন ঃ আমি অন্য চোয়াল দিয়ে খাচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি হাসলেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিজের চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রত্যেক রাত্রে চোখে সুরমা লাগাতেন, প্রতিমাসে শিঙ্গা দিয়ে বদরক্ত বের করতেন এবং প্রতিবছর জোলাব নিতেন। ওহী অবতরণের সময় তাঁর মাথায় ব্যথা হত। এ জন্যে তিনি মাথায় মেহেদির প্রলেপ দিতেন। যখমে মেহেদি লাগানোর কথাও কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। মোট কথা, নিজে চিকিৎসা করা ও অপরকে চিকিৎসা করতে বলা সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে "তিব্বুন্নবী (সাঃ)" নামে একটি পুস্তকও রচিত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেমের কাহিনীতে লিখিত আছে, একবার হযরত মূসা (আঃ) রোগাক্রান্ত হলে বনী ইসরাঈল তাঁর কাছে এসে রোগ নির্ণয় করল এবং আরয করল ঃ আপনি যদি এ চিকিৎসা করেন, তবে সুস্থ হয়ে যাবেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমার চিকিৎসার দরকার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা চিকিৎসা ছাড়াই আমাকে আরোগ্য দান করবেন। এরপর রোগ আরও বেড়ে গেল। লোকেরা এসে আরয করল ঃ এ রোগের ওষুধ তাই, যা আমরা বলেছি। এটা আমাদের পরীক্ষিত। মূসা (আঃ) এবারও অস্বীকার করলেন। ফলে রোগ বেড়েই চলল। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ওহী পাঠালেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, লোকদের বর্ণিত ওষুধ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে সুস্থ করব না। এরপর বনী ইসরাঈল এসে তাকে সে ওষুধ খাইয়ে দিলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। কিন্তু মনে কিছু খটকা রয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা আবার ওহী পাঠালেন ঃ তুমি আমার উপর তাওয়াক্কুল করে আমার প্রজ্ঞার ব্যবস্থাপনাকে এলোমেলো করে দিতে চাও। বল তো ওষুধের মধ্যে উপকারিতা কে রেখেছে? ওষুধ আমার আদেশে আরোগ্য দান করে। জনৈক পয়গাম্বর ধাতুদুর্বলতায় আক্রান্ত হলে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে গোশ্ত ও দুগ্ধ খাওয়ার আদেশ দেয়া হয়। কারণ, এগুলো বলকারক। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নবীর কাছে অভিযোগ করল যে, তাদের সন্তান-সন্ততি সুশ্রী হয় না। সেমতে নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করা হল— তোমার সম্প্রদায়কে বলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দাও, তারা যেন তাদের গর্ভবতী মহিলাদেরকে "বিহী" নামক অম্ল ফল খাওয়ায়। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা কারণ ও ঘটনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে। ওষুধও আল্লাহর আদেশের অধীন একটি কারণ বা উপায়। অতএব, রুটি যেমন ক্ষুধার প্রতিকার এবং পানি যেমন পিপাসার প্রতিকার, তেমনি 'সিকঞ্জবীন' (অম্লরসের সঙ্গে চিনি সহযোগে প্রস্তুত উপকরণ বিশেষ) পিত্তের ওষুধ। এতে কেবল একটি বিষয়ের পার্থক্য। ক্ষুধার প্রতিকার রুটি দ্বারা এবং পিপাসার প্রতিকার পানি দ্বারা করা এতই সুস্পষ্ট যে, মানুষ মাত্রই তা জানে; কিন্তু পিত্তের চিকিৎসা সিকঞ্জবীন দ্বারা হয়, তা অল্প লোকেই জানে।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, ওষুধ ও আরোগ্য কার হাতে? আল্লাহ বলেন ঃ আমার হাতে। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ তা হলে চিকিৎসক কি করে? আল্লাহ বললেন ঃ আমার কাছ থেকে আরোগ্য অথবা মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তারা রিযিক খায় এবং আমার বান্দাদেরকে আনন্দ দান করে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী মনীষী ও বুযুর্গগণের মধ্যে যারা অসুখে-বিসুখে চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আবার এমনও কিছু সংখ্যক মনীষী রয়েছেন, যাঁরা চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেছেন। উদাহরণতঃ অন্তিম মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খেদমতে কেউ কেউ আরয করল ঃ আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক আমাকে দেখেছে এবং বলেছে, আমি যা চাই, তাই করি। হযরত আবু যর (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা ছিল। লোকেরা বলল ঃ আপনি চিকিৎসা করুন। তিনি বললেন ঃ আমার এ জন্যে কোন চিন্তা নেই। লোকেরা বলল ঃ আপনি সুস্থতা লাভের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ চোখের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি তাঁর কাছে দোয়া করব। রবী ইবনে খায়সাম (রাঃ) অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলে তিনি বললেন ঃ আমিও ইচ্ছা করেছিলাম; কিন্তু পর মুহূর্তেই আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতির কথা মনে পড়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেক চিকিৎসক ছিল। কিন্তু এখন চিকিৎসকও নেই, রোগও নেই। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন ঃ যারা তাওয়াক্কুলে বিশ্বাস করে এ পথে চলে, তাদের জন্যে ওষুধ সেবনে চিকিৎসা না করাই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি ভাল মনে করি। স্বয়ং তাঁর কোন অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসকের জিজ্ঞাসারও তিনি কোন জওয়াব দিতেন না। হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হল ঃ বান্দার তাওয়াক্কুল কখন সঠিক হয়? তিনি বললেন ঃ যখন সে দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, নিজের অবস্থাতেই মশগুল থাকে।

এ বুযুর্গগণের কর্মপদ্ধতি ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় কিরূপে হবে, এক্ষণে তাই আলোচ্য বিষয়। এই বুযুর্গগণের চিকিৎসা না করানোর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রোগী যদি কাশফের স্তরে উন্নীত হয় এবং কাশফের মাধ্যমে জেনে নেয় যে, তার মৃত্যু নিকটবর্তী, চিকিৎসায় কোন উপকার হবে না, তবে চিকিৎসায় সম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অস্বীকৃতি এ কারণেই ছিল। তিনি কাশফবিশিষ্ট ছিলেন। অন্যথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিকিৎসা করতে দেখে এবং অপরকে চিকিৎসার জন্যে বলতে শুনে তিনি কিরূপে অস্বীকার করতে পারতেন?

দ্বিতীয় কারণ, রোগী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এবং নিজের পরিণতির ভয় ও অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ওয়াকিফহাল হওয়ার ব্যাপারে এত বেশী মশগুল যে, চিকিৎসার অবসরই নেই। এই দুঃখ ও আশংকায় সে রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করতেই সক্ষম নয়, চিকিৎসা করবে কিসের? হযরত আবু যরের উক্তি এ বিষয়েরই পরিচায়ক। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি চোখের ব্যাপারে কোন চিন্তাই করি না। তাঁর ভেতরে গোনাহের ভয় যেন দৈহিক রোগ-যন্ত্রণার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এরূপ রোগীর অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় এত বেশী ভারাক্রান্ত যে, ক্ষুধার কষ্ট পর্যন্ত অনুভব করতে পারে না। তাকে খেতে বলা হলে সে বলে, আমার মোটেই ক্ষুধা নেই। এ থেকে বুঝা যায় না যে, সে ক্ষুধার অবস্থায় খাদ্য গ্রহণকে উপকারী বলে স্বীকার করে না।

তৃতীয় কারণ, রোগ অতিশয় পুরাতন এবং ওষুধ যা বলা হয়, তা সংস্কারপ্রসূত। যেমন, দাগ দেয়া, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় রোগী চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়। রবী ইবনে খায়সামের উক্তিতে এ কারণের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, তাদের মধ্যে চিকিৎসক অনেক ছিল; কিন্তু কোন রোগীই বাঁচেনি, চিকিৎসকও রক্ষা পায়নি। উদ্দেশ্য, ওষুধের উপর ভরসা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিশ্চিত নয়। যেসব বুযুর্গ চিকিৎসা বর্জন করেছেন, তাদের অধিকাংশের সনদ ছিল, ওষুধ তাদের মতে সংস্কারপ্রসূত ও অনির্ভরযোগ্য। চিকিৎসা বিশারদগণও সুস্পষ্টভাবে জানে, বাস্তবে কোন কোন ওষুধ মোটেই উপকারী নয় এবং কোন কোন ওষুধ উপকারী। কিন্তু যে চিকিৎসক নয়, সে প্রায়শই সব ওষুধকে একই দৃষ্টিতে দেখে। ফলে সে চিকিৎসাকে মন্ত্র পাঠের মতই সংস্কারপ্রসূত মনে করে।

চতুর্থ কারণ, চিকিৎসা না করে রোগী তার রোগ ধরে রাখতে চায়, যাতে উত্তম সবরের মাধ্যমে সে রোগের সওয়াব অর্জন করতে পারে অথবা আল্লাহ প্রদত্ত বিপদাপদে নফস সবর করার শক্তি রাখে কি না, তা পরীক্ষা করতে পারে। কারণ, রোগের সওয়াব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, পয়গম্বরগণের উপর অন্যান্য লোকের তুলনায় বেশী কঠিন বিপদাপদ আসে। এর পর তা স্তর অনুযায়ী হ্রাস পেতে থাকে। বান্দার উপর মুসীবত তার ঈমানের মাপ অনুযায়ী আসে। যে শক্ত ও পাকাপোক্ত ঈমানের অধিকারী, তার মুসীবতও কঠোরতর হয়। যার ঈমান যত দুর্বল, তার মুসীবতও সেই পরিমাণে হাল্‌কা হয়। এক হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলা বিপদাপদ দ্বারা বান্দার পরীক্ষা নেন, যেমন তোমরা আগুনে পুড়িয়ে স্বর্ণের পরীক্ষা নাও। ফলে কোন কোন বান্দা খাঁটি ও উজ্জ্বল সোনা হয়ে বের হয়, কেউ কেউ তার চেয়ে কম এবং কেউ কেউ কাল পোড়া হয়ে বের হয়।

আহলে বায়ত থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে— আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে বন্ধু করে নেন, তখন তাকে বিপদে জড়িত করেন। যদি সে বিপদে সবর করে, তবে তাকে 'মুজতবা' (মনোনীত) করে নেন, আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে 'মুস্তফা' (পবিত্র) করে নেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনকে যখনই দেখবে, আন্তরিকভাবে সুস্থ এবং দৈহিকভাবে রোগী পাবে। আর মোনাফেককে দেহের দিক দিয়ে অধিকতর সুস্থ এবং অন্তরের দিক দিয়ে অধিকতর রোগী পাবে।

লোকেরা যখন রোগ-শোক ও বালামুসীবতের এতদূর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য শুনল, তখন রোগ ও অসুখ-বিসুখের প্রতি তাদের মনে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে কিছুসংখ্যক বুযুর্গের এটা রীতি হয়ে গেল যে, তারা নিজের রোগের কথা গোপন রাখতেন। চিকিৎসকদের কাছে প্রকাশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতেন না। তারা রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতেন, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতেন। তারা আরও বিশ্বাস করে নিতেন যে, যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সবর সহকারে বসেই নামায পড়া যায়, তবে এটা সুস্থাবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমার বান্দার সে সৎকর্মই লেখে নাও, যা সে সুস্থাবস্থায় করত। কারণ, সে এখন আমার বন্দী। যদি আমি তাকে রেহাই দেই, তবে মাংসের বদলে উৎকৃষ্ট মাংস এবং রক্তের বদলে উত্তম রক্ত দান করব। আর যদি মৃত্যু দেই, তবে নিজের রহমতের দিকে মৃত্যু দেব।

হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ সুস্থ সবল অবস্থায় এবাদত করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করার চেয়ে চিকিৎসা না করা এবং এবাদতে দুর্বল ও অক্ষম থাকা উত্তম। তিনি এক বড় রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু কখনও এর চিকিৎসার ইচ্ছা করেননি।

পঞ্চম কারণ, রোগী পূর্বে কিছু গোনাহ করেছে। এখন গোনাহের ভয়ে অসুস্থ থাকাকে গোনাহের কাফ্ফারা মনে করে। তাই চিকিৎসা করতে সম্মত হয় না। কারণ, চিকিৎসা করলে রোগ দ্রুত সেরে যাবে এবং গোনাহের যথেষ্ট কাফ্ফারা হবে না। হাদীস শরীফে আছে— মানুষের শরীরে পুরাতন জ্বর সর্বক্ষণ এ জন্যে থাকে, যাতে সে পরিণামে শিলার মত সাফ ও পরিষ্কার হয়ে যায়— কোন গোনাহ অবশিষ্ট না থাকে। এক হাদীসে আছে— এক দিনের জ্বর সারা বছরের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়।

রসূলে করীম (সাঃ) যখন জ্বরকে গোনাহের কাফ্ফারা বললেন, তখন সাহাবী যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সারা বছর জ্বরাক্রান্ত থাকার জন্যে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়া কবুল হল এবং তিনি আমৃত্যু জ্বর থেকে মুক্ত হলেন না। কয়েকজন আনসারীও এরূপ দোয়া করেছিলেন। ফলে তাঁদেরও কোন সময় জ্বর ছাড়ত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বললেন ঃ

من اذهب الله كريمتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যার চক্ষুদ্বয় নিয়ে যান, তার জন্যে তিনি জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াবে রাযী হন না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ কথা শুনে কিছুসংখ্যক আনসারী অন্ধ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে খুব বিপদগ্রস্ত দেখে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী, এর প্রতি রহম করুন। এরশাদ হল ঃ আর কিরূপে রহম করব? এর মাধ্যমেই তো রহম করব। অর্থাৎ, বিপদ দিয়ে তার গোনাহ দূর করব এবং মর্তবা বৃদ্ধি করব।

ষষ্ঠ কারণ, রোগী অধিক স্বাস্থ্যবান থাকতে ভয় করে, যাতে সে অহংকার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসা বর্জন করে। কেননা, স্বাস্থ্যবান হলেই মানুষ সবল হয়। আর সবল হলে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার এসে যায়। আত্মম্ভরিতার ফল স্বরূপ মানুষ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন— দরিদ্রতা আমার জেলখানা। এতে তাকেই বন্দী করি, যাকে আমি ভালবাসি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অবাধ্যতা ও গোনাহের আশংকা করে, তার কখনও চিকিৎসা না করানো উচিত। কেননা, গোনাহ না করার মধ্যেই তার কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। জনৈক সাধক তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমার কাছে কেমন ছিলে? সে উত্তর করল, কুশলেই ছিলাম। সাধক বললেন ঃ যদি তুমি কোন গোনাহ না করে থাক, তবে বাস্তবিকই কুশলে ছিলে। আর যদি কোন গোনাহ করে থাক, তবে গোনাহ্কারী ছাই কুশলে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) ইরাকে ঈদের দিনের সাজসজ্জা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কি করছে? লোকেরা আরয করল; এটা তাদের ঈদ। তিনি বললেন ঃ যেদিন আমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করব না, সেদিনই হবে আমাদের ঈদ। আল্লাহ বলেন ঃ

وعصيتم من بعد ماأراكم ماتحبون -

অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ, সুস্থতা দেখানোর পর তোমরা নাফরমানী করলে।

আরও বলা হয়েছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ নিজেকে অভাবমুক্ত দেখার কারণে সীমালজ্ঘন করে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিল। এর কারণ, সে সুদীর্ঘ চারশ' বছর পর্যন্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি। কখনও মাথা ব্যথা হয়নি, দেহে তাপ দেখা দেয়নি এবং কোন শিরা দ্রুত চলেনি।

যদি একদিনও তার মাথায় ব্যথা দেখা দিত, তবে খোদায়ী দাবী করা দূরের কথা, অনর্থক কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকত। তাই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اكثروا ذكر هادم اللذات

অর্থাৎ, তোমরা আনন্দ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বারবার স্মরণ কর।

বলা হয়, জ্বর হল মৃত্যুদূত। বাস্তবিকই মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ -

অর্থাৎ, তারা কি দেখে না, তাদেরকে প্রতিবছর একবার অথবা দু'বার পরীক্ষা করা হয়? তারপরেও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না! অর্থাৎ, তাদেরকে অসুখে-বিসুখে জড়িত করে পরীক্ষা করা হয়।

এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ যখন দেখতেন, কোন বছর তাদের উপর দিয়ে জান অথবা মালের বিপদ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন তারা খুব ঘাবড়ে যেতেন। জনৈকা বুযুর্গ বলেন ঃ ঈমানদারের উপর প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন না কোন বিপদ এসে যায়। বর্ণিত আছে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) জনৈক মহিলাকে বিয়ে করার পর তাঁর কোন দিন অসুখ-বিসুখ হল না। এ কারণে তিনি মহিলাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ অমুক রোগ এমন এবং মাথা ব্যথা এমন। এক ব্যক্তি বললেন ঃ মাথা ব্যথা কি, তা আমি জানিই না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। তিনি আরও বললেন ঃ কেউ যদি দোযখী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখেন। হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল— কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথেও কেউ থাকবে কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার হাশর শহীদদের সাথে হবে। বলা বাহুল্য, অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর কথা খুব স্মরণ হয়।

সারকথা, রোগব্যাধির এতসব উপকারিতা দৃষ্টে কোন কোন বুযুর্গ রোগ দূর করার কৌশল ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তাঁরা চিকিৎসা ক্ষতিকর জেনে বর্জন করেননি। যে চিকিৎসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত, তা ক্ষতিকর কেমন করে হতে পারে?

কিছু সংখ্যক বুযুর্গের মতে তাওয়াক্কুলের জন্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রয়োগ না করা সর্বাবস্থায় উত্তম। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের জন্যে সুন্নত করার লক্ষ্যে ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন। নতুবা এটা দুর্বলদের কাজ। যারা শক্তিশালী, তারা ওষুধ বর্জন করে তাওয়াক্কুল করবে। আমরা বলি, ওষুধ প্রয়োগ না করা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত হলে ক্ষুধায় খাদ্য না খাওয়া এবং তৃষ্ণায় পানি পান না করাও তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত তবে। কেননা, ওষুধ যেমন রোগ নিরসনে সহায়ক, তেমনি পানিও তৃষ্ণা নিবারক। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা পানির মত ওষুধকেও এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। অথচ কেউ বলে না যে, তৃষ্ণায় পানি বর্জন করা তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত। ওষুধ প্রয়োগ না করা যে তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়, এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলীফার সঙ্গে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন। দামেশকের অদূরে জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা খবর পান, সিরিয়ায় এখন মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। প্রত্যহ বহু লোক এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ব্যাপক আকারে প্রাণহানি ঘটছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এক দল বললেন ঃ আমরা মহামারীর ভেতরে প্রবেশ করব না এবং জ্বলন্ত আগুনে লাফিয়ে পড়ব না। অন্য দল অভিমত প্রকাশ করলেন— আমরা সেখানে যাব। কেননা, কোরআন পাকে মৃত্যুর ভয়ে স্থান ত্যাগ করার নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, "আপনি কি সে লোকদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল? অথচ তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার।"

অতঃপর উভয় দল খলীফার খেদমতে হাযির হয়ে তার অভিমত জানতে চাইল। খলীফা বললেন ঃ এখান থেকে প্রস্থান করা উচিত এবং মহামারীর ভেতরে প্রবেশ না করা উত্তম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের অভিমত খলীফার বিপরীতে ছিল, তাঁরা আরয করলেন ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার তাকদীর থেকে পালাব কি? খলীফা বললেন ঃ আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে তাঁরই তাকদীরের দিকে যাব। এতে দোষ কি? এর পর তিনি একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বললেন ঃ মনে কর, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে একটি ছাগলের পাল আছে এবং বিচরণের জন্যে দুটি চারণভূমি আছে। একটি সবুজ ঘাসে পূর্ণ ও অপরটি শুষ্ক। পালের মালিক যদি সবুজ ঘাসবিশিষ্ট চারণভূমিতে ছাগল চরায়, তবু আল্লাহ তা'আলার আদেশে হবে এবং যদি সে শুষ্ক চারণভূমিতে চরায়, তবু আল্লাহ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ী হবে। শ্রোতারা সকলেই খলীফার এই বক্তব্য যথার্থ বলে মেনে নিল। এরপর তিনি পরামর্শের জন্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ডেকে পাঠালেন। পরের দিন হযরত আবদুর রহমান এসে বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে যা শুনেছি, তাই আমার অভিমত। খলীফা বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, আপনি কি শুনেছেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। হযরত আবদুর রহমান বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— "যখন তোমরা কোন ভূখন্ডে মহামারীর কথা শুন, তখন সেখানে প্রবেশের দুঃসাহস দেখিও না। আর যদি যেখানে তোমরা আছ, সেখানেই মহামারী দেখা দেয়, তবে ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করো না।" হযরত ওমর (রাঃ) এই হাদীসে নিজের মতের সমর্থন দেখতে পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জাবিয়া থেকে সরিয়ে আনলেন।

এখন দেখা উচিত, এ ধরনের বিষয় যদি তাওয়াক্কুলের শর্ত হয়, তবে সাহাবায়ে কেরাম কেমন করে তাওয়াক্কুল বর্জন করতে একমত হলেন? অথচ তাওয়াক্কুল দ্বীনের উচ্চতর মকামসমূহের অন্যতম।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে যে শহরে মহামারী থাকে, সেখান থেকে চলে যেতে কেন নিষেধ করা হল? অথচ চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী মহামারীর কারণ হচ্ছে বায়ু দূষিত হওয়া। দূষিত বায়ু থেকে বেঁচে থাকা একটি উত্তম চিকিৎসা। হাদীসে এর অনুমতি দেয়া হল না কেন? এর জওয়াব,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিঃসন্দেহে দূষিত পরিবেশ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ হতে পারে না। এতে কারও দ্বিমত নেই। দূষিত বায়ু কেবল বাহ্যিক দেহে লাগলেই ক্ষতি হয়ে যায় না; বরং সর্বক্ষণ এতে শ্বাস গ্রহণ করলে ক্ষতির আশংকা থাকে। যদি বায়ুতে রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে এবং তাতে বেশী মাত্রায় শ্বাস গ্রহণ করা হয়, তবে শ্বাসের মাধ্যমে জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে পৌঁছে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্ত্রসমূহকে প্রভাবিত করে। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মহামারী এলাকায় বসবাস করার পর সেখান থেকে চলে যায়, তবে দূষিত বায়ুর প্রভাব থেকে মুক্ত না থাকাই তার জন্যে প্রবল। কিন্তু মুক্ত থাকারও সম্ভাবনা আছে। যেমন, প্রভাব দুর্বল হলে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতএব, মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়া হল তা থেকে মুক্ত থাকার একটি সংস্কারপ্রসূত উপায়। যেমন, মন্ত্রপাঠ একটি সংস্কার প্রসূত উপায়। অতঃপর মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণ যদি কেবল বায়ু দূষিত হওয়াই হত, তবে এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হত না এবং এর নিষেধাজ্ঞাও হত না। কিন্তু আসলে অন্য কারণে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে। তা হলো, যদি সুস্থ লোকদেরকে দুর্গত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তবে আক্রান্ত রোগীদের ছাড়া সেখানে সুস্থ লোক অবশিষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় কে রোগীদের খাওয়াবে, পানি পান করাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন করবে? এহেন পরিস্থিতিতে সুস্থদের সেখান থেকে চলে যাওয়া যেন রোগীদেরকে জীবন্ত সমাহিত করার শামিল, যাদের বেঁচে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্থরা যদি সেখানে অবস্থান করে, তবে তাদের মরে যাওয়া যেমন নিশ্চিত নয়, তেমনি সেখান থেকে চলে গেলেও বেঁচে যাওয়া নিশ্চিত নয়। তবে তাদের চলে যাওয়ার ক্ষতি রোগীদের বেলায় অবশ্য নিশ্চিত। মুসলমানরা সকলেই পরস্পরে দালানের ইটের মত— একটির শক্তি অপরটির দ্বারা হয় অথবা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত— এক অঙ্গে ব্যথা হলে অন্য অঙ্গও ব্যথিত হয়। সুতরাং চলে যেতে নিষেধ করার কারণ আমাদের মতে এটাই।

যে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত দুর্গত এলাকায় প্রবেশ করেনি, তার জন্যে ব্যাপারটি উল্টো। অর্থাৎ, তার অভ্যন্তরে দূষিত বায়ু এখন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেনি। তার দুর্গত এলাকায় প্রবেশ না করলেও সেখানকার রোগীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে না। অবশ্য যদি ধরে নেয়া হয় যে, দুর্গত এলাকায় আক্রান্ত রোগীদের ছাড়া কেউ নেই এবং সেখানে সেবা-যত্ন ও শুশ্রূষার প্রয়োজন রয়েছে, তবে কিছু লোকের সেখানে যাওয়া শরীয়তে পছন্দনীয় বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কেননা, তাদের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন ক্ষতি হওয়া একটি সংস্কারপ্রসূত বিষয় এবং তাদের যাওয়ার কারণে রোগাক্রান্ত মুসলমানদের ক্ষতি নিরসন হওয়া নিশ্চিত ব্যাপার। এ কারণেই হাদীসে মহামারী থেকে পলায়নকারীদেরকে জেহাদের সারি থেকে পলায়নকারীদের সমতুল্য বলা হয়েছে। কেননা, এ পলায়নের মধ্যে অন্য মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। অনেক আবেদ ও সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি এসব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

উপরের আদ্যোপান্ত বক্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হল যে, ওষুধ প্রয়োগ করা কোন কোন অবস্থায় উত্তম এবং কোন কোন অবস্থায় প্রয়োগ না করা উত্তম। আরও জানা গেল, ওষুধ প্রয়োগ করা ও না করা কোনটিই তাওয়াক্কুলের জন্যে শর্ত নয়। শর্ত হলো কেবল সংস্কারপ্রসূত বিষয়াদি। যেমন, ঝাড়, ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ ইত্যাদি বর্জন করা। এগুলো তাওয়াক্কুলকারীদের জন্যে শোভা পায় না।

জানা উচিত, অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র্য ও বিপদাপদ গোপন রাখা পুণ্যের অন্যতম ভাণ্ডার এবং উচ্চ মর্তবার লক্ষণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সম্মত এবং তাঁর দেয়া বিপদে সবর করা বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার একান্ত বিষয়। এগুলো গোপন করা বিপদাপদ থেকে বেশীর ভাগ আত্মরক্ষার উপায়। এতদসত্ত্বেও নিয়ত সঠিক থাকলে এগুলো প্রকাশ করায়ও কোন দোষ নেই। যে সকল উদ্দেশ্যের কারণে রোগ-ব্যাধি প্রকাশ করা যায়, সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা। অর্থাৎ, চিকিৎসকের কাছে অভিযোগের ভঙ্গিতে নয়; বরং বাস্তব অবস্থা বর্ণনার ভঙ্গিতে হুবহু প্রকাশ করতে হবে। হযরত বিশর ইবনে আবদুর রহমান চিকিৎসকের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করতেন।

দ্বিতীয়, রোগী অনুসরণীয় ব্যক্তি হলে সবর ও শোকর শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ছাড়া অন্যদের কাছে নিজের রোগের কথা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, এমনভাবে বর্ণনা করবে, যাতে বুঝা যায়, তার মতে রোগ একটি নেয়ামত। নেয়ামত সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা করা হয়, সেভাবে আলোচনা করবে, যাতে মানুষ সে জন্যে শোকর করে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যখন রোগী হামদ ও শোকরের পর নিজের ব্যথা বর্ণনা করে, তখন সে বর্ণনা অভিযোগের মধ্যে গণ্য হয় না।

তৃতীয়, নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি দীনতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে রোগ বর্ণনা করা। এটা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ভাল মনে হয়, যার বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য সর্বজনবিদিত। উদাহরণতঃ হযরত আলী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ)-কে অসুস্থ অবস্থায় লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কেমন? তিনি বললেন ঃ খারাপ। প্রশ্নকারীরা এ উত্তরকে ভাল মনে করল না। এতে অভিযোগের গন্ধ পেল। তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করব? এভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের অক্ষমতা ও দীনতা প্রকাশ করাই উত্তম মনে করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। অসুস্থ হয়ে তিনি দোয়া করতেন, ইলাহী! আমাকে মুসীবতে সবর দান করুন। এ দোয়া শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মুসীবতের প্রার্থনা তো তুমি নিজেই করেছ। আল্লাহ তা'আলার কাছে সুস্থতার দোয়া কর।

কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রোগের কথা প্রকাশ করে দেয়, সে সবর করে না। কোরআন মজীদে উল্লিখিত "সবরে জামীলে'র অর্থ এমন সবর, যাতে অভিযোগ নেই। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি কিসে বিনষ্ট করল? তিনি জওয়াব দিলেন— কালচক্র এবং দুঃখের আধিক্য। তৎক্ষণাৎ ওহী আগমন করল ঃ তুমি আমার বান্দাদের সামনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তৈরী হয়ে গেলে? হযরত ইয়াকুব আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমি তওবা করলাম। আর কখনও এমন হবে না।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ রোগীর 'আহ' বলাকে খারাপ মনে করতেন। কেননা, এটা অভিযোগের পরিচায়ক। বর্ণিত আছে, হযরত আইউব (আঃ) যন্ত্রণায় "আহ" বলেছিলেন এবং তাঁর দুঃখ-কষ্টে এটাই ছিল শয়তানের ভূমিকা। হাদীসে আছে, বান্দা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা উভয় ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন— দেখ, সে তার অবস্থা জিজ্ঞেসকারীদের সাথে কি বলে। যদি সে তাদের সাথে আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় তার জন্যে কল্যাণের দোয়া করে। আর যদি অভিযোগ করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় বলে— তুমি এমনি থাকবে। জনৈক বুযুর্গ অভিযোগ হয়ে যাওয়া এবং কথা বেশী হওয়ার আশংকায় অবস্থা জিজ্ঞাসাকে খারাপ মনে করতেন। অসুস্থ হলে তিনি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। কেউ তাঁর কাছে যেত না। সুস্থ হওয়ার পর নিজেই মানুষের কাছে যেতেন। এমনি অবস্থা ছিল ফোযায়ল ইবনে আয়ায, ওহাব ইবনে ওয়ার্দ ও বিশর ইবনে হারেসের। হযরত ফোযায়ল বলতেন, আমি চাই যাতে অসুস্থ হই; কিন্তু অবস্থা জিজ্ঞেসকারী কেউ না থাকুক। আমি তাদের কারণেই রোগী হতে অপছন্দ করি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহব্বত

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হচ্ছে সকল মকামের চূড়ান্ত সীমা এবং সর্বোচ্চ মর্তবা। কারণ. মহব্বতের পর 'শওক' (আগ্রহ), 'উন্‌স' (অনুরাগ), 'রিযা' (সম্মতি) ইত্যাদি যত মকামই আসুক না কেন, সবই মহব্বতের অনুগামী ও ফল। মহব্বতের পূর্বে তওবা, সবর, যুহ্‌দ ও অন্যান্য যত মকাম রয়েছে, সবই মহব্বতের ভূমিকা। অন্যান্য মকামের অস্তিত্ব বিরল হলেও সব অন্তরে সেগুলোর সম্ভাবনা থাকে এবং সেগুলোর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস থেকে কোন অন্তর শূন্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে বিশ্বাস স্থাপন করাই কঠিন। এমনকি, কোন কোন আলেম এর সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন— অব্যাহতভাবে তাঁর আনুগত্য করে যাওয়াই খোদায়ী মহব্বত। তাঁর সাথে সত্যিকার মহব্বত অসম্ভব। কেননা, মহব্বত সমজাতি ও সমশ্রেণীর সাথে হয়ে থাকে। তাঁরা মহব্বত অস্বীকার করার পর মহব্বতের অপরিহার্য বিষয়াবলী যেমন উন্‌স, শওক, রিযা ইত্যাদিও অস্বীকার করে বসেছেন। তাই আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহব্বতের আলোচনা

আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত ঃ মুসলিম উম্মাহর সবাই এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সাথে বান্দার মহব্বত থাকা ফরয। অতএব, আমাদের প্রশ্ন, যদি মহব্বতের অস্তিত্বই না থাকে, তবে তা ফরয কেমন করে হবে? মহব্বতের ব্যাখ্যা যারা আনুগত্যের দ্বারা করেন, তা-ও কিরূপে সম্ভব? কেননা, আনুগত্য তো মহব্বতের অনুগামী ও ফল। প্রথমে মহব্বত অস্তিত্ব লাভ করবে, এরপর প্রেমাস্পদের আনুগত্য হবে।

মহব্বতের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার এই এরশাদ—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

অর্থাৎ,আল্লাহ তাদেরকে মহববত করেন এবং তারা আল্লাহকে মহব্বত করে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে গভীরতর মহব্বত করে।

এ দুটি আয়াত থেকে জানা যায়, মহব্বতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাতে পার্থক্য হয়ে থাকে। রসূলে আকরাম (সাঃ) অনেক হাদীসে আল্লাহর মহব্বতকে ঈমানের শর্ত বলেছেন। ঈমান কি? আবু রুযায়ন ওকায়লীর এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহ ও রসূল অধিকতর প্রিয় হওয়া। এক হাদীসে আছে—

لايؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত না তার কাছে আল্লাহ ও রসূল দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে।

আরেক হাদীসে আছে—

لايؤمن العبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين -

অর্থাৎ, বান্দা ঈমানদার হবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পরিজন, ধন-সম্পদ ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। এক রেওয়ায়েতে ومن نفسه

অর্থাৎ, "তার নিজের চেয়ে অধিক" বলা হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাই হওয়া দরকার। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, পুত্র-পৌত্র, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, সঞ্চিত ধন-সম্পদ, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পছন্দনীয় বাসভবন তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও রসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জেহাদের চেয়ে, তবে তোমরা আল্লাহর (শাস্তির) আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বলা বাহুল্য, শাসনের সুরেই একথা বলা হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) ও এ মহব্বতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

احبوا الله لما يغدوكم به من نعمة واحبونى لحب الله اياى

অর্থাৎ, আল্লাহকে মহব্বত কর এজন্যে যে, তিনি প্রতি সকালে তোমাদেরকে নিজের নেয়ামতে ভূষিত করেন, আর আমাকে মহব্বত কর এ কারণে যে, আল্লাহ আমাকে মহব্বত করেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে— এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে দরিদ্রতার জন্যে প্রস্তুত থাক। লোকটি পুনরায় আরয করল ঃ আমি আল্লাহকে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে বিপদাপদের জন্যে তৈরী হয়ে যাও।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) মুসআব ইবনে ওমায়রকে কোমরে একটি ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ এ লোকটিকে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তরকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আমি তাকে তার পিতা-মাতার কাছে দেখেছিলাম। তারা তাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও সুপেয় পানি দিত। এখন আল্লাহ ও রসূলের মহব্বত তাকে এই স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যেমন দেখতে পাচ্ছ। বর্ণিত আছে, মালাকুল মওত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জান কবয করতে এলে তিনি বললেন ঃ আপনি কি এমন কোন দোস্তকে দেখেছেন, যে তার দোস্তের প্রাণ সংহার করে? জওয়াবে আল্লাহ তা'আল তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন— তুমি কি এমন কোন মহব্বতকারীকে দেখেছ, যে তার হাবীবের সাথে সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে? এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে বললেন ঃ এখন কবয করুন। এ বিষয়টি সে বান্দার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে। সে যখন বুঝে, মৃত্যু সাক্ষাতের সিঁড়ি, তখন তার অন্তর মৃত্যুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ ছাড়া মনোযোগ দেয়ার জন্যে কোন প্রেমাস্পদ তার থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ

وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন আপনার মহব্বত ও সে ব্যক্তির মহব্বত, যে আপনাকে মহব্বত করে এবং সে বিষয়ের মহব্বত, যা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করবে। আপনার মহব্বতকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করুন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি এর জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি আরয করল ঃ আমি অনেক নামায ও অনেক রোযার ভাণ্ডার গড়ে তুলিনি ঠিক; কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

المرء مع من احب

অর্থাৎ, মানুষ যাকে মহব্বত করে, তার সঙ্গে থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আনাস (রাঃ) বললেন ঃ আমি এর আগে মুসলমানদেরকে এতটুকু উৎফুল্ল হতে দেখিনি, যতটুকু এ কথা শুনে তারা উৎফুল্ল হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার খাঁটি মহব্বতের স্বাদ পায়, সে স্বাদ তাকে দুনিয়াদারী থেকে বিরত রাখে এবং সমস্ত মানুষ থেকে তাকে দূরে রাখে।

হযরত ঈসা (আঃ) তিনটি লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাদের দেহ ছিল ক্ষীণ এবং রং বিবর্ণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? তারা আরয করল ঃ দোযখের আগুনের ভয়ে। তিনি বললেন ঃ যারা ভয় রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই নিরাপদে রাখবেন। অতঃপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে আরও তিন ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। তাদের দেহ আরও শীর্ণ ও রং আরও বিবর্ণ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এই দুর্দশা কেন? তারা আরয করল ঃ জান্নাতের আগ্রহে আমাদের এ অবস্থা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা যে জান্নাত আশা কর, আল্লাহ অবশ্যই তা দান করবেন। অতঃপর তিনি আরও এগিয়ে তিন ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাদের অবস্থা পূর্বোক্ত দু'দলের চেয়েও শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাদের মুখমন্ডলে যেন স্বর্গীয় নূরের আভা ঝলমল করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কারণে তোমরা এমন হয়ে গেছ? তারা আরয করল ঃ আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে মহব্বত করি। হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করলেন ঃ নৈকট্যশীল তোমরাই।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলাম। সে বরফের উপর শুয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি বরফের শীতলতা অনুভব কর না? সে বলল ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে সদা গরম থাকে, সে শৈত্য অনুভব করে না।

হযরত সিররী সকতী বলেন ঃ যাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল নয়, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পয়গম্বরগণের নামে ডাকা হবে। উদাহরণতঃ বলা হবে— হে উম্মতে মূসা, হে উম্মতে ঈসা এবং উম্মতে মুহাম্মদ (সাঃ)। কিন্তু মহব্বতওয়ালাদেরকে এভাবে ডাকা হবে— হে আল্লাহর ওলী, আল্লাহর দিকে চল। এতে তাদের মন খুশীতে বাগবাগ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি যখন তার পরওয়ারদেগারকে চেনে, তখন তাকে মহব্বত করে। যখন মহব্বত করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন তাঁর দিকে মনোযোগী হয়। যখন সে এই মনোযোগের স্বাদ পায়, তখন দুনিয়ার দিকে খাহেশের দৃষ্টিতে তাকায় না এবং আখেরাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। দেহের দিক দিয়ে সে দুনিয়াতে থাকলেও তার আত্মা থাকে আখেরাতে।

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত সম্পর্কে হাদীস ও মনীষীগণের বাণী এত বেশী যে, সেগুলো গণনা করে শেষ করা যায় না। এটা একটা সুস্পষ্ট বিষয়। অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা রয়েছে মহব্বতের অর্থ ও স্বরূপ নিরূপণের ক্ষেত্রে। তাই আমরা সেদিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।

মহব্বতের স্বরূপ ও কারণাদি ঃ চেনা ও জানা ছাড়া মহব্বত হতে পারে না। মানুষ তাকেই মহব্বত করে, যাকে সে চেনে। জড় পদার্থ মহব্বত করে না। কারণ, তার মধ্যে চেনার শক্তি নেই। তাই মহব্বত একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যেসব বস্তু চেনে ও জানে, সেগুলো তিন প্রকার। এক, মানুষেরই স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও আনন্দদায়ক। দুই, মানব-স্বভাবের পরিপন্থী ও কষ্টদায়ক। তিন, আনন্দ ও কষ্ট কোন কিছুই দেয় না। এ তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যে বস্তু চিনলে ও জানলে মানুষ আনন্দ ও সুখ পায়, সে বস্তুই মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে। আর যে বস্তু চিনলেও জানলে কষ্ট হয়, সে বস্তু অপ্রিয় হয়ে থাকে। যে বস্তু চেনা-জানার পর কষ্টও হয় না, সুখও হয় না, সেটাকে প্রিয়-অপ্রিয় কোন কিছুই বলা যায় না।

কোন বস্তু প্রিয় হওয়ার অর্থ, মানব-স্বভাবে তার প্রতি ঝোঁক থাকা, আর অপ্রিয় হওয়ার অর্থ ঝোঁকের পরিবর্তে ঘৃণা থাকা। সুতরাং যে বস্তু থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, সে বস্তুর প্রতি স্বভাবের ঝোঁক থাকার নাম মহব্বত। এই ঝোঁক যদি পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয় এশ্ক। এ হচ্ছে মহব্বতের স্বরূপ, যা জানা অত্যন্ত জরুরী।

মহব্বত চেনা ও জানার অনুগামী। চেনা ও জানার হাতিয়ার হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বিধায় মহব্বতও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবে। কেননা, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা একটি বিশেষ বস্তুকে চেনা যায় এবং বিশেষ বস্তু থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ চোখের আনন্দ দেখার বস্তুসমূহে। কানের আনন্দ হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত ও মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বরে। নাকের আনন্দ উৎকৃষ্ট সুগন্ধিতে। আস্বাদন শক্তির আনন্দ সুস্বাদু খাদ্যে। স্পর্শ শক্তির আনন্দ মৃদুতা ও কোমলতায়। এসব বস্তু ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয় বিধায় এগুলো প্রিয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

احب الى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلوة -

অর্থাৎ, তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার কাছে তিনটি বস্তু প্রিয়— সুগন্ধি, নারী এবং আমার চোখের শীতলতা নামাযে।

এখানে তিনি সুগন্ধিকে প্রিয় বলেছেন। বলা বাহুল্য, এতে চোখ ও কানের কোন অংশ নেই; বরং এতে কেবল ঘ্রাণশক্তির অংশ রয়েছে। নারীকে প্রিয় বলা হয়েছে। এতে ঘ্রাণ শক্তির অংশ নেই; বরং দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শ শক্তির অংশ রয়েছে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আনন্দে মানুষের সাথে চতুষ্পদ জন্তুও শরীক। অতএব, মহব্বতকে শুধু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমিত করলে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চেনেন না ও জানেন না। এমতাবস্থায় মানুষের বৈশিষ্ট্য যে মহব্বত, তা নিষ্ফল সাব্যস্ত হবে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়– যা দ্বারা মানুষ জন্তু-জানোয়ার থেকে পৃথক এবং যাকে বুদ্ধি, নূর, অন্তর ইত্যাদি বলা যায়, তা মিথ্যা হয়ে যাবে। এটা অবান্তর। কেননা, অন্তর্দৃষ্টি চর্মচক্ষুর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। অন্তর চোখের তুলনায় অধিক চেনে ও জানে। অর্থসম্ভার– যা বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, তার সৌন্দর্য চোখে দেখা আকৃতিসমূহের তুলনায় অনেক বেশী। অতএব, অন্তর যে সকল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয় অনুভব করে এবং অনুভব করে আনন্দ পায়, সে আনন্দও অধিক পূর্ণাঙ্গ হবে। কেননা, সুস্থ স্বভাবের ঝোঁক সেদিকে অধিক জোরদার হবে। এই ঝোঁকের নামই হল মহব্বত। এমতাবস্থায় যে খোদায়ী মহব্বতকে অস্বীকার করবে, সে চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে অবস্থান করবে অথবা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির কাছে সর্বপ্রথম প্রিয় বস্তু হচ্ছে তার নিজের সত্তা। নিজ সত্তাকে মহব্বত করার উদ্দেশ্য হল, তার স্বভাবের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ও তার স্থায়িত্বের বাসনা এবং নাস্তি ও ধ্বংসের প্রতি অনীহা। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের মজ্জার অন্তর্গত। সত্তার মহব্বতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণেই মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে মহব্বত করে। এগুলোর প্রতি মহব্বতের কারণ স্বয়ং এগুলোর সত্তা নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা নিশ্চিত হয় বলে। এ কারণেই মানুষ তার পুত্রকে মহব্বত করে, যদিও পুত্রের দ্বারা তার কোন উপকার হয় না এবং নানাবিধ কষ্ট ও পীড়া সইতে হয়। কেননা, তার মৃত্যুর পর পুত্রই হবে তার স্থলাভিষিক্ত। সে যেন বংশের স্থায়িত্বের মধ্যেও নিজের এক প্রকার স্থায়িত্ব দেখতে পায়। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত নিজ সত্তার মহব্বতের পূর্ণতার কারণেই হয়ে থাকে। কারণ, আত্মীয়-স্বজনের কারণে সে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে এবং তাদের কৃতিত্বকে নিজের গৌরব মনে করে। এই বক্তব্য থেকে জানা গেল, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সত্তা, সত্তার পূর্ণতা ও তার স্থায়িত্ব মহব্বতের বিষয়। এ হচ্ছে মহব্বতের প্রথম কারণ।

মহব্বতের দ্বিতীয় কারণ অনুগ্রহ। কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। অনুগ্রহকারীকে মহব্বত করা মানুষের মজ্জাগত। হাদীসে বর্ণিত আছে—

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا فَيُحِبَّهُ قَلْبِيْ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কোন পাপাচারীর অনুগ্রহ আমার উপর রেখো না। রাখলে আমার অন্তর তাকে মহব্বত করবে।

এতে ইঙ্গিত হয়, অনুগ্রহকারীকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক। এটি এড়ানো যায় না। এ কারণেই মানুষ কখনও এমন ব্যক্তিকে মহব্বত করে, যার সাথে তার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই— নিছক অপরিচিত।

মহব্বতের তৃতীয় কারণ কোন বস্তুকে সেই বস্তুর সত্তার কারণে মহব্বত করা, তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং সে বস্তুর সত্তাই সাক্ষাৎ উপকার। এ মহব্বতকে হাকিকী তথা সত্যিকার মহব্বত বলা হয়। এরূপ মহব্বতের স্থায়িত্ব আশা করা যায়। উদাহরণতঃ রূপ-সৌন্দর্যের মহব্বত কেবল রূপ ও সৌন্দর্যের কারণেই হয়। এতে সৌন্দর্য চেনা ও অনুভব করাই সাক্ষাৎ আনন্দ। এখানে ধারণা করা উচিত নয় যে, সুশ্রী অবয়বের মহব্বত কাম-বাসনা চরিতার্থ করা ও বাসনা করা ছাড়া সম্ভব নয়। উচিত এজন্যে নয় যে, কাম-বাসনা চরিতার্থ করা একটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভিন্ন আনন্দ এবং স্বয়ং রূপও ভিন্ন আনন্দদায়ক। যেমন সবুজের সমারোহ ও বহমান পানিকে মহব্বত করা হয়, কিন্তু তা এ জন্যে নয় যে, এগুলোতে পানাহারের উপকার আছে। দেখা ছাড়া এগুলোতে অন্য কোন আনন্দ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবুজ শ্যামল বনানী ও বহমান পানিকে খুব মহব্বত করতেন। সকল সুস্থ মন বাগবাগিচা, ফুল, সুশ্রী জন্তু-জানোয়ার, মনোহারী ফুল ও ফলের বৃক্ষ এবং সুন্দর চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা আনন্দের কারণ মনে করে। এমনকি, মানুষ এগুলোর দ্বারা মনের দুঃখ দূর করে। এমন কোন রূপ-সৌন্দর্য নেই, যা অনুভব করাতে আনন্দ নেই। এখন যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্যশীল, তবে যার দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তার কাছে অবশ্যই তিনি মহব্বতের পাত্র হবেন। হাদীসে বলা হয়েছে—

ان الله جميل يحب الجمال

অর্থাৎ, আল্লাহ সৌন্দর্যশালী। তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

মহব্বতের চতুর্থ কারণ স্বয়ং-রূপ সৌন্দর্য। এখানে রূপ ও সৌন্দর্যের অর্থ বর্ণনা করা জরুরী। ভাবুক ও কল্পনা-বিলাসীদের মতে যার দৈহিক গড়ন সুসমঞ্জস, আকার-আকৃতি সঠিক এবং রং উজ্জ্বল গৌর, সে রূপবান ও সৌন্দর্যশালী। অধিকাংশ মানুষের মতেও যা দৃষ্টিকে তৃপ্তি দেয়, তাই সুন্দর। তাই তাদের ধারণা, যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, যার আকার-আকৃতি নেই, রং ও বর্ণ নেই এবং কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার রূপবান ও সৌন্দর্যশালী হওয়া সম্ভব নয়। যখন সৌন্দর্যশীল হবে না, তখন তাকে অনুভব করে আনন্দ হবে না। এটা তাদের বিরাট ভ্রান্তি। কেননা, দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া, গড়ন সুসমঞ্জস হওয়া এবং রং উজ্জ্বল হওয়ার মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়। উদাহরণতঃ আমরা বলি, এই হস্তলিপি সুন্দর, এই কণ্ঠস্বর সুন্দর। এখানে গড়ন, আকার-আকৃতি ও রং কিছুই নেই। অতএব, বুঝা গেল, মুখাকৃতি ও অবয়বের মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়।

প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার মধ্যে তার উপযুক্ত ও সম্ভাব্য সকল গুণের সমাবেশ ঘটা। যখন কোন বস্তুর মধ্যে সম্ভাব্য সকল গুণের সমাবেশ হয়ে যাবে, তখন সে বস্তু হবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি কতক গুণের সমাবেশ ঘটে, তবে সৌন্দর্যও সে তুলনায়ই হবে। উদাহরণতঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমরা সে ঘোড়াকে সুন্দর বলব, যার মধ্যে সুশ্রী আকার-আকৃতি, রং-ঢং দ্রুতগতি ইত্যাদি সম্ভাব্য গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকে।

জানা দরকার, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়াদির মধ্যেই সীমিত নয়; বরং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়াদির মধ্যেও বিদ্যমান। উদাহরণতঃ আমরা বলি— এই চরিত্র কত সুন্দর। এই বিদ্যা কত ভালো। চরিত্র ও বিদ্যার মধ্যে কোনটিই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় না; বরং অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা এগুলো উপলব্ধি করা হয়। এসব গুণ মানুষের প্রিয় এবং যারা এসব গুণে গুণান্বিত, তারাও প্রিয়। উদাহরণতঃ মানুষের এটা মজ্জাগত স্বভাব যে, তারা পয়গম্বরগণকে এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করে। অথচ তাদের কাউকে চোখে দেখেনি। মাযহাবসমূহের ইমামগণের মহব্বতও তেমনি। বলা বাহুল্য, তাঁদের এই মহব্বত বাহ্যিক আকার-আকৃতির কারণে নয়। বাহ্যিক আকার-আকৃতি তো কবে মাটির সাথে মিশে গেছে; বরং তাঁদের মহব্বতের কারণ হচ্ছে ধর্মীয় গুণাবলী যেমন, তাকওয়া, এলেম, ধর্ম প্রচার, শরীয়ত সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি। এসব গুণের সৌন্দর্য অনুভব করা অন্তর্দৃষ্টির নূর ছাড়া সম্ভব নয়।

মহব্বতের পঞ্চম কারণ আত্মিক মিল, যা মহব্বতকারী ও মাহবুবের মধ্যে থাকে। প্রায়ই দু'ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় মহব্বত হতে দেখা যায়; কোন সৌন্দর্য ও উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং কেবল আত্মিক মিলের কারণে। হাদীস শরীফে আছে—

فما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف -

অর্থাৎ, আত্মাসমূহের যেগুলো পরস্পর পরিচিত হয়েছে, সেগুলো পরস্পর মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, আর যেগুলো পরিচিত হয়নি, সেগুলো পৃথক হয়ে গেছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মহব্বতের পাঁচটি কারণ পাওয়া গেল। (এক) নিজের অস্তিত্বের পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মহব্বত। (দুই) অনুগ্রহের কারণে মহব্বত। (তিন) কোন বস্তুর সত্তার কারণে মহব্বত করা। (চার) স্বয়ং রূপ-সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত করা। (পাঁচ) আত্মিক মিলের কারণে মহব্বত। যদি এ কারণগুলো একই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে নিঃসন্দেহে মহব্বত বহুগুণ বেশী হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মহব্বতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহর সত্তা ঃ মহব্বতের উপরোক্ত পাঁচটি কারণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া অন্য কারও মধ্যে একত্রে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাস্তবে মহব্বতের যোগ্যও তাঁর সত্তা— অন্য কেউ নয়। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করে এবং এ মহব্বতকে আল্লাহর সাথে কোনরূপে সংযুক্ত না করে, তবে এটা হবে মূরর্খতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত উত্তম। কেননা, এটা হুবহু আল্লাহর মহব্বত। আলেম ও মুত্তাকী লোকদের মহব্বতও তদ্রূপ। কেননা, প্রেমাস্পদের প্রেমাস্পদও প্রেমাস্পদ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ মাহবুব কিংবা মহব্বতের যোগ্য নয়। এর ব্যাখ্যার জন্যে আমরা উল্লিখিত পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে প্রমাণ করব, এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই একত্রে পাওয়া যায়— অন্য কারও মধ্যে একটি অথবা দু'টি পাওয়া যায় মাত্র।

এখন প্রথম কারণ সম্পর্কে চিন্তা করুন। অর্থাৎ, মানুষ নিজের সত্তাকে মহব্বত করে এবং তার স্থায়িত্ব কামনা করে— ধ্বংস, নাস্তি ও ত্রুটি চায় না। এটা প্রত্যেক জীবিত মানুষের মজ্জাগত বিষয়। কেউ এ থেকে মুক্ত নয়। এটাই আল্লাহর মহব্বত দাবী করে। কেননা, যে ব্যক্তি নিজ সত্তা ও পালনকর্তাকে চেনে, সে নিশ্চিতরূপেই জানে, তার অস্তিত্ব তার নিজের পক্ষ থেকে নয়; বরং তার সত্তার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই তার অস্তিত্বের স্রষ্টা এবং তিনিই পূর্ণতার গুণাবলী সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণতা দান করেছেন। অন্যথায় মানুষ নিজ সত্তার দিক দিয়ে নিছক নাস্তি। আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় অস্তিত্ব দান না করলে এবং অস্তিত্বের পর তাঁর অনুগ্রহ সঙ্গে না থাকলে মানুষ নিঃসন্দেহে নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। অতএব পালনকর্তা, মারেফত অর্জনকারী ব্যক্তি যখন নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, তখন সে সত্তাকেও অবশ্যই মহব্বত করবে, যার দ্বারা তার সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদি সে সত্তাকে মহব্বত না করে, তবে সে নিজের সত্তা ও পালনকর্তা উভয়টি সম্পর্কেই অজ্ঞ। কেননা, মহব্বত মারেফত তথা চেনা ও জানার ফল। মারেফত না হলে মহব্বতও হবে না। মারেফত দুর্বল হলে মহব্বতও দুর্বল হবে এবং মারেফত শক্তিশালী হলে মহব্বতও শক্তিশালী হবে। এ কারণেই হযরত হাসান বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রবকে চিনবে, সে তাঁকে মহব্বত করবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনবে, সে তাঁর প্রতি অনাসক্ত হবে। একথা কল্পনাও করা যায় না যে, মানুষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, অথচ রবকে মহব্বত করবে না। কারণ, রবের মাধ্যমেই তার সত্তার প্রতিষ্ঠা। যে ব্যক্তি প্রখর সূর্যকিরণে অতিষ্ঠ হয়ে ছায়াকে মহব্বত করে, সে বৃক্ষকেও মহব্বত করবে, যার মাধ্যমে ছায়া প্রতিষ্ঠা পায়। ছায়ার সাথে বৃক্ষের যে সম্পর্ক, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুরও আল্লাহর সাথে সে সম্পর্ক।

দ্বিতীয় কারণ, এমন ব্যক্তিকে মহব্বত করা, যে টাকা-পয়সা ও কথার মাধ্যমে সাহায্য করে এবং শত্রুর শত্রুতা দূরীকরণে ও অনিষ্ট প্রতিহরণে সহায়তা করে। বলা-বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি মহব্বতের পাত্র না হয়ে পারে না। এ কারণটি দাবী করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করা যাবে না। কেননা, বাস্তবে আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহকারী। কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দেয় এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করার অধিকার প্রদান করে, তবে তুমি ধারণা করবে, এটা এই ব্যক্তির তরফ থেকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ। অথচ এটা ভ্রান্ত। কেননা, এ অনুগ্রহের পেছনে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এক, স্বয়ং অনুগ্রহকারীর অস্তিত্ব। দুই, তার ধন-সম্পদ থাকা। তিন, ধনের উপর তার অধিকার থাকা। চার, বিশেষভাবে তোমাকে দেয়ার তার ইচ্ছা। এখন প্রশ্ন, এই অনুগ্রহকারীকে কে সৃষ্টি করেছে? তার ধন-সম্পদ কে সৃষ্টি করেছে? তার ক্ষমতা ও ইচ্ছার সৃষ্টিকর্তা কে? তার মনে এ প্রেরণা কে সৃষ্টি করেছে যে, তোমাকে দান করার মধ্যে তার কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক উপকার আছে? এক কথায়, সব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তার অন্তরে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, তোমাকে দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। সুতরাং সে তোমাকে দান করতে বাধ্য এবং এর বিপরীত করতেই পারে না। সুতরাং সে সত্তাই প্রকৃত অনুগ্রহকারী যিনি তাকে তোমার জন্যে বাধ্য করেছেন।

হাঁ, ধন-ভাণ্ডার সে ব্যক্তির অধিকারে থাকাটা অবশ্য ইঙ্গিত দেয় যে, সম্ভবত অনুগ্রহকারী সে-ই। এ সম্পর্কে জানা দরকার, এ ব্যক্তি দান করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মাধ্যম হয় মাত্র। অর্থাৎ, তোমাকে দেয়ার জন্যেই আল্লাহ তাকে ধন-ভাণ্ডার দিয়েছেন। সুতরাং সে না দিয়ে কি করবে? সে তো পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ। পয়ঃপ্রণালী নিজের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে বাধ্য।

এ ছাড়া মানুষ যখন অনুগ্রহ করে, তখন নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্য কোন সৃষ্টির প্রতি তার অনুগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ, মানুষ যখন দান করে, তখন তার বিনিময় পূর্বেই আন্দাজ করে নেয়— আখেরাতে সওয়াবের আকারে অথবা দুনিয়াতে দানশীলতার সুখ্যাতি অর্জন করা কিংবা অপরের মন জয় করে তাকে অনুগত ও বশীভূত করা ইত্যাদি। মানুষ কখনও তার ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দেয় না। কারণ, এতে কোন লাভ নেই। এমনিভাবে সে তার অর্থ-কড়ি অন্যের হাতে বিনা লাভেই তুলে দেয় না। তোমাকে যখন সে ধন দেয়, তখন তার উদ্দেশ্য তুমি নও; বরং তুমি তার অর্থ গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্য হাসিলের ওসিলা হও মাত্র। অতএব, সে অনুগ্রহ তোমার প্রতি নয়— নিজের প্রতিই করে। তোমাকে দান করে সে বিনিময়ে যা পাবে, সেটা যদি তার কাছে প্রধান ও অগ্রগণ্য না হত, তবে সে কখনও তোমার হাতে ধন তুলে দিত না। অতএব, মহব্বত ও শোকরের যোগ্য সে নয়।

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিসত্তাকে অনুগ্রহ না পেয়েও মহব্বত করা। এটাও মানুষের স্বভাবে নিহিত। উদাহরণতঃ এক বাদশাহ সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, সে এবাদতকারী, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। অপরদিকে অন্য এক বাদশাহ সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গেল, সে অত্যাচারী, অহংকারী, পাপাচারী এবং প্রজার অধিকার খর্বকারী। তুমি উভয় বাদশাহ থেকে এতদূরে অবস্থান করছ যে, তাদের কোন অনুগ্রহ অথবা যুলুম তোমা পর্যন্ত পৌছতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তুমি প্রথম বাদশাহকে মহব্বত এবং দ্বিতীয় বাদশাহকে ঘৃণা করবে। তোমার এই মহব্বতও আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দাবী করে, এমনকি চায়, তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত না কর। কেননা, সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপাকারী তিনিই। তিনিই প্রথমে বাদশাহকে সৃষ্টি করে তাকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ, সৌন্দর্যশালীকে মহব্বত করা। এখানে মহব্বতকারী সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন উপকারের ভিত্তিতে মহব্বত করে না। এটাও মানুষের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। সৌন্দর্য দু'প্রকার। এক, বাহ্যিক, যা চর্মচক্ষে দেখা যায়। দুই, অভ্যন্তরীণ, যা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা যায়। সৌন্দর্য মাত্রই অনুভবকারীর কাছে প্রিয়। যদি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করা হয়, তবে মহব্বত আন্তরিক হবে। যেমন, পয়গম্বর, ওলী ও সচ্চরিত্রবানদের মহব্বত। এক্ষেত্রে মহব্বত হয়; কিন্তু এই মাহবুবদের মুখমণ্ডল দৃষ্টির

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্তরালে থাকে। তবে অভ্যন্তরীণ মুখমণ্ডল অর্থাৎ., তাদের গুণাবলী দৃষ্টির সামনে থাকে। উদাহরণতঃ কেউ রসূল অথবা সিদ্দীকে আকবর অথবা ইমাম শাফেঈকে মহব্বত করলে এর কারণ হবে, তাঁদের গুণাবলী তথা জ্ঞান-গরিমা তাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ তাঁদের গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর সামনে অসম্পূর্ণ। অতএব, আল্লাহর গুণাবলীর কারণে মহব্বত আরও বেশী হবে।

পঞ্চম কারণ অর্থাৎ, পারস্পরিক মিল হওয়া। মহব্বতের মধ্যে এরও দখল রয়েছে। কেননা, যে বস্তু যে বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল, সে সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। এ কারণেই ছোটরা ছোটদেরকে এবং বড়রা বড়দেরকে মহব্বত করে। মিল কখনও বাহ্যিক বিষয়ের হয়ে থাকে। যেমন, ছোটদের মিল ছোটদের সাথে। আবার কখনও গোপন বিষয়ে হয়ে থাকে, যা অন্যেরা জানে না। যেমন, ঘটনাক্রমে দু'ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, অথচ তার পূর্বে কখনও একে অপরকে দেখে না এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের কোন আদান-প্রদান থাকে না। এ গোপন মিলও মানুষ এবং আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে মহব্বত দাবী করে। কেননা, আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে এমন অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে মিল রয়েছে, যার কিছু অংশ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং কিছু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়; বরং সেগুলো যবনিকার অন্তরালে গোপন থাকতে দেয়াই সমীচীন, যাতে সাধকরা সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর নিজেরাই জেনে নেয়।

যে মিল লিপিবদ্ধ করার যোগ্য, তা হচ্ছে যেসব গুণ অনুসরণ করার আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন, সেগুলোতে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

تخلقوا باخلاق الله

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও।

অর্থাৎ, জ্ঞান-গরিমা, সহনশীলতা, অনুগ্রহ, কৃপা, অপরের কল্যাণ সাধন, জীবে দয়া, অপরের হিতাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি খোদায়ী গুণসমূহ অর্জন কর। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটি গুণ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। পক্ষান্তরে যে মিল পুস্তকে লেখা যায় না, তা এমন বিশেষ মিল, যা কেবল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়— ফেরেশতাদের মধ্যে নয়। এদিকেই ইঙ্গিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা হয়েছে এই আয়াতে—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

অর্থাৎ, তারা আপনাকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন— রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অংশ। এতে বলা হয়েছে যে, রূহ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমার বাইরে। নিম্নোক্ত আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

অর্থাৎ, অতঃপর আমি যখন তাকে সুগঠিত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দেব।

বলা বাহুল্য, এই গোপন মিলের কারণেই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদমকে সেজদা করতে। এই মিলের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এ আয়াতে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ, হে আদম, আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করেছি।

বলা বাহুল্য, মানুষ কেবল এ মিলের কারণেই আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

ان الله خلق ادم على صورته

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃজন করেছেন।

এ থেকে কোন কোন স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে দেহ ও আকৃতি গড়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এই মিলের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ আমি অসুস্থ হয়েছি, তুমি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করনি। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, এটা কিরূপে সম্ভব? উত্তর হল ঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করনি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুমি যদি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে, তবে আমাকে তার কাছে পেতে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই মিল তখন প্রকাশ পায়, যখন মানুষ ফরয কর্মসমূহ পালন করার পর নফল এবাদতে মশগুল হয়। যেমন, অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به -

অর্থাৎ, বান্দা সর্বদা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে মহব্বত করি। যখন মহব্বত করি, তখন তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে এবং তাঁর জিহ্বা হয়ে যাই, যাতে সে কথা বলে।

মোটকথা, মিল ও মহব্বতের একটি বড় কারণ, যা অধিক শক্তিশালী, উৎকৃষ্ট ও অচিন্তনীয়। এর অস্তিত্ব খুবই বিরল।

মহব্বতের উপরোক্ত পাঁচটি কারণই আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আক্ষরিক অর্থে একত্রিত রয়েছে এবং সবগুলো উচ্চস্তরে রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্ট মনীষীগণের মতে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন এক কারণে মাহবুব হয়, তবে অন্য ব্যক্তিরও সে কারণে মাহবুব হওয়া সম্ভব। এটা অংশীদারিত্ব, যা মহব্বতের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার প্রমাণ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর চূড়ান্ত প্রতাপ ও সৌন্দর্যের গুণাবলীতে কোন শরীক বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আসল মহব্বতের হকদার সেই সত্তা, যাতে কখনও অপরের অংশীদারিত্ব নেই।

খোদায়ী মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার উপায় ঃ আখেরাতে সে ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে, আল্লাহ তা'আলার সাথে যার মহব্বত অধিকতর শক্তিশালী হবে। কেননা, আখেরাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করা। বলা বাহুল্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন আশেক তার মাশুকের কাছে যাবে, তার দীদারে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চিরতরে ধন্য হবে, কোনরূপ বাধা থাকবে না এবং মালিন্য ও বিচ্ছিন্নতার কোন আশংকা থাকবে না, তখন কি অভাবনীয় খুশী ও অপার আনন্দই না তার অর্জিত হবে! কিন্তু এই আনন্দ মহব্বতের শক্তি অনুপাতে হবে। মহব্বত যত বেশী হবে, আনন্দও তত বেশী হবে।

দুনিয়াতে কোন ঈমানদার আল্লাহর মহব্বত থেকে খালি নয়। কিন্তু মহব্বতের আধিক্য যাকে এশ্ক বলা হয়, তা অনেকের মধ্যে নেই। এই এশ্ক অর্জনের উপায় দু'টি— দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মন থেকে গায়রুল্লাহর মহব্বত বের করে দেয়া। কেননা, মন হচ্ছে পান-পাত্রের মত। যদি পাত্রে পানি থাকে, তবে তাতে সিরকা রাখার অবকাশ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুটি মন দেননি যে, একটির দ্বারা আল্লাহকে মহব্বত করবে এবং অপরটি দ্বারা গায়রুল্লাহকে মহব্বত করবে। আল্লাহকে সর্বান্তকরণে চাওয়াই হচ্ছে পরিপূর্ণ মহব্বত। যে পর্যন্ত অপরের দিকে মনোযোগ রাখবে, সে পর্যন্ত মন অপরের সাথে একপ্রকার মশগুল থাকবে এবং যে পরিমাণ অপরের সাথে মশগুল থাকবে, সে পরিমাণ মনে আল্লাহর মহব্বত কম হবে। এই একাগ্রতার দিকেই এ আয়াতসমূহে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ-

অর্থাৎ, বলুন আল্লাহ, এরপর তাদেরকে তাদের অসার চিন্তায় খেলা করতে দিন।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, এরপর তাতে দৃঢ় থাকে।

কালেমায়ে তাইয়েবা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"— এর উদ্দেশ্যই তাই। অর্থাৎ কোন মাবুদ ও মাহবুব আল্লাহ ছাড়া নেই। বলা বাহুল্য, মাহবুবই মাবুদ হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ বলেন—

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

অর্থাৎ, দেখতো, যে মাবুদ করে নিয়েছে তার খেয়ালখুশীকে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন —

ابغض اله عبد فى الارض الهواء

অর্থাৎ, সর্বনিকৃষ্ট মাবুদ, যার পূজা করা হয় পৃথিবীতে, সে হচ্ছে খেয়ালখুশী।

অন্য এক হাদীসে আছে—

من قال لااله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنة -

অর্থাৎ, যে খাঁটি মনে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এখানে খাঁটি অর্থ অন্তরকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করা, যাতে অপরের অংশীদারিত্ব না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাই অন্তরের মাবুদ, মাহবুব ও মকসুদ হওয়া। যার এই অবস্থা, দুনিয়া তার জন্যে জেলখানা। কারণ, মাহবুবের সাথে সাক্ষাতে দুনিয়া একটি বাধা। মৃত্যু তার জন্যে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং মাহবুবের কাছে যাওয়া। যার মাহবুব এক সত্তা এবং সে জেলখানায় থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে, সে যদি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাহবুবের সাথে মিলিত হয় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত অনাবিল সুখে কাল কাটায়, তবে সে কতই না সৌভাগ্যশালী।

মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার আরেক উপায় হচ্ছে খোদায়ী মারেফত শক্তিশালী হওয়া ও অন্তরে তা বিস্তৃত হওয়া। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে অন্তর পাক হওয়ার পর তা অর্জিত হয়। যেমন, শস্যক্ষেত্রকে সকল আগাছা থেকে সাফ করার পর তাতে বীজ বপন করা হয়। অন্তরকে এভাবে পাক করার পর তাতে মহব্বত ও মারেফতের বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়। এ বৃক্ষের নাম কালেমায়ে তাইয়েবা, যার দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ কালেমায়ে তাইয়েবার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যা পবিত্র

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে বিস্তৃত।

নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ -

অর্থাৎ, তারই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কালাম ও সৎকর্ম।

এখানে পবিত্র কালামের অর্থ মারেফাত, আর সৎকর্ম এই মারেফাতের বাহক ও খাদেমের মত।

অন্তরকে পবিত্র করে তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখাই যাবতীয় সৎকর্মের উদ্দেশ্য। এভাবে মারেফত অর্জিত হলে তার পেছনে মহব্বত অবশ্যই থাকবে। মহব্বত থাকলে আনন্দও থাকবে।

মহব্বত ও মারেফতে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ঃ সকল ঈমানদার ঈমানে অভিন্ন হলেও মহব্বতে বিভিন্ন। কেননা, দুনিয়াতে মহব্বত ও মারেফত বিভিন্ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ও গুণাবলীর মধ্য থেকে যা শুনে, তাই শিখে মুখস্থ করে নেয়। এর বেশী তারা কিছু জানে না। কেউ কেউ এসব নাম ও গুণের অর্থ এমন কল্পনা করে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। বলা বাহুল্য, এরা পথভ্রষ্ট। আবার কেউ কেউ বাস্তব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় না এবং এসবের কোন অসার অর্থ কল্পনা করে না; বরং সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে। সত্যি বলতে কি, এরাই "আসহাবে ইয়ামীন"! আর যারা প্রত্যেক নাম ও গুণের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ অবগতি লাভ করে, তারা নৈকট্যশীল। আল্লাহ তা'আলা এই তিন প্রকার মানুষের কথা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যদি তারা হয় নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের জন্যে রয়েছে সুখ, রুযী ও নেয়ামতের বাগান। আর যদি তারা হয় আসহাবে ইয়ামীনদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি সালাম। আর যদি তারা হয় পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের আপ্যায়ন করা হবে উত্তপ্ত পানির দ্বারা এবং প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে।

এক্ষণে আমরা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহব্বতের বিভিন্নতা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাব। উদাহরণতঃ শাফেঈ মতাবলম্বীরা হযরত ইমাম শাফেঈকে মহব্বত করে। এ মহব্বতে ফেকাহবিদ, আলেম ও জনসাধারণ সকলেই অংশীদার। কারণ, তাঁর জ্ঞান-গরিমা, ধর্মপরায়ণতা, সচ্চরিত্রতা ও প্রশংসনীয় স্বভাব সম্পর্কে সবাই অবগত। কিন্তু সকলের অবগতি সমান নয়। জনসাধারণ তাঁর গুণ-গরিমা সংক্ষেপে এবং ফেকাহবিদগণ বিস্তারিতভাবে জানে। এ কারণে ফেকাহবিদদের মহব্বতও জনসাধারণের তুলনায় অনেক বেশী হবে। এমনিভাবে গোটা এ বিশ্ব আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও কারিগরীর জ্বলন্ত নমুনা। সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি কেবল বিশ্বাস করে এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়াকিফহাল। এমনকি, তারা সামান্য একটি মাছির ভেতরে এমন সব আশ্চর্য নিদর্শন দেখে, যা শুনে জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায়। একারণেই তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও পূর্ণতার গুণাবলী অধিক পরিমাণে জাগরূক থাকে। ফলে, তাদের মহব্বতও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মহব্বতের যে পাঁচটি কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর পার্থক্যের কারণে মহব্বতে পার্থক্য হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কেউ আল্লাহ তা'আলাকে এ কারণে মহব্বত করে যে, তিনি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদাতা, তবে তার এই মহব্বত হবে দুর্বল। কেননা, অনুগ্রহের পরিবর্তনে এ মহব্বত পরিবর্তন অনিবার্য। ফলে, বিপদাপদে পতিত হওয়ার সময় এ মহব্বত তেমন থাকে না, যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কারণে মহব্বত রাখে যে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা মহব্বতেরই যোগ্য, সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সকলই তাঁর অর্জিত রয়েছে, তবে তার মহব্বত অনুগ্রহের পরিবর্তনের কারণে কখনও পরিবর্তিত হবে না; বরং সদাসর্বদা একই রূপ থাকবে।

মোটকথা, এসব কারণে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে মানুষের অবস্থা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিভিন্ন হয় এবং এই বিভিন্নতার ভিত্তিতে পারলৌকিক সৌভাগ্যে পার্থক্য হয়।

আল্লাহর মারেফতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি ঃ পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, সেগুলোর মধ্যে অধিকতর দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তাই যাবতীয় মারেফতের মধ্যে আল্লাহর মারেফতই সর্বপ্রথম বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো প্রতীয়মান হয়। এর কারণ অবশ্যই জানা দরকার। আমরা আল্লাহ পাককে অস্তিত্ব জগতের সর্বাধিক দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর বলেছি। এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে আমরা একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করছি।

যদি আমরা কোন মানুষকে লিখতে, সেলাই করতে অথবা অন্য কোন কাজ করতে দেখি, তবে তার জীবিত হওয়া আমাদের কাছে সর্বাধিক স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ, তার জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা আমাদের মতে তার অন্যান্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর তুলনায় অধিক স্পষ্ট হবে। কেননা, তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যেমন, ক্রোধ, স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি তো আমরা জানিই না। আর বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে কতক আমরা জানি না আর কতক আমাদের জানা হয়ে যায়। যেমন, জীবন, জ্ঞান, কর্মক্ষমতা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অতঃপর আমরা যদি বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী আমাদের জানা হয়ে যায়। পাথর, ঢিলা, তরুলতা, বৃক্ষ, জীবজন্তু, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, সৌরজগত, জল, স্থল ইত্যাদি সকল বস্তু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, কুদরত, জ্ঞান ইত্যাদি গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলো সব এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, একজন স্রষ্টা, পরিচালক ও সবকিছুকে গতিশীলকারী অবশ্যই বিদ্যমান। এ ধরনের সৃষ্টবস্তুর কোন শেষ নেই। তাই আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রমাণসমূহের শেষ নেই। যদি লেখকের জীবন, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা কেবল একটি প্রমাণ অর্থাৎ, তার হাতের নড়াচড়া দেখে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয়ে যায়, তবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও জীব-কিরূপে স্পষ্ট হবে না। তাঁর অস্তিত্ব বুঝাবে না— এমন কোন বস্তুর থাকা সম্ভব নয়। আমাদের ভেতরেও এমন কোন বস্তু নেই এবং বাইরেও নেই। কেননা, বিশ্বের প্রতিটি কণা তার অবস্থার ভাষায় ডেকে বলছে— আমি আপনা-আপনি বিদ্যমান ও গতিশীল নই। আমার আবিষ্কর্তা ও গতিশীলকারী অন্য কেউ। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, অস্থির গ্রন্থি, রক্ত-মাংস ইত্যাদি সবকিছুই একজন স্রষ্টার সাক্ষ্য দেয় বিধায় তিনি এতই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

স্পষ্ট হয়ে গেছেন যে, তাঁকে উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা, দু'কারণে কোন বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম। এক, সেই বস্তুর সত্তাগতভাবে অপ্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম হওয়া। দুই, বস্তুর সীমাতিরিক্ত দৃশ্যমান ও প্রকট হওয়া। যেমন, বাদুড় রাতের অন্ধকারে দেখে এবং দিনের আলোতে দেখে না। এর কারণ এটা নয় যে, দিন রাতের তুলনায় অস্পষ্ট; বরং দিন এত বেশী স্পষ্ট যে, বাদুড়ের দুর্বল দৃষ্টি তাতে ধাঁধিয়ে যায়। সূর্যকিরণের তীব্রতা তার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। যখন এর সাথে কিছু অন্ধকার মিশ্রিত হয় এবং প্রকাশ দুর্বল হয়, তখন বাদুড় দেখতে শুরু করে। অনুরূপভাবে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল, আর আল্লাহ্ তা'আলার বিকাশে রয়েছে অসাধারণ চমক ও চূড়ান্ত দীপ্তি। এমনকি তাঁর বিকাশ দ্বারা প্রতিটি কণা দেদীপ্যমান। ফলে, এই অসাধারণ বিকাশই তাঁর গোপন ও অস্পষ্ট থাকার কারণ হয়ে গেছে।

তীব্র প্রকাশের কারণে গোপন থাকার তত্ত্ব শুনে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, বস্তুর বিকাশ ঘটে তার বিপরীত বস্তুর দ্বারা। যেমন, অন্ধকার আছে বলেই আমরা আলো উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তাঁর কোন বিপরীত নেই। এ কারণেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তিনি চূড়ান্ত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থেকে যান। কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং শক্তিপ্রবল, সে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন কিছু দেখে না। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই বিদ্যমান নেই। অন্যের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম তাঁর কুদরতের ফল এবং তাঁরই অনুগামী।

শওক তথা আগ্রহের স্বরূপ ঃ যারা মহব্বতের বাস্তবতা অস্বীকার করে, তারা আগ্রহের স্বরূপকে অবশ্যই স্বীকার করে না। কেননা, আগ্রহ মাহবুবের প্রতিই হয়ে থাকে। আমরা এখনি প্রমাণ করব, যে আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহর প্রতি তার আগ্রহ অবশ্যই থাকে এবং সে আগ্রহে বাধ্য।

মহব্বত প্রমাণ করার জন্যে আমরা ইতিপূর্বে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি, বলা বাহুল্য, আগ্রহ প্রমাণ করার জন্যে সেগুলোই যথেষ্ট। অর্থাৎ, মাহবুব যখন দৃষ্টির অন্তরালে থাকে, তখন তার প্রতি আগ্রহ হওয়া অনিবার্য। এর ব্যাখ্যা এই যে, যে বস্তু একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই আগ্রহ হওয়া সম্ভব। যে বস্তু কখনও উপলব্ধিতেই আসেনি, তার প্রতি আগ্রহ হওয়া অসম্ভব। এমনিভাবে যে বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপলব্ধ হয়ে যায়, তার প্রতিও আগ্রহ থাকে না। চূড়ান্ত উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কখনও দেখেনি এবং কখনও তার প্রশংসা শুনেনি। এমতাবস্থায় এই অদেখা ও অজানা ব্যক্তির প্রতি তার আগ্রহান্বিত হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। আর যে ব্যক্তি তার মাহবুবকে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করে, সে-ও মাহবুবের প্রতি আগ্রহান্বিত হবে না। বরং যে মাহবুব একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্যদিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই আগ্রহ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির মাহবুব তার কাছেই নেই; কিন্তু তার কল্পনা তার অন্তরে বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই কল্পনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে সে মাহবুবকে দেখতে আগ্রহান্বিত হবে। কেননা, আগ্রহের অর্থ হচ্ছে অন্তরস্থিত কল্পনাকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস পাওয়া। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবকে অন্ধকারে দেখে, ফলে তার মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দৃষ্টিতে পড়ে না, সে-ও এই অপূর্ণ দীদারকে পূর্ণ করতে আগ্রহী হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবের মুখমণ্ডল দেখে, কিন্তু তার কেশ ও অন্যান্য সৌন্দর্য দেখে না, সে-ও এগুলো দেখার জন্যে আগ্রহী হয়।

আগ্রহের উপরোক্ত ধরনগুলো আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বরং প্রত্যেক মহব্বতকারী সাধকের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলার যে সব বিষয় আল্লাহওয়ালাদের সামনে প্রকটিত হয়েছে, সেগুলো যেন হালকা যবনিকার অন্তরাল থেকে দেখার অনুরূপ এবং তাতে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্পষ্টতা নেই। পূর্ণ স্পষ্টতা প্রত্যক্ষকরণ ও জ্যোতির দীপ্তিকে বলা হয়, যা দুনিয়াতে অসম্ভব। কিন্তু এটাই আল্লাহওয়ালাদের চূড়ান্ত প্রিয় লক্ষ্য। তাই আগ্রহ সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ, মহব্বতকারীর সামনে আল্লাহ তা'আলার সামান্য প্রকাশ হওয়ার পর সে পূর্ণ প্রকাশের জন্যে নিঃসন্দেহে আগ্রহী হবে।

অসংখ্য হাদীস ও মনীষীগণের উক্তিতেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে এ দোয়া বর্ণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلَذَّةِ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقُ اِلٰى لِقَائِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার আদেশের পর সম্মতি, মৃত্যুর পর সুখী জীবন, তোমার প্রিয় মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং তোমার সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হযরত কা'ব আহবারকে বললেন ঃ আমাকে তাওরাতের কোন একটি আয়াত শুনাও। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— সজ্জনগণ আমার সাক্ষাতের প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়, আর আমি তাদের সাক্ষাতের প্রতি অধিক আগ্রহী। তিনি আরও বললেন ঃ তাওরাতে এই আয়াতের কাছাকাছি আরও উল্লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে। আর যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে না। হযরত আবুদ্দারদা বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে বললেন ঃ হে দাউদ, পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে শুনিয়ে দাও, যে আমাকে মহব্বত করবে, আমি তার হাবীব। যে আমার কাছে বসবে, আমি তার সহচর। যে আমার যিকর দ্বারা প্রীতি অর্জন করবে, আমি তার প্রিয়জন। যে আমার সাথে থাকবে, আমি তার সাথী। যে আমাকে অবলম্বন করবে, আমি তাকে অবলম্বন করব। যে আমার কথা মানবে, আমি তার কথা মানব। যে আমাকে মহব্বত করে, তার মহব্বত আমার খুব জানা হয়ে যায়। ফলে, আমি তাকে নিজের জন্যে কবুল করে নিই। তাকে এমন মহব্বত করি, আমার সৃষ্টির কেউ তার উপর অগ্রণী থাকে না। যে আমাকে সত্যি সত্যি অন্বেষণ করে, সে আমাকে পায়। আর যে অন্যকে অন্বেষণ করে, সে আমাকে পায় না। হে পৃথিবীর অধিবাসীরা, তোমরা এখন দুনিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছ। একে পরিত্যাগ কর এবং আমার সম্মান, সংসর্গ ও সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হও। আমার সাথে বন্ধুত্ব কর, আমি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করব। কেননা, আমি আমার বন্ধুদের খমীর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, মূসা কলীমুল্লাহ এবং মুহাম্মদ সফীউল্লাহর খমীর থেকে তৈরী করেছি। আমি আমার প্রতি আগ্রহীদের অন্তর নিজের নূর দ্বারা নির্মাণ করেছি এবং আমার প্রতাপ দ্বারা তাদেরকে লালিত করেছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা জনৈক সিদ্দীককে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট বান্দা আমার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, আমিও তাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখি। তারা আমার প্রতি আগ্রহী, আমিও তাদের প্রতি আগ্রহী। তারা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। তারা আমার দিকে তাকায়, আমিও তাদের দিকে তাকাই। যদি তুমিও তাদের পদাংক অনুসরণ কর, তবে আমি তোমাকে মহব্বত করব। আর যদি তাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হব। সিদ্দীক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার এই সকল বান্দার পরিচয় কি? এরশাদ হল— তারা দিনের বেলায় ছায়ার প্রতি এমন উৎসুক থাকে, যেমন— রাখাল তার ছাগলের প্রতি উৎসুক থাকে। তারা সূর্যাস্তের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে; যেমন পশুপাখি সন্ধ্যায় তাদের বাসায় ফেরার জন্যে আগ্রহী হয়। অতঃপর যখন রাত এসে যায়, অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায়, শয্যা বিছানো হয়, রহস্য উন্মোচিত এবং দোস্ত দোস্তের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা আমার উদ্দেশে পা বাড়ায়, কপাল বিছায়, আমার কালামের মাধ্যমে আমার কাছে মোনাজাত করে এবং আমার নেয়ামতের উপর আমাকে খোশামোদ করে। তাদের কেউ চিৎকার করে, কেই কান্নাকাটি করে এবং কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাদের কেউ আগ্রহী হয়ে দাঁড়ানো, কেউ বসা, কেউ রুকুকারী, কেউ সেজদাকারী। তারা আমার কারণে যা যা সহ্য করে এবং আমার কাছে অভিযোগ করে, তা সমস্তই গ্রহণ করে নিই। সর্বপ্রথম আমি তাদেরকে তিনটি বস্তু দান করব। এক, আমার নূর তাদের অন্তরে ঢেলে দেব। ফলে তারা আমার অবস্থা বর্ণনা করবে; যেমন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দেই। দুই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, যদি সবই তাদের মোকাবেলা করে, তবে আমি তাদের খাতিরে এগুলোকে কম মনে করব। তিন, আমি আমার পবিত্র মুখমণ্ডল তাদের দিকে ফিরিয়ে দেব। তুমি তো জান, আমি যার দিকে মুখ করি, তাকে কত কিছু দেই!

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনাবলীতে আরও উল্লিখিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বললেন ঃ হে দাউদ, জান্নাতকে কত স্মরণ করবে অথচ আমার কাছে আসার প্রতি আগ্রহের আবেদন করবে না? হযরত দাউদ আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার প্রতি আগ্রহী কারা? এরশাদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হল, তারা আমার আগ্রহী, যাদেরকে আমি সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে পবিত্র করে দিয়েছি এবং ভয় সম্পর্কে অবহিত করেছি। তাদের অন্তরে আমার দিকে ছিদ্র করে দিয়েছি। সেই ছিদ্রপথে তারা আমাকে দেখে। আমি তাদের অন্তরকে হাতে নিয়ে আকাশের উপর রাখি। এরপর শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদেরকে ডাকি। তারা সমবেত হয়ে আমাকে সেজদা করে। তখন আমি তাদেরকে বলি ঃ আমি তোমাদেরকে সেজদার জন্য ডাকিনি; বরং আমি তোমাদেরকে আমার প্রতি আগ্রহীদের নিষ্কলুষ অন্তর দেখাতে চাই এবং তাদের নিয়ে গর্ব করতে চাই। তাদের অন্তর আকাশে ফেরেশতাদেরকে এমন নূর দান করে, যেমন সূর্য পৃথিবীবাসীকে কিরণ দান করে। হে দাউদ, আমি আগ্রহীদের অন্তর আপন "রেযা" দ্বারা তৈরী করেছি। নিজের চেহারার নূর দ্বারা তাদের লালন করেছি। তাদের দেহকে পৃথিবীতে আমার লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছি। তারা অন্তরের পথ দিয়ে আমাকে দেখে এবং তাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

হযরত দাউদ আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার আশেকদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দাও। আদেশ হল ঃ লেবাননের পাহাড়ে চলে যাও। সেখানে চৌদ্দজন লোকের সাক্ষাত পাবে। তাদের মধ্যে রয়েছে যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সকল প্রকার লোক। তাদের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলো যে, আমাদের কাছে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন ব্যক্ত করো না কেন? তোমাদের পালনকর্তা সালাম জানিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন— তোমরা তো আমার বন্ধু, মনোনীত ও ওলী। আমি তোমাদের আনন্দে আনন্দিত হই এবং তোমাদের মহব্বতের দিকে অগ্রগামী হই। হযরত দাউদ নির্দেশ অনুযায়ী লেবানন পাহাড়ে গিয়ে তাদেরকে একটি ঝরণার কাছে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ঘোষণায় রত দেখলেন। তারা হযরত দাউদকে দেখেই প্রস্থানোদ্যত হলেন। হযরত দাউদ বললেন ঃ ভাইসব, আমি আল্লাহর রসূল। তাঁর একটি পয়গাম নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তারা তাঁর দিকে মুখ করে কান পেতে শুনতে লাগল। হযরত দাউদ বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই পয়গাম দিচ্ছেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছে ব্যক্ত করবে, তাঁকে ডাকবে, যাতে তিনি তোমাদের কণ্ঠস্বর শুনেন। তোমরা তাঁর বন্ধু ও ওলী। তোমাদের খুশীতে তিনি খুশী হন। স্নেহময়ী জননী যেমন তার সন্তানদের দেখাশুনা করে, তেমনি তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের দেখাশুনা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেন। একথা শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দোয়া করল। বৃদ্ধ দোয়ায় বলল ঃ ইলাহী, আমরা তোমার বান্দা এবং বান্দার সন্তান-সন্ততি। অতীত জীবনে আমরা যে পরিমাণ তোমাকে স্মরণ করিনি, আমাদেরকে সে পরিমাণ ক্ষমা কর। দ্বিতীয় জন বলল ঃ ইলাহী, তুমি পবিত্র। আমরা তোমার দাসানুদাস। তোমার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার রয়েছে তাতে সুদৃষ্টি দান কর। তৃতীয় জন বলল ঃ তুমি পবিত্র। আমরা কি তোমার কাছে দোয়া করার দুঃসাহস করব? তুমি জান, আমাদের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। তবে সর্বদা তোমার পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান কর। এতটুকু অনুগ্রহ আমাদের প্রতি কর। চতুর্থ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তোমার সন্তুষ্টি অন্বেষণে আমরা ক্রটি করেছি। তুমি নিজের কৃপায় এ কাজে আমাদের সাহায্য কর। পঞ্চম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা করার গৌরব দান করেছ। অতএব, যে ব্যক্তি তোমার মাহাত্ম্যে মশগুল, সে কি তোমার সাথে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? তুমি আমাদেরকে আপন নূরের নিকটবর্তী কর— এটাই ছিল আমাদের মকছুদ। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তুমি মহান। তুমি তোমার ওলীদের নিকটে থাক। তাই তোমার কাছে দোয়া করার সাহস আমরা পাই না। সপ্তম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, তুমি আমাদের অন্তরকে যিকিরের পথ প্রদর্শন করেছ এবং তোমাতে মশগুল হওয়ার ধ্যান দান করেছ। এই নেয়ামতের শোকরে আমাদের পক্ষ থেকে যে ক্রটি হয়েছে, তা ক্ষমা কর। অষ্টম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, আমাদের প্রয়োজন তো তুমি জানই। সেটা হচ্ছে কেবল তোমার দিকে দেখা। নবম ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, দাস তার প্রভুর সামনে দুঃসাহস দেখাতে পারে না। যেহেতু আপন কৃপায় আমাদেরকে দোয়ার আদেশ করেছ, তাই আরয করছি— আমাদেরকে সেই নূর দান কর, যা দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্ধকার স্তরসমূহে পথ পাওয়া যায়। দশম ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে তোমাকেই চাই। আমাদের প্রতি মনোযোগী হও এবং সর্বদা আমাদের কাছে থাক। একাদশ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তুমি আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছ, আমরা তা পূর্ণ করার আবেদন করি। দ্বাদশ ব্যক্তি বলল ঃ এলাহী, তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে আমাদের কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই। কেবল কৃপাদৃষ্টি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। ত্রয়োদশ ব্যক্তি বলল ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এলাহী, আমার আবেদন এই যে, দুনিয়াকে দেখার ব্যাপারে আমার চক্ষুকে অন্ধ কর এবং আখেরাতে মশগুল হওয়ার ব্যাপারে আমার অন্তরকে অন্ধ কর। চতুর্দশ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, আমি জানি তুমি ওলীদেরকে ভালবাস। অতএব, আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ কর যে, আমাদের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে কেবল তোমাতে মশগুল করে দাও।

আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ তাদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের সকল কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা যা যা কামনা করেছ, আমি সবই কবুল করলাম। তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও এবং ভূগর্ভে কুঠরী তৈরী করে নাও। আমি তোমাদের ও আমার মধ্যবর্তী যবনিকা সরিয়ে দিতে চাই যাতে তোমরা আমার নূর ও প্রতাপ দর্শন কর। হযরত দাউদ (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, এরা এই পর্যায়ে কেমন করে উন্নীত হল? এরশাদ হল— তারা আমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদেরকে ত্যাগ করে আমার সাথে একাকী থাকে।

বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত ঃ কোরআন মজীদের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে মহব্বত রাখেন। এখন এই মহব্বতের অর্থ কি, তা জানা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এর আগে আমরা সে সব আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করছি, যেগুলোর দ্বারা এই মহব্বত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারা তাঁকে মহব্বত করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন, যারা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর পথে যুদ্ধ করে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মহব্বত করেন তওবাকারীদেরকে ও পরিচ্ছন্নদেরকে।

আল্লাহ বান্দাকে মহব্বত করেনল—এ কারণেই যারা আল্লাহর মহব্বতের মিথ্যা দাবী করেছিল, তাদের জওয়াবে এরশাদ করেন—

অর্থাৎ, তাহলে গোনাহের কারণে তিনি তোমাদেরকে আযাব দেবেন কেন?

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اذا احب الله تعالى عبدا لا يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لاذنب له -

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন গোনাহ তার কোন ক্ষতি করে না। গোনাহ থেকে তওবাকারী গোনাহবিহীন ব্যক্তির মত।

এ হাদীসের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাহকে মহব্বত করেন, মৃত্যুর পূর্বেই তার তওবা কবুল করে নেন। এরপর অতীত গোনাহ অনেক হলেও তা তার কোন ক্ষতি করে না। যেমন, মুসলমান হওয়ার পর অতীত কুফর ক্ষতি করে না।

আল্লাহ তা'আলা মহব্বতের কারণে গোনাহ মাফ করার কথাও ঘোষণা করেছেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

অর্থাৎ, বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তিনি তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন।

রসূল আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الايمان الا من يحب -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাকে মহব্বত করেন এবং যাকে মহব্বত করেন না, উভয়কেই দুনিয়া দেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি মহব্বত করেন।

তিনি আরও বলেন—

من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اكثر ذكر الله احبه الله -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে অবনমিত করে দেন। আর যে আল্লাহকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন।

যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এতই মহব্বত করেন যে, তাঁকে এক পর্যায়ে বলেন— যা তোমার মন চায়, তাই কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত আক্ষরিক অর্থেই মহব্বত, রূপক অর্থে নয়। কেননা, অভিধানে মহব্বতের অর্থ অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের কামনা । এ কামনা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেলে তার নাম হয় এশ্‌ক। আমরা আরও বর্ণনা করেছি যে, অনুগ্রহ ও সৌন্দর্য উভয়টিই মনের অনুকূল। উভয়টি কখনও চর্মচক্ষু এবং কখনও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভূত হয়। অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যের উভয় প্রকার অনুভবে মহব্বত অপরিহার্য। চর্মচক্ষুতে অনুভূত হওয়াই জরুরী নয়। কিন্তু বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত এভাবে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহর জন্যে আরও যত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন শোনা, জানা ইত্যাদি মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার জন্যে একই অর্থে বলা যায় না। এমনকি অস্তিত্ব শব্দটি, যা অভিন্নতার দিক দিয়ে অত্যধিক ব্যাপক, সেটিও আল্লাহ ও মানুষের জন্যে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যতকিছু আছে, সব কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অনুসারী ও অনুসৃতের অস্তিত্ব এক রকম কিভাবে হতে পারে? শব্দ রচয়িতারা মহব্বত, কুদরত, ইচ্ছা, প্রভৃতি শব্দকে প্রথমে মানুষের জন্যে রচনা করেছিল। কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধিতে মানুষই প্রথমে ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার জন্যে এসব শব্দের ব্যবহার রূপক অর্থে হয়েছে।

মহব্বত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের কামনা। এটা সে মন হতে পারে, যা অনুকূল বস্তু না পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ থাকে এবং পাওয়া গেলে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অসম্ভব। কারণ, পূর্ণতা, সৌন্দর্য, প্রতাপ ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার কাছে বিদ্যমান এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ও অর্জিত থাকবে। আর বাস্তবে তাঁর সত্তা ও কর্ম ব্যতীত কোন কিছুই বিদ্যমান নেই। এ কারণেই শায়খ আবু সাঈদের সামনে যখন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারা আল্লাহকে মহব্বত করে।) আয়াতখানি পাঠ করা হল, তখন তিনি বললেন ঃ তিনি নিজেকেই মহব্বত করেন। অর্থাৎ, সবকিছু তিনিই। তিনি ব্যতীত কোন কিছু বিদ্যমান নেই।

সুতরাং বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার অন্তর থেকে যবনিকা উন্মোচিত করে দেয়া। ফলে, বান্দা তাঁকে অন্তর দিয়ে দেখতে অথবা তিনি বান্দাকে নৈকট্যলাভে সক্ষম করে দেন। এসব কাজ অর্থাৎ যবনিকা উন্মোচিত করা অথবা নৈকট্যলাভে সক্ষম করা সমস্তই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপায় হবে। বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের অর্থ তাই।

এখন প্রশ্ন হল, বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত একটি অস্পষ্ট ব্যাপার। আমরা কিরূপে জানব, এই বান্দা আল্লাহ তা'আলার মাহবুব? জওয়াব, এর কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়, সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতপ্রাপ্ত। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا احبه الحب البالغ اقتناه

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। যখন তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মহব্বত করেন, তখন তাকে খাঁটি করে নেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে "খাঁটি করে নেন" কথার মর্মার্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ অর্থাৎ তার কাছে ধন ও জন বলতে কিছুই রাখেন না। এ থেকে জানা গেল, বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের পরিচয় হল আল্লাহ তাকে গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেবেন এবং বান্দা ও গায়রুল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেবেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে কোন এক ব্যক্তি আরয করল ঃ আপনি সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চর ক্রয় করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় নয়, তিনি আমাকে নিজের সত্তা থেকে আলাদা করে খচ্চরের ব্যস্ততা দান করবেন। হাদীসে আছে—

اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه وان رضى اصطفاه

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। যদি সে সবর করে, তবে তাকে নির্বাচিত করে নেন, আর যদি সে রাযী থাকে, তবে মনোনীত করে নেন।

অন্য এক হাদীসে আছে—

اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يامره وينهاه -

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তার জন্যে তার নিজের মধ্য থেকে একজন উপদেশদাতা এবং অন্তরের তরফ থেকে একজন সতর্ককারী নিযুক্ত করে দেন। সে তাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।

মোটকথা, এসব লক্ষণের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রমাণিত হয়। এছাড়া, আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বতও এই মহব্বতের একটি দলীল।

এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার মহব্বতেরও কিছু লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত দাবী করা খুবই সহজ। কিন্তু এর বাস্তবতা খুবই বিরল। শয়তানের প্ররোচনায়ও মন অনেক সময় খোদায়ী মহব্বত দাবী করে। মহব্বতের আলামত দ্বারা মনের পরীক্ষা না নেওয়া পর্যন্ত এ দাবীতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। মহব্বত একটি বৃক্ষ, যার শিকড় পৃথিবীতে এবং শাখাপল্লব উর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত। এর ফল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় এবং এর দ্বারা মহব্বতের অস্তিত্ব জানা যায়। যেমন, ধোঁয়া দেখলে আগুনের অস্তিত্ব জানা যায়। এ ধরনের আলামত বা লক্ষণ অনেক। এক, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতকে প্রিয় জ্ঞান করবে। কেননা, মহব্বতের পর মাহবুবের সাক্ষাত কামনা করাই স্বাভাবিক। এটা জানা কথা যে, দুনিয়া থেকে প্রস্থান ব্যতীত এই বাসনা পূর্ণ হবে না। তাই মৃত্যুকে মহব্বত করা ও তাকে অপ্রিয় মনে না করাও জরুরী। কেননা, মাশুকের দেশে যাওয়ার জন্যে এবং তার দীদার দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার জন্যে সফর করা আশেকের কাছে অপ্রিয় মনে হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন—

من احب لقاء الله احب الله لقاءه –

অর্থাৎ, যে আল্লাহর তা'আলা সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাত পছন্দ করেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের পর বান্দার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় যে স্বভাবটি প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে অধিক পরিমাণে সেজদা।

আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা সত্য মহব্বত বলে এরশাদ করেছেন। সেমতে মুসলমানরা যখন খোদায়ী মহব্বতের দাবী করল, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا –

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকেই মহব্বত করেন, যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে।

আরও বলা হয়েছে—

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ –

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর মারে ও মরে।

এখানে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার বাসনাকে মহব্বতের আলামত বলা হয়েছে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে যে ওসিয়ত করেন, তাতে বলা হয়েছে— সত্য কথা অসহনীয়। এতদসত্ত্বেও তা প্রিয়। মিথ্যা হালকা হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও তা মন্দ। যদি তুমি আমার উপদেশ মনে রাখ, তবে মৃত্যুর চেয়ে অধিক কোন অনুপস্থিত বস্তু তোমার কাছে প্রিয় হবে না, যার আগমন সুনিশ্চিত। আর যদি এ উপদেশকে এড়িয়ে যাও, তবে কোন অনুপস্থিত বস্তু তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ হবে না; অথচ তুমি একে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।

সাঈদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁর পুত্র ইসহাকের কাছে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আমার কাছে এসে বললেন ঃ এস, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি। অতঃপর এক পার্শ্বে চলে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি— আগামীকাল যুদ্ধে যেন আমার মোকাবিলা কোন ভয়ংকর ক্রুদ্ধ বীরপুরুষের সাথে হয়। আমি তার সাথে এবং সে আমার সাথে লড়বে। অতঃপর সে আমাকে ভূতলশায়ী করে আমার নাক-কান কেটে দেবে এবং আমার পেট চিরবে। কিয়ামতে যখন আমি তোমার সামনে যাব, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ, তোমার নাক-কান কে কাটল? আমি আরয করব— ইলাহী, তোমার পথে এবং তোমার রসূলের পথে আমার এই দশা হয়েছে। হযরত সাঈদ বললেন ঃ আমি যুদ্ধের শেষ দিন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নাক ও কান সুতায় বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখেছি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন ঃ আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের অবশিষ্ট কসমও পূর্ণ করবেন।

হযরত সুফিয়ান ছওরী ও বিশরে হাফী (রহঃ) বলেন ঃ সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিই মৃত্যুকে খারাপ মনে করে। কারণ, হাবীব কোন অবস্থায় মাহবুবের সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না।

বুয়ায়তী জনৈক দরবেশকে জিজ্ঞেস করলে ঃ তুমি কি মৃত্যুকে মহব্বত কর? দরবেশ নিরুত্তর রইলেন, তিনি বললেন ঃ তুমি সত্যিকার দরবেশ হলে মৃত্যুকে প্রিয় মনে করতে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

দরবেশ বলল ঃ এক হাদীসে তো রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। বুয়ায়তী বললেন, এই নিষেধাজ্ঞা তখন, যখন বান্দার উপর কোন মুসীবত নাযিল হয়। অর্থাৎ, মুসীবতের কারণে যেন কেউ মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকা তাঁর হুকুম থেকে পলায়ন করার চেয়ে উত্তম।

এখন প্রশ্ন হয়, মৃত্যুকে মহব্বত না করে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করতে পারে কি না? জওয়াব এই যে, মৃত্যুকে মহব্বত না করার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছেদের দুঃখ। এতে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে ত্রুটি থাকে। কিন্তু দুনিয়া ও স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের মহব্বতের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার প্রতিও কিছু দুর্বল মহব্বত থাকা কঠিন নয়। মহব্বতে মহব্বতে তফাৎ থাকা তো একটা স্বীকৃত সত্য। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হযরত হুযায়ফা ইবনে ওতবা নিজের ভাগিনী ফাতেমাকে তারই মুক্ত ক্রীতদাস সালেমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এতে কোরায়শ বংশের লোকেরা ঘোর আপত্তি তুলতে লাগল ঃ তুমি একজন কোরায়শী মহিলার বিবাহ একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কেমন করে দিলে? হুযায়ফা জওয়াব দিলেন ঃ সালেম ফাতেমার চেয়ে উত্তম— একথা জেনেই আমি বিয়ে দিয়েছি। এই জওয়াব কোরায়শদের কাছে বিয়ের চাইতেও অধিক দুঃসহ মনে হল। তারা বলল ঃ এটা কিরূপে সম্ভব? ফাতেমা তো তোমার ভাগিনী এবং সালেম তোমার মুক্ত ক্রীতদাস! হুযায়ফা বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কাউকে দেখতে চায়, যে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে, সে যেন সালেমকে দেখে। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিছু লোক আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে না; বরং তারা দুনিয়ার সাথেও মহব্বত রাখে। অতএব, তারা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে যাবে, তখন দীদারের আনন্দ মহব্বত পরিমাণেই পাবে। পক্ষান্তরে তারা দুনিয়ার সাথে যে পরিমাণে মহব্বত রাখবে, দুনিয়া ত্যাগ করার সময় সে পরিমাণে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃত্যুকে খারাপ মনে করার আরেক কারণ হল, বান্দা মহব্বতের প্রাথমিক স্তরে থাকার কারণে তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসাকে খারাপ মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সাথে মোলাকাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর আগমনকে খারাপ মনে করে। এতে মহব্বত কম হওয়ার অবস্থা বুঝায় না। বরং তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন আশেক তার মাশুকের আগমনবার্তা শুনে চায় যে, মাশুক কিছুদিন পরে আসুক, যাতে তার জন্যে ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে নেওয়া যায় এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়া যায়। ফলে মাশুক আসার পর স্বচ্ছন্দে তার সাথে সাক্ষাত করা যাবে এবং কোন অসুবিধা থাকবে না। সুতরাং এই জাতীয় কারণে মৃত্যুকে খারাপ মনে করা পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থী নয়। এর পরিচয় হচ্ছে আসলে পুরাপুরি যত্নবান হওয়া এবং চিন্তাকে আখেরাতের প্রস্তুতিতে ডুবিয়ে রাখা।

মহব্বতের আরও একটি আলামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের প্রিয়বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেয়া, এর জন্যে কঠিনতর আমল বাস্তবায়িত করা এবং শৈথিল্য ও অলসতা পরিহার করে সার্বক্ষণিক এবাদতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রত্যাশী হওয়া। এরূপ আত্মত্যাগীদের প্রশংসায় কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

অর্থাৎ, তারা তাদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। তারা যা প্রাপ্ত হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কোন কৌতূহল নেই। নিজেরা ক্ষুধাপীড়িত হলেও তারা তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

আর যে ব্যক্তি সব সময় নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, তার মাহবুব খেয়ালখুশীই হবে। আশেক তো তার মাশুকের ইচ্ছার অনুসরণ করে। তার ইচ্ছার সামনে নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দেয়। বরং খোদায়ী এশক যখন প্রবল হয়, তখন মাশুক ছাড়া সবকিছুর মূলোৎপাটন করে ছাড়ে। যেমন, বর্ণিত আছে, যুলায়খা যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে বিহাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল, তখন তাকে ছেড়ে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হল এবং তাঁরই হয়ে রইল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে দিনের বেলায় কাছে পেতে চাইলে যুলায়খা রাতের কথা বলে এড়িয়ে যেত এবং রাতে দিনের ওয়াদা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। বলত ঃ হে ইউসুফ, আমি আপনাকে তখন মহব্বত করতাম, যখন আল্লাহ্ তা'আলাকে জানতাম না। এখন তাঁকে চিনেছি। এখন তাঁর মহব্বত আমার অন্তরে অন্য কারো মহব্বতের জন্যে জায়গা রাখেনি। আমি এই মহব্বতের কোন বিনিময়ও চাই না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ, তুমি যুলায়খার সাথে সহবাস কর। তার গর্ভ থেকে তোমার দুটি পুত্র সন্তান হবে। আমি তাদের উভয়কে নবী করব। যুলায়খা আরয করল ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই আদেশ দিয়ে থাকেন এবং আমাকে এই নিয়ামতের মাধ্যম করে থাকেন, তবে আমি তাঁর ইচ্ছা শিরোধার্য করে নেব এবং সহবাসে সম্মত হব। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করে, সে তার আদেশ অমান্য করে না।

এখন জানা উচিত, নাফরমানী তথা আদেশ অমান্য করা মূল মহব্বতের পরিপন্থী নয়; বরং পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থী। উদাহরণতঃ মানুষ নিজেকে মহব্বত করে। সে যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন রোগমুক্তিকে মহব্বত করে। এতদসত্ত্বেও সে এমন বস্তু খেয়ে ফেলে, যা তার জন্যে ক্ষতিকর; অথচ সে জানে তা খেলে তার রোগ বেড়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, সে নিজেকে মহব্বত করে না। বরং বলা হয়, তার জ্ঞান কম এবং খাহেশ প্রবল। তাই মহব্বতের দাবীর উপর কায়েম থাকতে অক্ষম। নাফরমানী যে মূল মহব্বতের পরিপন্থী নয়, এর প্রমাণ এ ঘটনা। নোমান নামক জনৈক মুসলমান পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘন ঘন ধৃত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আনীত হত। একবার তাকে ধরে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উপর শরীয়তের শাস্তি "হদ" জারি করলেন। অতঃপর জনৈক সাহাবী তাকে লানত করলে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তাকে লানত করো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করে। এখানে তিনি গোনাহের কারণে নোমানকে মহব্বত থেকে খারিজ করে দেননি। হ্যাঁ, গোনাহ মানুষকে পূর্ণ মহব্বত থেকে খারিজ করে দেয়। জনৈক সাধক বলেন ঃ যখন মানুষের ঈমান অন্তরের বাহ্যিক অংশে থাকে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন সে আল্লাহ তা'আলার সাথে মাঝারি ধরনের মহব্বত রাখে। আর যখন ঈমান অন্তরের অন্তস্তলে চলে যায়, তখন পূর্ণ মহব্বত রাখে এবং গোনাহ পরিত্যাগ করে।

মহব্বতের দাবী করা বিপদমুক্ত নয়। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ তোমাকে আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখ কি না, এ প্রশ্ন করা হলে তুমি চুপ থাকবে, জওয়াব দিবে না। কেননা, যদি বল "না", তবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি হাঁ বল, তবে তোমার গুণাবলী মজনুনের মত নয়। অতএব, আল্লাহর গযবকে ভয় কর এবং মিথ্যা দাবী করো না। জনৈক আলেম বলেন ঃ জান্নাতে মহব্বতকারীদের সুখ ও আনন্দের চেয়ে বড় কোন সুখ ও আনন্দ নেই। আর দোযখেও সে ব্যক্তির আযাবের চেয়ে বড় কোন আযাব নেই, যে মহব্বতের দাবী করে, অথচ মহব্বতের কোন বিষয় তার মধ্যে নেই।

মহব্বতের আরেক আলামত হচ্ছে, যিকিরের প্রতি অত্যধিক উৎসাহী হওয়া এবং যিকির থেকে অন্তরাশূন্য না থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর সাথে মহব্বত রাখে, সে তার যিকির তথা স্মরণ অনেক বেশী করে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহকেও অত্যধিক স্মরণ করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বতের লক্ষণ হবে তাঁর যিকির কে মহব্বত করা, তাঁর কালাম অর্থাৎ কোরআন মজীদকে মহব্বত করা এবং তাঁর রসূলকে মহব্বত করা। এমনিভাবে যে বস্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাকেও মহববত করা। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে মহব্বত করলে মাহবুবের গলির কুকুরকেও মহব্বত করতে থাকে। মহব্বত শক্তিশালী হয়ে গেলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। একে মহব্বতে অংশীদারিত্ব মনে করা ভুল। কেননা, মাহবুব আল্লাহর রসূলকে এজন্যে মহব্বত করবে যে, তিনি তাঁর রসূল। এটা হুবহু মাহবুবকেই মহব্বত করা— অপরকে নয়। যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যায়, সে সমগ্র সৃষ্টিকে মহব্বত করতে থাকে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টি যে মাহবুবেরই সৃষ্টি। সুতরাং কালামে পাক, রসূলে করীম (সাঃ) এবং ওলামায়ে কেরামকে মহব্বত না করে উপায় আছে কি? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, হে নবী বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

احبوا الله لما يغزوكم به من نعمة واحبونى لله -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে এজন্যে মহব্বত কর যে, তিনি তোমাদের নেয়ামত দিয়ে লালন-পালন করেন। আর আমাকে মহব্বত কর আল্লাহর জন্যে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতকারীকে মহব্বত করে, সে আল্লাহকে মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর তাযীমকারীর তাযীম করে, সে আল্লাহরই তাযীম করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোরআন ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন না করে। কেননা, যে কোরআনকে মহব্বত করে, সে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করে। যদি কোরআনের সাথে মহব্বত না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত হবে না।

হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ খোদায়ী মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে কোরআন মজীদের মহব্বত। আল্লাহ তা'আলা ও কোরআনের সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে মহব্বত। তাঁর সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে তাঁর সুন্নাহর সাথে মহব্বত। সুন্নাহর সাথে মহব্বতের লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের মহব্বত। আখেরাত যে প্রিয় তার পরিচয় হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা। আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার আলামত হচ্ছে দুনিয়া থেকে আখেরাতের পাথেয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করা।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে একান্ত বাস, মোনাজাত ও কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি অনুরক্ত হওয়া এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া। হাবীবের সাথে একান্তে বাস ও মোনাজাতের আনন্দকে সুখ মন করা এই মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর। অতএব, যে ব্যক্তির কাছে নিদ্রা ও পারস্পরিক গল্পগুজব মোনাজাতের তুলনায় উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক, তার মহব্বত কেমন করে সঠিক হবে? হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম যখন পাহাড় থেকে অবতরণ করেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কোথেকে আসলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনাবলীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ আমার সৃষ্টির কারও প্রতি অনুরক্ত হয়ো না। কারণ, আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দু'প্রকার লোককে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেই । এক, যে আমার ছওয়াবকে বিলম্বিত জেনে আলাদা হয়ে যায় এবং দুই, যে আমাকে বিস্মৃত হয়ে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এর পরিচয় এই যে, আমি তাকে তার নিজের হাতে সোপর্দ করি এবং দুনিয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছেড়ে দেই।

মানুষ যদি গায়রুল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে যে পরিমাণ অনুরাগ হবে, আল্লাহ থেকে সে পরিমাণ দূরত্ব হয়ে যাবে এবং মহব্বত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

বরখ ছিল একজন কাফ্রী গোলাম এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র। হযরত মূসা (আঃ) তার ওসিলায় বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন। তার বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ বরখ ভাল লোক। কিন্তু তার মধ্যে একটি দোষ আছে। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, তার দোষ কি? এরশাদ হল ঃ ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু তার খুব পছন্দ। সে এর প্রতি অনুরক্ত। যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, সে কোন বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হয় না।

বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ কোন এক জঙ্গলে দীর্ঘ দিন আল্লাহ তা'আলার এবাদত করে। অতঃপর সে দেখে, একটি পাখী এক গাছের উপর বাসা তৈরী করে তাতে বসে কিচিরমিচির করছে। আবেদ মনে মনে বলল ঃ এই গাছের নীচে এবাদতের জায়গা করে নিলে পাখীর ডাক শুনে মন বেশ প্রফুল্ল থাকবে। অতঃপর সে গাছের নীচে বসে এবাদত শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ অমুক আবেদকে জানিয়ে দাও, সে আমার সৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তার মর্তবা হ্রাস করে দিলাম, যা আর কোন আমল দ্বারা পূর্ণ হবে না।

মোটকথা, আশেক তাকেই বলে, যে মাশুক ছাড়া প্রশান্তি পায় না। কোরআন পাকে আছে—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। শুন, অন্তরসমূহ আল্লাহকে সরণ করেই প্রশান্তি পেতে পারে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ এখানে প্রশান্তির অর্থ খুশী ও আন্তরিক অনুরাগ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্ভেজাল খোদায়ী মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করে, এ স্বাদ তাকে দুনিয়ার পেছনে ছুটাছুটি থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মহব্বত দাবী করে, অথচ রাতের বেলায় গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে তাকে, সে মিথ্যুক। যে নিজের মাহবুবের সাক্ষাত পছন্দ করে না, সে কেমন মহব্বতকারী! আমি রাতের বেলায় যারা আমাকে চায়, তাদের জন্যে বিদ্যমান থাকি। সে সাচ্চা হলে আমাকে তখন চাইত।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয় না, সে আল্লাহর আশেক নয়— আল্লাহর কালামকে মানুষের কালামের উপর, আল্লাহর সাক্ষাতকে মানুষের সাক্ষাতের উপর এবং আল্লাহর এবাদতকে জনসেবার উপর।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছু হাত-ছাড়া হয়ে যায়, তার জন্য পরিতাপ না করা। কিন্তু কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গেলে সেজন্য নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করা এবং গাফেল হওয়ার সাথে সাথে তওবা ও এস্তেগফার করা কর্তব্য। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কিছু সংখ্যক বান্দা তাঁকে মহব্বত করার পর তাঁকে নিয়েই প্রশান্ত। বেহাত বস্তুর জন্যে তারা কোন দুঃখ করে না।

মহব্বতের এক আলামত আল্লাহ তা'আলার এবাদতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং এবাদতে কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বিশ বছর পর্যন্ত রাতের বেলায় বিপদ সহ্য করেছি। এরপর এর মাধ্যমে বিশ বছর আনন্দ করেছি। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ মহব্বতের আলামত সর্বদা প্রফুল্ল থাকা এবং এমন চেষ্টা করা, যাতে দেহ ক্লান্ত হয় এবং অন্তর ক্লান্ত না হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ আসলে মহব্বতের কোন ক্লান্তি নেই। জনৈক আলেম বলেন ঃ মহব্বতকারী অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলেও এবাদতে কখনও তৃপ্ত হয় না। বাস্তব জগতেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আশেক তার মাশুকের মহব্বতে চেষ্টা করতে ত্রুটি করে না এবং তার খেদমত করাকে আন্তরিকভাবে ভাল মনে করে। দেহের জন্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কষ্টকর হলেও সে এতেই আনন্দ পায়। দেহ অক্ষম হয়ে গেলে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে, যাতে আবার খেদমতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল হয়ে গেলেও তেমনি এবাদত ও খেদমতের চেয়ে উত্তম কোন কিছু থাকে না। যে বস্তুর মহব্বত মানুষের মধ্যে প্রবল হয়, তা তার নীচের বস্তুকে নির্মূল করে দেয়। উদাহরণতঃ কারও মহব্বত ধন-সম্পদের মহব্বতের তুলনায় বেশী হলে তার জন্যে ধন-সম্পদ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। জনৈক খোদাপ্রেমিক তার জানমাল সমস্তই উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করা হল ঃ মহব্বতে তোমার এ অবস্থা কিরূপে হল? সে উত্তর দিল ঃ আমি একদিন এক আশেকের নির্জনে তার মাশুকের সাথে একথা বলতে শুনেছিলাম— আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে সর্বান্তকরণে ভালবাসি। কিন্তু তুমি কেন জানি মুখ ফিরিয়ে রাখ। মাশুক বলল ঃ যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে বল আমার জন্যে কি ব্যয় করবে? আশেক বলল ঃ প্রথমে আমি যেসব বস্তুর মালিক, সেগুলো সব তোমাকে দিয়ে দেব। এরপর তোমার জন্যে আমার প্রাণ উৎসর্গ করব। তুমি সম্মত হয়ে যাও। এই কথাবার্তা শুনে আমি ভাবলাম, যদি মানুষ মানুষের জন্যে এরূপ করতে পারে, তবে মাবুদের সাথে বান্দার কিরূপ করা উচিত। আমার মহব্বতের উন্নতির এটাই কারণ।

আল্লাহ তা'আলার সকল বান্দার প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু হওয়াও মহব্বতের একটি লক্ষণ। আল্লাহ পাক বলেন—

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের উপর কঠোর এবং পরস্পর দয়ালু।

এ ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনায় প্রভাবিত না হওয়া উচিত এবং আল্লাহর জন্যে ক্রুদ্ধ হওয়ার পথে কোন বাধা না থাকা কর্তব্য। এক হাদীসে কুদসীতে ওলীদের এ গুণই উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে— তারাই আমার ওলী, যারা আমার মহব্বতে পাগলপারা, যেমন শিশু কোন বস্তুর জন্যে পাগলপারা হয়ে থাকে। তারা আমার যিকিরের দিকে এমন ধাবিত হয়, যেমন পশু-পাখি তাদের বাসার দিকে ধাবিত হয়। তারা আমার নিষিদ্ধ কাজকর্ম দেখে ক্রোধে বাঘের মত গর্জন করে; মানুষ কম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

না বেশী, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এই দৃষ্টান্তটি অনুধাবন করা দরকার। শিশুর মন কোন বস্তুতে লেগে গেলে সে তা থেকে কখনও আলাদা হয় না। কেউ সেই বস্তু নিয়ে গেলে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সে চীৎকার করতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার সময়ও বস্তুটি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ঘুমায়। জাগ্রত হলে আবার হাতে তুলে নেয়। বস্তুটি হারিয়ে গেলে কাঁদে এবং পেয়ে গেলে হাসতে থাকে। বাঘও ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ক্রোধের তীব্রতায় সে নিজেকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অতএব, এগুলো হচ্ছে মহব্বতের আলামত। যার ভেতরে এসব বিষয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তার মহব্বত পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি। আর যার মহব্বতে গায়রুল্লাহর মহব্বতের মিশ্রণ থাকবে, সে আখেরাতে মহব্বত পরিমাণই শান্তি পাবে।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের অর্থ ঃ পূর্বেই লিখিত হয়েছে, অনুরাগ, ভীতি ও আগ্রহ মহব্বতের অন্যতম ফল। কিন্তু এসব ফল অবস্থা ভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যখন মহব্বতকারী আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা বুঝে নেয় এবং অবস্থাটি প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন অন্তর তাঁর অন্বেষণে উত্তেজিত থাকে। অন্তরের এই উত্তেজনাকে "শওক" তথা আগ্রহ বলা হয়। যখন মহব্বতকারীর উপর খোদায়ী সৌন্দর্য ও নৈকট্যের আনন্দ প্রবল হয়, তখন অন্তরের এই আনন্দ ও খুশীর ভাবকে "উন্স" তথা অনুরাগ বলা হয়। মহব্বতকারীর দৃষ্টি কখনও মাহবুবের শক্তি, অমুখাপেক্ষিতা, বেপরওয়াভাব ইত্যাদি গুণাবলীর প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং এগুলো জানার কারণে মনে ব্যথা থাকে। অন্তরে এ ধরনের দুঃখের ভাব প্রবল হয়ে গেলে তাকে বলা হয় 'খওফ' তথা ভীতি।

যার মধ্যে অনুরাগ প্রবল, সে নির্জনতাপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম পাহাড় থেকে অবতরণ করলে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনি কোত্থেকে আসছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে।

যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হয়, গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া তার জন্যে অপরিহার্য। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেন, তখন কিছুদিন পর্যন্ত মানুষের কথাবার্তা শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এর কারণ, মাহবুবের কথা ও তাঁর প্রতি অনুরাগ এত মিষ্ট যে, অন্য বস্তুর মিষ্টতা অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী করেন— হে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দাউদ, আমারই আগ্রহী এবং আমারই প্রতি অনুরাগী হও। অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হও।

আবদুল ওয়াহেদ ইবন যায়দ বলেন— আমি জনৈক দরবেশের কাছে গিয়ে বললাম ঃ তুমি খুব নির্জনতা পছন্দ কর? সে বলল ঃ মিঞা সাহেব, আপনি যদি নির্জনতার স্বাদ আস্বাদন করেন, তবে নিজেকেও ঘৃণা করতে শুরু করবেন। নির্জনতাই তো এবাদতের মূল শিকড়। আমি শুধালাম ঃ তুমি নির্জনতার সর্বনিম্ন উপকার কি পেয়েছ? সে বলল ঃ মানুষের তোষামোদ থেকে মুক্তি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা। আমি বললাম ঃ মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরাগের মিষ্টতা কখন পায়? সে বলল ঃ যখন মহব্বত পরিষ্কার এবং আদান-প্রদান খাঁটি হয়। আমি শুধালাম ঃ মহব্বত কখন পরিষ্কার হয়? সে বলল ঃ যখন এবাদতে কোন চিন্তা অবশিষ্ট না থাকে।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের বিশেষ আলামত হচ্ছে জনকোলাহলে অস্বস্তিবোধ করা এবং খোদায়ী এবাদতের মিষ্টতা আস্বাদনে তীব্র লোভী হওয়া। এমতাবস্থায় অনুরাগী ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করলেও এমনভাবে করবে যেন সে জনসমাবেশের মধ্যেও একা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ অনুরাগী ব্যক্তিরা কেবল দৈহিকভাবে দুনিয়াকে সঙ্গ দেয়। তাঁদের আত্মা উচ্চতম প্রাসাদে নিবদ্ধ। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার নায়েব এবং তাঁর ধর্মের প্রতি আহ্বায়ক।

অনুরাগের প্রাবল্য ঃ অনুরাগ যখন স্থায়ী, প্রবল ও মযবুত হয়ে যায়, তখন তা মোনাজাতে এক প্রকার সন্তুষ্টি ও খোলাখুলি ভাব সৃষ্টি করে, যা মাঝে মাঝে বাহ্যত মন্দ হয়ে থাকে। কারণ, এতে থাকে দুঃসাহস ও নির্ভীকতা। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরাগের স্তরে অবস্থান করে, তার এই খোলাখুলি ভাব সহ্য করে নেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে অবস্থান না করে কথায় ও কাজে অনুরাগীদের ন্যায় সাহসিকতা দেখায়, সে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। বরখে আসওয়াদের মোনাজাত এর দৃষ্টান্ত। তার সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ করা হয় যে, বনী ইসরাঈলের নিমিত্ত বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে তাকে অনুরোধ কর। বরখে আসওয়াদের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

বনী ইসরাঈলের দেশে সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ বিরাজ করলে হযরত মূসা (আঃ) সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির দোয়া

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করতে বের হন এবং দোয়া করেন। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন— যারা গোনাহে আচ্ছন্ন, আন্তরিকভাবে পাপিষ্ঠ, বিশ্বাস ছাড়াই দোয়া করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে না, তাদের দোয়া আমি কেমন করে কবুল করব? তুমি আমার এক বান্দার কাছে যাও। যার নাম বরখ। তাকে বল বাইরে এসে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে, যাতে আমি কবুল করি। হযরত মূসা (আঃ) বরখের খোঁজ নিলে কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। একদিন তিনি জনৈক হাবশী গোলামকে পথিমধ্যে দেখতে পেলেন। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে সেজদার ধূলি লেগেছিল এবং গলায় একটি চাদর জড়ানো ছিল। তিনি খোদা প্রদত্ত নূরের মাধ্যমে তাকে চিনলেন এবং নাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে বলল ঃ আমার নাম বরখ। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমি তো দীর্ঘদিন ধরে তোমাকেই খুঁজছি। আমার সঙ্গে চল এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া কর। বরখ তার সঙ্গে বের হল এবং এভাবে দোয়া করল ঃ এলাহী, এটা তোমার কাজও নয়, হুকুমও নয়। তোমার কি হল যে, অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে রেখেছ? তোমার নিকটস্থ নদী-নালা শুকিয়ে গেছে কি? না বায়ু তোমার আনুগত্য স্বীকার করছে না? না গোনাহগারদের প্রতি তোমার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে? গোনাহগারদের সৃষ্টি করার পূর্বে তুমি ক্ষমাকারী ছিলে না কি? তুমিই তো রহমত সৃষ্টি করেছ এবং অনুগ্রহের আদেশ করছ। এখন কি আমাদেরকে দেখাচ্ছ যে, তোমার কাছ পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না? মোটকথা, সে দোয়ার মধ্যে এমনি ধরনের উচিত-অনুচিত কথাবার্তা বলতে লাগল। অবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং বনী ইসরাঈল সিক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলার আদেশে ঘাস গজিয়ে উঠল এবং দ্বিপ্রহর অবধি উরু পর্যন্ত উঁচু হয়ে গেল। এরপর বরখ স্বস্থানে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে সে বলল ঃ আমি আমার রবের সঙ্গে কেমন বিবাদ করেছি! তিনি আমার সাথে ইনসাফ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন— বরখ আমাকে দিনে তিনবার হাসায়।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— একবার বসরায় অগ্নিকাণ্ডে অনেক কুঁড়েঘর ভস্মীভূত হয়ে গেল; কিন্তু সেগুলোর মাঝে একটি কুঁড়েঘর সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেল। তখন বসরার গভর্নর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(রাঃ)। তিনি এই অভূতপূর্ব ঘটনার সংবাদ পেয়ে সে কুঁড়েঘরের মালিককে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল সে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তোমার কুঁড়েঘর জ্বলেনি কেন? সে বলল ঃ আমি আমার ঘরটি ভস্মীভূত না করার জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে কসম দিয়েছিলাম। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হবে, যাদের মাথার কেশ থাকবে বিক্ষিপ্ত এবং পোশাক হবে মলিন। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলাকে কোন বিষয়ে কসম দিলে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেখাবেন।

হযরত হাসান থেকে আরও বর্ণিত আছে, বসরায় একবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলে আবু ওবায়দা খাওয়াস সেখানে আগমন করলেন এবং আগুনের উপর চলতে লাগলেন। বসরার শাসনকর্তা আরয করলেন ঃ দেখুন, আপনি জ্বলে না যান। তিনি বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আগুনে না জ্বালানোর জন্যে আমি আল্লাহ পাককে কসম দিয়ে রেখেছি। শাসনকর্তা বললেন ঃ তাহলে আগুনকেও নিভে যাওয়ার জন্যে কসম দিন। তিনি আগুনকে কসম দিলেন এবং তা নিভে গেল।

একদিন আবু হাফস (রঃ) পথ চলছিলেন, এমন সময় এক ধোপা সামনে এল। সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উপর কি বিপদ এল? সে বলল ঃ আমার একমাত্র সম্বল গাধাটি হারিয়ে গেছে। এখন আমি কি করি? একথা শুনে আবু হাফস থেমে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন ঃ তোমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি এক পা-ও সামনে এগুব না যে পর্যন্ত তুমি এই ব্যক্তির গাধা তার কাছে পৌঁছিয়ে না দেবে। একথা বলার সাথে সাথে গাধা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তিনি সামনে এগুলেন।

এগুলো হচ্ছে অনুরাগীদের কর্মকাণ্ড। অন্যদের এরূপ করার অধিকার নেই। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) বলেন ঃ অনুরাগীরা তাদের কথাবার্তায় ও নির্জন মোনাজাতে এমন সব কথা বলেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে কুফর হয়ে থাকে। তারা এগুলো শুনলে অনুরাগীদেরকে সোজা কাফের বলতে শুরু করবে। অথচ এসব বিষয়ে অনুরাগীরা নিজেদের উন্নতি অনুভব করেন। তাদের জন্যেই এসব কথাবার্তা শোভনীয়— অন্যদের জন্যে নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমনটাও অসম্ভব নয় যে, একই কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা এক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট— যদি উভয়ের অবস্থান তথা মকাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে কোরআন পাকে এ বিষয়ে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাকের সমস্ত কিস্‌সা-কাহিনী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের অমূল্য ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কিছু নয়। আর যারা স্বল্পবুদ্ধি তাদের কাছে এগুলো নিছক কিসসা-কাহিনী। উদাহরণতঃ প্রথম কিস্‌সা হচ্ছে হযরত আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসের। গোনাহ্ ও বিরুদ্ধাচরণে তারা উভয়েই অংশীদার ছিলেন। কিন্তু যে গোনাহের পর ইবলীস রহমত থেকে বিতাড়িত হল এবং অভিশাপের বেড়ি গলায় পরল, সে গোনাহের পরই হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ হল—

وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى-

অর্থাৎ, আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল। ফলে, সে পথভ্রষ্ট হল। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথপ্রদর্শন করলেন।

আল্লাহ তা'আলা রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে এক বান্দার প্রতি মনোনিবেশ করাও অন্য বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন। অথচ তারা উভয়েই ছিল আল্লাহর বান্দা; কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এরশাদ হয়েছে—

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى-

অর্থাৎ, যে আপনার কাছে সোৎসাহে ও ভয়ার্তচিত্তে আসল, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।

আর অন্য বান্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যে বিত্তশালী, আপনি তার প্রতি মনোযোগী।

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক শ্রেণীর লোকের সাথে বসতে বলা হয়েছে এবং অন্য একশ্রেণীর লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে আছে—

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ -

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনি বলুন, তোমাদের প্রতি সালাম।

আরও এরশাদ হয়েছে—

فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ -

অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের পালনকর্তাকে ডাকে।

অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে—

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াত সম্পর্কে প্রলাপোক্তি করে, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রলাপোক্তি করে। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।

এমনিভাবে কোন কোন বান্দার পক্ষ থেকে মহব্বতের ছলনা ও গর্ব সহ্য করা হয় এবং কোন কোন বান্দার তরফ থেকে সহ্য করা হয় না। উদাহরণতঃ হযরত মূসা (আঃ) অনুরাগের আনন্দের ছলে আরয করেছিলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ

অর্থাৎ, এগুলো সব তো তোমার পরীক্ষা, যা দ্বারা যাকে ইচ্ছা গোমরাহ কর এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখাও।

যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি জওয়াবে ওযর স্বরূপ বললেন ঃ

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْنَ

অর্থাৎ, আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধের দাবী আছে। তাই আমার আশংকা হয়, তারা আমাকে হত্যা করবে।

এ ধরনের জওয়াব মূসা (আঃ) ছাড়া অন্যের মুখ দিয়ে বের হলে তা বে-আদবী বলে গণ্য হবে। তবে অনুরাগের স্তরে অবস্থানকারীর প্রতি নম্রতা করা হয়। অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) অনুরাগের স্তরে ছিলেন না। তাই তাঁর তরফ থেকে এর চেয়ে কম অভিমানকেও বরদাশত করা হয়নি এবং তাঁকে শাস্তিস্বরূপ মাছের পেটে বন্দী করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্যে এই ঘোষণা হয়ে যায়—

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ -

অর্থাৎ, যদি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নেয়ামত তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত হয়ে জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্তই হয়েছিল।

হযরত হাসান বলেন ঃ এখানে "জনশূন্য প্রান্তর" হল কিয়ামত। আমাদের রসূলে করীম (সাঃ)-কে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ

অর্থাৎ, অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় এবং মৎস্যওয়ালা ইউনুসের মত অধৈর্য হবেন না। সে বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় ডাক দিয়েছিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রিযার স্বরূপ ও ফযীলত ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, রিযা তথা সন্তুষ্টি মহব্বতের অন্যতম ফল এবং নৈকট্যশীলদের একটি উচ্চতম মকাম। এর স্বরূপ অনেকেরই অজানা। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে যথার্থ জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করেছেন, তারাই এর সামঞ্জস্য ও অস্পষ্টতার সমাধান ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। অতএব রিযার স্বরূপ, ফযীলত ও রিযাবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

রিযার ফযীলত সম্পর্কে আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

অর্থাৎ, অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হতে পারে।

চূড়ান্ত অনুগ্রহ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি। এটা তখনই হয়, যখন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ, বসবাসের উদ্যানসমূহে পরিচ্ছন্ন ভবন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিজের সন্তুষ্টিকে বসবাসের জান্নাত থেকে বৃহৎ বলেছেন। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিই জান্নাতবাসীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে মুমিনদের জন্যে জ্যোতি বিকিরণ করবেন এবং বলবেন ঃ আমার কাছে প্রার্থনা কর। মুমিনরা আরয করবে— আমরা তোমার রিযা চাই। দীদারের পর এই রিযা প্রার্থনা করা থেকে রিযার অসাধারণ ফযীলত জানা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বান্দার সন্তুষ্টির অর্থ পরে উল্লিখিত হবে। এখানে বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এর অর্থ বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থের কাছাকাছি, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচিত করা জায়েয নয়। কারণ, এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বিষয়টি উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ। যে ব্যক্তি এটা অর্জন করতে সক্ষম, তাকে অন্যের বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। সে নিজে নিজেই এর স্বরূপ জেনে নেয়।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার দীদারের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। দীদার লাভের পর জান্নাতীরা যে রিযা প্রার্থনা করেছে, তার কারণ রিযা হল, স্থায়ী দীদারের উপায়। তাই তারা রিযা প্রার্থনা করে যেন এটাই প্রার্থনা করেছে যে, আমাদের দীদার স্থায়ী হোক।

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

অর্থাৎ, আমার কাছে আরও বেশি আছে।

আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির তাফসীর প্রসঙ্গে জনৈক তাফসীরকার লিখেন— জান্নাতীদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনটি উপঢৌকন আসবে। এক, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এমন একটি হাদিয়া, যার তুলনা জান্নাতীদের কাছে থাকবে না। এই হাদিয়ার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে —

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ -

অর্থাৎ, তাদের জন্যে যে কি চোখের শান্তি নিহিত রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না।

দ্বিতীয় উপঢৌকন হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম। এটা হবে প্রথম হাদিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

অর্থাৎ, দয়ালু পালন কর্তার পক্ষ থেকে সালাম বলা হবে। তৃতীয়, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটা হাদিয়া ও সালাম উভয়টি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ পাক বলেন—

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ থেকে খোদায়ী সন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। রিযার ফযীলত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদল সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি? তারা আরয করলেন ঃ আমরা ঈমানদার। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের ঈমানের লক্ষণ কি? তারা আরয করলেন ঃ আমরা বালা মুসীবতে সবর করি, স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করি এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। অন্য এক হাদীসে আছে—

طوبى لمن هدى الى الاسلام وكان رزقه كفافا ورضى به

অর্থাৎ, মোবারকবাদ সে ব্যক্তিকে, যাকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করা হয়, যার রূযী প্রয়োজন পরিমাণে এবং সে তাতে রাযী।

আরও এরশাদ হয়েছে—

من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل -

অর্থাৎ, যে অল্প রিযিকে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ অল্প আমলে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

আরও বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের একদল লোকের প্রতি কৃপা করবেন। তারা তাদের কবর থেকে উড়ে জান্নাতের দিকে যাবে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেখানে আনন্দ-উল্লাস করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে— তোমরা কি পুলসিরাত পার হয়ে এসেছ? তারা জওয়াব দেবে— আমরা তো পুলসিরাত দেখিনি। আবার প্রশ্ন করা হবে— তোমরা কি দোযখ দেখেছ? তারা বলবে, আমরা তো কিছুই দেখিনি। ফেরেশতারা বলবে— তাহলে তোমরা কোন্ পয়গাম্বরের উম্মত? তারা বলবে— আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত। তারা শুধাবে, আমরা কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য বল দুনিয়াতে তোমাদের আমল কি ছিল? তারা জওয়াব দিবে— দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে দুটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

চরিত্র বিদ্যমান ছিল, যে কারণে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় আমরা এ মর্তবায় পৌঁছেছি। প্রথম, আমরা যখন একাকী থাকতাম, তখন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করতে লজ্জাবোধ করতাম। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে যা নির্দিষ্ট করতেন, তাতেই আমরা রাযী থাকতাম। ফেরেশতারা বলবে, তাহলে তো তোমাদের এ অবস্থা হওয়াই উচিত। অন্য এক হাদীসে আছে—

يامعشر الفقراء اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروابثواب فقركم وا لا فلا -

অর্থাৎ, হে দরিদ্র শ্রেণী, তোমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্টি নিবেদন কর। তা হলে দারিদ্র্যের সওয়াব লাভে সফল হবে। অন্যথায় নয়।

একবার বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের জন্যে এমন কোন কাজের কথা জিজ্ঞেস করুন, যা করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী, তারা যা বলে তা আপনি শুনেছেন। আদেশ হল ঃ হে মূসা, তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, যাতে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এরশাদ করেন—

من احب ان يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث انزله العبد من نفسه -

অর্থাৎ, সে পছন্দ করে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার যা আছে, তা জেনে নেবে, সে যেন দেখে, তার কাছে আল্লাহ তা'আলার জন্যে কি আছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নিজের কাছে সে স্তরে রাখেন, যে স্তরে বান্দা নিজের কাছে আল্লাহ তা'আলাকে রাখে।

হযরত মূসা (আঃ) তার মোনাজাতে আরয করলেন ঃ ইলাহী! তোমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সৃষ্টির মধ্যে কে তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? এরশাদ হল— যার কাছ থেকে আমি তার প্রিয়বস্তু নিয়ে নিলে সে আমার সাথে অনরঙ্গ সম্বন্ধ রাখে। মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ সে ব্যক্তি কে, যার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হও? এরশাদ হল— যে কোন কাজে আমার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে, এরপর যখন আমি আদেশ দিয়ে দেই, তখন সে নাখোশ হয়। অন্য এক রেওয়ায়েত আরও কঠোর। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যে ব্যক্তি আমার দেয়া মুসীবতে সবর করে না, আমার নেয়ামতের শোকর করে না এবং আমার ফয়সালায় রাযী থাকে না, তার উচিত আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নেয়া। এরই অনুরূপ একটি হাদীসে কুদসী রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি তাকদীর নির্ধারণ করেছি এবং কাজকর্ম সংহত করেছি। এখন যে রাযী হবে, তার প্রতি আমি রাযী আমার সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত, আর যে নাখোশ হবে, তার জন্যে আমার অসন্তুষ্টি আমার কাছে আসা পর্যন্ত। অন্য এক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ রয়েছে— আমি ভাল-মন্দ উভয়টি সৃষ্টি করেছি। এখন সে ব্যক্তি ভাল, যাকে আমি কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করি। আর সে ব্যক্তি মন্দ, যাকে আমি অমঙ্গলের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং অমঙ্গলের পথে চালনা করি। সে ব্যক্তির জন্যে ধ্বংসই ধ্বংস, যে বিতর্ক ও প্রশ্ন করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন— হে দাউদ, তুমি বাসনা কর, আমিও বাসনা করি; কিন্তু হবে তাই, যা আমি বাসনা করি। যদি তুমি আমার বাসনায় রাযী থাক, তবে তোমার বাসনার জন্যে আমি যথেষ্ট হব। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার বাসনা অমান্য কর, তবে তোমার বাসনায় আমি তোমাকে পরিশ্রমে ফেলে দেব, এরপর হবে তাই, যা আমি চাইব।

মনীষীদের উক্তিসমূহেও রিযার অনেক ফযীলত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম যাদেরকে জান্নাতে ডাকা হবে, তারা হবে এমন লোক, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় রাযী থাকে।

মায়মূন ইবনে মহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী হয় না, তার নির্বুদ্ধিতার কোন প্রতিকার নেই। আবদুল আযীয ইবনে আবু রোয়াদ (রঃ) বলেন ঃ সিরকা দিয়ে যবের রুটি খাওয়া ও পশমী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পোশাক পরার মধ্যে জাঁকজমক নেই; বরং জাঁকজমক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকার মধ্যে।

এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের পায়ে যখম দেখে বলল ঃ এই যখমের কারণে আপনার প্রতি আমার করুণা হয়। তিনি বললেন ঃ এই যখম হওয়ার পর থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর করছি যে, এটা আমার চোখে হয়নি।

বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে বর্ণিত আছে— জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার এবাদত করে। তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, অমুক মহিলা— যে ছাগল চরায়, সে জান্নাতে তোমার সঙ্গিনী হবে। আবেদ পর দিন সেই মহিলার খোঁজে বের হল এবং লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সন্ধান পেল। সে মহিলার আমল দেখার উদ্দেশ্যে তিন দিন তার বাড়িতে অবস্থান করল। এ সময় আবেদ নিজে সারারাত দাঁড়িয়ে এবাদত করত; কিন্তু মহিলা আরামে ঘুমিয়ে থাকত। দিনের বেলায় আবেদ রোযা রাখত, আর মহিলা পানাহার করত। একদিন আবেদ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার এ ছাড়া আরও কোন আমল আছে কি? মহিলা বলল ঃ আর কিছু নেই। আপনি যা দেখেছেন, তাই। আমি নিজের মধ্যে অন্য কোন আমল জানি না। আবেদ বলল ঃ ভাল করে স্মরণ করে বল আরও কোন আমল আছে কিনা? হাঁ আমার মধ্যে আর একটি ছোট-খাটো অভ্যাস আছে। তা এই যে, আমি সংকটে পড়ে কোন সময় বাসনা করি না যে, আমার অবস্থা আরও ভাল হোক। রুগ্ন হয়ে আশা করি না যে, সুস্বাস্থ্য ফিরে আসুক। যদি রৌদ্রে থাকি, তবে ছায়ার প্রত্যাশী হই না। এ কথা শুনে আবেদ নিজের মাথায় হাত রেখে বলল ঃ এটা ছোটখাটো অভ্যাস নয়; বরং এতই বড়, যা অর্জন করতে আবেদ অক্ষম।

জা'ফর ইবনে সোলায়মান হযরত রাবেয়া বসরীকে প্রশ্ন করলেন ঃ বান্দা আল্লাহর প্রতি রাযী— একথা কখন বলা যায়? তিনি বললেন ঃ যখন বিপদেও ততখানি খুশী হয়, যতখানি নেয়ামত পেয়ে হয়।

হযরত ফুযায়ল বলতেন— আল্লাহ তা'আলার দেয়া না দেয়া উভয়ই যখন বান্দার কাছে সমান হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর প্রতি রাযী হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া রিযার পরিপন্থী নয় ঃ যে দোয়া করে, দোয়ার কারণে সে রিযার মকাম থেকে খারিজ হয় না। এমনিভাবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোনাহকে খারাপ মনে করা, অপরাধীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া, গোনাহের কারণসমূহকে ঘৃণা করা এবং সেগুলো দূর করার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্য পালন করাও রিযার পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে কিছু লোকের বিভ্রান্তি হয়েছে। তারা বলে, গোনাহ, নির্লজ্জ কাজ ও কুফর আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা তাকদীর বৈ নয়। অতএব, এগুলোতেও রিযা ও সন্তুষ্টি দরকার। এসব লোক শরীয়তের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। দোয়াকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এবাদতই সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের অধিক পরিমাণে দোয়া করা এ বিষয়ের প্রমাণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিযার উচ্চতম মকামে ছিলেন। দোয়া রিযার পরিপন্থী হলে তিনি অধিক পরিমাণে দোয়া কেন করতেন? আল্লাহ পাক কোন কোন বান্দার প্রশংসায় বলেন ঃ

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا -

অর্থাৎ, আগ্রহ ও ভয় সহকারে তারা আমার কাছে দোয়া করে। গোনাহকে অপছন্দ করা, তাকে খারাপ মনে করা এবং তাতে রাযী না হওয়াকেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি গোনাহে সন্তুষ্ট থাকার নিন্দা করেছেন। বলা হয়েছে—

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রশান্ত ।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ, তারা পেছনে অবস্থানকারিণী মহিলাদের সাথে থাকতে রাযী হয়েছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।

এক মশহুর হাদীসে আছে—

من شهد منكرا فرضى به كانه قد فعله -

অর্থাৎ, যে কোন অসৎকাজে উপস্থিত থাকে, অতঃপর তাতে রাযী থাকে, সে যেন নিজেই সে অসৎ কাজ করে।

অন্য এক হাদীসে আছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

الدال على الشر كفاعله

অর্থাৎ, যে মন্দ কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, সে সে ব্যক্তির মত, যে নিজে সেটা করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ মন্দ কাজ থেকে অনুপস্থিত ও দূরে থাকে। এরপরও তার ততটুকুই গোনাহ হয়, যতটুকু যে মন্দ কাজ করে, তার হয়। শ্রোতারা আরয করল ঃ এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ এটা এভাবে যে, সে যখন সে মন্দ কাজের সংবাদ পায়, তখন তাতে রাযী থাকে। এক হাদীসে আছে— যদি এক ব্যক্তি প্রাচ্যে নিহত হয় এবং অপর ব্যক্তি পাশ্চাত্যে বসে সেই হত্যাকাণ্ডে রাযী থাকে, তবে সেও এই হত্যাকাণ্ডে অংশীদার হবে।

কাফের ও পাপাচারীদের সাথে শত্রুতা রাখা ও তাদের অস্বীকার করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ –

অর্থাৎ, মুমিনরা মুমিনদের ছাড়া কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ –

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا –

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি কিছু কিছু পাপাচারীকে কিছু কিছু পাপাচারীর সাথে মিলিয়ে দেই।

হাদীস শরীফে আছে— আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনের কাছ থেকে প্রত্যেক মুনাফিকের সাথে শত্রুতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রত্যেক মুনাফিকের কাছ থেকে মুমিনের সাথে শত্রুতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

من احب قوما ووالاهم حشر معهم يوم القيامة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথেই উত্থিত করা হবে।

এখানে প্রশ্ন হয়, কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকতে হবে। পাপ ও গোনাহ আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া হয় না। অতএব, পাপকে খারাপ মনে করা আল্লাহর ফয়সালাকে খারাপ মনে করা নয় কি? এই পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা কি? একই বস্তুর মধ্যে রিযা ও ঘৃণা কেমন করে একত্রিত হতে পারে? জওয়াব এই যে, যাদের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তারা অসৎকাজে চুপ থাকাকে রিযা মনে করেছে এবং এর নাম রেখেছে সচ্চরিত্রতা। অথচ এটা নিছক মূর্খতা। আসলে রিযা ও ঘৃণা যখন একই বস্তুতে একই দিক দিয়ে এবং একইভাবে হয়, তখন অবশ্য একটি অপরটির বিপরীত হয়। কিন্তু যদি এক বস্তুতে এক দিক দিয়ে রিযা এবং অন্য দিক দিয়ে ঘৃণা হয়, তবে নিশ্চিতই একটি অপরটির বিপরীত হবে না এবং তা সম্ভব। উদাহরণতঃ তোমার কোন শত্রু মারা গেল। সে ছিল তোমার অন্য এক শত্রুরও শত্রু এবং সে তোমার সেই শত্রুকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকত। বলা বাহুল্য, এমন শত্রুর মৃত্যু তোমার কাছে এ দিক দিয়ে খারাপ লাগবে যে, সে তোমার শত্রু নিধনে সচেষ্ট থাকত। আর এ দিক দিয়ে ভাল মনে হবে যে, তোমার এক শত্রু খতম হয়ে গেছে। এখানে একই শত্রুর মৃত্যু একদিক দিয়ে খারাপ হয় এবং অন্যদিক দিয়ে ভাল হল। এখানে মোটেই পরস্পর বিরোধিতা নেই।

এমনিভাবে গোনাহেরও দুটি দিক আছে। একদিক এই যে, গোনাহ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় ও ইচ্ছায় হয়। এদিক দিয়ে এতে রিযা থাকা দরকার যে, যার বস্তু, তিনি তাতে যা ইচ্ছা তাই করবেন। অপরদিক এই যে, গোনাহ বান্দার "কসব" তথা উপার্জন দ্বারা অর্জিত হয় এবং তার বিশেষণ হয়। এটা আল্লাহর কাছে "মগযুব" তথা গযবে পতিত হওয়ার কারণ। এই দৃষ্টিকোণে গোনাহ মন্দ ও নিন্দনীয়; সুতরাং ঘৃণার যোগ্য।

এ থেকে জানা গেল যে, গোনাহ থেকে বাঁচা এবং গোনাহ ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকার পরিপন্থী নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দোয়াকে বান্দার জন্যে এবাদত হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে দোয়ার কারণে অন্তরে অসহায়ত্ব, নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়। তবে অভিযোগের ভঙ্গিতে বিপদ প্রকাশ করা এবং অন্তরে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্দ জানা রিযার পরিপন্থী।

গোনাহের কেন্দ্র থেকে পলায়ন ঃ স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহামারীগ্রস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা যায়, যে এলাকায় গোনাহ প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখান থেকেও পলায়ন না করা উচিত। কেননা, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন হবে। এরূপ মনে করা ঠিক নয়। বরং মহামারী প্রকাশ হয়ে পড়লে পলায়ন নিষিদ্ধ করার কারণ এই যে, এর অনুমতি দেয়া হলে সুস্থ লোকজন সকলেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাবে এবং কেবল রোগাক্রান্তরা থেকে যাবে। ফলে, কোন সেবা-শুশ্রূষাকারী না থাকার কারণে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের কারণে হত, তবে যে ব্যক্তি মহীমারীগ্রস্ত এলাকার কাছে পৌঁছে যায়, তাকে সেখান থেকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হতো না। কেননা, এটাও আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের শামিল।

নিষেধাজ্ঞার উপরোক্ত কারণ জানার পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে এলাকায় গোনাহ প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখান থেকে পলায়ন করা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে গোনাহে উত্তেজিত করে এমন জায়গার নিন্দা বর্ণনা করা মানুষকে দূরে রাখার জন্যে নিন্দনীয় নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রায়ই এরূপ স্থান বিশেষের নিন্দা করেছেন। এমনী একদল বুযুর্গ বাগদাদ শহরের নিন্দায় মুখর ছিলেন। তারা যথাসম্ভব এই শহর থেকে পলায়নের চেষ্টা করতেন। হযরত ইবনে মোবারক (রঃ) বলতেন ঃ আমি পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশ ঘুরেছি; কিন্তু বাগদাদের মত মন্দ শহর কোথাও দেখিনি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে শহরটি কেমন? তিনি বললেন ঃ এই শহরে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁর প্রতি নাফরমানীকে তুচ্ছ বিষয় গণ্য করা হয়। তিনি যখন খোরাসানে পৌঁছেন, তখন লোকেরা তাঁকে বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমি এতে কেবল তিন প্রকার লোক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দেখেছি— ক্রুদ্ধ সিপাহী, বেদনাক্লিষ্ট বণিক ও বিস্ময়াবিষ্ট আলেম। তাঁর এই উক্তি কোন গীবত ছিল না। কেননা, তিনি এতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উচ্চারণ করেননি এবং কোন বাগদাদীকে লক্ষ্যে পরিণত করেননি; বরং এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সতর্ক করা। মক্কা যাওয়ার পথে তিনি বাগদাদে ষোল দিনের বেশী অবস্থান করতেন না। এ সময়ের মধ্যে তাঁর কাফেলা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে যেত। তিনি এই ষোল দিনের বিনিময়ে ষোল দীনার সদকা করে দিতেন। কোন কোন বুযুর্গ ইরাককে মন্দ বলতেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) এ দলভুক্ত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর এক গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুই কোথায় থাকিস? সে বলল ঃ ইরাকে। তিনি বললেন ঃ সেখানে তোর কাজ কি? আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ইরাকে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার পেছনে কোন বালা লাগিয়ে দেন। হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) একদিন ইরাকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ এর দশ ভাগের নয় ভাগে পাপাচার রয়েছে, যার কোন প্রতিকার নেই। জনৈক বুযুর্গ আরও বললেন ঃ কল্যাণকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর নয় ভাগ সিরিয়ায় এবং এক ভাগ ইরাকে স্থান পেয়েছে। আর অনিষ্টের দশ ভাগের নয় ভাগ ইরাকে এবং একভাগ সিরিয়ায় স্থান পেয়েছে।

জনৈক মুহাদ্দিস বলেন ঃ আমি একদিন হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়াযের খেদমতে ছিলাম। এমন সময় জনৈক সুফী সম্মুখে এল। তিনি তাকে নিজের সাথে বসিয়ে বললেন ঃ তোমার বাড়ি কোথায়? সুফী বলল ঃ বাগদাদে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কাছে মানুষ দরবেশের ন্যায় পোশাক পরিধান করে আসে; কিন্তু যখন কোথায় থাক জিজ্ঞেস করা হয়, তখন বলে ঃ যালেমদের বাসায় থাকি। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ যদি এই সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক আমার সাথে না থাকত, তবে আমি এ শহরে থাকতাম না। লোকেরা প্রশ্ন করল, তাহলে কোথায় থাকতেন? তিনি বললেন ঃ পাহাড়ের উপত্যকায়। এক বুযুর্গকে বাগদাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সেখানকার দরবেশ পাক্কা দরবেশ আর সেখানকার দুষ্ট পাক্কা দুষ্ট।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, যে শহরে গোনাহের আধিক্য ও পুণ্যের স্বল্পতা বিরাজমান, যেখানে কেউ আটকা পড়লে তার উচিত হিজরত করা। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا-

অর্থাৎ, হিজরত করার জন্যে আল্লাহর ভূ-পৃষ্ঠ কি সুবিস্তৃত ছিল না?

যদি পরিবার-পরিজনের বাধার কারণে কেউ হিজরত করতে সক্ষম না হয়, তবে বিষণ্ন মনেই থাকা উচিত এবং সর্বদা দোয়া করা উচিত—

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

অর্থাৎ, ইলাহী! যালেম অধিবাসীদের এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নাও।

এর কারণ এই যে, যেখানে পাপাচারীদের আধিক্য হয়ে যায়, সেখানে ব্যাপক বিপদ আসে, যা ভাল-মন্দ সকলকেই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দারাও রেহাই পায় না।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً -

অর্থাৎ, তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম তাদেরকেই বিপর্যস্ত করবে না।

মোটকথা, পাপকাজে রিযা সর্বাবস্থায় নয়; বরং শুধু এ দিক দিয়ে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। নতুবা স্বয়ং পাপকাজে রাযী থাকার কোন কারণ নেই।

তিন ব্যক্তি তিন স্থানে অবস্থান করে। তাদের একজন দীদারের আগ্রহে মৃত্যুকে পছন্দ করে। দ্বিতীয়জন মাওলার খেদমতের জন্যে জীবিত থাকাকে ভাল মনে করে। তৃতীয়জন বলে ঃ আমি কেবল তাই পছন্দ করি, যা আল্লাহ আমার জন্যে পছন্দ করেন— তা মৃত্যু হোক অথবা জীবন। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম, এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। জনৈক ওলী-আল্লাহকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ রিযা বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তম। কেননা, তাদের মধ্যে তার ঝামেলাই সবচেয়ে কম।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একদিন ওয়াহাব ইবনে ওয়ার্দ, সুফিয়ান ছওরী ও ইউসুফ ইবনে বিসাত এক জায়গায় সমবেত হলেন। হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ অদ্যকার পূর্বে আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে খুব খারাপ মনে হত; কিন্তু আজ আমি মরে যেতে চাই। ইউসুফ ইবনে বিসাত কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কারণ, আমি ফেতনাকে ভয় করি। ইউসুফ ইবনে বিসাত বললেন ঃ আমার কাছে দীর্ঘায়ু হওয়া খারাপ মনে হয় না। আমি আশা করি, সম্ভবত এমন কোন দিন পাওয়া যাবে, যাতে তওবা নসীব হয়ে যাবে এবং কোন নেক আমল করতে পারব। অতঃপর তাঁরা হযরত ওয়াহাবকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিছুই পছন্দ করি না। যা কিছু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রিয়, তাই আমার প্রিয়— তিনি জীবিত রাখুন অথবা ওফাত দান করুন। হযরত সুফিয়ান ছওরী উঠে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, এই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক।

আশেকগণের কাহিনী ঃ জনৈক আরেফ (আল্লাহভক্ত লোক) বলতেন ঃ যখন তুমি আমাকে দেখে ফেলেছ, তখন তা চল্লিশ জনকে দেখার সমান হয়ে গেছে। কেননা, আমি চল্লিশ জন আবদালকে দেখেছি এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা না একটা চরিত্র আহরণ করেছি। এই বুযুর্গকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আমরা শুনেছি, আপনি খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি হেসে বললেন ঃ যে খিযিরকে দেখে, তার কোন কৃতিত্ব নেই; বরং কৃতিত্ব সেই ব্যক্তির, যাকে খিযির দেখতে চায় কিন্তু সে আত্মগোপন করে।

হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ)-এর খেদমতে একবার আরয করা হল ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলাকে যে প্রত্যক্ষ করেন তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ এটা জানা তোমাদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোকেরা আরয করল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আপনি নিজের নফসের বিরুদ্ধে যে কঠোরতর মোযাজাদা করেছেন, তা আমাদেরকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল করাও বৈধ নয়। তারা আরয করল ঃ তা হলে সাধনার শুরুতে আপনি যা যা করতেন, তাই বলুন। তিনি বললেন ঃ প্রথমে আমি আমার নফ্সকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহবান করলাম। সে অবাধ্যতা করল। আমি তাকে কসম দিলাম যে, এক বছর পানি পান করব না এবং নিদ্রার স্বাদ আস্বাদন করব না। অতঃপর নফ্স তা পূর্ণ করেছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বর্ণনা করেন— আমি আবু ইয়াযীদকে এশার নামাযের পর সোবহে সাদেক পর্যন্ত এভাবে বসে থাকতে দেখেছি, হাঁটু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মাটিতে রাখা, আবার উপরে পায়ের পাতা ও গোড়ালি মাটি থেকে উত্তোলিত। চিবুক বুকের সাথে সংযুক্ত এবং উভয় চক্ষু অনিমেষ উন্মীলিত। যখন সকাল নিকটবর্তী হল, তখন তিনি একটি সেজদা করে আবার বসলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! কিছু লোক তোমার কাছে প্রার্থনা করেছে এবং তুমি তাদেরকে পানিতে ও বায়ুতে চলার ক্ষমতা দান করেছ। তারা এতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমি তোমার কাছে এসব বিষয় থেকে আশ্রয় চাই। আরও কিছু লোক তোমার কাছে আবেদন করেছে। তুমি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা দান করেছ। তারা এতেই রাযী হয়েছে। আমি এ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার কাছে সওয়াল করলে তুমি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দিয়েছ। তারা এ নিয়েই খুশী হয়েছে। কিন্তু আমি তোমার কাছে এ থেকেও আশ্রয় চাই। এভাবে তিনি ওলীগণের বিশটিরও বেশী কারামতের কথা দোয়ার ভেতরে উল্লেখ করলেন। এরপর চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতেই দেখলেন, ইয়াহইয়া দণ্ডায়মান। আমি আরয করলাম ঃ খাদেম হাযির। তিনি বললেন ঃ তুমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে? আমি আরয করলাম ঃ অনেকক্ষণ ধরে। অতঃপর তিনি চুপ করে রইলেন। আমি আরয করলাম ঃ আমাকে আপনার কিছু হাল বলুন। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্যে যা উপযুক্ত তাই বলছি শুন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিম্নের আকাশে দাখিল করলেন এবং নিম্নজগত ভ্রমণ করালেন। জান্নাত থেকে আরশ পর্যন্ত যা কিছু আকাশসমূহে ছিল, সবই আমাকে দেখিয়েছেন। এরপর আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন ঃ তুমি যা যা দেখছ, এগুলোর মধ্যে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিয়ে দেব। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ, আমি এমন কোন বস্তু দেখিনি, যা ভাল মনে করে তোমার কাছে চাইতে পারি। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি আমার সাচ্চা বান্দা। তুমি ঠিক আমারই জন্যে আমার এবাদত কর। এছাড়া আরও অনেক কথা বললেন। ইয়াহইয়া ইবনে মোয়ায বলেন ঃ একথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মারেফত প্রার্থনা করলেন না কেন? আপনাকে তো এই শাহানশাহের পক্ষ থেকে বলাই হয়েছিল, যা চাইবে, তা-ই পাবে। হযরত আবু ইয়াযীদ একটি চিৎকার দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ চুপ কর। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়ে গেল, আমাকে ছাড়া কেউ যেন তাঁকে না চিনে! তাঁর মারেফত অন্যরা পাবে, এটা আমার কাছে ভাল মনে হয়নি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণিত আছে, আবু তোরাব বখশী (রহঃ) জনৈক মুরীদকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাকে কাছে জায়গা দিতেন এবং তার খেদমত করতেন। মুরীদ এবাদতে মশগুল থাকত। একদিন আবু তোরাব তাকে বললেন ঃ আবু ইয়াযীদ বোস্তামীর সংসর্গ অবলম্বন কর। মুরীদ বলল ঃ আমার তার প্রয়োজন নেই। আবু তোরাব অধিক পীড়াপীড়ি করলে মুরীদ জোশের মুখে বলে ফেলল ঃ আমি আবু ইয়াযীদকে দিয়ে কি করব? আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি। তিনি আমাকে আবু ইয়াযীদকে দেখার মুখাপেক্ষী রাখেননি। আবু তোরাব বলেন ঃ এ কথা শুনে আমারও মন বিগড়ে গেল। আমি বেসামাল হয়ে বলে উঠলাম ঃ আল্লাহকে দেখে অহংকারী হয়ে যাও? যদি আবু ইয়াযীদকে একবার দেখ, তবে আল্লাহ তা'আলাকে সত্তর বার দেখার চেয়ে অধিক উপকারী হবে। মুরীদ অত্যন্ত হয়রান হয়ে বলল ঃ তা কেমন করে হতে পারে? আবু তোরাব বললেন— তুমি আল্লাহ তা'আলাকে নিজের কাছে দেখলে তিনি তোমার সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করেন, আর আবু ইয়াযীদকে আল্লাহ তা'আলার কাছে দেখলে আল্লাহ তা'আলা আবু ইয়াযীদের সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করবেন। মুরীদ একথার তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর বলল ঃ আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। আবু তোরাব বলেন ঃ আমরা গিয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম এই অপেক্ষায় যে, আবু ইয়াযীদ জঙ্গল থেকে বের হবেন। কেননা, তিনি তখন হিংস্র প্রাণীদের জঙ্গলে বসবাস করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু ইয়াযীদ একটি পালকযুক্ত পরিধেয় কোমরে বেঁধে বের হলেন। আমি মুরীদকে বললাম ঃ ইনি আবু ইয়াযীদ। তাঁকে দেখা মাত্রই সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আমরা তাকে নাড়া দিয়ে মৃত পেলাম। আমরা সকলে মিলে তাকে দাফন করলাম। আমি আবু ইয়াযীদের খেদমতে আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনার দিকে দেখার কারণে লোকটি মরে গেল। তিনি বললেন ঃ তা নয়; বরং তোমার মুরীদ ছিল সাচ্চা। তার অন্তরে একটি রহস্য লুকিয়ে ছিল। আমাকে দেখা মাত্রই তার মনের সব রহস্য খুলে গেল। দুর্বল মুরীদের মকামে ছিল বলে সে তা সহ্য করতে পারল না। মারা গেল।

যখন হাবশী সৈন্যরা বসরায় প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে, তখন হযরত সহলের মুরীদরা তাঁর কাছে সমবেত হয়ে আরয করে, আপনি এদেরকে হটিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। হযরত সহল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ এ শহরে আল্লাহ তা'আলার কিছু বান্দা আছেন, যারা যালেমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলে সকাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কোন যালেমের অস্তিত্ব থাকবে না। একই রাত্রিতে সব খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তারা বদদোয়া করেন না। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করল ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ, যে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা ভাল মনে করেন না, সেটা তাদের কাছেও ভাল লাগে না।

হযরত বিশর (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এই মর্তবায় কেমন করে পৌঁছলেন? তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতাম যাতে তিনি আমার অবস্থা গোপন রাখেন এবং কারও কাছে প্রকাশ না করেন। বর্ণিত আছে, তিনি হযরত খিযির (আঃ)-কে দেখেছেন এবং তাঁকে বলেছেন— আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। খিযির (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের আনুগত্য তোমার জন্যে সহজ করুন। তিনি বললেন ঃ আরও কিছু দোয়া করুন। খিযির (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আনুগত্যকে মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখুন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ হযরত খিযিরকে দেখার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এজন্যে আমি একবার আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলাম। আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর সাক্ষাত আমার নসীব হল। আমি তখন অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে কেবল একথাই বললাম ঃ হে আবুল আব্বাস! আপনি আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন, যা পাঠ করলে আমি মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে যাই। তাদের অন্তরে আমার কোন মান না থাকে এবং আমার ধর্মপরায়ণতা কেউ জানতে না পারে। তিনি বললেন ঃ এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اسْبِلْ عَلٰى كَثِيْفِ سِتْرِكَ وَحُطَّ عَلٰى سُرَادِقَاتِ حُجُبِكَ

وَاجْعَلْنِىْ فِىْ مَكْنُوْنِ غَيْبِكَ وَاحْجُبْنِىْ مِنْ قُلُوْبِ خَلْقِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমার উপর তোমার পুরু পর্দা ফেলে দাও। আমার উপর তোমার যবনিকা নামিয়ে দাও। আমাকে রাখ গোপন দোষের মধ্যে এবং আমাকে মানুষের অন্তর থেকে লুকিয়ে রাখ।

এরপর হযরত খিযির (আঃ) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে পুনরায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কখনও দেখিনি এবং মনে দেখার আগ্রহও সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাঁর শিখানো দোয়া সর্বদা পাঠ করতে থাকলাম।

তাঁরই বর্ণনা অনুযায়ী এই দোয়ার প্রভাব এমনভাবে প্রতিফলিত হল যে, মানুষের মধ্যে তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা ও মূল্যহীনতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। যিম্মী তথা অমুসলিম আশ্রিতরাও তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং ধরে নিয়ে বিনা মজুরীতে নিজেদের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিত। তিনি এসব আচরণ নীরবে সহ্য করতেন। মোটকথা, তাঁর অন্তরে সুখ ও সংশোধন লাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত থাকার মধ্যে নিহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার ওলীদের এই ছিল অবস্থা। তাদেরকে অজ্ঞাতদের মধ্যেই খোঁজ করা উচিত। কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ তাদেরকে এমন লোকদের মধ্যে তালাশ করে, যারা পরিধান করে নানা রকম কাপড়ে তালি দেওয়া পোশাক, কিন্তু জ্ঞান-গরিমা, পরহেযগারী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীগণকে গোপন রাখাই পছন্দ করেন। হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছে— আমার আওলিয়া আমার কা'বার নীচে থাকে। আমাকে ছাড়া কেউ তাদেরকে চিনে না।

সারকথা, যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা করে, তাদের অন্তর ওলীত্বের সুগন্ধি থেকে অধিকতর দূরে থাকে। আর অধিকতর নিকটবর্তী তাদের অন্তর, যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও বুঝে না যে, অপমান ও লাঞ্ছনা কি? যেমন, গোলাম অপমান বুঝে না যখন তার প্রভু তার উপরের আসনে বসে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাদের অন্তর এমন না থাকে এবং আমরা এমন আত্মা থেকে যদি বঞ্চিত হই, তবে যারা এর যোগ্য, এসব কারামতের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস না রাখা আমাদের উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ওলী হওয়া যদি কারো পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে অন্তত ওলীদের প্রতি মহব্বত ও ঈমান রাখা তো তার জন্যে সম্ভব। হয়তো বা এর দৌলতেই কিয়ামতের দিন ওলীদের সাথে তার হাশর হয়ে যাবে। প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে— المرء مع من احب —মানুষ তার সাথেই থাকবে, যাকে সে মহব্বত করে। অনুনয় ও বিনয় অধিকতর উপকারী। তার প্রমাণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি। তিনি বনী ইসরাঈলকে প্রশ্ন করেন ঃ শস্যকণা কোথায় গজায়? তারা আরয করল ঃ মাটিতে। তিনি বললেন ঃ আমি সত্য বলছি, হেকমত ও প্রজ্ঞাও সে অন্তরেই গজিয়ে উঠে, যা মাটির মত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলার ওলীত্ব অন্বেষণকারী বুযুর্গগণ নিজের নফসকে লাঞ্ছনার চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়েই এই মর্তবা লাভ করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর ওস্তাদ ইবনে করবনীকে এক ব্যক্তি ভোজের দাওয়াত দিল। তিনি তার ঘরের দরজায় পৌঁছলে তাঁকে তাড়িয়ে দিল। কিছুদূর চলে গেলে লোকটি তাঁকে আবার ডাকল। তিনি এলে আবার তাঁকে তাড়িয়ে দেয়া হল। এভাবে তিনবার ডাকল এবং তাড়িয়ে দিল। চতুর্থবার ডাকার পর যখন তিনি এলেন, তখন তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ মাফ করবেন, আমি আপনার বিনয় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আপনাকে বারবার তাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি আমার নফ্সকে বিশ বছর ধরে লাঞ্ছনায় অভ্যস্ত করেছি। ফলে, সে এখন কুকুরের মত হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দিলে চলে যায়। আবার একটি হাড্ডি ফেলে দিলে চলে আসে।

যদি তুমি আমাকে পঞ্চাশ বারও তাড়িয়ে দিতে এবং ডাকতে, তবে আমি চলে আসতাম। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ইবনে করবনীই বলেন ঃ আমি এক মহল্লায় বাস করতাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সাধুতায় খ্যাত হয়ে গেলাম। এতে আমার মন অশান্ত হয়ে উঠল। এক দিন আমি এক হাম্মামে (গোসলখানায়) গেলে সেখান থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তির মূল্যবান কাপড় নিয়ে এলাম। অতঃপর সে দামী কাপড় পরে তার উপর আমার তালিযুক্ত নানা রঙের ছেঁড়া কাপড় পরে নিলাম। রাস্তায় বের হতেই লোকেরা আমাকে পাকড়াও করল এবং আমার ছেঁড়াবস্ত্র খুলে সেই দামী পোশাক নিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, তারা আমাকে প্রচুর কিলঘুষিও মারল। এরপর থেকে আমি হাম্মাম চোর বলে খ্যাত হয়ে গেলাম এবং আমার অশান্ত মনে শান্তি ফিরে এল।

এখন চিন্তা করা উচিত, বুযুর্গগণ কেমন সাধনার স্তর অতিক্রম করতেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মনোযোগ মানুষের দিক থেকে এমনকি, নিজের সত্তার দিক থেকেও ফিরিয়ে নেন। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সের দিকে লক্ষ্য রাখে, সে আল্লাহ তা'আলা থেকে আড়ালে থাকে এবং নফ্সের দিকে এই দৃষ্টিই তার জন্যে পর্দা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক পর্দা হচ্ছে নিজের নফ্সকে নিয়ে মশগুল থাকা। সেমতে বর্ণিত আছে, বুস্তামের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামীর মজলিসে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকত। একদিন সে আরয করল ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি ত্রিশ বছর ধরে অবিরাম রোযা রাখছি এবং রাত জেগে নফল এবাদত করছি। কিন্তু এত সাধনা সত্ত্বেও আপনি যে জ্ঞান বর্ণনা করেন, তা নিজের অন্তরে বিদ্যমান পাই না। অথচ আমি এই জ্ঞানকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং ভালবাসি। হযরত আবু ইয়াযীদ বললেন ঃ ত্রিশ বছর কেন, যদি তুমি তিনশ' বছরও রোযা রাখ এবং রাত্রি জাগরণ কর, তবু এই জ্ঞানের কণা পরিমাণও পাবে না। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ কারণ এই যে, তুমি নিজের নফসের কারণে আল্লাহ তা'আলা থেকে আড়ালে আছ। লোকটি আরয করল ঃ তাহলে এর প্রতিকার কি? তিনি বললেন ঃ প্রতিকার আছে; কিন্তু তুমি তা কবুল করবে না। সে বলল ঃ আপনি বলুন, যাতে আমি তা পালন করতে পারি। তিনি বললেন ঃ এখনি নাপিতের কাছে গিয়ে মাথা ও দাড়ি মুণ্ডন কর। এই পোশাক খুলে কম্বলের লুঙ্গি পরিধান কর। ঘাড়ে আখরুটের একটি ঝুলি তুলে নাও। রাস্তায় গিয়ে নিজের চারপাশে লোকজনকে জড়ো কর। এরপর তাদেরকে বল ঃ যে কেউ আমাকে একটি থাপ্পড় মারবে, আমি তাকে একটি আখরুট দেব। এমনিভাবে প্রত্যেক বাজারে যাও এবং যারা তোমার পরিচিত, তাঁদের কাছেও যাও এবং থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে আখরুট বিলি কর। লোকটি বলল ঃ সোবহানাল্লাহ, আপনি আমাকে এমন কথা বললেন! তিনি বললেন ঃ তোমার "সোবহানাল্লাহ" বলা একটি শিরক। কারণ, তুমি নিজের নফসকে বড় জেনে "সোবহানাল্লাহ" বলেছ। আল্লাহ তা'আলার তাযীমের জন্যে বলনি। লোকটি বলল ঃ আমি এটা করব না। অন্য কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ সর্বাগ্রে এটাই করা দরকার। সে বলল ঃ এটা করার সাধ্য আমার নেই। হযরত আবু ইয়াযীদ বললেন ঃ আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, তুমি প্রতিকার কবুল করবে না। হযরত আবু ইয়াযীদ বর্ণিত এই প্রতিকারটি সে ব্যক্তির জন্যে, যে নিজের নফসের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে কামনা করে! এই চিকিৎসা ছাড়া এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। অতএব, যে ব্যক্তি এই চিকিৎসার শক্তি রাখে না, তার কমপক্ষে এর কার্যকারিতায় বিশ্বাস রাখা উচিত। যার মধ্যে এই বিশ্বাসটুকুও নেই, তার দুর্ভোগ নিশ্চিত। হাদীস শরীফে আছে—

لايستكمل ايمان العبد حتى تكون قلة الشى احب اليه من

كثرته وحتى يكون ان لايعرف احب اليه من ان يعرف -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান কামেল হয় না, যে পর্যন্ত তার কাছে কোন বস্তুর স্বল্পতা আধিক্যের তুলনায় অধিক প্রিয় না হয় এবং যে পর্যন্ত খ্যাত না হওয়া তার কাছে খ্যাত হওয়ার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় না হয়। আরও আছে—

ثلاث من كن فيه استكمل ايمانه لايخاف فى الله لومة لائم ولايرى الشئ من عمله وعرض امران احد هما للدنيا والثانى للاخرة اختر امر الاخرة على امر الدنيا -

অর্থাৎ, তিনটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যায়, তার ঈমান কামেল হয়ে যায়। এক, আল্লাহ তা'আলার কাজে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা। দুই, লোক দেখানোর জন্যে কোন আমল না করা। তিন, সামনে দু'টি বিষয় উপস্থিত হলে— একটি দুনিয়ার ও একটি আখেরাতের— আখেরাতের বিষয়টিকে বেছে নেয়া।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—

لايكمل ايمان العبد حتى يكون فيه ثلاث خصال اذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق واذا رضى لم يدخله رحناه فى باطل واذا قد رلم يتناول ماليس له -

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান কামেল হয় না যে পর্যন্ত তার মধ্যে তিনটি স্বভাব না পাওয়া যায়। এক, যখন সে ক্রুদ্ধ হয়, তখন তার ক্রোধ তাকে হক থেকে সরিয়ে দেয় না। দুই,যখন সে খুশী হয়, তখন খুশী তাকে অসত্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় না। তিন, যখন সে শক্তিশালী হয়, তখন যা তার নয়, সে তা গ্রহণ করে না।

এগুলো হচ্ছে মুমিন হওয়ার শর্ত, যা রসূলে করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। অতএব, সে ব্যক্তির জন্যে আশ্চর্য লাগে, যে ধার্মিকতার দাবী করে অথচ এসব শর্ত থেকে কণা পরিমাণও নিজের মধ্যে পায় না। এছাড়া ঈমানের পর যে সমস্ত স্তর অর্জিত হয়, সেগুলো সে অস্বীকারও করে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সপ্তম অধ্যায়

নিয়ত, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে ঈমানের রশ্মি ও কোরআনের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইলম ও আমল ব্যতীত দু'জাহানের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। কেননা, আলেমগণ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ধ্বংসের পথে। আবার আলেমগণের মধ্যেও যারা আমলকারী, তারা ব্যতীত সবাই ধ্বংসের পথে। আবার মুখলেস তথা নিষ্ঠাবান আমলকারী ছাড়া সকল আমলকারীও ধ্বংসের পথে। আবার নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণও মহাসংকটের সম্মুখীন।

মোটকথা, নিয়ত ব্যতীত আমল নিরেট পণ্ডশ্রম। আন্তরিকতা ছাড়া নিয়ত শুধু রিয়া, কপটতা, গোনাহ। আবার সত্যবাদিতা ছাড়া নিষ্ঠাও একটি প্রতারণা বৈ নয়। সেমতে গায়রুল্লাহর নিয়ত মিশ্রিত আমল সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

অর্থাৎ, তারা (রিয়া মিশ্রিত) যে সকল আমল করেছিল, আমি সেগুলোর দিকে অগ্রসর হলাম, অতঃপর সেগুলোকে ধুলার ন্যায় উড়িয়ে দিলাম।

আমরা জানি না, যে ব্যক্তি নিয়তের স্বরূপ জানে না, সে কিভাবে নিয়ত সঠিক করবে? যে নিষ্ঠা সম্পর্কে অজ্ঞ, সে কিভাবে নিষ্ঠা পালন করবে এবং যে সত্যবাদিতার অর্থ বুঝে না, সে কিরূপে সত্যবাদী হবে? তাই আল্লাহর এবাদতের জন্যে প্রথমে নিয়ত শিখতে হবে, এরপর নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার স্বরূপ জানতে হবে। তাই আমরা এই তিনটি বিষয়বস্তুকে তিনটি পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তের ফযীলত

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

এ আয়াতে "এরাদা" অর্থাৎ, কামনা করার অর্থ নিয়ত করা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

انما الاعمال بالنيات ولكل امرء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يعيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه

অর্থাৎ, আমলসমূহ নিয়ত অনুযায়ীই ধর্তব্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়তে অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত সেদিকেই ধর্তব্য হবে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— আমার উম্মতের অধিকাংশ শহীদ শয্যায় মৃত্যুবরণ করবে এবং অনেকে দু'সারির মাঝে নিহত হবে। আল্লাহ জানেন তাদের নিয়ত কি ছিল! আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا –

অর্থাৎ, যদি (বিচারকদ্বয়) সংশোধনের ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ তাদেরকে তাওফীক দান করবেন।

এখানে নিয়তকে তাওফীকপ্রাপ্তির কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুখাকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। অন্তরকে দেখার কারণ এটাই যে, অন্তর হল নিয়তের স্থান। এক হাদীসে আছে, বান্দা সৎকর্ম সম্পাদন করে। ফেরেশতারা সেগুলো মোহর আঁটা থলের মধ্যে নিয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করে। এরশাদ হয়— এই থলে দূরে নিক্ষেপ কর। কেননা, এতে যে সকল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমল রয়েছে, সেগুলো আমার নিয়তে করা হয়নি। এরপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন, এই ব্যক্তির জন্য এ আমল লিখ, সে আমল লিখ। ফেরেশতারা আরয করে, ইলাহী! এ ব্যক্তি তো এসব আমল করেনি। আল্লাহ বলেন ঃ সে এসব কাজের নিয়ত করেছিল।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— মানুষ চার প্রকার। এক, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইলম ও ধন-সম্পদ দিয়েছেন। সে ইলম অনুযায়ী নিজের ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করে। তা দেখে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি বলে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এ ব্যক্তির মত ইলম ও ধন-সম্পদ দান করেন, তবে আমিও তাই করব, যা সে করে। এই উভয় প্রকার মানুষ সমান সমান সওয়াব পাবে। তৃতীয় প্রকার সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। সে মূর্খতাবশত নিজের ধন-সম্পদ বাজে কাজে উড়ায়। এটা দেখে চতুর্থ প্রকার ব্যক্তি বলে, আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দিলে আমিও তাই করব, যা এ ব্যক্তি করে। এরা উভয়েই গোনাহে সমান অংশীদার হবে। লক্ষণীয় যে, কেবল নিয়তের কারণেই সৎকর্ম ও অসৎ কর্মে অংশীদার করা হয়েছে।

আনাস ইবনে মালেকের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক যুদ্ধে যাবার সময় বলেন ঃ মদীনায় কিছু লোক রয়েছে, যারা এখানে আমরা যা কিছু করছি অর্থাৎ, বিজন বন অতিক্রম করা, জেহাদে কিছু ব্যয় করা, ক্ষুধায় কষ্ট করা ইত্যাদি সব কিছুতে আমাদের সওয়াবের অংশীদার; অথচ তারা মদীনায়ই রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তা কেমন করে? তারা যে আমাদের সঙ্গে নেই। তিনি বললেন ঃ ওযরের কারণে তারা আসতে পারেনি। তাই ভাল নিয়তের কারণে সওয়াবে শরীক হয়ে গেছে। এক হাদীসে আছে, কোন এক ব্যক্তি হিজরত করে এক মহিলাকে বিয়ে করলে সে "মুহাজিরে উম্মে কায়স" নামে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবে সে নিজের নিয়তের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় এক ব্যক্তি বালুর টিলার উপর দিয়ে গমন করে এবং মনে মনে বলে— এই বালু যদি শস্যকণা হয়ে যেত, তবে আমি তা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা তখনকার নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন— এ ব্যক্তিকে বলে দাও, আল্লাহ তোমার দান কবুল করেছেন। ভাল নিয়তের কারণে তোমাকে এই সওয়াব দিয়েছেন, যা এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পরিমাণ শস্য বন্টন করলে দিতেন। অনেক হাদীসে বলা হয়েছে—

من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা সম্পন্ন করে না, তার জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টির সামনে দারিদ্র্য তুলে ধরেন এবং সে দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে যে আখেরাতের নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে প্রাচুর্য স্থাপন করে দেন এবং তার কাম্য সামগ্রী সরবরাহ করে দেন; কিন্তু সে দুনিয়াত্যাগী দরবেশ হয়ে পরপারে পাড়ি জমায়।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়, তখন ফেরেশতারা নেমে যোদ্ধাদেরকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি দুনিয়ার জন্যে যুদ্ধ করে, অমুক আত্মগরিমার জন্যে এবং অমুক বিদ্বেষবশত যুদ্ধ করে। সাবধান, কারও সম্পর্কে বলো না যে, সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী সমুচ্চে তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আহনাফ ইবনে কায়েসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار

অর্থাৎ, যখন দু'মুসলমান নিজ নিজ তরবারি নিয়ে মারমুখী হয়ে যায়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ একজন তো হত্যাকারী হওয়ার কারণে জাহান্নামী হয়, নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামী হয়? তিনি বললেন ঃ কারণ, সে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি নির্ধারিত কোন মোহরানার উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তা শোধ করার নিয়ত না রাখে, সে যিনা করে। আর যে পরিশোধ না করার নিয়তসহ করয গ্রহণ করে, সে চোর।

নিয়তের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও বুযুর্গগণের উক্তি এরূপ ঃ হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওমর (রাঃ) বলেন— সর্বোত্তম আমল তাই, যা আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকা। যেসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে, সেগুলোতে নিয়ত সঠিক করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে লিখেন— আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার নিয়ত পূর্ণ হবে, তার জন্যে আল্লাহর সাহায্যও পূর্ণ হবে। যার নিয়তে ত্রুটি থাকবে, তার জন্যে সাহায্যও ত্রুটিযুক্ত হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক ক্ষুদ্র কাজ নিয়তগুণে বড় কাজ হয়ে যায় এবং অনেক বড় কাজ নিয়ত দোষে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন ঃ আগেকার লোকেরা নিয়ত যত্নসহকারে শিখতেন, যেমন আজকাল তোমরা আমল শিখ। হেলাল ইবনে সা'দ বলেন ঃ বান্দা ঈমানদারের মত কথাবার্তা বলে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার আমল না দেখে তাকে এবং তার কথাবার্তাকে ছাড়পত্র দেন না। যদি সে আমল করে, তবে তার পরহেযগারী দেখেন। যদি পরহেযগারীও থাকে, তবে নিয়ত দেখেন! নিয়ত সঠিক হলে তার সকল কাজ সঠিক হয়। মোটকথা, নিয়ত হচ্ছে আমলের ভিত্তি। আমল ভাল হওয়ার জন্যে নিয়ত ভাল হতে হবে। নিয়ত নিজেই উত্তম, যদিও কোন বাধার কারণে আমল না হয়।

নিয়তের স্বরূপ ঃ নিয়ত, এরাদা ও কসদ— এগুলো আরবী ভাষার সমার্থবোধক শব্দ। এটা ইলম ও আমলের মধ্যবর্তী একটি আন্তরিক গুণ। ইলম আগে এবং আমল পরে আসে। কেননা, আমল হচ্ছে এই গুণের ফল ও শাখা। বলা বাহুল্য, কোন আমল সম্পন্ন হওয়ার জন্যে তিনটি বিষয় জরুরী— ইলম, ইচ্ছা ও ক্ষমতা। কেননা, মানুষ যে কাজের ইলম রাখে না, তা করার ইচ্ছা করে না। উদাহরণতঃ মানুষ খাদ্যবস্তুকে না জানলে ও না চিনলে তা খাওয়া তার জন্যে সম্ভব নয়। খাদ্যবস্তুকে জানাও যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত তা খাওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টি না হয়। আবার আগ্রহ ও ইচ্ছাও খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত ক্ষমতা না থাকে— যেমন, পঙ্গু ব্যক্তি খাদ্য চিনে এবং তা খাওয়ার ইচ্ছাও রাখে; কিন্তু পঙ্গুত্বের কারণে খেতে পারে না। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গতিশীল হয় না। ক্ষমতা ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে এবং ইচ্ছা ইলমের পরে জাগ্রত হয়। অতএব, ইচ্ছা ও নিয়ত হল ইলম ও ক্ষমতার মধ্যবর্তী একটি গুণ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিয়ত আমলের চেয়ে উত্তম ঃ

نية المؤمن خير من عمله

অর্থাৎ, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

হাদীসে বর্ণিত এ উক্তির কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন— নিয়তকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ এই যে, নিয়ত একটি গোপন বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ তা জানে না। পক্ষান্তরে আমল প্রকাশ্য বিষয়। অবশ্য গোপন আমলের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এতে জনহিতকর কাজ নিয়ে চিন্তাভাবনার নিয়ত স্বয়ং চিন্তা-ভাবনার চেয়ে উত্তম হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কখনও ধারণা করা হয় যে, নিয়তের অগ্রাধিকারের কারণ হচ্ছে নিয়ত আমলের পরিণতি পর্যন্ত থাকে, আর আমল সর্বক্ষণ থাকে না। এ ধারণাও অগ্রাহ্য। কারণ, এতে অধিক আমল অল্প আমলের চেয়ে উত্তম হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নিয়ত সর্বক্ষণ থাকাও জরুরী নয়। কেননা, নামায আমলের নিয়ত কখনও কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে এবং আমল অনেকক্ষণ থাকে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, কেবল নিয়ত এমন আমলের চেয়ে উত্তম, যাতে নিয়ত থাকে না। এরূপ আমল এবাদত নয়; কিন্তু নিয়ত সর্বাবস্থায় এবাদত— আমল হোক বা না হোক। উদ্দেশ্য এই যে, যে এবাদতে নিয়ত ও আমল উভয়টি থাকে, তাতে নিয়ত আমলের তুলনায় উত্তম। সুতরাং হাদীসের অর্থ এই, মুমিনের নিয়ত যা তার এবাদতের একটি অংশ, সে আমলের চেয়ে উত্তম, যা তার এবাদতেরই অংশ।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না এদের মাংস, না এদের রক্ত; কিন্তু পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি।

বলা বাহুল্য, তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের আমল। অতএব, অন্তরের আমল সর্বাবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল অপেক্ষা উত্তম হবে। নিয়ত যেহেতু সৎকর্মের প্রতি অন্তরের প্রবণতাকে বলা হয়, তাই নিয়তের শ্রেষ্ঠত্বও জরুরী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উদ্দেশ্য অন্তরকে সৎকর্মে অভ্যস্ত করা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এবং সৎকর্মের প্রবণতাকে পাকাপোক্ত করা। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যের পরিমাপেই আমল উত্তম হবে। নিয়তে এ উদ্দেশ্য অর্জিত রয়েছে। তাই নিয়তই শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ পাকস্থলীতে ব্যথা হলে তার এক চিকিৎসা হচ্ছে উপরে ঔষধের প্রলেপ দেয়া এবং অন্য চিকিৎসা হচ্ছে ঔষধ পান করানো, যা পাকস্থলীতে পৌঁছে যাবে। এখানে ঔষধ পান করা, প্রলেপ দেয়ার তুলনায় উত্তম হবে। কেননা, ঔষধের প্রভাব পাকস্থলীতে পৌঁছানোই আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ঔষধ পান করানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়। কারণ, এতে ঔষধ পাকস্থলীর সাথে মিলিত থাকে। সুতরাং এটা অধিক উপকারী হবে।

অনুরূপভাবে এবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের পরিবর্তন ও সদগুণাবলী অর্জন— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া নয়। উদাহরণতঃ সেজদার উদ্দেশ্য মাটিতে কপাল রাখা নয়; বরং অন্তরের গুণ নম্রতাকে মযবুত ও পাকাপোক্ত করা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নম্রতা অনুভব করে, সে যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নম্রতা অর্জনে সহায়ক থাকার আকৃতি দেবে, তখন তার নম্রতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এতীমের প্রতি দয়ার্দ্রতা অনুভব করে, সে যখন এতীমের মাথায় হাত বুলাবে এবং আদর করবে, তখন তার অন্তরের গুণটি অধিক মযবুত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ত ব্যতীত আমল মোটেই উপকারী নয়। যেমন, কেউ এতীমের মাথায় হাত বুলায়; কিন্তু মন গাফেল থাকে কিংবা মনে করে সে কাপড়ের উপর হাত বুলাচ্ছে। এরূপ আমল দ্বারা অন্তর এতটুকুও প্রভাবান্বিত হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গাফেল অবস্থায় সেজদা করে এবং মন থাকে দুনিয়ার চিন্তায় মশগুল, তার অন্তরও প্রভাবিত হবে না এবং নম্রতা মযবুত করতেও সহায়ক হবে না। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে এ ধরনের সেজদা করা না করা সমান। এরূপ সেজদাকে বাতিল ও বেকার বলা হয়। কিন্তু সেজদার উদ্দেশ্য যদি রিযা হয় কিংবা কোন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়, তবে তা করা না করা সমান হবে না; বরং একটি অনিষ্ট বেড়ে যাবে। আমলের চেয়ে নিয়ত উত্তম হওয়ার এটাই আসল কারণ। এ থেকে অন্য একটি হাদীসের অর্থও বুঝা যায়। বলা হয়েছে—

من هم حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকর্মের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা করে না, তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

কেননা, নিয়তের অর্থ হচ্ছে সৎকর্মের প্রতি অন্তরের ঝোঁক, যা একান্ত সদগুণ। আমল দ্বারা এই গুণ অধিক জোরদার হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কোরবানীর জন্তু যবেহ করার উদ্দেশ্য গোশত ও রক্ত নয়; বরং দুনিয়ার মহব্বত থেকে অন্তরকে ফিরানো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর পথে জন্তুকে উৎসর্গ করা। এটা নিয়ত ও দৃঢ় ইচ্ছার সাথে সাথে অর্জিত হয়ে যায়। যদি কোন বাধার কারণে যবেহ নাও হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, কিছু লোক মদীনায় থেকেও জেহাদে আমাদের সাথে শরীক। কেননা, তাদের নিয়তও তাদের মত ছিল, যারা জেহাদে বের হয়েছিল। বিশেষ ওযরবশতই তারা দৈহিকভাবে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

নিয়ত সম্পর্কিত আমলের বিবরণ ঃ আমল তিন প্রকার— গোনাহ, এবাদত ও অনুমোদিত কর্ম। নিয়তের কারণে এই তিন প্রকারে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম, গোনাহের ক্ষেত্রে নিয়তের কারণে কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং انما الاعمال بالنيات অর্থাৎ, নিয়তগুণে কর্ম এ হাদীস শুনে যদি কোন মূর্খ মনে করে, গোনাহ নিয়তের গুণে এবাদত হয়ে যায়, তবে তা নিরেট ভুল হবে। উদাহরণতঃ কেউ এক ব্যক্তির খাতিরে অন্যের গীবত করলে কিংবা অন্যের মাল ফকীরকে খাইয়ে দিলে কিংবা হারাম ধন-সম্পদ দিয়ে মাদ্রাসা অথবা মসজিদ নির্মাণ করলে তা হবে মূর্খতার কাজ। নিয়তের গুণে এসব কাজের যুলুম ও গোনাহ বিলুপ্ত হবে না। বরং শরীয়তের চাহিদার বিপরীতে এসবে সৎকর্মের নিয়ত করা আলাদা গোনাহ। কেউ জেনে-শুনে এরূপ করলে সে হবে শরীয়তের দুশমন। না জেনে করলে অজ্ঞানতার কারণে গোনাহগার হবে। কেননা, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কোন্ কর্ম সৎকর্ম, তা শরীয়ত দ্বারাই জানা যায়। সুতরাং যে কাজ অসৎ, তা সৎকর্ম কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই হযরত সহল বলেন ঃ মূর্খতাবশত আল্লাহর নাফরমানীর চেয়ে বড় কোন নাফরমানী নেই, যেমন জ্ঞানবশত আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে বড় কোন আনুগত্য নেই। সারকথা, যে ব্যক্তি মূর্খতার কারণে গোনাহ দ্বারা সৎকর্মের নিয়ত করবে, তার মূর্খতাজনিত আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। তবে এক অবস্থায় গ্রাহ্য হবে, যদি সে অল্প দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ না পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِاِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তবে যারা জেনে স্মরণ রেখেছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لايعذر الجاهل على الجهل ولايحل للجاهل ان يمكره على جهله ولا للعالم ان يسكت على علمه -

অর্থাৎ, মূর্খ তার মূর্খতার কারণে ক্ষমার যোগ্য হবে না। মূর্খের জন্যে মূর্খতার উপর অবস্থান করা জায়েয নয়। তেমনি আলেমের জন্যে চুপ থাকা জায়েয নয়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, "নিয়তগুণে কর্ম" হাদীসটি বিশেষভাবে এবাদত ও অনুমোদিত কর্মসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— গোনাহের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, এবাদত নিয়তের কারণে গোনাহ হয়ে যায় এবং নিয়তের কারণেই এবাদতও থাকে। অনুমোদিত কর্মের অবস্থাও তাই অর্থাৎ নিয়ত দ্বারা তা গোনাহ ও এবাদত উভয়টিই হতে পারে। কিন্তু গোনাহ কোন প্রকারেই এবাদত হতে পারে না; বরং বদ নিয়তের কারণে তা অধিকতর গুরুতর গোনাহ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়, এবাদত দুটি বিষয়ে নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত— বিশুদ্ধতা এবং অধিক সওয়াবপ্রাপ্তি। এবাদত বিশুদ্ধ তখন হবে, যখন আল্লাহর এবাদতের নিয়ত করা হবে— অন্য কিছুর নয়। অতএব, রিয়া তথা লোক দেখানোর নিয়ত করলে এবাদত গোনাহে পরিণত হবে। এবাদতের সওয়াব অধিক তখন হয়, যখন একই আমলে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করা হয়। এরূপ করলে প্রত্যেক নিয়তের জন্যে আলাদা এক সওয়াব পাওয়া যায়। কেননা, প্রত্যেক নিয়তই একটি নেকী। হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক নেকীর পেছনে দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে বসে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করতে পারে। প্রথমত, মসজিদে বসে পরওয়ারদেগারের যিয়ারতের নিয়ত করবে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঘর। যে এখানে আসে, তার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور اكرام زائره -

অর্থাৎ, যে মসজিদে বসে, সে আল্লাহ তা'আলার যিয়ারত করে। যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য যিয়ারতকারীর সমাদর করা। দ্বিতীয়ত, এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করার নিয়ত করবে, যাতে যতক্ষণ অপেক্ষা করা হয়, ততক্ষণই নামাযে থাকার সওয়াব পাওয়া যায়। কোরআন মজীদে উল্লিখিত رَابِطُوْا বাক্যে একথাই বুঝানো হয়েছে। তৃতীয়ত, কান, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রেখে সংসারত্যাগী হওয়ার নিয়ত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

رهبانية امتى القعود فى المساجد -

অর্থাৎ, আমার উম্মতের সংসার ত্যাগ হচ্ছে মসজিদে বসা।

চতুর্থত, সাহসিকতাকে আল্লাহতে সীমিত করা। পঞ্চমত, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে একাকী হওয়া। হাদীসে আছে—

من غدا الى المسجد ليذكر الله تعالى اويذكر به كان كالمجاهد فى سبيل الله -

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে অথবা স্মরণের উপদেশ দেওয়ার জন্যে মসজিদে যায়, সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর অনুরূপ।

ষষ্ঠত, কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নিয়ত করবে। সপ্তমত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার নিয়ত করবে। কেননা, মসজিদে এমন লোকও থাকে, যারা নামায ভালরূপে পড়তে পারে না অথবা অবৈধ কাজকর্ম করে। অষ্টমত, আল্লাহ তা'আলার কাছে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে গোনাহ ত্যাগ করার নিয়ত করবে। অনেক নিয়ত করার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। সকল এবাদতেই এরূপ মনে করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক এবাদতেই অনেক প্রকার নিয়ত করার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়, অনুমোদিত কর্মসমূহের মধ্যেও এমনি ধরনের এক অথবা একাধিক নিয়ত হতে পারে। ফলে, অনুমোদিত কাজও উৎকৃষ্ট এবাদতে পরিণত হতে পারে। বড় ক্ষতি তাদের, যারা এ বিষয়ে গাফেল। কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে, এসব কাজ কি নিয়তে করা হয়েছিল? এটা সেই অনুমোদিত কাজের বেলায়, যাতে কারাহাতের (অর্থাৎ মাকরূহ হওয়ার) মিশ্রণ নেই। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

حلالها حساب وحرامها عقاب – (এর হালালে হিসাব আছে এবং হারামে শাস্তি আছে)। মুয়ায ইবনে জাবালের হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ان العبد ليسأل يوم القيامة من كل شيئ حتى عن كحل عينه وعن فتات الطينة باصبعه وعن لمس ثوب اخيه –

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন বান্দা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, এমনকি, নিজের চোখের সুরমা, অঙ্গুলি দ্বারা মাটি খোঁড়া এবং নিজের ভাইয়ের কাপড় স্পর্শ করা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে সুগন্ধি লাগায়, সে কিয়ামতের দিন যখন উত্থিত হবে, তখন তার সুগন্ধি মেশকের চেয়েও উৎকৃষ্ট হবে। আর যে অন্যের জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন তার দুর্গন্ধ মৃতের চেয়েও বেশী হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, সুগন্ধি লাগানো একটি মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ। কিন্তু তাতে সুনিয়ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। প্রশ্ন হয় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করা একটি মানসিক আনন্দের কাজ। তা আল্লাহর জন্যে কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, যে ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করে, তার উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করা অথবা গর্ব ও প্রাচুর্য প্রকাশ করা অথবা মানুষকে দেখানো হতে পারে, যাতে মানুষের অন্তরে তার স্থান হয় এবং মানুষ তাকে খোশবুপ্রিয় ও রুচিশীল বলে আখ্যায়িত করে। যে পরনারীকে দেখে, তার খোশবু লাগানোর উদ্দেশ্য নিজের প্রতি পরনারীকে আকৃষ্ট করা হতে পারে। এসব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কারণে সুগন্ধি ব্যবহার করা গোনাহের কারণ। এ কারণেই কিয়ামতে এর দুর্গন্ধ মৃতের চেয়েও বেশী হবে। কিন্তু কেবল প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করা গোনাহ নয়। তবে জিজ্ঞাসা এ সম্পর্কেও করা হবে। যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তার শাস্তি হবে। যে সব নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার আল্লাহর জন্যে হয়, সেগুলো এই— জুমআর দিন খোশবু লাগিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা, আল্লাহর ঘরের তাযীমের নিয়ত করা, নিজ দেহ থেকে দুর্গন্ধ দূর করার নিয়ত করা, যাতে নিকটে উপবেশনকারীদের কষ্ট না হয়, আপন মস্তিষ্কের চিকিৎসার নিয়ত করা, যাতে সুগন্ধি দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তা করা সহজ হয়। ইমাম শাফেঈ বলেন ঃ যার খোশবু ভাল হয়, তার বুদ্ধি বাড়ে। মোটকথা, এমনি ধরনের আরও অনেক নিয়ত আছে। অন্তরে আখেরাতের তেজারত ও সৎকর্মের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হলে এরূপ নিয়ত করতে কেউ অক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে অন্তরে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা প্রবল হলে এসব নিয়ত মনে জাগ্রত হয় না।

মুবাহ তথা অনুমোদিত কর্ম যেমন গণনার বাইরে, তেমনি সেগুলোতে নিয়তেরও কোন শেষ নেই। নিম্নে বর্ণিত একটি উদাহরণ দ্বারা বাকীগুলোকে অনুমান করে নেয়া যায়। জনৈক সাধক বলেন— আমি মুস্তাহাব মনে করি যে, প্রত্যেক কাজে একটি না একটি নিয়ত করে নিই; এমনকি পানাহার, নিদ্রা, মলত্যাগ এবং অন্যান্য সব কাজে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত হওয়া চাই। কেননা, যে কাজ শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক অবসর লাভের কারণ হয়, তা ধর্মে-কর্মে সহায়ক হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি পানাহারে এবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত করে এবং স্ত্রী-সহবাসে পত্নীর মনোরঞ্জন ও সুসন্তান লাভের নিয়ত করে, সে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস দ্বারা এবাদত পালনকারী গণ্য হবে। যার মনে আখেরাতের চিন্তা প্রবল, তার জন্যে এ দু'টি প্রধান কাজে সৎকর্মের নিয়ত করা অসম্ভব নয়। এমনিভাবে যখন কারও ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন তাতেও সৎ নিয়ত করে সে ধন-সম্পদকে "ফী সাবীলিল্লাহ" বলে দেয়া উচিত। যখন শুনে যে, কেউ তার গীবত করে, তখন এ ভেবে খুশী হবে যে, এর বিনিময়ে গীবতকারী তার আমলনামা থেকে পাপ নিয়ে যাচ্ছে এবং গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকীসমূহ তার আমলনামায় চলে আসছে। কোন জওয়াব না দিয়ে এবং সম্পূর্ণ চুপ থেকে এ বিষয়ের নিয়ত করবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাদীস শরীফে আছে— হিসাব-নিকাশের পর বান্দার নিজস্ব আমল যখন বেকার হয়ে যাবে এবং সে দোযখের যোগ্য হয়ে যাবে, তখন তার জন্যে সৎকর্মের এমন আমলনামা খোলা হবে, যা দ্বারা সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। বান্দা এই আমলনামা দেখে বিস্মিত হয়ে বলবে— ইলাহী, এসব আমল তো আমি কখনও করিনি। তাকে বলা হবে, এসব আমল সে লোকদের, যারা তোমার গীবত করেছিল। এখন এগুলো তুমি পেয়ে গেছ।

নিয়ত ইচ্ছাধীন নয় ঃ মূর্খ ব্যক্তি যখন নিয়তের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ শুনে, তখন সে তার যাবতীয় কাজের শুরুতে মনে মনে বলে— আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যবসায়ের নিয়ত করছি অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়ার নিয়ত করছি। এতেই সে মনে করে, বুঝি নিয়ত হয়ে গেছে। অথচ এটা মনের জল্পনা মাত্র। নিয়তের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, যে বিষয়ের সাথে মনের বর্তমান অথবা ভবিষ্যত স্বার্থ জড়িত, তার প্রতি মনের উত্তেজনা ও প্রবণতাকে বলা হয় নিয়ত। প্রবণতা না থাকলে কেবল ইচ্ছার মাধ্যমে নিয়ত হাসিল করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক কাজের সাথে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ জড়িত, তখন সে সেই কাজের দিকে মনোযোগী হয়। মনে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। উদাহরণতঃ যার বিশ্বাসে সন্তান জন্মগ্রহণের কোন ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক উদ্দেশ্য নেই, তার পক্ষে স্ত্রী-সহবাসের সময় সন্তানের নিয়ত করা সম্ভব নয়। তার সহবাসের উদ্দেশ্য হবে কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কেননা, নিয়ত উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে উদ্দেশ্য, কামবাসনা চরিতার্থ করা। অনুরূপভাবে যদি অন্তরে এ বিশ্বাস প্রবল না থাকে যে, বিবাহ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত প্রতিপালন করা হয়, তবে বিবাহে সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মুখে 'সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করলাম, বলে দিলে নিয়ত হয়ে যাবে না। হাঁ, এই নিয়ত হাসিল করার পদ্ধতি হল— প্রথমে শরীয়তের প্রতি এবং উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যাবৃদ্ধি চেষ্টা করলে যে অসীম সওয়াব হয়, সে বিষয়ের প্রতি ঈমান মযবুত করা। এরপর সন্তান লালন-পালনের কষ্ট সম্পর্কিত যাবতীয় বিরুদ্ধ ভাব মন থেকে দূর করে দেয়া। এরূপ করলে সন্তান লাভের সত্যিকার নিয়ত অর্জিত হতে পারে।

মোটকথা, নিয়তের জন্যে মনের উত্তেজনা ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের বিশ্বাস পূর্ব থেকে থাকা উচিত বিধায় অনেক পূর্ববর্তী বুযুর্গ কোন কোন সৎকাজ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পাদন করতে দ্বিধা করেছেন। কারণ, তাদের মধ্যে সে সৎকাজের নিয়ত উপস্থিত ছিল না। বর্ণিত আছে, ইবনে সীরীন (রঃ) হযরত হাসান বসরীর জানাযার নামায পড়েননি এবং বলেন ঃ আমার মনে নিয়ত উপস্থিত হয় না। কুফার আলেম হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মানের ইন্তেকাল হলে হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল— আপনি তাঁর জানাযায় যাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার মধ্যে নিয়ত থাকলে অবশ্যই যেতাম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কাছে কেউ কোন সৎকর্মের অনুরোধ জানালে তারা জওয়াব দিতেন— যদি আল্লাহ নিয়ত দান করেন, তবে অবশ্যই করব। হযরত তাউস (রহঃ) নিয়ত ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতেন না। কেউ কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করলেও তিনি জওয়াব দিতেন না। আবার নিয়ত থাকলে জিজ্ঞাসা ছাড়া আপনা-আপনিই বর্ণনা শুরু করতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ ব্যাপার কি! কোন সময় আপনি প্রশ্নের উত্তরেও হাদীস বর্ণনা করেন না, আবার কোন সময় আপনা-আপনি বর্ণনা করেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি চাও যে, নিয়ত ছাড়াই আমি হাদীস বর্ণনা করি? যখন আমার মধ্যে নিয়ত উপস্থিত হয়, তখনই বর্ণনা করি। হযরত তাউস (রহঃ)-কে কেউ বলল ঃ আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ যখন নিজের মধ্যে নিয়ত পাব, তখন করব। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক মাস ধরে জনৈক রোগীকে দেখতে যাওয়ার নিয়ত তালাশ করছি। এখন পর্যন্ত সঠিক নিয়ত পাইনি।

আগেকার দিনের বুযুর্গগণের রীতি ছিল যে, তারা নিয়ত ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তারা জানতেন, নিয়ত হচ্ছে আমলের প্রাণ। সত্যনিষ্ঠ নিয়ত ছাড়া আমল রিয়ার নামান্তর। এরূপ আমল খোদায়ী গযবের কারণ— নৈকট্যের নয়। তারা আরও জানতেন যে, মুখে "নিয়ত করি" বলার নাম নিয়ত নয়। বরং এটা অন্তরের প্রেরণা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে উন্মোচনের স্থলবর্তী। মাঝে মাঝে অর্জিত হয় এবং মাঝে মাঝে হয় না। যার মনে অধিকাংশ সময় ধর্মীয় জ্ঞান প্রবল থাকে, তার অধিকাংশ সময় নিয়ত অর্জিত হয়। আর যার মনে দুনিয়া প্রবল থাকে, তার এটা অর্জিত হয় না।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখলাসের ফযীলত

এখলাস সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-

অর্থাৎ, তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল খাঁটিভাবে আল্লাহর এবাদত করতে।

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ -

অর্থাৎ, সাবধান! খাঁটি এবাদত আল্লাহরই হয়ে থাকে।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ -

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তওবা করে, সংশোধিত হয়; আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করে এবং আপন এবাদতকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করে।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا -

অর্থাৎ, অতএব যে তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং নিজের পালনকর্তার এবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

এ আয়াতটি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমল করে এবং তজ্জন্যে মানুষের প্রশংসা কামনা করে না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم اخلاص العمل لله

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

والنصيحة للولاة ولزوم الجماعة -

অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে মর্দে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না— আল্লাহর জন্যে আমলকে খাঁটি করা, শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দেয়া এবং মুসলিম দলের সাথে থাকা।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এখলাস আমার রহস্য। আমি যাকে ইচ্ছা এই রহস্য অবগত করি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমলের স্বল্পতার জন্যে চিন্তিত হয়ো না; বরং কবুল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হও। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) একবার মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন—

اخلص العمل يجزء ك منه القليل -

অর্থাৎ, এখলাস সহকারে আমল কর। এরূপ আমল অল্পই তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে—

مامن يخلعو الله العمل اربعين يوما الاظهرت ينابيع الحكم -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাস সহকারে আমল করে, তার অন্তর ও জিহ্বা থেকে প্রজ্ঞার ঝরনা প্রবাহিত হতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও এরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১) যাকে ইলম দান করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি তোমার ইলম দিয়ে কি করেছ? সে বলবে ঃ ইলাহী, দিবারাত্রি আমি এরই খেদমত করেছি। আল্লাহ বলবেন— তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার বাসনা ছিল যেন মানুষ তোমাকে আলেম বলে। অতঃপর ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ বলবেন ঃ মনে রেখ, তোমাকে দুনিয়াতে আলেম বলা হয়ে গেছে। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাকে প্রশ্ন করবেন— তুমি তোমার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ধন-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ? সে বলবে— পরওয়ারদেগার, আমি দুনিয়াতে দিবারাত্রি সদকা-খয়রাত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন— তুমি মিথ্যা বলছ। তৎসঙ্গে ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ আরও বলবেন, বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। বস্তুত তা বলা হয়ে গেছে। (৩) যে আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, আল্লাহ তাকে বলবেন— তুমি কি করেছ? সে বলবে, ইলাহী, তুমি জেহাদের নির্দেশ দিয়েছিলে। তাই আমি যুদ্ধ করেছি এবং তোমার পথে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন— তুমি মিথ্যাবাদী। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আরও বলবে— বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মানুষ তোমাকে একজন মহাবীর বলে। তা বলা হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উরুতে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ হে আবু হোরায়রা, সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তিকে দিয়েই জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে। হযরত আবু হোরায়রা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন, অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ পাক ঠিকই বলেছেন —

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেই। তারা এতে ঠকে না।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীতে বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে নিয়োজিত ছিল। একদিন কিছু লোক তার কাছে এসে বলল ঃ এখানে একটি সম্প্রদায় বৃক্ষের পূজা করে। আবেদ রাগান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ কুড়াল কাঁধে নিয়ে বৃক্ষটি কেটে ফেলার জন্যে রওয়ানা হল। পথে শয়তান এক বুড়োর বেশে তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আবেদ বলল ঃ আমি অমুক বৃক্ষটি কেটে ফেলতে চাই। বুড়ো বলল ঃ তুমি নিজের এবাদত ও কাজকর্ম ছেড়ে এ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বৃক্ষের পেছনে পড়লে কেন? এতে তোমার কি লাভ? আবেদ বলল ঃ এটাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। বুড়ো শয়তান বলল ঃ আমি তোমাকে এটা কাটতে দেব না। কথা কাটাকাটি চরমে পৌছলে আবেদ বুড়োকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসল। বুড়ো বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কিছু উপকারী কথা বলতে চাই। আবেদ দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ো বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর এ বৃক্ষ কাটা ফরয করেননি। তুমিও এর এবাদত কর না। যদি অন্য কেউ এবাদত করে, তবে তার গোনাহ্ তোমার উপর বর্তাবে না। ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর অনেক পয়গম্বর রয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে বৃক্ষ এলাকায় কোন পয়গম্বর পাঠিয়ে তাকে বৃক্ষ কর্তনের নির্দেশ দেবেন। যে কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তার পেছনে পড়ার প্রয়োজন তোমার আছে কি? আবেদ বলল ঃ আমি অবশ্যই বৃক্ষটি কর্তন করব। বুড়ো পুনরায় কুস্তি লড়ার ভাব প্রকাশ করলে আবেদ তাকে পুনরায় ভূতলশায়ী করে দিল এবং বুকের উপর চেপে বসল। বুড়োবেশী শয়তান অপারগ হয়ে বলতে লাগল ঃ এস, আমি তোমাকে আরও একটি কথা বলব, যা তোমার জন্যে নিশ্চিতই উত্তম ও কল্যাণকর হবে। আবেদ বলল ঃ আচ্ছা বল কি বলতে চাও। বুড়োবেশী শয়তান বলল ঃ আগে আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর বলব। আবেদ তাকে ছেড়ে দিল। বুড়ো বলল ঃ তুমি একজন অভাবী মানুষ। পরের দেয়া অন্ন ভক্ষণ কর। আমার মনে হয় অপরকে খাওয়াবার, প্রতিবেশীদের খাতির-আপ্যায়ন করার এবং অমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকার সাধ তোমার মনেও আছে। আবেদ বলল ঃ এ সাধ কার না আছে? বুড়ো বলল ঃ তা হলে এখন তুমি ফিরে যাও। আমি এখন থেকে প্রতিরাত্রে তোমার শিয়রে দু'টি দীনার রেখে দেব। ভোরে এগুলো তুলে নিও এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে সেগুলো ব্যয় করো। এটা তোমার জন্যে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যে বৃক্ষ কর্তনের তুলনায় অধিক উপকারী হবে। এ বৃক্ষটি কেটে কোন লাভ নেই। কারণ, এর জায়গায় অন্য বৃক্ষ রোপণ করা হবে এবং পূজা করা হবে। আবেদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনে মনে বলল ঃ বুড়ো ঠিকই বলেছে। আমি তো পয়গম্বর নই যে, বৃক্ষটি কাটা আমার জন্যে অপরিহার্য হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এটা কাটার হুকুমও করেননি, যা না কাটলে আমি নাফরমান সাব্যস্ত হব। সে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপকারও রয়েছে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে দীনারের ব্যাপারে পাকাপোক্ত চুক্তি হয়ে গেল।

আবেদ তার এবাদতখানায় ফিরে এল এবং রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে সে শিয়রের কাছে দু'টি দীনার পেয়ে তুলে নিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও তাই হল। এরপর কোনদিন সে দীনারের দেখা পেল না। সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে একদিন কাঁধে কুড়াল নিয়ে সে বৃক্ষের উদ্দেশে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে বুড়োবেশী ইবলীসও তার সামনে এসে বলল ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? আবেদ বলল, সে বৃক্ষ কর্তন করতে যাচ্ছে। ইবলীস বলল ঃ এখন তুমি সে বৃক্ষ কর্তন করতে পারবে না এবং সে পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হবে না। একথা শুনে আবেদ প্রথমবারের মত বুড়োকে মাটিতে ফেলে দিতে চাইল। বুড়োবেশী ইবলীস বলল ঃ এখন সে দিন বাসি হয়ে গেছে। অতঃপর সে আবেদকে উপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারল এবং লাথির উপর লাথি মারতে লাগল। আবেদকে তার পায়ে বলের মত মনে হচ্ছিল। এরপর ইবলীস তার ছাতির উপর বসে বলল ঃ হয় তুমি এ কার্য থেকে বিরত হবে, না হয় আমি তোমাকে যবেহ করে ফেলব। আবেদ নিজের ভেতরে মোকাবিলার শক্তি না পেয়ে হার মেনে নিল এবং বলল ঃ এখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল পূর্বে আমি কিরূপে জয়ী হয়েছিলাম এবং এখন তুমি কিভাবে জয়ী হলে? ইবলীস বলল ঃ এর কারণ, পূর্বে তুমি যা করেছিলে, তা আল্লাহর জন্যে করেছিলে এবং এখলাসের বলে বলীয়ান ছিলে। কিন্তু এখন তুমি ক্রোধ ও দুনিয়ার হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মাঠে নেমেছ। তাই আমি অনায়াসেই তোমাকে পরাভূত করে দিয়েছি।

সত্যি বলতে কি, উপরোক্ত কাহিনীতে নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যায়ন ও সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ -

অর্থাৎ,(শয়তান বলল ঃ) আমি অবশ্যই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। কিন্তু যারা তোমার এখলাস বিশিষ্ট বান্দা, তাদের কথা আলাদা।

কেননা, এখলাস ছাড়া বান্দা শয়তানের হাত থেকে ছাড়া পায় না। তাই হযরত মারূফ কারখী নিজেকে প্রহার করতেন এবং বলতেন— হে নফস, এখলাস অবলম্বন কর যাতে মুক্তি পাও। ইয়াকুব মককুফ বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে নেক কর্মসমূহকে গোপন করা, যেমন কুকর্মসমূহকে গোপন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করা হয়। আবু সোলায়মান বলেন, যার একটি পদক্ষেপও সঠিক হয় এবং তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ত না থাকে, সেই সুখী।

এখলাসের স্বরূপ ঃ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ থাকা সম্ভব। কোন বস্তু অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হলে,তাকে বলা হয় "খালেস" বা খাঁটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ -

অর্থাৎ, গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে নির্গত খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুপেয়।

অতএব দুধের মধ্যে গোবর ও রক্তের সংমিশ্রণ না থাকাই হচ্ছে দুধের খাঁটিত্ব। এখলাস অর্থ খাঁটি করা এবং এর বিপরীত হচ্ছে এশরাক অর্থাৎ শরীক করা। এ থেকে বুঝা যায়, যে মুখলেস নয়, সে মুশরেক। তবে শিরকের অনেক স্তর রয়েছে। তাওহীদের ক্ষেত্রে এখলাসের বিপরীত হচ্ছে উপাস্যতায় এশরাক। শিরকের মত এখলাসও কিছু গোপন এবং কিছু প্রকাশ্য। শিরক ও এখলাসের স্থান হচ্ছে অন্তর। নিয়তের মাধ্যমে উভয়টি অন্তরে উপস্থিত হয়। একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ সম্পাদিত হয় এবং তাতে অন্য কোন উদ্দেশ্যের মিশ্রণ না থাকে, তাই এখলাস হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ কেউ শুধু রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল অথবা শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান করল,আভিধানিক দিক দিয়ে উভয়টিকেই এখলাস বলা হবে। কেননা, এতে এক উদ্দেশ্যের সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ নেই। কিন্তু পরিভাষায় কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান করাকেই এখলাস বলা হয়। রিয়ার উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এখানে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখানে আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, নৈকট্য লাভের নিয়তের সাথে রিয়া অথবা অন্য কোন মানসিক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকলে তার বিধান কি হবে? উদাহরণতঃ কেউ নৈকট্য লাভের নিয়তে রোযা রাখে কিন্তু সাথে সাথে চিকিৎসার খাতিরে পরহেযের উপকারও হয়ে যায়। অথবা কেউ হজ্জ করে যাতে দেশ ভ্রমণের আনন্দও অর্জিত হয়ে যায়। কিংবা শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা হাসিল হয়ে যায়। অথবা কেউ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাহাজ্জুদ পড়ে যাতে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে হেফাযতও হয়ে যায়। অথবা কেউ উযু করে যাতে হাত পায়ের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং দেহ ঠাণ্ডা থাকে। এসব ক্ষেত্রে নৈকট্য লাভের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকার কারণে আমলসমূহ এখলাস বহির্ভূত হয়ে যাবে এবং এসব আমলকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি বলা যাবে না। কিন্তু মানুষের কোন কাজ ও এবাদত এ জাতীয় মানসিক আনন্দমুক্ত থাকে না। তাই বলা হযেছে, যে ব্যক্তি সারা জীবনে খাঁটি ভাবে আল্লাহর জন্যে একটি মুহূর্তও পাবে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেননা, এখলাস অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। মনকে উপরোক্ত রূপ মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। নিরেট নৈকট্য লাভের নিয়ত সেই ব্যক্তির জন্যে কল্পনা করা যায়, যে আল্লাহর পাগলপারা আশেক, আখরাতের চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং এ ধরনের পার্থিব মহব্বতের জন্যে যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অবকাশ নেই। এমনকি, খানাপিনার প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। এগুলোর প্রয়োজন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনের বেশী নয়। এরূপ ব্যক্তি আহার, পান, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি সকল কাজের ক্ষেত্রে খাঁটি আমলকারী ও সঠিক নিয়ত বিশিষ্ট হবে। এমনকি, সে এই নিয়তে ঘুমাবে যাতে পরবর্তী এবাদতের জন্যে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় তার নিদ্রাও এবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আমলে এখলাসের উপস্থিতি খুবই বিরল হবে। এ থেকে এখলাস অর্জনের এই উপায় জানা যায় যে, জৈবিক বাসনা ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে, দুনিয়ার লোভ-লালসা ছিন্ন করতে হবে এবং অন্তরে আখেরাতের চিন্তাই প্রবল রাখতে হবে।

এমন অনেক আমল রয়েছে, যেগুলোতে মানুষ শ্রম স্বীকার করে এবং একান্ত ভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ধারণা পোষণ করে অথচ এটা মানুষের একটা বিভ্রান্তি। কেননা, এতে বিপদের কারণ তাদের জানা থাকে না। উদাহরণতঃ জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি ত্রিশ বছরের নামায কাযা পড়েছি। এগুলো আমি মসজিদের প্রথম সারিতে পড়েছিলাম। কাযার কারণ, একদিন ওযরবশত আমার মসজিদে যেতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে, আমি দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়লাম এবং মনে মনে খুব লজ্জিত হলাম যে, মুসল্লীরা আমাকে দ্বিতীয় সারিতে দেখেছে। এই লজ্জা থেকে জানতে পারলাম, লোকেরা আমাকে যে প্রথম সারিতে দেখত, তাতে আমি আন্তরিকভাবে খুশী ও আনন্দিত হতাম। অথচ পূর্বে বিষয়টি টের পাইনি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বলা বাহুল্য, এটা এমন একটি সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয়, যা থেকে আমল কমই মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকেই এটা টেরও পায় না। আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন, তাদের কথা ভিন্ন। যারা এ থেকে গাফেল, তারা আখেরাতে নিজের সৎ আমলসমূহকে গোনাহ আকারে দেখতে পাবে। নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতে এরূপ লোকদের কথাই বুঝানো হয়েছে—

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا -

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় প্রকাশ পাবে, যার ধারণা তারা করত না এবং নিজের উপার্জিত কর্মের গোনাহ তাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا -

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে তাদের কথা কি বলব, যারা আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত! তারা এমন লোক, যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই সীমিত; অথচ তারা মনে করে তারা চমৎকার কাজ করছে।

আলেম সমাজই এই ফেতনায় সর্বাধিক পতিত। তাদের অধিকাংশের ইলম চর্চায় যে প্রেরণাটি কাজ করে, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের আনন্দ এবং তারীফ ও প্রশংসা-প্রীতি। শয়তান তাদের সামনে সত্যকে গোপন করে দেয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, তোমার উদ্দেশ্য তো খোদায়ী ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে বিরোধীদেরকে প্রতিহত করা। ওয়ায়েযরা জনসাধারণকে এবং শাসকবর্গকে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে। সাধারণ মানুষ তাদের উপদেশ মেনে নিলে এবং তাদের প্রতি মনোযোগী হলে তারা আহলাদে আটখানা হয়ে যায়। তারা বলে— আমরা এজন্য আনন্দিত যে, আল্লাহ তা'আলা ধর্মের সাহায্যের কাজে আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন। অথচ তাদের মত অন্য কোন কর্মী সৃষ্টি হয়ে গেলে, সে তাদের চেয়ে ভাল ওয়ায করলে এবং মানুষ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তার প্রতি মনোযোগী হলে তারা তাকে সহ্য করতে পারে না এবং মনে মনে দুঃখিত হয়। এখন প্রশ্ন, যদি দ্বীনের খাতিরেই তারা ওয়ায করত, তবে তাদের অবস্থা এমন হয় কেন? এক্ষেত্রে তো তাদের আরও খুশী হওয়া উচিত ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর করা দরকার ছিল যে, তিনি দ্বীনের একাজে অন্যকে নিযুক্ত করেছেন। ফলে, তাদের একাজে পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। কিন্তু শয়তান এরপরও তাদেরকে ছাড়ে না এবং বলে— তোমাদের দুঃখ এজন্য নয় যে, মানুষ তোমাদেরকে ছেড়ে অন্যের ওয়ায শুনছে; বরং দুঃখ এজন্যে যে, তোমরা সওয়াব লাভে বঞ্চিত হয়েছ। অর্থাৎ, মানুষ তোমাদের ওয়ায দ্বারা সৎপথে আসলে তোমাদের সওয়াব হত। এই সওয়াব না পাওয়ার জন্যে দুঃখ করা খারাপ নয়— ভাল। কিন্তু তারা জানে না যে, সত্যের আনুগত্য এবং উত্তম ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দিলে আখেরাতে সওয়াব বেশী হয় একা নিজে করার তুলনায়। যদি এরূপ দুঃখ করা প্রশংসনীয় হত, তবে হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ)-ও দুঃখ করতেন। কেননা, জনগণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব পালন করা অপরিসীম সওয়াবের কাজ। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতপ্রাপ্তিতে আনন্দিতই হয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জানি না, আজকাল আলেমগণ এ জাতীয় বিষয়সমূহে আনন্দিত হয় না কেন? যারা নফসের চক্রান্ত সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল, তারাই শয়তানের ধোকা সম্পর্কে জানে ও বুঝে।

সারকথা, এখলাসের স্বরূপ জানা ও তদনুযায়ী আমল করা একটি অথৈ সমুদ্র। এতে উত্তীর্ণ হওয়ার মত লোক খুবই বিরল। কোরআনে আছে–

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

অর্থাৎ, (শয়তান বলেছিল,) তোমার এখলাস বিশিষ্ট বান্দাগণ ছাড়া আমি সবাইকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ব।

বলা বাহুল্য, এখানে উপরোক্ত বিরল লোকদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব বান্দার উচিত এসব সূক্ষ্ম বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করার কাজে সদা তৎপর থাকা। অন্যথায় সে অজান্তেই শয়তানের দলে ভিড়ে যাবে।

এখলাস সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি ঃ হযরত সূমী (রহঃ) বলেন ঃ এখলাস হল এখলাসের প্রতি লক্ষ্য না থাকা। কেননা, যে এখলাসের প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লক্ষ্য রাখবে, তার এখলাসের জন্যে এখলাসের প্রয়োজন থাকবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমলকে আত্মম্ভরিতা থেকে পরিষ্কার রাখা উচিত। এখলাসের প্রতি দৃষ্টি রাখা আত্মম্ভরিতার নামান্তর, যা আমলের অন্যতম আপদ। খুলুস বা নিষ্ঠা তাকেই বলা হয়, যা যাবতীয় আপদ থেকে মুক্ত হবে। যে এখলাসে আত্মম্ভরিতা থাকে, তাতে একটি আপদ থেকে যায়। হযরত সহল (রহঃ) বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে নিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য পরিব্যাপ্ত। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের উক্তিও এ অর্থই জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিয়ত সাচ্চা করা। হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হল ঃ নফসের জন্যে সর্বাধিক কঠিন কাজ কি? তিনি বললেন ঃ এখলাস। কেননা, এতে নফসের কোন অংশ থাকে না।

রুয়ায়ম (রহঃ) বলেন ঃ আমলের এখলাস হচ্ছে উভয় জাহানে এখলাসের জন্য কোন বিনিময় কামনা না করা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, জৈবিক বাসনা পার্থিব হোক অথবা পারলৌকিক সবই আপদ। আসলে আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিত নয়। এতে সিদ্দীকগণের এখলাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতের আশায় অথবা দোযখের ভয়ে আমল করে, সে পার্থিব ভোগ-বিলাসের দিক দিয়ে মুখলেস বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বাসনার অন্বেষণকারী। সত্যপন্থীদের কাছে সত্যিকার চাওয়ার বিষয় হচ্ছে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।

আবু ওছমান বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার দিকে সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রেখে সৃষ্টির প্রতি তাকানো বিস্মৃত হওয়া। এতে কেবল রিয়ার আপদ থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ মলিনতা থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার নাম এখলাস। এখলাস সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সন্তোষজনক উক্তি তাই, যা রসূলে আকরাম (সাঃ) করেছেন। তাঁকে এখলাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

ان تقول ربی الله ثم تستقم كما امرت –

অর্থাৎ, একথা বলা যে, আমার পরওয়ারদেগার আল্লাহ। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী সরল পথে অবস্থান করা।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের নফস ও খেয়ালখুশীর কিংবা পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কারও এবাদত না করা। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী সোজা ও সরল থাকা। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া। বাস্তব এখলাস তাই।

যে সব বিষয় এখলাসকে কলুষিত করে ঃ যে সব বিষয় এখলাসকে কলুষিত ও দূষিত করে, সেগুলোর মধ্যে কতক সুস্পষ্ট ও কতক অস্পষ্ট। সুস্পষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রিয়া। উদাহরণতঃ যখন কেউ নামাযে এখলাস করে, তখন যদি কিছু লোক তাকে দেখে অথবা কাছে আসে, তখন শয়তান তাকে বলে নামায উত্তমরূপে পড় যাতে দর্শকরা তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং সাধু মনে করে। নামাযী একথা মেনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিনয় প্রকাশ করে এবং রুকু-সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে। প্রথম স্তরের এই রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের নামাযীদের কাছেও গোপন থাকে না। রিয়ার দ্বিতীয় স্তর এই যে, নামাযী এই আপদটি আঁচ করে নেয় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করে। অর্থাৎ, শয়তানের আনুগত্য করে না এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; বরং পূর্বে যেভাবে পড়ত, সেভাবেই পড়তে থাকে। তখন শয়তান তার কাছে কল্যাণের বাহানায় আসে এবং বলে ঃ তুমি তো অনুসৃত, পুরোহিত ও নামযাদা ব্যক্তি। তুমি যা করবে, তাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে। ফলে, তাদের আমলের সওয়াব তুমিও পাবে যদি তুমি ভালরূপে আমল কর। পক্ষান্তরে তুমি খারাপ আমল করলে অন্যদের খারাপ আমলের কুফল তোমার উপরও বর্তাবে। যারা প্রথম স্তরের ধোকার জালে আবদ্ধ হয় না, তারা কখনও এই দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও রিয়া এবং এর কারণেও এখলাস বরবাদ হয়ে যায়। কেননা, যদি বাস্তবিকই নামাযে খুশু তার কাছে উত্তম হয় যে, অন্যের কারণে তা ত্যাগ করে না, তবে একাকী নামায পড়ার সময় নিজেকে খুশুতে অভ্যস্ত করে না কেন? সত্যিকার সাধু সে ব্যক্তি, যার অন্তর উজ্জ্বল এবং তার ঔজ্জ্বল্য অন্যের উপর প্রতিফলিত হয়। একথা ঠিক যে, কেউ তার অনুসরণ করলে অনুসরণকারী সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু এই অনুসৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে বিষয় তোমার মধ্যে ছিল না, তা প্রকাশ করলে কেন?

তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম। তা এই যে, বান্দা নিজের নফসের পরীক্ষা নেবে এবং শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জেনে নেবে যে, নির্জনে এক অবস্থা হওয়া এবং জনসমক্ষে অন্য অবস্থা হওয়া নিছক রিয়া। এখানে এখলাস হল, নামায একাকীত্বেও তেমনি হওয়া, যেমন জনসমাবেশে হয়। কেউ যদি মানুষের দেখা অবস্থায় অভ্যাস অনুযায়ী নামাযে অধিক খুশু করে এবং একদিকে দৃষ্টি রেখে একাকীত্বেও নিজ নফসের প্রতি মনোনিবেশ করে অধিক খুশু করে, তবে তাও সূক্ষ্ম ও গোপন রিয়া। কেননা, সে নির্জনে এই নিয়তে উত্তমরূপে নামায পড়ে যে, জনসমাবেশেও যেন উত্তমরূপে নামায আদায় হয়। অতএব, নির্জনে ও জনসমাবেশে উভয় জায়গায় তার লক্ষ্য রইল মানুষের প্রতি। এখানে এখলাস এভাবে হত যে, চতুষ্পদ জন্তুর দেখা ও মানুষের দেখা উভয়টি নামাযীর দৃষ্টিতে সমান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নামাযী ধারণা করে নির্জনে ও জনসমাবেশে একই রূপে নামায পড়লে সে রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তা ঠিক নয়। রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হল মানুষের প্রতি দৃষ্টি তেমনি থাকা, যেমন জড় পদার্থের প্রতি দৃষ্টি হয়— নির্জনে হোক অথবা জনসমাবেশে।

চতুর্থ স্তর যা চূড়ান্ত পর্যায়ের গোপন তা হল এই যে, এক ব্যক্তি শয়তানের ধোকা জেনে ফেলেছে। ফলে, তার নামায পড়া মানুষে দেখলেও শয়তান একথা বলতে পারে না যে, তুমি দর্শকদের খাতিরে খুশু কর। ফলে, শয়তান তার কাছে এসে বলে ঃ আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর, যার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। আল্লাহ তোমার অন্তরকে তাঁর দিক থেকে গাফেল দেখুক— এ বিষয়ে লজ্জাবোধ কর। নামাযীর মনে এ ধারণা আসার সাথে সাথে তার অন্তর হাযির হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুশু করতে শুরু করে। নামাযী মনে করে, এটাই এখলাস। অথচ এটা হুবহু ধোকা ও প্রতারণা। কেননা, যদি আল্লাহর প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে এই খুশু হত, তবে একাকীত্বেও তাই হত। কেবল অন্য কারও আগমনের কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হত না। এই আপদ থেকে বাঁচার আলামত এই যে, উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা একাকীত্বেও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেমন জনসমাবেশে থাকে। মোটকথা, যে পর্যন্ত মানুষের দেখা ও গবাদি পশুর দেখার মধ্যে নিজের আমলে পার্থক্য হতে থাকবে, সে পর্যন্ত নামাযী এখলাস বহির্ভূত এবং গোপন শিরকে লিপ্ত বলে গণ্য হবে। এটাই সেই শিরক, যা মানুষের অন্তরে কালো পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক গোপন, যে পিঁপড়া অন্ধকার রাত্রে কঠিন পাথরের উপর দিয়ে চলে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মিশ্র আমলের সওয়াব ঃ আমল যখন আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে খালেস হয় না এবং তাতে রিয়া ইত্যাদি আপদের মিশ্রণ থাকে, তখন সে আমল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এরূপ মিশ্র আমল দ্বারা সওয়াব পাওয়া যাবে, না শাস্তি, না কোন কিছুই হবে না?— এ সম্পর্কে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, যে আমলের উদ্দেশ্য কেবল রিয়া হবে, তা তো আযাব ও গযবের কারণ হবেই এবং যা বিশেষভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, তা সওয়াবের কারণ হবে। মতভেদ কেবল মিশ্র আমল সম্পর্কে। বাহ্যিক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ রেওয়ায়েতও রয়েছে। আমাদের মতে উদ্দেশ্যের শক্তি ও প্রাবল্যের নিরিখে বিচার হওয়া উচিত। যদি দ্বীনী উদ্দেশ্য ও জৈবিক উদ্দেশ্য সমান সমান হয়, তবে এরূপ আমল সওয়াব ও আযাব এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিরই কারণ হবে না। আর রিয়ার উদ্দেশ্য প্রবল হলে তা আযাবেরই কারণ হবে। তবে এই আযাব শুধু রিয়ার উদ্দেশ্যে করা আমলের আযাব অপেক্ষা হালকা হবে। আর যদি নৈকট্যের নিয়ত প্রবল হয়, তবে যে পরিমাণ প্রবল হবে, সে পরিমাণ সওয়াব হবে। এর কারণ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অর্থাৎ, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

আরও এরশাদ হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا –

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। পুণ্য কাজ হলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন।

এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, সৎকর্মের ইচ্ছা পণ্ড হবে না। যদি সৎ কর্মের ইচ্ছা রিয়ার ইচ্ছা অপেক্ষা প্রবল হয়, তবে রিয়ার ইচ্ছার সমান তা পণ্ড হবে এবং বাড়তিটুকু অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি সৎ কর্মের ইচ্ছা কম এবং রিয়ার ইচ্ছা বেশী হয়, তবে শুধু রিয়ার ইচ্ছার কারণে যতটুকু আযাব হত, তা থেকে সৎকর্মের ইচ্ছা পরিমাণ আযাব কমে যাবে। সুতরাং যদি কেউ এমন সৎকর্ম করে, যা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক ফুট নৈকট্য অর্জিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয় এবং তাঁর সাথে এমন অসৎকর্ম করে, যা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক ফুট দূরত্ব অর্জিত হয়, তবে এই ব্যক্তি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তাতেই থেকে যাবে। না সওয়াব হবে, না আযাব। হাদীস শরীফে আছে—

اتبع السيئة الحسنة تمحا -

অর্থাৎ, অসৎ কর্মের পেছনে সৎকর্ম কর। এই সৎকর্ম অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেবে।

সুতরাং নির্ভেজাল রিয়াকে নির্ভেজাল এখলাস মিটিয়ে দেয়। যদি কারও মধ্যে উভয়টি একত্রিত হয়, তবে একটি অপরটির বিপরীত ক্রিয়া করবে। এ বিষয়ে উম্মতের এজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জে রওয়ানা হয় এবং তার সাথে পণ্য সামগ্রীও থাকে, তার হজ্জ জায়েয হবে এবং সে হজ্জের সওয়াব পাবে।

অবশ্য আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় রিয়ার সংমিশ্রণ সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়। হজ্জের সফরে ব্যবসায়ের ইচ্ছা করাও অনুরূপ একটি সংমিশ্রণ। তাউস এবং আরও কয়েকজন তাবেঈ রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করে এবং তাতে পছন্দ করে যে, মানুষ তার প্রশংসা করুক এবং সওয়াবও হোক। রসূলে করীম (সাঃ) এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং নিজের পালনকর্তার এবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

হযরত মুয়ায (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিয়াকে নিম্নতম শিরক বলেছেন। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আমলে শিরক করবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার প্রতিদান তার কাছ থেকে গ্রহণ কর, যার জন্যে তুমি আমল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করেছিলে। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি আত্মমর্যাদার জন্যে যুদ্ধ করে, অন্যজন বীরত্বের খাতিরে যুদ্ধে নামে এবং তৃতীয় জন আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা জানার জন্যে লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

আমরা বলি, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কেননা, এগুলোতে সে ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যে দুনিয়ার জন্যেই আমল করে এবং দুনিয়ার অন্বেষণই তার নিয়তে প্রবল থাকে। দ্বীনী আমলের বিনিময়ে দুনিয়া তলব করা হারাম। কেননা, এতে এবাদত স্বস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মিশ্র আমল বলতে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আমল, যাতে উভয় নিয়ত সমান সমান থাকে। এরূপ আমলে সওয়াব ও আযাব কিছুই হয় না। সুতরাং এরূপ আমল দ্বারা সওয়াবের আশা করা উচিত নয়।

মোটকথা, এখলাসে আপদ অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপদের কারণে আমল ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের উপরোক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য আসলে এখলাসকে ত্যাগ না করা। যদি আমলই না করা হয়, তবে আমল ও এখলাস উভয়টি বর্জিত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, জনৈক ফকীর হযরত আবু সাঈদ হেরাযের খেদমত করত এবং তাকে কাজকর্মে সাহায্য করত। একদিন তিনি ফকীরকে কাজকর্মে এখলাস অবলম্বন করতে বললেন। ফকীর প্রত্যেক কাজের সময় অন্তরের অবস্থা দেখতে লাগল। এখলাস অর্জনে অক্ষম হয়ে অবশেষে সে কাজকর্মই বন্ধ করে দিল। এতে হযরত আবু সাঈদ কষ্টে পড়ে গেলেন। কারণ, তার কাজকর্মে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। তিনি ফকীরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এখন কাজ কর না কেন? ফকীর বলল ঃ আপনার এরশাদ অনুযায়ী এখলাস অবলম্বনে ব্যর্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। এখলাস আমলকে ছিন্ন করে না। আমল করে যাও এবং এখলাস অর্জনের চেষ্টা করতে থাক। আমি তোমাকে আমল ছেড়ে দিতে বলিনি। বরং আমলকে খাঁটি করতে বলেছি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিদ্‌কের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, "তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে।"

সিদ্‌কের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'সিদ্দীক' শব্দটি এ থেকেই উদগত! আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রশংসায় তাদেরকে সিদ্দীক বলেছেন। বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ, কিতাবে ইবরাহীমের আলোচনা করুন। সে ছিল সিদ্দীক তথা সাচ্চা নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ, কিতাবে ইদ্‌রীসের আলোচনা করুন। সে ছিল সিদ্দীক ও নবী। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا - وان الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا -

অর্থাৎ, সত্যবাদিতা পূণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য বলতে থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক হিসাবে লিখিত হয়। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়। পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর উপকার সে-ই পায়, যার মাঝে এগুলো থাকে— সত্যবাদিতা, লজ্জা, সচ্চরিত্রতা ও শোকর। বিশর ইবনে হারেছ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে নিষ্ঠা সহকারে আচরণ করে, সে মানুষকে ঘৃণা করে। এক ব্যক্তি জনৈক দার্শনিককে বলল ঃ আমি কোন সাচ্চা মানুষ দেখিনি। দার্শনিক বলল ঃ যদি তুমি সাচ্চা হতে, তবে সাচ্চাদেরকে চিনতে। জনৈক ব্যক্তি হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মজলিসে চিৎকার দিয়ে উঠল। অতঃপর সে দজলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত শিবলী বললেন ঃ যদি সে সাচ্চা হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে দেবেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-কে বাঁচিয়েছিলেন। আর যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তাকে নিমজ্জিত করে দেবেন, যেমন ফেরাউনকে নিমজ্জিত করেছিলেন।

আলেম ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনটি বিষয় সঠিক হয়ে গেলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যাবে— (১) বেদআত ও খেয়ালখুশীমুক্ত ইসলাম, (২) আমলসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিষ্ঠা এবং (৩) হালাল খাদ্য। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ আমি তাওরাতের প্রান্তটীকায় বাইশটি বাক্য দেখেছি যা বনী ইসরাঈলের সাধু ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে পাঠ করত। বাক্যগুলো এই ঃ কোন ভাণ্ডার জ্ঞানের চেয়ে অধিক উপকারী নয়। কোন ধন সহনশীলতা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক নয়। কোন স্বভাব ক্রোধের চেয়ে অধিক নীচ নয়। কোন সঙ্গী আমলের চেয়ে বেশী শোভাদায়ক নয়। কোন সহচর মূর্খতার চেয়ে অধিক দোষী নয়। কোন গৌরব খোদাভীতি অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। কোন বীরত্ব বাসনা বর্জনের চেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ নয়। কোন আমল চিন্তা-ভাবনা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নয়। কোন পুণ্য কাজ সবর অপেক্ষা উচ্চ নয়। কোন দোষ অহংকার অপেক্ষা অধিক অপমানকর নয়। কোন ঔষধ নম্রতার চেয়ে অধিক নরম নয়। কোন ব্যাধি বোকামি অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক নয়। কোন রসূল সত্য বিমুখ নয়। সত্যবাদিতার চেয়ে অধিক কোন হিতাকাংখী নেই। কোন ফকীর-লোভের চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত নয়। কোন প্রাচুর্য সম্পদ আগলে রাখার চেয়ে অধিক হতভাগা নয়। কোন জীবন সুস্থতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয়। সাধুতার চেয়ে অধিক সহনীয় কোন পাপ নেই। খুশুর চেয়ে উত্তম কোন এবাদত নেই। অল্পে তুষ্টির চেয়ে ভাল কোন বৈরাগ্য নেই। চুপ থাকার চেয়ে অধিক কোন হেফাযতকারী নেই। কোন অদৃশ্য বস্তু মৃত্যুর চেয়ে অধিক নিকটবর্তী নয়।

মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ মরুযী বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে নিষ্ঠার সাথে অন্বেষণ করবে, তখন তিনি তোমার হাতে একটি আয়না

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিবেন, যার মধ্যে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখতে পাবে।

সিদ্কের স্বরূপ ঃ "সিদ্ক" তথা নিষ্ঠা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) কথায় নিষ্ঠা, (২) নিয়তে নিষ্ঠা (৩) সংকল্পে নিষ্ঠা (৪) সংকল্প বাস্তবায়নে নিষ্ঠা (৫) আমলে নিষ্ঠা এবং (৬) ধর্মীয় মকামসমূহে নিষ্ঠা। যে ব্যক্তি এই ছয়টি বিষয়েই নিষ্ঠার গুণে গুণান্বিত হয়, তাকে বলা হয় সিদ্দীক। কারণ, সে সিদকের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। এখন এই ছয়টি অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) কথায় সত্যবাদিতা বা নিষ্ঠা সেই সমস্ত উক্তি ও খবরে হয়ে থাকে, যেগুলো অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওয়াদা পূর্ণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য নিজের কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সত্য ছাড়া কোনরূপ কথাবার্তা না বলা। সিদকের সকল প্রকারের মধ্যে এ প্রকারটিই সর্বাধিক স্পষ্ট। যে ব্যক্তি নিজের মুখের হেফাযত করে এবং বাস্তব অবস্থার খেলাফ কিছু না বলে, তাকে বলা হয় সাদেক তথা সত্যবাদী। কিন্তু এই সিদকের পূর্ণতার দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম, রূপক ভাষা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, বলা হয়, মিথ্যা এড়ানোর জন্যে রূপক ভাষার আশ্রয় নেয়া হয়। আসলে এটাও মিথ্যার স্থলবর্তী। মাঝে মাঝে সময়ের উপযোগিতার কারণে এর আশ্রয় নিতে হয়। যেমন, বালক-বালিকা ও নারীদের শাসন করার ক্ষেত্রে, যালেমদের কবল থেকে আত্মরক্ষার বেলায় এবং শত্রুর মোকাবিলা করার সময়। এসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব রূপক ভাষা ব্যবহার করা যায়, যাতে পরিষ্কার মিথ্যা না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতি ছিল তিনি যখন সফরে রওয়ানা হতেন, তখন অন্যদের কাছে তা গোপন রাখতেন, যাতে শত্রুরা খবর না পায়। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا اونمى خيرا -

অর্থাৎ, সে মিথ্যাবাদী নয়, যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে ভাল কথা বলে অথবা ভাল কথা পৌঁছায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জায়গায় মিথ্যা ভাষণকে সময়োপযোগী বলেছেন। এক— যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। দুই— যার দুই স্ত্রী রয়েছে এবং তিন— যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব জায়গায় সিদকের অর্থ নিয়তের সত্যবাদিতা। ফলে সৎ নিয়ত ও সদিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়, ভাষার প্রতি নয়। সুতরাং যার ইচ্ছা সৎ হবে এবং শুধু কল্যাণই কাম্য হবে, সে সত্যবাদী ও সিদ্দীক কথিত হবে। এতদসত্ত্বেও এসব জায়গায় ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণনা করা উত্তম। উদাহরণতঃ বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গকে যখন কোন যালেম ব্যক্তি তালাশ করত এবং তিনি ঘরেই থাকতেন, তখন নিজের স্ত্রীকে বলতেন— অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে একটি বৃত্ত আঁক এবং তার ভিতরে আঙ্গুল রেখে বলে দাও তিনি এখানে নেই। এ বাহানায় তিনি মিথ্যা বলা থেকে এবং যালেম থেকে আত্মরক্ষা করতেন। পত্নীর কথা সত্য হত; কিন্তু যালেম বুঝত যে, তিনি ঘরে নেই।

পূর্ণতার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ব্যবহৃত ভাষার অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা। নতুবা মুখে সত্য কথা বললে এবং নিজের অবস্থা সে অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে মিথ্যা ভাষণ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ কেউ আল্লাহর কাছে মোনাজাত ও দোয়ায় মুখে বলে—

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ -

অর্থাৎ, আমি আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার প্রতি নিবিষ্ট করলাম, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু তার অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ এবং দুনিয়ার কামনা-বাসনায় মশগুল। এমতাবস্থায় সে হবে মিথ্যাবাদী। অথবা কেউ মুখে বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ, আমি শুধুমাত্র তোমারই বন্দেগী করি, অথচ তার মধ্যে বন্দেগীর স্বরূপ অনুপস্থিত থাকে, তবে তার কথা সত্য হবে না।

(২) নিয়তে সত্যবাদিতা হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, সাধকের যাবতীয় কাজকর্মের প্রেরণাদাতা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছু না হওয়া। অতএব, যদি কোন জৈবিক বাসনা এর সাথে মিলিত হয়ে যায়, তবে নিয়তের সত্যতা বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সাধককে মিথ্যাবাদী বলা হবে। এখলাসের ফযীলত সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক হাদীসে তিন ব্যক্তির প্রশ্ন ও উত্তর বার্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আলেমকে প্রশ্ন করা হবে তুমি ইলম শিখে কি আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আমি অমুক কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী; বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলুক। এখানে লক্ষণীয় যে, তাকে একথা বলা হয়নি যে, তুমি আমল করনি; বরং কেবল নিয়তের ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এমনিভাবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুনাফিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে—

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অথচ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছিল اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। তাদের এ কথাটি সত্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কথাটিকে মিথ্যা বলেননি; বরং একথা বলার পেছনে তাদের অন্তরে যে নিয়ত লুক্কায়িত ছিল, তাকে মিথ্যা বলেছেন।

(৩) সংকল্পে সত্যবাদিতার অর্থ এই যে, মানুষ কখনও আমল করার পূর্বে মনে মনে সংকল্প করে বলে, যদি আলাহ তা'আলা আমাকে অর্থ-সম্পদ দান করেন, তবে সমস্তই সদকা করে দেব অথবা অর্ধেক সদকা করব। এই সংকল্প কখনও মানুষের মনে পাকাপোক্ত ও সত্যিকারভাবে হয় এবং কখনও এতে এক প্রকার সংশয় ও দুর্বলতা থাকে। এই সংশয় ও দুর্বলতা সিদ্কের পরিপন্থী। অতএব, এখানে সিদ্কের অর্থ যেন শক্তিশালী হওয়া। এই অর্থ অনুযায়ী সাদেক ও সিদ্দীক এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যে তার সদকা করার সংকল্পকে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী পায়।

(৪) সংকল্প বাস্তবায়নেও সিদ্কের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, মানুষ প্রায়ই সংকল্প করে ফেলে। কারণ, এতে কোন কিছু ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু যখন বাস্তবায়নের সময় আসে, তখন কামনা-বাসনা জোরদার হবার কারণে সংকল্প শিথিল হয়ে যায়। এটা সংকল্প বাস্তবায়নে সিদকের পরিপন্থী। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের সিদ্ক সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে।

এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদর যুদ্ধে ওযরবশত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শরীক ছিলেন না। এটা ছিল তার জন্যে অসহনীয়। তিনি বললেন ঃ এটা ছিল শাহাদত লাভের প্রথম সুযোগ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যোগদান করেছেন, আর আমি কি না অনুপস্থিত রইলাম! আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে শাহাদত লাভের এরূপ সুযোগ আবার এলে আল্লাহ তা'আলা দেখবেন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি কি করি! বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই আনাস ইবনে নযর পরবর্তী বছর উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সা'দ ইবনে মুয়ায তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আমর, কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের চমৎকার হাওয়া আমি উহুদের দিক থেকে অনুভব করছি। এরপর তিনি বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। তাঁর দেহে আশিটির উপরে তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাত ছিল। তাঁর ভগ্নী বলেন ঃ যখমের কারণে আমি আমার ভাইকে চিনতে পারিনি। এরপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখে চিনতে পেরেছি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ চার ব্যক্তি শহীদ— (১) যে ঈমানদার শত্রুকে দেখে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন মানুষ এই ব্যক্তির প্রতি মাথা তুলে তাকাবে। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা তুললেন যাতে তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। (২) যে ঈমানদার শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর একটি ঘাতক তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং সে শহীদ হয়ে যায়। (৩) যে ঈমানদার কিছু ভাল ও কিছু মন্দ আমল করে। অতঃপর শত্রুর সাথে ভিড়ে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। (৪) যে ঈমানদার নিজের উপর যুলুম করে। অতঃপর শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, দুটি লোক মানুষের সামনে এসে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ধন-সম্পদ দিলে আমরা সদকা করব। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধন-সম্পদ দিলেন। কিন্তু তারা কৃপণতা অবলম্বন করল। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّآ اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ
يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ -

অর্থাৎ, তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করল, যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ (ধন-সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা সদকা করব এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ যখন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাদেরকে অনুগ্রহ করে দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা অবলম্বন করল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। অতঃপর আল্লাহ এর চিহ্ন হিসাবে নিফাক স্থাপন করে দিলেন, তাদের অন্তর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ করেছিল।

এ আয়াতে সংকল্পকে অঙ্গীকার বলা হয়েছে এবং এর খেলাফ করাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সিদ্‌ক তৃতীয় প্রকার সিদ্‌কের তুলনায় কঠিনতর। কেননা, মানুষ কখনও সংকল্প করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবায়নের সময় এলে নানাবিধ বাসনার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হয়ে পিছু হটে যায়।

(৫) আমলে সত্যবাদিতা হচ্ছে এমন চেষ্টা করা যাতে বাহ্যিক আমলে কোনরূপ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ, যে গুণ বাস্তবে তার মধ্যে নেই, বাহ্যিক আমল দ্বারা তা যেন আছে বলে প্রকাশ না পায়। কিন্তু এ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পাওয়া যেন আমল বর্জন করার মাধ্যমে না হয়। এই সিদ্‌কের উদ্দেশ্য রিয়া বর্জন নয়। কেননা, অধিকাংশ নামাযী নামাযে খুশুখুযুর আকার ধারণ করে থাকে। কিন্তু রিয়া তথা কাউকে দেখানো তাদের উদ্দেশ্য থাকে না; কিন্তু তাদের অন্তর নামায থেকে গাফেল থাকে এবং বাজারে ঘুরাফেরা করে। এরূপ ব্যক্তি আমলে মিথ্যাবাদী এবং সে সিদক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে— রিয়া সম্পর্কে নয়। মোটকথা, বাহ্যিক অবস্থা অন্তরের অবস্থার পরিপন্থী হওয়া ইচ্ছাকৃত হলে তা রিয়া। এর ফলে এখলাস বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যদি অনিচ্ছায় হয়, তবে সেটা মিথ্যা এবং এতে সিদক বিনষ্ট হয়। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরূপ দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِىْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِىْ صَالِحَةً -

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা উত্তম করে দাও এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাকে সৎ করে দাও।

যায়দ ইবনে হারেছ বলেন ঃ যখন মানুষের বাইরের অবস্থা ও ভেতরের অবস্থা সমান হয়ে যায়, তখন সে পুণ্যবান হয়ে যায়। যদি ভেতরের অবস্থা বাইরের তুলনায় ভাল হয়, তবে তাকে বলা হয় "ফয্‌ল"। আর বাইরের অবস্থা ভেতরের তুলনায় উত্তম হলে তার নাম হয় "জুর" তথা অন্যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আতিয়্যা ইবনে আবদুল গাফের বলেন ঃ ঈমানদারের ভেতরের অবস্থা বাইরের অবস্থার চেয়ে ভাল হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করে বলেন ঃ সে হচ্ছে আমার সত্যিকার বান্দা। অতএব বুঝা গেল, ভেতর ও বাইর সমান হওয়া এক প্রকার সিদক।

(৬) ধর্মীয় মকামসমূহে সত্যবাদিতা হচ্ছে খওফ, রেযা, যুহদ, তাওয়াক্কুল,মহব্বত ইত্যাদি তরীকতের বিষয়সমূহে যথার্থ হওয়া। কেননা, এসব বিষয়ের এক অংশ হচ্ছে সূচনা; এরপর আসে এগুলোর চূড়ান্ত সীমা তথা হাকীকত (স্বরূপ)। যে ব্যক্তি এগুলোর হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে-ই যথার্থ মুহাক্কিক। কোন গুণ কারো মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলে সে ব্যক্তিকে সে গুণে যথার্থ বলা হয়। যেমন, আমরা বলি অমুক ব্যক্তি যথার্থ বীর, অমুক ব্যক্তি যথার্থ খোদাভীরু। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

অর্থাৎ, ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর সন্দিহান হয় না এবং নিজের ধন ও প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে। তারাই যথার্থ নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, কিন্তু সৎকর্ম হল আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা, তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের এবং ক্রীতদাসের জন্যে সম্পদ ব্যয় করা। বস্তুত যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে, যারা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, বিপদাপদ ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, তারাই হল সত্যবাদী।

এক্ষণে আমরা খওফ তথা ভয়ের ক্ষেত্রে যথার্থতার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। যে বান্দা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে। কিন্তু এ ভয় এমন যে, একে কেবল শাব্দিক দিক দিয়েই ভয় বলা যায়। সত্যিকার ভয়ের যে স্তর তা সেই পর্যন্ত পৌঁছল না। দেখ, মানুষ যখন কোন বাদশাহকে ভয় করে অথবা পথিমধ্যে ডাকাতকে ভয় করে, তখন তার শরীরের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে, জীবন তিক্ত হয়ে যায় এবং আহার-নিদ্রা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামের আগুনকে ভয় করার পর মানুষ যখন কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন এসব কিছুই হয় না। তার দেহের রঙ স্বাভাবিকই থাকে এবং হাত-পা কাঁপে না। এর কারণ কি? রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لم ارمثل النار نام ها ربها ولامثل الجنة نام طالبها -

অর্থাৎ, দোযখ থেকে পলায়নকারী যেভাবে ঘুমায়, তেমন ঘুমাতে আমি কাউকে দেখি না এবং জান্নাত অন্বেষণকারীর মতও আমি কাউকে ঘুমুতে দেখি না।

সুতরাং খওফের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কঠিন। এসব মকামের স্বরূপ ও সিদকের কোন সীমা নেই। প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা অনুযায়ী এগুলোর অংশ প্রাপ্ত হয়। যে বেশী অংশ পায়, তাকেই সত্যিকার বান্দা বলা হয়। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে বললেন— আমি আপনাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি আমাকে আসল আকৃতিতে দেখলে ঠিক থাকতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, আমি দেখতেই চাই। জিবরাঈল ওয়াদা করলেন ঃ আচ্ছা, জোছনা রাতে 'বাকী' নামক স্থানে দেখিয়ে দেব।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাঁদনী রাতে সেখানে পৌঁছলে জিবরাঈলকে দেখলেন আকাশের সমগ্র দিগন্ত আচ্ছাদিত করে বিরাজমান। দেখার সাথে সাথেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন জিবরাঈলকে পূর্বের আকৃতিতে দেখে বললেন ঃ আমার মনে হয় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝে এ ধরনের কেউ নেই। জিবরাঈল আরয করলেন ঃ আপনি ইসরাফীলকে দেখলে ভালই হত। আরশে মোয়াল্লা তার কাঁধে এবং পা পৃথিবীর সর্বনিম্নে নামানো। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর মাহাত্ম্যের সামনে যখন তিনি সংকুচিত হন, তখন ক্ষুদ্র পাখীর মত হয়ে যান। এখানে দেখা উচিত যে, হযরত ইসরাফীল খওফের কত বিরাট অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। সকল ফেরেশতা এরূপ নন। কেননা, তারা খওফের ক্ষেত্রে সমান নন। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— আমি মে'রাজ রজনীতে উর্ধ্বাকাশে হযরত জিবরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে উটের পিঠে পুরানো চাদরের মত পড়ে থাকতে দেখেছি। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও খওফ ছিল। কিন্তু তাদের খওফ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খওফের সমান ছিল না।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল, খওফ, মহব্বত ইত্যাদি স্তরগুলোতে যারা সাদেক তথা নিষ্ঠাবান, তাদের সংখ্যা খুবই কম। মাঝে মাঝে বান্দা কোন কোন স্তরে সাদেক আর কোন কোন স্তরে সাদেক নয়। যে সব মকামে সাদেক, তাতে যথার্থই সিদ্দীক। আবু বকর ওররাফ বলেন ঃ সিদক তিন প্রকার— তাওহীদে সিদক, এবাদতে সিদক এবং মারেফতে সিদক। তাওহীদে সিদক সাধারণ মুমিনদেরও অর্জিত হয়। যেমন, আল্লাহ বলেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, তারা সাদেক।

এবাদতে সিদক আলেম ও পরহেযগারদের অর্জিত হয়। আর মারেফতে সিদক ওলীগণ অর্জন করেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অষ্টম অধ্যায়

মুরাকাবা ও মুহাসাবা

(ধ্যানমগ্নতা ও আত্মবিশ্লেষণ)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের মানদণ্ড স্থাপন করব। অতঃপর কারও প্রতি সামান্যও যুলুম করা হবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও আমল থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব করার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا -

অর্থাৎ, আমলনামা রাখা হবে। তখন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন, তারা আমলনামায় লিখিত বিষয়বস্তুর কারণে ভীত হচ্ছে। তারা বলবে ঃ হায় আমাদের দুর্ভোগ, এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন পাপই সন্নিবেশিত না করে ছাড়ে না। তারা যা কিছু করেছিল সমস্তই উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম বলে দিবেন। আল্লাহ তা গণনা করে রেখেছেন এবং তারা ভুলে গেছে। প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর দৃষ্টির সামনে উপস্থিত।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

অর্থাৎ, সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু-পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, অতঃপর পুরোপুরি দেয়া হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যা সে উপার্জন করেছে। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا وَّيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ -

অর্থাৎ, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভালমন্দ কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। সে আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তার মধ্যে ও তার কৃতকর্মের মধ্যে দূরবর্তী ব্যবধান থাকত। আল্লাহ নিজে থেকে তোমাদের সাবধান করেন।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ -

অর্থাৎ, জেনে নাও, আল্লাহ তোমাদের অন্তরস্থিত বিষয় জানেন, সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু থেকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ জেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবশ্যই নেবেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তারা এ কথাও উপলব্ধি করেছেন যে, এই বিপদ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা, নিজের অবস্থার পুরোপুরি দেখাশুনা করা এবং কিয়ামতে হিসাব নেয়ার পূর্বে নিজেই নিজের নফসের হিসাব নেয়া। কেননা, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, কিয়ামতে তার হিসাব হাল্‌কা হবে। সে জওয়াব দিতে সক্ষম হবে এবং তার পরিণাম শুভ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই নিজের নফসের হিসাব নেবে না, সে সর্বদা পরিতাপ করবে এবং তার কুকর্ম তাকে লাঞ্ছনা ও গযবে নিপতিত করবে। আল্লাহ তা'আলা সবর ও দেখাশুনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবর কর, সবরে থাক দৃঢ় এবং দেখাশুনা করতে থাক।

এসব কারণে বুযুর্গগণ মুহাসাবা তথা আত্মবিশ্লেষণের পথ বেছে নিয়েছেন। নিম্নে এই মুহাসাবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

নফসের প্রতি শর্ত আরোপ করা ঃ যারা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং ব্যবসার কাজে শরীক হয়, তাদের সবার উদ্দেশ্য থাকে হিসাবের পর কিছু মুনাফা অর্জন করা। ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার শরীকের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তার হাতে অর্থ অর্পণ করে। ব্যবসায়ের পর সে তার শরীকের সাথে হিসাব করে এবং মুনাফা গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আখেরাতের পথে ব্যবসায়ী হচ্ছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং তার মুনাফা হচ্ছে নফসকে পবিত্র ও শুদ্ধ করা। আখেরাতের সাফল্য এর উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

অর্থাৎ, যে নফসকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে, সে সফল হয়। আর যে নফসকে ধূলি ধূসরিত করে, সে ব্যর্থ হয়।

আখেরাতের ব্যবসায়ে জ্ঞান-বুদ্ধি নফসের সাহায্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ, তাকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যা দ্বারা সে পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। দুনিয়ার কারবারে ব্যবসায়ী শরীকের প্রতি প্রথমে কিছু শর্ত আরোপ করে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতঃপর সেগুলো পালিত হয় কিনা, তার দেখাশুনা করে। তেমনিভাবে জ্ঞানবুদ্ধিও নফসের সাথে চারটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকে ঃ (১) প্রথমে তার প্রতি কিছু শর্ত আরোপ করা। অর্থাৎ, কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যে, এগুলো মেনে চলতে হবে। (২) প্রতি মুহূর্তে অব্যাহতভাবে নফসের দেখাশুনা করা। কেননা, নফসকে বল্লাহীন উটের মত ছেড়ে দিলে তার কাছ থেকে কর্তব্যে অবহেলা ও খেয়ানত ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় মুনাফা দূরের কথা, পুঁজি রক্ষা করাই কঠিন হবে। (৩) দেখা-শুনার পর নফসের কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নিতে হবে এবং এতে কঠোরতা অবলম্বন করা জরুরী। (৪) হিসাবের পর যদি মুনাফার পরিবর্তে লোকসান দেখা যায়, তবে নফসকে শাস্তি দিতে হবে।

অতএব, ঈমানদার বান্দা যখন ভোরে ঘুম থেকে উঠে এবং ফজরের নামায পড়ে নেয়, তখন কিছু সময় নিজের নফসের সাথে শর্ত করার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নেবে। যেমন, ব্যবসায়ী মূলধন সোপর্দ করার আগে নিজের শরীকের সাথে শর্ত করার জন্যে একান্তে বসে যায়। অন্য কাউকে এই মজলিসে আসতে দেয় না, যাতে শরীক শর্তগুলো উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে এবং অন্য কথায় চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত না হয়। এরপর নিজের নফসকে এভাবে বলবে— আমার এই আয়ুই আমার পুঁজি। এটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মূলধনই খতম হয়ে যাবে এবং ব্যবসা ও মুনাফার কোন আশা থাকবে না। আজকের এই দিনে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সময় দিয়েছেন এবং আমার মৃত্যু বিলম্বিত করেছেন। অতএব, এ দিনটিকে বিনষ্ট করো না। মনে রেখ, হাদীসে বলা হয়েছে— বান্দার দিবারাত্রিতে চব্বিশটি ভাণ্ডার এক কাতারে সাজানো হয়। তন্মধ্যে একটি ভাণ্ডার তার জন্যে খোলা হয়। সে সেটাকে পুণ্যকর্মের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পায়। এটা সেই সময়, যাতে সে সৎকর্ম করে। এটা দেখে বান্দার এত আনন্দ ও খুশী হয় যে, এই খুশী দোযখীদের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের কোন কষ্টই অনুভূত হবে না। আর যে মুহূর্তে বান্দা পাপকর্ম ও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে,সে মুহূর্তের ভাণ্ডারও খোলা হয়। সেটা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্ধকার তাকে ঘিরে ফেলে। এ ভাণ্ডারটি দেখার পর বান্দার মধ্যে এত ভয় ও আতংক দেখা দেয় যে, এ আতংক জান্নাতীদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তাদের সুখ ও শান্তি বিলীন হয়ে যাবে। বান্দার জন্যে আরও একটি ভান্ডার খোলা হয়, যা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকে শূন্য। এতে না খুশীর বিষয় থাকে, না দুঃখের। এটা সেই মুহূর্ত, যাতে বান্দা ঘুমিয়ে অথবা গাফেল থাকে অথবা দুনিয়ার মোবাহ তথা অনুমোদিত কর্মে মশগুল থাকে।

ভাণ্ডারটি দেখে বান্দা অনুতাপ করে, হায়! এটা কেন শূন্য রইল! এতে তার এত ক্ষতি হয়, যা কোন বড় সাম্রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতি অপেক্ষা কম নয়। এমনিভাবে প্রাত্যহিক চব্বিশ ঘন্টার ভাণ্ডার বান্দার সমগ্র জীবনে খোলা হতে থাকে। অতএব, বান্দা নিজের নফসকে বলবে— আজ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে নিজের ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করে নাও। এরপর চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে নফসকে উপদেশ দেবে। কেননা, এগুলো এ ব্যবসায়ে নফসের খাদেমের অনুরূপ। এই ব্যবসায়ের তৎপরতা তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং নফসকে এভাবে নির্দেশ দেবে যে, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থেকে হেফাযতে রাখবে। চোখকে গায়র মাহরামের দিকে দেখা থেকে, কোন মুসলমানের গুপ্ত অঙ্গের দিকে দেখা থেকে এবং তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা থেকে বাঁচাবে। এসব বিষয় থেকে চোখকে বিরত রাখার পর এমন বিষয়ে লাগাতে বলবে, যা এই ব্যবসায়ে লাভদায়ক এবং যার জন্যে চোখ সৃষ্ট হয়েছে। যেমন, শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য কারিগরীকে দেখা, সৎকর্মসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা, কোরআন ও হাদীস দেখা এবং জ্ঞানার্জনের জন্যে বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে উপদেশ দেবে। বিশেষত জিহ্বা ও পেট সম্পর্কে অধিক জোর দিয়ে বলবে। কেননা, জিহ্বার ত্রুটিসমূহ— যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, অপরের দোষ বলা, শত্রুর প্রতি অভিসম্পাত করা, বদ দোয়া দেয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদি খুবই অনিষ্টকর। অথচ জিহ্বা সৃষ্টি হয়েছে যিকির, অপরকে যিকিরের উপদেশদান, শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর জন্যে। সুতরাং নফসের সাথে শর্ত করবে যে, সারাদিন যিকির ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে জিহ্বা হেলাবে না। মুমিনের উপকারী কথাবার্তা যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। পেটকে জোরপূর্বক বাধ্য করবে, যাতে লোভ-লালসা ত্যাগ করে এবং হালাল রুযী আহার করে। নফসের সাথে আরও শর্ত করবে যে, বর্ণিত বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটির খেলাফ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আহার বন্ধ করে দেয়া হবে এবং দৈহিক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এরপর নফসকে সেসব এবাদতের নির্দেশ দিবে, যেগুলো দিনে কয়েক বার হয়ে থাকে। অতঃপর নফল এবাদত সম্পর্কে উপদেশ দেবে। এসব শর্ত প্রত্যহ নবায়ন করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন এসব এবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন শর্ত করার প্রয়োজন থাকে না।

নফসের সাথে উপরোক্ত রূপ শর্ত করাকে বলা হয় "মুহাসাবা কাবলাল আমল" অর্থাৎ, আমল-পূর্ববর্তী আত্মবিশ্লেষণ। মুহাসাবা কখনও আমলের পরেও হয়। বান্দা যদি সারাদিন তার সামনের আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তা কম-বেশী হল কিনা দেখে, তবে তাও মুহাসাবার অন্তর্ভুক্ত।

মুরাকাবার ফযীলত ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে— হযরত জিবরাঈল (আঃ) একবার রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, 'এহসান' কি? তিনি বললেন ঃ বান্দার এমন মনোভাব নিয়ে আল্লাহ তা'আলার এবাদত করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে। যদি এই ভাব সৃষ্টি করা সম্ভবপর না হয়, তবে কমপক্ষে এমন হওয়া যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। অতএব মুরাকাবার অর্থ এবাদতের সময় এই মনোভাব হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন এবং আমি আল্লাহকে দেখছি। শেষোক্ত ভাব সম্ভব না হলে কমপক্ষে প্রথমোক্ত মনোভাব সহকারে এবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্ম নিয়ে তার উপর দণ্ডায়মান রয়েছেন।

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?

হযরত ইবনুল মুবারক এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবা কর। সে মুরাকাবার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সর্বদা এমনভাবে থাক যেন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছ। আবু ওছমান মাগরেবী বলেন ঃ অধ্যাত্ম পথে মানুষ যেসব বিষয় নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তম হচ্ছে মুহাসাবা ও মুরাকাবা এবং ইলম দ্বারা আমলের শাসন।

বর্ণিত আছে, কোন এক বুযুর্গের এক তরুণ শিষ্য ছিল। তিনি তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। একদিন অন্যরা আরয করল ঃ ব্যাপার কি, আপনি তার অধিক সম্মান করেন, অথচ সে বয়সে তরুণ এবং আমরা প্রবীণ! উত্তরে বুযুর্গ কয়েকটি পাখী আনিয়ে প্রত্যক শিষ্যকে একটি করে পাখী ও একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাখী এমন জায়গা থেকে যবেহ করে আনবে, যেখানে কেউ দেখে না। অতঃপর সকল শিষ্যই নিজ নিজ পাখী যবেহ করে আনল। কিন্তু তরুণ শিষ্যটি তার পাখী জীবিতই নিয়ে এল। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যবেহ করলে না কেন? সে বললঃ আমি এমন কোন জায়গা পেলাম না, যেখানে কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্রই আমাকে দেখেন। অতঃপর তরুণের এই মুরাকাবার ভাবটি সমস্ত শিষ্যই পছন্দ করল এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী বলেন ঃ এমন সত্তার মুরাকাবা কর, যাঁর দৃষ্টি থেকে তুমি উধাও হও না। এমন সত্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যাঁর নেয়ামত তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এমন সত্তার এবাদত কর, যাঁর দিক থেকে তুমি বেপরওয়া হতে পার না এবং খুশু ও নম্রতা তাঁর জন্যে কর, যাঁর রাজত্ব থেকে তুমি বাইরে যেতে পার না।

হুমায়দ তবীল সোলায়মান ইবনে আলী (রহঃ)-কে বললেনঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি গোনাহ কর, তখন তোমার মধ্যে দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটি ধারণা থাকে— হয় এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দেখছেন। এরূপ হলে তুমি নিঃসন্দেহে দুঃসাহস কর। না হয় এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দেখেন না। এরূপ হলে তুমি নিঃসন্দেহে কাফের।

ফারকাদ সন্‌জী (রহঃ) বলেন ঃ মুনাফিক এদিক-ওদিক তাকায়। যখন কাউকে দেখে না, তখন দ্রুত গোনাহের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু সে কেবল মানুষকেই ভয় করে— আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করে না।

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শেষরাতে এক জায়গায় বিশ্রামের জন্যে অবতরণ করলে পাহাড় থেকে এক রাখাল তাঁর কাছে এল। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার ছাগপাল থেকে একটি ছাগল আমার কাছে বিক্রি কর। রাখাল আরয করল ঃ আমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গোলাম। বিক্রি করার ক্ষমতা আমার নেই। হযরত ওমর পরীক্ষার ছলে বললেন ঃ তাতে কি, মালিককে বলে দেবে, একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। গোলাম বলল ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলাকে কি বলব বলে দিন। তিনি তো দেখেন। হযরত ওমর কেঁদে দিলেন এবং গোলামের সাথে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মালিকের কাছ থেকে গোলামকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার মুরাকাবার অবস্থা তোমাকে মুক্ত করেছে। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতেও তোমাকে মুক্ত করবেন।

মুরাকাবার স্বরূপ ও স্তর ঃ সূফীগণের পরিভাষায় এক প্রকার মারেফত থেকে উদ্ভূত অন্তরের একটি অবস্থার নাম মুরাকাবা। এই অবস্থা থেকে কিছু আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং কিছু আমল অন্তরে সৃষ্টি হয়। অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দিকে মশগুল ও মনোযোগী থাকা। যে মারেফত থেকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে অন্তরের যাবতীয় বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত বলে জানা। এই মারেফত যখন নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হয়ে যায়, তখন অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং তার সাহসিকতাকে আল্লাহর দিকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করে দেয়।

মুরাকাবার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর ঃ সিদ্দীকগণের মুরাকাবা। এই স্তরের অবস্থা এই যে, তখন অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ নিরীক্ষণে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অতঃপর তাতে অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ থাকে না। এই মুরাকাবার আমল কেবল অন্তরেই সীমিত থাকে। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া দূরের কথা, অনুমোদিত কাজকর্মের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না। যখন এবাদতের দিকে ধাবিত হয়, তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই ধাবিত হয়। এ কারণেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিক রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার তদবীর ও চেষ্টা-চরিত্রের প্রয়োজন হয় না। সে ব্যক্তিই এরূপ হয়, যার একটি মাত্র চিন্তা থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেন। যে ব্যক্তি এ স্তরে পৌঁছে যায়, সে পরিবেশ থেকে এমন গাফেল হয়ে যায় যে, কেউ তার কাছে এলে সে টের পায় না। চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখে না। কিছু বলা হলে বধির না হওয়া সত্ত্বেও তা শুনে না। এক বুযুর্গের ক্ষেত্রে এমনি হত। তাকে কেউ এজন্য তিরস্কার করলে তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আমার কাছে এস, তখন আমাকে ধাক্কা দিয়ো। এটা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এর দৃষ্টান্ত সেসব মানুষের ভেতরও পাওয়া যায়, যারা রাজ-দরবারে বসে রাজার সম্মানে ডুবে থাকে। কখনও মানুষের মন পার্থিব কোন কাজের চিন্তায় এমনভাবে ডুবে যায় যে, কোথাও যাওয়ার সময় অন্যমনস্কভাবে গন্তব্যস্থল পার হয়ে এগিয়ে যায় এবং যে কাজের জন্যে যায়, তাও ভুলে যায়।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এ যুগে আপনি এমন কোন ব্যাক্তিকে জানেন কি, যে নিজের অবস্থায় বেভুল হয়ে মানুষ থেকে বেখবর হয়ে গেছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এমন কেবল এক ব্যক্তিকে জানি, যে এক্ষণি তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। কিছুক্ষণ পরই ওতবা ক্রীতদাস সেখানে এসে উপস্থিত হল। আবদুল ওয়াহেদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথা থেকে এলে? সে এমন এক জায়গার নাম বলল, সেখান থেকে বাজার হয়ে আসতে হয়। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ পথে কারও সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে? সে বলল ঃ না, আমি কাউকে দেখিনি।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবনীতে লেখা আছে— তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার ধাক্কা লেগে এক মহিলা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এ মহিলাকে ধাক্কা দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার কাছে তো প্রাচীর ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি।

হযরত শিবলী (রহঃ) হযরত আবুল হাসান নূরীর কাছে গিয়ে দেখেন তিনি ঘরের এক কোণে চুপচাপ একাগ্র চিত্তে বসে আছেন। দৃশ্যত তার কোন কিছুই নড়াচড়া করছিল না। হযরত শিবলী বললেন ঃ তুমি এই মুরাকাবা ও স্থিরতা কোথায় শিখলে? তিনি বললেন ঃ আমার এখানে একটি বিড়াল ছিল। সে যখন শিকার ধরতে চাইত, তখন ইঁদুরের গর্তের কাছে ওঁৎ পেতে বসে থাকত এবং শরীরের একটি লোমও নাড়া দিত না। তার কাছ থেকে আমি এই পদ্ধতি শিখে নিয়েছি।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফীক বলেন ঃ আমি আবু আলী রুদবারীর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে মিসর থেকে রমল্লা যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। দরবেশ ঈসা ইবনে ইউনুস মিসরী আমাকে বললেন ঃ ছুর নামক স্থানে এক যুবক ও এক প্রৌঢ় ব্যক্তি মুরাকাবায় একত্রে বসে আছে। যদি তুমি তাদেরকে এক নজর দেখে নাও, তবে হয়তো তোমার উপকারই হবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

একথা শুনে আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ছুরে প্রবেশ করলাম। আমার কোমরে একটি কাপড় বাঁধা ছিল, কাঁধ ছিল খোলা। মসজিদে প্রবেশ করে দু'টি লোককে কেবলামুখী বসে থাকতে দেখলাম। আমি সালাম করলে তারা উত্তর দিল না। আমি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার সালাম করলাম; কিন্তু জওয়াব শুনা গেল না। আমি তাদেরকে সালামের জওয়াব দেয়ার জন্যে কসম দিলাম। যুবক তার নানা রঙের তালি দেয়া পোশাক থেকে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হে ইবনে খফীক! দুনিয়া সামান্য। সামান্য থেকেও সামান্যই রয়ে গেছে। তুমি এ সামান্য থেকে অনেক কিছু করে নাও। তোমার কাজকর্ম খুবই কম। ফলে আমাদের সাথে সাক্ষাতের অবসর পেয়েছ। এরপর সে আমার দিকে লক্ষ্য করল। আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই বিলীন হয়ে গেল। এরপর যুবক মাথা নত করল। আমি তাদের কাছে রইলাম এবং যোহর ও আসরের নামায সে মসজিদেই পড়লাম। আসরের পর আমি বললাম ঃ আমাকে উপদেশ দিন। যুবক আবার মাথা তুলে বলল ঃ হে ইবনে খফীক, আমরা নিজেরাই বিপদগ্রস্ত। নসিহতের ভাষা আমাদের নেই। আমি তাদের কাছে পানাহার ও ঘুম ছাড়াই তিনদিন অবস্থান করলাম। তারাও পানাহার করল না এবং ঘুমালও না। এরপর আমি মনে মনে স্থির করলাম আমাকে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্যে আমি তাদেরকে কসম দেব। সম্ভবত তাদের উপদেশ আমার জন্যে উপকারী হবে। আমি তাই করলাম। সেমতে যুবক মাথা তুলে বলল ঃ হে ইবনে খফীক! এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন কর, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে হয়, অন্তরে তার ভীতি সঞ্চার হয় এবং যে তোমাকে অবস্থার ভাষায় উপদেশ দেয়— কথার মাধ্যমে নয়। এখন তুমি চলে যাও, আসসালাম। যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য প্রবল, তাদের মুরাকাবা এমনি হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্য কোন কিছুর অবকাশ থাকে না।

মুরাকাবার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, এমন পরহেযগারদের মুরাকাবা, যাদের অন্তরে এ বিশ্বাস নিশ্চিতরূপেই প্রবল থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ভেতরের ও বাইরের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু প্রতাপের নিরীক্ষণ তাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ করে না; বরং তাদের অন্তরে হাল ও আমলের প্রতি মনোযোগ দেয়ারও অবকাশ থাকে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের লজ্জা প্রবল থাকে। এ কারণেই তারা কোন কাজ করলে অনেক আস্তে-ধীরে ও ভেবেচিন্তে করে। যে কাজের ফলে কিয়ামতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপমান ভোগ করতে হয়, তারা তার ধারে-কাছে যায় না। যেন তারা দুনিয়াতেই আল্লাহ তা'আলাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করে। তাই কিয়ামতের অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

উপরোক্ত দু'টি স্তরের পার্থক্য বাস্তব ঘটনা মাধ্যমেও জানা যায়। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি নির্জনে কোন কাজ করে এবং তার কাছে হঠাৎ কোন মহিলা এসে উপস্থিত হয়, তবে সে লজ্জাবশত পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করে উত্তমরূপে বসবে। এখানে লজ্জার কারণেই সে এরূপ করবে, সম্মানের কারণে নয়। কিন্তু যদি কোন বাদশাহ অথবা বুযুর্গ তার কাছে এসে হাযির হয়, তবে সে তার সম্মানের প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করবে যে, সকল কাজকর্ম ছেড়ে দেবে। এখানে লজ্জার কারণে নয়, বরং সম্মানের দিক দিয়েই এরূপ করবে। আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবায় বান্দার স্তর এমনিভাবেই বিভিন্ন হয়।

যে ব্যক্তি মুরাকাবার স্তরে থাকে, তার প্রথমে দেখা উচিত যে মুরাকাবা সে করতে চায়, তা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, না নিছক খেয়ালখুশী, না শয়তানের অনুসরণ? এ বিষয়টি উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত মুরাকাবা করবে না। এরপর যখন খোদায়ী নূরের মাধ্যমে জানা যাবে এটা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, তখন মুরাকাবার উদ্যোগ নেবে। যদি জানা যায় গায়রুল্লাহর জন্যে, তবে বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে লজ্জাবশত নিজের নফসকে তিরস্কার করবে। যারা প্রথম প্রথম মুরাকাবা করে, তাদের জন্যে এ পদ্ধতিটি ওয়াজেব ও অপরিহার্য। হাদীসে আছে, বান্দার প্রতিটি কাজে তা সামান্য হলেও তিনটি দফতর খোলা হয় এবং তাতে তিনটি প্রশ্ন থাকে। প্রথম দফতরে এ প্রশ্ন থাকে এ কাজটি কেন করলে? দ্বিতীয় দফতরে প্রশ্ন থাকে কিভাবে করলে? তৃতীয় দফতরে প্রশ্ন থাকে কার জন্যে করলে? প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য— এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণে করেছ, না কেবল মনে চেয়েছে তাই করেছ?

যদি প্রথম প্রশ্নের জওয়াব সঠিক হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে— এ কাজ কিভাবে করেছ? অর্থাৎ, নিশ্চিত সজ্ঞানে করেছ, না মূর্খতা সহকারে, না অনুমানের মাধ্যমে? যদি এ প্রশ্নের জওয়াবও শুদ্ধ হয়, তবে তৃতীয় প্রশ্ন হবে— এ কাজ কার জন্যে করেছ? অর্থাৎ, এখলাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি আল্লাহর জন্যে করে থাক, তবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা দেবেন। আর যদি মানুষকে দেখানোর জন্যে করে থাক, তবে মানুষের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কাছেই এর পুরস্কার চাও। আর যদি দুনিয়া পাওয়ার জন্যে করে থাক, তবে তা আমি তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে ফেলেছি। আর যদি ভুলক্রমে করে থাক, তবে সওয়াব খতম এবং আমল বরবাদ হয়েছে। আর যদি অন্য উপাস্যের জন্যে করে থাক, তবে আযাব ও গযবের যোগ্য হয়েছ। কারণ তুমি আমার বান্দা ছিলে, আমার দেয়া রিযিক খেয়েছিলে এবং আমার নেয়ামত ভোগ করেছিলে। এরপর অন্যের জন্যে কাজ করার অর্থ কি? তুমি কি আমার একথা শুননি—

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ –

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত কর, তারাও তো তোমাদের মতই আমার বান্দা।

মুহাসাবার ফযীলত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ –

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত, সে আগামীকালের জন্যে কি অগ্রে পাঠিয়েছে।"

এখানে অতীত আমলসমূহের হিসাব নেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমার কাছ থেকে হিসাব নেয়ার পূর্বে তুমি তোমার নফসের কাছ থেকে হিসাব নাও এবং তোমার পরীক্ষা নেয়ার পূর্বে তুমি তার পরীক্ষা নাও। এক হাদীসে আছে— বুদ্ধিমানের জন্যে চারটি মুহূর্ত থাকা উচিত। তন্মধ্যে একটি মুহূর্ত নফসের হিসাব নেয়ার জন্যে থাকা দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই তওবা কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

বলা বাহুল্য, গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর সেটিকে অনুশোচনার দৃষ্টিতে দেখার নামই তওবা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انى لاستغفر الله واتوب اليه فى اليوم مأة مرة –

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমি দৈনিক একশ' বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে যখন শয়তান স্পর্শ করে অমনি সচকিত হয়ে যায়। এরপর তাদের চোখ খুলে যায়।

হযরত ওমর (রাঃ) রাত হলে নিজের পায়ে দুররা দিয়ে আঘাত করতেন এবং নফসকে বলতেন, আজ তুই কি কি করেছিস? মায়মূন ইবনে মেহরান বলেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না— যে পর্যন্ত সে নফসের হিসাব এমনভাবে না নেয়, যেমন ব্যবসায়ে শরীকের কাছ থেকে নেয়া হয়। হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) একবার খড়ির বোঝা মাথায় তুলে নিলে এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এ কাজের জন্যে তো আপনার গোলামই ছিল। তিনি বললেন ঃ আমার নফস এটা খারাপ মনে করে কি না আমি তাই পরীক্ষা করছিলাম।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মুমিন তার নফসের ব্যবস্থাপক হয়ে থাকে। আল্লাহর ওয়াস্তে সে তার কাছ থেকে হিসাব নেয়। কিয়ামতে তাদের হিসাব হালকা হবে, যারা দুনিয়াতে নিজের নফসের কাছ থেকে হিসাব নেয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন— একদিন আমি হযরত ওমরের সাথে বাইরে বের হলাম। তিনি এক বাগানে চলে গেলেন। আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়াল ছিল। আমি তাঁকে বাগানে একথা বলতে শুনলাম ঃ কি চমৎকার, ওমর ইবনে খাত্তাব এখন আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহর কসম, তুই আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোকে আযাব দেবেন।

আহ্নাফ ইবনে কায়সের কোন এক শিষ্য বর্ণনা করেন— আমি আমার শায়খের সাথে থাকতাম। তিনি রাতের বেলায় নামাযের জায়গায় বসে অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন এবং বাতির কাছে গিয়ে তার শিখায় নিজের আঙ্গুল রাখতেন। যখন তীব্র উত্তাপ অনুভূত হত, তখন নফসকে বলতেন— তুই অমুক দিন অমুক কাজ কেন করেছিলে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমলের পর আত্মবিশ্লেষণ ঃ নফসের সাথে শর্ত করার জন্যে দিনের শুরুতে যেমন একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা দরকার, তেমনি দিনের শেষেও একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা জরুরী। তাতে বান্দা তার সারাদিনের আমলের হিসাব নফসের কাছ থেকে গ্রহণ করবে। দুনিয়াতে ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার শরীকদের কাছ থেকে বছরের শেষে অথবা মাসের শেষে অথবা দিনের শেষে এমনি ধরনের হিসাব নিয়ে থাকে, যাতে দুনিয়ার অর্থকড়ি বিনষ্ট না হয়ে যায়। অথচ দুনিয়ার অর্থকড়ি বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীর জন্যে উত্তম। বিনষ্ট না হয়ে পাওয়া গেলেও তা একান্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তু। ধ্বংসশীল বস্তুর জন্যে মানুষ যখন এতটুকু ঝামেলা পোহায়, তখন চিরন্তন সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তার হিসাব মানুষ নিজের নফসের কাছ থেকে কেন নিবে না?

শরীকের সাথে হিসাব-কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে পুঁজি ঠিক আছে কি না যাচাই এবং লাভ-লোকসান কতটুকু হয়েছে, তা দেখা। কিছু লাভ হলে তা নেয়া এবং তার কৃতিত্বের জন্যে ধন্যবাদ দেয়া। আর যদি লোকসান হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্যে তার ক্ষতিপূরণ করা। এমনিভাবে ধর্মে-কর্মে বান্দার পুঁজি হচ্ছে ফরয কর্মসমূহ, লাভ নফল ও মোস্তাহাব কর্মসমূহ এবং লোকসান গোনাহখাতা। এ ব্যবসায়ের সময়-কাল হচ্ছে সমস্ত দিন এবং এর পরিচালক হচ্ছে নফসে আম্মারা তথা কুকর্মের আদেশকারী রিপু। সুতরাং প্রথমে তার কাছ থেকে ফরয কর্মসমূহের হিসাব নেয়া উচিত সে তা যথাযথ আদায় করেছে কি না। করে থাকলে আল্লাহর শোকর করে নফসকে উৎসাহ দেয়া উচিত যেন সে এমনি করে। আর যদি ফরয আদায় না করে থাকে, তবে তার কাছে এগুলোর কাযা দাবী করা উচিত। অসম্পূর্ণরূপে আদায় করে থাকলে নফল দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

আর যদি নফস গোনাহ করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেয়ার কাজে মশগুল হতে হবে, যাতে সে কৃত গোনাহের ক্ষতি উত্তমরূপে পূরণ করে নিতে পারে। দুনিয়ার হিসাবে যেমন কড়াগণ্ডা খুঁজে বের করা হয়, তেমনি নফসের বেলায়ও করা দরকার। নফসের আত্মসাৎ ও প্রতারণা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা উচিত। নফস অত্যন্ত প্রতারক ও ধোকাবাজ। সুতরাং তার কাছ থেকে সারাদিনের কথাবার্তার সঠিক জওয়াব চাইবে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এমনিভাবে দৃষ্টি, চিন্তাভাবনা, উঠাবসা, পানাহার ও নিদ্রার হিসাব নিতে হবে। এমনকি, চুপ থাকারও জওয়াব চাইতে হবে যে, কেন চুপ রইল। এভাবে এক এক দিনের হিসাব নেয়ার পর সারা জীবনের দিন ও মুহূর্তসমূহের হিসাব নিতে হবে। সেমতে সূবা ইবনে সাম্মার জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি রিক্কা নামক স্থানে বাস করে নিজের নফসের হিসাব নিতেন। একদিন তিনি নিজের বয়স হিসাব করে দেখলেন ষাট বছর পূর্ণ হয়েছে। ষাট বছরের দিন হিসাব করে একুশ হাজার ছ'শ' দিন পেলেন। এরপর তিনি হঠাৎ এক চিৎকার করে বললেন ঃ হায়! আমি একুশ হাজার ছ'শ' গোনাহ নিয়ে রাব্বুল আলামীনের সামনে হাযির হব! যদি দৈনিক দশটি গোনাহ করে থাকি, তবে আমার কি উপায় হবে! এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি ওফাত পেয়েছেন। এমনিভাবে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব করবে। যদি মানুষ প্রত্যেক গোনাহের পর একটি কংকর নিজের ঘরে রেখে দেয়, তবে অল্পদিনেই তার ঘর কংকরে ভর্তি হয়ে যাবে। মানুষ অনেক গোনাহ করে, কিন্তু তা স্মরণ রাখার ব্যাপারে তার শৈথিল্যের অন্ত নেই। অথচ তার দুই কাঁধে বসে দুই ফেরেশতা নিরন্তর তার গোনাহসমূহ লিখে যায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা গুনে রাখেন, অথচ মানুষ তা ভুলে যায়।

ত্রুটির পর নফসের শাসন ঃ নফসের হিসাব নেয়ার পর যদি দেখা যায়, নফস চেষ্টা সত্ত্বেও অপরাধ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তবে তাকে ঢিলা ছেড়ে দেবে না। কেননা, ঢিলা ছেড়ে দিলে একের পর এক গোনাহ করা তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে। গোনাহের প্রতি তার এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হবে— যা থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যাবে। আর তাই হবে তার ধ্বংসের কারণ। বরং এমতাবস্থায় নফসকে শাস্তি দিতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কামনার তাড়নায় কোন সন্দেহযুক্ত লোকমা খেয়ে ফেলে, তবে উদরকে ক্ষুধার শাস্তি দেবে। যদি পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে, তবে চোখকে কিছু দেখতে দেবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক অঙ্গের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। অধ্যাত্ম পথের পথিকদের এটাই ছিল রীতি। সেমতে মনসুর ইবনে ইবরাহীম জনৈক আবেদের অবস্থা লিখেন যে, সে এক মহিলার সাথে কথাবার্তা বলল। এরপর ক্রমান্বয়ে তার উরুর উপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হাত রাখল। এরপরই সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের হাত আগুনে রেখে দিল। ফলে তা জ্বলে-পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত তার এবাদতখানায় এবাদত করছিল। একদিন সে বাইরের দিকে তাকিয়ে এক মহিলাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। তার মনে কুবাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে মহিলার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের পা এবাদতখানার বাইরে রাখল। অমনি আল্লাহর রহমত তার সাহায্যে এগিয়ে এল। তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল এবং সে মনে মনে বলতে লাগল ঃ আমি একি করছি! অতঃপর সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে পা এবাদতখানার ভেতরে নিতে চাইল। সে ভাবতে লাগল, যে পা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর জন্যে বাইরে এসেছিল, সে আবার আমার সাথে এবাদতখানায় কিরূপে যাবে? আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না। অতঃপর সে তার পা বাইরেই রেখে দিল। বৃষ্টি, বরফ, বাতাস ও রৌদ্র লেগে লেগে এক সময় সে পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার এই তওবা কবুল করলেন এবং তার কথা পরবর্তী আসমানী কিতাবে উল্লেখ করলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত গযওয়ান ও হযরত আবু মূসা এক সাথে কোন এক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। এক মহিলা আত্মপ্রকাশ করলে গযওয়ান তার দিকে তাকালেন। এরপর হাত তুলে আপন চোখে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে চোখ ফুলে গেল। তিনি চোখকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ তুই এমন বস্তুর দিকে দেখিস, যা তোর জন্যে ক্ষতিকর।

মালেক ইবনে যয়গম বর্ণনা করেন, একদিন রেমাহ কায়সী আসরের পর আমাদের বাড়ীতে এসে আমার পিতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ এ সময়ে ঘুম! এখন কি ঘুমের সময়! অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন। আমি তার পেছনে এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালাম যে, আপনি বললে আমরা তাকে জাগিয়ে দেই। লোকটি ফিরে এসে বললঃ তিনি তো ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফুরসত তার ছিল না। অতঃপর আমি তাকে দেখতে ছুটলাম। দেখলাম তিনি কবরস্তানে রয়েছেন এবং নিজের নফসকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন— তুই একথা কেন বললি যে, এ কি ঘুমের সময়? একথা বলা তোর জন্যে কি জরুরী ছিল? মানুষ যখন ইচ্ছা ঘুমাবে। তুই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কে? তুই কি জানিস তা ঘুমের সময় কি না? খবরদার! আমি আল্লাহ তাআলার সাথে পাকা অঙ্গীকার করছি, যা কোনদিন ভঙ্গ করব না। আমি এক বছর পর্যন্ত ঘুমের জন্যে মাটিতে কোমর লাগাব না— যদি কোন অসুখ-বিসুখ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে। নির্লজ্জ কোথাকার, তুই কতদিন অন্যকে শাসন করবি এবং নিজে গোনাহ থেকে বিরত হবি না? তিনি এসব কথা বলে কেঁদে যাচ্ছিলেন। তার খবরই ছিল না যে, আমিও সেখানে রয়েছি। এই অবস্থা দেখে আমি তাকে তেমনি রেখে চলে এলাম।

তামীম দারেমী এক রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাহাজ্জুদের জন্যে জাগতে পারলেন না। তিনি নফসকে এর শাস্তি এই দিলেন যে, এক বছর পর্যন্ত অনবরত রাত্রি জাগরণ করলেন এবং নিদ্রাকে হারাম করে নিলেন।

হযরত তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একদিন বস্ত্র খুলে গ্রীষ্মকালে কংকরের উপর খুব গড়াগড়ি করল। সে তার নফসকে বলছিল— হে রাতের মৃত এবং দিনের অকর্মণ্য! এখন মজা দেখ। জাহান্নামের উত্তাপ এর চেয়েও অনেক বেশী। ইতিমধ্যে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর লোকটির নজর পড়ল। তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন। সে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার নফস আমার উপর প্রবল হয়ে গেছে। তিনি এরশাদ করলেন ঃ যে চিকিৎসা তুমি করেছ, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। জেনে নাও, তোমার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেছেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের এই ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু পাথেয় নিয়ে নাও। এরপর চারদিক থেকে তাকে বলা হল ঃ মিয়াঁ, আমাদের জন্যেও দোয়া করো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাদের সকলের জন্যে দোয়া কর। লোকটি বলল ঃ ইলাহী, তাকওয়াকে তাদের পাথেয় বানাও এবং হেদায়েতের উপর সবাইকে সংহত কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, তুমি তাকে সরল পথে রাখ।

ইবনে সেমাক (রহঃ) হযরত দাউদ তাঈর খেদমতে তখন পৌছেন, যখন তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তার লাশ তখনও ঘরেই রাখা ছিল। তিনি চোখ দেখে বললেন ঃ হে দাউদ! তুমি কয়েদী হওয়ার পূর্বেই নিজের নফসকে কয়েদী করেছ এবং আযাবপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে আযাব দিয়েছ। যে সত্তার জন্যে তুমি এ কাজ করতে, আজ দেখবে তিনি তোমাকে কেমন বিপুল সওয়াব দান করেন!

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুহাম্মদ ইবনে বিশর দাউদ তাঈকে দেখলেন, রোযার ইফতারের পর তিনি পানসে রুটি খাচ্ছেন। তিনি আরয করলেন ঃ আপনি লবণ দিয়ে রুটি খেয়ে নিন। দাউদ তাঈ বললেন ঃ আমার নফস দশদিন ধরে লবণ খেতে চায়। কিন্তু দাউদ যতদিন দুনিয়াতে থাকবে লবণের স্বাদ গ্রহণ করবে না। মোটকথা, সাবধানী ব্যক্তিবর্গ নফসকে এমনিভাবে সাজা দিতেন।

মোজাহাদা ঃ এর অর্থ চেষ্টা, পরিশ্রম ও সাধনা। গোনাহ ও ক্রটির কারণে নফসকে উপরোক্ত রূপে সাজা দেয়ার পর দেখবে, নফস কোন মুস্তাহাব কাজে অথবা ওযীফায় অলসতা করে কি না। যদি অলসতা করে, তবে তার শাসন হল, ওযীফার বোঝা তার উপর চেপে দেয়া এবং অতীত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে কয়েক প্রকারের ওযীফা তার জন্যে অপরিহার্য করা। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এভাবেই আমল ও মোজাহাদা করতেন। সেমতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর যখন জামাত কাযা হয়ে যেত, তখন তিনি সারা রাত জেগে নফল এবাদত করতেন। একবার মাগরিবের নামাযে এতটা বিলম্ব হয়ে যায় যে, সন্ধ্যা তারা দেখা যেতে থাকে। তিনি এ কারণে দু'টি গোলাম মুক্ত করে দেন। ইবনে আবী রবীআর ফজরের সুন্নত কাযা হয়ে গেলে তিনি একটি গোলাম মুক্ত করে দেন। কোন কোন বুযুর্গ নিজের উপর সারা বছরের রোযা অথবা পদব্রজে হজ্জ অথবা সমুদয় সম্পদ সদকা করে দেয়া জরুরী করে নিতেন।

এখানে প্রশ্ন হল, যদি নফস সার্বক্ষণিক ওযীফার সাধনা করতে প্রস্তুত না হয়, তবে তার প্রতিকার কি? জওয়াব এই যে, হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত মোজাহাদাকারীগণের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব নফসকে শুনাতে হবে। সর্বাধিক উপকারী প্রতিকার হচ্ছে, যে ব্যক্তি এবাদতে খুব মোজাহাদা করে, তার সংসর্গে থাকা, তার অবস্থা দেখা এবং অনুসরণ করা। জনৈক বুযুর্গ বলতেন, এবাদতে যখন আমি কিছুটা অলসতার সম্মুখীন হতাম, তখন আমি খ্যাতনামা বুযুর্গ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের অবস্থা ও মোজাহাদা প্রত্যক্ষ করতাম। এক সপ্তাহ পর্যন্ত তাই করতাম। ফলে অলসতা দূর হয়ে যেত। কিন্তু এই চিকিৎসা কঠিন। কেননা, আজকাল এবাদতে মোজাহাদা করে এরূপ ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তীদের মোজাহাদা এখন নেই। পূর্ববর্তীদের অবস্থা শোনার চেয়ে উত্তম কোন চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান যুগে নেই। তাই পূর্ববর্তীদের রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাদের পরিশ্রম ও সাধনা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সওয়াব ও সুফল চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে। যে তাদের অনুসরণ করে না, তার জন্যে বড়ই পরিতাপ।

নিম্নে আমরা মোজাহাদাকারীদের গুণাবলী উল্লেখ করব, যেগুলো পাঠ করে মুরীদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অনুসরণ করে আমলে পরিশ্রম ও সাধনা অর্জিত হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

رحم الله اقواما يحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى -

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি রহম করুন, যাদেরকে মানুষ রুগ্ন মনে করে, অথচ তারা রুগ্ন নয়।

হযরত হাসান বলেন, এই হাদীসে রুগ্ন বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে এবাদত ও সাধনা রোগীর মত করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ -

অর্থাৎ, যারা পালন করে যা তারা পালন করে এবং তাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত।

হযরত হাসান বলেন, এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সৎকর্ম সাধ্যমত সম্পাদন করার পরও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, এসব আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাবে কি না!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله -

অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই সুখী, যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ আমার যে সব বান্দা মোজাহাদা ও চেষ্টা করে, তারা কেন এমন করে? ফেরেশতারা বলে— ইলাহী, তুমি তাদেরকে একটি বিষয়ের ভয় প্রদর্শন করেছ এবং একটি বিষয়ের জন্যে আগ্রহান্বিত করেছ। তাদের চেষ্টা ও সাধনা এ কারণেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে দেখতে পেলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কি হবে? ফেরেশতারা আরয করে, তাহলে তাদের চেষ্টা ও মোজাহাদা আরও বেড়ে যাবে।

হযরত হাসান বলেন ঃ আমি অনেক লোককে দেখেছি এবং তাদের সাথে অবস্থান করেছি। তারা দুনিয়ার কোন বস্তু পেয়ে আনন্দিত হয় না এবং কোন বস্তু হারিয়েও দুঃখ করে না। দুনিয়া তাদের কাছে সে মাটির চেয়েও নিকৃষ্ট, যাকে তোমরা পদতলে পিষ্ট কর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যে, সারাজীবন তাদের কোন কাপড় জুটেনি, কখনও স্ত্রীর কাছে কোন খাদ্যের ফরমায়েশ করেনি এবং ঘুমানোর জন্যে মাটিতে কোন কিছু বিছায়নি। এতদসত্ত্বেও আমি তাদেরকে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমলকারী পেয়েছি। যেখানে রাত হত, সেখানেই তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যেত। মুখমণ্ডল মাটিতে রাখত এবং অশ্রুতে কপোল ভাসিয়ে দিত। তারা যখন কোন ভাল কাজ করত, তখন আনন্দিত হত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তা কবুল করার দোয়া করত। পক্ষান্তরে যখন কোন খারাপ কাজ করত, তখন অনুতপ্ত হত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা করার জন্যে কাকুতি-মিনতি করত। বিশ্বাস কর, তারা সব সময় এ অবস্থায়ই থাকত। তারা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা না করে এবং মাগফেরাত ছাড়া নাজাত পায়নি অর্থাৎ, এত কিছুর পরও নাজাতের জন্যে তাদেরকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার মাগফেরাত কামনা করতে হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয অসুস্থ হলে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। তাদের মধ্যে জনৈক যুবক ছিল অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্বল। ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার এই দুরবস্থা কেন? যুবক বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন, অসুখ-বিসুখের কারণেই এই অবস্থা। তিনি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য কথা বল। যুবক আরয করল ঃ সত্য এই যে, আমি দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে দেখলাম তা তিক্ত। ফলে, দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, আরাম-আয়েশ সবই আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে গেছে। সোনা ও পাথর আমার কাছে একই রকম মনে হয়। আমার অবস্থা এই থাকে যে, আমি যেন আরশের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষকে দলে দলে জান্নাতে ও দোযখে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এ ভয়েই সারাদিন পিপাসিত থাকি এবং সারারাত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জেগে এবাদত করি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সওয়াব ও শাস্তির সামনে আমার এই এবাদত নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য বৈ নয়।

আবু নাঈম বলেন ঃ দাউদ তাঈ রুটির ক্ষুদ্রাংশসমূহ পানিতে গুলিয়ে পান করে নিতেন। রুটি খেতেন না। এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ রুটি চিবোতে অনেক সময় লেগে যায়। পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করার চেয়ে বেশী সময় রুটি খাওয়ায় ব্যয় হয়ে যায়। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে এসে বলল ঃ আপনার ঘরের ছাদে একটি কাঠ ভেঙ্গে গেছে। তিনি বললেন ঃ তা হতে পারে। কারণ, বিশ বছর ধরে আমি ছাদের দিকে তাকাইনি।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অনর্থক কথাবার্তার ন্যায় অনর্থক দৃষ্টিপাতকেও খারাপ মনে করতেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ একবার আহমদ যরীনের কাছে আমরা সকাল থেকে আসর পর্যন্ত বসে রইলাম। কিন্তু তিনি না ডানদিকে তাকালেন, না বামদিকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দু'টি চক্ষু দান করেছেন, যাতে বান্দা এগুলো দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য দর্শন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াই দর্শন করে, তার জন্যে গোনাহ লেখা হয়।

হযরত আবু দারদা বলেন ঃ যদি তিনটি বিষয় না থাকতো, তবে আমি এক দিনের জীবনকেও ভাল মনে করতাম না— (১) দুপুরে আল্লাহর জন্যে তৃষ্ণার্ত থাকা, (২) অধিক রাতে সেজদা করা এবং (৩) এমন লোকদের সংসর্গে বসা, যারা গ্রীষ্মকালে উত্তম খোরমা বাছাই করার মত সৎকর্ম বাছাই করে। আসওয়াদ ইবনে এয়াযীদ এবাদতে মোজাহাদা করতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে রোযা রাখতেন। ফলে, তাঁর দেহ সবুজ ও ফ্যাকাসে হয়ে যেত। আলকামা ইবনে কায়স তাঁকে বলতেন ঃ তুমি নিজের নফসকে আযাব দিচ্ছ কেন? তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ আমি তো তাকে সম্মানিত করতে চাই। রোযার সাথে সাথে তিনি নামায এত বেশী পড়তেন যে, প্রায়ই মাটিতে পড়ে যেতেন। আনাস ইবনে মালেক ও হাসান একবার তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এসব কাজের হুকুম দেননি; অর্থাৎ, এতটুকু মোজাহাদা ফরয করেননি। তুমি কেন তা কর? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি মালিকানাধীন গোলাম। মিনতি ও অসহায়তা প্রকাশ পায়— এমন কোন কাজ না করে থাকতে পারি না।

ছাবেত বানানী (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, নামায ছিল তাঁর সর্বাধিক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রিয় কাজ। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতেন— ইলাহী, যদি তুমি কাউকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দাও, তবে তা আমাকেই দিয়ো— যাতে আমি কবরেও নামায পড়তে পারি।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত সিররী অপেক্ষা অধিক এবাদতকারী কাউকে দেখিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল আটানব্বই বছর। কিন্তু মৃত্যুশয্যা ছাড়া তাঁকে কেউ কখনও শায়িত দেখেনি।

আবু মুহাম্মদ মাগাযেলী বলেন ঃ আবু মুহাম্মদ জারীরী (রহঃ) পূর্ণ এক বছর মক্কা মোয়াযযমায় কা'বাগৃহের খাদেম হয়ে বসবাস করেন। এ সময়ে কখনও তিনি ঘুমাননি, কথা বলেননি, স্তম্ভ অথবা প্রাচীরে হেলান দেননি এবং পা ছড়িয়ে বসেননি। একদিন আবু বকর কুত্তানী (রহঃ) তার কাছে গিয়ে সালাম করে বললেন ঃ আপনি কিসের বলে এই এতেকাফে সক্ষম হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ যে ইলম আমার অন্তরকে পাকাপোক্ত রেখেছে, সে ইলমই আমাকে বাহ্যিক কাজে সহায়তা করেছে। এই জওয়াব শুনে কুত্তানী মাথানত করে চিন্তা করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বর্ণিত আছে, কিছু লোক সফরে পথ ভুলে গেল। তারা জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দরবেশের কাছে গিয়ে পৌঁছল। দরবেশকে ডাক দিলে সে এবাদতখানা থেকে মাথা বের করে তাদের দিকে দেখল। তারা বলল ঃ পথ কোন্ দিকে? আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। দরবেশ মাথায় ইশারা করে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিল। আগন্তুকরা এর উদ্দেশ্য বুঝে নিল যে, দরবেশ মারেফতের পথ দেখাচ্ছে। তারা বলল ঃ আমরা-তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব, জওয়াব দেবে কি? দরবেশ বলল ঃ জিজ্ঞেস কর; কিন্তু বেশী নয়। কেননা, দিন পুনরায় ফিরে আসবে না এবং মৃত্যু তাড়াহুড়া করছে। তার কথাবার্তায় সবাই বিস্মিত হল। তারা বলল ঃ আসন্ন কিয়ামতে কি বিষয়ের উপর মানুষের হাশর হবে? দরবেশ বলল ঃ নিজ নিজ নিয়তের উপর। তারা বলল ঃ আমাদের কিছু উপদেশ দাও। সে বলল ঃ নিজের নফসের স্তর অনুযায়ী পাথেয় সংগ্রহ কর। উত্তম পাথেয় তা'ই, যা মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছায়। এরপর তাদেরকে পথ বলে দিয়ে সে মাথা ভেতরে নিয়ে গেল।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আমি এক চীন দেশীয় দরবেশের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে "ও দরবেশ" বলে ডাকলাম। সে জওয়াব দিল না। আমি দ্বিতীয়বার ডেকে জওয়াব পেলাম না। তৃতীয়বার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ডাকার পর সে আমার দিকে মাথা তুলে বলল ঃ মিয়া সাব, আমি দরবেশ নই। দরবেশ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর সম্মান করে, তাঁর বিপদে সবর করে, তাঁর ফয়সালায় রাযী থাকে, তাঁর নেয়ামতের শোকর করে, তাঁর মাহাত্ম্যের সামনে বিনম্র হয়, তাঁর ইযযতের মোকাবিলায় হেয় থাকে, তাঁর হিসাব ও আযাব নিয়ে চিন্তা করে, দিনে রোযা রাখে, রাতে দাঁড়িয়ে এবাদত করে, দোযখের স্মরণ যাকে ঘুমাতে দেয় না। এ হচ্ছে দরবেশ। আমি তো একটি ক্ষেপা কুকুর মাত্র। আমি নিজেকে এই এবাদতখানায় আটকে রেখেছি, যাতে মানুষকে কামড় না দেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম— কি বিষয় মানুষকে আল্লাহ তা'আলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আল্লাহকে চেনার পর তারা বিমুখ কেন? সে বলল ঃ ভাই, কেবল দুনিয়ার মহব্বত ও সাজ-সজ্জা মানুষকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দুনিয়া গোনাহ ও নাফরমানীর জায়গা। সে-ই হুশিয়ার ও সতর্ক, যে দুনিয়াকে মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে, আল্লাহর সামনে গোনাহ থেকে তওবা করে এবং নৈকট্যের বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগী হয়। হযরত ওয়ায়স করনী (রহঃ) এক রাত্রিকে বলতেন— এটা রুকুর রাত। অতঃপর সে রাতে এক রুকু করেই ভোর করে দিতেন। যখন পরের রাত আসত, তখন বলতেন— এটা সেজদার রাত। অতঃপর সে রাতও সেজদায় কাটিয়ে দিতেন।

বর্ণিত আছে, ওতবা গোলাম (রঃ) যখন তওবা করলেন, তখন পানাহারের প্রতি তার মোটেই আকর্ষণ ছিল না। তার স্নেহময়ী জননী বলতেন— বাছা, নিজের নফসের প্রতি নম্র হও। তিনি বলতেন— মা, আমি আরামই চাই। এখন সামান্য কষ্ট করে নিতে দাও। এরপর সুদীর্ঘকাল আরামই করব।

রবী' ইবনে খায়ছামের কন্যা পিতাকে জিজ্ঞাসা করত— আব্বাজান, ব্যাপার কি? সব মানুষ ঘুমায় কিন্তু আপনি ঘুমান না? তিনি বলতেন, বেটী, আমি আগুনকে ভয় করি। তার জননী পুত্রের কান্নাকাটি ও রাত্রি জাগরণের অবস্থা দেখে একদিন বলল ঃ বাছা, তুমি বোধ হয় কাউকে খুন করেছ। ফলে, এমন উদ্বিগ্ন থাক। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, মা। মা বলল ঃ কে সেই ব্যক্তি? আমি তার আত্মীয়-স্বজনকে খোঁজ করব, যাতে তারা তোমাকে মাফ করে দেয়। তোমার এই দুরবস্থা তারা দেখলে অবশ্যই দয়ার্দ্র হয়ে ক্ষমা করে দেবে। তিনি বললেন ঃ মা, সেতো আমার নফস। রবী' বলেন ঃ আমি হযরত ওয়ায়স করনী (রহঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁকে ফজরের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নামাযের পর বসা অবস্থায় পেলাম। আমিও বসে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, তাঁর ওযীফায় বাধা দেয়া উচিত হবে না। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না, এমনকি যোহর পড়লেন। যোহরের পর আসর পর্যন্ত একটানা নামায পড়তে থাকলেন। আসরের পর নিজের জায়গায় বসে গেলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত বসে রইলেন। মাগরিবের বৈঠকে বসলেন এবং এশা পড়লেন। এরপর আবার বসে রইলেন। অবশেষে ফজরের নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে বললেন ঃ ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই এমন চক্ষু থেকে, যে চক্ষু ঘুমিয়ে পড়ে এবং এমন পেট থেকে, যে তৃপ্ত হয় না। আমি মনে মনে বললাম ঃ তাঁর কাছ থেকে আমার এতটুকুই যথেষ্ট। অতঃপর চলে এলাম।

জনৈক আবেদ বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি সবেমাত্র এশার নামায সমাপ্ত করেছেন। অতঃপর তিনি কি করেন, তা দেখার জন্যে আমি বসে রইলাম। তিনি নিজেকে একটি কম্বলে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন এবং সারারাত একবারও পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন না। অবশেষে ভোর হল। মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে নামাযে শরীক হলেন। কিন্তু উযু করলেন না। এতে আমার মনে খটকা বাজল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি সারারাত শুয়ে ঘুমালেন। এরপরও নতুন উযু করলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি তো সারারাত কখনও জান্নাতের বাগ-বাগিচায় এবং কখনও দোযখের জঙ্গলসমূহে ছুটাছুটি করেছি। এমতাবস্থায় কি ঘুম আসে?

হযরত আলী (রাঃ)-এর জনৈক সহচর বর্ণনা করেন— আমি তাঁর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি ডানদিকে ফিরে বসলেন। তিনি কিছুটা চিন্তান্বিত ছিলেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি এভাবেই বসে রইলেন। অতঃপর বামদিকে ফিরে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি। আজকাল তাদের অনুরূপ কোন দ্বীনদারী দেখা যায় না। তারা ভোরবেলা মলিন, ফ্যাকাসে ও এলোকেশে গাত্রোত্থান করতেন। রাত সেজদা ও নামাযে কাটিয়ে দিতেন এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন। যখন যিকির করতেন, তখন ঝড়ের দিনে গাছ যেমন আন্দোলিত হয়, তেমনি আন্দোলিত হতেন। তাদের চোখের অশ্রু পরনের বস্ত্র ভিজিয়ে দিত। কিন্তু আজকাল আপনারা কি করেন, সারারাত গাফেল হয়ে নিদ্রা যান।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আবু মুসলিম খওলানী তাঁর নামাযের ঘরে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের নফসকে ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন— মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ হয়তো মনে করবেন, দ্বীনদারী কেবল তাঁরাই করে গেছেন, অন্যরা এতে তাঁদের সাথে শরীক হয়নি। আল্লাহর কসম, আমিও একাজে তাঁদের সাথে উত্তমরূপে যোগদান করব, যাতে তাঁরাও জানেন তাঁদের পেছনে কিছু লোক রয়ে গেছে।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন ঃ আমার নিয়ম ছিল প্রত্যহ সকালে উঠে প্রথমে আমার ফুফী আম্মা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করা। একদিন সকালে গিয়ে দেখি, তিনি চাশতের নামায পড়ছেন। নামাযে فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ আয়াতখানি বারবার পাঠ করে কাঁদছেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তাঁর নামায ও ক্রন্দন শেষ হচ্ছিল না। বিলম্ব দেখে আমি এই মনে করে বাজারে চলে গেলাম যে, প্রথমে নিজের কাজ শেষ করে পরে এসে সালাম করে যাব। আমি কাজ শেষ করে ফিরে এসে তাঁকে পূর্ববৎ ক্রন্দনরত ও দোয়ারত অবস্থায় পেলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে আমার বাড়িতে অতিথি হন। হঠাৎ তাঁর একটি পা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে এশার উযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মৃত্যুকে মোটেই ভয় করি না; কেবল আশংকা করি, আমার তাহাজ্জুদের নামায বন্ধ হয়ে না যায়!

হযরত হাসানকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এর কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ নূর থেকে কিছু নূর পরিয়ে দেন।

মোটকথা, এ হচ্ছে পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোজাহাদা ও মুরাকাবার অবস্থা। এখন যদি তোমার নফস অবাধ্য হয় এবং এবাদতে শৈথিল্য করে, তবে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা কর। কেননা, এধরনের লোকদের অস্তিত্ব এখন বিরল। আর যদি তাদেরকে দেখার ভাগ্য হয় এবং দেখে অনুসরণ করতে পার, তবে সোনার উপর সোহাগা। কেননা, অনুসরণের ক্ষেত্রে দেখার প্রভাব শোনার চেয়ে বেশী।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যদি তোমার নফস বলে পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো যবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাদের অনুসরণের সাধ্য আমাদের নেই, তবে যে সব মহিলা এবাদতে মোজাহাদা করে গেছেন, তাদের ঘটনাবলী পাঠ করে আপন নফসকে বল ঃ হতভাগা, তোর লজ্জা নেই? তুই কি অবলা মহিলাদেরও পেছনে পড়ে থাকবি? পুরুষ হয়ে দুনিয়া অথবা দ্বীনের ব্যাপারাদিতে মহিলাদের পেছনে পড়ে থাকা খুবই অপমানের কথা।

এখন আমরা মহিলাদের মধ্যে যারা মোজাহাদা করেছে, তাদের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করব।

বর্ণিত আছে, হাবীবা আদভিয়া যখন এশার নামায শেষে নিজের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, ইলাহী, তারকারাজি বিচ্ছুরিত হয়েছে, চক্ষুসমূহ মুদিত হয়ে গেছে, বাদশাহরা দরজা বন্ধ করে নিয়েছে এবং প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর সাথে একান্তে চলে গেছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। এরপর তিনি নামায পড়তে থাকতেন। ফজর হয়ে গেলে বলতেন, ইলাহী, রাত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং দিন আলোকিত হয়েছে। আমি জানি না, তুমি আমার এই রাত কবুল করেছ কিনা। কবুল করার কথা জানলে নিজেকে মোবারকবাদ দিতাম। আর নামনযুর করার কথা জানলে অনুতাপ প্রকাশ করতাম। তোমার ইযযতের কসম, যতদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখবে, এ কর্মপন্থা অব্যাহত রাখব। তুমি আমাকে নিজের দরজা থেকে ধাক্কা দিলেও আমি এতটুকুও টলব না। কেননা, আমার অন্তরে তোমার কৃপা ও দান অনেক।

আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আমার একটি রোমীয় বাঁদী ছিল। তার প্রতি আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলাম। একরাতে যখন সে আমার কাছে ঘুমিয়ে ছিল, তখন আমি জেগে দেখি, সে বিছানায় নেই। আমি তাকে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদে গেলাম। দেখি, সে মাটিতে পড়ে বলে যাচ্ছে— ইলাহী, আমার প্রতি তোমার যে মহব্বত, তার ওসীলায় আমাকে ক্ষমা কর। আমি বললাম ঃ আমার প্রতি তোমার যে মহব্বত— একথা বলো না; বরং বল ঃ তোমার প্রতি আমার যে মহব্বত, তার ওসীলায় আমার গোনাহ মাফ কর। বাঁদী বলল ঃ প্রভু, তা নয়। তিনিই আমাকে মহব্বত করেন। সে কারণেই তো আমাকে শিরক থেকে বের করে ইসলাম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং আমাকে রাতের বেলায় জাগিয়ে রেখেছেন।

আবু হাশেম কারশী বলেন ঃ একবার ইয়ামনের সারিয়্যা নাম্নী এক মহিলা আমাদের ঘরে এসে অবস্থান করে। রাত হলেই আমি তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেতাম। একদিন আমি আমার খাদেমকে বললাম ঃ এই মহিলাকে উঁকি দিয়ে দেখ তো সে কি করছে? সে দেখে জানতে পারল সে অনিমেষ নেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলামুখী হয়ে বলে যাচ্ছে ঃ ইলাহী, তুমি সারিয়্যাকে সৃষ্টি করেছ, অতঃপর নিজের নেয়ামত খাইয়ে লালন-পালন করেছ এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রেখেছ। তোমার সকল অবস্থাই তার জন্যে কল্যাণকর। তোমার দেয়া বিপদাপদ তার ধারণায় সদ্ব্যবহার। এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে তোমার ক্রোধের সামনে পেশ করে এবং বিনা দ্বিধায় তোমার নাফরমানী করার দুঃসাহস করে। তুমি কি জান, তার ধারণায় তার কুকর্ম তুমি দেখ না? অথচ তুমি সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমান।

যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ একরাতে আমি কানআন উপত্যকা থেকে বের হলাম। উপত্যকার উপরে পৌঁছে দেখি, আমার সামনে দিয়ে একটি কাল বস্তু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বলছে وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ এবং কাঁদছে। সে কাছে এলে জানা গেল, ছোট বালতি হাতে পশমী জোব্বা পরিহিতা এক মহিলা। সে বলল ঃ তুমি কে, আল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে অন্যের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ? আমি বললাম ঃ একজন পুরুষ মুসাফির। সে বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তা'আলা আছেন— এতদসত্ত্বেও মুসাফির হওয়ার কি অর্থ? আমি তার কথায় কেঁদে ফেললাম। সে প্রশ্ন করল ঃ কাঁদলে কেন? আমি বললাম ঃ ঔষধ এমন ব্যথার উপর পড়েছে যাতে যখম হয়ে গেছে। সে বলল ঃ তুমি সত্যবাদী হলে কান্নার কোন কারণ নেই। আমি বললাম ঃ সত্যবাদীরা কাঁদে না নাকি? সে বলল ঃ না। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ কান্না অন্তরের একটি সুখ। তার কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। আমি কিছুই বললাম না।

ইবনে আলা সাদী বলেন ঃ আমার পিতৃব্য কন্যা বরীরা খুব এবাদত করত এবং কোরআন অত্যধিক তেলাওয়াত করত। সে যখন দোযখের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত পাঠ করত, তখন ভীষণ কাঁদত। অধিক কান্নার ফলে অবশেষে তার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেল। তার চাচাত ভাইয়েরা পরস্পর বলল ঃ চল, আমরা অধিক কান্নার জন্য তাকে তিরস্কার করি। সেমতে আমরা সবাই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ বরীরা, তুমি কেমন আছ? সে জওয়াব দিল, অতিথি হয়ে অজানা ভূমিতে পড়ে আছি। কবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ডাক পড়বে, তারই অপেক্ষায় আছি। আমরা বললাম ঃ তাহলে এই কান্না আর কতদিন চলবে? দৃষ্টিশক্তি তো রহিতই হয়ে গেছে। সে বলল ঃ যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার চোখের কোন কল্যাণ থেকে থাকে, তবে যা নষ্ট হয়েছে, তা ক্ষতি। আর যদি তার কাছে এই চোখের অনিষ্ট থেকে থাকে, তবে আরও বেশী ক্রন্দন করা দরকার। একথা বলে বরীরা মুখ ফিরিয়ে নিল। অতঃপর তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে আমরা চলে এলাম।

খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ আমরা একবার রাহেলা আবেদার কাছে গেলাম। সে রোযা রাখতে রাখতে কৃষ্ণবর্ণ, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ এবং নামায পড়তে পড়তে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ফলে, বসে বসেই নামায পড়ত। আমরা তাকে সালাম করে আল্লাহ তা'আলার কিছু ক্ষমাগুণ বর্ণনা করলাম, যাতে তার এবাদত সহজ হয়। সে শুনে এক বুকফাটা চিৎকার দিয়ে বলল ঃ من آنم كه من دانم. অর্থাৎ, আমি কে, তা আমিই জানি! এই আত্মোপলব্ধির কারণে আমার অন্তর আহত এবং কলিজা খণ্ড-বিখণ্ড। হায়, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সৃষ্টি না করতেন এবং দুনিয়াতে আমার কথা আলোচিত না হত! একথা বলে সে নামায পড়তে লাগল।

সুতরাং তুমি যদি নিজের নফসের দেখাশুনা ও হেফাযত করতে চাও, তবে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ও মহিলাগণের অবস্থা দেখ, যাতে তোমার মাঝেও মোজাহাদার বাসনা জাগ্রত হয়! তুমি নিজের সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর প্রতি কখনও তাকিয়ো না। কারণ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

অর্থাৎ, "যদি তুমি পৃথিবীবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"

এছাড়া কাফের সম্প্রদায়কে সমসাময়িক লোকদের সাথে একাত্মতাই ধ্বংস করেছে। তারাও বলেছিল ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ –

অর্থাৎ, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এক ধর্মপথে পেয়েছি; আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটকথা, তুমি নফসকে শাসন করতে থাক এবং মোজাহাদার পথে ধাবিত হও। নফস অমান্য করলে তাকে তিরস্কার ও ধমক দাও।

নফসের শাসন ও নিন্দা ঃ মানুষের সর্ববৃহৎ শত্রু হল তার নফস। বগলের এই সর্পটি মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম থেকে পলায়ন করে। তাই মানুষ একে শুদ্ধ করতে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদতে আকৃষ্ট করতে এবং কামনা-বাসনা থেকে আলাদা রাখতে নির্দেশিত হয়েছে। মানুষ যদি এ শত্রুর খবর না নেয়, তবে সে অবাধ্য হয়ে পলায়ন করে এবং এরপর আর বশে আসে না। পক্ষান্তরে যদি সর্বক্ষণ ভীতিপ্রদর্শন, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে, তবে এ নফসই নফসে লাওয়ামা (তিরস্কারকারী নফস) হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে এরই কসম খেয়েছেন। এরপর আশা করা যায় এই নফস ক্রমান্বয়ে 'নফসে মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত নফস) হয়ে যাবে, যাকে সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন অবস্থায় আহবান করা হবে। অতএব, মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে কোন সময় নফসকে উপদেশ দান ও তাকে শাসন করা থেকে গাফেল না থাকা। অপরকে উপদেশ দেয়ার পূর্বে নিজের নফসকে উপদেশ দেবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এ মর্মে ওহী নাযিল করেন— হে মরিয়ম-তনয়, তুমি নিজের নফসকে উপদেশ দাও। যদি সে উপদেশ মেনে নেয়, তবে অপরকে উপদেশ দাও। অন্যথায় আমার কাছে লজ্জিত হও। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে এরশাদ করেন—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, হে নবী উপদেশ দিন। উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।

এর পদ্ধতি হল, নফসকে সম্বোধন করে তার নির্বুদ্ধিতা, বোকামি ও মূর্খতা প্রমাণ করা। কারণ, নফস সর্বদাই নিজের বিচক্ষণতা ও হেদায়েতকে বড় করে দেখে এবং তাকে বোকা বলা হলে অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং এভাবে বলবে— হে নফস, তুই তো নিজকে প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় পাকাপোক্ত মনে করিস; কিন্তু তোর সমান বোকা ও স্বল্পজ্ঞানী কেউ নেই। তোর তো জানা আছে যে, জান্নাত ও দোযখ তোর সামনে রয়েছে। তন্মধ্যে যে কোন একটিতে তুই সত্বরই প্রবেশ করবি। এমতাবস্থায় তোর খুশী হওয়া, হাস্য করা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হওয়ার কারণ কি? যে মৃত্যুকে তুই দূরে মনে করিস, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নিকটবর্তী। তোর কি জানা নেই যে, মৃত্যু হঠাৎ আসে। মৃত্যু হঠাৎ না এলেও রোগব্যাধি তো হঠাৎ আসে, যা মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়! তোর কি হল যে, মৃত্যু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তোর কোন প্রস্তুতি নেই? তুই কি নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম বুঝিস না?

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ - مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ -

অর্থাৎ, মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী, কিন্তু তারা উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা তা কৌতুকচ্ছলে শুনে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।

যদি তুই মনে করিস, আল্লাহ তা'আলা তোকে দেখেন না, এজন্য তাঁর নাফরমানী করিস, তবে তুই বড় কাফের। আর আল্লাহ তোর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত একথা বিশ্বাস করেও যদি নাফরমানী করিস, তবে তুই বড় নির্লজ্জ।

হে নফস, দেখ তোর পালনকর্তা বলেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রতিটি জীবের রিযিক আল্লাহরই দায়িত্বে।

আখেরাত সম্পর্কে বলেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى -

অর্থাৎ মানুষ যা চেষ্টা করে, কেবল তাই পায়।

এ দু'টি আয়াত থেকে জানা যায়, বিশেষত দুনিয়ার রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। এতে তোর চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। আর আখেরাতকে তোর উপার্জনের মধ্যে সীমিত রেখেছেন। কিন্তু তুই নিজের কর্মের দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিস। যে

1st-5th part

দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে তোর চেষ্টা-চরিত্রের সীমা-পরিসীমা নেই। আর আখেরাতের বিষয়, যা তোর চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, তাতে তোর অবহেলা ও শৈথিল্যের অন্ত নেই। এটা ঈমানের পরিচায়ক নয়। যদি মৌখিক ঈমানই গ্রহণীয় হত, তবে মুনাফিকের স্থান দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে কেন হত? হতভাগা, মনে হয় তুই হিসাব দিবসে বিশ্বাস করিস না। তোর ধারণা, মৃত্যুর পর তুই এমনিই রেহাই পেয়ে যাবি! কখনও তা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى -

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেছেন ও সুঠাম করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন?

এরপর যদি তুই ধারণা করিস, তোকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে, তবে তোর মত মূর্খ কেউ নেই এবং তুই মস্ত কাফের। চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তোকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ -

অর্থাৎ, মানুষ নিপাত যাক! সে কত অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ তাকে কি বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? বীর্য দিয়ে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে সমাহিত করেন। অতঃপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

হে নফস, যদি তুই আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা মনে না করিস, তবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাবধান হচ্ছিস না কেন? যদি কোন ইহুদী ডাক্তার তোকে বলে দেয় যে, তোর রোগে অমুক খাদ্য ক্ষতিকর, তবে সে খাদ্য তোর কাছে সর্বাধিক সুস্বাদু হলেও তুই তা ছেড়ে দিবি এবং সবর করে নিবি। এখন জিজ্ঞাস্য, যে পয়গম্বরকে আল্লাহ মোজেযা দিয়ে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কথা এবং ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার কথা তোর কাছে কি এক ইহুদী ডাক্তারের কথারও সমান নয়? অথচ সে বিনা প্রমাণে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিও অসম্পূর্ণ। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোর অবস্থা যদি চতুষ্পদ জন্তুদের কাছে উন্মোচিত হয়, তবে তারাও না হেসে পারবে না।

হে হতভাগা, পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকার করিস না। তুই নিজেই নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর। হেলায় সময় নষ্ট করিস না। এ জীবন গনাগুনতি কয়েক দিনের। রুগ্ন হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং কর্মব্যস্ততার পূর্বে অবসর মুহূর্তকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাতে শিখ। আখেরাতে যতদিন থাকতে হবে, সে পরিমাণে তার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দুনিয়াতেও তো তাই করিস। শীতের মেয়াদ যতদিনের হয়, ততদিনেরই সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করিস। খাদ্য, পোশাক ও খড়ি সংগ্রহ করিস। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর হেলান দিয়ে থাকিস না যে, তিনি জোব্বা, পশম, লাকড়ী ইত্যাদি ছাড়াই শীতের কষ্ট দূর করে দেবেন। অথচ তিনি তাও করতে সক্ষম। তুই কি মনে করিস যে, শীতকালের শৈত্যের তুলনায় জাহান্নামের ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে শৈত্য কম হবে? বরং দুনিয়ার শীত যেমন গরম কাপড়, আগুন ইত্যাদি ছাড়া প্রশমিত হয় না, তেমনি জাহান্নামের শীতও তাওহীদ ও আনুগত্যের লেফ ছাড়া দূর হবে না। আল্লাহ তা'আলার এই কৃপা কম নয় যে, তিনি তোকে এই শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলে দিয়েছেন। এর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। লাকড়ী কেনা, গরম কাপড় নেয়া যেমন আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়, তিনি এগুলোর উর্ধ্বে; বরং এসব সামগ্রী কেবল তোর আরামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি যত এবাদত ও মোজাহাদা রয়েছে, সেগুলো থেকেও তিনি বেপরওয়া। এগুলো কেবল তোর মুক্তির জন্যে। অতএব, যে কেউ ভাল করবে, তা নিজের জন্যে এবং খারাপ করবে, তাও নিজের জন্যে। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু থেকে বেপরওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হে নফস, তুই আল্লাহ তা'আলার সওয়াব, আযাব ও কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ গাফেল। এ কারণেই মৃত্যুর প্রতি তোর ঈমান ও বিশ্বাস নেই। যদি কেউ রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে এক দরজা দিয়ে ঢুকার পর অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে, এরপর বিরহ নিশ্চিত জেনেও সেই প্রাসাদের কোন সুন্দর বস্তুতে সর্বান্তকরণে ব্যাপৃত হয়ে যায়, তবে সে বুদ্ধিমান হবে, না বুদ্ধির দুশমন? এমনিভাবে দুনিয়া রাজাদের রাজা আল্লাহ তা'আলার ঘর। তোকে এখানে কেবল স্বল্পক্ষণ বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখানে যত বস্তু-সামগ্রী রয়েছে, সেগুলো কারও সাথে যায় না। মৃত্যুর পর দুনিয়াতেই থেকে যায়। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان روح القدس نفث في روحي احبب ماشئت فانك مفارقه

واعمل ماشئت فانك تجزى به وعش ما شئت فانك ميت –

অর্থাৎ, জিবরাঈল আমার অন্তরে একথা স্থাপন করেছেন, যে বস্তুকে ইচ্ছা মহব্বত কর, তা থেকে বিচ্ছিন্ন অবশ্যই হবে। যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং যতদিন ইচ্ছা জীবন ধারণ কর, মরতে তোমাকে হবেই।

তোর কি জানা নেই, মৃত্যু পেছনে থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়, সে যখন দুনিয়া ছেড়ে যায়, তখন অনেক বেদনা সাথে নিয়ে যায়। প্রত্যেকেই বসবাসের জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে। অথচ তার থাকার জায়গা হয় ভূগর্ভস্থ কবর। দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হবে? কেউ নিজের দুনিয়া আবাদ করে অথচ এখান থেকে সফর অবশ্যই করবে। কেউ নিজের আখেরাত বরবাদ করে অথচ সেখানে অবশ্যই যাবে।

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নবম অধ্যায়

ফিকর ও ইবরত

(চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা)

হাদীস শরীফে আছে— এক মুহূর্তের চিন্তাভাবনা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। কোরআন পাকে শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তাভাবনার প্রতি অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চিন্তা-ভাবনা খোদায়ী নূর ও আলোর চাবিকাঠি এবং অন্তর্দৃষ্টির উপায়। অনেক মানুষ চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত; কিন্তু তারা এর স্বরূপ ও ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা জানে না চিন্তাভাবনা কেমন করে করতে হয়, কি কি বিষয়ে করতে হয় এবং কেন করতে হয়? এসব বিষয় বর্ণনা করা জরুরী। তাই আমরা প্রথমে চিন্তাভাবনার ফযীলত, অতঃপর তার স্বরূপ ও ফলাফল বর্ণনা করব। এরপর যেখানে যেখানে চিন্তাভাবনা চলে, সেসব স্থান বর্ণনা করব।

চিন্তাভাবনার ফযীলত ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআন মজীদের বহু স্থানে চিন্তাভাবনার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন। এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তাভাবনা করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে, তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন— কিছু লোক আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে রসূলে আকরাম (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর— স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। কেননা, তাঁর সুউচ্চ মহিমা উদঘাটন করতে তোমরা কখনও সক্ষম হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বর্ণিত আছে, একদিন রসূলে করীম (সাঃ) কয়েকজন লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন চিন্তাভাবনায় মশগুল। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি, তোমরা কথা বলছ না কেন? তারা আরয করল ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলাম। তিনি বললেন ঃ বেশ তাই কর। স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। এখান থেকে কাছেই একটি শুভ্র ভূখণ্ড আছে, যার আলো শুভ্র। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এমন সব লোক বসবাস করে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী একদম করে না। তারা আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শয়তান তাদের কোন্ দিকে থাকে? তিনি বললেন ঃ শয়তান সৃজিত হয়েছে কি না সে কথাই তারা জানে না। তারা আরয করল ঃ তারা কি হযরত আদমের সন্তান? উত্তর হল ঃ আদম পয়দা হয়েছে কি না, তারা তাও জানে না।

আত্তার বর্ণনা করেন— একদিন আমি ও ওবায়দ ইবনে ওমায়র হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওবায়দ, তুমি ইদানীং আমার কাছে আসছ না কেন? ওবায়দ আরয করলেন ঃ কারণ রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— زرغبا تزدد حبا –'বিরতি দিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ কর। এতে মহব্বত বৃদ্ধি পারে।' অতঃপর ওবায়দ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এমন কোন আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করুন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে দেখেছেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ তাঁর সব কিছুই ছিল আশ্চর্যজনক। এক রাতে তিনি আমার কাছে এলেন এবং আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের এবাদত করতে দাও। এরপর তিনি উঠে একটি মশক থেকে পানি নিয়ে উযু করলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি এত কাঁদলেন যাতে শ্মশ্রু মোবারক ভিজে গেল। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। মুয়াযযিন বেলাল ফজরের নামাযের কথা জানাতে এসে তাঁকে নামাযের বিছানায় শায়িত দেখে বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত গোনাহ মোচন করে দিয়েছেন। এরপরও আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন ঃ হে বেলাল, আমি কাঁদব না কেন? আজ রাতে আমার প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে ব্যক্তির দুর্ভোগ, যে এ আয়াত পাঠ করে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ওফাতের পর এক বসরাবাসী তার মায়ের কাছে তার এবাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করল। হযরত আবু যরের মা বললেন ঃ সে সমস্ত দিন ঘরের কোণে বসে বসে চিন্তাভাবনা করত। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ চিন্তাভাবনা একটি দর্পণ। তাতে মানুষের সৎকর্ম ও কুকর্মসমূহের প্রতিফলন ঘটে।'

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে বলা হল ঃ আপনি খুব বেশী চিন্তাভাবনা করেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ চিন্তাভাবনা জ্ঞান-বুদ্ধির নির্যাস।

তাউস বর্ণনা করেন— ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ তাঁর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রূহুল্লাহ, আজ ভূপৃষ্ঠে আপনার সমান কেউ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যার কথাবার্তা যিকর হয় এবং চুপ থাকা ফিকর হয়, সে আমার সমান।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা চমৎকার এবাদত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক একদিন সহল ইবনে আলীকে নিশ্চুপ ও চিন্তান্বিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় পৌছে গেছেন? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতে।

আবু শোরায়হ একদিন চলতে চলতে হঠাৎ পথের মধ্যেই বসে পড়লেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমার বয়স চলে যাওয়া, আমল কম হওয়া এবং মৃত্যু নিকটে এসে পড়ার চিন্তা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

ইসহাক ইবনে খলফ বলেন ঃ দাউদ তাঈ জোছনা রাতে এক ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কেঁদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে এক প্রতিবেশীর ঘরের উপর পড়ে গেলেন। গৃহকর্তা চোর মনে করে তরবারি হাতে তাঁর দিকে দৌড়ে এল। অতঃপর দাউদকে দেখে তরবারি রেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাকে ছাদের উপর থেকে কে ফেলে দিল? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিস হচ্ছে তাওহীদের ময়দানে ফিকর সহকারে বসে মারেফতের বায়ু সেবন করা, একত্বের দরিয়া থেকে মহব্বতের পেয়ালা পান করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা সহকারে দর্শন করা। অতঃপর বলেন ঃ এই মজলিসগুলো খুবই উত্তম এবং এই পানীয়গুলো খুবই সুস্বাদু। সুখী সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা এগুলো দান করেন।

চিন্তাভাবনার স্বরূপ ও ফলাফল ঃ ফিকরের অর্থ অন্তরে দু'টি মারেফত উৎপন্ন করা, যাতে এগুলোর সাহায্যে তৃতীয় একটি মারেফত অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কোনরূপে একথা জানতে আগ্রহী হয় যে, দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। এখন এ জ্ঞান অর্জন করার দু'টি উপায় আছে। প্রথমত, আখেরাত যে উত্তম, একথা অপরের কাছে শুনা এবং শুনামাত্রই তা সত্য বলে মেনে নেয়া। এ উপায়ের মধ্যে বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান কার্যকর থাকে না। কেবল অপরের কথায় আস্থা স্থাপন করে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবক্তা হওয়া যায়। এ উপায়কে বলা হয় "তাকলীদ"। অর্থাৎ, অনুসরণ। দ্বিতীয়ত, প্রথমে একথা জানা যে, স্থায়ী ও চিরন্তন বস্তু অবলম্বন করা উত্তম। এরপর জানা যে, আখেরাত চিরন্তন। এ দু'টি মারেফত তথা জানার সাহায্যে একটি তৃতীয় মারেফত অর্জন করা। অর্থাৎ, আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। বলা বাহুল্য, এই তৃতীয় বিষয়টি জানা প্রথমোক্ত দু'টি বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং তৃতীয় মারেফত পর্যন্ত পৌছার জন্যে অন্তরে প্রথমোক্ত দু'টি মারেফত উৎপন্ন করাকে বলা হয় ফিকর, তাফাক্কুর, তাদাব্বুর ও তায়াম্মুল। এসব শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমার্থবোধক।

চিন্তাভাবনার উপকারিতা হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং যে মারেফত অর্জিত ছিল না, তা অর্জিত হওয়া। অন্তরে যখন মারেফতসমূহ এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহীত হয়, তখন সেগুলো থেকে আরও মারেফত নির্গত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, নতুন মারেফতটি প্রথম মারেফতের ফল। যখন এই নতুন মারেফতটি অন্য মারেফতের সাথে যোগ হয়, তখন এ থেকে আরও একটি ফল অর্জিত হয়। এমনিভাবে ফল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জ্ঞানও বাড়তে থাকে। মারেফতের এই প্রবৃদ্ধি মৃত্যু অথবা অন্য কোন বাধার কারণেই শুধু বন্ধ হতে পারে।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সে ব্যক্তিই অর্জন করতে পারে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে ফললাভ করতে সক্ষম এবং চিন্তাভাবনার পন্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। কারণ, তাদের কাছে পুঁজিই নেই। অর্থাৎ, সে মারেফত নেই, যা দ্বারা অন্য মারেফত সৃষ্টি হয়, যেমন কারও কাছে মূলধন না থাকলে সে মুনাফা অর্জন করতে পারে না। মাঝে মাঝে মূলধন থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুন জানা না থাকার কারণে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে কখনও মানুষের কাছে মারেফত থাকে, কিন্তু সেগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে না, যাতে ফল লাভ হয়। ব্যবহার পদ্ধতির জ্ঞান কখনও অন্তরে খোদায়ী নূরের কারণে জন্মগতভাবে অর্জিত হয়, যেমন, পয়গম্বরগণের ছিল। এটা খুবই বিরল। কখনও শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এ জ্ঞান অর্জিত হয়। এটাই মানুষের মধ্যে বেশী।

চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে কখনও মারেফত আসে এবং ফলও অর্জিত হয়। কিন্তু অর্জিত হওয়ার অবস্থা সে জানে না এবং বর্ণনা করতে পারে না। বর্ণনা শাস্ত্রে দক্ষতার অভাবই এর কারণ। উদাহরণতঃ অনেক মানুষ জানে আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। কিন্তু তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কখনও বর্ণনা করতে সক্ষম হয় না।

সারকথা, ফিকর হচ্ছে অর্জিত দু'টি মারেফত দ্বারা তৃতীয় মারেফত অর্জন করা। এর ফল জ্ঞান, হাল, আমল ইত্যাদি সবই হতে পারে। কিন্তু এর বিশেষ ফল হচ্ছে জ্ঞান। তবে অন্তরে যখন জ্ঞান অর্জিত হয়, তখন অন্তরের হাল বদলে যায়। বদলে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলও বদলে যায়। কেননা, আমল হালের অনুসারী, হাল জ্ঞানের এবং জ্ঞান ফিকরের অনুগামী। এ থেকে জানা গেল যে, ফিকর যাবতীয় নেক আমলের মূল ও উৎস। এ থেকে ফিকরের ফযীলতও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় যে, ফিকর যিকরের তুলনায় উত্তম। কেননা, ফিকরের মধ্যে যিকর তো থাকেই, আরও কিছু বিষয় অতিরিক্ত থাকে। যিকর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তুলনায় উত্তম; বরং আমলের উৎকর্ষ এ কারণেই সাধিত হয় যে, এতে কিছু যিকরও থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ফিকর যাবতীয় এবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই বলা হয়েছে, এক মুহূর্তের ফিকর এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

মোটকথা, এখানে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এক, তাযাক্কুর অর্থাৎ, অন্তরের দু'টি মারেফত অর্জন। দুই, তাফাক্কুর অর্থাৎ, অর্জিত দুই মারেফতের সাহায্যে তৃতীয় উদ্দিষ্ট মারেফত তলব। তিন, প্রার্থিত মারেফত অর্জিত হওয়া এবং তা দ্বারা অন্তর আলোকিত হওয়া। চার, মারেফতের নূর অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরের হাল বদলে যাওয়া। পাঁচ, অন্তরের হাল বদলে যাওয়ার মত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল বদলে যাওয়া এবং অন্তরের খেদমত করা। পাথর দ্বারা লোহাকে আঘাত করলে আগুন নির্গত হয়। তা দ্বারা স্থান আলোকোজ্জ্বল হয়। চোখে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমল করতে উদ্যত হয়। ঠিক এমনিভাবে মারেফতের নূর থেকে ফিকর জন্মলাভ করে। এই ফিকর উভয় মারেফতকে সমন্বিত করে বিশেষভাবে সাজায়, যার ফলে মারেফতের নূর ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর এই নূরের মাধ্যমে অন্তর বদলে যায় এবং পূর্বে যে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। যেমন, আগুনের আলোকে চোখের অবস্থা বদলে যায় এবং পূর্বে যা দৃষ্টিগোচর হত না, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অতঃপর অন্তরের অবস্থার দাবী অনুযায়ী আমলের জন্যে অঙ্গ গতিশীল হয়। যেমন, অন্ধকারের কারণে যে ব্যক্তি কাজ করতে পারত না, আলো আসার পর সে কাজে তৎপর হয়। সুতরাং জানা গেল ফিকরেরই ফল হচ্ছে জ্ঞান ও হাল। এই জ্ঞান ও হাল অসংখ্য ও অগণিত।

ফিকরের পথ ঃ ফিকর কখনও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদিতে এবং কখনও ধর্ম সম্পর্কিত নয়— এমন বিষয়াদিতে হয়ে থাকে। এখানে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ফিকর বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে পাওয়া যায়। এখন ফিকর বান্দা, তার গুণাবলী ও হাল সম্পর্কিত বিষয়ে হবে, অথবা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে হবে। বান্দা সম্পর্কিত বিষয়ের ফিকর দু' রকম। এক– বান্দার এমন হাল নিয়ে ফিকর, যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় এবং দুই– বান্দার এমন হাল নিয়ে ফিকর, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। এ দু'টি প্রকার ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ফিকর করার প্রয়োজন নেই।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত ফিকরও দুই প্রকার। এক— আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও সুন্দর নামসমূহ (আসমায়ে হুসনা) নিয়ে ফিকর এবং দুই— তাঁর ক্রিয়াকর্ম, সাম্রাজ্য, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু নিয়ে ফিকর। নিম্নে আমরা ফিকরের উপরোক্ত চারটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

(১) বান্দার গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে ফিকর করার উদ্দেশ্য একথা জানা যে, বান্দার কোন্ কোন্ গুণ ও কর্ম আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং কোন্গুলি অপছন্দ করেন। এই গুণ ও কর্ম আবার দু'প্রকার— বাহ্যিক; যেমন, এবাদত ও গোনাহ এবং অভ্যন্তরীণ; যেমন, উদ্ধারকারী ও ধ্বংসকারী গুণাবলী। দ্বিতীয় প্রকারের পাত্র হচ্ছে বান্দার অন্তর। পূর্বেকার খণ্ডগুলোতে এসব গুণা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আমরা গোনাহ, এবাদত, ধ্বংসকারী গুণ ও উদ্ধারকারী গুণ— এই প্রকার চতুষ্টয়ের জন্যে এক একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব— যাতে চিন্তাভাবনার পথ খুলে যায় ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এর সাহায্যে আরও দৃষ্টান্ত বুঝে নেয়া যায়।

প্রথমত, গোনাহ সম্পর্কে মানুষের উচিত, প্রতিদিন ভোর বেলায় চিন্তা করা যে, সে কোন গোনাহ করছে কিনা? যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন গোনাহে লিপ্ত থাকে, তবে তা বর্জন করবে। অতীতে করে থাকলে তওবা ও অনুশোচনার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে নেবে। আর যদি সেদিন করবে এমন গোনাহ থাকে, তবে তা থেকে বিরত থাকার প্রস্তুতি নেবে। উদাহরণতঃ নিজের জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, এর মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, আত্মপ্রশংসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অনর্থক কথাবার্তা ইত্যাদি গোনাহ হয়ে থাকে। অতএব, এসব গোনাহের কোন একটিতে কার্যত লিপ্ত থাকলে তা বর্জন করবে এবং অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে নেবে যে, এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে গর্হিত। কোরআন ও হাদীসে এগুলোর শাস্তি বর্ণিত রয়েছে। এরপর চিন্তা করবে যে, এগুলো থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যায়। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, একান্তবাস ও একাকীত্ব অবলম্বন করা ছাড়া জিহ্বার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। এর আরেকটি উপায় কোন সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তির সংসর্গে থাকা, যাতে সে কোন অন্যায় কথা মুখ থেকে বের হলেই বাধা প্রদান করতে পারে। অথবা মানুষের কাছে বসার সময় মুখে কংকর রেখে দেয়া যায়, যাতে তা সংযমের কথা সর্বক্ষণ স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুরূপভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এরই মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, বাজে কথা, ক্রীড়াকৌতুক ও বেদআতী কথাবার্তা শ্রবণ করা হয়। এটা খারাপ কথা। অতএব, এসব বিষয় শ্রবণ করা থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে একান্তে বাস করা। অথবা সামনে কেউ এসব কথা বললে তাকে নিষেধ করা। উদর সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, উদর পানাহারে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। হালাল রিযিক মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে খাহেশ বৃদ্ধি করে, যা শয়তানের হাতিয়ার, অথবা হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য ভক্ষণ করে। অতএব দেখবে, তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবিকা কিভাবে আসে। তৎসঙ্গে হালাল রিযিকের উপায় চিন্তা করবে। এটা জেনে নেবে যে, হারাম খাদ্য খেয়ে যত এবাদতই করা হোক না কেন, সবই পণ্ডশ্রম। হালাল রিযিক এবাদতের মূল। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার পরিধেয় বস্ত্রে হারামের এক দেরহামও ব্যয়িত হয়েছে। এমনিভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে।

দ্বিতীয়ত, এবাদতের মধ্যে প্রথমে ফরয এবাদত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে যে, একে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা হয় কিনা এবং এর ত্রুটি নফল এবাদত দ্বারা পূরণ করা হয় কিনা? অতঃপর প্রত্যেক অঙ্গের এবাদত সম্পর্কে চিন্তা করবে, যে অঙ্গের যে এবাদত আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়, তা সেই অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে কিনা? উদাহরণতঃ চক্ষু দেখার জন্য সৃজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এবাদতে মশগুল থাকার জন্যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যসমূহ শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও হাদীস দেখতে হবে। এগুলো দেখে চক্ষুকে এবাদতে মশগুল করতে মানুষ সক্ষম। অতএব, চিন্তা করবে চক্ষু দ্বারা এসব করা হয় না কেন?

এমনিভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করে বলবে— আমি মযলুমের ফরিয়াদ শুনতে পারি, জ্ঞানের কথাবার্তা, কেরাআত এবং যিকর শুনতে পারি। তবে কেন কানকে বেকার রাখি? জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি জিহ্বা দ্বারা শিক্ষাদান ও ওয়ায করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। সাধু পুরুষদের অন্তরে আসন করতে পারি। ভাল ভাল কথা বলতে পারি, যার প্রত্যেকটি বাক্যই হবে সদকা। এ নেয়ামত থেকে আমি আমার জিহ্বাকে কেন বঞ্চিত রাখি? ধন-সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি অমুক ধন সদকা করতে পারি। কারণ, এর প্রয়োজন আমার নেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। অতএব, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, ধন-সম্পদ, গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এসব বস্তু মানুষের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণ, যা দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার এবাদত করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

তৃতীয়ত, চিন্তাভাবনার বিষয় বিনাশকারী গুণাবলী, সেগুলোর স্থান অন্তর। এগুলো হচ্ছে খাহেশের প্রাবল্য, ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, রিয়া, হিংসা, কুধারণা, ঔদাসীন্য, গর্ব ইত্যাদি। যদি মনে করা হয় যে, অন্তর এসব মন্দ স্বভাব থেকে পাক ও পবিত্র, তবে এর পরীক্ষা নেবে। কেননা, নফস সর্বদাই সৎকর্মের ওয়াদা করতে থাকে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীত কাজ করে। পরীক্ষা এই যে, উদাহরণতঃ নফস যদি অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার দাবী করে, তবে একটি লাকড়ীর বোঝা মাথায় চেপে বাজারে চলে যাবে, যাতে দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এমনিভাবে নফসের পরীক্ষা নিতেন। আর যদি নফস জ্ঞান-গরিমার দাবী করে, তবে এমন কোন কাজ করবে, যা অন্যের উপর ক্রোধের সঞ্চার করে, এরপর দেখবে সে ক্রোধ সংবরণ করতে পারে কিনা? এমনিভাবে সকল গুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত যে, এসব গুণ তার মধ্যে আছে কিনা? যদি কোন লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, অমুক গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তবে এমন উপায় চিন্তা করবে, যাতে সে গুণটি তার দৃষ্টিতে মন্দ প্রতিভাত হয় এবং তার কারণ যে মূর্খতা, তা ফুটে উঠে। উদাহরণতঃ যদি নিজের মধ্যে অহংকার গুণটি পায়; তবে নফসকে এভাবে বুঝাবে যে, তুই নিজেকে কেন বড় মনে করিস? বড় তো সেই, যে আল্লাহ তা'আলার কাছে বড়। মৃত্যুর পরই জানা যাবে তাঁর কাছে কে বড়! বাহ্যত এমনও হয় যে, এক জন কাফের আজীবন কুফর করে মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে মরতে পারে এবং একজন মুমিন অন্তিম মুহূর্তে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। অহংকারের এ বিপর্যয় জানার পর এটা দূর করার প্রতিকার চিন্তা করবে। বলা বাহুল্য, এর প্রতিকার হচ্ছে বিনম্র লোকদের অনুরূপ কাজকর্ম অবলম্বন করা।

চতুর্থত, উদ্ধারকারী গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। এগুলো হচ্ছে তওবা ও গোনাহের জন্যে অনুশোচনা, বিপদে সবর, নেয়ামতে শোকর, ভয়, আশা, সংসার-বিমুখতা, এখলাস, সত্যবাদিতা, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তাযীম, আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি, নম্রতা, বিনয় ইত্যাদি। অতএব, বান্দার প্রত্যহ চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, এগুলোর মধ্য থেকে তার কোন্ গুণটির প্রয়োজন। এরপর উদাহরণতঃ যদি তওবা ও অনুশোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে প্রথমে নিজের গোনাহসমূহ অনুসন্ধান করবে। নফসের কাছে সবগুলোকে একত্রিত করবে। অতঃপর শরীয়তে বর্ণিত এসব গোনাহের শাস্তির কথা ভাববে। এরপর মনে মনে বলবে— আমি আল্লাহ তা'আলার গযবের কাজ করছি। এই উপায়ে বান্দার মধ্যে তওবা ও অনুশোচনার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে। যদি শোকরের অবস্থা সৃষ্টি করা লক্ষ্য হয়, তবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি ও নেয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করবে। একথাও ভেবে দেখবে যে, তিনি নিজ কৃপায় কেমন পর্দা ফেলে রেখেছেন। গোনাহের কারণে বান্দাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করেননি। ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে প্রথমে নিজের যাহেরী ও বাতেনী গোনাহসমূহের প্রতি তাকাবে। এরপর মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা, মৃত্যুর পর মুনকির-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সওয়াল, কবরের আযাব, সাপ, বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গের দংশন, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, চুলচেরা হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাতের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে। অতঃপর দোযখ সম্পর্কে কালামে মজীদে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোকে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত রাখবে। এভাবে বান্দার মধ্যে ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। রিজা তথা আশার অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে জান্নাত, তার আনন্দ, বাগ-বাগিচা, ঝরনা, হূর, গেলমান ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে।

আমরা এ সমস্ত গুণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতেও চিন্তাভাবনার সম্প্রসারণে সাহায্য হতে পারে। যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এক জায়গায় পাওয়ার জন্যে কোরআন মজীদ তেলাওয়াতের সমান উপকারী কোন কিছুই নেই। কেননা, কোরআন মজীদে সকল মকাম ও হালের কথা সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে এমন বিষয়ও রয়েছে, যা দ্বারা ভয়, আশা, সবর, শোকর, মহব্বত ও অন্যান্য হাল সৃষ্টি হয়। এগুলোই মানুষকে সকল নিন্দনীয় স্বভাব থেকে বিরত রাখে। অতএব, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা দরকার এবং যে বিষয়ে চিন্তাভাবনা উদ্দেশ্য হবে, সে বিষয়ের আয়াত বারবার পাঠ করা উচিত। প্রয়োজন হলে একশ' বার পাঠ করা কর্তব্য। চিন্তাভাবনা ও বোধগম্যতা সহকারে একটি কোরআনী আয়াত পাঠ করা না বুঝে তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খতম করার চেয়ে অনেক উত্তম। অতএব, আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে বিরতি দেবে, যদিও তাতে এক রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা, কোরআন পাকের এক এক শব্দের অধীনে অগণিত রহস্য নিহিত রয়েছে। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে চিন্তাভাবনা না করা পর্যন্ত এগুলো হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ গভীর চিন্তা সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তাঁর উক্তির প্রতিটি শব্দও প্রজ্ঞার এক অকূল দরিয়া। এসব শব্দ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি যথাযথ চিন্তা করলে সারা জীবনেও তার চিন্তা পূর্ণ হবে না।

উপরে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে অন্তর প্রদেশ আবাদ করার চিন্তাভাবনা, যাতে নৈকট্য ও মিলনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কেউ যদি নফসের সংশোধনেই সমগ্র জীবন ব্যয় করে দেয়, তবে নৈকট্যের স্বাদ কখন আস্বাদন করবে? হযরত খাওয়াস (রহঃ) বিজন বনে ও প্রান্তরে ঘুরাফেরা করতেন। একবার হোসায়ন ইবনে মনসুর (রহঃ) তাঁর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন ঃ তায়াক্কুলে নিজের অবস্থা দুরস্ত করার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করছি। হযরত হোসায়ন বললেন ঃ আপনি তো অন্তর প্রদেশ আবাদ করার কাজেই জীবন অতিবাহিত করে দিলেন। তাওহীদে বিলয় কখন অর্জিত হবে? এ থেকে জানা গেল যে, এক আল্লাহয় বিলীন হওয়া সাধকের পরম ও চরম কাম্য ও আনন্দ।

উদ্ধারকারী ও বিনাশকারী গুণসমূহ জেনে নেয়ার পর এগুলোকে সকাল-সন্ধ্যার অভ্যাসে পরিণত করে নেবে এবং এগুলো থেকে মোটেই গাফেল থাকবে না। এ ব্যাপারে সাধক নিজের কাছে একটি নোট বই রাখবে। এতে সকল উদ্ধারকারী ও বিনাশকারী গুণসমূহ এবং যাবতীয় গোনাহ ও আনুগত্যের কাজগুলো লিখে রাখবে। এর পর প্রত্যহ নিজের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখবে কি কি গুণ তার মধ্যে আছে এবং কি কি নেই। বিনাশকারী গুণসমূহের মধ্য থেকে দশটি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যথেষ্ট। এগুলো থেকে বেঁচে থাকলে অন্য সবগুলো থেকে বেঁচে থাকা হয়ে যাবে। দশটি বিষয় এই ঃ (১) কৃপণতা, (২) অহংকার, (৩) আত্মপ্রীতি, (৪) রিয়া, (৫) হিংসা, (৬) কঠোরতা, (৭) খাদ্য-লালসা, (৮) অতিরিক্ত কামভাব, (৯) অর্থলোভ ও (১০) জাঁকজমকপ্রীতি। উদ্ধারকারী গুণসমূহের মধ্যেও দশটিই যথেষ্ট। আর সেগুলো এই ঃ (১) গোনাহের কারণে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অনুতাপ, (২) বিপদে সবর, (৩) আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি, (৪) নেয়ামতের শোকর, (৫) ভয় ও আশার সমতা, (৬) সংসার অনাসক্তি, (৭) আমলে এখলাস, (৮) মানুষের সাথে সদাচরণ, (৯) আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও (১০) আল্লাহর সামনে খুশু ও নম্রতা।

এই বিশটি বিষয়ের মধ্য থেকে, এক একটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করবে। উদাহরণতঃ যখন একটি বিনাশকারী অভ্যাস দূর হয়ে যাবে, তখন নোট-বই থেকে সেটি কেটে দেবে এবং সে সম্পর্কে আর চিন্তাভাবনা করবে না। তৎসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শোকর করবে যে, তিনি একটি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এমনিভাবে দশটি মন্দ স্বভাব সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত, এক একটি করে নেবে এবং চিন্তাভাবনা করবে। অতঃপর নোট-বই থেকে তা কেটে দিতে থাকবে। এরপর নফসকে উদ্ধারকারী গুণে গুণান্বিত করার প্রয়াস চালাবে। যখন নফস একটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, উদাহরণতঃ তওবা ও অনুতাপের গুণ অর্জিত হয়ে যাবে, তখন নোট-বই থেকে সেটি কেটে দিয়ে অবশিষ্ট গুণসমূহ অর্জনে প্রয়াসী হবে। কিন্তু এই পন্থা অত্যন্ত কর্মতৎপর ব্যক্তির জন্যেই উপকারী। আর যারা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে গণ্য, তাদের অধিকাংশের উচিত নোট বইয়ে বাহ্যিক গোনাহও লিখে নেয়া। যেমন, সন্দেহযুক্ত খাদ্য খাওয়া, গীবত করা, ঝগড়া করা, আত্মপ্রশংসা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বর্জন করা ইত্যাদি। কেননা, অধিকাংশ সৎকর্মপরায়ণ বলে গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এসব গোনাহ কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বাহ্যিক অঙ্গ গোনাহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর আবাদ করার কাজে মশগুল হওয়া সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক স্তরের মানুষের উপর এক ধরনের গোনাহ প্রবল থাকে। অতএব, সে স্তরের মানুষের উচিত সে ধরনের গোনাহ দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া এবং তারা যে সকল গোনাহের প্রান্তে অবস্থান করে, সেগুলোর জন্যে চিন্তাভাবনা না করা। উদাহরণতঃ পরহেযগার আলেম প্রায়ই নিজের ইলম যাহির করার প্রয়াস পায় এবং মানুষের মধ্যে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি কামনা করে— শিক্ষকতার মাধ্যমে হোক অথবা ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, তারা এমন একটি ফেতনায় পতিত হয়, যা থেকে সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ নাজাত পায় না। অর্থাৎ, এ ধরনের আলেমের কথাবার্তা যদি জনপ্রিয়তা লাভ করে, তবে সে আলেম আত্মপ্রীতি, অহংকার ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকে না। কেউ তার কথা অমান্য করলে সে মনে মনে ভীষণ ব্যথা অনুভব

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে; অথচ এই অমান্যকারী ব্যক্তি অন্য কোন আলেমের কথা অমান্য করলে তাতে সে ক্ষুব্ধ হয় না। কেবল নিজের কথা অমান্য করলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। শয়তানের প্ররোচনাই এর কারণ।

মোটকথা, আলেমের ফেতনা অনেক বড়। সে হয় বাদশাহ, না হয় বরবাদ। অতএব, যে আলেম নিজের মধ্যে উপরোক্ত মন্দ স্বভাব অনুভব করবে, তার জন্যে নির্জনবাস, একাকীত্ব, অজ্ঞাত জীবন যাপন ও ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরামের যমানায় অনেক সাহাবী মসজিদে থাকতেন। তারা সবাই আলেম ও মুফতীর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ফতোয়া দেয়া থেকে তারা গা বাঁচিয়ে চলতেন। কেউ ফতোয়া দিলেও এটা চাইতেন, অন্য কেউ ফতোয়া দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিক।

নির্জনবাসের সময়ও শয়তানকে ভয় করা উচিত। কারণ, তখন শয়তান এসে বলে— তুমি নির্জনবাস অবলম্বন করো না। কেননা, যদি সবাই এমন করে, তবে মানুষের মধ্য থেকে ইলম বিদায় নেবে। এর জওয়াবে বলা উচিত— ইসলামে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার পূর্বেও ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল এবং পরেও থাকবে। আমার মৃত্যুতে দ্বীনের কোন স্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়ে যাবে না। কিন্তু আমার অবস্থা এই যে, আমি আমার অন্তরের সংশোধন থেকে বেপরওয়া নই। আমি বসে থাকলে ইলম বিদায় নেবে— একথা নিছক খামখেয়ালী এবং মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা, যদি সমস্ত মানুষকে জেলখানায় পুরে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয় এবং ইলম অন্বেষণ করলে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি প্রদর্শন করা হয়, তবু বড়ত্ব ও জাঁকজমকের মহব্বত তাদেরকে বেড়ী ছিন্ন করে, জেলের প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে বাধ্য করবে এবং ইলমের অন্বেষণে নিয়োজিত করবে। অতএব, শয়তান যতদিন মানুষের মনে জাঁকজমক ও নেতৃত্বের মহব্বত জাগ্রত রাখবে, ততদিন ইলম বিদায় নিতে পারবে না। বলা বাহুল্য, শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত নিজের কারসাজিতে শৈথিল্য করবে না। ফলে, কিয়ামত পর্যন্ত ইলমও অবশিষ্ট থাকবে। বরং দ্বীনের ইলম এমন লোকদের দ্বারা প্রসার লাভ করবে, যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان الله يويد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم وان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر –

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আল্লাহ এমন লোকদের দ্বারা এই দ্বীনকে শক্তি যোগাবেন, যাদের পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা'আলা পাপাসক্ত ব্যক্তি দ্বারা এই দ্বীনকে দৃঢ়তা দান করবেন।

সুতরাং শয়তানের এ ধরনের প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে মানুষের সাথে মেলামেশায় মশগুল হওয়া এবং পার্থিব জাঁকজমক, প্রশংসা ও সম্মানের মহব্বতকে লালন করা আলেমের জন্যে মঙ্গলজনক নয়। হাদীসে আছে— জাঁকজমক ও ধন-সম্পদের মহব্বত কপটতা উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক উৎপন্ন করে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ماذئبان ضاربان ارسلافى زربة غنم باكثر فسادا فيها من حب الجاه والمال فى دين المرء المسلم -

অর্থাৎ, দু'টি রক্তপিপাসু বাঘকে ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা এত বেশী ক্ষতি করতে পারে না, জাঁকজমক ও ধনের মহব্বত মুসলমানের দ্বীনের যত বেশী ক্ষতি করে।

জাঁকজমকের মহব্বত নির্জনবাস ও একাকীত্ব অবলম্বন করা ছাড়া অন্তর থেকে উৎপাটিত হয় না। সুতরাং আলেমের উচিত অন্তর থেকে এধরনের গোপন মহব্বতকে খুঁজে বের করা এবং তা দূরীকরণের চিন্তা করা। মুত্তাকী আলেমের জন্যে হল এই চিন্তা-ভাবনা। আর আমাদের মত লোকদের তো সেসব বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, যা দ্বারা আমাদের ঈমান কিয়ামতের দিন শক্তিশালী হয়। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ আমাদেরকে দেখলে নিশ্চিতরূপেই বলবেন এরা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। কারণ, যারা জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস করে, আমাদের আমল তাদের আমলের মত নয়। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে ভয় করে, সে সেই বস্তু থেকে পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাংখা করে, সে সেই বস্তু অন্বেষণ করে। আমরা আরও জানি, দোযখ থেকে পলায়ন হারাম কর্ম ও গোনাহ বর্জনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অথচ আমরা এগুলোতে আকণ্ঠ ডুবে থাকি। আমাদের আরও জানা আছে যে, জান্নাতের অন্বেষণ অধিক পরিমাণে নফল এবাদতের মাধ্যমে হয়। আমরা এতেও ত্রুটি করি; বরং আমাদের ফরয এবাদতও ঠিকমত আদায় হয় না। সুতরাং আমরা আমাদের ইলমের ফল এই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পেয়েছি যে, দুনিয়ালোভী হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ আমাদের অনুসরণ করবে এবং বলবে, যদি দুনিয়ার লোভ খারাপ হত, তবে আলেমগণ আমাদের তুলনায় এ থেকে অধিক বেঁচে থাকত। আমরা এখন ভাবছি, আমরা (আলেমরা) যে ফেতনার সম্মুখীন, তা খুবই গুরুতর। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের অবস্থা সংশোধন করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে তওবার তাওফীক দেন। তিনি করুণাময় ও নেয়ামতদাতা।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ বান্দা তার গুণাবলী ও হাল সম্পর্কে চিন্তাভাবনার আলোচনা এতটুকুই যথেষ্ট। এতেই চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও কাজকর্ম সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ স্তর হল আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা। কিন্তু এধরনের চিন্তা নিষিদ্ধ। কেননা, শরীয়তে বলা হয়েছে— আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে ফিকর কর— তাঁর সত্তা সম্পর্কে নয়। এর কারণ, তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায় এবং কোন কূল-কিনারা পায় না। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এদিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। তারাও সর্বক্ষণ তাঁকে দেখার সাধ্য রাখে না। সাধারণ মানুষ যেমন সূর্যের দিকে দেখতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; বেশীক্ষণ দেখলে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সত্তার দিকে দেখা হতবুদ্ধিতার কারণ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পথ বর্ণনা না করাই সমীচীন। অধিকাংশ মানুষ এটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। কোন কোন আলেম অবশ্য এ বিষয়ে স্বল্প পরিমাণে বর্ণনা করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা স্থান, পার্শ্ব ও দিক থেকে পবিত্র। তিনি না জগতের অভ্যন্তরে, না বাইরে। তিনি জগতের সাথে মিলিতও নন, পৃথকও নন। এই অল্প-বিস্তর বর্ণনা থেকেই কিছু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যাতে তারা একে অস্বীকারই করে বসেছে। বরং কিছুসংখ্যক লোক তো আরো কম বর্ণনাও বরদাশত করতে পারেনি। তাদের কাছে যখন বলা হল যে, আল্লাহ তাআলা মাথা, হাত, পা, চক্ষু ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে মুক্ত, তখন তারা তা মেনে নিল না এবং ধারণা করল যে, এই সংজ্ঞা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপে ত্রুটির কারণ। তাদের মতে মাহাত্ম্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও প্রতাপ এ সকল অঙ্গের মধ্যে সীমিত। কেননা, মানুষ কেবল নিজেকেই জানে ও চিনে। কাজেই যে, বস্তু গুণে মানুষের সমান নয়, কোন মাহাত্ম্যও সে বুঝে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা জনৈক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠান যে, আমার বান্দাদের কাছে আমার গুণাবলী বর্ণনা করো না। করলে তারা আমাকে মানবে না। বরং আমার অবস্থা এমন ভাষায় বর্ণনা কর, যা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা নিষিদ্ধ বিধায় আমরা এ বিষয়টি ছেড়ে অন্য বিষয়ের প্রতি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছি। তা হল, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়াকর্ম ও সিফাতের রহস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। কেননা, এসবের মধ্যে তাঁর প্রতাপ, মাহাত্ম্য, পবিত্রতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা পাওয়া যায়। অতএব সিফাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সিফাতের ফলাফল দ্বারাই করা উচিত। তাঁর সিফাতের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সাধ্য যখন আমাদের নেই, তখন সিফাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই উচিত। যেমন, সূর্য যখন চমকিতে থাকে, তখন আমরা তার দিকে তাকাতে পারি না; বরং ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাতে পারি এবং এর মাধ্যমেই চন্দ্র ও তারকার আলোর তুলনায় সূর্যকিরণের গুরুত্ব বুঝতে পারি। কারণ, ভূপৃষ্ঠের আলোকিত হওয়া সূর্যকিরণেরই ফল। দুনিয়াতে যা কিছু বিদ্যমান সমস্তই খোদায়ী কুদরতের ফল এবং আল্লাহর সত্তার নূরসমূহের একটি নূর।

সূর্যগ্রহণের সময় আমরা পাত্রে পানি রেখে তাতে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য অবলোকন করি, যাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি না হয়। সুতরাং সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যে পানি একটি উপায়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজকর্মও তাঁর গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার উপায়। এই উপায়ে গুণাবলী প্রত্যক্ষ করলে জ্ঞান-বুদ্ধির হতবাক হওয়ার আশংকা থাকে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى ذات الله -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর এবং তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না।

সুতরাং এখন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার নিয়ম-পদ্ধতি জানা দরকার।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছু বিদ্যমান, তা তাঁরই কর্ম ও তাঁরই সৃষ্টি। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অসংখ্য বৈচিত্র্য ও রহস্য রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, প্রতাপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ আমরা কিছু বৈচিত্র্য ও রহস্যের উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তা'আলার সৃজিত অনেক বিদ্যমান বস্তু আমাদের জানার বাইরে রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যায় না। আমাদের অজানা বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন— وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, তিনি এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। আবার এমনও অনেক বস্তু রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জানি— বিস্তারিত নয়। এরূপ বস্তুসমূহকে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্যে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। এরূপ বস্তুর কতক চোখে দেখা যায় এবং কতক দেখা যায় না। যেগুলো চোখে দেখা যায় না, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আরশ, কুরসী ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিসর খুবই অল্প। যে সকল বস্তু দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ। আকাশে দেখা যায় তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, তাদের পরিভ্রমণ, উদয়, অস্ত ইত্যাদি। পৃথিবীতে দেখা যায় পর্বতমালা, খনি, খাল, বিল, নদী, প্রাণী ও উদ্ভিদ। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীতে দেখা যায় মেঘমালা, বৃষ্টি, বরফ, শিলা, বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝড়ঝঞ্ঝা। মোটকথা, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের হাজারো শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। এগুলোর আকার-আকৃতি ও গুণাগুণে যে পরিমাণ বিভিন্নতা দেখা যায়, সে পরিমাণে বিভক্তিও বেড়ে যায়। এগুলোর প্রত্যেকটি প্রকার নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী, আকাশ ও নক্ষত্রের প্রতিটি কণাকেই আল্লাহ তা'আলা গতিশীল করেন। এসব বস্তু আল্লাহ তা'আলার একত্ব, প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। কোরআন মজীদে এসব বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

এ ধরনের আয়াত কোরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। কোন কোন আয়াতে চিন্তাভাবনার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ আল্লাহ তা'আলার এক নিদর্শন এই যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে এবং মানুষের সর্বাধিক নিকটবর্তী হচ্ছে তার নফস। এতে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যের পরিচায়ক এত অধিক বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে যে, মানুষ সারা জীবন অধ্যয়ন করেও তার এক-দশমাংশও জানতে পারে না। অথচ সে এগুলো থেকে গাফেল। যে মানুষ নিজের নফস থেকেই গাফেল, সে অন্যের মারেফত লাভ করার আশা কিরূপে করতে পারে? আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে মানুষকে তার নিজের নফস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে—

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ, স্বয়ং তোমাদের মধ্যে কি রয়েছে, তা কি তোমরা দেখ না?

আরও উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ নাপাক বীর্য দ্বারা সৃজিত। এরশাদ হয়েছে—

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ

فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ -

অর্থাৎ, মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন? বীর্য থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার বিকাশ সাধন করেছেন। এরপর তার পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তাকে সমাহিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ -

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হল এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى -

অর্থাৎ, মানুষ কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর হয়েছে রক্তপিণ্ড। এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দিয়েছেন ও সুঠাম করেছেন।

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ فَجَعَلْنَاهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ, মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতর্ককারী।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর আমি তাকে বীর্যরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। এরপর আমি বীর্যকে পরিণত করি জমাট রক্তে। অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে। অতঃপর আমি অস্থিপিঞ্জরকে পরিয়ে দেই মাংস।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব কোরআন মজীদে বারবার বীর্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বীর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বলা। উদাহরণতঃ এভাবে যে, এটি একটি অপবিত্র পানির ফোঁটা, যা কিছুক্ষণ বায়ু লাগা অবস্থায় রেখে দিলে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। রব্বুল আলামীন এই নাপাক বস্তুটিকে নরের মেরুদণ্ড এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে কিরূপে বের করেছেন! নর ও নারীর কিরূপে মিলন ঘটিয়েছেন! নর ও নারীর অন্তরে পারস্পরিক প্রেম ও ভালবাসা স্থাপন করে তাদেরকে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। অতঃপর সহবাসের মাধ্যমে নর থেকে বীর্য বের করে নারীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করেছেন। এরপর ঋতুর নাপাক রক্ত কোন কোন শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে টেনে গর্ভাশয়ে একত্রিত করেছেন এবং বীর্য থেকে ভ্রূণ তৈরী করে তাকে ঋতুর রক্ত খাইয়ে খাইয়ে লালন-পালন করেছেন। শুভ্র উজ্জ্বল বীর্যকে তিনি কিরূপে লাল জমাট রক্তে পরিণত করেছেন, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছেন। যে বীর্যের সকল অংশ একইরূপ ছিল তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এক অংশকে অস্থি, এক অংশকে শিরা-উপশিরা এবং এক অংশকে মাংসে পরিণত করেছেন। এরপর মাংস ও শিরা দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ কিরূপে তৈরী করেছেন। মাথা গোলাকার করেছেন, কান, চক্ষু, নাক ও মুখমণ্ডলকে প্রশস্ত করেছেন এবং হাত-পা-কে লম্বা বানিয়েছেন। এগুলোর মাথায় অঙ্গুলি সংযুক্ত করেছেন। এরপর অভ্যন্তরীণ অঙ্গ অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, গর্ভাশয়, মূত্রাশয় ও অন্ত্র কিরূপে তৈরী করেছেন। প্রত্যেকটির আকার, পরিমাণ ও কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

চক্ষুকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক স্তরের গুণাগুণ ভিন্ন এবং আকারও ভিন্ন। যদি একটি স্তর বিফল হয়ে যায় অথবা কোন গুণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাবে।

এখন অস্থি সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, নরম ও তরল বীর্য থেকে কেমন শক্ত ও সুঠাম অস্থি নির্মিত হয়েছে! এই অস্থির সাহায্যেই দেহ সোজা থাকে। ছোট-বড়, লম্বা, বেঁটে, গোল ও প্রশস্ত ইত্যাদি অনেক প্রকারের অস্থি নির্মিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজন ছিল সকল অঙ্গ দিয়ে নড়াচড়া করার এবং বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ অঙ্গ নাড়া দেয়ার। তাই অস্থি একটি নয়— অনেক নির্মাণ করে সেগুলোর মধ্যে জোড়া ও গ্রন্থি স্থাপন করা হয়েছে, যাতে নড়াচড়া সহজ হয়।

এরপর মস্তকের গঠন প্রণালী লক্ষ্য করা উচিত। এখানে পঞ্চান্নটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আলাদা আলাদা আকার-আকৃতির অস্থিকে কিরূপে একত্রিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টি অস্থি বিশেষভাবে মস্তকের উপরিভাগের, চৌদ্দটি উপরকার চোয়ালের, বারটি নীচের চোয়ালের এবং অবশিষ্টগুলো দাঁত। দাঁতের মধ্যে কতক প্রশস্ত ও চর্বণ ক্ষমতাসম্পন্ন, কতক তীক্ষ্ণ, কর্তন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কতক চোখা। এরপর গ্রীবাকে মস্তকের বাহন করে তাকে পৃষ্ঠদেশের উপর স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর নিতম্বের অস্থি পর্যন্ত চব্বিশটি আংটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। নিতম্বের অস্থি তিনটি। বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। অতঃপর পিঠের অস্থিসমূহকে বুকের অস্থি, কাঁধ, হাত, নাভির নিম্ন ও নিতম্বের অস্থিসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরপর রয়েছে, উরু, পায়ের গোছা ও পায়ের অঙ্গুলিসমূহের অস্থি। সমস্ত দেহে মোট দু'শত আটচল্লিশটি অস্থি রয়েছে। এতে সেসব ক্ষুদ্র অস্থিসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়, যেগুলো দ্বারা গ্রন্থির গর্ত ভরাট করা হয়েছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক নরম ও তরল শুক্রবিন্দু থেকে কেমন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অস্থির আকার-আকৃতি রেখেছেন। আলাদা আলাদা এবং সংখ্যা রেখেছেন নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে একটি বেড়ে গেলে যেমন অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায়, তেমনি একটি কম হলেও তা পূরণ করার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে অস্থি সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করা হয়, তার উদ্দেশ্য থাকে অস্থি চিকিৎসায় দক্ষতা সৃষ্টি করা। আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব উভয় চিন্তার মধ্যে বিরাট তফাত।

মোটকথা, মানুষের সমগ্র দেহ চিন্তাভাবনার বিচরণক্ষেত্র। এরপর যদি মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে তার ফলশ্রুতিতেও অনেক আশ্চর্য বিষয় ও অনন্য কারিগরী আমাদের সামনে আসে। আল্লাহ পাকের এসব কারিগরী একবিন্দু নাপাক পানিতে নিহিত।

এখন চিন্তা করা দরকার, যিনি এক ফোঁটা পানিতে এতসব শিল্পকর্ম করেন, তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সৃষ্টিতে না জানি কত কিছু করে থাকবেন! গঠন প্রণালীর দিক দিয়ে সৌরজগত অত্যন্ত দৃঢ়, অটল ও ঘন এবং কারিগরীর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত। মানবদেহের তুলনায় এতে অধিক অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের সমাবেশ ঘটেছে। বরং সৌরজগতের আশ্চর্য বিষয়াদির সাথে সমগ্র ভূপৃষ্ঠের আশ্চর্য বিষয়াদির কোন তুলনাই হয় না। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا -

অর্থাৎ, তোমাদের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের? তিনি সেটা নির্মাণ করেছেন। তিনি একে উচ্চ ও বিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক।

আমরা প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত কোন চিত্রকরের সুনিপুণ হাতে তৈরী সুন্দর ও নিখুঁত চিত্র দেখে চিত্রকরকে বাহবা দেই এবং তার শিল্পকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। অন্তরে তাকে একজন মহান শিল্পী বলে বিশ্বাস করতে থাকি। অথচ আমরা জানি, এ চিত্র কেবল রঙ, তুলি, সুনিপুণ হাত, প্রাচীর ও ইচ্ছাশক্তি সমন্বয়ে গঠিত। এগুলোর কোনটিই চিত্রকরের সৃষ্ট নয়; বরং এগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। চিত্রকর শুধু রঙকে এক বিশেষ ক্রম অনুসারে প্রাচীরগাত্রে সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতেই আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অপরপক্ষে স্বয়ং মানব সৃষ্টি দেখে আমরা কখনও বিস্মিত হই না যে, সৃষ্টিকর্তা এক ফোঁটা নাপাক বীর্যকে কিরূপ পৃষ্ঠদেশে ও বক্ষে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেখান থেকে বের করে তার সুসমঞ্জস আকৃতি তৈরী করেছেন। এর অংশসমূহ একই আকারের ছিল। সেগুলোকে আলাদা আলাদা অঙ্গে পরিণত করেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করে সেই শুক্রবিন্দুকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, বোধশক্তিসম্পন্ন ও বাকশক্তিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার এ অনুগ্রহ সত্যিই বিস্ময়কর যে, জন্মগ্রহণের পর শিশু যখন নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না, তখন পিতা-মাতা উভয়েই আল্লাহ প্রদত্ত স্নেহের কারণে তার সেবা-যত্ন করে। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এ স্নেহ সৃষ্টি না করতেন, তবে শিশুর চেয়ে অধিক অক্ষম এ পৃথিবীতে কেউ হত না। এরপর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েত দান করেছেন। এরপর শিশু সবল ও সুঠাম হয়ে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ, আনুগত্যশীল অথবা নাফরমান, ঈমানদার অথবা কাফের হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا -

অর্থাৎ, মানুষের উপর দিয়ে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।

উপরে মানবদেহের কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর বিষয় উল্লেখ করা হল। যদিও সবগুলো লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কেউ চিন্তা করতে চাইলে এতটুকু বিষয় চিন্তা দৌড়ানোর জন্যে পর্যাপ্ত এবং এগুলো স্রষ্টার মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মানুষ এগুলো থেকে গাফেল হয়ে পেট ও পিঠের ধান্দায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত রয়েছে। সে এ ছাড়া কিছুই করতে পারে না যে, ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নিল এবং যখন উদর তৃপ্ত হয়ে গেল ঘুমিয়ে পড়ল। কাম-বাসনা উত্তেজিত হলে সহবাস করে নিল এবং ক্রোধ হলে লড়ে নিল। অথচ এসব কাজে চতুষ্পদ জন্তু এবং হিংস্র প্রাণীরাও তার সাথে শরীক। যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে চতুষ্পদ জন্তুরা বঞ্চিত, তা হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্য এবং জান ও জাহানের অত্যাশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানা। কেননা, এর মাধ্যমেই মানুষ নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের দলে প্রবেশাধিকার পায় এবং পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের তালিকাভুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকটে চলে যায়। চতুষ্পদ জন্তুরা এ স্তর লাভ করতে পারে না এবং সে মানুষও পারে না, যে দুনিয়াতে কেবল চতুষ্পদ জন্তুদের কামভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তাই এরূপ মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। কারণ, তাদের মধ্যে মূলতই খোদায়ী মারেফত লাভের ক্ষমতা নেই। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

আত্মচিন্তার পদ্ধতি জানার পর, এখন মানুষের আবাসস্থল পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পালা। পৃথিবীতেও অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে শয্যা করেছেন। এতে পথ ও সড়ক নির্মাণ করে একে চলাফেরার উপযোগী করেছেন। এতে পর্বতমালার পেরেক লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে নড়াচড়া না করে। এরপর একে এত বিস্তীর্ণ করেছেন, যাতে কেউ সারা জীবন পরিভ্রমণ করেও এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে পারে না। সেমতে আল্লাহ পাক এসব বিষয় বর্ণনা করে বলেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি আকাশ নির্মাণ করেছি, আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দর বিছানাকারী।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا -

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা এর আনাচে-কানাচে বিচরণ কর।

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا -

অর্থাৎ, যিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন শয্যা।

এমনিভাবে কালামে মজীদে পৃথিবীর উল্লেখ বহু জায়গায় হয়েছে, যাতে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর উপরিভাগকে জীবন্ত মানুষের বসবাসের জায়গা করেছেন এবং অভ্যন্তর ভাগকে করেছেন মৃতদের নিদ্রাস্থল। তাই এরশাদ হয়েছে—

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا -

অর্থাৎ, আমি কি পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতদের জন্যে ধরিত্রীরূপে সৃষ্টি করিনি? যে ভূমিকে নিষ্প্রাণ দেখা যায়, বৃষ্টির পানি বর্ষিত হলে তাই সজীব হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং রঙ-বেরঙের শাক-সব্জি গজাতে থাকে। এতে নানা রকমের প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। আরও লক্ষণীয় যে,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রান্তে উঁচু উঁচু অটল পাহাড় দিয়ে একে কিরূপে মযবুত করা হয়েছে এবং পাহাড়ের নীচে কিরূপে পানির ভান্ডার স্থাপন করা হয়েছে, যা নির্ঝরিণী ও নদী-নালার আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে! এরপর এ পানির সাহায্যেই রকমারি বৃক্ষ, শস্য, আঙ্গুর, যয়তুন, খোরমা এবং বিভিন্ন আকার, রঙ, স্বাদ ও গন্ধের অসংখ্য ফলমূল উৎপন্ন করা হয়। এসব ফলমূল স্বাদে একটির চেয়ে অপরটি সেরা। অথচ এগুলো একই পানি দিয়ে সিঞ্চিত ও একই মাটি থেকে উৎপন্ন। এরপর চিন্তা করা দরকার আল্লাহ তা'আলা এসব ফলমূল ও উদ্ভিদের মধ্যে কত বিচিত্র উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। উদাহরণতঃ কোনটি খাদ্যের কাজ করে, কোনটি বলকারক, কোনটি জীবন রক্ষাকারী, কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি পাকস্থলীতে পৌঁছে শিরা-উপশিরার ভেতর থেকে পিত্ত দূর করে, কোনটি স্বয়ং পিত্ত হয়ে যায়, কোনটি শ্লেষ্মানাশক, কোনটি শ্লেষ্মাবর্ধক, কোনটি রক্ত পরিষ্কারক এবং কোনটি শ্রম নিবারক।

রকম রকম জন্তু-জানোয়ারও অন্যতম নিদর্শন। এগুলোর মধ্যে কতক উড়ে, কতক ভূমিতে চলে। যারা চলে, তাদের মধ্যে কতক দু'পায়ে, কতক চার পায়ে, কতক দশ পায়ে এবং কতক একশ' পায়ে চলে। কোন কোন কীট-পতঙ্গের মধ্যে এমনটা দেখা যায়। এরপর পশু-পক্ষী, বন্য ও গৃহপালিত জীব-জন্তুর মধ্যে এত বেশী বিস্ময়কর বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যায় না। মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি ও মাকড়সার মত ছোট প্রাণীর অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি বর্ণনা করতে চাইলেও তা কারও পক্ষে নিঃশেষে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ মাকড়সা নদীর তীরে নিজের ঘর নির্মাণ করে। প্রথমতঃ সে এমন দু'টি জায়গা তালাশ করে, তার মাঝে এক হাত অথবা তদপেক্ষা কম-বেশী ব্যবধান থাকে, যাতে উভয় জায়গায় সে মুখনিসৃত এঁটেল তার পৌঁছাতে পারে। এরপর সে মুখনিসৃত লালা অর্থাৎ তার এক জায়গায় স্থাপন করে, যা তৎক্ষণাৎ সেই জায়গার সাথে চিমটে যায়। অতঃপর সে অপর প্রান্তে গিয়ে সেখানেও তার লাগিয়ে দেয়। এরপর সে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে এবং উপযুক্ত ব্যবধানে তার সংযোজন করতে থাকে। যখন উভয় জায়গায় তারের মাথা সংযোজিত হয়ে যায়, তখন সে প্রস্থের বুনন কাজ শুরু করে এবং দৈর্ঘের তারের উপর প্রস্থের তার রাখতে থাকে। যেখানে প্রস্থের তার দৈর্ঘের তারের উপর মিলিত হয়, সেখানে গিরা লাগায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এতেও সে জ্যামিতিক আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এভাবে সে এমন একটি জাল তৈরী করে, যাতে মশা-মাছি আটকা পড়ে যায়। সে নিজে এক কোণে ওৎ পেতে বসে থাকে। কোন শিকার জালে আটকে গেলে তড়াক করে সেটিকে লুফে নেয় এবং খেয়ে ফেলে। এভাবে শিকার করে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কোন প্রাচীরের কোণ তালাশ করে তার দু'প্রান্তে তার লাগিয়ে দেয়। এরপর আরও তারে সে নিজে ঝুলতে থাকে। ঝুলন্ত অবস্থায় সে মশা-মাছি ইত্যাদির অপেক্ষা করতে থাকে। কোন মাছি সেখানে এলে সে তাকে ধরে পায়ে তার জড়িয়ে দেয়। এরপর হযম করে ফেলে।

এখন প্রশ্ন হল, ক্ষুদ্র মাকড়সা এ নৈপুণ্য নিজে নিজেই আয়ত্ত করেছে, না কোন মানুষ তাকে বলে দিয়েছে অথবা শিখিয়েছে? না, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। এমতাবস্থায় সেই কি তার স্রষ্টা। একি প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য দেয় না? বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে স্রষ্টার মহিমা, কুদরত ও প্রজ্ঞা দেখতে পায়। বৃহদাকার জন্তু-জানোয়ারের কথা না-ই বললাম। এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী অসংখ্য ও অগণিত। এগুলো দেখে আমাদের বিস্ময় না লাগার কারণ হচ্ছে, হরহামেশা প্রচুর পরিমাণে দেখা। দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, যদি নতুন কোন জন্তু ও পোকা দেখি, তবে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলি ঃ সোবহানাল্লাহ্, কি অদ্ভুত প্রাণী!

পৃথিবীর স্থলভাগের যৎকিঞ্চিৎ আশ্চর্য বস্তু দেখার পর এখন জলভাগের বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। জলভাগের বিস্তৃতি স্থলভাগের তুলনায় অনেক বেশী বিধায় এর আশ্চর্য বস্তুসমূহ স্থলভাগের আশ্চর্য বস্তুর চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেশী। সমুদ্রের কোন কোন জন্তু এত বিশালাকার যে, সেগুলোকে পানির উপরিভাগে দেখলে দ্বীপ বলেই ভ্রম হবে। ইতিহাসে এমনও প্রমাণ আছে যে, সমুদ্রে ভ্রমণকারীরা তিমি মাছের পিঠকে দ্বীপ মনে করে সেখানে নেমে পড়ে। এরপর আগুনের উত্তাপে তিমি যখন নড়াচড়া করতে থাকে, তখন বুঝতে পারে এটি একটি সামুদ্রিক জন্তু।

জীবজন্তুর যত প্রকার স্থলভাগে রয়েছে যেমন— গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি, তার চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এমনকি আরও অনেক বেশী প্রকার জলভাগে বিদ্যমান। এছাড়া সমুদ্রে কোন কোন প্রাণী এমনও আছে, যার নযীর স্থলভাগে পাওয়া যায় না। যারা সামুদ্রিক ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের লিখিত বই-পুস্তকে এসব প্রাণীর আকার-আকৃতি দেখা যায়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটকথা, সমুদ্রবক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার এত বেশী অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য কারিগরী রয়েছে যে, সেগুলো বৃহদাকারে কয়েকটি খণ্ডে বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও প্রকাশ্যতম বস্তু হচ্ছে পানি। এটা বহমান, স্বচ্ছ, সংযুক্ত অংশবিশিষ্ট একটি শারীরিক বস্তু। এর গঠন অত্যন্ত নাযুক। দৃশ্যত এক বস্তু হলেও পৃথকীকরণকে এত দ্রুত গ্রহণ করে যেন আলাদাই। স্থলভাগের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন এরই উপর নির্ভরশীল। যদি কোন মানুষ এক ঢোক পানির মুখাপেক্ষী হয় এবং তা তাকে পান করতে না দেয়া হয়, তবে তার মালিকানায় পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থাকলে সে তা ব্যয় করেও এক ঢোক পানি সংগ্রহ করবে। পান করার পর যদি প্রস্রাবের পথে তা বের করতে নিষেধ করা হয়, তবে তার জন্যেও সে পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডার দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্ তা'আলার এমন নেয়ামত সম্পর্কেও মানুষ চিন্তাভাবনা করে না। অথচ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার বিস্তর অবকাশ রয়েছে।

পানির পর আরও একটি চিন্তাভাবনার বিষয় হচ্ছে বায়ু। এই সূক্ষ্ম বস্তুটির অবস্থান নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে। চলাফেরার সময় দেহে লাগলে এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু চোখে দেখা যায় না। জলজ প্রাণী পানিতে হাত-পা নেড়ে যেমন সাঁতার কাটে, তেমনি পাখিরাও শূন্য মণ্ডলে পাখার সাহায্যে বায়ুকে চিরে সামনে এগিয়ে যায়। ঝড়ো হাওয়ার কারণে সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠে, তেমনি ঝঞ্ঝাবাত্যার কারণে বায়ুর সমুদ্রে ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে গতিশীল করলে সে চলমান বায়ু হয়ে যায়। এরপর ইচ্ছা করলে তিনি একে বৃষ্টির সুসংবাদদাতা করে দেন। এরশাদ হয়েছে—

وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ

অর্থাৎ, আমি পানিভর্তি বায়ু পাঠাই। আবার ইচ্ছা করলে তিনি একে অবাধ্য মানুষদের জন্যে আযাবে পরিণত করে দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝাবায়ু, এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে। সেটা মানুষকে এমনভাবে উৎখাত করেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর কাণ্ড।

বায়ু নাযুক ও সূক্ষ্ম। এতদসত্ত্বেও তার শক্তি ও বল এভাবে অনুমান করা যায় যে, বায়ুভর্তি কোন মশক যদি কেউ পানিতে ডুবিয়ে দিতে চায়, তবে তা সম্ভব হয় না। একারণেই ভারী জাহাজ ও নৌকা পানির উপর ভেসে থাকে— নিমজ্জিত হয় না। অতএব পবিত্র সে সত্তা, যিনি ভারী জাহাজকে কোনরূপ বন্ধন ছাড়াই পানির উপর আটকে রাখেন।

এছাড়া শূন্যমণ্ডলে আরও রয়েছে মেঘমালা, বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বরফ, অগ্নিপিণ্ড ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণতঃ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়োজিত মেঘমালা।

অন্যান্য আয়াতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিরও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে আমাদের অংশ যদি এতটুকুই থেকে থাকে যে, বৃষ্টিকে চোখে দেখে নিলাম এবং বজ্রকে কানে শুনে নিলাম, তবে এতে চতুষ্পদ জন্তুও তো আমাদের সাথে শরীক। অথচ আমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের অধঃজগত থেকে উন্নতি করে ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের সাথে শামিল হতে হবে। অর্থাৎ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো দেখে নেয়ার পর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এগুলোর অভ্যন্তরীণ বিস্ময়কর বিষয়সমূহ অবলোকন করা দরকার। এক্ষেত্রেও চিন্তাভাবনা অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে যদিও কিনারা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়।

চিন্তাভাবনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আকাশ ও তারকারাজির রহস্যাবলী। যদি কারও সকল বিষয় জানা হয়ে যায় এবং নভোমণ্ডলের রহস্যাবলী জানা না যায়, তবে বাস্তবে তার কিছুই জানা হল না। কারণ আকাশ ছাড়া পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, বায়ু ইত্যাদি যত কিছু রয়েছে, আকাশসমূহের তুলনায় সবগুলো যেন সাগরের তুলনায় এক ফোঁটা পানি; বরং এর চেয়েও ক্ষুদ্র। চিন্তার বিষয়, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও তারকারাজির বিষয়টিকে কোরআন মজীদে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কোন সূরা নেই, যাতে এগুলোর বিরাটত্বের বিষয় উল্লিখিত হয়নি। কয়েক জায়গায় তো এগুলোর কসমও করা হয়েছে। যেমন—

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

অর্থাৎ, কসম রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

অর্থাৎ কসম আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

অর্থাৎ, কসম তরঙ্গায়িত আকাশের।

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

অর্থাৎ, কসম আকাশের ও তার নির্মাণের।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا

অর্থাৎ, কসম সূর্যের ও তার কিরণের। কসম চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবিভূত হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

অর্থাৎ, আমি কসম করি ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى

অর্থাৎ কসম নক্ষত্রের, যখন অস্তমিত হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, আমি কসম করি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা কসম যদি তোমরা জানতে।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেছেন, তাতে যে কি পরিমাণ বিস্ময়কর বিষয়াদি রয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি রিযিকও আকাশে আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এরশাদ হয়েছে—

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

তিনি আকাশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকারীদের প্রশংসায় বলেন—

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, এবং তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ويل لمن قرأ هذه الاية ثم مسح بها سبته

অর্থাৎ, দুর্ভোগ সে ব্যক্তির, যে এ আয়াত পাঠ করে, অতঃপর গোঁফে

তা দেয়।

অর্থাৎ, চিন্তাভাবনা না করেই এগিয়ে যায়। যারা সব নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের নিন্দা প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ مُعْرِضُوْنَ

অর্থাৎ, আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

এছাড়া পৃথিবীস্থ সবকিছু দ্রুত বদলে যায়; কিন্তু আকাশ শক্ত-অটল ও অপরিবর্তনশীল। নির্ধারিত সময় এলেই কেবল এতে পরিবর্তন হবে। এরশাদ হয়েছে—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মাথার উপর সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি।

অতএব, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, যাতে ঊর্ধ্বজগতের আশ্চর্য বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠে। মনে রেখ, ঊর্ধ্বজগত দেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে, চোখ তুলে আকাশের নীলাভ রঙ এবং তারকারাজির কিরণ দেখে নিলাম। এরূপ দেখার মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুও আমাদের সাথে শরীক। এমন দেখাই উদ্দেশ্য হলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত আয়াতে কেন বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য।

অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কে খুব চিন্তাভাবনা করতে থাক। এতে করে হয়তো তোমার জন্যে আকাশসমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি নিজের অন্তর দ্বারা চারপাশে পায়চারি করতে পারবে। অবশেষে তোমার অন্তর আল্লাহর আরশের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন আশা করা যায় তুমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর মর্তবায় পৌঁছে যাবে, যিনি এরশাদ করেন— আমার অন্তর আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছে।

মোটকথা, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেকটি তারকার সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা অনেক হেকমত রেখেছেন। এর আকারে, বর্ণে, আকাশ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থানে এবং বিষুবরেখা ও পার্শ্ববর্তী তারকা থেকে দূরে বা কাছে থাকার মধ্যে অসংখ্য হেকমত রয়েছে। একথা সবাই জানে যে, এ সুবিশাল পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যের বিস্তৃতি এই পৃথিবীর তুলনায় একশ' ষাট গুণেরও বেশী। হাদীস থেকেও সূর্যের বিশালত্ব বুঝা যায়। যে তারকাকে আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হয়, সেগুলোর ক্ষুদ্রতম তারকাটিও পৃথিবীর চেয়ে আটগুণ বড়। আর বৃহত্তমটির তো কথাই নেই। এ থেকে তারকাসমূহের পৃথিবী থেকে ব্যবধান ও উচ্চতা অনুমান করা যায়। আল্লাহ তা'আলা এ দূরত্বের প্রতি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এভাবেই ইঙ্গিত করেছেন— رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا অর্থাৎ, তিনি আকাশকে উঁচু ও বিন্যস্ত করেছেন। হাদীসে আছে, প্রত্যেক আকাশ থেকে অপর আকাশের ব্যবধান পাঁচশ' বছরের পথ।

অতএব, আকাশ ও তারকারাজির স্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যে, তিনি কিভাবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন! কেমন করে খুঁটি ও বন্ধন ছাড়াই এগুলোকে স্থিতিশীল রেখেছেন। সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রহ সদৃশ, যার ছাদ হল আকাশ। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা যখন কোন বিত্তবান ব্যক্তির বাসভবনে যাই এবং তাকে বিচিত্র রঙের আসবাবপত্র ও সোনালী তৈজসপত্র দ্বারা সুসজ্জিত দেখি, তখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ি।

কিন্তু বিশ্বরূপী এ বিশাল বাসভবনের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কখনও বিস্মিত হই না। এ বিশাল বাসভবনটি আমরা সর্বক্ষণ দেখি। এর ভূমি, আলো, বাতাস, নীলাভ ছাদ, বিরল জীব-জানোয়ার, বিচিত্র নকশা ইত্যাদি প্রত্যহ দেখেও অন্তর দিয়ে সেদিকে মনোনিবেশ করি না। আমরা বিত্তবান ব্যক্তির যে ঘরের প্রশংসা করি, আল্লাহর ঘর কি তার চেয়ে কোন অংশে কম? বরং সেটা তো এ আলীশান ঘরেরই একটি সামান্য অংশ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা এ সুবিশাল ঘরের দিকে তাকাই না। কারণ, আমরা আমাদের পালনকর্তা, তাঁর নির্মিত ঘর ও অন্যান্য সবকিছুকে ভুলে কেবল পেট ও পিঠের ধান্দায় আপাদমস্তক ডুবে রয়েছি।

এ পর্যন্ত চিন্তাভাবনার কয়েকটি পথ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনা এসব পথেই বিচরণ করে। এতে স্রষ্টার সত্তা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বর্ণনা নেই। তবে সৃষ্টি সম্পর্কে যথাযথ চিন্তা করলে স্রষ্টার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও কুদরতের পরিচয় অবশ্যই অর্জিত হয়ে যায়। সৃষ্টির মারেফত তথা পরিচয় যত বেশী হয়, স্রষ্টার মারেফত ততই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আমরা যদি কোন কবির কবিতা পাঠ করে তাকে বড় বলে বিশ্বাস করি, তবে তার ফল এই হবে যে, যখনই তার কোন রচনা ও কবিতা আমরা পাঠ করব, তখনই তার মারেফত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাকে সম্মানও বেশী করব। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার অবস্থাও তদ্রূপ।

আল্লাহ তা'আলা নিজের রহমত ও কৃপায় আমাদেরকে চিন্তাশক্তি দান করুন এবং মূর্খদের পদস্খলন থেকে রক্ষা করুন! আমীন!

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দশম অধ্যায়

মৃত্যু ও মৃত্যুর পর

যার বিচ্ছেদ মুহূর্ত মৃত্যু, যার নিদ্রাস্থল মাটির শয্যা, যার প্রিয় সঙ্গী সরীসৃপ, যার সহচর মুনকার-নকীর, যার বাসস্থান কবর, যার বিশ্রামাগার ভূগর্ভ, যার প্রতিশ্রুত স্থান কিয়ামত এবং বেহেশত অথবা দোযখ যার অবতরণস্থল, তার জন্যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করা, অন্য কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কোন কিছুর প্রস্তুতি নেয়া এবং অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা করা মোটেই শোভনীয় নয়। তার উচিত নিজেকে মৃত ও কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করা। কেননা, যা আসন্ন তা খুবই নিকটবর্তী। দূরে তা-ই, যা কখনও আসবে না। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—বিজ্ঞ সেই, যে নিজের নফসকে দাবিয়ে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে আমল করে। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত কোন বিষয় মনে বার বার স্মরণ না হয়, সে পর্যন্ত সে বিষয়ের প্রস্তুতি হতে পারে না। মনে বার বার স্মরণ তখন হয়, যখন এমন বিষয়বস্তু অব্যাহতভাবে শুনতে থাকে, যা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা মৃত্যু, তার পরবর্তী বিষয়াদি তথা আখেরাত, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে বান্দা প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত হয়। কারণ সফরের সময় আসন্ন এবং মানুষ অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে নিমজ্জিত ও উদ্‌ভ্রান্ত, তার অন্তর মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন। ফলে, সে মৃত্যুকে স্মরণ করে না। কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সে বিরক্তিবোধ করে এবং মৃত্যুর স্মরণকে ঘৃণা করে। এধরনের লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ হে রসূল, বলে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

মানুষ তিন প্রকার ঃ (১) দুনিয়ায় নিমজ্জিত, (২) তওবাকারী ও (৩) সিদ্ধি লাভকারী সাধক। প্রথম প্রকার মানুষ মৃত্যুকে স্মরণ করে না। করলেও দুনিয়ার বিষয়ে পরিতাপের কারণে করে। তখন সে মৃত্যুর নিন্দা করতে শুরু করে। মৃত্যুর স্মরণ এ ধরনের লোককে আল্লাহ তা'আলা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তওবাকারী ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে, যাতে তার মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং তওবা পূর্ণতা লাভ করে। মাঝে মাঝে সে মৃত্যুকে খারাপ মনে করে এ আশংকায় যে, না জানি তওবা পূর্ণ হওয়া ও উপযুক্ত পাথেয় সংগৃহীত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু এসে পড়ে। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকে খারাপ মনে করার ব্যাপারে ক্ষমার্হ। সে এই হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় من كره لقاء الموت كره الله لقائه (যে মৃত্যুর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।)কারণ, সে মৃত্যুকে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না। বরং এর পরিচয় নিজের ক্রুটির কারণে ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত নসীব না হয়। এর পরিচয় এই যে, সে সর্বক্ষণ পাথেয় সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকবে। এ ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। অন্যথায় সে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সিদ্ধি লাভকারী সাধক সর্বক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করে। কেননা, মৃত্যুর উপরই প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের ওয়াদা কখনও ভুলে না। এরূপ ব্যক্তি দ্রুত মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়, তার আগমনে খুশী হয় এবং মৃত্যুকে প্রিয় জ্ঞান করে, যাতে গোনাহগারদের স্থান থেকে রেহাই পেয়ে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতে পারে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ প্রিয়জন প্রয়োজনের সময় এসেছে। যে অনুতপ্ত হয়, তার যেন সফলতা নসীব না হয়। ইলাহী, তুমি জান, প্রাচুর্যের তুলনায় আমি দারিদ্র্যকে পছন্দ করি, সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতা এবং জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে অধিক ভালবাসি। অতএব, আমার জন্যে মৃত্যুকে সহজ কর, যাতে আমি তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তওবাকারী মৃত্যুকে খারাপ জ্ঞান করার ব্যাপারে ক্ষমাযোগ্য, আর সাধক মৃত্যুকে ভাল জানা ও তার বাসনা করার ব্যাপারে ক্ষমাযোগ্য। তবে তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম সে ব্যক্তি, যে ভাল ও মন্দ জানার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সমর্পণ করে। তার কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে তাই অধিক প্রিয়, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়। এরূপ ব্যক্তি মহব্বত ও এশকের আতিশয্যে 'তাসলীম' ও রেযা' (আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি)-এর স্তরে পৌঁছে যায়।

মোটকথা, মৃত্যুকে স্মরণ করার মাঝেও সওয়াব রয়েছে। কেননা, দুনিয়াতে নিমজ্জিত ব্যক্তিও মৃত্যুকে স্মরণ করে লাভবান হয়। অর্থাৎ, সে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যুর স্মরণ তার সুখ ও আরামকে মলিন এবং আয়েশকে তিক্ত করে দেয়। যেসব বিষয়ে মানুষের আনন্দ ও খাহেশ তিক্ত হয়, সেগুলোই নাজাতের কারণ।

মৃত্যুকে স্মরণ করার ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اكثروا من ذكرهاذم اللذات

অর্থাৎ, তোমরা আনন্দ-উল্লাস ছিন্নকারীকে অধিক স্মরণ কর।

এর মর্ম মৃত্যুকে স্মরণ করে নিজের আনন্দ-উল্লাসকে বিমলিন কর, যাতে এর প্রতি তোমাদের আগ্রহ না থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হও। তিনি আরও বলেন— যদি গৃহপালিত পশু জানত, যা তোমরা জান, তবে তারা কখনও মোটা-তাজা হত না। অর্থাৎ, ক্ষীণ ও কৃশ হয়ে যেত। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে প্রশ্ন করলেন— শহীদদের সাথে কি কেউ উত্থিত হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, যে মৃত্যুকে দিবারাত্রি বিশ বার স্মরণ করে। এসব ফযীলতের কারণ, মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও আখেরাতের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার উপায়। এক হাদীসে আছে—

تحفة المؤمنين الموت

অর্থাৎ, মৃত্যু মুমিনদের উপঢৌকন।

কেননা, দুনিয়া ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জেলখানা। সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট এবং নফস ও শয়তানের তরফ থেকে বিপদে পতিত থাকে। মৃত্যুর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফলস্বরূপ সে এ আযাব থেকে নিষ্কৃতি পায়। এই নিষ্কৃতি তার জন্যে উপঢৌকন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

الموت كفارة لكل مسلم

অর্থাৎ, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের কাফফারা।

এখানে সাচ্চা মুসলমান ও পাকা ঈমানদার বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে ঈমানদারের চরিত্র বিদ্যমান এবং যে সগীরা গোনাহ ও ছোটখাটো বিচ্যুতি ছাড়া কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় না। সে যদি ফরয কর্মের উপর কায়েম থাকে, তবে তার ছোট ছোট গোনাহের জন্যে মৃত্যু কাফফারা হয়ে যায়।

আতা খোরাসানী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মসলিসের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। মজলিস থেকে অট্টহাসির শব্দ তাঁর কানে এলে তিনি বললেন ঃ তোমরা মজলিসে আনন্দ মলিনকারীর আলোচনাও শামিল করে নাও। লোকেরা আরয করল ঃ আনন্দ মলিনকারী কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যু। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন—

اكثروا من ذكر الموت فانه يمحو الذنوب ويزهدفى الدنيا

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। এটা গোনাহকে মিটিয়ে দেয় এবং দুনিয়া বিমুখ করে।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এসে কিছু লোককে হাসতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ কর। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠল। লোকেরা তার খুব প্রশংসা গাইল। তিনি বললেনঃ তোমাদের সে সহচর মৃত্যুকে কেমন স্মরণ করত? তারা বলল ঃ আমরা তাকে মৃত্যুকে স্মরণ করতে কখনও শুনিনি। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে সেই মর্তবার নয়, যে মর্তবার তোমরা তাকে মনে করছ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ লোকদের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ ও মহৎ কে? তিনি বললেন ঃ যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে। এর জন্যে অধিক প্রস্তুতি নেয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যু দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছে এবং বুদ্ধিমানের জন্যে খুশীর নাম-গন্ধ রাখেনি। রবী' ইবনে খায়ছাম (রহঃ) বলেন ঃ ঈমানদার যদি কোন কিছুর অপেক্ষা করে, তবে মৃত্যুর চেয়ে উত্তম তার জন্যে আর কিছু নেই। তিনি বলতেন ঃ আমি মরে গেলে কাউকে খবর দিয়ো না। আস্তে আমাকে মাবুদের দিকে সরিয়ে দেবে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) প্রত্যহ রাত্রিবেলায় আলেমগণকে একত্রিত করতেন, যাতে তারা মৃত্যু, আখেরাত ও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তাঁর মনে হত যেন, সামনে জানাযা নিয়ে বসে আছেন। ইবরাহীম তায়মী (রহঃ) বলেন ঃ দু'টি বস্তু আমার নিকট থেকে দুনিয়ার আনন্দকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে— একটি মৃত্যুর স্মরণ; অপরটি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর চিন্তা। আশআছ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা হাসান বসরীর কাছে গেলে কেবল দোযখ ও আখেরাতের ব্যাপার এবং মৃত্যুর আলোচনা পেতাম। হযরত সফিয়্যা (রাঃ) বলেন ঃ জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে এসে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ কর। তোমার মন নম্র হয়ে যাবে। সে তাই করল এবং দিল নরম হয়ে গেল। এরপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত আয়েশার কাছে আগমন করল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এক আলেমকে বললেন ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ শাসকদের মধ্যে আপনিই প্রথমে মৃত্যুবরণ করবেন না। অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আরও অনেক শাসক মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ আরও বলুন। আলেম বললেন ঃ আদম (আঃ) পর্যন্ত আপনার কোন পিতৃপুরুষ এমন নেই, যে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেনি। এখন আপনার পালা। হযরত ওমর একথা শুনে কেঁদে ফেললেন।

রবী' ইবনে খায়ছাম ঘরে একটি কবর খুদে রেখেছিলেন। প্রত্যহ কয়েকবার সে কবরে শয়ন করে তিনি মৃত্যুর স্মৃতিকে অম্লান রাখতেন। তিনি বলতেন— যদি এক মুহূর্তও মৃত্যুর স্মরণ আমার মন থেকে উধাও হয়ে যায়, তবে মন খারাপ হয়ে যাবে। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মৃত্যু সুখী মানুষদের সুখে ফাটল ধরিয়ে দেয়। অতএব, এমন সুখ অন্বেষণ কর, যা ধ্বংস হয় না।

মৃত্যু এক ভয়াবহ আশংকা সত্ত্বেও মানুষ এ থেকে উদাসীন। এর কারণ, তারা এর চিন্তা কম করে এবং একে স্মরণ করে না। কেউ স্মরণ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলেও মুক্ত মনে করে না; বরং নানা কামনা-বাসনায় তাদের মন ভর্তি থাকে। ফলে, মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মৃত্যুকে স্মরণ করার পদ্ধতি এই যে, অন্তরকে মৃত্যুর স্মরণ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত করে নিবে; যেমন কোন মুসাফির জাহাজ যোগে সমুদ্র ভ্রমণ করতে চাইলে সে ভ্রমণ ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করে না। এভাবে মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রভাব হওয়া বিচিত্র নয়।

এ ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী পন্থা হল, সমকক্ষ ও সমসাময়িক মৃত ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করা অথবা তাদের মৃত্যু ও বিচ্ছেদকে মনে মনে কল্পনা করা। এভাবে চিন্তা করা যে, এখন তাদের সুন্দর দেহ মাটিতে মিশে গেছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা কিভাবে স্ত্রীদেরকে বিধবা এবং সন্তানদেরকে এতীম করে চলে গেছে! তাদের বৈঠকসমূহ কিভাবে উজাড় হয়ে গেছে। এভাবে এক এক জনকে আলাদা আলাদাভাবে স্মরণ করবে। আরও ধ্যান করবে, তারা কিভাবে চলাফেরা করত! এখন তাদের পদযুগল ও দেহের সকল গ্রন্থি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তারা কিভাবে কথা বলত এবং হাসত! এখন কীট-পতঙ্গ তাদের জিহ্বা খেয়ে ফেলেছে। মাটি তাদের দাঁত খেয়ে ফেলেছে। তারা নিজেদের জন্যে এমন কৌশল অবলম্বন করত, যা বিশ বছর পর্যন্ত তাদের অভাব মোচন করে দিতে পারে। অথচ তাদের মরণের মাত্র এক মাসই অবশিষ্ট থাকত। হঠাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত এবং কর্ণকুহরে বেহেশত অথবা দোযখের পয়গাম পৌছে দিত। এরূপ চিন্তা করার পর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবে— আমিও তো তাদের মতই একজন। তারা যেমন গাফেল ছিল, আমিও তেমনি গাফেল। তাদের যে পরিণতি হয়েছে, আমারও তাই হবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি মৃতদেরকে স্মরণ করবে, তখন নিজেকে তাদেরই মত গণ্য করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সে ব্যক্তিই সৎ, যে অপরের কাছ থেকে উপদেশপ্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ অপরের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

মোটকথা, সর্বদা এ ধরনের চিন্তা করা, কবরস্তানে যাওয়া এবং অসুস্থ লোকদেরকে দেখার মাধ্যমে মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে সজীব হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এমন প্রবল হয় যে, সদা সর্বদা চোখের সামনে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করে। শুধু মৌখিক স্মরণে উপকার কমই হয়। দুনিয়ার কোন বস্তু পেয়ে যখন মানুষের মন পুলকিত হয়ে উঠে, তখনই স্মরণ করা দরকার যে, এ বস্তুটি অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে। ইবনে মুতী একদিন নিজের ঘরের দিকে তাকালেন। ঘরের সৌন্দর্য তাঁর মনকে আকৃষ্ট করল। তিনি তৎক্ষণাৎ কেঁদে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি মৃত্যু না হত, তবে আমি তোকে দেখে প্রফুল্ল হতাম।

আশা সংক্ষিপ্ত করা ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে এরশাদ করেছেন— যখন তোমার ভোর হয়, তখন নিজেকে বিকেলের আলোচনা শুনিয়ো না এবং বিকেল হলে সকালের আলোচনা করো না। জীবন থেকে মৃত্যুর জন্যে কিছু নিয়ে নাও এবং সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্যে। হে আবদুল্লাহ, তোমার জানা নেই আগামী কাল তোমার কি নাম হবে— জীবিত না মৃত? হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্যে দু'টি অভ্যাসের আশংকা বেশী করি— একটি খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ও অপরটি দীর্ঘ আশা। খেয়াল-খুশীর অনুসরণ মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আর দীর্ঘ আশা হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। খবরদার, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া তাকেও দেন যাকে মহব্বত করেন এবং তাকেও দেন যাকে অপছন্দ করেন। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে ঈমান দেন। মনে রেখো, কিছু লোক দ্বীনের যোগ্য এবং কিছু লোক দুনিয়ার যোগ্য। তোমরা দুনিয়াদার না হয়ে দ্বীনদার হয়ে যাও। দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে গত হয়ে গেছে এবং আখেরাত এগিয়ে আসছে। খবরদার, তোমরা আমল করার দিনে আছ, যাতে হিসাব-নিকাশ নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা হিসাব-নিকাশের দিনে থাকবে। তখন আমল হবে না।

উম্মে মুনযির বলেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সন্ধ্যায় লোকজনের কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কি লজ্জা-শরম নেই? তারা আরয করল ঃ হুযুর, এ কি কথা। তিনি বললেন ঃ তোমরা এমন সামগ্রী সংগ্রহ কর, যা খাও না। এমন সব আশা কর, যা পাও না। এমন ঘর নির্মাণ কর, যাতে বসবাস কর না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ উসামা ইবনে যায়েদ একশ' দীনারের বিনিময়ে এক মাসের বাকীতে একটি বাঁদী খরিদ করলেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনলাম— তোমরা কি বিস্মিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হও না যে, উসামা এক মাসের ওয়াদায় বাঁদী খরিদ করেছে? নিঃসন্দেহে সে দীর্ঘ আশা করে। কসম সে সত্তার, যার কবযায় আমার প্রাণ, আমি আমার দুচোখ কখনও এই বিশ্বাস না নিয়ে খুলি না যে, বন্ধ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ্ কবয করে নেবেন। আমি এরূপ বিশ্বাস নিয়েও লোকমা মুখে দেই না যে,মৃত্যুর পূর্বেই তা গলাধঃকরণ করে ফেলব। হে আদম সন্তান, তোমরা জ্ঞানী হলে নিজেদেরকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাবের জন্যে যেতেন। প্রস্রাব করে তিনি মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে নিতেন। আমি আরয করতাম— হুযুর, পানি তো আপনার কাছেই রয়েছে। তিনি বলতেন— পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব— এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তিনটি কাঠি নিলেন। একটি নিজের সামনে গাড়লেন, অপরটি তাঁর কাছে এবং তৃতীয়টি দূরে গাড়লেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান এগুলো কি? উত্তরে আরয করা হলো ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আমার সামনের কাঠিটি মানুষ। এর নিকটস্থ কাঠিটি তার মৃত্যু। আর দূরের কাঠিটি হচ্ছে মানুষের আশা। মানুষ এর সাথে সম্পর্ক রাখে, কিন্তু মৃত্যু সে পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। মাঝপথেই জীবনের অবসান ঘটে। এক হাদীসে আছে, মানুষের আশেপাশে নিরানব্বইটি মৃত্যু রয়েছে। সে এগুলো থেকে বেঁচে গেলেও বার্ধক্যের কবলে পড়ে যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এটা মানুষ, আর তার চারপাশে এগুলো তার মৃত্যু। তার দিকে ফণা তুলে রয়েছে। যার প্রতি হুকুম হয়, সেই মানুষকে ধরে বসে। যদি মানুষ এসব মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়, তবে বার্ধক্য এসে তার জীবনাবসান ঘটায়। যার আশায় সে কেবল অপেক্ষাই করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রেওয়ায়েত করেন— রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে একটি চতুর্ভুজ-রেখা আঁকলেন। অতঃপর তার মাঝখানে একটি রেখা টেনে আশেপাশে আরও কয়েকটি রেখা টানলেন। চতুর্ভুজের বাইরেও একটি রেখা টেনে বললেন ঃ তোমরা জান এগুলো কি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি মাঝখানের রেখাকে মানুষ বললেন এবং চতুর্ভুজকে মৃত্যু বললেন, যা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আশেপাশের রেখাগুলোকে তিনি বিপদাপদ বলে আখ্যায়িত করলেন, যা মানুষকে আঁচড়াতে থাকে। একটি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আঁচড়ানো ভুলে গেলে অপরটি আঁচড়িয়ে নেয়। আর বাইরের রেখাটিকে তিনি নাম দিলেন আশা।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

يهرم ابن ادم ويبقى معه اثنتان الحرص والامل

অর্থাৎ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায় এবং তার সাথে দু'টি জিনিস অবশিষ্ট থাকে— লালসা ও আশা।

এক রেওয়ায়েতে আছে—

وتشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر -

অর্থাৎ, আর যুবক হয় তার সাথে দুটি জিনিস— অর্থের লালসা ও জীবনের লালসা।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এক জায়গায় বসে ছিলেন। কাছেই এক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন— ইলাহী, এব্যক্তি থেকে আশা দূর করে দাও। বৃদ্ধ কোদাল ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং এক ঘন্টা পড়ে রইল। হযরত ঈসা (আঃ) আবার দোয়া করলেন— ইলাহী, তার আশা তাকে ফিরিয়ে দাও। বৃদ্ধ উঠে কাজ করতে লাগল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পূর্বে কেন শুয়ে রইলে এবং এখন কেন কাজ শুরু করেছ?

সে বলল ঃ কাজ করতে করতে আমার নফস আমাকে বলল, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। এখন কাজ করছ কেন? তাই আমি কোদাল ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার নফস আমাকে বলল, যে পর্যন্ত জীবিত আছ, দিনাতিপাতের চিন্তা করতেই হবে। তাই উঠে কাজ শুরু করেছি।

হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সবাই কি জান্নাতে যাওয়া পছন্দ কর? উত্তর হল ঃ জী হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তাহলে জীবনের লালসা কম কর এবং মৃত্যুকে চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে নাও। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন দুনিয়া থেকে, যা আখেরাতের কল্যাণ লাভে বাধা হয়, এমন জীবন থেকে, যা মৃত্যুর কল্যাণ থেকে বিরত রাখে এবং এমন আশা থেকে, যা আমলের কল্যাণলাভে প্রতিবন্ধক হয়।

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি কবে মরব তা যদি জানা থাকত, তবে আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীনতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এ উদাসীনতা না থাকলে জীবন যাপন ভালরূপে হত না এবং বাজারও জমত না।

হযরত হাসান বলেন ঃ ভুলে যাওয়া এবং আশা— এ দুটি মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। এ দুটি না থাকলে মুসলমান পথে বের হতে পারত না।

হযরত ছওরী বলেন ঃ সংসারের প্রতি উদাসীনতাই হচ্ছে আশা খাটো করা— মোটা খাওয়া ও কম্বল পরিধান করা নয়।

কথিত আছে, শকীক বলখী (রহঃ) নিজের ওস্তাদ আবু হাশেম রোমানীর কাছে আগমন করলেন। তাঁর চাদরের কোণে কিছু বাঁধা ছিল। ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার চাদরের কোণে ওটা কি? তিনি বললেন ঃ আমার এক ভাই কিছু বাদাম দিয়ে বলেছে এর দ্বারা ইফতার করলে সে খুশী হবে। ওস্তাদ বললেন ঃ শকীক তুমি মনে মনে একথা বল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকবে! তোমার সাথে আমার কোন কথা নেই, যাও। শকীক বলেন ঃ ওস্তাদ একথা বলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে রইলেন।

আশার কারণ ও প্রতিকার ঃ দীর্ঘ আশার কারণ হল দুনিয়ার মহব্বত। মানুষ যখন দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত হয়, তখন তার মনে দুনিয়ার বিচ্ছেদ খুব কষ্টকর হয়। সে তখন মৃত্যুকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ যাকে ঘৃণা করে, তাকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জড়িয়ে রাখে। ফলে, তার মন সে আশার ভেতরেই আবদ্ধ থাকে, মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকে না। যদি কোন কারণে মৃত্যু ও তার প্রস্তুতির কথা মনে উদয় হয়, তবে তার নফস তাকে বলে— এখনও অনেক দিন বাকী রয়েছে। বড় হয়ে তওবা করে নিয়ো। যখন মানুষ বড় হয়, তখন নফস বলে বুড়ো হয়ে তওবা করে নিয়ো। যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন নফস বলে— এ ঘর নির্মাণ শেষ করে অথবা এ সফর থেকে ফিরে এসে অথবা পুত্র-কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেলে তওবা করে নিয়ো।

মোটকথা, এমনিভাবে নফস মৃত্যুর প্রস্তুতিকে বিলম্বিত করতে থাকে। অথচ যে কাজ শুরু করে, তা পূর্ণ করতে আরও দশ কাজ বের হয়ে আসে। এভাবে একের পর এক দিন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু প্রস্তুতি হয়ে উঠে না। অবশেষে মৃত্যু এমন সময় এসে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে যার ধারণাও সে করে না। তখন অনুতাপ ও আফসোস ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। বেচারী মানুষ জানে না, যে কারণে আজ বিলম্বিত করে, তা কালও থাকবে; বরং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা আরও মযবুত হয়ে যাবে। মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্যে কোন না কোন সময় অবসর পাওয়া যাবে—এরূপ ধারণা করা খামখেয়ালী বৈ কিছু নয়। তবে যে আশা খাটো করে, সে-ই অবসর পায়।

মানুষ প্রায়শ নিজের যৌবনের উপর ভরসা করে এবং যৌবনে মৃত্যু আসাকে অবান্তর মনে করে। সে চিন্তা করে না যে, তার এলাকার বুড়োদেরকে গণনা করলে দশ-পাঁচ জনের বেশী হবে না। তাদের সংখ্যা কম হওয়ার একমাত্র কারণ যৌবন অবস্থায় মৃত্যু বেশী হওয়া। যতদিনে একজন বুড়ো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, ততদিনে হাজারো যুবক ও শিশু মারা যায়।

মানুষ কখনও নিজের সুস্বাস্থ্যের কারণে মৃত্যুকে অবান্তর জ্ঞান করে এবং হঠাৎ মৃত্যুর আগমনকে কঠিন মনে করে। সে জানে না, সহসা মৃত্যু হওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। রোগ-ব্যাধি তো সহসাই হয়ে থাকে। রোগী হয়ে গেলে মৃত্যু আর কত দূরে থাকে! যদি গাফেল মানুষ চিন্তা করে যে, মৃত্যুর জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই— যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে যেকোন সময় মৃত্যু আসতে পারে, এর জন্যে কোন ঋতুও নির্দিষ্ট নেই— শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্তে আসতে পারে এবং দিবারাত্রিও নির্দিষ্ট নেই, তবে অবশ্যই সে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সে তো মূর্খতা ও

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুনিয়ার মোহে পড়ে দীর্ঘ আশার হাতে গ্রেফতার হয়ে সর্বদা একথাই মনে করে যে, মৃত্যু তার সামনেই হবে। তার ধারণা, সে জানাযার সাথে চলবে; কিন্তু তার জানাযার সাথেও যে মানুষ চলবে তা কল্পনা করে না। এর প্রতিকার হল নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তার জানাযাও উঠবে এবং তাকেও কবরে দাফন করা হবে— যেমন অন্যকে করা হয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর প্রস্তুতি বিলম্বিত করা নিরেট মূর্খতা।

অতএব, বিলম্বিত করার প্রতিকার হল মূর্খতার অবসান এবং দুনিয়ার মোহ বর্জন। মূর্খতা এভাবে দূর করবে যে, উপস্থিত মন নিয়ে সাফ চিন্তা করবে এবং পূর্ণ জ্ঞানের কথাবার্তা সৎলোকদের কাছ থেকে শ্রবণ করবে। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা অবশ্য কঠিন কাজ। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এর চিকিৎসায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এর চিকিৎসা এটাই যে, আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং আখেরাতে যে মহা আযাব ও উৎকৃষ্টতম সওয়াব পাওয়া যাবে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাসের ফলে অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ কেটে যাবে। কেননা, বড় বিষয়ের মহব্বত অন্তর থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ের মহব্বতকে অপসারিত করে দেয়। অতএব, যখন দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও আখেরাতের উৎকৃষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে, তখন দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেও খারাপ মনে করবে। কেননা, প্রত্যেক মানুষ যে সামান্য দুনিয়া পায়, তাও মালিন্য ও বিস্বাদমুক্ত থাকে না। সুতরাং আখেরাতে বিশ্বাস থাকলে দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ না করারই কথা। আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দুনিয়াকে আমাদের দৃষ্টিতে এমন করে দেন, যেমন তাঁর নেক বান্দাদের দৃষ্টিতে করে রেখেছেন।

আশার ক্ষেত্রে মানুষের স্তরভেদ ঃ আশার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ চিরকাল বেঁচে থাকার আশা করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ, তাদের কেউ এক হাজার বছর বয়স হওয়াকে পছন্দ করে।

কেউ বুড়ো হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়। অর্থাৎ, অন্যান্য লোকের যতটুকু বয়স ও জীবন দেখে, ততটুকুরই প্রত্যাশা করে। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াকে অত্যধিক মহব্বত করে। হাদীস শরীফে আছে— বৃদ্ধ ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দুনিয়ার অন্বেষণে যুবক হয়ে যায়– যদিও বার্ধক্যের কারণে তার হাঁসুলী বাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু পরহেযগারদের কথা ভিন্ন। আর তাদের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন ব্যক্তি এক বছর বাঁচতে চায় এবং এর বেশী দিনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে না। আগামী বছর তাদের অস্তিত্ব থাকবে বলে তারা মনে করে না। তবে গ্রীষ্মকালে শীতের জন্যে এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের জন্যে উপকরণ যোগাড় করে। সারা বছরের আসবাবপত্র যোগাড় হলে তারা এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। কতক লোক শুধু গ্রীষ্ম অথবা শীত মওসুমেই বেঁচে থাকার আশা করে। এ কারণে তারা গ্রীষ্মে শীতের উপকরণ এবং শীতে গ্রীষ্মের উপকরণ সংগ্রহ করে না। কিছু লোকের আশা কেবল একদিন ও একরাত পর্যন্ত সীমিত থাকে। ফলে, তারা সারা দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে— আগামীকালের চিন্তা করে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ আগামীকালের রুযীর জন্যে যত্নবান হয়ো না। কেননা, তুমি আগামীকালের সময় পেলে, সময় ও রিযিক উভয়টিই পাবে। আর যদি আগামীকাল সময় না পাও, তবে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ এক মুহূর্তের আশা করে মাত্র। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে আবদুল্লাহ, যখন তোমার ভোর হয়, তখন বিকালের চিন্তা করো না। আর যখন বিকাল হয় তখন সকালের চিন্তাকে মনে স্থান দিয়ো না। কেউ কেউ এক মুহূর্ত বেঁচে থাকারও বিশ্বাস রাখে না। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অদূরে পানি থাকা সত্ত্বেও এস্তেঞ্জার পর মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নিতেন এ আশংকায় যে, যদি পানি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই জীবন শেষ হয়ে যায়। আবার কিছু লোক এমনও রয়েছে মৃত্যু যেন তাদের চোখের সামনেই রয়েছে এবং তাদেরকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। এধরনের লোক মৃত্যুর অপেক্ষায়ই থাকে। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর অবস্থা তা-ই ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরয করলেন ঃ আমি পা ফেলার সময় এরূপ ধারণা অবশ্যই রাখি যে, এরপর হয়তো আর দ্বিতীয় পা ফেলতে পারব না। আসওয়াদ হাবশী রাতের বেলায় নামায পড়তেন এবং ডানে-বামে তাকাতেন। কেউ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমি মালাকুল মওতকে দেখি সে কোন্ দিক দিয়ে আমার কাছে আসে। এগুলো হচ্ছে আশার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৃথক পৃথক মর্যাদা রয়েছে। তবে যার আশা এক মাস, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যার আশা এক মাস একদিন। অর্থাৎ, উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কণা পরিমাণও বে-ইনসাফী করেন না। তিনি বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

অর্থাৎ, যে কণা পরিমাণও সৎ কাজ করবে, সে তা দেখবে।

আশা খাটো হওয়ার প্রভাব আমলের প্রতি অগ্রগামী হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যে দাবী করে যে, তার আশা খাটো, তার দাবীর সত্যতা আমল দ্বারা বুঝা যাবে। যদি সে এমন সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে, যার প্রয়োজন বছরের মধ্যে পড়ে না, তবে বুঝতে হবে তার আশা দীর্ঘ। তাওফীকের আলামত হচ্ছে মৃত্যু চোখের সামনে থাকা, তা থেকে এক মুহূর্তও গাফেল না হওয়া এবং এমনভাবে প্রস্তুত থাকা, যেন এখনি এসে পড়বে। এরপর যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে যায়, তবে আল্লাহর শোকর করবে যে, আল্লাহ তার দ্বারা আনুগত্য করিয়েছেন এবং দিনটি বিফলে যায়নি। এরপর ভোর বেলায় এমনিভাবে প্রস্তুতি নেবে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাই করবে। এটা তার জন্যেই সহজ হয়, যে আগামীকালের চিন্তা করে না। এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে সৌভাগ্য লাভ করবে এবং জীবিত থাকলে উত্তম প্রস্তুতি ও মোনাজাতের আনন্দে উৎফুল্ল থাকবে।

দ্রুত আমল করা ও বিলম্ব থেকে বেঁচে থাকা ঃ যে ব্যক্তির দু'ভাই বিদেশে অবস্থান করে এবং একজনের আগামীকাল ফিরে আসার ও অপরজনের এক বছর পর ফিরে আসার কথা থাকে, সে সেই ভাইয়ের আগমনেরই প্রস্তুতি নেবে, যে আগামী কাল আসবে। এক বছর পর যে ভাই আসবে, তার জন্যে প্রস্তুতি নেবে না। এ থেকে বুঝা যায়, নিকটতম সময়ে যার অপেক্ষা করা হয়, প্রস্তুতি তার জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এক বছর পর মৃত্যুর আগমনের অপেক্ষা করে, তার অন্তর সে মেয়াদের সাথেই সংযুক্ত থাকে। সে অন্তর্বর্তী দিনগুলোতে মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করে না। সে প্রত্যহ সকালে মনে করে এখনও পূর্ণ এক বছর সামনে আছে। সে সেদিনকেই বছরের শুরু মনে করে, যে দিনে সে বিদ্যমান। দিন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু এক বছর এক বছরই থেকে যায়–হ্রাস পায় না। এ মনোবৃত্তি তাকে দ্রুত আমল করতে দেয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে রুগ্নাবস্থার পূর্বে, প্রাচুর্যকে দারিদ্রের পূর্বে, অবসর মুহূর্তকে কর্মব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

অর্থাৎ, দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ লোকসানে পতিত— একটি সুস্থতা এবং অপরটি অবসর। অর্থাৎ, মানুষ এ দু'টি নেয়ামতকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে না। কিন্তু যখন এগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন এর কদর বুঝে। এক হাদীসে আছে— যে ভয় করে, সে রাতের শুরু ভাগেই রওয়ানা হয়ে যায়। আর যে শুরু ভাগে রওয়ানা হয়, সে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনরূপ উদাসীনতা অথবা ভ্রান্তি লক্ষ্য করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—

اتتكم الموت راتبة لازمة امابشقاوة وامابسعادة

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে মৃত্যু এসেছে অপরিহার্য হয়ে দুর্ভাগ্য নিয়ে অথবা সৌভাগ্য নিয়ে। কোরআনের আয়াত—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -

অর্থাৎ, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কার আমল সুন্দর, তা দেখার জন্য।

সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে, তার প্রস্তুতি ভালরূপে নেয় এবং তাকে বেশী ভয় করে।

সহীম বলেন ঃ আমি আমের ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ কেন এসেছ বলে ফেল। আমি একজনের অপেক্ষা করছি। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কার অপেক্ষায় আছেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, আমি মালাকুল মওতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপেক্ষায় আছি। একথা শুনে আমি সেখান থেকে প্রস্থান করলাম এবং তিনি নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন।

হযরত দাউদ তাঈ পথ চলছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে যেতে দাও। আমি আমার প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সবকিছুতে বিলম্ব করা ভাল— আখেরাতের আমল ছাড়া।

হযরত হাসান (রহঃ) ওয়ায প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমল করার জন্যে তাড়াহুড়া কর। কেননা, জীবন কয়েকটি নিঃশ্বাস মাত্র। যদি আটকে যায়, তবে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আমল করতে পারবে না। আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে নিজের চিন্তা করে এবং গোনাহের জন্যে কাঁদে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

অর্থাৎ, আমি তো মানুষের গণনা পূর্ণ করি। অর্থাৎ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গণনা করি। গণনা শেষে মানুষের প্রাণ নির্গত হয়।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি এত পরিশ্রম করবেন না। নিজের প্রতি নম্রতা করুন। তিনি বললেন ঃ ঘোড়দৌড়ে ঘোড়া যখন দৌড়াতে দৌড়াতে লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি চলে যায়, তখন দৌড়ের যতটুকু ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে, সেটুকু নিঃশেষে তখনই ব্যয় করে। আমার মৃত্যুর যে সময় অবশিষ্ট আছে, সেটা এর চেয়েও কম। তিনি অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এমনিভাবে আমল করেছেন। তিনি নিজের স্ত্রীকে বলতেন ঃ বাহন কষে নাও। জান্নাতে অবতরণের কোন কিছু নেই। অর্থাৎ আমলই জান্নাতে অবতরণের বস্তু। অতএব এতে খুব চেষ্টা কর।

মৃত্যু ও সে সময়কার মোস্তাহাব আমল ঃ হযরত লোকমান নিজের পুত্রকে বলেন ঃ বৎস, মৃত্যু কখন আসবে, তা তোমার জানা নেই। সুতরাং অকস্মাৎ মৃত্যু আসার পূর্বে তুমি তার প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ আনন্দ-কোলাহলে মত্ত থাকা অবস্থায় যদি কল্পনা করে যে, এখনি এক সিপাহী এসে লাঠির উপর লাঠি মারতে থাকবে, তবে তার সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হয়ে যাবে। মানুষ জানে, মালাকুল মওত অকস্মাৎ মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু এতে তার আরাম-আয়েশ এতটুকুও মলিন হয় না। এর কারণ মূর্খতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রূহ কবয করার সময় যে অসহনীয় যন্ত্রণা ও কষ্ট হয়, তার স্বরূপ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। যে ব্যক্তি এই কষ্ট আস্বাদন করে না, সে তা দুই উপায়ে জানতে পারে। এক, অন্যান্য ব্যথা, যা সে ভোগ করেছে, তার সাথে অনুমান করে এবং দুই, অন্যের মৃত্যুকষ্ট স্বচক্ষে দেখে। অনুমান এভাবে হবে যে, মানুষের যে অঙ্গে প্রাণ থাকে না, তাতে ব্যথা অনুভূত হয় না। ব্যথা তখনই হয়, যখন সে অঙ্গে প্রাণ তথা রূহ থাকে। অতএব, যে বস্তু দ্বারা ব্যথা জানা যায়, তা হচ্ছে রূহ। কোন অঙ্গে ক্ষত অথবা জ্বালা হলে তার প্রভাব রূহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং যে পরিমাণ প্রভাব পৌঁছে, সে পরিমাণই ব্যথা হয়। ব্যথা যেহেতু মাংস, রক্ত ইত্যাদিতে সরে যায়, তাই রূহ সামান্যই ব্যথা পায়। আর যদি ব্যথা বিশেষভাবে রূহেই হয়, অন্য অঙ্গে না হয়, তবে এ ব্যথা যে একান্তই অসহনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। মৃত্যু-যন্ত্রণার অর্থ এটাই। এই যন্ত্রণা বিশেষভাবে রূহেই হয়ে থাকে এবং সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে ছড়িয়ে থাকা রূহের কোন অংশই এ ব্যথা থেকে বাদ পড়ে না। উদাহরণতঃ মানুষের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে যে ব্যথা অনুভূত হয়, তা শুধু রূহের সে অংশেই থাকে, যা দেহের সেই অংশে বিদ্যমান। কিন্তু কোন অঙ্গ আগুনে পুড়ে গেলে তার জ্বালা সমগ্র দেহে অনুভূত হয়। কেননা, আগুনের সকল অংশ দেহের সমগ্র অংশে অনুপ্রবেশ করে। কোন অংশ আগুন থেকে বাদ থাকে না। ফলে, রূহেরও কোন অংশ ব্যথা থেকে বাদ পড়ে না। মৃত্যু কষ্টও আগুনের জ্বালার অনুরূপ। রূহকে প্রতিটি শিরা-উপশিরা থেকে টেনে টেনে বের করা হয়। একারণেই বলা হয়, মৃত্যু তরবারির আঘাত, করাত দিয়ে চিরা এবং কাঁচি দিয়ে কাটার তুলনায় অধিকতর কষ্টকর। তবে তরবারির আঘাতে মানুষ চিৎকার করে; কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিৎকার করে না। এর কারণ মৃত্যু-যন্ত্রণা মানুষের অন্তর, জিহবা ও অন্যান্য অঙ্গের শক্তি নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এবং চিৎকারের ক্ষমতা থাকে না। তরবারির আঘাতে এমন হয় না।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে মরতে থাকে। প্রথমে পদ যুগল শীতল হয়, এরপর গোছা, এরপর উরু, এরপর মৃত্যু কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কণ্ঠে দম আটকে যাওয়ার শব্দ না হওয়া পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল হয়। কোরআনের আয়াত—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَاحَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ -

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তওবা নেই, যারা গোনাহ্ করতে থাকে, অবশেষে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এখন তওবা করলাম। হযরত মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন— উদ্দেশ্য সে সময়, যখন মালাকুল মওত ও ফেরেশতাগণ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মোটকথা, অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর তিক্ততা ও কঠোরতা বর্ণনাযোগ্য নয়। একারণেই রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করেছেন—

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ, এলাহী, মোহাম্মদের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করুন।

মানুষ এবিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না। কারণ, তারা এ কষ্ট অনুমানই করতে পারে না। পয়গম্বর ও ওলীগণ খোদায়ী নূরের সাহায্যে এটা অনুমান করতে পারেন। তাই তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে খুব ভয় পান। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ! আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর, যাতে তিনি আমার উপর মৃত্যুর কঠোরতা সহজ করে দেন। কারণ, আমার মধ্যে মৃত্যুর ভয় এত বেশী যে, মরার আগেই মরে যাওয়ার দশা। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের কিছু লোক এক কবরস্তানের কাছ দিয়ে গমন করছিল। তারা পরস্পরে বলল ঃ এস দোয়া করি, যাতে এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। অতঃপর সকলেই দোয়া করলে এক কবর থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এল। তার দুচোখের মাঝখানে সেজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল ঃ লোক সকল, আমার কাছে তোমাদের কি প্রয়োজন? পঞ্চাশ বছর হয় আমি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর তিক্ততা মুখ থেকে দূর হয়নি।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যুর ব্যথা ও গলায় আটকে যাওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছেন— এর কষ্ট তরবারির তিনশ' আঘাতের সমান।

হযরত আলী (রাঃ) মানুষকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করে বলতেন, যদি তোমরা যুদ্ধে নিহত না হও, তবু মরবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর কবযায়

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমার প্রাণ, হাজার তরবারির আঘাত আমার কাছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করার তুলনায় সহজ।

শাদ্দাদ ইবনে আওস বলেন ঃ ঈমানদারের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে কোন ভয় মৃত্যুর চেয়ে বেশী নেই। মৃত্যু যন্ত্রণা করাত দিয়ে চিরা, কাঁচি দিয়ে কাটা এবং পাতিলে সিদ্ধ হওয়ার তুলনায় বেশী। যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে কোন মৃত জীবিত হয়ে দুনিয়াবাসীকে মৃত্যুর কষ্ট শুনিয়ে দেয়, তবে তারা নিজের জীবন দ্বারা কোন উপকার গ্রহণ করবে না এবং নিদ্রায়ও সুখ পাবে না।

জনৈক বুযুর্গ প্রায়ই রোগীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, মৃত্যু তোমার কাছে কেমন? যখন তিনি নিজে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ মৃত্যু আপনার কাছে কেমন মনে হয়? তিনি বললেন ঃ মনে হয় যেন আকাশ এসে পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে, আর আমার আত্মা সূঁচের ছিদ্র পথে বের হয়ে আসছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

موت الفجاة راحة للمؤمن واسف على الفاجر -

অর্থাৎ, আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্যে সুখ এবং পাপাচারির জন্যে পরিতাপ।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন ওফাত পেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে আমার খলীল, তুমি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছ? তিনি বললেন ঃ যেমন উত্তপ্ত শিক ভিজা তুলার মধ্যে রেখে টেনে নেয়া হয়। আল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমার উপর মৃত্যুকে সহজ করেছি।

সহীহ রেওয়ায়েতে আছে— ওফাতের সময় রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি পেয়ালায় পানি রাখা হয়েছিল। তিনি সে পানিতে হাত ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে বুলাতেন এবং বলতেন—

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর।

হযরত ফাতেমা বলতেন, আব্বাজান, আপনার কি কষ্ট! তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ আজকের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।

হযরত ওমর (রাঃ) কা'বে আহবার (রাঃ)-কে বললেন ঃ মৃত্যুর কিছু

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ মৃত্যু এমন, যেমন কোন কাঁটাদার শাখা কোন মানুষের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং প্রত্যেকটি কাঁটা তার সমস্ত শিরা-উপশিরায় বিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর কোন সবল ও সুঠাম ব্যক্তি শাখাটি ধরে সজোরে টান দেয়। ফলে যা আসে, তা আসে এবং যা থাকে, তা থেকে যায়।

মৃত্যুর এ কঠোরতা আল্লাহ তা'আলার ওলী ও দোস্তগণের প্রতি। আমরা তো গোনাহে নিমজ্জিত। আমাদের কি অবস্থা হবে? মৃত্যু-যন্ত্রণা ছাড়া আমাদের উপর আরও বিপদ আপতিত হবে। মালাকুল মওতের চেহারা দেখা একটি বড় বিপদ। মালাকুল মওত যে চেহারা নিয়ে গোনাহগারদের রূহ কবয করে, তা সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিরও দেখার সাধ্য নেই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) একবার মালাকুল মওতকে বললেন ঃ যদি সম্ভব হয় তুমি আমাকে সে আকৃতি দেখাও, যা ধারণ করে তুমি গোনাহগারের রূহ কবয কর। মালাকুল মওত আরয করল ঃ আমি দেখাতে পারি; কিন্তু আপনি সহ্য করতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ কেন সহ্য করতে পারব না? মালাকুল মওত বলল ঃ মুখ ফেরান। তিনি মুখ ফিরিয়ে পুনরায় তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, একজন কৃষ্ণকায়, কেশ খাড়া দুর্গন্ধযুক্ত কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়ানো। তার মুখ ও নাকের ছিদ্র দিয়ে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন মালাকুল মওত পূর্বের আকৃতিতে বিরাজমান ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ যদি গোনাহগার ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তোমার চেহারা দেখা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট না হয়, তবে এটাই তার কষ্টের জন্যে যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা মালাকুল মওতকে অত্যন্ত সুশ্রী ও সুগঠিত দেখতে পায়। হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বিশেষ এবাদত কক্ষ ছিল। তিনি বাইরে যাওয়ার সময় সেটি বন্ধ করে যেতেন। একদিন ফিরে এসে কক্ষের ভেতরে এক ব্যক্তিকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে আমার কক্ষে কে দাখিল করল? লোকটি বলল ঃ কক্ষের মালিক। তিনি বললেন ঃ কক্ষ তো আমার। সে বলল ঃ আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, যিনি আপনার ও আমার চেয়ে বেশী মালিক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন ফেরেশতা? সে আরয করল, আমি মালাকুল মওত। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ তুমি যে আকৃতি ধারণ করে মুমিনের রূহ কবয কর, তা আমাকে দেখাতে পার কি? সে আরয করল ঃ হাঁ, একটু মুখ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফেরান। তিনি মুখ ফিরানোর পর পুনরায় তাকাতেই দেখলেন একজন সুশ্রী যুবক দাঁড়ানো। বর্ণনাকারী তার সৌন্দর্য, পোশাকের জাঁকজমক ও সুগন্ধি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ হে মালাকুল মওত, যদি মুমিন কেবল তোমারই দীদার লাভ করে এবং অন্য কোন সওয়াব না পায়, তবু তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

দু'জন লেখক ফেরেশতাকে দেখাও এরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমরা এ খবর পেয়েছি যে, মৃতের সামনে দু'জন আমল লেখক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করে। মৃতব্যক্তি আনুগত্যশীল হলে তারা বলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অনেক. সৎ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ এবং অনেক সৎ কাজে হাযির করেছ। আর মৃতব্যক্তি গোনাহগার হলে তারা বলে ঃ আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান না করুন। অনেক মন্দ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ এবং অনেক মন্দ কাজে হাযির করেছ। মন্দ কথা শুনিয়েছ। এটা তখন হয়, যখন মৃতের দৃষ্টি তাদের উপর পতিত হয়।

তৃতীয় বিপদ হচ্ছে দোযখে গোনাহগারদের ঠিকানা দেখতে পাওয়া। তারা তা দেখার পূর্বেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, অন্তিম মুহূর্তে তাদের দৈহিক শক্তিগুলো শিথিল হয়ে যায় এবং আত্মা বের হওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা মালাকুল মওতের একটি বাক্য না শুনা পর্যন্ত বের হয় না। এক বাক্য গোনাহগারের জন্যে এই ঃ হে আল্লাহর দুশমন! দোযখের সুসংবাদ শুন। অপর বাক্য মুমিনের জন্যে এই ঃ হে আল্লাহর ওলী! বেহেশতের খবর শুন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— তোমাদের কেউ দুনিয়া থেকে কখনও বের হবে না, যে পর্যন্ত জান্নাতে অথবা দোযখে নিজের ঠিকানা ও বৈঠক না দেখে নেবে। এক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে ঃ

من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاءه كره الله لقاءه -

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমরা তো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন ঃ এটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের বিপদকে সহজ করে দেয়া হলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন।

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন বলেন— হে মালাকুল মওত! আমার অমুক বান্দার কাছে যাও এবং তার রূহকে আমার কাছে আন, যাতে তাকে সুখী করি। তার আমল দ্বারা আমি কেবল তাকে পরীক্ষা করছি। আমি যেমন চেয়েছিলাম, তাকে তেমনি পেয়েছি। অতঃপর মালাকুল মওত পাঁচশ' ফেরেশতা সমভিব্যাহারে সে বান্দার কাছে যায়। ফেরেশতাদের হাতে থাকে ফুলের ছড়ি, জাফরানের শাখা। প্রত্যেক ফেরেশতা তাকে নতুন সুসংবাদ শুনায়। তার রূহের জন্যে ফেরেশতারা দু'সারিতে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শয়তান তাদেরকে দেখে মাথায় হাত রেখে চিৎকার করে এবং রাগে দাঁত কটমট করতে থাকে। তার বাহিনী তাকে জিজ্ঞেস করে— তোমার কি হল? এমন করছ কেন? সে বলে— তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, এই বান্দা এত মর্তবা লাভ করল, তোমরা কোথায় ছিলে? তার খবর নাওনি কেন? বাহিনী বলে— আমরা অনেক হাত-পা মেরেছি; কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হযরত হাসান বলেন ঃ মু'মিনের সুখ আল্লাহ তা'আলার দীদারেই নিহিত। মৃত্যুর দিন তার জন্যে উল্লাস, খুশী ও ইযযতের দিন হয়ে থাকে।

জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ)-কে কেউ মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি চান? তিনি বললেন ঃ হাসান বসরীকে দেখতে চাই। হযরত হাসান বসরী তাঁর কাছে গেলে বলা হল ঃ হাসান বসরী উপস্থিত হয়েছেন। হযরত জাবের তাঁর দিকে চোখ তুলে বললেন ঃ নাও ভাই, এখন আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জান্নাত অথবা দোযখের দিকে চললাম।

মৃত্যুর সময় মানুষের উত্তম অবস্থা হচ্ছে স্থির থাকা, মুখে কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা থাকা। আকার-আকৃতি কিরূপ হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির জন্যে তিনটি বিষয় আশাব্যঞ্জক— কপালে ঘাম থাকা, চক্ষু অশ্রুসজল থাকা এবং ঠোঁট শুকনো থাকা। এগুলো আল্লাহ তা'আলার রহমতের লক্ষণ, যা তার উপর নাযিল হয়। কণ্ঠে নাক ডাকার শব্দ এবং

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

লোহিত বর্ণ ও ঠোঁট মেটে রঙের হওয়া আযাবের লক্ষণ। মুখ দিয়ে কালেমায়ে শাহাদত বের হওয়া কল্যাণের লক্ষণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لقنوا امواتكم لااله الاالله

অর্থাৎ, তোমরা মরণোন্মুখ ব্যক্তিদেরকে কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার উপদেশ দাও।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরপর আছে,

فانها تهدم ما قبلها من الخطايا –

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা মরণোন্মুখদের কাছে যাও, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং কালেমা তাইয়েবার তালকীন কর। কেননা, তারা দেখে। যে কালেমার তালকীন করবে, তার উচিত পীড়াপীড়ি না করা; বরং নম্রতা সহকারে বলা। কেননা, রোগীর জিহ্বা কোন সময় বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন তার কাছে পীড়াপীড়ি অসহনীয় মনে হয়। ফলে, কালেমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে খাতেমা অশুভ হওয়ার আশংকা থাকে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা রাখার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াছেলা ইবনে আসকা কোন এক রোগীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ কর? সে বলল ঃ আমার গোনাহ আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমি আমার পালনকর্তার রহমত আশা করি। একথা শুনে ওয়াছেলা "আল্লাহু আকবার" বললেন। তার সাথে উপস্থিত সবাই "আল্লাহু আকবার" বলল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে একটি হাদীসে কুদসী শুনেছি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটবর্তী থাকি। সে যা ইচ্ছা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করুক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক যুবকের কাছে মরণাপন্ন অবস্থায় গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নিজেকে কেমন মনে কর? সে আরয

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী এবং নিজের গোনাহের জন্যে ভীতু। তিনি বললেন ঃ এই অবস্থায় এ দু'টি বিষয় যার অন্তরে একত্রিত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা-ই দেন— যা সে আশা করে। তাকে ভয় থেকে নিরাপদ রাখেন।

মৃত্যুর সময় বান্দার সামনে তার আমলের সৌন্দর্য আলোচনা করা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মতে মুস্তাহাব, যাতে সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা করে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যখন কোন প্রাণ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং কোন প্রাণ পশ্চিম প্রান্তে থাকে অথবা কোন জায়গায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় অথবা দুই বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তুমি কি কর? মালাকুল মওত বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশে আত্মাসমূহকে ডাক দেই। তারা আমার এই দু'অঙ্গুলির মধ্যে এসে যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ পৃথিবী মালাকুল মওতের সামনে বড় থালার মত বিস্তৃত থা ক। সে তা থেকে যাকে ইচ্ছা নিয়ে নেয়।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ এক বাদশাহ কোথাও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সে প্রথমে পোশাক আনতে বলল। পোশাক ভাল মনে হল না। অন্য পোশাক আনতে বলল। এভাবে সে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র জোড়াটি পরিধান করল। এমনিভাবে সে সওয়ারীসমূহের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম ছিল, সেটিতে আরোহণ করল। এরপর শয়তান এসে তার নাকের ছিদ্র পথে ফুঁ মেরে তাকে গর্ব ও অহংকারে পূর্ণ করে দিল। বাদশাহ লশকর সমভিব্যাহারে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হল। গর্ব ও অহংকারের আতিশয্যে কারও প্রতি তার দৃষ্টি পড়ত না। ইতিমধ্যে তার কাছে সেকেলে গোছের এক ব্যক্তি এসে সালাম করল। বাদশাহ সালামের জওয়াব দিল না। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল। বাদশাহ বলল ঃ লাগাম ছেড়ে দে। তুই চরম ধৃষ্টতা করেছিস। লোকটি বলল ঃ তোমার সাথে আমার কাজ আছে। বাদশাহ বলল ঃ আচ্ছা, বল কি বলবি। লোকটি বলল ঃ গোপন কথা বলব ঃ বাদশাহ মাথা নত করলে সে তার কানে আস্তে বলল ঃ আমি মালাকুল মওত। বাদশাহের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে কম্পিত স্বরে বলল ঃ আমাকে সময় দাও, যাতে আমি ঘরে ফিরে প্রয়োজন সেরে নিতে পারি এবং পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে পারি। সে বলল ঃ এখন সময় নেই। আপন ঘর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ও পরিবার-পরিজনকে দেখা তোমার আর ভাগ্য হবে না। এরপর মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল। সে কাঠের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেল।

এরপর মালাকুল মওত সামনে এগিয়ে গিয়ে এক ঈমানদারের সাথে মিলিত হল। তাকে সালাম করলে সে সালামের জওয়াব দিল। মালাকুল মওত বলল ঃ আমাকে তোমার কানে কানে কিছু কথা বলতে হবে। সে বলল ঃ খুব ভাল। সে আস্তে কানে বলে দিল। আমি মালাকুল মওত। মুমিন বলল ঃ চমৎকার। আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আমি ততটুকু আগ্রহান্বিত, যতটুকু আপনার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আগ্রহান্বিত। মালাকুল মওত বলল ঃ যে প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বের হয়েছ, তা পূর্ণ করে নাও। সে বলল, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের চেয়ে বেশী আমার অন্য কোন প্রিয় কাজ নেই। মালাকুল মওত বলল ঃ রূহ কবয করার জন্যে তুমি নিজের কোন অবস্থা পছন্দ করে নাও। সে বলল ঃ আমাকে উযু করে নামায পড়ার সময় দিন। যখন আমি সেজদায় থাকি, তখন আমার রূহ কবয করবেন। মালাকুল মওত তাই করল।

আবু বকর আব্দুল্লাহ মুযনী (রহঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি অগাধ ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে তার পুত্রদেরকে বলল ঃ তোমরা আমাকে আমার সব রকম ধন-সম্পদ দেখাও। সেমতে তার সামনে ঘোড়া, উট, গোলাম, বাঁদী ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী উপস্থিত করা হল। সে এ সমস্ত ধন-সম্পদ দেখে পরিতাপ ও ক্রন্দন করল। মালাকুল মওত তাকে ক্রন্দন করতে দেখে বলল ঃ কাঁদছ কেন? সেই সত্তার কসম, যিনি তোমাকে এই ধনরাশি দান করেছেন, তোমার দেহ থেকে তোমার আত্মা বিচ্ছিন্ন না করে আমি এ ঘর থেকে বের হব না। সে বলল ঃ আমাকে এ ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মত সময় দাও। মালাকুল মওত বলল ঃ তা হবে না। এখন আর সময় দেয়া হবে না। এর আগে দান করলে না কেন? একথা বলে মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল।

আমাশ খায়ছামা (রহঃ) রেওয়ায়েত করেন— মালাকুল মওত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর জনৈক সভাসদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বাইরে চলে আসার পর সভাসদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ সে মালাকুল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মওত। সভাসদ বলল ঃ সে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে আমার প্রাণ কেড়ে নেবে। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন ঃ এখন তোমার ইচ্ছা কি বল। সে বলল ঃ আমি চাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং বায়ুকে আদেশ করুন, যেন সে আমাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। সোলায়মান (আঃ) বায়ুকে আদেশ করলেন। বায়ু তাই করল। কিছুদিন পর মালাকুল মওত পুনরায় দরবারে আগমন করলে সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুমি আমার অমুক মুসাহিবের প্রতি বারবার তাকিয়েছিলে। এর কারণ কি? মালাকুল মওত বলল ঃ হ্যাঁ, আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছিল, আমি অমুক সময়ে পৃথিবীর অমুক প্রান্তে তার রূহ কবয করব। এমতাবস্থায় তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানেই পেয়েছি।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই ছিলেন বুযুর্গতম ব্যক্তি। মহত্ত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কেননা, তিনিই ছিলেন একাধারে তাঁর খলীল, হাবীব, মনোনীত রসূল, নবী ও পয়গম্বর। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর জীবনকাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ওফাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না; বরং অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে মনোনীত ফেরেশতাগণকে পাঠালেন, যারা অত্যন্ত দ্রুততা সহকারে তাঁর পবিত্র আত্মাকে পবিত্র দেহপিঞ্জর থেকে অপসারিত করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দিলেন। এরপরও রূহ কবয করার সময় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। মুখ দিয়ে "আহ" নির্গত হয়। উপর্যুপরি অস্থিরতা দেখা দেয়। রঙ বদলে যায় এবং কপাল ঘর্মাক্ত হয়। তাঁর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই মর্মবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নবুওয়তের পদমর্যাদা এখানে তাকদীরকে টলাতে পারেনি এবং তাঁর পরিবারের ব্যথা ও বেদনার প্রতি লক্ষ্য করেনি। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে "মকামে মাহমুদ" ও হাউযে কাওছারের অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন এবং তিনিই কিয়ামতের মাঠে অপরাধীদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে মুখ খুলবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, আমরা সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন ও হাবীবে রাব্বিল আলামীনের ওফাতদশা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করি না এবং যে অবস্থা আমাদের হবে, তা বিশ্বাস করি না; বরং আমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কামনা-বাসনা ও পাপাচারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকি। সম্ভবত আমরা মনে করি, আমরা চিরকাল এখানে থাকব অথবা কুকর্ম সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা বড়। কিন্তু তা সত্য নয়। আমরা বরং নিশ্চিতরূপে জানি, সবাই দোযখে নিপতিত হব। তবে যারা পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণ, তারাই কেবল দোযখ থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّاوَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّاثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই দোযখ অতিক্রম করবে। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালমেদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

অতএব, প্রত্যেকের উচিত নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা, সে যালেমদের নিকটবর্তী, না পরহেযগারদের নিকটবর্তী?

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের জীবন চরিতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা সদা সর্বদা ভীত থাকতেন। রসূলে করীম (সাঃ)ও নিজের ওফাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় কি কষ্টই না তিনি পেয়েছেন! হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ঘরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলাম। তিনি অশ্রুসজল নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা এসেছ? খুব ভাল হয়েছে! আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখুন, আশ্রয় দিন এবং সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়ত করছি। তোমরা আমার পক্ষ থেকে নিজেকে এবং তোমাদের পরে যারা এই দ্বীনে দাখিল হবে, তাদেরকে সালাম বলো।

বর্ণিত আছে, ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার পর আমার উম্মতের কাণ্ডারী কে হবে? আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের কাছে ওহী পাঠালেন— আমার হাবীবকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, উম্মতের ব্যাপারে আমি তাকে লাঞ্ছিত করব না। যারা কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমার হাবীব হবে প্রথম। সবাই সমবেত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হলে সে-ই হবে তাদের নেতা। তাঁর উম্মত জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য উম্মতের জান্নাতে যাওয়া হারাম হবে। এই সুসংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এবার আমার চোখ জুড়িয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ সাতটি কূপ থেকে সাত মশক পানি আনিয়ে আমাকে গোসল করাও। আমরা তাই করলাম। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। এরপর তিনি নামায পড়লেন, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন এবং আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করলেন হে মুহাজিরগণ! তোমরা সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছ। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা আর বাড়বে না। তারা আমার বিশেষ আপন। আমি তাদের মধ্যে এসে জায়গা নিয়েছি। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের সম্মান করো আর কুকর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করো। এরপর বললেন ঃ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটস্থ বস্তুর মধ্য থেকে যেকোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর নিকটস্থ বস্তুকেই পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) কাঁদলেন এবং বুঝে নিলেন যে, তিনি নিজের অবস্থাই বর্ণনা করছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শান্ত করার জন্যে বললেন ঃ আবুবকর! শক্ত হও, ঘাবড়িয়ো না। যে সব দরজা মসজিদের দিকে খুলে, সেগুলো সব বন্ধ করে দিয়ো; কিন্তু আবুবকরের দরজা বন্ধ করো না। আমি আবুবকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাউকে জানি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র রূহ আমারই ঘরে আমারই পালার দিনে এবং আমারই কোলে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে ঊর্ধ্বজগতের দিকে উড্ডয়ন করে। ওফাতের সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত করে দেন। আমার ভাই আবদুর রহমান তখন একটি মেসওয়াক হাতে নিয়ে আমার কাছে হাযির হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মেসওয়াকটির দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম, এটি তার খুব ভাল লাগছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম ঃ মেসওয়াকটি আপনাকে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করলে আমি সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি মুখে দিতেই তিক্ততা অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ নরম করে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় বললেন ঃ হ্যাঁ। সেমতে আমি সেটি চিবিয়ে নরম করে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

দিলাম। এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একটি পেয়ালায় পানি রাখা ছিল। তিনি পানিতে হাত রাখতেন এবং বলতেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'— মৃত্যু বড় কঠিন। অতঃপর তিনি হাত উপরে তুলে বললেন ঃ রফীকে আ'লা, রফীকে আ'লা। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, এখন তিনি আমাদেরকে অপছন্দ করবেন।

সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন— আনসাররা যখন দেখল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে, তখন তারা মসজিদে নববীর আশেপাশে জমায়েত হল। হযরত আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং আরয করলেন ঃ লোকজন সমবেত হয়েছে। তারা ভয় করছে! এরপর হযরত ফযল গেলেন এবং একই কথা বললেন। হযরত আলীও সেখানে পৌঁছে একই কথা আরয করলেন। তিনি বাহু প্রসারিত করে বললেন ঃ ধর আমার হাত। তাঁরা হাত ধরলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি বলাবলি করছে? তাঁরা আরয করলেন ঃ লোকেরা আপনার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে। পুরুষরা আপনার কাছে জমায়েত হয়েছে দেখে মহিলারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। রসূলে করীম (সাঃ) উঠলেন এবং হযরত আলী ও হযরত ফযলের সাহায্যে বাইরে এলেন। হযরত আব্বাস আগে আগে ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে পা ফেলছিলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরের নীচের সোপানে বসে গেলেন। জনতা তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও প্রশংসার পর এরশাদ করলেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমি শুনেছি তোমরা আমার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ। মনে হয় তোমরা মৃত্যুকে ঘৃণা করছ। আমি কি এর আগে আমার মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদেরকে খবর দেইনি? আমার পূর্বে যে সকল পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের কেউ মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেছেন কি? না তোমাদের মধ্যে কেউ অমর হয়েছে? শুন, আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হব। তোমরাও তাঁর সাথে মিলিত হবে। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, যারা পূর্বে হিজরত করে এখানে এসেছে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আমি মুহাজিরদেরকে পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রেখে চলার ওসিয়ত করছি। কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থাৎ, মহাকালের কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পরস্পরকে সত্য ও সবরের উপদেশ প্রদান করে।

সকল কাজই আল্লাহর আদেশে হয়। কাজেই কোন ব্যাপারে বিলম্বের কারণে তোমরা তাতে জায়েয হওয়ার আবেদন করো না। কেননা, কারও তাড়াহুড়ার কারণে আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যে আল্লাহর উপর প্রবল হতে চাইবে, আল্লাহ তাকে পরাভূত করবেন। তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا
اَرْحَامَكُمْ -

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আনসারদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সদাচরণের ওসিয়ত করছি। কারণ, তারা তোমাদের পূর্বে মদীনায় বসবাস ও খাঁটি ঈমান অর্জন করেছে। তারা নিজেদের অর্ধেক ফসল তোমাদেরকে দান করেছে। নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মনে রেখ, যদি তোমাদের কেউ দু'ব্যক্তির উপরও শাসনক্ষমতা লাভ করে, তবে তাদের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি যা দেয়, তা যেন সে কবুল করে এবং কেউ অন্যায় করলে তাকে যেন মার্জনা করে। তাদের উপর নিজেকে যেন অগ্রাধিকার না দেয়। জেনে রেখ, তোমাদের সাক্ষী আমি। তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। সাবধান! তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হাউযে কাওছার। আমার এই হাউয সিরিয়া, বসরা ও ইয়ামনের চেয়েও প্রশস্ত। এর একটি প্রণালীর পানি দুধের চেয়েও সাদা, ফেনার চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। কেউ একবার এই পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হবে না। এর কংকর মোতি ও মৃত্তিকা মেশ্‌ক। কিয়ামতে কেউ এ থেকে বঞ্চিত

——১৮

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থাকলে সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। শুন, যে ব্যক্তি কাল আমার কাছে এই হাউযে মিলিত হতে চায়, সে যেন নিজের জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখে এবং এগুলোকে যোগ্য কাজেই ব্যবহার করে। এরপর হযরত আব্বাস আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কোরায়শদের সম্পর্কে মুসলমানদের কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কোরায়শকে খেলাফতের ওসিয়ত করছি। মানুষ কোরায়শদের অনুগামী। সৎব্যক্তি তাদের সৎব্যক্তির অনুগামী এবং অসৎ লোক তাদের অসৎ লোকের অনুগামী। সুতরাং হে কোরায়শগণ! মানুষকে কল্যাণের কথা বলতে থাকবে। গোনাহ নেয়ামতকে পাল্টে দেয় এবং চরিত্রকে ধ্বংস করে। যখন জনগণ সৎকর্ম করবে, তখন তাদের শাসকও সৎকর্ম করবে। আর জনগণ কুকর্মী হলে তাদের শাসকও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, এমনিভাবে মানুষের কৃতকর্মের কারণে আমি কতক জালেমকে কতকের শাসক করে দেই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ কিছু জিজ্ঞেস করে নাও। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মৃত্যু কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, নিকটবর্তী। হযরত আবুবকর বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর নিকটস্থ বস্তু আপনার জন্যে মোবারক হোক।

আমরা যদি জানতাম আপনি কোথায় যাবেন! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর দিকে, সিদরাতুল মুনতাহার দিকে, এরপর জান্নাতে মাওয়া, জান্নাতে ফেরদাউসে আ'লা, রফীকে আ'লা, চিরন্তন জীবন ও সুমধুর আয়েশের দিকে। হযরত আবু বকর আরয করলেন ঃ আপনাকে গোসল কে দেবে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারের নিকটতম পুরুষ, এরপর যে একটু দূরের। প্রশ্ন করা হল ঃ আপনার কাফন কি হবে? তিনি বললেন ঃ আমার এসব কাপড় দিয়েই কাফন দেবে— ইয়ামনী জোড়া এবং মিসরীয় চাদর। আপনার জানাযার নামায আমরা কিভাবে পড়ব— এ প্রশ্নটি করেই হযরত আবু বকর কাঁদতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও কেঁদে বললেন ঃ ব্যস কর। আল্লাহ তোমাদের মাগফেরাত করুন এবং তোমাদের নবীর বিনিময়ে তোমাদেরকে উত্তম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

প্রতিদান দিন। তোমরা যখন আমাকে কাফন পরিয়ে দেবে, তখন খাট আমার এ কক্ষেই আমার কবরের পার্শ্বে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা বাইরে চলে যেয়ো। সর্বপ্রথম যিনি আমার উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করবেন, তিনি হবেন, আমার পরওয়ারদেগার। তিনি এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আমার উপর নামায পড়ার অনুমতি দেবেন। সেমতে প্রথমে জিবরাঈল এসে নামায পড়বেন, এরপর মীকাঈল, এরপর ইসরাফীল, এরপর মালাকুল মওত, এরপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতা নামায পড়বে।

এরপর তোমরা ভিতরে এসে আমার জানাযা পড়বে। এক এক দল আলাদা আলাদা এসে নামায পড়বে। আমার প্রশংসা করে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। চিৎকার করো না এবং সজোরে কান্নাকাটি করো না। প্রথমে ইমাম নামায শুরু করবে আমার পরিবারের নিকটতম লোকজনকে নিয়ে। তাদের পর যারা কিছু দূরের। পুরুষদের নামাযের পর মহিলারা, এরপর কিশোরদের দল আসবে। হযরত আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন ঃ কবরে কে নামবে? উত্তর হল ঃ আমার পরিবারের কয়েকজন নিকটতম লোক অনেক ফেরেশতাদের সাথে নামবে, যাদেরকে তোমরা দেখবে না; কিন্তু তারা তোমাদেরকে দেখবে। এখন আমার কাছ থেকে প্রস্থান কর এবং আমার পরবর্তী লোকদের ধর্মের কথাবার্তা শুনাও।

আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ বলেন ঃ অসুস্থতার সময় হযরত বেলাল একদিন নামায পড়ানোর জন্যে বললে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবুবকরকে নামায পড়াতে বল। হযরত আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি বাইরে এসে দরজার সামনে হযরত ওমর (রাঃ)-কে কয়েকজন লোকসহ দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে হযরত আবুবকর ছিলেন না। আমি হযরত ওমরকে বললাম ঃ আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ান। তিনি মসজিদে গমন করে নামাযের জন্যে "আল্লাহু আকবার" বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার 'আল্লাহু আকবার' বলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন ঃ আবুবকর কোথায়? ওমরের ইমামতি আল্লাহ তা'আলা মানবেন না এবং মুসলমানরাও স্বীকার করবে না। এ বাক্যটি তিনবার বলার পর তিনি বললেন ঃ আবুবকরকে বল নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আবুবকর একজন কোমলহৃদয় মানুষ। আপনার জায়গায় দণ্ডায়মান হলে তিনি কান্না সংবরণ করতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গিনী। আবুবকরকেই নামায পড়াতে বল। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন ঃ হযরত ওমরের নামায পড়ানোর পর হযরত আবুবকর নামায পড়ালেন। এরপর হযরত ওমর আমাকে বললেন ঃ হে রবীয়া তনয়! তুমি একি করলে? যদি আমার ধারণা না হত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে আমার কথা বলে থাকবেন, তবে আমি কেবল তোমার কথায় নামায পড়াতাম না। আমি বললাম ঃ তখন ইমামতির জন্যে আপনার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি।

হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমি হযরত আবুবকরের পক্ষ থেকে যে ওযর পেশ করেছিলাম, তার কারণ এই ছিল যে, তিনি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া খেলাফতে অনেক বিপদাশংকাও রয়েছে। তবে আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তার কথা ভিন্ন। আর এ আশংকাও ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই কেউ তাঁর জায়গায় নামায পড়াবে— তা হয়তো মুসলিম জনগণ পছন্দ করবে না। হযরত আবুবকর নামায পড়ালে মানুষ তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং তাকে অলক্ষুণে বলবে। কিন্তু তাই হয়, যা আল্লাহ চান। আল্লাহ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে হেফাযতে রেখেছেন এবং আমি যেসব বিষয়ের আশংকা করছিলাম, সেগুলো থেকে পরিষ্কার বাঁচিয়ে রেখেছেন। হযরত আয়েশা আরও বলেন ঃ ওফাতের দিন সকালে সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনেকটা সুস্থ দেখতে পান। এজন্যে সকলেই নিজ নিজ বাড়ি চলে গেলেন এবং খুশী খুশী কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে কেবল মহিলারা রয়ে গেল। আমি তাঁর পবিত্র মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইলাম। সেদিন আমাদের যে আশা ও আনন্দ ছিল, তা এর আগে কোন দিন ছিল না। ইতিমধ্যে তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমার কাছ থেকে বাইরে চলে যাও। এই ফেরেশতা আমার কাছে আসার অনুমতি চায়। মহিলারা বাইরে চলে গেল। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে বসলেন, তখন আমিও ঘরের এক কোণে চলে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ ধরে ফেরেশতার সাথে কানাকানি করলেন। এরপর আমাকে ডেকে নিজের মস্তক পুনরায় আমার কোলে তুলে দিলেন। মহিলাদেরকেও ভেতরে চলে আসতে বললেন। আমি আরয করলাম ঃ এই মৃদু আওয়াজ তো জিবরাঈলের ছিল না? তিনি বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ, হে আয়েশা! সে মালাকুল মওত। আমার কাছে এসে বলেছে— আল্লাহ তা'আলা আমাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বিনানুমতিতে আপনার কাছে না আসি। আপনি অনুমতি না দিলে আমি চলে যাব। অনুমতি দিলে ভেতরে আসব। আল্লাহ আরও নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনার কথা ছাড়া আপনার রূহ কবয না করি। এখন আপনি কি বল্লেন? আমি তাকে বলে দিয়েছি, জিবরাঈল না আসা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। জিবরাঈলের আসার সময় হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ তিনি বিষয়টি এমনভাবে পেশ করলেন আমাদের কাছে— যার কোন জওয়াব ছিল না। তাই আমরা চুপ করে রইলাম। এমন সময় মনে হল আমরা এক ভয়ংকর শব্দে হতবাক হয়ে গেছি। তাঁকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। বিষয়টির ভয়ঙ্করতা ও আতংকের কারণে আমাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মন-মস্তিষ্ক ভীতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিবরাঈল এসে সালাম করলেন। আমি তার মৃদু আওয়াজ চিনতে পারলাম। ঘরের সবাই বের হয়ে গেল। তিনি ভেতরে এলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বলে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি নিজেকে কেমন অনুভব করছেন? তিনি আপনার অবস্থা আপনার চেয়ে বেশী জানেন; কিন্তু তিনি আপনার মান-সম্মান ও গৌরবকে মানুষের উপর পূর্ণাঙ্গ করতে চান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি নিজেকে বেদনাক্লিষ্ট অনুভব করছি। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে যে মর্তবা তৈরী করে রেখেছেন, তাতে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতে চান। তিনি এরশাদ করলেন ঃ হে জিবরাঈল, মালাকুল মওত আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। জিবরাঈল আরয করলেন ঃ হে মুহাম্মদ, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্যে ব্যাকুল। তিনি আপনার সাথে যা করতে চান, তা তো আমি বলেই দিয়েছি। আল্লাহর কসম, মালাকুল মওত আজ পর্যন্ত কারও কাছে অনুমতি চায়নি এবং ভবিষ্যতেও কারও কাছে অনুমতি চাইবে না। কিন্তু আপনার গৌরবকে পূর্ণতা দান করা আল্লাহ তা'আলার লক্ষ্য এবং তিনি আপনার জন্যে অতিশয় আগ্রহী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন তুমি তার আগমন পর্যন্ত এখান থেকে যাবে না। এরপর রসূলে করীম (সাঃ) মহিলাদেরকে ভেতরে ডেকে নিলেন। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমার কাছে এস। তিনি তাঁর মাথার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। যখন হযরত ফাতেমা মাথা তুললেন,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তখন তাঁর চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তোমার মাথা আমার কাছে আন। তিনি পিতার মুখের কাছে কান লাগালেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কানে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতেমার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। পরবর্তীকালে আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমবার তিনি আমাকে বললেন ঃ তিনি আজই পরলোকগমন করবেন। এতে আমি কান্না রোধ করতে পারিনি। দ্বিতীয়বার তিনি বললেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছেন যাতে তাঁর পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে তাঁর সাথে মিলিত করেন এবং তাঁর সাথে রাখেন। তাই আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনি। এরপর হযরত ফাতেমা নিজের পুত্রদ্বয়কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনলেন। তিনি উভয়কে আদর করলেন। অতঃপর মালাকুল মওত এসে সালাম করল এবং অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ আমাকে আমার প্রভুর কাছে এক্ষুণি পৌছে দাও। মালাকুল মওত আরয করল ঃ আজই পৌছে দেব। আপনার প্রভু আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। অন্য কারও জন্যে তাঁর এতটুকু ব্যাকুলতা নেই। তিনি আমাকে কেবল আপনার বেলায় বিনা অনুমতিতে ভেতরে যেতে নিষেধ করেছেন— অন্য কারও বেলায় এমনটা হয়নি। কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট সময় একটু পরেই— একথা বলে মালাকুল মওত প্রস্থান করল এবং জিবরাঈল এসে আরয করল— আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা আমার পৃথিবীতে সর্বশেষ অবতরণ। এরপর কখনও অবতরণ করব না। ওহীও সমাপ্ত হল। আপনার কাছে উপস্থিতি ছাড়া পৃথিবীতে আমার কোন কাজ ছিল না। এখন আমি আমার স্থানেই থাকব।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ আল্লাহর কসম, ঘরের কারও কোন শব্দ করার সাধ্য ছিল না এবং কেউ পুরুষদেরকেও ডাকছিল না। জিবরাঈলের কথাবার্তা আমাদের সবাইকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল। এরপর আমি উঠে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মস্তক কোলে তুলে নিয়ে তাঁর বুকে হাত রেখে দিলাম। তাঁর সংজ্ঞাহীনতা শুরু হল। তাঁর কপাল থেকে এত ঘাম বের হচ্ছিল, যা আমি কোন মানুষের মধ্যে কখনও দেখিনি। আমি অঙ্গুলি দিয়ে ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি আমার জানা ছিল না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যখনই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসত, আমি বলতাম— আপনার প্রতি আমার পিতামাতা ও বাড়ীঘর সবকিছু কুরবান হোক, আপনার কপালে এত ঘাম দিচ্ছে কেন? তিনি বললেন ঃ আয়েশা! মুমিনের প্রাণ ঘামের সাথে বের হয়, আর কাফেরের প্রাণ গাধার ন্যায় পথে নির্গত হয়। তখন আমরা ভয় পেলাম এবং নিজ নিজ ঘরে লোক পাঠালাম। সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তি আমাদের কাছে এল, সে ছিল আমার ভাই। তাকে আমার পিতা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জীবিত পায়নি। এর আগেই তিনি ঊর্ধ্বজগতে তাশরীফ নিয়ে যান। মোটকথা, কোন পুরুষ লোকের আগমনের পূর্বেই তিনি বিদায় নেন। আল্লাহ তা'আলাই সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর কাছে আসতে দেননি। কারণ, তাঁর ব্যাপারটি ছিল জিবরাঈল ও মীকাঈলের কাছে ন্যস্ত। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি একটি কথাই বলতেন— بل رفيق الاعلى এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁকে কয়েকবার এক্তিয়ার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যই বেছে নিয়েছেন। যখনই তাঁর কথা বলার শক্তি হত, তখনই বলতেন— নামায, নামায, তোমরা যতদিন জামাআতে নামায পড়বে, ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাত সোমবার দিন চাশত ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছে। ফাতেমা বলেন ঃ সোমবার দিন আমার জন্যে শুভ নয়। এদিনে উম্মতের উপর বড় বড় বিপদ আসবে। কুফায় হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হলে উম্মে কুলছুমও তাই বললেন যে, এদিনটি তাঁর জন্য শুভ নয়। কেননা, এদিনেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও ওফাত পেয়েছেন, এদিনেই তাঁর স্বামী হযরত ওমর (রাঃ) শহীদ হন এবং এদিনেই তাঁর পিতা হযরত আলী শহীদ হন।

হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ফেরেশতারা মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দেয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর মৃত্যু অস্বীকার করলেন। কেউ কেউ বোবা হয়ে গেলেন— অনেকদিন পর্যন্ত কথা বললেন না এবং অনেকে পাগল হয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাদের মধ্যে ছিলেন, যারা মৃত্যু অস্বীকার করেছিল। তিনি বাইরে এসে বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পাননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ফিরিয়ে দেবেন এবং মুনাফিকদের হাত-পা কেটে দেবেন, যারা তাঁর মৃত্যু কামনা করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে যেমন চল্লিশ দিনের ওয়াদা করে নিয়ে যান, তেমনি আমাদের হুযুরকেও নিয়ে গেছেন। তিনি তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের কথা বলো না। তিনি ওফাত পাননি। আল্লাহর কসম, এখন থেকে যদি কাউকে একথা বলতে শুনি, তবে এই তরবারি দিয়ে তাকে আমি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব। হযরত আলী হতভম্ব হয়ে ঘরের ভেতরেই বসে রইলেন। হযরত ওসমান বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে হাতে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় যেন তিনি পথঘাটও ভুলে গিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যে অবস্থা হযরত আবুবকর ও আব্বাসের ছিল, তা আর কারও ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এ দু'জনকে তাওফীক ও দৃঢ়তা দান করেছিলেন। একা হযরত আবুবকরের সান্ত্বনাবাণীর কারণেই সবাই শান্ত ছিল। তবু হযরত আব্বাস বাইরে এসে বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, রসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি তো জীবদ্দশায় তোমাদের মধ্যে এ আয়াত পাঠ করতেন–

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পালনকর্তার সামনে বাদানুবাদ করবে।

হযরত আবুবকর বনী হারেছের কাছে অবস্থান করছিলেন। ওফাতের সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর দীদারে ধন্য হলেন। এরপর মৃতদেহের উপর ঝুঁকে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ আমার পিতা ও মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'বার মৃত্যু দেবেন না। একবারই ওফাত ছিল, যা আপনি পেয়েছেন। অতঃপর তিনি জনতার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুসলমানগণ! যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূজা করত, তারা জেনে নিক তিনি ওফাত পেয়েছেন। আর যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পালনকর্তার পূজা করত, তাদের জানা উচিত তিনিই চিরঞ্জীব— কখনও মরবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا -

অর্থাৎ, মুহাম্মদ তো একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পেছন ফিরে যাবে কি? যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না।

শ্রোতাদের এমন অবস্থা হল যেন তারা এই প্রথমবার আয়াতখানি শ্রবণ করল।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) খবর পেয়ে দুরূদ পাঠ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কথায় ও কাজে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। এসেই মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করে কপালে, কপোলে চুম্বন করলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন— আমি, আমার পিতা-মাতা ও সবকিছু আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি জীবিত অবস্থায়ও চমৎকার ছিলেন এবং মরেও চমৎকার। আপনার ইন্তেকালে সে ধারা খতম হয়ে গেল, যা অন্য কোন নবীর ইন্তেকালে খতম হয়নি। তাহলো ওহীর ধারা। অতএব, আপনার মর্যাদা বর্ণনার চেয়েও বেশী এবং কান্নারও ঊর্ধ্বে। আপনার রেসালত সর্বজনীন। যদি আপনার ইন্তেকাল আপনার ইচ্ছায় না হত, তবে আপনাকে হারানোর দুঃখে আমরা জীবন উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা চোখের পানি নিঃশেষ করে দিতাম।

কিন্তু যে বিষয়টি আপনি আমাদের থেকে দূর করতে পারেন না, তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হচ্ছে বিষাদ ও স্মৃতি। ইলাহী! আমাদের পক্ষ থেকে এটি তোমার হাবীবকে পৌঁছে দাও।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— যখন আবুবকর কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন ঘরময় কান্নার রোল পড়ে গেল, যা বাইরের লোকেরাও শুনতে পেল। তিনি যখন কিছু বলতেন, তখন রোল আরও বেড়ে যেত। এমতাবস্থায় জনৈক দীর্ঘদেহী সবল ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ গৃহবাসীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এরপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

বেঁচে থাকায় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন; অর্থাৎ যে চলে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বিদ্যমান থাকেন। তাঁর কাছেই আশা রাখুন এবং তাঁর উপরই ভরসা করুন। ঘরের লোকেরা আওয়াজ শুনল; কিন্তু কার আওয়াজ, তা বুঝতে পারল না। কান্না থেমে গেল। সাথে সাথে সে আওয়াজও থেমে গেল। একজন বাইরে এসে দেখল সেখানে কেউ নেই। সে ভেতরে চলে গেল এবং পুনরায় ক্রন্দন রোল উত্থিত হল। আরও একজন এসে আওয়াজ দিল এবং তাকেও কেউ চিনল না। সে বলল ঃ হে নবী পরিবার! আল্লাহকে স্মরণ করুন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর শুকরিয়া করুন। তিনিই প্রত্যেক বিপদে সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক প্রিয়জনের বিনিময়। অতএব, তাঁরই আনুগত্য করুন এবং তাঁরই হুকুম মেনে চলুন। হযরত আবুবকর বললেন ঃ এরা দু'জন হলেন খিযির ও ইলিয়াস (আঃ), তাঁরা জানাযায় এসেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— হযরত আবুবকর হযরত ওমরকে বললেন ঃ আমি শুনেছি তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত অস্বীকার কর?

তোমার কি জানা নেই যে, তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে অমুক দিন এবং অমুক দিন কথা বলেছিলেন? আল্লাহ তা'আলাও কোরআন পাকে বলেছেন— إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।

হযরত ওমর বললেন ঃ বিপদে মুষড়ে পড়ার কারণে আমার মনে হল যেন কোরআন মজীদের এ বিষয়বস্তু আমি অন্য কোন দিন শুনিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোরআন পাক যেমন অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি আছে এবং হাদীসও তেমনি, যেমন বলা হয়েছে। আল্লাহ্ জীবিত— কখনও মরবেন না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহর সালাত ও রহমত তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরহের সওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের কাছে বসে পড়লেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দেয়ার জন্য যখন সাহাবীগণ সমবেত হলেন, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলেন ঃ আমরা জানি না, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিভাবে গোসল দেব? অন্যান্য মৃতের ন্যায় বিবস্ত্র করে, না বস্ত্রসহ গোসল? এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নিদ্রা প্রবল করে দিলেন। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি বুকে দাঁড়ি ঠেকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। এ সময় জনৈক অজ্ঞাত বক্তা বলে উঠল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বস্ত্রসহ গোসল দাও। একথায় সকলেই চমকে উঠল এবং এই অদৃশ্য আওয়াজ অনুযায়ী গোসল দেয়া হল। গোসল শেষে কাফন পরানো হলো। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামা খুলতে চাইলে আবার আওয়াজ শুনা গেল,— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামা খুলো না। ফলে, জামা না খুলেই আমরা তাঁকে গোসল দিয়েছি। আমরা তাঁর কোন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে চাইলে তা অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যেত। আমরা ঘরের ভেতর বায়ুর শন্‌শন্‌ শব্দ শুনতে পেতাম।

আবু জাফর (রাঃ) বলেন, কবরে সর্বপ্রথম তাঁর বিছানা ও চাদর বিছানো হল। এরপর তাঁর পরিধেয় বস্ত্র রাখা হল। এগুলোর উপর তাঁকে কাফনসহ রাখা হল— এভাবে তাঁর বস্ত্র যা ছিল, সবই তাঁর সাথে দাফন হয়ে গেল। ওফাতের পর তাঁর কোন ধনসম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। জীবনে তিনি গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে কখনও ইটের উপর ইট রাখেননি। মোটকথা, রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত ঃ হযরত আবুবকর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সিদ্দীক (রাঃ)-এর ওফাত নিকবর্তী হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে এসে একটি কবিতা পাঠ করলেন, যার অর্থ এই ঃ যখন বুকে শ্বাসরুদ্ধ এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের কোন উপকারে আসে না। তিনি নিজের চেহারা খুলে দিয়ে বললেন ঃ কবিতা আবৃত্তি না করে এই আয়াত তেলাওয়াত কর ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ –

অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যি সত্যি আসবে। এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ।

আমার এ দু'টি বস্ত্র দেখে রাখ। এগুলো ধুয়ে আমাকে কাফন দেবে। কেননা, নতুন বস্ত্রের প্রয়োজন মৃতদের চেয়ে জীবিতদের বেশী। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার অবস্থা দেখার জন্যে আমরা চিকিৎসক ডাকব কি? তিনি বললেন ঃ আমার চিকিৎসক আমাকে দেখে বলে দিয়েছেন— – إِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا أُرِيْدُ অর্থাৎ, আমি আমার ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করি।

হযরত আবু বকরকে দেখতে এসে সালমান ফারেসী বললেন ঃ হে আবু বকর! আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের জন্যে দুনিয়া জয় করাবেন। তুমি সে দুনিয়া থেকে ততটুকুই নেবে, যতটুকু তোমার দিনাতিপাতের অনুকূলে হয়। মনে রেখ, যে ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারে থাকে। অতএব, আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। করলে উপুড় অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

রোগ বৃদ্ধির দরুন হযরত আবু বকর বাইরে আসতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম অনুরোধ করলেন, আপনি একজনকে নায়েব নিযুক্ত করে দিন। সেমতে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে নায়েব নিযুক্ত করলেন। এতে কেউ কেউ আপত্তি করে বললঃ আপনি একজন কঠোর প্রকৃতির রুক্ষভাষীকে নায়েব নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কি জওয়াব দেবেন? তিনি বললেন ঃ বলব, তোমার সৃষ্টির মধ্যে যে সর্বোত্তম ছিল, তাকেই নায়েব নিযুক্ত করেছি। এরপর হযরত ওমরকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি ওসিয়ত করছি— মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলার কিছু হক দিনের বেলায় রয়েছে, যা তিনি রাতের বেলায় কবুল করেন না এবং কিছু হক রাতের বেলায় রয়েছে, যা দিনের বেলায় কবুল করেন না। ফরয এবাদত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি নফল এবাদত কবুল করেন না। সত্যের অনুসরণের কারণেই কিয়ামতের দিন সত্যাশ্রয়ীদের পাল্লা ভারী হবে। যে পাল্লায় কেবল সত্য রাখা হয়, তার ওজন বেশী হওয়াই সমীচীন। কিয়ামতের দিন হালকা পাল্লাওয়ালাদের পাল্লা একারণেই হালকা হবে যে, তারা দুনিয়াতে মিথ্যার অনুসরণ করেছে এবং পাল্লাকে হালকা মনে করেছে। যে পাল্লায় মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু রাখা হয় না, তার হালকা হওয়াই শোভনীয়। অতএব, হে ওমর! যদি তুমি আমার উপদেশ স্মরণ রাখ, তবে তোমার কাছে মৃত্যু হবে প্রিয়তম। মৃত্যুর আগমন অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তুমি যদি আমার উপদেশ অমান্য কর, মৃত্যুর চেয়ে কঠিন তোমার কাছে কোন কিছু হবে না। অথচ তুমি এ থেকে পালাতে পারবে না।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাত ঃ আমর ইবনে মায়মূন বলেন ঃ যেদিন ফজরের নামাযে হযরত ওমর ছুরিকাহত হন, সেদিন আমিও জামায়াতে দাঁড়ানো ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝখানে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন। তিনি নামাযের কাতারে কোন ত্রুটি দেখলে বলতেন ঃ কাতার সোজা করে নাও। ত্রুটি দূর হয়ে গেলে তিনি সামনে এগিয়ে যেতেন। প্রায়ই প্রথম রাকআতে সূরা ইউসুফ, নাহল অথবা এমনি অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন, যাতে অধিকসংখ্যক মুসল্লী জামায়াতে যোগ দিতে পারে। তিনি আল্লাহু আকবারই বলেছিলেন, এর পরেই আমি শুনলাম তিনি বলছেন— আমাকে কুকুরে মেরে ফেলল, খেয়ে ফেলল। দুর্বৃত্ত কাফের আবু লু'লু' তাকে আহত করার পর দুধারী ছুরি হাতে পালাতে লাগল। যাওয়ার পথে সে ডানে-বামে ছুরি চালিয়ে আরও তেরজনকে আহত করল। তাদের মধ্যে পরে নয়জন মৃত্যুবরণ করে। এক রেওয়ায়েতে সাতজন মারা যাবার কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে জনৈক মুসল্লী তার উপর নিজের চাদর ফেলে দিল। কাফের যখন দেখল, সে ধরা পড়ে গেছে, তখন নিজেই নিজেকে যবাই করে জাহান্নামে পৌঁছে গেল।

আহত হওয়ার পর হযরত ওমর আবদুর রহমান ইবনে আওফকে নামায পড়ানোর জন্যে সামনে এগিয়ে দিলেন। তখন যারা মসজিদে ছিল,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তারা তো এই ঘটনা দেখল; কিন্তু যারা মসজিদের বাইরে আশে-পাশে ছিল, তারা কিছুই জানতে পারল না। তবে হযরত ওমরের আওয়াজ থেমে গেল। তিনি সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ বলতে লাগলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন। সালাম ফিরানোর পর হযরত ওমর হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন ঃ দেখ, আমাকে কে আহত করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ মুগীরা ইবনে শো'বার ক্রীতদাস এ কাণ্ড করেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাকে নিপাত করুক। আমি তো তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যে বলেছিলাম। আল্লাহর শোকর যে, তিনি কোন মুসলমানের হাতে আমাকে মৃত্যু দেননি। তুমি ও তোমার পিতাই মদীনায় অনারব কাফেরদের প্রাচুর্য কামনা কর। এরূপ বলার কারণ এই যে, তখন হযরত আব্বাসের অনেক ক্রীতদাস ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস আরয করলেন ঃ আপনার মরযী হলে সবাইকে মেরে ফেলি। তিনি বললেন ঃ এখন হত্যা করলে কি হবে। এখন তো তারা তোমাদের বুলিই বলতে শুরু করেছে। তোমাদের কেবলার দিকে নামায পড়তে শুরু করেছে। তোমাদের মত হজ্জ করতে শুরু করেছে।

অতঃপর আহত খলীফাকে মসজিদ থেকে তাঁর বাসগৃহে নিয়ে আসা হল। আমরাও সঙ্গে গেলাম। জনসাধারণের অবস্থা ছিল এই যে, সেদিনের পূর্বে যেন তাদের উপর কোন মুসীবত আসেনি। তারা নিজ নিজ মন্তব্য করছিল। কেউ বলছিল ঃ আমার আশংকা, তিনি মারা যাবেন। কেউ বলছিল, কোন আশংকা নেই। ইতিমধ্যে খলীফার জন্যে আঙ্গুরের রস আনা হল। তিনি সেটা পান করতেই পেট দিয়ে বের হয়ে গেল! এরপর দুধ আনা হল। পান করার পর তাও বের হয়ে গেল। তখন সকলেই তাঁর জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেল। জনগণ এসে তার প্রশংসা করছিল। এক যুবক এসে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার জন্যে সুসংবাদ হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ ও প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের কারণে সুউচ্চ মর্তবা অর্জিত হোক। আপনি শাসক হয়েছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি বললেন ঃ এসব বিষয়ের মাধ্যমে আমি কোন লাভ-লোকসান চাই না। যুবক যখন প্রস্থান করতে লাগল, তখন তার পায়জামা মাটি স্পর্শ করছিল। হযরত ওমর বললেন ঃ এই যুবককে আমার কাছে আন। যুবক ফিরে এলে তিনি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বললেন ঃ ভাতিজা! তোমার পায়জামা উঁচু কর। এতে ধুলাবালু ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে এবং তা তাক্ওয়ারও নিকটবর্তী।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ছেলেকে বললেন ঃ আবদুল্লাহ, দেখ আমার ঋণ কি পরিমাণ। হিসাব করে দেখা গেল ছিয়াশি হাজারের কাছাকাছি। তিনি বললেন ঃ যদি আমার পরিবারের ধন-সম্পদ দিয়ে ঋণ শোধ হয়ে যায়, তবে এ থেকেই শোধ করে দিয়ো। অন্যথায় আদী ইবনে কা'বের বংশধরের কাছ থেকে চেয়ে নিও। যদি তাতেও না কুলায়, তবে কোরায়শের কাছ থেকে নিয়ে শোধ করবে। কোরায়শ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে নেবে না। এখন তুমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে যাও এবং বল ঃ ওমর আপনাকে সালাম বলেছেন। 'আমীরুল মুমিনীন' বলবে না। কারণ, আমি আজ মুমিনদের আমীর নই। আরও বলবে— তিনি তার দু'জন সঙ্গীর সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে সালামের পর অনুমতি চাইলেন। তিনি তখন বসে কাঁদছিলেন। আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব আপনাকে সালাম বলেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবু বকরের সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। হযরত আয়েশা বললেন, আমি স্থানটি নিজের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আমি ত্যাগ স্বীকার করব এবং ওমরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেব। আবদুল্লাহ পিতার কাছে ফিরে এলে লোকেরা হযরত ওমরকে বলল ঃ আবদুল্লাহ হযরত আয়েশার কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে উঠাও। এক ব্যক্তি তাকে বসিয়ে দিলে তিনি পুত্রকে বললেন ঃ কি জওয়াব এনেছ বল। আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ আপনার প্রার্থনা হযরত আয়েশা মনযুর করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ, এর চেয়ে জরুরী আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার জানাযা নিয়ে হযরত আয়েশার দরজায় যাবে। সালাম করার পর বলবে— ওমর অনুমতি চায়। অনুমতি দিলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আর যদি অনুমতি না হয়, তবে মুসলমানদের কবরস্তানে নিয়ে দাফন করে দেবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এলেন। তাঁকে দেখে আমরা সরে গেলাম। তিনি হযরত ওমরের কাছে এসে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর তিনি অন্দরে চলে গেলেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্দর থেকে তার কান্নার আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। এরপর লোকেরা আরয করল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদেরকে কিছু ওসিয়ত করুন এবং আপনি খলীফা নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি বললেন ঃ খেলাফতের জন্যে আমি যাদেরকে যোগ্য মনে করি, তারা হলেন হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবায়র, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। আমার পুত্র আবদুল্লাহও তোমাদের কাছে যাবে। কিন্তু খেলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সা'দ যদি খলীফা হতে পারে, তবে ভাল। নতুবা যে-ই খলীফা হয়, সে যেন সা'দের সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন করে। কেননা, আমি তাকে কোনরূপ অক্ষমতা ও অসাধুতার কারণে পদচ্যুত করিনি। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসিয়ত করছি যে, যারা প্রথমে হিজরত করে মদীনায় এসেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হবে এবং তাদের সম্মান ও ইযযত অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আরও ওসিয়ত করছি যে, আনসার ভাইদের সাথে কল্যাণমূলক ব্যবহার করতে হবে। তারা মদীনায় সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে এবং সবাঁর আগে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের দুষ্কর্মীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আরও ওসিয়ত করছি যে, পার্শ্ববর্তী শহরবাসীদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে যা অতিরিক্ত হবে অথবা তারা মনের খুশীতে দেবে, কেবল তাই নেবে। আরবদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করে তাদেরই দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করে দেবে। যিম্মিদের সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং তাদের রক্ষার জন্যে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদেরকে দেবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন আমরা জানাযা নিয়ে রওয়ানা হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আয়েশার খেদমতে গিয়ে সালাম করলেন এবং বললেন ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চান। হযরত আয়েশা বললেন ঃ ভেতরে নিয়ে এস। অতঃপর ভিতরে নিয়ে তাঁর উভয় সহচরের পাশে দাফন করা হল।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে—জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছেন—ওমরের মৃত্যুতে ইসলাম কাঁদবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন ওমরের লাশ খাটে রাখা হল, তখন জনতা এসে জানাযাকে থামিয়ে দিল। তারা জানাযা উঠার পূর্বেই দোয়া করছিল ও নামায পড়ছিল। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমার উভয় কাঁধ ধরে আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। আমি পেছন ফিরে হযরত আলীকে দেখতে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

পেলাম। তিনি হযরত ওমরের জন্যে রহমতের দোয়া উচ্চারণ করলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর! তুমি নিজের পরে এমন কাউকে রেখে যাওনি, যার মত আমল করে মৃত্যুবরণ করাকে আমি পছন্দ করতে পারি। তোমার মত আমল করেই আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া আমার পছন্দনীয়। আল্লাহর কসম, আমার প্রবল ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার দুই সহচরের সাথেই রাখবেন। কারণ আমি অধিকাংশ সময় রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনতাম— আমি, আবু বকর ও ওমর গেলাম, আমি, আবুবকর ও ওমর বের হলাম, আবুবকর ও ওমর ভিতরে এল ইত্যাদি। প্রত্যেক বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এভাবে বলতে দেখে আমার মনে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনকে একত্রে রাখবেন।

হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর ওফাত ঃ হযরত ওসমানের শাহাদতের ঘটনা সুবিদিত। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ওসমান যখন অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন আমি তাঁকে সালাম করতে এলাম এবং ভিতরে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন ঃ ভাই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আজ রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ওসমান! শত্রুরা তোমাকে ঘেরাও করেছে? আমি আরয করলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমাকে তৃষ্ণার্ত রেখেছে? আমি আরয করলাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি একটি পানিভর্তি বালতি ঝুলিয়ে দিলেন। আমি পেট ভরে পানি পান করলাম। তার শীতলতা আমি বুকে ও কাঁধে এখনও অনুভব করছি। তিনি আরও বললেন ঃ যদি চাও সাহায্য লাভ করে তাদের উপর বিজয়ী হতে পার অথবা আমার কাছে এসে ইফতার কর। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইফতার করাকে পছন্দ করেছি। সেমতে সেদিনেই হযরত ওসমান শাহাদত বরণ করেন।

যারা হযরত ওসমানকে আহত হওয়ার পর রক্তের উপর গড়াগড়ি দিতে দেখেছিল, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রক্তের উপর গড়াগড়ি দেয়ার সময় হযরত ওসমান কি বলেছিলেন? লোকেরা উত্তরে বলল ঃ আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি— ইলাহী! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে একতা দান করুন। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়া করতেন যে, তাদের মধ্যে যেন একতা না হয়, তবে কোন সময়ই তাদের মধ্যে একতা হত না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছামামা ইবনে হাযন কায়শরী বলেন ঃ যখন হযরত ওসমান ঘরের ছাদ থেকে নীচে জনতার দিকে দেখেছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে দু'ব্যক্তি আপনাদেরকে এখানে সমবেত করেছে, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। তাদেরকে ডাকা হল। তারা এমনভাবে এল, যেমন দু'টি গাধা অথবা দু'টি উট আসে। হযরত ওসমান জনতার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা জান যে, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন, তখন রওমা কূপ ছাড়া মদীনায় কোথাও মিঠা পানির অস্তিত্ব ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কেউ আছ কি, যে এই কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে দেবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতে উত্তম প্রতিদান পাবে। তখন আমি আমার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে এই কূপটি ক্রয় করেছিলাম। কিন্তু তোমরা আজ আমাকে এই কূপের পানি পান করতে দিচ্ছ না। দরিয়ার পানিও দিচ্ছ না। জনতা বলল ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তিনি আরও বললেন ঃ তোমরা জান, আমি নিঃস্ব ও নিরস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলাম? জনতা বলল, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান, মসজিদে নামাযীদের স্থান সংকুলান হত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন— অমুকের জমি ক্রয় করে মসজিদটি সম্প্রসারিত করবে— এমন কেউ আছ কি? তখন আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে সেই জমি ক্রয় করেছি। কিন্তু আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়তে দিচ্ছ না। জনতা বলল ঃ এ ঘটনাও সত্য।

হযরত ওসমান আরও বললেন ঃ তোমরা জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় ছাবীর পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও আমি। এমন সময় পাহাড় নড়তে লাগল, যার ফলে কয়েক খণ্ড পাথরও নীচে খসে পড়ল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাহাড়ের গায়ে লাথি মেরে বললেন— থেমে যা হে ছাবীর! তোর উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছে। জনতা বলল ঃ আপনার বর্ণনা সত্য। তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! কা'বার পালনকর্তার কসম, এই জনতা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি নিঃসন্দেহে শহীদ।

জনৈক শায়খ বর্ণনা করেন— হযরত ওসমান আহত হওয়ার পর তাঁর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

শ্মশ্রু মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তখন তাঁর মুখে ছিল এই দোয়া—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

হযরত আলী (রাঃ)-এর ওফাত ঃ ইছবাগ হানযাল বলেন ঃ যে রাতের ভোরে হযরত আলী (রাঃ) ঘাতকের হাতে আহত হন, সে রাতে তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ইবনে তাইয়াহ ফজরের সময় তাঁর কাছে এসে নামাযের কথা বলে। তিনি বিলম্ব করলেন এবং শুয়ে রইলেন। ইবনে তাইয়াহ পুনরায় এল। এবারও তিনি গাত্রোত্থানে বিলম্ব করলেন। তৃতীয় বার নামাযের কথা বলার পর তিনি শয্যা ত্যাগ করে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি ছোট দরজার কাছে পৌঁছলেন, তখন নরাধম ইবনে মুলজেম তাঁর উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

হযরত আলীর কন্যা উম্মে কুলছুম বাইরে এসে বলতে লাগলেন ঃ ফজরের নামাযের কি হল যে, আমার স্বামী হযরত ওমরও এ নামাযেই শহীদ হয়েছেন এবং আমার পিতাও এ নামাযেই শাহাদত লাভ করলেন!

এক বৃদ্ধ কোরায়শ বর্ণনা করেন ঃ অভিশপ্ত ইবনে মুলজেম হযরত আলী (রাঃ)-কে আহত করলে তিনি বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

মোহাম্মদ ইবনে আলী বলেন ঃ আমার পিতা আহত হওয়ার পর নিজের পুত্রদেরকে ওসিয়ত করলেন। এরপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু বলেননি।

জীবন সায়াহ্নে খলীফা ও আমীরগণের উক্তি ঃ হযরত আমীর মোয়াবিয়ার (রাঃ) মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিল। তিনি তাসবীহ ও যিকির শুরু করলেন। অতঃপর কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ হে মোয়াবিয়া! বার্ধক্য ও ভগ্নদশায় বুঝি আল্লাহ তা'আলার যিকিরের কথা মনে পড়েছে? এর সময় তো তখন ছিল, যখন যৌবনের শাখা সজীব ছিল। একথা বলে তিনি প্রচুর কাঁদলেন। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে তিনি বললেন ঃ ইলাহী! এই কঠোরপ্রাণ বৃদ্ধের প্রতি রহম কর। এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর। নিজের সহনশীলতার মাধ্যমে এই ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে নাও, যে তোমাকে ছাড়া কারও কাছে আশা করে না এবং কারও উপর ভরসা করে না।

বর্ণিত আছে, আমীর মোয়াবিয়ার সর্বশেষ খোতবা ছিল এই ঃ লোক সকল! মানুষ যে ফসল বপন করে, তাই কাটে। আমি তোমাদের শাসক

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছিলাম। আমার পরে যে শাসক আসবে, সে আমার চেয়ে খারাপই হবে; যেমন আমার পূর্ববর্তী শাসক আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। হে এয়াযীদ! আমার মৃত্যু হয়ে গেলে কোন বুদ্ধিমান ও সুধী ব্যক্তি দ্বারা আমার গোসল দেবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। তাকে বলবে যেন উত্তমরূপে গোসল দেয় এবং আল্লাহু আকবার সজোরে বলে। এরপর ধনভাণ্ডারে দেখবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কিছু বস্ত্র এবং তাঁর কেশ ও নখের কিছু কিছু ক্ষুদ্রাংশ একটি রোমালে বাঁধা আছে। ক্ষুদ্রাংশগুলো নিয়ে আমার নাকে, মুখে, কানে ও চোখে স্থাপন করবে। আর বস্ত্রকে কাফনের ভেতরে আমার উপর রেখে দেবে। কাফন পরিয়ে কবরে রেখে দেয়ার পর তোমরা মোয়াবিয়া ও আরহামুর রাহিমীনকে একাকী ছেড়ে দিয়ো।

মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর বলেন, অন্তিম মুহূর্তে আমীর মোয়াবিয়া বলতে লাগলেন ঃ চমৎকার হত যদি আমি কোরায়শের একজন অভুক্ত ব্যক্তি হতাম এবং খেলাফতের কোন কিছুর অধিকারী না হতাম।

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ওফাত নিকটবর্তী হলে সে জনৈক ধোপাকে দামেশকের আশে-পাশে কাঠে পিটিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতে দেখল। আবদুল মালেক বলল ঃ কি চমৎকার হত যদি আমি ধোপা হতাম! প্রত্যহ নিজের হাতের কামাই খেতাম! দরবেশ আবু হাযেম এ কথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হাজার শোকর, তিনি এই শাসকবর্গকে এমন বানিয়েছেন যে, মৃত্যুর সময় তারা আমাদের দরিদ্রাবস্থা কামনা করেন। কিন্তু আমাদের যখন মৃত্যু আসে, তখন আমরা তাদের অবস্থা কামনা করি না।

মৃত্যুর পূর্বে কেউ আবদুল মালেককে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ এমন পাচ্ছি, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছে এসেছ এক এক করে, যেমন আমি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি যে আসবাবপত্র দিয়েছিলাম, তা তোমরা পেছনে ছেড়ে এসেছ।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মালেক বলেন ঃ ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় দোয়া করতেন— ইলাহী! আমার মৃত্যুকে মানুষের কাছে প্রকাশ করো না তা এক মুহূর্তের জন্য হলেও । সেমতে যেদিন তাঁর ওফাত হয়, সেদিন আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলাম। তাঁর মধ্যে ও আমার মধ্যে একটি দরজার ব্যবধান ছিল। আমি শুনলাম, তিনি এ আয়াতখানি পাঠ করছেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ, সে পরকালীন গৃহ আমি তাদেরকে দেব, যা পৃথিবীতে আগ্রাসন চায় না এবং গোলযোগও চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যে।

এরপর তিনি চুপ করলেন। আমি কোন আওয়াজ ও সাড়া-শব্দ না পেয়ে এক গোলামকে পাঠালাম— দেখ, ঘুমাচ্ছেন কি না। সে কাছে গিয়েই চিৎকার করে উঠল। আমি দ্রুত ধাবিত হলাম। তিনি তখন আর বেঁচে নেই। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। ফলে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু প্রকাশ পেল না।

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ওফাতের পূর্বে কেউ তাঁর কাছে প্রার্থনা করল— আমীরুল মুমিনীন! কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার বর্তমান এ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করছি। একদিন তোমারও এ অবস্থাই হবে।

বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আযীয যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর জন্যে একজন চিকিৎসক ডাকা হল। সে অবস্থা দেখে বলল ঃ আপনাকে বিষ দেয়া হয়েছে। আপনি বিষের ক্রিয়া অনুভব করছেন কি? তিনি বললেন ঃ যখন বিষ আমার পেটে পড়েছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। চিকিৎসক বলল ঃ তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় আপনার প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ প্রাণ তো পরওয়ারদেগারের কাছেই যাবে। তাই যাওয়ার শ্রেষ্ঠতম জায়গা। আল্লাহর কসম, যদি আমি জানতে পারি যে, আমার রোগের প্রতিকার আমার কানের লতির কাছেই রয়েছে, তবু আমি হাত কান পর্যন্ত তুলে তা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

গ্রহণ করব না। ইলাহী! ওমরের জন্যে তোমার সাক্ষাতে কল্যাণ রাখ। এর অল্প দিন পরেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

বর্ণিত আছে— ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি কাঁদলেন। এক ব্যক্তি আরয করল— আমীরুল মুমিনীন! কান্নার কারণ কি? আপনার জন্যে সুসংবাদ— আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দিয়ে অনেক সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কেঁদে কেঁদেই বললেন ঃ আমাকে কি হাশরের ময়দানে দাঁড় করানো হবে না? জনগণের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না? আল্লাহর কসম, যদি আমি কেবল ন্যায়বিচারই করতাম, তবু আল্লাহ তা'আলার শিখিয়ে দেয়া ছাড়া তাঁর সামনে আমার যুক্তি সম্পন্ন করতে পারতাম না। আর যে ক্ষেত্রে অনেক ন্যায়বিচার বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে ভয় না করে উপায় আছে কি? একথা বলে তিনি অনেক কাঁদলেন এবং এরপর অল্প দিনই জীবিত থাকেন।

বর্ণিত আছে— অন্তিম সময়ে তিনি বললেন ঃ আমাকে বসিয়ে দাও। বসিয়ে দেয়ার পর তিনি বললেন ঃ ইলাহী! তুমি আদেশ করেছ, আমি তা পালনে ত্রুটি করেছি। তুমি নিষেধ করেছ, আমি মান্য করিনি। একথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন ঃ কিন্তু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, তাওহীদে আমি কোন ত্রুটি করিনি। অতঃপর তিনি মাথা তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন ঃ আমি কিছু লোককে উপস্থিত দেখছি। তারা না মানুষ, না জিন। এরপরই তাঁর ওফাত হয়ে গেল।

খলীফা হারুনুর রশীদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মৃত্যুর সময় নিজের কাফন নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। সে কাফনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন—

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ -

অর্থাৎ, আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসেনি। আমার সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে গেছে।

মু'তাসিম বিল্লাহ মৃত্যুর সময় বললেন— যদি আমি জানতাম, আমার জীবন সামান্য, তবে যা করেছি তা করতাম না।

মুনতাসির মৃত্যুর সময় খুবই অস্থির ছিলেন। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ আপনার কোন ভয় নেই। পেরেশান হবেন না। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার এতটুকুই যে, দুনিয়া গত হয়েছে এবং আখেরাত এসে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমর ইবনে আছেরের কাছে ধন-সম্পদের কয়েকটি সিন্দুক ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি এগুলো দেখে পুত্রদেরকে বললেন ঃ এগুলো কে নেবে? হায়, এগুলোতে যদি ছাগলের বিষ্ঠা থাকত!

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মৃত্যুর সময় বলল ঃ ইলাহী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। লোকেরা বলে তুমি নাকি ক্ষমা করবে না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয হাজ্জাজের বক্তৃতায় মুগ্ধ হতেন এবং তার প্রতি ঈর্ষা করতেন। হযরত হাসান বসরীকে হাজ্জাজের এই দোয়ার কথা বলা হলে তিনি বললেন ঃ হাজ্জাজ এ কথাটি সরলভাবেই বলেছিল কি? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করলে আশ্চর্যের কিছু হবে না।

হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ ইলাহী! আমি তোমাকে ভয় করি এবং তোমার কাছে আশা করি। ইলাহী, তুমি জান আমি খাল খনন ও বৃক্ষ রোপণের জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাকে পছন্দ করতাম না; বরং গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসার্ত থাকা, কালের বিপদাপদ সহ্য করা এবং যিকিরের মজলিসে নতজানু হয়ে বসার জন্যে পছন্দ করতাম। তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে যখনই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত, তিনি চোখ খুলে বলতেন— ইলাহী! তুমি যত ইচ্ছা আমার গলা চেপে ধর। তোমার ইযযতের কসম, আমার অন্তর তোমাকে মহব্বত করে।

মৃত্যুর পূর্বে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি দুনিয়ার মহব্বতে অস্থির হয়ে কাঁদছি না; বরং আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, দুনিয়াতে আমাদের পাথেয় ততটুকুই হওয়া উচিত, যতটুকু মুসাফিরের হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যখন ওফাত হল, তখন তিনি যা কিছু ছেড়ে যান, তার মূল্য দশ দেরহামের কিছু বেশী। অর্থাৎ, চার টাকার কাছাকাছি ছিল।

হযরত বেলালের কানে যখন মৃত্যুর আযান পৌঁছল, তখন তাঁর স্ত্রী ব্যথিত স্বরে বলল ঃ হায়, কি দুঃখ! তিনি বললেন ঃ না বরং কি আনন্দ! কেননা, আগামী কাল আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর দলের সাথে মিলিত হব।

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) মৃত্যুর সময় চোখ খুলে হেসে উঠেন এবং বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

لمثل هذا فليعمل العاملون -

অর্থাৎ, এরই জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত।

হযরত ইবরাহীম নখঈ মৃত্যু নিকটবর্তী হলে কাঁদতে থাকেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার দূতের অপেক্ষায় আছি। দেখি, সে আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, না দোযখের?

আমর ইবনে আবদুল কায়েস ওফাতের পূর্বে এমনি প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ আমি না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদি, না দুনিয়ার লোভে কাঁদি; বরং দুপুরের পিপাসা এবং শীতের রাতের জাগরণ ফওত হয়ে যাবে বলে কাঁদছি।

হযরত ফুযায়ল (রহঃ) ওফাতের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর চক্ষু খুলে বললেন ঃ আফসোস, এত দীর্ঘ সফর আর এত অল্প পাথেয়!

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারকের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি গোলাম নসরকে বললেন ঃ আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। নসর কাঁদতে লাগল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ আমার মনে পড়ছে। এখন আপনি ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন! তিনি বললেন ঃ চুপ কর। আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলাম তিনি যেন আমাকে বিত্তবানদের মত জীবন দেন এবং ফকীর ও নিঃস্বদের মত মরণ দেন। আমার সামনে কালেমা পাঠ করবে। যে পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে অন্য কথা বের না হয়, দ্বিতীয় বার কালেমা পড়বে না।

জারীরী বলেন ঃ হযরত জুনায়দের মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার ও নববর্ষ। তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন এবং তদবস্থায়ই কোরআন খতম করে নেন। আমি আরয করলাম ঃ এই সংকট মুহূর্তে আপনি কোরআন খতম করলেন? তিনি বললেন ঃ আমার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার অধিকার আমারই বেশী। এখন আমার আমলনামা বন্ধ হওয়ার সময়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ নমশাদ দাইনুরীর খেদমতে ছিলাম। এমন সময় এক ফকীর এসে আসসালামু আলাইকুম বলে জিজ্ঞেস করল ঃ এখানে কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা আছে কি? যেখানে মানুষ মরতে পারে? লোকেরা তাকে পানির কাছাকাছি একটি জায়গা দেখিয়ে দিল। ফকীর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নতুন উযু করে কয়েক রাকআত নামায পড়ল। অতঃপর সে জায়গায় গেল এবং পা ছড়িয়ে মরে গেল।

হযরত জুনায়দকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলা হল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি বললেন ঃ আমি কি এটা ভুলে গেছি যে, স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

জাফর ইবনে নাসির হযরত শিবলী (রহঃ)-এর খাদেম বকরান দাইনুরীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মৃত্যুর সময় তুমি হযরত শিবলীর অবস্থা কেমন দেখেছ? বকরান বলল ঃ হযরত শিবলী আমাকে বললেন, আমার কাছে এক ব্যক্তির এক দেরহাম পাওনা ছিল, যা অন্যায়ভাবে আমার কাছে এসেছিল। যদিও আমি সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজারো দেরহাম দান করেছি, কিন্তু আমার অন্তরে এর চেয়ে বড় কোন বোঝা নেই। এরপর তিনি বললেন ঃ নামাযের জন্যে আমাকে উযু করিয়ে দাও। আমি উযু করালাম; কিন্তু দাড়িতে খেলাল করা ভুলে গেলাম। তখন তাঁর যবান বন্ধ ছিল। তিনি আমার হাত ধরে আপন দাড়িতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর ওফাত হয়ে গেল। বকরানের এ বর্ণনা শুনে জা'ফর কেঁদে বললেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল, জীবনের শেষ মুহূর্তেও যার একটি মোস্তাহাব কাযা হয়নি?

এগুলো হচ্ছে সাধক ও ওলীগণের অন্তিমকালীন অবস্থা ও উক্তি। তাঁদের অবস্থা যেমন বিভিন্ন ছিল, তেমনি উক্তিও বিভিন্ন। কারও উপর ভয় প্রবল ছিল এবং কারও উপর আশা। আবার কারও উপর প্রবল ছিল অনুরাগ ও মহব্বত। প্রত্যেকেই নিজের হাল অনুযায়ী কথাবার্তা বলেছেন। সুতরাং সকলের উক্তিই সঠিক ও যথার্থ।

জানাযা ও কবরস্তানে সাধকগণের উক্তি ঃ বুদ্ধিমানের জন্যে জানাযার মধ্যেও শিক্ষা ও হুশিয়ারি লাভ করার অনেক অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফেল, জানাযা দেখে তাদের অন্তরের কঠোরতা ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি পায় না। কারণ, তাদের ধারণা থাকে যে, তারা সর্বদা অন্যদের জানাযাই দেখবে। তারা একথা ভাবে না যে, তাদেরকেও একদিন খাটে বহন করা হবে। এটা তাদের নিছক একটি কুসংস্কার। তাদের চিন্তা করা উচিত, যত মানুষকে খাটে বহন করা হয়, তাদের সবাই এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তাদের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতএব প্রত্যেকের উচিত, যখন জানাযা দেখে, তখন নিজেকে তার মধ্যে ধরে নেয়া। কেননা, অচিরেই তা হবে, হয় দ্বিতীয় দিন অথবা তৃতীয় দিন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন জানাযা দেখতেন, তখন বলতেন— চল, আমরাও তোমার পেছনে আসছি। মকহুল দামেশকী জানাযা দেখে বলতেন— তুমি সকালে যাচ্ছ, আমরা বিকালে যাব। ওসায়দ ইবনে হুযায়র বলেন— আমি যখনই কোন জানাযায় উপস্থিত হয়েছি, আমার মনে সর্বক্ষণ এ চিন্তাই ঘুরাফেরা করেছে যে, এ মৃতের সাথে কি আচরণ হবে এবং এর কি পরিণতি হবে?

মালেক ইবনে দীনারের ভাইয়ের ইন্তেকাল হলে তিনি জানাযার সাথে বের হয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন— আল্লাহর কসম, তোমার পরিণাম না জানা পর্যন্ত আমার চোখ ঠাণ্ডা হবে না। অবশ্য, একথা সারা জীবনেও জানা যাবে না।

আমাল বলেন ঃ আমরা জানাযায় উপস্থিত হতাম; কিন্তু একথা জানার উপায় থাকত না যে, সমবেদনা কার কাছে প্রকাশ করব। কেননা, সকলেই সমান দুঃখিত থাকত। ছাবেত বানানী বলেন ঃ আমরা জানাযায় উপস্থিত হয়ে মুখ ঢেকে ক্রন্দনকারীদের ছাড়া কাউকে দেখতাম না। মোটকথা, পূর্ববর্তীরা মৃত্যুকে এভাবে ভয় করত। কিন্তু আজকাল ব্যাপার উল্টে গেছে। এখন যারা জানাযার সাথে থাকে, তাদের অধিকাংশই হাসে, কৌতুক করে এবং মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তিরই কথাবার্তা বলে। মৃতের আত্মীয়রাও ভাবে, কিভাবে সম্পত্তির কিছু অংশ তারাও পাবে। কেউ চিন্তা করে না, তার জানাযা যখন বের হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কি হবে? তার দশা কি হবে? এই উদাসীনতার একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের কঠোরতা। অধিক গোনাহ করতে করতে আমাদের মন কঠোর হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহকে, কিয়ামতের দিনকে এবং আখেরাতের ভয়কে আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেন।

জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে মৃতের জন্যে কান্নাকাটি করা। কিন্তু জ্ঞানী হলে নিজের অবস্থার জন্যেও কাঁদা উচিত। কেননা, মৃতের জন্যে কান্নাকাটির তুলনায় নিজের অবস্থার জন্যে কান্নাকাটি করা অধিক সমীচীন। যয়তুন ব্যবসায়ী ইবরাহীম কিছু লোককে মৃতের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

জন্যে কাঁদতে দেখে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ অবস্থার জন্যে কাঁদাকাটি কর, তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। কেননা, মৃত ব্যক্তি তিনটি ভয় অতিক্রম করে চলে গেছে। এক, সে মালাকুল মওতের আকৃতি দেখে নিয়েছে। দুই, সে মৃত্যুর তিক্ততা আস্বাদন করেছে। তিন, খাতেমার আশংকা থেকেও সে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এসব ভয় এখনও তোমাদের সম্মুখে রয়ে গেছে।

জানাযায় অংশগ্রহণের শিষ্টাচার ঃ জানযায় অংশ গ্রহণের শিষ্টাচার হচ্ছে হচ্ছে চিন্তা করা, গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া এবং বিনম্রভাবে জানাযার সামনে চলা। জানাযার আরও একটি শিষ্টাচার হচ্ছে মৃতের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, যদিও সে পাপাচারী ও ফাসেক হয়ে থাকে এবং নিজের প্রতি কুধারণা রাখা যদিও বাহ্যত সাধু হয়। কেননা, খাতেমার অবস্থা বিপদসংকুল। তার স্বরূপ কারও জানা নেই। এ কারণেই আমর ইবনে যর থেকে বর্ণিত আছে যে, তার জনৈক পাপাচারী প্রতিবেশী মারা গেলে অনেকেই তার জানাযায় যেতে রাযী হল না। কিন্তু আমর ইবনে যর গেলেন এবং জানাযার নামায পড়লেন। মৃতকে কবরে নামানো হলে তিনি কবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে অমুক! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি সারা জীবন তাওহীদের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং নিজের মাথা সেজদায় ভূলুণ্ঠিত করেছ। যারা বলে, তুমি গোনাহগার ও পাপাচারী, তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, আমাদের মধ্যে কে গোনাহগার ও পাপাচারী নয়?

বর্ণিত আছে, বসরার আশপাশে জনৈক নামকরা দুষ্কৃতকারী মারা গেলে তার স্ত্রী জানাযায় সাহায্য করার জন্যে কাউকে খুঁজে পেল না। কারণ, অধিক কুকর্মের কারণে কেউ তার ধারে-কাছে আসতে সম্মত হল না। সে মজুরী দিয়ে কিছু লোক এনে জানাযার ব্যবস্থা করল এবং নামাযের জায়গায় নিয়ে গেল। কিন্তু কেউ তার জানাযার নামায পড়ল না। অগত্যা সে মৃতকে দাফন করার জন্যে জঙ্গলে নিয়ে গেল। সেখান থেকে কাছেই এক পাহাড়ে একজন বড় দরবেশ বাস করতেন। মৃতের স্ত্রী দরবেশকে দেখল, যেন তিনি জানাযার অপেক্ষায়ই রয়েছেন। জানাযা পৌছে গেলে দরবেশ নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নামাযের জন্যে দরবেশ পাহাড় থেকে নেমেছেন - এ সংবাদ দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরবাসীরাও চলে এল এবং দরবেশের সাথে নামাযে শরীক হল। কিন্তু সবাই বিস্মিত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ছিল যে, দরবেশ কিরূপে এ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন! এ মর্মে দরবেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ আমাকে স্বপ্নে কেউ বলল, পাহাড় থেকে নেমে অমুক জায়গায় যাও। সেখানে তুমি একটি জানাযা পাবে, যার সাথে মৃতের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তার জানাযার নামায পড়। কারণ, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। এতে লোকদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। দরবেশ মৃতের স্ত্রীকে ডেকে এনে সেই ব্যক্তির অবস্থা ও অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বলল ঃ তার অভ্যাস ও চরিত্র সবারই জানা। সারাদিন পানশালায় পড়ে থেকে মদ্যপান করত। দরবেশ বললেন ঃ চিন্তা করে বল, তার কোন সৎকর্মও তোমার মনে পড়ে কি না। সে বলল ঃ হ্যাঁ, তিনটি বিষয় ছিল। এক, প্রত্যহ সকালে যখন নেশার ঘোর কেটে যেত, তখন পোশাক বদলিয়ে উযু করত এবং ফজরের নামায জামাআতে আদায় করত। এরপর পানশালায় পৌঁছে কুকর্মে লিপ্ত হত। দুই, কখনও তার ঘর এতীম-শূন্য থাকত না; দু'একজন এতীম সর্বদাই থাকত। তাদের সাথে সে আপন সন্তানের চেয়েও বেশী সদ্ব্যবহার করত। তাদের খোঁজখবর নিত। তিন, রাতে যখন তার নেশা কিছুটা প্রশমিত হত, তখন অন্ধকার রাতে কান্নাকাটি করে বলত ঃ ইলাহী, তুমি তোমার দোযখের কোন্ অংশটি এই নাপাক অধম দ্বারা পূর্ণ করতে চাও? একথা শুনে দরবেশের সন্দেহ দূর হল এবং তিনি আপন নিবাসে ফিরে গেলেন।

কবরের অবস্থা সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি ঃ যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ সর্বাধিক দরবেশ (দুনিয়াত্যাগী) কে? তিনি বললেন ঃ যে কবরকে এবং নিজের গলে যাওয়াকে বিস্মৃত হয় না। অধিক পার্থিব সাজসজ্জা বর্জন করে। অক্ষয় বস্তুকে ধ্বংসশীল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়। আগামী কালকে নিজের জীবনের মধ্যে গণ্য করে না। নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণনা করে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কবরস্তানে বসে থাকেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কবরবাসীদেরকে উত্তম প্রতিবেশী পেয়েছি এবং আমি তাদেরকে প্রতিবেশী বলে বিশ্বাস করি। কারণ, তারা মুখ বন্ধ রাখে এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ما رأيت منظرا الا والقبر اقطع منه

অর্থাৎ, আমি কবরের মত এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমরা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে কবরস্তানে গেলাম। তিনি একটি কবরের কাছে বসে কাঁদলেন। আমি অন্যদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। আমিও তাঁর দেখাদেখি কাঁদতে লাগলাম। অন্যরাও কাঁদল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা আরয করলাম ঃ আপনার কান্নার কারণে আমরা কাঁদছি। তিনি বললেন ঃ এ কবরটি আমার মা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর তাঁর মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করার অনুমতি চাইলে তা নামনযুর করা হল। মায়ের জন্যে সন্তানের মন যেমন নরম হয়, আমার মনও তেমনি নরম হয়েছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন কান্নার আতিশয্যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— কবর আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল। মৃত ব্যক্তি এ মনযিলটি নিরাপদে পার হয়ে গেলে অন্যান্য মনযিল তার জন্যে সহজ হয়। পক্ষান্তরে এখানে নাজাত না পেলে অন্যান্য মনযিল আরও সুকঠিন হয়ে যায়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, আমর ইবনুল আস (রাঃ) চলার পথে একটি কবরস্তান দেখে নেমে পড়লেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। সহচররা বলল ঃ আজ আপনি এমন করলেন, যা এর আগে কখনও করেননি। এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি কবরবাসীদেরকে এবং তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে অন্তরায়ের বিষয়টিকে মনে করে দু'রাকআত নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ উত্তম মনে করেছি।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায়ই কবরস্তানে বসে থাকতেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ঃ আমি এমন লোকদের মধ্যে বসি, যারা আমাকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে গেলে আমার গীবত করে না।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) রাতের বেলায় কবরস্তানে যেতেন এবং কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ হে কবরবাসীগণ, তোমাদের কি হল যে, আমি ডাকলে তোমরা সাড়া দাও না? এরপর বলতেন ঃ হ্যাঁ, তাদের সাড়া দেয়ার পথে একটি অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমিও যেন তাদেরই মত একজন। এরপর তিনি নামাযে মনোনিবেশ করতেন এবং ফজর পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকতেন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) জনৈক সহচরকে বললেন ঃ আমি রাত জেগে কবর ও কবরবাসীদের অবস্থা চিন্তা করেছি। তুমি যদি মৃত্যুর তিন দিন পর মৃতের অবস্থা দেখ, তবে তার কাছেই থাকবে না যদিও পূর্বে তার সাথে তোমার অসাধারণ প্রেম ও ভালবাসা থাকে। কারণ, তুমি কবরে দেখবে অসংখ্য কীট দৌড়াদৌড়ি করছে, পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, মৃতের বর্ণ ও গন্ধ বিগড়ে গেছে, কীটেরা কিলবিল করে দেহকে খেয়ে যাচ্ছে এবং কাফন মলিন হয়ে গেছে। একথা বলে তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

হাতেম আসাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরস্তানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের অবস্থা চিন্তা করে না এবং মৃতদের জন্যে দোয়া করে না, সে নিজের এবং মৃতদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রবী' ইবনে খায়ছাম নিজের ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন। তিনি যখনই অন্তরের কঠোরতা অনুভব করতেন, তখনই কবরে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন। এরপর বলতেন—

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ -

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, আমাকে ফিরিয়ে দাও, য়াতে কিছু ভাল কাজ করতে পারি।

এ আয়াতটি কয়েক বার আবৃত্তি করতেন। অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন - হে রবী', এখন তো তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার আমল কর।

মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন ঃ আমি একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে কবরস্তানে গেলাম। তিনি কবরগুলোকে দেখে কাঁদলেন। অতঃপর আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে মায়মুন, এগুলো আমার বাপ-দাদা অর্থাৎ উমাইয়া বংশীয় শাসকগণের কবর। তারা যেন দুনিয়াবাসীদের সাথে তাদের আনন্দ-উল্লাসে কখনও শরীকই ছিলেন না। দেখ, কেমন বিচ্ছিন্ন পড়ে আছেন । তাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের দেহে সরীসৃপ বাসা নির্মাণ করেছে। অতঃপর তিনি কেঁদে বললেন ঃ আমার মনে হয়, তাদের কেউ আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পায়নি।

ছাবেত বানানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার এক কবরস্তানে গেলাম। যখন সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলাম, তখন কাউকে বলতে শুনলাম

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ঃ হে ছাবেত, কবরবাসীদের নীরবতা দেখে ধোকা খেয়ো না । তাদের মধ্যে অনেকেই শোকার্ত।

আবু মূসা তামীমী (রহঃ) বলেন ঃ কবি ফারাযদাকের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জানাযার সাথে বসরার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি রওয়ানা হলেন। তাদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)ও ছিলেন। তিনি ফারাযদাককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি সে দিনের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছেন? সে বলল ঃ ষাট বছর ধরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তা সেদিনের জন্যেই।

সন্তান-সন্ততির ওফাত সম্পর্কে কথিত উক্তি ঃ যার পুত্র মারা যায়, সে একে মনে করবে, সে এবং তার পুত্র উভয়েই সফরে ছিল। তাদের গন্তব্যস্থল ছিল একটি শহর, যা সকলেরই প্রকৃত বাসস্থান। কিন্তু পুত্র সে বাসস্থানে প্রথমে চলে গেছে এবং সে-ও অচিরেই তার সাথে মিলিত হবে। এরূপ চিন্তা করলে বেশী অনুতাপ হবে না। কারণ, সে জানতে পারবে সে-ও কিছুদিনের মধ্যেই পুত্রের সাথে মিলিত হবে। এতে দুঃখ ও বেদনা কম হবে; বিশেষত তখন, যখন পুত্রের মৃত্যুর কারণে অপরিসীম ছওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— যদি আমি গর্ভপাতের সন্তান আগে পাঠিয়ে দেই, তবে সেটা আমার জন্যে একশ' অশ্বারোহী পিছনে ছেড়ে যাওয়ার চাইতে উত্তম, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে। নিম্নস্তর ও উচ্চস্তর বুঝানোর জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্ভপাতের সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় সওয়াব সে পরিমাণেই হয়, সন্তানের প্রতি অন্তরে যে পরিমাণ টান থাকে। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর এক পুত্র মারা গেলে তিনি তার জন্যে অত্যধিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, পুত্রের কদর আপনার কাছে কতটুকু ছিল? তিনি বললেন ঃ ভূ-পৃষ্ঠের সমান। অতঃপর তাকে বলা হল ঃ আখেরাতে আপনি ছওয়াবও এতটুকুই পাবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যদি কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে তাদের জন্যে সবর করে ছওয়াব প্রার্থী হয়, তবে সন্তানরা তার জন্যে দোযখ থেকে রক্ষার ঢাল হয়ে যাবে। কোন এক মহিলা আরয করল ঃ দু'জন মারা গেলেও কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দু'সন্তান মারা গেলেও।

পিতার উচিত মৃত্যুর সময় সন্তানের জন্যে দোয়া করা। কেননা, তার দোয়া অধিক আশাপ্রদ এবং কবুল হওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান নিজের পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে এরূপ দোয়া করেন— ইলাহী, আজ আমি তোমার কাছে তার জন্যে কল্যাণ আশা করি এবং তার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সম্পর্কে তোমাকে ভয় করি। অতএব, আমার আশা পূর্ণ কর এবং ভয় দূর কর।

আবু সিনান (রহঃ) তাঁর পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে এরূপ দোয়া করেন— এলাহী, আমার যে হক তার উপর ছিল, তা আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতএব, তোমার যে হক তার উপর ওয়াজেব ছিল, তা তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমি সর্বাধিক দাতা ও দয়ালু।

এক বেদুঈন তার পুত্রের কবরে দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইলাহী, সে আমার সাথে সদ্ব্যবহারে যে সকল ত্রুটি করেছে, তা আমি তাকে ক্ষমা করলাম। এখন তোমার আনুগত্যে সে যে সকল ত্রুটি করেছে, সেগুলো তুমি মার্জনা কর।

যুর ইবনে ওমরের ওফাত হলে তার পিতা ওমর পুত্রকে কবরে রাখার পর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে যুর, তোমার ব্যাপারে আমি এত বেশী শংকিত যে, তোমার জন্যে দুঃখ করাও ভুলে গেছি। জানি না, তোমাকে কি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তুমি কি জওয়াব দিয়েছ। অতঃপর বললেন ঃ ইলাহী, এ আমার পুত্র যুর। যতদিন তুমি ইচ্ছা করেছ, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছ। এখন তার আয়ু ও রুযী সমাপ্ত হয়েছে এবং তুমি তার প্রতি যুলুম করনি। ইলাহী, তুমি তার উপর তোমার ও আমার আনুগত্য অপরিহার্য করেছিলে। এ বিপদে সবর করার যে ছওয়াব তুমি আমাকে দিয়েছ, তা আমি তাকে দান করলাম। অতএব, তুমি তার আযাব আমাকে দিয়ে ফেল। তাকে আযাব দিয়ো না। একথা শুনে সকলেই কেঁদে ফেলল।

এক ব্যক্তি বসরায় এক মহিলাকে দেখে বলল ঃ এমন সজীবতা আমি কখনও দেখিনি। এর কারণ মনে হয়, তার দুঃখ কম। মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমি এমন দুঃখে জর্জরিত যাতে আমার কোন অংশীদার নেই। লোকটি বলল ঃ কিভাবে? মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী কোরবানীর ঈদের দিন একটি ছাগল যবেহ করেছিলেন। আমার ফুটফুটে ছেলে দু'টি অদূরেই খেলা করছিল। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বলল ঃ তুমি কি দেখতে চাও আমাদের পিতা কিভাবে ছাগল যবেহ করেছেন? সে বলল ঃ হাঁ। এরপর বড় ছেলে ছোট ছেলেকে ধরে যবেহ করে ফেলল। আমরা যখন খবর পেলাম, তখন ছেলে রক্তের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে বড় ছেলে দৌড়ে এক পাহাড়ে আত্মগোপন করতে চাইল। সেখানে ছিল এক বাঘ। সে ছেলেকে খেয়ে ফেলল। তার পিতা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে ভীষণ গরমে পিপাসায় কাতর হয়ে মারা গেল। এখন কালচক্র আমাকে একাই রেখে দিয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোটকথা, সন্তান মারা যাওয়ার সময় এ ধরনের বিপদাপদ স্মরণ করলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কেননা, এমন কোন বিপদ নেই, যার চেয়ে বড় বিপদ কল্পনা করা যায় না এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় যা দূর করেন না। অতএব হা-হুতাশ করা কিছুতেই উচিত নয়।

কবর যিয়ারত ঃ মৃত্যুকে স্মরণ ও শিক্ষা অর্জনের জন্যে যে কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। আর ওলী-আল্লাহগণের কবর যিয়ারত করা বরকত হাসিলের জন্যেও মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে এর অনুমতি দিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত কর। এটা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু সাবধান, কোন অযথা কথা সেখানে বলবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাজার সশস্ত্র ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে নিজের জননীর কবর যিয়ারত করেছেন। সেদিন যত মানুষকে কাঁদতে দেখা গেছে, এর চেয়ে বেশী কখনও দেখা যায়নি। সেদিনই তিনি এরশাদ করেন— আমি কেবল যিয়ারত করার অনুমতি পেয়েছি— মাগফেরাতের দোয়া করার নয়। ইবনে আবী মুশায়কা (রহঃ) বলেন ঃ একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কবরস্তান থেকে ফিরে এলে আমি আরয করলাম ঃ আপনি কোত্থেকে এলেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভাই আবদুর রহমানের কবর থেকে। আমি আরয করলাম ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রথম দিকে নিষেধ করেছিলেন, এরপর অনুমতি দিয়েছেন।

এই রেওয়ায়েত দৃষ্টে মহিলাদেরকে কবরস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। কেননা, তারা কবরস্তানে গিয়ে অনেক অশোভন কথাবার্তা বলে ফেলে। ফলে, কবর যিয়ারতে যে ছওয়াব হয়, গোনাহ্ তার চেয়ে বেশী হয়। এ ছাড়া পথে পর্দার খেলাফ করা এবং বেগানা পুরুষদের সামনে সাজসজ্জাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এগুলো কবীরা গোনাহ্। আর কবর যিয়ারত করা কেবল সুন্নত। অতএব, সুন্নত আদায় করার জন্য এমন গোনাহ্ করা কিরূপে বৈধ হবে? অবশ্য যদি মহিলারা ছেঁড়া ও জীর্ণ বস্ত্র পরে বের হয় এবং কবরে গিয়ে দোয়া ছাড়া অন্য কিছু না বলে, তবে কোন দোষ নেই।

হযরত আবু যর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কবর যিয়ারতের মাধ্যমে তোমরা আখেরাতকে স্মরণ কর এবং মৃতদেরকে গোসল দাও। কেননা, আত্মাহীন শরীরের তদবীর করা একটি বড় উপদেশ।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আর জানাযার নামায পড়। এতে আশা করা যায়, দুঃখ অর্জিত হবে। দুঃখিত মানুষ আল্লাহ তা'আলার ছায়ায় থাকে।

ইবনে আবী মুশায়কার রেওয়ায়েতে আছে— মৃতদের যিয়ারত কর, তাদেরকে সালাম কর এবং তাদের জন্যে দোয়া কর। এতে তোমাদের শিক্ষা অর্জিত হবে।

হযরত নাফে' বর্ণনা করেন— হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যে কবরের কাছ দিয়ে গমন করতেন, সেখানে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন— হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ) তাঁর পিতৃব্য হযরত হামযার কবর যিয়ারতের জন্যে কয়েক দিন পরপর গমন করতেন, কবরের কাছে নামায পড়তেন ও কাঁদতেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি প্রতি জুমআর দিনে নিজের পিতার অথবা যে কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করে, তার গোনাহ মার্জনা করা হয় এবং ছওয়াব লেখা হয়।

হযরত ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য কোন ব্যক্তি যদি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্যে দোয়া করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এক হাদীসে আছে— من زار قبرى وجبت له شفاعتى

অর্থাৎ, যে আমার কবর যিয়ারত করে, আমার শাফায়াত তার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে।

হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) বলেন ঃ যখন ফজর উদিত হয়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কবর শরীফকে আচ্ছন্ন করে নেয় এবং পাখা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে। সন্ধ্যা হলে এসব ফেরেশতা আকাশে চলে যায় এবং এ পরিমাণ অন্য ফেরেশতা নেমে আসে। তারাও তাই করে, যা পূর্ববর্তীরা করেছিল। এ ধারা ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্থিত হবেন এবং তাঁর সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর তাযীম করতে থাকবে।

কবর যিয়ারতে মুস্তাহাব হল, কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃতের প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো এবং মৃতের উদ্দেশে সালাম করা। কবরকে না মোছা, হাত না লাগানো এবং চুম্বন না করা। এসব কাজ খৃষ্টানদের রীতি। হযরত

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

নাফে' বলেন ঃ আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে একশ' বার বরং আরও বেশী বার দেখেছি, তিনি পবিত্র রওযার কাছে এসে বলতেন— সালাম নবী (আঃ)-এর প্রতি সালাম, আবু বকরের প্রতি সালাম এবং আমার পিতার প্রতি সালাম। এরপর তিনি ফিরে আসতেন।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন ঃ আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে দেখেছি— তিনি কবর শরীফের কাছে এলেন, দাঁড়ালেন এবং উভয় হাত উপরে তুললেন। এমনকি, আমার ধারণা হল তিনি নামাযের জন্যে আল্লাহু আকবার বললেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সালাম বলে ফিরে গেলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে, তার কাছ থেকে সে (মৃত ভাই) প্রীতি অর্জন করে যে পর্যন্ত সে সেখানে বসে থাকে এবং তার সালামের জওয়াব দেয়।

সোলায়মান ইবনে সহীম (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরয করলাম— ইয়া রসূলাল্লাহ, মানুষ আপনার কাছে উপস্থিত হয় এবং আপনার প্রতি সালাম করে। আপনি তাদের সালাম বুঝেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, বুঝি এবং তাদের সালামের জওয়াব দেই।

আসেম হজদরীর বংশধরদের একজন বললেন ঃ মৃত্যুর দু'বছর পর আমি আসেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি তো মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ আপনি কোথায় থাকেন? তিনি বললেন ঃ আমরা জান্নাতের একটি বাগানে থাকি। আমরা আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ প্রতি জুমআর রাতে ও ভোরে আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযনী (রহঃ)-এর কাছে সমবেত হয়ে তোমাদের খবরাখবর শুনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনাদের দেহ একত্রিত হয়, না রূহ? তিনি বললেন ঃ দেহের নয়— আত্মার মোলাকাত হয়। আমি বললাম ঃ আমাদের যিয়ারত সম্পর্কে আপনারা অবগত হন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, জুমআর রাতে পরবর্তী দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমাদের যিয়ারতের খবর পাই। আমি বললাম ঃ অন্য দিনগুলোতে খবর পান না কেন? তিনি বললেন ঃ জুমআর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এতে অবগতি হয়।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে জুমআর দিন কবর যিয়ারত করতেন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি রবিবার পর্যন্ত যিয়ারত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি মৃতরা তাদের যিয়ারতকারীদেরকে জুমআর দিন, তার একদিন আগে এবং একদিন পরে পর্যন্ত চিনতে পারে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বাশশার ইবনে গালেব নাজরানী বলেন ঃ আমি রাবেআ বসরীয়ার জন্যে অনেক দোয়া করতাম। এক রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ হে বাশশার, তোমার উপঢৌকন আমার কাছে উপর্যুপরি নূরের আলোয় রেশমী রুমালে বাঁধা অবস্থায় আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এগুলো এভাবে আসে কেন? তিনি বললেন ঃ যে মুসলমান মৃত বন্ধু-বান্ধবের জন্যে দোয়া করে এবং দোয়া কবুল হয়ে যায়, তার দোয়া এমনিভাবে নূরের আলোয় রেখে রেশমী রুমাল দিয়ে বেঁধে মৃতকে দিয়ে বলা হয়, এটা তোমার জন্যে অমুকের উপঢৌকন।

হাদীস শরীফে আছে— মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ফরিয়াদকারীর অনুরূপ। সে পিতা, ভাই অথবা বন্ধুর পক্ষ থেকে দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন কারও পক্ষ থেকে দোয়া পৌঁছে, তখন এটা তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়।

কবরের কাছে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মরুযী বলেন ঃ আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি— যখন তুমি কবরস্তানে যাবে, তখন সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা এখলাস পাঠ করে তার ছওয়াব কবরবাসীদেরকে বখশে দেবে। তারা তা পেয়ে যাবে। সুতরাং যিয়ারতকারী নিজের জন্যে এবং মৃতের জন্যে দোয়া করার ব্যাপারে গাফেল হবে না।

মৃত্যুর স্বরূপ ঃ মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নানা রকম ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণা প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কোন কোন লোক মনে করে মৃত্যু হচ্ছে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। এর সাথে না হাশর আছে, না পুনরুত্থান এবং না ভাল-মন্দ পরিণাম। মানুষের মৃত্যু জন্তু-জানোয়ার ও ঘাসের মৃত্যুর মতই। এ মত তাদের, যারা মুলহিদ তথা ধর্মদ্রোহী এবং আল্লাহ্ ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। কারও কারও ধারণা, মৃত্যুর কারণে মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়; কিন্তু কবর থেকে হাশর পর্যন্ত না কোন আযাবের কষ্ট অনুভব করে, না ছওয়াবের সুখ। কেউ কেউ বলে আত্মা অবশিষ্ট থাকে— মৃত্যুর কারণে অস্তিত্বহীন হয় না এবং ছওয়াব ও আযাব হয় আত্মার— দেহের নয়। দেহ কখনও উত্থিত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হবে না। এ সমস্ত উক্তি সত্যবিমুখ ও ভ্রান্ত। কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মৃত্যু কেবল অবস্থা পরিবর্তনের নাম। আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হয় আযাবে থাকে, না হয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে থাকে। দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ দেহের উপর তার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাওয়া এবং দেহ তার আনুগত্য থেকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মুক্ত হয়ে যাওয়া। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আত্মার হাতিয়ার। আত্মা এগুলোকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। উদাহরণতঃ হাত দ্বারা সে ধরে, কান দ্বারা শুনে এবং চোখের দ্বারা দেখে। কিন্তু বস্তুনিচয়ের স্বরূপ আত্মা নিজেই জেনে নেয়। এজন্যে কোন হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে বিভিন্ন দুঃখজনক ঘটনায় সে নিজেই দুঃখ পায় এবং সুখের ঘটনায় নিজেই সুখ অনুভব করে। এ ধরনের যেসকল বিষয়ের সাথে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক নেই, সেগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও আত্মার সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। আর আত্মা যেসকল বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অর্জন করে, সেগুলো দেহ মরে যাওয়ার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি, কবরে আত্মার পুনরায় দেহের মধ্যে আগমন এবং এ আগমন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

মৃত্যুর কারণে দেহের বেকার হয়ে যাওয়া অর্ধাঙ্গ রোগীর অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া এবং তাতে আত্মার নিষ্ক্রিয়তার অনুরূপ। এমতাবস্থায় আত্মার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে এবং সে কোন কোন অঙ্গকে কাজে লাগায় ও কোন কোন অঙ্গ অবাধ্য হয়ে যায়। মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, সকল অঙ্গের নাফরমান হয়ে যাওয়া। এভাবে মৃত্যুর কারণে দেহের উপর আত্মার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায় এবং তার জ্ঞান, চেতনা, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ ইত্যাদি অব্যাহত থাকে।

মৃত্যুর কারণে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন দু'ভাবে হয়ে থাকে। এক, মানুষ তথা আত্মার কাছ থেকে চোখ-কান-হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পরিবার, স্ত্রী-পুত্র, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়া। মানুষের কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেয়া অথবা মানুষকে এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া— এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কেননা, যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হচ্ছে বিচ্ছেদ। উভয় অবস্থায় এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সমান। কখনও মানুষের ধন-সম্পদ লুটে নেয়া হয় এবং কখনও ধন-সম্পদ ঠিক জায়গায় থাকে, কিন্তু তার মালিককেই বন্দী করে নেয়া হয়। উভয় অবস্থায় যন্ত্রণা একই রূপ থাকে। মৃত্যুও তাই; অর্থাৎ মানুষকে তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও বিষয়-আশয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা এ জগতের অনুরূপ নয়। সুতরাং এ জগতে তার কোন সখের বস্তু থেকে থাকলে মৃত্যুর পর তার বিরহে সে নেহায়েত কষ্ট ভোগ করবে। পরজগতে থেকে সে ইহজগতের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করবে। এমনকি,

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ইহজগতে সে কোন জামা পরিধান করে আনন্দিত হয়ে থাকলে তা হাতছাড়া হওয়ার কষ্টও সে অনুভব করবে। আর যদি সে ইহজগতে কেবল আল্লাহর যিকিরেই তৃপ্তি পেত, তবে মৃত্যুর কারণে অত্যন্ত সুখ ও স্বস্তি পাবে। কেননা, তখন বাধাসমূহ অপসারিত হয়ে যাবে এবং প্রিয়জন ও নিজের মধ্যে কোন অন্তরায় থাকবে না।

দ্বিতীয় পরিবর্তন হল, মৃত্যুর কারণে মানুষের সামনে এমনসব বিষয় উদঘাটিত হয়ে পড়া, যা জীবদ্দশায় উদঘাটিত হত না। যেমন— জাগ্রত মানুষের সামনে সে সব অবস্থা ফুটে উঠে না, যা স্বপ্নে ফুটে উঠে। মানুষ মাত্রই ঘুমন্ত। যখন মরবে, তখনই জাগ্রত হবে।

মৃত্যুর পর মানুষের সামনে যে অবস্থাটি সর্বপ্রথম ফুটে উঠবে, তা হল তার সৎকর্মের লাভ ও অসৎকর্মের ক্ষতি। অথচ এ অবস্থাটি তার অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থিত খাতায় লিখিত ছিল। কিন্তু দুনিয়ার ঝামেলার কারণে এর খবর ছিল না। যখন দুনিয়ার ঝামেলা থাকল না, তখন সমস্ত আমল তার কাছে ফুটে উঠল। এখন সে নিজের কুকর্ম দেখে এত অনুতাপ করে যে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তখন তাকে বলা হয়—

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

অর্থাৎ— নিজের হিসাব নেয়ার জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি প্রয়োজন অনুপাতে দুনিয়া অন্বেষণ করে, মৃত্যুর পর তার কোন বিরহ-যন্ত্রণা হয় না; বরং সে মনযিলে পৌঁছে আনন্দিত হয়। কেননা, মনযিলে পৌঁছাই তার উদ্দেশ্য ছিল— পাথেয় উদ্দেশ্য ছিল না।

অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর কারণে আত্মা অস্তিত্বহীন হয় না এবং তার উপলব্ধিও বিলুপ্ত হয় না। আল্লাহ তা'আলা শহীদদের সম্পর্কে এরশাদ করেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ -

অর্থাৎ— যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদের পালনকর্তার কাছে রিযিকপ্রাপ্ত ও প্রফুল্ল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

বদর যুদ্ধে অনেক কোরায়শ সরদার নিহত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকেন এবং বলেন ঃ হে অমুক, হে অমুক, আমার পালনকর্তা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। তোমাদের সাথে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে ওয়াদা করেছিলেন, তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কিনা? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন? তারা শুনবে কি? তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, তারা আমার কথা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনে। কিন্তু জওয়াব দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এ হাদীসটি হতভাগ্য আত্মার কায়েম থাকা, তার উপলব্ধি ও মারেফত বহাল থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। পূর্বোক্ত আয়াতটি প্রমাণ ছিল শহীদদের আত্মার ব্যাপারে। বলা বাহুল্য, মৃত দু'ধরনের— হতভাগ্য ও ভাগ্যবান।

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ কবর জাহান্নামের একটি গহ্বর অথবা জান্নাতের একটি উদ্যান। মৃত্যুর অর্থ যে কেবল অবস্থার পরিবর্তন, এ হাদীসটি তার সুস্পষ্ট দলীল। এ থেকে আরও বুঝা যায়, মৃতের জন্যে যে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অবধারিত থাকে, তা মৃত্যুর পরেই অবিলম্বে শুরু হয়ে যায়। তবে কোন কোন রকম আযাব ও ছওয়াব পরে হবে। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الموت قيامة فمن مات فقد قامت قيامته

অর্থাৎ, মৃত্যু হল একটি কিয়ামত। যার মৃত্যু হয়, তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

এক হাদীসে আছে— যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার ঠিকানা সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে পেশ করা হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাতে এবং দোযখী হলে দোযখে তার ঠিকানা দেখানো হয় এবং বলা হয়, এটা তোমার ঠিকানা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এতেই পৌছাবেন। তখন এসব ঠিকানা দেখে যে আনন্দ বা কষ্ট হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি দোযখীদের, তা না জানা পর্যন্ত কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

من مات غريبا مات شهيدا ووقي فتاني القبر وغدي وريح

عليه رزقه من الجنة –

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। তাকে কবরের দু'ফেতনা সৃষ্টিকারী ফেরেশতা থেকে বাঁচানো হয় এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার রিযিক জান্নাত থেকে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-কে বললেন ঃ (তার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাই? জাবের বললেন ঃ খুব ভাল কথা! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করে নিজের সামনে বসিয়ে বলেছেন, হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা আমার কাছে আশা কর, আমি তোমাকে দেব। তোমার পিতা আরয করল ঃ এলাহী, আমি তোমার এবাদত যথার্থরূপে করিনি। আমি আশা করি, তুমি আবার আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও, যাতে তোমার রসূলের পতাকাতলে যুদ্ধ করি এবং পুনরায় তোমার পথে মারা যাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি দুনিয়াতে ফিরে যাবে না, এটা পূর্বেই আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ যে ব্যক্তি মারা যায়, সে তার বাড়ীতে যা কিছু হয় সবই জানে। এমনকি, যখন তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হল, সে তাও জানে। মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন— আমি শুনেছি, মুমিনদের রূহ মুক্ত বিহঙ্গের মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা মন্দ কর্মের দ্বারা তোমাদের মৃতদেরকে লজ্জিত করো না। কেননা, তোমাদের কুকর্ম তোমাদের মৃত বন্ধুদের সামনে পেশ করা হয়। একারণেই হযরত আবুদারদা দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন— ইলাহী, আমি তোমার কাছে এমন কর্ম থেকে আশ্রয় চাই, যার কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে লজ্জিত হব। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আবুদারদার মামা ছিলেন এবং তাঁর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ কোথায় থাকে? তিনি বললেন ঃ সাদা পাখির আকারে আরশের ছায়ায় থাকে। আর কাফেরদের রূহ ভূ-গর্ভের সপ্তম স্তরে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন ঃ কবরবাসীরা খবরের অপেক্ষায় থাকে। কোন মৃত তাদের কাছে গেলে তারা বলে, অমুক ব্যক্তি কেমন? মৃত বলে, সে তো দুনিয়া থেকে চলে এসেছে। তোমাদের কাছে আসেনি? তারা বলে, না। এরপর বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাকে হয়তো অন্য কোন পথে নিয়ে গেছে। আমাদের কাছে আসেনি।

কবরের অবস্থা ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে বলে ঃ হে উজাড়-গৃহ ব্যক্তি, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে কিসে ধোকায় ফেলে রাখল? তুমি কি জান না, আমি পরীক্ষাগার, অন্ধকারের ঠিকানা, একাকীত্বের নিবাস এবং কীটের আবাসভূমি? আমার সম্পর্কে তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করেছিল যে, তুমি আমার উপর বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতে? মৃত সাধু ব্যক্তি হলে তার পক্ষ থেকে কেউ জওয়াব দেয়— হে কবর, তুমি দেখ না, এ ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ করত এবং অসৎ কাজে নিষেধ করত? কবর বলে— তাহলে এখন আমি তার জন্য সবুজ হয়ে যাব, তার দেহ নূর হয়ে যাবে এবং আত্মা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চলে যাবে।

এয়াযীদ রাক্কাসী বলেন ঃ আমি শুনেছি, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ তাকে বলেন ঃ হে গর্তে পতিত একাকী বান্দা, তোমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজন তোমার কাছ থেকে চলে গেছে। আমার কাছে আজ তোমার কোন সহচর নেই।

হযরত কা'বে আহবার বলেন ঃ যখন নেক বান্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জেহাদ ইত্যাদি সৎ কাজসমূহ এসে তাকে ঘিরে রাখে। আযাবের ফেরেশতা যখন তার পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে, দূরে থাক। এ ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে এ পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকত। এরপর ফেরেশতা মাথার দিক দিয়ে আসে। তখন রোযা বলে, এদিকে তোমার পথ নেই। এ ব্যক্তি দুনিয়াতে অনেক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকত। ফেরেশতা দেহের দিক দিয়ে আসতে চাইলে হজ্জ ও জেহাদ বলে, এদিক থেকে দূরে থাক। সে এ দেহ দিয়ে হজ্জের জন্য অনেক শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে। ফেরেশতা হাতের দিক দিয়ে আসতে চাইলে তার সদকা ও দান-খয়রাত বলে, এ নেক ব্যক্তিকে আযাব থেকে মুক্ত রাখ। সে এ হাত দিয়ে অনেক দান-খয়রাত করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবুল হয়েছে। অতএব, তুমি এদিক দিয়ে পথ পাবে না। তখন এই মৃতকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলা হয়— তুমি পবিত্র হয়েই জীবন যাপন করেছ এবং পবিত্র হয়েই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মৃত্যুবরণ করেছ। এরপর তার কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে এবং তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পাতে। তার জন্যে জান্নাতী পোশাক আনা হয় এবং যতদূর দৃষ্টি যায়, তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। জান্নাত থেকে একটি প্রদীপ এসে যায়, যার আলোকে সে পুনরুত্থান পর্যন্ত অবস্থান করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দ ইবনে ওমায়র এক জানাযার সাথে চলার সময় বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— মৃতকে কবরে বসানো হয় এবং সে জানাযায় উপস্থিত লোকদের পায়ের শব্দ শুনে। তখন কবর ছাড়া কেউ তার সাথে কথা বলে না। কবর বলে ঃ হে উজাড়-গৃহ ব্যক্তি, আমার সম্পর্কে কেউ কি তোমাকে সতর্ক করেনি? আমি যে সংকীর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, ভয়াবহ ও কীটে পরিপূর্ণ, একথা কি তোমাকে কেউ বলেনি? অতএব, তুমি আমার জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?

কবরের আযাব ও মুনকির-নকীরের সওয়াল ঃ হযরত বারা' ইবনে আযেব বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে জনৈক আনসারীর জানাযায় গেলাম। তিনি কবরের উপরে মাথা নীচু করে তিনবার বললেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যখন ঈমানদার আখেরাতে উপস্থিতির পর্যায়ে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা এমন ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে দেন, যাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মত উজ্জ্বল। তাদের সাথে ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে সুগন্ধি ও কাফন থাকে। তারা তার দৃষ্টির সামনে বসে। যখন তার রূহ নির্গত হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে যায়। প্রত্যেক দরজা চায়, মুমিনের রূহ তার ভিতর দিয়ে গমন করুক। মুমিনের রূহ যখন উপরে আরোহণ করে, তখন ফেরেশতারা আরয করে— ইলাহী, সে তোমার অমুক বান্দা। আদেশ হয়, তাকে নিয়ে যাও এবং তার সম্মানের জন্য আমি যা কিছু প্রস্তুত করেছি, তা তাকে দেখিয়ে দাও। কারণ, আমি ওয়াদা করেছি—

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى -

অর্থাৎ, এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এ মাটি থেকেই পুনরায় উত্থিত করব।।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এভাবে রূহ কবরে ফিরে আসে এবং সে প্রত্যাগত লোকদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে তাকে প্রশ্ন করা হয়— তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? মুমিন জওয়াব দেয়— আমার রব আল্লাহ। আমার দ্বীন ইসলাম। আমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। এ জওয়াবের পর এক ঘোষক ঘোষণা করে— তুমি সত্য বলেছ। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মযবুত কথা দ্বারা পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে মযবুত রাখেন।

এরপর তার কাছে একজন সুবেশী ও সুগন্ধযুক্ত আগন্তুক এসে বলে— তোমার জন্যে পরওয়ারদেগারের রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ, যাতে চিরস্থায়ী আনন্দ রয়েছে। মুমিন বলে— তোমার জন্যেও কল্যাণের সুসংবাদ হোক, তুমি কে? আগন্তুক বলে— আমি তোমার নেক আমল। আমি তোমার অবস্থা জানি। তুমি আল্লাহ তা'আলার এবাদতে দ্রুত ধাবিত হতে এবং গোনাহের কাজে বিলম্ব করতে। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে— এ মুমিনের জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও এবং এদিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। শয্যা পাতা এবং জান্নাতের দরজা খোলা হলে মুমিন বলে— ইলাহী, কিয়ামত অবিলম্বে কায়েম কর, যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফের যখন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখেরাতের সম্মুখীন হয়, তখন দু'জন রুক্ষ মেযাজের ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের সাথে থাকে আগুনের পোশাক ও গন্ধকের জামা। তারা তার আশে-পাশে অবস্থান নেয়। যখন আত্মা নির্গত হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতা তার প্রতি অভিসম্পাত করে এবং আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেকটি দরজাই তার ভেতর দিয়ে এ আত্মার গমনকে অশুভ মনে করে। তার আত্মা যখন উপরে আরোহণ করে, তখন তাকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়। ফেরেশতারা আরয করে, ইলাহী, তোমার এ বান্দাকে আকাশও কবুল করল না এবং পৃথিবীও না। আল্লাহ বলেন ঃ তাকে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সরিয়ে নিয়ে যাও এবং আযাবের যে সরঞ্জাম আমি তার জন্যে তৈরী করেছি, তা দেখিয়ে দাও। আমি তার কাছে مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ الخ এর ওয়াদা করেছি। এভাবে কবরে আসার পর সে প্রত্যাগতদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে তাকে বলা হয়, তোমার রব কে? নবী কে? দ্বীন কি? সে জওয়াব দেয়— আমি জানি না। এরপর তার কাছে এক কুশ্রী, দুর্গন্ধযুক্ত ও কুবেশী আগন্তুক এসে বলে, তোমাকে আল্লাহর গযব এবং যন্ত্রণাদায়ক ও স্থায়ী আযাবের দুঃসংবাদ। সে বলে— আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গলের সংবাদ দিন, তুমি কে? আগন্তুক বলে— আমি তোমার বদ আমল। তুমি আল্লাহর নাফরমানিতে দ্রুতগামী এবং এবাদতে বিলম্বকারী ছিলে। আল্লাহ তোমাকে কুপ্রতিদান দিন। সে বলে, তোমাকেও কুপ্রতিদান দিন। এরপর তার উপর এক বধির ও বোবাকে নিয়োগ করা হয়, যার কাছে থাকে লোহার গদা। যদি জিন ও মানব সেটাকে তুলতে চায়, তুলতে পারে না। এই গদা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলে পাহাড় মাটি হয়ে যায়। এই বধির ও বোবা কাফেরকে আঘাত করলে সে মাটি হয়ে যায়। পুনর্বার তাতে প্রাণ ফিরে আসে। অতঃপর তার চোখের মাঝখানে এক আঘাত করে। তার চীৎকার জিন ও মানব ছাড়া পৃথিবীবাসী সকলেই শুনে। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে— এই কাফেরের জন্যে দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও এবং একটি দরজা দোযখের দিকে খুলে দাও। সেমতে তার জন্যে দু'টি তক্তা বিছিয়ে দেয়া হয় এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর সময় মৃতের নেক ও বদ আমলসমূহ আকৃতি ধারণ করে তার সামনে আসে। সে নেক আমলগুলোকে দেখে এবং বদ আমলগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন মুমিন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন ফেরেশতা তার কাছে রেশমী বস্ত্রে করে মেশক ও রায়হানের মাটি নিয়ে আসে। অতঃপর তার আত্মা এত সহজে বের করে, যেমন আটার মধ্য থেকে চুল বের করে নেয়া হয়। ফেরেশতা বলে— হে প্রশান্ত নফস, আল্লাহর সম্মান ও সুখের দিকে বের হয়ে এস। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আত্মা বের হওয়ার পর সেটাকে মেশক ও রায়হানের মধ্যে রেখে উপরে রেশমী বস্ত্র জড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর ইল্লিয়্যীন অর্থাৎ, ঊর্ধ্বে বসবাসকারীদের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অপরপক্ষে কাফেরের যখন মৃত্যু আসে, তখন তার কাছে ফেরেশতারা চটের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তার প্রাণ বের করে। বলা হয়— হে অপবিত্র প্রাণ, আল্লাহর আযাব ও লাঞ্ছনার দিকে বের হয়ে আয়। তুই তাঁর প্রতি রুষ্ট এবং তিনি তোর প্রতি ক্রুদ্ধ। এরপর প্রাণ বের হলে সেটাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। তাতে সে ছটফট করতে থাকে। অতঃপর উপর দিয়ে চট জড়িয়ে সিজ্জীন তথা কয়েদখানায় পাঠানো হয়।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— মুমিনের কবরে একটি সবুজ বাগান থাকে। তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণিমার রাতের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল হয়।

তোমরা জান, এ আয়াতের মর্ম কি? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় তার জন্যে সংকীর্ণ জীবন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে কবরে কাফেরের আযাব। তার উপর নিরানব্বইটি "তিন্নীন" ছেড়ে দেয়া হবে। তোমরা জান তিন্নীন কি? এগুলো হচ্ছে— অজগর। এদের প্রত্যেকের সাতটি করে ফণা হবে। এগুলো কাফেরের দেহকে কিয়ামত পর্যন্ত পিষ্ট ও নিষ্পেষিত করতে থাকবে।

হাদীসে উল্লিখিত নিরানব্বই সংখ্যাটি দেখে বিস্মিত না হওয়া উচিত। কারণ, সর্প ও বিচ্ছুর সংখ্যা মন্দ চরিত্র তথা অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদির সংখ্যা অনুসারে হবে। কেননা, এগুলোর মূল গুণাগুণ কয়েকটি মাত্র। অতঃপর এসব মূল থেকে কতিপয় শাখা নির্গত হয়েছে এবং শাখাসমূহও কয়েক প্রকারে বিভক্ত হয়েছে। নিজের সত্তার দিক দিয়ে সব প্রকারই মারাত্মক। এগুলোই স্বয়ং সাপ ও বিচ্ছুতে পরিণত হবে। তবে যে স্বভাবটি যবরদস্ত হবে, সেটি অজগরের ন্যায় দংশন করবে এবং যে স্বভাবটি দুর্বল হবে, সেটি বিচ্ছুর ন্যায় হুল মারবে। আর মাঝারি স্বভাবটি সাপের ন্যায় যন্ত্রণা দেবে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বুযুর্গগণ এসব মন্দ স্বভাবের ধ্বংসকারিতা ও এদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্তিকে নূরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেন। তবে এদের সংখ্যা নবুওয়তের নূর ছাড়া অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না।

মোটকথা, এ ধরনের হাদীসের বাহ্যিক অর্থ সঠিক এবং এতে অনেক রহস্য লুক্কায়িত, যা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের কাছে সুস্পষ্ট। সুতরাং কারও কাছে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

এগুলোর স্বরূপ উদঘাটিত না হলে বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা মোটেই উচিত নয়। বরং বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াই কর্তব্য।

প্রশ্ন হয়, এটা অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। কেননা, আমরা কাফেরকে কবরে দীর্ঘ দিন দেখি; কিন্তু এসব সাপ-বিচ্ছু কখনও দেখা যায় না। সুতরাং অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বিশ্বাস স্থাপন করা কিরূপে সম্ভব? জওয়াব এই যে, এধরনের বিষয়কে তিন ভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়।

প্রথমত, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং মৃত কাফেরকে দংশন করে। কিন্তু এ কারণে আমরা তা জানি না যে, এগুলো দেখার যোগ্যতা আমাদের চর্মচক্ষে নেই। আখেরাত সম্পর্কিত এসব ব্যাপার বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সাহাবায়ে কেরাম হযরত জিবরাঈলের অবতরণে বিশ্বাস করতেন। অথচ তাঁকে দেখতেন না। তারা একথাও বিশ্বাস করতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে দেখেন। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে প্রথমে ফেরেশতা ও ওহীর প্রতি বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা অপরিহার্য। নবী এক বিষয় দেখতে পারেন, যা তাঁর উম্মত দেখতে পারে না— এটা বিশ্বাস্য ও সম্ভবপর হলে মৃতের বেলায় কেন সম্ভবপর হবে না? ফেরেশতা যেমন দুনিয়ার মানুষের অনুরূপ নয়, তেমনি কবরের সাপ-বিচ্ছুও দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর মত নয়। তাদের প্রজাতি ভিন্ন এবং যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাদেরকে জানা যায়, তাও ভিন্ন।

দ্বিতীয়ত, তুমি নিদ্রিত ব্যক্তির অবস্থা দেখ। সে কখনও স্বপ্নে দেখে, তাকে বিচ্ছু ও সাপ দংশন করছে। এতে তার ব্যথাও এমন হয় যাতে মাঝে মাঝে নিদ্রার মধ্যেই সে চীৎকার করে উঠে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায় এবং কখনও নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে। নিদ্রিত ব্যক্তি এসব জানতে পারে এবং ব্যথা তেমনি পায়, যেমন জাগ্রত ব্যক্তি পায়। অথচ মনে হয় না, সে নড়াচড়া করছে এবং তার আশেপাশে কোন সাপ-বিচ্ছুও দেখা যায় না। কিন্তু তার বেলায় সাপও থাকে এবং কষ্টও। অবশ্য সেটা তোমার প্রত্যক্ষণের বাইরে। অতএব, যে ক্ষেত্রে দংশনের কষ্ট অর্জিত, সেখানে সাপের কাল্পনিকতা অথবা চোখে দেখা উভয়টিই সমান।

তৃতীয়ত, তুমি জান, সাপ নিজে কষ্ট দেয় না বরং কষ্ট এর বিষের মাধ্যমে হয়। এরপর বিষও ব্যথা নয়; বরং তোমার মধ্যে বিষের যে প্রভাব হয়, কষ্ট তা থেকেই অনুভূত হয়। সুতরাং যদি বিষ ছাড়াই এমনি প্রভাব দেহের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে কষ্ট প্রচুর হবে। কিন্তু এই কষ্ট এছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যক্ত করা যায় না যে, যে কারণে এরূপ কষ্ট হওয়ার নিয়ম প্রচলিত, সেই কারণের প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করে দেয়া। উদাহরণতঃ যদি

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মানুষের মধ্যে বাহ্যত কোন নারীর সাথে সহবাস ছাড়াই সহবাসের আনন্দ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এই আনন্দকে কিভাবে ব্যক্ত করবে? একথাই বলবে যে, এটা সহবাসের আনন্দ। এই সম্বন্ধের মাধ্যমে কারণ শনাক্ত হয়ে যাবে এবং তার ফল জানা হয়ে যাবে, যদিও দৃশ্যত কারণ উপস্থিত নয়। ফলাফলের জন্যেই তো কারণ তালাশ করা হয়। কারণের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হয় না। মৃত্যুর সময় মানুষের বদ-স্বভাবসমূহ কষ্টদায়ক হয়ে যায় এবং সে কষ্ট সাপ ও বিচ্ছুর কষ্টের অনুরূপ হয়। সাপ ও বিচ্ছু সেখানে থাকে না। বদ-স্বভাবের কষ্টদায়ক হয়ে যাওয়া এমন, যেমন মাশুকের মৃত্যুর পর ইশক আশেকের জন্যে কষ্টদায়ক হয়ে যায়। অর্থাৎ, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, পূর্বে যা ছিল আনন্দদায়ক, তা এখন কষ্টদায়ক হয়ে যায়। ফলে, মনের উপর এমন আযাব হতে থাকে, যাতে আশেক কামনা করতে থাকে যে, এই ইশক ও মিলন না হলেই ভাল হত! মৃতের আযাবের অবস্থাও হুবহু তেমনি। দুনিয়াতে সে মোহগ্রস্ত হয়ে ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের সাথে ইশক করতে থাকে! যদি জীবদ্দশায় এগুলো কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায় এবং ফেরত পাওয়ার আশা না থাকে, তবে দেখা যায়, তার কি শোচনীয় অবস্থা হয়! সে বাসনা করতে থাকে, এগুলো আমার হাতে কোনদিন না এলেই ভাল হত। আজ এহেন দুর্দিনের মুখ দেখতে হত না এবং হারানোর ব্যথা সইতে হত না। মৃত্যুতেও তাই হয়। অর্থাৎ, যাবতীয় পার্থিব প্রিয়বস্তু একযোগে হাতছাড়া হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? জওয়াব এই যে, কতক লোক প্রথম উপায়ের প্রবক্তা। তাদের মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় স্বীকার্য নয়। কেউ কেউ প্রথমটি অস্বীকার করে ও দ্বিতীয়টি মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ শুধু তৃতীয়টি স্বীকার করে। বাস্তব সত্য এই যে, তিনটি উপায়ই সম্ভব। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা তাই জানতে সক্ষম হয়েছি। মনোবলের সংকীর্ণতার কারণেই কেউ কেউ কতক উপায়কে অস্বীকার করে। তারা আল্লাহ তা'আলার যে সকল ক্রিয়াকর্মের সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত নয়, সেগুলোকেই অস্বীকার করে বসে। বান্দাকে আযাব দেয়ার এই উপায়ত্রয়কেই সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে একভাবে এবং কোন বান্দাকে অন্যভাবে আযাব দেন। কতক বান্দা এমনও থাকে, যাদেরকে তিন প্রকারেই আযাব দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কম ও বেশী আযাব থেকে নিজের আশ্রয়ে রাখুন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— মৃত্যুর পর মানুষের কাছে দু'জন কৃষ্ণবর্ণ, নীল চক্ষুবিশিষ্ট ফেরেশতা আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নকীর। তারা মৃতকে জিজ্ঞেস করে, নবী সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য ছিল? মৃত ঈমানদার হলে জওয়াব দেয়, আমি তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বলতাম। উভয় ফেরেশতা বলে— আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম, তুমি একথা বলবে। এরপর তার কবর সত্তর গজ দৈর্ঘ ও সত্তর গজ প্রস্থ করে দেয়া হয়। কবরকে আলোকোজ্জ্বল করা হয় এবং মৃতকে বলা হয়— ঘুমিয়ে পড়। সে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজের পরিজনের মধ্যে গিয়ে তাদেরকে অবস্থা বলে আসি। তাকে বলা হয়— তুমি ঘুমিয়ে পড়। সেমতে সে নববধূর মত ঘুমিয়ে পড়ে, যাকে তার সর্বাধিক প্রিয়জনই জাগ্রত করে। এই মুমিনকেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাই জাগ্রত করবেন।

পক্ষান্তরে যদি মৃত মুনাফিক হয়, তবে জওয়াবে বলে— আমি জানি না। মানুষকে যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। উভয় ফেরেশতা বলে ঃ আমরা পূর্ব থেকেই জানতাম তুমি একথা বলবে। এরপর মাটিকে আদেশ করা হয়, এর উপর মিলিত হয়ে যা। ফলে, মাটি তাকে এমনভাবে পিষ্ট করে দেয় যে, পাঁজরের হাড় এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। অতঃপর সর্বদা তাকে এমনিভাবে আযাব দেয়া হয়, যে পর্যন্ত পুনরুত্থান না হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন ঃ হে ওমর, তোমার কি দশা হবে যখন তুমি মরে যাবে! তোমার লোকজন তোমাকে নিয়ে যাবে এবং তোমার জন্যে দৈর্ঘে তিন হাত ও প্রস্থে দেড় হাত একটি গর্ত তৈরী করবে। তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে এবং সুগন্ধি লাগিয়ে কাঁধে তুলে নেবে। এরপর সেই গর্তে রেখে তোমার উপর মাটি ফেলে দেবে এবং দাফন করবে। তারা যখন তোমার কাছ থেকে ফিরে যাবে, তখন তোমার কাছে কবরে মুনকির, নকীর নামের দু'জন ফেরেশতা আসবে। তাদের আওয়াজ হবে বজ্রের মত কর্কশ, চক্ষু হবে বিদ্যুতের মত ঝলমলে, চুল হেঁচড়িয়ে যাবে এবং কবরকে দাঁত দিয়ে আঁচড়ে তারা তোমাকে নাড়া দেবে। তখন হে ওমর, তোমার কি অবস্থা হবে! হযরত ওমর আরয করলেন ঃ আমার জ্ঞান-বুদ্ধিও তখন বহাল থাকবে কি, যেমন এখন আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। হযরত ওমর বললেন ঃ তাহলে কোন চিন্তা করবেন না, তাদের জন্যে আমি যথেষ্ট হব।

এ হাদীসটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, মৃত্যুর পর জ্ঞান-বুদ্ধি বদলে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

যায় না, কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলে যায়। মৃতব্যক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন ও সুখ-দুঃখ অনুভবকারী থেকে যায়; যেমন জীবদ্দশায় ছিল। মৃতের এই অংশে মৃত্যু ও অস্তিত্বহীনতা আসে না।

শিঙ্গার ফুঁক ঃ শিঙ্গার ফুঁক সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ -

অর্থাৎ— সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে, সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তবে যাদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করতে চাইবেন, তারা নয়। অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ كَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ -

অর্থাৎ— যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন। কাফেরদের জন্যে এটা কঠিন।

يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ - فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ -

অর্থাৎ, তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

কখন পূর্ণ হবে? তারা তো অপেক্ষা করছে এক মহাচীৎকারের, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে যখন তারা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে। ফলে তারা ওসিয়ত করতে পারবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে মানুষ কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগাল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এর ওয়াদাই দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

অতএব, যদি মৃতদের সামনে এই চীৎকারের আতংক ছাড়া অন্য কোন আতংক না থাকত, তবু একে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা, এটি এমন এক ভয়ংকর চীৎকার হবে, যাতে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবাই প্রাণত্যাগ করবে। কেবল আল্লাহ্ যাদেরকে বাঁচাতে চাইবেন, তারা বাঁচবে। বলা বাহুল্য, তারা হবে কয়েকজন ফেরেশতা। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

وكيف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة واصغى بالاذن ينظر متى يومر بنفخ -

অর্থাৎ— আমি কিরূপে স্বস্তি পেতে পারি এমতাবস্থায় যে, শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মুখে রেখে দিয়েছে এবং মাথা নত করে কান পেতে রেখেছে, কখন ফুঁক দেয়ার আদেশ হয়ে যাবে।

হযরত মুকাতিল বলেন ঃ হযরত ইসরাফীল (আঃ) তূরীর আকৃতি বিশিষ্ট একটি শিঙ্গায় মুখ লাগিয়ে রেখেছেন। এই শিঙ্গার মুখের বৃত্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান। হযরত ইসরাফীল নিজের দৃষ্টি আরশের দিকে তুলে অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়ার আদেশ হবে? প্রথমবার যখন তিনি ফুঁক দেবেন, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ভয়ের আতিশয্যে প্রাণত্যাগ করবে। কেবল চারজন ফেরেশতা বেঁচে থাকবেন। তাঁরা হলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আঃ) এরপর আযরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হবে, প্রথমে জিবরাঈলের জান কবয করার জন্যে। এরপর মীকাঈলের, এরপর ইসরাফীলের জান কবয করা হবে। এরপর আযরাঈলকে নিজেই মরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি বরযখ জগতে থাকবে। অতঃপর

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীলকে জীবিত করে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

অর্থাৎ— অতঃপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া হবে। হঠাৎ তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

অর্থাৎ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে জীবিত হওয়াকে পর্যবেক্ষণ করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— আমাকে যখন আল্লাহ তা'আলা নবীরূপে পাঠান, তখন শিঙ্গাওয়ালা ইসরাফীলকে বলে পাঠান। তিনি শিঙ্গাকে মুখে লাগিয়ে নেন এবং এক পা পিছনে ও এক পা সামনে রেখে ফুঁক দেয়া নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। অতএব, তোমরা ফুঁককে ভয় কর।

সুতরাং সে অবস্থায় মানুষের দুর্গতি, লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের চিত্রটি মনে মনে কল্পনা কর এবং সৌভাগ্যসূচক নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করার কথা চিন্তা কর। এরপর নিজেকেও তাদের মধ্যে ধরে নাও। সবার যেমন দুরবস্থা হবে, তোমারও তেমনি হবে। তারা যেমন বিস্ময়াবিষ্ট থাকবে, তেমনি তুমিও থাকবে। বরং দুনিয়াতে যারা আমীর, বিত্তবান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ও রাজা-বাদশাহ ছিল, তারা সেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাতারে লাঞ্ছিত, নীচ, হেয় ও পদদলিত ধূলিকণার অনুরূপ হবে। সেদিন বন্য জন্তুরা বন ও পাহাড় থেকে এসে পলায়নের স্বভাব ভুলে গিয়ে মানুষের সাথে মিলেমিশে যাবে। তাদের কোন গোনাহ না থাকলেও সেদিনের উত্থান, ভীষণ নাদ ও শিঙ্গার ফুঁকের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা লম্ফ-ঝম্প বিস্মৃত হয়ে মানুষের সাথে মিলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ

অর্থাৎ, যখন বন্য প্রাণীদের একত্র সমাবেশ হবে।

এরপর অবাধ্য শয়তানরা আসবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থাপিত হওয়ার ভয়ে মাথা নীচু করে থাকবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ— সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি তাদেরকে শয়তানদের সহ একত্রে সমবেত করবই। অতঃপর নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করবই।

অতএব, এখানে নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর, কি হবে!

হাশরের ময়দান ঃ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর মানুষকে নগ্নপদে নগ্নদেহে খতনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে হাঁকানো হবে। সেটি হবে এক নরম, সমতল ও সাদা রঙের ময়দান, যাতে আত্মগোপন করার মত কোন উঁচু টিলা ও নীচু গর্ত থাকবে না। সেদিকে মানুষকে দলে দলে পৌঁছানো হবে। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া সত্ত্বেও ভূ-পৃষ্ঠের চারদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে এক জায়গায় সমবেত করবেন। সে সময় অন্তরসমূহ ধড়ফড় করতে থাকবে এবং চোখসমূহ নত থাকবে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর একটি সাদামাঠা ময়দানে হবে। তাতে কোন প্রকার দালান, কোঠা থাকবে না— যাতে মানুষ আত্মগোপন করতে পারে।

হাশরের যমীন দুনিয়ার যমীনের মত হবে না। দুনিয়ার যমীনের সাথে এটা কেবল নামেই অভিন্ন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

অর্থাৎ— যেদিন এ যমীন অন্য যমীনে পরিবর্তিত হবে এবং আকাশও পরিবর্তিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যমীনে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে। এর বৃক্ষ, পর্বতমালা, বন-জঙ্গল ও অন্যান্য সবকিছু লোপ পাবে এবং ওকাযের চামড়ার মত ছড়ানো হবে। যমীন রৌপ্যের মত সাদা হবে, যার উপর কোন রক্তপাত ও গোনাহ হয়ে থাকবে না। নভোমণ্ডলের চাঁদ, সূর্য ও তারকা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যখন সে ময়দানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হয়ে যাবে, তখন উপর থেকে তারকারাজি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, সূর্য কিরণবিহীন এবং চন্দ্র আলোবিহীন হয়ে যাবে। ভূ-পৃষ্ঠ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। ঠিক এ অবস্থায় হঠাৎ মাথার উপর থেকে আকাশ ঘুরতে ঘুরতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফেরেশতারা এর চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। আকাশ হবে ধুনিত তুলার মত এবং মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ নগ্নপদে, নগ্নদেহে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা (রাঃ) — যিনি এই হাদীস রেওয়ায়েত করেন— বলেন ঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা একে অপরকে উলঙ্গ দেখব, এটা তো বড় সর্বনাশের কথা! তিনি বললেন ঃ সেদিন মানুষ অন্য চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। কারও দেখার ফুরসতই থাকবে না। এতেই অনুমান করা যায়, সেদিনটি কেমন ভয়ংকর হবে! কেন হবে না? কতক মানুষ তো পেটের উপর এবং কেউ মাথার উপর ভর দিয়ে চলবে। ফলে অপরের দিকে তাকানোর সাধ্য কোত্থেকে হবে?

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তিন ভাবে উঠানো হবে। এক, সওয়ার হয়ে। দুই, পায়ে হেঁটে এবং তিন মাথার উপর ভর দিয়ে। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, মাথার উপর ভর দিয়ে মানুষ কেমন করে চলবে? তিনি বললেন ঃ যিনি তাদেরকে পায়ের উপর ভর দিয়ে চালিয়েছেন, তিনি মাথার উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম।

মানুষ যে বিষয়ের সাথে পরিচিত নয়, তাকে অস্বীকার করা মানুষের স্বভাব। উদাহরণতঃ যদি মানুষ সাপকে পেটের উপর ভর দিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে না দেখে, তবে বলবে, পা ব্যতীত চলা সম্ভব নয়। আর যে কাউকে পায়ে চলতে না দেখে, সে পায়ে চলাকেও সুকঠিন মনে করবে। এই দৃষ্টিতে মানুষের উচিত, কিয়ামতের কোন আশ্চর্য বিষয় যদি তার নজরে না পড়ে, এরপর হঠাৎ দেখতে পায়, তবে সে তাকেও অস্বীকার করতে থাকে। অথচ সেটা একটা বাস্তব বিষয়।

এরপর হাশরের ময়দানে কি পরিমাণ ভিড় হবে, তাও লক্ষণীয়! সেখানে সুপ্ত আকাশ, সুপ্ত যমীনের বাশিন্দা অর্থাৎ, ফেরেশতা, জিন, মানব, শয়তান, বন্য জন্তু, হিংস্র প্রাণী ও পশুপক্ষী একত্র সমবেত হবে। অতঃপর তাদের মাথার উপর সূর্য অত্যন্ত তেজ সহকারে তাপ বিকিরণ করতে থাকবে। দুনিয়াতে সূর্যের যে প্রখরতা, তা বদলে যাবে এবং জনতার মাথা থেকে মাত্র দু'ধনুক দূরে অবস্থান করবে। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং নৈকট্যশীলগণ ছাড়া অন্য কেউ এই ছায়ায় স্থান পাবে না। তখন কিছু লোক আরশের ছায়াতলে থাকবে এবং কিছু লোক প্রখর রৌদ্রতাপে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকবে। ভিড়ের ধাক্কায় একজনের কাঁধ অন্যজনের কাঁধের সাথে মিলিত থাকবে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার সামনে যাওয়ার ভয় ও লজ্জা সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ফলে, তাদেরকে এক সাথে কয়েক প্রকারের উত্তাপ সইতে হবে। যেমন.

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সূর্যের উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ, লজ্জা ও ভয় থেকে উদ্ভূত অন্তর্জ্বালা ইত্যাদি। এ সকল তাপ ও জ্বালার ফলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম বেরুতে থাকবে এবং ময়দানে প্রবাহিত হতে থাকবে। এরপর মানুষের শরীরের দিকে উত্থিত হতে শুরু করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে যার যতটুকু মর্তবা হবে, সে অনুপাতে তার ঘাম উপরে উঠবে। সেমতে কারও ঘাম উরু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কারও কান পর্যন্ত এবং কারও মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত হবে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে একথা পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। তীব্র ব্যাকুলতার কারণে ঘাম তাদের মুখের লাগাম হয়ে যাবে।

অতএব, হে মিসকীন, হাশরবাসীদের ঘাম এবং দুঃখ-দুর্দশা চিন্তা কর। এই কষ্টে পড়ে কেউ কেউ আরয করবে, এলাহী, আমাদেরকে এহেন বেদনা ও অপেক্ষার কষ্ট থেকে মুক্তি দাও যদিও আমরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হই। এই হবে হিসাব-নিকাশ ও আযাবের পূর্ববর্তী কষ্ট। তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে। জেনে রাখ, যদি দুনিয়াতে কারও ঘাম আল্লাহর পথে অর্থাৎ হজ্জ, জেহাদ, রোযা, নামায ও কোন মুসলমানের কল্যাণ সাধনে বের না হয়ে থাকে, তবে তার ঘাম সেদিন ভয় ও লজ্জার কারণে কিয়ামতের ময়দানে বের হবে এবং তার কষ্ট অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মূর্খতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হলে মানুষ নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে কষ্ট স্বীকার করা ও ঘাম বের হওয়া সহজ ও স্বল্পস্থায়ী বিষয়। পক্ষান্তরে হাশরের ময়দানে ঘাম বের হওয়া অত্যধিক কষ্টকর ও দীর্ঘস্থায়ী। কেননা, সে দিনটিই এমন যে, এতে মেয়াদ ও তীব্রতা উভয়টিই অধিক।

কিয়ামত দিবসের দীর্ঘতা ঃ কিয়ামত দিবসে মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের মন হবে ত্যক্ত-বিরক্ত। কেউ তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। তিনশ' বছর ধরে তারা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। না কোন লোকমা খাবে, না পানির কোন ঢোক গিলবে। বাতাসের কোন ঝাঁপটাও তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে না। হযরত কা'ব ও কাতাদাহ নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ— সেদিন মানুষ বিশ্ব-পালকের পথ পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

মানুষ তিনশ' বছর পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকবে। বরং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক জায়গায় এমনভাবে জমায়েত করবেন, যেমন তূণের মধ্যে তীরসমূহকে খচ্‌খচ্‌ করে ভরে দেয়া হয়। তিনি পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত তোমাদের প্রতি দৃকপাত করবেন না।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ তুমি সেদিনকে কি মনে কর, যেদিন মানুষ পায়ের উপর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মেয়াদ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। এ সময়ে তারা কোন লোকমা খাবে না এবং এক চুমুক পানিও পান করবে না। অবশেষে পিপাসার আতিশয্যে.যখন তাদের ঘাড় আলাদা হয়ে যাবে, তখন দোযখে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে গরম পানির ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। অসহ্য কষ্টের সম্মুখীন হয়ে তারা একে অপরকে বলবে, চল, আল্লাহ তা'আলার কাছে যার ইযযত ও সম্মান রয়েছে, তাঁকে খুঁজে বের করি, যাতে সে আমাদের জন্যে শাফায়াত করে। অতঃপর তারা যে পয়গম্বরেরই দ্বারস্থ হবে, তিনিই তাদেরকে "নফসী, নফসী" বলে সরিয়ে দেবেন এবং বলবেন, আজ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এত বেশী, যা আর কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অবশেষে আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) যার জন্যে আদেশ পাবেন, তার জন্যে শাফায়াত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا

অর্থাৎ— যার জন্যে আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা পছন্দ করবেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও জন্যে শাফায়াত উপকারী হবে না।

এখন সে দিনের দৈর্ঘ চিন্তা কর। হাদীস শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, সেদিনটি মুমিনের জন্যে ততটুকু হালকা ও সামান্য হবে, যতটুকু সময়ের মধ্যে সে দুনিয়াতে একটি ফরয নামায আদায় করত; বরং এর চেয়েও সহজতর মনে হবে। অতএব তুমি চেষ্টা কর, যাতে এই ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কারণ, যে পর্যন্ত তোমার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অবশিষ্ট আছে, সে পর্যন্ত ব্যাপারটি তোমার এখতিয়ারাধীন।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সওয়াল প্রসঙ্গ ঃ হে মিসকীন, এসব অবস্থার পর তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে যে সওয়াল করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা কর। তুমি যখন কিয়ামতের সংকটময় অবস্থায় থাকবে, তখন হঠাৎ আকাশের প্রান্ত থেকে বিরাটকায়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা উত্থিত হবে। তাকে নির্দেশ দেয়া হবে— পাপীদের মাথার চুল ধরে সর্বশক্তিমানের সামনে পেশ হওয়ার স্থানে নিয়ে এস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে একজন ফেরেশতা রয়েছে। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী ব্যবধান মুসাফিরের এক বছর পর্যন্ত চলার পথের সমান। তখন কেউ কেউ ভয়ের আতিশয্যে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করে বসবে— পালনকর্তা তোমাদের ভেতরেই রয়েছেন কি? ফেরেশতারা সজোরে বলবে, আমাদের রব পবিত্র এবং তিনি আমাদের মধ্যে নন। তবে তিনি পরে আসবেন। এরপর ফেরেশতারা মানুষদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি বাস্তবরূপ লাভ করবে—

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ -

অর্থাৎ— আমি অবশ্যই তাদেরকে সওয়াল করব, যাদের প্রতি রসূল প্রেরিত হয়েছে এবং রসূলগণকেও অবশ্য সওয়াল করব, অতঃপর তাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

সওয়ালের শুরু হবে পয়গম্বরগণ থেকে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -

অর্থাৎ— যেদিন আল্লাহ পয়গম্বরগণকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি জওয়াব পেয়েছ? তাঁরা বলবে ঃ আমরা জানি না। তুমিই অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

অনুমান কর, সেদিনটি কেমন কঠিন হবে, যেদিন পয়গম্বরগণও হতভম্ব হয়ে যাবেন। এ প্রশ্নটির জওয়াব তাঁদের জানা ছিল, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কি বললেন, তা জানা থাকবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি রেসালত পৌঁছিয়েছ কি? তিনি আরয করবেন, হাঁ। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে কেউ পয়গাম পৌঁছিয়েছে কি? তারা আরয করবে— আমাদের কাছে তো কোন সতর্ককারী আসেনি!

হযরত ঈসা (আঃ)-কে ডেকে সওয়াল করা হবে, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, আমাকে ও আমার জননীকে দু'খোদা মেনে নাও? এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বছরের পর বছর পর্যন্ত অস্থির থাকবেন। অতঃপর ফেরেশতারা এসে এক এক ব্যক্তিকে ডেকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি, হে অমুক মহিলার পুত্র, পেশ হওয়ার জন্যে যথাস্থানে উপস্থিত হও। এই আওয়াজে মানুষ প্রকম্পিত হবে এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হবে। কেউ কেউ বাসনা প্রকাশ করবে, তাদের কুকর্ম হিসাবের জন্যে পেশ না করে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেই ভাল হাত। সওয়ালের পূর্বে আরশের নূর প্রকাশিত হবে এবং হাশরের ময়দান উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেক মানুষ মনে করতে থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা বুঝি সওয়ালের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাকে ছাড়া কেউ আল্লাহকে দেখছে না এবং সওয়াল বুঝি কেবল তাকেই করা হবে— অন্য কাউকে নয়। এরপর জিবরাঈলকে বলা হবে— দোযখ আমার কাছে নিয়ে এস। জিবরাঈল দোযখের কাছে এসে বলবেন— মালিকের আদেশ পালন কর। দোযখ একথা শুনেই ক্রোধে জ্বলে উঠবে এবং উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে চীৎকার করবে। মানুষ তার তর্জন-গর্জন শুনে ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দোযখের রক্ষীরা নাফরমান বান্দাদের দিকে এগিয়ে আসবে। চিন্তা কর, তখন মানুষের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে! ভয়-ভীতিতে তাদের মন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। যালেম ও নাফরমানদের মধ্যে হায় হায় রব উঠবে এবং সিদ্দীকগণ "নফসী, নফসী" বলতে থাকবেন। ইত্যবসরে দোযখ দ্বিতীয় চীৎকার দিবে। তখন ভয় ও আতংক দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শক্তি শিথিল হয়ে যাবে। তারা জেনে নিবে তারা গ্রেফতার হবে। অতঃপর তৃতীয় চীৎকারের সাথে সাথে মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। দুঃখে যালেমদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে উদ্দেশ করে সওয়াল করবেন— তোমরা কি জওয়াব পেয়েছিলে? পয়গম্বরগণের এই শাসন দেখে গোনাহগারদের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং পিতা-পুত্রের কাছ থেকে, ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। অতঃপর প্রত্যেককে ধরে এনে আল্লাহ্ তা'আলার

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সামনে পেশ করা হবে। তিনি কম-বেশী, প্রকাশ্য ও গোপন আমল সম্পর্কে সওয়াল করবেন এবং হাত-পা ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞেস করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন— কিয়ামতের দিন কি আমরা পরওয়ারদেগারকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ দুপুরের মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি মতবিরোধ কর? সবাই বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার চাঁদ মেঘমুক্ত আকাশে দেখার ব্যাপারে সন্দেহ কর কি? সবাই আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারেও তোমরা কোন সন্দেহ ও দ্বিধা করবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন ঃ আমি কি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি? তোমাকে সরদার করিনি? তোমাকে স্ত্রী দেইনি? ঘোড়া ও উটকে তোমার অনুগত করিনি? বান্দা বলবে ঃ জী হাঁ, এ সকল নেয়ামত তুমি দিয়েছিলে। আল্লাহ্ এবার বলবেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাত হবে এ ধারণা তোমার ছিল না? বান্দা বলবে— না। আল্লাহ্ বলবেন— আচ্ছা, তাহলে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি।

দাঁড়িপাল্লা ঃ এরপর দাঁড়িপাল্লার চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। সওয়ালের পর মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, যাদের কোন নেকী থাকবে না, তাদের জন্যে একটি কাল ঘাড় দোযখ থেকে বের হবে। পাখী যেমন মাটি থেকে দানা চয়ন করে, তেমনি সে ঘাড়টি তাদেরকে তুলে দোযখে ফেলে দেবে এবং দোযখ তাদেরকে গিলে ফেলবে। দুই, যাদের কাছে কোন বদী থাকবে না। তাদের জন্যে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করত, তারা দণ্ডায়মান হোক। এই ঘোষণা শুনে তাঁরা দণ্ডায়মান হবে এবং জান্নাতে চলে যাবে। এরপর যারা তাহাজ্জুদ পড়ত, তাদের সাথেও এমনি আচরণ করা হবে। এরপর তাদের সাথেও করা হবে, যাদেরকে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর যিকর থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। তৃতীয় দল এমন লোকদের, যারা নেক আমলের সাথে বদ আমলও মিশ্রিত করেছে। বদ আমল তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন থাকবে না। তাদের নেক আমল বেশী কি বদ আমল বেশী, তা আল্লাহ্ তা'আলার খুব ভালই জানা থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও পরিস্থিতি জানিয়ে দিতে চাইবেন, যাতে ক্ষমা করার সময় তাঁর অনুগ্রহ এবং শাস্তি দেওয়ার সময় তাঁর ন্যায়বিচার ফুটে উঠে। নেক আমল ও বদ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমল সম্বলিত আমলনামাসমূহ উড়ানো হবে এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তখন মানুষের চোখগুলো আমলনামার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। নেকীর পাল্লা ঝুঁকে পড়ে কি বদীর পাল্লা। এটা হবে অত্যন্ত ভয় ও আশংকার মুহূর্ত। ফলে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি উড়ে যাবে।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে হযরত আয়েশা আখেরাত স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। ফলে, তাঁর গরম অশ্রু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গণ্ডদেশে পতিত হলে তিনি জেগে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আয়েশা, কাঁদছ কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আখেরাত স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাঁ। কিন্তু তিন জায়গায় মানুষ কেবল নিজেকেই স্মরণ করবে। প্রথম, যখন দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হবে এবং আমলসমূহ ওজন করা হবে। দাঁড়িপাল্লা হালকা হল কি ভারী হল— তা দেখে নেয়া পর্যন্ত এই আত্মমগ্নতা অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়, যখন আমলনামাসমূহ উড়িয়ে দেয়া হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে কি বাম হাতে আসে, সে অপেক্ষায় মানুষ নিজেকে ছাড়া সবকিছু ভুলে যাবে। তৃতীয়, পুলসিরাতে থাকাকালে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা মানুষকে মানদণ্ডের উভয় পাল্লার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা সজোরে ঘোষণা করবে, অমুক ভাগ্যবান হয়েছে। সে আর কখনও হতভাগ্য হবে না। এ ঘোষণার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টি শুনতে পাবে। আর যদি পাল্লা হালকা হয়, তবে ফেরেশতা সবাইকে শুনিয়ে ঘোষণা করবে। অমুক এমন হতভাগা হয়েছে যে, আর কোনদিন ভাগ্যবান হবে না। নেকীর পাল্লা হালকা হলে দোযখের ফেরেশতা লোহার গদা হাতে নিয়ে আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আসবে এবং যারা দোযখের ভাগে পড়বে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে ডেকে বলবেন ঃ হে আদম, দাঁড়াও এবং যারা দোযখে যাওয়ার, তাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দাও। তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ তাদের সংখ্যা কত হবে? আল্লাহ বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে খুবই চিন্তিত হলেন এবং কখনও মুখে হাসি ফুটালেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এই সদা বিমর্ষ অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা আমল কর এবং প্রফুল্ল থাক। কারণ, সেই

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমাদের সাথে দু'টি সম্প্রদায় থাকবে, যাদেরকে মানুষের বিপরীতে দাঁড় করালে তাদের সংখ্যা বেশীই থাকে। এছাড়া আদমের যে সব সন্তান ও শয়তানের যত আওলাদ মারা গেছে, তারাও এই হাজারের মধ্যে রয়েছে। তাদের সংখ্যাও অনেক বেশী। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ সে দুটি সম্প্রদায় কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। রাবী বলেন ঃ একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আশান্বিত ও আনন্দিত হলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমল কর এবং প্রফুল্ল থাক। কসম সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমরা কিয়ামতে এমন হবে, যেমন উটের পাঁজরে কাল দাগ অথবা ঘোড়ার চোখে ঘর্ষণের দাগ।

পারস্পরিক হক দেয়ানোর কথা ঃ দাঁড়িপাল্লার আতংক জানার পর এখন উচিত যে, এই আতংক ও আশংকা থেকে সে ব্যক্তি মুক্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে এবং শরীয়তের দাঁড়িপাল্লায় নিজের আমল ও কথাবার্তা ওজন করবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমার হিসাব নেয়ার পূর্বে তুমি তোমার নিজের হিসাব নাও। নিজের হিসাব নেয়ার অর্থ মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক গোনাহ থেকে খাঁটি তওবা করা, অপরের হক কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেয়া এবং মুখে অথবা হাতে কারও মানহানি করে থাকলে অথবা অন্তর দ্বারা কারও প্রতি কুধারণা করে থাকলে তা মাফ করিয়ে নেয়া। মুমিনের এমনভাবে মৃত্যুবরণ করা উচিত যাতে কারও কোন হক অথবা কর্তব্য তার যিম্মায় অবশিষ্ট না থাকে। এরূপ মুমিন হিসাব ব্যতিরেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি কেউ হক আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামতের দিন হকদাররা এসে তাকে ঘিরে ফেলবে। কেউ হাত ধরবে, কেউ মাথার চুল এবং কেউ জামার কলার চেপে ধরে বলবে— তুমি আমার উপর যুলুম করেছ, তুমি আমাকে গালি দিয়েছ, তুমি আমার সাথে উপহাস করেছ, তুমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমাকে ঠকিয়েছ, তুমি প্রতিবেশী হয়েও আমাকে কষ্ট দিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি। হকদারদের প্রচুণ্ড ভিড় দেখে সে হয়রান-পেরেশান হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে এই আশায় মাথা তুলে তাকিয়ে থাকবে যে, তিনিই তাদের কবল থেকে তাকে মুক্তি দেবেন। এমনি অবস্থায় তার কানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে—

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ -

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অর্থাৎ— আজকের দিনে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ কোন যুলুম হবে না।

এরপর তার সারা জীবনের পরিশ্রম-লব্ধ নেক আমলসমূহ কেড়ে নিয়ে হকদারদের হকের বিনিময়ে প্রদান করা হবে। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমাদের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতে অনেক নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কারও প্রতি মিথ্যার অপবাদ আরোপ করে থাকবে, কারও ধন-সম্পদ আত্মসাত করে থাকবে, কাউকে খুন করে থাকবে এবং কাউকে প্রহার করে থাকবে। ফলে, তার নেকীসমূহ এসব হকদারকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার সমস্ত নেকী দেয়ার পরও হক অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে হকদারদের পাপসমূহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

অর্থাৎ— পৃথিবীতে সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী তোমাদের মতই উম্মত।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল সৃষ্টিই পুনরুত্থিত হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার এমন হবে যে, তিনি শিংবিহীন জন্তুর হক শিংবিশিষ্ট জন্তুর কাছ থেকে নেবেন। অতঃপর বলবেন— মাটি হয়ে যাও। তখন কাফের আশংকা করবে, হায়, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম!

অতএব , হে মিসকীন, তোমার কি দশা হবে, যেদিন তুমি তোমার আমলনামা নেকীশূন্য পাবে, অথচ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে নেকী উপার্জন করেছিলে? তুমি বলবে, আমার নেকী কোথায় গেল? উত্তরে তোমাকে বলা হবে, তোমার নেকীসমূহ তোমার হকদারদের আমলনামায় চলে গেছে। শুধু তাই নয়, তুমি তোমার আমলনামাকে গোনাহে পরিপূর্ণ দেখতে পাবে; অথচ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তুমি এসব গোনাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

থেকে আত্মরক্ষা করেছিলে। তুমি জিজ্ঞেস করবে— ইলাহী, এসব গোনাহ তো আমি কখনও করিনি। এগুলো আমার আমলনামায় কেন? উত্তর হবে— এগুলো সে সব লোকের গোনাহ, যাদেরকে তুমি গালি দিয়েছিলে, যাদের গীবত করেছিলে, ক্ষতি করেছিলে এবং ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকিয়েছিলে।

পুলসিরাত ঃ অতঃপর হে মিসকীন, নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ -

অর্থাৎ, যেদিন আমি পরহেযগারদেরকে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে রহমান আল্লাহর কাছে একত্রিত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

অতঃপর এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ, তাদেরকে চালনা কর জাহান্নামের পথে এবং তাদেরকে থামিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ভয়াবহ অবস্থাসমূহের পর মানুষকে সিরাতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এটি দোযখের উপর নির্মিত। তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো ও চুলের চেয়ে অধিক সরু একটি পুল। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে জীবন যাপন করবে, সে আখেরাতের পুলসিরাতে হালকা হবে এবং নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে অধিক পাপের কারণে যার পৃষ্ঠদেশ ভারী হবে, পুলসিরাতের প্রথম ধাপেই তার পদস্খলন ঘটবে এবং সে দোযখে পতিত হবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— পুলসিরাত দোযখের মাঝখানে স্থাপিত হবে। পয়গম্বরগণের মধ্যে আমি উম্মতকে নিয়ে তাতে অবতরণ করব। সেদিন পয়গম্বরগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না। সকল পয়গম্বর এ কথাই বলবেন— “আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ বাঁচাও।” দোযখে সা’দানের কাঁটার মত কাঁটা থাকবে। (সা’দান এক প্রকার ঘাস, যাকে উট খুব চিচিয়ে খায়। এর কাঁটার আকৃতি স্তনের অগ্রভাগের মত।) তোমরা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

সা'দানের কাঁটা দেখেছ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আকৃতি সে রকমই হবে; কিন্তু বড় কতটুকু হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের আমল অনুসারে সে কাঁটা তাদের গায়ে বিদ্ধ হবে। কেউ কেউ তো তার বদ আমলের কারণে ধ্বংসই হয়ে যাবে। কেউ নিষ্পেষিত হয়ে সরিষার মত হয়ে যাবে এবং পুনরায় নিষ্পেষিত হবে।

আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, মানুষ দোযখের পুলের উপর দিয়ে গমন করবে। তার উপর থাকবে কাঁটা এবং অগ্রভাগ বাঁকানো লোহার শলাকা, যা ডান ও বাম দিক থেকে এসে মানুষকে জড়িয়ে ধরবে। পুলের উভয় পার্শ্বের ফেরেশতারা বলবে— ইলাহী, বাঁচাও, ইলাহী, বাঁচাও। কোন কোন লোক বিদ্যুতগতিতে পুল পার হয়ে যাবে— কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, কেউ হাঁটার মত এবং কেউ দৌড়ের বেগে অতিক্রম করবে। যারা দোযখের স্থায়ী অধিবাসী, তারা মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। কিন্তু যারা গোনাহের কারণে যোযখে যাবে এবং জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে, তাদের জন্যে শাফায়াতের অনুমতি হবে এবং তারা একদিন না একদিন মুক্তি পাবে।

শাফায়াত ঃ আযাবের যোগ্য বলে প্রমাণিত কোন কোন ঈমানদারের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কৃপা করতে চাইবেন। সেমতে তাদের সম্পর্কে শাফায়াত করার জন্যে তিনি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি দেবেন। এ কাজের জন্য যাঁরা অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন, তারা হলেন পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্তবা ও সদাচরণের অধিকারী ব্যক্তি। তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের শাফায়াত কবুল করবেন। অতএব, তাঁদের কাছে শাফায়াতের মর্তবা হাসিল করার জন্য মানুষের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর কয়েকটি উপায় রয়েছে—

(১) কোন মানুষকে কখনও হেয় মনে করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর "বেলায়েত" (বন্ধুত্ব) বান্দাদের মধ্যে গোপন রেখেছেন। অতএব, তোমার দৃষ্টিতে যে হেয় হতে পারে, সে আল্লাহর ওলী হতে পারে।

(২) কোন গোনাহকে কখনও ছোট মনে করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর গযব তাঁর অবাধ্যতাসমূহের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন। অতএব, যে গোনাহকে তুমি সামান্য মনে করবে, তার মধ্যে আল্লাহর গযব নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

(৩) কোন আনুগত্য ও এবাদতকে ক্ষুদ্র মনে করবে না। কারণ, আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তা'আলা নিজ সন্তুষ্টি তাঁর এবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে গোপন রাখতে পারেন। অতএব, যে এবাদতকে তুমি ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে, তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিও থাকতে পারে।

শাফায়াতের প্রমাণ কোরআন শরীফ ও হাদীসে অনেক বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى -

অর্থাৎ— অচিরেই আপনার পালনকর্তা আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি পাঠ করলেন ঃ

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত এবং যে অবাধ্যতা করে, তার জন্য তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

এরপর তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই উক্তি তেলাওয়াত করলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ -

অর্থাৎ— তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত তুলে বললেন ঃ ইলাহী, আমার উম্মতের কি হবে? একথা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমার হাবীবের কাছে যাও এবং কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস কর। সেমতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি উম্মতের কারণে কাঁদছি। অথচ এসবই আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে একথা আরয

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

করলে নির্দেশ হল ঃ যাও, আমার হাবীবকে বলে দাও, আমি তার উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন— আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে। এক, এক মাসের ব্যবধান থেকে আমার ভীতি। দুই, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারও জন্য তা হালাল ছিল না। তিন, আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। এর মাটিকেও পবিত্র করার উপাদান করা হয়েছে। অতএব, নামাযের সময় হয়ে গেলে আমার উম্মত পানি না পেলেও নামায পড়তে পারে। কেননা, তায়াম্মুমের মাটি সর্বত্রই মওজুদ রয়েছে। নামায পড়ার জন্য বিশেষ জায়গারও শর্ত নেই। কারণ, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠই সেজদার স্থান। চার, আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পাঁচ, প্রত্যেক নবী বিশেষ ভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আমি বিশ্বমানবের জন্যে প্রেরিত হয়েছি। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন আমি নবীগণের ইমাম হব। কিন্তু তাই বলে গর্ব করি না। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার। এজন্য গর্ব করি না। ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে যারা উত্থিত হবে, আমি হব তাদের প্রথম ব্যক্তি। আমি প্রথম সুপারিশকারী হব এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমার হাতে থাকবে হামদের পতাকা। আদম (আঃ) ও অন্য সবাই এর তলে থাকবে। আরও এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয়। আমি চাই , আমার দোয়াটি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য কিয়ামতের দিন ব্যবহার করব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের জন্য স্বর্ণের মিম্বর বিছানো হবে। তাঁরা তার উপর বসবেন। কিন্তু আমার মিম্বর খালি থাকব। আমি তাতে বসব না এবং পরওয়ারদেগারের সামনে এই আশংকায় দাঁড়িয়ে থাকবে যে, আমাকে না আবার জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয় অথচ আমার উম্মত পেছনে থেকে যায়। আমি আরয করব ঃ পরওয়ারদেগার, আমার উম্মত! আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করবেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার উম্মতের সাথে আমার কি আচরণ প্রত্যাশা কর? আমি আরয করব ঃ ইলাহী! তাদের হিসাব দ্রুত সম্পন্ন হোক। এভাবে আমি সুপারিশ করতে থাকব। অবশেষে যারা দোযখে প্রেরিত হয়ে গেছে, তাদেরও মুক্তির আদেশনামা আমি পেয়ে যাব। দোযখের দারোগা মালেক বলবে ঃ হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে গযবের আগুনের কোন প্রাপ্য রাখেননি।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে গোশত আনা হল এবং তা থেকে একটি বাহু তাঁকে দেয়া হল। কারণ, এটা তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি বাহুর মাংস দাঁত দিয়ে কাটলেন, অতঃপর বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি মানুষের সরদার হব। এর কারণ কি তোমরা জান? আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এক ময়দানে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে চোখের সামনে রাখবেন। সূর্য মাথার উপরে নিকটেই থাকবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত থাকবে। তারা একে অপরকে বলবে ঃ দেখ না, আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে? এমন কোন লোক তালাশ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করবেন। সেমতে তারা বলবে, চল হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে যাই। তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি মানব-পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সেজদা করিয়েছেন। আজ আপনার পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় আছি। আদম (আঃ) জওয়াবে বলবেন, আজ আমার পরওয়ারদেগার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। এরূপ ক্রুদ্ধ পূর্বেও হননি এবং পরেও হবেন না। এছাড়া তিনি আমাকে জান্নাতের একটি ফল খেতে বারণ করেছিলেন। আমি তাঁর আদেশ মান্য করিনি। তাই আমার নিজের প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে পড়েছে। তোমরা হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করবে, আপনি পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে প্রথম রসূল হয়ে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা আখ্যা দিয়েছেন। আজ আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখুন, আমাদের কী দুরবস্থা! তিনি জওয়াব দেবেন, আজ আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক রাগান্বিত। এরূপ রাগ এর পূর্বেও হননি এবং পরেও হবে না। এছাড়া আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি বদ দোয়া করেছিলাম। তাই আমি নিজের চিন্তায়ই বাঁচি না। তোমরা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও। সেমতে তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করবে, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর এবং সকল মানুষের মধ্যে আপনিই তাঁর খলীল। দয়া করে পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দেবেন, আমার পরওয়ারদেগার আজ এমন ক্রুদ্ধ যে, এর আগে তিনি কখনও এরূপ হননি এবং পরেও হবেন না। তাছাড়া, আমি তিনবার অসত্য বলেছিলাম। তাই আমি এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে একাধারে রেসালত ও কালাম উভয়টি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখন পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমাদের দুরবস্থা তো আপনার অজানা নেই। হযরত মূসা (আঃ) জওয়াব দেবেন, আমার পরওয়ারদেগার এত রাগান্বিত যে, এর আগে কখনও এরূপ হননি এবং পরেও হবেন না। আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর আদেশ ছাড়াই খুন করেছিলাম। তাই আমি নিজেকে নিয়েই উৎকণ্ঠিত। তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আল্লাহর রসূল, মরিয়ম (আঃ)-কে প্রদত্ত তাঁর কলেমা এবং তাঁর রূহ। আপনি মাতৃক্রোড়ে থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত ঈসা (আঃ) জওয়াবে আল্লাহ তা'আলার অভূতপূর্ব ক্রোধের উল্লেখ করে বলবেন, আমি আজ নিজের চিন্তায়ই মগ্ন। তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যাও।

অতঃপর মানুষ আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগের ও পেছনের সকল গোনাহ মার্জনা করেছেন। পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমি আরশের নীচে উপস্থিত হয়ে পরওয়ারদেগারের উদ্দেশে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে এমন বিষয় খুলে দেবেন, যা পূর্বে কারও কাছে খোলেননি। এরপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা তোল। চাও, যা চাইবে, পাবে। শাফায়াত কর। তোমার শাফায়াত কবুল হবে। সেমতে আমি মাথা তুলে বলব, উম্মতী, উম্মতী, ইয়া রব অর্থাৎ, আমার উম্মতকে মাফ করে দাও। এরশাদ হবে, হে মুহাম্মদ, তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে ভেতরে পৌঁছে দাও। বাকী দরজাগুলোতে তোমার উম্মত অন্যদের সাথে শরীক। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতের দু'কপাটের মধ্যে দূরত্ব এতটুকু, যতটুকু মক্কা ও হেমইয়ারের মধ্যে অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যে রয়েছে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তিনটি অসত্য ভাষণও উল্লিখিত আছে। এক— তারকারাজি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ঃ هٰذَا رَبِّىْ এ আমার পরওয়ারদেগার! দুই— কাফেরদের উপাস্য মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে চুরমার করার পর বলেছিলেন—

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا

অর্থাৎ, বরং এটা তাদের এই বড় মূর্তির কাজ। তিন—কাফেররা তাঁকে মেলায় নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেছিলেন—إِنِّيْ سَقِيْمٌ —আমি অসুস্থ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতের আলেম ও সৎ ব্যক্তিরাও সুপারিশ করবে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, এক ব্যক্তিকে আদেশ করা হবে— ওঠ এবং সুপারিশ কর। সে উঠে আপন বংশধর ও পরিবার-পরিজনের জন্য এবং আমল অনুযায়ী দু'এক ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করবে।

হাউযে কাওছার ঃ হাউয একটি অনন্যসাধারণ দান, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এর গুণাগুণসম্বলিত অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, তিনি দুনিয়াতে এর জ্ঞান এবং আখেরাতে এর স্বাদ নসীব করবেন। এই হাউযের প্রভাব এই যে, কেউ এর পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হয় না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হালকা নিদ্রার পর যখন গাত্রোত্থান করলেন,তখন তাঁর চোখে-মুখে হাসির রেখা সুস্পষ্ট ছিল। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন ঃ একটি আয়াত আমার প্রতি এই মুহূর্তে অবতীর্ণ হয়েছে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ অর্থাৎ, আমি আপনাকে কাওছার দান করলাম।

তিনি আরও বললেন ঃ তোমরা জান কাওছার কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি একটি নির্ঝরিণী, যা আমার পরওয়ারদেগার আমাকে জান্নাতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে একটি বরকতময় হাউয আছে। আমার উম্মত কিয়ামতের দিন এই হাউযে যাবে। এর পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ (মেরাজের সফরে) আমি জান্নাত পরিভ্রমণ করেছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল একটি নহরের উপর, যার দু'সারি মোতি নির্মিত খিলানসমূহ শূন্যগর্ভ ছিল।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা কাওছার, যা আপনাকে আপনার রব দান করেছেন। এরপর ফেরেশতা তাতে হাত লাগালে দেখা গেল এর মাটি ইযফির জাতীয় মেশ্ক।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, ইন্না আ'তাইনা সূরা অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ কাওছার জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর। এর কিনারা স্বর্ণের এবং এর পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং মেশ্‌কের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এই পানি মুক্তা ও প্রবালের কংকরের উপর প্রবাহিত।

দোযখ ও তার ভয়ানক অবস্থা ঃ লোক সকল, তোমরা ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল দুনিয়ার ধান্দায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের সম্পর্কে গাফেল হয়ে আছ। অথচ এখান থেকে তোমাদের একদিন না দিন চলে যেতে হবে। অতএব, এখানকার চিন্তা বাদ দিয়ে তোমরা সে জায়গার কথা চিন্তা কর, যেখানে তোমরা অবতরণ করবে। অর্থাৎ এটা জানা হয়ে গেছে যে, জাহান্নামের আগুন সকলেরই অবতরণস্থল। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থাৎ,— তোমাদের প্রত্যেকেই সেখানে (জাহান্নামে) অবতরণ করবে। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।

এ আয়াত দৃষ্টে অবতরণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত এবং মুক্তি পাওয়া সন্দিগ্ধ। সুতরাং এখন মনে মনে এই অবতরণস্থলের ভয়াবহতা চিন্তা কর। এতে আশা করা যায়,আত্মরক্ষার প্রেরণা জাগ্রত হবে।

হাশরের ময়দানে মানুষ যখন সুপারিশকারীর সুপারিশের ফলাফল জানার অপেক্ষা করবে, তখন অপরাধীদেরকে গভীর অন্ধকার এসে ঘিরে ফেলবে এবং তাদেরকে স্ফুলিঙ্গ বিস্তারকারী আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তাদের কানে আসবে, যা ক্রোধের পরিচায়ক। তখন অপরাধীরা নিজেদের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং সবাই নতজানু হয়ে বসে পড়বে। দোযখের এক ফেরেশতা একথা বলতে বলতে বের হবে ঃ কোথায় অমুকের পুত্র অমুক, যে দুনিয়াতে দীর্ঘ আশা পোষণ করে সৎ কাজে বিলম্ব করত এবং মন্দ কাজে জীবন বরবাদ করত। ফেরেশতা লোহার গদা নিয়ে তার প্রতি ধাবিত হবে এবং আযাবের দিকে টেনে নিয়ে উপুড় করে দোযখের গভীরে নিক্ষেপ করবে। এরপর বলবে, স্বাদ আস্বাদন কর এবং এই অগ্নিশালাতেই বন্দী থাক। এখানে খেতে হবে

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

আগুন, পান করতে হবে আগুন, বস্ত্র হবে আগুনের এবং শয্যা হবে আগুনের।

দোযখের সাতটি স্তর একটি অপরটির উপরে রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জাহান্নাম, এরপর সাকার, এরপর লাযা, এরপর হুতামা, এরপর সাঈর, এরপর জাহীম এবং সর্বনিম্ন স্তরকে বলা হয় হাবিয়া। হাবিয়ার গভীরতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই; যেমন দুনিয়ার কামনা-বাসনারও কোন সীমা নেই। দোযখের স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্য তেমন, যেমন মানুষের দুনিয়া নিয়ে মত্ত হওয়ার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। কেউ কেউ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকে, আবার কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে আগুনের শাস্তিও তাদের বিভিন্নরূপ হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কণা পরিমাণও যুলুম করবেন না। এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি দোযখে যাবে, তার উপর উপর্যুপরি সব রকম আযাব হওয়া অপরিহার্য নয়, বরং প্রত্যেকের আযাব একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত হবে, যা তার নাফরমানীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এরপরও যে ব্যক্তি ন্যূনতম আযাব ভোগ করবে, তার অবস্থা এমন হবে যে, সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়, সে কষ্টের তীব্রতার বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখে ন্যূনতম আযাব হবে ঃ দু'টি আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। যার ফলে তার মগজ উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করতে থাকবে। দেখ, যার হালকা আযাব হবে, তারই যখন এই অবস্থা হবে, তখন যে ব্যক্তি কঠোর আযাব ভোগ করবে, তার কি অবস্থা হবে? আগুনের আযাবের ব্যাপারে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তবে আঙ্গুল আগুনের কাছে নিয়ে যাও এবং এ থেকে দোযখের আগুন কেমন হবে,তা অনুমান করে নাও। কিন্তু তোমার এই অনুমানও সঠিক হবে না। কেননা, দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুল্য নয়। তবে দুনিয়াতে কোন শাস্তি আগুনের শাস্তির তুলনায় কঠোরতম নয় বিধায় দোযখের শাস্তি বুঝবার জন্যে দুনিয়ার আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নতুবা দোযখীদেরকে দোযখের আগুনের পরিবর্তে দুনিয়ার আগুন দেয়া হলে তারা খুশীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ, দোযখের আগুনের কষ্ট অনেক বেশী। এর তুলনায় দুনিয়ার আগুন যেন সুখের বস্তু। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ার আগুনকে রহমতের পানি দ্বারা ধৌত করার পর এটা দুনিয়ার মানুষের ব্যবহারোপযোগী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশে জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে। ফলে, এখন সেটা কাল অন্ধকারে পরিণত হয়ে আছে। অন্য এক হাদীসে আছে, দোযখ তার পরওয়ারদেগারের কাছে অভিযোগ করে বলল ঃ ইলাহী, আমার কতক অংশ কতক অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'টি শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন— একটি শীতকালে ও একটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে তুমি যে অসহ্য গরম অনুভব কর, সেটা দোযখের শ্বাসেরই উত্তাপ। আর শীতকালে যে কনকনে শীত পড়ে, সেটা তারই শ্বাসের প্রভাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক ঐশ্বর্যে লালিত অপরাধীকে উপস্থিত করে আদেশ করা হবে একে আগুনে ডুবিয়ে আন। ডুবানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুনিয়াতে কখনও সুখ পেয়েছিলে কি? সে বলবে, না। পক্ষান্তরে যে মুমিন দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্ট ভোগ করবে, তাকে এনে আদেশ করা হবে, একে জান্নাতে ডুবিয়ে আন। ডুবানোর পর তাকে প্রশ্ন করা হবে, দুনিয়াতে তুমি কখনও কষ্ট ভোগ করেছ কি? সে বলবে, না।

দোযখীদের দেহ থেকে এত বেশী দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ প্রবাহিত হবে যাতে দোযখীরা ডুবে যাবে। কোরআনের ভাষায় এই পুঁজের নাম "গাস্‌সাক"। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি জাহান্নামের এক বালতি গাসসাক দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তবে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। দোযখীরা পিপাসায় কাতরোক্তি করলে এই পুঁজ তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। সেমতে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ –

অর্থাৎ— তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং সেটা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হবে। চারদিক থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু; কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاۤءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاۤءَتْ مُرْتَفَقًا -

অর্থাৎ— তারা পানির জন্যে কাতরোক্তি করলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটা কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!

এরপর তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেয়া হবে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّاۤلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ -

অর্থাৎ— অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীরা, তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে। অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি— পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মত।

আরও বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْۤ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ— এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে। এর মোচা সাপের ফণার মত। জাহান্নামীরা এটা ভক্ষণ করবে, অতঃপর এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি এর সঙ্গে তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। পরে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে জাহান্নাম।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ –

অর্থাৎ— তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদেরকে পান করানো হবে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا –

অর্থাৎ— আমার কাছে আছে শৃঙ্খল, জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি যাক্কুমের একটি ফোঁটা দুনিয়ার স্থলভাগে পড়ে যায়, তবে পরিবেশ দূষণের কারণে দুনিয়ার সকল মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। অতএব, এটা যাদের খাদ্য হবে, তাদের কি দশা হবে!

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ের উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে আগ্রহী হও এবং যে বিষয়ে সতর্ক করেছেন, তাকে ভয় কর ও সতর্ক হও। অর্থাৎ তাঁর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং জাহান্নামকে ভয় কর।

জান্নাত ও তার অপার সুখ ঃ দোযখের বিপরীতে জান্নাত ও তার অশেষ আনন্দের কথাও স্মরণ করা দরকার। কেননা, যে ব্যক্তি এতদুভয়ের যে কোন একটি থেকে দূরে থাকবে, সে অবশ্যই অপরটিতে অবস্থান করবে। অতএব, দোযখের ভয়াবহতা চিন্তা করে অন্তরে ভয় সৃষ্টি করার সাথে সাথে জান্নাতের অনন্ত সুখ ও আনন্দের কথা ভেবে অন্তরে আশার সঞ্চার করা জরুরী।

জান্নাতের অবস্থা জানতে চাইলে তোমার উচিত কোরআন মজীদ পাঠ করা। এ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনার চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং সূরা আর-রহমানের وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সূরা ওয়াকেয়া ও অন্যান্য সূরা পাঠ কর। আর যদি হাদীসের দৃষ্টিতে জান্নাতের বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাও, তবে এক্ষেত্রে জান্নাতের কয়েকটি বিষয়ই বর্ণনা সাপেক্ষ।

(১) জান্নাতের সংখ্যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা আর-রহমানের

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্য নির্মিত। এর যাবতীয় আসবাবপত্র এবং অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই রৌপ্য নির্মিত হবে। এছাড়া আরও দু'টি জান্নাত থাকবে, যাতে আসবাবপত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছু হবে স্বর্ণ নির্মিত।

(২) জান্নাতের দরজাসমূহ মৌলিক এবাদতের সংখ্যানুসারে বিভিন্ন রূপ হবে। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দু'টি জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে। জান্নাতের দরজা আটটি। যে ব্যক্তি নামাযী হবে, তাকে নামাযের দরজা দিয়ে, যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, তাকে রাইয়্যান দরজা দিয়ে, যে ব্যক্তি দাতা হবে, তাকে দানের দরজা দিয়ে এবং যে ব্যক্তি মুজাহিদ হবে, তাকে জেহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। তবে কেউ এমনও হবে, যাকে সকল দরজা দিয়েই ডাকা হবে।

(৩) জান্নাতের কক্ষ ও সুউচ্চ স্তরও বিভিন্নরূপ হবে। মানুষের বাহ্যিক এবাদত ও আন্তরিক এবাদতের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে, তেমনি এগুলোর ছওয়াবেও পার্থক্য থাকবে। সুতরাং কেউ যদি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর পেতে চায়, তবে এবাদতের প্রতিযোগিতায় তার সকলের অগ্রে থাকার চেষ্টা করা উচিত। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীরা উচ্চস্তর বিশিষ্টদেরকে নিজেদের উপরে এমনভাবে দেখবে, যেমন তোমরা তারকাসমূহকে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে যেতে দেখ। কারণ, জান্নাতীদের মধ্যেও মর্তবার অনেক তফাৎ হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এই স্তরসমূহ কি কেবল পয়গম্বরগণই পাবেন? তাদের ছাড়া অন্যরা কি পাবে না? তিনি বললেন ঃ কেন পাবে না! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এই স্তরসমূহের অধিকারী তারা হবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

হযরত জাবের বর্ণনা করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন আমাদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে জান্নাতের জানালাসমূহের বর্ণনা দেব। আমি বললাম ঃ খুব ভাল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ জান্নাতের জানালা হবে মণিমুক্তা নির্মিত। এগুলো দিয়ে ভেতরের বস্তু বাইরে এবং বাইরের বস্তু ভিতরে মনে হবে। এগুলোর সুখ ও আনন্দ কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কেউ মনে মনেও কল্পনা করেনি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এসব জানালা কারা পাবে? তিনি বললেন ঃ যারা সালামের প্রসার ঘটায়, আহার করায়, সর্বদা

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

রোযা রাখে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমায়, তখন নামায পড়ে। আমরা বললাম ঃ এসব কাজের শক্তি কার আছে? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের এই শক্তি রয়েছে। আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার পর সালাম করে অথবা সালামের জওয়াব দেয়, সে সালামের প্রসার ঘটায়। যে নিজের পরিবার-পরিজনকে পেট ভরে আহার করায়, সে খাদ্য খাওয়ায়। আর যে রমযানের রোযা রাখে এবং প্রতিমাসে তিনটি করে রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখে। যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, সে রাতে নামায পড়ে, যখন অন্যরা অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজারীরা ঘুমায়।

(৪) জান্নাতের প্রাচীর, যমীন, বৃক্ষ ও নহর সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, যারা এগুলোতে থাকবে, তারা এসবের আকৃতি দেখে কতই না আনন্দিত হবে! পক্ষান্তরে যারা এ থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কতই না পরিতাপ করবে!

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাত প্রাচীরের এক ইট হবে রৌপ্যের এবং এক ইট স্বর্ণের। এর মাটি হবে জাফরান এবং কাদা মেশক। এক হাদীসে আছে— জান্নাতের নহরসমূহ মেশকের টিলা অথবা মেশকের পাহাড় থেকে নির্গত। অন্য এক রেওয়ায়েতে রসূল করীম (সাঃ) বলেন— জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী একশ' বছর চললেও তা শেষ হবে না। কোরআন মজীদে وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (সুদীর্ঘ ছায়ায়) বলা হয়েছে।

হযরত আবু উমামা বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম বলাবলি করতেন, আল্লাহ তা'আলা বেদুঈন ও তাদের সমস্যাদির দ্বারা আমাদেরকে উপকার পৌছান। একবার জনৈক বেদুঈন এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে কষ্টদায়াক বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন। জান্নাতে কোন কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকবে, এটা আমার জানা ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কোন্ বৃক্ষের কথা বলছ? সে আরয করল ঃ আমি বদরী বৃক্ষের কথা বলছি, যাতে কাঁটা থাকে। তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ অর্থাৎ, কন্টকহীন বদরী বৃক্ষের তলে। আল্লাহ তা'আলা এই বৃক্ষের কাঁটা কেটে দেবেন এবং প্রত্যেক কাঁটার জায়গায় একটি ফল লাগাবেন। প্রত্যেক ফলের উৎকৃষ্ট স্বাদ হবে এবং একটি অপরটির সাথে মিলবে না।

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

(৫) জান্নাতীতের পোশাক, শয্যা, আসন, তাঁবু ইত্যাদিও উৎকৃষ্টতর হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীদেরকে স্বর্ণের কংকণ ও মোতি পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী। কোরআনের আয়াতসমূহে এর আরও অনেক বিবরণ রয়েছে। হাদীসেও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে— যে জান্নাতে দাখিল হবে, সে নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে। সে অভাবগ্রস্ত হবে না। তার বস্ত্র পুরাতন হবে না। যৌবন অক্ষুণ্ন থাকবে। জান্নাতের নেয়ামত এমন, যা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং মনও কল্পনা করেনি।

(৬) জান্নাতীদের আহার্য বস্তু সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের খাদ্য, ফলমূল, মোটা তাজা পাখি, মান্না ও সালওয়া, মধু, দুধ, আরও অসংখ্য প্রকারের বস্তু হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে—

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ـ

অর্থাৎ— যখনই তারা সেখানকার কোন ফল খাওয়ার জন্যে পাবে, তখনই বলবে— এটা তো আমরা পেয়েছিলাম ইতিপূর্বে। বস্তুত তাদেরকে এক রকম খাদ্যই দেয়া হবে। জান্নাতীদের পানীয় দ্রব্যের অবস্থাও অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ছওবান (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। এক পর্যায়ে সে বলল ঃ পুলসিরাতে সর্বপ্রথম কারা অবতরণ করবে? তিনি বললেন ঃ ফকীর-মুহাজিরগণ। ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জান্নাতে যাওয়ার পর তারা কি উপঢৌকন পাবে? তিনি বললেন ঃ মাছের কলিজার কাবাব। সে বলল ঃ এরপর তাদের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের বলদ, যেগুলো জান্নাতের কিনারায় খায়-দায়। এগুলো তাদের জন্যে যবাই করা হবে। সে প্রশ্ন করল ঃ তারা পানি কী পান করবে?

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

তিনি বললেন ঃ তারা "সালসাবিল" নামক ঝরনা থেকে পানি পান করবে। ইহুদী বলল ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের জওয়াবে বললেন ঃ জান্নাতীদের এক একজনকে একশ' পুরুষের পানাহার ও সহবাসের শক্তি দান করা হবে। ইহুদী বলল ঃ যে পানাহার করে, তার পায়খানা করার প্রয়োজন হয়। তিনি বললেন ঃ পায়খানার পরিবর্তে তাদের ত্বক থেকে মেশকের মত প্রবাহিত হবে। এতেই পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের পাখী দেখে তুমি তা খাওয়ার ইচ্ছা করলে তোমার সামনেই পাখীটি যবাই হয়ে ভাজা হয়ে যাবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ — এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন— জান্নাতীদের মধ্যে সত্তরটি স্বর্ণের পিয়ালা পেশ করা হবে। প্রত্যেকটিতে নতুন ধরনের খাদ্য থাকবে, যা অন্যটিতে থাকবে না।

(৭) হূর ও গেলমানের গুণাবলী কোরআন মজীদ নানা জায়গায় বর্ণনা করেছে এবং হাদীসে অধিক ব্যাখ্যাসহকারে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহর পথে একবার সকালে অথবা বিকালে যাওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারও পা রাখার জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে কোন রমণী পৃথিবীতে এসে গেলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল উজালা হয়ে যাবে এবং সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যাবে। তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা মূল্যবান।

আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন—

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

অর্থাৎ, এই রমণীগণ যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ।

আয়াতের তাফসীরে তিনি এরশাদ করেন— পর্দার অন্তরালে তাদের মুখাকৃতি আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখা যাবে। তাদের অলংকারের সামান্য

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

মোতিও পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে দেবে। তাদের দেহে সত্তরটি কাপড় এমন থাকবে যে, মানুষের দৃষ্টি সেগুলো পার হয়ে যাবে। তাদের গোছার মগয অস্থির ভিতরে দৃষ্টিগোচর হবে।

হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—মে'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতের ইয়াবযখ নামক এক জায়গায় গেলাম। সেখানে মোতি, সবুজ পান্না ও লাল পদ্মরাগ মণির তাঁবু ছিল। তাঁবুর রমণীরা আমাকে ' আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ' বললে আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম ঃ এই কণ্ঠস্বর কোন্ রমণীদের? তিনি বললেন ঃ এই রমণীগণ তাঁবুর মধ্যে পর্দানশীন। তারা পরওয়ারদেগারের কাছে আপনাকে সালাম করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ

অর্থাৎ, সুলোচনা ও তাঁবুতে অবস্থানকারিণী রমণীগণ।

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (পবিত্র স্ত্রীগণ) আয়াতাংশের তাফসীরে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ পবিত্র হওয়ার অর্থ তারা হায়েয, প্রস্রাব-পায়খান, থুথু, বীর্য, প্রসব ইত্যাদি থেকে পবিত্র হবে।

আবদুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির অধীনে এক হাজার খেদমতগার থাকবে। প্রত্যেক খেদমতগার এমন কাজ করবে, যা অন্যে করবে না। হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, জান্নাতে সুলোচনা রমণীগণ গান গায় এবং বলে— আমরা অপরূপা সুন্দরী রমণী। ভদ্রলোকদের জন্যে আমাদেরকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ

অর্থাৎ, তারা বাগানে সম্বর্ধিত হবে।

আয়াতাংশের তাফসীরে ইয়াহইয়া ইবনে কাছির বলেন ঃ জান্নাতে রাগ ও সঙ্গীত থাকবে।

আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতী

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

ব্যক্তির শিয়র ও পায়ের কাছে বসে দু'জন হূর অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে গীত শুনায়। মানুষ ও জিন উৎসাহভরে এই গীত শুনে।

আল্লাহ তা'আলার রহমত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) শুভ লক্ষণ পছন্দ করতেন। মাগফেরাত আশা করার মত নেক আমল আমাদের নেই বিধায় আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর অনুকরণে শুভ লক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আশা করছি, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের পরিণাম শুভ করবেন। সেমতে আমরা এই গ্রন্থটি রহমতের আলোচনা দ্বারা সমাপ্ত করছি।

রসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলার একশ'টি রহমত থেকে মাত্র একটি রহমত পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে নাযিল করেছেন। এ থেকেই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী পরস্পর দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। তিনি নিরানব্বইটি রহমত পেছনে রেখেছেন। সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন বান্দাদের প্রতি রহমত করবেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচ থেকে একটি লিখিত কাগজ বের করবেন। তাতে লেখা থাকবে— আমার রহমত আমার গযবের উপর প্রবল। আমি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিকতর মেহেরবান। এরপর দোযখ থেকে জান্নাতীদের দ্বিগুণ সংখ্যক লোক বের হয়ে যাবে।

এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেন— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান হবেন এবং বলবেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে একজন করে ইহুদী ও খৃষ্টানকে দোযখে নিক্ষেপ করেছি।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— যখন দোযখীরা দোযখে একত্রিত হবে এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুসংখ্যক মুসলমানও থাকবে, তখন কাফেররা মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করবে— তোমরা কি দুনিয়াতে মুসলমান ছিলে না? তারা জওয়াব দিবে, হাঁ, ছিলাম। কাফেররা বলবে— তাহলে তোমাদের ইসলাম তোমাদের জন্যে উপকারী হল না কেন? আজ তোমরা ও তো আমাদের সাথে দোযখে রয়েছ। মুসলমানরা বলবে— আমরা অনেক গোনাহ করেছিলাম। তাই সাজাপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কথাবার্তা শুনবেন এবং আদেশ করবেন, দোযখে যে সকল মুসলমান রয়েছে, তাদের সকলকে বের করে দাও। অতঃপর আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে বের করে আনা হবে। এটা দেখে কাফেররা বলবে— হায়, আমরাও মুসলমান হলে এমনিভাবে মুক্তি পেতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

www.islamfind.wordpress.com

1st-5th part

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, প্রায়ই কাফেররা বাসনা করবে, যদি তারা মুসলমান হত!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী জননীর যে অনুকম্পা, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা তার চেয়ে অনেক বেশী।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার সৎকর্ম পাপকর্মের তুলনায় বেশী হবে, সে বে-হিসাব জান্নাতে দাখিল হবে। যার সৎকর্ম ও পাপকর্ম সমান সমান হবে, সে সামান্য হিসাবের পর জান্নাতে দাখিল হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শাফায়াত সে ব্যক্তির জন্যে, যার পিঠ পাপকর্মের বোঝায় অত্যধিক ভারী হবে।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— কিয়ামতের দিন আরশের নীচ থেকে ঘোষণা করা হবে— হে উম্মতে মুহাম্মাদী, আমার যে হক তোমাদের যিম্মায় ছিল, তা আমি মাফ করে দিলাম। এখন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল হক রয়েছে, সেগুলো তোমরা একে অপরকে মাফ করে দাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার অপার ও অসীম রহমতের সুসংবাদ দেয়। সেমতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সাথে সেই আচরণ না করেন, যার আমরা যোগ্য এবং তাঁর কৃপা, দান, অনুগ্রহ ও রহমতের আচরণই যেন আমাদের নসীব হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا -

© PDF created by haiderdotnet@gmail.com

www.islamfind.wordpress.com